

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্তিক—চৈত্র

১৩৩১

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

কার্তিক, ১৩৩২

১ম সংখ্যা

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—বড়বাঙ্গার
১৯ অক্টোবর ১৯১৯]

বরেণ্ড

তোমার রাখা সাদরে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করলুম।
ছবির নূতন প্রফ্ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন।
লাল আঙ্গ যাচ্ছেন—বোধ হয় তোমার সঙ্গে খুব এক-
ট ঝগড়া ক'রে নেবেন।

আমার বরোদায় নিমন্ত্রণ আছে। খাব কি না
হ'।

বাংলার উপর দিয়ে যশু একটা ঝড় গেছে। এখনো
ধবর পাইনি। আমাদের চাষাদের ধান যদি কাত
পাকে তবে আমাদেরও সেই সঙ্গে ভূমিসাৎ হ'তে

শিশু বের হয়নি ব'লে অনেকের নিকট হ'তে লাঞ্ছনা
হা যাচ্ছে। অত আগে থাকতে ঘোষণা করলে কেন?
রিপের কাছে সত্য রক্ষা না করলে তাদের প্রজা
বে।

কোথাও পালাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু পথ পাচ্চিনে—

পাথেরও অভাব। ঈশ্বর যদি জানা দিতেন তা হ'লে
রেলোয়ে কোম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হ'ত।
জানা যদি না দিলেন তা হ'লে মনটাকে অচল করলে
কোনো নালিশের কারণ থাকত না।

ইতি ২রা কার্তিক, ১৩১৬।
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—বোলপুর
৪ নভেম্বর ১৯১৯]

স্বহৃদয়েণ্ড

তোমাকেই চিঠি লিখ ব'লে স্থির ছিল, এমন সময়
মণিলালকে প্রবাসী সংকলনের জন্তে একটা চিঠি লেখা
অক্ষরি হ'য়ে উঠল, তাই নিতান্ত অলসপ্রকৃতি-বশত সব
কথা একচিঠিতে লিখে শ্রমলাঘবের কৌশল উদ্ভাবন
করেছিলুম। এমনি ক'রেই মাহুভ অপরাধের সৃষ্টি করে
এবং যেটিকে লাঘব করবার জন্তে এত ফন্দি করে

* এই চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চারুকলা বন্দোপাধ্যায়কে
লিখিয়াছিলেন।

সেইটেকেই দশগুণ বাড়িয়ে তোলে। তোমাকেই লেখা আমার কর্তব্য ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই—তুমি মনে যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের চেয়ে গুরুদণ্ডস্বরূপ বিধান করেছেন—আমি অত্যন্ত অমৃত্যুপ ভোগ করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

গানের বই সংশোধন করা যদি সম্ভব হয় তা হ'লে ভালোই হয়—একজন্মে খতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।

কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমার কোনো কথায় উত্তেজিত হ'য়ে নিজের কোনো ক্ষতির কারণ ঘটায়ো না। তা হ'লে সেটাও আমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। গোরা তোমরা সময়-মত এবং সুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার কোনো ক্ষতি থাকবে না। আমার মনে এই ছিল যে, ধীরে ধীরে ছাপালে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভুল থাকবার আশঙ্কা থাকবে না, সেইজন্মেই তাগিদ দিয়েছি। নিজের বই সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বভাবতই অধীর ও অসহিষ্ণু—প্রকাশক হ'য়ে আশু যদি সেটা সহ্য করার শক্তি তোমার না হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাবছি। চিত্তকে পরীক্ষার মতো গঠন করতে না পারলে গ্রন্থকার-সমূহের উন্নত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিকতে পারবে না। আমার কথায় বিচলিত হোয়ো না—আমি তোমার উপরে রাগ ক'রে একেবারে আগুন হ'য়ে থাকব আমার এমন কদম্বতা তুমি কল্পনা করো না। এই পবিত্র কাগজখণ্ডে পবিত্র কালী দিয়ে আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিচ্ছি তোমার উপরে আমার শিকি পয়সার রাগ নেই। বিশেষত তুমি ভ্রমক্রমে একটা গলদ ক'রে ফেলেছ, সেটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড, তার উপরে এই সুযোগে আমি যদি তোমার প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে দাঁড়াই তা হ'লে ঈশ্বর আমাকেই বা ক্ষমা করবেন কেন? তোমার দুঃখে তুমি আমাকে ব্যথিত ব'লেই জেনো, ক্রুদ্ধ ব'লে মনে করো না।

যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তা হ'লেই দিয়ে, নতুবা যদি বিরক্ত হ'য়ে দাও তা হ'লে আমার প্রতি নির্দয়তা করা হবে—কখনো তা করো না। দেখ, এইসমস্ত বই-ছাপানো প্রভৃতি যে জগাল নিয়ে এই বুদ্ধবঙ্গ পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশী দিন

পর্য্যন্ত চলবে না—এইজন্মেই যা লিখেছি তা যথাসম্ভব নিতুল ক'রে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্ত মন ব্যগ্র হয়েছে। যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন আমারও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হবে। খুড়ি খুড়ি ভুল যদি ছাপিয়ে যাই তা হ'লে পাছে আমার প্রেতাত্মা সেই ভুলগুলোতে জড়িয়ে প'ড়ে দিনরাত্রি ইণ্ডিয়ান পার্লি'শং হোসকে ঘিরে ঘিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায় এই আমার একটা মস্ত ভয় আছে—অতএব ভুল সংশোধন না হ'লে আমার গয়ায় পিণ্ডদান হবে না। কিন্তু, হায়, হায়, কত শত পিণ্ডেরই যে প্রয়োজন হবে!

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণ ক'রে আমাকে ক্ষমা কর। ইতি ১৬ই কার্তিক, ১৩১৬।

তোমার—

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ইণ্ডিয়ান পার্লি'শং হাউস থেকে আমি কবীন্দ্রের যেসব বই প্রকাশ করি তার ছাপা সম্বন্ধে তিনি খুঁত ধরে মনে করেন বঙ্গবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নব-প্রতিষ্ঠিত কার্তিক-প্রেসে ছাপতে দিলে ভালো ছাপা হবে। চাক।]

[পোস্টমার্ক—একসপেরিমেন্টাল পি, ও (শান্তিনিকেতন); ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ বোলপুর।]

ও

শ্রদ্ধবরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভালো করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সূত্রাধা হবে না। সেজন্মেও না—আসল কথা, অনেক দিন ধ'রে লিখে আসছি, বয়সও কম হয়নি—আর অল্পকাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে—আমি যখন রক্তমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নির্বিঘ্নে সরে যাব তখন সকলপ্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব—তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখা-

শুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবাব কোনো দরকার নেই, কেননা আমার কবিতা ত রয়েইছে—যদি ভালো হয় ত ভালোই, যদি ভালো না হয় ত ও আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশঙ্কে স'রে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধূলো ওড়াতে ইচ্ছা করিনে। তোমরা আমার লেখা ভালো বললে আমার ভালো লাগে না এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হয়—প্রশংসা শুনে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে—সেইজন্তাই ঐ নেশাটাকে প্রশংস দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না—কারণ, ঐ জিনিষটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা—অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয়, নিজের প্রশংসাবাদ শোনার ইচ্ছা—সেই ইচ্ছা এ-সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যাঙ্কিক ভালোবাসে—নিজের নাম নামক জিনিষ এমনি একটা বিস্ত্রী জিনিষ। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্যিসেই হোক আর ইংলিশ অক্ষরেই হোক ছাপিয়ে—এখন ওটাকে টাকা দিয়ে আড়াল ক'রে রাখ, যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও, ঐটেকে সর্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দিকে বিদ্রোহের বিষ মখিত ক'রে তুলো না।

কাল থেকে জরে পড়েছি। ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শিলাইদা

৩ নভেম্বর ১৯১০]

ও

প্রিয়বরেষু

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে, সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চলবে না। নিষিদ্ধ ছোট নাটক—পারদোৎসবের স্বাভাবিক—আমার স্যালনের ছেলেদের অস্বস্তিতে প'ড়ে লিখতে বসেছি।

তাকে টুকরো ক'রে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভালো লাগবে না। জিনিষটাও একটু অভূতরকমের হবে—কেউ বলবে ভালো, কেউ বা বলবে মন্দ, এবং অনেক হয়ত ভেবেই পাবে না ভালো বলবে কি মন্দ বলবে। মোটের উপর বারো আনা লোক বলবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্ছে। আমি সে-কথা অস্বীকার করিনে—শক্তির রূপান্তর ঘটে—সেই রূপান্তর ঘটবার সজীবতা ঈশ্বর যদি শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে রক্ষা করেন তাহ'লেই শক্তির সার্থকতা ঘটে। যাই হোক হঠাৎ যে-জিনিষটাকে ঠিক দূর যাবে না, তাকে মাসিকে দিগে তার আর দুর্গতির সীমা থাকবে না। তুমি ত দেখেইছ পারদোৎসবটাতে পাঠকদের বিরকম পীড়া উৎপাদন করেছে।

গোটা-কতক সংকলন জমেছে, ফি'রে গিয়ে দেওয়া যাবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমার

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন

১০ মার্চ ১৯১১]

ও

প্রিয়বরেষু

কিছুদিন পূর্বে যখন আমার বিবাহের সঙ্কল্প কাগজে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল তখন সেই শুভ সংবাদে আমার বন্ধুগণের মধ্যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজে আমি প্রবন্ধ লিখব কি না এ সংবাদে তোমাদের এত কৌতূহল উদ্ভূত হ'ল কেন।

এই কাগজের সঙ্গে কোম্পানির কাগজের সম্বন্ধ আছে শুনেছি বটে—কিন্তু ভব-সমূহে এই কোম্পানির কাগজের নৌকোটোর উপরে আমি ত আজকাল তেমন ভরসা রাখিনে।

নরেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে গতকলা অস্বস্তি পেয়েছি। আমি সম্মতি দান করিনি। না দেবার প্রধান কারণ

এই যে এত দিন ধরে কলমের মুখে অনেক কালী মাখিয়েছি এখন তার কলম কালন ক'রে ভালোমানুষটি হ'য়ে চূপ ক'রে বসে থাকবে এই আমার স্বপ্ন। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাকটাকে অবলম্বন ক'রে পলিটিক্স বাদ দিয়ে অশান্ত ভালো ভালো প্রয়োজনীয় তথ্য দেশময় প্রচার ক'রবার সুযোগ অবলম্বন ক'রলে দোষ কি? কোনো দীনপ্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বারা ত এ-সুবিধা খুঁজে পাবে না। বস্তুত আমাদের বাংলা ধরের কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্ছে না—হ'লেও তার গ্রাহক হওয়া শক্ত হয়। এমন স্থলে এ-রকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে। ইতি ২৬শে ফাল্গুন ১৩১৭

স্বদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী রবিবারের পর রবিবারে “রাজা” অভিনয়ের নিমন্ত্রণ রইল। ব্যাকরণ লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

[পোস্টমার্ক—শিলাইদা
১৬ মে ১৯১১]

ও

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ

বাঃ, তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও। এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে! সম্পাদক হ'লে মানুষের দয়ামাত্রা একেবারে তিরোহিত হয়, তুমি তারই জাজল্যমান দৃষ্টান্ত হ'য়ে উঠেছ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক। তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্ছে। বড়দাদার লেখা ও প্রক্ আমাকে পাঠিয়ে।

কই প্রবাসী ত পাইনি। বোলপুরে পাঠিয়েছ বুঝি? এখানে একখানা পাঠিয়ে দিয়ে।

একটা নূতন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি। ছুই-একদিনের মধ্যে শুরু ক'রব।

বড়দাদার লেখার ছুই কিস্তিটো এবার একসঙ্গে ছাপিয়ে।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবীরের জীবনকৃতি অবগীতে ছাপবার আর্থনা জানিয়েছিলাম।
পূজাপদ শ্রীযুক্ত বিদ্যেশনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ধানকরেক চমৎকার সরস পত্র পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেগুলিও পরে প্রকাশ করা যাবে। —চাক।]

[পোস্টমার্ক—শিলাইদা
২০ মে ১৯১১]

ও

শিলাইদা

নন্দীয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবি ক'রে তুমি যে যুক্ত প্রয়োগ করেছ সেটা সম্ভাবজনক নয়। তুমি লিখেছ, “আপনার জীবনটা চাই।” এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত, তা হ'লে তোমার যুক্তির প্রবলতা-সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাকবে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা ক'রে এই প্রস্তাবটি করে না সম্পাদকীয় চূর্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে এ-ছঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্ছ, তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছিলাম ব'লে কিছু স্থির করতে পারছিলাম। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ-সম্বন্ধে রামানন্দ-বাবুর মত কি তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and whiteএ আমার জীবনটার একপালে চূপ ও একপালে কালী লেপন করতে পারব না। পকাশ পেরলে লোকে প্রসন্ন

হবার অধিকার লাভ করে, কিন্তু তবুও শাদা চুল ও শ্বেতশ্মক্রেতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ স্তম্ভ ক'রে তুলতে পারে না।

মাতা স—কে জানিয়ে যে, উৎসব হ'লে তবে তাঁরা বোলপুরে যাবেন, এ-কথাটা গ্রাহ্যই নয়—তাঁরা গেলেই আমাদের উৎসব হবে এইটেই আসল কথা। অপর মাতা শ—কে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে—তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়া ভোগ করেছিলেন সেই হৃৎস্বতীই যেন আমাদের স্মরণকে আচ্ছন্ন ক'রে না রাখে।

এইমাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ রায় মহাশয়ের এক তাঁর চিঠি পেলুম। তাতে তোমার প্রতি তিনি

সৌহৃদ্য প্রকাশ করেননি। তাঁর “গোরার” সমালোচনাটা “বহুদর্শনে”ই পাঠিয়ে দিয়ে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস সেটা বেরয়নি দেখে তিনি জ্বল হয়েছেন।

কিতিমোহন বাবু সপরিবারে এখানে আসবেন কথা ছিল—কিন্তু এপর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। তুমি তাঁর কোনো সংবাদ রাখ কি? ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

স্বদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ঐযুক্ত তারকনাথ রায় আমার ঘনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধু; বহু-কলহ শাস্ত্রোক্ত অস্ত কলহের দ্বারা বহুবারে লক্ষ্মীয়াতেই পরিণত হয়ে থাকে।—চার।]

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধন চক্রবর্তীর শাস্তিতে সমস্ত গ্রাম রোবে কোভে ভয়ে ধম্বম্ব করছিল। দুর্কলের অবলম্বন নিন্দা কুংসা 'রে' যে কেউ মনের ঝাল মিটিয়ে নেবে সে সাহসও কারো হচ্ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে সকলেরই বিচিত্র ঝগড়ায় অনল ও ধনিষ্ঠা কুংসার কালীতে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সকলেরই হৃদয় বাসনা অস্তুতঃ ইজিতেও কথাটাকে প্রকাশ করে' মনটাকে একটু হালকা করে' নেয়; কিন্তু যার কাছে বলবে সে যে কোনো সূত্রে সেই কথাটি অনল তথা ধনিষ্ঠার কানে পৌঁছে দেবে না তার বিশ্বাসই বা কি? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে' কিছু বলতে পারছিল না বলে' কেউ সহজে বিশ্বাস ফেলতে পারছিল না।

সবচেয়ে রাগ হয়েছিল সাধন চক্রবর্তীর। হবারই

কথা। তারা ব্রাহ্মণ; স্নেহকে যদি গেলাস-বাটিতে জল খেতে দিতে না পেরে থাকে তাতে তাদের এমন কি অপরাধ হয়েছে যে তার স্নেহে তার চাকরী যায়? হ'লোই বা সে স্নেহ ছেলেমানুষ, মানেজারের ভাইঝি; আর জমিদারগীর পোষাকস্তা।

সাধন নিজের স্ত্রীর কাছে প্রাণ খুলে যে-সব কথা চাপা-গলায় রোজই আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিল, তার মধ্যে কল্পনা একেবারে উদ্ভাস হয়ে তাওব জুড়ে দিয়েছিল। তারা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল যে, অনলের সুপারিশই সাধনের চাকরীটুকু এখনো বজায় আছে।

অনল অথবা গৌরীকে দেখলেই একজন আর-এক-জনের দিকে অর্ধভরা দৃষ্টিতে একবার তাকায়, একের চোখ থেকে চাপা হাসি অপরের চোখে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু কেউ একটু টু শব্দও করে না।

সাধনের শাস্তিতে অনল অত্যন্ত কুষ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেছিল; কিন্তু সে যে সাধনের চাকরীটি বজায় রাখতে

পেরেছে, এই আত্মপ্রসাদে তাঁর আত্মগানি অনেকখানি চাপা পড়ে'ও গিয়েছিল।

ধনিষ্ঠাও রাগের ঝোঁকে জেদের বশে সাধনকে শাস্তি দিয়ে বেশ স্বস্তি অহুভব করুছিল না; সে কিছু শুন্তে না পেলেও অহুমান করুতে পারুছিল যে, তার এই শাসনে গ্রামের আর কেউ না হোক তো অন্ততঃ সাধন সপরিবারে তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে; এবং সাধনের পক্ষে যে গ্রামে আর একজনও নেই এও তো হ'তে পারে না। কিন্তু তার উপরে বিরক্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে তার একটুও নিন্দা করুছে না এইভেই ধনিষ্ঠার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। যদি কেউ ঘূণাকরেও তার নিন্দা করুত তা হ'লে তার রূপা ও প্রসাদ পাবার লোভে সে খবর কেউ না কেউ ঠিক তার কানে পৌঁছে দিত; কিন্তু তাঁ যখন আজ পর্যন্ত হয়নি তখন ধনিষ্ঠার মনে হ'তে লাগল যে, হয় গ্রামস্থ সকলেই তার নিন্দায় যোগ দিয়েছে, নয়তো কেউই কিছু নিন্দা করুছে না। সকলেই যদি নিন্দা থেকে বিরত হয়ে থাকে তা হ'লে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের কারণ নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে দণ্ড পাবার ভয় ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। ধনিষ্ঠার এক-একবার মনে হ'তে লাগল অনলকে অথবা মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ তার কিছু নিন্দা করুছে কি না। কিন্তু তার অহুকার তাকে সেই কৌতূহল প্রকাশ করুতে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তার কৌতূহল হয়েছিল বলেই তার মন সকলের আচরণ ও বচন-সম্বন্ধে সজাগ-হয়ে উঠেছিল; সে জান্নার খড়্গড়ির পাখী তুলে বাইরে পথের উপর দৃষ্টি পেতে বসে' বসে' সকলকে লক্ষ্য করুত; তার মনে হ'তে লাগল লোকে গৌরীকে দেখলেই হয় বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে, নয় মুখ টিপে হাসে, আর নয় তো তাকে পরিহার করে' তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে' চলে' যায়। কিন্তু ধনিষ্ঠা নিজের মনকে বোঝাতে লাগল, তার মন সন্দ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই সে নিজের সন্দেহ ও কল্পনাকে অপরের উপর আরোপ করুছে, বাস্তবিক কারো ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ধনিষ্ঠা যখন অপ্রকাশ্য কৌতূহলে ও সন্দেহে দোমনা

হয়ে অস্বস্তি অহুভব করুছিল, তখন একদিন হঠাৎ তার কাছে গ্রামবার্তা মূর্তি ধারণ করে' এসে উপস্থিত হ'ল।

সেই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণী বিধবা বাস করে, সে গ্রামের ছেলেবুড়ো, বৌ-বি সকলেরই সবকারী জানো-দিদি। সে ঝাড়া চার হাত লম্বা, মোটা-সোটা, আঁটসাঁট, বলিষ্ঠ; মুখখানা তোলো হাড়ির মতন, ঠোঁটের উপর দ্বিবা গৌঁফের সমারোহ, চিবুকে স্থানে স্থানে ছু-এক গুচ্ছ দাড়িরও চিহ্ন দেদীপ্যমান; তার কর্ণধর গম্ভীর কর্ণধর; মেজাজ কড়া এবং স্পষ্টভাষিনী বলে' গ্রামে তার বিশেষ খ্যাতি আছে ও সেইজন্য সকলেই তাকে বেশ একটু ভয় করে' চলে। তাকে দেখলেই মনে হয় ভগবান তাকে পুরুষ গড়তে-গড়তে রক্ত দেখবার খেয়ালে তাকে মেয়ে করেছিলেন। তার বয়স যে কত তা তাব চেহারা দেখে আন্দাজ করা শক্ত; তার যে-রকম আঁটালো চেহারা, তাতে তাকে পঞ্চাশের বেশী বয়সের মনে করা কঠিন; কিন্তু নিজের সে কখনো বয়সের হিসাব না দিলেও গ্রামের বৃদ্ধতম লোককেও নাম ধবে' ডাকে এবং সকলকেই সে হ'তে দেখেছে ও কোলে-পিঠে করে' মাতুল করেছে এমন খবর সে প্রায়ই কারণে-অকারণে ঘোষণা করে' থাকে। তাই সে সকলেরই জানো-দিদি, সখম ও ভয়ের পাত্রী। তার জানো নামটি জানকী অথবা জাহ্নবী বা জানোয়ার কোন্ শব্দের অপভ্রংশ তা শব্দতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হ'লেও গ্রামের লোক তা নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামায়নি, তারা আচণ্ডাল ও আবালবৃদ্ধবিনতা সকলেই জানো-দিদি বলেই নিশ্চিত। জানো-দিদি ব্রাহ্মণ বলে' সকলের পূজনীয়; সকলের চেয়ে বয়সে বড় বলে' মাননীয়, স্পষ্টবাদিনী রুক্ষপ্রকৃতি বলে' বিভীষণা। জানো-দিদি বিধবা নিঃসন্তানা নিরাশ্রীয়া; লোকে বলে তার হাতে বেশ ছু-পয়সা পুঁজি আছে, এবং কতকগুলি শিষ্য-সেবক থাকতে তার একার খোরাক-পোশাকের জন্ত কিছুই ভাবতে হয় না; তার বাড়ীটি নিরুন্ন ব্রহ্মত্র জমির উপর, সুতরাং জমিদারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এইসব কারণে জানো-দিদি ভয় কাকে বলে তা জানে না; সে সকলের কাছে সমান মুখকোড় আর বে-পরোয়া, জমিদারকে পর্যন্ত সে উচিত কথা শুনিয়ে

দিতে পারে বলে' জোর গলায় স্পর্ধা করে' বেড়ায়। এ-
হেন জানো-দিদি কিছুদিন গ্রামে অস্থপস্থিত ছিল—শিখা-
বাড়ী ও তীর্থস্থান পর্যটনে বেরিয়েছিল। একদিন
বিকালে ধনিষ্ঠা গৌরীকে নিয়ে পড়তে বসবার আয়োজন
করছে, এমন সময় বিপুল-কলেবরা জানো-দিদির আবির্ভাব
হ'লো; প্রয়াগ থেকে সদ্য প্রত্যাগমনের সাক্ষীস্বরূপ তার
প্রকাণ্ড মাথাটি নেড়া; মাথায় কাপড় নেই; যেন কোনো
পালোয়ান কুস্তির আখড়ায় এসে অবতীর্ণ হচ্ছে।

জানো-দিদিকে দূর থেকে আসতে দেখেই ধনিষ্ঠা
ভাড়াভাড়ি উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জানো
ধনিষ্ঠাকে প্রথম সন্তাষণ করে' বললে—ঐ দূর থেকেই
পেলাম করো, যে মেলেচ্ছ নিয়ে জয়-জয় করছ।

ধনিষ্ঠা জানো-দিদির প্রথম সন্তাষণেই বুঝতে পারলে
যে জাদুরেল জানো-দিদি যুদ্ধার্থিনী হয়েই তার বাড়ীতে
সভাগমন করেছেন। দর্পিতা ধনিষ্ঠার প্রফুল্ল মুখ তৎ-
ক্ষণাৎ কঠোর হয়ে উঠল, সে গম্ভীরভাবে বললে—আমি
প্রণাম করতে উঠিনি জানো-দিদি, মাথা কি ধার-তার
কাছেই নোয়ানো যায়!

এতবড় স্পর্ধার কথা জানো-বামনীর মুখের সাম্ন
কেউ কখনো বলতে সাহস করেনি, তাই সে এই
কায়েতনীর কথা শুনে একেবারে ধ হয়ে গেল। কিন্তু
সে বেশীক্ষণ দমে' থাকবার পাত্রী নয়, সে হতুমথুমো
পাখীর মতন গম্ভীর গলায় বলে' উঠল—তা তুমি আজ-
কাল খে-রকম বিবি সাহেব হয়ে উঠেছ, তাতে তোমার
কাছে বেরাস্তন-কন্ডাও যে-দে হবেই তো? সেদিনকের
একরাত্রি মেয়ে, গাল টিপলে দুধ বেরোয়, উনি চান
জানো-বামনীকে ডিঙিয়ে চলতে! ওলো ছুঁড়ি, তোর
শুশুরকে আমি হ'তে দেখেছি.....

ধনিষ্ঠা এবার হেসে বললে—তাতে কি? ঘুঘুভাঙার
অশখ-গাছটাও ত অনেক-কেন্দ্রে, অনেককেই ও হ'তে
দেখেছে; তা হ'লে ত তাকেও পেলাম করতে হয়।

জানো বলিল—এও তোমার মেম-সাহেবের মতন
কথা হলো। আশদ-গাছ হলেন সাক্ষাৎ ভগমান, বিষ্টুর
অবতার; তাকে পেলাম করলে উচ্ছন্ন যাবার পথ বন্ধ
হয়ে যাবে যে! তা বলি নাত-বৌ, এত অহঙ্কার দম্ভহারী

সন না। একে ভরা যৌবন, তায় এক্সার টাকা হাতে
পড়েছে, ধরাধানাকে শরাধানা ভাবছ। কিন্তু ভগমান
তো আর সাধন চক্রভী নয় যে তোমার চোখ-রাঙানীতে
ভয় পাবে! জানো-বামনীই ডরায় না তা দম্ভহারী
মধুসূদন ত অনেক দূরের কথা!

সাধন চক্রভীর উল্লেখ শুনে ধনিষ্ঠা কৌতূহলী হয়ে
উঠল; তার মনে হ'ল এই সব-জাঙ্ঘা জানোর কাছ থেকে
গাঁয়ের অনেক খবর শুন্তে পাওয়া যাবে; তাই সে
জানোর অভিসম্পাত গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে হেসে বললে—
তা জানো-দিদি, এতদিন পরে তীর্থস্থান করে' এলে, মেই-
সব কথা বলো শুনি; তা না বাড়ীতে পা দিয়েই গা-মন্দ
দিতে শুরু করলে। তা আমাকে গাল দিয়ে আর করবে
কি? আমার না স্বামী, না পুত্রুর। বিষয়? সেও তো
আমার নয়—যাঁর বিষয় তিনি উইল করে' রেখে গেছেন—
আমি যদি পুষ্টিপুত্রুর না নিই, তা হ'লে সমস্ত বিষয় দিয়ে
এই গাঁয়ে ছেলেদের কলেজ, মেয়ে-স্কুল, হাস্পাতাল, অন্নছত্র
প্রতিষ্ঠা করা হবে; পুষ্টিপুত্রুর আমি নেবো না; যাঁর
সম্পত্তি তাঁর ইচ্ছা-অনুসারে খয়রাত করবার আয়োজন
হচ্ছে—তুমি তো বিশ্বত্রকাণ্ডের সব খবরই জানো, এও
শুনেছ বোধ হয়।

জানো অস্থভব করতে লাগল, আজ তার খাতাটা বড়
অশুভফণে হয়েছে; সে বার-বার এই একরাত্রি মেয়ের
কাছে হেরে যাচ্ছে। সে একটু দমা হুরে বললে—হ্যা
তা তো সবই শুনেছি! দান ধ্যান বেরুতো দম্ভও খুল করছ
শুনিছ; কিন্তু তার সঙ্গে আবার মেলেচ্ছ ছোঁয়া-নাড়া
করছ, কেউ যদি তোমার মতন মেলেচ্ছ যজ্ঞাতে না পারছে
তাকে অপমান করছ, এ-সব কি ভালো হচ্ছে ভাই?

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—জানো-দিদি, তোমার তিরস্কার
আর উপদেশ তো অল্পক্ষণে শেষ হবে না, তা একটু বসুণে
হ'ত না?

জানো যখন কথা বলে, তখন মনে হয় সে যেন এক-
মুখ খাবার চিবতে-চিবতে কথা বলছে; সে ভারী গলায়
বললে—তুমি তোমার বাড়ীময় যে মেলেচ্ছ মেড়ে রেখেছ
তা বসি কেমন করে' ভাই, আমাদের তো ইংকাল-পর-
কালের ভয় আছে।

ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে বললে—কিন্তু স্নেহ-মাড়া বাড়ীতে
বাড়িয়ে তো আছে, বললেই কি যত দোষ? মাধী, জানো-
দিদিকে পূজোর ঘর থেকে একখানা আসন এনে বসতে
দে।

মাধবী আসন খান্ডতে গেল। ধনিষ্ঠা জানোকে আগ
বাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরের দালানে চলল। মাধবী আসন
এনে পেতে দিলে। জানো আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে
ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করলে—এ-আসন সেই মেয়েটা ছোঁয়-
টেঁয়নি তো?

ধনিষ্ঠা কিছু বলবার আগেই মাধবী বলে উঠল—না
গো না। শুধু কি তোমারই জাতধন আছে, আর
সবাই খুইয়ে বসেছে! কোমর বেঁধে যাকে নিন্দে করতে
এসেছ তার দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি—কি ছিরি,
কি হয়েছে! বেবুতো উপোষ আর দিনে-রাতে দশ বার
চান করতে-কতে যে শরীর পাত কবুছে তাকে নিন্দে
কতে একটু মুখে আটকায় না!

জানো আজকে পদে-পদেই অপ্রতিভ হচ্ছে; তবু
সে স্কন্ধুটি করে বললে—ওরে বাস রে! একেবারে ডাল-
কুস্তা! মাধী তুই খাসা খোসামোদ করতে শিখেছিস।

মাধবী বক্তার দিয়ে বলে উঠল—এর আর খোসা-
মোদ কি? সত্যি কথা বললে আবার খোসামোদ করা
হয় নাকি? গায়ের কোন্ চোখথেকে চোখখাকী মিথ্যে
বলবে বলুক দেখি!

মাধবীর কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে গম্ভীর
কঠোরস্বরে বললে—মাধী, তুই এখান থেকে যা।.....
জানো-দিদি, তুমি বোসো।

মাধবীর চলে যাবার কোনো লক্ষণ না দেখে জানো
তার দিকে চেয়ে বললে—বলি ও বড়-মানুষের কি, শুধু
আমায় বসতে দিলে, তোমার মুনিককে একটা কিছু বসতে
দাও।

মাধবী মাথা ছলিয়ে মুখ ঝাঁকিয়ে বললে—মুছ! কাকে
বসতে দেবো আমার মাথা আর মুণ্ড। শয্যে ত্যাগ করে
বসে' আছেন! বিধবা তো ডের লোক হয়, কিন্তু.....

ধনিষ্ঠা ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে চেয়ে রুদ্ধস্বরে
বললে—মাধী, আমি বলছি তুই এখান থেকে যা।

মাধবী ধনিষ্ঠার মুখ দেখে আর সেখানে থাকতে সাহস
'পেলে না, সে প্রহান করলে।

ধনিষ্ঠা জানোর সামনে মাটিতে বসল।

জানোর মন ধনিষ্ঠার ক্রুদ্ধব্রতের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে
ও সঙ্কমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে নরমস্বরে বললে...তা
নাত-বৌ, এত কাণ্ড করছ যদি তবে ঐ একটু খুঁত ফেন
রেখেছ ভাই?

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে মাটিতে আঙুল বুলোতে-বুলোতে
বললে—কি করবো বলো জানো-দিদি, মেয়েটা মাওড়া,
ওকে আমি না দেখলে শুন্দে.....

জানো ধনিষ্ঠার কথা শেষ হওয়ার ক্ষণে অপেক্ষা না
করেই বলে উঠল...তা মেয়েকে দেখছ দেখো, কিন্তু
মেয়ের জেঠাকে নিয়ে অত মাতামাতি করাটা কি ভালো
হচ্ছে? তোমার সকল ব্রতের প্রধান দানের পাস্তর ঐ
অনল; তোমার ম্যানেজার ঐ অনল; তোমাকে পড়া-
বার ম্যাষ্টার ঐ অনল! ঐ অনল ছোড়া ছাড়া কি
দেশে আর লোক নেই; মেয়ের মেয়েটা অনলকে
বলে বাবা, আর তোমায় বলে মা...এই বা কেমন
ধারা?

জানো ধনিষ্ঠার মুখের ভাব দেখবার ও বক্তব্য
শোনবার ক্ষণে চূপ করলে। কিন্তু ধনিষ্ঠা মুখ খুব নীচু
করে' নীরবে যেমন বসে' ছিল তেমনি বসে' রইল।
তার মুখ গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিল।

ধনিষ্ঠাকে নিরস্তর নতমুখী দেখে জানো মনে-মনে
খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে মুখরা দর্পিতা ধনিষ্ঠাকে
সে এইবার কাবু করে' এনেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে
আবার বলতে আরম্ভ করলে...লোকে তোমাদের ভয়
করে। একজন জমিদারপী মুনিক, আর-একজন ম্যানে-
জার; তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে লোকের সাহসে
কুলোয় না। তার পর আবার সাধন চক্ৰীর অবস্থা
দেখে সবাই আরো ভড়কে গেছে। কিন্তু লোকের
মুখই যেন বন্ধ করলে, মন তো আর তোমাদের শাসন
মানবে না।.....

জানো আবার চূপ করলে, যদি ধনিষ্ঠা কিছু বলে।
ধনিষ্ঠাকে তখনো নিরস্তর নতমুখী দেখে সে আবার

বলতে লাগল—তুমি মেয়েমানুষ, তায় বিধবা, তোমার আবার লেখাপড়া শেখাবাই বা কি দরকার... ..

- ধনিষ্ঠা এবার কথা বললে—জমিদারীর কাগজপত্ৰ...

জানো ধনিষ্ঠার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে— জমিদারীর কাগজ-পত্ৰ দেখাশোনা সহী করা তো রাজকুমারের আমলেও তুমিই করেছ, তখন তো লেখাপড়া না জানাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

ধনিষ্ঠা আবার নীরব হয়ে মুখ নত করে' বসল।

জানো বলতে লাগল—লোকে তো বলতে পারে না, কিন্তু সবাই মনে করছে, তোমার এইসব বেরতো-ফেরতো হয়েছে শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা.....

এইসময় গৌরী সেইখানে ছুটে এসে মা বলে' ধনিষ্ঠাকে ডেকেই জানোকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর পাহারাওয়ালী দাসী ছুটে এসে তাকে ধরে' ফেললে, যদিও তখন তাকে ধরবার আর কোনো দরকার ছিল না।

ধনিষ্ঠার কানে সেই একাকর ডাকটি এসে পৌঁছতেই তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে গৌরীর সমস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললে—ডোর্ট্ কাম্ হিয়ার ডালিং, হিয়ার'স্ এ স্কেয়ার-ক্রো!

গৌরী ভয়ে ভয়ে জানোর দিকে এক-একবার তাকাতে তাকাতে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করলে—মা, হ ইজ্ হি?

ধনিষ্ঠা জানোর দিকে না তাকিয়ে গৌরীকে যেন অস্ত্র কথা বলছে এমনি ভাবে দেখিয়ে বললে—ইট ইজ্ নট্ হি ডালিং, ইট ইজ্ শি!

এই কথা বলে'ই কৌতুকভরে ধনিষ্ঠা খিলখিল করে' হেসে উঠল। কিন্তু মার অমন হাসি সঙ্গেও গৌরী হাসতে পারলে না, তার শিশুমনে প্রব্র উঠতে লাগল নেড়া-মাথা বিগুল-বপু ঐ ব্যক্তি কেমন করে' শি হ'তে পারে? তার স্বল্প অভিজ্ঞতায় সে যত জীলোক দেখেছে, কারো সঙ্গে তো এর একটুও সাদৃশ্য সে খুঁজে আবিষ্কার করতে পারছিল না।

গৌরীর ঝি গৌরীকে বললে—ঠাকুর-ঘরের দালানে আমাদের উঠতে নেই, চলো আমরা খেলিগে।

গৌরী আড়চোখে জানোকে দেখতে দেখতে সেখান থেকে চলে' গেল।

গৌরীর দাসীর কথা শুনে জানো বুঝতে পারলে যে গৌরীকে ঠাকুর-দালানে উঠতে দেওয়া হয় না। সেদিক থেকে ধনিষ্ঠাকে কিছু বলবার মতন খুঁত না পেয়ে সে বললে—তুই তো একেবারে মেমের মতন ইংরিজি বলতে শিখেছিস, নাত-বৌ! এইবার নিকে করলেই হয়।

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় ও রাগে লাল হয়ে উঠল, সে আত্মসম্বরণ করে' কাঁঠহাসি হেসে বললে—হ্যা, শীগ্ গিরই হবে জানো-দিদি, স্বয়ংরা হয়ে বর ঠিক করে' রেখেছি— তোমার নাত-জামাইকে তোমার মনে ধরবে তো?

জানো ঢং করে' বললে—তা আর মনে ধরবে না ভাই, অমন সোনার চাঁদ নাত-জামাই.....

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—বরের নাম তো মুখে আনতে নেই, তবু তোমাকে চুপিচুপি বলি.....

জানো মুখ ঘুরিয়ে বললে—সে আর বলতে হবে না ভাই, জানাই আছে.....

ধনিষ্ঠা কৌতুকহাস্তে ঝলমল করতে করতে বললে— জানা আছে তো নিশ্চয়ই। তাতে আবার তোমার নাম জানো—তুমি জানো না কি? তবু তোমায় বলি—তার নাম ষম! এ-নাত-জামাইকে কি মনে ধরবে তোমার?

জানো ছুঁদে দজ্জাল হ'লেও তার একটি দুর্বলতা ছিল, সে ষমের নাম বরদাস্ত করতে পারত না। সে সকলের চেয়ে বয়সে বড় হ'তে চাইত, কিন্তু মরতে চাইত না, সে যেন অমর। তাই সে ধনিষ্ঠার কথায় ভেলে-বেগুনে জলে উঠে বললে—তুই যার নাম করলি শীগ্ গির তার বাড়ী যা.....

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—স্বয়ংরা হয়ে তো বসে' আছি; বর এলেই ঘর-বসত করতে যাবো। তুমি আমার বরের বাড়ী রাখতে যাবে তো?

জানো আসন ছেড়ে, উঠে পড়ে' সেখান থেকে [চলে' যেতে যেতে টেঁচাতে লাগল—সেই চুলোর দোরে তোর সাতগুটি ঝাক, যারা তোর ভালোবাসার তারা তোর সঙ্গে ঝাক.....

আনো চলে' ঘাবার সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠার মুখ আবার পঙ্কীর চিত্তাকুল হয়ে উঠল। সে যেখানে বসে' ছিল সেইখানে বসে'ই রইল।

ধানিকক্ষণ পরে মাধবী এসে খবর দিলে—মা, ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা ভারী গলায় বললে—তাকে বলগে আমার যেতে একটু দেরী হবে।

মাধবী শঙ্কিত সঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে চলে' গেল, সে ভাবলে—নিশ্চয় ঐ আনো-বাম্নী কিছু বলে' গেছে। আচ্ছা আমি দেখে নেবো মফা মাসী কতবড় দজ্জাল।

মাধবী চলে' যেতেই ধনিষ্ঠা ঠাকুর-ঘরে ঢুকে চোখ বুজে হাত জোড় করে' শুরু হয়ে বসল।

[ক্রমশঃ]

প্রাচীন মিশরের দেবতা

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মিশর দেশ আফ্রিকায়। মিশরের সভ্যতা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতা—এই সভ্যতার বয়স যে ঠিক কত তাহা এখনও নিষ্কারণ করা হয় নাই। মিশরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী নাইল—প্রাচীন কালে এই নদীর দুই তীরে বহু সহর ছিল, তাহাদের চিহ্ন এখন নানা স্থানে আবিষ্কার হইতেছে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা কোনো দিনও নাইল নদীর উৎপত্তি-স্থানের সন্ধান করে নাই। তাহারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একটা বাস্তব মতন কিছু-একটা মনে করিত। এই বাস্তব নীচের দিকে পৃথিবীর অবস্থান ছিল। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিম চওড়া দিক ছিল। পৃথিবীর উপরে আকাশ সমতলভাবে কিংবা খিলানের মতন ঝুলানো ছিল। দুই দলের দুইপ্রকার মত। এই আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে শক্ত তारे বহুসংখ্যক আলোক ঝুলিয়া থাকিত। দিনে এইসকল আলোক জলিত না, কাজেই আমরা তাহাদের দেখিতে পাইতাম না। এইসকল আলোক নক্ষত্র। আকাশকে তাহার চারিকোণে ঠেকা দিয়া আটকাইয়া রাখা হইত। তবুও মিশরীয়দের ভয় ছিল যে হয়ত কোনদিন ঝড়ে আকাশ হড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে ভাঙিয়া পড়িবে। পৃথিবীর ঠিক মাঝখানেই ছিল মিশর-দেশ। প্রাচীন মিশরীয়দের মতে সূর্য ছিল একটা আগুনের চাকতি—ইহা একটা নৌকার উপর

রক্ষিত ছিল। এই নৌকা পৃথিবীর দেওয়ালের চারিদিকে ঘুরিত এবং সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের আড়ালে চলিয়া যাইত বলিয়া পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইত। প্রাচীন মিশরীয়দের পৃথিবী এবং সৌর-জগৎ সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা অদ্ভুত-অদ্ভুত বিশ্বাস এবং ধারণা ছিল।

এইসময়ে মিশরদেশে যে কতপ্রকার ধর্মের চলন ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রাচীন যে সমস্ত স্তম্ভ এবং প্রস্তরখোদিত মন্দির-আদি এখন মিশরে বর্তমান আছে, তাহাদের গায়ে হাজার-হাজার দেবতার চিত্র খোদাই করা আছে। এইসকল দেবতা যে কেবল আঁকাই থাকিত, তাহা নহে, অস্তুত একজন লোকেরও পূজা প্রত্যেকটি দেবতা পাইত। প্রতি-দেবতার কম করিয়া একটি পূজারী এবং ভক্ত ছিলই। প্রাচীন মিশরে দেবতাদের আতিশয্য দেখিয়া মনে হয় যে যেন সেইসময় মিশরে মানুষ অপেক্ষা দেবতার সংখ্যা অধিকপরিমাণে ছিল এবং এইসমস্ত দেবতাদের বিবিধ অভিলাষ এবং প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার মতন মানুষ এবং অস্ত্রাস্ত্র জন্ম ছিল।

মিশরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই দেবতাবাহিনী লইয়া বিষম ধন্দে পড়িতে হয়। এক-একজন দেবতার প্রভাব মানুষের জীবনের এক-একটি বিশেষ সময় বা বয়সে—

এই নির্দিষ্ট সময় এবং স্থান ছাড়া সেই বিশেষ দেবতার আর কোনো প্রয়োজন এবং প্রত্যাশা নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বিশেষ-বিশেষ মুহূর্ত্তে এবং কালে বিশেষ-বিশেষ দেবতার প্রভাব ছিল। প্রত্যেক দেবতাই আপন-আপন নির্দিষ্ট কৰ্ম সাধন করিয়া যাইত।

নাপ্রিট * (Naprit) নামক দেবতার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ ছিল গমের পাকা শীষের সঙ্গে। এই দেবতা দেখিতে মানুষের মতনই, কেবল মাথায় দুইটি গম বা যবের শীষ গোঁজা আছে।

মাস্খোনিত (Maskhonit) দেবতা নবশিশুর জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার বিছানা বা দোলনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। ইনি স্ত্রী-দেবতা। ইনিও দেখিতে মানবীর মতনই, ইহার মাথায় কচি তাল-পাতা গোঁজা থাকে।

রানিনীত (Raninit) শিশুর নামকরণের এবং লালন-পালন ও শিক্ষাদি-ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উক্ত দুইজন দেবী যে একইসময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের দরকার-মতন বিরাজ করিত তাহা নহে, ইহাদের ক্রমাগত ছুটিয়া-ছুটিয়া এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট কৰ্ম সম্পাদন করিতে হইত। একজন দেবীকে প্রসববেদনাগ্রস্তা নারীর বেদনা লাঘব করিয়া ফিরিতে হইত। আর-একজনকে সকল সময় নবাগত শিশুদের স্তন্য শুভ নাম খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। প্রত্যেক শিশুরই এমন-একটি করিয়া নাম রাখিতে হইত যে নামের শব্দের জোরে ভবিষ্যতে অনেক অকল্যাণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিত। এই দুইজন দেবীর নিকট হইতে লোকে আর বেশী-কিছুর আশা বা প্রার্থনা করিত না, কারণ তাহারা জানিত যে ইহাদের আর বেশী-কিছু দিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই।

Cynocephalia (সাইনোসেফালি) দল বাধিয়া পূর্ব এবং পশ্চিমদিকের পর্বত-শিখরে ভ্রমণ করিত। ইহাদের একমাত্র কাজ ছিল পৃথিবীতে প্রবেশ করিবার সময়

সূর্যকে বন্দনা করা। সূর্যোদয়ের সময় তাহারা নৃত্য এবং গীত করিয়া সূর্যদেবকে পৃথিবীতে প্রতিদিন বরণ করিত। আর-একদল সূর্যকে এমনি করিয়া রাজির রাজস্ব বরণ করিত। একদল দৈত্যের বিশেষ কাজ ছিল, সূর্য আসিবার সময় পৃথিবীর আলোক-ভোরণঘার খুলিয়া দেওয়া—ইহারা সূর্যের পৃথিবী ভ্রমণ করিবার যে নির্দিষ্ট পথ ছিল, তাহাও রক্ষা করিত।

এই দৈত্যগণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইত। ইহাদের সকল সময় নির্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিয়া কর্তব্য কার্য করিয়া যাইতে হইত। নিজের-নিজের স্থান হইতে ইহাদের এক-পাও নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। নিজ কর্তব্য করিবার কালের কিছুপূর্বে ছাড়া অন্য-কোনো সময় ইহাদের দেখা যাইত না। কর্তব্যকাজ শেষ হইবামাত্র যে যার স্থানে বসিয়া পড়িত। এই দেবতাদের বিশেষ দেখা পাওয়া যাইত না বলিয়া ইহাদের কোনো ভালো মূর্তি বা প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না। ইহাদের কার্যের অমূর্ত্ত মূর্তি কল্পনা করিয়া লোকে ইহাদের ছবি আঁকিত বা খোদাই করিত। যেসমস্ত দৈত্য সূর্যের পৃথিবী-প্রবেশের-পথে মৃত ব্যক্তিদের বর্শা দ্বারা হত্যা করিয়া বেড়াইত, তাহাদের প্রতিকৃতি তীরধনুকওয়াল লোকের মতন করিয়া আঁকা হইত। যাহারা মানুষের আত্মাকে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দিত—তাহাদের ছুরিকা-হস্ত-স্ত্রীলোক বলিয়া কল্পনা করা হইত। ইহাদিগকে নোকিত (Nokit) * বলা হইল। সূর্যের পথ-রক্ষক দৈত্য এবং সূর্যের ভ্রমণপথ-রক্ষক দেবতাদের কোনো বিশেষ রূপ ছিল না বলিলেও চলে। কাহাকেও মানুষের রূপে দেখা যাইত, কাহাকেও বা কোনো জন্তুর রূপে দেখা যাইত—বাঁড়, সিংহ, ভেড়া, বাঁদর, সাপ, মাছ, বাজপাখী ইত্যাদি সকলপ্রকার রূপেই এই বিশেষ দেবতাদের দর্শনলাভ ঘটিত। অনেক দেবতা আবার প্রাণহীন দ্রব্য-রূপে বা তাহার মধ্যে বাস করিত। অনেকে মানুষ এবং পশুর সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত রূপ ধরিয়া বাস করিত।

* Naprit কথার অর্থ 'ই শস্য-গমকেই বিশেষ ভাবে বলা হয়। (Brugsch, Dict. Hieroglyphique, pp. 752-753)। এই শস্য দেবতার প্রতিকৃতি প্রথম সেটি (Seti I) এর কবরে খোদাই করা আছে।

* Maspero—Études de mythologie et d'Archéologie Égyptiennes, vol. ii. pp. 35, প্রথম সেটির কবরের দেওয়ালে নোকিতদের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

মিশরীয়দের নিকট এই মানুষ-পশু সংমিশ্রণজাত বিকট প্রাণী সত্য বলিয়া চলিত ছিল, অবশ্য অস্ত্র দেবতা এবং দৈত্যদের অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমাদের কাছে এইসমস্ত দেবদেবী এবং দৈত্য-দানাদের কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দের নিকট এই সমস্ত দেবদেবী প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া চলিত ছিল। শুনা যায়, অনেক শিকারী জঙ্গলে শিকারের খোঁজ করিতে-করিতে বিশেষ-বিশেষ দেবতার দেখা পাইত। মেঘপালকেরা এইসমস্ত দেবতাদের বিষয় ভয় করিত।

মিশরের দেবতা-জাতির মধ্যেও অনেক বিদেশী দেবতা ছিল। মিশরীয়েরাই এইসকল দেবতাদের জাতি-পরিচয় এবং গোষ্ঠী-পরিচয় অবগত ছিল। মিশরীয়েরা জানিত যে ছাথরু, অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী, অতি পুরাকাল হইতেই তাহার নিজে দেশ পুয়ানিত (Puanit) ত্যাগ করিয়া আসিয়া মিশরেই বাস করিতেছে। এই জন্ত দুগ্ধবতী গাভীকে বলা হইত—“পুয়ানিতের মহিলা” (The Lady of Puanit)।

হ্যাথরের পিছন-পিছন “বিশ্ব”ও নেকড়ে বাঘের বেশে আসিয়া মিশরে বাসা বাঁধিল এবং হ্যাথরের সঙ্গে-সঙ্গেই মিশরীয়দের পূজায় ভাগ বসাইল। তা’র পর ক্রমে ‘বিশ্ব’ নেকড়ের চামড়া-পরা মানুষের রূপ ধারণ করিল, কিন্তু তাহার চেহারা অদ্ভুত এবং চরিত্র নেকড়ের মতন ভীষণই রহিয়া গেল। “বিশ্ব” নৃত্য এবং যুদ্ধের বহু-দেবতা বলিয়া গণ্য হইত।

পুরাকালে যে-সব জাতি ফ্যারাওদের দ্বারা বিজিত হইত, তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের কয়েকটি করিয়া দেবতা মিশরীয়দের দান করিত। ফ্যারাও এইসব দেবতাগণকে নাইল নদের তীরে স্থাপন করিত। কিন্তু কিছু-কাল পরে এইসমস্ত বিদেশী দেবতা তাহাদের বিজাতীয়তা ত্যাগ করিয়া একেবারে পুরা-মাত্রায় মিশরীয় দেবতার পরিণত হইত। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, নীল-নদ—এই-সবই মিশরীয়দের নিকট প্রাণবান ছিল এবং ইহাদের জীবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ছিল। সমগ্র মিশরীয় জাতি ইহাদের পূজা করিত এবং ইহাদের শক্তিতে

বিশ্বাস করিত। সমগ্র মিশর যখন এইসব দেবতাদের একভাবে বিশ্বাস এবং পূজা করিত তখন কোনো-প্রকার গোলমাল ছিল না। সমগ্র মিশরে এইসব দেব-তারা একই পরিচয়ে এবং নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু যখন তাহাদের বিশেষভাবে নামকরণ আরম্ভ হইল তখনই গোল বাধিল। এক-এক স্থানের লোকেরা একই দেবতার পরি-চয় নাম এবং শক্তি অস্ত্র স্থানের সেই দেবতার নাম এবং পরিচয় অ-কি-অস্ত্র-প্রকার করিয়া ফেলিল।

বিদেশী যে-সমস্ত জাতি নাইল-নদের তীরে বসবাস করিয়াছিল, তাহারা যেমন ক্রমশ নিজেদের সকল-প্রকার বিভিন্নতা লোপ করিয়া কালক্রমে মিশরীয়দের সহিত এক-জাতির মতন মিশিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বিনেশাগত দেবতারা নিজেদের বিদেশীয়ত্ব ত্যাগ করিয়া মিশরীয় দেবজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই দেব-জাতির মধ্যে রাজাপ্রভা উজীর ইত্যাদি নানাবিধ শ্রেণী-বিভাগ করা ছিল। দেবগণের প্রত্যেকেই প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যের প্রতিভূ-স্বরূপ ছিল।

এইসমস্ত দেবতারা সকলে মিলিয়া প্রকৃতি এবং পৃথিবী শাসন করিত। আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, সূর্য, নীল-নদ ইত্যাদি সবই প্রাণবান ছিল, ইহারা সবাই মানুষের মতনই বিশ্বাস ফেলিত এবং চিন্তা করিতে পারিত। ইহারা মিশরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলের নিকটেই পূজা পাইত এবং সকলেই ইহাদের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসবান ছিল।

প্রথমে সকল দেবতাই একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী-রূপেই পূজা পাইত—কিন্তু যখন মিশরীয়েরা, কোন্ দেবতার কি কাজ, কাহার কতখানি শক্তি, কাহার রূপ কি-প্রকার ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে আরম্ভ করিল তখনই দেবতা-জাতির সকলের একইভাবে একইপ্রকার পূজা পাওয়ার দিন চলিয়া গেল। প্রত্যেক সহর, প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক গ্রাম, সকল স্থানের লোকেরাই একই বিশেষ দেবতাকে নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারে পূজা করিতে লাগিল—একই দেবতাকে বিভিন্নভাবে কল্পনা করিতে লাগিল।

অনেকে আকাশকে “বৃহৎ হোরাস্” (Great

Horus) বলিত। Haroeris ছিলেন 'র' অর্থাৎ সূর্য-দেব। উচ্চ মিশরের লোকেরা Haroerisকে তাহার সাথী 'Sit of Ombos'এর সহিত, পূজা করিত। এই শেষোক্ত দেবতা ছিলেন পৃথিবীর প্রতিভূ। এই দুই দেবতাকে প্রায়ই একজন দুই-মাথাওয়ালা-লোকের মূর্তিতে অঙ্কিত বা খোদিত করা হইত। আকাশকেও অনেক সময় Haroeris বলা হইত। এই দেবতা দেখিতে ছিলেন ফোটা-ফোটা-দাগবিশিষ্ট পালকযুক্ত ছোটো একপ্রকার বাজপক্ষীর মতন। ইনি পৃথিবীর বহু উচ্চে সকল সময় উড়িয়া বেড়াইতেন। ইহার চোখ সকল সময় পৃথিবীর উপর নজর রাখিত। আর-একটি প্রবাদ আকাশ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে আছে। আকাশ এবং পৃথিবী বিবাহিত—একজন স্বামী অপর জন স্ত্রী। পৃথিবীর নাম শিবু এবং আকাশের নাম নুইত (Nuit)। ইহাদের বিবাহের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিষের জন্ম হইয়াছে এবং হইবে।

অনেকে আকাশ এবং পৃথিবীর দেবতা দুই-জনকে মামুঘের আকারবিশিষ্ট মনে করিত এবং তাহাদের ছবিও আঁকিত দুইজন মামুঘের মতনই। এই দুই দেবতার যে প্রাচীন চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, আকাশ-দেবের নীচে পৃথিবী-দেবী পড়িয়া আছে। দুইজনেরই মামুঘের রূপ। অনেকে শিবু—অর্থাৎ পৃথিবীকে—প্রকাণ্ড-একটি রাজহংস-রূপে কল্পনা করিত। এই রাজহংসের হংসিনীই সূর্যরূপ অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। এই হংসিনী যাকি এখনও প্রতিদিন এইরূপ একটি করিয়াই সূর্য-অণ্ড প্রসব করিয়াই চলিয়াছে। সূর্য-অণ্ড প্রসব করিবার পর :দংগণকে এই শুভখবর দিবার জন্ত এবং হংসিনীকে মতিনন্দন করিবার জন্ত পৃথিবীদেব রাজহংস বিকট-ভাবে চীৎকার করে। এই চীৎকারের জন্ত ইহার আর একটি নাম Ngagu oeru অর্থাৎ বিকট প্যাক-প্যাক-বকারী পক্ষী (Great Cackler)*।

আর-একটি বিবরণে পৃথিবীদেবকে প্রকাণ্ড-এক বাঁড়ের রূপে পাওয়া যায়। এই বাঁড় পৃথিবীর সকল দেবতা এবং মামুঘের পিতা। মাতা—একটি চমৎকার গরু, ইহার বড়-বড় চোখ ছিল। এই গরুর মাথা আকাশমার্গে উঠিত, এবং ইহার শির-দাঁড়া দিয়া পৃথিবী গ্রাবনকারী জলের ধারা বহিত। এই গরুর শরীরের তলদেশ অর্থাৎ পেট এবং বক্ষদেশ পৃথিবীর লোকেরা আকাশরূপে দেখিতে পাইত। ইহার চারখানি পা পৃথিবীর বিশেষ চার কোণে দণ্ডায়মান ছিল।

প্রাচীন মিশরীয়দের আকাশের কল্পনার অস্থায়ী গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিষয়ে নানা-প্রকার অদ্ভুত ধারণা ছিল। অ্যাটোন্নু (Atonu) ছিল একটি আঙনের চাকতির মতন দেখিতে, ইনি জীবন্ত দেবতা ছিলেন এবং ইহার সাহায্যেই সূর্যদেব পৃথিবীর লোকদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করিত। ইহার আর-একটি নাম ছিল রা। সূর্য-ও এই নামে মিশরে পরিচিত ছিল। আকাশ দেবতার ডান চক্ষু ছিল রা অর্থাৎ সূর্যদেবতা। মিশরের যে সব স্থানে 'হোরাস' আকাশ-দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিল—সেই-সব দেশে সকালে হোরাস প্রথম যখন চোখ খুলিত তখন পৃথিবীর লোকের সকাল হইত—এবং সন্ধ্যাবেলায় যখন হোরাস চোখ বন্ধ করিত, তখন হইত রাত্রি।

অনেক স্থানে আকাশকে দেবী বলিয়া মনে করা হইত সেই সব স্থানে রা' অর্থাৎ সূর্য ছিল আকাশ-দেবীর পুত্র। রা-এর মা ছিল পৃথিবী। রা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নতুন করিয়া জন্মলাভ করিত। সূর্যদেব মাথার দুই-পাশে ঝাঁকুড়া-ঝাঁকুড়া চুল লইয়া এবং ঠোঁটের ভিতর আঙ্গুল ভরিয়া দিয়া নবাগত মানবশিশুর মতন পৃথিবীতে আগমন করিতেন।

অনেক স্থলে সূর্যকে মানবশিশুর মতনই কল্পনা করা হইয়াছে। জন্ম হইবামাত্র নাপূরিত এবং মাসধোনিত—এই দুই দেবতা সূর্যকে ধাত্রীর মতন হস্তে ধারণ করিত। মাত্র একঘণ্টা কাল অর্থাৎ দিনের প্রথম ঘণ্টা শিশুসূর্য এই দেবীদের তত্বাবধানে থাকিয়া দ্বিতীয় ঘণ্টা হইতেই ইহাদের ত্যাগ করিয়া Nuitএর (আকাশের) পেটের তলা দিয়া সজীব হইতে

* Book of the Dead, ch. liv., Naville's Edition, vol 1. pl., lxvi; cf. Lepage—Renouf, Seb the Great Cackler.

সজীবতর হইয়া ভ্রমণ করিত। ষ্টিপ্রহরে সূর্য্য পূর্ণ-
বয়স্ক হইয়া মহাপরাক্রান্ত হইত এবং পৃথিবীর সকল স্থানে
নিজের তেজ ছড়াইত। তার পর ক্রমশঃ তাহার বয়স
বাড়িতে-বাড়িতে সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িত, এবং অবশেষে

রাত্রি আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সমস্ত তেজ ফুরাইয়া
যাইত এবং বৃদ্ধ সূর্য্য আকাশ-দেবীর মুখের ভিতর দিয়া
মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত। পরদিন সকালে তাহার
আবার নবজন্ম লাভ হইত।

কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধে দু-চারিটি কথা

কুষ্ঠরোগ আয়ুর্বেদমতে দু-রকমের—গলিত ও ধবল।
কিন্তু অ্যালোপ্যাথি-মতে ধবল-কুষ্ঠটা কুষ্ঠ নয়, অস্ত্র-
রকমের রোগ; ইহার সহিত গলিত-কুষ্ঠের কোনো সম্বন্ধই
নাই। গলিত-কুষ্ঠ সংক্রামক, কিন্তু ধবল মোটেই সংক্রামক
নয়। কতকগুলি জীবাণু হইতে গলিত-কুষ্ঠের সৃষ্টি হয়
—কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে ধবল-কুষ্ঠ মোটেই
জীবাণু-ঘটিত রোগ নয়।

গলিত-কুষ্ঠ গরম দেশেই হয়—শীত-প্রধান দেশে নাই
বলিলেই হয়। স্ত্রাব লিয়োনার্ড রজার্স অল্পসন্ধান করিয়া
দেখাইয়াছেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যে-যে জায়গায় বৃষ্টি
খুব বেশী হয়, সেইসমস্ত জায়গায় অস্ত্রান্ত স্থানের তুলনায়
কুষ্ঠ রোগটা বেশী। তাহার কারণ তিনি বলেন যে
যেখানে বেশী বৃষ্টি পড়ে সেইসব জায়গায় পোকা মাকড়
অস্ত্রান্ত দেশের তুলনায় বেশী। ঐসকল পোকা-মাকড়
কুষ্ঠ-রোগীর ঘা হইতে জীবাণু লইয়া কামড়াইবার সময়
স্বস্থ লোকের দেহে ঢুকাইয়া দেয়।

কুষ্ঠ-রোগীদের অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে অতি
নির্দয় ব্যক্তির প্রাণেও কষ্ট হয়। গরীব লোকের ত
কথাই নাই—কোনো অবস্থাপন্ন লোকেরও কুষ্ঠ হইলে
তাঁহারও কষ্টের সীমা নাই। কুষ্ঠ-রোগীর সমাজে স্থান
নাই—আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহাকে আন্তরিক
স্বপ্না করে ও ত্যাগ করে। তা'র পর আবার হিন্দুশাস্ত্র
বলে, পূর্ব-জন্মে গো-হত্যা-ব্রহ্মহত্যা-ধরণের কোনো মহা-

পাতকের জন্ত লোকে কুষ্ঠগ্রস্ত হয়। অতএব অস্ত্রান্ত
দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগীর উপর স্বপ্নাটা
বেশী। কারণ প্রথমতঃ সর্কালে ঘা থাকার জন্ত ত
স্বভাবতই কুষ্ঠরোগী দেখিলেই স্বপ্না জন্মায়, তা'র পর আবার
শাস্ত্রমতের জন্ত আরও বেশী স্বপ্না হয়। ইহা দেহ পক্ষে
জীবিকা-নির্ভর ও স্বাধীনভাবে করা সম্ভব নয়—তা'র পর
আবার অস্ত্রান্ত রোগের মতন কুষ্ঠরোগের সাধারণ
চিকিৎসাতেও কোনো উপকার হয় না। কেহ কুষ্ঠরোগীকে
গৃহে আশ্রয় দিতে চান না, পাছে নিজদের কুষ্ঠগ্রস্ত হইতে
হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগীর সহিত আট নয় বৎসর কাল
একত্রে না থাকিলে কুষ্ঠ অস্ত্রের দেহে সংক্রামিত হয় না।

আমাদের এ-প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য কুষ্ঠ-চিকিৎসা-
সম্বন্ধে সাধারণকে দু-চারিটি কথা বলা। কুষ্ঠরোগের
ঔষধ বাহির করিবার জন্ত অনেক দিন হইতেই
বৈজ্ঞানিকেরা খুব চেষ্টা করিতেছেন—সম্পূর্ণ সফলকাম
না হইলেও কতকপরিমাণে হইয়াছেন।

ডাইক ও রস্‌চিদ্ বে নামে দুইজন পণ্ডিত কুষ্ঠরোগের
জীবাণুর দেহ হইতে একরকম চর্কি-জাতীয় (fatty
substance) জিনিষ বাহির করিয়াছেন। এখন কোনো-
রকম জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেও মাতৃষের
রক্তে ঐ জীবাণুগুলিকে বিনষ্ট করিতে পারে, এমন-একটা
জিনিষ তৈরি হয়। যে সমস্ত জীবাণু কুষ্ঠরোগের কারণ,
তাহাদের দেহে ঐ চর্কি-জাতীয় জিনিষটা থাকিবার জন্ত

মালুমের রক্তে যে বাধা দিবার জিনিষটা তৈরি হয়, ঐ জিনিষটা কুষ্ঠ-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন, কুষ্ঠ-জীবাণুর দেহ হইতে তৈরী চর্কিজাতীয় জিনিষটি ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু ক্রিয়া বাড়াইয়া যদি ইন্জেক্শান্ (Injection hypodermic) যাত্রা কুষ্ঠ-রোগীর দেহের মধ্যে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার রক্তে ঐ চর্কিজাতীয় জিনিষটাকে নষ্ট করিবার একটা শক্তির বিকাশ হয়। তাহা হইলে মালুমের-রক্ত-তৈরী বাধা দিবার জিনিষটা কুষ্ঠজীবাণুগুলিকে সহজেই ধ্বংস করিতে পারে। কেননা ঐ চর্কিজাতীয় জিনিষটা—যেটা রক্ত-তৈরী বাধা-দিবার-জিনিষটাকে কুষ্ঠ-জীবাণুর উপর কাজ করিতে দিতেছিল না—সেটা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা ঐ চর্কিজাতীয় জিনিষটির নাম নাস্টিন-বি (Nastin-B) রাখিয়াছেন। নাস্টিন-বি অনেকগুলি কুষ্ঠরোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, উহা দ্বারা কুষ্ঠরোগ অনেক-পরিমাণে কমানো যায়। আমরাও নাস্টিন-বি ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছি—নাস্টিন-বি ব্যবহারে একটি কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণভাবে আরাম হইতে দেখিয়াছি। আমরা নাস্টিন-বি ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে আল্ট্রা ভায়োলেট্ (Ultra-Violet) আলোক কুষ্ঠরোগীর ঘায়ে উপর ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া ফেলিয়া যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছি।

সূর্যের আলোককে যদি কোনো ত্রিকোণাকৃতি কাঁচের (prism) ভিতর দিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সূর্যালোক বেগুনী, নীল, লাল, হলুদে, সবুজ, ভায়োলেট্ (Violet) কমলা লেবুর রং (Orange) ও ইণ্ডিগো (Indigo) এই সাত-রকম আলোতে ভাগ হয়। এখন ঐ সাত-রকম আলো ছাড়া আরো কতকগুলি আলোতে সূর্যের আলোক ভাগ হয়। কিন্তু ঐ আলোগুলি মানব-চক্ষুর অগোচর। ঐ আলোগুলি ভায়োলেট্ আলোর পানেই পড়ে। অনেক বৈজ্ঞানিক আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে এমন অনেক চর্মরোগ সারাইয়াছেন, যাহা বহু চিকিৎসাতেও কিছু হয় নাই। এই আলোকের জীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি অসাধারণ।

এখন যদি দরিদ্র কুষ্ঠরোগীগণকে এইভাবে চিকিৎসা করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। আমরা এই বিষয়টি লইয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি। ভগবান্ জানেন, কতদূর সফলকাম হইব। পাঠকদিগের নিকট সর্বিনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন গরীব কুষ্ঠরোগীদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন।

শ্রী রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২১এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,
বৌবাজার, কলিকাতা।

দৈন্য

শ্রী কালীপদ রায়

ভাগ্যদেবের মহা মতিশাপ কক্ষণে তব সৃষ্টি,
স্বরণে চিত্ত ভীতি-কম্পিত, শনির করাল দৃষ্টি।
পুষ্পকাননে দাবানল জ্বালি' অস্তরে তব তৃপ্তি,
পূর্ণে করিয়া শূন্য তোমার প্রকাশো দানব-দৃষ্টি।
শিশুর বদনে আনো ক্রন্দন নাশি' হর্ষের হাশ্বে,
মসী-কলঙ্ক অঙ্কিত করো সহাস কিশোরী-আশ্বে।
শক্তি-সাহসে পূর্ণ যুবকে নিয়োজিত করো দাস্বে,
অপমৃত করো দীর্ঘশ্বাসে কামিনীর কম-লাস্যে।
দিগন্তমকারী প্রবল ঝঞ্ঝা প্রণয়-পয়োধি-বক্ষে,
ভূলায়ে বৃদ্ধে ধর্মসাধনা ঝরাও অশ্রু চক্ষে।

শিল্পীর তুলি তুলিয়া গোপনে নিজীব করো সৃষ্টি,
কবির লেখনী স্তব্ধ করিয়া ব্যর্থতা করো বৃষ্টি।
সুস্থ সবল শরীরে তুমিই ছরতিক্রম-যন্ত্রা,
মৃত্যু-মহিমা প্রচারে তোমার শক্তি পরম দক্ষা।
বিফলতা তব সদা-সঙ্গিনী, অপমান প্রিয়-সঙ্গী,
বিবেক, বুদ্ধি পলায় স্তব্ধে সজ্ঞাসে দেখি' ভঙ্গী।
যন্ত্রণা হেরি' সদা আনন্দ পিশাচ-দারুণ-চিত্তে,
সংসারে কেহ স্বপ্নেও তোমা চাহে না ছাড়িয়া বিত্তে।
যাও অনাহত রক্ত-শিখা ল'য়ে অহুচর-বর্গ,
তোমার দৈন্তে ধন্য মানিমা মর্ত্য হউক স্বর্গ।

শ্রী

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

আমিও তোমার মতো সৃষ্টিয়াছি একখানি অপূর্ব ভুবন,
সেখা রাত্রি নেমে আসে বন্ধে ল'য়ে বিরহের ব্যথা-গুঞ্জরণ
রিক্তা নিরাভরণার মতো
অন্ধে ধরি' ব্যর্থতার ব্রত ।

প্রেমের পাচুর্য্য দিয়া রচিয়াছি আকাশের মজল মহিমা,
ব্যথার লাবণ্য দিয়া আঁকিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা ;
রামধনু আঁকিয়াছি অক্ষুট চুষনে,
গগন-কম্পন-ব্যথা মুগ্ধ-আলিঙ্গনে !

অসংখ্য আশার ভাতি জালায়েছি নয়নে তারার,
অশ্রু দিয়া গড়িয়াছি নবঘন পুঞ্জিত আবাচ ।
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি' তুলি' জলদের কম্পন-আনন্দে,
মনের নিকুঞ্জতল পুঞ্জ-পুঞ্জ বেদনার কেতকী-সুগন্ধে
আন্দোলিয়া উঠিছে উত্তলি',
আকাজ্জার বিহঙ্গ-কাকলী !

যেমন তুমি হে কবি, রচিয়াছ এ সুন্দর সৃষ্টির কবিতা,
আপন আনন্দ-ছন্দে মেলিয়াছ নব-নব বর্ণ-বিলাসিতা,
তেমনি আমিও কবি ; আমার কল্পনা ।
আঁকে নিত্য আনন্দের শুভ্র আলিঙ্গনা !

নিত্য মায়া-মহোৎসব আমার সে মর্মরিত মর্মেের জগতে,
প্রিয়া সেখা চিরঘাত্রী পল্লব-হিমোল-ফুল ফাস্তনের রথে ;
প্রাণের কুসুম দিয়া সেখা নিত্য মাল্য-বিরচন,
ব্যথিত বৃকের গৃহে সেখা মোর বাসক-শয়ন,
সেখা নিত্য আশা যায় বুনি'
আকাশের ফুলের ফাস্তনী !

আমিও তোমার মতো, হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্যাপা খেয়ালী,
বেদনার রসায়নে রচি নিত্য ব'সি-ব'সি আনন্দের দীপের মেয়ালি
অস্তর-ব্যঞ্জনা দিয়া মঞ্জুল করেছি মোর মনের মঞ্জুবা,—
সেখা রাত্রি-অবসানে দেখা দেয় তরুগাত্রী জ্যোতির্ময়ী উষা ;

সেখা সূখা-সস্থানের নব-নব জন্মের উৎসব,
আলোকের স্তোত্র-স্তোত্রে আনন্দের মঞ্জ-কলরব,
সেখা ফোটে প্রেমের মালতী,
তাই সেখা অরণ-আরতি !

যেমন তুমি গো তা'র পর,
ভেঙে ফেলো স্বপ্ন-খেলা-ঘর,
ধূলির সঞ্চয় কাড়ি' নিঃসঞ্চল করো ধরণীয়ে,
সৃষ্টির কবিতাখানি অবহেলে ফে'লে দাও ছি'ড়ে—
তেমনি আমিও একদিন
অশান্ত বিরক্ত তৃপ্তিহীন
দারুণ হেলার ভরে চূর্ণ করি আনন্দ-লেখনী,
দীর্ঘশ্বাসে ভ্রম ক'রে দিয়ে যাই স্বপ্নের বিপণী,
দুইজনে ভয়ঙ্কর বীভৎস নিষ্ঠুর,
গুধু ছবি আঁকি ব'সে জীবন-মৃত্যুর !

আমার ভুবনে আমি তোমা-মতো খুশী-ক্যাপা শ্রীটা,ভগবান্—
কাহারে বঞ্চিত করি, বন্ধ ভরি' কাহারে সর্বস্ব করি দান ;
মিলন-চুষন করে, কাহারে বা আতপ্ত বিরহ,
কারে দগ্ধ মরুভূমি, কারে বর্ষা-অশ্রু-অহুগ্রহ ;
আমার খেয়াল-মতো গান গাহি ভৈরবী-বিভাসে,
ধস্ত করি কারে প্রেমে ; খিন্ন করি কারে দীর্ঘশ্বাসে ;
কারে কণ্টকের মালা, কারে বা মাধবী,
যাহা খুশী দান করি তোমা-সম, কবি !

আমিও তোমারি মতো পাইয়াছি অমূল্য সে স্বর্গ-সিংহাসন,
রাত্রিদিন সেখা বসি' মূল্যহীন রাজস্বের করি আয়োজন ;
অকারণে ব'সে-ব'সে কণিকের কণপ্রভা হানি',
তোমারি মতন শেষে মৃত্যুর গুণ্ডন দিই টানি ;
মি'শে যায় একে-একে মূল্যহীন স্বপ্নের বৃষুদ,
আতকে নিবিয়া যায় সে-রহস্যলীলার বিদ্যুৎ,
প'ড়ে থাকে বিদীর্ণ বাশরী,
ভয় যত ভাবের গাগরী !

সনৎকুমারের ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সনৎকুমার নারদকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ম অধ্যায়) অন্য তাহাই আলোচিত হইবে।

একসময়ে নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—“ভগবন্! আমাকে (ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষা দিন।”

সনৎকুমার বলিলেন, “তুমি যাহা জান, তাহা প্রথমে বল; পরে তাহার অতিরিক্ত বলিব।”

তখন নারদ ১২টি বিদ্যার নাম করিয়া বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি এইসমুদয় বিদ্যা অবগত আছি। কিন্তু এইসমুদয় বিদ্যা লাভ করিয়া আমি কেবল মন্ত্রবিৎ হইয়াছি—আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। ভগবৎসদৃশ লোকসমূহের মুখে শুনিয়াছি, যে আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকমগ্ন; ভগবান্ আমাকে শোকের পর-পারে লইয়া যান।”

ইহা শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন—“তুমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নামমাত্র। তুমি নামকে (ব্রহ্মরূপে) উপাসনা কর।”

তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?”

সনৎকুমার বলিলেন—“নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ। তুমি এই বাক্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর।” ছ: ৭।১।

ইহার পরে আরও ১৩ বার প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। এইসমুদয় প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন— তাহা এই: -

বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, সঙ্কল্প

* ১২টি বিদ্যা এই:—(১) ঋষি, (২) যজুর্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) আথর্ষবেদ (= অথর্ষ বেদ), (৫) ইতিহাস ও পুরাণ, (৬) ব্যাকরণ, (৭) ব্রহ্মতত্ত্ব, (৮) গাণিত্যবিদ্যা, (৯) দৈব-উৎপাদ-বিংগক বিদ্যা, (১০) কালবিদ্যা, (১১) তর্কবিদ্যা, (১২) নীতিবিদ্যা (১৩) নিকট, (১৪) ব্রহ্মবিদ্যা, (১৫) ভূতবিদ্যা, (১৬) ক্ষত্রবিদ্যা, (১৭) নক্ষত্রবিদ্যা, (১৮) সর্পবিদ্যা এবং (১৯) দেবজনবিদ্যা।

অপেক্ষা চিত্ত, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অপেক্ষা বল, বল অপেক্ষা অন্ন, অন্ন অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা সৃষ্টি, সৃষ্টি অপেক্ষা আশা এবং আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। ছা: ৭।২—১৪।

এ-স্থলে ‘নাম’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘প্রাণ’ পর্যন্ত ১৫টি সত্তা, বা বস্তু বা বিষয়ের নাম করা হইয়াছে। প্রথমটা অপেক্ষা দ্বিতীয়টা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়টা অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ, তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেষ্ঠ; এইভাবে অগ্রসর হইয়া শেষবারে বলা হইয়াছে চতুর্দশ অপেক্ষা পঞ্চদশ শ্রেষ্ঠ। একটি অপেক্ষা অপরটি কেন শ্রেষ্ঠ, প্রত্যেকবারেই তাহার কারণও দেখান হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব বস্তুটিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সনৎকুমার শেষবার যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

“আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। (রথচক্রের) অর-সমূহ যেমন (রথের) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সমুদায়ই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ দ্বারাই প্রাণ কার্য করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ। যদি কেহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য বা ব্রাহ্মণকে সম্মান না দেখাইয়া প্রত্যাশ্রয় করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বলে—‘ধিক্ তোমাকে; তুমি পিতৃহা (—পিতৃ-হত্যা), মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বশৃহা, আচার্য্যহা, এবং ব্রাহ্মণহা। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, যদি কেহ শূল দ্বারা ইহাদিগের দেহকে বিদ্ধ করিয়া সম্যক্রূপে দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলিবে না—‘তুমি পিতৃহা, মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বশৃহা, আচার্য্যহা বা ব্রাহ্মণহা’। (সুতরাং) প্রাণই এইসমুদয়।

যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন করেন,

এবং এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে, “তুমি অতিবাদী”,—তিনি (ইহার উত্তরে) বলিবেন—“হাঁ আমি অতিবাদী”, ইহা তিনি গোপন করিবেন না”। ৭।১৫।

‘অতিবাদী’ শব্দের একটি অর্থ, ‘যে অধিক কথা বলে’; অপর অর্থ—নিন্দাসূচক। কিন্তু উপনিষদে এই শব্দ অল্প অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতি—অধিক, সাধারণ তত্ত্বের অতীত; বাদী—বক্তা। অতিবাদী—অধিকতত্ত্বের বক্তা কিংবা শ্রেষ্ঠ বক্তা। ‘নাম—ব্রহ্ম’—এই তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া “আশা—ব্রহ্ম” এইপর্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ তত্ত্ব। কিন্তু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’—এই জ্ঞান পূর্বোক্ত সত্যসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব-পূর্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন, সুতরাং কিছু অতিরিক্ত বলেন। এইজন্য এইপ্রকার লোককে এস্থলে ‘অতিবাদী’ বলা হইয়াছে।

নারদ এপর্যন্ত যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ‘অতিবাদী’ বলা যাইতে পারে। নারদও বুঝিয়াছিলেন যে তিনি অতিবাদী হইয়াছেন। তিনি যখন অতিবাদী হইয়াছেন তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইল যে ‘প্রাণই ব্রহ্ম’ ইহাই শেষ কথা। সেইজন্য তিনি আর প্রশ্ন করিলেন না—“প্রাণ-অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?”

যখন সনৎকুমার দেখিলেন যে, নারদ আর প্রশ্ন করিতেছেন না, তখন তিনি নিজেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

সত্য

তাঁহার উপদেশ এই :—

যিনি সত্য দ্বারা (অর্থাৎ সত্য লাভ করিয়া) অতিবাদী হন, তিনিই (প্রকৃত পক্ষে) অতিবাদী।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি সত্যকে জানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি”।

সনৎকুমার বলিলেন :— “সত্যকে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।”

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি সত্যকে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করিতেছি।” ৭।১৬।

বিজ্ঞান

সনৎকুমার বলিলেন :—“যখন মানুষ বিশেষ-রূপে জানে, তখনই সত্য বলে। বিশেষ-রূপে না জানিয়া সত্য বলে না; বিশেষ-রূপে জানিয়াই সত্য বলে। সুতরাং এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত”।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।” ৭।১৭।

মনন

সনৎকুমার বলিলেন :—“যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে বিশেষ-রূপে জানিতে পারে না। সুতরাং এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত”।

নারদ বলিলেন, “হে ভগবন্! আমি মননকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।” ৭।১৮।

শ্রদ্ধা

সনৎকুমার বলিলেন—“মানুষ যখন শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই মনন করিতে পারে, শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে মনন করিতে পারে না; শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই মনন করিতে পারে। সুতরাং শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে”।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।” ৭।১৯।

নিষ্ঠা

সনৎকুমার বলিলেন—“মানুষ যখন নিষ্ঠাবান হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান না হইলে শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না, নিষ্ঠাবান হইলেই শ্রদ্ধাবান হইতে পারে। সুতরাং নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।”

নারদ বলিলেন—“আমি এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি”। ৭।২০।

কর্ম

সনৎকুমার বলিলেন :—“যখন লোকে কর্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান হয়। কর্ম না করিলে নিষ্ঠাবান

হইতে পারে না ; কৰ্ম করিলেই নিষ্ঠাবান হয় । সুতরাং এই 'কৃতি'কেই (অর্থাৎ কর্তব্য কৰ্মকেই) বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত ।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমি এই কৃতিকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি” । ৭১২১ ।

সুখ

সনৎকুমার বলিলেন—“যদি মানুষ সুখ লাভ করে, তবেই কৰ্ম করে । সুখ লাভ না করিলে কৰ্ম করে না ; সুখ লাভ করিলেই কৰ্ম করে । সুতরাং এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত” ।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমি এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।” ৭১২২ ।

ভূমা

সনৎকুমার বলিলেন—“যাহা ভূমা তাহাই সুখ ; যাহা অন্ন, তাহাতে সুখ নাই । ভূমাই সুখ । এই ভূমাকেই জানিবার ইচ্ছা করা উচিত” ।

নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমি এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি” । ৭১২৩ ।

সনৎকুমারের মতে এই ভূমাতত্ত্বই শেষ তত্ত্ব । ইহা-অপেক্ষা অধিক জানিবার বা বলিবার কিছু নাই ।

প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পরে সনৎকুমার নারদকে সত্য, বিজ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৰ্ম ও সুখ-বিষয়ে উপদেশ দিলেন । এই উপদেশের ভাবার্থ এই :—

(১) সুখ হয় বলিয়াই লোকে কৰ্ম করে । (২) কর্তব্য কৰ্ম করিতে-করিতে ইহাতে তাহার নিষ্ঠা হয় অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে স্থিতি হয় ; কর্তব্য সম্পাদনে তাহার দৃঢ়তা জন্মে । (৩) কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হইলেই মানুষ সত্যে শ্রদ্ধাবান হয় । (৪) সত্যে শ্রদ্ধাবান হইলেই সে সত্যকে মনন করে । (৫) সত্যকে মনন করিলে সত্যের বিজ্ঞান জন্মে । (৬) সত্যের বিজ্ঞান অর্থেই সত্য-লাভ । এইরূপে সত্য-লাভ করিয়া যিনি অতিবাদী হন, তিনিই প্রকৃতভাবে অতিবাদী ।

কেহ-কেহ বলেন, এস্থলে 'কৰ্ম' অর্থ 'ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কৰ্ম ;' এবং 'নিষ্ঠা' অর্থ গুরু-গুরুবাদিতে তৎপরতা । শাস্ত্রে অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরু-গুরুবাদিকে অতি

শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে ! সুতরাং এ-অর্থও অসঙ্গত নহে ।

এস্থলে সনৎকুমার সত্য-লাভের এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ নির্দেশ করিলেন । পথ এই—প্রথমে কৰ্ম, তাহার পরে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও মনন । এই মনন দ্বারাই সত্যের বিজ্ঞান হয় অর্থাৎ সত্য-লাভ হয় । কেহ-কেহ বলেন, এ-স্থলে 'সত্য' অর্থ 'সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম' ।

ভূমা

কৰ্ম-সম্পাদন এইজগত্বে সম্ভব হয়, যে কৰ্মে সুখ আছে । সুখ না থাকিলে মানুষ কৰ্ম করিতে পারিত না । কিন্তু প্রকৃত সুখ কি ? সনৎকুমার বলিতেছেন—

“যাহা ভূমা তাহাই সুখ ; যাহা অন্ন তাহাতে সুখ নাই । ভূমাই সুখ । এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে হইবে ।” ৭১২৩

ভূমার প্রকৃতি

ভূমার প্রকৃতি-বিষয়ে সনৎকুমার এইপ্রকার বলিয়াছেন :—

যাহাতে অগ্ন-কিছু (অগ্ন) দেখা যায় না, অগ্ন-কিছু শুনা যায় না, অগ্ন-কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা । আর যাহাতে অগ্ন-কিছু দৃষ্ট হয়, অগ্ন-কিছু শ্রুত হয়, অগ্ন-কিছু বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অন্ন । যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত ; আর যাহা অন্ন, তাহাই মরণশীল ।” ৭১২৪।১

এই অংশকে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । যাস্তবস্ব্য অনেক স্থলে অস্তবাহ্য ভেদ-রহিত ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন । শঙ্করপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভূম-প্রকরণেও ঐপ্রকার ভেদরহিত ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে ।

অনেকে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, হেদাভেদ-বাদ প্রভৃতি সমর্থন করিয়া এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহারা বলেন ভূমা হইতে পৃথক্ ও দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, কিন্তু ভূমাতে স্বগত-ভেদ আছে । ভূমার মধ্যে জড় জীবাদি যাহা আছে, তাহা ভূমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাহা ভূমা হইতে পৃথক্ নহে ।

ভূমার প্রতিষ্ঠা

ভূমার প্রকৃতি কি-প্রকার তাহা শ্রবণ করিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

‘হে ভগবন! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?’

সনৎকুমার ভূমার প্রকৃতি-বিষয়ে তাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মৃতিজাত হইলে এ-প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যখন একমাত্র ভূমাই বর্তমান, যখন ভূমা এক এবং অদ্বিতীয়, যখন ভূমা হইতে পৃথক কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই তখন ভূমার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন-প্রকার চিন্তা আসিতে পারে না। কিন্তু শেষে বা কোন ঘটনায় এইপ্রকার চিন্তা আসে, সেইজন্যই নারদের মুখে ঐ প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন, ‘স্বীয় মহিমাতে’। এই সন্দেহ-সন্দেহই বলিলেন, ‘অথবা স্বীয় মহিমাতেও নহেন’। ৭.২৪।১

ভূমা নিজেতেই নিজে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে, ‘তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত’। ইহা শুনিয়া নারদ মনে করিতে পারিত যে ভূমারও আশ্রয় আবশ্যিক এবং ইহাও মনে হইতে পারিত যে, ‘ভূমা এক এবং ভূমার মহিমা অল্প এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অন্তে প্রতিষ্ঠিত’। এইপ্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—‘ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন’, অর্থাৎ তাহার আশ্রয় আবশ্যিক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব।

আমরা এস্থলে যে ব্যাখ্যা দিলাম, সনৎকুমার নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন :—

‘লোকে এই জগতে গো ও অশ্ব, হস্তী ও হিরণ্য, দাস ও ভার্য্যা, ক্লেদসমূহ ও বাসগৃহসমূহকে ‘মহিমা’ বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি এপ্রকার (মহিমার কথা) বলিতেছি না; কারণ (ইহাদিগের মধ্যে) এক অপর বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।’ ৭।২৪।২

ভূমা-দর্শন

ভূমাকে কিভাবে দর্শন করিতে হইবে সে-বিষয়ে সনৎকুমার এইপ্রকার বলিতেছেন :—

(ক)

‘তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধভাগে, তিনিই

পশ্চাৎভাগে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—আমিই এইসমুদায়’।

(খ)

‘আমিই অধোভাগে, আমিই উর্দ্ধভাগে, আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—তিনিই এইসমুদায়’।

(গ)

‘আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাৎভাগে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে—আত্মা এইসমুদায়’। ৭.২৫

এই যে তিনভাবে ভূমাকে দর্শনের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে, ইহার অর্থ অতি গভীর। তাহাকে প্রথমে দেখিতে হইবে তৃতীয় পুরুষরূপে। ‘তিনিই সর্বত্র এবং তিনিই সমুদায়’—এইভাবে ‘ভূম-দর্শন’ সাধনের প্রথম স্তর। কিন্তু এপ্রকার দর্শন যথেষ্ট নহে। ভূমাকে তৃতীয় পুরুষরূপে দর্শন করিলে দ্বৈতজ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় না। এইজন্য ঋষি উপদেশ দিলেন—‘অহম্’ ভাবে (অর্থ ‘আমি’ এইভাবে) ‘ভূম-দর্শন’ করিতে হইবে। ‘আমিই সর্বত্র এবং আমিই সমুদায়,’ এইভাবে দর্শনের নাম ‘অহম্’ দৃষ্টিতে ‘ভূম-দর্শন’। ইহা সাধনের দ্বিতীয় স্তর। এইপ্রকার সাধনে ভূমা এবং ‘অহম্’—এতদুভয়ের একত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু এপ্রকার দর্শনও যথেষ্ট নহে। ‘অহম্’ জ্ঞানও দ্বৈত-মূলক। ‘অহম্’ (অর্থাৎ ‘আমি’) বলিলেই ‘ইদম্’ (অর্থাৎ ‘ইহা’) বুঝায়। এখানেও ভেদ-বুদ্ধি রহিয়া গেল। এই ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য ঋষি উপদেশ দিলেন—ভূমাকে আত্মদৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে।

আত্মাই সর্বত্র এবং আত্মাই সমুদায়—এইপ্রকার দর্শনের নাম আত্ম-দৃষ্টিতে—‘ভূম-দর্শন’। পার্থক্য মতে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং আত্মদৃষ্টি ভূম-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। ‘এই জগৎই ব্রহ্ম’ কিংবা ‘আমিই ব্রহ্ম’—এপ্রকার বলিলে ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব বলা হয় না। ‘তিনি আত্মা’—ইহাই শেষ কথা। ‘ভূমা প্রকরণে’ বলা হইল যিনি আত্মা, তিনিই ভূমা এবং যিনি ভূমা, তিনিই আত্মা।



শিল্পেৰ দুবাহু
‘চত্ৰকৰ ত্ৰী বামলুনা’ ১৯৬৬
শান্তিনিকেতন

ভূম দর্শনের ফল

ভূম-দর্শনের ফল কি, সে-বিষয়ে ঋষি এইপ্রকার বলিতেছেন :—

“যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন করেন, এইপ্রকার বিজ্ঞানলাভ করেন, তিনি আত্মরতি আত্ম-ক্রীড়া, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনি স্ব-রাট্ হন।

আর যে ইহা অপেক্ষা অন্তরূপ জানে, সে অস্ত্রের অধীন হয় এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদায় লোকে তাহার পরাধীন।

এইপ্রকার স্রষ্টার, এইপ্রকার মনন-কর্তার, এই-প্রকার বিজ্ঞাতার নিকট আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই স্বেদ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিন্তা, আত্মা হইতেই সঙ্কল্প, আত্মা হইতেই মন, আত্মা হইতেই বাক, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতেই মন্ত্রসমূহ এবং আত্মা হইতেই এই সমুদয় (উৎপন্ন হয়)” । ৭।২৬।১

নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য ঋষি নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“তত্ত্বদর্শী মৃত্যুদর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না এবং দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদায়ই করেন, এবং সর্বদা সমুদায়ই লাভ করেন। তিনি (সৃষ্টির পূর্বে) এক ; (সৃষ্টির পরে) তিনি তিন-প্রকার,

পাঁচ-প্রকার, সাত-প্রকার, নয়-প্রকার হন ; পুনশ্চ তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ, এবং এক হাজার বিশ বলা হয় (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয়রূপে বর্তমান এবং সৃষ্টির পরে বহুরূপে প্রকাশিত) । ৭।২৬।২

যিনি ভূমাকে দর্শন করেন, তিনি ভূমত্বই লাভ করেন। ভূমা আত্মাই ; ভূমজ্ঞও অমৃত্যব করেন যে, তিনিও সেই আত্মা এবং তিনি ইহাও অমৃত্যব করেন যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণাদি যাহা-কিছু আছে সমুদায়ই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদর্শনের পর যে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞ অমৃত্যব করেন যে, সৃষ্টির পূর্বেও তিনি এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে বর্তমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরও তিনি সেই আত্মা ; তবে এই সময়ে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত (৭।২৬।২)। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী প্রত্যক্ষ করেন যে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় তিনি সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম।

সিদ্ধান্ত

‘ভূম-প্রকরণ’ আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

- ১। ভূমা এক ও অদ্বিতীয়।
- ২। এই ভূমা আত্মাই।
- ৩। আমরা যাহাকে মানবাত্মা বলি, তাহা ভূমাই অর্থাৎ ব্রহ্মই।
- ৪। এই অধ্যায়ে ‘নাম’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত যে ১৫টিকে প্রথমে ব্রহ্ম বলা হইয়াছিল, সে-সমুদায়ই আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন ভারতে কার্পাস-শিল্প ও চরকা

শ্রী বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

চরকাই প্রাচীন হিন্দু জাতির বস্ত্র জোগাইয়া দিত। তখন কল-কারখানা বা অন্য কোনো বিপুলায়তন যন্ত্রের প্রচলন ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু কত পূর্ব কাল হইতে যে চরকা এদেশে বস্ত্রদান করিয়া আসিতেছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যতদিন হইতে আৰ্য্য হিন্দুগণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, ততদিন হইতেই চরকার সৃষ্টি হইয়াছে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর অতি সুদূর কাল হইতেই যে তাঁহারা সভ্যতায় সম্মত ছিলেন এবং সভ্যজনোচিত বসনাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা স্থনিশ্চিতরূপে বলা যায়। এক্ষণে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে কতকাল পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা গণিয়া স্থির করা যায় না। পুরাণাদির সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে ত সে-কালের সীমা নির্ণয় হয় না; বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদিগের বিবেচনাতেও উহা বিংশ, ত্রিংশ বা পঞ্চাশ শতাব্দী খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে ঘাইয়া পড়ে। সেই অতিপ্রাচীন কাল হইতেই যে বয়নশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এবং তাহা ভারতীয় আৰ্য্য-জাতির সভ্যতার পরিচ্ছদ জোগাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ। আধুনিক পণ্ডিতগণ উহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বেদ ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাহাতে সমাজনীতি আদি বস্তুর বিষয়ের মৌলিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তৎকালে আৰ্য্য হিন্দুদিগের সামাজিক গঠন, শিল্প-নৈপুণ্য প্রভৃতি কিরূপ ছিল, বৈদিক গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ যে সময়ে প্রচলিত হয়, মানব-ইতিহাসের সেই প্রাচীনতম যুগে, হিন্দুদিগের পূর্বপুরুষগণ বয়ন-শিল্প সবিশেষ অবগত ছিলেন; এবং সভ্যজনোচিত বেশভূষাদি পরিধান করিতেন। বিবিধ মন্ত্র হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

‘উকীষ’ শব্দ মন্তকের ভূষণ বা বসন বাচক, সকলেই জানেন। বৈদিক গ্রন্থে ইহার বহুল উল্লেখ রহিয়াছে— বিজ্ঞানং বাসোংকুক্ষীষঃ : অথর্ক ১৫, ১১৫), মৈত্রেয় সংহিতা (৪।৪।৩), কাঠক সংহিতা (১৩।১০) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬।১), শতপথব্রাহ্মণ (৩।৩।২।৩) প্রভৃতি আরও অনেক স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত আছে।

‘পরিধান’ শব্দের অর্থ সাধারণ কাপড় বা ধুতি; ‘নোবি’র অর্থ ভিতরে পরিবার বস্ত্র, যেমন নেজট-বিশেষ; ‘অধিবাস’ অর্থে উপরে গায়ে দিবার কাপড়—ওড়না বুঝায়। বৈদিক মন্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে—

যন্তে বাসঃ পরিধানং যাং নোবিং কৃণুযে স্ব।
শিবং তে তযে তৎকৃণুঃ সংস্পর্শে জ্ঞকমন্ততে।

(অথর্ক—৮।২।১৬)

—যেই বস্ত্র তোমার ধুতিরূপে পরিধান করিয়াছ, আর বাহা তার নীচে পরিয়াছ, তাহা তোমার শরীরের পক্ষে উত্তম শোভাদায়ক হইয়াছে, আর উহাতে তোমার শরীরে স্পর্শ করিলে মাত্র (আঁটা হইয়া কষ্ট দায়ক হইবে না)।

আবার, অধিবাসং পরিমাতুরিহন্নহং (ঋগ্বেদ ১।৪।১২)
—ইহা মাতার উপরে-পরিবার (ওড়নী) বস্ত্র।

এস্থলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেইকালে শরীরের মাপের ঠিক যোগ্য করিয়া বস্ত্র তৈয়ারি করা হইত; এবং মাতার (স্ত্রীদিগের) জন্ম বিশেষ-প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

এতদ্ব্যতীত ‘জাবি’ ও ‘অংক’ (চোগা ও কোট ইত্যাদি), ‘সামুল’ ‘শামুলা’ (গরম কাপড়, পশমী বস্ত্র ইত্যাদি) প্রভৃতির বহুস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে; [ঋ— ১।২৫।১৩, ১।১১।৬।১০, ৪।৫।৩২, ২।৮।১।১৪, ১০।৪।২।৩, ১০।২।২।২, ১০।৮।২।২২, ৪।৫।৩।২, ৬।২।২।২, ইত্যাদি]

আবার, ভালো কাপড় (=‘সুবসন’ ঋ—৬।৫।১।৪, ২।২।১।১৫, ১।১২।৪।৭, ৩।৮।৪, ১০।৭।১।৪), রাজার যোগ্য বস্ত্র (ঋ—৬।৫।১।৪; অথর্ক—২।১।৩), পতিতদিগের পোষাক (অথর্ক ১৪।১।৫৩), মাজলিক বেশ (অথর্ক ১৪।১।৩০),

বুটীদার বা embroidered কাপড় (—‘পেশস্’, ঋ—২।৩।৬, ৪।৩৬।৭, ৩।৩৪।১১, ৭।৪২।১ ; বাজ. ষজু—১২।৮২, ২০।৪০ ; ঐত. ব্রা,—৩।১০, ষজু,—৩০।২ ; তৈত্তিরী. ব্রা—৩।৪।৫।১, ইত্যাদি), ঝালর (—‘তুস্’, তৈ. সং—১।৮।১।১, ২।৪।২।১, ৪।১।১।৩ ; কাঠক সং—১৬।১), কিনার বা পাড় (—‘দশা’, ‘দশাপবিত্র’, শত. ব্রা ৩।৩।২।২, ঐ. ব্রা—৭।৩২ ; শত ব্রা—৪।২।২।১১), আঁচলের দিকের সূতার বহিরংশে গ্রহি (—‘প্রগাথ’, তৈত্তি-সং—৪।১।১।৩ ; কাঠক সং—২৩।১), দরজা, জানালা আদির পরদা (—‘বাত-পান’, তৈ. সং—৩।১।১।৩), গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি ছোটো ও মোটা কাপড় (—‘প্রবর’, ‘প্রবার’, বৃহদা. উপ, ৬।১।১০ ; —‘বরাসী’, কাং সং—১৫।৪ ; —‘প্রাচীনাবীত’, শত. প.ব্রা, —২।৪।২।২, ইত্যাদি), বিবাহাদির জন্ত বিশেষ-প্রকার কাপড় (—‘বান্ধুংবাস’, ঋ—১০।৮।৫।৩৪ ; অথর্ক—১৪।২।৪।১) প্রভৃতি বৈদিক কালে প্রচলিত ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার কাপড়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত রঙীন কাপড় (বাজ. ষজু—১।১।৪০, ঋ—৪।৫।৩।২, শত. ব্রা—৫।৬।৫), সুন্দর সুন্দর কাপড় (ঋ—২।২।৭।৫০, ১।৮।৪, ১।১৩।৪।৪, ২।২।৬।১, ২।২।৭।২, ৩।৩।২।২, ১০।১।৬, ১৪।১।২।৭), রেশমী কাপড় (অথর্ক—১৮।৪।৩।১), পশমের কাপড় (ঋ,—১০।৮।৫।২২), অনেক কাপড় পরিবার রীতি (ঋ,—১।১।৬।১, অথর্ক ২।৫।২।৬, ঋ, ১।১৫।২।১), বস্ত্রদান (ঋ,—৫।৪।২।৮, ৬।৪।৭।২৩ ; অথর্ক—২।৫।২।৫, ৫।১।৩, ১৪।২।৪।১), এমন-কি কাপড়ের চোর (ঋ—৪।৩।৮।৫) প্রভৃতি বস্ত্র-বিষয়ক প্রায় সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

একগে বস্ত্র প্রস্তুত-করণ-বিষয়ে বৈদিক গ্রন্থের কি প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

সাধুপাংসি সনতান উকিতে উবা সানজা বন্যেবরন্বিতে ।
তত্ত্বং তত্ত্বং সংবরন্বী সমীচী বস্ত্রং পেশঃ স্ত্রুবে পরন্বতী ॥
(ঋ ২।৩।৬)

—‘আমাদিগের সাধু কর্তৃক সকলের চির কলপ্রদায়ী উবা ও নস্ত্র বয়ন কুশল রমণীষরের স্তায় পরস্পরের সাহায্যার্থ পরস্পর গমনাগমনকরতঃ বস্ত্রের রূপ নির্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত ভক্ত বয়ন-করিতেছেন।

পুনঃ সমব্যম্বিতত্ত্বং বরন্বী মধ্যা কর্তোক্ত ধাজ্জকম ধীর ।

(ঋ ২।৩।৪)

—‘বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর স্তায় রাজি পুনর্বার আলোককে সম্যক-রূপে বেটন করিতেছে।’

নাহং ভক্তং ন বিজানাম্যোতুং ন বং বয়ন্তি সমরেহমানাঃ ।

স ই ভক্তং স বিজানাত্যোতুং স বস্ত্রান্বতুখা বদাতি ॥

ঋ ৩।২।২।৩

—‘আমি ভক্ত (তানা) বা ওতু (বানা) জানি না। কিংবা সতত চেষ্টা করিয়া যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।

একমাত্র সেই বৈদ্বানর অগ্নি ভক্ত ও ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য-সমূহ বলিয়া দেন।’

আধীযমানায়া পতিঃ স্তচারাশ্চ স্তচস্ত চ ।

বাসো বারোহবী না মা বাসাংসি মমুন্নৎ ॥

ঋ ১০।২।৬।৬

—‘তিনি (পুত্র দেবতা) মেঘ-লোমের বস্ত্র বয়ন করেন। তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন ; ইত্যাদি

এইপ্রকার সূক্তসমূহের অন্তরালে তত্ত্ব ও বয়ন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত নিহিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া নানা-প্রকার মত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইসকল কথা ভরষাচ্ছ (ঋ ৩।২।২, ৩), গৃৎসমদ (২।৩।৬) প্রভৃতি ঋষিগণের কল্পনা-প্রসূত অলৌকবাণী কি না, এবং বৈদ্বানর অগ্নি ভক্ত ও বয়নবিদ্যার আবিষ্কার-কর্তা বা প্রথম শিক্ষাদাতা কি না, অথবা উষা উহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন, এবং পুত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন কি না এইসকল তত্ত্বের আলোচনা এখানে নিষ্পন্নোক্তন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সেই সূদূর ঋষি-যুগে তত্ত্ব ও বয়নবিদ্যা ভারতীয় আৰ্য্য সমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

কেবল তাহাই নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে তত্ত্ব-করণ বা সূতা-কাটা সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে :—

তত্ত্বং তদ্বন্ রজসো ভানুমধিহি, জ্যোতিমতঃ পথো রক্ষ ধিরা কৃত্যন ।
অমুখনং বয়ত জোণবামণো মমুর্ভব জনয় দেব্যং জনম্ ॥

১০।৫৩।৬

‘তোমরা সূতা কাটিয়া তাহাতে রং দিবে, এবং উহা নষ্ট হইয়া না যাইতে-যাইতে কাপড় বুনিয়া লইবে ; বিচার-শীল হইবে, স্ত্রীকাজ সৃষ্টি করিবে, আর তেজস্বীদিগের বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে পথ, তাহা রক্ষা করিয়া চলিবে। এইরূপ করা বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কার্য।’

এইস্থলে ঋগ্বেদ অন্যান্য কতিপয় সদসুশীলনের সহিত চরকায় সূতা-প্রস্তুত করণ, তাহাতে রং দেওয়া ও তাহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা সূধীদিগের কর্তব্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দারণ করিতেছেন। যাহারা বেদের ধর্ম অমুসরণ করেন ও তাহাতে গৌরব বোধ করেন তাহারা

উর্হাদিগের ধর্মের আদেশ বলিয়াই চরকাকে গ্রহণ করিতে পারেন।

বাস্তবিক বৈদিক গ্রন্থসমূহে তন্ত্র ও ব্রহ্ম নির্মাণ বিদ্যার একরূপ ছুরি-ছুরি উল্লেখ রহিয়াছে যেতাহাতে সেই-সময়ে আর্ষ্য হিন্দুদিগের ঘরে-ঘরে চরকা ও তাঁতের প্রচলন ছিল, একরূপ অসুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য বেদ তন্ত্র বা বয়ন-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ নহে। কেবল মন্ত্রার্থক অল্প বিষয়ের সম্পর্কে বেদ ইহাদের আভাস বা ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা-দিগের কোনো কোনো মন্ত্র ব্রহ্ম-প্রকরণে কোনো মন্ত্র দেয়ী বা পৃথিবীর বর্ণনে কোনো মন্ত্র উষার বর্ণনে, কোনো মন্ত্র বা অল্প বিষয়ে; দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র ব্রহ্ম-বয়ন বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহে এইরূপ আরো বহুবিষয়ের উল্লেখ বা আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের ইহা এক বিশেষত্ব; অন্য কোনো সাহিত্যে বা গ্রন্থে একরূপ পাওয়া যায় না।

তখন ঘরে-ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। জ্বীদিগের প্রধান কার্য ছিল দুইটি—সন্তান-পালন ও সূত্র এবং ব্রহ্ম প্রস্তুত-করণ। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র হইতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় :—

কৃত্যসিনী মারিনী সন্দধাতে মিহা শিশুঃ স্তম্ভতুর্ভবঃস্বী।
বিষস্ত নাস্তি চরতী প্রবস্ত কবেশ্বিঃ তস্তঃ মনসা বিসস্ত।
(ঋ ১০।৫।৩)

—‘সরল-স্বভাব কুশলদায়িনী স্ত্রীপণ সন্তানগণকে জনন ও পালন করিয়া থাকেন, আর শিশু ও চলনশীল সকল পদার্থের মধ্যস্থলে কবিশন-মূলত মানসিক শক্তি-সাহায্যে সমান মাপে সূত্র-যোজনা করিয়া ব্রহ্ম বয়ন করিয়া থাকেন।’

আবার,

তিস্র দেবীর্হবিবা বর্ধনান। ইন্দ্রঃ জুগাণা জনয়োম পত্নীঃ।
অচ্ছিন্নঃ তস্তঃ পরমা সঃ স্বতীড়া দেবী ভারতী বিবৃত্তাঃ।

—‘সকল কার্যকর্ম নিঃসৃত হইয়া, ভাষা ও সত্যতার বর্ধনশীল সন্তান-গণের জননীপণ হুহু ও হবিঃ দ্বারা ইন্দ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকেন এবং অচ্ছিন্ন তন্ত্র নির্মাণ করেন।’

জ্বীদিগের কর্তব্য, ব্রহ্মের তন্ত্র বিশেষ-প্রকার কাপড় বোনা, এ-বিষয়ে ব্রহ্মস্য পেশঃ সমীচী সংবয়ন্তী (ঋ ২।৩।৬) এই বাক্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার মাতা আপন পুত্রের তন্ত্র ব্রহ্ম বয়ন করিতেছেন এই আভাস প্রতিকলিত হইতেছে :—

বিতম্বতে থিরো অত্রা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রার মাতরে বস্ত্রি।
(ঋ ৫.৪৭।৬)

এই মন্ত্রে পুত্রের প্রতি মাতার কর্তব্য নির্দেশ করা যাইতেছে। বাস্তবিক মাতা পুত্রের তন্ত্র, পত্নী পতির তন্ত্র নিজ হস্তে কাপড় বুনিয়া দিলে তাহাতে উর্হাদিগের সদিচ্ছা ও সম্ভাবসমূহ ব্রহ্মের সূত্র-নালের সহিত জড়িত হইয়া পুত্র ও পতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে, এই ধারণা নিতান্ত ভাবুকেরই কল্পনা-মাত্র বলিয়া উপেক্ষা নাও করা যাইতে পারে।

পত্নী পতির তন্ত্র কাপড় বুনিয়া দিতেছে, নিম্নোল্লিখিত সূক্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে :—

যে অস্ত্রা যাবতীঃ সিতো য ওত্তরো সে চ তস্তবঃ।
বাসো যৎ পত্নীভিরুত্ত তন্নঃ স্তোনমূপ সম্পূশাৎ।

(অথর্ব ১৪।২।৫১)

—‘অস্ত্র (আঁচলা) ও কিনিরা (পাড়) এবং তানা ও বানা—এইসমূহের অর্থাৎ সূত্র কাটা, আঁচলা ও পাড় তোলা ইত্যাদি সহ পত্নীদিগের দ্বারা বোনা কাপড় আর্হাদিগের সূত্রকারক হউক।’

এই মন্ত্রের টীকা করিতে গিয়া কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে তৎকালে বিবাহের প্রথম দিন পতির পরিধানের নিমিত্ত কোনো বিশেষ-প্রকারের কাপড় নব-পরিণীতা পত্নীর নিজ হাতের তৈয়ারী থাকিত (গ্রিকিথ—অথর্ব-বেদ, পৃষ্ঠা ১৭২)

পিতারও ব্রহ্মবয়ন একস্থানে উল্লিখিত আছে।

—ইমে বস্ত্রি পিতরঃ (ঋ ১০।১৩০।১)

তাহা বালিয়া সমাজে তখন ব্রহ্ম-বয়ন ব্যবসায়ী তন্ত্র-বায়ের অভাব ছিল, একরূপ অসুমান করা যায় না। বেদ ইহার ইঙ্গিত করিতেছেন :—

উত্তা উ নুনঃ তদিদর্শয়েথ বিতম্বাথে থিরো বস্ত্রংসেব।

(ঋ ১০।১০০।১)

‘কবির কাব্য-রচনা ও তন্ত্রবায়ের ব্রহ্মবয়ন একরূপ। কপকুশল তন্ত্রবার বেঘন সূত্র রচনা দ্বারা ব্রহ্ম বয়ন করে, কবিশ্রম সেইরূপ সূত্রিচারপূর্কক লক্ষ রচনা করিয়া কাব্য প্রস্তুত করে।’ কি শুল্কর উপমা।

বস্ত্রঃ তস্তা সূত্রতা বস্তুয়ু রথঃ ন ধীরঃ স্বপা অতম্বু। . ঋ ৫.২২।১৫

—‘বুদ্ধমান, নিজ ব্যবসারে সূত্র লাভেচ্ছু কারিগরগণ যেই-প্রকার উত্তম ও সুন্দর বস্ত্র তৈয়ারী করে; ইত্যাদি।’

বাসোবারোহবীনায়া বাপাংসি ময়ুগৎ। (ঋ ১০।১৬৬) —‘ব্রহ্ম বয়নশীল তন্ত্রবারগণ মেঘ-আদির লোমের দ্বারা ব্রহ্ম বয়ন করিয়া থাকে, আর তাহা মাতিয়া সূত্রর করে।’

সৌমেন ওত্তঃ মনসা মনীষিণঃ উর্ধা পুত্রেন কবরো বস্ত্রি। (বসু— ১৩।৮০)

—‘মননশীল কবি (পুত্র) গণ উর্ধাশ্রিতের সহিত মন মিশাইয়া তাঁনার উপর কাপড় বুনিতেন।’

ইহা হইতে পুরুষগণের বস্ত্রবয়নে বিশেষ অধিকার জানা যায় ; এবং বোধ হয় উর্না বা পশমের সূত্রে কাপড় পুরুষগণই বয়ন করিত। বৈদিক স্মনেক মন্ত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসায় হিসাবে পুরুষগণ বয়ন করিত ; স্ত্রীগণ তানা প্রস্তুত করিয়া দিত ; এই শ্রম-বিভাগ তন্ত্রবায়গণের মধ্যে এখনও দেখা যায়। চরকার খুঁটা কাটা ঘরে-ঘরে প্রচলিত থাকি আরো সম্ভবপর ; নচেৎ সমুদায় সমাজের বস্ত্র সরবরাহ হইতে পারিত না। গৃহস্থ-ঘরে স্ত্রীগণও নিজ-নিজ পতিপুত্র প্রভৃতির কাপড় খুঁনিয়া দিতেন।

বয়ন-স্ত্রীদিগের ব্যবসায় পুরুষ এবং স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ-বিষয়ে বেদ-মন্ত্রের ইঙ্গিত রহিয়াছে—‘তানা’ তৈয়ারী করিবার কাজ স্ত্রীদিগের হাতে ছিল।

সরীসৃষ্টবস্ত্রে। (ঋ—১০।৭।১২)—‘সূত্র কার্যো-নিযুক্তা স্ত্রী তানা তৈয়ারী করে।’

আবার স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া বয়ন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশে কাজ করিতেছে, এমন-এক চিত্র অথর্ক বেদের নিম্ন-লিখিত সূত্রে রহিয়াছে :—

তত্তমেকে বুভতী বিরূপে অভ্যাজানঃ বরতঃ বন্থুৎ। প্রাণ্যা
উত্তরিততে ধন্তে অন্যা নাপ বৃষ্টাতে ন গমাতো অন্থুৎ।

তন্নোরহং পরিনৃত্যন্তোরিব ন বিজানামি যতরা পরন্তাৎ।

পুমানেন ঘরত্বাদ্গুণাতি পুমানেন বিজ্ঞ ভারধি নাকে।

(অথর্ক ১০।৭।৪২-৪৩)

—এই মন্ত্রে কর্ম-কর্তাদিগের কি প্রণালীতে কার্য করা উচিত তাহা বলা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তন্ত্রবায়ের কার্য দেখানো যাইতেছে।

‘স্ত্রিয়-স্ত্রিয় আকৃতির দুইটি নবীনা স্ত্রী চরটি খুঁটিতে লাগানো একই ঠাঁতে কাজ করিতেছে। একজন তানার দিকের সূতাগুলি টানিয়া দিতেছে, আর একজন তাহা ধরিতেছে। কেহই কোণে-কোণে কাজ নষ্ট করিতেছে না। তাহার কখনও কাজ বন্ধ করিতেছে না। নর্তকী-দিগের ন্যায় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ইহারা এই বে কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত আর তিনজন পুরুষও কাজ করিতেছে ; তাহাদের একজন বানের দিকে কাপড় বুনিতেছে ; আর-একজন উহা আলুগা করিয়া ধরিতেছে। তৃতীয় জন তাহা ঠিকরূপে উপরে ধরিয়া রাখিতেছে।’

অন্ত্রজ বয়নশালার এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে :—

পুমাং এনং তত্তুত উৎকৃপন্তি পুমান্ বিতন্তে অধিনাকে অগ্নিন্।
ইমে বন্থুখা উপসেত্বরঃ সদঃ সামানি চক্রন্তসরান্যোত্তবে। (ঋ ১০।১৩০।২)

—‘একজন ‘তানা’ ঠিক করিতেছে, আর-একজন ‘বানা’ খুঁনিয়া ধরিতেছে। এইপ্রকারে এই হস্তকার্যক হানে বিশেষ রীতি-

অনুসারে বয়ন-কার্য চলিতেছে। আর ঐখানে কয়েকটি খুঁটিতে তাঁত খাটানো রহিয়াছে, তাহাতে আরাংদায়ক ‘নলি’ (মাকু) বানের দিকে চলিতেছে।’

বয়ন-বিষয়ক বহু শব্দ বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যেমন, ‘বাসোবায়’ ও ‘বায়’—তন্ত্রবায় পুরুষ ; সিরী ও বরিত্রী—বয়নকারিণী স্ত্রী ; বেমন—তাঁত ; (যজু ১২।৮৩) ; তসরং—নালী বা মাকু (shuttle) (ঋ ১০।১৩০।২, যজু ১২।৩, মৈ. সং ৩।২।১, কাঠক ৩।৮।৩) ; সীসং—সীসার ভার (lead-weight) কাপড় টান করিয়া ঠিক রাখিবার জন্য (যজু ১২।৮০) ; নন্ত, তন্নং (বাজ. যজু ১২।৮০, ঋ—১০।১৩০।২, অথর্ক ১০।৭।৪৩), অহুচ্ছাদ (শত. ত্রা ৩।১।২।১৮) প্রাচীনতান (তৈ. সং ৩।১।১।৪, ঐ. ত্রা, ৮।১।২।৩—তানা (warp), ওতু (ঋ ৩।২।২—৩, তৈ. সং ৩।১।১।৪, অথ ১৪।২।৫২), পর্যাস (শত. ত্রা ৩।১।২।১৮)—বানা পড়েন (woof) ; ময়ুথ—খুঁটি (peg)।

তন্ত্র-বিদ্যা বা চরকার আর্থিক লাভ-সম্বন্ধেও বেদ-সংহিতায় ইঙ্গিত রহিয়াছে :—

তন্তনা বারম্পোষেণ বারম্পোষং জিহ (যজু ২০।৭)

‘ধনবৃদ্ধিকারী তন্ত্র হইতে ধন বৃদ্ধিত করিয়া লও।’

তন্ত্র শব্দের উক্ত বেদমন্ত্রে সাক্ষাৎ অর্থ যজ্ঞ ; কিন্তু বেদ-মন্ত্র বহুস্থলে অর্থক। এই স্থলে, ‘যেমন যজ্ঞ দ্বারা আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধিত হয়, সেইরূপ সূত্র দ্বারা ঐহিক সম্পত্তি বৃদ্ধিত হইয়া থাকে’,—এইরূপ বুঝা যায়। বেদ-মন্ত্রের অর্থ বহুজ্ঞাপক ও রহস্যময় ; ইহা স্থূল হইতে স্থূল এবং স্থূল হইতে স্থূলকে বুঝাইয়া থাকে। আবার সূতা কাটার আর্থিক প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন যে ধনী বা বণিকসমূহ হইতে অর্থ ধার করিয়াও সূতা কাটার সম্বল সংগ্রহ করিবে :—

ঋং সোম পণিত্য আ বহু গব্যানি ধারয়ঃ। তত্তঃ তন্ত্রমচিক্রকঃ।
(ঋ ১।২২।৭)

আরো অনেকানেক মন্ত্রে বয়ন-বিদ্যার শিক্ষা ও শিক্ষালয় (ঋ ১০।১৩০।১), সূত্র রংকরা (যজু ২০।৪১, অথর্ক ৩।২।৩), বস্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা (অথর্ক ১২।৩।২১), প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

আর্য-হিন্দুজাতি এদেশে আপন সভ্যতা বিস্তার করিবার পূর্বে যাহারা এ-দেশের অধিবাসী ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাই, তাহাদিগের মধ্যেও বয়নবিদ্যার

প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে। বর্তমান সময়ের অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে বঙ্গ নিষ্কাণ-নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব-শিল্পী বিধাতা মানবের দেহে লক্ষ্য ও মনে বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া, চতুর্দিকে পশুরোম ও বৃক্ষবকলাদি রাশি-রাশি তন্তুর উপাদান রাখিয়া দিয়া, এবং উর্নভ, গুটি-পোকা প্রভৃতির উজ্জল শিল্প-কৌশলের দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধরিয়া, এই পৃথিবীর কোন্ যুগের কোন্ সময়, কোন্ স্থানে কাহাকে কিরূপে সর্বপ্রথম তন্তু ও বয়নশিল্পে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় কে করিবে ?

কিন্তু কেবলমাত্র কোনো বিষয় জানা থাকিলে হয় না ; তাহাদের উন্নতিসাধনই মানবের সভ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ তাহাতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয় যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রাচীন ভারতে শিল্পবাণিজ্যাদির উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছিল ; এবং সেইজন্ত সমাজে বণিক ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুশৃঙ্খল নিয়মাদি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের সাহিত্য পাঠ করিলে এবং এই যুগের শিলা-লিপি আদি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে এই দেশে নানাবিধ শিল্প ও তাহার উন্নতিকল্পে নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বয়ন তখন ভারতীয় শিল্পে পরিগণিত হইত, এবং গৃহে-গৃহে চবুকার কাজ চলিত। উল্লিখিত আছে, একদা ভগবান ঃক্কেদেব কোনো শ্রেষ্ঠীর অসুস্থরোধ-ক্রমে একস্থানে সমবেত কুমারীগণকে উপদেশ দিতেছেন—“কুমারীগণ, তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে, তোমাদিগের স্বামীর ঘরে যাহা আছে, অর্থাৎ উর্না বা ছাগ, মেঘ প্রভৃতির রোমের কার্য, কার্পাস বা সূতার কার্য, রং করা, গুচ্ছ-গুচ্ছ করা, তুলা পেরা, চরকীতে বিচি-ছাড়ানো, ধোনা, পাঁজ কাটা, সূত্রনাল বাহির করা, প্রভৃতি কর্মে তোমাদিগকে দক্ষ হইতে হইবে। এই-সকল কার্যে অলস হইবে না, নানা উপায় উদ্ভাবন করিবে, নিশ্চয় দক্ষ হইবে এবং অশ্রুকে দক্ষ করিয়া লইবে।”

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বণিক ও

শিল্পিগণ নিজ-নিজ ব্যবসাতে উন্নতি ও সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত, আপনাদিগের মধ্যে সম্প্রদায় * প্রভৃতি গঠন করিয়া চলিত ; এবং আপনাদিগের দল-নায়ক (শ্রেষ্ঠী) নির্বাচন করিয়া তাহাদিগের নেতৃত্বে ব্যবসায় পরিচালনা করিত ; ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতক আখ্যায়িকাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যজুসংহিতার রচনা-কালে তন্তু-করণ ও বয়ন-শিল্প যে কেবলমাত্র এই দেশে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে ; বয়নকার্যে বর্তমান কালে যে-সকল প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহার সমুদয়ই তখন কার্যে প্রযুক্ত হইত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্বে হইতে ভারতীয় বণিকগণ পৃথিবীর অসংখ্য সভ্যদেশের সহিত বাণিজ্যও করিতে-ছিল ; এবং ভারত-নির্মিত বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা আদরের সহিত গ্রহণ করিত। ইহাদিগের পরে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের প্রাধান্যকালে, তথায় ইহাদিগের সমাদর ছিল। বর্তমান কালে ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রমাণ পাইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, উত্তর-ভারতে আর্ধ্য-বসতি বিস্তারের সেই সুদূর প্রাচীন কাল হইতে, হিন্দুগণ অতি নিপুণতার সহিত এমন সুন্দর বস্ত্রসূত্র প্রস্তুত করিত যে, এই কাল পর্যন্ত অশ্রু আর-কোনো জাতি উহা প্রাপ্যে ক্ষমতর ও অধিক সুন্দর সূত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্যে মসলিন নামক সুন্দর সূতার কোমল বস্ত্রের নাম ছিল—‘সিন্ধু’। সিন্ধু-নদের তীরবর্তী দেশ হইতে আনীত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল। ব্যাবিলনের গৌরবের সময় কত প্রাচীন, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিচারসাপেক্ষ। কেহ-কেহ উহা খৃষ্টীয় সনের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগে আর্ধ্য হিন্দুদিগের শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচয় ঐ দেশে বিস্তৃতলাভ করিয়াছিল। তখন তাঁহারা অবশ্যই কার্পাস-বপন, সূত্র-প্রস্তুত-করণ ও বস্ত্র-বয়নে সুদক্ষ ছিলেন।

* Trade-guild (modern)

† ‘মসলিন’ নামটি পরবর্তী কালের ; তাইসিন্ধু নদের তীরবর্তী ‘মোসাল’ নামক স্থান হইতে ঐ নাম উদ্ভূত হইয়াছিল। ঐ স্থান মধ্য-যুগ হইতে হিন্দুর বস্ত্র-শিল্পের লক্ষ্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

অধ্যাপক ভেবার বলেন—অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্পিগণ যেরূপ নিপুণতার সহিত স্বল্প স্বত্ন কোমল বস্ত্র প্রস্তুত করিত এবং নানা রংএর মিশ্রণ, ধাতুদ্রব্য ও মণিমাণিক্যাদির কার্য, স্বগন্ধি ষাণ্ডের প্রভৃতি প্রস্তুত-করণ ও অন্ত নানাবিধ কারুকার্যে তাহাদিগের যেরূপ দক্ষতা ছিল, তাহাতে পৃথিব্যাময় তাহাদিগের স্মৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল।”

প্রাচীন গ্রীক-সমাজে চাকার সূত্রসিদ্ধ ‘মসলিন’ বস্ত্র ‘গ্যাঞ্জেটিকা’ নামে কথিত হইত; গঙ্গানদীর দেশে উৎপন্ন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল। তথায় উহার অতিশয় আদর ছিল। পণ্যজাত দ্রব্যের এক অভিধানের গ্রন্থকার ডাক্তার ওয়াট বলিতেছেন—“গ্রীক ইতিবৃত্তবিদ হেরোডোটাস ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সেই-দেশে একপ্রকার বস্ত্রবৃক্ষ পশম ফলে; তাহা গুণে ও মৌল্যে মেস-রোম হইতেও উৎকৃষ্ট। ভারতীয় লোকেরা উহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।” এই হেরোডোটাস গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের আদিগুরু; খৃষ্টপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভারতীয় একপ্রকার বৃক্ষ হইতে যে পশম উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা যে কার্পাস তাহা বুঝা যাইতেছে। আর এই উক্তি হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার পূর্বে গ্রীকগণ কার্পাসের সহিত পরিচিত ছিলেন না, রোমজ বস্ত্রাদিই ব্যবহার করিতেন। অজ্ঞাত কোনো বস্ত্রের সহিত প্রথম পরিচয়ে তাহাকে পূর্কজাত সমশ্রেণীর বস্ত্রবিশেষের নামে অভিহিত করা স্বাভাবিক। এই-জগুই আবার প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতীয় কার্পাসকে “স্বেত-পশম” নামে অভিহিত করিয়াছিল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতেই সর্বপ্রথম কার্পাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ও উচ্চ ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে সর্বপ্রথম হেরোডোটাসের গ্রন্থেই কার্পাস-সূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস-শিল্প ক্রমে পারস্ত, আরব, মিশর, ফিনিসীয় ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তার লাভ করে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ষাটশ শতাব্দীতে মাত্র ইউরোপীয়গণ সূত্র সূত্র করণে প্রবৃত্ত হয়। ইংলও তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রহণ করিয়াছে।

রোম-সাম্রাজ্যে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রভূত-পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং তাহাতে রোমকদিগের প্রচুর অর্থ ভারতবর্ষে চলিয়া আসিত। ঐতিহাসিক প্লিনি (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তজ্জগৎ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরো কত পূর্বে, খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীর মিশর দেশে ‘মামি’ করিয়া মৃতদেহ কবরস্থ করা হইত, এরূপ দেখা যাইতেছে যে, তাহা অতি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মসলিনে আবৃত করিয়া দেওয়া হইত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্বে গ্রীক-বিজ্ঞেতা আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন এবং তাহার পূর্ববর্তী বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ ধন, ধাতু ও নানাপ্রকার পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত বিজ্ঞেতার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাহার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তখন আরব, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় বণিকগণ ভারত-জাত পণ্য পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে লইয়া গিয়া বাণিজ্য করিত ও তাহাতে বিস্তর লাভবান হইত।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরবর্তী সময়েও ভারতীয় শিল্প ও ঐশ্বৰ্য্যের কোনোরূপ অবনতি হয় নাই। বরং ঐ সময় হইতে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক এবং গুপ্ত ও চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় পরাক্রমশালী নৃপতিগণের রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যাদির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল। ঐ সময় পারসিক, রোমক প্রভৃতি রাজ-দ্রব্যের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের আন্তর্কর্ষণিক সঙ্ঘর্ষ সংস্থাপিত ছিল; ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন।

মৌর্যনৃপতিগণের রাজত্বকালে ৩০ তাহার পরে যে-সকল বিদেশীয় পরিব্রাজক ও রাজদূত এই দেশে আসিয়া-ছিলেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ‘পেরিপ্লাস’ নামক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক রোমক বণিকের জন-যাত্রা-বিবরণীতে দেখা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষের উপকূল ও অভ্যন্তর ভাগ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে—বস্ত্র ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত শতাব্দীর

মধ্যভাগে তাঁতে-জাত বস্ত্র রোম-সাম্রাজ্যে অতিশয় চলিতেছিল। তাৎকালিক আরও অনেক পাশ্চাত্য পরিব্রাজক ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান্, হিউএন্-সঙ্ প্রভৃতি বহুসংখ্যক চীনদেশীয় পরিব্রাজক খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে শিল্প-কলার বিশেষ উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে বহিরাক্রমণের বিপ্লব আরম্ভ হয়। দলে-দলে মুসলমান বিজেতাগণ পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশ অধিকারপূর্বক ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতভূমিতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মুসলমানেরা এই দেশে রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিতেই আসিয়াছিল; শিল্প ও বাণিজ্যের লোপ সাধন করিতে আসে নাই। আবার ভারতীয় সমাজ-বন্ধনের তখনও এমন বিশেষত্ব ছিল যে, বহিরাক্রমণের বা অন্তর্কর্ষণের অন্তরায়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিশেষ কিছু বিঘ্ন হয় নাই। মার্কোপোলো নামক ভিনিস্-দেশীয় পরিব্রাজক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তখন এই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান রাজত্বের সেই নানা বিপ্লবের ও উচ্ছেদের সময় ভারতীয় শিল্পের

সমৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পরে যখন মোগল রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং আকবর প্রভৃতি মহামান্ন নৃপতিগণ ভারত-সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিলেন, তখন ভারতবর্ষের শিল্প ও কারুকার্যের কতই না শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বারনিষে, তভাবুনিষে প্রভৃতি ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারিগণ তাহার উচ্ছল কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতীয় শিল্প ও পণ্যাদির নামে আকৃষ্ট হইয়াই বর্তমানকালের ইউরোপীয়গণ এই দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তবেত্তা মুম্বলিতেছেন—“ভারতবর্ষে যেমন সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তেমন জগতের আর কোনো স্থানের মনুষ্যের হাতে হইতে পারিত না। তাহা লইবার জন্য ইউরোপীয় বণিকগণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া ও নানা-প্রকার বিপন্ন মাথায় লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিত।”

ভারতবর্ষ যে এতকাল পর্য্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তত্ত্ব ও বয়নকার্যে নিপুণতাই তাহার প্রধান কারণ। পণ্যের মধ্যে বস্ত্রই প্রধান ও অধিকতর সমৃদ্ধির হেতু। বর্তমান পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উচ্চ-শিল্প-প্রধান দেশ-সমূহ প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে, অর্থাৎ বিগত দুই শত বৎসরেরও অল্পকাল পূর্বে পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ জগতের বাণিজ্যের প্রধান অধিকারী ছিল। চব্ব্বকাই তাহাতে মূল সঞ্চল ছিল।

কবি কৃত্তিবাস

শ্রী কলিঙ্গনাথ ঘোষ

আজ শ্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, বাঙালীর যবের কবি অমর কৃত্তিবাস নদীয়ার কুলিয়া গ্রামে বনমালী ওঝার কোড়ে বসিয়া “হাতে-খড়ি” লইয়া-ছিলেন—‘অন্ধার সন্ধান গুরু বড় উদ্ভাৱ’ ‘হেন গুরু

ঠাকুর’ ‘বিদ্যার উদ্ভাৱ’ করিতে বড়গড়ায় পায় প্রতাপাদিত্যের বশোহরে আসিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া, গুরুস্থানে ‘মেলানি’ লইয়া কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, ‘পঞ্চ শ্লোকে

ভেটিলেন রাজা গৌড়েশ্বরে'। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ
স্বরচিত সাতটি শ্লোক নানা ছন্দে নানা মতে আবৃত্তি
করিলেন,

“পঞ্চদেব অধিষ্ঠান তাহার শরীরে ।

সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে ফুরে ॥”

রসাল শ্লোক-পাঠ শুনিয়া গৌড়েশ্বর পাণ্ডিত্যের পানে
চাহিলেন, এবং খুসী হইয়া মহারাজ ‘চন্দনে ভূষিত’
কৃষ্ণিবাসকে ফুলের মালা দিলেন, বহুমূল্য ‘পাটের পাছড়া’
দান করিলেন—‘কেদার ঋগি শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া’।
সভার লোক মহা আনন্দিত, ‘সবে বলে ধন্ত ধন্ত ফুলিয়া
পণ্ডিত ।’

পাত্রমিত্রের কাছে রাজা গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,
আর ‘কিবা দিব দান?’ পাত্রমিত্র সকলে দ্বিজরাজকে
বলিল, ‘যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে’। কৃষ্ণিবাস
উত্তর করিলেন,

“কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার ।

যেথা যাই তথায় গৌরব-মাত্র সার ॥”

‘দ্বিজরাজে’র উপযুক্ত উত্তর বটে। ত্যাগশীল লোভ-
হীন কৃষ্ণিবাসের আদর্শ চরিত্রের আর দ্বিতীয় নিদর্শন
অনাবশ্যক। সাংসারিকদের মধ্যে কৃষ্ণিবাসের মতন
অমন একটি লোভহীন ত্যাগশীল একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
ছন্দ ।

এযুগে আমরা শুধু পর্ক করিয়া, অহঙ্কার দেখাইয়াই
পরিভূষ্ট থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। ‘পণ্ডিতের
মধ্যে কৃষ্ণিবাস গুণী’, কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত এই স্পর্ধা করিয়া
কান্ত রহেন নাই, যে পণ্ডিতের শুধু গৌরবমাত্র সার।
তাহার মুখে এ আশ্চর্য্য কথা অসম্ভব নহে—‘যে-পর্কটায় হৃৎ
দেয় তার লাধিটাও নয় ।’

“বত-বত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে,

আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥”

যে ফুলিয়া পণ্ডিতের অসাধারণ কবি-প্রতিভার
পুরস্কারস্বরূপ “সন্তোক” দিয়াও রাজা গৌড়েশ্বর পরিভূষ্ট
হন নাই, রাজসভায়, অশেষ-প্রকারে সম্মানিত সেই
‘ধীমান্ সাম্যশান্তিজনপ্রিয়ঃ’ কবি কৃষ্ণিবাসের মুখে
এই আশ্চ-অহঙ্কার অশোভন নহে। এই অহঙ্কার-বাক্য কবি

অবশ্য তাঁহার সংস্কৃত কবিতা-সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু
তাঁহার বাংলা কবিতার পক্ষে ঐ অহঙ্কারের কথা অক্ষরে-
অক্ষরে সত্য, পর্কিত বচন লক্ষী সহিতে না পারিলেও,
সরস্বতী তাঁহার বরপুত্রগণের এ-অপরাধ সর্বান্তঃকরণে
ক্ষমা করেন। তাই কৃষ্ণিবাসের ভাষার প্রাঞ্জলতা, সোজা
সরল কথায় মনের ভাব প্রকাশ, তাঁহার কবিতার ধর্ম
এবং অপ্রতিহত গতি, সর্বোপরি তাঁহার স্বল্প-কমতা
ও মধুর কোমল কল্পনাস-সৃষ্টি, আমরা অতি অল্প কবির
ভিতরই দেখিতে পাই—এক কাশীরাম দাস ব্যতীত—
বাংলাদেশে কৃষ্ণিবাসের অসামান্য কবি প্রতিভার নিকটে
আর-কেহ বড় একটা ঘেসিতে পারেন না।

একটি দেশের ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবাল-
বৃদ্ধবন্দিতার যিনি পরম প্রিয় কবি, তাঁহার অসামান্য কবি-
প্রতিভায় কে সন্দেহ করিবে? বাংলার রবি, বিশ্বের
কবি, আজিও বাংলার জাতীয় কবি কৃষ্ণিবাসকে
বিতাড়িত করিয়া বাঙালীর পল্লী-হৃদয়ের বিরাট
সিংহাসন দখল করিতে পারেন নাই। পল্লীগ্রামে, মহিলা-
মঙ্গলিসে, কৃষ্ণিবাস-কাশীদাসের অসীম প্রভাবের কথা
কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

দীনেপবাবু বলিয়াছেন—“কৃষ্ণিবাস শুধু কবি নহেন,
তিনি বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে উৎসবের স্রষ্টা; তাঁহার কথা
লইয়া রামলক্ষ্মণ-প্রসঙ্গ বাঙালী মুখে-মুখে আবৃত্তি করিতে
শিখিয়াছে—তাহা না হইলে কি ব্যাধবধু ফুল্লরা সীতার
দৃষ্টান্ত চণ্ডীদেবীকে সুনাইতে পারিত?” কবিকল্প
চণ্ডীতে দেখিতে পাই ফুল্লরা কালকেতুকে বলিতেছেন—

“কি লাগিয়া বীর এবে পাশে দিলা মন ।

বেই পাশে নষ্ট হৈলা লক্ষার রাক্ষ ।

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার ভয়ে ।

কাহার বোড়শী কথা আনিয়াছ করে ॥

অথবা ‘ধননগজেন-আধি অকলঙ্কশিশুধী’ পাটের-
সাড়ী-পরা যোলো বৎসরের রামাকে ফুল্লরা বলিতেছেন :—

“কৌশল্যা রানের বাঙা কৈকরী তাহার সভা

ছ’হার কোন্দল সর্বনেপে ।”

“শুনগো শুনগো সই হিত-উপদেশ কই

ইতিহাসে কর অবগতি ।”

ব্যাধবধু ফুল্লরা-কথিত এই যে “ইতিহাস” “সতী

সাধিত্রীর" উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া—ইহার সব ইতিহাসই বঙ্গরমণীর নিকট সুপরিচিত—কৃষ্ণিবাস-কাশীরামদাসের কল্যাণে বাঙ্গলার জলবায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী ইতিহাস হজম করিয়া মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে।

কৃষ্ণিবাস প্রকৃত পক্ষে বাংলার তুলসীদাস। কারণ, কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ শুধু মহাকাব্য নয়, তুলসীদাসের রামায়ণের মতন উহা বাঙালীর ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণিবাস একাধারে কবি ও ধর্মোপদেশী। তিনি যেমন আনন্দ দান করেন, তেমনি ধর্মোপদেশও দিয়া থাকেন। রামায়ণের অমূল্য উপদেশাবলী আবৃত্তি করিয়া বাংলা দেশে ধর্ম ও নীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহা বাংলার যাহারা অস্থিমজ্জা সেই পল্লীবাসীদের মধ্যে—নিরক্ষর অথবা অর্ধশিক্ষিত কৃষক হইতে, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে—বিশেষভাবে অল্পভূত হইবে। বিদ্যাসাগর-চরিত-লেখক চণ্ডীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, “এদেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোক যে অন্যান্য দেশের তদবস্থাপন্ন লোকদের অপেক্ষা নম্র ও ধর্মশীল, কৃষ্ণিবাসের অক্ষয়কীর্তি ও কাশীরাম দাসের ভারতরত্নখনিই তাহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্ম-গ্রন্থ বাইবেল দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ভারতে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণসমূহের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হয় নাই, বাঙ্গলা দেশে তাহা এই দুই মহাকাব্য-গ্রন্থ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বহুবিধ বিভিন্নতা ও বিচিহ্নতার মধ্যে ভারতে জাতীয়তার শেষ রেখা সমাজ-দেহের ভিত্তি-মূলে যে দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণ ও মহাভারত তাহা নীরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে কৃষ্ণিবাস ও কাশীরাম, ভারতে ব্যাস ও বাম্বীকিঃ”

রামায়ণ-মহাভারত বাঙালী জীলোকের উপর কি প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বঙ্গললনা রামায়ণ-মহাভারত কি অকপট বিশ্বাসে, কি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পাঠ করেন, তাহার একটি চিত্র শরৎবাবু তাঁহার ‘চরিত্রহীনে’ নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গে আশুপ্রাচীর অব্যবহিত পরেই

একপালা রামায়ণ দেওয়া অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। প্রেত-আত্মার কল্যাণের নিমিত্তই যে রামায়ণ দেওয়া হয় তাহা মনে করিবেন না। জীলোক ও অশিক্ষিতদের ধারণা শ্রাঘের পর রামায়ণ গান হইলে বাড়ীতে আর ভূতপ্রেতের উপদ্রব হয় না। ‘রাম-নামে ভূত পলায়’ এই বিশ্বাসেই ভূত-শাস্তির জন্ত অর্থাৎ গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় উক্ত প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে।

আর-একটি প্রথা আছে, সন্তানাদি ভূমিষ্ট হওয়ার পর ষষ্ঠ রাত্রিতে অর্থাৎ যে দিন বিধাতা পুরুষ শিশুর ভাগ্য লিখিয়া যান, ছেলে হইলে রামের জন্ম, আর মেয়ে হইলে সীতার জন্ম কৃষ্ণিবাস হইতে অবশ্য-অবশ্য পাঠ করিতে হয়। আজকাল বটতলার দৌলতে ঘরে-ঘরে রামায়ণের অভাব নাই—যাহার ঘরে রামায়ণ নাই, তাহার অন্তের নিকট চাহিয়া-চিন্তিয়া রামায়ণ জোগাড় করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না—তাই প্রতিঘরে প্রসূতির শিয়রে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ সাজাইয়া রাখা হয়। এ সম্মান কিন্তু কাশীরামদাসী মহাভারতও পান না, পূর্ববঙ্গে ঘরে-ঘরে রামায়ণ ঐরূপ ধর্মগ্রন্থের মতন সম্মম ও ভক্তিসহকারে আজিও আদৃত হয়।

রাম-নাম লইলে ভূত পলায়—এ-বিশ্বাস সকলের না থাকিতে পারে, রত্নাকর-দম্ভ্য ‘মরা-মরা’ করিয়া সর্বপাপে পরিজ্ঞান পাইয়াছেন একথাও বোধ হয় কেহ-কেহ হাসিয়া উড়াইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালীর নিকট রামনামের যে অশেষ মহিমা!

কৃষ্ণিবাসের প্রসাদে বাঙালীর কাছে রাম লক্ষণ সীতা তাঁহাদের মনুষ্যজন্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাম-লক্ষণ বিষ্ণুর অবতার, সীতা ত শ্ৰীমতী দেবী। কোন্ বাঙালী অস্বীকার করিবেন, তাঁহারা দেবদেবীর অবতার নহেন? ঐ যে হুম্মানজি, তিনিও ত ব্রহ্মার শাপে স্বর্গচ্যুত দেবতা! আর দশমুণ্ড কুড়িহস্ত ঐ যে রাবণ রাজা, তিনি ত ‘ঠাকুরমা’র বুলির রাক্ষসদেরই পূর্ব-পুরুষ! স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্য ও সভ্যতা যে শ্রীরামচন্দ্রের অধোধ্যাপুরীর অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না, তাহা

বাল্মীকির কাব্য পড়িয়া বাঙালী শিখিয়াছে। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে খাঁটি বাঙালীরা নিত্য অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের কাছে “রামস্ত ভগবান্ স্বয়ং”। রামকে সকলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া বিশ্বাস করেন। কৃত্তিবাসের রত্নাকর দস্যুর কাছে ব্রহ্মার কুপায়—

মরা-মরা বলিতে আইল রাম-নাম ।
পাইল সকল পাপে মূনি পরিভ্রাণ ।
ভুলরাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয় ।
একবার রাম-নামে সৰ্ব্ব পাপ ক্ষয় ।

নামের মহিমা দেখিয়া ব্রহ্মারও আতঙ্ক হইয়াছিল। তাই কৃত্তিবাস গাহিয়াছেন—

রাম-নাম বল তাই এইবার বার ।
ভেবে দেখ নাম বিনা গতি নাই আর ।
রামনদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে ।
গঙ্গার গিয়া স্নান কর কুলে বসি কেনে ।
হেদেরে পামর লোক পার হবি যদি ।
মন ভরি' পান করে, ব'য়ে যায় নদী ।
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে ।
সেই স্বর্গে বার রাম দাঁড়াইয়া দেখে ।
এমন নামের গুণ কি বলিতে পারি ।
হেলায় ভরিবে বাবে মুখে বল হরি ।

আর-একস্থলে

পণ্ডিত পাবন নাম কি গুণ ধরিবে ।
সাধুজনে ভরাইতে সৰ্ব্ব মেবে পারে ।
অসাধু ভরান্ তিনি ঠাকুর বলি তারে ।
পায় কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি,
ভরিবারে ছুটি পদ করেছ তরণী ।
তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব ।
বাঞ্ছন নুপুর হ'য়ে চরণে বাজিব ।

কেহ-কেহ বলেন, কৃত্তিবাস, যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব প্রচুর-পরিমাণে তাঁহাতে ছিল। এ-কথা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু কৃত্তিবাসের মানস-তনয় তরণীসেন ও বীরবাহ এমন রামভক্ত হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? তরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রাম-নামের ছাপ মারিয়া রামের সঙ্গে যুক্ত করিতে যাইতেছেন, তাঁহার রথের রামনামের ছাপ-দেওয়া সব নিশান উড়িতেছে এবং তাঁহার রণবাদ্য শুধু রামায়ণ-শব্দ বাজাইতেছে। বীরবাহ শ্রীরামচন্দ্রকে—

“রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবনমোহন”

লিখিয়া শুভ করিতেছেন! এমন-কি দশমুণ্ড কুড়িহস্ত

রাবণরাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া,

“অম্বিয়া ভারতভূমে আমি হুরাচার,
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার ।”

বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন এবং তাঁহার কুড়িচক্ষু দিয়া দর-দর করিয়া অশ্রু পড়িয়া রাজ-পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছে।

কথক-ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া কৃত্তিবাস ঠাকুর রামায়ণ-রচনা করিয়াছেন একথা যাহারা বলেন, তাঁহারা কবি কৃত্তিবাসের এই বৈষ্ণব প্রভাবের কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত-শাস্ত্রে মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত রাজ-আজ্ঞায় সরস্বতী-বরে রামায়ণ রচিতে অমুরুদ্ধ হইয়া কথায়-কথায় প্রেম ও ক্ষমার বন্তা বহাইয়া বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদ্যশ্রদ্ধ করেন নাই। তবে “লোক বুঝবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত”, একথাটা ত অক্ষরে-অক্ষরে সত্য! সুতরাং লোক বুঝাইতে গিয়া কৃত্তিবাস-পণ্ডিত কি কবিগুরু বাল্মীকি ও তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বিশ্বিত হইয়াছিলেন? গোপ্পদে বিদ্বিত যথা অনন্ত আকাশ, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও কি তেমনি বাল্মীকির প্রকাশ? “এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে।”

কবিগুরু বাল্মীকি বৈদিক সভ্যতার পরবর্তী যুগের ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধি, তখনকার নীতিপ্রধান আধ্যাত্মিক সভ্যতার ছাপ বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্ট রহিয়াছে—বিশিষ্ট সমালোচকেরা একথা নখদর্পণে প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বাল্মীকি-মূনির সৃষ্টি রামলক্ষণ সীতাকে আমরা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ-গ্রন্থে পাইব কিরূপে? কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অমুবাদ করেন নাই, তুলসীদাসের মতন নিজে স্বয়ং রামায়ণ রচনা করিয়াছেন—

“বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান ।

রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ।”

গৌড়েশ্বরও তাঁহাকে রামায়ণ অমুবাদ করিতে বলেন নাই, “রামায়ণ রচিতে করিলা অমুরোধ,” এবং তাই কৃত্তিবাস “রচে গীত সরস্বতী-বরে।” কৃত্তিবাস পরাধীন

দেশের পরপদানত হিন্দুজাতির কবি, বাঙ্গালিকির যুগে বে-
সত্যতা-স্বর্ষের উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন অন্তর্ভুক্ত।
মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের প্রভাবে তদানীন্তন
বাঙালী হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে
ভীষণ পরিবর্তন ঘটয়াছিল। ছায়ায় যেমন আগাছা
জন্মে, দাসত্বেও তেমনি ছর্কল, পরপদলেহী, সংকীর্ণ-
চেতা মানুষ গড়িয়া উঠে। উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা,
উচ্চ আদর্শ গণ্ডীবেষ্টিত মানুষ হৃদয়ে পোষণ করিতে
পারে না।

এই পরাধীন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালী হিন্দুর
দৈহিক ও মানসিক অবনতির ছাপটা কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের
প্রতি ছন্দে বিদ্যমান। তাই পূর্বে স্বীকার করিয়াছি
যে, কৃষ্ণিবাস যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন
নাই এবং সেইজন্যই কৃষ্ণিবাস যে মৌলিক রামায়ণ রচনা
করিয়াছেন তাহাতে “পরিঘসঙ্কশবাহ”, ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ,
রঘুকুলভিত্তিক—যিনি নিভীক, স্নিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ,
অপরিমেয় ধৈর্যশীল ও গম্ভীর, বিপৎপাতে ও শোকের
ভীক্ষুরাঘাতে ব্যথিত-হৃদয় হইলেও, অবাতবিকোভিত
মহাসাগরের স্রাব প্রশান্ত, চির তুবারকিরীটধারী
হিমালয়ের মতন অটল, ‘অচল’ আদর্শ প্রজ্ঞাতুরঙ্গক নৃপতি
শ্রীরামচন্দ্রের আভাস আমরা পাই না, বরং তাঁহার সম্পূর্ণ
বিপরীত এক রামকে দেখিতে পাই যিনি ফুলধর হাতে
করিয়া ‘কাননে কাননে’ ভ্রমণ করে!—পাঁচশত বৎসর
পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত, দাসত্বের গুরুভারে অর্জরিত
বাঙালী হিন্দুর আদর্শের সঠিক নমুনা। লঙ্কাকাণ্ডে
সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষার সময় রামের যে চিত্রটি
কৃষ্ণিবাস আঁকিয়াছেন তাহাতেই আমাদের উজ্জ্বল
সংসার্য উপলব্ধি হইবে—

বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর।
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশ মাস।
পূর্বাংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা ছেন শরীতে নাহিক প্রয়োজন।
তোমারে লইতে পুনঃ লঙ্কা হয় মনে।
যথা-তথা বাও তুমি থাক অস্ত হানে।
এই দেখ হুগ্ৰীব বানর-অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি।

লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন।
ভরত শক্রয় মন দেখে ছুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে-সবার ঠাই।
যথা-তথা বাও তুমি আগনার হুখে।
কেন ঠাড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে।

ব্যাধবধু ফুল্লরা চণ্ডীদেবীকে ঘে-উপদেশ দিয়াছিলেন
এখানে আমাদের শুধু সেই-কথাই মনে পড়ে। কবি-
কল্প মুকুন্দরাম কালকেতুর জীর মুখ দিয়া তৎকালীন
বঙ্গসমাজে হিন্দুনারীর অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন
মাত্র। অষ্টাচার লম্পটতাব স্বামী পাপপক্ষে ডুবিয়া
থাকিলেও তার ‘সাতধুন মাক।’ আর জী একটু চোখের
আড়ালে, একরাত্রি ঘরের বাহিরে থাকিলেই ভীত
হলাহলের স্রাব বর্জিতা হয়, যে জী গলিতকুষ্ঠগ্যাধিতে
আক্রান্ত স্বামীর ইন্দ্রিয়চরিতার্থের নিমিত্ত তাঁহাকে ঘাড়ে
করিয়া বহিয়া রূপসী বারবনিতার ঘরে লইয়া যাইতে
পারে, সেই জী ঘেদেশে আদর্শ সতী বলিয়া বিবেচিত
হয়, সেদেশে কিছুই অসম্ভব না! ফুল্লরা চণ্ডীদেবীকে ভয়
দেখাইতেছেন যে, তিনি যদি ফুল্লরাদের কুঁড়েয়া ঘরে
একরাত্রিও থাকেন, তবে স্বামী-পাশে আর ঠাই
পাইবেন না, তাঁহাকে আর ঘরে লওয়া হইবে না।
সুতরাং কৃষ্ণিবাসের রাম, একদিন একরাত্রি নয়—একে-
বারে পূরা দশ মাস পরগৃহে বাস করার অপরাধে সীতাকে
পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?
আরো বিশেষতঃ সীতার কাছে রামের কোন আত্মীয়-
কুটুম্ব ছিল না—দশ মাস পর্যন্ত সীতার ব্যবহার তিনি
কিছুই জানেন না! দশ মাস অদর্শনে রাম-সীতার মতন
আদর্শদম্পতীর ভালোবাসা এ-রকম লোপ পাইল কেমন
করিয়া তাহা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালিকির রামচন্দ্রের
চরিত্রের যে সমালোচনা পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয়
রামের মুখে এসব বাঙ্গালিকি মূনি অশ্রুও কল্পনা করিতে
পারিতেন না। একথা শুধু কৃষ্ণিবাসের মেয়েলী-
ধরণের নাকে-কাঁড়নে নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, অবিদ্যাসী,
সংকীর্ণ-চেতা দাসত্বলত সংশয়চ্ছন্ন রামচন্দ্রের মুখেই
শোভা পায়।

নীলাকাশের মতন অসীম উদার ভাব, বুকতরা
সংকোচহীন অকপট বিশ্বাস অধীন জাতির মানুষ কোথায়

পাইবে? মনকে নিজগুণে ভালো করা, কুৎসিতকে সৌন্দর্যাদান করা, পশুকে দেবস্বে উন্নীত করা, এসব আকাঙ্ক্ষা কি অধীন জাতির পক্ষে সম্ভব?

এই সামাজিক হীন আদর্শ ঢাকিবাবর অল্প কৌশলী কবি কৃত্তিবাস একটা গৌজা-মিল দিয়াছেন—বোধ হয় শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের শাপ স্বরণ করিয়া মন্দোদরীর দ্বারা তিনি জানকীকে অভিশাপ দেওয়াইয়াছিলেন—

এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ ।

বিবদীষ্টে তোমারে দেখিলে রঘুনাথ ।

বেচারী জানকী রঘুনাথের বিষ-নন্দরে পড়িবার মতন এমন-কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন! কৃত্তিবাস আবার যশ-অভিমানী রামের মুখ দিয়া বীর দর্প করাইয়াছেন---

ধাকিতে রাক্ষস ঘরে না হইত উদ্ধার ।

ত্রিভুবনে অপবন পাইত আমার ।

ঘুটিল সে অপবন তোমার উদ্ধারে ।

এখন মেলানি দিলাম সত্যর ভিতরে ।

ইর উত্তরে পাঁচশতাব্দী পূর্বের জনৈক বজ্ররমণীর মতন ধীরে-ধীরে ক'ন সীতা মুছিয়া নয়ন—

ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি ।

জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ হুর্গতি ।

বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে ।

স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছায়ালে ।

সবেমাত্র হরিয়াছে পাগিষ্ঠ রাবণ ।

ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ।

হনুকে আমার কাছে পাঠাইলে বধন ।

আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন ।

বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ ।

শকার ভিতরে এত না পাইতাম ক্রেশ । ইত্যাদি ।

সীতার এই বিষ খাওয়ার কথায় ব্যাধবধু ফুল্লরার কথা মনে পড়িল। 'স্নেহলতার' ভগিনীরা কেবোসিনের কথা জানিতেন না—বিষভক্ষণই তখন খুব প্রচলিত ছিল। ফুল্লরাও চণ্ডীদেবীকে তাই বলিতেছেন—

কোপে করি বিষপান, আগনি ত্যাগিবে প্রাণ,

সতীনের কি হইবে হানি ।

বান্দীকির সীতা বোধ হয় বিষ খাওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। আর শুনিয়াছি, সীতাদেবী রামচন্দ্রকে লঙ্কাকাণ্ডে প্রাকৃত ব্যক্তি অর্থাৎ ছোটো লোক বলিয়া গালিগালাজ করিয়াছেন। আর কৃত্তিবাসের সীতা

বাঙালীর ঘরের ভীক মেয়ের মতন স্বামীর সঙ্গেহ কুবাক্য-বাণ নীরবে সহ করিয়া নিজের দোষ ঢাকিবাবর চেঁচা করিতেছেন—আরো আশ্চর্য্য, পাঁচশ' বছর পূর্বে আমাদের ভাবায় 'ইতর' শব্দটি চুকিয়াছে। তাই বোধ হয় সাম্রাজ্যীয় শ্রায় তেজস্বিনী সীতাদেবী যে-জাতির আদর্শ ছিল, সে-জাতির কবির কল্পনার অঙ্কিত সীতা এতদূর সতর্ক সাবধান ছিলেন যে, বাল্যকালে খেলার সময় ভুলক্রমেও বালক সঙ্গীকে স্পর্শ করেন নাই! পাঁচশ' বছর পূর্বের বাঙালী হিন্দু সমাজের এই 'ছোঁয়াচে' রোগের হাত হইতে কৃত্তিবাস পণ্ডিত অব্যাহতি পান নাই। দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন, "কৃত্তিবাসের সময় বহুবিবাহ বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, রাম যখন পবনুরামের ধনুর্ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সীতা কুলীন ব্রাহ্মণ-কস্তার শ্রায় স্বামীর বহুবিবাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন :-

একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া রঘুনাথ

করিলেন আমারে বিবাহ সেই সাথ ।

আর বার ধনুক আনিল তুঙ্গমণি ।

না জানি হইবে আমার কতক সতিনী ।

এই প্রসঙ্গে বান্দীকির এক অমোঘ মহিমামণ্ডিত ছত্র মনে পড়ে—ন রামঃ পরদারেভ্যশ্চক্ষুভ্যামপিপঙ্কতি । যেমন বান্দীকির রাম, তেমনি তাঁহার সীতাদেবী। "পেঁচা দেখিয়া পেঁচী গড়ায়, রাজা দেখিয়া রাণী গড়ায়"—বাংলার এই প্রবাদবাক্য অতীব সত্য, যেমন কৃত্তিবাসের রাম, তেমনি তাঁহার সীতা, "যেমন সীতা, তেমনি রাম", একথা কৃত্তিবাস ও বান্দীকি উভয়ের পক্ষেই সত্য।

তবে বান্দীকির স্বাধীন ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা-প্রসূত মহুয্যেঘের মহান আদর্শ, আর কৃত্তিবাসের পরাধীন বাংলার অজ্ঞানতা ও কুসংস্করীচ্ছন্ন বাঙালী হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র আদর্শ—ইহাদের হুবহু মিল দেখিতে চাওয়া আহাম্মকি। অপ্রতিহত গতিতে প্রবহমাণ ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহের সহিত বন্ধ পুঙ্করিণীর সলিলের তুলনা চলে না, তাই আমরা বান্দীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনামূলক সমালোচনা এইখানেই শেষ করিতে চাই।

তবে বান্দীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা করিয়া যাহারা কবি-হিসাবে কৃত্তিবাসকে বান্দীকির কাছে আদৌ আমল

দিতে চান না, তাঁহাদের প্রচেষ্টাও ভ্রান্ত মনে করি। কবি কৃত্তিবাসকে খাটো বা হেয় করিবার প্রয়াস সাগর-ছেঁচার স্তায় একেবারে ব্যর্থ হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কৃত্তিবাস, বাঙ্গালী বা বাঙ্গালীর অনুবাদক নহেন। কৃত্তিবাস কৃত্তিবাস; তিনি বাঙ্গালী নহেন বলিয়া সমালোচকের দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কৃত্তিবাস বাংলার কবি, বাঙালীর ঘরের কবি, কৃত্তিবাস তাঁহার কৃত্তিবাসী রামায়ণে তদানীন্তন বঙ্গ-সমাজের সভ্যতা ও আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন; কৃত্তিবাসের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্রে অলঙ্কিতে, বাংলার স্ত্রীপুরুষ, বাঙালী হিন্দুর ঘরের স্বামী, দেবর ও বধুর ছাপ অতি স্পষ্টই পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-রচয়িতা বাঙালীর ঘরের কবি কৃত্তিবাস, ভারতের বাঙ্গালী

নহেন, এবং এই অপরাধে কোনোদিনই বাঙালী তাঁহার প্রাণের কবিকে—“ধীমান্ সাম্যশাস্তিজনপ্রিয়ঃ” কবি কৃত্তিবাসকে—কিছুতেই উপেক্ষা বা অনাদর করিতে পারিবে না।

চণ্ডীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, “বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাস ও কালীদাস রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া আমাদের চিরঞ্জে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ষাাঁহাদের ঋণপরিশোধপ্রয়াস বাঙালীর পক্ষে মুঢ়তা—এই দুই মহাত্মা তাঁহাদের অগ্রণী, বঙ্গের গৃহে-গৃহে স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা যে রামায়ণ ও মহাভারতের অমূল্য উপদেশ-বাণী আবৃত্তি করিয়া থাকে তাহার অন্ত আমরা বিশেষভাবে ইহাদিগকেই ভক্তি-সহকারে স্মরণ করিয়া থাকি।”

পাথুরিয়া কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার

শ্রী কালীপদ ঘোষ

হীরক-অপেক্ষা যে পাথুরিয়া কয়লা অধিক মূল্যবান, তাহা পাশ্চাত্য-জগৎ এই যুদ্ধের ফলে স্বীকার করিয়াছে। পাথুরিয়া কয়লা না থাকিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধই একরূপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইত। আজ তাহারা এইটুকু বুঝিয়াছে বলিয়াই কয়লার সমধিক আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক-গণ এই কয়লা লইয়া ভীষণভাবে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন; এই কয়লার প্রস্তুতি সেখানে সকলের মস্তিষ্কে এখন একমাত্র চিন্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যদিও প্রায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই কয়লার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ভারতবাসী আমরা আজ পর্যন্তও তাহার ব্যবহার শিখিলাম না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে (১) জানা

গিয়াছিল, রাণীগঞ্জে কয়লার খনি আছে, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সেখানে কোনো কোলিয়ারিই স্থাপিত হয় নাই। ঐ সনে মিঃ জোন্স নামে জনৈক ইংরেজই রাণীগঞ্জে প্রথম কোলিয়ারি স্থাপন করেন। তাহার পূর্বেও কিন্তু অন্তান্ত স্থানে কোলিয়ারি স্থাপিত হইয়াছিল। এইত এক শতাব্দীরও অধিক কাল হইতে চলিল কোলিয়ারি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও কয়লার গৌণ উৎপাদিত দ্রব্যের (Byproduct) অন্ত কারখানা স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে কোলিয়ারিতে খোলামাঠে কয়লার গাদায় আশ্রয় ধরাইয়া কোককয়লা প্রস্তুত করা হইত, এখন সেইস্থলে শুধু বি-হাইভ (২) (Bee-hive) চূম্বী (oven) নির্মিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে

(২) কয়লাকে কোককয়লা করিবার একপ্রকার চূম্বীর নাম। ইহাতে গৌণ উৎপন্ন জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না।

(১) Geological Survey of India, Vol. III.

রাণীগঞ্জই কয়লার খনির জন্ম বিখ্যাত; এত কোলিয়ারি আর কোথাও নাই। একপ স্থলে রাণীগঞ্জে দু'একটা গৌণ উৎপন্ন দ্রব্যের (By-product) কারখানা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত কয়লার গৌণ উৎপাদন-সম্বন্ধে কাহারো কোনো চেষ্টা দেখা যায় নাই। ইহার জন্ম খনির স্বত্বাধিকারীগণকে বিশেষভাবে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একটি গৌণ উৎপাদনের কারখানা-খুলিতে অনেক মূলধন আবশ্যিক, সে মূলধন তাঁহাদের না থাকিতে পারে; ইহার জন্ম অধিকতর দায়ী আমাদের দেশের ধন-কুবেরগণ, যাহারা শুধু কোম্পানির কাগজের স্তম্ভ লইয়া বিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আমাদের দেশের একটি মজ্জাগত দোষ যে, যাহার কিছু অর্থ আছে অথবা জমিদারি আছে, তিনি কেবল নিশ্চিন্তভাবে, আলস্বে সময় অতিবাহিত করেন। পিতৃপরিত্যক্ত অর্থকে খাটাইয়া তাহা হইতে আয়বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বাহারও নাই। ব্যবসাকে অনেকে হীন কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয় সেই রূদ্ধ অর্থ লইয়া এইসব শিল্পের যৌথ-কারখানা খুলিলে দেশের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এই গৌণ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ যে কিরূপ লাভবান হইতেছেন, তাহা আমাদের ধারণাতীত। এখন সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ও আমেরিকায় এই গৌণ উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ম একটা ভীষণ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৫ সালের জাছুয়ারিতে যুক্তরাজ্য ও কানাডায় গৌণ-উৎপন্ন জিনিষের চুল্লীর (byproduct oven) সংখ্যা ছিল মোট ৬৪৬৮টি, এবং তাহা দ্বারা বৎসরে মোট ২,৪০,০০,০০০ টন (৩) কয়লাকে কোককয়লায় পরিণত করিয়া প্রায় ১৮,৮,০০,০০০ টন কোক কয়লা পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই স্থলে প্রায় ২,২০০ চুল্লী (oven) কার্য্য করিতেছে এবং তাহার দ্বারা বৎসরে ৪৭,৪০,০০০ টন কোক কয়লাকে কয়লায় পরিণত করিয়া ৩,৫০,০০,০০০ টন কোক কয়লা পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই কম বৎসরেই গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্য প্রায় পূর্বের দ্বিগুণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহা ব্যতীত অনেক চুল্লী প্রস্তুত হইতেছে।

(৩) Byproduct Coke—by C. J. Ramsburg

উপরে যে গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কথা বলা হইল উহা শুধু উচ্চ তাপের কোক কয়লা-করিবার (high temperature carbonisation) জন্ম। ইহা ছাড়া নিম্নতাপে কয়লাকে কোককয়লা (low temperature carbonisation) করিবার জন্ম অনেক চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে।

চৌয়াইবার উপরোক্ত দুইপ্রকার প্রণালীর (method of destructive distillation) মধ্যে প্রভেদ এই যে,— যেখানে ভালো গ্যাসের (coal gas) আবশ্যিক সেখানে উচ্চ তাপে চৌয়াইতে হয়; আর যেখানে ধূমবিহীন উৎকৃষ্ট ইন্ধনের আবশ্যিক, সেখানে নিম্নতাপে চৌয়াইতে হয়। এই নিম্নতাপে চৌয়ানো ব্যাপারটি (low temperature carbonisation) অল্পদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও এসম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে।

গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্য (byproduct) হইতে যে কিরূপ লাভ হইতে পারে, তাহা কয়লার মূল্যে ধরিয়া (coal equivalent) হিসাব করিলে বেশ বঝিতে পারা যাইবে।

তালিকা—(১)

প্রথম শ্রেণীর কোক করিতে গেলে যে রূপ লাভ হইতে পারে :— শতকরা ৮৫ ভাগ high volatile (H) ; এবং ১৫ ভাগ low volatile মিশ্রিত কয়লা]

অতিরিক্ত গ্যাস	কয়লা মূল্যে (coal equivalent)
২,০০০ ঘন ফুট, ৫৫০ B.T.U.(e) ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত।	কয়লার পাউণ্ড ৩৫০
আলকাতরা—	
১২ গ্যালন	১১৩
Creosote oil, পিচ, ভূষা, অস্তান্ত তৈল এবং রংএর উপাদান-রূপে ব্যবহৃত।	
অ্যামোনিয়াম সালফেট ৩৩ পাউণ্ড, কয়লার মূল্যে ধরা হইল না।	
সার, তাপ কমাইবার জন্ম, নাইট্রিক এসিড এবং অস্তান্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্ম ব্যবহৃত।	
Benzols (লঘুতৈলরূপে)	
৪'৫ গ্যালন	৪২

(৪) Volatile matter—বায়ুর সংস্পর্শবিহীন-ভাবে চৌয়াইলে যে-অংশ উড়িয়া যায়।

(৫) B.T.U. British Thermal Unit :—উত্তাপ মাপিবার ইংরেজী প্রণালীর পরিমাণ।

হাওরাগাড়ী ও ভৈলঘারা চালিত ইঞ্জিনের ইন্ধন, রংএর উপাদান, কিনল (phenol) এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, পরিষ্কার ও দ্রব করিবার জন্য ব্যবহৃত

১০০

কোক-ব্রিজ (Coke Breeze)

১২০ পাউণ্ড

ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত

একুনে ... ৬২৫

Bee-hive চুলীতে নষ্ট-অংশ করলা মূল্য ... ২০০

প্রত্যেক টন কোককরলায় গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের আয় ৮১৫

উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রত্যেক টন কোকে ৮২৫ পাউণ্ড করলা বাঁচিয়া যায়। বি-হাইড্ চুলীতে প্রস্তুত কোক অপেক্ষা গৌণ উৎপন্ন করার প্রণালী-অনুসারে প্রাপ্ত কোক করলা ব্যবহারে মোটের উপর যে ২০০ পাউণ্ড করলা বাঁচিয়া যায়, প্রায় সকল কারখানার রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়।

তালিকা—২

প্রত্যেক টন কোককরলায় প্রাপ্ত গৌণ উৎপন্ন দ্রব্য।

শতকরা ৮০ ভাগ low volatile	} মিশ্রিত	high volatile matter
আলকাতরা ...	৩'৫ গ্যালন।	১'৩৫ গ্যালন।
অ্যামোনিয়াম্ সাল্ফেট ...	২৩'৩ পাউণ্ড	৩৮'০ পাউণ্ড।
অতিরিক্ত গ্যাস বেনজলবিহীন	৭৫০০ ঘন ফুট।	১০,০০০ ঘন ফুট।
B.T.U প্রত্যেক ঘনফুট গ্যাসে	৫০০	৫৬০
অতিরিক্ত গ্যাসে মোট B.T.U	৩৭,৫০,০০০।	৫৬,০০,০০০।
লঘুতৈল (বেনজল) ...	২'৬ গ্যালন।	৫'৪ গ্যালন।

উক্ত তালিকা-দ্বয় হইতেই সমস্ত ব্যাপারের একটা পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। সকল জিনিষের মূল্য এখন ষেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ২নং তালিকা দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই গৌণ-উৎপন্ন হইতে কিরূপ লাভ হইতে পারে।

উপস্থিত কোলিয়ারিতে যে-সকল চুলী কার্য করিতেছে, তাহা বি-হাইড্ চুলী—কেবলমাত্র কোককরলা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গৌণ-উৎপাদনের জন্য আলাহিদা চুলীর প্রয়োজন এবং প্লান্ট (কল ইত্যাদি) আবশ্যিক। ভারতবর্ষে গৌণ-উৎপাদনের কারখানার মধ্যে টাটা আয়রন্-ফ্যাক্টরিতে একটি আছে

এবং আর-একটি প্রস্তুত হইতেছে। Bengal Coke এবং Coal Products নাম দিয়া কলিকাতার একটি কোম্পানির গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা খুলিবার কথা ছিল, তাহা হইয়াছে কি না জানি না। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত একটি গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা।

অনেকে হয়ত বিবেচনা করেন যে, উক্ত কারখানা স্থাপন করিতে প্রচুর মূলধন আবশ্যিক, কিন্তু লাভের দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহা অল্প বলিয়া বোধ হয়; কারণ এই যে বি-হাইড্ চুলী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও ত বিনা পয়সায় হয় নাই। তাহার উপর না হয় আর-কিছু বেশী লাগিবে। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ লাভ থাকিবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ যদি লাভ না থাকিত তবে পাশ্চাত্য সকল দেশেই—যেখানে মজুরের দাম এত বেশী; সেখানে এত গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা চলিত না। আসল কথা, আমরা করলায় বৈজ্ঞানিক ব্যবহার এখনও শিখি নাই। সেইজন্য করলায় এত অপব্যবহার করিয়া থাকি। করলায় সাধারণ গৌণ-উৎপন্ন জিনিষ আলকাতরা, অ্যামোনিয়াম্ সাল্ফেট এবং গ্যাস। শুধু এরই যদি কারখানা খুলিতে পারা যায়, তাহা হইলেও তাহা হইতে প্রভূত লাভ থাকিতে পারিবে।

অনেক কারখানায় আবার বেনজল (Benzol) নিষ্কাশনের কল স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা করলায় গ্যাস হইতে বেনজলটুকু বাহির করিয়া লইয়া থাকে। ইহাতে যদিও গ্যাসের উত্তাপ-শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু লাভের হিসাবে সে-লোকসান কিছুই নহে। এমন-কি, এই বেনজল হইতে যে লাভ পাওয়া যায়, তাহা আলকাতরা হইতে লাভের চেয়েও অধিক। এই হাওয়া-গাড়ীর যুগে বেনজলের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, বেনজল শুধু যে গ্যাসোলিন্ অপেক্ষা মূল্যবান তাহা নহে, গ্যাসোলিনের সঙ্গে ইহা সমপরিমাণে মিশ্রিত করিলে মোটরের ইন্ধনের কার্যে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ শক্তি বাড়িয়া যায়।

আলকাতরা চৌয়ান (Tar Distillation) ভারতবর্ষের কোথাও নাই। কিছুদিন পূর্বে Lister Anti-

septic & Dressing কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখিয়া-
ছিলাম যে, তাঁহারা আল্কাডরা চোয়াইবেন। জানি না,
তাঁহাদের সে কারখানা হইয়াছে কি না। আল্কাডরা
কয়লার বিশেষ। ইহা চোয়াইলে যে কত জিনিষ পাওয়া
যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। এক আল্কাডরা হইতে প্রায়
৩০০ শত-রকমের রংই পাওয়া গিয়াছে। এইপ্রকার
অত্যাবশ্যক কারখানা এত বড় ভারতবর্ষে একটিও নাই,
আর স্থাপনের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টাও হয় নাই।

ইহা ছাড়া আমেরিকা কিংবা ইউরোপে কয়লার গুঁড়া-
টুকু পর্যন্ত নষ্ট হইতে দেয় না। খনিতে কার্যের পর যে
গুঁড়া পড়িয়া থাকে, আমাদের দেশের কোলিয়ারিতে তাহা
নষ্টই হইয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্যে উহার সম্যক ব্যবহার
হইয়া থাকে। গুঁড়ার সঙ্গে নানারূপ খাত্ত, যুক্তিকা
প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় তাহা ব্যবহারের অযোগ্য, কিন্তু
তাহা হইতে কয়লার অংশটুকু বাহির করিতে পারিলে
অনেক কয়লা বাঁচিয়া যায়। সেইজন্য ইয়োরোপ এবং
আমেরিকায় কয়লা ধোত করিবার (coal-washing)
প্রণালী বাহির হইয়াছে। ইহা দ্বারা খাত্ত পদার্থ, যুক্তিকা
প্রভৃতিকৈ কয়লা হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। ঐ-
সকল দেশের প্রত্যেক কোলিয়ারিতেই কয়লা ধোত করি-
বার কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতেও যে লাভ ভিন্ন লোক-
সান নাই তাহা বেশ বলিতে পারা যায়।

আবার গুঁড়া কয়লা সকল কার্যে ব্যবহৃত হইতে
পারিবে না বলিয়া কয়লা ব্রিক্কেট (৬) (Coal Briquet-
ting) করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশে সে-
লাভের কথা বোধ হয় কেহ শ্রুতিও ভাবেন না। কারণ
আমাদের স্বভাব অন্য আয়্যাসে যাহা পাওয়া যায় তাহাই
যথেষ্ট। পাশ্চাত্যে শুধু এই কয়লা ধোত এবং কয়লা
ব্রিক্কেট করিবার প্রণালী লইয়া এখনও গভীরভাবে
গবেষণা চলিতেছে। সম্ভ্রতি Gee's Process of Coal-
Washing বলিয়া Gee এক ধোত করিবার কল বাহির
করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রত্যেক মিশ্রিত দ্রব্য পৃথক পৃথক
হইয়া পড়িবে। কয়লা ব্রিক্কেটিং-এ শুধু কয়লার গুঁড়াকে
বাঁধিবার জন্য বাইণ্ডার (binder) লইয়াই যে কত গবেষণা

চলিতেছে, তাহা আমরা শুনিতে বিশ্বয়ে অবাধ হইয়া
যাইব।

ইহা আরও চুংখের বিষয় যে, আমাদের দেশের
অধিকাংশ কোলিয়ারিই ইংরেজ-পরিচালিত এবং পাশ্চাত্য
মূলধনে স্থাপিত। আমরা দেশের লোক হইয়া, জমির
স্বাধিকারী হইয়া তাহার লাভটুকু ভোগ করিতে পাই-
না। কোথাও কয়লার খনি বাহির হইলেই কিছু টাকা
লইয়া তাহা বিদেশীকে ধরিয়া দিই। এই দৌর্ভাগ্য কি
কম দৌর্ভাগ্য! আমরা বলিব আমরা খনি-সম্বন্ধে কিছুই
জানি না, কি করিয়া চালাইব। কিন্তু তাহার পূর্বে
আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, টাটার বিরাট
লৌহ কারখানা স্থাপিত হইল কিরূপে এবং চলিতেছে
কিরূপে। অথবা এই বিলাতী কোম্পানিগুলিই বা
চলিতেছে কিরূপে? কোম্পানির স্বাধিকারিগণ কেহই
সর্বশাস্ত্রবিদ হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের যত্ন,
পরিশ্রম এবং চেষ্টা থাকা আবশ্যক। একটি কোম্পানি
খুলিতে গেলে সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (expert) একজন
লোকের বিশেষ আবশ্যক। যদি সে-প্রকার লোক
ভারতবর্ষে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কার্য আরম্ভ
করিবার জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে এবং
আমাদের দেশের লোক উপযুক্ত হইলে শেষে তাহাকে
বিদায় দিতে হইবে। এইরূপ সাহস করিয়া না চেষ্টা করিলে
কখনও দেশের উন্নতি হইবে না। অনেকে হয়ত আপত্তি
করিবেন যে, তাহাতে বেশী টাকা খরচ হইবে, কিন্তু তাহা
না হইলে কখনও কোম্পানির সাফল্য আসিবে কিরূপে?
মোট লাভের উপর হিসাব করিয়া দেখিলে তাহাতে লাভ
ভিন্ন কখনও লোকসান হইতে পারে না। এ শুধু
আমাদের দেশের কথা নয়, আমেরিকাকেও সময়ে সময়ে
ইংলণ্ড এবং জার্মানি হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানি করিতে
হয় এবং কারখানার ক্রমোন্নতির জন্য প্রত্যেক কারখানায়
একজন বিশেষজ্ঞ রাখিতে হয়। শুনিতে অবাধ হইতে হয়
যে, লণ্ডনের Low Temperature Carbonisation
Ltd. কোম্পানি শুধু গবেষণা করিবার জন্য ১০,০০,০০০
পাউণ্ড খরচ করিয়াছেন। অনেকে বলিবেন হয়ত, আমা-
দের দেশ গরীবের দেশ, টাকা কোথায় পাইব? আমি বলি,

(৬) Briquetting গুঁড়া কয়লাকে চাপ বাঁধিরে দেওয়া।

যে-সকল অর্থ শুধু বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা দ্বারা বিশটা গৌণ-উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। আরো কত যে অর্থ অনর্থক রুদ্ধ হইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা দ্বারাও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এখন সাধারণ গৌণ-উৎপাদনের কারখানা, কয়লা খোঁত

করিবার কল এবং কয়লা ত্রিকোটের কল যাহাতে এদেশে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্ঠা সর্বতোভাবে করা উচিত, কারণ কয়লার খনি ত আর অক্ষয় তাণ্ডার নহে। একদিন-না-একদিন তাহা কম পড়িবেই, তখন কি হইবে এই ভাবিয়া এখন হইতে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের গো-সমস্যা

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; জন-সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষি-কার্যদ্বারা জীবিকা-নির্ভর্য্য করিয়া থাকে। এখানে চল কর্ষণের প্রধান সহায় বলদ। সুতরাং কৃষি-কার্যে গো-জাতির বিশেষ আবশ্যিকতার কথা এদেশের কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু কৃষির যে মূলশক্তি, সেই গোজাতির প্রতি আমাদের দেশবাসীর সম্যক দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নাই। কৃষির উন্নতি-সাধন ও গো-জাতির উন্নতি-বিধান পরস্পর-সাপেক্ষ, একথা ভুলিলে চলিবে না। ভারতবর্ষে যে গো-জাতির অবনতি ঘটিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই অনুভব করিতেছেন এতোক চক্ষুমান তাহা দর্শন করিতেছেন। গোজাতির অবনতির সঙ্গে যে, দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে যে-সব গরু রহিয়াছে, সংখ্যা ও গুণের হিসাবে কৃষি-কার্য ও চক্ষু-দান-পক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্ত বলিলেও অত্যাধিক হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত এদেশের জন-সংখ্যা গো-সংখ্যা ও ক্ষেত্রফলের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে গরুর সংখ্যা যতটা বেশী মনে করা হয়, ততটা কিছুই নহে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে প্রমাণিত হইবে যে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান কৃষি-প্রধান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গো-সম্পদ কিরূপ হীন।

দেশ	গো-সংখ্যা	জন-সংখ্যা	প্রতি-শত লোকের গো-সংখ্যা
বৃটিশ ভারত	১১,৭৪,২৬,৩৬৫	৩৪,৭১,৩৮,০০০	৪৭
বাংলা	২,৩৬,২৮,৪১১	৪,৬৬,৫১,০০০	৫০
ডেনমার্ক	২৫,২৫,৩৪৮	৩২,৮৮,০০০	৭৮
মার্কিন	৬,৬৩,৫২,০০০	১১,৭৮,৫২,০০০	৫৭
কানাডা	২৮,১২,২৬২	৮৭,৭২,০০০	১১৬
অস্ট্রেলিয়া	১,৪৫,৩০,০০১	৫৫,১০,০০০	২৪৫
নিউজিল্যান্ড	৩৪,৮০,৬২৪	১২,৮৫,০০০	২৫৮*

ভারত-গবর্নমেন্ট যে “প্রাণী বিবরণী” (live-stock statistics) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে আমাদের দেশের গরুর সংখ্যা ১৫১১৬ বৎসর হইতে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ১৯১৬-১৭ অব্দে

The Official Year-Book of New Zealand, 1924.

সমগ্র ভারতে গরুর সংখ্যা ছিল ১৪,২৪,২৫,০০০, ১৯০০-২১ অব্দে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪,৫১,০০,০০০। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র এই পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে ভারতে প্রায় ৪৩ লক্ষ ২২ হাজার গরু কমিয়া গিয়াছে। এই হ্রাস আমাদের দেশের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নহে।

হল-কর্ষণের গরু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে খুব কম আছে। কৃষকের শস্ত-উৎপাদনের পক্ষে ইহা কম অসুবিধা নহে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া বলদ দ্বারা প্রত্যেক ষড়ভূতে মাত্র ৪ একর ভূমি কর্ষণ করা যাইতে পারে। বৃটিশ ভারতে প্রায় ২২ কোটি ৮০ লক্ষ একর কৃষি উপযোগী জমি রহিয়াছে। বলদ ও মহিষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ। যে-পরিমাণে কর্ষণ-উপযোগী পল্ল আছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৫টি শিশু বা অস্থি-চর্শ-সার একজোড়া, আরও প্রায় ২৫টি গাড়ীটানা কার্যে নিয়োজিত আছে। শতকরা ৫০টি নানা কার্যে পরিত্যক্ত হইলে প্রায় ২১ কোটি পল্ল কৃষিকার্যের জন্য অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং একজোড়া পল্লকে ঠেঙ্গাইয়া-ঠেঙ্গাইয়া প্রতি ষড়ভূতে প্রায় ১২ একর জমি কর্ষণ করিতে হয়; কিন্তু এই ১২ একর জমি চাষের নিমিত্ত অন্ততঃপক্ষে ৪ জোড়া পল্ল প্রয়োজন। ৪ জোড়া পল্ল পরিবর্তে একজোড়া খাটাইয়া আমরা কি-পরিমাণ কমল প্রাপ্ত হই, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষিজাত জীব্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নে একটা হিসাব দেওয়া গেলঃ—

দেশ	প্রতি-একরে গড়ে উৎপন্ন		
	গম	দল	তুট্টা
	বুশেল	বুশেল	বুশেল
ডেনমার্ক	৫১	৪১'২	—
নেদারল্যান্ড	৪২'২	৫৬'৮	—
বেলজিয়াম	৪২'৬	৫১'৩	—
নিউজিল্যান্ড	২৯'৯	৩৪'৮	—
গ্রেট ব্রিটেন	৩৫'১	৩২'১	—
অস্ট্রেলিয়া	১৩'৩	২১'৪	২৫'
ফ্রান্স	২৪'৬	২২'৮	১৫'
জাপান	২১'৩	৩৮'৮	২৯'

দেশ	গর	বব	ভুট্টা
মার্কিন	২৪'১	২৩'৯	২৯'৭
কানাডা	২৫'১	২০'৫	৫০'২
রিশর	২২'৪	২৯'১	৩৬'৪
সুইডেন	৩৪'৯	২৯'৬	২০'১
সুইজারল্যান্ড	৩২'৪	—	২০'০
জার্মানি	৩০'৩	৩০'৪	৪৮'২
স্পেন	১০'০	১৯'৮	২১'১
ভারতবর্ষ	৯'৭	১৫'৬	১০'৯ *

ভারতের প্রধান-খাদ্য-পশু চাউল। সুতরাং আমাদের দেশে একর-প্রতি কত খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাও দেখা যাক।

প্রতি হেক্টরে উৎপন্ন খাদ্য। এক হেক্টর = ২'৪৭ একর

দেশ	খাদ্য
স্পেন	৫৯৫ বুশেল
ইতালি	৩৯১ "
জাপান	৩৫২ "
পর্তুগাল	৩৩৯ "
মার্কিন	২০১ "
ভারতবর্ষ	১৫৭ " †

ভারতে প্রায় ৯ কোটি টন খাদ্য-পশুর প্রয়োজন; কিন্তু ভারত উৎপাদন করে অর্ধেকের কিছু বেশী। ইহার উপর রপ্তানিও আছে। কাজেই কোটি-কোটি লোক অর্ধাহারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। গো-খাদকের দেশে গবাদি পশুর প্রতি কিরূপ বড় লগুয়া হয়। গো-জাতিকে জননী-বোধে যে জাতি পূজা করে, তাহাদের দেশে গোজাতির প্রতি তাচ্ছিল্যভাব যে মরণ-দশার প্রথম নিদর্শন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

কেবল কৃষি-কার্যের ক্ষতিই যে গো-জাতি আনয়ক তাহা নহে, গাভীর দুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন-রক্ষার উপায় হয়। ভারতের নরনারী আজ দুগ্ধের অভাবে রোগ-ক্রীর্ণ দুর্বল, ক্ষীণজীবী ও নষ্টবাহ্য। সর্বত্রই দুগ্ধের দারুণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। শিশু-জীবনের একমাত্র খাদ্য দুগ্ধের অভাবেই আজ বাংলার তথা সমগ্র ভারতের শিশু কুলের এই ছরবহা। যে-পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে, তাহাও অবিপণিত, জল-মিশ্রিত। এ-দেশের শিশু-মৃত্যু-আধিক্যের প্রধান কারণ বহুস্থলে ও বহু সংসারেই যে বিপুল পুষ্টিকর মাতৃ স্তন্য-দুগ্ধের এবং গোদুগ্ধের অভাব তাহা কে না বলিবে? অস্তান্ত দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে মৃত্যু-হার ও শিশু-মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিবে।

দেশ	প্রতি-হাজারে মৃত্যু-হার	প্রতি-হাজারে এক-বৎসরের কম বয়সের শিশু মৃত্যু-হার
নিউজিল্যান্ড	৮'৭	৪৮
নেদারল্যান্ড	১০'২	৫০
নরওয়ে	১৬'৪	৫৪
অস্ট্রেলিয়া	৯'৯	৬৬
সুইডেন	১৭'৯	৭৬

*The Year-Book of the Commonwealth of Australia, 1923.

† The International Year-Book of Agri. Statistics, 1922, Rome.

দেশ	প্রতি-হাজারে মৃত্যু-হার	প্রতি-হাজারে এক-বৎসরের কম-বয়সের শিশু মৃত্যু-হার
সুইজারল্যান্ড	১৪'২	৮২
গ্রেট-ব্রিটেন	১২'৫	৮৩
মার্কিন	১২'৯	৮০
ডেনমার্ক	১৩'১	৯৫
ইতালি	১৮'৭	১৪০
জাপান	২৬'৮	১৮৯
স্পেন	২৩'৩	১৯২
ভারতবর্ষ	৩৫'৬	২৬১ *

বড়-বড় সহরের শিশু-মৃত্যু-হারের তুলনা-মূলক-হিসাবে ভারতবর্ষের সহরগুলির অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ নিম্নে তাহা দেখাইতেছি :—

সহর	প্রতি-হাজারে শিশু-মৃত্যু-হার
অকল্যান্ড	৪৮
স্টকহলম	৬১
নিউইয়র্ক	৭১
লন্ডন	৮০
ওয়ারশিংটন	৮৫
প্যারিস	৯৫
অ্যাণ্টোয়ার্প	৯৮
বার্লিন	১০৫
শিকাগো	১৪৫
মাদ্রিদ	১৭৭
মাস্কো	২৮১
কলিকাতা	৩৩১
বোম্বাই	৫৫৬ *

বাঙালী আমরা; বাংলা দেশের অবস্থাটাও এইমত্রে একবার দেখা যাক। বাঙালী-জাতির জীবনী-শক্তিও নানাদিক দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, দারিদ্র্য ও ব্যাধি মিলিয়া বাঙালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয়, অনেকে স্তন্য চর্মকিত হইবেন, যে, বাঙালী বালক-বালিকাদিগের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে মারা যার এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পৌঁছায়। শিশু ও কুমারেরাই শুবিঘ্ন জাতির বীজ; কিন্তু সমগ্র বাংলার প্রতিশত শিশুর জন্মের ৪ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর হার ৪০'৩ জন এবং জন্মের ৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট শিশু-গণের প্রতিশতের মধ্যে মৃত্যুর হার ৬২'০ জন।

বাংলা দেশের সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ। বাংলার কোন্-কোন্ বিভাগে কোন্-কোন্ বয়সের শিশু-মৃত্যু-হার কত তাহার একটা বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

বর্ধমান	প্রেসিডেন্সি	রাজসাহী	ঢাকা	চট্টগ্রাম
প্রতি-সহস্রের মধ্যে				
শিশু মৃত্যুর হার	২২.০	২১.৮	২১.০	২০.৬
শিশু-মৃত্যুর শতকরা হার :—				
১। একবৎসরের কম				
বয়সের	৫১.৮	৪০.০	৩৫.৪	৩৫.৮
			৩৫.২	

* The Official Year-Book of New Zealand, 1921.

* The Official Year-Book of New Zealand, 1924.

পশু হত্যা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে যে বৎস বধ করা হয়, তাহা আরো সাংঘাতিক। কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত কসাইখানার গত ১৯১৯-২০ সালের গড়ে প্রতিবৎসরে ৮১৯৭টি বৎস হত্যা করা হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১১২১ টন, ১৯২২-২৩ সালে ১২২১ টন এবং ১৯২৩-২৪ সালে ১১৭৫ টন বৎস-চর্শ্ব বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ভবিষ্যৎ গো-বংশ-রক্ষার একমাত্র উপায় বৎস। এই বৎস-হত্যা-সবন্ধে Mr. W. Smith, Imperial Dairy Expert বলেন, ভারতের অর্ধ-নৈতিক উন্নতির পক্ষে গো-রক্ষা একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। ভারতের অনেক প্রশিদ্ধ লোকের মতে গো-রপ্তানি বন্ধ করাই গো-রক্ষার উপায়, অনেকে আবার খাওয়ার জন্য গো-বধ নিবারণ করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। প্রায় একদল লোক মনে করেন, গো-চারপের জন্য বহু জমি রাখিয়া দিলেই সমস্তা মিটিবে। সকল কথাই সত্য আছে, কিন্তু আবার মতে গো-রক্ষার সর্বপ্রধান ও প্রথম উপায় সহরে বৎস শিশু গাভী ও শিশু মহিষী বধ নিবারণ। মফঃস্বলেও বহু পশু হত্যা করা হয়। সরকার এ-বিষয়ে কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। অবাধ গো-হত্যা ঘারা দেশের প্রচুত অমঙ্গল-সাধনে—আমাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর ভিস্মিত-বৃত্ত হইতেছে, সরকার তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না, কারণ গোরা-সৈন্তের জন্যই বেশীর ভাগ গো-হত্যা সাধিত হইয়া থাকে। এই মাংস গো-মাংস ব্যতীত অন্য মাংসঘারা পূরণ করিতে গেলে অত্যধিক খরচের দরকার। সুতরাং গো-হত্যা-রোধ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠিলেই 'জাতি-বিষেব-সৃষ্টি'র দোহাই দিয়া সরকার বুদ্ধিমানের দ্বার বোন থাকেন।

বর্তমানে কৃষক ও গোয়ালপণ্ডা অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যবশতঃ গো কুলের যে-ভাবে সর্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও মর্মান্বিত হইতে হয়। সাধারণতঃ গাভীর ছুঙ্কের অর্ধেকাংশই বৎসকে পান করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল তাহারা গরুর সবটুকু ছুঙ্কই দোহন করিয়া লয়; অথচ তাহার পরিবর্তে বৎসকে কিছুই খাইতে দেয় না। শৈশবাবস্থায় এইরূপ

বহুর কলে বৎস রুগ ও দুর্বল হইয়া পড়িলে, পরবর্তীকালে কিছুতেই উহাকে আর সখল করিতে পারা যায় না। শুৎপর সহরে-সহরে নৃশংস' জঘন্য কুকা-প্রকার ছুঙ্কনিঃসরণ করিয়া গাভীগুলিকে এমন অকর্ষণ্য করিয়া কেলে যে ১০।১২ মাস দুষ্কবনের পর তাহারা কসাইয়ের হস্তে বিক্রীত হইয়া গাভী-জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। তন্নির, পরীক্রমে বলিষ্ঠ উপভুক্ত বও নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। আমরা একটি গাভী নির্বাচন করিতে বহু আশাস ও পরিচরন স্বীকার করিয়া থাকি; কিন্তু বও-নির্বাচন-সবন্ধে উদাসীন। সাধারণত, একটি গাভী হইতে সমস্ত জীবনে ৫।৬টির অধিক বৎস লাভের আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, একটি বও প্রতিবৎসরে অন্ততঃপক্ষে ৫০টি বৎস উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ একটি বওের উপর প্রায় ৪০০ বৎসের শুভাশুভ নির্ভর করে। উপভুক্ত বও-নির্বাচন যে কিরূপ গুরুতর কার্য তাহা ইহা হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। সমস্ত বাংলা দেশে সরকারী ও বে-সরকারী নানা অনুষ্ঠানকর্তৃক মাত্র ১৫৮টি বও পালিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সুদৃশ্য দেশ-সমূহের তুলনায় বর্তমান কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষের গো-ধনের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ও তাহার কল যে কি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে চলিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাই-বার প্রয়াস পাউয়াছি। আমরা আজ নানাদিক্ দিগা অধঃপতনের দিকে ছুটরা চলিয়াছি। গো-জাতির ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশবাসী এই সর্বনাশের গুরুত্ব স্বয়ং-জন্ম করিতে পারিলেই, উন্নতির উপায় করিতে তাদের আগ্রহ জন্মিবে। ভারতের সম্মুখে আজ যে বিপুল কর্তব্যের বোঝা রহিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। জাতির চক্ষু ফুটিয়াছে, তারা নিজেস্বাই যদি এ-দিকে দৃষ্টি দেয়, তবেই দেশ বাঁচিবে, নচেৎ মরণ বরণ করিয়াই এ-জাতি ধ্বংস হইবে।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(১)

এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালিক অবস্থা যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ১৮৬২ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ফাস্টি আর্টস্ পড়িতে লাগিলাম। ১৮৬৪ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িবার জন্য আলবার্ট্ হলের দোতালায়স্থিত প্রেসিডেন্সী কলেজের খার্ড্ ইয়ারে পড়িতে গেলাম। আমরা যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম তথাপি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপেই পরিগণিত হইতাম। ৮ আনন্দ-মোহন বসু আমাদের সতীর্থ, ইহা মনে করিয়া আমরা

আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। আমাদের আর ছুইজন বিখ্যাত সতীর্থ অদ্যাপি জীবিত আছেন। ১ম—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদিন ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজীয়তি করিয়া এক্ষণে পেনশান্ লইয়াছেন। ২য়—রামচরণ মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের গবর্নমেন্ট্ উকীল ছিলেন। নিমাই বসু নামক বিখ্যাত হাইকোর্টের এটর্নী আর-একজন সতীর্থ।

আমরা যখন খার্ড্ ইয়ারে গিয়া ভর্তি হইলাম, তখন ডাণ্ডার্স নামক একজন বর্ষীয়ান্ সাহেব আমাদের ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতেন। সাটলিক্ অঙ্ক কবাইতেন।

বীবি নামক একজন সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন। বোধ হয় তখন কাউয়েল সাহেব ছুটিতে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। নীচের তালার একজন সাহেব কেমিস্ট্রী পড়াইতেন। তৎকালে ফিজিক্স বৃত্ত ছিল না; ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রী একই ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বাব্বালা পড়াইতেন। ইতিপূর্বে রামচন্দ্র মিত্র নামক একটি বাবু বাব্বালা পড়াইতেন। আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র স্মৃতরাং আমরা বাব্বালা পড়িতাম না। কে এম্ ব্যাচার্জি কৃত বড়দর্শন-সংবাদ এবং মাইকেল মধুসূদন কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্য কোর্স ছিল। ফোর্ড ইয়ারে উঠিয়া অনেক নূতন সাহেব দেখিলাম। সী-এইচ-টনী নামক একজন লাতিন ও গ্রীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন সাহেব আমাদের কাছে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ক্রফ্ট নামে একজন সাহেব ফিলসফি পড়াইতেন। সী-বী-ক্লার্ক নামে একজন তৃতীয় ক্লাসের সাহেব অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন। এই ক্লার্ক সাহেব চারিটার পর হইতে সধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আনন্দমোহন বসুকে একবারেই বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তৎকালে বি-এ পরীক্ষার একমাস পরে এম্-এ পরীক্ষা হইত। স্মৃতরাং আনন্দমোহন আমাদের সঙ্গে বি-এ দিলেন, এবং একমাস পরেই এম্-এ দিলেন। দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ ক্লার্ক সাহেব আনন্দমোহন বসুকে বিলাতে পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থাভাব হেতু সার্চক্রফ সাহেব তাঁহাকে একবৎসরের জন্ম এঞ্জিনীয়ারিং প্রফেসর করিয়া দিলেন। তাহাতে যে টাকা উপার্জিত হইল, তাহা লইয়া আনন্দমোহন বিলাত গেলেন। তৎকালে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গেই ছিল। আনন্দমোহন যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ক্রীক রো'তে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপর তালার ছিলেন। আমি নাম পাঠাইয়া দিবামাত্র তিনি চটি জুতা পায় নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং শ্রীতিপূর্ববচনে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম—“আনন্দমোহন! আমি মনে করিয়া-

ছিলাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা নহে। তুমি ঠিক সেই আনন্দমোহনই আছ।” তাহাতে আনন্দমোহন বলিলেন—“এজীবনে আপনাদিগকে কখনো ভুলতে পারিব না।”

আমাদের সময় ৬টি বিষয়ই কম্পালসারি ছিল। ১ম ইংরেজি, ২য় অঙ্ক, ৩য় সংস্কৃত বা বাব্বালা, ৪র্থ ফিলসফি, (mental ও moral), ৫ম ইতিহাস এবং ৬ষ্ঠ কেমিস্ট্রী বা কনিক্স। আমি দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাসে ৩ নম্বরের অল্প ফেল হইয়াছিলাম। ক্যাপ্টেন আইভস্ ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি আনন্দমোহন প্রভৃতি ভাল ভাল ছাত্রকে এত কম নম্বর দিয়াছিলেন, যে, সার্চক্রফ সাহেব গ্রেস্ দিয়া অনেককে পাস্ করিয়া দিলেন। ইতিহাসে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ হইলেই পাস্ হওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৎসর ১২০ জন বি-এ ছাত্রের মধ্যে ৮০ জন ইতিহাসে ফেল হইয়াছিল; আমরা শুনিয়াছিলাম আইভস্ সাহেব নিজে বি-এ বলিয়া তাঁহাকে এম্-এর পরীক্ষক করা হয় নাই, এইজন্য তিনি রাগ করিয়া ঐরূপ ফেল করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবানুই জানেন। “রাজার রাজায় যুদ্ধ হয়, খড়ি খাগড়ার প্রাণ যায়।” প্রথমতঃ ঐবার ফেল হওয়াতে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল; কারণ ইতিপূর্বে আমি কখনো কোন পরীক্ষায় ফেল হই নাই। স্মৃতরাং ফেল হওয়াতে আমার শরীর এরূপ ভয় হইয়া পড়িল যে, আমি পর বৎসরে আর বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এস্থলে আমি পাঠক ছাত্রদিগকে একটি বিষয় বলিব। লোকে প্রবাদ আছে “দেখে শিখে ও ঠেকে শিখে।” আমার অদৃষ্টে “ঠেকে শিখে” ঘটিয়াছে। আমি পঠদশায় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বড় মনোযোগ দিই নাই। অসুস্থয়ে আহার ও অধিক রাত্রি আগরণ করিয়া পড়াতে আমার সাত্বাতিক “পিত্তশূল” রোগ উপস্থিত হইল। অদ্যাপি ঐ রোগে ভুগিতেছি, এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ঐ রোগে ভুগিতে হইবে। আমি যখন চাকুরি করিতাম, তখন পকেটে খানিকটা সোডা লইয়া যাইতাম। পড়াইতে-পড়াইতে শূল-বেদনা উপস্থিত হইলে মালী ঘারা জল আনাইয়া ঐ সোডা খাইয়া কিছুক্ষণ স্থস্থ হইলে তবে আবার পড়াইতাম।

আমার ভ্রাতৃ আর যেন কেহ এরূপ পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত না হন—ইহা আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একটি আশ্রম খাইতে পারিতেন না। আমারও দশা তাহাই। অতএব হে ছাত্রগণ! তোমরা সাবধান হও; কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—“শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্”। শরীর রক্ষা কর, নতুবা কোন ধর্মের সাধন হইবে না।

১৮৬৯ সালের প্রথমেই আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সীনিয়ার সংস্কৃত-অধ্যাপক ছিলেন। এবং স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জুনিয়ার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন হঠাৎ কৃষ্ণকমল বাবু আমাকে বলিলেন—“হরিশ! তুমি আমাদের কলেজে অ্যাডিশনাল পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব আংগামী কল্যা হইতে চাকরিতে যাইও; তুমি অগ্রে সার্টিফিক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও।” আমি তাঁহার আদেশানুসারে পরদিন সার্টিফিক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণকমল তোমাকে পাঠাইয়াছেন।” আমি কহিলাম—“আজ্ঞে।” তিনি কহিলেন—“যাও, চাকরি করগে।” এইরূপে বিনা দরখাস্তে আমার চাকরি হইল।

আমার চাকরির কারণ আমি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জি তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক হইতেন। তিনি নাকি সার্টিফিক্ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, যে “তোমার কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ান হয় ভাল; কিন্তু ব্যাকরণ পড়ান বা অনুবাদ করান ভাল হয় না।” সার্টিফিক্ সাহেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই কার্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন।

আমি যখন প্রথম চাকরি করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিলাম প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এবং মহেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফার্স্ট-ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারে পড়ান। প্যারি-বাবু ইংরেজি-কবিতা ও মহেশ-বাবু

ইংরেজি-গদ্য পড়াইতেন। রীস্ নামে এক কিরিন্দী সাহেব অঙ্ক কড়াইতেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। আমি প্রত্যহ এক ঘণ্টা মাত্র কার্য করিতাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করান আমার উপর ভার ছিল। আমি প্রথম দিন যখন ক্লাসে পড়াইতে যাই, তখন ছাত্রেরা একটু চঞ্চল হইয়াছিল। তাহারা রাজকৃষ্ণ-বাবুকে বলিয়াছিল—মহাশয়! আমাদের একটি ‘কুচো’ পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু না কি বলিয়াছিলেন—“ওহে বাবু! ও বড় কুচো পণ্ডিত নয়, ও বড় বুড়ো পণ্ডিত, ইহার পর দেখিতে পাইবে।” ইহার পর হইতে ছাত্রেরা আমাকে খুব ভক্তি করিতে লাগিল। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; এবং কেহ-কেহ [অধরচন্দ্র সেন প্রভৃতি। সেই অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিল] রাজকৃষ্ণ বাবু যাহা পড়া দিতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিত। আমি বলিতাম—“দেখ বাবু! ইহাতে রাজকৃষ্ণ-বাবু আমার উপর রাগ করিতে পারেন।” ছাত্রেরা বলিত—“মহাশয় আমাদের ত পড়া চাই।”

এইরূপে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর চাকরি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন সার্টিফিক্ সাহেব আসিয়া বলিলেন—Pundit, your service is no longer needed. আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি কহিলেন, It is the order of the Lt. Governor. আমাকে ঐ কথা বলিয়া মহেশ-বাবুকে কহিলেন, You are pensioned off. মহেশ-বাবু কহিলেন, আমার ত এখন পেনশনের সময় হয় নাই। তাহাতে সার্টিফিক্ কহিলেন, You are compelled to retire. তৎকালে ক্যাশেল নামক একজন ছোটলাট বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া বিলাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচার্থ আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই সকল সরকারী ডিপার্টমেন্ট হইতে লোক ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাশেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ইতিপূর্বে পটল-

ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের এক দিকে বাহালা ডাক্তারী ক্লাস ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি যাওয়ার পর আমি আর কোন চাকরি করি নাই; পৈতৃক “গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র” চালাইতে লাগিলাম।

যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সৃষ্টি হয় নাই তখন Hindu College নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহার দুইটি Department ছিল—Senior ও Junior। শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্কাদিকারী, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার ইত্যাদি অনেকগুলি ছাত্র ঐ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন Captain Richardson নামে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন। তিনি Richardson's Selections নামে দুইখানি বই প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তকগুলি Hindu College এ পড়া হইত। আমরা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্কাদিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একদিন Macaulay সাহেব ঐ College দেখিতে আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে Hamlet হইতে সুপ্রসিদ্ধ passage টি—to be or not be—ব্যাখ্যা করিতে দেন। ছাত্রেরা নীরব হইয়াছিল। তাহার মনে করিয়াছিল—যখন Macaulay সাহেব এই স্থানটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন এই স্থানে অন্য কোন গৃহ অর্থ থাকিবে, এই ভাবিয়া তাহার কেহ কিছুই বলে নাই। তাহা দেখিয়া Richardson সাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি তোমাдиগকে যেরূপ পড়াইয়াছি, তাহা বল। তাহাতে ছাত্রেরা বলাতে Macaulay সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সময়ে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি Head Clerk এর কাজ করিতেন, এবং প্রত্যহ ১১টার পর একবার সকল class পর্যটন করিয়া যাইতেন। তৎকালে Presidency College ১১টার সময় বসিত। (হরমোহন-বাবুর ২য় পুত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরে Deputy Magistrate হইয়াছিলেন।) হরমোহন-বাবুর আর-একটি কাজ ছিল জরিমানা আদায় করা।

Principal সাহেব বা অন্য কোন professor যদি কোন ছাত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে জরিমানা করিতেন, তাহা হইলে হরমোহন-বাবু ঐ জরিমানার টাকা আদায় করিতেন। একবার বিখ্যাত ছাত্র কমলাকান্তকে কোন professor ১ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। পরদিন কমলাকান্ত ১ টাকার পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি আনিয়া হরমোহন-বাবুর টেবিলে রাখিয়া দেয়। হরমোহন-বাবু কহিলেন, “কমলাকান্ত! ও কি?” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! জরিমানার টাকা।” হরমোহন-বাবু বলিলেন, “আমি এত পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি গণিতে পারিব না।” কমলাকান্ত কহিল— “মহাশয়! এ-সবের কি মূল্য নাই? মহাশয় আপনি যদি না লন, বলুন, আমি সাহেবের নিকট গিয়া দিই।” তাহাতে হরমোহন-বাবু বলিলেন, “না, না, আর তোমার সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার দরকার নাই। আমি লইতেছি।” বলা বাহুল্য, যে, হরমোহন বাবু সার্টক্লিফ সাহেবকে বড় ভয় করিতেন। হরমোহন-বাবুর সহিত কমলাকান্তের এইরূপ তামাসা চলিত। একদিন First Year Class এর একখান কাচ ভাঙিয়া যায়। হরমোহন-বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কমলাকান্ত! তোমাকে কাচের দাম দিতে হইবে।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয় জানিলেন কিরূপে যে আমি কাচখানা ভাঙিয়াছি।” হরমোহন-বাবু কহিলেন, “তুমিই যত অনিষ্ট করিবার কর্তা।” কমলাকান্ত কহিল, “মহাশয়! সেদিন দণ্ডি যে কালীর বোতল ভাঙিয়াছিল, সে কাজটি কি আপনি করিয়াছিলেন?” হরমোহন-বাবু বলিলেন, “আরে সে দৈবাৎ ভাঙিয়া গিয়াছিল।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! আমাদের ঘরের কাচ যে দৈবাৎ ভাঙে নাই, আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?” হরমোহন-বাবু কহিলেন, “তোমরা ছটোপাটি করিয়া কাচ ভাঙিয়াছ, আমি সাহেবকে বলিয়া দিব।” কমলাকান্ত বলিল, “আজ্ঞে! আমিও সাহেবকে বলিব, যে, হরমোহন-বাবু গবর্ণমেন্টের এক বোতল কালী নষ্ট করিয়াছেন।” হরমোহন-বাবু কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতাম ও

translation করাইতাম। একদিন কমলাকান্ত আমাকে বলিল,—“পণ্ডিত মহাশয়! ব্যাকরণ ত মুখস্থ হয় না, কি করি বলুন দেখি? ইহার কি কোন সহজ পথ নাই?” আমি বলিলাম, “বাপু! আমরা বালক কাল হইতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছি। কোন সহজ পথ ত দেখি নাই।” কমলাকান্ত বলিল, “পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি না বকেন, তাহা হইলে বলি।” আমি কহিলাম, “কি বল না।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! না পড়াই সহজ পথ।” আমি বলিলাম, “বাপু! একটু একটু পড়িও, নতুবা বিদ্যা হইবে কেন? পরীক্ষায় ফেল হওয়া বড় লজ্জার কথা।” আর-একদিন কমলাকান্ত আমার বলিল, “পণ্ডিত মহাশয়! আমি ত translation লিখিতে পারি না, আঙ্গুল ব্যথা করে।” আমি কহিলাম, “তুমি এত ইংরেজি লেখ কেমন করিয়া?” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! ইংরেজি খুব চড়চড় করিয়া লিখিতে পারি, তাহাতে ত আঙ্গুল ব্যথা হয় না। সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে গেলে আঙ্গুলের বড় খাটুনি হয়; বিশেষতঃ বড়ো আঙ্গুলে সংস্কৃত অক্ষরগুলো লিখিতে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্র লিখিতে পারা যায় না, বড় দেরি হয়।”

তিন বৎসর বেকার বসিয়া থাকার পর ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আবার পূর্বের চাকরিই হয়। পাঠক দেখুন, আমার ৮বৎসর break of service হইল। দ্বিতীয়বার চাকরির কারণ আমি বেরুপ শুনিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি।—ছোটলার্ট ক্যাথেল সাহেব ৩ বা ৩০ বৎসর চাকরি করিয়া অসুস্থ-দেহ হইয়া পড়েন। জ্ঞানভাঙ্গণ তাঁহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিলেন। উদয়সারে তিনি স্বদেশে গমন করিলেন। মিস্টার গ্রে নামক একজন সাহেবের Offg. ছোট লার্ট হইলেন। ঐ সময় সার্টিফিক সাহেব কৃষ্ণকমল-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ছাপাখানার কাজ করিতেছি, হঠাৎ একদিন আমার স্বর্ণীয় পিতৃদেব সংস্কৃত কলেজের একটি বেহারী দ্বারা পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন—“হরিশ! তুমি এখন সার্টিফিক সাহেবের সঙ্গে Senate House এ গিয়া দেখা কর।” তাঁহার আদেশক্রমে আমি তথায় গিয়া সার্টিফিক সাহেবের

সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি এমনি বোকা যে গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত একদিনও দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু তিনি আমাকে ভুলেন নাই। আমি যাইবামাত্র তিনি কহিলেন—“How are you, Haris?” আমি কহিলাম—“In a manner starving.” ইহা শুনিয়া সাহেব আমাকে কহিলেন—“Go to the Presidency College and take out your Routine.” এই আমার appointment। এম্বলে পাঠক। একটি মজার কথা শুন। Presidency Collegeএ একটি ৫০ টাকার চাকরি হইবে জানিতে পারিয়া ৮মহেশচন্দ্র ভায়রভ মহাশয় একটি M.A. ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া সার্টিফিক সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন; গিয়া বলিলেন—“Sir, Sir, শুনিলাম আপনার কলেজে একটি চাকরি খালি আছে; তজ্জন এই একটি M.A. ছাত্রকে আনিয়াছি; আপনি ইহাকে ঐ চাকরি দিন।” সার্টিফিক সাহেব বলিলেন,—“Where is Haris? Is he in Calcutta? Is he employed elsewhere? Better call him, Mahes! I do'nt want any M.A.”—ভায়রভ মহাশয় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

সার্টিফিক সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি সেই দিনই Presidency Collgeএ গেলাম; এবং তথাকার asst. secretary মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। (পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম ব্রজনাথ লাহিড়ী।) তিনি আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—“তুমি বৈদিক?” আমি বলিলাম—“বৈদিক বলিয়া আপনি অস্ত ভয় পাইলেন কেন?” তিনি কহিলেন “না না।” পরে এই ব্রজবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

এবার যখন Presidency Collegeএ প্রবেশ করিলাম তখন অনেক পরিবর্তন দেখিলাম। ১ম Senate House হইয়াছে; ২য় Presidency College বাড়ী হইয়াছে; ৩য় শ্রীযুক্ত জৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বে Librarian ছিলেন, এক্ষণে Asst. Registrar হইয়াছেন; ৪র্থ হরমোহন-বাবু নাই, তৎপদে পূর্বোক্ত ৬ব্রজনাথ লাহিড়ী নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫ম Chemistry পড়াইবার জন্য Pedler নামে এক সাহেব আসিয়াছেন; Physics স্বতন্ত্র পড়ান

হইতেছে, তৎকাল Booth নামে একজন সাহেব আসিয়াছেন; ৬ষ্ঠ অঙ্ক পড়াইবার জন্য শ্রী বিপিনবিহারী গুপ্ত আসিয়াছেন। B.A. Class এ পড়াইবার জন্য ক্রাশ নামে আর-একটি সাহেব আসিয়াছেন। তাহার অনেক দিন পরে মির্টল নামে একটি সাহেব অঙ্ক পড়াইবার জন্য আসেন। কাক্স সাহেব Botanical Garden এ চলিয়া গিয়াছিলেন। সার্টক্রিফ্ আর পড়াইতেন না। তিনি আমাদের Principal, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar ছিলেন।

শ্রী রাজকৃষ্ণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি Booth সাহেবের assistant ছিলেন। তিনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং একটু বেশী মোটা ছিলেন। বুধ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে তাড়া করিতেন। একদিন সাহেবও রাজকৃষ্ণ-বাবুকে “নিকাল দেও” বলাতে উক্ত রাজকৃষ্ণ-বাবু মনে করিলেন যে সাহেব তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য চাপরাশিকে হুকুম দিতেছেন ও ভয়ে পলায়ন করেন। পরে জানা যায় যে সাহেব নিকল নামক সাহেবের গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ না রাজকৃষ্ণ-বাবু কলেজের কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইলেন; ততক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঐ প্রকাণ্ড জোয়ান আইরিশম্যান বুধ সাহেব যাইলেন। রাজকৃষ্ণ-বাবু গেটের বাহিরে বড় রাস্তায় গেলে সাহেব নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু শীঘ্র পেনশন্ লইলেন তবে বুধের ভয় তাঁহার ঘুচিল। রাজকৃষ্ণ-বাবুর পদে হৃদয় বন্দোপাধ্যায় নামে একজন M.A নিযুক্ত হন। হৃদয়-বাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বুধ সাহেবের মন জোপাইয়া চলিতে পারিতেন, তৎকাল উক্ত সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। ছুঃখের বিষয়! হৃদয়-বাবু আর এ-জগতে নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকৃষ্ণ ভাট্টা B. A. নামক একজন ছাত্র Chemistry Professor এর assistant ছিলেন। পড়বার সাহেব যখন Director হইয়া যান তখন পি, মুখার্জী নামক একজন বিলাত-কেরত হুগলী কলেজ হইতে Presidency College এ আসেন। তিনি পরে Presidency Circle এর Inspector of Schools

হইয়াছিলেন; এবং এক্ষণে পেনশন্ লইয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল, যে, তিনি আমার পুরাতন ছাত্র হইলেও আমার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় কথা না কহিয়া ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতেন।

তাহার অনেক দিন পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত হইতে আসিয়া Presidency College এ ক্রমাগত Chemistry ও Physics পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্রলোক। বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন অহঙ্কার নাই। জগদীশচন্দ্র বসু এক্ষণে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রথিতযশা হইয়াছেন। সেকথা পাঠক জানেন বলিয়া আর বলিলাম না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধী মহাত্মার শিষ্য হইয়া দেশে-দেশে চরকার চলন করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও আমি একত্র হইয়া “রসার্ণব” নামে একখানি সংস্কৃত রসগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। Asiatic Society of Bengal এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন।

সার্টক্রিফ্ সাহেব পেনশন্ লইয়া বিলাত যাইবার সময় Croft সাহেবকে Director of Public Instruction করিয়া যান। ঐ পদ টনি সাহেবের পাওয়া উচিত ছিল; কারণ তিনি ১৮৭৯ সনের senior in service ছিলেন। লোকে বলে, যে, সার্টক্রিফ্ সাহেব Croft সাহেবকে বিশেষ চতুর দেখিয়া ঐ কাজ করেন। টনি সাহেব বড় ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহাকে Presidency College এর Principal ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar করিয়া যান। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তে Croft সাহেব ও টনি এ উভয়ের মধ্যে বড় মনোভঙ্গ (বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে চটাচটি বলে) হইয়াছিল। টনি সাহেব যদি কখন তাঁহার অধীনস্থ কোন শিক্ষকের প্রমোশন্ হটুক বলিয়া লিখিতেন, Croft সাহেব তাহা অগ্রাহ করিতেন। এই বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার দশ বৎসর কোন প্রমোশন্ হয় নাই। ৪০ টাকা বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। পরে টনি

সাহেব একবার বিলাত যাওয়াতে বেলেট নামে একজন স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। আমি ঐ বেলেট সাহেবকে আমার ছুঁড়িশার কথা বলিয়াছিলাম। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ বেলেট সাহেবই ছয়মাসের জন্ত ডিরেক্টর হইয়া যান। তিনি আমার কথা মনে করিয়া স্বয়ং আমাকে ৫০ হইতে ৭৫ গ্রেড দেন। পরে যখন টনি সাহেব একবার ডিরেক্টর হইয়া যান, তখন আমাকে ১০০ হইতে ১৫০ গ্রেড দেন। টনি সাহেব বিপিনবিহারী গুপ্ত M. A. ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমরা যাহাতে কিছু টাকা পাই তাহার উপায় করিয়া দিতেন। বিপিন-বাবুকে ১০০ টাকার একটি মেম-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন। লরেটো হাউসের একজন বিবি শিক্ষয়িত্রীকে অল্প কষাতিতে হইত। আর আমাকে নক্স নামক এক সাহেব-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন; বেতন ৪৫ টাকা। নক্স সাহেব পরে এলাহাবাদ হাই কোর্টের চিফ্ জাস্টিস হইয়াছিলেন। আর Robinson Crusoe নামক একখানি ইংরেজী পুস্তক বাঙ্গালী ছাত্রদের অল্পবয়সে আমাকে দেন। আমি ঐ কার্যে প্রায় ২৫০ টাকা পাঠিয়াছিলাম।

একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের ১st Year ছাত্রেরা টনি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল যে—“মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রদিগের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ, তাহাদের মুখ হইতে বড় পোস্তের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।” এই দরখাস্ত পাঠিয়া প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, “দেখ হরিশ! তোমার ছাত্রেরা কি দরখাস্ত করিয়াছে।” তাহা পাঠ করিয়া আমি বলিলাম,—“মহাশয় যে-ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহা পালন করিব।” তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—“হরিশ! আমি কোন বন্দোবস্ত করিব না, যাহা করিতে হয় তুমি কর।” আমি “বে আজে” বলিয়া পরদিন আমার ঘরের বেহারাকে একখানি বড় বেঞ্চ আমার বাম দিকে দিতে বলিলাম, এবং মুসলমান ছাত্রদিগকে বলিলাম, “তোমরা প্রত্যঃ এই বেঞ্চে

বসিও; আর কোন বেঞ্চে বসিও না।” এবং হিন্দু ছাত্রদিগকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিলাম—“বাপুসকল! তোমরা সকলেই আমার ছাত্র; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই আমি সমান চক্ষে দেখি; কোন ইতরবিশেষ করি না।” এই বলিয়া ভবভূতির উত্তরচরিত হইতে বিতরতি গুরু: প্রাজে ইত্যাদি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সকল ছাত্রকে কহিলাম,—“বাপুসকল! তোমাদের পরস্পর জাতিভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। আমার নিকট পড়ার ভালমন্দই জাতি, অর্থাৎ যে ভাল পড়ে, সেই আমার নিকট ভাল জাতি আর যে আমার লোকচারে মনোযোগ দেয় না, সে আমার নিকট মন্দ জাতি। জগতে জাতিভেদে আহাৰ ও ব্যবহারের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা অপরের উচিত নহে। দেখ, আমার পিতার একটি ছাপাখানা আছে। আমি তথায় কার্য করি। ছাপাখানায় হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিই আছে। আমি তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করি।” আমার এইরূপ উপদেশ শুনিয়া আমার ছাত্রেরা নীরব হইয়া রহিল। হইতে পারে, এইরূপ বন্দোবস্তে হিন্দু ছাত্রেরা আমার উপর বিরক্ত হইল; কিন্তু মুসলমান ছাত্রেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল; জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে অপরজন বিরক্ত হয়। একরূপ স্থলে শিক্ষক সমদর্শী হইবেন; কখনো ভিন্ন-ভাবাপন্ন হইবেন না। ইহাই আমার মত।

আমার ছাত্রেরা এক-একদিন এক-একটি কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। একদিন এক ছাত্র কহিয়াছিল—মহাশয়, কক্ষফল যদি প্রবল হইল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার দরকার কি? আপনি বলিয়া থাকেন “নমস্তৎকক্ষভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।” অর্থাৎ কক্ষফলের নিকট বিধাতাও প্রবল হইতে পারেন না। এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কহিলাম “বাপু! তোমরা জান, হাই কোর্ট একটি আছে, এবং জেলখানাও আছে। কোন অপরাধীকে হাই কোর্ট দণ্ড দিলেন—৭ বৎসর মেয়াদ। পুলিশের লোকে তাহাকে জেলে লইয়া গেল; তথায় জেল-দারোগা

সাহেব বন্ধে বস্ত করিয়া দিলেন—“তাহাকে পাথর ভাঙিতে হইবে।” এক্ষণে দেখ বাপু! মনে কর, High Court ভগবান্। কর্মফল জেলদারোগা। এস্থলে অপরাধীকে ৭ বৎসর ধরিয়া মেয়াদ খাটিতে হইবে, ইহা High Court এর হুকুম। High Court এমন কথা বলে নাই, যে তাহাকে এই-এই কাজ করিতে হইবে। সেকাজ জেলদারোগা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এক্ষণে এই উপমার সহিত জগতের জীবের তুলনা করিয়া দেখ। জীব পূর্কজন্মে যে-সকল কার্য করে, ভগবান্ তাহা দেখিয়া থাকেন; কারণ, তিনি সাক্ষী-মাত্র ইহা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। জীব পূর্কজন্মে পাপ বা পুণ্য যাহাই করে, পর জন্মে তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করে। যদি একটু পুণ্য করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে সুখভোগ করে। যদি একটু পাপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থলে দেখ, কিরূপ সুখ বা কিরূপ দুঃখ জীব ভোগ করিবে, তাহা তাহার কর্মফলের অঙ্গুসারে হইয়া থাকে। ভগবান্ তাহার ইতরবিশেষ কিছুই করেন না।

কিছুকাল পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে Gil-Christ পরীক্ষা দিবার জন্ত দুইটি ছাত্র উপস্থিত হইলেন। ১ম H. M. Percival, ২য় P. K. Lahiri। যে-কয়েক দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, সে-কয়েক দিন আমাকেই guard হইতে হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষায় Percival সাহেব পাশ হইয়া বিলাতে চলিয়া যান; পরে তথ্য হইতে পাশ হইয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে Professor হন। P. K. Lahiri Metropolitan Institution এর অন্ততম Professor ছিলেন। তিনি পাশ না হওয়াতে বিলাত যাইতে পারিলেন না। Tawney সাহেব তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আসিতে দিলেন না; বরং তাঁহার বেতন ৫০০ টাকা করিয়া দিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি Tawney সাহেবের চিঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ওরে! সাহেবেরা আমার কলেজ খেলো করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহা কখনই করিতে দিব না।”

আরও কিছুদিন পরে P. K. Ray ঢাকা হইতে

প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া philosophy পড়াইবার professor হইলেন। তিনি একখানি Logic রচনা করেন।

Presidency Collegeএর Libraryর প্রথম Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার Rowe সাহেবের উপর পড়ে। এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকসকলের Catalogue করিবার ভার আমার উপর পড়ে। কিন্তু Rowe সাহেব ইংরেজি ও সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা সমগ্র Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন; তিনি কেবল শেষ প্রকটি দেখিতেন। আমি অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেনশন হওয়াতে ঐপদে নীলমণি মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, এবং ৬ মাস আমাদের সঙ্গে পড়িয়া উপরি শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—“এ-ছেলেটা বড় খেড়ে, একে উপর শ্রেণীতে দেওয়াই ভাল।” নীলমণি-বাবু রামচন্দ্র মিত্রের Private tutor ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন বাঙ্গালা পড়ান হইত, সংস্কৃত প্রবর্তিত হয় নাই, তৎকালে রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা Professor ছিলেন। তাঁহার পর কৃষ্ণকমল-বাবু, senior professor হন। সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবু-গেলেও আমরা ৩ জন professor রহিলাম—১ম কৃষ্ণকমল-বাবু ২য় নীলমণি বাবু, ও ৩য় আমি। নীলমণি বাবু M. A. পাশ করিয়া ২৪ পরগণায় Assistant Deputy Inspector of Schools হইয়াছিলেন। ২৪ পরগণায় ২জন Deputy Inspector of Schools ছিলেন—১ম রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও নীলমণি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি চাকরি খালি হওয়াতে (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেনশন হওয়াতে) নীলমণি-বাবু জোগাড় করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন।

কিছুদিন পরে তৎকালীন High Courtএর জজ হারকানাথ মিত্র মহাশয় কৃষ্ণকমল-বাবুকে High Courtএর ওকালতি করিতে পরামর্শ দিয়া Presidency College

ছাড়িতে বলেন। তিনি কলেজ ভ্যাগ করিলে নীলমণি-বাবু ঐ পদে উন্নীত হন; এবং আমিও নীলমণি বাবুর পদে উন্নীত হইলাম। সুতরাং এ-সময় আমরা ২ জন বই আর Professor রহিলাম না; কারণ আমার পদটি গবর্ণমেন্টে abolish করিয়া দিলেন, তৎপদে আর নূতন লোক রাখিলেন না। ইহাতে নীলমণি-বাবু 3rd year ও 4th year পড়াইতে লাগিলেন; এবং আমি 1st year ও 2nd year পড়াইতে লাগিলাম। আমি তখন একজন Professor হইলাম। Lord Ripon যে Education Report প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে কলেজের অধ্যাপক যাজেই professor হইবেন, assistant professor বলিয়া আর নাম থাকিবে না। ঐ নিয়ম অল্পসারে বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় professor হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি assistant professor of Mathematics ছিলেন। Lord Ripon Professorদিগকে একরূপ ক্মতা দিয়া ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদিগকে fine করা বা rusticate করা যে কোন কার্য করিতে পারিবেন *without reference to the Principal*. এই সময় Rowe সাহেব কয়েক মাসের জন্য off. principal হইয়াছিলেন। তিনি Reportএর ঐ underlined কথাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই চটিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন Principal সর্বময় কর্তা; Professorগণ তাঁহার অধীন। Lord Ripon তাহা করিয়া যান নাই। তিনি সকল Professorকে সমান ক্মতা দিয়া গিয়াছিলেন। (Lord Ripon প্রকাশিত Education Report দেখুন।)

প্রতিবৎসর 1st year ও 3rd year classএ যে পরীক্ষা হইত, তাহার ফল দেখিয়া ছাত্রদিগকে promotion দেওয়া হইত। ঐ দুই পরীক্ষার ফল বিপিন-বাবু ও আমি দুইজনে একত্র হইয়া স্থির করিতাম। Tawney সাহেব ঐ ভার আমাদের দুইজনের উপর দিতেন। Tawney সাহেব এতাদৃশ সদাশয় লোক ছিলেন যে, ছাত্রেরা কেবল হইলে যদি আমরা অস্বরোধ করিতাম, তাহা হইলে Tawney সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে promoted করিতেন। একবার একছাত্র অর্ধে শূন্য

পাইয়াছিল। বিপিনবাবু অস্বরোধ করিলেন—ঐ ছাত্রকে উঠাইয়া দিউন, আমি 2nd yearএ তাহাকে প্রবেশ করিয়া লইব। Tawney সাহেব হাসিয়া সই করিলেন। এইরূপ কার্য করাতে ছাত্রেরা আমাদের দুইজনকে বড় ভালবাসিত, এবং আমাদের খুব বাধ্য ছিল। একবার Robson নামে একটি সাহেবের টমটম গাড়ী ঘিরিয়া ছাত্রেরা দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব কিছুতেই বাড়াইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে আমি উপরতলা হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ কাণ্ড দেখিলাম। সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—Pundit! See the behaviour of your students.” আমি তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে বাড়াইতে বলিলাম, এবং কহিলাম, আগামী কল্য আমি তোমাদের উপায় করিব। ব্যাপার হইয়াছিল কি, পাঠক শুনুন। Robson Missionary সাহেব ছিলেন। ছেলেরা বলিল, তিনি ইংরাজী ভাল পড়াইতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। সাহেব বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এইজন্য তাহার Robson সাহেবকে উত্ত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়া দিবে এই তাহাদের মতলব ছিল। পরদিন আমি Tawney সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম—এবং Robson সাহেবকে transfer করিবার জন্য Director সাহেবকে লিখুন বলিয়া অস্বরোধ করিলাম। Tawney সাহেব আমার অস্বরোধ রক্ষা করিলেন। একসপ্তাহ-মধ্যে Gazetteএ দেখিলাম, Robson সাহেব পাটনায় transfere হইয়াছেন।

একবার নীলমণি-বাবু কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া-ছিলেন বোধ হয় ৩ মাস। শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, এবং Tawney সাহেবের Private tutor ছিলেন। Tawney সাহেব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে নীলমণি-বাবুর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পড়াইয়া তাঁহাকে আর 3rd yearএ পড়াইতে হয় নাই। কারণ তথাকার ছেলেরা দুরখাস্ত করিয়াছিল—শ্রীমাচরণ পণ্ডিতমহাশয় আমাদের পড়াইতে পারিবেন না, হরিশ পণ্ডিতমহাশয়কে আমা-

পকে পড়াইতে দিন। Tawney সাহেব পরদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—“হরিশ! তুমি নীলমণির কাজের ভার লও, এবং তোমার কাজের ভার শ্যামাচরণকে দাও। ছুঃখের মধ্যে এই হইল—শ্যামাচরণ-বাবু Office allowance পাইতে লাগিলেন; আমি কিছুই পাইলাম না।

একবার Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর প্রতি এরূপ অসন্তোষ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে Presidency College এ আনিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ঐকথা শুনিয়া Tawney সাহেবকে বলিয়াছিলাম, আমার কি অপরাধ দেখিলেন যে, আমাকে Presidency College হইতে দূর করিয়া দিতেছেন? তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—আমি শ্যামাচরণের উপকার করিবার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করিব মনে করিয়াছি। Tawney সাহেব আমার কথায় বড় মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা Tawney সাহেবের ঐ প্রস্তাব শুনিয়া 1st year, 2nd year, 3rd year ও 4th year এর সমস্ত ছাত্র Tawney সাহেবের নিকট একটি দরখাস্ত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—যদি আপনি হরিশ পণ্ডিত-মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারিত করেন, তবে, আমরা সকলেই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। Croft সাহেব এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়া লিখিয়া পাঠান, হরিশকে কোনরূপে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়। Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর নিকট বড় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং ব্রজ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন তুমি শ্যামাচরণকে বলিও—“What can I do? The whole Presidency College is for Haris. Even the Director is for Haris.”

যখন নীলমণি-বাবু সংস্কৃত কলেজের Principal হইয়া তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Senior Professor

হইলেন এবং আমি কেবল Professor বহিলাম। তখন একটি মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. দিবার জন্য আমাদের কলেজে আসে। সে প্রথমে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল; কিন্তু মহেশ স্তায়রত্ন মহাশয় মুসলমান বলিয়া তাহাকে ভর্তি করেন নাই। সে ছাত্র নাগপুরের জেল-দারোগার পুত্র। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা—সংস্কৃত M. A. দেয়। সে Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ভর্তি হইবার জন্য। সাহেব জবাব দিয়াছিলেন—“আমি একটি ছেলের জন্য একটি Class খুলিতে পারিব না।” পরে তিনি হরপ্রসাদ ও আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা এই ছাত্রটিকে M. A. পড়াইতে পারিবে কি না? আমরা উত্তর করিলাম, “আপনি যদি হুকুম করেন, তবে পড়াইতে পারি।” সাহেব বলিলেন “আমি একটি ছেলের জন্য ২ জন Professorকে হুকুম দিতে পারি না। তবে তোমরা যদি ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পড়াও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।” আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলিলাম “দেখ হরপ্রসাদ! (হরপ্রসাদ আমাপেক্ষা ১০ বৎসরের ছোট হইবে) যদি কোন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সংস্কৃত কলেজ যদি না লয়, এবং আমরাও (অর্থাৎ Presidency College) যদি না লই, তবে সে যার কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কহিলেন—“দাদা যদি তুমি খাটিতে পার, তবে তার গ্রহণ কর। আমি দুই-একখানা কাব্যের ভার লইতে পারি।” আমি বলিলাম—“তুমি আমাকে যে ভার দিবে, আমি লইব।” এইরূপ কথার পর ঐ ছাত্রকে Presidency কলেজে ভর্তি করা হইল। আমি নিজ নিয়মিত কাজ করিয়া অবকাশকালে তাহাকে বেদান্তচতুষ্টয়, কাব্য-প্রকাশ অলঙ্কার, পাণিনি ব্যাকরণ (বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অংশ) পড়াইবার ভার লইলাম। ছুঃখের বিষয় এই—উক্ত মুসলমান ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

নীলার দৌলত

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন শেয়ারের দালালি করছি। নিতাই লাখপতি হবার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনে। বাড়ীতে ছুটি প্রাণী, নিজের আর অর্ধাঙ্গিনী, তাই টায়েটোয়ে সংসার-ধরচ চ'লে যায়। এর ওপর মা-ষষ্ঠীর রূপা হ'লে আর রক্ষা ছিল না।

নিজের চেষ্টায় মানুষ যখন কিছু করে উঠতে পারে না, তখন সে দৈবের দ্বারে ধরুণা দেয়। আত্ম-অবিখ্যাসী অর্ধলুক আমিও একদিন গ্রহাচার্যের সামনে হাত মেলি বসলুম। তিনি অনেককণ ধ'রে আমার হাতের তেলো টেপাটিপি ক'রে এদিক-ওদিক কাত ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকমে দেখলেন, তা'র পর আমার মুখের পানে চেয়ে স্মিতহাস্তে বললেন, যান যান, বাড়ী যান! আপনার আবার ভাবনা! টাকা ত আপনার হাতে এসে পড়েছে বললেই হয়!

মনের আনন্দ গোপন ক'রে গম্ভীরভাবে বললুম, বলেন কি? আমি ত টাকার টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনে।

গ্রহাচার্য বললেন, এক কাজ করুন। ভালো দে'পে একটি নীলার আংটি পান। তা হ'লে আর দেখতে হবে না! আপনার টাকা মারে কে!

গ্রহাচার্যের পায়ের ধূলো নিলুম। মনে-মনে বললুম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তা'র পর তাঁর হাতে একপানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে সরাসর আমার আলাপী জুয়েলারের কাছে গিয়ে একটি দামী নীলার আংটি পরলুম।

আংটিটি পরিয়ে দিয়ে সে বললে, দিনকতক পরে দেখুন, যদি না সব অস্ত্র নীলা বদলে দেবো।

আশ্চর্য নীলার শক্তি! পরের দিনই কিছু খোকটাকা পেলুম। তা'র পর, তৃতীয় দিন সকালবেলা বৈঠকখানায় ব'সে চা-পান ও সংবাদপত্রপাঠে রত আছি, এমন সময়

এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বয়স বছর ২২২৩, খাসা চেহারা, পরিপাটি বেশভূষা, বুদ্ধির ছাপ চোখেমুখে স্থম্পষ্ট।

তাঁকে বসতে ব'লে জিজ্ঞাসা করলুম, মহাশয়ের নাম? ভদ্রলোক বললেন, মলয়কুমার মিত্র। আপনার নাম বিনয়-বাবু? শেয়ারের দালাল?

মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলুম।

মলয়-বাবু বললেন, আপনাকে কিছু বড় কাজ স্কুটিয়ে দিতে পারি, যদি...

জিজ্ঞাসা করলুম, কত টাকার?

মলয়-বাবু বললেন, লাখখানেকের কম নয়, বেশি হ'লেও হ'তে পারে।

মনে-মনে বললুম, বেঁচে থাক আমার নীলা। প্রকাশে বললুম বেশ ত! তা কাজ হ'লে আপনিও কিছু পাবেন বই কি! তবে বেশি কিছু আশা করবেন না কিন্তু! আমার ত ফার্ম নেই, আমি আঙার-ত্রোকার। কমিশন যা হয় তার অর্ধেক ত ফার্মকেই দিতে হয়, বাকি অর্ধেক আমার, তা থেকে ত আর বেশি দেওয়া চলে না।

মলয়বাবু বললেন, তা বেশ ত, যা আপনার সুবিধে হয় তাই দেবেন! আমি অজ্ঞান-কিছু আপনার কাছে চাইব কেন বলুন?

লোকটি যে যথার্থ ভদ্রলোক সে-সঙ্গে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

মলয়বাবুর কাছে খবর পাওয়া গেল মক্কেলের নাম পদ্মপতি ঘোষাল, ক্রোরপতি লোক, তেজারতির কাবুবার করেন। শ'বাজারে তাঁর ইন্দ্রভবনতুল্য প্রাসাদ! হীরে জহরৎ আর নগদ টাকা যা ঘরে মজুদ আছে তা দিয়ে একটা গোটা রাজস্ব কেনা যায়!

মলয়-বাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, আজ

তবে উঠি মশাই ! তা কবে আপনার স্ববিধে হবে বলুন, বাবুকে নিয়ে আসব 'খন !

আমি বললুম, বিলম্ব, তাও কি হয় ! তিনি আসতে যাবেন কেন ? গরজ আমার, আমিই যাবো, একটা দিন স্থির করুন ।

মলয়-বাবু বললেন, তবে কাল সকাল আটটা । শুভস্র শীঘ্র, কি বলেন ? বলে তিনি ছোটো ছেলের মতন হাসতে লাগলেন । তা'র পর টেবিলের ওপর থেকে স্নিপ প্যাড্‌টা টেনে নিয়ে বুক থেকে ফস ক'রে স্টাইলো-কলমটা তুলে নক্সা কেটে পশুপতি-বাবুর বাড়ী ঠিক কোন্‌খানে তা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন ।

যাবার সময় বললেন, বাড়ী খুঁজে পেতে আপনার কষ্ট হবে না । আমি গেটের কাছেই থাকব 'খন !

পরদিন যাত্রাকালে একবার নীলার আংটির পানে চাইলুম । নীলা ঝকঝক করছে, মনে হ'ল যেন হাসছে । নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখি প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড বাড়ী, ফটকের ওপর কপারপ্লেটের ওপর লেখা P. Ghoshal । বন্দুক উচিয়ে সেপাই-পাহারা দিচ্ছে ।

সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই মলয়বাবু এগিয়ে এলেন । হাসিমুখে আমার নমস্কার করলেন । লোকটির সমস্তটাই যেন সৌজন্য ! আসন্ন বলে তিনি আমায় নিয়ে ফটকের মধ্যে ঢুকলেন ।

বাড়ীর মস্ত হাতা, সেখানে নানারকম বাহারি পাতা আর মণ্ডুগি ফুলের গাছ । আধতালা-সমান উচু ভিতের ওপর বাড়ী, সামনেই অর্ধচন্দ্রাকারে মন্দির সোপানের শ্রেণী । তা দিয়ে চওড়া বারান্দায় গিয়ে পৌঁছলুম । বারান্দার মাঝে সমুচ্চ পাদ-পীঠের ওপর একটি পাশ্চাত্য ধাতুমূর্তি, তা'র দুইপাশে ছাদ থেকে দুটি বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলানো । সেই মূর্তি অতিক্রম ক'রে গিয়ে ডানদিকে একটা সরু পথ । মনে হ'ল বাড়ীর পিছন-পর্যন্ত তা'র প্রসার । সেই পথ ধ'রে কিছুক্ষণ চ'লে ঝাঁদিকে ফি'রে দোতলার চওড়া কাঠের সিঁড়ি, ধাপ-গুলোর মাঝখানটা বরাবর রক্তবর্ণের কার্পেটে ঢাকা । সিঁড়ির ধারে দেয়ালের ওপর গিল্টি-করা ক্রেমে-বাঁধানো ছোটোবড় নানারকম বিলিতি ছবি ।

দোতলায় উঠে ভাইনে-বায়ে অনেক ঘর । এমনি-একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মলয়-বাবু বললেন, এইখানে বাবুর নায়েব বসেন, তাঁর সঙ্গে আগে কথাবার্তা হোক !

প্রায় ঘরছোড়া তক্তপোষের ও'র সতরকি পাতা, তা'র ওপর ধবধবে সাদা জাকি.ঘর আন্দরণ । ইতস্তত কয়েকটা মোটা তাকিয়া, তা'রই একটার ওপর হেলান দিয়ে এক ভদ্রলোক ব'লে শুড়গাড়ি টানছেন । বয়স অল্পমান পঞ্চাশের ক.ছাকাছি, মাথার সামনে খানিকটা টাক । ঝড়ের মত নাক, নাকের ওপর চশমা—চোখ থেকে অনেকটা দূরে । সামনে খেরোয় বাঁধা খানকত জাকা খাতা ।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, বসুন, বসুন, বিনয়-বাবু ! আপনা . সঙ্গে বিশেষ কাজ আছে, শুনেছেন বোধ হয় এ'র কাছে ? ব'লে মলয়-বাবুর পায়নে ইঙ্গিত করলেন !

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যা, শুনেছি ।

জুতো খুলে আরাম ক'রে বসলুম । মলয়-বাবুও তক্তপ করলেন । নায়েব গলার হুব ন'নিয়ে বললেন, লাগলেন—বাবুর ত খরচের অস্ত্র নেই—জানেনই ত বড়মাস্ত্রদের ধরণধারণ ! কর্তা বেঁচে থাকতে তবু একটু রাশটান ছিল, তিনি মারা যাবার পর থেকে দারা একেবারে উল্টে গেছে ! ছেলেছোকরার হাতে অগাধ টাকা পড়লে যা হয় আর কি ! ঘোড়দৌড়, বাগানবাড়ী, লজ, তা'র ওপর এদিক-ওদিক সমস্তই আছে, বুঝতেই পারছেন ! টাকাকড়ি সব তচনচ ক'রে ফেললে ! তাই মনে করছি আন্তে-আন্তে কিছু টাকা শেয়ারে আটকে ফেলব । কি বলেন ?

আমি বললুম, আপনি বিবেচকের মতন কথা বলেছেন ।

নায়েব বললেন, বাবুকে নিমরাজি করিয়েছি । আপনিও, শেয়ারে টাকা রাখা যে বিশেষ দরকার, আর তা'তে লাভ অনেক, সেটা তাঁকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন ।

হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, এই যে, নাম কর্তেই হাজির !

বাবুর বয়স পঁচিশের বেশী নয় । স্বকুমার স্বশ্রী

চেহারায ছুধের মতন সাদা আঁধির পাঞ্জাবি, ফরাসীভাঙার লাল নকনপাড় কোঁচানো ধুতি আর সাদা কটকী চটি দাঁবা মানিয়েছে। বাঁহাতে ক'ড়ে-আঙুলের ওপর একটা মস্ত হীরের আংটি।

আমাদের কিছু বলবার বা করবার অবসর না দিয়েই তিনি বললেন, বসুন বসুন। ব্যস্ত হবেন না।

নায়েব বললেন, ইনি শেয়ারের দালাল বিনয়বাবু।

বাবু বললেন, অ, হ্যা! আপনার আস্বার কথা ছিল বটে! তা বেশ! চলুন আমার ঘরে, সেখানেই আলাপ হবে'ধন!

বাবুর অঙ্গসরণ কথলুম। বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেটা যে বাবুর খাসকামরা তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না। ঘরের ওপর কাশ্মীরী কার্পেট, দোরের গায়ে মণমলের পর্দা, সৌখীন আসবাবপত্র সমস্তই ল্যাক্সারাসের, অস্কারের পাখা আর বিছাতের বাতি, আলুমারির দরজায় মালুমসমান বড়-বড় আয়না। ঘরের একধারে কয়েকটা লোহার আলুমারি আরু পিস্জুক, তা'র পাশে একটা শেল্ফের ওপর কয়েকটা পিস্তল ও বন্দুকের চামড়ার কেস।

একখানা চৌকো ছোটো টেবিলের পাশে সাতিনের গদি আঁটা চেয়ারে আমায় বসতে ব'লে সামনের চেয়ারে বাবু বসলেন। বললেন, এইবার বলুন কি কি শেয়ার কেনা যায়? কিছু কমলা, পাট আর চায়ের শেয়ার কিনব মনে করছি। তা'র পর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন। বললেন, একমিনিট মাপ করুতে হবে!

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখোলো চাবি বার করে একটা লোহার আলুমারি খুলে তা'র একটা দেওয়াল টানলেন। আমি সেইদিকে মুখ করে বসেছিলুম, বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম দেওয়ালটা তাড়া বাঁধা নখরি নোটে ঠাসা। গোটা কত তাড়া বার করে অল্প একটা দেওয়াল খুলে তা'র মধ্যে রাখলেন, তা'র পর সে দেওয়াল বন্ধ করে আর-একটা দেওয়াল খুললেন। অমনি মোহর আর মুক্তোর মালা আর অড়োয়া গহনার ঝিলিক চোখে এসে লাগল। সেই দেওয়ালটার মধ্যে খানিকক্ষণ ধ'রে বাবু

যেন কি খুঁজতে লাগলেন, তা'র পর সেটা বন্ধ করে আলুমারিতে চাবি লাগালেন।

আমার পাশে ফি'রে এসে তিনি বললেন, আপনাকে বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রতার খাতিরে বললুম, না না, তা'তে কি হয়েছে, আমার ত তাড়া নেই! যদিও মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিলুম।

বাবু বললেন, চলুন নায়েব-মশায়ের ঘরে, ফর্দটা ক'রে ফেলা যাক।

ভাবলুম, তা হ'লে এঘরে আস্বার কি দরকার ছিল? ঐখর্য দেখানো উদ্দেশ্য নয় কি?

নায়েবের ঘরের সামনে এসে বাবু বললেন, আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। আমি আস্টি চট্ করে।

নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কথাবার্তা হ'ল?

আমি বললুম, বিশেষ কিছু না। এটু ঘরেই হবে বললেন।

নায়েব বললেন, তা বেশ, বসুন।

এমন সময় একটা লোক নায়েবকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। মাথার পিছনটা কামানো, সামনে চেঁউখেলানো সিঁথি, চোখ কোটরগত, মুখ শীর্ণ ও শ্রান্ত, তা'র রেখায়-রেখায় নিশাচর জীবের অকথা ইতিহাস পরিস্ফুট। মিহিন্দুতার ধুতি ও চাপকানের মতন লম্বা পাঞ্জাবি আধময়লা, পায়ের পাম্প্ণ্য ধূলিধূসরিত অপরিচ্ছন্ন। কতকগুলো লোক আছে যাদের উপর প্রথমদর্শনেই বিতৃষ্ণা জন্মে, লোকটা সেই শ্রেণীভুক্ত।

তা'র দিকে মুখ ছুঁলে নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কি দরকার আপনার?

লোকটা সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে, আমি এসেছি একটা বাড়ী বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার করুতে।

নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা?

সে বললে, পঞ্চাশ হাজার।

নায়েব বললেন, কোথায় বাড়ী? কত জমির ওপর?

সে বললে, আজ্ঞে বাড়ী পুরোনো নয়, হালে তৈরি হয়েছে। আমহাট্ স্ট্রীটের ওপর। জমি দশকাঠা, আটকাঠার ওপর বাড়ী।

নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কত সূদ দেবে ?

সে বললে, দশটাকা।

নায়েব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, দশটাকা! বারো-টাকা দিতে পারবে ? পারো ত বলো, গিয়ে বাড়ী দেখে আসি।

এমন-সময় বাবুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?

নায়েব আগন্তুককে দেখিয়ে বললেন, ইনি বাড়ীর দালাল, বাড়ী বাঁধা রেখে পঞ্চাশহাজার টাকা ধার চান।

বাবু বললেন, কত সূদে ?

লোকটা বললে, আজ্ঞে আনি বলছি দশটাকা.....

বাবু বললেন, বারোটাকার এক পয়সা কম নয়।

দালাল বললে, আজ্ঞে দশটাকার বেশী.....

বাবু বললেন, না হে না। হয়ত দেখ। নইলে আমার কাজ আছে, সময় নষ্ট কোরো না।

সে তখন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে 'আজ্ঞে তা হ'লে আসি,' বলে বিদায় হ'ল।

বাবু তক্তপোষে উঠে বসলেন। আমার দিকে ফি'রে বললেন, আসুন এবার, কাজে বসা যাক।

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লেখবার উদ্যোগ করছি, হঠাৎ চোখ পড়ল বারান্দায়, বাড়ীর-দালাল তা'র বিলী মুখানা চট্ট করে দোরের পাশে টেনে নিলে দেখতে পেলুম। লোকটা তা হ'লে ধায়নি! ওখানে দাঁড়িয়ে করছে কি ? মরুক গে, আমার অতশতয় দরকার ? আবার কাজে মন দিলুম।

মাথা হেঁট করে লিখছি, বাবু ব'লে উঠলেন, আবার কি ? ফিরলে যে ?

চোখ তুলে দেখি, বাড়ীর-দালাল আবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, আজ্ঞে আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা ?

সে বললে, একটু আড়ালে বলতে চাই।

বাবু বললেন, যা বলবার এখানেই বলতে পারো! তিনি বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারলুম। আর হবারই কথা।

দালালটা যে unmitigated nuisance হ'তে আর সন্দেহ কি ?

সে আমতা-আমতা ক'রে বলতে লাগল, আজ্ঞে দেখুন, অনেকদিন আগে এক আমেরিকান সাহেবের কাছে একটা ম্যাজিক শিখেছিলুম। অহুমতি করেন ত আপনাকে দেখাই!

বাবু হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে লাগলেন। বললেন, সকাল-বেলা ম্যাজিক, বলো কি হে ? দেখছ না, কাজ করছি ? এখন কি ম্যাজিক দেখবার সময় ?

দালাল মিনতি ক'রে বললে, আজ্ঞে বেশী সময় লাগবে না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাতে পারি, যদি অহুমতি করেন.....

বাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, ইয়াঃ! ম্যাজিকের তোড়-জোড় করতেই যায় একঘণ্টা, বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাবে! তা'র পর আমার দিকে ফি'রে বললেন, কি বলেন বিনয়-বাবু, সকাল-বেলা কি ম্যাজিক দেখবার সময় ?

ছেলেবেলা থেকে ম্যাজিকের ওপর আমার জারি ঝোঁক। কলেজে পড়বার সময় সেটা একরকম নেশায় পবিণত হয়েছিল। অনেক সময় আর অর্থ ব্যয় ক'রে ও বিজ্ঞাটা বেশ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলুম। স্কুল-কলেজের অ্যানিভার্সারি বা বিয়ের নিমন্ত্রণ-সভায় ম্যাজিক দেখাবার জন্তে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত। বহুকাল পরে ম্যাজিকের নাম শু'নে ভারি কৌতূহল হ'ল, দেখাই যাকনা, হয়ত একটা নতুন খেলা শেখা যাবে, তা-ছাড়া লোকটাকেও কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল, তাই বাবুর প্রস্তাব উত্তরে বললুম, মন্দ কি! পাঁচ মিনিট সময় বই ত নয়!

বাবু দ্বিধা হেসে বললেন, আজ্ঞা, দেখি কি তোমার ম্যাজিক।

লোকটা বললে, যে আজ্ঞে। তা'র পর আসনপিড়ি হ'য়ে ব'সে পকেট থেকে একমুঠো স্ফটিকের দানা বার করলে, মুসলমান ফকিরেরা ধার মালা গলায় পরে। সে বললে, এখানে চোদ্দগুণা দানা আছে। এই দানা আমি আপনার সামনে রাখব। তা থেকে আপনি ছ'টা দানা নিয়ে সামনে একসাথে তিনভাগে সাজাবেন। প্রথমভাগে

১, দ্বিতীয় ভাগে ২, তৃতীয় ভাগে ৩। তা'র পর আমি যখন বলব, তখন ঐ তিন ভাগের যে-কোনো একটা ভাগ এই দানাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। তা'র পর আমি গুণব। গু'নে যদি গুণা পুরো হ'য়ে, যে-কটা দানা মিশিয়ে-ছেন তাই বাড়তি থাকে তা হ'লে আমার জিত, নইলে আপনায়। এখন এই দানাগুলোর সঙ্গে ঐ মাঝের ভাগ অর্থাৎ দুটো দানা মিশিয়ে দিলেন, আর গু'নে দেখা গেল, গুণা পুরো হয়ে বেশী রইল দুটো, তা হ'লে আমার জিত। বুঝলেন? বাজি রেখে খেলতে হয়, আর যত টাকা বাজি ধরবেন জিতলে তা'র চারগুণ পাবেন, হারলে চারগুণ দিতে হবে।

বাবু বললেন, বাঃ এ আবার ম্যাজিক কোন্‌খানে? এত gambling। তবে রেগে হারলে যে টাকা ধরা যায় সেইটেই লোকসান হয় আর তোমার খেলায় হয় চারগুণ, এই ত তফাৎ দেখছি।

লোকটা বললে, আজ্ঞে এইরকমই খেলা, তা একে খাই বলুন। দু-একহাত খেলে দেখবেন কি? অনেকদিন ধ'রে আমার ইচ্ছে হজুরের সঙ্গে একবার খেলি।

বাবু অবজ্ঞার স্বরে বললেন, তুমি খেলবে আমার সঙ্গে? টাকা পাবে কোথা?

সে বললে, আজ্ঞে সঙ্গে আমার ৮০০ টাকা আছে। দরকার হলে আরও হাজার-দুই জোগাড় করতে পারি।

আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। বললুম, মশায় মাপ করবেন, কিন্তু আপনার বুকের পাটা ত কম নয়! করেন ত বাড়ীর দালালি, বাবুর সঙ্গে খেলতে চান কোন্ সাহসে?

লোকটা আমার কথার কোনো জবাব দিলে না, কথাগুলো যে তা'র বানে গেছে, এমন মনে হ'ল না। সে বাবুর দিকে ফিরে বললে, তা হ'লে কি একহাত খেলবেন হজুর?

বাবু বললেন, আচ্ছা, এস দেখাই যাক? এই নাও ধরলুম, ব'লে একখানা একশ'টাকার নোট সামনে রাখলেন।

লোকটাও পকেট থেকে একখানা নোট বার ক'রে সামনে রাখলে।

মলম-বাবু, আমি আর নায়েব খেলা দেখবার জন্তে খুঁকে পড়লুম।

খেলায় বাবু হেরে গেলেন।

দালাল ও বাবু নিজ-নিজ নোট তুলে নিলেন। নায়েবের দিকে ফিরে বাবু বললেন, লেখো আমার চারশ' টাকা হার।

নায়েব তাই করলে, আবার খেলা হ'ল। এবারও বাবুর হার হ'ল। বাজি ধরেছিলেন ২০০ টাকা, কাজেই ৮০০ টাকা হার হ'ল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে বাবু যখন ৬৪০০ টাকা হেরেছেন তখন নায়েব বাবুর হাত-দুটো চেপে ধরলেন। বললেন, দোহাই আপনার! আর খেলতে পারবেন না! আপনি দেবেন না টাকা! নিশ্চয় এতে জোচ্চরি আছে!

লোকটি বললে, কেন আমি দানা রাখবার আগে ত গু'নে দেখলুম?

বাবু বললেন, থাক! আজ আর না। একে টাকা দেওয়া উচিত কি না, বলুন বিনয়বাবু?

আমি বললুম, আপনি যখন স্বেচ্ছায় খেলতে বসেছেন তখন দেওয়া উচিত বইকি!

বাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। ডেই-অব-অনার। টাকা আমি দেবো।

লোকটা বললে, টাকা আজ নাই বা দিলেন! আবার কাল খেলুন। কাল যে জিতবেন না, কে বলতে পারে? কাল খেলার পর একেবারে হিসেব করলেই হবে।

বাবু বললেন, না হে না। কালকের কথা কাল হবে। আজকের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি, ব'লে বাবু টাকা আনতে উঠে গেলেন।

লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম, বলুন ত ম্যাজিকটা কেমন ক'রে করেন? বার-বার জেতেন কি ক'রে?

সে বিরক্তভাবে বললে, আপনার অত মাথাব্যথা কেন? আমি তখন নায়েবকে বললুম, আচ্ছা, আমার হাতে দানাগুলো দিতে বলুন ত।

নায়েব লোকটার হাত থেকে দানাগুলো নিয়ে আমার হাতে দিলেন। খেলাটা দেখিয়ে দিলুম।

অবাক হ'য়ে নায়েব বললেন, আপনি পারেন? কি ক'রে করলেন?

আমি তাজিলোর স্বরে বললুম, ও আর এমন-কি,

হাতের মারপ্যাচ বই ত নয় ? চোদ্দগুণ থেকে বেমালুম ছুঁটো দানা সরিয়ে ফেলতে হবে। বাকি থাকে সাড়ে তের গুণ। তা থেকে ছুঁটো দানা আপনি সামনে তিনভাগে সঞ্চালন ১, ২ আর ৩। বাকি থাকে বারো গুণ। বারো গুণের সঙ্গে আপনি ১, ২ বা ৩ যাই মেশান, প্রত্যেক-বারই গুণা ভর্তি হয়ে ঠিক যা মেশাবেন তাই বাড়তি থাকবে, আর আপনার হার হবে।

নায়েব বললেন, ঠিক ঠিক, আমিও ত তাই বলছিলাম, নিশ্চয় কোনো জোচ্ছুরি আছে, নইলে বার-বার হার হয় কেমন করে !

তার পর দালালের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, ফের যদি কখনো এখানে আসো তা হলে তোমার হাড় আর মাংস আলাদা করে ফেলব ! প্রাণ নিয়ে ফিবুতে হবে না, মনে থাকে যেন ! পাঁচি কোথাকার !

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবু এসে ঢুকলেন। একতাত্তা নোট লোকটার হাতে দিয়ে ৬৪০০ টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিলেন।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। কি-কাণ্ড ! পনেরো মিনিটের মধ্যে লোকটা এত টাকা ঠকিয়ে নিলে !

দালাল চলে গেলে আমাকে দেখিয়ে নায়েব বাবুকে বললেন, ইনিও ও-খেলাটা জানেন।

বাবু বললেন, সত্যি নাকি ? আসুন না, একশত পেলা যাক।

আমি বললুম, মাপ করবেন। আমি পরীষ মাস্তুম, আপনার মতন আমীরের সঙ্গে খেলবার স্পর্ধা আমার নেই।

বাবু বললেন, আহা, এমনি না হয় একবার খেলে দেখান না ! তাতে ত আর দোষ নেই !

অগত্যা খেলাটা দেখালুম। ছুঁ-একবার ইচ্ছে করেই বাবুকেও জিতিয়ে দিলুম।

বাবু মহাখুসি ! বললেন, বাঃ, আপনার দেখছি পাকা হাত ! আসুন, আসুন খেলা যাক ! টাকার অভাবে ভাবছেন কেন ? টাকা নয় আমি আ্যাডভান্স করছি !

আমি বললুম, মাপ করবেন, টাকা ধার করে আমি খেলতে পারব না।

বাবু আর অরোধ করলেন না। হঠাৎ বললেন, বাজে কাজেই সময় গেল, আমাদের আসল কাজটা এখনো হ'ল না, বেলাও হ'য়ে গেল। আচ্ছা আর মিনিটপাঁচেক বসুন, একটু জল খেয়ে আসি।

কিছুক্ষণ ধরে যে সন্দেহ আমার মনের মাঝে উকি-ঝুঁকি মারছিল, সেই কথাটায় তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে উঠল। এত-বড় আমীর লোক, এত বার লোকলস্কর, তাকে জল খেতে উঠে যেতে হয়, কথাটা এমনি অদ্ভুত যে আমার মনে আর সংশয় রইল না, এতক্ষণ যে সমস্ত ব্যাপার ঘটল, লোহার আলমারি খুলে ধনদৌলত দেখানো থেকে শুরু করে এই ম্যাজিক পর্যন্ত, তার একটাও আকস্মিক নয়, সমস্তই একটা পূর্বনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চক্রান্ত, উদ্দেশ্য আমাকে জালে ফেলা। আমার মনে হ'ল, এই যে, ক্রোরপতি বাবু, যিনি এইমাত্র জন শাবার অছিলায় বার হ'য়ে গেলেন এবং খুব সম্ভবত অগোচরে থেকে এই মুহূর্তে আমার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী লক্ষ্য করছেন আর সেই বাড়ীর দালালটিও হয়ত তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে আমার সর্বস্বান্ত করবার ফন্দি আঁটছেন, এই যে আমার সামনে নায়েব আর তাঁরই পাশে মলয়বাবু ভিজ্জেবিড়ানের মতন অতি নিরীহভাবে বসে আছেন, এঁরা সবাই এক গোয়ালের গরু, সকলেই পাকা খেলোয়াড়। এঁরা সকলেই চমৎকার অভিনয় করছেন, সে-অভিনয় দেখছি আমি একা। এরা যদি আমাকে দিয়ে জোর করে ছাণ্ডনোটের সই করিয়ে নেয়, তা হলেই বা আমার বাঁচাতে পারে কে ?

ভাবতে-ভাবতে আমি শিউরে উঠলুম, নিজেকে বড় দুর্বল, ভারি অসহায় বলে মনে হ'ল, একটা দারুণ উদ্বেগ ও আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আমি যেন একটা তুচ্ছ মাছির মতন মাকড়সার জালে ধরা পড়েছি। সেই জাল ছিঁড়ে কেমন করে আবার কলকাতার পথে বার হতে পারব এই চিন্তায় আমি উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলুম। হঠাৎ আঙুলের ওপর চোখ পড়ল, নীলাটা ঝকঝক করছে। রাগে আমার গা রি-রি করে উঠল। তাবলুম, নীলা পরেই এই বিপত্তি, সেই ত লোক দেখিয়ে আলেয়ার মতন পথ তুলিয়ে

আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। প্রাণ নিয়ে যদি কিবুতে পারি, তা হ'লে ঐ নীলাটাকে ছুর ক'রে দিয়ে তবে অস্ত্র কাজ! এতটা বেলা হ'ল, অস্ত্র নিশ্চয়ই না খেয়ে আমার অস্ত্রে ব'সে আছে, কি সে ভাবছে কে জানে, আমার যদি ভালোমন্দ কিছু-একটা ঘটে, তা হ'লে তা'র উপায় কি হবে?

এমনিধারা এলোমেলো নানাচিন্তা আমার মগজটাকে ভোলগাড় ক'রে তুললে, ইলেকট্রিক পাখার তলার ব'সেও সর্বদা ঘামে ভিজ্জে উঠল আমার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল, অথচ একটু জল চেয়ে খাবারও সাহস হ'ল না, কি জানি যদি বিষ মিশিয়ে দেয়!

কিন্তু একটা কথা বেশ বক্তে পারলুম, চিন্তার যতটুকু কারণ থাক, বাচতে হ'লে আর দেরি করা চলবে না, যেমন ক'রেই হোক, এখান থেকে ছাড়াতাড়ি বার হ'য়ে পড়তে হবে। তা'র একমাত্র উপায় দর্শক হ'য়ে ব'সে না থেকে ওদেরই মতন পাকা অভিনয় করা।

বাবু যেই বার হ'য়ে গেলেন, নায়েব অমনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আপনি ত খাসা খেলেন, বিনয়-বাবু। আসুন না আমরাও বাবুর সঙ্গে খেলে কিছু টাকা মেরে নিই। এতে অর্ধ নেই, দেখলেন ত, বাউরে থেকে একটা কে-না-কে লোক এসে দেপতে-দেপতে কাড়িটাকা লুটে নিয়ে গেল।

ছুঃখের স্তরে তিনি বলতে লাগলেন, এই দেখুন না, এদের কাজে চুল পাকালুম, তা কিইবা এমন স্তবিধে করতে পেরেছি। এখনো তিন-তিনটে মেয়ে পার করতে বাকি, বিয়ের বাজার ত জানেনই, কোথেকে টাকা আসে বলুন দেখি? পাঁচতুতে লুটে থাকে, নয় আমরাও কিছু খেলুম। কেমন? কি বলেন?

তৎপরতার সঙ্গে বললুম, আপনি ঠিক বলেছেন। পরমা করতে হ'লে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে মালা জপলে চলে না, অনেক ফিকিরফন্দি আঁটতে হয়। আমারই কি অমত? তবে বক্তেই পারছেন, পুঁজিপাটা ত বিশেষ কিছু নেই, তাই ভাবছি।

নায়েবের মুখে হাসি ফুটল। শিকার জালে ঝেঁপেছে। বললেন, বেশি দরকার নেই, হাজার-ছয়েক

হ'লেই হবে। গরনা বন্ধক রেখে আমিও হাজার-খানেক জোগাড় ক'রে আনব'খন।

মলয়-বাবু এতক্ষণ একটুও কথা কননি। এবার তিনিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন, আমিও হাজার-খানেক আনব। তা হ'লেই আমাদের পুঁজি হ'ল চারহাজার! বেশ হবে'খন! লাভ যা হবে তিনজনে ভাগ ক'রে নেবো!

আমি বললুম, পুরো ছ-হাজার যে জোগাড় করতে পারব, এমন ত মনে হয় না! তবে ছহাজারের কাছাকাছি নিশ্চয়ই আনব। তা হ'লে কবে আসব বলুন।

তা'রা ছুজনে একসঙ্গে ব'লে উঠল, কবে? কালকেই! এ-ব্যাপার কি জুড়োতে দিতে আছে? বড় মাস্তবের খেয়াল, আসতেও যেমন যেতেও তেমনি!

স্বযোগ বুঝে, তবে তাই হবে, ব'লে উঠে পড়লুম। মলয়-বাবু দৃঢ়ক পর্ষ্যন্ত সঙ্গে এলেন। নমস্কার ক'রে বললেন, বেলা ন'টা নাগাদ আনতে যাবো। ঠিক হ'য়ে থাকবেন।

আমি বললুম, না না, আপনার আর কষ্ট কব্বার দরকার নেই, আমিই আসব।

বিনয়বতার মলয়-বাবু বললেন, বিলক্ষণ! কষ্ট কিমের!

বেলা একটা বেজে গেছে। জ্যোতের রক্তরূপ আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছিল। শানবাধানে ফুটপাথের উত্তাপ জুতো ভেদ ক'রে উঠতে লাগল। কিন্তু আমার ক্রক্ষেপ ছিল না। আমি সামনের দিকে একরকম ছুটে চলেছি, বকের মাঝটা ধুকপুক করছে, মনে হচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর ছুঃস্পের হাত থেকে এইমাত্র পরিজ্ঞাপ পেলুম! পিছনে তাকাবার সাহস নেই, সেখানে পশুপতিবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীটা ইঁা করে' আছে, বলা ত যায় না, আবার যদি কোনোগতিকে গ্রাস ক'রে ফেলে!

চিংপুরের রাস্তায় ট্যান্ডির ওপর ব'সে ইঁাপ ছেড়ে বাচলুম। ওঃ! পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে মানে-মানে যে পালাতে পেরেছি, এই ডের।

পরের দিন সকালে বধাসময়ে মলয়-বাবু আবার আমার বৈঠকখানার দরজার দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন।

আমি বললুম, আহ্নন। বসতে'জা হয়।

মলয়-বাবু বললেন, না, বসব না। সময় হয়েছে, টঠন।

আমি বললুম, মলয়-বাবু? আপনার সৌজন্মে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার পর, আপনার ধর্মবোধের অস্তিত্ব-দৃষ্টি লোকে হয়ত সন্দেহ করতেও পারে, কিন্তু আপনার য বুদ্ধির অভাব আছে, সে-সন্দেহ শক্তিতেও করবে না। আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের কি মনে হয়, পাশা একবার জ্বাল কেটে পালিয়ে ফের ধরা দিতে চাইবে?

মলয়-বাবুর মুগের ভাবে অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল

না। ষাভাবিক কণ্ঠে তিনি বললেন, যেতে ইচ্ছে নেই তাই বলুন। হেঁয়ালি ব'লে কষ্ট দেন কেন?

তিনি নমস্কার ক'রে ঢ'লে গেলেন।

দিন-কয়েক পরে শেয়ার-মার্কেটে এক দালাল-বন্ধুকে ব্যাপারটা মোটামুটি বললুম।

তু'নে সে বললে, খুব বেঁচে গেছিস! অমন পান্নাতেও পড়ে! এগাচি খেলার নাম শুনিস্নি কখনো?

আমি বললুম, না। তুই ও-খেলার কথা কি ক'বে জান্নি?

সে বললে, হাজার-তুই টাকা গচ্ছা দিয়ে!

জিম্মাসা করলুম, কোথায়?

বন্ধু বললে, পশুপতি-ঘোষালেব বাড়ী।

গজানন্দ

শ্রী ভাবকুমার কাজীলাল

গজানন্দ শেষশেষি সত্য-সত্যই একটা পাকা ব্যবসাদারী অফিসে মাসিক সংখ্যক টাকায় কেরানী-Salesman এ বদলি নিলে। কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে সে গোড়াতেই সমস্ত পার্কিত্য তিরাই ইজারা নেওয়ার কথা ভেবেছে, ট্যাক্সি চালাবার কথা হ'লেই সে Indo-Tibetan Railway সম্বন্ধে Schemic ফেঁদেছে— চুকোটি হামান দিস্তা রাখার সুবিধা মতন Warehouse না পাওয়াতে সে কব'রেজি ব্যবসাটাতে হাতই দিতে পারলে না, অংচ সেই আঙ্গ ঠিক সাড়ে নটার সময় ছাতাটি খলায় আটকে দোকানে হাজির হ'য়ে হাসিমুখে প্রথমেই বড়বাবুকে দর্শন দেয় তার পর সারাদিন হাংক বাজিয়ে হাতুড়ি ঠুকে নখের আঁচড় দিয়ে রঙের চিরস্থায়িত্ব প্রমাণ ক'রে পূর্ববন্দের সওদাগারীদের ষ্টলট্রাক বিক্রী করে।

জ্যোতির্বিদ্র আঙ্গয় অনন্ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতি ও অবস্থান পর্য্যালোচনা ক'রে একদিন হঠাৎ মাটির

দিকে তাকিয়ে পিপড়েরাৎ বুদ্ধিমানের মতো সার বেঁধে চলাফেরা করছে দেখে সহসা বিশ্বয়ে অভিভূত হ'য়ে দূব-বীক্ষণকে বিসর্জন দিয়ে অল্পবীক্ষণকেই ধর্মভাগী নবলক ধর্মকে যেমন গভীর প্রস্থাব চক্ষে দেখে তেমনি করে পূজা করে; গজানন্দও আজ হঠাৎ হাইফাইনাল ও ইকনমিক্স-ক্রিট মস্তিষ্কে ষ্টলট্রাক ব্যবসায়ের অসম্ভব জটিলতা ও চরম পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ভাবগদগদ-প্রাণে দোকানে ক্রেতার অভাব-অবকাশে ভক্তের মতো 'লক্ অ্যাণ্ড কি' ডিপার্টমেন্টের হেড্-ছোটো বাবুর দিকে উৎসব-বিশ্কারিত বদনে তাকিয়ে থাকে।—

এইত ব্যবসা! বিল আসে, বিল যায়, দরদস্ত, কেনাবেচা, লাভলোকমান, credit cash, ব্যাঙ্ক চেক, ড্রাফ্ট রিমাইণ্ডার, লেজার ডে-বুক, মেমো পেটিক্যাশ প্রভৃতির আবর্ষে সে আপনাকে হারিয়ে ফেললে। যে বড়বাবু ক্রস্‌চেক গোস্ট ডেট ক'রে ছাড়া পেমেণ্ট করেন না, দশ পার্সেন্ট-এ টাকাধার ক'রে চক্ৰিশ পার্সেন্ট-এ খাটিয়ে

মার্কিন রেখে লাল হ'য়ে উঠেন, তিনি কী মানুষ! না ছোটোবাবুই—যিনি দিশী লকের উপর অহস্তে Made in England লিখে ছনো দামে বিক্রী ক'রে দাঁও মেরেছি-ভেবে-বহির্গমন-পর ক্ষেতার দিকে সম্মিত-বদনে চেয়ে থাকতে পারেন—তিনিই মানুষ ?

গজানন্দ এতদিন দেবতাহীন ভক্তের মতো তাহার উচ্চ-ব্যবসায়-উন্নত হৃদয়টি নিয়ে আজ Commercial Institute, কাল correspondence course নিয়ে কথঞ্চিৎ কৃষিবৃত্তি করেছে। আজ সে ধর্ম পরিবর্তন করলে বটে, কিন্তু নবাবিকৃত দেবতার দিব্যভাতিতে ধর্মত্যাগের দুঃখ তাহার মনে একবারও জাগল না। বড়-বাবু বললে সে এখন একটা হামানদিস্তা নিয়েই কবরে ছি স্ক্রু করতে পারে; একখানা ট্যান্ডির মালিক হ'য়েই পথে-পথে ভাড়া খুঁজে ছোটোছোটো কবুতে পারে; পাঁচ কিউবিক ফুট সেগুন কাঠ কিম্বা দুই স্কোয়ার ফুট টিনের পাত নিয়ে দুঘণ্টা দর-দস্তুরও করতে পারে।—আর বিজ্ঞাপনের কথা!—সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় যখন সে দেখত যে 'বদনচক্র গুড়-আঁণ্ড সল' এর pure steel trunk পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন এই শ্রেষ্ঠের আভা তা'র নিজের মুখকেও উজ্জ্বল ক'রে তুলত। 'যে steel trunk ছশো বছর পুরের কেউ কলনায়ও করতে পারত না, যা আজ বাংলার ঘরে-ঘরে হাঁড়ি ও কাঠের সিন্দুককে দূর ক'রে বিরাজমান, যার অভ্যন্তরে ছিন্নবস্ত্র থাকলেও বস্তুর মালিককে সমৃদ্ধিশালী ব'লে জুল হয়, যার পেটেন্ট লক ছোটোবাবুর নিজের আবিষ্কৃত এবং সকল চোরের সরমের মূল সেট ষ্টীলট্রাক-মাহাজোয় গজানন্দ আজ নিজেকে ধন্য মনে করলে।

নব-নব ব্যবসায়ের নব-নব scheme যার উর্ধ্ব মস্তিষ্ক হ'তে অহরহ গজিয়ে উঠত—কাল্পনিক ব্যবসায়ের বিরাট-উন্নতিতে যুগ হ'য়ে যে ছনিয়ার সাধারণ ব্যবসায় হাতই দিতে পারলে না, সেই গজানন্দ এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমূগ্ধমনে তাহার কলকল্য নিরীক্ষণ করে; অদ্ভুত বিশ্বয়ে দেখতে থাকে বর্ণহীন ষ্টীল কি ক'রে বর্ণবৈচিত্র্যে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। ষ্টীলট্রাকের গায়ে সে দেখে, কখনও বা পীতসাগরের উত্তালতরঙ্গ বিক্ষেপ, কখনো বা লোহিত সাগরের বৃহস্পতি বীচিত্র, কখনও বা সূর্য সূর্য

প্রান্তরের পার্শ্বতা বাসু-গুহার পত্তরাজের পাংশল কেশররাজি; কোথাও চূর্ণম সূর্যবনের কৃষ্ণ পীতরেখ রয়াল বেঙ্গল শার্দুলের ময়ূগপত্র কণ্ডুয়ন; কোথাও তিব্বত উপত্যকার বাইসনের কৃষ্ণকান্তি, কোথাও অতলাস্তিক মহাসাগরের অশাস্ত বর্ষলাকার আবর্ষ। কখনও বা সে কোনো ট্রাকের দিকে চেয়ে থাকতে-পাকতে School of Tropical Medicine এর show-caseস্থিত মানব-গাত্রচর্মের বীভৎস রেখা-বৈচিত্র্য দেখে যুগপৎ বীভৎস ও মাধুর্য রসপ্লুত হয়; কখনও বা বিদ্যাচল গিরির শ্রামল বনানীর হরিৎ, মালয় সাগর-বেলাভূমিস্থিত তমাস-তালীবনরাজি নীলার নীল নয়নসম্মুখে ট্রাকাকারে সজ্জিত দেখে এষ্ট সকলের মূলাধার বড় বাবুর চরণে বারম্ব-শত-শত প্রণাম নিবেদন করে।

গজানন্দের ধোয়াটে জীবন এমনি ক'রে রূপে রস-বর্ণে গন্ধে ভ'রে উঠতে লাগল। সে মুখে নিজেকে কেরাগী ব'লে প্রচার করলেও বড়বাবুর ব্যবসা-সাফল্য-গর্বে নিম্নে গৌরববিমণ্ডিত মনে করত, পথেঘাটে মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় বদনচক্র গুড়ের ষ্টীলট্রাকের বিজ্ঞাপন দেখে নিজেরই প্রদংশাপত্র ভেবে 'আজগর্বে ক্ষীণ হ'ত—ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, নাকের কাছে, দূরে, ব্যাকা ক'রে, সোজা ক'বে, বিজ্ঞাপনের type, setting, position, border, spacing effect প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে-দেখতে তরঙ্গ হ'য়ে যেত।

কোনোদিন হস্ত বড়বাবু বাড়ী ফেরবার পথে ছোটো গোলাপী-রং-করা হৃদে ১৯০৩ সালে সেলে-কেনা ফোর্ড-গাড়িটিতে গজানন্দকেও নিয়ে আসতেন। গজানন্দের বাড়ীর গলির মুখে গজানন্দকে নামিয়ে দিয়ে বড়রাক্ষা বরাবর বড়বাবুর গাড়ী যখন দৃষ্টির অস্তরালে চ'লে যেত, তা'র অনেকক্ষণ পরেও দেখা যেত গজানন্দ তা'র ডক্তি-গদগদ দেংটি নিয়ে মহাশিল্পীর হস্তপ্রসূত সহজ কোনো গতায়ু শ্রেষ্ঠ স্বতিমুষ্টির মতো নিশ্চলভাবে গলির ঘোড়ে ঝাড়িয়ে আছে, সে-সময়ে কোনো পরিচিত লোক তা'কে ডাকলে কোনো উত্তর পেত না। গজানন্দ তরঙ্গ ও তদগদচিত্তে অনন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থাপুর মতো নিঃশব্দ মাদকতায় উন্নত হ'য়ে কখনো আধঘণ্টা কখনো একঘণ্টা

সেই কোলাহলমুখর ভাস্করবিনসঙ্গ গলির মোড়টিতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিত।

আগে-আগে যেদিন যত বড়, scheme গজানন্দের মাথায় খেলত নিজের জীবন ততখানি নৈরাশ্রম মনে হ'ত, কিন্তু আজকাল জীবনকে সহজ সরল উজ্জস বিরাট মনে হয়; ষ্টীলট্রাক্, বিল আর লেক্সারের নিরেটসত্তার ভেতর দিয়ে কোভ আর মনের মধ্যে উকি-ঝুকি যাবতে পাবে না। গজানন্দ অঙ্ক খুসী, গজানন্দ অঙ্ক সুখী।

দিন যায়।—বড়বাবু আজকাল অনেককরণ গজানন্দের সঙ্গে ব্যরসা-সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ করেন। গজানন্দ বড়বাবুর প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত হ'য়ে উঠতে থাকে, রোজ ঠিক অভ্যস্ত সময়ে বড়বাবু ডাকেন, গজানন্দ !

গজানন্দ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বিনীত ছাত্তের মতো এসে বড়বাবুর সামনেটিতে বসে।—

বড়বাবু বলেন,—“দেখ ক্যাবিন-সাইড ট্রাকে four lever lock দেওয়াটাই দরকার। কি বলো হে—”

গজানন্দ বলে, “আজ্ঞে।”

—“আর দেখ,—বিজ্ঞাপনের দিকে আর একটা বেশী নজর দেওয়া চাই—হ্যাঁ, ষ্টীলট্রাক্ সম্বন্ধে একটা circular বের করতে হবে—তা দেগ আমরা ত মুখ্যস্থখা মাফুয এন্ট্রালও পাশ করিনি। তা তুমিই এটা লিখো। তবে আমি একটা লিখেছি—দেখ ত যা তুলটুল আছে তা সংশোধন ক'রে চালানো যায় কিনা—”

গজানন্দ বিস্ফারিতনয়নে circularখানি গড়ে দেখলে। বললে—ওর চেয়ে ভালো সে কল্পনাও করতে পারে না।

তা'র পর আপনার জায়গায় এসে ক্রেতার প্রতীক্ষায় গজানন্দ বড়বাবুর মহানুভবতা আর তীক্ষ্ণতার কথা ভাবতে ভাবতে চুলতে থাকে। চোখ তা'র দীরে-দীরে নিম্ন হ'য়ে আসে। কার যেন কীর্পর্শে পশু ও চক্ষে এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে ওঠে যে চক্ষুস্মীলন অসাধ্য হ'য়ে ওঠে।……

……আহা কে যেন একতাল গিনি সোনা পিছে আকাশের কোলে ছড়িয়ে দিয়েছে—বড়বাবু কি বলেছেন ? —গিনি সোনা বাইশ না তেইশ ক্যারেট ? মন্দানিলে ভাসমান পায়রার পালকের মতো ওকি ভেসে আসছে ?

ওকি পুষ্পক-বথ ?—প্রাচীন ভারতের Dirigibleএ কি Hydrogen থাকত ? না, Helium gas ? তাইত She- nandoahটা গেল—বড়বাবু বলেছেন, ভারতে ইংরেজ আসবার আগে বিজ্ঞান বা ব্যবসাবুদ্ধি বা system বলে কিছু ছিল না—তা নইলে এত অশোকসুস্ত এতপ্রস্তর ফসক কোথাও business publicityর গন্ধ নাই কেন ? Waste of energy ! আসছে, আসছে—ওই আরও এগিয়ে এল—এ কি Streamline body—একি Valspar না Robailace ? না, পুষ্পক-বথ ত নয়—মোটর কারও নয়, মেঘের কোলে ভেসে-ভেসে ওত আমারই দিকে আসছে— Show Windowর কাঁচটার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সোজা এদিকেই এল—তাই ত কাঁচটা ভেঙে যাবে না ত ? যাক—বড়বাবু window-pane insure করেছেন। আহা, প্রভঞ্জন-জননী গজেন্দ্রগামিনী মেঘমালার কোলে দোহুশামান এত রথ নয়, এ যে বিশালকায় স্বর্গীয় রঙে রঞ্জিত একটা ষ্টীল ট্রাক্ glass-pane এর ভিতর দিয়ে ওটা যে ভেতরে ঢুকে গেল, কই কাঁচ ত ভাঙল না—তাজব ব্যাপার ! Counterএর ওপর ভাসমান Steel Trunkটা এসে দাঁড়াল। দীরে-দীরে তা'র re-inforced brass-knobbed ঢাকনিটা খুলে গেল……ওকি ! ওকি ! কি যেন একটা চাপা হাসির আভাস ওর অন্তরতম প্রদেশ থেকে যেন বেরিয়ে আসছে আমাবই দিকে…… কত নূপুরশিঞ্জন, কত বলয়নিকণ, কত মন্দ গজানিল —একি ? উর্কশী, বস্তা, ভোমবা ? কোথেকে ? এই Steel trunkএর গর্ভ থেকেই হাসিমুখে নৃত্য- পরায়ণা নটীর মতো বেরিয়ে এলে—না, না ? এ কু শব্দদের ছোটো খোকার ঝি। গোকাকে লেভিঙ্গ পার্কে বোজ ঠেলাগাড়ীতে ক'রে নিয়ে যায়…… আর তুমি, ভোমায় যেন কাদের বাড়ীর না গাড়ীর জানালাতে দেখেছি—ছিছি, একি কবুচ ? লুকিয়ে পড়ো, লুকিয়ে পড়ো—ছোটোবাবু দেখলে কি ভাববেন ?—চকিত আতকে গজানন্দ সটান ছেগে উঠল।—দেখলে আজাহ- লম্বিত-খন্দর-পরিহিত কতিপয় ক্রেতা ; তাহাদের 'ক্যাম্বে' 'ক্যাম্বে' ও 'ই—বটে' শব্দে দোকান মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। গজানন্দ কাস্টমার পেয়ে স্বপ্ন-শোক তুলে

ট্রাকের ক্রেতা আর কলকজার পেচনে মেতে উঠল।

দিনগুলো এমনি নানারঙে রঙীন হ'য়ে গজানন্দের salesman জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে লাগল। সে এখন বড়বাবু, ছোটোবাবু আর manager মদন মোহন—এই তিনে Trinity God-head দেখতে শুরু করেছে; লক আটবার জুড়াইভারটিতেই সোনার কাঠির পবন পায়—গজানন্দ আর ধনু!

পূজোর ছুটি এগিয়ে আসছে;—দোকানে প্রত্যহ এবারকার বিজ্ঞাপন কি-ভাবে দেওয়া যাবে, এই নিয়ে বিরাট জল্পনাকল্পনা চলছে। বড়বাবু বলছেন—সব কাগজে ভালো space নিয়ে খুব অল্প কথাই খুব effective campaign করতে হবে; প্রতিবন্দী সাময়িক ও সালিমার কোং কে একেবারে বসিয়ে দেওয়া চাই—ছোটোবাবু বলছেন—একটা বিরাট effect produce করবেন; ম্যানেক্চার একবার বড়বাবুর কথা শুনে তাঁর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে আর ছোটোবাবুর কথা তালে-তালে সম্বন্ধে মাথা নাড়ে। আর গজানন্দ, এই আর্থিক ছরবস্তার সময়েও একটা তেইশ শিলিং দামের বিলিভী বিজ্ঞাপনের বইই অর্ডার দিয়ে ফেললে। মোটের উপর একটা বিরাট রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে পূজোর হিড়িকে বড়বাবুর বিশেষ-কিছু লাভ পাঠিয়ে দিয়ে সামান্য-কিছু bonus পাবার ভরসায় কর্মচারীদের হৃদয় আন্দোলিত হ'তে লাগল।

পূজোর দিন-কয়েক আগে নিত্য দোকান জীবন-যাত্রার স্রোতে একটু বাধা পড়ল।—

বড়বাবু একদিন অফিসে এসে ডাকলেন—‘গজানন্দ।’ গজানন্দ নিঃশব্দপদসঞ্চারে সামনের চেয়ারে এসে বসল—বড়বাবু তার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে ক্যানের দিকে তাকিয়ে দাড়িতে অঙ্গুলিচালনা করতে লাগলেন। গজানন্দ পড়ল—বড়বাবুর ভগিনীর বেনারসে খুব অস্থগ। বড়বাবু আর ছোটো বাবুকে সেখানে অবিলম্বে যেতে হবে। এই পূজোর বাজারের সময় দোকান ছেড়ে যাওয়া! বড়বাবু বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন, তবে গজানন্দ আছে এই যা ভরসা। বড়বাবু বললেন,—দেখ গজানন্দ—আমাদের তু

যে :ই হবে—মদন বিজ্ঞাপনের দিকটা তেরন বোঝে না,

অথচ এই বিজ্ঞাপনের ওপরেই পূজোর বিক্রী সব নির্ভর করছে। আমি আর কচি (ছোটো-বাবু) আজকেই বেনারস যাবো; কবে ফিরব বলা যায় না। একটু সাবধানে সব বিজ্ঞাপন দেবে। তুমি এসব বেশ বোঝো, তবু আমি সামান্য ছ-চারটে কথা বলে যাচ্ছি।—দেখ সব কাগজে বেশ ভালো space নেবে। টাকা-খরচে ভয় কোরো না, কারণ টাকা না গেলে টাকা আসে না। সব জায়গায় এক বিজ্ঞাপন দেবে—তা'তে কাজ হয় বেশী। অল্পকথায় বেশ ফাঁক রেখে বিজ্ঞাপন লিখবে। Customerদের কাছে বেশ একটু intellectual appeal থাকবে—এবিষয়ে তুমি বেশ বোঝো—একটু বিবেচনা ক'রে কাজ করবে। আর দেখ জিনিষটা একটু নতুন-ধরণের হওয়া চাই—নতুনের দিকে লোকের চোখ সহজেই আকৃষ্ট হয়। Type setting বেশ ভালো হবে—আর প্রত্যেকটা লাইন আলাদা point এর typeএ দেবে—মোটের ওপর তোমাকে সব ভার দিয়ে যাচ্ছি—জানি তুমি কাজটা ঠিক পারবে,—

গজানন্দ বিনীতহাস্তে একবার ই্যা ই্যা ক'রে সম্ম-পূর্ণ হৃদয়ে আনন্দাশ্র গোপন করতে চেয়ে ক'রে বললে—সে যথাসাধ্য কাজ করতে চেষ্টা করবে,—

বড়বাবু ও ছোটো-বাবু চলে গেলেন। গজানন্দ মহা ভাবনায় পড়ল, অথচ আনন্দ আর তা'র হৃদয়ে ধরে না। এত বড় responsibility! এত অগণ্ড বিশ্বাস!! এমন সহানুভূতি!!! সে একদিন বদনচন্দ্র শুড় আণ্ড সঙ্গের partner হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল—তা'র মনে পড়তে লাগল, এমন অনেকসব ঘটনার কথা মেখানে গোড়াতেই এর চেয়ে কম বিশ্বাস-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কতজনে Business partner হয়েছে। এই ত সেদিন কুমিল্লার কেশব রায় Germanyর একটা glass-factoryতে mechanic-এর কাজ করতে-করতে তা'র partner ত হয়েইছে আবার কর্তার মেয়েটি পর্যন্ত পেয়েছে। সে চারবার মাটির দিকে চেয়ে আর তিনবার শিলিং-এর দিকে চেয়ে সমস্ত steel trunkগুলোর চার পাশে ঘুরে এল—Thacker Spink-এ কোন ক'রে জানলে তা'র সেই advertisement-এর বইটা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

গজানন্দ সেদিন অনভ্যস্ত হাসিমুখে চায়ের দোকানের

বন্ধুদের সঙ্গে অল্পকণ আলাপ ক'রে বাড়ী গিয়ে ভাবতে লাগল—বত ভাবে ভাবনার আর অস্ত নাই। Advertisement, বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন ; Advertisement, Space, Type, Intelligence, Appeal, কাঁকে-কাঁকে ক্রেতা বড়বাবুর হাসিমুখ, partner—গজানন্দ ঘামতে শুরু করলে, সে লেখে আর কাটে, কাটে আর ছেড়ে, একখানা উর্ধ্বশী writing-pad প্রায় শেষ হ'য়ে এল—শেষকালে রাত্রি আড়াইটার সময় তিন প্যাকেট ট্যাটুলার সিগারেট পুড়িয়ে একটা লেখা খাতা হ'ল যেটা তাঁর বেশ মনঃপুত হ'ল। সে সাতখানা কাগজে বড়-ছোটো হরফে সাত'-রকম ক'রে বিজ্ঞাপনটা লিখে কাছে নিয়ে দূরে নিয়ে চোখের উপর তাঁর effect দেখতে লাগল ; scale নিয়ে type-face কি-রকম হবে ঠিক ক'বে নিলে ; most up-to-date করবার জন্তে বিশ্বভাবতীর নবপ্রচারিত scientific বানানবিষয়ক পুস্তিকাটি একবার দেখে নিয়ে সেট-অনুসারে বানান ঠিক ক'রে নিলে, তাঁর পর যেটি পছন্দ হ'ল সেইটে হাতে ক'রে বহু ক্ষণ ব'সে-ব'সে কত কী ভাবলে—

আহা, বেচারী মদনমোহন !

তাঁর পরদিন গজানন্দ দোকানে এসেই জোরে-জোরে পা ফেলে পায়েচারি করতে লাগল। ছই-একটি খন্ডের আসছে,—গজানন্দের কেয়ার নাই। একটা ছটোঁক, দশটা-পাঁচটা কি, বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লে কাঁকে-কাঁকে লাখে-লাখে খন্ডের জুটবে। Salesmanরা হাঁফ ছাড়বার অবসর পাবে না—মদনবাবুকেও screw-driver ধরতে হবে ! গজানন্দ মদন বাবুর দিকে চেয়ে একটা অবজার হাসি হাসলে।—মদন বাবু বললে—‘গজানন্দ-বাবু এদের দেখুন।’

গজানন্দ ম্যানেজারকে বিজ্ঞাপনের কাপিটা দিলে। ম্যানেজার চমকে উঠল, বললে—‘না মশায়, এ চলবে না, লোকে বুঝবেই না, patent ওষুধের বিজ্ঞাপন না ষ্টীল-ট্রাকের বিজ্ঞাপন। গজানন্দ একটু বাকা হাসি হেসে বললে—‘ঠিক চলবে মশাই, ব'লে ভালো পাটা নাচাতে শুরু করলে। মদন-বাবু কি করবেন—বড়বাবুর হুকুম গজানন্দ বিজ্ঞাপন বা দেবে তাই দিতে হবে ; আর বড়বাবুর মত

নেবার সময়ও নেই, সে অপত্যা। সব কাগজের অফিসে গজানন্দের কাপি একটা ক'রে নকল পাঠিয়ে দিলে।

গজানন্দ বড়বাবুকে চিঠি দিলে—বিজ্ঞাপন ঠিক দেওয়া হয়েছে :—সে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরদিন থেকে একঘণ্টা আগে দোকানে যেতে শুরু করলে—কাল ‘প্রবাহিনী’ কাগজ বের হবে ; পরশুদিন আরো গোটা কয়েক বের হবে, গজানন্দ কমচারীদের একটু সকাল-সকাল আসতে অনুরোধ করলে।

কিন্তু গজানন্দ মাপকাঠি আর জুড়াইতার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; সাধারণ খেমন খন্ডের আসে তেমনই আসে—গজানন্দ মহা ভাবনার পড়ল ; মদন-বাবু ডাকলেন ‘কি গজানন্দ বাবু’—গজানন্দ জোরের সঙ্গে বললে—আরে দেখুন না, এখনও কাগজ লোকের হাতে পৌঁছানি।

এদিকে বড়বাবু কাছে সব কাগজ পৌঁছতে লাগল। তিনি গজানন্দের কীর্তি দেখে চমকে উঠলেন। সব কাগজেই এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন—বেরিয়েছে।

“ দেশ, শোনা, বোঝা, কেনা

চোরের কাজ

আমাদের কাজ

তোমাদের কাজ

পূজা বাজারে পথের মাঝারে
কী জন্ত এত হলমূল ?

আধুনিক ব্যবসায়ের পাঁচটি মূল শব্দ—

সাবধানতা !

শঠতা নিবারণ !!

সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ !!!

অগ্রগামী ব্যাহারিকণ !!!!

কিছদস্তীর মতো প্রচারিত হওন !!!!!

সামাজিক ডাক্তার কেং থাকিলে বলিবে

Be One or more Badan Chandra Gur's
Sure Steel Trunk.

মফঃসলে সব বড় বড় দোকানে ও কলিকাতায়
Central Avenue Junctionএ আমাদের Show
Roomএ প্রাপ্য।”

বড়বাবু প্রমাদ আশঙ্কা ক'বে তৎক্ষণাৎ কলকাতা
রওনা হলেন! এসেই দোকানে হাজির হ'য়ে গজানন্দকে
ডাকলেন— 'শোনো ত হে'

গজানন্দ আশঙ্কায় কম্পিত-জড়িতভাবে তাঁর কাছে
এসে দাঁড়াল,— 'এ কী সর্বনাশ কবেছ!'

"আজ্ঞে, এই ত intellectual appeal হয়েছে, খুব
নতুন-ধরণের,"

"না বাপু তুমি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার মত
লোকসান ক'রে দিলে। দেখ ত আজ অষ্টমী সবচে আট-
জনও খন্দেব নেই —তোমাতে বাপু ভাব দিলাম।
সহে মদন গজানন্দকে এঁই মাসেব মাহনেটা পুরো দিখে
দাও ত —"

গজানন্দ কি যেন বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু তাব শুধু মুগ
দিয়ে কথা বেব হ'ল না। ধীবে-ধাবে নিজেব জাবগাটিতে
এসে ছাতাটি নিষে কাঁধে ফেললে, তা'ব পব একবাব
দোকানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র তাঁর সম্বন্ধ

ঘরখানি দে'খে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে! বেরিয়ে
আসবার পথে মদনবাবুকে একটা শুধু প্রণাম ক'বে বাইবে
এসে দাঁড়াল—বড়বাবুকে আর প্রণাম ক'বা হ'ল না।

গজানন্দ বাইবে দাঁড়িয়ে একবাব জগতের অকৃতজ্ঞতার
কথা ভেবে বড়বাবুর দাঁড়ির কথা ভাবলে, তা'ব পব ধীবে-
ধাবে আবার দু'বোটি হামানাদস্তা আর তিবোই ইজাবা
নেওয়াব কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ী ফিরে এল।

তিন দিন পবে Thacker Spink এর দোকান থেকে
গবব এল, তা'ব জুডাব সেই Pills এর Perspicuous
Publicity বইখানা এসেছে—নতুন exchangeএ দাম ৩০
টাকা বেশী লাগবে।

গজানন্দ আবাব একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। তখনও
বাতবে বিসম্ভনের ককণ হুবে কালকাতাব ধোঁয়াটে
আকাশ খনখম কব'ছিল। গজানন্দ তা'ব 'নবাবববাদ
ভু'লে ব'লে উঠল— 'হায় বা'।

ভূমিকা

শ্রী নন্দনন্দন একাচাবী

আজি মিহিরের গাসি ম'ণ-হেমশীরা

চমকে মহড়া বন'লে গে বন'লে,
ককর-কুট মু'খানি লুকায়

নভসার নীল অকলে গো অকলে।

বস্তাব বারি ধাঙেব বনে

বুকে ধরে সাদা মে' ছায়া গো মে' ছায়া,

দিগ্-ছালোর বন্ধিমতুর

বিলাসে বিলায় বেশ' মায় গো বেশ' মায়।

তৃণমূঞ্জরা সৌমাসরণী

হুর দেশে ধায় কাব তরে গো কাব তরে,

পাশে রহি'-রহি' মেহেন্দী মহয়া

চাহনি জানিছে মান'তবে .গ মান'বে।

বেদনাবধুবা বকাবধবাবা

শিত'বছে জায়-প্রাকবে গো প্রাকবে,
ক্রৌঞ্চাকশোণী মবি। মবি। মবি।

মনোৎসবে প্রাণ ভবে গো প্রাণ ভবে।

দাঁবিঅল মঙ্গল জুলিছে

মেধ মধুধাবা পান কবি' গো পান কবি',

'বহগেব গীতে জড়িমা জড়ি'

কাঠাবোয়া বাগে গান ধার' গো গান ধার'।

আজি পারদোৎসব ভূমিকা ভবনে

বনপিরিধবা সব' ভবে গো সব' ভবে,

ছায়া গোপসাকী আলোককিশোরে

ডাকে যেন গিরি-গহ্ববে গো গহ্ববে!

চন্দননগরের বয়ন-শিল্প

শ্রী হরিহর শেঠ

চন্দননগরের পরিচয় প্রধানত শিল্পে। বস্ত্রশিল্পই উন্নয়নে প্রধান। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্ম প্রসিদ্ধ ফরাস-ডাঙ্গায় বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের আরম্ভ-কাল কোন্ সময়, তাহা বহু চেষ্টায়ও নির্ণয় করিতে পারি নাই। প্রথম ধুঁগে এখানে ঠিক কি প্রণালীতে বস্ত্র বয়ন করা হইত, তাহাও স্থির করা স্ককঠিন। ফরাসীদের এখানে আসিবার পূর্বেও চন্দননগরের নাম কোথাও উল্লেখ না পাইলেও, হুগলীর সান্নিধ্যে বিস্তৃত তক্তবায় বাস করিত ও তাহারা তুলাজাত সূত্রের ও তসরের বস্ত্র বয়ন করিত বলিয়া জানা যায়। (১) জানি না হুগলীর সান্নিধ্যে সে কোন্ স্থান— চন্দননগর কি না। এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক তক্তবায়ের বাস ছিল ইহা সত্য। কিন্তু সে কোন্ সময় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, এখানে ১৪০০ ঘর তাঁতীর বাস ছিল। (২)

প্রথমাবধিই এখানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া যাইলেও, ফরাসী কোম্পানির এখানে উপনিবেশ স্থাপনের পরই ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ফেলিপো (Phelypeaux) নামক একখানি জাহাজেই ১৫০ গাঁইট বস্ত্র রপ্তানির কথা এবং সেইসঙ্গে এখানে প্রচুর-পরিমাণে বস্ত্র ও মসলিন কাপড় পাওয়া যাইত বলিয়া জানা যায়। (৩) চন্দননগরের বস্ত্র রপ্তানি হইয়া যে অল্প স্থানের উৎপন্ন বস্ত্র অপেক্ষা অনেক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। (৪) এখান হইতে মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র যাহা বিদেশে প্রেরিত হইত; উহা যে এখানকার প্রস্তুত, এরূপ অস্বীকার করিবার কারণ

আছে। কারণ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ফরাসীদের ঢাকার সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। (৫) ঢাকা ভিন্ন বাঙ্গলার অন্য কোথাও উৎকৃষ্ট মসলিন উৎপন্ন হইত বলিয়া জানা যায় না।

বস্ত্র-শিল্প চন্দননগরের একটি প্রাচীন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প হইলেও, এখানে যে তুলার চাব অধিক হইত, এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় চন্দননগরের কিছু উত্তরে কাপাশ-ডাঙ্গা-নামক স্থানে পূর্বে তুলার কাজ খুব প্রবল ছিল এবং তুলাপটীর ঘাটের উপর বড়-বড় তুলার গুদাম ছিল; এই স্থান হইতে তুলা খরিদ হইত। পশ্চিম প্রদেশ ও অন্তর্ভুক্ত হইতেও তুলা আসিত। ম্যানিলা হইতে এখানকার জন্ম দু দে অর্ল্যান (Duo d' Orleans) জাহাজে অনেক তুলা আসিয়াছিল উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬) ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তুলা আসিয়া এই স্থানে চব্বাকায় কাটিয়া সূতা তৈয়ারি হইত। এই কার্যের দ্বারা এখানকার বিস্তর দরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্ন-সংস্থান হইত। শুধু তক্তবায় কস্তারাই যে এ কার্য করিতেন তাহা নহে, অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরাও এ কার্য করিতেন। কিন্তু স্থানীয় কৈবর্তদের এই কার্য একটি অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। (৭) এখানে অনেক সূত্র উৎপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা এখানকার চাহিদা মিটিত না। অন্তর্ভুক্ত হইতেও অধিক পরিমাণে সূতা খরিদ করিয়া আনা হইত। মুসলমানদের দ্বারা প্রস্তুত সূতা বাবনান ও পাণ্ডুয়াতেই সর্বাধিক অধিক পাওয়া যাইত। বোড়াই ও শেঁতপুরের হাট হইতেও সূতা আনা হইত। তখনকার চব্বাকাই সূতা কাটিবার প্রধান যন্ত্র ছিল। তক্র

(১) Diary of William Hedges, Vol. II. এবং The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I.

(২) চন্দননগরের শিল্প—বঙ্গ, ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(৩) La Compagnie Des Indes Orientales.

(৪) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Vol.—I.

(৫) A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca in Bengal.

(৬) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Vol. I.

(৭) চন্দননগরের শিল্প—বঙ্গ, ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(টাকু) দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র ভাল হইত, কিন্তু চব্বকার মত ইহাতে সস্তর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত না।

এখানে এখন প্রায় সকলেই ঠক্ঠকি তাঁত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে ইহাকে কলের তাঁত বলিয়া থাকেন। হস্ত-পরিচালিত মাকুর ব্যবহার প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। সেরূপ তাঁত এখন বোধ হয় দুই-তিনখানির অধিক এখানে ব্যবহার হয় না। কলের তাঁতে কাপড় পুরাতন প্রণালীর তাঁতের মত সূক্ষ্ম হয় না। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বেও হস্ত-পরিচালিত তাঁত অধিক চলিত। (৮) এইসব তাঁতের প্রচলন এখানে কত দিন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ-কেহ অনুমান করেন, দেড় শতাব্দিক বৎসর ধরিয়া এখানে এই তাঁতের ব্যবহার চলিতেছে এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী স্থানসমূহে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। (৯) শ্রীরামপুরে যে হস্ত-চালিত ঠক্ঠকি তাঁত ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ যাহা শ্রীরামপুরের তাঁত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা চন্দননগর হইতেই ঐস্থানে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ওয়ালে (L. S. S. O'Malley) সাহেব বলেন, এই তাঁত জন কে (John Kay) দ্বারা উদ্ভাবিত পুরাতন বিলাতী তাঁতের কিছু উন্নত যন্ত্র মাত্র; ৬০ বৎসরের অধিক হইল উহা চন্দননগর হইতে শ্রীরামপুরে প্রবর্তিত হয়। (১০) শ্রীরামপুরের তাঁতীদেরও বিশ্বাস উহা ফরাস-ডাকার হইতে নীত হয়। (১১) এ কথা কত দূর ঠিক, তাহা বলা যায় না। কারণ বহু পূর্বে যখন এ প্রদেশে উৎকৃষ্ট বস্ত্রসকল প্রস্তুত হইত, তখন এই দেশীয় কাহারও দ্বারা এই তাঁতের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে।

এখনও এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রসিদ্ধি যথেষ্ট থাকিলেও পূর্বের মত মিহি কাপড় আর প্রস্তুত হয় না এবং তাঁতের কাপড়ের কাজ পর-পর কমিয়াই যাইতেছে। ২৫।৩০০ নম্বর সূতার কাপড় প্রস্তুত করিবার মত শিল্পী এখন আর

একজনও নাই। পূর্বের তুলনায় তন্তুবায়েদের সংখ্যাও অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে হরিত্রা-ডাকার অঞ্চলে বিস্তর তাঁতীর বাস ছিল, এক্ষণে সে-স্থান প্রায় জনশূন্য। ১২।১৩ ঘর বাহার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চারিজন জাতি-ব্যবসা করিয়া থাকেন। লালবাগানের চক্-নামক পল্লীতে ৬০ বৎসর পূর্বেও অন্ততঃ ১৫০ খানি তাঁত চলিত; তৎস্থানে এখন ১০।১২ খানি মাত্র আছে। এখন সমগ্র লালবাগান অঞ্চলের মধ্যেই তন্তুবায়েদের সংখ্যা অধিক এবং তথায় এখনও কয়েকজন ভাল তাঁতী আছেন।

শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের মিহি কাপড় বহুদিন হইতেই ফরাস-ডাকার কাপড় নামে খ্যাত। (১২) এখন ফরাস-ডাকার কাপড় নামে সচরাচর যে-সব কাপড় কলিকাতায়, এমন-কি ফরাসডাকার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে হরিপাল, ধনেখালি, শ্রীরামপুর, ধরসরাই, বেগমপুর, হুগলী, কৈকালী প্রভৃতি স্থানের উৎপন্নই অধিক। এইসকল কাপড়ের অধিকাংশই ফরাস-ডাকায় ধোলাই করা হয়। এখানে বেক্রপ সূক্ষ্মর ধোলাই-কার্য ও কাপড় পাট-করা হইয়া থাকে, সেরূপ এ-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কলিকাতার দোকানদারেরাও এখন হইতে বিস্তর কোরা কাপড় কাচাইয়া লইয়া যান।

বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সহিত বয়ন-যন্ত্রে ব্যবহারের জন্ত সানা এবং মাকু প্রভৃতি যন্ত্রাদিও এখানে ভালরূপ প্রস্তুত হইত, এবং ধুতি ও শাড়ীর পাড়ের জন্ত সূতা রং করা কাজও খুব প্রবল ছিল। এমন সূক্ষ্ম ও পাকা সূতা রং করিতে অন্তর্ভুক্ত পারিত না। রঞ্জনের কাজ এখানকার একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল। স্থানীয় মুসলমানেরাই এই কার্য করিত। তাহাদের কালাকর বলিত। মুসলমানপাড়া ও কাঁটাপুকুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁহাদের সংখ্যা ২০০।২৫০ ধরেরও অধিক ছিল। ফরাসী, ডাচ, প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ এইসকল সূতা এখান হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে চালান দিত। (১৩) এখন এই শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন কালাকর দুই-চারিজন

(৮) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N.N. Banerjee, B. A. M. R. A. C., F.II. A. S.

(৯) চন্দননগরের বস্ত্রশিল্প নিবন্ধ, ৪র্থ খণ্ড।

(১০) The District Gazetteers of Hughly, Vol. XXIX.

(১১) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N. N Banerjee, B.A., M.R, A. C. F., II.A.S.

(১২) Bengal District Gazetteers—Hughly, Vol. XXIX.

(১৩) চন্দননগর দশভূমি সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে পঠিত “চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ”।

যাহারা জীবিত আছে, তাহারা এখন অল্প কাজে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এখন স্থানীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অল্প পরিমাণে সূত্র-রঞ্জনের কার্য যাহা হইয়া থাকে, তাহা অন্যান্য জাতির জীলোকদের দ্বারা প্রায় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বয়ন-শিল্পের এখানে আর উন্নতি নাই; দিনের পর দিন অবনতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। বিলাতী-বস্ত্রের প্রতিযোগিতা ইহার মূল কারণ হইলেও, এই শিল্প রক্ষার্থ উৎসাহ দিবার জন্য কেহই না থাকা ইহার অবনতির অন্ততম কারণ। যদিও এখানে তত্ত্বাবয়গণের মধ্যে এই শিল্প প্রায় একচেটিয়া, তথাপি যোগী, মুচি, বৈবাগী প্রভৃতিদের মধ্যেও কেহ-কেহ তাঁত বুনিয়া থাকেন। বস্ত্র-বয়ন-কার্য দ্বারা এখানে কেহ বিশেষ ধন-সম্পদশালী হইয়াছেন এরূপ শুনা না বাইলেও, এই ব্যবসার দ্বারা পূর্বে তাঁহারা স্থখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন।

একণে এই জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অনেকেই চাকুরি বা অন্য কার্য করিতেছেন। এই দেশীয় প্রাচীন শিল্পটির অবনতি লক্ষ্য করিয়া, উহাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও যে বিশেষভাবে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 'করাসভা-তত্ত্বাবয়-সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কিছু চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৪) কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল লাভ হয় নাই। একণে পুনরায় 'চন্দননগর তত্ত্বাবয় সমিতি'-নামে যে-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার, জাতীয় ব্যবসার উন্নতি-বিধান একটি অন্ততম উদ্দেশ্য থাকিলেও, তাহার দ্বারা আড়াই বৎসরের মধ্যে এদিকে যে-কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের ফলেও এখানে শিল্পীদের কোনোই সুবিধা হয় নাই। দেশের বর্তমান অবস্থায় শুধু তত্ত্বাবয়-মিগের চেষ্টায় কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনো দিন এই শিল্পের উন্নতি বা ইহার রক্ষা হইতে পারে না।

(১৪) "করাসভা তত্ত্বাবয় সমিতি, লালবাগান"—প্রজাবন্ধু, ২১শে বর্ষাখ, ১২৯৬ সাল।

এখনকার বয়ন-শিল্পের পূর্ব ইতিহাস কোনো গ্রন্থাদিতে পাই নাই। কতিপয় প্রাচীন এবং বিশ্বস্ত তত্ত্বাবয় ভ্রমলোকের নিকট বিশেষ অল্পসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, (১৫) তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব পুরুষগণ বর্গীর ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে ধনিয়াখালি, হরিপাল, বেগমপুর, তালদা, ট্যাগ্‌রা, রাজবলহাট, দেবানন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই জনাঙ্গনের সম্ভান দক্ষিণকুলশ্রেণীভুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, বর্গীর ভয়ে প্রথমে অনেকে এখানে আসিয়া আশ্রয় লইলেও, দেশ ইংরেজ-কোম্পানীর অধিকারে আসার পর, কোম্পানীর কর্মচারীদের নিকট নিষ্কৃতি লাভার্থ বহুসংখ্যক তত্ত্বাবয় পূর্বোক্ত স্থান হইতে আসিয়া চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, কোম্পানীর লোক শিল্পীদের নিকট হইতে বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইবার জন্য তাহাদের অনিচ্ছা-সঙ্গেও জোর করিয়া টাকা দান দিত এবং যাহা কিছু বস্ত্র বোনা হইত, কোম্পানির লোক তাহার মধ্য হইতে তাহাদের প্রয়োজন-মত ভাল বস্ত্রগুলি লইয়া অবশিষ্টগুলি পাট-করা অবস্থায় কোণ কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিত। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। প্রতি-বিধানের কোনো ক্ষমতা না থাকায়, এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিভিন্ন রাজাধিকারভুক্ত, তৎকালের একটি প্রধান ব্যবসা ও শিল্প-কেন্দ্র এই চন্দননগরকেই তাঁহাদের বাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন করিয়া তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। দিনেমার-অধিকারভুক্ত শ্রীরামপুরেও সেই সময় তত্ত্বাবয়গণ আসিয়াছিলেন। (১৬) পূর্বাপর কার্পাসজাত সূত্র দ্বারা প্রধানতঃ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এখনকার ৫০ নম্বর সূতার অপেক্ষা মিহি সূতা সচরাচর তৈয়ার হইত না, বরং আরও মোটা সূতার কাপড় হইত। এই সূতা-কাটা জীলোকদেরই

(১৫) এই কার্যে বন্ধুদের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস, এম-এ, মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১৬) শ্রীযুক্ত জরগোপাল সেন মহাশয়ের নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছি।

কাজ ছিল। তখন হস্তচালিত তাঁত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার তাঁত ব্যবহার হইত না। এখানে পবিধয় বস্ত্রই প্রধানতঃ প্রস্তুত হইলেও, বিদেশে জাহাজে চালান দিবার উপযোগী রুমালেব জন্ত 'লাল গিলে' ও 'কাল গিলে'-নামক চৌখুবি ডবে, সূসী (খান) গিমাম, চিলে কস্তা, চড়ীক কাপড়, গাউনেব কাপড় প্রভৃতি তৈয়াবি হইত। পূর্বে খাসা, মলমল এবং মসলিন-নামক সূক্ষ্ম বস্ত্রও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

এখানকার বড় বাজারে একটি কাপড়ের গাট বসিত। তথায় বিস্তর কাপড় বিক্রয়ার্থ আসিত এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া বর্তমান চন্দননগরেব উত্তরে ডলাপটীক ঘাট হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া বঙ্গোপসাগরে হইত। এই স্থানে জাহাজ বাধিবার লোহার বড়া পুষ্কিন ভগ্ন পোস্তার গায়ে এখনও দেখা যায়। এই স্থানটি এখন বৃটিশ চন্দননগর, তখন উইলিয়ামসো অধিকাৰেব মধ্যে ছিল। (১৭)

১০৮০ বৎসর পূর্বে এখানে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর একটি শুল্ক আদায় করা হইত বলিয়া জানা যায়। এই শুল্ক আদায় করা প্রসঙ্গে চন্দননগরে ভূতপূর্ক ম্যার ভার্ভিভ্যাল সাহেবেব পিতামহেব রুত অত্যাচাবেব কথা শুনিতে পাওয়া যায়। (১৮)

দেশী তাঁতে বিলাতী সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নকারীদের মধ্যে ৮বাংলাকুমার সেন মহাশয়েব নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেহ-কেহ তাঁহাকে এই কাব্যেব প্রবর্তক এরূপও বলিয়া থাকেন। তাঁহার বয়ন-নৈপুণ্যেব জন্ত তিনি যখন একজন দক্ষ বস্ত্র-শিল্পী বলিয়া পরিচিত হন, তখন তাঁহার শুল্কদেবেব আদেশে কোনো বিলাতী অফিসেব মুচ্ছুরির অভিপ্রায়-মত, তাঁহাদেব অফিসেব নতন আমদানি ৩০০ নম্বরের বিলাতী সূত্র দ্বারা তিন-চারি চডান কাপড় বয়ন কবিয়া দিয়াছিলেন। ইহা অতি সূক্ষ্ম হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহার খ্যাতি বিশেষরূপে বর্ধিত হয়। পবে তিনি স্থানীয় তত্ত্বাবায়দিগকে এই নব আমদানি সূক্ষ্ম সূত্রে

বস্ত্র বয়ন-কৌশল শিখাইয়া দিয়া উক্ত মুচ্ছুরির মাফকং নানা প্রকার নম্বরের সূতা আনাইয়া তাঁহাদিগকে বিলি কবিয়া দিতেন, এবং উৎপন্ন বস্ত্রের অধিকাংশ লইয়া নিজেই বিক্রী কবিতেন। এইরূপে ক্রমে অনেকেব বিলাতী সূক্ষ্ম সূত্র বয়নেব পারদর্শিতা লাভেব সহিত তাঁহাব ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (১৯) অন্তর জানিতে পাবি, শম্ভুচন্দ্র কুণ্ড মহাশয় এখানে প্রথম বিলাতী সূত্র আমদানি কবেন এবং তিনিই প্রথম উহাতে বয়ন কবেন। (২০)

এখানে বিলাতী সূত্রে বস্ত্রবয়নের ইহাই আদি ইতিহাস কি না তাহা নিশ্চয় কবিয়া বলিতে পাবি না, তবে আমি এসম্বন্ধে যতদূর তথ্য সংগ্রহ কবিতে পাবিমাছি তাহাই লিখিলাম। এখানকার পূর্ককার বিলাতী সূত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে চন্দ্রনাথ দে ও ভোলানাথ ঘোষেব নাম উল্লেখযোগ্য।

ম্যাক্লেটাবেব প্রতিযোগিতা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের কার্তিক কমিয়া যাওয়ায়, এখানকার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট দৈন্তর্য প্রাপ্ত হইলেও, এখনও কাপড়ের জমি, পার্শ্ব ও মাঝার সমান, পাড়ের বং এবং ধোলাঘের জন্ত ফরাস ডাকার কাপড় তাহার বিশিষ্টতা বাখিয়া চলিয়াছে। (২১) এইসবল কাৰণে এখনও ইহাব আদর অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, বেশী মিহি সূতাব বস্ত্র বয়ন কবিবার মত শিল্পী আব একজনও নাই। এখন সচরাচর ভাল কাপড় বলিতে ৮০ হইতে ১০০ নম্বরের বুঝায়। ১২০।৩০ পর্যন্ত কেহ কেহ বয়ন কবিয়া থাকেন। ইহাব অপেক্ষা মিহি কাপড় আর পাওয়া যায় না। হয় ত দুই-চারিজন ১৫০ নম্বরের পর্যন্ত বয়ন কবিতে পারেন, কিন্তু তাহা পূর্কের মত পবিষ্কার হয় না। প্রথমতঃ শিল্পীদের বয়সেব প্রাচীনতা-হেতু দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, দ্বিতীয়তঃ ভাল সূত্রেব অভাবই ইহার কাৰণ বলিয়া বুঝা যায়।

(১৯) কন্নড়ী কুম্বলের সহকারী ৮ নন্দলাল ভট্ট মহাশয়ের প্রদত্ত লিখিত তথ্য হইতে ইহা অবগত হইয়াছি।

(২০) বস্ত্র শিল্পী শ্রীবৃক্স প্রেরনারায়ণ নান মহাশয়ের নিকট হইতে অবগত হই।

(২১) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N N Banerjee, B. A., M. R. A. C., F. II A. S.

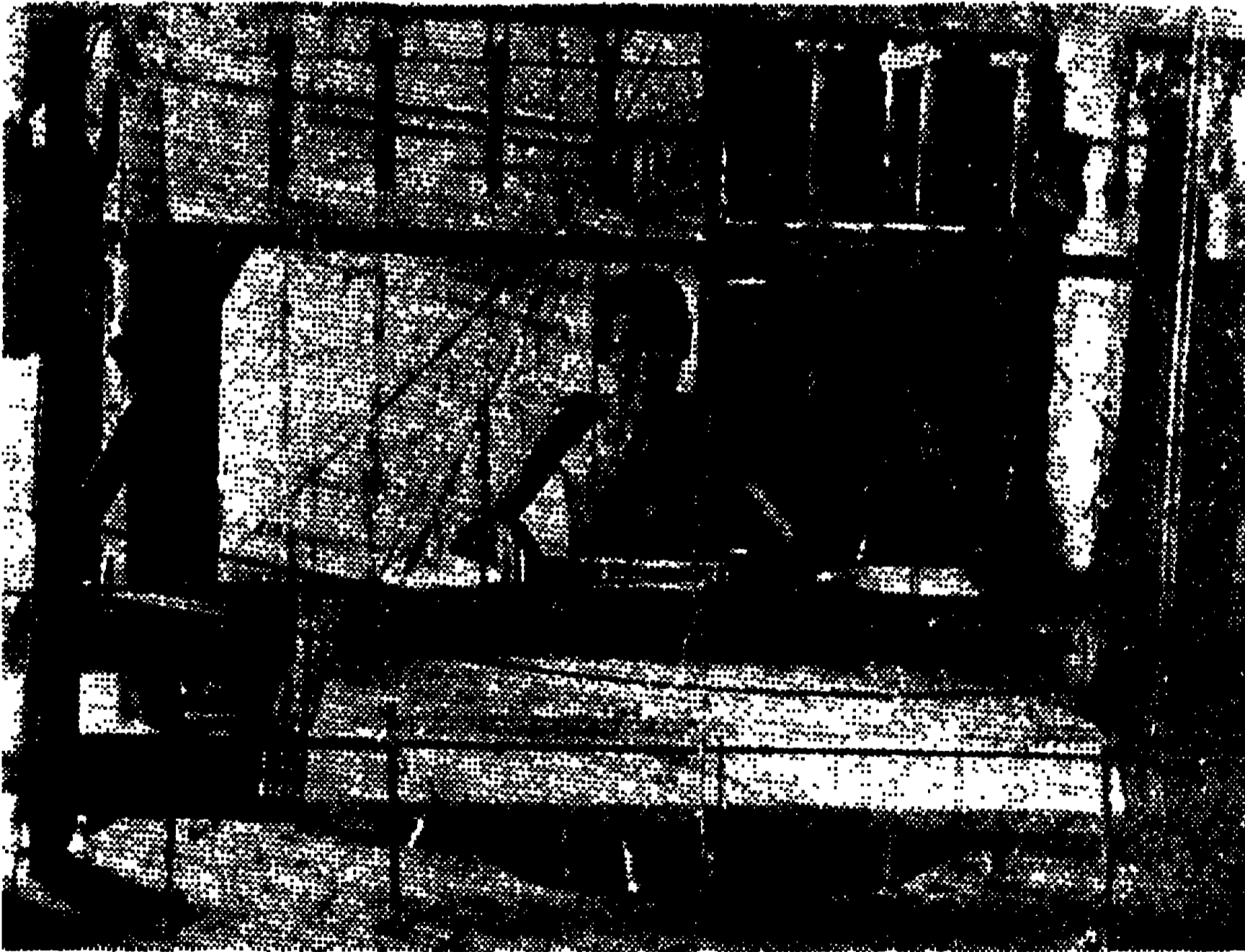
(১৭) মল্লিখিত 'চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বস্ত্র কারীগরের আদিস্থান নির্ণয়' অবধি উল্লেখ্য। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩১।

(১৮) শ্রীবৃক্স গোপালচন্দ্র লাহা মহাশয় এইরূপে বলিয়া থাকেন।

অতি পুরাতন কালের বিখ্যাত শিল্পীদের নাম জানিতে পারা যায় না। আনুমানিক শত বৎসর পূর্বে এখানকার বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্পীদের মধ্যে রামনিধি ভড়, চন্দ্রনাথ দে, জগৎচন্দ্র দাস, মথুরমোহন লাহা ও চৈতন্যচরণ রক্ষিতের নাম জানিতে পারা যায়। (২২) জগা-মাতাল নামে আর-একজন খুব উচ্চদরের শিল্পীর নামও পাওয়া যায়। জানি না উল্লিখিত জগৎচন্দ্র দাসের নামের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।



খ্যাতনামা শিল্পী সূর্যচরণ লাহা প্রাচীন প্রকার মাটির নীচে পদদ্বয় রাখিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন



খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভড় তাঁহার ঝাঁপ দেওয়া তাঁতে জরিপাড় শাড়ী বুনিতেন

অর্ধ শতাব্দীর পূর্বে এখানে যে-সকল উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ভড়, রামচরণ দে, তিনকড়ি দত্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ ভড়, সাধুচরণ দাস, গোবিন্দ দে,

বর্তমানে যাহারা বিশেষ খ্যাতিপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে সূর্যচরণ লাহা, রজনীকান্ত ভড়, জয়গোপাল সেন, বৈকুণ্ঠ সেন, বেচারাম দে, অধরচন্দ্র ভোস, উপেন্দ্রচন্দ্র দে, স্কৃদিরাম

(২২) শ্রীযুক্ত প্রেমনারায়ণ নান মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(২৩) ৮নন্দলাল ভড়, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহা, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতির নিকট হইতে এই নামগুলি প্রাপ্ত হই।

দাস, জহরলাল প্রামাণিক প্রভৃতির নাম অনেকেই বলিয়া থাকেন। ইহার সর্বত্রই প্রায় ৮০ হইতে ১০০ নম্বরের সূতার বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন; কেহ-কেহ ১৫০ নম্বরের ধুতি বা শাটীও বয়ন করিতে সক্ষম। আজকাল যে-কয়েকজন এখানে জরিপ পাড় বুনিতে পারেন, তন্মধ্যে রজনীকান্ত ভড় মহাশয়ই প্রধান। তাঁহার মত স্বল্প জরিপ ফুলপাড় কাপড় এ-প্রদেশে কম লোকই বয়ন করিতে পারেন। জরিপ কাজে এখানে সুদীরাম দাসের স্থান উহার পরই। ইনি উক্ত ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের উৎপন্ন সমস্ত কাপড়ই শান্তিপুরে চলিয়া যায় এবং তথায় শান্তিপুরের কাপড় বলিয়া বিক্রয় হয়। জহরলাল প্রামাণিক মহাশয় কাঁচির কাপড় বয়ন করিতে সিদ্ধহস্ত। স্বঘাচরণ, বেচারাম, উপেন্দ্র প্রভৃতির হস্তে মিহি কাপড় খুব ভালরূপ জন্মে।

অহুসঙ্কান দ্বারা যত দূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এখন এখানে মোট কিছু কম প্রায় একশতখানি মাত্র তাঁত আছে, তন্মধ্যে ৮০খানি আন্দাজ চলিয়া থাকে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে এই সংখ্যা অস্বতঃ পাঁচ-ছয় গুণ ছিল। এক চকে তখন প্রায় ১৫০খানি এবং হরিজাদাঙ্গায় প্রায় ৬০খানি ছিল। কোন-কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, তখনকার তাঁতের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র ছিল। তাঁহাদের অহুমান শতাধিক বৎসর পূর্বে এই সংখ্যা তিন সহস্রের কম ছিল না। কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্রীযুত কৃষ্ণলাল দাস, এম-এ, মহাশয় গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, তখন এখানে প্রায় ১৮০খানি তাঁত ছিল। (২৪) এখানে তাঁত প্রস্তুত হইলেও, বাহিরখণ্ড-নামক স্থান হইতেই অনেকে খরিদ করিয়া আনেন। পূর্বেও এই স্থান হইতে অনেক আসিত।

এখানকার বস্ত্র-শিল্পের পুরাতন পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, শত বৎসরের মধ্যে এখানে যে-সব উৎকৃষ্ট মিহি বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা বিলাতী সূতায় এবং ৩০০ নম্বর পর্যন্ত হইত। এরূপ বস্ত্র বয়ন করিবার শিল্পী তখন এখানে অনেক ছিলেন। তৎপূর্বে দেশী সূতা দ্বারা প্রস্তুত হইত, তাহা ২০ হইতে ৫০ নম্বর সূতার অনুরূপ হইত। খুব মিহি সূতায় যে-সব উৎকৃষ্ট বস্ত্র পূর্বে প্রস্তুত হইত, তাহার সূত্র কোথায় পাওয়া যাইত, বিশেষ

চেষ্টায় দ্বারাও তাহা স্থির করিতে পারি নাই। টাকুর সাহায্যে প্রস্তুত সূত্র সূত্র দ্বারা করাসজাদার মিহি কাপড় বয়ন করা হইত এইটুকু মাত্র জানা যায়। (২৫) এখানে প্রস্তুত হইত ইহার উপযুক্ত প্রমাণভাবে এবং এ-সম্বন্ধে স্থমীমাংসা ব্যতিরেকে পূর্বকালের সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সত্যের অহুরোধে এ কথা বলিতেই হইবে।

কলে-চালিত তাঁতের কাপড় চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের ঠিক অন্তর্গত না হইলেও, এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বটকুট্ট ঘোষ মহাশয়ের কাপড়ের কলের কথা বাদ দিলে অসঙ্গত হইয়া যাইবে মনে করি। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই এ কার্যের অগ্রণী।



বটকুট্ট ঘোষ

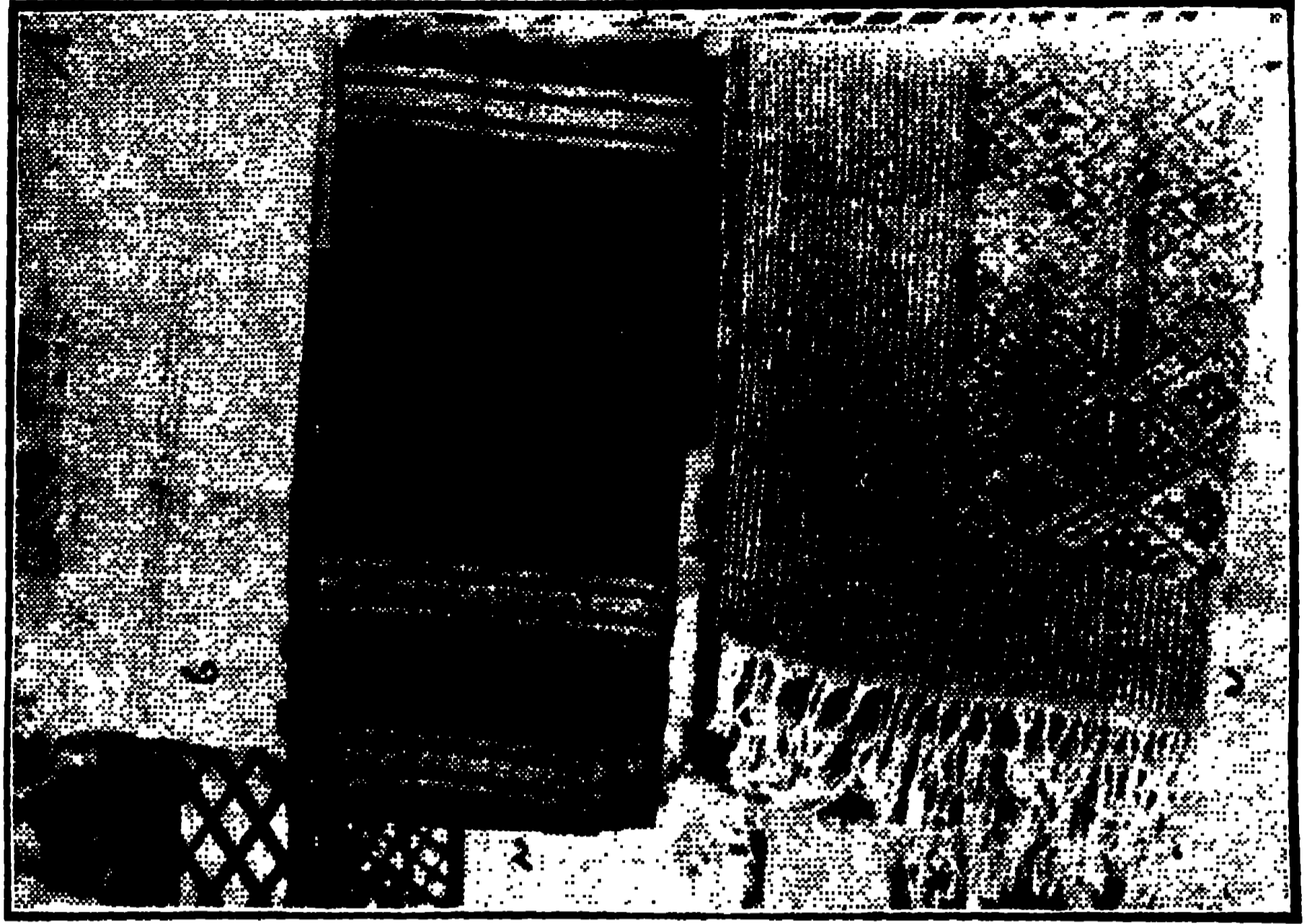
বটকুট্ট-বাবুর প্রাথমিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বস্ত্রশিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অভিজ্ঞতা পূর্বে ছিল না বা তিনি এ-শিল্প-সম্বন্ধে কোনো দিন কোথাও কোনো শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। যে উৎসাহ ও মনের বলে তিনি দূরদেশে নাপ-পুরের জহলে ঘাইয়া কাঁচের ব্যবসা এবং চন্দননগরে ও বিভিন্ন স্থানে একটি সুপরিচালিত চর্কির কারখানা

(২৪) "তাঁতী ও তাঁত"—কমলা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

(২৫) ভারতে প্রাচীন বস্ত্র-শিল্প—কমলা, প্রথম, ১৩১২।

চালাইয়াছিলেন, প্রধানতঃ সেই উৎসাহ মাত্র মঞ্চল লইয়া তিনি নিজের চেষ্টায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়। একদিন একটি জাপানী পায়-চালান তাঁতের (Paddle Loom) বিজ্ঞাপন কোনোক্রমে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহাকে পদদ্বারা চালাইয়া একটি স্ত্রীলোক কাপড় বুনিতেছে এইরূপ একটি ছবি ছিল। এই চিত্র দেখিয়া তাঁহার মনে



বটকুটে ঘোবের কলে প্রস্তুত বস্ত্র—১। টেবিল-বস্ত্র, ২। জরিপাড় কাল রংএর শাড়ী, ৩। তোয়ালে

হয়, জাপানী রমণীরা যদি এত সহজে বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকেই বা সহজে একাধা করিতে পারিবে না কেন? ইহা হইতে তাঁহার এখানে ঐ তাঁত বসাইবার ইচ্ছা হয়। তাঁহার এক ভাগিনেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু জব্বলপুরে রাজা গোকুল দাসের মিলে বহু দিন বয়ন-কাৰ্য্য শিখিয়াছিলেন। মাতুলের এই নূতন কাৰ্য্যে আগ্রহ দেখিয়া তিনি প্রথম কতকগুলি ঠক্কঠিক তাঁত স্থানীয় সূত্রধরের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া সানা, ব, রিড্ প্রভৃতি, বিলাতী দ্রব্য-সহযোগে উন্নতি করিয়া বসাইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে জাপানে একখানি জাপানী পদচালিত তাঁতের অর্ডার পাঠাইয়া দিলেন। ইহাই বটকুষ্-বাবুর কাপড়ের কলের সূত্রপাত।

এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে, বিলাতি কলের তাঁতে (Power Loom) মিহি সূতায় দেশী কাপড়ের স্নায় কাপড় উৎপাদন করিয়া স্থলভে বিক্রী করিতে পারা যায় কি না, তাহার পরীক্ষার জন্ত বোম্বাই হইতে একখানি কলের তাঁত আনান হয়। উহা প্রথম হস্ত দ্বারাই চালান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কাৰ্য্যের অসুবিধা হওয়ায় একটি ছোট অয়েল্ এঞ্জিন্ খরিদ হয় এবং সেইসঙ্গে আরও দুই-চারিখানি কলের তাঁতও আনান হইল। অয়েল্ এঞ্জিন্ সর্বদা

খারাপ হওয়া, বিধায় পরে উহার পরিবর্তে স্টীম এঞ্জিন্ বসান হয় এবং পর-পর বিলাতের ম্যান্‌চেষ্টারের র্যাফেল্ ব্রাদার্সের (Raphael Brothers) নিকট হইতে বহু-সংখ্যক তাঁত আনান হয়।

এই কলে কাপড়, তোয়ালে, টেবিল-বস্ত্র, জামার কাপড় প্রভৃতি সুন্দর প্রস্তুত হইত। বঙ্গ-বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কলের মোটা কাপড় খুবই চলিয়াছিল। মিহি সূতায় কাপড়, এমন-কি সুন্দর জরিপাড় কাপড়ও এই কলে উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু দেশীভাবের মিহি বস্ত্র ব্যবসার প্রতিযোগিতায় টিকিবার মত উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। একসময় তিনি অনেক চেষ্টা এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাতে অকৃত-কাৰ্য্যতার সহিত এবং এই সময় ইণ্ডিয়ান স্পিনিং উইভিং কোম্পানি লিমিটেড্ নামক-একদল দুর্ভাগিনী বিশিষ্ট লোকের কথায় ভুলিয়া কাৰ্য্য করার পর বিস্তর লোকসান হইয়া ইহা শেষে উঠিয়া যায়।

এই কলে শেষ অবধি পঁচিশ-ত্রিশখানি ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের তাঁত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ড্রপ-বস্ত্র লুম্ এক-খানা এবং একখানা ভাল ডবল্ লিফ্‌টেড্ জ্যাক্‌কার্ড লুম্ ছিল। এই শেষোক্ত প্রকার লুম্ এখন পর্যন্ত বাঙ্গলার



মুগালিনী বস্ত্রালয়

কোনো কাপড়ের কলে আছে বলিয়া জানি না। (২৬)

এখানে সাধারণ বস্ত্র-শিল্পীগণ ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র ও উড়ানি ভিন্ন অল্প কিছু বয়ন করেন না। খাটি খন্ডরের কাজও তাঁহারা করেন না। প্রবর্তক-সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মুগালিনী বস্ত্রালয়-নামে এখানে একটি তাঁত-শালা আছে। উহাতে মোট তেরখানি তাঁত আছে। পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গলোকের ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকার জামার কাপড় ও টুইলও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে দেশী মিলের সূতা এবং খন্ডরও ব্যবহৃত হয়। এই বস্ত্রালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বয়ন-যন্ত্রের টানা-বিষয়ে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। এখন সমস্ত তাঁতগুলি না চলিলেও, এখানে একত্রে এতগুলি তাঁত আর কোথাও নাই।

‘চন্দননগর বস্ত্রালয়’-নামে এখানে আর-একটি তাঁত-

(২৬) মুহম্মদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমান শরৎচন্দ্র পালের নিকট হইতে সর্বাধিক অবগত হই। ইহারা উভয়েই এই কলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কলের উৎপন্ন যে বস্ত্রাদির ছবি দেওয়া হইল, এই বস্ত্রগুলি উহাদের ও শ্রীমান হুমকু পালের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছি। বটকুট-বাবুর কলের সম্বন্ধে আরও বিশদ রূপে জানিতে হইলে ১৩১২ সালের আবেগের “কমলায়” শ্রীযুক্ত বিরিকি-মোহন কর-লিখিত “করাসভাকার কাপড়ের কল”-নামক প্রবন্ধ জ্ঞেয়া।

শালা আছে। তথায়ও টুইল এবং অন্যান্য বস্ত্র তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী দত্তের তাঁত-শালায়ও টুইল এবং অন্যান্য জামার কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসকল স্থানেও যে সব বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাও ভঙ্গলোকের ব্যবহারোপযোগী, কিন্তু পরিমাণে অল্প। শেষোক্ত ভঙ্গলোক তাঁহার তাঁত-শালায় গরম কাপড় বয়নেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের কথা-প্রসঙ্গে এখানকার চট ও ক্যান্সিসের কাজের কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক। বৈদেশিক বণিকগণ-পরিচালিত বাঙ্গলার অন্ততম বিখ্যাত গোম্বলপাড়া-জুট মিলের কথা অনেকেই জানেন, সুতরাং ইহার কথা অধিক বলার আবশ্যিক নাই। এদেশে কল-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে এখানে চট ও ক্যান্সিসের কাজ খুব বেশী ছিল। উহা সে-সময়ে এখানকার একটি লাভবান ও প্রসিদ্ধ শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন উহা হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত হইত এবং উহার কাটুতিও যথেষ্ট ছিল।

সহরের দক্ষিণ অংশে বর্তমান মুসলমানপাড়ায় মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বহুল পরিমাণে এই কাজ করিত। বারাসতের দে-মহাশয়রা ঐ-সকল লোকদের দাদন দিয়া গুন চটের ব্যবসা করিতেন। (২৭) অনেকে এই ব্যবসায় প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছিলেন। এই কার্যে বহু দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত লোকও প্রতিপালিত হইত। স্থানীয় কৈবর্তরা এ-কাজটিও যথেষ্ট করিত।

মেকেন্সী-নামক এক বৈদেশিক ছপ্পেন্স-পটী-নামক পল্লীতে একটি চট বুনবার কল স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২৭) মশহুদা সাহিত্য মন্দিরের ৩৭ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

যে-স্থানে তাঁহার কল ছিল, এখনও সেই স্থান মেকাবী সাহেবের বাগান বা সাহেব-বাগান নামে পরিচিত (২৮) বোনো (Louis Bannaud) নামক এক ফরাসী সাহেব প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার হাজিনগরের বাগানে একটি বড় দড়ি ও চটের কারুখানা করিয়াছিলেন। উহা শেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। (২৯) নেড়োর

(২৮) চন্দননগরে 'মুসলমান উপনিবেশ'-নামক প্রবন্ধ।

(২৯) The Good Old Days of Honourable John Company.

মোহনার গোপীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ও এই কার্যের দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটার নিকটেই তাঁহার স্ববৃহৎ কারুখানার উৎপন্ন চট ও খ'লে চালান দিতেন।

তাঁতে বোনো চটের কাজ আর কোথাও দেখা যায় না। চট-কলের প্রসাদে এখন এ-শিল্পটি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বায়ুন-বাগদী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিতে-দেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল। সুখেন্দুর বিষয়-কর্ম-পর্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এখন কানাইলালের উপর। সে যেমন স্ত্রীনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ, তেমনি শিষ্ট, শাস্ত্র ও বিনয়ী। তাহার মনের যে একটু উচ্ছ্বল ও চঞ্চল ভাব ছিল, এই বড় আঘাতটা পাওয়ার পর হইতে তাহা অতিমাত্রায় সংযত হইয়াছে। সে এখন বিশেষ পর্যবেক্ষণ না করিয়া কোনো কাজই করে না। গ্রামবাসী সকলেই তাহার উপর সম্বল ও শ্রদ্ধাবান।

মনিবের সহিত প্রজ্ঞাদের কোনো গোলযোগ ঘটিলে তাহারা কানাইলালকে আসিয়া ধরিত। তাহারা জানিত কানাইলাল মধ্যস্থ থাকিলে একটা সুবিচার হইবে। এইরূপে কানাইলালের সংসর্গে থাকিয়া সুখেন্দুর চরিত্রেরও অনেকটা পরিবর্তন ঘটয়াছিল।

সুখেন্দুর বিষয়-কর্মোপলক্ষে কানাইলালকে এখন প্রায়ই জমিদারির বিভিন্ন অংশে যাইতে হইত। সে কত বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের ভিন্ন-ভিন্ন আচার-ব্যবহার দেখিত। কেহ জল ছুইতে পায়—কেহ পায় না। কেহ ঘরে উঠিতে পায়—জল ছুইতে পায় না। আবার খাণ্ড-

সম্বন্ধেও জাতি-বিশেষে কত ইতর-বিশেষ হয়। কোনো কোনো খাদ্য একে খাওয়া যায়, অন্যের তাহা অখাদ্য। শিক্ষা, সংস্রব ও অভ্যাসের ফলে চরিত্রেরও বা কত ইতর-বিশেষ হয়।

কানাইলালের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ-মুহুরী প্রায়ই থাকিতেন। তিনি কাহারো বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজও করিতেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি তাঁহার আচার-রক্ষার জন্ত বিভিন্নজাতীয় লোকের সহিত যে ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া কানাইলাল এইসকল জাতির শ্রেষ্ঠতা, নীচতা, ও হীনতার একটা ক্রম পাইত। তাহা ছাড়া নিজে স্বচক্ষে তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়াও অনেকটা বুঝিয়া লইত। তাহার বয়স হইয়াছিল, বাংলা দেশে জন্মিয়া মা'র আচলের বাহিরে আসিয়া জাতিভেদ ও উচ্চ-নীচের প্রভেদ বুঝিতে তাহার কিছু বাঁকি রহিল না।

কানাইলাল প্রতিগ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় কাজে-অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক জাতি দেখিত। কিন্তু যে-জাতিটার পরিচয় জানিবার জন্ত তাহার মনে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, * সেই বাগদী জাতিটা সে কোথাও দেখিতে পাইত না। কাহাকেও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না।

সে চাক্ষুষ দেখিতে না পাইলেও এই যেসব

অনাচরণীয় জাতি নিত্য তাহার সম্মুখে পড়িতেছে, ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদেরও আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কেমন—এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়, .সেসবই—কল্পনাবলে সে অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারিত।

যে আকাজকা লইয়া গে আজ এই বিস্তৃত জ্ঞান ও নির্মল চরিত্রলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এইসব দেখিয়া-তিনি পূজাগৃহে যাইবার এবং রান্নাঘরে ঢুকিবার ছেলেবেলাকার সেই প্রবল আকাজকাটা আপনা হইতে তাহার হৃদয়ের কোন্ দূরদেশে যাইয়া থিতাইয়া পড়িয়াছিল। বরং এই ব্রাহ্মণ পরিবার যে তাহার কত-কত অন্তায় ও অত্যাচার নীরবে সহ করিয়া তাহাকে ঘরের ছেলের মতন আদরে যত্নে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া নিয়ত তাঁহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইত।

কানাইলালের মনে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায়, সে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাছে সর্বদা হীন জাতির মতন এমন সঙ্কচিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল যে, এই শিক্ষিত ও শিষ্ট যুবকের তেমন ব্যবহার পাইয়া সকলে লজ্জা পাইতেন। আপনার পদোচিত মর্যাদা তুলিয়া অধস্তন কর্মচারীদিগকে জাতির হিসাবে কানাইলাল যেরূপ সমাদর করিয়া চলিত, তাহাতে তাঁহারাই সমস্ত সময় কুণ্ঠিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

বাগ্দী-জাতি নীচ, মনে-মনে ইহা ধারণা করিয়া লইলেও সে জাতি-হিসাবে যে কত নীচ—কত হীন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার ও ভালো করিয়া বুঝিবার তাহার দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাহার এই উচ্চ পদ এবং নির্মল চরিত্র এই দু'য়ে মিলিয়া-মিশিয়া তাহাকে এ-বিষয়ে আরও অধিকতর অহঙ্ক করিয়া রাখিবার সুযোগ দিয়াছিল; কেননা গ্রামের কোনো লোকই কোনো দিন তাহার জাতি-সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাটি করিয়া তাহার নিকট সেটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেন না। বরং তাহাকে যথেষ্ট সম্মম ও সম্মান করিতেন। এবং সে যে ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঘরের ছেলের মতন প্রতিপালিত হইয়াও আপনার জাতির বিশিষ্টতাটুকু রক্ষা করিয়া চলিতেছে ইহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। তাহার

আচরণ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, এই যুবক তাহার জাতি সম্বন্ধে নিতান্ত অহঙ্ক।

একদিন সুখেন্দু কহিলেন, কানাই! তুমি জমিদারির কাজকর্ম সব দেখছ—অথচ তোমার নির্দিষ্ট আসনে তুমি বসো না। সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে ব'সে কাজকর্ম দেখাশুনা করো—এমন করলে তোমার সম্মান থাকবে কেন?

কানাই হাসিয়া কহিল, “আজ্ঞে সম্মান দিয়ে কি হবে? কাজ চললেই হ'ল। যারা আমার সম্মান করবেন, তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু না দিয়েওঁত পারিনে।”

সুখেন্দু কহিলেন, “তুমি ছেলেমানুষ, বোঝো না, এ-সব কাজে একটু রাশপসার রাখতে হয়।”

কানাই কহিল, “কিন্তু নিজেকে সকলের কাছে একটা ভয়ের বস্তু ক'রে তোলাও উচিত নয়। তা'তে অনেক সময় প্রাণের কথা প্রাণেই থেকে যায়—কাজ ভালো হয় না।”

সুখেন্দু কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, “গছ-খুড়োর সুদের টাকাটা নাকি বেবাক ছেড়ে দিয়েছ?”

কানাই কহিল, “হাঁ। আসলই তাঁর দেবার চাড় নেই। আমি নিজেরই দেখেছি, পাঁচ-সাত দিন অন্তর তাঁর প্রায়ই একআধদিন উপোষ যায়। তবে আসল টাকাটা পড়বে না। আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাঁকে একখানা মুলীখানার দোকান ক'রে দিয়েছি। তিনি লাভের টাকা থেকে মাসে-মাসে পাঁচ টাকা ক'রে আসলের বাবা দেবেন।”

সুখেন্দু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

মহেশ্বরীর প্রাণেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কানাইলালের বয়স হইয়াছে—সে শিক্ষায় স্বভাবে সকল বিষয়েই কৃতী হইয়াছে। তাহাকে সংসারী করিতে মহেশ্বরীর প্রাণে প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু অতি কদম্বা আচার-ব্যবহার যে-জাতিটার অস্থি-মজ্জায় জড়িত হইয়া আছে, তাহাদের গৃহ হইতে একটা স্নেহ কণ্টাকে আনিয়া কি করিয়া তাহার জীবনসঙ্গিনী করিয়া দিবেন? সেই মেয়েটি যদি হইত ত বেশ হইত।

কানাইলাল মজুমদার-উপাধিই লিপিত। সেই

কান্‌কালে সে ছোয়া-খাওয়া লইয়া প্রস্তুত তুলিলে মহেশ্বরী
একদিন তাহাকে বাগ্‌দীর ছেলে নামে পরিচিত করিয়া-
ছিলেন, সে-কথা কি সে আজিও মনে করিয়া রাখিয়াছে ?
মহেশ্বরী ভাবিলেন,—সে যদি তাহার এই হীন মেকনগের
স্বপ্ন-স্বপ্নটুকু আজ পায়, তাহা হইলে তাহার জীবনের
স্বপ্ন-স্বপ্ন হইত চিরদিনের মতন ধামিয়া যাইবে ! চিরদিন
সেই স্থানে রাখিয়া আজ তাহাকে নিয়ের পংক্তিতে যাইয়া
সিঁড়ি বসিলে, সে উদ্বেজন্য বেগ হইত সে সামলাইয়া
সিঁড়িতে পারিবে না।

কানাইলালের পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়া পরিণামে
তাহাকে ধাঁদার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া মহেশ্বরীর কোনো-
কোনই ইচ্ছা ছিল না। তিনি নবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ
লুকাইয়া নবীর কত গল্পই তাহার সহিত বলিতেন।
কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া কোনোদিন কিছু বলিতে পারেন
নাই। ভাবিয়াছিলেন, বয়স হইলে আপনিই সে সব
ঝিঁঝি লইতে পারিবে। এমন-সময় তাহার সহিত তাঁহার
বচ্ছেদ ঘটিল। তাহার পর তাহাকে যখন শিক্ষায়,
শিক্ষায়, স্বভাবে সকলদিকেই অতি পবিত্র অবস্থায় প্রাপ্ত
হইলেন, তখন তাহাকে তাহার পরিচয় শুনাইতে তাঁহার
পত্নী-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তিনি একদিন তাঁহার পুত্র-
ধিকে ডাকিয়া কহিলেন—

“শৈল ! কানাইলালের ত, একটা বে-খা দিতে হয়—
কি করা যায় বল দেখি ?”

শৈল কহিল, “তাই ত, এমন ছেলের গলায় একটা
বাগ্‌দীর মেয়ে কি ক’রে এনে গেঁথে দেওয়া যায় ?”

মহেশ্বরী কহিলেন, “তা-ছাড়া আর উপায় কি ?”

শৈল কহিল, “না মা, আজন্ম কুমার থাকে সেও ভালো,
সে যা জানে না, তা শুনিয়া এমন একটা ছঃসহ ছঃখ
গর প্রাণে ফুটিয়ে তুলো না, সে হয়ত সে-জালা জুড়োবার
হান পা’বে না।”

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।
কিছুই স্থির হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চিন্তের অন্তরালে যে সংঘর্ষ উপস্থিত
হইয়াছিল, সেই চাকল্যের বশে সে একদিন প্রাতে

অখারোহণে নবীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। এই
নবীর সম্বন্ধে অনেক কথাই সে মহেশ্বরীর নিকট
শুনিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, একমাত্র নবীর সাহায্যেই
তাহার পিতা-মাতার সংকার হইয়াছিল। এবং সে এই
মহদাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল নবীর সাহায্যেই। সে
জান হইবার পর নবীকে কোনোদিন দেখে নাই।
কিন্তু যখনই তাহার কথা শ্রবণ হইত, কৃতজ্ঞতায় তাহার
চক্ষু-দুটি জলে ভরিয়া উঠিত।

সুখেন্দুর জমিদারির সংলগ্ন অল্প এক জমিদারের এলাকায়
নবীর বাস। কানাইলাল জমিদারি-পরিদর্শনে আসিয়া
একদিন প্রাতঃকালে কাছারী বাড়ী হইতে অখারোহণে
একাকী নবীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে
বাগ্‌দী-জাতির সম্মান করিতে করিতে নবীর পবনও
পাইয়াছিল।

নবী যে গ্রামে বাস করিত, তাহার নাম চাঁদপাড়া।
কানাইলাল কত কত প্রাস্তব ও লোকালয় পশ্চাতে
ফেলিয়া চলিয়াছিল। স্বমন্দ বাতাসে তাহার অঙ্গের
পরিচ্ছদ নাচানাচি করিতেছিল। পাখীরা কলরব
করিতেছিল, গবাদি পশুগণ মাঠের দিকে চলিয়াছিল।
সকলেই কোনো-না-কোনো কাজে বাড়ীর বাহির হইয়া
পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেমন একটা আয়োজন ও
ব্যস্ততার ভাব। কিন্তু তাহার চিত্ত আজ নিরতিশয়
ব্যাকুল ! সে বুঝি কৃতজ্ঞতার কৌশলে আপনার সম্মানের
বোঝা ভারী করিয়া চলিয়াছে। সে-কৃতজ্ঞতা যে
কতখানি, তাহাই জানিতে সে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে।
তাহার মনের এতকালের জিজ্ঞাসার মীমাংসা সে আজ
করিতে চায়। সে প্রাণের মধ্যে এমন-একটা লুকোচুরি
কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। সে খোলা-
খুলিভাবে অতি নিষ্ঠুর সত্যও জানিবে। কিন্তু আজ যে
তাহাতে কতখানি মানি মর্মে-মর্মে বিধি তাহার
সহিষ্ণুতাকে ছঃসাধ্য করিয়া তুলিবে, তাহা কে জানে ?
মহেশ্বরীর স্নেহধারায় সে যে চির-বসন্তের মতন সুখে
জীবন যাপন করিতেছিল। আজ সে জীবনকে অধঃপতিত,
লাঞ্ছিত করিতে এবং হীনতার পক্ষে তলাইয়া দিতে কি
জানি তাহার ইতিমত ছুটিয়া চলিয়াছে ?

কিছুদিন হইতে তাহার মনে হইতেছিল যে এমন-একটা মিথ্যার চোরাবালির মধ্যে সে আর কিছুতেই আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হয়ত তাহার আজিকার এই গম্ভব্য-পথে এমন নির্ভরতা সে পাইবে না, যাহাকে ভর করিয়া সে যেমনটি ছিল, তেমনটি থাকিতে পারিবে। কিন্তু এই অকারণ লুকুতায় যে আত্ম-পরিচয় লুকাইয়া রাখিতে চায়, সে গৌরবের নামে আপনার মহামূল্য সম্পদটাই হারাইয়া ফেলে। জাতির গায়ে কোনো দুর্গন্ধ নাই। দুর্গন্ধ—সে কেবল আচার-ব্যবহার ও কর্মের দোষে। তাহার মনে আপনার জাতিটার উপর যখন একটু সহানুভূতির ভাব আসিতেছিল তখন একটা করুণ আনন্দের স্বর প্রাণের মাঝে বাজিয়া তাহার চিন্তের সমস্ত অন্ধকার ও নিরানন্দকে ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের সত্যকার পরিচয় পাইবার বাসনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছিল। অন্তরে এইরূপ তুমুল ঝড় তুলিয়া, কখনো উৎসাহে, কখনো অবসাদে টলিতে টলিতে সে নবীনদের গ্রামে চাঁদপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, দুইটি বালক ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “নবীন-বাগ্গীর বাড়ী কোন্ দিকে?”

ছেলে দুইটি কিছুকণ তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। পরে একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি জমিদারের লোক?”

কানাই বলিল “হাঁ।”

বালক বলিল, “সে যে বাগ্গী-পাড়ায়। ঐ বাঁদিকের রাস্তা ধরে যাও।”

“কত পথ হবে?”

“কত পথ আর হবে—মুগীপাড়া ছাড়ালেই ত বাগ্গী-পাড়া।”

কানাইলাল অশ্বের মুখ বামদিকে ঘুরাইয়া দিল এবং মুহূর্ত্তে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার গতি আরও মসৃণ হইয়া আসিল। সে যেন তাহার নিজের ঐশ্বর্য্য নিজেই লুপ্তিত করিয়া শূন্যভাণ্ডারের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে চলিয়াছে! সে তখনও ভালো বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কোন্ কীর্ণ লালসার মোহে সে আপনার জয়-শ্রী হরণ

করাকেই লক্ষ্মী-শ্রী বলিয়া মনে করিতেছে! কিন্তু শুধু স্বপ্নের মতন একটা আভাস কিছুদিন হইতে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল যে, তাহার এই সুখ-শান্তির অন্তরালে একটু সত্যের কটক গভীর অবসাদে যেন লুকাইয়া আছে, তাহা একদিন-না-একদিন মর্মান্তিক হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিবেই। তাই সে তাহার সুখ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিত পরিচয় করিতে দীর্ঘ-হৃদয়ে এমন ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছে।

সে যখন বাগ্গীপাড়ায় আসিল, তখন বেলা মাথার উপর। সে প্রথমত পরাণ-বাগ্গী-নামক একব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কোম্পানীর লোক ডাবিয়া পরাণ শশব্যস্তে একখানি খাটিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং নমস্কার করিয়া কিছুদূরে যাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কানাই কহিল, “দাঁড়ালে কেন? বসো।”

পরাণ না বসিয়া দাওয়ার উপরে উঠিয়া একছিলিম তামাক সাজিল এবং একটুকুরা কলার পাতা আনিয়া কল্কেটা তাহার সম্মুখে ধরিল।

কানাই কহিল, “আমি তামাক খাইনে।”

পরাণ তখন আপনার ডাবা ছঁকাটিতে কল্কে পরাইয়া কানাইলালের সম্মুখে বসিয়া ধূম উদগীরণ করিতে লাগিল। সে কহিল, “আপনারা?”

কানাই বলিল, “আমরা এই তোমাদেরই মতন মাছ ধর আর কি!”

পরাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, “আমাদের মতন—বলেন কি মশাই? আমরা পশুরও অধম। আপনারা সব দেবতা-লোক। তা বামুন, কি আর কিছু-জান্‌বার মন ক’রে কথাটা বলেছিলাম।”

কানাই কহিল, “হবো একটা-কিছু। তোমরা লেখা-পড়া শেখো না কেন?”

পরাণ হাসিয়া কহিল, “নেকাপড়া শিখতে কি বিধেতা আমাদের পাঠিয়েছে? ওসব ভদ্র-নোকের কাজ।”

কানাই বলিল, “বিধাতা কা’কেও ‘তুমি এ করবে—তুমি ও করবে, বলে পাঠাননি! লেখাপড়া শিখতে কারও মানা নেই। তোমাদের জা’তের মধ্যে কি কেউ লেখাপড়া শেখে না?”

পরাণ কহিল, “দেখিনে ত বড়।”

কানাই দেখিল, পরাণের ছুটি ছেলে ও একটি মেয়ে উঠানে পা ছড়াইয়া দিয়া রোহ-পিঠ করিয়া খাইতে বসিল। পরাণের স্ত্রী তিনখানি শালুক আমানি ভাত ও ছুটা করিয়া মাছ-পোড়া রাগিয়া গেল। মাছ-পোড়ায় না লাগিল তেল—না লাগিল ছুন—না লাগিল লস্ক। এঁটোর বিচার নাই; তাহারা যে-হাতে শালুক ধরিতেছে সেই-হাতে গায়ে-কাপড়ে মাখামাখি করিতেছে। পরিহিত বস্ত্রগুলি যুক্তিকা অপেক্ষাও মলিন ও দুর্গন্ধ।

কানাই ভাবিতে লাগিল, “ইহারা ই বাগ্দী-জাতি! ইহাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে একই রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে? এই হীন বাগ্দী-জাতি আমি! ইহাদের লোকে পূজা-গৃহে, রন্ধন-গৃহে ঢুকিতে দিবে কেন?” তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আজ কোন্ পথে সে পা বাড়াইবে? কোন্ পথ ধরিয়া সে চলিবে? কোনো পথ নাই! পথ নাই!!

সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নির্জীবের মতন বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “কি অসীম—কি পবিত্র মাতৃস্নেহ এই মহেশ্বরী-মায়ের! এই হীন অনাচরণীয় বাগ্দীর ছেলেকে বুক করিয়া মাহুষ করিয়াছেন! দেশ ছাড়িয়া তাহারই সন্মানে স্বদূর ঘাঁটাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন! আত্মীয়-স্বজনের স্তম্ভীক তীর-গুলি একে-একে বুক পাতিয়া লইয়াছেন! পুত্রকে যে-স্নেহ দেন নাই, বাগ্দীর ছেলেকে তাহা দিয়াছেন!” অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল। সে মনে-মনে ডাকিয়া কহিল, “মা! ওমা! মহেশ্বরী-মা! সন্তানকে পথ দেখাও!!”

সে দেখিল, এমন মায়ের বিনিময়ে সকলই দেওয়া যায়। মহেশ্বরী যে তাহাকে বাগ্দীর ছেলে জানিয়া-গুনিয়াই স্নেহ করেন! এমন বিশ্বজননীর স্নেহ হইতে সে ত কোনোদিনই বঞ্চিত হইবে না। অথচ সে শূন্যের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া যেন নূতন একটা-কিছু গড়িতে চাহিতেছে!

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে তাহার অন্তঃকরণ তাহার জাতিটার দিকে যখন আবার সদয় হইয়া উঠিল,

তখন সে দেখিতে পাইল, এই পরাণ-বাগ্দী যে শক্তি রাখে, তাহার সে-শক্তিও নাই। একটা বিরাট জাতির বিশাল শক্তি এই পরাণ-বাগ্দীর পিছনে-পিছনে, আর সে? সম্পূর্ণ নিঃশব্দ নিঃস্বল। কেবল মহেশ্বরী তাহাকে একে সহশ্র করিয়া রাগিয়াছেন! মহেশ্বরীর অভাবে এত-বড় একটা শক্তি তাহারও পিছনে থাকিতেও সে শক্তি-হীন! নিঃস্বল!! একাকী!!!

কানাইলালকে একাকী বসাইয়া রাগিয়া পরাণ বাগানে গরু তাড়াইতে গিয়াছিল। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার খাওয়াদাওয়ার কি বিধি হয়েছে?”

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “নবীনের বাড়ী কোন্টা?”

“এই ত চারপানা বাড়ী পরে।”

“তা’র বাড়ী আমাকে একবার যেতে হবে।”

“আম্বন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।”

পরাণ তামাক টানিতে-টানিতে আগে-আগে চলিল, কানাই পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

নবীন ভিন্নধামে এক জমিদারের সরকারে পেয়াদা-গিরির কাজ করিত। সে অনেকটা আদবকায়দা ও সভ্যতা শিখিয়াছিল। এবং তাহার কথাবার্তাও অনেকটা ছরস্তু হইয়াছিল। তথাপি পরাণ যখন এই জামা জুতা-পরা চশমাধারী ঘোড়সওয়ারটিকে অকস্মাৎ তাহার ঘারে লইয়া হাজির করিল, তখন তাহার পর্ণকুটীরে এমন-একটি ভদ্রলোককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। যাহা হউক সে কানাইলালকে বসিবার জন্ত একখানি মোড়া দিয়া পরাণকেও একখানি পিঁড়ি দিল। পরাণ কহিল, “এ রি নাম নবীন।”

নবীনকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইতে গেলে সে চকিত হইয়া দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “করেন কি মশাই?”

কানাই বলিল, “তা হোক, তা’তে দোষ নেই।” তা’র পর উপবেশন করিয়া কহিল, “আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।”

নবীন এই ভদ্রযুবকের আচরণ দেখিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। পরাণও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। নবীন কহিল, “আমরা আপনার পায়ের ধূলোমাটি!

আমাকে লক্ষ্য দেওয়ার জন্য কি এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন ?” পরাগের দিকে ফিরিয়া সে যুহুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পেলে এঁকে ? পাগল নাকি ?”

পরাণ যুহুস্বরে কহিল, “না। তেমন ত কোনো লক্ষণ পাইনি।”

কানাই এসব শুনিতে পাইল। সে বলিল, “আমি পাগল নই। আপনারা বয়সে বড়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইরূপ আচরণই করা উচিত। আপনি জমিদার স্মৃৎশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন ?

নবীন কহিল, খুবই জানি। মুনিব-লোক তাঁরা ! জানিনে ?”

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কোনো সময়—সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় কুড়ি-বাইশ বছর হবে—একটি আড়াইবছরের শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন ?”

নবীনের সে-কথা বেশ মনে ছিল। সে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “হাঁ। সে ত নিতাই-খুড়োর ছেলে। ছেলেটা এখন মাতুষ হয়েছে শুনতে পাই। এমন কাজের ঝগড়াট যে একদিন দেখে আসতেও পারিনি। যেমন পোড়া অদেষ্ট ক’রে এসেছিল, তা বিধাতা তাঁকে দেখবেন না ত আর কা’কে দেখবেন ? পেট থেকে না পড়তে বাপ মা ভাই বোন সব গুলিই খেলে।”

কানাই কহিল, “আমিই সে হতভাগা—রাক্ষসে ছেলে !”

নবীনের বিস্মিত চক্ষু-দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কানাইলালকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে তাহার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। কংগার্ড-স্বরে কহিল, “আহা ! নিতাই-খুড়ো এমন ভালো মাতুষ ছিল, এমন ছেলে পেয়েছে একবার দেখে যেতে পারলে না ! পরাগ-দা ! নিতাই-খুড়োকে তুলে গেলে ? এখানে এলে ত তোমাদের বাড়ীতে পাত না পেতে যেত না !” কানাই পরাগের পদধূলি লইল।

পরাণ লক্ষ্য, সঙ্কোচে ও পুলকে অভিভূত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তখানি কানাইলালের স্বস্ত্রের উপর রাখিল। তাহার আঙ্গ কি-বস্তুই হাতে পাইয়াছে !

ইহাকে কোথায় রাখিবে—কোথায় বসাইবে—কি বলিয়া আপ্যায়িত করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

নবীনের বর্তমানে চাকরি ছিল না। সে তাহার স্ত্রী ও পুত্রটিকে লইয়া আজ দুই বৎসর রোগের সহিত লড়াই করিতে-করিতে তাহার সামান্য ছুঁচার পরমা যাহা বৃত্ত ছিল, তাহা কোন্ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তাহার ঘরের চালে ছাউনি ছিল না। যেখানে একেবারে শুল্ল সেখানটা পাটি দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটিও ঔষধ-পথ্যের অভাবে ককালসার। কানাইলাল বসিয়া-বসিয়া এই সব দেখিতেছিল।

নবীন শুনিয়াছিল যে, নিতাই-খুড়োর ছেলে লেগা-পড়া শিগিয়াছে, ভদ্র-আচরণ পাইয়াছে এবং বাবুদের সরকারে বড়দরের চাকরি করিতেছে। কিন্তু এয়াবৎ দেখা-শুনা করিবার কোনো সুবিধাই সে পায় নাই।

কানাইলাল গাত্ৰোখান করিয়া নবীনের হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিল। এবং বলিল, আমি ত আপনার ছোটো ভাই। আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি এই টাকায় একগানা ঘর বাঁধবেন। আমি সময়-মত এসে মাঝে-মাঝে দেখে-শুনে যাবো।”

নবীন কহিল, “এত বেলায়—খাওয়া-দাওয়া—

“সে আমি কাছারী থেকে স্কের এসেছি। আবার গিয়ে পাবো। আমার খাবার সেখানে প্রস্তুত আছে। ঘোড়ায় যেতে বেশী সময় লাগবে না।”

এই বলিয়া পরাগের হস্তেও পাঁচটি টাকা দিয়া সে প্রস্থান করিল। নবীনের চক্ষু-দুটি সজল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চক্ষের ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে। যে-শক্তি ও সাধনার বলে তাহার পূর্বপুরুষগণ তাহার অন্ত যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানে সেই অক্ষয়পীঠে যাইয়া না দাঁড়াইলে তাহার কোনো জাতি নাই—শক্তি নাই—ধর্ম নাই—সাধনাও নাই। সে কেবল তাহার জাতির নিকট ছুঁর্কিনয়ের একটা চিত্র হইয়া থাকিবে। যে-রক্তের মধ্যে তাহার স্বয়ং, সে-

রক্তকে বিস্ময় করিতে হইলে, সেই রক্তের উপর আসন পাতিয়াই তাহাকে তপস্বী করিতে হইবে। পিতৃপুরুষের সে-সিদ্ধপীঠ ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রতিভা একটা আকস্মিক ঘূর্ণীবাঘুর সহিত যুঝিয়া অবশেষে আপনা হইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহার অন্তরে যখন এইরূপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন একদিন মহেশ্বরী হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, “এখন ত আর এমন উড়ু-উড়ু থাকা ভালো দেখায় না বাছা! এখন একটা বে'-খা' কর।”

কানাই হাসিয়া কহিল, “সে ত তোমার বাগ্দীর মেয়ে নইলে হবে না!”

মহেশ্বরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এতদিনেও সে তাহার জাতির কথাটা বিস্মৃত হয় নাই,—শিশুকালের শোনা সেই নিষ্ঠুর কথাটি প্রাণের মধ্যে বড় করিয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরখ করিয়া দেখিবার জন্য মহেশ্বরীর চক্ষু-ছুটি অতিমাত্র ব্যথিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বেদনাতুর মুখখানি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃশ্রেহের নিমন্ত্রণে বালকের সকল খাদ্য জোগাইতে পারেন নাই। তাহার বাল্যকালের জানিবার শুনিবার সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা এখন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অন্তর-বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বের সহিত বোঝাপড়া করিতেছে! মহেশ্বরী কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু-ছুটি তাহার প্রতি নির্নিমেঘ হইয়া রহিল।

কানাই কহিল, “মা! তোমাদের স্নেহ-স্রোত সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সংসারে—সমাজে তা চায় না। তুমি তোমার প্রাণ-মন্দিরের মধ্যে আমাকে মুক্ত পুঙ্খাবী ক'রে রাখতে পারো—কিন্তু বাগ্দীর ছেলেকে বামুন করবার হাত তোমার নেই!”

মহেশ্বরী নিম্নস্বরে কহিলেন, “সে ত জানি।”

কানাই বলিল, “তবে যে বিশাল শক্তিটা আমার পিছনে জেগে আছে, তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে রাখব কেন? এখানে একমাত্র তুমি—মহেশ্বরী-মা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই; কিন্তু সেখানে তুমিও থাকবে—আর শত সহস্র মা-ভাইও আমার পিছনে থাকবে।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “তাদের আচার ব্যবহার যে—”
“অতি নীচ—তাই বলছ? হোক নীচ—হোক জঘন; তা' ব'লে পিতৃপুরুষকে কেহ ত্যাগ করতে পারে না। আর তা-ছাড়া আমি যাবোই বা কোথায়? আমার জাতের কতটা কি শক্তি আছে, জানিনে। কিন্তু অনেক স্থলে দেখতে পাই, লোকে এক জা'ত থেকে অন্য জাতে যায়। যারা যায়, তা'রা আপনার জাতিকে কিছু দেওয়া দূরে থাক, নিজের অঙ্গ কেটে অন্যের অঙ্গ পুষ্ট করে।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “কিন্তু তোমার জাতের মধ্যে কি তেমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে পাওয়া যাবে?”

“না পেলোও যে আমি তাই চাই। আমার রক্তটা যেখানে প'ড়ে আছে, তা অ-স্থান হোক, কু-স্থান হোক, তা'কে মমতারই চক্ষে আমাকে দেখতে হবে।”

মহেশ্বরী বলিলেন, “তবে কি বাঁসু?”

“আমার বলাবলি কিছু নেই—তোমারও ভাবনার কিছু নেই। আমি জা'ত ছাড়ব না—বে-ও করব না। আমার বাপ-মা, ভাই-বোন যখন অকালে চ'লে গেলেন, তখন এ-দেহটার পরে আমার আর বিশ্বাস নেই। যে কয়দিন থাকব, তোমার সেবা, দেশের সেবা, আর আমার জাতির সেবা ক'রে তোমার শ্রীচরণে আমার শক্তির পরীক্ষা দেবো।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “চিরজীবনটা সন্ন্যাসী সেজে কাটাবি?”

“সন্ন্যাসী কেন সাজতে যাবো? পরের গৃহ নিজের ভেবে নেওয়াই আমার জীবনে তোমার শিক্ষায় বাঞ্ছিত অবস্থা।”

“কিন্তু আমি কি তাতে শাস্তি পাবো?”

“তুমি বেশী শাস্তি পাবে। পরিবার ছেড়ে বিশাল পরিবারের দিকে যার প্রাণের শুভ আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে, সে বাইরে না হ'লেও অন্তরে আরাম পাবে।”

মহেশ্বরীর মুখমণ্ডলে চিন্তার ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কানাইলাল অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা! কি ভাবছ?”

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, “ভাবছি অনেক কথা,—সে আর তুই শুনে কি করবি?”

কানাইলাল বলিল, “করা না-করা সে পরের কথা, আগে শোনাও ত?”

মহেশ্বরী মুহূর্তে কহিলেন “ভাবছি, এ তোমার ঘুমের আবেশ, না জাগরণের নেশা!”

কানাইলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, “তোমরা চোখ-ছুটি এত দূরে ফেলেও দেখতে পারো? ঘুমোলেও তোমার ওই কোল, জাগরণেও ওই কোল, তা’র আর ভাবনা কি?”

মহেশ্বরী কোনো কথা বলিলেন না।

কানাই কহিল, “মা! আমার একটা বড় সাধ হয়েছে—পূর্ণ করবে ত?”

মহেশ্বরী কহিলেন, “তা কি ক’রে বলতে পারি? আকাশের চাঁদ ধ’রে দিতে বললে হয়ত ‘আয়! আয়! চাঁদ আয়!’ বলেই নিরস্ত হ’তে হবে।”

কানাই হাসিয়া কহিল, “সে-বয়সটা বোধ হয় তোমার এ পরিতাপমাণ ছেলের কেটে গেছে।”

মহেশ্বরী শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, “ঘাট্—ঘাট্—অমন কথা বলে না। এখন কি বলবি, শুনি?”

কানাই কহিল, “বাস্তুভিটায় বাপ-মায়ের প্রদীপটা যাতে জলে তা করিতে হবে।”

“আমাকে ছেড়ে যাবি, বুঝি? সেখানে একলাটি কি ক’রে থাকবি?”

“থাকব ত তোমারই কাছে। শুধু আমি জানতে চাই যে আমার দাঁড়ানোর একটা স্থান আছে। আর আমার পিতৃপুরুষেরা জানতে চান যে তাঁদের ভিটায় প্রদীপ জলছে।”

* * *

তা’র পর কিছুদিনের মধ্যে নিতাই-বাগ্গীর ভিটার উপর কানাইলালের এক বাসভবন নির্মিত হইল। সেখানে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহাদের অন্তত জায়গা-জমি দিয়া সুখেন্দু কানাইএর জন্য একটি সুদৃশ্য পাকা-বাড়ী নির্মাণ করাইয়া দিলেন।

গৃহের নাম রাখা হইল, ‘মাতৃ-নিবাস।’ কানাইলাল সুখেন্দুর নিকট হইতে বেতন-স্বরূপে যাহা পাইত, আপনার গৃহে বসিয়া সে তাহা হইতে কিছু-কিছু দরিদ্রদিগকে দান করিত। অবশিষ্ট অর্থ বাগ্গী-জাতির শিক্ষার্থে—বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিত। এইরূপে তাহার জনহীন মাতৃ-নিবাস দিন দিন দরিদ্রদিগের কলকণ্ঠে মুগ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

যুক্তি লাভ

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

বুড়া রতনদাস বাবাজি নবদ্বীপে তীর্থ করিতে গিয়া যখন ছোট একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের লোকে একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ছেলেটি তখন বছর পাঁচেকের; বেশ ছোটপুটে, উজ্জল গৌরবর্ণ, মুখখানি অতি সুন্দর। মাথাভরা তাহার কালো কৌড়ী চুলের রাশি। পরণে তাহার অতি জীর্ণ

ছোট একখানা কাপড়, বাবাজির ভিক্ষাপাত্র বহিয়া লইয়া সে গ্রামে প্রবেশ করিল।

এমন সুন্দর ছেলে গ্রামে আর একটিও ছিল না। এমন দীর্ঘ ছোটপুটে চেহারা অনেক বড় লোকের ছেলেরও নাই, ছেলেটি যে কে তাহা জানিবার জন্য সকলেই মনে অদম্য কৌতূহল চাপিয়াছিল। তাই সকলেই গিয়া রতনদাসকে ধরিল, “বাবাজি, এ ছেলেটিকে পেলে কোথায়; কা’র ছেলে কুড়িয়ে আনলে?”

রতনদাস একটু হাসিয়া উত্তর দিল, “ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন বাবা। এ ছেলেটির পরিচয় আমি বিশেষ কিছুই জানিনে। স্বরূপনগরের কাছ দিয়ে আসতে দেখলুম পথে একটা গাছতলায় প’ড়ে কাঁদছে, শুনলুম সারাদিন কিছু খায়নি। আমার কাছে খাবার ছিল, খেয়ে বললে আমি তোমার সঙ্গে যাবো, তাই নিয়ে এলুম। ভগবানের জীব, বন্ধন সব কেটে দিয়েও তিনি আবার বন্ধনে ফেলছেন, এসব তাঁরই ইচ্ছে।”

উদ্দেশ্যে সে ভগবানকে প্রণাম করিল।

ছেলেটিকে এত জিজ্ঞাসা করা হইল তার বাড়ী কোথায়, তার বাপের নাম কি, কেন সে চলিয়া আসিল,—সে সকল প্রশ্নের উত্তর এক-কথাতেই দিয়া দিল, গম্ভীর-মুখে শুধু বলিল, “জানিনে।”

তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিল, তেমনি গম্ভীর-মুখে সে উত্তর দিল—“নিমাই।”

গ্রামবাসীগণ নিজেরাই তাহার পরিচয় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—নিশ্চয়ই সে কোনো ব্রহ্ম নারীর সন্তান, অপবাদ-ভয়ে কোথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, পাঁচ জনের অমুগ্রহে এত বড়টা হইতে পারিয়াছে।

রতনদাস তাহার কড়িবাঁধা জলো হাঁকায় তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরমুখে বলিল, “তা হ’তেও পারে, তা ব’লে ত আমি ফেলে দিতে পারিনে,—জীব নারায়ণ।

তাহার এই অত্যধিক ভক্তি দেখিয়া অনেকে চটিয়া গেল, বলিল, “জীব নারায়ণ ব’লে—তিনকাল কাটিয়ে এই শেষকালটায় জাতজন্ম হারাবে রতন দাস?”

রতন দাস হাঁকাটি পার্শ্বে রাখিয়া ললাটে হাত-ছুখানা ছোঁইয়া গদগদ-কণ্ঠে বলিল, “বৈরাগীর জাত জন্ম কি আছে দাদা-ঠাকুর? কথায় বলে জাত হারালেই বৈষ্ণব হয়, আমিও ত তাই। আমার সমাজ নেই, জাত নেই, জন্ম নেই। আমি এসবের বাইরে প’ড়ে আছি, আপনারা দয়া ক’রে স্বেচ্ছা দেখেন এই ঢের। আমি আপনাদের কোনো কাজেই ত আসিনে দাদাঠাকুর, ছেলেটি আমার কাছে থাকলেও আপনাদের কোনো কিছুর মধ্যেই যাবে না। আপনাদের পাঁচ জনের অমুগ্রহ থাকলে আমার এই

খড়ের ঘরে বাস ক’রে আপনাদের পাঁচ জনের ছুয়ারে ভিক্ষে ক’রে ওর সারাজীবনটা কাটিয়ে দেবে। অনেক হাড়ি বাগ্দীও তো আছে দাদাঠাকুর, যারা আপনাদের ঘরে-ছুয়ারে উঠতে না পেলেও আপনাদের দয়া হ’তে বঞ্চিত হয় না, এ-কেও না হয় তেমনি চোখে দেখবেন।”

রতনদাসের এই অমুগ্রহে সকলেরই মন ভিজিয়া গেল, অনেকেই বিশেষ করুণার চোখে ছেলেটির পানে চাহিল। ছেলেটি এখানেই রহিয়া গেল।

রতনদাস যেন বাঁচিয়া গেল। তাহার অনেক কাজ এই ছেলেটি চালাইয়া দিত, যথা—উনানে কাঠ দেওয়া, একঘটি জল গড়াইয়া দেওয়া, কাপড় তোলা ইত্যাদি। অবশ্য, কাজ যে খুবই বেশী তাহা নয়, তথাপি নিমাইয়ের দ্বারা এই সামান্ত উপকার পাইয়া রতনদাসের মনে হইত, সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

রতনদাসের সংসারে কেহই ছিল না। যৌবনে তাহার সবই ছিল, অবস্থাও বেশ ভালো ছিল, আর্থিক মতন ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাইতে হইত না। দু’টি পুত্র-কন্যা তাহার এই পূর্ণ কুটার একদিন আলো করিয়াছিল, তাহাদের পানে চাহিয়া একদিন রতনদাসও আশা করিয়াছিল, সে স্বখের সংসার পাতাইয়া এখানেই বাস করিবে, কিন্তু তাহার আশা ব্যর্থ করিয়া—তাহার স্বখের সংসার হুঃখময় করিয়া একে-একে জী, দু’টি পুত্র-কন্যা, সবাই চলিয়া গেল। তখন রতনদাসের বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর, অনেকে তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসার বাঁধিতে উপদেশ দিল, কিন্তু রতনদাস রাজি হইল না। নূতন করিয়া আবার সংসার পাতাইতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, সে সংসারে বাস করিয়াও অনাসক্ত রহিয়া গেল। হরিনামে সে উন্মত্ত হইয়া গেল, আর কোনো কষ্ট-হুঃখকে সহজে আমল দিল না। বৎসরের মধ্যে এগারো মাস সে ঘর ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া দেশে-দেশে বেড়াইত, একমাস সে কোনো ক্রমে বাড়ীতে থাকিত।

নিমাইকে আনিয়া তাহার পায়ে সত্যই শৃঙ্খল পড়িল, সে আবার সংসারী হইয়া পড়িল।

দেড় মাস তাহাকে একাদিক্রমে বাড়ী থাকিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। কেহ বা মুখ ফুটিয়াই

জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই রতন, এখনও যে বাড়ী ছেড়ে বা’র হওনি?”

রতনদাস একটু হাসিয়া তখনি গভীর হইয়া উত্তর দিল, “উপস্থিত কিছুদিন বা’র হবো না ব’লেই ভেবেছি দাদাঠাকুর, তা’র পর—ভগবানের যদি ইচ্ছে হয়। তিনি নিজেই নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবেন।”

বর্ষার আগে সে যখন পর্ণকুটারের পার্শ্বে বহুকাল হইতে পতিত একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়া মাচা তুলিয়া নানাবিধ শাকসব্জি বুনিতে লাগিল, তখন রামনাথ চাটুর্ঘ্যে পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে হাসিয়া বলিলেন, “কি হে বাবাজি, আবার যে গাছপালাও লাগিয়ে ফেললে।”

রতনদাস একটু হাসিয়া বলিল, “কি করি বলুন? আবার একটি প্রাণীকে গলায় পেঁথে দিলেন, ফেলতে পারলুম না।

রামনাথ বাবু বলিলেন, “কিন্তু ফেললেই বোধ হয় ভাল হ’তো বাবাজি। তোমার বেঁচে সম্বোধ করাটা বড় আশ্চর্য্য ব’লেই মনে হয়। ত্রিশ বছর বৈরাগ্য নিয়ে থেকে আবার সংসারী হ’য়ে পড়লে—তা আবার ভীষণ-রকম। যাই হোক, দেখো,—শেষকালটায় যেন রাজা ভরতের মতন না হয়!”

তিনি চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন আগে বৈশাখ মাসে গ্রামে কথকতা হইয়া গিয়া ছিল, কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে, কেহই অশ্রু সামলাইতে পারে নাই। সে-সময়টায় রতনদাস গ্রামেই ছিল, সেও কথকতা শুনিয়াছিল। রাজা ভরতের দুর্দশা শুনিয়া সেও চোখের জল সামলাইতে পারে নাই, সেদিনও সে ভগবানকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়াছিল—ঠাকুর, তুমি বেশ করিয়াছ, আমার সকল বন্ধন খসাইয়া আমার মুক্ত করিয়া দিয়াছ। সে সেদিনও প্রার্থনা করিয়াছিল যেন মায়ামোহে তাহাকে আর জড়াইয়া পড়িতে না হয়, সে যেন মুক্ত থাকিয়া ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাইয়া যাইতে পারে।

তাহার হাতের বীজ মাটিতে পড়িয়া গেল, সে শূন্য-নয়নে অসীম আকাশের পানে দৃষ্টি রাখিয়া আর্দ্রভাবে বলিয়া উঠিল, “একি করলে ঠাকুর, এমন ক’রে মায়ার

জড়ালে কেন? আমি ত এ চাইনি প্রভু, কেন আমার এ-কে দিলে?”

বিচানাধু গিয়া সে শুইয়া পড়িল।

উনানে ভাত হইতেছিল, নিমাই ভাতে আল দিতেছিল। ভাত পুড়িয়া ছুর্গন্ধে যখন চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল তখন তাহার জ্ঞান হইল, সে ঘরে আসিয়া দেখিল, রতনদাস শুইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার কাছে যাইবামাত্র রতনদাস চোঁচাইয়া উঠিল, “খা এখন হ’তে, আমার কাছে আসিস্নে বলছি, দূর হ’য়ে যা।”

খতমত খাইয়া নিমাই দাঁড়াইয়া রহিল।

রতনদাসের মনে আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবেই রাজা ভরতের উপাখ্যান জাগিয়া উঠিতেছিল। হায়রে, হতভাগা ভরত রাজ্য ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ভগবানের তপস্যা করিতে বনে গিয়াছিলেন, মায়াকে তিনি জ্ঞোষ করিয়া তাড়াইতে গেলেও তাড়াইতে পারেন নাই, তাই সামান্ত একটা হরিণশিশুর মায়ায় তিনি জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে স্বাধীন জীব, ইচ্ছামত কহদিন রহিল, তাহার পর কোথায় উধাও হইয়া গেল। ভরতের আহা-নিজ্রা গেল, যাহার জন্ত সব ত্যাগ করিয়া নির্জনে বনে গিয়াছিলেন, সেই ভগবানের আরাধনা গেল—কোথায় হরিণ, কোথায় হরিণ করিয়া বনে-বনে খুঁজিতে লাগিলেন। কত ঝোপ দেখিয়া হরিণ-স্রমে ছুটিলেন, কতবার আছাড় খাইলেন। তাহার পর তাহার মৃত্যুকাল, তিনি তখন কি চিন্তা করিতেছেন? ভগবানের চিন্তা তাহার মনে ছিল না, সেই হরিণের চিন্তা তাহার মনে, তাহার চিরতরে নিমীলিত-প্রাণ চক্ষু তখনও সেই হরিণকে দেখিবার জন্ত ঘুরিতেছে। ইহার পর ভরত সেই হরিণ-জন্ম পাইলেন। একসময় জ্ঞান তাহার পূর্ণ-মাত্রায় ছিল, তাই তিনি দিন-রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন।

কি হৃদয় এই উপাখ্যানটি, মায়াতে জীবকে যে কত কষ্ট দেয় তাহা যেন স্পষ্টই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অনাথ শিশুটিও সেই হরিণ শিশুর মতন রতনদাসের এতদিনকার আরাধিত মুক্তিপথ বন্ধ করিতে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। ভগবান্, রক্ষা করো, চিরপ্রার্থিত মুক্তি হইতে বঞ্চিত করিও না, তাহাকে পরিজ্ঞাপ করো।

এই ছেলেটিকে কোথাও দিবার জন্ত রতনদাস ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

(২)

এই কয়মাসের মধ্যে নিমাই গ্রামের সব চিনিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেটি ভারি শাস্ত্রভাবের ছিল, কথা-বার্তাও তাহার বড় সুন্দর ছিল; সেইজন্ত সে সকলেরই মনজরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে যতটা দূরে রাখা হইবে তাহা হইয়াছিল, ততটা দূরে সে রহিল না; দিন-দিন যেন সে গ্রামের লোকের খুব কাছে আসিয়া পড়িল।

রতনদাস তাহাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিবার জন্ত যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে একটুও জানিতে পারে নাই। রতনদাসের গম্ভীর মুখখানা দেখিয়া সে আর ততটা সাহস করিয়া তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই, সে রকম অসঙ্কোচে কথাও বলিতে পারে নাই। রতনদাস তাহাকে খাইতে দিত, সে-রকম জোর করিয়া আর ধরিয়া ধাঁওয়াইত না। আগে নিজের কাছেই তাহাকে শোয়াইত, এখন একটু তফাতে তাহার বিছানা করিয়া দেয়। ছেলেমানুষ, রাত্রে একদিন ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল,—‘বাবা’, আমি তোমার কাছে আগেকার মতন শোবো।’ রতনদাস খুব জোরে একটা ধমকু দিয়া উঠিতেই সে ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছিল।

আসল কথা—রতনদাস আর এই পবের ছেলের মায়ায় জড়াইবে না। ভগবান্ তাহাকে সংসারের নিয়মানুসারেই বাঁধন পরাইয়া দিয়াছিলেন, আবার একে-একে নিজের হাতেই সকল বাঁধন খসাইয়া দিয়াছেন, এখন কেছায় আর মায়ায় বাঁধনে পড়িতে সে চায় না।

ছেলেটার পানে সমস্ত দিন আর সে চোখ তুলিয়াও চায় না। রাত্রে পৃথক বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে, রতনদাস এক ঘুম দিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বলাইয়া তামাক খাইতে-খাইতে অন্তমনস্কভাবে তাহার পানে চাহিয়া ভাবে—বেচারাকে ওখানে শোওয়ানো উচিত নহে। ছেলেমানুষ,—ভয় পাইয়া রাত্রে উঠিয়া পড়ে,

সে-সময়ে তাহার গায়ে হাত থাকিলে সে নিশ্চিন্তভাবে তাহার বুকের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। একদিন ধমক খাইয়া সে আর কাঁদিতে পারে না, ডাকিতে পারে না, ভয়ে-ভয়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া হুই হাতে বালিশটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আহা, এরকম করাটা কি রতনদাসের উচিত হইতেছে? ও যে নেহাৎ ছেলেমানুষ—”

‘ভাবিতে-ভাবিতে চট করিয়া মনে জাগিয়া উঠে রাজা ভরতের কথা। না না, এ তফাতেই থাক, বুকের মধ্যে পবের ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাজ নাই। এই যে সমস্ত ভালোবাসাটা দিয়া সে এই ছেলেটিকে ধরিবে, তাহার পর সে পবের ছেলে যখন চলিয়া যাইবে তখন তাহার উপায় কি হইবে? ভগবানের নাম করা খাইবে না, এই পবের ছেলেটার ভাবনায় সে সব ভুলিয়া যাইবে। —

মনটা তাহার নিমিষে কঠিন হইয়া উঠিত, সে জোর করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া অন্তদিকে চাহিত, আলো নিভাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িত। জোর করিয়া ভগবানের নাম করিতে চাহিত—এ-বাঁধন দিয়ো না প্রভু! —

হায় রে! এই নামের মধ্যে—প্রার্থনার মধ্যে মনে হইত বেচারী অদূরে বিছানার উপর একলাটি পড়িয়া আছে। এই অঙ্ককারে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া সে ভয়ে তাহাকে ডাকিত না।

খড়খড় করিয়া উঠিয়া সে আলো জালিয়া দিত। বেচারী শিশুটিকে সব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিত। সে ত সব রকমে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলিতেছে, একটা আলো—তা জ্বলাইয়া রাখিতে দোষ কি?

পবের গরু আসিয়া তাহার চোখের সামনে বাগানের বেড়া ভাঙিয়া ফেলিল, মাচার উপর লাউগাছ, কুমড়া-গাছ ফলেফলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সম্মুখে সেই গাছগুলি খাইতে লাগিল; সে দেখিল, কিছু তাড়াইল না, নিমাই গরু তাড়াইয়া দিতে গেল,—রতনদাস বাশ লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া গেল—“খাচ্ছে থাক না কেন, তোর তা’তে কি, কেন তুই গরু তাড়াতে যাবি?”

কেট বৈরাগী পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে অমন সুন্দর

গাছগুলির এই দুর্দশা দেখিয়া দুঃখে বলিল, “গাছগুলো এমনি ক’রে কাড়িয়ে থেকে পরের গরু দিয়ে খাওয়ালে দাদা, তবে এতটা কষ্ট ক’রে গাছ লাগালেই বা কেন?”

বৃদ্ধ রাগ করিয়া উত্তর দিল, “লাগিয়েছিলুম ইচ্ছে ক’রে, এদের খাওয়াচ্ছিও ইচ্ছে করে, তা’তে কারও কোনো কথা বলবার দরকার দেখছিনে।”

ছেলেটাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়। এ যেন তাহার পায়ের শিকল হইয়াছে। আর স্বেচ্ছামত কোথাও যাইবার জো নাই, নড়িতে-চড়িতে শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। এ যে ভারি মুশ্কিল হইয়াছে, এ ভার সে নামায় কোথা।

ঠিক এমনি-সময়ে একদিন নিমাই জ্বর করিয়া বসিল। দুপুরেই তাহার জ্বর আসিয়াছিল, ভয়ে সেকথা সে রতনদাসকে জানাইতে পারে নাই। ক্রমান্বয়ে সে ধমক খাইয়া আসিতেছিল, অথচ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার অপরাধ কোন্খানে, কেন সে তিরস্কার লাভ করে। সে ছোটো শিশু হইলেও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল রতন দাস তাহাকে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, সেও সেইজন্য সেও খুব দূরে-দূরে ছিল।

সন্ধ্যা-বেলায় রতনদাস এক হুকুর দিল, “নিমাই, ভাত খাবি যদি—আয়।”

নিমাই বারাণ্ডায় একটা কোণ নির্বাচন করিয়া বসিয়া কাপিতেছিল, সে উত্তর দিল, “আজ ভাত খাবো না, বাবা।”

রতনদাস আর কথা বলিল না, নিজের ভাত খাইয়া লইল। একবার বলাটা কর্তব্য, যেহেতু ভগবানের জীব, নারায়ণ উহার মধ্যেও আছেন; তাই বলিয়া সে কি নিমাইয়ের হাত ধুরিয়া টানাটানি করিয়া আনিয়া ভাত খাওয়াইতে বসাইবে, তাহাতে মাঝাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র।

অনুরে নিমাইয়ের বিছানা করিয়া দিয়া সে তামাক টানিতে বসিল। নিমাই আজ পরনের কাপড়খানা দিয়া গা ঢাকিয়া অত্যন্ত জড়সড়ভাবে শুইয়া পড়িল ও তখনি ঘুমাইয়া পড়িল।

রতনদাস তামাক খাইতে-খাইতে তাহার পানে

চাহিতেছিল। তাই ত—আজ নিমাই এ রকম করিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শুইয়াছে কেন? এই গরমে রতনদাসের গা দিয়া ঘাম পড়িতেছে, নিমাইয়ের কি গরম লাগিতেছে না?

কি আপদ! উহার যা হয় তাই হোক না কেন; শীতই বোধ হোক অথবা গরমই বোধ হোক, তাহাতে রতনদাসের কি? উহার কথা ভাবাও যে মহা পাপ। নাঃ, ভগবানকে ভাবা থাক, মুক্তির প্রার্থনা করা যাক।

রতনদাস মালা জপ করিতে বসিল।

নিমাই জ্বরের তাড়নায় বকিতেছিল; ক্রমে প্রবল শীতের জন্ত সে দুই হাঁটু বকের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। মালা জপ করিতে-করিতে রতনদাস একান্ত উদাসভাবে তাহার পানে তাকাইল। দুর্ভাগ্য, যে, উদাসীনতা বেশীকণ রহিল না।

আচ্ছা, নিমাই আজ তুল বকিতেছে কেন, এত শীতই বা কেন? তবে কি উহার অসুখ করিয়াছে? হাঁ, তাহাও ত বিচিত্র নয়। যে ছরস্তু ছেলে, বারণ করিলে যদি কথা শোনে। আজ কয় মাসই যেন রতনদাস তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে, তার আগে ত দিনে না হোক পঞ্চাশবার তাহাকে বারণ করিয়াছে, বেশীকণ যেন জলে না থাকে, বৃষ্টিতে যেন না ভেজে, তেঁতুল, আমড়া প্রভৃতিগুলো যেন না খায়। ভয় ত দেখাইয়া দিয়াছিল, একবছর সে এখানে আসিলেও যদি একবার জ্বর হয়, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়া ধরিবে—তখন সারানো মুশ্কিল হইবে। আজ-কাল যেন রতনদাস নেহাৎ মায়া কাটাইবার জন্তই কোনো কথা বলে না, তাহা হইলেও ত তাহার আপেকার উপদেশগুলো মনে রাখা উচিত। বয়সও ত হইল, ছয় বছর যার বয়স হইয়াছে, তাহার অনেকটা ভালোমন্দ জ্ঞান থাকা উচিত। সে কি বুঝিতেছে না, নেহাৎ মায়া কাটাইবার জন্তই রতনদাস একটু তফাতে রহিয়াছে, তাই তাহাকে হাতে করিয়া ভাত খাওয়ান না, বকের মধ্যে লইয়া শোয় না।

রতনদাস মালা ফেলিয়া উঠিল, আশ্বে-আশ্বে গায়ের কাপড়খানা সরাইয়া নিমাইয়ের গায়ে হাত দিল, উঃ, গা



চিত্রকর শ্রী বিপিনচন্দ্র দে
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

যে ভারি গরম। কখন জর আসিয়াছে তাই বা কে জানে? ছপুর হইতে আজ সে বাইরেই ছিল, সেই সময়ে নিশ্চয় জর আসিয়াছে।

নাঃ, ছেলেটা ভারি ভাবাইয়া ভুলিল। এখন এই জর অবস্থায় ইহাকে একা বিছানায় ফেলিয়া রাখা চলে কি? ভালো অবস্থায় রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলেও চলে, অস্থির অবস্থায় ঘুম ভাঙিয়া যদি ভয় পায়—জর যে ছাড়িবে না। আহা, হৃদয় জরের তাড়নায় কত কাঁপিয়াছে, যন্ত্রণায় গোপনে চোখের জল ফেলিয়াছে, মুখ ফুটিয়া তবু তাহাকে তো বলিতে পারে নাই।

রতনদাসের হৃদয়টা বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল। ছেলেটি যে পরের, দু'দিন বাদে—হরিণ-শিশু যেমন করিয়া রাজা ভরতকে ফেলিয়া পলাইয়াছিল—তেমনি করিয়া পলাইবে, তাহা সে ভাবিতে একেবারেই ভুলিয়া গেল। উপরে বাঁশের উপর লেপখানা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা ছিল, রতনদাস ছোটো টুলখানা টানিয়া আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া একঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমে লেপ পাড়িল, সেখানা আশু-আশু রতনের গায়ের উপর চাপা দিয়া নিজের বিছানা টানিয়া কাছে আনিল।

সমস্ত রাতটাই যে বিনিদ্র ছুটি চোখ তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, একখানি হাত বড় স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া বৃকের মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহা নিতাই মোটেই জানিতেই পারে নাই। সকালবেলা খুম ভাঙিতেই সহজ জ্ঞান পাইয়া সে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল, তাহাকে বৃকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতনদাস তখনও ধুমাইতেছে। নিজের গায়ে লেপ দেখিয়া সে সবই বেশ বুঝিতে পারিল। অভিমানে শিশুর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সে বৃকের বৃকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া কোনোরকমে কাপাটাকে চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নিমাই ভালো হইবামাত্র রতনদাসের হারানো অশান্তিটা আবার ঘুরিয়া আসিল, অহুতাপে তাহার হৃদয় জর্জরীভূত হইয়া উঠিল। হায়রে! সব ছাড়িয়াও আবার যে জড়াইয়া পড়িতে হয়। সব-রকমেই সে মাগাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অস্ব হয় কই? আরও যে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। একপে কি তাহার

ভগবানের সাধনা করা হইবে? সব ব্যর্থ হইয়া গেল! তাহার এতদিনের সাধনা, ভজনা, মালা-জপ,—এই শিশুটা সব নষ্ট করিয়া দিল!

রতনদাস ছুইহাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। না, ইহাকে কাছ ছাড়া করা চাই-ই, নহিলে সে ঠিক আবার তাহাকে মাগাতে বাঁধিবে, তাহার মুক্তি কিছুতেই হইবে না।

কোথায় দেওয়া যায়?

ভাবিতে-ভাবিতে মনে পড়িয়া গেল, পাখবস্তী গ্রামে মোহান্ত স্বরূপদাসের আখড়ার কথা। তাহার সম্পর্কীয়া এক ভগিনী এই আখড়ায় থাকে। তাহার কাছে ছেলেটিকে দিলে খুব সম্ভব সে রাখিবে। অবশ্য কিছু টাকা দেওয়া চাই, নহিলে তাহারা ছেলেটিকে হৃদয় রাখিবে না, নানা আপত্তি জানাইবে। টাকা পাইলে তাহারা একটি কথাও বলিবে না, নিশ্চয়ই রাখিবে।

পরদিন আহার করিয়া নিমাইকে খাওয়াইয়া তাহাকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে বলিয়া সে বাহির হইল।

প্রথমটায় ভগিনী এতটুকু ছেলে লইতে আপত্তি করিল, কিন্তু রতনদাস যখন টাকার কথা বলিল, তখন তাহার সে আপত্তি আর রহিল না, সে সহজেই রাজি হইয়া গেল; দ্বিগ্ভাসা করিল, “কবে তা'কে পাঠাবে, দাদা?”

দাদা গম্ভীরমুখে বলিল, “একদিন দিবে যাব।”

ভগিনীর উপস্থিত কিছু টাকার দরকার ছিল, কারণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াও সে বেশ একটি ছোটোখাটো সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিল; একটি গরু আনিয়াছিল, তাহার সব টাকা দেওয়া হয় নাই।

সে বলিল, “তবে কাল সকালেই ছেলেটিকে পৌছে দিবে যেয়ো দাদা, এখানে এসেই দু'জনে খেয়ো, সেখানে রান্না ক'রে খেয়ে আসতে বড় বেলা হ'য়ে যাবে। আমি কিন্তু সকাল-সকাল এখানে রান্না ক'রে রাখ'ব, সকাল-সকাল আসা চাই।”

“কালই সকালে”—হৃদয়টা কে ঘেন কঠিন হাতে, চাপিয়া মুড়াইয়া ধরিল। কালই সকালে, কেন দুই দিন

বাদে আসিলে ভালো হয় না কি? তাহাকে বিদায় করিতে হইবে বলিয়া কি এতই শীঘ্র বিদায় করা চাই?

না না, আর কেন, তাহাকে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। ভগবান্ দিয়াছিলেন তিনিই আবার ঋণাইয়া লইতেছেন। তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন, দেখিতেছিলেন তত্ত্ব যথার্থই তাহাকে লয় কি না। রতনদাস ভগবানের সে পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছে, সংসারের কাছে সে ধরা পড়ে নাই, সে জড়াইয়া পড়ে নাই।

মনে অবশ্যই একটু গরু যে না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। যতটা ব্যথা জাগিতেছিল ঠিক ততপানিই আনন্দ হইয়াছিল, এই বেদনাভরা আনন্দ বহন করিয়া রতনদাস ফিরিল।

রাত্রে নিমাই ঘুমাইলে সে বাস—দেয়ালের কোঁকর খুঁজিয়া গুঁজিয়া তাহার সর্ব্ব বাহির করিল। নগদ ত্রিশ টাকা কয়েক আনা পয়সা আর পরলোকগত ছেলের হাতের একগাছি সোনার তাগামাত্র তাহার সম্বল, আর কিছুই নাই।

সালোর সম্মুখে এইগুলি রাখিয়া তামাক টানিতে-টানিতে সে ভাবিতেছিল। তাগাটির পানে চাহিবামাত্র—তুলিয়া-যাওয়া-সেই-বহুদিনকার-অতীতের-কথাগুলো তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। যে ছেলেটি মারা গিয়াছে, সে নিমাইয়ের চেয়ে চার বছরের বড় ছিল। দশ বৎসর হইলেও সে নিমাইয়ের সমানই ছিল, ছোটো বেলায় অল্পে ভোগার জন্ত ছেলেটি বেশী বাড়িতে পায় নাই।

আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়া যাইত, তাহার ছেলেমেয়েতে ঘর ভরিয়া যাইত। হয় রে, তাহারা আজ সব কোথায়, কোন্ দেশে—?

সে অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল, করিতেছে কি, সে কি ভাবিতেছে? তাহাদের কথা ভাবিবে না বলিয়াই না সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে? তবু তাহাদের কথাই আবার ভাবিতেছে! নাঃ, এই হতভাগটাকে বিদায় না করিলে কিছুতেই চলিবে না, ইহারই জন্ত সেসব অতীতের কথা মাঝে-মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে।

তাগা ও টাকাগুলি বিছানার তলায় রাখিয়া দিয়া রতনদাস শুইয়া পড়িল। টাকা ত ঠিকই রহিল, সকাল

বেলা নিমাইয়ের কাপড় জামা কয়খানা গুছাইয়া লইতে আর দেরি হইবে না।

নিমাই একটু বেলায় যখন ঘুম হইতে উঠিল, তখন রতনদাসের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। নিমাইয়ের খানতিন-চার কাপড়, জামা গেঞ্জি সবই বৌচকা-আকারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। টাকাগুলি টাকাকে গুঁজিয়া তাগাটা হাতে লইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া সে কি ভাবিতেছিল।

আজ এই ত্রিশটি টাকা দিয়া আসিয়া কাল হইতে আবার তাহাকে প্রত্যহ ভিন্কা করিয়া আনিয়া তবে খাইতে হইবে, এমন একটি পয়সা থাকিবে না যাগা দিয়া সে কর-কারী কিনিবে। কিন্তু ইহার জন্ত সে একটুও ভাবে নাই, সে ভাবিতেছিল নিমাই আজ চলিয়া যাইবে সেই কথা। যত সে আনন্দকে মনে টানিয়া আনিতে যাইতেছিল, ততই যেন বেদনায় তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিতেছিল।

নিমাইকে ডাকিবামাত্র সে কাছে আসিল। রতনদাস বৌচ কাটা হাতে তুলিয়া লইয়া—যদিও ঘরে কিছুই ছিল না, তথাপি শিকলটা তুলিয়া দিয়া বলিল, “আমাব সঙ্গে চল এখনি।”

কোথায় যাইতে হইবে নিমাই সে-কথাটা বিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, রতনদাসের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে নীরবে তাহার পিছনে চলিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, বৈশাখের নিদারুণ রৌদ্রতাপে নিমাইয়ের কচি মুখখানা শুকাইয়া উঠিল। রতনদাস কয়বার তাহার মুখের পানে তাকাইল, গম্ভীর-মুখে বলিল, “হুঁ, চল, আর বেশী দূর নেই।”

আধু ডায় যখন তাহারা গিয়া পৌঁছাইল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ভগিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিল।

আহারান্তে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া রতনদাস নিমাইকে ডাকিল। সে বাহিরে আমগাছের ছায়ায় বসিয়া শূন্যমনে চারিদিক-পানে কেবল তাকাইতেছিল। রতনদাসের ভগিনী কয়েকটি তাহার সমবয়স্ক শিশু আনিয়া দিয়াছে, নিমাই কিছুতেই তাহাদের সহিত মিশিতে পারিতেছিল না। কে জানে কেন—কোন্ এক অজ্ঞাত

ভয়ে তাহার বুকটা কাঁপিতেছিল, থাকিয়া-থাকিয়া চোখে কেবল জল আসিতেছিল। ছুই করতলে চোখের জল মুছিতে-মুছিতে সে ভাবিতেছিল—বাধা তাহাকে আনিয়া ফেলিল কোথায়? সে যে এখন বাড়ী যাইতে পারিলে বাচে!

রতনদাস ভগিনীকে ত্রিশটাকা মিটাইয়া দিতেছিল, ভগিনীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না। সে প্রথমটায় ভাবিয়াছিল, রতনদাস তাহাকে গুটিদুই-চার টাকা দিয়া যাইবে, ত্রিশটি—আনুকোরা বাক্যকে টাকা পাইয়া তাহার আনন্দের শেষ রহিল না।

নিমাই আসিলে রতনদাস অতি সন্তর্পণে চাদরের খুঁট ছুইতে সেই তাগাটি বাহির করিয়া তাহার দক্ষিণ বাহুতে পরাইয়া দিল। এ সোনা তাগা পাওয়ার কারণ নিমাই কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

তাহার হাতখানা নিজের কোলে টানিয়া আনিয়া বিদায় মুহূর্তে রতনদাস আর্জকণ্ঠে বলিল, “খুব ভালো হ’য়ে চল্‌বি নিমাই, বাবাজি যখন যা ফরমাস করবেন তা শুনিস্, তোম পিসি যা বলবে তাই কর্‌বি, অবাধা যেন হোসনে।”

নিমাই তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সতাই কাঁদিয়া উঠিল, তাহার চাদরের কোণ চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া বলিল, “আমি এখানে থাকব না বাবা, আমি যাবো—”

রতনদাস মিষ্টমুখে তাহাকে ভুলাইয়া গেল, সে ভুলিল না, আরও বেশী কাঁদিয়া বলিল, “আমি তোমার কাছে যাবো বাবা, আমায় এখানে রেখে যেনো না, তা হ’লে—

রতনদাস ধমক দিয়া উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, “থাক থাক, আমার সর্ব্ব্ব না খেয়ে তোম শাস্তি হবে কেন? মায়াবী রাক্ষসের দল, কেবল আমায় সব-রকমে মাঝবার চেঁচা তোদের!”

ধমক খাইয়া নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে চাদর ছাড়িয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখের জল পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল।

রতনদাস আর তাহার পানে তাকাইল না, অত্যন্ত রাগ

করিয়াই—হরিবোল—হরিবোল—বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া পড়িল।

(৪)

পথে আসিতে-আসিতেই তাহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল, কতবার নিমাইয়ের সেই বিবর্ণ মুখখানার কথা ভাবিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, মনে ভাবিল ফিরিয়া যাই, নিমাইকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাখিয়া না হয় কাল ফেরা যাইবে। মাত্র দুই ঘণ্টা সে সেখানে গিয়াছে, কাহারও সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই, সেখানে সে থাকিবে কি করিয়া? একটা দিন থাকিয়া তাহাকে সব চিনাইয়া দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া রাখিয়া আসা তাহার খুবই উচিত ছিল।

দুই পা আখড়ার দিকে ফিরিয়া সে থামিল। আবার—আবার সে যাইতেছে, আবার সেই মায়াবী বাধনে জড়াইয়া পড়িবে? একটু কাঁদিয়া নিজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, সকলের সহিত হরির ইচ্ছায় নিজেই পরিচয় করিয়া লইবে। না, আর সে ফিরিবে না, আর সে তাহার কাছে যাইবে না। রতনদাস আবার বাড়ীর দিকে ফিরিল।

হায় রে! শূন্য বাড়ী কাঁদিতেছে। শিশুর অশান্ত চরণ-ক্ষেপণে সে উঠান ত গুঞ্জরিয়া উঠে না, সে যেন আজ একেবারেই মরিয়া গিয়াছে। আজ কিছুর মধ্যেই জীবনের সাদা যেন নাই। রতনদাস চুপ করিয়া বারাণ্ডার একধারে বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণ বৈরাগী সম্মুখের পথ দিয়া যাইতে-যাইতে বুড়াকে চুপচাপ বসিয়া ভাবিতে দেখিয়া বলিল, “কি দাদা, আলু যে বড় সব চুপচাপ।”

শুধু হাসিয়া রতনদাস ডাকিল, “এস নাতি, একটু গল্প করা যাক, একলা ঘরে টিকতে প্রাণ আর চাচ্ছে না।”

কৃষ্ণ তাহার পাশে বসিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে বলিল, “তোমার পুণ্ড্রপুত্রটি কোথা গেল দাদা?”

রতনদাস বলিল, তা’কে আমার বোনের কাছে স্বরূপদাস বাবাজির আখড়ায় দিয়ে এলুম। অনেক ভেবে দেখলুম, তোমাদের কথাই ঠিক, আমার কি ওসর পোষায় দাদা? সংসার ভগবান দিয়েও কেড়ে নিয়েছেন, আবার সাধ ক’রে পরের একটা ছেলে কুড়িয়ে এনে সংসার

পাতি কেন? ওসব ঝকি মাথায় নেওয়া ভারি দায়, নইলে আর কি? ভগবান যদি দিতেন, তবে আমার ঘর আজ কি খালি হ'ত? এ একটা পরীক্ষা—অর্থাৎ—সব দিয়ে কেড়ে নিয়ে আমার বৈরাগী ক'রে রেখেও এই একটা ছেলে দিয়ে দেখছিলেন আমি আবার জড়িয়ে পড়ি কি না। আমি সে চালাকিটুকু যদি ধরতেই না পারুব, তবে এতদিন ধ'রে তাঁর সঙ্গে কারবারই বা করছি কেন? দেড় বছর রাখলুম অসহ, বোধ হ'ল—ফেলে দিয়ে এলুম। যাক, এবার নিশ্চিত হয়েছি, আর কখনও কোনো জীবকে দয়া দেখাতে গিয়ে ঠকুব না।”

কৃষ্ণ কল্কেটা তাহার হাতে দিতে-দিতে বলিল, “ওইটুকুই বুঝো দাদা, ওই বুঝবার জ্ঞানটুকু থাকলে কথ'গুলো তোমায় কষ্ট পেতে হবে না, ভগবান তোমার দিন একরকম করে চালিয়ে দেবেনই।”

রতনদাস দম ভরিয়া তামাক টানিয়া কল্কে কৃষ্ণের হাতে ফিরাইয়া দিল, অশ্রুদিন সে সব তামাকটুকু নিঃশেষ না করিয়া কল্কে ছাড়িত না, কিন্তু আজ কি জানি কেন,—তামাকটা তাহার কাছে বড়ই বিখী ঠেকিতেছিল।

সে বলিল, যা বলেছ দাদা। হোঁড়াটা আসার সময় বড় কাঁদতে লাগল, আমার চাদরের এইখানাটা চেপে ধরেছিল—, বলিতে-বলিতে চাদরের যে অংশটা নিমাই চাপিয়া ধরিয়াছিল সেই দিকটা একবার দেখাইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল; আবার বলিল, “তা—আমি কি তাহাতে ভুলি? একধমকে তা'কে একেবারে চূপ করিয়ে দিলুম, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মুখের পানে চেয়ে রইল, তবু আর একটি কথা বলবার সাধ্য রইল না।”

কৃষ্ণ এ-বর্ণনাতে ষথার্থই একটু ব্যথা পাইল, বলিল, অমন ক'রে তাড়া দিয়ে চ'লে আসাটা তোমার কিন্তু উচিত হয়নি, দাদা। ছেলেমানুষ, তোমাকেই চেনে-জানে, তা'কে—”

ঠিক এই কথাটা রতনদাসের হৃদয়ের মধ্যে আর্জহুরে টীংকার করিতেছিল; সে সেই কথা বাহিরেও শুনি, অস্থির হইয়া বলিল, “এ-রকম না করলে সে থাকত কখনও সেখানে? ঠিক আমার পিছনে-পিছনে, চ'লে

আসত। এই ঘরটাতে তা'র যে কি যধু মাথানো আছে তা জানিনে, এ ঘর ছেড়ে সে কোথাও যেতে চাইত না।”

ঘরের পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু সে সজোরনিঃশ্বাসে হৃদয়ের ব্যথা কমিল না, আরও যেন জমাট বাঁধিয়া আসিল।

দিনটা তবু এখানে ওখানে সেখানে করিয়া কাটাইয়া আসিতে পারা যায়, সুদীর্ঘ রাত কাটে কই? বৃদ্ধা তামাক সাজিতে বসে, বার-বার তাহার দৃষ্টি পড়ে গিয়া সেই-খানটিতে যেখানে সে শুইয়া থাকিত। হায় রে, কোথায় কার কাছে সে আজ শুইয়া পড়িয়া আছে। বড় অভিমানী যে সে, রাত্রে ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে বিছানায় মুখখানা শুঁজিয়া দিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিলে, তবু কাহাকেও ডাকিলে না।

রাঁধিতে বসিয়া মনটা এমন তিক্তবিরক্তিতে ভরিয়া উঠে যে, তাহার আর রাঁধিতে ইচ্ছা হয় না। তা'তে জাল হয়ত নিভিয়া গিয়াছে, উঠি-উঠি করিয়াও সে আর উঠিতে পারে না, কিন্তু উনানের পানে তাকাইয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোনো একখানা তরকারী রাঁধিতে গেলে মনে হয়, কে খাইবে।

নাঃ, এমন করিয়াও দিন কাটানো যায় না। রতনদাস ভাবিয়াছিল, তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সব ভাবনা চুকিয়া যাইবে, কিন্তু ভাবনা চুকিয়া যাওয়া দূরে থাক, এ-যেন বিশ্বের ভাবনা আসিয়া তাহার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে।

বিরক্ত রতনদাস আবার দেশজমগে বাহির হইবে, স্থির করিল। এই তাহার শেষ যাত্রা, আর কিছুতেই সে এ-জীবনে দেশে ফিরিবে না।

খড়ম-জোড়া, আর খেলো হ'কা, মালা, ছু'খানা ময়লা হেঁড়া কাপড় সে তাহার ভিকার বুলির মধ্যে একদিন ভরিয়া লইল। বিদেশ-যাত্রা করিতে হইতেছে, আর সে আসিবে না।

জন্মের শোধ গ্রামটাকে একবার দেখিয়া লইয়া সে যখন ঘরে ফিরিল, তখন দেখিতে পাইল একটি অর্ধ-উলঙ্গ শিশু তাহার বারাণ্ডায় মাটিতে মুখখানা শুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

এ কে ?—বিশ্বয়ে রতনদাসের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিল, নিমাই-ই বটে। হুঃখ, মমতা, বিশ্বয় মুহূর্তে উড়িয়া গেল, রাগ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। আবার কি বিপত্তি ? কাল ছুপুরে সে চলিয়া যাইবে, আজ বৈকালে আপদ্ আসিয়া জুটিল কোথা হইতে ? আজ নয় দশ দিন মাত্র সে গিয়াছে, ইহার মধ্যে—

রাগে রতনদাস ছুটিয়া গিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিল, ক্রন্দনকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তুই আবার এসেছিস্ যে ছোড়া, কে তোকে রেখে গেল ?”

অতি কষ্টে সে উঠিয়া বসিল। তাহার গা তখন জরে পুড়িয়া যাইতেছে, মুখখানা সিঁহরের মতন লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে মোটে চাহিতে পারিতেছে না, কথা কহিতে পারিতেছে না। জড়িতকণ্ঠে সে বলিল, কেউ দিয়ে যখন বাবা, আনি পালিয়ে এসেছি। আমায় তা’রা বড্ড মারে, এই দেখ আমার গায়ে মারের কত দাগ রয়েছে। বড্ড জর হয়েছে, তবু বল্ছে গরু নিয়ে মাঠে যেতে, আ’ম তাই পালিয়েছি।”

“তাই পালিয়েছ”—রতনদাস বিকট মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল, “তাই আমায় চরিতার্থ ক’রে দিতে এসেছ ? পাজি বন্দ্যাসে ছেলে, বাসিন্দে তোকে ভাত খাওয়াবে কে রে ? দু’ হ, দু’ হ, এখান আনার বাড়ী থেকে দু’ হ’য়ে যা।”

নিমাই তেমনিই পড়িয়া রহিল, রাগের প্রাবল্যে রতনদাস তিন ছিলিম ভামাকই খাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার সময় নিমাইয়ের অশেষগণ ভগিনী আসিল। নিমাইকে সে নাকি বড় ভালোবাসে, এমন হতভাগা ছেলে যে তবু সেখানে থাকিতে চায় না। মাঠে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় গরুটিকে ছাড়িয়া দিয়া সে এখানে চলিয়া আসি-ছে। গরু নিরাপদে বাড়ী গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার বাজে ভগিনীকে এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে। আজই তাহার ফিরিয়া যাওয়া চাই, কেন-না গরু-বাছুর আছে, থাকিলে চলবে না। নিমাই যদি না যায়, তবে দাদার কাছেই থাক, সে যেমন আসিয়াছে, তেমনিই যাইবে।

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রতনদাস বলিল, “না না, নিমাই থাকলে আমার চলবে না। আমি কাল ছুপুরে মথুরায় যাবো ঠিক করেছি, ও মায়ার বাঁধনে জড়াবো না ব’লেই ত ওকে তোর কাছে দিয়েছি। সামান্য একটু জর হয়েছে বই ত না, এতখানি থাকতে পেরে থাকে যদি, অনায়াসে যেতে পারবে।”

নিমাইকে উঠাইয়া সে তাহার আদেশ জারি করিল, এখনি এই মুহূর্তে তাহার চলিয়া-যাওয়া চাই-ই, রতনদাস আর তাহার ফাঁদে কিছুতেই পা দিবে না, অতএব তাহার এখানে আসাই অন্তায় হইয়াছে।

নিমাই শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পা ও সমস্ত দেহ তাহার জরের প্রাবল্যে থর-থর কাঁপিতেছিল, ঠোঁট দিয়া একটা আর্ন্ত স্বর বাহির হইতে চাহিতেছিল, সে-জোর করিয়া ঠোঁট চাপিয়া রহিল।

তাহারা সেই সন্ধ্যাবেলায় চলিয়া গেল। আশ্চর্যের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভামাক সাজিতে-সাজিতে রতনদাস বলিল “বাক্ আপদ্ গেল, বাঁচা গেল”।

পরদিন রতনদাস চলিয়া যাইবার আয়োজনে মহাব্যস্ত, তাড়াতাড়িতে ভাতই খাইতে পারিল না।

দলে-দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, সে এই চিরবিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সকলেই দেখাশুনা করিতে আসিতেছে।

রতনদাস দরজার শিশল তুলিয়া দিতেছিল, উর্দান হইতে শশী পোদ্ধার হাঁকিল,—“বাবাজি, চল্ছ নাকি ?”

ফিরিয়া একটু হাসিয়া রতনদাস বলিল, “কেমন ক’রে বলব পোদ্ধারের পো, যতক্ষণ না ট্রেনে উঠব ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।”

শশী পোদ্ধার বলিল, “স্বরূপদাস বাবাজির আপড়ার ব্যাপারটা জানো, বাবাজি ? শুন্লুম ছেলেটি নাকি তোমার কাছেই এসেছিল, তুমি বুঝি তা’কে আবার ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?”

রতনদাস বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিল, “হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।”

শশী পোদ্ধার শুককণ্ঠে বলিল, “আহা, ততটা জর গায়ে এই আড়াই-তিন ক্রোশ পথ হেঁটে সাত বছরের

পরিজ্ঞান পাওয়ার আশায় তোমারই কাছে পালিয়ে এসে-
ছিল, তুমি সব জেনে-শুনে সেই জর-গায়ে আবার এতটা
পথ হাঁটিয়ে তা'কে পাঠিয়ে দিলে বাবাজি? সে কি কম
অত্যাচারটা সচ্ছিন্ন সেখানে? শুন্লুম তিনদিন ধ'রে তা'র
জর হচ্ছিল, তা'র ওপর এতটা মার খেয়েছে কাজ করতে
পারেনি ব'লে, তুমি আবার তা'কে কোন্ প্রাণে সেখানে
পাঠিয়ে দিলে, তা'র মরুবার জন্তেই নাকি?"

আর্ন্তভাবে চৈচাইয়া উঠিয়া রতনদাস তাহার হাতখানা
শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল—“কি—কি বললে পোদ্ধারের
পো?”

পোদ্ধার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “এখান
হ'তে ফি'রে গিয়েই ছেলে সেই খে শুয়ে পড়ল, আর উঠল
না। এক ঘণ্টার মধ্যে তা'র সব শেষ হ'য়ে গেল।
আমি কাল আখড়ায় ছিলাম; ভেলেটা যাওয়ার সময়
চীৎকার করছিলাম—“ও বাবা, বাবা গো, আমি তোমার
কাছে থাকুব, আমার কোথাও পাঠিয়ে না”, শুন্তে-শুন্তে
খামার চোখের জলে বুক ভেসে গেল, তুমি যত ধর্মই করো
না বাবাজি, এই জীবহত্যার মহাপাপ তোমারই—আর
কারও নয়; তোমার সব ধর্ম-কর্ম পণ্ড হ'য়ে গেল।”

আড়ষ্ট রতনদাস বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনের
মধ্যে বজ্রের স্বরে কে যেন গর্জিয়া বলিতেছিল, তুই-ই
তা'হাকে মারিয়া ফেলিলি মহাপাতকী!

আহা, বাছা রে, সে যে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া-
ছিল। মনে পড়িতে লাগিল নিমাইয়ের কথা, নিজের
ব্যবহার; মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন নিমাই
চলিয়া যায়, তখন তাহার মুখখানা কিরূপ হইয়া গিয়াছিল।

সুদূর আকাশের কোনোখানে দৃষ্টি রাখিয়া রতনদাস
বসিয়া রহিল। যে ট্রেনে সে যাইত, একটার সময়
সেখানা চলিয়া গেল, সে উঠিতে পারিল না, নড়িতে
পারিল না।

নিমাই—নিমাই রে!

বুদ্ধ শেষ বেলায় মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল—তোমার
ছিত ভগবান, পরাক্রম সে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না,
কাঁচা গুঁটি লইয়া খেলিতে বসিয়া তাহার হার হইয়া
গিয়াছে, মায়ার বান্ধন পরিব না ভাবিয়া মায়ার বান্ধন
পরিয়াছে। তা'হাকে বাঁচাইয়া রাখিলে না কেন প্রভু,
তা'হা হইলে দেখিতে পাইতে সে সংসারে জয়লাভ
করিতে সমর্থ হইত কিনা।

রতনদাস কলাটে করাঘাত করিয়া ভাঙাস্বরে
চৈচাইয়া উঠিল, “তুই কি রাগ ক'রে চ'লে গেলি, নিমাই?
ওরে, আমি আর তোকে তফাতে রাখব না, তোকে
বুকের মধ্যে রাখব! আয় রে, একবার ফি'রে আয়রে
নিমাই—”

জমালগীরী গান্ধার ভাস্কর্য

শ্রী প্রভাত সান্যাল

খৃষ্টীয় ও খৃষ্ট-জন্মের দুই শতাব্দী পূর্বে আফগানিস্থান,
ব্যাক্তিয়ার ও পশ্চিম-পাকিস্তানে যে-ধরণের গ্রীক মূর্তি-শিল্প
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল মহাবীর আলেকজান্দারের প্রাচ্য-
'সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষে তাহার কতকগুলি
স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতি-
র্বিজ্ঞান ও অক্ষাংশের প্রসারে গ্রীকদিগের দান
কখনও

বোধ হয় অতি অল্পই ছিল, সেই কারণে সে দানের
স্মৃতি এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়
প্রাচীন গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-
প্রদেশে যে-সকল অনপনয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা
হইতে এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে
পরবর্তী গ্রীকগণ ভারতবর্ষে গুণ বিবেতরূপেই আসেন

নাই। তাঁহারা ঔপনিবেশিকভাবেও বাস করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীকদিগের শিলা শিল্প ভারতীয় অনেকস্থানের শিলা-শিল্প হইতে বিশেষরূপ পৃথক্। গ্রীসীয়গণ, প্রথমে :গাঁণভাবে পারস্তদেশীয় চিত্র-শিল্পের সাহায্যে ও পরে ারও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শদ্বারা, ভারতীয় ভাস্কর্যের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। যদিও ভারতীয় শিল্পীগণ গ্রীসদেশের নিকট তাঁহাদের ঋণ বিশ্বস্ত হইয়াছেন, তথাপি উত্তর ভারতের গাঙ্কার ভাস্কর্যশিল্পের সহিত খাঁটি গ্রীক-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে গ্রীক বিহ্বের ও উপনিবেশ-স্থাপনের কথা প্রমাণ করাইয়া দেয়।

গ্রীকগণ ভারতবর্ষে বিজেতারূপে আগমন করেন ও এ-দেশে যথাসম্ভব গ্রীসদেশীয় আচার-ব্যবহার পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। সেলুকাস নিকেটরের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ও স্বাধীন পারস্তের অভ্যুত্থানের দরুন ব্যাক্টিয়ার গ্রীকগণ তাহাদের ইউফ্রেটিস উপত্যকা ও এশিয়া মাইনরের স্বাভাবিকগণের ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসী গ্রীকগণ পরবর্তী গ্রীসদেশীয় ও রোমকদেশীয় ইতিহাসে ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ধীরে-ধীরে তাঁহারা ভারতীয় আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম ও গ্রহণ করিয়া এ-দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অস্তুর্কিবাহ দ্বারা তাঁহারা ক্রমে এদেশের অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া গেলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের কোটি-কোটি অধিবাসীর ভিতর, এই প্রবাসী গ্রীকদের কোনো চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাক্টিয়ার ও আফ্গানিস্থানের গ্রীকগণ এক নূতন-ধরণের ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূত ও প্রবর্তক-রূপে গণ্য হইতে পারেন। এই সভ্যতার চিহ্ন চীনদেশের পশ্চিম-পারস্তদেশের সীমান্ত-প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকগণ প্রথমে বৌদ্ধ অথবা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। পরে গ্রীক নৃপতি আন্টি আলকিডাস্ মধ্যপ্রদেশের মাদ্রাস-রাজ্যের নিকট যে দূত পাঠান, তিনি ভিলসা বা বিদি-

শার নিকটস্থ বেশনগর নামক স্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ করান। এই স্থানটি এখন সিদ্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক-রাজদূতটি হেলিওডোরাস নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল ডিয়ন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। হেলিওডোরাস-নামক অপর একজন গ্রীক একটি নাগ-দেবতার মন্দির নির্মাণ করান। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ এইসব মন্দিরাদিকে বিহার বা স্তূপ আখ্যা দিয়াছেন। গ্রীক-বৌদ্ধগণ উপাসনায় মূর্তিপূজার প্রথা স্বাধীনভাবে প্রবর্তিত করেন। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধগণের ভিতর মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সেই কারণে বরহত এবং সাঁচির পাথরে খোদা চিত্রসমূহে বুদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্তির কোনোই চিহ্ন নাই। সেগুলিতে প্রভুর পদচিহ্ন দ্বারা ই তাঁহার উপস্থিতি দেখানো হইয়াছে। গ্রীকগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে মূর্তি পূজা করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় গ্রীকগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়া প্রভুর মূর্তি নির্মাণ করেন। বুদ্ধদেবের বৌদ্ধ প্রাপ্তির পর এবং বোধিসত্ত্ব হইয়া থাকিবার সময়—এই উভয় অবস্থারই মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতীয় গ্রীকগণ আফ্গানিস্থানে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে মন্দির নির্মাণ করাইয়া গ্রীসদেশীয় মোটিফ্ (চিত্রিকা) দ্বারা সজ্জিত করেন।

সমগ্র আফ্গানিস্থানে, ব্যাক্টিয়ার অনেক অগম্যস্থানে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বহু গ্রীক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে প্রাপ্ত খাঁটি গ্রীসীয়-ধরণের বা ইণ্ডো গ্রীক-ধরণের অনেক ভালো-ভালো খোদিত মূর্তি ইয়োরোপের সর্বত্র চালান হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব-পর্যন্ত পাঞ্জাবী বেনেরা এইধরণের শিলামূর্তিসমূহ ইউরোপে পাঠাইয়া বেশ লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি আইন দ্বারা এই ব্যবসায় বন্ধ করা হইয়াছে। পেশওয়ার, তকশিলা, লাহোর,, কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় খাঁটি গ্রীক-ধরণের ও ইণ্ডো-গ্রীক-ধরণের অনেক সুন্দর-সুন্দর ভাস্কর্য-শিল্পের সংগ্রহ আছে। এক্ষেত্রে ইউরোপের অনেক জায়গায় ও ব্যক্তিবিশেষের গৃহে গাঙ্কার-ভাস্কর্যের অনেক নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাবতবর্ষে বোধ হয় একমাত্র এলাহাবাদের অবসর-প্রাপ্ত ডাক্তার মেজর বামনদাস বহু মহাশয়ের গৃহেই এই-প্রকার সংগ্রহ রহিয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে তিনি এইসব সংগৃহীত মূর্তি সাধারণকে দেখান। তাঁহার সংগৃহীত উৎকর্ণ শিলালিপি ও প্রস্তমূর্তিসমূহের ভিতর গাঙ্গার দেশীয় ইণ্ডোগ্রীক শিল্পীদের তৈরী অনেক মূর্তি আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই মূর্তিগুলিকেই সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীক মোটিফ-চিত্রসমূহ নৈপুলেই প্রথমে সেগুলির স্বাভাবিক সজ্জা ও পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। গাঙ্গার-শিল্পের দুইটি বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয় পাথরের পোনা চিত্রসমূহের সাহায্যে বুদ্ধদেবের কৌরুকাকারিণী বর্ণনা করা।

মেজর বহুর সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলি মূর্তি আছে। ১নং মূর্তিট মস্তকবিহীন বুদ্ধ-মূর্তি। ২নং মূর্তিটি পরবর্তী ইণ্ডোগ্রীক যুগের অর্থাৎ কণিক, হবিষ্ক ও শক সম্রাটদের রাজত্বকালের ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন। মূর্তিটা বালি চূর্ণ নির্মিত, পাথরের নহে; এবং ইহার গড়ন

নৈপুণ্য ও পূর্ববর্তী ইণ্ডোগ্রীক শিল্পীদের মতন নয়। তৃতীয় মূর্তিটি সম্পূর্ণই আছে, কিন্তু নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই



২। চূর্ণ-বানিতে গড়া বুদ্ধমূর্তি



১। বুদ্ধ-মূর্তি [পরিধের বস্ত্রাদিঃ কারুকার্য্য অটব্য]



৩। গাঙ্গার-ভাস্কর্য্যর অবনতির এখন যুগের বুদ্ধমূর্তি



৪। বুদ্ধের মস্তক



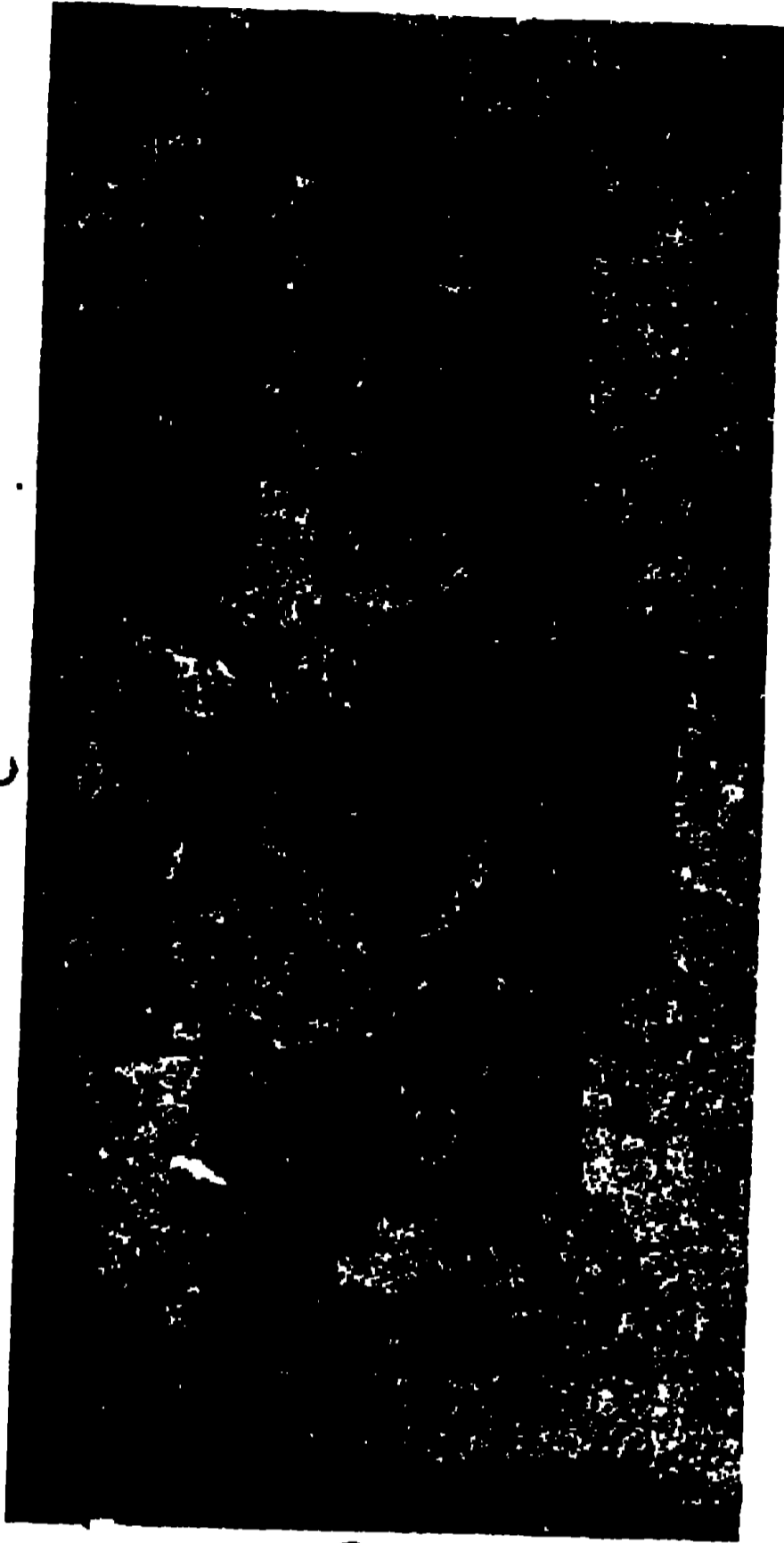
৬। বুদ্ধ মূর্তি



৫। বুদ্ধদেব



৭। বোধিসত্ত্ব-মূর্তি



মস্তকবিহীন বোধিসত্ত্ব-মূর্তি
[পলাশ হার ও সপ্তাঙ্গ আভরণ স্রষ্টব্য]



১০। বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রের



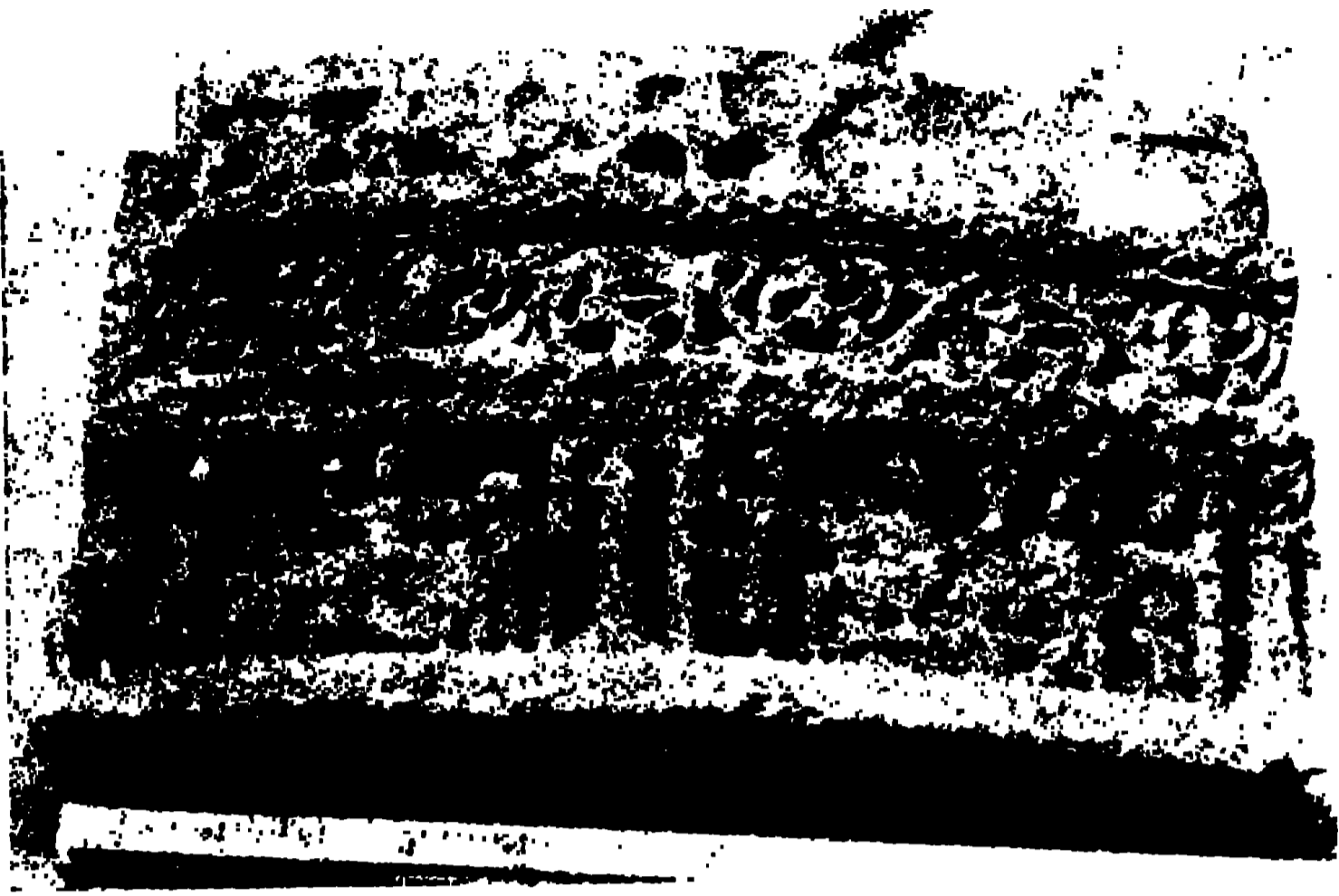
১১। বোধিসত্ত্ব সহ বুদ্ধমূর্তি, (পরিবেশ বস্ত্রাদির কারুকাৰ্য্য স্রষ্টব্য)



৯। কুমাৰমাৰ্জ্জুনের শেখতাপের বোধিসত্ত্ব-মূর্তি



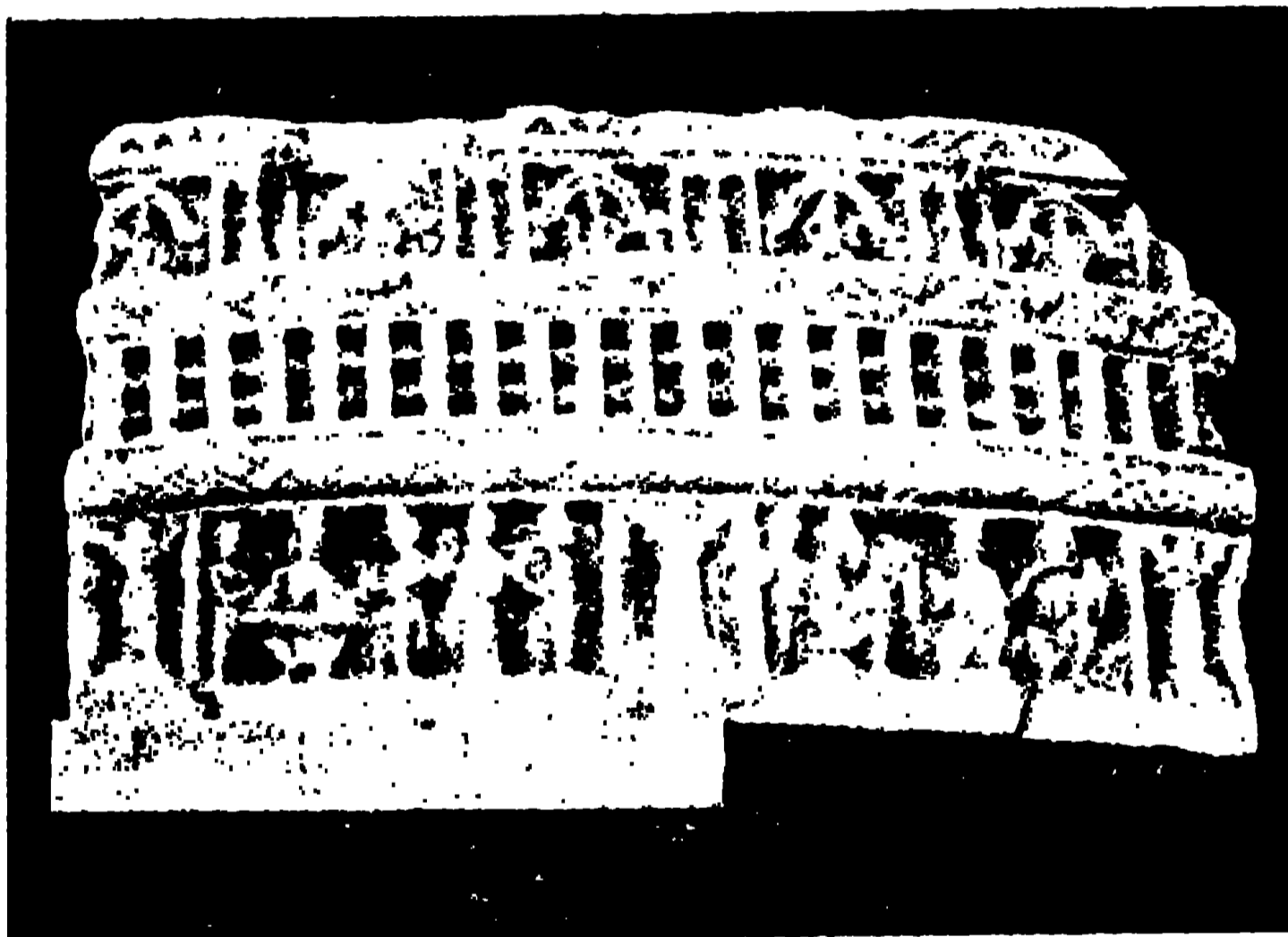
বুদ্ধের সম্মুখে একটি দৃশ্য



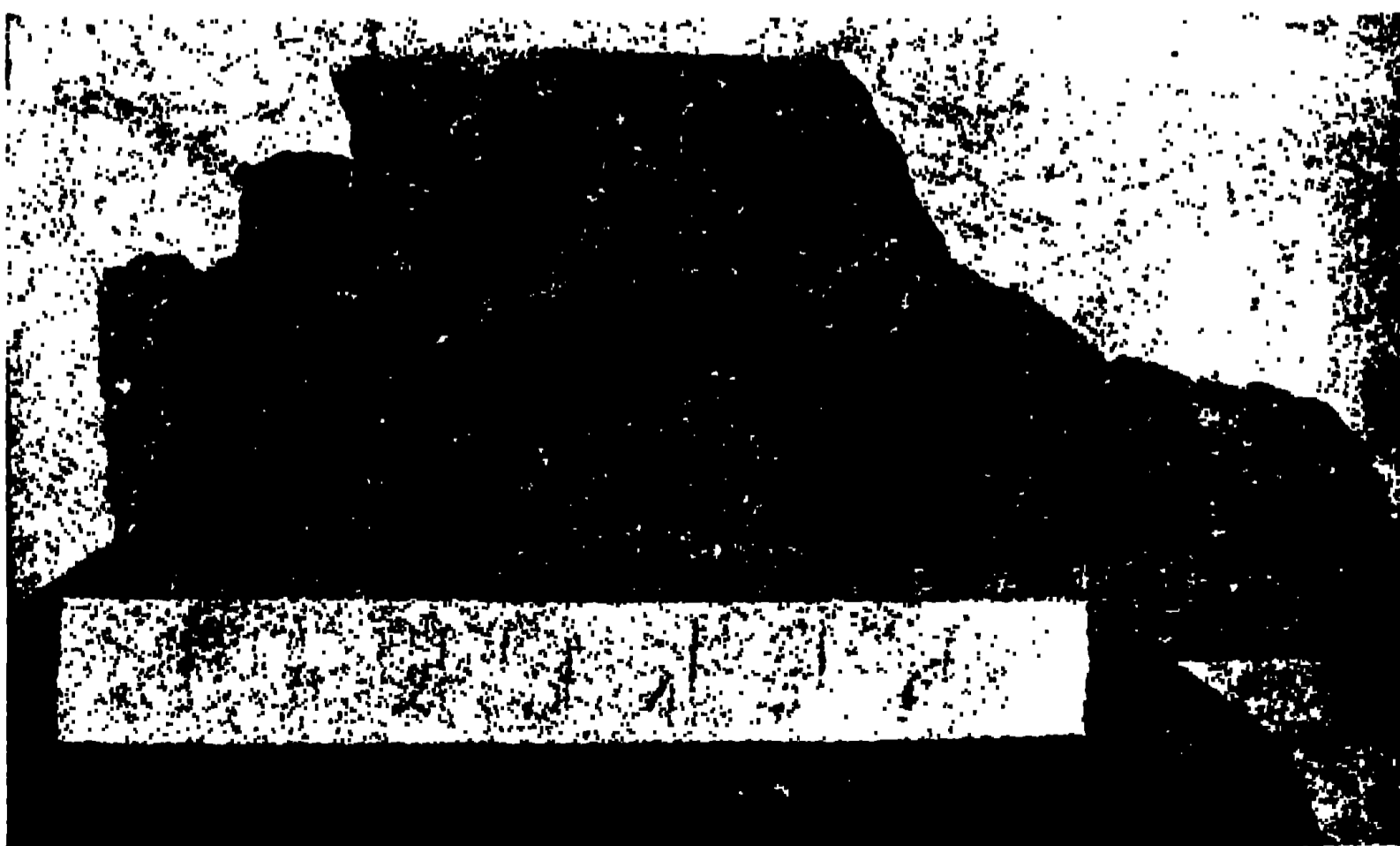
১৩। বুদ্ধের শব্দাহ



২৭। ইতোগ্রীক বিহারের দরজার চৌকাঠ



১৪। বুদ্ধের পাঠশালার গমন। মলিতবিশ্বর হইতে একটি দৃশ্য।
কলিকাতা জাদুঘরের আসল মূর্তিটি হইতে ছাঁচ প্রস্তুত





২৫। গ্রীক-ধরণে বুদ্ধ মন্দির সাজানো



২২। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষে বিভরণ



২৬। নেশার ঘোরে অর্ধ উচ্চ রমণীমূর্তি

২৭। কুশানরাজ্যের শৈবতাদের বোধিসত্ত্ব-মূর্তি



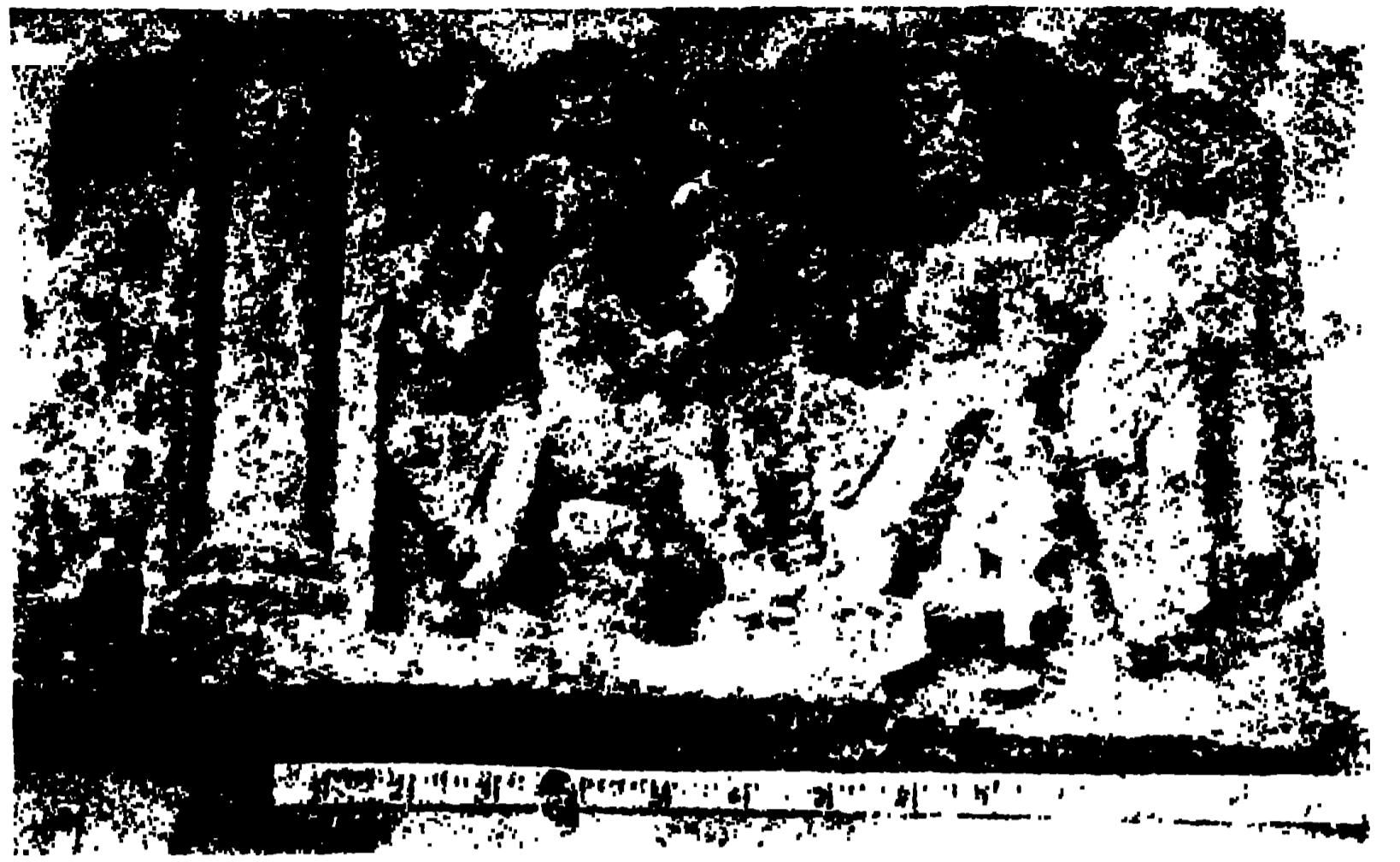
২৩। এতুর মস্তকাতরণ

মূর্তিটি গাছার-শিল্পের অবনতির প্রথম যুগের বলিয়া মনে হয়। ৪নং মূর্তিটি বুদ্ধের মতক। ইহা গাছার-শিল্পের উন্নতির সময়কার মূর্তি। ৫ ও ৬ নং মূর্তি-দুইটিতে সমাসীন বুদ্ধ ধর্মের চক্র ঘুরাইতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধ-মূর্তি খিলানের নিম্নে স্থাপিত হইয়াছে। খিলানের উপরে মন্দিরের গোলাকার গম্বুজ দৃষ্ট হয়। উভয়পার্শ্বে পরিচারকগণ রহিয়াছে। এই মূর্তিগুলি গাছার-শিল্পের অবনতির যুগের। বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির

মধ্যে ৭ নং মূর্তিটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা গ্রীকদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করার কালের। ৮ নং মূর্তিটিও এই যুগের বোধিসত্ত্ব মূর্তি। মূর্তিটির গলায় মালা ও পায়ে পাছকা ও অস্ত্রাস্ত্র বসন-আভরণ দৃষ্ট হয়। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ঐধরণের আভরণাদি ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় বোধিসত্ত্ব মূর্তিটি (৯ নং) পরবর্তী যুগের বোধি হয় কুম্ভাচরণের সমসাময়িক। ইহার পূর্ববর্তী



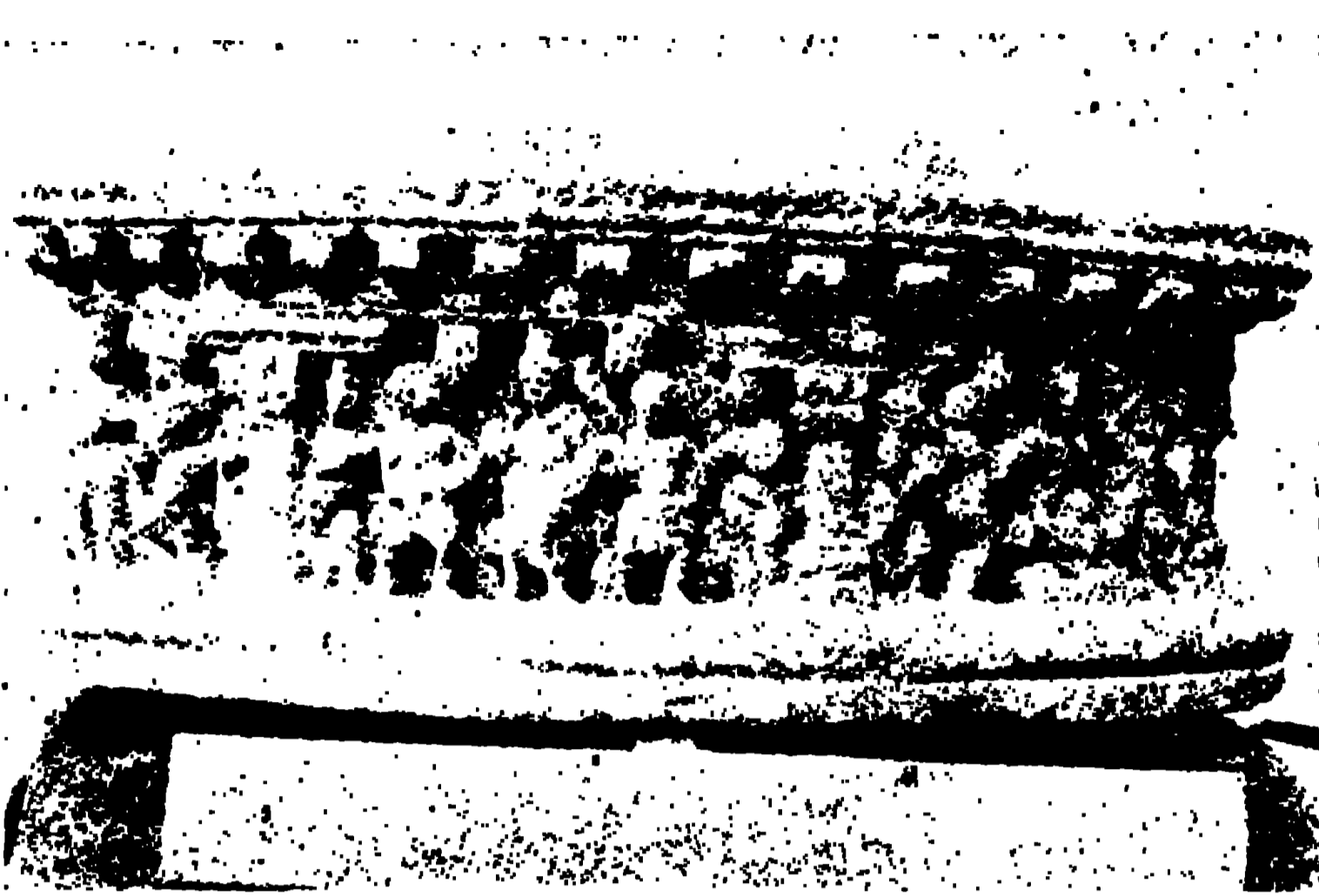
১৫। পাঠশালার অধ্যয়নরত বুদ্ধ। বুদ্ধ কাঠকলকে লিখিতেছেন



১৬। শাক্যদিংহের জন্মের মহলে বুঝাইয়া সিদ্ধার্থ

যুগের মূর্তিগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে (নং ১০) মুখাম্বলে বুদ্ধমূর্তি আসীন ৭-৮ উন্ময় পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়র মূর্তি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলি (নং ১১) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ অবস্থায় সাতটি অতীত ও ভবিষ্যৎবুদ্ধের মূর্তি ছিল। কিন্তু মূর্তিটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখন মাত্র তিনটি মূর্তি আছে। মধ্যের মূর্তিটি সমাসীন বুদ্ধমূর্তি।

মেজর বহুর সংগ্রহসমূহের মধ্যে প্রভু বুদ্ধের জীবন কথা-পরিচায়ক অনেকগুলি খোদিত চিত্র আছে। এগুলি দ্বারা বৌদ্ধ মন্দির, স্তূপ ও বিহারগুলি সাজানো হইত। যে সকল খোদিত প্রস্তর দিয়া স্তূপসমূহ সজ্জিত হইত সেগুলি অর্ধ গোলাকার। সোজা খোদিত প্রস্তর-গুলি বিহারসমূহ হইতে প্রাপ্ত। ১২ নং মূর্তিটিতে বুদ্ধের জন্ম দেখানো হইয়াছে। ইহাতে তিনটি পুরুষ-মাতৃবের মূর্তি আছে বঙ্গ হস্তে ইন্দ্রদেব, মূর্তির পুরোভাগে ব্রহ্মা ও অপর একটি দেবতা। কথিত আছে যে প্রভুর জন্ম সাধারণ মাতৃবের মতন হয় না—তাঁহার মাতার পার্শ্বদেশ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। যখন তাঁহার জন্ম হয় তখন ইন্দ্রদেব স্বর্ণনির্মিত বঙ্গ হস্তে এই দেবশিশুকে বরণ করিতে আসেন। ১৩ নং মূর্তিটি স্তূপ হইতে সংগৃহীত। ইহাতে দুইটি চিত্র দেখানো হইয়াছে। মূর্তিটি উন্নতস্থায় আছে বলিয়া দৃশ্য-দুইটি ভালো করিয়া দেখা যায় না। বামদিকের চিত্রটিতে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক



১৭। মার বুদ্ধকে প্রণাম দেখাইতেছে

উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বুদ্ধ তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে-
ছেন, পশ্চাতে একটি বৃষ আসিতেছে। দক্ষিণদিকের
চিত্রটিতে ঐ প্রাসাদেরই অপর অংশ
দেখানো হইয়াছে। ১৪নং মূর্তিটি ইণ্ডি
য়ান মিউজিয়ামের একটি মূর্তি হইবে।
এই মূর্তিটির দুইটি দৃশ্য দেখান
হইয়াছে। প্রথম দৃশ্য বোধিসত্ত্বের
পাঠশালায় গমনের চিত্র। তাঁহার
হস্তে স্নেহ বহিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে
ঋষি অসিত দেবলের ক্রোড় বোধি
সত্ত্ব। ঋষি ক্রোড়স্থ শিশুটি ভবিষ্যতে
কিরূপ বিশিষ্ট লোক হইবে তাহাই

গণনা করিয়া বলিতেছেন। দক্ষিণ-দিকে
রাজা শুদ্ধাদন ও মায়াদেবী রহিয়াছেন।
১৫নং চিত্রেও তাঁহার পাঠশালায় গমনের
চিত্র দেখানো হইয়াছে।

গৌতম যখন যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছিলেন,
তখন তিনি শ্রাব্যসিংহের অন্দরমহলে
যে রূপভাবে বাস করিতেন, ১৬নং শিলা-
চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। তিনি তখন
গৃহবাস ছাড়িতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।
পরের মূর্তিটি একটি স্তূপ হইতে সংগৃহীত।
ইহাতে দুইটি সম্পূর্ণ দৃশ্য ও একটি আংশিক
দৃশ্য আছে। ঘটনাবলী শিলাখণ্ডের

বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে শেষ হইয়াছে।
আংশিক চিত্রটিতে হিন্দু সন্ন্যাসী উৎকর্ষ কাশ্মপের সহিত



১৮। বুদ্ধদেবের শিবাগণ তাঁহাকে পূজা করিতেছে

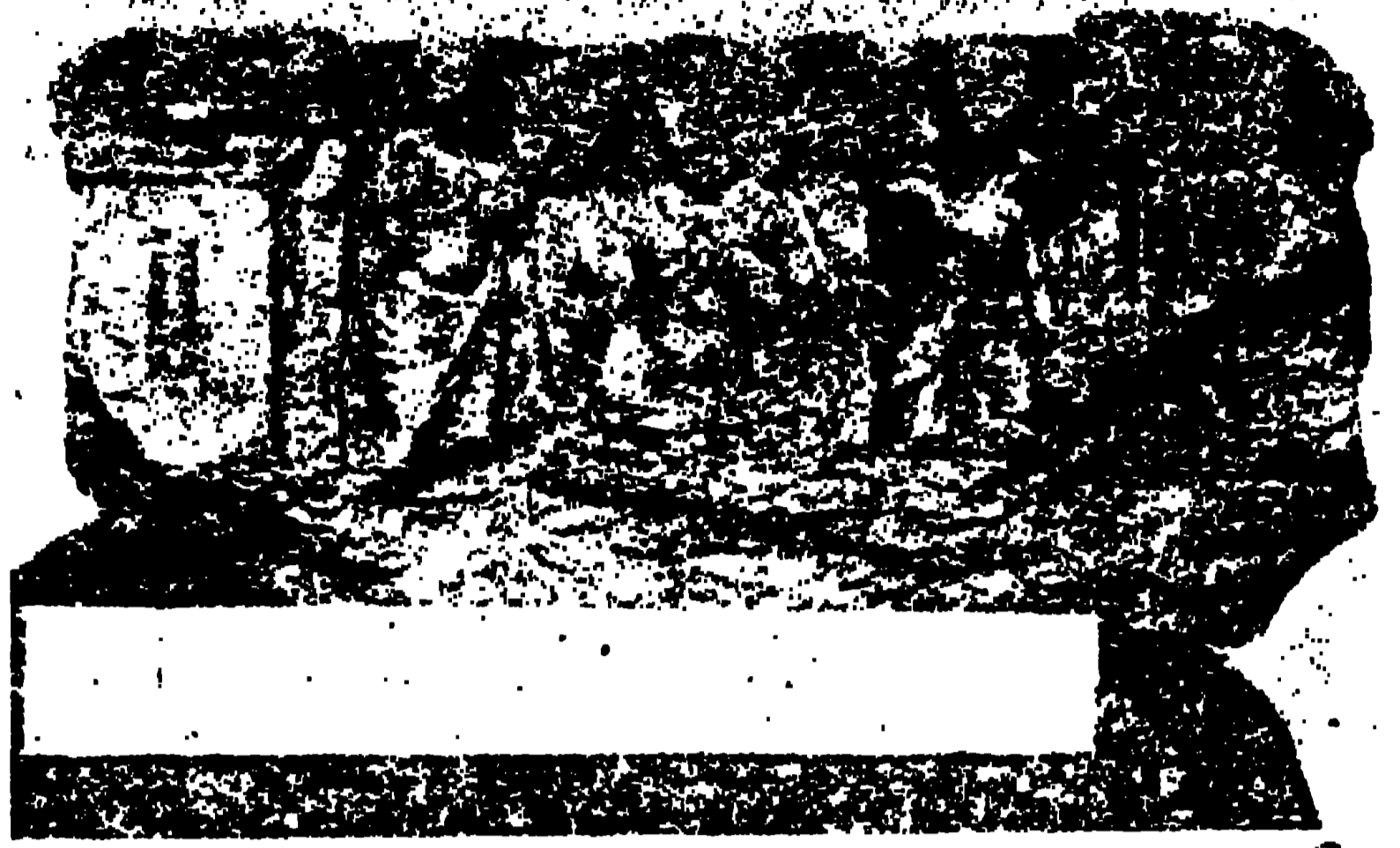
কথোপকথনরত গৌতমের মূর্তি। কাশ্মপ
পরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মধ্য-
স্থিত দ্বিতীয় চিত্রটিতে বুদ্ধদেব বৃক্ষের নিকট
আগমন করিতেছেন দেখানো হইয়াছে।
এই বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানমগ্ন হইয়াই তিনি
প্রার্থিত আলোক দেখিতে পান।

পরের দৃশ্যটি বোধিজন্ম-তলে সমাসীন
বুদ্ধের মূর্তি। উভয় পার্শ্বে কতকগুলি পুরুষ
ও স্ত্রীলোকের মূর্তি রহিয়াছে। এই
চিত্রগানতে দেখানো হইয়াছে কিরূপে মার-
দৈত্যের বা শয়তানের কস্তাগণ বুদ্ধকে প্রলুব্ধ



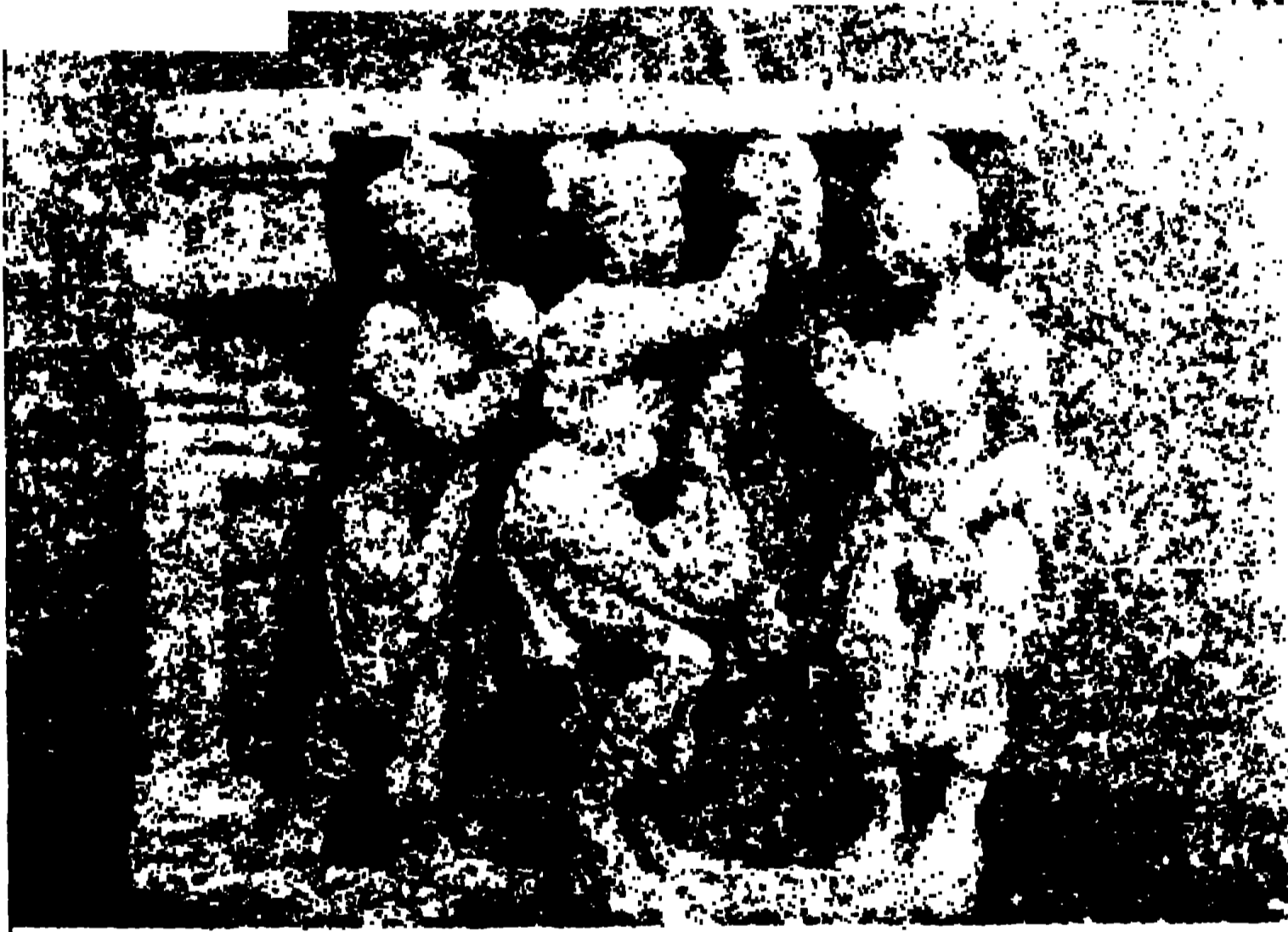
১৯। দেবদত্ত কর্তৃক প্ররোচিত প্রমত্ত হস্তী বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতেছে

করিতে চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে শয়তান মার বুদ্ধকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে। প্রথমে সে তাহার দৈত্য সেনাগণ দ্বারা বুদ্ধকে ভয়ংকরপাঠতে প্রয়াস পায়। ইহাতে বিফল হইয়া সে তাহার কুম্ভরী কন্যাগণের নগ্ন-সৌন্দর্য্য দ্বারা বুদ্ধ-দেবকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে (মূর্তি নং ১৭)। পরের চবিখানিতে প্রভুর সমাক সম্বোধি দেখানো হইয়াছে। এই শিলাখণ্ডখানি সোজা স্তম্ভাং



২০। বুদ্ধ-মূর্তি

বামদিক্কার দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর দৃশ্যটিকে একটি গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হস্তীকে বুদ্ধ আশীর্বাদ করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধের পশ্চাতে যে মূর্তিটি রহিয়াছে ভারতীয় মূর্তিশিল্পে তাহার পরিচয় একটি অস্পষ্ট সমস্যা। মূর্তিটিকে দেখিবামাত্র বহুপার্শ্ব ইঙ্গ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এস্থলে তাহার উপস্থিতির কোনো সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন এটি বুদ্ধের জাতি-ভ্রাতা দেবদত্তের মূর্তি। দেবদত্ত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন ও বহুবার বুদ্ধ-দেবকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া



২১। পুরুষ ও রমণীর সহিত কথোপকথনরত বুদ্ধমূর্তি

ইহা বিহার হইতে সংগৃহীত (মূর্তি নং ১৮)। ইহাতে দুইটি দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। বামদিকের দৃশ্যে অশ্বিনিসার সন্ন্যাসী উকবিষ কাশ্যপ তাহার কুটীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। দক্ষিণদিকের চিত্রে খের রাজা বিম্বিসার স্বজনিক বুদ্ধকে পাম করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। নং শিলা-চিত্রটিও বিহার হইতে প্রাপ্ত। ইহার দুইটি দৃশ্যের মধ্যে

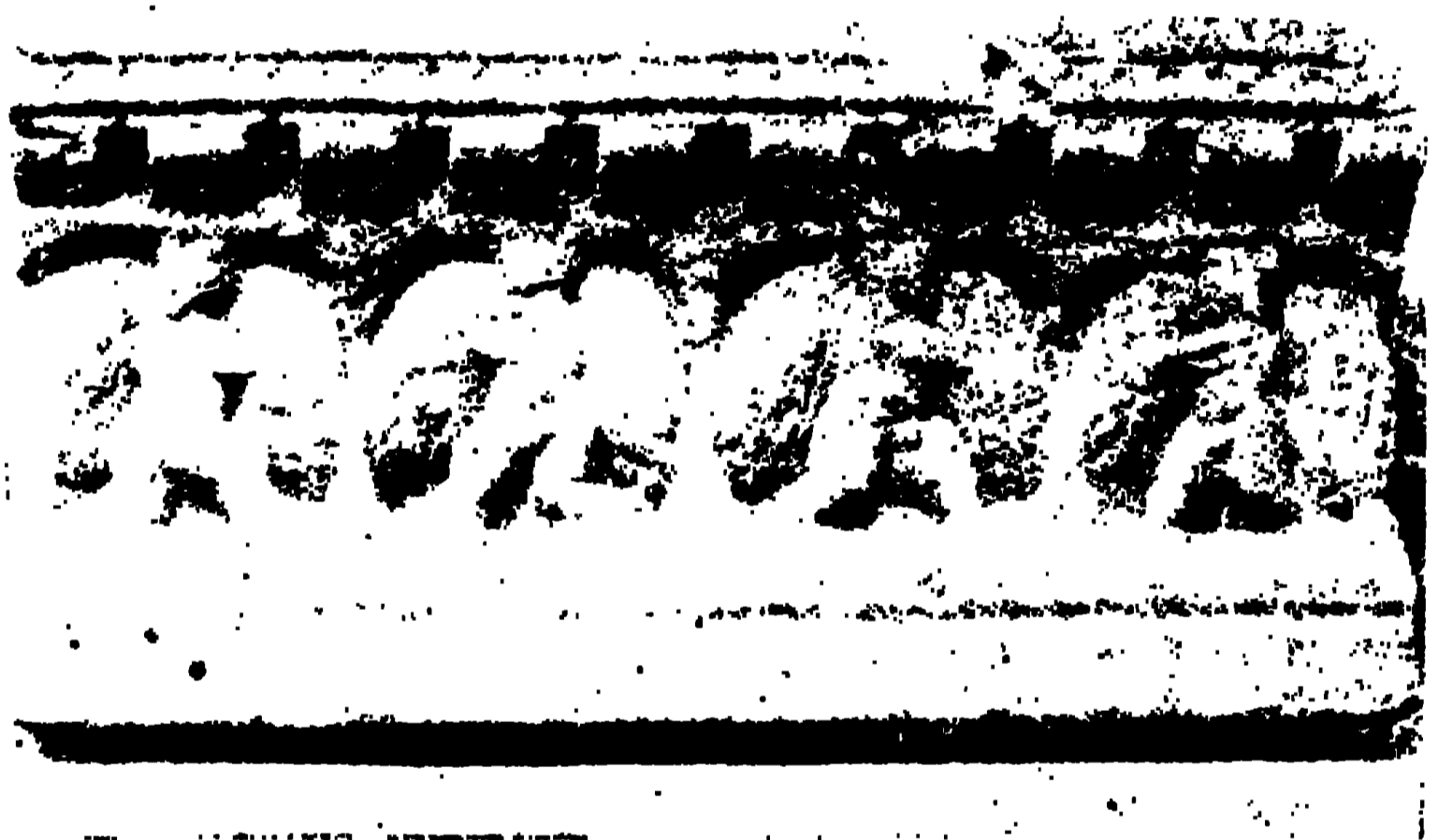


২২। মন্দির-সম্মার ব্যবহৃত বুদ্ধমূর্তি



২০। নৃত্য ও গীত

প্রকাশ। একবার তিনি একটি প্রমত্ত হস্তীর মাহতকে রাজগৃহের সঙ্কীর্ণ গলিতে বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু প্রভুর দর্শনমাত্র এই প্রমত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ ৩৩ হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়ে। ১৯ মূর্তিতে এই পদানত হস্তীটিকে প্রভু আশীর্বাদ করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধদেবের চরিতাখ্যান-সমূহে এই বৃত্তান্তটি নালাগিরির বশী-



৩০। বালকগণ ও মালা-অর্ঘ্য বহন করিতেছে



৩৩। বুদ্ধ-মন্দিরের ছই খিলান

করণ নামে পরিচিত। হস্তীটির নাম নালাগিরি রত্নপাল।

২০ নং চিত্র প্রচার-কার্যে রত বুদ্ধদেবের মূর্তি—উভয় পার্শ্বে দুইটি অমূর্ত্য। ২১ নং মূর্তিটি অসম্পূর্ণ। ইহা একটি ভগ্ন মূর্তির বামদিককার অংশ বলিয়া মনে হয়। এই দৃশ্বে বুদ্ধ একজন পুরুষ ও একজন রমণীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। দৃশ্যটি একটি গৃহের সদর দরজার নিকট বলিয়া মনে হয়। ২২নং মূর্তিতে বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ

প্রভুর ভিক্ষা বিতরণ করিতেছেন। মহাকাশ্যপ একটি টেবিলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। টেবিলের উপর ভিক্ষা-গোলক রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বে আটজন নৃপতি প্রভুর দেহাবশেষ গ্রহণার্থ পাত্রহস্তে দণ্ডায়মান। অপর দৃশ্যে (মূর্তি নং ২৩) বুদ্ধদেবের মস্তকভরণ স্বর্গে পূজিত হইতেছে, দেখানো হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের কপিলাবাস্ত পরিত্যাগ-করিবার সময়-কার ঘটনা। [কপিলাবাস্ত পরিত্যাগ করিয়া]গৌতম পথে একজন ব্যাধের

সহিত বেশ পরিবর্তন করেন। সেই সময় ইন্দ্র তাঁহার মস্তকাকরণ স্বর্গে লইয়া যান ও সেখানে তাহা পূজিত হয়। ২৪নং পাথরে-খোদা চিত্রটিতে একটি চতুঃস্তম্ভযুক্ত মন্দিরে প্রভুর দেহাবশেষ পূজিত হইতেছে।

গ্রীকগণ বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ বি-
ভাবে সজ্জিত করিতেন, তাহার
নিদর্শনও মেজর বস্তুর সংগৃহীত
শিলাখণ্ডসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।
২৫ নং শিলাখণ্ডটি একটি চৈত্যা
দরজার অংশ। একটি খিলানের নীচে



৩১। অর্ঘ্যবাহী বালকগণ



৩২। গ্রীক পুরুষ ও রমণীমূর্তি

ছই সারিতে চারিটি বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে। দ্বিতীয় খিলানের
নীচে খাটি গ্রীক আদর্শে অ্যাকান্থাস্ পাতায়
চিত্রিত নক্সা আছে। ২৩ নং শিলা-খণ্ডে একটি গ্রীক
ব্যাকাস্-উৎসবের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে
একটি অর্ধ-উলঙ্গ রমণী নেশার ঘোরে একটি পুরুষকে
আলিঙ্গন করিতেছে।



৩৬। ইথোগ্রীক শিল্পীগণ কর্তৃক নির্মিত মূর্তি

২৭ ও ২৮ নং শিলাচিত্র ইথোগ্রীক বিহারের ছইটি
চৌকাঠের। ২৯ নং মূর্তিতে তিনজোড়া নৃত্যগীতরত মূর্তি
রহিয়াছে। প্রতিদলে ২ জন করিয়া নর্তক আছে।
বামদিকের মন্তব্য-ছইটি আধুনিক পেশোয়ারীদের মতন
সজ্জিত। মধ্যস্থিত মূর্তি-ছটির মধ্যে একজন রমণী বীণা
বাজাইতেছে, অপর পুরুষটি বাশী বাজাইতেছে। দক্ষিণ



৩৫। ইণ্ডো-গ্রীক শিল্পীগণের নির্মিত মূর্তি



৪০। পাথরে খোদাই-করা সিংহমূর্তি



৪১। প্রস্তর ও বালিচূণে নির্মিত বুদ্ধের মস্তক



দিকের মূর্তিতে আধুনিক-ধরণের পায়জামা ও কোট পরিহিত দুইটি মানুষ নৃত্য করিতেছে। ইগো গ্রীক যুগের গ্রীক ভাস্করগণ বৌদ্ধ-মন্দির-সজ্জার সময় কাম-দেবের মূর্তি অঙ্কিত করিতেন। ৩০নং শিলাখণ্ডে একদল বালক একটি বৃহৎ মালা লইয়া চলিয়াছে। ৩১নং মূর্তিতে দুইটি খিলানের নিম্নে দুইটি বালক অর্থাৎ হস্তে দণ্ডায়মান। অনেক খোদিত চিত্রে খাটি গ্রীক-ধরণের মূর্তিও দৃষ্ট হয়। ৩২নং



৩৮। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা



৩৯ নং মূর্তি

মূর্তিতে একটি গ্রীক-পুরুষ ও গ্রীক রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। ৩৩নং শিলাচিত্র একটি ভারতীয় নৃগতি বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছেন, দেখানো হইয়াছে। ৩৪নং দৃশ্য মন্দির-সজ্জায় যেসমস্ত বুদ্ধ মূর্তি ব্যবহৃত হইত তাহার একটি নমুনা। ইহাতে ভিন্ন-ভিন্ন কক্ষে বিভক্ত তিনটি খিলান আছে। প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করিয়া দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মণ্ডবা মূর্তি আছে। প্রস্তর-খোদিত কক্ষগুলিকে বিভক্ত করিবার সময় ও সজ্জিত করিবার অন্ত ইগো গ্রীক শিল্পীগণ সাধারণত



৩৭। পাথরে-খোদা বুদ্ধমূর্তি

ছোটো-ছোটো চতুষ্কোণ খাম অঙ্কিত করিতেন। এইসব দেওয়ালের গাত্রে অ্যাকান্থাস পাতারও নক্সা থাকিত। ৩৫নং এবং ৩৬নং মূর্তিদ্বয়ও সুন্দর নমুনা। এইসব দেওয়ালের shaft-এর উপর সাপ, মানুষ এবং বানরের মূর্তি খোদিত আছে। ৩৭নং শিলাখণ্ড একটি সুন্দর বোধিসত্ত্ব-মূর্তির অংশ। ৩৮নং শিলাখণ্ডে মন্দিরপথ-গামী একদল মূণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষু-দল।

মোনার মোহাঙ্গা

শ্রী প্রমদাচরণ রায়, এম-এ, বি-এল

[শেক্তের অনুসরণে]

মহিম—হ্যা-পোবা লোক—চাক্বে।

নিভাই—মহিমের বন্ধু—অবস্থা ভালো।

হান—১৩।৫ বিভূক্ত প্লট—নিভাইয়ের বাড়ী।

[নিভাইয়ের পড়বার ঘর—সুন্দরভাবে সাজানো। নিভাই টেবিলের কাছে বসে একখানা বই পড়ছে। মহিমের প্রবেশ—তা'র বগলে ছাত্তা, নানা-ধরণের, নানা-আকারের জিনিবে তা'র দুই হাত জোড়া—ডিক্স লঠনের চিম্বুনি, ছেলেদের খেলবার মোটর-কার, পোষাকের মোড়ক, আরও কত কি। যেন ভাবাচ্যাকা খেয়েছে এমনভাবে একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে হঠাৎ একটা কোচের উপর এলিয়ে পড়ল।]

নিভাই—এই যে মহিম, তোমার দেখে ভারি খুশী হলুম। তা'র পর কেমন আছ? হঠাৎ কি মনে করে?

মহিম। (হাঁপাতে-হাঁপাতে) ভাই, আমি তোমার কাছে একটা জিনিব চাইছি; জোড়াহাত করে বন্ধু আমি নিরাশ করো না। আজকের জন্ত আমার একখানা ছোরা ধার দাও; বন্ধু কাজ করো।

নিভাই। ছোরা দিয়ে তুমি কি করবে?

মহিম। ছোরা একখানা আমার এখন চাই—...তা'র ভগবান... আমার এক গেলাস জল দাও ত—দীপগীর।...ভাই আমার একখানা ছোরা দিতেই হবে।...যেতে রাত হ'য়ে যাবে কিনা—তা'র পর জঙ্গলের মধ্যে চারদিকে ভ্রম—অতএব বুঝতে পারছি।

নিভাই। ওটা তোমার মিথ্যা কথা মহিম। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে তোমার কি চরকার? নিশ্চয় তোমার কোনো মতলব আছে। তোমার চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে।...আচ্ছা তোমার কি হয়েছে ঠিক করে বল দিকিন—অনুগ্রহ করেছে নাকি?

মহিম। একটু সবুজ করো; আমার একটু জিরিয়ে নিতে দাও।...হ্যা ভগবান...আমার আজ খোড়োড় করিয়েছে। আমার এমন মাথা ধরেছে, সারা গা যেন জ্বলে যাচ্ছে। আর সফল করতে পারিনে।...ভাই, কিছু জিজ্ঞেস করো না—ছোরাখানা এখনুনি দাও, এই তোমার হাত ধ'রে বন্ধু।

নিভাই। সত্যি মহিম, একটা সংসারের মাথা তুমি। পবর্নমেণ্টের বড় চাকরে হ'য়ে তোমার এ-কি কাপুরুষতা! লজ্জার কথা, ভাই, লজ্জার কথা।

মহিম। আহা! কি সংসারের মাথা। আমি একটা বলির পণ্ড বই আর কিছুই নই, একটা ভারবাহী পর্দা, একটা ক্রীতদাসের চেয়ে কোনো অংশে সুখী নই। বুঝতে পারিনে, কি আশায় এখনো সংসারে আছি। আমার মতন মুখ'আর ছুনিয়ার নেই। আঃ—কেমন আমি বেঁচে আছি? এতে কি লাভ? (কোচ থেকে লাফিয়ে উঠে) বলো, বলো, আমি কেন বেঁচে আছি—এইসব শরীর ও মনের ব্যস্ততা সফল করার কি প্রয়োজন আছে? সত্যের জন্ত জীবনপাত করার একটা মহত্ব আছে স্বীকার করি; কিন্তু আমি কিসের জন্ত প্রাণ দিচ্ছি—না এইসব

লঠনের চিম্বুনি আর ব্লাউস-পেটিকোটের জন্ত।...নাঃ, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি সফল করব না।

নিভাই। ওহে, অত চেঁচিও না, পাশের বাড়ীর লোকে শুনতে পাবে।

মহিম। শুনুকুণে, তোমার পাড়াপড়শীরা, তা'তে আমার কি এসে যাবে? তুমি যদি ছোরা না দাও ত আর একজন দেবে। আমি আর এ-প্রাণ রাখছি, আমার সফল হির।

নিভাই। আরে খামো, খামো! তুমি যে কোচের বোতাম সব ছিঁড়ে ফেললে। হির হও—তোমার কি হয়েছে বুঝিয়ে বলো।

মহিম। কি হয়েছে? এগুনো জিজ্ঞেস করুচ কি হয়েছে?...আচ্ছা সব শোনো তবে, শুনে বিচার করে আমারও মনটা একটু হালকা হোক।...তবে বসা যাক, আমি একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি।...আজকের কথাই ধরা যাক।...তুমি ত জানো আমি দশটা থেকে চারটা অবধি ট্রেজারিতে কাজ করি। সেখানে যেমন পরম, তেমনি ভীড়, মাটিরও অভাব নেই। সেক্রেটারি আছেন দুটিতে, রমেনও আদেশি—সে গেছে বিয়ে করতে। আর কয়েকজন বাড়ী গিয়ে হর শ্রীর আঁচল চাপা পড়েছে, নরত মজা ক'রে সখের খিরেটার করুচে। আর লোকগুলোও এমন বোকা যে এক কথা পাঁচ বার ক'রে বন্ধুতে হয়। সেক্রেটারির কাজ যিনি করুছেন তিনি আবার কানে ঘাটো। চারদিকে হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। একটা মোরগোল লেগেই রয়েছে—কারও কথা শুনবার জো নেই। আর আমার কাজও এত বিতর্কিত আয় এমনি একদেয়ে যে বুদ্ধিবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। আঃ—গলাটা শুকিয়ে এসেছে—আর-এক গেলাস জল দাও।...তা'র পর, হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন দেহ মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমন অবস্থা, যে দু'টো খেয়ে নিয়ে শুতে পারলে প্রাণটা বাঁচে। কিন্তু তা হবার কি জো আছে?—মকঃখলে যখন বাস করি তখন ফরমারেস খাটুতেই হবে। অন্তত আমি যেখানে থাকি সেখানকার লোক মনে করে যে তাদের ফরমারেস খাটুতেই আমি জন্মেছি। সহরে আসবার সময় অমুকের স্ত্রী ব'লে পাঠালেন তা'র একটা ব্লাউস আনতে হবে—বুকেটা একটু চওড়া চাই, কোমরটা হবে একটু সরু আর অমুক জারপার এক ইঞ্চি চওড়া লেস থাকবে। আর-এক জনের একজোড়া চীনে বাড়ীর জুতো চাই—লীলার একটা খেলনা চাই—শ্রালিকার দুগুজ আসমানী রংএর সিক্ চাই।...দাঁড়াও, আমি বর্ধ ক'রে এনেছি, প'ড়ে শোনাচ্ছি।... (কাপড় বার ক'রে পাঠ) ডিক্স লঠনের চিম্বুনি একটি—দুগুতা পলুতা চিম্বু—পাঁচ আনার মোরকা—পাঁচলের জন্ত কেশরজন তেল—দশ সের কাশীর চিনি—গিরীর জন্ত এক তোলা বাদলরামের স্ত্রী। বাড়ী থেকে নিতে হবে—চিনির টিন—জুতোর মাপ—২।৭ মথর গ্রে প্লটে দেবার জন্ত দুসের বেগুন—৭।৫ মথর পটলডাঙার দ্বিত এক টিন ঘি—রামবাগানে শ্রামবাবুকে একটা কোচ পৌঁছে দিতে হবে। এ-ছাড়া আরও কত ফরমারেস আছে তা লিখে আনবার সময় হয়নি—সেগুলো মনে ক'রে রাখতে হবে।—তা'র পর কাল আবার

স্বধীরের জন্মতিথি-উপলক্ষে তাঁকে একটা খেলার মোটর-কার দিতে হবে—
গিন্নী মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন। যোগেশ-বাবুর জ্বর অবস্থা ভালো
নয়— তাঁর জন্ম রোজ একবার ক'রে লেডি-ডাক্তারের বাড়ী দৌড়তে হয়।
এমনি কত কি। আমার পকেটে আছে পাঁচগুনা ফর্দ—তা ছাড়া এই
দেখ কাপড়ের কোণেও আবার পেরো দিয়ে দিয়েছে একটা। টেশন থেকে
পড়ি-কি-নরি ক'রে অফিসে ছুটতে হয়—আবার অফিসের ছুটি হ'লে
চরকির মতো সারা কলকাতা পুরতে হয়। পোষাকের দোকান থেকে
বাগ ওয়ুথের দোকানে, সেপান থেকে কলের দোকান, তাঁর পর মেডো-
বাজার, আবার ঘুরে এসে পোষাকের দোকানে। কোনোখানে হয়ত হুমড়ি
খেয়ে প'ড়ে গেলে, কোথাও মানিব্যাগটি হারালে, আবার কোনো জায়গায়
হয়ত দাম দিতে ভুলে গেলে—আর একশ লোক চোর-চোর ব'লে পেছনে
ছুটল। ভাই হাড়গুলো আর আস্ত থাকে না।.....তাঁর পর, কেনা
যখন শেষ হ'ল, তখন ভাবনা হ'ল প্যাক করি কি ক'রে? চিম্নীটাকে
কোথায় ঢোকাই, কার্ভলিক অ্যাসিড আর চিনি একজায়গায় কি ক'রে
রাপি, মোটর-কারটা হাতেই নিই না পকেটেই পুরি, আর চায়ের কোটো
নিয়েই বা করি কি? শেষটা কল এই দাঁড়ায় যে কোনোটা বা ভোঙস
গেল, কোনোটা বা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল, আর কোনোটা হয়ত এমনভাবে
অদৃশ হ'রে গেল যে টেরই পেলাম না। এইমন বোঝা ব'য়ে যদি বা
শেষের কাছে আসা গেল, অমনি দিলে গাড়ী ছেড়ে। এখন ব'সে থাকে।
দুগুণটা পরের পাড়ীর জন্ত। গাড়ীতে উঠলাম, কিন্তু জায়গার অভাব—
কোথায় বোঝা রাখি। আর-একজন এসে হয়ত আমার চিম্নীর ওপর
তাঁর ঠানটাকা রাখলে—অবস্থা তখন কি দাঁড়ায় তা বুঝতেই পারো।
স্বপ্নিত করতে গেলে তাবার গার্ডকে ডাকতে চার, নয়ঃ গাড়ী থেকে হেঁসে
ফেলে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। অগত্যা বসবার জায়গা অদৃশ ছেড়ে দিয়ে
সারা বাস্টাটা দাঁড়িয়েই থাকি। কোনো রকমে বা হোক বাড়ী এসে
পৌঁছলাম—ভাবলাম এইবারে একটু হাত-পা ছড়িয়ে সুরে পড়ব। একটু
আরাম ক'রে গুড়গুড়ি টানতে পারব। অমনি চারদিকে সব লোক নিরে
দাঁড়াল—অমুকের কি হ'ল, অমুক জায়গায় গিয়েছি কি না, এটা জানা
হয়নি কেন, ওটা ভেঙেছে কেন—ইত্যাদি প্রশ্নবর্ষণ—উত্তর না দিলে
কি রকম আছে? লোকজন যেই বিদায় হ'ল পিঙ্গি বনুলেন তাঁকে
ও-পাড়ায় থিয়েটার দেখিয়ে আনতে হবে। প্রথমে আনদারের সুরে
আরম্ভ হ'ল, কিন্তু ক্রমে সুর চড়তে লাগল—শেষে গর্জন—তৎপরে
বর্ষণ। অগত্যা যেতে হ'ল—না গেলে যে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হ'ত
তা গৃহী গাঁরা তাঁরা বেশ বুঝতে পারবেন। রাত-ছুটোর সময় বাড়ী
ফিরে শোয়া গেল—কিন্তু ঘুম কি হয়...বিছানা ভরা ছারপোকা। সকাল-
বেলা তজ্জা থেকে জবাফুলের মতন চোখ নিরে জেগে হাতমুখ ধোবো
ভাবছি অমনি করমায়ের আস্তে সুর হ'ল...আবার অফিস আবার সময়
হ'ল। ভাড়াভাড়ি নাকে-মুখে ছোটো গুঁজে দে ছুট, তা বড়ই হোক
আর জলই হোক, অক্ষিপ করলে চলবে না।এই ত আমার
জীবন! বলাও ভাই, এত সফল করা যায় কি? ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে
দিয়ে বনে চলে যাই—সেখানে অন্তত একটু শান্তি পাওয়া যাবে। এর
চেয়ে কেউ যদি আমার গলায় ছুরী দেয়, তাও ভালো। সবাই কেবল

নিজের কথাই ভাবে, আমার দুঃখ কেউ দেখে না। অন্তত তুমি আমার
অবস্থাটা বুঝে দেখ, ভাই।

নিভাই। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার কষ্টের কথা শুনে আমি তাঁর
হুঃখিত হলেন।

মহিম। হ্যাঁ, তুমি বা হুঃখিত হয়েছ তা দেখতে পাচ্ছি :.....
আচ্ছা, তবে আমি। টেশনে যাবার আগে আমার একবার রানাবাড়া
যেতে হবে, বেঙ্গল কোমিক্যালটাও একবার ঘুরে আসতে হবে।

নিভাই। তুমি আনকাল কোথায় আছ?

মহিম। উত্তরপাড়ায়—

নিভাই। ভাই নাকি! তবে তুমি উত্তরপাড়ার তারিণী ঘোষকে চেন?

মহিম। বিলক্ষণ। তারিণী বাবুকে জানিনে? তাঁর সঙ্গে
আমার বেশ আলাপ আছে।

নিভাই। বেশ, বেশ, তবে ত পূর্ব স্ববিধেই হ'ল।

মহিম। কেন, কি হয়েছে?

নিভাই। নাঃ—থাক—আচ্ছা—তা ভাই, আমার একটা সামান্য
কাজ করতে পারবে কি? বন্ধ হ'য়ে তুমি বোধ হয় এতে কিছু মনে
করবে না? যদি কর তবে আর বলতে চাই নে।

মহিম। কি কাজ বলেই ফেল না চাই।

নিভাই। এই সামান্য একটু কাজ—বন্ধুর পক্ষে মোটেই কঠিন
নয় :.....মাথা খাও, এটি তোমায় করতেই হবে। আর কিছু নয়, একটা
সামান্য ডিনিস ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে। তারিণী বাবু তাঁর জ্বর জন্ত
অনেকদিন থেকে একটা সেলাইয়ের কল পাঠাতে বলছেন। পাচ
অবধি পাঠাবার স্বপ্নে ক'রে উঠতে পারিনি। তুমি মগন এনেছ,
তখন আর কাকে খুঁজতে যাবো? এ তুমি স্বহস্তে নিয়ে সেতে পারবে।
যাক, নিশ্চয় হওয়া গেল :.....আর দেখ, এই পাঁচাত্তর পাণ্ডিটে
নিরে যাবে—একটু সাবধানে নিয়ে যেও—দেপো যেন পাঁচটি ভাঃ-
না :.....ওকি, তুমি অমন ক'রে তাকিয়ে রয়েছ কেন?

মহিম। এত দয়া তোমার। একটা সেলাইয়ের কল, পাঁচাত্তর
পাণ্ডি একটা—এইমাত্র?—আর কিছু নেই?

নিভাই। এই কি হে, তোমার হ'ল কি? সুখ লাল হোয়ে
উড়ে যে?

মহিম। (হাত-পা ছুড়ে দাঁতমুগ পিঁচিয়ে) দাঁও, দাঁও, তোমার
সেলাইয়ের কল দাঁও, পাঁচা আর পাণ্ডিও দাঁও...তুমি নিজেও উঠে পড়ো...
আমায় খেয়ে ফেল...গলায় ছুরি দাঁও :.....(হাত-ছুটো মুঠো ক'রে)
রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই।

নিভাই। তোমার মাথা প্যাপ হ'য়েছে।

মহিম। (খুব জোরে-জোরে পা ক'লে) রক্ত, রক্ত, রক্ত, চাই।

নিভাই। (ভয় পেয়ে) ক্ষেপেছে। (চোঁচিয়ে) মধু, নবীন, হরি,
কে কোথায় আছ...শীগ'গির এস...আমায় বাঁচাও।

মহিম। (ধরমর ছোটোছোটো ক'রে নিভাইকে ভাড়া করতে করতে)
রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই।

যবনিকা

সকারী

মজা মজা যা পা -১ পা পথা পথা পথা -১
 তা ০ ০ না ০ ০ তে তে ০ ০ ০ ০ ০
 যা ধা ধা মজা -১ মজা -১ সা -১ সা প্‌া ধ্‌া
 না ০ ০ তে ০ য় না ০ ০ ০ আ না ০
 য় প্‌া সা ১ সা সা মজা যা ধা পা -১ মজা ১
 তে ০ ০ ০ না তে ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০
 যা রা -১ সা -১।
 তো ০ য় না ০

আভোগ

যা পথা সী -১ সী -১ -১ সী রী স্‌া সী ১ সী
 তো ০ ০ ০ য় না ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ রি
 সী ম্‌া সী রী -১ সী -১ -১ রী সী -১
 রে ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ তা ০ ০
 পথা পা পা -১ পী রী সী -১ রণা সী পা ধা
 ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ তে ০ ০ না ০
 পা -১ মজা -১ যা রা -১ সা -১ সা সা সা স্‌া স্‌া সা রা ১ সা -১।
 ০ ০ না ০ তো ০ য় না ০ তে রে না তে না ০ তো ০ ০ য়

ক্রপদ

কৌশিকী—চৌতাল

কৌন অম তুলো রে মন অজানি ?
 শিখত ন রাগ-রহ তান অজর শুধ বাণী
 ঔর আরধ সোঁ অনম গঁবারো
 বিদ্যা বাত অধিক সয়ানী।
 যে সাধ গুণী তরে তিনকো ন
 গুণকী মত ঠানী।
 বিলাসকে প্রতুকো জো তুলো চাহত তো
 মিলহি তানসেন গুণজানী।

বিলাস সেন*।

আছাড়া

০	৩	৪	১	০	২	
সা স্‌া	সী পথা	পথা পথা	মজা মজা	যা পা	পথা পা	
কৌ ০ ০	ন অ ০	০ ০ য ০	তু ০ ০ ০	লো রে	য ০ ন	
০	৩	৪	১	০	২	০
পা ম্‌া	মজা মজা	যা রা	সা সা	সা সা	যা জা	যা রা
ম্‌া ০ ০	জা ০ ০ ০	০ নি	শি ধ	ত ন	০ ০	রা ০

১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০
১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০

অতঃপর।

১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০
১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০
১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০

অতঃপর।

অতঃপর।

১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০
১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০

অতঃপর।

১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০
১	১	১	১	১	১	১	১
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০



পুস্তক পাবিত্রয়

দেশবন্ধুর বঙ্গবাণী (সচিত্র)—শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীত ও গ্রন্থকারের নিকট ১১নং আপার সার্বস্বতের হোটে প্রবাসী
বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

দেশবন্ধু দ্বাৰা বঙ্গভাষায় হইতে উহার সমাজ-সংস্কার, ভাৰতে
বীৰতা, অশ্রুত জাতির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের ১৩৩ বাণী
ই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তিন এই পুস্তকে দেশবন্ধুর সংক্ষিপ্ত
জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি অঙ্গানস্পর্শ সমস্ত
পাঠকই এই মূল্যবান সংগ্রহ-পুস্তক সাধারে পাঠ করিবেন ইহা আনন্দের
বসন। পুস্তকের ছাপা, বাধাই ও চিত্রগুলি খুব সুন্দর হইয়াছে।

কেটের মেট্রিয়া মেডিকা (প্রথম খণ্ড)—ডাঃ
ক চাটার্জী প্রণীত। মূল্য প্রতিখণ্ড বাবো আনা। প্রাপ্তস্থান দি বুক
কোম্পানি ৪, ৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে কেটের মেট্রিয়া মেডিকা সুপরিচিত।
ঔষধ-লক্ষণ ও ভুলনামূলক বিচার এই পুস্তকে খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া
আছে। ডাঃ চাটার্জী এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও সাধারণ গৃহস্থেব অশেষ উপকার করিয়াছেন।
আমরা আশা করি এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হইবে।
পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর হইয়াছে।

প্র

বাংলার বাঘ বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—
শ্রী হেমচন্দ্র বসু বি-এ প্রণীত। দি বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা। দাম দশ আনা।

বাংলাদেশের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা বাংলাদেশের পুরুষ-সিংহের
জীবনের কথা মোটামুটিভাবে এই জীবনী হইতে বেশ ভালো করিয়াই
জানিতে পারিবে। লেখকের লেখা ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে।
স্বার আশুতোষের জীবনের প্রধান প্রধান সকল ঘটনাই এই পুস্তকে
সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুড়াদেরও এই পুস্তক পড়িতে ভালো লাগিবে।

মৃগাল—শ্রী হেমচন্দ্র বসু প্রণীত উপজ্ঞান। বুক কোম্পানি।
কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম ১১-টাকা।

উপজ্ঞানখানি পড়িয়া ভালো লাগিল। বাঙালীগণের সহজ কথায়
লেখক সরস এবং সুন্দর করিয়া, পুরাতনকে নূতনরূপে, ফুটাইয়া
ভুলিয়াছেন। তবে বইখানিকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করিয়া কিকিৎ সোলল্য-
হানি করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে উপকৃত
হইবেন। বইখানির ছাপা, বাধাই অতি পরিপাটি হইয়াছে।

গ্রন্থকোট

উপাসিকা-চরিত (সচিত্র)—শ্রী দুর্গানাথ ঘোষ ওষ-
ভূষণ প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। পৃ: ১১০+১১১+১০।
১৩৩২।

খিওসকিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাঙ্কির জীবন-কথা
এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। লেখক ১৯১১ সাল হইতে কয়েক বৎসর
খ্যাগিরা নব্যভারত পত্রিকার "মাদাম ব্লাভাঙ্কির জীবন কথা" শীর্ষক

গ্রন্থমালায় এই মহীয়নী মহিলার বিবরণ লেখেন। গ্রন্থগুলি কিছু
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে পুস্তককারের প্রকাশ
করিলেন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের এতদ্বন্দ্ব মাদামের
জীবন-বৃত্তান্ত ও বিচিত্র জিমাঙ্গলাপ জানিবার কোনোরূপ সুযোগ ছিল
না। এই অনানুষ্ঠানিক কথ-মহিলার জীবন এক আশ্চর্য রহস্যমানে
বিবৃত। উহার জীবনী হইতে জানিবার ও শিখিবার অনেক আছে।
গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-রচনায় অনুদান ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয়
দিয়াছেন। উহার লিপিত্রুখে "উপাসিকা চরিত" সরস ও চিত্তাকর্ষক
হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই মূল্যবান গ্রন্থ বাঙালী পাঠকদিগের
নিকট সমাদৃত হইবে। পুস্তকের ছাপা ও বাধাই ভালো।

অতীন্দ্র—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বরদা এডেন্সো,
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। একটাকা বাবো আনা।

গল্পের বই। ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলির এতোকটিতেই নূতনত্ব
আছে। উদীয়মান গল্পলেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দকে প্রথম স্থান
দেওয়া যাইতে পারে। চা-পাট, বিলাতী কাপড়ের প্রেমের পড়া, হা-তাপ
—ইত্যাদি আধুনিক গল্পের কাঠামো। এগুলিতে সে সব হ'স্রামা
নাই; এগুলি বাঙালী স্ত্রী-মহিলার ছবি—সুন্দর ও মনোহর। ছাপা ও
বাধাই ভালো। দাম আর-একটু কম হইলে ভালো হইত।

বিমানিকা—শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন। প্রকাশক ভট্টাচার্য
হ্যাণ্ড সন্, ৬৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

কবিতার বই। শশাঙ্কমোহন-বাবু খ্যাতনামা কবি। উহার
কবিতার বিশেষত্ব আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির পোড়ার দিক ও মাঝে
কয়েকটি দুর্দল কবিতা আছে—সেগুলিতে ছন্দের দোষ ও মিলের বোঝ
আছে। কিন্তু ভালো কবিতা অনেক আছে; দুর্দল কবিতাগুলির পাশে
এগুলি বেশ চোখে পড়ে। এগুলি উচ্চ ও উন্নত রসে ভরপুর।
উপনিষদের ধর্মবাণী ও ভারতবর্ষের স্বরূপ-সত্য এগুলিতে বেশ ফুটিয়াছে।
কাব্যমোহী পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

পল্লী-সংগঠন—শ্রী শ্রীচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক
বাহাদুর সজ্জ, ৪৫ নং আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।
পৃ: ৪৮(১৩৩২)।

পুস্তিকার লেখক বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর একজন কর্মী। তিনি
বাংলায় ও বাংলার বাহিরে প্রায়ে-প্রায়ে বাইরা পল্লী সংস্কার কার্য-সম্বন্ধে
বে অজ্ঞতা সঙ্কর করিয়াছেন সেই বিষয়ে গুটিকতক কথা এই পুস্তকে
বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে আসল পথধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন
এবং পল্লী সংস্কার-বিষয়ে বহু চিন্তাশীল লেখকের মতের সহিত পাঠকদের
পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীশ্রী বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। আশা করি,
পুস্তকে বিবৃত বিষয়টি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পুস্তকখানির
বহুল প্রচার আবশ্যক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন পুস্তকের বিক্রয়দক অর্ধ
বেলতলা (জেলা ঢাকা) প্রায়ে জনহিতকর কার্যে ব্যয়িত হইবে।

প্র



আত্মরক্ষার উপায়—

সঙ্গে টাকা কড়ি লইয়া বড় বড় সহরের রাস্তা দিয়া একলা চলা আজকাল নিপঙ্কনক ব্যাপার। রাস্তায় ভ্রমঃবশধারী চোরডাকাতের অভাব নাই। একপ্রকার ছোটো যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে—এই যন্ত্রের ভিতর কাদানো-গ্যাস ভরা থাকে। দরকার মতন কল টিপিলেই এই ছোটো



যন্ত্র হইতে কাদানো-গ্যাস বাহির হইয়া চোরকে নিরুপায় করিয়া দিল

যন্ত্র হইতে ভীষণ বেগে গ্যাস বাহির হইয়া আক্রমণকারীকে কিছুক্ষণের জন্য শ্রয় অক্ষ করিয়া দেয়। এই কাদানো গ্যাস পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত বেশ ছোরে যায়। যন্ত্রটিও খুব ছোটো-খাটো এবং পকেটের মধ্যে সহজেই লুকাইয়া রাখা যায়।

পাঁচ হাজার মাইল হইতে ফোটো তোলা—

হনলুলু হইতে একটি কোটা র্যাডিওর সাহায্যে নিউইয়র্ক পাঠানো সম্ভবপর হইয়াছে। এই দুই স্থানের দূরত্ব পাঁচ হাজার মাইল। ইতিপূর্বে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে বেতারের সাহায্যে ছবি পাঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দূরত্ব ২৫০০ মাইলের বেশী নয়। হনলুলু হইতে একেবারেই সোজাসুজি নিউইয়র্কে এই ছবি পাঠানো যায় নাই। মাঝখানে চারটি রিলের (relay) সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই চারটি



হনলুলু হইতে নিউ-ইয়র্কে র্যাডিও প্রেরিত প্রথম ছবি

রিলে—আপনা-আপনিই (automatically) কাজ করে। মাঝখানে চারটি রিলে থাকা সত্ত্বেও হনলুলু হইতে নিউইয়র্ক রিসিভিং স্টেশনে বিদ্যুৎ প্রবাহের ১ম টক্কর পছ চিত্তে ১-৪ সেকেন্ডেরও কম সময় লাগিয়া ছিল। সমস্ত ছবিখানি পাঠাইতে মোট ২০ মিনিট কাল সময় লাগিয়াছিল। সমস্ত প্রান্তঃকাল ধরিয়া ৭খানি ফোটোগ্রাফ র্যাডিওতে পাঠানো হইয়াছিল।

যে-ছবিখানি র্যাডিওতে পাঠানো হইবে, তাহার একটি ফিল্ম একটি cylinderএ জড়াইয়া দেওয়া হয়। ফিল্মটি cylinderএ ঘুরিতে থাকে। এইসময় ইচার উপর একটি আলোক-রশ্মি পড়িতে থাকে এবং সেই আলোক রশ্মি ফিল্মের মধ্য দিয়া একটি delicate photo-electric এর উপর গিয়া নিপতিত হয়। এই photo-electricকে light sensitive cell বলা যায়। ফিল্মের গাড়তার উপর আলোকের পরি-



র্যাডিও-সাহায্যে প্রেরিত আর-একখানি ছবি

মাণ নির্ভর করে। আলোক-রশ্মি এই light sensitive cellএর উপর আঘাত করিবারাত্র একটি electric impulseএ পরিণত হয়, এই বৈদ্যুতিক impulse relayর সাহায্যে wireless transmitter এর মধ্য দিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়।

রিসিভিং স্টেশনে এই impulseকে pen arrangement এর মধ্য দিয়া চালাইয়া photo negative তৈয়ার করা যায়। impulseএর কম বেশী অনুসারে negative গাড় বা ক্যাকাণে হইবে। এই negative হইতে ছবি তোলা সহজ ব্যাপার।

ভূ-পরিচয়ের নতুন উপায়—

স্পেনদেশের Aviles নামক স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে একটি অভিনব উপায়ে ভূ-পরিচয় করানো হয়। দুইটি গোলাকার

কোনো রকমেই ছক করিতে পারিতেছে না। বরং অনেক দেশ দেখা যাউতেছে যে নিজের এবং দেশের স্বাধীনতা প্রবাসী আবহুল করিম অসামান্ত সাহস এবং বুদ্ধিবলে সাম্রাজ্য অগ্রগম্য এবং লোকজন লইয়া স্পেন এবং ফ্রান্সের মিলিত ফৌজকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছে। স্পেনের সেনাপতি ডি রিভারাত্ত আবহুল করিম এবং রীফদের অলৌকিক সাহস এবং বীরত্বের প্রশংসা করিতেছেন। জগতের স্বাধীনতাকামী কয়েকজন আমেরিকান বিনান বীব এই রীফদের দমন করিবার জন্য স্পেনের মৈত্রীদলে যোগদান করিয়াছেন।



ভূ পরিচয়ের নতুন উপায়

কনক্রিটের তৈরী প্রকাণ্ড ভূলাখ্যার আছে। তাহার মধ্যে পৃথিবীর খাবতীয় মহাদেশ এবং দ্বীপগুলির আকারে কাটা পাথর বসানো আছে। দুইটি ভূলাখ্যারের একটি পুরোনো hemisphere এবং অন্যটি নতুন। ইহার সাহায্যে ছাত্রেরা খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজে পৃথিবীর নানা দেশ-মহাদেশ এবং সাগরগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানলাভ করে। পৃথিবীর জল এবং স্থলের পরিমাণ বিভিন্ন দেশ মহাদেশের অবস্থান এবং একদেশের সহিত অন্য দেশের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সহজেই নিতুল পারণা করিতে পারে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও এই প্রকার প্রবর্তন অতি সহজেই হইতে পারে। ভবি দেপিলেই এই বিষয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মরক্কোর লড়াই -

যাহারা খবরের কাগজ পড়েন, তাহারাই সকলেই জানেন আফিকার উত্তর প্রান্তে স্থিত মরক্কোদেশের রীফদের সহিত ইউরোপের স্পেন এবং ফ্রান্সের বিঘ্ন লড়াই চলিয়াছে। রীফ বা মরক্কোর প্রাসীন অধিবাসী, মরক্কো তাহাদের দেশ। বর্তমান সময়ে মরক্কো স্পেন এবং ফ্রান্স ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। রীফদের নেতা আবহুল করিমের সহিত প্রথমে লড়াই বাধে স্পেনের। আবহুল করিম বলেন মরক্কো স্বাধীন দেশ—বিদেশীয়দের এখানে শাসনকর্তারূপে থাকিবার কোনো অধিকার নাই। স্পেনও তাহার অস্তায় অধিকার ছাড়িতে অস্বস্ত নহে—সে করিমকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া তাহার সহিত লড়াই শুরু করিয়াছে গত চার বৎসর ধরিয়া। ফ্রান্সের ভয় হইল যে তাহার অধিকৃত মরক্কোর বিশেষ-অংশ হয়ত করিমের দেগাদেধি বিক্রয় করিতে পারে—এইজন্য ফ্রান্স স্পেনের সহিত যোগ দিয়া করিমকে হারাইবার বিষয় উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু জগতের দুইটি প্রধান শক্তির মিলিত শক্তি এই সামান্য আরব বিদ্রোহীকে

আবহুল করিমও মরণ পদ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাহার দেশ একবিন্দু রক্ত এবং তাহার একটি অঙ্গের বর্তমান থাকিতে তিনি দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ত্যাগ করিবেন না। তাহার অশ্রুচেরাও নেত্র ভাবে অশ্রুপ্রাণিত হইয়া মরণ পদ্য করিয়াছে। পনরের কাগজে আদ্যকাল যেমন খবর আসিতেছে, তাহা পড়িয়া রীফদেরই ক্রমাগত পরাভয় হতাশ হইতে বুলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই পনর নিছক সত্য বুলিয়া মনে হয় না।

পতন-রক্ষণী কল—

তিনি বেশিরভাগেই পুনিতে পারিবেন। শিশুটি সবেমাত্র হাটিতে শিখিয়াছে। পদে-পদে পড়িয়া গড়িবার ভয় সেইজন্য তাহার চারিদিকে একটি বেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বেড়া শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চলিবে—এই বেড়াও পাছে শিশুর চাপে উল্টাইয়া যায়, সেইজন্য নীচের বেড়াকে একটু বেশী ভারী করিয়া দিলে আর কোনো ভয় থাকে না। চক্রাকার বেড়া-ছটিকে কাঠ বা লোহা যে-কোনো দণ্ডের সাহায্যে



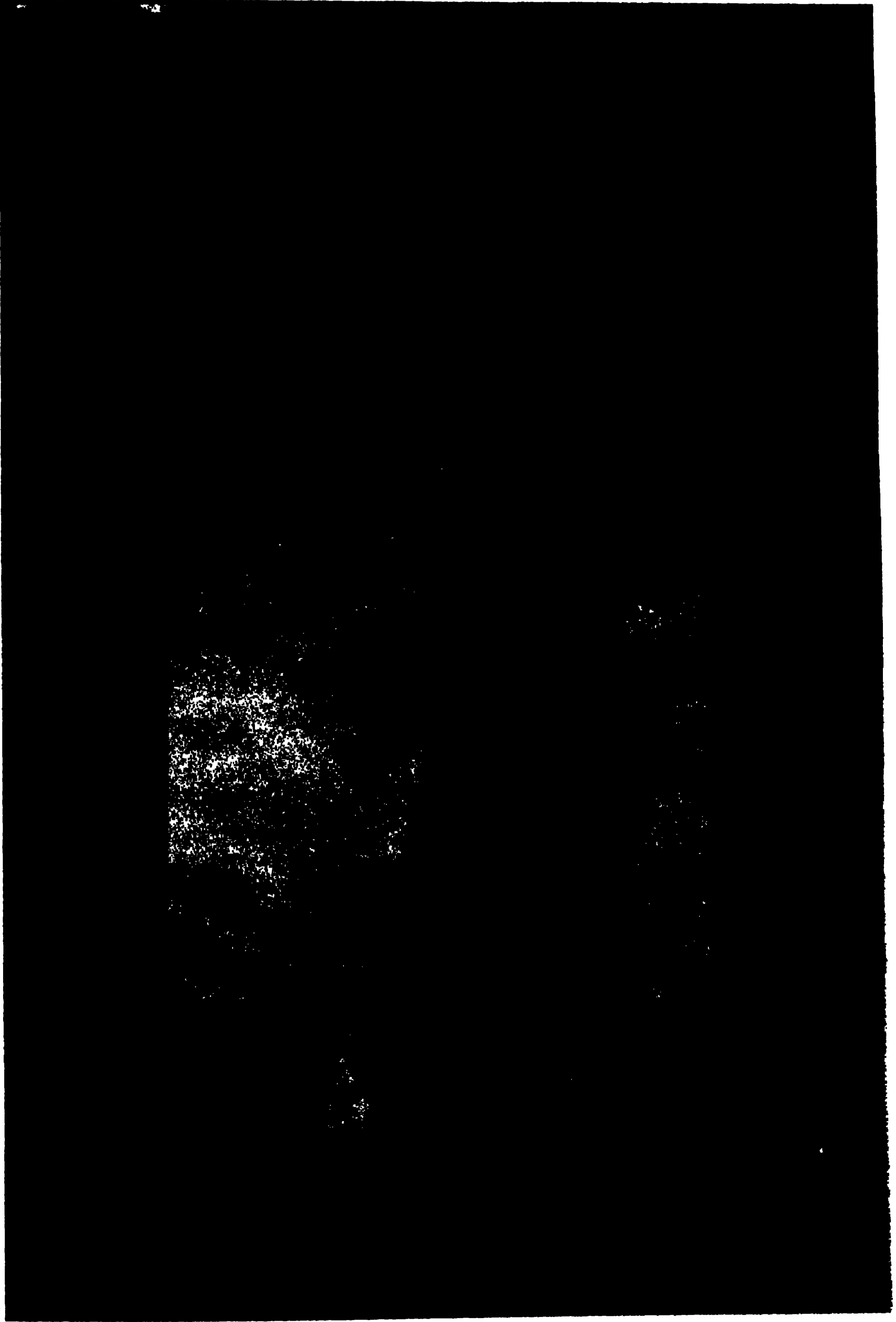
আবহুল করিমের রীফ অধারোহীদল, ইহার অসমসাহসী স্প্যানিস এবং ফ্রেন্স পণ্টনকে ইহার নাস্তানাবুদ করিতেছে।

দেখিযাছি ; দেখিযাছি ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবন্ধনা চলিতেছে ! অথচ এইসকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ। নিরীহ প্রজাকে লাঞ্চিত করিবার জন্ত রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশ-গরিমায় ভক্ত। ইহার কারণ এই, যে, মানুষ যখন এইসকল বিপুল যন্ত্রসংঘকে নির্বিচারে মানিতে শুরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মতো এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার-সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়-পৌত্তলিকতার (fetish worship) প্রভাবে অন্তসব মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে ;—মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিনদিন জোগাইয়া দিতেছে।

আমার এই চিন্তাধারায় সহানুভূতিসম্পন্ন একজন শ্রোতা আমাকে শিঞ্জাসা করিয়াছিলেন—এই সংঘ যন্ত্রকে সৈকাইয়া রাখা যায় কি করিয়া ; তাঁহার ভয় ছিল যে তাহা করিতে গেলেই অল্পপ্রকারের যন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে। আমি বলিয়াছিলাম—ব্যক্তিস্বরূপ (personality) ও আদর্শ (ideal) যাহাদের জীবনে একীভূত এমন কতকগুলি মানুষের (individual) উপর আমার ভরসা আছে। যে যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা দণ্ডায়মান, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল মনে হইতে পারেন, প্রকাণ্ড একটি জড় পর্বতের পাশে সম্ভব একটি বৃক্ষকে যেমন মনে হয়। কিন্তু প্রাণের ইন্দ্রজালশক্তি ত এই বৃক্ষের আছে, দিনে দিনে উহা আপনার প্রাণশক্তির নব-নব প্রকাশে আপনার জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, পরাস্ত হইয়া আপাতমৃত্যুমুখে পতিত হয়, শুধু পুনর্বার সম্ভবিত হইয়া উঠিবার জন্ত। আমার বিশ্বাস অমাসুখিক জড়শক্তি যখন দিকে-দিকে প্রভাব বিস্তার করে, তখন মনুষ্যত্বে দৃঢ় বিশ্বাসপরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তাঁহারা মানুষের প্রাণ শক্তির অবমাননায় তীব্রভাবে সচেতন হইয়া উঠেন এবং অবজ্ঞা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেও অকুতো-

ভয়ে আপনাদের নির্দ্বারিত পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। ইংলণ্ডে ঠিক এমনি একটি ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ই, ডি, মোরেল (E.D. Morel)। তিনি আজ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। মৃত্যুতে ইহাদের সমাপ্তি নহে। এমন সব লোককে দেখিলে বৃত্তিতে পাবি এই সর্বব্যাপী জড়ত্বের মধ্যে মানব-প্রাণ-শক্তির ক্ষুণ্ণিত এখনো জ্বলিতেছে—নিরাশ হইবার কারণ নাই। মানবের সভ্যতা যেমন কয়েকটি ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে—কয়েকটি ব্যক্তিই তাহা বাঁচাইয়া রাখিবে। আজিকার দিনে জড় যন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যে যে এমন-সব ব্যক্তি জন্মিতে পারে, রম্যা রলার জীবন ও সাধনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে নিরন্তর সহিতে হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে আজিকার দিনে তাঁহাকে জগতের এতদন্ত প্রয়োজন আছে এবং এই লাঞ্ছনা ও অপবাদের দ্বারাই তাঁহার সমসাময়িক মানুষেরা তাঁহার মহত্বকে স্বীকার করিয়া লইতেছে।”

রবীন্দ্রনাথ যে সকল মহাপুরুষকে আধুনিক জড়-জগতে প্রাণশুষ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা মোরেল ও বিশ্বপ্রাণ মনস্বী রলাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তিনি নিজেও তাঁহাদের অন্ততম ; তাঁহার বিশ্বপ্রাণতার কথা দিকে-দিকে প্রচারিত হইতেছে ও আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বমানবের কাছে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বিশ্বপ্রেমিক রম্যা রলার জন্মদিনে এখন দেশে-দেশে উৎসব হইতেছে এবং তাহাতে যোগ দিয়া বিশ্ববাসী তাহাদের অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। কবির সহিত আমরাও এই মহাপুরুষের সম্বন্ধনা করিতেছি এবং বলিতেছি, “দেশের গণ্ডী বা কালের গণ্ডী দ্বারা তোমরা বন্ধ নও, তোমরা সর্বকালের এবং সর্বদেশের। তোমরা যে সত্য প্রচার করিতেছ তাহা চিরন্তন, মনুষ্যত্বের জয় পতাকা তোমরা ছুঁধ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যেও বহন করিতেছ, তোমাদের কার্য জয়যুক্ত হউক।”



ভিক্ষু-বুদ্ধ

চিত্রকর শ্রী পুণ্ডিনবিহারী দত্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



ভারতগবর্নেন্টের ব্যবস্থাসচিবের পদ

বাংলাদেশের গ্যাভর্নমেন্ট-জেনার্যাল ক্রীযুক্ত সতীশ-শ্রীনাথ দাশ ভারতগবর্নেন্টের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগে বাংলা দেশের বাহিরের অনেক পবরের কাগজ সজ্জ হইয়াছে ;--সম্ভবতঃ বঙ্গের অনেকেও খুসী হইয়াছেন।

দাশ-মহাশয় আইন ভাল জানেন না, একথা কেও বলিতেছেন না। এমন কাহারও নামও কেহ করিতেছেন না, কাহার নিয়োগ অধিকতর সম্ভাষক হইত এবং তিনি তাঁহা অপেক্ষা বেশী আইনজ্ঞ। তাঁহার নিয়োগে অসন্তোষের কারণ প্রধানতঃ দুটি। অনেকে বলিতেছেন, যে, বোম্বাই হইতে কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে এবার ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত করা উচিত ছিল। বোম্বাইয়ের কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে আমরা তাহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই এক-একজন লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম বা রীতির পক্ষপাতী আমরা নহি। যোগ্যতম ব্যক্তি যে-প্রদেশেরই লোক হউন, তাঁহাকে নিযুক্ত করাই ভাল। যাহা হউক, বোম্বাইয়ের যোগ্য কোন লোক নিযুক্ত হইলে ভালই হইত ; কারণ, চাকরীর জন্ত বা অন্ত কোন কারণে প্রদেশে প্রদেশে ভ্রমণের সঞ্চার হওয়া ভাল নয়।

দাশ-মহাশয়ের নিয়োগে অসন্তোষের আর-একটা কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, তিনি খুব "অগ্রসর"-রকমের মডারেট নহেন এবং ভারতগবর্নেন্টের শাসননীতির উপর তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার কোন ইচ্ছাও আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহার নিয়োগে অসন্তোষের

এই যে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় অমূলক। "অগ্রসর" বা "শচাৎপদ" যে কোন-রকমের যে-কয়জন ভারতীয় এপার্টমেন্ট ভারতগবর্নেন্টের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি ভারতশাসন নীতির কোন পরিবর্তন করিতে পারিয়াছেন ? ভারতীয় সভ্য দূরে থাক, লর্ড বিপনের মত ভারতহিতৈষী বড়লাট কোন পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন কি ? সুতরাং যদি দাশ-মহাশয়ের প্রভাবে ভারত-শাসন-নীতির কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার অযোগ্যতার পরিচায়ক হইবে না। বস্তুতঃ অগ্রসর বা অনগ্রসর যে-কোন ভারতীয় ব্যক্তি ভারত-গবর্নেন্টের সভ্য হইবেন, তাঁহাকেই মোটের উপর শাসন কাধ্যে অধিকাংশ সভ্যের মতে সাহায্য দিতে হইবে ; না দিলে তাঁহার স্বতন্ত্র মতের জয়যুক্ত হইবার যে কোন সম্ভাবনা থাকিবে, তাহাও নয়। বস্তুতঃ লর্ড সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া এপার্টমেন্ট যে-কয়জন ভারতীয় ব্যক্তি ভারত-গবর্নেন্টের শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই সামরিক আইন প্রয়োগ, বিনাবিচারে কারারোধ, জনতার উপর অনাবশ্যক গুলিবর্ষণ দ্বারা নরহত্যা, প্রভৃতি জুলুম নিবারণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ নানা কারণে "অগ্রসর" ভারতীয় রাজনীতিবিদগণের রাজকার্য গ্রহণ না-করাই মডারেট সংবাদপত্রগুলির অনুমোদনীয় হওয়া উচিত। কারণ "অগ্রসর" ব্যক্তির বেসরকারী অবস্থায় বরং দেশের কিছু কাজে লাগিতে পারেন, সরকারী কর্মচারী হইয়া গেলে তাঁহাদের দ্বারা ততটা কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। সাবেক কংগ্রেসের আমলে অনেক কংগ্রেস-নেতা হাইকোর্টের জজ বা অন্ত বড় চাকরো হইয়া যাইতেন। তাহাতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত সুবিধা হইয়া থাকিবে, এবং বিচারাসন বা অন্ত

কোন আসন অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে; কিন্তু কংগ্রেসের যাহা উদ্দেশ্য তাহা নেতাদের জজিয়তী বা অল্প উচ্চপদ-বাহ্য দ্বারা একটুও সিদ্ধ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ কোন শ্রেণীর মডারেট তাহার আলোচনা আমরা করিতে চাই না; কিন্তু একথা আমাদের কাছে বলিতেই হইবে, যে, তিনি স্বদেশবাসীদের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কায় নিজের মত গোপন রাখেন নাই, অকপটভাবে তাহা বাক্য করিয়াছেন। তাঁহার মত সব বিষয়ে ইংরেজদের পক্ষে প্রীতিকর হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তিনি বলিয়াছেন, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষের হিতসাপনের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন বা এদেশ শাসন করেন, এই ভাণ ছাড়িয়া দিন, এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভারতের শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্টতর করুন ও ভারতে স্বায়ত্তশাসন বিস্তৃত করুন ও দৃঢ়তর করুন। এপর্যন্ত উচ্চপদস্থ সব ইংরেজ রাজপুরুষ প্রকাশ্যভাবে এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, যে, ইংরেজ ভারতবর্ষের উদ্ধার ও পরিব্রাজনের জন্যই ভারতশাসন করিয়া আসিতেছে। সতীশরঞ্জন মডারেট হইয়াও ইংরেজদিগকে এই ভাণ ত্যাগ করিতে বলিয়া সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজে অল্প অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিবিদদের স্মরণ, স্বাধীনতা লাভের জন্য বোম্বা, রিভলভার প্রভৃতির দ্বারা রাজনৈতিক হত্যার বিরোধী হইলেও ইহা বলিয়াছেন, যে, বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় বোম্বা নিক্সিগ হওয়ার গবর্নেন্টে বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন, যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ কিরূপ প্রবল হইয়াছে। অবশ্য, ইহার দ্বারা তিনি বোম্বা-নিক্সিপের বিন্দুমাত্রও সমর্থন করেন নাই; কিন্তু কেবল এই ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, যে, যুক্তিতর্ক আবেদন-নিবেদন-রূপ অহিংস সূচপায় দ্বারা গবর্নেন্টের যে চৈতন্য উৎপাদিত হয় নাই, তাহা হিংসা-প্রণোদিত অবৈধ উপায়ে উৎপাদিত হইয়াছিল। অনেক সময় মানুষ হিতৈষীদের পরামর্শ অহুরোধ উপরোধ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার ফলে যখন তাহার কোন কঠিন পীড়া হয়, তখন তাহার জীবন-যাপন-

প্রণালীর অনিষ্টকারিতা সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া ব্যাধি জিনিষটাকে কেহ কল্যাণকর মনে করে না।

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের রাজনৈতিক মত-দৃষ্টি সাধারণতঃ এই ধারণা প্রচলিত আছে, যে, তিনি সকল বিষয়ে গবর্নেন্টের মন জোগাইয়া কথা বলেন। ইহা যে সর্বোংশে সত্য নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা উপরে কিছু লিখিয়াছি, নতুবা, আমাদের নিজের বিশ্বাস এরূপ নহে, যে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে উন্নততর শাসনবিধি প্রবর্তিত করিবে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অহত্বিত থাকিয়া ভারতবর্ষের লোকেরা সকল বিষয়ে ইংরেজদের সমান অধিকার লাভ করিতে পারিবে। ইহা আমরা মানি বটে, যে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত আত্মকর্তৃত্ব পাইলে পরে আমাদের প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরাজ্য লাভের সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং “ঐতিহাসিক স্বায়ত্তশাসনকে” আমরা স্বরাজ্যের পক্ষে একটা ধাপ মনে করিলেও উহাকে আমরা প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরাজ্য মনে করি না।

কেহ যদি মনে করেন কোন পদ গ্রহণ করিয়া দেশের হিত করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আর্থিক ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। এইজন্য যদিও দাশ-মহাশয়ের বেতন তাঁহার বর্তমান আয়ের মোটামুটি একতৃতীয়াংশ মাত্র হইবে, তথাপি যদি তিনি মনে করেন, যে, মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা ক্ষতিস্বীকার করিয়া তিনি দেশহিতসাধন করিতে পারিবেন, তাহা হইলে ক্ষতিস্বীকার করিবার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে, তাঁহার ক্ষতিস্বীকারের সহিত তুলনীয় কোন দেশহিত তিনি করিতে পারিবেন না। কোন কোন ভারতীয় আইনজীবী ব্যবস্থাসচিব হইয়া আর্থিক লাভবান হইয়াছিলেন। কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলেও, এক লর্ড সিংহ ছাড়া, কাহারও আর্থিক ক্ষতি তত হয় নাই, যত সতীশ-রঞ্জন দাশ মহাশয়ের হইবে। তাঁহার ব্যক্তিগত লাভ-লাভের সহিত সর্বসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে, যে, তাঁহার আয়ের

এরূপ প্রভূত হ্রাস হইলে দেশহিতকর কোন কোন কাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। দরিদ্র ছাত্র প্রভৃতির সাহায্যার্থ এবং নানা দেশহিতকর কার্যে সতীশরঞ্জন স্ত্রীরাছিন্দু ন্যূনকমে মাসিক দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। রাজকার্য গ্রহণ করিবার পর সংকার্যে এরূপ ব্যয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে কি ?

ধর্মমতের পার্থক্যে মানুষকে কিরূপ অন্ধ করে, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আজকাল প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। রাজনৈতিক মতের পার্থক্যবশতও একদলের লোক অল্প দলের কোন লোকের সঙ্গুণ বা সংকার্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সতীশরঞ্জনের দলের লোক না হইলেও আমাদের একটা কথা বলিতে হইবে; তিনি গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া কিছা ছেলে গিয়া বীরপদবাচ্য হইতে পাবেন নাই। কিন্তু একটা বাজ তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন, যাহা বঙ্গের অসহযোগী ও স্বরাজ্যী প্রকৃত বীরেরাও করেন নাই; মেকীদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বাঙালী সংবাদপত্রপাঠক মাত্রে জানেন, প্রধানতঃ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে পশুপ্রকৃতি মানুষেরা কুমারী, সখবা, বিধবা কত কত নারীর সর্বনাশ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই নরপশুদিগকে আইন-অনুসারে দণ্ডিত করিয়া এবং অল্প উপায়ে নারীনির্ধ্যাতন বন্ধ করিবার নিমিত্ত “নারী-রক্ষা সমিতি” নামক একটি সমিতি দীর্ঘকাল কাজ করিতেছে। সতীশরঞ্জন তাহার সভাপতি। সভাপতিরূপে তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং লাঞ্ছিতা ধর্মিতা নারীদের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্ত কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা উচ্চ মর্মে ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু নারীদের, সতীশ্বের, মাতৃশ্বের সম্মান রক্ষা করিতে গাঁহারা চান, তাঁহারা, রাজনৈতিক মতভেদ-সত্ত্বেও নারীরক্ষা সমিতিকে ও তাহার সভাপতিকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য; যদিও রাজনৈতিক দলাদলি ভুলিয়া তাঁহারা সমিতিকে অর্থসাহায্য করিবেন, এরূপ আশা আমরা করি না। যাহা হউক, ইহা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমাদের বক্তব্য এই, যে, সতীশরঞ্জনের আয় কমিয়া গেলে যদি তৎকাল নারীরক্ষা সমিতির কাজ করিবার শক্তি কমিয়া যায়

তাহা হইলে তাহা নিতান্ত পবিত্রতার বিষয় হইবে। রাজনৈতিক বাগ্‌যুদ্ধ, তর্কযুদ্ধ করিবার লোক অনেক আছে, হাততালি রোজগার করিবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু বঙ্গের লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, অবমানিতা নারীদের জন্ত খ্যাতিস্পৃহাবিহীন হইয়া পাটবার ও টাকা দিবার লোক নিতান্তই বিরল।

প্রধানতঃ এবিধ কারণে আমরা সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ব্যবস্থা-সচিবের পদে নিয়োগে স্বীকৃত হই নাই; বরং দুঃখিতই হইয়াছি; বিশেষতঃ যখন আমাদের ধারণা এই, যে, ভারতশাসন-প্রণালী তাঁহার রাজনৈতিক মত-অনুসারে পরিবর্তিত হইলেও (তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প), বিশেষ কোন লাভ নাই। কিন্তু আমরা আমাদের এই মত পরিবর্তন করিব, যদি তিনি ভারতগবর্নেন্টের দ্বারা এমন কোন উপায় অবলম্বন করাইতে পারেন, যাহাতে নারীনির্ধ্যাতন দমন বর্তমান সময় অপেক্ষা সহজতর ও অপ্রায়সসাধ্য হয়, এবং নারীরা পথে ঘাটে মাঠে রেলের স্ট্রীমারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন। ইহার জন্ত গবর্নেন্টের মৃগাপেক্ষী হইতে মাথা হেঁট হইতেছে। কিন্তু বঙ্গে পৌরুষের অভাব পটায় লজ্জা ও অপমান স্বীকার করিতে হইতেছে। নারীনির্ধ্যাতন নিবারণের প্রতি দেশের লোক যথেষ্ট মনোযোগ করিতেছেন না। গবর্নেন্ট-ও যথেষ্ট মনোযোগী নহেন। নান রকম কাজের জন্ত দেশের লোক টাকা দিতেছেন; অনেক টাকা চুরিও হইতেছে। কিন্তু নারীদের যে সতীশ্বের গৌরব ভারতীয়েরা করিয়া থাকেন, তাহা রক্ষার জন্ত যথেষ্ট মনোযোগী লোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজনের সহায়তা না পাওয়া গেলে বা কম পাওয়া গেলে বাঙালী-সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে খুব-বেশী পরিমাণে নগদ টাকা উপার্জন করিবার লোক বিস্তার আছে। সুতরাং তথাকার কোন লোক আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াও যদি ভারতগবর্নেন্টের শাসনপরিষদের সভ্য হইতেন, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বেশী রোজগারী বাঙালীর সংখ্যা কম, এবং তাঁহাদের মধ্যে সংকার্যে দাতার সংখ্যা আরো কম। এইজন্য সতীশরঞ্জন

দাশের মত বেশী রোজগারী অথচ সংকার্যে দাতা লোকের কার্যতঃ নিফল আর্থিক কতিবীকার আমরা ভাল মনে করি না। যদি কতিবীকার করিয়া তিনি ভারতবর্ষের শাসনবিধির উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ত্যাগবীকার সার্থক হইত। তাহার এখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কেন তিনি কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান করিতে রাজী হইলেন ?

যদি সম্মানের কথা বলেন, এবং বিদেশী ভারত-গবর্নেন্টের শাসনযন্ত্রে একটা অঙ্ক হওয়া সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, গবর্নেন্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন অথচ তিনি পদটি লইতে রাজী হইলেন না, অবস্থা এইরূপ ঘটিলে সম্মানের কিছু কমী হইত কি ?

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া “প্রবাসী”ই তাঁহাদের কথা বঙ্গ-নিবাসী বাঙালীদিগকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে আরম্ভ করে, এবং “প্রবাসী”তে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই কাজ করেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী বলিতে আমরা বরাবর সেইসকল বাঙালী বুঝিয়াছি, যাহারা বাংলা দেশে বাস করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ কথাটির মানে ছুরকম। প্রাকৃতিক বঙ্গ এবং গবর্নেন্টের বঙ্গ এক নয়। শ্রীহট্ট প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্তু গবর্নেন্ট উহাকে আসাম প্রদেশের মধ্যে ফেলিয়াছেন। মানভূম প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্তু সরকারী ভূখণ্ডবিভাগ অনুসারে উহা বিহারের অন্তর্গত। এইরূপ আরো ছোট বড় কোন কোন জেলা ও মহকুমা আছে, যাহা বস্তুতঃ বঙ্গের অংশ অথচ অন্য কোন কোন প্রদেশের সামিল হইয়া আছে। প্রাকৃতিক বঙ্গ আমরা তাহাকেই বলি, যাহার অধিকাংশ অধিবাসী বহুশতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ কোন স্থান বাংলার বাহিরের কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত নহে। ভারত-শাসনসংস্কার-বিধিতে

এই নীতি স্মারসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, যে, এক-ভাষাভাষী পরস্পরের অব্যবহিত নিকটবর্তী জেলাসমূহ একই প্রদেশভুক্ত হওয়া উচিত।

এইজন্য শ্রীহট্টকে সরকারী বঙ্গের সামিল করিবার নিমিত্ত যে-আন্দোলন হইতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন করি।

মানভূমকে বিহার হইতে বিযুক্ত করিয়া বাংলার সামিল করিবার নিমিত্তও এইরূপ আন্দোলন হওয়া উচিত।

এইরূপ আরো যত ভূখণ্ড আছে, তাহার অধিবাসীরাও আন্দোলন করুন।

এক-ভাষাভাষী লোকেরা একত্র বাস করিলে সাহিত্যিক ও অন্তর নানাবিধ প্রচেষ্টা যেরূপ বলবতী হয়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিলে সেরূপ হয় না।

বাঙালী জাতির অধিকাংশ লোকের সহিত যোগ রক্ষা করিতে না পারায় যে-কৃতি, তাহা ছাড়া মানভূমের লোকদের অন্য নানাবিধ অনুবিধাও আছে। বিহারের শিক্ষাবিভাগের সমুদয় বন্দোবস্ত প্রধানতঃ বিহারীদের উপযোগী করা হইয়াছে। বাঙালীদের জন্য যাহা উপযোগী তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা বিহারের শিক্ষাবিভাগ করিতে পারেন না। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ে মানভূমের লোকদের অনুবিধা হইতেছে। মানভূমের আদালতের ভাষা বাংলা। কিন্তু যে-সব বিহারী মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্মচারী তথায় কাজ করিতে যান, তাঁহারা অনেকেই বাংলা জ্ঞানেন না এবং বাংলা দলিলাদি পড়িতে পারেন না। ইহাতে বিচার ও অন্যান্য রাজকার্যের অনুবিধা হয়।

আমরা প্রবাসীর গত এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি, যে, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রধান প্রদেশের মধ্যে বাংলার লোক-সংখ্যা যদিও অধিকতম কিন্তু ইহার সরকারী আয় সর্বাপেক্ষা কম। মানভূমে বর্তমান সময়েই অনেক খনি আছে : ভবিষ্যতে আরও অনেক খনিজ পদার্থ ঐ জেলা হইতে আহৃত হইবে এবং খনির সংখ্যা বাড়িবে। এইসমুদয় খনি

হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ সর্বকারী আয় হইতে বাংলা গবন্মেণ্টকে বঞ্চিত করা অসুচিত। বাংলা দেশ হইতে প্রাপ্ত ইনকামট্যাক্স সর্বাধিক; তাহা ভারত গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন। বঙ্গের বাণিজ্যস্বত্বও খুব বেশী; তাহাও ভারত গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন। পার্টের রপ্তানী-স্বত্বও বঙ্গের একচেটিয়া; কিন্তু তাহাও ভারত গবন্মেণ্ট শোষণ করেন। ভারত গবন্মেণ্ট এই প্রকারে কৃত্রিম অস্বাভাবিক উপায়ে বাংলা গবন্মেণ্টকে দরিদ্র করিয়াছেন। তাহার উপর আবার বহুকাল ধরিয়া যে ছোটনাগপুর বঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল, সেই বহুপনিষ্করসম্বন্ধ ভূখণ্ডকে বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। উহার সমুদয় অংশের উপর বঙ্গের স্বেচ্ছা দাবী নাই—যদিও বিহারেরও স্বেচ্ছা দাবী নাই; কিন্তু যে-সকল অংশের অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালী, সেই সমুদয় অংশের উপর নিশ্চয়ই বঙ্গের দাবী আছে। তাহা বঙ্গের সহিত পুনর্যুক্ত হউক।

বীরাষ্ট্রমী

কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্রীমতী সরলা দেবী বঙ্গ বীরাষ্ট্রমী উৎসব পুনঃপ্রবর্তিত করেন। বহু বৎসর উহা বন্ধ ছিল। এবার তিনি আবার উহা প্রবর্তিত করিয়াছেন। বালক ও যুবকেরা স্বস্থ, সবল এবং আত্মরক্ষা ও দুর্বলের রক্ষায় সমর্থ হন, ইহা সর্বথা বাঞ্ছনীয়। শ্রীমতী সরলা দেবী নারীদিগের মধ্যে আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গের মহা কল্যাণ সাধন করিবেন।

বীরাষ্ট্রমী উৎসব উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের আদর্শ বীররূপে খাড়া করার সমর্থন আমরা করিতে পারি না। তাঁহাকে আদর্শ বীর বলিয়া চিত্রিত করিতে হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের অপলাপ করিতে হয়, এবং চূর্ণকামের প্রয়োজনও বড় কম হয় না। একজন আদর্শ বীর খাড়া করিতে না পারিলেও বীরাষ্ট্রমীর উৎসব স্থানিকভাবে এবং উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

শৈতানের দেবোত্তর বিল

আধুনিক সময়ে কেহ কেহ পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য নিজের সমুদয় সম্পত্তিকে দেবোত্তর এবং উত্তরাধিকারীদিগকে সেবাইত করিয়া দেন। কিন্তু আগেকার যে-সব দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ ধর্মার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু তাহা ধর্মার্থে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও তাহার অধিকাংশ আয় সেবাইতদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় পাপাচরণে ও বহু-সংখ্যক নারীর সর্বনাশসাধনের জন্য ব্যয়িত হয়। অনেক মহান্ত ছুরাচার; তাহাদের দ্বারা এইরূপ অধর্ম আচরিত হয়।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় যাহাতে ধর্মার্থেই ব্যয়িত হয়, তাহার আইন-সম্মত উপায় নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত, প্রকাশিত ও পরীক্ষিত যাহাতে হয়, এতদ্বিনয়ক আইনে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এইরূপ আইন মাদ্রাজ প্রদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলায় এইরূপ আইন করাটবার জন্য শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ শৈতান একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মূল নীতির আমরা সমর্থন করি। এইরূপ আইন অল্পসারে কাজ হইলে নারীর সর্বনাশসাধন ও অন্তবিধ নানা পাপাচার কমিবার সম্ভাবনা। ধর্মশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির কতক আয় ব্যয়িত হইলে তাহা দাতাদের উদ্দেশ্যবিরোধী হইবে না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

যোলটি কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের অল্পমোদন করায় তিনি সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। কেবল তিনটি কমিটি পুনর শ্রীযুক্ত নরসিং চিন্তামন্ কেলকারকে সভাপতি নির্বাচন করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভারতীয় মহিলা এই প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারত-

বর্ষের সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বহুবার বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি এতদ্বারা বিস্তর পরিচয় করিয়াছেন। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য তথায় গিয়াছিলেন। বক্তৃতাশক্তি, সাহস, রাজনীতি-জ্ঞান ও মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি তথাকার অনেক ইউরোপীয়ের নিকট হইতেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমান সভ্যতার উৎকৃষ্ট দিকটি সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তিনি অনেক মুসলমান মহিলা ও ভ্রমলোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এইজন্য তিনি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে মুসলমান সমাজের পক্ষে প্রীতিকর অনেক কথা বলিতে পারিবেন। উর্দ্ধুতে বক্তৃতা করিবার অসুবিধা হইলে তিনি তাহাও সুন্দররূপে করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার কিম্বা অন্য কাহারও বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব্য স্থাপিত বা বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা না থাকিলেও সকল রাজনৈতিক দল যাহাতে এখন হইতে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন, তাহার চেষ্টা সীমিত সেরাজিনী নাইডু করিতে পারেন, এবং সে-চেষ্টা সফলও হইতে পারে। কারণ, এখন যে-কেহ বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিলেই কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারেন। এখন অবশ্য কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ স্বরাজ্যীরা ব্যবস্থাপক সভাপ্রলিতে মডারেট বা উদার-নৈতিকদের মতই কখন গবর্নেন্টের সহযোগিতা কখন বা বিরোধিতা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের মূল রাজনৈতিক মত বা কাৰ্য্য-প্রণালীতে উদারনৈতিকদিগের সহিত বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা অবশ্য চরম উপায় নিকপত্রব আইনলঙ্ঘনের কথা এখনও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। উহার মূল্য অন্ততঃ গবর্নেন্ট বৃত্তিতে সমর্থ।

এশিয়া আতঙ্ক-প্রসূত বিল

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোৎপন্ন অনেক

লোকের বাস। তথাকার তথাকথিত শ্বেত মাতৃষেরা নিজেদের ধনোপার্জননের সুবিধায় নিমিত্তই প্রথমতঃ অনেক ভারতীয়কে চুক্তিবদ্ধ কুলিরূপে তথায় লইয়া যায়। তাহাদের চুক্তির সময় শেষ হইবার পর তাহারা অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া যায়, এবং তাহাদের সম্মান-সম্মতিও অনেক হইয়াছে। তা ছাড়া প্রধানতঃ এইসকল ভারতীয়ের দরকারী নানা জিনিষ জোগাইবার ও প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত অনেক দোকানদার, ফেরীওয়াল, কারিগর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। অল্পসংখ্যক আইনজীবী, শিক্ষক প্রভৃতি ভারতীয়ও তথায় যায়।

অনেক বৎসর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়েরা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহী সমুদয় ভারতীয়কে নানা প্রকারে ঐ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ, শ্বেতকায়েরা বুঝিয়াছে, কোন প্রকার কাজেই তাহারা অবাধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না; কেননা, ভারতীয়দের খরচ কম এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহারা জিনিষপত্র শ্বেতকায় ব্যবসাদারদের চেয়ে সস্তায় দিতে পারে। ভারতীয়দিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন। তাহার ফলে তৎকালীন মন্ত্রী জেনার্যাল স্মার্টস্‌এর সহিত একটা রফা হয়। সেই রফা ভঙ্গ করিয়া এখন আবার নূতন উদ্যমে ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত মন্ত্রী ডাক্তার ম্যালান্ তৎপ্রণীত আইনের খসড়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে স্থাপিত করিবার 'বহুমতি চাহিবার নিমিত্ত যে-বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "জাতি হিসাবে ভারতীয়েরা এদেশে বিদেশী; এই প্রস্নের কোন সমাধানই এই দেশ-বাসীরা অনুমোদন করিবে না, যদি তাহা এই পরদেশীদের সংখ্যা খুব হ্রাস করিতে না পারে।" অবশ্য বিলটার আসল উদ্দেশ্য ভারতীয়দের হ্রাস নহে, তাহাদের উচ্ছেদই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বাসার্থ জমীর বা চাষের জমীর মালিক হওয়া কিম্বা

ব্যবসা বাণিজ্য করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে।

ইহা যে কিরূপ অশ্রম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহা বিধিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের প্রায় কাহারও ভারতবর্ষে ঘরবাড়ী নাই; তাহাদের অনেকেরই নিজের এবং বিস্তর লোকের বাপ-পিতামহের পর্য্যন্ত জন্ম হইয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকায়; তাহাদের বিস্তর লোক ভারতবর্ষের কোন ভাষায় কথা বলিতে পারে না; তাহাদের পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ধনশালী হইয়াছে; এবং তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে এক ছটাক জমীও কোথাও পৈত্রিক ভিটা বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না, এবং কোথাও জীবিকানির্ভর করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে।

আফ্রিকা কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের দেশ। মূলতঃ শ্বেত-কায়েরাও তথায় পরদেশী। কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনীতির জায়বিচার এমনি, যে, একজন শ্বেতকায় যদি সত্তর বৎসর বয়সে আফ্রিকার কোথাও গিয়া আড্ডা গাড়ে, তাহা হইলে সে পরদেশী বিবেচিত হইবে না, কিন্তু একজন ভারতীয়ের বাপ-পিতামহ পর্য্যন্ত যদি আফ্রিকা-জাত হয়, তাহা হইলেও সে তথায় পরদেশী বিবেচিত হইবে। ইহাও কম করিয়া বলা হইল। কয়েক শতাব্দী পূর্বে, যখন ইংরেজ ভারতে আসে নাই, তখন হইতে অনেক ভারতীয় পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছে; তাহাদেরই শ্রমে পূর্ব আফ্রিকা সভ্য যাত্রাবের বাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকাতেও ভারতীয়েরা পরদেশী এবং সেদিনকার আগন্তুক ইংরেজরা “স্বদেশী”; সেখান হইতেও ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১১ই অক্টোবর ভারতবর্ষের সর্বত্র ডাক্তার ম্যালানের বিলের প্রতিবাদ করিতে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের দুঃখমোচনার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে অস্বরোধ জানাইয়াছেন। (৬-১০-১৯২৫।)

বোম্বাই মিলসকলে ধর্মঘট

বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের মিলে যত কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহার কাটুতি কম হওয়ার মিলওয়ালারা শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দেয়। তাহাতে একটি একটি করিয়া সমুদয় মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। বোম্বাইয়ের মিলসকলের কাপড়ের কাটুতি কমিবার কারণ অনেক। জাপানের প্রতিযোগিতা তাহার মধ্যে একটি। উৎপাদনের ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাতেও দোষ আছে। মিলওয়ালারা কিন্তু বলিতেছে, যে, তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের উপর যে-শুল্ক আছে, তাহা উঠাইয়া দিলে তাহারা দর কমাইতে ও কাটুতি বাড়াইতে পারিবে। এই শুল্কের ইতিহাস সুবিদিত। বিলাতী কাপড় ও সূতার উপর যখন শুল্ক বসে, তখন বিলাতী মিলওয়ালারা দাবী করে, যে, শুল্ক ভারতের মিলজাত কাপড় ও সূতার উপরও বসুক। দেশী পণ্যশিল্প রক্ষার জন্ত বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসান প্রচলিত রীতি; কিন্তু যে-দেশে কাপড় প্রস্তুত হয়, সেই দেশেই তাহার উপর ট্যাক্স বসান অসম্ভব ব্যবস্থা। কিন্তু ভারত-প্রভু ইংরেজদের স্বার্থক্ষার জন্ত তাহাদের জেদে এই অসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই শুল্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন বহুবৎসরব্যাপী; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উঠাইয়া দিবার জন্ত প্রস্তাবও ধার্য হইয়া আছে, যদিও গবর্নেন্ট তাহা কার্যে পরিণত করেন নাই। সূতরাং বর্তমান ধর্মঘট না ঘটিলেও ঐ শুল্ক উঠিয়া যাওয়া উচিত ছিল।

মিলওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ইহা বলা আবশ্যিক যে, তাহারা কয়েক বৎসর পূর্বে তাহাদের মূলধনের উপর শতকরা একশত, দুইশত, তিনশত, চারিশত টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন শ্রমিকদিগকে সেই অসাধারণ লাভের হারাহারি অংশ দেন নাই। সৌভাগ্যের সময় শ্রমিকদিগকে সুখের ভাগ না দিয়া, এখন কাটুতি হ্রাসের সময় তাহারা শ্রমিকদিগের মজুরী কমাইতেছেন। এই শ্রমবিরুদ্ধ ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্ত তাহারা সর্বসাধারণের সহায়ত্ব পাাইবার অধিকারী নহেন।

মোটামুটি দেড় লক্ষ শ্রমিকের বেকার অবস্থা ঘটিয়াছে,

তাহাদের অনেকে নিজের নিজের গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বের লোক বেকার হওয়ার আহাঙ্গারির অপ্রাচুর্য্যবশতঃ নানাবিধ পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট্‌ এরূপ অবস্থায় বিলাতে যেরূপ সত্বর প্রতিকার-চেষ্টা করেন, এদেশে সেরূপ করেন না। বোধাই অঞ্চলে মিল-ওয়ালাদের প্রভাব বেশী বলিয়া শ্রমিকদের সাহায্যের জন্ত যথোচিত বে-সরকারী চেষ্টাও কিপ্রকারিতামহকারে আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কর্ম-পদ্ধতি

এসোসিয়েটেড্‌ প্রেস্‌ বলেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কানপুর কংগ্রেসের জন্ত নির্বাচিত সভাপতিরূপে কি করিবেন, তাহার নিম্নলিখিতরূপ আভাস দিয়াছেন :—

“নারীর পক্ষে যাহা শোভা পায়, আমার কার্য-পদ্ধতি সেইরূপ অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য রকমের হইবে। উহার উদ্দেশ্য হইবে কেবলমাত্র ভারতমাতাকে তাঁহার গৃহ-স্থালীতে একমাত্র কর্তার, তাঁহার সমৃদ্ধির অপরিমেয় উপাদান ও উপায়সকলের একমাত্র অভিভাবিকার এবং তাঁহার অক্লান্ত আতিথ্যের একমাত্র বিতরিতরী পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ভারতমাতার ভক্তিমতী বক্তারূপে আগামী সারা বৎসর ধরিয়্যা আমার প্রীতিপ্রসূত যদিও দুঃসাধ্য কর্তব্য হইবে, আমার মায়ের ধরকন্নায় শৃঙ্খলা আনয়ন, যে শোকাবহ বিবাদ-বিরোধে তাঁহার নানা সম্প্রদায়ের ও ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত পরিবারের একত্রে ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া সত্তাব স্থাপন, তাঁহার গৃহস্থালীতে তাঁহার দীনতম ও প্রবলতম সন্তানদের জন্ত উপযুক্ত স্থান, জীবনোদ্দেশ্য ও সম্মান নির্ধারণ, এবং তাঁহার গৃহে তাঁহার সন্তান, অতিথি ও বিদেশী আগন্তুকদিগের পোষণ।”

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

ব্রহ্মদেশে বহিষ্কার আইনের প্রতিবাদ

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি যে বহিষ্কার আইন পাস হইয়াছে, তদনুসারে, ব্রহ্ম-প্রবাসী কোন ভারতীয় কোন কোন অপরাধে দণ্ডিত হইলে, তাহাকে ব্রহ্মদেশ হইতে তাড়াইয়া

দেওয়া চলিবে। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়-সভ্যেরা এবং কোন-কোন ইউরোপীয় সভ্য উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও সরকারী সভ্য ও জাতীয় দলেব ব্রহ্মদেশীয় সভ্যদের মিলিত ভোটে উহা পাস হইয়াছে। এক্ষণে অনেক ব্রহ্মদেশীয় ব্যক্তিও প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছেন।

অতঃপর খাস ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশেব গবর্ণমেন্ট্‌ অল্প-সব প্রদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করিলেই ইংরেজ-ভেদ নীতির পূর্ণ বিকাশ হয়! তাহা অসম্ভবও নহে। কারণ নিবৃদ্ধিতা ও প্রাদেশিক ঈর্ষ্যা ব্রহ্মদেশীয়দিগের একচেটিয়া নহে।

একই ব্রিটিশ প্রভুর গোলাম ভারত-সাম্রাজ্যের এক অংশের লোকেরা যখন অল্প অংশের লোকদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করিতেছে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, যে, দণ্ডিত অপরাধীকে তাড়াইয়া দেওয়া বিশেষ আপত্তিজনক নহে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বাবস্থাটা কিরূপ অদ্ভুত। বিশেষ রকম ও গুরুতর অপরাধ না করিলে এক স্বাধীন জাতির লোক অল্প স্বাধীন দেশ হইতে যথা—ইংরেজ ক্রান্ত হইতে, ফরাসী ইংলণ্ড হইতে, সুইড-ইটালী হইতে ইত্যাদি তাড়িত হয় না। কি স্বদেশী কি বিদেশী চির-নির্কাসন দণ্ড গুরুতর অপরাধ ভিন্ন কাহাকেও দেওয়া হয় না। তা' ছাড়া, ব্রহ্মদেশীয় যে-অপরাধ করিলে তাড়িত হইবে না, ভারতীয় তাহা করিলে তাড়িত হইবে। এইরূপ অসাম্য ভারত বিদ্রোহী ব্রিটিশ উপনিবেশসকলের ভারতীয়গিরোধী নীতির সমর্থনার্থ ব্যবহৃত হইবে।

যে-সব ভারতীয় রাজনৈতিক পুরুষ ব্রহ্মদেশে জাগরণ আনয়নের চেষ্টা করিবেন, কিম্বা ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের নামে একটা য়া তা' অভিযোগ আনিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডিত ও নির্কাসিত করা কঠিন হইবে না।

সরকারত্ব ইংরেজদের প্ররোচনায় ব্রহ্মদেশের

ভারতীয় দল নির্বোধের কাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মদেশের বর্ধকার আইনের মত আইন বর্ষাদেবের বিরুদ্ধে প্রণয়ন করিবেন না। কিন্তু কিস্তি করিলে তাহা বর্ষাদেবের কেমন লাগিবে ?

গোকুলচন্দ্র নাগ

একত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগেব যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যের ও চিত্রকলার ক্ষতি হইল।

বাল্যকাল হইতে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা



গোকুলচন্দ্র নাগ

চিত্রকলায় তাঁহার অধিকতর অগ্রগতি ছিল। তিনি তিন বৎসর কলিকাতায় সরকারী আর্টস্কুলে মিঃ পাদি ব্রাউন্ ও শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, আনি বেসান্ট প্রভৃতির ছবি আঁকিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবার দিকেই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল।

তিনি ১৯১৮-১৯ সালে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম চক্রে কাজ করেন ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন।

১৯২০-২১ সালে ফোর্ আর্টস ক্লাবের (Four Arts Club) সংস্থানে স্থনীতি দেবী, মণীন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র দাস ও তিনি “ঝড়ের দোলা”-নামক গল্পের বহিঃ প্রকাশ করেন। পরবর্তী বৎসর তাঁহার ছোট গল্পের বহিঃ “সোনার ফল”, এবং টেনিসনের “দি প্রিন্সেস” কাব্য অবলম্বনে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য “রাজকন্যা” প্রকাশিত হয়।

১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত তিনি দীনেশচন্দ্র দাসের সহিত “কল্লোল” নামক মাসিক পত্র সম্পাদন ও পরিচালন করেন। এই সময়ে “পথিক” নামক সামাজিক উপস্থাপনের রচনা আঁকেন। ইহা কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যোগেশ্বায় তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন। তিনি মেটাবুলিঙ্কের ব্ল-বার্ডের বঙ্গভাষায় “পরীক্ষান” নাম দিয়া রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার “মায়াশুকুল” নামক ছোট গল্প সংগ্রহ, ও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লক্ষ্মী ট্রেন-ডাকাতি ও কংগ্রেসওয়ালাদের গ্রেপ্তার

লক্ষ্মী ট্রেন-ডাকাতি উপলক্ষ্যে আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের পুলিশ কয়েকজন কংগ্রেসের সভ্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এবং পরে তত্ত্ব আরও অনেককে গ্রেপ্তার করিতে পারে। নিঃসন্দেহ প্রমাণ ব্যতিরেকে দৃঢ় ব্যক্তিদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পণ্ডিত জগদীশ্বর লাল নেহরু বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু আছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না, যে, তাঁহারা এরূপ জঘন্য কাজ করিতে পারেন।

এ বৎসর আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে এখন আর নিজের হাতে চরকাই সূতা কাটিয়া চাদা স্বরূপ তাহা দিতে হইবে না; চারি আনা চাদা বৎসরে দিলেই হইবে।

সুতরাং এখন কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা খুব বাড়িতে পারে, এবং কংগ্রেস দলে পুরু হইলে তাহার প্রভাবও বাড়িবে। কিন্তু কংগ্রেসের সভ্য হইলে যদি ডাকাতি অপরাধের সম্বন্ধে ধৃত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অনেকে ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার সভ্য হইবে না। কংগ্রেসের সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণাবলীর মধ্যে এইরূপ কোন অভিসন্ধি আছে কি না, বলা যায় না। বন্ধে অজ্ঞেদের পরবর্তী আন্দোলনের সময় অনেক নির্দোষ ব্যক্তিকে “রাজনৈতিক ডাকাতি” অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকাল হাজতে রাখিয়া তাহাদের “বিচার” করা হয়। কিন্তু পুলিশ দোষ প্রমাণ করিতে না পারায় তাহারা বেকসুর খালাস পান; প্রসিদ্ধ অদেশী গায়ক হেমচন্দ্র সেন ইহার মধ্যে ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্বেও বাংলা দেশে ডাকাতি অপরাধে ধৃত কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর যুবক বিচারে খালাস পাইয়াছে।

ভদ্রশ্রেণীর লোকের কিনা কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত লোকের ডাকাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব, বলিতেছি না। কিন্তু ইহাই বলিতে চাই, যে, কাহাকেও ডাকাত বলিয়া বিশ্বাস করিবার পূর্বে সম্বন্ধহাতীত প্রমাণ চাই। পক্ষান্তরে ইহাও বলিতেছি, যে, কোন-না-কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরপরাধ লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বাংলায় শ্রমিকের সংখ্যা

একজন লেখক মহাত্মা গান্ধীকে বাংলা দেশের কলকারখানা সমূহের শ্রমিকদিগের সংখ্যার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা ইয়ং ইণ্ডিয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৬,৬২,০০০। ইহাদের অধিকাংশ (প্রায় সকলেই বলিলে অত্যুক্তি হয় না) অবাঙালী। লেখক বলেন, ইহাদের নৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয়। মদ, বেয়া ও জুয়াখেলায় ইহাদের সর্বনাশ হইতেছে। ইহাদিগকে সংপথে আনিয়া চরিজবানু করিতে হইলে অনন্তকর্ম্মা, ত্যাগী ও পবিত্রচেতা এরূপ কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাহারা ইহাদের মধ্যে দিব্যরাজি বাস করিবেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ

করিতে সমর্থ হইবেন। অর্থের অভাব হইবে না; যথেষ্ট অর্থ শ্রমিকরাই দিবে। ইহারা যদিও বাঙালী নহে, তথাপি ইহারা বাংলাদেশে বাস করে বলিয়া ইহাদের সংস্পর্শে বন্ধের সামাজিক অধোগতি অনিবার্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ধর্ম্মঘট ঘটাইবার জন্ত মধ্য মধ্য ইহাদের প্রতি রাজনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এখনও নেতা ও নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করে নাই।

—

শ্রমিকদের নেতার খবর

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসের একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্নেন্ট স্বীকার করিয়াছেন, যে, কলকারখানার শ্রমিকরা চাষীশ্রেণীর লোকদের চেয়ে মদ, আফিং, গাঁজা প্রভৃতিতে বেশী খরচ করে। উক্ত সভা যখন পুনর্বার জিজ্ঞাসা করেন, যে, এই অবস্থায় গবর্নেন্ট মদের দোকান কলকারখানার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া পানমত্ততার হ্রাস করিবেন কি না, তখন সবুকার পক্ষ হইতে এমার্সন্ সাহেব বলেন, “না”।

লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, ভারতশাসন ও ভারতবর্ষ হইতে ধন আহরণ (administration and exploitation) একই প্রক্রিয়ার দুটা দিক্। বক্ষ্যমাণ বিষয়টি হইতে দেখা যাইতেছে যে, কম মজুরী দিয়া ইউরোপীয় কলকারখানাওয়ালারা শ্রমিকদের পরিশ্রম হইতে প্রভূত ধন উপার্জন করিতেছে। আবার ভারত-শাসনযন্ত্র মদ, গাঁজা, আফিং শ্রমিকদের দরজার নিকট পৌছাইয়া দিয়া ঐ কম মজুরীতেও ভাগ বসাইতেছে।

অসভ্য লোকদিগকে সভ্য করিয়া তাহাদের পরিজ্ঞান সাধনের ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কি হইতে পারে ?

—

নারীর সাহস

নারীর উপর অত্যাচার বাংলাদেশে বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। পুরুষেরা নিরস্ত্র ও নিবীৰ্য্য এবং নারীরা

ঘরের মধ্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকায় দুর্ভাগ্য লোকদের খুব স্বেচ্ছা হইয়াছে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও কোন মহিলা সাহস দেখাইলে তাহা প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। এইরূপ একটি সাহসের দৃষ্টান্ত কলিকাতার দৈনিক “হিন্দুস্থান” হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গিরীশচন্দ্র আদক বঙ্গবন্ধু খানার এলাকাধীন রাজারামপুরের একজন ধনী গৃহস্থ। গত ১৬ই তারিখ সন্ধ্যার কিছু পরে, গিরীশবাবুর স্ত্রী তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন; ছেলেপিলেরা তাঁহার পাশে খেলিতেছিল। ঐ সময় তিনি কতকগুলি লোককে তাঁহাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেখিতে পান। স্বামী গৃহে ছিলেন না, এমন অবস্থায় অপরিচিত লোকদিগকে ঐরূপ সময় বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে স্বভাবতই ভয় হয়। তিনি ছেলেপিলেদিগকে ঘরের ভিতরে দিয়া নিজেও তাহাদের পিছনে ঘরে ঢুকিতে বাইতেছেন ঠিক সেই সময়ই ডাকাতদের মধ্যে একজন ছুটিয়া বারান্দার উপর উঠে এবং দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য দেয়। গিরীশবাবুর পত্নী ঘরের ভিতর হইতে দরজা চাপিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করেন—ছুই দিক হইতে প্রবল সংগ্রাম চলিতে থাকে। দরজা বন্ধ হইতেছিল না ভিতরে মাঝে মাঝে একটু বেশী হইতেছিল, একজন ডাকাত ঐ কাকের ভিতর দিয়া একটা পটকা ছুড়িয়া দেয়; পটকাটি কাটিয়া গিরীশবাবুর পত্নীর গায়ে লাগে। এই ব্যাপারে তাঁহার হাতের জোর একটু টিলা হয়। দরজার কঁক আরও বেশী হয়। ঐ সময় একজন ডাকাত দরজার দুইটি পাটের ভিতর দিয়া হাত পলাইয়া দেয়। গিরীশবাবুর পত্নী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন—তিনি দিয়া না গিয়া বিগুণ জোরে দরজা চাপেন এবং ডাকাতের ৪টি আঙ্গুল সহিতই দরজার খিল আঁটিয়া দেন। অতঃপর ডাকাতেরা তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হয় না। অবশেষে তাহাদের সঙ্গীর চারিটি আঙ্গুল সেই দরজার সঙ্গে রাখিয়াই তাহাদিগকে প্রাণ লইয়া পলাইতে হয়। পুলিশ ঐ চারিটি আঙ্গুলকে স্ত্রী স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ডাকাতদের ধোঁজ করিতে থাকে। ধোঁজ হয় যে, রাজারামপুরের নিকটবর্তী কালীপুরের বোগেন্দ্রনাথ দাশের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র দাশের চারিটি আঙ্গুলের সম্পত্তি অভাব ঘটয়াছে। বোগেন্দ্রবাবু সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ব্যক্তি, বঙ্কিম ভৃত্যের শ্রেণীর ছাত্র। কালীপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বঙ্কিমকে হাজীর করা হইয়াছিল। বঙ্কিম তাঁহার কাছে স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

নারীর সাহসের দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে বিরল নহে। দৃষ্টান্তগুলি যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নিশ্চয় দেশের উপকার হইবে। যিনি সংগ্রহ করিবেন, তিনি কোন্ ঘটনা কোন্ তারিখের কোন্ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাহা যেন সকল স্থলে নির্দেশ করেন। দৃষ্টান্তগুলি সংকলিত ও স্বেচ্ছাস্থ হইলে প্রকাশকের অভাব হইবে না।

ইতিহাস দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উৎপাদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অণ্ড অতঃপর ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা বাংলা ভাষার সাহায্যে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই নিয়ম প্রণয়ন উপলক্ষ্যে আমরা পূর্বে লিখিয়াছিলাম, যে, অতঃপর প্রবেশিকার উপযোগী ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় লিখিতে হইবে।

তৎসম্পর্কে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; ভারতবর্ষের বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাস রচনা করিবার সময় ভারতীয় লেখকেরা সচরাচর ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পক্ষা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল স্থলে তাহা বিধেয় নহে। ইংরেজদের লেখা ইতিহাস দ্বারা অনেক স্থলে অকারণ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসম্ভাব উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। সত্যের অপলাপ বা গোপন করিতে আমরা বলিতেছি না। কিন্তু মিথ্যা পরিহার করিতে হইবে, এবং সত্যও এরূপ ভাষায় ও এরূপ সাবধানতার সহিত বলিতে হইবে, যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্মিয়া আদি জন্মিবার বা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা যথাসম্ভব কম হয়।

রামলীলা বন্ধ

বাংলাদেশে যেমন দুর্গাৎসব, হিন্দীভাষী সমুদয় উত্তর ও মধ্যভারতে রামলীলা তেমনি বৎসরের মধ্যে সর্বসাধারণের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য উৎসব। এই উপলক্ষ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রামের জয়লাভ শোভাযাত্রা দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়, এবং তন্মিত্র কোন কোন যুবকে বাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবান্ধ প্রভৃতি সাম্রাজ্য শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যাওয়া হয়। সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির সংও কিছু কিছু শোভাযাত্রার সহিত বাহির করা হয়।

যাহাতে সাক্ষাৎভাবে সমাজে ছনীতি ও অপবিত্রতা বাড়ে, এরূপ কোন কোন সামাজিক অস্থিষ্ঠান ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া গবয়েন্টের কর্তব্য বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু অন্ত কোন স্থলেই কোনও

ধর্মসম্প্রদায়ের পূজা-উৎসব প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করা গবর্নেন্টের অকর্তব্য। কিন্তু এবৎসর গবর্নেন্টের কর্মচারীরা এলাহাবাদ ও অন্ত কোন কোন জায়গায় প্রকারান্তরে হিন্দুদিগকে রামলীলারূপ উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ উৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। আমরা এলাহাবাদের কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি; এইজন্য এখানকার কথাই লিখিব।

আমরা ১-২৫ হইতে ১২০৮ পর্যন্ত তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার পরও বহুবার এখানে পূজার ছুটিতে আসিয়াছি। এলাহাবাদ-প্রবাসের শেষ কয়েক বৎসর, যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া রামলীলার শোভাযাত্রা গিয়া থাকে, সেই রাস্তার একটি বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। এখানকার বিখ্যাত পাণিনি আফিস যে-বাড়ীতে অবস্থিত তাহাও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর। এই বাড়ীতে বসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি বৎসর শতশত হিন্দুস্থানী ও বাঙালী পুরুষ ও নারী রামলীলা দেখিয়া থাকেন; আমরাও অনেকবার দেখিয়াছি। বর্তমান বৎসর এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম করেন, যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে স্থিত তিনটি মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদিগকে শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক গীতবাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। গীতবাদ্য শোভাযাত্রার অঙ্গ এবং এলাহাবাদে উহা বন্ধ করিতে কোন বৎসরই বলা হয় নাই। সুতরাং এবৎসর একরূপ হুকুম দেওয়ায় হিন্দুরা স্থির করেন, যে, বরং তাঁহারা রামলীলা করিবেন না, তন্ম্যাজিস্ট্রেটের এই অস্তায় আদেশ মানিয়া লইবেন না। আমাদের বিবেচনায় হিন্দুরা ঠিক কাজ করিয়াছেন। সহকারী কর্মচারীর আদেশে কোন ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিজ জায়সজ্জত অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য, যদি কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক আপোষে নিজেদের কোন কোন অধিকার-ভোগ স্বগিত রাখেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

একরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে, হিন্দুরা এবার যদি রামলীলা বাহির করিতেন এবং তিনটি মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিতেন, তাহা হইলেও কোন-না-কোন অছিলায় একটা দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা

করা হইত; বিশ্বস্তৃত্রে ভুলিয়াছি, তাহার আয়োজন পূর্ব হইতেই করা হইয়াছিল।

মসজিদের সম্মুখে, বিশেষতঃ নমাজের সময়, গীতবাদ্য মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহার আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ; কারণ আমরা তাঁহাদের শাস্ত্রের সামান্য অংশমাত্র অমুবাদ পড়িয়াছি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝিতে পারি, যে, যখন ঈশ্বরের আরাধনা-আদি মসজিদে হয়, তখন বাহিরে গোলমাল হইলে ব্যাঘাত জন্মে; অস্ত্র সময়ে কোন গোলমাল হইলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আরাধনা প্রার্থনা ধ্যানধারণার স্থান সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুক্ত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যে, বড় বড় শহরে রাস্তার উপর নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমন্দির অবস্থিত, এবং রাস্তা দিয়া ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানারকমের গাড়ী ও অস্ত্র বাহন, নানা রকমের মানুষ ও জন্তু নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে যায়। তাহাতে আরাধনা, ধ্যানধারণা দূরে থাকুক, সাধারণ কথা-বার্তা, পরামর্শ ও লেখাপড়ার কাজ করাও অনেক সময় নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু অভ্যাসদ্বারা মনকে বাহ্যবিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের-নিজের কাজে মন দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মের মসজিদ মন্দির গির্জা গুরুদ্বারা প্রভৃতির সম্মুখে দিবস ও রাত্রির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাস্তার সব শব্দ বন্ধ করিতে হইলে নগরবাসীদের কাজ করা সুকঠিন হয়। এইজন্য লোকালয়ে বাস করিতে হইলে কোন কোন অস্থবিধা সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই।

মুসলমানেরা যখন অন্ত নানা ধর্মাবলম্বীর সহিত একই দেশে, নগরে, গ্রামে বাস করেন, তখন তাঁহারা একরূপ দাবী করিলে সুশোভন হইবে না, যে, কেবল তাঁহাদেরই অস্ত্র একরূপ কোন-কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা অন্ত্রের জন্ত করিতে হইবে না। মুসলমানেরা যে-দেশের একমাত্র অধিবাসী, সেখানে অবশ্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা হইতে পারে।

শুধু মুসলমানদের শাস্ত্রে নহে, অন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রেও একরূপ আদেশ থাকিতে পারে, যাহা কেবল ঐ-ঐ ধর্মাবলম্বীরা মানিতে পারেন, অন্ত্রেরা যেচ্ছাষ মানিতে

পারে না। এই অল্প নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতবর্ষে সকলকে স্মৃষ্টি ও সন্তোষে এবং উন্নতিকর অবস্থাতে বাস করিতে হইলে, প্রত্যেককেই নিজের কিছু-কিছু দাবী হ্রাস করিতে বা ছাড়িয়া দিতে হইবে। এলাহাবাদ এবং অল্প নানাস্থানে বহুবৎসর ধারিয়া যে মসজিদ গির্জা প্রভৃতির সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, ইহাতে মুসলমান ধর্মের ও সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই।

কেবলমাত্র হিন্দুদের গীতবাদ্যেই ব্যাঘাত বা ধর্মহানি হয়, এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এলাহাবাদের যে গ্র্যাণ্ডট্রাক্ রোডের তিনটি মসজিদের সম্মুখে রামলীলার গীতবাদ্য বন্ধ করিতে ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দেন, সেই রাস্তায় ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত একার বন্বান্, ঘড়ং-ঘড়ং শব্দে কান ঝালাপালা হয়; তাহা মসজিদের সামনে কেহ কখন বন্ধ করে না, করা যায় না। তাহার উপর ঘোড়ার-গাড়ীর শব্দ, মোটরকারের ভেঁপু, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনদাতাদের ঢাকের শব্দ, এবং অন্যান্য গোলমাল এই রাস্তায় লাগিয়াই আছে। মহরমের সময় মুসলমানেরা যে দিনরাত ঢাক পিটান, তাহা কোন মসজিদের সম্মুখে বন্ধ হয় না, কোন গির্জার সামনে বন্ধ হয় না, কোথাও বন্ধ হয় না। স্মরণীয় যুক্তি ও স্ববিবেচনার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে, যে-সকল মুসলমানের অহুরোধে এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার হুকুম জারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রতি সন্তোষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই; এবং ম্যাজিস্ট্রেটও স্তায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখান নাই। সমস্ত বৎসর ধরিয়া মসজিদের নমাজকারীরা যদি একার শ্রুতিকটু শব্দ, থিয়েটারের ঢকা নিনাদ, ঘোড়ার-গাড়ী, গরুরগাড়ী, মোটরকার প্রভৃতির শব্দ ও অল্প গোলমাল সহ্য করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদের ধর্মহানি না হয়, তাহা হইলে বৎসরান্তে একদিন কয়েক মিনিটের অল্প হিন্দুদের গীতবাদ্যে তাঁহাদের ধর্মহানি হইত না, সাধনার ব্যাঘাত হইত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

অনেক দিন হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, ধর্মহানি হইলেও তাহা সহিয়া বাইতে হইবে, এমন কথা আমরা

বলিতেছি না। এই বৎসরই নাগপুরে মুসলমানদের সম্মতিক্রমে মসজিদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্যসহ হিন্দু শোভাযাত্রা করিয়াছেন। তথাপি বলি, যদি এলাহাবাদের মুসলমানেরা মনে করিয়াছিলেন, যে, রামলীলার গীতবাদ্য মসজিদের সম্মুখে বন্ধ না করিলে তাঁহাদেরও ধর্ম টিকিবে না (যদিও গীতবাদ্যসঙ্গেও এতদিন টিকিয়া আছে) তাহা হইলে হিন্দু-নেতাদের সহিত আপোষ এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করাই উচিত ছিল। প্রয়োজন হইলে বাহিরের প্রসিদ্ধ মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সাহায্য তাঁহারা লইতে পারিতেন। প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য চাহিয়া তাঁহারা এই অপমানকর সিদ্ধান্তের প্রমাণ জোগাইয়াছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানেরা সামান্ত বিষয়েও নিজেরা কোন নিষ্পত্তি করিতে পারে না, একই মনিবের পরস্পরদংশনপয়ারণ কুকুরের মত তাহারা মনিবের চাবুকের অপেক্ষা রাখে।

সহজ যুক্তিতে ও সাধারণ যুক্তিতে যাহা বলে, আমরা তদনুসারে মুসলমানদের কি করা উচিত ছিল, তাহা নির্দেশ করিয়াছি। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। কারণ ইংরেজদের যুক্তিই এই, যে, তাহারা হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ নিরারণের জন্যই এদেশে আসিয়াছিল ও এখনও আছে, স্মরণীয় তাহারা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, কল্লিত-ঝগড়া, প্রত্যাশিত ঝগড়া, কৃত্রিম উপায়ে বাধান ঝগড়া ইত্যাদি কোন-টাই নিবারণ করিবার বা মিটাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারে না। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় সামাজিক হিত-সাধনের জন্য বে-স্বকারী সভ্যেরা কোন বিচার উপস্থিত করিলে গবর্নমেন্টের মুখপাত্রেরা কখন-কখন ভ্রাতৃসাজেন ও বলেন, আমরা ধর্ম-স্বাধীন ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।

মুসলমানদের যে-পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল আমরা বলিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর একশতদিনব্যাপী উপবাসের সময়ের নানা সম্প্রদায়ের একতা-বিধায়ক কন্কারেন্সে সেইরূপ পন্থাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার কয়েকটি প্রস্তাব নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

That Muslims must not expect to stop Hindu music near or in front of mosques by force, reso-

lution of a local body, act of legislature or order of court, except by mutual consent, but must rely upon the good sense of Hindus to respect their feelings.

Nothing stated in the above clause shall unsettle or affect any local custom or agreement between the two communities already in existence nor shall it authorise the playing of music in front of mosques where it has not been played before. Any dispute with regard to the latter shall be referred for settlement to the National Panchayet formed under Resolution No. 5.

The Hindu members of this conference call upon their co-religionists to avoid playing music before mosques in such a manner as to disturb congregational prayers.

পল্লীগঠনের জন্য স্বরাজ্য তহবিল

১৯২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বন্ধের পল্লী সকলের সংস্কার ও পুনর্গঠনের নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকা জম্ম একটি আবেদন-পত্র বাহির করেন, স্বরাজ্যদলের এই তহবিলের অধিকাংশ পল্লীগঠনমূহে কাজ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে ('will be mostly devoted to work in the villages') বলা হয়। গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের ফরওয়ার্ড কাগজে দাশ-মহাশয় প্রকাশ করেন, যে, স্বরাজ্য তহবিলে ঐ তারিখ পর্যন্ত ২২৫০০৩/১১।।০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ১৯শে ভাদ্র তারিখের নামক কাগজে লেখেন, যে, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২,৩২,২২১।।০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ফরওয়ার্ডে এই তহবিলের আর্থিক কমিটির সভ্য প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু, আবু প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু নিখিলচন্দ্র চন্দ্র, বাবু শরৎচন্দ্র বসু ও বাবু নলিনীরঞ্জন সরকার সর্বসাধারণকে জানানাইয়াছেন যে, ঐ তহবিলের হিসাবে ব্যাঙ্কে মোট ২২,২১২/৩ প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মোট ১০৮৬৬/০র কতকগুলি চেক ছিল, তাহার টাকা পাওয়া যায় নাই; কারণ চেকদাতাগণের হিসাবে ব্যাঙ্কে কোন টাকা ছিল না। এই সাধু ধনী দাতাগণ ছাড়া কতকগুলি দরিদ্রতর সাধু দাতা কিছু মেকী মুদ্রা দিয়াছিলেন; তাহার মোট পরিমাণ ১৫২।। এই সমুদয় সাধু দাতাগণের দান বাদ দিয়া ব্যাঙ্কে খাটি ৮১৬৮২৬/৩ জমা ছিল। এই তহবিলের জম্ম আবেদন

বাড়ির কারবার বহু পূর্বে শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী ফরওয়ার্ডের জম্ম ছাপিবার যত্নাদি কিনিবার নিমিত্ত যে সওয়া লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য তহবিলে তিনি দান করেন, অর্থাৎ সেই টাকাটা স্বরাজ্য তহবিলে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে যে-আয় হইবে, তাহা পল্লীগঠনের জম্ম ব্যয়িত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

যাহা হউক যখন সর্বসাধারণকে জানান হয়, যে, স্বরাজ্য তহবিলে সওয়া দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে সওয়া লক্ষ টাকা যে এই রকমের দান তাহা প্রকাশ করা হয় নাই; স্বরাজ্য তহবিলে খুব টাকা আসিতেছে সর্বসাধারণের মনে এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়া আরও টাকা পাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ফরওয়ার্ড-কাগজে হইতে যদি কোন আয় না হয়, কিম্বা উহার পুরাতন যত্নাদি একেজো হইয়া গেলে নূতন যত্নাদি কিনিবার জম্ম আবার টাকা তুলিতে হয়, তাহা হইলে এই সওয়া লক্ষ টাকা কিম্বা তাহার আয় পল্লীগঠনকার্যে কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে? এরূপ ভেদী বাজী ভাল নয়। ইহা মিথ্যাচরণের মাসতুতো ভাই।

যে-সব সাধু ধনী দাতা মোট ১০৮৬৬/০র ব্যাঙ্কে চেক দিয়াছিলেন, স্বরাজ্য তহবিলের আর্থিক কমিটির উর্দাদিগকে উকিলের চিঠি দেওয়া উচিত, যে, হয় উর্দাদিগকে স্বয়ং চেকের সমান নগদ টাকা দিন, নতুবা উর্দাদিগের বিরুদ্ধে আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করা হইবে। প্রবন্ধ-নার প্রথম দেওয়া কমিটির উচিত নহে।

কমিটি যে-হিসাব দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ব্যাঙ্কে ২২২৪২/৩ প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার সহিত তুলসী-বাবুর সওয়া লাখরূপ দ্বিতীয়বার জবাই-করা মুরগী যোগ করিলে মোট টাকা ২১৭২৪২/৩ হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, মোট ২২৫০০৩/১১।।০ আদায় হইয়াছে। তাহা হইলে ৭৭৫৪।।০র পরমিল হইতেছে। এই প্রায় আট হাজার টাকা কে লইল? চিত্তরঞ্জন সওয়া ছায়া সংগৃহীত হইয়াছে প্রকাশ করিবার

পর প্রতাপচন্দ্র গুহরায় যে আরও প্রায় সাত হাজার টাকা আদায়ের সংবাদ “নায়ক” পত্রের মারফৎ জ্ঞাপন করেন, তাহারই বা কি হইল? অবশ্য স্বরাজ্য দলের প্রত্যেক সন্তকে এই গরমিলের জন্ম দায়ী করা যায় না। কিন্তু নেতারা ত দায়ী? চিত্তরঞ্জন পরলোকে, প্রতাপচন্দ্র জেলে। কৈফিয়ৎ কাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে? মহাত্মা গান্ধী এখন একটা খুব জবর রকমের সার্টিফিকেট স্বরাজ্য-দলকে বা উহার নেতাদিগকে দিলে ভাল হয়। তাহা সিলেট বা কাটনীর অনেক মণ চূণের কাজ করিবে কি না, তাহা অবশ্য বলিতে পারি না।

যাহা হউক অর্ধ-কমিটির হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, খাঁটি ৮১৩৮২৫/৩ ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল। এই টাকার কত অংশ কি বাবতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা দরকার। হিসাবে দেখা যাইতেছে, যে, একাশি হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা চিত্তরঞ্জনকে দেওয়া হয়, স্বরাজ্য দলের অতীত কালের দেনা শোধ ও বর্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্ম। এই পঁচিশ হাজার কিরূপে খরচ করা হইয়াছে, তাহার কোন বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের দেশবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনে লেখা হইয়াছিল বটে, যে, স্বরাজ্য তহবিলের অধিকাংশ টাকা পল্লীসমূহের কার্যে ব্যয়িত হইবে, অর্থাৎ উহার কতক অংশ অন্য কাজেও খরচ হইতে পারে; সুতরাং আইনজীবীদের চুলচেরা তর্ক-অল্পসারে এই ২৫০০০ টাকাকে তহবিল-তরুণ বলা যায় না। তাহা হইলেও কি-কি বাবতে উহা খরচ হইল, তাহার একটা বিস্তারিত হিসাব দেশ-বন্ধুর দেওয়া উচিত ছিল। জমার অর্থাৎ আদায়ের ঘরে তিনি সাড়ে এগার পাইটি-পর্যন্ত দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু খরচের ঘরে পঁচিশের পিঠে, একটা নয়, দুটা নয়, একেবারে তিন-তিনটা শুল্ক বড় বেমানান দেখাইতেছে।

পঁচিশ হাজার টাকাটা বড় সামান্য টাকা নয়। স্বরাজ্যদলের নেতারা দাবী করেন, যে, তাঁহারা লোকদের ভারী বিশ্বাসভাজন এবং দেশের মহা-উপকার করিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অতীত দেনা-শোধ ও বর্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্ম টাকা তুলিবার

নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র আবেদন কেন বাহির করেন নাই? পল্লীসকলের ছরবহা সর্বজনবিদিত, এবং পল্লীবাসীদের প্রতি অগণিত লোকের সহায়ত্ব আছে। এই মমতার স্বঘোণে টাকা তুলিয়া তাহার মধ্য হইতে স্বরাজ্যদলের দেনা শোধ কি উচিত হইয়াছে?

তাহার পর দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে ৩২০০ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্ম প্রাদেশিক কমিটি কি দলিল দিয়াছেন, বা কি সম্পত্তি বন্ধক দিয়াছেন? এই টাকা আদায় কি প্রকারে হইবে? প্রাদেশিক কমিটির ব্যয় টিগক-স্বরাজ্য-ফণ্ড হইতে বা অন্য কোন উপায়ে নির্বাহিত না হইয়া, পল্লীবাসীদের জন্ম সংগৃহীত টাকা হইতে কেন নির্বাহ করা হইল?

তাহার পর দেখা যাইতেছে, যে, ছয় শত কত টাকা স্বরাজ্যদলের মেসের খরচ; অর্থাৎ তাঁহারা ইহা নিজদের খানাপিনায় ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্য স্বরাজ্যদলের ভোক্তা এই সভ্যরা কিম্বা তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বেরা যখন কোন-কোন পল্লীগ্রামে বাস করেন বা করিতেন, তখন এই সবলগ্ ছয় শত টাকা পল্লীগ্রাম-সমূহের জন্ম খরচ করা হইয়াছে বলিলে সভ্যের অপলাপ করা হইবে না।

অতঃপর দেখা যাইতেছে, যে, আঠার শত টাকা মোটর-গাড়ীর ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রায় এগার হাজার টাকার বাজে চেক আদায় করিবার নিমিত্ত স্বরাজ্য দলের সভ্যরা ট্যান্ডিতে চড়িয়া সাধু ধনীদাতাদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

সর্বশেষে দেখা যাইতেছে, যে, স্বরাজ্য তহবিল হইতে প্রায় দুই হাজার (“about two thousand”) টাকা পল্লীগঠনের জন্ম খরচ করা হইয়াছে—কোথায়-কোথায় কি-কি বাবতে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আশা করি ঠিক ১৯২৫/১৯১০ খরচ করা হইয়াছে; দুইয়ের পিঠে তিনটা শুল্ক নিতান্ত অশোভন।

ব্যাঙ্কে খাঁটি জমা ৮১৩৮২৫/৩ পাইয়ের মধ্যে তাহা হইলে মোটামুটি ৩০৬০০ টাকা, অর্থাৎ একতৃতীয়াংশেরও উপর, পল্লীগঠন ভিন্ন অন্য কাজে ব্যয় করা হইয়াছে, এবং পল্লীগঠনের জন্ম প্রায় দুই হাজার ব্যয় করা হইয়াছে।

এখনও অর্ধেকের উপর টাকা মজুদ আছে ; সুতরাং দেশ-বন্ধুর আবেদনের আইনসম্মত ব্যাখ্যা-অনুসারে এখনও গচ্ছিত টাকার “অধিকাংশ” পরীক্ষার কাজে ব্যয় করা যাইতে পারে ;—তুলসী-বাবুর ছুইবার অবাই মুরগী “সওয়া লাখ” অবশ্য হিসাবে না ধরিয়া ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন্, বেঙ্গল) ১৯২৪ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে ইহার ১৯২৪ সালের কার্যবিবরণ এবং আর্থিক অবস্থা জানিতে পারা যায়।

১৯২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫২ ছিল। ইহা বড় কম। সভ্য-সংখ্যা আরো বাড়ি উচিত। বাড়াইবার কোন চেষ্টা এখন হয় কি না, প্রতিবেদন হইতে তাহা জানা যায় না।

১৯২৪ সালে পরিষদের আয় ৪৭৩৪৭.০৮/৬ এবং ব্যয় ৪৭১২০.০৮/৭ হইয়াছিল। ইহার অল্পমোদিত বিভাগ-গুলির অল্প ৫১৯৫, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের অল্প ১১৮১৮৩/৫ এবং পরিষদের সাধারণ ব্যয় বাবতে ৩৪৮৫-২২৬২ খরচ হইয়াছিল। বিস্তারিত হিসাব প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত।

শ্রাব্ রাসবিহারী ঘোষের সম্পত্তি হইতে তাঁহার নির্দিষ্ট অল্পদান দানের টাকা দিয়া বাকী সম্পত্তি পরিষদকে তিনি দান করিয়া যান। ইহার মূল্য বোল লক্ষ টাকার অধিক বলিয়া অল্পমিত হইয়াছে। এই দান পরিষদের কার্যকে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে।

১৯২৪ সালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল-ইন্সটিটিউটের ছাত্র-সংখ্যা ৭০০ ছিল ; তন্মধ্যে ঐ বৎসর ২৮৭ জন নূতন ছাত্র ভর্তি হয়, বাকী পূর্ব-পূর্ব বৎসরে ভর্তি হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানটির সমুদয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্মিত ও সজ্জিত হইয়া গেলে উহাতে প্রায় এক হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইতে পারিবে।

পরিষদ-কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল জাশনাল কলেজ ছাত্রাবাসে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন সাধারণ শিক্ষার জন্য নানা বিষয়ে বন্ধুতা দেওয়া হয়, এবং মফঃস্বলের একশটি বিভাগকে অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে কলিত বিজ্ঞান ও শিল্প শিখন হয়। তাহার অল্প পরিষদ আরও টাকা চান। এক্ষণে যতগুলি ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকনিবাস আছে, তাহার উপর আটটি ছাত্রাবাস ও ছয়টি অধ্যাপকনিবাস নির্মাণ করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের অল্প আরো অনেক পুস্তক, বিশেষতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক কিনিতে হইবে। অনেক কল, যন্ত্র, প্রভৃতি কিনিতে হইবে। বর্তমানে ছাত্রদের নিকট হইতে নিম্নবিভাগে মাসিক ছয় এবং উচ্চ বিভাগে মাসিক আট টাকা বেতন লওয়া হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যয়ের তুলনায় এই বেতন কম। যদি বেতন না বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে পরিষদের আরো যবলগ দান পাওয়া দরকার, যাহার আয় হইতে ছাত্রদের বেতনের আয়ের প্রাপ্তি হইতে পারে। পরিষদ তাঁহাদের মূলধন আর ইয়ারতে ও সর-কামে ব্যয় করিতে সমর্থ নহেন। এইজন্য বহু ব্যক্তি-দের দানের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

লগনের সিটি এণ্ড্ গিল্ডস্ ইন্সটিটিউট পরীক্ষার কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের ছাত্রদিগকে প্রথম-শ্রেণীর পরীক্ষা না দিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা দিবার অল্পমতি দিয়াছেন। লগনের ঐ পরীক্ষায় ১৯২৪ সালে পরিষদের প্রতিষ্ঠানের ৪৫ জন ছাত্র পাস হইয়াছে। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট অল্পমোদিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

বাংলা দেশে গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে অল্প যত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কর্তৃপক্ষদেরা যদি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এইসকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই আয় যথেষ্ট নহে উনিয়াছি। তাহা-দের বর্তমান আয় কিভাবে ব্যয়িত হয় এবং আরও কত আয় হইলে ভাল করিয়া কাজ চলিতে পারে, তাহা সর্ব-

সাধারণকে জানাইলে প্রতিষ্ঠানগুলি আরও সাহায্য পাইতে পারে। সদ্য-সদ্য সাহায্য না পাইলেও, প্রতিবেদন ও হিসাব প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতির স্ভাবনা পাই।

নারীরক্ষা সমিতি

বঙ্গের নানা জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে, দুর্ভিক্ষ লোকেরা অনেক স্থলে নারীদের উপর অবাধে অত্যাচার করে। লাহিতা ও ধর্ষিতা অনেক নারী ও শিশুদের আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক সময় সামাজিক পাতিত্বের ভয়ে কিংবা দুর্ভিক্ষের প্রতিহিংসার ভয়ে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন না। অনেক সময় স্থানীয় পুলিশের শিথিল্যে বা উৎকোচগ্রাহিতার জন্ত, কিংবা অত্যাচারিতাদের মোকদ্দমা চালাইবার মত টাকা না থাকায়, দুর্ভিক্ষেরা কিছু পায় না। অন্তর্দিকে, কয়েকটি মোকদ্দমায়, যেমন বরদাসুন্দরী ও সুহাসিনীর মোকদ্দমায়, দেখা গিয়াছে, যে, অত্যাচারিতাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্ত টাকার অভাব হয় না।

এরূপ অবস্থায় অত্যাচার দমনের জন্ত এবং অত্যাচারিতাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্ত গ্রামে গ্রামে নারীরক্ষা সমিতি স্থাপন, জাতিধর্ম-নির্কির্ষে সকল শ্রেণীর সাহসী পুরুষদিগের দ্বারা রক্ষাদল গঠন, অর্থসংগ্রহ, প্রভৃতি করা আবশ্যিক। এতদর্থে নারীরক্ষাসমিতির নেতৃবর্গ অর্থ-সাহায্যের প্রার্থী হইয়া একটি আবেদন বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা সর্বশেষে বলিতেছেন :—

এইসকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত জনসাধারণের নিকট আমরা দানবল ও অর্থবল প্রার্থনা করিতেছি।

জাতিধর্ম-নির্কির্ষে আমরা আমাদের দেশবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছি, এই মহাত্রস্ত উদ্ভাপনে তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। জনসাধারণের অর্থসাহায্যের গুরুতর প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ পাঠাইবেন :—

মিঃ স্কে, এন, বহু (সলিসিটার) কোবাধ্যক্ষ, ১১নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রট, কলিকাতা। অথবা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক, ৬নং কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা।

নিবেদকগণ—

এস, আর, দাশ, সভাপতি।
পি, সি, রায়, সহ-সভাপতি।
হীতৈশ্বনাথ বসু, ঐ
বতাসুন্দরী বসু, কোবাধ্যক্ষ।
কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক।
বেতাগেও বি, এ, দাস।
সত্যানন্দ বহু।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

রেলওয়ে ট্রেনের গার্ডের কাজের বেতন উচ্চ নহে, এবং শাসন-পরিষদের সভ্য, মন্ত্রী, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি পদের মত ইহা উচ্চ পদও নহে। কিন্তু এই পদের দায়িত্ব খুব বেশী, এবং ইহা কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত করিতে হইলে স্বাস্থ্য, সবল দেহ, সাহস, সততা, কর্ণিষ্ঠতা প্রভৃতির আবশ্যিক হয়। যখন এদেশে প্রথম রেলওয়ে চলিতে আরম্ভ হয়, তাহার পর বহুবৎসর পর্যন্ত মালগাড়ীতেও বাঙালী-দিগকে গার্ডের কাজ দেওয়া হইত না; তাহাদের বিরুদ্ধে এই অমূলক সংস্কার ছিল, যে, তাহারা এই কাজের উপযুক্ত নহে। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে কোন-কোন বাঙালী মালগাড়ী ও যাত্রী ট্রেনে গার্ডের কাজ পান। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তই বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও একমাত্র দার্জিলিং ডাক-গাড়ীর গার্ড। কিছুদিন পূর্বে দান্দমা ও বারাকপুরের কাছাকাছি কোন স্থানে ডাকগাড়ী হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক কিরূপে ও কি কারণে তিনি পড়িয়া মারা যান, তাহা কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ধরুণ আহত ও ভয় অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমিত হইয়াছে, যে, তিনি ডাকগাড়ীতে নিজের কামরার পাদানীতে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া “লাইন ক্লিয়ার” দেখিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় রেললাইনের খুব নিকবর্তী কোন খামের সহিত তাঁহার মাথায় গুরুতর ধাক্কা লাগায় তাঁহার মাথা ভাঙিয়া যায় ও তিনি মৃত অবস্থায় পড়িয়া যান। আমরা শুনিয়াছি, তিনি অতি সং ও কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন, এবং সেইজন্য দার্জিলিং ডাকগাড়ীর গার্ডের পদ পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ গাড়ীতে বিস্তর উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও তাহাদের পত্নী ও সন্তানাদি যাতায়াত করে। এইজন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কিরূপ যোগ্য লোক ছিলেন।

অনগ্রসর জাতিদের উন্নতিকামী সভা

বাংলা ও আসামের অনগ্রসর শ্রেণীসকলের উন্নতি-বিদায়িনী সভার ১৪শ বার্ষিক প্রতিবেদন পাইয়াছি। ইহার দ্বারা বেশ কাজ হইতেছে। এই প্রতিবেদনে ১৯২৩-২৪ সালের কার্যবিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ঐ সালে লর্ড সিংহ ছিলেন ইহার সভাপতি; স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, মিঃ এন্স আবু দাশ, মিঃ সি আর দাশ, বাবু বসন্তকুমার বসু এম্, এ, বি, এন্স, মিঃ যুগোলকিশোর বিদ্যা, সহকারী সভাপতি; রায়সাহেব

রাজমোহন দাস অবৈতনিক সম্পাদক; এবং ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ।

বাংলা ও আসামের কুড়িটি জেলায় এই সভার ৩৬২টি বিদ্যালয় আছে। কোন্ জেলায় কত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কত ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১০৭৬৩ জন ছাত্র এবং ৩৩২৮ জন ছাত্রী ছিল। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি উচ্চ ইংরেজী, ১০টি মধ্যইংরেজী, ২৫০টি বালকদের প্রাথমিক, ১৫টি বালকদের নৈশ প্রাথমিক এবং ৮৬টি বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি যশোর জেলার মাসিহাটী গ্রামে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্তী স্কাইতপুর, কুলটিয়া ও নেহালপুর গ্রামে আগে তিনটি নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা ছিল। মাসিহাটী গ্রামটি নমশূত্রদের অধীস্থিত ২৬টি-গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ঐসব স্থানের নম-শূত্রেরা একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঐ গ্রামটি নির্বাচন করেন। উহাদের স্বাধীন চেষ্টায় নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটিকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমে একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়; তাহার পর কালক্রমে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সকলেই চাষী। তাঁহারা সন্ধ্যায় দৈনিক শ্রমের পর বাড়ী আসিয়া, কখন-কখন অনেক রাত্রি পর্যন্ত, প্রস্তুত করিতেন ও তাহা পুড়াইবার জন্য জালানি কাঠ সংগ্রহ করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা দেড় লক্ষ ইট পুড়াইতে সমর্থ হইলেন। সামান্ত অবস্থার এই গ্রাম্য লোকগুলির একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাঘূর্ণিত হইয়া সভার কর্মীগণ তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়টিকে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে সাহায্য করেন। ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চ এই বিদ্যালয়ে ১১৪ জন ছাত্র ছিল, তাহারা সকলেই নমশূত্র। ইহাদের মধ্যে পাঁচ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় বালকটিকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক চারিটাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। সভা বিদ্যালয়টিকে ২৫০ টাকার স্থানিকার্ণিত বহি দিয়াছেন।

সভার ৩৬২টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীসকলের বালকবালিকাদের জন্য অভিপ্রোক্ত, এবং অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ঐ ঐ শ্রেণীর। মোট ১৪১৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্কাপেক্ষা অধিক (৪৫২১ জন) নমশূত্র, তাহার পর ২৯৬৩ জন মুসলমান। তাহার পর মুচি ৬১১ জন এবং পোদ ৪২৫ জন। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে, যদিও এত মুসলমান বালকবালিকা সভার বিদ্যালয়-

গুলিতে শিক্ষা লাভ করে, তথাপি ইহার সভ্য ও চান্দা-দাতাদিগের মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। কোন্-কোন্ জাতির কত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়গুলিতে পড়ে, তাহার বিস্তারিত তালিকা প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

ধুবড়ীতে মেথর বালকবালিকাদের জন্য সভার একটি বিদ্যালয় আছে, যদিও উহা প্রথমতঃ মেথরদের জন্যই খোলা হয়, তথাপি ক্রমে-ক্রমে উহাতে অন্যান্য শ্রেণীর বালকবালিকারাও পড়িতে আসিতেছে। কুমার, রাজবংশী ও বৈরাগী জাতির বালকেরা এবং কুমার-জাতীয়া দুটি বালিকা উহাতে পড়িতেছে।

৮৬টি বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭টির শিক্ষক পুরুষ। বাকী ১৯টির শিক্ষাদানকার্য্য সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-লোকেরাই করেন। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে একজন বিবাহিতা মুসলমান মহিলা আছেন। তাঁহাকে শিক্ষাদান-কার্য্য শিক্ষালাভের জন্য দুই বৎসর টাকা ফিমেল ট্রেনিং স্কুলে রাখা হইয়াছিল। একটি ছাড়া সভার সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা বিনা-বেতনে শিক্ষা পায়।

নৈশবিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে প্রতিবেদনে অন্যান্য কথার মধ্যে দেখিলাম, বীরভূম জেলার নৈশ বিদ্যালয়গুলিই সর্কাপেক্ষা লোকদের অসুরাগ-ভাজন, তাহার পর বাঁকুড়ারগুলি।

একটি বিষয়ে সভা পথপ্রদর্শক এবং তাঁহাদের কৃতিত্ব উৎসাহজনক। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে তাঁহারা সর্কাপ্রথমে গ্রাম্য বালিকাদিগকে একরূপ ভিন্ন গ্রাম বা সহরে অবস্থিত মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন, যেখানে ঐ বালিকাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। তাঁহাদের কেহ-কেহ হোটেল বা ছাত্রী-নিবাসে বাস করেন, এবং শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের নিজ-নিজ গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার-কল্পে কাজে লাগিবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত এইরূপ দুইটি বালিকার ইতিহাস সংক্ষেপে দিতেছি। বিবাহিতা হিন্দু-বালিকাদের ও তাঁহাদের স্বামীদের একরূপ উৎসাহ বড়ই আশাপ্রদ।

যশোর জেলার মালিয়াট গ্রামে সভার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পত্নী স্রীমতী সুধামুখী বৈরাগীকে সভা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বানিবন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য মাসিক চারি টাকা বৃত্তি দেন। স্রীমতী সুধামুখী ১৯২৩ সালে বর্তমান ডিবিজনের সমুদয় ছাত্রীদের মধ্যে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। এক্ষে- তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায়

শিক্ষা বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িতেছেন। সভা তাঁহাকে মাসিক ৬টাকা বিশেষ বৃত্তি দিয়াছেন, এবং উহার গর্হানির্কাহক কমিটির একজন সভ্য অতিরিক্ত মাসিক ৬টাকা বৃত্তি দিতেছেন।

মালিয়াটে সভার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রমিকের পত্নী শ্রীমতী সুরধুনী বিশ্বাসকে সভা ১৯২৩ সালে মাসিক ৪টাকা বৃত্তি দেন। তিনি বানিবন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতেছেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীর যোগ্যতা স্বীকৃত করিয়া নিজের জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে সার্বভৌম সাহায্য করিতে সক্ষম করিয়াছেন।

এই সভা ১৯০৯ সালে স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নতুন ব্রাহ্ম সাধনাসম্প্রদায়ের কয়েকজন কর্মীর দ্বারা স্থাপিত হয়। ইহা পরে ১৮৬০ সালের একুশ আইন-অনুসারে স্বীকৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার কমিটিতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের সভ্য আছেন, এবং অত্র যে কোন অধিবাসী ব্যক্তির সভ্য হইতে কোন বাধা নাই। সভা জাতিধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে বঙ্গের নানা শ্রেণীর লোক-দিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য ও সহায়ভূক্তি লাভ করিয়াছেন। সভার এখনও বিস্তার টাকার প্রয়োজন। যথেষ্ট টাকা পাইলে সভা নিম্নলিখিতরূপে নিজ কার্যের বিস্তার-সাধন, বিস্তার ও উন্নতি করিতে পারিবেন।

১। একটি স্থায়ী ফণ্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন, যাহার সুদ হইতে সভার কাজ দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে।

২। আরও বিদ্যালয় খুলিতে পারিবেন।

৩। বর্তমান বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন।

৪। গণসভাসারে ছাত্রছাত্রীদিগকে বৃত্তি ও পুরস্কার দিতে পারিবেন।

৫। ছাত্রছাত্রীদিগকে উপার্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত কৃষি, কারুকার্য, পণ্যশিল্প প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৬। বিদ্যালয়রাগী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদিগকে, বিশেষতঃ ছাত্রীদিগকে, উচ্চতর শিক্ষালাভের সুবিধা দিতে পারিবেন।

৭। কালক্রমে সভার কার্য আরও ভাল করিয়া যাহাতে চলে, তাহার নিমিত্ত সভার বিশেষ প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা ইহার শিক্ষক ও বিদ্যালয়পরিদর্শকদিগকে দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন স্থাপন করিতে পারিবেন।

৮। শিক্ষাবিস্তার ছাড়া আরও নানা উপায়ে জনসাধারণের জ্ঞান-প্রসার সাধন করিতে পারিবেন।

প্রতিবেদনটির পরিশিষ্টে সভার কাৰ্য্য-সম্বন্ধীয় নানা তথ্য সূক্ষ্মভাবে নিপুণতার সহিত দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম। বঙ্গের মোট অধিবাসী ৪৭৬ লক্ষের মধ্যে ৪৪৪ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৯৩ জন গ্রামে বাস করে। গ্রামবাসী এই ৪৪৪ লক্ষের মধ্যে কেবল শতকরা দুইজন সামান্য লিখিতে পড়িতে পারে। নিরক্ষর সাড়ে চারি কোটি লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। স্বতরাং সভার যে কত টাকার প্রয়োজন তাহা বলিতে হইবে না।

বর্তমানে সভার মাসিক ব্যয় ১৪৫০ টাকা; কিন্তু মাসিক স্থায়ী আয় ৮০০ টাকা মাত্র। বাকী মাসিক ৬৫০ টাকা সভাকে নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে; নতুবা ইহার বর্তমান কাজ চলিবে না। কার্য বিস্তার করিতে হইলে আরও টাকার আবশ্যক। এপর্যন্ত ইহার এ-টি পয়সাও অপব্যয় বা চুরি হয় নাই; ভবিষ্যতেও অপব্যয় নিবারণের জন্য সুবন্দোবস্ত আছে।

সামান্য টাকায় বাংলা দেশে কত বেশী কাজ সভা করিতে পারেন, ইহার লোকহিতব্রত সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কেহ মাসিক দশ টাকা চাঁদা দিলে সভা শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত (“trained”) শিক্ষকের দ্বারা একটি প্রাইমারী পাঠশালা চালাইতে পারেন। কেহ মাসিক চারি টাকা মাত্র চাঁদা দিলে সভা সাধারণ শিক্ষকের দ্বারা একটি পাঠশালা চালাইতে পারেন।

সম্পাদক মহাশয়ের ঠিকানা, ১৪ বাহুড়াগান রো, কলিকাতা।

বড়লাটের পুরাতন-নূতন বুলি

ইংরেজ রাজনীতিকুল লোকেরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায়ই একরূপ কথা বলেন, যে, ধৈর্যের সহিত তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

সিমলা হইতে বড়লাট লর্ড রেলিংহামের প্রধান-উপলক্ষে প্রদত্ত বিদায়-ভোজে প্যার মুহম্মদ শকী তাঁহার খুব প্রশংসা করেন। উত্তর দিতে উঠিয়া লর্ড সাহেব লর্ড বার্কেনহেডের ও নিজের এমন অনেক বুলি পুনর্কীর আওড়ান, যাহার উত্তর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একাধিক সভ্য এবং সকল প্রদেশের নানা সংবাদপত্র-সম্পাদক দিয়াছেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কথার যত বৃক্তিসম্বত উত্তরই দেওয়া হউক না, তাঁহারা তাহা গনিয়াও গনেন না, কেবল নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। ইহা দেখাও গিয়াছে, যে,

কথা কাটাকাটি করিয়া কোন ফল হয় না। কিন্তু বক্তৃতা করা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কাজ, এবং কাগজ ও কালীস সাচায়া তর্ক করা প্রান্তবাদ করা সম্পাদকদের কাজ। সুতরাং তাঁগদিগকে তাহা করিতেই হইবে। লার্ট-বেলার্টরা যদি তাঁহাদের বুলি একশবার আওড়ান, তাহা হইলে ভারতীয় বক্তা ৭ ভারতীয় সম্পাদকদিগকে তাহার খণ্ডনও হাজার বার করিতে হইবে। কিন্তু হ্যাঁ কখনও তুলিলে চলিবে না, যে, ভারতীয়েরা যদি স্বদেশে সেইরূপ কর্তৃত্ব চান, তেঁরূপ কর্তৃত্ব স্বাধীন গণতন্ত্র দেশসমূহের লোকদের তাঁহাদের স্বদেশে আছে, তাহা হইলে বক্তৃতা ও লেখা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক লোককে আত্ম কর্তৃত্ব লাভের জন্য একতাসূত্রে বন্ধ করা সম্ভব নহে; কিন্তু অধিকাংশ লোককে তজ্জন্ম একতাসূত্রে বন্ধ করা অসম্ভব নহে। এইরূপ একতার ফলে ইংরেজরা যদি দেখে, যে, বর্তমান প্রণালীতে ভারতশাসন আর সহজ ও লাভজনক নহে, তবেই আমরা স্বাধিকার লাভ করিতে পারিব।

বড়লার্ট তাঁহার বক্ত্যমাণ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের সব রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের প্রতি মিত্রের কাজ করিতে ইচ্ছুক। সবাই ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার একটা ইচ্ছিতের অপেক্ষা করিতেছে। বড়লার্টের মতে ভারতীয়েরা বলিতে পারিত, “আমরা আমাদের মতে দৃঢ় আছি, কিন্তু যেহেতু প্রগতি সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে, তজ্জন্ম আমরা সদিচ্ছা দেখাইতে ও সহযোগিতা করিতে রাজী আছি।” ভারতীয়েরা এইরূপ বলিলে, বড়লার্টের মতে, একটা সম্ভাব্যের তরফ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিত এবং রাজনৈতিক অবস্থার চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিত; তখন যেহেতু বিশ্বাসই বিশ্বাস উৎপন্ন করে, সেইজন্য ভারতীয়েরা তাহাদের সহযোগিতার ফল দেখিতে চাহিতে পারিত, এবং তাহার ফলে দেখা যাইত, যে, ইংলণ্ড-রূপণতার সহিত দরদস্তুর করে না কিন্তু মুক্ত হস্তে দান করে।

ভারতশাসন-সংস্কার-আইন-অনুসারে প্রথম যে-সব প্রাদেশিক ও সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তাহাতে অসহযোগীরা প্রবেশই করেন নাই; তাহাতে ঐহারা সভা নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শাসন-প্রণালী-অনুসারে দেশের উপকার যতটা হইতে পারে, তাহা লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহাদের দলের কতকগুলি লোক মন্ত্রীও হইয়াছিলেন। এই সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ফলে ইংলণ্ড কেন মুক্তহস্ত হন নাই? তর্ক উঠিতে পারে, তখনও অসহযোগীরা বাহিরে কোলাহল করিতেছিল বলিয়া ইংরেজের

হাতের মুঠা খুলে নাই। এনার একত অসহযোগীদের সংখ্যাভীরত ও প্রবলতম দল স্বরাজী হইয়া ব্যবস্থাপক-সভাসকলে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্ততম নেতা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির চাকরী লইয়াছেন। স্বরাজী সভ্যেরা একাধিক সরকারী কমিটির সভ্য হইয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক সিনিয়র গবর্নেন্টের সাহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। সুতরাং গবর্নেন্ট কোন সদিচ্ছা ও সহযোগিতা পান নাই বলিলে সভ্যের অপলাপ করা হইবে। অবশ্য সরকার-পক্ষ বলিতে পারেন, এখনও মহাত্মা গান্ধী ৭ তাঁহার অনুচরেরা সহযোগিতা করিতে হন না, এখনও স্বরাজী ব্যবস্থাপকেরা কোন-কোন বিষয়ে গবর্নেন্টের বিপক্ষে ভোট দিতেছেন; এবং এখনও স্বরাজ্য দল বলিতেছেন, যে, তাঁহাদের দাবী মঞ্জুর না হইলে শেষ উপায়-স্বরূপ নিরুপদ্রব ভাবে আইন অমান্ত করিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যে, কোন দেশেই দেশের সব লোক কোন কালেই গবর্নেন্টের সব কথায়, কাজে, অভিপ্রায়ে সাঙ্গ দেয় নাই, দিতে পারে না; গবর্নেন্টের বিপরীতমতাবলম্বী লোক সর্বকালে সকল দেশেই ছিল ও আছে। সুতরাং গবর্নেন্ট, যে রূপ সহযোগিতা চাহিতেছেন, তাহা কোন কালেই পাইবেন না। আমাদের ধারণা এই, যে, ইংরেজরাও জানেন, যে, ঐপ্রকার সহযোগিতা পাইবেন না; এবং সেইজন্যই ভারতীয়দিগের নিকট হইতে ঐরূপ সহযোগিতা লাভের সর্ব জগতের সম্মুখে বারবার স্থাপন করিতেছেন। যেমন সাত মণ তেলও পুড়িবে না, রাখাও নাচিবে না, তেমনি ইংরেজরা জানেন, ভারতীয়েরা এই সর্ব পালন করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহাদিগকেও (ইংরেজদিগকেও) মুক্তহস্তে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে হইবে না।

কিন্তু যদি কো-অপারেশ্যনের বা সহযোগিতার মানে হইত সম্পূর্ণ বাধ্যতা-স্বীকার ও ইংরেজের রাঙাপায়ে চিরকালের জন্য আত্ম-বিক্রম, যদি অসম্ভব সম্ভব হইত, এবং ভারতের সব নেতা ও অনেতা কো-অপারেশ্যনের উক্ত সংজ্ঞানুসারে গবর্নেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলেও কি সত্য-সত্যই ইংরেজ মুক্তহস্তে ভারতীয়দিগকে স্বরাজ দিয়া ফেলিতেন? কখনই না। না দিবার নানা নূতন-পুরাতন ওজর আবিষ্কৃত হইত।

তন্নিম্ন, ইংরেজ তখন স্বদেশবাসীকে ও অগবাসীকে বলিতেন, “দেখ, আমাদের স্থশাসনের গুণে ভারতীয়েরা এমন মুগ্ধ ও সস্তম্ব, যে, আমরা যাহা করি ও বলি তাহাতে এখন সকলেই আত্মাদের সহিত সাঙ্গ দেয়, কেহ বিকৃত্তি মাত্র করে না। অতএব, আমাদের বর্তমান শাসন-প্রণালীর বিস্মৃমাত্রও পরিবর্তন করা অনাবশ্যক।”

বস্তুতঃ আমরা যদি চূপ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের সম্ভাব ও সম্মতির লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, এবং বর্তমান শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা আন্দোলন করি এবং ইংরেজের অস্তায় আদেশ ও আইন-পালনে অসম্মতি প্রকাশ করি, তাহা হইলে প্রভুরা বলেন, “তোমরা আমাদের ভয় দেখাইতেছ, চোখ রাঙাইতেছ? আমরা তাহাতে ডরাইব না, এবং আমরা যে ডরাই নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ তোমাদের আবেদন-নিবেদন ক্রন্দন, দাবী কিছুতেই কর্ণপাত করিব না ও আমাদের বর্তমান কার্য-প্রণালীর কোন পরিবর্তন করিব না।”

সুতরাং ভারতীয়দের উত্তম-সঙ্কট। কিন্তু যদি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ বাধ্যতা ও দাস্য দ্বারা ইংরেজের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও ভারতীয়দের সে উপায়ে কিছু পাওয়া উচিত ও মনুষ্যত্ব-সঙ্গত হইত না। দাস্য দ্বারা কি কখনও মনুষ্যত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব পাওয়া যায়? মনুষ্যোচিত আচরণই স্বরাজ্য লাভের একমাত্র পন্থা। স্বরাজ্য কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। স্ব-রাজ্য অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব নিজেই অর্জন করিতে হয়। অপরের দাস হইয়া যাহা পাইতে হয়, তাহা মূল্যহীন, মনুষ্যত্ববিনাশক ও অপমানকর।

ফল যাহাই হউক, মনুষ্যত্বের, বিবেকের, ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা আমাদেরকে যে-পথে চালিত করিবে, আমরা সেই পথেই চলিব।

বড়লাট যুগপৎ হাস্যকর ও ক্রোধজনক একটা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, trust begets trust, বিশ্বাসই বিশ্বাস উৎপাদন করে। কথাটা সাধারণভাবে সত্য, কিন্তু তিনি যে-চিন্তা মনের মধ্যে রাখিয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। তিনি বলিতে চান, ভারতবাসীরা ইংরেজদিগকে বিশ্বাস করিলে ও তাহাদের উপর নির্ভর করিলে তবে ইংরেজ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দিবে। যেন ভারতীয়েরা কখন ইংরেজের উপর নির্ভর করে নাই। সত্য কথা এই, যে, ইংরেজ বার বার অধীকার ভঙ্গ করায় তবে বহুসংখ্যক ভারতীয় রাজনীতিবিদ ইংরেজের সদভিপ্রায়ে, অধীকারপালনেচ্ছায় সন্দিহান হইয়াছে ও বিশ্বাস হারাইয়াছে। নতুবা ইংরেজের উপর নির্ভর ত খুবই করা হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরোজী ব্রিটিশজাতির ন্যায়-পরায়ণতার নিজের বিশ্বাস পকাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ঘোষণা করিয়া এবং তাহার মোহাই দিয়া গিয়াছেন। প্রবীণ সমুদ্র মডারেট বা উদারনৈতিক কংগ্রেস-নেতা এই নির্ভরে অটল ছিলেন। গোথলের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতি (The Servant of India Society)

এই নির্ভরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উক্ত সমিতির একটি স্থায়ী মত এই, যে, ভারতবর্ষের চিরকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র দ্বারা উচিত, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রাণ মহাত্মা গান্ধীও ত রোলট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের পূর্বে ইংরেজের প্রতি এতটা নির্ভরপরায়ণ ছিলেন, যে, জুলুদের ও বোয়ারদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের পক্ষে সৈনিক সংগ্রহের আড়কাটীর কাজ করিয়াছিলেন।

ইংরেজের উপর ভারতীয়দের এই নির্ভর ও বিশ্বাসের ফলে ইংরেজ আমাদের যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা রোলট আইনে, সামরিক তথাকথিত “আইনে”র ভীষণ ও অপমানকর প্রয়োগে, বিনাবিচারে নিকাসনে, বিনাবিচারে নজরবন্দী ও অস্বীয়-করণে, অস্বথেষ্ট কারণে জনতার উপর গুলির্ষণে, এবং আরও নানা ঘটনায় এ ঘোষণায় জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

বিদেশী মূলধন আমদানী

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস বাহারা মূল উপাদান-গুলি হইতে পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে, ইংরেজরা প্রথমতঃ এদেশে স্বদেশ হইতে আনীত কোন মূলধন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান নাই; ব্রিটিশ মূলধন বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা এদেশেই নানা উপায়ে উপার্জিত হয়, এবং তাহারই সাহায্যে ভারতবর্ষের ধন-শোষণ পুনঃপুনঃ চলিতে থাকে। বাহারা বিষয়ে কিছু তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা মেজর বামনদাস বসু মহাশয়-প্রণীত “ভারতীয় বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের বিনাশ” (“Ruin of Indian Trade and Industries”) নামক পুস্তকের ১২২-১৩৪ পৃষ্ঠা পড়িতে পারেন। তন্নিম্ন ইংরেজদের লেখা অনেক বহি হইতেও এবিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ১৮৫২ সালে মেজর উইল্কেট “ভারতের সহিত আমাদের আর্থিক সম্বন্ধ-বিষয়ে কয়েকটি কথা” নামক যে-পুস্তিকা লেখেন, এই প্রসঙ্গে তাহা পঠনীয়। এই পুস্তিকার ১৩-১৪ পৃষ্ঠা হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

“The funded debt of the Government of India borrowed in India, is estimated at nearly sixty millions sterling, of which three-fifths, or thirty-six millions, is the property of our own countrymen. The whole, or mostly the whole of these thirty-six millions, consists of investments by Europeans in

* A Few Words on Our Financial Relations with India. By Major Wingate. London. Richardson Brothers, 23, Cornhill, E. C. 1859.

India out of money made in that country, and constitute, therefore, a clear addition to British property, gained through our connection with India:.....”

ইংরেজরা এদেশে যে মূলধন খাটাইয়াছিলেন, তাহা এই দেশ হইতেই আহৃত, ইহা যেমন ইংরেজদের লেখা হইতেই প্রমাণ করা যায়, তেমনি ইংরেজদের লেখা হইতেই ইহাও প্রমাণ করা যায়, যে, ইংলণ্ডে বাণ্যীয় শক্তি ও নানা বৈজ্ঞানিক কলের সাহায্যে কারুখানায় সস্তায় প্রচুরপরিমাণে নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনযোগ্য শিল্প-জগতে যে-বিপ্লব সংসাধিত হয়, তাহাও ভারতবর্ষ হইতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে, আহৃত মূলধনের সাহায্যে করা হইয়াছিল। বঙ্কর লুট ইংলণ্ডে না পৌঁছিলে ইংলণ্ডের কলগুলিতে মরিচা পড়িয়া তাহা অকেজো হইয়া থাকিত।

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে খাটান “ব্রিটিশ” মূলধন যেমন রহ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতেই অর্জিত, লুপ্তিত বা অন্তপ্রকারে আহৃত মূলধন ছিল, তেমনি বর্তমানেও ভারতবর্ষে যত তথাকথিত “ব্রিটিশ” মূলধন খাটে, তাহার অনেক অংশ ভারতবর্ষেরই টাকা। ইহা সুবিদিত, যে, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ভারতীয় গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা থাকে। ঐ টাকা ভারতীয় প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের টাকা। তন্ত্রের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বিস্তর ভারতীয় লোক টাকা গচ্ছিত রাখে এবং তাহার ভিত্তি সামান্য সুদ পায়। অধিকতর অনেক ভারতীয় ঐ ব্যাঙ্কের অংশীদার। তাহারাই যত টাকা দিয়া ঐ ব্যাঙ্কেব অংশ কিনিয়াছেন, তাহাও ব্যাঙ্ক থাকে ও ব্যাঙ্কের মহাজনী ভেজাবতী কার্যে খাটে।

ইহাও সুবিদিত, যে, ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ ব্যবসাদার ও পণ্যদ্রব্যোৎপাদক ব্যক্তিগতভাবে বা কোম্পানী গঠন করিয়া কারুবার করে, প্রধানতঃ তাহাবাই অল্প সুদে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, এবং সেই মূলধনের সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে টাকা রোজগার করে। ভারতীয় সওদাগরদের পক্ষে ও কারুখানার মালিক কোম্পানীদের পক্ষে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া অত্যন্ত বঞ্চিত।

ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ছাড়া ইউরোপীয়দের আরও যত ব্যাঙ্ক আছে, তাহাতেও বিস্তর ভারতীয়ের প্রচুর অর্থ গচ্ছিত থাকে। তাহাও প্রধানতঃ ইংরেজ কারুবারীদেরকে টাকা ধার দিয়া থাকে; ভারতীয়দেরকে তত সহজে দেয় না।

ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতবর্ষে যত বিদেশী লাইফ ইন্সিওরেন্স বা জীবনীবিম্বাব কোম্পানী আছে, তাহাও ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা প্রধানত

ভারতবর্ষের ইউরোপীয় ব্যবসাদারদেরকে ধার দেয়, ভারতীয়দেরকে সহজে দেয় না।

ভারতবর্ষের অনেক কোটি টাকা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, রিজার্ভ বা তথ্য কোন নাম দিয়া ভারতসচিবের হাতে লগুনে গচ্ছিত থাকে। ইংরেজ বণিকৃগ তাহা শতকরা দুই আড়াই টাকা সুদে ধার পায়। কিন্তু ভারতসচিব যখন ইংরেজ মূলধনীদের কাছে ধার লন তখন ৩%, ৭, ৭।০ সুদ দিতে হয় !!

এইরূপে সংক্ষেপে দেখা যাইতেছে, ইংরেজ প্রথম প্রথম ভারতবর্ষ হইতেই নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া [মাছের তেলে মাছ ডাভিয়া] ঐ অর্থকেই “ব্রিটিশ মূলধন” নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণেও ভারতবর্ষেরই টাকা ইংরেজেরা নানা সূত্রে পাইয়া তাহার দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে টাকা রোজগার করিতেছে। অথচ, নামতঃ তাহাদের নানা কারুবারে খাটান সমস্ত টাকাই “ব্রিটিশ” মূলধন নামে পরিচিত হইতেছে। অবশ্য আধুনিক কালে ব্রিটিশ মূলধন নামে পরিচিত কতক টাকা ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়াছে বটে, কিন্তু যত টাকা ঐ নামে খাটিতেছে, তাহা “ব্রিটিশ” নহে, ভারতীয়।

বিদেশী মূলধন ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া উচিত কি না, উচিত হইলে কত ও কি কি সূত্রে আসিতে দেওয়া উচিত, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজ দেখিলাম। কমিটি যে-সকল কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে ধবের কাগজসকলে বাহির হইয়াছে। সেই উপলক্ষে আমরা বিদেশী মূলধন আমদানী সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কমিটির নির্ধারণগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আর স্থান নাই। কিন্তু আমরা বাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে, যে, ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজ বণিকৃ-বাজারের সম্পর্ক আংশে হ্রাসের সময় হইতে একাল পর্যন্ত ইংরেজকে ধনী করিবার যত মূলধন ভারতবর্ষের ছিল ও আছে। যুদ্ধের সময় ভারতীয়েরা কোটি কোটি টাকা গবর্ণমেন্টকে ধার দিয়াছিল ও দান করিয়াছিল। আমাদিগকে এখন ইহা দেখিতে হইবে, যে, বর্তমান সময়েই ভারতবর্ষেরই লোকদের টাকা যে যে প্রকারে ইংরেজকে ধন উপার্জন করিতে সাহায্য করে, তাহা সেই সেই প্রকারে আমাদের কারুবার ও কারুখানাগুলিকে রোজগারে সাহায্য করিতে পারে কি না। স্বরাজ্য-লাভের পূর্বে ইহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা না থাকিলেও, কিছু সুবিধা হয়ত হইতে পারে; ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ইউরোপীয়

ব্যাক এবং বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে দেশী কারুবার ও কারুখানাসমূহকে উপযুক্ত জামীন ও বন্ধকাদিতে হস্ত কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়ার দায়িত্ব পাইতে পারে।

এইরূপ আর্টন বা নিয়ম প্রণয়ন করাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, যে, গভর্নমেন্ট মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির টাকা ধার করা দরকার হইলে, তাহা ভারতবর্ষ হইতে ধার করিতে হইবে; এখানে ধার না পাটলে তবে বিদেশে ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের কোন স্থানের কোন খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও বিক্রয় করিবার অধিকার কোনও বিদেশী ব্যক্তি বা কোম্পানীকে দেওয়া উচিত নয়; এখন উহা উত্তোলনাদি করিবার সমস্ত কোন ভারতীয় ব্যক্তি বা কোম্পানী প্রস্তুত না থাকিলে আপাততঃ এই কার্য স্থগিত রাখাই শ্রেয়ঃ। যখন ভারতীয়েরা প্রস্তুত হইবে, তখন উহা উত্তোলিত হইবে। কারণ, খনিজ দ্রব্য একবার নিঃশেষ হইয়া গেলে, গাছপালার মত পুনর্কীর পড়াইবে না।

ভারতবর্ষে এমন কোন কোম্পানীকে কোন প্রকার কারুবার করিতে বা কারুখানা চালাইতে দেওয়া উচিত নয়, যাহার অন্যান্য ছুট-ছুটীয়াংশ মূলধন ভারতীয় লোকদের নহে, এবং যাহার ডিরেক্টরদের অন্যান্য ছুট-ছুটীয়াংশ ভারতীয় লোক নহে। বেনামীদ্বারা ও সাক্ষীগোপাল শ্রেণীর লোক দ্বারা এরূপ নিয়ম কার্যতঃ ভঙ্গ করা ছুঃসাধ্য না হইলেও, এইপ্রকার কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। কেননা ভারতবর্ষের যে-যে কৃষি, বাণিজ্য, পণ্যশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্র বিদেশীর হস্ত-গত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে দেশী লোকদের প্রবেশ ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব কিম্বা অস্বস্তঃ ছুঃসাধ্য হইবে। অধিকন্তু চীনে যেমন বিদেশী বণিকেরা উহার স্বাধীনতা লাভে বাধা দিতেছে, ভারতবর্ষেও তেমনি বিদেশী বণিকেরা এখনই আমাদের স্বরাজ্যলাভে বাধা দিতেছে, পরে আরও বেশী করিয়া দিবে।

বিদেশী মূলধন কমিটির রিপোর্টের বিস্তৃত আলোচনা সকল রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সভাসমিতি দ্বারা এবং সকল সংবাদপত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফুটকী

শ্রী শান্তা দেবী

১

পলির মোড়ে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। এক-খানা বার্ডক্লাশ গাড়ী বোকাই করিয়া সাতটি সন্তানসহ একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভ্রমলোক ফুটপাথের উপর সদ্য নামিয়াছেন। গাড়ীর মাথায়ও ভাঙা তক্তাপোষ, টিনের বাক্স, দেয়াল আলনা, ছেঁড়া মাহুর, লর্ঠন, বালতি, একঝুড়ি শিশিবোতল ও চটে-জড়ানো ময়লা খেরোর ভোবক প্রভৃতি হরেক বকম জিনিষ এতক্ষণ শোভমান ছিল। তাহার কিছু-কিছু এখন ছেলের হাতে-হাতে ঝুলিতেছে, চু বা পলির মুখ জুড়িয়া পথরোধ করিয়া বিগড় গিতেছে। ভ্রমলোকের সঙ্গে ভাড়া লইয়া গাড়োয়ানের তর্ষে হইয়াছে, তাই এত তুমুল কোলাহল। ছয় আনা দসার এতগুলি সজীব ও নিরীক মাল যে তাহার পিতৃ-পুত্রযোগে কেহ কখনও পার করে নাই ইহাই ছিল গাড়োয়ানের প্রধান বক্তব্য। তবে সে মূল বক্তব্যটা যথা-সাধ্য উপমা ও অলঙ্কারে বিজুড়িত করিয়া প্রবণস্বধকর করিয়াই নিবেদন করিতেছিল। ছয় আনা পরসার কারুখানা খাটিয়া সে হাত ময়লা করিতে চায় না শুনিয়া প্রৌঢ় ভ্রমলোকটি পরসার ক' আনা পকেটে কেলিয়া খুসী

ইহাতে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া এতক্ষণের বাকু বিতণ্ডা তাহার সার্থক বোধ হইতেছিল।

কিন্তু গাড়োয়ানের বৈরাগ্য বহুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, বাবুকে ঘরমুখো দেখিয়া সে তার কোচবাক্স হইতে নামিয়া আস্তিন গুটাইয়া ছুটিল। শিশুনলে মহা আর্জুনাদ পড়িয়া গেল। একটি দশ এগার বৎসরের মেয়ে কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলে লইয়া এবং ভানহাতে ছুইটা চিম্-কাটা লর্ঠন ঝুলাইয়া এতক্ষণ কোতুহলপূর্ণ নেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার অবস্থা সজান দেখিয়া হাতের লর্ঠন ছুইটা ফুটপাথে কেলিয়া দিয়া সে চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, “ওরে বাবারে, আমার বাবাকে মেরে ফেলেরে, ওরে কি হবে রে!”

পলির ভিতরে একটা ছোট বড়ীর সম্মুখের রোয়াকে বসিয়া একদল ছেলে একটা দৈনিক কাগজ লইয়া জটলা করিতেছিল। তাহারা যখন এক-এক মুহূর্তে দেশের এক একটা সমস্তার সমাধানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মেয়েটির তীব্র চীৎকার তাহাদের কাণে আসিল। মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের হাত চাপিয়া

ধরিয়া বলিল, “শীগ্গির এস, শীগ্গির এস; লোকটা আমার বাবাকে মেরে ফেললে।”

এমন কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ হতভয় হইয়া গেল। মাণিকলাল সদলে মেয়েটির পিছন-পিছন ফুটপাথে গিয়া হাঙ্গির হঠল। তাহাদের দেখিবা মাত্র অশ্চালকের মর্মে-বেদনা আবার জাগিয়া উঠিল। মাণিকলালের বুকিতে দেবী হইল না যে ব্যাপার আটআনার মামলা মাত্র। সে আর কিছু না ভাবিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি টানিয়া ঠন্ করিয়া ফেলিয়া দিল। রক্তমন্ডের ঘবনিকা পড়িয়া গেল।

কিন্তু মাণিকলালের মুখ অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যে চুই করিয়া পরের হইয়া গাড়ী ভাড়া দিয়া দিল ইহাতে অপরিচিত ভ্রমলোকের যে কতবড় অপমান হইতে পারে তাহা তাহার মাথায় আসিল এতক্ষণে। সে লজ্জিত হইয়া কমা চাহিতে যাইবে অথচ কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমন সময় শুনিল ভ্রমলোকটি হাসিয়া বলিতেছেন, “আরে ছোকরা, তুমিও যেমন! খামকা কতকগুলো পরমা নষ্ট করলে। ওর যা পাণনা তা আমি কোনকালে চুকিয়ে দি'য়ছি। মাঝের থেকে তোমায় ছেলে মাছুর পেয়ে কিছু লাভ করে নিলে।” মাণিকলাল খানিকটা সপ্রতিভ ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল বাবুটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহারই পাশের বাড়ীর “টুলেট” লেখা ঘরখানা দখল করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মেয়েটির মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। সে চিম্নীহীন লঠন ছুইটা কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত।

মাণিকলালকে দেখিয়া সে বেশ সহজ স্বরেই বলিল, “তুমি কিছু জান না। বাবা মিছে কথা বলেছে, বাবা পরমা দেয়নি।”

পিতার সম্বন্ধে সন্তানের এরূপ মতামত শুনিতে মাণিকলাল অভিযত্ন ছিল না। তবে ব্যাপারটা তাহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও অবিশ্বাস্ত বোধ হইল না, কারণ সে দেখিল তাহার পরমাটা তাহাকে দিবার কোনোরকম কৌশল প্রয়াসও ভ্রমলোক করিল না। বেশ নিশ্চিত মনে ঘর গুছাইতে সে ব্যস্ত।

মেয়েটি তাহার সঙ্গে ভাব জমাইতে উৎসুক দেখিয়া মাণিকলালও তাহার কথায় নানাকথা তুলিল। তাহাকে দেখিলেই যেন কেমন গল্প করিতে ইচ্ছা হয়। রোগ্য-পাতলা মেয়েটি, ছেলেদের মত হাঁটা চুল, পোষাকও তেমনি, ছোট হাতের পাগাবী কোর্ডা ও পায়জামা। হাত দুখানি খালি, কোন গহনা নাই। চোখছুটি আশ্চর্য উজ্জল ও বড়-বড়; মুহূর্তপূর্বের ভীতির চিহ্ন মাত্র তাহাতে নাই; হাসি ও আলো যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শরীর

মাণিকলাল বলিল, “তোমার নাম কি খুকী?”

মেয়েটি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মাণিকলালের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার হাসি আর ধামে না।

মাণিকলাল তাহার মিষ্টিগলার স্বরে পুলকিত হইয়া উঠিল। পিয়ানোর পর্দার মত মধুর কোমল স্বর; তাহার বালকোচিত বেশভূষার সহিত মোটেই খাপ খায় না। মাণিকলাল কৌতুহল দেখাইয়া বলিল, “ও কি, অত হাসুছ কেন?”

মেয়েটি আরো হাসিয়া ছলিয়া-ছলিয়া বলিল, “ও মা, তুমি আমার নাম জান না! সে ভ—রা—ন—ক অদ্ভুত!” আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল। মাণিকলাল বলিল, “কি বলই না—”

মেয়েটি দুই হাতে মুখ চাপিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “ফুটকী।” তাহার পরই তাড়াতাড়ি মাণিকের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, “হাসুতে পাবে না কিন্তু, খবর্দার বলছি।” ফুটকীর চোখ দুইটা রোমে ও কৌতুকে জল-জল করিয়া উঠিল।

ফুটকীর কোলের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ গলির মুখে গাদা করা জিনিষপত্রের ভিতর বসিয়া নিশ্চীর্ণভাবে আঙুল চুষিতেছিল। অন্য ছেলেরা একটা একটা করিয়া জিনিষ টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতেছিল। মাণিকলালের সঙ্গে ফুটকীকে ভাব করিতে দেখিয়া তাহারাও তুষিত দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া উহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে কে গর্জন করিয়া উঠিল, “মটকা, ফুটকী, ছুনী, কুনী, ভোনা!”

ছেলেগুলি ছুড়-ছুড় করিয়া দৌড় দিল। ফুটকী “বাই বাবা” বলিয়া ভোনাকে কাঁকালে তুলিয়া লইল, কিন্তু তখনও নড়িল না। তাহার কথার ভের তখনও ফুরায় নাই। সে বলিল, “তোমার নাম কি বললে না যে বড়!”

মাণিকলাল বলিল, “আমার নামও তোমারই মত, মান্কে।”

ফুটকী হাসিয়া বলিল, “আহা, ওটা হ ডাক নাম, ভাল নাম ত মাণিক! আমার যে মোটে ভাল নামই নেই। ভাগ্যে ইচ্ছল বাই না, তাহলে খাতায় কি লিখতুম?”

ভিতর হইতে নাকি স্বরে কে চেঁচাইয়া উঠিল, “ফুটকী কিঁদে পেয়েছে। উছনে আঁশন দি'বি না!”

ফুটকী এইবার পলাইল। বলিল, “বাই কুনীটার অর হয়েছে, বাপি রেঁধে দিতে হবে। তোমার বাড়ী ঐদিক পানে বুকি! ছকুর বেলা আসব'ধন।”

যেন তাহার আসাটা নিতান্তই দয়কার।

ঠিক দশজনের পং অঙ্গুসরণ করিয়া চলিত না, কারণ মাহুঘের সঙ্গে মেশার অভ্যাসটাই ছিল তাহার অভ্যস্ত কম। সে লোকের সঙ্গে নিজে গিয়া আলাপ করিতে কি খুঁটিনাটি ঘবোয়া গল্প করিতে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইত। তাহার কথা বলা মানে ছিল হয় বক্তৃতা নয় সমস্যা-সমাধান। কোনো মাহুঘ তাহার সহিত কথা শুরু করিলেই পাছে সে একটু কাছে আসিয়া পড়ে এই লজ্জায় বিব্রত হইয়া মাণিক স্বরাজ কি চরকা, কি বাল্যবিবাহ, কি বেকারসমস্যা কি আরো কিছু উৎকট ও ছুর্কোধ্য রকম একটা আলোচনার ঝাঁপাইয়া পড়িত। বেশীর ভাগ কথাই সে নিজে বলিয়া যাইত, স্তত্রাং কাহারও তাহার সহিত ঠিক আলাপ করিবার সুবিধা হইত না। অবশেষে কথা শেষ করিয়াই মাণিক কোঁছার খুটে চশমাটা মুছিতে মুছিতে একটা কিছু ছুর্কোধ্যতর কৈফিয়ৎ দিয়া বিনা জামকায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে দূর হইতে একটি আঙ্গব চীৎ মনে করিয়া পর্যবেক্ষণ করিত, কিন্তু কেহ কাছ ঘেসিত না।

এত লোক থাকিতে ফুটুকী এই মাহুঘটাকেই তাহার বন্ধু বলিয়া কেন নির্বাচন করিল জানি না। মাণিক কিন্তু ফুটুকীকে তাহার অটল গাভীর্ষ্য অসীম লজ্জা ও অপরিসীম মনুষ্যভীতির ব্যুৎ এমন অনায়াসে ভেদ করিয়া চুকিতে দেখিয়া খুসী হইল। তাহার প্রাণটা এই ব্যূহের মাঝখানে পড়িয়া সজত্বায় শুধাইয়া উঠিতেছিল। বয়স্ক মাহুঘের সঙ্গে কেবল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সে তৃষা মোটেই মিটিত না, অথচ ছোট ছেলে মেয়েকে কেমন করিয়া যে কাছে টানিতে হয় সে বিদ্যাটা তাহার মোটেই জানা ছিল না।

ফুটুকী নিজেই তাহার ঘরবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল, নিজেই যাওয়া আসার সময় ইচ্ছা মত ঠিক করিয়া লইল। তাহার উপর গল্পের ধোরাক ত তাহার অঙ্গুরঙ্গ ছিলই। মাণিক হয়ত অর্থনীতির অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছে, ফুটুকী ভোনাকে টানিতে-টানিতে আসিয়া বলিল, “আচ্ছা, ভোনাকা কি বোকা দেখেছ! এক পয়সায় বাতাসা দেবে এতগুলো আর জিলিপি দেবে ছুখানা। তবু বলবে, জিলিপি খাব। পারিনে বাপু এমন বেয়াড়া ছেলে নিয়ে।”

একটু পরেই গিল্পিপনা জুলিয়া সে মাণিকের বই টানিয়া মেঝের কেলিয়া দিত, বলিত, “বইগুলো কেলে দাও না। তোমার ত এক শ’ ছ’শ’ টাকা আছে। তবে আবার কেন লেখা পড়া করছ?”

মাণিক বলিত, “কে বলেছে আমার এক শ’ ছ’ শ’ টাকা আছে?”

ফুটুকী বলিত, “আহা, আমি বেন আর কিছু বুঝি

লোক? তা’ হলে তোমার ঘরে কেন টেবিল চেয়ার, ডুমি কেন পেয়লাতে চা খাও? তোমার যে হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে। বাবার ত নেই, দাদারও নেই। কখখনো তোমার পঞ্চায় টাকা মাইনে নয়।”

ফুটুকীর কাছে মাণিক ছিল ঐশ্বর্ষ্যের, বিদ্যার, সৌন্দর্ষ্যের এমন কি আচার ব্যবহারেরও আদর্শস্থল। এহেন মাহুঘকে বন্ধুরূপে দখল করিতে পারাকে সে গর্কের বিষয়ই মনে করিত! সাধারণ শিশুমহলে ততটা না হইলেও তাহার ভ্রাতৃমহলে এইজন্য তাহার একটা খাতির ছিল।

সাতটি সন্তান রাখিয়া ফুটুকীর মা আজ ছয়মাস হইল সংসারের মায়া কাটাইয়া গিয়াছেন তখন হইতে এই নয় বছরের মেয়েটিই হইয়াছে বাড়ীর গৃহিণী। গৃহকর্তার মাসিক বেতন ছিগ পঞ্চায় টাকা, অবশ্য উপরি পাঁচদশ টাকা এদিক ওদিক হইতে তিনি যে সংগ্রহ না করিতেন তা নয়। কিন্তু তাহাতেও সাতটি ছেলে মেয়েকে খাইতে পরিতে এবং থাকিতে দিতে ভাল করিয়া কুলাইত না। স্তত্রাং এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটির সহায়রূপ কোনো দাসী চাকরের বালাই ছিল না! উপরন্তু অর্ধেব অভাবে এত বয়সেও তাহার সাজপোষাক ছেলেদের মত থাকিয়া গিয়াছিল।

তাহাতে ফুটুকীর আপত্তি ছিল না; কারণ শাড়ী পরিয়া হাড়ি নামাইতে, ছেলে কোলে করিতে এবং মধ্যে-মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া এবাড়ী সেবাড়ী লাক ঝাঁপ করিতে তাহার অভ্যস্ত অসুবিধাই হইত। গায়ের জামার উপর প্যাচ দেওয়া শাড়ীর অনাবশ্যক অংশটা ক্রমাগত গড়াইয়া পারে আসিয়া জড়াইত, পারে পারে হোঁচট খাইতে হইত। কাজেই শাড়ীর ছুখে সে মোটেই কাতর ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ছুখের অভাব ছিল না। ভোর না হইতে ভোনা কান্না জুড়িয়া দিত, মটকা তাহার খাটো চুল ধরিয়াই ই্যাচকা টান দিত, “ওঠ না বাদরী, রান্না করতে যে বেলা হয়ে যাবে।” কুনী নাকি সুরে কাঁদিয়া উঠিত, “আগে আমি বাঁনি খাব।” কুনী বিনা বাক্যব্যয়ে লেপের ভিতর হইতে নিষ্ঠুরভাবে তাহার পা ধরিয়া টান দিত; আর সকলের বড় ভাই মিঠু ফুটুকীর বহু যত্নে সঞ্চিত দুই চার আনা পয়সা, কি টিনের বাল্ল, ছোট আসী কিয়া রজনী কিতাগুলি আত্মসাৎ করিয়া সকলের আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। ফুটুকীর ইচ্ছা করিত বিছানাটা আর একটু আকড়াইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঢালা বিছানায় সব কটি ভাইএর সঙ্গে তাহাকে শুইতে হইত, স্তত্রাং তাহাদের অভ্যাচারের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাওয়া শক্ত। কাজ করিবার ও আপনার ধনমৌলত সামলাইবার জন্য আলস্য তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইত।

হঠাৎ কখন যেন উড়িয়া অদৃশ হইয়া যাইত। সারা বাড়ী খুঁজিয়াও তাহাকে না পাইয়া মটকা আসিয়া মাণিক-লালের ঘরে দেখিত ফুটুকী ভোনাকে কোলে করিয়া সকাল বেলা বেশ দিব্য আরাগমে চেয়াবে পা ঝুলাইয়া ডিমডাঙ্গা খাইতেছে। মটকা আসিয়া পড়িলে অবশ্য ভাগ পাইত; কিন্তু মাণিকলাল চশমা তুলিয়া পরিয়া তৎক্ষণাৎ এমনই কাজের ভাণ করিয়া ভোজে মন্দা পড়াইয়া দিত যে নবাগত অতিথি মোটেই খুসী হইত না। সুতরাং সে রাগে ও হিংসায় জ্বলিয়া গায়ের জোরে ফুটুকীকে টানিতে-টানিতে বাড়ী লইয়া যাইত আর বলিত, “বাবা বলেছে আজ পাড়াবেড়ানি-মেয়েকে ঘেরে পিঠের ছাল তুলে দেবে।”

মিঠু সচরাচর বাড়ীতে থাকিত খুব কমই, কিন্তু যদিই বা কোনোদিন অসময়ে হঠাৎ আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে সেও মটকার সহায়ক হইয়া ফুটুকীকে শাস্তি দিবার নানা অভিনব উপায় আবিষ্কার করিত।

ফুটুকী কিন্তু দমিত না। ছাড়া পাইলেই আবার ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের বাড়ী হাজির হইত এবং বলিত, “ওরা আমাকে ধরে-ধরে হেঁচছিল। আচ্ছা, দাঁড়াও না বড় হলে আমিও ওদের ধরে হেঁচব, আর সব জিনিস কেড়ে নেব; কাল তুমি যে আমার পরসা দিচ্ছিলে মিঠু লক্ষীছাড়া নিয়ে নিয়েছে। ওকে দাদা বলবে না কচু বলবে।”

মাণিকলাল উপহার দিবার একটা মাছুর পাইয়া প্রায় প্রত্যহই ফুটুকীকে হয় লক্ষ্মীস, নয় কিতা, নয় পেনসিল-কলম, কি পরসা সিকি ছয়ানি কিছু না কিছু একটা দিত। মটকা কুনী কুনীরা এই কারণে তাহার খানিকটা স্তাবক ছিল, কিন্তু মিঠু করিত জুলুম। পরদিন প্রায়ই শোনা যাইত, “আহা, মটকা বেচারী চাইলে,” অথবা “কুনীটা ছেলেমাছুর ওকে যে কেউ দেয় না,” নহত “দাদা লক্ষীছাড়া হাড়আলানে আমার ঘেরে কেড়ে নিলে।”

সুতরাং এত পাইয়াও ফুটুকীর সম্পদ বাড়িত না।

৩

মাণিক কসেজ যাইতেছিল ফুটুকী পিছন হইতে ডাকিল, “মাণিকদা তুমি যাও, বিনি বলছে তুমি বেশ ছন্দর দেখতে, ও তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাবে।”

বিনি নামী বালিকাটি ফুটুকীর পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিল, “মেয়ে কেবল যদি কেয় একটা কথা বলিস্।”

মাণিক একবার মাত্র পিছন কিরিয়া ছোট বড় মাঁকণর নানা রকমের সংখী ও অবখী বালিকার দল দেখিয়া হন্-হন্ করিয়া ছুটিয়া গলির বাহিরে চলিয়া গেল। মেয়েটা ঠাঁটা করিয়া উঠিল, “ওঃ তারি তোর বন্ধু রে, ডাকলেও ডাকার না।”

ফুটুকী রাগে অভিযানে গাল ফুলাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একবার মাণিকের খালি বগড়াটার চুকিয়া কি সব হিজি বিজি কাটিল, তাহার পর নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ীতে এমন সময়ে মিঠু কোনো দিন থাকে না; সস্তা চায়ের দোকানের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে তাকে বন্ধু পাকড়াইয়া পরের পরসায় কিছু বাসি মাছের চণ খাইয়া ও বিড়ি ফুকিয়া ট্যানী ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়া গারে হাংগা লাগাইয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রাত্যহিক কাজ। ইহা ছাড়াও আর তাহার যা সব কাজ ছিল তাহাকে ভয় কোনো আখ্যা দেওয়া শক্ত।

ফুটুকী বাড়ী চুকিয়াই দেখিল মিঠু তাহাদের ঘরের একমাত্র আসবাব বাবার তক্তাপোষখানার উপর পা তুলিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। ফুটুকী বলিল, “দাদা, বাড়ী এসেছ যে। অস্থখ করেছে বুঝি।”

মিঠু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “একটু মাথা ধরেছিল সে এখন সেয়ে যাবে।”

ফুটুকী নাচিয়া উঠিয়া বলিল, “আরে দূর! মাথাধরা বুঝি অমনি সারে? মাণিকদা বলেছে ওঁতকলোন দিতে হয়। দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি, মাণিকদার অনেক আছে।”

মিঠু বলিল, “তোমার মাণিকদা বড় নবাব দেখছি, সবট তার আছে?”

ফুটুকী গর্কিতভাবে মাথা দোলাইয়া বলিল, “ওমা তা থাকবে না! ওরা যে বড়লোক। সব আলমারী বাস্তু বোকাই পড়ে রয়েছে, তাতে কতো—ও কাপড় জামা, বই, টাকা-পরসা। ঘরে কেমন সুন্দর আলো, পাখা; তুমি অমন দেখই নি।”

মিঠুর লুকদৃষ্টি চকল হইয়া উঠিল, বলিল “আমাকে দেখাবি।”

ফুটুকী একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, “তুমি এত বড় খেড়ে ছেলে, ইংরিজী জান না, কলেজে যাও না, শুধু-পারে রাস্তায় বেড়াও, তোমাকে আমি মাণিকদার কাছে নিয়ে যেতে পারুব না। আমার বিচ্ছিন্নী লাগে।”

মিঠু মুখটা বাকাইয়া বলিল, “ওরে আমার বিচ্ছিন্নী রে। তুই বড় ইংরিজী জানিস, আর লেড-লর বাড়ীর জুতো-জামা পরিস না? নিজের পেছীরূপ দেখাতে ত বেশ সুচ্ছিন্নী লাগে।”

ফুটুকী বলিল, “আমার সঙ্গে যে চেনা হয়ে গেছে, ওবে আমার মাণিকদা।” এই বৃক্তির কাছে হার মানিয়া মিঠু বলিল, “আচ্ছা চল না চুপি চুপি দেখে আসি।” তোর মাণিককে বলিস্ না যেন।”

গিল্লির মত ঘুরে ফুটুকী বলিল, “তাই চল। চাকরটাকে বলব এখন, তাতে আমার লজ্জা করে না।”

চাকর তাহাদের দেখিছা বলিল, “কি খোকী দিদিমণি! বাবু নেই, উপরে কুখা যাচ্ছ?”

ফুটকী বলিল, “তুই খাম্ না। তোকে অত সফা গী করুতে হবে না। আমার উপরে কাজ আছে আমি যাচ্ছি।”

চাকরটা আর কিছু না বলিছা চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ফুটকী পরম উৎসাহে ঘর-বাড়ী দেখাইতে শুরু করিল। “এই মাণিকদার পড়বার ঘর। ইংরিজা বইতে পেন্সিলের দাগ দিয়ে একছামিনের পড়া এখানে পড়তে হয়। তার গায়ে মাটোরের সব কথা লিখে রাখতে হয়। কেবল একপাতা ছাপাতা পড়া নয়, কলেক্সে অনেক পড়া দ্যায়, গাদি-গাদি মোটা-মোটা বই এক-দিনেই পড়ে।”

“এই যে মাণিকদার খাবর টেবিল। এর উপর চাদর বিছিয়ে খায়, আর বাটির ভিতরে হাত ধোয়। চাদরের উপর জন ফেলতে নেই, ছিব্ড়েও না। কেমন রূপোর ফুলদানি দেখেছ? আর টেবিলের ঘড়িটা দ্যাখ, ওটা গান গায়।”

ফুটকীর বক্তৃতা কেহ শুনিতেছিল কিনা এবং তাহার নির্দেশমত সকল জিনিষ দেখিয়া যাইতেছিল কিনা, সেদিকে তাহার কোনোই লক্ষ্য ছিল না। সে আপন-মনেই মাণিকের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইয়া ও তাহার বর্ণনা করিয়া চলিয়াছিল। মিষ্ট মাঝে-মাঝে “হ্যাঁরে, এটা কি ওটা কি?” বলিয়া তাহার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিল বটে, কিন্তু প্রায় শেষ হইবার পূর্বেই ফুটকী প্রায় সব উত্তর শেষ করিয়া রাখিতেছিল। নিজের ধন-দৌলতেরও মাহুকের এত গর্ব হয় না, যত তাহার মাণিকের সম্পদে ছিল।

মাণিক যখন াড়ী ফিরিল, তাহার অনেক আগেই ফুটকী ও মিষ্ট চলিয়া গিয়াছে। মাণিক ঘরে ঢুকিয়া দেখিল পড়বার টেবিল জুড়িয়া ফুটকী খড়ি দিয়া বড়-বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, “মাণিকদার বড় ছুটু। আমার কথা শোনে না; মাণিকদার সঙ্গে আড়ি, এক শ’, দুশ’ তিন শ’ বার।” তাহার পর টেবিলে ১ এর পিঠে বতগুলি ০ ধরে তত শূন্য দিয়া লিখিয়াছে, “যার চেয়ে বেশী বলা যায় না ততবার।”

সকালে ফুটকীর ডাকে সাড়া না দিয়া চলিয়া বাওয়ার অপরাধেই যে তাহার এই শাস্তি হইয়াছে বুঝিয়া মাণিক হাসিল। কিন্তু তখন রাত হইয়াছে রাত্রি ভাঙাইতে বাইবার মত সময় নয় এবং বাড়ী গিয়া ফুটকীকে ডাকা-ডাকি করা কোনোদিন তাহার অভ্যাসও ছিল না, তাই মাণিকলাল শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মাণিকলাল চাকরটাকে ভিন্ন কিনিতে পরমা দিতে যাইবে, দেয়ালে টান দিয়া দেখিল খুচুরো

পরমাগুলো পাড়িয়া আছে, কিন্তু পাচখানা দশ টাকার নোট নাই।

মাণিক বিস্মিত হইল। চিরকাল খোলা দেয়ালে কিছা পাড়বার টেবিলের উপর চিঠি-পত্রের সঙ্গে টাকা কেলিয়া রাখাই তাহার স্বভাব; কিন্তু কখনও ত একপরমা তাহার লোকসান হয় নাই। আজ হঠাৎ এতগুলো টাকা গেল কোথায়? মাণিক চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, “এই লক্ষ্মীছাড়া, দিন-দিন বুঝি তোর বিদ্যে বাড়ছে? দেয়াল থেকে টাকা কোথায় রেখেছিস?”

সে বলিল, “রাম রাম, বাবু, ই সময়কে তাত। টাকা আমি লিলে গলা দিয়ে খুন উতারকে মরু খাব না।”

মাণিক বলিল, “তুই নিস্ নি ত কি ভুতে এসে নিয়ে গেছে নাকি?”

চাকরটা বলিল, “খোকী দিদিমণি এসেছিল, আর সেই চোষ্ঠা বাবুটা এসেছিল। ওই বদ্মাসোয়া লিয়ে হোবে।”

মাণিক কিছু বলিল না, অকুণ্ঠিত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ফুটকী একহাত করিয়া মাণিকের ঘরজার কাছে একবার উকি মারিয়া চলিয়া গেল। মাণিক কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। খানিকপরে শুনিল ভোনাকে সে তর্জন করিয়া বহিতেছে, “না গো না, অত নোনার কাজ নেই! আর ভিম খায় না; হ্যাংলা ছেলে কোথাকার! মাণিকদার সঙ্গে আমি আড়ি করে দিয়েছি।”

তাহার আড়ির খবরটা মাণিক যদি ভুল করিয়া না পড়িয়া থাকে, তাই ভোনাকে ধরিয়া আনিয়া মাণিককেই যে খবরটা শুনান হইতেছে তাহা বুঝিতে মাণিকের দেয়ী হইল না। একটা সন্ধ্যের চাপে মনটা তাহার ক্লিষ্ট হইয়া থাকিলেও ফুটকীর ব্যবহারে সে তাহাকে না ডাকিয়া পারিল না। সে ডাকিল “ফুটকী, শুনে যাও।” ফুটকী খাটো চুলগুলো ছুলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “সন্ধ্যাবেলায় তোমার ডাকাতাকি শুনবার আমার সময় নেই। আমার কাজ আছে; এত-ওপো রাকসের ভাত জোপাতে হবেনা?”

মাণিক বলিল, “হবে ত হবে! দরকারী কথা আছে, শুনে যাও।”

ফুটকী যেন কতই অনিচ্ছাস্তরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মাণিক একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, “ফুটকী, কাল ছপুর্বে কাকে সঙ্গে করে এনেছিলে!”

ফুটকী একটু চম্কাইয়া উঠিল; মাণিকদাকে বলিতে যে মিষ্ট বারণ করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া মিষ্টর কথা বলিতে তাহার নিজেরও ভাল লাগে না। ফুটকী বলিল, “কাউকে না। এবাই এসেছিলাম। কেন, আমি লিখতে পারি না ভেবেছ? নিজেই লিখেছিলুম।”

মাণিক ভাবিয়া পাইল না, মিষ্টকে আনিয়া থাকিলে

ফুটকী কেন তাহা লুকটিতেছে। তাহার কি এই ব্যাপারে যোগ থাকা সম্ভব! না চাকরটা নিজের দোষ এই উপায়ে পরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিতেছে। সে বলিল, “না, তার জন্তে নয়। কতকগুলো টাকা পাচ্ছি না। কেউ যদি ভুল করে নিয়ে থাকে, তাই ভাবছি।”

ফুটকী মুখটা লাল করিয়া বলিল, “সত্যি নাকি? ওমা, কি হবে?”

সে আর দাঁড়াইল না। হন্-হন্ করিয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল, মাণিক তাহার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

সারাদিনের মধ্যে ফুটকীর আর দেখা পাওয়া গেল না। মাণিক একবার ভাবিল গিয়া খোঁজ করিবে। কিন্তু পুলিশের মত আজকের দিনে বাড়ীচড়াও হইতে তাহার লজ্জা করিল। সে কাজে-অকাজে যতবার বাহিরে যাওয়া-আসা করিল, ততবারই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া নীচ বাড়ী কিরিয়া আসিল, কি জানি যদি ফুটকী আসিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অথবা যদি চাকরটা তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দিয়া থাকে।

গলির মধ্যে ভোনা ধূলায় একলা বসিয়া মুঠা-মুঠা ধূলা গায়ে মাখিতেছিল ও চাল-ডালের খুদ কি কাঁকর-বালি বাহা পাইতেছিল, তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুখে পুরিতেছিল। আজ তাহাকে আগলাইবার কেহ নাই। ছনী ও কুনী দুই টুকরা শুকনো রুটি হাতে করিয়া জানালার ভিতর দিয়া উকি মারিতেছিল, মাণিককে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। মুঠকা একটা গলাভাঙা বোতলে তেল কিনিয়া বাড়ী কিরিতেছিল, সেও যেন কোনো প্রকারে মাণিকের চোখ এড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মাণিক যখন বিছানায় শুইয়া বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন হঠাৎ কে যেন তাহার দরজা ঠেলিল। মাণিক ধড় কড় করিয়া উঠিয়া বসিল, মনে হইল যেন ফুটকী বাহির হইতে ডাকিতেছে, ‘মাণিক-দা’ দরজাটা খোল।’ এমন মিহিগলায় ফুটকী কখন ত ডাকে না। মাণিক অবাক হইয়া গেল। মাণিক পরে বলিল—“দরজা খোলা আছে ঠেলে এস।”

কি রকম যেন চোরের মত চুপি চুপি ফুটকী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার গতিতে হরিণ শিশুর মত সে চাকলা নাই, কথায় হাসির সে উচ্ছ্বাস নাই, চোখের দৃষ্টিতে শরভের আলোর মত সে দীপ্তি নাই; একদিনে কে যেন তাহার ফুটকী প্রাণ দুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে। মাণিক উঠিয়া বসিয়া বলিল, “ফুটকী কি হয়েছে তাই? এতরাজে কেন?”

ফুটকী হঠাৎ কাঁপাইয়া আসিয়া মাণিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ‘মাণিক-দা’ আমি মিছে কথা

বলেছিলাম। বাবা মিছে কথা বলে, দাদা মিছে কথা বলে, তবে আমি কেন বলব না? মিঠু পাণ্ডিটা চুপি চুপি এসেছিল আমার সঙ্গে।”

মাণিক বলিল, ‘এত রাজে না বলে কাল সকালে বললেই ত হত।’

ফুটকী গলায় স্বর নামাইয়া বলিল, “ওরে বাবা, সকালে যে আমাকে বন্ধ করে রাখবে! আজ সারাদিন আমায় বন্ধ করে রেখেছিল। মাণিক-দা মিঠুটা বড় লক্ষ্মীছাড়া ও তোমার টাকা চুরি করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি। ওটাকে বলেছিলাম তাই আমাকে হাত ছুটো বেঁধে কড়িকাটের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছিল’ কেবল বড় আঙ্গুল ছুটো মাটিতে ঠেকেছিল। উঃ, এমন মেরেছে জান না। আবার বাবাকে বলেছে আমি নাকি বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশি। বাবা আমাকে তার উপরে বিছুটি দিয়ে মেরে সারাদিন ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। বলেছে, ‘কোথাও বেরোতে পারি না।’ রাত্তিরে খাবার সময় ছেড়ে দিয়েছিল। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই দরজা খুলে পালিয়ে এসেছি।”

ফুটকী হঠাৎ নিজের পা-ছুইটা ধরিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, “মাণিকদা, তোমার সেই ভাল ওষুধটা দাও না তাই; পায়ে বড় ব্যথা, গায়ে বড় জ্বালা। আমি হাঁটতে পারছি না।”

মাণিক তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া ওষুধ পাড়িয়া ফুটকীর হাতে-পায়ে লাগাইতে বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে উচু-উচু হইয়া সান্নি-সান্নি কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। ছুট-ছুট হাসি-হাসি মুখখানা একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ে ঝরণার মত ছুরসু মেরেটির এমন চেহারা দেখিয়া মাণিকের চোখে জল আসিল।

মাণিক বলিল, “চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। তা’ না হ’লে জানতে পারলে আবার তোমায় ওরা শাস্তি দেবে।”

ফুটকী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, “মাণিকদা’ তোমার মালা আছে?”

মাণিক বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন রে?”

ফুটকী বলিল, “তা হ’লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে। আমাকে আর যেতে হবে না। আমি ওখানে যাব না, আমার ভয় করে। মিঠুটা আমাকে মেরে ফেলবে। বলেছে, যদি আমার নাম করিস্ তবে খুন করে ফেলবে।”

মাণিক বলিল, “আচ্ছা, মিঠু কে নাই বা বললে এ-সব কথা। সে কেমন খুন করে আমি দেখে নেব। তারপর একদিন আমি ভাল মালা কিনে আনব। আধার ঘরে বিয়ে হবে না, অনেক ভালো জেলে ভাল করে বিয়ে হবে।”

স্বাধীনতার স্বপ্ন

শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

২য় সংখ্যা

নামঞ্জুর গল্প

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; তা ছাড়া সেই অগ্নি-দাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রক্তভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হ'ল। দবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুরে পরিবেশ পৌঁছল আশামানের সমুদ্রকূলে। পারাগীর গাধের আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে হাসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক সহরের কোণে হামিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুলেলাম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলা-দেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকীল। উপাধি ছিল ঠাকুর-বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা ক'রেই আমার ডিগ্রি বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার বাগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্ধামী জানেন, কিন্তু

হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শান্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার ঘোপাঙ্কিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় আছে। তাঁর কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাকুক, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতাকালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হ'ত। তিনি আত্মীয় পশ্চিমেই কাটিয়েছেন, সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরো-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কল্যাণী স্বামীর বটে, স্বামীর নয়। তাঁর মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর

মেধেটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করতেন—সে জানেও না যে, তিনি তাঁর মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অভ্যস্ত সর্দীর্ণ, তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তাঁর পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেননি, তখন হুখেছুখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই ব'লে স্নেহ তো ঘুচল না। তিনি বললেন, “বাবা, বেখানেই থাকো, আমার আশীর্বাদ রইল।” আমি বললুম, “সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজং থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখতে পাইনি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।” পিসিমা তাঁর এত-কালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় চ'লে এলেন। আমি হেসে বললুম, “তোমার স্নেহ-গভীর ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন ক'রে এনেছি, আমি কলির ভগ্নীরথ।”

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু বিধাও হ'ল; বললেন, “অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল মেয়েটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেষ বয়সে তীর্থ ক'রে বেড়াবো—কিন্তু বাবা, আজ যে তাঁর উল্টো পথে টেনে নিয়ে চললি।” আমি বললুম, “পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ভ্রমের ক্ষেত্রেই তুমি আশ্রয়দান করো না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আশ্রা।”

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হ'ল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির কোঁকটা আশ্রয়-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিশের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবোই। তাঁর মতলব ছিল, যে-কোনো বাহুবন্ধন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তাঁরই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি তীর্থস্রমে

বাঁর হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর যুক্তি নেই।

আমার চরিত্র-স্বভবে এইখানে তুল হিসেব করেছিলেন। কুঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অস্তিত্বে আমাকেশকুনি-গৃধিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কস্তা-কর্তারা ক্রটি করেন-নি, তাঁদের সংখ্যাও অল্প। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছন্দতার কথা সকলেই জানত, অতএব ইচ্ছা করলে সম্ভবপর খণ্ডরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কস্তার সঙ্গে সঙ্গে বিশপঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেন। করিনি। আমার ভাবী চরিত্রলেখক একথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সঙ্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশপঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অকটা অদৃষ্ট কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েননি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্রান্তযুগের পরবর্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্বেই বলেছি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলতে। এত নিস্তেজ যে পিসিমা আমার স্বভবে নিশ্চিতই ছিলেন। আমার জন্মে কালীঘাটে স্বস্তায়ন করবার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানীং আমার ভাগ্য-আকাশে লালপাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃষ্ট থাকতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই তুল করলেন।

সেদিন পূজোর বাজারে ছিল খন্দরের পিকেটিঙ। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিরেছিলুম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-ধবর আমার কুটির মক্কা ছাড়া আর সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খন্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালী মহিলাকে

পুলিশ সার্জন দিলে খাফা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল হুঃসহযোগে পরিণত হ'ল। স্মৃতরাং অনতিবিলম্বে খানার হ'ল আমার গতি। তা'র পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অঙ্কার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্তে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়ীতেও দেখবার শোন্বার লোক আছে, অতএব এখন তুমি দেবসেবায় যোলো আনা মন দিলে দেবমানব কারো কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা ব'লেই গণ্য ক'রে নিয়ে-ছিলাম। সেখানে কোনোরকম দাবীদাওয়া আবদার-উৎপাত করিনি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুস্থ ও সুখান্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হইনি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলাম। কোনো-রকম আপত্তি করাটাই লঙ্কার বিষয় ব'লে মনে করতাম।

মেয়াদ পূরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারদিকে খুব হাততালি। মনে হ'ল যেন বাংলাদেশের হাওয়ার বাজতে লাগল, এন্কোর, এক্সেলেট্। মনটা ধারাপ হ'ল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর মিষ্টান্নমিতরে অনাঃ, রস পেলে দশে মি'লে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা প'ড়ে যায়, আলো নেভে, তা'র পরে ভোলুবাথ পালা। কেবল বোঁড়হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তা'রই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তা'র ঠিকানাও জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পূজোর সংখ্যার জন্তে একটা লেখা চাই।" জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার একসংখ্যার ধরবে না।"

"একসংখ্যায় কেন? ক্রমে ক্রমে বেরবে।"

"সতীর মৃতদেহ স্মর্শনচক্রে টুকরো টুকরো ক'রে

ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্রে তেমনি টুকরো টুকরো ক'রে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের ক'রে দেবো।"

"না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও না।"

"কি-রকম ঘটনা?"

"তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব ঘাতে ব'ল।"

"কি হবে লিখে?"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কৌতুহল? আচ্ছা, বেশ, লিখ্বে।"

"মনে থাকে যেন, সবচেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ সবচেয়ে যেটাতে হুঃখ পেয়েছি লোকের তা'তেই সবচেয়ে মজা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু নামটাম-গুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা, তা'র ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখ, তা'র পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু আর কাউকে দিতে পারবে না ব'লে রাখ্চি। যিনি যত দর হাঁকুন আমি তা'র উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "তোমাদের ইনি, বুঝতে পার্চ? নাম করব না, ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর—মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ডসনের বৃট আর তালতলার চটি।"

বুঝলেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্য-মাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সন্ধ্যা কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার-সহজে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলখানার রিহার্সাল বলা হ'ত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হ'য়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণ-পুরুষ বিচলিত হয়নি। তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-শুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করিনি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, “পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, বৈরাগ্য,—সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।” তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতেন, “আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।” নির্কোষ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

তুলেছিলাম, স্নেহ-সেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তা'র মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না, যে লক্ষ্মী কোন্-একসময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বু'নে রেখেছেন, তা'র সোনার সূতোর দামে সূর্য্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি ব'লে সন্ন্যাসী নিশ্চিত, তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মস্লাম বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্তে নন্দীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করতে থাকেন! আমার হ'ল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইস্ত্র-জাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্তমনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে ব'সে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙল জেলখানার গিয়ে। পিসিমা ও পুলিশের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অশেষবুদ্ধিধারা তা'র সম্বরণ করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, “নির্ভৈশ্চোপ্যা ভবাজ্জুন।” হায়রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকঘরে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারিনি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

কল হ'ল এই যে বজ্রাঘাতছাড়া আর-কিছুতে

যে-শরীর কাবু হ'ত না, সে পড়ল অস্থস্থ হ'য়ে। জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়লে, জেলের রোগ-গুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেল-বেলা জর হ'তে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দ্রন হাততালি ফিকে হ'য়ে এসেছে, তখনো এ আপদগুলো টন্টনে হ'য়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্মজ্ঞান নেই? কিন্তু দোষ দেবো কা'কে? ইতিপূর্বে অস্থখবিস্তৃখে আমার সেবা করবার জন্তে পিসিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন—আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না। পিসিমা বলেছেন, “অমিয়ার শিকার জন্তেই বল্চি, তোর আরামের জন্তে নয়।” আমি বলেছি, “হাঁসপাতালে নাসিং করতে পাঠাও না।” পিসিমা রাগ ক'রে আর জবাব করেননি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাব্চি, “না হয় একসময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই ব'লে কি সেই বাধাই মান্তে হবে। গুরুজনের আদেশের পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!”

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অস্থখ ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রথর। লক্ষ্য করলেম আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তা'র এত অভাবনীয় উন্নতি হয়নি। আজ অসহযোগের অসহ আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তা'র হৃৎকম্প হয় না; অনাধাসদনের চাঁদার জন্তে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য ক'রে দেখলেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবসায় দে'খে তা'কে দেবী ব'লে ভক্তি করে,—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐধরণের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অস্থবিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত, হাতের কাছে কাউকে-

না-কাউকে পাওয়া যেত। এখন একপ্লাস অলের দরকার হ'লে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিষমবিরুদ্ধ হ'লেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্তে অমিয়াকে ছুই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শুনেই সে দরজার দিকে চমুকে ডাকায়, কেবলি উসুখুসু করতে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি, “অমিয়া আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।” অমিয়া বলে, “তা হোক না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ”—আমি বলি, “না, না, সে কি হয়? কর্তব্য সব আগে।” কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দমকা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না। শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরো অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তা'রা সকলেই অমিয়াকে যুগলন্দী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়-বাহাদুর, পাট করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগো জোটে সে বেচারি নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্তে অহরহ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হ'য়ে না থাকলে তা'কে মানায় না। খেতে শুতে তা'র সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ক'রেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন কবুলে শরীর টিকবে কি ক'রে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম গ্রহণে, একরকম ক'রে কাজটা সেরে নেবো,—সে তা'তে ক্ষুব্ধ হয়,—ক্লাস্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা? ছুঃখ-পৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা? তা'র স্ত্যাপ-স্বীকারের ক্ষণের মধ্যে আমিও প'ড়ে গেছি। আমি যে তা'র এতবড়ো জেল-খাটা দাদা, উল্লাসকর

কানাই, বারীন, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তা'র যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তা'কেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এতবড়ো স্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনো কারণে তা'র দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তা'র উৎসাহের মৌতাৎ জোগাবার জন্তে বলেছি, “অমিয়া, ব্যক্তিগত মাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্তে নয়, তোর জন্তে বর্তমান যুগ।” আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইচে—যারা আমাকে চেনে না তা'রা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর ব'লেই মনে করে।

বিছানায় একলা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌চি, বিমুখা বান্ধবা যাস্তি। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা জাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আবরু নেই,—আধমরা তা'র অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তা'কে দূর দূর করে' তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাব্‌ছিলেম এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তা'কে তাড়ালেম কেন? বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্কাজে মরণশয্যা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সঙ্কীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেহুরো, ওর রুগ্নতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চার-দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ—স্রোতের বাধা। সে দাবী করে, শিয়রের কাছে চুপ ক'রে ব'সে থাকো; প্রাণের দাবী, দিকে বিনিকে চ'লে বেড়াও। রোগের বাধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়,—এটা একটা অপরাধ। অতএব জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ ক'র মনে ক'রে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধী: অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ অরোগের বন্দ ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অসুভব কবুলেম, কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম কবুলে। স্নীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এপর্যন্ত দু'বের থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে জানি; বিশেষভাবে তা'র

পরিচয় জানিনে—তা'র নাম পর্যন্ত আমার অবদিত। মাথার ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ায় মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকতে পারেনি। আমার অজান্তসারে আমার মাথাধরার, গায়ে ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম ক'রে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্তে দুঃখ-স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ে কাছের তারি প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিঃশব্দে হবার উমেদার এই জেলখাটা পুরুষের বহুকালের শুকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্বেই বলেছি, সেবার আমার অভ্যাস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা দিয়ে দিতাম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হ'ল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি খত্তরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের ছুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে পূজা-অর্চনার তা'রা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হ'লে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পূজার ঘরে না। অমিয়া তা'র কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাধাবাধি নেই, আর দেবদেবী যেখান থেকে ধাতির না পেয়ে শূন্য-হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হ'তেই পারে না,—বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে? সেই কারণে অমিয়াকে তিনি টিলেমির চালুতট বেয়ে আধুনিক আচার-

হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধ্য হননি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্ক আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে কাস্ট্রি। বছরে বছরে মিশনারি ইন্সল থেকে ক্রক প'রে বেশী ছলিয়ে চারটে-পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। বেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আর কি। এমনি ক'রে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনার দীর্ঘকাল তন্নয় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পরীক্ষা-দেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ল। পাস্ প্রহণেও যেমন, পাস্ ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো ক'রে তা'র যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তা'র চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যেসব প্রাইজ তা'র হাতের কাছে ফিরুচে, তা'রা চলে, তারা বলে, তা'রা অশ্রুসলিলে গলে, তা'রা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়ারগেয়ে পোষ্য মেয়েগুলির পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাধাসমানে যে-সময়ে তাঁহার টাকার চেয়ে অনাধারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্তে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেচেন, "সে কী কথা—এরা তো অনাধা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে? অনাধ হোক সনাধ হোক মেয়েরা চায় ঘর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেয়ে বস্তাবন্দী ক'রে রাখা কেন? তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি?"

বা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সঙ্কচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ডাইকোটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়; আমার কাছে তা'রই সাহায্য আবশ্যিক। এই লেখাটির ওরিজিনাল আইডিয়াতে উজ্জ্বল খুব বিচলিত,—এই নিয়ে তা'রা একটা ধুমধাম করবে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিয়ুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠল। তা'র দেশ-বিশ্রুত রান্না যদি একটু ইসারামাত্র করত, তা হ'লে তা'র সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল? এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, “দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—” প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ করে ব'লে ফেললেন, “পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।”

পুলিস সার্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক-মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্তে মিথ্যে কথা ব'লে ফেললেন। এবারেও শাস্তি স্বরূপ হ'ল। অমিয়া আমার পায়ে কাছ বসল। হরিমতি তা'কে কুণ্ঠিত মুহূর্তে কি-একটা বললে। সে ঈষৎ মুখ ঝাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আঙুলে আঙুলে উঠে চ'লে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি, দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ে সযত্নে যে স্বাস্থ্যশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়কড় করে উঠে ব'লে বললেন, “অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জমা করে ফেলি।”

“এখন থাক না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই না?”

“না, পা কেন কামড়াবে? হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বটে। তা দেখ্ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়ারটা ভারি চমৎকার। কী করে তোর মাথায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিলুম “বর্তমান যুগে ভাইয়ের লম্বা অতি বিরাট, সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তা'র স্থান হয় না।” এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি। With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the

boundaries of the individual home. একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হ'য়ে ছোটে।”

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধ'রে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না—তবু এম্পেরিনের বড়ি গিলে ব'লে গেলেন।

পরদিন দুপুর-বেলায় আমার জলধর যখন দিবানিজায় রত, দেউড়িতে দরওয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গলির নোড় থেকে ভালুকনাচ-ওয়ালার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয় যখন যুগলন্দীর কর্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীক ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করতে করতে কখন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'লে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হ'ল না। এতক্ষণে নববন্ধের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা করে ব'লে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করছে। ভাগ্যে বলিনি।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে, ঠিক সেই সময়ে অনাথা-সদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল;—তা'র ছৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হ'ল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাখার গতি খুব মুছ হ'য়ে এল।

অমিয়া বিছানার একধারে ব'লে খুব শক্তস্বরে বললে, “দেখ দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়-হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সেসব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে—যেমন আমাদের অনাথা-সদনের কাজ—তা হ'লে—”

বুললেন আমাকে উপলক্ষ্য করে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেন “অর্থাৎ তুমি

চলবে নিজের সখ অহুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম অহুসারে; তুমি হবে অনাধাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাধাসদনের সেবাকারিণী। তা'র চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝতে পারবে সেকাজ তোমার অসাধ্য। অনাধাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।”

আমার কাজবতাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই, অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্। ফল হ'ল এই যে আমি পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে,—তা'র নাম প্রসন্ন। তা'কে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে বললে, “দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।” সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মুখে বলে, যে, তা'র পায়ে কোনোরকম বিকার হয়নি? কেমন ক'রে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তা'কে অপদস্থ করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববন্ধের ভাইফোঁটা সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে খেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অহুতব করলে, ষ্টিঅজ্ঞটা তারি উদ্দেশে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হ'ল। তবুও শ্লোকের কঁাকে কঁাকে দরজার কঁাকের দিকে চেয়ে দেখি—কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। তা'র বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরো দুইচারিটি মেয়ে আমার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্তে জড়ো হ'ল। আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে দিলে, যাতে পালা ক'রে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে

শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছেড়ে তা'র পাড়ারগায়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন—
“এ কী ব্যাপার? ঠাট্টা নাকি? এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা?”

আমি হেসে বললেম, ‘পুছোর বাজারে চলবে না কি?’

“একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হালকা-রকমের জিনিষ”

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রদ্ধল অন্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হালকা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এল অনিল। বললে, “মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।”

চিঠিতে আমিরােকে, তা'র দেবীকে, যুগলশ্রীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে, একথাও বলেছে, আমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন আমিয়ার জগদ্বস্তান্ত তা'কে বলতে হ'ল। সহজে বলতেম না, কিন্তু জানতেম, হানব'র্গর পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে বললেম পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই কালিত হ'য়ে যায়, এ তো তোমরা আমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্চ। সে পদ্ম, তা'তে পঙ্কের চিহ্ন নেই।”

নববন্ধের ভাইফোঁটার সভা তা'র পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরী, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লার স্বরাজপ্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েচে।

অমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্ভোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুক্রবার সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-দুটো খালাস পেয়েছে।

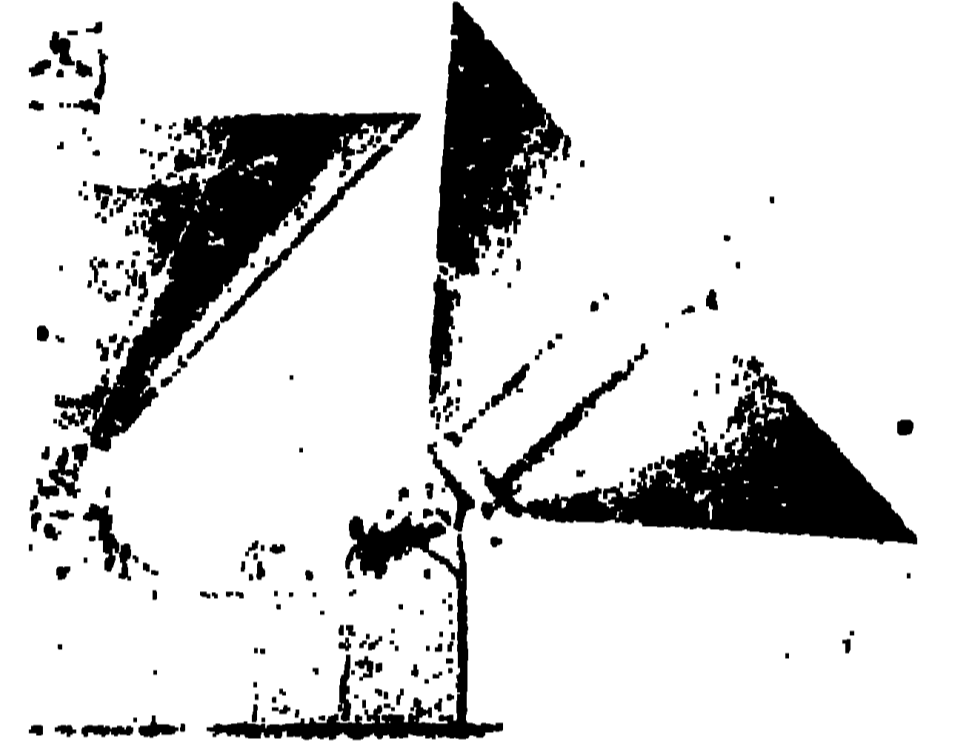
সৌরশক্তি

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

আধুনিক সময়ে কলকারখানার যুগ বলা যাইতে পারে। কলকারখানাসমূহ আবার শক্তির লীলাক্ষেত্র। বিজ্ঞানের মূলনীতি বলে, যে শক্তি অক্ষয়, অব্যয়, (conservation of energy)। ইহা রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু নষ্ট হইতে পারে না। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির রূপান্তর মাত্র। কোনো যন্ত্রে তাপকে, কোনো যন্ত্রে বিদ্যুৎকে কোনো যন্ত্রে বা রাসায়নিক শক্তিকে (chemical energy) যান্ত্রিক শক্তিতে (mechanical energy) পরিণত করা হয়। এই শক্তির প্রধান উপাদান হইতেছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। দুইতিন শতাব্দী পূর্বে ও প্রাচীন কালে অরণ্যমধ্যস্থ বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষগুলি আমাদের ইন্ধন জোগাইত। তা'র পর মনুষ্য-বৃক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে যখন অরণ্যগুলি লোকালয়ে ও সমতল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইল, তখন বৈজ্ঞানিকেরা রত্নগর্ভা ধরিত্রীর শরণাপন্ন হইয়া তাহার কৃষ্ণ হইতে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম উদ্ধার করিলেন। এই দুই বস্তুই এখন কলকারখানার প্রধান খাদ্য। প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে যে-অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, পৃথিবীর আর সে-অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদি আর ভূপ্রোথিত হইতেছে না, সুতরাং নূতন করিয়া কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্বেসঞ্চিত কয়লাদির ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বৃষ্টি বা একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির নব উৎসের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যেসব দেশে জলপ্রপাত আছে, তথায় ঐ শক্তির সাহায্যে নানারূপ যন্ত্রাদি চালিত হইতেছে। আমেরিকার নায়েগ্রাপ্রপাত শক্তির এক প্রকাণ্ড লীলাক্ষেত্র; কিন্তু সমস্তল-প্রদেশে জলপ্রপাতের অভাব। দেখা গিয়াছে যে

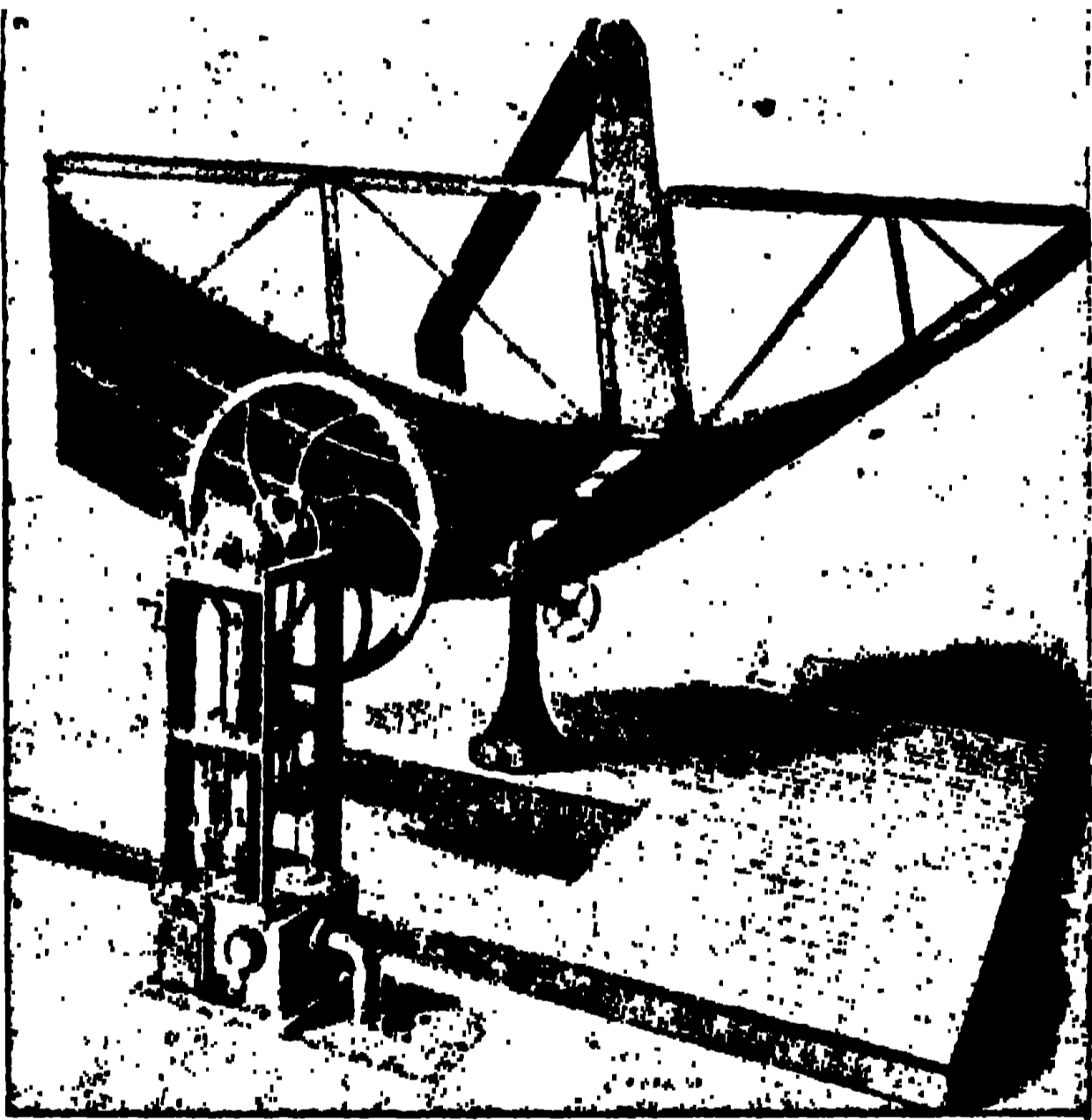
এইসব প্রদেশে সৌরতাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদেরকে আর কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের খনির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কলকারখানার বংশধরেরাও নিশ্চিত ও নিঃশঙ্ক হইবেন।



১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মুশো কর্তৃক উদ্ভাবিত সূর্যতাপ সঞ্চয়কারী বহু পার্শ্ববিশিষ্ট নল

সৌরশক্তির পরিচয়-প্রদানের পূর্বে সূর্য-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। প্রাচীন কালে লোকের ধারণা ছিল যে, রাবণের চিতার স্তায় সূর্যের মধ্যে অবিরত দহন-ক্রিয়া চলিতেছে; কিন্তু এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সূর্যের মধ্যে যদি ক্রমাগত দহন-ক্রিয়া (combustion) চলিত, তাহা হইলে উহা এতদিনে ভস্মে পরিণত হইত। অধিকন্তু আধুনিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্যের তাপ স্ফটিকগ্রেডের ছয় হাজার ডিগ্রি। ঐ তাপে দহন-ক্রিয়া চলিতে পারে না। কোনো বস্তু যখন দহন হয়, তখন উহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অল্প পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু ছয় হাজার ডিগ্রি উত্তাপে রাসায়নিক সংযোগ ত হইবে না, বরং এত উচ্চ তাপে সমস্ত যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হইয়া যায়। কি উপায়ে সূর্য প্রত্যহ এত তাপ বিকিরণ করিয়াও নিশ্চত হয় না, সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে ও অদ্যাপিও ইহার স্ফীমাংসা হয় নাই।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত হেলমহোলৎস (Helmholtz) বলিয়াছেন যে সূর্য্যাতিসূক্ষ্ম-পরিমাণে অবয়ব-সঙ্কোচের জন্তই এই বিরাট তাপ নির্গত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই মত অভ্রান্ত হইলে সূর্য্যের বয়স হয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বৎসর, কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎগণ গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীরই বয়স ছই কোটি বৎসরের অধিক, সুতরাং সূর্য্যের বয়স আরও বেশী, এইজন্য এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কতকগুলি তেজোনির্গমণীল পদার্থের (radio-active substances) আবিষ্কারের পর হইতে বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর আসিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপের কারণ আধুনিকতম পণ্ডিতগণের মতে ঐ তেজোনির্গমণীলতার (radio-activity) সহিত সংশ্লিষ্ট।



এরিকসনের তৈরী সূর্য্যশক্তি সংগ্রাহক কল (১৮৮০)

সূর্য্য-দেহের মধ্যে একটি মূল দেহ বা কোষ (nucleus) আছে, তাহার চতুর্দিকে একটি বাষ্পাবরণ আছে। সূর্য্যের মূল-দেহটি কঠিন কি তরল, উহা বাষ্পাকারে আছে কি না, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। যদি বাষ্পাকারে থাকে, তাহা হইলে উহা যে অত্যন্ত চাপযুক্ত অবস্থায় আছে, তাহা বর্ণচ্ছত্রপরীক্ষায় (spectrum analysis) বেশ বোঝা যায়। আধুনিক জ্যোতিষীরা সূর্য্যের বাষ্পাবরণটিতে মূলত তিনটি স্তর দেখিতে

পাওয়াছেন। প্রথমটির নাম দেওয়া হইয়াছে আলোকমণ্ডল (photo sphere); সূর্য্যের যে দীপ্তি তাহা আলোকমণ্ডল হইতে উৎপন্ন। মূলে এই মণ্ডল প্রজ্বলিত বাষ্প ব্যতীত আর-কিছুই নয়। ইহার পর সূর্য্যের বাষ্পাবরণের যে আর একটি স্তর আছে তাহাকে বর্ণমণ্ডল বলা হইয়া থাকে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণকালে যখন সৌরবিষ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন এই বর্ণমণ্ডল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। রক্ত, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত বাষ্পরাশি শিখাকারে উঠিয়া যে অত্যন্ত দৃশ্য দেখায়, তাহা প্রকৃতই দর্শনীয় ব্যাপার। ইহার পরই সূর্য্যের আকাশের তৃতীয় স্তরটি আছে, তাহা জ্যোতিষীরা নিকট ছটা-মুকুট নামে (corona) প্রসিদ্ধ। দূরবান্ দিয়া এই স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালই এই স্তর-পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। গ্রহণকালে যখন চন্দ্রের কৃষ্ণবিষ সূর্য্যের উজ্জ্বল দেহ ও আলোকমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন সূর্য্যের স্তরটি ছটার মতন সূর্য্যকে ঘিরিয়া আছে, দেখা যায়। পরীক্ষায় কতকগুলি শিখাকে প্রায় ষাট হাজার মাইল দীর্ঘ দেখা গিয়াছে এবং কতকগুলিকে প্রতি সেকেন্ডে ছই শত হইতে তিনশত মাইল বেগে উঠিতে দেখা গিয়াছে।

সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য্যের ব্যাস ৮,৬৩,৬০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় একশতগুণ। সূর্য্যের বৃত্তাকার স্থানটিকে সমতল কল্পনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার আয়তন ৫৮৫,৭৫,০০,০০,০০০ বর্গমাইল। এই বিরাট অবয়ব হইতে অবিরত তেজোনির্গমন হইতেছে। শক্তি- (energy) নির্গমনের একটি হিসাবও প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা মাপকাঠি (standard) আছে। ইংরাজেরা শক্তির মাপকাঠির নাম দিয়াছেন অশ্বশক্তি (horse power)। অশ্বের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোনো সঘন্য নাই। একটি ৪১২ মণ ভারী জিনিষকে ১ ফুট উচ্চে তুলিতে যে-পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে এক অশ্বশক্তি। তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপকে এই মাপকাঠির

সাহায্যে প্রকাশিত করা যাইতে পারে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের এই বিরাট অবয়বের প্রতি বর্গফুট হইতে প্রত্যহ ১২,৫০০ অশ্বশক্তি তেজ নির্গত হয় এবং পৃথিবীতে প্রতি একরে ৭,৩০০ অশ্বশক্তি তেজ পতিত হয়। ইহার মধ্যে পরিষ্কার দিনে দুপুরবেলায় প্রায় ৫০০ অশ্বশক্তি তেজ পৃথিবীর স্থলভাগে পতিত হয়।

সূর্যরশ্মি ৯,৩০,০০,০০০ মাইল পথ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়। এই পথের অধিকাংশই সর্বব্যাপী ইথার (ether) ব্যতীত আর কিছুই নাই। বায়ু কেবল পৃথিবীর উপরেই আছে, নব্বই কি একশত মাইল উর্দ্ধে উঠিলে আর বায়ুর অস্তিত্ব থাকে না। সম্প্রতি বিখ্যাত জ্যোতিষিক অ্যাব্বে মোরো (Abbe Morcaux) উদীয় উষা (Aurora Borealis) পর্যবেক্ষণ করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে বায়ুস্তর ৫৪০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ইথার জিনিষটা সে-প্রকার নয়, ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে।

বায়ুতে বা জলের কোনো স্থানে একটু আলোড়ন হইলে যেমন তরঙ্গাকারে সেই আলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া চলে, ইথারেও তাহাই হয়। কোটি-কোটি মাইল দূরের জ্যোতিষে অগ্নি প্রজলিত হইলে ইথারে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তাহা তরঙ্গপরম্পরায় আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কাতেই আমরা আলোক দেখিতে পাই, কিন্তু সাধারণত সূর্যালোক আসিয়া ধরাতলে পতিত হয় ও তাহা প্রতিফলিত হইয়া (reflected) যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমরা সূর্যালোকের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। সৌরশক্তি (solar energy) যখন তরঙ্গবাহিত হইয়া পৃথিবীস্থ কোনো ভৌতিক পদার্থে (material body) পতিত হয়, তখন ইহার কতকাংশ তাপরূপে প্রকাশিত হয়, কতকাংশ আলোকরূপে প্রকাশিত হয়। মধ্যস্থ ইথার ও বায়ুমণ্ডল মোটেই উত্তপ্ত হয় না। মধ্যস্থ ইথার অতিশয় শীতল, তরল বায়ুও ইহার তুলনায় উষ্ণ। পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সৌর শক্তি আসিলেও ইহা উত্তপ্ত হয় না। সৌরশক্তি পৃথিবীতে আসিয়া তাপরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় এবং ধরাতলের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু উত্তপ্ত হয়, এইজন্য

যত উপরে উঠা যায়, বায়ুর তাপও (temperature) তত কমিতে থাকে। ধরাতলের উত্তাপ গড়ে সেন্টিগ্রেডের ১৫ ডিগ্রি। এক মাইল উর্দ্ধে বায়ুর উত্তাপ শূন্য ডিগ্রি, এই স্থানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। পাঁচ মাইল উর্দ্ধে বায়ুর শৈত্য—২০ ডিগ্রি, ১০ দশ মাইল উর্দ্ধে—৭৫ ডিগ্রি। ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যস্থ ইথার ও বায়ুমণ্ডল সৌরশক্তির বাহক মাত্র (carrier of solar energy)। দেখা গিয়াছে যে সৌররশ্মি (solar radiation) ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপর পতিত হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ উৎপন্ন হয়।

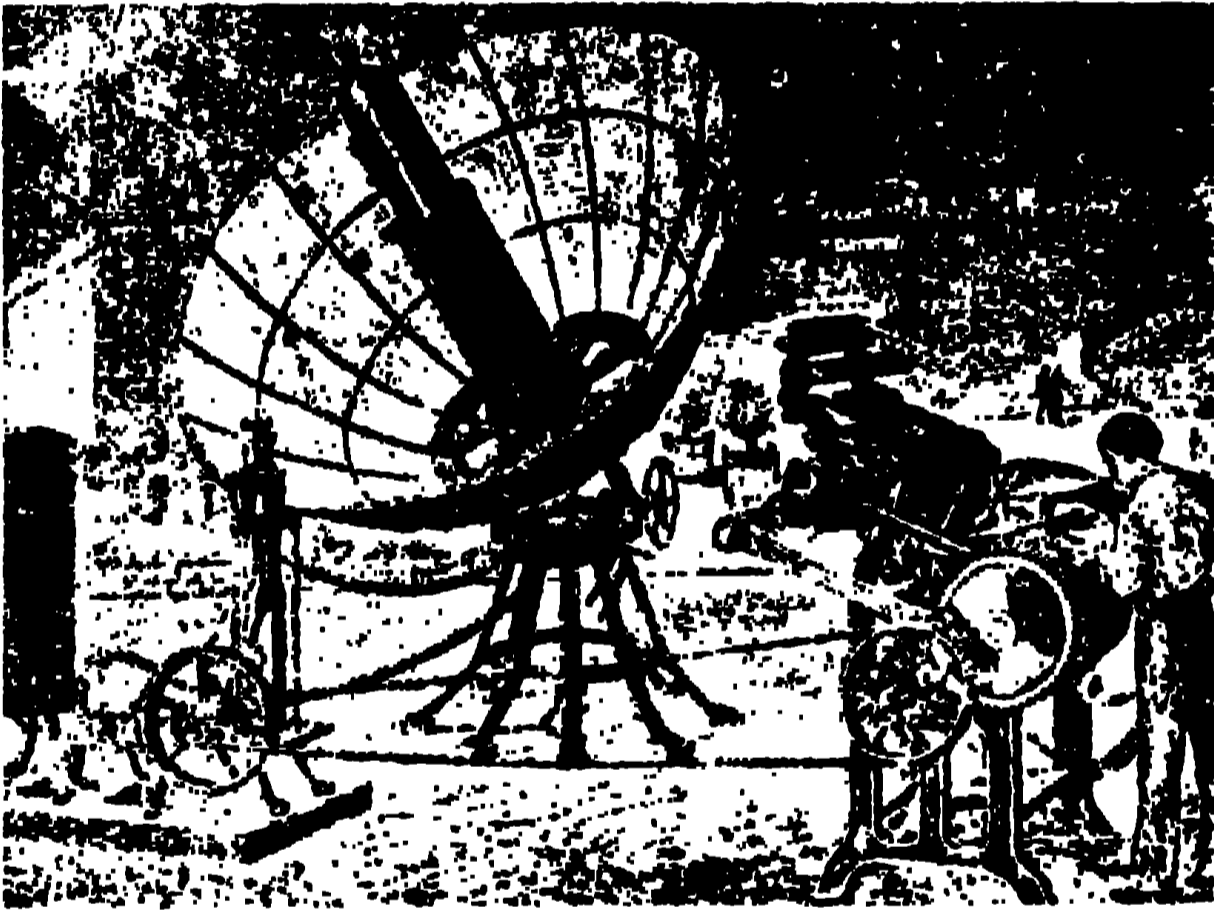


আডম্‌স্-এর সৌরতাপ কুকার।

ধরাতল (surface of the earth) প্রতি এবরে প্রায় ৫০০০ অশ্বশক্তি সৌরতেজ গ্রহণ করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরও আবার অতিশয় উত্তপ্ত। ধরাগর্ভ হইতেও সর্বদা তাপ আসিয়া ধরাতলে উপস্থিত হইতেছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই তাপের পরিমাণ প্রতি একরে দুই অশ্বশক্তি। এখন অবৈজ্ঞানিকের নিকট মনে হইতে পারে যে, এই উভয়বিধ কারণের জন্ত ধরাতল অল্পকাল মধ্যে এত উত্তপ্ত হইয়া যাইবে যে, ইহা মনুষ্য-বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু ধরাতল যেকোন সমস্ত দিন তাপ গ্রহণ করে, সেইরূপ সমস্ত রাত্রি তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ বিকীর্ণ হইয়া অনন্ত শূন্যে চলিয়া যায়। তাপের আয়ব্যায়ে মাত্রা প্রায় সমান, সেইজন্য ধরাতলের তাপও

প্রায় সমান থাকে। গ্রীষ্মকালে ধরাতলের অংশবিশেষে তাপের আর, ব্যয় অপেক্ষা অধিক, এজন্য সেই অংশ কিছু উত্তপ্ত হয়, আর শীতকালে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া কিছু শীতল হয়।

এখন সৌরশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, আতস কাচের (lens) সাহায্যে কেহ-কেহ দেশলাইয়ের অভাবে সিগারেট বা অল্প দাহ পদার্থ প্রজ্জ্বলিত করেন। আতস-কাচের দ্বারা সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত (focussed) করিয়া কেন্দ্র-স্থানে (focus) দাহ পদার্থ রাখিলে উহা জলিয়া উঠে। ইহাই সৌরশক্তির ব্যবহারের অতি সরল উদাহরণ। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব ২১২ অব্দে যখন সিরাকিউজের (Syracuse) অধিপতি হিরোরের (Hiero)



সিক্কের সৌরশক্তিচালিত যন্ত্র ছাপাখানার কল চালাইতেছে (১৮৭৮)

বিরুদ্ধে মার্সেলাসের (Marcellus) নৌবাহিনী পরিচালিত হইয়াছিল, তখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস (Archimedes) এই পন্থা অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষের সমস্ত নৌকা দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের সত্যতা-প্রমাণের জন্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক বুফ (Buffon) ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আয়না দ্বারা ১৫০ ফুট দূরস্থিত আল্কাতরা-লিপ কাঠখণ্ডে রৌদ্র প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখেন যে, কিয়ৎক্ষণ পরে কাঠখণ্ডগুলি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পুরাকালে রোম-দেশে গৃহস্থালী ও অগ্নিকুণ্ডের দেবী ভেষ্টার (Vesta) মন্দির-মধ্যে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার প্রথা ছিল। ঐ মন্দির-মধ্যে একটি খাতুনির্মিত

কলার মোচার মতন প্রতিফলক (conical reflector) ছিল। হঠাৎ কোনো কারণবশত অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গেলে, প্রধান পুরোহিত প্রতিফলকের কেন্দ্রে (focus) শুষ্ককাঠ রাখিয়া দিতেন। সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত হইয়া কাঠে পতিত হওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা জলিয়া উঠিত। প্রধান পুরোহিত প্রচার করিতেন যে তিনি দৈবশক্তি দ্বারা কাঠখণ্ড জ্বলাইয়াছেন। অজ্ঞ নরনারীগণ ইহাকে অলৌকিক ঘটনা মনে করিত ও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল-মাত্র দেবীর কৃপায় পুরোহিত দ্বারাই ঐরূপ অগ্নি-প্রজ্জ্বলন সম্ভব।

সৌরশক্তির সাহায্যে কল চালাইবার চেষ্টা সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সলোমঁ স্ত কো (Solomon-de-caux) সর্ব-প্রথম সৌরশক্তি-চালিত এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার পর এই তিন শতাব্দী ধরিয়া নানারূপ যন্ত্র-নিষ্কাশনের চেষ্টা চলিতেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলকের সাহায্যে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ একটি পাত্রে পাতিত করা হয়। পাত্রটির মধ্যে জল থাকে। পাত্রটি সৌরতাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে পাত্রমধ্যস্থ জল বাষ্পে (steam) পরিণত হয়। এই বাষ্পায় শক্তির সাহায্যে অগ্ন্যান্ত কল চালানো হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিনে কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করা হয়, সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনে সূর্যতাপ দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। যে-সমস্ত সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ক্রমাগত প্রতিফলক ও অগ্ন্যান্ত অংশের বিশেষ উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সুইস বৈজ্ঞানিক সোসুরে (Saussure) সর্বপ্রথম তাপের বায়ু আবিষ্কার করেন। ইহা কাঠ-নির্মিত ও ইহার অভ্যন্তর ভাগ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং দুই স্তর সমতল কাচের (plane glass) দ্বারা ইহার মুখ আবদ্ধ। এই বায়ুর সাহায্যে সেন্ট্রিগ্রেডের ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপ পাওয়া গিয়াছিল।

তার পর সার জন হার্শেল (Sir John Herchel) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ঐপ্রকার একটি মেহগনি কাঠনির্মিত বায়ু প্রস্তুত করেন; উহার সাহায্যে তিনি ৬৫ ডিগ্রি পর্যন্ত

তাপ প্রাপ্ত হন। চতুর্দিকস্থ শীতল বায়ু সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পরবর্তী পরীক্ষায় বালুকাপূর্ণ আর-একটি বাস্তুর মধ্যে প্রথম বাস্তুটি স্থাপিত করিয়া কাচ দ্বারা মুখটি আবৃত করিয়া দেন। তিনি একপাত্রে ইহা সংস্থাপিত করেন যে, সূর্য্যবশি লক্ষভাবে আসিয়া পড়িতে পারে। এইপ্রকারে তিনি প্রায় ১২০° ডিগ্রি তাপ প্রাপ্ত হন। জল ১০০° ডিগ্রি তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং এই যন্ত্রেব সাহায্যে তিনি মাংস ইত্যাদি রন্ধন করিতেন ও অনেক সময় এইরূপে প্রস্তুত খাদ্য জব্যাদি বন্ধুবান্ধবগণকে বিতরণ করিতেন।

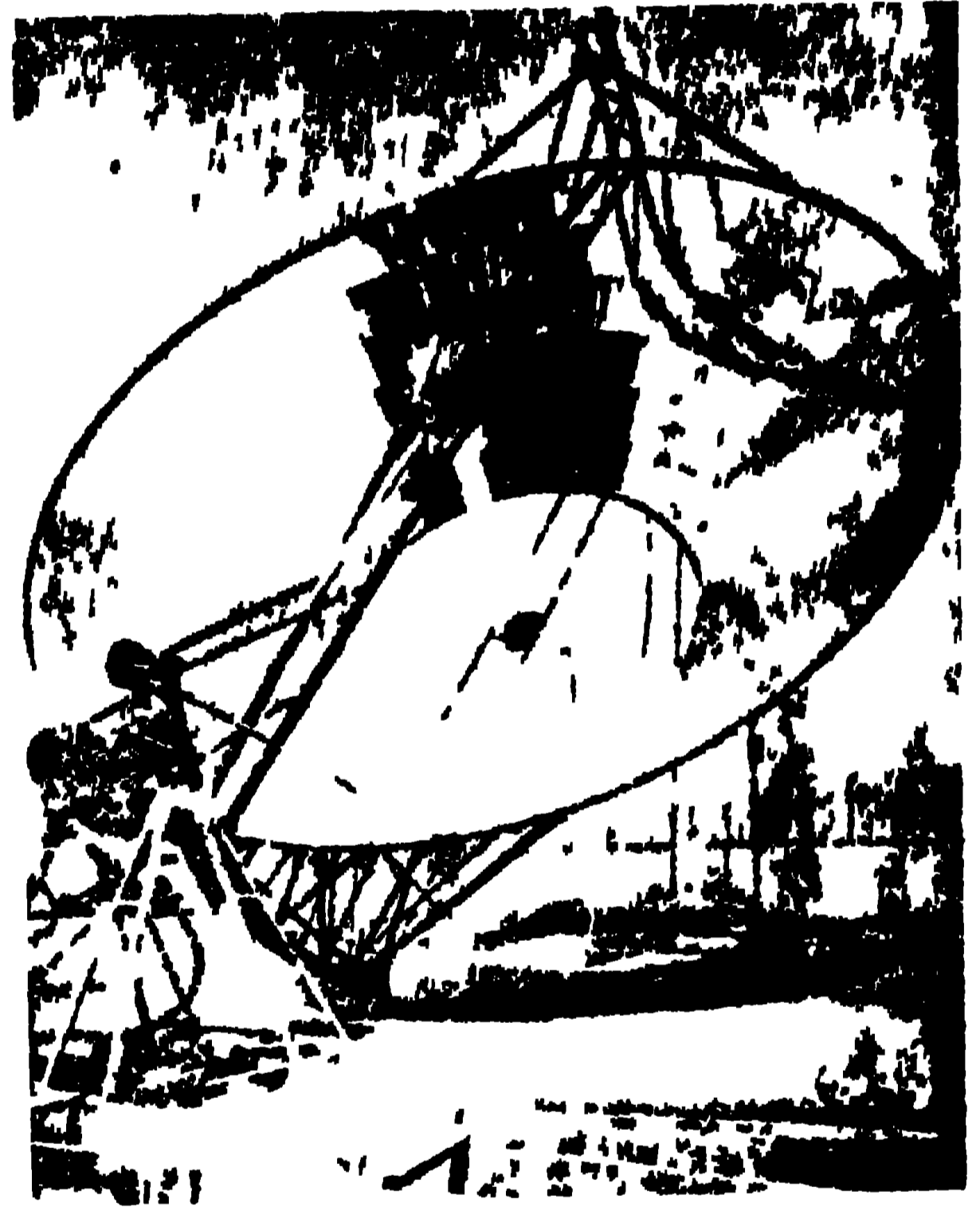
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুশো (Mouchot) সর্বপ্রথম একটি উল্লেখযোগ্য সৌর-ইঞ্জিন প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রে তাম্র-নির্মিত একটি প্রতিফলক ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রতিফলকের অভ্যন্তরগত বোঁপা পাত দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া তাম্রনির্মিত বৃত্তাকার (cylindrical) একটি বয়লারেব (boiler) উপবেষ্টিভূত হইয়া পতিত হইত। বয়লাবেব বিভিন্ন অংশে ঘোঁড়ার কৃষ্ণবর্ণে বঞ্জিত ছিল। বয়লাবেব মধ্যস্থ জল ক্রমাগত উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইত ও এই বাষ্পেব সাহায্যে ইঞ্জিন চলিত। প্রতিফলকটিতে বাহ্যতে সর্বদা সৌরবশি লক্ষভাবে আসিয়া পড়ে, তাহাব ব্যবস্থা ছিল।

ইহাব পর এ'ব'সন্ (Lissou) প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও ইহাব উৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ হন। অবশেষে তিনি আব একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাহাব প্রতিফলকটি বৃত্তাকার চাপাকৃতি ও মুশোব যন্ত্র হইতে স্তম্ভাক্রমণে ইহাব কিছু বিচলিত ছিল। এই গবেষণা-কাষে তিনি নিজে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অবশেষে তিনি বলেন যে, সূর্য্য আলো বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও ইহা হইতে তাপ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট ব্যয় হয়, তাহা বয়লা ব্যবহার করিয়া ব্যয়েব তুলনায় অনেক অধিক।

ইংরেজদের মধ্যে কেবলমাত্র বোম্বাই হাইকোর্টেব ডেপুটি বেজিস্ট্রার উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্ (William Adams) সূর্য্যতাপ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত পরীক্ষা-কার্য বোম্বাই-নগরেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

তিনি অনেক পরীক্ষার পর স্থির করেন যে খাত্ত-নির্মিত প্রতিফলক অপেক্ষা কাচের আয়না অধিকতর উপযোগী। কাচের আয়নাকে প্রতিফলকরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রেব সাহায্যে তিনি দ্বিতলে জল উত্তোলন করিতেন। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া তিনি এই যন্ত্র নগরবাসীদিগকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

তাঁহাব নির্মিত সৌরতাপ কুকারে (solar cooker) ইকমিক কুকারেব ত্রায় সহজে ও শীঘ্র পাক করা যাইত,



পাসাদনার সৌরতাপ সংগ্রাহক যন্ত্র।

অবশ্য কয়লা বা টেনেব প্রয়োজন হইত না। তাম্রনির্মিত নলাক ও পাত্রের মধ্যে পানাদ্রব্য রাখা হইত। পাত্রটি একটি অষ্টকোণাকৃতি (octagonal) কাচখণ্ড দ্বারা আবৃত ছিল। পাত্রের কাচখণ্ড দ্বারা নির্মিত হইত ও ইহাব আকার পিবামিডেব ত্রায় ছিল। খাদ্য-দ্রব্য অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি ইহাব সাহায্যে অনেক-প্রকার খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই কুকারে মাংস রোস্ট করা যাইত। রোস্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে পান



ট্যাকোনির শুমান সূর্যাতাপসংগ্রাহক কৃষ্ণানার পশ্চিমাংশের সাধারণ দৃশ্য (১১১)

চর্কিব (animal lat) বিষদংশ বিউটারিফ অ্যাসিড নামক জ্বাবকে পবিণত হয় ও উহা ভক্ষণে অল্পযুক্ত হইয়া পড়ে। পবে দেখা যায় যে যদি প্রাতফলক ও চর্কিবর মধ্যে লোহিত বা হরিদ্রা বর্ণেব কাচখণ্ড সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে এই জ্বাবক উৎপন্ন হয় না, মাংসও স্থানান্তরে পবিণত হয়।

অ্যাডাম্‌স্ ইঞ্জিনিয়ার বা পদার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন না, এইজন্য তাঁহার এই আবিষ্কার আতশয় প্রশংসাহ। তিনি সৌরশক্তিব উপযুক্ত প্রয়োগ-(utilization of solar energy) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বোসাইয়েব সাসুন ইনস্টিটিউট হইতে (Sassoan Instituce) স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবেল পিফ্রে (Abel Pifre) তাঁহার সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনেব সাহায্যে একটি মুদ্রায়ন্ত্র (printing press) পবিচালিত করিতেন। ইহাব প্রতিফলকের আকার অল্পবৃত্তের স্তায় (parabolic ছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জেমস হার্ডিং (James Harding) সৌরশক্তির সাহায্যে পবিস্কৃত জল (distilled water) প্রস্তুত কবিবার এক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র মন্দির আমেরিকাব চিলি দেশে সালিনাস (Salinus) নামক স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে চারি হাজার তিনশত ফুট উচ্চে

অবস্থিত ছিল। এই যন্ত্র প্রত্যহ পাঁচ হাজার গ্যালন পবিস্কৃত জল প্রস্তুত হইত। প্রতি গ্যালন জল প্রস্তুত কবিবার ব্যয় দুই পয়সা অপেক্ষাও অল্প পড়িত। ইহা হইতেই বুঝিতে পাওয়া যায় যন্ত্রটি বিরূপ কাব্যকাব্যী ছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে যুক্তবাহ্যের(United States) বোস্টন (Boston) নগরের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে পাসাডেনা নামক (Pasadena) এক সৌরশক্তি-আহরণকারী যন্ত্র (sun power plant) নির্মিত হয়। ইহার প্রতিফলকের আকৃতি মাথা কাটা কলার মোচার স্তায় (truncated conc) ছিল। প্রথম পার্শ্বের ব্যাসের পরিমাণ তেত্রিশ ফুট ও অপর পার্শ্বের ব্যাসের পরিমাণ পনেরো ফুট করা হইয়াছিল। এই যন্ত্রের বয়লাবেব মধ্যে একশত গ্যালন জল ও আট ঘনবর্গ ফুট বাষ্প থাকিবার স্থান ছিল। এই যন্ত্রে প্রত্যহ চৌদ্দশত গ্যালন জল প্রতি-মিনিটে ১২ ফুট উচ্চে চালিত হইত। ইহা নির্মাণ কবিতে পনেরো হাজার টাকা লাগিয়াছিল ও ইহা তৎকালীন সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল।

ফ্র্যাঙ্ক শুমান (Frank Shuman) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই কার্যে অগ্রসর হন। তিনি বৃহত্তর প্রতিফলক নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত প্রথম যন্ত্র বয়লার-মধ্যস্থ জলের মধ্যে সমান্তরালভাবে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণের অনেকগুলি নল



মিরাডির শুমান বয়েজ কার্গানার দক্ষিণ দিক্ হইতে সাধারণ দৃশ্য (১৯১১)

(pipe) ছিল। নলগুলি ইথারে (Di-ethyl ether) পরিপূর্ণ থাকিত। সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া জলে পড়িলে জল উত্তপ্ত হইত ও জলের উত্তাপে ইথার বাষ্পে পরিণত হইত। ইথার-বাষ্পের সাহায্যে এই যন্ত্রের ইঞ্জিন চালিত হইত। শুমান এইরূপ তিনটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার তৃতীয় যন্ত্রটি তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) নগরের উপকণ্ঠে ট্যাকোনি (Tacony) নামক স্থানে স্থাপিত করেন।

এই সময় সৌরতাপ দ্বারা যন্ত্র পরিচালনের জন্য Sun Power Company নামক একটি যৌথ সমবায় স্থাপিত হয়। শুমান, অধ্যাপক বয়েজ্ (Professor C. V. Boys, F.R. S.) ও প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণ সমবেত হইয়া কোম্পানির টাকায় একটি যন্ত্র মিশর দেশে কায়রো (Cairo) নগরীর সাত মাইল দক্ষিণে নীল নদের তীরস্থ মিরাডি (Meadi) নামক স্থানে সংস্থাপিত করেন। ষড়-গুলি যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

অবশ্য এইসঙ্গে বলা আবশ্যিক যে সৌরশক্তির সকল অংশ আমরা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারি না। কয়লার দ্বারা চালিত ইঞ্জিনেও শক্তির অতিশয় অপচয় হয়। কয়লার মধ্যে যে-শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই তাহা তাপালোকে পরিণত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। কয়ের সময় বোনো আনা শক্তিকেই যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের লাভ হয়, কিন্তু

অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্রেও কয়লা পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি না। অধিকাংশই বৃথা তাপালোকে উৎপন্ন করিয়া এবং পার্থক্যে জলবায়ুকে অনাবশ্যক গরম করিয়া নষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে এই অপব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ। এ-অপচয় বড় অল্প নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণায় কয়লা পোড়াইয়া তাহার অধিকাংশ শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে যে কতকগুলি অনাবশ্যক বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়। এইসব বাষ্পকে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে কলে পোড়াইবার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে গ্যাস-ইঞ্জিনে শতকরা ২৫'৫ ভাগ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। ডিসেলের তৈলচালিত ইঞ্জিনে (Diesel's oil engine) শতকরা ৩১ ভাগ শক্তি কাজে লাগে, কিন্তু শুমান ও বয়েজের প্রস্তুত যন্ত্রে মাত্র শতকরা ৪'৩২ অংশ সৌর-শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। তবে ইহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। কালক্রমে আরও উৎকৃষ্ট সৌর ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে ও কয়লা যতই দুপ্রাপ্য হইবে, উৎকৃষ্ট সৌর ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও তত বর্ধিত হইবে।

যেখানে কয়লার মূল্য অতিশয় অধিক সেখানে সৌর-তাপ চালিত সূত্র ইঞ্জিন দ্বারা জল সেচন করা যাইতে



মিদাডির স্তম্ভ-বয়েজ কারখানার উত্তর দিক হইতে
একঅংশের দৃশ্য [১৯১৩]

পারে। যেখানে কয়লা ছুপ্রাপ্য, বৃষ্টির অভাব ও রৌদ্রের তাপ খুব বেশী, তথায় এইরূপ যন্ত্র অতিশয় কার্যকারী হইবে।

সূর্যের তাপই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাণ্ডারকে পূর্ণ

করিয়া রাখে। যে-কয়লা পোড়াইয়া আমরা বাষ্পযন্ত্র বা বিদ্যুতের যন্ত্র চালাইতেছি তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উদ্ভিদ আবার প্রাচীন যুগে সেই শক্তি সূর্য্যতাপ হইতে আহরণ করিয়া সঞ্চিত রাখিয়াছিল। কাজেই কয়লার শক্তিকে সৌরশক্তির রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপ্রপাতকে শূন্যলিত করিয়া আজকাল নানা কাজ করিয়া লওয়া হইতেছে, অল্পসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের শক্তি সৌর শক্তির রূপান্তর মাত্র। পর্তুগীজের জলের সঞ্চয় সূর্য্যতাপের কাজ। জলই সেই সৌরশক্তিকে বন্ধে ধরিয়া রাখে এবং তাহার পরে নীচে নামিবার সময় তাহার বিকাশ দেখায়।

এই বিরাট বিশ্বের শক্তির উৎসের সন্ধান করিলে জলে, স্থলে, নভোনীলে সর্বত্র সৌরশক্তিই লীলা দোখতে পাওয়া যায়।

নীড় ও আকাশ

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

ছক্কহ দূরের লোভে সামান্ত যা তা'রে
সামান্ত দেখো না যেন অভ্যাস-বিকারে।
মাটির মাছুষ মোরা যেখানেই যাই
ফিরে-ফিরে মাটিতেই নিতে হবে ঠাই
শূন্যে-শূন্যে ঘুরে শেষে; ধরণীর বুকে
রচিয়া নিতেই হবে নানা ছুখে-সুখে

আপন শক্তির নীড়; তুচ্ছ বলি যারে,
ছোটোখাটো বাহা-কিছু নিত্য রহে যারে
সহজে হাতের কাছে,—পথে-যেতে দেখা
অচেনা বনের ফুল, স্বর্ণময় লেখা
সাম্রাজ্য-গগনকোণে, বিহঙ্গের গান,
শিশুর সরল হাসি—এতে যদি প্রাণ
আপন আশ্রয় লভে, আছে তা'র পরে
অনন্ত অঘর পক্ষ মেলিবার তরে।

হরিৎদীপে

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১

চোল, কাশী, বাণী বেজে উঠল—কাড়া, নাকাড়া, দামায়া করতাল ডিম্ ডিম্ দম্ দম্ বম্ বম্ ক'রে উঠল—নবৎ-খানার সানাইয়ের গলা চি'রে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে এল—কি হয়েছে!—কি হয়েছে! হয়েছে? ছয়োরাণীর এক ছেলে হয়েছে আর ছয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে।

প্রকাণ্ড রাজা। সাত গাঁ নিয়ে তাঁর রাজপুরী। সাত রাজ্য নিয়ে তাঁর প্রজা। সাত সমুদ্র নিয়ে তাঁর শাসন। রাজার অভাব কি? হাতীশালে হাতী—ঘোড়াশালে ঘোড়া—ভাণ্ডার ভরা ধন, রাজ্য-ভরা প্রজা, দেশ-বিদেশে আধিপত্য। কিন্তু রাজার মনে স্থখ নেই। রাজার ছই রাণী। ছ'রাণীর যে কারোই ছেলেপুলে হয় না।

রাজার মনে স্থখ নেই—সাত রাজ্যের প্রজার মুখে হাসি নেই। রাজার রাজ্যে ফুলের গাছে ফুল ধরে না, কলের গাছে কল ধরে না, জোছনার গায়ে পুলক লাগে না—কোকিল ডাকে না, পাপিয়া গায় না, দোয়েল শীস দেয় না—রাজার ছুখে সব স্মিয়মাণ। রাজার সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই। ছ'রাণী—ছ'রাণীর কারোই সন্তান হয় না।

এমনি ক'রেই দিন যায় মাস যায়—কত বছর যায়—একদিন যে ভোর হ'তে না হ'তেই রাজার রাজ্যে কোকিল দোয়েল সব ডেকে উঠল, শারী, শুক, ভায়া শীস দিবে উঠল—রাজার বাগানে কত বছর ধ'রে একটি ফুল ফোটে না, একটি কলি ধরে না, সেদিন মল্লিকা, মালতী, জাতি ফুলী, বকুল, পাকুল, শেফালি, চামেলি, গছরাজ দিকে-দিকে সৌরভ ছুটিয়ে ভেগে উঠল—কোথা থেকে লক্ষ-লক্ষ মৌমাছি এসে গুঞ্জন ডুললে।

রাজার খুব ভাতভে-না-ভাতভেই সে পাখীর ডাক, ফুলের সৌরভ, মৌমাছির পুলক গুঞ্জন রাজার শরনকক্ষে গিয়ে পৌছল।

রাজা সিংহাসনে এসে বসলেন—পাত্র-মিত্র, অমাত্য সভাসদেরা এসে রাজাকে ঘিরে দাঁড়াল। ঘোবারিকেরা সেদিন অভিবাচন করতে তুলে গেল, বন্দীরা সেদিন আর রাজার গুণগান করতে সাহস পেলে না। সবার মুখেই বিশ্বয়, সবার মুখেই আশা-আশঙ্কার ঘন্থ। সবারই আশা-উষেগ-আকুল দৃষ্টি রাজার মুখের উপর স্থাপিত। রাজা গভীরকণ্ঠে মন্ত্রীকে সোধোদন ক'রে বসলেন—“মন্ত্রী এ আজ কি হ'ল? স্বরাজহীন রাজ্যে এ আজ কোন্ সৌভাগ্যের স্মৃচনা? কোন আনন্দের আমন্ত্রণ?”

মন্ত্রীর রাজকার্য্য করতে-করতে চুল পেকে গেছে। দেশবিদেশের রাজ-দূতদের কাছ থেকে কত-কত গল্প শুনেছেন—কত-কত আশ্চর্য্য ব্যাপারের ইতিহাসকাহিনী শ্রবণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির এমন খামখেয়ালী ও খোস-খেজাজী আজগবি কাণ্ড কোনো দিন দেখেনওনি কারো কাছ থেকে শোনেওনি। মন্ত্রী আর কি উত্তর দেবেন! একেবারে চূপ ক'রে রইলেন। জীবনে এই প্রথম বার মন্ত্রী রাজার প্রশ্নে নিরুত্তর রইলেন।

সারা শরীরে আসোয়াস্তি নিয়ে নীচুপানে চেয়ে মন্ত্রী দাঁড়িয়েই রইলেন—সভাসদেরা দাঁড়িয়ে রইল—সমস্ত সভা-মণ্ডপটা যেন নির্ঝাঁকু-নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময়ে সভাগৃহের বাহিরে একটা চাকল্যের আভাস ভেগে উঠল—ঘোবারিক-মহল থেকে যেন একটা অক্ষুট গুঞ্জন ভেসে উঠল—রাজসভার চক্ষু বিজ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে সভামণ্ডপের প্রবেশদ্বারে নিবন্ধ হ'ল।

দেখতে-দেখতে দ্বারের পর্দা সরিয়ে দ্বারে-ঝুলোনো পুষ্পমালায়ালি বিধা বিভক্ত ক'রে এক সন্ন্যাসী সভাগৃহে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করলেন।

সন্ন্যাসীর উন্নত দীর্ঘ দেহ—মাথায় নিবিড় অটালটাল-ভার—পরনে গৈরিক কৌপীন—সর্ব অঙ্গে ভয়ের গুণ-ধূসর অবলম্ব।

সন্ন্যাসী কোনো দিকে না তাকিয়ে একেবারে সরাসর গিয়ে রাজসিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হস্তে একটি অ-দৃষ্টপূর্ব ফল।

সন্ন্যাসী রাজাকে লক্ষ্য করে ফলটি তুলে ধরলেন—
বললেন—“মহারাজ, এই ফলটি বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন আপনায় ছুরাণীকে খাওয়াবেন, তবেই তা’রা সন্তানবতী হবে।”

রাজা যম্ভচালিত পুতুলের মতো সন্ন্যাসীর হাত থেকে ফলটি গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাসী তখন ষে-পথে এসেছিলেন সেই পথে আবার সভাগৃহ থেকে নিজাস্ত হলেন।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে যাবামাত্র রাজার চমক ভাঙল, সভাসদদের চমক ভাঙল, সমস্ত সভাগৃহটা ঘেন সজীব হ’য়ে উঠল। কে এ সন্ন্যাসী? কে এ সন্ন্যাসী? তাঁকে যে ধন্ববাদ দেওয়া হয়নি, সম্মান করা হয়নি, পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হয়নি! রাজা ব্যস্তকণ্ঠে ডাকলেন—“দৌবারিক, দৌবারিক।”

অন্তে এসে দৌবারিক রাজসিংহাসনের কাছে উন্নত বেহ নত ক’রে দাঁড়াল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—“সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?”

দৌবারিক ছুই নেড়ে কণমাত্র বিশ্বয়ের আভাস প্রকাশ ক’রে স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলে—“মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসীকে সভাগৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি, কিন্তু কেউ-ই সেখান থেকে তাঁকে নিজাস্ত হ’তে দেখিনি।”

চারিদিকে যুহু গুণধ্বনি উঠল—রাজা মন্ত্রীর দিকে বিশ্বদৃষ্টিতে চাইলেন। মন্ত্রী বললেন—“মহারাজ, দৈব-ফলের দৈব-বাণীর সম্মান রক্ষা করুন। ঐ ফলটি আপনায় ছ’মহিষীকে উপহার দিন।”

রাজা ফলটি বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন ছ’রাণীকে খাওয়ালেন।

তা’র পর দিনে-দিনে দিন যায়, মাস যায়, দশমাস যায় একদিন শেষরজনীতে—টোল, কাশী, বাশী বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া দামামা করতাল ডিম্ ডিম্ দম্ দম্ বম্ বম্ ক’রে উঠল নবংখানার সানাইয়ের গলা চিরে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে এল—কি হয়েছে! কি হয়েছে! কি হয়েছে? ছ’রাণীর সন্তান হয়েছে—ছুরোরাণীর এক ছেলে হয়েছে—আর ছুরোরাণীর এক মেয়ে হয়েছে।

রজনীর শেষ যায়। তখন একটিও কাক তাকেনি পূব পগনে একটি রেখাও শুভতা ধারণ করেনি। আতুড় ঘরে একদিকে একটি প্রদীপ—মারখানে একটা অগ্নিকুণ্ড—পালকে অট্টেত্ত্র ছুরোরাণী—দাই অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব’সে সদ্যোজাত শিশুকে তাপ দিচ্ছে।

অট্টেত্ত্র ছুরোরাণী চৈতন্ত লাভ ক’রে জেগে উঠলেন। তা’র পর কীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—“দাই কি ত’ল?”

দাই বললে—“রাণী-মা, মেয়ে হয়েছে—আঃ, কি তা’র টানা-টানা কালো চোখ—চাঁপা ফুলের মতো—”

এক কোপে ধহুকের ছিলেটা কেটে দিলে ধহুক যেমন চট্ ক’রে সোজা হ’য়ে যায় তেমনি ক’রে ছুরোরাণী পালকে উঠে বসলেন—চোখ-ছুরোরাণী আশুন জেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—“আর ছুরোরাণীর?”

“ছুরোরাণীর হয়েছে এক ছেলে।”

ছুরোরাণী পালক থেকে উঠে নেমে দাঁড়ালেন। কোথায় গেল তাঁর দুর্ভলতা? এক মুহূর্তে তাঁর দেহ, মন, প্রাণ থেকে আলস্ত, জড়তা, দুর্ভলতা সব কোথায় অন্তহিত হ’য়ে গেল। ছুরোরাণী দাইকে বললে...“দাই, মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে দুর্জনকে ডেকে আন।”

দুর্জন ছুরোরাণীর বাপের বাড়ীর চাকর। ছেলেবেলা থেকে তা’কে কোলেপিঠে ক’রে মালুস করেছে। তা’র পর ধীরে-ধীরে রাজকত্তা বাড়তে লাগলেন...তা’র পর রাজকত্তা রাজরাণী হলেন...নিজের রাজ্য ছেড়ে স্বামীর রাজ্যে এলেন—দুর্জনও সেই সঙ্গে-সঙ্গে নতুন রাজ্যে এসে ছুরোরাণীর বিশ্বস্ত চাকর ব’লে পরিচিত হ’ল।

দাই ছুরোরাণীর কোলে মেয়েকে দিয়ে দুর্জনকে দেউড়ি থেকে ডেকে আনতে গেল। ছুরোরাণী ডাকছে, দুর্জন তৎক্ষণাৎ তা’র কাঁধে একষটি বছর বয়েসের ও জীবনভরা যত স্বকাজ-স্বকাজের বোঝা নিয়ে এসে দাঁড়াল—বললে, “মা আমার ডেকেছিলি?”

ছুরোরাণী বললে, “দুর্জন, ছুরোরাণীর এক ছেলে হয়েছে আর আমার হয়েছে এক মেয়ে। ছুরোরাণীর ছেলেকে অপর্ণার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে, আর তা’র আরগায় একটা-কোনো আনোয়ারের বাচ্চাটাছা রেখে দে। রাজা ঘেন ভোর হ’লে এসে দেখেন আমার হয়েছে

স্নান-হেলে আর ছয়রাণীর হয়েছে পতির বাচ্চা।
ছয়রাণী তাঁর গলা থেকে বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত রত্ন-
হার খুলে ছুঁকনের হাতে দিলেন।

সেইদিনই রাজার পুত্রশালার একটি বানরী বাচ্চা
পেড়েছিল। সেই বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ছুঁকন
ছয়রাণীর আঁতুড় ঘরে এল। ছয়রাণী তখনও অচৈতন্য।
ছুঁকন দাইয়ের হাতে মুক্তামালা ও বানরীর বাচ্চাটা দিয়ে
রাজপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তা'র পর তা'কে একটা
কাঠের সিন্দুকে পু'রে অপর্ণার তীরে এসে হাজির।
অপর্ণার পরপারে তাল-সুপুড়ীর বোপের আড়ে চাঁদ ঢ'লে
পড়েছিল—আকাশের তারাগুলো ম্লান হ'য়ে উঠেছে। ছুঁকন
সিন্দুকটা মাথায় নিয়ে নদীতে নামল—গলা জলে গিয়ে
অপর্ণার ধরস্রোতে সন্তোজাত রাজপুত্রকে ভাসিয়ে দিলে।

তা'র পরদিন সারা রাজপুরী আনন্দ-কোলাহলে
মুগ্ধরিত হ'য়ে উঠল। চারিদিকে আহ্লাদ, চারিদিকে
আনন্দ। প্রকাণ্ড রাজপুরীতে আসল ধবর আর কে পায় ?
সারা স্থানে র'টে গেল ছ'রাণীর সন্তান হয়েছে। রাজা
ভোরে উঠে ছ'রাণীকেই দেখতে গেলেন। দেখলেন
ছয়রাণীর এক মেয়ে হয়েছে আর ছয়রাণীর হয়েছে
এক বানরের বাচ্চা। বানরের বাচ্চা দেখে রাজা
একেবারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। এত-বড় রাজ্য, তা'র এত-
বড় রাজা, তা'রই রাণী কিনা প্রসব করলে বানরের বাচ্চা !
তৎক্ষণাৎ রাজা কোতোয়ালকে ডেকে হুকুম দিলেন—
“কোতোয়াল ছয়রাণী আর তা'র বানরের বাচ্চাকে
আমার রাজ্য-ছাড়া ক'রে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।”
কোতোয়াল, রাজার আদেশ-মতো ছয়রাণী ও বানরের
বাচ্চাকে বনবাস দিয়ে এল। ছয়রাণীর ক্রুর মুখে
আহ্লাদের হাসি ছু'টে উঠল।

২

ধরস্রোতা অপর্ণা ছু'টে চলেছে উদ্যম অদম্য রণ-
ভুরভয়ের মতো। তা'রই মধ্যে আবার তা'র কত স্নেহ,
কত করুণা, পৃথিবীর গায়ে-গায়ে তা'র কি আদর স্পর্শ।
সেই আদর স্পর্শে-স্পর্শে অপর্ণার ছু'তীর কি শ্রামল হ'য়ে
উঠেছে—বৃহৎ-বৃহৎ বটে কি শীতল কি মনোরম ছায়া
বিছিয়েছে—বত হ্রু হ্রুটি চলে—যেন সারা বিশ্ব শ্রামলিমা

দিয়ে মুড়ে-দেওয়া পৃথিবীতে এত আদর ক'রেও কিন্তু
অপর্ণার অন্তরের স্রুতের ডাক ধামেনি। অপর্ণার স্নে-
ডাক বুঝি চিরন্তনের—সারাবিশ্বের প্রতি—অপর্ণা যেন
ডাকছে।

আরও বেখার অনেক ব'লে শোনবে আমি কি পাই পান,
কোন্ কাহিনী কোন্ বপনে ব্যাপ্ত রে বোর স্বয়ংপ্রাণ,
অধীর আমার বুকটি নিয়ে
কোন্ বরণের মধু পিরে
চল্ছি ছুটি দিবসরাতি বধ দেখি কি মহান্।

শোনবে ওরে কান পাতিয়া হরটি আমার কি পান পান,
সঙ্গে আমার কে বাবিরে আরও তোরা আরও আর ;

রাখিস্ না আর কুলের মারা,
লুটিয়ে দেবে জীবনকারা,
ভাসিয়ে দেবে অকুল স্রোতে কুণ্ড সকল বাসনার।

কুলের মারা করিস্ কে রে ? অকুলে কার মাইরে টান
এই অকুলেই সত্য বত বৃহৎ বত মিলবে দান ;

একটুখানি আশার ভাবা,
একটু কান্দা, একটু হাসা,
কুলের-দেওয়া অঁকড়ে-ধরা একটা শুধু দিনের প্রাণ।

কুলের মাটি অঁকড়ে ধ'রে অস্তিনে স্থখ মিলবে না,
পাঁখন যদি অঁকড়ে থাকিস্ থলুবে না তা থলুবে না,
আমার মতো সকল ছাড়ি
দীর্ঘ পথের দীর্ঘ পাড়ি
ধরতে হবে নইলে কতু বাহিত রে টলুবে না।

আরও ওরে নরনারী, ওরে কুলের মানুসল,
আরও ছুটে কেলিসনে আর কুলে-কুলে অঁধির জল,
একটি নিমেষ সাহস করি'
মধুর বপন বকে ধরি'
অকুল আমার শীতল স্রোতে বঁাপ দিয়ে দেখ স্বয়ং-ভল।

থাকবি কি রে বধির চির শুন্বি না কি এ-আহ্বান ?
এই স্রোতে হ্রু মিলারে পাইবি না কি পাইবি পান ?
দীপ্তরে ঐ পগনভলে
থাকবি তোরা কিসের ছলে
অন্ধকারে কিসের ভরে চাকবি তোদের জীবনখান ?

আরও আমি নেবো তোদের বেখার ভগনচক্রে রে,
উঠ ছে রোজই ডুব'ছে রোজই শু'বে সাগরমন্ত্র রে,
হ্রু বেখার সাক্ষিহীন
জীবন-বোলা নয় বেখা দীন,
বাজার বেখা আনন্দ-বীণ্ প্রতি অপুর রত্ন রে।
আরও আমি নেবো তোদের বেখার কোটি তারার জাল,
দৃপ্ত মোহে দীপ্ত করে শুক অসীম আকাশ-ভাল,
মুক্তি বেখা মরুরে বীণা,
জীবন বেখা মরুরে কীনা,
বিখ্যা বেখার স্তম্ভন-নায়ে মরণ কিবা মহাকাল

এমনি অপর্ণা তারি জলে সন্ধ্যাজাত রাজপুত্রকে নিয়ে কাঠের সিন্দুক ভেসে চলল। তা'র পর সে-সিন্দুক নদী বেয়ে কত নগর-নগরী, কত পল্লী-প্রাস্তর, কত বন-পর্বত, অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। তা'র পর সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এক দ্বীপে গিয়ে লাগল। সেই দ্বীপের এক জেলে পরদিন মাছ ধরতে এসে দেখে চড়ায় এক সিন্দুক প'ড়ে আছে। সিন্দুক খুলে যখন দেখলে এক রাজপুত্রের মতো শিশু তখন জেলের অন্তরে বিশ্বয় ও আনন্দের একটা দারুণ তুফান উঠল। জেলে সেই শিশুকে বুকে ক'রে বাড়ী ফিরল। সেদিন আর মাছধরা হ'ল না। তা'র পর মহা আনন্দে জেলে-জেলে নী সেই শিশুপুত্র মাহুষ করিতে লাগল। জেলে-জেলে নী নিঃসন্তান। রাজপুত্র জেলের দ্বারে জেলে জেলে নীর স্নেহে ও আদরে দিন-দিন শশিকলার স্তায় বাড়তে লাগল। জেলে-জেলে নী ভাবে—কোন্ দেবতার আশীর্বাদ তাদের ঘরে সন্তান-রূপে উদয় হয়েছে। এ সন্তান জালও টানবে না, দাঁড়ও ধরবে না, কিন্তু অতুল আনন্দ বিতরণ করবে।

৩

দেখতে-দেখতে আঠারটি বছর কেটে গেল।

এখন ধীবর-পল্লীতে সুর বিছিয়ে সময় নেই অসময় নেই বাশীর সুর বেজে ওঠে—কখনও কাছে, কখনও দূরে—কখনও সুরের কখনও ছঃখের—কখনও বাশীর সুরে আকাশে-বাতাসে হাসির ঢেউ তুলে যায়, আবার কখনও তা'র করুণ রাগিনী, জল, স্থল, কানন, বাস্তায় কি-একটা অশ্রুভেজা কাহিনীর আভাস দিয়ে ভ'রে দেয়! এ বাশীর সুর জলে-ভাসিয়ে-দেওয়া রাজপুত্রের। এই ধীবরপল্লীর সঙ্গে যে রাজপুত্রের কোনোখানেই মিল নেই, তা'রই গাথা বাশীর সাতটা রঙ্গপথে সাতটা সুরের সাথে বেজে ওঠে। সন্ধ্যাকালের আবছায়াতে যখন সাগরবুকের উচ্ছল কলরোল ধীরে-ধীরে যুহু হ'য়ে আসে—যখন তা'র বুকের ধ্বংসের মন্ত্র ধীরে-ধীরে ঘুমপাড়ানী গানের সুরের মতো সোহাগ-কোমল মোলায়েম হ'য়ে আসে, তখন নিবিড় বিজন সাগর-সৈকতে রাজপুত্রের বাশীর বুক চি'রে কেবলই কিরে-কিরে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে—কোথায় ? কোথায় ?—

“বুকের মাঝে যে-একটি মন্ত শিশু নৃত্য করছে—সে-নৃত্যের ছন্দ ত ধীবর-পল্লীর কোনোখানেই মিল খুঁজে পায় না—এ-নৃত্যের ছন্দের মিল মিলবে—সে কোথায় ? কোথায় ?...”

“এই যে বুকের মাঝে একটা বেদনা দিন-দিন কেবল যেতেই চলেছে—এধীবর-পল্লীর কোনো স্থখছঃখই ত তা'কে আপনার ক'রে ধরতে পারছে না—এ-বেদনার বিরতি হবে—সে কোথায় ? কোথায় ?...”

“এই যে প্রাণের তারে একটা সুর বাজে কখনও কোমল, কখনও উদাম, কখনও বিশ্ব আপনাকে বিলিয়ে দিতে চায়, কখনও বিশ্বকে আপনার মুঠোর মধ্যে ছুঁবিবার-ভাবে ধরতে চায়, এ ধীবর-পল্লীর সহজ-জীবন যাত্রার মধ্যে সে সুর ত কোনোখানেই আপনার সহজ স্থান খুঁজে পায় না—কবে এ সুরের বিজয়-মাল্য মিলবে—সে কোথায় ? কোথায় ?...”

এমনি ক'রে বাশীর সুরের পর্দা রাজপুত্রের চারিদিক ঘি'রে রাজপুত্রকে ধীবর-জীবনের ক্ষুদ্র স্থখ, ক্ষুদ্র মর্ম থেকে রক্ষা ক'রে-ক'রে চলেছে।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে জ্যোৎস্না-ধারার বান ডেকেছে। সেই জ্যোৎস্নায় সস্তুরণ-শীলা উর্ধ্ববালা-দের লীলায়িত তহু সব চিক্-চিক্ করছে, বেলাভূমে গুল বালুরাশি গুলতর হ'য়ে উঠেছে, ঝাউকুঞ্জে-কুঞ্জে নিবিড়তা নিবিড়তর হ'য়ে উঠেছে। সেদিন বিজন সাগর-সৈকতে বসে রাজপুত্র একমনে বাশী বাজাচ্ছিল। সে বাশীর গান একটা অতৃপ্ত আত্মার ব্যাকুল মর্মবেদনা। এই মর্মবেদনা যেন বাশীর সুরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়ে, সূক্ষ্মতম হ'য়ে আকাশে-বাতাসে আপনার তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাশীর সুর যেন বলছিল—“হে আকাশ, তোমার ঐ অনন্ত পথের পথিক ক'রে আমাকে নিয়ে যাও—এই নিগড়বহু পৃথিবীর কঠোর পাশ থেকে তোমার ঐ অবিরাম স্বপ্ন-শ্রোতের মাঝে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো—মানব-জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—হে বাতাস তোমার সুরের বারতা, তোমার অনির্দেশ্যের মরীচিকা আমার কাছে সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক।” বাশী ঘুরে-ঘুরে কিরে-



ହଂସପୁତ୍ର

ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍ ସି. ଦାଶଙ୍କଦ୍ୱାରା

କଳାକୃତିକାଳୀନ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, କଲିକତା :

কি'রে অনেকক্ষণ বাজল, তা'র পর একটা ক্লান্ত অবসাদের মাঝে তা'র স্বর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। তখন রাজপুত্র হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন ডাকছে—রাজপুত্র, ও রাজপুত্র !”

রাজপুত্র চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলে। দেখলে, বলাভূমে যেখানে তরঙ্গের দল সব এসে-এনে কি'রে যাচ্ছে সেইখানে ছুই কছুইয়ে ভর দিয়ে হাতে চিবুক রেখে অর্ধ-স্নানিত অবস্থায় এক অপকৃপ জীব। তা'র কটি পর্যাস্ত একটি অপকৃপ রূপসী অনাবৃতদেহ কিশোরী। দীর্ঘ নেবিড় কুম্বল, গায়ের রঙ জ্যোৎস্নার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, ছুইটি নিটোল স্থির বক্ষ, পল্লবের মতো ছুটি বাহু, দুইটি চোখে যেন সাগরের মায়া। আর কটি থেকে একটি মৎসপুচ্ছ—তা'র শঙ্করাজি জ্যোৎস্না-কিরণে রূপের মতো চক্-চক্ করছে।

রাজপুত্র আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে—“তুমি কে ?”

“আমি একটি মৎসনারী”

“একটি মৎসনারী ! তোমার নাম কি ?”

মৎসনারী উত্তর করলে—“আমার নাম সাগরিকা।”

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলে—“সাগরিকা, আমাকে রাজপুত্র বললে কেন ?”

সাগরিকা উত্তর করলে—“তুমি যে রাজপুত্রই। হরিৎসীপের রাজা তোমার জনক, বিমাতার হিংসায় তোমার দেশান্তর।”

রাজপুত্র ক্ষণকাল মৌন থেকে ধীরে ধীরে বললে—
বুঝেছি, তাই বুঝি এই ধীবরপল্লীর জীবনের সঙ্গে কিছু-
তই আমার জীবন মিলিয়ে দিতে পারছিলাম না।”

সাগরিকা উত্তর করলে—“সত্যিই তাই।” তা'র পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—“রাজপুত্র, আমি তোমার বাণী শুনছিলাম। জানো কি, তোমার বাণীর কি বলছিল ?”

“কি ?”

“বাণীর স্বর ঘুরে-ঘুরে শুধু এই কথাই বলছিল—
একা-একা—আমি বড় একা।”

রাজপুত্র বললে—“বুঝিনি। কিন্তু এ আকুলতার আমি মানে বুঝতে পারছিলাম। কিছুদিন থেকে আমার

বাণীর বুক চি'রে কেবল এই আকুলতাই ফুটে বেরিয়ে
—কেন ?”

“কারণ—রাজপুত্র তোমার জীবনের কিনারা বসন্ত
দেখা দিয়েছে।”

“সে কি ?”

“অর্থাৎ যৌবন।”

“তাই বা কি ?”

“প্রতিবৎসরে যেমন বসন্ত, প্রতিজীবনে তেমনি
যৌবন।”

“তা'তে কি হয় ?”

“প্রতিবৎসরে যেমন পৃথিবীর আকাশবাতাস এক
নব স্পন্দনে স্পন্দিত হ'য়ে উঠে, প্রতিযৌবনে তেমনি
মানুষের জীবন এক নব স্পন্দনে আকুল হ'য়ে যায়।”

“এর শেষ কি ?”

“পৃথিবীর উচ্ছ্বসিত হৃদয় যেমন সার্থক হ'য়ে ওঠে নব
পল্লবের স্নিগ্ধতা, প্রস্ফুটিত ফুলরাশির বর্ণচ্ছটায়, অলির
শুভ্ররণে, মৌরভের মাদকতায়, নানা অশরীরী স্বরের মুচ্ছ-
নায়, তেমনি মানুষের এই আকুলতারও মুক্তি হয়—”

“কিসে ?”

“প্রেমে।”

“কি এ প্রেম ?”

“এ এক অপূর্ণ রহস্য, কেউ জানে না যে কি। দশ-
খানি মুখের মধ্যে একখানি মুখ, দশজোড়া চোখের মধ্যে
দুখানি চোখ, একটি নাক, দুখানি ঠোঁট, একটি চিবুক, এক-
খানি গ্রীবাভঙ্গি কেন যে একদিন বিশেষ হ'য়ে ওঠে মোহন
হ'য়ে ওঠে, আকাঙ্ক্ষার বিষয় হ'য়ে, ওঠে তা কেউ জানে
না।” তা'র পর একটু থেমে ধীরে-ধীরে বললে—“আর
জানেনা ব'লেই তা মানুষের জীবনে এমন অপূর্ণ রহস্য
সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের দেবতা অঙ্ক। এই অঙ্ক
দেবতার চোখ ফুটিয়ে দিলে প্রেমিক হ'য়ে উঠবে জানী।
প্রণয়ীর চিত্তলোকের কাব্য তখন হ'য়ে উঠবে তা'র মানস
লোকের বিজ্ঞান। এতে মানুষের লাভ বেশী না ক্ষতি
বেশী তা ওজন ক'রে বলা কঠিন।”

ক্ষণকাল মৌন থেকে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলে—“এই
প্রেম কোথায় মিলবে ?”

সাগরিকা উত্তর করলে—“সবখানেই। ধীবরপঞ্জীর কুটী। থেকে রাজপ্রাসাদের কক্ষ পর্যন্ত সবখানেই।”

রাজপুত্র বললে—“তবে এখানে আমার এ আকুলতা কেন?”

সাগরিকা উত্তর দিলে—“রাজপুত্র, তুমি যে রাজপুত্র। তোমার আত্মা ত ধীবরের আত্মা নয়।”

তা’র পর সহসা সাগরিকা জিজ্ঞেস করলে—“রাজপুত্র, আমাদের দেশে যাবে?”

রাজপুত্র বললে—“তোমাদের দেশ? সে কোন্ দেশ?”

“মৎস্যনারীর দেশ।”

“সে কোথায়?”

“সাগরের অতল তলে, যেখানে উর্ধ্ববালারা ঘুমোর, শুক্রিরা মুক্তা ফলার, সূর্যের রশ্মি যেখানে দ্বিগু হ’রে নামে, বড় যেখানে জল-তরঙ্গের আলাপ শুনায়।”

“সেখানে কি আছে?”

“সেখানে আছে ঘর-বাড়ী, রাজা, রাজপ্রাসাদ আর কেবল মৎস্যনারীর দল।”

“আর কি আছে?”

“আর আছে হীরে, পারা, চুনি, অহরত, মোতি, মরকত, পোখবাজ, প্রবাল, শঙ্খ, শুক্রি—”

“স্বখ আছে?”

“না।”

“সুখ আছে?”

“না।”

“হাসি আছে? অশ্রু আছে?”

“না।”

“তবে কি আছে?”

“আছে বিরাট শান্তি।”

“শান্তি নিধে আমি কি করব? আমি বৃদ্ধ নাবৈরাগী, দুর্বল না ক্লান্ত?”

সাগরিকা বললে—“রাজপুত্র, এই ধীবরপঞ্জীর সুখ-সুখ দিয়েই বা তুমি কি করবে? ধীবরজীবনের সুখ-সুখ কোনো দিনই তোমার চিত্ত-ভ’রে ভুলতে পারবে না। ভিতরে-বাহিরে নিঃসঙ্গ হ’য়ে চিরকাল জীবন কাটাতে এইখানে?”

রাজপুত্র উন্নত হ’ল—তা’র পর বললে—“আচ্ছা, যাবো তোমাদের দেশে। কখন?”

“এখ-ই।”

“এখনই?”

“এই মুহূর্তে।”

“আচ্ছা, চলো।”

সাগরিকা বললে—“রাজপুত্র, এস, আমার হাত ধরো।” রাজপুত্র গিয়ে মৎস্যনারীর কমল-দল-সম হস্ত ধারণ করলে। দেখলে, সে-হাত একেবারে তুহিন-শীতল, তা’তে উত্তাপের লেশমাত্র নেই।

ধীরে-ধীরে ছ’জনে জল কেটে অগ্রসর হ’তে লাগল। তা’র পর ধীরে-ধীরে মৎস্যনারী ও রাজপুত্র তরঙ্গের নীচে অদৃশ হ’য়ে গেল।

ধীবরপঞ্জী তখন ঘোর নিদ্রামগ্ন।

৪

সাগরিকার রাজপুত্র মৎস্যনারীর দেশে পৌঁছল।

মৎস্যনারীর দেশ সেদিন মহা চঞ্চলতায় ভ’রে গেল। হাজার-হাজার বৎসরের মৎস্যনারীদের জীবনে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। এই যে রাজপুত্র এর সঙ্গে মৎস্যনারীদের যেন কোথায় একটা মিল আছে, কিন্তু তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মৎস্যনারীদের কাছে রাজপুত্র এমন বহস্যের। ওর মধ্যে একটা আনন্দের দান লুকোনো আছে, আবার যেন কোথায় একটা আশঙ্কা কবুবারও বস্তু আছে।

রাজপুত্র প্রবাল-নির্ধিত রাজপ্রাসাদে রাণীর শতক সহচরীদের মধ্যে বাস করে।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত্রের মধ্যে বা অনির্দিষ্ট, বা অস্পষ্ট ছিল, তা মূর্ত হ’য়ে স্পষ্ট হ’য়ে উঠল। অন্তরের অব্যক্ত আকুলতা পরিষ্কার আকাঙ্ক্ষার মূর্তি ধারণ করলে। চক্কর কূর্ঠা-কাতর দৃষ্টি সাহসী হ’য়ে উঠল। বাইশ বছরের রাজপুত্র পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে জেগে দাঁড়াল। তা’র চোখের গাভে শুদ্ধি-লেখা। স্পর্শে আকর্ষণী শক্তি। আজ তা’র বাণীর স্বর আর অব্যক্ত আকুলতার চারিদিক ভ’রে তোলে না। সে বাণীর স্বর যেন বলে—জানি

তুমি কে—জানি তুমি কি—এস আমার এই বাহুবন্ধনে—
এস—এস—এস হে।

এই সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সহচরীদের মধ্যে একটা হলদুল প'ড়ে গেল। একটা বিশ্বখলা, একটা অশান্তিতে চারিদিক ভ'রে উঠল। সহচরীদের একটানা সহজ শান্তি-ময় জীবন যেন কিসের ভায়ে ভায়াক্রান্ত হ'য়ে উঠল। তা'রা আর ভেমন ক'রে সাগর-তরঙ্গের সঙ্গে লুটোপুটি করে না—সাগরবুকের স্থনীল দোলায় দোল খায় না—কুন্তলজাল বিছিয়ে সূর্য্যরশ্মি ধরে না। দিন যেন আর কাটে না—রাত অতি দীর্ঘ মনে হয়। আর এসবের কারণ ঐ রাজপুত্র—তা'র পরিপূর্ণ উন্নত দেহ—তা'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—তা'র মধ্যকার কে জানে কি! এমন ক'রেও দিন কাটবে না। মৎস্যনারীরা সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে—মৎস্যনারীর দেশ লুপ্ত হ'য়ে যাবে। কি করা যায়? সহচরীরা সব যুক্তি করলে যে রাণীকে গিয়ে সব কথা জানাবে।

তখন দল বেঁধে সহচরীরা ধে-মহলে রাণী থাকেন সেই মহলে গিয়ে হাজির হ'ল।

রাণীর প্রধানা সহচরী সাগরিকা। সহচরীদের একজন ডাকলে—“সাগরিকা! সাগরিকা।”

সাগরিকা তখন পুরুত্বের স্নায়ুর সঙ্গে চিত্তবিচিত্র কড়ি পৈঁথে একটা কুন্তল-শোভা তৈরি করছিল, ডাক শু'নে মহল থেকে বেরিয়ে এল। বললে—“কি লো অতলিকা! তোরা সব দল বেঁধে এখানে কি জন্তে? তোরা আজ বরণসাগরে মাণিক কুড়োতে যাস্নি?”

অতলিকা ভিজেন করলে—“রাণী মা কোথায়?”

“রাণী মা গেল-পূর্ণিমায় কোন্-কোন্ শুভিতে হাতীর অঙ্গ পড়েছে তাই দেখু'ছেন শুভিমন্ডিরে।

“তাকে ডেকে দে।”

“কেন লো, রাণীমাকে কি দরকার?”

“রাজপুত্রের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে।”

অতলিকার কথা শুনে সাগরিকার ছুটি চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেল।

আশ্চর্যের স্বরে বললে—“নালিশ? রাজপুত্রের বিরুদ্ধে? কি নালিশ?”

“রাণীমা এসে বলবে—এখন তাঁকে ডেকে দে।”

সাগরিকা গিয়ে রাণী মন্ডাকান্তাকে ডেকে আনলে।

রাণী এসে বললেন, “কি গো অতলিকা তরনিকা তরনিকা তোদের যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, রাজপুত্রের খবর কি?”

অতলিকা বললে—“রাণীমা, রাজপুত্রের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে।”

“নালিশ? কি নালিশ?”

“ওর ভিতরে একটা দারুণ অমঙ্গল আছে। মৎস্যনারীর দেশ উচ্ছন্ন করবে।”

রাণী আশ্চর্য হ'য়ে বললেন—“সে কি—রাজপুত্র কি করেছে?”

অতলিকা বললে—“একদিন রাজপুত্র আমার চোখে চোখে তাকিয়েছিল—আর আমার বুক পর্যন্ত সমস্ত রক্ত ধীরে-ধীরে উষ্ণ হ'য়ে উঠল—সে কি জালা—সে-অসোয়াস্তি আমার আজ পর্যন্তও ঘোচেনি। রাজপুত্রের দৃষ্টিতে বিব আছে।”

তরনিকা বললে—“আর-একদিন রাজপুত্র আমার একখানি হাত তার মুঠোয় ক'রে ধরেছিল—আর সঙ্গে-সঙ্গে বুক পর্যন্ত সে কি একটা কম্পন—মনে হ'ল যেন দেহের সমস্ত অস্থি একেবারে ভেঙে-চূ'রে যাবে—আজ পর্যন্ত মাঝে-মাঝে আমার বুক তেমনি কাঁপন লাগে—সেই থেকে জীবনে সব বিশ্বাস হ'য়ে উঠেছে—রাজপুত্রের স্পর্শে বিব আছে।”

তরনিকা বললে—“আর একদিন রাজপুত্র এসে আমাকে বললে, ‘তরনিকা শোন, তোকে বাঁশী শোনাই’ এই না বলেই রাজপুত্র বাঁশী বাজাতে লাগল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার কি যে হ'ল—দেহের স্নায়ু সব টনটন করতে লাগল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর-অর করতে লাগল—মনে হ'ল সমস্ত দেহ কোথায় মিলিয়ে যাবে—রাজপুত্রের বাঁশীর সুর বিব ছড়ায়।”

সবাই সম্বরে বললে—“রাজপুত্রের মধ্যে বিব আছে—বিব আছে—ও মৎস্যনারীর দেশ উচ্ছন্ন দেবে।”

তখন রাণী সাগরিকাকে সযোজন ক'রে বললেন—“সাগরিকা তুমি কি বলিস?”

সাগরিকা বললে—“রাজপুত্রের মধ্যে বা আছে সে

বিব নর, বিছাৎ। মাহুবদের রাজ্যে বে-কথা, বে-সুরে, বে-স্পর্শ, যে-দৃষ্টিতে বিছাৎ নেই; সে-কথা, সে-সুর, সে-স্পর্শ, সে-দৃষ্টির কাণাকড়িমাঝ মূল্যও নেই। এই বিছাতেই দেহ দেহকে টানে, প্রাণ প্রাণকে টানে, মন মনকে টানে। শিল্পী, কবি, কন্ঠী, প্রেমিক এদের মধ্যে এই বিছাতেই নানা প্রকাশ। এই বিছাৎই মাহুবের আত্মাকে প্রকাশ করে। এই বিছাৎছাড়া মাহুবের সমাজ একটা জড়পিণ্ড হ'য়ে উঠবে। রাজপুত্রের মধ্যে যা ফুটেছে, সে বিব নর সে হচ্ছে সঞ্জীবনী স্বধা। তবে মাহুবের পক্ষে যা স্বধা, আমাদের মন্ত্র-নারীদের পক্ষে তাই বিব। যে-বিছাৎ মাহুবদের উজ্জল করে, সেই বিছাৎই আবার মন্ত্র-নারীকে পুড়িয়ে দেবে।”

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—“সাগরিকা এ-সব কথা তুই জান্নি কেমন করে?”

সাগরিকা উত্তর করলে—“আমি যে সন্ধ্যারাতে ধীবর-বালায় কালো চোখের নিবিড় দৃষ্টি দেখেছি—জ্যোৎস্না রাতে ধীবর-যুবকের বলিষ্ঠ বাহুঘরের দাঁড়-ফেলা, জাল-টানা দেখেছি—আর দেখেছি—রাজপুত্রের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখায়-রেখায় সুরের রেশ—তার কৃকিত কেশের গুচ্ছে-গুচ্ছে আকাঙ্ক্ষার হিমোল, তা'র চোখের পাতে-পাতে যনিয়ে-আসা নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়া—কিন্তু হায়! তা মৎস্যনারীকে কেবল প্রলুব্ধ করে, কিন্তু প্রবুদ্ধ করে না।”

সাগরিকার কথা শুনে-শুনে রাণী মন্ডাকান্তা ধীরেধীরে গভীর হ'য়ে উঠলেন—কিয়ৎকণ নিস্তব্ধ থেকে তা'র পর বললেন—“আমার রাজ্যে আর রাজপুত্রের স্থান নেই—আমি তা'র নির্কাসনের আদেশ দিলাম হরিৎস্বীপে। হরিৎস্বীপের দক্ষিণ উপকূলে চন্দ্রচূড়গিরির সাহুদেশে যে পঞ্চদারী গুহা আছে, সেইখানে রাজপুত্রের বাসস্থান।”

তখন সাগরিকা বিনীতকণ্ঠে বললে—“রাণীমা, আমার একটি আবেদন আছে।”

“কি?”

“রাজপুত্রের সঙ্গে-সঙ্গে হরিৎস্বীপে আমারও নির্কাসনের আদেশ হোক।”

“সাগরিকার আবেদন শুনে রাণী তা'র নির্ণয়ের দৃষ্টি

সাগরিকার উপর স্থাপিত করলেন। সে-দৃষ্টি সহ করতে না পেরে সাগরিকার মস্তক অবনত হ'য়ে গেল। তা'র পর রাণী বললেন—তোমার আবেদন মঞ্জুর—তোমার নির্কাসন হরিৎস্বীপে। আজ থেকে অতলিকা আমার প্রধান সহচরী।”

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিৎস্বীপে নির্কাসিত হইল।

৫

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিৎস্বীপে থাকে। রাজপুত্র পঞ্চদারী গুহায়, আর সাগরিকা সেই গুহায়ই কাছে-কাছে চন্দ্রচূড়-গিরির ধারে ধারে সিন্ধু সৈকতের তটে-তটে বেধানে উর্ধ্বিরা'জ আসে, আবার কি'রে-কি'রে যায়, গুহা কেনপুঞ্জ ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে।

মৎস্যনারীর দেশের সঙ্গে এই হরিৎস্বীপের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মৎস্যনারীর দেশে যা-কিছু সবই অচঞ্চল স্থির। মৎস্যনারীরা সব চিরকিশোরী। তাদের মণিমুক্তা সব ক্ষয়বৃদ্ধিহীন। মণিমুক্তার ক্ষয়ের রশ্মি অচঞ্চল—মৎস্যনারীদের চোখের রোয়াতি অচঞ্চল। এখানে যা আছে তা চিরকালই আছে, আবার যা নেই তা কোনো কালেই হবে না। এখানে কিছুই আরম্ভও নেই, স্তব্ধতা কিছুই সমাপ্তিও নাই। এদেশকে যেমন মৃত্যু স্পর্শ করে না, তেমনি আবার জীবনের বিজয়-মাল্যও এর কণ্ঠে পড়ে না।

কিন্তু হরিৎস্বীপের ব্যাপার উল্টো। ক্ষয়বৃদ্ধির চাকল্যে এর আকাশ-পাতাল আকুলিত, হাসি কান্নার-হিমোলে এর গিরি, কান্তায়, উপত্যকা, অধিত্যকা—সব উষ্মলিত। উবার নীলিমায় সন্ধ্যায় রঙিমায় এর জল-স্থল রঞ্জিত। দধিনা বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে এর বৃকে কত-কত ফুল মোহন হাসি নিয়ে জেগে ওঠে, আবার উত্তরে বাতাসের স্পর্শে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধুলোর ঝ'রে যায়, বসন্তের স্পর্শে এখানে সব শ্যামল হ'য়ে ওঠে—পাখীর কণ্ঠে গান জাগে—অগির পক্ষ-স্পন্দনে গুহন তোলে, আবার প্রহ্ননপন্নব সব হৃবির হ'য়ে ওঠে—পাখীর কণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়—অগির গুহন শুক হ'য়ে যায়। প্রাণের এখানে হিসাব নেই, তাই মৃত্যু এখানে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু চিরজ্বনের বেদনা রেখে যেতে পারে না।

হরিংশীপের একদিনের রিক্ততা আর একদিনের ঐশ্বর্য দিয়ে ভরে যায়, আক্ষেপের পাছে পাছে এখনে আনন্দের আয়োজন চলতে থাকে।

এই হরিংশীপে এসে রাজপুত্রের যেন একটা নবজন্ম লাভ হ'ল। মৎস্যনারীর দেশে যেন কিসের একটা সূক্ষ্ম প্রভাব তা'র চারিদিকে ঘিরে তাঁর জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করছিল। হরিংশীপে এসে সে-প্রভাব যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দখিনা বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঝরা ফুলের দীর্ঘশ্বাসের সাথে-সাথে অলি-গুঞ্জরণের সুরে-সুরে তাঁর অর্ধব্যক্ত জীবন-সঙ্গীত তা'র পূর্ণ পরিচয়ের মহিমা নিয়ে ফুটে উঠল। সাগরিকা—সাগরিকা—সাগরিকা!! কিন্তু ও যে কেবল সাগরেরই, ধরিজীর কেউ নয়। সাগর তরঙ্গের মতোই ওকে ধরা যায় না—সাগর-বুকের নীলিমার মতোই ওকে আপনার করা যায় না, ফেনপুঞ্জের মতোই মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তবু—তবু—ওই সাগরিকা—কি—কোথায় কেন! কি এই আকর্ষণ ওর প্রতি—কোথায় লুকিয়ে আছে ওর গোপন রহস্যটি, কেন এই আকুলতা, আর অতৃপ্তি? কাছে থেকে এই দূরের ব্যবধান কোন্ মন্ত্রে তা ঘুচবে? দখিনা বাতাস ব'য়ে যায়, ফুল-গাছের মাথায় মাথায় ফুল ফুটে ওঠে, লতার গায় গায় পল্লবরাজি ছলতে থাকে, রাজপুত্রের মনে খালি মন্ত্রের মতো ধ্বনি হ'তে থাকে—সাগরিকা—সাগরিকা—সাগরিকা! কিন্তু মিলন-মন্দির,—সে কোথায়? জলেস্থলে না আকাশে—কোথায়? যেন অনল-ভরা একটা ছুঁকার আকাজকা তুহিন-আবৃত মেরু-প্রদেশের সীমা-প্রান্তে এসে থেমে আছে।

একদিন রাজপুত্র বললে—“সাগরিকা, জানো কি আমার এই বুকের উন্নত বাসনা?”

“কি?”

“তোমার ঐ বন্ধ আমার এই অনল-ভরা বুকের উপর নিষ্পেষিত করতে।”

রাজপুত্রের কথা শুনে সাগরিকা সরল দৃষ্টিতে রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকল—তা'র পর বললে—“রাজপুত্র আমি যে তোমারই।”

বিজ্রোহের কণ্ঠে রাজপুত্র বলে উঠল—“তুমি

আমারই, কিন্তু তুমি কি সাগরিকা, তোমার চোখের পাতে অশ্রু কই? ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা কই? গণ্ডে রক্তিম-রাগ কই? বক্ষ ঘিরে কম্পন কই? কই—কই সাগরিকা—আমার উন্নত আকাজকার অনল-স্পর্শে তোমার স্নায়ুতে-স্নায়ুতে শোণিতে-শোণিতে প্রলয়-প্রবাহের উদ্দাম নৃত্য? সাগর-তলের মতো তুমি স্থির, সাগরের মাথার মতো তুমি অপ্রাপ্তব্যা, কোথায় সেই আত্মা, যৌবন যার অভিসারে বেয়োর, বসন্ত যার সংবাদ বহন ক'রে আনে! হায় মৎস্য-নারী—তুমি আমারই, কিন্তু কোন্ ঐশ্বর্যের এ অবদান তোমার? তুহিনে-গড়া ঐ বন্ধে মানবতার উচ্চতাটুকু পর্যন্ত কোথায়? আমি কোন্ পথে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছব?”

সাগরিকা বললে—“রাজপুত্র মৎস্যনারীর জীবনের এ অভিশাপ—এতদিন কারো কাছে ধরা পড়েনি—তা'র চির-কৈশোর চিরনিষ্ফলতার মুক হ'য়ে আমার এ দেহ, আমার মন'ক প্রতিকলিত ক'রে ধ্বস্তে পারে না, কিন্তু তবু—তবু—শোনো রাজকুমার—”

“কি?”

“অতলিকা তরলিকা তরলিকারা বা বুস্তে পারেনি, আমি তা প্রথম থেকেই বুঝেছি।”

“কি সে?”

“আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু হায়! চিন্তে বা জেগেছে, এ দেহের তা বহন কবুবার সামর্থ্য নেই।”

রাজপুত্র সাগরিকার দিকে নির্গিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এ যেন মেরুপ্রদেশের তুহিন-গড়া এক মেরু-কন্যা। হায় কোথায় আছে এর মধ্যে একটিও অগ্নি-ফুলিক! কোথায় এ-জীবনের হোমের বেদী? কোন্ বস্তু এর আহুতি?

বহর ঘুরে গেল। বসন্তের স্পর্শে আবার হরিংশীপ নিঃশব্দামল হ'য়ে উঠেছে। বস্ত-কুহুমের তীব্র গন্ধ যেন চারিদিক মানকতায় উন্নত ক'রে তুলেছে। বৃক্ষে-বৃক্ষে ফুল, ফুলে-ফুলে মধু, মধুতে-মধুতে মধুপ। বনছায়ে-ছায়ে কুরঙ্গ-কুরঙ্গিনীরা আনন্দে ক্রীড়া করছে—কপোত-কপোতীরা ঠোটে-ঠোটে লাগিয়ে আনন্দ-কুজন-ধ্বনিতে চারিদিক আকুল ক'রে তুলেছে—সেই আনন্দ কুজন-ধ্বনি

গিরি-গুহার কন্দরে-কন্দরে যে প্রতিধ্বনি তুলেছে, তা
মাহুষের মনকে উদাস করে, হতাশ করে। বৃষ্টি আজ
এখানে কারো একা থাকবার হুকুম নেই।

রাজপুত্র তা'র গুহা থেকে ছুটে বেরল। বনফুলের
ভীষণগন্ধের মাদকতা তা'র শিরায়-শিরায় শোণিত-
প্রবাহকে মাতাল করে তুলেছে—কপোত-কপোতীর
আনন্দ-কুজন-ধ্বনি তা'র চিত্তে স্বপ্নলোকের কোন্ অশরীরী
অনির্দেশকে ছুঁঁবার করে তুলেছে—যৌবন তা'র রঙীন
চিঠি আজ দিকে-দিকে উড়িয়ে দিয়েছে—এ চিঠিকে
অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারো নেই।

রাজপুত্র উত্তেজিতকণ্ঠে ডাকলে—“সাগরিকা—
সাগরিকা!”

“কি রাজকুমার।”

রাজপুত্র আকুল আবেগে সাগরিকার বক্ষ আপনার
বক্ষে জড়িয়ে নিলে—তা'র ঠোঁট-ছুখানি একটা নিষ্ঠুর চুষনে
অধিকার করলে। পরক্ষণে রাজপুত্র মৎসনারীকে আপনার
আলিঙ্গন থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ছইটি তুহিন-
রেখার চাপে যেন তা'র ঠোঁট-ছুখানি থেকে সমস্ত রক্ত
নিঃশোষিত হ'য়ে তা নীল হ'য়ে উঠেছে, তা'র হৃদয়ে একটা
বরফের চাপ নেমে এসেছে। রাজপুত্র সেইখানে কোখে-
কোখে বসে পড়ল। তার মাথাটি হাঁটুর উপরে লুটিয়ে
পড়ল। তা'র চোখ কেটে আর অশ্রু বাধা মান্লে না।

পায়ের কাছে তা'র প'ড়ে রইল, মৎসনারী নির্ঝাঁকু,
নিঃস্পন্দ।

ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে গেল। তা'র পর হঠাৎ গুরু গুরু
গুরু, ছুরু ছুরু ছুরু! দক্ষিণ সাগরের দিক্চক্রবালের পর-
পার থেকে সহসা শব্দ উঠল—গুরু গুরু গুরু, ছুরু ছুরু
ছুরু! প্রথমে ছোট্ট, তা'র পর বৃহৎ, তা'র পর আরও বৃহৎ
হ'য়ে একখানি মসীকৃষ্ণ মেঘ দিক্চক্রবালের কোল থেকে
মাথা তুললে। উর্ধ্বালারা সে মেঘের ছায়াকে বুকে
ধরবার জন্যে ধীরে-ধীরে স্থির হ'য়ে গেল।

মৎসনারী ডাকলে—“রাজকুমার।”

রাজপুত্র মুখ তুলে চেয়ে দেখলে—বল্লে—“কি?”

মৎসনারী বল্লে—“ভীষণ ঝড় উঠবে—আমার ভয়
করছে।”

রাজপুত্র আশ্চর্য হ'য়ে বল্লে—“মৎসনারীর ভয়—
তাও আবার সাগর-বুকের ঝড়ে।”

মৎসনারী উত্তর কর্লে—“হ্যাঁ রাজকুমার—জানিনে
এ কি—কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে—আমাকে
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ঐ গুহার মধ্যে।” মৎস-
নারীর কণ্ঠস্বর জাস-আকুল।

রাজপুত্র মৎসনারীকে বহন করে আপনার গুহার
মধ্যে নিয়ে এল—তা'র পর আপনার তৃণশয্যায় তা'কে
শায়িত করে দিয়ে নিজে গুহাঘরের কাছে গিয়ে বসে
পড়ল। দৃষ্টি তা'র দূর দিক্চক্রবালের আকাশে যেখানে
মেঘেরা রণরঙ্গ মূর্তিতে সাজছে। রাজপুত্রের অন্তরে
যে ঝড় উঠেছে, বাইরেও যেন তারি আয়োজন
হচ্ছে।

দেখতে-দেখতে মসীকৃষ্ণ কালো-কালো মেঘে সারা
আকাশ ছেয়ে গেল। সমস্ত প্রকৃতি প্রলয়ের পূর্বের
মতো প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করলে। তা'র পর হঠাৎ সাগরের
কোন্ পার থেকে সোঁ-সোঁ শব্দে বাতাস ছুটল—সিঁদু-
বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য তুলে—বনানী-অস্তর তোলপাড় করে।
মেঘের গর্জনে সিঁদু-বুকের ক্রুদ্ধ আক্ষালনে বনানীর
হাহাখাসে আকাশ-বাতাসে একটা প্রলয়-রোল উঠে
গেল। তা'র পর মূলধারে বৃষ্টি অবিরাম অবিশ্রান্ত।
দিক্ মুছে গেল—বনানী-রেখা মিশিয়ে গেল। বিশ্ব-
প্রকৃতির একটা তাণ্ডব-নৃত্য যেন অলঙ্ককে দলিত করে
চারিদিকে ছুটছে।

কড়—কড়—কড়—কড়—কড়াৎ। কোথায় একটা
বাক পড়ল। একটা ক্রুদ্ধ বিদ্যৎ-রেখা অসংখ্য লৈলি-
হান সর্প-জিহ্বা বিস্তার করে আকাশ চি'রে দিলে।
কণকালের জন্তে দিক্-দেশ সব আলোকিত হ'য়ে গেল।
তা'র পর গভীরতর অন্ধকার।

“রাজকুমার! রাজকুমার!! রাজকুমার!!!”

মৎসনারীর ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠ শু'নে রাজপুত্র তাহার
পাশে গিয়ে বসল। মৎসনারী বল্লে—“রাজকুমার
আমার ভয় করছে—ভীষণ ভয়! আজ আর আমার
কাছ থেকে দূরে থেকে না।”

বলকের পর বলক, আবার বলক, আবার বলক,

বিছাৎফুরণ হচ্ছে। তারি আলোকে রাজপুত্র দেখলে মৎসনারীর আধিপাত অশ্র-রেখার সিক্ত।

আশ্চর্য্যঘটিত-কণ্ঠে রাজপুত্র ব'লে উঠল—“সাগরিকা, তোমার আধিপাতে হল!”

মৎসনারী উত্তর করলে—“জানি নে—জানি নে, এ কি—আমার অন্তরে যে একটা কি হচ্ছে—একটা ভয়—একটা পুলক—না এ কি—রাজকুমার! রাজকুমার! আজ আমার মৃত্যু হবে!”

রাজপুত্র বললে—“মৎসনারীর কি মৃত্যু হয়?”

“না—কিন্তু আমার হবে।”

মৎসনারী তা'র দুই হাতে রাজপুত্রের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলে। বললে—“রাজকুমার, যেন তোমার বুকে আমার মৃত্যু হয়।”

ব্যথিত কণ্ঠের আকুল আবেদন রাজপুত্রের অন্তরে একটা নিবিড় বেদনা জাগিয়ে তুললে। একটা বিরাট সাস্তনার মতো ছ'হাতে মৎসনারীর দেহকে আপনার বক্ষে জড়িয়ে নিয়ে রাজপুত্র সেই তৃণশয্যার উপর আপনার দেহ রক্ষা করলে।

বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

ধীরে-ধীরে রাজপুত্রের অন্তরের ঝড় ক'মে আসতে লাগল। তা'র পর কখন যে তন্দ্রা এসে তা'র চোখ-ছটিকে অধিকার করলে, তা রাজপুত্র টেরও পেলেন না। আলিঙ্গনে বদ্ধ তা'র মৎসনারী। তা'র অন্তরে কি চলছে, কে-জানে।

* * * *

রজনীর শেষদিকে ঝড় খেমে গেল। প্রকৃতি শান্ত মূর্তি ধারণ করেছে। উষার স্নিগ্ধ আলো গুহার প্রবেশ ক'রে সব স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। রাজপুত্র চোখ মেলে। তা'র পর ডাকলে—“সাগরিকা।”

সাগরিকা চোখ মেলে রাজপুত্রের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। পর মুহূর্তে সাগরিকার দৃষ্টি নত হ'য়ে গেল। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে তা'র গণ্ড, কপোল, কণ্ঠ, বক্ষ—সমস্ত গোলাপে-গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে মোহন রঞ্জিমায় রঞ্জিত হ'য়ে গেল। রাজপুত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শিরায়-শিরায় শোণিতে-শোণিতে একটা পুলক-স্পন্দন একটা আনন্দ-কম্পনে ছুঁর্ণিবারভাবে জাগিয়ে গেল। তা'র পর—তা'র পর রাজপুত্র দেখলে তা'র বাহুবন্ধনে একটি পরিপূর্ণ মানবী-মূর্তি!

গদগদস্বরে কোমলকণ্ঠে রাজপুত্র ডাকলে—“সাগরিকা।”

সাগরিকা লাজ-লিপ্ত চোখছটি আবার রাজপুত্রের দিকে তুলে ধরলে, সরম-মিষ্ট কণ্ঠে বললে—“কি?”

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলে—“তুমি কে, সাগরিকা?”

সাগরিকা উত্তর দিলে, “রাজকুমার আমি সাগরের মায়া—ধরিত্রীর স্নেহ-স্পর্শে বেঁচে উঠেছি।”

মাহুষের আকাঙ্ক্ষায় মৎসনারী পরিপূর্ণ নারী হ'য়ে উঠেছে!

বামুন-বাগদী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমন এক-একটা সময় আসে, যাহার জন্ত কেহ কোনো দিন প্রস্তুত থাকে না। অথচ সূর্যময় হটক ছঃসময় হটক মাহুষকে সে তাহার স্রোতে ডাসিয়া বাইতে বাধ্য করে।

কানাইলালের সম্মুখে এমনই একটা ছঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বধেন্দুদের গ্রামে প্যারীমোহন রায় নামক আর-একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। একটি জমির অংশ-বিশেষ লইয়া উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কানাইলাল এই বিবাদ মীমাংসার জন্ত

অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনো পক্ষকে ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করিতে পারে নাই। একদিন স্মৃধেন্দুর পক্ষের লোকে ঐ ভূমিতে খানা কাটিতে উত্তোঙ্গী হইলে ভূমির সীমানা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এবং প্যারী-মোহনের পক্ষের লোকে বাধ্য দেয়। মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। স্মৃধেন্দুর হুকুম-মতে লাঠি চালাইতে বাইয়া—প্যারীমোহনের পক্ষের একটি লোক জখম হইয়া পড়িল। কানাইলাল তথায় উপস্থিত ছিল। তাহার উপস্থিত থাকাতেই তাহার ভাগ্যের এক বিষম পরি-বর্তনের সূচনা হইল।

প্যারীমোহন কৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। এবং তাঁহার পক্ষ হইতে কানাইলালকে সাক্ষী মাস্ত করা হইল। তাঁহারা জানিতেন কানাইলাল ভ্রাতৃনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ। সে কখনও মিথ্যা বলিবে না। বিশেষতঃ সে স্মৃধেন্দুর কর্মচারী ও অল্পগত লোক, তাহার দ্বারা আদালতে সত্য কথা প্রকাশ পাইলে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা।

নির্দিষ্ট সময়ে কানাইলালের উপর সমন হইল। তাহা দেখিয়া স্মৃধেন্দু চিন্তিত হইলেন। তিনি কামাইকে চিনিতেন, তাহার স্বভাব জানিতেন। একদিন তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমাকে ত ও-পক্ষ থেকে সাক্ষী মেনেছে—”

কানাই কহিল, “হাঁ, সমন পেয়েছি।”

স্মৃধেন্দু সহজ সুরেই বলিলেন, “তোমাকে সাক্ষী মেনে ভালোই করেছে। করেদীপক্ষের সাক্ষী তাঁদের বিপক্ষে কথা বললে আসামী পক্ষেরই সুবিধা হয়।”

কথাটা কানাইলালের পছন্দ হইল না। সে সন্দ্বিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে কি বলতে বলেন?”

স্মৃধেন্দু বলিলেন, “সে এখানে তা’র কি বলবে? সে-জন্তে ভাবনা কি? উকীল-মোক্তারে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে। নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে ত!”

“কিন্তু আমি যা জানি তা’র উপর উকীল-মোক্তার কি শেখাবে?”

স্মৃধেন্দু হাসিয়া বলিলেন, “পাপল আর কা’কে বলে? নিজের জানাজানি নিয়ে কি মাথলা মোকদ্দমা চলে?

তা’হলে যে খুন করেছে—সে তা’ বেশ জানে—আর। তা ব’লে জেলখানার পথটা সোজা ক’রে নিতে পারে?”

কানাই গম্ভীর হইয়া বলিল, “তা যা’রা নেয় না—তা’রা আর-একটা জেলখানার পথও সোজা ক’রে রাখে।”

স্মৃধেন্দু কহিলেন, “সংসারী লোকে অতদূর ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলে পদে-পদে তাদের পরাজয় ঘটে।”

কানাই মুহূষরে কহিল, “নিজের বিবেকবুদ্ধি বলি দেওয়ার চেয়ে সে জয় কি খুবই বড়?”

স্মৃধেন্দু কিছু রুক্ষস্বরেই কহিলেন, “মা দেখছি তোমার মাথাটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছেন। তুমি আমায় জেল খাটাবে নাকি?”

সে নীরবে মস্তক নত করিয়া রাখিল।

স্মৃধেন্দু কহিলেন, “তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছ না। এ-মোকদ্দমায় হারলে কি আমার সম্মান থাকবে?”

কানাই মুহূষরে বলিল, “মিথ্যা দিয়েই যদি সম্মম কিনতে হয়, তবে সে-সম্মম হাতছাড়া করা কি আপনার উচিত হয়েছে?”

স্মৃধেন্দু দেখিলেন, সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই অর্ধাচীন বালককে বিপক্ষেরা সাক্ষী মাস্ত করিয়া তাঁহাকে অত্যধিক বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। তিনি বলিলেন, “আমারই ভূমি—আমি অস্তায়-কিছু করিনি।”

কানাই কহিল, “তা হ’তে পারে। কিন্তু আপনার দাঙ্গা করা উচিত হয়নি। যদি করেছিলেন—এখন ঢাকতে যাওয়া অস্তায়।”

ইহার পর স্মৃধেন্দু অগত্যা মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া কহিলেন, “মা! তোমার সত্যবাদী সুধিষ্ঠির এবার আমার আর জেলে না পাঠিয়ে ছাড়লে না!”

মহেশ্বরী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্মৃধেন্দু কহিলেন, “প্যারী-খুড়োদের সঙ্গে জাম নিয়ে এক কৌজদারি বেধে গেছে, শুনেছ বোধ হয়?”

আমার লোকজনে খানা কাটছিল, এমন সময় তা’রা এসে বাধ্য দেয়। শেষে আমার হুকুম-মতে একটা দাঙ্গা বেধে একজন জখম হয়। জমিদারি করতে গেলে এমন

খুন কখন আখ্ছাই হ'য়েই থাকে। কানাইলাল সেখানে উপস্থিত ছিল। প্যারী-খুড়োরা এক কোমদারী জুড়ে দিয়ে তা'কে সাকী মাত্ত করেছে। তোমার যুধিষ্ঠির আবার সত্য বই মিথ্যা বলবেন না।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “সে ত সত্য বই মিথ্যা কোনোদিন জানে না। তা'র দোষ কি বাবা ?”

“জানে না—তা ত জানি। কিন্তু সংসারটা কি নিছক সত্যের উপর চলে? তা হ'লে ত লোকে এতদিন দেউলে হ'য়ে যেত। “বিষয়-কার্য কাউকে আর করতে হ'ত না।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “তা বোধ হয় যেত না। মিথ্যে যখন এসে পড়ে, তখন লোকে আবার মিথ্যে দিয়েই তাকে বাঁচায়। তাই সংসারে এতটা কুজিমতা এসে সত্যকে একপাশে ঠেলে রেখেছে। যে জমিটে নিয়ে বিবাদ, ঐ জমি তোমাদের ছ'জনের মধ্যে একজনের এ-কথা সত্য। এবং সেই সত্যের আশ্রয় নিলে আর এতটা মিথ্যের মধ্যে এসে পড়তে হ'ত না।”

“তা'রাই ত মিথ্যে-মিথ্যে জমিটার উপর দাবি করছে। আমি ত সত্যই বলছি।”

মহেশ্বরী বলিলেন, “আমি শুধু তোমার কথা ত বলিনি। সংসারটার কথাই বলছি। সংসারটা সত্য-পথে চললে তা'রাই বা মিথ্যা গ্রহণ করবে কেন—তুমিই বা করবে কেন? আমরা আত্মাকে মেরে ফেলে মাথাটা বাঁচিয়ে রাখতে চাই।”

স্বধেন্দু কহিলেন, “সে-শব ধর্মকথা বিচার করলে ত আর এখন চলবে না। এখন সামনে যা এসে পড়েছে সেইটে সামলাতে হবে।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “দেখ, এই মিথ্যার পথ কত অতিগামী। আমরা নিজে এই জালে জড়িয়ে প'ড়ে শেষে অস্ত্রের নিকট বিচারহীন অসুরাগ পেতে চাই। অবস্থা-বিশেষে তা'রও সত্যটুকু বিক্রয় করতে বাধ্য করি।”

“তা হ'লে তোমরা সকলে মিলেমিশে আমাকে জেলে পাঠাও—এই ত তোমাদের ধর্মবুদ্ধি বলছে?”

স্বধেন্দু বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন।

শৈল মাতাপুত্রের কথোপকথন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া

শুনিতেছিল। এবং স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া—সে ভয়ে একান্ত অভিজুতা হইয়া পড়িতেছিল। স্বধেন্দু চলিয়া গেলে সে মহেশ্বরীকে কহিল :

“মা! এমন-একটা বিপদ—কানাইলাল ছ'একটা মিথ্যা বললে যদি বিপদটা কেটে যায়—তবে কি তা'র তা বলা উচিত নয়?”

মহেশ্বরী বলিলেন, “উচিত কি না সে যে বলবে, সেই জানে। স্বধেন্দু আমার পেটের ছেলে, সন্তানের বিপদ ঝেড়ে কেলে দিয়ে কোনো মাতা আপনাকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন না। কিন্তু সত্য দিয়ে যে প'ড়ে উঠেছে—মিথ্যার সামান্য সংস্রবকেও যে প্রাপের বিকৃতি ব'লে জানে, তা'কে মিথ্যে বলতে বাধ্য করানো যে কতবড় বিপদ সে আমি জানি।”

এইসময় কানাইলাল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, “মা! বড়বাবুর বিপদের কথা শুনেছ?”

মহেশ্বরী বলিলেন, “শুধু বড়বাবুর কেন—তোমারও বিপদের কথা শুনেছি।”

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “এখন উপায়?”

মহেশ্বরী কহিলেন, “জননীরা সকল সময়ই সন্তানকে সদ্ব্যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তাদের বিপদের সময়ে মাগের বুদ্ধি-সুস্থি থাকে না। আমি দেখতে পারছি, স্বধেন্দুর যেমন বিপদ, তোমারও সেইরূপ। মা ইচ্ছা করেন না—একটি ছেলেকে মেরে ফেলে আর একটিকে বাঁচাতে। কিন্তু ছুটি ছেলেই যে কি উপায়ে রক্ষা পেতে পারে, তা ত বাবা আমি ভেবে উঠতে পারি-নে!”

মহেশ্বরী ভাবিতে লাগিলেন। কানাইলাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে কহিল, “কিন্তু তুমি ভিন্ন আর কে আমাকে পরামর্শ দেবে?”

মহেশ্বরী বলিলেন, “সে জানি। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি আমার কিছুই নেই, বাবা। বিশেষ-ছুটি-ছেলের বিপদে কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি স্থস্থ আছে? পরস্পর আড়ি না ক'রে এক হ'য়ে ছুজনায় যাতে রক্ষা পাও এমন কোনো সুপথ বের করার চেষ্টা দেখ। আমি আর কি বলব?”

কানাইলাল আর-কিছু বলিল না।

হাজির সময় সে তাঁহার সহযোগী হইয়া তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ সুযোগ পাইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত-ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। যখন সে উপস্থিত হইল না তখন তিনি বলিলেন, “দেখ—দেখ—খোঁজ করো, আমি আরও আধঘণ্টা সময় অপেক্ষা করছি।” কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেও সে হাজির হইল না তখন বিপকেরা তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব দেখিলেন দুই পক্ষেরই যথেষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল কানাইলালের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মোকদ্দমাটি তখনও পর্যন্ত হাতে রাখিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি করিয়াদী পক্ষের আবেদন মঞ্জুর না করিয়া সুধেন্দুর সপক্ষে রায় দিলেন।

কানাইলাল অস্থপস্থিত থাকার দরুন যখন সুধেন্দুর গলার খাঁড়াটা নামিয়া দাঁড়াইল, তখন হইতে তাহার প্রতি তাঁহার বিরোধী চিন্তা আবার পরিবর্তনের দিকে চলিতেছিল। এতৎ এই সাধু যুবকের প্রতি যে-সব হীন-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও বেদনায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি মহেশ্বরীকে কহিলেন, “মা! কানাই উপস্থিত হয়নি। মোকদ্দমায় আমাদের জয়লাভ হয়েছে, কিন্তু আমার জিহ্বাটা কলঙ্কিত ক’রে না দিয়ে আগে বললেই পারত। এখন দেখছি তা’র কাছে মুখ দেখানো ভার হবে।”

এমন সময় একটি যুবক আসিয়া সংবাদ দিল যে, কানাইবাবু সাহেবখালির বিলের ধারে এক গাছতলার অন্তরান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সুধেন্দু তখনও বস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ দুঃসংবাদে মহেশ্বরীর জীবনশক্তি যেন অতি ক্ষুণ্ণত করিয়া আসিতেছিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, “বাবা! আর ঐদেয়ি করিস্ নে, বেহারাদের ভাকা—আমিও যাবো”

সুধেন্দু কোনো আপত্তি করিলেন না। তৎকণাৎ

বাহকেরা পাল্কা লইয়া উপস্থিত হইল। একজন ডাক্তারও তাঁহারা সঙ্গে লইলেন।

তাঁহাদের গৃহ হইতে সাহেবখালির বিল একমাইল দূর। তাঁহারা তাড়াতাড়ি করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহেশ্বরী দেখিলেন, তাঁহার অঞ্চলের নিধি—নিষ্ঠুর সংসারে স্বন্দ ও সংগ্রামের সহচর—অনাথ বালক—নির্কাঙ্কব স্থানে ধুলার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে!!

মহেশ্বরী পাল্কা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে, তাহার কোমল হৃদয় নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে পরিজ্ঞাপ লাভের জন্য কোন্ সুদূর দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে!! তিনি ভাবিলেন ঘাঁটালে ক্ষুধার তাড়নায় সে যেমন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল—আজ দুইদিন বাড়ী যায় নাই পায় নাই—আজও বুঝি ক্ষুধার আগায় সেইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছে! তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহার মৃত্যুমলিন দেহখানি ক্রোডের উপর তুলিয়া লইলেন। ডাকিলেন “কানাই,—এমন হলি কেন, বাবা!”

কানাইলালের দেহ তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সে চক্ষু অন্ন মেলিয়া আবার মুদ্রিত করিল। মহেশ্বরী ডাকিলেন, “বাবা! কথা ক—এই যে আমি—চেষ্টা দেপ—তো’র মহেশ্বরী মা!”

কানাই চক্ষু মেলিল। মহেশ্বরী কহিলেন, “বাবা! কথা বল, একবার মা ব’লে ডাক, আজ দু’ দু’দিন দেখিনি যে—দু’দিন কিছু খাসনি! ছিঃ! অভিমান করিতে নেই। সেই একদিন অভিমান ক’রে কি কষ্টটাই পেয়েছিলি তা ত এখনও ভুলতে পারিসনি? কথা ক। সবাই ভুলতে পারে—আমি ত কোনো দিন ভুলিনি।”

কানাইলাল ইচ্ছিত করিয়া মহেশ্বরীর পদধূলি চাহিয়া লইল ও জল চাহিল।

মহেশ্বরী তাহার মস্তকে পদধূলি দিলেন। মুখে অন্ন-জল দিলে সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া সুধেন্দুকে কহিলেন “আক্ষয় ধেরেছেন। এখন চরমাবস্থা, তথিরের আর সময় নেই, এখনই সব শেষ হবে।”

তাহার গাত্র পরীক্ষা করিয়া আমার পকেট হইতে একখানি পত্র পাওয়া গেল। মহেশ্বরী ব্যস্তভাবে সেখানি নিজের হাতে লইলেন এবং পড়িয়া দেখিলেন। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

“মা। আমার জীবনের বিনিময়ে বড়বাবুর সম্মান এবং আমার সত্য রক্ষা করুন। তুমি দুঃখিত হোয়ো না—তোমার শিক্ষাই এইরূপ। কিন্তু যে কদম্ব উপায়ে বিনিময় করতে হ'ল, তা তুমি সমর্থন করবে না; উপায় ছিল না—ক্ষমা করবে। শাস্তি আর নলিনীকে অনেক দিন দেখিনি। বলার প্রাণে বড় বাজবে, তা'কে নিরস্ত করবে। বড়বাবু যেন সাধের মাতৃ-নিবাস থেকে আমাকে বঞ্চিত না করেন। তাঁর মনের গ্লানি গেলে আর তোমার আশীর্বাদ পেলে আমার পাপ-ক্ষম হবে। তাঁকে এবং ছোটো-মাকে আমার কলঙ্কিত

আত্মার কল্যাণকামনায় প্রার্থনা করতে বলবে। জন্মে-জন্মে যেন তোমাকেই মা পাই। মা! মহেশ্বরী-মা! আসি তবে।

সংসারত্যাগ

তোমারই কানাইলাল।

মহেশ্বরীর হস্ত হইতে পত্রখানি ভ্রমিতলে পড়িয়া গেল। তিনি কানাইলালের দেহের উপর সর্জিত হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে-দেখিতে উভয়ের দেহের স্পন্দন ফুরাইয়া গেল। যে-বক্ষে ইতর-বিশেষ নাই—সেই উদার বক্ষে বাগ্‌দীর ছেলেকে লইয়া মহাপ্রাণ। ব্রাহ্মণ-জননী মহানিদ্রায় ধুমাঈয়া পড়িলেন। আর স্বপ্নে—জড়ের মতন - পাথরের মতন বসিয়া-বসিয়া মাতা ও পুত্রের সেই মহামুক্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

ছুরী ও বাঁকশিক্ষা

(পূর্বসম্বন্ধ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

যুৎসু

অষ্টম পাঠ

“শব্দদক্ষিণে” আক্রান্ত হইলে, কিম্বা “বাহেরা”, “ত্রিহর” প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হইলে যুৎসুপ্রয়োগ-কারী তুরস্বে সমগ্র শরীর অগ্রসর করাইয়া নজে-নজেই দক্ষিণ মণিবন্ধের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধের ঐ পার্শ্বেই আঘাত করিবে; তদবস্থায় যুৎসু-প্রয়োগকারীর ছুরী আক্রমণ-কারীর করপৃষ্ঠের দিকে থাকিবে; যথা, অষ্টষষ্ঠিতম চিত্রে:—

ক্রমে যুৎসু প্রয়োগকারী ক্ষিপ্ততাসহ সবেগে আক্রমণকারীর হস্ত তাহার (আক্রমণকারীর) পশ্চাদিকে অপসারিত করিতে-করিতে নিজ বাম হস্ত আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোপির (কহুইর) দক্ষিণ পার্শ্বের দিক্ দিচ্চা লইয়া অভ্যন্তরের দিকে প্রবেশ করাইবার উপক্রম করিবে; যথা, উনসপ্ততম চিত্রে :—



৬৮তম চিত্র



৩৯তম চিত্র

ক্রমে যুষ্ক্-প্রয়োগকারী নিজ বাম বাহু দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ কক্ষোণি (কহুই) বেঁটন করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ও সবলে আক্রমণকারীর দক্ষিণ কক্ষোণি ভঙ্গ করিয়া নিজ বাম হস্ত দ্বারা নিজ দক্ষিণ কক্ষোণি (কহুই) দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে; তদবস্থায়



৩৯তম চিত্র

যুষ্ক্-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ প্রগণ্ড { স্বদেশ হইতে কক্ষোণি (কহুই) পর্যন্ত বাহুভাগ } আক্রমণকারীর বাম গলপার্শ্বে এবং তাহার প্রকোষ্ঠ (পুরোবাহু) আক্রমণকারীর গলদেশের পশ্চাতে থাকিবে; যথা, সপ্ততিতম ও একসপ্ততিতম চিত্রে :—



৩৯তম চিত্র

তদবস্থায় যুষ্ক্-প্রয়োগকারী নিষ্কৃতির চেষ্ঠা অবলম্বন-হেতু “ব্যাজ্র থাবা” প্রয়োগের উপক্রম করিবে; কিন্তু যুষ্ক্-প্রয়োগকারী নিষ্ঠাসহ তাহার কৌশল-প্রয়োগে সমর্থ হইলে আক্রমণকারীর পক্ষে উপযুক্তরূপে “ব্যাজ্রথাবার” প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্ভবপর হইবে না; বরং আক্রমণকারী যুষ্ক্-প্রয়োগকারীর সম-বলশালী কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেও যুষ্ক্-প্রয়োগকারীকে অপারগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু, এখানে বর্ণিত হইবে যে, যুষ্ক্-প্রয়োগকারী কিশকরিতা-সহ অষ্টবস্তিতম হইতে একসপ্ততিতম চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি এক-যোগে তীব্রবেগে সম্পন্ন করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী প্রতিদ্বন্দী হইতেও তাহার উৎকর্ষের আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে।

তৎপর যুষ্ক্-প্রয়োগকারী ত্বরন্তে নিজ দক্ষিণ পার্শ্ব নিয়ান্তিমুখে সবেগে ও সবলে চালনা করিয়া আক্রমণকারীকে তাহার (আক্রমণকারীর) নিজ দক্ষিণপার্শ্বের দিকে তুপাতিত করিবার উপক্রম করিবে; স্থযোগ

পাইলে আক্রমণকারীও এই অবসরে “ব্যাক্সথার” প্রয়োগে নিজকে মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিবে; যথা, দ্বিসপ্ততিতম ও ত্রিসপ্ততিতম চিত্রে :—

ছুরীর অগ্রভাগ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে; এবং আক্রমণকারীও প্রতিকারহেতু তুরন্তে নিজ বাম বাহু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ স্বহস্তের উপর দিয়া আনয়ন



৭২তম চিত্র



৭৪তম চিত্র



৭৩তম চিত্র

তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে নিজ দক্ষিণ মণিবন্ধ চালনা করিয়া আক্রমণকারীর বক্ষোপরি নিজ



৭৫তম চিত্র

করিয়া দ্বিপ্রকারিতাসহ আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ কিম্বা দক্ষিণ, মুষ্টি দৃঢ়রূপে ধরিয়াই যুযুৎসু-প্রয়োগকারীরই

ছুরী যুৎসু-প্রয়োগকারীরই বামস্বক-মোড়ে কিম্বা তৎ-
সন্নিবর্তন বক্ষ-পার্শ্বে বিদ্ধ করাইবার চেষ্টা দেখিবে—অথবা,
যুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মুষ্টি যুৎসু-প্রয়োগ-
কারীরই দক্ষিণ কর্ণপার্শ্বে ঘেঁষিয়া উর্দ্ধদিকান্তিমুখে আকর্ষণ
করিবে ; যথা, চতুস্পৃতিতম ও পঞ্চস্পৃতিতম
চিত্রে :—

এই প্রক্রিয়ার ফলে যুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহু
সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হওয়ার উপক্রম হইবে ; এবং, তদবস্থায়
যুৎসু-প্রয়োগকারী বলপ্রয়োগের উপক্রম করলে, ও
আক্রমণকারী প্রযুক্ত-প্রক্রিয়ায় স্তূঢ় থাকিলে, যুৎসু-
প্রয়োগকারী নিজেই উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) ভূপতিত
হইবে,—কিম্বা, তাহার দক্ষিণ স্বকসন্ধি গুরুতর বেদনা-
পূর্ণ ও বিকল হইয়া যাইবে ; সুতরাং, নিষ্কৃতিহেতু যুৎসু-
প্রয়োগকারীকেও তদবস্থায় বামপদ ও সমগ্র শরীর
পশ্চাদিকে অপসারিত করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে ।

নিম্নাভিমুখে চালনা করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) পরস্পর নিজ
নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে ; যথা, ষষ্ঠ-স্পৃতিতম, সপ্ত-
স্পৃতিতম ও অষ্ট-স্পৃতিতম চিত্রে :—



৭৭তম চিত্র



৭৬তম চিত্র

তৎপর, উভয়েই নিষ্কৃতিহেতু নিজ নিজ
সতর্কতাসহ ঈষৎ শিথিল করিয়াই অবিলম্বে পুনরায়
উপযুক্ত ও পরিবর্তিত মুষ্টিতে পরস্পর প্রতিঘন্বীয় হস্তমুষ্টি
ধরিয়া, হস্তদ্বয় প্রথমতঃ উর্দ্ধে তুলিয়াই হঠাৎ সবেগে



৭৮তম চিত্র

অথবা, সপ্ত-স্পৃতিতম চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরেই
একে অপরের মণিবদ্ধ দক্ষিণাবর্তে মুচ্ড়াইয়া পরস্পর একে

অন্তের ছুরী হস্ত বিচ্যুত করিয়া লইবে ; যথা, উনাশীতিতম চিত্রে :—

নিজকেও সম্পূর্ণ বামাবর্তে ঘুরাইয়া দিতে হয় ; যথা, অশীতিতম চিত্রে :—



৭৯তম চিত্র



৮০তম চিত্র

এইভাবে ছুরী হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে প্রতিপক্ষের হস্তমুষ্টি, দক্ষিণাবর্তে মুচ্ড়াইবার পূর্বে, একরূপভাবে ধরিতে হইবে যেন নিজ বৃদ্ধাস্থিত প্রতিপক্ষের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পার্শ্বে ও তাহার করপৃষ্ঠের দিকে, এবং তাহার (প্রতিপক্ষের) ছুরী-সংলগ্ন থাকে,—এবং নিজ অপর চারিটি অঙ্গুলী যেন প্রতিপক্ষের মুষ্টি র অন্তর্গত অঙ্গুলীগুলির অত্রভাগের উপরে পাতিত থাকে ।

ছুরী প্রতিপক্ষের হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে কখন-কখন প্রতিপক্ষের হস্ত দক্ষিণাবর্তে মুচ্ড়াইবার সঙ্গে-সঙ্গে

[এ স্থলে আক্রমণকারী ও যুযুৎসু-প্রয়োগকারী, উভয়কেই সমবলশালী, সম-কৌশলী ও সম-ক্ষিপ্তকারী কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে ; তাই, দেখানো হইয়াছে যে, উভয়েই উভয়ের ছুরী হস্ত-বিচ্যুত করিয়া লইল ; কিন্তু, প্রকৃত ঘটনাকালে যাহার সমবেত উৎকর্ষের আধিক্য থাকিবে, কেবলমাত্র সেই তাহার প্রতিপক্ষের ছুরী হস্তবিচ্যুত করিয়া লইতে সমর্থ হইবে ।]

(ক্রমশঃ)

আমার নিজের মতে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করার চেয়ে অনেক জারগায় সোজাসুজি া-কার লেখাই সুবিধা অর্থাৎ [ক'রতুম, ক'রছি, ক'রবো, ক'রো] না লিখে [কোরতুম, কোরছি, কোরবো, কোরো] লেখাই ভালো। তাতে বারবার ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করবার অসুবিধা এড়ানো যায়। তা ছাড়া ইলেক-চিহ্নটিকে শুধু অ-ধ্বনি নির্দেশ করবার জন্ত রাখা যায়। একই ইলেক চিহ্নটিকে ছুরকম ধ্বনি (কোনো জারগায় অ-ধ্বনি, আর কোনো জারগায় ও-ধ্বনি) দেখাবার জন্ত দু'কাজে ব্যবহার করতে হয় না।

া-কার দিয়ে লেগার বিরুদ্ধে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটা বড়ো আপত্তি আছে :— তাতে ধাতুর মূলরূপ ব'দলিয়ে যাবে। তবে এই রকম একটা রক্ষা করতে করা যেতে পারে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় [ক'রে, ব'লে, ধ'রে ব'সে ইত্যাদি] সর্বত্র ইলেক ব্যবহার হবে। [বলেছিলাম, (বলেছিলুম, বলেছিলেন), বলেছি, বলেছো, বলি, বলো প্রভৃতি শব্দে] যেখানে মধ্যস্থিত অ-এর পর হসন্ত অক্ষর নেই সেখানে ইলেক বা া-কার কিছুই ব্যবহার করবার দরকার নেই, উচ্চারণের একটা সাধারণ নিয়ম মনে রাখলেই চলবে। শুধু [বলো] আর [বোলো] মতো পার্শ্বিক্য করবার জন্ত [বোলো] লেখা দরকার। হসন্ত অক্ষরের আগে সর্বত্র মধ্যস্থিত অ-কারের অ-ধ্বনি া-কার দিয়ে লেখাই সহজ। যেমন :— [বোল'তাম, (বোল'তুম, বোল'তেম), বোল'তো বোল'লাম, (বোল'লেম, বোল'তুম), বোল'লো, বোল'ছো, বোল'বো]। যা হোক ভাষাতত্ত্ববিদের খাতিরে আপাতত সর্বত্র ইলেক ব্যবহার করতে বাধ্য হ'লুম।

বাঙলা এ্যা-দার

বাঙলা এ্যা-কারের জন্ত একটা আলাদা অক্ষর নিতান্ত আবশ্যিক হ'রে প'ড়েছে। একটা নতুন অক্ষর ছাড়া, 'দ্যাখো' (দেখহ) আর 'ফেখো' (দেখিও), ফ্যালো (ফেলহ) আর 'ফেলো' (ফেলিও) প্রভৃতির পার্শ্বিক্য নির্দেশ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এর একটা সহজ সঙ্কেত ব'লে দিয়েছেন।

(চ) া-কারকে মধ্য া-কার দিয়ে দেখানো হবে।

যেমন :— [দেখো (দ্যাখো—দেখহ) মেলো (ম্যালো—মেলহ), ফেলো (ফ্যালো—ফেলহ) ইত্যাদি]

আর এ্যা-ধ্বনির জন্তও একটা অক্ষর দরকার। এ অক্ষরটিকে সামান্ত একটু ব'দলিয়ে নিয়ে নতুন একটা অক্ষর তৈরী ক'রে নিলে সুবিধা হয়। সামান্ত পরিবর্তন চোখে লাগবে না কিন্তু [একক ও একা (এ্যাকা), এমনি ও এমন (এ্যামন) প্রভৃতি শব্দের] উচ্চারণের পার্শ্বিক্য দেখানো সম্ভবপর হবে।

উপরেব মূল সূত্রগুলি অবলম্বন ক'রে বাঙলা বানানের একটা খসড়া নিম্নমাবলী নীচে দেওয়া হ'লো।

নিম্নমাবলী

(১) সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত

সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অনুসারে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম :—

(১,১), সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও া-কারই বজায় থাকবে। ইন্-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে ই-বানান চ'লতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙলার া-কারান্ত

প্রথমার রূপকেই বাঙলার শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন [ধনীকে, বাত্মীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি]

(১,২) সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই া-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে া-কার বজায় থাকবে। যেমন :— [দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, উর্ধ্বশী ইত্যাদি]

(১,৩) যেখানে অস্ত্য : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে : (বিসর্গ) না লেখাই ভালো যেমন :— [জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত, সাধারণত ইত্যাদি (৭)] অবশ্য যেখানে : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় সেখানে : (বিসর্গ) লিপ্ত হ'বে। যেমন [মাতঃ, পিতঃ, নমোনমঃ ইত্যাদি]

(২) হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব'লে শেষে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই।

যেমন : [সকল, বালক, নিশ্চিত, ব'লুলেন ইত্যাদি]

(২,১) সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই অর্গের পার্শ্বিক্য দেখাবার জন্ত সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন [“এ জিনিসটার চল'হ'য়ে গেছে”; “যদিও ব্রাহ্মণবংশজাত তবু জাত মানি না”; “রোজ রোজ যোগান্ যোগানো চলে না, এই সব বাক্যে চল্, যোগান্ প্রভৃতি শব্দ] সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো।

(২,২) চ'লতি ভাষার তুচ্ছ অনুজ্ঞার (বিকল্পে) শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন [ডাক্, কর্, বল্, হোক্, বলিস্, করিস্ ; ইত্যাদি] কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো।

(২,৩) সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অস্ত্যস্ত তিন অক্ষরের শব্দে উপাস্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার ; যেমন [মেঘলা, বাদলা, পশলা, এমনি, জানলা ইত্যাদি]

কবিতার ছন্দ-অনুসারে অনেক সময়ে উপাস্ত অক্ষরের অ অথবা হসন্ত ছুরকম উচ্চারণই হয় ; তাই কবিতার অনেক জারগায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার। যেমন :— [বরষা (বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাব'না, ভরসা আর ভর'সা] এইসব শব্দে উচ্চারণ পার্শ্বিক্য দেখানোর জন্ত হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

(২,৪) চ'লতি ভাষার তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপাস্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না ক'লেও চলে। যেমন : [ক'রতে, ব'লতে, চ'লতে, ধ'রতে, প'রতে চিনতে]। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে ; যেমন : [ক'রতে, ব'লতে, চ'লতে, ধ'রতে, প'রতে, চিনতে ইত্যাদি]। কোনোটাতেই অসুবিধা হয় না ; উচ্চারণের দিক থেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধ হয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের কলে যেখানে উচ্চারণে সংস্কৃত বর্ধ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রূপের অসুবিধারী ব্যঞ্জন-বর্ধগুলিকে পৃথক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা [কর্তে, কর্তে, পার্ক, কর্ক প্রভৃতি] বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরূপ অনাবশ্যক বিকৃত হ'য়ে যাবে—অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

(৭) [আপাতত, বিশেষত, প্রভৃতি] শব্দ : (বিসর্গ) লোপ করার কিছু অসুবিধা আছে ; [আপাতৎ, বিশেষৎ] পড়বার সম্ভাবনা থেকে যায়। চ'লতি ভাষার ইলেক দিয়ে [আপাতত', বিশেষত',] কিংবা পুরোপুরি া-কার নিয়ে [আপাততো, বিশেষতো] লেখা যেতে পারে ; কিন্তু বোধ হয় চোখে লাগবে।

(২,৫) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন :-[মশ'স্তল, বুল'বুল শেক'সুপির ইত্যাদি]।

(২,৬) চ'ল্‌তি ভাষার চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চল, কোনো অসুবিধা হয় না। ছনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে, বাঙলা উচ্চারণের কাঠামো ঐ-মাত্রিক। ছই ছই অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়। তবে [দেখ'বার (ছাখ'বার), কর'বার, বল'বার প্রভৃতি শব্দে] হসন্ত ব্যবহার করা ভালো কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

(৩) ইলেক-চিহ্ন (,) ব্যবহার

(৩,১) কবিতার সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই ি-কারান্ত অস-মাপিকা ক্রিয়ার ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন :-[করি', ভরি', ধরি', চমকি', উচ্ছ'সি' ইত্যাদি]।

(৩,২) মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক চিহ্ন ব্যবহার হবে; এসম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। (৬) সূত্র জট্টবা।

(৩,২-১) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ার লুপ্ত ইকারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিতে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-বাঙ্গল বর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ্ন তা'র পাশে ব'সবে। যেমন :-[ক'রে, ব'লে, ক'র'বো, ব'ল'বো, ক'র'তে, প'র'তে, ম'র'তে, ক'র'ছে। ইত্যাদি]।

(৩,২-২) কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমন :-[কর'বার, ধর'বার, বল'বার ইত্যাদি]।

(৩,২-৩) সাধু ভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষার ছুয়েতেই বর্তমান অনুজ্ঞার ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন :-[ডাক' (ডাকহ), দেখ' (দেখহ) কর' (করহ), বল' (বলহ) ইত্যাদি] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষার ১-কার ব্যবহার করাই সহজ।=যেমন :-[ডাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাদি]। সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষার দ্বিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন :-[কাঁদ'-কাঁদ', পড়'-পড়', নিব'-নিব'] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষার ১-কার লেখাই ভালো; যেমন :-[কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ইত্যাদি]।

(৩,২-৪) চ'ল্‌তি ভাষার [আছ', দিল', দিত', ছিল',] এই কয়টি শব্দে ইলেক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোপে লাগবে।

(৩,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই অর্ধের পার্শ্বক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন :-[ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনো দিন), র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দ), তা'র (তাহার) ও তার (তত্বী); তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দিন) ইত্যাদি] কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জাগক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘোষ ঘ'টবে।

(৩,৪) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :-[ভর'সা ও ভর'সা, এম'নি ও এম'নি ইত্যাদি] কিন্তু তাতে (৩,২)-এর সঙ্গে অস-ঙ্গতি ঘোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন ও ধ্বনি আর অ-ধ্বনি ছুয়ের জন্য ব্যবহার ক'রতে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। মধ্য ও-ধ্বনি সর্বত্রই ১-কার দিয়ে লিখলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

(৪) অ-কার উব্যহার

(৪,১) তৎসম শব্দে :-[রেহ, গত, নত, যুগ, পালিত, বিহিত ইত্যাদি]

(৪,২) অস্ত্য সংযুক্ত বর্ণে; তৎসম, তত্ত্ব ও বিদেশী শব্দে সর্বত্রই। [সূধ্য, মন্দ, কর্ণ, কর্জ ইত্যাদি]

(৪,৩) সাধুভাষার ক্রিয়া-পদে। [রহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ইত্যাদি]

(৪,৪) [যেন, কেন, যত, তত, এত, কত] এই কয়টি অভ্যন্ত প্রচলিত শব্দে। উচ্চারণ-অনুসারে [যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা উচিত; কিন্তু অভ্যন্ত সংস্কারে মইবে কি না সম্ভেহ। তবে ১-কার চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়।

(৪,৫) অস্ত্য : (বিসর্গ) যেখানে লোপ হ'য়েছে সেখানে আপা-তত শুধু অকার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন :-[আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ইত্যাদি] তাতে কিছু অসুবিধা আছে; [ঙ] মস্তবা জট্টবা।

(৪,৬) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩,২) এর সঙ্গে অসঙ্গতি ঘোষ ঘ'টবে। (৩,৪) জট্টবা।

(৫) অ-এর ও-ধ্বনি

(৫,১) মধ্যস্থিত অ-এর ও-ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু (৩,২) ও (৩,৪) জট্টবা।

(৫,২) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই তত্ত্ব শব্দে যেখানে অস্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ১-কার দেওয়া হ'বে। [ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, আরো, তেরো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ) পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি]

ব্যতিক্রম :-[যেন, কেন, যত, তত, কত, এত]। এই শব্দ শব্দে ১-কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। (৪,৪) জট্টবা।

(৫,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষার 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ১-কার দেওয়া হবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]।

(৫,৪) সাধু ভাষার বিকল্পে ও চ'ল্‌তি ভাষার সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ১-কার ব্যবহার হ'তে পারে। [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো] [৩-২৩] জট্টবা।

(৫,৫) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ১-কার ব্যবহার হবে। [ডাকো (ডাকিও), খেকো (খাকিও); এলো, ব'ল'লো, ক'র'লো; ব'য়েছো, ব'লেছে ইত্যাদি]। (৩,২৩) জট্টবা।

(৬) ই-ঈ-কার ব্যবহার

(৬,১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিতক্তিকৃত হ'লেও ঈ-কার লেখা হবে। [গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রী, রোগীদের ইত্যাদি]। (১,১) জট্টবা।

(৬,২) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা ছুয়েতেই প্রায়শ্চক অব্যয় কি [হুখ] ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্বনাম "কী" [দীর্ঘ] ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন [তুমি কি খাবে ? [অব্যয়], তুমি কী খাবে ? [সর্বনাম] তুমি কী কী খাবে [সর্বনাম]]। (৮)

(৭) উ-কার ব্যবহার

তত্ত্ব শব্দে সাধু ও চ'ল্‌তি ছই ভাষাতেই [অ] উ-কার লেখাই ভালো; ও কার বতহুর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। [বউ, লাউ, মউ ইত্যাদি] কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ১-কার লেখা যেতে পারে। [বৌঠাকুরাণী, চৌধুরী, নৌমাছি চৌধুরী ইত্যাদি]

(৮) পুরানো বাঙলা পুঁথিতে "কী" বানান অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

(৮) ে-কার ও ঠে-কার ব্যবহার

(৮.১) চ'ল্‌তি ভাবার সর্কর্ক ক্রিয়ার অতীতে বিকল্পে ে-কার লেখা হবে। যেমন [কী'ল্‌লে, কর'লে, বল'লে ইত্যাদি]

অকর্কর্ক ক্রিয়ার ে-কার চলে না; সর্কর্ক ে-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার করতে হবে। যেমন [কী'ল্‌লো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি]

(৮.২) চ'ল্‌তি ভাবার অতীত ক্রিয়ার বিকল্পে। যেমন [ক'র'লেম, কর'লেম, বল'লেম, বল'লেম ইত্যাদি]।

(৮.৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ছই ভাবাতেই এ্যা উচ্চারণে সর্কর্ক ে-কার ব্যবহার হবে। যেমন : [যেমন, দেখা, খেলা, বেলা, ফেলা মেলা, বেন, কেন ইত্যাদি]।

(৯) ও-কার ব্যবহার

ও-ক্ষনি বতদূর সম্ভব ে-কার দিবে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাবা-ভাষের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ক্ষনি ইলেক-চিহ্ন দিবে নির্দেশ করতে হ'লে। (৩) ঞ্ঠব্য।

(৯.১) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাবা এই ছয়েতেই [মোতি, পোক, কোলু এবং বিকল্পে নোতুন] এই কর্টি তত্ত্ব শব্দে ও কার লেখা হবে।

(৯.২) [কোনো] আর [কোনও] এই ছয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আবস্তক-মতো [কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যাদি] লেখা হবে।

(৯.৩) [করিয়ে, নিয়ো প্রভৃতি] শব্দে "য়ো" লেখাই আপাতত চ'ল্‌বে।

(১০) ব্যঞ্জনবর্ণ

(১০.১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা-ছয়েতেই [কান, বানান, পান, সোনা] এই শব্দগুলি দন্ত্য-ন দন্ত্য-ন লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙ'লা উচ্চারণ আর বাঙ'লা বানান এই দুইটিই অনুমোদিত। (২)

(১০.২) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা-ছয়েতেই "আছ" ধাতুর বিকল্পে সর্কর্ক "ছ" ব্যবহার করা যাবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি]

(১০.৩) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা ছয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরূপ অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। [শহর, শেক্সপিয়র, শেলি, শাজাহান, হামেশা, মশ'লা ইত্যাদি] কিন্তু [সরম] শব্দটিতে প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য 'স' লেখাই চ'ল্‌বে।

(১১) স্বরানুক্রম

চ'ল্‌তি ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম (vocalic harmony) চ'ল্‌বে। যেমন :—[একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতি, দিশি, পুতো, জুরো, ধুহুরী, খুড়ো, বুড়ো, শুখো, কিত্তে, হিসেব ইত্যাদি]

(১২) রবীন্দ্রনাথের "বাঙ'লা বানান", প্রবাসী ১৩২৬, বৈশাখ, ৭৮-৭৯ পৃ: ঞ্ঠব্য। ওড়িয়া ভাষার মূর্চ্ছ-ণ উচ্চারণ থাকা সত্ত্বেও কান, পান দন্ত্য-ন দিবে লেখা হয়।

নব্যচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*
* *

পনেরো বিংশ মিনিট পরে ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরকে যখন গড় হয়ে প্রণাম করলে তখন তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজলও ঠাকুরঘরের মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে জোর করে' প্রসন্নতা টেনে এনে তার মুখ উজ্জ্বল করে' তুললে। তার পর সে বেখানে অনল গৌরীকে পড়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। অনল তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ধনিষ্ঠা একমুখ হেসে বললে—জানো-দিদি এসেছিল তাই পড়তে আসতে দেবী হয়ে গেল।

অনল হেসে বললে—দেবী করে' আসার ভুলে

আমার ছাত্তীর জরিমানা মাপ করে' দেওয়া গেল; কিন্তু দেবী করার ভুলে তাঁকে কনুকাইও থাকতে হবে। কেমন ?

তাহার এই ধনিষ্ঠতাবের কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জা পেয়ে চূপ করে' গেল, অনলও তাহার লজ্জায় লজ্জা বোধ করলে। কিন্তু তাদের ছজনকে রক্ষা করলে গৌরী। সে খিলখিল করে' বলে' উঠল—বাবা, আজ একটা ক্ষেয়ার-কো দেখেছি, সেই আজব দেশ বইয়ের কাগ-তাজুরা; ওটা অর্ধেক হি, অর্ধেক শি!

অনল মনের অবস্থি থেকে নিহুতি পেয়ে ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে হেসে বললে—এ যে কমলাকান্তের সমস্তা দেখছি—চন্দ্র, ভূমি হি না শি! সেই কাগতাজুরা পদার্থটি কি ?

ধনিষ্ঠা হাসিতে উত্তাসিত মুখে বললে—আনো-
দিদিকে দেখে ঐ কথা বলছে।

অনল ধনিষ্ঠার কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

গৌরী অনলের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠল
—বাবা, মা সেই কাগতাজুয়াটার কাছে বসে' ছিল...

অনলকে বাবা সোধোন করার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী মা
বলে' ধনিষ্ঠার উল্লেখ করাতে ধনিষ্ঠার আবার মনে পড়ল
আনোর কথা এবং অমনি তার মুখ আরক্ত ও কর্ণমূল উষ্ণ
হয়ে উঠল; পাছে অনল তার কাছে অকারণ ধনিষ্ঠার
এই লজ্জার বিকাশ দেখতে পায় সেই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠা
তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গৌরীকে বললে—নাও গৌরী,
তোমার গল্প রাখো; পড়ে' নাও, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে.....

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনে পড়ল সন্ধ্যাকালে
ধনিষ্ঠা জপ পূজা করতে ব্যাপৃত হয়। তাই সে বললে...
আজ দেবী হয়ে গেছে, আজ না হয় পড়া বন্ধ থাক.....

কথা বলতে বলতে অনল ধনিষ্ঠার মুখের দিকে
তাকিয়ে একটু থামল, তার মনের মধ্যে ঈষৎ আশা ও
গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল যে ধনিষ্ঠা এখন পড়া বন্ধ
করতে চাইবে না, সে অনলের কথায় আপত্তি করে'
তাকে আরো কিছুক্ষণ থাকতে বলবে। কিন্তু অনল
অবাক হয়ে দেখলে ধনিষ্ঠা কিছুমাত্র আপত্তি ত তুলেই
না, বরং তার মুখে সন্মতির স্মিতহাস্য ফুটে উঠল। অনল
স্বপ্ন মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

অনল ধনিষ্ঠাকে তখনও নীরব থাকতে দেখে সেও
নীরবে যেখানে জুতো খুলে রেখে এসেছিল সেইখানে
গেল, এবং জুতোর মুখ বেদিকে সে এসেছিল সেইদিকে
ফিরানো ছিল বলে' সে সেইদিকে ফিরে জুতো পরতে
লাগল। এতে সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেই দাঁড়ি-
য়েছিল। ধনিষ্ঠা মুখ তুলে অনলের দিকে দেখে উঠে
দাঁড়াল এবং অনল জুতো পরা শেষ করে' প্রমোদিত
হতেই ধনিষ্ঠা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গিয়ে মুছ অথচ
স্পষ্ট স্বরে বললে—দেখুন,.....

অনলের পিঠের অর্ধেকটা ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেছিল;
সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে
তার মুখের দিকে চাইল।

ধনিষ্ঠা বলতে লাগল—কাল থেকে আমার পড়ার
আর সুবিধা হবে না.....

অনল বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের উপর
উৎসুক দৃষ্টি ফেলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল—সে ভেবে
পাচ্ছিল না ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ পাঠ বন্ধ করার কি কারণ
হতে পারে—তার কি কোনো জ্রুটি বা অপরাধ ঘটেছে?

অনলের মনের আশঙ্কা মুখে ফুটে উঠতে দেখেই বোধ
হয় ধনিষ্ঠা বললে—আমার ব্রত নিয়ম পূজো অর্চা নিয়ে
আমি আর পড়াশুনার সময় পাই না; তাতে লেখাপড়াও
হয় না, পূজো অর্চারও ব্যাঘাত ঘটে। ইহকাল ত খুইয়ে
বসে'ই আছি, দেখি পরকালে এর চেয়ে কিছু সুবিধা হয়
কি না.....

এ কথার উত্তরে অনল আর কি বলবে? যুবতী স্বন্দরী
ধনশালিনী ধনিষ্ঠার মুখে এই নির্বেদ হতাশার উজ্জ্বল শুনে
অনলেরও অন্তর হৃৎকভারাতুর হয়ে উঠল। সে বিষণ্ণ-
বদনে চলে' যাবার উপক্রম করছে, ধনিষ্ঠা আবার বললে
—সমস্ত দিন আপিসের খাটুনির পর পড়াতে আপনার খুব
কষ্ট হয়.....

অনল তো এতদিন এ ধরন জানত না, সেই কষ্ট
থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশু সম্ভাবনাত্তেও সে বিশেষ
আনন্দ অনুভব করলে না। সে উদাসনেজে ধনিষ্ঠার
মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ধনিষ্ঠা বলতে লাগল—গৌরীকে পড়বার অস্ত্রে
ছুলের হেড্‌মাটার আর হেড্‌পণ্ডিত ছন্নকেই কাল
থেকেই নিযুক্ত করে' দেবেন.....

এবার অনল কথা বললে—গৌরীর অস্ত্রে আর পৃথক
মাটারের কি দরকার, আমিই তো.....

ধনিষ্ঠা অনলের কথায় বাধা দিয়ে বললে—আপনি
তো দেখবেনই; কিন্তু আজকাল বিষয়-সম্পত্তির নতুন
ব্যবস্থা করা নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকবেন; আমাদের অস্ত্রে
গৌরীর লেখাপড়ার কোনো ব্যাঘাত হতে দেওয়া উচিত
হবে না। গৌরীর মাটারদের মাইনে আমি আমার মাস-
হারা থেকে.....

অনল লজ্জিত হয়ে বললে—মাটারের মাইনে দেওয়ার
কোনো কথাই আমার মনে হয় নি। গৌরী আপনার
ঘেয়ে.....

ধনিষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে একটা লাগের আভা খেলে গেল।

অনল বলতে লাগল—আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।

ধনিষ্ঠা একটু চূপ করে' থেকে বললে...জমিদারীর কাগজ পত্রের সহি করাবার জন্তে আপনাকে আর কষ্ট করে' আসতে হবে না.....

এই কথা বলে' ফেলেই ধনিষ্ঠার মনে হল এটা যেন নিবেদের আদেশের মত শোনাল; তাই সে তাড়াতাড়ি বললে...আপনি প্রধান ম্যানেজার, আপনি কাগজপত্রের সহি করাতে আসেন এটা ভালো দেখায় না; ও কাজটাও কাল থেকে পেশকার হরকান্ত-বাবুকে করতে বলবেন.....

হরকান্ত ধনিষ্ঠার স্বত্তরের আমলের অতিবৃদ্ধ কর্মচারী; ধনিষ্ঠার সাবধানতা সত্ত্বেও অনলের মনে হল কাল থেকে এ বাড়ীতে তার কি প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে নাকি।

অনের মুখের উপর সন্দেহের চায়াপাত হতে দেখেই ধনিষ্ঠা অসুস্থমনে তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে বললে... কেবল যে-সব কাগজপত্রের আমাকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করবেন সেইগুলি আপনি নিজে নিয়ে আসবেন—আর আমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে আপনাকে খবর পাঠালে আপনি অসুগ্রহ করে' একবার পায়ের ধুলো দেবেন.....

ধনিষ্ঠার এই কথা শুনে অনলের মনের সন্দেহ অনেকখানি দূর হয়ে গেল; তার মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

ধনিষ্ঠাকে চূপ করে' যেতে দেখে অনল “যে আজ্ঞে” বলে' প্রস্থান করলে।

অনল চ'লে যেতেই ধনিষ্ঠার বুক ঠেলে চোখ ফাটিয়ে কান্না ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। সে জোর করে' কান্না চেপে কম্পিতকণ্ঠে গৌরীকে বললে...মা মণি, তুমি খেয়ে শোও পে যাও; আমি পূজা করে' আসি.....

গৌরী নীরবে ঘাড় নেড়ে তার দাসীর সঙ্গে তার ঘরে চ'লে গেল।

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজার খিল দিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে লুটিয়ে পড়ল। আজ জানোর

কথায় সে জানতে পেরেছে তার এতদিনকার অনাবিহিত মনের অবস্থা। তার যে কেন কান্না আসি'ছে এ কথা মনে করতেও তার লজ্জা করতে লাগল, তাই সে গোপনেও কাঁদতে পারুল না, নিজের লজ্জাতেই সে নিজেকে সশরণ করে' নিলে।

কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে থেকে মাধবীর কথা ধনিষ্ঠার কানে গেল—মা, পুরুত-ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুরের আরাতির সময় বয়ে যাচ্ছে যে!

ধনিষ্ঠা ধড়মড় করে' উঠে আবার গড় হয়ে ঠাকুরকে একটি প্রণাম করলে এবং উঠে দরজার খিল খুলে দরজা খুলে দিলে।

পুরোহিত আর মাধবী দেখলে প্রশান্ত দেবীপ্রতিমার মত ধনিষ্ঠা ঝাড়ের উজ্জল আলোতে বলমল করছে। সে যে কি কঠোর শাস্তি আজ নিজেকে দিয়েছে তার কেউ একটু আভাসও টের পেল না।

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিতকে প্রণাম করে' বললে—ঠাকুর মহাশয়, আমি এ বছর সাবিন্দী-ব্রত নেবো।

পুরোহিত বললে—তা বেশ। কিন্তু তার তো মা এখনো অনেক দেবী আছে, সে তো সেই অষ্টমাসে...

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' বললে—হ্যাঁ তা জানি; তবু আপনাকে আগে থাকতেই বলে' রাখলাম।

পুরোহিত এ কথার উত্তরে কি যে বলবে ঠিক করতে না পেরে কিছু একটা বলতে হবে বলে'ই বললে—তা আমি এ কথা মনে রাখব মা।

ধনিষ্ঠা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে' গেল, পুরোহিত ঠাকুরের আরাতি করবে বলে' ঠাকুর-ঘরে চুকল।

*
* *

অনল ধনিষ্ঠার কাছ থেকে এসেই ছুলের চেড-মাটার আর হেড-পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল; সে জানত ধনিষ্ঠা যা বলে তাই তার আদেশ, এবং সে আদেশের নড়চড় প্রায়ই হতে দেখা যায় না। অনল তাঁদের বললে—এতদিন আমিই রাণীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে

পড়া তাম ; রাণী আর কাল থেকে পড়বে না... বড়লোকের
সখ ছ' দিনেই মিটে গেল, তাই তার হুমুস হয়েছিল
গৌরীর শিকার তার অহুগ্রহ করে' আপনাদের নিতে
হবে...

অনল গৌরীর শিকার নিযুক্ত করে' বাসায় ফিরে
বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাতেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে কাল
থেকে রাণী আর অনলের কাছে পড়বেন না । অনল
কাজে ধনিষ্ঠার গড়ার ব্যাপারটা গ্রামের সকল লোকের
মনে এমনি একটা প্রবল কৌতূহলের প্রধান ঘটনা হয়েছিল।
কিন্তু যে যার কাছ থেকে এই খবরটা শুনে তাকে কেবল
অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে
থেকেই নিরন্ত থাকতে হল, বক্তা বা শ্রোতা কেউ রসা-
লাপের বিলাস সম্ভোগ করতে সাহস করতে পারলে না ।
কেবল সাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খবর শুনে
মুচকি হেসে চাপা গলায় বললে—এত শীগগির পিরাতি
চটে' গেল ?

সাধন বিন্যাসের থেকে পরা আওড়ে বললে—

“বড়র পিরাতি বালির বাধ ।

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক টান ।”

খবরটা জানোর কানেও গেল । সে ধনিষ্ঠার উপর
চটে' গিয়ে কি বলে' তার কুৎসা রটাবে তারই গল্প রচনায়
প্রবৃত্ত ছিল, এই খবরে তার সব কল্পনা ভেঙে গেল । সে
মনে মনে বুঝতে পারলে তারই কথার অপ্রত্যাশিত ফল
এই আকাম্বক ব্যাপার । যদি গ্রামের লোকের সন্দেহ
সত্য হত তা হলে ধনিষ্ঠার মতন কড়া ও বেপরোয়া স্বাধীনা
অধিনারনী আর নিরাস্বীয় নিরাতক ম্যানেজার অনল
কখনো এত সহজে বিচ্ছেদ ঘটতে স্বীকৃত হত না । জানো
ধনিষ্ঠার উপর রাগ তুলে গিয়ে গায়ের লোকদের উপর
চটে' গেল ; সে নিজের মনে মনে বললে—গায়ের লোক-
গুলোর এমন পাঞ্জি পচা-মন যে এমন লোকদেরও মন্দ
সন্দেহ করে । হোক না একবার সকাল, কাল আমি সব
মুখপোড়া মুখপুড়ীদের মজা টের পাঠিয়ে দেবো না ।

ধনিষ্ঠা প্রত্যহ প্রভাতে জ্ঞান সমাপন করে' পূজা করতে
বসে, এবং সূর্যোদয়ের পর গৌরীর জাগ্রত সময় হলে
সে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে । এই ঘটনার পরদিন

প্রভাতে সে যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন অল্প
দিনের চেয়ে বিলম্ব হয়ে গেছে ; সে বাইরে এসে দেখলে
মাধবী তাদের পড়বার জায়গায় বিছানা পাড়ছে । ধনিষ্ঠা
মাধবীকে ডেকে বললে—মাধী, আজ থেকে এখানে আর
বিছানা পাড়তে হবে না...

ধনিষ্ঠার কথার আওয়াজ শুনে মাধবী তার দিকে
চোখ ফিরিয়েই কপালে করাঘাত করে' ক্ষুব্ধ হয়ে বলে'
উঠল— আঃ আমার পোড়া কপাল ! ও করেছে কি ?

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি স্থলিত ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে
একটু মুচকি হেসে মাধবীর আক্ষেপকে চাপা দিয়ে নিজের
পূর্বস্মরণ কথার ক্ষেত্র টেনে বললে—আজ থেকে আমি
আর পড়ব না । গৌরীকে স্কুলের মাষ্টার মহাশয়রা পড়াতে
আসবেন ; বাব-বাবুদের সিঁড়ির উপরের ঘরটা গৌরীর
পড়ার ঘর হবে...

মাধবী ধনিষ্ঠার কথা শুনেও না শোনা ভাবে পাড়া-
বিছানা তুলে ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি কি কাণ্ডখানা
কবেছ মা ? অমন বেশমের মত চুলগুলো কোন্ প্রাণে
তুমি কেটে ফেললে ?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ হেসে বললে—গৌরীর চুল বাঁধবার গুছি
নেই...

মাধবী আবার কপালে করাঘাত করে' বললে—আমার
মাথা আর মুণ্ড ! কাকে বোকা বোঝাচ্ছ মা ! মেম-দিদি-
মণির চুল হল কটা ভুট্টার কেশের মতন, আর তোমার চুল
হল কালো বেশমের ঝালরের মতন ; তোমার চুলের গুছি
দিয়ে মেম-দিদিমণির চুল বিননী করলে দিব্যি শখচুড়
সাপের মতন দেখতে হবে !

কাল জানো ধনিষ্ঠাকে তার মনেরও অগোচর অনলের
প্রতি প্রসক্তির কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়াতে ধনিষ্ঠা সমস্ত
রাত ভেগে নিজের অন্তরের অহুসস্থান আর হৃদয়ভাবের
বিশ্লেষণ কবেছে ; সেই সূত্রে তার হঠাৎ মনে হল প্রায়শ্চিত্ত
করতে গিয়ে সে চুল কাটতে হবে বলে' ভয় পেয়েছিল সেও
তো ঐ অনলের কাছে তাকে কুশী মেধাবে মনে করে' । তা
হলে জানো যে সন্দেহ প্রকাশ করে' গেছে তা তো সত্য ।
এই কথা মনে হতেই রাতেই ধনিষ্ঠা বিছানা থেকে উঠে
কাঁচি দিয়ে সমস্ত চুল গোড়া থেকে পুঁচিয়ে কেটে

কেন্দ্রে। নিজের মনের কাছেও অস্বীকৃত সেই লজ্জার কথা চাপা দেবার জন্তে ধনিষ্ঠা হেসে মাধবীর কথার জবাব সেরে দিয়ে বললে—তুই বার-বাড়ীর রাস্তার ধারের কোণের গোল ঘরটার আমার পূজা করবার সব জোগাড় করে' দিস। আমি আজ থেকে সেই ঘরে পূজা করবো...

মাধবী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন, ঠাকুর-ঘরে কি হল ?

ধনিষ্ঠা বললে—পূজারী-ঠাকুর যখন পূজা করেন তখন আমি ত সে ঘরে পূজা করতে পারি না ; অনেক সময় আমি পূজা করতে বসতে না বসতে তিনি এনে পড়েন, আমাকে তাড়াতাড়ি...

মাধবী বিরক্ত হয়ে বললে—এর নাম তোমার তাড়া-তাড়ি পূজা সারা। সেই ভোরবেলা ঠাকুর-ঘরে ঢোকা আর সাতটা-আটটা বাজলে বেরোও ; তারপর আবার ছুপুরবেলা আছে, সন্ধ্যাবেলা আছে...

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—ভগবানকে ডাকার কি সময় অসময় আছে রে ! তাঁকে অষ্টপ্রহর...

মাধবী মাথা নেড়ে বললে—তাইতে লেখাপড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে একেবারে সারাক্ষণ ঐ এক পূজা-অর্চা নিয়েই থাকতে হবে ! আহা! নিজে তো ত্যাগ করেইছ, একটু সময় তবু লোকে বাইরে দেখতে পেত, এখন থেকে আর.....

ধনিষ্ঠা মাধবীর বকুনি খামিয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বললে—দেখিগে গৌরীর মুখ ধোওয়া জামা পরা হয়েছে কি না.....দেখ মাধী, আমার ঘরের পাথরের ঘড়ীটা পূজার ঘরে দিস.....

মাধবী নিজের মনে গজর গজর করে' বকতে বকতে বলতে লাগল—বাই দেখি গে, বামুন-দিদির নাওয়া হয়েছে কি না ; পূজার জো করে' রাখাই গে.....এখন আলাদা ঘরে পূজার জো হবে, সে ঘর থেকে তো টেনে বার করাই দায় হবে.....এমন অত্যাচারে শরীর আর কদিন টিকবে ? মাহুঘের শরীর তো !..... চের চের বিধবা দেখেছি, কিন্তু এমন করে' আপনা থেকে সোয়ামীর জন্তে দণ্ডে' মরতে কাউকে দেখিনি ; এর চেয়ে যে সহ-

মরণে পুড়ে মরা ছিল ভালো.....পূজার ঘরে আবার ঘড়ী ! ঘড়ীর দিকে খেয়াল থাকবে কিনা.....

*
*

ধনিষ্ঠা নূতন পূজার ঘরে দিয়ে দরজা বন্ধ করে' পূজায় বসেছে। গৌরী মায়ের পূজা শেষ হবার আশায় বার বার এসে রুদ্ধ দরজার বাইরে থেকে ফিরে গেছে, দরজা ঠেলে মাকে ডাকতে তার খুবই ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে পূজার ঘরের দরজা ছুঁতে সাহস করে নি।

ধনিষ্ঠা অপ পূজা স্তবপাঠ করে'ও কিছুতেই মন থেকে অনলের চিন্তা দূর করতে পারছিল না ; তার কেবলই মনে হচ্ছিল অশুভদিন এতক্ষণ তিনি এসে পড়াতে বসতেন ; আমি পড়া বন্ধ করাতে তিনি না জানি কি মনে করেছেন ; এখন তিনি বাসায় একলাটি কি করছেন ; এই যে সময়টা তিনি পড়ানোর কাজে ব্যস্ত করতেন, এখন থেকে সেটা কি কাজে লাগাবেন ? পড়বেন বোধ হয়। একা তিনি, বিয়ে করেন না কেন ? তা হলে তো তাঁকে দেখবার শোনবার একজন লোক হয়। নিজে উদ্বোধন করে' বিয়ে করতে বোধ হয় ঠিক লজ্জা করছে ; কোনো দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু কি তাঁর কেউ নেই যে তাঁকে বিয়ে করতে অহরোধ করতে, জেদ করতে পারে ? আমি অহরোধ করব ? কেন করব, আমি তাঁকে বিয়ে করতে অহরোধ করব কোন্ অধিকারে আর তিনিই বা আমার অহরোধ শুনবেন কেন ? আমার কর্ণচারীদের মধ্যে আরো কত লোকের হয় তো বিয়ে হয় নি, স্ত্রী মারা গেছে, তাদের তো আমি অহরোধ করতে যাই নি, তবে এঁকেই বা অহরোধ করব কেন ? দেশে গুনি লোকের ডয়ানক কস্তাদার, এমন কস্তাদারগ্রন্থ লোক কি দেশে কেউ নেই যে এমন সংপাত্রকে জেদ করে' কস্তা সস্তাদান করে ?

এই কথা মনে হতেই ধনিষ্ঠার কেমন একটা অস্বীকৃত আতঙ্ক উদয় হল...যদি বাস্তবিকই কেউ তাকে জেদ করে' ধরে' বসে আর তিনি বিয়ে করেন ? এই আশঙ্কা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিলে—“বিয়ে যদি করেন সে ভালোই তো।” কিন্তু এতদিন অনল যে বিয়ে করে নি তার জন্তে একটু কীণ

আনন্দের আভাস ও ভবিষ্যতে বিয়ে করার সম্ভাবনার ভয় তার মনের কোণে গোপন হয়ে থেকে গেল।

ধনিষ্ঠা এই চিন্তা থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্তে ভাবতে লাগল গৌরী আজ নতুন মাটারের কাছে পড়ছে, তার না জানি কেমন লাগছে! এতদিন সে নিজের জ্যেষ্ঠার কাছে পড়েছে, পড়ার সঙ্গে স্নেহ মিশ্রিত থাকতে পড়ার কঠোরতা সে কখনো অনুভব করে নি; আজ নিঃসম্পর্কীর কাছে পড়তে তার কেমন লাগছে? খুব ধারাপ লাগছে—নিশ্চয়ই...আজ আবার তার মা তার সঙ্গে নেই। 'ওঁর মতন অমন সুন্দর করে' আর কেউ পড়াতে পারবে কি? 'উনি কী চমৎকার পড়াতেন! এই অল্প কদিনেই আমরা হেসে খেলে কত কি শিখেছি—যদি আরও কিছুদিন পড়তে পেতাম..... যাক গে আমি বিধবা মাতুল, বেশী লেখাপড়া শিখে কি করব.....সেই সময়টাতে ভগবানের নাম করলে পর-কালের কাজে লাগবে.....

ধনিষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল।

পাথরের ঘড়ীতে তীক্ষ্ণ মধুর শব্দে টং করে' একটা বাজল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলে সাড়ে দশটা বাজল। অমনি সে তাড়াতাড়ি জপ সাক্ষ করে' প্রণাম করে' উঠল এবং জানুলার কাছে গিয়ে বসে' খড়খড়ির একটি পাখী তুলে বাইরে দেখতে লাগল। সেই ঘরের সামনেই সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রকাণ্ড বড় উঠান; কল দিয়ে ছাঁটা ঘাস একখানি দামী বনাভের ফরাসের মতন দেখাচ্ছে; সেই ঘাসের বুকের উপর দিয়ে লাল শুকী ফেলা আঁকা-বাঁকা পথ; উঠানের মাঝখানে একটি তোকোণা ছোট বাগান পাতা-বাহার আর ফুলের গাছে সুসজ্জিত হয়ে আছে; বাগানটির সীমার তিন দিকে ফুল-কাটা বেঁটে বেঁটে লোহার খুঁটি পোতা আছে ও খুঁটিতে খুঁটিতে কালো রং করা মোটা লোহার শিকল মালার মতন লব্ধিত আছে; বাগানটির মাঝখানে খেত-পাথরে বাঁধানো একটি ছোট চৌবাচ্চা আছে, তাতে লাল-মাছ খেলা করে' বেড়ায়। এই উঠানের এক পাশে ঠাকুর-বাড়ী, আর এক পাশে কাছারী-বাড়ী, সামনে খুব উঁচু দেউড়ি—তার ভিতর দিয়ে পথ সোজা নদীর

দিকে চলে গেছে। দেউড়ির ছপাশে দুটি দীর্ঘিকা, দীর্ঘির জলে দলে দলে হাঁস চরছে। দেউড়ির সামনে পথের ছধারে দুটা বলরামচূড়া গাছের শীর্ষ দেখা যাচ্ছে। দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঝড়ু ঝড়ুদার, তুফানী দপ্তরী আর আশামুগা ফরাস কাছারীতে এল—সাড়ে দশটার সময় ভৃত্যদের আসতে হয়; ১১টার সময় বাবুরা আসে, তার আগে চাকরেরা এসে ঘর-দোর ঝেড়ে, ফরাস টেবিল চেয়ার সাফ করে', পেঙ্গিল কলম কেটে, লোয়াতে কালী ভরে' কাজের আয়োজন সব ঠিক করে' রাখে, ঘেন বাবুরা এসেই কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ভাগুরী মুকুন্দ বহু দরজার তালাগুলো প্রকাণ্ড এক গোছা চাবি নিয়ে ক্রমে ক্রমে খুলে দিতে লাগল, ঝড়ু ঝড়ু দিয়ে ধূলা ঝাড়তে প্রবৃত্ত হ'ল; দপ্তরী পেঙ্গিল কলম পরীক্ষা করে' দেখছে আর যেটি মনে হচ্ছে ভোঁতা হয়েছে সেইটে একটু একটু টেঁচে দিচ্ছে অথবা ষ্টীল-পেনে নূতন নিব পরিষে দিচ্ছে। ক্রমে আরও ভৃত্যেরা এসে একে একে কর্ষে নিযুক্ত হতে লাগল।

ধনিষ্ঠা এইসব দেখছে আর এক-একবার ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। পোনে এগারোটা। বৃদ্ধ মহীপৎ সিং তার গুল চাপ দাড়িকে বেলাতটে আছড়ে পড়া সমুদ্রের চেউয়ের মতন মোচড় দিতে দিতে ঠাকুরবাড়ীর দিক থেকে এসে কাছারীর ছড়-দেওয়া বড় বড় খামওয়াল বারান্দার উপর উঠল—এই মহীপৎ সিং অনলের আপিসের ষারবান্। তাকে দেখেই ধনিষ্ঠার চিত্ত কেন উতলা হয়ে উঠল। সে আবার ঘড়ীর দিকে ফিরে দেখলে তখনও এগারটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। মহীপৎ সিং অনলের আপিস-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তার উর্দির চাপকান হাত দিয়ে চেপে চেপে চোস্ত করতে মনোনিবেশ করেছে। ধনিষ্ঠা বুঝলে সে তার প্রকুর আগমনের প্রতীক্ষা করছে। এগারোটা বাজতে আট মিনিট। জমানবিশ রমানাথ-বাবু আর মহাক্ষেজ ঈশান-বাবু ছাতা মাথার দিয়ে আপিসে এলেন; শুভারনবীশ তাহের-উদ্দিন মুন্সি, খাজাঞ্চিখানার মোহরের কিফায়েৎ হোসেন একসঙ্গে এসে কাছারীবাড়ীর সিঁড়িতে উঠছেন, পিছনে এসে উপস্থিত হলেন খাজাঞ্চি পরাণ-বাবু, পোদার লক্ষ্মীদাস, সেহানবিশ সমরেশ-বাবু।

সময় মত এগরোটোর ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে লাগল কঞ্চচাণী-দের ডিড়ও তত বাড়তে লাগল, একে একে ছুয়ে ছুয়ে তিনে তিনে সব এসে কাছাবিতে উঠছে। কিন্তু ম্যানেজারের ত এখনো দেখা নেই। তিনি সর্বপ্রধান কর্মচারী, তিনি বোধ হয় পরে আসেন। কিন্তু তিনি ত অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, তিনি ত দেবী করে' আসবার লোক নন। তবে কি তিনি এসে গেছেন, সে তাঁকে দেখতে পায় নি। এই সম্ভাবনার শঙ্কা মনে হতেই ধনিষ্ঠার মন কেমন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তবু সে গড়খড়ির ফাঁক দিচ্ছে এপাশ ওপাশ বতদূর দেখা যায় ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল কোথাও অনলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। বৃদ্ধ পেশ্কার হরকান্ত-বাবু আত জর্গ ময়লা তালি-দেওয়া শাদা কাপড়ে ছাওয়া একটি ছাতা কাঁধ কবে' স্থবির শরীর নিয়ে এলেন। এগরোটো বাজতে পাঁচ মিনিট। হরকান্ত-বাবুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়েই ধনিষ্ঠা দেখলে দীর্ঘোন্নত সরল-শরীর অনলকান্তি অনল কাছারীতে আসছে, তার মাথায় ছাতা নেই, রোদ লেগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কৃষ্ণিত কেশের তলায় কালো রেশমের ঝালরের মুখে মুক্তার ধরের মতন কপালের উপর স্বদবিন্দু রৌদ্রালোকে চকচক করছে। তার পিছনে পুংগটাদ পাঠক অনলের আদালী একটা ষ্টিলের ডেসপ্যাচ বক্স আর তার উপরে কাগজপত্রের কতকগুলো ফাইল চাপিয়ে কাঁধে করে' আসছে। অনল কাছে আসতেই দেউড়ীর পাহারা-ওয়াল কটিলম্বিত কোষবন্ধ তরবারী মুহূর্তমধ্যে অর্ধমুক্ত ও পুনঃ-কোষবন্ধ করে' বাঁ হাতে তরবারি চেপে থেকে ডান হাত উল্টে কপালের পাশে উত্তানভাবে ঠেকিয়ে রীতিমত সামরিক কার্যায় সেলাম করলে। অনল কাছারী বাড়ীর নীচে যেতেই মালখানার পাহারাওয়াল হঠাৎ টহলানো থেকে সমুখ ফিরে ধমুকে দাঁড়াল এবং মুহূর্তমধ্যে কাঁধ থেকে সজীন-গোঁজা বন্দুক নামিয়ে সামনে মাটির উপর ঠেকিয়ে খাড়া করে' ধরলে এবং অনল তার সামনে থেকে সরে' যেতেই সে আবার বন্দুক তুলে ছবার ছুহাতে লুকে কাঁধে রেখে আগের মতন মালখানার মোটা লোহার পরাদে-দেওয়া দরজার সামনে টহলাতে লাগল। অনলকে আসতে দেখেই যে যেখানে যে কর্ণে নিবৃত্ত ছিল সে সেই

কর্ণ কণকালের জন্ত বন্ধ রেখে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল এবং অনল যার যার সামনে নিয়ে বা দৃষ্টিপথ দিয়ে যেতে লাগল সেই সেই ঝুঁকে ঝুঁকে প্রণাম সেলাম নমস্কার নিবেদন করতে লাগল। অনলের এই সম্মান দেখে ধনিষ্ঠার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধনিষ্ঠা বলে' বসে' তন্নয় হয়ে দেখতে লাগল অনল নিজের আপিস-ঘরের সামনে যেতেই মহাপং সিং ঈশং নতাহয়ে প্রভুকে সেলাম করলে। অনল প্রত্যেকের অভিবাদন প্রত্যাৰ্পণ করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। মালখানার সামনের পাহারাওয়াল পেটা-ঘড়ীতে জোড়া জোড়া ঘা ঘন ঘন দিয়ে এগারোটা বাজালে।

ধনিষ্ঠা এইবার উঠবে-উঠবে মনে করতে করতেও জান্‌লার ফাঁকে চোখ পেতে বসেই রইল কেন তা নিজেও ঠিক স্পষ্ট জানে না, হয় তো অনলকে আর-একবার দেখতে পাবার ইচ্ছা তখনো তার মনের তলে গোপন হয়ে ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে অনল আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধনিষ্ঠার মুখ আবার উৎফুল্ল, দৃষ্টি বিক্ষারিত হয়ে উঠল। অনল এক-একবার প্রত্যেক ঘরে-ঘরে গিয়ে কে এসেছে না এসেছে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। এইবার ধনিষ্ঠা উঠে পড়ল এবং বেকবে বলে' ঘরের দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলেই ধনিষ্ঠা দেখলে দরজার সামনে দরজা থেকে দূরে দালানের রেলিঙে ঠেস দিয়ে গৌরী চূপ করে' বসে' আছে, তার পাশে বসে' আছে তার দাসী। ধনিষ্ঠা গৌরীকে দেখেই হাসিমুখে স্নেহভরা স্বরে বলে' উঠল— কি মা, ওখানে বসে' কি হচ্ছে ?

দাসী বললে—মাটার মশায় পড়িয়ে চলে' গেলেন আর দাঁদিমণি তখন থেকে ঠায় এখানে এসে বসে' আছেনকত বললাম যে খাবে চলো, খেলা করিগে চলো, তা নড়লো না.....

দাসীর কথা শুন্তে শুন্তেই ধনিষ্ঠা ব্যগ্র পদে অগ্রসর হয়ে এসে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে গাল টিপে আদর করলে এবং হেসে বললে—মরে' বাই আমার বাছা রে !

গৌরী ম্লান মুখে কাতর স্বরে ধনিষ্ঠাকে বিজ্ঞাসা করলে—মা, তুমি এতকণ কেন পূজো করো ?

বালিকার এই প্রস্নেও ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জার লাল হয়ে উঠল, সে গৌরীকে বুকের মধ্যে সবলে চেপে ধরে' বললে—পুছো ত করি ছাই! পুছো করিতে চাই, হয় না মা। আমি যে মহাপাপিষ্ঠা!

দাসী বলে' উঠল—তুমি যদি পাপিষ্ঠি মা, তবে পুণ্য-বতী কে? তুমি যে কি তা দেশের সবাই জানে।

ধনিষ্ঠা হতাশাভরা উদাস করে বলে' উঠল—সব লোক-দেখানো ভড়ং রে, সব লোক-দেখানো ভড়ং! আমি যে কী তা অন্তর্ভামী জানেন!

ধনিষ্ঠার গলার আওয়াজ শুনে পেয়ে মাধবী হনহন করে' সেইদিকে আসছিল; সে বারান্দার বাঁক ফিরেই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' ধাঁড়িয়ে আছে দেখেই থমকে ধাঁড়িয়ে গেল এবং হাতের উল্টা পিঠ আঙুল মুড়ে গালে ঠেকিয়ে ঘাড় কাত করে' বিষয় জানিয়ে বলে উঠল—মা, দিবিয় আক্কেল তো তোমার! তিন পহর বেলায় তো পুছোর ঘর থেকে বেরলে। তার পর বেরতে না বেরতে সবাইকে ছুঁয়ে নেড়ে ঠিক করে' রেখেছ! খাওয়া-দাওয়া আজ তা হলে শিকের তোলা রইল।

গৌরী মাধবীর ভাব দেখে ও কথা শুনে ভয়-সঙ্কচিত মান মুখে কাতর মুহু করে বললে—মা, আমি তো তোমার ছুঁইনি, তুমি কেন আমাকে কোলে নিলে?

গৌরীর মান মুখের কাতর কথা ধনিষ্ঠার বুকে গিয়ে বাজল, সে ব্যথিত হয়ে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' বললে—বেশ কর, মা, আমি তোমাকে বুকে চেপে ধরব, তোকে বুকে চেপে না ধরলে বুকে যে আমার ভেঙে যাবে।

মার মুখে এই কথা তাকেই আদর মনে করে' বালিকা

গৌরীর মনের মানি অনেকখানি কমে' গেল বটে, কিন্তু মাধবীর ভাবভঙ্গী ও কথা তার কোমল মনে বিদ্ধ হয়ে রইল যে তার মাকে তার হোঁরা অত্যন্ত অন্ডায়।

গৌরীকে নীরব দেখে ধনিষ্ঠা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—আজ নতুন মাটার-মশায়ের কাছে পড়লে, গৌরী? কেমন লাগল?

গৌরী ধনিষ্ঠার বুক থেকে মাথা তুলে ধনিষ্ঠার মুখ দেখবার চেষ্টায় মাথাটিকে একটু পিছন দিকে হেলিয়ে কর্ণধরে জোর দিয়ে বললে—আমার একটুও ভালো লাগল না। বাবা আর কেন পড়াবে না মা? তুমি কেন পড়তে গেলেনা?

ধনিষ্ঠা দাসীদের সামনে গৌরীর মুখে একই কথার মধ্যে অনলকে বাবা ও তাকে মা সযোজন করিতে শুনে লজ্জা অহুভব করলে; তার মন এখন অনল সঘনো সঙ্গাপ হয়ে উঠেছে বলে' সে গৌরীর কথা বেতাবে অহুভব করলে, অশিক্ষিত ও গৌরীর ঐরূপ সযোজনে অত্যন্ত দাসীরা সেভাবে মোটেই শোনেনি। ধনিষ্ঠা লজ্জিত হাসি হেসে গৌরীকে বললে—তিনি নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন, পড়বার সময় হয় না। আর আমি বুড়ো মানুষ আর কত কাল পড়ব? আজ থেকে আমি তোমার কাছে পড়ব। তুমি যা পড়ে' আসবে তাই আমাকে পড়াবে। আমি তোমার ছাত্রী হব। কেমন?

ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে গৌরী বললে—সে বেশ হবে মা। আমি হব তোমার মাটার!

ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে যেতে যেতে বললে—অনেক বেলা হয়েছে, চলো, খাবে চলো।

(ক্রমশঃ)

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১৪ই জুলাই ১১]

ও

প্রিয়বরেষু

শেষকালে নাটকটা (অচলায়তন) প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি কাঁটাকাটি চলবে এই আমার একটা মন্ত সাধনা।

তোমাদের সর্ষর্কনাটা শেষ হ'য়ে গেলে সেটা নিঃশেষে হজম করবার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার স্মরণ হবে। সমস্ত জিনিষটা আর-একবার মেজে ঘসে' বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মতো ক'রে নিয়েছি।

জীবনযুঁতিটা নিয়ে পড়েছি—ওটাও সাফ-সোফ ক'রে দিচ্ছি—খুব মনোযোগ ক'রে দেখ্‌লুম,এ-রচনাটা সাহিত্যে চলবার মতো হয়েছে—নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২৩ দিনের মধ্যে ওর প্রথম কিস্তিটা পাঠিয়ে দেবো।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

tmark—London

১ই আগষ্ট, ১২]

Telegram
"Whitemore"

Butterton Vicarage,
Newcastle,
Staffs.

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। দেশ থেকে যাত্রা করবার সময় মনে করেছিলুম কিছুকালের জন্যে মাহুকের ঘূর্ণির মধ্যে থেকে পরিজ্ঞান পাবো। এদেশে মাহুকের অভাব আছে, এমন কথা আমার মনে ছিল না—কিন্তু অপরিচিত জায়গায় সুবিধা এই যে, ভিড়ের মাঝখানেই নিরালা পাওয়া যায়, তাই ভেবেছিলুম অপরিচয়ের তট-ভূমিতে একলা দাঁড়িয়ে এখানকার জনসমূহের তরঙ্গলীলা

দেখতে পাবো। কিন্তু বুঝতে পারা গেল, আমার কুণ্ঠিতে ওটা লেখে না। লণ্ডনের পাকের মধ্যে খুব একচোট ঘুর খেয়ে কয়েকদিন হ'ল পাড়াগাঁয়ে একটি পাত্রির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষে এও ঠিক উল্টো ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ ভিড়ের মধ্যে থাকতে গেলে অপরিচিত হওয়ার সুবিধা আছে, ফাঁকা পাওয়া যায়—কিন্তু দুই-একজনের সঙ্গে বাস করতে গেলে রীতিমত বন্ধু না থাকলে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা লোক খুব ভালো, সন্দেহ নেই।

আষাঢ় মাসের প্রবাসী ও জুন মাসের Modern Review আমাকে পাঠালে না কেন? লণ্ডন থেকে দূরে থাকতে এবারকার মেল এখনো হস্তগত হয়নি। হয়তো আজ পাওয়া যেতে পারে—দেখ'ব তা'র সঙ্গে এসেছে কি না। বিদেশে দেশের বাণীর জন্যে মন উৎসুক হ'য়ে থাকে। অতএব তোমাদের কাগজপত্র পাঠাতে অবহেলা করো না। বলা বাহুল্য, Thomas Cook and Son, Ludgate Circus, London ঠিকানায় আমার চিঠি পাঠানোই ভালো। সত্যজ্ঞকে আমার অন্তরের স্নেহ জানিয়ে—সে আজ এখানে থাকলে কত আনন্দ হ'ত।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

[Postmark—London

13 Sept. 13]

আমার ঠিকানা

21, Cromwell Road,
South Kensington,
London S. W.

প্রিয়বরেষু

বারম্বার আমার সম্মান-সর্ষর্কনার কথা কাগজে পড়তে পড়তে আমি যে কতটা সঙ্কোচ অনুভব করছি সে কথা বলতে পারিনে। এখানকার লোকে আমার

* এই চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত চার্লস বন্ডোপাধ্যায়কে লেখেন।

রচনার আদর করুছেন, সে-ঘটনায় আমি পুলকিত হইনি এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তোমরা যখন সেই-সমস্ত খবর জোড়াজোড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে থাকো, তখন আমি বড় লজ্জা পাই। বিশেষত এবারকার প্রবাসীতে দেখ্‌লুম, Miss Radford এবং Miss Sinclair-এর চিঠি-ছুটো তর্জমা ক'রে দিয়েছ—আমি যে কি ভয়ে ভয়ে আছি—পাছে তোমরা ওগুলো Modern Reviewতে তুলে দাও—তা আমি বলতে পারিনে। ওগুলো প্রাইভেট পত্র; ছাপা হ'লে হয়তো তাঁদের পক্ষে বিশেষসঙ্কোচের কারণ হবে এবং ওটা ঠিক সঙ্গত হবে না। অবশ্য কি করেছ জানিনে এবং যদি ক'রে থাকো নিবেদন ক'রে প্রত্যাখ্যান করবারও সময় নেই। কিন্তু দোহাই আমার—এখানে প্রাইভেট-ভাবে কে কি বলছেন তা নিয়ে প্রকাশ্য পত্রে আলোচনা করো না।

বহুকাল পরে কাল ১লা আশ্বিন ১লা আষাঢ়ের প্রবাসী পেলুম। অন্ত্যায় মাসের প্রবাসী ঠিক সময়েই পেয়েছি, কেবল ঐ আষাঢ়টাতেই আটকে গিয়েছিল।

য়েট্‌স যে বইটা edit করুছেন সেটা ভূমিকাসমেত ছাপাখানায় গেছে—বোধ হচ্ছে, অক্টোবর মাসের মধ্যেই বের হ'তে পারবে। হাতে আরো অনেকগুলো জমেছে। ছোটো গল্প আরো গোটাকতক পেলো মন্দ হ'ত না। সুকুমার কিছু তর্জমা করতে শুরু করেছে। সুকুমারের তর্জমা মন্দ হয় না। গোটাটিনেক নাটক ক'রে ফেলেছি, কবিতাও কম হয়নি। শেষ বয়সে যে আমাকে ইংরেজি ভাষার সাধনা করতে হবে, সেকথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে আমি হয়তো আমার লেখার সমালোচক হবো—ইহজন্মে তা'র একটা ভূমিকা হ'ল, নিজের লেখার নিজে অল্পবাদক হওয়াও একটা উৎকর্ষ ব্যাপার—ওতেও নিজের রচনাকে কম পৌড়ন করতে হয় না, একেবারে তা'র সর্কায়ে কালশিটে পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রামানন্দ-বাবুকে বোলো, Modern Reviewর অন্ত রোটেনস্টাইনকে লিখতে একটু যেন পীড়াপীড়ি ক'রে ধরেন। Modern Reviewর প্রতি তাঁ'র খুব একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় আর্ট-সম্বন্ধে তিনি যদি

একটা সমালোচনা লেখেন এবং আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সহৃদয়তা দেন তা হ'লে সেটা নিশ্চয়ই উপদেশ হবে। জ্যোতিদাদার ছবি তাঁ'র অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তাঁ'র চিত্রকলা-সম্বন্ধে এখানকার কোনো-একটা কাগজে তিনি লিখবেন মনে করেছেন।

জীবনস্বত্তিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন। ও বইটা কি বিক্রি হবার আশা আছে? বিপরীত-রকম খরচ করেছে।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Postmark—South Kensington
17 May, 13]

C/o Messrs Thomas Cook & Son,
Ludgate Circus,
London.

প্রিয়বরেষু

চাক, আসল কথা—আমার আদবে আর লিখতে ইচ্ছা করে না। কলমের সঙ্গে মনটাকে জুতে আজ পর্যন্ত তাকে হায়রান্ ক'রে ছুটিয়েছি, মারামারি ঠেলাঠেলি রক্তপাতও কম হয়নি—এখন মনে হয় এই লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে আর প্রবেশ করা নয়। প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর একটা যোগসাধন হ'য়ে গেছে এবং তা'র প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ আছে—সেই মমতা-বন্ধনে হয়তো আবার কোনোদিন জড়িয়ে পড়ব, কিন্তু মুক্তিলাভের অন্তেই চেষ্টা করতে হবে। আমার হাটের বেসাতী হ'য়ে গেছে বোধ হচ্ছে যেন—এবার ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ-লোক-সানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা হ'তে হবে—নইলে রাজি এসে পড়বে—আর পথ দেখতে পাবো না।

তোমাদের সমাজে একটা লড়াইয়ের দিন এসেছে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহসম্বন্ধে আমাকেও বোধ হয় হার মানতে হবে। তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ, তখন আমার পাণ্ডব তোম্বার

শক্তি ভগবান্ অপহরণ করেছেন—জয়ী হবার পৌরব আর আমার সহিবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ বা ছিল তা একরকম চুকিয়েছি—এবার পায়ের কাজ, এখন বিদ্যালয়ের রাস্তার চলতে হবে, ঘুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। অতএব ঘোড়া হালকা ক'রে দিয়ে যাত্রা করা যাক—এখন আর গিছু ডেকো না।

এখান থেকে রওনা হ'তে বোধ হয় আর খুব বেশি দেরি হবে না। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508 W. High Street,
Urbana, Illinois,
U. S. A.

ও

প্রিয়বরেষু

চাক, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌঁচছে না কেন, জিজ্ঞাসা করেছি। তা'র একটা কারণ বললেই বাকীগুলো বলবার আর দরকার হবে না—কিছুকাল থেকে বাংলা একেবারেই লিখিনি। কোনো কালে যে এদেশে এসে ইংরেজিতে যে কোনোরকম লেখাপড়া কবুব একথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সেইজন্মেই বিদেশ-যাত্রার আরম্ভের মুখে খুব ক'বে কোমর বেঁধে দেদার বাংলা লিখতে শুরু করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইরকম অনর্গল চলবে। তোমরাও সেইভাবে পাত পেড়ে বসেছ। ইতিমধ্যে খেতখীপের খেতফুজা ভারতী বখন তলব দিলেন তখন ক্রমশঃ বুঝতে পারলুম এখানে আমাকে এখানকারই কাজ করতে হবে। সমুদ্রের ৬-পারের বরাদ্দ বন্ধ হ'য়ে এসেছে। এখানে তো চিরদিন থাকব না; এই ক'দিনের মধ্যে এখানকার কাজ যতটা পারি শেষ ক'রে দিয়ে যেতে চাই। অতএব এখন তোমরা জাক দিলে লাড়া পাবে না।

ইংরেজি পীতাম্বলি ম্যাকমিলন'রা ছাপ'বার ব্যবস্থা করছে। ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে। সুবিধা এই যে ইংলণ্ডে, আমেরিকার ও ভারতবর্ষে ওদের কাবুবার আছে। বোধ হয়, আর্বিচ কিছু সুবিধা হ'তেও পারে। এবারকার বইগুলো তো সব বিকিয়ে গেছে—লোকে খুব উৎসুক হ'য়ে উঠেছে—সকলের ভালোও লেগেছে—অতএব এইবার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে আমার বিদ্যালয়ের অকাল যুচ'তেও পারে। এদেশে বোধ হয় লক্ষী সরস্বতীর সতীন নন, কেননা এদেশে বহুবিবাহ আইন-বিরুদ্ধ—এই একটা মন্ত ভরসার কথা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে তর্জমা জ'মে উঠেছে। একবার লক্ষ্যার বাঁধ ডাঙলে তখন ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে আর কে ভয় করে? ছেলেবেলায় বেরকম ক'রে দুই পায়ের চিটি সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলি যেতুম, ঠিক তেমনি-ভাবেই ইংরেজি ভাষার বস্তু ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলি—মোদ্দা, চলা বন্ধ করিনি। আজ এই ধানিকরণ হ'ল শারদোৎসব তর্জমা ক'রে সেরেছি—কাল ওটা আরম্ভ করেছিলুম।

তুমি ভোজানোই, এদেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল। যতই চেষ্টা করি না কেন, বক্তৃতা না ক'রে পার পাবার জো নেই। সেজন্মে কিছু কিছু লিখতে হচ্ছে। এ কাণ্ডটা আমার কাছে তেমন হৃদয় নয়, অথচ এটার প্রয়োজন আছে। এদিকে ওদিকে নিয়ন্ত্রণ জুটছে—যতটা পারি কাটাবার চেষ্টার থাকি—কিন্তু বাদ-সাদ দিয়েও বাকি থাকে—বক্তৃতার নিয়ন্ত্রণ তো বিনা-বক্তৃতার সাবুবার জো নেই, তাই প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে—সামনে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে কোথাও অবকাশের টিকিমাত্র দেখতে পাচ্ছিনে।

—বাবুর জন্মে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি। আমি এদেশে ধ্যাতিলাভ কবুব কল্পনাও করিনি, সুতরাং সেজন্মে অগ্রসর হ'য়ে আসিনি—দৈবক্রমে জুটে গিয়েছে। এই ধ্যাতির সর্বপ্রধান সুখ এই যে এতে ক'রে আমাদের দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে—এ আমার একমাত্র জিনিষ নয়। কিন্তু কোনো একজায়গায় দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, সে আমারও দুঃখ।—বাবু বখন এ দেশে বন উপার্জন কব্বেন তখন আমি তাতে অন্তরের



প্লেটো এবং এরিস্টটল
অমরশিল্পী—র্যাফেল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

নদে স্থখী হবো, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আমাদের দেশের বে-কেউ বেটুকু সফলতা লাভ করতে পেরেছেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই।—বাবুর প্রতিভা কি তাঁর একলার সামগ্রী? তিনি যেখানে বহু সেখানে সে-মহত্ব আমাদের সকলেরই, কিন্তু যেখানে তিনি ক্ষুদ্র, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র। দস্য রত্নাকরের পুত্র-পরিবারেরা তা'র ঐশ্বর্যের ভাগ নিয়েছিল, কিন্তু তা'র পাপের ভাগ নিতে তো পারেনি। তাঁদের জ্যোৎস্না সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা'র কলক তা'র নিজের বুকেই দাগা থাকে। আমার কবিতার মধ্যে অযোগ্য জিনিষ ঢের আছে, আমার বাণীর সকল রঙেই যে উঁচু স্বর বেজেছে তা নয়—আমার প্রকাশের স্রোতের মধ্যে পাপের মূর্তিও যে প্রকাশ পায়নি একথা কখনই সত্য নয়—কিন্তু নদীর জলে কাদা মিশল থাকে বলে সেইটেই তো তার মুখ্য জিনিষ নয়—সেটা স্বেচ্ছা যদি তা'র জ্ঞান মানে পানে কাজে লাগে, তবে পৃথিবীস্থ লোক তো তাকে ক্ষমা করে—সেই ক্ষমা যদি—বাবুর কাছ থেকে একেবারে না পাই তবে আমার কবিত্বের গানির চেয়ে তাঁরি চিন্তের গানির জন্তে আমি বেশি বেদনা পাবো। এই গানি কবে এবং কেমন ক'রে দূর হবে জানিনে, কিন্তু প্রার্থনা করি, এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর জন্তে একটা কবিতা এই-স্থানে পাঠাই।

[“কে নিবিগো কিনে আমার
কে নিবিগো কিনে?”]

কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা আমার ষতগুলি কবিতা ছাপিয়েছ কোনোটাই নিজুল হয়নি। বোধ হয়, পাণ্ডুলিপি কেউ নকল ক'রে দিয়েছিল এবং নকলে তুল থেকে গিয়েছিল। কতগুলো তুল গুরুতর ছিল—কবিতার অর্থ বোঝা কেউ দৃষ্কার মনে করে না বলেই সেগুলো

ধরা পড়েনি। যাই হোক কবিতার উপর এরকম অল্প-মাত্র নির্ভরতাও ব্যথাজনক।

[পোঃ মার্ক.—শান্তিনিকেতন
৫ মার্চ, ১৪]

ও

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি, কিন্তু এগুলো গান, সেক্ষা মনে রেখো—স্বর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মতো—এ তো ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না।

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত

হ'ল উত্তলা,

বুকের পরে দোলে রে তার

পর্যাপ-পুতলা।

এর মধ্যে তো কোনো আইডিয়া নেই। এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে, সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্ছে—শাধা কথায় এর কোনো নেশা নেই—এইজন্তে কাগজে ছাপবার যোগ্য বলে এ'কে মনে করিনে। বরঞ্চ আর-একটা দিচ্ছি, সেটা যদিচ গান, তবু চলতেও পারে।

রাজপুরীতে বাজার বাশি

বেলা-শেষের তান।

পথে চলি, পথিক শুধায়

“কি নিলি তোর দান?”

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা তত্ত্বাবোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখতে গিয়ে দেখলুম মনের মতো হ'ল না। তবু ষিক্সেজের কাছে কপিটা কিছা ওর প্রকৃ চেয়ে নিয়ে দেখো, যদি চলনসই মনে করো, তবে প্রবাসীতে নিতে পারো। কিন্তু ছাপবার কি সময় আছে? ইতি বৃহস্পতিবার।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(২)

আমি বরাবর টেক্সট্ বকের সমস্তটার উপর প্রশ্ন লিখিয়া দিতাম; কোন শ্লোক বাদ দিতাম না— কোন শ্লোকটির সংস্কৃত টীকা লিখিতে দিতাম, কোনটির বা ইংরেজি অনুবাদ করিতে দিতাম। কোনটির বা বাচ্যপরিবর্তন করিতে দিতাম, কোনটির বা মর্মার্থ লিখিতে দিতাম; কোন শ্লোকের বা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন লিখিতে দিতাম। ফলতঃ আমার প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই প্রায়ই পড়িত। একত্র খুব মনোযোগের সহিত ছাত্রেরা আমার প্রশ্নগুলি গুণিত ও লিখিয়া লইত। একদিন এমন সময় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব ও এসিস্ট্যান্ট্ সেক্রেটারী ব্রজ বাবু পশ্চাতে আসিয়া যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ছেলেরাও সাহেবকে দেখিয়াও চঞ্চল হয় নাই; নীরবভাবে প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইতেছিল। সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ব্রজবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন—“হরিশ! তুমি কি পড়াইতেছিলে? সাহেব তোমার ক্লাস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি হুগলি কলেজে সংস্কৃত পড়াইবার সময় বড় গোল হয় তাহা দেখিয়াছেন; কিন্তু এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। বাহা হউক, সাহেব তোমাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা কর।” আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং ক্লাসে আমার শাস্তিরক্ষার খুব প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

নিম্নে একটি ঘটনা লিখিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক বিচার করিয়া বলিবেন—আমি দোষী কি

নির্দোষী। পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংকলিত ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ নামক পুস্তকখানি প্রায় ১৬ বৎসরের অধিককাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ সময় মৎসংকলিত সংস্কৃত-পাঠ প্রথম ভাগ নামক পুস্তকখানি অনেক স্থলের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় আমি উহার ২য় ভাগ সংকলিত করি। ঐ শেষোক্ত পুস্তকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হইতে গদ্য অংশ সংগৃহীত করিয়া এবং মহাভারত হইতে বক-রাক্ষস বধ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রো-পাখ্যান পদ্য-অংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। এবং মোহমুদগর, নীতি-নিচয় প্রভৃতি নানা নীতিসূচক শ্লোকও দিয়াছিলাম। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া আমি ঐ দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃতপাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইবার উদ্দেশে সিণ্ডিকেটে পেশ করিয়াছিলাম। বইখানির সঙ্গে কে এম্ ব্যানার্জি টনি সাহেব, গাফ্ সাহেব, হান্‌লি সাহেব, এই ৪ জনের অভিমতগুলিও পাঠাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ঐ বইখানিতে খুব ভাল অভিমত দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড্ অফ্ সানস্ক্রিট স্টাডিস্ ঐ বইখানি পছন্দ করিলেন না। তৎকালে ঐ বোর্ডে কে এম্ ব্যানার্জি মহাশয়, মহেশচন্দ্র স্মায়রত্ন মহাশয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নীলমণি মুখো-পাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি কয়েকজন সভ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত ৪জন মেম্বার আমার পুস্তক মনোনীত করিলেন না। তাঁহারা সিণ্ডিকেটের উপর ভার দিলেন। তৎকালে সার্ব্ এল্‌ফ্রেড ক্রক্‌ট্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের প্রধান মেম্বার ছিলেন টনি সাহেব রেজিস্ট্রার ছিলেন; এবং ত্রৈলোক্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিস্ট্যান্ট্ রেজিস্ট্রার ছিলেন

আমি শেখোক্ত ব্যক্তির মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। টনি সাহেব যখন ঐ সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানি ও তৎসম্পৃক্ত মতগুলি ও বোর্ডের মতটি ক্রফ্ট সাহেবের হাতে দেন তখন এই বলিয়া দিয়াছিলেন,—“The opinion of an European is ten times valuable than the opinion of a native”। ক্রফ্ট সাহেব (যখন দেখিলেন যে সকল সাহেবই ঐ পুস্তকে ভাল মত দিয়াছেন তখন) ‘Oh yes’ এই বলিয়া সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানিকে ১ বৎসরের জন্য পাঠ্য করিয়া দিলেন। সিঙিকটে কোনরূপ বিচার উঠে নাই; নির্বিঘ্নে আমার বইখানি মনোনীত হইল। ইহাতে শ্রায়রত্ন মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া এবং প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিয়া কৃতকার্য হইলাম দেখিয়া কিছুকাল পরে আমি ‘রূপকরত্নম্’ নামে একখানি ফার্মস্ট আর্টস্ পাঠ্য সংগৃহীত করিলাম। উহাতে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বেণী-সংহার প্রভৃতি নাটক ইহাতে সম্বর্ত্ত সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে স্ত্রীলোকের বর্ণনা ছিল না; বীররস ও শাস্তিরসের বর্ণনা ছিল। বইখানি সিঙিকটের সভায় পেশ করিবার পর পূর্ববৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ মহাশয়, এই তিন জনে মত দিলেন না। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সারদা মিত্র জজ মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মহাশয় এবং আর-একজন হাইকোর্টের উকীল, নাম গোলাপ শাস্ত্রীসরকার এম্-এ এই চার জনে মত দিলেন; বিশেষতঃ বঙ্কিম-বাবু আমার পুস্তকের জন্য খুব লড়াই করিয়াছিলেন। এ কথা আমি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বঙ্কিমবাবু তোকে এত ভালবাসে কেন?” আমি বলিয়াছিলাম, “বঙ্কিমবাবুর প্রথম তিনখানি পুস্তক অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ আমাদের ছাপা-খানায় ছাপা হইয়াছিল। সেই স্মৃতিতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। এতদ্বিধে তাঁহার দুইটি দৌহিত্র

আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এইরূপে ‘রূপকরত্নম্’ এক বৎসরের জন্য পাঠ্য হওয়াতে শ্রায়রত্ন মহাশয় আরও বিরক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়া লইলেন, যে, এখন হইতে আর কোন বাহিরের লোককে কোন পাঠ্য পুস্তক করিতে দেওয়া হইবে না; বোর্ডের মেম্বরগণ আপনারা পুস্তক প্রস্তুত করিবেন। তদনুসারে মহেশচন্দ্র শ্রায়রত্ন মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়, এই তিনজনে একত্র হইয়া একখানি প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিলেন। ঐ পুস্তকের পাদটীকা তাঁহারা সংস্কৃত লিখিয়াছিলেন। ঐ পাদটীকা-সকলে দুইচারিটি সংস্কৃতব্যাকরণভুল হইয়াছিল। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী, এম্-এ এবং বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল বিভাগের হেড পণ্ডিত শ্রীমান্ চন্দ্রোদয় বিদ্যা-বিনোদ এই দুই জনে “হিতবাদী” সংবাদপত্রের ৩টা সংখ্যায় ঐ ভুলগুলি ছাপাইয়া দেন, এবং শ্রায়রত্ন, নীলমণি ও কৃষ্ণকমল এই তিনটি নামের উপর রসিকতা করিয়া বেশ দুই চারিটি তামাসা করিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, এবং এক কলমও লিখি নাই। হিতবাদী কাগজের ছাপা পাঠ করিয়া শ্রায়রত্ন-মহাশয় সার্ব আলফ্রেড্ ক্রফ্ট ডিরেক্টর মহাশয়ের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন যে “কলিকাতার মধ্যে হরিশ ছাড়া এমন কোন পণ্ডিত নাই যে আমাদের তিন জন কর্তৃক বিরচিত পুস্তকের দোষ ধরে। এসব কার্য হরিশের নিশ্চয়।” শ্রায়রত্ন-মহাশয় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তুমি এইগুলি লিখিয়াছ কি না। যদি জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে আমি প্রমাণ করিয়া দিতাম, যে, আমি উহা লিখি নাই। তিনি আমার নামে ঐরূপ দোষারোপ করিতেছেন শুনিয়া আমি শপথ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি উহার কিছুই করি নাই। তিনি চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে রসগোল্লা খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এ কার্য কে করিয়াছে, বল, হরিশ কি লিখিয়াছে?” চন্দ্রোদয় বলিয়াছিল—“মহাশয়, ইহা আমিই করিয়াছি; হরিশবাবু কিছুই করেন নাই। চন্দ্রোদয় আরও

বলিয়াছিল, “ভায়রস-মহাশয়, ডবী তুলিবার নয়। অর্থাৎ আপনি যতই কেন রসগোল্লা খাওয়ান, আমি কলম ধরিতে ছাড়িব না।” এই কথা উক্ত পণ্ডিত আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল। পূর্বোক্ত দুইটি লোকের কার্যে ভায়রস-মহাশয় আমার উপর একরূপ কুপিত হইয়া রহিলেন যে, আমাকে কিরূপে ঘোরতর অপদৃষ্টি করিবেন মনে মনে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকস্ট বুকসকলের উপর এক সেট প্রশ্ন খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, এবং ঐগুলি সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদিগকে ডিক্টেট করিতাম। তাহারা ঐসকল প্রশ্ন লিখিয়া লইত। আমি প্রত্যেক শ্লোকের উপর প্রশ্ন করিতাম তাহা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। এক বৎসর নীলমণিকে ও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কান্ট্রি আর্টস্ সংস্কৃত পরীক্ষক করিল। নীলমণিকে সকালের পেপার ও আমাকে বৈকালের পেপার দিয়াছিল। তখন মডারেশন্স সিস্টেম ছিল। সুতরাং ভায়রস-মহাশয়, গুরুদাসবাবু ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আমাদের মডারেটাবু হইলেন। আমাদের প্রশ্ন তাঁহারা পৃথক্ সময়ে দেখিয়া দিলেন। অর্থাৎ অগ্রে নীলমণিকে ডাকিয়া তাহার প্রশ্ন দেখিলেন। তখন আমাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না। এবং আমার প্রশ্ন যখন দেখেন, তখন নীলমণিকে তথায় থাকিতে দিলেন না। এইরূপ লুকোচুরির ভিতর যে একটা গূঢ় রহস্য ছিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ভায়রস-মহাশয় আমার প্রশ্নের শ্লোকগুলি যেন গিলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একটি একটি শ্লোক ৩৪ বার আমাকে পড়িতে বলিলেন। কিন্তু আমার দস্ত প্রশ্নসকল যথাযথ মুখস্থ করিতে পারিলেন না। ঐদিন তিনি নিজ বাটা গিয়া যে কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন, সেইগুলি একটা কাগজে লিখিয়া এবং নিজে মনগড়া একসেট প্রশ্ন লিখিয়া (কারণ আমার দস্ত প্রশ্নগুলি তাঁহার ঠিক মনে ছিল না) শীলমোহর করিয়া ঐ কাগজখানি “সঞ্জীবনী”র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং বলিয়া দেন, যেন এই কাগজে লিখিত বিষয়গুলি এখন ছাপা না হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের কান্ট্রি আর্টস্

পরীক্ষা হইয়া গেলে যেন ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর যখন তিনি ভায়রস মহাশয়-প্রদত্ত শীলমোহর করা প্রশ্নগুলি ছাপিলেন তখন দেখিলেন যে, শ্লোকগুলির মিল আছে, কিন্তু প্রশ্নগুলির কোন মিল নাই। কারণ, ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি যে, তিনি আমার উক্ত শ্লোকগুলি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দস্ত প্রশ্নগুলি মনে করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজের সঙ্গে তাঁহার দস্ত কাগজের ঠিক মিল হয় নাই। কিন্তু ভায়রস মহাশয় কনক্ট সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন যে, হরিশ নিজেই ছেলেদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছে, অতএব তাহার বিচার করা উচিত। বিচারে যদি দোষী প্রমাণীকৃত হয়, তবে তাহাকে ডিপার্টমেন্ট হইতে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে কনক্ট সাহেব, টনি সাহেব, গুরুদাসবাবু, এবং এ এম বোস, এই ৪ জন বিচারক স্থিরীকৃত হইল; এবং একদিন রাজি ১০টার সময় রাইটাস্ বিজিৎসে হাজির হইতে আমার উপর হুকুম হইল। আমি ঐ নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি গিয়া শুনিলাম যে, ইতিপূর্বে আমার ৮ জন ছাত্রকে তলব দিয়া আনা হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল—পণ্ডিত-মহাশয় আমাদের দিগকে কিছুই বলেন নাই। তিনি পূর্ব-পূর্ব বৎসর ছাত্রদিগকে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমরা দিগকেও সেইসকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, বেশী কিছু দেন নাই। শুনিলাম, বিচারকগণের একজন এক ছাত্রকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে যদি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া দেওয়া হয়, তবে তুমি তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের নামে কোন দোষ আছে কি না, সত্য বলিতে পার কি না? সে নাকি বলিয়াছিল—আপনি যদি আমাকে হাই কোর্টের জজ করিয়া দেন, তথাপি আমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের কোন দোষ দিতে পারি না। শুনিলাম, কেহ কেহ লিখিত খাতা আনিয়া প্রমাণ করিয়াছিল, যে “আমাদের পণ্ডিত-মহাশয় নির্দোষ।” এইরূপ আমার অগোচরে আমার ৮ জন ছাত্রের সাক্ষ্য লইয়া বিচারকগণ বসিয়া ছিলেন, এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হই। এ এম বোস আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে-সকল প্রশ্ন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে ছাত্রদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কই? আমি আমার খাতা লইয়া গিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেইখানি এ এম বোসকে দিলাম, এবং বলিলাম যে, আপনি দেখুন যে সংস্কৃত টেক্সট বুক বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি সকল প্লোকেরই উপর প্রশ্ন দিয়াছি। একটি স্ট্যান্ডার্ড ছাড়ি নাই। এ এম বোস দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—হ্যাঁ, দেখিতেছি সকল প্লোকের উপর আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম—দেখুন, আমি ক্লাসে যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাপত্রে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক প্রশ্ন দিয়াছি। দেখুন, ক্লাসে যে-প্লোকে Explain in Sanskrit প্রশ্ন দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে সে প্লোকে Translate into English দিয়াছি। এইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেখিবেন। এই সময় গুরুদাসবাবু বলিলেন—“Still the stanza is the same.” ইহাতে এ এম বোস বলিয়া উঠিলেন, “গুরুদাসবাবু, আপনি ভ্রম, বিচার করিয়া বলুন দেখি, হরিশবাবু যখন সকল স্ট্যান্ডার্ড উপরই প্রশ্নাদি করুছেন, তখন তিনি নূতন স্ট্যান্ডার্ড কোথায় পাইবেন? তিনি ত কালিদাস নন, যে নূতন স্ট্যান্ডার্ড গড়িবেন। আর গড়িলেই বা আমরা সে স্ট্যান্ডার্ড অঙ্গমোদন করিব কেন? সেগুলি ত আমাদের নির্দিষ্ট টেক্সট, নহে। অতএব উহাকে একটা না একটা স্ট্যান্ডার্ড উদ্ধৃত করিতেই হইবে। তবে আমাদের এই দেখা কর্তব্য যে, উনি ক্লাসে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, সেগুলির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে দত্ত প্রশ্নের একটিও মিলিয়াছে কি না। যদি না মিলিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা দোষী করিতে পারি না। ইহাতে গুরুদাসবাবু আবার বলিলেন—“It was not fair on the part of Pandit Kaviratna to set questions on the text-book.” ইহাতে এ এম বোস, টনি সাহেব ও ক্রফট সাহেব সকলেই বলিয়া উঠিলেন—“He has done his duty as a Professor. A Professor must point out difficult and important passages to

his students.” আমার মনে হয় ক্রফট সাহেব বলিয়াছিলেন—“I did such things when I was a Professor in the Presidency College.” ইহাতে গুরুদাসবাবু আর কিছু বলিলেন না। নীরব হইয়া রহিলেন। ইহাতে ক্রফট সাহেব নিজ টেবিলে একটি দৃঢ় মূঢ়াঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “Haris is honourably acquitted.” টনি সাহেব বলিলেন, “O yes, he is honourably acquitted.” ইহার পর আমি সকলকে লম্বা সেলাম দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং ঐ রাত্রি নির্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যালকাটা গেজেটে দেখিলাম—আমি প্রভিলিয়াল্ গ্রেডে উন্নীত হইয়াছি ও ২০০ টাকা বেতন হইয়াছে। আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিস্টার স্ট্যাক সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন—“Haris, do'nt fear. Sir Alfred Croft has told me that he has understood everything. When Haris can find out the mistakes of even Pandit Mahes Nyaya-ratna, he must be promoted.” আমি বৃদ্ধিলাভ ভগবান্, আমার প্রতি কৃপা করিয়া ক্রফট সাহেব দ্বারা আমার উন্নতি করিয়া দিলেন।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই—শ্রায়রত্ন মহাশয় যে আমার উপর আতঙ্কোদ্বাহ হইয়া আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ তিনি কর্তব্য-বোধেই এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি আমার নামে যেরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক মিস্টার হিল্ নামে একজন সাহেবের নামেও এরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। হিল্ সাহেব ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আসিয়া কিরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি মাত্র (সত্য-মিথ্যা জানি না) ডিরেক্টর সাহেব যখন বলেন, “তুমি ছাত্রদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছ? তাহাতে হিল্ সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন—It is a happy coincidence. বাহা হউক শ্রায়রত্ন মহাশয় আমার পূর্বে ভালবাসিতেন; এবং আমার অনেক বিপদ নিবারণ করিয়াছিলেন।

একবার তিনি আমাকে বলেন, “হরিশ, তুমি তোমার ছাপাখানার কোন পুস্তকে তুমি প্রিন্টের বলিয়া ছাপিও না। তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট তোমাকে পেন্সন দিবেন না। আমি ইহাকে শত শত ধস্তাবাদ দিয়াছিলাম। আর একবার যখন টনি সাহেব আমাকে হেয়ার স্কুলে হেডপণ্ডিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন আমি চাকরি ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া স্ত্রায়রত্ন মহাশয় ডিরেক্টর-সাহেবের নিকট গিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং আমার কোথায়ও যাইতে হয় নাই। তখন আমি স্ত্রায়রত্ন-মহাশয়কে আমার পরম-হিতৈষী বলিয়া ধস্তাবাদ দিয়াছিলাম। আর-একবার যখন ডিরেক্টর-সাহেব আমাকে ঢাকায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রায়রত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডিরেক্টর-সাহেবকে এরূপ বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ঢাকায় যাইতে হয় নাই। এইসকল করিয়া তিনি আমার চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছিলেন।

গুরুদাস-বাবুও বিচারাসনে বসিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলিতে আমার উপকারই করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া ডিরেক্টর সাহেব বুঝিয়াছিলেন, যে আমি নির্দোষ। গুরুদাস-বাবু আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে বরাবর আন্তরিক সম্মান করিতাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন রো-সাহেব প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন অধিলচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন কেশিয়ার কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া তৎকালে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট মাল্জাজ হইতে একজন অভিচার আনাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের খাতাপত্র অভিচার করিতে হুকুম দেন। সে-ব্যক্তি আমাদিগকে খাতা দেখাইয়া বলিলেন—“দেখুন মহাশয়গণ, কিরূপ ভয়ঙ্কর চুরি। কেশিয়ার-বাবু খাতার এক পৃষ্ঠের নীচে যে টাকা জমা করিয়াছেন, খাতার ঐ পৃষ্ঠা উন্টাইয়া দেখা গেল—তাহার মধ্য হইতে প্রথম নম্বরটি বাদ দিয়া শেষ ৩টি নম্বর তুলিয়াছে। রো সাহেব তাহা পরীক্ষা না করিয়া পরপৃষ্ঠায় সই করিয়াছেন। একটি

দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেছি। পাঠক মহাশয় মনে করুন—এম পৃষ্ঠের শেষ লাইনে ২৩৬৭।।০ এইরূপ আছে। কেশিয়ার-বাবু পাতাটি উন্টাইয়া যখন ঐ নম্বর তুলেন, তখন প্রথম নম্বরটি (অর্থাৎ ২টি) না তুলিয়া কেবল ৩৬৭। এই নম্বরটি তুলিলেন। ইহাতে একেবারে দুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলেন। এইরূপ প্রতি পৃষ্ঠা উন্টাইবার সময় দুই এক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইরূপে অভিচার অনেক হাজার টাকা তরুপ হইয়াছে দেখাইল, এবং গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করিল, যে কেশিয়ার-বাবু ষাড়া করিয়াছেন, রো সাহেব তাহা তদারক না করিয়া সই করিয়াছেন। এইটুকু তাঁহার দোষ হইয়াছিল; তাঁহার উচিত ছিল, দেখিয়া শুনিয়া সই করা। গবর্ণমেন্ট এই রিপোর্ট পাইয়া হুকুম দিলেন—কেশিয়ার-বাবুর যেখানে যে-সম্পত্তি আছে সকলগুলি বিক্রীত হইয়া গবর্ণমেন্টের তহবিলে জমা হউক এবং রো সাহেবের বেতন হইতে প্রতিমাসে ৫০০ পাঁচ শত টাকা কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেন্টের তহবিলে জমা হউক। যখন এই হুকুম বাহির হয় তখন অধিলবাবু (কেশিয়ার) কোথায় পলাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। গবর্ণমেন্ট হুকুম দিলেন, টিকটিকি পুলিশ কেশিয়ারকে ধরিবার চেষ্টা করুক। আর রো-সাহেব সেই সময় দার্জিলিঙে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এই হুকুম গেল যে, প্রতি মাসে ৫০০ টাকা তাঁহার বেতন হইতে কাটা যাইবে ও গবর্ণমেন্ট তহবিলে জমা হইবে। আমরা শুনিয়াছিলাম—এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রো-সাহেব (সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন) পাগল হইয়াছিলেন। এবং যে লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তিনি তাহাকে কান্দাইতে যাইতেন। তাঁহার মেম বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, “আমার স্বামী রো-সাহেব পাগল হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে অরোগ করিবার জন্য বিলাতে যাইব; সুতরাং আমার স্বামীকে ছুটি দেওয়া হউক।” বলা বাহুল্য—রো সাহেব আর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন নাই এবং টাকাও দেন নাই।

এই রো-সাহেবের আমলে একজন লাইব্রেরিয়ান্

কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি নূতন বই-গুলি যখন ক্রয় করা হইত তখন সেগুলির রীতিমত জমা-খরচ রাখিতেন না; অর্থাৎ এখানা বই ক্রয় করা হইল; তিনি এখানা জমা করিলেন, ২খানা স্বয়ং বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে অনেক টাকার পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন। যখন রো সাহেব এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লাইব্রেরির চাবি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং লাইব্রেরিয়ান-বাবুর নামে নালিশ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান-বাবু আদালতে গিয়া বলিয়া আসিলেন, যে-দিন পর্যন্ত লাইব্রেরির ঘরের চাবি আমার নিকট ছিল, সেদিন পর্যন্ত আমি পুস্তকের হিসাব দিতে বাধ্য। কিন্তু যেদিন হইতে রো-সাহেব আমার নিকট হইতে চাবি স্বয়ং লইয়াছেন, সেদিনের পর যদি কিছু চুরি গিয়া থাকে, তাহার জন্ত আমি দায়ী নহি। মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইয়া যায়।

এদিকে গবর্ণমেন্ট অধিলবাবুর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইলেন। এবং অল্প দিনের পর নেপাল হইতে তাঁহাকে টিকটিকি পুলিশ ধরিয়া আনে এবং তাঁহার ১৯০ দেড় বৎসর মেয়াদ হয়।

রো-সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে নাটক অভিনয় হইত। ছাত্রেরা বেশভূষা করিয়া কোন বৎসর হ্যামলেটের কোন অঙ্ক অভিনয় করিত; কোন বৎসর মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রিমের এক অঙ্ক বা দুই অঙ্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর ওথেলোর এক অঙ্ক অভিনয় করিত। প্রতিবৎসর এই কার্য হইত স্টার থিয়েটারের অমৃতবাবু আসিয়া বেশভূষা করিয়া দিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দিকের উঠানে ছাত্রেরা জিমনাস্টিক করিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

মিস্টার লিটল যখন প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন, তখন আমার সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রতিবৎসর ফার্স্ট ইয়ার ও থার্ড ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষা হইত। সেবৎসর আমি ও মৌলভী ও লিটল-সাহেব গার্ড্ দিতেছিলাম। তেতালার হলঘরের

উত্তর দিকে মৌলভী সাহেব, এবং দক্ষিণ দিকে আমি, ও মধ্যস্থলে লিটল-সাহেব গার্ড্ দিতেছিলাম। লিটল সাহেব মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি মৌলভী ও আমাকে ক্রমাগত উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে গার্ড্ দিতে হুকুম করিলেন; এবং স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবেন এরূপ কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি আপনার এলাকার মধ্যে কোন ছাত্র অপর ছাত্রের সহিত কনসার্ট করে বা পুস্তক দেখে তাহা হইলে আমরা আপনার এলাকার মধ্যে যাইতে পারিব কি না? লিটল সাহেব বলিলেন—“By no means.” আমি বলিলাম, “সাহেব, আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়ম জানেন না; এই হলে আমরা ৩ জনেই সমান।” তাহাতে লিটল-সাহেব একটু ক্রোধাশ্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন, “Do you question my authority?” আমি কহিলাম—“হাঁ, সাহেব।” তিনি ঐ কথা ৩ বার বলিলেন। আমিও ৩ বার ঐরূপ উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি রাগিয়া টকটক করিয়া জুতার শব্দ করিয়া আমার নামে নালিশ করিতে প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেবের নিকট গেলেন, এবং তাঁহাকে কি বলিলেন তিনিই জানেন। ঋণকাল পরে লিটল সাহেব আমাদের হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপশ্চাৎ একটি বেহারা আসিয়া আমাকে কহিল—“পণ্ডিতজি, বড়া-সাহেব আপ্কা সেলাম দিয়া।” তাহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ টনি সাহেবের নিকট গেলাম। টনি-সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিশ, কি হইয়াছে?” আমি বলিলাম,—“আপনি কি আমাদের দুজনকে লিটল-সাহেবের চাকর করিয়া পাঠাইয়াছেন?” টনি-সাহেব কহিলেন, “By no means. You are all equal in the hall.” আমি বলিলাম,—“তবে লিটল-সাহেব আমাদের চাকরের স্তায় ব্যবহার করিতেছেন কেন?” টনি সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা, কাল আমি ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করিব।” পরদিন হইতে আমাদের ৩ জনকে ৩টি পৃথক ঘরে গার্ড্ দিতে হুকুম করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন লিটল সাহেব কলেজে আসিয়া অগ্রেই আমাকে বলিলেন,—“Good

morning, pandit.” আমিও করিলাম, “Good morning, Mr. Little.” তাহার পর হইতে লিটল সাহেব আমাকে একটু ভালবাসিতে লাগিলেন, কেন জানি না। ঐ বৎসর আমার সঙ্কলিত “রূপকরত্নম্”-নামে একখানি বই ফাস্ট্-আর্টসের পাঠ্য হইয়াছিল। আমি বেণীসংহার নাটকের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। Little-সাহেব ঐ শ্লোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। আমি যখন আমাদের বসিবার ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি কি পড়াইতেছিলে, আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমাকে সংস্কৃত পড়াইতে হইবে।” আমি একখানি মৎপ্রণীত সংস্কৃত পাঠ ১ম ভাগ আনাইয়া তাঁহাকে দিলাম এবং বলিলাম,—“সাহেব! অগ্রে বর্ণমালা শিক্ষা কর।” তিনি ২৩ দিনের মধ্যে ক খ শিখিয়া আমাকে বলিলেন, “পণ্ডিত, আমি বর্ণমালা শিখিয়াছি, আমাকে বই পড়াও।” যাহা হউক তিনি প্রায় এক মাস সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত, আমাকে একটি শ্লোক শিখাও”। আমি তাহাকে হরে মুরারে মধুকৈটভহারে ইত্যাদি শ্লোকটি শিখাইয়াছিলাম। লিটল সাহেব স্বচ্ছ-ম্যানু ছিলেন; সুতরাং তিনি “হরে” ইত্যাদি স্থানে “হড়ে” “মুড়াড়ে” বলিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ফুটবল খেলার একটি দল ছিল। গণিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্-এ ঐ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। কখন কখন ঐ দল গড়ের মাঠে খেলিতে যাইত। সেই দিন ছুটি হইত। সুতরাং আমরাও তাহা দেখিতে যাইতাম। ঐ সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

তখন ছোটলাট বাংলা শাসন করিতেন। নূতন শাসনকর্তা হইয়া আসিলে প্রায় প্রত্যেক ছোটলাট প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিতে আসিতেন। আমার মনে হয়, একবার একজন ছোটলাট আমাদের সকলের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। কোন্ ছোটলাট আগায় মনে নাই। তিনি জে সি বোসের একটি বেহারার কার্যদক্ষতা দেখিয়া তাহার ডবল বেতন বাড়াইয়া যান। বেহারার নাম ননু। সে

ইংরেজি পড়ে নাই, কিন্তু সব ঔষধের শিশি চিনিত। উক্ত ছোটলাট ননুকে বেহারাকে যে শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশি আনিয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট তাহাকে Mr. Nanku বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ঐ বেহারার তৎকালীন আনন্দপূর্ণ মুখখানি আমার এখনও মনে পড়ে।

একসময় কোন ছোটলাট, (আমার স্মরণ হয় না।) প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে আসেন। এবং আমার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলে সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মান করিবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি পড়াইতেছেন?” আমি কহিলাম—“রঘুবংশ।” তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন—“আমরা পড়িয়াছি, ‘আসীদ্রাজা নলো নাম’।” আমি বলিলাম, “আজ্ঞে হাঁ”। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—“Sanskrit is a very difficult language.”

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষক-গণের অতিশয় বাধ্য ছিল। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আমার আদেশানুসারে ছাত্রেরা রব্-সন্-সাহেবকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। একবার কোন সাহেব-অধ্যাপক ছাত্রদিগকে stupid, goose বলিয়াছিলেন। ছেলেরা বিপিন-বাবু ও আমাকে ঐ কথা জানাইলে আমরা পরদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ঐ কথা জানাই। প্রিন্সিপ্যাল উক্ত প্রোফেসরকে বাড়ীতে ডাকাইয়া একরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পরদিন উক্ত প্রোফেসর-সাহেব ক্লাসে আসিয়া ‘you gentlemen!’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছেলেরা ঐ কথা আমাদের কাছে জানাইয়াছিল। আমি ছেলেরা বলিতাম, তোমরা কখন মাতাকে ইংরেজিতে পত্র লিখিও না। কারণ বাহুল্যে যেরূপ ভক্তিবাচক শব্দ আছে, ইংরেজিতে তাহা নাই। ইংরেজিতে মাকে ও স্ত্রীকে একরূপ কথায় সম্বোধন করিয়া থাকে, যথা—My dear mother ও My dear wife ইহা আমাদের কর্ণে বড় বিসদৃশ লাগে।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর পরলোক হইবার পর ‘ক্রকট’ সাহেব আমাকে ঢাকা

পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমার ছাত্ররা তাঁহাকে যে পত্র লিখে, তাহা পড়িয়া ক্রফ্ট-সাহেব তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ল ক্লাস ছিল, তথায় ৩ বৎসর পড়িতে হইত। যে বৎসর ক্রফ্ট-কমল ভট্টাচার্য মহাশয় ল পড়েন, তখন আমিও ঐ সঙ্গে ল' পড়ি। আমার মনে পড়ে তিনি আমাদের হাজিরা করিতেন। মাননীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিছু পূর্বে ল পড়িয়া বাহিব হইয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অনেকদিন ল লেকচারার ছিলেন, এবং তথায় প্র্যাক্টিস্ কবিয়া পরে কলিকাতায় হাই কোর্টে আসেন। আমাব একজন সহপাঠ্য স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ বহরমপুরে গিয়া প্র্যাক্টিস্ কবিয়া অনেক টাকা উপাঞ্জন করিয়াছিলেন। তথায় একটি বাটীও করিয়াছিলেন।

তৎকালে হাইকোর্টেব ইন্টারপ্রেটার ত্রীযুক্ত শ্যামা চরণ সরকার নামক একজন কৃতবিদ্য মনীষী প্রেসিডেন্সী কলেজে হিন্দু ল ও মুসলমান ল লেকচার দিতেন। আব-একজন সাহেব বোমা। ল ও জুরিস্ প্রভেদে পড়াইতেন। কিছু দিন পরে শ্যামাচরণ বাবুব স্থানে একজন সাহেব নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যবস্থাচক্রিকা বচনা বনে। ঐ কাষে আমি প্রায় ২০ বৎসর তাঁহাব সাহায্য করিয়াছিলাম।

একবার পেডলার সাহেব যখন কয়েক মাসের জন্য অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন, তখন ঠিক ৬পূজার পূর্বে কলেজের ক্যাশ বাস হইতে ১২৫ টাকা চুরি যায়। ঐ ঘরের বেহারা ঐ কাজ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে ধরিতে পারা গেল না। সুতরাং ঐ টাকা এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রজবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের টাকা। এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী দায়ী; কারণ তাঁহার হাতবাক্স হইতে ঐ টাকা চুরি গিয়াছিল; কেশিয়ারের বাস হইতে চুরি গেলে কেশিয়ারকেই দিতে হইত। ৬দুর্গাপূজার পূর্বে নিজ পকেট হইতে ১২৫ টাকা দিয়া ব্রজবাবু সাশ্রনয়নে অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল

পেডলার সাহেবকে জানাইলেন যে, "মহাশয়! আমার বাড়ী ৬দুর্গাপূজা হইবে; আমি যদি এই টাকা নিজ বেতন হইতে দিই, তবে ৬ মাসের পূজা হইবে না। পেডলার সাহেব সমস্ত শুনিয়া পরদিন ব্রজবাবুকে ডাকিয়া একখানি ১০০ টাকা নোট দিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি মাসের পূজা কর।" ব্রজবাবু সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সাহেব তাঁহাকে ধার দিলেন। কিন্তু ৬পূজার ছুটি পর যখন ব্রজবাবু বেতন পাঠিয়া ঐ ১০০ টাকা পেডলার সাহেবকে দিতে গেলেন, তখন পেডলার সাহেব বলিলেন, "ব্রজবাবু, ৬ টাকা দিতেছ কেন? আমি তোমাকে ত ধ'র দিই নাই, তুমি যখন বলিয়াছিলে, যে, ৬ মাসের পূজা হইবে না, তখন আমি ঐ পূজার জন্য ঐ ১০০ টাকা দিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া ব্রজবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমবা এই কথা শুনিয়া পেডলার সাহেবকে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। সাহেব যদিও দুর্গ-ঠাকুব মানেন না, কিন্তু আমবা তাঁহাব হৃদয়ের ভাব দেখি। মহাশয় প্রশংসা করতে লাগিলাম। এক বাব একটি বেহারা একটি টাকা চাড়াইয়া যায়। বেহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পেডলার সাহেবকে জানাইল, "ছজুব আমার একমাসেব খোরাক কম পড়িবে।" সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুমি কাঁদিও না, 'এই লও'। এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। সে শত শত বার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। পেডলার সাহেবের সম্মানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার হৃদয় অতি দয়ালু ছিল। তিনি আমাকে ২ বৎসর একস্টেনশন্ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি অর্ধেক পেন্স পাইয়াছিলাম; নতুবা একের তিনভাগ বই পাইতাম না। একবার ডাঃ জে সি বোস নিজের বক্তৃতা-গৃহের পশ্চিম পাশে একটি কাঠ ও কাচ দ্বারা নির্মিত গৃহ কোন বাঙ্গালী কন্ট্রাক্টার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমরা গ্রীষ্মের ছুটির পর আসিয়া দেখিলাম মাঠের ধারে একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার এঞ্জিনিয়ার সাহেব তাহা দেখিয়া বলিলেন, "উহাতে বাড়ীর সামঞ্জস্য থাকিবে না; অতএব ঐ ঘরটি ডাকিয়া

কেল"। বলা বাহুল্য, ঐ ঘর করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, তাহা ডাক্তার জে সি বোসকে নিজ হইতে দিতে হইয়াছিল।

সেকালে 'শিবরাত্রি'র অন্ত গবর্ণমেন্ট ছুটি দিতেন না। কিন্তু টনি সাহেব যখন জানিতে পাইলেন, যে, ঐ উপবাস অনেক ছেলেরা করে, এবং ব্রহ্মবাবু ও আমি করি, তখন হইতে ১ ঘণ্টা মাত্র কলেজ হইতে লাগিল; অর্থাৎ ১১টার পর ১ ঘণ্টা কলেজ হইয়া ১২টার সময় বন্ধ হইতে লাগিল। সাহেব প্রোফেসররা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— ১ ঘণ্টা কলেজ হইবার অর্থ কি? আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, যে 'শিবরাত্রি'তে হিন্দুরা ৩৬ ঘণ্টা আহার করেন না; অথচ এটি গেজেটেড হলেও নহে, সুতরাং প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত দিন কলেজ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—(তাহা করা তাঁহার অধিকার নহে), কিন্তু ছাত্রগণ ও প্রোফেসরদিগের সুবিধা করা তাঁহার অভিপ্রেত, এইজন্য ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লিটল সাহেব শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "You Pandit! you do not take a single drop of water for 36 hours." আমি বলিয়াছিলাম, "না, সাহেব।" লিটল সাহেব শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "We would die then." আমি বলিয়াছিলাম, "সাহেব, আমরা হিন্দু, আমরা উপবাস খুব করিতে পারি। আমরা উপবাস না করিয়া কোন দেবতার উপাসনা করি না।"

একদিন লিটল সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি—তোমার জলখাবার কুঁজা ও গেলাস পৃথক স্থানে রক্ষিত হয়। তুমি আমাদের গেলাসে জল খাও না কেন? আমি জানি তোমার মতামত উদার। তবে তুমি কি জাতিভেদ বলিয়া খাও না; অথবা অন্য কোন কারণ আছে?" আমি কহিলাম, "সাহেব, তোমার প্রশ্নে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যে সকলের গেলাসে জল খাই না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তির মুখের ভিতর এমন ক্ষত থাকে, যে, তাহা সংক্রামক। তাহার

ওষ্ঠে, দস্তে ও কর্ণে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে গেলাসে জল খায়, সে গেলাসে যদি অপর কোন ব্যক্তি জল খায়, তবে পরোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির মুখের রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিরা নিজ সংহিতাতে লিখিয়া গিয়াছেন, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই তিনজন ভিন্ন অল্প কাহারকর্তৃক প্রস্তুত অন্ন খাওয়া উচিত নহে। যদি পূর্বোক্ত ৩ জনের মধ্যে কেহ না থাকেন তবে স্বয়ং পাক করিয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ শাসনের নিগূঢ় বরণ আছে। ঋষিরা বিনাকারণে কোন কথা লিখেন নাই। সাহেব, আমি এই কারণে কাহারও উচ্ছিষ্ট জল বা অন্ন খাই না। আমি কিপ্রকারে জানিব যে, আপনার মুখের মধ্যে কোন রোগ আছে কি না। মিঃ গাক্ নামে একজন সাহেব ফিলজফি পড়াইতেন। তাঁহার সহিত রি-বার্ণ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে আমার তর্কবিতর্ক হইত। আমি তাঁহাকে বলিতাম কৰ্মফল স্বীকার না করিলে ধনী ও নিধন, জানী ও মুখ ইত্যাদির সমন্বয় করা হয় না। ভগবানকে ভ্রায়পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি পরুপাতী নহেন। অনেক তর্কের পরে সাহেব স্বীকার করিতেন যে, কৰ্মফল স্বীকার না করিলে এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

ইউরোপে অস্ট্রিয়া নামে একটি দেশ আছে। তথায় গ্র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একবার ঐ স্থান হইতে আমার উপর দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। ১ম—অহুস্বার ও বিসর্গের স্থান কোথায়? ২য়—মিরাকুল প্রমাণ করিতে পার কি না। আমি পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতে অহুস্বার ও বিসর্গের স্থান লিখিয়া দিলাম,—যে, ঐ দুইটির স্থান স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে। কারণ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। ২য় প্রশ্ন অর্থাৎ মিরাকুল প্রমাণ করিবার জন্য আমি ঋক বেদের ও অথর্ববেদের অনেক স্থান ও তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং যোগশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ দিয়াছিলাম, যে, মিরাকুল সত্য হইতে পারে।

তৎকালের ছাত্রেরা সাহেব প্রোফেসরদিগকে ভয় করিত, এবং বাঙ্গালী প্রোফেসরদিগকে ভক্তি করিত। একটি দৃষ্টান্ত

আমার মনে পড়িতেছে। একদিন মিষ্টল সাহেব ও আমি তেতালার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ঐ সময় ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রেরা তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের ঘাড়ে পড়িয়া নীচে নামিতেছিল! ছাত্রদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি সিঁড়ির একধারে দাঁড়াইলাম, সাহেব কিন্তু মধ্যস্থল দিয়া নামিতে লাগিলেন। একটি ছাত্রের হাত সাহেবের হাতের সহিত সজোরে ঠাকাঠেকি হওয়াতে সাহেব তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “Who are

you?” সে কহিল, “আমি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।” সাহেব কহিলেন—“I fine you fifteen rupces.” ছাত্রটি কমাপ্রার্থনা করিতে সাহেব তাহাকে কমা করিলেন।

[জন্মসংশোধন—প্রবাসী (১ম খণ্ড, ১৩৩২) ৮২৪ পৃষ্ঠায় মুক্তি মোকার্ণের পর নিম্নলিখিত মোকার্ণ হইবে—

তথাহি সানৌ মলয়স্ত নান্ততো।

মনোহরশ্চন্দন এব রোহতি।]

জীবনের মূল্য

শ্রী দেবী মুখোপাধ্যায়

হল-ঘরের দরজা খুলে জোসেফ এসে জানিয়ে দিলে যে বাবার জন্তে গাড়ী প্রস্তুত হয়েছে। মা আর বোনেরা বুকে এসে আমার ঘিরে ধাঁড়ালেন। তাঁরা বললেন, “এখনও সময় আছে, এ বাগুরা স্থগিত কর; আমাদের কেলে রেখে অত দুরদেশে যেও না.....” আমি বলে উঠলুম,—“মা, আমি সম্রাট বংশের ছেলে; কুড়ি বৎসর বয়স হ’ল। দেশের কাজ আমার যে এখন করতেই হবে,—খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত আমার অর্জন করতে হবে....একজন বড় বীরপুরুষ, কিম্বা সম্রাট রাজপুরুষ, কি খুব শক্তিশালী একজন জেনারেল—বা হয় কিছু একটা হ’লে, আমাকে নাম কিনতেই হবে যে মা.....”

মা বললেন, “আচ্ছা, তুমি যখন হুদুর বিদেশে চ’লে যাবে, তখন তোমার এই অভাগিনী মা’র দশা কি হবে, বারগাড’?”

“ছেলের প্রশংসা-খ্যাতি শুনে তোমার বুক গর্বে ত’রে উঠবে; তুমি আরও সুখ পাবে.....”

“আর যদি কোনো লড়াইয়ে তোর প্রাণ নষ্ট হয় বাবা.....”

“তাতে আর কি হয়েছে মা? এ জীবনটা কি? কেবল স্বপ্ন বই ত নয়। আর, এই যৌবনেই ত পৌরব পাবার, জয়লাভ করার স্বপ্ন জাগে—বিশেষ যখন, একটা মাস্তপণ্য বংশের ছেলে আমি। তুমি কিছু ভয় করো না মা, ছ’ চার বছরের মধ্যেই দেখবে, আমি একজন কর্ণেল,—কি মস্ত একজন জেনারেল,—এমন-কি ভাসেলে একজন পদম্ লোক হ’লে, তোমার কোলে কিরে আসব।”

“সত্যি কি সেদিন আসবে, বাবা?”

“আসবে মা সেদিন, আসবে,—তুমি দেখো, তখন সকলে আমার প্রতিপত্তির ঈর্ষা করবে,—আমার সকলে বখেট সম্মান দেখাবে। আমার দেখে টুপী খুলে সকলে মাথা নীচু করবে; আমি হেনরিয়েটাকে বিয়ে করব;—বোনদের ভালো-ভালো ঘরে বিয়ে দেবো; আর সকলে মিলে মহানগরে আমাদের এই ব্রিটেনির ষ্টেটে বাস করব।”

“এখনই ভাই করো না, বাবা। টাকাকড়ির ত অভাব নেই তোমার চারিপাশে খুঁরে এসে দেখ দেখি,—এই আমাদের ‘বক বার্ণার্ড’এর মতন বড় প্রাসাদ; আর জমিজমা কারও আছে? তোমার প্রকারা কি তোমার

সম্মান দেখায় না? তুমি যখন দেশের মধ্যে খুঁরে বেড়াও, কে তোমাকে দেখে টুপী খোলে না, নাম ক’রে বলে দেখি? আমাদের ছেড়ে বাসনে বাবা.....তোর এখানকার বন্ধুবান্ধব,—বোনরা, এই বুড়ী মা,—এদের কাছেই থাক। কিরে এসে হয়ত এই মাকে আর দেখতে পাবি নে। মিছামিছি কষ্ট ক’রে খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্তে আর শরীরটা বাটি করিস নে। জীবনটা ভারি স্থখের,—বড়ই মিষ্ট; আর আমাদের এই দেশ কি চমৎকার!.....” এই বলে তিনি, আমাকে একটা খোলা জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে, বাগানের সুন্দর কুলভরা রাস্তাগুলি দেখাতে লাগলেন। ‘স্টেট-নাট’ গাছটা ফুলে-ফুলে ত’রে উঠেছিল; লতানে বাহারে পাছের ফুলের বাসে বাতাস মস্ত হ’রে উঠেছিল; রোদের আলো প’ড়ে তার পাতাগুলো বক্বক্ব করছিল।

পাশের কান্নাতেই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা জমায়েত হয়েছিল। তাদের বিষয় শান্ত খুঁস্তি নীরব ভাবার যেন বন্দুছিল, “হুদুর! আমাদের ছেড়ে যাবেন না, ছেড়ে যাবেন না।” আমার বড় বোন, আমাকে ছু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ছোটো বোন ঘরের এক কোণে ব’সে একখানা ছবির বই দেখছিল। সে আমাকে ছবি দেখিয়ে, আমার ক’রে জুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে। আমি তাদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে বললুম,—“কুড়ি বৎসর বয়স হ’ল আমার—নামজাদা ঘরের ছেলে আমি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আমাকে অর্জন করতেই হবে। নাঃ—আমার তোমরা সকলে আজ বিদায় যাও.....”, এই বলে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলুম। সিঁড়িতে দেখতে গেলুম, হেনরিয়েটা দাঁড়িয়ে আছে; তার চোখে একবিন্দুও জল ছিল না, মুখ দিয়েও তার একটিও কথা বেরুচ্ছিল না বটে, কিন্তু সে এত কাঁপছিল যে, আর যেন সে কোনো মতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তার সাদা কামলখানি বেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়েই, সে সেখানে অজ্ঞান হ’রে পড়ল। আমি ছুটে তার কাছে গিয়ে তাকে ডুলে নিলুম, আর তাকে আজীবন ভালোবাসব বলে আশ্বাস দিলুম। শীঘ্রই তার জান কি’রে এল; মার হাতে তার তার দিয়ে, আমি গাড়ীর দিকে ছুটলুম। পিছন দিকে আর না তাকিয়ে, লাকিয়ে গাড়ীতে উঠে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলুম।

(২)

যদি হেনরিরেটার দিকে কিয়তুম ভা হ'লে হয়ত চিত্তবিভ্রম ঘটত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বড় রাস্তা দিয়ে চললাম। অনেকক্ষণ ধরে মা, বোন আর হেনরিরেটার কথা চাড়া আর কোনো চিন্তা মনে জাগল না। আমাদের প্রাসাদ 'রক্ বার্নার্ড'এর চূড়াটা যেই দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়ে পড়ল, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার গৌরব অর্জনের স্বপ্ন আবার মধ্যে ছেপে উঠতে লাগল। সে কিসব মতলব—কতই আকাশকুহুমরচনা.....খনদৌলত, মান-প্রতিপত্তি, কিছুই আর অর্জন করতে বাধ পড়ল না। গাড়ী যতই এগিয়ে যেতে লাগল, আমি ততই আপন মনে, উজীর, সেনাপতি, দেশের রাজা হ'য়ে পড়তে লাগলাম। শেষে সন্ধ্যার সময় আমি সেদিনকার গল্পব্যস্তলে এসে পৌঁছলাম। এই সময়ে আমার চাকর জোসেফ ডাক্তাই, আমার স্বপ্নে গড়া সোনার রাজ্য থেকে যেন মাটিতে প'ড়ে গেলুম।

পরের দিন আবার যাত্রা শুরু হ'ল। আবার দীর্ঘপথ পাওয়ার, আমার মনের ঘোড়া সেই গৌরবময় স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে মহানন্দে ছুটে নেড়াতে লাগল। অবশেষে আমরা সীডানে এসে হাজির হলাম। এখানে আমাদের পরিবারের আলাপী একজন ডিউকের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই আমাকে পারীতে নিয়ে যাবেন, আর সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি আমাদের পরিবারকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন আর, ছুদিন বাদেই তিনি পারীতেই যাবেন ঠিক ছিল, কাজেই আশা ছিল, তিনি আমার উন্নতির যথাসাধ্য সুবিধা করে' দেবেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সীডানে পৌঁছানো গেল। কিন্তু আমাদের বন্ধুর বাড়ী সহর থেকে দূর ব'লে সে-রাস্তা আর তাঁর বাড়ী বাওয়া ব'টে উঠল না। কাজে-কাজেই আমে'দ্য-ফ্রাঁসে নামে সেখানকার সবচেয়ে ভালো হোটেলে সেরাজি আশ্রয় নেওয়া গেল।

সেখানে খেতে ব'সে আমি ডিউকের বাড়ী যাবার পথ জিজ্ঞাসা করতেই, পাশের লোকটি ব'লে উঠল, "ওঃ! সে বাড়ী আশেপাশের সকল লোকেই জানে। বে কেউ সেপথ দেখিয়ে দিতে পারে, ওই প্রাসাদেই ত সেই মস্ত বড় বীর বোদ্ধা মার্শেল কেবার্ট মারা গিয়েছিল।" এই কথা শুনেই তখনই যুবকদের মধ্যে কেবার্টের কথা উঠল। কেমন ক'রে ভীষণভাবে তিনি যুদ্ধ করতেন,—অদ্ভুত বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও, কি-রকম বিনয় প্রকাশ ক'রে তিনি সজাট্-লুইএর-দেওরা সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,—এইসব বর্ণনা চলতে লাগল। তাঁরা সকলে এই ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল, কেমন ক'রে এক-একজন লোক হঠাৎ অসম্ভব-রকমের সৌভাগ্যশালী হ'য়ে ওঠে। সামান্য একজন মুজাকরের হলে হ'য়ে কেবার্ট একেবারে ফ্রান্সের মার্শেল হ'য়ে উঠেছিলেন। এর কমে আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত না গেলে, সকলে ঠিক করলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু অমানুষিক ব্যাপার আছে। লোকে বলে, তিনি জাদুবিদ্যা জানতেন,—একটা দৈত্যের সঙ্গে তাঁর সর্ভ ছিল,—সেই শক্তি তাঁর সব কাজ ক'র দিত। হোটেলের ম্যানেজার বলেন—এখনও দেশের কৃষকেরা বিশ্বাস করে, ঐ ডিউকের প্রাসাদে, যেখানে কেবার্ট মারা গিয়েছিল সেখানে একজন কালো রংয়ের লোককে দেখতে পাওয়া যায়,—অথচ কেউই তাঁর পরিচয় জানে না। চাকর-দাসীরাও, সেই কালো দৈত্যটাকে, কেবার্টের ঘরের মধ্যে ঢুকে কেবার্টের শ্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে যেতে আসতে দেখেছে। কেবার্টের শ্রাণ নাকি সে একেবারে কি'নে নিবেছিল, কাজেই সেটা বরাবর তাঁর কাছেই থাকে। এখনও যে মাসে কেবার্টের মরবার দিনটিতে, রাতিকালে দেখতে পাওয়া যায়, যে একটা কালো লোক একটা আলো হাতে

ক'রে নিয়ে চলাকেরা করছে,—সেই আলোটাই নাকি কেবার্টের আত্মা।

আমাদের খাওয়া শেষ হ'য়ে এসেছিল। গল্পটা ভারি চমৎকার লাগল। আমরা বাতে খুব বড় বড় বুদ্ধে ভরী হ'তে পারি, সেইজন্যে, কেবার্টের সেই দৈত্যের নামে এক বোতল স্লাম্পেন পান করলাম।

পরের দিন সকালে উঠে সেই প্রাসাদের দিকে চলেছি। পুরাতন গথিক প্যাটানের মস্ত বড় বাড়ী; এ-চাড়া আর তাঁর কিছু বিশেষত্ব ছিল না। অল্প সময় হ'লে কিছুই হয়ত লক্ষ্য করতুম না, কিন্তু কাল রাত্রে হোটেলের গল্পটা মনে পড়ার, হঠাৎ আমার উৎসুক্য বেড়ে গেল।

একজন বৃদ্ধ চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই আমি তাঁকে জানালুম যে গৃহস্থামীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। সে বললে, "মনিবকে এখন দেখতে পাবো কি না তাঁর ঠিক নেই...আর তিনি যে দেখা করবেন এখনও কোনো স্থিরতা নেই।" আমি তাঁকে আমার নামের কার্ড দিতে সে সেখানি নিয়ে চ'লে গেল। আমি একা মস্ত বড় একটা হল ঘরে ব'সে রইলামসে ঘরটা চারিদিকে শিকারের স্মৃতি আর পরিবারের পূর্ব পুরুষদের ছবি টাঙিয়ে বেশ ভালো ক'রে সাজানো। আমি গানিক-ক্ষণ চূপ ক'বে ব'সে থাকা সত্ত্বেও চাকরটা কিয়ল না; নির্জনতাটা আমার কাছে ক্রমশঃই অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। চূপ ক'রে ব'সে থেকে ঘরের সমস্ত ছবিগুলো আর কড়ি-বরগা সব চুচার-বার যখন গুণে কেলেছি, তখন একটা শব্দ আমার কানে গেল। চেয়ে দেখি, একটা ঘরের দরজা খুলে গেছে;—সেটা একটা চমৎকার ড্রয়িং রুম। কাচের একটা দরজা দেখতে পাওয়া গেল—সেটা খুললেই একেবারে একটা সুন্দর বাগানে গিয়ে পড়া যায়! ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। একজন লোক দরজার দিকে পিছন করে' কোচের উপর শুয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে আমাকে লক্ষ্য না ক'রেই তাড়াতাড়ি জানালার দিকে ছুটে চললেন। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল ক'রে পড়তে লাগল। সারা দেহে নৈরাশ্রের ছাপ কুটে উঠল। হাতের ওপর মাথাটি রেখে তিনি কিছুক্ষণ অচল অটল অবস্থায় ব'সে রইলেন।

তাঁর পর তিনি আবার জোরে জোরে পা ক'লে ঘরের মধ্যে পারচারি করতে লাগলেন। ঘোরবার সময় আমি তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ার, তিনি কাপ্তে লাগলেন। আমিও ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে আমার অবিবেচনার কাজের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। পালিয়ে আসবার চেষ্টা ক'রে অসংলগ্ন ভাবায়, আমি তাঁর কাছে কমা প্রার্থনা করতে লাগলাম।

তিনি হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার হাত ধ'রে গভীরভাবে বললেন— "কে তুমি? কি চাও?"

আমি ভয়ে যেন কেমনধারা হ'য়ে গেলুম; ভবু উত্তর দিলাম— "আমি 'রক্ বার্নার্ড'এর স্মৃতিতে বার্নার্ড.....আমি ব্রিটেনি থেকে সবেমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি।"

তিনি আমাকে স্নেহে ছুহাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রে বললেন— "আমি তোমাদের খুব জানি—খুব জানি....." তাঁর পর একখানা কোচে তাঁর পাশে বসিয়ে আমাদের পরিবারের সমস্ত সংবাদ, আমার পিতার কথা এমনভাবে ব'লে যেতে লাগলেন, বাতে আমার ধারণা হ'ল ইনিই হচ্ছেন এই প্রাসাদের অধীশ্বর।

আমি তাঁকে বললাম— "আপনিই তাহ'লে এই বাড়ীর মালিক, ব'সিয়ে—" আমার কথার বাধা দিয়ে তিনি আমার দিকে কেমন যেন একভাবে চেয়ে রইলেন, তাঁর পর বললেন, "হী ছিলুম বটে; তবে এখন আর নই। এখন আমি আর কিছুই নই....."

আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে দেখে তিনি ব'লে উঠলেন, দেখ কথা বোলো না; আমাকে একটুও প্রশ্ন করো না....."

আর এই আজকের দিনই এই পৃথিবীতে আমার শেষ দিন...“শেখের দিকটা তাঁর গলার খরটা করণ হয়ে কেঁপে উঠল।”

তাঁর পর কাচের দরজার কাছে গিয়ে, বাগানের দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—“হায়,—এই সূর্যর আকাশ,—এই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, মাণিকঝরা এই যে ঝরণা,—এইসব কিছুই আর আমি দেখতে পাবো না। বসন্তের মদ্যর বাতাসের স্পর্শ, আর আমি পাবো না।...কি নির্ঝঞ্ঝের কাজই আমি করেছি। এইসব, বা কিছু সূর্যর, ভগবান্ ক’রে মানুষকে দিয়েছেন—অথচ এই সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখবার খেয়াল, এতদিন মোটেই হয়নি আমার...। হাঁস বগন হ’ল, তখন বড় দৌ হ’য়ে গেছে, আর সময় নেই। আরও পঁচিশ বৎসর আমি এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতুম...হ’য়ে মিথ্যাই এ জীবনটা নষ্ট করেছি। কি পেলুম আমি? কিছুই নয়। মিথ্যা পৌরব খানিকটা অর্জন করেছি, সে ত, আমার সঙ্গে-সঙ্গেই লোপ পেয়ে যাবে। এতে আমি ত মোটেই প্রকৃত সুখী হ’তে পারিনি।”

বাগানের পাশ দিয়ে যে চাষারা গান করতে-করতে কাঙ্গে বাচ্ছিল, তাদের দেখিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য ক’রে বললেন, দেখো—এইসব চাষারা—এইসব লোকদের সঙ্গে মজুদী ক’রে খেটে দৈন্তরুৎ লাভ করতে পেন্ডেও, আমি সব—আমার সব অর্থ পৌরব দান করতে পারি। এই পৃথিবীতে এখন আর দেবার মতন কিথা আশা করবার মতন আমার আর কিছুই নেই—এমন কি ছুর্ভাগ্য পর্যন্তও নয়।”

সেইসময়ে যে মাসের সূর্যের খানিক আলো জানুলা দিয়ে এসে তাঁর পাখুর মুখে আর নীর্ণ দেহের ওপর পড়ল। তিনি যেন কোঁকের মাধার আমার ২৩ ছুটো চেপে ধরলেন, তাঁর পরে বললেন, “দেখ ঐ দিকে চেয়ে দেখ—সূর্যর নয় কি? ঐ যে সূর্য...সোনার আলো... হায়, এইসবই, আমাকে ত্যাগ ক’রে যেতে হবে। আঃ—তবু ঐটুকু সাধনা—এখনও আমি বেঁচে আছি। আজকের সারা দিনটা বাঁচতে পাওয়া যাবে—এই চমৎকার সূর্যর দিন...আমি আর কাল এই চমৎকার দিন দেখতে পাবো না—”

এই ব’লেই তিনি খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ০০ ম বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে হরিণের মতন চারিদিকে ছুটেছুটি করে বেড়াতে লাগলেন। আমার বিস্ময়ের মাত্রা এত বেশী হ’য়ে প’ড়েছিল, যে, তাঁকে যে ধ’রে রাখব, এমন অবস্থাও আমার ছিল না। প্রকৃতিই হ’তেই দেখি, তিনি একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ হ’য়ে গেলেন। আর সত্য কথা বলতে কি,—আমার মনের বা শরীরের এমন শক্তি তখন ছিল না, যাতে তাঁকে ধ’রে রাখতে পারি। এতক্ষণ বা শুনলুম, তা’তে আমি স্তম্ভিত হ’য়ে পড়লুম।...আমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়... আমি কোচখানার ওপর ব’সে পড়লুম। আমি যে জেপে আছি—এসব যে স্বপ্ন নয়,—এই ভুল ভাঙবার জন্তে আমি তখন উঠে দাঁড়ালুম,—তাঁর পর ঘরের মধ্যেই এদিক-ওদিকে পারচারি করতে লাগলুম। এই সময়ে হল-ঘরের দরজা খুলে চাকর এসে বললে—এই যে বাড়ীর মনিব এসেছেন...”

একজন বাট বৎসরের বৃদ্ধ আমার দিকে অগ্রসর হ’য়ে অভ্যর্থনা করবার আশায় তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর পর, এতক্ষণ বসিয়ে রাখার দেয়ী হওয়ার জন্ত ক’রা প্রার্থনা ক’রে বললেন—“আমি বাড়ীতে ছিলুম না,—আমার ছোটো ভাইকে আমি এতক্ষণ খুঁজছিলাম—তাঁর অস্থখ করেছে কি না...”

আমি তাঁর কথার বাধা দিয়ে বললুম—“রোগ কি খুব সাংঘাতিক, বাঁচবার আশা নেই?”

তিনি বললেন,—“ভগবান্ রক্ষা করুন,—ব্যাপার ততদূর নয়... যৌবনেই, সে বড় হওয়ার আশায়, খ্যাতিলাভের স্বপ্নে একেবারে মেতে উঠেছিল। সম্ভ্রান্তি একটা ভীষণ অস্থখ থেকে বেঁচে ওঠবার পর থেকেই, তাঁর মাথাটা কেমন ধারণ হ’য়ে গেছে। এখন তাঁর এক খেয়াল হয়েছে—আর কেমন তাঁর এক ধারণা হয়ে গেছে, যে আর একদিন যাত্র তাঁর পরমায়ু আছে...একেবারে পাগল হ’য়ে গেছে আর কি...।”

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটি বেশ জলের মতন পরিষ্কার হ’য়ে গেল। ডিউক বলতে লাগলেন—“বাক্—এখন তুমি এদিকে এস—দেখি বেশ চেষ্টা ক’রে কিসে তোমার উন্নতি হ’তে পারে। আমরা এই মাসের শেষেই তা হ’লে রাজধানীতে যাবো, কি বলো? বড় বড় রাজসভায়, তোমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করব...”

আমি বললুম, “আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন ম’সিয়ারে,... আমি আপনাকে সের্বস্তে ধন্যবাদ আর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—কিন্তু আমি আর সহরে যাবো না...লজ্জার আনার মুখ লাগ হ’য়ে নীচু হ’য়ে পড়ল।”

সে কি। তুমি দরবারে যাবে না? সেখানে গেল তোমার নিশ্চয়ই খুব উন্নতি হবে। এইসব মান-সম্মত তুমি হেলার হারাতে চাও?”

“হ্যাঁ, ম’সিয়ারে...”

“কিন্তু ভেবে দেখ,—আমি থাকলে পরে আটদশ বৎসরের মধ্যেই তুমি বিশেষ ক্ষমতালী আর প্রতিপত্তিশালী হ’য়ে উঠতে পারবে—তোমার উন্নতি যাতে নীর্ণগির হয়, আমি তা’র বিশেষ চেষ্টা করব...”

আমি সম্মত হ’লে উঠলুম—“দশটা বৎসর নষ্ট করতে হবে।”

বিস্মিত হ’য়ে তিনি বললেন,—“কি বলছ তুমি,—মান-সম্মত, অর্থ-সম্পদ লাভ করতে হ’লে, দশটা বছর কি এতই বেশী হ’ল? না, না,—ওসব পাগলামি ছাড়া,—চলো তুমি, আমার সঙ্গে সহরে যেতে হবে তোমায়।”

“না,—তা আর হবে না, আমি ব্রিটেনিতেই কিয়তে মনস্থ করেছি, আমরা আপনার এই ভালো করবার চেষ্টার জন্ত আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।”

তিনি ক্ষুব্ধ হ’য়ে একটু ক্রীণ হাসি হেসে বললেন, “কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি সব! এসব খেয়াল, আহাশুকি বুদ্ধি ছাড়া...খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করবার সময়টা হেলার হারিও না।”

তাঁর ভাইয়ের মুখে এর আগে যে কাহিনী শুনেছিলুম, তাই স্মরণ ক’রে আমি বললুম, না এ বোকামি নয়,...এই হচ্ছে জ্ঞানীর কাজ, আমার প্রগল্ভতা মাপ করবেন...”

পরের দিন আমি বাড়ী ফেরবার জন্ত রওনা হলুম। আমাদের প্রাসাদ,...রক্ বার্নগার্ড—বড়-বড় গাছপালা, আর ব্রিটেনির চমৎকার রোদস্তরা আকাশ এখন আমার চোখে পড়ল, তখন আনন্দে আমার প্রাণ নৃত্য করে উঠল। আমি আবার আমার মা, বোন, লোকজন আর প্রজাদের পেয়ে সুখী হলুম। আর এই সুখ আমার চিরস্থায়ী হ’য়ে আছে, কেননা, এক সপ্তাহ পরেই আমি হেনরিয়েটাকে বিয়ে ক’রে কেললুম। জীবনটা সত্যি এখন বড় আনন্দের—উপভোগ করবার মতন ব’লে মনে হচ্ছে...। *

* Augustin Eugene Scribe হইতে।

শূদ্রধর্ম

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ জীবিকার জন্তে নিজের সুযোগমত নানা কাজ করে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তা'র কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শাস্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রে তা'র সমস্ত সর্কারিতাসমের মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্বাচন-সম্বন্ধে ইচ্ছাব দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কা'জের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তা'র বি'জ্ঞান ধামতে চায় না।

মুস্থিল এই যে, বাজ-সংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে-স্থলে তা'র পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তা'র খেতাব নিয়ে মানের দাবী করে। ফরাস এদিকে পেটে খেতে হয়রানু হয় আর মনে মনে ভাবে, তা'র প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হ'লে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজ একেবারেই বন্ধ হ'য়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে ফরাসের কাজ অত্যাৱশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসম্ভাবজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃহস্পতি-ভেদকে পুরুষাত্মকমে পাকা করে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তা হ'লেও তা'র মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বি'জ্ঞান হের চেষ্টা কখনই ধামত না। পাকা হ'ল ধর্মের শাসনে। বলা

হ'ল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তা'র ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবী করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্ত নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণেরও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তা'র সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায়নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের প্রতিবে হীনতা স্বীকার করার মধ্যে তা'র এমটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্ত্রত জীবিকানির্বাচকে ধর্মের শ্রেণীতে তুলু করা তখন চল যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহু দৈন্ত স্বীকার করে নিয়ে সমাজের আধা'অক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিস্তৃত যদি রাখে তবে তা'র দ্বারা তার জীবিকানির্বাচ হলেও সেটা জীবিকানির্বাচের চেয়ে ব'ড়া, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে, তবে একদিনও সমাজ টেকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম বলে স্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সাস্ত্রনা তাকে কেউ দেয়নি যে, চাষকরার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তা'র সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, একথা সুস্থপট।

যেদেশে জীবিকা অর্জনকে ধর্মধর্মের সামিল করে দেখে না, সেদেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হ'লে সমাজের সর্কনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সর্কারিতাবশত সে-রকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার

আমি লাজত হ'য়ে বললুম “দেখুন, অনিচ্ছাসবেও আমি আপনার এই দুঃখতরা গ.তবিধি লক্ষ্য করেছি ; আশা করি, আমার অজ্ঞা আর বন্ধুত্ব অরণ ক'রে আপনার মনের কষ্টের কিছু লাঘব হবে—”

“হাঁ, হাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যাই হোক, তুমি ত আর এখন আমার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তথাপি তুমি আমার শেষ সাধ আর শেষ প্রতিজ্ঞার কথা আমার কাছে শুনতে পারো। এইটুকু তোমার কাছে এখন আমার প্রার্থনা—তুমি ধীর হ'য়ে আমার কাহিনী শুনবে—”

তিনি ঘরখানা একবার পায়চারি ক'রে ঘুরে দরজা বন্ধ করে' দিলেন, তাঁর পর আমার কাছে এসে বসলেন। আমি বিচলিত আর সশঙ্কিত হ'য়ে তাঁর কথা শোনার আশায় ব'সে রইলুম। তাঁর গলায় স্বব হিঙ্গ গভীর আর তাঁর আকৃতিতে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যা আমি কখনও কারও লক্ষ্য করিনি। তাঁর প্রশস্ত ললাট, —অদৃষ্টদেবী যেন নিজ হাতে তা চিহ্নিত করে' দিয়েছেন। গায়ের রং একেবারে কাকাসে হ'য়ে গিয়েছে। চোখ-দুটি ছিল কালো, বেশ উজ্জ্বল, আর দৃষ্টি ছিল যেন অগস্ত্য। মাঝে-মাঝে তাঁর মুখে বহুলা আর দুঃখের হাসির ছাপ ফুটে উঠছিল।

তিনি বসতে লাগলেন, “আমি তোমার কাছে যে-বর্ণনা আজ করব, তা শুনে তুমি বিশ্বাস স্থাপিত হ'য়ে যাবে। তবুও আমার কথার বিশ্বাস করবে না। আমি নিজেই যে এখনও সব সময়ে এটা বিশ্বাস করতে পারি নে !.....আমি নিজেই বলি—না,—এ হ'তে পারে না, কিছুতেই না। কিন্তু এর অসমাপ রয়েছে যে, জলজলে সত্য ঘটনা। আর এটাও কি সত্য নয়, যে, অনেক সময় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ না জেনেও, আমরা অনে - অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করতে বাধ্য হই ?”

কিছুকণ চুপ ক'রে কপালে হাত রেখে, বোধ হয় তিনি সমস্ত ঘটনাটি মনে করতে লাগলেন। তাঁর পর ধীরে-ধীরে বললেন, “আমি এই প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলুম ; আমার বড় ছ ভাইই আমাদের বংশের সম্মান আর অর্থের উত্তরাধিকারী হলেন। আমি সামান্ত একটা বাড়ী তির, অল্প কিছুই পাবার আশা করতে পারলুম না। কিন্তু তথাপি, বড় হওয়ার আশা, গৌরব অর্জন করবার একটা বাসনা, আমার মাথায় জেগে আমার প্রাণে আশাব আনন্দ ছড়াতে লাগল। খ্যাতি-প্রতিপত্তি-হীন হওয়ার, আর লোকচক্ষুর অগোচরে থাকায়—বণ-প্রতিপত্তি লাভ করবার জন্তে আমি যেন মরিয়া হ'য়ে উঠলুম। এই পেরাল আর পাগলামিতে আমার জীবনের আনন্দ বা মাধুর্ষ উপভোগ করবারও আর হ'স রইল না। বর্তমানকে আমি ত মোটেই আমলে না এনে, ভবিষ্যতের আশায় আশ্রয় ধারণ ক'রে রইলুম ; কিন্তু ভবিষ্যৎও আমার কাছে মধুর হ'য়ে ধরা পড়ল না।

ত্রিশ বছর বয়স যখন আমার হ'ল, তখনও আমার আসল কাকের মতন কাঁজ, জীবনে কিছু হ'য়ে উঠল না। এই সময়ে পাত্রী সহরে, সাহিত্য-সাধনার বাতি, এমন উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে উঠল, যে আমাদের এই শূন্য মনকেও, তাঁর শানিক আলো ছাড়িয়ে পড়ল। আমি ভাললুম,—হাস, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যদি একটা নাম কিনি, আমি বিখ্যাত হ'তে পারতুম, তা হ'লেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যেত !.....আমার কাজকর্ম করবার জন্তে একজন বৃদ্ধা চাকর ছিল ;—সে আমার জন্মবার বহু আগে হ'তেই আমাদের বাড়ী কাজ করছে। এ-দেশের মধ্যে, ওই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন,—কেননা, কবে যে, সে প্রথম এদেশে এল তা কেউই বলতে পারে না—চাষা লোকেরা বলে থাকে,—মার্শেল ফেবার্টের মরণের সময়ও নাকি বেঁচে ছিল, আর আসলে ও হচ্ছে নাকি একটা বদমাইস্ দেহা...”

এই নাম শুনে আশ্চর্য হ'য়ে চমকিত হলুম। সন্মুখের অপরিচিত লোকটি, আমার এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য ক'রে তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা

করলেন। আমি বলে উঠলুম,—“না ও কিছু নয়।” আমার মনে কিন্তু এই ধারণা দৃঢ় হ'ল, যে, কাল সন্ধ্যাবেলা হোটেলের সকলে, এর কথাই গল্প করতেন.....

ভক্ত্যলোকটি আবার বলতে লাগলেন,—“একদিন ইয়োগোব কাছে,—আমার ওই কাফ্রি-চাকরটার ঐ নাম কি না,—আমি আমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলুম ; আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন, নিষ্ফল জীবনের জন্তে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলুম। আমার বার্ষিক একঘেয়ে জীবনব্যতীর জন্তে আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ছিলাম। অবশেষে হতাশ হ'য়ে নিরাশ কণ্ঠে বললুম, ‘আমি যদি প্রথম শ্রেণীর একজন নামজাদা প্রত্নকার হ'তে পারতুম তা' হ'লে মানস্ক আমি আমার জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু দান ক'রে দিতাম।

‘ইয়োগো শাস্তকণ্ঠে বললে,—‘দশ বৎসর। এ যে চড়া দান হ'য়ে গেল ! সামান্ত এই ব্যাপারের জন্তে, এ যে প্রচুর ব'লে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমি তোমার দশ বৎসরই গ্রহণ করলুম,.....তোমার অঙ্গীকারের কথা কিন্তু মনে থাকে যেন,.....আমি কিন্তু আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব—এটা ঠিক জেনো।”

তা'কে এইরকম বলতে শুনে, আমার যে কি রকম আশ্চর্য বোধ হ'ল, তা আর তোমাকে কি বর্ণন। আমি ভেবেছিলুম, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তা'র বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তা'র কথায়, আমি একটু হান্ধলুম মাত্র। তা'র পর আর তা'র কোনো খবর আমি রাখলুম না। দিন-কয়েক পরে, আমি পারাতে গিয়ে হাজির হলুম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমি উৎসাহিত হ'য়ে খানকয়েক বই প্রকাশ ক'রে ফেললুম, সেগুলো সব খুব উচুনের বই দাড়িয়ে গেল। যাক,—তা'র বিশদ বিবরণ আমি আর এখন দিতে চাইনে। এই বললেই চলবে, সারা দেশের লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে উদ্গ্রীব হ'য়ে পড়ল, আর কাগজগুলো আমার প্রশংসা ক'রে পাতা ভরাতে লাগল। আমি যে ছদ্ম নামের আশ্রয় গ্রহণ করে' বই লিখলুম,—ক্রমে সে নাম এত প্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়ল, যে আজকালকার দিনের ছোকরারা—তোমরা পঞ্চাশ—তা'র বইয়ের কদর করো...”

তিনি যে কে হ'তে পারেন; মনে-মনে চিন্তা ক'রেও কিছু ঠিক করতে না পেয়ে আমি বিশ্বাসে অভিভূত হ'য়ে পড়লুম। তা'র পর বললুম,—তা হ'লে আপনি এবাড়ীর কর্তা;...ডিডক্ নু ?

তিনি শুধু শাস্ত্যাবে উত্তর দিলেন “না,” তা'র পর দুঃখতরা একটি দীর্ঘবাস মোচন করলেন। মুখে তাঁর একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। তা'র পর আবার বলতে লাগলেন—“এই সাহিত্যিকের গৌরব—বা লাভ করবার জন্তে আমি দক্ষিণ পন ক'রে বসেছিলুম—এতে আর আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত রইল না। আরও বেশী খ্যাতি অর্জন করবার জন্তে আমার জন্মের নেচে উঠল। ইয়োগো আমার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবার জন্তে সঙ্গে-সঙ্গে পারাতে এসে হাজির হয়েছিল। আমি তা'কে বললুম—এ কি !...এতে প্রকৃত গৌরব নেই। বিচক্ষণ সমরজয়ী বীর পুরুষ না হ'লে সত্যকার খ্যাতি পাওয়া যায় না। লেখক বা কবি...এসব ত কিছুই নয়। এর চেয়ে আমি একজন জেনারেল বা পল্টনের ক্যাপ্টেন হ'তে পারলে ঢের বেশী সুখী হতুম। দ্যাপো ইয়োগো—আমি যদি সৈন্য-বিশাগে খুব খ্যাতিলাভ করতে পারি, তা হ'লে আমি হাসতে-হাসতে আমার জীবনের আরও দশটা বৎসর নষ্ট করতে রাজি আছি.....

ইয়োগো বললে—‘তথ্য আমিই তোমার ওই দান গ্রহণ করলুম, কিন্তু শেষে যেন জু'লে যেও না...দাখা...” আমার মুখে ভয় আর আবিষ্টাসের যে ছাপ ফুটে উঠেছিল সেটা লক্ষ্য ক'রে ওই মজুত লোকটি আবার চুপ করলেন। তিনি আমাকে বললেন

“দেখ, আমি গোড়াতেই ত বলেছিলুম; তুমি এ বিশ্বাস করবে না।...তুমি তাবু এ রূপকথা—স্বপ্ন, না? আমার নিজের কাছেও তাই ব’লে মনে হয় বটে...বাই হোক, ইরানোর সঙ্গে সর্ভ হওয়ার কলে, আমি যে সৈন্ত-বিশ্বাসে সম্মান আর উচ্চপদ লাভ করলুম, সেটা ত স্বপ্ন বা অলৌকিক নয়! আমি খুব পরাক্রমী সৈন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতুম। ওঃ!—সে, কি অদ্ভুত অভিব্যক্তি। কি-রকম দৃষ্ট ভাবে, আমি বিপক্ষদের বিজয়-পতাকা ধূলাশায়ী ক’রে দিয়েছি। সারা ক্রান্ত আমায় বিজয়-যোষণায় মুগ্ধ হ’রে উঠল। যত যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, তা’র মূলে ছিলুম আমি...আর তা’র জন্তে যা কিছু পৌরব, সে প্রাপ্য হচ্ছে একা আমার।”

এই ব’লে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে, খুব জোব জোর পা কে’লে বীরের মতন ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগলেন। উদ্বেগ আর বিষয়ে আমার চৈতন্য পর্যাপ্ত যেন লোপ পাচ্ছিল। আমি আপন মনে জনকয়েক প্রসিদ্ধ যোদ্ধার নাম সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে কে ইনি হ’তে পারেন...সেই চিন্তা করতে লাগলুম।

এইরকম বীরত্ব প্রকাশের পর হঠাৎ আবার যেন তিনি মনভাঙা হ’য়ে পড়লেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে শাস্তকণ্ঠে তিনি আবার বলতে লাগলেন, “ইরানো কিন্তু তা’র প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিল।...কিন্তু এই প্রতুত পরিমাণে সমরগৌরব লাভ ক’রেও কিছুদিন পরে তা’তেও যেন আমার অর্ধি আর বিরক্তি ধ’রে গেল। তখন বাস্তবজগতের একমাত্র সারবস্তু যা, সেই ধনদৌলত লাভ করবার জন্তে আমি ব্যগ্র হ’য়ে উঠলুম। আবার পাঁচ বৎসর পরমায়ুর বিনিময়ে আমার মনস্কামনা সে পূর্ণ করলে। শোনো তুমি,—প্রচুর অর্থ আমার আছে; আমার ধনদৌলত, বিষয়-সম্পত্তি এত যে, লোকে স্বপ্নেও তা ধারণা করতে পারে না। এইসব অট্টালিকা, বাগান, জমিজমা, সব এখনও আমার...আমার এইসব কথার আর ইরানোর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি তোমার অবিশ্বাস হয়, তা হ’লে একটু অপেক্ষা করো,—দেখতে পাবে, সে আসছে...দেখলে, শুনে, তোমার পর্যাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে।...এ যে একবারে নিছক সত্য ঘটনা কি না...!”

তা’রপর তিনি আগুন আলুবার চিমনির দিকে একবার এগিয়ে গেলেন। ঘড়িটার দিকে একবার চাইতেই তাঁর মুখে শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল। তা’র পর আবার ধীরভাবে বলতে লাগলেন—এই আশ্রয়ী সকালবেলা, আমি এত অস্থূল আর দুর্বল বোধ করছিলুম, যে, আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছিলুম না। আমি আমার চাকর ইরানোকে ডাক দিতেই সে এসে হাজির হ’ল। আমি তা’কে জিজ্ঞাসা করলুম—“এ আমার কি হচ্ছে বলা দেখি?”

সে বললে, ‘বিশেষ কিছুই এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়...সময় হ’য়ে এসেছে হজুর,—দিন ফুরিয়ে এসে,—আর কি?’

আমি বিস্মিত হ’রে জিজ্ঞাসা করলুম—“সে আবার কি?”

সে বললে—“বলতে পারছ না? ভগবান তোমার ষাট বৎসর পরমায়ু দিয়েছেন,—আর ত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই ত তোমার কাছে কাজ ক’রে আসছে—”

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম—ইরানো, সত্য কথাই বলছে তুমি?”

...হ্যাঁ হজুর।...পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে কর্তা তুমি তোমার পঁচিশ বৎসর জীবন নষ্ট ক’রে কলেছ। সেসব ত আমাকে বিক্রী ক’রে দিয়েছ,—সে পরমায়ু এখন আমার জীবনের সঙ্গে যোগ হ’রে যাওয়ার,—আমারই বাঁচবার দিনের মাত্রাটা বেশ বেড়ে গেছে.....”

“সে কি! তা হ’লে কি আমার জীবনের বিনিময়ে তুমি আমার সমস্ত কাজ করেছিলে?”

“হ্যাঁ তাই বই কি! শুধু তুমি একা নও,—সকলেই ওইভাবে

যুগযুগান্ত থেকে তাদের জীবনের মূল্য দিয়ে এসেছে.....আমার আগেকার এক মনিব কেবার্ট ছিল,—তা’রও হয়েছিল ঠিক ওই দশা—”

আমি ব’লে উঠলুম—“চূপ করো—চূপ করো—এসব মিথ্যা...কখন সম্ভবপর হ’তেই পারে না—কিছুতেই না...”

“সে আপনার যেমন অস্তিত্ব, বলতে পারেন,—কিন্তু প্রকৃত হোন—আপনার আর মাত্র আধঘণ্টা আর অবশিষ্ট আছে।”

“আমার সঙ্গে উপহাস করছ তুমি, ইরানো।”

“না কর্তা, মোটেই না,—তুমি নিজেই হিসাব ক’রে দেখ না। তোমার বয়স হ’ল এখন পঁচাত্তিশ বৎসর—আর তোমার পঁচিশ বৎসরের পরমায়ু আমাকে বিক্রী ক’রে ফেলেছি,—তা হ’লেই ষাট হ’ল না? এ-ত বেশ সোজা হিসাব প’ড়ে রয়েছে”—এই ব’লে সে চ’লে যেতে চেষ্টা করলে। আমার শক্তি যেন লোপ পেতে লাগল—প্রাণ বেরিয়ে আসবার উপক্রম হ’ল!...

আমি ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে ব’লে উঠলুম—“ইরানো, ইরানো—আমাকে আর ছুটার ঘণ্টা সময় দাও...”

সে বললে,—“না, সে হবে না; তা হ’লে আমার নিজের পরমায়ু থেকে যে তোমায় দিতে হয়। দু’ঘণ্টা বাঁচতে পাওয়ার সঙ্গে সমমূল্য হ’তে পারে, এমন কোনও সম্পদ পৃথিবীতে নেই। আমি তোমার চেয়ে জীবনের মূল্য চের বেশী বুঝি।”...

আমি আর কথা কইতে পারছিলুম না। চোখ যেন ব’সে যেতে লাগল। শিরার মধ্যের রক্ত যেন স্তম্ভের স্পর্শে হিম হ’য়ে আসতে লাগল। অনেক চেষ্টা করবার পর, আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটল—আচ্ছা, তুমি তোমার সমস্ত দান ফিরিয়ে নাও। আমি প্রাণ তরে’ বে ধনদৌলত অর্থ সম্পত্তি চেয়েছি—আর লাভও করেছি,—মাত্র চারঘণ্টা জীবন পাওয়ার আশায় আমি এসমস্তই ত্যাগ করতে এখনই প্রস্তুত আছি...”

আমার কথার সে ব’লে উঠল—“আচ্ছা, তাই হোক—তুমি বড় ভালো মনিব—তোমার জন্তে আমি কিছু উপকার করতে রাজি আছি।...বাই হোক, তোমার কথা-মতই কাজ হবে—তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।...”

“আমার শরীরে আবার যেন বল ফি’রে এল। আমি চীৎকার ক’রে ব’লে উঠলুম,—“মোটে চার ঘণ্টা। ভারি বড় অল্প সময় যে সে...ইরানো ইরানো,—যে সাহিত্যের খ্যাতির জন্তে আমি একজন বিশ্ববিখ্যাত লোক হ’য়ে উঠেছি,—আরও চার ঘণ্টা জীবনে: বিনিময়ে, আমি সেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই ত্যাগ করতে রাজি আছি।”

সে বললে—“এরই জন্তে চার ঘণ্টা,—অনেক হ’য়ে গেল যে। থাক তোমার শেষ অনুরোধটা, আমি আর অস্বীকার করব না।...”

আমি আবার ব’লে উঠলুম—“এই শেষ নয় ইরানো, এই ইশেব নয়।” আমি মিনতি করছি, আজকের সন্ধ্যা পর্যাপ্ত অন্তত আমাকে বাঁচতে দাও। এই সারাদিনের বিনিময়ে, আমার সাময়িক কোশল, বীরপুরুষের খ্যাতি, জয়ের গৌরব, সব দান করছি,—লোকেরা, তাদের স্তুতি থেকে আমাকে একেবারে মু’ছে ফে’লে দিক—আমি কীর্তি রেখে যেতে চাই নে। ইরানো—শুধু আজকের সারা দিনটা আমাকে বাঁচ’তে দাও—কেবলমাত্র দিনটি...বাস, আমি আর-কিছু চাইব না,—তা’তেই সন্তুষ্ট থাকব।”

“তুমি আমার দয়ার অপব্যবহার করছ—বাই হোক, আজকের সন্ধ্যা পর্যাপ্ত তোমাকে বাঁচতে দিলুম,—কিন্তু তা’র পর আর-কিছু চাইতে পারবে না বলছি। সন্ধ্যা হ’লেই আমি তোমার কাছে আসব’—ব’লে সে চ’লে গেছে। তোমার আমি আজ এই প্রথম দেখছি।—

সাংঘাই শহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট চলছে তা'র সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার The Nation পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীন ভ্রমণগোষ্ঠীর যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে উদ্ধৃত করি :—

8 A Chinese Graduate of Glasgow. His English is faultless. His labor library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.

I am a pacifist. But I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike. It will show you how hard it is to be a pacifist in China today.

There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman

chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one of the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said:

“If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men”.

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two Englishmen came up. They said to me :

“What are you doing here interfering with this policeman? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here.”

They said that to me in China.

“গড্ডলিকা” *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বইখানির নাম “গড্ডলিকা”। ভয় ছিল, পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের অংশুপরিচয়ের মিল থাকে,—কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা-প্রবাহের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি ঘরের কাছে দেখি একটা উইয়ের টিবি, আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাহরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।

লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়াছেন। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, চে-১ লোক বলিয়া মনে হইল

না। কেননা, লেখার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।

পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশুরাম রূপধ্বংসকারী, তাহা রূপসৃষ্টিকারী নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জন্ম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একে-বারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তা'র কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অব্যক্ত বা হৃৎকৃতিকে লেখক তাহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি

* গড্ডলিকা—পরশুরাম রচিত, যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত। পাঁচ সিকা। ১৯০৭ পার্শ্ববাগান, কলিকাতা।

না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন-কি, তাঁর ভূমণ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণবিবরণের মধ্যে কোথাও লেখা আছে; এমন-কি, যে পাঠাটা কলকট-ওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে আমারই টেবিলের উপর ছুই পা তুলিয়া আমার কবিতার খাতাখানা চিবাইতে দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। লেখক বোধ করি আধুনিক কল্প-হেতুর দিনে নিজেদের বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই,

কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসশটার দলেই দাবী করি। ইহাতে বর্তমান খ্যাতির অঙ্কে যদি তাঁহার কিছু লোকসান হয়, সুদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উষ্ম থাকিবে।

লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিশ্ময়কর, ইহাতে আরো বিশ্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার ছোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গীতে ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।

দেবতার গ্রাম

শ্রী সীতা দেবী

১

সমস্ত দিন অসহ্য গরমের পর সবে একটুখানি বাতাস ঝিরঝির করিয়া সামনের নারিকেল-গাছের পাতাগুলি ছলাইয়া দিয়া গেল। চক্রবর্তীদের বাড়ীর বড় শুইবার ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলিয়া একটি বছর পঁচিশের মেয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'কান্ন, ও কান্ন'।

ডাকের উত্তরে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেয়েটি উঠানে নামিয়া আসিয়া দেখিল, সদর দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। ছয়তের গোড়ায় দাঁড়াইয়া সে উদ্ভয় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। একটি দশ বারো বছরের মেয়ে একখানি লাল ডুরে শাড়ী পরিয়া মল বাজাইতে-বাজাইতে দরজার সামনে আসিয়া বলিল, "ঘাটে যাবে, সরি মাসি?"

সরি বলিল, "যাব কি? হতভাগা ছেলেটা যে কোথায়

গেল খুঁজে পাচ্ছি না। এই খানাখন্ডের দেশে কোথাও জলেটলেই পড়ল নাকি কে জানে?"

মেয়েটি বলিল, "জলে পড়বে কেন? এই ত আমি দেখে এলাম ছিদামদের বাড়ীতে খেলা করছে তাঁর নাতিনাত্নী দুটোর সঙ্গে।"

"লক্ষ্মাছাড়া ছোড়ার যেমন রূপ তেমনি গুণ।" বলিয়া সরি ওরফে সরোজিনী দরজা পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। "বামুনের ঘরে জন্মেছে, কিন্তু মুচি মুদফরাম ছাড়া কারো সঙ্গে ওর ভাব নেই। এখানে এসে অবধি কি যে ছিদামের বাড়ীতে পেয়েছে হতভাগাকে। মেজ মাসি জানতে পারলে আমাকেই ঝাঁটা-পেটা করবে। মুসলমানের বাড়ী সারাদিন পড়ে থাকবে ছোড়া। জলটলও খেয়ে আসে না কি কে জানে?"

পাড়াগাঁয়ে অত পরদার ঘট নাই, তাহার উপর সরোজিনী আবার এই গ্রামের মেয়ে। কাজেই তাহার ঘোমটা টানিবারও প্রয়োজন হইল না। "শৈলি, আর ত

শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা, বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আরজি মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তান্তভেদকে ধর্মশাসনের অঙ্গগত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখে বাব বিষয়।

যেসকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, বা বুদ্ধিমূলক বিশেষ কর্মতার দ্বারা সাধিত হ'তে পারে, তা ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না। যদি তা'কে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তা হ'লে ক্রমে তা'র প্রাণ ম'রে গিয়ে বাইরের ঠ'টুটাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে-সাধনা আন্তরিক তা'র জন্মে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবলমাত্র আন্তরিক, সেটা সহজ। আন্তরিক আচার বংশান্তরক্রমে চলতে চলতে তা'র অভ্যাসটা পাকা ও দৃঢ়তা প্রবল হ'তে পারে, কিন্তু তা'র আসল জিনিষটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উঠে জীবনপথের বিপ্লব ঘটায়। উপনয়ন প্রথা একসময়ে আর্ষাধিকারের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল,—তা'র শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্যা, গুরুগৃহবাস সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্ষাদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যেসকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্মে নিয়ত জাগরুক চিন্তাশক্তির দরকার সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্দূকের মধ্যে বদ্ধ করে রাখার নয়। সেইজন্মেই স্বভাবতই উপনয়ন প্রথা এখন প্রহসন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা'র কারণ উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে স'রে। কজ্রিয়েরও সেই দশা, কোথায় যে সে, তা'কে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা কজ্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অস্থানীয় সময়েই তা'রা কজ্রিয়ের কর্তকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এদিকে শাস্ত্র বলচেন স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ-কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম তা'কে, তাই পালন করতে হবে। এ-কথা বললেই তা'র তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে-অংশটুকু অক্ষতাবে পালন করা চলে, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তা'র কোনো প্রয়োজন থাকে তা'র নাই থাক, তাতে অকারণে মাতৃমহের স্বাধীনতার স্বর্ধতা ঘাটে তা'র ক্ষতি হোক। অক্ষ অচারের অত্যাচার অত্যাচার বেশি, তা'র কাছে ভালো-মন্দ আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে-শুচিবায়ুগত মেরে কণায় কণায় স্থান করতে ছোট্টে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে ঘৃণা বোধ করে না। বস্তুত তা'র পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্মে অহংকার ও অস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞায় তা'র চিন্তের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এই কারণে আধুনিককালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্মণ-সভার মতে স্বধর্মপালন করে, তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশান্তরক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তাতে মন যতই ম'রে যায়, কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এইসকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিন্তা চাই। বংশান্তরক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তা'র উপযুক্ত চিন্তাও বশিক থাকে না, মানুষ কেবল ধর্ম হ'য়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাট হোক, আজ ভারতে বিস্তৃতভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রের তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্মেই ভারতবর্ষের নিম্নে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তা'রা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষান্তরক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাখিয়ার্টা-বর্ণের মধ্যেও তা'রা স্বধর্মরক্ষা করতে স্তুতিত হয় না। তা'রা তো কোনো ালে

সম্মানের দাবী করেনি, পায়ওনি, তা'রা কেবল শূদ্রধর্ম
অত্যন্ত বিপুলভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে
করেছে। আজ যদি তা'রা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে
আত্মবিস্মৃত হয়, তবে ব্রাহ্মণসভা তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে
আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি,
তাই একদিক্ থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই
দেশ। তা'র নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই
অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের
সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হ'য়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য
জ্ঞানসাধ্য চারিত্র-শক্তিসাধ্য যেকোনো মহাসম্পদাভের
সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্ব-
ভার ঠেলে তবে করতে হবে,—তা'র পরে সেই সম্পদকে
রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ
করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের
ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় দুর্গতির যে ছবি
দেখতে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে
আমাদের জাহাজ লাগল, দেখ লুম সেখানে ঘাটে একজন
পাঞ্জাবী পাহারাওয়ালার অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের
বেগী ধ'রে তা'কে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হ'য়ে
গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাজনধারীকর্তৃক স্বদেশীর
এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে
দিয়েও তাই দেখ লুম। দেশেবিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন
করতে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হ'য়ে এরা
গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই
চায় না, কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মাতুষ। নিমকের
সহজ দাবী যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তা'কে বহুদূরে
জল্বন ক'রে যায়, তা'তে আনন্দ পায়, গর্ক বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ্ কেড়ে নিতে
গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে
এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে
যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের
পদাচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইংসিং হিউয়েনসাঙের চীন।

মানব-বিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার-
দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে
ইংরেজের তীক্ষ্ণচক্ষু ধরনধর-দারুণ শোনতরণীর নীড়
বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে,
এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলচে, যুরোপের
মর্মের প্রতি তা'র লক্ষ্য। রক্তমোকণক্লাস্ত পীড়িত
এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্ব-
মহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তা'র
দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগ্‌বার উপক্রম
করতে। হয়তো একদিন এই বিরাট্‌রায় জাতি তা'র বন্ধন
ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তা'র
আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে
আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি
যারা ফুটো করতে লেগেছিল, তা'রা চীনের এই চৈতন্য-
লাভকে যুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লেই গণ্য করবে।
তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্রভারতবর্ষের কী কাজ ?
তখন সে যুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল
কাঁধে ক'রে নির্কিঁচারে তা'র প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে।
সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে একথা প্রশ্ন
করতে তা'র ধর্ম নিষেধ। সে বলবে স্বধর্ম হননঃ শ্রেয়ঃ,
স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ। ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে
সম্মান চায় না, পায়ও না—ইংরেজের হ'য়ে সে কুলিগিরির
বোঝা ব'য়ে মরে, যে-বোঝার মধ্যে তা'র অর্থ নেই, পরমার্থ
নেই, ইংরেজের হ'য়ে পরকে সে ভেড়ে মারতে যায়, যে-পর
তা'র শত্রু নয়, কাল সিদ্ধ হবামাত্র আবার তাড়া খেয়ে
তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের
দীক্ষা। তা'র কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে
কেবল স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ এই বাণী। নিধনের অভাব
হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মাতুষের বড় দুর্গতি আছে,
যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ
করাকেই অনায়াসে কর্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব
এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে
কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা
হ'লে নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, "I miss my best
servant."

একটু আমার সঙ্গে”, বলিয়া নবাগতা শৈলর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। শৈল একটুখানি আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমার যে দেবী হ’য়ে যাবে মাসি, যা আমাকে শিগ্গির করে’ফিরতে বলেছে।”

“কেন লা ? তোর বর আসবে বুঝি আজ ?” মেয়েটি লাল হইয়া উঠিয়াই তাহার কথার উত্তর দিল।

“আচ্ছা যা, আমি একলাই এটুকু যেতে পারুব,” বলিয়া সরোজিনী শৈলকে ছাড়িয়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ছিদামের বাড়ী বেশী দূর নয়। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই সরোজিনী নেপিল, তাহার চার বছরের ছেলে কাহু বসিয়া-বসিয়া একটা ছাগলছানাকে কচি পাতা আর ঘাস খাওয়াইতেছে। ছিদামের নাতি পাতা-ঘাস কুড়াইয়া আনিতেছে এবং নাত্নাটি আপনার পাখের মল খুলিয়া ছাগলের পায়ে পরানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। চতুর্পদটি এ-প্রকার প্রসাদনে প্রবল আপত্তি করিলেও তাহাকে মোটেই নিষ্কৃতি দেওয়া হইতেছে না।

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় লাগাইয়া দিয়া সরোজিনী ছেলের হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। ছেলে সারাপথ আর্ন্তনাদে মুখর করিয়া তুলিল। বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই সরোজিনী পড়িল তাহার পুষ্ণায়া মেজমাসির সামনে। তিনি বারাণ্ডার উপর দুই পা ষথাসম্ভব ছড়াইয়া বসিয়া হাই তুলিতেছিলেন। বোনঝিকে দেখিয়া বলিলেন, “ছেলেটাকে অমন করে’ ঠাণ্ডাচ্ছিস্ কেন রে ?”

“না ঠেঙিয়ে করি কি ? যা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কোন্ দিন জলে ডুবে মরবে ! গিয়ে দেখি পুকুরপাড়ে বসে’ কাদা নিয়ে খেলছে।”

“আমি পুকুরপাড়ে যাইনি, আমি ছাগলছানা নেবো ‘ও-ও-ও’, করিয়া কাহু আবার চীৎকার শুরু করিল। পাছে সব কথা কাশ হইয়া যায় সেই ভয়ে ছেলেকে আরো গোটা কয়েক চড় লাগাইয়া সরোজিনী তাহার কথা বলার পথ বন্ধ করিয়া দিল। “কি ছেলে-ঠাণ্ডানীই হয়েছিস্ বাছা, দশটা না পাঁচটা না, ঐ ত একটাতে এসে ঠেকেছে মরে’ করে’, তাকেও রাত দিন চড়

চাপড় !” বলিয়া বুঝা আবার হাই তোলায় মন দিলেন। মাসীর কথায় সরোজিনীর ছেলে ঠাণ্ডানোর উৎসাহ হঠাৎ যেন অস্তর্ধান করিল। সে কাহুকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সরোজিনীর বিবাহ হইয়াছিল নিকটেরই এক গ্রামে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই সে পূজার সময় বাড়ী আসিত। দুই একটি ছেলে মেয়ে হওয়ার পর ক্রমে বাপের বাড়ী আসাটা তাহার কমিয়া আসিল। এইবার সে আসিয়াছে চার পাঁচ বৎসর পরে। ইহার ভিতর সুখ-দুঃখের কত প্রাবন তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। তিনটি সন্তানের মধ্যে দুইটি তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যেটি আছে তাহাকে লইয়া সরোজিনীর আশঙ্কার অস্ত নাই। কাহুকেও কি আর বিধাতা তাহার মত হতভাগিনীর কাছে রাখিবেন ? তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সে উজাড় করিয়া এই শিশুদেবতার নিকটেই উৎসর্গ করিতে চাহিত, আবার ভয়ে হাত গুটাইয়া লইত। এইজন্য ছেলের প্রতি ব্যবহারে তাহার কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। কখনও তাহাকে আদরে আদরে ডুবাইয়া রাখিত, কখনও বা তাহার অদৃষ্টে চড়চাপড় বকুনি ভিন্ন কিছুই জুটিত না। দেশের বাড়ীতে থাকিতে এইরূপ ব্যবহারে কাহুর কিছু অস্ববিধা ছিল, কারণ মায়ের আদর বা অনাদর কোনো কিছু হইতেই তাহার পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। বাড়ীর যে ক’টা ঝি চাকর ছিল, সব ক’জন এই একমাত্র শিশুর পিছনে ঘুরিত। একটু সদর দরজার চৌকাঠ মাড়াইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

কিন্তু মামার বাড়ী আসিয়া সে ঝিচিয়া গিয়াছিল। মাও এখানে সারাক্ষণ তাহাকে আগ্লাইয়া রাখিতে সময় পায় না ; বাল্যসখী, ভ্রাতৃভায়া প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া তাহার অনেকটা সময়ই কাটিয়া যায়। দরিদ্রের সংসারে ঝি-চাকরের বাল্যইও বিশেষ ছিল না, কাজেই মায়ের হাত হইতে ছাড়া পাইলেই কাহুর ছিল অবাধ গতি।

এই নূতনলক স্বাধীনতাটার সে ভাল করিয়াই সম্বাবহার করিতেছিল। পাড়ার যেখানে যত ছেলে-মেয়ে ছিল, ভদ্রলোক ছোটলোক-নির্কিশেষে সে সকলের সঙ্গেই বন্ধুতা করিয়া তুলিয়াছিল। সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাহার ছিদাম মুসলমানের বাড়ীটা। সম্বয়সী দুটি ছেলেমেয়ে ত এখানে ছিলই, তাহার উপর ছিল একটা ছাগলছানা এবং গোটা-দুই কুকুরছানা। ছাগলছানাটাই তাহার বেশী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের নামের সহিত নাম মিলাইয়া ছানাটার সে নাম রাখিয়াছিল পানু, এবং নিজের এই বছরের কেনা নূতন পূজার কোটটা তাহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছিল। সরোজিনী অবশ্য সেটা উদ্ধার করিয়া আনিয়া জুতা-জোড়া দিতেও তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহার দুপাটি জুতাতে পানুর চারটি পায়ের শোভাবর্ধন করা সহজ নয় দেখিয়া সে-সংকল্পটা কাহাকে ত্যাগই করিতে হইল।

কিন্তু তাহার মামার বাড়ীর ব্রাহ্মণ্য তাহাকে বড়ই আলাইয়া তুলিয়াছিল। যখন-তখন তাহাকে ছিদামের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া শুষ্ক করিয়া তোলা ত কাহুর মায়ের এক নিত্য-কর্মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সরোজিনীর নিজের যে গৌড়ামী খুব বেশী ছিল তাহা নয়, তবে মাসী পিসীর পাল্লায় পড়িয়া খানিকটা জাত বাঁচানোর চেষ্টা না করিয়া তাহার উপায় ছিল না। তবে অল্প ক’দিনের জন্ত সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে অনেক দিন পরে, কাজেই কাহু মাঝে-মাঝে ছুটি পাইতই। মায়ের বয়স অল্প, সঙ্গিনীরও অভাব নাই।

পূজার দিন-ক’টা বড়ই যেন তাড়াতাড়ি কাটিয়া গেল। সরোজিনীর এর পর না ফিরিলেই নয়; অনেক বৎসর বাপের বাড়ী যায় নাই, পনেরো ষোলো দিনের বেশী কখনই থাকিবে না, ঠাকুর-বি শঙ্কর-বাড়ী যাইবার আগেই সে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে, ইত্যাদি অনেক প্রকার কথাই জ্বরে তবে সে স্বামীর কাছে ছুটি পাইয়াছিল। তাহার ননদও দিন কয়েকের জন্ত দয়া করিয়া সংসার চালাইবার ভার লইয়াছিল।

বিদায়ের দিন কাহুকে অনেক কষ্টে ছিদামের বাড়ী

হইতে টানিয়া আনা হইল। পানুকে সে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানো যায় না। তাহার কান্নায় ব্যাধিত হইয়া বৃদ্ধ ছিদাম বলিল, “দিদি ঠাকুরোন, আপনি ওটারে নিয়ে যান।”

সরোজিনী বলিল, “না, না, নেব কেন? ছেলেটার যত অনাচ্ছিষ্ট আবদার। এই নে, ছাড়্ বল্ছি ছাড়্,” সে একরকম জোর করিয়া কাহুকে টানিয়া লইল। “তোমার ছাগলছানা নিয়ে যাও বাপু, চোখের সামনে থাকলে, ও কিছুতেই বায়না ছাড়্বে না।”

গাড়ীতে উঠিবার বেলা তাহার মাসী বলিলেন, “দেখ্ বাছা, ছেলেটারে অত করে’ ঠ্যাঙাস্ না, মরে’ হেজে ঐ একটা গুঁড়োতে ঠেকেছে। আর বামুনের মেয়ে একটু জাতজন্ম বাঁচিয়ে চাঁলস্, তা না হ’লে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে? ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোয়াছুঁয়ি করিস্, এতে কি কম পাপ হয়?”

২

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কাহু কেমন দেন মনমরা হইয়া রহিল। বিকালবেলা তাহাকে দুধ খাওয়াইতে গিয়া সরোজিনী দেখিল সে চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া আছে। মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, অস্থখ করেছে নাকি?” কাহু মাথা নাড়িয়া জানাইল অস্থখ তাহার করে নাই।

“তবে অমন মুখ হাঁড়ি করে’ বসে’ আছিস্ কেন?”

কাহু হঠাৎ ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, “আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে।”

সরোজিনী দুধের বাটি তাহার মুখের কাছে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, “ক্ষিদে পেয়েছে তা মুখ ফুটে বলতে কি হয়? এমনি ছেলের মুখে ঠৈ ফোটে, আর দব্কারের সময় কনে বৌয়ের মত মুখ বুজে বসে’ আছে।”

কাহু দুই ঢোক দুধ গিলিয়াই বাটিটা ঠেলিয়া দিল। সরোজিনী বলিল, “এরি মধ্যে গেলা হ’য়ে গেল?”

কাহু বলিল, “দুধ বিচ্ছিরি, আমি খাব না।”

তাহার মা বলিল, “বিচ্ছিরি না তোমার মাথা! ওখান থেকে এসে অবধি ছেলে যেন কি হয়েছে,

সারাদিন নাকে কায়া!" সে ছুধের বাটি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। স্বামী বাড়ী আসিবামাত্র বলিল, "ছেলেটাকে একটু দেখ না কিছু না, ও যে দিনকার দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। খাওয়া শুদ্ধ ছেড়ে দিলে ঐটুকু ছেলে বাঁচবে কেমন করে?"

তাহার স্বামী বলিল, "তুমি আছ কি কবুতে? আমি বাইরেও খাটব, ঘরেও ছেলে দেখব? তা তুমি আমার অফিসের কাজটা করে' দিও, আমি ছেলের খাওয়া দাওয়া দেখব এখন।"

একটুখানি সহানুভূতির আশায় আসিয়া এইরকম সুমধুর উত্তর পাঠিয়া সরোজিনী আর কণা না বলিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার কতটা ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় আর কতটা স্বামীর প্রতি অভিমানে তাহা সে নিজেই বুঝিল না।

কাহুর খাওয়া-দাওয়া কিছুতেই আর ঠিক মত হয় না। অ'গে রাত আটটায় ঘুমাইয়া পড়িয়া পরদিন বেলা আটটায় ওঠা ছিল তাহার স্বভাব, এখন সে রাত্রে তিন চার বার কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে। তাহারে খাবড়াইয়া নারিকেল নাড়ু খাওয়াইয়া, গল্প বলিয়া অনেক কষ্টে আবার ঘুম পাড়াইতে হয়।

কালীপূজার দিনকয়েক আগে সকালবেলা উঠিয়া সরোজিনী দেখিল কাহুর গা গরম। এই বয়সেই বিয়োগ-ছুঃখের অভিজ্ঞতা তাহার কম হয় নাট, সে একেবারে ভয়ে যেন অচল হইয়া গেল। খানিক পরে নিদ্রিত স্বামীকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "কাহুর জ্বর হয়েছে।"

স্বামী বলিল, "ভাল করে' দেখেছ?" সরোজিনী ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিল, "আমার যথাসাধ্য ভাল করে'ই দেখেছি, এইবার তুমি দেখ।"

কাহুর বাবা উঠিয়া বসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর বিছানা ছাড়িয়া জামা গায়ে দিতে-দিতে বলিল, "ওকে এখনই কিছু খাইও না, আমি যত্ন ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

সে বাহির হইয়া গেল। ভয়ের একটা কালো ছায়া

যেন সরোজিনীর চোখের সামনে সমস্ত জগৎ সংসারকে অন্ধে অন্ধে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। অল্প বয়সেই তাহার ছুঃখের অভিজ্ঞতা কম হয় নাট, ভগবান শোকের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। তাই পীড়িত পুত্রের পাশে বসিয়া তাহার ভয় পাইতেও যেন ভয় করিতে লাগিল।

তাহার স্বামী বীরেন্দ্র অল্পকণ পরে ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বীরেন্দ্র কি জিজ্ঞাসা করাতে ইংরেজীতে তাহার উত্তর দিলেন। ভয়ে সরোজিনীর বকের ভিতরটা আরো যেন শীতল হইয়া আসিল। স্বামী ফিরিবামাত্র সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, ডাক্তার কি বললে?"

বীরেন্দ্র বলিল, "কি আবার বলবে? সময়টা ভাল নয় তাই সাবধানে রাখতে বললে।" পাছে জ্বী আবার কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়েই যেন সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সরোজিনীর সেদিন নাওয়া খাওয়া, ঘরের কাজ দেখা কিছুই ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্যে তাহার নন্দটি তখনও শশুরবাড়ী যায় নাট, তাহা না হইলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মানুষকেও উপবাস করিতে হইত।

পরদিন সকালে উঠিয়াই বীরেন্দ্র খাম্বোমিটার লইয়া ছেলের জ্বর দেখিতে গেল। সরোজিনী উৎকণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, জ্বর ছেড়েছে?"

বীরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে বয়ে নাই। যম-রাজের সহিত অল্প বয়সেই পরিচয় করিতে হইয়াছিল বলিয়া এই দম্পতিটির মুখে আর যেন কথাই আসিতেছিল না। তাহাদের আর বলিবার আছে কি?

খানিক পরে চোখ মেলিয়া কাহুর বলিল, "মা, আমি মুড়ি খাব।"

সরোজিনী ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "মুড়ি ত এখন নেই বাবা, পরে দেব; এখন একটু দুধ খাও, লক্ষ্মী ছেলে।"

কাহুর লক্ষ্মী ছেলে হইবার কোনোরূপ বাসনা ছিল না। সে মাথা নাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "না আমি দুধ

খাব না, মুড়ি খাব। আমাকে মামাবাড়ী নিয়ে চল, সেখানে মুড়ি আছে।”

সরোজিনী সাহসনার স্বরে বলিল, “আচ্ছা, মুড়ি ভেজে নিয়ে আসছি, তুমি আগে দুধটা খেয়ে নাও।”

তুধু মুড়িতে ভুলিবার ইচ্ছা কান্নুর ছিল না, সে একটু-খানি দুধ খাইয়া বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “আমি মামাবাড়ী যাব।”

সরোজিনী বলিল, “আচ্ছা, তাই যাস্ এখন, আগে ভাল হ’য়ে নে।”

কান্নু কিছু ভাল হইবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। তাহার জ্বর বাড়িতে লাগিল সর্দি-কাশিও দেখা দিল। সরোজিনীর কান্নাকাটিতে বীরেন সহরে গিয়া ভাল ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। তিনি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু রোগীর রে’গের কোনোই প্রতিকার তাহাতে হইবে বলিয়া মনে হইল না। ছেলে ক্রমেই যেন নিঝুম হইয়া পড়িতে লাগিল; কথা-বার্তা কান্নাকাটি পর্য্যন্ত যেন তাহার বন্ধ হইয়া গেল।

গ্রামে এক বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেন। সরোজিনী কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি রোগের ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন, “তা মা, ঔষুধ আমি দিতে পারি, কিন্তু ডাক্তারী ঔষুধের সঙ্গে ত আমার ঔষুধ চলবে না।”

সরোজিনী বলিল, “আমি ডাক্তারী ঔষুধ দেব না, আপনার ঔষুধই দিন।”

বাড়ী আসিয়া দেখিল বীরেন কান্নুকে ঔষুধ খাওয়াইয়া রাখিয়াছে। দুটা ভাল ঔষুধে ষিগুণ উপকারের আশা করিয়া সরোজিনী হোমিওপ্যাথীর ঔষুধটাও লুকাইয়া খাওয়াইয়া দিল। একবার নয় কয়েক বারই কান্নুর উপর দুই ধরণের চিকিৎসার পরীক্ষা হইয়া গেল। জ্বরটা কিন্তু এনোপ্যাথী বা হোমিওপ্যাথী কাহারও উপর পক্ষপাত না দেখাইয়া আপন মনে বাড়িয়াই চলিল।

ভোবের বেলা সরোজিনী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল। অদূরে খাটের উপর তাহার স্বামী শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “খোকাকে দেখো একটু, আমি আসছি এখনি কালীবাড়ী থেকে।”

তাহার স্বামী বলিল, “এখন তোমায় কোথাও যেতে হবে না, আগে ছেলের দুধ জাল দিয়ে দাও।” সরোজিনী তাহার কথায় কান না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে তাহার লাগিল অনেকক্ষণ। এক-মনে দেবীর কাছে কি সে প্রার্থনা করিতেছিল সেই জানে, কিন্তু সময়ের জ্ঞান তাহার আর ছিল না। পীড়িত পুত্রের পথ্যের ব্যবস্থা সে করিয়া আসে নাই, তাহাও যেন তাহার মনে ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী অত্যন্ত বিরক্ত মুগ্ন করিয়া বসিয়া আছে। সরোজিনীকে দেখিয়া বলিল, “কি ঘোড়ার ডিম কবুছিলে এতক্ষণ ধরে? রোগী ছেলেটা ক্ষিদেয় চেষ্টা মবুছিল! তোমার যদি কোনো কাণ্ড-জ্ঞান আছে!”

স্বামীর কথার অবজ্ঞা কাহার উপর গিয়া যে পড়িল ভাবিয়া সরোজিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার কাছে সে এতক্ষণ মাথা কুটিয়া রুপা ভিক্ষা করিতেছিল, তাহাকেই যে বাবুজী তুচ্ছ করিতে চায়! সে প্রসন্নতা তাড়াতাড়ি চুকাইয়া ফেলিবার জ্ঞান বলিল, “মা কালীর কাছে জোড়া পাটা মানত করে’ এলাম, তিনি আমার বাছাকে ভাল করে’ দিন। ওকে কিছু কি খাইয়েছ, না দুধ নিয়ে আসব?”

বীবেক্র অপ্রসন্ন মুগ্ন করিয়া বলিল, “না খেলে কি আর এতক্ষণ রক্ষে রাখত? দুধ জাল দিয়ে অর্ধেক ত নিষ্কের গাতের ওপরেই ফেলেছি। পার ত একটু আলু বাটা টাটা এনে দাও, জলে’ মবুছি তখন থেকে।”

রাতটা সরোজিনী একরসম বসিয়াই কাটাইয়া দিল। এক একবার তাহার ঘুম আসিতে লাগিল, কিন্তু আগের রাতের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাহাকে বারবার ঘুমেব সিংহাস হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া একবার নিদ্রিত পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া একবার জানলার ধারে দাঁড়াইয়া রাতটা শেষ করিয়া ফেলিল। ভোবের আলোর পূর্বের আকাশটা যখন স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন কেন জানি না তাহার মনে হইল বুকের বোঝাটা তাহার যেন অনেকখানিই হালকা। তাড়াতাড়ি কান্নুর কাছে ছুটিয়া গিয়া সে তাহার কপালে



রক্তসন্ধ্যা।

চিত্রকর শ্রী অন্নদা মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হাত দিল। জর যেন অনেক কম। নিম্নে বিখাস হইল না। দুর্ভাগোর তাড়না সহ করিয়া করিয়া ছোট-খাটো সৌভাগ্যকেও বিখাস করা তাহার শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। আর একবার ছেলের গায়ে হাত দিল। এবারও মনে হইল জর কম। সে বীরেন্দ্রের কাছে গিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল, বলিল, “একটু কাছুর গায়ে হাত দিয়ে দেখ ত।”

বীরেন্দ্র ভয় পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “কেন কেন, জর বেশী মনে হচ্ছে নাকি?”

সরোজিনী বলিল, “বার্ট বার্ট, বেশী হতে যাবে কেন? একটু কম লাগছে তাই তোমাকেও দেখতে বলছি, সত্যি না আমার মনের ভুল।”

বীরেন্দ্র খাট ছাড়িয়া উঠিয়া থার্মোমিটার হাতে করিয়া ছেলের জর দেখিতে গেল। সরোজিনী আশা-আশঙ্কায় দুই চোখ ভরিয়া ঐ ছোট কাঁচের নলটির দিকে চাহিয়া রহিল, উষ্ণ উপরেই যেন তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। থার্মোমিটার বাহির করিয়া লইয়া স্থানিকেন-বর্ণনের কাছে ধরিয়া বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাব স্ত্রী ভয় পাইয়া বলিল, “অতক্ষণ ধরে’ কি দেখছ গো, জর কি কমেনি? কথা বল না কেন?”

বীরেন্দ্র চোখ তুলিয়া স্ত্রীর ভয়কাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আরে, সব তাতে অত ভয় পাও কেন? ভয় পেয়ে ত অনেক দেখলে, কিছু লাভ হ’ল কখনও তাতে? আর কি ছেলেমানুষী কর, কান্না আর স্ত কবলে কেন? ভয় নেই তোমার কাছুর জর খুবই কম; প্রায় ছেড়ে গিয়েছে বললেই হয়। এই নাও, দেখ আমার কথায় বিখাস না হয় ত।” সরোজিনী স্বামীর হাত হইতে থার্মোমিটার লইয়া দেখিল সত্যই জর নাই বলিলেই হয়, নিরানন্দইয়ের নীচে নামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পরে সে নিম্নের সারারাত অব্যবহৃত বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাহার মনের যত আশঙ্কা আর উদ্বেগ যেন চোখের জল হইয়া গলিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বুঝিল। সেও কথা না বলিয়া স্ত্রী পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

কাছুর জর সত্যই ছাড়িয়া গেল। অল্পে-অল্পে সে আবার কথা বলা, অন্তায় আব্দার করা, খাইবার অন্ত উৎপাদ করা, এমন-কি বিছানা ছাড়িয়া দৌড় মারিবার চেষ্টা সবই শুরু করিল। সরোজিনী এতদিন একলা তিনটা মানুষের কাজ করিয়া আসিতেছিল। রাত্রেও অধিকাংশ সময় সে জাগিয়াই থাকিত, তবু তাহার দেহে মনে শ্রান্তি ছিল না। এখন হঠাৎ তাহার সমস্ত শক্তি তাহাকে যেন ত্যাগ করিয়া গেল। সকালে তাহার খাট হইতে দেহটাকে যেন জোর করিয়া টানিয়া তুলিতে হয়, ঘুমের ঘোর যেন সারাদিনের মধ্যে তাহাকে ছাড়িতে চায় না। রান্নাঘরে সে উনানের পাশে বসিয়া-বসিয়া তুলিতে থাকে। কোন্ তরকারিতে কি যে দিয়া বসে তাহার ঠি গানা নাই। অবস্থা দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিল, “আর তোমার রান্না করে’ কাজ নেই, কোন্ দিন আগুনের মধ্যে পড়ে’ মরবে। আমি তারিণী জ্যাঠার কাছে বলে’ তাঁর বড় বোটিকে ঠিক করে’ এনেছি। বিধবা মানুষ সারাদিন খুন্সুবাড়ীর সকলের গাল-মন্দ খায়, সেও একটু বেরতে পেয়ে বেঁচে যাবে, তোমারও একটু বিশ্রাম হবে। ডাক্তার-বাবু বলছিলেন কাছুরে নিয়ে একবার চেষ্টা যেতে। যে-রকম দেখছি—কাছুর চেয়ে কাছুর মায়েই চেষ্টার বেশী দরকার।”

হাওয়া বদলানোর প্রয়োজন হইল না, কাছুর ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর বাহির হইয়া দৌড় মারিবার উৎসাহ তাহার এমন ক্ষতগতিতে বাড়িতে লাগিল যে, সরোজিনীকে তাহাকে আগ্লাইয়া রাখিতেই সারাদিন ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। রান্নাবান্নার কাজটা অন্ত মানুষের হাতে পড়ায় তাহার অবশ্য সময়ের অভাব ছিল না, তবে বিশ্রামের প্রয়োজন তখনও ছিল। কাজেই ছেলের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে তাহার আগেকার দিনের ছেলে-ঠাঙ্গানোর ভৃত তাহাকে পাইয়া বসিত। কিন্তু কাছুর গায়ে গায়ে তাহার উদ্যত হস্ত নামিয়া পড়িত। এও ত যাইতেই বসিয়াছিল। আর একটু হইলেই হতভাগিনী মাকে জালাইবার অন্ত জগতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিত না। কাছুর চির-কালের অভ্যাসমত ঘাড় নীচু ও পিঠ কঁজা করিয়া মার

খাইতে প্রস্তুত হইত, তাহার পর প্রচণ্ড আর্ন্তনাদ করিবার জগৎ প্রস্তুত হইয়া থাকিত। কিন্তু মারটা যখন মাঝ-পথে আসিয়াই থামিয়া যাইত, তখন সে অত্যন্তই হতবুদ্ধি হইয়া মাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন এমন ব্যাপার সে সাত জন্মে দেখে নাই।

দিনকয়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তারপর সরোজিনী বলিল, “হ্যাঁ গা, খুব ত চূপ করে’ রয়েছ, আসল কাজ যে বাকি রয়েছে, সেদিকে হুঁস্ নেই ?”

বীরেন্দ্র বলিল, “আসল কাজখানা কি ?”

“মাথের কাছে যে মানত্ করেছি, দিতে হবে না ? আসচে অমাবস্মাতেই দিয়ে ফেলা উচিত।”

বীরেন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, “আচ্ছা।” সেদিন সকালে উঠিয়া, একবাটি দুধ খাইয়া, বাহিরে আসিয়াই কাহ্নু আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, “পাহ্নু, পাহ্নু, ওমা দেখ পাহ্নু এসেছে।” সরোজিনী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ছাগল কিনিতে হাটে লোক পাঠানো হইয়াছিল, সে কখন আসিয়া উঠানে ছাগল রাখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সরোজিনী তত লক্ষ্য করে নাই। ছেলের চোঁচানিতে বাহিরে আসিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাহ্নু দুই হাতে পাহ্নুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে ঘাস খাওয়াইতেছে, গায়ে হাত বুলাইতেছে এবং কোলে তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টারও তাহার অস্ত নাই। ছাগলছানাটা খুব যে খুসি হইয়াছে তাহা বোধ হইল না, তবে ঘাস-পাতা খাইতে কোনো প্রকার আপত্তি তাহার দেখা যাইতেছে না। সরোজিনী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ছেলের হাত হইতে এটাকে কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে কিরূপে ? কিন্তু না লইয়াই বা উপায় কি ? দেবীর নামে যাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে, তাহাকে দেবীর কাছেই উৎসর্গ করিতে হইবে। অস্ত চিন্তা মনে আনাও যে মহাপাপ ! কাহ্নুর মঙ্গলের জন্তই তাহাকে কষ্ট দিয়াও একাজ করিতেই হইবে।

ছেলেকে তুলাইবার চেষ্টায় সে বলিল, “দূব, ও পাহ্নু হুঁতে যাবে কেন ? তুই এক বোকা, পাহ্নু কি এত বড় ?”

কাহ্নু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, “ইঃ, পাহ্নুই ত,

আমি বুঝি জানি না ? এই দেখ ওর চার পায়ে মলের দাগ রয়েছে।” পাহ্নুর চারিটি পায়েই যে শাদা লোমের দাগ ছিল তাহা সরোজিনী প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার আশা ছিল যে বাজে কথা বলিয়া সে কাহ্নুকে তুলাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই সে পুত্রের কাছে হার মানিয়া থামিয়া গেল।

কাহ্নুকে লইয়া সেদিন আর কাহাকেও কোনো ঝগড়াট পোহাইতে হইল না। সে পাহ্নুর কাছ ছাড়িয়া একপাও কোথাও নড়িল না। ছাগলছানাটার আনাহারের ব্যবস্থা এত যত্নের সহিত হইতে লাগিল যে সে চীৎকার করিয়া পাড়া কাঁপাইয়া তুলিল। রাত্রে সরোজিনী শুইতে গিয়া দেখিল তাহার শয্যা অধিকার করিয়া কাহ্নুর পাশে পাহ্নুও বিরাজ করিতেছে। এবার কাহ্নুকে গোটা কয়েক চড় খাইতে হইল, কিন্তু তাগতেও ছেলের দমিবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। সেও পাহ্নুর সঙ্গে উঠানে শুইতে চলিল। সরোজিনী হার মানিয়া শেষে শোবার ঘরের দরজার কাছে পাহ্নুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। শঙ্কিত চিন্তে ভাবিতে লাগিল, কাল ত পূজা দিবার কথা কিন্তু পাহ্নুকে ছাড়াইয়া লইবে সে কি করিয়া ? ঠিক করিল একেবারে খুব ভোরে ভোরে উঠিয়া ছাগল-ছানাটাকে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ী রাখিয়া আসিবে, তাহার পর সময়মত সেখান হইতে কালীবাড়ীতে লইয়া গেলেই চলিবে।

কিন্তু যথেষ্ট সকালে উঠিয়াও সরোজিনীকেই হার মানিতে হইল। যে-স্বয়ং রক্ষা করিতে চায়, তাহারই চক্ষু বিনাশপ্রার্থীর চক্ষুর চেয়ে যে সজাগ তাহা স্বীকার করিতে হইল। সরোজিনী দেখিল একটা ছাগলছানা মাত্র উঠানে বাঁধা, অস্তটার সন্ধান নাই। কাহ্নুও যে ঘরে নাই, তাহা সে ঘুম ভাঙিয়াই দেখিয়াছিল ; কাজেই তাহার ঝুঝিতে মেরি হইল না যে, দুটি পলাতকের সন্ধানই এক জায়গায় মিলিবে। স্বামীকে জাগাইয়া খবরটা দিয়া সে চাকরকে ছেলের খোঁজে পাঠাইয়া দিল। বৌ-মাহ্নুব বলিয়া সে নিজে যাইতে পারিল না, সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিল পুত্রের কোনো চিহ্ন দেখা যায় কি না।

কাহ্নর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু এই সময় কালীবাড়ী হইতে লোক আসিয়া জানাইয়া গেল যে পূজার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, ঠাকুর শীঘ্র করিয়া সব আয়োজন লইয়া তাহাদের যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। সরোজিনী তাহাকে “এখনি যাচ্ছি” বলিয়া বিদায় করিয়া দিল বটে, কিন্তু এখনই যাইবার কোনো উপায় তাহার মাথায় আসিল না। কাহ্ন এবং পাহ্নর সন্ধান না মিলিলে কিছুই যে করা সম্ভব নয়। তাহার পা কিছুতেই সদর দরজা ছাড়িয়া নড়িতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া ভিতরে গিয়া পূজার জন্ত আর যাহা কিছু আয়োজন করা দরকার সব শেষ করিয়া রাখিল। বীরেন্দ্রকে ভাগিদ দিয়া স্নান করাইল, নিজের স্নান সাধিয়া কালীবাড়ী যাইবার উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া লইল।

এমন সময় সদর দরজার কাছে মানব-শিশু ও ছাগ-শিশুর এমন একটা মিলিত আর্ন্তনাদ শোনা গেল যে, বাড়ীর সকলে কাজফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। অল্প ছাগল-ছানাটার গলার দড়ি হাতে ধরিয়া যে চাকরটা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল, সে কাহ্নর হাত হইতে পাহ্নকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই এই কাণ্ড। কাহ্ন প্রাণপণ শক্তিতে ছোট দুই হাতে পাহ্নকে ধরিয়া আছে, আর যথাসম্ভব ইা করিয়া চীৎকার করিতেছে।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া কাহ্নকে ধরিতে গেল। সে ছেলেকে ধরবামাত্র চাকরটা একটানে কাহ্নকে হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল। ছাগলের মত মাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ধর করিয়া তুলিল, সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, “আমি পাহ্নকে কাটতে দেব না।”

সরোজিনী ভাবিয়া পাইল না এ খবরটা দয়া করিয়া কাহ্নকে কে দিয়াছে। সে কাহ্নকে কোলে লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল, “কে বললে তোকে যে পাহ্নকে কাটবে? ওকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে, ময়লা থাকলে যে অস্থখ করবে?”

কাহ্ন হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিল, “তুমি মিথ্যে

কথা বলছ! আমাকে ভোলা বলে' দিয়েছে তোমরা ওকে কাটবে। আমি ওকে দেব না।” চাকরটা এই ফাঁকে ছাগলছানা ছুটা লইয়া একেবারে সরিয়া পড়িল।

সরোজিনীর মন্দিরে যাইতে অনেক বেলা হইয়া গেল। কাহ্নকে সে শাস্ত করিতে কোনোমতে পারিল না, অবশেষে ননদের হাতে তাহাকে সঁপিধা দিয়া কোনো মতে সে বাহির হইল। মন্দিরে বলি তখনও দেওয়া হয় নাই, সে আসিতেই কাজ আরম্ভ হইল, দেখিতে-দেখিতে শেষও হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতে সরোজিনীর কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল, না জানি গিয়া কি দেখিবে। বাড়ীতে ঢুকিবার অনেক আগেই সে ছেলের কান্না শুনিতে পাইল এবং ঢুকিয়াই খবর পাইল যে কাহ্নকে নাওয়ানো যায় নাই, খাওয়ানোও যায় নাই। সে মন্দিরে যাইবার জন্ত ছুটিয়া যাইতে গিয়া চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার কপাল ফাটিয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কাহ্নকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার পিসী পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছে। কাহ্নর কপাল বেড়িয়া কাপড়ের পটি বাধা, তাহা ভেদ করিয়া রক্তের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে।

সরোজিনীর বুকের ভিতরটা যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এই মাত্র মন্দিরে যে-রক্তস্রোত দেখিয়া আসিল, তাহাই যেন গড়াইয়া এই শিশুর মাথায় আসিয়া লাগিয়াছে। একজনের কল্যাণের জন্ত যে-রক্তপাত হইল, তাহার ফলে প্রথমে রক্তপাতই ঘটিল? তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে মনে মনে দেবীর চরণে সহস্র প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, “অবোধ শিশুর অপরাধ নিম্নো না মা, সে না জেনেই তোমার অপমান করেছে! ওর যেন কোনো অকল্যাণ না হয়।”

বীরেন্দ্র কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া জীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ'ল আবার?”

সরোজিনী বলিল, “ঘরে গিয়ে দেখ।” বীরেন্দ্র আর কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর চলিল এবং মিনিট দুইয়ের

মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “জর হ’লে ডাক্তার ডাকতে হয় এ ; জানটা এখনও তোমার হ’তে বাকি আছে ? বাড়ীতে ছোটো চাকর একটা কি রয়েছে, সব কজন ডাক্তারের বাড়ী জানে, এতক্ষণ ধরে’ না কেঁদে একজনকে পাঠিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত।”

সরোজিনী মুখ শাদা করিয়া বলিল, “জরও হয়েছে নাকি ?”

তাহার স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিল, “তাও এতক্ষণ জান না ? তবে কাঁদতে বসেছিলে কেন ? যাও ছেলের কাছে, আমি ডাক্তার ডেকে আনি। সব এক এক মহা-পণ্ডিত, রোগা ছেলেটাকে কাঁদিয়ে ছাগলছানাটাকে না কেড়ে নিলেই চলছিল না ? বাজারে একেবারে ছাগলের দুর্ভিক্ষ পড়ে’ গিয়েছিল নাকি ?”

সরোজিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “কি বল গো ! মাথের কাছে উৎসর্গ-করা জিনিষ, সে না দিলে কি রক্ষে আছে ?”

বীরেন্দ্র বলিল, “আচ্ছা, আচ্ছা, এখন দিবে কত রক্ষা থাকে তাই দেখ।” বলিয়া সে বিরক্তমুখে ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিল, মুখ খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, “আবার relapse করল ? এটা ত ভাল হ’ল না। ইন্-ফ্লুয়েন্সাতে একবারেই কাবু করে’ রেখে যায় বড় বড় মানুষকে, আর এইটুকু ছেলে ! যা হোক, খুব সাবধানে রাখবেন। এই ঔষুধটা এখনি করিয়ে আনুন, ঠিক সময় মত যেন পড়ে। ছেলেকে মোটেই উঠতে দেবেন না, আর ঠাণ্ডাও যেন একটুও না লাগে। আপনি নিজে একটু

চোখ রাখবেন মশায়, মেয়েদের হাতে ফেলে দিবে নিশ্চিন্ত হবেন না।”

বীরেন্দ্র অফিস কামাই করিয়া ছেলের সেবায় লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে না খাওয়ানো যায় ওষুধ, না রাখা যায় শোয়াইয়া। সে কাঁদিয়া-কাটিয়া ছটফট করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। জর তাহার ক্রমে বাড়িতেই লাগিল, ক্রমেই সে নিঃশ্বাস হইয়া পড়তে লাগিল।

তৃতীয় দিনের দিন হঠাৎ সকালে সে কাঁদিয়া বলিল, “পান্নকে এনে দাও।”

তাহার বাবা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “আচ্ছা বাবা, তুমি ভাল হ’য়ে ওঠ, আমি পান্নকে এনে দেব।”

সে বীরেন্দ্রের হাত ঠেলিয়া দিল। আরো জ্বরে কাঁদিয়া বলিল, “না আনবে না, তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তোমরা তাকে কেটে ফেলেছ।”

রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত সরোজিনী তখন মেঝের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। স্বপ্ন দেখিতেছিল, দেবী যেন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “বড় দেরি হ’য়ে গেল। বলি কই ?”

বীরেন্দ্রের ভীত ডাকে সে যখন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, একটি খেলার সাথী তখন অস্ত্রটির সন্ধানে অচেনা পথে বাহির হইয়া গিয়াছে। পান্নকে সে যে কোর্টটি আদর করিয়া দান করিতে গিয়াছিল, সেইটি পরিষ্কারই সে বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া গেল।



অশ্বারোহী পুলিশ ও অশ্বের শিক্ষা—

আজকাল মানুষের জীবন-যাত্রার সর্ববিভাগে বিজ্ঞানের একহাত অধিকার। প্রাচীনকালেই যেনকল জিনিষ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ছিল আজকাল তাহার অনেকগুলির কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইরাছি; মাটির প্রদীপের পরিবর্তে হারিকেন বা বৈদ্যুতিক আলো, নৌকার পরিবর্তে স্টীমলক্, ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে মোটর গাড়ী প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদের দেশে তবু এখনও পূর্বকালের স্মৃতিচিহ্ন অনেক কিছু বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নূতনযুগের আমদানির এত প্রচুরা যে প্রাচীনকালের ব্যবহৃত, তৈলসপত্র, আলো ও যানবাহনাদি মিউজিয়ামেই স্থান পাইতেছে। যানবাহনাদিতে আজকাল আর ঘোড়ার ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। বড়-বড় সহরেতো দূরের কথা, সামান্ত পল্লী-গ্রামেও মোটর ও সাইকেলের ছড়াছড়ি, শ্রুতরাং মানুষবাহী ঘোড়াকে বিদায় লইতে হইয়াছে। অথচ ঘোড়ার আধর যে কমিতেছে তাহা নহে ঘোড় বৌড়ের মাঠে দৌলতে ঘোড়ার খাতির অসম্ভব-রকম বাড়িয়া যাইতেছে। তাছাড়া আর-একজায়গায় ঘোড়াকে কেহ হঠাইতে পারে নাই,—সে জনবহুলসহরে mounted-পুলিশের

লোককে সারিবন্দী রাখিতে ঘোড়ার মতন আর-কিছু পারে না—৭শবিশ জন লোকে বাহা পারে না, ১টি ঘোড়া ঘরা তাহা অনায়াসে সাধিত হয়, কিছুকাল পূর্বে নিউইয়র্ক সহরে অশ্বারোহী পুলিশের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া



পতন-উখল ঘোড়ার পিঠ হইতে পাশের অস্ত্র ঘোড়ার পিঠে চড়া অভ্যাস



ঘোড়ার পিঠে পুলিশেরা জিমনাস্টিক অভ্যাস করিতেছে।

বাহকরূপে দেশের শান্তিশৃঙ্খলার প্রভূত সহায়তা করিতেছে এবং এই কার্যে তাহার প্রতিবন্দী হইবার মত কোনো যন্ত্রেরও আবিষ্কার হইতেছে না।

একজন অশ্বারোহী পুলিশ তিন বা ততোধিক পদাতিক পুলিশের সমান কাজ করে কারণ সে ঘোড়ার উচ্চতার অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনতার বিশৃঙ্খলতা বহুদূর দেখিতে পার এবং স্তম্ভিত স্তম্ভিত সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। জনতার শঙ্কাসাধনে, পথে ছর্ষটনার, ধর্ষটনে, দাঙ্গাহাঙ্গামার

হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে উহার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়াতে আবার পূর্বসংখ্যক অশ্বারোহী নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিকাগোসহরের ব্যবসা প্রধান অংশে অশ্বারোহী পুলিশ নিযুক্ত করাতে সহরের অস্ত্রাস্ত্র ভাগ অপেক্ষা সেখানে রাস্তার দুর্ঘটনা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ঘোড়াকে সকল বিপৎসঙ্কলস্থানে নির্ভরে হইয়া যাউতে হইলে অস্ত্রতঃ দুই বৎসর নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন—অবশ্য আরোহীকেও যথেষ্ট শিক্ষা হইতে হইবে। এই বিভাগে ইংলরা ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত কর্মকর্ম থাকে। তাঁর পর ইহাদিগকে কোনো চাগী গৃহস্থের নিকট নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরীক্ষা হইয়া জমিকর্ষণ করে।

ঘোড়া অভ্যাশচর্য তৎপরতার সহিত পথঘাটে ঠিকমত চলিবার সঙ্কেত ঠিকমত আদত্ত করিতে পারে। আরোহীকে যদি কোথায়ও কোনো কারণে নামিয়া বাইতে হয়, তবে শিক্ষিত ঘোড়া জনতার মধ্যে ঠিকমত চলিতে পারে; এবং প্রয়োজনমত কাহাকেও আঘাত না দিয়া জনতাকে আক্রমণ করিতেও ইংলরা পটু।

পথঘাটের কার্যোপযোগী ঘোড়ার গুণ সাধারণত ১৪ মণের বেশী হয় না, ঘোড়া কিনিবার সময় এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, কারণ ভারী ঘোড়া পথঘাটের ক্রমকালের উপযুক্ত নয়। ঘোড়া কেনা হইলে



তাহাকে প্রথমতঃ দিন-দশকের মতন বন্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহার পর তাহার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়, নির্বাচিত হইলেই তাহার শিক্ষা শুরু হয়, প্রথমতঃ পথঘাটের চীৎকার-গোলমালের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কাজগুলি ধীরে ধীরে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাঁর পর তাহাকে সহরে আনা হয়। তাহার পায়ে রবারের নাল লাগানো হয়, নরম-ধরণের সাজ পরানো হয়। তাঁর পর তাহার শিক্ষকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার হাতেই ঘোড়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সে তাহাকে নানাভাবে শারেন্তা (break) করে, তাঁর ভালোমন্দ গুণগুলি আবিষ্কার করে এবং তিন মাস পরীক্ষার পর রায় দেয় ঘোড়া পথের কাজের উপযোগী কি না; না হইলে তাহাকে পুনরায় চাবের কাজে পাঠানো হয়।

শিক্ষার পূর্বে ঘোড়া অভ্যস্ত চকল ও রোখা থাকে। সেই অবস্থায় রাস্তায় নানারকম অসুস্থ শব্দ শোনাইয়া তাহার ভয় কাটাইয়া দেওয়া হয় :—শাস্ত্র অবস্থায় চলিতে চলিতে আচম্ভক তাহার সামনে কিছু ফেলিয়া দেওয়া হয়, রেলগাড়ীর কাছে লঠিয়া গিয়া টেনের ভীষণ শব্দ শোনানো হয়, কারণ পুলিশের ঘোড়া হইতে হইলে সর্বত্র বাইতে হইতে পারে। বস্তুত সন্তোষুত ভীক ঘোড়ার পক্ষে সহরের পথঘাট নানা বিপদ ও ভয়সঙ্কুল এইসব নানা বিকল্প অবস্থার আরোহীর হাতের পিঠ-চাপড়ানি এবং গলার আঘাসপূর্ণ খরে ঘোড়া আশু হর—না হইলে এই কাজের পক্ষে ঘোড়া অনুপযুক্ত। শিকাগোতে একবার একটি ঘোড়া দোকানের আয়নার নিজের মূর্তি দেখিয়া ভড়কাইয়া যায় ও আতঙ্কিত ভাবে পলায়ন হয়।



নানা প্রকার কার্যের ঘোড়ার চড়া অভ্যাস

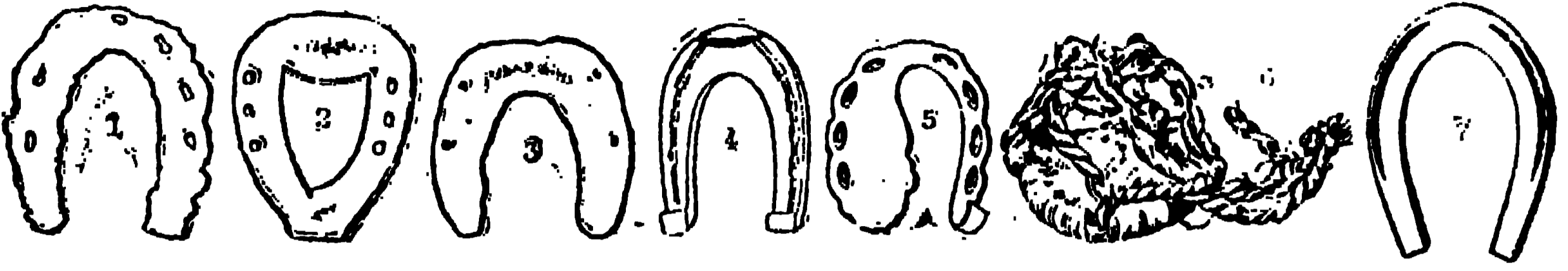
তিনমাস প্রত্যহ ছ-ঘণ্টা করিয়া এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বৎসরে একবার শিক্ষক ঘোড়ার উপযুক্ততা বিচার করে, তাহার সমস্ত গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিশেষগুলি দেখা হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার আরোহীকে সেইগুলি জানানো হয়। যদি ঐগুলি সুবিধাজনক মনে হয়, তবে ঘোড়াকে অগ্রাঙ্ক নির্বাচিত ঘোড়ার সহিত সকাল সাড়টা হইতে সহরের রাস্তার রাস্তার ঘোরানো হয় এবং বিউগল ও অন্যান্য সঙ্কেতধ্বনির সহিত পরিচিত করানো হয়। একাদিক্রমে ছয়ঘণ্টা এরূপ প্রত্যহ ষাটানো হয়। প্রত্যহ অন্তত ২-মাইল হাঁটানো হয়। এমনি করিয়া কিছুকাল ধরিয়া শিক্ষা দেওয়ার পর ঘোড়া শৃঙ্খলার কাব্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করে। এমনি ১৫ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে সহরের শান্তি বিধান করিয়া রাজ্য কাব্য করে এবং তৎপরে বৃদ্ধ বয়সে হৃৎকর্ষণ করিয়া ঘোড়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটায়।

ঘোড়ার নালের কথা—

অনেকে মনে করেন যে মোটরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার ব্যবহার কমিয়া আসিবে এবং সেইসঙ্গে যেসকল লোক ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইবার ব্যবসা করে, তাহাদের ব্যবসায় লোপ পাইবে। ২৫০০ বছরেরও পূর্বে সময় হইতে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো হইতেছে—এবং ইহা যে সহজে উঠিয়া যাইবে তাহা মনে হয় না। ইহা অবশ্য সত্য যে পূর্বকালে যেসকল কাজ (যেমন লাঙল টানা, গাড়ী টানা, কারার ব্রিগেডের ইঞ্জিন টানা ইত্যাদি) ঘোড়ার একচেটিয়া ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই মোটরের সাহায্যে চলিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও গ্রামে এবং বাহারা দরিদ্র তাহারা মোটর অপেক্ষা বহু অল্প ব্যয়ে ঘোড়ার ঘারাই সেইসকল কাজ চালাইয়া থাকে, অবশ্য এইসকল পরীষ লোক রাস্তারান্তি যদি ধনী হইয়া যায়, তাহা হইলে ঘোড়ার সঙ্গে-

সঙ্গে ঘোড়ার নালেরও ইতিহাস শেষ হইবে।

আমেরিকায় গত ১০ বৎসর সময়ে চাববাসের কাজ বাতীত অস্বাভাবিক কাঙ্ক্ষিত ঘোড়ার পরিমাণ কত কমিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে। ১৯১০ সালে আমেরিকাতে গাড়ী টানা ইত্যাদি কাজে ৩,০০০,০০০ ঘোড়া ব্যবহৃত হইত—১৯২০-তে এই সংখ্যা কমিয়া গিয়া ২,০০০,০০০ হয়। কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে ঘোড়ার সংখ্যা বিশেষ বেশীপরিমাণে হ্রাস পায় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় মোটর ট্রাক ঘোড়ার সংখ্যা বহুলপরিমাণে কমাইয়াছিল, কারণ তখন ঘোড়ার খাদ্যের দাম ছিল ভয়ানক এবং ঘোড়ার জন্ত উপযুক্তসংখ্যক লোকও পাওয়া হুঙ্কর ছিল—অথচ মোটরের খরচও কম এবং মোটর-প্রতি একজন লোক হইলেই চলিয়া যায়।



ঘোড়ার নালের ক্রমবিকাশ চিত্র

[(১) ইংলণ্ডে রোমানরা আসিবার পূর্বে ব্যবহার হইত। (২) প্রাচীন কালে মূরদেশে ব্যবহৃত হইত। (৩) ১৭৫ খৃঃ অব্দে করাদী দেশের নাল। (৪) আহত ঘোড়ার-পাকে রক্ষা করিবার নাল। গলরা যখন ফ্রান্সে রাক্ষু করিত, সেইসময়ের। (৫) কোন সময়ের টিক বলা যায় না—খৃঃ ৩ বা ৪ শতাব্দীর হইতে পারে। (৬) জাপানে ব্যবহৃত—খড়ের তৈরী। ধনী লোকেরা রেশমের তৈরী নাল ঘোড়ার পায়ে লাগাইতেন। (৭) বর্তমান সময়ের ঘোড়ার নাল- নানা-ওজনের হয়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারা ৫ আউন্স ওজনের নাল পরে—অস্ত্রান্ত ভারী কাজের ঘোড়ারা ১ সের ওজনের নালও পরে।]

বর্তমানে আমেরিকাতে ১৭,০০০,০০০ খচ্চর এবং ঘোড়া চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। এইসকল ঘোড়ার খুব কম-সংখ্যাকেই নাল পরানো হইয়া থাকে। যেসকল প্রদেশে মাটি শক্ত এবং প্রস্তুতকারী কেবল সেইসকল স্থানেই ঘোড়ার নালের দরকার হইয়া থাকে। ঘোড়ার ব্যবহার কমিবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার নাল প্রস্তুতকারী কামারদের সংখ্যাও আমেরিকাতে কেমন কমিয়াছে তাহাও নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইবে। ১৫ বৎসর পূর্বে আমেরিকার কামারদের সংখ্যা ছিল ২৩২,০০০ পাঁচ বছর পরে ইহা ১৯৫,০০০ হয় এবং বর্তমানে ইহা ১৭৫,০০০ হইয়াছে। বর্তমানে যে সংখ্যা রহিয়াছে, ইহা আর বিশেষ কমিবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশ-সম্বন্ধে অবশ্য এসকল কথা খাটে না, কারণ আমাদের দেশে বিশেষ ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও মোটর গাড়ী নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের চাষীরা চাষের কাজে মোটর-ব্যবহার দূরের কথা—ঘোড়া ব্যবহারও করে না।

ঘোড়ার পায়ে নালরূপে নানা সময়ে নানা দেশে নানা-প্রকার জ্বোয়র ব্যবহার হইয়াছে, যথা- চামড়া, শিং, ভালুক্যানাইট, পাপিরো-মাশে, হাড়ি, রবার, কাঁসা এবং খড়। বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ জ্বোয়র ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু নালের পক্ষে লোহা এবং ইস্পাতই সর্বাপেক্ষা বেশী উপযুক্ত।

হাতে তৈরী নাল অপেক্ষা কলে প্রস্তুত নাল ভালো হইবে, ইহা সহজ কথা। কলের তৈরী নালের ওজন এবং আকার সমান এবং পরিষ্কার হয়। ঘোড়ার নালের আকারের পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই—বহু পূর্বে যাহা ছিল এখনও আর তাহাই আছে। নালের প্রস্তুত প্রণালীও অনেক-পরিমাণে প্রায় পূর্বের মতনই আছে—সামান্য উন্নতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন এই ব্যবসারে যেমন মন্দা পড়িয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহার আর কোনো প্রকার উন্নতি এখন আর সম্ভবপর হইবে না। এখন যদি হঠাৎ গ্যাসোলিন্ কমিয়া যায় তাহা হইলেই ঘোড়ার ব্যবহার বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

ঘোড়ার নালের কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল—ইহা হইতে নালের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাণদণ্ডের প্রাণদণ্ড—

League for the Abolition of Capital Punishment অর্থাৎ প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিবার সঙ্ঘ—এই নামের একটি সমিতি কিছুদিন পূর্বে নিউইয়র্ক সহরে তাহাদের কার্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন লোককে প্রাণদণ্ড দিবার প্রথা রদ করা উচিত। ইহার নিউইয়র্ক সহরে প্রথম কার্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে-ক্রমে

আমেরিকার সকল প্রদেশে ইহাদের কার্য বিস্তার করিবেন। ইতিমধ্যেই মিশিগান, রোড আইলাণ্ড, উইসকন্সিন, ক্যান্সাস, মেন্, মিন্নেসোটা (Minnesota) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা—এই প্রদেশগুলি হইতে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও আমেরিকার চলিষটি প্রদেশে খুনীর প্রাণদণ্ড হয়। অরেগন, ওয়াশিংটন, আরিজোনা এবং মিশোরী এই কয়টি প্রদেশে প্রাণদণ্ড উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮ সাল হইতে আবার তাহা আরম্ভ হইয়াছে। এই সমিতির মতে :—

“চিন্তাশীল ব্যক্তি-মত্রেই প্রাণদণ্ডাঙ্কায় রদ করিবার পক্ষপাতী। প্রাণদণ্ডাঙ্কায় অসম্মতদের নিদর্শন—এখনও সত্যসমাজের বুক চাপিয়া আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব, সরল অর্থাৎ বোকা, অল্পবুদ্ধি এবং নিঃসহায়, ব্যক্তিরাই এই দণ্ড লাভ করে। বড় লোকেরা খুন করিয়া টাকার জোরে বাঁচিয়া যায়। সাধারণ লোকের মতও প্রাণদণ্ডাঙ্কায় উঠাইয়া দিবার পক্ষে।”

এই সমিতির কার্য অতি শক্ত। একদল লোক বলেন যে প্রাণদণ্ড রদ হইয়া গেলে দেশের যত পাগলী বদমাসের দল বাঁধিয়া খুন-খারাবি শুরু করিবে—ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে প্রাণদণ্ডের ভয়ে যদি খুন বন্ধ হইত তবে এতদিন ধরিয়া পৃথিবীতে অসংখ্য লোক প্রাণদণ্ড লাভ করিয়াছে। কিন্তু কই? তাহাতে খুন বন্ধ হইয়াছে কি? যে খুনি সে অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধী গুণ্ডাইবার অবসর দেওয়া কর্তব্য। তাহাকে আইনের সাহায্যে হত্যা করিলে সমাজের এবং যে অপরাধ করিল, তাহার কি লাভ হইল? এই সমিতি প্রাণদণ্ডের বদলে খুনীকে চিরকাল কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী—অবশ্য কারাগারে হত্যাপরোধী স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হইলে, তাহার পুনর্বিচার করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। এই সমিতির সকল সন্তাই অত্যন্ত উৎসাহী এবং নিজেদের মতে ও কাৰ্য্যে বিশ্বাসবান্, কাজেই আশা করা যায়, ইহার ক্রমে সফলকাম হইতে পারেন।

রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায়—

পৃথিবীর নানা স্থানে রেলওয়ে সংঘর্ষণের ফলে বহু ব্যক্তি এবং রেলওয়ে কর্মচারী প্রতিবৎসর প্রাণ হারায়। এখন যেমন রেলওয়ে সংঘর্ষণ হয় বহুকাল পূর্বেও সেই প্রকার হইত এবং বহুলোক হতাহত হইত। বিলাতের পাক্ নামক ব্যঙ্গ-পত্রিকা রেলওয়ে সংঘর্ষণ বন্ধ করিবার একটি ভালো উপায় আবিষ্কার করিয়া তাহার একটি ছবি ১৮৫৭ সালে বাহির করেন। ছবিটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইঞ্জিনের সামনেই রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাঁধার স্থান নির্দেশ করা আছে এবং উক্ত কর্মচারী তথায় বাসিয়া আছেন প্রত্যেক ইঞ্জিনের সামনে



রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায়

[পাক, জুলাই ১৮, ১৮৫৭

এইপ্রকার একজন করিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারী বসিয়া থাকিলে কলিশন হইবার আর কোনো আশঙ্কা নাই। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি।

এডিসন্ বধির কেন—

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে বিখ্যাত আবিষ্কর্তা এডিসন্ বধির। তাঁহার এ-বধিরতা দূর করিতে পারা বাইত, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ইচ্ছা করিয়াই বধির হইয়া আছেন। সামান্য অস্ত্রোপচার করিয়া এডিসন্ তাঁহার চির-বধিরতা দূর করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে শ্রবণশক্তি না থাকার তাঁহার চিন্তা-শক্তি বিনা-বাধায় কাজ করিতে পারে। বাহিরের কোলাহলে তাঁহার কাজের ব্যাঘাত হয় না। শ্রবণশক্তি না থাকিলেও তিনি তাঁহার বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ সহজে করিতে পারেন বলিয়া বুঝিতে পারেন। তাহিলে অবাক হইতে হয়, চিরবধির এডিসন্ই কোনপ্রকারে আবিষ্কর্তা।

এডিসন্ বিজ্ঞানচর্চার জন্ত নিজেকে শ্রবণ-স্থলের নানা-প্রকার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। পাখীর গান, মানুষের হাসি, পত্নীর প্রিয় সম্ভাষণ, শিশুর কচিমুখের বুলি, এইসমস্ত হইতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করিলেন। জ্ঞানচর্চার এমনই প্রবল তৃষ্ণা।

একবার অনেক অনুরোধ করিয়া এডিসনের স্ত্রী তাঁহার কানে অস্ত্রোপচার করাইতে তাঁহাকে রাজি করাইলেন। যেদিন ডাক্তার আসিবার কথা, তাহার পূর্বদিন এডিসন ডাক্তারকে খবর দিতে বলিলেন যে তাঁহার আসিবার দরকার নাই, কারণ তিনি অস্ত্রোপচার করাইবেন না। মরিবার পূর্বে তাঁহাকে অনেক গভীর চিন্তার কাজ শেষ করিয়া বাইতে হইবে। শ্রবণ-শক্তি হঠাৎ লাভ করিলে তাঁহার চিন্তা-শক্তির কাজে ব্যাঘাত জন্মিবে এবং তাহাতে অনেক সময় অনাবশ্যক নষ্ট হইবে। নষ্ট করিবার মতন সময় এডিসনের নাই।

এডিসন্ সহজে ডাক্তার দেখাইতে রাজি হন না। তাঁহার চোখ খারাপ হইয়া বাইবার বছব্যসর পরে তাঁহাকে চশমা পরাইতে রাজি করা হইয়াছিল। চশমা পরিয়া তিনি বলিতেন যে চোখে চশমা থাকিলে তাঁহার কোনো কাজে মনোযোগ হয় না—সেইজন্য বেহাৎ দরকার না হইলে তিনি চশমা পরেন না। এডিসন্ কোনো প্রকার খেলা বা আমোদে যোগ দেন না। বাহিরে একমাত্র মোটরে চড়াতে তাঁহার আনন্দ আছে। ডাক্তারেরা এডিসন্কে সিগার খাওয়া বন্ধ করিতে অনেকবার বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই—এবং হইবে না। সিগার না খাইলে তাঁহার বুদ্ধি খোলে না।



আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্ এবং তাঁহার পত্নী-

এডিসনের পত্নী আদর্শ পত্নী। তিনি বলেন যে “এডিসনের সেবা এবং তাঁহাকে আনন্দদান আমার জীবনের একমাত্র কাজ এবং আনন্দ। এডিসনের সেবার আমি যে আনন্দ পাই, অস্ত্র কিছুতেই তাহা পাই না।”

কুষ্ঠব্যাদির প্রতিকার-চেষ্ঠা—

এতদিন ধরিয়া যেসকল মহাব্যাধি মানুষকে পীড়িত করিতেছিল, তাগাদের করেকটি ছাড়া প্রায় সমস্তকে বিজ্ঞানবলে মানুষ জয় করিতে পারিয়াছে। যেসকল ব্যাধিকে মানুষ এখনও জয় করিতে পারে নাই,



কুলীয়ন দ্বীপের দৃশ্য—পৃথিবীর বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রম—
এই দ্বীপ ম্যানিলায় ২০০ মাইল দক্ষিণে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত

কুষ্ঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ব্যাধি। কিন্তু বহু শতাব্দীর ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আজ আশা হইতেছে যে মানুষ কুষ্ঠকে জয় করিতে পারিবে। কুষ্ঠগ্রস্ত লোক নীরোগ হইতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কুষ্ঠব্যাধিকে তাড়াইবার জন্ত যে ঔষধ বাহির হইয়াছে, তাহা চাল-মুগরা তেল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই তৈল কুষ্ঠব্যাধিতে ব্যবহার হইতেছে কিন্তু বর্তমানে ইহা প্রকৃষ্ট রাসায়নিক মতে ব্যবহৃত হইয়া আশাভিত্তিক ফলদান করিতেছে। চালমুগরা গাছের বোটানিক্যাল নাম "Tarakto-genos Kurzii"। এই বৃক্ষ জাম, ব্রহ্ম, আসাম এবং বাংলা দেশের গভীর জঙ্গলে জন্মায়। সম্প্রতি হাওয়াই দ্বীপে ১০০ একর জমিতে এই বৃক্ষের চাষ করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। কম কলিতে চাল-মুগরা গাছের আট বৎসর সময় লাগে। যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্টের কৃষিবিভাগের অধ্যাপক ডে এফ. রুচ চালমুগরা বৃক্ষের বীজ সংগ্রহের জন্ত জাম ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশের গভীর-গভীর জঙ্গলে প্রায় এক বৎসরকাল বাসন করেন। এইসময় জঙ্গলে ভ্রমণ তাঁহার বৃথা হইয়াছিল, যদিও তিনি চাল-মুগরা বৃক্ষ ছাড়া অসংখ্য নানা-প্রকার নতুন-নতুন বৃক্ষাদি আবিষ্কার করেন। এইসময় জঙ্গলে তিনি সত্তের-রকমের বিবিধ শ্রেণীর গুঁড় বৃক্ষ আবিষ্কার করেন। ব্রহ্মদেশ হইতে রকুসাহেব কলিকাতায় আনেন, এবং সুন্দরবন ও আসামের অতি গভীর অনেক জঙ্গলে চালমুগরা বৃক্ষ সন্ধান করেন। এই সময় তিনি একখানি বৌদ্ধ পুঁথি হস্তে এই গুঁড়টি পাঠ করেন :—ব্রহ্মদেশের এক রাজার কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে বাস। বনে গিয়া তিনি আর-এক জন সাধী পাইলেন—সে নারী এবং তাহারও কুষ্ঠ হইয়াছে। রাজা তাহার প্রেমে পড়িলেন এবং অবশেষ চালমুগরা তেলের জ্বারে উত্তরেই নীরোগ হইলেন। তাহার পর সকল প্রেমের গল্পে বাহা হইবার কথা তাহা হইল, অর্থাৎ তাহার বিবাহ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এই গল্পে প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ষের লোকেরা বহু শত বৎসর পূর্বে চালমুগরার ব্যবহার জানিত। কিন্তু ঠিক প্রথমত ইহার ব্যবহার হইত না বলিয়া বোধ হয় লোকে চালমুগরা তেল ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিত না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার ফ্রেড্রিক বি পাওয়ার নানা-প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা চালমুগরা তেলের বিবিধ গুণাবলী আবিষ্কার করেন। ১৯১৮ সাল হইতে চালমুগরা বিশেষ রাসায়নিক প্রণালী কুষ্ঠচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পৃথিবীতে কত কুষ্ঠ রোগী আছে তাহা বলা যায় না। জাপানে

৬০,০০০ কুষ্ঠরোগী, ফিলিপাইন দ্বীপে ১২,০০০ ভারতবর্ষের কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ, চীনেরও তাই, আফ্রিকার সকল স্থানে এবং দক্ষিণ সাগরের সকল দ্বীপেই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সমস্ত পৃথিবীতে বোধ হয় ৫০,০০০,০০০ কুষ্ঠরোগী আছে। কুষ্ঠরোগের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা যায় না। মিশর হইতে এই রোগ বোধ হয় খ্রীস্টে বাস এবং সেখান হইতে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় ইহা দমন করিবার নিমিত্ত ইউরোপে নানা-প্রকার কঠিন আইনকানুন তৈয়ার করা হয়। কুষ্ঠরোগীদের আলাপা নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে হইত। তাহাদের নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করিতে হইত এবং রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিবার সময় বিশেষ এক-প্রকার শব্দ করিতে করিতে বাইতে হইত। সাধারণ

পানাপান হইতে তাহাদের জল পান নিষিদ্ধ ছিল। এমন-কি, ধর্মমন্দির-সমূহে কুষ্ঠরোগীদেরকে স্নান বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের অশোভিত্রিমার উপাসনা করা হইত। এই সতর্কতার ফলে ইউরোপে কুষ্ঠরোগ কমিয়া যায়।

কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধে অনেকের নানা-প্রকার অজুত-অজুত ধারণা আছে। ইহা পৈতৃক ব্যাধি নহে। কুষ্ঠের এক-প্রকার বিশেষ বীজাণু আছে। ইহা ১৮৭৪ সালে আবিষ্কার হয়। কুষ্ঠ সকল স্থানে সমানভাবে ছড়ায় না। স্থানবিশেষে ইহার কম-বেশী দেখা যায়।

কুষ্ঠ কেমন করিয়া ছড়ায় তাহার সম্বন্ধে নানা-প্রকার আলোচনা হইয়াছে কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত কেহ এখনও হইতে পারেন নাই। কেহ-কেহ বলেন, মাছের এই ব্যাধি আছে, কেহ বলেন ইহা জুল। মশা মাছি এই রোগের বীজ ছড়ায় বলিয়া অনেকের ধারণা, ইহা ইহার কোনো বিধাসম্বোগ্য প্রমাণ নাই। ইন্দুরের কুষ্ঠ আছে বটে, কিন্তু মগের মতন কুষ্ঠব্যাধিকে ইঁদুর মানুষের শরীরে সংক্রামিত করিতে পারে কি না, এবিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই, তবে বতদূর মনে হয়, পারে না। এক মানুষের শরীর হইতে অল্প শরীরে কুষ্ঠব্যাধি সকল ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয় না। হাওয়াই দ্বীপে একই পরিবারে একই ঘরে একশস্যার কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামী এবং নীরোগ স্ত্রী বাস করে, কিন্তু স্ত্রীর কোনোকালে কুষ্ঠব্যাধি হয় নাই, ইহাও দেখা গিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সম্পূর্ণ স্বস্থ ব্যক্তি কুষ্ঠরোগীর সেবা করিতে গিয়া ঐ রোগগ্রস্ত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ তিনপ্রকারের, (১) nodular অথবা tubercular type. (২) anasthetic and attacks the nerves এবং (৩) প্রথম দুই প্রকারের মিলিত অবস্থা। কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করিবার পর একজন লোক ১০ বৎসর কাল পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে অবশ্য ইহা অপেক্ষা বেশীও বাঁচে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই কুষ্ঠরোগ বেশী হয়।

আমাদের দেশে এই রোগ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই দেশের লোকের এই সর্বজনঘৃণিত ব্যক্তির প্রতিকার-সম্বন্ধে কোনো প্রকার চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটি কুষ্ঠাশ্রমের নাম করা বাইতে পারে, একটি বাঁকুড়ায় আর একটি পুরুলিয়ার, এই কুষ্ঠাশ্রমটি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দুইটি কুষ্ঠাশ্রমই খুঁটান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত।

হাওয়াই দ্বীপে একটি প্রকাণ্ড কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই আশ্রম ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত ঐ

আশ্রমে মোট ১০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী আশ্রয় পাইরাছে। ১৯০৫ সালে, অর্থাৎ হাওয়ারী দ্বীপ আমেরিকার অধীনে আসিবার সাতবৎসর পরে মোলাকী নামক স্থানে একটি কুষ্ঠচিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ করিব জন্য এই চিকিৎসালয় অনেক কার্য করিয়াছে।

কিলিগাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৮ সালে আমেরিকানদের হাতে আসে। তখন আর ৬০০০ কুষ্ঠরোগী ঐ দ্বীপপুঞ্জে ছিল। ঐ দ্বীপে ডাক্তার হাইসার (Dr. Heiser) কুলিয়ন দ্বীপে (Island of Culion) কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন। দ্বীপটি ৪৬০ বর্গ মাইল। এইখানে ক্রমে-ক্রমে একটি সম্পূর্ণ সহর তৈয়ার হইল। বর্তমানে এই দ্বীপে ৫,৬০০ কুষ্ঠ-রোগী বাস করে।

কুলিয়ন দ্বীপের কুষ্ঠাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম। এইখানে কুষ্ঠ রোগীরা তাহাদের সকল-প্রকার নাগরিক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাকে কুষ্ঠরাজ্য বলিলেও চলে। সহরের পুলিশ দারোগা মেথর ম্যিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, কুলী মজুর ইত্যাদি সকলেই কুষ্ঠরোগী। দ্বীপে বিশেষ এক-প্রকার মুদ্রার চলন আছে, এই মুদ্রা এই কুষ্ঠ রাজ্য ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারে না। এখান হইতে যেসকল চিঠিপত্র বাহিরে যায় সবই শোধন করিয়া তা'র পর ডাক জাহাজে পাঠানো হয়। এখানে রোগীদের খাওয়া পরা থাকার কোনো খরচ নাই, তবে বাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা কাজকর্ম করিয়া বেতন পাইতে পারে। এইখানে কুষ্ঠরোগীরা অনেকটা আশ্রমে বাস করিতে পারে--কুষ্ঠ বলিয়া ঘৃণা করিবার কেহ এখানে নাই এবং অশান্ত স্থানের মতন কুষ্ঠরোগীদের



কুলিয়ন দ্বীপের একদল কুষ্ঠরোগী—

ইহাদের অবস্থা আরোগ্য হইবার পক্ষে বিশেষ আশাজনক

সমাজবর্জিত হইয়া বাস করিতে হয় না। এই আশ্রম হইতে ১৯৬ জন কুষ্ঠরোগী একেবারে নিরাময় হইয়া গৃহপ্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরো হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বাঙালী পালোয়ান “বর্ষাতি বাবু”

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

আশানন্দ, শ্র'মাকান্ত, গোবর, ভীষভবানী-প্রমুখ বঙ্গজননীর প্রখ্যাত সম্মানগণ বাঙালীর শক্তির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ বাঙালীর দুর্বলতার কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করিয়াছেন বঙ্গমাতার এমন আরও অনেক সুসম্মান বঙ্গের বাহিরেও জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ও বর্তমান আছেন যাঁহাদের নাম আমরা অনেকেই

জানি না। তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জনের সহিত পাঠক-পাঠিকাগণের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। তাঁহারা বিহারের ঔপনিবেশিক বাঙালী।

বিহারের রাজধানী বাকীপুরে বাঙালী বালকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য “শুরোদ্যান” নামে একটি ব্যায়ামাগার



বাকীপুরের “শুরোদ্দানের” বাঙালী পালোয়ানগণ—সর্বনিম্ন পংক্তির বাবু দিক হইতে
তৃতীয় ব্যক্তি “বর্ষাতি বাবু”

আছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কবিরাজ বি এ, মহাশয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাধায়াগারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৭১ বৎসর হইবে। যৌবনে তাঁহার স্ত্রী বলশালী বাঙালী বিহার-অঞ্চলে ছিলেন না বলিয়া এখনও একটা প্রখ্যাতি আছে। এই শুরোদ্দানের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া সম্পাদকের কার্য করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরেশ-বাবুর কীর্তি “শুরোদ্দান” আজিও বিদ্যমান এবং সুপরিচালিত। এখানে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকার ব্যায়াম-শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। এই ব্যাধায়াগারে যোগ দিয়া আজ অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া যে শত-শত বালক স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছে তন্মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বাবু অমরনাথ রায় অন্ততম। তিনি বাকীপুরের প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের সন্তান। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বাকীপুরে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। এই বংশের বহু সন্তান আজ বিহার সরকারের নানা বিভাগে কর্ম লইয়া নানা-স্থান-প্রবাসী হইয়াছেন। অমরনাথ বাবু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পিতার কর্মস্থান-মোতি-হারীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাটনার সার্ভে স্কুল—এক্ষণে “বিহার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং”—হইতে পরীক্ষায় পাশ করিয়া ভ ভারসীয়ারি পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ৬ শ্রামনাথ রায়, এম্-এ, মহাশয়ের কর্ম-স্থান মুঙ্গেরপুর-প্রবাসী হন।

পাটনায় অবস্থানকালে অমর-বাবু “শুরোদ্দানে” যোগ-দান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন বলবান্ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে তাঁহার বিশাল বক্ষ, উন্নত গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ স্ফুটিত পেশল দেহ তাঁহার বীর্যবাহক শারীরিক মৌল্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সুদর্শন করিয়াছিল, অত্রদিকে তাঁহার ধীরেন্দ্র অমায়িক প্রকৃতি তাঁহাকে আবালবৃদ্ধ সকলের প্রিয় এবং বাঙালী বিহারী সকলেরই নিকট সম্মানিত করিয়াছিল।

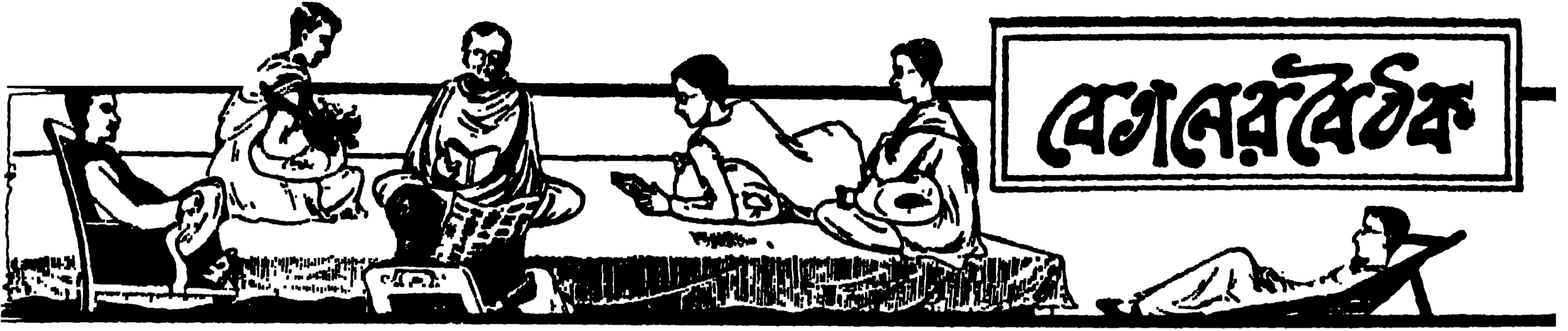
বাল্যকালে প্রতিবর্ষীয় তাঁহার প্রায়ই ফোড়া হইত বলিয়া শুরোদ্যানের সম্পাদক মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে “বর্ষাতি” এই নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আর সকলেও তাঁহাকে ঐরূপ ডাকিতে ডাকিতে তিনি “বর্ষাতি বাবু” নামেই অধিক পরিচিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা চার সহোদর। অমরনাথই জ্যেষ্ঠ, শিখরনাথ মধ্যম, মেঘনাথ তৃতীয় এবং প্রিয়নাথ কনিষ্ঠ। সকলেই বলিষ্ঠ। এক্ষণে প্রিয়নাথ-বাবুই জীবিত আছেন। ছুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের গৌরব, চিরকৌমার্যব্রতী, নিরামিষভোজী বিমলচরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমূত্র-রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যৌবনে বহু স্থানে বহু ভদ্র-সমাজে তাঁহার শারীরিক বলের বহু পরিচয় দিয়াছিলেন এবং নানা স্থানের পালোয়ানদের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারতবর্ষীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক হিন্দু মুসলমান শিখ-পালোয়ান এবং ইংরেজ গোরা স্বয়ং শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎকালীন নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মল্ল-ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাকীপুর হইতে বাঙ্গালী বীর “বর্ষাতি বাবু”কে আপন খরচায় এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল-পরীক্ষণীয় অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে একটি স্প্রিং পিস্টন বা চাপদণ্ড (spring piston)

রক্ষিত হইয়াছিল। যিনি ঐ পিস্টনে সঙ্কিত ১০ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই জিৎ হইবে। কিন্তু পিস্টনে হাত না দিয়া কেবল বুক দিয়া বুকেরই জ্বোরে ঠেলিতে হইবে। কি পশ্চিমা পালোয়ান, কি শিখ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে-পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্টনে বুক সংলগ্ন করিয়া সবলে তাহা ১০ চিহ্ন পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন! দর্শকমণ্ডলী আনন্দধ্বনি ও প্রশংসাবাহীতে প্রদর্শনোৎসব মুখরিত করিয়া তুলিলেন। এই সংবাদ তৎকালীন অমৃত-বাক্যর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ষাতি বাবুরা চার সহোদরে যখন আহারে বসিতেন তখন তাঁহাদের আহার্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক-এক জনের পাত্রে যে কটির গোছা উপযুক্ত পরিমাণে রাখিয়া দেওয়া হইত তাহা পাত্র হইতে প্রায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঁচু হইত। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ভোজনের ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ফোটো ও প্লেট দুইই নষ্ট হওয়ায় আমরা এখানে শুরোদ্যানে গৃহীত একখানি অতি পুরাতন গ্রুপের প্রতিলিপি মাত্র মুদ্রিত করিলাম। সর্বনিম্ন পঙ্ক্তির বাম দিক হইতে তৃতীয় এবং দক্ষিণ হইতে চতুর্থই “বর্ষাতি বাবু”। তাঁহার পাশ্বে দর্শকের দক্ষিণে তাঁহার প্রথম অল্প এবং বামে অল্প-দুই কনিষ্ঠ সহোদর।

আশা করি শুরোদ্যানের বর্তমান পরিচালকগণ তাঁহাদের গৌরবস্বরূপ এই বীরের একখানি তৈল চিত্র রক্ষা করিতে তুলিবেন না।



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়া হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে বাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাড়া হইবে। বাহারের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার লিখিত জানাইবেন। অন্যান্য প্রশ্নোত্তর ছাড়া হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিত পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিত পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিয়কোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। বাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দৃষ্টিদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, বাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় বাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও বুদ্ধিবৃত্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যথার্থ-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ চাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাড়া বা না-ছাড়া সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং বাহার মীমাংসা পাঠাইবেন তাহার কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৭)

দালানের দাগ

কোনও দালানের ভিতরের দিকের ছাদে চূণকাম করিবার সময় মেঝের কাঁচা সিমেন্টের উপর ঐ চূণের ছিটা পড়িয়া আর উঠিতেছে না। কেরোসিন, স্পিরিট ইত্যাদি দিয়া কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। উক্ত দাগ তুলিবার কোনও উপায় আছে কি না ?

শ্রীভারকনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮)

ভাণ্ডারহাটের ইতিবৃত্ত

হুগলী জেলায় ভাণ্ডারহাট নামে একটি গ্রাম আছে। শুনা যায় পূর্বে এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইত, যদিও এখন তাহার চিহ্ন পর্যাপ্ত নাই। এই গ্রামে "সাবিজী" ও ১মাইল দূরে মোগলপুর গ্রামে জয়চণ্ডী নামে ২টি গ্রাম্য দেবতা আছে, এই দেবতা ২টির নামানুযায়ী ২টি ঘাট ছিল "সাবিজী ঘাট" ও "জয়চণ্ডী ঘাট"। শুনা যায় এই দুইটি ঘাট হইতে একটি মাত্র খেওয়া হইত, ইহা কতদূর সত্য জানি না। তবে একটি যে নদী ছিল তাহার প্রমাণ—এই গ্রামে ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুই-একটি গ্রামে পাশাপাশি ছোটবড় ১০-১৫টি পুকুরিণী, বাহা দেখিলেই মনে হয় নদী বা খাল বাধিয়া করা হইয়াছে। সম্প্রতি এইরকম ২১টি ডোবার পক্ষোদ্ধারের সময় হাল ও নৌকার ভগ্ন অংশ, মরার করলা, হাড়, কলসী প্রভৃতি অংশের সামগ্ৰী পাওয়া গিয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে নদীটি কতদিন পূর্বে বিচ্ছিন্ন ছিল? কি কারণেই বা অদৃশ্য হইয়াছে? ইহার কি নাম ছিল? ইহার উৎপত্তিস্থল কোথায় ও ইহা কোন নদীর সহিত মিশিয়াছিল? ইহার প্রবাহ কোন দিকে ছিল?

এই সাবিজী ঠাকুর বর্ধমানের মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

হিমালয়ের বিবরণ

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোন ভারতীয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম হিমালয়ের ও তৎ-

সংলিষ্ট পর্বতমালার প্রথম বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যে হিমালয় পর্বতকে নানা প্রকার বিভিন্ন নামে অভিহিত দেখা যায়, কিন্তু হিমা লয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি ?

সত্যভূষণ সেন

(২০)

জলের রং

অনেকেই বলিয়া থাকেন জলের কোন স্বাভাবিক রং নাই, পাত্র-বিশেষে উহার রং হয়। কিন্তু আমরা পদ্মা নদী, জল সাদা এবং মেঘনা নদীর জল কালো দেখিতে পাই; তদ্ব্যতীত বর্ধাকালে প্রায় সকল স্থানেই কালো জল দেখিতে পাই এবং ঐ সকল জলের রং পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত হইবার কারণ কি? প্রশ্নগনন্যমে গঙ্গা ও যমুনার জলের রং ছুই প্রকার।

শ্রী সুধীররঞ্জন দত্ত

(২১)

রাক্ষস-ভাল বা রাবণ-হৃদ

মানস-সরোবরের পশ্চিমে প্রায় ৫১ মাইল দূরে একটি হ্রদ আছে। হ্রদটি বেশ বড়—আয়তনে প্রায় মানস-সরোবরের সমান। এই হ্রদের নাম রাক্ষস-ভাল বা রাবণ-হৃদ; ইহার এরূপ নাম-করণের কোন অর্থ-সঙ্গতি কেহ নির্ধারণ করিতে পারেন কি ?

শ্রী পঙ্কজবাসিনী সেন

মীমাংসা

"মেরেদের কি ব'লে সম্বোধন করা যেতে পারে"

ভাষ্যের প্রবাসীতে শ্রী স্নোৎসনানাথ চন্দ মহাশয় একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার "উত্তরের" দেশে বাওয়ার দুইটি পৃথক আমরা দেখিতেছি। এক-- তিনি যে 'দেবী'কে অমুপযুক্ত বোধে পরিভাষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বপদে আসীনা হইবার জন্য তেটি দেওয়া; আর--স্ব-সাম্রাজ্য দাঁড়িয়া উপযুক্ততার কাহাকে আনিয়া ব্যবহারের জন্যে চালাইয়া দেওয়া। তিনি যদিও এই শেষটি ইচ্ছা

করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের “দেবী”কেই বহাল রাখা সমীচীন বোধ হয়। নূতন শব্দ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই।

‘দেবী’ ও ‘বাবু’কে উচ্চারণের দিক্ দিয়া আমরা একই পর্যায়ের শব্দ মনে করি। কারণ ‘বী’র দীর্ঘস্বরটুকু আমাদের উচ্চারণে হ্রস্ব হইয়া পড়ে। সুতরাং কতকগুলি নামের পিছনে যখন ‘বাবু’রা স্থান লইতে পারিয়াছেন, ‘দেবী’দেরই বা নিরাশ হইবার কারণ কি? তবে চল-মহাশয় “কেমন যেন খাপচাড়া ঠেকে” বলিয়াছেন, তাই কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিতে হইল।

‘চার’ “বীণা”, “নীলা” প্রভৃতি শব্দের মত নামগুলির শেষে “দেবী” লাগাইলে যে অশোভন বা শ্রুতিকটু হয়, এ অপবাদ হয়ত চল-মহাশয়ও দিবে ন। তিন অক্ষরের নামগুলি অর্থাৎ “অমলা দেবী” “নির্মলা দেবী” “পূর্ণিমা দেবী” প্রভৃতিতেও একটু কষ্ট করিয়া ঐদলে ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বা একটু খাপচাড়া ঠেকে, ব্যবহার-ভলে স্থান করিয়া দানের মরলা কাটিলে ওটুকুও সরিয়া যাইবে নিশ্চয়। কিন্তু মুস্কল বাধার ঐ বছর্ষ ও অতিরিক্ত দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট এবং বৃত্তাকর-সংবলিত নামগুলি। যেমন, “গিরীশমোহিনী”, “শৈবলিনী”, “পদ্মকনলিনী”, “অপরাজিতা” প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদিগকেও একটু ভাঙাইয়া চুয়াইয়া “গিরি দেবী,” “পদ্ম দেবী”.

“অপরা দেবী”, “শৈব দেবী” বলিয়া সম্মান দিলে অস্তায় হয় না। এমনও সব অকাটা নাম আছে, বাহাদিগকে কোন মতে বাপে কেলা যায় না যেমন, “সৌদামিনী”, “কাদম্বিনী” প্রভৃতি। ইহাদিগকে ‘সহু দেবী’ “কানী দেবী”ও বলা চলে না, আবার পিছনে ‘দেবী’ জুড়িলেও আমার কানে “বাবু”ওলা ‘হরবল্লভ’ ‘দীনবন্ধু’, ‘জ্যোৎস্না’ প্রভৃতির স্তায় গোবর্ধন গোছের শুনায়। অনেকে বলিতে পারেন, ‘এ’দের পিছে বাবু-জুড়িয়া আমরা ডাকিয়া থাকি।’ কিন্তু সকলে সমান নয়; তার খাপ-চাড়া ঠেকানাটাও শব্দ সমাজে কাহারও এক চেটিয়া নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দীনবন্ধু নামক জনৈক বন্ধুকে ‘দীনবন্ধু-বাবু’ বলিতে গিয়া কানে বাধার দ্রবণ লঙ্কার, অগত্যা আমার তাহার সহিত ‘ভূমি’র বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। বর্তমান জিজ্ঞাস্যকেও ঐ কারণে আমি বারবার ‘চল-মহাশয়’ বলিতেছি। কিন্তু দীনবন্ধু ও চল-মহাশয়ের যাতে ‘বাবু’ হওয়া আটকায় নাই, ‘দেবী’র জলচল হইলে ঐ মহাশয়-দিগেরও একপতি হইবেই। সেদিন আর খাপচাড়া ঠেকিবে না।

পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ সৌদামিনী, কাদম্বিনী বা হরবল্লভ, দীনবন্ধু প্রভৃতি থাকেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সরকার

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ *

অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওহুদ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলায় কথা স্বরণ ক’রে ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখছেন :—

“এক একদিন মধ্যাহ্নে চাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম...দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে অথর স্তম্ভতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডবর্ণ নীলিমা মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। সেইসকল অতিদূর বাড়ীর ছাদে একটি চিলা কোঠা উচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল স্তম্ভনী তুলিয়া চোপ টিপিয়া আপনায় ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন আমাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাস্তাভারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রহস্যময় কল্পনা করে, আমিও ভেদনি ঐ অজানা বাড়ীগুলিতে কত খেলা কত স্বাধীনতার আগাগোড়া বোকাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথা উপরে আকাশব্যাপী ধরদীপ্ত, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের স্তম্ভ ভীক ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত, এবং সিঁড়ির বাগানের পাশের গলিতে দিবালুপ্ত নিস্তক বাড়ীগুলোর সম্মুখ দিয়া পসারী স্থব করিয়া ‘চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই’ হাঁকিয়া যাইত— তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদ্বাস করিয়া দিত।”

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর “রবীন্দ্রনাথে” যে একটি চিঠি তুলেছেন তার কতক অংশ এই—

* ঢাকা বিশ্বভারতী স্মরণনীর এক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল। তারপর এটি ভারপার ভারপার পুনর্লিখিত হয়েছে।

“আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিষ্কৃত যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে ছেপে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাধার দিগে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে।”

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর বৈচিত্র্যে কিছু-না-কিছু আনন্দ উপভোগ করা বালক কেন সকল মানুষেরই সাধারণ ধর্ম। তবু বলতে হবে, বালক রবীন্দ্রনাথ সেইসকল মানুষের শ্রেণীতে বেমালুম খাপ খেয়ে যান না। বালক বয়সেই অসীমের রহস্যকে এমন সারা প্রকৃতি দিগে অসম্ভব করা এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। বালক নচিকেতা নাকি মৃত্যুর গুহায় তলিয়ে গিয়ে অমৃতের উদ্ধার করে’ এনেছিলেন, তাঁর প্রপ্নে দেখতে পাই আশ্চর্য্য সমাহিত-চিন্ততা। কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিকীর্তিতে যে বৈচিত্র্য, বিপুলতা আর অমর সৃষ্টি-মাহাত্ম্য লাভ করেছেন সেটি এই আশ্চর্য্য রহস্যের অসম্ভবকর্তা বালক রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পরিণতি।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষত্বকে অল্প দুটি কথায় নির্দেশ করা যেতে পারে—অতি তীক্ষ্ণ অহুত্বিত্তি আর সন্ধানপরতা। অহুত্বিত্তি তাঁর ভিতরে এর চাইতে কিছু কম থাকলে এই অপ্রতিহত সন্ধানপরতার মুখে তিনি হয়ত হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্তু প্রকৃত কবির মত অহুত্বিত্তিই তাঁর ভিতরে সব চাইতে প্রবল। এই অহুত্বিত্তিরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চলছে সন্ধান। “ফাল্গুনীর” অঙ্ক বাউলের মতন সত্যের অরুণ আলো প্রথমে তাঁর “ভূকর মাঝখানে খেয়া নৌকাটির মত এসে” ঠেকে, আর তিনি গান গেয়ে ওঠেন।

প্রথম পর্ব্যায়

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। আঠে শব্দ তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মাতুল; তাই বুদ্ধিমান বালকের পক্ষে এইটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গানে ছন্দে বদ্ধ হ'য়ে উঠবার ক্ষমতা যে তাঁর মজাগত তাঁর পরিচয় সেই অল্প বয়সের কবিতায়ও প্রচুর।

উন্নত পবনে যমুনা তর্জিত,
যন যন গর্জিত মেহ।
দ্রুমকত বিছাত পথের লুষ্ঠিত,
ধর হর কম্পত মেহ।
যন যন রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্,
বরষত নীরদ পুঞ্জ।
• যোর গহন যন ভাল তমালে
নিবিড় ভিমিরমর কুঞ্জ।

হোক এ অহুসরণ হোক এ “আজকালকার সস্তা
আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাজ” তবু এ বেশ একটু স্নেহ
আর আনন্দের দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য নয় কি? কেমন
একটু রসবিলাসী মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে এর
ভিতরে!

সন্ধ্যাসন্ধ্যাতে কবি নিজের বিশেষত্ব প্রথম উপলব্ধি
করেন। আর পরলোকগত প্রহের অজিতবাবুর বিশ্বাস
“প্রভাত সন্ধ্যাতে কবির সমস্ত জীবনের ডাবটির ভূমিকা
নিহিত রয়েছে। মিথ্যা নয়। এর “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ”
কবিতায় কেমন এক বিপুল কবিপ্রাণ উঘেলিত হ'য়ে
উঠেছে—

জানিরা উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উখলি উঠেছে বারি ;
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
কথিরা রাখিতে নারি।

তাঁর রুদ্ধ প্রতিভা-নির্ঝরিণী প্রকাশের মহাসাগরের
ডাক শুন্তে পেয়েছে—

ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিঁদু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার যেন।

“প্রভাত উৎসব” কবিতায় জগতের আনন্দ আর
সৌন্দর্যের মূর্তির কবির চোখের সামনে কেমন স্তম্ভর
ভাবে খুলে গেছে—

হরর আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেখা করিছে কোলাকুলি।

* * * * *
এসেছে সখাসখী, বসিরা চোখোচোখী,
দাঁড়ারে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন, পুলক-ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' রাখিতে আঁধি তুলি।

আর “অনন্ত জীবন” “অনন্ত মরণ,” “মহাস্বপ্ন” “সৃষ্টি-
স্থিতি-প্রলয়” প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রতিভা কি এক
বিরাট সৃষ্টিতেই না আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছে!

“গাচ্ছে” কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি ;
আমাদের বলবার মতলব—প্রকৃত স্রষ্টার সাক্ষাৎ এখনো
আমরা পাইনি। † সৃষ্টির জন্ত কবির মনে আবেগ
জেগে উঠেছে—বিপুল গভীর সে আবেগ ; কবির দৃষ্টিও
কিছু পরিষ্কার ; কিন্তু নিশ্চয়ই এত পরিচ্ছন্ন নয় যাতে
তাঁর সামনে সৃষ্টি পূর্ণচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।
“প্রভাত উৎসবে”র পরে “ছবিও গানেও” প্রকৃত স্রষ্টাকে
আমরা দেখতে পাইনে। কবির দৃষ্টি এখানে আরো
কিছু পরিষ্কার ; কিন্তু সমগ্রের ধারণায় জটিল রয়েছে ব'লে
মনে হয়। পাঠক এর “একাকিনী” কবিতাটির সঙ্গে
Wordsworth এর The Reaper কবিতাটি মিলিয়ে
পড়লে হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম প্রকৃত স্রষ্টারূপে দেখতে
পাই তাঁর “কড়ি ও কোমলে”, বিশেষ ক'রে এর সনেট-
গুলোতে। তিনি নিজেও বলেছেন—

+ অতি বিখ্যাত কবিতা “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ”ও এমন সব চরণ
আছে যা আটটি রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে কখনই বেরত না।

আমার কাব্যলোকে বর্ষন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বারু এবং বর্ষণ; কিন্তু পরংকালের “কড়ি ও কোমল” কেবল আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে কসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ভাষা নানা-রকম রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

“কড়ি ও কোমলের” প্রথম কবিতায় কবির সাধটি যে কি ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে সবাইকে বলতে হবে তা সুন্দর। “বলাকার” একটি কবিতার কয়েকটি চরণ এই—

কত লক্ষ বরষের উপস্থার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে স্মৃতি এ মাধবী।

কবিপ্রাণও তেমনিভাবে সংশয়, ব্যথা, আবেগ, উচ্ছ্বাস সমস্তের ভিতর দিয়ে এক শুভ মুহূর্তে ফুলের মতো পূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি পাঁচিবারে চাই!
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত সঙ্গ-মাঝে যদি স্থান পাই।

“কড়ি ও কোমলে” শরীর এই প্রথম সৃষ্টিকর্মতা নানা-ভাবে সার্থকতা খুঁজছে, দেখতে পাচ্ছি। “শিশু” কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ কৃতিত্ব তারও পরিচয় এতে রয়েছে। (“সাত ভাই চম্পা”, “পুরানো বট”, “হাসিরাশি” “আশীর্বাদ” ইত্যাদি।) আর কবির দেশাত্মবোধও এর আহ্বান গীতে ঝঙ্কত হচ্ছে—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিধাণ,
সুনিতে পেরেছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙ্গালী কই।

কিন্তু এর সনেটগুলোই যে সব-চাইতে বেশী প্রশংসার জিনিষ সে-সম্বন্ধে বোধ হয় সব কাব্যরসিকই একমত; প্রায় প্রত্যেকটি সনেটই দামী মুক্তার মতো নিটোল—প্রকাশে, রসে জমাট।

এইসব সনেটের কতকগুলোর ভিতর যে ভোগের সুর বাজছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্ধপত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট ব'লেই একটুখানি সংস্কার-বিমুক্ত হ'য়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের ভিতর এখন ব্যাহত। কাব্য আত্মা:ই

এক প্রকাশ; কাজেই এর সৌন্দর্য্যও “ন বলহীনেন লভ্যঃ।”

এই ভোগের “কুসুমের কারাগার” থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাজক্ষা জেগেছে ব'লেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তা সত্য নয়। অনেক বড় কবির ভিতরে এবিদ্ভোহ জাগেনি। তাই বাল, তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়। কালিদাস, বিজ্ঞাপতি, হাফেজ, Burns (বার্নস) Byron (বায়রন্) প্রভৃতি কবির কথা স্মরণ ক'রে আমরা এ কথা বলছি। আসলে, জীবনে ভোগ অসত্য নয়। আর এই সনেট-গুলোর ভিতরে সুপ্রকাশের সৌন্দর্য্য স্নাত হ'য়ে সেই ভোগের সত্য যথাযথভাবেই ফুটে উঠেছে।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতরে দুর্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে বলে যে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জাগাচ্ছে তা নয়। “কুসুমের” কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাজক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেমনি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে—তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগৃত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে। নারী সৌন্দর্য্য ত সাধারণত আমরা তুচ্ছ ভেবেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি; যাকে আমরা মহত্তর ভাব বলি, পরে পরের কাব্যে দেখব, সেই জাতীয়তা, স্বদেশিকতা ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাজক্ষাও কবির ভিতরে এমনই প্রবল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁর ভোগের কবিতার ভিতরে যথেষ্ট পরিস্ফুট। কালিদাসের দুয়ন্ত শকুন্তলার কথা স্মরণ ক'রে বলছেন—

অনাত্মং পুষ্পং কিশলয়মলনং করকরৈঃ
অনাবিচ্ছং রত্নং মধু অনাবাদিতরসম্।

হাফেজ তাঁর “মাগলের” কথা বলছেন—
কজিরে মা বা আর লাগে শকরু আকাশানে শুমা +।

আর Burns তাঁর Highland Maryর কথা স্মরণ ক'রে বলছেন—

+ “লাল শরীরে ঠোট প্রিয়ার রোজ পাই গুরাই লাখলাখ চুধনে।” কবি নজরুল ইসলামের অনুবাদ।

How sweetly bloom'd the gay green birk
How rich the hawthorn's blossoms,
As underneath the fragrant shade
I clasp'd her to my bosom !
The golden hours on angel wings
Flow o'er me and my dearie;
For dear to me as light and life
Was my sweet Highland Mary.

এসব কবিতার ভোগ কেমন আত্মসম্পূর্ণ, যথেষ্ট তৃপ্তি স্বস্তি এতে রয়েছে। তবে কালিদাসের ভোগ কেমন গোলাপগন্ধি, আর হাফেজ, Burns-এ মত্ততা আর আবেগ কিছু বেশী। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভোগের স্বরূপ যখন উপলব্ধি করিতে যাই তখন দেখি কালিদাসের মতন সৌন্দর্যের উপাসক তিনি, মাঝে-মাঝে বুঝতে পারা যায়, এ ভোগে তিনি তৃপ্ত; কিন্তু মোটের উপর এই ভোগের ভিতরে আকর্ষণ নিমজ্জনের স্বস্তি যেন তিনি পাচ্ছেন না। সেইজন্য কেমন-একটা ব্যথা তাঁর “বাহু” “দেহের মিলন” প্রভৃতি কবিতায় বর্তমান; আর সব ভোগ সব অসুস্থতির ভিতরে পরম রহস্যমণ্ডিত সত্যের সন্ধানই যে তাঁর মজ্জাগত মানসীয় “হৃদয়ের ধন” কবিতায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।

নাই নাই কিছু নাই শুধু অঘোষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ চাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পছন্দ,
দেহ শুধু হাতে আসে লাগু করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
জননের ধন কতু ধরা যায় দেহে।

“কড়ি ও কোমলের” পর মানসীতে দেখতে পাই কবির প্রকাশ-সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ আরো বিস্তৃত, জীবন হর্ষে আর ব্যথায় জটিল হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জটিলতায় তাঁর দৃষ্টি বিপর্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছে না। উপরে “হৃদয়ের ধন” কবিতার কয়েক চরণ যে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে কবি তাঁর সমস্ত কথা কি নিখুঁত আর অব্যর্থভাবে পাঠকের সামনে ধরতে পেরেছেন!

“মানসীকে” মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করে পড়া যেতে পারে। প্রথমভাগের বিশেষত্ব এর প্রেমের কবিতা।

মানসীর চরণাব্যাহারে কবিস্বদয়ে সৌন্দর্য্য যেন সহস্রধারে উচ্ছৃত হ'য়ে উঠেছে। মানসীকে কাঁব কখনো বলছেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাঁও মুগপানে
নয়ন ভুলে।
দেখি ও নয়নে নিমিষের গুরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁধিপাতাছুটি
পড়ে কি চুলে!
কণেকের তরে ভুল ভাঙারোনা,
এসেছি ভুলে।

কখনো ভুল ভেঙে যাওয়ায় কবি বলছেন—

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু বেই
খামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কটিন ফাঁসি।

কখনো বলছেন, বিরহেই তিনি ছিলেন ভালো—

তবু সে ছিনু ভালো আধো আলো আঁধানে,
গহন শত-কের বিবাদের মাঝারে।

কখনো শূন্যহৃদয়ে তিনি বসে আছেন, মনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগছে, কবে—

পাপল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে, মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।

কখনো সংশয়ের আবেগে কবি স্থির থাকতে পারছেন না—

ভালো বাসো, কি না বাসো বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুগপানে রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁধি।

.....

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছে মোরে,
বহে যায় বেলা।

জীবনের কাজ আছে, প্রেম নহে ক'রিকি,
প্রাণ নহে খেলা।

কখনো এক অপূর্ণ বিচ্ছেদের ছবি আঁকছেন—

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করণ নয়নে
আমার মুখের পানে চাঁও।

আবার কখনো সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে কবি বলছেন—

তবু মনে রেখো...
তবু মনে রেখো যদি মনে পড়ে আর
ঐশি-প্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

হুটি হাতে হাত দিয়ে কুখার্ত নরনে
চেরে বাহি হুটি ঐশি-মাঝে।
খুসিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!

*

এইসব কবিতায় অতি সূক্ষ্ম অল্পভূতিও অল্পম
সৌন্দর্য্য ভঙ্গিমা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো যে
অ-“বাস্তব” নয় তার খুব ভালো একটি প্রমাণ আমরা
জানি। আমাদের এক সুবিখ্যাত কবি-বন্ধু এইসব
কবিতার বহু চরণের পাশে-পাশে তারিখ দিয়ে
রেখেছেন।

‘মানসী’তে কবি দক্ষ স্রষ্টা হ’য়ে উঠেছেন। ভাব, ছন্দ
প্রকাশ-ভঙ্গিমা সমস্তেরই উপর পর্যাপ্ত অধিকারের জন্তে
এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লিখেছেন
তা’র প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রসংশাযোগ্য
আছে। জগতের অতি অল্প কবি সঞ্চয়েই এত বড় কথা
বলা যেতে পারে। আমাদের কথা যেন কেউ ভুল না
বোঝেন। বলছি না, রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখেছেন তা’র
প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ কবিতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাব্যে যা
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনো কবির ভিতরই তা পরিমাণে বা সংখ্যায়
বেশী নয়, এমন-কি অল্পই। এখানে আমরা শুধু এই
কথা বলছি যে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অল্পভূতি, সঙ্কান-
তৎপরতা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের
স্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েননি; এটি যেন তাঁর
প্রতিভার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

যে-সমস্ত কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভিন্ন
‘মানসী’র প্রথম ভাগে “কণিক মিলন”, “একাল ও
সেফাল”, “আকাজ্জা”, “নিষ্ফল প্রয়াস”, “নারীর উক্তি”,
“পুরুষের উক্তি” প্রভৃতি আরো চমৎকার কবিতা রয়েছে
—সৃষ্টি হিসাবেই এসব চমৎকার কবিতা। কিন্তু এসমস্তের
মুকুটমণি হচ্ছে “নিষ্ফল কামনা”।

বুধা এ কন্দন।
বুধা এ অনল-স্তরঃ ছরস্ত বামনা।
রবি অন্ত দায়।
অরণোতে অন্ধকার আকাশেতে অাগো।
সন্ধ্যা নত-ঐশি
ধীরে আসে; দিব্যর পঞ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায় বিদায়-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

এর ছন্দ, যতি, ভাবাবেগের বিপুলতা, চিত্তার অতল-
স্পর্শতা, প্রকাশ-ভঙ্গিমার অব্যর্থতা সমস্তের মিলনে সৃষ্টি
যে অপূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে কি কথায় তা’র
যোগ্য প্রশংসা হ’তে পারে? ৭২ লাইনের কবিতা এটি,
অথচ কোথাও এতটুকু ক্রটি, এতটুকু দীনতা প্রকাশ পায়-
নি। এই কবিতাটিকে আমরা কত উচুতে স্থান দিই
তা শুধু এই কথাতেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-
সাহিত্যে এরকম আর দুটি কবিতার সাক্ষাৎ আমরা
পাই। চিত্তার “উর্ধ্বশা” আর বঙ্গাকার “বলাকা” কবিতা।
এগুলো কাব্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একথা বললে অতি সামান্তই
বলা হয়। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে আরো ঢের আছে।
কি গগনস্পর্শী সৃষ্টির অধিকার বিধাতা মাকুষ্যকে
দিয়েছেন এসব তা’রই প্রমাণ। মানসীর দ্বিতীয় ভাগের
অর্থাৎ শেষের দিকের অনেক কবিতায় দেখছি কেমন
বেদনামাখা কবি-হৃদয়—বিশ্ববিধানে জড়প্রকৃতির
নির্মমতার জগৎ এই বেদনা (“নিষ্ঠুর সৃষ্টি”, “সিদ্ধু তরঙ্গ”
প্রভৃতি) নিজেই কল্প জীবনের কারাগারে বন্দী দে’পে
এই বেদনা। তাঁর বিরাট আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত
হবার জগৎ ভিতরে-ভিতরে কামনা করছে। এতদিনের
যে একলা-মনে রস-সম্ভোগের জীবন, তা’র মায়া কাটাতে
তাঁর ব’ড়ে; অথচ কর্মক্ষেত্রে ঐশিপিয়ে পড়বার জন্তে
আকাজ্জাও তাঁর মনে যথেষ্ট প্রবল হ’য়ে দেখা দিয়েছে।
কবির এই অবস্থার সূক্ষ্ম চিত্র বিধৃত হ’য়ে আছে
এর ‘ভৈরবী গান’ কবিতাটিতে। তাঁর এই সমগ্রকার
এমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-কমতা, এত সৌন্দর্য্য-উপভোগ, সব
যেন ফেটে চৌচির হ’য়ে ভিতরকার বেদনাময় কবিহৃদয়
খুলে ধরেছে।—

যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে?
কাদে শিশির-বিন্দুঃ রতের তুষা
হরিতে।
কেন অকুণ সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ ভরীতে।

শেষে দেখিব, পড়িল স্থখ-বৌবন
ফুলের মতন খাসরা,
হার বসন্ত-বায়ু মিছে চলে গেল
বসিয়া,
সেই বেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।
* * *

তবু সামনে না চ'লে তিনি পারুছেন না; তাঁর ভিতর-
কার দুর্জয় শক্তি-স্রোত আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে।

ওগো, খাম, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তাঁরে আর কি'রে চেয়ো না।
ওই অক্ষ-সজল ঐশ্বরী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম ওস্তাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না।
* * *

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনাবে তা'রা ভুলাবে,
সেই আপনার দেহে সঙ্করণ কর
বুলাবে।
স্থপে কোমল শরনে রাপিয়া শীতল
যুগের দোলার ছুলাবে।
ওগো এর চেয়ে ভালো প্রথম দহন,
নিঠুব অঘাত চরণে।
যাবো আঞ্জীবন কাগো পাষণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে য'ব পথ,
স্থপ আছে সেই মরণে।

আন্তে-আন্তে চলিছে আনন্দই তাঁর ভিতরে কেবল
জমাট হ'য়ে উঠেছে; মানসীর 'পলিতাক্ত' কবিতায় তার
পরিচয় রয়েছে। বন্ধুদের দ্বারা পলিতাক্ত হ'য়েও তিনি
আব দমুছেন না। প্রতিভাও এই স্বাতন্ত্র্য বড়
রহস্যপূর্ণ।

বন্ধু এ তব নিফল চেষ্টা,
আর কি 'করিতে পারি ?
শিখর-গুহার আর কিরে যার
নদীর 'গবল' দাবি ?
জীবনের দ্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরণের মাঝে ?

'মানসী'র "বঙ্গবীর", "ধর্মপ্রচার" প্রভৃতি ব্যক্ত
কবিতার ভিতরও যে-বেদনার সঞ্চার হয়েছে দেখতে
পাওয়া যায়, তা এক বড় জীবনেরই গর্ভবাস থেকে মুক্ত

হওয়ার বেদনা। বাঙালীর বোতাম-খাঁটা পোষমান
প্রাণের তলে বাস্তবিকই ছুরক বাননা "সর্পসম" কবির
মনে ফুঁসে—

ইহার চেয়ে কতক যদি আঁব বেছাইন—
চরণতলে বিশাল মরু দিনস্তে বিলীন।

"শুক গোবিন্দে" পরে "নিফল উপহার" কবিতাটি
বেশ বিশিষ্ট; নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "সুন্দারের প্রার্থনা",
"শুক গোবিন্দ" প্রভৃতি ভালো কবিতা, কিন্তু সৃষ্টি-দিশাবে
শয়ত মিথুৎ নয়। এসমস্ত কবিতা এমন-একটি গাঁত-
চন্দ্রের ভিতর দিয়ে দেখে চলেছে যে ত'ই জগৎ সৃষ্টি-কমল
যেন পূর্ণভাবে দল মেলেই পারেনি। "নিফল উপহারে"
দেখা'ছি, কবি তাঁর সেই গাঁতের রাশ খুব ছোরে টেনে
ধরেছেন এবং রাশ টেনে ধ'রে তিনি যে এক চমৎকার
ভঙ্গিতে রথ চালনা করিতে পারেন, তার পরিচয় দিয়েছেন।
এই সর্বত্র কি দৃঢ় সংঘম। এক-একটি চরণ এক-একটি
ভাব প্রায় পুরোপুরি প্রকাশ করছে বলে তাদের সমবায়
সমগ্র কবিতাটিতে যে ভাবধ্বনি উঠছে তা গভীর আর
উদাত্ত।

"মানসী"র শেষের দিকে 'আবো কতকগুলি সুন্দর
কবিতা আছে। "ধ্যান", "অনন্ত প্রেম", "উচ্ছ্বল"
প্রভৃতির কথা বলছি। "ধ্যান" প্রতিভার প্রাণ। কবি
নিজেই সেই ধ্যানের রূপ যেন উপলব্ধি করিতে পেয়েছেন—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আনন যেন ওই অসীম পানার,
আকুল ক'লেছে মাননানে তার
আনন্দ পূর্ণমা।

"উচ্ছ্বল" কবিতাটি এক সুন্দর সৃষ্টি। কবির মনো-
জগৎ এখন খণ্ডেই বিস্তৃত, সেই বিস্তৃত মনোজগতের বুকে
উচ্ছ্বলকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন।

প্রতিদিন বসে মূঢ় সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
বড় শুধু আমে অপেক্ষের তরে
স্বপ্নের এক ভুগ।
ছুরক সাধ কাতর বেদনা
ফুৎকারিয়া উত্তরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।
এ স্ববেগ নিয়ে কার কাছে যাবো,
নিত্য কে পারিবে মোরে।
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
ছ'খনি বাকর ভোরে।

নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত “বিক্রোহীণ” সৃষ্টিকর্মতার সঙ্গে যুক্ত হ’লে কি অপকল্প কাব্য হ’তে আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু সে আবেগ পারে, বায়রনের (Byron) চাইল্ড্ হারল্ডের (Childe Harold) শেষের দিকে সমুদ্র-বন্দন তা’র এক বড় এমন স্রষ্টার হাতে নিরস্তিত নয়। তাই তা’র অনেকখানি কাব্যহিসাবে অকিঞ্চিৎকর। অতি বিপুল আবেগ প্রমাণ।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্রুপদ ।

টঙ্কা—চৌতাল ।

ঈশ্বর তু’ হৈ দয়াল অমৃতগতি প্রণতপাল
ব্যাপক পূরণ বিশাল সত্তা চিত্ত হৃৎ দাই ।
সকল ভুবন জনম করণ জীবন কে পরম শরণ
শরণাগত ভাগ হরণ নিগমায়ম পাই ।
ভেরী মহিমা অগার কোই নহি পাবে পার
কবি মুনি কর কর বিচার অস্ত হার জাই ।
ব্রহ্মা শ্রীপতি গণেশ নারদ শারদ সুরেশ
ধ্যাবত মন মে হমেশ ব্রহ্মানন্দ পাই ।

ব্রহ্মানন্দ

১	০	২	০	৩	৪	১	০
মা ধা ।	ধা ধা ।	সাঁ পা ।	মজা -।	মা রা ।	। সা ।	সা পা ।	সা পা ।
ই ০	ব র	০ ভু’	হৈ ০	দ যা	০ ল	অ গ	ত প
২	০	৩	৪	১	০	২	০
ধাপা ।	। মা ধা ।	পা সা ।	-। সা ।	সা মা ।	মা মা ।	জা জা ।	মা ধা ।
তি ০	প্র ৭	ত পা	০ ল	ব্যা ০	প ক	০ পু	র ৭
৩	৪	১	০	২	০	৩	৪
পা সা ।	সাঁ সা ।	ধা সা ।	পা সা ।	পা ধা ।	সাঁ সা ।	ধা পা ।	সা মা ॥
বি শা	০ ল	স ত	চি ত	সু খ	দা ০ ০ ০	০ ০	ই ০

অন্তরা ।

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 মা মা । ধা পা । সী সী । সী সী । সী সী । সী সী ।
 স ক ল কু ব ন জ ন ম ক র ণ

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 সী সী । জী জী । সী সী । সী পা । সী সী । পা ধা ।
 জী ০ ব ন ০ কে প র ম শ র ণ

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪^০
 ধা পা । ধপা সী । সী সী । ধা সী । সী সী । পা ধা ।
 শ র গা ০ ০ । গ ড তা ০ প হ র ণ

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 মা ধা । ধা পা । পা পা । সপা সপা । ধা পা । ধা মা ।
 নি গ ম আ গ ম গা ০ ০ ০ ০ ০ ই ০

সঙ্কারী

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 মজা -১ । জা মা । রা রা । রা রা । পা সা । ১ সা
 তে ০ ০ রী ম হি মা অ পা ০ ০ ০ র

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 সা সা । সা পা । ধা -১ । ধা পা । সা রা । সা সা
 কো ই ন হি ০ ০ পা ০ বে পা ০ র

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 সা সা । মা মা । মা মা । জা জা । মা মা । ধা ধা
 ঞ যি মু গি ক র ক র বি চা ০ র

১^০ ০ ২ ০ ৩ ৪
 ধা সী । পা ধা । মা মা । মজা -১ । মা রা । ১ সা
 অ ০ ক হা ০ র জা ০ ০ ০ ০ ই

আভোগ ।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
 মা -১ । মা ধা । পা সী । সী সী । পা সী । -১ সী
 ব ০ আ ক্রী প তি গ ঞে ০ ০ ০ শ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
 সী সী । সী সী । সী জী । সী সী । সী পা । ধা ধা
 না ০ র দ ০ শা র দ হু রে ০ শ

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 ধা গা । রা সী । সী সী । ধা সা । সা গা । ধা ধা ।
 ধ্যা ০ ব ত ম ন যে ০ হ যে ০ শ

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 মা ধা । ধা গা । ১ গা ১ সগা সগা । ধা গা । ধা মা ।
 ব ০ দ্বা ন ০ দ্ব পা ০ ০০ ০ ০ ই ০

মুদ্রাকী—ধ্যান

“স্বনতটকৃতরাগা কুহুমৈঃ পীতবজ্রা
 বিবিধকুহুমস্রজাং কক্কীমাদধতি ।
 উচ্চকিতমৃগাকী কাঙ্ককণ্ঠে বিলম্বা
 মালকৌশল্য ভাষ্যা মুদ্রাকী রানিগীর্য় ॥”

ভাবার্থ—

কুহুমের দ্বারা বাঁহা স্বনতট রঞ্জিত, যিনি পীতবজ্রা, বিবিধ কুহুমের মালোর কক্কী যিনি ধারণ করিয়া আছেন, বাঁহা মৃগচকু ভয়ে চকিত, এবং যিনি কাঙ্ককণ্ঠে লম্বা, তিনিই মালকৌশলের ভাষ্যা মুদ্রাকী রানিগী ।

মুদ্রাকী—আলাপ

সম্পূর্ণ মাস্তি ।
 গা ও নি কোমল ।
 ম—বাদী ।
 প—সংবাদী ।

অঙ্গারী ।

সা মা -১ মপা মজা মা -১ রা -১ সা গা -১ স্গা রমা মা মা -১
 তে ০ ম না ০ ০০ ০ ০ • • তে না ০ ০ ০০ ০ নে ০

পমা পা মা জা -১ মা । রা -১ সা -১ সা গ্ধা গা প্গা -১
 রি ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০ তে রি ০ ০ ০ ০

প্গা প্গা গ্ধা গ্ধা স্গা রা -১ সা -১ সসা ধা ধা প্গা
 রে নে না ০ ০০ তো ০ ০ ম্ না • তে ০ ০ না ০

সী গা -১ ধা পা -১ পধা পা মপা মা জা -১ রা -১
 ০ ০ ০ নে তে ০ রি ০ ০ রে ০ না ০ ০ • ০

মা -১ মপা মজা মা রা । সা । সা সা সা
 তে ০ না ০ ০ ০ তো ০ ০ না ০ তে রে না

স্গা! স্গা রা ১ সা -১ ॥
 তে না ০ ০ তো ম্

অঙ্গরী ।

মা মা গ্ধা গা সী -১ সী সী -১ সী রা গা সী -১ সী -১
 তে রে নে ০ রি ০ ০ রে না ০ তো ০ ০ ০ ম্ না ০

সঁপা সঁপা সঁ রা' মঁজা' মা' রা' -১ সঁ -১ সঁ পধা পা -১
 তে না রি ০ রে ০ ০ ০ ০ না ০ তে না ০ ০ ০
 পা -১ পা পমা পা মা জাঃ জাঃ মজা মজা মা ধা
 ০ ০ নে রি ০ ০ রে ০ ০ ০০ ০০ ০ ০
 পা পা ধপা মজা -১ মা রা -১ সঁ -১ সা সা সা
 ০ ০ নে ০ রি ০ ০ রে ০ ০ না ০ তে রে না
 সঁপা সঁপা রা -১ সা -১ II
 তে না ০ ০ তো ম্

সকারী ।

পমা পা মা জা মা রা -১ সা পধা প্ প্ ।
 তে ০ ০ না ০ রি ০ ০ রে না ০ ০ ০ ০
 প্ সা -১ সা -১ সা রা মজা মা ধপা পা
 তো ম্ ম্ না ০ তে ০ রি ০ রে ০ ০ ০
 মজা -১ মা রা -১ সা -১ I
 তে ০ ০ ০ ০ না ০

গভোগ ।

সঁ পধা পধা সঁ -১ সঁ রা' পা -১ সঁ সঁ
 তা না ০ ০ ০ ০ ০ তে রি ০ ০ ০ ০ রে
 সঁ পধা পধা -১ ধমা পা মা জা -১
 তে না ০ ০ ০ ০ তো ০ ম্ না ০ ০
 মা পা ধা পা মজা -১ মা রা -১ সা ।
 তা ০ নে তে রে ০ ০ না ০ ০ নে ০
 সা সা সা সঁপা সঁপা রা -১ সা । II
 তে রে না তে না ০ ০ তো ম্

ক্রপদ ।

মুদ্রাকী—চৌতাল

আদ কঠিন গাইয়ে বজাইয়ে,
 শুধ মুদ্রা শুধ-বাণী শুধ-সজত
 শুধ-অজর শুধ-তান-তাল ।
 শুধ সালক সর্কার শুধ বিকৃত
 নেবধরব একাশ সম বিবস
 অতীত অনাগত সব হো এসর করতার ॥

নেমধরব ।

বাহারী।

০	০	৪	১	০	২	
সা	মা	।	মপা	মজা	।	রা সা
আ	০	০	০	০	০	০
০	৩	৪	১	০	২	
মা	জা	।	মা	ররা	।	সা -।
জা	০	০	০	০	০	০
০	৩	৪	১	০	২	০
-।	সা	।	-।	সসা	।	রা জপা
০	জা	০	০	০	০	০
৩	৪	১	০	২	০	৩
-।	পা	।	ধা	-।	।	পা পা
০	০	০	০	০	০	০
৪	১	০	২			
রা	মমা	।	মাঃ	পঃ	।	পা মজা
র	৩	তা	০	ন	তা	০

অন্তরা।

১	০	২	০	৩	৪	১	০
মা	মা	।	পধা	সা	।	-।	সা
৩	৪	১	০	২	০	৩	৪
সা	সা	।	সা	পা	।	রসা	রা
ক	ত	নে	০	ম	০	ব	০
০	৩	৪	১	০	২		
পা	মা	।	পা	মা	।	জা	জা
০	০	০	০	০	০	০	০
২	০	৩	৪	১	০		
পাঃ	পাঃ	।	পপা	মজা	।	মা	রা
তী	০	০	০	০	০	০	০
০	০	৩	৪	১	০	২	
-।	সা	।	পসা	পা	।	ধা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০



কৈফিয়ৎ

“আসক্তিপরাণ মাতার মুচু আদেশ পালনের অনর্থ বহন করে’ অপমানের মধ্যে, অত্যাচারের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে এমন সকল বরফ নাভালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়-রাজত্ব-বিভাগে পৌরুষের বৃত্ত হানি হয়েছে এমন বিশেষী শাসনের হাতকড়ির নির্ভরতার ঝাঁগু হইয়াছে।” (প্রবাসী—বৈশাখ, পশ্চিম-বাহীর ডারেরী—রবীন্দ্রনাথ)। যে-দেশে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, সে-দেশে সন্তানের জীবন-রাজ্যে মায়ের এমন নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পরিকল্পনা কবির পক্ষে নিতান্তই আর্ধ প্রয়োগ হয়েছে। আর এর ফলে কারো হেঁট মুখে সাধনার হাসি ফুটে উঠবে কি না জানি না, তবে পুত্র-পুত্রের পুত্রিতা অনেক মাতার মুখেই আত্মসন্দেহের ছায়া নেমে আসবে এ স্থানান্তিত। হু’এক স্থলে আসক্তিপরাণ মাতার মুচু আদেশের সম্মুখে আত্ম-বলিদান বিরল না হ’লেও মাতৃ-ভক্তির এমন উগ্র সংকরণ দেশের সন্তানদের মনোরাজ্যে যে ম্যাসেরিয়া বা কালোজরের মত ব্যাপক ভাবে বাগা বেঁধেছে এমন আশঙ্কা করবার মতন প্রমাণ আমাদের সমাজেও নেই; সাহিত্যেও নেই। সর্বত্রই ত দেখি ছেলোদের বা কোঁকু ওঠে তা তারা করেই—মায়ের অক্ষ এবং আবেদন সম্পূর্ণ অবহেলা এবং অগ্রাহ করে’ই। জেতার কৌশল্যার আসক্তির টান শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি; দ্বাপরেও না বশোদার স্নেহের বীড়ের সহস্র আয়োজন শ্রী কৃষ্ণের কর্ণপূহাকে আবিষ্ট রাখতে পারেনি; আর কলিযুগে মায়ের আসক্তির টান আর চোখের জলের মূল্য যে কতখানি তা ত এ যুগের কবি তাঁর “চোখের বাসি”তে চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়েছেন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের দেশের তথাকথিত নাভালকের দল বিবাহে পণ গ্রহণের সময় পিতার একান্ত অনুগত, এবং দারাস্তর পরিগ্রহণের বেলায় মায়ের পরম বাধ্য হ’য়ে থাকে;—কিন্তু ওসব কাজের দরমু সমাজে যদি চিরজীবনের কথা মূলে থাকে কণকালের জন্তেও কারো মাথা হেঁট হবার সম্ভাবনা থাকত, তাহ’লে আত্মগত্য এবং বাধ্যতা অতটা বৃত্ত:উৎসারিত হত না। আসল কথা, পো-বধের সময়ে খুড়ো কর্তা হিসেবেই সাধারণতঃ মায়ের আসক্তির টানটাকে আমল দেওয়া হ’য়ে থাকে। নৈলে মায়ের অস্তর আদেশ পালনের অনর্থ বহন করবার মতন বীরত্ব যদি সত্যিই আমাদের ঘরে ঘরে থাকত তা হ’লে মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেশেরও শ্রী অচিরেই কিরে যেত।

সাধারণিত আসক্তিই দেশের পৌরুষকে গ্রাস করেছে কিবা উজ্জ্বাহত পৌরুষই গিরে মায়ের আঁচলে আত্ম নিয়োছে সে-সময়েও বখেট সম্বন্ধের অবকাশ রয়েছে। আর, যে-পৌরুষ মায়ের আঁচলের কোণে বাঁধা পড়ে-রকেছে তার বহরও যে খুব বেশী বিপুল নয় একথা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এ হতভাগ্য দেশে এই অতিশয় যুগেও যে হু-একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে বাঁধের কর্ণের কুশলতা এবং চিত্তার উদারতা জগতের বিস্ময় এবং অর্থ; আহরণে সমর্থ হয়েছে তাঁদের মায়ের মনের অপত্যস্নেহকে বিদ্রোহণ করলেও তাতে ত্যাগ এবং

আসক্তির সামান্যিক অনুপাত খুব সম্ভব, এদেশের জলহাওয়ার বেবনটি হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক ভেদনটিই দেখতে পাওয়া বাবে।

এদেশের পৌরুষ মায়ের আসক্তিপরাণতার শৃঙ্খলিত হয়নি। মায়ের টানের চাইতে এদের ঘরের টান চের বেশী; আর ঘরের টানের চাইতে-প্রাণের টান এদের আরো বেশী।—আত্মানং সন্ততঃ রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি—এই হচ্ছে এ দেশের হিতোপদেশের অবল্য নির্দেশ। মায়ের ত্যাগের আলোতে যদি অন্ধের দৃষ্টিশক্তি কিরে পাঁচার সম্ভাবনা থাকত তাহ’লে একই সময়ে একই দেশে সতী-দাহ আর বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার কথা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করতে পারত না। ছেলেরা অমানুষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের মনও ছোট হতে শুরু করেছে। কুস্তী বধন জন্ত ব্রাহ্মণ পরিবারকে অস্তর দিয়ে বালক ভীমকে পাঠিয়েছিলেন হুর্দাত বক রাক্ষসকে সমুচিত শিকার দেবার জন্তে তখন তাঁর মনের কোণে সম্ভবতঃ ত্যাগ বা আসক্তির কথা মোটেই ওঠেনি। ভূতারভের কোনো রাক্ষসই তাঁর ভীমকে এঁটে উঠতে পারবে না এই বিশ্বাসই তাঁর পক্ষে বখেট ছিল। আর এখনকার মায়েরা যে ছেলে চোখের; আড়ালে গেলেই অন্ধকার দেখেন তারও কারণ তাঁদের অস্তরের ত্যাগের অভাব বা আসক্তির টান নয়। সন্তানের সামর্থ্যে বিশ্বাস এবং নির্ভরের একান্ত অভাবই তাঁদের এ দুর্বলতার মূল কারণ। বিজ্ঞানগণের অসাধ শাস্ত্র-জ্ঞান, অক্রান্ত কর্ণশক্তি আর পরের হুঃখে অকুরন্ত সহানুভূতিই তাঁর মায়ের মনের ভারে নুতন হুঃখ জনিত করে’ তুলেছিল। নিষ্ঠাবর্তী হিন্দু-রমণী তাই বাল-বিধবাদের হুঃখমোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্তে ছেলেকে অকুরোধ করে-ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতন ছেলে না পেলে এমন দেশাচার-বহির্ভূত কথা হয়ত তাঁর মনেও উঠত না, মুখেও ফুটত না। সব মায়ের ভাগ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মতন ছেলে না জুটলেও, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে—দেশের কর্ণের শক্তি এবং চিত্তার ধারা আবার বধন পারি-বারিক পতী ছাড়িয়ে সর্বভোমুখীন হবে তখন দেশের মায়ের মনও গিছিরে পড়ে’ থাকবে না।

যে-দিন থেকে ছেলেরা বৃহৎ জনং থেকে বিমুখ হ’য়ে সামাজিকতা আর পারিবারিকতার হুর্নের প্রাচীর পঠন আর পরিধা খননেই আত্ম-বিনিয়োগ করেছে সেই দিন থেকেই হরত মায়ের মনের উৎসও জমাট বীধতে শুরু করেছে। বৃত্ত-বৎসা জননীরা তত্ত আপনা-হতেই শুকিয়ে আসে।—প্রকৃতির রাজ্যে বাড়ে ধরত হবার উপায় নেই। রাজপুত-জীবনে বধন মুচু-বিগ্রহ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, শোনা যায় তখন রাজপুত মহিলারা নাকি মাথার চুলে স্বামী-পুত্রের ধনুকের ছিল। তৈরী করে’ দিভেন মরুকার হ’লে। আর এখন রাজপুত তার মুচুর নেশা প্রায়শঃ আকিং-দিয়েই বেটার, কানেই রাজপুত মহিলাদের চুল বধাছানেই থাকে, আর বহরের পর বছর আকিং-এর কবে তাদের হঃতের ভেলো ক্রমশঃ পরিপক হয়। সে-কালে যে-সমরটা ধনুকবাণ, বর্ষ-চর্কের তথা-বধানে কাটত এখন তার চেয়ে চের বেশী সময় আকিং-এর ক্ষেতে অতি-বাহিত হয়। কিছু দিন আগেও হিন্দু-পরিবারে ছেলোপিলেরা তোরে শব্যাত্যাগের পূর্বে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শিবভোজ, গন্ধাভোজ আরো কত-কি মুখে মুখে শিখত আনুভূতি করত। আর এখন মায়ের ক্রোড়-রাজত্বেরও বিভাগে স্বাধ হাপিত হ’য়ে গিয়েছে। যে-সমরটা

“পুণ্যলোকো নলরাজা ; পুণ্যলোকো সুধিতিরো” করবে, সে-সময়টা বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে “সোনার
 খেলো নিরে হু-পাতা বা হু-পাতা” কী কী কৈতাবে মূর্খ কল্পিত হওয়ার কথা মনে পড়বে। এই পদে “সোনার
 আখেরের কাণ্ড হবে। এ-বিষয়ে ছেলে এক ছেলের বাগের জিহ্বের আশাও থাকবে না তখন মায়ের শুধু “বেঁচ থাকো” বলেই কুই
 কিছুমাত্র মত-বৈধ নেই। থাকতে হবে। মায়ের মনের এই যে ক্রমবর্ধমান কৃপণতা এর ক্ষেত্রে

এ যে ছেলের আখের—ও বিষয়ে চিরদিনই ছেলের বা ছেলের
 বাগের মুখেই বাণ খেয়ে আসছেন। কলে এ-দেখের ছেলেদের কর্ণ-

বরদাচরণ গুপ্ত

কার্ল স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্ প্রতিভা •

রম্যা রমা

[মনসী রম্যা রমা-কর্তৃক হুইট-ভারগ্যাণ্ডের জার্মানভাষী অশীতিপর
 বৃদ্ধ কবি কার্ল স্পিটলারকে প্রথম সর্ধনার ইহা অনুবাদ।
 মহাকা কাৰ্ল স্পিটলার সম্প্রতি গত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ রম্যা
 রমার পত্নীর গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। কবিত্বের অস্তিত্ব-নির্দেশী-
 ধারার যে সম্বন্ধ ইহার মধ্যে আমরা পাইতেছি উক্ত আমরা রমা
 মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। এই কবিত্ব-নির্দেশীধারা বিশ্বমানবের
 নিত্য-মুচন আশা আকাঙ্ক্ষাকে চিরন্তন রূপ দান করিতেছে।

আমাদের চিত্ত যেন কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সর্ধীর্ণ
 সীমার মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যাকাশের নব নব ভাষার
 জ্যোতির্মগুনীকে নতুনভাবে অর্ধ, নিবেদন করিতে পারে টহাই আমাদের
 কামনা বসিয়া বিদেশের এই মহামনীষার প্রতি অনাতর বিদেশী
 মনসীর অর্ধদান আমরা আমাদের দেশীয় লোকদিগের নিকট নিবেদন
 করিতেছি—অনুবাদক]

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর অমানুষিক ব্যব-
 হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নোবেল-প্রাইজ্ লাভের ফলে
 কার্ল স্পিটলার সাধারণের নিকট যশস্বী হইয়াছেন।
 অনেকের ধারণা যে মিত্র-পক্ষের অস্ত্রকূলে তাঁহার এই উক্তি
 তাঁহার নোবেল প্রাইজ্ পাইবার কতকটা কারণ, কিন্তু
 এই ধারণা সত্য না হইতেও পারে। ১৯১৫ সালে টুর্ভুরিকে
 (Zurich) সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক এই বৃদ্ধ-কবি প্রকাশ্যে জার্মানীর
 রাষ্ট্রনীতি ও বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের নিষ্কপ্তায়
 হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে তাঁহার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ
 করেন। ইহা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক, কারণ তখন
 ইউরোপে একমাত্র জার্মানীতেই তাঁহার গ্রন্থগুলি পঠিত
 ও প্রসংসিত হইত এবং জার্মান-স্ট্রিটেরা তাহা-
 মের চূর্নিত প্রতিবেশীর (জার্মানী) সহিত অত্যন্ত
 সাবধানভাবে ব্যবহার করিত। কিন্তু কার্ল স্পিটলারের

* মূল করাসী হইতে।

প্রতিভা যেমন স্বতঃউৎসারিত হইত, তাঁহার সাহসও
 তেমন স্বাভাবিক ছিল। তিনি ক্রম ও সত্যের খাতারে
 ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোনো বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না এবং
 একবার যাহা বলিতেন তাহা লইয়া কখনও মাথা
 ঘামাইতেন না।

কিন্তু অল্পে তাঁহার সম্বন্ধে বেশ মাথা ঘামাইত।
 চারিদিক হইতে মিত্র-পক্ষীয়েরা লুজার্নে (Luzern)
 তাঁহার ব-সভূমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিত।
 তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ, সর্ধনা-লিপি, প্রশংসাপত্র বৃহৎ বৃদ্ধি
 বর্ধিত হইত ও তাঁহাকে লইয়া বহু উৎসবাদিও হইত,
 এমন-কি জেনেভা-সর্ধনার “ফ্রেঙ্ক একাডেমী” কয়েকজন
 সদস্যকে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। তৎকালে
 প্রাইজ্ দেখা দাঁড়িত যে, তাঁহাকে পুষ্পপেলব বচন অর্ঘ্য
 দিবার উক্ত এমন সব লোকে দল বাঁধিয়া ছড়াছড়ি
 করিতেছে, যাহারা জীবনে তাঁহার একটি লাইনও পাঠ
 করে নাই। সেইসকল কৌতুক-অভিনয়ে আম উৎসাহিত
 থাকিতাম ও রাজকীয় মহারথিগণের মুগ্ধতার পরিমাণ
 লক্ষ্য করিতাম। ফ্রান্সের এইরূপ একজন পদস্থ কর্মচারীর
 কথা মনে আছে, ইনি এইরূপ একটি সভায় কি বাত্বেন
 খুঁজিয়া না পাইয়া কার্ল স্পিটলারের বোনো গ্রন্থ-
 পাঠরূপ বার্ষ পরিপ্রম না করিয়া একটি জার্মান
 অভিধান সুলিচা স্পিট্জ (Spitz) শব্দের অর্ধ ‘শীর্ষ’
 বা ‘শিখর’ দোষিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বয়েবটি চমৎকার
 ‘দ্বিপদী’ (Couplet) রচনা করিয়া ফোকাইছিলেন!

স্পিটলারের নিম্নলিখিত ল্যাটিন-স্ট্রুস্ জাতিও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সম্পর্ক অক্ষত ছিল। সেনেতা-ভোক্তে স্পিটলার যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, আমি তখন একটি কথোপকথনের নিম্নলিখিত অংশটুকু স্মরণ করিলাম—

“কিহে, ওর কোনো বই কি তুমি পড়েছ?”

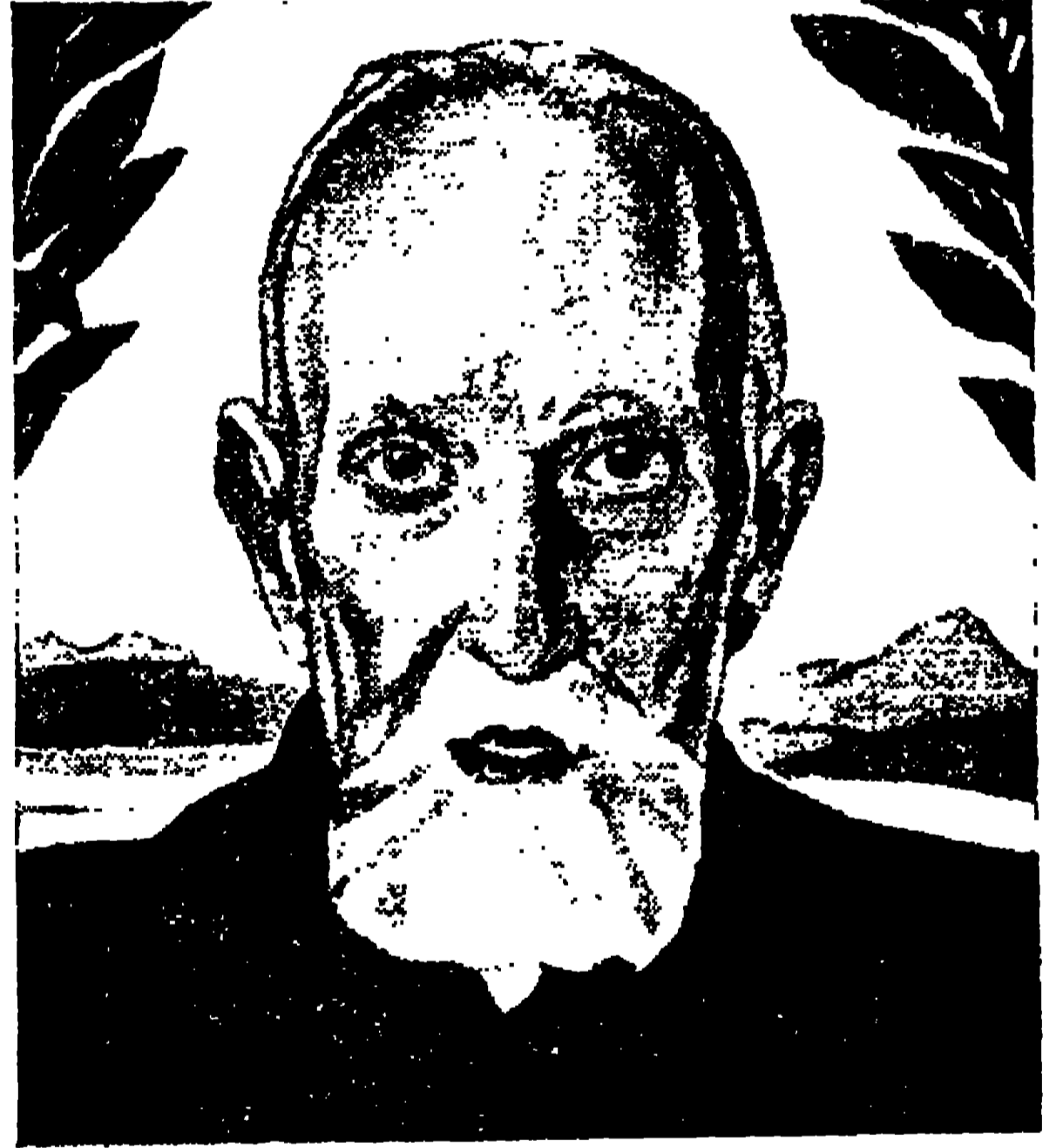
“না, তুমি পড়েছ নাকি?”

‘আরে না (ব্যঙ্গ-সহকারে)। প্রথমতঃ কবিতা জিনিষটা আমার পক্ষে অতি উচ্চারণের ব্যাপার—তা’ছাড়া আমি জর্জ নই জানি না। (বলিতে বলিতে থামিয়া— বক্তৃতার উদ্দেশ্যে) সমস্কার, বাৎসব।’

স্পিটলার উদ্যতে মোটেই অশর্বা হইতেন না ও ইঙ্গা লইয়া যথেষ্ট কোতূহল করিতেন। আর কখনও কোনো-কিছু উদ্যতে আশর্বা করিতেও পাবিত না। সত্যই ত তিনি হঠাৎ তাগদ্বিগ্নে চমকাইয়া দিগাছেন। সদাবিপ্যাত লোককে লইয়া হৈ হৈ করার ত চিহ্নিত প্রথাই আছে!

সেই ঘটনার পর দশ বৎসর অধিক হইয়াছে অথচ কার্ল স্পিটলার সেদিন অপেক্ষা তির্যাক্ত অধিক পরিচিত হন নাই; ফ্রান্সে তাঁহার সম্বন্ধে লোকে কিই বা জানে? প্রচোজন হইলে যে ভাববাজোর কাঁচ বাস্তবতার ক্ষেত্রেও শক্তিশীলনের পরিচয় দিতে পাবেন তাহা দেখাইবার জন্য লিপিত ‘লেফ্টেনান্ট কনরাড’ (Conrad the lieutenant) প্রভৃতি দুটি কবিতা মাত্র গ্রন্থের সহিত সেগানকার লোকে পরিচিত। ফ্রয়ড (Freud) সম্প্রতি ফ্রান্সের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ দুই একজন উদ্যব ‘ইমাগো’ (Imago) পুস্তকখানিও পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যাহাদের বর্তমান কালের মহাকাব্যের শিরোমণি বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না সেই ‘অলিম্পিয়ার বসন্ত’ (Olympian Spring) ও ‘প্রমিথিয়ুস’ (Prometheus) — অল্‌প্‌স (Alps) গগনচুম্বী শিখরের মত যাহারা দীপ্যমান;—ফ্রান্সের কয়জন লোক স্মিটলারল্যাগেবই বা কয়জন তাহা পড়িয়াছে? কখনও কি কাহারও মনে জাগিয়াছে যে স্পিটলার নামক যে লোকটি সেদিন পরলোক গমন করিলেন, তিনি পায়টে ও মিল্টনের সহিত একাগন পাইবার অধিকারী।

তাঁহার তিনটি মহাকাব্যের মধ্যে প্রমিথিয়ুস ও এপি-থিয়ুস, অলিম্পিয়ার বসন্ত ও সয়েব অবতার প্রমিথিয়ুস (Prometheus der Dulder) প্রথমটি তৃতীয়টি একই কাল-শিল্পের দুই বিভিন্ন দিক, (সুতরাং দুইটি মিলিয়া সাধারণতঃ প্রমিথিয়ুস নামে কথিত হয়) একই স্বর যেন বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন তানলয়ে গীত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক স্পিটলার ‘কবির লড়াই-’ ক্ষেত্রে কৌশলী যোদ্ধার মত যথেষ্ট চন্দ-কাটাকাটির খেলা দেখাইয়াছেন; প্রাচীন কবি-যোদ্ধারা তাঁহার জয়ের উপকরণ ছোগাইয়াছেন মাত্র কিন্তু তিনি সেই জয়ের নিষ্ফল গর্বে আত্ম-প্রত্যাহিত হন নাই।



কার্ল স্পিটলার

এই মহাকাব্যগুলির মূল বিষয়, মানুষের চিরন্তন বিজ্রোহ। তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকী দূরে রাখা হইয়াছে তবু সে বিধিবদ্ধ বিবেক ও আড়ষ্ট নীতির শাসন মানিয়া তাহার স্বাধীন আত্মাকে বাঁচ দিবে না। এই নীতি ও বিবেক প্রভুর মত নিরস্তর তাহাকে হুকুম করিতেছে; রাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা ঈশ্বরবাদরূপ কোনো পৌত্তলিকতাই সে মানিবে না। যাহারা তাহাকে নিখ্যাতিত করিতেছে, তাহাদেরই মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য নিদারুণ যত্ন



কাল্প স্পিটলার

চিত্রকর হোড্‌লার

সহিষ্ণা সে পরিশেষে বিজয়ী হইয়াছে,—সেই রাষ্ট্রপ্রভু, পরমেশ্বরপ্রভু এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ—যাহাদের ধর্মের অঙ্ক শূন্য ও যাহাদের একমাত্র কৃতিত্ব বলিহিসাবে এই বীরের রক্তপান বরণ—এইগুলিই হইতেছে এই একক নগ্ন আত্মার (solitary nude soul) বিপুল বিজয় সঙ্গীতের বিষয়—এই আত্মাকে মানুষ নিরন্তর ক্রোশ-বিদ্ধ করা সত্ত্বেও সে তাহার আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

অলিম্পিয়ার বসন্ত (Olympischer Frühling) হিন্দু মহাকাব্যের মত যেন বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বিপুল প্রকৃতির ক্রমিক পটোন্মোচন। নবতম দেবতা সমাজ—বর্তমান যুগে যাহারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—নিশীথিনীর গভীর তমিস্রা হইতে উদ্ভূত হইয়া যাহারা এখন মধ্যরুশ্বের মত লিপ্যমান—রাজদণ্ড লোভে তাহাদের দৃষ্টি—নতন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা—অলিম্পিয়ান স্বর্গের যৌবন—পরিপূর্ণতার

আনন্দ—এইসব লইয়াই এই কাব্যটি রচিত। কিন্তু ধীরে-ধীরে সৃষ্টির দিনের অবসান হইতেছে—কবি তাই শেষ পর্য্যন্ত না দেখাইয়া ঐক্যজালিক প্রাসাদে প্রথম ফাটল দেখা দিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন; তিনি তামসঘন ভবিষ্যৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। যে শিখরে তাঁহার অধিষ্ঠান দেখান হইতে নিম্নের অতলস্পর্শ গহ্বরগুলি—যেখানে অচিরে জীবনের সকল আনন্দ নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়িবে—তাহা দেখিয়াই কান্দ হইয়াছেন। বিশ্বমানবের জন্ম আপনাকে বলি দিতে ভগবানের পুত্র 'হেরাক্লেসের' (Herakles) অবতরণ পর্য্যন্ত দেখাইয়া তিনি তাঁহার কাব্যের যবনিকা ফেলিয়াছেন।

গ্রীক নামগুলি দেখিচা যেন আমরা প্রতারিত না হই। আমরা এতকাল পৌরাণিক গ্রীক নামগুলি দ্বারা যাহা বা যাহাকে বুঝিতাম এই নামগুলির সঠিক তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। পুরাণ-কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে। ভাব ও রূপে সহস্রই নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

আল্ফ্রেড এই দেবতামণ্ডলীকে যে-সব নূতন দৃষ্টে অবতারণা করিয়া স্পিটলার নব-নব রূপ দিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই নবজন্ম দেওয়ার ধারা যখন একবার প্রবর্তিত করিয়াছেন তখন একগুলিকে তাহার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ছাড়া অল্প-কিছু বলিয়া মনে হয় না। পুরাতনকে এই নূতন রূপ দেওয়াতেই প্রতিভা ও সৌন্দর্যের যথার্থ মাপকাঠি।

আমাদের বিশ্বাস আছে যে ফ্রান্স একদিন এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবে। আমার আরো বিশ্বাস এই যে ল্যাটিন-জাতিসমূহ জাশ্মান-জাতি অপেক্ষা সহজেই এই কাব্যরসগ্রহণে সমর্থ হইবে। এই কাব্যের রূপোন্মেষণী (plastic) শক্তি অপূর্ণ। এরজন্য যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টির ভিতর দিয়া ভাব সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা পর্যন্ত সব কিছু আমরা উদ্ভাসে দেখিতে পাই। অশরীরী আত্মার চরম শূন্যতা পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টি একটি শরীরে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফাউস্টের (Faust) পর জাশ্মান প্রতিভা আমাদের কাছে এমন প্রাচুর্য ও গুণসম্পন্ন কিছুই দিতে পারে নাই। আমার বয়স যদি আরো ত্রিশ বৎসর কম হইত আমার জীবনের কয়েক বৎসর আমি স্পিটলারের কয়েকটি গ্রন্থের অল্পমানে আতিবাহিত করিতাম। বর্তমানে যাহাকে ইউরোপের কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি সম্মান করি তাহার উদ্দেশে শুধু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে স্পিটলারের সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। তখন মহাযুদ্ধের আটমাস কাল গত হইয়াছে। এই আটমাস কাল আমি একাকা এই দারুণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আমার এই যুদ্ধকে আমি বেদনামিশ্রিত পরিহাসের সহিত "সমরান্ধনের উর্দ্ধে" (Above the battlefield) নাম দিয়াছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টা জায় কি অজায় তাহার বিচার আমি করিব না কিন্তু এই যুদ্ধে আমার সমস্ত জায় বিশ্বাস, সমস্ত অন্তরাঙ্গা আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ আমি "প্রিমিথিউস"র সন্ধান পাইলাম, এই বীরনায়ক

জায়ের জন্ম আপনার জীবন ও আত্মাকে বিসর্জন দিয়াছে। এই আকস্মিক পরিচয়ে আমার ধমনীতে ধমনীতে আনন্দ ও ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল, আমি অমৃতব করিলাম যে আমি আর একক নহি; আমার গুরু ও সাথী সৃষ্টি আছে।

স্পিটলারের সপ্ততম জন্মদিনের কিছুদিন পূর্বে তাহার বিচিত্র গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুক্তি ও সৌন্দর্যের যে দুই আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে তজ্জন্ম তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি পত্র লিখিলাম।

১৯১৫ সালের ২১শে এপ্রিল আমি লিখিয়াছিলাম—

"আমার মনে হয় এই দুইদিনে 'প্রিমিথিউস' কাব্যখানি পাঠ করিলে, যে দারুণ রক্ষণে ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, মাথার উপর হইতে ধীরে ধীরে তাহা অপসারিত হইয়া শান্তিপূর্ণ শান্ত অনন্ত নীলাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে ত্রিশ বৎসর-দানব আমাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে তাহার এই উৎপীড়নের মধ্যেই আপনাকে মহাশিল্পীর নিভীক প্রশান্তি দেখিয়াছি এবং তাহারই উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।"

তৎপরদিনই স্পিটলারের উত্তর পাইলাম—

"অশরীরী আত্মার বিচিত্র যোগসূত্রের দ্বারা আমাদের পরস্পর বন্ধন ঘটিয়াছে, বিভিন্ন জাতির প্রতি জায়-সাপনের জগৎ আমরা চেষ্টা করিতেছি এবং উভয়েই ইউরোপের লোক বলিয়াই আমাদের চিন্তার ধারা একই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদের কাব্যে ও জীবনে আরো কত হিসেবে যে একতা রহিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমার স্ত্রী তোমার 'জন ক্রিস্টোফার' (John Christopher) পড়িলে পড়িতে বিস্মিত হইয়া আমাকে বলিল—'আশ্চর্য, ঠিক মনে হইতেছে যেন তুমিই এই বইখানি লিখিয়াছ'! ধর্ম-সম্বন্ধেও তোমার মহতী মূর্তির অন্তর্ভুক্তি ঠিক আমাবই অমুরূপ এবং 'বেটোফেন' (Beethoven) এর প্রতি আমরা উভয়েই সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন।"

যখন এই পত্র পাই তখন আমি স্নেহভাবে 'যুদ্ধ বন্দীদের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সম্মেলনে' (International Agency for the War-prisoners) কাজ

করিতেছিলাম। ইয়োরোপ তখন যুদ্ধ-অগ্নির ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে, সকলদেশে গুপ্তবার্তাবাহী বিভাগ (Intelligence Department) হিংসা ও উন্নততায় পবনস্রোতের সহিত পাল্লা দিতে ব্যস্ত। ফ্রান্সে তখন লোকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কান্ট (Kant) গায়টে (Goethe) ও হাইনে (Heine)কে অতি নিরন্তরের লেখক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। বেলজিয়ামের নিলিপ্ততায় হস্তক্ষেপ করাকে নিন্দা করিয়া জাৰ্মানীতে স্পিটলাব একঘবে হইয়াছেন। প্রতিদিন তাঁহার নিকট কদর্য অপমানকর বহু পত্র আসিত, তিনি সেগুলিকে একটি বৃহৎ কাঁচের পাত্রে রাখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতেন, 'এটি আমার যাদু ঘর'। তিনি আমোদের জন্ত মাঝে-মাঝে সেগুলি পাঠ করিতেন। আমিও ঐসময়ে নিকৃতি পাই নাই। আমাকে তখন দুইদিক হইতে দুই মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ফ্রান্সের সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে আমি বিশ্ব-মানবকে ভালবাসিতে গিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি।* জাৰ্মান পত্রিকাগুলির অভিযোগ ছিল এই যে, আমি আমার লেখা দ্বারা যুদ্ধাবসানে বিলম্ব ঘটাইতেছি। আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগেব কোনই ফল হইল না। যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তাহা বলিতে দ্বিধা করি নাই। বহুকষ্টে জার্নেস (Jaurès) সহজে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি পবন 'জাৰ্মান অফ জেনেভা'তে প্রকাশ করিলেন এবং পুনর্বার 'অনন্ড ডাবরাজ্যে বিচরণ করিবার স্ত্রয়োগ পাইলাম।

আমি স্পিটলাবের একখণ্ড 'প্রমিথিয়ুস ও এপিটিমিয়ুস সঙ্কে লইয়া থন (Thun) এ বিখ্যাত কবিতা লেখা গেল। এই কাব্যরসে নিমগ্ন হইয়া আমি একমাসকাল খেন এবং দুর্ভেদ্য ভূর্গের মধ্যে বাস করিলাম। আমার সঙ্গুগ স্ত্রীও অন্ত সব কিছু অশুভ হইল। যুদ্ধ-কোলাহল, তউনোপের উন্নত প্রলাপ সব বোধায় মিলাইয়া গেল। আমি অন্তঃ

* ১৯০৫ সালের ২০, ১, ১৮০৫ ইংল্যান্ডে এ হেনরী মাসিস লিখিল "এই হস্তাঙ্গা বর্নিতা গিয়া এখনও বিশ্ব-মানবকে প্রভাষিত করিয়া আসিলে তাহাও স্বদেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে করিতেছে"। হেনরী মাসিসের লেখার বিরুদ্ধে বর্নিতা ব্যায়া নামক পুস্তিকাও লেখা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বিশ্বমানবকে সে স্টুটগার্টে পেম বিত্তের দ্বারা তাহার স্বদেশে সে হস্তবু বর্নিতা করে

প্রান্তরের নীববতা—কাদা-খোঁচার (swallow) স্বমধু স্ববলহরী—আর (Aai) নদী ও তাহার শৈবালদাম, সবুজ জলধাণা এবং রক্ততুল্য বৃক্ষেব মৌল্যঘোর মধ্যে একেলা কোথায় ডুবিয়া গেলাম। নিকরিরী-ধাবাব জালে-জালে হস্ত মুখবা প্যাণ্ডোরার (Pandora) আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপ স্তনিতাম—যখন পড়িতাম—

'নিশাধিনী শান্তি তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে— উদ্ধাধানে নীলাভ নক্ষত্রবাহী ঝিকিমিকি করিতেছে এবং সেই নিঃসায় শূন্য তাহার নিজেব যুদ্ধবর্ণপাতেব শব্দ ব্যতীত কোনো শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিতেছে না'—

তখন আমি কালের সীমা অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন অজানালোকে চলিয়া যাইতাম।

আমার মনে হয়, আমার জন্মের পব তউনোপে লিখিত এইটাই প্রথম কাব্যগ্রন্থ যাহা অনন্তকাল আপনার গৌবব অক্ষয় রাখিবে। অবশ্য ষ্টলটমের 'সমর ও শান্তি' War and Peace ও এই চিবস্তনী সান্তিত্যের একটি, কিন্তু 'সমর ও শান্তি'র যেন কালের মুগোস প'বয়া আছে, যাহাষেব প্রাত্যাঠিক জীবনধাণা চিবস্তন যাহাষেব চাৰ্বিদেবে যে অক্ষয়াল রচনা করে 'সমর ও শান্তি'তে সেই আবরণটি লক্ষিত হয়। স্পিটলাব কালের পিঞ্জরদ্বার চর্চ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহাশিল্পী চবিত্র সৃষ্টিব মত সময়ব ও সৃষ্টি ববিয়া লন। তিনি কালের প্রভাব স্বীকার করেন না, আত্মাব বিষে তিনি সত্রাট। এই বিবটি মহাকাব্যগুলি বৈদিক সান্তিত্য ও হোমবর্ক গ্রীসেব মহাকাব্যগুলিব সান্তিত্য একশ্রেণীতে স্থান পাইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম মহাকাব্য রচনা কাববার মত মহাপ্রাণ একালে আর সম্ভব নহে। কিন্তু আজিও সে সৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান। স্পিটলাব প্রতীচ্য দেশে সেই মহাপ্রাণ মহাশিল্পীগণের শেষ প্রতিনিধি—বর্তমান যুগে তিনি কেবল, তিনি আমাকে যে বর্নিতা গিয়াছে দোষযাছেন তাহা কিছু এক শব্দ বাবণাব উপর প্রতিষ্ঠিত।—এই মহাবর্নিতা নাকি গাষ্টীয় প্রসঙ্গে যল্লেখী হইয়াছেন।

স্পিটলাব যুদ্ধ হস্যন সান্তিত্য আমাকে এববার বলিয়াছিলেন—'আমার জীবন নাট্যে অর্ধ ঘটামাত্র

পলিটিক্যাল অভিনয় করিয়াছি ; একটি বিন্দু যতটুকু স্থান অধিকার করে আমার জীবনে পলিটিক্সের স্থান ততটুকুও নহে ।”

১৯১৫ সালের আগস্টের শেষাংশে লুজার্ণে তাহার সঞ্চিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অতীব সমাদরের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বিপুল-কায় ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। রূপাট-পৃষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ লোহিতচর্ম, খেতখশ্র স্পিটলারের গৌফের স্বর্ণাভা এখনও নষ্ট হয় নাই ; চুল পশ্চাদ্ধিকে ফিরান ছিল ; দেখিলেই সহাস্তগর্ভিত সরল আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হইত। ১৯১৫ সালে হোডলার (Hodler) তাঁহার যে ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিখুঁত প্রতিকৃতি।

মিষ্ট ও গম্ভীরভাষী স্পিটলার যেন মৌঃস্র ও দয়ার অবতার ছিলেন। অথচ সে দয়া সঃস্রহ বাঙ্-পরিহাসেব লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। জ্ঞাতিকৈ তিনি অসাধারণ সম্মান করিতেন। তিনি চমৎকার ফরাসী বলিতে পারিতেন।

ছুই কল্পা ও জ্ঞাকে লইয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্জনবাস করিতেন। সাহিত্যিকদের সহবাস বর্জন করিয়া চলিতেন এবং তাহার প্রয়োজনও অনুভব করিতেন না। লুজার্ণে মস্তিষ্কবান লোকদের সহিত আলাপের সুযোগ আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—‘না, ভগবানকে ধন্যবাদ।’

লুজার্ণেও তাঁহার বাড়ীখানি তিনি লতাপাতা ও গাছপালা দিয়া এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মনে হইত বাড়ীটি সহরের বাহিরে অবস্থিত। স্পিটলারে নির্জনতাপ্রিয় হইলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন, প্রতিদিন প্রাতে ৭টার সময় তিনি বাজারে গিয়া ফলমুলাদি ক্রয় করিতেন ও সে সময় নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ পাইতেন।

তিনি অত্যন্ত গৃহপ্রিয় (ঘরমুখো,) ছিলেন। তাঁহার ঘোবনে মাত্র এক বৎসর জার্মানীতে, ছুই কি তিন বৎসর ক্র্যিয়ায়, আর্টান প্যারিসে, ইটালীর পাম্পিয়াই

পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে আটদিন—ইহাই তাঁহার জীবনের বিদেশ ভ্রমণের তালিকা। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে তিনি ইটিয়া প্রচুর ভ্রমণ করিতেন এবং একই পথে বার বার গিয়াও বিরক্ত হইতেন না—তিনি তাঁহার পরিচিত পর্বত, তাঁহার নিজস্ব ক্ষুদ্র ডিটসেনব্যাৰ্গ (Dietchenberg) হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় শোভা ও সৌন্দর্য, সকল প্রকারের দৃশ্য আহরণ করিয়া লইতেন।

সুইটজারল্যাণ্ডেই তাঁহার আত্মীয় সংখ্যা অতি অল্প ছিল ; সুইটজারল্যাণ্ডের বাহিরে একেবারেই ছিল না বলা চলে। জার্মানীতে হ্লাইনগার্টনার (Weingartner) স্পিটলারকে পরিচিত করিয়া দেন ; ইহার প্রতি স্পিটলার সর্বদা হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেন যদিও টুঃস্রিকৈ তাঁহার রাষ্ট্রীয় উক্তি (জার্মানীর বিরুদ্ধে) প্রকাশিত হইবার পর হ্লাইনগার্টনার একটা উগ্র প্রকাশ্য পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের শেষ করিয়া দেন। স্পিটলারের কাব্যগুলির প্রশংসায় তিনি বিরক্ত হন নাই বটে তবে তিনি বলিতেন যে কবি মাহুঘটা সে প্রশংসার যোগ্য নহে। “এই কাব্যগুলি স্পিটলার লেখে নাই—কোনো দেবতা তাহাতে ভর করিয়া এইগুলি লিখাইয়াছেন”—নিশ্চয়ই সে কোনো জার্মান দেবতা! স্পিটলার ঝাঁঝাল ব্যক্তির সহিত উত্তর করেন—“আশ্চর্যের বিষয় এই যে জার্মানদেবতা একজন সুইসের স্কন্ধে ভর করিবার হীনতা স্বীকার করিলেন—যে সুইস আবার ফরাসী, ইংরেজ ও রাশিয়ানদের সহিত পরিচিত ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ; অথচ সেই দেবতা হিগেনবার্গ, ম্যাকেনসেন এণ্ড কোং মহোদয়-গণকে অনুগ্রহ করিলেন না।”

আধুনিক জার্মানীকে তিনি মোটেই ভালবাসিতেন না যদিও এখানেই সর্বপ্রথম তাঁহার প্রতিভা আদৃত হইয়াছিল। সেখানকার সঙ্কীর্ণতা ও ‘পাগিত মুখার্মি’ দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। জার্মানীর কথা হইলেই তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, “এখানে কবির কাব্য না পড়িয়া লোকে তাঁহার সঘন্ধ সমালোচনা সাহিত্য পাঠ করে” (তিনি বহুবার নাকি এই উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ পাইয়াছেন : এমন কি গ্যায়টে এবং তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

ইফিজেনিয়া (Iphigenia) সম্বন্ধেও ওই ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।)

তিনি জার্মানীর জনসাধারণের সহিত ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠজনপদের (elite) তুলনা করিয়া দেখাইতেন যে ফরাসীরা তাহাদের শীর্ষ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে (classics) পূজা করার প্রথা (cult) অব্যাহত রাখিতে এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির স্মৃতি বজায় রাখিতে জানে। স্পিটলার বলিতেন জার্মানেরা বই দেখিয়া তাহার বিচার করে না; তাহারা বই ভাল হইবার যে কতকগুলি বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত (theory) আছে তাহার সহিত মিলাইয়া তবে বিচার করে। তাহারা বলে না—‘এই বইখানি ভাল কিম্বা ভাল নয়’ তাহারা মনে মনে বিচার করে—‘যে যে গুণ থাকিলে একটি বইকে ভাল বলা যায় তাহার প্রত্যেকটি এই-বইয়ে আছে কি না?’ সুতরাং তাঁহার ‘অলিম্পিয়ার বসন্ত’ কাব্যখানিকে না পড়িয়া এই অহুমান (a priori) নিন্দা করা হয় যে (১) বর্তমান যুগে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নহে, (২) স্পিটলার যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন বর্তমান যুগে তাহা বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত ও হাল ফ্যাসনের মত প্রতিভারও যে একটা নিদ্রা দাবী আছে একথা ইহাদের মনেই উদ্ভিত হয় না।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে জার্মানী নিষ্ঠুর ভাবে স্পিটলারকে পরিত্যাগ করে। তিনি ইহাতে বিরক্তি সূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন যে জার্মানেরা দাসজাতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। “স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীন জাতিতে বৃদ্ধিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে,” (সম্ভবতঃ স্পিটলার স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীনজাতীর স্বাধীনতাকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন!) সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সুইসজাতির শ্রেষ্ঠতা ও জার্মানীর জনসাধারণ হইতে সুইসজাতির কয়েকটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশেষ স্মরণ দিয়া বলিয়া বেড়াইতেন। স্পিটলারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে সুইসভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার মুক্তির সবলতা ও আনন্দের অধিকারী; সেখানে কার লোকেরা স্বাধীন; সেখানে কৌলিন্দ্যপর্ষাদ (hierarchy) নাই—বিদ্বজ্জন-সংঘ (Academics) নাই;—অসামরিক, সামরিক, সরকারী বা—সাংসারিক কোনো শ্রেণীবিভাগ

নাই। কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে পূজার বেদীতে এখানে বসান হয় না; তিনি জনসাধারণের সহিত সমানভাবে চলিতে ফিরিতে পারেন। এইভাবে এই মহাশিল্পী, অন্তরে অন্তরে আভিজাত্যগর্ভী এই স্বাধীন আত্মা আপনার স্ব-জাতিতে গণতান্ত্রিক সাম্যতার (democratic equality) প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়াছেন এবং এই সাম্যতার দ্বারা তিনি তাঁহার দেশস্থ জনসাধারণের সহিত প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ; অথচ সেই জনসাধারণ তাঁহার কোনো গ্রন্থই পাঠ করে নাই।

* * *

আমাদের পরিচয়ের প্রারম্ভে বেটোফেন (Beethoven) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি যেন আমাদের উভয়েরই বন্ধু। যৌবনে আমরা উভয়েই ‘দীন যখা রাজেন্দ্র সঙ্গমে’ (duca e maestro) তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতাম। তিনিই আমাদের উদ্বোধক গুরু ছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সে স্পিটলার যখন লেখক হইবার অভিলাষী হন, তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ বেটোফেনের প্রথম রচনার মত সুন্দর কিছু না লিপিতে পারিলে তিনি লেখা ছাপাইবেন নী।

সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনার সময় আবেগে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম;— “কিন্তু আশ্চর্য—আমার মনে হয়, সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্র-কলায় আপনি অধিক উৎসাহী।”

তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস মুখ সমস্তা বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তিনি বলিলেন, “চিত্রবিদ্যা-সম্বন্ধে আমি কথা বলি না—কথা বলিতেও চাহি না—কারণ তাহাতে আমার হৃদয়ের একটি পুরাতন ক্ষতের মুগ সুলিয়া যায়; সম্প্রতি সে ক্ষত আরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্প আঘাতেই তাহা যন্ত্রণায় অধীর করে। সেইজন্য আমি ভরসা করিয়া কোনো ছবি দেখি না। ছবি দেখিলেই আমার চিত্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু সঙ্গীত-সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে ভালবাসি এবং সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হইয়া যাই।”

স্পিটলারের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা চিত্রকরের জীবনানুসরণে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। আমি বলিলাম, আমাকেও ঠিক

ওই বয়সে আমার পিতা সঙ্গীত-কলার অহুশীলনে নিরস্ত করেন। স্পিটলারের মুখ আবার সমবেদনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আমাদের মিলনের যেন আর একটি বন্ধন বাড়িয়া গেল।

চিত্রকলার প্রতি তাঁহার এই অহুরাগ-অহুভূতি তাঁহার কাব্যে স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছু লিখিবার পূর্বে তিনি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক বেটেনা সমস্তই নিখুঁতভাবে কল্পনা করিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন,—“আমি সমস্তটা একসঙ্গে দেখিতে চাই।”

তাঁহার ‘প্যাণ্ডোরা’র অপূর্ণ কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, যে, উহা পাঠে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃতিদেবী যেন নিজহস্তে তাঁহাকে (স্পিটলারকে) চালনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন।

স্পিটলার একটু খেন আহত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কিন্তু উহা আমার অগোচরে ঘটিয়াছে; প্রকৃতি আমার লক্ষ্যের (objective) মধ্যে ছিল না। আমার ব্যগ্র দৃষ্টি ছিল সেই ‘সূর্য বিপুল সূর্যের’ পানে—সেই মেঘস্তর, সেই প্রতীকলহরী (symbols)—সাধারণে যাহাকে অধ্যাত্মবস্তু (metaphysics) বলে, তাহা তন্নয় হইয়া দোঁপিয়াছি; চক্ষুর অগ্রভাগ হইতে মেঘলোক পর্যন্ত বিরাট শূন্যে কত ভাব মক্ষিকাসমূহ উড়িয়া বেড়াইতেছে; আমি তাহাদের অহুগাবন করি; এবং মধ্যমখে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।”

তিনি পুনরায় বলিলেন, “আমি বরাবরই ভাবিতাম ও বিশ্বাস করিতাম যে, বাস্তব-বাদীরা (realists) যে ভাববাদীদের (idealists) অপেক্ষা বাস্তবকে বেশী পরিষ্কার দেখিতে পারি এই ধারণা সত্য নহে। ভাববাদীরাই পরিষ্কার দেখে। এ-সম্বন্ধে এই উপমাটি আমার মনে হয়—একটি সুসজ্জিত গৃহ এবং একটি শূন্য গৃহ; অথচ বাড়ার বাহিরে যাহা-কিছু ঘটে, ছুটি ঘরেরই জানালা হইতে সমান স্পষ্ট দেখা যায়।”

কিন্তু যাহা অস্তরের অস্তরত্বের ব্যাপার—আত্মার অতলস্পর্শ গহ্বরের তলদেশ অবধি তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন, তবু সংজ্ঞা হারান নাই! তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই শুধু লিখিয়াছেন; তাহার কিছু অর্থ

দিবার চেষ্টা করেন নাই। আমি অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার এইরূপ কতকগুলি কল্পনা-অহুভূতির অর্থ জানিতে চাওয়াছিলাম। গায়টের মতন তিনি উত্তর করিলেন—“হায় আমি যদি উহার অর্থ জানিতাম!” * আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। স্পিটলার শব্দ (word) মানে ভাব (thought) মনে করিয়া বলিলেন, “আমার কাছেও বহু জিনিষ অবোধ।”

ফাউস্টে যাহাকে ‘মৃত-শক্তি’ (Earth-spirit) বলিত, সেই শক্তি যখন প্রতিভাবান পুরুষ আত্মসাৎ করে তাঁহার উদ্বোধন-শক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ফাউস্টের মত স্পিটলার তাঁহারই আহুত শক্তির সম্মুখে মুহূমান হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার গৃহ হইতে ষ্টেশন পর্যন্ত তিনি যখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে কষ্ট করিয়া আসিতে নিষেধ করা-সম্বন্ধে তিনি নিরস্ত হইলেন না। বৃহৎ সেতুর উপর উঠিবার মুখে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি রৌদ্রকে ভয় করেন কি না; তিনি বলিয়া উঠিলেন—“আমি কিছুতেই ভীত নহি।”

সত্য-সত্যই এই বীরপ্রসূ সুইজারল্যান্ডের স্বভাব-কবি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না।

তিনি বলিতেন, “জীবনের সকল রোগে একটিমাত্র প্রতিষেধক আমি ব্যবহার করি; সেটি সাহস—কোনো-কিছুতেই বিক্ষিপ্ত না হওয়া।”

তিনি হাস্তমুখেই তাঁহার অদৃষ্টকে উপহাস করিতেন। চরম প্রলয়ের সহিত মুখামুখি হইয়া যখন সকল সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছে (annihilation) তখনও যেন তাঁহার আত্মা তাঁহার নন্দন মালকে একটি পুষ্পিত শাখা রোপন করিয়া ধাইবে এবং সেই জীবনবৃক্ষে অনির্কান হাস্যের একটি অমর পারিজাত বিকশিত হইয়া উঠিবে।

“সেই রক্তরাঙা অক্ষর—তাঁহার আত্মা; ‘হাসি’ আসিয়া কানে কানে তাঁহার অফুরাণ আনন্দ-বারতা কহিয়া

* কবির রবীন্দ্রনাথের—“বা পেরেছি তার অর্থ রয়েছে কিছু কি” মনে পড়িয়া যায়—অনুবাদক।

যাইবে...জীবনের উজ্জলতা মুহূর্তের জন্তও বিনষ্ট হইবে না, ভবিষ্যতে নিয়তি যে দুঃখভার বহন করিয়া আনিবে ; তাহাতেও সে হাসির দীপশিখা নিবিবে না।”

স্পিটলারের সপ্ততিতম জন্ম উপলক্ষ্যে জেনেভাতে যে বিখ্যাত সম্বর্ধনা উৎসব হয়, তাহার কিছুকাল পরে গ্রীষ্মের শেষাংশে তাঁহার সহিত আমার আবার দেখা হয়, এবার তাহাকে শীর্ণ ও ক্লান্ত মনে হইল। সহসা-আবির্ভূত ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথাই বলিলেন। তাহারা নাকি এক মুহূর্ত তাঁহাকে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার অবসর দিতেছে না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার ভক্তদের হাত হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাই। আমি বলিলাম যে আমি কোনো-রকমে জনসাধারণের অগ্রিয় হইয়া একটু সুবিধা করিয়া লইয়াছি। তিনি ইহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন ও আমাকে হিংসা করিতে লাগিলেন। তিনি লামার্তীনের (Lamartine) মত পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন কোনো শিল্পীই যেন এ ভুল না করে। তবে জেনেভা-বাসীর সহানুভূতি তাঁহার কল্যাণই করিয়াছিল, এবং সেই প্রশংসাবাদের স্মৃতি তাঁহার মানসপটে উজ্জল ছিল। তিনি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনকে পূরাপূরি উপভোগ করার বাসনা তাঁহার আছে; তিনি দেখিয়াছেন যে, জীবন তাঁহার কাছে মাধুর্যে কল্যাণে পূর্ণ। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হয় নাই। আমি তাঁহার ‘প্রমিথিয়ুসের’ উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে কবির ব্যক্তিগত এক দারুণ বিয়োগ ব্যথা তাঁহার ওই প্রথম কাব্যে অস্তনিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মধুময় পরিণত বয়সের ফল, ‘অলিম্পিয়ার বসন্তে’ শরতের শস্যসমারোহ দেখিতে পাই—কেবল আলোক...

স্পিটলার ব্যথিত গাঙ্গীর্ষের সহিত উত্তর করিলেন,—
“যৌবন সুখের নহে। লোকে বলে যৌবনকাল আনন্দ-ময়—কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশের এই নৈতিক পক্ষাঘাতের যুগে অন্ততঃ পুরুষের পক্ষে যৌবন

আমরা পরস্পর আমাদের অতীত জীবনের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আশা আকাঙ্ক্ষার অল্পপাতে জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! যেমনি লোকে জীবনকে বুঝিয়া জীবনকে ভালবাসিতে শুরু করে, অমনি তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের নিমন্ত্রণকারী আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পুরাতন রাজকীয় প্রতিনিধি মহামতি মিঃ এইচ রেম্‌সেন্‌ হোয়াইটহাউস্‌ মহোদয় সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত একটি ছোট-খাটো সভায় আমাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন। কিন্তু পলিটিক্সের মত সাহিত্যালোচনায়ও স্পিটলার বিরক্ত হইতেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন ও আমাদের প্রিয়-প্রসন্ন সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে শুনাইবার জন্ত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন ইতালিয়ান ও জার্মান সুর, মন্টেভার্ডির রচনা (Monteverdi) এবং বেটোফেনের রিটার্‌বালেট (Ritterballet) বাজাইলাম। আমরা নিম্নকণ্ঠে গভীর প্রেমের আদান-প্রদান করিলাম এবং বিদায়-কালে আমি তাঁহাকে চুম্বন করিলাম।

আমি ফিরিয়া আসিগাই যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সহসা আজ যাহা বুঝিয়া পাইলাম তাহা এই—

“আমার বৃদ্ধ প্রিয় বন্ধুর কথা ভাবিতেছি, সেই শ্রান্ত মুখখানি—যাহার উপর মৃত্যু তাহার স্বাক্ষর বসাইয়াছে! আমি এত বিলম্বে তাঁহাকে চিনিলাম বলিয়া একসঙ্গে সুখে ও ব্যথায় পূর্ণ হইয়াছি। আমি তাঁহাতেই প্রথম জীবন্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইলাম* কিন্তু পরিচয় এত বিলম্বে ঘটিল কেন? আজ তাঁহার বয়স ৭১ ও আমার বয়স ৫০—একত্রে আর কটা দিনই বা চলবে।

প্রতিভার অলৌকিকত্ব এই যে মৃত্যুতেও প্রতিভাবান পুরুষের জীবনের সমাপ্তি নহে। তাহারা আপনাদের জীবনেই অমরতার অমৃত আহরণ করেন। তাঁহাদের

* ১৯১৫ সালে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আমার

কাব্যকলায় তাঁহার তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের সার সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করেন ;—তাঁহাদের আনন্দ—তাঁহাদের বেদনা, তাঁহাদের বেদনা-মধুর অল্পভূতি, তাঁহাদের পুলক-বেদনা (sophrosuny) সমস্তই পরিশোধিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহার অনন্তকাল জীবিত থাকেন।

স্পিটলারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতে আমি মানস-সৌন্দর্য্য-লোকে তাঁহার সহযাত্রী হইয়া দূরে ও নিকটে পরিভ্রমণ করিয়াছি। তাঁহার নিত্যপ্রবহমান কাব্যধারা হইতে উৎসারিত সঙ্গীতে আমার সমস্ত হৃদয়-উপত্যকা মুগ্ধিত থাকিত। যখনই আমার চিন্তা ও কণ্ঠের ধারা শুক হইয়াছে আমি তাঁহার কলসঙ্গীত শ্রুতিতে পাইয়াছি। বিশেষত পরিচয়ের প্রারম্ভে যখন তাঁহার সকলই আমার নিকট নূতন বলিয়া ঠেকিত, তখন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছি। ১৯১৫ সালে এমন একটি দিনও ছিল না যখন আমি স্পিটলার-গহনে নূতন কিছু সন্ধানের জন্ত অভিযান করি নাই।

প্রথমেই আমি 'প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস' পড়িয়া এই কাব্যের উদার অমার্জিত সৌন্দর্য্য (ruggedness) ও মহান্ বিশৃঙ্খলতা (chaotic aspect) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ওক্ বৃক্ষের মূলদেশ হইতে জীবনী রসধারা যেমন প্রচণ্ড গতিতে ছাড়াইয়া পড়িয়া বৃক্ষকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করে, তেমনি এই কাব্যটি কোথায়ও পুৰাণ কাহিনী অবদান ও রূপকোপাখ্যানে বিকশিত হইয়া সহজ ও পরিচিত সমায়োহ লাভ করিয়াছে—কোথায়ও বা মধ্য-যুগের কোনো পাশ্চাত্য-পঞ্চতন্ত্রের ভীষণ প্রতীকে শোভা পাইতেছে। সেই পরলৌকিক (pastoral) 'প্যাগোরা'র অপূর্ণ স্বরসঙ্গতির (symphony) অতুলনীয় আনন্দে বিভোর হইয়াছি, আর মনে পড়িয়া গিয়াছে যুনক বেটোফেনের কথা। তিনি যেন নিপুণ অশ্বারোহীর অভিজ্ঞতা লইয়া ভীমবলে ভাব ও রূপের নিগড়কণ্ড চূর্ণ করিয়া উদ্যমগতিতে অশ্চালনা করিতেছেন; যেমন তাঁহার সঙ্গশেষ স্বর-সৃষ্টিগুলির (Quartettes) মধ্যে দেখিতে পাই।

এই বিপুল কাব্যনদীর স্রোতে গা ঢালিয়া আরও কিছুদূর

ভাসিয়া চলিলাম—সংসা যেন কোন্ অন্ধকার নদীধাত হইতে বাহির হইয়া 'স্বাশ্বত প্রেমসী' (Eternal Beloved) প্যাগোরা (যাহার সহিত বিরহের কল্পনাও আমার এখন অসহ্য) নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রৌদ্র-ছায়া পরিস্রাত সেই উপত্যকার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া তাহার উচ্ছলিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার সবচেয়ে কক্ষণ ব্যথিত অথচ সবচেয়ে প্রিয় স্বর 'তম-বিষাদের' গান গাহিয়া উঠিল।

বিপুলকায় বৃত্তাকারে সজ্জিত পর্কত শ্রেণীর মহাদৃশ্য, ছইকুল পরিপ্রাভিনী শাস্ত ও বিশাল তটিনী, দেব-নিকেতনে—'অলিম্পিয়ার বসন্ত' ধীরে-ধীরে আমার নয়ন সম্মুখে একখানা চিত্রপটের মত উন্মোচিত হইতে লাগিল। এখন আর ইহা শুধু প্রমিথিয়ুসের হৃদয়বিদারক জীবন কাহিনী নহে, শুধু তাহার আশা ও আশ্বাস, বিজিত বা বর্তমান ব্যথার কথা নহে; যাহা তাঁহার প্রথম জীবনের লেখার বিশেষত্ব শুধু সেই তীব্র ২৩ গন্ধে তাঁহার অল্পময় মৌলিকতায় পূর্ণও নহে। আমাদের সৌভাগ্যগুণে 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' আমরা অদম্য ইচ্ছাশক্তি, ভাবসঙ্গতির অপূর্ণ খেলা—এ্যাপোলো-বীর (Apollo the Hero—অলিম্পিয়ার বসন্তে একটি গানের নাম) প্রভৃতির পরিচয় পাই। স্বপ্ন ও কল্পনার কি বিপুল পুষ্পসম্ভার। মহতীমধুর সৃজনীশক্তির কি লীলা!—সকলই যেন নূতন, সদ্যবিকশিত স্বাস্থ্যবান্ এবং সবল! বসন্ত ধীরে-ধীরে আপনার পটভূমিকা উন্মোচন করিল—পর্কতে পর্কতে পরিপূর্ণ বসন্ত বিকাশ এবং অনন্ত আকাশে নক্ষত্র পুষ্পরাঙ্গি। এ যেন আপনাতে আপনি বিকশিত এক নূতন পৃথিবী—উপকথা আর দেবতার রাজত্ব—এখানে আনিলে উন্মাদনায় বিভোর হইয়া খাইতে হয়।

আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন গটফ্রীড কেলার (Gottfried Keller) যেমন জাতিহিন্দাবে সুইজারল্যান্ডকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন তেমনি কোনো সুইস্ মহাকবি সুইজারল্যান্ডের মৃত্তিকা-সুসমা, তথাকার মেঘমালা, পর্কতশ্রেণী এবং হৃদ ও নদীর বর্ণনা দ্বারা তাঁহার দেশের যথার্থ পরিচয় দিবেন। এই ত

সেই কবি। স্পিটলাবের মত সুইস-প্রতিভা ব্যতীত আর কে এই বিরাট চিত্র আঁকতে পারে—অধোলোক (Hades) হইতে স্বর্গলোকে নূতন দেবতাদের বিপুল অবরোধন, মধ্যপথে বিপদমঙ্গল পরীত-গাত্রে উপর প্রাচীন দেবতাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ—ভূবার-প্রবাহে প্রাচীন দেবতাদের অধোগমন—ক্ষিপ্ত-অশ্বাকৃৎ রাজা ক্রোনসের (Kronos) উপলক্ষণবৎ গহ্বরের তলদেশে পতন! আমি নূতন দেবতাদের অমুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—বহুকষ্টে উপরে উঠিলাম—গোপবাল্য হিবি (Hebe) শুভ-শঙ্খনিবাদ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল, শুনিলাম। সেই শিখরদেশের লঘু সমীরণে স্নাত হইলাম; এখানে সাধু-রাজা উরেনাসের (Uranus) সপ্তবত্তা—সাতটি অপূর্ণ মোহিনী স্তম্ভী যেন সস্থরণ করিয়া ফিরিতেছে। এই মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্রামস্থলী হইতে এক প্রশান্ত আবেগময় আনন্দধারা প্রবহমান—যে আনন্দ রসধারা আমি আর কোনো কাব্য সাহিত্যে আনন্দন করি নাই। ইহার সহিত কিসেব তুলনা করিতে পারি, আরিয়োস্টো (Ariosto) এবং দাশে, মোজার্ট (Mozart) এবং ভেরোনাজেব (Veronese) কথা একই মনে আসে। স্পিটলাবের কলাশিল্পের ইচ্ছাজানে শব্দ যেন স্বর ও রঙে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে সাহিত্যিক উপকরণকে স্পিটলাব 'জড় ও অকৃতজ্ঞ' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার লেপনীর ইচ্ছাজালস্পর্শে চিত্রে ও সুরে মূর্ছিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সে মোহিনী-শক্তি যে সে সপ্তস্তম্ভীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে সাহসনা খুঁজিয়া পায় না। বিচ্ছেদের মধুর বেদনায় সেই 'হারানো প্রেমসী'র পিছনে সে হাতাকার করিয়া ফেরে। কিন্তু একি! নূতন মাধাজাল যে আবার আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল! আত্মার ও ভাবের ভিন্ন রাঢ়ে এ যে বিচরণ করিতেছি;—একই স্থপ্তবিশ্বের একমেরু হইতে অপর মেরুতে চলিয়া আনিয়াছি; সেই রূপসীম অসীম আনন্দ নীহারিকা যাহাকে রূপ দিবার জন্ম চিন্তা করিতে হয় না—বেদনার অতলস্পর্শ গহ্বর—যানাকে (Ananke) বহুক ক্রুণবিদ্ধ জীবনের প্রহেলিকা—এ সমস্তই দেখিতে পাউতেছি। আমার বিশ্বাস, গায়টে এ সমস্ত যন্ত্রণার আভাষ পাউয়া-

ছিলেন, কিন্তু ভয়ে শিহরিয়া সেদিক হইতে পিছু হটিয়াছিলেন কিন্তু নিঃশব্দতর স্পিটলাব ফাউন্টের মত আদ্যাশক্তির (Mothers) নামোন্মেষে শিহরিয়া পিছাইয়া পড়েন নাই। তিনি গহ্বরের অসীম অতল পর্য্যন্ত—চরম শূন্যতার (annihilation) শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছেন, এবং নরক প্রত্যাগত দাশের মুখে বেদনার যে স্তম্ভে বলিবেগা দেখি তাহার একটিও তাঁহার সলাটে দৃষ্ট হয় না। স্পিটলাবের বিরাট হইয়া ফিরিয়াছেন; অকরতম প্রদেশেরও প্রভু হইয়া তাহার চাবি হাতে রাখিয়াছেন এবং তাঁহার উরেনাস যেমন, যে অচরম জীবনী রসধারা শোষণ করিবার জন্ম অদম্য চেষ্টা করিতেছে, সেই মূর্ছিত দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আলোক ও ভৈরব হস্ত বিকীর্ণ করিয়া বিছাদী হইয়াছেন, তেমনি নিরস্তর গোপনে বজ্রনীর অঙ্ককারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। সুরসমষ্টির (Symphony) স্বর-বৈচিত্র্য (Variation) যেমন অপূর্ণ চক্রাকারে (Cycle) ফিরিয়া ফিরিয়া আসে; এই কবিতাটিও তেমনি দীর্ঘ-দীর্ঘে আপনাকে প্রসারিত করে। এই তুলনাটি করিতে গিয়া আমার আবার বৈশিষ্ট্যের অলৌকিক উদ্ভোধিনী প্রতিভার কথা মনে পড়িল—একই সুর ও একই বস্তু হইতে চিত্রার সমস্ত বেগা ও স্তম্ভে রূপ তিনি কেমন কবিয়া টানিয়া বাহির করিতেন, অল্পম সঙ্গীত-ভাঙ্গুরের দ্বারা সকল-প্রকার ভাব—ব্যঞ্জনা করিতেন। আমি মনে করি 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' 'পবিত্র সময়ের' (The Holy Time) বারোটি অপূর্ণ তানবিত্তাসেও স্পিটলাব সেই চরম শক্তির খেলা দেখাইয়াছেন। উঃ যেন দেবতা-যুগের—আনন্দ-পরিপূর্ণতার চরম (apogee)। উঃ উপলক্ষ্য করিয়া স্পিটলাব দ্বাদশটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; প্রত্যেকটি এক-একটি দেবতার মতিমা-সঙ্গীত। তারপর সেই বাপিত বৃচ্ছনা—সেই 'আনাকে'র নিরোধ! (Ananke's Halt) যাহা শিল্প "আনকে"র সঙ্গীতের অকালে কঠরোধ করিয়া ধরে। এই সুর সঙ্গীতের মধ্যে ভয়, মৃত্যু, হেরার (Hera) যন্ত্রণা-মুক্তির সঙ্গীত প্রভৃতি অবতারণা করিয়া কবি প্রকৃত শিল্পকলা-কৌশল দেখাইয়াছেন। ঐ সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া

হেরাক্লেশের স্বর্গ হইতে অবতরণ ও তাহার কঠোর কর্তব্যায়ুখে গর্কিতশিরে অভিধান—সেখানে জুগ যজ্ঞণা তাহাকে পাইতেই হইবে, কিন্তু তবু সে গাভীর্ষ্য ও প্রশান্তির সঙ্গে আত্মাকে বলিদান দিবে—এই সমস্ত মিলিয়া সঙ্গীতের একটি অনন্ত সমুদ্র সৃষ্ট হইয়াছে। —এ সমুদ্রের শেষ দেখা যায় না। আবার কাব্যখানি খুলিয়া পড়িতে বসিলাম; ইহাকে ছাড়িয়া দিবার শক্তি যেন আমার নাই। এই রসসমুদ্রে যেন যুগযুগ নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চাই। তাঁরে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রয়োজন কি? হাসি ও কান্নাময় বিপদসঙ্কল গহন-সমাকীর্ণ অনন্ত-তমিস্রার অঙ্কণার ও তরঙ্গপরিপ্লাবী হান্তোজ্জল রৌদ্র-কিরণলেখা এই ছুই মিলিয়া সম্পূর্ণ জীবনের ধারা ত এখানেই বিদ্যমান!

অলিম্পিয়ার রৌদ্রময়ী সুরসজ্জত অহুধাবনের বহু বৎসর পরে এই সেদিন মাত্র তাঁহার তৃতীয় মহাকাব্য 'প্ৰমিথিয়ুস' (Prometheus der Dulder) খানি পাঠ করিলাম। এই কাব্যখানি ১২২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পিটলারের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই প্রাচীন নাটকেরা যেন অনঙ্কার-বাহুল্য, স্বপ্নাতিশয্য ও যৌবনের অধীর পক্ষ-বিধূনন পরিত্যাগ করিয়া আরও সুস্পষ্ট ও সুসজ্জত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। এই কাব্য অনেক পরিণত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, classic গুণে ইহা পরিপূর্ণ; বাহিরের অযথা বাহুল্য বর্জন করিয়া অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে লইয়া নিবিড় ভাবে জমাট বাধিয়াছে। পরিণত বয়সের ধীর রেখাঙ্কন, মর্হমাময় কারুকার্যে ও জীবনের বেদনাতিক্ত মহান অভিজ্ঞতার গৌরবে ভরপুর! প্রথম জীবনের প্রমিথিয়ুসের সহিত তুলনায় মণীষার কি তীক্ষ্ণতা! কবির কি অপূর্ণ ভাবসন্ন্যাস (detachment)! যজ্ঞণা যেমন অসীম, যজ্ঞণাশেষে শান্তিও তেমনি সীমামুক্ত। ইহার শেষ গান (chant) 'বিজয়ীর' (The Conquerer) মত গভীর ও প্রশান্ত কোনো কিছুই আমি জানি না। এই অংশটুকুই স্পিটলারের লেখনীর চরম দানপত্র। তাঁহার প্রথম—'প্রমিথিয়ুস' লেখার পর বয়স বাড়িয়া

চলিয়াছে এবং 'বিজয়ী' 'যশধূলির' আত্মদ লাভ করিয়াছে। মাহুব এই অবস্থায় উপনীত হইয়া চরম বিজয় ও পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। আছে শুধু নির্ভয়, আশাহীন—স্বাস্থিশীন দীপ্তি।

সেই বিরাট আত্মনাট্যের উদার পরিকল্পনা এই:— একক আত্মা, বহুভাঙ্গর করিয়া নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধীর নির্ভীকভাবে ভগবানের আমলাবর্গের (Angel of God)* সম্মুখে মাথা খাড়া করিয়াছিল এবং ভগবানের দূত তাহাকে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিতে বলাতে নিজ বিবেকদ্বারাই তাহাকে স্থণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এই গর্কিত বিজ্রোহীকে উপলক্ষ্য করিয়া সদা-প্রভুর ক্রোধান্বিত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অঙ্কার-নির্জন নির্কামনে বহু বৎসর তাহাকে নির্ধ্যাতিত করা হয়, এবং এই দৃষ্টিগণের অবতার এই নির্কাক জবের (Job) মস্তকে সেই নির্ধ্যাতনের ধূলি ও কালিমা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। তারপর যখন দেবশক্ররা দেবপুরী আক্রমণ করিল—মাহুব তাহা রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল—তাহাদের চূর্ণল বিবেক—নতজাহ্নু হইয়া তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল; সেই বিপৎকালে এই নির্ধ্যাতিত, অভিশপ্ত, নিঃসঙ্গ 'প্রমিথিয়ুসই' ভগবানের সন্তানদের রক্ষা করিল; সে সমরাত্তিলাবী ছিল বলিয়া নহে, পুরুষারের আশায় নহে, এমন কি স্ত্রায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও নহে—শুধু তাহার 'আত্মা' তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে! অথচ সেই প্রেমসী আত্মার মোহবন্ধনও এখন আর তার নাই। দ্বিতীয় 'প্রমিথিয়ুসে' এই আত্মাকে সে যদিও আগের মতই ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসায় মোহ নাই—এ যেন সমানে-সমানে ভালবাসা; এখন সে জানে এবং বলিতে পারে তাহার প্রেমসী আত্মার প্রণয়ের কি

* ইব্রের সঙ্গে পৃথিবীর ও মাহুবের বরাবর সম্পর্ক নহে তাঁহার প্রতিনিধি দেবদূতগণের (Der Engelgottes) সহিত মাহুবের সম্পর্ক। তিনি যেন ভারতবর্ষের বড়লাট। ইব্র রাজকীয় বিবেক বুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া এপিথিয়ুসের হাতে আপন শক্তি অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত আমলা সর্কার অমিত বীর এপিথিয়ুসকে নির্কামনে দণ্ড দেয়। এই গভিচকল জগতের বহু উর্ধ্ব সেই বৃদ্ধ অদৃষ্ট, রোগাতুর পাপের অনুশোচনার বিদ্ধ অথচ কিছু করিতে অপারগ ভগবান যেন উদ্ভাট রাজা লিয়ারের মত বিধায়ের শোচনীয় সূর্তি হইয়া বুরিয়া ক্রিড়েছেন।

মূল্যই না দিতে হইয়াছে। অথচ এই আত্মা যন্ত্রণার সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ইহার জন্ত সে বিসর্জন দিয়াছে; সে ইহার সকলই লইয়া পরিবর্তে কিছুই দেয় নাই এবং যখন জয়ের (জয় এখন আর তাহাকে আনন্দ দেয় না) সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনও বন্ধ এমন কি বিশ্বস্ত ভৃত্য যে সে, তাহাকেও যত্নের সম্মুখেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কোনো অসুযোগ করিবে না। সে এখনও ভালবাসে সেই ঈশ্বর প্রিয়া এই আত্মাকে; এবং উহার জন্ত প্রয়োজন হইলে আবার ঐ বেদন-নাট্যের অভিনয় করিতে সে রাজি আছে। অসীম নিঃশুভতা! বীৰ্য্যদীপ্ত প্রেম এবং অজ্ঞেয় আত্মগরিমা—ভাবিতেও মস্তক বিঘূর্ণিত হয়।

কিন্তু এমন জালাময় সোমরস কয়জনে পান করিতে পারে? শক্তিশালী পুরুষের সংখ্যা অধিক নহে; ইহা প্রায় ভালই যে এত বড় কাব্য সাধারণের অপরিচিত ও অপঠিত থাকিবে। তাহাদের এই ঔদাসীন্য ক্ষণে ক্ষণে টুটিয়া থাকে শুধু এ হেন রসসৃষ্টিকে উপভোগ করিবার জন্ত! এই পুত অগ্নিবর্ধনে তাহাদের সামগ্র্য আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভ্রম্যভূত হয় এবং বহারা এই ভ্রম্যভূত আশা নবগোরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই আত্মা—সেই আত্মাবৈশ্বানর সাধারণ মানুষের দুর্বল হৃদয়ের পক্ষে অতিরিক্ত জালাময়।

* * * * *

আমি স্পিটলারকে আল্পের ম্যাটার্ণ (Matter horn) শিখরের মত দুর্গম একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতরূপে দেখিতেছি। পাদমূল হইতে শিখর পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটি পর্বত। সেখানে আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু করিবার অবকাশ পাই—গুম্বা লতা কর্তন করা, পুষ্প সংগ্রহ করা, ফল সংগ্রহ করা। তুষার সময় তুষানিবৃত্তির জন্ত

প্রসবণও সেখানে রহিয়াছে, শান্তি ও স্বপ্নরচনা করিবার ছায়া-সুশীতল স্থানও আছে। ইহার প্রাচুর্য্য, ইহার জলবায়ু ও দৃশ্যপটের বৈচিত্র্যকে ধন্যবাদ! পথিক এই বিপুল দৃশ্য-ভূমির অর্ধেক বা আংশিক অংশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু একেবারেই কিছু বুঝিতে না পারে, শুধু ভালবাসিলেই যথেষ্ট! এই কলাশিল্পের একটিমাত্র অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খবর্ণনাকে, এই চিন্তাসমুদ্রের একটি জলধরীকেও যদি কেহ ভালবাসিতে পারে তাহা হইলে সামান্ত জনসাধারণের স্বত্বিত্তেও এই মহাকবি জীবিত থাকিবেন।

বিশ্ব এই বিপুল পর্বতের তলদেশে নিখরিনী ধারা যেমন উপত্যকার জনসাধারণকে সম্ভাবিত করিতেছে—অন্য দিকে তেমনি তুমারধবল শিখরমালা নিঃসীম নীল গগনে মাথা তুলিয়া আছে—শেহ-কৃষ্ণ দেগদারশ্রেণী যেন চন্দ্রাক্ষরের মত শোভা পাইতেছে—তুহিন শীতল আকাশে শুধু অনন্ত নক্ষত্রের স্পন্দন! পাদপরাঙ্কি প্রায়োমেঘিণী ঝটিকার নিঃশ্বাসে আনমিত হইয়াছে—শুষ্কাদির মর্ম্মর রব উঠিয়াছে; প্রমিথিয়ুস যন্ত্রণায় বাহর—তাহার রক্ত তাণ্ডবের লীলা শুরু হইয়াছে—সে মৃত্যুসীম সৌন্দর্য্যক্রপিনী দেবী-আত্মার আগমনী অস্ত্রভব করিতেছে—তাহার অস্ত্রময় নয়নসম্পাতে মোহ! প্রমিথিয়ুস পল-ইতে চাহে, কিন্তু নড়িবার শক্তি তাহার নাই—সে যেন শূন্যলাবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সে! ব্যাতীর মত মোহন-ভয়াল কম্পিত দৃষ্টি অগ্নি শিখার মত তাহারই উপর ফেলিয়াছে! প্রেমসী সম্মুখ! গাঠ তাহার শুভ্রত হাসি, সে তাহার স্বল্পদেশে হস্তার্পণ করিল—প্রেমসী তাহাকেই তাহার বলিরূপে বরণ করিয়াছে!

শ্রী কালিদাস নাগ

শ্রী সজনীকান্ত দাস



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

রিকের কথা—

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশে সহায়-মুসলমান মুসলিম জনকতক অসীম সাহসী দেশভক্ত অমৃতবের সাহায্য-মাত্র সম্বল করিয়া রিকনেত' আক্ষ'ল করিম ইউরোপের দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিকে কেমন করিয়া ভুলিলেন, তাহা যেমন একাধারে আমাদের বিশ্বাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই অন্তর্ধারে দেশ-প্রাণ এই ক্ষুদ্র জাতিটির স্বাধীনতাটুকু হরণ করিবার জন্য ফ্রান্স ও স্পেনের এত ব্যাকুলতা কেন তাহা বুঝিয়া উঠাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। মহা বটে, এই ক্ষুদ্র প্রদেশটি পনিজসম্পত্তিতে ধনশালী; কিন্তু কেবলমাত্র সেই পনিজসম্পত্তিটুকুই অংশমাত্র হরণের জন্য বণিক্রান্ত করাসী জাতি এত বিপুল অর্প-অয় ও লোক-অয় কবিতেন না। হাজার অস্ত্রশাস্ত্র বহু গুলি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্তা রক্ষিয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে ইসলামের চাগবনে যেহকার জাতির আচাভীতি এবং ইংরেজ ও করাসীর পদস্পর্ষ অসীতি ও সন্দেহই প্রধান।

ফ্রান্স বণন বৃদ্ধ অন্তীর্ণ হয় নাই, সে সময়ে স্পেনকে ক্রমাগত হারাটয়া দিয়া আক্ষ'ল করিম আপনার প্রস্তাব নিকটবর্তী অল্প মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে বিস্তার করিতেছিলেন। তাহার বিজয়ধর্মিয়ানে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্সের স্বাধীন মুসলমান আফ্রিকার বিশেষত আলজিরিয়া ও টিউনিসে যদি বিজয়ত মাথা তুলে সে হয়ে করাসী আক্ষ'ল করিমকে পরাক্রান্ত করিতে বন্ধপত্রিকর হয়। সেইসময়ে সুবিখ্যাত পত্রিকা Le Figaro লেখেন

"An independent Mohamedan kingdom in Northern Morocco would constitute a very serious change in the equilibrium of Islam."

অর্থাৎ "উত্তর মরক্কোতে (স্পেনের অধিকৃত অঞ্চলে) একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের সৃষ্টি হইলে মুসলমান জাতির যে স্বাণুধ পালি ঘটনাতে তাহার বিপর্যয় ঘটিল' মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।"

ইসলামের জাগরণে করাসীর এই যে ভীতি ইহা যে শুধু রিকের পনিজ সম্পত্তিহরণের জন্য একটা ছলমাত্র তাহা মনে হয় না। বাস্তবিকই ইউরোপ ইসলামীর সাম্রাজ্যকে যেস্বপভাবে এতকাল চিরন্তন করিয়া হীনবল করিয়া রাগিরাছিলেন ইসলামের এই নবজাগরণে তাহার প্রতি-ক্রিয়া যদি দেখা দেয় তাহা হইলে ইউরোপের ভবিষ্যৎও যে খুব সুখিধা-জনক হইবে না, ইহা করাসীর পক্ষে উপলক্ষ করা অতি সহজ। করাসী জাতি যে তাহা মর্মে-মর্মে বুঝিয়াছে তাহাও নানা ব্যাপারে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদানে ইংরেজ সেনাপতি স্তর লি স্টাকের হত্যার যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন করিয়া Le Figaro বলিতেছেন

"A fire started in Egypt may spread to the whole of Mohamedan world, even to India."

ইংরেজ সরকারের আচরণ করাসীজাতি সমর্থন করিলেও সে ইংরেজ-ইতি তখন করাসীদের মোটেই ছিগা না, তাহার বহু প্ৰমাণ পাওয়া যায়। সেই সময় সমস্তের ব্যাপার হইয়া উৎসাহ ও তুর্কীর মধ্যে বিবাদ খুবই পাকইয়া উঠিতেছিল। সেই ব্যাপার-সম্পর্কে সুবিখ্যাত করাসী পত্রিকা Revue Blanche বলিতেছিলেন

"When we consider the double game that the British agents have played in Syria, what they have done to embarrass us in the administration of our mandate, we are tempted to rejoice in their Asiatic difficulties or at least regard them with an unweeping eye. But today all Westerners must stand shoulder to shoulder before the Mohamedan East."

ফ্রান্সের ইসলামভীতি যতটা অস্বস্তির আকার ধারণ করিয়াছে ইংরেজ কিন্তু সেরূপ ভীত নহে। যদি বিপদ সত্যই দেখা দেয় তাহা হইলে কতক আপনার বাহুবলে, কতক রাষ্ট্রনৈতিক চাতুর্য্য, কতক কৌশলে আপনার প্রভাব অব্যাহত রাখিতে পারিবে বলিয়া ইংরেজের বিশ্বাস আছে। কাজেই আপনার মনের আতঙ্কে করাসীর মতন শিরিরা উঠিয়া ইংরেজ আপনার রাষ্ট্রনৈতিক তাল হারায় নাই। সেজন্য করাসীর মতন যেন-তেন প্রকারে ইসলামের বিরুদ্ধে রণ-ঘোষণা করিবার প্রয়োজন ইংরেজ সরকার দেখেন নাই। ইসলামকে দুর্বল কবিবার জন্য যেমন করাসী সরকার ইজিপ্টে ও মসুলে ইংরেজকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত, ইংরেজ সরকার কিন্তু তেমন মরক্কো ও সিরিয়াতে করাসীকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। ইংরেজ জানে যদি ইসলামের প্রভাব স্পষ্ট করিতে হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইংরেজ একাকীই তাহাতে সমর্থ হইবে।

ইংরেজ জাতি বেশ ভালোরকমেই জানে যে যদি রিক জাতি পরাক্রম হইয়া তাহা হইলে করাসী উত্তর মরক্কোর প্রভু হইয়া বসিবে। সিরিয়াটারের ঠিক দক্ষিণে ইংরেজের নৌ শক্তির করাসীর জায় এত বড় একটি অবল প্রতিদ্বন্দ্বী যদি আস্তানা গাড়িয়া বসে তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কাজে কাজেই করাসীর এই রিক্রমন পর্ব ইংরেজের অভিপ্রায় নহে। সিরিয়াতে করাসীর প্রভু ইংরেজ সরকারের পছন্দ-সই হইতে পারে না। বিগত বিষয়কে করাসীর জায় ইংরেজও অকাতরে আপনার শক্তিস্বয় করিলেন কিন্তু ম্যাগেট-জক রাজ্যগুলির মধ্যে বাছা-বাছা অংশগুলি পড়িল ফ্রান্সের ভাগ্যে। সার ও কুরে পনিগুলি ও সিরিয়ার লৌহ ও তৈল সম্পদ সমস্ত পড়িল করাসীর ভাগ্যে। ইংরেজ পাইলেন আরবের মরুভূমি ও ইরাকের খবরদারী; ইরাকের মসুল-অঞ্চলে যদি-কিছু তৈলের মন্ডান মিলিল, তাহা বিনাবাধার ভোগ করিবার অন্তরায় হইয়া উঠিল তুর্কী। ফলে পনিজ-সম্পত্তি লাভ ইংরেজের ভাগ্যে ঘটে নাই। অথচ বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎস হইল এই পনিজ সম্পত্তি। তৈল ও লৌহের প্রতিযোগিতার

করাসী ও ইংরেজের এই মনোমালিন্যের কথা পূর্বে বিদগ্ধভাবে “প্রবাসীতে” প্রকাশিত হইয়াছে, সেজন্য আজ আর তাহার পুনরুৎসাহ নিম্নপ্রয়োজন। মোট কথা যে বনিয়াদ-সম্পাদনের এই মালিকানা লইয়া রেবায়েবির কলে করাসীর বিপক্ষে ইংরেজ করাসীর সহায় হয় নাই। তাই দিয়ারা ও মরাক্কোতে করাসীর যত ক্রটিবিচুতি ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ জানা আশাবাদের সহায় হইয়া পড়িতেছে এবং করাসীর পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্তো এত মূল্যবান হইয়া পড়িয়াছে। মসুলের ব্যাপার লইয়া যে সমস্তাটি ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহার মূলে ইংরেজ সরকার বলিতেছেন যে ইরাকের খ্রীষ্টিয়ান অধিবাসীবর্গের ও কুর্দ-স্থানের কুর্দ জাতিকের রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব সচিব সমর ইংরেজ খেজার লইয়াছেন, প্রত্যেকেই কেবল বজায় রাখিবার ইচ্ছাতে তাহার মসুল অধিকার করিতে চাহেন। কিন্তু করাসীর মনে-মনে সন্দেহ যে ইংরেজের লোভ, কিন্তু মসুলের তৈল-খনির উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৈলের মালিকানা তিরু ও অন্তরায় অতিসংকট হইবার অন্তরালে এজ্বর আছে। নিউইয়র্কের New Republic পত্রিকা এসম্বন্ধে বলেন “When Mosul is said, ‘oil’ occurs to most person. But the thing to bear in mind is Kurdistan, not oil. The Kurds might be roused to a nationalistic movement for self-determination if events were propitious and if there were a neighbour interested in a celerating their desire for Independence. The Turks, therefore, want as much of Mosul as they can get, to keep the British as far away from Kurdistan as possible believing that it is fixed policy of the British foreign office to erect Kurdistan as another buffer State on the route to India.”

কুর্দস্থানের স্বাধীনতা-স্বাধীনতা তাগাইয়া তোলা যে ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ইহা বিশ্বাস করিবার তুরকের কতকগুলি কারণ আছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনেক নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং গোপন সন্ধি বাহাতে ভবিষ্যতে সম্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু তদানন্তর গোপন চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার বিরাম ছিল না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এইরূপ একটি গোপন চুক্তিপত্র লন্ডন শহরে স্বাক্ষরিত হয়; এই চুক্তি পত্রে ইংরেজ সরকার অস্বীকার করেন যে রুশিয়াকে মুছাবসানে আর্জেনিয়া ও কুর্দস্থান প্রদান করা হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন সেতুর এ সন্ধিপত্র রচিত হয়, তখন রুশিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেজন্য কুর্দস্থান আর তাহাকে দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুর্দস্থানে স্বাধীনশাসন লাভের ভিত্তি কোনো আন্দোলন না থাকায় ইংরেজ সরকার খরট্, কুর্দস্থান সংস্থাপনের প্রতিশ্রুতি কর্তৃক তুরক সরকারের নিকট হইতে আশ্রয় করিয়া গিয়া। কন্সটান্টিনোপল্ সরকারের এই কর্তৃত্বকে স্বীকার করিতে নাগরিক হইয়া জরুরীভাৱে পথেই আন্দোলন সরকার সেতুর সন্ধিপত্রকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কাভে-কাভেই কুর্দস্থানে স্বাধীনশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল না। কিন্তু আন্দোলন সরকারের মনে এই বিশ্বাস সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল যে কুর্দস্থান সম্বন্ধে আপনাদের সমস্ত ইংরেজ আভ্যন্তরীণ পরিচালনা করে নাই। তাই সমস্ত কুর্দস্থানে আপনাদের প্রস্তাব বজায় রাখিবার জন্য তুরক মসুল লইয়া ইংরেজের সহিত প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত।

ঐ প্রত্যাহার পদোপাধ্যায়

বাংলা

দেশের অবস্থা—

এ-বৎসর বাংলাদেশে পাটের কসল ভালোই চইয়াছে এবং দরও বেশ আছে। সে-হিসাবে প্রত্যেক কৃষকই এ বৎসর কিছু কিছু টাকা পাইবে। কিন্তু সে-টাকা কতকখন থাকিবে? শুধু টাকা উপায় করিলে হয় না, টাকা সঞ্চয়ের পন্থাও শিক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। এ বৎসর আশার ধানের কসল ভালো হয় নাই, অধিকাংশ কৃষককেই খাদ্য ক্রয় করিতে হইবে। নানা বাজে খরচে তাহার পাটের টাকা ও সস্ত্র সঞ্চে খরচ করিয়া কেতিহেছে, এখন খোরাকী খাদ্য ও সঞ্চয়ের অপ্রাপ্ত খরচ কল্পে সর্ববরাহ হইবে। তখন বাধ্য হইয়া মহাজনের ঋণগ্রহণ হইতে হইবে। আমরা কৃষককুলকে নিম্ন-লিখিত করটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলি :—

(১) কেবলমাত্র পাটের চাষ করিয়া টাকা উপায় করিলে চলিবে না। টাকা বাচাতে রক্ষা হয় সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। কৃষকগণকে খাদ্য ও তরকারীর চাষে অধিক মনোযোগী হইতে বলি।

(২) অতিরিক্ত মগ্নের প্রায় দেওয়া উচিত নয়। সখ মিটাইতে বাইয়া ভবিষ্যৎচিন্তাশূন্য হওয়া অন্তায়।

(৩) এ বৎসর বাজারের খোরাকী ধানের অভাব আছে, টাকা হাতে পাওয়া যেন তাহার অগ্রাধান ক্রয় করে। ঘরে ভাত না থাকিলে বৃদ্ধি যোগায় না, এ কথা ঠিক। ভাতের জোগাড় অগ্রাধান পর অত্র-কিছু।

(৪) সামান্য কারণ লইয়া তাই-তাই বগড়া-বিবাদ করিয়া কেহই যেন আদালতের আশ্রয় না লয়।

(৫) স্ব-স্ব পুত্র-কন্যাপুত্রকে সকলেই পাঠশালে দিবে। সম্ভবনকে কিছু-কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্তব্য। যতদিন সমাজে লেখাপড়া ব্যাপকভাবে বিস্তারিত না হইতেছে, ততদিন কোনো স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না।

— মোসলিম হিটৈখী

শ্রীহট্টের বঙ্গ-ভুক্ত—

বাংলা কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাংলা সরকার এই প্রস্তাবের বিস্তারিত প্রকাশ করেন নাই সত্য, কিন্তু সরকারী সদস্য বলিয়াছেন যে, বাংলা সরকার এখনও এ-সম্বন্ধে কোনো চরম সিদ্ধান্ত উপনীত হন নাই। আগাম কাউন্সিলেও শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্ত-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—বাংলা কাউন্সিলেও ঐ সম্বন্ধে নিজেদের মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত-গবর্ণমেন্ট এখনও এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বঙ্গীয় বাৎসরিক সভার আগামী অধিবেশনে সরকার আবার এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিবেন। শ্রীহট্ট বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলে বাৎসরিক আয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ বাড়িবে।

বাংলার জেলাখানা—

১৯২৪ সালের বঙ্গদেশের জেলার রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সালে সর্বমুদ্র ২৩৮৬৫ জন কয়েদী জেলাখানার শক্তি হইয়াছিল। তাঁর মধ্যে শতকরা ৫৪.৭৯ জন মুসলমান এবং ৪৫.২১ জন হিন্দু। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান লোকসংখ্যাও ঐ অনুপাতেই। বঙ্গ-অনুসারে কয়েদীদের হিসাব—

১৩ বৎসরের কম বয়সের কয়েদী-সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন বা শতকরা

বৎসর বয়সের শতকরা ৯'৩১ জন এবং ২২ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের শতকরা ৩৪'৪১ জন।

কয়েকদৈবে মধ্যে শতকরা ১০'৮৪ জন লেখাপড়া জানা ছিল, শতকরা ৪'১৪ জন কেবল পড়িতে পারিত, বাকী শতকরা ৮৫'২ জন নিবন্ধর মূর্খ। সুতরাং মূর্খতা যে অপরাধ-বৃদ্ধির একটা কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী-কয়েদী—

১৯২৪ সালে মোট ৪৩৭ জন স্ত্রী-কয়েদী জেলখানার ভিত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২৩১ জন হিন্দু, ১২৫ জন মুসলমান, ৮ জন খৃষ্টীয় এবং ৩৩ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

বয়স-অনুসারে স্ত্রী-কয়েদীদের হিসাব—

কোন কোন বয়সে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা কিরূপ তাহাও হিচাবে জানা যায়। ১৬ বৎসরের নীচে ৪ জন মাত্র, ১৬:৮ বৎসর ২০ জন, ১০-২১ বৎসরের ৩৯ জন, ২২-৩০ বৎসরের ১৪৩ জন, ৩১-৪০ বৎসরের ১২৩ জন, অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে ২২ হইতে ৩০ বৎসর এই সময়েই অপরাধ-প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলার মানক জব্য—

সরকারী আনুগারী-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯১৩-২৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে মানক জব্যর ব্যবহার পূর্বে বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। অসহযোগ-আন্দোলনে বাংলার মানক জব্যর ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছিল—কিন্তু ধীরে ধীরে আবার পূর্বাৱস্থায় আসিয়াছে। সহযোগী বরিণাল হিঠৈতে প্রকাশ যে, বরিণালের স্বরাজ সেবক-সম্মান মানক জব্যর ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারকাব্যে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলার সর্বত্র যে সমস্ত সভা-সমিতি আছে, তাহাদের কন্ঠারা যদি মানক জব্যর বিরুদ্ধে গচার কাব্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। এ-বিষয়ে উদাসীন্য জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া বাহতেছে।

বাংলায় বিদেশী পণ্য—

বাংলার বিপণিতে বিদেশী তাহাদের পণ্যদ্রব্য কিরূপ মাত্রা লুটিয়া লইতেছে তাহার অমান দেখুন। গত ১৯২৪-২৫ খৃঃ বৎসরে নিম্নলিখিত টাকার মাল বিদেশ হইতে বাংলার আদান হইয়াছে। সুত্রঃ বস্ত্র ৩৫৪৮৯.৯৮৮, চিনি ৭৫৭৯ ৪৬৭, তৈল ৩৮৯৬৯৫৪, খাত্ত জব্য ১৬৫৮৯১১, মণলা ১১৭৩৫৩৫, লবণ ১০৫৪৬০০, খাত্তজব্য ১০৫০.৩১৭, মোটরকার প্রকৃতি ৯৯৯.৭৮, কাগজ, পেট্রোবোর্ড ৮৮.৩৮৬, কাচ ও কাচের জব্য ৭৭৩৮.৩৫, নকল রেশম ৫৪০.৫৬, রং ও সরঞ্জাম ৪৬০.৮২, রবার ৪৫৪৭.০৫, পলম ৩৬৯৬.২৪, দিয়াগলাই ৫৩২.৮২, সাইকেল ৩০০.৫২৭, পুস্তক ৩৫২৯৬.৭৭, ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম ২৪৮২৩২, মোজা, ও সের্জ ইত্যাদি ২৪১৫৫৪, বস্ত্র ২২৮৬৪২, বন্দুক ইত্যাদি ২২৭.৯৭, সাবান ২১৪১২৫, খেলনা ১৯৬২৪, চামড়া ১৯৪৪৭৪, রেশমের বস্ত্র ১৬২৩৭৮, অঙ্গরাস ১৪৪৬৩৬, মাটির জব্য ১৩.৮২৮, ছুরিকাঁচ ১৩.৫৬২, সর্বসমেত ৮৬৮৩১৬৩.৩ টাকা।

আর আমরা ?

“পরহাতে দিয়ে ধনত্ব হুখে
বহি লোহবিদিত হার বুকে।”

বরিশাল

বঙ্গমহিলার ক্রান্তি—

চাকার জন্ম, স্বর্গীয় তারকেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্ত জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার বিজ্ঞান-কলেজ হইতে এম্ এম্-সি পাশ করিয়া আমেরিকার গমন করেন। তথায় কিছুদিন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসেন, কলম্বিয়া হইতে এম্ এ উপাধি লইয়া শ্রীমতী প্রভাবতী জার্মানিতে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রী: ট নারী-শিক্ষা মেলা—

শ্রীহট্ট নারী শিক্ষা মেলার কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ছাত্রী-সমিতির পক্ষ হইতে এই মেলার আয়োজন হয়। ছাত্রীরা সম্বৎসর ধরিত্রী নানা প্রকার শিক্ষা জব্য প্রস্তুত করেন। সেই জব্যগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থদ্বারা দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষার সাহায্য করেন এবং অন্যান্য সংকার্যে ব্যয় করেন। তাহাদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের জনশক্তি লিপিতেছেন :—শিক্ষা চর্চা ও সেবা এই উভয়বিধ কাব্যের স্বযোগ লাভ হয়। সুখের বিষয় বালিকারা প্রধানতঃ স্বদেশ ও দেশী কাপড়দ্রব্যই শিক্ষা চর্চা করিয়াছেন। প্রায় আট শতাধিক বিহীন-প্রকারের জব্য প্রেরিত হইয়াছিল। অনেকেই বিদেশী বস্ত্রের উপর শিক্ষা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিগত দুইটি প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, ক্রমশঃ সূতা কাটা, বস্ত্রায়ন ও দেশী বস্ত্রের আদর বৃদ্ধি হইতেছে। এবার সূতা কাটা ও তাঁতের কাপড় অনেক অধিক হইয়াছে।

বাংলায় নারীমঞ্জল প্রচেষ্টা—

“সরোজনলিনী দত্ত নারীমঞ্জল সমিতি”র কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার জন্ত দুইটি শিক্ষালয় শীঘ্র খোলা হইবে। যে-সকল মহিলা এই বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা করিতে বা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অসুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইবেন।

বাজলা-দেশের ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার যে-কোনো নগরে বা গ্রামে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সভাপতির শিক্ষার্থে “সরোজনলিনী দত্ত নারীমঞ্জল সমিতি” শিক্ষার্থী পাঠাইবেন।

বাজলাদেশের নানান স্থানে অনেক অণ্ডাবস্ত্র মহিলা আছেন। তাহারা বঙ্গ শিক্ষার্থীদের কাব্য, নাসের কাব্য এবং ধাত্তিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপনার পায়ে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সম্পাদিকা তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীকুমুদিনী বসু, সম্পাদিকা, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঞ্জল সমিতি, ৮নং ম্যাক্সন লেন, কলিকাতা।

সুখের বিষয়, আজকাল বাঙ্গলার স্থানে-স্থানে নারীমঞ্জল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। বহুদিন পূর্বে স্বর্গীয়া কৃষ্ণাভাবিনী দাসীর নেতৃত্বে “ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের” প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি নারী-শিক্ষার জন্ত বাঙ্গলাদেশে অনেক কাজ করিতেছে। “বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের” নামে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতীতকালে স্বর্গীয়া কুমুদিনী-নিবেদিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রী: অক্ষয় মিশ্র কর্তৃক পরিচালিত নিবেদিতা বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নীরবে বহু নারীমঞ্জল কার্য করিতেছে। নৌরী মাতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কার্যও প্রশংসনীয়।

বঙ্গদেশী বীর—

ঢাকার ম্যাডিস্ট্রাল কলেজের আদালতে সম্প্রতি একটি ভীষণ ডাকাতি-মামলার বিচার হইয়াছে। এই মোকদ্দমার আমরক আলী ও অপর ৪ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়।

প্রকাশ যে গত এপ্রিল মাসে এক নিশীথ রাত্রে তিনজন ডাকাত ঢাকার মার্গকণ্ঠ মজুমদার রামনগর গ্রামের কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহে প্রবেশ করে। ডাকাতদের মধ্যে একজন পুলিশের চাবিলদাবের বেগে ছিল ও তাহার হস্তে বন্দুক ছিল ও অপর দুই জন কনস্টেবলের বেশ ধরিয়াছিল। তাহার কৃষ্ণকুমার সাহাকে ডাকিয়া বলে যে তাহার গ্রামের চৌকিদারদের কাৰ্য্য পরিদর্শন করিতে আনিয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে হিচ্ছামা করে যে, গ্রামে কোনো নাকির বন্দুক আছে কি না। এষ্ট কথা হিচ্ছামা করিয়াই তাহার চলিয়া যায় এবং অল্পক্ষণ পরেই ২০ জন সশস্ত্র ডাকাত কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহ আক্রমণ করে। কৃষ্ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার প্রতিবেশীদেরকে ডাকাতির সংবাদ দেয়।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণব পাণের বাড়ীর কয়জন গোয়ালী লাঠি লইয়া ডাকাতদের আক্রমণ করে। গোয়ালীদের ৩২ বৎসর বয়স্ক বিধবা স্ত্রী হেমলা গোপিনী তাহার জাহাঙ্গিরকে লাঠি ভোগাইয়া দিতে থাকে। মারামারির গোলমালে ডাকাতগণ ঘটনাস্থলের আলোকগুলি অগম্য করিতে। প্রকৃত্যে ডাকাতদের বিপদ দেখিয়া হেমলা তৎক্ষণাৎ একপল বস্ত্র কেবেরসিন তৈলে মিস্ত্র করিয়া তাহাতে আশ্রয় দিয়া মশাল প্রস্তুত করিয়া ঘটনাস্থল আলোকিত করে। সে ধরের ভিতর হইতে তিনশানি মাত্র মারিবার 'পাঁচ' স্থানস্থল করিয়া ডাকাতদের চাতে দেয়। একজন গোয়ালী 'পাঁচ' দিয়া দলের নেতাকে আঘাত করে। আঘাত পাইয়া মর্দার দলকে পলাইতে উপদেশ দেয়। ডাকাতগণ তখন একটি সস্ত্র গুলি দিয়া পলাইতে থাকে—গোয়ালীগণও অল্পক্ষণে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এবারও হেমলা মশালহস্তে ডাকাতগণকে আক্রমণ করিতে সাহায্য করে। এই সময় একজন ডাকাত সাংঘাতিকরূপে 'পাঁচ' দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া যায়। ডাকাতগণ এক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাকে লইয়া যাঁইতে অসমর্থ হয় কাবণ, তখন গ্রামের আনন্ড লোক জুটিয়া গিয়াছিল। যে পাঁচজন ডাকাত 'পাঁচ' দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় পুলিশ তৎক্ষণে কলে তাহার প্রেরণ হয়।

বিচারে জুরীগণ একমতে ৪জন ডাকাতকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা সাহেব প্রত্যেককে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। রায়ে উচ্চসাহেব গবর্নমেন্টকে হেমলার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি—

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির উন্নতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। এই মহান আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকদিগের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত

প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত এবং সম্বদ্ধ করিতে হইবে, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি জাতীয় সাহিত্য-সম্মেলন প্রয়োজন অত্যধিক।

সমাজের এই অভাব সুবীকরণের জন্যই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির পরিচালকেরা সমাজের সাহিত্য-সেবীদেরকে উচ্চাঙ্গের নিজ-নিজ ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষত্বের উপর কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সমাজের মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং উচ্চাঙ্গের সমক্ষে জাতীয় মঙ্গলতার উচ্চন স্বরূপ সংস্থাপনের জন্য মনোযোগী হইবেন। বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগামী মুসলমান সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী ব্যক্তিই এই সমিতির সম্মেলনীভূত হইয়াছেন। সমিতির স্বচ্ছলতার জন্য, সমিতি সংসদে পাঠ্যপাঠের বায়নির্বাচনের ক্ষমতা যদি সমাজ এককালীন ১০,০০০ দশ হাজার টাকা সমিতির দান করেন, তাহা হইলে এই সমিতিটি স্বদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন—

বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাঙ্গালার শাসন-পরিষদে বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যাল শাসন-সম্বন্ধে এক নূতন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইবে। প্রকাশ যে সকল স্থানে যথাযথা ব্যবস্থা করিবার জন্য আর্থিক-ধরণে এই মিউনিসিপ্যাল আইন রচনা করা হইয়াছে।

দুইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা হইয়াছে—(১) সর্বত্র মিউনিসিপ্যাল বাবস্থার উন্নতি সাধিত হইতেছে (২) মিউনিসিপ্যাল অধিকারসমূহ সরকারী লোকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া বে-সরকারী লোকদিগের হাতে দেওয়া হইতেছে, সরকারী চেয়ারম্যান মনোনয়নের প্রথা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, বাজেট ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আলোচনার অনেক স্বাধীনতা প্রধান করা হইয়াছে, নূতন আইনে মক্কেলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতেও অধ্যক্ষের গৃহ ও স্থান পরিষ্কার, বাহিনীবাহন, খাদ্যাদি বিক্রয়, জন্ম-মৃত্যুর হিসাবপ্রকাশ, শিশুস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্বাঘবস্থার সরকারী কমিশনার চেয়ারম্যান নিয়োগ করিতেন—এখনও কোথাও-কোথাও সে রূপ ব্যবস্থা আছে। নূতন আইনে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিতে শতকরা ৭৫ জন কমিশনার নির্বাচিত হইবেন। কোথাও বা শতকরা ৮০ জন নির্বাচিত হইবেন। যে-সকল সম্মেলনের লোক সংখ্যা কম, তাহাদের স্বার্থক্ষার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। চেয়ারম্যান, ডাটাস্চেয়ারম্যান কমিশনার প্রভৃতির কার্যকাল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কমিশনারগণকে নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্ভাববাহবাবস্থা, জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষা প্রভৃতির অল্প ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্বত্র শিক্ষাকর্মিটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাড়ীর উপর যে টাক্স বসিবে, তাহার কতকংশ বাহাতে শিক্ষার জন্য পৃথক রাখা হয়, সেজন্য অমুরোধ করা হইবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

কণ্ঠ পাথর



রৌদ্র চিকিৎসা

আমাদের দেশে শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে তৈল মাখাইয়া দিবসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে রাখা হয়। শিশুপালনেও এই প্রথাটি বড় সুলভ। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক বাঙ্গালী জননী আর এপ্রথা পালন করিতে চান না। কারণ, সূর্য্যকিরণের যে কত গুণ তাহা তাহার জানেন না।

প্রতীচা চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যকিরণের এই নতন গুণের সম্বন্ধে পাইয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছাচরিত হইতেছেন। ইংরেজেরা জানে জানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজীতে এই চিকিৎসা-প্রণালী Heliotherapy নামে পরিচিত।

ইয়োথোপীয় চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা যে বিস্কন্ধ বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির যোগে নিরাময়ের ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রতীচা চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিস্কন্ধ বায়ু চিকিৎসার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর সূর্য্যকিরণ এখনও সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই—মাত্র কয়েকজন চিকিৎসক অল্প কয়েক বৎসর ইহার উপকারিতা জানিতে পারিয়া ইহার সাহায্যে চিকিৎসা চালাইতেছেন। তাহার সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া তদ্বাধ্য হইতে চিকিৎসা-কার্যের উপযোগী বিশেষ কিরণ-বর্ণটি বাছিয়া লইয়াছেন। যেখানে সূর্য্যকিরণ সুলভ নহে, সেখানে তাহার কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যকিরণ উৎপাদন করিয়া সূর্যালোকের স্বভাব মিটাইতেছেন। এই কৃত্রিম সূর্যালোকের যে অংশ চিকিৎসা-কার্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে ultra-violet light বা তীক্ষ্ণ বেগুনি খালো বলা হয়। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া সংকট মূলক এবং আরও কয়েকটি মিল-বর্ণ পাওয়া যায়। রামধনু উদ্ভিত হইলে সূর্য্যকিরণের বর্ণ-বিভাজন বিক্রম তাহা বর্ণে যায়। ঐ বর্ণ সমূহের মধ্যে যে কিরণেরা তীব্র বেগুনি খালো প্রদান করে তাহাই রোগ নিরাময় করিতে পারে।

সূর্য্যকিরণ যে ভীষণ বিনাশ করিতে সমর্থ তাহা অনেক কাল পূর্বেই লোকে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু গভীর ক্ষত, যেখানে সাধারণতঃ ঔষধ পৌঁচিতে পারে না, সে-সব স্থলে সূর্য্যকিরণ পৌঁছিয়া ভীষণ বিনাশ করিতে সমর্থ, এই তত্ত্বটুকু কয়েক বৎসর হইল বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের ফলে নিশ্চয়রূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ মানবদেহের চর্ম্ম তেজ করিয়া তাহার রক্তকে এমন তেজসম্পন্ন করিয়া তুলে যে, রক্তের স্বাভাবিক রোগ বীজাণু নাশক ক্ষমতা বহুশত গুণ বাড়িয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসা সাধা যন্ত্রা রোগ ও রিকিটস রোগ আরাম করিবার পক্ষে সূর্য্যকিরণের স্কুভ ক্ষমতা। ক্ষত-চিকিৎসারও সূর্য্যকিরণ প্রয়োগ করিয়া স-লভ্য লাভ হইয়া থাকে। তাছাড়া চর্ম্মের শিশুর পক্ষে রৌদ্র অত্যন্ত হিতকর।

ডাক্তার এ. রোলিয়ার (Dr. A. Rollier) একজন সুইজারল্যান্ডবাসী বিশেষজ্ঞ রৌদ্র-চিকিৎসক। ইনি ১৮ বৎসর ধরিয়া এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। সুইজারল্যান্ডের Leysin প্রদেশে দু'টি আলুপ্‌স পর্ব্বতের উপর তাহার চিকিৎসাগার (Clinics) স্থাপিত। তুপুটে অব্যবহিত পরবর্তী তরের বায়ু ততটা বিস্কন্ধ নহে; তাহাতে

সূর্য্যকিরণ ও অস্ত্রাশ্র পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এবং ইয়োথোপ মতাদেশে সূর্য্যকিরণ ততটা সুলভ নহে। এই দুই কারণে ডাক্তার রোলিয়ার আলুপ্‌স পর্ব্বত-পৃষ্ঠে দু'টি স্থান তাহার চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। কারণ, এখানে দু'টি পদার্থই অপ্রত্যক্ষ সুলভ। এক্ষণে দু'টি স্থানে চিকিৎসাগার স্থাপনের আবশ্যিকতা প্রবল কারণ আছে। সূর্য্যকিরণে রৌদ্রের পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিতে অনেকটা বায়ু পুর তেজ করিয়া আসিতে হয়। এই বায়ুপূর সূর্য্যকিরণের কতকটা বাছিয়া ফেলে। সেইজন্য সমস্ত তুপুটে যে সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়, তাহাতেই ultra-violet rays সবটা থাকে না।

ডাক্তার রোলিয়ারের বিশ্বাস এইরূপ যে, চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা-সাধা যন্ত্রা-রোগ-তা সে শরীরে যে-কোন স্থানেই হটক না কেন, এবং যত দিনের পুরাতন রোগই হটক না কেন,—নিরাময় করা যায়।

পূর্বে চিকিৎসকেরা মনে করিতেন, অস্ত্র-চিকিৎসা-সাধা যন্ত্রা-রোগ স্থানীয় বাধি, অর্থাৎ উহা শরীরের যে-অংশে হয় কেবল সেই অংশই পীড়িত হইয়া থাকে। অধুনা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বলে জানা গিয়াছে যে, ঐ বাধা সত্য নয়। কোন স্থানে রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে শরীর সাধারণভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে; এবং সেই দুর্বলতার সুযোগে রোগ প্রবল হইয়া থাকে। অতি বেশকাল হটমুখে যন্ত্রা রোগের বীজাণু মানব-দেহে বসমান থাকে। শরীরের যে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ-শক্তি আছে, তাহারই প্রকরণ এই বীজাণুগুলি শাস্ত্র সংযত থাকে, প্রবল হইতে পার না। কিন্তু শরীর দুর্বল হইয়া পড়িলে আর তাহাঙ্গিকে বাধা দিতে পারেন না। কাজেই রোগ প্রবল হইবার সুযোগ পায়। সংক্রামক রোগ-মুহুরে মধ্য যন্ত্রা-রোগ শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। অতএব ইহার প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইলে কেবল স্থানিক চিকিৎসা করিলে চলে না, শরীরে সাধারণভাবে বলাধান কাংক্ষা তাহার রোগ প্রতিরোধ শক্তি আগে বাড়াইয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ভাবে এবং যতটুকু মাত্রায় রৌদ্র প্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যকিরণ হইবে। রোগীর সমগ্র উৎসাহ দেহে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যকিরণের প্রভাব এবং বিস্কন্ধ অংশ পার্শ্বিক বায়ু সেবনে তাহার স্বাস্থ্যের সমুদ্র উন্নত হয়।

মানুষের গাত্রে চর্ম্ম একটি শুষ্ক জিনিস। ইহা যে কেবল শরীরের ময়লা লোম-কূপের শুষ্কতা দূর করিয়া লয় তাহা নয়; ইহা বাহির হইতে নানা বস্তু শোষণ করিয়া থাকে। বায়ু-শুষ্কতা, জল, এবং উষ্ণতা চর্ম্ম দ্বারা শরীরে শোষিত হয়। বায়ুতে আর একটি পদার্থ আছে—তেজ, energy। চর্ম্ম এই atmospheric energyও শোষণ করে। এই জিনিসটি যে কি তাহাও এখনও সঠিক নির্ণয় হয় নাই; তবে ইহা আছে, এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। যুক্ত বায়ুতে অবস্থিতি করিয়া এই তেজ শোষণ করিয়া বহুদিনের শয্যাগত রোগী অচিরে বলবীর্ণ লাভ করিয়া থাকে।

সকল রোগী একইভাবে এই চিকিৎসা সফল করিতে পারে না। ইহা সওয়ারিরা লইতে তিন-তিন রোগীর শিল্প তিন পরিমাণ সময় লাগে। একেবারে সমগ্র দেহে সমস্ত দিন ধরিয়া রৌদ্র লাগানো হয় না। প্রথমে শরীরের সামান্য একটু অংশ অদৃশ্য রাখিয়া সামান্য কালের জন্য

রৌত্র লাগানো হয়। ক্রমে-ক্রমে দেহের বেশী বেশী অংশ অনাবৃত করিয়া বেশীকণ সময় রৌত্র পোহানো হয়।

সূর্যালোক কি? তাহার এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? সূর্যালোক সমগ্র মৌরুজগতে আলোকের একমাত্র উপাদান। উহা প্রকৃতপক্ষে একটা তেজ মাত্র। ইহারের মধ্য দিয়া এই তেজের তরঙ্গ আসিয়া আলোরূপে আমাদের চক্ষু প্রতিক্রিয়া করে। এই তেজ আবার ইলেকট্রনের কম্পন হইতে উদ্ভূত। জড়-বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন—ইলেকট্রন। একটি কেন্দ্রে চতুর্দিকে ইলেকট্রনগুলি থাকিয়া কম্পিত হয়। ইলেকট্রনের সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি হয়। ঐ কেন্দ্রটি পঞ্জিচিত ভাঙিত ও ইলেকট্রনগুলি নেনেটিভ ভাঙিত-গুণসম্পন্ন; কাজেই উহাদের সমবায়ে ইলেকট্রনগুলি নিরস্ত কম্পিত হইতেছে। কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে কম্পনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়; এবং বস্তুটি দীপ্ত হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন খাতুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা জ্বল হয় ও তাহা হইতে আলো উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ উহা হইতে তেজের তরঙ্গ চারিদিকে বিকিরণ হইয়া পড়ে। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ও কম্পনের গতিবেগ বিভিন্ন প্রকার। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বেতার বার্তাবাহকের কাজে লাগে। যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম, তাহার কম্পন বেগ তত বেশী। দৈর্ঘ্য যে তরঙ্গ দ্বিতীয়, তাহার নাম হার্টজিয়ান তরঙ্গ। তৃতীয় তরঙ্গ গুণ উৎপাদন করে। চতুর্থ তরঙ্গ আলোর সৃষ্টি করে। আর কেবল এই তরঙ্গগুলিই মানুষের চোখে ধরা পড়ে। সূর্যের কিরণ এইসকল তরঙ্গ সমায়ে উৎপন্ন। উদ্যম্যে যেগুলি আলোক-উৎপাদক তরঙ্গ, বাহ্য আমরা দেখিতে পাই, বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের luminous rays বলিয়া থাকেন, তাহার কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। একটি ত্রিকোণাকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য-কিরণ দর্শন করিলে এই বর্ণগুলি দেখা যায়। রামধনুও এই বর্ণ সমায়ে উৎপন্ন হয়। উক্ত কাচখণ্ডকে spectrum বলে। ইহার মধ্যে যে-সকল বর্ণ দেখা যায়, উদ্যম্যে এক প্রান্তের বর্ণ infra-red rays ও অপর প্রান্তের বর্ণ ultra-violet rays। লাল বর্ণটি তাপজনক। আর তীব্র বেগুনী বর্ণটি রাসায়নিক বর্ণ। আলোক রেখাটিই কটোগ্রাফের স্টেটে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে চিত্র উৎপাদন করে। এই আলোক শরীরের তত্ত্ব বা চিকিৎসিক উদ্বেজিত করিয়া থাকে।

ঋতুভেদে সূর্য কিরণের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের কল মানবদেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ঋতুভেদে রৌত্রের উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহের অবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। আমাদের শরীরে যে ductless glands আছে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের ক্রিয়া ভাল হয়। গোলকীয় thyroid gland এ শতকালের অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে আরোক্তির পরিমাণ অধিক দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দেহের রক্তে চূর্ণ ও কসকাসের ভাগ বেশী থাকে। রক্তে এই ছুই পদার্থ কমিয়া গেলেই শিশু rickets রোগে আক্রান্ত হয়। সূর্যকিরণ-সম্পাতে এই দোষ শীঘ্রই কাটিয়া বাইতে পারে।

উত্তপ্তকরণের উপরও সূর্যকিরণের প্রভাব অল্প নহে। বসন্ত: রৌত্র না পাইলে গাছপালা প্রায় বাঁচে না। যদি বাঁচে, তথাপি রুগ্ন অবস্থার কোনরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত আমাদের অস্ত্রম খাদ্য। উত্তপ্ত খাদ্যের সহিত আমরা সূর্যকিরণ ভক্ষণ করি। যে শাকসব্জি বা তরকারী যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যকিরণ ভোগ করিতে পারে নাই, সেসকল উত্তপ্ত বস্তু আহাৰ করিলে আমরাও আহাৰের সম্যক কল প্রাপ্ত হই না—আমাদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত করে।

সূর্য-কিরণ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভোগে আসে না, রৌত্র

সেবন করিয়াও যে ক্ষেত্রে আমরা উপকার পাই না, সে-সব ক্ষেত্রে খাদ্যে রৌত্র খাওয়ারই সেই খাদ্য ভক্ষণে প্রকৃত উপকার লাভ করা যায়। ইন্দুর-শাবকের উপর সূর্য-কিরণের এই বিশেষ গুণটির চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন কালের লোকেরা সূর্যকিরণের এই মহৎ গুণের কথা জানিতেন। সেইরূপ অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্যোপাসনা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে।

মেক্সিকো ও পেরুদেশে মেগাস্ ও আস্টেক্ নামক প্রাচীন জাতি-দ্বয় সূর্যোপাসক ছিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে, ইশ্রৈগাইট্‌স্, ইজিপ্‌সগান্‌স্, আরব্য জাতি চাল্ডিয়ান্‌স্, সীরিয়ান্‌ ও রোমান্‌ জাতি পূর্বকালে সূর্যোপাসনা করিতেন। বর্তমান কালে পার্শ্বীরা সূর্যোপাসনা করেন। নিষ্ঠাবান 'হিন্দু উষাহান সারিরা "ঋতুকৃৎসমস্তাং" মন্ত্র-জপ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। খৃষ্টানদের রবিবার বা সূর্যবার পবিত্র দিবস বলিয়া গণ্য। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা Aesculapius সূর্য, ঔষধ ও সন্মোক্তের দেবতা ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যে গ্রীক স্থাপত্যের অন্তর্গত কোস (Cos) স্থানে একটি স্বাস্থ্যমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের পুরোহিতেরা চিকিৎসক ছিলেন। রোগ-নিরাময়-কল্পে বাতাস, আলো ও জল এখানে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত।

(স্বাস্থ্যসমাচার, বার্তিক ১৩৩২)

দাঁতের কদর

সাধারণতঃ দাঁতের দ্বারা আমরা তিনটি উপকার পাই—

(১) প্রধান উপকার—দাঁত আমাদের খাদ্যগুলি চর্ষণ করিয়া সহজপাচ্য করে। খাদ্য রীতিমত হজম হইলে অধিকাংশ রোগ নিকটে আসিতে পারে না। নীরোগ-শরীর কারো উৎসাহ দেয় ও জীবনে শান্তি আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শরীর বস্তুগাদায়ক ও অকেন্দ্র।

(২) দাঁত আমাদের মস্তিষ্কে কথো বলিতে সাহায্য করে। বাহাদের কতক দাঁত নাই, তাহাদের কথা অস্পষ্ট হয় ও প্রতি মধুর হইতে পারে না। কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য অল্পকৈ সন্তুষ্ট রাখা ও নিজ মতে আনয়ন করা। দস্তহীন লোকেরা এই ছুইটি কাজের কোনটিতেই বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারে না।

(৩) মুখের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করাও দাঁতের একটি কাজ। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে মুখখানা বিকীর্ণ দেখায়।

দাঁত আমাদের জীবনে ছুইবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে, তাহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬-৭ বাস, তখন হইতে দুধে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং আড়াই বৎসর পর্যন্ত উঠে। এই দাঁতগুলির মোট সংখ্যা ২০টি প্রত্যেকসারিতে দশটি করিয়া। এই দাঁতগুলি সাধারণতঃ দেখিতে খুব সুন্দর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাঁত না উঠা পর্যন্ত এই দাঁতগুলি থাকিবে।

৬-৭ বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাঁত উঠে। স্থায়ী দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২টি, অর্থাৎ প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টি করিয়া। এই দাঁতগুলি দুধে দাঁত হইতে বড় হয়। এই দাঁতের মধ্যে কয়েকটিকে বলে আকেন দাঁত। তাহা ১৭ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বাহির হয়। এই দাঁতগুলি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকার কথা।

সব দাঁতগুলি দেখিতে এক প্রকার নয়। কোনগুলি ধারালো, কোনগুলি চোখা, কতকগুলির উপরিভাগ প্রশস্ত ইত্যাদি। প্রত্যেক রকম দাঁতের পৃথক পৃথক নাম আছে। দাঁতের রক্ষণকর কাজ করিতে হয় বলিয়া দাঁতও রক্ষণকর। কতকগুলি দাঁতের দ্বারা

খাবার জিনিস কর্তন করিবার সুবিধা হয়, কোনগুলি শক্ত খাদ্য-দ্রব্য সহজে ছিঁড়তে পারে, আর কতগুলি ভক্ষ্যসহ সহজে পিষিতে পারে। দাঁতগুলির উপরিভাগ সমতল নহে, তাহাও কাজের সুবিধার জন্য।

দাঁতগুলির রীতিমত ব্যবহার না করিলে দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরিষ্কারের দরুন দাঁতের গায়ে একপ্রকার পাথরের স্তর শক্ত জিনিস জন্মে, তাহাও দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেক বলেন, দাঁত দিয়া যে রক্ত পড়ে, ইহাই তাহার কারণ। দাঁত রীতিমত পরিষ্কার না করিলে খাদ্যবোর টুকরা ছুই দাঁতের মধ্যে থাকার দরুন দাঁত ক্রমশঃ ক্রম হইয়া যায়। দাঁতরক্ষা-সম্পর্কে কতকগুলি কথা নিম্নে বলা হইবে। আশা করা যায় তাহা অনেকের উপকারে আসিবে।

(১) শিশুকাল হইতেই ছেলে-মেয়েদিগকে দাঁত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করাইতে হইবে। এইটি মার'র কাজ। একবার অভ্যাস হইলে দাঁত পরিষ্কার করিতে কোনও ক্রটি কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। শৈশবে অনেকের দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস না থাকায়, বড় হইয়াও তাহার দাঁতের প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না; ফলে অল্প বয়সে দাঁত নষ্ট হইয়া যায়।

(২) যখন দুঃখ দাঁত পড়িয়া স্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে, তখন মাতা ছেলে-মেয়েদের দাঁতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দাঁত নড়িলে বাহাতে যথাসময়ে উঠানো হয় তাহা করিতে হইবে। অনেক ছেলে-মেয়ে বেদনার ভয়ে যথাসময়ে নড়া দাঁত উঠায় না, ফলে দুঃখ দাঁত থাকার অবস্থায়ই স্থায়ী দাঁত উঠে, ইহাতে মুখ দেখিতে বিকী ও দাঁতগুলি বেকাতেড়া হয়। পরে চেষ্টা করিলেও এই দাঁতগুলি পরিষ্কার করা যায় না।

(৩) খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা দ্রব্য আহাৰ করিবে না, কারণ উভয়ই দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর।

(৪) নিম্ন, বট প্রভৃতি গাছের কোমল শাখাগ্রকে ত্রাশের মতন করিয়া দস্ত মার্জন করিবে। ত্রাশ ব্যবহার করিলে খুব শক্ত ত্রাশ ব্যবহার করিবে।

(৫) দাঁতন বা ত্রাশ দ্বারা দাঁতের বাহির ভিতর ও মাড়ির সমস্ত স্থানই মার্জনা করিবে। মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হইলে ভীত হইবে না; আরও দৃঢ়তার সহিত মার্জনা করিবে।

(৬) দাঁত মাজিবারও নিয়ম আছে। উপরের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে মাজিবে। নীচের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে মাজিতে থাকিবে। এইরূপে দাঁত মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয়। অস্ত্রভাবে মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয় না। এইরূপ দাঁত মাজার অভ্যাস হইলে কয়েক দিন পরে কোনই কষ্ট অনুভব হইবে না।

(৭) দিনে দুইবার দাঁত মাজিবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া একবার, আর রাত্রে খাওয়ার পর শয়নের পূর্বে একবার। আমরা সাধারণতঃ প্রাতে দাঁত মাজিয়া রাত্রে আর কেহই দাঁত মাজি না। দুই দাঁতের মধ্যস্থিত ছিঁড়ের ভিতর খাদ্যবোর টুকরা থাকে, তাহা রাত্রে পচিয়া দাঁতগুলির অনিষ্ট করে। ঘুমাইবার পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করিলে পাত্তাবিশিষ্টগুলি বাহির হইয়া যায় ও রাত্রে দাঁতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

(৮) দাঁত মাজিবার জন্য সুলাবান্ দস্তমঞ্জনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। সামান্য একটু লবণ ও কটুকিরির মিহি-ভাঁড়ার সহিত পরিষ্কার চকের গুড়া দ্বারা মাজিলেই চলে।

(৯) কোন দাঁত নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা উঠাইয়া কেলিবে; কিম্বা তাহার চিত্রগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করিয়া কেলিবে। কখনও তাহা ডাক্তার না দেখাইয়া রাখিবে না, বেদনা না থাকিলেও ডাক্তার দেখাইবে।

(১০) দাঁত পড়িয়া গেলে উঠাইয়া কেলিলে কৃত্রিম দাঁত বগাইয়া লইবে; ইহাতে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

(১১) কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা সহজে দাঁত পরিষ্কার করে; যথা,—নানাপ্রকার শাক, ফল প্রভৃতি। খাবার শেষে এইরূপ দাঁত পরিষ্কারক খাদ্য খাইলে ভালো হয়।

(১২) “মলমূত্র পরিভ্রাণের সময় দস্তে দস্তে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে। যতক্ষণ মলমূত্র নিঃসারণ হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়া থাকিলে শীঘ্র দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কাঁচাফস থাকিবে।” (নিগমানন্দের ব্রহ্মচর্যা-সাধন)।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, কার্তিক ১৩৩২) শ্রী জগদীশচন্দ্র মজুমদার

পুস্তক-পরিচয়

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রী কীরোদকুমার দাস প্রণীত।

দাম বাধাই এক টাকা, সাঃ বাঃ বারো আনা। ১৩৩২।

কবিতার পুস্তক—এই পুস্তকখানিকে গদ্য কাব্য বলা চলে। কবি যদি তাহার লেখাগুলিকে কবিতা না বলিয়া দিতেন তবে সাধারণ পাঠক তাহা গদ্যের মতন পড়িয়া বিবম ভ্রমে পড়িত। কবি নানা-প্রকার ছন্দে গদ্য-কাব্য রচনা করিয়াছেন। অসম্বন্ধে উপর কবির যথেষ্ট একান্তর আছে। স্থানাভাববশত মাত্র দু-একটি কবিতার নমুনা দিলাম—

(১) তাই বলি পুনঃ, হে মানবগণ,
ছেড়ে যাও দলাদলি,
সবলে ছুর্কীলে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
কর সবে কোলাকোলি।

(২) সন্দেশ বানায় সুদি

খায়ে সন্দেশ

প্রশংসা অশেষ,

করে তা'রে অকাতরে

ভালো হয় যদি,

মিঠাই ও ছুতি—।

বইখানিতে এইপ্রকার বহুত সু-কবিতা আছে।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত গল্পের বই।

মোসলিম পাবলিশিং হাউস, কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ।
দাম দেড় টাকা। ১৩৩১।

ষটক এম্-এ। ২৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে কলোজ পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩০২।

বাংলা মাসিকপত্রিকার পাঠকপাঠিকাদের নিকট মূললেখক হরেশ-বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিম্নরোজন। এক-একটা ঐতিহাসিক কালপর্যায়কে আশ্রয় করিয়া গল্পগুলি রচিত। দুই-একটি গল্পে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য-বন্ধনের বে-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অধিকানবোধ্য। লেখকের ভাষা উত্তম ও রচনাতত্ত্বী জড়তা-বর্জিত। ত্রিবেণীর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। বই-দুইখানির ছাপা ও বাধাই চমৎকার।

প

শশাঙ্কবর্ধন—শ্রী নিরঞ্জন বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নলিন চন্দ্র বসু, ৩ ইন্ডিয়ান ঠাকুর লেন, বর্ডিশপাড়া, কলিকাতা। পাঁচ টাকা। ১৩০২।
লেখক ভূমিকার লিখিতাছেন—“শশাঙ্কবর্ধন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু নাটকখানি ঐতিহাসিক নাটক নহে; ইহা নাট্যকাব্য।” নাটকখানি গলাফ। চরিত্রগুলি বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের হাত কাঁচা নয়, রচনার দক্ষতা আছে।

জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ)—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুখে-মুখে যে-সব ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন প্রহকার (মহর্ষির পোত্র) তাহাই লিখিয়া রাখিয়া প্রহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যে গভীর ধর্মোপলক্ষ্যের পরিচায়ক—তাহা বলাই বাহুল্য। পুস্তকখানি আমাদের ধর্মপ্রস্তুতকারক রত্ন পূর্ণ করিবে। ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

চাণক্য—শ্রী হুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৬টাচার্য এণ্ড সন্স ৬৫ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক “মুদ্রারাক্ষস” হইতে এই চাণক্য চরিত্রকথা সংগৃহীত হইয়াছে। গোড়ার অংশটি ইতিহাস হইতে গৃহীত। বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস, রাজনীতিকুশলতা প্রভৃতি গুণে চাণক্যের চরিত্র অদ্ভুত কৌতুহলপূর্ণ। এক্ষণে চরিত্রের সহিত ছেলোদের পরিচয় হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রহকার সহজ ভাষায় চাণক্যচরিত্র গাঁথিয়াছেন। বইখানি স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

সব ভাল যার শেষ ভাল, কুঁড়ুলির শিক্ষা, হ্যাম্লেট—তিনখানা বই-ই শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী প্রণীত। প্রত্যেক খানির মূল্য দুই আনা। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, ১২১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের বোধগম্য করিয়া সরল ভাষায় Lamb's Tales from Shakespeare অনুসরণে গল্পগুলি লিখিত। বইগুলি ভালো হইয়াছে। আণা করি প্রহকার এ জাতীয় পুস্তক আরো লিখিয়া শিশু-সাহিত্যের অভাব মোচন করিবেন।

প্রভাতী—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক আদি ব্রাহ্ম-সমাজ, ৫৫ আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা। বারো আনা।

ধর্মমূলক গ্রন্থ। সুলিখিত।

মাটির ঘর—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রিট-মার্কেট, কলিকাতা। দুই টাকা।

উপভাস। লোহার কারখানার চাকুরিজীবী অনিলের দাতিত্ব-

গীড়নে প্রহরর বদেখপ্রম উপযুক্ত সম্বন্ধে পরিণতি লাভ করিল। সব চরিত্রগুলিই সুন্দর হইয়াছে। সুলিখিতা স্বাধীন হইলেও দীর্ঘ আধুনিক নভেলের বিলাতী কারবার প্রমে পড়িল না, অথচ উপযুক্ত বাঞ্ছনীয় স্বামী লাভ করিল। ঘোটের উপর বইটি সুন্দর হইয়াছে। রচনা সহজ, সরল—কোথাও আড়ম্বর নাই, জড়তা নাই। ভাষার উপর লেখকের প্রচুর দখল আছে। বইখানির দাম বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছাপা ও বাধাই ভালো।

ভূঁইচাঁপা—শ্রী দীনেশচন্দ্র দাস। বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রিট-মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

গল্পের বই। সাতটি গল্প আছে। কয়েকটি গল্প ভালো। বাকি-গুলি অসরল, জটিলত্বী, একঘেয়ে প্রেমের হা-হতাশে পূর্ণ।

ফস্তু—শ্রী বোপেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্ এ, বি-এল্। প্রকাশক মনোমোহন প্রেস, ঢাকা। এক টাকা।

কবিতার বই। অধিকাংশ কবিতা চলনসই। দুই-একটি কবিতা ভালো লাগিয়াছে।

শ্রী শ্রী বিজয়-মঞ্জল—শ্রী বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রী বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমোরিয়া, ঢাকা। দেড় টাকা।

বিজয়কুক পোখামী মহাশয় তত্ত্ব ও শিষ্যগণকে যে সব উপদেশ ও সংশিক্ষা দান করেন এবং তাঁহাদের সহিত যে সব সমালোচনা করেন তাহাই এই পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া বরদা-বাবু ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের ও সাধারণের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন। ধর্মতত্ত্বগুলি একটু জটিল হইলেও ইহা পরমহংসদেবের কথাসুতের দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিবে।

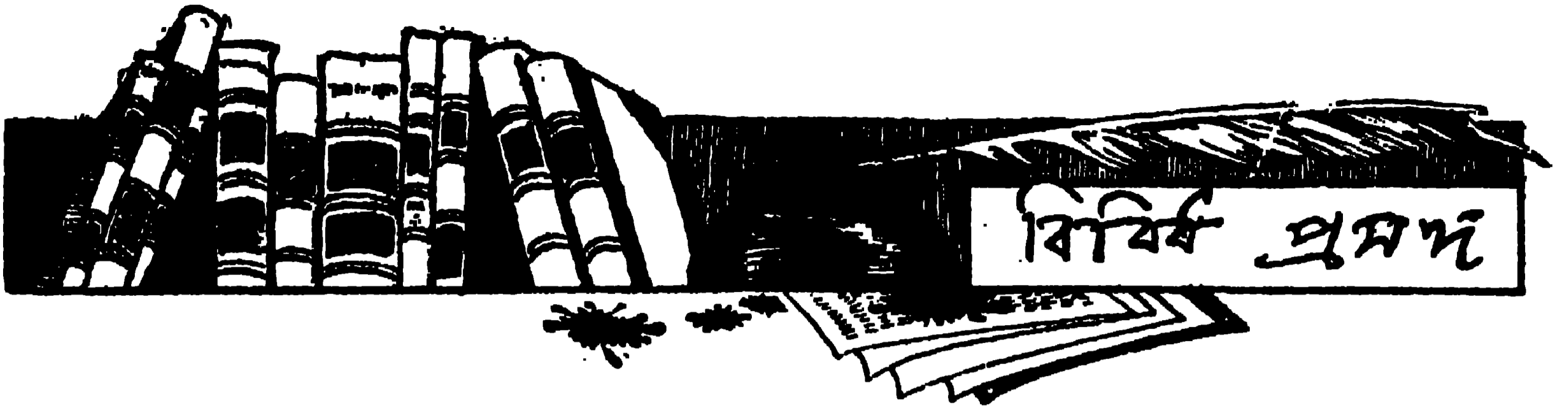
বন্দীজীবন (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রিট-মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা।

ভূমিকার আছে—“বিগত যুদ্ধের সময় সারা উত্তরভারতজোড়া কিরুপ বিরাট বিপ্লবরোজন হইয়াছিল তাহা ‘বন্দীজীবনের’ প্রথম খণ্ডে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে ঠিক তাহার ঘটনা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। পঞ্জাবের বিপ্লবরোজন পশ্চ হইবার পর কিরুপে বিপ্লবরোজন হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতার কলে তাহাও কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়—এইসব কথা এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।” প্রথমখণ্ড পড়িয়া বাঁহারা উৎসুক ছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের উৎসুক সানন্দ ভূগি লাভ করিবে। শচীন্দ্র বাবুর রচনা সুন্দর, শক্তিশালী।

নানা কথা—বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩:১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দুই টাকা।

বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিবেদী মহাশয়ের বারোটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। চিন্তাস্বাতন্ত্র্য, সরল ধীর বুদ্ধিবাদে, বক্তব্য বিষয়ের ধীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যানে এবং সারল্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধ অধিতীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রবন্ধগুলি বহুদিন আগেকার লেখা। তাহা হইলেও ইহাতে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে যাহা আমাদের আবার পাঠ করিবার দিন আসিয়াছে, যেমন—রাষ্ট্র ও নেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, শিক্ষা-প্রণালী, পরাধীনতা প্রভৃতি প্রবন্ধ। বক্তব্য বিষয় এত সরলভাবে অভিব্যক্ত ও এমন স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত যে, অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষেও এগুলি বোধগম্য। ইহাই ত্রিবেদী-মহাশয়ের বিশেষত্ব। আমরা সর্বসাধারণকে মনীষী বামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাকে আবার মনের মধ্যে কার্যকরী করিতে অনুরোধ করি।

গুপ্ত



ভারতে বিদেশী হিতসাধন চেষ্টা

কয়েক মাস হইল, জাপান হইতে “দি ইয়ং ইন্সট্” বা “তরুণ প্রাচ্য” নামক একটি উৎকৃষ্ট দৈনিক পত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জাপানে জনহিতসাধক কতগুলি প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। আমরা নীচে তাহার বাংলা অনুবাদ দিচ্ছি।

কাজ	বৌদ্ধ	খৃষ্টিয়	শিষ্টো	মোট
কৈশোর চরিত্রসংস্কার	১৬	১	২	১৯
শিশুর ধার্মীকতা	৮৩	২২	১	১০৬
শিশুদের রক্ষা	৮	২	০	১০
দুর্ভবল বা অস্বাভাবিক				
শিশুদের রক্ষা	৬	১	০	৭
দরিদ্রদিগকে সাহায্যদান	৩৮	৯	১	৪৮
বিনামূল্যে চিকিৎসা	১২	৭	০	২৬
বুদ্ধ দরিদ্র পোষণ	১৪	৩	০	১৭
বিপন্নদিগকে পরামর্শদান	১৬	৪	০	২০
বেকারদিগের কাজ জুটানো	১৫	৩	২	২০
বিনাভাড়ায় বাসা দেওয়া	২৪	১	০	২৫
বিবিধ	৭	২	০	৯
মোট	২৪৬	৫৫	৬	৩০৭

জাপানী কাগজখানির সম্পাদক লিখিতেছেন, যে, জাপানের শিকাবিভাগের অন্তর্গত ধর্মসম্বন্ধীয় আফিসে যে-সকল হিতসাধক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট প্রেরিত হয়, উপরের তালিকাতে কেবল সেইগুলিই গণিত হইয়াছে। অনেক জাপানী বৌদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে উক্তপ্রকার নানা প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকেন, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধীয় আফিসে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠান না। তাঁহাদের দ্বারা করা উচিত তাঁহারা তাহা করিতেছেন, ইহা অসম্ভব করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। অন্তর্দিকে খৃষ্টিয়ানেরা লোকহিত চেষ্টার উপর খুব ঝোঁক দেন ও তাহাতে খুব মনোযোগী বলিয়া তরুণ কোন কাজ করিলে তাহার রিপোর্ট যথাসময়ে উক্ত

আফিসে পাঠাইয়া দেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রায় সমুদয় হিতসাধক প্রতিষ্ঠান উপরের তালিকায় গণিত হইয়াছে। বোধহয় যদি সকলে খৃষ্টিয়ানদের মত তাঁহাদের সব হিতসাধনচেষ্টার রিপোর্ট দিতেন, তাহা হইলে মোট সংখ্যা উপরের সংখ্যার তিনগুণেরও অধিক হইত।

জাপানী সম্পাদকমহাশয়ের যে-সব মন্তব্যের তাৎপর্য উপরে দিলাম, তাহা বিবেচনা না করিলেও দেখা যাইতেছে, যে, জাপানী বোধহয় খৃষ্টিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী হিতসাধক প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকেন। জাপানে খৃষ্টিয়ানদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলে বিদেশীদের টাকায় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারা জাপানের চেয়ে ধনী দেশের লোক। তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, যে, স্বাধীন জাপানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশী লোকেরা ধনী বিদেশী খৃষ্টিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী-পরিমাণে সমাজসেবার কাজ করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা যে কেবল রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন তাহা নহে, সমাজসেবা বিষয়েও তাঁহারা আত্মনির্ভর-পরায়ণ ও স্বাবলম্বনসমর্থ।

জাপানে হিতসাধক প্রতিষ্ঠানগুলির যেরূপ সরকারী তালিকা আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কোন তালিকা সংগ্রহের সরকারী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে, ভারতবর্ষে বিদেশী খৃষ্টিয়ানরা সংখ্যায় কম হইলেও যত হিতসাধক প্রতিষ্ঠান চালান, হিন্দুমুসলমানবৌদ্ধজৈন প্রভৃতির সংখ্যায় বেশী হইলেও তুলনায় তত বেশী চালান না। ইহার সমুদয় কারণ অনুসন্ধান এখন করিতে পারিতেছি না। এখন কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, আমরা যেমন রাজনৈতিক পরাধীনতাগ্রস্ত, সমাজসেবা বিষয়েও তেমনি অনগ্রসর এবং স্বাবলম্বনে অসমর্থ।

বিদেশীদের ভারতহিতৈষণা

বিদেশী খৃষ্টিয়ানেরা ভারতবর্ষে অনেক লোকহিতকর কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্কুল কলেজ অনাথালয় চালান, হাসপাতাল চালান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রদান করেন, দুর্ভিক্ষের সময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন, ভূমিকম্প, জলপ্রাবন, ঝড় প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন, পতিতাদের উদ্ধারচেষ্টা করেন, মদ্যপানাদি নেশার অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, চুরি ডাকাতি যাহাদের পেশা একরূপ অমূল্য জাতিদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। অনেকস্থলে তাঁহারা খৃষ্টিয় সমাজের দল পুট করিবার জন্য এইসব কাজ করেন, এবং তাহা করিতে পারিলে প্রেস্টিজ পাদরীদের পদোন্নতি ও আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়া থাকে, সুনিয়াছি। তাহা হইলেও কাজগুলি ভাল।

খৃষ্টিয় মিশনারী এবং অন্তর্বিদেশী জনহিতৈষীরা ভারতবর্ষে যে-সব কাজ করিয়া জগতে লোকহিতসাধক বলিয়া পরিচিত হন, তাহা করিবার সুযোগ তাঁহারা এই জন্য পাইয়া আসিতেছেন, যে, ভারতবর্ষে গবর্নেন্ট পূর্ণমাত্রায় নিজের কর্তব্য করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

খৃষ্টিয় মিশনারীরা ভারতীয় ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অনেক ছোটবড় শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহারা সর্বত্র যশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের গবর্নেন্ট কর্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে দেশের সর্বত্র যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপিত হইত এবং মিশনারীদের একরূপ কাজ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না ও সুযোগ জুটত না। অতএব, ইহা বলিলে অন্তায় হইবে না, যে, বিদেশী গবর্নেন্টের একটিই বিদেশী মিশনারীদিগকে বিদ্যাভিত্তিক হইয়া প্রশংসা পাইবার সুযোগ দিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের সময় খৃষ্টিয় মিশনারীরা বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন এবং অনেক পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত বালকবালিকার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা

করেন। কিন্তু দেশে যদি দুর্ভিক্ষ না হইত, তাহা হইলে মিশনারীদের এইরূপ কাজ করিবার সুযোগ হইত না। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইত না, এমন নয়; হইত। কিন্তু পুরাকালে দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর নানা দেশে যেরূপ হইত, এখন আধুনিক প্রণালীতে শাসিত স্বশাসক সভা কোন দেশে যুদ্ধজনিত কারণ ভিন্ন তাহা হয় না। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে পুরাকালে যেমন দুর্ভিক্ষ হইত, সেরূপ দুর্ভিক্ষ তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্তর্বিদেশী অনেক দেশেও হইত; কিন্তু পাশ্চাত্য ঐ সব দেশের অধিকাংশে অন্ততঃ শত বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। পঞ্চাশতাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব যতগুলি, যেরূপ ব্যাপক, এবং যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণঘাতক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে তাহা হয় নাই। ইহার অর্থ এই, যে, ইংরেজ জাতি যেরূপ শাসন-ব্যবস্থা, পণ্যব্যাপ্যপাদন-ব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি, মহাজনী ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা নিজের দেশে ও উপনিবেশসমূহে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্য তদ্রূপ কিছু করিয়া ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের বা ভারতীয়দের প্রকৃতিগত কোন দোষকে সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী করা যায় না। ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত দোষ কিছুই নাই, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। কারণ, ভারতবর্ষের দৌলতে প্রধানতঃ ইংরেজ জাতি ধনী হইয়াছে; তা ছাড়া জার্মানীও অনেকটা ধনী হইয়াছে এবং এখন জাপান হইতেছে। ভারতীয় মানুষদের দোষ অবশ্য কিছু আছে; কিন্তু প্রধানতঃ সেই মানুষদেরই পরিশ্রমে যখন বিদেশী নানা জাতি ধনী হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় না, তখন সকল রকমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে আমাদের দোষ সুধরাইয়া আমাদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমাদের দেশেও যে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের বক্তব্য এই, যে, যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর গুণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আর দুর্ভিক্ষ হয় না, সেই ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর গুণে

কিন্তু ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত সেরূপ অবস্থার আবির্ভাব হয় নাই। ইহার জন্য মিশনারীরা লোকহিতসাধক বলিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আরও নানা-প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই।

বিদেশী খৃষ্টীয় মিশনারী ও অন্ত বিদেশী ভারত-হিতৈষীরা কেহই হিতৈষী নহেন, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত ভারতহিতৈষণা কি এবং পূর্ণ মাত্রায় ভারত-হিত কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারই আলোচনা আমরা করিতে চাই।

একটি গরীব অসহায় ছেলে যদি কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সে যতবার সাহায্য চাহিবে, ততবার তাহাকে কিছু অন্ন, বস্ত্র বা পয়সা দিলেই পূর্ণ-মাত্রায় তাহার হিতৈষিতা করা চইবে না; বরং কোন কোন স্থলে কেবল তাহার ক্রমাগত সাহায্য করিলে তাহাকে পেশাদার ভিক্কু বানাইয়া ফেলিয়া তাহার প্রভূত অনিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রকৃত হিতৈষী তিনি, যিনি বালকটিকে এরূপ পরামর্শ ও সাহায্য দিতে পারেন, যাহাতে সে মানুষের মত নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। নতুবা কেহ যদি তাহার বার্ষিক্য পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করে, তাহা তাহার প্রকৃত হিতৈষিতা না হইয়া তাহার বিপরীতই হইবে।

কোন বালক যদি নিজের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য কোন বিদ্বান ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সে যাহা জানিতে চায় তাহা বলিয়া দেওয়া অবশ্যই তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তাহার হিতৈষী হইতে হইলে তাহাকে এমন পরামর্শ ও উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে সে পরে ক্রমশঃ নিজেই জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের অজ্ঞতা দূর করিতে পারে।

বস্তুতঃ কাহাকেও কোন বিষয়েই চিরকাল পরমুখা-পেকী করিয়া রাখিলে সাহায্যদাতার আত্মগৌরব অল্পভব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সুযোগ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পরনির্ভরপরায়ণ লোকটিকে খাট করিয়া রাখা হয়; সুতরাং এরূপ ব্যবস্থায় তাহার পূর্ণ হিতৈষিতা করা হয় না।

ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য।

বিশ্বের সভ্যদেশে সরকারী ব্যবস্থার গুণে ও উদ্দেশ্য-বাসীদের নিজের চেষ্টায় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশেও ঠিক তাহাই হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে হইলে আমাদের দেশে আমাদেরই কর্তা হওয়া দরকার। সুতরাং ভারতবর্ষে যে-সব বিদেশী লোক সুল-কলেজ চালাইতেছেন, তাঁহাদের প্রাপ্য কোন প্রশংসা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া একথা আমাদের বলিতে হইবে, যে, তাঁহারা যদি আমাদের পূর্ণ হিতৈষী হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভে বাধা ত দিবেনই না, অধিকন্তু আমাদের সেরূপ চেষ্টায় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ্য-ভাবে যোগ দিবেন। যদি বিদেশী কেহ ইহাতে বাধা দেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বুলিতে হইবে, যে, তাঁহার অন্ত কাজ যাহাই হউক, তিনি পূর্ণমাত্রায় আমাদের বন্ধু নহেন,—বিক্রমচারীও হইতে পারেন। যদি বিদেশী কোন জনহিতসাধক বাধা না দেন অথচ আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে পূর্ণমাত্রায় যোগ না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমরা আমাদের সম্পূর্ণ হিতকামী মনে করিব না।

আর একটি দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। ইউরোপীয়বংশোদ্ভব লোকদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও পৃথিবীর সর্বত্র যাতায়াত যত সহজ ও বাধাহীন, আমাদের পক্ষে তাহা নহে;—বস্তুতঃ অনেক দেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তন্মিত্ত, ইউরোপীয় লোকেরা যত সহজে সরকারী নিয়ম ও উচ্চ নানাপদের লোকদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রব্যবহার করিতে পারে, আমাদের তাহা করিবার উপায় নাই। এবিধ নানা কারণে হিতসাধন-কার্যে নেতৃত্বগ্রহণ ইউরোপীয়দের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। এই বিষয়ে আমাদের আলস্তের ও জড়তার দোষক্ষালন করিবার বা প্রশ্রয় দিবার জন্য একথা লিখিতেছি না। লিখিতেছি ইহাই নির্দেশ করিবার নিমিত্ত, যে, আমাদের পরাধীনতা সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ ছই

রকমের বলিয়া বিবেচিত হয়—রাজনৈতিক এবং পণ্য-
অব্যোৎপাদন, বাণিজ্য, মহাজনৌ প্রভৃতি বিষয়ক; কিন্তু
ইহা ছাড়া স্কন্ধ আকারে আর এক রকমের পরাধীনতা
আমাদের রহিয়াছে। তাহা হিতসাধন-প্রচেষ্টা-বিষয়ক।
দেশে বিদেশে ভারতবর্ষের যে-কোন মঙ্গলের চেষ্টা
হইতেছে বা হইতে পারে, তাহার নেতৃত্ব করিবার
উপযুক্ত ভারতীয় লোকদিগকেই হইতে হইবে। নতুবা
আমরা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা কখনও লাভ করিতে সমর্থ
হইব না।

অবশ্য, ভারতীয় হিতসাধক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে
একরূপ লোক আছেন, যাহারা নিজ-নিজ নির্দোষিত কার্য-
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ভিন্ন অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া
কাজ করিতে অভ্যস্ত নহেন, এবং হয় ত তাহা করিতেও
চান না। একরূপ অভ্যাস বা মনোভাব পূরা ভারত-
হিতৈষণার সহিত সঙ্গত নহে; যেখানে যে-কোন ক্ষুদ্র
বা বৃহৎ ভাল কাজ হইতেছে, অনাবশ্যক হইলেও,
অযাচিতভাবে গায়ে পড়িয়া সেখানে গিয়া মুকস্বিয়ানা
করিবার প্রবৃত্তিও কোন বিদেশী ভারতবন্ধুর নাই, এমন
নয়। এরকম প্রবৃত্তিও অবাঞ্ছনীয়।

আমরা জানি, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায়
যোগ দেওয়া, ভারতীয়ের পক্ষে যেমন, মিশনারী বা
অন্য ইউরোপীয়ের পক্ষেও তেমন নিরাপদ নহে।
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথমতঃ ত মিশনারী-
দিগকে ইংরেজাধিকৃত স্থানে আসিতে ও থাকিতেই
দেওয়া হইত না; পরে যখন দেওয়া হয়, তখনও এই বুঝা-
পড়ার পর, যে, তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে নির্লিপ্ত
থাকিবেন। যাহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্য নহে,
মিশনারী ভিন্ন একরূপ অন্য ইউরোপীয়দের কার্যকলাপের
প্রতিও কোম্পানীর খর দৃষ্টি ছিল। এই কারণে রাম-
মোহন রায়ের সমসাময়িক সিক্‌ বাকিংহাম-নামক একজন
ইংরেজ সাংবাদিক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।
বর্তমান সময়ে বিস্তার পাত্রী গবর্নমেন্টের বেতনভোগী
ভৃত্য; অন্য রাজভৃত্যদের মত তাঁহারাও রাজনৈতিক বিষয়ে
নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য। যে-সব পাত্রী রাজভৃত্য নহেন,
তাঁহাদের অনেকেও নানাপ্রকারে পরোকভাবে গবর্ন-

মেন্টের সাহায্য পান। যেমন মিশনারীদের বালিকাবিদ্যা-
লয়ে এবং তাঁহাদের অন্ত-সব স্কুল-কলেজে বেশ মোটা-
রকমের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের
সহিত সংশ্লিষ্ট পাত্রীরা ভারতীয় রাজনীতির সহিত যোগ
রাখিয়া ভারতীয়দের সাহায্য করিতে পারেন না; কিন্তু
প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যাইতে
তাঁহাদের বাধা নাই।

ইয়াং মেন্স্ ক্রিস্টিয়ান্ এসোসিয়েশ্যন্ নামক যে দেশ-
ব্যাপী পৃথিবী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাও সরকারী পোষকতা
পাইয়া থাকে। “দি ইয়াং মেন্স্ অব ইণ্ডিয়া” নামে ইহার
একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী মাসিক পত্র আছে। কিছুদিন পূর্বে
ইহাতে ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভের
অনুকূল কিছু-কিছু লেখা বাহির হইতেছিল। কিছুকাল পর
হইতে সেরূপ লেখা আর বাহির হইতেছে না। অধিকন্তু,
আজকাল পরিষ্কার করিয়া একরূপ কথা লেখা থাকে (যাহা না
লিখিলেও সব কাগজের পক্ষেই মত), যাহাতে বুঝা যায়,
যে, প্রবন্ধাদির মতামতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল
না থাকিতেও পারে। গবর্নমেন্টের অপ্রকাশিত প্রভাব
প্রায়ঃ এই সব পরিবর্তনের কারণ বলিয়া অনুমান করিলে
বেশী ভুল হইবে না।

দক্ষিণ ভারতে মিঃ পপলা নামক একজন পাত্রী
রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতীয়দের অনুকূল মত প্রকাশ করায়
সরকারী তাড়া খাইয়াছিলেন। শুনা যায়, একজন বিখ্যাত
বাঙালী খৃষ্টিয়ান ব্যবস্থাপককে গবর্নমেন্টের কোন লোক
বিরক্তিব্যক্তির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, ইয়াং মেন্স্
ক্রিস্টিয়ান্ এসোসিয়েশ্যন্ আমেরিকানদিগকে কেন নিষুক্ত
কবেন। অবশ্য আমেরিকান হইলেই যে, কেহ রাষ্ট্রীয়
বিষয়ে ভারতবন্ধু হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরং
অনেকস্থলে উল্টাই দেখা যায়। তথাপি গবর্নমেন্ট সন্দেহ
করিতে পারেন, যে, অস্বিটিশ স্বাধীন দেশের লোকদের
পরাধীন ভারতের প্রতি অনুকম্পা হওয়া বিচিত্র নহে।

আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতীয়দিগের সহিত
যোগ দেওয়ার বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য তাহাদের
চূড়ান্ত চেষ্টার সমর্থন করায় দুই জন ইংরেজ তাড়িত
হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনের অন্ততম শিক্ষক পিয়ার্সন্

সাহেব গত মহাযুদ্ধের সময় চীনদেশে থাকা-কালে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে, যদি ভারতীয়েরা স্বাধীনতা-লাভের কোন চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য জাপানীরা যেন ইংরেজদের সাহায্য ও ভারতীয়দের শত্রুতা না করে। এই কারণে তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া একে-বারে ইংলণ্ডে চালান করা হয়, ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে এদেশে আসিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-প্রত্যাগমনের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বোম্বাই জর্নালের সম্পাদক মিস্টার হর্নিগ্যানকে কয়েক বৎসর হইল বিলাত চালান করা হইয়াছে; অনেক আন্দোলনসম্বন্ধে এখনও তাঁহাকে এদেশে আসিতে দেওয়া হয় নাই। মিস্টার এণ্ড্রু লেখায় কয়েকবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের সম্পর্কে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কার্যতঃ কেবল অরাজনৈতিক হিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, কোন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় কার্যতঃ যোগ দেন না, এবং মহাশয় গান্ধীর বিদেশী বস্ত্রাদির বিরোধিতায় তিনি সমর্থক নহেন। এই সকল কারণে মিস্টার এণ্ড্রু গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন নাই।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য দুটি। প্রথম এই, যে, আমাদের যখন রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন-বিষয়ক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, সমাজসেবা, শিক্ষাদান ও অন্তর নানাবিধ জনহিতকর কার্যনির্বাহেও তেমনি স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কর্তা ইংরেজ; বাণিজ্যে, আমদানি-রপ্তানিতে, ব্যাঙ্কের কাজে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব ইউরোপীয়দের; জনহিতকর কার্যে মুকসিয়ানা করেন ইংরেজ; এমন কি রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাতেও মিসেস্ বেসান্টের মত কেহ কেহ প্রভুত্ব করিতে চান। আমরা কাহারও শত্রুতা অর্জন করিতে ব্যগ্র নহি, সব কাজেই পৃথিবীর সকল দেশের লোকের সহকর্মিতা চাই; কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বাধীনতা চাই, নিজেদের আমদানি-রপ্তানি নিজেদের জাহাজে করিতে চাই, নিজেদের আবশ্যিক পণ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপন্ন করিতে চাই, তেমনি দেশহিত-

কর সব কাজের কর্মী ও পরিচালকও হইতে চাই। ভারতবর্ষের সব রকম জনহিতকর কাজ ভারতীয়দের দ্বারা হইতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, যে, সব কার্যক্ষেত্রেই ভারতীয়দের কৃতিত্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নমুনা আছে; কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কাজই সকলের চেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ;—যেমন বোম্বাইয়ের সেবা-সদন প্রতিষ্ঠান, বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য চেষ্টা ইত্যাদি। বিদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে ভারতীয়দের যাওয়াই কঠিন; তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও সরোজিনী নাইডু ভারতহিতার্থে গিয়াছিলেন, এবং ফিল্ম দীপে ব্যারিস্টার মণিলাল গিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য, এই, যে, কোনও বিদেশী ব্যক্তি যোল আনা ভারতীয় বনিয়া গিয়াছেন কি না, কিম্বা বনিতে অকপটভাবে ইচ্ছুক কি না, এবং তিনি আমাদের ভাগ্যের পূর্বাংশী হইতে চান কি না, তাহার কয়েকটি পরীক্ষা আছে। একটি পরীক্ষা এই, যে, তিনি সব বিষয়েই টাইগিরি করেন, না, (অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে) ভারতীয়ের নেতৃত্বে অন্য ভারতীয়দের সমান অহুচর হইয়া কাজ করিয়াছেন বা করিতে রাজী আছেন কি না। দ্বিতীয় পরীক্ষা এই, যে, ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁহার দহরম-মহরম আছে কি না, এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ খুব সহজে হয় কি না ও তাঁহাদের উপর প্রভাবশতঃ নানাপ্রকার কাজ আদায় হয় কি না। তৃতীয় পরীক্ষা এই, যে, তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় যোগ দিয়া, তাঁহার স্বজাতির লোকেরা তাঁহাদের স্বদেশের যখন কর্তা, আমাদের দেশে আমাদের সৈনিক কর্তা করিতে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছেন কি না। চতুর্থ পরীক্ষা এই, যে, তিনি বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন ও ব্যবহারবিষয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার কার্যতঃ সমর্থক, না বিরোধী, না কৌশল-পূর্বক তদ্বিষয়ে উদাসীন। চরম পরীক্ষা এই, যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে একবারও তাড়াইয়া দিয়াছেন কি না।

আমরা ইহা বলিতে চাই না, যে, কেহ যোল আনা

ভারতীয় বর্ননা না গেলে, ষোল আনা আমাদের দশভাগী না হইলে, কিছা উপরে নির্দিষ্ট সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, তাঁহাকে আমরা ভারতবন্ধু মনে করিব না, বা তাঁহাব সেবা অগ্রাহ্য হইবার যোগ্য ; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিব, যে, ষোল আনা ভারতবন্ধু তিনি নহেন, তাঁহাকে আমরা আমাদেরই একজন, আমাদেরই বড় ভাই বা ছোট ভাই বা ঐরূপ কিছু মনে করিব না।

আবো এ-টি কথা আমাদেরকে বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় ধর্মের বা খৃষ্টীয়ানদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় খৃষ্টীয়ানেরা নিজেদের কর্তৃ হু নিজেদের টাকায় দেশসেবায় যে কোন কাজ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের ভারতীয়দের কাজের মত দেশী চেষ্টি বলিয়া গণনীয় অবশ্যই হইবে।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ত্রিমূর্তি

লাট কর্জন বলিয়া গিয়াছেন, ভারত-শাসন (administration) এবং বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যোৎপাদনাদি দ্বারা ভারতের ঐশ্বর্য্য হইতে ধন আহরণ (exploitation) একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক্। আমরা তাহাতে আর একটি কথা যোগ করিয়া তাঁহার উক্তিটি পূর্ণাঙ্গ ও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রতি প্রয়োজ্য করিতে চাই। আমরা উহাতে মানবসেবাকার্য্য (philanthropy) যোগ করিয়া বলিতে চাই, স্বাধিকৃত বিদেশশাসন, তথা হইতে ধন আহরণ এবং তথায় মানবসেবাত্রত পালন, এই তিনটি কাজ একই চেষ্টির তিনটি দিক্, অথবা পাশ্চাত্য ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ। সবগুলিরই উদ্দেশ্য খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু তিনটির দ্বারাই পরাধীন দেশগুলির চির-নাবালক থাকিবার সুবিধা হইতেছে। বিদেশীরা নিজের দেশে যে রাজনীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্যানীতি, মুদ্রানীতি, প্রভৃতি চালাইয়া স্বদেশকে নিরক্ষরতা, হুর্জিক, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, পরাধীন দেশসকলের শাসনকর্তারা ঐসব দেশে সেইসকল নীতি চালাইলে বিদেশী জনসেবকদের শিক্ষাদানের, অন্নদানের, ঔষধদানের ও অন্ত নানাবিধ কার্যের ক্ষেত্র লোপ পাইত, অন্ততঃ খুব সংকীর্ণ হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন,

কোন দুর্বাস্তব না থাকিলে, পাশ্চাত্য জাতরা বিদেশে ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়াছেন বলিলে তাঁহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। ইহা ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি নহে। ইহাব নামকরণ সদ্য সদ্য করিতে পারি-লাম না। নব ত্রিমূর্তির একটি (উপ)দেবতা কুবের বা যক্ষের মাসতুতো ভাই হইবার সম্ভাবনা। অন্তগুলির নামকরণে গবেষণার প্রয়োজন।

বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কিছা বিদেশী কোন শ্রেণীর লোকদের প্রতিকূল সমালোচনা করিলেই সমালোচিত ব্যক্তির বলে, যে, সমালোচনা জাতি-বিদ্বেষ প্রসূত। একথার জবাব দিতে যাওয়াও অপমানকর। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা ভারতের পক্ষ হইতে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ন্যবতবর্ষনক বিস্তার জ্বারে বিদেশীরা ধনী, হুইপুট্ট, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কলাকুশল, নীরোগ হইতেছে ;—অথচ আমরা সেই ভারতেরই লোক হইয়া কেন বিদেশীদের দয়াপ্রদত্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, ঔষধ, অন্ন প্রভৃতি গ্রহণের লজ্জা ও অপমান সহ্য করিতে থাকিব ? মানব-হিতৈষী সর্বজাতীয় প্রতীচী-নন্দনদিগকেও বলি, তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাঁহাদের জননীর উদ্দেশ্যে তাঁহার শক্রবো বলিতে না পারে, “সাপ হৈয়া দংশ, মাগো, ওঝা হৈয়া ঝাড।”

দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিশপ ফিশারের উক্তি

পাদরী ফ্রাঙ্ক ফিশার আমেরিকার লোক। তিনি মেথডিস্ট খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের কলিকাতাবাসী বিশপ। তিনি কিছুকাল আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল কাগজের একজন প্রতিনিধির নিকট তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি। তাহা হইতে, ঐ দেশে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতকায়েরা বিরূপ ব্যবহার করে, তাহার ধারণা নূতন করিয়া উজ্জল হইবে।

“আমি দুমাস আফ্রিকায় ছিলাম। এই সময়ে আমি বোভেনিয়া ও পোর্ট গীজ-অধিকৃত দেশ প্রভৃতি আফ্রিকার সমুদয় প্রদেশে ভ্রমণ

করিয়াছি। প্রতি কেন্দ্রে যেসকল ভারতীয় সমিতি আছে, তাহাও আমি দেখিয়াছি। প্রত্যেক নগরের মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং বহু কৌন্সিলার, প্যারামেন্ট, সমস্ত ও ক্যান্টনমেন্ট মন্ত্রীর সহিত পরিচয়লাভের সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছে। ফরাসী, ইংরেজ, পোর্্তুগীজ, ভারতীয় ও আদিম আফ্রিকাবাসী প্রভৃতি সকলের মনোভাবই আমি নিরপেক্ষভাবে জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাতে বৃষ্টিতেছি যে, সংস্কা বড়ই জটিল! আফ্রিকায় বর্ণবিষয়ে এত প্রবল, যে, পৃথিবীর কোথায়ও আর এরূপ দেখা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রান্সভালের কথা বলা যাইতে পারে। মেদেশে কোন ভারতীয় বিনা লাইসেন্সে বাবসা করিতে পারে না; এবং সে লাইসেন্সও একজন স্বেচ্ছাক্রমে করায়ত্ত। কোন ভারতীয়ের কোন জায়গায় দোকান থাকিলে ঐ স্বেচ্ছা কর্তারই ইচ্ছা করিলে তাহাকে অল্পস্থানে উঠাইয়া দিতে পারে। ভারতীয়দিগকে কোন স্থায়ী ভূমিস্বত্তি দেওয়া হয় না। ইহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। তাহারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে পারে না এবং যে কোন মজুরের তাহাদের নিকট উঠিয়া যাওয়ার পরওয়ানা আসিতে পারে। পূর্বে রুশিয়াতে উচ্চদীর্ঘ সেকপ ব্যবহার পাইত, ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা আফ্রিকায় সেইরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে। মনন উচ্চদীর্ঘ উৎপাদিত হইয়াছিল, মনন কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইংলণ্ডের সামরিক ও মাসিকপত্র সেটমব অত্যাচারকাহিনী লিখিয়া উচ্চদীর্ঘের উপর রুশদ্বারী মহাপ্রাণ এবং রুশ-সরকারের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন! আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, সেই সকল উদার বিশ্বভিত্তিকী স্বাধীনতাভাবের পরগণী লোকগণ এই অসহায় দুর্বল ভারতীয়দিগের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী কোন মতেই প্রকাশ করিতেছেন না, অথবা সেই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদকল্পে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না। ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? ইহাতে কি মনে হয় না, যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ স্বেচ্ছাক্রমে মানব-হিতৈষণা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার; অথবা তাহাদের বিশ্বপ্রেম কেবল মৌখিক; তাহাদের মন উহাতে সায় দেয় না।

এসিয়াবাসীর, বিশেষতঃ ভারতীয়দের উপর দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী স্বেচ্ছাক্রমেণের এ বিদ্বেষের কারণ কি? ইতিপূর্বে তাহারা বলিতেন যে, ভারতবাসীরা অত্যন্ত নোংরা, এবং সুসভ্য ইউরোপীয়গণ কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারে না। এ উক্তির অসত্যতা একাধিকবার প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-আফ্রিকায় সমস্ত ভারতীয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া তোলাই তথাকার স্বেচ্ছাক্রমেণের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাকার স্বেচ্ছাক্রমেণ যে যে কারণে ভারতীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদেরই মতে তাহার একটি এই যে, ভারতীয়েরা ঐ স্থানের স্বেচ্ছাক্রমেণের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান। দ্বিতীয় কারণ,—তাহারা খুব কম পরচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। স্বেচ্ছা উপনিবেশিকেরা প্রতিযোগিতার দাঁড়াইতে না পারিয়া আতন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকাকে কেবল নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করে এবং তথায় নিজেদের প্রাধান্ত অক্ষয় বানিতে চায়। বুদ্ধিমান প্রতিযোগী ভারতীয়দের দর্প কি করিয়া চূর্ণ করিলে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্তই দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বেচ্ছা সম্প্রদায় এসিয়াবাসীর উচ্ছেদকল্পে আতনের এক পাণ্ডুলিপি করিয়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছে। এই বিস্ময়কর আইনে পরিণত হইলে সমস্ত দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোথাও ভারতীয়ের ঠাই হইবে না। স্বেচ্ছাক্রমেণের প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের মনোভাবও আদৌ সম্ভাবজনক নহে। তথাপি যে কেবল ভারতীয়েরাই স্বেচ্ছাক্রমেণের চক্ষুশূল, ইহার কারণ ভারতীয়েরা অধিকতর বুদ্ধিমান। প্রতিযোগিতার তাহাদের সহিত

স্বেচ্ছাক্রমেণের পরিমাণ উঠা দায়। তাই ভারতীয়দিগকে কথা কহিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ইংলণ্ডের ও ভারতীয় প্যারামেন্ট যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইতে পারে। নতুবা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দিগকে চিরকাল স্বেচ্ছাক্রমেণের পদানত থাকিতে হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার খৃষ্টিয়ান বা অল্প ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই। সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কথা এই, যে, এ বিষয়ে ভারতবাসীদের একমাত্র নিতান্ত অভাব। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বেকর সর্বনাশকর আতন প্রণীত হইতেছে, তাহাতে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর একযোগে ইহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য।

বিশপ ফিশারু ইহাও বলিয়াছেন, যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় সমুদয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নিধন ভারতীয়কে কুলি বলা হয়। স্বেচ্ছা বালকবালিকাদের স্কুলপাঠ্য বহিতে ৬ লেখা আছে, যে, সব ভারতীয়ই কুলি। কোন হোটেলে চাকর না হইয়া কোন ভারতীয় চুক্তিতে পারে না। ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারী ভারতীয়দের সঙ্গেও বিশপ ফিশারুকে তাহার হোটেলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হইয়াছিল।

কোনও শ্রেণীর মানুষকেই কাহারও অবজ্ঞা করা বা বিদ্বেষের চক্ষে দেখা উচিত নয়। এইজন্য আমরা ভারতবাসী অস্পৃশ্যতার নিন্দা ও বিরুদ্ধাচরণ চিরকাল করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইংরেজেরা সচবাচর বলেন, “তোমাদের দেশে বিস্তর লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে; অতএব তোমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইতে পার না।” কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বেচ্ছা মাছুষেরাও ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্যের স্বার্থে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এবং অধিকন্তু তাহাদিগকে ঐদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য আতন করিতেছে। অতএব, যে যুক্তি অল্পসারে আমরা স্বরাষ্ট্র-শাসন-ক্ষমতা পাইবার অনধিকারী, সেই যুক্তি অল্পসারেই দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বেচ্ছাক্রমেণেরাও শৃঙ্খলিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা স্বদেশের প্রভু। সুতরাং ইংরেজদের অল্প কোন কথা না বলিয়া ইহা বলাই সঙ্গত, “আমাদের সুবিধা, স্বার্থ ও মজি অল্পসারে আমরা যেখানে যেমন দরকার সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থা করিব”।

জনৈক আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র

অনেক বৎসর পূর্বে আমরা জাপান ও আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্বের বৃত্তান্ত তাঁহাদের ছবি-সমেত প্রকাশিত করিতাম। প্রথম-প্রথম তদ্রূপ ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ইহা করিবার প্রয়োজন ছিল। এখন আর প্রয়োজন নাই। এখন যে ছাত্রটির পরিচয় দিতে যাইতেছি, তিনি কোন অর্থহীন বিদ্যা শিখিবার জন্য আমেরিকা গমন নাই; অবশ্য সে উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়া বিন্দুমাত্রও নিন্দার বিষয় নহে।

এই যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত। তিনি দর্শন-শাস্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন শাখায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষা দুইবার দিয়া দুইবারই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্শীলনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমেরিকার মীড্‌লিং-নামক স্থানে যে তত্ত্ববিদ্যালয় আছে, তাহার কর্তৃপক্ষ ত্রাণসমাজ কর্তৃক নির্ধারিত একজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। শ্রীমান অমল সেই বৃত্তি পাইয়া মীড্‌লিংয়ে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন। আহলাদের বিষয়, তিনি সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র এবং বাঁ ডী (ব্যাচলর অব ডিভিনিটি) উপাধি পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমেরিকার সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন ও অন্তর্শীলন করিতেছেন। আমেরিকার একেশ্বরবাদী সভা তাঁহাকে প্রায় সাত শত টাকা এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ববিদ্যাশিক্ষা-বিভাগ তাঁহাকে প্রায় ১৭৫০ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন।

প্রবাসীর পাঠকেরা শুনিয়া সুখী হইবেন, শ্রীমান অমলকুমার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয়।

ভাই নন্দলাল সেন

বাংলা দেশের অল্প লোকেই ভাই নন্দলাল সেন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু সিন্ধুদেশে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

তিনি ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সিন্ধুদেশে নবযুগের প্রবর্তক সাধু হীরানন্দের সহকর্মী হইয়া ভাই নন্দলাল তথায় গমন করেন। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার এবং শিক্ষাদান ও বিস্তার তাঁহাদের কার্যক্ষেত্র ছিল। সাধু হীরানন্দ আত্মত্যাগী যৌবনে বাংলাদেশে আগমন করেন, এবং ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার আদেশে জীবন গঠন করিয়া মাতৃভূমির সেবা করিতে সংকল্প করেন। জন্মভূমি সিন্ধুদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়



ভাই নন্দলাল সেন

তিনি শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনকে সহকর্মীরূপে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ভবানীচরণ পরে রোমান ক্যাথলিক হন এবং উপাধ্যায় ব্রজবান্দব নাম গ্রহণ করেন। বাংলা দেশে ব্রজবান্দবের জীবন-কথা শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত। ভাই নন্দলাল সেন মধ্য-মধ্যে বাংলা দেশে আসিতেন বটে, কিন্তু জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর তিনি সিন্ধুদেশেই কাটাইয়া গিয়াছেন।

সিন্ধুদেশে তিনি প্রথম-প্রথম হায়দরাবাদ নগরে

যুনিয়ন অ্যাকাডেমী নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন ও উহার তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। উহা পরে তত্ত্বাবধায় বিখ্যাত নবলরায় হীরানন্দ অ্যাকাডেমীতে পরিণত হয়। অতঃপর তিনি কিছুকাল লাহোরের দয়াল সিং কলেজের সেবা করিয়া, করাচীকেই জীবনের কার্যক্ষেত্র করেন। তথায় ধর্ম্মাহুশীলন ও শিক্ষাদান তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। তিনি বক্তৃতা করিয়া ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বেড়াইতেন না—নির্জনবাস, অধ্যয়ন ও সাধন-ভঙ্গনেরই তিনি অধিকতর অমুরাগী ছিলেন। দু'চার জন ছাত্র কখন-কখন তাঁহার নিকট আসিলে তাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেন। যে সকল পুরুষ ও মহিলা ধর্ম্মজ্ঞান ও শাস্তিপিত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে তিনি উপদেশ দিতেন।

হায়দরাবাদে যাহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের এখন অনেকেই নানা কার্যক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সকলেই ভক্তিমান। তাঁহাকে যাহারা জানিতেন, তাঁহাদের অনেকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়া যে-সব চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতে তিনি বর্ম্মযোগী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

তাঁহার শেষ বয়সের কোন ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় না—যদিও তিনি নিজে স্বয়ং ফোটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁহার যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা অনেক বৎসর পূর্বের, তাঁহার ভ্রাতা প্রমথলাল সেন মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয় মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপূর্বে তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। যখন তিনি ঐ কলেজে কাজ করিতে আসেন, তখন উহা মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশ্যন্ নামে পরিচিত ছিল।

তাঁহার শিক্ষক জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে গণিতজ্ঞ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। শিক্ষিত-সমাজেও গণিতজ্ঞ বলিয়াই তাঁহার নাম ছিল। তিনি তখন ইংরেজীতে বাঙ্গলাগণিতের একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক



অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি ছাত্রদের পাঠ্য কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের সটীক ও মাহুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। ছাত্রদের জন্ম পূর্ব পূর্বে যে সব সংস্কৃত কাব্যের সটীক সংস্করণ বাহির হইত, অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়ের সংস্করণগুলি তাহা অনেকা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ছাত্রদের মধ্যে সেগুলির খুব চলন হয়। তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চর্চা করিতেন। সিদ্ধান্তমৌমুদীর তৎকৃত সংস্করণের সন্ধিপ্রক্রমের হস্তলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্ররূপে এক বিদ্যার চর্চা করিয়া ও তাহাতে পারদর্শী হইয়া পরে অন্য বিদ্যায় মনোযোগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আরও আছে। যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছাত্ররূপে বিজ্ঞানের চর্চাই সম্বন্ধে করিয়াছিলেন, এবং রসায়নী বিদ্যাতে এম্-এ হইয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের



অধ্যাপক সারদারঞ্জন দাস

এই শাখায় পারদর্শিতার জন্যই প্রেসমর্চাদ রায়চাঁদ বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বৃতি রক্ষিত হইবে রাসায়নিক বলিয়া নহে, সাহিত্যিক বলিয়া এবং দার্শনিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক বলিয়াই ভবিষ্যৎ বংশের লোকে তাঁহাকে জানবে।

সারদারঞ্জন যৌবনকালে ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া বিখ্যাত হন। প্রৌঢ় বয়সে, এমন কি বার্দ্ধক্যে, তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। যুবকদের মধ্যে পুরুষোচিত খেলার প্রচলন ও উৎসাহদানের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের দৃষ্টান্ত তাহার মধ্যে প্রধান। তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাও ক্রিকেট খেলায় দক্ষ।

সারদারঞ্জন চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চাও করিতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহা দিতেন।

তাঁহার প্রধান “বাতিক” ছিল মাছ ধরা। ছুটির

সময় গিরিভি প্রভৃতি স্থানে এবং অল্প সময়ে কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মাছধরায় কখন কখন সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন।

বিখ্যাত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের তিনি প্রোক্ত সহোদর ছিলেন।

আমেরিকা ও শাপুরজি সাক্কাথ্ ওয়াল

শাপুরজি সাক্কাথ্ ওয়াল বেংগলিয়ার একজন পারস্যী। তিনি বিলাত গিয়া তথাকার পার্লামেন্টের অন্ততম সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বিলাতেই বাস করেন। তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমেরিকাতে ইণ্টারপারলামেন্টারি যুনিয়ন নামক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বিলাতী পার্লামেন্টের কয়েকজন সভ্য তাহাতে যোগ দিবার জন্য মনোনীত হন। সাক্কাথ্ ওয়াল তাহাব মধ্যে একজন। কিন্তু আমেরিকার গবর্নেন্ট তাঁহাকে সে দেশে যাঁতে দেন নাই। কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, তিনি কম্যুনিষ্ট, ইত্যাদি। সাক্কাথ্ ওয়াল বলেন, যে, তিনি আমেরিকায় কম্যুনিজম প্রচার করিতে খাইতেছেন না তাহা করিবেন না। তথাপি তাঁহার আমেরিকা-প্রবেশ নিষেধই আছে।

কম্যুনিষ্টদল ক্রমশঃ শক্তিতে শুব পুরু। কম্যুনিষ্টদের একটা মত এই, যে, কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকি উচিত নয়; দেশের ও জাতীয় সব সম্পত্তি সর্বসাধারণের সমান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত; জাতির সকলের উপাঞ্জন সকলের মধ্যে বণ্টন করা উচিত; ইত্যাদি। এবিধ মতের জন্য পনী লোকেরা তাহাদের মতকে বড় ভয় করে।

মজার কথা এই, যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া সাক্কাথ্ ওয়াল দিন-রাত ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, কাজ করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, পার্লামেন্টের সভ্য হইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের গবর্নেন্ট ও সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয় নাই, ইংলণ্ডে রাসাতলে যায় নাই;

কিন্তু আশঙ্কা এই হইয়াছে, যে, আমেরিকায় তিনি কিছুদিন বাস করিয়া কয়েকটা কথা বলিলেই আমেরিকা টলমল করিবে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর তাহাকে গ্রাস করিবে!

অনেকে প্রকাশ্যভাবে এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যে, এই ব্যাপারের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হাত আছে। ভারতীয় লোকদের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহা আমেরিকায় যাহাতে প্রকাশিত



শাপুরজি সাক্কাখওয়ালা ও তাহার পত্নী

ও প্রচারিত না হয়, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাহার জন্ত সমুচিত চেষ্টা করিয়া থাকেন। গবর্নমেন্ট তরফের কথা প্রচার ও গবর্নমেন্টের ওকালতি করিবার জন্ত আমেরিকায় কতকগুলি ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় লোক নিযুক্ত আছে। তাহাদিগকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজস্ব হইতেই গৃহীত। সাক্কাখওয়ালা আমেরিকায় গিয়া ভারত গবর্নমেন্ট সম্বন্ধে পাছে অনেক

সত্য কথা বলিয়া ফেলেন, এই জন্ত তাহার সেই দেশে যাওয়া বন্ধ করা ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অব্যাহতীয় মনে করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার আমেরিকা গমন নিজে বন্ধ না করিয়া আমেরিকান গবর্নমেন্ট দ্বারা করাইয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ সন্দেহ আমাদের মতে অমূলক নহে। কম্যুনিষ্টদের মত আমেরিকায় অজ্ঞাত বা নূতন নহে, যে, সেখানে উহা প্রচারিত হইবামাত্র তথাকার গবর্নমেন্ট উদ্বিগ্ন হইবে এবং ব্যাঙ্ক, কারখানা প্রভৃতি লুটপাট হইবে। উহাদের প্রধান লীলাভূমি কাশ্মীরেও প্রভুত্বশক্তি সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির এমন মজ্জাগত যে, আপাততঃ কতকগুলি লোক সম্পত্তিসাম্য ও সাধারণ সম্পত্তিতে বিশ্বাসী হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার টীকবে বালিয়া আমাদের মনে হয়। অবশ্য যাহাদের অর্থনৈতিক উৎপন্ন হয়, তাহারা বর্তমান কালে পারিশ্রমিকরূপে উহার যে অংশ পায়, তাহা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো বাড়িয়া গিয়া যাইবে হইবে, এবং অল্প নানা দিকেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হইবে।

একবার একটি শিশু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মাকে আসিয়া বলিতেছিল, “মা, মা, রাত্তি দিগে ছটো চোর নিয়ে খাচ্ছে দেখলাম; ঠিক মানুষের মত!” সে বোধ হয় চোরদের ভীষণত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছিল; সেইজন্য মাকে তাহার আবিষ্কৃত এই তথ্য বিশ্বাসের সহিত জানাইতেছিল, যে, চোরেরা ঠিক মানুষের মত। কম্যুনিষ্টরাও দেখিতে ঠিক মানুষের মত, সাক্কাখওয়ালা ও তাহার পত্নীর ছবি দেখিলে এইরূপই মনে হয়।

আবার বোমা আবিষ্কার

২২শে কার্তিক চই নবেম্বর, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতিকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাণিবার বিরুদ্ধে খবরের কাগজে ও বহুজনাকীর্ণ সভায় তীব্র প্রতিবাদ হয়। এরূপ প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য। সুভাষবাবু প্রভৃতিকে হয়

গবর্নমেন্ট্‌ ছাড়াই ডিউন, কিম্বা প্রকাশ আদালতে সাধারণ আইন অনুসারে তাঁহাদের বিচার হউক। আদালত ইংরেজদেরই প্রতীতি, আইন তাঁহারা করিয়াছেন, এবং বিচারকেরা তাঁহাদেরই নিযুক্ত বেতনভোগী ভূক্ত; সুতরাং প্রকাশ বিচারে বন্দীদের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইবে না, বলা যাইতে পারে। প্রকাশ আদালতে বিচার করিবার বিপক্ষে একটা কথা রাক্ষসেরা এই বলিয়াছিলেন, যে, বন্দীরা বিপ্লবী, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ সাক্ষ্য দিতে কাহারও সাহস হইবে না, কেহ সেরূপ সাক্ষ্য দিলে বিপ্লবীরা তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা করিবে, ইত্যাদি। বেঙ্গল আর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করিবার সময় এই সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ক্যালকাটা উর্জক্লি নোটস্‌ নামক আইনের কাগজ এবং পরে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী এই যুক্তি অমূলক বলিয়া প্রমাণ করেন।

অতএব দেশবাসী অস্ত্র সকলের সহিত আমরাও বলিতেছি, গবর্নমেন্ট্‌ হয় স্বভাববাহু প্রভৃতিকে ছাড়াই ডিউন, নতুনা প্রকাশ আদালতে সাধারণ আইন-অনুসারে তাঁহাদের বিচার করুন।

অতীত কালের ইতিহাসে ও সমসাময়িক ইতিহাসে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ঘটনাচক্র ঞ্জিনিগটা এমন, যে, একটা ঘটনার জবাব আর একটা ঘটনা দেয়। জবাবী ঘটনার মধ্যে মানুষের কোন কারসাজি আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া আগে হইতে বলা যায় না, অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমান কখন কখন পরে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। যেমন মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্র মামলায় প্রমাণ হইয়াছিল, যে পুলিশের চর এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাড়ীতে যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, এখন প্রথম ঘটনা ও জবাবী ঘটনার কথা বলি। প্রথম ঘটনা হইতেছে বিনা বিচারে বন্দীকরণের বিরুদ্ধে ২২শে কার্তিক সরকারস্বায়ংক্রমিক প্রতিবাদ; জবাবী ঘটনা ঠিক “ফেরত ডাকে” (“বাই রিটার্ন অব্‌ পোস্ট্‌”) আসিল ২৪শে কার্তিক। সেই দিন পুলিশ খানাতলাসী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে নয়জন যুবককে, একটি জ্যান্ড

(“লাইভ”) বোমাকে, কিছু বন্দুক ও কাম্বুকে, এবং কিছু নাইটিক গ্যাসিডকে গ্রেপ্তার করিল। কলিকাতাতেও কোন কোন স্থানে খানাতলাসী করিয়া কিছু মানুষ ও বমাল পাওয়া গিয়াছে।

যদি বলেন, ইহাকে জবাবী ঘটনা কেন বল ? বলি এই জ্ঞান। স্বভাববাহু প্রভৃতিকে ছাড়াই ডিউন দেশের লোকে কাঁপতেছে, তাহাব মূলে এই যুক্তি আছে বিপ্লবী সরকার অনুমান করিতেছেন, যে, দেশে বিপ্লব নাহি, এবং বিপ্লবের আয়োজনও কিছু নাহি, অতএব সন্দেহে দুই বন্দাদিগকে ছাড়াই ডিউন দেশে হউক। জবাবী ঘটনাটি বলিতেছে, “এই দেশ বিপ্লবীদের জ্যান্ড বোমা, এই দেশ বিপ্লবীদের রিভলুভার, এই দেশ তাহাদের কারুজ, এই দেশ বোমা তৈরি করিবার এসিড ও অস্ত্র মালমশলা;—এবং, যদি ইহাতেও বিশ্বাস না হয়, এই দেশ খোদ নয়জন বিপ্লবী! তাহারা বেশ নিশ্চয়মনে নিশ্চয় খাইতেছিল, এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এরূপ পীড়িত ছিল, যে, গ্রেপ্তারকালে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল ও তাহাদিগকে এডুল্যান্স করিয়া যখন স্থানে পাঠাইতে হইয়াছিল; ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে, যে, তাহারা অতি ভয়ানক ও দুর্ভয় বিপ্লবী।” বোমাটি বাস্তবিক খাটি বোমা কি না এবং জ্যান্ড কি না, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে, পুলিশ নিশ্চয়ই তাহাকে উৎস নিরুদ্ধন প্রাস্তরে ফাটাইয়া দেখিয়া নিজের প্রাণবধ করিবার অধ্যমতি দিবেন।

খানাতলাসী ও তাহার ফলকে জবাবী ঘটনা আরও একটা কারণে বলিতে পারা যায়। যৎকালে স্বভাববাহু বহু প্রভৃতি বন্দীকৃত হন, তখন দেশের যত দুই সম্পাদক ও অল্প দুই লোকে বলিয়াছিল, স্বভাববাহুরা যে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্গত কোথাও ? বাংলাদেশের রাজধানীতে ও মফঃস্বলের নানাস্থানে খানাতলাসী করিয়া কোথাও অন্তর্গত পাওয়া যায় নাহি। জবাবী ঘটনা মহাশয় এত দিন পরে বলিতেছেন, “এই দেশ অস্ত্র, আর এই দেশ শত্রু।” কিন্তু দুই লোকেরা এখনও ভয়ে-ভয়ে বলিতে পারে, “ছদ্ম জবাবী ঘটনা, আপনার দরবারে অদীন মজকুবের আর্জি

এই, যে, প্রবলপ্রতাপাধিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকারকে হায়রান পরেশান করিবার নিমিত্ত একটা বোমা, কয়েকটা বন্দুক, কয়েকটা কার্তুজ ও কিছু এসিড কি যথেষ্ট? পঞ্জাবে বোমা ছুড়িয়া দস্যুতা অল্প দিন পূর্বে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা বিপ্লবীদের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অতএব বন্দা কহে, আশনার সহচর আর এক জবাবী ঘটনার প্রয়োজন যাহাতে আরও বেশী বোমা গ্রেপ্তার হইবে। অরাজনৈতিক সাধারণ গুণ্ডা ও ডাকাতদের নিবট, খানাতল্লাসীতে গ্রেপ্তারীকৃত রিভল্ভার ও কার্তুজ অপেক্ষা, ঐরূপ জিনিষ অনেক বেশী আছে। কিন্তু তাহারা বিপ্লবী বলিয়া বাহুসন্মান লাভ করে না। সার্জেন্ট কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট জোন্স কলেজ, স্কটল্যান্ডের দোকান, গিণ্টিকারীদের দোকান, ইংরেজদের দোকান, প্রভৃতি খানাতল্লাসী করিলে নানারকম এসিড্ আরও অধিকপরিমাণে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা নিশ্চিত, যে, এইসকল স্থান বিপ্লবীদের আড্ডা নহে।”

যাহারা কয়েকটা বোমা, রিভল্ভার প্রভৃতির দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে কিম্বা ইংরেজের পিলে চম্কাইয়া দিতে চান, এরূপ বুদ্ধিমান লোক বাংলাদেশে একেবারেই নাই, জোর করিয়া বলা যায় না। দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে যে প্রকার যুদ্ধের আয়োজন আবশ্যিক, তাহা ইতিহাসে লেখা আছে; বঙ্গের সত্যিকার বিপ্লবীরা সেরূপ কোন আয়োজন করিতে পারেন নাই। তবে যদি ইংরেজের পিলে চম্কাইতে কেহ চান, তাঁহাকে আগে প্রমাণ করিতে হইবে, যে, ইংরেজদের পিলে আছে। কেননা, দেখা যাইতেছে, এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত লোক পিলে ফাটিয়া মরিয়াছে, তাহারা সবাই দেশী আদমী; গোরা নয়, ফিরিকীও নয়।

কতিপয় বোমা রিভল্ভারাদি দ্বারা দেশ-উদ্ধার-প্রয়াসী বুদ্ধিমান লোকের অস্তিত্ব বন্ধে যেমন অসম্ভব নহে, তেমনি কিছু “বিবেচনা” করিলে, বিপ্লবচেষ্টা কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষা অপরাধে জেলে যাইতে প্রস্তুত বেকার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ভাড়াটিয়া “ভদ্রলোক” বাংলা দেশে পাওয়াও অসম্ভব নহে। বঙ্গের পূর্বে প্রকারের লোকের অস্তিত্ব অপেক্ষা শেখোক্তপ্রকার লোকের

অস্তিত্বের সম্ভাবনা বেশী। যদি সরকারের কোন দোস্ত-বেকার-সমস্তার এই সমাধান আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহা অপেক্ষাও দামী আর কিছু জিনিষ পাইবার উৎসুক।

যাহা হউক, পুলিস লোককে যাহা বিশ্বাস করাইতে চান, আমরা সেই বিপ্লবপ্রচাসের ও বিপ্লবীদের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যখন অনেক বৎসর পূর্বে গবর্ণমেন্ট বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করিয়া অরবিবন্ধ ঘোষণা করেন, তখন বাস্তবিকই এমন একজন মাথা-ওখালা লোককে পাকড়াও করা হয় যিনি পৃথিবীর মনুষীদের মধ্যে গণিত হইবার যোগ্য। যাহা হউক, তিনি বিচাবে খালাস পাইলেন। তাহার পর যদিও তিনি অনেক দিন ব্রিটিশশাসিত ভাষাতে ছিলেন, তথাপি বিপ্লবী বলিয়া আর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তৎপরে তিনি বহু বৎসর ফরাসীর অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে বাস করিতেছেন। তিনি স্পেন হইতে বিপ্লবের বড়বস্ত্র চালাইতেছেন, ইহা এখন ইংরেজরাও কল্পনা করে না; কবিলে মিত্রশক্তি ফ্রান্সের সাহায্যে তাঁহাকে কবলিত করিবার চেষ্টা হইত।

অরবিবন্ধের পর যাহারা বিপ্লব-অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, তাহাদের নাম করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার আপেক্ষিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, তিনি যদি সত্য-সত্যি একদা বিপ্লব-চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং যদি তাহার পরেও অন্তান্ত অনেকে সেই চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাহার মত লোকের নেতৃত্বের অভাবেও এবং অনেকের প্রাণদণ্ড ও নির্কাসন-দণ্ডাদি হওয়া সত্ত্বেও, বিপ্লব-চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের কথা বলি। যখন স্বভাষচন্দ্র বসুপ্রমুখ লোকেরা ধৃত হইলেন, স্বীকার করিতে হইবে, যে, তখনও দেশের কয়েকজন মান্তগণ ও বুদ্ধিমান লোক ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টেই পুলিস বিভাগের কার্য হইতে বৃদ্ধা যাইতেছে, যে, সেরূপ নামজাদা লোকদের বন্দীকরণেও বিপ্লব-চেষ্টা থামে নাই, এখনও উহা চলিতেছে, এখনও লোকে বোমা তৈরী,

রিভলভার সংগ্রহ প্রভৃতি করিতেছে। কাহারা করিতেছে? নামজাদা, নেতৃস্থানীয়, স্থপিত্ত, বুদ্ধমান লোকেরা নহে, এমন কতকগুলি লোক তাহাদের নামও কেহ কখনও শুনে নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ইহাই করিতে হয়, যে, বঙ্গের বিপ্লববাদ এমন-একটা জিনিষ যাহা নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে আটক করিয়া রাখিলেও নিমূল হয় না; উহা তাহাদের চেয়ে নিম্নতর ও অধিকতর সংখ্যাবহুল স্তরের লোকদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহার উত্তরে অবশ্য গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, যে, যথেষ্টসংখ্যক বিপ্লবী ধৃত হয় নাই, যথেষ্ট ধৃত হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বলি, এই যুক্তির অস্ত কখনও পাওয়া যাইবে না। যতবার সরকার বিপ্লবী পাকড়াও করিবেন, তত বারই কিছু বিপ্লবী অধৃত থাকিয়া যাইবে ও তাহাদের দ্বারা বিপ্লববাদ প্রচারিত ও বিপ্লবচেষ্টা সংরক্ষিত হইবে। দেশের লোক যতবারই বলিবে, ধরপাকড় শাস্তি দ্বারা এরোগের প্রতিকার হইবে না, ততবারই সরকার বলিবেন, আরও কতকগুলি লোককে ধরিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

আমরা অপরাধীর শাস্তির বিরোধী নহি। কিন্তু অপরাধের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, সেই কারণ ও অবস্থা-নিচয়ের উচ্ছেদকেই প্রকৃত প্রতিকার মনে করি। ম্যালেরিয়ার বিষবাহী মশা দেখিলেই মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা মন্দ নহে; কিন্তু সে উপায়ে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ হইতে পারে না। যে-যে রকম জায়গায় যে-যে কারণে মশা জন্মে, তাহা আবিষ্কার করিয়া, জায়গাগুলার দোষ দূরীকরণ ও কারণগুলার বিনাশই প্রকৃত প্রতিকার।

অবশ্য ইহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র। নতুবা বস্তুতঃ স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ম্যালেরিয়ার মত একটা ব্যাধি নহে। কিন্তু সজে-সজে ইহাও বলা দরকার, যে, স্বাধীন হইবার জন্য ধর্মসঙ্কত বা অবৈধ সব-রকম চেষ্টাই প্রশংসনীয় নহে। কোন-কোন রকমের চেষ্টা মানসিক বিকার-প্রসূত।

পুলিস্কর্ভুক বোমার আবিষ্কার প্রভৃতি উপলক্ষে টেট্‌স্ম্যানের বেতনভোগী ভারতীয় লেখক ১৬ই ডিসেম্বর ঐ কাগজে কতকগুলি প্যারাগ্রাফ লিখিয়াছেন।

এতদ্বিবয়ক প্রথম প্যারাগ্রাফটি-সম্বন্ধে আমাদের বেশী-কিছু বক্তব্য নাই। কেবল এইটুকু বলিব, যে, একদিকে যেমন ইহা নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া উচিত নহে, যে, পুলিশের চরেরাই কোন উপায়ে আবিষ্কারস্থলে বোমা প্রভৃতি রাখিয়াছিল, তেমনি উক্ত লেখকের মত ইহাও ধরিয়া লওয়া উচিত নয়, যে, পুলিশ বা তাহাদের চরদের ইহাতে কোন হাত ছিল না এবং তাহারা বা চরেরা পূর্বে এ বিষয়ের খবর জানিত না, পরে পুলিশ খবর পাইয়া খানা তল্লাসী দ্বারা জিনিষগুলি আবিষ্কার করিল।

পরবর্তী প্যারাগ্রাফগুলিতে লেখক বলিতেছেন, এরূপ ইঙ্গিত অনেক করিতেছেন, যে, সরকারী চরেরাই বোমা প্রভৃতি কোন-কোন স্থানে রাখিয়া দিয়া পরে পুলিশকে খবর দিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। সে-সম্বন্ধে লেখক বলেন, এখনও ত গবর্ণমেন্টই দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু আছেন এবং যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা হইলে সোজাসৃজি সন্দেহভাজন লোকদিগকে ধরিয়া সাজা না দিয়া গবর্ণমেন্ট এরূপ কুটিল বাবা নীচ উপায় কেন অবলম্বন করিবেন? ইহার পর লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাহার কথার উত্তর রাখিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

“Internments and deportations without trial are very bad things in themselves, and not only the Indians of all shades of opinion, but even a large number of foreigners, have condemned this method, and yet the Government did not hesitate to incur the unpopularity almost all over the civilised world, by having recourse to such a method. One, therefore, fails to realize why Government should set up an agency to place bombs in the houses of those by interning whom ultimately they are bound to incur unpopularity in the end. At least no sane person would do so and it has not yet been proved that the Government of Bengal is composed entirely of insane persons.”

ভাষ্যার্থ। “বিনা বিচারে অন্তরায়ন ও নির্বাসন বড় বড় জিনিষ, এবং শুধু সব রকম রাজনৈতিক মতের ভারতীয়েরা নহে, বহুসংখ্যক বিদেশীও এই অপালীর নিন্দা করিয়াছে; তথাপি এই উপায় অবলম্বন দ্বারা প্রায় সমগ্র সভ্যজগতের বিরাপভাজন হইতে গবর্ণমেন্ট বিধা বোধ করেন নাই। অতএব ইহা উপলব্ধি করা যায় না, যে, বাহাদুরকে অন্তরায়িত করিয়া গবর্ণমেন্টকে পরিণামে অপ্রিয় হইতেই হইবে, তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কোন লোক নিযুক্ত করিবেন। অন্ততঃ কোন সুস্থমস্তিষ্ক লোক এরূপ করিবে না, এবং ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই, যে, বাংলা গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে পাগল লোকদের দ্বারা গঠিত।”

লেখক কি বলিতে চান, যে, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও

অংশতঃ বাংলা গবর্ণমেন্ট পাগল লোকদের দ্বারা গঠিত ? আমরা কিন্তু উক্ত মহামাত্র বাংলা গবর্ণমেন্টের একরূপ কোন বন্দনাম রটাইতে অসমর্থ। আরও একটা কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, দ্রুত লোকদিগকে পরিণামে সবুকার অন্তরাগ্নিত করিবেনই ? পুলিশ কি তাঁহাকে সবুকারের মনের কথা বলিয়াছে ?

যাহাদিগকে অন্তরাগ্নিত করিয়া গবর্ণমেন্টকে পরিণামে সভ্য জগতের বিরাগভাজন হইতেই হইবে, তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন সরকার করাইয়াছেন কিনা আমরা জানি না।^১ কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে বোমা আবিষ্কৃত হইলে এবং তাহার পর তাহারা অন্তরাগ্নিত বা নির্কাসিত হইলে, সভ্য জগৎ (অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় লোকদের প্রভু কিম্বা প্রভুহলিন্সু পাশ্চাত্য জাতিরা) অহুমান করিবে, যে, লোকগুলা খুব সম্ভবতঃ দোষী ছিল ; কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে কোন অন্তশস্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে অত্র লোকদের তাহাদের অপরাধ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবেই, এমন-কি তথাকথিত সভ্য জগতেরও সন্দেহ থাকিবে। খানাতল্লাসী-দ্বারা অন্তশস্ত্র না পাওয়াসঙ্গেও কাহাকেও বন্দী করিলে গবর্ণমেন্টকে সভ্য জগতের যতটা নিন্দা ও বিরাগভাজন হইতে হয়, অন্তশস্ত্র পাওয়া গেলে ততটা হয় না। সুতরাং আশা করি, টেটস্ম্যানের লেখক বুঝিতে পারিবেন, কাহারও বাড়ীতে সরকারের বন্ধুদের দ্বারা বোমা স্থাপনের কারণ যথেষ্ট থাকিতে পারে—যদিও সত্যসত্যই বক্ষ্যমান ঘটনায় কেহ তাহা করিয়াছিল কিনা আমরা জানি না।

লেখক অতঃপর লিখিয়াছেন, যে, দেশভক্ত বাঙালীরা নিশ্চয়ই এই দাবী করিবেন না, যে, বাংলাদেশ রাজনৈতিক চেষ্টায় অত্র-সব প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে এবং বাঙালী যুবকেরা স্বরাজ-লাভের এতটা কাছাকাছি আসিয়াছে, যে, তাহারা সেই কারণে সরকারের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লেখক বলিতে চান, অত্র-সব প্রদেশে যখন গবর্ণমেন্ট বোমা স্থাপনাদি করান না, তখন বন্ধে কেন করাইবেন ? এই জন্ত লেখক লিখিয়াছেন :—

‘Mahatma Gandhi is the strongest opponent of the present system of the bureaucratic Govern-

ment and Pundit Motilal Nehru is now going round the country openly inciting the people to practise civil disobedience. Yet there is no house search, no arrest, no placing of bombs in the houses of patriots either in the Bombay Presidency or in the United Provinces.’

তাৎপৰ্য্য। “মহাত্মা গান্ধী বর্তমান আমলাতন্ত্রের প্রবলতম বিরোধী এবং পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু নিরস্ত্র আইন অমান্ত করিবার নিমিত্ত সমগ্র দেশকে একান্তভাবে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতেছেন। অথচ বোমাই প্রেসিডেন্সীতে কিম্বা আত্রা-অবোধ্যাপ্রদেশে দেশ-সেবকদের বাড়ী খানা-তল্লাসী, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার এবং তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন করা হয় না।”

প্রথমতঃ, এই কথাটা মিথ্যা, যে, অত্র-কোন প্রদেশে দেশসেবকদের বাড়ী খানা-তল্লাসী বা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। লক্ষ্মৌয়ের নিকট কাকোরীর ট্রেন-ভাঙ্গাতি উপলক্ষ করিয়া অনেক কংগ্রেস সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ঘর তল্লাস করাও হইয়াছে। বোমা আবিষ্কারটা হয় নাই বটে ; তাহার কারণ সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে, যে, একই প্রণালী সব জায়গার উপযোগী নহে।—কিন্তু যুক্ত প্রদেশে কার্ত্ত্বী ও রিভলুভার স্থাপন ও আবিষ্কারের নিম্নলিখিত প্রমাণটি “আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ঝাঁসীর জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল শর্মা ঝাঁসীর সেসন জজের বিচারে অস্ত্র আইনের ধারায় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপীলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁহাকে বেকশ্বর খালাস দিয়াছেন। গত ৩১শে মে তারিখে পুলিশ হঠাৎ ঝাঁসী কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় খানা-তল্লাস করিয়া একটি রিভলভার ও ৬৪টা কার্ত্ত্বী পায়। ঐগুলি একখানা শবরের কাপড়ে ভড়াইয়া রান্নাঘরে ডালের হাঁড়ির মধ্যে রাখা হইয়াছিল। রান্নাঘর কংগ্রেস কার্যালয়ের সংস্পর্শে হইলেও তাহা বাহিরের নানা লোকে বাসচার করিত। খানা-তল্লাসীর সময়ে পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল ছিলেন না। তবুও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয় ; কেননা কংগ্রেস কার্যালয়ের বাড়ী তাঁহার নামেই ভাড়া করা ছিল। এই সামান্য স্ত্রী ধরিয়া সেসন জজ পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালকে আঠার মাসের জন্ত জেলে পাঠাইতে কিছুমাত্র বিধা বোধ করেন নাই।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জন্ত বোধ হয় সেসন জজের মত অন্তর্ধানি সন্দেহ নহেন। কাজেই তিনি পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালকে সম্মানে মুক্ত দিয়াছেন। পণ্ডিতজীর ভাগ্যের জোর বলিতে হইবে। ঝাঁসীর ব্যাপারের মতো আরো অনেকটাই যে পুলিশ রিভলভার, কার্ত্ত্বী প্রভৃতি রহস্তময় উপায়ে আবিষ্কার করে না, তাহা কে বলিতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশ রাজনৈতিক কর্কটপাত্রে অগ্রসরতম হউক বা না হউক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসা সবুকার কেন অত্র-সকল প্রদেশ হইতে

একটু স্বতন্ত্র রকমের করিতে চাহিতে পারেন, তাহার কিছু আভাস গত ২২শে জুন তারিখের লণ্ডন টাইমসের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। উহা বঙ্গে বৈরাজ্য বা ডায়ার্কির তিরোভাব সম্বন্ধে। উহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"The fact is that Bengal differs more from most other Indian provinces than they differ from one another. Economic, temperamental and social causes account for this difference. Caste is less powerful; a common literary language unites over forty million Bengalis. Even the Moslem community, who form a narrow majority of the population, are indisputably less divided both socially and politically from their Hindu countrymen than they are in other parts of India. The Bengali temperament, at once calculating and emotional, critical and enthusiastic, baffles other Indians almost as much as it puzzles British administrators. There have been periods when Bengal has led Indian nationalism. But this leadership has been temporary. The disappearance of Mr. Das, the rapidity with which other provinces are gaining ground educationally at the expense of what once seemed a Bengali monopoly, and the growth of "communal" feeling throughout India may to some extent isolate the Nationalism of Bengal from the main current of Indian politics."

ভাষ্যার্থ। "বাস্তবিক কথা এই যে, অল্পসব প্রদেশ পরস্পর যতটা পৃথক্। বাংলাদেশ তাহাদের সবগুলি হইতে তার চেয়ে বেশী পৃথক্। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনোভাবজনিত কারণে এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। বঙ্গে জাতি ভেদ প্রবল নয়; এক সাধারণ ভাষা চার কোটির উপর বাঙালীকে সংমিলিত করিয়াছে। এমন কি বঙ্গে সংখ্যাভূমিট মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য নিশ্চয়ই অল্পতর অপেক্ষা কম। বাঙালীর দাত বোঝা যেমন ব্রিটিশ শাসকদের আর তেমনই অল্প ভারতীয়দের পক্ষেও বড়ই কঠিন। কোন কোন সময়ে বাংলাদেশ ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রণী হইয়াছিল। কিন্তু এই নেতৃত্ব অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। বঙ্গের স্বাধীনতা যে ভারতীয় রাজনীতির মূল ও প্রধান শ্রোত হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, তাহার কারণ মিঃ সি আর দাশের মৃত্যু, শিক্ষা-বিস্তার ক্ষেত্রে অল্প সব প্রদেশের ক্ষতবেগে বঙ্গের সমকক্ষতা লাভ, এবং সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বৃদ্ধি।"

রাজনীতিতে যে বাংলাদেশের সহিত ভারতের অবশিষ্ট অংশের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনার টাইমসের স্মৃতি হইয়াছে, এবং এসব বিষয়ে ঐ কাগজ ভারতের শাসনযন্ত্র-পরিচালক লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের মুখপত্র। বাংলাদেশ ঘটনাচক্রে ও নানা অবস্থার সমাবেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে "একঘরে" হইবে এই ভাবিয়া যদি আমলাতন্ত্র খুণী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের ইচ্ছিত সেই স্মৃতিটা যাহাতে নিশ্চয় ও শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত বঙ্গের অল্প স্বতন্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করি আমলাতন্ত্রের পক্ষে অসম্ভব নহে।

ষ্টেটস্ ম্যানের লেখক ধরিয়া লইয়াছেন, যে, দূত যুবকেরা দেশভক্ত দেশসেবক এবং স্বরাজ্য দলের কিংবা কংগ্রেসের কাজ করিতেছেন। এরূপ মনে করিবার কারণ কি? দেশভক্তি, স্বরাজ্য-দল ও কংগ্রেসকে লোক-চক্ষে ছেয় করিবার জন্য কি এইরূপ বলা হইয়াছে?

ষ্টেটস্ ম্যানের লেখকের কথার সমালোচনা এই জন্ত করিলাম যে, তিনি পুলিশ ও গবর্নমেন্টের ওকালতি করিয়াছেন এবং সম্ভবত সরকারী কৈফিয়ৎ তাহার কলম দিয়া বাহির হইয়াছে। নতুবা ব্যক্তি হিসাবে তাহার নিজের কথার সমালোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

নারীর উপর অত্যাচার

নারীর উপর অত্যাচার কেবল যে বঙ্গের—প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের—পল্লীগাম অঞ্চলে হইতেছে তাহা নহে, দিনে-দুপুরে কলিকাতা সহরেও হইতেছে। এই অবস্থা যেমন লজ্জাকর, তেমনই শোচনীয়। সেদিন প্রমথনাথ হালদার-নামক এক ভদ্রলোকের পনের বৎসর বয়স্ক কন্যাকে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা তাহার পিতাকে জখম করিয়া রাস্তা হইতে গাড়ী করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। গুণ্ডাদের সহায়ক বলিয়া অভিযুক্ত এক পশ্চিমা স্ত্রীলোক ও একজন মিঠাইয়ের দোকান-ওয়ালা ধৃত হইয়াছে। একজন মুসলমান রিকশা-ওয়াল (মাহুদ-টানা-গাড়ীওয়াল) ও তাহার তিন সহচর আরোহী একজন ভদ্রমহিলাকে বলাৎকার করার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারী সোপর্দ হইয়াছে।

মফঃস্বলের ও কলিকাতার ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের জানা উচিত, যে, দকল সম্প্রদায়ের সব রিকশা-ওয়াল সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিঃসন্দেহ অসম্ভব না হইলে মহিলারা যেন চেনা লোক দেখিয়া তবে তাহাদের যানে আরোহণ করেন।

আগামী বড়লাট

আগামী বড়লাট মিস্টার উড্ যে বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর লোক নহেন, তাহা ইংরেজদের লেখা কাগজগুলার প্রশংসাসম্বন্ধেও বুঝা যায়। আগেকার প্রত্যেক

বড়লাটই যে স্বদেশে প্রথম শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কাজের জন্য সেরা সেরা লোক পাঠান, এইরূপ কথা মধ্য-মধ্যে ইংরেজদের মুখে শোনা যায় ও কাগজে দেখা যায়। সেইজন্য কথাটা বলিতে হইল। বিলাতী কাগজে দেখা যাইতেছে, যে, মিঃ উড্‌সার্খিক, দয়ালু, সহায়ত্বভূতসম্পন্ন, জাত্যভিমান ও জাতিবিদ্বেষ-বিহীন, বিদ্বান লোক; তাঁহার মনের ভাব অনেকটা লর্ড ক্যানিংয়ের মত। ভারতবর্ষে তিনি তাঁহার কাজে তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় দিতে পারিলে তিনি পুণ্যবান হইবেন ও প্রশংসা পাইবেন। আগে হইতে কিছু বলা যায় না।

ইতিপূর্বে যাহারা ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে মন্দ লোক ছিলেন না; কেহ-কেহ ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য-পূজা এবং ভারত-শাসন যন্ত্রটিই এমন, যে, কেহ ভাল লোক হইলেও ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু কল্যাণ করিতে পারেন নাই। খুব শক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, কৌশলী ও ভারতহিতৈষী কেহ যদি বড়লাট হইয়া আসেন, এবং স্বজাতির বিরাগভাজন হওয়াকে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে ভারতের কোন কল্যাণই করিতে পারেন না, এমন নয়। কিন্তু এমন মানুষ দুর্লভ।

বিলাতী কাগজগুলি আগেই বলিয়াছিল এবং তাহার পর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডউইন্‌ বুলিয়াছেন, ভারত-বর্ষ প্রধানতঃ গ্রামের দেশ এবং উহার অধিকাংশ লোকের নির্ভর চাষের উপর; মিঃ উড্‌ চাষ-ঘটিত প্রশ্ন খুব ভাল বুঝেন, সুতরাং যদিও ভারতের কৃষি-সমস্যা ইংলণ্ডের সমস্যা হইতে গভীরভাবে পৃথক্, তথাপি তিনি ভারতীয় কৃষিজীবীদের আন্তরিক দরদী হইয়া ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

ব্রিটিশ রাজত্ব-কালের পূর্বে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না। ভারতীয়েরা যেমন কৃষি দ্বারা আঃনাদের অল্পের জোগাড় করিত, তেমনি নানা পণ্য-শিল্পের দ্বারা অল্প সব আবশ্যিক জিনিষের অভাবও পূর্ণ

করিত। ইহার বেশী প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা সুবিদিত তথ্য। কেবল ঐতিহাসিক ডাক্তার রবার্টসনের কয়েকটি বাক্য তৎপ্রণীত “এ ডিস্কুইজিশন্‌ কন্সার্নিং ইণ্ডিয়া” নামক বই হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“In all ages gold and silver, particularly the latter, have been the commodities exported with the greatest profit to India. In no part of the earth do the natives depend so little upon foreign countries, either for the necessaries or the luxuries of life. The blessing of a favourable climate and a fertile soil, augmented by their own ingenuity, afford them whatever they desire.”

ভাষণ্য। “সকল যুগে, সোনা ও রূপা, বিশেষতঃ রূপা, খুব লাভের সহিত ভারতে রপ্তানী হইয়া আসিয়াছে। (অর্থাৎ ভারতে উৎপন্ন জব্য বিনিময়ে পাইবার জন্য বিদেশীরা এদেশে সোনা ও রূপা চালান করিত।) জীবনধারণের নিমিত্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের তত্ত্ব পৃথিবীর কোন অংশের লোকই ভারতীয়দের মত বিদেশের উপর এত অল্প নির্ভর করে। অশুকুস মলবারু এবং উর্করা ভূমি তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের সহযোগে তাহারা বাহ্য কিছু চায় তাহাই তাহাদিগকে প্রদান করে।”

ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের নানা পণ্যশিল্প লুপ্ত বা প্রায়-লুপ্ত হওয়ায় যাহারা পূর্বে পণ্যশিল্পের কৃষি ও পণ্য-শিল্প উভয়ের উপর নির্ভর করিত, তাহাদিগকে হয় কেবল জমীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে কিম্বা সাধারণ কুলি-মজুরের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। তাহাতে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের জমী যত লোককে সুস্থ সবল অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক উহার উপর নির্ভর করিতেছে। তাহার উপর আবার নানা খাদ্যশস্ত্রের বিদেশে প্রদৃত চালান আছে। ফলে ভারতবর্ষের অনেক কোটি লোক তন্ন হইতে মৃত্যু গর্ভাস্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অতএব ভারতবর্ষের অনশন ও অর্দ্ধাশন দূর করিতে হইলে শুধু কৃষির দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা কম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রবর্তন প্রয়োজন হইবে। সুতরাং কৃষির প্রতি যাহার মন চিরকাল আকৃষ্ট হইয়াছে, শুধু এই রকম একজন লোকের দ্বারা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

“হইতে পারে না” বলাটা হয়ত একেবারে নিতুল কথা নয়। ভারতের কৃষিজীবীদের অধিকাংশ যেকোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে চাষ করে, তাহাতে এদেশে আপানের

মত অল্প জমী হইতে অনেক ফসল ও বৎসবে অনেকবার ফসল আদায় করিবার (ইন্টেন্সিভ্) প্রথা অবলম্বন করিতে পারিলে হয়ত ফসল ফলিতে পারে। জাপানেও ভারতবর্ষের মত আদিম ও সেকেলে কৃষিক্ষেত্রের দ্বারা চাষ হয় এবং তথাকার লোকেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে চাষ করে। অতএব কেবল কৃষির সাহায্যেই ভারতবর্ষকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইলে ইং-ও হইতে কৃষি-অনুরাগী ব্যক্তি আমদানী না করিয়া জাপান হইতে করিলে ভাল হয়—অবশ্য যদি আমদানী করিতেই হয়। আমাদের মতে ভারতের লোকদিগকে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনমত এদেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যালয়ে পাঠাইলেই যথেষ্ট ফল ফলিতে পারে। ইংলণ্ডের চাষের ব্যবস্থাই অন্য রকমের। সেখানে কৃষিজীবী গৃহস্থেরা অপেক্ষাকৃত বড় বড় ভূমিখণ্ড লইয়া চাষ করে;—যথা চেম্বার্সের একাইক্লোপীডিয়া বলিতেছেন :—

The characteristic feature of agriculture in Great Britain is that it is for the most part carried on by tenant-farmers holding comparatively large farms.....

তা ছাড়া, ইহাও জানা কণা এবং ঐ বহিতেই দেখিতেছি, যে, কৃষিবিদ্যার উন্নতি বিলাতে বেশী হয় নাই; এবং আমেরিকায় ও ইউরোপের মহাদেশস্থ দেশসমূহে কৃষিবিসয়ক গবেষণায় যত মন দেওয়া হইয়াছে, বিলাতে তাহা দেওয়া হয় নাই। বিলাতের লোককে খাদ্যশস্ত্র বাহির হইতে খুব বেশী পরিমাণে আমদানী করিতে হয়। সুতরাং কৃষিবিসয় আমদানী করিতে হইলে আমেরিকা হইতে বা ইউরোপের মহাদেশ হইতে আমদানী করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, বড়লাটকে বেতন রাখাখরচ অতিখিসংকার প্রভৃতি বাবতে যত লক্ষ টাকা দিতে হয়, তত হাজার টাকা দিলেই একজন ভাল কৃষিবিসয় পাওয়া যাউতে পারে। যাহা সম্ভব হয়, তাহার জন্য এত বেশী খরচ করিবার কি প্রয়োজন?

ভারতবর্ষের গ্রাম সকলের উন্নতির জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহার তত্ত্ব গুহানিহিত এমন কিছু নয় যে তাহা দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন চার? কৃষির উন্নতির সমস্তাটী স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার সমস্যাসমূহের সাহিত্য এবং গোষ্ঠাতির রক্ষা ও উন্নতি সমস্যার সাহিত্য, সমাধানের জন্য, পংস্পর্শনির্ভরশীল। ভাবী বড়লাট উভয়সাহেব বিলাতে শিক্ষাবোর্ডের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও ছিলেন বটে। কিন্তু তাহা হইলেই তা হইবে না। ভারতের রাজস্ব প্রধানতঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজনের জন্য ব্যয় না করিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের হিতসাধনে নিয়োগ করিবার ইচ্ছা ও কমতা থাকা চাই। শুধু কথাই চিঁড়া ভিজবে

না। মাছের তেলে মাছ ভাজিবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজস্ব আয়ত্ত্ব বিংশ শতাব্দীতে হয় নাই, উনবিংশ শতাব্দীতেও হয় নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছে। এক দিন পরে ইংরেজের ঠাণ্ডা হইল, যে, ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং তাহাদের জন্য কিছু করিতে হইবে। ইংরেজদের ঘুমটা সচবাচর অধীনস্থ বিদেশীদের উপকার করিবার নিমিত্ত ভাঙে না; নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে ভাঙিয়া থাকে। আমাদের অনুমান হয়, ইংরেজ গুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক চৈতন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া নিরক্ষর ও দরিদ্র লোকদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। এই প্রক্রিয়ার আরম্ভ বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহা এপনকার মত ব্যাপক হয় নাই। শিক্ষিত লোকদের ভাঙে নিরক্ষর দরিদ্র লোকেরাও সাড়া দিতে আরম্ভ করায় ইংরেজকে তাহার একটা প্রতিকারের চিন্তা করিতে হইয়াছে। মাতৃষের পেটের ভিতর দিয়া যে তাহার হৃদয়ে পৌঁছান যায়, ইহা বহুজনবিদিত তথ্য। ইহার প্রতি ইতিপূর্বে কেন যে ইংরেজদের নজর পড়ে নাই, জানি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা কৃষি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বিলাতে ভারতীয় পল্লীসংস্কার ও কৃষির উন্নতি বিষয়ে যে লেখালেখি ও দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, হয়ত তাহাতেও ইংরেজের কিছু চোখ ফুটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, যে প্রকারেই হউক, ভারতের অধিকাংশ লোকের হৃদয় জয় করিবার জন্য এবার ইংরেজ লাগিবেন। তাই একজন কৃষি-অনুরাগী বড়লাট ভারতে পদার্পণ করিবেন। যদি তাঁহার দ্বারা ভারতের কৃষিজীবীদের বাস্তবিক উপকার হয় ও তাহাদের পেট ভরে, তাহা হইলে আমরা খুব আহলাদিত হইব।

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির মানে হইবে, মোটা বেতনে আরও ইংরেজ কৃষিবিসয়, কীটতত্ত্ববিসয় প্রভৃতির নিয়োগ, ভারী ভারী ও দামী বিলাতী কৃষিক্ষেত্রের আমদানী এবং তুলা গম প্রভৃতি যেসব জিনিষের ইংলণ্ডের দরকার বেশী, তাহার উৎপাদন বাড়াইয়া রাখাণী বৃদ্ধি। কর্মচারীদের নাম হইবে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, যদিও ইহারা ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের তুলনায় বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কোন ফল হয় না। চাষাদিগকে নিরক্ষর, অজ্ঞ, ও কৃষি বাধিয়া মোটা বেতনের কৃষিবিসয়-

দের গবেষণার ফল ইংরেজিতে উৎকৃষ্ট আর্টপেপারে ছবি
দিয়া ছাপিলে তাহা উৎকৃষ্ট উপহাসের মত দেখায়।

তাহার পর আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে।
দারিদ্র্যজনিত অনশন অর্ধাশন নগ্নতা ও ব্যাধি মানুষের
ছুঃখের ও অসন্তোষের কারণ বটে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর
কবিয়াই মানুষকে সজ্জ্বল করা যায় না। কারণ পেটই
মানুষের সর্বস্ব নহে; তাহার হৃদয় মন আত্মা আছে। এই
জন্ত সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, নিজের ভাবনা
নিজে ভাবিতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চায়।
সুপুটে ঘোড়া গোক কুকুণের মত সুপুটে মনুষ্য কেবল খাওয়া
পরা লইয়াই সজ্জ্বল থাকিবে, মনে করা মগালম। প্রথমতঃ
ত ভারতবর্ষ জাতীয় আত্মশুদ্ধি না পাইলে কখনই
ভারতের দারিদ্র্য দূর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি আত্ম-
শুদ্ধি বিনাও ভারতের দারিদ্র্য দূর হয়, তাহা হইলেও
দেপা যাইবে, মানুষের দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে সে
উচ্চতর জিনিষের ক্ষুধা এখনকার চেয়ে আরও ভাল করিয়া
অনুভব করিবে। বিলাতে ও আমেরিকায় দারিদ্র্য
ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু তথাপি তথায়
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এদেশ অপেক্ষা প্রবলতর।

বিলাতী কাগজওয়ালারা বলেন, উড সাহেবের ভারত-
বর্ষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই (ক'জন ইংরেজেরই বা
আছে?) এবং কোন মতামত নাই। এক দিক দিয়া
তাহা মন্দ নয়। কিন্তু ইহার মানে এও হইতে পারে, যে,
ভারতের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট লোকদের চেয়ে তিনি
বিলাতী মন্ত্রীদের অধিক আজ্ঞাকারী হইবেন বলিয়াই
তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ইংরেজ যদি ভারতের অধিকাংশলোকের
পেট ভরাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাতে
আগদের লাভ বই অলাভ নাই।

—

সদিচ্ছার ফরমাইস্

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন ভারতীয়দিগকে বলিয়াছেন,
“তোমরা সদিচ্ছা দেখাইয়া আমাদের সদিচ্ছা অর্জন
কর।” আমলাতন্ত্র-শাসনের প্রধান বিরোধী মহাত্মা
গান্ধী পর্যন্ত যুদ্ধের সময় সিপাহী সংগ্রহে নামিয়া সদিচ্ছা
দেখাইয়াছিলেন। ভারতের সদিচ্ছা ব্রিটেনের বিপদের
সময় লক্ষ লক্ষ মৈনিক ও শ্রমিক, কোটি কোটি টাকা, ও
প্রচুর যুদ্ধসম্ভারাদি প্রদানে প্রকটিত হইয়াছিল। তাহার
বিনিময়ে ব্রিটেনের সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল রোলট
আইনে, সামরিক আইনজারীতে, জালিয়ানওয়ালাবাগে,
এবং আরো অনেক জিনিষে। এক কথায়, ভারত সদিচ্ছার
কাঞ্চন দিয়া পাশে লোহার বেড়ী ও পিঠে কশাঘাত

পাইয়াছিল। একটা কথা বলা হয়, যুদ্ধে যে সব ভারতীয়
প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা অশিক্ষিত শ্রেণীর; তাহাদের
জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে শিক্ষিত লোকেরা রাষ্ট্রীয় অ-
কর্তৃত্ব পাইতে পারে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত
ভারতীয়দের মধ্যে এই আত্যন্তিক প্রভেদ মানিয়া লইলেও
জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, অশিক্ষিত শ্রেণীর ভারতী-
য়োই বা তাহাদের প্রাণপণ সদিচ্ছার বিনিময়ে কি
পাইয়াছে?

যাহা হউক, এখন আবার নূতন করিয়া সদিচ্ছার দাবী
হইয়াছে। আন্তরিক সদিচ্ছা দেখাইতে আমাদের বিনু-
মাত্রও অনিচ্ছা নাই। সেই জন্ত আমরা জানিতে চাই,
এই সদিচ্ছার মানে কি এবং কি ভাবে কি বকম কথা
ও কাজের দ্বারা উহা দেখাইতে হইবে? ইংরেজরা আমা-
দিগকে যেমনটি হইতে, বলিতে ও করিতে আদেশ করবে,
ঠিক তেমনটি না হইলে বলিলে করিলে যদি সদিচ্ছা
দেখান না হয়, তাহা হইলে আমরা আগে হইতেই বলিয়া
দিতেছি আমরা ইংরেজদের সর্ব বা দাবীতে রাজী নহি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানিতে চাই, আমাদের সদিচ্ছার
বিনিময়ে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ও তৎপূর্ব ইংরেজ ভারত-
সচিব তাঁহাদের যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন,
সেটা কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ সেটা তাঁহাদের কিরূপ ব্যবহারে
প্রকাশ পাইবে। তা ছাড়া, তাহারা যে কথা রাখিবেন,
তাহার প্রমাণ কি? ইংরেজ জাতি ও গবর্নেন্ট
ভারতবর্ষের সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্ত বিখ্যাত। যদিই
বা প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের অঙ্গীকার পালনের
অকপট ইচ্ছা থাকে, সে ইচ্ছায় যে পার্লামেন্ট সাই দিবে,
তাহার নিশ্চয় কি?

ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলেরই সিপাহী-
বিরোধের মত একটা কিছু বিরোধ করিবার ইচ্ছা নাই,
তাহার সম্ভাবনা নাই, তাহা করা উচিত বা সুবিধার
পরিচায়কও হইবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক একটা ঘটনা
ইংরেজদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মহারাণী ভিক্টো-
রিয়ার ঘোষণা-পত্র অনুসারে কাজ না হইয়া থাকিলেও
শিক্ষিত ভারতীয়েরা উহাকে দীর্ঘকাল নিজেদের রাষ্ট্রীয়
অধিকারের প্রধান সনন্দ মনে করিয়া আসিয়াছে। ঐ
সনন্দ ভারতীয়েরা সদিচ্ছার বিনিময়ে পায় নাই। পরেও
তাহারা যে-সব “বর” ব্রিটিশ গবর্নেন্টের নিকট হইতে
পাইয়াছে, তাহাও একটা না একটা প্রবল আন্দোলন
অশান্তি বা বিদ্রোহের পরে বা সমকালে পাইয়াছে। এই
সব ঐতিহাসিক তথ্য সদিচ্ছার-বিনিময়ে-সদিচ্ছা-বাদ
সমর্থন করে কি?

আমাদের মনে হয়, আমরা ইংরেজের সব কথায়,
কাজে, মৎসবে চেয়া সই দিয়া সদিচ্ছা প্রকাশ করিলে

তাঁহারা ভারতবর্ষকে, ব্রিটেনকে ও সভ্য জগৎকে এই বুঝাইয়া নিশ্চয় মনে নিজে দিতে থাকিবেন, যে, ব্রিটিশ রাজ্যের ভারতীয়েরা এত সুখী ও সমৃদ্ধ যে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করে না; অতএব শাসনপ্রণালীর বা অন্তর্বিধির একটুও পরিবর্তনের আবশ্যিক নাই।

পারস্যে রক্তপাতহীন বিপ্লব

পারস্যের শাহ ও তাঁহার বংশ বিনা রক্তপাতে সিংহ-সনচ্যুত হইয়াছেন এবং রাষ্ট্রশক্তি রিজা খানের হাতে আসিয়াছে। তিনি নূতন রাজবংশের সংস্থাপক হইবেন, না পারস্যে সাধারণতঃ স্থাপিত হইবে, এগনও বলা যায় না। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতম জাতিরা নূতন গবর্নেন্টকে বৈধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পদচ্যুত শাহ পারিস্ হইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করা ঠিকই হইয়াছে। যে সব রাজা কেবল বিদেশে বেড়াইয়া বিলাসে বাসনে পাপাচারে প্রজার রক্তস্বরূপ ঘর্ষের অপব্যয় করে, যেমন পারস্যের শাহ এবং ভারতবর্ষের অনেক রাজা, তাহাদের রাজ্যলোপ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

ভারতীয় রাজাগুলার ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণা হয়। যোধপুরের রাজা পোলো খেলা ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে বিলাতে আঠার লাখ টাকা উড়াইয়াছেন, অথচ তাহার অষ্টমাংশও প্রজাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন না। পাটনালার রাজা ৬০ জন অস্থির ও ৩৫০টা বাস্তু পার্টিরা লইয়া ছেনিভায় জাতিসঙ্ঘে গিয়াছিলেন। অথচ স্বাধীন শক্তিশালী দেশের প্রতিনিধিরা একজন সেক্রেটারী এবং একটা কি ছুটা ব্যাগ লইয়া যান। ভারতীয় রাজাগুলার বিদেশে অপব্যয়ে আমাদের আর একটা এই অপকার হয়, যে, তাহাদের ব্যয়বাহুল্য বশতঃ বিদেশীরা অধিকাংশ ভারতীয় লোক যে অতি দরিদ্র তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না।

ডামাস্কে গোলাবর্ষণ

ফরাসীরা ডামাস্কে গোলাবর্ষণ করিয়া পচিশ হাজার, বার হাজার, বা দুই শত, কত লোক মারিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা হইলেও, সভ্যতম শ্রেণী মানুষকে আঁচড়াইলে যে অসভ্যতম মানুষ বাহির হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণ ঐ ঘটনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। শত্রুনিপাত করিয়া তাহার মৃতদেহ প্রদর্শন

করিয়া বেড়াইবার বর্ষের প্রথার অনুশরণও ফরাসীরা করিয়াছে।

এক বিষয়ে জেঙ্গীস খা ও নাদির শাহের সৈন্তেরা ফরাসী সেনাপত ও সৈনিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারাও নরহত্যা করিয়াছিল বটে; কিন্তু স্মরণ সময়ে একরূপ ভাবে তাহাদিগকে হত্যা কার্য্য চালাইতে হইয়াছিল, যে, তাহাদের শত্রু হাতে প্রাণ হারবার সম্ভাবনা ছিল। অন্তর্দিকে, ফরাসী সৈন্তেরা বহু দূর হইতে ডামাস্কেসের অযোদ্ধা নরনারী ও শিশুদের উপর গোলা চালাইয়া নির্ভয়ে কাপুকষোচিত নৃশসতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

নারী-নির্যাতন সম্বন্ধে সরকারী উদাসীনতা

কলিকাতায় গুণ্ডারা কখন কখন পৃথিবীদিগকে ছোঁরা মারিয়া বা মারিবার ভয় দেখাইয়া টাকা কাড়িয়া লইত; অমান গুণ্ডা আইন হইল। কিছু অল্প বোমার মশলা কোথাও আবিষ্কৃত হইল বা না হইল; অমান কত লোকের নির্যাসন হইল, বেঙ্গল আর্ডিন্যান্স জারী হইল, ইত্যাদি। কিন্তু এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া পত শত নারীর উপর অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবন বাধ হইতেছে, পরিবার কলঙ্কিত হইতেছে, কেহ বা আত্মহত্যা করিতেছে, কেহ বা দুর্বিষহ দুঃখের বোঝা আজীবন বহন করিতেছে, কেহ বা পতিতার দল বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইতেছে—ইহার কোন প্রতিকার করা গবর্নেন্ট উচিত বোধ করিতেছেন না। দেশের সার্বজনিক কার্য্যে এবং ব্যবস্থাপক সভায় নারীর পিদ্যমানতা ও প্রভাব থাকিলে গবর্নেন্ট একরূপ উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, দেশের প্রবলতম রাজনৈতিকদল স্বরাজ্যবাদীরাও মুসলমানদিগকে চটাইবার ভয়ে এ বিষয়ে এমন চূপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত, দীর্ঘকাল বাংলা দেশে সফর করিয়া, বিষয়টির গুরুত্ব উপলক্ষি করিয়াছেন, তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা হইতে একরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্বরাজ্যদলের গৃহবিবাদ

অল্প দলের মত স্বরাজ্য দলেরও সমালোচনা আধার সরকার হইলে করিয়া থাকি। কিন্তু এখনও তাহারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবলতম দল, এবং আধুনিক সময়ে তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষকে যতবার কোণঠাসা

করিয়াছেন, অল্প কোন দল তাহা পারে নাই। অতএব গৃহ বিবাদে তাঁহাদের শক্তিকর হুঃখের বিষয়।

বাংলা মিউনিসিপ্যাল বিল

বাংলা মিউনিসিপ্যাল বিলে নির্ধারিত সভ্যের হার পূর্ণসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশ হইতে তিন-চতুর্থাংশে এবং কোথাও কোথাও চারি-পঞ্চমাংশ করা হইয়াছে। ইহা ভাল। কিন্তু বিলে ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে সভ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া সম্মিলিত জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এবং জাতীয় জীবনে একটা তীব্র মারাত্মক বিষের থাকিবার অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। “স্বরাজ্যচুক্তি”সঙ্গে স্বরাজ্যদলের মুখপত্র ফরোয়ার্ড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংখ্যায় নূন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট মুখপত্র দি গার্ডিয়ান ইহাকে অনিঃকর বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিগুলির কাজ সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ধারিত সভ্যদের দ্বারাই বেশ চলিতেছিল; নূতন করিয়া অবিশ্বাস ও ভেদের উপায় অবলম্বন কেন করা হইতেছে? ২৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত টাইমসের মন্তব্যে বাংলা দেশে অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য কম আছে বলা হইয়াছে। সেই অল্প পার্থক্য বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে বোধ হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এক বৎসর স্থপরি-চালিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, কোন নিয়মে না বাধিলে; বন্ধের মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইলে ভাল হয়। মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কথা সাধারণ সংবাদপত্রসকলে ভাল করিয়া আলোচিত হয় না।

জজ পেজের মামলা

হাইকোর্টের জজ পেজের নামে এই অভিযোগ হয়, যে তিনি এক মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ারকে লাঞ্ছিত করিয়া নিঃস্বের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, যদিও সেই উক্তলোক সরকারী কাজে তথায় গিয়াছিলেন। কোন আদালতেই ইহার সুবিচার হইল না। নিয়তন ছুই

আদালত ত আইনবিরুদ্ধ ভাবে মোকদ্দমা চালাইয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দেন। হাইকোর্টের ছুই আদালতে জজেরা বলেন, এ বিষয়ে পূর্বে তাঁহারা জজ পেজের কথা শুনিয়াছেন বা লেখা পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহারা বিচার করিবেন না। তাহা ভাল। কিন্তু জজ পেজ ও অল্প জজেরা জানিতেন, যে, মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্যন্ত আসিতে পারে; সুতরাং এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কাহারও এ বিষয়ে বাড়ীতে বা ক্লাবে কোন প্রকার আলোচনা করা অনুচিত হইয়াছিল। যে ছু জন জজ শেষে বিচার করিলেন, তাঁহারা উভয়েই রায়ে বলিয়াছেন, যে, ম্যাজিস্ট্রেট আইনসম্মত বিচারপ্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। তাহা হইলেও কিন্তু তাঁহাদের মতে পুনর্বিচার অনাবশ্যক! অসুত রায়! নারী স্বতন্ত্র ও ধর্মিতা হইলে ও মোকদ্দমা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়া গেলেও, বিচারপ্রণালী নিখুঁত না হওয়ার হাইকোর্টেই আদেশে আবার সেই নারীকে পুনর্বিচারের ব্যয় ও হুঃখ সঙ্ক করিতে হইয়াছে; কিন্তু এক্ষেত্রে পুনর্বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই! অধিকন্তু জজদের মতে, নিয় আদালতে আসামীর কৌশলি ঠারেঠোরে আসামীর হুঃখপ্রকাশের আভাস দেওয়ার করিয়ার তাহা লাঞ্ছিত মলম স্বরূপ লুকিয়া লওয়া উচিত ছিল।!! আইনের চক্ষে যে ধলা কালা ছোট বড় সবাই সমান, এই মোকদ্দমার রায়টি তাহার আধুনিকতম আভ্যন্তরীণ প্রমাণ।

আব্দুল করিম

মরক্কোর নেতা আব্দুল করিম চারিমাগ হারিতেছেন না, মরিয়াও মরিতেছেন না। ক্রান্ত ও স্পেনের পক্ষে ইহা বড়ই হুঃখের বিষয়।

ওড়িষায় দুর্ভিক্ষ

এণ্ড্রু সাহেব ওড়িষায় দুর্ভিক্ষের কথা নানা ধরনের কাগজে প্রকাশ করিয়া উৎকলীয়দিগের যেমন উপকার করিয়াছেন, বিহার-ওড়িষা গবর্নমেন্টের তেমনি অগ্রায় হইয়াছেন। বিহার-সরকার তাঁহার বর্ণনার প্রতিবাদও করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোন মূল্য নাই। সরকারী অনেক কক্ষচারীর দেশের হুঃখহর্দশার কথা চাপা দিয়া রাখা বা ধুব কয় করিয়া বলাই অভ্যাস।

এণ্ড্রু সাহেবের পিছনে টিকটিকিও লাগান হইয়াছিল। ইহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বেকুবী। তিনি সামনৈতিক আন্দোলনকারী মোটেই নহেন; সুতরাং টিকটিকির সেবা পাইতে অনধিকারী।



পথ প্রদর্শক জ্ঞানি
অমৃত জীবনধারি, মনোময় আলোক রেখার অভিযাত্রক



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩২

৩য় সংখ্যা

উদ্ভিদের জংশ্পন্দন

আচার্য্য শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

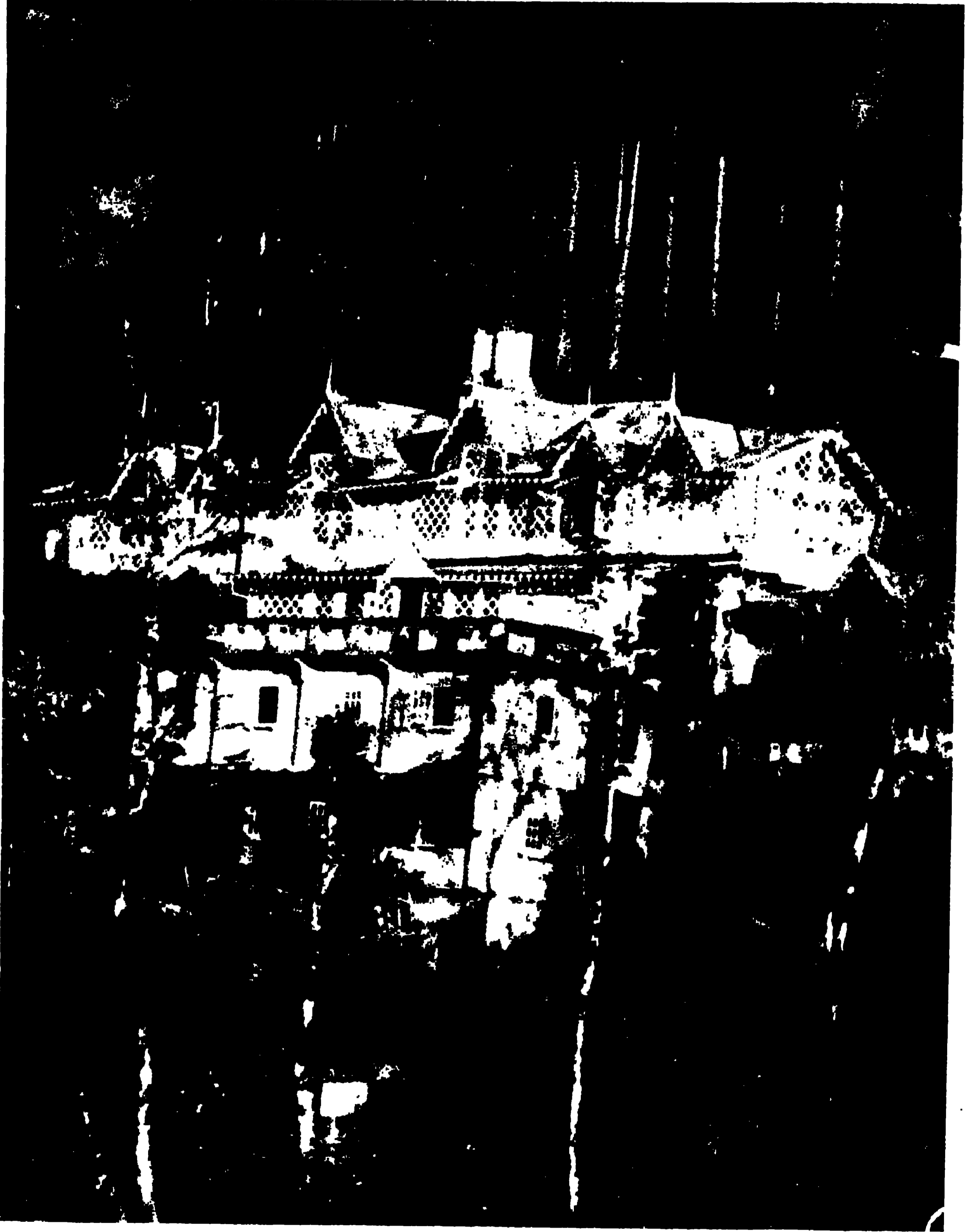
[পূর্বে এক বৎসরের মধ্যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদজীবনের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে তিনটি গুচ গ্রন্থ উদ্ভাষিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। গত মাসে দার্জিলিংএর গবর্নমেন্ট হাউসে লর্ড-লিটনের নিমন্ত্রণে বে-সভা আহৃত হয় তাহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের পেশীমণ্ডল আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাদিনের অষ্টম বার্ষিক উৎসব সভায় তিনি উদ্ভিদের জংশ্পন্দন ও রসসঞ্চালন সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ইংরেজী সভাবন্ প্রিন্টিয়ুতে প্রকাশিত বক্তৃতা ও আচার্য্য বসুর সঙ্গীত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিপিত হইল।]

বত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি অদৃশ্য বৈদ্যুতিকরশ্মি-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। হার্জ (Hertz) আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অতি বৃহদাকার বলিয়া, সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আলোর উর্ধ্ব গর্ভ করা আবশ্যিক। আমি যে কল নিষ্কাশন করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা প্রেরিত আকাশ-উর্ধ্ব দৈর্ঘ্য এক-ইঞ্চির ছয় ভাগের একভাগমাত্র। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অল্প জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই

আলোকে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া থাকে। অদৃশ্য আলো উপলব্ধি করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কল তৎকালে ছিল না। আমি কতক গ্যালিনা রিমিঙা উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাঠন-সম্ভাবনা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি সন্দেহমুক্তে বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিদ্যুৎ-উর্ধ্ব গবর্নরের বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি কক্ষ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানা-প্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। তাহা একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বাকদম্বুপ উড়াইয়া দিল।

জীব ও অজীব

তারঙ্গীন কল লইয়া পরীক্ষা করিতে-করিতে দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাতন্ত্রী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্রান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই,



মায়াপুরী বহু পবেষণা-মন্দির, দার্জিলিং (৭ হাজার ফুট উচ্চে হিত)



মারাপুরার সংক্ষেপে ভূমির-দৃশ্য

যে, বিশ্বামের পর কলের ক্লাসিক দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অস্তিত্ব হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধানাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইত, জড়ও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপে বহু মধ্য একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

উদ্ভিদের সাড়া

ইহার পরে আমি উদ্ভিদের চেতনা-সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য আছে।

আহত হইলে প্রাণী দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে ; তাহার হৃদযন্ত্র সন্দীপিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাণী, ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্যিক উপলক্ষি করিতে পারে। অপর পক্ষে একাদির সংশোধন বা প্রসারণ করিবার ক্ষমতানাই, তাহাতে কোন স্পন্দন নাই, তাহারা স্নানুষ্ঠান, উচ্চ প্রচলিত বিশ্বাস। দুইটি জীবন-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, অথচ তাহাদের জীবনে কোথাও একেবারে চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহুদিন ধাবৎ উদ্ভিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে-দিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষ চেতনার সাড়া দিল, সেই দিনই তাহার অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ জীবন-ধারা-প্রণালী অবগত হওয়া সম্ভবপর হইল। ক্রমে-ক্রমে

এই সাত্তাকে লেখায় পরিণত করিবার যত্নাদি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, সেই লেখা পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এই নূতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই সত্য; সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের জীবন একই প্রকার। মাকুষের যেমন হৃৎস্পন্দন আছে, বৃক্ষলতাতিরও ঠিক সেইরূপ হৃৎস্পন্দন আছে। প্রাণী যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদও সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন



মাচাপুরী গবেষণা-মন্দির সংলগ্ন অরণ্যোচ্চান

করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উদ্ভেজক ঔষধ বা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই একই প্রকার। ইহা হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজীবন সম্পর্কিত এই নূতন গবেষণার ফলে ঔষধ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্তনের দ্বারা অবগত হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এই ধারার রহস্যও অনাবৃত হইয়াছে।

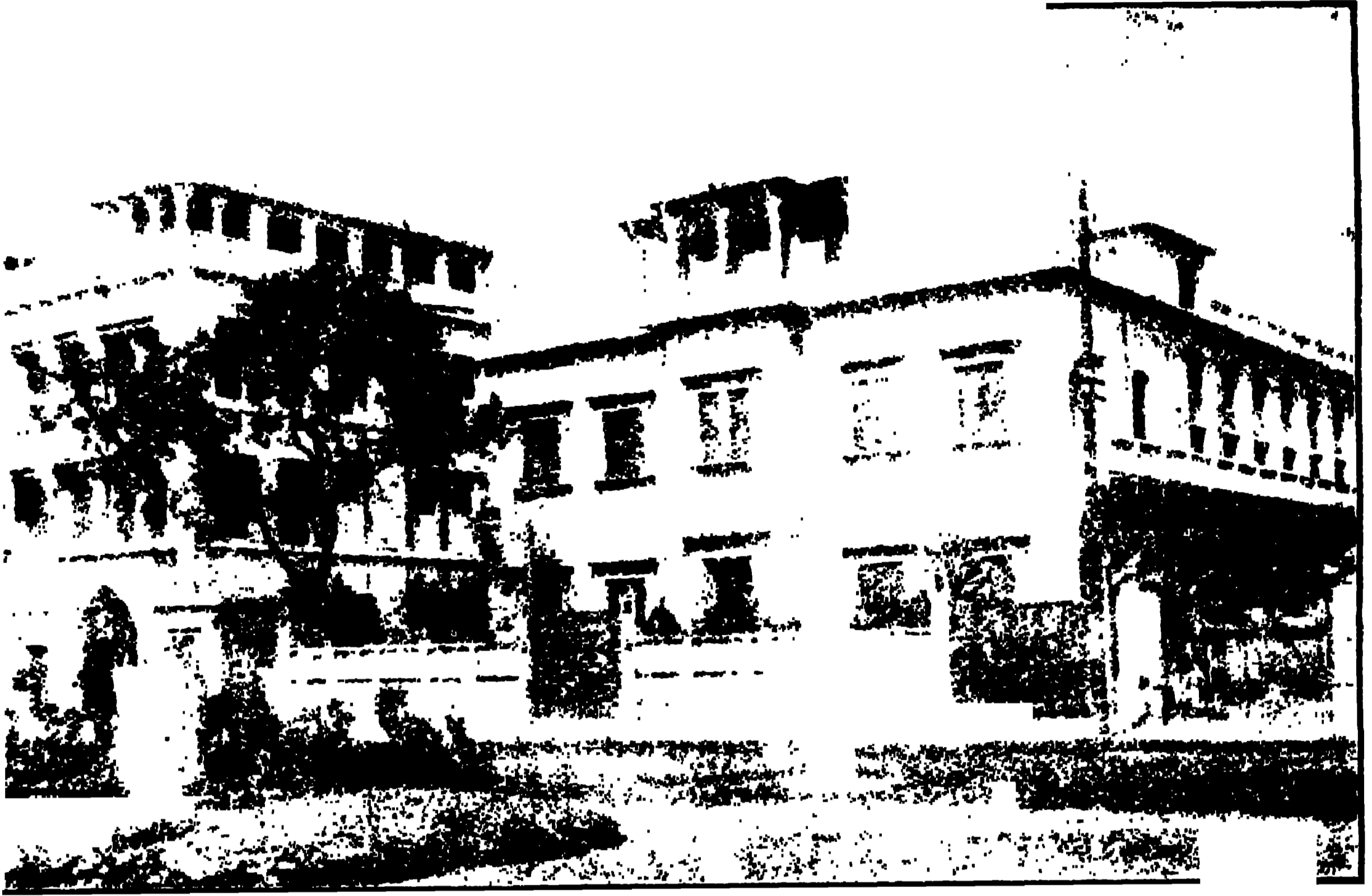
সাধনা

এইসমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। একদিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বর্ষ একাগ্রতার সহিত সাধনা করিয়াই ইহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আট বৎসর পূর্বে যখন আমি বহু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কাখে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল এবং দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোন কার্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম—এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জগৎ সেই তথাকথিত কলঙ্ক-কালিমা মুছাইতে ক্রতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অস্তুদৃষ্টি

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অস্তুদৃষ্টি ও সূক্ষ্মতর আবিষ্কার ও নির্মাণের দক্ষতা ও অল্পসন্ধান করিবার কৌশল জ্ঞানা আবশ্যিক। অস্তুদৃষ্টিশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অল্পসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত জ্ঞান-প্রচার-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্যশালী করে ও সত্যের অল্পসন্ধান সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞান-মন্দির।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রাণ-যন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অস্তুদৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অল্পভব করিতে হইবে। এই অস্তুদৃষ্টি মাঝে-মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য; কারণ অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারামিকে বিপথগামী করে। অল্পবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয় না, তখনও আমাদিগকে অদর্শনীয়ের অল্পসরণ করিতে হয়। কারণ, যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্ত। সেই অদৃষ্টরাজ্যে তন্ন-তন্ন করিয়া অল্পসন্ধান



বহু বিজ্ঞান-মন্দির, কলিকাতা

করিবার জ্ঞত ক্রেস্কোগ্রাফের (Crescograph) আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জিনিষই তাহার আসল মাপ হইতে দশকোটিগুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে দৃষ্টির বহির্ভূত জীবনের মূলগতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণরূপ মনের অধীন করিতে হয়। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিমিত এবং মনের বল দ্বারা যে-সাকল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইঙ্গ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এইসমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ২০০টি বিষয়, এই কারণে সাকল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে।

বৃক্ষে রস-সঞ্চালন

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অহুসঙ্ঘিৎসা দ্বারা স্বকঠিন সমস্তাসমূহ কি-প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অভ-প্রত্যয়ে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্তা লইয়া দুইশত বর্ষের

অধিক কাল অহুসঙ্ঘান চলিয়াছে, কিন্তু কোন হুমুমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপরে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহুদিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস-সঞ্চালন কি জড়শক্তির প্রভাবে হয় না জীবন-শক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্ত স্ট্রাসবুর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিঘ্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবন-শক্তি দ্বারা ঐরূপ রস-সঞ্চালন হইতে পারে না। জড়-বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অহুসঙ্ঘান চলিতে লাগিল—কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্ত অদ্ভুত-অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোন নির্দর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়।

এ-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দেশক। রসের ক্রান্ত সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া উঠে উঠে

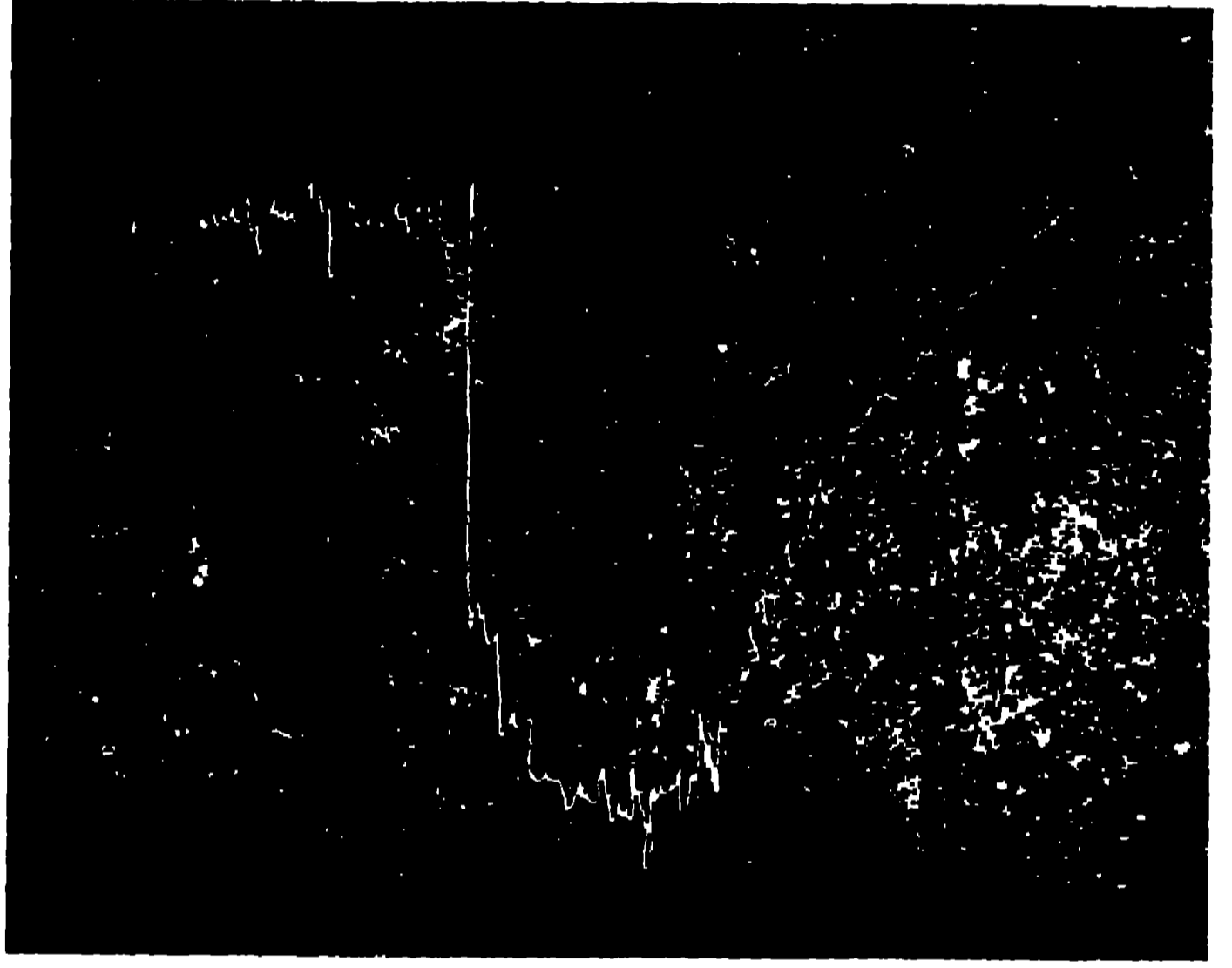
এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা চলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষ্যীভূত হয় না। আনি অপটিক্যাল লিভার (Optical Lever) দ্বারা এই অস্ত্রবিদ্যা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডের একদিক এনটি সূত্র দ্বারা পাতার সহিত বাধা থাকে। দণ্ডটির সহিত একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপে পাতার অতি সামান্য উত্থান-পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ৫ হাজার গুণ পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে সূচাসূত্রগাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নাড়ীর স্পন্দন প্রতিফলিত আলোক রশ্মির সাহায্যে বড় করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কক্ষের নিকটস্থ নাড়াটি বাহিরেই অবস্থিত, সুতরাং নাড়ীর স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। মানুষের নাড়া স্পন্দন সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে হৃদয় সতেজ হয় ও তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রেকর্ডারে (Recorder) উৎকরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের সময় অধোরেখা দীর্ঘতর হয় এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই নাড়া মাংসপেশীতে নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ নির্ণয় করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রসচাপ কি বর্দ্ধিত কিম্বা প্রবল হয়। এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের দক্ষণে যে সঙ্কোচ-প্রসারণ ২য় অত্যন্তকষ্ট অনুবাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র পেশীর মধ্যে বৃক্ষ হৃদয় নিমজ্জিত। সুতরাং এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে ?

এহ স্থানে আচার্য্য বহু একট বৃক্ষে বিষপ্রয়োগ করিয়া সর্ব-সাধারণসমক্ষে দেখাইলেন যে, বৃক্ষের চেতনা এবং রস-সঞ্চালনের ক্ষমতা ক্রমে-ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।

উদ্ভিদের হৃদয়-সন্ধান

তবে বৃক্ষের হৃদয় কোথায় ? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যাংশলাকা দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। নিম্পন্দিত পেশীর সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিম্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদয়যন্ত্রের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্পন্দনের অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। বৃক্ষের হৃদয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত



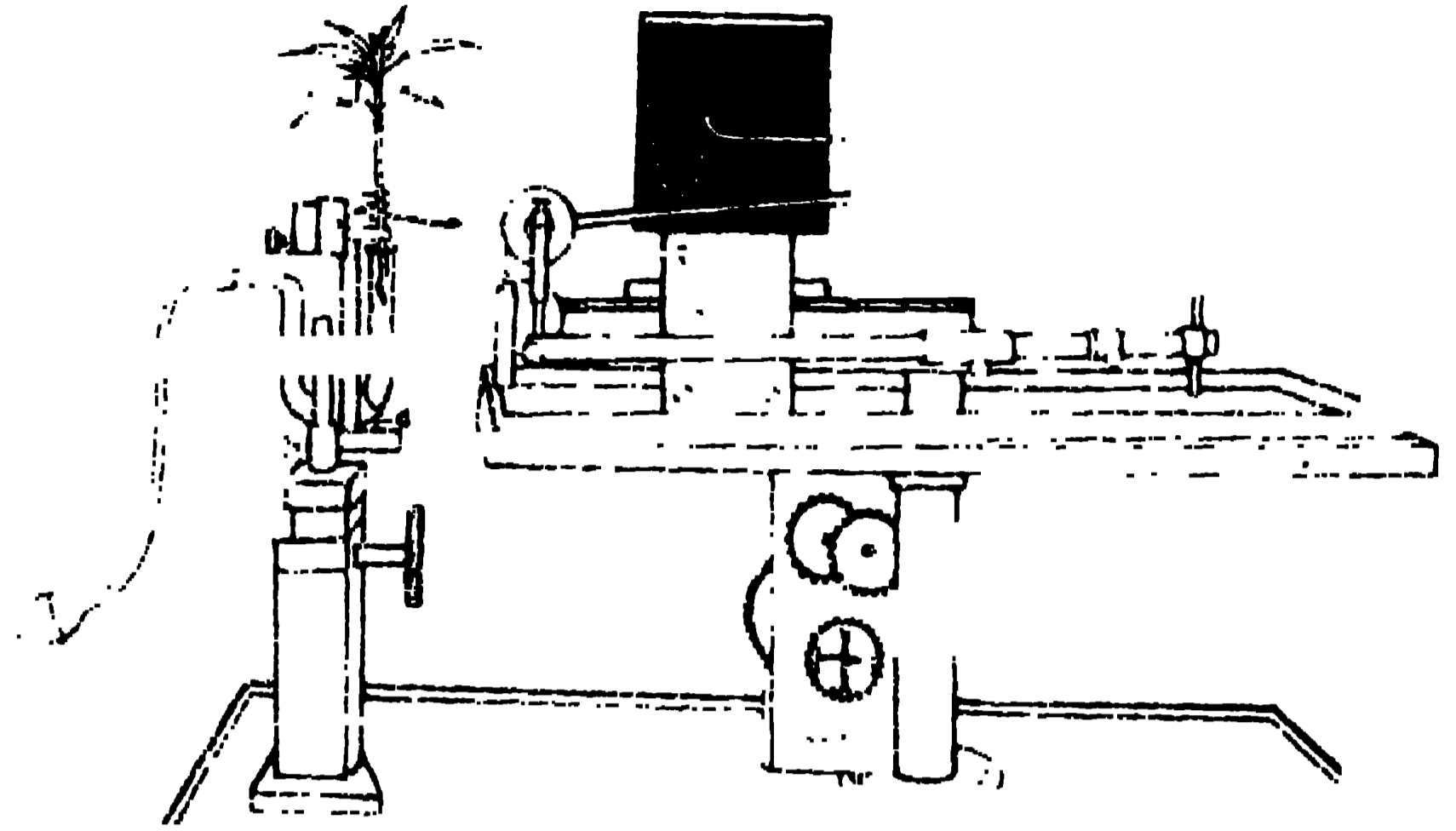
রক্তচাপলিপি। অবসাদে হৃদয়স্পন্দন নিয়মগামী। উত্তেজনার উৎসর্গামী

আমি বৃক্ষের কাণ্ডের দাপে-দাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে-মুহূর্তে ঐ শলাকা স্পন্দমানস্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ঐ সাড়া গ্যালভানোগ্রাফ (Galvanograph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণ কালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিমা লয় এবং সঙ্কোচের সময় উহা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হৃদয় নিম্নশ্রেণীর জীবের হৃদয়যন্ত্রেরই অনুরূপ।

হৃদয়-স্পন্দন অনুভব-করার যন্ত্র

ইহার পর অল্প সমস্তা মনে উদ্ভিত হইল। বিদ্যাংশলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের হৃদয়-স্পন্দন কি .কোনদিন আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইবে ? যখন নিম্পন্দিত রস-প্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক

টেউ বৃক্ষকে কণিকের উদ্ভ
প্রসারিত করে; টেউটি চলিয়া
গেলে বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব আকার
ধারণ করে। এই অদৃষ্ট ও
অস্পষ্ট স্পন্দন মনুষ্য-প্রত্যক্ষ-
গোচর করিবার জন্ত কল্পনারও
অন্তীত অল্প ভবয়ন্ত আবিষ্কার
করিতে হইয়াছে। এই অল্প-
ভবয়ন্তে দুইটি দণ্ড আছে—
একটি স্থির, আর একটি

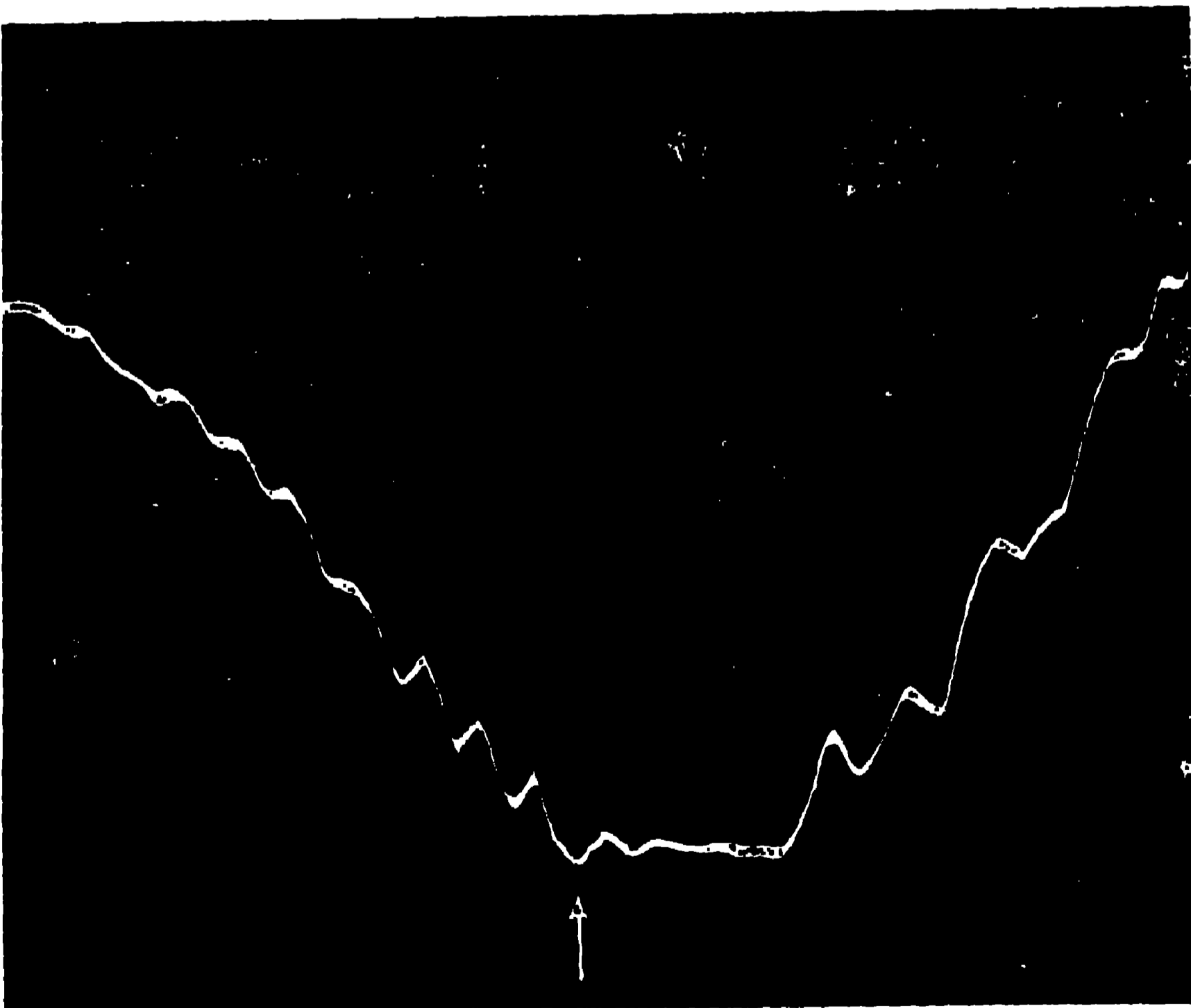


বৃক্ষের জংশনস্পন্দননির্ণায়ক

দুইটির মতো অবস্থাপিত করিলে

প্রসারণতরঙ্গ, চালন-যোগ্য দৃষ্টান্তনিকে বাতিরের দিকে
সেলিয়া দেয়। তবে, উহাচোখে দেখা যায় না। এই সংকোচন-
প্রসারণ একইকির দশলক্ষ ভাগের একভাগেরও
কম। সুতরাং আমার ম্যাগনেটিক অ্যাম্পলিফায়ার
(Magnetic Amplifier) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-
সংকোচনকে এককোটি ভাগ বাড়াইতে হইয়াছে। এট
যন্ত্রের চক্ষুর সহিত সংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত আলোক-

রশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় দর্শিত হয়। বৃক্ষটির জংশনস্পন্দন-
সম্বন্ধে এই আলোকবাহী খালোড়িত হইতেছে।
উদ্ভেজক বা কাঙ্ক্ষিতক উদ্ভিদ প্রয়োগের ফলে এই
আলোড়নের গতি বৃদ্ধি অথবা কম প্রাপ্ত হইতেছে।
জীবনীশক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কম্পাত আলোকবেগে
দ্বারা জীবনের গুঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে এতরূপ সন্দর্ভে
প্রচারিত করিল।



বৃক্ষের জংশনস্পন্দন। অবসাদে স্পন্দন রেখা নিরে বাইতেছে। পরে উদ্ভেজনার উপরে উঠিতেছে

অভাব ও দৈন্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বাস্তবে :
ভার লাগব করা। দৈন্য এবং
অভাব আদিয়া জাতীয় জীবনকে
মৃত্যুপদে লইয়া যাইতেছে।
দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন
করিতে হইলে কৃষি এবং
শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন
করা আবশ্যিক। ইহা করিতে
হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর
করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ
করিয়াছি যে, অল্পসন্ধান এবং
আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী
বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন
করিতে পারে। যেমন আর্থিক

ছরবস্থা ইউরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে—ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মুক্তিকা-নিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়—দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপ্ত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন ঐশ্বর্য আশ্রয়লহে ব্যাপ্ত, এই সুযোগে বাহির হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুটিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, যে, অকূল জনাধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না? পরিত্রা গাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে।

ধ্বংসশীল শরীর যুক্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

বীরধর্ম

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুক্তিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব—নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল এবং যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের জায় সংগ্রামে যুক্তিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেইই তাহার জয়লব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দানদ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির সাধনা হউক।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃথীরাজ রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্-এ

মহারাজ পৃথীরাজ চোহানকে ভারতের শেষ হিন্দু স্বাধীন নরপতি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার পূর্বে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার পতনের সহিত (১১৯৩খৃঃ) দিল্লী ও আজমীর শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর কবলে পড়ে ও ভারতে মুসলমানের রাজত্ব আরম্ভ ধরা হয়। পৃথীরাজের সভাতে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ বা চাঁদ, তিনি লাহোরবাসী ব্রাহ্মণ, তপস্বী করিয়া সরস্বতীর কাছে বর পাইয়া কবি হইয়াছিলেন বলিয়া “বরদাই কবি চন্দ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পৃথীরাজ রাসো নামক মহাকাব্যে পৃথীরাজের বিস্তৃত জীবনী লিখিয়াছেন। পৃথী যে-সকল রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদেরও ইতিহাস লিখিয়াছেন।

বহুকাল একমাত্র রাসোই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশ্বসনীয় ইতিহাস বলিয়া গণিত হইত। কিন্তু এখন শিলালেখ, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ইত্যাদি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ফলে রাসো ইতিহাসের সম্মানিত আসন হইতে পতিত হইয়া কেবলমাত্র কাব্য থাকিয়া গিয়াছে। যদিও তাহার ভাষা খাঁটি হিন্দী না হইয়া পঞ্জাবী মিশ্রিত হিন্দী, তথাপি হিন্দী সাহিত্যে রাসোর স্থান যে অতি উচ্চে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত পুস্তককে বিশেষজ্ঞেরা মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে শেকসপিয়ারের যে স্থান, হিন্দী সাহিত্যে চাঁদ কবির সেই স্থান বলা যাইতে পারে।

রাসোর প্রধান-প্রধান ভ্রম প্রমাণ-সহ দেখাইতেছি।

চন্দ কবি রাসোতে পৃথীরাজের জীবনের ঘটনাগুলি

ইতিহাসের মতন পূর্বাপর পর্য্যায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই; রাজার জীবনের এক-একটি ঘটনা-সম্বন্ধে কবির পদ্যী এক-একটি প্রশ্ন করিয়াছেন, কবি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; উত্তরের সমষ্টি ইতিহাস ও মহাকাব্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

রাসোতে যে সঘৎ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা আজ-কাল প্রচলিত বিক্রম সঘৎ নহে, চন্দ্র তাহাকে “অনন্দ সঘৎ” বলিয়াছেন। এই অনন্দ সঘৎ কে কোন্‌কালে প্রচলিত করিয়াছিল জানা নাই; তবে বিক্রম সঘৎ আরম্ভ হইবার ২১ বৎসর পরে ৩৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা বলেন অনন্দ অর্থে একশত হইতে নয় কম। অ—বিয়োগ, নন্দ—নয়। একশত হইতে নয় কম করা হইল, কিন্তু একশত কোন্‌ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। আমার ধারণা এ অর্থ কষ্টকল্পিত ও ভিত্তিহীন। অনন্দ নামধারী কোনও ব্যক্তি এ সঘৎ প্রচলিত করিয়া থাকিবেন, ইতিহাসে হয়ত তাঁহার অন্য কোনও নাম আছে। প্রাচীন আরও দুই চারি খানি হিন্দী পুস্তকে অনন্দ সঘতের ব্যবহার আছে।

রাসোর অধ্যায়গুলিকে “সময়” বলা হইয়াছে। এক-একটি “সময়” এক-একটি প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করা হইয়াছে। রাসোর শেষ সময় (৬২) মহোবা সময়। ইহাতে পৃথ্বীরাজ ও মহোবা রাজের যুদ্ধ বর্ণিত ও আল্‌হার উপখ্যান আছে, কিন্তু প্রচলিত আল্‌হার গানের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ।

ক

রাসোতে আছে :—

১। যখন সোমেশ্বর চোহান শাকস্তরী দেশের [Sambhar country] রাজধানী অজমীরে রাজত্ব করিতেন, তখন অনঙ্গপাল তোমর দিল্লীর রাজা ছিলেন। একবার কোনও কারণে কনোজপতি কমধ্বজ বিজয়পাল দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেকালে বিজয়পাল উত্তর ভারতে চক্রবর্তী রাজা বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন; তাঁহার রাজ্য সর্কাপেকা বিস্তৃত, আর সর্কাপেকা বেশী, ও সেনা সর্কাপেকা প্রবল ছিল। তিনি একবার দিগ্বিজয়ও

করিয়াছিলেন। অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিজয়পালের দিল্লী পহুঁছবার পূর্বে দিবস সোমেশ্বর সসৈন্য অনঙ্গকে সাহায্য করিতে আসিলেন, ও দুইজনে পরামর্শ করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। পর দিবস বিজয়পাল আক্রমণ করিলেন ও যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। অনঙ্গপাল সোমেশ্বরকে আপনার কনিষ্ঠা স্ত্রন্দরী কন্যা কমলা দান করিলেন। তখনও বিজয়পাল ফিরিয়া যান নাই, অনঙ্গ তাঁহার জোষ্ঠা কন্যা সুরস্তন্দরী বিজয়পালকে দান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। কালে, কমলাব গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম [বৈশাখ ১১৪৮খৃঃ] হইল। বিজয়পালের পুত্র জয়চন্দ্র, কিন্তু সুরস্তন্দরীর গর্ভে কি না সেকথা ভাবিয়া লেখা নাই। কেবল একস্থানে [৪৮ সময়] জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে বলিতেছেন “মাতুল হম তুম ইচ্ছ” অর্থাৎ তোমার ও আমার মাতুল একই, ইহা ছাড়া সমস্ত পুস্তকে আর এ সঘতের কোন উল্লেখ নাই। অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন, বৃদ্ধাবস্থায় বদরিকাশ্রমে তীর্থ করিতে যাইবার পূর্বে দৌহিত্র পৃথ্বীকে পূর্ণকমতাসহ আপনার রাজ্যরক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার মন্ত্রীরা বিদেশী পৃথ্বীকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি গুনিলেন না। সোমেশ্বর পৃথ্বীর বাল্যাবস্থা হইতে বাছা-বাছা সঘৎসজাত ঘোড়া বালকদের সহচর করিয়া দিয়া ছিলেন। ইহারা সকলেই অত্যন্ত সাহসী ও বলবান ছিল, ও পৃথ্বীর অষ্টোত্তর সুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অনঙ্গপাল চলিয়া গেলে পৃথ্বী একে-একে দিল্লীর প্রাচীন কর্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া আপনার অল্পচর সুরদের সেই কর্মভার দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে দিল্লীবাসীরা দেখিল রাজকোষ রক্ষা, দুর্গঘার নগরঘার রক্ষা ইত্যাদি সকল দায়িত্বপূর্ণ স্থানেই অজমীরবাসী পৃথ্বীরাজের সহচররা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা দিল্লীবাসীদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করে। রাজা ও প্রজা অর্থাৎ অজমীরের আগন্তুক ও দিল্লীবাসীর মধ্যে ভেদা ও বিদ্বেদতা সঘৎ স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীবাসী কতকগুলি প্রধান বদরিকাশ্রমে গিয়া অনঙ্গপালের কাছে অভিযোগ করিল। অনঙ্গপাল প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু পৃথ্বী তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন

না। অনঙ্গপালকে নগর প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তীর্থবাসের অস্ত্র কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এ-সময়ে সোমেশ্বর অঙ্গমীরের রাজা, অর্থাৎ যুবরাজ অবস্থায় পৃথ্বী মাতামহের রাজ্যলাভ করিলেন।

২। বিজয়পাল কমধ্বজ একবার দিগ্বিজয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাদেশের রাজধানী কটক আক্রমণ করিলেন, তখন সোমবংশীয় মুহম্মদেব যুদ্ধ না করিয়াই অধীনতা স্বীকার করিলেন ও আপনার কন্যা উপহার দিলেন। বিজয়পাল এই কন্যার সহিত পুত্র জয়চন্দ্রের বিবাহ দিলেন। এই কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে জুনাইয়া [জ্যোৎস্না] বলিত। তাহার গর্ভে পতি ও পিতৃকুলক্ষয়কারিণী অধিতীয়া সুন্দরী সংযুক্তার জন্ম হইয়াছিল।

৩। শেষ যুদ্ধের পূর্বে পৃথ্বী দিল্লীতে ছিলেন, দিল্লীতে সংযুক্তা ও রাজপরিবারকে রাখিয়া তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। দিল্লী লাভ করিবার পর তিনি দিল্লীতেই আপনার বাসস্থান বা রাজধানী করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা রাসোর; এখন দেখা যাউক অস্ত্রান্ত্র গ্রন্থ, শিলালেখ ইত্যাদিতে কি সংবাদ পাওয়া যায়।

১। দিল্লীতে একটি অশোকস্তম্ভ আছে। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট কিরোজ তুগলক [১৩৫১—১৩৮৮] উহাকে অস্ত্র স্থান হইতে আনিয়া নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অস্ত্র দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে উহাকে কিরোজসাহের লাট বলে। ঐ স্তম্ভে অশোক শাসনের নীচে ১২২০ সন্থৎ [খৃঃ ১১৬৩] বৈশাখী পূর্ণিমার লেখা কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি সোমেশ্বরের অগ্রজ চতুর্ধ বিগ্রহরাজ বীসলদেবের লেখা। তিনি আপনার তীর্থযাত্রা ও সেই সঙ্গে দেশজয় সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

“বিদ্যাচল হইতে হিমালয় পর্যন্ত সকল দেশ জয় করিয়া তিনি কর সংগ্রহ করিলেন ও আর্ধ্যাবর্ষ হইতে মুসলমানদের তাড়াইয়া আর-একবার ভারতকে ষথার্ধ্য আর্ধ্যভূমি করিলেন” ইত্যাদি। ইহাছায়া প্রমাণিত হইতেছে যে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে অঙ্গমীর-রাজ দিল্লী জয় করিয়া ছিলেন। দিল্লীতে অঙ্গমীরের এক-

জন করদাতা সামন্ত অথবা বেতনকৃৎ দুর্গরক্ষক বাস করিয়া দেশ শাসন করিতেন। পৃথ্বীরাজ অঙ্গমীরের বিদ্রুত রাজ্যের যুবরাজ হইয়া আপন পিতার অধীন একজন সামন্তরাজ্যের পোষাপুত্র হইতে যাওয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

২। রাসোতে জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে দিল্লী ত্যাগ করিয়া সান্তরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু মাতামহের রাজ্য বলিয়া সমস্ত রাজ্য বা অর্ধেক অংশ দাবী করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, “তুমি বলিতেছ, অনঙ্গপাল তোমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, কিন্তু আমি চক্রবর্তী সম্রাট, তাঁহার রাজ্য হস্তান্তর করিবার পূর্বে আমার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল; তিনি তাহা লন নাই। আমি ঐ দান অনুমোদন করিতেছি না; তুমি সান্তরের রাজা সান্তরে যাও, অনঙ্গপালের অবর্তমানে দিল্লীর আমি অস্ত্র ব্যবস্থা করিব”।

৩। রাসো অঙ্গমীরে পৃথ্বীরাজের জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে। তিনি বার বৎসর বয়সে, অতএব ১১৬০ খৃষ্টাব্দে, মাতামহের রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিরোজ সাহের লাটের লেখ ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে চতুর্ধ বিগ্রহরাজ বীসলদেবের লেখা, অর্থাৎ পৃথ্বীর দিল্লী সিংহাসন লাভের তিন বৎসর পরে বিগ্রহরাজ রাজা ছিলেন, ও তিনি তখন দিল্লী জয় করিয়াছিলেন। হাম্মীর কাব্য ও বিজয়লার পর্কিত গানে লেখমতে বিগ্রহরাজের পর অমরগাঙ্গের, তাঁহার পর দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার পর সোমেশ্বর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ১১৬০ খৃঃ সোমেশ্বরের রাজ্যকাল হইতে পারে না।

৪। পৃথ্বীরাজের যখন ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জন্ম, তখন ১১৪৭ খৃঃ বা তৎপূর্বেই সোমেশ্বর রাজা ছিলেন, ও অনঙ্গপালকে সাহায্য করিয়া কমলাকে লাভ করিয়াছিলেন। ১২২৬ সন্থৎ (১১৬৩ খৃঃ) এক লেখ সোমেশ্বরের পূর্করাজা দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের পাওয়া গিয়াছে ও ১২২৬ সন্থতের ফাস্তুন মাসে [ফেব্রুয়ারী ১১৭০ খৃঃ] বিজয়লার লেখ সোমেশ্বরের লেখা; অতএব ১২২৬ সন্থতে দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও সোমেশ্বরের রাজ্যলাভ হইয়া থাকিবে। অতএব ১২০৪ সন্থতে (১১৪৭ খৃঃ) বাইশ বৎসর পূর্বে, সোমেশ্বরের অনঙ্গপালকে সাহায্য করিয়া কমলাকে লাভ করা অসম্ভব।

৫। সোমেশ্বরের পিতা অর্নোরাজা একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন রানী। প্রথম, মারবার কস্তা সূত্ৰা, তাঁহার গর্ভে অগদেব ও বীসলদেব, বিগ্রহরাজ (চতুর্থ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া গুজরাটের সিদ্ধরাজ অয়সিংহের কস্তা কাঞ্চনা দেবী, তিনি অপুত্রক। তৃতীয়া গুজরাট রাজ সোলঙ্কী কুমারপালের ভগ্নী দেবল-দেবী। এই কুমারপাল গুজরাটের পূর্বরাজা সিদ্ধরাজ অয়সিংহের খুড়তুত ভাই ত্রিভুবনপালের পুত্র। দেবল দেবীর গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম হইয়াছিল; সোমেশ্বর বেশীর ভাগ মাতুলালয়ে থাকিতেন, তাঁহার শিক্ষা মাতুলের কাছেই হইয়াছিল। একবার কুমারপাল কোকন দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। সোমেশ্বর স্বহস্তে কোকনরাজকে নিহত করিয়াছিলেন।

সোমেশ্বরের বিবাহ চেরা [জব্বলপুরের চারি দিকের দেশ; রাজধানী ত্রিপুরী—আধুনিক জব্বলপুর হইতে নয় মাইল দূরে তেবর] দেশের হৈহয়-বংশীয় রাজা নরসিংহ দেবের কস্তা কপূরা দেবীর সহিত হইয়াছিল, তাঁহার দুই পুত্র, পৃথীরাজ ও হরিরাজ। সোমেশ্বর ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হাম্মীর কাব্য-মতে ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল।

সোমেশ্বরের চারটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। (১) আধুনিক মিম্বার রাজ্যে বিজওলা নামক গ্রামের উপকণ্ঠে এক পর্বত-গাত্রে অতি বিস্তৃত লেখ, ১২২৬ সন্থতের ফাস্তন কৃষ্ণ তৃতীয়ের লেখা; ইহাতে সোমেশ্বরের উপাধি প্রতাপ-লক্ষ্মণের। এই লেখে চোহান বংশের ইতিহাস আছে, উপরোক্ত সংবাদগুলি এইলেখ হইতে গৃহীত। (২) সন্থৎ ১২২৮ (১১৭১ খৃঃ) তৈয়্যে শুক্রদশমীর লেখা। (৩) সন্থৎ ১২২৯ শ্রাবণ শুক্রাষ্টম্যেদশমীর লেখা। এই উভয় লেখ ঘোড়গামে কঠিরানীর মন্দিরের স্তম্ভে খোদিত। (৪) সন্থৎ ১২৩৪ (১১৭৭ খৃঃ) ভাদ্র শুক্ল চতুর্থীর লেখা। এই গ্রাম জাহাজপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। এই চারটি লেখ মধ্যে বিজওলার লেখট সর্বাঙ্গের বেশী প্রয়োজনীয়, কেননা তাহাতে সোমেশ্বর পর্যন্ত চোহান বংশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লেখা আছে।

৬। হাম্মীর মহাকাব্য ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে নয়চন্দ্রস্বরী

নামক জৈন সাধু শেব করিয়াছেন। হাম্মীর পৃথীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, রণধ্বের রাজা ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, অতএব এই পুস্তকখানি চোহানবংশের ইতিহাস। এই পুস্তকে সোমেশ্বরের জ্যৈষ্ঠ নাম কপূরা দেবী, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় নাই। এই কাব্যে শাক্তরীর রাজ্যরূপে পৃথীর সবিস্তার জীবন-কাহিনী আছে, কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ অথবা তোমর বংশের সহিত কোনও সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

তাহাতে আছে যে মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার করিলে পর পৃথী সসৈন্ত দিল্লী আক্রমণ করিলেন, অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্বে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না।

৭। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা পৃথীকে অজমীরের রাজাই বলিয়াছেন, দিল্লীর সহিত কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। তবকাত-ই-নাসিরী বলেন দিল্লীর রাজা গোবিন্দরাজ বা গোবিন্দরায়।

৮। ফেরেস্তা বলেন পিখোরার ভাই দিল্লীর চামুণ্ড রায়।

৯। তাজ-উল-মাআসীর বলেন :—“শিহাবউদ্দীন গজনী হঠতে ৫৮৭ হিঃ [১১৯১ খৃঃ] লাহোরে আসিলেন, ও সরদার হুমজাকে দূত-রূপে অজমীরে বাজার কাছে পাঠাইলেন। অজমীরের রাজাকে পূর্ক শান্তি দিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন রাজা মুসলমানদের ঘৃণা করেন ও বড়বন্দ করিতেছেন তখন রাজার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। অজমীরের রাজ্য রায় পিখোরার পুত্রকে দিয়া স্বয়ং দিল্লী চলিয়া গেলেন। দিল্লীর রাজা অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। হুলত'ন আপনার কতক সেনা ইজ্রাথে রাখিয়া স্বয়ং গজনী চলিয়া গেলেন।” অতএব দিল্লী ও অজমীরের রাজা দুই জন ভিন্ন ব্যক্তি। দিল্লীর রাজার সহিত অজমীর রাজের কি সম্বন্ধ, ঠিক জানা গেল না, কিন্তু পৃথীরাজ স্বয়ং দিল্লীর রাজা ছিলেন না। দিল্লীর রাজার সহিত কোনও কুটুম্বিতা থাকা অসম্ভব নহে।

১০। পৃথীরাজের কতকগুলি তাম্রমূত্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক দিকে অশ্বারোহী মূর্তি ও “শ্রীপৃথী রাজদেব” লেখা, ও অপরদিকে একটি বলদমূর্তি ও “আসাবরী শ্রীসামন্ত

দেব" লেখা। অল্প কয়েকটি এমন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে যাহার এক দিকে পৃথ্বীরাজের নাম ও অন্যদিকে "সুলতান মহম্মদ সাম" লেখা। এই মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পৃথ্বীরাজ স্বাধীনতা হারাইয়া কিছুকাল ঘোরীর সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাজ-উল-মাআসীরের উপরি লিখিত উক্তি পৃথ্বীরাজের সামন্ত অবস্থাই প্রমাণিত করে।

এইসকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রাসোর কথাগুলি কল্পিত, সে-সময়ে দিল্লীতে তোমর বংশীয়দের রাজ্য ছিল কি না সন্দেহ, থাকিলেও প্রমাণিত হইল যে সে-বংশ পৃথ্বীর মাতামহ-বংশ নহে। পৃথ্বী কোনও কালে দিল্লীর রাজার পোষাপুত্র হন নাই, বা দিল্লী রাজ্য পান নাই। শেষ মুহুর সময়ে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না, রাজপরিবার দিল্লীতে ছাড়িয়া যুদ্ধে যান নাই। শেষ যুদ্ধ ও পতনের সময়ে তিনি শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর করদাতা সামন্ত ছিলেন, তবে এ সামন্ত অবস্থা কতদিন ছিল জানা যায় না, সম্ভবতঃ বেশী দিন ছিল না।

খ

রাসো অনুসারে পৃথ্বীরাজের যখন বারো বৎসর বয়স, তখন গুজরাটে ভোলারায় ভীমদেব ও আবুতে সলখ [সলখ] প্রমার রাজ্য করিতেন; উভয়ে স্বাধীন প্রতিবাসী ছিলেন। রাসোর বর্ণনা অনুসারে পৃথ্বী বার বৎসর বয়সে, তাহার ১০৮ সূরের বহাবলে একজন প্রবীণ যোদ্ধা বলিয়া গণ্য। ভীমদেবের ছোট ভাইদের আট পুত্র জ্যাঠার সহিত বিবাদ করিয়া সোমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছিল; তাহারা পৃথ্বীর সমবয়স্ক বলিয়া সোমেশ্বরের তাহাদের পৃথ্বীর সহিত রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীর এক সূর কঙ্কাকার সম্মুখে তাহাদের মধ্যে একজন গোঁফে তা দিয়াছিল বলিয়া কঙ্ক সকলকে হত্যা করিয়াছিলেন। সলখের দুই কন্যা, মন্দোদরী, ও ইচ্ছিনী, ও এক পুত্র, জেত প্রমার। জ্যেষ্ঠা মন্দোদরীর সহিত ভীমদেবের বিবাহ হইয়াছিল, ও কনিষ্ঠা ইচ্ছিনীর সহিত পৃথ্বীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। রাসো ও আল্‌হার গানে দেখিতে পাওয়া যায় যে কজিয়রা বার বৎসর বয়সে পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধা বলিয়া সম্মানিত। বিবাহের সময়ে কন্যার বয়স লেখা নিয়ম নহে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই

বর অপেক্ষা বেশী বয়স্ক হইত। গুজরাটে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে, অধিকাংশ বর অপেক্ষা কন্যা বয়স্ক। মন্দোদরীর সেবিকাদের মুখে ইচ্ছিনীর অসাধারণ রূপ ও লাবণ্যের কথা শুনিয়া, ভীমদেব ইচ্ছিনীকে লাভ করিতে উন্নত হইয়া পড়িলেন। তিনি দূত পাঠাইয়া সলখকে সংবাদ দিলেন, যে হয় স্ব-ইচ্ছায় ইচ্ছিনী দান কর, নতুবা আমি আবু রাজ্য চারণার করিব। ইহাতে সলখ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন, অতএব ভীমকে কন্যাদান করিতে অস্বীকার করিলেন, ও পৃথ্বীকে শীঘ্র আসিয়া বিবাহ করিতে আহ্বান করিলেন। পৃথ্বীর সসৈন্য আবু পছঁচিবার পূর্বেই ভীমদেব আবু আক্রমণ করিলেন। প্রমারের যুদ্ধে পরাজিত হইল, সলখ যুদ্ধে নিহত হইলেন; কিন্তু ভীমদেব জেত বা রাজ পরিবারের সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা আবুতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গুজরাটে প্রত্যাগমন করিলেন। গুজরাটে ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন, পৃথ্বী ও তাহার সূরেরা গিরিসঙ্কে লুকাইয়া পথ আটক করিয়া বসিয়া আছেন। যে-দিন চোহানদের সহিত দেখা হইল, সে-দিন ঘোর যুদ্ধ হইল। ভীম পরাজিত হইয়া পলাইলেন। বিজয়ী পৃথ্বীর সহিত জেত ও সমস্ত রাজ পরিবার আবুতে ফিরিয়া গেল। পর দিবস পৃথ্বী আবুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; (১) তাহার পরদিবস ইচ্ছিনীর সহিত মহা সমারোহে বিবাহ হইল। এই ইচ্ছিনী পৃথ্বীর একাদশ রাণী-মধ্যে প্রধান বা পাটরাণী ছিলেন। পৃথ্বী আপন শ্যালক জেতপ্রমারকে তাহার পৈতৃক স্বাধীন রাজ্যে অজমীরের সামন্ত নিযুক্ত করিলেন। জেত এইরূপে ভয়ীদান করিয়া স্বাধীন রাজ্য হইতে সামন্ত পদে পতিত হইলেন। তিনি কিছুকাল পরে আবুতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া স্বয়ং পৃথ্বীর সহচর হইলেন। ভবিষ্যতে পৃথ্বীর প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পর জেত প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কনোজ অভিযানে পৃথ্বীর সঙ্গে ছিলেন, ও জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঘোরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

১। পৃথ্বীরাজ সলখের আহ্বানে ইচ্ছিনীকে বিবাহ করিতে আবু গিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন কেন, তাহার কোনও কারণ লেখা নাই, কেবল সমারোহের সহিত অভিষেকের কথা আছে।

পরাজিত ভীমদেব প্রতিশোধ লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি অতর্কিত-ভাবে অজমীরে সোমেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন, ও তাঁহাকে সৈন্যসংগ্রহ করিতে অবসর দিলেন না। যুদ্ধের পূর্বরাজে সোমেশ্বর সকল কথা পৃথাকে পরদ্বারা জানাইলেন, ও যদি তাঁহার পরাজয় বা মৃত্যু হয়, তবে প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন। পরদিবস যুদ্ধক্ষেত্রে সোমেশ্বর বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। রাসোতে এ ঘটনাকে “সোমেশ্বর বধ” লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমেশ্বরকে অশ্ব যুদ্ধে হত্যা করা হইয়াছে। অশৌচান্তে প্রথমে পৃথী পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, পরে ভীমদেবকে শাস্তি দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ভীমকে [৪৪ সময়] আক্রমণ করিলেন। এ-যুদ্ধের সন লেখা নাই, কিন্তু পৃথীর পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্তির পর ইটাই প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে ভীমদেব নিহত হইলেন, পৃথী তাঁহার ৮৪টি বন্দর কাঁড়িয়া লইলেন; পরে ভীমের শিশু-পুত্রকে পট্টন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বিজয় গৌরবে দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

সোমেশ্বরের মৃত্যুর পরও পৃথী দিল্লীতেই থাকিতেন।

এ-বিষয়ে অগ্ৰাণ্ড গ্রন্থে, শিলালেখাদিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

পৃথীরাজের সময়ের বহু পূর্বে—প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে—আবুর প্রমারবংশে ধরণীবরহ নামক এক রাজা ছিলেন। গুজরাটের রাজা মূলরাজ সোলকী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত করিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সে-সময়ে রাষ্ট্রকূট [রাঠোর] ধবল আবুরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ধবলের ২২৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালেখে এই বর্ণনা আছে। মূলরাজ ২৬১ হইতে ২২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে ধরণীবরহকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। আবুর রাজারা এই সময় হইতে গুজরাটের সামন্ত, ও ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত [অর্থাৎ পৃথীর মৃত্যুর চার বৎসর পরেও] এই সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জিনমণ্ডন নামক একজন জৈন লেখক “কুমারপাল প্রবন্ধ” নামক এক পুস্তকে কুমারপালের জীবনী

লিখিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে একদিন শাকন্তরী-পতি অর্ণোরাজা আপনার রাণী দেবলদেবীর সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। এই দেবলদেবী কুমারপালের কনিষ্ঠা ভগ্নী। রাজা প্রায়ই রাণীর বাপ, ভাই তুলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, রাণীর তাহা অসহ্য বোধ হইত। সেদিন ঐরূপ কোনও বিদ্রূপে রাণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “তুমি এক্ষণে আমার পিতৃবংশের অপমান করিলে, আমি কুমারপাল-দাদাকে বলিয়া দিব, তখন দেখিবে, তিনি তোমার কি দুর্গতি করেন।” একথা শুনিয়া, রাজাও ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি রাণীকে পদাঘাত করিয়া সে প্রকোষ্ঠ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, ও সেবকদের ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, “রাণীকে এখনই তাঁহার পিতৃরাজ্যে রাখিয়া আউস।” রাণী ইহাতে অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন, ও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কুমারপালের কাছে অপমানের প্রতিশোধ ভিক্ষা করিলেন।

কুমারপাল ১১৪৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অমাত্যদের পরামর্শ ও মতামত গ্রাহ্য না করিয়া আপনার ইচ্ছামত সকল রাজকার্য করিতেন, সেইজন্য রাজসভাতে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহার প্রধান অমাত্য বাগভট্টের ছোট ভাই আর ভট্টের ডাক নাম চাহড় বা জাহড় ছিল। তাঁহাকে গুজরাটের পূর্বরাজা সিদ্ধবাল্ল জয়সিংহ পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, ও সকল গুপ্ত পরামর্শের সভাতে ডাকিতেন, কিন্তু নূতন রাজা গ্রাহ্যও করিতেন না। সেই জন্স রাগে ও অভিমানে তিনি কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোরাজের আশ্রয় লইলেন, ও তাঁহাকে গুজরাট আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে গুজরাটের কতকগুলি সামন্তকে অর্থদ্বারা বশ করিয়াছিলেন ও তাহাদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে তাহারা হই কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোরাজের আশ্রয় লইবে, নতুবা যুদ্ধান্তে ও পরে পরাজিত হইয়া পলাইবার ভাণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবে। অর্ণোরাজ গুজরাট

আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাণীর ঘটনা ঘটিল। কুমারপালও উগ্রীর অভিযোগ শুনিয়া অতিশীঘ্র যুদ্ধধাত্রা করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বিপক্ষ সম্মুখান হইলে, যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই কয়েকটি গুজরাটের ছোট সামন্ত পলাইয়া ক্ষেত্রত্যাগ করিল, ও কুমারপাল দেখিলেন চন্দ্রাবতীর [আবু] রাজা বিক্রম-প্রমার তাঁহার পক্ষত্যাগ করিয়া অর্ণোর দলে প্রবেশ করিল। তিনি সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু ভয় পাইলেন না। তিনি আপনার হস্তীচালককে আজ্ঞা করিলেন, যেরূপে সম্ভব হয় অর্ণোর হাতীর কাছে চল। হস্তী-চালকও অতিশীঘ্র সোজা অর্ণোর হাতীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। অর্ণো বা তাঁহার সহচরেরা এরূপ সশরীরে বিপক্ষ রাজার আক্রমণ আশা করেন নাই। আর তঁহু আপনার হাতী হইতে কুমারপালের হাতীতে আসিবার জন্ত লক্ষ প্রদান করিলে কুমারপালের হস্তী-চালকের ইচ্ছিতে হাতী একটু সরিয়া গেল; আর তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, ও আবার উঠিবার পূর্বেই শিক্ত গজরাজের পদতলে মর্দিত হইলেন। এই বার, হস্তীপৃষ্ঠে দুই রাজার হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবুদ্ধও অনেকক্ষণ হয় নাই, বলবান কুমারপাল লক্ষ দিয়া অর্ণোর হাতীতে উঠিলেন, ও অর্ণোকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, ও গলার উপর একটি তীর-ফলক চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তমধ্যে অর্ণো পরাজয় স্বীকার করিলেন। কুমারপাল তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া একটি কাঠের খাঁচাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সামন্ত ও সৈনিকদের অসি নিষ্কাশ করিতে হইল না, অথচ অর্ধ দণ্ড-মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। সামন্তরা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও গুজরাট-রাজের জয় হইল। কুমারপাল অর্ণোকে তিন দিন বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও অনেকগুলি হাতীঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন; পরে অর্ণো আপনার উগ্রী জলুহনা দেবীকে দান করিয়া ও দেবলদেবীর সহিত সংব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি ও মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

চোহানদের ইতিহাসে এপরাজয়ের কথা কেহ লেখে নাই সত্য, কিন্তু গুজরাটের নানা ইতিহাসে, কাব্যে ও

নাটকে এজয়ের কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। আজ-কাল নানাপ্রকার অহুসন্মানে জানা গিয়াছে, যে জৈন লেখকেরা কুমারপালের প্রশংসায় অযথা অত্যাক্তি করিয়াছেন, অতএব জৈন লেখকদের সকল কথা বিশ্বাসনীয় নহে। কুমারপাল পূর্বে শৈব ছিলেন, হেমচন্দ্র আচার্য নামক এক জৈন বিদ্বান সাধুকে তিনি আপনার সভার প্রধান বিদ্বান পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই হেমাচার্যের প্রভাবে তিনি অল্পকাল-মধ্যে জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন, ও রাজ্য-মধ্যে পশুবধ নিবেদন করিয়াছিলেন। সেইজন্ত জৈনেরা কুমারপালের অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক স্তুত্যাতি করিয়াছে।

এ-যুদ্ধের উল্লেখ চোহানদের ইতিহাসে না থাকিলেও অল্প-এক তৃতীয় নিরূপেক স্থানে আছে। চিতোরের কেল্লার মধ্যে সমিচ্ছেদ্বরের মন্দির-গাত্রে একটি লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে :—“গুজরাটের সোলঙ্কী রাজা কুমারপাল শাকম্বরীর (Sambhar country) রাজাকে জয় ও সপাদলক্ষ (২) দেশ মর্দন করিয়া প্রত্য্যাগমনের সময়ে শালীপুর গ্রামে আপনার সেনা ত্যাগ করিয়া, একাকী চিত্রকূটের [চিতোর] শোভা দর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামত এই লেখ ১২০৭ সন্থতে লেখা হইল।” এলেখে যুদ্ধের সময় জানা যায় না, তবে, ১২০৭ সন্থতের পূর্বে কোনও সময়ে হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধ শেষ হইলে, কুমারপাল বিশ্বাসঘাতক সামন্তদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবতীর

(২) চোহানদের দেশকে সপাদলক্ষ দেশ বলে। এই শব্দের উৎপত্তি সন্থতে মতভেদ আছে। আমি দুইটি পাইয়াছি। (১) চোহানেরা পূর্বে অহিন্বেত্রপুরে বাস করিত, তাহার উত্তরাংশে এখন বেরেলীর ৩০ মাইল পশ্চিমে পাণ্ডুরা বার। তাহার সেখান হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম-সীমান্তে শিবালিক পর্বতের কাছে বাস করিল। এ-পর্বতের নাম শিবালিক বা শওরালক্ষ, কেননা তাহার ১২৫০০০ শৃঙ্গ আছে। চোহানেরা যখন শাকম্বরী দেশে আসিল, তখনও তাহাদের দেশের নাম শওরালক্ষদেশ রাখিয়া গেল। শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় হইয়া সপাদলক্ষ দেশ হইয়াছে। (২) চোহানদের রাজ্যে শওরালক্ষ ১২৫০০০ গ্রাম ছিল বলিয়া সপাদলক্ষদেশ নামে প্রসিদ্ধ।

[আবু] রাজা বিক্রমপ্রমার অর্ণোর সেনার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তাঁহার স্থানে বিক্রমের দ্ব্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রামদেবের পুত্র যশোধবলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এ-যুদ্ধে যশোধবল কুমারপালের পক্ষে ছিলেন। আবু পাহাড়ে অচলেশ্বর মন্দির-গাত্রে লেখে ও বাস্তুপালের মৈত্র মন্দিরের ১২৮৭ সন্বতের প্রশস্তিতে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

আবুর কাছে অজারী গ্রামে ১২০২ সন্বতের [১১৪৫ খৃঃ] একটি লেখ আছে, তাহাতে “প্রমার বংশোদ্ভব মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীযশোধবল রাজ্যে.....” শব্দ আছে। অতএব, কুমারপাল ও অর্ণোর যুদ্ধ, বিক্রমের সিংহাসনচ্যুতি ও যশোধবলের রাজ্যপ্রাপ্তি ১১৪৫ খৃঃ বা তাহার পূর্বেই কোনও সময়ে হইয়াছিল। নবেম্বর ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন কুমারপাল রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন এ-সকল ঘটনা দু'এক বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল।

সিরোহী রাজ্যের সীমা মধ্যে কাশ্মীর গ্রামের উপকণ্ঠে কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির গাত্রে ১২২০ সন্বৎ [১১৬৩ খৃঃ] লিখিত এক শিলালেখ আছে, ইহা “যশোধবলের দ্ব্যেষ্ঠপুত্র ধারাবর্ষের” লেখা। অতএব যশোধবলের মৃত্যুর পর ১১৪৫ ও ১১৬৩ খৃঃ মধ্যে কোনও সময়ে তাঁহার দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র ধারাবর্ষ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই ধারাবর্ষ একজন বীর ধোন্ধা ও “ধার পমার” নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু ও তাহার চারিদিকে তাঁহার বহু কীর্তির চিহ্ন বা তাহার উন্নয়নশেষ এখনও বর্তমান আছে, ও তাঁহার বীরত্বের নানা গীত সে-দেশে এখনও গ্রামে-গ্রামে গীত হইয়া থাকে।

মুসলমানদের ইতিহাস “তাজ-উল-মাআসীর”তে আছে যে “হিজরী ৫২৩ [১১২৭ খৃঃ] তে খুসরো [কুতুবউদ্দিন এবক] অনহলবারায় [গুজরাট] রাজাকে আক্রমণ করিলেন, তখন আবুর কাছে তাঁহার দুই সামন্ত রায়কর্ণ ও দারাবর্ষ [ধারাবর্ষ] যুদ্ধ করিয়াছিলেন।” অর্থাৎ ১১২৭ খৃষ্টাব্দে ধারাবর্ষ জীবিত ছিলেন, ও গুজরাটের সামন্ত ছিলেন।

এইরূপে ১১৪৫ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবুর রাজাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া গেল, ও তাঁহারা এই

সময়ে যে গুজরাটের রাজার সামন্ত ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হইল।

সোমেশ্বরের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ, সোমেশ্বরের পরাজয় ও মৃত্যু [সোমেশ্বর বধ], পরে প্রতিশোধের জন্য পৃথ্বীর আক্রমণ, ভীমের পরাজয় ও মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটনা রাসোতেই বর্ণিত হইয়াছে, অল্প কোনও ইতিহাসে, কাব্যে বা নাটকে নাই। গুজরাটের ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকরা ভীমের পরাজয়ের কথা হয়ত লুকাইয়াছে, অপমানের ভয়ে লেখে নাই, কিন্তু গুজরাটের পক্ষে মহা গৌরব কাহিনী সোমেশ্বরের মত প্রবল শত্রুকে জয় ও বধের কথাও কেহ লেখে নাই। গুজরাটের ইতিহাসে ও মুসলমানদের ইতিহাসে আছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ভীমদেব ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়া ১২৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ পৃথ্বীর মৃত্যুর ৪৮ বৎসর পর পর্য্যন্ত—রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সোমেশ্বরের মৃত্যু যখন ১১২২ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, তখন ভীমদেব ও পৃথ্বী প্রায় এক সময়েই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীর জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে সত্য হইলে, ভীম তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন, কেননা ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ঐতিহাসিক ও গুজরাটী লেখকেরা ভীমকে বালক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়াই বর্ণিত করিয়াছেন, ও পৃথ্বীর বয়স তখন ৩০ বৎসর। অতএব ভীমের ছোট ভাইদের পুত্রেরা পৃথ্বীর সমবয়স্ক হইতে পারে না; ভীমের পৃথ্বীর বিবাহের পূর্বে মন্দোদরীর সহিত বিবাহ, ইচ্ছিনীর জন্য আবু আক্রমণ, পৃথ্বীর ভীমকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া কেলা, ৮৪টি বন্দর কাড়িয়া লওয়া ও তাহার শিশু-পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা কেবল মিথ্যা নহে, অসম্ভব মিথ্যা রূপকথা মাত্র।

রাসোর বর্ণিত সলখপ্রমার ও জেৎপ্রমরের যখন অস্তিত্বই ছিল না, তখন মন্দোদরী ও পৃথ্বীর পাটরাণী ইচ্ছিনী কল্পিত নারিকী মাত্র।

রাসোর বর্ণনা-মধ্যে এইটুকু সত্য সংবাদ আছে, যে, পৃথ্বীর সময়ে আবুতে প্রমার বংশ ও গুজরাটে ভীমদেব রাজ্যশাসন করিতেন। ইহা ছাড়া আর সকলই অসম্ভব কল্পনা।

গ

রাসোর বর্ণনা [২০ সময়] অল্পসারে ১১৭২ খৃষ্টাব্দে পূর্বদেশে সমুদ্র-শিখর-গড়ে যাদব বংশীয় রাজা বিজয়পালের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাঁহার দশ হাজার বর্ষাবৃত অশ্বারোহী, অনেক হাতী, তিন লক্ষ পদাতিক, দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। পদ্মাবতী নামী কন্যার বিবাহ কমাউর রাজা কুমোদমণির সহিত স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পদ্মাবতী পৃথীর সাহস ও বীরত্বের নানা গল্প ও গাথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে আপন পুরোহিতের হাতে পৃথীকে একখানি পত্র গোপনে লিখিল, যে আমার বিবাহের পূর্বে, মন্দিরে পূজা করিতে যাইবার সময় আমাকে হরণ করিয়া উদ্ধার কর, নতুবা আমি বিষ খাইয়া মরিব। পৃথী এই পত্র পাইয়া কবি চন্দ্র ও আপনার অল্প কয়েকটি সাহসী অশ্বচর ও সংক্ষিপ্ত সেনা সঙ্গে লইয়া সমুদ্রশিখর গড়ে আসিলেন। বিবাহের পূর্ক দিবস যখন পদ্মাবতী দেবপূজার উত্তর নগরের বাহিরে মন্দিরে গিয়াছিলেন, তখন পৃথী তাঁহাকে হরণ করিলেন। বিজয়পালের পুত্ররা ও কুমোদমণি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সকলকে পরাজিত করিয়া পদ্মাবতীকে লইয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে পর্হাছিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রমত বিবাহ হইল।

সমুদ্রশিখর-গড়-নামক কোনও নগরের, বা নগরের উদ্ধাবশেষের অস্তিত্ব আজকালকার ইতিহাস, ভূগোল, বা প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারে নাই। পূর্বদেশে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য হয় বড়ের নয় উড়িষ্যার হইতে পারে। রাসো-অল্পসারে উড়িষ্যাতে কনোজের বিজয়পালের আক্রমণের সময়ে, এই ঘটনার উর্ক সংখ্যা ১৫

বৎসর পূর্কে প্রবল রাজা সোমবংশীয় মুকুন্দদেব কটকে রাজ্য করিতেন। মুকুন্দদেবের কন্যা জুনাইয়া বা জ্যোৎস্নার সহিত জয়চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার গর্ভে সংযুক্তার জন্ম বিবরণ রাসোতেই আছে, অতএব যদিও যাদবদের সোমবংশীয় বলা যাইতে পারে, তথাপি উড়িষ্যার রাজধানী কটক সমুদ্র-শিখর-গড়, ও মুকুন্দদেব বিজয়পাল হইতে পারে না। সমুদ্রশিখর গড়ের রাজা, ছোট রাজা ছিলেন না, যাহার দশহাজার বর্ষাবৃত অশ্বারোহী, তিনলক্ষ পদাতিক সেনা, ও অগণিত হাতী, সে একজন সম্রাটসদৃশ বিস্তৃত রাণ্যের রাজা, অথচ বাঙ্গলা দেশে ঐ নাম বা বংশের কোনও রাজা ঐ সময়ে ছিল না। [রাঢ়ে পাল-বংশীয় রাজারা ও বারেন্দ্র বিজয়সেন প্রতাপী রাজা ছিলেন। বোধ হয়, লেখক ঐ দুই নাম শুনিয়া বিজয়পাল করিয়াছেন]

বিবাহের উত্তর রাজকন্যার পুরোহিতের হাতে আপনার মনোনীত বরকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো, পূর্কাবধি অস্ত্র-এক রাজার সহিত বিবাহ স্থির হওয়া, হরণ, নিমন্ত্রিত বরের কন্যার ভ্রাতা ও ভৃত্যপূর্ক বরের সহিত যুদ্ধ, সকলের পরাজয়, রাজকন্যার নিমন্ত্রিত নূতন বরের সহিত তাহার দেশে গিয়া বিবাহ, এই ঘটনাগুলি পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও রসিক তোষামোদকারী লেখক ভগবান্দ্রীকৃষ্ণ ও কল্পিণীর বিবাহের গল্পটি কেবল নাম বদল করিয়া লিখিয়াছে। এরূপে পৃথীকে ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের সহিত উপমিত করায় তোষামোদের চূড়ান্ত করা হইয়াছে। ঐ তোষামোদের কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্য অন্বেষণ বা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র।

(ক্রমশঃ)

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—শিলাইয়া
৭ ফেব্রুয়ারি ১৫]

ও

কল্যাণীয়েষু

চারু, দুটো নূতন কবিতা পাঠিয়েছি বোধ করি পেয়েছ। আমি যে-ভাবে ছন্দ প্রভৃতি দিয়েছি সেই ভাবেই ছাপিয়ে। চলতি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দে পড়তে পদক্ষণন হয় না ত? লেখক স্বয়ং ত দিব্য আরামে পড়তে পারেন—কিন্তু পাঠকের উপরে ভরস! হুম ন'।

ভবসিন্দু-বাবু পিতৃদেবের যে জীবনী লিখেছেন তা মধ্য একটি গল্প আছে, যে, আমি ষারকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙচুর করাতে পিতৃদেব প্রথমে আমাকে ভৎসনা করেন, তার পরে আমার অকৌর্টি সংশোধন ক'রে দেন, তার পরে আমাকে বাস করবার জন্তে নূতন বাড়ি দেন। যখন সমালোচনা করবে, তখন পাঠকদের বোলো, আমার নূতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ, আমি ষারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙি নি; যা কিছু ক্ষণতক্ষুর, তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ ক'রে গেছেন, উত্তর-বংশীয়ের জন্তে অপেক্ষা করেন নি। অতএব ঐ গল্পটি সংশোধন করা কর্তব্য। তা যদি করা হয়, তাহলে শেষাংশটিই বাকি থাকে, অর্থাৎ তিনি আমাকে বাস জন্তে একটা নূতন বাড়ি দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেক পিতাই এমন কাজ ক'রে থাকেন। অতএব এই ঘটনা আমার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক, মহর্ষির জীবনীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইতি ২৩ মাঘ, ১৩২১।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

পিতামহের কীর্তির প্রতি কালাপাহাড়ি করা যে আমার প্রকৃত্তিসিদ্ধ, এই সংবাদটি আমার পাঠকবন্ধুরা

* এই চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন।

বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করবেন। অতএব এই বেলা এই মাথ্যাটাকে সরিয়ে ফেলা কর্তব্য। আমার বিক্ষেপে সত্যপ্রমাণ যা আছে, তাই এত বেশি, যে, সনাতনীর দলে আমার মুখ দেখাবার জো নেই—তার উপরে আর কেন?

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৭ এপ্রিল ১৭]

ও

কল্যাণীয়েষু

চারু, ক্ষিত্তিমোহন-বাবুকে মোক্তার ক'রে আমার কাছ থেকে একটি গানের জন্যে দরবার করেছ। আমার দরবারে মোক্তারের প্রয়োজন একেবারে নেই, সে তুমি জান। কিন্তু আমার ভাঙার যে শূন্য। গান আমার হাতে ছুঁচারটে আছে বটে, কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার ছুঁই কেজ্জেই উভচরবৃত্তি করতে পারে—যা স্বরের ঘরে পিসি এবং কাব্যের ঘরে মাসির মত। তেমন ত খুঁজে পাইনে। ধরা দিয়ে প'ড়ে থেকে একটা আদায় করেছে মণিলাল—আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে, পাঠালুম। পরমা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পারবে? রামানন্দ-বাবু এখানে একসময় আসবার দ্বন্দ্ব আভাস দিয়েছেন—তিনি এলে খুঁসি হব, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। আমেরিকায় Lynching-এর কয়েকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ কাল তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়েছি। পেয়েছেন বোধ হয়। তাঁর notes-এর মশানে এই ছুঁড়তির বিবরণগুলিকে শুলে চড়ানো চাই।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“যখন পড়বে না মোর পায়ে চিহ্ন
এই বাটে” ইত্যাদি।

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১৭ মে ১৯]

ও

কল্যাণীয়েষু

কাব্যরচনা এবং অন্যান্যকর্ম প'ড়ে নোট করে
রেখেছি।

এক কপি মনসামকল ও ধর্মমকল যদি পাঠাতে পার
তাহলে মঙ্গলকাব্য সংগ্রহ আমার বা কিছু বক্তব্য আছে,
জানতে পারবে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
২৭ নভেম্বর ১৯]

ও

কল্যাণীয়েষু

শোনা গেল, জগদানন্দ সম্পাদকী দরকার থেকে
তোমার উপর পত্রজারি করেছে। তাতে তুমি বিচলিত
হোয়ো না। আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের খিড়কির
দরজা জগদানন্দের সভায়, আর তার সদর দরজা না হয়
প্রবাসী আপিসে রইল, তাতে কতি কি? আমাদের
এই মাসিক পত্র যোগে আমরা নাম করতেও চাইনে,
গ্রাহক বাড়তেও চাইনি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্ছে
বাইরে যদি তার ব্যবহার চলে তাহলে তাতে ভালো ছাড়া
মন্দ কিছু নেই। একজন ছাত্র শান্তিনিকেতনের লেখাগুলি
প্রবাসীতে প'ড়ে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং উপকৃতও
হয়েছে—সেই বার্তাটি জানিয়ে সে আমাকে পত্র লিখেছে,
তাই আমার এই কথাগুলি মনে এল।

তোমাকে একটা গল্পের প্রট শিলঙ্ক থেকে পাঠিয়ে-
ছিলুম, পেয়েছ ত? কাজে লাগবে কি? কিন্তু গল্পে
কি কোনো প্রটের বিশেষ দরকার আছে? যদি তোমার
সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি তুমি মনে থাকে তবে সেই
প্রটটা সংগ্রহ আলোচনা করা যাবে।

তুমি একবার সশরীরে সুরেনের আপিসে গিয়ে গোরী
তর্কমা সংগ্রহ তার আভিপ্রায় জেনে নিয়ো। তার কাছ
থেকে চিঠির অব্যবস্থা পাওয়া হুর্লভ। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ
১৯২৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই গল্পের প্রটটি নিয়ে আমি সম্প্রতি “দোরোখা”
নামে একটি উল্লেখ লিখছি। এলাহাবাদের হাঁওয়ান
প্রেস সেটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন।—চাক]

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৫ মার্চ ১৯২০]

ও

কল্যাণীয়েষু—

গল্প লেখবার মতো মেজাজও নেই, সময়ও নেই। মনে
হয় ও-পাঠ উঠে গেছে—এখন ইচ্ছা করলেও আর লিখতে
পারব না। তবে এক কাজ করতে পারি। আমার
কাঁধকার ছোটো ছোটো গল্প—সে নিতান্তই গল্পবয়ন—ছ
চারটে দিতে পারি। কিন্তু যারা স্কুলের খাওয়া চায় তাদের
পেট ভরবে না। ওতে বস্ত-অংশ নেই—যারা কীকৎ রস
গ্রহণ করে খুঁসি থাকতে চায় তাদের ওতে একটুখানি ভাঁপ
দিতে পারে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখতে চাও আমি
বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্রট দিতে পারি, কিন্তু আজকাল তাও
আমার মাথায় সংগ্রহ আসে না। বোধ হচ্ছে আমার
মানসিক উন্নতি হচ্ছে; আমি সাহিত্যে গল্পের ক্লাস থেকে
হয় ত বা লোক-শিক্ষার ক্লাসে উত্তীর্ণ হব-হব করছি।
তাহলে মরুবার পূর্বে আমার স্বতন্ত্র হাপনের জোগাড়
করে' যেতে পারব। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা
এই যে, পূর্ণ ফলে হয় ত বাংলাদেশে অধ্যাপকরূপে আমার
পুনর্জন্ম ঘটবে। সেইটে এড়াতে চাই। ইতি ২২ ফাল্গুন—
১৩২৬

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—সাহিত্যনিবেশন
১০ মে ২৫]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

চাক, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না? একবার এসে কিছু আলাপ আলোচনা ক'রে যাও না। আপাতত আমি চলৎশক্তি-রহিত—ভাগ্যক্রমে এখনো বলৎশক্তি আছে। কিছু কাল পরেই আর একবার যুরোপ পাড়ি দেব।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু—

আমার ব্যাকরণ এবং বড় দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রফটা একবার কাপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রফ তত্ত্ববোধিনীতে ও অন্যটা আমার কাছে পাঠিয়ে। জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ। জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন ব'লে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হ'য়ে না ওঠে তার জন্তে আমার চেষ্টার ক্রটি হয় নি—আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু অপারি-ভোষাদ্ বিছবাং ইত্যাদি।

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিষ এমন কথা আমার শক্রপঙ্কেরাও বলবে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে শুবক পাঠকের চরিত্র-বিকার ঘটতে পারে। তিথ্যক্রমের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মূনিগণের তপস্যার বিষয় হবে না, অতএব এ রকম জিনিষ কি মাসিকে চলতে পারবে?

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল হয়েছে। বিশেষতঃ এবারকার বষ্টিপাথর নামের উ-গুক্ত হয়েছে। অনাবশ্যক লোককে আঘাত কোরো না। অন্য-বশ্যক এই জন্তে বল্ছি, যাদের মরণদশা তারা খুবই—মারের থেকে গোহত্যার পাপে লিপ্ত হও কেন? যারা সাহিত্যের গুণাগিরি ব্যবসায় পাকা হ'য়ে উঠেছে, খুন-জখমের খ্যাতিটা তাদেরি হোক। তোমরা উদ্রলোক, দয়ামায়া আছে বলেই যেন সকলে তোমাদের স্বয়ং করে।

যাও লিপ্তে অক্ষয় তারা সহজেই হতভাগ্য—বিধাতাই তাদের দণ্ড দেন, তার উপরে তোমরা কেন তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াও? যারা তোমাদের প্রতি ঘেঁষ বহন করে তারা নিজে অক্ষয়-রূপে নিজে দগ্ন হয়, তাদের উপর আর অ'গ্নিগণ বর্ষণ কোরো না—শান্ত হয়ে হাসামুখে প্রফুল্ল'চক্রে সম্পাদকের আসন আলোক'রে থাক, এই আমি আশীর্বাদ করি। লগাটে ক্রকুটির চিহ্ন দূর হ'য়ে যাক।

রামানন্দ বাবুর চিহ্নিত একটি প্রবন্ধ শরৎ বাবুকে দিয়ে সংকলন করিয়েছি, সেটা পাঠাই—সংশোধন তুমি ক'রে নিয়ে, আমার সময় আদবে নেই—আরো কতকগুলো পরে পরে পাঠাব।

ওঁ

প্রিয়বরেষু—

প্রবাসীর জন্ত বেতেই ডাকে আজ আমার “বাংলা নির্দেশক”, সঙ্কোষের “অশ্বের মনস্তত্ত্ব” এবং শরৎবাবুর একটা সংকলন পাঠাই। অশ্বের মনস্তত্ত্বটি বেশ ভালো লেখা হয়েছে; একবার ভেবেছিলুম তত্ত্ববোধিনীতেই নেব—তার পরে লোভ মন্বরণ করা গেল।

সোনার তরীর ইংরেজি তর্জমা অভিত করেছিল—বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত করিয়েছিল, তার পরে বিখ্যাত কবি ও ষ'ব Edward Carpenterকে দেখিয়ে সেই মহিলা ওটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। Carpenter অভিতের কতকগুলি ইংরেজি অম্ববাদের খুব প্রশংসা করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার

মধ্যে কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল। সেই গুলির দিকে আমার বোঁক ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞের বোঁক এইটের উপরেই, তাই পাঠিয়ে দিলুম। ছদ্মন ইংরেজের হাতের মধ্যে দিয়ে ফিল্টার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাজালিষ-দোষ যুচে গিয়েছে। রামানন্দ-বাবুকে দেখিয়ে—যদি পছন্দ করেন Modern Reviewতে ছাপতে পারেন।

তোমরা প্রবাসী ও মজার্ন রিভিউতে আমার ছবি বের ক'রে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ। এই রকম বার-বার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শাস্তি নেই। ঐ

পাতগুলোর উপর আমি চোখ কেঁতে পারিনে। দোহাই তোমাদের—আমার মৃত্যুর পূর্বে আর আমার ছবি বের কোরা না।

ভারতীর জন্তে গল্প সিধুতে বসেছি। কিন্তু কাজের ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্ত এগতে পারছিনে। মুছিলে পড়েছি। পাতা বোলো লিখেছি, এখনো অন্তত ১২।১৩ পাতা বাকী।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

স্বর্গীয় মুন্সী গোবিন্দচন্দ্র সেন-মহাশয় নিজামরাজ্য হইতে বিদায় লইবার পর, সেই বৎসরই (১৮৬৮ খৃঃ অব্দ) বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন কৃতী বাঙ্গালী হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। তাঁহার পিতা শ্রীমুনাথ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় বর্তমান জেলায় বৈচিত্র উত্তরে বড়খামাস নামক একজন সম্মানিত গৃহস্থ ছিলেন এবং কলিকাতায় এক সওদাগরী অফিসে ২৫ টাকা বেতনে গুদাম-সরকারী করিতেন। কর্মস্থলে তিনি কলিকাতা হোগোলকুড়িয়ার পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বুধবার শিবচতুর্দশীর সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র মধুসূদনের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তিনি পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয়রূপ তিনি নাকি শৈশবে অতিশয় ছরঙ্গ ছিলেন। দেশস্থ অনেকেই তাঁহার পিতার নিকট চাকরির উমেদারী করিতে আসিত। একবার অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এইরূপ একজন আসিলে সরলপ্রকৃতি পিতা তাঁহার জামিন হইয়া এক চিনির কলে চাকরি করিয়া দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক কলের তহবিল ভাঙ্গিয়া দশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিলে

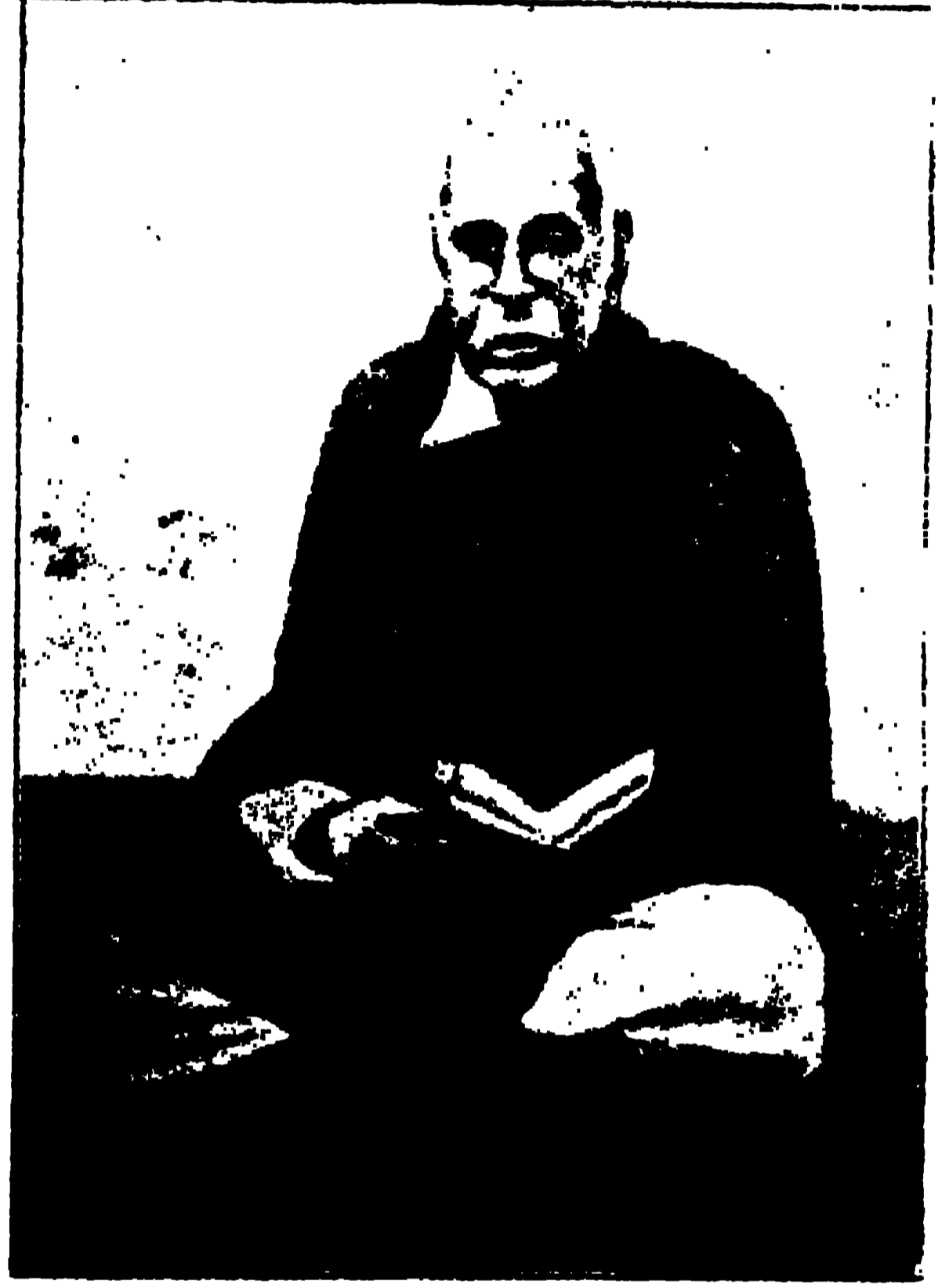
চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে জামিনের টাকা দিতে হয়। তাহাতে দেশে ৩২৫ ইথানি খোড়োঘর আর সামান্ত চাষের জমি ছাড়া সর্ব্বই নষ্ট হয়। কলিকাতার বাড়ী-খানাও যায়। তিনি হোগোলকুড়িয়াতেই একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অনতিকাল পড়েই তিনি দ্বীপুত্র কল্যাণকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কেলিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এই সময় শিশুপুত্রের অক্লান্ত পিতৃসেবায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সপ্তমবর্ষীয় পুত্র তখন পিতৃবন্ধুগণের পরামর্শে ও সাহায্যে বিধবামাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীদ্বয়কে লইয়া দেশে যান, এখানে অনন্তোপায় জননী অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। সেই বিধবাকে গৃহচরকার সূতা ও সামান্ত জমির কৃষিজাত হইতে কত কষ্টে যে চারিজনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। মাতৃভক্ত শিশুর প্রাণে তাহা বাজিল। সেই অতি কষ্টের সংসার তাঁহার অনর্নিহিত শক্তিকে এমনই ভাবে ও এত সখর আগাইয়া তুলিল যে, সেই সপ্তমবর্ষীয় শিশু ছরঙ্গপণা এককালে পরিহার করিয়া জননী ও ভগিনীদের চুঃখমোচনে বহুপরিকর হইয়া একাকী

কলিকাতায় অনৈক পরিচিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে থাকিয়া বালক হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইয়া স্বীয় সংসাহস, মধুর প্রকৃতি ও বিদ্যাহুরাগে অচিরেই হেয়ার সাহেবের হৃদয় জয় করিয়া বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

বিভার্জনকালে এই কোমলমতি নিঃকণ্ড অহুবিধা কত যে বিষের মুখ দেখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু হিরসকর সহিষ্ণু বালক সকল বাধা অগ্রাহ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রবাদ মিথ্যা নহে যে, “বাবলখীর সহায় স্বয়ং ভগবান্”। তিনি যে ভক্তলোকের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অধিক রাজি পর্য্যন্ত তথায় প্রদীপ জালিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং বালক মধুসূদন রাজপথের আলোকে আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। একদিন স্বনামপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র গুহ-মহাশয় তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং কারণ জানিতে পারিয়া দয়াজ্বলিত্তে বলেন, “তুমি কাল থেকে আমার ছোট ছেলেকে ইংরেজী প্রথমভাগ পড়াইও, আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।” এই সময় মধুসূদনের বয়স মাত্র নয় বৎসর। সঙ্কল্প জমিদার বালককে বেতন ব্যতীত প্রতিমাসে এতটা ‘সিধা’ দিতেন যে, তাঁহার আর খাবার খরচ লাগিত না। সুতরাং, তিনি মাতাকে প্রতিমাসেই তিন টাকা করিয়া পাঠাইতেন। কয়জন ২ বৎসরের বালক দূর দেশে থাকিয়া শিক্ষকতার দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া আপনার ভরণপোষণ এবং বিধবা জননীকে অর্থসাহায্য করিতে সমর্থ হয়? সময়ে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রথমাবধি কলেজের একজন সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। হিন্দু কলেজ হইতে তিনি জুনিয়ার পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২০০ টাকা এবং ১৮৪২ অব্দে সিনিয়ার বা চরম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৪০০ টাকা বৃত্তি পান। এই সময় তাঁহার তৃতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। ষাটশ বর্ষ বয়সে প্রথম বিবাহ হইলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ

হয় এবং পঞ্চাদশ বর্ষ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিলে দুই বৎসরের মধ্যে সেই স্ত্রীও মৃত্যু হয়। মাতার আদেশে কিন্তু ইহার পরও তিনি এক পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন।



পরলোকগত বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মধুসূদনবাবু যখন শেষ পরীক্ষার দ্বন্দ্ব প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার সহপাঠী ও প্রসন্নকুমার সর্দারদিকারী এবং উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে তিনি রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিদ্যাসাগর-মহাশয় ও রাম-গোপাল ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তিনি গবর্ণমেন্ট ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ১৮৫২ অব্দের ১৮ই নভেম্বর উক্ত কলেজে গিয়া ভর্তি হন। তিনি রুড়কী কলেজের দ্বিতীয় বাঙ্গালী ছাত্র। প্রথম ছাত্র বাবু নীলমণি মিত্র ১৮৫১ অব্দের ৩রা মার্চ এখানে ভর্তি হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত এবং লালু ময়লালের সহিত একত্র বন্ধুত্ব করিয়া যে, তাহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী

হইয়াছিল। তাঁহার তিন জনেই এক বাসাতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে যেমন, এখানেও তেমনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা তাঁহার একায়ত্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ অব্দের আগষ্ট মাসে পরীক্ষার সময় পীড়িত হওয়ায় এবং একদিন পরীক্ষা দিতে না পাবায় শেষ এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হন এবং সার্ভেইং (জরাজ) ও সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংএ প্রথম হইয়া দুইটি পুঙ্খানুপুঙ্খ লাভ করেন। শেষ পরীক্ষার পর তিনি এক বৎসর কড়কী কলেজের অব্যাপকের কাৰ্য্য করিয়া যশোলাভ করেন। এই সময় কানপুরের গঙ্গার খাল খনন-কাৰ্য্য আরম্ভ হওয়ায় তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য ছোটলাট বাহাদুর মধুসূদন-বাবুকে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ারের পদ প্রদান করিয়া তথায় পাঠান। কিছুদিন পরেই সিপাহী বিদ্রোহের আশঙ্ক চারিদিকে জলিয়া উঠে। মধুসূদন-বাবুর হস্তে তখন বিশ্বস্ত সরকারী অৰ্থ ছিল। তিনি তৎসমুদয় গোপনে লক্ষ্মী রেসিডেন্সীতে পাঠাইয়া দেন। পরে বিদ্রোহীদল তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিলে তিনি দ্বিতলের ছাদ হইতে লুকাইয়া পড়িয়া ফতেআলী নামক একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সহিত পলায়ন করেন। দিবসে লুকাইয়া থাকিয়া ও রাত্রিতে পথ চলিয়া ক্রমে তিনি এটাওয়ারে আসিয়া পৌঁছেন, কিন্তু এটি সহরও বিদ্রোহীদল বেষ্টিত করিতে আসিলে তিনি রজনীযোগে জীলোকের বেণে উঠুপুঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন এবং শীল্ডই লর্ড্ গফ্ ও জেনারেল হাভলকের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হন। এক্ষণে তিনি সামরিক এঞ্জিনীয়ার হইয়া জেনারেল হাভলকের সেনাদলে কাৰ্য্য করিতে থাকেন। স্বাস্থী আক্রমণ এবং লক্ষ্মী উদ্ধারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীয়ে যুদ্ধস্থলে তাঁহার কাৰ্য্য দেখিয়া জেনারেল হাভলক বলিয়াছিলেন, “বাবু এ দুর্দিনে আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকিবে।” দুর্ভাগ্যক্রমে সেই যুদ্ধই জেনারেলের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহ প্রশান্ত হইলে মধুসূদন-বাবু দুটি লইয়া দেশে যান। সেই সময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের হাত দিয়া ভারত গবর্নমেন্ট ঐ প্রদেশে বিশ্বস্ত কর্মচারীদিগকে জায়গীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দেন। মধুসূদন-বাবু অল্পপস্থিত থাকায় তাঁহার

প্রাপ্য জায়গীর তিন পান নাট। এই সময় মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি সপরিবারে কানপুর যাত্রা করেন এবং তথা হইতে মৌরাটে বদলি হন। মৌরাটে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এখানে থাকিতে-থাকিতে ১৮৬৭ অব্দে হিন্দু-স্থানী ভাষায় এল, সি, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথম গ্রেড অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ারের পদে বেবেরলী বদলী হন এবং পর-বৎসর ডেপুটি এঞ্জিনীয়ার হইয়া স্বাস্থী-প্রবাসী হন।

স্বাস্থী অবস্থান কালে তাঁহার সহপাঠী বন্ধু রায় ময়লাল বাহাদুর, সার সালারজাদ্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নিজাম রাজ্যের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। তিনি মধুসূদন-বাবুকেও নিজামরাজ্যে কক্ষ লইবার জন্য অনুরোধ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবরের অনুরোধে ১৮৬৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইংরেজ গবর্নমেন্টের কক্ষ ত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া আসেন এবং উক্ত সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপালের পদ লইয়া হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ এঞ্জিনীয়ারের পদ লইলে তিনি তাহার স্থলে প্রিন্সিপাল হন এবং নিজাম রাজ্যের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হন। ১৮৭২ অব্দে সার সালারজাদ্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মধুসূদন-বাবু বালক নিজামের বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য নিজামকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তাঁহার স্বাধীনমত পাঠ করিয়া জাহাঙ্গীর ও নিজামের গৃহশিক্ষক কাপ্তেন ক্লার্ক সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধুসূদনবাবুর ছাত্র, বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভূতপূর্ব মেম্বর এবং পরে নিজামবাহাদুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিষ্টার মিঃ সৈয়দহোসেন বিলুগ্রামী, তাঁহার সহোদর মিঃ সৈয়দআলী বিলুগ্রামী এবং রাজা লালুতা প্রসাদ তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের শীর্ষস্থানীয়। ১৮৭৮ অব্দে তিনি স্বীয় পুত্রগণকে দেশ হইতে আনাইয়া নিজাম-কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। তাঁহার দুই বৎসর মাত্র পরে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রামচরণ আত্মহত্যা করায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া

অল্প দুই পুত্র কালীচরণ ও করালীচরণকে দেখে পাঠাইয়া দেন।

কিছুকাল পরে হায়দ্রাবাদের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উদ্ভিষ্টা গেলে মধুসূদনবাবু ১২০০ টাকা বেতনে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৭ অব্দে প্রথম ইন্টারমিডিয়েট এক্সামিনেশন উপলক্ষে নিজাম বাহাদুর কলিকাতা আসেন। নিজামগবর্নমেন্ট মধুসূদনবাবুর উপর সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা পাঠান। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্সপেক্টর প্রাসাদ ভাড়া করিয়া নিজামের বাসের ব্যবস্থা ও সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হয়। এবং সমগ্রই মধুসূদন-বাবুর হাত দিয়াই খরচ হয়। এরূপ স্থলে সাধারণ ছুটিগচ্ছিত লোকের পদস্থান হওয়া বিচিত্র ছিল না, কিন্তু চতুর্দশীর সন্ধ্যায় জাত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় প্রচলিত প্রবানকে মিনায়া করিয়া এমন অনলোভিত, বিশ্বাসী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন, যে, পদস্থান ত দুয়ের কথা উঃ তাঁহার বলনাতেই আসিতে পারিত না। কানপুরে তাঁহার হস্তে যখন ইংরেজ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিল, তখন কটনক বন্ধু এবং অন্যান্য দুই-একজন লোক তাঁহার হস্তে শুল্ক বিপুল অর্থের কিছুদংশ আত্মসাৎ করিবার হাঁকত করিতে লক্ষ্য বোধ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন বাবু মধুব তিন্দুকারে তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সংসার বলিয়াছিলেন, "দাদা! টাকার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশী।"

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এঞ্জিনীয়ার হওয়ায় সর্বদাই তাঁহাকে মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতে হইত এবং সেই সূত্রে তিনি এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই পরিদর্শন করেন। এই সময় কয়েকবার বাঘের মুখে পাড়িয়া তাহা হইতে রক্ষা পান। ১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থতি করিয়াছিলেন। মধুসূদন বাবু কয়েকজন বাঙ্গালীকে নিজাম-সরকারে কর্মোপলক্ষে হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী করাইয়াছিলেন। চীফ এঞ্জিনীয়ার পামার সাহেবের পরামর্শে তিনি হায়দ্রাবাদ সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে খয়রাতাবাদে নিজের একখানি বাগানবাড়া

নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। পামার-সাহেবও তাহার উক্ত বাংলার পার্বেই নিজের বাংলা প্রস্তুত করিয়া ছইজনেই খয়রাতাবাদে বাস করিতেন। এই সময় মধুসূদন পুত্র স্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় নিজাম সরকারের কক্ষ গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্রের কলিকাতাতেই থাকিয়া ব্যবসায়াদি করেন।

ত্রিংশ বৎসর নিজাম-সরকারে গৌরবের সহিত কক্ষ করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মধুসূদনবাবু পেন্সন গ্রহণ করেন। পেন্সন প্রাপ্তির পরও নবাব ফকর উল-মুজ্-শায় নৈলবাগ নিৰ্মাণের কার্যে তাঁহাকে সহস্র টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার শেষ জীবন কলিকাতা টালার বাড়ীতে আতবাহিত করিয়া ১৯০৯ অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে পঃলোক যাত্রা করেন। তিনি কয়েকদিন মাত্র সামান্ত জর ভোগ করিয়া রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ডাক্তার ও কবিবাজকে আসিতে দোখরা বলেন, "এত রাত্রে কেন আসিয়াছ—আমি ত বেশ ভাল আছি"। ইহার একঘণ্টা পরেই ফোনকরণ কষ্ট অল্পভব না করিয়া তিন পুত্র—কালীচরণ, করালীচরণ ও শান্তচরণ, পত্নী দেবী বিন্দুবাসিনী, দুই কন্যা এবং প্রকাণ্ড পরিবার রাখিয়া অনন্ত কালের জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করেন।

স্বর্গীয় মধুসূদনবাবুর অনন্তসাধারণ গুণরাশির মধ্যে তাঁহার চরিত্রের নিখলতা, মনুষ্যোচিত সত্যপ্রিয়তা, সংসার, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুবৎসলতা ত হাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। নিঃসহায় বালক দেখিলেই তিনি তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইতেন। সেইসকল বালকের অনেকেই এখন উকীল মুন্সেফ প্রভৃতি হইয়াছেন। তাঁহাকে আত্ম-উপায়বাদ করিতে কেহ শুনে নাই। তিনি কখন কাহারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই।

পেন্সন গ্রহণের পর তিনি একবারমাত্র দুই মাসের জন্য হায়দ্রাবাদে পুণাতন বন্ধুদিগের নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্টিত থাকিয়া ভগবচ্ছন্দায় কালযাপন করিয়াছিলেন, মধুসূদনবাবু ইহজগত হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ তাঁহার স্মৃতি মুছিতে পারিবে

না। হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে তাঁহার বহু কীর্তি বিগ্ৰহ-মান রহিয়াছে। নিজামবাহাদুরের স্মৃতি “কালকনামা প্যালেস” নবাব ককর-উল-মুলকের শৈলবাস চারমিনারের নবলী এবং মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তাহার অশ্রুতম। তিনি যখন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন একবার সেকেন্দ্রাবাদের “হোসেন সাগরের” বাধ ভাঙিয়া যায়। সে জল কেহ আটকাইতে না পারায় হু-হু শব্দে জল স্রাসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে। চীফ এঞ্জিনীয়ার পামার সাহেবও ইতিকর্ষব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া রাজিকালেই সার গালারজকে লইয়া মধুবাবুর বাটীতে ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভগ্নবাধের নিকট লইয়া যান। তখন জলের প্রবাহ যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ

ডুবিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মধুসুন্দন-বাবুর ব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ বড়-বড় পাথরে বালি ও খড় বাধিয়া ভগ্ন বাধের মুখে নিঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা কাল এইরূপ প্রস্তর নিঃক্ষেপের পর জলের প্রবাহপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মধুসুন্দন বাবুর প্রত্যাশপূর্ণমতিতে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা হওয়ায় নগরবাসী সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা কৃতজ্ঞতার সহিত ধ্বনিত হইয়াছিল ও তাঁহার যশঃ অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিবার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসী নদীর বন্যায় হায়দ্রাবাদ সহর ডুবিয়া যায়, তখন তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আক্ষেপ করিতে বলিয়াছিল,—“আজ মধু-বাবু থাকিলে আমা-দিগকে এমন বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না।”

সন্ধ্যামায়া

বিজন প্রাস্তর-পরে সন্ধ্যা নামে একাকিনী তারাসী খি-শিরে
সকল যেতেছে।মি'শে অবসন্ন তন্মায়ুধ অনন্ত ভিমিরে—
দূর পশ্চিমের কোণে চন্দ্রমার কীর্ণ রশ্মি কাঁপিছে গগনে
ধরণী আধারময়ী পরিপূর্ণ নীরবতা সকল ভুবনে—
যেন মায়্যাপাশে ধরা রহিয়াছে বাধা পড়ি' আপন ইচ্ছা
যেন দূরাগত কোন্ অস্তরের কীর্ণ বাণী কি কহে হিমাধ।

সেই নীরবতা-মাঝে সে মায়্যাবী অঙ্ককারে কে গাহিল গান?
নিমেষে সে অবসাদ ধরণী ত্যজিয়া গেল—জাগিল পরাণ!
দেখিছ আকাশে চাহি'—পূর্ণ চন্দ্র ধীরে-ধীরে উঠে উজ্জ্বলাশে
তুনিছ শ্রবণ পাতি'—সকল ভুলানো স্মৃতি কাঁপিছে বাতাসে।
কে রচিল সুর দিয়া মায়্যার প্রাসাদ নব মণি-আভরণ?—
মায়্যার তুলিকাপাত আধারের বিভীষিকা করিল হরণ।

সেদিন সন্ধ্যার বেলা দিবস যখন আসে হ'য়ে অবসান,
ধরিত্রী দিনের শেষে আধার-রজনী-তটে শেষ ক্লাস্ত গান
অবসন্ন-কণ্ঠে গেয়ে ডুবিয়া যেতেছে ধীরে ভিমির-তন্মায়
বিদ্বান! অক্ষুটালোকে দূরদিগন্তের সীমা দেখা নাহি যায়,—
বিমুগ্ধ নিশীথ নামে, নীরবতা চারিদিকে ভুবন ভরিয়া,
বাক্য নাহি, গান নাহি দিনান্তের শেষ আলো যেতেছে সরিয়া।

অপূর্ব মায়্যার জালে ধরণী ছাইয়া গেল, ছাপিল আকাশ,
তরঙ্গে-তরঙ্গে আসি' ধরণী ফেলিবে গ্রাসি' সুরের আভাস!
কীর্ণ চন্দ্রমার করে, নীরব গগন-মাঝে নিশীথ-প্রাস্তরে—
দূর হ'তে কীর্ণ সুর কাঁপি'-কাঁপি' ভাসি'-ভাসি' পশিল অস্তরে!
দূর হ'তে যে শুনেছে সিদ্ধুর উচ্ছ্বাসগীত—ভুলেছে কি আর?
করেছে উদ্বাটন জীবনের শেষ দিন রহস্তের দ্বার...?

কি গান গাহিতেছিল নাহি জানি--নাহি চাহি তাহা জানিবারে
কি কথা কহিতেছিল—বাতাসে মিলায়ে পেল পরাণের দ্বারে।
শুধু তা'র সুরধানি অব্যক্ত পরাণময় করিল আঘাত,
নিশীথের মৌন মায়্যা পশিল পরাণে আসি' আজি তা'র সাধ;
কি দুখে গাহিতেছিল এমন করুণ সুরে এমন নিশীথে
প্রাস্তর ভাসিয়ে দিবে, গগন ছাপিয়ে দিবে সকরুণ গীতে।

বেদনার সে সঙ্গীতে পরাণ ভরিয়া মোর কত কথা আগে;
আধস্থ আধস্থ—আধেক বিশ্বয়মেশা ঘোর চোখে লাগে।
গেয়ে-গেয়ে ক্লাস্ত সুর অবসন্ন ডু'বে গেল সমাপ্তির মাঝে,
নীরব বিশ্বয়ে ডুবে প্রেমমন্ত্রবিমোহিত ধরণী বিরাজে।
কি ভাবিছ,—কি হেরিছ,—কি যেন করিছ স্থির, নাহি
আর মনে—
জাগিয়া আছিছ কিবা ডুবেছিছ বিশ্বতির আগ্রস্ত স্বপনে।

হুমায়ূন কবির

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ

স্বামী চন্দ্রশরানন্দ

ধর্মলাভ করিতে হইলে মানুষ চোখ, কান বুদ্ধি ইঞ্জিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া চিরচঞ্চল মনকে ধোয় বস্তুতে সমাহিত করিতে সচেষ্ট হয়। অন্তপক্ষে, মনকে সর্বদা সজাগ রাখিয়া চক্ষু বর্ণ প্রভৃতি ইঞ্জিয়নিচয়ের শক্তিকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রসারিত না করিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। একের সিদ্ধি—মনকে অক্ষমুখী করিয়া, অন্যের সিদ্ধি—তাহাকে বহিমুখী করিয়া; এক চায়—ব্যষ্টি ছাড়িয়া সমষ্টিকে, অন্য চায়—সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টিকে। এই দুইটি বিভিন্নমুখী, আলো-অন্ধকারের ত্রায় বিভিন্ন ভাবে কিরূপে একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যায় তাহাই দেখিতে হইবে। কারণ দেখা যায়, ভারত আধ্যাত্মিক সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও একদিন অসমুদ্রহিমাচল শাসন করিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বিদেহ জনক, অজাতশত্রু, প্রবাহন, জানশ্রুতি প্রভৃতি নরপতিগণ যুষ্টিমান্ ধর্মস্বরূপ হইয়াও এক-একজন বড় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ “ব্রহ্ম সত্য, জগন্নিখ্যা” বলিয়া জগৎকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেন এবং উহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইত। অষ্টেতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, “তমেতম-বিজ্ঞানমঃস্মানাস্মানোরিতরেতরাধ্যাসং পুংস্তুত্যা সর্কে প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারো লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ,” অর্থাৎ ‘এই আত্মা এবং অন্যাত্মাতে যে অবিদ্যা প্রযুক্ত অধ্যাস ইহাও এই অবলম্বন করিয়া প্রমাণ, প্রমেয়, লৌকিক, বৈদিক প্রভৃতি কার্যের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়।’ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যদেব জুগতের এই ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াই অষ্টেত মত স্থাপনায় জন্তু নির্ধিক্রমে বহির্গত হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের “অষ্টেতজ্ঞান আঁচলে

বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা করো”রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য ইহাই; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্বক “ব্রহ্ম সত্য, জগন্নিখ্যা” উপলব্ধি করিয়া লোককল্যাণ-মানসে সাংসারিক কস্মাচলান। নতুবা মহাপুরুষগণ যদি জ্ঞানলাভের পর বর্ষহ্যাগী হইয়া অবস্থান করেন, তবে ইতরসাধারণ আদর্শচ্যুত হইয়া মগ্ন অনাচারে নিপত্ত হইবে।* তজ্জন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :-

“সক্তাঃ বর্ষণ্যবিদ্বাংসো যথা কুরুক্জ ভারত।

কুর্ধ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তাশ্চকৌর্ধুলো নসংগ্রহম্ ॥”

গীতা—৩য় অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘হে ভারত, কখনে আসক্ত অজ্ঞেরা যেরূপ করিয়া থাকে, অসাক্ত জ্ঞানীরাও লোকদিগকে স্বধর্মে প্রবর্তিত করণার্থ সেইরূপ করিবেন।’ প্রবাহন, জানশ্রুতি ও বিদেহ-জনক জ্ঞানলাভের পর জগৎকে ‘মায়ায় খেলা’ বলিয়া যদি চূপ-চাপ-বসিয়া থাকিতেন, তবে রাজ্যো নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইত এবং প্রজাবর্গ তাঁহাদের কর্মহীনতা অনুসরণপূর্বক অকর্মণ্য হইয়া উৎসন্ন হইত; শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ যদি সংসারকে মায়া-প্রপঞ্চময় দেখিয়া যুদ্ধবিগ্রহাদির অন্তর্ধান না করিতেন, তাহা হইলে জগতে পাপের বৃদ্ধি হইত। বস্তুতঃ, তাঁহারা জগৎকে অজ্ঞান-বিলসিত দেখিয়াও, অসত্য বুদ্ধিগণ, ইহার আপেক্ষিক সত্যতা মানিয়া জগদ্বাসীকে ক্রমশঃ সেই পারমাধিক সত্যে লইবার জন্তু নানারূপ সংকর্ষের অন্তর্ধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া আর সর্পরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া ভয়গ্রস্ত হন নাই; অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য বুদ্ধিগণ এখানে নানারূপ সংকর্ষ করিয়াও

* “বর্ষি জগৎ ন বর্ষেরং জাতু কর্ণণাতন্ত্রিতঃ।

মম বর্ষাভুবর্ষে মনুষ্যাঃ পার্ধ সর্কণঃ।

উৎসীদেগুরিমে লোকা ন কুর্ধ্যাং কণ্ঠেদেহম্।” ইত্যাদি। গীতা— ৩য় অধ্যায়, ২৩, ২৪ শ্লোক। অর্থাৎ ‘হে পার্ধ, যদি আমি কদাচিত্ আল্পপরিপুষ্ট হইয়া কর্ণের অন্তর্ধান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্কতোভাবে আমার পশু অনুসরণ করিবে। যদি আমি কর্ণ না করি তবে এই লোকসকল বিনষ্ট হইবে।’

আর মায়ায় জড়িত হইয়া পড়েন নাই। এমন-কি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়াও আত্মার অকর্ষিত জ্ঞানবশতঃ নরহত্যাदि पापे उाहारा लिख हन नাই। यथा—

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्बल न लिप्यते।

इहापि स इमाम्लोकान् न हस्ति न निबध्यते।”

শ্রীতা—১৮শ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘আমি এই কৰ্ম্ম করিলাম—আমি কৰ্ত্তা,’ যাহার এইরূপ ভাব নাই এবং যাহার বুদ্ধি কৰ্ম্মে আসক্ত হয় না, তাদৃশ আত্মদর্শী ব্যক্তি এইসকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার ফলে কৰ্ম্মে বদ্ধ হন না।’ আত্মাকে অকৰ্ত্তা জানিয়া, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে বুঝিয়া পুরাকালের রাজসিগল প্রজ্ঞাপালন ও রাজ্যের মঙ্গলার্থে রাজনৈতিক চর্চা এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনীতি প্রবৃত্তিমূলক হইলেও আত্মজ্ঞানের পরে এবং পূর্বে স্বধর্ম্ম-হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞানের হানিকর বা বাধক নহে।

ভারতীয় রাজনীতি প্রধানতঃ সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ এই চারিটি নীতির (policy) উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব-কালে রাজনীতিজ্ঞ নরপতিগণ এই নীতিসমূহ অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।* ইহা শাস্ত্রায়মোদিত। রাজ্য শাসন, রক্ষা বা শত্রুজয় করিতে হইলে হিংসাদি অনিবার্য। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি হইতে হিংসা একেবারে বর্জন করিতে চাহেন, এই অহিংসামূলক রাজনীতি অতি অপূর্ব জিনিষ। তাই রাজনীতি আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই অহিংস রাজনীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুতরাং বিশদভাবে ইহার বিচার আবশ্যিক। মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের আলোচনা করিবার পূর্বে ইউরোপের বর্তমান রাজনীতি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা প্রয়োজন, কারণ উহার সহিত গান্ধী-মহারাজের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমাগত

* সর্কোপ-রৈলুখা কুর্ঘ্যারী-তিজঃ পৃথিবীপতিঃ।

যথাস্তাতাধিকা ন স্তু মি-ত্রোভাসীন-ত্রবঃ।” মনুসংহিতা—৭ম অধ্যায়; ১৭৭ শ্লোক। অর্থাৎ ‘রাজনীতিজ্ঞ নরপতি, যাহাতে শত্রু, মিত্র ও উদারীন, আপন অপেক্ষার প্রবল না হইতে পারে, সেইরূপে (সাম, দান, দণ্ড, ভেদ) এইসকল উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য করিধেন।’

যুদ্ধাদিতে লিপ্ত থাকিয়া এবং তৎকালীন সর্বসাধারণের অসৌম যজ্ঞা, বিবিধ অসুবিধা এবং পরস্পরের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি দেখিয়া প্রতীচ্যের কোনো-কোনো মনীষী যুদ্ধবিগ্রহের বিষম বিক্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। মহাত্মা টলস্টয় বলেন :—

“All the Governments not only most evidently infringed, and are infringing, the elementary demands of justice in relation to the conquered peoples, and in relation to one another, but they were guilty, and continue to be guilty of every kind of cheating, swindling, bribing, fraud, spying, robbery and murder; and the peoples not only sympathized, and still sympathize, with them in all this, but they rejoice when it is their own Government and not another Government that commits such crimes. * * * * To deliver men from the terrible and ever-increasing evils of armaments and wars, we want neither Congresses nor Conferences, nor treaties, nor Courts of arbitration, but the destruction of those instruments of violence which are called Governments, and from which humanity's greatest evils flow” *

অর্থাৎ ‘যাবতীয় শাসক-সম্প্রদায় বিজিত জাতিব এবং পরস্পরের অতি সাধারণ জাতি দাবীসমূহ বাস্তবিকপক্ষে ভাঙ্গিয়াছে এবং এখনও ভাঙ্গিতেছে; তথু তাহাই নহে, জুগচুরি, প্রতারণা, উৎকোচ দেওয়া, শঠতা, গোয়েন্দাগিরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম্ম তাহারা করিয়াছে এবং বর্তমানও করিতেছে। উক্ত পাপকার্যে দেশবাসী নিজ শাসক-সম্প্রদায়ের উপর কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই এবং হয় না, এমন-কি, আনন্দপ্রকাশও করিয়া থাকে; কিন্তু অল্প কোনো শক্তি ঐরূপ দোষ করিলে তাহারা দণ্ড করিতে পারে না * * * রণতরীসমূহ এবং যুদ্ধবিগ্রহাদির দিন-দিন পরিবর্তমান জঘন্য অত্যাচার হইতে মানব-সাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য আমরা মহানজ্ঞা, সন্মেলন, সন্ধিপত্র, মালিসি প্রভৃতি কিছুই চাহি না, কেবল গভর্নমেন্টনামা সেই অত্যাচারের বন্ধকে ধ্বংস করিতে চাই বাহা হইতে মানবজাতির উপর ঘোরতর পীড়ন আসিয়া থাকে।’

টলস্টয়, ব্রহ্মপাত এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহাতে জগৎ হইতে যুদ্ধ চিরকালের জন্য চলিয়া যায় তাহার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা, অনেক বক্তৃতা এবং অনেক লেখালেখি করিয়াছেন; এমন-কি, ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহাকে কঠোর রাজদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার মত—আমাদের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের প্রধান কারণ যুদ্ধ; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জনপদের ধ্বংস, মৃত্যু, অশান্তি প্রভৃতি সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্টেব হেতু যুদ্ধ। যে

* “.Patriotism and Governments”—Leo Tolstoy.

শাসক-সম্প্রদায় প্রজাসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ শতশ্রেণী বর্ধিত করিয়া স্বার্থসাধন করিতেছে, নিজ রক্ত-ভাগ্য পূর্ণ করিবার জন্য যাহারা আমাদের পিতা, পুত্র, স্বামী ও বন্ধুবান্ধবকে টানিয়া লইয়া গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বাই করিতেছে, সেই ভয়ানক শাসন-যন্ত্রকে (A terrible machine of power—L.T.) ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু বিনা রক্তপাতে কিরূপে সেই প্রবল শাসন-যন্ত্রকে ধ্বংস করা সম্ভব? টল্‌স্টয়-মতাবলম্বী কোনো ব্যক্তি উহার উপায় নির্দেশ করিতেছেন, যথা—

"We will not enlist. We will not shoot on their order. We will not 'charge bayonet' upon a mild and gentle people. We will not fire upon shepherds and farmers, fighting for their firesides, upon a suggestion of Cecil Rhodes. Your false cry 'wolf! wolf' shall not alarm us. We pay your taxes only because we have to, and we will pay no longer than we have to" *

অর্থাৎ 'আমরা সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইব না। তাহাদের (শাসক-সম্প্রদায়ের) আদেশে আমরা গুলি ছুড়িব না। নিরীহ জনসাধারণের উপর সশস্ত্র চালাইব না। সেন্সিটাইভ রোডসের নির্দেশানুযায়ী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বন্ধপরিষ্কার মেঘপালক ও কৃষককুলের উপর গোলাবর্ষণ করিব না। "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" রূপ প্রভাষণকার মিথ্যা চীৎকারে আমরা দ্বার ভীত হইব না। উপায়ান্তর নাই বলিয়া তোমাদিগকে কর দিবা দািক, কিন্তু প্রয়োজনাত্মক এক দিনেরও অধিক উহা দিতে আর আমরা রাজি নহি।'

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনার জন্য যেন ঐ নীতিকে (policy) অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন :—

"Complete civil disobedience is rebellion without the elements of violence in it. An out and out civil resister simply ignores the authority of the State. He becomes an outlaw claiming to disregard every unmoral State law. Thus, for instance, he may refuse to pay taxes, he may refuse to recognise the authority of the State in his daily intercourse. He may refuse to obey the law of trespass and claim to enter military barracks in order to speak to the soldiers, he may refuse to submit to limitations upon the manner of picketing and may picket within the prescribed area" †

অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ অহিংস-আইন-অমান্য-করারূপ বিদ্রোহে হিংসার ভাব

"Patriotism and Government"—L. T.

† "The Momentous Issue"—Young India 10. 11. 31. M. K. Gandhi.

ধাকে না। সম্পূর্ণ অহিংস আইন-অমান্যকারী দেশের শাসনকর্তৃক কেবলমাত্র অগ্রাহ্য করিবে। এতোক নীতিবিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিয়া সে বিদ্রোহাচরণ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিবে, দৈনন্দিন জীবনে শাসনকর্তৃক মানিবে না। টে ম্পাস (trespass) আইন অমান্যকরিয়া সৈনিকগণকে সমস্ত শুনাইবার ক্ষমতা সে সেনানিবাসে প্রবেশের দাবী রাখিবে এবং পিকেটিং- (picketing) পদ্ধতির সীমানির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া নির্দেশিত সীমামধ্যে পিকেটিং করিবে।'

মহাত্মাজীর অভিমত, ইংরাজ-শাসন-প্রসূত অত্যাচার-অনাচারের হেতু অনেকটা আমরা স্বয়ং। কারণ, এই শাসন-যন্ত্র প্রধানতঃ ভারতীয় লোকদ্বারা গঠিত। কাউন্সিল, কোর্ট, পুলিশ, ইংরাজেব বাণিজ্য, সৈন্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ভারতবাসীর সংখ্যাই অধিক, ইংরাজ নাম মাত্র। অদ্য সমস্ত ভারতবাসী যদি একসঙ্গে সর্বতোভাবে ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, রাজস্ব বন্ধ করে, কল্যা ইংরাজ-শাসন মুগ্ধ-কর্তৃত মহীকহের জ্বায় পতিত ও ধ্বংস হইবে। ইহা জানিয়াও এই শয়তানী শাসন ("Satanic Government"—M. K. G.) আমরা সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজেদের দুর্দশা বর্ধিত করিতেছি, সুতরাং আমাদের কষ্টের হেতু আমরা স্বয়ং। তাই গান্ধী-মহারাজ ভারতবাসীকে কাউন্সিল, কোর্ট, পুলিশ প্রভৃতি বয়কট (boycott) এবং রাজস্ব বন্ধ করিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তিনি টল্‌স্টয়ের মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যথা—

"Reflect, and you will understand that your foes are not the Boers, or the English, or the French, or the Germans, or the Finns, or the Russians, but that your foes—your only foes—are you yourselves, who by your patriotism maintain the Governments that oppress you and make you unhappy" *

অর্থাৎ 'চিন্তা করিলেই বুঝিবে যে, বুয়ার, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, কিন্স, অথবা রুশীয় তোমার শত্রু নহে, তোমার শত্রু—তোমার একমাত্র শত্রু—তুমি স্বয়ং। এবং তুমিই তোমার স্বদেশহিতৈষিতার অজুহাতে অত্যাচারী এবং অন্তস্তকর শাসনের পোষকতা করিতেছ।'

অনেকের ধারণা, মহাত্মাজীর Non violent Non-co-operation (অহিংস অসহযোগ) Civil Disobedience (অহিংস আইন-অমান্যতা) প্রভৃতি মতবাদ

* "Patriotism and Government"—L. T.

ভারতের নিজস্ব দান, কিন্তু পাশ্চাত্য মনুষীদের উপরোক্ত ভাবসমূহের সঠিত পরিচিত হইলে মনে হয় তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নির্দেশিত পথেই গমন করিতেছেন। তবে, মহাত্মার অহিংস মতবাদের উপর “অহিংসা পরমোধর্মঃ”রূপ বৌদ্ধ, জৈন তথা বৈষ্ণব উপদেশের খুব প্রভাব আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, বেদে অধিকারি-ভেদে হিংসারও স্থান আছে, যথা— ‘অগ্নীষোমীয়ঃ পশুমাংসভেদতঃ’ অর্থাৎ ‘অগ্নি ও সোমদেবের উদ্দেশে পশুত্যাগ করিবে।’

“Complete non-violence is complete absence of ill-will against all that lives. It therefore embraces even sub-human life, not excluding noxious insects or beasts. They have not been created to feed our destructive propensities” *

অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণীজাতের উপর অশুভ উচ্চার একেবারে বিবর্তিত নাম সম্পূর্ণ অহিংসা-পরায়ণতা। সূতরাং মনুষ্যের প্রাণী, এমন-কি তুচ্ছ জীব-জন্তু অথবা কৃমি-কীটের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য। আমাদের ক্রম-এসুস্ত চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের ভয় হয় নাই।

মহাত্মাজীর এই মতবাদ অত্যাৎকষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা কতখানি প্রযোজ্য, সর্বসাধারণকে ঐ মতাবলম্বী করিলে তাহা শুভ কি অশুভ ফল প্রসব করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম ভারতে অহিংস নীতি চালাইয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে।

“অহিংসা পরমোধর্মঃ এই শাসনবাক্য অত্যন্ত মহান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা সন্ন্যাসীর ধর্ম, সাধারণের নহে। * * * বৌদ্ধধর্ম অহিংসারূপ ধর্ম প্রচার করিল, তাহার ফলে পূর্বে এশিয়ার সমস্ত রাজ্যগুলি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। * * * বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার হইতেই ভারতীয় অধঃপতনের আশঙ্কা হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের অসামু্যক ও অতি-মানসিক কাল্পনিক আদর্শ সার্বজনীন হওয়াতে ভারতীয় জাতি অধঃপতিত ও অবনতিত হইয়াছে। * * * অহিংসা পরমোধর্মঃ—এই মতবাদের অস্বাভাবিকতার জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল, জাতির অবনতি অবশ্য-জ্ঞানী হইল। * * * পরবর্তী কালে তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্মও ভারতীয় অধঃপতনের সহায় হইয়াছে। এই উভয় ধর্মই জাতীয়তাগোপন হইয়া এক অপূর্ণ কাল্পনিক আদর্শে মূঢ় করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানপ্রবণ বলিয়া কতকটা সজীবতা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্মের কৃপার ভারতবর্ষের না হইলেও বঙ্গদেশের মেরুদণ্ড চূর্ণ ও ভুঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় পতনের অন্যত্র কারণ থাকিলেও আমাদের বিবেচনার এইগুলিই মুখ্য কারণ।”†

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন :—

* “Non-violence”—Young India, 9-3-20. M. K. G.
† “ভারতীয় মতের বিশেষত্ব”—রাজনীতি, স্বামী বিবেকানন্দ সংকলিত।

“বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধ ধর্ম ম’রে যাবার সময় চিন্মুখ উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর চূ’করে আপনায় করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম বলে বিখ্যাত। অহিংসা পরমোধর্মঃ—বৌদ্ধধর্মের এই মত খু’তালো, তবে অধিকারী বিচার না ক’রে বলপূর্বক রাজশাসনের দ্বারা ঐ মত ইতরসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে শেষে দিয়ে গেছে।”*

Dr. Harald Hoffding (ডাঃ. হেরল্ড হফ্’ডিং) বলেন,—

“For the most part its (Buddhism) effect has been damping, lulling, restraining, except where—as in case of the Japanese, it has encountered and been transformed by an active forward-pushing racial tendency, and by the influence of an earlier religion (Shintoism) which had specially developed the feelings of individuality and of nationality * * * Buddha softened Asia.”†

অর্থাৎ ‘অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার (বৌদ্ধধর্মের) ফল—অবসাদ, টেংসা-হীনতা ও উল্লসিত পরিপন্থী। একমাত্র জাপানে ইহা একটি কর্মপ্রবণ ও গতিশীল জাতীয়-ভাবের সম্মুখীন ও তাহাতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং একটি প্রাচীন ধর্মের (শিন্টো ধর্ম) প্রভাবে ইহা ব্যক্তিগত স্বাভাব্য ও জাতীয়তাবাদ বিশেষরূপে বর্ধিত করিয়াছে। * * * বুদ্ধ এশিয়াকে কোমলভাবাপন্ন করিয়াছেন।’

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অহিংসাদর্শরূপ সাম্বিক ভাব সর্বসাধারণে চালাইতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম দেশকে তমোভাবাপন্ন করিয়াছে। তমের লক্ষণ ভয়, নিকর্ষীয়, আলস্য, উদাম-হীনতা, দীর্ঘসূত্রতা, পরাধীনতা প্রভৃতি, এইসব লক্ষণের সহিত দেশবাসী মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তাহারা তমোভাবাপন্ন কি না? স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহূর্ত্তে, তমোগুণী জাতির হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহার রজোশক্তি উদ্দীপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ঠিক তাহারই পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী রজোগুণপ্রধান ক্ষাত্র ধর্মকে দমিত করিয়া দেশবাসীকে সত্বভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দেব সহিত মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যবিভিন্নতা আমরা দেখি না, কেবল তাহাদের উভয়ের মধ্যে মতের বা পথের বিভিন্নতা স্বল্লাধিক দৃষ্ট হয়। মহাত্মাজী ক্ষাত্রধর্মকে অবহেলা করিয়া দেশকে ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান করিতে চাহেন, তথা স্বামিজী ক্ষাত্রধর্মের ক্ষুরে দেশের তমোগুণ দূরীভূত করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ কবিত্তে ইচ্ছুক। তুলনায় এই দুই মহাপুরুষের পরস্পরের গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা

* “স্বা’ম-শিবা সংবাদ” (উত্তরার্ধ), ঐ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।

† “Philosophy of Religion”—Dr. H. Hoffding.



কম নহে, সুতরাং তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় শাস্ত্রদিক্কারের প্রামাণ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। মহাত্মাজী বলিতেছেন—

“The religion of non-violence is not meant merely for the Rishis and Saints. It is meant for the common people as well. Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute. The spirit lies dormant in the brute and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law—to the strength of the spirit. * * * * I do not wait till India recognises the practicability of the spiritual life in the political world” *

অর্থাৎ অহিংস ধর্ম যে কেবল মুনি ঋষিদের জন্য তাহা নহে, সর্বসাধারণের পক্ষেও সমভাবে ইহা অবলম্বনীয়। হিংসা বেরূপ পশুজাতির, অহিংসা তদ্রূপ মানুষদের জায় মানবজাতির ধর্ম। আত্মার মহিমা পশুপক্ষের জগতের সুপ্তভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ তাহার শারীরিক শক্তি ব্যতীত অস্ত্র কোনো শক্তির বিষয় অধগত নহে। কোনো উচ্চতর শক্তি—আত্ম-শক্তির নির্দোষপ্রযোজ্য চলিতে মানবের মানসস্থ উচ্ছা করে। * * * রাষ্ট্রনীতিক রূপে যতদিন না ভারতবর্ষ ধর্মজীবনের কার্যকারিতা স্বীকার করিবে, ততদিন আমি অপেক্ষা করিতে পারি না।’

গান্ধী-মহারাজ ভারতের তথা জগতের রাজনৈতিক সাধনায় অহিংসা নীতি প্রবর্তন করিতে গাছেন। তাঁহার অভিমত, অহিংসা নীতি সর্বসাধারণের জন্য—“It is meant for the common people as well.” কিন্তু ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধ অপেক্ষা অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়া যখন গান্ধীব ত্যাগ-পূর্বক বলিলেন, “ন যোন্তে”—‘আমি যুদ্ধ করিব না,’ তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “ক্লব্যং মান্ধ গমঃ পার্থ নৈতৎ অযুপপদ্যতে”—‘ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার শোভা পায় না’; “নিরাশীর্নির্মমো ভূষা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ”—‘নির্দামী ও মমত্বশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ করো’ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা ও শিষ্য অর্জুনের হিতার্থে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আবার বলিয়াছেন—

“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্তপঃ পংধর্মাৎ বহুষ্ঠিতাৎ”—‘উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কিংকং অল্পতীন্ও স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ।’ ইহার তাৎপর্য এই, অহিংস ব্রহ্মণ্য ধর্ম যদিও ক্রান্তধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তথাপি তোমার স্বধর্ম

যে রক্তোত্তপপ্রধান ক্রিয়্য ধর্ম তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ব্রহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিতে পারো না; এই ধর্মে থাকিয়া যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহাও ভালো তথাপি পরধর্ম ভয়াবহ—‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পংধর্মো ভয়াবহঃ।’

কিন্তু গান্ধী মহারাজ এই ‘বিত্তপ’ (অপকৃষ্ট—imperfect) ক্রান্তধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সকলকেই ‘বহুষ্ঠিত’ (উৎকৃষ্ট—perfect) ব্রহ্মণ্য ধর্মে টানিয়া লইবার পক্ষপাতী। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার সঙ্গিত মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু মহাত্মাজী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের এবং অর্জুনের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

“I do not believe that the Gita teaches violence for doing good. It is pre-eminently a description of the duel that goes on in our own hearts. The divine author has used a historical incident for inculcating the lesson of doing one’s duty even at the peril of one’s life. * * * The Gita distinguishes between the powers of light and darkness and demonstrates their incompatibility.” *

অর্থাৎ মহৎ কর্ম সাধনের জন্য গীতা হিংসানীতি শিক্ষা দেয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে যে যুদ্ধ (পাপ পুণের সংগ্রাম) চলিতেছে ইহা তাহারই একটি সর্বিশেষ বর্ণনামাত্র। অমানব ঐশ্বর্যকার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গরে, স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াও মানবকে কর্তব্যসাধনের শিক্ষা দিয়াছেন। গীতা, অগো-অন্ধকারের (পাপ-পুণের) শক্তির পার্থক্য দেখাইয়া তাহাদের অসামঞ্জস্য প্রাচল্য করিয়াছে।’

মহাত্মা গান্ধী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন তাহাতে কোনো কতি নাই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রামতন্ত্র মহাত্মাজী শ্রীরামচন্দ্র ও লঙ্কাসমরের সত্যতা-সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দেহ হইবেন না। তিনি নিজেই একস্থানে লিখিতেছেন—

“What is the meaning of Rama, a mere human being, with his host of monkeys, pitting himself against the insolent strength of ten-headed Ravan surrounded in supposed safety by the raging waters on all sides of Lanka? Does it not mean the conquest of physical might by spiritual strength?”†

অর্থাৎ ‘দশমুণ্ড রাবণ যিনি চতুর্দিকে বিক্ষুব্ধ সলিলরাশি পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কাধীশে নিজে সস্পূর্ণ নিরাপত্তা মনে করিতেন, সামান্য একজন মানুষবিশেষ রাম এককল বানর চইয়া অতি অসহায়ভাবে তাঁহার দৃষ্ট

* “Religious authority for Non-co-operation”—Young India 25-8-20. M. K. G.

† “Doctrine of the sword”—Young India, 11-8-20 M. K. G.

* “The Doctrine of the Sword”—Young India, 11-8-20, M. K. G.

শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহাতে কি বুঝায়? শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মশক্তির দয়লাভ কি ইহাতে প্রমাণিত হয় না?"

মহাত্মার বাক্যে স্বীকৃত হইতেছে যে লক্ষ্যপতি স্বাধীনতার সহিত অখোখানাথ শ্রীরামচন্দ্রের এক সময় যুদ্ধ হইয়াছিল। ভার্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য যদি যুদ্ধ করা অন্তায় না হয়, তাহা হইলে স্বদেশ বা স্বজাতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ কোনো-রূপেই দৃশ্যমান হইতে পারে না। অন্তায় ভারতীয় শাস্ত্রেও যুদ্ধের বিধি ও প্রশংসা আছে। যথা—

“স্বাধীনো পুরুষো লোকে সর্গামণ্ডলমেদকো।
পরিব্রাজ্য যোগযুদ্ধে রণে চাতিমুখে হতঃ।”

অর্থাৎ ‘ইহলোকে যোগযুদ্ধে পরিব্রাজক এবং যিনি সন্মুখ সমরে নিহত হন, এই দুইপ্রকার ব্যক্তি সর্গামণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করেন।’

যোগী ও যোদ্ধা উভয়েই মৃত্যুর পর যদি একই গতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অধঃসবাদী সন্ন্যাসী অপেক্ষা যুদ্ধবাদী সৈনিক কোথায়—কিভাবে নিকটে হইলেন? বস্তুতঃ “Each is great in his own place.”* অর্থাৎ ‘স্ব-স্ব কার্যক্ষেত্রে কেই ছোটো নহেন’ এই স্বামি-বাক্যই সত্য। তাহা ছাড়া মন্তু বলিতেছেন:—

“আহবেবু মিথোঃস্তাঃ ত্রিখাসস্তো মহীক্ষিতঃ।

যুধ্যমানঃ পরঃ শক্ত্যা স্বর্গং যাস্ত্যপাঃমুখাঃ।” মন্তু সং-৭ম অধ্যায়, ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘যুদ্ধে প্রবৃত্ত নরপতিগণ, পরস্পরের বধের ইচ্ছাপূর্বক পরাধ্বুণ না হইয়া শক্তি-অনুসারে যুদ্ধ করিলে স্বর্গ লাভ করেন।’

পুনশ্চ,—

“উপক্ৰম্যারিসাসীত বাষ্টুঃ চাস্তোপপৌড়য়েৎ।

যুযুৎসু সন্ততঃ যবসান্নোদকেসু-ম্।

তিন্ম্যাত্চেব তড়াগানি শাকারপরিপান্তথা।

সমবন্ধন্যঃসৈচনঃ রাজৌ বিভ্রাসরেস্তথা।

উপক্ৰম্যামুশপেদুধেঃসৈব চ তৎকৃতম্।

যুক্তৈ চ সৈবে যুধেত জয়প্রাপ্তুরপেততীঃ।” মন্তু সং-৭ম

অধ্যায় ১১৫-১১৭ শ্লোক।

অর্থাৎ শত্রুকে অবরোধ করিবে এবং তাহার রাজ্যের অনিষ্টাচরণ করিবে, শত্রুর স্বয়ং সেনা প্রকৃত্তিৎ পানীর তল, যাদ প্রকৃত্তিকে বিষ্টা-যুজ্যাদি অপজিত ত্রবা মিশাইয়া নষ্ট করিবে। শত্রুর জাগরণ ও প্রচীর ভেদ করিবে, পরিধার মধ্যে যুক্তিকা দ্বারা তলশূণ্য করিবে এবং নানা উপায়ে শত্রুকে ব্যতিবাস্ত করিবে, রাজ্যেতে সিংহনাদ, বাদ্য প্রকৃত্তি দ্বারা শত্রুর তর ভঙ্গাইবে। জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত শত্রুর বিচ্ছেদ জ্ঞাপাইবে, এবং তাহাদের কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, এইসকল অনুষ্ঠান দ্বারা পরিণামে শুভফল প্রাপিয়া জয়প্রাপ্তিলাভী রাজা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবেন।’

ভারতীয় কোনো প্রাচীন শাস্ত্রই কখনও ক্ষাত্তধর্মকে

ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ক্ষাত্তধর্ম না থাকিলে জাতি বাঁচিতে পারে না, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঋগ্বেদে আছে—

“ত্রাক্ষণোহস্ত যুগমাসীদহু রাতস্বঃ কৃতঃ।

উক তদস্ত যৈশ্চঃ পস্তাঃ শূত্রো অচারত।”

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ১২ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘ত্রাক্ষণই তাঁহার (বিরাট পুরুষের) যুগ,কৃত্রিয় তাঁহার বাহ্য, বৈশ্ব তাঁহার উক এবং শূত্রই তাঁহার পদ।’

কোনো ব্যক্তি যেরূপ যুগ অর্থাৎ শিরোবর্জিত হইয়া বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ বাহ্য অর্থাৎ হৃদয়হীন হইয়াও সে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অস্ত্রের একটা প্রত্যক্ষ না থাকিলে যেমন অঙ্গহানি হয়, ঠিক তেমনি জাতি-শরীরের কোনো একটা অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে সে অসম্পূর্ণ ও অক্ষম হইয়া পড়ে। ত্রিকিষ্ঠ ত্রাক্ষণ না থাকিলে যেমন দেশের অনল্যাগ, যুদ্ধপরায়ণ কৃত্রিয় না থাকিলেও সেই-রূপ জাতির ধ্বংস অনিবার্য। প্রতি অঙ্গ নিজ কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক বিরাট জাতি-শরীরের পূর্ণতা সাধন করিবে, ইহাই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। বিবিধ শাস্ত্র-সহায়ে দেখা গেল, মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে ও জাতিধর্ম ক্ষাত্তভাবে যে অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতে চাহেন তাহা অশাস্ত্রীয় এবং অধৌকিক।

মহাত্মাজী ইতিহাসেব দিক্ দিয়াও প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা ভারতের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—

“India cannot become free by armed rebellion for generations. India can become free by refraining from national violence.....The people of the plains do not know what it is to put up an organized armed fight.”*

অর্থাৎ ‘সশস্ত্র বিদ্রোহাচরণ দ্বারা ভারতবর্ষ পুরুবাস্ত্রমেও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় হিংসানীতি পরিত্যাগ করিলে ভারত স্বাধীন হইতে পারে। কিরূপে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হয় তাহা সমতলভূমির লোক জানে না।’

অবশ্য রাজবিদ্রোহের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আনয়ন সম্ভবপর কি না তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তবে ভারতবাসী সমতলভূমিতে বাস করিলেও যে সংঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

* “Needless Nervousness”—Young India. 2-3-22. M. K. G.

* “Karma Yoga”—S. Vivekananda.

“এশিয়ামাইনবের দো-আসলা ব্রাক্ হেলেনিষ্টিক রাজ্য সেলিটকস্ হিন্দুর সামরিক শক্তি যোগের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন খঃ পূঃ ৩০৩ সালে। আকসান মুসল্কের দো আসলা গ্রীক হেলেনিষ্টিক নরপতি মেনান্দার বা মিলিন্দকে হিন্দু ১৫৩ খঃ পূঃ অর্থে পরাজিত করে। এই গেল মোর্থা ও হুজবংশের শক্তি যোগের সাক্ষী। পরবর্তীকালে মধ্য-এশিয়ান হুণ জাতিও হিন্দু জাতির সামরিক শক্তি যোগের ক্ষমতা চাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪৫৫—৪৫৮ সালে স্বল্পকাল ইহাদের গতিবোধ করেন। ৫২৮ সালেও আর একবার হুনেরা হিন্দু জাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। বৃষ্টিতে হইবে যে, একমাত্র স্বদেশী লড়াইয়েই হিন্দু-পণ্টন ওপাত ছিল। এমন নয় : বিশ্বশক্তির মাপকাঠিহেতু ভারতের জনসাধারণ সামরিক জীবনের দক্ষতা বাচাই কনাইতে অভ্যস্ত ছিল। জীবন-যুদ্ধে স্বপ্নদায় দাড়াইয়া হিন্দু সেনাপতির বিদেশী রণ নায়কগণকে পায়তায় চট্ট করিতে জানিতেন। সুর-বাহিরে লড়িবার চক্ষু হিন্দু-জাতিকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত। কোথায় আফগানিস্তান, কোথায় মধ্য এশিয়া, এই সকল সুদূরস্থিত জনপদেও ভারতের উত্তম সৌমান্য আরে আরে গিয়া ঠিকিয়াছিল। ভারতের নরনারীকে সেইসকল দেশের দুর্গম্ভয় এবং স্বাধীনতা রক্ষার পণ্টন পাঠাইতে হইত। আবার জীবিত-সাগরে ঘোপপুত্রও ভারতীয় রাষ্ট্রে বস্তুতা স্বীকার করিয়াছিল। এইসকল স্বীপ দেশে বক্ষণাবেক্ষণের চক্ষু ভারতের নারীকুল নিজ নিজ সম্মান পাঠাইতে জানিত। * * * খৃষ্টীয় নবম শতকে মুসলমানেরা ভারতের সৌমান্য আশিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দু জাতি তাহাদের সংক্রামিত তিনশ বৎসর ধরিয়৷ সম্মুখ লড়াইয়ে ধস্তাধস্ত করে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মর্জ্জা প্রতীকারেরা রণে ভঙ্গ দেয় নাই। বাংলায় সেন বংশ ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পরাজয় স্বীকার করে নাই। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাভারতের ঘাঘব এবং চোল রাজারা কাণ্ড হন। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ১১৩৯ সাল পর্যন্ত পটুট ছিল। আর আড়াই তিন শতাব্দী ধরিয়৷ যে জাতি বিদেশী আক্রমণ কপিতে পারে, তাহার যোগ এবং স্বদেশ-সেবা-মধ্যঃ সন্দেহ করা একমাত্র ইতিহাসে অনাভিঃ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। * * * যে আড়াই তিনশ বৎসর হিন্দু নরনারী বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল সেই সময়ে এইসকল শত্রুই ইয়োরোপের নানা দেশে ইয়োরোপীয়ানদিগকে গোলাম করিয়া রাখে নাই কি ? * * * দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দুজাতির সামরিক শক্তি-যোগ অস্ত্র কোনো জাতির হুলনার খাটে নয়। লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়া হিন্দু নরনারী মন্বনীয় বিবেচনা করিত না। লড়াই না করাই পাপ, এটী ছিল হিন্দু সমরযোগের প্রাথমিক ত্রিষ্টি। এই কথাটাই আলেকজান্ডার হিন্দু দার্শনিকের মুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন।”*

অতাত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে মেসো-পোটামিয়ায় এবং ফরাসী রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকের অদ্ভুত সমর-কুশলতার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর “The people of plains do not know what it is to put up an organised armed fight” অর্থাৎ ‘কিভাবে সংঘবদ্ধভাবে মশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা সমস্তলভূমির লোক জানে না’। এই বাক্যের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

* “হিন্দু রাজ্যের সমর-বিতাগ,”—শ্রী। বনরুখার সরকার।

তা’র পর, হিংসা করিব না বলিলেই অহিংস হওয়া যায় না। যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কাষমনো-বাক্যে ত্যাগ করার নামই প্রকৃত ত্যাগ ; নতুবা কাষিক ত্যাগ করিয়া মানসিক ত্যাগ না করিলে কপটাচার হয়, যথ —

“কর্পেঞ্জিয়ানি সংযমা ব আল্পে মনসা শ্রয়ন।

ইল্ল্যার্থান্ বিমুচ্যাম্মা মিধ্যাচারঃ স ইচাতে।”

শ্লোকঃ, ৩য় অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি কর্পেঞ্জিয়ানকে সংযত করিয়া মনে-মনে ইঞ্জিয়-বিষয়সকল শ্রয়ণ করিয়া থাকে, সেই বিমুচ্যাকে কপটাচার বলা যায়।’

সুতরাং শরীর দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন না করিয়া মন বা বুদ্ধির দ্বারা কাহারও অনিষ্ট চেষ্টাকেও হিংসা নামে অভিহিত করা খাইতে পারে, বরং শরীর দ্বারা হিংসা করা অপেক্ষা শেযোক্ত-প্রকারের হিংসা অধিকতর নিন্দনীয়, কারণ উভাতে হিংসা ও মিথ্যাচার উভয়ই অজুষ্টিত হয়। এই হিসাবে মহাত্মা গান্ধীও কতখানি অহিংসপরায়ণ, সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন—

“It (non-violence) does not mean meek submission to the will of the evil-doer, but it means the putting of one’s whole soul against the will of the tyrant.”

অর্থাৎ ‘অতি দীনভাবে অত্যাচারীর ইচ্ছার বশীভূত হওয়াই অহিংস-নীতির অর্থ নহে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত আত্মশক্তির নিয়োগের নামই অহিংসত্ব।’

শারীরিক প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে আত্মশক্তির প্রয়োগকেও ‘স্বল্পভাবে হিংসা’ বলিলে আশা করি, অজ্ঞায় হইবে না। যেহেতু শরীরের ত্রায় মন এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াক্ষম, তবে শরীরের কার্য স্থল এবং মন ও বুদ্ধির কার্য স্থল এইমাত্র প্রভেদ। অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া যদি ভারত স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ইংরেজের সমূহ ক্ষতি হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজস্ব, শুল্ক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়া তাহার ভয়ানক অল্পকষ্ট উপস্থিত হইবে; হস্ত বহু লোক অন্নাত্যয়ে প্রাণত্যাগও করিবে। মহাত্মার ‘অহিংস-অসহযোগ-নীতি (Non-

* “The Doctrine of the Sword”—Young India. 11-8-20. M. K. G.

violent Non-Co-operation Policy) কি তাহা হইলে ইংরেজের সর্বনাশের হেতু হইল না? অতএব তাহাকে অহিংসা নীতি কিরূপে বলিব? বেয়োনেটের (bayonet) খোঁচায় হত্যা না করিয়া খাইতে না দিয়া পেটে মারিয়া হত্যা করাকে যদি হিংসা-বৃত্তি বলিলে দোষাবহ না হয়, তবে মহাত্মা গান্ধীর তথাকথিত অহিংসা নীতিও সর্বতোভাবে হিংসাপূর্ণ—এই কথা বলিলে আশা করি, পাঠকবর্গ কিছু মনে করিবেন না। মহাত্মাজীর নীতি লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে বেশ, কিন্তু সাধারণ কার্যক্ষেত্রে উহার প্রচলন অসম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অর্জুন যখন অহিংসা পরামর্শ হইবার প্রয়াসী, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “কার্ষাতে জ্বষণঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিঐক্যং তৈঃ” অর্থাৎ ‘রাগঘোষাদি স্বাভাবিক গুণসমূহ সকলকেই অবশ্য করিয়া কৰ্ম্ম করাইয়া থাকে।’ উহার প্রমাণ বর্তমান সময়েও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মাজী ভারতের সর্বত্র অহিংসা নীতি প্রচার করিতেছেন, তাঁহার উপস্থিতকালেই হিন্দু মুসলমান, হিন্দু-পার্শী পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতেছে; তাহাদের স্বভাবই তাহাদিগকে অবশ্য করিয়া ঐরূপ হিংসাদি কার্য করাইতেছে। তবে কি মানব-সাধারণকে হিংসাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে? তাহা কেন? ঐ হিংসাদি চেষ্টা পরস্পরের মধ্যে হানাহানি না করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্ত কোনো মহত্তর কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে। কার্য দুইপ্রকার—নিবৃত্তিমূলক ও প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিমূলক কার্যে জোর করিয়া সকলকেই

নিবৃত্ত করা যায় না; সুতরাং প্রবৃত্তিমূলক কৰ্ম্মের ভিতর দিয়া ধীরে-ধীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তি-মার্গে আনয়ন করাই ভারতীয় শাস্ত্রের বিশেষত্ব। অবশ্য, ষাঁহারা মহাত্মাজীর জায় নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া একেবারে অহিংস হইতে পারেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সর্বদেশে সর্বকালে অতি মুষ্টিমেয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদ সংক্ষেপে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে বুঝিয়াছি, ক্ষাত্রধর্ম্ম জাতির মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা কোনোরূপেই সম্ভব নহে। সম্বৎসর-প্রধান ব্রাহ্মণ, রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজ ও তম মিশ্রিত বৈশ্য, এবং তমোগুণ-প্রধান শূদ্র, এই চারি বিভাগকেই সম্বন্ধে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া কোনো জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া গেলে সেই জাতি একদিন পরিপূর্ণ অথবা জাতিতে পরিণত হইবে; তন্মধ্যে কোনো-একটি ভাবে বর্জন করিলে সেই জাতির অজহানি ও অসম্পূর্ণতা অবশ্যস্তাণী। পুরাকালে হিন্দুদার্শনিকগণ ক্ষাত্রভাব জাতির অতরে জাগাইয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—

“ষাঁহারা হিন্দুচিন্তের সমরপিপাসা এবং হিংসাযোগ-বিষয়ক বাস্তব তথ্যের দিকে জ্ঞানপূর্ণ না করিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার বিপ্লবণ করিতে বসেন, তাঁহার হিন্দুদর্শনের আলোচনায় অনধিকারী বিবেচিত হইবেন। অস্ততঃপক্ষে তাঁহাদের প্রচারিত হিন্দুদর্শন একদেশদর্শী; আংশিক এবং ভ্রমাত্মক থাকিতে বাধ্য।”

গল্প

শ্রী সজনীকান্ত দাস

পর পর পাঁচটি মেস ও হোটেলের রান্নাঘরের দরজায় কিম্বা ম্যানেজারের নোটিশবোর্ডে মাথা ঠুকিয়া শেষে নিজে আলাদা একটা বাড়ী নেওয়াই ঠিক করিলাম। দৈনিক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা রূপে মাসিক ৭০।৭৫ টাকা মাত্র আয় করিতাম বটে, কিন্তু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার যে সুবিধা তাহা পূরাপুরি ভোগ করিতেছিলাম। পোষা বলিতে আমার কেহ ছিল না। বাবা গবর্ণমেন্টের দৌলতে বেশ ছ'পয়সা আয় করিতেন; তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করার কথা মনেও হইত না। দুই বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছি কিন্তু পড়াটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো বৎসরের কিছু কাল কলিকাতায় বাগবাজারস্থিত তাহার পিতৃগৃহে এবং কিছুকাল আমার পিতৃগৃহে দোল খাইয়া ফিবিতেছিল। তাহাকে পড়াহিসাবে প্রাপ্য কিছু দিতে কেমন খেন লজ্জা করিত। সুতরাং যাহা আয় করিতাম তাহা ব্যয় করিবার অধিকারও মনে মনে অর্জন করাতে ৩০ টাকা দিয়া বাড়ী ভাড়া নিতে কিছুমাত্র-বিধা করিলাম না। একটি চাকর রাখলাম সে একাধারে আমার চাকর, ঠাকুর ও মুক্দি ছিল। মোটের উপর সেই সামান্য টাকায় ঘরভাড়া এবং গোবিন্দের মাছিনা দিয়াও ছুজনের খাইবার উপযুক্ত টাকা থাকিত এবং উষ্ণতা টাকা দিয়া বন্ধুদের চা ও সিগারেট সরবরাহ করিত কৃষ্টি হইতাম না।

আমারই একটি বন্ধু তাহাদের বাড়ীর নীচের তলাটা আমাকে ভাড়া দিয়াছিল। বাড়ীটা একটা নোংরা পল্লীর মধ্যে হইলেও আমার তেমন কিছু অসুবিধা হইত না। সকাল ন'টার সময় ভাত খাইয়া বাহির হইয়া যাইতাম এবং পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় প্রায়ই বাড়ী ফিরিতাম; মাসের মধ্যে ত্রিশদিনই প্রায় সে সময় এক বা একাধিক বন্ধু আমার সঙ্গে জুটিত। চা ও চুরুটে রাত্রি আটটা পর্যন্ত হালোড় করিয়া কাটাইয়া দিতাম। তারপর গোবিন্দের কপায় বাহা জুটত তাহা ভূপ্তির সঙ্গে আহার করিয়া ইঞ্জি-

চেয়াটা প্যাসেজে (passage) রাখিয়া তাহাতে চিং হইয়া পড়িয়া সামনে একটা মোড়ায় পা তুলিয়া দিতাম আর চুরুট টানিতে থাকিতাম। মাঝে মাঝে আমার কাংশু বিনিমিত-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের পৌ ধরিতেও ছাড়িতাম না। বস্তুতঃ এই নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী আর শেলার 'Complete Works' আমার সঙ্গী ছিল। আমি চেয়ারের পিছনে লঠন রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে কখনও বা মেঘদূত পড়িতাম; কখনও বা মগোল্লাসে 'বর্ষশেষ' আবৃত্ত করিতাম এবং ইংরেজীতেও আমি কয়েকখানি গর্ক ছিল বলিয়া নিব্বন নিশীথ রাত্রে শেলার 'Spirit of Solitude' কিম্বা 'Hymn to Intellectual Beauty' পাঠ করিতাম। আমার ওই বাড়ীওয়ালার বন্ধু যতীন প্রায়ই ওই সময়টা আমার কাছে বাসিয়া একটু সঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কাব্য পাঠের অবকাশে আমাদের সংসারের অনিত্যতা ও বিবাহিত জীবনের নিদারুণ বন্ধন-সম্বন্ধে আলোচনা চলিত।

যখন বাড়ীভাড়া লইলাম তখন সরমা (আমার স্ত্রী) হাজারীবাগে তাহার দাদা-মহাশয়ের কাছে থাকিত সুতরাং রাত্রিতে প্রত্যহই গৃহবাস করিতে হইত। মেসে অবস্থানকালে আমার স্ত্রী কলিকাতায় থাকিলে আমি নামমাত্র 'মেসের বাবু' থাকিতাম; খাওয়া ও শোওয়া প্রায়ই স্বস্তর গৃহ করিতে হইত। কিন্তু এখন গোবিন্দের দৌলতে স্ত্রীর অবস্ঠমানেই home comforts পাইতে-ছিলাম বলিয়া চায়ে দোকান, বায়োস্কোপ বা গড়ের মাঠে কিম্বা কোথায়ও পরনিম্মা বা কুৎসা করিয়া সময় কাটাইতে হইত না। অবশ্য বাড়ীতে থাকার অসুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা নয়; রাত্রি দুই প্রহরে সামনের খোলা-বাড়ীগুলির কোনোটার মাতালের চাঁৎকারে কিম্বা

উৎপীড়িতা কোনো নারীর আর্ন্তকন্ডনে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে যে-সব কদম্ব গালাগালি ও আলোচনা শুনিতে হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার বাসনা হইয়াছে তবু মোটের উপর শাস্তিতে ছিলাম বলিয়া অন্ত চেষ্টা করি নাই। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কচি ছেলে-মেয়ের কাঁচুনি কিম্বা পাশের হরিহর-বাবুর জ্বর সহিত নিত্য কলহ আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল।

আমি ওপাড়ায় বাসা নেওয়ার পরদিন হইতে সেখানে বেশ একটু সোরগোল পড়িয়াছিল। প্রথম যেদিন বাড়ীতে উঠিরা আসিলাম আমার সঙ্গে আসুবাব বিশেষতঃ দুই গাড়া বই অনেকেই বেশ উৎসুক হইয়া দেখিয়াছিল দেখিয়াছি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতাম আমার নিজস্ব পেটেন্ট-সুরে চৈচাইয়া গান গাহিয়া, কবিতা আওড়াইয়া পাড়া সরগরম করিয়া রাখিতাম। বিশেষতঃ বৈকালে অফিস ফেরত যখন ইঞ্জিচেমারটা সামূ-র গলিতে পাতিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতাম আর কুড়ি পাঁচশ মিনিট অন্তর হাঁকিতাম, 'গোবিন্দ চা' তখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এক ভিন্ন রাত্তোর জীব বলিয়া কল্পনা করিত। তাছাড়া আমার বাড়ীতে যে-পরিমাণ বন্ধু সমাগত হইয়া যে-পরিমাণ চা ও সিগারেট ধ্বংস করিত ও যে পরিমাণ চৌৎকার করিত তাহাতে পাড়ার অন্তরালবর্তিনীদের প্রাত্যাহিক কৰ্মবন্ধনের অবকাশে দেখিবার বা শুনিবার বিষয়াভাব ঘটিত না। বিশেষতঃ যেদিন হৃদয়দা' আসিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত তাঁহার হাসি গল্প ৬ গানে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেন সেদিন এই ভয় লইয়া শুইতে যাইতাম যে পরদিন প্রাতেই যতীনের বাবা বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ দিবেন।

এমনি কারণে দিন মন্দ কাটিতেছিল না। যে দিন নূতন কোনো কবিতা বা গল্প লিখিতাম, বন্ধুরা দল বাধিয়া শুনিতে আসিত, আমি মনে মনে লেখক-অন স্থলভ-গর্ভ অহুভব করিয়া বেশ শাস্ত নির্ঝিকার ভাব দেখাইয়া বসিয়া থাকিতাম; চা জোগাইতে-জোগাইতে গোবিন্দের প্রাণান্ত হইত।

ইতিমধ্যে একদিন যতীনের জী বাপের বাড়ী হইতে যন্ত্রবাড়ী আসিল। যতীনের একটি মেয়ে লিলি, চমৎ-

কার ফুট ফুটে পুতুলের মতন মেয়েটি। আধো-আধো কথা ফুটিয়াছে,—'না' আর 'আবার' কথা দুইটি বিরক্তির সময় এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করিত যে মনে হইত সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথই বা হুকুম করিতেছেন। লিলির বয়স দেড় কি দুই বৎসর। প্রথম ক'দিন লিলি আমার পারিপাট্যহীন বিশাল বপু ও গৌফ দেখিয়া ভয়ে কাছে ঘেঁসিল না, কিন্তু কখন যে ভয়ের ও সঙ্কোচের বাধন কাটিয়া গিয়া মেয়েটি একেবারে আমাকে আত্মসমর্পণ করিল লক্ষ্য করি নাই। একদিন হঠাৎ দেখিলাম লিলি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি সে আমার কাছে কাছে 'কাকা কাকা' করিয়া ফিরি ৩ আর আমার অবর্ত-মানে কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ীত্ব সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিত। যতীন আমার কাজের ক্ষাত হইতেছে দেখিয়া সত্য সত্যই বড় লজ্জিত হইত। যতীনের জ্বরও লজ্জার অন্ত ছিল না। সে লিলিকে কিছুতেই আমার কাছে আসিতে দিতে চাহিত না—তাহাকে মারিয়া ধরিয়া একা-কার করিত।

যতীনের বাড়ীতে যতীনের বাবা, মা, বড় দাদা ও তাঁহার জী ও তাঁদের একটি ছেলে, যতীনের একটি ছোট ভাই, যতীনের জী, লিলি আর যতীন এই ক'জন মাত্র লোক। লিলি যতদিন ছিল না আমি বাহিরেরই লোক ছিলাম, বাহিরে বাহিরে ফিরিতাম, যতীনের বাড়ীর ভিতরের সন্ধান কিছুই পাই নাই। বরঞ্চ হরিহর-বাবুর বাড়ী আমার খাওয়ার ঘরের ঠিক সামূ-টিতে থাকিতে তাঁদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে অনেক বেশী পরিচিত ছিলাম। যতীনের বাড়ীর সঙ্গে গোবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী ছিল—কাজে অকাজে বাড়ীর ভিতর তা'র ডাক পড়িত। কিন্তু লিলি তার অকারণ সৌজন্য আর ঘনিষ্ঠতা দিয়া তাহাদের বাড়ীর সহিত আমার দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া দিতে লাগিল।

আমি খুব ভোরে উঠিতাম। ভোরে উঠিয়াই অভ্যাস-মত গান ধরিতাম। লিলি আমার সাড়া পাইয়া নাচে আসিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিত; আমাকে দেখিতে পাইয়া দোতালার বাঁকান্নার রেলিং ধরিয়া নাচে কুঁকিয়া দেখিত আর ঘন-ঘন ডাকিত 'কাকা'। উপরে মুখ তুলিয়া চাহিতে

দেখিতে পাইতাম লিলির জ্যাঠাইমা রেলিঙের ধার হইতে লিলিকে সরাইবার অন্ত তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। আমাকে দেখামাত্র অন্তরালে সরিয়া যাউতেন; অথচ লিলিকে বলিতেন ‘কই কাকা’—। লিলি আর তার কাকার-পরিচয়ের মধ্যে এই জ্যাঠাইমাটির কিছু হাত ছিল। মাঝে-মাঝে কদাচিৎ শুনিতে পাইতাম ভুলাইয়া ভুলাইয়া লিলিকে জামা পরাইবার বা ছুধ লাগাইবার সময় জ্যাঠাইমা তাহাকে তাহার কাকার সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক কথা বলিতেছেন।

লিলিকে পাইয়া আমি বাহিরের বন্ধুবান্ধব একে একে প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অফিস আর বাড়ী এ-ছাড়া অন্তর বাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতাম না—রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেও নয় কারণ সে কাণ্ডটা ঘরে বসিয়াই শৃঙ্খলার সহিত করা যাইত। এর বাহিরে মনের যতটুকু খোরাক দরকার হইত পত্নীর ঘনঘন চিঠিতে তাহার পূরণ হইত। মোটের উপর আমার যতন নামজাদা বোধেমিয়ান্ একজন ধীরে ধীরে domesticated হইয়া পড়িতেছিল।

বাহিরে যাইতাম না বলিয়া আমার বাড়ীতেই আজ্ঞা জমিতে লাগিল কারণ আমাকে বাদ দিলে নাকি বন্ধুদের আসরটা তেমন জমিত না। আমি সমানে চা এবং সিগারেট সাপ্লাই করিতাম এবং বাদলার দিন হইলেই খিচুণী ও ভিমভাজা অর্ডার করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতাম না।

পেয়ালার ঠনঠন যত ক্ষততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক ৭০-৭৫ টাকা কোথায় কুকিয়া গিয়া দেবার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল এবং একদিন নিত্যকাল অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মুখিক হইতে হইবে, যেস ভিন্ন পত্যন্তর নাই। স্বত্তরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ী এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগ্‌বাজারে তাহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া

যতীন্দকে নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্তর চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

দেখিলাম, বাড়ীর সামূহ্য আবার বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপন কোলানো হইল; পাড়ায় আবার একটা গোল পড়িল। লোকে পথ চলিতে চলিতে একবার করিয়া নোটিশ পড়িয়া জিজ্ঞাসনেন্দ্রে আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়—আমার চিত্ত ব্যথিত হইতে থাকে। এই যে পাঁচ মাস এখানে হাসি-গান-গল্প দিয়া পাড়াটিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজিকার বিদায় দিনে কোথাও কি এতটুকু ব্যথা থাকিবে না? দম্কা হাওয়ার মতো যে আসিয়া-ছিলাম কোনো চিহ্নই কি রাখিয়া যাইব না? লিলির কথা বড় বেদনার সঙ্গে বুকে থাকিতে লাগিল। কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, অভ্যন্তর সময়ে ‘কাকা’ বলিয়া সে থাকিবে কিন্তু কাকাকে না পাইলে সে কি দিনের হাসি খেলা তুলিয়া থাকিবে? আরো কোথাও এতটুকু কাঁটা কি নাই?

আমি জোর গলায় পাড়া শুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া গোবিন্দকে বলিলাম, ‘কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব—তুমি আজই জিনিষপত্র লইয়া যেখানে চাকরি পাইয়াছ সেখানে যাও।’ লিলি কাছে আসিল। তাহাকে বলিলাম—‘আমি চলিয়া যাইতেছি—বলিয়াই চকিতে যেন কি দেখিবার প্রত্যাশায় দূরের বারান্দার পানে চাহিলাম; শুধু সদ্য-মেসো একটা ভিছাকাপড়ের উপর বসিয়া একটা কাক ‘কা কা’ করিতেছে দেখিলাম।

সেদিন স্নানের সময় কান পাতিয়া শুনিলাম জেঠীমার সহিত লিলির কথা হইতেছে। জেঠীমা বলিতেছেন, ‘লিলি, তোর কাকা যে চলিল।’ লিলি বলিল, ‘আবার!’ অর্থাৎ যাও অমন মিথ্যা কথা বলিও না। জেঠীমা বলিলেন, ‘কাকাকে বল, কাকা যেও না।’ লিলি আঙ্গুণ্ড ভাবেই বলিল, ‘বল কাকা যেও না।’

চরিতার্থ হইলাম। কে বলিল বন্ধন নাই? কোথায় কোন্ অজানা যুক্তিকায় যে মানুষ পরিচয়ের শিকড় চালায়, কোন্ অদৃশ্য আকাশ হইতে প্রেমের বানী পরিচয়ের বানী সে শুনিতে পায়, কে বলিবে? চারিদিকে যখন উত্তর মক দেখিয়া ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেছিলাম

তখন এই অনির্দিষ্ট স্থানে কে শীতল সরণী রচনা করিল ?

শেষবারটির মত ই.জ.চেন্নারটি পাতিয়া চূকটের টিন লইয়া বাসিলাম। কত কথাই একে-একে মনে আন্সিতে লাগিল ! এই যে শৈবালের মতন ভাসিতে-ভাসিতে এই জল ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বস্ত্রার স্রোতে আপনার সমস্ত পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অল্প কোথায়ও ভাসিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাই কি হইবে ? মানুষ এমনি করিয়া কি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে ? পরিচয়ের অসংখ্য বীজ নিবস্তুর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হাসি আনন্দে ও বেদনায়, সামান্য ছটিকণা কিম্বা কণিকের একটি চাউনি কখন কোথায় জীবন পাইয়া কেমন করি ? অক্ষুরিত, পল্লবিঃ ও ফ-ফুলশোভিত হইতেছে, মাতৃষের সাধারণ স্তায়শাস্ত্রে ত এ প্রব্লেম সমাধান নাই। এই বাড়ী ঘর-ছুদার সবই ত যেমন ছিল তেমনি থাকিবে ;—একবার চূণ ফিরাইয়া লইলেই হয়ত পরিচয়ের কালিমাটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু সহরের একপ্রান্তে এই যে এখানে কণিকের খেলাঘর রচনা করিয়াছিলাম তাহা কি একেলা আমারই জিনিষ ? তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আজ যে চলিয়া যাইতেছি, সে ভাঙনের ব্যথা কি শুধু আমাকেই লাগিবে ? আমার প্রাণ এই কণিকেব খেলাঘরের স্মৃতি লইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে—তাহার সাথে আর কোনো উত্তপ্ত শ্বাস কি মিলিত হইবে না ?

চূকটের ধোয়ার কুণ্ডলী পাক খাইতে খাইতে শূন্য মিলাইতে লাগিল ; আমি নির্লিপ্ত বৈবাগীর মতন তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার মাথায় কল্পনার প্রবাহও অমনি পাক খাইতে লাগিল। আমি ভুলিয়া গেলাম, কাল আমাকে খাইতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম আমি শ্রী যমুচন্দ্র অমুক, খবরের কাগজের অফিসে রিপোর্টার। যুগে যুগে যে সকল বিরহী দেবতাও শাপে ব্যাধিত নিশ্বাস ফেলিয়াছে। আমি ত তাহাদেরই একজন—তাহাদের সঞ্চিত অশ্রুভার যে আমারই বুকে আসিয়া জমিয়াছে।

রোজ যেমন যায় ; একটি ছুটি করিয়া তেমনি লোক সামনের গলিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা

হইয়া আসিল,—আজ গোবিন্দ নাই। আলো জ্বলা হইল না ;—চায়ের আওয়াজ আর শুনা গেল না। বন্ধুরা আজ কেহ আসিল না। পথিকেরা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আলোটি জ্বালা হইল না দেখিয়া কি ভাবিল জানি না ; আমার মন বলিতে লাগিল—এ ঠিক হইতেছে না। আলোটি জ্বালাইয়া ঠিক জায়গাটিতে রাখিলাম, তার পর আবার ধোয়ার খেলা আর মনের খেলা চলিতে লাগিল।

কত অপূর্ণ কামনা, কত হতাশাস, কত স্তম্ভিত বেদনা আমার মনে জমাট বাধিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, আবার ধোয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।—

* * ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—আকাশ বাতাস চারিদিক ধমধম করিতেছে। মনে হইতেছে এখনই যেন বিশ্বপ্রকৃতি ফাটিয়া পড়িয়া বহু বিদ্যুৎ আর জলধারে ধংসাত্মক প্রাবিত করিবে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এই দুর্ঘোমে আমি একমাত্র পথিক, গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। কুটীরে-কুটীরে দ্বার বন্ধ হইয়াছে ; মনে হইল এ যেন আমার অভিসার। ‘ঘোর তবধ সব তিমির মগন ভব’—আমি একেলা অজানার অভিসাবে চলিয়াছি।

কেমন করিয়া জানি-আশ্রয় পাইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দেখিলাম, আসন্ন দুর্ঘোমে আলোকায় সব ঘরের বাতায়ন বন্ধ। জনসকল নগবীর উপর যেন জনশূন্য মকর প্রেতাঙ্গী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।

চিন্তের মতো তাহাকে দেখিলাম—আলুনাথিতকুল্লা নিকষকক্ষঃমঘের পানে স্থিব দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছেন—বিশ্বপ্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় তাহার ক্ষুদ্রমনে কি কামনা ঘনাইতেছিল জানি না। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল। সরমকুণ্ডিত নয়নে পলাইতে গিয়া লজ্জিত হইয়া মুহূর্তকাল হঠাৎ জস্ত হিংসীর মত ধমকিয়া দাড়াইল ; সন্ধ্যার ছুই একটি কেশভঙ্ক তাহার চক্ষু উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ; অক্ষয়প্রাস্তস্থিত চাবির গোছা একটিবার মাত্র বন্ধার দিয়া উঠিল, তারপর জ্বত

অন্তরালে চলিয়া গেল। তাহার পিঠভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া একটি কালো জ্যোত্বকের মতো নৃত্য করিতে করিতে অয়্যহিত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, তবু মনে হইল আমারই কাণে চাক চকণ দুটি লঙ্কিত, মৃগল বাহু দুটি কুণ্ডিত, নয়ন দুটি ত্রস্ত অর হ্রস্বটি যেন ফুলের ভিত্তরকার লুপনো মধুটুকু মতো মধু— শিশিরটুকুর মতন করণ।

ভাবিলাম অভিনায় সার্থক হইয়াছে, প্রার্থিতের দর্শন পাইয়াছি।

দুর্যোগ কাটিয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হইল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিলাম না। দিনের পরে দিনের ব্যর্থ আশায় ধীরে ধীরে তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, এবং আগর দিবসের কর্মপ্রাণির অ-কাশে অপরিচিতা প্রেমণীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

এমনি করিয়া দিন যায়, বাড়ীর আনাচে-কানাচে romance এর গন্ধ সন্ধানি ফিরি; কল্পিত নায়িকাকে কখনো পেছনের বাড়ীর ছাদে দেখিতে পাই, কখনো সামনের বাড়ীর জানলায় চকিতে তাহার আভাস পাই; কিন্তু এই ধোঁয়াট পিচিষ ছাড়া তাহার আর কোনো নিরেট পিচিষ জোটে না।

প্রথম কিছুদিন হরিহর-বাবুর মেয়েকে লইয়া কব্যা শুরু করিলাম। তাহার ঘুম হইতে জাগরণ, ছেলে ঠেকান, স্বপ্ন, চুল ঝাঁচড়ান, বাঁহেরে যাক্যার পোষাক পরা, রিক্সা করিয়া বাঁহেরে যাক্যার, বৈকালিক ছাদ-বিহার, কালোয়াতী গান ও মার সহিত ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকদিন মৌল খাইয়া ফিরিলাম; ভাবিলাম এই ত মিলিয়াছে, এই আমার নায়িকা! ইহাকে লইয়াই ত আমার কাব্য—! কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিগড়াইয়া যাইত—সে তাহার মায়ে বা বাবার সহিত ঝগড়া করিবার সময় বা ছেলেকে মারিবার সময় যে কথাগুলি ব্যবহার করিত তা মোটেই নায়িকাদের মুখে শোভা পায় না। বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন কেহ দরজায় ঘা দিত তখন সে যেভাবে “কে গা!” বলিয়া হাঁক দিয়া উঠিত তাহাতে আমার নায়কের মন অতিশয় পীড়িত হইত। অবশেষে একদিন এই মেয়েটির স্বামী আসিল এবং আমি

অবশেষে তাহাকে নায়িকার আসন হইতে বরখাস্ত করিলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম, হায়রে আজ এতকাল কলিকাতার পথে-পথে কাকের অত্যাচার আর মোটোর কাদা সর্ব্বত্র মাগিয়া ফিিয়াছি কিন্তু কই চোখেও সম্মনে একটি গাড়ীও ত উল্টাইল না—বিনয়ের মতো যে কোনো সন্ধ্যা বৃদ্ধকে ছুদও ঘরে বসাইয়া চিরস্থায়ী আলাপের ব্যবস্থা করিব সে সন্ধ্যোগও ত মিলিল না। স্মৃতিভিত্তি ললিতা না হয় নাই জুটিল নিদেন পক্ষে একটা সাবিয়া কি একটা চন্দ্রমুগীট। ক ভগবান জুগাইয়া দিতে পারিলেন না?

এমনি করিয়া অনিশ্চিত পিছনে আমার মন যখন কাঁদিয়া ফিিতেছে তখন কে জানিত আমার শক্তি বিরহিনী আমারই অতি নিকটে তাহার হ্রস্ব মেলধা বসিয়া আছে; আমি তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ পাইয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করি নাই। আমি যখন বাঁহেরে ছুটিবার জন্ত বাস্তু তখন কে জানিত একটি বাগ্ন হ্রস্ব আমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে আঁহাই ঘরে পথ চাহিয়া আছে। সেই দুর্যোগদিনে যাহাকে চকিতের মতো দেখিয়াছি আমার সেই ‘অধরা স্বপ্ন’ যে আমাকে লইয়াই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল তাহা ত ভাবিতে পারি নাই। আমি বলনায় অনেক শৈবলিনী ও আশ্রমের স্বপ্ন হয় ত দেখিয়াছি কিন্তু বাস্তব জীবনে এই রূপদসগীত লোকটিকে যে কাহারও প্রয়োজন ঘটিতে পারে তাহা ত পরিপূর্ণ ভ্যেৎস্নামোদিত শারদীয় নিশীথের মুহূর্ত্তের জন্ত স্বপ্নও ভাবিতে পারি নাই। তাই আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম, প্রাণেও দেহেও নেওয়া ব্যাপারে মানুষ গণিত বা ন্যায়ের পথ ধরিয়া ত চলে না; অসম্ভবের পথেই তাহার অভিবান, ভুলের মধ্যেই তার লীলা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় Tragedy য়ুলে এই অঘটন স ঘটন।

যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন নায়িকা মিলনের কথা ভাবিয়া রমাগুহ হইয়াছি কিন্তু অনিশ্চয় যখন নিশ্চয়তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমার কর্মত্যা বিরহিনী যখন অতি নিকটে চকিত চাহিনী বা চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার আভাস দিতে লাগিল তখন ভয়ে বিশ্বয়ে চমকিয়া উঠিলাম—ভাবিলাম এ কী হইল। এমন ত কথা ছিল না।

বেশ অলসভাবে চলিতেছিলাম হঠাৎ বাধা পাইলাম। দিনের পর দিন যখন ইঞ্জিচেগাবে বসিয়া বাহিরে ও ভিতরে ধোয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়াছি কে জানিত একটি শাক্ত চিত্র আঁক মনোযোগের সহিত আমার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছে; যখন গান ধরিয়াছি কে জানিত আমার সেই অসুর-সুরে একটি 'চঞ্চল' হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছে। সন্ধ্যা হাওয়ায় আমার উতলা ঘরের কোণে বসিয়া যখন হতাশাস হ্রদয়ে বাতায়ন-পথে দূর-দিগন্তে প্রেমসীর সন্ধান করিয়াছি তখন কে জানিত আমার অতি নিকটে তাহারই চাক চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজিয়াছে। যখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছি—

—মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
তুলাইছ বারে বারে—
বন্ধ ছুয়ার খুঁচি আমার,
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।

ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যায় মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে
কতু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে
তুলাইছ বারে বারে—

হে আমার সেই অজানা প্রেমসী কোথায় তুমি?
তোমার বিরহে নিরবধি শূন্যতার সীমান্তভারে আমার
সমস্ত ছুবন মরুসম রুদ্র হইয়া গেছে; যখন আমার
গোপন অভিসারিকার উদ্দেশ্যে পাঠ করিয়াছি—

'হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে আছি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌন বীণা ধোয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ
তারায় তারায় খোঁজে তুমায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।'

তখন তাহারই চঞ্চল অঞ্চলের মদির স্নিগ্ধ হাওয়া
আমায় স্পর্শ করিয়া বলিয়াছে 'ওগো অন্ধ! প্রেমসী

তোমার এত নিকটে উন্মূখ প্রতীক্ষায় অধীর, আর তুমি
কোথায় ব্যর্থ হাহাকার করিয়া ফিরিতেছ?' তখন কে
সেই মুক ঙ্গিত বুঝাচ্ছে! সরমার চিঠি যখন আসত
আমি কি জানিতাম যে আর একটি প্রাণী অকস্মালে
ধাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিল; এবং চিঠির প্রত্যেকটি
অক্ষর আমার মুখে যে—ছায়াপাত করিত তাহা আর কাহারও
হৃদয়কেও মথিত করিল! যখন কোনোদিন কোনো কারণে
ব্যথিত চিত্তে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম একটি স্নেহকর-
স্পর্শ দূর হইতে যে আমার কপাল ছুঁইয়া যাইত তাহা
কি কখনো বুঝিয়াছি। গোবিন্দ কোনোদিন হৃদয় রান্না
করিয়া আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে;
জানিতাম না যে একজন ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে
আর মনে মনে বলিতেছে—'ওগো খাও, তোমার ভাত যে
সুকাইয়া চাল হইয়া আসিল'। দৃতক্ষণ আমি না খাইতাম
সেই কিছু মুখে দিত না। রাত্রিতে আলোটি জ্বালাইয়া
লইয়া যেদিন কিছু লিখিতে বসিতাম এবং ভাবের
অভাবে ও মিলের অমিলে কুঞ্চিত ললাটে চূপ করিয়া
অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম তখন যে
একটি নারী-হৃদয় বাণীর ছুঁয়ায় কাতর প্রার্থনা করিতে
থাকিত তাহাও ত এতদিন বুঝি নাই;—যখন বুঝলাম
তখন শঙ্কা ও সঙ্কোচে ব্যথিত হইলাম।

প্রথম প্রথম কিছুটা বুঝিতে পারি নাই হঠাৎ চমক
ভঙিল সেদিন, যেদিন দেখিলাম আমার bachelor's den
এ কোনোদিক দিয়া শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আমার ঘরে
অনভ্যস্ত পারিপাট্য লক্ষিত হইল। প্রথমে মনে হইল
গোবিন্দ কি সহসা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া
উঠিল। অফিস যাইবার সময় প্রত্যাহ গোবিন্দের কাছে
চাবি রাখিয়া যাইতাম—সে ঘর কাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু
এতকাল ত কই আমার বিছানার উপর বা টেবিলের
সঙ্কিত ধুলির দিকে তার নজর পড়ে নাই;—তা
হইবেও বা মনিব দিন দিন পুরাণো হইতেছে ত। কিন্তু
ক্রমশঃ সে তুল ভাঙিল,—দেখিলাম ময়লা চাদর পিঁড়ির
হইয়াছে, মশারীর ছিন্ন অংশগুলি তালি সংযুক্ত হইয়াছে,
বইগুলি বাঙলা ইংরেজী ক্রমে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করা
হইয়াছে; চিঠিগুলি letter padএ বা fileএ বণাঙ্কানে

স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দকে কিছাসা করিতে ভরসা হইল না পাছে অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়।

কিন্তু এই চকিত আভাস ইচ্ছিতের মাঝে মাঝে কৌ এক অজানা স্বর আমার মনের আনাচে-কানাচে গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল; বসন্ত হাওয়া কোন্ দিক দিয়া যেন আমার মনে প্রবেশ-পথ পাইয়া ভোলপাড় তুলিয়া দিল। তাহার আভাস আভাসে মাত্র পাই নাছি তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্ত মন ব্যগ্র হইল।

পরিচয় শেষে একদিন ঘটিল—কেমন করিয়া তাহা বলিব না। মেয়েটি কে, তাহাও নাই বলিলাম। তাহার নাম উমা। সে এত নিকটে কিন্তু এতদিন আভাসে ইচ্ছিতেও তার পরিচয় পাই নাই বলিয়া নিজেকে দিকার দিলাম।—বুঝিলাম কত প্রতীক্ষা, কত শক্তি হইয়াছিল রজনী যাপন ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে করিতে হইয়াছে অথচ এত নিকটে থাকিয়াও তাহার প্রতি বিমুগ্ধ ছিলাম। ধীরে ধীরে কখন কেমন করিয়া যেন আমার গৃহটিকে সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং আমার অন্তরে নিরন্তর আমারই কল্যাণ কামনা করিতেছে। অস্বরণে থাকিয়া আমার ঘটকু পরিচয় উমা পাইয়াছে তাহাতেই এই জন্মবিরহিণী সস্তুষ্ট; সে যে এতদিন শুধু তার বাহিতকে দেখার আশায় বার্থ জীবন যাপিতেছিল—এতদিনে কি তাহার প্রিয়তম আমারই মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে উপহাস করিল। তাহার অদৃষ্টদেবতা তাহাকে উপহাস করিল কি না জানি না কিন্তু আমার দেবতা আমার সঙ্গে নিদাক্ষণ পরিহাস করিলেন; মনের কোণে কোণে দখিনা হাওয়া বহিতে শুরু করিলেও জন্ত হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম, এ কী!

উমা তাহার দৈনন্দিন কাজের অবকাশে আমার ঘরটিকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখিত। বিছানা টেবিল ঝাড়িয়া বই গুছাইয়া কিছুতেই যেন তাহার ছুটি হইত না। সে আমার আর সরমার একসঙ্গে-তোলা ফোটোখানি প্রতিদিন নামাইয়া ঝারিয়া রাখিত। আমার কবিতার খাতা আর letter-pad এর দিকে তার লোভ ছিল বেশী; সে কবিতার খাতা হইতে কবি-জনোচিত অজানা প্রেধসীর উদ্দেশে কবিতাগুলি নকল করিয়া লইয়া বিনীত রজনীর খোরাক সংগ্রহ

করিত এবং সরমার চিঠিগুলি এমন লোলুপ আগ্রহে পাঠ করিত যে দুই একদিন তার সময়-সব্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এবং সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

চিরবিরহিণীর বার্থ জীবন এমনি করিয়া রূপে-সে ভরিয়া উঠিতেছিল; তাহার শুধু মরুময় জীবন কখন অলক্ষ্যদেবতার কৃপা-বরিষণে শস্ত্রগ্রামনা হইয়া উঠিল—উমা একদিন সহসা অনুভব করিল যে, জীবন! স্বপ্নের, বাঁচিয়া থাকা ভগবানের অসীম অনুগ্রহ।

বাহিরে আমার আঙ্গুল কোনো বন্ধন নাই, বন্ধুবান্ধব সকলকে ছাড়িয়াছি; আমার বাড়ীর আসরণ আর জমে না। আমি কেমন যেন অন্তমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলাম। পতঙ্গরূপ গুল্মগা যেমন আগে তাহাদের শিকারকে বেশ করিয়া লালাসিক্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে পরিপাক করে আমার এই আবাসভূমি আমাকে তেমনি সিক্ত করিয়া আনিতেছিল—আমি আপনার রচিত জালে আপনিই জড়িত হইয়া পড়িতেছিলাম।

অত্যন্ত ব্যথিত কাতর হৃদয়ে অফিস ঘাটতায় আর তিনট; বাজিবার পর হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্ত মন কেমন করিত, চকল হইয়া উঠিতাম। মাঝে-মাঝে মনে হইত এ কী দ্বিতীয় 'ক্ষুধিত পাষণে'র অভিনয় নাকি? এখানকার বাড়ী পাষণ না হইয়া না হয় চুনকাম করা ইটকই হইল কিন্তু এষে দেখি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার অদৃষ্ট বার্ত্তিনীরা বাদশাজাদী নন—বাজালী ঘরের একটি মাত্র ছুঃখিনী মেয়ে, কিন্তু হৃদয়ের খেলার আকর্ষণ বিকর্ষণে বাদশা-জাদীদের চেয়ে যে কম যান তাহা ত মনে হয় না।

বাড়ীর বাহির হইলেই আমি অহরহ কানের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইতাম, বুকের কাছে কার যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিতাম। কে যেন অতি কাতর করণ স্বরে নিরন্তর বলিতে থাকিত, "ওগো, সময় যে বড় অল্প, তুমি কেন দূরে দূরে ফিরিতেছ, আমি যে পথ চাহিয়া আছি।" আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া প্রায় উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতাম। ইপাইতে-ইপাইতে বাড়ীতে আসিয়া চেয়ারটি লইয়া বসিয়া আকুল আগ্রহে কাহার যেন আগমন-প্রতীক্ষা

করিতাম; বাসিয়া বসিয়া যতদূর সম্ভব 'দরদ' দিয়া
গাহিতাম—

'ওগো সূদূর ওগো মধুব

পথ বলে দাও পরাণ বঁধুর

সব আবরণ তোলা' তোলা'।'

তখন 'পরান-বঁধু' অতি নিকটে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে
বলিত, 'ওগো এই ত আমি আছি'। আমার অপরিচিতাকে
উদ্দেশ্য করিয়া যখন পড়িতাম,—

'পথ বাকী আর নাই ত আমার চলে এলেম একা,

তোমার সাথে কই হ'ল গো দেখা—'

অমনি স্বাস্থ্যরালবস্তিনী হস্ত বলিয়া উঠিত 'ওগো
এখনো কি তোমার দেখা শেষ হয় নাই।'

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে অগত্য যখন লক্ষ্যের মধ্যে
আসিতে লাগিল, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া অপরিচয়ের শেষ
অস্তুরালটুকু যখন প্রায় স'র স'র করিতেছিল এমন সময়
সহসা চমক ভাঙিল। ভাবিলাম, এ কি করিতেছি। এই
লুকোচুর এই অগত্য আবেদন-নিবেদনের শেষ কোথায় ?
শৃঙ্খলবদ্ধ আমি, উমাকে দিবার আমার কি আছে। আর
এই যে ব্যবধান, ইহার অবকাশে হস্ত স্বপ্ন বা কাব্য
রচনা করিতে পারি, কিন্তু দূরত্ব যখন দূর হইয়া প্রাণের
সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটিবে তখন কি পঙ্কিতার দিকারে
জীবন বিকৃত হইবে না ? এই যে সামান্ত ব্যবধান ইহা
ঘুচাইবার অ'ধকার ত আমার নাই। আমি দূর হইতে
অস্তুরালবস্তিনীকে আমার প্রাণের একান্ত অসহায়তা
করিব, কিন্তু মুখামুখ আমার বখা ত ফুটিবে না।

আমি যেন কোনো আঘাত পাইয়া মূর্ছিত হইয়া
পড়িয়াছিলাম—মূর্ছিত হইয়া আঘাতের বেদনার পীড়িত
হইতে লাগিলাম। নিঃস্বীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আর
একটি ব্যথিত অসহায় প্রাণীর অস্তরের গোপনবারতা
পাঠতোছিলাম। আমার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া
উঠিতেছিল। আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মনে মনে
বলিলাম, 'ওগো আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে যাইতেই
হইবে। তোমার স্নেহ-বন্ধন আমাকে দৃঢ় করিয়া
বাঁধিয়াছে এবং এই বন্ধন অটুট রাখিবার জন্যই আমাকে
দূরে যাইতে হইবে, তুমি এই অসহায়কে কমা করিও—'

পরদিন সকালে বাড়ী ছাড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম,
উমা কি কাজে যাইতেছিল তাহার হাত হইতে ঝন্-ঝন্
করিয়া কি যেন পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম—
সে বস্ত্রাধতার মতো বসিয়া আছে, সকলের খাওয়া হইল
কি না সে দেখিল না, দিনের কাজে আজ আর সে
কাধাকেও সাহায্য করিতে ছুটিল না। সে মনে-মনে
বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো কৃপণ, এ'টুকু
দিতেও তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ! দিনান্তে শুধু তোমাকে
একবার দেখিলাম তাহাও কি তোমার সহিল না। ভীক
আমি কি জানি না তুমি কেন যাইতেছ, এই দুর্বল নারীর
কাছ হইতে পলায়ন করা ছাড়া কি তোমার কোনো
পথ ছিল না! ওগো আমি তোমার কাছ হইতে দূরে দূরে
থাকিব, আমার অস্তুরালটুকু পর্যন্ত তুমি কোনোদিন অসুভব
করিতে পারিবে না, শুধু তুমি থাকিয়া যাও!' হাস
অসহায় নারী!

প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বই গুছাইতে-গুছাইতে
আমার কবিতার খাতা হইতে একটি চিঠি মাটিতে প'ড়ল।
দেখিলাম আমাকেই লেখা চিঠি—উমা লিখিয়াছে।
চিত্তেরে শুধু একটি লাইন লেগা—'ওগো তুমি যেও না'—
কোনো সাক্ষর নাই। জিনিষ গোছানো, বঁধা ছাড়া
আমার কাছে বিববৎ মনে হইতে লাগিল, কিন্তু তবু
যাইতে হইবে। শঙ্কিত হস্তের তিন-টি অক্ষরে হস্তের
যে ভাষা ওই অসহায় আমাকে নিবেদন করিয়াছে—
তাহা আমাকে কতখানই না বলিল! জলহুল, আকাশে,
বাতাসে আমি ওই করুণ আর্ন্তরূপ স্তবিত্তে লাগিলাম,—
'ওগো তুমি যেও না'।

ধরণী নিরস্তর ব্যগ্রবাহ মেলিয়া মাতৃষকে ধরিয়া
রাখিতে চায়—যুগে-যুগে প্রাণহীনজন তাগদের
প্রেমাস্পন্দকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে শুধু এই তিনটি
কথা বলিয়া—'ওগো তুমি যেও না'। কিন্তু কেহ কি
ধরিয়া রাখিতে পারে ? সব বন্ধন পিছনে পড়িয়া থাকে,
ব্যর্থ নমন-সর্গলে ভাসিয়া প্রেমিকা শূন্য হৃদয়ে চাহিয়া
থাকে, যে যাইবার সে চলিয়া যায়।

আমাকেও যাইতে হইল।

আবার সোর-গোল পড়িল। গাড়ীবন্দী করিয়া

তিনিষপন্ন লইয়া অন্তর উঠিয়া গেলাম; অন্তরালবর্তিনী
উমার বিমদিত বৃকে আর আমার ছিন্ন হৃদয়ের কোণে কি
ঘটিল সে ইতিহাস নাই বলিলাম।

আবার নূতন ভাড়াটে আসিল, উমা একবারমাত্র
তাহার শাস্ত আয়ত চোখ দুটি মেলিয়া দেখিল,
ভারপর—

* * *
আমার গল্প আরো কতদূর চলিত বালতে পারি না,
হঠাৎ সামনের খোলার বাড়ীতে একটা হৈ চৈ রব উঠাতে
চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাত্রি বারোটা বাজিয়া
গিয়াছে, অতি প্রত্যাষে বাড়ী ছাড়িতে হইবে বালিয়া স্বপ্ন
ও বাস্তব ভুলিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

কাব্য-কথা

কবি ও কাব্য

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

কবি কে?—এই কথার সহজ উত্তর, যিনি কাব্য রচনা
করেন, তিনিই কবি। কিন্তু কথাটা এত সহজ নয়, কারণ
সঙ্গে সঙ্গে—কাব্য কি?—এ কথারও উত্তর চাই, এবং
সে উত্তর কঠিন বটে। তথাপি কাব্যের সংজ্ঞানির্দেশের
'প্রকৃত' আপাততঃ কাব্যমোদী পাঠকের উপরে চাপাইয়া
যিনি কাব্যকার, কবি বলিতে তাঁহাকেই বুঝিব। কাব্য
কি, তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যে, 'শকুন্তলা' ও
'মেঘদূত' কাব্য, 'লিয়ার' ও 'টেম্পেষ্ট' কাব্য, 'চিত্রাঙ্গদা'
ও 'সোণার তরী' কাব্য। ইহাদের মধ্যে কাব্যবস্তু
কোথায়—ছন্দে না বাক্যে, অর্থে না আখ্যান-ব্যাখ্যানে,
বহুনা-কৌশলে না সঙ্ঘা-বিকাশে—কিছা, এই সকলের
সহযোগে, এমন কি সহযোগেরও অধিক একটি অপূর্ব
চিত্ত চমৎকার বা অসুভূতি-বিলাসে—সে আলোচনা
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল কবি ও
কাব্যের কাৰ্ণাগত সঙ্ঘ নিৰ্ণয় করিতে চাই, কীৰ্ত্তি ও
কর্তার মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সূত্র কতটুকু, কবির
প্রেরণা ও কাব্যের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ
আলোচনা করিব।

অতএব প্রথমেই ধরিয়া লইলাম, যিনি কাব্যকার
তিনিই কবি। আর একটু স্পষ্ট করিয়া লই। প্রথমতঃ
যিনি কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি কবি নহেন, যথা—

নীরব কবি। দ্বিতীয়তঃ যিনি কাব্য রচনা করেন, কবি
বলিতে সেই মানুষটিকে বুঝিব না, সেই মানুষটির মধ্যে
যে আর একটি মানুষ আছে, কাব্যরচনাকালে যে
আত্মপ্রকাশ করে, অথবা আর একটি যে আত্মা যেন
তাঁহার উপরে ভর করে, সেই অপর ব্যক্তি বা আত্মাকেই
কবি বলিয়া বুঝিব।

যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনি কবি নহেন—
এ কথাটা বোধ হয় বেশি বুঝাইতে হইবে না। ভাবুক
বা রসিকমাত্রেই কবি নহেন, কাব্যের ভাবনা বা ধারণা
করিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, ইহা সকলেই
স্বীকার করিবেন। ভাবুক বা রসিকের বহুনা আছে
সত্য, কিন্তু সে বহুনা বহুনা, ভাবুকের মনেই কল্প হইয়া
থাকে। যে দৈবী-প্রেরণার বশে সেই বহুনা কাব্যসৃষ্টিতে
রূপময়ী হইয়া উঠে, সে প্রেরণা সকলের ভাগ্যে ঘটে না;
যাঁহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ভাগ্যবানই বাণীর বরপুত্র,
তিনিই কবি।

আবার যে মানুষটির মধ্যে এই দৈবী প্রেরণার লীলা
দেখিতে পাওয়া যায় সেই মানুষটির সাধারণ মনুষ্যজীবন
একরূপ, তাঁহার কবিজীবন বা কাব্যগত পরিচয় স্বতন্ত্র।
কবির জীবনে এই দ্বৈত আছে। কাব্যের মধ্যে যাহাকে
পাই তাঁহার মূর্ত্তি, আর সমাজে সংসারে যাহাকে পাই,

ঐহাং মূর্তি এক নহে। এমন কি, কাব্যের মধ্যে ঐহাং সঙ্কে পরিচয় হয়, ঐহাং মধ্যে আমাদের সাধারণ ধারণার অল্পযায়ী কোনও ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। কবির ব্যক্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কোনওরূপ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়—ইহাই আমার কথাই তাৎপর্য।

কাব্যের গৌরব আর যাহা হউক, তাহা যুদ্ধজয়ের মত একটা কীর্তি নয়, সাম্রাজ্যস্থাপন নয়, পতিতোদ্ধার নয়। মানুষের কর্মগৌরব, এবং তাহার মূলে যে বুদ্ধি, নীতি, কৌশল ও চরিত্রশক্তির পরিচয় আছে, সে রূপ কোনও পরিচয় কবি কীর্তির মধ্যে নাই। কবির কাজ ইহা হইতে বহুগুণে উত্তম হইতে পারে; তাহার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহার চংকারিত্ব অনেক বেশি হইতে পারে, তথাপি তাহাতে সাধারণ মানুষ-ধর্মের পরিচয় নাই।

কাব্যে মনোবার পরিচয় নাই, কবিপ্রতিভা বলিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না, কারণ যাহাকে আমরা চিন্তাবৃত্তি বলি, কাব্যে সেই চিন্তাবৃত্তির ফল নয়।

কাব্যের মধ্যে কবির যে সঙ্কল্পতার পরিচয় পাই, যে সহস্রভূতিকে সত্যকার কবি-ধর্ম বলিয়া বুঝি, তাহা লৌকিক সঙ্কল্পবৃত্তি নয়। যে প্রাণ, কৃষ্ণীর কত নিঃস্ব হস্তে ধৌত করিতে চায়, ক্ষুধিতের ক্ষুধাবারণে উৎসুক, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে চিন্তিত—কাব্যের মধ্যে সেই প্রাণের পরিচয় অসম্ভব; বরং অনেক সময়ে (সাধারণ পাঠকের বুঝিতে) তাহার উল্টা পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবি এমন সকল বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত, যাহা পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—এমন কল্পনায় মশগুল, যাহা শব্দতানকেও আমাদের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করে।

অতএব যাহা কিছু লইয়া সাধারণ মানুষের কৃতিত্ব তাহার অল্পরূপ লক্ষণ কাব্যে পাওয়া যাইতে পারে না। কাব্যদ্বারা কাব্যকারের বাস্তব চরিত্রের কোনও ধারণা পরিষ্কৃত হয় না।

চরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কবির মনটাকেই যদি কাব্যের মধ্যে ধরিতে যাই—তবে সেই পরিচয়ের মূল্য কোন দিক দিয়া কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কবিবর্ণনার সত্যাসত্য অন্তরূপ। সে যে কিরূপ, সেই

কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু তৎপূর্বে, ব্যবহারিক জীবনে, 'লোকচয়চা'য়—যে সংস্কার, সকলের সম্বন্ধেই নানাদিক হইতে ফুটিয়া উঠিয়া মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা ধারণা গড়িয়া তোলে, কাব্যের মধ্যে কবির সম্বন্ধে সেই ধারণাকে সর্বদা দূরে রাখিতে হইবে—ইহাই আমার সর্বপ্রথম বক্তব্য। কথাটা অনেকের পক্ষেই হয়ত নূতন নয়, তথাপি অনেকের মনে এইরূপ একটা অভ্যাসের সংস্কার রহিয়াছে দেখা যায়, এই জন্ত আমি বাহ্যভয় সঙ্কেও ওই কথাটাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে চাই। কাব্য পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক—ঐহাং যতটুকু রসবোধ আছে, সেই অল্পপাতে—আনন্দ ইপায়াও, কবির একটা অবাস্তব পরিচয় লাভ হইতে খাড়া করিয়া, কাব্যের অর্থ সঙ্গতি বা অর্থ-গৌরব অথবা অর্থ-লাঘব করিতে চান; ইহাতে কবি ও কাব্য উভয়েরই মর্যাদাহানি হয়।

কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যের একটা যোগ কোথাও আছে, সে যোগসূত্র বাহির করার উপায়ও স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক জীবনের কার্যক্ষেত্রে মানুষের কার্য ও স্বভাবের মধ্যে যে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, মানুষের মতামত ও সামাজিক আচরণের মধ্যে যে মিল না থাকিলে তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয়—কবির কবিজীবন ও কাব্যের মধ্যে সেইরূপ একটা মিল থাকাই সম্ভব, কিন্তু সে যে কিরূপ এবং কোথায়, তাহা বিচার করিতে হইলে, কবি ও কাব্যের একটি স্বার্থ ধারণার প্রয়োজন। কাব্যের কবি-মানস কবির ব্যক্তিগত চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। ইহার প্রমাণ সকল উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিবার সময় মনে-মনে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট নাটক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার নিদর্শন, সেখানে কবির ব্যক্তিত্ব কোথায়? বরং সেইটি লোপ হয় বলিয়াই নাটক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কাহিনী-কাব্যের আখ্যানবস্ত-নির্বাচনে বা বর্ণনাতন্ত্রিতে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, তাহাও কবির বাস্তবজীবনের বাস্তব অভিপ্রায়ের সহিত না মিলিবারই সম্ভাবনা। লিরিকের মধ্যে কবির যে আত্মগত উচ্ছ্বাস থাকে, তাহাতে যে আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, তাহাও একটা আদর্শ-কল্পনার আবেগ, সেও কবির ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় নয়।

অতএব কাব্য-ধর্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তি-ধর্ম মনে করা চলে না। তাহার কারণ, কাব্যরচনাকালে মানুষটি আর সেই-মানুষ নাই, তখন একটা বৃহত্তর চেতনার আবেশে প্রাণের অবাধ ক্ষুধা, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে। কবি তখন মনুষ্যজীবনের সাধারণ স্তর হইতে একটা উর্দ্ধতর স্তরে উঠিয়া যান; এই mood বা ভাবাবস্থাই কাব্যের জননী। কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে আত্মবিকাশ বা আত্মপ্রসার হয়, তাহাতে কোনওরূপ চরিত্রলক্ষণ থাকে না। চরিত্র কি?—মানুষের সাধ ও সাধোর বিষমতায়, অহুকুল বা প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে, তাহার ইচ্ছা-শক্তি নিরস্তর যে কৰ্ম রূপ ধারণ করিতেছে তাহারই একটি বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত আকারকে আমরা চরিত্র বলিয়া থাকি। কবি যখন কাব্যরচনায় ব্যাপ্ত, যখন তাঁহার এই mood উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার জীবন এই কৰ্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, লৌকিকতার সর্বসংস্কার ঘূর্ণিয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবন একটি মহত্তর সত্তায় ডুবিয়া যায়—তখন তাঁহার নবজন্ম বা স্বিদ্বন্দ লাভ হয়। এই অবস্থায় মানুষ যেন স্বমহিমায় বিরাজ করে। এই উল্লাসের অবস্থায় মানুষের 'অহং'টি আর থাকে না। এই অহংজ্ঞানই সর্বপ্রকার অশক্তি ও অজ্ঞানের মূল। ইহারই ফলে মানুষের সাধনা ও সিদ্ধি, জ্ঞান ও প্রবৃত্তির নিত্য বিরোধ ঘটে, এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে আত্ম-সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার ইচ্ছাশক্তি, জগৎ ব্যাপারের প্রতিপদে বিস্ত্রিত হইয়া সূর্ণাশ্রোতে বহিয়া চলে, এবং তাহার মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পীড়িত করিয়া, তাহার উপর ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বের বা সঙ্কীর্ণ চরিত্র-বুদ্ধির আরোপ করে। কাব্যসৃষ্টিকালে এই অহং-মুক্তি ঘটে বলিয়াই কবির সম্বন্ধে কোনও চরিত্রবিচার খাটে না। বাস্তব জীবনে কবির কৰ্মবৃত্তি সাধারণ মানুষের মতই অবস্থা ও চরিত্রবশে নানারূপ হইতে পারে। কেহ যোদ্ধা, কেহ রাজসভাসদ, কেহ জমীদার, কেহ পল্লীবাসী গৃহস্থ, কেহ শেকস্পীরারের মত সাধারণ বিষয়ী লোক, কেহ গোড়া ধর্মবিশ্বাসী, স্বজাতি ও স্বদেশ পরাধীন; আবার কেহ গেটে বা রবীন্দ্রনাথের মত জাতি ও স্বদেশাভিমান-বর্জিত বিশ্বপরাধীন মনীষী। কিন্তু যেমনি তাঁহার জন্মে

কাব্যপ্রেরণা জাগিয়া উঠে, সেই বৃহত্তর চেতনার আবেশ হয়, অমনি বাহিরের সকল সাজসজ্জা খসিয়া যায়—বিষয়-বুদ্ধি, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস, স্বার্থসাধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা কোথায় ভাসিয়া যায়, তখন তাঁহার চিত্ত শিশুর মত সরল, বিশ্বাস-প্রবণ ও আনন্দময় হইয়া উঠে।

কবির এই অবস্থা, এই নবজন্মের পরিচয় আমরা কাব্যে সর্বত্র পাইয়া থাকি। দেশ, কাল ও পাত্রের সীমা কোথাও থাকে না, কোনোখানে গণ্ডী নাই, কুত্রাপি ব্যক্তিস্বনিষ্ঠা বা চরিত্রনীতির পরিচয় নাই। বিশ্ব-বিধানের যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহাকে এক দিব্যজ্ঞানের ও আনন্দের ঐক্যস্থানে বাধিয়া,—যুক্তিবিরোধ, নীতিবিরোধ, জ্ঞানবিরোধ—সকলই অস্বীকার করিয়া, কবি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-রসাতলে তাঁহার 'আমি'টাকে প্রসারিত করিয়া এক অপূর্ব ক্ষুধা, এক মহান উল্লাস প্রকটিত করেন। নিজেই প্রজ্ঞাপতি হইয়া ফুলের উপর উড়িয়া বসেন, মেঘ হইয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়ান, ঘাতক হইয়া হত্যা করেন, প্রণয়মুগ্ধা কিশোরী হইয়া ত্রীড়াবনতমুখী হন; একই কালে 'খেলা'র অকল্পিত জয়যাতনা এবং 'ইয়াগো'র নৃশংস উল্লাস ভোগ করেন। কখনও বলিয়া উঠেন,

ইহার চেয়ে হস্তে যদি
আরব বেহরীন।
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
জীবনশ্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহি জালি'
চলেছি নিশিদিন;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্ধেশ,—
মরুর বড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

আবার,

যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অপোক-নীপের চারে
আমি কোনজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের গোপবালক।

—ইহার মধ্যে ব্যক্তিস্বনিষ্ঠা কোথায়?

আবার, কবি কোনও কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়াছেন কি না—তাঁহার যে অমুক্তি কাব্যের মধ্যে জলন্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবন-যাত্রায় তাহার কতটুকু সত্য হইয়া উঠিয়াছে—সেই প্রমাণ যদি পাইতে চাই, তবে নিরাশ হওয়া আশ্চর্য নয়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যজগৎ স্বতন্ত্র জগৎ, সেখানে বাস্তবের কঠিন শাসন অগ্রাহ্য করা চলিতে পারে বলিয়াই কবিশক্তিকে পূর্ণমানবতার লীলা বলা যায়। বাস্তব জীবনের সকল অক্ষমতা, অজ্ঞান ও অশক্তির হাত এড়াইয়া কবি কাব্যলোকে প্রবেশ করেন। এই সৃষ্টির অন্তরালে যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি একাধারে প্রবাহিত, তাহারি পূর্ণ-চেতনায় তিনি তখন লীলাময়। সেই অবস্থায় কবির আহ্লাদের অবধি থাকে না; স্বমহিমায় পূর্ণকিত হইয়া সেই দিব্যশক্তিরূপিনী কাব্যসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কবি তখন জয়োচ্চারণ করেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,

হোক সে এ বহুমতী যার খুসী তার।

এ অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি তাই, আবার যখন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নামিয়া আসেন, তখন তিনি যে-মানুষ সেই-মানুষ, তখন তাঁহার চরিত্র আছে, কর্মনীতি আছে, সাধারণ মানুষের যাহা কিছু দুর্বলতা সবই তাঁহার আছে। অতএব কবি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের কর্মনীতির মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রভাব রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া যদি হতাশ হইতে হয়, তাহা হইলে কবি যখন উৎকৃষ্ট ভাবাবেশে কাব্যলোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি নিজ জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা ও সঙ্কীর্ণতা সেখানেও সঙ্গে লইয়া যান না কেন, বলিয়া দোষ দেওয়া চলে; কেন না, কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন এই দুইয়ের সামঞ্জস্য উভয় প্রকারেই হইতে পারে।

কাব্যের মধ্যে বাস্তব-মুক্তি আছে। জীবনে যে বাধা, কবি-স্বর্গে সে বাধা নাই। সে-স্বর্গে কবি একেশ্বর, সেখানে তিনিই স্রষ্টা, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান। সে স্বর্গ তাঁহার মনের মত করিয়া রচিত, কোথাও তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির বাধা নাই। তিনি যাহা চান তাহাই হইবে; যেমন করিয়া সাজাইতে চান, যেমন করিয়া দেখিতে চান,

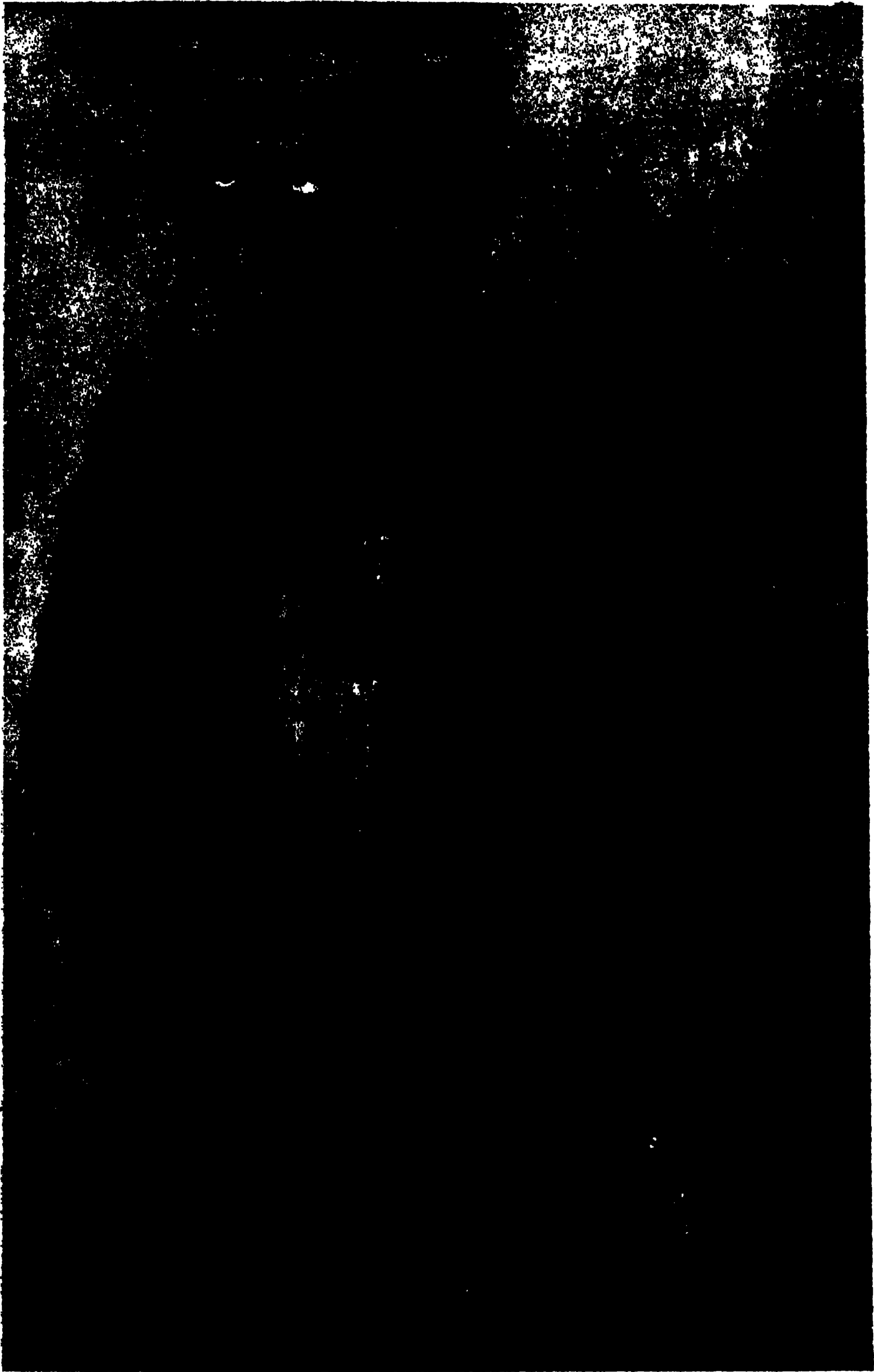
তেমনি হইবে—জড় ও চেতন সর্ববস্তুর তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবে। কবির যখন বাসনা হয়—

মেরেটি মোর আগ-বাড়ারে
দাঁড়িয়ে রবে ঘারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে',
সাঁঝের আঁধারে ;
কাপ্তল-দেওয়া চক্ষু দুটি
আদর-দোলে উঠবে কুটি'
'কণী মনসা'র বেড়ার ঘেরা
ছর্ণী-দীঘির ঘারে।

শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়বে করে',
দূর বেটলের পরে ;
অল্প মাস্তি' ছুঁবে সরে,
ঘাটটি চ'কে ঘটটি করে',
সইয়ের সাথে গৃহিণী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।

—তখন তাঁহার কামনা অপূর্ণ থাকে না। দোপাটি ফুল সময় না হইলেও ফুটিবে, ঘরে কাড়ল-পরা শিশু কন্যা না থাকিলেও ঘরে আসিয়া দাঁড়াইবে, শিউলি-ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নাধারা মেঘ-বানলে আচ্ছন্ন হইবে না; ঘাট হইতে ঘট ভরিতে গিয়া গৃহিণীর পা পিছলাইয়া ঘট ভাঙিবে না, সইএর সাথেও কলহ হইবে না—তিনি স্তম্ভদেহে ও স্তম্ভমনে, পল্লিপথে সিক্তপদপল্লবের আলিপনা আঁকিয়া স্মিতমুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

এই অধিকার কবির আছে। আবার কবিশক্তির গৌরব ও বিশেষত্ব এই যে, পাঠককেও কবি এই অধিকার দিতে পারেন। কবির এই ক্ষুধিত পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়; কবিতা পাঠ করিবার সময়ে বা গান গাহিতে-গাহিতে আমরা অনায়াসে এই চেতনা-লোক বিহার করি, আমরাও এই উচ্চ সত্তায় যেন কতকটা স্বপ্নবান হই। ইহাই কবির প্রধান কৃতিত্ব, এই জন্মই আমরা কবির নিকটে পাই। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে, কাব্যের ভিতর দিয়া কবির সঙ্গে যে পরিচয়—সে কতকটা আত্ম-পরিচয়ই বটে। কারণ, আমার ভিতরে যে রসবোধ আছে, কবি তাহাই উদ্ধৃত করেন—তাঁহার মধ্য দিয়া আমি আমারই পরিচয় পাই। কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল বস্ত্রজগৎকে আবার মনোরম মূর্তিতে প্রকটিত করিয়া



তৈমুর

শিল্পী শ্রী অক্ষয় প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবাসী প্রেস, কলকাতা]

আমার মধ্যে আমারই নিগূঢ় সত্তার যেন সাক্ষাৎকার ঘটায়। আমার প্রাণের অবাধ ক্ষুধা—আমার চিত্তের চমৎকার বিধান করিয়া, আমার মধ্যে যে উদার বৃহৎ 'আমি' রহিয়াছে তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেয়। এই আত্মোপলব্ধিই কাব্যের প্রধান অভিপ্রায়।

কাব্যের মধ্য দিয়া কবির সঙ্গে পাঠকের এই পরিচয়, তথা আত্মপরিচয়—ইহাই কাব্য-পরিচয়ের ভিত্তি। এই পরিচয়ের মূলতত্ত্ব ঠিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয়ত যাইবে না, তথাপি আমি সেই চুঃসাহস করিব। আমার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, বিষয়টি শেষপর্যন্ত ছুঃসাহসে থাকিয়া যাইবে। তথাপি, যদি সঙ্গম পাঠক কেবল তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মর্মগ্রাহী হইবার চেষ্টা করেন তবে সফল হইতেও পারি।

কাব্যের ভিতর কবিচরিত্র সন্ধান করিতে গিয়া একটা কথাই বার-বার স্মরণীয়। ফিডিয়া আসিয়া পড়িয়াছে যে, কবির personality অর্থাৎ কবি-মানুষটির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি কাব্যের মধ্যে না ফুটিবারই কথা, তাহার ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় না থাকাই সঙ্গত। এই ব্যক্তি-জীবনের সঙ্কীর্ণতা থাকে না বলিয়াহ জগৎ ও জীবনের আসল রূপটি তিনি দেখিতে পান। এই 'দেখা', এই কবি-দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি—ঋষির মন্ত্র-দৃষ্টির মত। কাব্যে উপস্থানে জীবনের যে চিত্র আমরা পাই, তাহার মধ্যে একটা অত্যন্ত সরল সহজ ও তীক্ষ্ণ সত্যবোধ জাগে বলিয়াই আমরা আনন্দ পাই। সত্যের এই মূর্তি স্মরণ না হইয়া পারে না বলিয়াই তাহা স্মরণ। কারণ, যে প্রতীতি সম্যক বা সম্পূর্ণ—সমস্ত সংশয়-সংস্কারের বাহিরে যাহার সঙ্গে পরিচয় হয়, সেই ত আনন্দ। স্মরণ-বোধ ও আনন্দ একই কারণে হয়। যে কাব্যে এই সত্য-স্মরণের বোধ এমন করিয়া জাগেনা, সে কাব্যের প্রেরণা অসম্পূর্ণ বোধিতে হইবে। কবির এই সত্যদৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। স্মরণকে ফুটাইয়া তুলিতে পৃথক আয়াস করিতে হয় না, যাহা সত্য তাহা অনিবার্যরূপেই স্মরণ। বরং যেখানে স্মরণকে ফুটাইবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেখানে সত্যের অভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে। কাব্যে জীবনের কোনও fact ই রঞ্জিত

বা রূপান্তরিত হয় না, গভীরতমরূপে সত্য হইয়া উঠে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কি? সত্য আর যাই হোক, তাহা বিজ্ঞানের থিয়রি, ধর্মশাস্ত্রের অমূল্যশাসন বা দর্শনের মতবাদ নয়। সত্য একটি চিন্তাগত ধারণা নয়, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অমূল্যভূতি। সত্যের একটি প্রমাণ এই যে, তাহাকে পাইলে কোনোখানে আর কোনও সংশয় থাকে না। 'জানা' বলিতে আমরা সর্ববস্তু সম্বন্ধে—কি? বা, কেন হয়?—এইরূপ একটা কৌতূহল-তৃপ্তি বৃদ্ধি, কিন্তু তাহাতে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না; মনের স্বাচ্ছন্দ্য হয় ত' হয়—এমনকি সর্ববস্তুর উপর ক্রমান্বয়ে মনের অধিকার বিস্তার করায় একটা আত্মগৌরব জাগে—কিন্তু সংশয়ের শেষ হয় না। কারণ সর্বত্রই পৃথকভাবে কৌতূহল তৃপ্তি হয়—কোনটির পরিচয়েই সমগ্রতাবোধ জাগে না। এই সমগ্রতা বোধ মনের ধর্ম নয়; মন সর্বকিছু খর্ব করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়া দেখে, সেজন্ত সে-দেখায় পূর্ণদৃষ্টির আনন্দ নাই। 'To know all is to pardon all' (জান সম্পূর্ণ হইলেই তিত্তিকা আসে)—এই উক্তিতে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ দিব্যামূল্যভূতি, তাহাই সত্যোপলব্ধি। তাহার লক্ষণ—সর্বসংশয়ের সমাধান নয়, সর্বসংশয়ের বিরোধান। ইহাকে কেবল মাত্র মনের ঘারা লাভ করা যায় না। কেবল মন লইয়াই মানুষ নয়। যাহা কিছু লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহার ভিতরকার সেই সমগ্র রহস্যটি—তাহার সবখানি যখন সম্মাপ হইয়া ওঠে, তখনই এই সত্যচেতনা সম্ভব হয়। অতএব বলিতে হইবে, দেহ-চেতনা, হৃদয় বেদনা ও মানস ক্রিয়া—এই তিনের পূর্ণ-পরিণাম ও সামঞ্জস্য না ঘটিলে, প্রত্যেকটি পূর্ণবিকশিত অথচ পরস্পরের অমূল্যভূতি না হইলে, এই সত্যের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। এ অবস্থা যে কখন কেমন করিয়া ঘটে, তাহাই মানবের চিরবিস্ময়। ইহারই সাধনাকে লক্ষ্য করিয়া গুরু উপদেশ করেন যে, তাহা—

স্মরণ ধারা নিশিতা হৃদয়তারা

ঋষি ইহারই উদ্দেশে বলিগাছেন,

কর্মবৈব বৃগুতে তেন লভ্যঃ

—যাহাকে তিনি আপনি বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে।—তিনি কাহাকে বরণ করেন? সেই ভাগ্যবান কে?

আদিকাল হইতে তিনি কবিকেই বরণ করিয়া আসিতেছেন। কবি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ, —তিনি অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে নাস্তিক, দর্শন তর্ক-বিচারের দুর্ভেদ্য জালে জড়িত; ভক্ত বলেন বটে, ‘বিশ্বাসে মিলয়ে রুক্ষ, তর্কে বহুদূর’—কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁহার নিজেরই থাকে, অপরের মনে জাগাইতে পারেন না। একমাত্র কবিই যাহা দেখেন, অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন। একমাত্র সাহিত্যই প্রকৃত জ্ঞানের উপায়, সাহিত্যের জ্ঞানযোগই উৎকৃষ্ট।

কাব্যকে Imitation বা অনুকৃতি বলা হয়। তাহার অর্থ এই যে, কবি কাব্যের মধ্যে যাহা যেমনটি দেখেন তাহাকে ঠিক তেমনটি করিয়া দেখাইয়া থাকেন। যাহা যেমনটি, তাহা ঠিক তেমনটি দেখি বলিয়াই রসোজ্জ্বল হয়। কবির এই সত্যদৃষ্টির কথা পূর্বে বলিয়াছি। যাহা বাস্তব-জীবনে পীড়াদায়ক, তাহাই কাব্যের ইন্দ্রজালে মনোহর, অথচ তাহাকে একটুও অস্বার্থ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না—অন্ততঃ যতক্ষণ তাহা পাঠ করি, যতক্ষণ কাব্যের বাহিরে না আসি। ইহাতেই বুঝিতে পারি, এ দেখা আর এক রকমের দেখা। যে-দেখায় নিজ-নিজ ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ও নানা সংস্কারের বাধা আছে, তাই দেখাই সত্যকার দেখা নয়; সেখানে স্বার্থ ও স্বাভিমানের বিরোধ আছে বলিয়াই সবটুকু চোখে পড়ে না। যখন সবটুকু চোখে পড়ে তখনই সামঞ্জস্য বুঝি, তাই সন্ধে-সন্ধে স্তম্ভর বোধ হয়। সত্য-স্তম্ভরের এই অর্থেতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াই ইংরাজ কবি কীটস্ তাঁহার সেই বিখ্যাত বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন—

Beauty is truth, truth beauty,—that is all

Ye know on earth, and all ye need to know.

“যাহা স্তম্ভর তাহাই সত্য, সত্যই স্তম্ভর,—মানুষের জ্ঞান ইহার অধিক হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজনও নাই।”

—এই বাণীর অন্তরালে সাহিত্যবিজ্ঞানের শেষকথাটি রহিয়াছে। ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে

পারা যদি সম্ভব হয়, তবে সাহিত্যকে যে অভিনব জ্ঞান-যোগ বলিয়াছি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

কবি-প্রতিভায় এই জ্ঞানযোগের একটি প্রধানী আবিষ্কার করা যায়। যাহা কিছু কবিচিত্তকে স্পর্শ করে, কবির অন্তরতম অনুভূতিতে কবি যেন তার সঙ্গে এক হইয়া যান—কবি যেন তাহারই রূপ ধারণ করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহাকে প্রকাশিত করেন। ইহাই কবির একমাত্র জ্ঞান-বৃত্তি; ইহারই ইংরেজী নাম Imagination, দেশী নাম প্রতিভা বা প্রজ্ঞা। এই বৃত্তিঘারা কিছু জানিতে হইলে তাহা ‘হইতে’ হয়। কবি কোনও কিছুকে বাখ্যা বা বর্ণনা করেন না, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহার সত্যায় নিজ সত্তা মিলাইয়া, তন্ময় হইয়া—তাহার রূপটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এইরূপ আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা আত্মবিশ্বাস না হইলে হয় না। এইরূপ আত্মবিশ্বাস না হইলে, যাহা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—সেই আত্মোপলব্ধি বা সত্যজ্ঞানের উদয় হয় না। এই অবস্থার আনন্দ স্বরণ করিয়া কবি কীটস্ বলিতেন—

“() for a life of sensation rather than of thought!”
[আমি কেবল দেহ-প্রাণে অনুভব করিতে চাই, বিচার করিতে চাই না।]

এই আনন্দের লোভেই আমাদের দেশের ভক্তেরা বলিয়া থাকেন, “আমায় দে মা পাগল করে,” আমার কাজ নেই জ্ঞান-বিচারে!” এই উপলব্ধিকেই কতকটা চিন্তার আকারে ব্যক্ত করিতে গিয়া আমাদের কবি গাহিয়াছেন—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী

তুমি অন্তরব্যাপিনী।

একটি স্বপ্ন যুদ্ধ সজল নয়নে,

একটি পদ্ম হৃদয়-বৃত্ত শরনে,

একটি চন্দ্র অসীম চিন্ত-পগনে

চারিদিকে চির-যামিনী।

অকূল শান্তি, সেখায় বিপুল বিরতি,

একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,

নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেব মূর্তি,

তুমি অচল দামিনী।

কবি এখানে সেই আত্মবিশ্বাসের অবস্থাকে কতকটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সেই দিব্যজ্ঞানের অবস্থাকে সজ্ঞান চেতনায় জ্ঞাপন করিতেছেন।

একটি চমক অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-ধামিনী।

এবং

অকূল শান্তি, সেখান বিপুল বিরতি,

এই দুইটি বাক্যের একটিতে বাহুজ্ঞানলোপের, ও
অপরটিতে পূর্ণজ্ঞানের যে আনন্দ, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।
মনে রাখিতে হইবে, এই সকল উক্তিই ইঙ্গিত মাত্র
আছে; যিনি এই রসের আনন্দন করিয়াছেন তিনিই
ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপরে পারিবেন না। এই সকল
শ্লোক ঠিক কাব্য নয়—ইহা কবির মন্ত্রোচ্চারণ। আর
একটি কবিরও এই ধরণের সাক্ষ্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম। গান শুনিতে শুনিতে কবি বলিতেছেন—

পিশে ও সঙ্গীতমধু আমার মানসী-বধু
আহ্লাদে উশুধ আজি, উর্ধ্ব করি' কাণ।
বধিরতা সারিয়াছে, আশ্রয় মোর বুঝিয়াছে
রূপ রস স্পর্শ গন্ধ একই উপাদান।
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান এক সেতারের তান!
গেয়ে বাও, খেমনা'ক, গেয়ে বাও গান;
তোমারে সাজে না সখি মিছা গতিমান।

সৃষ্টির মঞ্চস্থানে যেখানে সর্ববৈচিত্র্য এক হইয়া আছে,
সেখানে পৌঁছিতে পারিলে, কোন বৈচিত্র্যই আর ভেদ-
বুদ্ধি জাগাইয়া, চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না; জ্ঞান অহুত্ব-
মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কোনোখানে আনন্দের বাধা থাকে
না—সর্বত্র বিরোধ ঘুচিয়া সর্বাঙ্গীয়তা জন্মে। বহিঃ-
সৃষ্টি একবারে কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, কবি
তন্ময় হইয়া যান। তখন আর কথা থাকে না, ভাব তখন
রূপ হইয়া বিরাজ করে—কবি কথা বলেন না, রূপসৃষ্টি
করেন। এই সময়ে ভাব যদি রূপের সহিত লুকোচুরী
খেলিতে থাকে—কবি যদি রূপ-রসের পরিবর্তে ইঙ্গিত-
রসে মজিয়া যান, তবে সে অবস্থায় কি হয়, তাহারও
সাক্ষ্য আছে—

মনে হ'ল সৃষ্টি যেন খন্ডে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'
অবাক্ত জনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুরি'।

কিন্তু খাঁটি কাব্যসৃষ্টিতে এই তন্ময়তাই অসাধ্য সাধ-
নের একমাত্র উপায়। কবি কীটসেরই একটি কথায় এই
তন্ময়তার অতি সুন্দর উদাহরণ আছে। কীটস্ একবার

বলিয়াছিলেন, “আমার সম্মুখে ওই যে পাখীগুলো নাচিয়া
নাচিয়া খাদ্য খুঁটিয়া বেড়াইতেছে—উহাদের পানে চাহিবা
মাত্র আমি যেন আমাকে তুলিয়া যাই, আমি যেন উহা-
দের মত নাচিয়া নাচিয়া ওই রূপ করিয়া বেড়াই।” তিনি
পাখী দেখিতে দেখিতে পাখী হইয়া যান! এই দেখিয়া-
হওয়াকেই আমি কবির জ্ঞান-বৃত্তি বলিয়াছি। এই অহু-
প্রবিষ্ট হইবার ঐচ্ছিক শক্তি আছে বলিয়াই কবি
যেমন দেখাইতে পারেন, সাধারণ ব্যক্তি নিজে তেমন
করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। মহাকবি শেক্সপীয়ারের
এই ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই, তিনি অপরের মধ্যে
এইরূপ অবাধে অহুপ্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। বলিয়াই,
মানুষের সমগ্র মনুষ্যত্বকে এমন সত্য-স্বরূপে প্রকটিত
করিতে পারিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানযোগ বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরও নয়। ইহা
প্রকৃত রসাহুত্বের অবস্থা। এ অবস্থায় সকল বিরোধ
ঘুচিয়া যায়, কোনো সমস্যাই থাকে না—‘অকূল শান্তি,
সেখান বিপুল বিরতি’। এ অবস্থায় জ্ঞানী ও জ্ঞেয়
(Subject and Object) এই দুইয়ের ভেদ আর থাকে
না,—ইহা ‘বেদ্যাত্তরস্পর্শশূন্য’ ব্রহ্মাবাদের অবস্থা। ষাঁহার
রসিক, ষাঁহার ইহার একটু আনন্দ জাত আছেন,
তাঁহারাই বুঝিবেন ইহাই আশ্রয় শ্রেষ্ঠ অধিকার কিনা।
ষাঁহাদের এই আনন্দন ক্ষমতা নাই, তাঁহার কাব্যজগৎ ও
ব্যবহারিক জগৎকে পৃথক করিয়া রাখিবেন, কাব্যপাঠের
পর তাহার চমৎকান্দিভ সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া উঠিবেন
—A superior pyrotechnic! সুন্দর আতসবাজী!
ইহাতে কোনও সমস্যা মীমাংসা নাই। ইহাতে সমাজের
কোনও বাস্তব উপকার সাধন হয় না। ইত্যাদি।

কিন্তু জ্ঞানকে ষাঁহার আনন্দরূপে চান, ষাঁহার সত্য-
সুন্দরের মূল-রহস্যটি ধরিতে পারিয়াছেন বা ধরিতে
উৎসুক—তাঁহার কবির সঙ্গে-সঙ্গে এই তন্ময় হওয়ার
সৌভাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলিয়া জানেন। তাঁহার এই
জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিবেন। এই জ্ঞান কাব্যে ভিন্ন
ফুটিতে পারে না, যেখানে যেরূপে ফুটিয়াছে তাহাই কাব্য,
কাব্য ব্যতীত আর কোথাও এই সত্য-সাক্ষ্যকার হয়
না। ইহার ধারণা দর্শন করাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা

ধারণা নয়—আত্মদান করিবার বস্তু। তাই বৈষ্ণবচার্য্যগণ ইহা আত্মদান করাইতে গিয়া বহুল পরিমাণে কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন, বৈষ্ণবদর্শন সাহিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গেছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী যাহার রূপক, তাহা এই সাহিত্যসাধনারই মূলতত্ত্ব। যে আত্মবিস্তৃতি ও তন্নয়তার শক্তিকে কবির প্রজ্ঞা বলিয়াছি—বাহার সাহায্যে কবি অপরের মধ্যে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া, তদনুরূপ হইয়া, তাহাকে পাওয়ার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন, বৈষ্ণব-কবি রাধার প্রেমযোগের মধ্যে সেই রহস্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত কাব্য-রচনায় কেমন ফুটিয়াছে!—

“সকলবন্দী বাজিলেই বনে বাইতে হইবে, অতএব রাধা সমকৈ দা রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা ভিলকাদি রচনা করিতেছিল। কিছু ধ আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিম্নমুখ দেখিতে দেখিতে বাণী শুনা গেল সচকিত রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণমুখ দেখিল, নিম্ন মুখ প্রতিবিম্ব না দেখি কৃষ্ণমুখ দেখিল। এত দৃঢ় কৃষ্ণখান, এত ভালবাসা রাধা বাতীত অ কাহারও নাই। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে ন করে নাই, করিবে না।”

আমরা বলি, কবির প্রাণই রাধা। আবার এই রাধাকে যে সৃষ্টি করিয়াছে, সেও কবি। এই তন্নয়ত কবিরই আছে, আর কাহারও নাই। এই রাধা অপেক্ষা কবিচিত্ত বড়; কারণ সেই ত রাধার একমাত্র লীলা নিকেতন। কবির প্রতিভাশুণেই, কাব্যের সাহায্যে রাধা সর্বজনমনোমোহিনী হইয়া ওঠে।

মিশরের দেবতা

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(২)

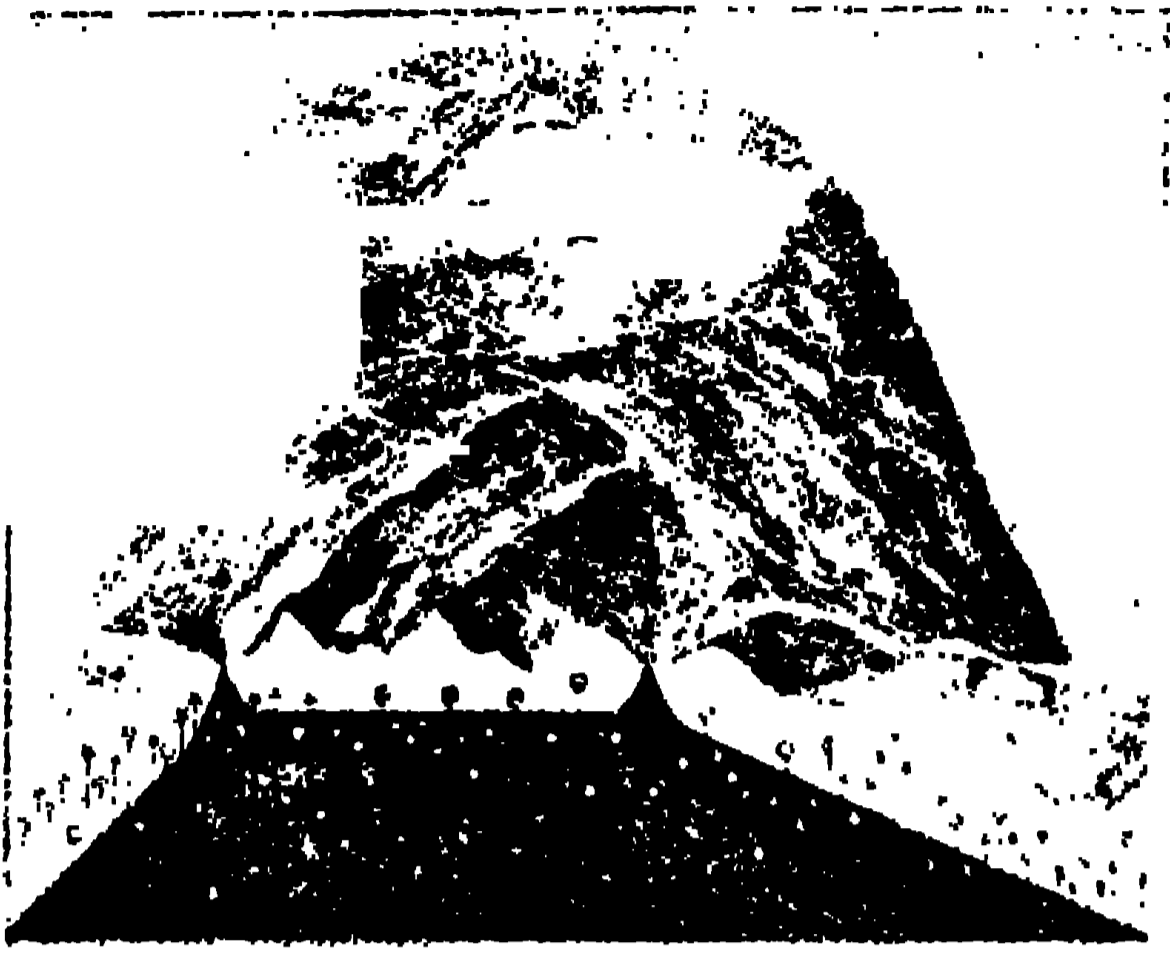


সূর্যদেব প্রাতঃকালে পৃথিবীতে দেখা দিবামাত্র এক-খানি নৌকা তাহাকে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত লইয়া যাইত। এই নৌকাটির নাম ছিল, ‘শাক্ত’। দ্বিতীয় আর একখানি নৌকা ‘মহু’ সূর্যদেবকে বিপ্রহরে নিম্নের বক্ষে ধারণ করিত এবং তাহাকে ‘মহুর’ দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সূর্যদেবের

না। সূর্যদেব এই সকল নৌকাতে অনেক সময় কোনো অহুচরাদি না লইয়াই প্রবেশ করিতেন—তখন নৌকাতে দাঁড়ি, মাঝি, দাঁড়, হাল ইত্যাদি কিছুই দৃষ্কার হইত না, ইহাঃ মন্ত্রবলে চলিত—পথেরও কোনো রকম গোলমাল হইত না। অন্তান্ত সময় নৌকাগুলিতে মাঝি মাল্লা ইত্যাদি কিছুই অভাব থাকিত না।

সূর্যের এই নৌকাবিহার যে সকল সময় নিরাপদে হইত, তাহা নহে—জলে ‘এপোপি’ নামে একটি অতিকায় সর্প বাস করিত, ইহা মাঝে মাঝে হঠাৎ জল হইতে মুখ বাহির করিয়া সে সূর্যের নৌকার পথ রোধ করিত। সূর্যের নৌকার লোকজন যদি এপোপিকে দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহারা কণবিলম্ব না করিয়া প্রার্থনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে এপোপিকে পরাজিত করিবার আয়োজন করিত। পৃথিবীর লোকজন এই সময় দেখিত সূর্যদেব হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া নৌকার পড়িয়া গেলেন; তখন তাহারা চুঃখে

দেহকে রাজিকালের বিভিন্ন সময়ে বহন করিবার জন্য আরো অনেক নৌকা ছিল, কিন্তু তাহারা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া তাহাদের কোনো উল্লেখ করিলাম

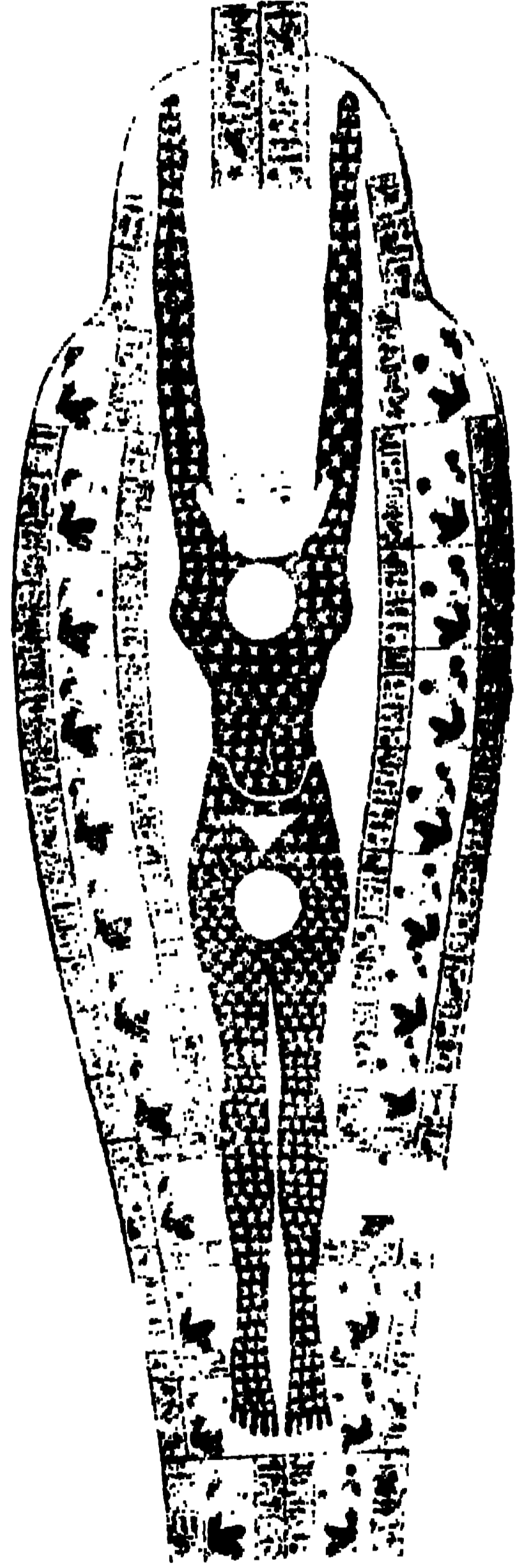


প্রাচীন মিশরীয়দের কল্পিত, আকাশের চিত্র—আকাশের চারি কোণ,
পৃথিবীর চারি প্রান্তের চারিটি ১৬ পর্কতচূড়ার উপর স্থিত

বৃক চাপড়াইত, ঢাক-ঢোলের বিষয় নামে চারিদিক
কাপাইতে থাকিত এবং সামনে যে-কোনো ধাতু-পাত্র
পাইত তাহাই বাজাইতে আরম্ভ করিত। এই শব্দের
চোটে এপোপি ভয় পাইয়া পুনরায় জলে মগ্ন লুকাইত,
এবং “রা” অর্থাৎ সূর্য্যদেব জ্ঞানলাভ করিয়া আবার
তাহার নিদ্রিষ্ট পথে চালাইতে আরম্ভ করিত। এপোপি
যে কেবল মৃত্যুস্বরূপ নানা-প্রকার শব্দেই ভয় পাইত,
তাহা নহে, আকাশ হইতে দেবতারাও তাহাকে নানা-
প্রকার অস্ত্র দ্বারা বিয়ম আঘাত করিত।

সূর্য্য-গ্রহণকে প্রাচীন মিশরীয়েরা এইপ্রকার অপকরণ
এক ব্যাখ্যা দান করিয়াছিল। সূর্য্য বৎসরের নিদ্রিষ্ট এক
সময়ে মিশরের অতি নিকটে আসিতেন, তা’র পর পুনরায়
ক্রমে ক্রমে অতি দূরে চলিয়া যাইতেন। সূর্য্য যখন
নিকটে থাকিতেন, তখন হইত গ্রীষ্মকাল, এবং যখন দূরে
থাকিতেন, তখন হইত শীত কাল। সূর্য্যের এইপ্রকার
নিকট-দূর হইবার কারণ ছিল। কথিত আছে, যে
নদীতে সূর্য্য নৌকায় করিয়া ভ্রমণ করিতেন সেই
নদীতে যখন বান ডাকিয়া জল বাড়িত, তখন জল
বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে নৌকাও সূর্য্যকে লইয়া পৃথিবীর
নিকটবর্তী হইত। তা’র পর যখন বানের জল কমিতে
আরম্ভ হইত, তখন হইতে সূর্য্যও জলের সঙ্গে-সঙ্গে
পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইত

সূর্য্যের এইপ্রকার নিকটে আসা এবং দূরে যাওয়া
এমন নিয়মের সহিত এত নিদ্রিষ্ট সময়ে হইত, যে সেই
সময়ে পণ্ডিতেরা ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে
পারিতেন



“সুইত” দেবী—আকাশের রাণী

সে স্বর্গীয় নদীতে সূর্য্যদেব ভ্রমণ করিতেন, সেই নদীতে
নৌকায় করিয়া আরো একদল দেবতাও বিহার করিতেন।
কিন্তু এইসকল দেবতারা সূর্য্যের আলোতে মানুষের
চোখ হইতে আবৃত হইয়া থাকিতেন, রাত্রির অন্ধকারে
এইসকল দেবতার রূপ মানুষের চোখে দেখা যাইত।



ছাথর—খর্গের গাভীরূপী দেবী

চন্দ্রদেবতা সূর্য্যের পিছন-পিছন বারো ঘণ্টা অস্তুর নাইল নদীতে ভ্রমণ করিতেন। চন্দ্রের মিশরীর নাম ছিল “ইয়াউহু অওহু” (Yauhu Auhu)—ইহার পথ এবং সূর্য্যের পথ একই ছিল, তবে দুইজন কখনও এক-সঙ্গে ঐ পথে বিহার করিতেন না। চন্দ্রদেবকেও নানা স্থানে নানা সময়ে নানা রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। কোথাও বা চন্দ্র মানুষ, হুইতের সন্তান, কোথাও বা বক-জাতীয় পক্ষী-বিশেষ, কোথাও বা “হোরাসের” একটি চক্ষুরূপে তিনি ব্যক্ত হইয়াছেন। যেখানে চন্দ্রকে হোরাসের চক্ষুরূপে খোদাই করা বা আঁকা হইয়াছে, সেইখানে এই বিশেষ বকজাতীয় পক্ষীকে তাঁহার রক্ষাকর্তারূপে খোদাই করা বা আঁকা হইয়াছে।

সূর্য্যের মতন চন্দ্রেরও শত্রু ছিল। এই শত্রুদলের সংখ্যা ছিল তিন :—কুমীর, হিগ্নপটেমাস, এবং বরাহ। এই তিন শত্রু সকল সময় চন্দ্রদেবকে গিলিয়া খাইবার বা অস্ত্র-প্রকারে ভেদ করিবার মতনবে থাকিত। পূর্ণচন্দ্রের সময়

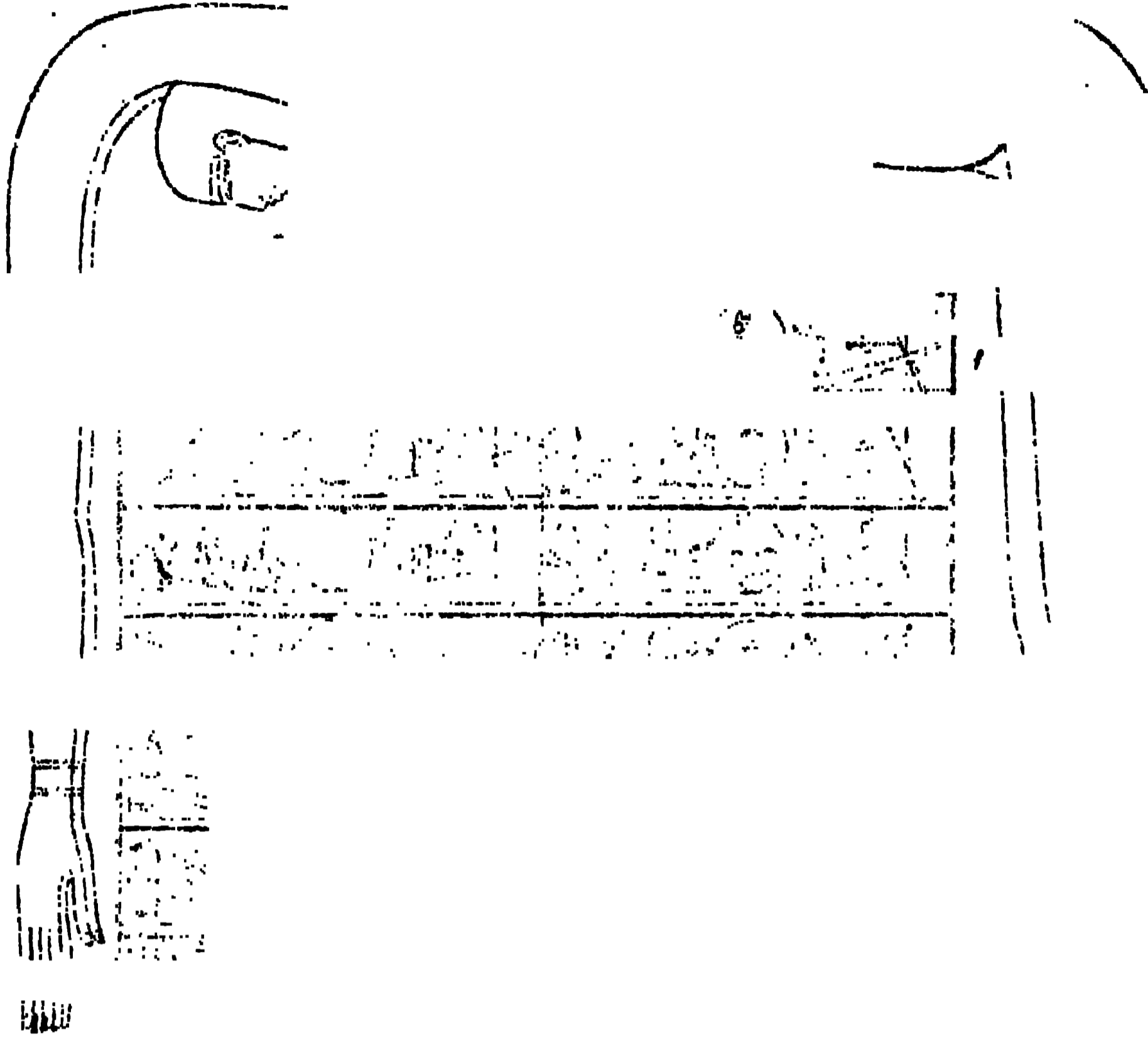
বরাহ অনেক সময় চন্দ্রদেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের নাইল নদীতে নিক্ষেপ করিত। ইহার পর চন্দ্রদেবকে কয়েকদিন আর দেপা যাউত না। তখন সূর্য্যদেব বা রক্ষাকর্তা বক অনেক খোঁজাখুঁজির পর চন্দ্রদেবকে জল হইতে উদ্ধার করিতেন। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে চন্দ্রদেব পুনরাধ সবল হইতে-হইতে নষ্টগোরব প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্রদেব আসেব মধ্যে পনেরো দিন যুবকরূপে থাকিতেন, বাকি পনেরো দিন যবণের দিকে ঘাইতেন, এবং যবণ লাভ করিয়া তিনি পুনরায় শিশু হইয়া নবজন্ম লাভ করিতেন। বছরের বারো মাস ধরিয়া চন্দ্রের এই জন্মমৃত্যুর খেলা চলিত।

চন্দ্রের পরম শত্রু শূকর মাঝে-মাঝে একটা বিষম বিপদ ঘটাইত। চন্দ্রের রক্ষাকর্তারা সামান্য-একটু অসাবধান হইলেই সে চন্দ্রকে একেবারে গালে পুরিধা দিত। কিন্তু এইভাবে বেশী কাল সে চন্দ্রকে রাখিতে পারিত না। দেবতাদের অস্ত্রাগার চন্দ্রকে উদ্গার করিয়া দিতে তাহাকে বাধা করিত। চন্দ্রের এইপ্রকার তিরোভাবে পৃথিবীর লোকে ভয়ানক ভয় পাইত, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ দীর্ঘকালস্থায়ী নয় বলিয়া সহজেই লোকের ভয় কাটিয়া যাইত।

সূর্য্য রাত্রির রাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রদেবের নৌকা সূর্য্যের প্রবেশ-পথেই স্বর্গীয় নীল নদে উপনীত হইত। এইসঙ্গে নক্ষত্রগণও আগমন করিত। নক্ষত্রদের মধ্যে কতকগুলি ছিল চিরস্থায়ী অর্থাৎ তাহাদের কোনো কালে ধ্বংস হইত না, তাহাদের নাম ছিল “আখিমু সোকু” অথবা “আখিমা উর্দু”। এইসকল নক্ষত্র অস্ত্রাস্ত্র নক্ষত্রদের পাহারা দিত এবং দরকার-মতন সেবাও করিত।

এই সেবক বা পাহারাওয়ালারা নক্ষত্রদের দল যেখানে সেখানে ছড়ানো ছিল না। বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে ইহারা রক্ষিত ছিল। কতকগুলি তারকাকে পৃথিবীর লোকে মানুষ বা অস্ত্রাস্ত্র কোনো-প্রকার জন্তুর আকারে দেখিতে পাইত।

আমরা যে সাতটি তারকাপুঞ্জকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলি, প্রাচীন মিশরীয়েরা তাহাকে আকাশের উত্তর কোণ-



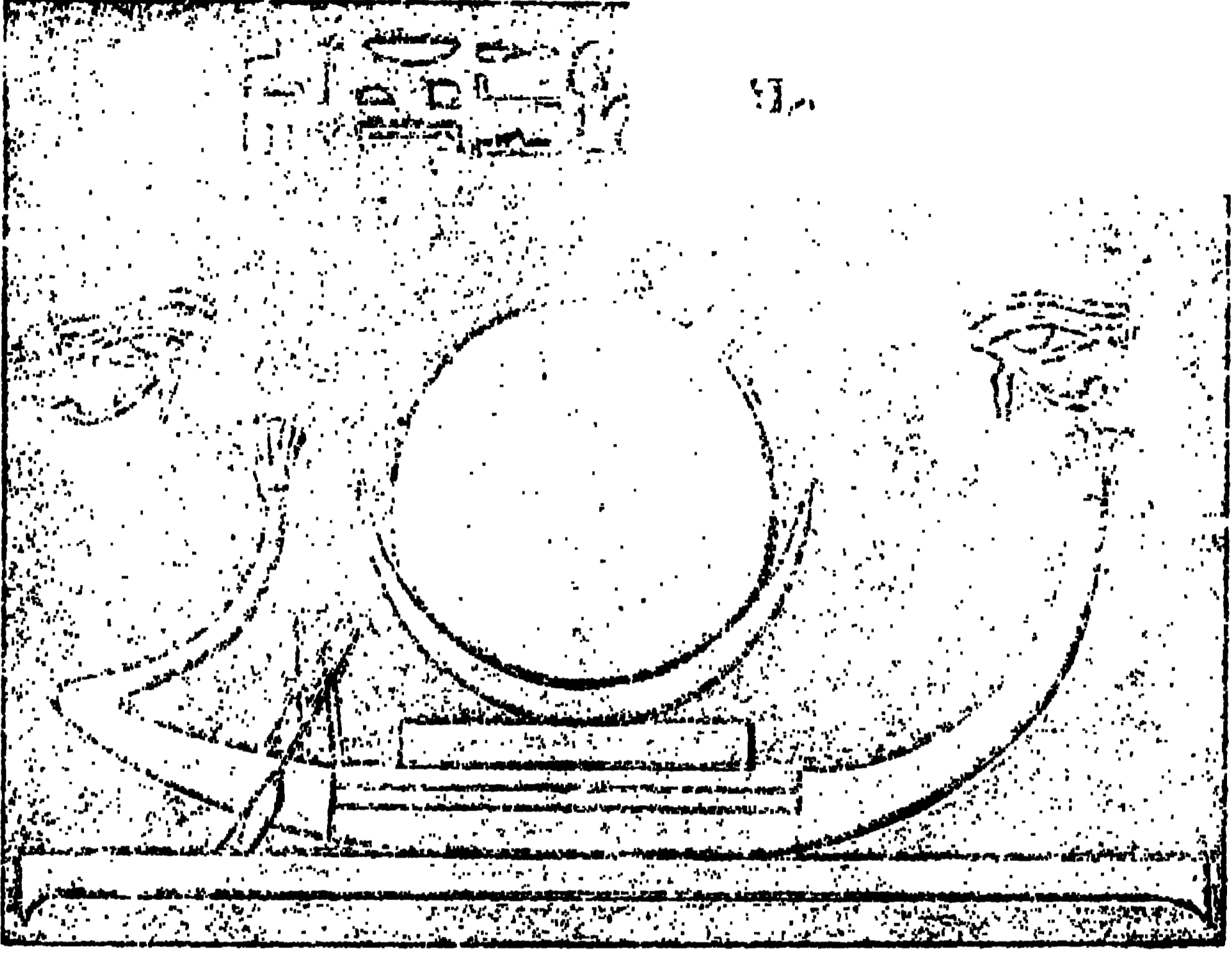
দিনের বার সন্টার সূর্যের বার-সংকার রূপ

স্থিত একটি সঁড়ের কঁজ বালিধা কল্পনা করিত। দুইটি ক্ষুদ্র তারকা এই কঁজটিকে অণু তেরটি তারকার সঞ্চিত যুক্ত করিয়াছিল। এই সাত এবং তেরটি তারকাকে মিশরীয়েরা একটা স্ত্রী হিগপটেমাস বালিধা কল্পনা করিত। হিগপটেমাস তাহার পিছনের পায়ে যেন দাঁড়াইয়া আছে বালিধা মনে হইত এবং সে মাথার উপর একটা কুমীর বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কুমীর স্ত্রী হিগপটেমাসের মাথার উপর হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে।

বেশীর ভাগ নক্ষত্রই কোনো সময়েই আকাশ ত্যাগ করিত না। প্রতিরাতে তাহাদের একই নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যাইত। আমরা যে-সকল গ্রহকে বর্তমানে জানি, তাহার অল্পত পাঁচটিকে প্রাচীন মিশরীয়েরা জানিত। বৃহস্পতির নাম ছিল ওয়াপশেতাভুই (Wapshetatu) শনির নাম ছিল কাহিরী, বুধের নাম ছিল মোবু। ইহার সর্বমোট “৯” অর্থাৎ সূর্যের মতনই নৌকায় সামনের

দিকে চলিত। ‘১১’ নক্ষত্র দোসিবি, অর্থাৎ ১১খল পিছনদিকে চলিত। ‘১২’ নক্ষত্র অর্থাৎ ১২খল গবেষ দুইটি প্রধান কাজ ছিল। সূর্য নক্ষত্রের ন্যায় সন্ধ্যাপ্রথম আকাশে উদয় হইয়া অস্তান্ত নক্ষত্রের অভ্যর্থনা করিত। তা’র পর ভোরের দিকে বহু তিউপুতীর নামক দেবতার রূপ ধরিয়া শিশু সূর্যকে অভ্যর্থনা করিয়া রাত্রিকে বিদায় এবং দিবার আগমন ঘোষণা করিত।

এই বিশাল তারকারাজ্যের শাসক ছিল সাত এবং সপ্তদশ অর্থাৎ Orion এবং Sirius। সাত ১৭টি তারকার সমষ্টি ছিল। এই তারকাগুলি এমনভাবে সঞ্চিত ছিল যে দেখিলে মনে হইত যেন একজন লোক আকাশে দৌড়িয়া চলিয়াছে। সর্কাপেকা উজ্জল তারকাটি সাতের মস্তকে শোভা পাইত। সাতের রূপ ভগতের সকলের নিকট প্রকট ছিল। সাতকে কোনো-কোনো স্থানে নৌকাতে শায়িত গরুর রূপেও বল্পনা করা হইয়াছে।



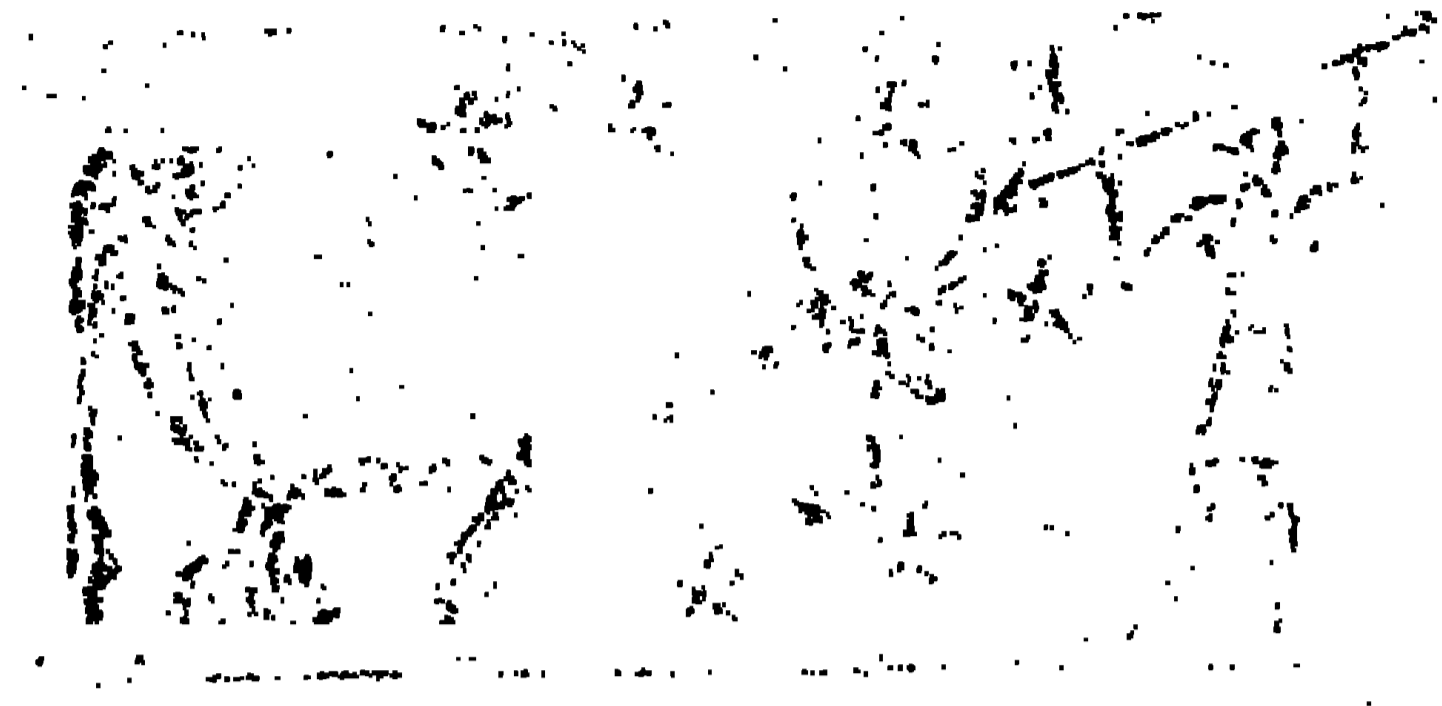
চক্রের নৌকা। এই নৌকা রক্ষা করে দুই পাশে দুইটি চক্রাঙ্গী নক্ষত্র

সাহর একটি বিশেষ কাজ ছিল। আমাদের পৃথিবীর উপর যে আকাশ ছড়ানো আছে, সেই আকাশের ওপারে আর-একটি জগৎ আছে, এই জগতে নদনদী, পাহাড়-পর্বত সমুদ্র আদি সবই আমাদের এই পৃথিবীর মতন—কেবল সেই দেশের লোকেরা যে কেমন তাহা পৃথিবীর কাহারো জানা নাই। সাহ দিনের বেলা এই জগতের উপর ভ্রমণ করিত। সাহ তাহার সহচর দৈত্যদানাদের লইয়া এইখানে শিকারের খোঁজে আসিত। দেবতাদের শিকার করাই তাহার কাজ ছিল, সেইজন্য সাহর আগমন-বার্তা ঘোষিত হইবামাত্র সেই দ্বিতীয় পৃথিবীর নক্ষত্রাদি এবং দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সাহর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। শিকার করা হইয়া গেলে তাহাদের টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া একটা প্রকাণ্ড পাত্রে আগুনের উপর রাখিয়া রাখা করা হইত। সাহর খাওয়ার মধ্যে এষ্টা নিয়ম ছিল। প্রাতঃকালে সাহ বড়-বড় দেবতাদের বড়-হাঙ্গরি রূপে ভক্ষণ করিত। দ্বিপ্রহরে ছোটোখাটো দেবতাদের ভক্ষণ করিত। এবেবারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবতাদের বাজে ভোজন

করিত। বৃদ্ধ দেবতাদের আগুনে বল্মপাইয়া নরম করা হইত।

দেবতা ভক্ষণের ফলে সাহ দেবতাদের বিবিধ-গুণাবলী লাভ করিত। যুবক দেবতাদের যৌবনও সে লাভ করিত। দেবতাদের মধ্যে যে তেজ বা অগ্নি থাকিত সেই তেজ বা অগ্নি সাহকে চির তেজোময় বা জ্যোতিমান করিয়া রাখিত।

যে-সমস্ত দেবতাপণ মিশরের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভুত্ব বা জমিদারি করিত তাহারা সকলেই কোনো-না-কোনো প্রাকৃতিক দ্রব্যের (যেমন নক্ষত্র, নদনদী, জল, হাওয়া ইত্যাদি) সঙ্গীভূত বা সংস্কীভূত ছিল। প্রাচীন মিশরের দেবতার কালক্রমে সংখ্যায় অসংখ্য—এমন-কি, মিশরের লোকসংখ্যাকেও ছাড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি, কার্যকলাপ এবং আকার-প্রকার বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহারা সকলে আদি কয়েকটি প্রাচীন দেবতা হইতে উদ্ভূত। বিশেষ-বিশেষ দেবতার আদি রূপটি স্থান এবং কালবিশেষে নানা-প্রকার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তাহাদের মূল



সমস্তি-নগরের প্রাচীন মিশরীয় ধারণার চিত্র

রূপের কতকগুলি চিত্র সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। জমির উৎকর্ষদাতা এবং মানব রক্ষা-কর্তা নাইল নদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবতার রূপে মিশরীয়দের পূজা পাইয়াছে। মিশরদেশের যেখানে নাইল নদ প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানে সূর্যমু দেবতা নাইলের অবতাররূপে সেই প্রদেশের পূজা লাভ করিয়াছে। নাইল-নদের 'উবিসিস্' হারমাক্তিডু প্রভৃতি বহু অবতাররূপী নাম আছে।

সমস্ত পৃথিবীকে তাহার নদ নদী, পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ইত্যাদি লইয়া একটি মনুষ্যাকৃতি দেবতার রূপে প্রাচীন মিশরীয়গণ বঙ্গনা করিয়াছিল। এই পৃথিবী দেবতার তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ছিল, ফ্‌টাহ্ (phthah) অ্যামন এবং মিত্তু। অ্যামন সারাল ক্ষেত্রসমূহের প্রতীকস্বরূপ ছিল, মিত্তু মরুভূমিসকলের উপর রাজত্ব করিত।

এই দুই দেবতার এই দুই বিশেষ গুণ অনুসারে সকল স্থানে ভিন্নভাবে পূজিত হইত না, অনেক স্থানে পূজাতে একের গুণ অন্তের ঘাড়ে লোকে চাপাইয়া দিত। অর্থাৎ অ্যামন, মিত্তু বলিয়া পূজিত হইত এবং মিত্তু অ্যামনের স্থানে দাঁড়াইত।

আকাশের দেবতাগণ প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। পুরুষ দেবতা ও স্ত্রী দেবতা। আকাশ 'হোরাস' বা 'অ্যান্‌হরি' নামে চলিত থাকিলেও ইহার সূর্য্য দেবতার সঙ্গে বিশেষ তফাৎ ছিল না। অনেক সময় কোনো-কোনো স্থানে সূর্য্যদেবতাকে আকাশ-দেবতা বলিয়া লোকে বঙ্গনা করিয়াছে এবং সেই মতন পূজাও করিয়াছে। কালক্রমে 'রা' অর্থাৎ সূর্য্যদেবতার সকল গুণাবলি হোরাস্

হরণ করিয়াছিল এবং হোরাসের বিবিধ নামে 'রা'ও কালক্রমে অভিহিত হইত। মিশরের অত্রান্ত নানা স্থানের লোকে নানা নামে আকাশকে পূজা করিত, উপর-মিশরে আকাশকে লোকে 'জারিট্' বানিত এবং নিম্ন মিশরে বলিত 'আনহরি'।

সকল দেবতাই নিজেকে সর্গস্বামী এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজা বলিয়া চালাইবার চেষ্টায় থাকিত, কিন্তু নিজ-নিজ নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া তাহাদের অত্র নোখান বিশেষ থাকিত না। স্ত্রী দেবতাদেরও এইপ্রকার অবস্থা ছিল।

আকাশ-দেবতা যখন সূর্য্যদেবের অর্থাৎ 'রা'এব সকল বিশেষণ হরণ করিত, তখন মিশরীয়েরা তাহাকে আকাশ-বিজয়ী মূর্তিতে বঙ্গনা করিত। সূর্য্যকরাই উহার প্রধান কাজ ছিল। উহার মাথার উপর খাড়া-খাড়া পালকের মনুট ছিল, এবং বর্ষাকে হাতে করিয়া শত্রুর ঘাড়ে কোপ মারিবার জন্ত তৈয়ার হইয়া এই আকাশ-দেবতা দিনের বেলায় সমস্ত আকাশে ভ্রমণ করিত। সূর্য্য-দেব 'মট্' নামে যেসকল স্থানে পরিচিত ছিলেন, সেই-সব স্থানেও ইহাকে যোদ্ধা-রূপেই বঙ্গনা করা হইয়াছে। মট্, নামা সূর্য্যদেবতার হাতে বশীর বসলে ততোয়ার আছে।



সাহ-ওরিন্

পুরুষ-দেবতার। যেমন বিশেষ-বিশেষ সহরে রাজার মতন সম্মান এবং পূজা পাইত, সেইপ্রকার স্ত্রীদেবতারও রাণীর মতন সম্মান ও পূজা পাইত। একই স্থানে বা সহরে একজন পুরুষ-দেবতা এবং একজন স্ত্রী-দেবতা বাস করিতে পারিত। পুরুষ দেবতা মিশরে প্রচুর-পরিমাণে

ছিল। এই দেবতারা সম্পূর্ণ পশুর মতনও ছিল এবং অর্ধ-পশু অর্ধ-মহুম্বাষ্কৃতিও ছিল। প্রাচীন মিশরীয়েরা কি কারণে যে এক-একটি পশুকে দেবতারূপে গ্রহণ করিত তাহা বলা বড় শক্ত। তবে মনে হয় যে কোনো-কোনো জন্তুর বিচিত্র স্বভাব বা ব্যবহার দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া তাহাকে পশুরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। শ্বশুপ কপির দল সূর্য্য উদয় হইবার পূর্বে এবং অস্ত যাইবার পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইয়া বিকট চীৎকার করে। এইজন্তু মিশরীয়েরা বলিত—

“ইহারা নিম্ন-জাতীয় দেবতা, উচ্চ দেবতা ‘রাকে’ অভিবাদন এবং বিদায়-সম্বায়ণ করিয়া থাকে।”

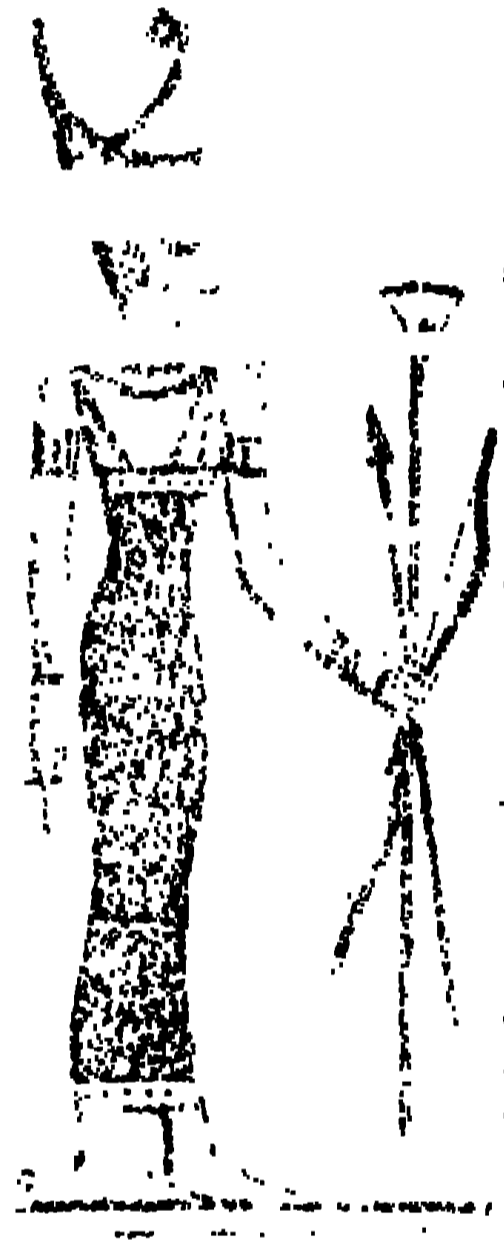
বহু-বহু প্রাচীনকালে ‘রা’ অর্থাৎ সূর্য্যকে ফড়িং বলিয়া বঙ্গনা করা হইত, কারণ সূর্য্য মাটি হইতে লাফ দিয়া বহু উচ্চে উঠিয়া থাকে এবং ফড়িং এর মতন পুনরায় মাটিতেই পড়িয়া যায়। নীলনদের দেবতাদের প্রায় ক্ষেত্রেই ভেড়া বা কুম্ভসার বলিয়া বঙ্গনা করা হইয়াছে। নীল নদের জল লাফাইয়া, ছুটিয়া যায়—এই-প্রকার ছুটিয়া যাওয়ার সঙ্গে ভেড়া এবং কুম্ভসারের চলার সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই বোধ হয় নাইল দেবতাকে কুম্ভসার বা ভেড়ারূপী মনে করা হইত।

জনাভূমি বা পাথুরে নদীর নিকটস্থ প্রদেশের লোকেরা



আনহরি

কুম্ভসারকে দেবতা বলিয়া পূজা করত। এইসমস্ত স্থানে কুম্ভসারের সংখ্যা অত্যন্ত সহজে বৃদ্ধি পাইত এবং লোক-জনের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের কারণ ছিল। প্রায় প্রত্যেক খাল-ভোবাতেই এক বা ততোধিক কুম্ভসার বাস করিত। কুম্ভসারকে শাস্ত রাখিবার জন্তু তাহাকে বলি (মানুষ এবং পশু দুইই) দেওয়া হইত। বলি না পাইলে কুম্ভসার ক্ষুধার্ত হইয়া নিজেই শিকার ধরিয়া খাদ্যেব জোগাড় করিয়া লইত। মিশরীয়েরা এই ভয়ে অল্পসবল জ্ঞান



মাইস-প্রদেশের নিত্-দেবী

কোনো পশু-দেবতাই চারাইয়া মনে করিল যে রীতিমত বলির সঙ্গে নিম্ন-মতন পূজা না পাইলে কুম্ভসারদেব ক্রুপিত হইয়া দেশ ধ্বংস করিবেন—অতএব কুম্ভসার-দেবের পাকা-পূজার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে শাস্ত রাখিবার বন্দোবস্তও হইয়া গেল। প্রাচীন মিশরে কুম্ভসার-দেবতা যত মানুষ-বলি ভক্ষণ করিয়াছে এমন আর

কোনো পশু-দেবতাই করিতে পারে নাই। শত বৎসর পূর্বে এক কুম্ভসার-দেবতার কাছে মানুষ-বলি নিম্নমতন দেওয়া হইত। যুদ্ধের বন্দী, অপরাধী ইত্যাদিদের এই পরম দেবতার সেবার কাখে লাগানো হইত।

প্রাদেশিক দেবতাগণ রাজ্য আরম্ভ করিবার সময় একলাই আরম্ভ করিত। এক প্রদেশের দেবতার সহিত অন্য প্রদেশের দেবতার একেবারেই সম্বন্ধ ছিল না। কালক্রমে প্রাদেশিক দেবতাগণের পরিবারবর্গও হয়। দেবতাগণ দুইটি করিয়া সহচরী সাধারণত গ্রহণ করিত। তবে অনেক প্রদেশের দেবতার এক স্ত্রী এবং এক পুত্র, এই লইয়াই পরিবার গঠিত হইত। অনেক স্থলে প্রাদেশিক দেবতার সহচরীকে একাধারে স্ত্রী এবং ভগিনী দুইই বলা হইয়াছে। নাইল জল-প্রপাতের দেবতা ‘কুম্ভসার’

দুইজন পরীকে বা স্ত্রী-দেবতাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। একজনের নাম “অমুকিত” ইহার কাজ ছিল ফিলাএ (Philae) এবং সাইনে (Syene) নামক স্থানে নাইল নদকে অবরুদ্ধ করা, আর-একজন ছিলেন ‘সাতিত’— ইহার কাজ ছিল নাইল নদীর জনকে তাঁরের মতন বেগে চাফিচা দেওয়া।

যেসকল প্রদেশে স্ত্রী-দেবতাব প্রভৃৎ ছিল, সেই-সকল দেশে সেই স্ত্রীদেবতার সঙ্গে দুইটি করিয়া পুরুষ-দেবতা থাকিত। একজন পতি অত্র জন পুত্র। সাইস-প্রদেশে “নি-ত” দেবী ওগিরিস্ দেবতাকে বিবাহ করেন এবং তাহারেব সিংহশাবক রূপী সন্তান হয়—ইহার নাম ছিল “আর-হস-নোফির”।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগ্দর্শন

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

একদিন পুণা-প্রভাতে ভগবান্ তথাগত ভারতকে যে সঙ্ঘ দান করলেন, কালে সারা এশিয়া যে সেই ধর্ম গ্রহণ করবে, তা অনেকের কল্পনাও আশেনি। সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নানান্ লোকে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধদেব একদল শক্তিশালী শিষ্য সংগ্রহ করেন, এমন-কি মগদের রাজা বিম্বিসারও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইরকমে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথম রাজ-আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। যখন খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হ’ল, তখন বৌদ্ধধর্ম পূর্বে ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল।

মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামে এক ভিক্ষু যখন বললেন—“তোমরা শোক করছ কেন? আর ত মহাশ্রমণ আমাদের এটা করো ওটা করো ব’লে বিরক্ত করবেন না। তখন মহাকল্প রাজা অজাতশত্রু সাহায্যে রাজগৃহে সপ্তপর্নী স্তূপে ৫০০ অর্হৎ একত্র ক’রে ত্রিপিটক সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন।*

এর ১০০ বৎসর পরে বৈশালী নগরে ভিক্ষুদের আর-একটি সভা হয়, তা’তেও ত্রিপিটকটি আবৃত্তি করা হয়। এই যে দুটি সঙ্ঘীতি হ’ল, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ করা যার দ্বারা ভিক্ষুরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করবে। বিনয়-সম্বন্ধে ও শীল-সম্বন্ধে নিয়মাদি সংগৃহীত

হয়েছিল ব’লে, ভিক্ষুগণ স্তম্ভের মতন ছবু’দি ভিক্ষু-পরামর্শ উপেক্ষা ক’রে নিজেদের বাচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

যে-পর্যন্ত না রাজা অশোক এসে নিজে এই ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন পর্যন্ত এরকম ক’রে সঙ্ঘ প্রচারিত হ’ছিল যদি “দেবানাং পিতৃ পিতৃদশী” নিজে সঙ্ঘকে আশ্রয় ক’রে তা’কে রাজধর্মের আসনে না বসাতেন, তবে বোধ হ বৌদ্ধধর্মের এত প্রচার হ’ত না। এর প্রচারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন ব’লে, তিনি দেশে বিদেশে এ প্রচার করতে পেরেছিলেন। কোথায়-কোথায় তিনি ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা’র বিবরণ তিনি নিজেই তাঁ শিলালিপিতে দিয়েছেন (Rock Edict No.13) তা’তে তিনি বলেছেন—“দেখানে গ্রীক রাজা অ্যান্টিওক (Antiochos) বাস করেন; ও তা’র উত্তরে যেখানে টলেম (Ptolemy), অ্যান্টিগোনাস (Antigonas) ম্যাগাস (Magasm), ও আলেকজান্ডার (Alexander) এই চার রাজা বাস করেন; এবং তাঁর সাম্রাজ্যে দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যে একেবারে তাম্রপর্নী নদ পর্যন্ত, ও তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে যোন, কাথোজ; ভো’ ও পতিনিক, অঙ্ক ও পুলিন্দদের মধ্যে”—* এই সঙ্ঘ তিনি প্রচার করেছিলেন।

* Kern’s Manual of Buddhism ৩৪৫।

* V. Smith’s Asoka—Rock Edict XIII.

এতদিন বৌদ্ধধর্ম পূর্বভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই-বার রাজা অশোকের সাধায্য পেয়ে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ সেই গণ্ডীর বাইরে বেতে লাগল। তা'র ইতিহাস আমরা ওপরেব শিলালিপিতে পেলুম। অশোকের রূপায় এ-ধর্ম এখন শুধু মগধে বদ্ধ নয়, দক্ষিণ ভারতে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য, এমন-কি সিংহল অবধি ছড়িয়ে পড়ল; এমন-কি, তিনটি মহাদেশে—পশ্চিম এশিয়া পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায়ও প্রসার লাভ করলে।

মহাবংশ সিংহলের ইতিহাস। কি-ভাবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করে, তা'র বিবরণ মহাবংশে আছে। অশোকের প্ররোচনায় যোগলিপিত তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলিত আহ্বান করেন। এই সম্মেলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়; কতকগুলি ভিক্ষু বিনয়-শাসনকে শিথিল করবার চেষ্টা করেন, তা'র ফলে এই উচ্ছৃঙ্খল ভিক্ষুরা ভিন্ন দল গঠন করে। যখন যোগলিপিতের অধীনে মহাসংঘের অধিবেশন হচ্ছিল ও ত্রিপিটকের আবৃত্তি হচ্ছিল—সেই সময় দল-চাড়া ভিক্ষুরা আলাদা একটি সভা করে নিজেদের জেদ বজায় রাখছিল। তা'রা এই সময় মহাস্থানিক বলে পরিচিত হয়। মূল সম্মেলিতে আরও স্থির হয় যে সম্রাট অশোক দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাবেন ধর্ম প্রচারের জন্ত।

সেই সভার মত-অনুযায়ী সম্রাট অশোক—সিংহলে, ব্রহ্মে, শ্রামদেশেও প্রচারক পাঠান। যদিও অশোকের শিলালিপিতে ব্রহ্মে বা শ্রামদেশে প্রচারক পাঠানোর উল্লেখ নেই, তবু স্থানীয় জনশ্রুতি বলে, অশোকের প্রচারকই এ-সব দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। অশোক নিজের পুত্র মহেন্দ্রকে ও কন্যা সজ্জমিত্রাকে সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে পাঠান। মহেন্দ্র তাঁর সঙ্গে ত্রিপিটক ও অনেক ভিক্ষু সঙ্গে করে নিয়ে যান। সজ্জমিত্রার সঙ্গে অনেক ভিক্ষুণী যান, তাঁরা গিয়ে রাজা তিস্তার কন্যাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি গয়ার বোধিধর্ম থেকে একটি শাখা সিংহলে নিয়ে যান। সেই শাখাটি অনুরুদ্ধ-পুবে রোপিত হয়, এবং সেইটিই এখনও বেঁচে আছে।

সাঁচির স্থূপে একটি ছবি আছে, তা'তে বোধিধর্মের শাখা সিংহলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটি আঁকা আছে। *

এইরকমে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভারতের বাইরে যেতে শুরু করলে। তাই ক্রমে এ ধর্ম চীন, জাপান, তিব্বত, তুর্কীস্থান ছেয়ে ফেললে।

কি করে যে বৌদ্ধধর্ম চীনে, তিব্বতে, জাপানে গিয়ে হাজির হ'ল তা'র ইতিহাস অনেকদিন থেকে অন্ধকারে ঢাকা ছিল। সেই কাহিনী কি করে আমরা জানতে পেরেছি? কেবল কয়েকজন পণ্ডিতদের শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে।

আগে তিব্বত দেশের কথাই ধরুন; এর প্রাকৃতিক অবস্থান এমনই যে সহজে হিমালয় পার হ'য়ে বা অন্তর্দিক দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। সেইজন্ত অনেক দিন যাবৎ তিব্বতের কোনো কথাই জানা যায়নি। শেষে ছ'একটি ভ্রমণকারী কেবল বেড়াবার সখে তিব্বতে প্রবেশ করেন, তাঁদের দ্বারা ই ক্রমশঃ তিব্বতের কাহিনী লোক চক্ষুর গোচরে আসে। ১৭৬২ সালে রোম সহরে Fr. A. Giorgi যখন তাঁর Alphabetum Tibetanum প্রকাশ করেন, তখনই তিব্বত-সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষায় প্রথম বই পণ্ডিতসমাজে হাজির হয়। সেইজন্ত আমরা বলতে পারি যে, এখন থেকে তিব্বতের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হ'ল। এর আগে জনকতক মিশনারী তিব্বতে যান। তাঁদের মধ্যে একজনও বোধ হয় ইংরেজ ছিলেন না। অনেক দেরীতে (১৮১১ সালে) Manning ব'লে একজন ইংরেজ সে-দেশে যান। তাঁকেই আমরা প্রথম ইংরেজ বলতে পারি। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তিনি তিব্বতের বিষয় আলোচনা করেননি, তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা সে-দেশের সমাজ, ধর্ম বা আচার ব্যবহাবের সম্বন্ধে কোনো ভালো খবর পাই-নে। † তিব্বত-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার শুরু হয় Alexander Cosma de Koros এর সময় থেকে। তাঁকে আমরা Father of Tibetan Studies ব'লি। Ladakএ কিছুকাল থাকবার পর, Koros এখানে

* Waddell Lamaism, p. 2.

† Macphail's Asoka স্তম্ভ।

তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ ১৮৩৪ সালে লেগেন। ইংরেজী ভাষাতে এই প্রথম তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ প্রকাশিত হ'ল। এ-সময় Koros বাংলা গবর্ণমেন্টের ও এসিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য পেয়ে ছিলেন। তা'র পরে তিনি তিব্বতে যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু দার্জিলিং-এ মারা যান। (১৮৪২)* তিনি তিব্বতী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। Asiatic Researches এ তিনি তিব্বতী বিশ্বকোষের Tanjur ও Khaygur এর বিস্তৃত তালিকা তৈরী করেন। তাঁর আনীত সেই বিশ্বকোষ এখনও এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে। তাঁর পর Hodgson নেপাল থেকে তিব্বতী বিশ্বকোষ সংগ্রহ করেন। এ যুগের ভ্রমণকারী ও লেখকদের মধ্যে আমরা Rockhill, Bower, Miss Taylor, ও Waddell-এর নাম করতে পারি। আমাদের দেশের রায় বাহাদুর শরৎদাস ও সতীশ বিদ্যাকৃষ্ণের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শরৎদাস ১৮৭৯ সালে প্রথম তিব্বতে যান, দ্বিতীয় বার তিনি ১৮৮১ সালে তিব্বতে গিয়েছিলেন। শরৎদাসের বৃহৎ তিব্বতী অভিধান তাঁর তিব্বতী জ্ঞানের ও শ্রমের পরিচয় দিচ্ছে। এইসব পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে তিব্বতের মতন দুর্গম দেশের অনেক তথ্য ও বৌদ্ধধর্মের পরিচয় আমরা লাভ করতে পেরেছি।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—একজন Siculo-Hungarian-এর কৃপায় আর চীনের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচয় হ'ল একজন ফরাসী পণ্ডিতের অমুকম্পায়। সেই ফরাসী পণ্ডিতের নাম—ABEL et REMUSAT. তিনি ১৮৩৬ সালে চীনা ভাষা শিক্ষা ক'রে চীনা ভাষা থেকে ফাংহিয়ানের ভ্রমণ-কাহিনী ফরাসী ভাষাতে অনুবাদ করেন। সেই সময় পণ্ডিত-জগৎ জানতে পারে যে বৌদ্ধ-চীন থেকে ধর্মের টানে ভিক্ষুরা আস্ত ভারতে তীর্থস্থান

গুলি দর্শন করতে।* তাঁর পর ১৮৪৩ অব্দে Stanislas Julien নামে আর একজন ফরাসী পণ্ডিত ভ্রমণ-কাহিনী-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চীনা ভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করেন। তাঁদের পরে দু'-একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই Sinology-র গেষ্ট দেখা দেন—যেমন Beal et Giles. Beal সাহেব ১৮৬৯ সালে ফাংহিয়ান ও ১৮৮৪ সালে ভ্রমণ-কাহিনী ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদ করেন। Giles ৭ ১৮৭৭ সালে ফাংহিয়ান অনুবাদ করেন। এ ভ্রমণ-কাহিনী-গুলি ইংরেজীতে অনূদিত হওয়াতে অধিক সংখ্যক পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ-ছাড়া চীনের বৌদ্ধ-ধর্ম-সম্বন্ধে ১৮৭৩ সালে Dr. E. J. Fitel—Buddhism ও পরে Hand book for the Student of Chinese Buddhism লেগেন। Edkins (১৮৮০) ও Beal (১৮৮৪) এর চীনা বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধে বইও উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগের চীনা ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে শাভান্ (Chavannes) পেলিও (Pelliot) ও সিল্ভিয়া লেভী (S. Levi) সাহেবের নাম করা যেতে পারে। এইসব পণ্ডিতদের সাহায্যে চীনা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করেছি।

আগেই বলেছি, কিভাবে অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম তিনটি মহাদেশে প্রসার লাভ করলে। অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মের যদিও সমৃদ্ধির যুগ, তবুও সেই প্রসারের সময়েই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দলে দলাদলি দেখা দিয়েছিল।

অশোকের সাম্রাজ্য যদিও পঙ্গু হয়ে গেল, তবু তিনি বৌদ্ধধর্মকে যে রাজ্যসন দিয়েছিলেন, তা থেকে কেউ তা'কে অনেক দিন পর্যন্ত নামাতে পারেনি। তা'র পর শকরাজ কর্ণিক সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তা'কে রাজ্যসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই কৃপান বা ইউচি জাতি আগে

* Burnouf ১৮৪২ অব্দে চীনা বই *Miao-fu-lien-hua King* ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন, সেটি Lotus of the Good Law—সঙ্কল্পপুণ্ডরীক বই।

† Beal সাহেব London এ University College এ চীন ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চীন ভাষা থেকে A Catena of Buddhist Scriptures ও the Romantic Legend of Sakya Buddha. (Edkins Chinese Buddhism p. 3) সংকলন করেন।

* Waddell Preface xii.

† তিনি College de France এ চীনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বই—Foe Koue Ki—Relation of Buddhist Kingdoms.

(Xus নদীর ধারে বাস করত, ক্রমশঃ নানা কারণে তা'রা ভারতের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে আসে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এসে তা'রা রাজ্য স্থাপন করবার চেষ্টা করে ও কালে পশ্চিমভারতে কুশান সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পরে বৌদ্ধ-ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতির চেষ্টা করে।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ইতিহাসে পশ্চিম ভারত অনেক সাহায্য করে। এই পশ্চিম ভারত অর্থাৎ পাঞ্জাব, আফগানিস্থান ও কাশ্মীর অনেক বিভিন্ন জাতির মিলন-ক্ষেত্র ছিল। এখানে গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানরা, শকেরা, ভারতীয়েরা ও এসিয়ার অন্যান্য জাতি একসঙ্গে মেলা-মেশা করিতে পারত। আর এইখানকার লোকেরাই নানা দেশ-বিদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত।

কণিক বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য নানা বিহার ও মঠ স্থাপন করেন। তাঁর সময়েই জনস্বর্ষে বৌদ্ধ সংঘের চতুর্থ সঙ্ঘীতির অধিবেশন হয়। এই সভাতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে দলদলিটা ঠিকভাবে জ'মে গঠে। এর পর থেকেই তা'রা ছ'টো বড় দলে বিভক্ত হ'য়ে গেল; যারা মহাযান মতের তা'রা বললে—নির্ঝাণ সবাই লাভ করিতে পারবে, সেটি কারুর জন্মে বিশেষভাবে রক্ষিত নয়। কিন্তু হীনযানরা বললে—না, নির্ঝাণ কেবল বিশিষ্ট কয়েকজনের জন্য, সবাই এমন সৌভাগ্য করেনি যে নির্ঝাণের যোগ্য হবে। হীনযান গিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম দেশে ও মহাযান পূর্ব এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

পশ্চিম ভারত মহাযান মতের একটি প্রধান আড্ডা হ'য়ে দাঁড়াল। তাই এখান থেকে যে-যে দেশে বৌদ্ধধর্ম গেল—সেই-সেই দেশেই মহাযান মত এখনও প্রচলিত আছে।

চীনদেশে যে বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ গিয়ে পড়ল, সেই প্রবাহের উৎপত্তি-স্থান এই পশ্চিম ভারতেই। কুশানরা এই প্রচার কার্যে অনেক সহায়তা করেন। তাঁদেরই রাজসভা থেকে নাকি একজন দূত প্রথম চীনদেশে গিয়ে সেখানে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। তবে আচার্য্য সিলভা লেভী বলেন*—তিনি কুশান রাজসভা থেকে

গিয়েছিলেন বটে, তবে আসলে তিনি চীনরাজেরই দূত কুশান দূত নন। তিনি চীন থেকে কুশান রাজ্যে এ বুদ্ধের বাণীতে নিজেরই মুগ্ধ হ'য়ে, চীনে ফি'রে গিয়ে সে বাণী প্রচার করেন। এই চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ।

এর কিছু দিন পরে চীনের Ming ব'লে এক রাজ স্বপ্ন দেখেন যে—স্বর্গ থেকে এক সাধুপুরুষ তাঁর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। স্বপ্নের অর্থ কি জিজ্ঞাস করায় পণ্ডিতরা বললেন—এর মানে হচ্ছে যে ভারতবর্ষ থেকে একজন সাধু আসবেন—যিনি চীনে কিছু নতুন জিনিষ দেবেন। Ming রাজা এ-কথা শু'নে দূত পাঠালেন— ভারতবর্ষ থেকে সেই অজানা মহাপুরুষকে আনতে। অনেক পাহাড়পর্বত অতিক্রম করে মক্কায়ির বালুশিখর মধ্য দিয়ে, সেই চীনের রাজদূত গাঙ্গারে এসে উপস্থিত হলেন। গাঙ্গারে তাঁর দেখা হ'ল এক ভারতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে তাঁর নাম—মাতঙ্গ; কাশ্মপ-কুলে তাঁর জন্ম। তাই চীনা বইতে তিনি কাশ্মপ মাতঙ্গ নামে অভিহিত। তাঁর বাড়ী মগধ দেশে, মগধ থেকে তিনি গাঙ্গারে এসেছিলেন। সেই চীনা-দূতের কথায় (যার নাম হচ্ছে—Tsai-yin) কাশ্মপ-মাতঙ্গ কতকগুলি বৌদ্ধ পুঁথি ও বুদ্ধের মূর্তি নিয়ে সেই দূতের সঙ্গে চীনদেশের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে রাজা Min 'ti তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর থাকবার জন্মে ব্যবস্থা ক'রে দেন। খুব শীঘ্রই তিনি রাজ্যের অহুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজা তাঁকেই নিজের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন।

তিনি সম্ভবত ৬৭ অব্দে চীনে যান, কিন্তু Hsueh সাহেব বলেন ৭১ অব্দে। সে যা হোক এটি ঠিক যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে গিয়েছিল।

তিনি Po-Mash বা শ্বেত-অশ্ব মঠে (Lo-yan তে) একখানি বৌদ্ধধর্ম চীনাভাষায় অহুবাদ করেন।* তিনিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় পণ্ডিত যিনি চীনাভাষায়

* সে বইটি—Sutra of Forty-two Sections (Edkins —p 88)

বৌদ্ধ বই অনুবাদ করেন। সেই মঠেতেই এর কিছু দিন পরে তিনি মারা যান*।

এইরকমে ভারত থেকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্মের প্রবাহ সেই সূত্র চীনদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। যে বৌদ্ধ-ধর্ম সে-দেশে গিয়ে হাজির হ'ল সেটা মহাযান মতের। কারণ সে-ধর্ম সেই গাফার দেশ থেকে এসেছিল, যেটি কপিঙ্কের অধীনে ছিল, এবং যেখানে মহাযান মতের প্রাদাণ্ড প্রচলিত ছিল।

স্বপ্নের বিষয় সে-সময় কাশ্মপ-মাতঙ্গ ছাড়াও ভারতে এমন লোক ছিলেন, যারা স্বচ্ছায় নিজেদের দেশ ছেড়ে সেই অজানা দেশে যেতে স্বীকৃত হন। তাই দেখি যে কাশ্মপ-মাতঙ্গের কিছু পরেই আর-একজন ভারতবাসী ভিক্ষু চীনে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে—ধর্মরক্ষ। সেই শ্রমণের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে। তিনি বিনয়-পিটকে খুব পারদর্শী ছিলেন। চীনদেশ থেকে যখন তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ এল সে-দেশে যাবার জন্যে তখন তাঁর রাজা তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু তাঁর যাবার ইচ্ছাটা খুব বেশী ছিল, তাই রাজাকে না ব'লে লুকিয়ে তিনি চীনদেশে গেলেন—কাশ্মপের যাবাব কিছু পরেই। চীনে গিয়ে তাঁর কাশ্মপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তাই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্যে তাঁরা দুজনে মিলে একখানা বৌদ্ধসূত্রের অনুবাদ করেন। সেটি বুদ্ধকথিত একখানি সূত্র, চীনা ত্রিপিটকের ৬৭৮নং পুঁথি (See Nanjio's Catalogue).

কাশ্মপ-মাতঙ্গের মৃত্যুর পরও, ধর্মরক্ষ তাঁর কার্যে শিথিলতা দেখাননি। তা'র পরেও (৬৮—৭০ অব্দে) তিনি পাচখানি বৌদ্ধ বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন, কারণ সে-সময় চীনা ভাষায় বৌদ্ধ বই এমন ছিল না, যা পড়ে চীনের ধর্ম-পিপাসুরা শাস্তি পেতে পারে। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রসারের প্রথম যুগে ভারতীয় শ্রমণদেরই অনুবাদ-কার্যে হাত দিতে হয়েছিল। পরে তাঁরা চীনা শ্রমণদের সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি (১) বুদ্ধচরিত সূত্র (২) দশভূমি-ক্লেণ-ছেদিক সূত্র (৩) ধর্মসমুদ্র-কোষ সূত্র (৪) একটি জাতক (৫) ও শীল বিষয়ে সূত্র অনুবাদ

করেছিলেন। কাশ্মপ-মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ সম্ভবতঃ একই মঠে বাস করতেন। Lo-yan-এর সেই মঠে ধর্মরক্ষ ৬০ বছর বয়সে মারা যান।

তা'র পরে যারা চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রাণীপটি জালিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে (১) মহাবল, (২) ধর্মকাল, (৩) বিঘ্ন, (৪) কলাগক্ণ, (৫) কলাগ। এদের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এসব ভারতবাসী শ্রমণ ছাড়া আরও অনেকেই চীনে এসেছিলেন ও নানা বৌদ্ধ বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

মহাবল ১২৭খৃঃ অব্দে পুন্ড্রি চীনে আসেন। তিনি একজন তিব্বত-প্রবাসী ভারতীয় ভিক্ষুর সহিত একখানি বৌদ্ধসূত্র অনুবাদ করেন। সেই সূত্রখানি আর-বিঘ্ন নয়, শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনী।

ধর্মকাল ২২২ খৃঃ অব্দে চীনে যান। তাঁর বাড়ী ছিল মধ্যভারতে। চীনদেশে এসে তিনি দেখলেন যে চীনের বৌদ্ধরা বিনয়ের নিয়ম-কাঠন জানেন না। তাই তিনি ২৫০ অব্দে বিনয়-সম্বন্ধে বই প্রাতিমোক্ষ অনুবাদ করেন। এর আগে বিনয়-সম্বন্ধে কোনো বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি, এইটিই বিনয়-সম্বন্ধে প্রথম বই।

বিঘ্ন—একজন ভারতীয় শ্রমণ। তিনি প্রথমে সূত্র-উপাসক ছিলেন, পরে স্বদম-তাগ ক'রে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর তিনি সেই ধর্ম প্রচারের জন্যে চীনদেশে আসেন। আসবার সময় তিনি ধর্মপদসূত্রের একখানি পুঁথি নিয়ে আসেন। ২২৪ অব্দে তিনি আর-একজন ভারতবাসী শ্রমণের সাহায্যে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। চীনা ভাষায় অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। একে চীনা ভাষা খুব শক্ত, তা'তে চীনদেশে গিয়েই অনুবাদ করতে হ'লে, কাজটি আরও শক্ত হ'য়ে পড়ে। তবু এটা খুব গৌরবের কথা, যে, ভারতের লোকেরা চীনদেশে গিয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যে চীনের মতন শক্ত ভাষা আয়ত্ত করতেন এবং সেই ভাষাতেই বই অনুবাদ করতেন। বিঘ্ন নামে শ্রমণটি অল্পদিন চীনে গিয়েছিলেন ব'লে, চীনা ভাষায় তত দখল তাঁর হয়নি। তবু তিনি ও তাঁর বন্ধু চীনাভাষায় ধর্মপদটি অনুবাদ করেছিলেন! তা'র ফল হয়েছিল এই যে অনুবাদের ভাষাটি কিছু

* Nanjio's Catalogue, Appendix.

কটমট হয়েছিল। তাঁর জীবনী-লেখক স্বীকার করেছেন যে যদিও ভাষাটি শক্ত হয়েছিল, তবু তাঁর উদ্দেশ্য সাধু ছিল; তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন মূল পুঁথির ভাবটি রক্ষা করতে।

কল্যাণরূপ ২৫৫ অব্দে চীনে গিয়ে “সঙ্ঘসমাধি-সূত্র” চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। কল্যাণ-নামে আর-একটি শ্রমণ ভারত থেকে যান ও ২৮১ অব্দে একটি সূত্র অনুবাদ করেন (See Nanjio's Catalogue)

এইরকমে ভারত থেকে এক-একটি সূত্র গিয়ে যা নিচ্ছিল চীনের জাতীয় জীবনে। সেই যা খেয়ে একটা সাড়া পড়েছিল তাদের মধ্যে। তা'রা স্থির হ'য়ে ভাবতে শুরু করেছিল, কোন্টা তা'রা নেবে—কনফুসিয়সের (Confucius) গুরাণ ধর্ম, না বিদেশী বৌদ্ধধর্ম। ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সেখানে গিয়ে বলছিলেন—“বুদ্ধে শরণ লও, সংঘে শরণ লও, তা হ'লে নিষ্কাম পাবে।” এই ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁরা চীনে নিজেরা হাজির ছিলেন। সেইজন্য এই দুটো ধর্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল।

ভারত থেকে বৌদ্ধরা যখন চীনে যেতেন, তখন পথে পড়ত পূর্ব তুর্কীস্থান। আগে সেটা মরুভূমি ছিল না, সেখানে বেশ বড়-বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেমন বালুরাশির ঢেউ এসে সে দেশে ঢুকল, তখন থেকে দেশটি মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটি ওয়েসিস্, আর সেই ওয়েসিস্ নিয়ে এক-একটি রাজ্য। এই ভীষণ মরুভূমি পার হবার সময় এই ওয়েসিস্গুলো খুব সাহায্য করত। সেখানে শ্রান্ত পথিকেরা আশ্রয় পেত। তাই চীন, তিব্বত এই ছোটো রাজ্যগুলো জয় করবার খুব চেষ্টা করেছিল। চীনের পথের এই আশ্রয়-গুলি এইরকমে বৌদ্ধ আড্ডা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, মাঝে-মাঝে, বোধ হয়, দু'-একটা বৌদ্ধ মঠও গড়ে উঠেছিল। এইরকমে এই জনপদগুলির একধারে চীন, অপর ধারে গ্রীস ও অণ্ড ধারে ভারতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এখানে এই তিন সভ্যতা মিলে এক নতুন সভ্যতা গড়েছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের প্রভাবে ক্রমে-ক্রমে এ স্থানটিও বৌদ্ধ হ'য়ে উঠল। সম্ভবতঃ খৃঃ তৃতীয়

শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। সে-সময় এখানকার অবস্থা কি-রকম ছিল, বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কি-রকম ঘটেছিল, তার ছবি আমরা সার আউরেল্ স্টাইন্ সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে এই মরুভূমির বালুরাশির মধ্য থেকে কত বৌদ্ধ চিত্রকলার নমুনা, কত পালি, সংস্কৃত পুঁথির ছিন্ন পত্র, কত ধংসাবশেষ আমাদের চোখের সামনে আসছে। (See Stein's Sand-Buried Ruins of Khotan and Ancient Khotan.)

যদিও বৌদ্ধধর্ম ১ম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম প্রবেশ করলে, তবু সেদেশে যথার্থ স্থান লাভ করতে তা'র ২০০-৩০০ বৎসর লেগেছিল। এর কারণ কনফুসিয়সের (Confucius) ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষ। সে-দেশে এধর্ম এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা'র স্থান অধিকার করতে বৌদ্ধধর্মকে অনেক বিরোধের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সেই বিরোধের ইতিহাস—দুই শতাব্দীর চানেরই ইতিহাস। একদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চেষ্টা, অপর দিকে কনফুসিয়সের (Confucius) শিষ্যদের চেষ্টা। যে-পন্থায় বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে রাজ্যসনে স্থান পায়নি, সেইপন্থায় এই-রকম বিরোধ চলছিল। এটি সম্ভবপর হয়েছিল যখন চীনে আর-একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার তারিখ—৩৫০ অব্দ। পূর্ব তুর্কীস্থান ও চীনের মাঝে একজাতীয় লোক বাস করত। তা'রা তিব্বতী জাতীয়। এই চতুর্থ শতাব্দীতে তা'রা সেই স্থান থেকে এসে চীনদেশ দখল করে ও একটি নতুন রাজবংশ স্থাপন করে। সেই বংশের নাম পূর্ব Tsin রাজবংশ। ভাগ্যক্রমে এই রাজবংশ বুদ্ধদেবের ভক্ত হ'য়ে পড়েন। তা'রই ফলে বুদ্ধদেবের ধর্ম চীনে আরও বেশী প্রসার লাভ করে। দেশের লোকেরা যখন দেখলে, যে তাদের রাজাই ভারতের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন, আর তা'র প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তখন তারাও আন্তে-আন্তে নিজদের ধর্ম ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'তে লাগল। এই-রকমে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ বৌদ্ধধর্ম আর বুদ্ধের প্রচারিত

প্রথম বৌদ্ধধর্মের অনেক তফাৎ আছে। এ বৌদ্ধধর্ম গাঙ্কার বৌদ্ধধর্ম বা মহাযান-মতের বৌদ্ধধর্ম।

ক্রমে চীনদেশে মঠ স্থাপনা হ'তে লাগল, ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমে-ক্রমে বাড়তে লাগল। ৩৬৩ সালে একজন চীনা শ্রমণ—Lo-I'souen, একটি ছোটো মঠ এক পাহাড়ের গুহায় স্থাপন করেন, কালে সেটি এক বিরাট মঠে পরিণত হয়।*

ভারত থেকে বে-ধর্মপ্রবাহ তুর্কীস্থান হ'য়ে চীনে গিয়ে লেগেছিল সেটি আরও ক্রমশঃ পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। চীনে যখন বৌদ্ধধর্ম রাজাসন পেলে, তখন সেটি কোরিয়াতে খাবার চেষ্টা করলে। সেই প্রচার-কাজটি ভার নিয়োঁছিলেন একজন চীনা ভিক্ষু। ৩৭৩ অব্দে তিনি চীনদেশ থেকে কোরিয়াতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কোরিয়াতে শীঘ্রই এ ধর্ম প্রসার লাভ করলে।

এবার ধর্মের গতি আরও পূর্বদিকে যেতে লাগল। কোরিয়া থেকে ক্রমে ৩টি জাপানে প্রবেশ লাভ করলে। এই সুধা-উদয়ের দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হ'ল—তখনকার তারিখ—৫৫২ খৃঃ অব্দ। সেই সময় কোরিয়ার পুনরা বিভাগের রাজা জাপানের সম্রাটকে এক বুদ্ধমূর্তি ও থানকয়েক ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে জাপানের সম্রাটের বুদ্ধদেবের ধর্মের উপর শ্রদ্ধা জন্ম। এর পর ৬২৫ অব্দে আর-একজন ভিক্ষু কোরিয়া থেকে জাপানে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, এবং দুটি সম্প্রদায় গঠন ক'রে যান। এইবদমে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করলে। ৬৫৩ সালে জাপান থেকে একজন ভিক্ষু চীনে যান এবং হুয়েনসাং-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধর্ম-বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রে জাপানে ফি'রে আসেন। এইভাবে জাপানে ক্রমে-ক্রমে ১২টি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তার ইতিহাস বি জ্ঞান্জিও তাঁর A Short History of the Twelve Japanese Buddhist Sects বইতে সুন্দর ভাবে দিয়েছেন। সেই ১২টি সম্প্রদায়ের নাম—

- (১) কু সা-সু (অভিধর্ম-কোষ। শাস্ত্র সম্প্রদায়)
- (২) জো-জিৎসু-সু (সত্যসিদ্ধি " ")
- (৩) বিসু (বিনয় " ")

(৪) হসু-সা-সু (ধর্ম-সঙ্গ " ")

(৫) সান-রগ-সু (ত্রিশাস্ত্র ")

(৬) কে-গণ-সু (অবতং শক-সু ")

(৭) তেন-দাই-সু (তেনদাই ")

(৮) সিন গণ-সু (মন্ত্র ")

(৯) জোদ-সু (পবিত্র ভূমি ")

(১০) সেন সু (সমাধি ")

(১১) সিন-সু (সত্য ")

(১২) নিচিরেণ-সু (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক-সু ")*

এইরকমে বৌদ্ধধর্ম মগল থেকে মাঝে ভারতবর্ষে, গাঙ্কার থেকে তুর্কীস্থান ও চীনদেশে, চীন থেকে কোরিয়ায়, কোরিয়া থেকে জাপানে বিস্তৃত লাভ করে। এতে এনিয়াব বেশী অংশ একটা সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। যদিও ভারতবাসী, চীনা, জাপানীরা ভাষায়, ভাবে, আদর্শে আলাদা, তাদের মতামতলনের কোনো সম্মিলন নেই, তবু এই এক ধর্ম-বন্ধন সবাইকে আপন হ'তে আপন ক'রে দিলে।

এইবার আমরা আলোচনা করব কি ক'রে এ ধর্ম তিব্বতে প্রবেশ লাভ করলে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের বিষয় আধুনিকদের মধ্যে Dr. L. Austine Waddell, M. B. তাঁর The Buddhism of Tibet or Lamaism বইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন (১৮৯৭)।

যখন চীন, কোরিয়া বৌদ্ধধর্মকে নিজেদের ধর্ম হ'লে গ্রহণ করলে, তখনও তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের বিষয় ততটা সজাগ ছিল না। তিব্বতের দক্ষিণে হ'ল ভারতবর্ষ, যেখানে বৌদ্ধধর্মের জন্ম-স্থান, তা'র উত্তরে হ'ল চীন আর পশ্চিমে হ'ল তুর্কীস্থান—যারা খুব শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম নিয়োঁছিল। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে, তিব্বতের এই কয় পাশে বৌদ্ধ প্রভাব থাকলেও—অনেক দিন সে-প্রভাব তা'র জাতীয় জীবনে দেখা দেয়নি।

মহান যখন আরবে নিজের ধর্ম প্রচার করছিলেন, তখন তিব্বতে এমন-এক রাজা ছিলেন, যিনি দেশটিকে ঠিক ক'রে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। তার চেষ্টা তত সফল না হ'লেও, সেটা তাঁর পুত্রের জীবনে সফল হয়।

* Chavannes—Les Chinois Voyageurs অষ্টব্য।

* জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়—জগজ্যোতিঃ সমভাগ, ১৫ সংখ্যা, ১০৩পৃষ্ঠা।

তার পুত্রের নাম হচ্ছে—Sron Tsan Gampo। তিনি ছিলেন খুব বড় বীর। তাঁর সময়ে তিব্বতে Bon ধর্ম প্রচলিত ছিল, সেই ধর্ম চীনের Taoism-এর অনেকটা অনুরূপ। সম্ভবত চীন থেকেই সেটা আমদানি করা হয়েছিল। নতুন রাজা আগে নিজের রাজ্য গুছিয়ে নিয়ে, চীনের সঙ্গে লড়াই করতে যান। চীনের প্রান্তভাগ আক্রমণ করে তিনি চীনের তখনকার রাজা Chitsung-luntsanকে এত বাতিবাত্ত করে তোলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। আর সন্ধির শর্তে অল্পসংখ্যে ৬৩২ অব্দে তিব্বতের রাজার সঙ্গে তাঁর বক্সা Wenchang-এর বিবাহ দেন।

তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল, এই বিবাহকে আমরা তাঁর অত্যন্ত কারণ বলে ধরতে পারি। আর-একটি কারণ হচ্ছে নেপালের রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ। চীনের রাজকুমারীকে বিবাহ করার ছ'বছর আগে তিনি নেপালের রাজা অশ্বমেধের কন্যা ভুকুটী দেবীকে বিবাহ করেন। এই ছ'ই রাজকুমারী বৌদ্ধ ছিলেন বলে তাঁরা শীঘ্রই রাজাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। আর রাজা নিজেই নেপালের রাজকুমারীকে বিবাহ করার সময় স্বীকার করেছিলেন যে—তিনি কোনো বিনয়ের নিয়মাদি পালন করেন না। তবে যদি নেপালের রাজা তাঁকে কন্যা সম্ভ্রদান করেন তবে তিনিও ভগবান্ বুদ্ধের শরণ নেবেন এবং দেশের মধ্যে ৫০০০ মঠ তৈরী করে দেবেন। রাজার বয়স যদিও অল্প ছিল, তবু বৌদ্ধধর্ম দেশে প্রচার করার জন্তে দ্বিধা ছেড়ে করেছিলেন। আর তিনি ভারতে, নেপালে ও চীনে লোক পাঠালেন বৌদ্ধ-পুঁথি ও প্রচারক আনবার জন্তে।

যাকে তিনি ভারতে পাঠালেন, তা'র নাম—Thonmi-Sam lhota। সম-ভোট হচ্ছে তাঁর সংস্কৃত উপাধি, তা'র মানে সম ভোট অর্থাৎ সম তিব্বতী। তাঁর আসল নাম—Thonmi, তিনি Anur পুত্র। তিনি কবে ভারতের দিকে যাত্রা করলেন, বা কবে ফিরলেন তা'র সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে কারও মতে তিনি ৬৩২ অব্দে ভারতের দিকে যাত্রা করেন আর ৬৫০ সালে ফিরে আসেন। সম্ভবতঃ ছ'হেনসাং যখন ভারতে আসেন,

তিনিও তাঁর সমসময়ে এদেশে আসেন। ভারতে তিনি অনেক বছর ছিলেন, আর লিপিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্ সিংহ নামে পণ্ডিতের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফেব্রুয়ার সময় তিনি সঙ্গে অনেক বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে আসেন। তিনি তিব্বতী অক্ষরের সৃষ্টি করেন—অর্থাৎ সে-সময় ভারতে যে-লিপি প্রচলিত ছিল—তাই একটু বদল করে নেন। আর সেই অক্ষরে একখানি ব্যাকরণ তৈরী করেন। এ-ছাড়া তিনি আরও দু'একখানা বৌদ্ধ বই তিব্বতী ভাষায় তর্জমা করে কেলেন।

ভারতবর্ষ থেকে সে-সময় কুশর (কুমার ?) ও শকর ব্রাহ্মণ ব'লে দুটি বৌদ্ধ ভিক্ষু, নেপাল থেকে শিলমঞ্জু, তিব্বতে যান। তাঁরা ছাড়া চানদেশ থেকে ও কাশ্মীর থেকেও প্রচারক আসেন।

এসব চেষ্টার ফল এই হ'ল যে, এই রাজার মৃত্যুর পর, রাজা দেবই প্রাপ্ত হলেন। লামারা বললে যে, তিনি স্বয়ং অবলোকিতের অবতার। এ-ছাড়া তাঁর যে দুই স্ত্রী ছিলেন তারাও মৃত্যুর পরে সেই অবলোকিতের স্ত্রী তারার অবতাব বলে গণ্য হলেন।

তাঁর ১০০ বছর পরে আর-এক রাজা তিব্বতের সিংহাসনে বসেন, তাঁর নাম—Thi-Sron-Detsan। তাঁর মা বৌদ্ধ ছিলেন বলে তাঁর গোড়া থেকেই বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব বেশী টান ছিল। আর সেইজন্ত তিনি এ-ধর্মের উন্নতির জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁর যে রাজপুত্র ছিলেন তাঁর বাড়ী ছিল ভারতে। তাঁর নাম—শাস্তরক্ষিত। শাস্তরক্ষিত পরামর্শ দেন যে—নালন্দার মঠে “পদ্মসম্ভব” বলে যে বৌদ্ধ পণ্ডিত আছেন তাঁকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ করতে। পদ্মসম্ভব যে বৌদ্ধ-মলের মধ্যে ছিলেন সেটি হচ্ছে—তান্ত্রিক ঘোষাচার্য্য-দল।

যখন তিব্বতের রাজার কাছ থেকে সেই ডাক এল, পণ্ডিত পদ্মসম্ভব আনন্দের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এই পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের কাহিনী তিব্বতের অনেক বইতে পাওয়া যায়। তা'তে দেখা যায় যে—উদ্যান (কাশ্মীর) দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে—ইন্দ্রবোধি। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে রাজ্যের মধ্যে শোকের প্রবাহ বায়ে যায়। রাজ্যের অবস্থাও খারাপ হ'য়ে যায়। তখন

প্রজাবা ভগবান্ বুদ্ধদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল—
যাতে এ মল্ল অবস্থা থেকে তাঁরা উদ্ধার পায়।

সেই রাত্রে রাজা এক স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বজ্র তাঁর
হাতে এসেছে। পরদিন তাঁর পুরোহিত বলেন যে, এক
সরোবরে রাজ্যের উদ্ধারকর্তা পদ্মের উপর জন্মেছে।

রাজা সেই পদ্মের কাছে গিয়ে দেখেন, যে একটা পুকুরে
পদ্ম ফুটে আছে, আর তাতে একটি সুন্দর ছেলে বাঁসে
আছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি?
সে উত্তর দিলে—ভগবান্ শাক্যমুনির আদেশে আমি
এসছি। রাজা তখন তাঁকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে রাখেন।
ছেলেটির নাম হ'ল—সরোকহ বজ্র। তিনিও ছেলেবেলায়
আমোদ-আহ্লাদ ভালোবাসতেন না, তাই রাজা তাঁর
বিবাহ দিয়ে সংসারে তাঁকে বাঁধতে চেষ্টা করলেন।
একবার সেই ছেলেটি বৌদ্ধধর্মের শত্রু কুরুকণ্ডলা প্রজাকে
হত্যা করেন। তাতে প্রজারা রাজাকে বলে—এ কুমারকে
তাড়িয়ে দিন। তাতে তাঁর নিক্রাসন হয়। রাজা থেকে
নিক্রাসিত হ'য়ে তিনি নানা স্থানে বেড়ান, আর অনেকের
কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। যখন তিনি লাঙ্গোরে
ছিলেন, সেখানকার রাজকুমারী তাঁকে দেখে বিবাহ করতে
চান—কারণ তিনি তাঁর মনের মহা স্বামী পাননি। তাঁর
সঙ্গেই শেষে রাজকুমারীর বিবাহ হয়। রাজকুমারীর
নাম হচ্ছে—কুমারী দেবী। তিনিই পদ্মসম্বরের সঙ্গে-
সঙ্গে তিব্বতে ভ্রমণ করেছিলেন। এ-রকম আরও অনেক
গল্প তাঁর সম্বন্ধে তিব্বতে প্রচলিত আছে। পদ্মে তাঁর
জন্ম বলে তাঁকে পদ্মসম্বব বলা হয়।

তিব্বত দেশে পণ্ডিত পদ্মসম্বরের যে ছবি আছে,
তাতে দেখা যায় যে—তিনি উদ্যান-দেশের পোমাক প'রে
আছেন, তাঁর দক্ষিণ হাতে একটা বজ্র আর বাম হাতে
একটা মাথার রক্তের খুলি। আর বগলে একটা ত্রিশূল—
সেটা একটা মাহুকের মাথায় বিদ্ধ। তাঁর দু'পাশে তাঁর
দুই স্ত্রী—তাঁকে রক্ত আর মদ্য মডার মাথার খুলি ক'রে
দিয়েছে। তাঁকে পূজা করবার সময়ও নরবলি দেওয়া হয়।
এইরকমে তাঁর তান্ত্রিক মূর্তিটা যেন ফুটে উঠেছে।

৭৪৭ অব্দে তিনি তিব্বত দেশে যখন হাজির হলেন,
তখন তিব্বতের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা

করলে। তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নতুন স্বরূপ
দেন, তাঁকে আমরা লামাদের বৌদ্ধধর্ম বলাব।
তাই তাঁকে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা
যেটো বৌদ্ধধর্ম সেনেগে বেশী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত
না। তিনি
বৌদ্ধধর্মের মতো তান্ত্রিক অংশ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।
৭৭৯ অব্দে তিনি Sam-yas এ একটি মঠ স্থাপনা করেন।
এ-সময় রাজত্বক পণ্ডিত শাস্ত্রবক্তিত তাঁকে খুব সাহায্য
করেন। এই যে মঠটি তৈরী হ'ল, এর খানসহ হ'ল
৩৩৩পুণের বিহার। এ-বিধাবেই প্রথম মঠাঙ্ক হ'লেন—
শাস্ত্রবক্তিত। এখানে তিনি ১৩ বৎসব আছেন। তাঁকেই
আমরা প্রথম লামা বলতে পারি। লামা তিব্বতী
শব্দ। তাঁর অর্থ 'গুরু'। সাধারণত মঠের অধ্যক্ষকেই
তিব্বতীয়েরা লামা বলে। এইরকমে তিব্বতে লামা-
ধর্মের প্রবর্তন হ'ল।

এই যে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করলে, সেটার মধ্যে
তান্ত্রিক অংশই বেশী। কারণে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম
প্রচলিত ছিল—সেটাই তিব্বতে নীত হ'য়েছিল। তাঁর
সঙ্গে তিব্বতের ভূত-পুঞ্জাদিও মিশে গিয়েছিল। এই দুটির
সংমিশ্রণে লামাধর্মের উদ্ভব হ'ল। তাঁর আগে কিছু দেশীয়
পুরাণ Bön ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিরোধ উপস্থিত
হ'ল। যেমন চীনদেশে, তেমনি তিব্বতে, পুরাতন মন্তা-
বলম্বী লোকেরা তাঁর ভাবে নতুন ধর্মকে আক্রমণ করলে,
তাঁরা চেষ্টা করলে এই নতুন ধর্মকে একবারে তিব্বত
দেশ থেকে বিদায় করতে। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম আর
তাঁর নর্মবাদ তিব্বতীদের খুব ভালো লাগল। তাই অনেক
বড় লোক ও মন্ত্রীরা আপত্তি করলেও—বৌদ্ধধর্ম দেশের
মধ্যে নিজের আধিকার স্থাপন ক'রে নিলে।

এ-ছাড়া চীনের বৌদ্ধরাও ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল। এটা
খুব আশ্চর্য্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটি কথা আমাদের
মনে রাখতে হবে যে, চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করেছিল
১ম শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্মে এত আকর্ষণ এসে
ছিলেন। চীনের বৌদ্ধধর্মও মহাযান মতের হ'লেও তাঁর
মধ্যে ১ম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ভাব আসেনি। তাই
চীনা বৌদ্ধরা তিব্বতে যে নতুন ধর্ম এল তার পক্ষপাতী
ছিল না। সেই কারণে Mahayana Hwa-shang নামক

একজন চীনা বৌদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, পণ্ডিত পদ্মসম্বৎসর ও শাক্যবিরুদ্ধে যে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীদের শিক্ষা দিচ্ছেন—সেটি ভালো নয়। এই নিয়ে তাঁর ভারতীয় বৌদ্ধ পাণ্ডিতদের সঙ্গে খুব তর্ক হ'ল। দুঃখের বিষয় তিনি তর্কে পরাজিত হ'য়ে গেলেন। আর কমলশীল নামে এক ভারতীয় ভিক্ষু তাঁকে তিব্বত থেকে নির্দাসিত ক'রে দেন। এষ্ট ভিক্ষু কমলশীলও স্বল্প মাধ্যমিক মহাবিশ্বী ছিলেন। তাঁর তর্কের বিটও তিব্বতে আছে।

এ ছাড়া আরও ভারতীয় সে-দেশে গির্জাসংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষাতে অনূবাদ করেন। তাঁরা রাজার সাহায্য যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম —

- (১) বিমল মিত্র
- (২) বুদ্ধ গুহ
- (৩) শান্তিগর্ভ
- (৪) বিজ্ঞান সিংহ
- (৫) তান্ত্রিক বিমলকীর্তি
- (৬) কাশ্মীরের জিনমিত্র
- (৭) দানশীল
- (৮) আনন্দ

তখনও তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্য এত সমৃদ্ধ হয়নি যে, তাতে ধর্মপিপাসুরা শান্তি পেতে পারে। আর তিব্বতীদের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার এত প্রচলন হয়নি যে, তিব্বতীরা নিজেই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য তাদের ভাষাতে অনূদিত করতে পারে। তা'র ফল এই হ'ল যে, ভারত-বর্ষের পণ্ডিত সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করতে হ'ত তিব্বতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্তে। এইরকমে যেমন চীন দেশে তেমন তিব্বতে ভারতীয় ভিক্ষুদের সাহায্য দরকার হয়েছিল। সেইজন্তে এর পরেও ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা Ralpachan যখন তিব্বতের সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতিসাধন করছিলেন তখনও একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত নিজেদের দেশ ছেড়ে পাহাড় পর্বত অতিক্রম ক'রে সেই পার্বত্য তিব্বতে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁদের মধ্যে

- (১) জিন মিত্র
- (২) শীলেন্দ্রবোধি
- (৩) স্বরেন্দ্রবোধি
- (৪) প্রজ্ঞা-বন্দন
- (৫) দানশীল
- (৬) বোধিনিত্র উল্লেখ-যোগ্য।

এই-যেসব মহাপণ্ডিত ভিক্ষুরা, যারা ভারতের বাইরে জ্ঞানের দীপ নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করছিলেন—তাঁরা আস্তে আস্তে ভারতের নানা দেশ থেকে। সে-সব দেশের মধ্যে কাশ্মীর ও বাংলাদেশই বেশী ভিক্ষু পাঠাতেন। বাংলা দেশের নালন্দার মঠ, বিক্রমশিলার মঠ, ওদন্তপুত্রের বিহার, ও অন্তান্ত বিহার থেকেই ভিক্ষুরা যেতেন। এসব বিহারে যে তিব্বতী ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল, এবং এখানে যে সময়ে-সময়ে তিব্বতী গ্রন্থাদি রচিত হ'ত,—একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কারণ তিব্বতী বিশ্বকোষে আমরা এর উল্লেখ পেয়ে থাকি। যা হোক এইরকমে যে বিরাট চীনা ও তিব্বতী সাহিত্য গ'ড়ে উঠল—তা'র জন্তে ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞ যথেষ্ট।

বৌদ্ধধর্মের এই ক্ষুদ্র উন্নতির গতি অ-বৌদ্ধ তিব্বতীদের ভালো লাগল না। তাই এর বিরুদ্ধে একটা বড় দল গ'ড়ে উঠল। সেই দলে Ralpachan রাজার ভাই আর তাঁর মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁদের বড়মুখে রাজা হ'ত হলেন, আর তাঁর ভাই সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন। এ অত্যাচার নানা আকার ধারণ করলে; তাঁর লামাদের অপমান করতে লাগলেন, বিহারাদি ভেঙে দিতে লাগলেন, দাম্য-দাম্যী পুঁথি পুঁড়িয়ে দিতে লাগলেন। অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে উঠল যে লামারা আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে না। তা'রা শান্তির উপায় খুঁজতে লাগল। একদিন একজন লামা এক নৃত্যকারীর বেশ ধারণ ক'রে রাজার প্রাসাদের কাছে নাচতে থাকেন। রাজা তাঁকে যখন প্রাসাদের মধ্যে আহ্বান করেন তখন সেই লামা নিজের জামার মধ্য থেকে অস্ত্র বা'র ক'রে সেই ধর্মদ্রোহী রাজাকে হত্যা ক'রে বৌদ্ধ-জগতে শান্তি আনেন। লামারা ক্রমে এত

শক্তিমান হ'য়ে পড়েন যে—ঊরুই তিব্বতের রাজকমতা হস্তগত করিতে পারেন।

যে ধর্মের প্রবাহ তিব্বতে এসে পৌঁছিল, মুসলমান আক্রমণও তা'কে বাধা দিতে পারেনি। যখন মুসলমানরা দিল্লীর দরজাতে যা মারুছিল—তখনও ভারতের নানা দেশ থেকে দলে-দলে ভিক্তরা চীনে আর তিব্বতে যাচ্ছিল। তিব্বতে যারা এই সময়ে (১১শ শতাব্দীতে) যান, তাঁদের মধ্যে—

- (১) বিক্রমশিলার অতীশ বা দীপঙ্কর
- (২) স্তুতি
- (৩) ধর্মপাল (১০১৩ খৃঃ)
- (৪) সিদ্ধপাল
- (৫) গুণপাল
- (৬) প্রজ্ঞাপাল
- (৭) স্বকৃতি ত্রিশান্তি-প্রসিদ্ধ

এদের মধ্যে অতীশ বা ত্রিজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে এমন-একটি কাজ করিতে পেরেছিলেন, যার জন্তে এখনও তিব্বতীরা তাঁকে মঞ্জুরীর অবতার ব'লে স্বীকার করে। তাঁর বাড়ী বাংলা দেশেই ছিল। যদি আমরা তিব্বতী ইতিহাসে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, তবে আমরা বলব যে—১৮০ অব্দে তিনি গৌড়ের রাজবংশে জয়গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কল্যাণশ্রী, আর মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি ওদন্তপুরের বিহারে শিক্ষা ও দীক্ষা হুইই গ্রহণ করেন। পরে তিনি স্বর্ণধীপের চন্দ্রকীর্তির কাছেও শিক্ষা পান। যখন তাঁর স্বখ্যাতি খুব বেড়ে উঠল—তখন তিনি বিক্রমশিলার বিহারের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সে-সময় বাংলার রাজা ছিলেন নরপাল। তিনি নানাভাবে রাজা নরপালকে সাহায্য করেন। তিব্বতের রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে, তাঁকে আহ্বান ক'রে পাঠান। তা'র কলে ১০৩৮ অব্দে তিনি তিব্বতী পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তিব্বতে উপস্থিত হন।

তাঁর আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতে ধর্মসংস্কারের সূচনা হ'ল। যদিও তিনি ৬০ বছর বয়সে তিব্বতে এলেন, তবু পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে তিনি লামা-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করেন। তিনি একটি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করেন। সেই হল কালে এত শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে যে, বর্তমানে

তাঁর হলই প্রধান ব'লে তিব্বতে গণ্য। তিনিও তিব্বতী ভাষায় একজন বড় লেখক, এখনও তাঁর ২০২খোনা বই দেখতে পাওয়া যায়। তা'র মধ্যে—

- (১) বোধিপথ-প্রদীপ
- (২) মধ্যমোপদেশ
- (৩) কর্মবিভঙ্গ
- (৪) গুরুক্রিয়াক্রম
- (৫) লোকোত্তর সপ্তক বিধি
- (৬) মহাযানপঞ্চসাধনবর্ণসংগ্রহ
- (৭) বিমলরত্ন লেখন

উল্লেখযোগ্য।

১১ শতাব্দীর শেষে যখন মুসলমানেরা ভারত জয় ক'রে ফেলেছে তখন লামা-ধর্ম তিব্বতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ধর্মের লামারা ক্রমে নিজদের হাতে দেশ-শাসনের কমতাও নিতে লাগল। এই কমতা পূর্ণমাত্রায় লামাদের হাতে আসে কুবিলাই খাঁর (Khubilai Khan) সময়ে। কুবিলাই খাঁ চীনের রাজা, তাঁর আগে Jenghiz Khan ১২০৬ সালে তিব্বত জয় করেন। কুবিলাই খাঁর একটি খেয়াল ছিল, তিনি সাম্রাজ্যের অসভ্য জাতিদের একবন্ধনে বাঁধবার জন্তে একটি ধর্ম খুঁজলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি Saskya Grand Lamaকে মুসলমানদের, খৃষ্টানদের ও কনফুসিয়ানদের (Confucian) তাঁর রাজধানীতে আহ্বান করেন। তিনি তাদের ডেকে বললেন—যারা আমাকে অক্লান্ত কার্য ক'রে মেধাতে পারবে, তাদের ধর্মকেই আমি বড় মনে করব। তা'তে লামারা মন্ত্রবলে তাঁর মুখের কাছে একটা মদের পাত্র তুলে দেন। অতএব তিনি লামাদের ধর্মকেই বড় ব'লে গ্রহণ করলেন। আর Saskya'র লামাকে তিনি প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে তিব্বতের শাসনভারও তাঁর হাতে দেন। এই সময় থেকেই লামারা একসঙ্গে ধর্ম ও দেশের কর্তা হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্বন্ধে লোকদের বিধান দিতে লাগলেন তা নয়, তাঁরা রাজ্যও শাসন করিতে লাগলেন। এইরকমে তাঁরা তিব্বতে প্রবল পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠলেন।*

* এই অবস্থার চরম পরিণতি হ'ল ১৬৪০ অব্দে যখন দালাই লামা পদের সৃষ্টি হ'ল। Gusri Khan ব'লে এক Mongol রাজা তিব্বত জয় ক'রে Nag-wan Lo-zang ব'লে লামাকে উপহার দেন ও তাঁকে দালাই বা সন্থ উগাধি দেন।

কুবিলাই খাঁ এই লামাদের সাহায্যে আর-একটা বড় কাজ করলেন। তিনি সেই লামাদের সাহায্যে Khaygur-এর সমস্ত তিব্বতী বই মোজলীয় ভাষাতে অনুবাদ করালেন। অনুবাদের সময় সেই বৌদ্ধ বইগুলো তিনি চীনা বৌদ্ধবই-এর সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলেন।

তা হ'লে দেখছি কুবিলাই খাঁ বৌদ্ধধর্মের জন্তে যথেষ্ট

কাজ করেছিলেন। যে বৌদ্ধশাস্ত্র চীনে গিয়ে চীনা, ভাষায় ও তিব্বতে গিয়ে তিব্বতী ভাষায় আশ্রয় পেয়েছিল, সেই শাস্ত্রই এখন আবার তিব্বতী থেকে মোজলীয় ভাষায় স্থান পেলে। এইরকমে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয়দের, চীনা, তিব্বতী, মোজলীয়, কোরিয়াবাসী ও জাপানীদের এক-বন্ধনে বন্ধন করতে পেরেছিল।

অপরাধী

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

তা'র বাবা ছিল লাঠিয়ালের সর্দার। ছেলেবেলায় ওয়াজিদকে সে বুঝাইয়াছিল, তা'রা শের পাঠানের জাত, নিতান্ত খোদাতালার মবুজি, তাই ঘাসঙ্গলের জমীন্ বাংলা-মুলুকে আসিয়া ঝিমাইভেছে, এদেশের জমিতে মরদের রক্ত নাই। কিন্তু গোছাগোছা লম্বা চুল ছিপ্‌ছিপে সুন্দর গড়ন, আর ছ'চোখভরা স্নেহকরণ দৃষ্টি লইয়া ওয়াজিদ যখন বড় হইল তখন তা'র সমস্ত দেহ ভরিয়া বাংলা দেশ যেন কথা কহিল, তা'র বাবার উর্দুর বুকনি দেওয়া উগ্র ভাষার সঙ্গে সে-কথার ভাষা একেবারেই মিলিল না।

বাংলা তাহার ধমনীতে বীরের রক্ত প্রচুর করিয়া দিতে পারিল না বটে, কিন্তু যেটুকু দিল তাহাকেই নিজের মনে পাগ্‌লামির বিচিত্র ছন্দে নাচাইয়া দিল, শত্রুজয়ের বদলে সে হৃদয় জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহুযুগের বাংলা তাহাকে যথাযথসময়ে বুদ্ধিসূতা ধরিতে ছুটাইল, কাদাজলে গামছা গাতিয়া মাছ ধরাইল, কাঁচা আম বিহুকে কুরিয়া খাওয়াইল এবং তা'র আঁঠির বাঁশীতে ফুঁ দেওয়াইল। পুত্রের এই সমস্ত অধোগতির লক্ষণ দেখিয়া তা'র বাবা যখন প্রাণপণে পীরের মোহাই মানিতেছে, তখন পীরেরা করুণা করিয়াই তা'র সেই শা-সুলতানের দেশের প্রাণ-টাকে একদিন নিজেদের কাছে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বাংলা দেশ নিতান্ত নিজের মতো করিয়া তাহার জন্ত শোক করিল।

শোকের প্রথম ঘোরটা ভালো করিয়া না কাটিতেই ওয়াজিদ লক্ষ্য করিল, কেবলমাত্র কাঁচা আম এবং কাদা-জলের মাছ তা'র মতো খামখেয়ালি মাহুঘেরও পেট ভরাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তখন সে একদিন তা'র এক দূরসম্পর্কের চাচাকে সুপারিশ ধরিয়া তা'র মৃত পিতার মুনিব রায়বাবুদের দরজায় আসিয়া হাজির হইল। সর্দারের ছেলেকে সকলেই চিনিত; বিধাতা তাহাকে কোন্ কাজের জন্ত সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন জানিবার জন্ত তাহারা কৌতূহলা হইয়া ভিড় করিল।

কিন্তু দেখা গেল, এইখানে বিধাতার একটু অন্তমনস্ক-তার ক্রটি ঘটিয়াছে, ওয়াজিদ যে-কাজটি খুব সুন্দররূপে করিতে পারে সেইটিকেই কোথাও তাহার জন্ত সৃষ্টি করিয়া রাখিতে, তিনি ভুলিয়াছেন। বাংলা দেশের জীবনে তখন খুব বড় একটা পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে।—বাঙালী জমিদারের বীরত্ব পাঠান লাঠিয়ালের লাঠির চোটেও আর প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাহাদের জায়গায় বাঁশীর ওস্তাদদের নিযুক্ত করিবার রেওয়াজ শুরু হয় নাই।

কাছারীর দরবার হইতে ওয়াজিদকে অগত্যা কিরিতে হইল। কিন্তু ফটক ছাড়িয়া বাহির হইবার পথটা যেখানে দীঘির কোণ ঘিরিয়া মোড় কিরিয়াছে সেইখানে, একটি ছায়া এবং সৌরভে নিবিড় বাতাসি-লেবুর বনে, একটি

পরিপূর্ণ দিবস এবং পরিপূর্ণ রাজির আবেগ-স্তিমিত সঙ্কীর্ণে, এক স্তম্ভরী তরুণী তাহার গতি রোধ করিল; এবং কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না।

ইহারা পরস্পরকে চিনিত, বাবুদের বাগানে লিচু চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া ওয়াজিদ একদিন ইহাকে বধরা দিয়াছিল। মহরমের পর্বেই সময় জারি গাহিয়া, চোল পিটিয়া, চুল দোলাইয়া সে যখন বাবুদের অন্দর-মহলের প্রাঙ্গণে মশালের আলোয় নাচিয়াছিল, তখন খুসির আগ্রহে এবং উত্তেজনায় বুক ছুঁছুঁ করিয়া কাঁপে নাই এমনতর তরুণী মানবী চারিপার্শ্বের ভিড়ের মধ্যে একটিও কোথাও ছিল না। সুতরাং মোজোবাবুর সেজো মেয়ে কাত্যায়নীও সে-দল হইতে বাদ পড়ে নাই। আজ প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে সে তাই চিনিল, এবং নিজের রক্ষী পরিচারিকারা আশেপাশে কেহ কোথাও আছে কি না চকিত-চোখে একবার দেখিয়া লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে সবেগে তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একটু পরে কাছারী বাড়ীর লোকেরা যে-যার কাজ ফেলিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, শাড়ীর আঁচল উপচিয়া পড়া বাতাবি-লেবুর ফুলে সারা পথ চিহ্নিত করিতে-করিতে ওয়াজিদ-বাগিনী কাত্যায়নী হাস্তবিকশিত মুখে অন্দরমহলের ফটক পার হইতেছে।

(২)

সেই হইতে ওয়াজিদ বিনা-কাজেই বাবুদের বাড়ীতে রহিয়া গেল। সে মাহিনা লইত না, সেই কারণে, অকারণে এবং অকালে যার-তার কাছে তার বক্শিস্ মিলিত। এইভাবে, কিছুই পাইতেছে না বলিয়া সে যাহা পাইত তাহা যে কোনো তিন জন ভৃত্যের বহু আয়াসের পাওনাকেও সহজেই ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। ওয়াজিদ যে ভৃত্য হইয়াছে ভৃত্য নহে, তাহার মাহিনা না-লগ্গার এই অভিমান একেই ত অল্প ভৃত্যদের গাজ্জালা ধরাই-য়াছিল, তদুপরি তাহার এই বিনাপাওনার পাওনা তাহাদের মনে মেঘসঙ্কার করিতে লাগিল। কেবল কাত্যায়নীর পরিচারিকার দল কাজে বাহাল থাকিয়াও কাজ হইতে ছুটি পাইয়া খুসি হইল, এবং ওয়াজিদের পক্ষ লইয়া ছএকসময় ছএকজনের সঙ্গে তর্ক করিল।

যুম ভাঙিয়া চোখ কচলাইতে-কচলাইতে “ওয়াজিদ-ডাই” বলিয়া কাতু যখন তাহার শোবার ঘরের রকে আসিয়া দাঁড়াইত তখন হইতে আবার সেই খোলা রকেই উপর ওয়াজিদের কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া মধুমালা, রাক্সী রাণী, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও বেজমা-বেজমীর গল্প শুনিতে-শুনিতে তাহার হুঁচোখ যুমে বৃষ্টিয়া আসার সময় পর্য্যন্ত ওয়াজিদের ছন্দগুরও তবু ছুটি ছিল না। কেবল মাঝে-মাঝে বাবুরা বিলের চরে পাখী শিকার করিতে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইতেন, সে ছবুরা বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিত। নদীর কোন্ বঁকে মাছ ধাইতেছে পবর লইবার জন্ত তাহাকে পাঠাইতেন, সে ছিপ হাতে রোদে-রোদে ঘুরিয়া জায়গা ঠিক করিয়া চার ফেলিয়া আসিত। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নারাজের মজলিসে বাশী বাজাইবার ডাকও যে আসিত না এমন নয়, সে-রাজে তাহার আর সময়ের জ্ঞান থাকিত না। বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে সে বকুনি শুনিত।

বাড়ীতে মা ছাড়া তাহার ছোটো একটি বোন ছিল, প্রায় কাত্যায়নীরই সমবয়সী। মুন্সিঙ্গ ছিল এই,—বোনটি তাহাকে ভালোবাসিত। যে-স্নেহ তাহা পাওনা, তাহা বাহিরের সংসার কোন্ ছলে তাহার দাদার হাতে হইতে ঠকাইয়া লইতেছে, কি-স্বত্রে কাত্যায়নীর অধিকার তাহার দাবী অপেক্ষা বড় হইতেছে, তাহার শিশুমনের কাছে তাহা স্পষ্ট ছিল না, তাই কিছুই সে বলিত না, কিন্তু নীরবে কঠিন দুঃখ বহন করিত। ওয়াজিদ বৃষ্টিত এবং অত্যন্তই দুঃখিত হইত, কিন্তু তাহারও মন শিশুবয়সের সীমা পার হইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া বাবুদের বাড়ীর নিত্য উৎসব, বহুজনাকীর্ণ স্বখদুঃখসমাকুল বিচিত্র জীবন-নাট্য, ঐশ্বর্যের সম্মোহন দ্রুতি তাহাকে প্রসূর করিত। সে-আকস্মিকে কাটাইয়া আসা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না।—তদুপরি কাত্যায়নীকে সে ভালোও-বাসিত।

ওয়াজিদ কেন বকুনি শুনিত তাহার কারণ ছিল। তাহার মা সারাদিন রীখা-বাড়া, ধান-ভানা, মাছ-শুকানো, জল-আনা প্রভৃতি কাজে এবং অবসর সময়ে পাড়া বহিয়া কোঁদল করিতে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকিত যে, তাহার

মধ্য দিয়া কোনো ঝাঁকে ছেলের চিন্তা তাহার মনে চুকিতে পাইত না, কিন্তু রাজিতে ওয়াজিদ বাড়ী না আসা পর্যন্ত মৌলতী ওরকে ছলী, কিছুতেই ঘুমাতে বাইত না এবং তাহার পাহারা দিতে বাধ্য হইয়া তাহার মাকেও সঙ্গে-সঙ্গে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইত।

ওয়াজিদ ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিত। মৌলতী তাহার উজ্জ্বলিত সহস্র কথাই ই-না ব্যতীত আর কোনো জবাব না পাইয়া নিজে হইতেই চুপ করিত। এবং ভাইয়ের হাত-পায়ের আঙুল টানিয়া দিয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া পা টিপিয়া দিয়া তাহার বুকের কাছে পরম পরিতৃপ্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িত। সকালে উঠিয়াই ওয়াজিদ নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে চেষ্টা একদিনও প্রায় সকল হইত না। ঝাঁপ ধোলার সামান্য শব্দে চকিত হইয়া ছলী একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িত, একমুখ হাসিয়া পলায়নোন্মুখ ওয়াজিদকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিত, “দাদাতাই, সেলাম।”

তাহার হাসির আনুকে শেষ করিয়া দিয়া “সেলাম” বলিয়া ওয়াজিদ চলিয়া যাইত।

(৩)

কিন্তু বাবুদের বাড়ীতে ছলীর দাদাতাইয়ের পাণ্ডনার বহর বত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, সে পাণ্ডয়াতে তাহার সুখ সেই-পরিমাণে বাড়িল না। বাবুরা তাহাকে কথায়-কথায় পুরস্কৃত করিতেন, সে সত্যই কৃতজ্ঞ হইত, এবং হাসিমুখেই তাঁহাদের স্নেহ-সমাদরের দানগুলিকে লইত, কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে হাসিতে হইত। পুরস্কারের যে-অংশগুলি বাড়ী অবধি লওয়া চলিত তাহার সাহায্যে বহু ক্রমশে ছলী এবং তা’র মায়ের ছবেলা ছুঁঠা আর জুটিত এবং কোনোদিন বা জুটিত না, কিন্তু ওয়াজিদের সামনে পায়সের বাটা রাখিয়া মেজো গিন্নি বসিয়া থাকিতেন, সে না খাইলে কাত্যায়নী রাগারাগি করিয়া অস্থির করিত। বাবুরা তাহাকে নিজের পরিবারস্থ একজন মনে করিতে পাইয়াই অত্যন্ত খুসি হইতেন, ঐরূপ করিয়াই ওয়াজিদকে তাঁহাদের স্নেহার্জ চিত্তের একেবারে মধ্যখানে তাঁহারা লইতে

পারিতেন, হুতরাং আরও কোথাও যে তাহার জীবনের কোনো বন্ধন আছে, ইহা ভাবিতে তাঁহাদের ভালো লাগিত না, তাই পূজায়-পার্কণে বিবাহে অন্নপ্রাশনে, অরিপাড় মুতি হইতে, ফুলকাটা পেলি, রেশমী আঙরাখা বিলিতি দামী বাশী প্রভৃতি নানা উপহারে সে বখন ভারাক্রান্ত হইত, তখন একটি পিচ্ছীনা মেহন্থবকিতা কচি বালিকার ছহাতী একটি পাছা-পাড় শাড়ীর ডাবনার তাহার মনের ভার নামিত না। বাবুদের সম্মুখে অরিপাড়ের কাপড় পরিয়া অত্যন্ত গর্ভিত-মুখ করিয়া তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু রান্ধবাড়ীর ফটক পার হইয়াই দীঘিতে স্নান করিবার ছলে সেই পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া ছাড়া-কাপড়টি সে পরিয়া লইত, তা’র পর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁক দিত, “ছলী! তোর জন্তে কি এনেছি দেখসে!”

মৌলতী স্থিরপতিতে বাহির হইয়া আসিত, দাদার হাত হইতে উজ্জ্বল প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে কাপড়টি লইয়া মাকে গিয়া দেখাইত, তা’র পর এতবড় কাপড়কে বহুকষ্টে শরীর ঘেরিয়া কোনোওরূপে জড়াইয়া লইয়া পরম প্রশংসমুখে দাদার কাছটিতে আসিয়া বসিয়া থাকিত। একটু পরে তাহার মা আসিয়া মেয়ে নোংরা করিয়া ফেলিবে বলিয়া টান মারিয়া কাপড়টিকে খুলিয়া লইয়া যাইত, তখনও সে কেবল কাতরকরণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকিত, কোনো কথা কহিত না।

সে-বার মহরমের সময় কাত্যায়নী বায়না ধরিল, ওয়াজিদ-ভাইকে অরির তাজ করিয়া দিতে হইবে, সে তাহাই পরিয়া সিঁহিলের সময় নাচিবে। কলিকাতার বেড়াইতে গিয়া থিয়েটারে সে “ওসমানের” মাথায় যে-রকম তাজ দেখিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেই-রকমটি না হইলে চলিবে না, সকলকে বিশেষ করিয়া তাহা বলিয়া দিল। যথাসময়ে লক্ষ্য হইতে যে বিচিত্র-কারুকার্য-খচিত শিরস্ত্রাণ আসিয়া উপস্থিত হইল, কাত্যায়নীকে স্বীকার করিতে হইল যে তেমন জিনিস “ওসমান” কোনো জীবনে চোখেও দেখে নাই। বাবুরা চলন-সই-রকম চক্চকে একটা টুপি মনে করিয়াই ফরমাস করিয়াছিলেন, হঠাৎ এমন জিনিস আসিয়া পড়াতে নিজেরাও একটু

চমৎকৃত হইলেন, বুঝিলেন এ-সব জিনিসের ঠিক দামটি কাহারো জানা না থাকায় এরূপ ঘটিয়াছে।

কাতুর বায়নার বাড়াবাড়িতে কাপরে পড়িয়া ওয়াজিকে মহরমের মিছিলের সময়ের চেয়ে আগেই তাজ পরিমা নৃত্য করিতে হইল। তাহার নিবেদনও মন প্রসন্ন হইয়াছিল, কিছুক্ষণের অল্প দৌলতীকে তুলিয়া অন্তরের অকুণ্ঠিত আনন্দের ছন্দে সে নৃত্য করিল, তা'র পর কলার খোল কাটিয়া আনিয়া কাতুর অস্ত্র সে খড়্‌কের সাহায্যে নৌকা তৈরি করিল, খোলের টুকরা উন্টাইয়া তাহাতে ছই দিল, মাঝখানে সূতার টানা দিয়া নলের মাড়ল খাড়া করিয়া দিল। তাহার সেই অপূর্ব-গঠন মেকি খেয়ার সাহায্যে যখন শিশুদের একেবারে খাটি নিখাত সোনার আনন্দ-পণ্য সব্বব্রাহ হইতে লাগিল, তখন জরিব তাজটিকে কাপড়ে ঢাকা দিয়া সকলের অলক্ষ্যে রাখবাড়ী হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

পথে আসিতে মনে পড়িল, আজ গ্রামের সমস্ত ছেলে-মেয়ে তাদের সাধ্যমত সাজিয়া-গুজিয়া মহরমের মিছিল দেখিতে বাহির হইবে, কিন্তু দৌলতীর অন্ন, সে কোথাও বাইতে পাইবে না। মনে পড়িল, মহরম আসিতেছে, এবং তাহার দাদা-ভাই তাহাতে জরিব পিটিয়া নাচিবে, একথা পৃথিবীর আর-সকলের আগে দৌলতীর মনে পড়িয়াছিল। তখন হইতে কতবার সে সে-কথা বলিয়াছে। দু'দিন আগে যখন তাহার অন্ন ধরা পড়িয়াছিল, তখন সেই বৃহত্তারী কীর্ণপ্রাণ বালিকা দুর্ভিক্ষ শক্তিতে অন্নের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছিল, তাহাও বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। উর্কে চাহিয়া ভাবিল, আজ আন্নাতালার দৃষ্টি খোলা রহিয়াছে, তাহার এই দৃষ্টির সম্মুখে আজ ছই ভাইবোনে তাহার। একটি পরিপূর্ণ মহরম উৎসব সম্পন্ন করিবে। দৌলতী দেখিবে, সে নাচিবে। আজকের দিনে আর কাহারো কথা, আর-কিছুর কথা ভাবিবে না।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া একটা কোলাহল শুনিতে পাইল। বাকী পথটা ছুটাছুটি করিয়া আসিল। আসিয়া শুনিল, দৌলতীকে শাস্তভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া তাহার

মা নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। কল্প মেয়েকে ফেলিয়া বাহিরে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বলিয়া ছুটিতে-ছুটিতে সে কিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৌলতীকে কোথাও পাওয়া বাইতেছে না।

তখন হঠাৎ তারার মজলিশের মাঝে পড়িয়া সূর্যের আলো লক্ষিত আরক্তমুখে বিদায় হইতেছে। মিছিল বাহির হইবার আর দেরি নাই, মোলা পাড়ার টাকে কাটি পড়িয়াছে শোনা বাইতেছে। ওয়াজিদ মাকে সাহসনা দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করিয়াই তাড়াতাড়ি আবার বাহির হইয়া পড়িল, যেখানে-যেখানে ছেলে-মেয়েদের জটলা দেখিল তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, তা'র পর নিরাশ এবং হতাশ হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে, এমন সময় দেখিল, কাহারো বাড়ীর আলিসার কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া দৌলতী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতোছে। কাছে গিয়া শুধাইল, কি হইয়াছে। বলিল, “ওরা সকলে মিলে আমার কাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে দিয়েছে। বলে, ওর কি এত বড় কাপড়, কাদের কাপড় চুরি করেছে। বলে, ও পুঁটলি! পুঁটলিতে কি রেখেছিল, আর সব কাপড় ক'রে দিই, বলে—”

ওয়াজিদের মধ্যে তা'র পিতৃপুরুষের লাঠিয়ালবৃত্তি হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াইল, গর্জন করিয়া বলিল, “কে তা'রা, কোথায় তা'রা?”

দৌলতী বলিল, “জানি না, হাসতে-হাসতে ঐদিকে সব চ'লে গেল।”

দৌলতীর অন্নতপ্ত দেহ নিঃশব্দে বৃক উঠাইয়া লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। বহুবৎসরের সেই প্রথম ওয়াজিদের অভাবে মহরমের উৎসব অজহীন হইয়া সম্পন্ন হইল। বাবুরা পেয়াদা পাঠাইলেন, কাতু সংবাদ দিল, এখনি না আসিলে সে এমন রাগ করবে যে আর কখনো তা'র কোলে শুইয়া গল্প শুনিবে না, সে নৌকা গড়িয়া দিলে তাহা লইবে না, ওয়াজিদ মাথায় দিব্যি দিয়া সাধিলেও তা'র পাড়িয়া দেওয়া লিচু খাইবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ওয়াজিদ সেদিন তা'র এত সমস্ত ভয়ানক সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া একটুও ভীত কিংবা কাতর হইল না, বাবুদের সেলাম জানাইয়া বলিয়া

পাঠাইল, তার বোনটির অত্যন্ত কঠিন অস্থখ, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও গেলে আজ তাহার গোসার শেষ থাকিবে না।

পরের দিন ছলীর অস্থখ বাড়িল। বাবুরা সকাল হইতেই লোক পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাল সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, আজও ভোর হইতেই গোলযোগ সুরু করিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই শান্ত করা কিম্বা নাওয়ানো-খাওয়ানো যাইতেছে না।

ওয়াজিদ কহিল, “একবার একটু খুঁরে আস্ব, ছলী?”

ছলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “যাও।”

বলিবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, তনু ওয়াজিদ বলিয়া গেল, সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।

সেদিন কাতুর অভিমান ভাঙিয়া যাঁতেই তাহার আকারের আর অস্ত্র নাই। ওয়াজিদ মাটি দিয়া যে হাতী গড়িয়াছিল, তা'র উপর হাওদা চড়াইয়া নিবার কথা কতদিন ধরিয়া রোজ সে ওয়াজিদকে বলিতেছে, আজ সেটা করিয়া দেওয়া চাই। কাতুর পুতুল-ক'নের সঙ্গে কাতুর খুড়তুত বোন কাতুর পুতুল-বরের যে সেদিন বিবাহ হইয়া গেল, তা'তে ওয়াজিদের ঢোল বাজাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে বাজায় নাই, আজ আবার নতুন করিয়া ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইবে। সেদিন রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র গাছে চাড়িয়া ঘুমাইতেছেন, কোটাল-পুত্র পাহারায় আছে, এমন-সময় একটা প্রকাণ্ড অজগর গাছের তলায় আসিয়া মাংস মণিটা কইয়া খেলা করিতে লাগিল,—এই পর্যন্ত শুনিয়া কাতু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গল্পের বাকীটুকু এখনই তাহাকে শুনিতে হইবে। এইভাবে ওয়াজিদের প্রতিশ্রুতির আধ ঘণ্টা সে কতক্ষণ হইয়া রহিয়া গেল, তাহার কোনো হিসাব রহিল না।

রাঘবাড়ীতে চতুর্দিক হইতে সকলে এমন করিয়া ওয়াজিদকে ঘিরিয়া ধরিত, যে তাহার স্বভাবত দুর্বল মন কিছুতেই সেই ব্যাধ ভেদ করিতে পারিত না, আজিও পারিল না। এখন অবশেষে তাহার চৈতন্য হইল

তখন সমস্ত আকাশে গোধূলির বিবল আলো ধম্বম্ব করিতেছে।

দোলতী, ছলী! আজ সমস্ত দিন জরে ছটফট করিতে-করিতে সে তাহার পথ চাহিয়াছে, আর সে নিজে! বালিকার এত দুঃখের এত আগ্রহের প্রতীককে কি দিয়া সে পুঙ্কৃত করিবে, কি তাহার কাছে এতদিন সে লইয়া গিয়াছে, কি আজ সে লইয়া যাইবে? সত্যমিথ্যায় মিশানো কতকগুলি দেরি করার অজুহাত?

দুঃখ, অহুতাপ তাহাকে পাগল করিল, সে কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে তাহা বুঝিল না, এমন অবস্থায়, বাড়ীর সর্বত্র নিজের অবাধগতির স্বযোগে, কাতুর ঘরে তার বিছানার পাশের দেওয়ালের উপর হইতে তা'র গলার লকেট-দেওয়া একগাছা সুরু হার সে চুরি করিল।

(৫)

মনে করিয়াছিল, বাড়ী গিয়া ছলীর গলায় পরাইয়া দিবে, কিন্তু পারিল না। তাহার মা বসিয়াছিল, হার সে কোথায় পাইল, এ প্রশ্ন তাহার মা নিশ্চয় করিবে। তখন সে কি জবাব দিবে? লুকাইয়া বাতাসা বাহির করিয়া খাইবার ছলে শিকের খুলানো একটা হাড়ির মধ্যে হারটিকে রাখিয়া দিল। ছলী তাহাকে দেখিয়া মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সেও আজ চোখের জল ফেলিতে লাগিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে যা দুঃস্থ কাজ আজ ছলীর জন্ত তাহাই সে করিয়া ফিরিয়াছে, কি করিয়া তাহাকে সেকথা সে বুঝাইবে?

মনে করিয়াছিল, কিছুতেই ঘুমাইতে পারিবে না, কিন্তু শুইবা-মাত্র শুইমাত্র মনের ক্লাস্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিল, প্রাণপণে বাঁশীতে ফুঁ দিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাহা হইতে সুর বাহির হইতেছে না, কাতু রাগ করিতেছে, ছলী কাঁদিতেছে, সেও কাঁদিতেছে।

সকাল বেলা খড়খড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। গত রাতের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল সে চুরি করিয়াছে, সে চোর! মনে হইল, পৃথিবীর সব মানুষকে কেবল দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। এক ধারা চোর,

আর যারা চোর নয়। যারা চোর, তাদের পৃথিবী আলাদা, তা'রা অন্য পৃথিবীর মানুষদের কেউ হয় না। সেদিনকার সকালবেলাকার রৌদ্র, শরতের স্নিগ্ধ প্রশান্ত আকাশ, তা'র মেঘসজ্জা, একেবারে নূতনরূপে তা'র চোখে প্রতিভাত হইল। একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল, সবটাই স্বপ্ন, কিন্তু পারিল না।

কান পাতিয়া রহিল, কখন বাবুদের বাড়ী হইতে পেয়াদা আসিয়া হাঁক দিবে। কিন্তু বেলা বহিয়া চলিল, কেউ আসিল না। দুলাইর অস্থখ আরও বাড়িয়াছে, বাবুরা শুনিতে পাইয়াছেন, কাতুও শুনিয়াছে। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ যেন ওয়াজিদকে ডাকাডাকি করিয়া ব্যস্ত না করে। দেয়ালের উপর খোলা পড়িয়াছিল, কে কখন উঠাইয়া লইয়াছে, ইহার বেশী কাতুর হারের খোঁজ আর কেহ লয় নাই। জমিদার-পরিবারে এমনতর ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে, বাবুদের তরফ হইতে কিছুই প্রায় বলা হয় না, গিন্নীরা কিছু বকাবকি করেন, ঝিচাকরেবা পরম্পরের স্বন্ধে অসাবধানতার দোষ চাপাইয়া, কলহ করিয়া পালা সজে করে।

ওয়াজিদ সমস্ত দিন কল্পনার চোখে দেখিল, বাড়ীতে তোলপাড় বাধিয়া গেছে, বাস্তব তোঃঃ খুলিয়া উপুড় করিয়া হারের খোঁজ হইতেছে, পুলিশে খবর গিয়াছে, ঝিচাকরেবা কেহবা প্রকাশ্যে, কেহবা ইজিতে ওয়াজিদের প্রতি সন্দেহ ব্যক্ত করিতেছে। কাতু কাঁদিয়া হাট বাধাইতেছে বলিয়া বাবুরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতেছেন না, কিন্তু ওয়াজিদের অপরাধের কি প্রতিকার করা যায় সে-সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিতেছেন।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে অনিশ্চয়তার ভার মনের উপর চাপিয়া ওয়াজিদের যেন শ্বাস-রোধ করিয়া দিতে লাগিল। আর না পারিয়া অঙ্ককারে গা-ঢাকা দিয়া বাবুদের বাড়ীর আশপাশে সে ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইল। কোথাও কোনো উত্তেজনা, কোনো চাকলোর চিহ্ন দেখিল না, ভাবিল হয়ত এখনও হারের খোঁজ হয় নাই; তখন সাহসে ভর করিয়া আন্তে-আন্তে কটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিল, যেখানকার-বা সব ঠিক আছে দেখিতে পাইলে নিজের মনে অন্তত হুঁহু বোধ করিবে।

ছোটো বাবু বৈকালিক অস্বাভাবিক করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, দৌঘির পারে ওয়াজিদকে দেখিয়া ঘোড়া ধামাইলেন, কহিলেন, "দৌলতী কেমন আছে ওয়াজিদ?"

ওয়াজিদ সেলাম করিয়া কহিল, "জরটা কমেই হুঁহু।"

ছোটো বাবু কহিলেন, "মহিম-ডাক্তারকে বলা হইতেছে সে রাত্রেই গিয়ে দেখে ওষুদ দিয়ে আসবে। তুমি আর বাইরে বেড়িয়ে দেবি কোবো না, বাড়ী যাও।" ছোটো-বাবুকে সেলাম করিয়া কতকটা হুঁহু মনেই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

(৬)

রাত্রে ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছিলেন সকালবেলা তাহা বদলাইলেন। বিকালে আসিয়া আবার দেখিয়া বলিয়া গেলেন, বহুদিনের পীড়ায় ক্রমে-ক্রমে বালিকার জীবনী-শক্তির ক্ষয় হইয়াছে, ঔষধে কিছু হইবার নহে, এক যদি মনের পিক হইতে রোগমুক্তির কোনো সাহায্য হয় তবে সে ঐচ্ছিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু আনন্দের অনুপান যাহাই তাহার অন্ত ব্যবস্থা করা হোক, তা'র মধ্যে অধিক-পরিমাণে উত্তেজনা যেন না থাকে।

দৌলতী মুছার ঘোরে ঘুমাইতেছিল, অশ্রুজলে ভিজিয়া ওয়াজিদ মাকে লুকাইয়া তাহার গলায় হারটি পরাইয়া দিল। কিন্তু দৌলতীকে সে কিছু দিতেছে এই ফাঁকি নিজেকে অধিকক্ষণ দিতে পারিল না। হারটি খুলিয়া লইতে যাইবে, চুলে বাধিয়া দুলা জাগিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোয় হারের লকেটটি বক্বক্ব করিয়া উঠিল, সেদিকে চাওয়া দুলাইর চোখ-ছুটিও যেন প্রোজ্জন হইয়া উঠিল। হারগাছি তাহার দাদা কোথা হইতে আনিয়াছে, কখন আনিয়াছে, আনিতে কত টাকা বা লাগিল কিছু সে জানিতে চাহিল না, কৃতজ্ঞতার মুগটিকে ভরিয়া তুলিয়া লকেটটিকে মুঠোয় ভরিয়া দাদার কোলের কাছে ঘেসিয়া শুইল, যেন বলিতে চাহিল, কত ভাগ্যে তাহার অস্থখ করিয়াছে, এখন এমনি কেবল যদি থাকিয়া যায়।

কিন্তু এমনি সময় বাহিরে বাবুদের বাড়ীর পাইকের হাজার শোনা গেল।—ইহার সময়-অসময়ে একেবারে ঘরের দাওয়ার আসিয়া বসিত, অনেক মজা স্থপারী

এবং কড়া ভাষাক ধ্বংস না করিয়া উঠিত না। ওয়াজিদ অত্যন্ত ভয়ত হইল। ছলীর গলা হইতে হারটা সে প্রায় ছিঁড়িয়া ছিনাইয়া লইল। ছলী “উঃ” করিয়া উঠিল, তা’র পর আর তা’র কোনো সাড়া মিলিল না। ওয়াজিদ বাহিরে আসিয়া তুলিল, বাবুরা ছলীর খবর লইতে পাঠাইয়াছেন, তাহার বেশী কিছু নহে। তাহার মনের একটা দিক্ একটু হাল্কা হইতেই সে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সন্ন জুড়িয়া দিল। কাতুরাশী বধাসময়ে স্নানাহার করিতেছে কি না, তাহাকে সকালে-বিকালে বেড়াইতে কে লইয়া যাইতেছে, ঢাকা হইতে যে কারিকর তা’র পুতুলের জন্ত জরিপাড় শাড়ী বুনিয়া পাঠাইবে বলিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে কোনো খবর পাওয়া গিয়াছে কি না, এমনি আরও অনেক কথাই হইল। একটা নলের বেহালা তৈরি করিয়াছিল, পেয়াদার হাতে সেইটি পাঠাইল, তা’র পর ঘরে আসিয়া দেখিল, ছলী আবার মূর্ছিতদেহে এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাকাতকি করিল, নাড়া দিল, সাড়া মিলিল না। মুখেচোখে জলের ছিটা দিয়া মূর্ছা ভাঙাইবার ব্যর্থ চেষ্টা কিছুক্ষণ করিয়া রোকন্যমানা মাকে ছলীর কাছে বসাইয়া আবার সে ডাকাতের খোঁজে গেল।

ডাকাতর আবার আসিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, তা’র পর বলিলেন যে, তাঁহার সাধ্যের সীমা বহুক্ষণ পার হইয়া গেছে, ওয়াজিদ যদি ইচ্ছা করে সহরে তার করিয়া ভালো ডাকাতর আনিয়া দেখাইতে পারে। ওয়াজিদ আর বিক্রান্তি না করিয়া হারটাকে কাপড়ের খুঁটে লুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একপ্রকার ছুটিতে-ছুটিতে সে রায়গঞ্জের বাজারে আসিয়া হাজির হইল। ভাবিল, ধরা যদি পড়ে ত পরে পড়িবে, আপাতত কোনও মহাজনের কাছে হার গচ্ছিত রাখিয়া টাকা লইবে ও সেই টাকায় দৌলতীর চিকিৎসা চালাইবে। সহর হইতে ডাকাতর আনিতে কত খরচ পড়িতে পারে সে-সবকে তাহার কোনোই ধারণা ছিল না, তবু হার বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা সে পাইল এবং তাহাই লইয়া অনেক রাজে মাড়ী করিয়া আসিল।

সুস্থ দৌলতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাতের

প্রভাতের সমস্ত রাত সে আগিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু পূর্বাকাশ প্রভাতের আলোর বধন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ঠিক তখনই দৌলতীর নির্ভরভরা বক্ষণ চোখদু’টিতে চিরদিনের মতো রাজি নামিয়া আসিল।

(৭)

বে-মহাজনদের কাছে ওয়াজিদ হার গচ্ছিত রাখিয়া-ছিল, তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া ইতিমধ্যেই রাজদরবারে এতেলা করিয়া আসিয়াছে। বাবুরা গোপনে বসিয়া সব শুনিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করিয়া তা’র পর বলিয়াছেন, এই হার তাঁতাদেরই বাড়ীর জিনিষ বটে, কিন্তু ওয়াজিদকে ইহা তাঁহারা বক্ষিস্ব করিয়াছিলেন, এসবকে তাহাকে কিছুই বেন না বলা হয়। সুতরাং হার লইতে আসিবার সময় ধরা পড়িতে কতকটা প্রস্তুত হইয়া আসা সত্ত্বেও ওয়াজিদকে কেহ ধরিল না। সুদের টাকা লইয়া মহাজনদের সঙ্গে সে তর্ক করিল, বলিল, “তোমাদের টাকাও যেমন টাকা, আমার সোনাও তেমনি সোনা, ওর যদি স্ত্রী থাকে ত এরই বা কেন থাকবে না?”

রায়বাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি যখন আসিল, তখন রাজি অনেক হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়ার অপেক্ষায় বহুক্ষণ অস্থকারে গা-ঢাকা দিয়া রহিল। যখন কোথাও আর কিছু সাড়াশব্দ রহিল না, তখন ছুটিয়া আসিয়া দেয়াল ঘেসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধরের দীঘির ঘাটের দরজা প্রায়ই রাজে খোলা থাকিত। সেদিক দিয়া সাংরাইয়া গিয়া ঢোকা কঠিন হইত না, কিন্তু সে গাছে চড়িবার বিদ্যাতেও অধিতীয় ছিল; একটা পেয়াদা-গাছের ডাল লাফ দিয়া ধরিয়া বুণিয়া, দোল খাইয়া দোল খাইয়া হঠাৎ একসময় দেয়ালের উপর উঠিয়া পড়িল। ভিতরের দিকে, প্রায় দেয়ালের আর-এক প্রান্তে কাতুর আদরের গাই “চুবি” দাঁড়াইয়া তা’র-বাহুরের গা চাটিয়া দিতেছিল, সাবধানে ডাল সামলাইয়া সে সেইদিকে গেল এবং চুবির পিঠ আশ্রয় করিয়া ভিতরের উঠানে নামিয়া পড়িল।

ভয়ে উত্তেজনার তা’র সারা গা বিম্বিম্ব করিতেছিল। একবার হৌচট খাইয়া প্রাণগণে সামলাইয়া গেল, পরক্ষণেই সম্মুখে বে-জায়গা খোলা পাইল তাহার ভিতর

দিয়া হারটাকে প্রাণপণে ছুড়িয়া দিয়া পিছন কিরিয়া ছুট দিল।

হারটা স্বতন্ত্র তা'র হাতে ছিল, তা'র সাবধানতার অন্ত ছিল না, কিন্তু ভয়ের আসল কারণটা দূর হইয়া যাইতেই তা'র ক্রমাগত ভুল হইতে লাগিল। ছুটিতে গিয়া পায়ের শব্দ হইল, চুম্বির পিঠ আশ্রয় করিয়া আবার দেখালে চড়িবার চেষ্টা করাতে সে ভয় পাইয়া লেজ উচু করিয়া উঠানময় ছুটাছুটি করিল। পেয়ারা-গাছের ডাঙ্গাটাও ঝুঁকি সহিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, কিন্তু বাবুদের বাড়ীর পাইকরা সেটাকে রক্ষা করিল, ওয়াজিদ শূন্যে থাকিতে-থাকিতেই তাহাকে তাহারা ধরিয়া ফেলিল।

ওয়াজিদের আর-কিছুতে বাধিত না, কিন্তু চোর বলিয়া কাতুর কাছে ধরা পড়া, তা'র চোখের সম্মুখে নাজেহাল হওয়া, এই সম্ভাবনামাজেই তা'র শরীরে লাঠিয়ালের রক্ত টপবগ করিয়া কুটিয়া উঠিল। পেয়ারা গাছের যে-ডালটা দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছিল সেটাকে মড়মড় করিয়া সে টানিয়া ভাঙিল, তা'র পর চীৎকারে হুকারে লাঠি-সোটার ফটাফট শব্দে স্বখারীতি প্রলয় বাধিয়া গেল।

ভোরবেলা আপাদমস্তক রক্তচিহ্নিত ওয়াজিদকে যখন বাবুদের দরবারে ধরিয়া আনা হইল, তখন তাহারা তাহাকে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাহার একটি অপরাধকে কাটাইয়া দিতে-না-দিতেই তাহার এই দ্বিতীয় অপরাধ তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। সে যে স্বভাবতই চোর সেবিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ রহিল না। তৎসঙ্গেও, কুড়ি বৎসর আগে হইলে সহজেই সমস্তা মিটিতে পারিত। তাহাকে গ্রামের এলাকার বাহির করিয়া দিয়া হাতী পাঠাইয়া তাহার দু'তিনটি স্তেরাঘরকে গুঁড়া করিয়া দিলেই তাহাদের চূড়ান্ত কর্তব্য

করা হইত। কিন্তু অমিদারের কাছারী ঘেসিয়া তখন পুলিশের থানা বসিয়াছে। যে মীমাংসা বাবুবা করিতে পারিলেন না, পুলিশের লোকেরা খবর পাইয়া সাজগোজ করিয়া আসিয়া অযাচিতভাবে তাহার ভার লইল।

বাবুরা ওয়াজিদের দোষ ঢাকিবার নানা চেষ্টা করিলেন, বহু টাকা ঘুস কবুল করিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না। দারোগা বলিল, ওয়াজিদ যদি ধরা পড়িয়া একজন পাইকের একটা হাতকে জন্মের মতো একেজো করিয়া না দিত এবং আর-একজনের মাথাটি চৌচৌর করিয়া না ফাটাইত তবে তাহাকে রক্ষা করিবার অন্ত সম্ভব-অসম্ভব যেকোনো গল্প অবাধে বিশ্বাস করিতে সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন তাহা করিলে চাকরি বাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকেও জেলে যাইতে হইতে পারে।...

ওয়াজিদ তিন বৎসরের অন্ত জেল খাটিতে যাইবার ঠিক পাঁচ দিন পরে সেজোবাবুর ঘর কাঁট দিতে গিয়া তাহার খাটের তলা হইতে কাতুর হারানো হারটি কিরিয়া পাওয়া গেল। বাবুরা আবার একবার পরাম্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন, তা'র পর ভুলিয়া গেলেন। হারটি যেমন ধূলি ও বুল মাখিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনিভাবেই কিছুদিন কাতুর ঘরে আয়নার টেবিলের একটা দেয়ালে পড়িয়া রহিল। মেজোগিগি রোজ মনে করেন, ভুলিয়া রাখিবেন, রোজ কিছু-না-কিছু একটা কাজের পোলমালে ভুলিয়া যান। শেষে যে-দিন তিনি নিতান্তই মনের কল্পনাটাকে কাজে পরিণত করিতে আসিলেন, সেদিন আবার সেটাকে কিছুতেই কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এবারেও মেজোগিগি সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই একটু বকাঝকা করিলেন, বাবুরা দাঁড়াইয়া শুনিয়া যার-যার কাজে গেলেন, ঝি-চাকরেরা পরাম্পরের মধ্যে কলহ করিল, এবং পরের দিন কাহারোই আর কিছু মনে রহিল না।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকাল বেলা ধনিষ্ঠা গৌরীর কাছে বাস্তবিকই পড়তে বসল। পড়তে-পড়তে যেই চারটে বাজল ধনিষ্ঠা অমনি চঞ্চল হয়ে উঠল। সে হেসে গৌরীকে বললে—মাটার মশায়, এইবার তোমার পোড়োকে ছুটি দিতে হবে। তুমি খেলা করো গে, আমি কাজ করি গে।

গৌরী মার সঙ্গে পড়া-পড়া খেলাই করছিল; সেই খেলা ছেড়ে অন্য খেলা করতে যেতে তার মন সর্ব্ব ছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ করতে অনভ্যস্ত সে একবার মার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

গৌরী চলে' যাবার জন্তে উঠে দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠাও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের আপিস-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে।

আপিস-ঘরে এসে সে চেয়ারের উপর চূপ করে' বসে' রইল। রোজ চারটার সময় অনল জমিদারীর কাগজপত্র দেখাতে শোনাতে সই করাতে নিয়ে আসত। ধনিষ্ঠা তাকে আসতে নিজে বারণ করেছে। আজ হয়তো নিয়ে আসবে হরকান্ত পেশ্কার, কিন্তু ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে এই আশা এক-একবার উঁকি মারছিল যে এমন হয়তো কোনো কাজ থাকবে যা হরকান্তকে দিয়ে বলে' পাঠালেই চলবে না, অনলকে নিজে আসতে হবে। আবার পর-ক্ষেপেই মনে হচ্ছিল, আজ তিনি কিছুতেই আসবেন না; কাল তাঁকে আসতে বারণ করেছি, বিশেষ কাজ থাকলেও আজ তিনি কিছুতেই আসতে পারবেন না।

চারটে বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল। ঘড়ীর দিকে চেয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল আজ তিনি কখনই আসবেন না; তিনি এলে কখনোই এত বিলম্ব হ'ত না—তিনি এতদিন এসেছেন একেবারে কাঁটার-কাঁটার চারটেতে; তাঁর সব

কাজ একেবারে ঘড়ী-ধরা। আজ নিশ্চয়ই হরকান্তের শুভাগমন হবে।

এত লোক থাকতে সে ঐ মোটা কালো অতি সুবির জড়ভরত হরকান্তকে দিয়ে তার কাছে কাগজপত্র পাঠাতে বলেছিল কেন? ওর চেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি কি তার সেরেস্তায় কেউ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, হরকান্তের চেয়ে যে-কেউ সুদর্শন। কিন্তু সে বেছে-বেছে হরকান্তের আগমনই বাহা করেছিল এইজন্তে যে অতিনিদ্রুকণ-হরকান্তকে নিয়ে কোনোরকম কুৎসা রটাবার কল্পনা মনের কোণেও স্থান দিতে পারবে না।

চারটা বেজে কুড়ি মিনিট। খান্সামা এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—পেশ্কার মশায় এসেছেন।

অনলের আগমনের ক্ষীণ-আশা ধনিষ্ঠার মন থেকে খান্সামার কথার ফুৎকারে উড়ে গেল। সে উদগত দীর্ঘনিশ্বাস সেপে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খান্সামাকে বললে—নিয়ে এস।

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে হরকান্ত পেশ্কার প্রস্থান করলে ধনিষ্ঠা উঠে গিয়ে তার নূতন পূজার ঘরে খড়খড়ির ফাঁকে চোখ দিয়ে বসল—এইবার আপিসের ছুটি হবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাছারীর পেটা ঘড়ীতে পাঁচটা বাজল। কর্মচারীরা দলে-দলে বেরিয়ে আসতে লাগল এবং উঠানে নেমে নানান দিকে চলে' যেতে লাগল। সকলে চলে' গেলে পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটের সময় অনলের চাপরাসী মহীপৎ সিং দরজার সামনে তার বসবার টুল ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধনিষ্ঠা বুঝতে পারলে যে অনলও তা হ'লে আপিসঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। মিনিট খানেক পরেই অনল ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, মহীপৎ সিং সেলাম করে' তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। অনলের পিছনে-পিছনে তার আব্দালী সকালবেলার মতন ভেসপ্যাচ বকসের

উপর কাগজের নখি কাইল চাপিয়ে চলল। আবার সকাল বেলায় মতন মালখানার পাহারাওয়াল বন্ধক নামিয়ে ম্যানেজার-সাহেবকে সম্মান দেখালে, দেউড়ির পাহারা-ওয়াল কিরীচ অর্ধমুক্ত করে' ফৌজী কায়দায় কুর্শি কবুলে।

আজ থেকে ধনিষ্ঠার এই ধরা-বাঁধা কাজ হ'ল—সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত পূজো জপ করা, এগারোটায় সময় কর্মচারীদের কাছারাতে আসা দেখা; দুপুর বেলা গোরকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, বিকালে গোরীর কাছে পড়া, অঙ্ক কষা, চারটের সময় অনল আসবে আশা করে' প্রতীক্ষা করা এবং হরকাস্তের আবির্ভাবে মনমগ্ন হয়ে জমিদারীর কাগজে দস্তখৎ করা; আবার তার পর পুজার ঘর থেকে আপিসের ছুটির পর কর্মচারীদের প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা। ট্রাজ্জই হরকাস্তই আসে; সেই এসে বলে—ম্যানেজার বাবু আপনাকে বলতে বলেছেন....., অথবা ম্যানেজার-বাবু এই কাগজগুলো আপনাকে বিশেষ করে' দেখে হুকুম দিতে বলেছেন....., কিন্তু ম্যানেজার-বাবুর স্বয়ং আসার আবশ্যক একদিনও কি হ'তে নেই? ধনিষ্ঠা যতই হরকাস্তের কুলী চেহারা দেখে ততই তার মনের সামনে অনলের অনলপ্রভ দিব্যাস্ত্রের কাস্তি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে-ফুটে ওঠে।

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় দশ দিন কেটে গেল; অনল একদিনও আসা আবশ্যক মনে করলে না ধনিষ্ঠা মনে মনে অত্যন্ত অস্থিত্তি অনুভব করতে লাগল। সে নিজের কাছেও ঠিক স্বীকার করতে চায় না যে সে অনলের অহুরাগিনী; অথচ অনল যে তার কাছে না এসে বেশ নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারছে, এতেও সে ক্রেশ অনুভব করছিল; সে কি অনলের কাছে এমনই তুচ্ছ যে তার আসবার উপায় থাকা সত্ত্বেও অনল এই কদিনের মধ্যে একবার আসার তাগাদা অনুভব করেনি; অথবা অনলও তারই মতন ঔৎসুক্যের আগ্রহের বেদনা বোধ করছে, কিন্তু সে বীরপুরুষ, সকল দুঃখ অভাব সে যেমন অমান-বদনে বহন করেছে এই বেদনাও সে তেমনি সহজে সহ্য করছে। এই কথাটাই ধনিষ্ঠার মনে খুব সজত বলে' মনে হ'ল এবং ছুঁধের মধ্যেও সে আনন্দ অনুভব করতে

লাগল এই ভেবে যে অনলও তারই মতন বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করছে এবং অনল সাধারণ পুরুষের চেয়ে চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠ, সে বীরপুরুষ; সে যদিই অনলকে দেখে একটুও মুগ্ধ হয়ে থাকে তবে সে অপাত্রে তার শ্রদ্ধা সমর্পণ করেনি।

অনল যখন কিছুতেই কোনো কাজের উপলক্ষ্যই আসে না, তখন ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হ'তে লাগল যে সেই কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে একদিন ডেকে পাঠাবে। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যটি কি হবে? ধনিষ্ঠা হাজার-রকম প্রয়োজন উদ্ভাবন করলে, কিন্তু সব-কটাই তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল—তার মনে হ'তে লাগল, এষ্টরকম কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে ডেকে পাঠালে সে অনলের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে' যাবে।

বৈষায়িক কষ্ট-উপলক্ষ্যে অনলকে আহ্বান করার সুযোগ না দেপতে পেয়ে ধনিষ্ঠা পাঁজি দেখতে বসল, যদি কোনো পার্শ্ব-উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারা যায়। এটা অগ্রহায়ণ মাস; এ-মাসে কোনো পূজা ব্রত নেই; পৌষ মাসেও না—একেবারে পৌষ মাসের শেষে দধি-সংক্রান্তি ব্রত তার করতে হবে। অগ্রহায়ণ মাসে অগণ্ডবাদনী ব্রত বা পামাণচতুর্দশী ব্রত নূতন নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এইসব নূতন ব্রত নিয়ে তার নিজের কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু লাভ হবার তো সম্ভাবনা নেই; ব্রত-উপলক্ষ্যে আর-দশজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনল খেতে আসবে আর খেয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে' যাবে—এতে চোখের দেখা ছাড়া একটি কথা কইবারও সুযোগ ঘটবে না। চোখের দেখা তো সে রোজই দেখছে—এ না হয় দূর থেকে দেখছে, আর দক্ষিণা দেবার সময় সে নিকটে গিয়ে দেখতে পাবে এইমাত্র তো তাকাৎ। ব্রতের দান-সামগ্রী আর তো সে অনলকেই কেবল দিতে পারবে না, অনলকে ব্রতের প্রধান দান দেওয়াতে যখন কথা হয়েছে, তখন এবার থেকে অনলকে বেশী-কিছু দেওয়া উচিত হবে না; অনলই যদি লাভবান না হয় তবে মিছামিছি আর কোন্ লোকের ঘর ভরাবার জন্তে সে কষ্ট করে' নূতন ব্রত নিতে যাবে? সে অপেক্ষা করে'ই দেখবে কতদিনে অনল নিজে-তার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

*
* *

পূজোর ঘর থেকে খড়খড়ির কঁক দিয়ে ফুলের মতন ছুটি চোখের দৃষ্টি অনলের আসা-যাওয়ার পথের উপর সকাল-বিকাল পেতে রেখে ধনিষ্ঠার দেড় মাস কেটে গেল; অনল একদিনও ধনিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাকের কথার পরামর্শ করতেনও এল না। সমস্ত গ্রাম বিন্মরে অবাক হয়ে শুক হয়ে উঠেছিল। জানো সবাইকে বলে' বেড়াচ্ছিল—“তবে যে তোরা ভালোমাহুষের নামে বড় কলঙ্ক দিয়ে বেড়াচ্ছিলি, এবার বল কি বলবি?” সাধনের মতন কারো কিছু বলবার থাকলেও কেউ সাহস করে' বলতে পারছিল না; সবাই নিরুত্তরে শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়িই করছিল। কিন্তু তা'রাও নিজের অন্তরের মধ্যেও ঠিক সাড়া পাচ্ছিল না যে মনে-মনেও বলে ধনিষ্ঠা ও অনলের মনোমালিন্য ঘটেছে; অনলের ভাষ্করি গোরীর আদরের এতটুকুও হ্রাস হয়নি, ম্যানেজার অনলের প্রতাপও একটুকুও ক্ষয় হয়নি; অথচ অনাবিকৃত একটা ঘন রহস্য যে অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে এটাও অস্বীকার করবার জো নেই।

পৌষ মাসের শেষে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন দধি-সংক্রান্তির ব্রত। তার আগের দিন ধনিষ্ঠা তার ব্রত-পূজা-পার্কণের ব্রাহ্মণ পরিচারক প্রাণকৃষ্ণকে ডেকে বললে—কেউ ঠাকুর, গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে' এস, কাল আমার এখানেই তাঁরা অন্নগ্রহ করে' পৌষপার্কণ করবেন।

প্রাণকৃষ্ণ ধনিষ্ঠার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে হবে?

ধনিষ্ঠা বললে—হ্যাঁ।

প্রাণকৃষ্ণ একটু ইতস্তত করে' জিজ্ঞাসা করলে—সাধন চক্রবর্তী মশায়কেও?

ধনিষ্ঠা নিজের পূর্ব কঠিন আচরণের কথার উল্লেখে ঈর্ষং লজ্জিত হয়ে বললে—হ্যাঁ, কাউকে বাদ দিয়ে কাজ নেই; তবে সবাইকে বলে' দিয়ে, আমার বাড়ীতে ভোজন করতে যে-ব্রাহ্মণের আগন্তি আছে তিনি যেন কেবল-মাত্র অমিদারের খাতিরে খেতে এসে নিজের ধর্ম

নষ্ট না করেন। তা'তে আমি একটুকু অসন্তুষ্ট হবো না। একথাটা সবাইকে তুমি বেশ করে' বুঝিয়ে বলে দিয়ে।

প্রাণকৃষ্ণ “যে আছে” বলে' চলে' গেল।

অনল যখন শুনে যে এবার সাধনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে তখন সে একটা প্রচ্ছন্ন মানি থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ অস্বভব করলে।

সাধন নিজের গৃহিণীকে বললে—বড়লোকদের লীলা-খেলা বোঝা ভার!

পরদিন প্রত্যুষে উঠে ধনিষ্ঠা নিজের হাতে নানাবিধ পিঠে প্রস্তুত করতে লেগে গেল—মুখশাউনী, রসবড়া, গোকুল-পিঠে, পাটি-সাপটা, গোল-আলু পিঠে, বাঙা আলুর পিঠে, চিড়ার পিঠে, কীরের মালপো; ব্রাহ্মণীকে দিয়ে সর-চাকলি, আঁকে-পিঠে, চালের গুঁড়োর সিদ্ধ পিঠে প্রস্তুত করতে লাগল। তার এত আয়োজনের তলায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল গ্রামের সকল ব্রাহ্মণ-ভোক্তার পুণ্যসঙ্কয়ের লোভের ছদ্মবেশে একটিমাত্র ব্রাহ্মণের পরিতোষ।

ব্রত সাক্ষ হলে ধনিষ্ঠা ব্রাহ্মণভোজন দেখ্বে বলে নীচের তলায় যেখানে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসেছে তারই সামনের উপরের এক ঘরে এসে খড়খড়ির পাখী তুলে দাঁড়াল। সে চারি দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কোথাও যাকে দেখতে চায় তাকে দেখতে পেল না; তখন সে জান্না থেকে সরে' অপর জান্নায় গেল, দেখলে অনল সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে বটে, কিন্তু এক-টেরে একটা খামের আড়ালে, সেই জান্না থেকে তার শরীরের আভাস-মাত্র দেখা যাচ্ছে। ধনিষ্ঠা সেই ঘরের প্রত্যেক জান্নায় গিয়ে নানান দিক থেকে উকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল, কোথাও থেকে অনলকে স্পষ্ট দেখা যায় কি না। বুধা চেঁচা। খামটা ছল্‌ছল্য আড়াল করে' আছে। তখন ধনিষ্ঠার রাগ হ'তে লাগল অনলের উপর—সে কেন এত জয়গা থাকতে ঐ কোণে আড়ালে বসতে গেল। ধনিষ্ঠার ইচ্ছা যদি থাকে দেবার শক্তি থাকত, তা হ'লে ঐ খামটা ভূমিসাৎ হয়ে গুঁড়িয়ে যেত। সে যে ভোর-বেলা থেকে এত পরিশ্রম করে' নিজের হাতে এত পিঠাপুলি প্রস্তুত করলে, তা যার ভোগের জন্তে তাকেই সে দেখতে পেল না, এমনই তার ছয়দৃষ্ট!

ব্রাহ্মণদের ভোজন হবে গেন। প্রাণরক্ষ সকলকে অন্ন ও সদরের মধ্যবর্তী দালানে ডেকে নিয়ে এল, রাণী-মা সকলকে নিজের হাতে ভোজন-দক্ষিণা দিবেন।

ধনিষ্ঠা এসেই সঙ্কচিত দৃষ্টি চকিতে একবার সকল ব্রাহ্মণের মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে দেখলে, ম্যানেজার হ'লেও অনল প্রায় সকলের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। ধনিষ্ঠা এক-একখানি নূতন পাথরের রেকাবিতে ফল উপবীত ও দধিপূর্ণ বাটি নিয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবে; প্রাণরক্ষ একখানি রেকাবি তুলে ধনিষ্ঠার হাতে দিলে। সাধন চক্রবর্তী ধনিষ্ঠার নজরে ভালো করে' পড়বে বলে সকলের আগে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে ধনিষ্ঠার হাত থেকে দক্ষিণা নিতে অগ্রসর না হয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে অনলকে ডাকলে—ম্যানেজার-বাবু, আগিয়ে আনুন, রাণী-মা দক্ষিণা দিচ্ছেন।

অনল একজনের সঙ্গে কথা বলছিল, সে সাধনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বললে—আপনাদের দক্ষিণাস্ত আগে হয়ে যাক, আমার পালা.....

সাধন ব্যস্ত ভাবে বলে' উঠল—আরে মশায়, এও কি একটা কথা হ'ল, আপনি থাকতে অগ্রণী কি আর কেউ হওয়া সাজে.....

অম্নি আর দশ জনে বলে' উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি হলেন গিয়ে সকলের প্রধান, সকলের মাথার মণি.....

ধনিষ্ঠার মুখ লক্ষ্য লাল হুখে উঠল; অত শীতের দিনেও তার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিলে; তার সর্কাজ লক্ষ্য শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।

আর আপত্তি করা অশোভন হবে মনে করে' অনল হাসিমুখে এ'গিয়ে এসে ধনিষ্ঠার সামনে ছুহাতের অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল; তার মনে হ'ল যেন অনল-শিখা তাকে দগ্ধ কনুবার অস্ত্রে লকলক করে' তার দিকে এগিয়ে আসছে; ধনিষ্ঠা চোখ তুলে অনলের মুখের দিকে আর তাকাতে পারলে না, সে নতুনরনে কম্পিত-হস্তে অনলের হাতের উপর থালা রেখে দিলে।

তার পর প্রাণরক্ষ একে-একে তার হাতে দক্ষিণার থালা তুলে-তুলে দিতে লাগল, আর ধনিষ্ঠা কলের পুতুলের মতন সেগুলি তার সামনে প্রসারিত এক-এক ব্রাহ্মণের

হাতে সম্ভ্রমান করে' দিলে; সে একবারও চোখ তুলে' দেখলে না যে কার হাতে সে দক্ষিণা দিচ্ছে।

* * *

সাধন চক্রবর্তী প্রকৃতি ব্রাহ্মণেরা ম্যানেজার বলে' অনলকে সর্কাজে দক্ষিণা নিতে অহুরোধ করেছিল কি ধনিষ্ঠার প্রিয়পাত্র বলে তাকে অগ্রণী হ'তে বলেছিল, এই সম্বন্ধে ধনিষ্ঠার অন্ন নিরস্তর পৌড়িত হচ্ছিল; সে যতই ভাবছিল, ততই ব্রাহ্মণদের কথার মধোকার প্রচ্ছন্ন বিক্রমের ইঙ্গিত তার মনের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এক-একবার ধনিষ্ঠা লক্ষ্য অপ্রতিভ হচ্ছিল, আবার এক-একবার সে সকলকে উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে' নিজেকে অহঙ্কারের সাঙ্ঘনা দিতে চেষ্টা করত—“বলুক গে যে যার খুশী, আমি কি কাউকে ভয় করি, না কারো তোয়াক্বা রাখি। আমি আমি তো কিছু অন্ডায় অপকর্ষ করিনি যে লক্ষ্য পাবো।” কিন্তু তখনই আবার তার মনে হচ্ছিল—“স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালো লাগাও যে অপরাধ!” ধনিষ্ঠা নিজের মনেও অনলের প্রতি তার মনের ভাবকে ভালোবাসা বলতে সঙ্কোচবোধ করে' ভালো লাগা বললে। পরক্ষণেই সে আবার এই ভেবে সাঙ্ঘনা খুজলে যে—বাঃ রে! ভালো লোককে ভালো লাগবে না!

ধনিষ্ঠার মন অনলের চিন্তায় যখন একেবারে পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে তখন একদিন মাধবী এসে তাকে হাস্তে-হাস্তে উৎসাহে ব্যস্ত হ'য়ে ধবর দিলে—মা গো মা, ননী ঘটক ম্যানেজার-বাবুর...

মাধবীর কথার এইটুকু ধাঁ করে' ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার বুকে এমন জোরে ধাক্কা দিলে যে তার সর্কাজের শিরা-উপশিরা ঝিনঝিনিয়ে উঠল, মাধবীর কথার শেষটুকু, “বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিল,” সে আপনি আশ্বাস করে' নিতে পেরেছিল। ধনিষ্ঠার মনের উপর দিয়ে চকিতে চিন্তার ঝড় বয়ে গেল—“উনি যদি বিয়ে করেন তাতে আমার কি, বিয়ে নাই যদি করেন তাতেই বা আমার কি? কেন তিনি চির-জীবনটা একলা থাকবেন, কিসের জন্তে?” এই কথা মনে ভাবলেও ধনিষ্ঠা তার ম্যানেজারের বিয়ের খবরে মুখে কিছুমাত্র উৎসাহ বা সন্তোষ

দেখাতে পারলে না, সে চূপ করে' মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাধবী বলতে লাগল—কেতনপুরের জমিদারের মেয়ে, বেশ ডাগর, সুন্দর; তারা খুব সুন্দর সূঁচিরি একটি পাস্তর চায়। তা আমাদের ম্যানেজার-বাবুর মতন সুন্দর পাস্তর আর পাবে কোথায়? মেয়েও ভালো ঘর, ভালো, এ বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত

মাধবীর কথা এই “হ'লে হ'ত” শব্দটি সম্ভাবনাকে নিরস্ত করে' দিতেই ধনিষ্ঠার মন প্রফুল্ল ও শ্রবণ উৎসুক হয়ে উঠল, তখন সে হেসে কথা বলতে পারলে—কিছু হ'ল না কেন?

মাধবী বললে—ম্যানেজার-বাবু এই বলে, ননী ঘটককে ফিরিয়ে দিলেন যে তিনি কখনো বিয়ে করবেন না...

ধনিষ্ঠার মন অকস্মাৎ অকারণ আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠল। মাধবী বলতে লাগল—কে একজন অচেনা লোক এসে মেম-দিদিমণিকে যদি দেখতে না পারে

ধনিষ্ঠার মনটা আবার দমে' গেল—ও। এইজন্তে তিনি বিয়ে করবেন না? ভাইবির কষ্ট হবার ভয়ে? আর-কিছুর জন্তে নয়?

এই আর-কিছুটা যে কি তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই রয়ে' গেল, মনের সামনে সেটাকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে সে দিলে না।

এই সংবাদ পাওয়ার পর অনলের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা ধনিষ্ঠার মনে প্রবল দুর্দম হয়ে উঠল। সে পরদিন সকাল বেলা উঠেই অনলকে বলে' পাঠালে—যদি আপনার অবকাশ থাকে তা হ'লে আজ বিকালে যখন হয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

আজও ধনিষ্ঠা পূজার ঘরে বসে' বসে' খড়খড়ির পাখীর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে অনলকে আপিসে আসতে দেখলে—আজ অনলকে যেন আরো ভাবের বলে' বোধ হ'ল; অনল বিয়ে কর'ত চায় না পিতৃমাতৃহীন ভাইবির কাছে কোনো ক্লেশ হয় এই সুদূর সম্ভাবনার কল্পনার ভয়ে! এ কী কম আত্মত্যাগ, সাধারণ সংযম, সামান্ত স্নেহপরায়ণতা? অনলের ভাইবির সকল তার তো স্বেচ্ছায় সানন্দে ধনিষ্ঠা গ্রহণ করেছে, অনল তো অনায়াসেই ভাইবির সহজে নিশ্চিত হয়ে নিজের সুখস্বাস্থ্যের জন্তে ঘর-করা পাত্তে পারত; সবু যে

সে অস্বীকার করছে এ কি ভাইবির প্রতি অত্যধিক স্নেহ মমতার পরিচয়, না তদতিরিক্ত আর-কিছু, যা সে প্রকাশ করে' বলতে পারে না বলে'ই ভাইবির বেনামিতে বিয়ে করতে আপত্তি করছে? এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ধনিষ্ঠার মনে উদয় হ'তেই তার বুকের রক্তে টেউ খেলে উঠল, আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিকাল বেলা হরকান্ত পেশকার ম্যানেজারের কাছে বক্তীকে দিয়ে সই করাবার কাগজপত্র বুঝে নিতে গেল। অনল একটা কাগজে কি লিখতে-লিখতে মাথা না তুলেই বললে—একটা বিশেষ কাজের জন্তে আজ একবার আমাকে রাণীর কাছে যেতে হবে, আমিই চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসব, আপনাকে আর কষ্ট করে' যেতে হবে না।

“যে আজ্ঞে” বলে' হরকান্ত নিষ্কাশ হ'তেই অনল তার ষারবানকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলে। মহীপৎ সিং ঘরে এসে দাঁড়াতেই একটা কাগজ পত্রের ফাইল তার হাতে দিতে-দিতে অনল বললে—অন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

অনল অন্দরের উদ্দেশে রওনা হ'ল, পিছনে-পিছনে চলল মহীপৎ সিং।

ধনিষ্ঠা এই সময়টিতে অনলের শুভাগমন দর্শন করবার প্রতীক্ষাতে তার পূজার ঘরের জান্নায়ে চোঁখ দিয়ে বসে' ছিল। চারটের আগে থেকে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করে' করে' সে দেখলে, হরকান্ত ম্যানেজারের ঘরে গেল; অমনই আশঙ্কায় তার বুক চুরুচুরু করে' উঠল—তা হ'লে আজও হরকান্তেরই আবির্ভাব হবে! হরকান্ত অতি অল্পকণ পরেই খালিহাতে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের আপিস-ঘরে চলে' গেল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে মহীপৎ সিং তার টুল ছেড়ে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকল; এ-দেখে ধনিষ্ঠার মন আশায় ফুলে উঠল। অল্পকণ পরেই অনল বেরিয়ে অন্দরের দিকে রওনা হ'ল, তার পশ্চাতে কাগজ-পত্রের ফাইল নিয়ে আসছে মহীপৎ সিং। এই বহু প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখে ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের আপিস-ঘরে গিয়ে চূপ করে' বসল। অল্পকণ পরেই তার খান্সামা এসে তাকে তার জানা-খবর জানালে—ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

প্রতিদিনের বাধি বুলি “নিরে এস” বলতে আজ

ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল।

অনল এসে ঘরে প্রবেশ করলে।

প্রায় দু'মাস অসামান্যতের পরে আজ উভয়ে পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে দুজনেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, যেন আজ তাদের আবার নূতন করে' পরিচয় হচ্ছে, নিত্যকার দর্শনের সেই শিথল-ছাত্রীর সহজ ঘনিষ্ঠতা কেউ আর প্রকাশ করতে পারছিল না।

জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র দেখা-শোনা ও সই করা হয়ে গেল, কিন্তু দুজনের কেউই একথা উত্থাপন করতে পারলে না যে, ধনিষ্ঠার আহ্বানে অনল আজ তার কাছে এসেছে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে আর যখন ধনিষ্ঠার কাছে থাকবার কোনো প্রয়োজনই রইল না, তখন অনল কাগজ-পত্র তুলে নিয়ে গমনোদ্ভূত হ'ল; তখনও সে মনে করছিল যে এইবার ধনিষ্ঠা তাকে তার আহ্বানের প্রয়োজনের কথা বলবে। সে যখন দ্বারের কাছে পধ্যস্ত চলে' গেল তখনও ধনিষ্ঠা তাকে কিছু বললে না দেখে সে হতাশ হ'ল, অথচ কৌতূহলের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠাতে সে ধনিষ্ঠার আহ্বানের কারণ না জেনেও যেতে পারছিল না। অনল মনে করলে, ধনিষ্ঠা হয়তো ভুলেই গেছে যে তারই আহ্বানে আজ অনল এসেছে। কিন্তু ধনিষ্ঠা সে-কথা মোটেই ভোলেনি। সে অনলকে কাছে এনে দেখবার আগ্রহে যে অছিল করে' তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, অনল কাছে আসাতে সেই প্রয়োজন এমন অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি হাস্যকর বলে' তারই মনে হ'ল যে সে-কথা সে উত্থাপন করতেই পারলে না। অনল যখন তার আহ্বানের কথা উত্থাপন না করে'ই চলে' যেতে উদ্ভূত হ'ল তখন ধনিষ্ঠা যেন স্বস্তি বোধ করতে লাগল—যাক তাকে অনলের কাছে সেই হাস্যজনক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হ'ল না।

অনল দরজা পেরিয়ে গিয়েও যখন দেখলে, ধনিষ্ঠা তাকে ফিরে ডাকলে না, তখন সে নিজেরই আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল এবং যেন সে ভোলা কথা স্বরণ হওয়াতে ফিরে এসেছে এমনিভাবে ভিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন? কোনো কাজ.....

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল,—মনে অভিমান জ্বলন্তরে বলে' উঠল—ওগো অমুনি কি কাউকে ডাকতে নেই? কিন্তু সে মুখে যুহু নম্ররূপে বললে—কাজ তেমন কিছু নয়.....গৌরার বিয়ের জন্তে একটি পাত্র....

ছ' বছরের মেয়ের বিয়ের জন্তে পাত্র। কথাটা বলতেই ধনিষ্ঠার কানে নিজের কথাই যেন বিজ্ঞপের মতন বাজল—এই কথা বলতে অনলকে ডেকে আনা যে কত বড় স্পষ্ট চলনা তা ধনিষ্ঠার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনলও বোধ হয় ধনিষ্ঠার চল বুঝতে পেরেছিল, নইলে সে ধনিষ্ঠার ঐ অসম্ভব প্রস্তাবে হেসে না উঠে গম্ভীর হয়ে থেকেই বললে—যে আজ্ঞে, আমি ননী-ঘটককে বলে' দেবো খুজতে থাকবে।

অনলের এই উত্তরে ধনিষ্ঠা আরামের অহুভব করলে—যাক, তা হ'লে তার প্রস্তাবটা অনলের কাছে নিতান্ত হাস্যকর হই-নি; আবার সে অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল—এমন অসম্ভব প্রস্তাবে অনল না হেসে, আপত্তি না করে' গম্ভীর হয়ে যে সম্মত হ'ল এতে সন্দেহ হ'লে লাগল, তার তুচ্ছ চলনা নিশ্চয়ই অনলের কাছে পরা পড়ে' গেছে। ধনিষ্ঠা এই ভেবে তাড়াতাড়ি বললে—গৌরার বিয়ে এখন দেবো না; কিন্তু সদ্ভ্রাতৃত্বের সদাচারী একটি ছেলে দেখে তো গৌরীকে সম্প্রদান করতে হবে; সে-রকম পাত্র সংসা পাওয়া কঠিন হ'তে পারে। তাই মনে করুছিলাম একটি ভালো ছেলের সম্মান পেলে তাকে মাগুয করে' তোলাবার ভারও আমরা নিতে পারি...ছেলেটি সং বংশের সংপাত্র হওয়া চাই, আর কিছু দেখবার দরকার নেই।

অনল কেবলমাত্র বললে—যে আজ্ঞে।

অনল ঘর থেকে চলে' গেলে ধনিষ্ঠার মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠল, তার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হ'তে লাগল। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে—আমি মরে' গেলেও আর কোনো দিন ঠেকে ডেকে পাঠাবো না; উনি নিজেকে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো আসবেন, নইলে এই শেষ।

শেষ কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল, মুখ মলিন হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

কাপ্তেন আমুনসেন

শ্রী কনক গুপ্ত

ভগতে জ্ঞানের রাজ্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জ্ঞানের দিক দিয়ে মানুষ সাধনার পথে বতই এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট ছুনিয়ার অজ্ঞাত অখ্যাত দেশগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার পথ হাও তা'র ওতই বেড়ে উঠছে। এইসব অজানা অঞ্চলের আবিষ্কারের দ্বারা ধারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, কাপ্তেন আমুনসেনের (Captain Amundsen) নাম তাঁদের ভিতর বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর উত্তর-পশ্চিম (North-West Passage) ও উত্তর-পূর্ব-পথের (North-East Passage) আবিষ্কার, তাঁর দক্ষিণ মেরু (South Pole) পরিভ্রমণ তাঁকে মানুষের সমাজে যে অনন্য করে তুলেছে তাতে আর এতটুকু সংশয় নেই।

কাপ্তেন আমুনসেনের বয়স এই ৫২ বৎসর। জীবনের শেষ-বয়সে বাঙালীর মেহের গুণের বেলা-পেহের রান অক্ষকার ঘনিষ্ঠ আসে, সে-বয়সেও কাপ্তেন আমুনসেনের মনের যৌবন এতটুকু হ্রাস পায় নি। প্রাণের পরিপূর্ণ চাকসো এবং অকুরন্ত কুর্তির বাহুল্যে তা এখনও সম্ভব, স্তম্ভ, উত্তরায়িত। মেহের নৈর্ঘ্য তাঁর চর কুটেরও বেশী; চোখ উজ্জ্বল—সমুদ্রের মতন নীল; তাঁর গুণেরে অকুরটো এসে থমুকের মতন বুলে পড়েছে; মাথা প্রকাণ্ড একটা চম্বলিগে চাকা; শরের তেতর দিয়ে একটা অক্ষয় কুটুর আভাস পাওয়া যায়; মুখের দিকে তাকালেই বোকা বার, বৈধ্য এবং সাহস তাঁর মেহমনে যে শক্তি এনে দিচ্ছে তা যেমন অসাধ, তেমনি অসাধারণ। মেরুপ্রান্তের যুদ্ধ যে তাঁকে একেবারে অক্ষত রেখে রাখনি, তাঁর পরিচরও তাঁর রেখা-বহুল মুখের ভিতর দিয়েই ফুটে উঠেছে।

আবিষ্কারক বলতে বা বুঝায় কাপ্তেন আমুনসেনের আসন তাঁর চেয়ে অনেকখানি উচুতে প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক বললেই তাঁকে বর্ধার সন্ধান দেওয়া হয়। আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর সামুদ্রিক অভিযানগুলি স্তম্ভ হবার অনেক আগে ক্রিস্টিয়ানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছু দিন ভেজ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এইসময় থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আসক্তির পরিচর পাওয়া যায়। তরুণ বয়সেই তাঁর মনের ভিতর ছুনিয়ার অনাবিষ্কৃত স্থানগুলির আহ্বান এসে পৌঁছেছিল। সেই-সব রহস্য-লোকের মারা-কভারা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই তিনি বেগিয়ে পড়লেন জাহাজে চড়ে উত্তর-পশ্চিম-পথের অভিসারে। এ-পথটা তিনশ বছর ধরে এমনি ক'রে অনেকেই হাতছানি দিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে ধরা দেয়নি। সে ১২০৩ খৃষ্টাব্দের কথা এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। এ সেই বয়স যে-বয়সে মেহের ভিতর যৌবনের রক্ত টপক ক'রে ফুটে থাকে এবং মানসীর সম্মানে ছুসাহসের পথে পা বাড়াতে মানুষ কিছুমাত্র বিধা করে না।

কাপ্তেন আমুনসেন রওনা হলেন, তখনকার ক্রিস্টিয়ানিয়া বর্তমান ওসলো সহর হ'তে। আর সেই দিগন্তহারা সমুদ্রের বুকে এই অনিশ্চিত অভিযানে তাঁর বাহন ছিল ছোট একখানা জাহাজ—বাকে লক্ বললেও অজ্ঞানি হয় না। তাঁর এই বাহনের নাম ছিল জোয়া (Gjoa) এবং সেখানা পরিচালিত হ'ত পেটোলিরান ইঞ্জিনের সাহায্যে। এই দক্ষিণ-পশ্চিম পথের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইংলন্ড, কত বড়-বড় জাহাজ পাঠিয়েছে, কিন্তু জয়ের সৌভাগ্য তারা কেউ কিন্তে পারেনি। পথের সম্মান তাঁরা পেরেছে, কিন্তু পথের প্রান্ত-সীমার পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তিন বৎসর ক্রমাগত সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম পথ ও পাঁচাড়-পূর্বপথের সংঘাত হ'তে আক্রমণ ক'রে মারা-রকমেব জাত ও অজ্ঞাত বিপদের সঙ্গে বুকে তাঁর সেই নোটে ৪৭ টন ভারবাহী কুস্ত লক্খানা গোটা উত্তর-পশ্চিম পথ প্রদক্ষিণ ক'রে একদিন ব্যারিং প্রণালী এবং তা'র পর প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতর প'ড়ে ইংপ ছেড়ে বাঁচল। উত্তর-পশ্চিম-পথের গুণর সেই প্রথম মানুষের অহ-বাজার বিজয়-নিশান উড়ুল, কাপ্তেন আমুনসেনের ধৈর্য, সাহস ও অ-স্বসাধারণ প্রতিভার।

এই সমুদ্র-বাজার তিনি চুখক ও বায়ুমণ্ডল-সম্পর্কীয় এমন কতকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যার থেকে একরূপ আকস্মিকভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে যে, উত্তর মেরুর চুখকাধার এক জারগার দ্বারা নয় প্রতি বৃহর্ষে তা স্থান পরিবর্তন ক'রে চলেছে। এই আশিষানে তিনি বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে এতসব রসদ সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন যে, ক্রিস্টিয়ানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সেগুলোর পরীক্ষা শেষ ক'রে উঠতে পারেননি, তাঁর কিয়ে আসবার বিশ বৎসর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা তাঁর সেইসব মাল-মশলা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষার জের টেনে চলেছেন।

এর পরে আমুনসেনের মনের ধোয়া-দেবতার কাছে আহ্বান এসে পৌঁছিল, দক্ষিণ-মেরুর প্রান্ত হ'তে সেখানকার অনাবিষ্কৃত রাজ্যটা জয় করবার ক্ষেত্রে। ইংরেজ পরিভ্রমণক শ্রাকল্টন দক্ষিণ-মেরুর তুমার-কুপকে শ'থানেক মাইল দূর থেকে মনকার ক'রেই কিয়ে এসেছিলেন—তা'র প্রান্তসীমার পৌঁছবার শক্তি তাঁর হয়নি। শ্রাকল্টন বা পাবেননি তাই সাধন করবার ক্ষেত্রে এবার আমুনসেনের মন মাতাল হ'য়ে উঠল। তিনি আবার 'ক্রাম' নামক জাহাজে চড়ে সাগরে তাসলেন। এই জাহাজখানির পিছনেও একটা খ্যাতির বনিয়াদ ছিল। এই জাহাজে চড়েই তাঁর আগে কাপ্তেন নানসেন উত্তর-মেরুর অভিসারে পা বাড়িয়ে-ছিলেন।

দক্ষিণ-মেরুর আবহাওয়া উত্তর-মেরু অপেক্ষাও পীড়াদায়ক। গ্রীষ্মকালেও এখানকার উত্তাপ তাপবস্তুর শূন্য অঙ্কটাকে চাড়িয়ে নীচের দিকে প্রায় ৫০ ডিগ্রি নেমে যায়। উত্তর-মেরু চারিদিকে তল দিয়ে ঘেরা সমুদ্রের ভিতর অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ঠিক এর উল্টো। এ একটা মহাদেশ এবং এর চারিদিকেই সমুদ্র। এর অক্ষ:প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম। কারণ, বরকের বিপুল স্তম্ভ এ'কে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আর সেইক্ষেত্রেই আমুনসেনের আগে ধারা এই মহাদেশটাকে আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁরা কেউ মেরু-ক্ষেত্রের ভিতর পৌঁছতে পারেননি, বৃহত্তর বাইরে এখানে-ওখানে ছ'একটা ছোটোখাটো দ্বীপ আবিষ্কার ক'রেই কিয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-মেরু বিস্তৃতিতে পোটা ইরোরোপের অন্ততঃ বিপণন হবে। মাঝে-মাঝে বছর পূর্বে এ মহাদেশটা সম্ভবতঃ আমেরিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তা'র পর প্রাদৈত্বাসিক যুগেও প্রায়-বিকোচে পৃথিবীর ওলটপালট ঘটন স্তম্ভ হ'ল, তখন আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রের তলে আত্মর গ্রহণ করেছিল। এখন এর কোনো কোনো স্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত চার মাইল নীচে অবস্থিত। এর যুক্তিকাত্যস্তর



উত্তর-মেরু একদল অধিবাসী

থেকে যে-সব উদ্ভিদের ও জীবদের অবশেষ উদ্ধার করা গেছে তা দেখে মনে হয়, এখানকার আবহাওয়া গরম না হ'লেও অস্বস্তি: নাতিশীতোষ্ণ-রকমের ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাপ্তেন আমুনসেন নরওয়ের জাতীয় পতাকা দক্ষিণ মেরু বৃক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এসেছেন। কেমন ক'বে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এই স্থানের ভূগর্ভস্থ গিরিগুলো অতিক্রম করেছিলেন, জুবার-প্রাচীর ও জুবার-নদীর ভূগর্ভস্থ পাথর পার হয়ে-ছিলেন সে এক অদ্ভুত কাহিনী। অপূর্ব বীরত্ব, বৈদ্য এবং জুগোপিততার চাপে তাঁর ই'তহাসের আগাগোড়া পরিপূর্ণ।

তাঁর জীবনের এই সার্থকতম দিনটার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:—
আমরা বরফে পেরেছিলুম, ১৪ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পার্লাম। অবশেষে সেই ১৪ই ডিসেম্বর এনে কাড়ির হ'ল। চিত্ত আমাদের একপন্থাবে উত্তেজিত হয়েছিল, যেখানে বেলোকন ঘূষ'ত পার্লাম না। তাড়াতাড়ি প্রত্যর্ভোজন শেষ ক'রে মিলুম। অস্তান্ত 'ভনের চেয়ে সেদিন আমাদের পথযাত্রাও অনেক আগেই শুরু হ'ল। আর সব দিনের মতোই সে'রনটাও খুব ক্লান্ত ছিল। চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ, বাতাস খীর সূক্ষ-মন্দ। আমাদের পথ খুব এখির চলল। তারা যুগে বেলোকনা নেই। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই আমরা নিভের-নিভের চিত্তা িয়েই ব্যস্ত ছিলাম, অথবা আনন্দ সকলের

মন জুড়ে' একটা চিত্তাই ভেগে ছিল, বার জন্তে সখুখের বিসৃত বিপুল অধিত্যকার দক্ষিণ প্রান্তের দেক্ থেকে আমরা নিম্পলক দৃষ্টিটাকে কিছুতেই ফেরাতে পার্লাম না। আমরা ভাব'ছিলুম—আমরাই এখানে প্রথম, না আমাদের আগে আরো কেউ এখানে এসেছে?—“দাঁড়াও”—সে-সকল আনন্দের তড়িৎ প্রবাহের মতন আমাদের দেহের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। দু'র হৃদয় নিকটতম হ'য়ে উঠেছে; গন্তব্য স্থান আমাদের অধিগত; বিরাট অধিত্যকা আমাদের পায়ের তলায় পা'ড়ে রয়েছে যাকে এর আগে আর কেউ কখনো চোখে দেখেনি, মানুষের পায়ের চিত্ত এর আগে যাকে আর কখনো কলঙ্কিত করেনি! কোথাও কোনো দগটিও নেই। সে মুহূর্ত্ত কি নাভীঘাতরা গৌরবের মুহূর্ত্ত। আমরা সকলে একসঙ্গে হাতে ধ'রে

ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু বৃক্কের উপর বদেশের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করলুম।

আমুনসেনের তৃতীয় কীর্তি উত্তর-পূর্ব-পশ পরিভ্রমণ। তিনি নিজে এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার ব'লেই বর্ণনা করেছেন। পরাভ্রমণের ত্রিতর দিগেও এগার ভাগের ষেরালী দেবতা তাঁর পলায় যশেব জয়মালা ছলিয়ে দিগেছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে সমুদ্র-যাত্রা করেন, তা'তে উত্তর-পূর্ব পথে: আবিষ্কার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, রশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশের একটা উত্তরতম অংশ হ'তে বরফস্তূপের



জুবার-কুটারের অধিবাসী একদল মেরুবাসী। কোটো জুলিবার ভয়ে প্রত্যেকেই খুব চাকিয়া আছে



কাপ্তেন আমুনসেন ও একখানি কুকুরটানা সেজ গাড়ী

পিঠে চ'ড়ে উত্তর-মেরুর ভিতর দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে প্রাণল্যাণ্ডের কাছে এসে পৌঁছানো। তাঁর উত্তর মেরু আবিষ্কারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, সাইবেরিয়ার সমুদ্রোপকূলের একটা জন-মানবশূন্য দ্বীপের কাছে তাঁর জাহাজ বরফের ভিতর ছ'বছর ধরে আটকা প'ড়ে ছিল। তাঁর চারপাশের এই বরফস্তূপের উচ্চতা কোথাও ছিল তিন ফুট, কোথাও চার ফুট, আবার কোথাও বা ন' ফুট। এই বরফস্তূপকে ভেঙে, চূর্ণ করে তাঁকে বেরিয়ে আসবার পথ তৈরী করে নিতে হয়েছিল। কলে যে উত্তর-মেরু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দরিয়ার ভেসেছিলেন, তাতে বাধা পড়লেও তিনি উত্তর-পূর্ব পথ আবিষ্কার করে কিয়ে এলেন। তাঁর আগে উত্তর-মেরুর সমুদ্রগুলোকে প্রদক্ষিণ করবার সামর্থ্য আর কারো হয়নি।

এইসময় কাপ্তেন আমুনসেন এবং তাঁর সহযাত্রী বহুরা চারিধারের অধিবাসীদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখবার অবকাশ পান। তাঁরা এইসব পরিত্যক্ত প্রান্তরে বরফস্তূপের ভিতর বসুণা-হরিণ সংগ্রহ ও শিলমাছ শিকারের উদ্দেশ্যে এসে হাজির হ'ত। এদের রাজনীতি, ভাষা, বাসের প্রণালী সব এসকিমোদের থেকে ভিন্ন-ধরণের। এইসব প্রান্তরে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তাঁবু কেসে তাঁরা বাস করত। এক-একটা তাঁবু ভিতর একসঙ্গে ৫০ জন লোককেও বাস করতে দেখা গিয়েছে।

ইরোরোপিয়ানদের সংস্পর্শ এই উত্তর মেরু অঞ্চলের লোকদের পক্ষে হিতকর হয়েছে কি না, সে-সম্বন্ধে কাপ্তেন আমুনসেনের বখেট সন্দেহ আছে এবং সে-সন্দেহ প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন—“যেতান্নেই এই মেরুপ্রান্তবাসী লোকগুলোর ভিতর বন্দা, উপহাস, মদ প্রভৃতি জিনিষের আমদানি করেছেন। মিশনারীরা এদেশে

এসে দেখলেন, এরা দেহাবরণের জন্তে খুব সামান্ত বস্ত্রই ব্যবহার করে। এ-দৃশ্য দেখে লজ্জার এবং করুণার তাঁদের মন উবেলিত হ'য়ে উঠল। হুতরাং তাঁরা এদেরকে উপহার দিলেন, তাঁদের প্যাণ্ট, শার্ট, চুপি প্রভৃতি। এইসব উপহারে দেহ আচ্ছাদন করার কলে তাঁদের দেহ বাতাস হ'তে বঞ্চিত হ'ল, যতটা সূর্যালোক মেহের জন্তে আবশ্যিক তাও তাঁরা পেলে না। এমনি ক'রে ক্ষয়-রোগের বীজ তাঁদের দেহ অধিকার ক'রে বসেছে। এইসব বিংশম্রীদের আমরা হয়তো খানিকটা উপকার করেছি, কিন্তু ঋণের খাতার আমাদের নামে যে অঙ্কগুলো জমা হ'য়ে আছে তাঁর পরিমাণও বড় কম নয়।

উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টার ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তা নয়। তিনি আবার অবিলম্বেই মেরুপথে পাড়ি জমাবার জন্তে ধর ছেড়ে ঝকুলে ভাসবেন। এবার তাঁদের বাহন হবে চুখানা উড়ো জাহাজ এবং স্পিটবার্জেন থেকে তাঁদের এই উড়ো জাহাজ উত্তর মেরুর অভিবানে বাতাসের দরিয়ার গা ভাসাবে। উড়ো জাহাজে 'রোলস রয়স্' মোটরকার থাকবে। কাপ্তেন আমুনসেন বলেছেন— এই মেরুপ্রান্তর প্রদক্ষিণে তিনি সাত বছর বেকী সময় নেবেন না। কিন্তু কুকুর এবং নোকোর সাহায্যে একাজে সাফল্য লাভ করতে অন্তত সাত বৎসর সময়ের দরকার হ'ত।

কেবলমাত্র সাহসিকতার দিক দিয়েই যে কাপ্তেন আমুনসেন অসাধারণ তা নয়, মানবতার দিক দিয়েও তাঁর উদারতা অনন্ত সাধারণ। ইরোরোপ ও আমেরিকার মনে যেতান্ন-শ্রেষ্ঠতার যে গর্ব আজ হিমালয়ের মতন এশিয়ার সঙ্গে মিলনের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, কাপ্তেন আমুনসেনের মন তাতে একটুকুও সাড়া দেয়নি। তাঁকে গ্লিঙ্জেস করা



একজন এস্কিমো বর্ষা দিরা মৎস্ত শিকার করিতেছে

হয়েছিল, "যেত জাতিটাই ছুনিয়ার চিরদিন বড় করে থাকবে, এই-রকমের একটা আন্দোলন যে যেতাজদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে—এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

উত্তরে তিনি বলেছেন—"বিজ্ঞান এরকম কোনো আন্দোলনকে আমল দেয় না। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চামড়ার রঙের স্বেচ্ছায় বড়াই হেঁচো দিতে শুরু করেছে। বিজ্ঞান জোর দিচ্ছে চামড়ার নীচে যে ব্যক্তিগত শক্তি লুকানো রয়েছে তারি ওপরে। ভীষণ, বিজ্ঞানসত্তা, মানসিক শক্তি—এগুলোই সজে গায়ের রঙের কোনো সম্বন্ধ নেই।"

কোঁকের মাথার আল ইয়োয়োপ এবং আমেরিকা অবস্থ বৃদ্ধে পাবতে না সে, কাপ্তেন আমুনসেনের এই কথার ভিতর কত বড় একটা সত্য নিহিত আছে। তাই তাঁদের কাজ-কর্মে আইনে-কানুনে, আচার-বাবচানে-এশিয়ার প্রতি একটা বিষয়ের ভাব একান্ত স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। সামোর দোহাই দিয়ে বত-রকমের অজ্ঞানের অনাচার এঁরা দিনের পর দিন মিলনের পথের সম্মুখে জমা করে তুলছেন। কালো, জ্ঞান, পীত এমনি সব বর্ণভেদে বাতলো তাঁদের মনের সাদা রঙটা ঘুলিয়ে কালো করে উঠেছে। এর কলে মানবের ভবিষ্যৎ আকাশেও যে মেঘের সকার হচ্ছে তার প্রতি কাব্য নেই। কিন্তু ঝড় যদি জোরে ওঠে তবে তা'তে যে কেবল এশিয়ারই ক্ষতি হবে না, এটা সোজা কথা।

কাপ্তেন আমুনসেনের দেহেব রং সাদা হ'লেও যেতাজদের এই দৃষ্টি তাঁর মনের সাদা রংকে নষ্ট করতে পারেনি। তিনি যে সমগ্র মানব জাতির বন্ধ এবং জায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত তা তাঁর আন্তর্জাতিক সমস্তাগুলির আলোচনায় ভিতর দিয়েও ফুটে উঠেছে। এসম্বন্ধে তাঁর উক্তি পরূপাত-বর্জিত ও নির্ভীকতার ভরা। বৃদ্ধের সময় 'লীগ অফ নেশনস' পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করণের ব'লে পায়তারা শুরু করেছিলেন। এই 'লীগ অফ নেশনস'-সম্বন্ধে কাপ্তেন আমুনসেন যা বলেছেন তার ছ'-চাঃটে কথা তর্জমা করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, "ছুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার 'লীগ অফ নেশনস'-এ"র চেয়ে যে বার্গ হ'ল তা'র কারণ, জায়ের উপর ভিত্তি করে এ-প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে ওঠেনি। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তা'র বনিয়াদ জায় ও মানবজাতির সৌজাতের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। লীগ এশিয়ার কথাটা একেবারেই ভেবে দেখেনি, অথচ এই এশিয়াতে গোটা ছুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশী লোক বাস করে। এরাও প্রাচ্য দেশটাকে ইয়োয়োপের দোহন করবার গাঙ্গী ক'রেই রাখতে চেয়েছেন। লীগের যারা মোড়ল, তাঁরা কেউ কাটিকে বিশ্বাস করেন না, পরস্পরকে ঙিৎসা করেন এবং এশিয়া ও জাফিকাতে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে আন্তর্জাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিযুক্ত। জেনেতার এই রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজিতে সেই জাতিই জয়লাভ করেছে, হাতিয়ার চালাতে এবং রক্তের নদী বইয়ে দিতে যারা সমান দক্ষ।..... 'লীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, এবং করতেও পারে না। কারণ 'লীগ'র অনুষ্ঠাতারা অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আছেন। আর সেইজন্মেই বৃদ্ধ শেব করবার উদ্দেশ্যে আর-একটা বৃদ্ধের সম্ভাবনা এর ভিতরেই স্থাপ্ত হ'য়ে উঠেছে। শীতলিরই হোক আর দেহীতেই হোক, ইউরোপের বৃদ্ধের ওপর আবার নতুন করে যে বৃদ্ধের দামালা বেজে উঠবে তা'তে সন্দেহ নেই।

এসব কথা থেকে বেশ বোঝা যায়, কাপ্তেন আমুনসেনের জীবন বিজ্ঞানের সেবার উৎসর্গীকৃত হ'লেও রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্তাগুলোও তাঁর অন্তরে ধা দেয় এবং সেগুলো-সম্বন্ধে যেনো-রকমের দিকান্তে উপনীত হবার সময় তাঁর মনে জাগে সকলের আগে সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তম কল্যাণের আদর্শ।

কাপ্তেন আমুনসেন 'The North-West Passage' এবং 'South Pole' নামে দু'গ'নি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থগ'নি স্মৃষ্টি হুই যথেষ্ট সমাপ্ত এবং ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। বশ এবং সম্মানের পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁর সম্মুখের পথ ঢেকে গেছে, কিন্তু এতে তাঁর মাথা এতটুকুও গবম ক'রে তুলতে পারেনি। তিনি বৃদ্ধ হ'য়ে আছেন তাঁর কাজের ভিতর, তাঁর সাধনার ভিতর, তাঁর ভগন্তার ভিতর। জীবনের বিগাট বাজাপথে তাঁর আদর্শ হচ্ছে—'যদি পরাজিত হও, তবুও চলতে হবে, যদি জয়লাভ করে, তবু থাকতে পাবে না।' *

* এই প্রবন্ধের উপাদানগুলি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার প্রকাশিত ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

জাম্বুবানের জীবন-কথা

শ্রী সুধীন্দ্রলাল রায়

শরৎ তাহার আলোছায়ার খেলা শেষ করিয়া গিয়াছে—
ধানের ক্ষেত পড়িয়া আছে পূজা-শেষের শূন্য বরণ-
ভালার মতন। ছোটো নাগপুরের পাথুরে মাটির গাছপালা
নিদাঘরবির উৎকর্ষভাজিতে বলসিয়া পীতবর্ণ হইয়া
গিয়াছিল। কণস্থায়ী বর্ষার স্নিগ্ধ আশীষধারার সঞ্জীবনমন্ত্র-

স্পর্শে তাহাদের জরা কাটিয়া যাওয়ায় নবজীবনের
চেতনায় তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। হেমন্তের
শিশিরে স্নাত হইয়া তাহাদের প্রতিপল্লবে সবুজ রং জমাট
বাধিয়াছে। কষ্টকণ্ডমূলতাদির ঝোপজললাকীর্ণা বনভূমি
আজ পল্লববীথির ঐশ্বর্যসম্বারে গৌরবাঘিতা। সেই তরু-

লতা-শুষ্কাদিব ব্যবচ্ছেদ-পথে বৈমস্তিক বাতাস শীতের আগমনী গাহিয়া পাতায়-পাতায় মর্ম্মর-শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে।

এইরূপ সময়ে ঘনকরুচ্ছায় অন্ধকার পাড়াড়ের উপর দিয়া একটি বনবাসী স্বাপন নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পদ-সঞ্চারে কঁটা বন উপেক্ষা করিয়া দুর্গমতর বন-মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৌতুহলী নীচ তরুশ্রেণী দেখিতেছিল তাহার ঘনকরু পৃষ্ঠদেশ আব ঈষৎ তামাটে নাসিকা; শাস্ত ধরিত্রী দেখিতেছিল তাহার বিশাল বক্ষের স্তম্ভতা। তাহার বর্ণ, তাহার ঈষৎ উন্নমিত পশ্চাদ্দেশ ও তাহার দোলায়মান গতিভঙ্গী নির্দেশ করিতেছিল যে, সে জাহ্নুবানের বংশধর—প্রাণবিজ্ঞানের পরিচিত ভারতবর্ষের হিঃস কৃষ্ণভ্রুঃ। ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। নাসিকাগ্রভাগ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে সে অবলাজাতীয়া।

পাহাড়পৃষ্ঠে সবুজ শোভার যে আনন্দবাজার বসিয়াছিল, তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে যে কলগুঞ্জন শোনা যাইতেছিল, শীর্ণতোয়া গিরিনির্ম্মলিনী যে বল্লোলিত নৃত্যভঙ্গি শিলা হইতে শিলাস্তরে উল্লম্বন-ক্রীড়া করিতেছিল—স্বভাব-সৌন্দর্যের এদিকে স্রীমতী ভল্লুকর কোনো লক্ষ্যই ছিল না। তাহার যেন সময় নাই একরূপ বাস্তবতার সহিত সে চলিয়াছে। শীত সমীপাগত; তাহার অজ্ঞাতবাসের স্থান তাহাকে অবিলম্বে খুঁজিয়া লইতে হইবে। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে কতকগুলি জীব ভূগর্ভের মূচ্ছ উত্তাপে সমস্ত শীত ঋতু স্থখনিদ্রায় অতিবাহিত করে। সূর্য্যদেব তখন মকরক্রান্তিতে অবস্থান করেন—দক্ষিণায়নে হাওয়া খাইতে যান। এদেশে ভূপৃষ্ঠ তাই বিনশা শীতলা হইয়া পড়ে। ঐসকল জীব তখন হিমসিক্ত হাওয়ায় আহার অন্বেষণে কষ্টভোগ অপেক্ষা আবামে নিদ্রাদেবীর আরাধনাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করে ও মাস-তিনেকের জন্ত ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া ফেলে। এই অভ্যাস শুধু সরীসৃচের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অনেক ছোটোখাটো চতুষ্পদও এইরূপ করে। বৃহত্তর জানোয়ারদের মধ্যে একটি চহতেছে আমাদের আলোচন্যন জীব।

আসন্ন শীতের উপক্রমে তাই সে একটি সুবিধাজনক

কোটর অন্বেষণে চলিতেছিল। চলিতে-চলিতে কখনও কখনও তাহার রসনার উপযোগী কোনো মূল অথবা ফলের লোভে থামিতেছিল। তাহার রসনার অল্পকৃতি-শক্তি মনুষ্যবৎসনা অপেক্ষা অনেক কঠোর। এমন-সব বস্তুরূপাদি অবলীলাক্রমে সে চর্ষণ ও ভোজন করিতেছিল যাহা মনুষ্যবৎসনার পতিত হইলে ঐ স্বাদগ্রাহী অঙ্গটির বিশেষ গানি কবিত্তে পারিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে বৃক্ষাপরি একটা গুহ্মগণ গুহ্মনিত পাইল। যেন খানিকটা পুলকোৎফুল্ল হইয়া সে পলকে বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যন্ত তৎপরতাব সূচিত সেই অনতি-বৃৎ বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া যে-ভালে মধুচক্র ছিল তাহাতে আরোহণ করিল। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহার বৃহৎ পদের একটি তাড়নায় সেটিকে সে ভূগাহিত করিল। পরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসবায়ুর সাধ্যাধো মক্ষিকাগুলিকে অপসারিত করিয়া মধুগানে রত হইল।

খুব কম প্রাণীই মধুমক্ষিকার নীড় হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পায়। একটু তাড়নায় এই পতঙ্গ যেন অকৌণিনী হইয়া শক্রের উপর পতিত হয় এবং নিরুপায় শক্রের দেহে অসংখ্য তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া ফেলে। অনেক মধুলালুপ নরজাতীয় জীবের একরূপ অভিজ্ঞতা হয়ত আছে। স্রীমতী ভল্লুক-জায়া কিন্তু এ-আক্রমণ একেবারেই অগ্রাহ্য করিল। অসংখ্য উড্ডীয়মান মক্ষিকা সশব্দ কোথ-গুহ্মরণে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ক্রমেক্রম মাত্র না করিয়া ভল্লুক সেই মধুচক্র চিবাইতে লাগিল। মক্ষিকার দল বর্ষ বোধে তাহাকে আক্রমণ করিতে বাইয়া অনেকে তাহার দীর্ঘ বর্ষণ রোমাবলী মধ্যে আবদ্ধ হইল এবং মুক্তির চেষ্টায় নিবিড়তর বন্ধনে বন্দী হইল। ভোজন সমাপন করিয়া ভল্লুক একবার মাটিতে গড়াগড় দিল। তাহাতে রোমাবদ্ধ আক্রমণকারীগণ নিশ্চেষ্ট হইল। পরে উঠিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

এইরূপে পাহাড় বাহিয়া উঠিতে-উঠিতে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে, মনসা প্রকৃতি কাটাগাছের ঝোপে-ঘেরা প্রকাণ্ড এক সজিয়া-বৃক্ষ দেখিতে পাইল। বনপ্রান্ত হইতে স্থানটি অনেক দূরে—পর্ব্বতের চূড়াও

মূলদেশের মধ্য পথে। কাটাঝোপের বাহির হইতে স্ফুটন
খনন করিয়া বৃক্ষের মূলে সে উপস্থিত হইল। সেই-
খানটা সে একটু প্রশস্ততর করিয়া একটি বিবর রচনা
করিল। বিবরের প্রবেশ-পথ এত ক্ষুদ্র যে ঐ পথে অত
বড় একটি জানোয়ার গত্যাত্ত করিতে পারে উঠা মনেও
করা যায় না। তৎপরে বাহিরে আসিয়া বিবরোখিত
মুক্তিকারাগি ছড়াইয়া-ছড়াইয়া এমন করিয়া অপস্থত
করিল যে সেই মুহূর্ত্ত সেখানে যে মুক্তিকা খনন করা
হইয়াছে ইহা বুঝা দুঃসাধ্য হইল। ভল্লুক অতিশয়
সাবধানতা ও অববেচনার সহিত মুক্তিকা-খননের সকল
চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর অনেকগুলি কণ্টকাকৃত
শাখা স্ফুটনের রক্ষণপথে স্থাপন করিল। স্ফুটন প্রবেশ
করিয়া, ডালগুলি বিবরের ভিতরে খানিকটা টানিয়া
প্রবেশ করাইয়া স্ফুটন-মুখ উত্তমরূপে পরিরক্ষিত
করিল।

তাহার পর ভূগর্ভস্থ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত
শরীর গুটাইয়া তিন মাসের নিদ্রার জন্ত প্রস্তুত হইল।
শীত অস্ত্রে মদনসখা বসন্ত যখন দখিনবাতাসে আপনার
পীত উত্তরীয় উড়াইয়া পৃথিবীতে হাসি ফুটা বে, আবার
'যখন ধরণী হবে তরুণা'—তখনই পুনরায় ভল্লুক-জায়া
তাহার স্বস্ত্রে র'চত কাগাগার হইতে নিজ্জায়া হইবে।

পৌষমাস শেষ হইবার সময় সেই বৃক্ষ কারামধ্যে
দুইটি ভল্লুক শিশু দেখা দিল—গুণ্ডু চঞ্চাকৃত রোমহীন
দুটি অসহায় জীব। ভূমিষ্ঠ হইবার ঠিক চত্বারিংশৎ
দিবস পরে তাহাদের চোখ ফুটিল। সন্তানের প্রতিভার
এই লক্ষণ দেখিয়া মাতা অস্বাভিক্যে তাহাদের শরীর
লেহন করিল।

তদবধি ইহারা শীঘ্রগতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।
চাকলা, ক্ষুষ্টি, শক্তিও বা'ড়তে লাগিল। পরস্পর মল্লগ্ধে
ও মাতার সহিত ক্রীড়ায় ইহাদের সময় কাটিতে লাগিল।

একদিন ইহাদিগের নিকট বাহিরের ডাক আসিল।
বসন্ত তখন তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে গাছে-গাছে
কচিপাতার জীবন দিতোছিল। ধ'রজী জীর্ণ চৌর পরিত্যাগ
করিয়া বসন্ত উৎসবের জন্ত প্রসংধনরতা। মহয়া ফুলের
নিবিড় গন্ধ বাতাসে উন্মাননা চালিতেছিল। জানি না,

এইসব খবর সেই গহ্বরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল।
হয়ত সেই গভীর অরণ্যে বায়ুমণ্ডলের প্রতি স্রোতোরেখা
কল্পিত করিয়া শ্রামা পূর্ণকণ্ঠে যে ললিতকন্টার তুলিতেছিল
—তাহারই অসুরণন আমাদের ভল্লুক-পরিবারের কর্ণে
পৌছিয়াছিল।

সহসা একদিন ভল্লুকশিশুদ্বয় মাথা উচু করিয়া বার-
বার বাতাস আশ্রয় করিতে লাগিল এবং মাঝে-মাঝে
নখর-প্রহারে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহারা যেন মুক্তি
চাহিতেছিল, যেন বলিতেছিল—

কেন রে বিধাতা পাষণ্ড হেন—

চারিদিকে মোর বাধন কেন ?

কয়েকদিন পরে তাহাদের জননী তাহার অলস
বপুটিকে টানিয়া তুলিয়া গহ্বরের চারিদিকে ঘুরিয়া লইল।
তাহার পর স্ফুটনপথে প্রবেশ করিয়া দ্বারমুখের কঁট ডাল-
গুলি বিপুল খাবার এক আঘাতে ঠেলিয়া দিয়া বাহির
হইয়া পড়িল। সন্তানদ্বয় মাতাকে অনুসরণ করিল।
কিছুক্ষণ ভল্লুকমাতা নাসিকা উত্তোলন করিয়া স্বদীর্ঘ
শ্বাস টানিয়া চারিদিকের জ্ঞান লইতে লাগিল। তাহার
পর হঠাৎ দক্ষিণ দিকে পর্বতসামু বাহিয়া অবতরণ করিতে
লাগিল। কিছুদূর চলিয়া দোখল পাহাড়ের খাঁজের মধ্য
দিয়া একটি জলধারা বাহিয়া চলিয়াছে। সেই জলে মুখ
দিয়া পান করিতে লাগিল। সে যেন অগস্ত্য-ভৃগু—বৃষ্ণবা
সে সমস্ত নিবারণীটি শোষণ করিয়া ফেলিবে। মাতার
পান শেষ হইলে শিশুদ্বয় জলে চুমুক দিয়া দেখিল। সেই
তাহারা জীবনে প্রথম জলের আশ্বাদ পাইল। আর
তাহারা গহ্বরে ফিরিল না। তদবধি মুক্ত আকাশতলে,
ঝোপে ঝোপে, গিরিদ্বীতে নিদ্রা যাপ্ত।

সেইদিন ভল্লুকমাতা তাহার সন্তানদ্বয়কে দিনের
আলোতে ভালো করিয়া দেখিল—বার-বার জ্ঞান লইল।
যেটি বৃহত্তর সেটি পুত্র, তাহার রং খুব ঘনকৃষ্ণ নহে, একটু
যেন কটা-কটা। আমবা তাহাকে 'কটা' নামেই অভিহিত
করিব। কল্পাটি বেশ কৃষ্ণবর্ণ, এই উপাখ্যানে কৃষ্ণা নামই
তাহার পরিচয় হইবে।

তখন ফাস্তন। পলাশবনে পলাশের লালফুলে পাহাড়-
তলী রঙান—ধরণী যেন আবীরলিপ্তা। মহয়াফুল ক্রমশঃ

রসাল, বাহু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্ফুমিষ্ট ফলে পরিণত হইতেছিল। ভল্লুকমাতা সন্তানদের শিক্ষা আরম্ভ করিল।

সকল শ্বাপদেরই শিক্ষার মূল কথা দুইটি—জীবনধারণ ও আত্মরক্ষা। ভল্লুকমাতা অবাধ্য হইলেই সন্তানদের কঠোর দণ্ড বিধান করিত। ভূগর্ভ হইতে নিজস্ব হইয়া পথ চলিতে-চলিতে শিশু কৃষ্ণা অনবরত পিছাইয়া পড়িতেছিল। মায়ের সহিত সমান ক্রম চলিতে পারিতেছিল না। ইহাতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা। কাজেই একসময় যখন কৃষ্ণা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইল, মাতা তাহাকে এমন চপেটাঘাত করিল যে, কিছুক্ষণ সে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই হইতে আর সে পিছাইয়া পড়িত না।

অপর কোনো একটি ভল্লুকের পদচিহ্ন তাহাদের সম্মুখে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। সেই পদাঙ্ক ধরিয়া ইহারা চলিল। কটা ক্ষুধিত আবেগে মাতা ও ভগ্নীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইল। ইহা অজ্ঞায়। শিক্ষানবিশী অবস্থায় অজ্ঞাতপথে এত সাহস ভালো নয়। চলিতে-চলিতে সামনে একটি তৃণান্তীর্ণ স্থানে এক চাপড়া মাটি দেখিল, তাহাতে ভল্লুক-পদচিহ্ন রহিয়াছে। কোঁতুল-বশবর্তী হইয়া সেই মৃত্তিকাখণ্ডের উপর সে আপনার খাবাটি তুলিয়া দিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে তাহার মাতা ও ভগ্নীর গতিবেগে অপসারিত একটি অনতিক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড গড়াইতে-গড়াইতে সেই মৃত্তিকা-চাপের উপর সশব্দে আসিয়া পতিত হইল। কটা চমকাইয়া পিছু হটিল। সেই মুহূর্তে দুই দিক হইতে দস্তবিশিষ্ট সাঁড়াশির মতন লৌহঘন্ত্রের দুই অংশ সবেগে আসিয়া মিলিত হইল। মাহুষ এইরূপে বস্ত্রশ্বাপদের জন্ত ফাঁদ পাতিয়া রাখে। কটা সেদিন খুব একটা বিপদ হইতে বাঁচিয়া গেল।

এইরূপ ফাঁদে পড়িলে কি অবস্থা হয় কয়দিন পরে ইহারা তাহা চাক্ষুষ দেখিল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বস্ত্রবদরিকার ছোটোখাটো কাটাঝোপ ও ছোটো-বড় প্রস্তরখণ্ডে সমা-কীর্ণ ভূমির উপর দিয়া চলিতে-চলিতে দূরাগত বেদনাতর্য আর্ন্তনাম ভল্লুকজায়ার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে সহসা স্থির হইয়া চারিদিকের বাতাস আত্মাণ করিয়া লইল।

যখন বাতাসে মাহুষ প্রভৃতি আততায়ীর সন্ধান পাইল না, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই ভ্রাণ অহুসরণ করিয়া যন জল মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরে, সাবধানে চলিতে লাগিল। সন্তানস্বয় ছায়ার মতন পশ্চাতে চলিল। ক্রমশঃ একটি বৃক্ষ-বিরল খোলা জায়গায় আসিয়া উক্তপ্রকার জাঁতিকলে আবহ একটি জীভল্লুক দেখিতে পাইল। জাঁতিকলের সাঁড়াশিষয় তাহার পশ্চাতের জজ্বা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মুক্তির জন্ত সে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াছে, তাহাতে আরও আহত হইয়াছে। ক্ষুরোষে আপনার আহত জজ্বা বার-বার আপনিই দস্তপেষণে চিবাইয়াছে—তাহাতে অস্থিগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। ভালুকমাতাওই কোনো স্থানে আহত হইলে সেই বেদনাস্থানে বেদনার কারণ লুক্কায়িত আছে মনে করিয়া আপনার দেহ আপনিই কামড়াইয়া ফেলে। অনেক শিকারী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—ভালুক হয়ত পায় আহত হইয়াছে; পাখানি এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে অস্থিগুলি মড়-মড় শব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, ক্লান্ত কধিরাস্ত কলেবরে ভল্লুক মৃতকর অবস্থায় কল্পণ বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাসে বন-ভূমি শোকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে-মাঝে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। মৃত্যু নিকটবর্তী। তা'র পার্শ্বে একটি শিশুভল্লুক মায়ের অবস্থা হৃদয়হরম করিতে না পারিয়া মাঝে-মাঝে তা'র ছোটো খাবাটি মায়ের গায়ে স্তম্ভ করিতেছে।

আমাদের শ্রীমতী ভল্লুক নিঃশব্দে সাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল। তাহার সন্তান-দুটি এই দৃশ্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়া মাতার উদরতলে আশ্রয় লইল। তা'র পর তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিল। ভল্লুকপত্নী জানিত যে, ঐ স্থানে আসা মৃত্তিকায় হয় নাই। কারণ যে-পথে সে ফিরিয়া চলিল সে-পথে তাহার পদাঙ্ক অহুসরণ করিয়া নররূপী মৃত্যু তাহার পিছু লইতে পারে। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা, ঐ স্থান ছাড়িয়া কয়েক কোশ দূরে আসিয়া পড়িয়া ভল্লুকজায়ার দুইটি বন্ধকের শব্দ শুনিতে পাইল। বুঝিল, দিনের বেলায় সেই কল্পণ দৃশ্যের উপর পর্যবেক্ষণ হইল। তাহার সন্তানগণ সে-শব্দ শুনিতে পাইল না, কারণ, তাহাদের শ্রবণ-শক্তি ততটা প্রধর হয় নাই।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে, পশ্চাতে শিশুভ্রমকের আর্তনাদ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল তাহার ছেলেমেয়ের কোনো বিপদ উপস্থিত কি না। দেখিল দিবাভাগে যে ভ্রমকশিশুকে মুমূর্ষু মাতার পার্শ্বে দেখিয়াছিল সেটি আর্ত-চীৎকার করিতে-করিতে আসিতেছে। ভ্রমকজাম্বুকে দেখিয়া সে আনন্দধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার উদরে মুখ দিয়া ক্ষুধিত শাবকের মতন দুধ খাড়া করিল। ভ্রমকজাম্বু একটু ধীরগর্জনে বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া যেন এই অনাথ শাবকটিকে স্তম্ভদানে আশ্রয় করিল। ভ্রমকজাম্বুর সন্ধানবধি এই নূতন আগন্তুককে আপাদমস্তক আত্মাণ করিয়া আপনাদের স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিল। নূতন শাবকটি উহাদিগের অপেক্ষাও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল এবং তাহার-নাসিকাগ্রভাগে একটি তিলক-সদৃশ খেতটীকা ছিল। ইহাকে আমরা এখানে 'তিলি' নামে অভিহিত করিব।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই, বৈশাখ মাসে ভ্রমকজাম্বু শাবক-দিগকে ক্রমশঃ স্তম্ভ ছাড়াইয়া দিল। এখন হইতে প্রতিদিন সে সন্ধানগণকে ধরিয়া হইতে আহার সন্ধান করিতে শিখাইতে লাগিল। কত-রকম মূলফলাদি সে চিনাইয়া দিল। আবার যে-সমস্ত মূলাদি খাইলে অপকার হয় তাহা দেখাইয়া দিল। বিশেষ করিয়া বন্মীক-মধ্য হইতে পিপীলিকার ডিম্ব কিরূপে বাহির করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিল। বন্মীকে মুখ দিয়া সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে বন্মীকের মৃত্তিকা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং এই-রূপে মাটি সরাইলেই যে-সকল কামরাগ ডিম্ব ও বাচ্চা রক্ষিত থাকে সেগুলি বাহির হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের আতিশয্য হইলে সন্ধানগুলিকে একটি পাহাড়-বেষ্টিত ক্ষুদ্র জলাশয়ে লইয়া গিয়া একে-একে তাহাদিগকে সাতার শিখাইল। প্রথম-প্রথম মাতার পুচ্ছ দাঁতে ধরিয়া তাহারা জলে ভাসিতে শিখিল; জল কাটিবার কৌশল শিখিবার পর তাহাদিগকে বিনাসাহায্যে সাতরাইতে হইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি পর্বতপাতের জঙ্গলমধ্যে ভ্রমকজাম্বু পুত্রকন্তাসহ একটি গিরিগাত্রস্থ গহ্বরের সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ভ্রমক বৃক্ষশাখির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের

নিকট উপস্থিত হইল। এপর্যন্ত অনেক ভ্রমকের সহিত দেখা হইয়াছে, কিন্তু কেহই পরস্পরকে বড়-একটা গ্রাহ্য করে নাই—পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। যদি কেহ অত্যন্ত নিকটে আসিত—ভ্রমকজাম্বু আপনাদের রোমাবলী পাড়া করিয়া কণ্ঠ হইতে এমনই বজ্র-নির্ঘোষ বাহির করিত যে, আগন্তুক আর অধিক পরিচয়ের জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না।

আজ কিন্তু ভ্রমকজাম্বু এই নবাগতের ঘনিষ্ঠতায় কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। আগন্তুক তাহাদের সকলের দেহ আত্মাণ করিয়া মস্তব্য প্রকাশ করিল—“খোঃ-খোঃ-খোঃ।” ভ্রমক-জননী এই মস্তব্যে প্রীত হইল। সেই হইতে এই ভ্রমকপুত্র সেই দলের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল এবং সন্ধানগণ জানিতে পারিল যে, ইনিই তাহাদের জন্মদাতা। ভ্রমকের দুই বৎসর অস্তর সন্ধান হয়; তবে শাবকগণের বয়স এক বৎসর হইলেই দম্পতি পুনর্মিলিত হইয়া একত্র বসবাস করে। ভ্রমক-পিতা দলের কর্তা হইয়া শাবকগণকে অনেক নূতন শিক্ষা দিল এবং নানা বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। কতবার তাহারা নৈশ অভিযানের সময় পানীয়ের জন্ত এমন জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে মাকুষ-শিকারী মৃগসমূহ অসঙ্গীত হইয়া লুকায়িত। শুধু সেই পুং-ভ্রমকের বুদ্ধিমত্তায় সে-সকল বিপদ হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। বর্ষার সময় যখন পাহাড়তলীর গ্রামপার্শ্বস্থ ক্ষেতগুলি কচিভুটার মৃৎগন্ধে ভরপুর তখন একদিন ভ্রমকজাম্বু অনবধানতাবশত দলচ্যুত হইয়া এক ক্ষেত্রে ঢুকিয়া ভুটার দ্বারা রসনা তৃপ্ত করিতে গিয়াছিল। এক গ্রাম্য শিকারীর একটা একনলা গাদা বন্মুকের গুলি হঠাৎ তাহার উখিত সম্মুখপদে লাগে। ধ্বংসাত্মক ক-জাম্বু জানহারা হইয়া আপনাদের পাগানি এমন কামড়াইয়া ধরে যে, মড়মড়-শব্দে হাড় ভুঁড়া হইয়া যায়। তাহাজে আরও বেদনা পাইয়া সে বিকটচীৎকার করিয়া উঠে। সেই চীৎকারে ভ্রমকপিতা বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া দোং-ঘোং শব্দ করে। তাহাকে ও তাহার পশ্চাতে তিনটি ভ্রমক দেখিয়া রিক্তনল শিকারী আর বন্মুকে বারুদপূরিবার সময় করিতে পারিল না—কিটি সে-স্থান পরিত্যাগ

করিয়া আশস্ত হইল। সেই ক্ষত শুধাইতে ভল্লুপিতার অনেক দিন লাগিয়াছিল। আর-একদিন সকলে মিলিয়া যখন একটি পাহাড়-গাজের সফর্ণ পথ দিয়া গমন করিতেছিল, তখন নিম্ন হইতে একজন শিকারী তাহা-দিগকে দেখিয়া পুং-ভল্লুককে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে। চলন্ত ভল্লুকের নিতম্ব স্পর্শ করিয়া সামান্য চর্ম-ক্ষত রাখিয়া গুলি চলিয়া যায়। ভল্লুক নিম্নের আততায়ীকে না দেখিয়া পশ্চাতে শাবকদিগের একটিকে এইরূপ ছুটামির অস্ত্র দায়ী মনে করিয়া একলক্ষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এবং কঠনালীর নীচে দস্তদ্বারা অনতিজোরে চাপিয়া ধরিয়া দুইতিনবার কাঁকানি দিয়া দেয়। বেচারী শিশু এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যেন বলিল—“ও বাবা আমি নই গো।” তখন ভল্লুকপিতার মগজে বোধ হয় অদৃশ্য শত্রু সযত্নে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা জাগিয়া উঠে, কারণ, সে হঠাৎ শাবককে ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুণ্ণভাবে অগ্রগামনী, বনানীমধ্যে অদৃশ্য-প্রায়া, ভল্লুপিতার অহুসরণ করে। তিনকৃত শাবকটি ক্রমশে পিতার পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। শিকারী দাঁড়াইয়া এতক্ষণ মজা দেখিতেছিলেন ও পুনরায় গুলি করিতে তুলিয়া গিয়াছিলেন। ভল্লুকের সহসা অহুসানে তিনি বোকা বনিয়া গেলেন।

শীতকাল আসিয়া পড়িল। শিশির-ভেজা তৃণান্তীর্ণ ভূমিতে বড়-বড় বারশিঙয়ালী হরিণের কুর-চিহ্ন দেখা গেল। সিরগুজার পাহাড় জঙ্গল পার হইয়া ইহার পালামৌর উপত্যকায় আসিগাছে সন্ধিনী-অহু-স্থানে। এই সময় ইহার বড় কক্ষভাবের হইয়া পড়ে। মাহুয, পশু কাহাকেও ভরায় না। এমনিই-একটি মদমস্ত হরিণের সহিত আমাদের ভল্লুকদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার স্নর্ঘ্য সূত্র শূন্য তাহাকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছিল। ভল্লুককে দেখিয়া তাহার কলহস্পৃহা জাগ্রত হইল। গজীর উচ্চনাদে সে ভল্লুককে যুদ্ধ আহ্বান করিয়া পশ্চাতের পন্থরে দণ্ডায়মান হইয়া শূন্য অবনত করিয়া লাফাইয়া আসিল। ভল্লুক জঁপুবেষ্টিত হইয়া মধ্যমা-বক্ষার্ধ নাচার হইয়া যুদ্ধায়ুগ হইল—নহিলে হরিণকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত। ভল্লুকও কম

কৌশলী ও বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। হরিণ সে-কথা তুলিয়া গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখের ক্ষুণ্ণ দ্বারা আঘাত করিল—ভল্লুকের হিংস্রভাব সম্যক অবগত থাকিলে সে নিশ্চয়ই ভগবদস্ত্র অস্ত্র শূন্য ব্যবহার করিত। সে যেরূপ বেগে আঘাত করিল, তাহাতে মাহুয পক্ষ পাইত, নেকড়ে বাঘের পেট কাটিয়া অস্ত্র বানর্গত হইয়া পড়িত, কিংবা ঐরূপই কোনো জানোয়ার বিশ্বস্ত হইয়া ধরাশায়ী হইত। ভল্লুক কিন্তু অত্যন্ত ঘাতমহ কঠিনপ্রাণের জীব। হরিণ দাঁড়াইয়া পদাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ভল্লুকের সম্মুখ-পদস্থ দ্বারা তাহার পাণ্টা জবাব আসিতে লাগিল। সহসা হরিণের পা ফস্কিয়া যাওয়ায় সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্তমাত্র-অবসরে ভল্লুক বজ্রহকার করিয়া তাহার দীর্ঘনখযুক্ত দক্ষিণপদের খাবা দ্বারা প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিল—সে-বজ্রাঘাত সহিতে পারে এমন পশু খুব কম। এক আঘাতে হরিণের প্রাণহীন দেহ তুলে গড়াগড়ি দিল। তাহার পর যুগ শত্রুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভল্লুক বিজয়োল্লাস করিল। কখনে, কখনো ব্যাঘ্রের সঙ্গে ভল্লুকের এরূপ খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমাদের এই উপাখ্যানের ভল্লুকের ইতিহাসে সেরূপ ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই না।

আবার হেমস্তের শেষে একদিন ভল্লুকপিতা স্ত্রী পুত্র-বন্তাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শীতকালে সে কুগর্ভে আত্মগোপন করিয়া নিত্রায় কালহরণ করিবে। দু-এক সপ্তাহ পরে ভল্লুকমাতা সন্তানসহ একটি গুহা খুঁজিয়া বাহির করিল। সেই গুহায় তাহার শীতকাল অতিবাহিত করিল।

আবার যখন বসন্ত ঘুরিয়া আসিল তখন শাবকগুলি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। ‘কটা’ই বচাগুলির মধ্যে সর্কোপেক্ষা বৃত্তম ছিল এবং বেশ স্পষ্ট ও বর্নিতদেহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাতার কুড়ানি কস্তা ‘তি’ল’ তাহাপেক্ষা কৃশ হলেও বেশ বর্নকম ও দক্ষ ছিল। প্রায়ই সে ‘কটার’ সঙ্গে সঙ্গ থাকিত। কটা যেখানে শিকার করিত, ‘তি’ল’ তাহাতে ভাগ লইত। সাধারণত ভল্লুক আহার-বিষয়ে

অন্ত ভালুকর উৎপাত সহ্য করে না। কিন্তু 'তিল'র উপর তাহার এমনই একটা মেহ ছিল যে, সেই খেত-ভিলকাহিত-নাগা ভলুক-কন্ডাকে সে কিছুই বলিত না। এদিকে কৃষ্ণার যেন কি কারণে মেজাজ বড় কষ্ট হইয়া পড়িল। 'কটা' তাহার নিকটে আসিলেই সে তাহাকে দাঁত খিচাইত। ভলুকজায়ারও ক্রমশঃ স্বভাব উগ্ররকমের হইয়া পড়িল। একদিন জ্যোৎস্না-নিশীথে 'কৃষ্ণা' ও 'তিল' দুজনে একসঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। বসন্তের মলয় বাতাস তাহাদিগের নিকট কি জানি কোন্ স্বপ্নপূরী ভলুক-রাজপুত্রের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। তাই তাহারা মদনপূজার জন্য আপন-আপন সহচরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। 'কটা' তাহাদের অনেক খুঁজিল, কিন্তু সন্ধান পাইল না।

এদিকে ভলুক-মাতাও কেমন যেন একটু ককস্বভাবের হইয়া গেল। পুত্রকে সে আর বড় একটা কাছে আসিতে দেয় না। জ্যেষ্ঠমাসের শেষাংশে তাহার মেজাজ এরূপ হইল যে 'কটা' আর তাহার নিকটে ঘাইতে পার না। ঘুরে-ঘুরেই মাতার অহুসরণ করে। তা'র পর প্রথম বর্ষার কালমেঘ আকাশে ঘনাইয়া আসিয়াছে—এমনই আবাচুস্ত প্রথম দিবসে, বনাস্তরাল হইতে একটি বৃহৎ কালো পুং-ভালুকের মূর্তি নয়নগোচর হইল। সহর্ষধ্বনি-সহকারে

ভলুকজায়ী তাহার পুনরাগত তর্টার অভিধুখে ছুটিয়া গেল এবং উভয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। 'কটা' তাহাদিগের পশ্চাৎ লইল, কিন্তু পিতামাতা উভয়েই ফিরিয়া গমন-সহকারে এমনই তিরস্কার করিল যে 'কটা' চলিতে-চলিতে ধামিয়া গেল। তাহার পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ফেলিয়া ক্রমশঃ পাহাড়ের মোড় ঘুরিয়া অদৃশ হইয়া গেল। এই যে দলভঙ্গ হইল আর কখনও ইহারা সন্মিলিত হইবে না। ক্রমশঃ আর পরস্পরকে চিনিতেও পারিবে না।

'কটা'র কাছে জীবনটা বড় শূন্যময় বোধ হইল। কিছুদিন সে একা-একা বিচরণ করিত, আহার জোগাড় করিত। কিন্তু কি যেন একটা অভাব সে অহুত্ব করিত। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মে ঘোবনে যে স্বজনৌশক্তি সকল জীবের মধ্যে বিকাশলাভ করে তাহারই প্রেরণা সে অহুত্ব করিতে লাগিল। তাহার পর একদিন টানে-টাকা পূর্ণিমার রজনীতে সে দোঁখতে পাইল এক প্রান্তরধারে একটি অপেকাকৃত হৃদয়ে ভলুক-মূর্তি—তাহার নাসিকাগ্রভাগ শুভ্র।—তাহাকে দেখিবামাত্র 'কটা'র মনে হইল যে, সে যেন তাহার হারানিধি পাইয়াছে। সেই নবপরিচিত ভলুক-কন্ডার সাহচর্যাগ ভ করিয়া তাহার জীবনে আবার আনন্দ ও হর্ষ ফুটিয়া উঠিল।

সাঁওতালী সংস্কার

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, এম্-এ, বি-এল্

অসভ্য সাঁওতাল-জাতির মধ্যেও কয়েকটি সংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাদেরও কয়েকটি সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। জাতিবিচার পৌরোহিত্যপ্রথা ও ধর্ম্মঃসূশাসনের গণ্ডীর বাহিরে তাহারা ও ঘাইতে পারে না। যাহুব বনে-জঙ্গলে বাস করিলেও সমাজ সৃষ্টি করে এবং সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। সামাজিক নিয়মাবলী আবার পারি-

পার্শ্বিকের প্রভাবে সংগঠিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সাঁওতালেরা ক্রমশঃ বন-জঙ্গল ছাড়িয়া বাঙ্গলা ও বিহারের লোকালয়ের সংস্পর্শে অনেকটা হিন্দু সংস্কার গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাঁওতালেরা আজকাল কোথাও-কোথাও কালী ও দুর্গা পূজাও করে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্কারাদি দেখা যায়।—

ছেটিয়েবু—সন্তানেরা পিতার জাতিতে পরিচিত হয়,

মাতার জাতি পায় না। সাঁওতালদের মধ্যেও জাতি-বিভাগ আছে, কিন্তু তাহা হিন্দুজাতি বিভাগের মত নয়। সাঁওতালদের এক-এক জাতি এক-এক গোত্র; স্বজাতির মধ্যে বিবাহ হয় না। কোনো গ্রামে কাহারও সন্তান জন্মিলে সমস্ত গ্রামের অশৌচ হয় এবং অশৌচ-মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে-গ্রামে বড়া (পূজাদি) হয় না। বাহার গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে অশৌচমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার গৃহে কেহ আহালাদি করে না। পুত্র-সন্তান জন্মিলে পঞ্চম দিনে ও কন্যা জন্মিলে তৃতীয় দিনে সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। গ্রামে সমস্ত লোকও ঐ ব্যক্তির গৃহে সমবেত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করে। নব-জাত শিশুকে ভেল-হলুদ মাধাইয়া স্নান করানো হয় এবং সমবেত গ্রামের লোকেরাও ঐরূপ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। ছেটিয়েবু সংক্রান্ত নানা-প্রকার ক্রিয়াদিও আছে। ঐ সময় সন্তানেরও নামকরণ হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের পিতামহের নামে, জ্যেষ্ঠা কন্যার পিতামহীর নামে, দ্বিতীয় পুত্রের মাতামহের নামে, দ্বিতীয়া কন্যার মাতামহীর নামে নামকরণ হয়। অন্তান্ত পুত্রকন্যাগণকে অন্তান্ত আত্মীয়ের নামে অভিহিত করা হয়। অবশেষে সকলকে নিম দাক্'মেণ্ডি* (নিমপাতার সহিত সিদ্ধ ফেনসহ ভাত) ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হয়। এই শুদ্ধিক্রিয়াকে জানাম্-ছেটিয়েবু (জন্মশৌচমুক্তি) বলে।

বিবাহের পূর্বে কোনো কুমারীর সন্তান জন্মিলে কন্যার পিতা গ্রামের মাঝির নিকট সংবাদ দেয়। তাহারা গ্রামের লোকদের একত্র সমবেত করিয়া কন্যাকে তাহার সন্তানের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে। কন্যা কোনো যুবকের নাম করিলে গ্রামের পাঁচজনে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনে। যদি তাহার সহিত অন্তান্ত লোকও সংস্রষ্ট থাকে প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র একজন সংস্রষ্ট থাকা প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ কুমারী ও সন্তানকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সন্তানের মাতা যদি কোনো বিশেষ

ব্যক্তিকে সন্তানের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারে তাহা হইলেও সন্তান জারজ সাব্যস্ত হয়। ঐরূপ কন্যার জন্ম জামাতা ক্রয় করিতে ২০ টাকা লাগে। কন্যার পিতৃপক্ষ জামাতা ক্রয় করিতে না পারিলে গ্রামের লোকে জোগাড় করিয়া দেয়। এইপ্রকার জামাতাকে তেজল জাঁওয়াই (উপস্থিত বা ধরা জামাই) বলে; ক্রয়-মূল্য সেই ব্যক্তিই পায়। জারজ সন্তান তাহারই জাতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারই নামেই সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। কোনো ব্যক্তি ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হইলে গ্রামের মাঝি বা যে-কোনো ব্যক্তির নামেই সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং সন্তান সেই ব্যক্তির জাতি প্রাপ্ত হয়।

আর-একপ্রকার ছেটিয়েবু আছে, তাহাকে চাচো ছেটিয়েবু বলে। চাচো ছেটিয়েবু না হইলে কোনো সাঁওতাল বিবাহ করিতে পারে না। চাচো ছেটিয়েবু হইবার পূর্বেই কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার শব-দেহ পোড়ানো হয় না, অস্থিও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। চাচো ছেটিয়ের কালে একটি ছোটোখাটো উৎসব হয় তাহাতে সকলে প্রচুর-পরিমাণে হেণ্ডি (মদ) পান করে ও নাচগানও হয়। পরে বিস্তি কাথা (ধর্মকাথা) হয়। কি-প্রকারে পৃথিবী সৃষ্ট হইল, আর কিরূপে সাঁওতাল বংশের বৃদ্ধি ও বিস্তার হইল, এইসব কাহিনী বাহাতে আধুনিক বালকেরা ভুলিয়া না যায় এইজন্য বৃদ্ধেরা এই-সব গল্প করে! পরে গৃহস্থের পক্ষ হইতে সমবেত লোক-দ্বিগুণে বলা হয়, “আপে মঁড়ে হড়্ ঠেঁনুলে নেঁহরঃ কানা, কেঁহ লেকালে তাঁহেকানা বঁাক লেকালে পগুঁএনা, আদ আপে মঁড়ে হড়্গে গোহা তাহেন্ পে”। (আপনাদের পাঁচজনের নিকট এই মিনতি করিতেছি যে আমরা কাকের মত ছিলাম বকের মত সাদা হইলাম, আপনারা পাঁচজনে সাক্ষী থাকুন)। পরে পুনরায় হেণ্ডিপান ও নাচ-গান করিয়া এই ক্রিয়া শেষ করা হয়।

সিকে—সাঁওতালদের বিশ্বাস, যে-ব্যক্তির সিকে না হয় তাহার পরলোকে দুর্গতি হয়। নেকড়ার সলিতা করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া বায় হাতের যে-স্থানে সিকে হইবে সেই স্থান চাপিয়া ধরা হয়। সেই স্থান

* সংস্কৃত বর্ণগুলি অর্ধ-উচ্চারিত হসন্ত বর্ণ। সাঁওতালদের কথো-পকথনে এইরূপ শব্দ শুনা যায়, বধা ওড়াক্ (বাড়ী); হেই' এনা আসিল); রায়বারুই (ঘটক); লেগিং' (জন্ত) ইত্যাদি।

পুড়িয়া কত হয় ; কত সারিয়া গেলে সিকের চিহ্ন থাকে । কেহ একটা কেহ দুইটা কেহ তিনটা এইরূপে সাতটা পর্যন্ত সিকে লইতে দেখা গিয়াছে । স্ত্রীলোকেরা সিকে লয় না, তাহারা উঁক পরে । কালী . রা ইচ্ছানুরূপ চিত্র করিয়া সূচি দিয়া ফুটাইয়া দাগ করা হয় । পরে হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া আসে । উঁকিও পারলৌকিক মন্ত্রের অস্ত্র পরা হইত ; আজকাল কেবলমাত্র সৌন্দর্য-বৃদ্ধির অস্ত্র সাঁওতাল-স্ত্রীলোকেরা ইহা পরিয়া থাকে ।

বাপলা (বিবাহ)—সাঁওতালদেরও বিবাহের ঘটক (‘রায়বাবুই’) আছে ; তাহারা পাত্র ও পাত্রীর সম্মান করিয়া দেয় । পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছানুসারেও বিবাহ হইয়া থাকে । প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলে কস্তাপক্ষের লোক দিয়া ভাবী জামাতার গৃহাদি ও অবস্থা দেখিয়া আসে । তা’র পর হরক্’ চিহ্নে (পাকা দেখা) হয় । প্রথমে বরের পিতা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লইয়া গিয়া কস্তার বাড়ীতে উপস্থিত হয় । ভাবী বধুর দ্বারা অতিথিগণের সেবা-শুশ্রূষা করানো হয় । ভোজনান্তে বরের পিতা ভাবী বধুর গলায় একটি হাঁসুলি পরাইয়া দেয় । এইরূপে বধুর হরক্’চিহ্নে সমাপ্ত হইলে কস্তাপক্ষীয়েরা গিয়া ভাবী জামাতার হরক্’চিহ্নে করিয়া আসে । তা’র পর একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া “টাকাচাল” অর্থাৎ পণের টাকা আদান-প্রদান করা হয় এবং বিবাহের দিনস্থির করিয়া যত দিন পরে বিবাহ হইবে একটি সূতায় ততগুলি গাঁট দিয়া রাখা হয় । প্রতিদিন একটি করিয়া গাঁট খোলা হয়, শেষ গাঁট খোলার দিন বিবাহ সম্পন্ন হয় । বিবাহের সময় উভয় পক্ষের লোকেরা প্রচুর-পরিমাণে মদ পান করে ; বিবাহের পূর্বে হইতেই তাহার সংস্থান কর হয় । নানা-প্রকার নৃত্যগীতও হইয়া থাকে ; বিবাহের সময় কয়েক-প্রকার বিশেষ নৃত্যগীত আছে । বিবাহের সময় উভয়-পক্ষের মাঝিদের মধ্যে যে “বিস্তি” হয় তাহার কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য । কস্তা-পক্ষের মাঝি বর-পক্ষের মাঝিকে বলে, “গেল্‌বাবু আওরাখন্‌ ভাজান্‌পে বাছাও কেদা, ঠুকিয়ে বাজিয়ে কাতেপে কিরিংকেদা : আদ কুচিয়ে’কান্, ভেদে’ কান্, কাঁড়াক্’ কান্, খঁড়ে’কান্ পাড়্‌হাক্’

সতক্ কান্ আলোয়াঃ এলেকা দ বাহুঃ আনা—রাদক্’ কান্, ক্’ কান্ বেড়ি’ কান্, চিনেরক্’ কান্, রানক্’ কান্, নজমক্’ কান্, আপে সাতাংগেয়ে চালাক্’ আ ; গুড়াক্’ গুনেক্’ হড়কো বেনাওক্’ আ, গোড়া গুনেক্’ গেই কো বেনাওক্’ আ ; জাং ই জাং তরই’ ই তরই’ লে এক্টিং আকাদা বহঃ মায়াব্‌ লুতুব্‌ মায়াব্‌ ইনে দ বালে এক্টিং আকাদা, ওনাদলে পাঞ্জারে গিয়া, তবে মিং দিন তারা দিন দাকা রদক্’ উতু রদক্’ সাহাওকে লাহাওকেয়া পে ; শিখেউ শিখেউতে পাড়্‌হাও পাড়্‌হাওতে বাং গানক্’ ধান্, ইনরে মিটে’ হড়্‌বাড়ে কোল্‌ আলোপে চেপেদাবন্ ।” অর্থাৎ বারো রকমের মধ্যে তোমরা বাসন বাচ্ছিয়া লইয়াছ, ঠুকিয়া বাজাইয়া তোমরা কিনিয়াছ ; এখন কুঁড়ে হোক, ছুটু হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, ধারাপ হোক, হীন হোক, আমাদের আর এলেকা নাই । রাঙ হোক, তামা হোক, ছুট হোক, ভ্রষ্টা হোক, অবাধ্য হোক, তোমাদের সঙ্গেই বাইবে—ঘর-গুণে মাহুব হয়, গোয়াল-গুণে গাভী হয়—হাড় হোক, ছাই হোক আমরা বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু মাথার রক্ত, কানের রক্ত বিক্রয় করি নাই (অর্থাৎ হত্যা করিবার অধিকার তোমাদের নাই ; তাহার আমরা প্রতিশোধ লইব । তবে একদিন আধদিন ভাত পোড়া, তরকারী পোড়া সহ্য করিও, শিখাইয়া-পড়াইয়া ভালো না হয় আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া দিও ; আমরা সে-সময়ে বৃষ্টি-পরামর্শ করিব ।) বরপক্ষের মাঝিও এইসব স্বীকার করিয়া লয় । পরে কন্যা-পক্ষের মাঝি বধুর হাত ধরিয়া বরপক্ষের মাঝির নিকট লইয়া গিয়া বলে, “নি বাবা হড়্‌ইং সপ্রস্তাপে কান্!” (নাও বাবা বধুকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি) । বরপক্ষের মাঝি বলে, “হেঁ বাবা এগাম্ কেদালে” (হাঁ বাবা আমরা পাইলাম) । বরপক্ষীয়েরা তখন বধু লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া যায় । ইহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথাও আছে ; তাহাকে সাকাম্ অড়ে’ বলে ।

সেজা (শিকার)—শিকার সাঁওতালদের প্রধান আনন্দ । ইহারা গ্রামে-গ্রামে সংবাদ পাঠাইয়া সকলে মল বাধিয়া কাড়া-নাকাড়া বাশী বাজাইয়া শিকারে বাহির

হয়। সশ্রমে শিকারে কুকুর থাকে। শিকার যাত্রারও বিশেষ নৃত্যগীত আছে। ইহারা সাধারণত আহার-অবেষণেই শিকার করে, কিন্তু শিকারোত্তর সাঁওতাল-দলের সম্মুখে ব্যাঙ্গাদি বক্তৃত্ত পড়িলে তাহাদের নিস্তার নাই। ইহাদের শিকারের সংগ্রাম তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, টাঁক, বল্লম, লাঠি ইত্যাদি। শিকারে বাহির হইবার পূর্বে ইহারা নানা-প্রকার মাজলিক ক্রিয়াদি করে।

সেওয়া আর পরব—সাঁওতালদের প্রধান দেবতা সিং-বকা (সূর্যদেব), তাঁর পর মারাং বুক (বৃহৎ পর্কত) তদাতীত আরও অনেক দেবতা ইহারা মানে, যথা চাম্ সিম্ বকা, মঁড়ে তুরুই, গোসাই এরা প্রভৃতি। সম্বৎসরে ইহাদের নানা-প্রকার পর্কও আছে। আষাঢ় মাসে ধাতু-রোপণ-কালে এরঃ সিম্ পরব, ধাতুরোপণ শেষ হইলে শ্রাবণ মাসে হেরিয়েড়্ সিম্ পরব, ভাদ্র মাসে ইড়ি গুঁহলি নাওয়াই, অগ্রহায়ণ মাসে বাছাড়্ ও প্রধান পরব সোহরায়। সোহরায় ইহাদের সপ্তাহব্যাপী বৃহৎ পর্ক।

সাঁওতালদের ভূঃপ্রভেতে দৃঢ়বিশ্বাস। জাইনের ও ইহাদের খুব বেশী। জীলোকেরাই জাইনের বিদ শিখিয়া জাইন হয় এবং কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে তাহাকে অলঙ্কিতে খাইয়া ফেলে, সে-ব্যক্তি শুকাইয়া শুকাইয়া মারা যায়। ইহাদের যত-প্রকার ছুঃখকষ্ট অশান্তির কারণ এই জাইনের।

ভাওয়ান্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)—সাঁওতালেরা মৃত ব্যক্তিঃ শবদাহ করে এবং মৃতের অস্থি নদীতে নিক্ষেপ করে ভাওয়ানক্রিয়ার দ্বারা ইহারা অশৌচমুক্ত হয়। ভাওয়ান ন হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তির বাড়ীতে কোনো পর্কাদি হইতে পারে না। ইহা শ্রাদ্ধের স্তায় একপ্রকার ক্রিয়া। এই উপলক্ষ্যেও গ্রামবাসিগণের পান-ভোজনের ব্যবস্থা আছে *।

*হুঃ কোরেন্ মারে হাপড়ান্ কো রেগাক্' কথা (The Traditions and Institutions of the Santals, published by the Santal Mission of the Northern Churches of Bengal) অবলম্বনে লিখিত।

ভারতবর্ষের অর্থের কথা

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই অর্থের প্রচলন হইয়াছিল। এই দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালেই ভারতবাসী সভ্যতার অত্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিল্প-বাণিজ্যে তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও অধিবাসীদিগের বিবরণ-গ্রন্থ, বেদ, সংহিতা, বৌদ্ধগ্রন্থাদি, এবং তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতে অর্থের ব্যবহার-সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো-কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময়েরও ধরন পাওয়া যায়। অথর্ববেদে 'প্রতিপণের' অর্থাৎ সামগ্রী বিনিময়ের উল্লেখ আছে।

পাণিনিতে (৫।৪।৩০) আছে—“পঞ্চভিনেীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চমুঃ”, “দাত্যাং পুরুষাত্যাং ক্রীতা বিপুরুষা (কাশিকা ৪।১।২৪)” “পঞ্চভিঃ মূচীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চমুঃ (কাশিকা ১।২।৪০)”, ইত্যাদি। আবার প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেই ধাতুমুদ্রা ছাড়া পঞ্চমুঃ যে মূল্য-নির্ধারণের মানস্বরূপ ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি পঞ্চমুঃ একটি ইন্দ্রমুষ্টির মূল্যের পরিমাণ-নির্দেশক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গরুর বিনিময়ে সোমের ক্রয়ের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন-প্রকারের সোনা, রূপা ও তামার তৈয়ারী মুদ্রার প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগে আর্ষ্য-গণ ভারতবর্ষে 'নিক' নামক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত

করেন। ইহা দেখিতে কেমন ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। এই 'নিক'ই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুদ্রা বলিয়া ননে হয়। বৈদিক যুগে ধাতুমুদ্রা ছাড়া স্বর্ণপিণ্ডও অর্থের কাজ চালাইত। বৈদিকযুগেও শেষে, ১০০০ ষ্ঠ: পূ: হইতে ৪০০ ষ্ঠ: পূ: মধ্যে 'নিক' ছাড়া আরও কতকগুলি ধাতুমুদ্রার প্রচলন ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে 'শতমান' মুদ্রার উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে 'পাদ' মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "কৃষ্ণাল" নামে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার উল্লেখ পাই। "শতমান" ও "কৃষ্ণাল" এই যুগের পরেও বহুকাল চলিয়াছিল। মহু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সোনার ও রূপার শতমান মুদ্রার উল্লেখ আছে। মহুসংহিতা পাঠে জানিতে পারি যে, চাকর যদি পীড়িত না হইয়া খেয়ালের বলে চুক্তিমতো কাজ না করিত, তাহা হইলে তাহাকে আট কৃষ্ণাল জরিমানা করিবার রীতি ছিল। বৌদ্ধ জাতকপাঠে জানা যায় যে, গৌতম-বুদ্ধের যুগে, অর্থাৎ ষ্ঠ: পূ: ৬০০ হইতে ষ্ঠ: পূ: ৩২১ মধ্যে আরও কয়েকটি নূতন ধাতুমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, যথা—নিক্খ, মাঙ্ক, কাকনিকা, কাহাপন (কাষাপন) ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে সম্রাট বা রাজাই মুদ্রা নিষ্কাশন করাইতেন।*

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের সময়ে চলিত অর্থের সংস্কারের সঙ্গ বহু চেষ্টা হইয়াছে। তখনও মুদ্রা-নিষ্কাশনের ভার সম্রাটগণের উপরে ছিল। মহম্মদ তোঘলক্ অর্থ-সংস্কারে হাত দিতে যাইয়া তখনকার রূপার মুদ্রাতে খাদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া উহা রৌপ্য-মুদ্রার মূল্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার লোক উহাতে রাজি হইল না। এখন পতর্ন-মেণ্টের প্রচলিত একটুকরা কাগজের নোট আমাদের সমাজে অর্থের কাজ চালাইতেছে। কিন্তু তখনকার

সমাজে সম্রাটের প্রচলিত তাম্রমুদ্রা—মাত্র কতকটা এই কালের নোটের মতো ছিল—তাহা চলল না। সম্রাট আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে এক আদর্শমুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'তিনিও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। স্থলতান আল্-তামাশ ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে রূপার 'টকা' সর্বপ্রথম তৈয়ারী করান। উত্তর ভারতে এই 'টকা' ধন চলিয়াছিল।

মোগল আমলে হিসাবপত্র, দরকষা প্রভৃতি সব কাজই রূপার টাকার হিসাবে হইত; কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্ণমুদ্রা যে চলিত না তাহা নহে। তবে উহার প্রচলন খুব কম ছিল। মোগল সম্রাটগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দুইই তৈয়ার করাইতেন। কিন্তু কয়টি স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে কয়টি রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহা ঠিক থাকিত না—প্রায়ই বদলাইত। মোগল রাজত্বের শেষ-সময়ে উত্তর ভারতে ও বাংলা দেশে রূপার টাকাই চলিত বেশী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভাব তেমন হয় নাই বলিয়া তথায় স্বর্ণ মুদ্রার চলন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন নানান-রকম সোনার মোহর ও রূপার টাকা চলিত। কেহ-কেহ বলেন, তখন ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত রকম সোনার মোহর এবং প্রায় ৫৫০শত-প্রকারের রূপার টাকা প্রচলিত ছিল।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আইনের সাহায্যে সোনা ও রূপার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দ্বিধাতু-পরিমাণ (Bimetalism) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। একটি সোনার মোহরের দাম ১৪ সিকা টাকা স্থির হইল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে তাহারিগের রূপার টাকা চালাইবার চেষ্টা করিলেন।

ভারতবর্ষে নানান-রকম মোহর ও টাকার প্রচলন থাকিতে বড় অসুবিধা হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় সার আলমের আমলের সিকা টাকা তাহারিগের কলিকাতা টাওয়ারে তৈয়ার করাইয়া তাহারের সীমানার মধ্যে আদর্শ মুদ্রারূপে চালাইবার চেষ্টা করিলেন। আর

* প্রাচীন ভারতের অর্থ-সংস্কারে (১) Economic Life and Progress in Ancient India, by Narayan Chandra Bandyopadhyaya.

(২) The Economic History of Ancient India, by Santosh Kumar Das.

(৩) যেহেতু (৪) সংহিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইল।

ঐ সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন আরও তিন রকম টাকা
উহার চালাইলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী স্বিডাভু-পরিমাণের প্রথা
উঠাইয়া দিলেন। সোনার মূল্য আর অল্প-অল্প জোরে
ঠিক করিয়া না দিয়া উহার ক্রেতার উপরেই ছাড়িয়া
দিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে রূপার টাকাই একমাত্র চলত-
সিকা (legal tender money) বলিয়া প্রচারিত হইল।
ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী আরও হুকুম জারি করিলেন যে,
ভারতবর্ষে তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে কোথাও সোনার
মোহর চলত-সিকা বলিয়া আর চলিবে না। কিন্তু ১৮৪১
খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট আইন করিলেন যে, গভর্নমেন্টের
দ্রোণীতে ১৫ টাকায় ১ মোহর, এই হিসাবে সোনার
মোহর গ্রহণ করা হইবে। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই
অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে সোনার খনি আবিষ্কার হওয়ার
দরুন পৃথিবীর বাজারে সোনা খুব সস্তা হইয়া গেল।
ভারতবর্ষেও (গভর্নমেন্ট যে-দরে ১৫ টাকায় ১ মোহর)
স্বর্ণ গ্রহণ করিতেছিলেন বাজারে সোনা তাহার চেয়ে সস্তা
হইয়া গেল। লোকের বাজার হইতে কম দামে সোনা
কিনিয়া উহা গভর্নমেন্টের দ্রোণীতে দিয়া বেশী মূল্য
আদায় করিতে লাগিল। গভর্নমেন্ট ব্যক্তি-বাস্ত হইয়া
প্রচার করিয়া দিলেন যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

হইতে খাজনা বা অন্য-কোনো বাবদে গভর্নমেন্টের খাজনা-
খানার আর সোনা লওয়া হইবে না। এই হুকুমের ফলে
গভর্নমেন্টের কর্মচারিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল।
ভারত ও যুরোপীয় সওদাগরগণও গভর্নমেন্টকে অস্বীকার
করিলেন যে, ভারতবর্ষে সোনার মুদ্রাই চালানো হউক।
১০ টাকায় এক সোভারেন্স এই হিসাবে সোভারেন্সকে
চলত-সিকা (legal tender money) করিতেও তাঁহারা
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাহাতে রাজি
হইলেন না। গভর্নমেন্ট কেবল এইটুকু পরিবর্তনের
আদেশ দিলেন যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দ্রোণীতে যেমন
একটা নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা হইত,
এখন হইতে আবার তেমনি করা হইবে।

কাজেই ভারতবর্ষে রূপার মুদ্রাই চলিতে লাগিল।
আমাদের দেশে যখন এই অবস্থা, তখন যুরোপের অনেক
দেশেই ইংলণ্ডের দেখা-দেখি রূপার মুদ্রার প্রচলন উঠাইয়া
দিয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন শুরু হইয়াছে। তাহার ফলে
পৃথিবীর বাজারে রূপার টান কমিয়া গেল। পণ্যের
জোগান ঠিক থাকিয়া টান যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে
উহার দাম কমে। এই ক্ষেত্রে, রূপারও জোগান ঠিক
থাকিয়া টান কম হওয়াতে উহার দাম কমিতে আরম্ভ
করিল।

রূপ ও প্রেম

(কোন্‌রিতের অনুসরণে)

মনের ধনুজিনি সুবন্ধিম ভূক-বেথা লতা,
গোলাপের রাগ রক্ত কাপোলের পুষ্পপেলবতা,
উজ্জল নয়ন প্রান্তে কটাক্ষের চটুল বিলাস,
নাহি মাগি, তার লাগি নাহি মোর কোন অভিলাষ।
দ্বিধ নীল আঁধিপুটে প্রণয়ের নন্দ্র নিবেদন,
বিকারেছি তার কাছে, ওগো মোর সমগ্র ঘৌবন।

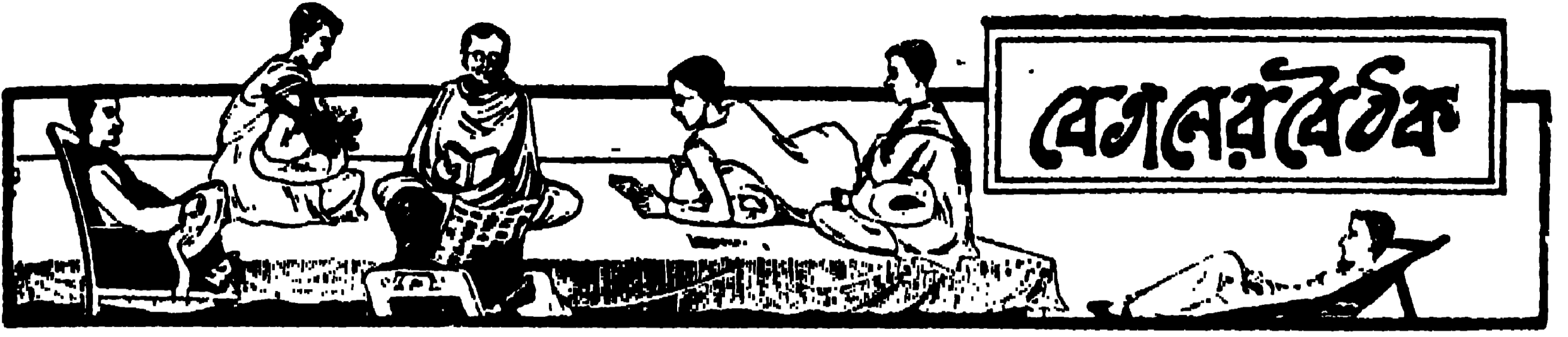
শ্রী চারুবালা চট্টোপাধ্যায়

স্বরূপ

(লেখ সাদী অনুসরণে)

শ্রামল তরুর শিরে—চিত্রিত পল্লব
সে কি শুধু—অর্থহীন ছন্দহীন বাণী,
জানীর মানস চক্ষে—প্রতি পত্র তার
—তাঁহার মহিমা মাথা—মহাগ্রহ খানি।

শ্রী শচীন্দ্রমোহন সরকার



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়া হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনকে দিলে বাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাটী চাওয়া হইবে। বাহারের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাহার লিখিতা জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর চাওয়া হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পৃষ্ঠে কালীতে লিখিতা পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিতা পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিয়কোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। বাহাতে সাধারণের সংশ্লিষ্ট-নিরসনের দৃষ্টিভঙ্গন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, বাহার মীমাংসা বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার চক্র কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় বাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিবদ্ধ হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ চাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাপূর্ণ আরম্ভ হয়। সুতরাং বাহার মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহার কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

চিনির কারখানা

ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে চিনির কারখানা আছে ও তাহা কতটা দেশের লোক দ্বারা চালিত ?

শ্রী মণিলাল সেন

জন্মদিন

হিন্দুদিগের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, জন্মদিনে কোনো স্তম্ভকাল কোথায় গমনাগমন, ক্ষৌরকর্ম ইত্যাদি করিতে নাই। এ-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত কি ?

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

মীমাংসা

বিধবা-বিবাহ

(৭)

মহাত্মার উত্তর-পার্শ্বে দেখা যায়, নাগরাজ ঐরাবতের পুত্র সুপর্ণকে গরুড় বিনষ্ট করিলে সুপর্ণের বিধবা পত্নীকে নিঃসন্তান দীন-চিন্তা ও দুঃখিতা দর্শন করিয়া নাগরাজ বিধবা পুত্রবধূকে ভার্য্যাৰ্হ অর্জুনকে দান করেন এবং অর্জুনও তাহাকে ভার্য্যাৰ্হ পরিগ্রহ করেন। নাগরাজের এই বিধবা পুত্রবধূর গর্ভে অর্জুনের ঔরসে অর্জুনের ইরাবান্ নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল (১০ অধ্যায় ৬—১৩ শ্লোক)। অর্জুনের এই পত্নী ইরাবান্-জননীই "নাগরাজসুবা স্তম্ভকাল" ছিলেন। ইহার নাম মহাত্মার উত্তর কোথাও নাই। ঐবৃত্ত পঞ্চানন ভট্টরচয় মহাশয়ের "ধর্মসংহিতার" বে-চিত্রাঙ্ককে নাগরাজসুবা স্তম্ভকাল বলা হইয়াছে এই চিত্রাঙ্ক মণিপুররাজ চিত্রবাহনের (আতিথানিক মহাশয়ের) এই চিত্রবাহনকে "চিত্রভানু" বলিয়া ডাক করা হইয়াছে। অর্জুন ইহাকে পুত্রিকাধর্মীসুবারে বিবাহ

করিয়াছিলেন। এই চিত্রাঙ্ক অর্জুন-মন্দন বক্রবাহনের জননী। ইনি নাগরাজসুবাও নহেন স্তম্ভকালও নহেন [আদিপর্ক ২১৬ অধ্যায় এবং ২১৭ অঃ ২০-২৬ শ্লোক]। অতএব এই চিত্রাঙ্ককে বে ভট্টরচয় মহাশয় "ধর্মসংহিতার" স্তম্ভকাল নাগরাজসুবা বলিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণই ভুল। ভট্টরচয়-মহাশয় একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত, সংস্কৃত মহাত্মার উত্তর সম্পাদিতা, তিনি হিন্দুর ঐতিহ্য-গ্রন্থগুলির বাঙ্গালা অনুবাদক, তিনি কেমন করিয়া যে "ধর্মসংহিতার" এত বড় একটা ভুল করিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যিনি চিত্রাঙ্ককে "নাগরাজ-সুবা স্তম্ভকাল" বলিয়াছেন তিনি যেমন ভ্রান্ত, ইহা মহাত্মার উত্তর আছে বলিয়া বাহার বিবাস করেন, তাহাও তেমনি ভ্রান্ত। চিত্রাঙ্ক "নাগরাজসুবা স্তম্ভকাল," ইহা মহাত্মার উত্তর কি অপর-কোনো আনুষ্ঠানিক গ্রন্থেই নাই।

(৮)

বাঙ্গালা দেশে বিবাহ

কোন্ মাসে কি কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহা আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এইরূপ আছে, যথা—

আষাঢ়ে ধনধান্যভোগবিহীনতা, নষ্টপ্রজা জীবনে, বেস্তা ভ্রান্তপথে, ইবে চ মরণ, রোগাঘাত কার্তিকে, পৌষে প্রেতবতী বিরোগবহলা, চৈত্রে মদোগ্রাভিনী। আষাঢ় মাসে বিবাহ হইলে কষ্টা ধনধান্যভোগ-বিহীনতা, জীবনে স্তম্ভকাল, ভ্রান্তে বেস্তা, আঘিনে স্তম্ভকাল, কার্তিকে রোগবৃদ্ধা, পৌষে আচাংক্রমণ ও স্বামী-বিরোগিনী, চৈত্রে মদোগ্রাভা হয়। কিন্তু অরক্ষণীয়া কষ্টার পক্ষে কেবল পৌষ ও চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহা অচলিত পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষেই যখন এই বিধান অবশ্যপালনীয়, তখন, ভারতের অপর প্রশ্বে হিন্দু-দিগের মধ্যেও এইসকল মাসে বিবাহ-প্রথা নাই।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(৯)

গত শ্রাবণমাসের প্রবাসীর "বেতালের বৈঠকের" চাউল-রক্ষণ প্রশ্নের মীমাংসার ঐবৃত্ত পূর্ণেন্দ্রবরণ দত্ত রায় মহাশয় পোকাধরা পশ্চ

পোকা নষ্ট করিবার যে করেকটি প্রণালী বিদ্যমান, উল্লেখ্য প্রথম প্রণালীটি বড়ই বিপজ্জনক। পোটাসিয়াম সাইয়ানাইড-এর (Potassium Cyanide) সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid) মিশাইলে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (Hydrocyanic Acid) নামে যে-গ্যাসটি উৎপন্ন হয় তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত। এই গ্যাস অতি অল্পমাত্রায় যদি কোনো প্রকারে নিশ্বাসের সহিত প্রবেশ করে তাহা হইলে অত্যন্ত সবলও সুস্থকার মানুষও অজ্ঞান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও পর্যন্ত এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বাহা ইহার প্রতিবেদকরূপে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এরূপ ভীত বিবাক্ত জব্য কোনো প্রকারেই ব্যবহার করা উচিত নহে। সামান্য পোকা নষ্ট করিবার জন্য নিজের জীবন এরূপসেই বিপন্ন করা সুস্তিযুক্ত নয়।

শ্রী ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায়

(১০)

ধনার বচন

জিজ্ঞাসু-মহাশয়ের উক্ত ধনার বচনে এবং লালমোহন বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনার উক্ত ভাংশে একটু ভুল হইয়াছে। বচনের শেষ পঙ্ক্তির “সামনে” শব্দের পর একটি “না” এবং বিজ্ঞানিধি-মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনার উক্ত কথায় প্রথমেই যে “ভৈলী” শব্দ রহিয়াছে এই “ভৈলী” শব্দের স্থানে “ভিলি” শব্দ হইবে। কেননা জিজ্ঞাসু-বিজ্ঞানিধি মহাশয় নবশাকের জাতিগুলির উল্লেখ করিয়া পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই “ভিলি” শব্দ তিনি (বিজ্ঞানিধি-মহাশয়) কোথা হইতে পাইলেন? অতএব বোধ হয় জিজ্ঞাসু জন-ক্রমে “ভিলি” স্থলে “ভৈলী” লিখিয়াছেন।

যাত্রা করিয়া পথে বাহির হইতেই বাহা দর্শন করিলে যাত্রা নষ্ট হইবে, সুতরাং বাত্রিক স্থানে বাগরী নিবেদ, ধনার এই বচনাংশে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই—

“মাকুল চোপা” দুইটি শব্দ ‘মাকুল’ ও ‘চোপা’ বাহার কখনই গৌক-দাড়ী পড়ার না বা কখনও পড়াইবেও না তাহাকে “মাকুল” এবং সুথকে ইতর ভাবার “চোপা” কহে। অতএব বাহার গৌক-দাড়ী পড়ার না বা কখনও পড়াইবে না, তাহার মুখই “মাকুল চোপা”। যাত্রা করিয়া এই “মাকুল চোপা” দর্শন করা অন্ততঃজনক। অতএব বাত্রিক স্থানে বাইতে পথে এষ্ট “মাকুল চোপা” দর্শন করিলে বাত্রিক স্থানে বাইবে না। তাই ধনা বলিয়াছেন, “যদি দেখ মাকুল চোপা, এক পা না বাড়াও বাপা।” বাবা। মাকুল চোপা দেখিলে আর বাত্রিক স্থানে বাইও না। কিন্তু বাত্রিক স্থানে একান্তই না গেলে নয় এমন হইলে “মাকুল চোপা” দেখিলেও বাত্রিক স্থানে বাগরীর বিধান দিয়া বলিলেন, “এরেও ঠেলি”, অর্থাৎ “মাকুল চোপা” দেখাও অগ্রাহ্য করি “যদি সামনে না দেখি ভৈলী”। যাত্রা করিয়া বাত্রিক স্থানে বাইতে পথে “মাকুল চোপা” দেখিলেও বাইতে পারা যায়, কিন্তু “মাকুল চোপা” দেখিয়া বাগরী যায়, যদি “ভৈলী” না দেখা যায়। “মাকুল চোপা” দেখিয়া ভৈলী দেখিলেই যাত্রা একেগারে পশু হইবে। ইহাই ধনার এই বচনের অর্থ। এখানে যে ‘ভৈলী’ কথা রহিয়াছে, এই “ভৈলী” শব্দ সংস্কৃতের “ভৈলিকঃ” শব্দেরই অপভ্রংশ। এই ‘ভৈলিক’ শব্দের অর্থ কলু, ভৈল-প্রস্তুত কারক। এই “ভৈলী”ই মানব-সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮৪ স্লোকের টীকাব টীকা-কারের বাখ্যায় “ভৈলিকঃ”; এষ্ট ভৈলিক বা ভৈলী কলু-জাতি বাচ্য। এই জাতি ব্রাহ্মণদিগের অনাচরণীয়। কিন্তু নবশাক ব্রাহ্মণদিগের অনাচরণীয় নহে। এমনকি মহর্ষি পরাশর নবশাকের “গোপ” ও “নাগিতের” অল্প পর্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের ভোগ্যের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া-ছেন (১১ অঃ, ২০ স্লোক)। অতএব নবশাকের “ভৈলী” সংস্কৃত

“ভৈলিকঃ” শব্দের অপভ্রংশও নহে এবং একার্থবাচকও নহে।—ভিল+অ (ক) বিকারার্থে ‘ভৈল’ শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে।

সুতরাং এই “ভৈলী” আচরণীয় নবশাক-শ্রেণীভুক্ত। আভি-ধানিকেরাও এই “ভৈলী”কে একবার আচরণীয় নবশাক বলিয়াছেন; তাহারাই আবার নবশাকের এই আচরণীয় “ভৈলীকে” অনাচরণীয় “ভৈলিক” পধ্যায়ভুক্ত করিয়া ভৈলকারক, কলু, এবং ভৈলী অর্থ করিয়াছেন। ইহা যে আভিধানিক মহাশয়দিগের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং নবশাকের বর্ণনাতে রহিয়াছে

গোপ মালী, তথা ভৈলী, তস্ত্রী, মোদকব রঙ্গী।

কুলালঃ কল্পকারন্ট নাগিতো নবশারকাঃ।

গোপ (গোয়াল), মালী (ফুলমালী), ভৈলী (ভৈলব্যবসারী), তস্ত্রী (তাঁত), মোদক (ময়রা) বাঙ্গালী (পানতি), কুলকার, কল্পকার, এবং নাগিত ইহারাই নবশারক। কিন্তু বিজ্ঞানিধি-মহাশয় নবশারকের বর্ণনাতে ‘ভামুলী’, ‘গোয়ালী’ এবং ‘গুটুলী’ দিগকে নবশারক বলিয়াছেন; সুতরাং ইহাদিগের নাম নাই। তিনি এই আভি-ধানিক কোথায় পাইলেন বলিবেন কি?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১১)

মহিবী

মহিব শব্দ সংজ্ঞা-বাচক পুংলিঙ্গ। এই শব্দের মহ অর্থ পূজা করা। এই মহ+ইব (টিবচ) প্রত্যয়ে এই মহিব শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। এই মহিব শব্দের ত্রীলিঙ্গে মহিবী হইয়াছে। কেহ কেহ মহিব শব্দ ইপ প্রত্যয় করিয়া মহিবী পদ সাধন করিয়াছেন। মহিবী শব্দের প্রথম অর্থ স্ত্রীমাতঃ, ২য় অর্থ কৃতান্ত্রিবেকা রাজ্ঞী। সুতরাং “মহিবী” কথার পৃথক কোনো ব্যুৎপত্তি নাই।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১২)

বাট বলা

জাতকর্ষনময়ে “শতবর্ষ জীবিত থাকো” বলিয়া জনক আশীর্বাদ করিয়া জাতকর্ষ সম্পন্ন করেন। সুতরাং আশুভাগ্যের পূজা সময়ে স্ত্রীলোকগণ শ্রান করিয়া উষ্ণিরা সম্ভান-সম্ভতিদিগের মাখার জল দিয়া (পূর্বাঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে পাখার বাতাস করে, জল মাখার দেয় না, পূজার পরে ধানপূর্কীসহ জল মাখার দেয়) যে “বাটুবাটু” বলে, ইহার অর্থ বাট বৎসর বাঁচায়। থাকিবার আশীর্বাদ হইতেই পারে না। তবে কলিকালে মানুষের আয়ু নাকি ১২০ বৎসর তাই “বাটুবাটু” অর্থাৎ ৬০+৬০=১২০ বৎসর জীবিত থাকো এই অর্থও করা বাইতে পারে। কিন্তু এই অর্থও সমীচীন নয়।

সাধারণত দেগা যায় শিশুগণ আছাড় খাইয়া পড়িলে বা কোনোরূপ ব্যথা পাইলে “বাটুবাটু” বলিয়া তাহা দগকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাশ্বনা করা হয়। অতএব এই “বাটুবাটু” সাশ্বনা-সূচক স্নেহ-বাক্য বলা বাইতে পারে।

আশুভাগ্যের ব্রত-কথায় দেখা যায়, ছেলে আব্দার করিয়া পিতৃঘরার নানিকা কর্তন, মাতৃঘরার মূল্যবান শাড়ী ছেঁড়া এবং ভৈলীর তৈলের মটুলী তালিয়া গুরুতর ক্ষতি করিলেও তাহারাই ছেলেদিগকে “বাটুবাটু” বা “ক’রেছ তালো করেছ” বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া-হিলেন। অতএব আশুভাগ্যের দিবস ছেলেরা বত কতি ও অপকারই

কল্পক না কেন, উজ্জ্বল ভাষাটিকে গালি-মন্দ না করিয়া আদরই করিতে হইবে। অতএব আরণ্যবস্তীর দিনের “বাটুবাটু” সম্পূর্ণ অপ-শয্য কমান্বনক মঙ্গল-কামনা-সুচক শ্রেয়বাক্য। এই আরণ্যবস্তী পুত্রের অশ্রু জননীর অপূর্ব কষ্ট-সহিকুড়া, আশ্র ও স্বার্থভাগ-ব্রত।

(২২)

রাহ চণ্ডাল

শ্রীবুত্র বিষ্ণুরকুণ্ডার মহাশয় “বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” গ্রন্থে “রাহ” চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইয়া “শব্দকল্পদ্রুম” গ্রন্থকে চণ্ডাল-জাতি ও সর্পাকৃতি বলা হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু “শব্দকল্পদ্রুম” হইতে রায় মহাশয়ের উক্ত ভাষ্যের শেষভাগে যখন “ইতি বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” বলিয়া লিখিত রহিয়াছে তখন ঐ কথা “বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” গ্রন্থ হইতেই “শব্দকল্পদ্রুম” উদ্ধৃত করিয়াছেন। “বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” এবং ভদ্রসুবারী “শব্দকল্পদ্রুমের” ঐ কথা স্মৃতিপূর্ণ। “রাহ” চণ্ডালও নহে, “সর্পাকৃতি”ও নহে। প্রচলিত পঞ্জিকাতে “কেতুর”ই সর্পাকৃতি এবং ‘রাহুর’ মানবমস্তক সদৃশ অহরমস্তকই স্মৃতি রহিয়াছে দেখা যায়। গ্রহণের সূক্তস্মান মন্ত্রে রহিয়াছে—

উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ভাজাতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ ।

কর্কচাণ্ডাল যোগোথং কুরু পাপকরং মম ।

স্মানমন্ত্রে এই “কর্কচাণ্ডাল” কথাটা দেখিয়াই বোধ হয় “বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” গ্রন্থকে চণ্ডাল বলিয়াছেন এবং “শব্দকল্পদ্রুম”ও অবিচারিতচিত্তে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাহুর চণ্ডালত্বের অপর কোন প্রমাণই নাই; বরং রাহুর ব্রাহ্মণ্যেরই প্রমাণ বখেটে পাওয়া যায়।

মহাতারতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ পুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কণাপ মুনির সহিত বিবাহিতা ত্রয়োদশ কণ্ডার অন্ততম “সিংহিকা”। এই সিংহিকারই পুত্র কল্পপ মুনির ঔরসে রাহুর জন্ম (আদিপর্ক ৬৫ অধ্যায়, ১১—১৩ এবং ৩১ শ্লোক)। এই রাহু দেবতার চন্দ্রবেশে অমৃত পান করিবার সময় চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর চন্দ্রবেশ ধরাইয়া দিলে বিষ্ণু চন্দ্রদ্বারা রাহুর মস্তক ছেদ করেন; এই মস্তকই বিধেববেশে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ ঘটায়। এতদ্বারা মহাতারতে রাহুকে “চন্দ্রাধিত্য-বিমর্দনম্” ও বলা হইয়াছে (আদিপর্ক ১৯ অঃ ৪—৯ শ্লোক)। বাহ্মাণা আতিথানিক মহাশয়েরও রাহুকে “অষ্টম-গ্রহ” এবং সিংহিকা-পুত্র বলিয়াছেন। অতএব দেখা বাইতেছে, রাহুর জননী ব্রাহ্মণ ছুহিতা এবং জনকও ব্রাহ্মণ, সূতরাং রাহুও ব্রাহ্মণেরই সন্তান, ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান চণ্ডাল হইবে কেন? ব্রাহ্মণাচিত সংস্কার না হইলেও চণ্ডাল হয় না, শূদ্র হয়; কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ কল্পপ সন্তানের ব্রাহ্মণাচিত সংস্কার করেন নাই ইহা একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য কথা। পরন্তু মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বলিয়া প্রচারিত নবগ্রহ-স্তোত্রেরও রাহুকে অষ্টম গ্রহ হলে

অর্ধকাল মহাধোরঃ চন্দ্রাধিত্যবিমর্দকঃ ।

সিংহিকারঃ সূতঃ রৌত্রঃ জংগলঃ প্রণমাম্যহম্ ।

বলিয়া মহর্ষি ব্যাস এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ রাহুকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং বর্তমানেও ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ এই স্তোত্র পাঠ করিয়া “তঃরাহু প্রণমাম্যহম্” বলিয়া প্রণাম করেন। রাহু চণ্ডাল হইলে মহর্ষি বেদব্যাস এবং ব্রাহ্মণগণ কি চণ্ডালকে প্রণাম করিতেন? এবং বর্তমানেও ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালকে প্রণাম করে নাকি? চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুর গ্রাস করা চণ্ডালের কার্য্য কল্পনা করিয়া রাহুকে কর্ক চণ্ডাল বলা হইয়া থাকিলেও সিংহিকা-সূত রাহুকে চণ্ডাল বলা বাইতে পারে না। কোনো চন্দ্রসূর্য্যকে সিংহিকা-সূত রাহু গ্রাস করিয়াও গ্রহণ ঘটায়ই না অপর কোন রাহুও গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ ঘটায় না। এবং রাহুও গ্রহণের কারণ নহে। প্রাকৃতিক-

কারণেই গ্রহণ ঘটয়া থাকে, সূতরাং রাহু “কর্কচাণ্ডালও” নহে। হৃদ-বেশে সিংহিকা-সূত রাহুর অমৃত পান চন্দ্রসূর্য্যের চন্দ্র বেশ ধরাইয়া দেওয়া এবং বিষ্ণুচন্দ্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন ও তদ্বৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গে রাহু মস্তকের বিধেব হরত সভা ইহাতে পারে, কিন্তু এই রাহু মস্তক “চন্দ্রাধিত্য-বিমর্দনম্” চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে উজ্জ্বল গ্রহণ হয় এবং উজ্জ্বল রাহু “চণ্ডাল কর্ককারী” ও রাহু অষ্টমগ্রহ, ইহার সহিত সত্যের আদৌ কোন সম্বন্ধই নাই। ইহা সমুদায়ই পৌরাণিকের অবাস্তব মনোরম গল্পমাত্র। যে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয় আমাদের পৌরাণিক এবং জ্যোতিষী মহাশয়েরা তাহা অবগত ছিলেন না। তাই পৌরাণিক এই অবাস্তব মনোরম গল্পে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জ্যোতিষী মহাশয়েরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়া পঞ্জিকাতে রাহু-কেতুকে অষ্টম ও নব গ্রহ এবং রাহুর মানবাকৃতি অহরমস্তক ও কেতুর সর্পাকৃতি স্মৃতি করিয়াছেন। এবং নবগ্রহ স্তোত্রকার তাঁহার সূত নবগ্রহ-স্তোত্রে রাহুকে ‘চন্দ্রাধিত্য-বিমর্দকং’ এবং কেতুকে ‘ভারা গ্রহ-বিমর্দকং’ বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। রাহু-কেতুকে যে কোনই সম্বন্ধ নাই, সূতরাং অষ্টম ও নবম গ্রহ নহে এবং যে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয়, তাহা দেখান বাইতেছে।

পৃথিবীকে মাঝখানে রাখিয়া তাহার একদিকে চন্দ্র ও অপর দিকে সূর্য্য থাকিলে পূর্ণিমা এবং উভয়ে পৃথিবীর একই দিকে সমন্বয় হইলে অমাবস্তা হয়। পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পূর্বদিকে এবং চন্দ্র আবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গমনপ্রবৃত্ত সূর্য্য কিরণ পূর্ব হইতে গমন করিতে দেখা যায়, সূর্য্যের সেই কল্পিত গমন-পন্থাকে “ক্রান্তিবৃত্ত” এবং চন্দ্রের গমন-পন্থাকে ‘চন্দ্রকক্ষ’ কহে। এই ‘চন্দ্রকক্ষ’ “ক্রান্তিবৃত্ত” পরস্পরকে যে ছুই বিন্দুতে ছেদ করে কল্পনা করা হয় সেই ছুই বিন্দুকে ‘পাত’ কহে। চন্দ্র ও সূর্য্য যত্নরূপে এই ছুই সমপাতে বিন্দুতে সম-স্বয় হইলে যদি পূর্ণিমা ঘটে, তাহা হইলে চন্দ্র গ্রহণ এবং উভয়ে একত্রে এক সমপাত বিন্দুতে সমস্বয় হইলে যদি অমাবস্তা ঘটে তাহা সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্যের গমন-পন্থা “ক্রান্তিবৃত্ত” এবং ‘চন্দ্রকক্ষ’ উভয়ই যেমন কল্পিত, ইহাদের পরস্পরের সমপাত বিখ্যাতরূপে তেমনই কল্পিত; সূতরাং ইহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। ১২৬৪ সন এবং তৎপূর্ববর্তী পঞ্জিকাতে দেখা যায়, এই পাত-বিন্দুদ্বয়েরই এক বিন্দুকে ‘রাহু’ অপর বিন্দুকে ‘কেতু’ কল্পনা করা হইয়াছে। পশ্চাত্যদিগের গ্রহণের নির্ণায়ক কারণই এই কল্পনার ভিত্তি। অতএব ‘রাহু’ ও ‘কেতু’ এবং তাহাদের অষ্টম ও নবম গ্রহত্বের কে জ্যোতিষিক কোন ভিত্তিই নাই। অতএব ‘রাহু’ চণ্ডাল কর্ককারীও নহে অষ্টম গ্রহও নহে। অষ্টম ও নবম গ্রহ-রাহু-কেতু কল্পিত না হইলে পঞ্জিকার প্রচলিত স্তোত্র, স্ত্রী পুরুষ ভেদ, পরস্পর শক্রমিত্র ও মম, কোন্ গ্রহ, কোন্ জাতি, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির আধিপতি; কোন্ গ্রহ উচ্চ, কোন্ গ্রহ নীচ গ্রহ এইসকল হলেই অষ্টম ও নবম গ্রহ রাহু কেতুর উল্লেখ দেখা বাইত। স্বর্গীয় নারায়ণ জ্যোতিষ্মণ মহাশয় ও তাঁহার “হোয়া বিজ্ঞান” গ্রন্থে অষ্টম ও নবম গ্রহ কল্পিত বলিয়া এই “রাহু ও কেতুকে” গ্রহ পদ হইতে খারিজ করিয়া ৭টি মাত্র গ্রহ বলিয়াছেন। অতএব ‘রাহুর’ বখন কোন ভিত্তিই নাই, তখন গ্রহণ-সূক্তস্মানমন্ত্রে আমরা যাহাকে ‘উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো’ বলি, সেই রাহুও নাই, তাহার কোন জাতিও নাই। অতএব রায় মহাশয় যে “রাহুকে” চণ্ডাল জাতি বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিসূচক। এই ভ্রান্তির মূল ‘বৃহজ্জাতকাদয়ঃ’ গ্রন্থ এবং ‘শব্দকল্পদ্রুম’।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

কণ্ঠ পাথর



বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র যে কখনও ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনে কোনও পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবতঃ অনেকের জানেন না। সম্ভ্রাত বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুণ্ডিত পুস্তকগণির মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আবিষ্কারের পর ঐ ধারণার ও বিধানের মূল শিখিন হইয়াছে।

পুস্তিকাকথানির নাম “বঙ্কিম বাবুর সহজ রচনা-শিক্ষা”। নামের নীচে মলাটে প্রথম কালের নাম নাই, কিন্তু ভিতরের টাইটেল-পেজে “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত” লেখা আছে।

“সহজ রচনাশিক্ষা”-নামক পুস্তিকাকথানি আমার হস্তগত হইলে প্রথমেই আমার মনে এই প্রশ্নের উৎস হইল, এ কোন্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? দেখিলাম পুস্তিকাকথানি এং প্রতাপ চাট্টোপাধ্যায় লেন হইতে উদ্ভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত; তাহা ছাড়া বেঙ্গল লাইব্রেরীর তদানীন্তন প্রত্নপত্রীতেও বঙ্কিমবাবুর পত্রীকেই পুস্তিকার স্বাধিকারিণী বলিয়া লেখা হইয়াছে। তথাপি আর-একটি সংস্করণের অবকাশ রহিল।

যে-বইখানি আমি পাইয়াছি, উহা “সহজ রচনাশিক্ষার” তৃতীয় সংস্করণের একখণ্ড, ১৮৯৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর উহা মুদ্রিত হইয়া মুদ্রণালয় হইতে নির্গত হয়। ইহা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক “বেঙ্গল লাইব্রেরী”তে পাওয়া গেল না; তবে তৎসম্বন্ধে যে-বিবরণ পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা গেল, উহাও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হয়। ছাপাখানা হইতে উহার বাহির হইবার তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে হয়।

“সহজ রচনাশিক্ষার” প্রথম সংস্করণের কোনও পুস্তক বা তৎসম্বন্ধে কোনও বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরীতে পাওয়া গেল না। সুতরাং উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও বঙ্কিমের জীবিতাবতার হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না।

“সহজ রচনাশিক্ষা”ই যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রকাশিত একমাত্র পাঠ্য-পুস্তক তাহা নহে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া আরও একখানি গ্রন্থের বিবরণ পাওয়া গেল। উহার নাম “সহজ ইংরেজী শিক্ষা”। লেখক- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ৪৬নং বেচু চাট্টোপাধ্যায় বহুনাথ মীল কর্তৃক মুদ্রিত; এং প্রতাপ চাট্টোপাধ্যায় লেন হইতে উদ্ভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রত্নস্বাধিকারিণী—“মৃত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রী”। তৃতীয় সংস্করণ। ঐ সংস্করণের পুস্তকগুলি ১৮৯৫ সনের ১৫ই ডিসেম্বর ছাপাখানা হইতে বাহির হয়। ইহাও বঙ্কিমের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা। “সহজ ইংরেজী-শিক্ষা”র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ-সম্বন্ধে কোনও বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রত্নপত্রীতে পাওয়া গেল না।

কি “সহজ রচনাশিক্ষা”, কি “সহজ ইংরেজী শিক্ষা”—কোনও পুস্তকেরই আমার তৃতীয় সংস্করণের পরে আর কোনও সংস্করণ পাওয়ার

প্রমাণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর দপ্তরে পাই নাই। ছুইটা বই-ই ভাল বলিয়া লোকে সম্বোধ করিয়াছিল কি?

“সহজ রচনাশিক্ষা” অতি ক্ষুদ্র পুস্তক; উহার পত্রসংখ্যা মাত্র ৩২। বাঙ্গালা রচনার বাহাদুর মাত্র “হাতে পড়ির” অবস্থা, তাহাদের তত্ত্ব উহা লিখিত। ঐ শ্রেণীর ছাত্রগণের গুরুমহাশয়দিগকে ইংরেজীতে কথ্যটিং কৃতবিদ্য দেখা যায়। এমত অবস্থায় “সহজ রচনাশিক্ষা”র গোড়াতেই একটি ইংরেজীতে লিপিত ভূমিকা দেখিয়া মনে প্রথমেই এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, এটি কাহাদের তত্ত্ব অভিপ্রায়? ভূমিকাকথানির নীচে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর নাই, কিন্তু উহা প্রত্নকারের কথা। উহার প্রথম প্যারাগ্রাফটি এইরূপ—

“It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the Vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect; there exist no rules for his guidance, none at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on composition has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as as clear as possible.”

যে-বঙ্কিম বঙ্গবর্শনে “পত্র সূচনার” লিখিয়াছিলেন, “এখন নব্য-সম্ভ্রদায়ের মধ্যে কোনও কাজই বাঙ্গালার হয় না। বিদ্যালোচনী ইংরেজিতে, সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকচার, এসে, প্রসিডিন্স সনুদর কার্য ইংরেজিতে। যদি উত্তরপক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন বোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালার হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উত্তর পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালার পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের এমনিও ভরসা আছে যে, অগোণে ছুপোংসবের মতাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।” সেই বঙ্কিম যে একখানি নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকের ছুই পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ভূমিকা লিখেন, ইহা বিশ্বাসের বিষয় কি না?

পুস্তকের ভিতরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে রচনা “বিশুদ্ধির” বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পাঠে প্রত্নকারের ছুই চারিটি বক্ত উল্লেখযোগ্য :-

“সংস্কৃত অসংস্কৃত কখনও সঙ্গি হইবে না * * * সকলেই ‘মনোমুগ্ধ’ বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেননা মন বাঙ্গালী শব্দ; সংস্কৃত মনসু, প্রথমায় মনঃ এমত, মনোহুঃখ, মনোরথ শুদ্ধ।”

* ঐ সংস্করণের “সহজ রচনাশিক্ষা” ও ৪৬নং বেচু চাট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

“সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত সমাস হয় না। যেমন, মহাকুমারাক টকীলংগ্ৰন্থা, যোজ্যারাদি এসকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায়।”

“সংস্কৃত শব্দে পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। যুথামি বলা যায় না, কেন না ‘যু’ সংস্কৃত শব্দ, ‘মি’ সংস্কৃত প্রত্যয় নহে, ‘যুথামি’ বলিতে হইবে। ‘অহমুখ’ সংস্কৃত শব্দ, এতদ্ভিন্ন বাহ্যমুখি অশুদ্ধ, ‘অহমুখমি’ বলিতে হইবে।”

“অসংস্কৃত শব্দে: জালিকান্ত বিশেষণ ভাল শুনার না। ‘পূর্ভগতী মেয়ে’ না বলিয়া ‘পূর্ভগতী কন্যা’ বলাই ভাল। ‘সুশীলা’ বউ না বলিয়া ‘সুশীল বউ’ বা ‘সুশীলা বধু’ বলা উচিত। ‘মুখরা চাকরাণী’ না বলিয়া ‘মুখরা দাসী’ বলিব।”

(মাননী শ্রী মধুবাণী, কাঠিক ১৩৩২) শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত

চীন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা

অল্প সকল দেশের মত চীন দেশেও প্রাণের ভাষা প্রথমে স্বাক্ষরপ্রকাশ করে কাব্যতার কথা দিয়া। খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম সপ্তদশ শতাব্দী পূর্বে হইতে আমরা সর্বপ্রথম চীন সাহিত্যের রেণুপাত দেখতে পাই। কাব্যরকমের জীবনকথা, কৃষকের আশা ও আশঙ্কা, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কথা, হাসি ও কান্না সহস্রাই প্রথম চীন সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়। অপর জাতির মধ্যে আমরা যে-সকল আশমিক গাথা পাই, তাহার কথাবস্তু সাধারণতঃ বুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্য; কিন্তু আশমিকের বিষয় এই যে, চীনের গীতিকবিতা শান্তির ভাবে পরিপূর্ণ।

কিন্তু তাহা বৃগুই সত্য সত্য চীন সাহিত্যের সৌরভের বৃগু। এই বৃগুই আমরা লীপো, তুফু ও পোচুই এই তিন কাব্যকে পাই—বাহারী উহারের বংশগৌরবে চীনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে চুয়ুগান নামক এক কবির নাম দেখিতে পাই। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থানবংশীয় রাজারা চীনের সিংহাসনে আরোহণ হন। চারিশত বৎসর কাল উহার চীনে রাজত্ব করেন। এই চারি শতাব্দী চীন জাতিতে এমন আশ্চর্য্যভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যে তাহার এখনও স্থান পুস্তক বলিয়া পরিচিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। এই বংশের সম্রাটগণ সকলেই নিজেরা সাহিত্যিক ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। নানাপ্রকার ললিতকলা এই বংশের রাজত্বকালে সমৃদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধধর্মও এইসময়ে চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চীন সাহিত্য হইতে আনন্দবাদ নিকরাসিত হয়।

তৃতীয় পৃষ্ঠাকে বংশকল্পের মস্তুরা নামক কবিসংঘ চীনের সাহিত্য-জগতে প্রমিষ্ট লাভ করেন। এই বংশকল্পের বিশেষত্ব এই ছিল, যে, উহার একাধারে সাহিত্যিক, কবি, গায়ক ও দার্শনিক ছিলেন।

তুফু, লীপো ও পোচুই এই তিন জনই অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তুফু ও লীপোর ভাষ্যে রাজকাব্য চিত্রাঙ্কন ধারণা করা লেগা ছিল না। সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে উহার অবহেলা করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যও উহারদিগের কাছে বহুমূল্য দেন নাই।

তুফু বহুবর্ষ ধরিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে সাতাইশ বৎসর বয়সে রাজধানীর অতিথি করেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজসভার উচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু উহার আগে এই কাজ কোন সাজা বিত্তে পারিল না, স্বেচ্ছাবিনতনর অপরাধে কোন এক প্রদেশের শাসনকর্তারূপে উহার নির্বাসন-দণ্ড হইল। তুফু শাসনকর্তারূপে অতিথিত হইবার সময় হঠাৎ রাজসভার সকল চিত্র ও পদক অক্ষ হইতে

খুলিয়া ও কোন বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিস্মিত সভাসদগণের সম্মুখে রাজসভা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। এইবার উহার বাহিরের জীবন আরম্ভ হইল। দেশে-দেশে নগরে-নগরে আশ্রয়গোপন করিয়া বেড়াইয়া, কবিতা শুনাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া, সাহিত্য প্রেমিক সঙ্ঘের ব্যক্তগণের আতিথ্য গ্রহণকারী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় সম্রাটের প্রদেশের সেনাধক্ষ ও শাসনকর্তা উচ্চ কে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং উহারই আশ্রয়ভিষ্যে তুফুকে প্রত্ন-স্ব-বিহাগে একটি উচ্চ রাজপদ দেওয়া হইল। ছয় বৎসর কাব্য কার্যের পর একদিন সেই প্রদেশ নিজস্বাভিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং বাধ্য হইয়া তুফুকে আবার গৃহত্যাগী হইতে হইল।

লীপো অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন। রাজা সিংহাচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্বেই উহার বয়স সমস্ত চীনদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। উহাকে পাঠবার জন্য সম্রাট-সমাজে একপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। সিংহাচার্য্যের আশ্রয়ে আসিয়া উহার আদর ও যত্নের সীমা রহিল না।

অবশেষে লীপোকে রাজাতিথ্য ভাগ করিয়া বনবাসে বাঠিতে হইল। লীপো এতবার মুগ্ধ হইলেন। মুগ্ধকণ্ঠ বিহঙ্গমের ভায় এইবার তিনি দেশে-দেশে নগরীতে-নগরীতে আশ্রয় ভিক্ষা গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে তনুশূন্যের বিজ্ঞানকে লিখি হইয়া পড়ার লীপোর কারণও হইল। কিন্তু কারাগৃহের আচীরমালা উহার বশোভাতিকে স্থান করিতে পারিল না।

পোচুই যখন চন্দ্রগ্রহণ কবেন, তখন সিংহাচার্য্যের গৌরবময় বৃগু চলিয়া গিয়াছে। অসাধারণবুদ্ধিমত্তার সপ্তদশবর্ষীয় বৃগু পোচুই সমগ্র চীন সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজকাব্য গ্রহণ করেন এবং প্রতিভা-বলে উচ্চ চরিতে উচ্চতর পদে আরোহণ করেন। তুফু ও লীপোর সঙ্গে উহার এক বিষয়ে অভেদ ছিল; তুফু ও লীপো রাজকাব্য কখন জীবনের সঙ্গে এক করিয়া লইতে পারেন নাই। পোচুই উহার জীবনে উচ্চ রাজকাব্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উহার সমস্ত কাব্যতা রাজকাব্যের অবসর-সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

তিনি জাতিতে এক পরিবার মনে করিতেন এবং সম্রাটকে সেই জাতির পরিবারের পিতৃশ্রমণীয় পণ্য করিতেন। উচ্চবিশেষজ্ঞের সহিত তিনি “রোমান”কে চীনের সাহিত্যে প্রথম অবতরণ করেন।

(নব্যভারত, ভাস্ক-আশ্বিন, ১৩৩২) শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

জাতি-সংগঠনে সমবায়ের স্থান

বর্তমান জাতীয় অবস্থার সহিত নানা প্রকার জড়িত আছে, বিশেষণ করিয়া দেখিলে অর্থনৈতিক সমস্যাটাই একটা বৃহৎ প্রকার প্রতীত হয়। অপরের স্বার্থস্কৃত আধিক শোষণ বা exploitation দ্বারা ভারতের জনগণ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত, এই দারিদ্র্য নৈতিক ও সামাজিক হ্রস্বকারণ কারণ। এইজন্য ভারতের জনবৃদ্ধ তাহার উচ্চ গুণগুলি হারাইয়া স্বাধীন জাতিসমূহের সহিত এক পংক্তিতে স্থান পাইবার আশা হইয়াছে।

বর্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের আধিক উন্নতি সাধনই আমাদের আশু কর্তব্য। তাহার দারিদ্র্য দূরীকৃত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক জীবন সমুন্নত হইবে না। বাহারা দৈনন্দিন ও অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত নহে, বাহারা নিজেদের দক্ষি-দামন্য সংক্ষেপে সচেতন, তাহারাই

জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিবার পক্ষে উপযুক্ত; জাতীয় মুক্তির স্বত্বস্বরূপ হওয়া তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর।

সমাজের কর্তৃকম ব্যক্তিদের প্রাসাচ্ছাদনের জন্ত জীবিকাজীবনের নুতন পথ আবিষ্কার ও নুতন নুতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সঙ্গে পরীচ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার শিক্ষিতদের ব্যবসায়ের সৃষ্টি (petty-bourgeois mentality) জ্ঞাপন করিতে হইবে; কারিকর্মের প্রতি সম্মান শিক্ষা করিতে হইবে; আইনের ও চিকিৎসার ব্যবসায় ছাড়াও যে সম্মানজনক ব্যবসা আছে, ইহা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে।

আর্থিক বিনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ভারতের শ্রমিকগণ ও দরিদ্র মধ্যবিত্তগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি (Co-operation) অবলম্বন করিতে পারেন। এই বিষয়ে অল্প দেশের দৃষ্টান্ত তাহাদের প্রেরণীয়। সকল সত্য মেনেই গণবৃত্ত জনবৃত্ত “সমবায়” দ্বারা বখানস্বত্ব অস্বাভাবিক শোষণের পথ রোধ করিয়া আপনাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য (mutual aid) অর্থদ্বারা সৃষ্ট কর্তের মূল্যের অতিরিক্ত লাভ (surplus value of the capital) শ্রমিকদের হস্তে রাখাকে ‘সমবায়’ বলে।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য—স্বচ্ছন্দপ্রণোদিত এমন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বাহাতে সাম্যসম্মত কার্যপ্রণালী ও পরোপার্জননের উপায়দ্বারা সত্যেরা নিজেদের ও সমাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী অল্পসকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। অল্পপ্রকার কারুগারে মূলধনের উপরে যে লাভ হয় অপরীতা তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু সমবায় সমিতিতে সত্যেরা কেবলমাত্র কতকগুলি সুবিধা পাইয়া থাকে। এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে কর্তৃকর্মচারী (entrepreneur) মালিক ও পরিচালকেরা আবার খরিদার হয়। সমবায় সমিতি কেবলমাত্র নিজের সত্যদের উপকারার্থ নিযুক্ত থাকে, এই বিষয়ে অল্পসকল মহাজনী (capitalistic) কারুবার হইতে এই পদ্ধতির প্রভেদ আছে। ইহার অর্থনৈতিক সুবিধা এই যে উৎপাদন (production) ও বন্টন (distribution) কালে মধ্যবর্তী কারুবারীদের (middle men) বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ কারুবারের মাল মশ হাতের ভিতর দিয়া খরিদারের হাতে পৌঁছায় না, এইজন্য মাল অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়। সত্যেরা বাহিরের যোকান অপেক্ষা সমিতির যোকানে সস্তার দ্রব্য পাইয়া থাকে। সমবায় আর্থিক দিকের মত একটা সামাজিক দিক বিদ্যমান। ইহা কিয়ৎ-পর্যাপ্তে কতকগুলি সামাজিক সমস্যাগুলির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার ও ক্রমবিকাশদ্বারা বিশুদ্ধ জাতীয় অর্থনীতিক পরিবর্তন করিয়া উন্নতপ্রকার উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রবর্তনই সমবায় প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এই পদ্ধতিকে প্রমীর্ণ ধারণা, ব্যবসায় উদ্যোগী ও মধ্যবর্তী লোকদের লাভ, মূলধনের উপর সুদ প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, এবং বাহাতে প্রত্যেক শ্রমিক তাহার কারিকর্মের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন পূর্ণ মূল্য পায় এবং জাতির দ্বারা উৎপাদনের উৎপাদন (production of the nation) কাটুতি বা প্রয়োজনের (consumption) সঙ্গে সমানীভূত (balanced) হয় সেইরূপ সুকৃত্ত (rational) নিয়ম প্রচলিত হইবে। এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে উন্নত করা আবশ্যিক; উচ্চ জাতীয় প্রত্যেককে আহার্য উৎপাদনের, বর্তমানকালের স্বত্বপাতি, কর্তের হান, মাল উন্নতির উপকরণ (raw stuff) সমবায়-সমিতিতে সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রদানদ্বারা জোগাইতে হইবে। এইরূপে পরস্পর সহযোগিতাসাপেক্ষ সমবায় সমিতি দ্বারা দরিদ্রগণ আপনাদের আর্থিক

ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইবে। এই ব্যাপারের সামাজিক দিকটি প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহযোগিতা একত্র মিলিত হইবে (অর্থাৎ co-operate করিবে)। এবং তদ্বারা পরস্পরকে চিনিবে, জানিবে, এবং পরস্পরের প্রতি প্রত্যাশা হইবে। ইহাতে ভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও বিবেচন দূর হইয়া সাম্য ও সন্তোষ স্থাপিত হইবে। ইহার দ্বারা যে শিক্ষালাভ হইবে তাহার মূল্য অনেক। কর্তব্য-জ্ঞান, লাভের (dividend) প্রতি নিস্পৃহতা, ভবিষ্যতের জন্ত সংস্থানের (reserve fund) অত্যাস ইত্যাদি সমবায়ের কার্য-প্রণালীর ভিতর দিয়া শিক্ষা করা যাইবে। সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যে মিলন ও প্রচেষ্টা তাহা দ্বারা স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। আজকাল ব্যবসায়ের লাভের জন্ত যে একটা অদমনীয় অসীম লোভ দেখা যায় তাহা প্রশমিত হইয়া তৎপরিবর্তে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও উৎপাদন মূল্যতা অবস্থিত হইবে। সমবায়ের উদ্দেশ্য সমবেত বহুজননের সেবা।

(নব্যভারত, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কাছোজ ও চম্পা

ভারতীয় প্রাচীন বণিকগণ যে কেবলমাত্র এসিয়ার পশ্চিমভাগে মিশর দেশে এবং ইরোরেপে বাণিজ্য করিতে বাইতেন, তাহা নহে, তাহারা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, মালয়-দ্বীপ, ববদ্বীপ, বালী-দ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (Borneo), শ্রামদেশ, কেম্বোদিয়া বা কাছোজদেশ এবং চীনদেশের উপকূলসমূহেও বাণিজ্য করিতে বাইতেন এবং যে যে স্থানে বাণিজ্যের সুবিধা হইত, সেই-সেই স্থানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি বাস্তুকি-প্রণীত রামায়ণে ববদ্বীপ, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বীপের উল্লেখ আছে। সুবর্ণ-দ্বীপকে রামায়ণে সম্ভবতঃ “সুবর্ণ” দ্বীপ বলা হইয়াছে। “সুবর্ণ” দ্বীপকে আধুনিক বোর্নিওর সহিত অতিশয় মনে করা বাইতে পারে, এবং “শিলির” নামক পর্বত সম্ভবতঃ আধুনিক শিলিবিসু (Celebes) দ্বীপ কিংবা কোনও উচ্চ পর্বতের নাম হইতে পারে।

কাছোজের কথা বলা বাউক। ইরোরা ভাষায় এই দেশকে কেম্বোদিয়া (Cambodia) বলে। কিন্তু ক্রমসীগণ, (বর্তমান সময়ে এই দেশ তাহাদের অধিকৃত) ইহাকে কাছোজ (Cambodge) বলেন। স্থানীয় খেমর (Khmers) ইহাকে কাছোজ-নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। রামায়ণে “কাছোজ”-নামে এক দেশের উল্লেখ দেখা যায়। সেই দেশে উৎকৃষ্ট অথ উৎপন্ন হইত। কথা :—

কাছোজবিষয়ে তাত্ত্বিকৈক হরোত্তমৈঃ।

বনায়ুর্জৈর্নদ্যৈকৈক পূর্ণা হরিহরোত্তমৈঃ।

(আদি, ৭, ২৩)

অর্থাৎ “অবোধাপুরী কাছোজ ও তাম্বোদেশজাত উৎকৃষ্ট অথসমূহে এবং বনায়ুদেশজাত ও সিঙ্ঘনদের তীরবর্তী দেশজাত উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য উৎকৃষ্ট হরসমূহে পূর্ণ থাকিত।” এই কাছোজ দেশ পাক্ষার দেশের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সিঙ্ঘু ও বাহ্মাকদেশের উল্লেখ বর্ণনে মনে হয়, রামায়ণের কাছোজ আধুনিক কাম্বোদিয়ার সহিত অতিশয়, কিন্তু ইহাও মনে হয় যে, তাহা শ্রামদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত কাছোজ দেশও হইতে পারে। কেননা, এই দেশের অথ, আকারে কিছু ছোট হইলেও দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব নবম বা দশম শতাব্দীতে কবু নামক জনৈক হিন্দুরাজ, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গমন করিয়া কাছোজে



“তাহারে নাচাত প্রিয়া
করতালি নিয়া দিচা।”

—সত্যেন্দ্রনাথ।

চিত্রকর শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বিশি

অবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া এই দেশে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এবং “কছু” হইতেই কছু বা কাছোজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও উদ্দেশ্যের খেঁচপণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। রাজ্যের উল্লিখিত কাছোজ কেছোদিয়া না হইতেও পারে এবং সম্ভবতঃ নহে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মের সমুদ্রযাত্রা করিয়া “ভেড়ার বদলে ঘোড়াও” আনিভেন। সে বাহা হউক, কাছোজের প্রধান নগরের নাম “আছোর”; কিন্তু ইহার অপর-একটি নাম “হন্দপথবুরী” অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থপুরী। কছু ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গিয়া সে-দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি এই নূতন উপনিবেশের রাজধানীর নাম মাতৃভূমির এসিদ্ধ প্রাচীন নগরীর নামানুসারেই রাখিয়া-ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইবে না।

এসিয়ার মানচিত্রে উল্লেখ্যকৃত করিলে দেখিতে পাটবেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ; তাহার পূর্বদক্ষিণ দিকে স্ত্রামদেশ; এবং এই স্ত্রামদেশের পূর্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রতটে কাছোজ দেশ অবস্থিত। মেকঙ্গ-নামক নদী এই দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে। এই দেশের চতুঃসীমা এইরূপঃ—উত্তরে স্ত্রামদেশ ও লেয়সু; পূর্বে আনাম দেশ; দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণদিকে কোচিন্-চায়না; দক্ষিণ পশ্চিমে স্ত্রাম-উপসাগর এবং পশ্চিমে স্ত্রামদেশ। এই দেশের পরিমাণ ৬৫০০০ বর্গ মাইল এবং বর্তমান সময়ে ইহার অধিবাসিগণের সংখ্যা ১৫ লক্ষ; তন্মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ লোক কাছোজ-দেশীয়, এবং অবশিষ্ট লোক চীন, আনাম, চম্পা ও মালয়বাসী এবং আদিম অধিবাসী।

কাছোজের প্রধান নৈসর্গিক দৃশ্য একটি বৃহৎ হ্রদ। ইহার নাম তৌলে সাপ (Toule-Sap)। ইহা ৬৮ মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ মাইল চওড়া।

খেঁচর জাতি স্থানীয় অধিবাসী এবং আর্ধ্য ও চীনজাতির সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। ইহারা এখন বৌদ্ধধর্ম মানিয়া চলে। কিন্তু কাছোজের রাজসভার ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই আধার আছে। হিন্দুগণের জ্ঞান ইহাদের জাতি-বিভাগ আছে। রাজ্যের উচ্চতম পদম পুরুষ পর্যন্ত ব্রাহ্মবংশ (Brah-vansa) এবং পদম পুরুষের উচ্চতম ব্যক্তিবর্গ ব্রাহ্মণ (Brah-van) নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-বংশের ব্যক্তিবর্গের নাম বকৌ (Bakou)। সম্ভবতঃ ইহা তিব্বু শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা রাজকর দেয় না, এবং বাখাতামূলক সকল-প্রকার কাষা চইতে বিমুক্ত। এই দেশের রাজতাবা, রাজলিপি ও ধর্মসম্বন্ধীয় বাক্যসমূহ আর্ধ্য (সংস্কৃত) ভাষা ও লিপি হইতে সমুৎপন্ন। পালিতাবার সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রতর্নীর রাজত্বকালে কাছোজের সত্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। ১০০ খৃষ্টাব্দে রাজা বনোবর্নার রাজত্বকালে চমৎকার সৌধাবলী সমন্বিত আছোর-খোম নামক রাজধানীর নির্মাণ-কাষা শেষ হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। মন্দিরসমূহের মধ্যে ব্রহ্মার মন্দিরই প্রকাণ্ড, যেট ও চমৎকার-কারকাষা-সমন্বিত। মন্দিরটি প্রস্তরনির্মিত ও পকাশি চূড়ার দ্বারা শোভিত। মধ্যের চূড়াটি সর্বোচ্চ ও প্রকাণ্ড। প্রত্যেক

চূড়ার চারি পার্শ্বেই প্রস্তরের উপর গোদিত ব্রহ্মার স্তম্ভসমূহ স্থাপনরব আছে।

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পূর্বোক্ত নদীতটে “আছোর-বাট”-নামক প্রকাণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃশ্যমান আছে।

মন্দির ও প্রাসাদের পাশ্বে প্রস্তরের উপর লতাগাতা ফুলকল এবং পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক ঘটনাসমূহের বৃত্তান্ত এরূপ স্মরণভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিশ্বরে অভিভূত হইতে হয় এবং স্থাপত্যশিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

চম্পাদেশ কাছোজের দক্ষিণপূর্বভাগে আধুনিক কোচিন্-চায়না ও আনাম-দেশ ব্যাপিয়া সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। ১৬৮ খৃষ্টাব্দে দিনহ-বো-লানহ (Dinh-Bo-Lanh) আনামের কিয়দংশ অধিকার করিয়া স্বীয় নামে একটি নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। চম্পারাজ্য এক সময়ে কাছোজ রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উত্তর রাজ্যের মধ্যে বহু বুদ্ধবিগ্রহও চলিয়াছিল। চম্পার অধিকাংশ মন্দিরই শিব মন্দির, এখনও অর্ধা-সম্বলিত শিবলিঙ্গসমূহ বিদ্যমান আছে। মন্দিরপাশ্বে ও তোরণের উপর দেবদেবীর যে-সকল মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের শিল্পসৌন্দর্য্যও চমৎকার। এইসকল দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে দশভুজা ভগবতী দুর্গা দেবীর এবং কাষ্ঠিকগণেশেরও মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাছোজ নামের প্রকাণ্ড প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়া মনে হয়, কাছোজবাসীরা প্রধানতঃ নাগোপাসক ছিলেন, আর চম্পাবাসীরা শৈব ও শক্তি ছিলেন। এই বিভিন্ন প্রকাণ্ড ধর্মবিশ্বাসই বুদ্ধের মূল কারণ হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে শৈব চাঁদসদাগরের সহিত মনসা দেবীর বিবাদের কাহিনীতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য মুখরিত। এই বিবাদে সাত-সাতটি পুত্র কারাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মনসার পূজা করেন নাই। এই চাঁদ সদাগরের বাটী চম্পাই-নগরে ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে—

“চাঁদবেশে সদাগর
চম্পাই নগরে ঘর।”

এই চম্পাই নগর কোথায়? বঙ্গদেশের নানাহানে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। কেহ বলেন, ভাগলপুরের নিকট চম্পাপুরীই চাঁদবেশের চম্পাই নগর; কেহ-কেহ বর্তমান মানকরের নিকট কস্বা গ্রামে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন;—এইখানে এখনও চাঁদ-সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছে, এবং প্রতিবৎসর মাকরা সপ্তমী তিথিতে চাঁদসদাগরের নামে মেলা বসিয়া থাকে, এবং সেই মেলায় বহু গঙ্গাগণিক নরনারী শিবলিঙ্গ ধর্মন ও পূজা করিতে আসেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বোক্ত এবং আনামদেশে কোনও-কোনও স্থানে চম্পাই-নগরীর অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। আমায় অনুমান হয় যে, বাঙ্গালী গঙ্গাবিক্রমণ বাঙ্গালা দেশ হইতে সূদূর কোচিন্-চায়নাতে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই স্থানে অঙ্গদেশ বা বঙ্গদেশের চম্পা-নগরীর নামানুসারে চম্পা নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন, এবং তাহাই চম্পা-রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

(গঙ্গাবিক্রম, কাষ্ঠিক ১৩৩২)

শ্রী অবিলাশচন্দ্র দাস

“সোক্রাটীস”।

(সমালোচনা)

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

এই গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় সোক্রাটীসের জীবনচরিত; দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে ‘সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যু’ এবং তৃতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ‘সোক্রাটীসের উপদেশ’। প্রথম ভাগে ১২টি অধ্যায়। বিষয় এই :—(১) সোক্রাটীসের আবির্ভাব-কাল ও পারিবারিক অণুভা, (২) সংসারজীবন, (৩) জীবনব্রত (৪) সফিস্টিকাল, (৫) শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সংস্কার, (৬) সোক্রাটীসের কয়েকটি মত, (৭) সোক্রাটীসের পূর্ববর্তী দার্শনিক-গণ, (৮) সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ, (৯) চরিত্র, (১০) সোক্রাটীস ও বুদ্ধ, (১১) সোক্রাটীস ও আর্স্টিক্যানোস এবং (১২) বিচার ও মৃত্যু। এই ১২টি অধ্যায়ের বহু বিভাগ ও উপবিভাগ। ইহাদিগের মোট সংখ্যা ২১৪।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে চারিখানা গ্রন্থ পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছে। পুস্তকগুলি এই—(১) এমথুক্সান, (২) সোক্রাটীসের আত্ম-সমর্পণ, (৩) ক্রিটোন এবং (৪) কাইডোন। প্রত্যেক গ্রন্থের অনুবাদের পূর্বে অনুবাদক এক-একটি মূলবাক্য দিচ্ছিলেন এবং বাক্যগুলি সমুদায় অধ্যায়ের ভাবার্থও দিচ্ছিলেন। টীকাও আছে বহু।

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে সোক্রাটীসের উপদেশ; এই অংশ জেনকোন-প্রণীত ‘সোক্রাটীসের জীবন-শ্রুতি’ এবং ‘পানপর্ক’ হইতে সংকলিত।

ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টে অধ্যাতব্য গ্রন্থাবলি, এবং চারিটি নির্ধারিত গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম; এবং বিষয়নিচয় (২১ পৃঃ), দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের সূচীপত্র ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী। চিত্র দুইখানি—একখানা সোক্রাটীসের, অপরটি তাঁহার বিবপানের দৃশ্য।

গ্রন্থের সূচীপত্র পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন কি বিপুল ব্যাপার। সোক্রাটীসের জীবন-চরিত্র এবং উপদেশ ত্রিভুত হইয়াছেই, ইহা ভাড়া আছে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, শিষ্যগণের বিবরণ, স্টেটোর দর্শন, স্টেটোর চারিখানা পুস্তকের অনুবাদ, বুদ্ধের সহিত সোক্রাটীসের তুলনা—আরও কত বিষয়।

গ্রন্থকার নব বৎসর কাল পরিভ্রমণ করিয়া ‘সোক্রাটীস’ গ্রন্থ (দুই খণ্ড) প্রণয়ন করিয়াছেন। গুরুতর পরিভ্রমণে তিনি পুনঃপুনঃ অগ্রন্থ হইয়াছিলেন, তৎসং কাব্য হইতে বিরত হইয়া নাই। বাহা হউক বিধাতার কৃপায় পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বঙ্গ-ভাষায় এপ্রকার পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এ পর্যন্ত কেহ গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়া গ্রীকসাহিত্যের রত্নরাজি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাষ্যে অর্পণ করেন নাই। একাধিক রত্ননীবাবুই প্রথম ব্রতী। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিবে।

ধর্ম নীতি চরিত্রাদি বিষয়ে ভগবতের যদি প্রধান দুইজন মহাপুরুষের নাম করিতে হয়, আমরা দ্বিধাশূন্য হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিব—একজন

* সোক্রাটীস, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রী রজনীকান্ত গুহ, এম-এ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কঙ্ক প্রকাশিত। পৃঃ ৮৩১; মূল্য ১০ টাকা।

পোতম বুদ্ধ, আর একজন সোক্রাটীস। এই গ্রন্থে উক্ত মহাপুরুষেরই দর্শন ও সঙ্গলাভ হইবে। যেমন ইহাদিগের উপদেশ, তেমনি ইহাদিগের চরিত্র। বিষয়গৌরবে গ্রন্থও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

বে চারিখানা গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকখানাই অবুল্য রত্ন। পুস্তকসমূহ বঙ্গভাষায় এই প্রথম অনূদিত হইল। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই চারিখানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থকার বহু স্থল হইতে সোক্রাটীসের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন, বোদ্ধশাস্ত্র এবং হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রোকাহি সংগ্রহ করিয়া তুলনার সমালোচনা করিয়াছেন।

সমুদয়ই উপদেশ হইয়াছে। আশা করি এগ্রন্থের সমাদর হইবে।

সর্ববিষয়ে সকলের সহিত একমত হওয়া সম্ভব নহে; গ্রন্থকারের সহিতও আমরা সর্ববিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। প্রধান প্রধান যে যে বিষয়ে আমাদের মতভেদ বা মতব্য আছে, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। গ্রীক উচ্চারণ

গ্রীকের ইংরাজী উচ্চারণই আমরা এপর্যন্ত বাংলার গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, অথচ ইংরাজী ভাষায় ইহার উচ্চারণ বহু বিকৃত হইয়াছে, ইউরোপের অপর কোনও দেশে এপ্রকার হইয়াছে কি না সন্দেহ। গ্রন্থকার আর্থাৎগ্রীকে গ্রীকের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। ইংরাজী উচ্চারণের তুলনার অধিকাংশ উচ্চারণই নূতন। আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, এত সমুদায় উচ্চারণ কতটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের সাহায্যে আমরা উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিব। গ্রন্থকারের নামের টিক পরেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইল। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধে এই চিহ্ন ব্যবহার করিব।

১। Jannaris (জান্নারিস) কৃত An Historical Greek Grammar (Macmillan, মূল্য 31-6.)

২। Blass (ব্লাস) কৃত Pronunciation of Ancient Greek (Cambridge U. Press. 10-6.)

৩। Arnold এবং Canway (আর্নল্ড) কৃত The Restored Pronunciation of Greek and Latin (C. U. Press. 1-3.)

৪। Goodwin (গুডউইন) কৃত Elementary Greek Grammar (Macmillan. 7s.)

৫। Hadley এবং Allen (হ্যাডলি) কৃত Greek Grammar (Macmillan. 6s.)

৬। Curtius (কুর্টিয়াস) কৃত A Grammar of Greek Language (Nurury, 7-6)

৭। Thompston (টম্পসন) কৃত Greek Grammar for Schools and Colleges (Murray. 7-6)

৮। Geddes (গেড্ডেস) কৃত Compendious Greek Grammar (Oliver and Boyd)

১। Robertson (রবার্ট) কৃত A Grammar of the New Testament Greek (Hodder and Stoughton. 42s)

১০। J. H. Moulton (মৌল্টন) কৃত Grammar of the N. T. Greek, Vol. i (10s) Vol. ii Part I (7s) T and T. Clark.

১১। Max-muller (ম্যাক্স মুলার) কৃত (The Science of Language (Longmans. 10s).

আন্দোলন

ইউরোপে একসময়ে এই উচ্চারণ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। যথাক্রমে পেরগামে Bizantiumএব (বিজান্টিয়াম্, বাইজ্যান্টিয়াম্) গ্রীক পণ্ডিতগণ ইটালীতে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য পুনঃ প্রবর্তন করেন। ঊহানিপের সময় গ্রীকগণা যেভাবে উচ্চারিত হইত, তাহার প্রাচীন গ্রীকভাষাও সেইভাবে উচ্চারণ করিতেন। ক্রমে গ্রীক সাহিত্য অপর্যায় দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল এবং সেই সমুদায় দেশেও প্রাচীন গ্রীক নবান গ্রীকের স্থায় উচ্চারিত হইতে লাগিল হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এবিধে কোন-প্রকার প্রয় উৎপাদিত হয় নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে এবিধে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। এরাস্মাস্ (Erasmus) এবং তাহার অনুবর্তীগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণ নবীন গ্রীক উচ্চারণ হইতে পৃথক্। পণ্ডিতগণ চুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দলের নেতা ‘এরাস্মাস্’, অপর দলের নেতা রয়খলিন্ (Rouchlin). প্রথম দলকে অনেক ‘এটা’-বাদী (Itacists) এবং দ্বিতীয় দলকে ‘ইটা’-বাদী (Itacists) বলিত। এইপ্রকার বলিবার কারণ এই—গ্রীক বর্ণমালার সপ্তম অক্ষরকে ইংরাজীতে লেখা হয় ϵ । এরাস্মাসের দল বলিতেন ইহার নাম ‘এটা’; এইসকল এগুলোর নাম হইয়াছিল ‘এটা’-বাদী। অপর দলের মতে এ অক্ষরের নাম ইটা; এইসকল এগুলোর নাম ‘ইটা’-বাদী। আরও কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ লইয়াও মতভেদ ছিল, কিন্তু প্রধান মতভেদ ঐ সপ্তম বর্ণের উচ্চারণ লইয়া। সমগ্র ইউরোপে এই আন্দোলন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৫২ সালে কে.সি.সি. ইন্সটিটিউটের চ্যান্সেলার এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে যদি কেহ গ্রীক ‘ai’ কে ‘u’-রূপে উচ্চারণ না করে, যদি ‘oi’ এবং ‘ou’ কে ‘i’ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করে, সে সেনেট হইতে বিতাড়িত হইবে, ডিগ্রী গ্রহণে বঞ্চিত হইবে, ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং বালকগণকে গৃহে তাড়না করা হইবে। কিন্তু এইপ্রকার অভ্যাসে স্থায়ী ফল কমে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতেই নব্য মত ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (“The Erasmusian pronunciation prevailed throughout the West” পৃঃ ৫)। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাহাণ প্রাচীন মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সকলকাম হন নাই। Blass বলে—“All our great grammarians have entered the arena either entirely or essentially on the side of the Erasmusian pronunciation (পৃঃ ৫)। অর্থাৎ ‘ইউরোপে প্রাচীনতা বৈরাগ্যরূপে সকলেই একেধারে প্রবেশ করিয়াছেন—সকলেই এরাস্মাসের মতে, হয় সম্পূর্ণরূপে, না হয় মৌলিক বিধে সন্দেহ করিতেছেন। (স্মার, ২৫—২৬; স্মা, ২—৩; রবার্ট, ২৩০—২৩১ পৃষ্ঠা, অধ্যায়)।

উচ্চারণ

এখন দেখা যাক গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ কি। আমরা প্রথমে:

Jannaris এবং Blassএর পুস্তক পর্যালোচনা করিয়াই ইহার বিচার করিব। অপর্যায় বৈরাগ্যের নাম বখাফলে উল্লিখিত হইবে।

প্রথম ‘অক্ষর’

১। প্রথম বর্ণ ‘a’ (alpha, আল্ফা)। ইহার উচ্চারণ ‘আ’। এবিধে উচ্চারণ দলে মতভেদ নাই।

দ্বিতীয় নিয়ম

২। দ্বিতীয় বর্ণের নাম ও উচ্চারণ-বিধে মতভেদ আছে। ‘ইটা’-বাদীগণের মতে ইহার নাম ‘বীটা’ এবং উচ্চারণ ‘অক্ষর ব’। ‘এটা’-বাদীগণের মতে ইহার নাম ‘বেটা’ এবং উচ্চারণ ‘বর্ণীয় ব’। সংক্ষেপে উচ্চারণ ‘ব’ এর উচ্চারণে পার্থক্য আছে: বাংলায় কোন পার্থক্য নাই। তবে ছেলেবেলা শিখিয়াছিলাম বর্ণীয় ‘ব’—পেট-কাটা ‘ব’।

তৃতীয় নিয়ম

৩। তৃতীয় বর্ণকে সাধারণতঃ গাম্মা γ বলা হয়। ‘এটা’-বাদীর মতে ইহার উচ্চারণ ‘গ’; কয়েকটি ভিজ্যান্টিনীয় বর্ণ (ক, খ, গ) পরে থাকিলে, ইহার উচ্চারণ হয় অনুনাসিক বর্ণের স্থায়।

‘ইটা’-বাদীর উচ্চারণ ‘ঘ’; পুরোস্ত ভিজ্যান্টিনীয় বর্ণমালার পরে থাকিলে উচ্চারণ হয় অনুনাসিক বর্ণের স্থায়। ‘e’ এবং ‘i’ পরে থাকিলে গাম্মার উচ্চারণ হয় ‘y’ এর স্থায় [স্মার, পৃঃ ৫২]

চতুর্থ নিয়ম

৪। চতুর্থ বর্ণের প্রচলিত নাম ডেল্টা (delta)। ‘এটা’-বাদীর উচ্চারণ ‘ড’; ‘ইটা’-বাদীর উচ্চারণ ‘ধ’ (স্মার, পৃঃ ৩৩, ৫২—৬০; স্মা, ১১)

পঞ্চম নিয়ম

৫। পঞ্চম বর্ণকে প্রাচীন কালে বলা হইত ‘e’; কিন্তু উক্তকালে নাম হইয়াছিল e-pilon; ‘psilon’ অংশের অর্থ simple অর্থাৎ অসংযুক্ত (স্মার, পৃঃ ২৩)। ইহার উচ্চারণ ‘এ’; কোন মতভেদ নাই।

ষষ্ঠ নিয়ম

৬। ষষ্ঠ বর্ণ ζ (জেটা, জীটা)। ‘ইটা’-বাদীর উচ্চারণ ‘জ’; ‘এটা’-বাদীর উচ্চারণ ‘ds’ (কিংবা ts)। বাংলায় ষ্টিক ‘z’ এর উচ্চারণ নাই; তবে অনেকটা ‘জ’ এর স্থায়।

সপ্তম নিয়ম

৭। সপ্তম বর্ণের নাম ও উচ্চারণ লইয়াই বিশেষ মতভেদ। এরাস্মাসের দল বলেন ইহার নাম ‘এটা’; অপর দলের মতে ইহার নাম ‘ইটা’।

‘এটা’-বাদী বলেন, “ভেড়া ডাকে ‘বে’”। বাস্তব কথায় এই ‘বে’ ডাকের উল্লেখ আছে। স্মার এবং স্মারারিস ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (স্মা, ২৭; স্মার, পৃঃ ৫০)। এই ‘বে’ শব্দ লেখা হয় গ্রীক দ্বিতীয় ও সপ্তম বর্ণের সহযোগে। ইংরেজীতে b + e; বাংলায় ব + এ। সুতরাং বলিতেই হইবে ইংরাজী ‘b’ এক গ্রীক সপ্তম বর্ণের উচ্চারণ ‘এ’। সুতরাং সপ্তম বর্ণের নাম ‘ইটা’ নহে; ইহার নাম ‘এটা’।

এবিধে আরও প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালে গ্রীকগণ হইতে অনেক শব্দ লাতিন ভাষাতে পৃষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহার কয়েকটি এই:— (ক) গ্রীক শব্দ $\epsilon\kappa\kappa\lambda\epsilon\iota\sigma\mu\delta\alpha$ (দ্বিতীয় $\epsilon = \epsilon\tau\alpha$); ইহার আধুনিক

গ্রীক উচ্চারণ *ekklisia* ('eta' এর উচ্চারণ i অর্থাৎ ই) লাতিনে গৃহীত *ecclesia* (*eta* হলে o অর্থাৎ এ)। এখানে বলা আবশ্যিক লাতিন 'c' এর উচ্চারণ 'ক' এবং 'e' এর উচ্চারণ 'এ'।

(খ) গ্রীক *ethikōs* (প্রথম বর্ণ *eta*) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ *ithikos* (*eta* এর উচ্চারণ 'ই') লাতিনে গৃহীত *ethice* (*eta* হলে e অর্থাৎ এ)।

(গ) গ্রীক *alphabētos* (তৃতীয় বর্ণ *eta*) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ *alphavitōs* (*eta*=ই) লাতিনে গৃহীত *alphabetum* (*eta*=এ)।

(ঘ) গ্রীক শব্দ *kēnsos* (দ্বিতীয় অক্ষর *eta*) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ *kinsos* (*eta*=ই) লাতিনে গৃহীত *census* (*eta*=এ)।

(ঙ) গ্রীক *Loukiētios* (ষষ্ঠ অক্ষর *eta*) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ *Lukritios* (*eta*=ই) লাতিনে গৃহীত *Lucretium* (*eta*=ইত্যাদি)।

এই সমুদায় বিচার করিলেও প্রমাণিত হয় যে আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণ হইতে পৃথক। প্রাচীনকালে 'eta' এর উচ্চারণ হইত 'এ'।

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই এই মত পোষণ করেন (ডব্লু., পৃ: XIV, হাড্., পৃ: ৪; কুর., পৃ: ৩; টম্., পৃ: ৪; পেড্., পৃ: ১; আর্., পৃ: ৩; মো, *vo ii* পৃ: ৪০; রয়, পৃ: ১১১)।

প্রকৃত ঘটনা এই—অতি প্রাচীন কালে গ্রীক বর্ণমালার 'eta' এবং 'omega' ছিল ঠা। সাধারণ 'e' এবং সাধারণ 'o' ই দীর্ঘ 'e' এবং দীর্ঘ 'o' এর কার্য করিত। ৪০৩ পূ: খ্রীষ্টাব্দে এয়ুয়েইডেস (ইউক্লিড) বিধিবদ্ধ করিয়া 'eta' এবং 'omega' কে গ্রীক বর্ণমালার গ্রহণ করেন। প্রথমে 'eta' এর উচ্চারণ ছিল 'এ'; কিন্তু ক্রমে-ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া ইহার উচ্চারণ হইয়াছিল 'ই'। রবার্টসন বলেন, খ্রীষ্টের পূর্বে প্রথম শতাব্দীতেই এই 'ই' উচ্চারণ প্রচলিত ছিল (পৃ: ২৩৮)।

Jannaris একজন ইটা-বাদী; তিনি বিবৃত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দীর্ঘ e (—এ) এর কার্য করিবার জন্য *eta* এর সৃষ্টি; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে *ei* বলিয়া ভুল করিত এবং ঐ সময়ে *ei* উচ্চারিত হইত *i* রূপে ("Eta was technically intended for 'long' e, but popularly mistaken for ei, which ei by this time was pronounced as i." (পৃ: ৪১)।

যখন *eta* এর উৎপত্তি, তখন পণ্ডিত-সমাজ যখন ইহাকে দীর্ঘ e অর্থাৎ দীর্ঘ 'এ' রূপে উচ্চারণ করিতেন, তখন বর্তমান যুগেও পণ্ডিত-গণকে সেইভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ *eta* = দীর্ঘ 'এ'।

অষ্টম নিয়ম

৮। অষ্টম বর্ণের প্রচলিত নাম খেটা বা থীটা।

'ইটা'-বাদী উচ্চারণ করেন 'থ'; *thin* শব্দের 'th' এর স্থান—'th' কে একটা বর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়।

'এটা' বাদীর উচ্চারণ *t+h* = ট+হ; দুইটি বর্ণই উচ্চারিত হয় যেমন 'কঠ' শব্দকে 'কট্‌হ' বলিলে 'ট্‌হ' এর যেমন উচ্চারণ হয়।

Thompson বলেন, "The aspirates 'thēta' 'phei' are usually pronounced as spirants, thēta as *th* in *thick*, 'phei' as *ph* in *Philip* or *f* in *fear*; 'chei' is pronounced like *ch* in *character*. But in Greek they were real aspirates and were pronounced: 'thēta' as *t-h* in *mast-head*, 'phei' as *p-h* in *up-hill* and 'choi' as *k-h* in *work-house*." (পৃ: ৩; পৃ: ৩, ৪ ইত্যাদি)।

ভাবার্থ এই—গ্রীক ভাবার পূর্বে *thēta*, *phei* এবং 'chei' এই তিনটি অক্ষরকে পূর্বে 'হ' যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা হইত, যেমন 'ট্‌হ', 'প্‌হ' 'ক্‌হ'। এখন 'হ' উচ্চারণ না করিয়া কেবল থ, ফ এবং খ রূপে উচ্চারণ করা হয়।

ম্যান্সুলারও এই কথাই বলেন :—

In Greek we find one set of aspirates *chi*, *thēta*, *phi*, which are surds and which in later Greek dwindle away into corresponding spirants (Vol. ii, পৃ: ২২১)।

Moulton (Vol. ii, পৃ: ৪৫), Hadly and Albu (পৃ: ৭), Arnold and Conway (পৃ: ৭) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও এই মত পোষণ করেন।

নবম নিয়ম

৯। নবম বর্ণের নাম 'ইয়োটা' (*iota*—এটা বাদীর মতে); ইয়োটা (*iota*—ইটা বাদীর মতে)। উচ্চারণ 'ই'; মতভেদ নাই।

১০ম—১৩শ

১০—১৩। *kappa* (ক), *lambda* (ল), *mu* (ম), *nu* (ন), এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে মতভেদ নাই।

চতুর্দশ নিয়ম

১৪। চতুর্দশ বর্ণ ইংরেজীতে *x* লেখা হয়। উচ্চারণ *k+s*; কোন মতভেদ নাই। ইহার অনুরূপ বাংলাতে কোন একটি বর্ণ নাই। 'ক' অক্ষরের সংস্কৃত উচ্চারণ *k* ব; বাংলা উচ্চারণ *kh*। *k+s* এবং *k+b* এক নহে সুতরাং 'ক' (অর্থাৎ *k+b* দ্বারা 'x' কে প্রকাশ করা যায় না। বাংলার লিখিতে হইলে *ks* (ক্স) ই লিখিতে হইবে।

পঞ্চদশ নিয়ম

১৫। পঞ্চদশ বর্ণ 'ও' গ্রীক বর্ণমালার দুইটি 'ও'; পঞ্চদশ বর্ণকে বলা হয় ছোট 'ও' (*o-mikron*) এবং চতুর্দশ বর্ণকে একটা 'ও'—ইহার নাম বড় 'ও' (*O-mega*)। ছোট 'ও' এর উচ্চারণ 'অ'—মতভেদ নাই।

১৬শ—১৯শ

১৬শ—১৯শ। *Pei* (প), *Rhō* (র), *Sigma* (স) এবং *Tau* (এই চারিটির উচ্চারণে মতভেদ নাই)।

বিংশ নিয়ম

২০। বিংশ অক্ষর 'ই'। ইহার নাম *u-psi-lon*; *psi-lon* অংশ বোপ করিবার কারণ-বিষয়ে *Liddell and Scott* তাঁহাদের গ্রীক অভিধানে এইপ্রকার লিখিয়াছেন—

"Called *u-psi-lon* because the original sound was broad like 'ou' and afterwards was thin like French 'u.'"

উচ্চারণ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। 'ইটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ই'। 'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'উ'; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন জার্মান *ü* এর স্থায়। হাড্‌লী বলেন, ইহার উচ্চারণ ইংরেজী 'oo' এবং 'ee' এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। জার্মানির 'ü' এর উচ্চারণ কিপ্রকার তাহা বর্ণনা করিবার

৩ ম্যাক্সমুলার গ্রহ-বিশেষ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত
করিয়াছেন—

While the tongue gets ready to pronounce ‘i’
the lips assume the position required for ‘u’ (Vol.ii
[: ১৩০) অর্থাৎ যখন জিহ্বা ‘ই’ উচ্চারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়,
যখন ওষ্ঠ ‘উ’ উচ্চারণ করিবার আকার ধারণ করে।

জান্নারিস (Jannaris) বলেন, পূর্বে ইহার উচ্চারণ ছিল u (উ)
৩১ন হইয়াছে ‘i’ (ই) পৃ: ৪৭ ।

একবিংশ নিয়ম

২১। একবিংশ বর্ণের নাম phei. ঐটা-বাদীর উচ্চারণ ‘ক’।
এটা-বাদীর উচ্চারণ প + হ; বাংলার শব্দ ‘কক’ শব্দকে ‘কক্’
রূপে উচ্চারণ করিলে ‘প্’ এর যেমন উচ্চারণ হয়।

Curtius বলেন, লাতিন ভাষার গ্রীক শব্দ লিপিতে হইলে ঐ বর্ণের
লিপি (=ক) না লিখিয়া ‘ph’ লেখা হয় (পৃ: ৪)।

অষ্টম নিয়মে এই বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে অপরূপ বৈয়াকরণের
মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ নিয়ম

২২। দ্বাবিংশ বর্ণের নাম chei। ঐটা-বাদীর উচ্চারণ বাংলা ‘খ’।
সংস্কৃতে ‘খ’ এবং অপরূপ বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ কি, সে-
বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। (ম্যাক্,
Vol ii, পৃ: ১৬০)

‘এটা-বাদীর উচ্চারণ ‘ক্ হ’—বাংলার ‘দেখ’ শব্দকে ‘দেক্ হ’ রূপে
উচ্চারণ করিলে ‘ক্ হ’ এর যেমন উচ্চারণ হয়।

ত্রয়োবিংশ নিয়ম

২৩। ত্রয়োবিংশ অক্ষর প্ সাই; উচ্চারণ ‘প্ সাই’—মত ভেদ নাই।

চতুর্বিংশ নিয়ম

২৪। গ্রীক বর্ণমালার শেষ বর্ণের নাম (O)-mega (বড় ‘O’)।
উচ্চারণে মতভেদ আছে। ঐটা-বাদীর উচ্চারণ ‘অ’; এটা-বাদীর উচ্চারণ
) দীর্ঘ ‘o’; জাভলির দৃষ্টান্ত prone এর ‘o’; শুডউইন এর দৃষ্টান্ত
note এর ‘o’। Arnold এবং Conway বলেন, এই ‘o’ coke এর
o’ অপেক্ষা ‘ore’ এর ‘o’ বর্ণের অধিকতর নিকটবর্তী। ইংরাজীতে
দীর্ঘ ‘o’ বর্ণের এইপ্রকার উচ্চারণ। কিন্তু ইউরোপের অপরূপ দেশে
দীর্ঘ ‘o’ এর উচ্চারণ কিছু বিভিন্ন; এই উচ্চারণ saw শব্দের ‘aw’ এর
উচ্চারণের স্থায় (ব্লাস, অসুবাধকের ভূমিকা, পৃ: VI)।

Thompson বলেন (O)-mega এর উচ্চারণ ‘ought’ শব্দের ‘ou’
এর উচ্চারণের স্থায় (পৃ: ৪, ৫)।

ইহাদিগের সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই অব্যক্তিক তাহা বলা যায় না।
ছোট ‘o’ এবং বড় ‘o’—একটাই, একটি দীর্ঘ। ছোট ‘o’ এর উচ্চারণ
‘অ’; বড় ‘o’ এর উচ্চারণ ইহারই দীর্ঘ হইবে। ‘অ’ কে দীর্ঘ করিলে
ও হয় না—হয় “অঅ”। দৃষ্টান্ত saw শব্দের aw, কিংবা ought
শব্দের ou.

যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে (O)-mega = দীর্ঘ ‘o’, তাহা হইলে
যদি এই দীর্ঘ ‘o’ ইংলণ্ডের দীর্ঘ ‘o’, না ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘ ‘o’?
এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার Blass এবং Jannaris এর পুস্তকে
হইবে।

কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ-বিবরণেও মতভেদ আছে।

২৫। ai = এ (ঐটা-বাদী) = আ + ই (এটা-বাদী)—যদি দুইটার
পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ)।

২৬। ei = ই (ঐটা-বাদী = এ + ই) এটা-বাদী Thompson
বলেন ইহার উচ্চারণ hail এর ai এর স্থায়। (পৃ: ৫)

Hadley and Allen বলেন, win এর ei এর স্থায়।
(পৃ: ৫)

Goodwin বলেন, “অনেক পণ্ডিত right এর ei এর স্থায় ইহার
উচ্চারণ করেন এবং এই মতের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে” পৃ: xv.

কিন্তু তিনি নিজে height এর ei এর স্থায় উচ্চারণ করেন।
এপ্রকার করিবার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি জার্মানী ও ইংলণ্ডের
প্রচলিত শব্দ পরিবর্তন করিতে চাহেন না (“simply to avoid
another change”, পৃ: xv)।

Curtius এর উচ্চারণ height এর ei এর স্থায়। (পৃ: ৪)।

২৭। oi = ই (ঐটা-বাদী) = অ + ই (এটা-বাদী) পূর্বেও পাঁচ
জন উচ্চারণ করেন—oil এর ‘oi’ কিংবা boy এর ‘oi’ এর স্থায়।

২৮। ui = ই (ঐটা-বাদী) = উ + ই (এটা-বাদী)।

Hadley and Allen, Goodwin, Arnold and Conway-
এরও মত ‘এটা-বাদী’র স্থায়।

Curtius এর দৃষ্টান্ত why (অর্থাৎ hwy) এর wy এর স্থায়।

২৯। au = আ + উ (এটা-বাদী) দৃষ্টান্ত house এবং ou (শুড, পৃ:
xiv); our এর ou (হ্যাড্, পৃ: ৫)।

Thompson উচ্চারণ করেন, note এর ‘o’ এর স্থায় (পৃ: ৫)।

ঐটা-বাদীর মতে ইহার উচ্চারণ av (আবি—অন্তঃস্থ ব) ; কিন্তু
ক, খ, ট, থ, প, ক, স পরে থাকিলে au এর উচ্চারণ হয় af (আফ্)।
এবিষয়ে Jannaris এর ভাষা এই—“The diphthongs au, eu
are now pronounced in N [Modern Greek] as av,
ev, modified to af, ef before hard consonants”
(পৃ: ৫৫)।

Moulton এর ভাষা এই—“The MGr. pronunciation is
av, ev (or af, ef, before breathed consonants) Vol.
ii, পৃ: ৪৩।

ত্রিংশ নিয়ম

৩০। ou = এ + উ (এটা-বাদী) কেহ কেহ উচ্চারণ করেন,
feud এর ‘ou’ এর স্থায় (শুড, XIV ; হ্যাড্, ৫)। Curtius এবং
Thompson এর দৃষ্টান্ত ‘new’ এর ‘ew’ (ক্ল, পৃ: ৪ ; চন্, ৫), তবে
Thompson ‘প্রায়’ nearly শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ঐটা-বাদী ‘au’ কে যে নিয়মানুসারে উচ্চারণ করেন ‘ou’ কে উচ্চারণ
করেন ঠিক সেই নিয়মানুসারে। সাধারণতঃ ইহার উচ্চারণ ov (এব,
অন্তঃস্থ ব) ; কিন্তু ক খ প্রকৃতি পরে থাকিলে উচ্চারণ হয় oi’ অর্থাৎ
‘এক্’ (উনত্রিশ নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

৩১। ou = উ। উত্তর দলে মতভেদ নাই।

Jannaris বলেন, ইহার উচ্চারণ শব্দ ‘u’ (=উ)—distinct
sound as ‘u’ (পৃ ২৬, ৪০, ৪৭)।

Goodwin এর দৃষ্টান্ত moon এর ‘oo’; Hadley and
Allen এর দৃষ্টান্ত youth এর ou.

Geddes বলেন—“The natural ‘n’ i.e. English ‘oo’ is
properly ‘ou’; bull = bous (পৃ: ২)।

Thompson এর মত বিভিন্ন—তিনি বলেন, ইহার উচ্চারণ ‘note’
এর ‘o’ এর স্থায় (পৃ: ৫)।

Plato বলেন ou=o, যেমন kalon=kalous; পার্থক্য কেবল ইন্দ্রদীর্ঘাধি স্বাক্ষর এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভৃতি করে (ক্রাইটলস্, ৪১৬, বি)।

আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ইটা-বাদীর মতে নিম্নলিখিত পাঁচটির উচ্চারণই 'ই' :-

'e', i, u, ei, oi, ui.

নিম্নলিখিত তিনটির উচ্চারণ "এ" :-

e, ai, ai. এবং নিম্নলিখিত দুইটির উচ্চারণই "অ" :- o (ছোট 'o'), o (বড় 'o')।

'এটা'-বাদীগণ বলেন, কাবা ও দর্শনে যখন গ্রীসদেশ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তখনও যে বহুস্বরের একপ্রকার উচ্চারণ হইত, এপ্রকার কল্পনা করা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। আরও একটি কথা—সংযুক্ত স্বর-সমূহের উচ্চারণও যদি অসংযুক্ত স্বরের জায়গাই হয়, তাহা হইলে সংযুক্ত স্বর সমূহের সার্থকতা কোথায়? বিনা প্রয়োজনে নতুন কিছু প্রবর্তিত হয় না। অসংযুক্ত স্বরবর্ণ দ্বারা সমূহ স্বর প্রকাশ করা বাইতনা, সেই জন্তই ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণের সংযোগ আবশ্যিক হইয়াছিল।

আমরা উত্তরদলের মত জানিলাম এবং খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ উচ্চারণ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এখন দেখা বাটিক আমাদের গ্রন্থকার কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

(১) Sokrates, গ্রীক। প্রথম স্বর, o-megha, শেষ স্বর, eta। সোক্রেটস্, গ্রন্থকারের উচ্চারণ; সক্রাটস্, ইটা-বাদীর। সোক্রেটস্, ইংলণ্ডের এটা-বাদীর। সাক্রাটস্, অপর এটা-বাদীর; (২৪, ৭ এর নিয়ম)।

(২) Xanthippē, গ্রীক। শেষ স্বর, eta।

খান্টিপ্পী, গ্রন্থকারের; খান্টিপ্পী, ইটা-বাদীর; খান্টি-হিপ্পে, এটা-বাদীর (১৪, ৮, ৭ এর নিয়ম)।

(৩) Parmenidēs, গ্রীক। শেষ স্বর eta। প্যার্মেনিডীস্, গ্রন্থকারের; প্যার্মেনিডীস্, ইটা-বাদীর; প্যার্মেনিডেস্, এটা-বাদীর, (৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৪) Euripides, গ্রীক শেষ স্বর eta। ইউরিপিডীস্, গ্রন্থকারের; ইউরিপিডীস্, ইটা-বাদীর; ইউরিপিডেস্, এটা-বাদীর (৩০, ৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৫) Thoukudides—গ্রীক। শেষ স্বর—eta. থোকুডিডীস্—গ্রন্থকার, ১ম খণ্ডে, থোকুডিডীস্—গ্রন্থকার, ২য় খণ্ডে; থুকুদিদীস্—ইটাবাদীর; টু হু কু ডিডেস্—এটা-বাদীর। (৮, ৩১, ৩০, ৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৬) Zēnōn—গ্রীক। প্রথম স্বর—eta, দ্বিতীয় স্বর—o-megha। জীনোন—গ্রন্থকারের; জীনন্—ইটাবাদীর; ডেসেনোন—ইংলণ্ডের এটাবাদীর; ডেসেনঅন্—অপর এটাবাদীর ('ড' হলে 'ট'ও উচ্চারিত হয়। (৬, ৭, ২৪ এর নিয়ম)।

(৭) Eukleidēs—গ্রীক শেষ স্বর—eta। এয়ুক্লাইডীস্—গ্রন্থকারের; এক্ক্লিডীস্—ইটাবাদীর; এয়ুক্লাইডেস্—এটাবাদীর। (৩০, ২৬, ৭ এর নিয়ম)।

(৮) Glankon—গ্রীক। শেষ স্বর—o-megha। গ্লোকোন—গ্রন্থকারের; গ্লান্ কন্—ইটাবাদীর; গ্লাউকোন্ গ্লাউকঅন্, এটাবাদীর (৩, ২২, ২৪ এর নিয়ম)।

(৯) Aischulos—গ্রীক। আইসখুলস্—গ্রন্থকার, ১ম খণ্ডে আইসখুলস্—গ্রন্থকার ২য় খণ্ডে; এখিলস্—ইটাবাদীর; আইসখুলস্—এটাবাদীর (২৫, ২২, ২০, এর নিয়ম)।

(১০) Phaidōn—গ্রীক। শেফথর—(i)-megha। ফাইডোন—গ্রন্থকারের; ফেদন্—ইটাবাদীর। প্-হাই ডোন্, প্-হাই ডঅন্, এটা-বাদীর (২১, ২৫, ৪, ২৪ এর নিয়ম)।

(১১) Puthagoras—গ্রীক। পিথাগরাস—গ্রন্থকার, ১ম খণ্ডে, পুথাগরাস—গ্রন্থকার, ২য় খণ্ডে; পিথাগরাস—ইটাবাদীর; পুথ্-হাগরাস—এটাবাদীর। (২০, ৮, ৩৫ এর নিয়ম)।

(১২) Lukourgās—গ্রীক। লুকোর্গাস—গ্রন্থকারের। লিকুর্গাস ইটাবাদীর। লুকুর্গাস্—এটাবাদীর (২০, ৩১, ৩৫ এর নিয়ম)।

দেখা যাইতেছে অনেক স্থলে গ্রন্থকার 'এ' বাদীদের মত গ্রহণ না করিয়া 'ই' বাদীদের মত গ্রহণ করিয়াছেন—যেমন zeta, eta, theta, phi, chi ইত্যাদির উচ্চারণে।

আবার কোন কোন স্থলে 'ই' বাদীর উচ্চারণ অগ্রাহ্য করিয়া 'এ' বাদীর মত গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন gamma, delta, upsilon, omega, ai, ইত্যাদির উচ্চারণে।

আবার কোন স্থলে কাগরও মত গ্রহণ করেন নাই—যেমন au—উ ('প্লোকন'); ou—উ ('মোসাইরস্') x—ফ ('আনাক্সাগরাস') কোন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণই ইহা সমর্থন করেন না।

গ্রন্থকার সর্বত্র এক নিয়ম রক্ষা করেন নাই; কোন স্থলে eu—এয় ('জেনুস') কোন স্থলে বা 'ইয়ু' ('ইউরিপিডীস'), কোন স্থলে x—ফ ('জেনকানীস') কোন স্থলে বা ফ ('আনাক্সিনেনীস')। তবে বোধ হয় এচলিত নামের ইংরাজী উচ্চারণ দিয়াছেন, এইজন্য মতভেদ।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সচিত্র দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বত্র ঐক্য নাই। যেমন থোকুডিডীস (১ম খণ্ড) এবং থোকুডিডীস (২য় খণ্ড); আইসখুলস (১ম খণ্ড) এবং আইসখুলস (২য় খণ্ড); পীথাগরাস (১ম খণ্ড) এবং পুথাগরাস (২য় খণ্ড) ইত্যাদি।

'উপদেবতা'

প্লেটোর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে সোক্রেটস বিশেষ বিশেষ সময়ে দৈববাণী গ্রহণ করিতেন বা দৈব উজ্জ্বিত লাভ করিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থে To daimonion শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ইহারই বাংলা করিয়াছেন 'উপদেবতা' (পৃ: ৫০; ২৪ নিয়ম হইতে তৃতীয় লাইন)। এ বিষয়ে বক্তব্য দুইটি :-

(১) বাংলা ভাষার উপদেবতা শব্দ ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সোক্রেটস্ যাহার বাণী গ্রহণ করিতেন তিনি মঙ্গলময় দেবতা। সুতরাং এ স্থলে 'উপদেবতা' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই শব্দের অর্থ দেবতা, না দেব-কর্তৃক, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Riddel প্রমুখ অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে daimonion (ডাইমনিঅন্) এবং daimon (ডাইমোন) একার্থ-প্রকাশক নহে। উত্তর কালে সর্বত্র ইহাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন কালে পার্থক্য ছিল। ডাইমোন শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা দেবতা। বিশেষতঃ এই, এই দেবতা মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখেন। হোমারের সময় হইতে প্লেটোর সময় পর্যন্ত এই অর্থ। To daimonion (ট ডাইমনিঅন্) কখন কর্তৃক, কখন বা কর্তা অর্থে ব্যবহৃত হইত। সোক্রেটস্ দেবকর্তৃক অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মেলেটস্ সোক্রেটস্কে অভিযুক্ত করিবার সময়ে এই শব্দকে 'দেবতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "প্লেটো সর্বত্রই ডাইমনিঅন্কে ক্রীতজন্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।" (জাউয়েট, Republic, Vol. iii টীকা, পৃ: ২৮৫; Campbell, Theaetetus টীকা, পৃ: ৩৪)। বার্ণেট বলেন, "ইহা ঈশ্বর হইতে আইসে, ইহা কোন দেবতা নহে" (Euthyphro টীকা পৃ: ১৬)। Riddel নিজগ্রন্থে

জেনকোন ও প্লেটো হইতে প্রধান প্রধান অংশ (Apal. 31c; Phaedrus 242 b; Euthydemus 272 E; Theaet 151 a ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত ভাবে এ সমুদায়ের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত ‘ডাইমনিয়ন’ দেবকর্তৃত্ব (agency); দেবতা (agent) নহে (Apology পৃ: ১০২—১১৭)।

প্রকৃত পক্ষে ইহা দৈববাণী, দৈবদেপ বা দৈব ইচ্ছিত। খ্যাতনামা প্রায় সমুদায় পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন (Zeller's Socrates, পৃ: ৮২-৯৬; গ্রোট, সোক্রেটিস Vol. i, 115, Vol. ii, 101; Thompson's Phaedrus পৃ: ৩৬; Adam's Apology, p. XXVII; Gifford's Euthydemus, পৃ: ৮; Gomperz, Greek thinkers, Vol. ii, পৃ: ৮৭—৮৮; (Riddel এর পুরোস্ত পুস্তক ইত্যাদি)।

সুতরাং ‘উপদেবতা’ শব্দ এখানে ব্যবহার করা উচিত নহে।

তবে এখানে বলা আবশ্যিক, যে, উক্তর কালের অনেক লেখক ‘ডাইমোন’ এবং ‘ডাইমনিয়ন’—এতদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ প্লেটোর অনুসরণ করিয়া ‘daemon’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পারিভাষিক শব্দ

গ্রন্থকার অনেক প্রাক দার্শনিক শব্দ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের ভাষান্তর করা অতীব কঠিন। বাংলা ভাষার বিশেষ অসুবিধা—অনেক স্থলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে।

প্লেটোর একটি বিশেষ মত আছে যাহাকে ইংরাজীতে ‘Theory of Ideas’ নাম দেওয়া হইয়াছে। প্লেটো অনুরূপ তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—(১) idea, (২) eidos (এইডস্) এবং (৩) eide (এইডে)। প্রথম শব্দটির ব্যবহার অল্প। আমরা যাহাকে প্লেটোর ideas বলি তাহা সাধারণতঃ eide (এইডে)। আর্ডমান (Erdmann) বলেন—“Where we speak of Ideas, Plato generally speaks of eide” (History of Philosophy, Vol i, পৃ: ১৮)।

Ideas শব্দের নানা অর্থ; আবার কোন কোন অর্থ প্লেটোর অর্থের বিরোধী। এইজন্য অনেকে মূল গ্রীক শব্দই রাখিয়া দিতেছেন; অনেকে আবার প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অনেক পণ্ডিত বলিতেছেন, ইহার অনুরূপ শব্দ “form” (Adam's Republic. Greek Text, টীকার, Vol. i, p. 335; Davies and Vaughan এর Republic, অনুবাদ; Macquire এর Parmenides, টীকা পৃ: ৭০; Burnit's Phaedo এবং Greek Philosophy. Stewart এর Plato's Theory of Ideas; Taylor's Varia Socratica পৃ: ১৭৮...২৬৭ প্রস্তব্য)। ম্যাক-মুলার eide শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন ‘আকৃতি’ (Six Systems, পৃ: ৩৯৮) Deussen এর মতে আকৃতি—eidos (এইডস্) (System of the Vedanta, p. 69)। আমরা যাদের মনে হয় আকৃতি বা পরাকৃতি, রূপ বা পরমরূপ, আদর্শ বা আদর্শরূপ দ্বারা প্লেটোর অর্থ ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ‘তত্ত্ব’ বা প্রকৃত তত্ত্বও উপযুক্ত প্রতিশব্দ। তত্ত্ব—তৎ+ত্ব; ইহার অর্থ ‘তাহার ভাব বা বিশেষত্ব’। Taylor সাহেব ‘real essences’ ব্যবহার করিয়াছেন।

আমাদেরই গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন ‘ফোর্টি’। কিন্তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। পানিনি দর্শনের

একটি বিশেষ মতের নাম ফোর্টিবাদ। নানা গ্রন্থে এই গ্রন্থের বাধা ও সমালোচনা আছে (সর্বদর্শনসংগ্রহ, কুমারিল ভট্টের শ্লোক বার্তিক, ৫১১—১৩৭; শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১০.২৮; মাদ্‌সমুলার, Six Systems, পৃ: ৩২৭ ৪১৫; সতীশচন্দ্র বিদ্যাত্মবর্ণের History of Indian Logic পৃ: ১১, ১৩২, ১৪৮, ১৪৯। Deussen's System of the Vedanta, পৃ: ৭১-৭৬ ইত্যাদি)।

সর্বত্রই দেখা যায় যে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সহিতই ফোর্টিব মত। ফোর্টিবাদ এক প্রকার ‘শব্দ-দর্শন’। সর্বদর্শনসংগ্রহে বলা হইয়াছে, যে, নিত্যশব্দকে ফোর্টি বলা হয়; ‘ইহা বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত কিন্তু বর্ণাতিরিক্ত নিত্যশব্দ’। শব্দও বলা হইয়াছে, যে, “বর্ণদ্বারা সৃষ্টিত হয় এইজন্য ইহাকে ফোর্টি বলা হয়; কিংবা ইহা হইতে অর্থ সূচীকৃত হয়, এইজন্য ইহার নাম ফোর্টি” (আনন্দাশ্রম সংস্করণ পৃ: ১১৪)। Deussen এর অনুবাদ ‘the bursting forth (পৃ: ৭১—৭২)। ম্যাকমুলার বলেন—“It really means the sound of a word as a whole and as conveying the meaning apart from its component parts (Six Systems, পৃ: ৪০২—৪০৩) অর্থাৎ ফোর্টি মনগ্র পদের শব্দ; ইহা বর্ণাতিরিক্ত ও অর্থপ্রকাশক। বিদ্যাত্মবর্ণ অর্থ করিয়াছেন—‘the outburst of conglomerate sound, phonetic explosion (পৃ: ১৩১)। এখানে বলা হইল, ফোর্টি শব্দের অর্থ, সম্মিলিত শব্দসমূহের সূচীভবন। জয়ন্ত বর্ণফোর্টি পদফোর্টি, বাক্যফোর্টি ইত্যাদির সমালোচনা করিয়াছেন। (বিদ্যাত্মবর্ণের গ্রন্থ পৃ: ১৪৯)। রূপফোর্টি, রসফোর্টিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রকৃত কথা এই, শব্দের সহিতই ফোর্টির মত। এই শব্দ একটি পারিভাষিক শব্দ; এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে ইহার বহু প্রচলন।

প্লেটোর ‘এইডে’-বাদ সম্পূর্ণ পৃথক্। এ অংশের ‘এইডে’-বাদকে ফোর্টিবারূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

অনুবাদ

আমরা অনেক স্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে, অনুবাদ মূল গ্রীকের অনুসৃত। ছুই এক স্থলে ভানার্থ দেওয়া হইয়াছে। যেমন এয়ুথুক্সোন্ গ্রন্থের একস্থলের অনুবাদ করা হইয়াছে :-

“আমি অভিযোক্তা নই, এয়ুথুক্সোন্, অভিযুক্ত। আমার মোকদ্দমা দেওয়ানী নয়, অধীনীরেরা ইহাকে বলে কৌজদারী”। পৃ: ৩২৯।

এখানে আইনসংক্রান্ত ছুইটা কথা ব্যবহৃত হইয়াছে (১) dikē (ডিকে); (২) graphē (গ্রাপ্‌হে)। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাহা ‘ডিকে’; আর রাজ্যের বিরুদ্ধে নীতিধর্মাদি বিষয়ে অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাহার নাম ‘গ্রাপ্‌হে’। (Burnet, Watt and Mills, Adam, Wells প্রভৃতির টীকা; Jowett, Cary, Mills প্রভৃতির অনুবাদ গ্রহণ)। কেবল কৌজদারী বলিলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয় না। কৌজদারী ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধেও হইতে পারে; যেমন অনধিকার প্রবেশ। ‘গ্রাপ্‌হে’ শব্দের ইংরেজীতে অর্থ impeachment (Jowett), indictment (Cary), public prosecution (Mills)। ইহা দেশের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বিশেষ কৌজদারী মোকদ্দমা।

অনুবাদের প্রথম বাক্যের সমগ্র অংশ মূল নাই। তবে অর্থের কোন বাস্তবিক হয় নাই।

এ সমুদায় অবান্তর বিবরণ। পাঠকগণ গ্রন্থকারের অনুবাদ পড়িয়া গ্রন্থের মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

অপরাধ বিবরণ পরে আলোচিত হইবে।

সাংবাদিকের ডায়ারি

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

যখন ফোর্স-এ ক্লাশে পড়ি, তখন একদিন অমৃত-বাজার পত্রিকা নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে পড়িলাম, যে, ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট বলিয়া যে-প্রতিষ্ঠান আমাদের শাসনকর্তা এবং মা-বাপ, তাহার অন্ত নাম ডাকাইত। কথাটা পড়িয়া ভালো লাগিয়াছিল—ভারি ভালো লাগিয়াছিল। দেশের লোকদের যাহা বলিবার তাহা সংবাদপত্রেই বলিয়া থাকে—অতএব যাহারা সংবাদপত্রসেবী তাহারাই দেশের মূর্তিমান্ জন-মত। সেই কাঁচা বয়স হইতেই আমার জীবনের সর্বোচ্চ বাসনা ছিল—আমি বড় হইয়া কোনো খবরের কাগজে কাজ করিব, অর্থাৎ কিনা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনমত গঠন করিব। এই কথাটা কল্পনা করিতেও আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণমন কেমন যেন একটা কথায়-বলা-ঘায়-না উল্লাসে নাচিয়া উঠিত।

মনে পড়ে, আমাদের গাঁয়ের শ্রীনকুড়চন্দ্র দাসের কথা। তিনি ভারতবিখ্যাত চ্যাগঞ্জা টাইম্‌স্‌এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে নীলামী ইস্তাহার, কৰ্মখালি প্রভৃতি অত্যন্ত দরকারী সংবাদে সদা পরিপূর্ণ থাকিত। যুদ্ধের সময় নকুড়-বাবু যখন গাঁয়ে আসিতেন, তখন গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা (বনিতা বাদ দিয়া) সকলে যুদ্ধের খাতি খবর শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। নকুড়-বাবু পরম বিজ্ঞের মতন শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিতেন “আরে সত্যি খবর বল্‌বার কি জো আছে? তা হ’লে যে জেল হ’য়ে যাবে—আমাদের যে সংবাদদাতা এখন যুদ্ধের জায়গায় আছে সে সব খবর পাঠায়। কিন্তু তা আমাদের অন্ত কারকে বল্‌বার জো নেই। এই শোনো না, কাইজার সেদিন প্রায়—না থাক, একথা বল্‌বার নয়।”

আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। নকুড়-বাবু এত কথা, এত ভয়ানক-ভয়ানক সংবাদ কেমন করিয়া গোপন

রাখেন। আমরা প্রায়ই শুনিতাম যে লাট সাহেব নকুড়-বাবুকে ডাকিয়া নানা গভীর বিষয়ের সাংবাদাদি দেন; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিতে বিশেষভাবে অল্পরোধ করেন। নকুড়-বাবুও তাহার কথা ঠেলিতে পারেন না।

নকুড়-বাবুর কথা এখনও বেশ মনে আছে। নকুড়-বাবুর সঙ্গে আর-একজন লোকের কথা মনে পড়ে। তাহার নাম মনে নাই। সে খবরের কাগজের আপিসে সকলের লেখার তুল সংশোধন করিত। মনে ভাবিতাম, সে কত বড় না জানি একটা পণ্ডিত! তা’র বিদ্যার পরিমাণ না জানি কত ভয়ানক। তাহার খেতাব ছিল হেড প্রফ-রিভার।

ক্রমাগত চারবার বি-এ ফেল করিবার পর আর বি-এ পাসের চেষ্টা না করিয়া, অনেকের সুপারিশ জোগাড় করিয়া একটি দৈনিক কাগজের আপিসে বিনা-বেতনের কৰ্মচারী নিযুক্ত হইলাম। কথা হইল যে কাজকৰ্ম শিক্কা করার পর কর্তারা আমার উপযুক্ত দক্ষিণার বন্দোবস্ত করিতে বিন্দুমাত্র কাৰ্পণ্য করিবেন না, তবে ধৈর্য ধরিয়া কাজকৰ্ম শিখিতে একটু সময় লাগিবে, এই যা! আমার ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জল সে-বিষয়ে সেই কাগজের কর্তাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না। মনের আনন্দে কাজে ভক্তি হইলাম। তখন মনে ভাবিতাম যে ক্রমে-ক্রমে দেশের লোকদের মতকে এমনভাবে গঠন করিব যে দেশ একদিন হঠাৎ অত্যাচারী পাশ্চাত্য শক্তি-গুণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। সেই অদূর ভবিষ্যতে আমি দেশের লোককে যে-পথে ইচ্ছা চালাইব। আমার কাগজে তখন কি-কি লিখিব, তাহারই কিছু-কিছু মনে উদয় হইতে লাগিল। কোনো দিন হয়ত লিখিব, দেশ জাগো, ঐ দেখ তোমার মা ভাই অনাহারে মরিতেছে, ঐ দেখ, চোখ মেলিয়া দেখ, তোমার পরনে কাপড় নাই। ভাবো, ভাবো, একবার সেই অতীত বৈদিক কালের কথা ভাবো, যখন

তোমার পূর্ব পুরুষগণের ধমনীতে-ধমনীতে পবিত্র আর্ধ্য-শোণিত অনাবিল আবেগে ছুটিয়া চলিত, তখন তাঁহারা বকলে অঙ্গ আবৃত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বেদগান করিতে-করিতে বনে-বনে মেঘ ও কামধেনু-সদৃশ গাভীগণকে চরাইয়া দিন যাপন করিতেন। কি স্থখের দিন ছিল তখন! তখন গাছে-গাছে ফল ফলিত, নদীতে জল ছিল, এবং সেই জলে বিবিধ কত সুখাছু মৎসকুল মনের আনন্দে বিচরণ করিত। আর আজ! অহো! সে-কথা আর বলিয়া কাজ নাই।” ইত্যাদি

এদিকে বাবা বেজায় চটিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার ই-আই-আর-এর বড় সাহেবকে অনেক বলিয়া-কহিয়া আমার জন্ত মানকর টেশনে একটি টিকিট কালেক্টারির কাজ জোগাড় করিলেন,—মাসিক বেতন ৩০। আর আমি কিনা তাহা পায়ে ঠেলিলাম! বাবা বলিলেন, তিনি আর আমার মুখ দেখিবেন না। তখন মনে-মনে ক্রোধের হাসি হাসিয়া ভাবিলাম, “হায় বৃদ্ধ! তুমি কি জানিবে এই তরুণ হৃদয়ের আরব টাট্টুর মতন উদ্দাম আকাজ্জার কথা! তোমার প্রাণমন সব শুখাইয়া গিয়াছে, চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই কিছু দেখিতে পাও না, কিছু অনুভব করিতেও পারো না। কিন্তু একদিন দেখিবে তোমার এই পুত্র তোমার শৃঙ্খলিতা পদদলিতা মাতাকে কেমন করিয়া দেশ-শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবে!” মনে-মনে এই কথাগুলি বলিলাম বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার ভরসা হইল না, কারণ বাবা-ঠাকুরের দেহবলের খ্যাতি ছিল।

প্রথম-প্রথম আমি প্রফ দেখা শিক্ষা করিতাম। তাহার পর ক্রমে সংবাদ সংশোধন করা শিখিতে লাগিলাম। এই সময় একদিন প্রধান সম্পাদক আমাকে বলিলেন “ওহে, অনেক সংবাদ প্রায়ই আসে, যা খুব দরকারী, কিন্তু অনিল সেগুলোকে ভালো ক’রে সংশোধন ক’রে বসাতে পারে না, তুমি বাপু একদিন এই কাজটি ক’রে দেখাও ত কেমন পারো।” আমি ভাবিলাম—কি খড়িবাজ লোক বাবা! আমি যে ঐ কাজটা ভালো ক’রে করিতে পারি, সেটা সোজা কথায় বলিবেন না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা চাই, সম্পাদকি বুদ্ধি আর কারে বলে! এমন ক’রে সংবাদ সংশোধন

করব যে—হ্যাঁ, সবাই একেবারে অবাক হ’য়ে যাবে, চাই কি কাগজের কাঁচিতিও কিছু-কিছু বেড়ে যাবে।

একদিন একটি সংবাদ আসিল, তাহা এই: “মাস্ত্রাজ-বাজারে চিনির দর পড়িয়াছে।” এই এক লাইন সংবাদ কাহারো চোখে পড়িবে না—অথচ এই সংবাদের উপর কত লোকের কত আশা-ছরাশা নির্ভর করিতেছে। আমি সংবাদটিকে অতি মনোহর এবং ছন্দোময় করিয়া লিখিলাম:—

পতন !!

ভীষণ পতন! কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ। “সংসারের চাকা অবিরাম ঘুরিতেছে—কখনও স্থির হইয়া নাই। আজ যে-বৃক্ষে ফল ফলিল, কাল সে-বৃক্ষ ফলহীন হইল। আজ যে কুমারী বালিকা, কাল সে সপ্ত সন্তানের গৌরবময়ী জননী, তাহার পর দিন সেই জননী আর নাই! কিন্তু তাহার সেই সপ্ত সন্তান কত শততে পরিণত হইল! নদীতে এই জোয়ার আসিল, খানিক পরে দেখ, তাঁটার টানে জোয়ার ভাসিয়া গেল। আজ তোমার দেহে রেশমী জামা, কাল তুমি খালি-পায়ে পথে দাঁড়াইয়া আছ! চাতিয়া দেখ উজ্জল সূর্যালোক কাঁচা ধানের ক্ষেতে সোনা ঢালিয়া দিয়াছে—আবার একটুপরে দেখ রাজির গভীর তিমির-পরদা কালো-চাদরে মাঠ-ঘাট আবৃত করিয়া দিয়াছে—। আজ যে জিনিসের দাম চড়া, কাল তাহার দাম পড়িয়া গিয়াছে। সত্য-সত্যই তাহাই আজ ঘটিয়াছে—মাস্ত্রাজের বাজারে হাহাকার! কিন্তু ঘরে-ঘরে মুচকি হাসির লহর, কারণ চিনির দাম পড়িয়াছে।

নিজের লেখা বার-বার পড়িলাম—বেশ লাগিল। যেমনি ভাষার চটা, তেমনি বর্ণনার ঘটা! কেহ কাহাকেও ছাড়াইতে পারে নাই, কিন্তু ছুই চমৎকার!

ছাপার অক্ষরে বখন প্রফ দেখিলাম, তখন আমি আমার এই অদ্ভুত, চমৎকার, সংবাদ-সংশোধনের কমতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এবার আটকায় কে? কাল সম্পাদক নিশ্চয়ই ছুপুয়ে আমায় ডাকিবেন—তা’র পর বলিবেন “—তা দেখ তুমিই ঐ সংবাদ-সংশোধনের কাজটা নাও, আর—হ্যাঁ, দ্যাখ,

এ-মাস থেকে কিছু অ্যানাওয়েন্স নিও, এই শ-দেড়েক নিও, তা'র পর একটা-কিছু পাকা বন্দোবস্ত করা যাবে।” হরিশের চোখ টাটাবে! ওঃ! ভারি কাজ ত করেন! “ভালো প্রফ দেখি, ভালো প্রফ দেখি!”—“দেখ এইবার প্রফ। আমি যা লিখিব, তুই দেখবি তা'র প্রফ! যদি কোনো ভুল হয়, বা শোমার বিদ্যে ফলাও, তবে বুঝলে বাবাজি—সামনের ঐ দরজা, দারোয়ান যেখানে টুলে বসে বসিয়ে!”

[আর-একটি সংবাদ সংশোধন আমি করি, তাহার মূল সংবাদ ছিল এইপ্রকার

“আমার পুত্রের বিবাহ এবং পরে আমার হঠাৎ কলেরা হওয়ায়, গত চারদিন কাগজ বন্ধ ছিল—ইতি

সম্পাদক।”

সম্পাদক মহাশয় আমায় একবার বলেন, যে, খবরের কাগজে ‘আমি’ বলিয়া কোনো জিনিষ নাই, সকল ক্ষেত্রেই ‘সম্পাদকীয় আমরা’ (অর্থাৎ Editorial We) ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন ‘আমার কাগজ’ না লিখিয়া ‘আমাদের কাগজ’ লিখিতে হইবে। আমি তাই উপরে লিখিত সংবাদটিকে এইপ্রকার সংশোধন করিলাম—

“আমাদের পুত্রের বিবাহের জন্ত এবং তা'র পর হঠাৎ আমাদের কলেরা হওয়ায় আমাদের কাগজ গত চারদিন বন্ধ ছিল। ইতি

সম্পাদক।”

কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই সংবাদটি ছাপা হইবার পূর্বেই সম্পাদকের হাতে পড়ে এবং তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং জেদি লোক ছিলেন বলিয়া নিজের পূর্ব জেদই বজায় রাখেন।]

সকালে যখন কাগজ বাহির হইল তখন চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! বোধ হয় কাগজও সেদিন কিছু বেশী বিক্রয় হইয়া থাকিবে। সম্পাদক-মহাশয় ছুপূরে আপিসে আসিলেন—তাঁর মুখ বেশ গম্ভীর দেখিলাম। মনে ভাবিলাম—আনন্দের আতিশয্যই ইহার কারণ এবং একজন যোগ্য লোককে এতদিন যে নীচে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল—ইহার দরুন ছুঃখও যে সম্পাদকের মনকে কিছু-

পরিমাণে বিকৃত করে নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমাব ঘরে আমি চেয়ারে বসিয়া ছুয়ারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, কখন আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত সম্পাদক মহাশয় আমাকে ডাকেন। বলিতে মনে ছিল না, ঐ দিনকার কাগজে আরো অনেকগুলি সংবাদ আমি বিশেষমনস্কসহকারে সূ-সংশোধন করিয়া দিয়াছিলাম—তাহার মধ্যে একটির এখানে উল্লেখ করিতেছি। মূল সংবাদটি এই :—

“কাল রাতে হৌগলকুড়িয়ার রাজা মারা গিয়াছেন।” আমি এই মৃত্যু সংবাদটিকে সর্বজনমনোরঞ্জক করিয়া কাগজের সংবাদস্তম্ভের সর্বাপেক্ষা ভালো স্থানে বসাইয়া দিয়াছিলাম। সংশোধিত সংবাদটি হইয়াছিল এইপ্রকার :—

প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল!

সমস্ত পৃথিবীর হৃদ্য কর্তা বিধাতা পরমেশ্বর— তিনি সর্বনিয়ন্তা—তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়, তিনিও মঙ্গলময়। তিনি যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্ত। তিনি গরীবকে ধনদান করেন, দুঃখীকে সুখ দান করেন। ভগবান্ যাহা করেন তাহা আমাদের এবং দেশের ভালোর জন্তই করেন। হৌগলকুড়িয়ার রাজার এই যে গত কল্য রাত্তিরে মৃত্যু ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে, দেশেরও মঙ্গল হইবে!”

যাক্—হঠাৎ দেখি সম্পাদকের প্রধান বেয় সিয়া আমাকে সম্পাদকের সেলাম জ্ঞাপন করিল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহার ঘরে চলিলাম—মারুধানে দেখি, অনিল তাহার প্যারিসূরীড বিনিমিত দস্তরাজি বাহির করিয়া হাসিতেছে—ভাবিলাম একটা চড় বশাইয়া দিই, তা'র পর মনে হইল, আহা! বেচারী আমার সুখে সুখী হইয়া হাসিতেছে—এই কথা মনে হইবামাত্র অনিলকে আমায় বড় ভালো লোক বলিয়া মনে হইল।

সম্পাদকের ঘরে গিয়া দেখিলাম সম্পাদক এবং কাগজের মালিক ও তাঁহার দুই পুত্র বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া সম্পাদক গম্ভীরভাবে বলিলেন—“কালকের এই সংবাদগুলি কে সংশোধন করেছে?” আমি বলিলাম যে

“সবগুলিই আমি করেছি।” তখন সম্পাদক-মহাশয় বলিলেন “দেখ বাপু, আমাদের সামান্য কাগজে তোমার মত মহাপণ্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং নক্ষিণা দিতে পারব না। তা ছাড়া আমাদের কাগজের পাঠকও সব সামান্য বিদ্যেওয়াল লোক, তাহারা তোমার সু-সংশোধিত সংবাদের মর্ম গ্রহণ একতিলমাত্রও করতে পারবে কি না সন্দেহ! তা তুমি—এই কি বলে, অন্ত-কোনো ভালো জায়গায় যাও।” আমি কোনো কথা বলিলাম না। মাস্তুরের অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন পাঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

অনিল তখনও হাসিতেছে। দাবোয়ান টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছে। আমি বাহির হইয়া গেলাম।

মনে করিলাম—আর না, এনার পিতার শ্রীচরণে বার-কয়েক প্রণাম করিয়া টিকিট কালেক্টারের কাছেই আশ্রয়-নিয়োগ করি, তার পর মনে হইল—নাঃ! ছিঃ! পুরুস আমি! নানা বিকল্প অবস্থার ভিতর দিয়া আমার পুরুসত্বের পূর্ণ বিকাশলাভ হইবে। অনেক ইঁটাহাটি করিয়াও কোথাও কাঙ্ক্ষ না পাঠিয়া অবশেষে অতি কম বেতনের একজন রিপোর্টার হইলাম। সহরের যত ভালো ভালো বক্তৃতা এবং ঘটনার সংবাদ আমি ভ্রোগাড় করিয়া লিখিয়া আনিয়া দিতাম—আর সেই সমস্ত কাগজে ছাপা হইত। স্থানাভাব হইত বলিয়া আমার লিখিত সংবাদ-সংগ্রহের কিছু-কিছু প্রায়ই কাটিয়া-ইটিয়া দেওয়া হইত। আমি কিন্তু সেই কাটা অংশগুলি সবসঙ্গে রাগিয়া দিতাম—পরে যখন কোনো পুস্তক রচনা করিব, তাহা কাজে লাগাইয়া দিব, এই মনে করিয়া।

একদিন সহরে এক ভয়ানক জুয়াচুরির ব্যাপার হইল। দুইজন বড় বড় উকিল ইহাতে অভিব্যক্ত হইলেন। আমি সংবাদ লিখিলাম :

“সহরের দুইজন প্রধান উকিল জুয়াচুরি করিয়া আজ শরা পড়িয়াছেন। ইঁহারা অনেক লোককে ঠকাইয়াছেন, ইঁহাদের শাস্তি হওয়া উচিত। বিচার চলিতেছে।”

সংবাদটি পড়িয়া আমাদের কাগজের সম্পাদক বলিলেন “দেখুন—যে সমস্ত ব্যাপার এখনও বিচারাধীন, সেই সমস্ত ব্যাপার ওরকম ক’রে লিখবেন না। দুইজন উকিল

অভিব্যক্ত হয়েছেন মাত্র—এখনও প্রমাণ হয় নি যে তাঁহারা সত্য-সত্যই জুয়াচুরি করেছেন কি না—তা ছাড়া রিপোর্টারের কোনো বিষয়ে মতামত দিবার বা ভালোমন্দ বলিবার কোনো দরকার নেই। আপনি একটি কথা সকল সময় মনে রাখবেন, কোনো কথা স্পষ্ট ক’রে বলবেন না, অর্থাৎ কিনা commit করবেন না কোনো বিষয়ে। দয়া ক’রে এই কথাটি মনে রাখবেন।”

সম্পাদকের বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সত্যটি ত—অভিব্যক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত চোর বলা অত্যন্ত অন্তায় হইয়াছে। আর কখনও এমন কথা বলিব না।

কয়েকদিন পরে সহরে আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমাদের কাগজে পরীক্ষার সমস্ত লিস্ট বাহির হইত না। কেবলমাত্র খবরটি বাহির হইত। আমি সংবাদ লিখিলাম :

“সহরে বিষম গুজব যে আই-এ পরীক্ষার ফল নাকি বাহির হইয়াছে। আরো গুজব যে এবার নাকি ৫০ পারসেন্ট ছেলে পাস হইয়াছে। এ বিষয়ের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, ভালোমন্দ সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার নাই।”

এই সঙ্গে আরো একটি সংবাদ সংগ্রহ করিলাম।

“গুজব যে কাল রাতে প্রসিদ্ধ বণিক হরিদাস দাবুর বাড়ীতে শুব ভোজ হইয়া গিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে ইঁহাও অবগত হইলাম যে আমাদের কাগজের প্রতিনিধিও নাকি সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাও গুজব যে নিমন্ত্রিত সকল লোকে নাকি পেট ভরিয়া ভোজন করেন। আরো প্রকাশ যে নিমন্ত্রিতগণ রাজি ১টার সময় যে-যার গৃহে গমন করেন। এ-বিষয়ে কোনো মতামত আমরা এখন দিব না।”

এই সংবাদ-দুটি পরদিন কাগজে প্রকাশ হইল। বেশী রাতে এই সংবাদদ্বয় প্রেসে যায় বলিয়া সম্পাদকের হাতে পড়ে নাই—তাহা হইলে বোধ হয় কাগজে স্থানাভাব হইত। দ্বিপ্রহরে সম্পাদক-মহাশয় আমাকে ১৫ দিনের আগামী বেতন দিয়া বলিলেন, “আপনি এখন কিছুদিন বিপ্রাম করুন; সাংবাদিকের হাড়ভাঙা পাটুনি আপনার সহ্য হইতেছে না।” বৃষ্টিতে পারিলাম

সম্পাদকের মনে হিংসার উদয় হইয়াছে। মনে-মনে হাসিয়া বলিলাম—আজকে চাপা দিয়া রাখা যায় না—সে একদিন-না-একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই। সম্পাদক, আজ তুমি আমাকে বিশ্রাম করিবার অবসর দিতেছ—এমনদিন আসিবে যখন তুমি বিশ্রাম চাহিবে না, কিন্তু আমি তোমাকে জোর করিয়া বিশ্রাম দিব।

আমি এখন ঘরে বসিয়া-বসিয়া সংবাদপত্র সেবা করিতেছি—আজ আমি স্বাধীন, কাহারো বেতন-খাওয়া চাকর নহি। আমার নানাপ্রকার সংবাদ, প্রবন্ধ, ইত্যাদি নানা কাগজে বেনামিতে ছাপা হইয়া থাকে।

* * *

সংবাদপত্রের সহিত বহুকালের যোগ থাকাতে এবং সেই সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার একটা তীব্র অন্তর্দৃষ্টি থাকার দরুন আমি দেখিতে পাইলাম যে সংবাদ পত্রের যাহারা নিয়মিত বা বিখ্যাত লেখক সকলেরই এক-একটি করিয়া ভালো নাম আছে। এই যে আমরা থাকে নকুড়বাবু বলি, ইহার সংবাদ পত্রের নাম জীমূতবাহন। তাহার পর ইহাও বেশ ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যদি বরীন্দ্রনাথ না হইয়া শ্রীবেচারাম ভড় হইত, তাহা হইলে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে তিনি কখনই এত বড় কবি হইতে পারিতেন না, এবং লোকেও কখনই তাঁহাকে কবীন্দ্র বা সাহিত্যসম্রাট্ নামে অভিহিত করিত না। আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এই কথা বলিতে পারি। সত্যমিথ্যা ভগবান্ জানেন—আজকালকার একজন বিখ্যাত কবি এবং ঔপন্যাসিক, এবং ছোটোগল্পলেখক তাঁহার পিতামাতার দেওয়া নামটিকে একদিন গভাঙ্গান করিবার সময় পুণ্যস্রোতা জাহ্নবীর জলে ত্যাগ করিয়া সেইসঙ্গে আর-একটি ভালো নাম গঙ্গার দানস্বরূপ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন, এবং সেই সময় হইতেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে বিষম প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আমার আসল এবং মৌলিক অর্থাৎ পিতার দেওয়া নাম ছিল শ্রীভদ্রহরি হাতী। এখন আমার প্রবল ইচ্ছা হইল, আমি এই নামটিকে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাহিত্যিকের মতন একটা নাম গ্রহণ করিব। কিন্তু নিজের গায়ে বসিয়া নাম

বদলানো একটু কঠিন বলিয়া আমি গ্রাম ত্যাগ করিয়া আবার কলিকাতার একটা নতুন মেসে গিয়া উঠিলাম। সেখানে আমার নাম হইল শ্রীনবীন্দ্রকুমার রায়।

কলিকাতার আসিয়া আমি আবার সেই পুরোনো কাগজ, যেখানে দ্বিতীয়বারে কাজ করিয়াছিলাম, সেইখানে কাজে লাগিয়া গেলাম। সে সম্পাদক নাই, নতুন একজন সম্পাদক আসিয়াছেন—ইনি বিলাত-ফেরত এবং কাজকর্ম খুব ভালো বুঝিতে পারেন। ইহাকে কেন জানি না আমি প্রথম হইতেই ভয়ানক শ্রদ্ধা করিতাম, এবং সময় পাইলেই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিতাম। ইনি বয়সে আমার চেয়ে ছোটো হইলেও ইহাকে আমি জানে বড় বলিয়া মনে করিতাম এবং তিনিও আমাকে ‘তুমি’ সম্বোধনে আমার সে দাবীকে সার্থকতার মুকুট পরাইয়া দিতেন। প্রথম-প্রথম সম্পাদক-মশায় আমার সঙ্গে একটু পর-পর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে সেই মেঘ কাটিয়া গিয়া পরম আত্মীয়তার সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পাইল। তিনি আমাকে এতটা আপন মনে করিয়াছিলেন যে আমাকে মাঝে-মাঝে তাঁহার বাড়ীর তরকারীর বাজারটাও করিয়া দিতে অস্বরোধ করিতেন, কিন্তু কোনোদিন হুকুম করেন নাই—বা বাজারের হিসাব চাহেন নাই। এতই ছিল তাঁর মহানুভবতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রধান রিপোর্টার হইলাম। এই সময় যেন আমার বুদ্ধির লোহার কপাট খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভাগ্যেরও সিংহী দরজা খুলিয়া গেল। আমি প্রায়ই নানা-প্রকার লোমহর্ষক এবং ভয়ানক-ভয়ানক খবর সংগ্রহ করিয়া আনিতাম—যাহা অন্য কোনো কাগজে বাহির হইত না।

একদিন মেছুয়াবাজারের একটা চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাইতেছি, হঠাৎ পিঠের কাছে নেপথ্যে শুনিতে পাইলাম—“আজ রাতকো দো বাজে—আমার কান খাড়া হইয়া উঠিল। রাত দো বাজে কি রে বাবা? একটু পরে পিঠের দিকের চাটাই-এর দেওয়াল ভেদ করিয়া কথা আসিল “১১ নং পুকুরঘাটা বাড়ীতে

সিঁদু চালাও, মাল'ত বহুত—আউর
কুপিয়া ভি খোড়া বহুত হোপা—”

আমি কালবিলম্ব না করিয়া,
সোজা মালবাজারে গিয়া খবর দিলাম
এবং কয়েকজন পুলিশ ও সার্জন সঙ্গে
কইয়া ১১নং বাড়ীর পাশের গলিতে
লুকাইয়া রহিলাম। রাত্রি দুইটা
বাতিল। সমস্ত আকাশ বাতাস,
পৃথিবীর গাছপালা নিস্তব্ধ। অন্ধকার
আকাশের বৃক তাবাপুলি যেন
পৃথিবীর দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টি মেলিয়া
চাহিয়া আছে—তাহারা যেন
বলিতেছে, “ওগো পৃথিবী! কত যুগ
যুগান্ত ধরিয়া আমরা তোমার আশায়
এম্নি করিয়া বসিয়া থাকিব?”—

এমন সময় জন-ভয়েক লোক ১১নং
শুদামঘরের দেওয়ালে সিঁদু কাটিয়া প্রবেশ করিল এবং
ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা দলবল বাহিরে আসিয়া-মাত্র
আমরা তাহাদের বমাল বন্ধ করিলাম। পরদিন সহরের
লোকের আমাদের কাগজে এই ভীষণ চুরির কথা পড়িয়া
অবাক হইয়া গেল। অস্ত্র কোনো কাগজ এখন
পায় নাই।

আমাদের কাগজের নাম ছিল “পৃথিবী।” “রাজপথ”
বলিয়া দৈনিক কাগজটার সঙ্গে এই সময় আমাদের সকল
বিষয় কইয়া ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। তাহারা
আমাদের সঙ্গে কোনো রকমেই যেন পারিয়া উঠিতেছে
না। এই সময় আমি মেছুয়াবাজার, চীনা-পাড়া, খিদিরপুর
ইত্যাদি স্থানে খুব বেশী সময় ঘুরিতাম।

একদিন শীতকালের সন্ধ্যাবেলা খিদিরপুরের
একটা গলিতে ঘুরিতেছি। চারিদিক ধোঁয়াতে ভরিয়া
গিয়াছে, কাছের মানুষ চিনিতেও বেশ কষ্ট হয়। আমি
একটা চায়ের দোকানের সন্ধান করিতেছি, এমন সময়
একজন লোক আপাদমস্তক মূড় দিয়া আমার পাশে
আসিয়া তাহার জুতার ফিতা বাধিতে-বাধিতে বলিল
“খবর আছে—সামনের গলিতে আসুন।” আমি প্রথম



কোনোদিন লিখিব “জাগো, স্তাবো, চাহিয়া দেখ ভারতবাসী” ইত্যাদি—

কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। তবে বুঝিতে পারিলাম,
অস্ত্র ক.হারো সঙ্গে লোকটা আমাকে ভুল করিয়াছে।
একবার ভাবিলাম যে তাহাকে বলি, “বাপু হে, আমি ত
তোমাকে আমার বাপের-কালে কোনোদিন দেখি নাই”
কিন্তু কি জানি কি মনে করিয়া বলিলাম—“আচ্ছা, তুমি
এগোও।” লোকটা সামনের একটা সড় অন্ধকার গলির
মধ্যে প্রবেশ করিল।

গলিটাকে সড় বলিলে গলিটাকে খানিকটা চওড়া বলা
হয়—আসলে কিন্তু তাহা নয়। দেড়জন লোক কষ্টে-কষ্টে
পাশাপাশি সেই গলিটা দিয়া চলিতে পারে। ছপাশের
বাড়গুলো প্রায় সব তিনতলা হওয়াতে গলিটাকে যেন
নরকের বা ঐ-রকম কোনো ভাণ্ডে স্থানে গমন করিবার
পথ বন্ধিয়া মনে হইতেছিল। মাঝে-মাঝে গ্যাসের বাতিও
ছিল, কিন্তু সেগুলো নামমাত্র জলিতেছিল। আলুকাওয়ার
মতন অন্ধকারকে ঐ মিটমিট করা গ্যাস-আলোগুলা
যেন আরো জমাট করিয়া দিয়াছিল। লোকটা আমার
প্রায় দশ হাত আগে-আগে চলিতেছিল। গলিটা আবার
সোজা নয়। হেলে-সাপের মতন আকাবাকা।

গলিতে কোনোরকমে পথ ঠিক করিয়া চলিতেছি,

৮০৪
এমন সময় হঠাৎ সামনে দেখি, একটা গোলাকার সজীব পদার্থ, তাহার চোখ-দুইটা আমার দিকে চাহিয়া জল-জল করিতেছে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ ক্যাচ করিয়া এক লোক!—ভালো করিয়া ঠাঠর করিয়া দেখিলাম একটা ডাস্ট-বিন্ উল্টাইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে একটা মিশমিশে কালো-বিড়াল খাদ্যের সন্ধান করিতেছে। সমস্ত গা ছম্ছম করিয়া উঠিল। ভাবিলাম কাজ নাই বাবা, জীব-সংবাদসংগ্রহের পায় পড়িয়া শেষে বিঘোরে মরিব। কিরিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে সীম-গাড়ীর পায় হুকুম আসিল—আগে চলো বাবু। পিছনে ফিরিয়া দেখি বাপ! সওয়া-চারহাত লম্বা এক কবুলি তাহার লাঠিটা ঠক ঠক করিতে-করিতে আসিতেছে। আমি আর ফিরিবার সাহস না পাইয়া সামনেই আগাইয়া চলিলাম। গোটা-কয়েক পাক খাইবার পর হঠাৎ কানের পাশে কে খেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল, তাহার পরই আমার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিতে লাগিল! ভয় ত পাইলামই, তাহার সঙ্গে এমন অন্ধকারে এক এমন চমৎকার স্থানে এমন একটা মল্ল রসিকতার হাসিও আসিল—সেগানটা আবার গলির একটা পাকের মাথায়, কোনোদিক্ দিয়াই আলো-অসে না। নিয়ন্ত্রণাই ছিল পকেটে, জালিয়া দেখিলাম ভয়ে-ম্যাপার বিশেষ নয়, দেওয়ালের একটা ফটলে শ-পাঁচেক আরম্ভেণ্য-স্বাভাৱে হইয়া মহা হস্তা করিতেছে, তাহারাই দু-একটা আমার ঘাড়ে-ভুক্তকমে আসিয়া পড়িয়াছিল।

আর-একটা কান্টি জালিয়া কিছুদূর আগাইয়া গেলাম। হঠাৎ আমার হাতে, মাথায়, ঘাড়ে কি-একটা ঠাণ্ডা তরল পদার্থ আসিয়া পড়িল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম বহু উচ্চ জানলায় আলো দেখা যায়,—ভাবিলাম, ডাকিয়া বলি—কি আর ডাকিতে হইল না, ডাকিবার ভাবনা শেষ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই মুখে-উপর আসিয়া পড়িল খানিকটা তরল পদার্থ। আর কোন-প্রকার ভাবনা বা চিন্তা না করিয়াই হনহন করিয়া আগাইয়া চলিলাম।

হঠাৎ এক রামধাঙ্গা। তার পরেই বিশুদ্ধ দেবনাগরী ভাষায় মধুর-মধুর সজ্জাধন আরম্ভ হইল। ব্যাপারটা কি

হইয়াছে বুঝিবার পূর্বেই দুই খোটা চানাচুরওয়াল আমার নিকট তাহাদের ভূপতিত চনাচুরের মূল্যস্বরূপ পাঁচটি টাকার দাবি করিল।

অন্ধকারাবৃত গলি। তরল পদার্থে আপ্ত দেহ এবং বস্ত্র। পিছনে কবুলিওয়ালার লাঠির ঠক-ঠক ঠক শব্দ। সামনে দুইজন সুদর্শন হিন্দুস্থানী চানাচুর-ওয়াল। পাঁচটাকার মায়া ত্যাগ করিয়া আগাইয়া চলিলাম।

একটু দূরে আসিয়া দেখি, সেই লোকটা একটা প্রায়-ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই আমার মেজাজ চটিয়া গেল। বলিলাম “তুমি আচ্ছা লোক হে—এমন জায়গায় ভুললোককে কেন—? তাই না হয় সঙ্গে-সঙ্গেই এস, তা নয়! আচ্ছা লোক বাপু তুমি! দেখ ত এখন সমস্ত কাপড়-চোপড় কোথায় বদলাই?” লোকটা হাসিয়া ফেলিল—বলিল “এতদিন ধরিয়া এইসব জায়গায় ঘোরাফেরা করুছেন, তবু জানেন না যে এই গলিতে কাপ্তে-কাপ্তে বা লাঠি ঠক্ঠক্ করতে-করতে চলতে হয়? আপনি যে এত কাঁচা এখনও, তা আমি কেমন ক’রে জানুব বলুন?”

বাড়ির ভিতর ঢুকিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, মাঝখানে বড় উঠান—তাহার চারিদিকে সারি-সারি ঘর। প্রায় সবই কিন্তু অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনতালি বাড়ি, উপরের তালির দু-একটা ঘর হইতে ভাঙা গলার মিঠা গানের আওয়াজ মাঝে-মাঝে আসিতেছিল। লোকটা কোণের একটা ঘরের শিকল খুলিয়া একটা কেরাসিন বাতি জালিল এবং আমাকে একটা ছেড়া মাদুরে বসিতে বলিল। “আপনি একটু বসুন—এখনি সধাই আসবে। আমি একটু জোগাড় দেখি—বলিয়াই সে হঠাৎ ঘরের বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবার আমার সত-সতাই ভয়ানক ভয় হইল। অজানা জায়গা, তার উপর এই ভীষণ গলি। এত-বড় বাড়িতে লোক নাই বলিলেই হয়, আমি একটা ঘরের মধ্যে শিকল-বন্ধ অবস্থায়! হায় হায়! আজ বুঝি আমার সব শেষ হইল। পলাইবার কোনো পথ নাই। একটা জানালা আছে বটে

কিছু সেটা আবার অনেকখানি উচুতে, হাত পৌছায় না। ভয়ে আমার শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। ঘরের বাহিরে কাহাদের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ ক্রমশঃ কাছে আসিল, অবশেষে বানাৎ করিয়া শিকল খোলার শব্দ হইল এবং তাহার পরেই সেই লোকটা তাহার সঙ্গে চারজন ভীষণদর্শন কাবুলিওয়ালাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দেবী হওয়ার জন্য লোকটা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমাকে দেখাইয়া কাবুলি চারজনকে বলিল “আগা সাহেব—ইনি মিরজা সাহেবের বড় পেয়ারের লোক—সব মতলব ইনিই জোগাইয়া থাকেন।” সকলেই দেখিলাম আমাকে বেশ সম্মানের সঙ্গে সেলাম করিয়া মাহুরে বসিল। তা’র পর বখা আরম্ভ হইল।

লোকটা বলিল—“প্রথমে আপনাকে চিন্তে পারিনি, তা’র পর আপনি যখন গ্যামপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে কুমাল নাড়তে লাগলেন, তখনই বুঝতে পারলাম। তা’র পর গলিতে আসবার কারণ হচ্ছে যে ওদিকের ভালো রাস্তায় পুলিশের টিকটিক বসেছে। এখন কাছের কথা বলি—এঁরা প্রায় একলক্ষ টাকার কোকেন চালান এনেছেন। কোকেন চার ভাগে ভাগ করা আছে—৪নং বেলবাগান, ৭নং নিমতলা, ১৩নং গণেশপাড়া এবং ১৭নং কাঁঠালবাগান, এই চার জায়গায় আছে। মিরজা-সাহেবকে এই খবরটা দিতে হবে, আর বলতে হবে যে কাল সকাল আটটার মধ্যেই যেন সমস্তটা কোকেন অন্ত-কোথাও চালান করা হয়, কারণ পুলিশের চোখ পড়তে বেশা সময় লাগবে না। আপনি ঠিকানাগুলো লিখে নিন—আচ্ছা। না, ওখানে নয়, জুতোর স্বকতলার তলায় কাগজটা রাখুন, আপনি ধরা পড়লেও কোকেন বেঁচে যাবে। সব মনে রাখবেন।”

আমি ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, “এরা বলে কি? মিরজা-সাহেব যে ভারতবর্ষে কোকেন-চালানের রাজা! আমি তা’রই দক্ষিণ হস্ত। এত বড় হুল এরা কেন ক’রে করলে?” তা’র পর সেই লোকটা বলিল, “বাবার সময় আপনি একটু সাবধানে যাবেন, রাস্তার যেন পুলিশ কোনো-রকম সন্দেহ না করে।”

আমাকে বাড়ির বাহিরে আনিয়া দিল এবং তাহার পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া ছুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। সেই সন্ধ্যাটা দিয়া চলিতে লাগিলাম। আকাশের দু-একটি তারা সেই গলির তলা হইতেও দেখা যায়। বাহিরের জগতের সহিত এই গলির আর কোনো প্রকার যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। গলির দুই পাশেই ছুতলা-তিনতলা বাড়ির জানালা-দুয়ার বন্ধ। গলিতে চলিতে-চলিতে কেবল মনে হইতে লাগিল মিরজা-সাহেব এবং আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে যেন আর কিছু নাই। তা’র পর পুলিশ কমিশনারের জন্ম হইল, তা’র পর কাহার জন্ম হইল বুঝিতে পারিবার পূর্বেই আমি গ্যাটগঞ্জ রোডে আসিয়া পৌঁছলাম। রাত ১০খন দশটা।

রিকশ করিয়া চীনা-সুন্দরী চলিয়াছে। লুজি জাহাজের খালাসীরা রাস্তায় হলা করিতেছে।

আমি একটা রিকশ ভাড়া করিয়া বাড়ীতে আসিয়া স্নান এবং বেশ পরিবর্তন করিয়া যেন পুনরায় বাহির হইলাম।

তা’র পর স্বকতলার তলা হইতে সেই গোবিন্দ-রাথার বাড়িগুলার নম্বর লেখা কাগজটা বাহির করিয়া একেবারে লাল-বাজারে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে বলিলাম, এবং বাড়িগুলার ঠিকানাও দিলাম। পুলিশ সাহেব ভারি খুশী হইয়া বলিলেন, “Thanks very much Baboo—if everything is all right, the government will not forget you—now I will see to the necessary arrangements—all right, good night Baboo—”

অন্ত-একটু-ভবিষ্যতের সুখের পরামর্শ আমি ভয়পূর। আমাদের কাগজের আপিসে আসিয়া মন্ত বড় এক রিপোর্ট লিখলাম।

“মিরজা সাহেব !! প্রসিদ্ধ কোকেনওয়াল !!

আজ সে বন্দি !! আজ সে কারাগারে !!

আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতাই এই

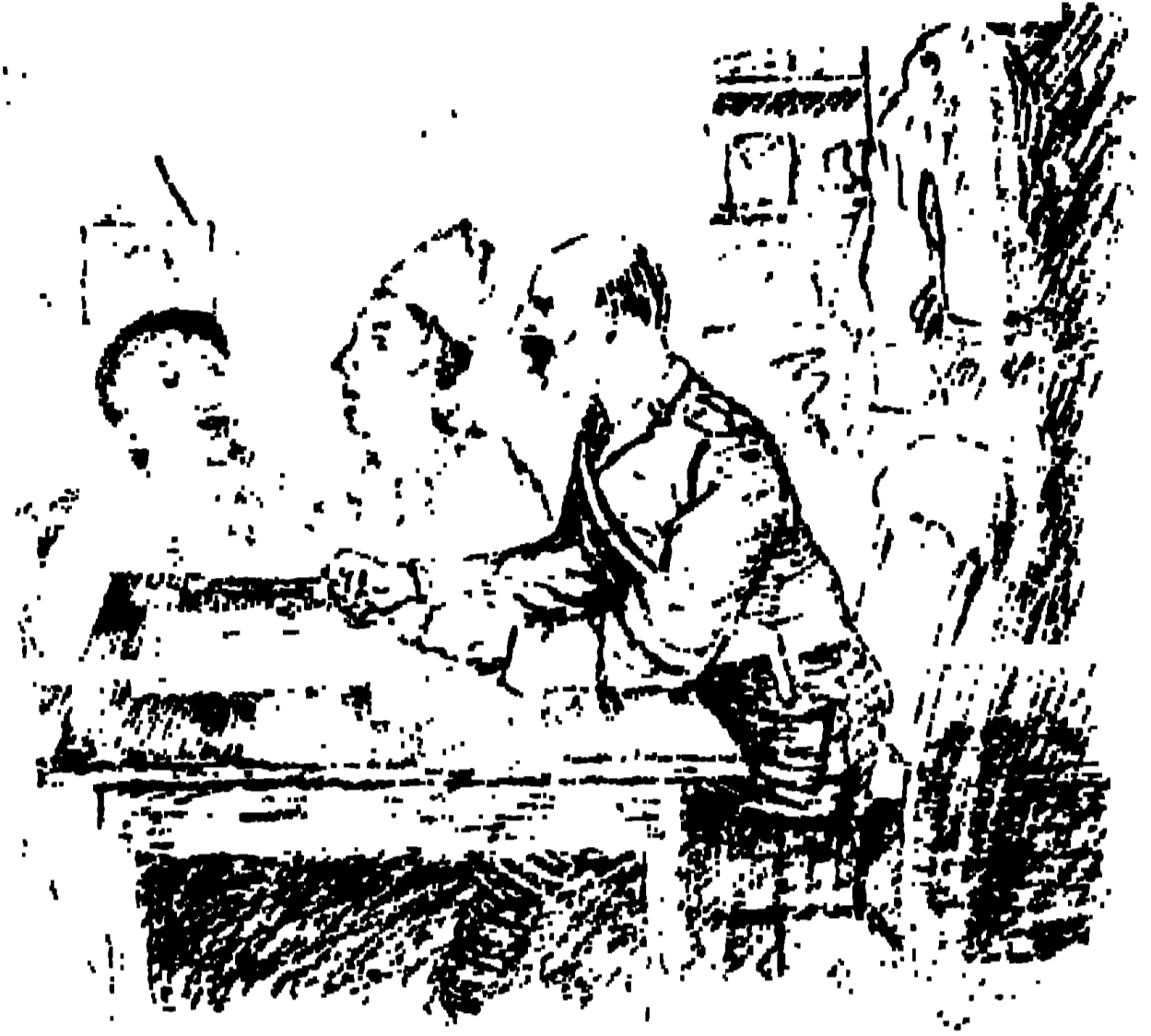
কার্যের জন্য দায়ী

১০০,০০০ টাকার

কোকেন ধৃত

উভয়টি অনেক কিছুই লিখিলাম।
তা'র পর মনের আনন্দ কোনো
প্রকারে দমন করিয়া বাড়ি চলিয়া
গেলাম। প্রাতঃকালে সকলে কেমন
অবাক হইবে তাই ভাবিয়া আমিই
অবাক হইয়া গেলাম। এক-বড়
খবরটা আমাদের আশ্রমে একজন
কম্পোজিটার ছাড়া আর কেহ জানে
না, এমন কি সম্পাদক মহাশয়ও না!

আমি গুম হইতে উঠিয়াই
মুখে সামান্য-একটু জল দিয়া
স্নান করিবার হইয়া পড়িলাম।
আমাদের কাগজ সেদিন তুচ্ছ করিয়া
বিক্রি হইতেছে। অল্প সব কাগজ,
বিশেষ করিয়া “রাজপথ” রাজপথেই
পড়িয়া আছে।



D— you liar— what the hell did you mean by bluffing the police ?

বেলা দশটার সময় আশ্রমে পৌঁছিয়াই দেখিলাম
দুইজন কনেবল এবং একজন পুলিশ ইনসপেক্টর
বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখা-মাত্র তাহারা এক-
রকম ঘোর ক'ম্পি মোটরে বসাইয়া লালবাজার
লইয়া গেল। সেখানে কমিশনারের ঘরে প্রবেশ করিয়াই
দেখি সাহেব আশ্রমের মতন লাল হইয়া বসিয়া আছেন—
ঘরে আবে দুইজন লোক রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই
সাহেব টেবিলে এক প্রচণ্ড ঘৃণা মারিয়া বলিলেন “D—
you liar— what the hell did you mean by
bluffing the police like a fool ?

আমি অবাক হইয়া গেলাম! সাহেব এ কি বলিতে-
ছেন? তবে কি সব মিথ্যা?

ই, তাই।

সাহেব বলিলেন, “তুমি যে ঠিকানা দিয়াছ, তা'র ১নং
বাড়ী নাই, তাহা আজ এক বছর আগে ইম্প্রুভমেন্ট
ট্রাস্ট ভাঙিয়া দিয়াছে। ২নং বাড়ীতে থাকে একজন
রায় সাহেব। ৩নং বাড়ীতে গত মাস হইতে স্ত্রী বন্ধি
উল্লা, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলংগালা ভাড়া লইয়াছেন।
৪নং বাড়ী কোনোকালে ছিল না এবং সেই জগৎ
বর্জ্যমানের নাই।”

“পুলিসকে দাঙ্গা দেওয়া বিষয় অপরাধ। তোমাকে
ইহার জন্য বিষয় শাস্ত লাভ করিতে হইবে।”
আমি ক'দিয়া কোললাম। তা'র পর সাহেবের এবং
স্বার বন্ধিউল্লাব পায়ে পরিচয় বারবার ক্ষমা প্রার্থনা
করিলাম এবং অবশেষে ক্ষমা লাভ করিয়া লালবাজারের
খানার বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি,
অনিল দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। আমি ব্যাপারটা
এক্ষণে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম কিন্তু কোনো কথা না
বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আমি এখন আবার ৩৬৬ হইয়াছি। নবীজ্ঞ যে
আমারি নাম ছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে
পারে না।

দেশের দুঃখ দূর করিতে পারি নাই। দেশকে শত্রুর
হাত হইতে বাঁচাইতেও পারি নাই। এই লজ্জা এবং
দুঃখ আমার বুকে পাথরের মতন বসিয়া আছে। যা!
ওমা! তুমি আমার চিরদুঃখিনী মা-ই রহিলে। আমাকে
ক্ষমা করো মা!

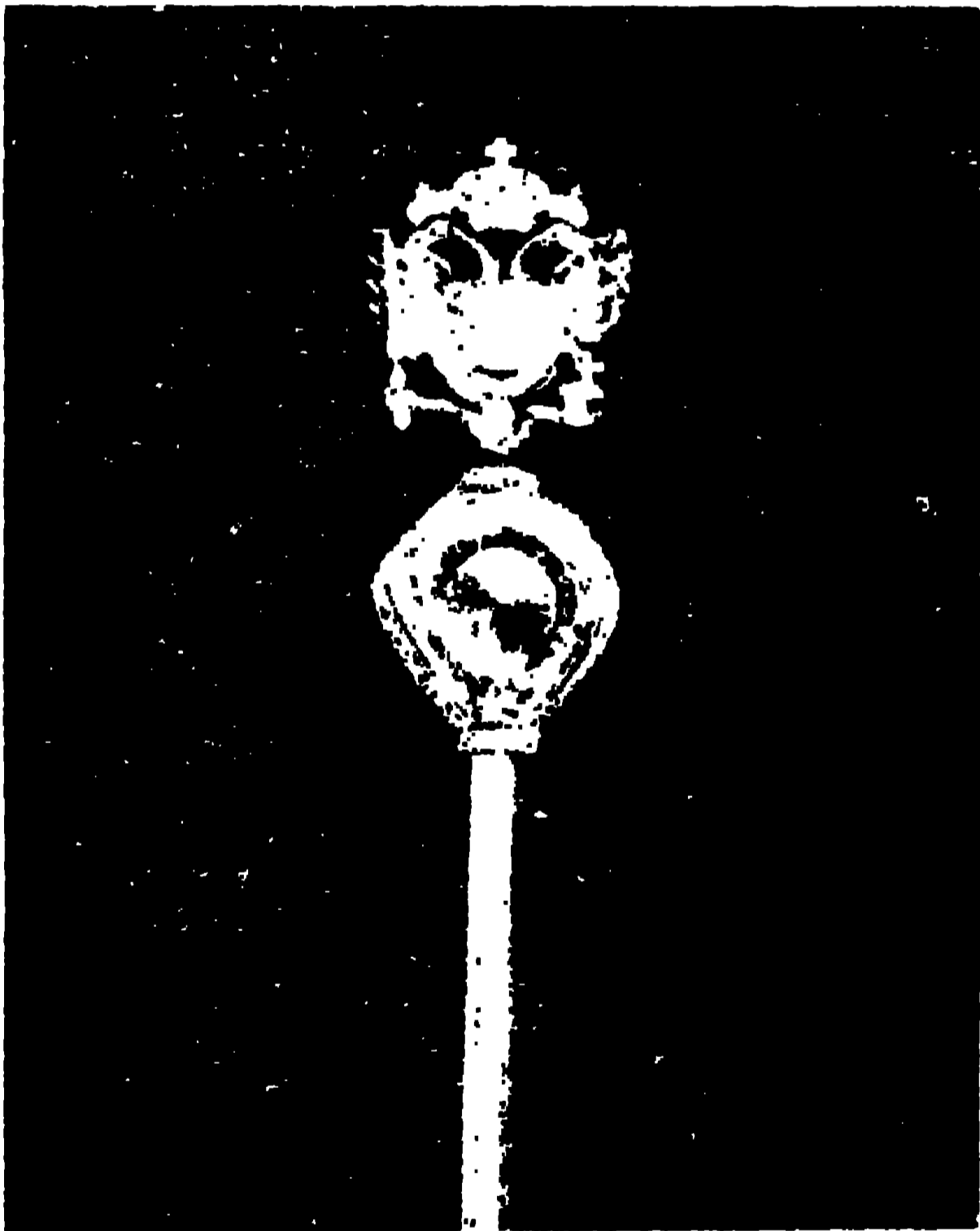
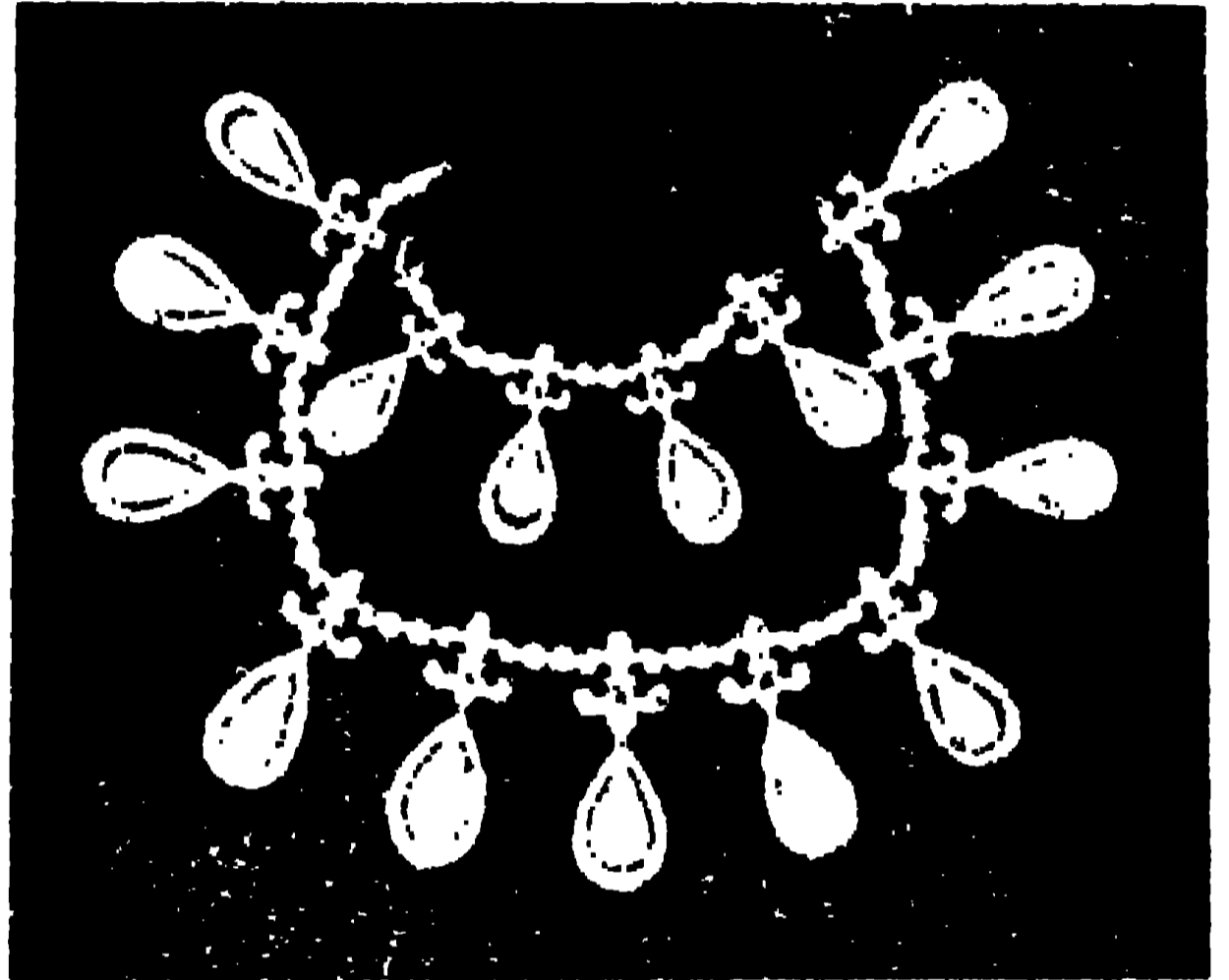
ইতিমধ্যে একদিন নকুড়-বাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি
বলিলেন—“‘পৃথিবীর’ সংবাদদাতার কাণ্ড শুনেছ হ্যা?
নবীজ্ঞ নাম?—লোকটা আমল গাধা।”



রুশ-সাম্রাজ্যের রত্নকোষ—

অনেকের ধারণা ছিল যে রুশিয়ার আয়ের পারিবারিক ও রাজস্বের জলস্রাবগুলি উচ্চাঙ্গের দুর্দশার সময় হাজার হাজার ক্রিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অন্য পিঠাতে যে সেগুলি কালো ভানেই আছে। এখন তাই রুশ প্রজাতন্ত্রে সম্প্রতি। এরটি জলস্রাবের চিত্রে দেওয়া হইল।

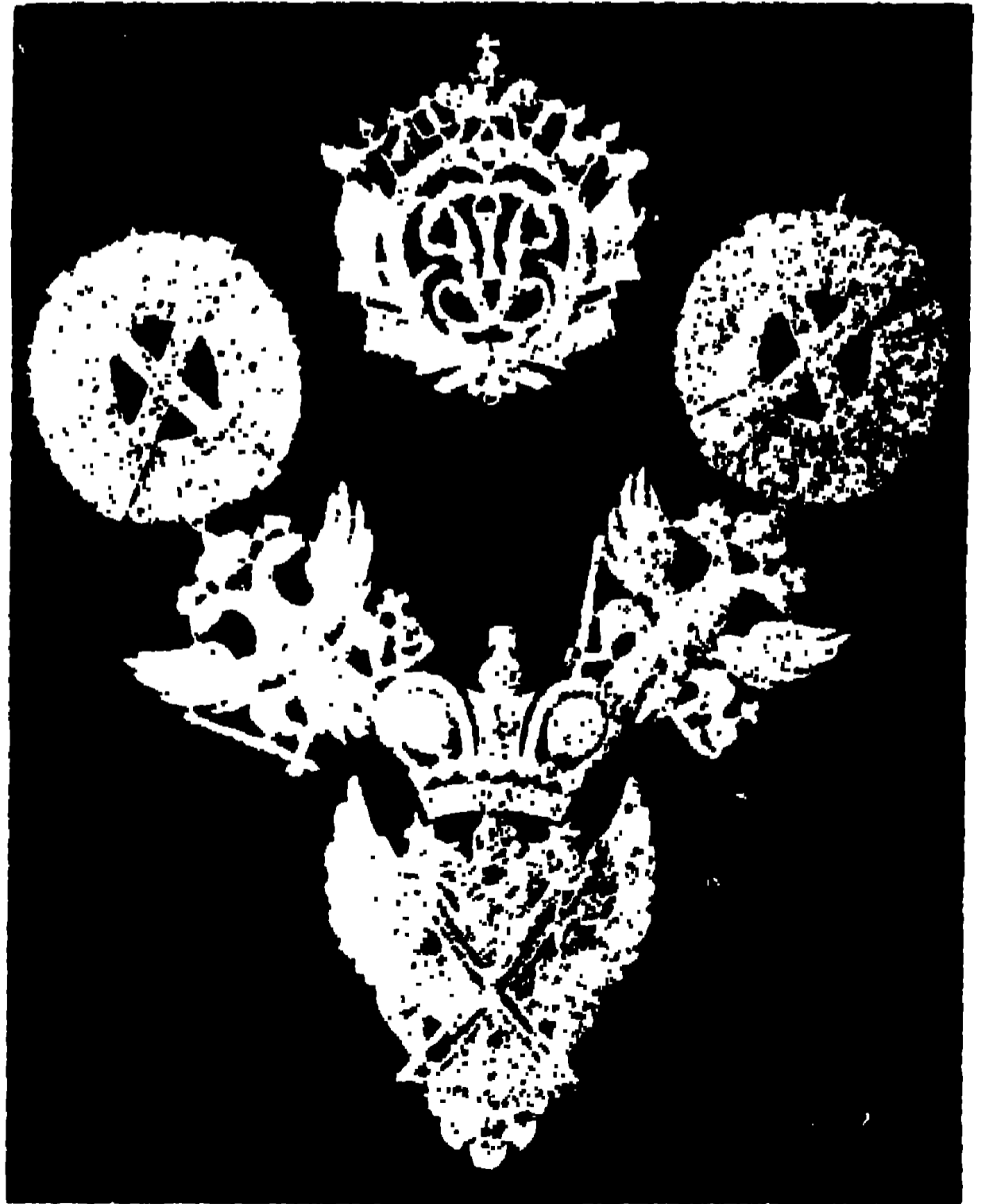
১। রানদণ্ডের মাথা। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। ১০০ ক্যারিট ওজন "খেলক" নামক হীরক উহার শিবোভূষণ। এই হীরক-সমূহকে বহু গল্প প্রচলিত আছে।



রানদণ্ডের মাথা

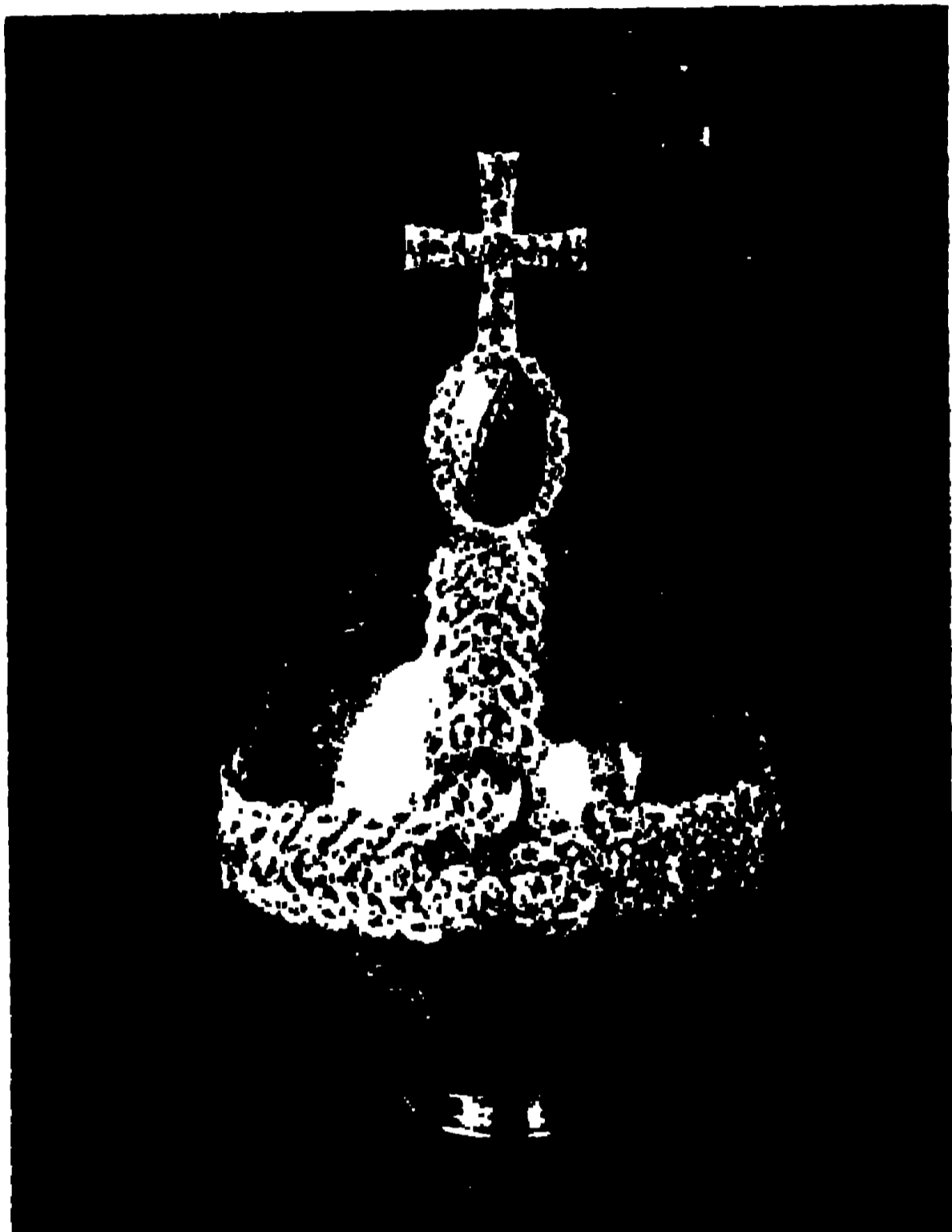
২। মুক্তাকৃষ্টি—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মুক্তাগুলি ডিখাকৃতি ও অতুল্য ; ওজন আনু ৩২০ ক্যারিট। ভারতীয় পুরাতন হীরকের সহিত মুক্তাগুলি গাঁথ: হইয়াছে। হীরক ওজন ১৩১ ক্যারিট।

৩। সেন্ট অ্যালেক্সে সাম্রাজ্যের চিত্ররূপে ব্যবহৃত অলঙ্কার। উহা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। হীরকগুলির অশুভ জ্যোতি: ; সিংহলের হীরক। ওজন ১০৪২ ক্যারিট।



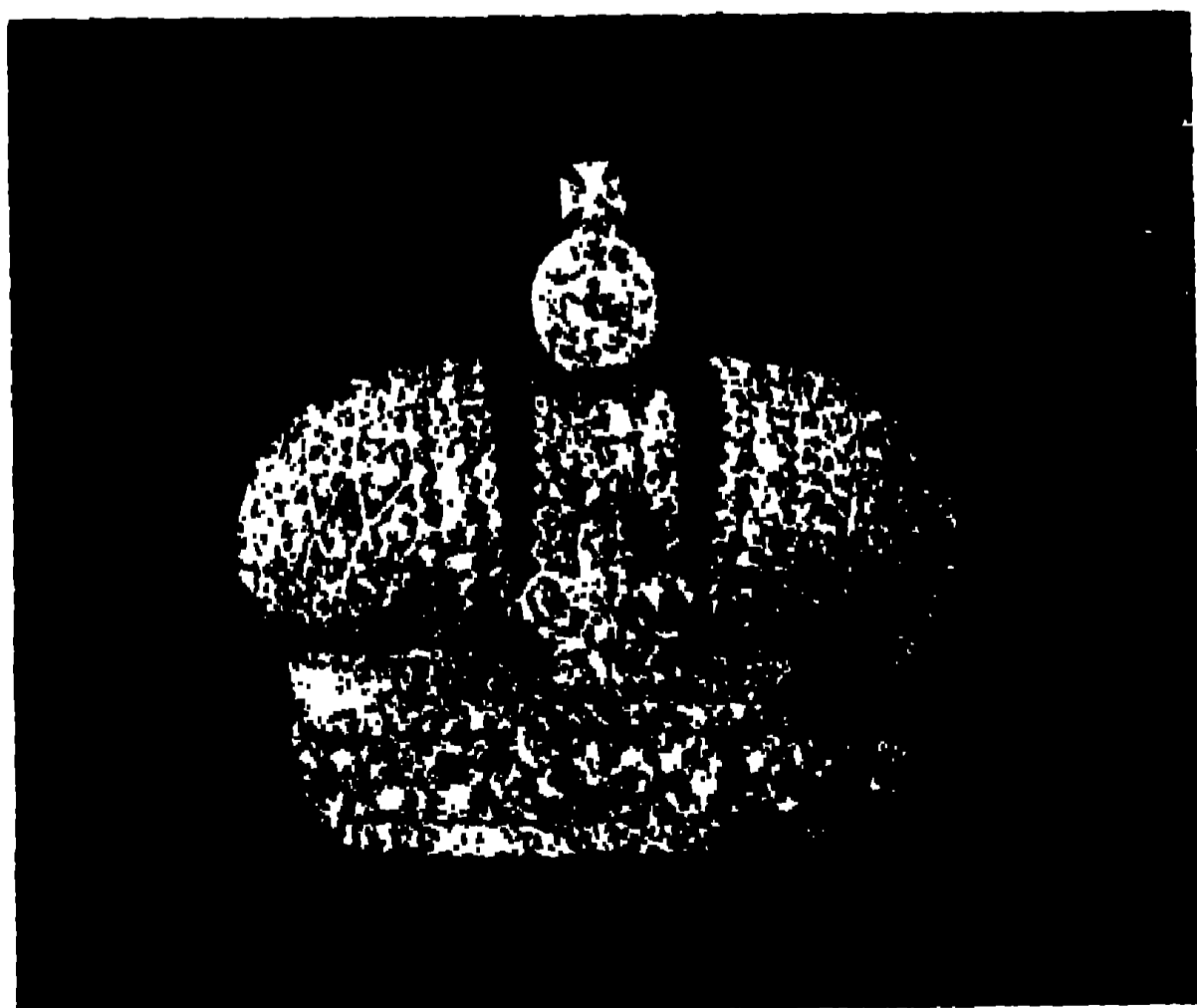
সেন্ট অ্যালেক্স সাম্রাজ্যের চিত্ররূপে ব্যবহৃত অলঙ্কার

৪। রাজচিহ্নরূপ হিরণ্ময় গোলক। ইহা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। গোলকটি রক্তাক্ত স্বর্ণে নির্মিত ও হীরকমালায় বেষ্টিত। মধ্যমণিটি ভারতের গোলকোত্তা হইতে আনীত হীরক। শিরোমণি সিংহলের একটি ২০০ ক্যারেট ওজনের ইন্দ্রনীলমণি। মণিটির সৌন্দর্য অতুলনীয়।



রাজচিহ্নরূপ স্বর্ণ-গোলক

৫। ছোটো রাজমুকুট। সম্রাট প্রথম পলের সময় তাঁহার আদেশে নির্মিত হয়। হীরকগুলি ভারত ও ব্রিটনের। ওজন ৫৮৪ ক্যারেট।



ছোট রাজমুকুট

৬। সম্রাটের শ্রেষ্ঠ মুকুট। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে মণিশিল্পী ডুভাল কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা ভারতের প্রাচীন হীরকদামে শোভিত। হীরকের



রাজসভার বড়মুকুট

ওজন ২৮০৫ ক্যারেট। শীর্ষদেশে ৪০২ ক্যারেট ওজনের একটি রূপমণি ("Spinelle Virgin") ও দুই সারি বড় মুক্তা আছে।

আবদুল করিম—

সরকার স্বাধীনতার জন্য যে বীর পত চারবছর হইতে ইউরোপীয় দুইটি মহাশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন তাঁহার নাম আবদুল করিম। শব্বরের কাগজের সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয় যে ফ্রান্স এবং স্পেন রীকদের প্রায় পরাজিত করিয়া আবার দামদে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সত্যিকার বাণ্যার বোধ হয় একটু অস্ত-রকমের হইবে। এই শীতকালের বৃষ্টির জন্য ইউরোপীয় এবং রীকীয় দুই পক্ষই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ করিয়াও স্পেন এবং ফ্রান্স রীকদের কাবু করিতে পারে নাই। রীকেরা প্রথমে স্পেনের সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু যখন স্পেনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন তখন ফ্রান্স বাজে অজুহাতে রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স বলে যে



আবদুল করিম

শেনের পরাজয় হইলে ফ্রান্স, অধিকৃত মরক্কো-প্রদেশে গোলমাল হইবে এবং তাহাতে নানা-প্রকার অশান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। পাছে পরে অশান্তি হয় এবং রীকগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে, এই ভয়ে ফ্রান্সই পূর্বে হইতেই রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। যুদ্ধের শেষ কিস কি হইবে বলা শক্ত, তবে রীকগণ তাহাদের বিন্দুমাত্র শক্তি থাকিতে যে আবার যেতাদের দাসত্ব মানিয়া লইবে তাহা মনে হয় না। জগতের সমস্ত মুসলমান জাতি রীকদের এই চুক্তিনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, অনেকে সাহায্যও করিতেছে।

রীক ঘোড়সওয়ারগণ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার বলিলেও হয়। ইহারা "Guerilla Warfare" করে—তাহার কারণ ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইহাদের হঠাৎ আক্রমণে শেন এবং ফ্রান্সের সৈন্তসমূহ নাস্তানাবুদ হইতেছে। ইতিপূর্বে আবদুল করিমের অনেক ছবি আমরা প্রকাশ

করিয়াছি। এইসঙ্গে তাহার যে চিত্র দিলাম তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে গৃহীত। যেন পাহাড় হইতে বড়ের বেগে অবতরণ করিতেছে—এইপ্রকার একদল রীক ঘোড়সওয়ারের ছবি হেত্তরা হইল। আমেরিকা হইতে একদল বিমানচারী ইহাদের দমন করিবার চেষ্টা আসিয়াছে।

কপি-পথ—

আফ্রিকায় এমন সমস্ত জঙ্গল আছে সেখানে বায়ু দুয়ের কথ-পূর্ব্বের আলোও প্রবেশ করিতে পারে না। এইসমস্ত জঙ্গলের মধ্যে কোটি-কোটি বৃক্ষলতাাদি এমন ঘনভাবে অবস্থিত যে কোনো পকারেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। এইপ্রকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে সামান্ত সামান্ত স্থান পরিষ্কার করিয়া তাইরা নরপাদক অস্ত্রাদির বাস তাহাদের খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টার মাঝে-মাঝে জঙ্গলের বাহিরেও যাওয়া-আসা করিতে হয়। সেইজন্ত তাহারা মাটি হইতে বহু উচ্চ বৃক্ষলতাাদি মধ্য দিয়া, যে-পথ দিয়া বাঁদররা যাওয়া-আসা করে, সেইপথ ব্যবহার করে। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, একজন অসভ্য জাতীয় মানব এইপ্রকার একটি পথ লতাপাতা দিয়া মজদুত করিয়া তৈয়ার করিতেছে। এক-একটি পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু ক্রোশ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গলবাসী ভিন্ন-ভিন্ন জাতিরা এই পথের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ভাবের



রীক ঘোড়সওয়ার পাহাড় হইতে শত্রু আক্রমণ করিতেছে



বুকাতির: মাঝখান দিরা বোলানো-পথ, মাটি হইতে বহু উচ্চে এই পথ বুলানো থাকে, ইহাকে সেতু বলাও চলে

আদান-প্রদান করে। পথটিকে একটি সেতু বলিলেও চলে। ছবি দেখিলেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পিপীলিকার কথা—

পিপীলিকাকে আমরা সামান্য প্রাণী বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিষয় কিছু চিন্তাও করি না। কিন্তু পিপীলিকাদের জীবন ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের জীবনকাহিনী এত বৃহৎ মানুস অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যজনক। বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণিতত্ত্ববিদ ডার জন লব বক্,

বলিয়াছেন যে, ইহাদের মাথাখের মধ্যে পিপীলিকাই বৃহৎ ইত্যাদিতে মানুষের সর্বাপেক্ষা মিকটে আসিতে পারে। লতন চিড়িয়াখানার একবার একটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়। বিষয়টি এই:—

“একদিন সোমবার সকালবেলায় দুইটি পিপীলিকার উপনিবেশের মাঝখানে একটি কাঠের টুকরাকে সেতুবন্ধন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল। এই দুইটি পিপীলিকা-উপনিবেশের একটি নতুন আর একটি পুরোনো। সেতু-নির্মাণ হইবার পরেই পুরোনো আবাসের একটি পিপীলিকা ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেতু পার হইয়া নতুন উপনিবেশে প্রবেশ করিল। সে আর প্রত্যাবর্তন করিল না। ইহাই এই দুই দল পিপীলিকার মধ্যে বৃহৎ কারণ হইল। কিন্তু একদল অস্ত্রদলকে হতভুত করিয়া আক্রমণ করিল না। পুরোনো আবাসের দৃশ্যটি পাকা বোঝা পিপীলিকা লুকাইয়া-লুকাইয়া সন্ত্রস্তের সীমানার প্রবেশ করিয়া বৃহৎ অস্ত্রদলকারী সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর বোধ হয় পিপীলিকা-আবাসের তিতর বৃহৎ-সত্তা বসিয়াছিল। খানক-পরে দেখা গেল যে সার্ববাদ্য হইয়া পুরোনো আবাসের সন্ত্রস্ত অস্ত্র আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। কোনো একর এলোমেলো ভাব নাই, সোলমাল নাই। কতকগুলি পিপীলিকা আশেপাশে ছোটো-ছোটো বায়ুর স্তূপ নির্মাণ করিতে লাগিল। পুরোনো আবাসের সন্ত্রস্ত বধন নতুন আবাসের সীমানার তিতর প্রবেশ করিয়াছে, তখন নতুন আবাসের একটি পিপীলিকা কোনো কারণে বাহ্যরে আসিয়াছিল সে ব্যাপার দেখিয়া তিতরে চলিয়া গেল, সকলকে সংবাদ দিতে। তাহার পর ভীষণ লড়াই আরম্ভ হইল। পিপীলিকার লড়াই হইলে কি হয়—সে ভয়ানক ব্যাপার! চারদিন চাররাত্রি ধরিয় লড়াই চলিয়াছিল। মাঝখানে খানকক্ষণ বৃহৎ হুগিত ছিল।

বৃহৎ স্তূপের নতুন আবাসের পল্টনে জরলাভ করিয়া পুরোনো আবাসের দলকে সেতু পার করিয়া ডাড়াইয়া দিল। বাহ্যরা আতঙ্ক হইয়া পাড়িয়া হইল, তাহাদের সেতুর নীচে কাদাভলে কেঁলিয়া দিল, অনেককে অস্ত্র-ক্ষেত্র করিয়া মারিয়া ফেলিল। পুরোনো দলের কয়েকজনকে দাস করিয়া লইয়া নতুনদল সমীরবে তাহাদের আবাসের তিতর প্রবেশ করিল।

পিপীলিকা আশ্চর্য্য স্তূপটি। পিপীলিকাদের এক-একটি বাড়ি বা আবাসস্থল দেখিলে অর্থাৎ চটই বা ষাটতে হয়। পূর্বে আফ্রিকাতে পিপীলিকা নির্মিত প্রায় ২০ ফুট উচ্চ উচ্চ মাটির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসকল নির্মাণ করিতে পিপীলিকাদের কোনো একর হাতিয়ার নাই—তাহারা তাহাদের অস্ত্রপ্রত্যয়ের সাহায্যেই এইসকল নির্মাণ করে। আর্গানির মিউনিক্ মহরের বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ ডাঃ হার্বান্

কলেব যে পিপীলিকারা নাকি কথাও বলিতে পারে। আমেরিকাতে পেন্সিলভ্যানিয়ার শহাড়ে পিপীলিকা-সহর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহর অধিকাংশই মাটির ভলার নির্মিত হয়। সর্বাপেক্ষা বড় সহরটি ৩০ একর ভূমি ব্যাপিয়া আছে। ৩০ একর ভূমি ব্যাপিয়া পিপীলিকার ঘর। ব্যাপারটা কল্পনা করিলেই অবাক হইতে হয়।

পিপীলিকাদের মধ্যে সহবোধিতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। সার্ব জন লাবক একবার করেকটি পিপীলিকা ধরিতা তাহাদের মিষ্টমদ খাওয়াইয়া

তাহাদের ঘরের মাঝখানে চাড়িয়া দেন। মাতাল পিপীলিকাগুলি টলিতে লাগিল—এমন অবস্থায় তাহাদের জ্ঞান তাইরা এই কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় যেন অতিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পর মাতালদের জোর করিয়া ধরিতা আবাসে বন্ধ করিতা রাখিতা আসিল। এই ব্যাপারে আর একটী জিনিস লক্ষ্য করা হয়। মাতালদের মধ্যে করেকটি অপরিচিত পিপীলিকাও ছিল। তাহাদের ধরিতা পিপীলিকারা বিকটবর্তী মনে ছুঁয়াইয়া দিল।

পুস্তক-পরিচয়

বড়ের দোলা—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। বঙ্গবা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০ আনা। ১৩৩২।

উপস্থান। বাঙালীর সমাজে বালবিধবা-সমস্যা এক মহাসমস্যা; সেই সমস্যাই বইটিতে আলোচিত হইয়াছে। অমলার চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে—হিন্দুরমণীর স্বামীভক্তি ও ভয়গত সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষা ও আবহাওয়ার উদ্ভূত সনাতনদের প্রতি বিরোধ—এই দুইটি ভাবই ঘনঘন বর্ণিত হইয়াছে অমলার চরিত্রে। অমলা ছিল তেজস্বিনী; এই তেজের পাশেই তাহার এক কঠোর সত্যানুসরণ ছিল। এবং এই সত্যানুসরণের জন্যই সে কামান্দ রমেশের বশতঃ স্বীকার করিতে পারে নাই, অথচ তাহার হৃদয় ছিল স্বামীপ্রেমবিকিত সুতরাং প্রেমদুর্ভুক। অমলার মানসিক দৃষ্টি বেশ কুটিল। তবে অমলা ও রমেশের কথা-বার্তার অনেক কথা এত স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যাহা আরো সংক্ষেপে ও আত্মসে বলিলেও পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইত না। শব্দবাহুল্য এবং বর্ণনাবাহুল্যও বইটিতে স্থানে স্থানে আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’র ভাষাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ছাপা ও বাঁধান ভাল; কিন্তু নাম বেশী হইয়াছে।

শ্রীতাম্বুত—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকাল

মোহন সোম, ২১৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলিকাতা। আট আনা। ১৩৩১।

পদ্যে শীতা। পদ্যবন্ধ চলনসই। ধর্মতত্ত্ব কবিতার বাঁধিতে গেলেই কবিতা আড়ট হইয়া পড়ে; ইহাতেও সে দোষ আছে।

প্রফেসর-পত্নী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। এক টাকা। ১৩৩২।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ গল্পলেখক কোনান্ ডয়েলের চারিটি গল্পের অনুবাদ এই পুস্তকে আছে। লেখক ডাক্তার; সুতরাং ডাক্তারী গল্প তাহার মনোহরণ করিয়াছে,—তাহারই কল এই অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। বইখানি অনুবাদ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবে।

স্বামি-শীতা—শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী বিবৃত এবং শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত, বি-এ কর্তৃক সংস্কৃত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দশ আনা। ১৩৩২।

স্বামী পূর্ণানন্দের সাধনানুকূল জ্ঞান উপদেশগুলি উচ্চতাপূর্ণ গভীর ধর্মতত্ত্বের পরিচায়ক। পুস্তকখানি আমাদের ধর্মগ্রন্থপাঠ্যে স্থান লাভ করিবে।

গুণ

ধেরী—কবিতাপুস্তক। শ্রী কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীশ্রীমোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পোঃ মুক্তাপাড়া, ময়মনসিংহ।

এই পুস্তকখানি চাতে লইয়া দেখিলাম গ্রন্থকারের নামটি অপরিচিত। পাঠ্য বৌদ্ধ-পাঠ্যকে বাঙলা চন্দ্রানন্দ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস তাহার বইটিকে সনাইয়া রাখিলাম; এই কাব্যাত্মক বুলে, বর্তমানের চন্দ্রভাবতী কবিসম্প্রদায়ের মাসিক সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিকের সহায়তার অসহায় পাঠককে নির্ভর আশ্রয়ণ। একদিন বিখ্যাত কোমো কবিবন্ধু ষাঙ্গিরা বইখানি আমার টেবিলে দেখিয়া বলিলেন যে বইখানি তাঁহার চাটই; শুনিলাম বহুকাল পূর্বে ‘সৌরভে’ কৃষ্ণদাস বাবুর কবিতা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সেদিন হইতে কৃষ্ণদাস বাবুর লেখা সম্বন্ধ করিয়াও আর কোথায়ও দেখেন নাই বলিয়া দৃঢ় আছেন। এই পুস্তকে প্রকাশিত ছুইটি গাথারই একটি ‘সৌরভে’ প্রকাশিত হইয়া কাব্যমোহীর প্রশংসালভ করিয়াছিল। আমি কৌতূহলী হইয়া পুস্তকখানি পড়িতে বসিলাম; অল্পকালেই শেষ হইয়া গেল। বার বার তিনবার বইখানি পড়িলাম। দেখিলাম—বর্তমান যুগে এ এক অদ্ভুত সংঘটন; রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ বা ‘বিহার অভিলাষে’র পর এমন সুন্দর কিছু পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। তাব ও তাহার মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিলেও লেখকের কমতাগুণে তাহা তাহার নিম্ন হইয়া গিয়াছে। উপমা ও বর্ণনা সুস্বাভাবিক মত বহু—কোথাও এতটুকু আভিপ্রায় নাই; একেবারে সোজা সরাসরি হৃদয়কে অতিভূত করিয়া কলে। এই গাথা ছুইটির বর্ণনাও স্থানে স্থানে পুঁতবন্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্র-পরবর্তী বর্তমানকালের এই লাভল মার্কা; ‘সু-আবিল’ ‘সু-কিশোরী’ প্রভৃতির ধোয়াটে যুগেও এমন নিরেট জিনিষ কি করিয়া সম্ভব হইল সত্যই তাবিবার বিবরণ। আর একটী বিষয়ের কথা এই যে এই শক্তি সম্পন্ন লেখক এমন অগোচরেই বা রহিলেন কি করিয়া? এই অপরূপ কাব্যের স্থানে-স্থানে ছুই একটি লাইন উদ্ধৃত করিবার সোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বসন্তের

গুহা উন্মোচনী। মত্ত জনপদ-বাসী
বসন্ত উৎসবে, ছুটিত কানন পানে
আবীরে কুহুনে, রঞ্জিত বিচিত্র-বাস ;
জনপদবধু, নব চূড় মঞ্জরীয়ে
ছলারে অবশে মিলিত সেখার আসি,
অশোভের তল উঠিত নুগর হয়ে
নুপুর মিলনে কিঞ্চিণীর যিনি যিনি,
কল হান্তে গীতে, প্রিয়জন কঠোরনে
লভিত বিজ্ঞান নৃত্যশাস্ত কোন বালা ;
ছলিত তরুণ, প্রিয়ভূমি আবেষ্টিত
কণ্ঠে হিন্দোলার ;—

* *

হিমালীর

শেষে যবে জনপদ-বধু, দিন গনি
বাণিত দ্বিস, ভাবিত উঠিবে বাজি
নুকুলিত চূড় মঞ্জরীয়ে বেড়ি করে
বসন্তের চরণ মঞ্জীর—অমরের
গুহরনে, তবু যদি না কোটে অশোক
নুপুর লাঞ্চিত মোর চরণ আঘাত
করিতার কক্ষ মেহে তার ; ফুলে ফুলে
হৃদয়ার উঠিত সে হাসি ।

* *

দিনান্তে ডুবিল নুঘা ;

জলে কালো হারা, আকাশের পট হতে
নুহে পেস রক্ত রাগ রেখা ; মুখরিত
শব্দ খণ্টা মন্দিরে মন্দিরে ; ধীর বৃহ
সজ্জার বাতাস বহি জানে ধূপ গন্ধ ;
টটিনার মদীকুল ছাড়ি ।

* *

অতিবাহি বক পথ

পথিক বখন চাহে কিরি, মেখে সেই
ভক্ত ভাস্কর বন্ধ বালুরাশি দিবশেমে
হয়ে গেছে সোনা ; তারি মাঝে দুয়ে ওই
কুহু ভাব শোভা, জলের তরল দাঁড়ি,
ভালীবন হারা। সেইরূপ হলে মোর
আগিতেছে রেহীন শৈশবের কথা
অভীত স্ততির রঙে হইয়া রঙীন ।
তারি মাঝে হু এক দিনের আদরের
ভাব-শোভা, আনন্দের তরল কিরণ ।

এই ক্ষমতা সম্পন্ন কবিকে আমরা সাদরে বাঙ্গলার কাব্য-ক্ষেত্রে
আহ্বান করিতেছি, তিনি গোপনে থাকিয়া যেন আর আনাদিপকে
বঞ্চিত না করেন ।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

নোঙর-ছেড়া নৌকা—শ্রীচক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । রায়
এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক ২০-২ এ ফারিসন রোড হইতে
প্রকাশিত । মূল্য ২।০ । পৃঃ ৩৩৮ (১৩৩২)

সুপ্রসিদ্ধ উপভাস-লেখক চক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আর
নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক । শ্রীযুক্ত কুতাবাতেই-লিখিত সোনো-
গুবোকায়ে (বর জামাই) নামক উপভাস অবলম্বনে লিখিত । চক্র-বাবুর
লিপি চাডুৰ্য্যে চরিত্রগুলি হৃদয় ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । বইখানির
চাপা, বাখাই প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা মনোরম হইয়াছে ।

উপল-খণ্ড—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী । প্রকাশক

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মুক্তাগাছা, বরননসিংহ । ছয় আনা । ১৩৩২ ।

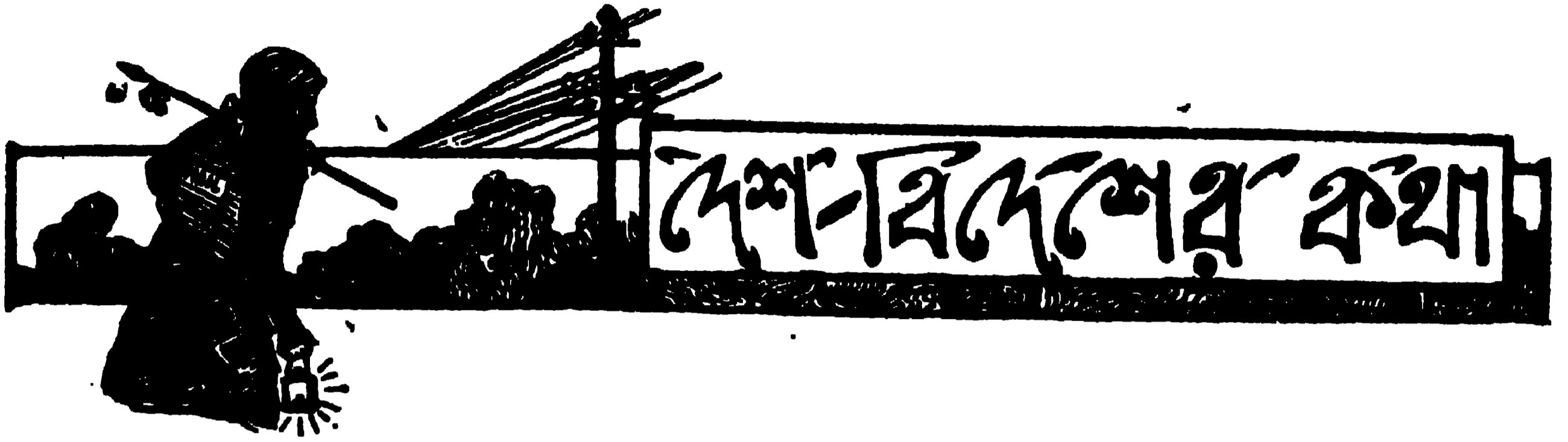
কবি এবং কাব্য, চিত্র, গীতি-কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি চক্র কলা
সম্বন্ধে লেখকের চিন্তাগুলি অতি সংক্ষেপে ও সংবন্ধের সহিত বিবৃত
হইয়াছে । আলোচনা দীর্ঘ নয়, কিন্তু হৃদয়, সুবিশুদ্ধ, কবিত্বগর্ভ,
কবিত্বটির পরিচায়ক । চিন্তার নূতনত্ব আছে । উপলখণ্ডের-বতোই
লেখকের হৃদয় ভাবাবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে ।

অমর

গোলাপের হাসি চুরি ক'রে ক'রে
শিল্পী এঁকেছে ছবি ;
গোলাপের ভাবা গানেতে গাঁথিয়া
কবিতা লিখেছে কবি ;—
শিল্পীর ছবি দেখেছে সবাই,
মুগ্ধ হ'য়েছে সবে—
মুগ্ধ হ'য়েছে কবির গানের
ছন্দ-মুখর রবে ।

কিন্তু কোথায় সে গোলাপ হার,
যার এত হাসি গান,—
বৃহৎ জীবন বৃহৎই তার
হ'য়ে গেছে অবসান !
আনন্দ তার শিল্পী ও কবি
রেখেছে রঙীন ক'রে,
বেদনা তাহার, সজ্জা আধারে
ধূলিতে পড়েছে ঝরে !

—বনকুল



বাংলা

বাংলার অবস্থা—

ভারতের এক সময় কত সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। একপে বিশেষের তুলনার আশায়ের বেশের কি ছুঁচুনা তাহারই একটা তালিকা সহযোগী বরিশাল-হিঁওবী হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

১। শিকিডের হার শতকরা, জাপান ৯৭, আমেরিকা ৯৫, ইংলও ৯৭, ভারত ৫২, বাঙ্গালা ৯৭।

২। বৃত্ত্যরহার হাজারকরা, জাপান ১৫৩, ইংলও ৯৮, আমেরিকা ৮৮, ভারত ৩০, বাঙ্গালা ৩০।

৩। শিক্ত-বৃত্ত্য—হাজারকরা জাপান আমেরিকা ৬৫, ইংলও ৬৬, ভারত ২৭, বাঙ্গালা ২১৩।

৪। গড়পত্রতা আয়—বৎসর, ইংলও ৫০, আমেরিকা ৫৬, জাপান ৪৭, ভারত ২২।

৫। জনপ্রতি ধন—ইংলও ৩৫০০, আমেরিকা ৭৬৪০, জাপান ২৮৬০, ভারত ২৫০, বাঙ্গালা ৪২০।

৬। জন প্রতি দৈনিক আয়—ইংলও ৬৫০, আমেরিকা ১৪১০, জাপান ৪১০, ভারত ১১০, বাঙ্গালা ১১০।

৭। বাঙ্গালা-দেশের শত করা ৯৪ জন গ্রামেই বাস করে। সহরে মাত্র শতকরা ৪৬ মাত্র বাস করে।

আসামে বৃত্তা—

ভিক্রমচন্দ্রের লালিকা জাবরা নৌজা বার বার ব্রহ্মপুত্রের বস্তার ভাসিরা বাওরাতে ঐ-হানের রবি-শস্তের বিশেষ কতি হইয়াছে। কয়েক বৎসর বাবৎ প্রায় প্রত্যেকবারই এই অঞ্চলের ঐ-প্রকার কতি হইতেছে। নদীর ধার দিরা প্রায় ৫০০০ একর জমি জলে ডুবিরা গিয়াছে। ঐ-হানের লোকেরা সমবেতভাবে জেলার ডেপুটী কমিশনারের কাছে খাজানা মাপের জন্ত আবেদন করিয়াছে।

বিশ্বভারতী-সংবাদ—

নবনগরের মহারাণী জাম সাহেব, বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের অটো-লিকা নির্মাণ করে দ্বিতীয় কিত্তিতে মণ হাজার টাকা ঐবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ইংলও বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর মৃত্যু—

ইংলও-প্রবাসী সাহিত্য-সেবী ঐবৃত্ত সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয় গত ১৪ই নভেম্বর বোর্নহাউথে নিজ ভবনে বেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নানা ভাবাবিধি ছিলেন। আরবী এবং পারসী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু আয়ুর্বেদ এবং বোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১৩ সালে লন্ডনে চিকিৎসক-মণ্ডলীর যে বিদ্য-সম্মিলন হয় তাহাতে মিত্র-মহাশয় হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। ডেকান্ পোস্ট নামক একখানি প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র

তিনি নিজাম রাজ্য হইতে পরিচালনা করিতেন। ১৯০৫ সালে তিনি ইংলও গমন করেন। ইংরেজী, বাংলা, পারসী এবং উর্দুতে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হুগলী কোরগর মন্দির মিত্র-বংশে সিদ্ধমোহনের জন্ম হয়।

মেমারি ইন্সটিটিউট ও এ্যাটি-ম্যালেরিয়াল সমিতি—

কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট না হইয়া পরস্পর সহ-বোণীতার সাধারণ হিতকর কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে মেমারি ইন্সটিটিউট ও এ্যাটি-ম্যালেরিয়াল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ হিতকর কার্যে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত শারীরিক ও মানসিক বাহ্যের উন্নতির প্রতি ইহার প্রধান লক্ষ্য। সত্যগণের শারীরিক বাহ্য অকুর রাখিবার জন্ত তাহাদের মধ্যে ব্যাধিমাধি বহিগৃহ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেহের পূর্ণবাহ্যের উপরই সাধারণ হিতকর কার্যের প্রবৃত্তি নির্ভর করে অতএব শারীরিক ও মানসিক বাহ্যের নিয়ন্ত্রিত পূর্ণবাহ্য আনিবার জন্ত সংগণের মধ্যে ধর্মবিষয়ক কতিপয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাধারণের শারীরিক বাহ্য-রক্ষা করিবার জন্ত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও মহামারী প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদেরও শারীরিক বাহ্য ও পূর্ণবাহ্য আনয়ন করিবার জন্ত সমিতি ব্যাধিমের উৎসাহ দিয়া লাইব্রেরী স্থাপনপূর্বক জ্ঞান ও ধর্মবিকাশের জন্ত কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রমিক বিদ্যালয়—

বেঙ্গল স্কুল ওয়ার্কস এসোসিয়েশনের পরিচালকরা কলের কর্তৃতারী ও তাহাদের সম্মান-সম্মতিদের লেখা-পড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা ও রাত্রে ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত বিদ্যালয় দুইটি খোলা হয়। স্থানীয় চটকলের এবং অন্যান্য কলের অনেকগুলি কর্তৃতারী ও তাহাদের ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। বেতন বাবদ ছাত্রদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না। সকলেই এখানে বেতনে পড়িতে পার।

সমাজে নিগৃহীতার স্থান—

সম্প্রতি রংপুরের নিগৃহীতা রমণী সুহাসিনী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। যে অবস্থা এবং যে মনোভাব লইয়া তিনি বাস করিতেছিলেন তাহাতে মনে হয় না যে তাহার মৃত্যু স্বাভাবিক। সুহাসিনীর অত্যাচারের কাহিনী সবাই জানেন। তাঁর বস্ত্র ও স্বামী উন্নতির পরিচয় দিরা তাহাকে পুনরায় সংসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কলে কি হয় তাহা সুহাসিনীর নিয়ন্ত্রিত চিঠিখানাতেই স্পষ্ট কুটির উঠিয়াছে। চিঠি-খানি নারী-রক্ষা-সমিতির সম্পাদক ঐবৃত্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নিকট মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে লিখিত।

“নিবেদন এই যে, পিতা, ভগবান আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ আপনাদের। আপনারা যে উপকার করিয়াছেন



বিলাতে আয়ুর প্রত্যাশা বৃদ্ধি

বিলাতের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীর প্রধান চিকিৎসাকর্মচারী ডাক্তার জর্জ নিউম্যান অল্পদিন হইল বলিয়াছেন, যে, বর্তমান সময়ে বিলাতের শিশুরা গড়ে তাহাদের পিতামহদের চেয়ে বার বৎসর বেশী বাঁচিবার আশা করিতে পারে। উহার মতে ইহার প্রধান কারণ এই, যে, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার তুলনায় ইংরেজরা মুক্ত বাতাসে অধিকতর সময় যাপন করে; খোলা জায়গায় নানা প্রকার খেলা বেশী করে; তাহাদের আহাৰ্য্য ও পরিধেয় আগেকার চেয়ে ভাল, পরিমাণে বেশী ও স্বাস্থ্যবর্ধক, তাহাদের মধ্যে পানদোষ আগেকার চেয়ে কমিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের অবসর-সময় আগেকার চেয়ে সুবিবেচনার সহিত একরূপভাবে যাপন করে যাহাতে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে।

ভারতবর্ষে আয়ুষ্কালের প্রত্যাশা বাড়িতেছে না কমিতেছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানই হয় না। সেন্সু রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে, আয়ুর প্রত্যাশা বাড়িতেছে না। এদেশে যাহুব গড়ে তেইশ-চব্বিশ বৎসর বাঁচে, জাপানে ও ইংলেণ্ডে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ। আমাদের আয়ু-হ্রাসের কারণ গুহামধ্যে নিহিত নহে। কিন্তু কারণ জানা থাকিলেও সমুচিত প্রতিকার-চেষ্টা কই হইতেছে?

ধনী আমেরিকানদের দানশীলতা

কয়েক মাস পূর্বে আমেরিকার ছদ্মন ধনী একদিনে জন-হিতসাধনের জন্য মোট ৫,২৫,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ মোটামুটি বোল কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঐ দেশের মিটারগারী ডাইজেস্ট্-নামক সাপ্তাহিক

পত্র আমেরিকার ধনী লোকদের (অধিকাংশ স্থলে গত দশ বৎসরে) দানের নিম্নমুদ্রিত তালিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

নাম	ডলার-দানের পরিমাণ।
জন ডি ককগার	৫৭৫০০০০০
ম্যাগ কার্ণেলী	৩৫০০০০০০
লীডল্যান্ড কাটগেভর্ন (বিবিধ)	১৫০০০০০০
হেনরী সি স্ট্রিক	৮৫০০০০০০
মিষ্টন এন্স হার্বনী	৬০০০০০০০
জর্জ ইস্টম্যান	৫৮০০০০০০
জেমস্ বি ডিউক	৪১৫০০০০০
মিসেস রাসেলসেন	৪০০০০০০০
হেনরী কিপল	৩১৫০০০০০
বেঞ্জামিন স্ট্যান	৩০০০০০০০
জন স্ট্রাট কেলেভি	৩০০০০০০০
জন ডব্লিউ স্ট্যানিং	২০০০০০০০
এডওয়ার্ড সি কনলিস	২০০০০০০০
জে আর ডি লামার	১৬৫০০০০০
মিসেস সটিকেন্ ডি হার্কনেস	১৬০০০০০০
অগাস্টাস ডি জুইলিয়ার্ড	১৫০০০০০০
হেনরী ই হাষ্টিংস	১৫০০০০০০
জর্জ এক বেকার	১২০০০০০০
জে, সি, মর্গান	১০০০০০০০
মিসেস মিলবার্গ এণ্ডার্সন	১০০০০০০০
ডব্লিউ জে এবং সি এইচ মেরো	৮০০০০০০০
পি এন্স এবং টি কোল্যান্ড ডু পন্ট	৮০০০০০০০
জে অগডেন্স আমার	৬০০০০০০০
জর্জ আর হোরাইট	৫০০০০০০০
ডব্লিউ এ ওয়াটবোর্ট	৪৫০০০০০০
অগাস্ট চেকনার	৪০০০০০০০
জন জেকব রাস্টন	৪০০০০০০০
লটা ক্রাব্‌লী	৪০০০০০০০

মোট দান

১৬২৯০০০০০০ ডলার

এক ডলার তিন টাকা অপেক্ষা কিছু বেশী।

আমেরিকায় ধনীদের সংখ্যা ও ধনের পরিমাণ খুব বেশী সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্য খুব বেশী হইলেও ধনী যে একেবারে নাই তাহা নয়। যেখানে আমেরিকার ধনীরা লোকহিতার্থে কোটি, নিষুত বা লক্ষ টাকা দেন,

সেখানে ভারতীয় ধনীরা লক্ষ, অর্ধ বা হাজার টাকা জনহিত-সাধনের জন্য দিলে দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

যুদ্ধে কাহাদের লাভ হয়

দেশে-দেশে যুদ্ধ হইলে মরে বেশীর ভাগ সাধারণ সৈন্তেরা; সম্রাট, রাজা ও নানাশ্রেণীর সেনা-নায়েকেরা শতকরা তত মরে না। আবার যুদ্ধান্তে বোকারদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে বড়-বড় সেনাপতি প্রভৃতিই খুব বেশী টাকা বখ্শিশ পায়, সাধারণ সৈনিকেরা সামান্য পেনশন্স পায়। অর্জ ল্যান্সবেরি-কর্ভুক প্রকাশিত একটি তালিকায় দেখিতেছি, গত মহা যুদ্ধে সম্পূর্ণ অক্ষয়ীভূত সৈন্তদিগকে পেনশন্স দেওয়া হইয়াছে সপ্তাহে ৪০ শিলিং, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্তদিগকে ৪০ শিলিং, উন্নয়নগ্রস্তদিগকে ৪০ শিলিং, অক্ষয়ীভূতদিগকে ৪০ শিলিং, দক্ষিণহস্তহীনদিগকে ৩৬ শিলিং, পদহীনদিগকে ৩২ শিলিং, বৃকীভূতদিগকে ২৮ শিলিং, ইত্যাদি। কিন্তু র্যাডমিরাল অর্থাৎ নৌসেনাপতি বেটা পাইয়াছেন একলক্ষ পাউণ্ড, র্যাডমিরাল জেলিকো পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, ফীল্ড মার্শ্যাল হেগ্ একলক্ষ পাউণ্ড, ফীল্ডমার্শ্যাল ক্রেক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, ইত্যাদি। এক শিলিং মোটামুটি বার আনার এবং এক পাউণ্ড পনের টাকার সমান। মিঃ ল্যান্সবেরী বলেন, এই বৃহৎ বখ্শিশগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া বা অন্যরূপে খাটাইয়া পুরকৃত ব্যক্তিগণ স্বয়ং ও পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সাপ্তাহিক পঞ্চাশ হইতে একশত পাউণ্ড পেনশন্স ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অন্যদিকে গরীব অক্ষয়ীভূত সৈনিকদের সামান্য পেনশন্স কেবল তাহারা আত্মবিশ্বাস পাইবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের ১৯২৩ সালের রিপোর্ট অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ সাল শেষ হইতে বাইতেছে। সুতরাং ১৯২৩ এর রিপোর্ট সঘর প্রকাশিত হইয়াছে বলা যায় না।

১৯২৩এ বৎসরে ১১,৮৫,৭৩১ জনের মৃত্যু এবং ১৩,৯৩, ৪১১ জনের জন্ম হইয়াছিল। জন্মের হার হাজারকরা ২৩.৯ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে জন্মের হার ইহা অপেক্ষা কম ছিল; ভারতবর্ষের অন্তঃসকল প্রদেশে জন্মের হার বাংলা অপেক্ষা বেশী ছিল। বৎসর মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২৫.৫। ছয়টি প্রদেশের মৃত্যুর হার বাংলা অপেক্ষা কম ছিল।

১৯২৩ সালে এক বৎসরের কমবয়স্ক ২৫৩৬৯৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২২ এ ঐ বয়সের শিশু মরিয়াছিল ২৩২৪৫১টি। সুতরাং ১৯২৩এ শিশু-মৃত্যু শতকরা ৫.৯ বাড়িয়াছিল।

জন্মের .বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী মাতৃমর মরে। ১৯২৩ সালে যত্নালোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের মৃত্যু হয় জন্মে। ম্যালেরিয়া-জন্মে মৃত্যু ১৯২২এ ৫৪০৪৬৩ হইতে কমিয়া ১৯২৩এ ৫৩৯৮২২ হয়; কিন্তু টাইফয়েড, হাম, কালাজর প্রভৃতিতে মৃত্যু বেশী হয়। কালাজরে মৃত্যু ভীষণ-রকম বাড়িতেছে। উহার সংখ্যা ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ এ যথাক্রমে ১৫৫২, ১৫৩১ ও ৪৫৬৫ ছিল। সম্ভবতঃ আরো বেশী লোক কালাজরে মরে, কিন্তু ঠিক রোগ নির্ণয় হয় না।

বর্তমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে জন্মে মৃত্যু অনেক কমিয়াছে। পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া-জন্ম বাড়িয়াছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর বলেন, ইহার কারণ কচুরী-পানার বৃদ্ধি, গ্রাম্য উচ্চ পথের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং কোন-কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ মৈমনসিংহে, রেলওয়ের বিস্তৃতি। কচুরী-পানার বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায় বিল ও খালসকলের মধ্য দিয়া ভূভাগের উপর জল চলাচল অনেক কমিয়াছে, এবং জলের গতি কমায় পানার বাড়িয়াছে। গ্রাম্য পথগুলি চারি পাশের জমি অপেক্ষা উচ্চ আঁলের আকার ধারণ করে। তাহাতে অবাধে জল চলাচল হয় না, নানাস্থানে জল দাঁড়াইয়া থাকে, ও তাহাতে কচুরী-পানার জন্ম ও বাড়িতে থাকে। রেলওয়ের বিস্তারেও ঐপ্রকারে জল চলাচল বন্ধ হয়। স্বাস্থ্য-ডিরেক্টরের মতে কোনও ভূখণ্ড জলে প্রাণিত হইবার পর জল শুষ্ক হইতে মরিয়া গেলে সেখানে

ম্যালেরিয়া হয় না, বা কমিয়া যায়। লোকে নিজের অস্তিত্বতা হইতে তির সহজে শিক্ষা লাভ করে না। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এখন বৃষ্টিতে পারিতেছে না, যে, চারিপাশের অসী অপেক্ষা উচু গ্রাম্য পথের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহারা জলের স্বাভাবিক গতি রোধ করিতেছে, এবং তদ্বারা ম্যালেরিয়া বাড়াইতেছে। তাহারা ম্যালেরিয়ার ভূগিয়া শিক্ষা পাইলে বৃষ্টিতে পারিবে, যে, ইহা নিবৃত্তিতার কাজ হইতেছে।

প্রতিযোগিতায় ইংরেজ-বাঙালী

একদেশের মানুষ যদি অন্যদেশের মালিক হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে, মালিক-জাতির লোকদের এমন কোন গুণ বা শক্তি ছিল, যাহা অধীন জাতির লোকদের ছিল না, বা কম ছিল। গুণ বলিলে যে সঙ্গুণই বৃষ্টিতে হইবে, তাহা নয়। শক্তির উল্লেখ করায়, মালিক জাতির লোকেরা শক্তির প্রয়োগ সকল স্থলেই ধর্ম ও নীতিসঙ্গতভাবেই করিয়াছিল, এইরূপও মনে করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লউন। অধিকাংশ ইংরেজ মনে করেন এবং অনেকে বলেন, তাহারা তরবারির দ্বারা অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ দখল করিয়াছেন। ইহা সর্বাংশে সত্য নহে। এইজন্য ভারতীয়েরা জবাবে বলিয়া থাকেন, যে, বড়বন্দ, উৎকোচ-প্রদান, জাল, প্রতারণা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারাও ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই কথাই প্রমাণ ইংরেজদের লেখা ভারতভিহাসেও পাওয়া যায়। অবশ্য ইংরেজরা একথা অস্বীকার করিবার বা চাপা দিবার খুব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যদি সকল ইংরেজ একবাক্যে ইহা স্বীকারও করিতেন, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদের গৌরববোধ করিবার কোন কারণ থাকিত কি ?

ভারতীয় লোকদের মধ্যে অনেকে যদি ঘুষ দিয়া ইংরেজ হাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মধ্যে অধম লোকদের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

ভারতবর্ষের যে-সব রাজাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল, ঘুষ দিতে তাহাদেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহারা ত ঘুষ দিয়া ইংরেজকে স্বদেশের স্বার্থের বিরোধী কাজ করাইতে পারেন নাই ? এইরূপ অসঙ্গত বিষয়েও দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে প্রভুত্বস্থাপনে যে-সব ইংরেজ কৃতকার্য হইয়াছিল, তাহাদের নৈতিক ও চারিত্রিক নানা দোষ থাকিলেও, তাহারা মোটের উপর স্বজাতি ও স্বদেশের স্বার্থ-সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক হয় নাই; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে তাহা হইয়াছিল। তা ছাড়া, চাতুরী, দল বাঁধবার ক্ষমতা, চক্রান্ত করিবার ক্ষমতা, কুট নীতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা, প্রতৃতি ইংরেজদের যতটা ছিল, দেশী রাজাদের ততটা ছিল না। এইরূপ নানা কারণে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্তগত হইয়াছে। কেবল যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করিয়াছে বলিলে মনে হয়, ভারতীয়দের মৃত্যুভয় বেশী ও সাহস কম ছিল, এবং শারীরিক বলও কম ছিল! কিন্তু তাহা সত্য নহে: ভারতের নানা জাতির সিপাহীরা সাহসে ও শারীরিক বলে আগেও ইংরেজদের সমকক্ষ ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ইংরেজ ইংরেজকে যতটা বিশ্বাস করে ও ভালবাসে, ভারতীয় ভারতীয়কে ততটা বিশ্বাস করে না ও ভালবাসে না। এবিধ নানাকারণে আমাদের পরাধীনতা ঘটিয়াছে।

অন্য অনেক বিষয়েও দেখা যাইতেছে, যে, যেসব কার্যক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অবাধ না হইলেও, কতকটা অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ আছে, সেখানে বাঙালী ইংরেজের চেয়ে নিকট বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা এখানে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কথাই বলিতে চাই।

বিচার-কার্য ও ব্যবহারাজীবের কার্যে দেখা যাইতেছে, হাইকোর্টের বাঙালী জজেরা, এবং উকীল ব্যারিস্টারেরা ঐ-ঐ কার্যে নিরত ইংরেজদের চেয়ে নিকট নহেন। এত বাঙালী জজ বিচার-কার্যে যশস্বী হইয়াছেন, যে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। সাধারণতঃ ব্যারিস্টারদের মধ্যে অগ্রণী বা অন্ততঃপক্ষে অন্ততম অগ্রণীকেই গবর্নেন্ট হ্যাভজোকেট বেনারগ্যান নিবৃত্ত

করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ম্যাজিস্ট্রেট জেনার্যাল নিযুক্ত হন। এই কার্যে তাঁহার যোগ্যতা সর্ববাদিস্বীকৃত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস যখন ঐ কাজ ছাড়িয়া ভারত গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হন, তখন অশান্ত-রকমের আপত্তি কেহ-কেহ করিয়া থাকিলেও, তাঁহার আইনের জ্ঞান এবং ব্যারিস্টারীতে দক্ষতা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গের ম্যাজিস্ট্রেট জেনার্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারও আইন-জ্ঞান এবং ব্যারিস্টারীতে বিচক্ষণতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করে না। অধিকন্তু, ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার এই আছে, যে, ইনি প্রথমে উকীল ছিলেন, পরে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। বরাবর যদি উকীলই থাকিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জেনার্যাল হইতে পারিতেন না;—যেমন স্ত্রীর রাসবিহারী ঘোষের মত এত বড় আইনজ্ঞ লোকেরও ম্যাজিস্ট্রেট জেনার্যাল হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। এইজন্যই গোড়ায়, সম্পূর্ণ অবাধ প্রতিযোগিতার কথা না বলিয়া কতটা অবাধ প্রাতিযোগিতার কথা বলিয়াছি। বাঙালী হইয়া বাঙালীর বড়াই করার প্রবৃত্তি হইতে আমরা কোন কথা বলিতেছি না। বাহাদুরের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের যোগ্যতা এবং ইংরেজের সমকক্ষতা ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বীকৃত। দৃষ্টান্তরূপ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নিয়োগ সম্বন্ধে এলাহাবাদের লীডারের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। লীডার বাঙালীদের কাগজ নহে, এবং ইহার প্রধান ও অশান্ত সম্পাদক বাঙালী নহেন। ইহাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিপিত হইয়াছে :—

The appointment of Mr. B.L. Mitter as Advocate-General of Bengal in succession to the Hon. Mr. S. R. Das is thoroughly satisfactory, as Mr. Mitter is one of the ablest leaders of the bar in Calcutta and a man respected for his uprightness.

“শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসের পর বঙ্গের ম্যাজিস্ট্রেট জেনার্যালের পদে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নিয়োগ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক; কারণ মিত্র-বাহাদুর কলিকাতার যোগ্যতম ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন, এক ভদ্র ও তাঁহার সভ্যতার জন্য সম্মানিত।”

এখন কথা উঠিতে পারে, যে, বসিয়া-বসিয়া বিচার

করা বা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া আইনের কূটতর্ক করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কঠিন কাজ শান্তিরক্ষা করা, রাজনৈতিক অপরাধী এবং চোর-বন্দমায়েস্ ধরিয়া শাস্তি দেওয়া, প্রজাদের হিতকর কাজ করা, ইত্যাদি। আমাদের ধারণা, অহুসস্থান করিলে এবিষয়েও বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবেন না।

বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতে এপর্যন্ত যত রাজনৈতিক বা তথাকথিত রাজনৈতিক এবং বিপ্লবঘটিত অপরাধে অনেক লোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে বা খালাস পাইয়াছে, তাহার সকল স্থলে বা প্রায় সকল স্থলেই বড়ঘম্ম বা তথাকথিত বড়ঘম্মের আবিষ্কার বাঙালী পুলিশ কর্মচারীদের দ্বারা হইয়াছে। দেশে অরাজনৈতিক চোর, ডাকাত ও অন্ত অপরাধী যত ধরা পড়ে, তাহার প্রায় সবই বাঙালী পুলিশ কর্মচারীদের চেষ্টায় ধরা পড়ে। ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজের যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনস্থ জেলাসকলে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চুরি-ডাকাতী ও অন্ত অপরাধ হয়, বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনস্থ জেলাসকলে তাহা অপেক্ষা বেশী হয় না; বরং কমই হয়। ইহাও বলা চলিবে না, যে, বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে কেবল সেইসব জেলাই ভার দেওয়া হয়, যেগুলির অধিবাসীরা অতিশয় সাধু ও শাস্ত-প্রকৃতির লোক।

দেশহিতকর কাজ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা বেশী করেন, না বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটরা বেশী করেন, তাহার বিচার করাও কঠিন নহে। আমাদের ধারণা এবিষয়েও বাঙালীরা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবেন না। কোন্ ম্যাজিস্ট্রেটের আমলে কোন্ জেলায় কলেক, ফুল প্রভৃতি শিকালয় কত হার্পিত হইয়াছিল, হাসপাতাল কত বাড়িয়াছিল, কৃষির উন্নতির নিমিত্ত জল-সেচনের জন্য পুষ্করিণীর পুকুরকার, নদীতে বাধ দেওয়া প্রভৃতি কাহার আমলে কত হইয়াছিল, সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া ও অন্তান্ত উপায়ে দেশের পণ্য-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা কাহার আমলে বেশী হইয়াছিল, স্বাস্থ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা কাহার দ্বারা বেশী হইয়াছিল, তাহার অহুসস্থান করিলেই লোক-হিতসাধন বিষয়ে ইংরেজ ও বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটদের আপেক্ষিক কৃতিত্ব নির্ধারিত হইতে

পারিবে। কেহ যদি দেশব্যাপী বিস্তারিত অহুসস্থান কথিতে না চান বা না পারেন, তাহা হইলে তিনি, দৃষ্টান্তরূপ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিতে পারেন। কেবল এই দুই জেলার উল্লেখে অন্যান্য জেলার বাঙালী কর্মচারীদের কৃতিত্ব অস্বীকৃত হইতেছে না। বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণশোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হুম্মার চট্টোপাধ্যায় ভেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজের তুলনা করিলে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে না। বীরভূমেও গুরুসদয় দত্ত ও হুম্মার চট্টোপাধ্যায়ের কাজ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজের চেয়ে নিকট বিবেচিত হইবে না। এইসব কাজ খুব বেশী না হইলেও, ইংরেজ কর্মচারীদের কাজের চেয়ে কম নয়।

সরকারী বা আধা-সরকারী, আধা বে-সরকারী কাজ দেশে বহু রকম হয়, একে-একে সবগুলিতে ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্বের তুলনার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল আর একটি কার্যক্ষেত্রের বিষয় বলিয়া আমরা আর্গুমেন্ট বর্তমান মন্তব্য শেষ করিব।

শিক্ষা ও মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি কার্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, আগে আমাদের ধারণা এই ছিল, যে, কোনও বিদ্যার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ইউরোপীয়েরা ভিন্ন কেহ দিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশনে এক-এ ক্লাস খুলেন, তখন তাহা শহরের কাজ বিবেচিত হইয়াছিল। এখন কিন্তু প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, যে, শক্ত শক্ত বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাও বাঙালী অধ্যাপকেরা দিতে পারেন। এমন-কি, এম-এ পরীক্ষার অন্তর্নির্দিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের কঠিন কঠিন বহির অধ্যাপনাতেও বাঙালী অধ্যাপকেরা যে ইংরেজ অধ্যাপকের সমান এবং কোন-কোন স্থলে তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই, যে, ইংরেজী ইংরেজদের মাতৃভাষা, আমাদের নহে।

প্ৰবেশপাঠে এবং অন্ততঃ জ্ঞানবৃদ্ধিতে বাংলাদেশে আপেক্ষিক ও বর্তমান সময়ের নামজাদা ইংরেজ অধ্যা-

পকেরা বাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙালী অধ্যাপকের কৃতিত্বের তুলনার অকিঞ্চিৎকর। বাঙালীদের মধ্যে বিজ্ঞানে বাহারা প্ৰবেশপাঠেরা খুব বিখ্যাত হইয়াছেন, শুধু তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; তাঁহাদের ছাত্রেরাও বাহা করিয়াছেন, বাংলাদেশে ইংরেজ অধ্যাপকেরা অধিকাংশ স্থলে তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙালীদের দ্বারা প্ৰবেশপাঠ যে শুধু বিজ্ঞানে হইয়াছে, তাহা নহে; সাহিত্যে, দর্শনে, অর্থনীতি-শাস্ত্রে, প্রকৃতত্বে, ভাষাবিজ্ঞানে, ইতিহাসে—নানা বিদ্যায় হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বহু ইংরেজ অধ্যাপকের কৃতিত্ব বাঙালীদের কৃতিত্বকে জ্ঞান করিতে পারে নাই। বাঙালীদের কৃতিত্বের পরিমাণ অবশ্য অল্প সত্য দেশের লোকদের কৃতিত্বের তুলনার খুব সামান্য; কিন্তু তাহা বাংলা দেশের ইংরেজ অধ্যাপকের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম নহে।

অবশ্য, আমরা যে-যে রকম কাজের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই এই যুক্তি প্রযুক্ত হইবে, যে, বাংলাদেশে ইংরেজ কর্মীরা কি করিতেছে ও বাঙালী কর্মীরা কি করিতেছে, তাহার দ্বারা উত্তর জাতির বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও কার্যশীলতার বিচার হইতে পারে না। কারণ, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা ত এদেশে আসেন না। হুতরাং তুলনার বিচার করিতে হইলে ইংলণ্ডের ইংরেজদের সহিত ভারতবর্ষের বাঙালীদের তুলনা করা উচিত। এই যুক্তি-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

বড়-বড় ইংরেজ অনেকবার বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ভারতের সেবার অন্তর্গত তাহার শ্রেষ্ঠ সম্ভানদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। এই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া যদি আমরা ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্ব-সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি করিতাম, তাহা হইলেও অস্তায় হইত না। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সত্য নহে; মোটের উপর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সম্ভানেরা এদেশে আসেন না। তাহা হইলেও, আমাদের তুলনাটা অস্তায় নহে। কারণ, আমরা ত ইহা বলিতেছি না, যে, বাঙালী জাতির কৃতিত্ব সব বিষয়ে ইংরেজ জাতির কৃতিত্বের সমান, অতএব বাঙালীদিগকে ইংলণ্ডের নানা চাকরীতে ও কার্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কর। আমরা বলিতেছি, বাংলাদেশে যে-যে কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ ও

বাঙালী একই রকমের কাজ করিয়াছে, তথ্য দেখা গিয়াছে, যে, বাঙালীর কৃতিত্ব ইংরেজের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম নয়; অতএব এই সকল কাজের জন্য একজনও ইংরেজ আমদানি না করিয়া বাঙালীদিগকেই সম্পূর্ণ সুযোগ দাও। ইংরেজদের এ পাণ্টা জবাব দিবার জো নাই, যে, যে-রকম ইংরেজ এদেশে আসে, তার চেয়ে আরও ভাল ইংরেজ আমদানি করিলে বাঙালীদের চেয়ে তাহাদের কৃতিত্ব বেশী হইবে। কেন না, ইংরেজরা আগে হইতেই বার-বার বলিয়াছেন, যে, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা এদেশে কাজ করিতে আসিয়া থাকেন; সুতরাং এখন বিপরীত কথা বলিলে চলিবে না। তা' ছাড়া, যে-রকম ইংরেজ এদেশে আসেন, তাঁদের বেতনাদি যোগাইতেই ভারতবর্ষকে জাহি-জাহি ভাক ছাড়িতে হইয়াছে; ইংদের চেয়েও বাঁদেই বেশী, তাহারা আসিলে একেবারে ভারতের নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।

অধ্যাপনার বাঙালী

বাংলাদেশে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্ব-সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছি, সে বিষয়ে একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উচ্চতম অধ্যাপকতার কাজে বাঙালী নিযুক্ত না হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন-কোন প্রদেশের লোক বাঙালীর দ্বারাই নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙালীদের সম্বন্ধে আমরা যে দাবী করিতেছি, তাহা ঠিক নয়। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, আমরা সাধারণতঃ, আবশ্যিক হইলে, অবাঙালী আমদানি করিবার বিক্ষুব্ধতা বিরোধী নহি—তা, সেই অবাঙালী ইউরোপীয়, আমেরিকান, জাপানী, বা ভারতের অন্ত-প্রদেশীয়ই হউন, তাহাতে আপত্তি নাই; আমরা কেবল অনাবশ্যিক আমদানিরই বিরোধী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অবাঙালী অধ্যাপক সম্বন্ধে আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, যে, ইহাদের সমকক্ষ লোক বঙ্গদেশেই ছিলেন এবং এখনও আছেন; কিন্তু আন্ত-বার্ষিক গুণ উদ্ভেদ সিদ্ধির জন্য কোন-কোন অবাঙালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যেমন অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডার-

কর ইহার কোন সমালোচনা আমরা করিগেই ইহার মুকুটি ও মলের লোকেরা বরাবর কতকগুলি বাঙালীর নিম্ন-কুৎসা দ্বারা সমালোচনাটা চাপা বিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন;—বদিও অল্প লোকদের অপ-দার্বতা স্বীকার করিয়া নইলেও তাহার দ্বারা অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের সুযোগ্যতা, জ্ঞাতীত্ব ইত্যাদি কেমন করিয়া প্রমাণিত হয়, বুঝা কঠিন। বাহা হউক, আমরা এখন নিজে তাহার কোন সমালোচনা করিতে চাই না, বরম্বা এমিরাটিক সোসাইটীর জার্নালের অক্টোবর সংখ্যায় উদ্ভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাল্ফ শার্পার্তিতে ভাণ্ডারকর মহাশয়ের নবতম পুস্তক “অশোক” সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

So much has been written upon Asoka already and so many times have the materials at our disposal—which are, after all, fairly scanty—been investigated by various scholars without very tangible results, that one gets an uneasy feeling that, unless some startling finds shed new light upon the career of the Buddhist emperor or some genius comes upon a wholly new interpretation of the extant inscriptions, not much is to be won by writing large books on him, merely relying upon the already well-known store of information.

Such rather pessimistic reflections have, however, not obtained a grip on the mind of Professor D. R. Bhandarkar, who has, with admirable energy, retold the old tale in a volume of some 350 pages. This is distinctly too much and tells somewhat upon the patience of the reader, who has the constant feeling that this could just as well have been told in a hundred pages or even less; but he is at the same time undoubtedly obliged to admire the enthusiasm and zeal of the author.

Professor Bhandarkar's name holds a high rank within the scholarly world of India, and the present writer therefore feels it somewhat painful to admit that his latest book is a heavy disillusion. Not only is the book far too extensive in relation to the rather scanty materials, but the information conveyed in it is not always trustworthy. The author has, on the whole, very little new to add to the results of his predecessors, and where he tries to supply us with some hitherto undiscovered facts, we generally feel inclined to disagree with him.

But these remarks are only concerned with details, and might, after all, detract only a little from our general appreciation of the work. What, however, is distinctly worse is the lack of the sense of historical proportion and the revelling in historical parallels which, at the end, will prove to be no parallels at all.

সমালোচকের এই মন্তব্যগুলির মধ্যে যে কিঞ্চিৎ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গরস আছে, তাহা বাংলা অল্পবাদে আমরা রাখিতে পারিব না বলিয়া অল্পবাদের চেষ্টা করিব না। কিন্তু তাৎপর্য দেওয়া সরকার বলিয়া নীচে তাহা দিতেছি।

ইতিমধ্যেই অশোক সম্বন্ধে এত লেখা চইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আশ্চর্য সামান্য উপাঙ্গনগুলি অনেক পড়িত ব্যক্তি এত বার চর্চা করিয়া বিশেষ কোন ফললাভ করেন নাই, যে, ঐ বৌদ্ধ স্তম্ভটির জীবনচরিত্রের উপর কোন নূতন আলোকপাত না হইলে বা কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁহার বর্তমান অনুশাসনগুলির কোন নূতন ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে, মনে এইরূপ ভাবের স্বয়ং স্বয়ং, যে, কেবল তাঁহার সম্বন্ধে সুবিধিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিয়া বড় বড় খুঁজিবার বিশেষ কোন লাভ নাই।

এরূপ কোন চিন্তা। কিন্তু অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকরের মনকে অধিকার করে নাই;—তিনি ভারি-বোধ্য কর্মসূত্রের সাহায্যে মোটামুটি ৩৫০ পৃষ্ঠার একখানা বইতে অশোকের পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইহা নিতান্তই বাহুলা, এবং ইহাতে পাঠকের ঘেঁষার উপর বড় বেশী চাপ পড়ে; কারণ, পাঠক বহিধান পড়িতে পড়িতে সর্বদা ইহাই ভাবিতে থাকেন, যে, কাহিনীটা একশত পৃষ্ঠা কিংবা তাহারও বেশী বলা বাইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠক নিজের প্রসঙ্গকারের উৎসাহ ও আগ্রহের ভারি-কম্বিত্তে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যিক জগতের সীমার মধ্যে অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মার উচ্চ প্রশীতি অধিকৃত হইয়া আছে। সেই স্তম্ভ বর্তমান লেখক ইহা বলিতে কিছু স্নেহ অনুভব করিতেছেন, যে, তাঁহার (ভাণ্ডারকরের) নূতনতম বহিধানি তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা যে সত্য, তাহারই মত একটা প্রমাণ। কেবল যে বহিধানি সামান্য উপাঙ্গনের তুলনার অতিবিকৃত ভাণ্ডার নহে, ইহাতে যে-সব কথা লেখা হইয়াছে, তাহাও সকলস্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। মোটের উপর, এই বিষয়ে তাঁহার পূর্বসঙ্গী প্রসঙ্গকারিণের পরিষ্কার কলের উপর তিনি অতি সামান্যই নূতন কিছু যোগ করিতে পারিয়াছেন, এবং তিনি যেখানে আশ্চর্যকে ইতিপূর্বে অনাবিকৃত কিছু নূতন তথ্য ভোগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সহিত একমত না হইবার দিকেই আশ্চর্যের প্রবৃত্তি বেশী হয়।

কিন্তু এই সব মন্তব্য বইখানিতে লিখিত তিন্ন তিন্ন বিষয় সমূহের সম্বন্ধে প্ৰযোজ্য, এবং হয়ত হৃদয় আশ্চর্য মনে বহিধানির সাধারণ কল্প সামান্যই করিত। কিন্তু বহিধানি সম্বন্ধে যাহা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর নিম্নর কথা তাহা এই, যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসিক জ্ঞানসমৃদ্ধতা ও বিশালতা প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুপাত-জ্ঞান মোটেই নাই, এবং তিনি তিন্ন তিন্ন দেশের ও কালের ইতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্যে যে-সব সামান্য সাদৃশ্যে পুনরাবৃত্তিতা করিয়াছেন, সে-পৰ্যন্ত তাহার মনে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের "অশোক" বহিধানি, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাসাধ্যাপক-রূপে ১৯২৩ সালে যে কয়টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই সমষ্টি। অধ্যাপক হাল শার্বপাতিয়ের সমালোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভাণ্ডারকর সামান্য পুরাতন উপকরণ কেনাইয়া ফাঁপাইয়া অতিবিকৃত বক্তৃতা করিয়া মাসিক চৌদ্দশত টাকা বেতন পাইয়া আসিতেছেন। উৎসাহের অধ্যাপক ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যিক জগতের অন্ততম শিরোমণি সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের অল্প প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুবই সম্মানিত বোধ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব সমস্ত বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভাণ্ডারকর মহাশয়কে তাঁহার পূর্বতন কক্ষকেন্দ্র সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে কেবল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। সেখানে গিয়া তিনি পুনর্বার বালিনের অধ্যাপক ল্যাডার্স বা অন্য কোন দূর-দেশের অধ্যাপকের কোন আবিষ্কৃত্য আশ্চর্য করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না; পুনর্বার কোন পুরাতন পাথরের হাতিলারে কাসিমের আঁচড়ান ইংরেজী তারিখ উল্টা করিয়া পড়িয়া ভারতীয় কোন নূতন প্রাগৈতিহাসিক লিপি উদ্ধার করিলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না; সেখানে তিনি পাহাড়পুরের মত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে যাত্রা গৌরব অর্জন করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরস্যা দিয়া সেই গৌরবের কতকটা অংশ ক্রয় করিতে হইবে না।

পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী পাহাড়পুরে একটি চিবি খুঁড়িয়া তাহা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক অমূল্য উপকরণ পাওয়া যাইবে, কিছু কাল পূর্বে বড়ের অনেক ধবরের কাগজে নানা ছবির দ্বারা অঙ্কিত এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের নেতা ছিলেন অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহযোগে এই কাজটি করা হয়।

ইহার অন্ত দিবাপাতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায় মোট আড়াই হাজার টাকা দিয়াছিলেন—বাস্তবিক খনন কার্যের জন্য ২০০০ এবং কর্মীদের রাহাখরচাদির জন্য ৫০০। এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান কেবল যদি নিষ্ফল হইত, তাহা হইলেও বিশেষ কোন লক্ষ্যের বিষয় হইত না। কিন্তু ইহা নিষ্ফল হইয়াছিলই, অধিকন্তু টাকার অপব্যয় হওয়ার কুমার শরৎকুমার রায় নিজের প্রদত্ত অর্থ কেবল চান। শুনা যায় তাহাতে শ্রীবৃদ্ধ রমাপ্রসাদ চন্দ্র ও শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ওটেন সালিস্ নিযুক্ত হন। সালিসীর দ্বারা স্থির হয়, যে, কুমার মহাশয়কে ১৪৭০০ টাকা কেবল দিতে হইবে। ষাটশরা অপব্যয় করিয়াছিলেন, এই টাকাটা তাঁহাদের নিকট হইতেই আদায় হওয়া উচিত ছিল, এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকরই অপব্যয়ের অধিক অংশের জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মূল্যবান চ'জ্, যে, তাঁহার টাকার প্রতিতে হাত পড়া অস্বীকার্য বিবেচিত হওয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অস্বীকার্য ধনভাণ্ডার হইতে এই টাকা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরের কথা সত্ত্বে নিতুল সংবাদ পাওয়া কঠিন। অতএব এই ধরবে কোন ভুল থাকিলে ও তাহা জানিতে পারিলে সংশোধন করিব।

কুমার শরৎকুমার রায়ের সমুদয় টাকা কিরূপে খরচ করা হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খবৃত্তান্ত ছাপিবার প্রবৃত্তি ও স্থান আমাদের নাই। কিন্তু মোটামুটি কিছু বলিতে চাই।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ও তাঁহার দলের লোকদের বাতায়ন প্রভৃতির ব্যয় হইয়াছিল ২৩৫১/০ টাকা; কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের বেতন বেতনের লোকদের জন্য সরকারের সময় যত রাহাখরচ খাইখরচ প্রভৃতি ধরা হয়, তদনুসারে, এবং কর্মীরা একমাস এই কাজে যাপন করিয়াছেন ধরিলেও, ৫২১১/০র বেশী ভ্রাত্য ব্যয় হয় না। সুতরাং বাকী ৩৪৫৫০ টাকা কোন ব্যক্তির বা কোন কোন ব্যক্তির সিদ্ধকে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিংবা উহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে।

যেহেতু অসুস্থান সমিতির দলের রাহাখরচ আদি হইয়াছিল ১৬০৫০/৬; ভ্রাত্য হিসাবে হওয়া উচিত ছিল

৭৭/০। সুতরাং এই দলের ব্যয়ে ৮০৫৬/৬ অকাংক্ষণ শরণ লইয়া থাকিবে। কিংবা, 'কোম্পানী কা মাল পরিয়া মে ডাল', নীতিও অস্বীকার্য হইয়া থাকিতে পারে।

টির খনন কার্যের জন্য মোট ৫২১০ ব্যয়িত হইয়াছিল। প্যাকিং খরচা ১২৫০/২, তাঁবু ও দলিল দস্তাবেজাদির ব্যয় ২১৪১০, এবং বিবিধ ব্যয় হইয়াছিল ১২৪১/৬। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের জন্য অনাবশ্যক ব্যয় হইয়াছিল—আস্বাবে ৬৭১০/০, ব্যক্তিগত আয়ামের জন্য ৭২১/০। তাঁহাদের রাহাখরচ আদিতে অন্ত্যাত্ম ব্যয় বাহা হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা উহারে মোটামুটি ব্যয়ের কর্দ দিলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সরকারী হাতা বেড়া খুঁটি ইত্যাদি বীটী আশবটি চামচ পেয়লা পিগনোড়া ছাকনী চৌকী ট্রাঙ্ক ডালকাটা প্রভৃতি জব্যের দাম সমেত পুঁজি কর্দ স্থানান্তরে দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে অবশ্য ভাল হইত; কারণ, ভবিষ্যতে কোন অনভিজ্ঞ লোক যদি কোথাও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের জন্য পাহাড়পুঁজের যত কোন দূর দেশে যান, তাহা হইলে তিনি ঐ কর্দ অস্বাভাবিক প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র আনে হইতেই জোগাড় করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন।

মহাভারত ও আচার্য্য বহুর আবিষ্কার

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত চিঠিটি আমাদের হস্তগত হইল।

“গত সপ্তাহের বঙ্গবাসী পত্রিকায় শ্রীবৃদ্ধ অপরীচন্দ্র বহু মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'বৃক্ষের জন্ম সম্পন্ন' উপলক্ষ করিয়া যে বিজ্ঞোচিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি না জানি না। উহা কাটির এই চিঠির ভিতরে পাঠাইলাম। আপনার 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নোটে উহার উপরে একটি ...টিপ্পনী দেখিতে ইচ্ছা হয়।...বিশেষ এই অংশটুকু :— 'মহাভারতে বৃক্ষজীবনের সকল রঃসুই বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে অল্প বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাওয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।’

“আমি বাল্যকাল হইতে কাশীতে মাসের মহাত্মারত ও কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা সংস্কৃত মহাত্মারতের অমূল্য পড়িয়া আসিতেছি। এ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের কিছুই তাহা হইতে শিক্ষা করিতে পারি নাই। বুদ্ধজীবনের সকল রহস্য কোন্ পর্কের কোন্ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে জানিতে পারিলে আমি উপকৃত হইব এবং আমার মত আরও অনেকে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আপনি নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে পারিবেন।”

যিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি আছে। তিনি যখন মহাত্মারত হইতে জড়-বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব, বিশেষতঃ আচার্য বহুর আবিষ্কারের মত কিছু, উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তখন আমরা কিছু করিতে নিশ্চয়ই পারিব না। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না, এবং চেষ্টার পূর্বে বলিবও না, “গমিষ্যামুপহাস্ততাম্ প্রাংগনভ্যে কলে গো ভাহুদাহরিব বামনঃ”।

কিন্তু আচার্যের বিবরণ এই, যে, বাহারা অধুনা চীনদেশ হইতে নোমলতা আমদানী করিয়া তাহা হইতে সালসা প্রস্তুত করিয়া সমুদয় বাঙালীকে চাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেক হিন্দু করায়ত্ত মহাত্মারত হইতে জড়-বিজ্ঞানের সমুদয় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তাহা বড়ের আপামরসাধারণ সকল হিন্দুকে এ পর্য্যন্ত “উপহার” যেন নাই। তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের ঐ সব তত্ত্বই শিখিবার জন্য বড়ীর সুবন্ধিগকে সমুদ্র সঙ্ঘন করিয়া ইউরোপ আমেরিকা গিয়া রেলুই প্রাপ্ত হইতে হইত না; তাহাদিগকে ছোর বটতলা বা “বজবানী” কার্যালয় পর্য্যন্ত বাইতে হইত, এবং তাহাতে আঁত বাইত না। বাহা হউক, “বজবানী” এপর্য্যন্ত বাহা করেন নাই, তাহা অধুনা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করিবেন। তখন পাশ্চাত্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিককে আচার্য বহুর নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে জড় করমাইস্ না দিয়া “বজবানী”-কার্যালয়ে অর্ডার দিলেই চলিবে। আচার্য বহুও সাবধান হউন। বাহা অচিরে ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটে পাওয়া বাইবে, তাহার জন্য কেন তিনি অত্যন্ত শক্তি, সময় ও অর্থব্যয় করিতেছেন? “বজবানী” কি বলিতেছেন, দেখুন।

বুদ্ধের স্পন্দন।—বাহুরের এবং অত্যন্ত জীব-জন্তুর জগৎপিত্তের স্পন্দন

সকলেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। বুদ্ধের জগৎপিত্ত স্পন্দন দেখা যায় না, বা স্পন্দনরোগ অনুভব করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বুদ্ধিতে হইবে যে, বুদ্ধের স্পন্দন কোন স্পন্দন নাট? লৌকিক-অলৌকিক বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর হিন্দুর উপনিষৎ শাস্ত্র এবং পুরাণ ও সাহিত্য প্রভৃতি জানাইবা দিগাভয়, বুদ্ধেরও জীব-জন্তুর মত ইন্দ্রিয় আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়ামূল। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানে অবশ্য একই নূতন; এখনও এমন অনেক কথাই বিজ্ঞানে অজ্ঞাত। কাজেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বুদ্ধের জগৎস্পন্দনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্প্রতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জননীশঙ্কর বহু মহাপন এইরূপ কথা শুনাইয়া পাশ্চাত্য জনগণকে মুগ্ধ করিতেছেন। তাঁহার বিস্ময়কর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা অনেকই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি নূতন জগৎপিত্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। সে দুইটি এই,—(১) বুদ্ধসমূহের জীব-জন্তুর মতই বাসপেশী আছে এবং (২) জীব-জন্তুর জগৎপিত্ত স্পন্দনের মত বুদ্ধের দেহাত্মারও এক প্রকার স্পন্দন অগ্রকৃত হওয়া থাকে। তাঁহার আবিষ্কৃত আরও একটি নূতন কথা তিনি বাঙ্গালী ভাষায় আসি যোগ্য করিবেন লিখিয়াছেন। ডাক্তার জননীশঙ্কর আবিষ্কারের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এইসব কথা বাহাতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহার উপযোগী বৈজ্ঞানিক বস্ত্রসমূহ তৈয়ারী করিয়াছেন এবং সেইসকল বস্ত্র সাহায্যেই নিজের বক্তব্য উক্তরূপে বুঝাইয়া যেন। আমরা অনেক-বারই বলিয়াছি, হিন্দুর নিকট এ সব আদৌ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছেই ইহা অজ্ঞাত। তাহার কারণ, হিন্দু এখন নিজের পরিচরই নিজে জানেন না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কলে নিজের পরিচর জানিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের মধ্যেই কমিয়া বাইতেছে। হিন্দু বাঙালীর বর্ণবিভেদের সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকে ইংলণ্ডের অস্ত্রপাতী রেডিং মসজিরে ডুবালের গল্প পড়িতে আরম্ভ করে; আমাদের অনন্ত জ্ঞানের আকর মহাত্মারতের উপাখ্যান পড়িবার অবসর তাহাদের অনেকেরই সারা জীবনেও হয় না। মহাত্মারত বুদ্ধ-জীবনের সকল রহস্যই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড় বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জ্ঞান পথ চাহিয়া বলিয়া থাকিতে হয় না। কাল-প্রত্যয়ে অনেকে আমাদের পুণ্ড্র নিছাতে বিদ্যান পর্য্যন্ত হারাইতে বলিয়াছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের প্রতি নিরন্তরঃ আবিষ্কারও এখন তাহাদের বিস্ময় উপস্থাপন করিয়া থাকে। ডাক্তার জননীশঙ্কর আবিষ্কারের কলে যদি তাহারা হিন্দুর প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহে বিদ্যানবান হইতে পারেন, তাহা হইলেও এদের অনেক উপকার হইবে।

শুনিয়াছি, আচার্যসমাজের লোকেরা মনে করেন, বেদে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা মরানন্দস্বামী প্রণীত “সত্যার্থ-প্রকাশ” পড়ি নাই; সুতরাং উহা সত্য কিনা বলিতে পারি না।

বাস্তবিকই আমরা একান্ত আশ্চর্যবিশ্বস্ত আছি। বেদে টেলিগ্রাফ-আদি সব-কিছু আছে; মহাত্মারত জড়-বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব আছে; রামায়ণে পুষ্পক-রথ অর্থাৎ এরোপ্লেন আছে, মহীরাধণ অহিরাবণের সব-মেরিন্ আছে; অস্ত্রান্ত শাস্ত্রে বে-তার বার্তা, বে-তার টেলিফোন প্রভৃতি আছে। অথচ এই সকল জিনিষের জন্য

আমাদিগকে অর্কাটীন পাশ্চাত্য লোকদিগের নিকট ধনী হইতে হইয়াছে।

পাশ্চাত্যজাতির লোকেরাও কম বেকুব নহে। বেদ প্রথম ছাপিলেন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত; বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত এবং অনেক পুরাণ ও তন্ত্র শ্লেচ্ছ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য অল্পবৃদ্ধি লোকদেরও, বহুংসর হইল, বোধগম্য হইয়াছে। এক-একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যেমন প্রোগ্রিভিভিদিয়াসের অন্যান্যক ভিন্টারনিজ, সংস্কৃতের চর্চায় চল্লিশ বৎসর কাটাইয়াছেন। অথচ তাঁহারা নানাবিধ জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এবং নানা-প্রকার কল তৈয়াব করিবার জন্ত বড়-বড় ল্যাবোরেটরী, কারখানা প্রভৃতিতে অকারণ অর্থব্যয় ও আয়ুকষ করেন। সংস্কৃত-শাস্ত্র হইতেই এই সবই খুব কম আয়াসে পাওয়া যাইতে পারিত।

আমরাই একমাত্র আশ্চর্যবিশ্ব জাতি নহি। সেদিন যুগপৎ ইবাকেব (মেসোপটেমিয়ার) একখানা ও আফ-গানিস্তানের একখানা—এই দু'খানা আখ্‌বাব্ অর্থাৎ খবরের কাগজ কলিকাতা পৌছিয়াছে। দু'টাতেই একই-রকমের আফসোস জাহির করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে :— “ফেরিছারা আগিয়া আস্মান হইতে আমাদের মাথায় বোমা ফেলে; আমরা তাহাদের কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরই আলফলায়লাহ্ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সকালে আমাদের এমন গালিচা ছিল, যে, তাহাতে বসিয়া ইচ্ছা করিলেই আস্মানে উড়িয়া যেখানে-সেখানে আমরা যাইতে পারিতাম; এমন কলের ঘোড়াও ছিল, যাহার পিঠে চড়িয়া কল টিপিলেই সে সওয়ারকে হইয়া আস্মানে উঠিত। সেই গালিচা ও ঘোড়া এক-একটা জোগাড় করিলেই ত আমরাও আস্মানে উঠিয়া ফেরিছাদের উপর হট-পাটকেল আতস-বাজী ছুড়িতে পারি।”

আরব-দেশেরও একখানা কাগজে সার্ব জনশ্রী বহু মহাশয়ের কোন-কোন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত দিয়া লেখা হইয়াছে, “এটা আর এমন-কি আশ্চর্য খবর? আমাদের আলফলায়লাহ্ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সেখানে শাহজাদীদের গায়ক বৃন্দ ছিল; তাহারা

নিজে-নিজে গান করিত। আর এখন কিনা বহু সাহেবকে কল বানাইয়া, গাছেব নাড়ী ছাড়িয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইতেছে!”

বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাগানে একটিও গায়ক-বৃন্দ না থাক। বাস্তবিকই বড় লজ্জার বিষয়।

বঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রীদের বেতন

বঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রীদের বেতন বর্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য একাধিকবার নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাহাতে বাংলাদেশে মৈরাল্য স্থগিত হইয়াছে। এখন আবার সেই ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশের মতে সেই মন্ত্রীদেরই বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি সভ্যের মতিস্বৈর্যের অভাব প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা দেশের প্রতিনিধি, তাঁহাদের এরূপ চাঞ্চল্য বাহনীয় নহে।

যাহারা যতদিন কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের তত দিনের পারিশ্রমিক অবশ্যই পাওয়া উচিত। সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হওয়া উচিত নহে। কথা হইতেছে, যে, বেতন দিবে কে? যিনি বা যাহারা নিয়োগ করেন, বেতনের দাবী তাঁহার বা তাঁহাদের নিকট হইতেই করা উচিত। মন্ত্রীদেরকে ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচিত, মনোনীত বা নিযুক্ত করেন নাট, বঙ্গের গবর্নর করিয়াছিলেন। সুতরাং বেতনটাও তাঁহারই দেওয়া উচিত। নিয়োগ করিবেন একজন, প্রোগ্রামেব প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধে; অথচ সেই প্রতিনিধিদিগকেই বেতন মঞ্জুর করিতে হইবে; ইহা হান্তকর ব্যবস্থা।

বঙ্গায় মিউনিসিপ্যাল বিল

বাংলাদেশের মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাজ যে আইন-অনুসারে চলে, তাহা সহ বৎসর পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। তদনুসারে কাজ চালাইতে গিয়া উহার কে-সব দোষ ধরা পড়িয়াছে, তাহার সংশোধন হওয়া উচিত; এবং কলিকাতাদের অধিকার ও দায়িত্ব হইই বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বর্তমান আইন শোধন করিবার নিমিত্ত যে বিল প্রণীত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমোদনযোগ্য কোন

কোন ব্যবস্থা ছিল। যথা, নির্ধারিত কর্মচারীদের অস্থপাত বাড়াইয়া পূর্ণসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, কোথাও কোথাও চারি-পঞ্চমাংশ, করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিলটিতে একটি অতিরিক্ত গুরুতর কুব্যবস্থা ছিল। উহাতে, হিন্দু ও মুসলমান কর্মদাতারা নিজের নিজের প্রতিনিধি পৃথক পৃথক নির্বাচন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে, আমাদের বিবেচনা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা উহা পেশ করিবার অসম্মতি না দিয়া ভালই করিয়াছেন। বাহার গোড়াতেই মন্ত পলদ, তাহাও খুটিনাটি বিচার করিবার আগেই সেই পলদ দূরীভূত হওয়া সরকার। সাম্প্রায়িক পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা বাদ দিয়া বিলটি পুনর্বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থিত করিলে উহা বিবেচিত হইতে পারিবে।

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার

এক শতের উপর বাঙালী ভ্রলোককে বৎসরাধিক পূর্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পর তাহাদের বিচার না করিয়া তাহাদিগকে বন্ধের ও বন্ধের বাহিরের নানা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখা অশ্রাব্য; অনির্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপে বন্দী করিয়া রাখা আরও অশ্রাব্য। ইহার উপর আরও একটি কারণ পবর্ত্তে নিন্দাতাজন হইতেছেন। বন্দীদের প্রতি যে রূপ ব্যবহার হওয়া উচিত তাহা হয় না, এই অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়। তাহাতে তাহাদের অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তখন আবার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তও হয় না। এই প্রকার নানা অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে যে সরকারী কর্মচারী উত্তর দেন, তিনি স্বাধীনভাবে অস্বস্তান করিয়া বা করাইয়া উত্তর দেন না; যে যে জেলে বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, সেই সেই জেলের কর্তৃপক্ষ যে-সব জবাব লিখিয়া পাঠান, সরকারী কর্মচারী তাহাই অবলম্বন করিয়া উত্তর দেন। স্তত্রাং স্বভাবতই এরূপ উত্তরে সর্বসাধারণের সম্মত দূর হয় না।

সেদিন এই অভিযোগটি বিবেচনা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, কতকগুলি রাজবন্দীকে এই শীতের দিনে

যথেষ্ট শীতবস্ত্র এবং দুর্ভোজ্যে ব্যবহারেব লেপ কখনাদি যথেষ্ট না দিয়া এক জেলে হইতে অন্য জেলে চালান করা হইয়াছে। প্রস্তাব করেন, স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সরকার পক্ষের জবাব এট, যে, বন্দীরা ইচ্ছাপূর্বক তাহাদিগকে প্রদত্ত শীতে ব্যবহার্য বস্ত্র ও কখন ফেলিয়া দিয়াছিল। মনুষ্য শীতের দিনে অকারণ এইরূপ কাজ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায়, যে, তাহারা এইরূপ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাহারও ত কারণ অস্বস্তান হওয়া উচিত? বাংলা দেশে মোটের উপর বিহার, ছোট নাগপুর, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ অপেক্ষা শীত কম। বাংলা দেশে বেশ মজবুত উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জেলেরও অভাব নাই। এ অবস্থায় শীতকালে বাঙালী রাজবন্দীদিগকে অধিক শীতের জায়গায় চালান করা অশ্রাব্য। বাঙালীরা যখন স্ব-ইচ্ছায় অধিক শীতের জায়গায় যায়, তখন তাহারা যথাসাধ্য তদুপযোগী খাদ্য পরিবেশের বন্দোবস্ত করে; করিতে না পারিলে তক্ষণিত কষ্টের বা স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী হয়। কিন্তু বন্দীদের স্বয়ং যখন প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার উপায় নাই এবং জেলের বন্দোবস্ত যখন মধ্যবিত্ত লোকদের গার্হস্থ্য বন্দোবস্তের সমান নয়, তখন মধ্যবিত্ত বাঙালী রাজবন্দীদিগকে শীতের সময় বেশী শীতের জায়গায় চালান করিলে তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয়।

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের পার্থক্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পায়, যে, সতীশচন্দ্র মিত্র নামক একজন রাজবন্দীকে এম্-এ পরীক্ষা দিবার অসম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, ডালাগা হাউসে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভেও অসম্মতিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কালীশঙ্কর গাঙ্গুলী নামক অন্য একজন রাজবন্দীকে আই-এ পরীক্ষা দিবার অসম্মতি দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু সন্দোষ মিত্রকে নিজের বাড়ীতেই অন্তরীণ করিবার হুকুম করা হইয়াছিল। স্যার হিউ স্ট্রিডেন্সন্ যে বলিয়াছেন,

যে, কোন বন্দীকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহার বিচার প্রত্যেক স্থলে পৃথক্ করিয়া করা হয়, তাহা সত্য; [সাধারণ নিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধের অভিযোগ হইয়াছিল তাহা খুব গুরুতর, কালীশঙ্কর গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে সম্বন্ধে তত গুরুতর নহে। তাহা হইলে সন্তোষ মিত্রকে অধিকতর সুবিধা ও স্বাধীনতা দিবার কাঙ্গীকৃত ভিতরের কথাটা কি? গবর্নেন্ট তাহা বলিবেন এমন আশা করা যায় না। হালদার মহাশয়ের জানা থাকিলে বলিতে বাধা আছে কি?

কচুরীপানা-বিনাশ পরীক্ষায় অপব্যয়

ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারের প্রস্তাব উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, কচুরীপানা বিনষ্ট করিবার জন্য তিন বৎসরের জন্য ২২৫০০ টাকা দিয়া গ্রিকিথ্‌সের বিধের ব্যবস্থাপত্র জম্ম করা হইয়াছিল, এবং তদনুসারে প্রস্তুত বিবাস্ত্র জ্রব্য দ্বারা ঐ পানা বিনাশ করা যায় কিনা, তাহার কতকগুলি পরীক্ষা বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়াছে; তাহার ফলে গবর্নেন্ট এখনও সম্বন্ধে হন নাই, যে, উক্ত বিবাস্ত্র তরল পদার্থ পিচকারী দ্বারা ছড়াইয়া কোন স্থান হইতে কচুরীপানা একেবারে নির্মূল করা যাইবে।

গবর্নেন্ট অগণীচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া কচুরী পানা ধ্বংস করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগ করেন। বসু মহাশয় স্বয়ং এবং কমিটির অধিকাংশ সভ্য গ্রিকিথ্‌সের বিষটার কার্যকারিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তথাপি গবর্নেন্ট একজন দক্ষিণ আফ্রিকার খেতাব গ্রিকিথ্‌সকে টাকা পাওয়াইবার নিমিত্ত সাড়ে বাইশ হাজার টাকা দিয়াছেন, এবং উহার বিধের পরীক্ষার কর্মচারীর বেতনাদি প্রদানে এবং যত্নক্রমে আরো অনেক টাকা অপব্যয় করিয়াছেন। অথচ দেশের লোকদের পক্ষ হইতে লোক-হিতকর কার্যের জন্য টাকা চাহিলে অনেক সময় সরকারী তহবিলে টাকা নাই বলা হয়।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ

বন্দীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস প্রস্তাব করেন, যে, প্রতি বৎসর শিক্ষার জন্য যে সরকারী বরাদ্দ হইবে তাহার মধ্যে দুলাধ টাকি অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেন আলাদা করিয়া রাখা হয়। মৌলবী শাহ্ সৈয়দ এমদাতুল হকের কথা-মত প্রস্তাবক দুলাধের পরিবর্তে বরাদ্দ তিনলাখ হটক এই রূপ বলেন। গবর্নেন্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন প্রভেদ করেন না, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য মুক্তদ্বার,—স্বাবু আশ্বর রহীম সরকার পক্ষ হইতে এই কথা উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করেন। ইত্যাকার কারণে তিনি প্রস্তাবটির বিরোধী হন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে উহা গৃহীত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য সাধারণ ব্যয় ও বন্দোবস্ত ব্যতীত, বিশেষ বরাদ্দ ও বন্দোবস্তও যে আছে, সেবিষয়ে রহীম সাহেব কি বলেন?

স্বহাসিনীর মৃত্যু

রংপুর জেলার গাইবান্ধায় যে-স্বহাসিনীর উপর অত্যাচারের কাহিনী অনেক বার সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগের একটা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বোধ করি এখনও হয় নাই, সেই স্বহাসিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিতৃকুল ও স্বত্বকুলের লোকেরা, সমাজের লোকেরা, দেশের লোকেরা, গবর্নেন্ট তাহাকে যে শাস্তি দেয় নাই, দিতে পারে নাই, সেই শাস্তি এখন সে পাইয়াছে। সে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে নারীরক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

বিশেষ সমাচারপূর্বক নিবেদন এই, যে, পিতা ভগবান, আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ্য আপনাই; এবং আপনাই যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ভীষনে বিস্তৃত হইবার নহে। এখানে আমার পরে স্বপ্নের কাণ্ড পিরাছে। তাহাকে একঘরে করেছে, এক এইরূপ হয়েছে, যে, ভীষনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা হাতে না খেয়েই এই; খেলে কি হত জানি না। ভগবানের সৃষ্টিব মতো আমার মত হতভাগিনী দ্বিতীয় আছে কি না সম্বন্ধ। এখন এমন অবস্থা, ইহাদের না খেয়ে মরিবার উপক্রম। * * * আমার সংসারে একভিল শাস্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা এই, যে, কোন আমনে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিই। ইহা আমার

মনের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। ইহাতে আমার স্বামীও অমত হইবে না। যদি ভাল বোঝেন, আমার স্বামীও যারা কিছা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। * বাচালতার জন্ত কমা চাই। পত্র-পাঠ আপনার অভিমত বা, জানাইবেন।

ইতি— স্ফাসিনী

স্ফাসিনীকে একাধিকবার ভরণ করিয়া লইয়া ছবুস্তেরা তাহাদের ঘবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; স্ফাসিনী বার-বার পলাইয়া আসিয়াছিল। ছবুস্তেরা তাহাকে প্রহাব করিয়া, হাতে দড়ি বাঁধিয়া স্ফাসিনী রাখিয়া, দীপ্ত ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া,—নানাবিধ যজ্ঞা দিয়া—তাহাকে সতীত্ব ও পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে বার-বার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তা, সাহস, মানসিক শক্তি ও সতীত্বনিষ্ঠা সত্বেও এই বালিকা নিজের মেহ-মন-আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। তাহার উপর ছবুস্তদের অত্যাচারের নানা চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার শরীরে ছিল। সে সাধারণ শিক্ষাও বিশেষ কিছু পায় নাই; শিক্ষা, সচুপদেশ, দেহমনের পূর্ণবিকাশ, অস্ত্রপূরের বাস্তবের জগতের অভিজ্ঞতা, কোন সুবিধাই তাহার হয় নাই; বাল্যকালেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তথাপি সতী ও বীরান্নাদিগের মতো তাহার সম্মানিত অতি উচ্চ আসন চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; পবিত্রতার ও আদর্শনিষ্ঠার পূজা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন এই বালিকা সঙ্গদয় জায়বান্ লোকদিগের শ্রদ্ধা ও পীতি পাইবে।

কিন্তু ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, সভ্যতাভিমানী বাংলাদেশে, স্ফাসিনীর উপর যে রূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা হইয়াছিল, এবং পুনরায় অন্ত কোন বালিকার উপর হইতে পারে; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, কল্পিত বা অংশত সত্য রাজনৈতিক বিপ্লবচেষ্টা দমনের জন্ত গবর্নেন্ট ডয়বিহুলগিষ্ঠে নানা অঘটন ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু বালিকাদের উপর নারীদের উপর পাশব অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার দমনের ও নিবারণের জন্ত গবর্নেন্ট বিশেষ কোন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করা উচিত মনে করেন নাই; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, দেশের সংখ্যা-ভূষ্টি রাজনৈতিক দল নারীবিশিষ্ট সমস্তার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করেন নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিদারুণ মনস্তাপ ও

লজ্জার বিষয় এই, যে, যে-বালিকা তাহার সতীত্ব, দৃঢ়তা ও সাহসের জন্ত সর্বত্র পরমপীতি ও সম্মানের পাত্র হইবার যোগ্য ছিল, তাহার ও তাহার স্বামী ও পরিজন-বর্গের সামাজিক নিগ্রহ হইয়াছিল, এবং নানা-প্রকার নিধ্যাতন নিগ্রহ ও সামাজিক লাঞ্চার ফলে ভয়-দেয়ে ভয় হৃদয়ে নৃচ্ছাদি রোগে ক্লিষ্ট তাহার মকালে মৃত্যু হইয়াছে। যে সামাজিক ব্যবস্থা, মুসলমান-সংস্রব তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটা সংবৎ, তাহার মত মহীয়সী নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছিল, তাহা অতি ঘৃণিত ও লজ্জাকর। যাহারা তাহার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গরূপ তাহার স্বামী ও (জ্যেষ্ঠতাত) স্বশ্রবকে ভোক্তা দত্তে বাধ্য করিয়া ছিল, তাহারা অতি অধম নীচ হৃদয়হীন ও নিলজ্জা; যে সামাজিক প্রথা অল্পসারে তাহার পবে ও স্ফাসিনীর হাতের অঙ্গুল, সমাজের লোকে দূরে থাকে, তাহার পরিবারস্থ লোকেরাও গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই, তাহা অতি ঘৃণ্য ও পৈশাচিক। একদিনে স্ফাসিনীর দৃঢ়তা, সাহস ও সতীত্ব যেমন বঙ্গনারীকুলের চিরগৌরবের ও চির আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে, অত্র দিনে তেমনি সমাজের লোকের হৃদয়হীনতা, জ্ঞানহীনতা, অজ্ঞতা ও কাপুরুষতা আমাদের চিরকাল কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। কাপুরুষ, হৃদয়হীন, অজ্ঞানকারী আমরা অস্ত্র সংশোধন ও সমাজ-সংশোধন করিয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে না পারিলে কখনও স্বাধীন হইতে পারিব না; রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিদেশীর অনধীনতা কোন-প্রকারে গটিলেও মাহুষ হইতে পারিব না।

লিটনের শান্তিনিকেতন গমন

রাধিবাবুর সহিত সকলে সব বিষয়ে একমত হইলে, এ আশা বা ইচ্ছা তিনি নিশ্চয়ই করেন না। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত সব কাজের আলোচনা করাও আবশ্যক মনে হয় না। যে-সব মত বা কাজের সহিত সর্ব-সাধারণের সম্পর্ক আছে, তাহার আলোচনা আমরা কখন-কখন করিয়াছি। যেমন, কলিকাতার বঙ্গীয় থিয়েটারগুলি-সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে দৃশ্যীয় বা অনিষ্টকর না হইলেও, উহার অঙ্গুৎসরণ

দ্বারা অন্ত লোকদের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এই কারণে, এবং তাঁহার সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই এরূপ অন্তান্ত কারণে, আমরা থিয়েটার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগে-আগে করিয়াছি। সত্য কারণ থাকিলে আমরা যেমন তাঁহার মত ও কাজের সমালোচনা করিবার অধিকারী, অন্তেরাও সেইরূপ করিবার অধিকারী। শুধু অধিকারী নহেন, তাহা করা কর্তব্য। কিন্তু যাহা সত্য নহে, বা যাহা আংশিক সত্য, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে বা অন্ত কাহাকে আক্রমণ করা উচিত নহে। তাঁহার স্তায় অন্ত যেসকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করে, তাঁহাদিগের অমূলক সমালোচনা দ্বারা আমরা নিজেদেরই অসম্মান করি, ইহাও মনে রাখা উচিত।

সম্প্রতি লর্ড লিটন শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয় এবং স্কুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসমূহের উন্নতিসাধন চেষ্টার প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। এবিষয়ে একজন 'দর্শক' একখানি খবরের কাগজে রবিবাবুর নিন্দা করিয়াছেন, এবং অন্ত একখানা কাগজেও এরূপ নিন্দা দেখিয়াছি। নিন্দা যিনি যাহা করেন, সেবিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাতে "দর্শকের" চিঠিতে তথ্য হিসাবে কিছু ভুল আছে। তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবিবাবু লর্ড লিটনকে আমন্ত্রণ করিয়া শাস্তিনিকেতনে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; আমরা নিজে যাহা জানি তাহাই বলিতেছি।

গত পূজাব ছুটির আগের দিন পর্যন্ত আমরা শাস্তিনিকেতনে ছিলাম। তাহার অনেক দিন আগে, তখন রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে ছিলেন না, বীরভূমের একজন সরকারী কর্মচারী বোলপুরে আসেন। তাঁহাকে তাঁহার বোলপুর আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যে, লর্ড-সাহেব বীরভূম জেলায় আসিবেন এবং তখন প্রাইভেট-ভাবে শাস্তিনিকেতন দেখিতেও তিনি ইচ্ছা করেন; কিন্তু লর্ড-সাহেব কোথাও প্রাইভেট-ভাবে আসিলেও তাঁহার নিরাপদ-অবস্থান ও আরামাদির বন্দোবস্তের দরকার বলিয়া

তত আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিতে হইতেছে। কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা-প্রসঙ্গে লর্ড-সাহেবের শাস্তিনিকেতন দর্শন-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অহুমতি আমরা চাই নাই। অহুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত, যে, ঐ দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশী কিছু লিখিব না। তবে, কেহ যদি মনে করেন ও বলেন, শাস্তিনিকেতনের প্রত্যেক ভাবী অতিথি-অভ্যাগতের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া তবে তাহাকে সেখানে আসিতে দেওয়া উচিত, এবং লর্ড লিটন আসিতে চাহিলেও তাহাকে নিষেধ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে পাবেন।

লর্ড-সাহেবকে অভিনয়াদি দেখান হইয়াছিল, রবিবাবুর নিন্দার ইহা একটা কারণ। কিন্তু অভিনয়াদি শুধু লর্ড-সাহেবের জন্মই হয় নাই; পূর্বে আরও নানা উপলক্ষে হইয়া গিয়াছে। যমুনালাল বজ্রাজ মহাশয় একবার যখন আসিয়াছিলেন, তখন হইয়াছিল; বীরভূম জেলার স্বাস্থ্যকর্মিশিল্প-আদির উন্নতির জন্ম কনকারেলের প্রতিনিধিদের জন্ম হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাহা হইয়া থাকিলেও লর্ড-সাহেবের জন্ম হওয়া উচিত ছিল না, যদি কেহ মনে করেন, তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

রবিবাবু লিটনের সহিত আহা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ। কিন্তু আহা রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনের অনেক অপ্রসিদ্ধ বাঙালী ও অবাঙালী অতিথির সহিত, জা'ত ও কর্মের বিচার না করিয়া, করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও, লিটন-সাহেবের সহিত তাঁহার অন্নগ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার অধিকার অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকের আছে। তথ্য-সম্বন্ধে ঠিক খবর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, সমালোচনার সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে।

ঢাকায় পুলিশের প্রশংসাপূর্ণ যে বক্তৃতায় লিটন ভারতনারীদের উল্লেখ করেন, আমাদের বিবেচনায় রবিবাবু তাঁহাকে সে-বিষয়ে ছুখানা চিঠি লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম চিঠির জবাবে লর্ড-সাহেব

ভারতমহিলাদিগের অবিমিশ্র উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবিবাবু দ্বিতীয় যে চিঠি লেখেন, তাহাতে লাট-সাহেব কোণঠাসা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তরে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, যে, ভারতীয়েরা লাটসাহেবের গবন্মেণ্টকে এই 'চ্যালেঞ্জ' করিতে প্রস্তুত, যে, উক্ত গবন্মেণ্ট লাট সাহেবের উল্লিখিত একুশ কোন মোকদ্দমার উল্লেখ করুন, যাহাতে ভারতনারীরা তাহাদের পুরুষ আত্মীয়দের প্ররোচনায় পুলিশকে হুকুম করিবার জন্ত নিজেদের সতীত্বের উপর পুলিশের হস্তক্ষেপের মিত্যা অভিযোগ আনিয়াছে। একুশ কোন দৃষ্টান্ত লাট সাহেব বা তাহার গবন্মেণ্ট দিতে পারেন নাই। অবশ্য চর মনাইয়ের মোকদ্দমাকে লাট-সাহেব তাহার বক্তৃতায় লক্ষ্য করেন নাই বলায়, তথাকার স্ত্রী-লোকদের উপর পুলিশের অভিযাচার সম্বন্ধে ঐ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সত্য বা মিথ্যা তাহা বিবেচনার বিষয় ছিল না; অল্প দৃষ্টান্তই রবিবাবু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই।

কোন-কোন ধরনের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয়-স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে, যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাহাকে প্রথম চিঠি লেখেন; কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোট অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না একুশ এক কোণে ছাপা হইয়াছিল। একুশ লোকদের কাছে তিনি জায়বিচার পাইবেন না, জানি; তথাপি আমাদের জ্ঞান-অনুসারে কয়েকটা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

চা-বাগানে কুলীর প্রাণনাশ

সম্প্রতি দুটি চা-বাগানে দুজন কুলির প্রাণবধ অভিযোগে দুজন ইংরেজের বিচার হইয়া গিয়াছে। মাধবপুরে দশরথ নামক কুলিকে হত্যা করার অপরাধে উইলসনের বিচার হয়। জুররদের মধ্যে ইংরেজ তিন জনের মতে আসামী উত্তেজনাবশে কুলিকে সামান্ত আঘাত করিয়াছিল, দেশী জুরর দুজন তাহাকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। জজ ইংরেজদের মতে সায় দিয়া উইলসনকে কেবল দু শ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। অবশ্য বেকসুর খালাস দিলে আরও জায়সত্ত্ব হইত।

দশরথ বেচারার নাকি সামান্ত আঘাতেই গীহা ফাটিয়া মৃত্যু হইয়াছিল।

আর একটি মোকদ্দমার আসামী ওয়া চা-বাগানের মানেজার বিটা নামক এক ইংরেজ। মৃত, কুলিটির নাম তেলু। জুররদের মধ্যে অধিকাংশ বিটিকে নিন্দোষ সাব্যস্ত করায় জজ তাহাদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। হতভাগা তেলুর ম নাকি গীহা ফাটিয়া প্রাণান্ত হয়।

উভয় মোকদ্দমার পুস্তক পড়িয়া বেশ বুঝা যায়, যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পক্ষ হইতে হত্যা বা অন্তবিধ ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হইলে সচরাচর দেকদ বিচার দিখাট হইয়া থাকে, এই দুই ক্ষেত্রেই সেইরূপ হইয়াছে।

একুশ বিশেষের প্রতিকার হইতে পারে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলে।

বিদ্যাহা ভারতবর্ষের জন্ত সম্পূর্ণ প্রাধিকার মান্য সৃষ্টি করুন, এ আবেদন ত করা যায় না; নতুবা তাহা একটা উপায় ছিল বটে।

প্রজাস্বত্ব-বিষয়ে বঙ্গীয় আইন

বাংলা দেশে প্রজাস্বত্ব বিষয়ে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা অনেক বৎসর পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। উহা সংশোধনার্থ সনুকার পক্ষ হইতে নদিয়ার মহারাজা ব্যবস্থাপকসভায় একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন।

জমীদার-পক্ষ প্রবল ও ধনশালী। তাহাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্ত চেষ্টার ক্রটি হইবে না। রায়তরা তেমন ধন-শালী এবং দলবদ্ধ নহেন। এই কারণেই, রায়তদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার উপায় নির্দেশ করিবার নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটিতে রায়তপক্ষের সভ্য, যথেষ্ট সংখ্যক থাকি একান্ত আবশ্যিক।

যে-সব প্রজা কোন জমীর স্বয়ং চাষ করিয়া থাকে, নূতন বিলে তাহাদিগকে তাহাদের ঐ জমী হস্তান্তর করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে ভিন্ন অন্য প্রকারে ঐ জমী হস্তান্তর হইলে, জমীদার নির্দিষ্ট-পরিমাণ টাকা দিয়া উহা নিজের হাতে লইতে পারিবেন, এই ব্যবস্থা আছে। রায়ত নিজে কোন

জমীর চাষ করিলে তাহাতে তাহাকে এই যে স্বয়ং দেওয়া হইতেছে, ইহাতে তাহার বিপদও আছে। এই কারণে জমীদারেরা ঐভাবে জমী বিলি না করিয়া চাষী-দিগকে বেতনভোগী মজুরের মত নিযুক্ত করিয়া চাষ করাইতে পারেন। তাহাতে তাহাদের দশা এখনকার চেয়ে মন্দ বই ভাল হইবে না। এইজন্য নূতন বিলের পারাটি একরূপভাবে লিখিত হওয়া উচিত, যাহাতে রায়ভ-দিগকে বেতনভোগী মজুরে পরিণত হইতে না হয়।

নূতন বিলে চাষী রায়ভকে তাহার জমীর উপরের গাছ কাটিয়া বিক্রী করিবার বা নিজের কাজে লাগাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গাছ মূল্যবান হইলে তাহার দামেব কিয়দংশ জমীদারকে দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কোন্ কোন্ গাছ মূল্যবান, বিলে অস্তিত্ব: মোটামুটি তাহার একটা নিদেপ আছে কি না, এবং মূল্যের কত অংশ জমীদারের প্রাপ্য তাহা লিখিত আছে কি না, জানি না। তাহা থাকা দরকার; নতুবা ইহা লইয়া বিবাদ ও মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা।

কোন জমীর খাজনা জমীদার যাহা পান, তাহা কমবে না, কিন্তু রায়ভ তাহাতে ধরবাড়ী নির্মাণ করিতে বা পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিতে পারিবে, নূতন আইনে এইরূপ ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

দু মিনিটের জন্য অর্ধপৃথিবী বেটন

আগামী ৩০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী, সুমাত্রা দ্বীপে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমেরিকার অক্সপোর্ট ওয়াশিংটনের নৌবিভাগের পর্যবেক্ষণাগার হইতে একদল বৈজ্ঞানিক সুমাত্রা গিয়াছেন। গ্রহণ কেবল দুই মিনিট স্থায়ী হইবে। কিন্তু সেই দুই মিনিটেই পর্যবেক্ষকেরা বায়োস্কোপের জন্ত ছবি তুলিতে এবং বহুবর্ণ ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ লইতে পারিবেন, আশা করেন। তাহা হইতে সূর্যমণ্ডলের নানা গ্যাস সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, এবং সূর্য সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ও জানা যাইতে পারে। এই কাজের জন্ত আমেরিকার উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর আধটা পরিধি বেটন করিয়া সূর্য সুমাত্রায় আসিচ্ছিলেন।

এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের লোকেরা তাহাদের পর্যবেক্ষণের আড়তা গাড়িবার জন্ত এবং দূরবীক্ষণস্থাপনের উচ্চ মঞ্চ নির্মাণের জন্ত তিন মাস ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মেনী হইতে এবং সোয়াথমোর কলেজ হইতে অল্প এক এক দল বৈজ্ঞানিকও গ্রহণের সময় সুমাত্রায় উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন। ইটালীর এক দল বৈজ্ঞানিক আফ্রিকায় থাকিবেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যত্নব্যবহারে দক্ষতা, জ্ঞানপিপাসা, ধনশালিতা ও উচ্ছোগিতার একত্র সমাবেশ হইলে তবে কোন জাতি দূরদেশে গিয়া বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্ত এত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে ও কষ্ট স্বীকার করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে এখনও এই অবস্থা জন্মে নাই। ইহা দুঃখের বিষয়।

পুরাকালে অবশ্য কোন দেশেই জ্যোতিষিক ও জন্ত-বিধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্ত একরূপ বৃহৎ আয়োজন ও চেষ্টা হইত না; কিন্তু কিছু জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণ ভারতবর্ষে ও অন্তর্গত কোন-কোন দেশে হইত।

আমেরিকান পুলিশের দক্ষতা

আমেরিকার পুলিশ বিরূপ সামান্য প্রমাণ অবলম্বনে অপরাধী নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সে-বিষয়ে সম্প্রতি সাত্তিকিফিক আমেরিকান নামক বৈজ্ঞানিক মাসিকপত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিব।

গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা-প্রবাসী কতিপয় ভারতীয় ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টায় কারাকন্ড হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যে-সব চিঠিপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বাংলা, গুরুমুখী, হিন্দুস্থানী, উর্দু, জার্মান, স্পেনীয়, বা ইংরেজীতে লিখিত। কালী-কর্ণিয়ারস্থিত বার্কলী শহরের অপরাধতত্ত্ববিৎ এডওয়ার্ড অস্কার হাইনরিক্ ভারতীয়ভাষাবিদ বা নানাভাষাবিদ না হইয়াও কোন-কোন ভারতীয়ের দোষ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। সে-বিষয়ে তিনি বলেন :—

“ During the World War enemy Agents lused themselves in an attempt to hatch a nasty brood of

troubles for John Bull, and by making their headquarters in San Francisco, Uncle Sam was drawn into it. The idea was to stir up enough strife to warrant sending troops to India, thereby making that many less effectives available for use on the Western front. This was known as the Hindu-Gadhr Revolution Plot.

"During the trial of these cases I served the United States and British Governments jointly. Examinations were made and authorship established of documents and papers written in Bengali, Gurumukhi, Hindustani, Urdu, German, Spanish and English, and I lay no claim to being a linguist."

নানাভাষায় লেখা কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া তিনি সাংকেতিক আমেরিকানের প্রবন্ধলেখককে বলেন—

"This is Bengali script. Do you see how this W-like character is formed? And this one that looks like the letter V? See how it is joined to the next character in every case? These are some of the peculiarities of this man's writing which helped to clear up a great many questions and to convict him.

"In work of this kind, while it is not essential that an examiner should be a linguist, it is necessary that the fundamental movements by which writing is executed be thoroughly understood."

অপরামিতস্বস্ত হাইনরিকের মন্তব্যের তাৎপৰ্য্য এই, যে, লেখার ছাঁদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে ই লেখার পরীক্ষকের নানা ভাষাবিদ হইবার প্রয়োজন নাই; যে-সব মূল রেখাগতি বা টানের দ্বারা লিপিকায় সম্পন্ন হয়, তাহাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা চাই।

হাইনরিক যে-সব চিঠি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া

ছিলেন, তাহার মধ্যে বাংলা একটি চিঠির প্রিলিপি এখানে দিলাম।

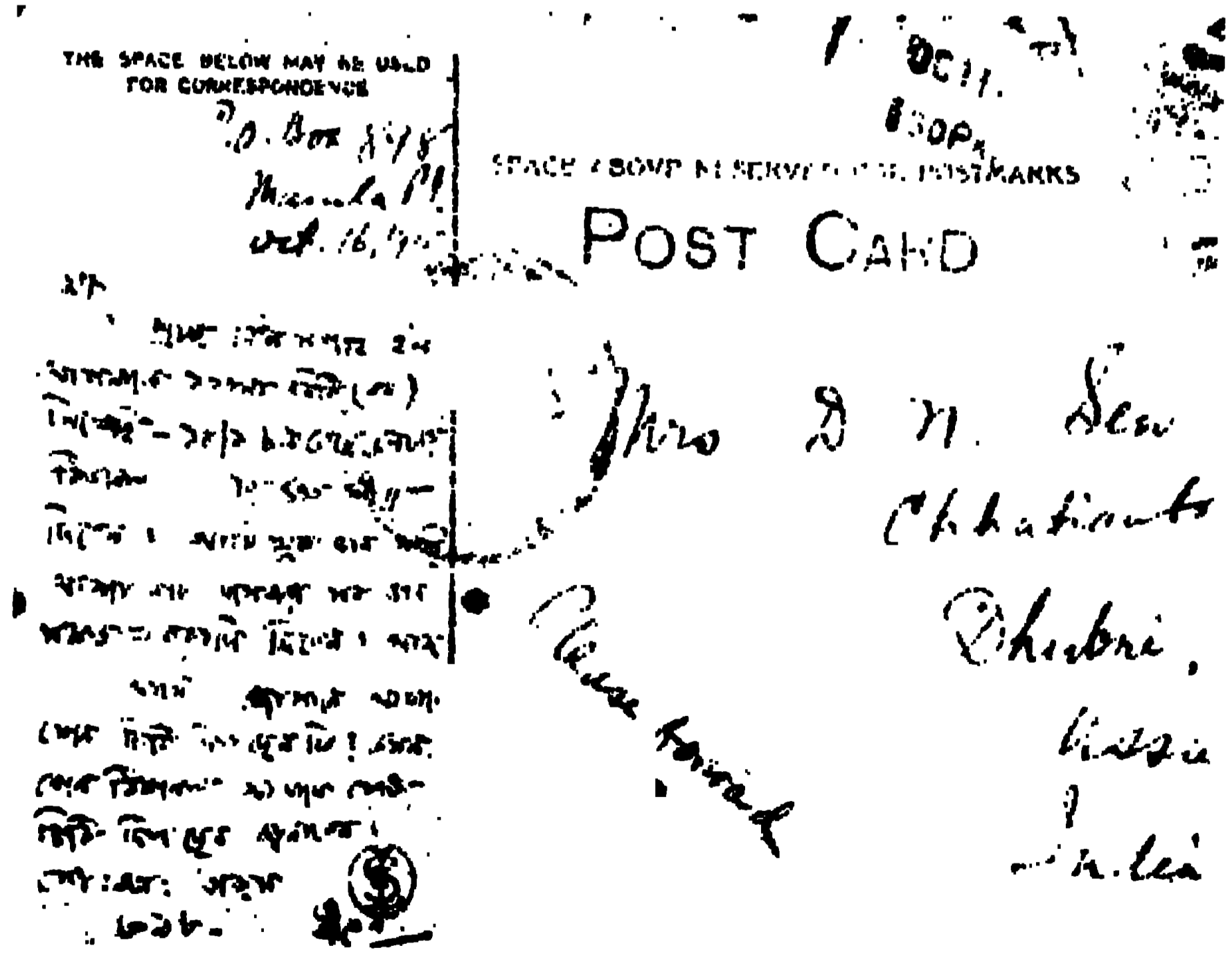
সুমাত্রায় হিন্দু সভ্যতা

বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে না হইলেই অন্য নানা বদ উদ্দেশ্যে হিন্দুরা ভারত মহাসাগরের বহুদূরে পুরাকালে যাত্রায়াত করিতেন, এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দু সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গভূমি সুমাত্রায় প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকালে তথাকার নানা বিদ্যার উৎপত্তি হইয়া ভারতবর্ষের সঞ্চিত সংস্বে। এই স্থানের অসংখ্য পাহাড় মালভূমিতে আবিষ্কৃত উৎকর্ণ কোন-কোন লিপি হইতে জানা যায়, যে, সুমাত্রায় তানা নানার তরুণ পৃথিবী সমগ্র শব্দার্থে এক প্রবল পরাক্রম হিন্দু বাঙা ছিল। এইসব লিপিতে সুমাত্রাকে "প্রথম যমদ্বীপ" বলা হইয়াছে। সুমাত্রায় হিন্দু সভ্যতার বিস্তার চিত্র একদল বিদ্যমান আছে। বৃন্দার এবং আরও বহুসংখ্যক স্থানে হিন্দু মন্দিরের ভগ্না বশেষ দৃষ্ট হয়। কাম্পার নদীর তীরবর্তী মুন্সারা জাকুম নামক স্থানের পরসামবেশ তাহার মধ্যে প্রধান। সেখানে একটি ৪০ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মূর্তি আছে। এই ভগ্নাংশগুলি বোধ হয় একাদশ শতাব্দীর। পাগার কঙ্ক নামক স্থানে কতকগুলি পাথরে সংস্কৃত ও মন্যাকাব্যে মালয় ভাষায় নানা লিপি উৎকর্ণ আছে। সুমাত্রায় যে-যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাতে বিস্তার সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয়। অসংখ্য বৃক্ষ

সেমন হিন্দুরা পবিত্র জ্ঞান করে, সুমাত্রায় বাঙা জাতিও সেইরূপ করিয়া থাকে। উত্তরকালে যমদ্বীপ হইতেও শৈব সম্প্রদায়ের অনেক ঐতিহাসিক হিন্দু সুমাত্রায় গিয়া হিন্দু সভ্যতার বন্ধিত করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৈব ভাবের

—

স্থানের উত্তরদিকগামী বৌদ্ধের সঞ্চিত মিলিয়া হাইতে পারে নাই। হ্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্মের প্রভাব ও শক্তি অত্যুৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়া, এবং কালক্রমে উহা প্রধান কয়েকটি রাজ্যে বহুমূল হয়।



আমেরিকায় হিন্দু-বিপ্লবীদের বিচারে প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহৃত একটি পোস্টকার্ড ১লা পৌষ অধ্যাপক স্কোকেল

এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে স্মার্ত্রায় বৌদ্ধ কীর্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন এবং ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে তৎসমুদয়ের চিত্র দেখাইবেন। তাহা দেখিয়া যদি কোন ভারতীয়ের অবিলম্বে স্মার্ত্রা যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাচীন হিন্দু কীর্তি দর্শন এবং স্মার্ত্রা-গ্রন্থ পর্য্যবেক্ষণ উভয়ই হইতে পারিবে।

ইটালী ও ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে দুইজন সংস্কৃত ও অল্প কোন কোন ভাষাবিদ ইটালীয় অধ্যাপক আসিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি বয়োজ্যেষ্ঠ।



অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি

অন্তের নাম অধ্যাপক টাচ্চি। ফর্মিকি মহাশয়ের সহিত ইটালীর প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনি ইটালীয় সাহিত্যের সমুদয় শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং ইটালীয় ললিতকল-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলী ইটালীর পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। এই উপলক্ষে মুসোলিনি ফর্মিকিকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে জগতের সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।



ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিংহর মুসোলিনি

কার্পাস-শুষ্ক-আদায় স্থগিত

সিকি শতাব্দীরও অধিক পূর্বে ভারতবর্ষের সূতা ও কাপড়ের কলে যত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার উপর শুষ্ক বসান হয়। বিলাতী সূতা ও কাপড়কে ভারতীয় ঐ-ঐ পণ্য দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই শুষ্ক স্থাপিত হয়। বিদেশ হইতে যে-সব পণ্যদ্রব্যের আমদানী হয়, তাহার কোন-কোনটা বা সবগুলার উপর একটা কর বসাইবার রীতি নানাদেশে প্রচলিত আছে। দেশী পণ্যশিল্প বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিলে দেশীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কখন-কখন এই শুষ্ক ধার্য্য হয়, কখন-বা রাজস্ববৃদ্ধির জন্য তাহা ধার্য্য হয়। এইরূপ কারণে বিলাতী সূতা ও কাপড়ের উপর ভারতবর্ষে শুষ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে বিলাতের কলওয়ালারা চীৎকার জুড়িয়া দিল, যে, ভারতের কলে উৎপন্ন ঐ-ঐ জিনিষের উপর ট্যাক্স বসান হউক। তাহারা “বাদশাহ-কা দোস্ত”; কাজেই তাহাদের হুকুম অনুসারে ভারতের জিনিষের উপরই ভারতে ট্যাক্স স্থাপিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন এদেশে বরাবরই হইয়া আসিতেছে। একবৎসরেরও উপর

হইল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উঠাইয়া দিবার জ্ঞপ্তি প্রস্তাব ধার্য হইল। কিন্তু এতদিন গবর্নেন্ট সেই প্রস্তাব অল্পসারে কাজ করেন নাই। কয়েক মাস হইল, বোম্বাই অঞ্চলের কলওয়ালারা এই ওজুহাতে শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দেয়, যে, তাহাদের উপর জব্বার উপর ট্যাক্স থাকায় এবং অগ্ৰান্ত কারণে তাহাদের ব্যবসাতে মন্দা পড়িয়াছে। তাহাতে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয় এবং বেকার থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। বিলাতের শ্রমিকদের বৃহৎ সভায় ইহার খবর পৌঁছে এবং তাহারা এখানকার শ্রমিকদের সহিত সহায়ত্ব প্রকাশ করে ও কিছু অর্থসাহায্যও করে। এখানকার কলওয়ালাদের উপর নানাদিক হইতে চাপ-পড়া সত্ত্বেও তাহারা বলে, যে, কার্পাস-পণ্যস্বত্ব উঠিয়া না গেলে তাহারা শ্রমিকদিগকে আগেকার হারে বেতন দিতে পারিবে না।

যাহা হউক, এত দিনে বড়নাটের হুকুম অল্পসারে তিন মাসের জ্ঞপ্তি শুধু আদায় স্থগিত হইয়াছে, এবং উহা স্বাধীনভাবে উঠিয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, যে, উহার আদায় স্থগিত রাখিবার আদেশ দিবার পূর্বে বড় নাটকে বিলাতের মন্ত্রীসভার অস্থমতি লইতে হইয়াছিল। ইহা আগে হইতেই জানা ছিল, যে, ভারত গবর্নেন্ট বিলাতী গবর্নেন্টের হুকুম অল্পসারে কাজ করেন। বিলাতী গবর্নেন্ট এখন হয়ত কোন-কোন কারণে বুঝিয়াছেন, যে, ভারতীয় কার্পাস পণ্যস্বত্ব উঠাইয়া দিলেও বিলাতী কলওয়ালাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিংবা কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিলাতী মন্ত্রীসভার স্ববুদ্ধি হইয়া থাকিবে। ভিতরের কথা পরে জানা যাইতে পারে।

কারণ যাহাই হউক, শুকটা উঠিয়া যাওয়ায় ভারতীয় কলওয়ালাদের সুবিধা হইল। তাহারা শ্রমিকদের বেতন পূর্ববৎ করিয়া দিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের কাপড়ের দরও কমিয়াছে বা শীঘ্র কমিবে। গবর্নেন্ট এই কাজটা ভালই করিয়াছেন। কিন্তু যদি বিলাতী কলওয়ালারা আবার ধরিয়া বসে, যে, তাহারা ভারতবর্ষে যে কার্পাস-জব্য রপ্তানী করে, তাহার উপর শুকও রদ করিতে বা কমাইয়া দিতে হইবে, এবং যদি গবর্নেন্ট তাহাদের অগ্ৰায় আদায় করেন, তাহা হইলে ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের কোন সুবিধা হইবে না।

গঙ্গার জল নির্মল রাখিবার উপায় আলোচনা

আশপাশের মাটি ধুইয়া যে জল নদীতে পড়ে, তাহার সহিত নানাবিধ আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ মিশ্রিত

থাকিলে নদীর জলও ময়লা হয়। ইহা অস্বাস্থ্য-পরিমাণে সকল নদীতেই হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য দুটি কারণে গঙ্গার জল খুব দূষিত হইয়া আসিতেছে। একটি কারণ, নদীর উপর যে-সব মালবাণী নৌকা নজর করা থাকে, তাহার মাঝিরা নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু প্রধান কারণ নদীর ধারে বহুসংখ্যক পাটের কল স্থাপন। এইসব কলে হাজার-হাজার মজুর কাজ করে। তাহাদের মলমূত্রে নদীর জল দূষিত হয়। প্রতিকারের জ্ঞপ্তি আন্দোলন কুড়ি বৎসরেরও উপর ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু এখনও কাজে কিছু হয় নাই। সেইজন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন, যে, গঙ্গার জল দূষিত হইতেছে কেন, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর, সার নীলরতন সরকার প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিবার জ্ঞপ্তি বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বরদাপ্রসন্ন দে, মৌলবী সয়্যাদ হোসেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিঃ এমি বিয়ানাজ্জি, শাহ সৈয়দ এমদাতুল্লাহ্ এবং অগ্ৰান্তকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক।

মাননীয় নদিয়ার মহারাজা সরকার পক্ষ হইতে বলেন, বিষয়টি খুব আবশ্যিক; ডাঃ রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া ধন্যবাদ হইয়াছেন। গঙ্গার জল যে খুব দূষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য, এবং সরকারেরও এই দোষ নিবারণ-কল্পে কোন আইন প্রণয়নে অমত নাই, এবং এষ্টজন্য প্রস্তাব উত্থাপনের আবশ্যিক নাই।

এইসব কথাই খুব সত্য হইতে পারে। কিন্তু গবর্নেন্টের সাধু ইচ্ছা কুড়ি বৎসরেরও কেন কাগো পরিণত হইল না ?

ডাক্তার রায়ের মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হইয়াছে।

গবর্নেন্টের ইচ্ছার অকপটতার প্রমাণ এখন পাওয়া যাইতে পারিবে।

নেপালে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ

নেপালের নৃপতি সাকীগোপাল; প্রধান মন্ত্রী সর্কেসর্কা। তাঁহাকে মহারাজা বলা হয়। মহারাজা নেপালে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার এই কাজ শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি নেপালের দাসদের প্রভূদিগকে দাসগণকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন; তাহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেছে। প্রভুদের সংখ্যা ১৫০০০ এবং দাসদের সংখ্যা

প্রায় ৫৩০০০। গত বৎসর নবেম্বর মাসে মহারাজা বলেন, যে, তিনি দাসদের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য, অর্থাৎ তাহাদের প্রভূদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার জন্য, চৌদ্দ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন। পরে দেখা গিয়াছে, যে, ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা লাগিবে। এপর্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে; তাহার অধিকাংশ মহারাজার নিজের দান। তাহার এই কাজটি খুব প্রশংসনীয়।

সিদ্ধুদেশে অন্নসমস্যার আলোচনা

সিদ্ধুদেশে ছাত্রদের কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন গত নবেম্বর মাসে হইয়া গিয়াছে। এবার বঙ্গের জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি কনফারেন্সের শেষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ছাত্রদের সমক্ষে তিনি উজ্জলভাষায় জীবনের যে সাদাসিধে আদর্শ স্থাপিত করেন, তাহা মনে রাখিবার যোগ্য। তাহাতে কাজের কথাও যে ছিল না, তাহা নহে। সেরূপ কোন কোন কথার তাৎপর্য নীচে দিতেছি।

“আজকাল বৃত্তি শিক্ষা, পণ্যশিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির এক-রকম বাতীক লক্ষিত হইতেছে। লোকে জীবনে অকৃতকার্য হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে চীৎকার করিতেছে, ‘আমাদিগকে বৃত্তি শিক্ষা দাও।…… বাঙালী, মাদ্রাজী ও সিদ্ধীদের মত লোকেরা যে জীবনে কিছু করিতে পারিতেছে না, তাহা বৃত্তি শিক্ষা ও পণ্যশিল্প-শিক্ষার অভাবে নয়। বিদেশী সর্বোৎকৃষ্ট পণ্যশিল্প-শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু শত বাঙালী যুবক আছে। কিন্তু তাহারা, অল্প লোকদের মত, চাকরী খুঁজিতেছে। অল্প দিকে, যে নব মাড়োয়ারী দলে-দলে বৎসর বৎসর বাংলা দেশে আসিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাও। আমার বোধ হয় না, যে, মাড়োয়ারীরা যখন বাংলা দেশের জন্য রওনা হয়, তখন তাহারা মাড়োয়ার বা বিকানেরের শক্ত মাটি হইতে আহৃত মূলধনে পকেট বোঝাই করিয়া আসে। কিন্তু তাহারা আমাদের উর্ধ্ব দেশে ১০।১৫।২০ বৎসর

থাকে; এবং তার পর যখন বাড়ী যায়, তখন খলি খলি সোনা লইয়া যায়। বাঙালী কিম্বা মাদ্রাজী যেখানে অকৃতকার্য হয়, সেখানে মাড়োয়ারী কৃতকার্য হয় কেন? ইহা বলিবার জো নাই, যে, মাড়োয়ারী বৃত্তি শিক্ষা ও পণ্য শিল্প শিক্ষার বোঝায় ভারাক্রান্ত। তথাপি সে কৃতকার্য হয়। কেন? উত্তরটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট। মাড়োয়ারী কখন শ্রমে বিমূঢ় হয় না। সে সকাল সন্ধ্যা খুব পরিশ্রম করে, ‘বুদ্ধিপ্রধান’ বাঙালী বা মাদ্রাজীর মত সে সর্বদা সোজা নরম চাকরীর জন্য হাঁ করিয়া থাকে না। তা ছাড়া মাড়োয়ারী সাহস করিয়া দায় খুঁকি লয়, সর্বস্ব পণ করে; কাজেই, পরিণামে, যা চায় তা সবই পায়। পণ্যশিল্প শিক্ষা বা বৃত্তি শিক্ষা মাড়োয়ারীর কৃতিত্বের বারণ নহে; তাহার স্বভাবে যে সব গুণ আছে, তাহাতেই সে সফলকাম হয়— তাহার সাহস, তাহার দায়খুঁকি লইবার ক্ষমতা, তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা, অবিরত কঠোর শ্রম কবিবার শক্তি তাহাকে সাফল্য দান করে। তোমরাও এইসব গুণ বিকশিত করিতে চেষ্টা কর: তাহা হইলে মাড়োয়ারী যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তোমরাও তাহা অর্জন করিতে পারিবে।”

বৃত্তি শিক্ষা ও পণ্যশিল্প শিক্ষার উপর যদি কেহ মাড়োয়ারীদের গুণসমূহ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সাফল্য নিশ্চয়ই তাহারও করায়ত্ত হইবে।

পঞ্জাবে নারীর অধিকার

পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা সকলে একমত হইয়া নারীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দিয়াছেন। অর্থাৎ পুরুষদের যে প্রকার যোগ্যতা থাকিলে তাহারা ভোট দিতে পারে, সেই-রূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট নারীরাও ভোট দিতে পারিবে। এ বিষয়ে পঞ্জাবী সভ্যদের একমত বাংলাদেশকে লজ্জা দিয়াছে। এখন পঞ্জাবী নেতারা বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের এই অধিকারের সদ্যবহার করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি করিলে স্বথের বিষয় হইবে।



“এমনি করেই যার যদি দিন থাকে না—”

চিহ্নকর শ্রী দাঃকেন্দ্রনাথ দেববন্দ্য,

কলিকাতা



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩২

৪র্থ সংখ্যা

গান

স্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রত্যাহার মাঝে,
দিগ্দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে ।

হের গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে

নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,

এস আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে ।

কলুষ কলুষ বিরোধ বিচ্ছেদ

হউক নিঃশূল হউক নিঃশেষ,

চিন্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে ।

স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম

পূর্ব পশ্চিম বহু সঙ্গম,

মৈত্রী-বন্ধন-পুণ্যমন্ত্র-পবিত্র বিশ্বসমাজে ॥ •

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কচি-সংসদ



পরশুরাম রচিত ❑ নারদ বিচিত্রিত

আলিগরের সংবাদ—সাগর আইলাগে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ভ হইয়াছিল সেটা সস্ত্রিতি পাকা-রকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, স্ততয়াং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরদীতে তিনটা সবুজ পোকায় অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুধাইতেছেন। শেখরায়ে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকার এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্ছা বিকসিত হইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ঘ্যোমে বেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিবিজয়ে বাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মক্কেলহীন। সাকুলার রোডে ধাপা-মেলের বাঁশী পৌ করিয়া বাজিল,—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেরা জিওমেট্রি ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেবুল অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেরা

ঘাড়ে এগুনের ছূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত ছ'হাতের কছই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মুখ করিয়া বুক বুক বুক বুক করিতেছে। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবার কোথা যাওয়া যায়? ছ'একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বহু বহু সংকারণের জায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানাষি ধর্ম—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু নচ মে প্রবৃত্তিঃ। স্বম্পের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে।

পদব্রজ, গৌ-ধান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে-মাঝে মুখ বদলাইবার জন্ত মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ী, রেলগাড়ীর রাজা ই-আই-আর। বন্ধু বলেন—ইংরাজের জিনিবে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আজ্ঞা, রেল না হয় ইংরাজ করিয়াছে, কিন্তু ধরচটা কে যোগাইতেছে? আজ না হয় আমরা

ইংরাজকে সহিংস-বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সে-ও আমাদের কীর্তি অবাক হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্টাইবে, ছ'শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরাজ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পয়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী বোপ-ঝাড়, পল্লী-কুটীরের খুঁটের ছুমিটে ধোঁয়া, পানা-পুকুর হইতে উখিত জুই ফুলের গন্ধ—এ সব অতি স্নিগ্ধ জিনিষ। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিজীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া বাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি ভালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম্, পুরী-কচৌড়ি, কচি-কাবাব, dinner, sir, at Shikohabad ? তার পর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, ছ'পাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মত বহিয়া বাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের স্তামাধমান বনানীকে ধীরে পরিক্রমণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুন্ধটের গন্ধ, হঠাৎ লানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা,—পশ্চিম আকাশে গুই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পালা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে সুলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক জাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে জুই কঞ্চল পাতা, তার উপর আরো জুই কঞ্চল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ডর-পেট ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী,—তা ছাড়া বেতের বাসে আরো অনেক আছে। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লোহা-লকড়ে চাকার ঠোকরে জিঞ্জির ভাঙার ঝঙ্কার মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে,—আমি চিৎপাত হইয়া ভাঙব নাচিতেছি। হমে নস্ত, হমে নস্ত, হমে নস্ত।

এই পাশবিক কবি-কল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়ে-প্রীতি,—ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ ছুট সর্প লুকায়িত আছে ? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউসি বাইব,

আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই বাইব, গৃহিনীকে একটা মোটা রকম ঘুস এবং অজস্র ধিরেটার-দেখাব অহুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes, woman disposes।

আমার বড় স্কটকেসটা বাড়িতেছি; হঠাৎ বিছিন্নতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিনী বলিলেন—“হোয়াট্-হোয়াট্-হোয়াট্ ?”

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিনীর ইংরাজী বিদ্যা ফাট্ বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার কাজিল স্তালকবৃক্ষের কল্যাণে গুটিকতক মূখরোচক ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং স্বেযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—“এই মনে কচি ছুটির ক'দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।”

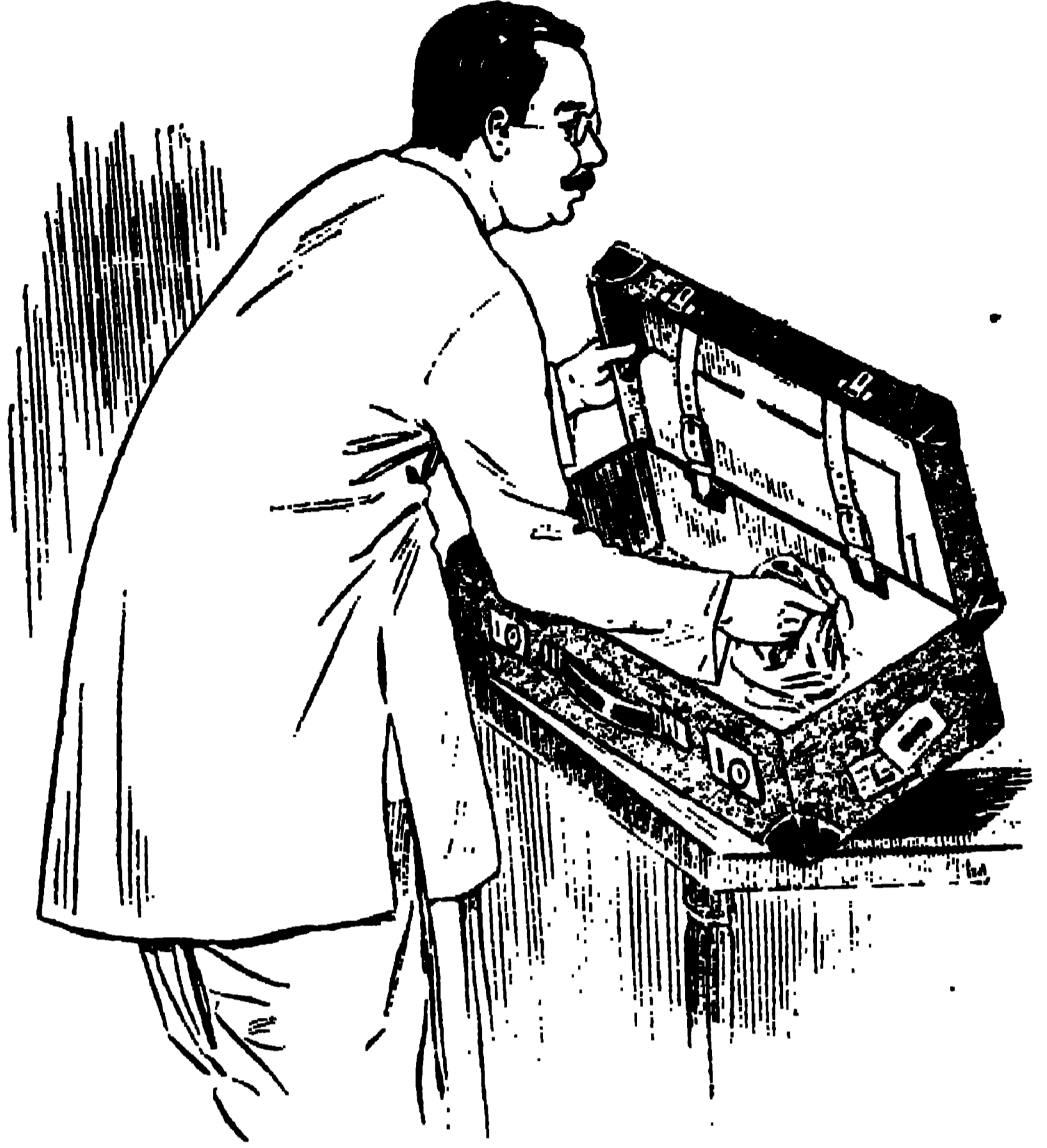
গৃহিনী বলিলেন—“হোয়াট্ ইয়ে ? হঁ, একাই বাবার মতলব দেখ্ চি,—আমি বুঝি একটা মস্ত ভারি বোকা হয়ে পড়েছি ? পাহাড়ে গিয়ে তপস্তা হবে নাকি ?”

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমাধমান, বুঝিলাম পর্ত্তো বহিমান্। ধাঁ করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—“রাম বল, একা কখনো তপস্তা হয়। আমি হব না হব না হব না তপস ঘাদ না মিলে তপস্বিনী।”

মস্তবলে স্নোক জুইসাল কাটিয়া গেল। গৃহিনী সহান্তে বলিলেন—“হোয়াট্ পাহাড় ?”

আমি।—ডালহাউসি। সে অনেক দূর।

গৃহিনী।—হাঃ ডালহাউসি। দাজিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন কাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার গুয়োপোকা কেনা হ'ল—সেই যে, বোয়া না কি বলে,—আর হীরে-বসানো চরকা ব্রোচ্,—তা ত এপর্যন্ত পরতেই গেলুম না। তোমার সেই ডালকুস্তো পাহাড়ে সে-সব দেখ্বে কে ? দাজিলিঙে বরঞ্চ কত চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার নন্দ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, স্কু-খাসী, এরাও গেছে। মংকি



আমার হটকেসটা বাড়িয়েছি—

মিত্তিরের বউ তার ভেরোটো এঁড়ি-গেঁড়ি ছানা-পোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাটা, স্তত্রাং দার্ভিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্ভিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহাৰ সমাধা করিয়া পারে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্টশ্ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।...জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না...এমন সময় অনতিদূরে—

এই পর্য্যন্ত রবিবাবুর সহিত আশ্চর্য্যরকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্তপ্রকার,—বজ্রাণের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমরাণের মোস্তাফ নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি

সম্পর্ক-নির্কিশেবে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।

নকুড় মামা পথের পার্শ্বস্থিত খন্ডের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কন্ফটার, পায়ে ওভারকোট, চকুতে ক্রকুটি, মুখে বিরক্তি, আমাকে দেখিয়া কহিলেন—“ব্রহ্মেন নাকি ?”

বলিলাম—“আজ্ঞে হ্যাঁ। তার পর, আপনি যে হঠাৎ দার্ভিলিঙে? বাড়ীর সব ভাল ত? কেউ খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি কক্ষে সে আজকাল?” কেউ নকুড়-মামার আপন ভাগিনের, বেনারসের বিখ্যাত ষাদব ভাস্কারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাপ্লাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড় একটা গ্রাঙ্ক করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—“সব বল্টি। তুমি আগে আমার একটা কথা জবাব দাও দিকি। এই দার্ভিলিঙে লোকে আসে কি কত হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কল্কাতার



'হোয়াই—হোয়াই—হোয়াই

ত আজকাল টাকার এক মণ বরফ মেলে, তারই গোটা-কতক টালির ওপর অয়েলক্রথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সত্যায় শীত-ভোগ হয়। উচু চাই—তা না হ'লে সৌখীন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, ছ'বেলা তালগাছে চড়লেই ত হয়। যত সব হতভাগা—।”

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল, তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-ধাসা করিয়া-ছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের দাঁটার ছাপ এখনো রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত-উপত্যকা নদী-জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিমটির ফল এই

হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,— ডগবানের আকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দাঙ্কিলিতে বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—“কি জানেন নকুড়-মামা,—কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেচে—

ভাগ্যিস্ আছিল নদী অগং সংসারে

তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দাঙ্কিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড়



নকুড় বাসা

ভিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে-মাঝে ধস্ন নাবে।”

মামা জন্ত হইয়া খদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—“উচ্ছ্রে যাবে। এটা কি ভদ্র লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরলে ত দশ-তলার ধাকা, ছু'পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে ত হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, খাম্লে কাঁপুনি। কেনরে বাপু?”

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য জেতা নিদেনে ছাপর যুগ হইত এবং মামা যদি মুনিষ্কবি বা ভাস্নলোচন হইতেন, তবে এক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহরটা সাহারা মরুভূমি

অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম—“তবে এলেন কেন?”

নকুড়।—আরে এসেছি কি সাথে। কেটার স্বভাব জানো ত? লেখাপড়া শিখলি, বে-খা কর, বিবয়-আশয় দেখ্—রোজগার ত আর করতে হবে না। সে-সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ'ল, ছবি আঁকলে। তার পর আম-সব্বর কল ক'রে কিছু টাকা ওড়ালে। তার পর কল্কাতার গিয়ে কতকগুলো হোঁড়ার সর্দার হয়ে একটা সমিতি করলে। তার পর বসে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেন্ট-টেলিগ্রাম। কি হকুম? না একুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন্ ডিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করতে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগ্নে, সকল আব্দার শুন্তে হয়। এসে দেখি—মুন-শাইন্ ডিলায় নরক

সুন্দার। বরদারীর দল আগে থেকে এসে বসে আছে।
সই কচি-সংসদ,—কেটা যার প্রেসিডেন্ট।

আমি।—পাজী ঠিক হয়েছে ?

নকুড়।—আরে কোথায় পাজী। এখানে এসে হয়ত
একটা লেপ্‌চানী কি ছুটানী বিয়ে করবে।

আমি।—কচি-সংসদের সদস্যরা কিছু জানে না ?

নকুড়।—কিছু না। আর জানলেই বা কি, তাদের
কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন
হেয়ালী। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে
তাদের ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেটে-বাবাজি আজ বিকেলে
পৌছবেন। সম্বোধন যদি এস, তবে সবই টের পাবে,
সংসদের সম্বোধনের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারী
পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম
পেলারাম। বি-এ পাশ করিয়া ছোকরার কচি এবং
মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গৌফ কামাইল,
চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিষ্টের খোঁপার মতন মাথার
ছ'পাশ কাঁপাইয়া দিল। তার পর মুগার পাজাবী, গরদের
চাদর, সবুজ নাগ্‌রা ও লাল ফাউন্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে
গিয়া আঙ মুখুয়্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে
পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। তার
আঙতোষ এক তলুম এন্‌গাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া
করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি-এ
ডিগ্রীয়া বাস্তব করিয়া নিকপাখিক পেলব রায় হইল।
তারই উদ্দেশ্যে কচি-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে যতদূর
জানি কেটেই সমস্ত ধরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের
উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে-
তাকে মেঘার করে না এবং নূতন মেঘারের দীক্ষা-
প্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে
সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করম্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী যোগটি
ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে যোগ টিন সিগারেট
পোড়ে এবং এন্‌তার চা ধরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, যেসব কাটিয়া গিয়াছে।
সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মুন-শাইন্‌ ভিলায় যাইব, বলিয়া
নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।



পেলব রায়

গৃহিণী তিনছড়া পাঁচসিকা নামের চুণী-পায়ার মালা
উপর্যুপরি গলায় পরিয়া বলিলেন—“দেখ ত, কেমন
মানাচ্ছে।”

আমি বলিলাম—“চমৎকার। যেন পরজী।”

গৃহিণী।—তুমি অতি ক্যাভাভেরাস্‌। পরজী না হ'লে
বুঝি মনে ধরে না ?

আমি।—আরে চটো কেন। পরকীয়াত্ত্ব অতি
উচুদরের জিনিষ। তার মহিমা বোঝা যার তার কন্‌ নয়,
তবে যে নিজের জীকে পরজীর মতন নিত্যানুতন—ধরি
ধরি ধরিতে না পারি—দেখে, সে অনেকটা এগিয়েচে।
রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। ক্রয়েন্‌ বলেচেন—

গৃহিণী।—ডায়াম ক্রয়েন্‌—এও রাধাকৃষ্ণ মাথায়
ধাকুন। আমাদের মতন মুখখু লোকের সীতারামই
ভাল।

আমি।—কিন্তু রাম যে সীতাকে ছ-ছ-বার গোড়াতে চাইলেন তার কি ?

গৃহিণী।—সে ত লোকনিষেধ বাধ্য হয়ে। জেতা-যুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাস্কেল।

আমি।—তা—তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পারতেন।

গৃহিণী।—সেই আশ্রমে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি।—বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকীল। আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্তবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস্তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লার পড়লে অযোধ্যা শহরটাকেই কাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী।—কেন, আমি কি সূৰ্পনখা না তাড়কা রাক্ষসী ?

আমি।—সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আবুপেরে নয়।

গৃহিণী।—সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায় ? কত ওজন তার খোঁজ রাখ ? যদি কাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ডরি।

আমি।—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেট যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেট।

গৃহিণী।—হরে ! ভাগ্যিস্তানকতক গহনা এনেচি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই ?

আমি।—প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়ত এখেনো পাত্রীই স্থির হয়নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী।—গ্যাড। শুনেছিলুম কেটের বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেটের বিয়ে দিতে। সে মেয়ে ত এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনিদির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি।—তা বলতে পারি না। কেটের মতি-গতি বোঝা শিবের অসাধ্য। বাই হোক, সন্ধ্যার সময় একবার কেটের বাসার ঘোঁষ।

অনোহারিণী সন্ধ্যা। জন-বিবল পথ দিয়া চলিয়াছি শহরের সর্বত্র—উপরে, আরো উপরে, নীচে, আরো নীচে, স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু'ধারে ঝোপে অল্পশে পাহাড়ী বিঁবিঁর অলৌকিক সূঁঁনা বড় বড় হইতে নিবানে লাকাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে টান উঠিয়াছে, কুমাসার চিহ্নমাত্র নাই। এ মুন-শাইন্ ভিলা।

কিসের শব্দ ? দাঙ্গিলিং শহরে পূর্বে শেয়াল ছিল না। বর্তমানের মহারাজা ষে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন্ ভিলায় উপনিবেশ স্থাপনা করিয়াছে ? না, শেয়াল নয়, কচি-সংসদ্ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আশ্রমে উপলব্ধি করিলাম এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয় বিশ্বতরুণীর উদ্দেশে কচি-গণ স্বপ্নের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল ?

আমাকে দেখিয়া সংসদ্ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেটকে দেখিলাম না। কেট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন-শাইন্ ভিলায় আশ্রমে একরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অশ্রান্ত সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—

শিহরণ সেন

বিপ্লবিত ব্যানার্জি

অকিকিং কর

হত্যাশ হালদার

দোহুল দে

লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অরপ্রাশন-লক্ষ না সজ্ঞানে অনির্বাচিৎ ? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু চক্ষুলা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে তুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পরে 'পুং' লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে ? এই কি কেট ? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ্ অবাক হইয়া

দেখিতে লাগিল। হতাশ বেচারী নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আংকাইয়া উঠিল।

কেটের আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশ-বিন্যাসের বিরুদ্ধে বিজোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্ব-কেশরের মতন ছাঁটা, গৌফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেন্ট, মালকোচা মারা, বেগুনি রঙের ধুতি, পায়ে পট্ট ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোংকা, পিঠে ক্যাশিসের স্তাপ-স্তাক ট্রাপ দিয়া বাধা।

আমিই প্রথমে কথা কাহলাম—“কেট, একি বিভীষিকা?”

কেট বলিল,—“প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ, কেট ঠিক করেছে। ব্রহ্মেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়,—আর্ট এণ্ড এক্শিশন্স।”

আমি।—কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন?

কেট।—শুভুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীতাতপ নিবারণের জন্তে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন,—অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোষাক দেখুন—প্রম্-ভায়োলেট্ এণ্ড সেক্স-গ্রীন, হোয়াইট স্পট্‌স্—কলার কন্ট্রাষ্ট্ এণ্ড হার্মনি। এইবার পাছাপাড় হাফ-প্যান্ট্ ফর্মাস্ দিয়েছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন্স আরো ইম্প্রভ্ করবে। এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিষ নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বে-পরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেট দুই পকেট হইতে দুইপ্রকার সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—“পারেন এরকম? একটা জার্জিনিয়া একটা টর্কিশ। মুখে গিয়ে রোগ্ হচ্ছে।”

নকুড়-মামা চকু মুদিয়া অগ্নিগর্ভ শমীকবৎ বসিয়া রহিলেন। তাহার অভ্যস্তরে বিশ্বয় ও ক্রোধ খিক খিক জ্বলিতেছিল।

পেলব রায় বলিল—“কেটবাবু, আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটার এমন হলেন?”

কেট।—কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময় হয়েছে।

আমি।—নিশ্চয়ই, নইলে দরকাটা মেরে যাবে। যাক্ ওসব কথা,—কেট তুমি নাকি বে করবে?

কেট।—সেই পরামর্শ করিতেই ত আসা। আপনিও এসেচেন খুব ভালই হয়েছে। প্রথমে আমি প্রেম-সম্বন্ধে ছুঁচার কথা বলতে চাই।

আমি।—নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাবো এখন। তার পর কেট, প্রেম কি-প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—“বোদা—বোদা—!” বোদা বলিল—“হু!”

বোদা কেটের চাকর, নেপালী ক্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতঃস। পেলব তাহাকে দশ পেয়লা চা আনিতে বলিল।

কেট বলিতে লাগিল—“প্রেম-সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেচেন—নিম্নে ছুখ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কাগুর প্রেম। রশিয়ান্ কবি ভঙ্কাউইক্ বলেন—প্রেম নেশায় রাজা। মেট্রিক্ক বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খোল আরো উপকারী। মাদাম্ দে সেইয়া বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র, যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্ব্ব্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়য়াম্ লিখেচেন—প্রেম টানের সরবৎ, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী নিশতে হয়। হেন্‌রি-দি এইটুখ বলেছিলেন—প্রেম অবিদ্যার, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে ক্রমে ক্রমে আর দশটি এসে জোটে। ক্রয়েড্ বলেন—প্রেম হচ্ছে পশুধর্ম্মের ওপর সভ্যতার পালেশ্বারা। হ্যাভেলক্ এলিস্ বলেন—”

কেট।—এক পরসাগ নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই অগত্যা একটা আদর্শ দেখাবার স্বপ্নে। অগত্যা ছ'রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে—আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকলে হি'ছুর। আর এক-রকম হচ্ছে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি—হু-ই তুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনাও না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান ধারণা, কারণ কোর্টশিপের সময় ছু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হয়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি।—ওসব ত পুরানো কথা বল্চ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল।

কেট।—আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—ছদ্মন নিলিষ্ট সুশিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ তুচ্ছভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি,— যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ ক'রে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিষ্ট করেছি। এতে আছে—বেশভূষা, আহাৰ্য্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি ভিরেনকইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে আমি-স্ত্রীর হৃদয় মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এই-সব মোকাবেলা হয়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে ছু'পক্ষের একমত হয়, আর বাকী অল্প-খল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলো-যোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জ্বাটে, তা হ'লেই সব ভুল হবে। শেষে যতখুসি প্রেম হোক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল—কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে—হাইকোর্টশিপ।

আমি।—কোর্ট-মার্শাল বলে আরো ঠিক হয়। সিস্টেম ত বুঝলুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেন্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় কচ্ছ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ্ বাপ্ ক'রে পালাবে।

কেট।—পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেছি।

আমি।—কে সেই হতভাগিনী?

কেট।—পদ্ম ভুবন বোসের ভগ্নী।

আমি।—আরে! আমাদের টুনি-দিদির নন্দা? তাই বল। গিন্নি তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুনলুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্ভ হবে না?

কেট।—মোটাই না। আমরা ছু'পক্ষই নির্বিচার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল্ ম্যাটি'মনিয়াল্ ছু'রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'রে জেরা করতে পারবেন।

আমি।—রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেট।—কোনো ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।

আমি।—লোকটি ত বুদ্ধিমান্, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেট।—মজবুত ব'লেই ত বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, ছু'ঘণ্টা টেনিস খেলতে পারে, মস্কুলার ইন্ডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েকশেণ্ট্ বেশ লো। সেলাই জানে, রায়া জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবার সময় বেশী চোঁচা না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যাবেলা ভুবন বাবুর বাড়ী ঠিক যাবেন,—লডলক্ রোড, মড্ লিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখী হইলাম। মুন্-শাইন্ ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কাণে আসিল। আশ্বাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের ক্রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেটকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সংসত্ত নিয়া গৃহিণী কহিলেন—“রিপিং! পার্শ্ব-ধিরেটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।”

আমি বলিলাম—“কিন্তু তোমাকে ত শুনতে দেবে না। হাইকোর্ট শিপ গোপনে হয়, ঐটুকুই সাধারণ



‘এইবার দেখ ত’

কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেটে
‘আর পদ্ম।’

গৃহিণী।—আড়ি পাত্ব।

আমি।—তার দরকার হবে না। সব কথাই পরে
শুনতে পাবে। আমার যে কাণ তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী।—বাই হোক, আমিও যাব।

আমি।—কিন্তু তোমার ও-রকম কৌতূহল ত ভাল
নয়। ক্রমেই এর কি ব্যাখ্যা করেন জানো?

গৃহিণী।—খবদার ও মুখপোড়ার নাম কোরো না
বলুচি।

অগত্যা ছুজনেই টুনি-দিদির বাগায় চললাম।

ভুবনবাবু ও টুনিদিদি—এঁরা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-
প্রকৃতি। কর্তাটি কুড়ের সম্রাট, সমস্তকণ ড্রেসিং গাউন
পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুকট ফোকেন।
পিন্নিটি ঠিক উন্টা, অসীম শক্তিময়ী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী,
মাছ-কোটা হইতে গাড়ী রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ
নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসৎ নাই।

তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথি-সংকারের
বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া
প্রণাম করিল।

গাসা মেয়ে। কেটে হতভাগা বলে কিনা মজবুত!
একি হাতুড়ি না হামান্দিস্তা? কচি-সংসদের মধ্যে
বাস্তবিক যদি কেউ কচি থাকে, তবে সে কেটে,—বতই
প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্যশূঙ্কের একটা শিং ছিল,
কেটের ছ’টো শিং। কিন্তু এই স্ত্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ
মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? জীজাতি
বান্দর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু
তাই? জীচরিত্র বোঝা শক্ত। নাঃ, মনস্তত্ত্বের বইওলা
ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা তেদ করিয়া
সুদূর রান্নাঘর হইতে টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ
হাসি এবং কাটলেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি
যথাসাধ্য গান্ধীর্ষ্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য আরম্ভ করিলাম—

“এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অজুবাদী, সম্বাদী,
বিসম্বাদী কে কে তা এখনো স্থির হয়নি। কিন্তু সেজন্য

বিচার আটকাবে না, কারণ ছুই সাকী হাজির,—শ্রীমান্ কেট এবং শ্রীমতী পদ্ম—”

কেট বলিল—“ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না,—কাজ শুরু করুন।”

আমি।—ব্যস্ত হও কেন, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান্ কেট, তুমি শপথ করে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরূপের কোনো কমপ্লেক্স নেই! যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনি তিস্মিস্ হবে।

কেট।—একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের, আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে বে-রকম দেখতুম এখনো ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি।—শ্রীমতী পদ্ম, কেটের প্রতি তোমার মনোভাব কি-রকম তা জিজ্ঞেস ক’রে তোমায় অপমান করতে চাই না। কেটের মূর্তিই হচ্ছে পূর্বরূপের এন্টিভোট। কেট, এইবার তোমার সেই কিরিত্তিটা দাও। বাপ! তিরেননকইটা আইটেম্। বেশভূষা—আহার্য—শয্যা—পাঠা—এ ত দেখ্চি পাকা পনের দিন লাগবে। দেখ, আজ বরফ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রয় করি,—যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিটেম্যাটিক টেট্ শুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী। কেট, তুমি লক্ষা খাও?

কেট।—কাল আমার মোটেই লক্ষ হয় না।

আমি।—পদ্ম কি বল?

পদ্ম।—লক্ষা না হ’লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাভ। প্রথমেই চেরা পড়ল। স্বামিন্দ্রীর ত ভিন্ন হেঁসেল হ’তে পারে না। রফা করা চলে কি না পরে স্থির করা যাবে। জলে লক্ষা সেদ্ধ ক’রে দুজনকে খাইয়ে এমন একটা পাসেপ্টেজ ঠিক করতে হবে যা দুপকেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা—তোমরা চায়ের কে ক’ চামচ চিনি খাও?

কেট।—এক।

পদ্ম।—সাত।

আমি।—ভেরি ব্যাভ। আবার চেরা পড়ল।

কেট।—আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি।—ধবরদার, সাকী ভাঙাবার চেষ্টা কোরো না। বা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেট।—একটু শক্ত-রকম, ধরন দুইকি গদি। বেশী নরম হ’লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম।—আমি চাই তুলতুলে।

আমি।—ভেরি ভেরি ব্যাভ। এই কের চেরা দিলুম। আচ্ছা—কেট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেট।—তা মন্দ কি।

আমি সাকী-বিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম—“ও সব ভাসা-ভাসা জবাব চলবে না,—ভাল ক’রে দেখ তার পর বল।

পদ্ম লাল হইল। কেট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—“খা-খ-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, একেবারে—”

আমি।—বস্ বস্—বাজে কথা বোলো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেটকে দেখে বল।

পদ্ম ক্রকুঙ্কিত করিয়া কেটের প্রতি চকিত-দৃষ্টির সার্চলাইট্ হানিয়া বলিল—“বেন একটি সং।”

কেট।—তা—তা—আমি না হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না হয় কেলে দেব। আচ্ছা এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলুম,—এইবার দেখ ত পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—“হোপলেস্। আপত্তির প্রতিকার হ’তে পারে, কিন্তু বিজ্ঞপের ওষুধ নেই।

কেট একটু গরম হইয়া বলিল—“আপনিই ত যা তা রিমার্ক্ ক’রে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।”

আমি।—আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না হয় জেরা কর।

কেটে প্রত্যালীচ-পদে দাঁড়াইয়া আন্তিন গুটাইয়া বলিল—“পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেন্স—এই দেখ ট্রাইসেন্স। এই-রকম অবরুদ্ধ গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রহ্মেন-দার মতন গোলগাল নাছস হুছস চাও? তোমার মতামত জানতে পাবুলে আমি না হয় আমার আদর্শ-সম্বন্ধে কের বিবেচনা করুব।

পদ্ম।—তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি ত আর তোমার দারোয়ান রাখ্চি না।

কেটে।—আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কিরকম পাঞ্জার জোর—

কেটে ধপ্ করিয়া পদ্মর পদ্ম-হস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—“হাঁ হাঁ—ও কি? সাকীর ওপর হামলা? ও সব চলবে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা করবার আমিই করুব। তুমি ঐ ওখানে গিয়ে বোসো।”

কেটে অপ্রতিভ হইয়া বলিল—“বেশ ত, আপনিই কের কোশ্চেন্ করুন।”

আমি।—আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, রফা করাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম—napoo, nothing doing. কেস্ এখন মুলতবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ ক’রে রিভাইজ কর, তার পরে আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেটে এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—“আপনি আমার সিটেম কিছু বুঝতে পারেননি। আপনি যা করুলেন সে কি একটা টেট্ হ’ল?—ওধু ইয়ার্কি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই বকমারি হয়েছে।”

আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম—“দেখ কেটে, বেশী চালাকি কোরো না। আমি একজন ডকীল, বারো বৎসর প্র্যাকটিস করেচি, পনের বৎসর হল বিবাহ করেচি, বাড়ী একটি মাস সাইকলজি পড়েচি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি ত নির্কিরকার, তোমার অত রাগ কেন? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক’রে ব’সে আছে।”

কেটে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দা ঠেলিয়া টুনি-বিদীর ছোট খুকী প্রবেশ করিল। আমি পড়ীর ঘরে বলিলাম—“নারী, তুমি কী চাও?” খুকীর নারীস্বের দাবী অতি মহৎ এবং সমস্ত নারী-সমাজের অস্থখাবনযোগ্য। বলিল—“ধাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।”

কেটে কাহারো সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া ধাইলও না। আহাঃ! আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাজি-ষাপন করিবেন।



‘বাবু বাগ, গিরা’

প্রদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সতবে দেখিলাম তিনি কবলের ভিতরে কণে কণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অকুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—“কিছু ব্যাধাটা আবার ধরেচে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাক্ব?”

গৃহিণী কষ্টে বলিলেন—“না, কিছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হঃ হঃ হিঃ।”

হিষ্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত ত ছিল না, নিশ্চয় বেচারী কল্যকার ব্যাপারে মনঃক্লম্ব হইয়াছে। আমার মতলব ত জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে? কেটা সবে বড়শী গিলিয়াছে, এখন তাকে আরো দিন-কতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন্ ডিলায় যাইলাম—উদ্দেশ্য কেটকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেটের দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ স্ব স্ব খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়-রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাবু কাঁহা?”

বোদার বদন-চক্রে দর্শন নিখাস ও বাক্য-নিঃসরণের জন্ত যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—“বাবু বাগা।”

আ্যা? কেটবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়ীতে গিয়া হোগা।

“বুবনবাবু বাগ্ গিয়া। উন্কা বিবি বাগ্ গিয়া। উন্কা কোকী বাগ্ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ্ গিয়া। গোয়ে-সি মিসি-বাবা যো থি সো বি বাগ্ গিয়া।”

কেট পলাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফসী-মতন মিসি-বাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পলাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোঁজে বাহির হইয়াছেন। কচি-সংসদ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক ব্যথাও নয় হিষ্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—“তুমিই যত নষ্টের গোড়া।”

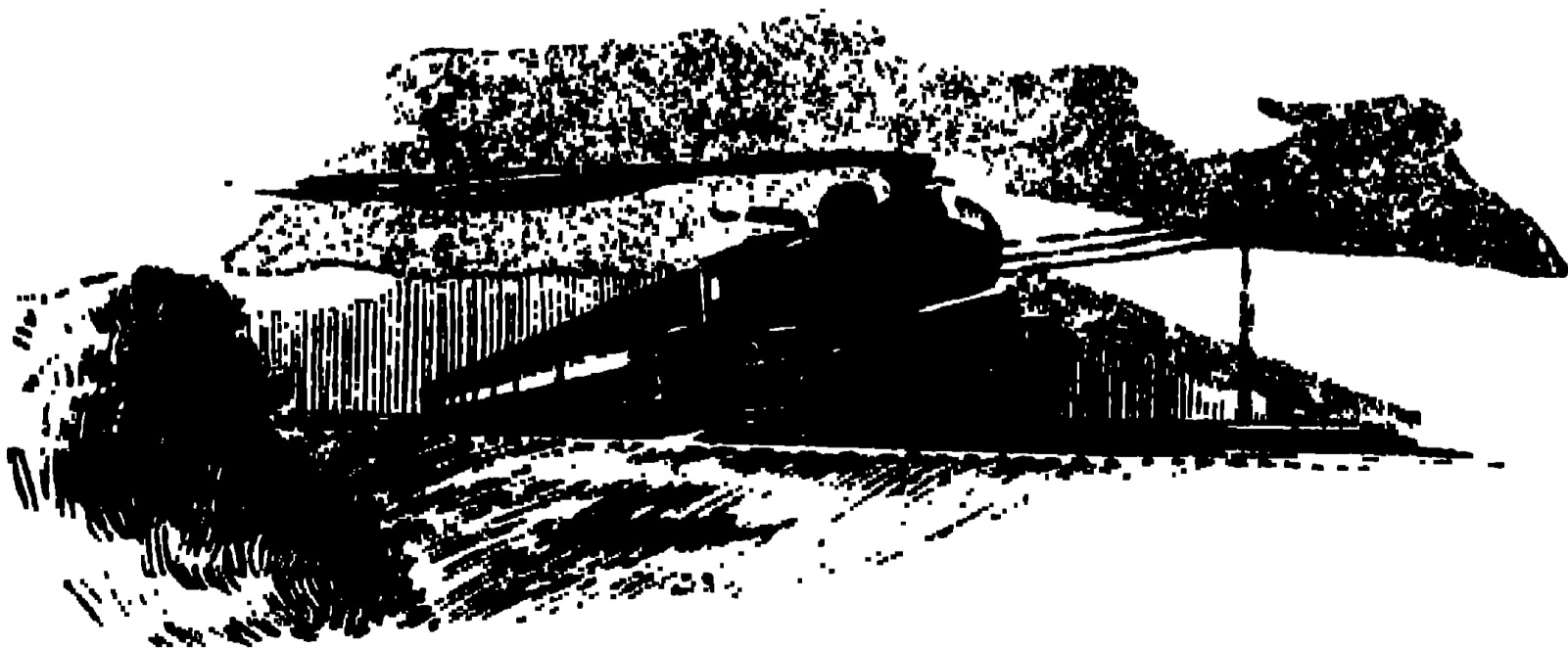
গৃহিণী।—আহা, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করিতে পারেন না, এখন আমার দোষ।

আমি।—তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—“তুমি ত রাত সাড়ে দশটায় কিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগ লুম—সে সুখ-ছুঃখের কথা। রাত বারোটায় সময় দেখি—কেট টিপি-টিপি আস্চে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বলে—কেট কি হয়েছে? কেট বলে পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তসু সহঁচে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা এসিড। আমি বলুম—তার আর চিন্তা কি, আগে সকাল হোক, তার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেট বলে—সে একুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্রর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? টুনি-দি বলে—কুছ পুরোয়া নেই, কালকের মেলেই কল্কাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে এসল। টুনি-দি বলে, নে নে:—নেকী। টুনি-দিকে জানো ত, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাজেই মশায় মোট বাঁধা হ'য়ে গেল,—তেবড়িটা লগেজ। তার পর আজ সকালে তাদের ট্রেনে তু'লে দিখে এখানে চ'লে এলুম।”

বিবাহের পর দেড়মাস কেট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা ক'রে নাই,—সবে কাল আসিয়া কমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্বাস্বঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হঠতে নজীর দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই। কেটের মনের আড়ালে যে আর একটা উপ-মন এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বীদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেট আবার একটা নতুন ক্লাব স্থাপনা করিয়াছে—হৈহয়-সম্ব। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তৈহয়-কজিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সঙ্গীক আমি ও কেট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওয়ার পর্যন্ত হৈ হৈ করিতে যাইব।



কানপুরে জাতীয় সপ্তাহ

শ্রী প্রভাত সাহা

বাংলা পৌষ মাসের গোড়ার দিকের একটি সপ্তাহ ভারতের জাতীয় সপ্তাহ আখ্যা পাইতে পারে। কারণ এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে ঘেন একটা আগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। ভারতের নানা সহরে এই সময়ে সভা-সমিতি ও সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিশেষতঃ যেখানে নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, সেই স্থানটি সভাসমিতির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। এবার কানপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—সেই অধিবেশনের সঙ্গে-সঙ্গে



কানপুর সহরের এক-অংশের সাধারণ দৃশ্য

সেখানে নানা প্রকারের প্রায় ৩৪টি সম্মেলনের বৈঠক বসে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কানপুর সহরের ও সেইসকল সভাসমিতির কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

কানপুর আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি সহর। লক্ষ্মী হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে সহরটি অবস্থিত। সহরের নিকটবর্তী নদীকূলে বহু ষ্টীমার ও দেশী জাহাজের সমাগম হয়, কারণ ইহা বর্তমানে উত্তর ভারতের প্রধানতম ব্যবসাকেন্দ্র। বহুদিন পূর্বে অযোধ্যা ও বাংলার অধিবাসীগণ উত্তর ভারতের অভিবাসনকারীদেরকে বাধা দিবার নিমিত্ত এখানে একটি সেনানিবাস নির্মাণ করে।

কানপুরের অতীত ইতিহাস অতি অল্পদিনের। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও কানপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহ জনমানবশূন্য প্রান্তর মাত্র ছিল। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সচেন্দ্রীর রাজা হিন্দু সিংহ জম্মাষ্টমী উপলক্ষে গঙ্গা-

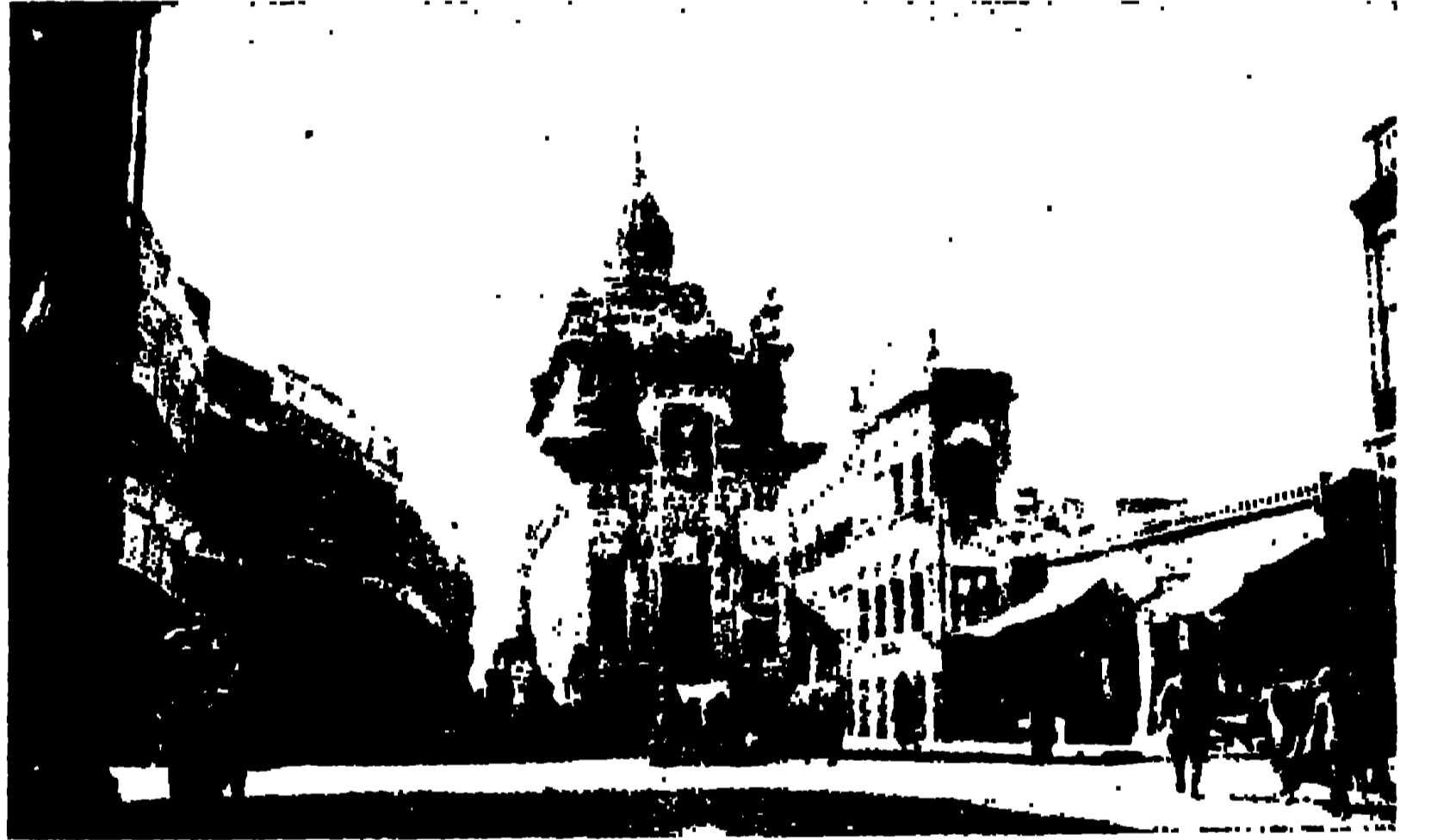


। সরোজিনী নাইডু, চত্বারিংশৎ নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার সভাপতি (ডায়ুবানে গৃহীত কটো হইতে)

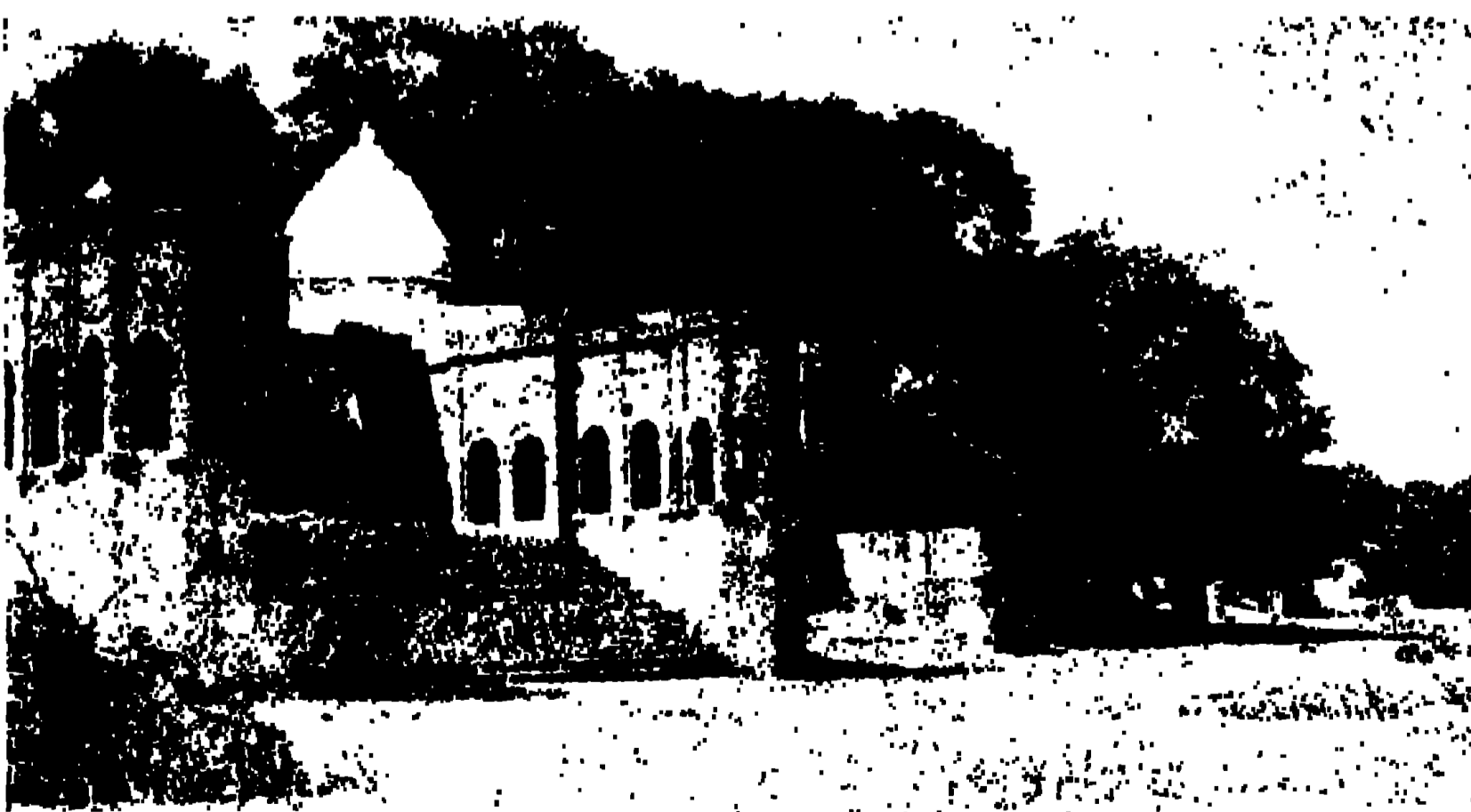


কানপুরের কারখানা-সমূহের দৃশ্য

স্মান করিতে আসিয়া এই স্থানের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এমন শুভদিনে এই মনোরম স্থানে নগর পত্তন করিলে কালক্রমে উহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারই খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে এইরূপ আশা লইয়া তিনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিত্তী হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে বেশী দিন-সখানে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি তাঁহার অধীনস্থ রামাইপুরের (কানপুর



কানপুরে ওয়েস্টন রোডের উপরের মন্দির। এই রাস্তা নির্মাণকালে মন্দিরের দক্ষিণস্থিত মসজিদ লইয়া দাড়া হয়



গঙ্গমনঘাট ও মহাদেবের মন্দির, কানপুর

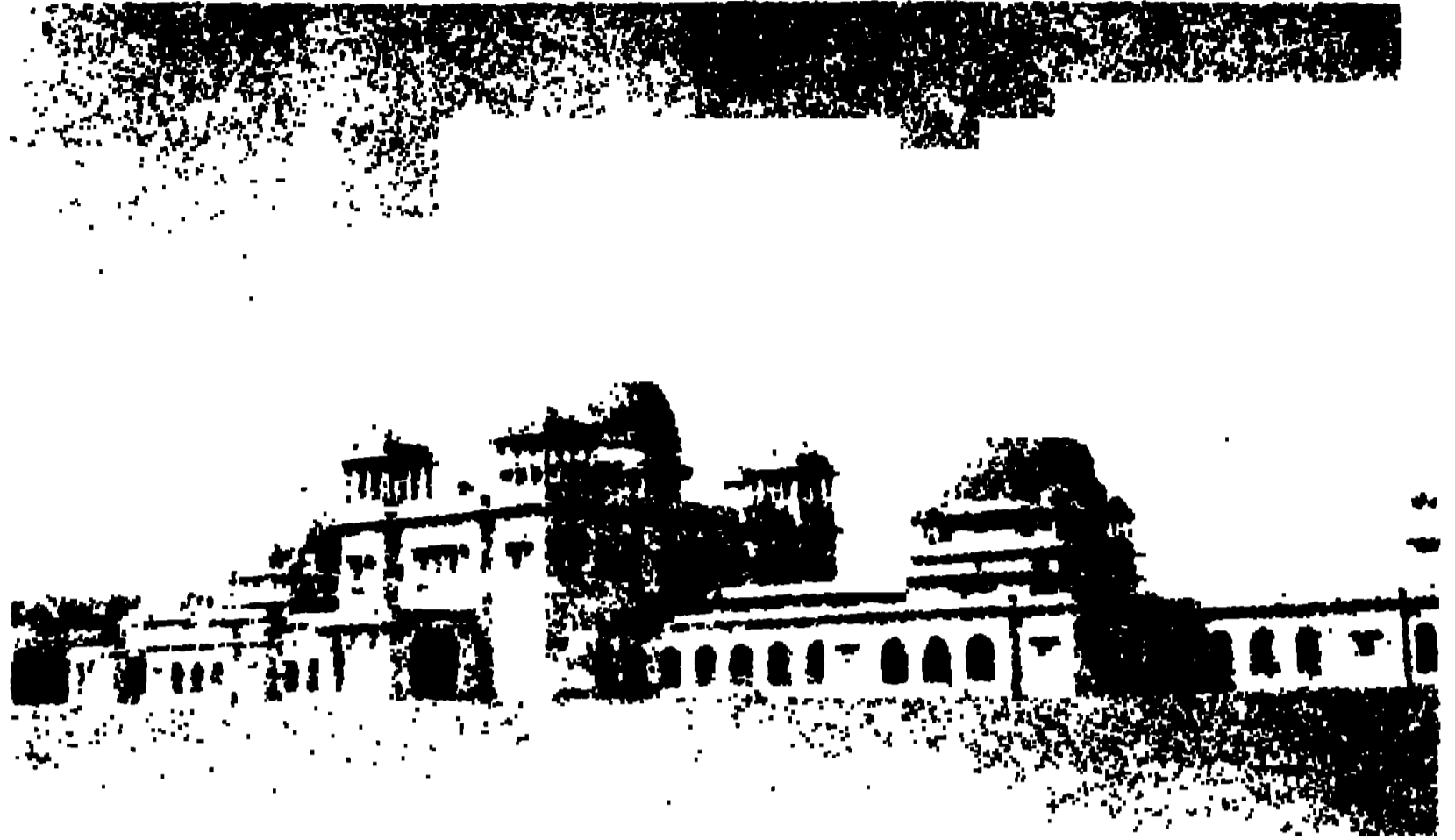
হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত) রাজা ঘনশ্যাম সিংহ চৌহানের উপর নগরের। অট্টালিকা-সমূহের নির্মাণের ও লোকবসতি করাইবার ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের (অপর নাম কানাই বা কাহ্ন) জন্মদিনে স্থাপিত বলিয়া নগরটির নামকরণ হইল কানপুর। সেই-সময়ে নির্মিত তোরণদ্বার ও গলার ঘাট অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে ও তৎকালীন একটি দুর্গের

ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছাড়া অন্যান্য কারণেও কানপুর ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়েও সহরটি ক্রমশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্যন্ত কানপুর অযোধ্যার নবাবদিগের রাষ্ট্রভূক্ত ছিল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার

তৎকালীন নবাব সর্বাভিয়ারি সন্ধির সর্ব অঙ্গসারে ইংরেজ সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইবার অন্য সহরটি কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০১ খৃঃ) ইহা বৃটিশের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়।

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে কানপুর সমধিক প্রাসিদ্ধি লাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের অনেকেই উক্ত যুদ্ধের যতকিছু দোষ তাহা সমস্তই ভারতীয় সিপাহীদের স্বক্ষে আরোপ করিয়া থাকেন। সে-কালের সে-সব বেদনা-মাথা পুরাতন স্মৃতি পুনরায় জাগ্রৎ করা নিশ্চয়োজ্ঞন। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে মিঃ ফরেস্ট্ লিখিত এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “ভারতীয় বিদ্রোহ” (Indian Mutiny) নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে নানা-সাহেব জ্বীলোক ও শিবুদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে-সময় জ্বীলোকদের উপর অত্যাচার বা অপমানের কোনোও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসম্বন্ধে ১৯২৫খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “পদকের অপর পার্শ্ব” (The Other Side of the Medal) নামক পুস্তকে গ্রন্থকার এডওয়ার্ড টমসন্ লিখিয়াছেন :



কানপুর কৃষি-বিদ্যালয়

There is long overdue a new orientation in the histories of India. We must no longer stress the Black Hole of Calcutta, and ignore the seventy suffocated Moplah prisoners of our railway vans; we must no longer stress Cawnpore, and ignore Benares and Allahabad and Delhi and Renaud's march on Cawnpore. If there was one phrase more than another in Romesh Dutt's dignified appeal to us which should win our respectful sympathy, it was his request that the darker incidents of the mutiny (or such as we chose shall be told) should be expunged from books, "at least as recorded in school-books meant for boys". Why should Indian boys be compelled to read about the fiendish work at the well, when there is not a word said about Neill's fiendish work on the way to the well?—(p. 126)



এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল, কানপুর

ভাবার্থ :—বহুদিন পূর্বেই ভারতীয় ইতিহাসগুলি নূতন করিয়া লিখিবার সময় আসিয়াছে। অল্পকুপ হত্যাকে বড় করিয়া তোলা কিন্তু সেই সঙ্গে চলন্ত রেলগাড়ীতে ৭০ জন মোপ্লার দম বন্ধ হইবার ব্যাপারটাকে গোপন করিয়া যাইবার দিন আর নাই। এখন শুধু কানপুরের ঘটনাবলীর (বিদ্রোহসংক্রান্ত) বিস্তৃত বিবরণ দিয়া অথচ সেই সঙ্গে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লীর ব্যাপারগুলি ও রেনাউয়ের কানপুর

অভিধানের বৃত্তান্ত গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। ৮৮৯-১৮৯০ সালের মধ্যে সমর্থন করিয়া মিঃ টমসন্ বলিয়াছেন যে, স্থল-পাঠ্য পুস্তকগুলি হইতে অন্ততঃ সিপাহী বিদ্রোহের তথাকথিত অধ্যাত্মজনক ঘটনাগুলি বাদ দেওয়া উচিত।

স্থান নির্দেশ হয়। কানপুর চাম্ভার াজাদির কাবুবারের জন্তও বিখ্যাত। কাপড়ের কল, ময়দার কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কল, তাম্বু, টুইল, তোয়ালে ইত্যাদি তৈয়ারির কল, চিনির কল, সূতার কল প্রভৃতি অনেক-গুলি কলকারখানা এই সহরে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার



ক্রাইষ্ট্ চার্চ, কানপুর



মেমোরিয়াল ফন্টেন (সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি স্তূপ)

কানপুর যুক্তপ্রদেশের অপেক্ষাকৃত নবীন সহর। সেই কারণেই এখানে আখ্রা বা লক্ষ্মী সহরের স্তায় সমৃদ্ধিশালী সৌধমণ্ডলী নাই। ইতিমধ্যেই ক্রাইষ্ট্ কলেজ, কবি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবহারিক-শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি ইহাকে একটি বিদ্যাকেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান, আউদ রোহিলখণ্ড, রাজপুতনা এবং ইণ্ডিয়ান মিডল্যান্ড্ এই চারিটি রেলপথ কানপুরে আসিয়া মিলিয়াছে। বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেও কলিকাতা, বোম্বাই, করাচি, মাদ্রাস, ও রেঙ্গুন এই পাঁচটি বন্দরের পরেই কানপুরের

অধিকাংশ কলই বিদেশী মূলধনে স্থাপিত। চাম্ভা ও অন্যান্য অনেক কাঁচা মাল এখানে আমদানি হয় ও পরে সেগুলি বাহিরে রপ্তানী হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কানপুরের লোকসংখ্যা ১৫১,৪৪৪ ছিল ১৯১১ সালের আদম-সুমারীতে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ১৭৮,৫৫৭ হয় এবং ১৯২১ সালে উহা ২১৩,০৪১ দাঁড়াইয়াছে। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশই হিন্দু। স্থানীয় সম্রাজ মুসলমানদের অনেকেই অধোধ্যা নবাবগণকর্তৃক বিভাঙিত আমির-ওমরাহগণের বংশধর।



দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদল

দরিদ্র হিন্দুগণের সাহায্যদান-কল্পে এখানে একটি “দরিদ্র-সদন” স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি জন-হিত-কর প্রতিষ্ঠান কানপুর-বাসীদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে।



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
বিলাকৎ কনকারেলের সভাপতি



ডাক্তার এন্ সি হার্ডিকর, নিখিল-ভারত বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নায়ক



ডা: মুরারীলাল জাতীয় মহাসভার অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতি

পণ্ডিত নগেশ শঙ্কর বিদ্যার্খী, অধ্যক্ষনা সমিতির সম্পাদক

জাতীয় সপ্তাহে কানপুরে যে-সমস্ত সভা-সমিতির
অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত
হইল :—

সভা	সভাপতি
নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
হিন্দু মহাসভা	শ্রীযুক্ত এন্ সি কেলকার
বিলাকৎ কনফারেন্স	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
আধা-স্বরাষ্ট্র সভা	শ্রীযুক্ত টি, এন্, ভাসুগোয়ানী
রাজনৈতিক বন্দী সম্মেলন	শ্রীমতী গোবিন্দ দাস
কৃষক ও শ্রমিক-সম্মেলন	লালা লক্ষণৎ রায়
নিখিল-ভারত কবি-সম্মেলন	পণ্ডিত রুগরাম প্রসাদ
নিখিল-ভারত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী	শ্রীযুক্ত ভুলসীচরণ পোখামী
১০। সনাতন ধর্ম সম্মেলন	আচার্য্য রঘুবীর দয়াল
১০। সম্পৃক্ততা-নিবারণী সম্মেলন	শ্রীমতী ব্রহ্মানন্দ
১১। মেধর সম্মেলন	ডাক্তার সভাপাল
১২। আধা-সমাজ সম্মেলন	শ্রীযুক্ত টি এন্ ভাসুগোয়ানী
১৩। রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলন	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র রাও
১৪। সাম্যবাদী সম্মেলন	শ্রীযুক্ত সিদ্ধরাতেলু চেটি

সভা	সভাপতি
দেশীয় রাজ্যের প্রজা পরিষৎ	শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল কটল
লোকাল বোর্ড'স্ কনফারেন্স	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী
স্বদেশী প্রদর্শনী	মহাত্মা গান্ধী
সঙ্গীত সভা	শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দ্বিগধর
কুম্ভী ক্ষত্রিয় সভা	শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনলাল
২০। ভারতীয় পাঠাগার সম্মেলন	শ্রীযুক্ত এন্, সি, কেলকার
২১। বিদ্যার্থী সম্মেলন	আচার্য্য এ, টি, গিৎগোয়ানী
২২। শিশু দীওয়ান	সরদার মহাত্মাব সিং
২৩। আত্মবিধা পরিষৎ	২৪। কলোয়ার মহাসভা, ২৫। রাজপুত ধর্মসভা, ২৬। চোরানীরা রাজপুত সভা, ২৭। বর্ধকরাল বৈষ্ণব সভা, ২৮। গোরক্ষিণী মহাসভা, ২৯। শুদ্ধি সভা, ৩০। ভাবুলি সভা, ৩১। ওমর বৈষ্ণব সভা, ৩২। বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, ৩৩। ভারতীয় অধ্যাপক সভা ৩৪। পরলোক তাত্ত্বিক সম্মেলন।

এইসমস্ত সম্মেলনৌ এত বিভিন্ন প্রকারের—রাজ-
নৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক সভা হইতে আরম্ভ করিয়া
শিক্ষা-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার পর্য্যন্ত—এত বিচিত্র বিষয়ে
ইহাদের অভিব্যক্তি যে ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়

সম্মেলন

জীবনের বহুমুখী ভাবই প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমরা ইহাদের মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিম্নয়োজন। এই মহাসভার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরোজনী নাইডু ও অত্যাধনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন যুক্ত-প্রদেশের বিখ্যাত কন্যা ডাক্তার মুরারী-লাল। জাতীয় মহাসভার সঙ্গে একটি খাদি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী

এই প্রদর্শনার ঘারোদঘাটন করেন। খাদি-মণ্ডপে নানা প্রদেশ হইতে আনীত বস্ত্রের দ্রব্য-সম্ভার প্রদর্শিত হয় এবং চরকা ও তাঁত চালনের প্রতিযোগিতা হয়। স্বথের বিষয় স্বদূর কানপুরেও



নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার মহিলা-খেঁচাসেবিকা বাহিনী

চরকা-প্রতিযোগিতায় বাংলা বিশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছে। প্রদর্শনীতে সূতা-কাটা প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রথম হইয়াছেন। ৭৫ নম্বরের



শ্রীমতী সান্ধবাই গৌকিন্ত, মহিলা-খেঁচাসেবিকা বাহিনীর নেত্রী



পাণ্ডিত রামকুমার, অত্যাধনা-সমিতির অর্থ-সচিব

সূতা ঘণ্টায় ২২৫ গজ হিসাবে কাটয়া তিনি বিভিন্ন দেশাগত দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কংগ্রেস ক্যাম্পের নাম তিলক-নগর দেওয়া হইয়াছিল। তিলক-নগরেই সমাগত নেতা ও প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মহাসভার অধিবেশনের পূর্বে লাল লালপৎ রায় এই অধিবেশনের জন্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়-পতাকা স্থাপন করেন। মহাসভা-সম্পর্কে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি। ডাক্তার অক্ষু

মোট ৩১৬২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী প্রতিনিধির সংখ্যা ৪২৭।

অস্তান্ত রাজনৈতিক সম্মিলনী সমূহের মধ্যে নির্ঘাতিত রাজনৈতিক-বন্দী সম্মিলন ও সাম্যবাদীদের সম্মিলনের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক-বন্দী সম্মিলনের সভাপতি স্বামী গোবিন্দদাস তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, এইসমস্ত নির্ঘাতিত স্বদেশ-সেবকেরা স্বাধীনতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া অন্তরে অন্তরে অহুভব করিয়া তাহার জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাদেরই ত্যাগ ও দুঃখের মূলে যে স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে তাহাই দেশের অস্ত সকলে ভোগ করিতেছে। সাম্যবাদী-দল দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য অহুষ্ঠানের কথা এইস্থানে বলা দরকার। এই সম্মিলনের নাম নিখিল-ভারত খেচ্ছাসেবক-বাহিনী সম্মেলন। এই বাহিনী গঠনের জন্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন্সি হার্দিকর দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন। জাতীয় খেচ্ছাসেবক সত্ব স্বাধীনতা বা স্বরাজ আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য এ-কথা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীমতী সরোজনী নাট্টু, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হার্দিকর যেদিক দিয়া দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেদিকে আর কেহ তেমন ভাবে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া কাজ করেন নাই। আশা করা যায় শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া খেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইবে এবং সেগুলি নিখিল-ভারত খেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুগঠিত ও সম্ববহ বিপুল খেচ্ছাসেবক-দল জাতীয় মহাসভার পতাকা-তলে সম্মিলিত হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে।



শ্রীযুক্ত চি. জি. বোগ
খেচ্ছাসেবক সমিতির সম্পাদক

ব্রহ্মানের নেতৃত্বে তাঁহারা মহাসভার সমক্ষে তাঁহাদের অভিযোগ বিবৃত করেন। শ্রীমতী সর্জিবাই দীক্ষিতের নেতৃত্বে মহিলা-খেচ্ছাসেবিকা দল জাতীয় মহাসভায় স্মৃষ্কার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। এবার মহাসভায়

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃথ্বীনাথ রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্-এ

য

রাসোর ২৫২৬ সময়ে আছে যে, একজন দক্ষিণ-দেশীয় বাজীকর উত্তর ভারতে তীর্থ করিতে যাইতেছিল, পথে পৃথ্বীকে খেলা দেখাইয়া কিছু লাভ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে পৃথ্বী শুনিলেন, সে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-বাসী, দেবগিরিতে যাদব ভানু সে-সময়ের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। ভানুর অধিতীয়া সুন্দরী কস্তা শশিবৃত্তার সহিত কনোজপতি জয়চন্দের এক ভ্রাতৃপুত্রের বিবাহ আর কয়েক দিবস পরে হইবে। পৃথ্বী বাজীকরকে বিদায় দিয়া শশিবৃত্তার রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহের আর বেশী দিন ছিল না, অতএব পরদিবস চন্দ্র কবিও কতকগুলি ঘোড়া লইয়া দেবগিরি যাত্রা করিলেন। দেবগিরিতে ভানু ও জয়চন্দের মিলিত সৈন্যদের পরাস্ত করিয়া ভানুকে কস্তাদান করিতে বাধ্য করিলেন, ও নব বধু লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। দেশে ফিরিবার পরই ভানুর দূত গিয়া বলিল যে, আপনাকে কস্তাদান করা হইয়াছে বলিয়া জয়চন্দ্র দেশ হইতে আরও সৈন্য আনাহবার আদেশ পাঠাইয়াছেন, তাহারা আসিলে, দেবগিরি ছাড়িবার করিবেন। দেবগিরি-পতি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। পৃথ্বী আবার সৈন্যসহ দেবগিরি আসিলেন, ও জয়চন্দের সেনাপতিদের তাড়াইয়া দিলেন।

এ যুদ্ধের সন নাই; এইমাত্র আছে যে, সমুদ্রশিখর গড়ের পদ্মাবতীর বিবাহের পর মাঘ মাসে সুকুমারী করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে কল্যাণে সোলঙ্কীদের প্রবল রাজ্য কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী ছিল। এ কল্যাণ বঙ্গে হইতে ৩৪ মাইল দূর নগর কল্যাণ [Kalyan Junction, G. I. P. Ry.] নহে। আধুনিক নিজাম রাজ্যে কল্যাণ বা কলিয়ানী (Kaliani) এখনও এক সামন্ত নবাব বা জায়গীরদারের রাজধানী। কলিয়ানী যে এককালে সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল

রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। কল্যাণের সোলঙ্কীদের রাজ্য এককালে পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত, উত্তরে নর্মদা ও দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন দেবগিরি কল্যাণের একটি দুর্গ। পৃথ্বীর যৌবনাবস্থায় কল্যাণের পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দেবগিরিতে কল্যাণরাজ্যের বেতনভুক্ত দুর্গরক্ষক থাকিতেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পর দেবগিরির যাদব দুর্গেশ কল্যাণের রাজ্য সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করিলেন, ও স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে বলসম্বল করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেবগিরির যাদবেরা পূর্ণ গৌরবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়া ১২২৪ খৃষ্টাব্দে কুমার আলাউদ্দীন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইহাই মুসলমানদের সৈন্য * প্রথম যুদ্ধ-অভিযান। পৃথ্বীর বিবাহের সন নাই বটে, কিন্তু ১১৮২র পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১১৭৩-৭৪র ঘটনা হইবে। তখন দেবগিরিতে ভানুরূপী প্রবল যাদব-রাজ্য উদয় হয় নাই, তখনও সেখানে কল্যাণরাজ্যের বেতনভুক্ত দুর্গ-রক্ষক ছিলেন। অতএব শশিবৃত্তা কাল্পনিক নায়িকা-

* মুসলমান সৈন্য ১২২৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে দক্ষিণে গিয়াছিল। ইহার পূর্বে দাক্ষিণাত্যের তির তির-স্থানে মুসলমান সাধুরা গিয়া আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় রাজারা তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূপস্যা করিয়া সময় কাটাইতেন ও কিছু-কিছু ধর্মপ্রচার করিতেন। তাঁহারা আপনাদের সাধুব্যবহারের জন্য দেশবাসীর কাছে সম্মানিত ছিলেন। তখনও মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের পশ্চিমতীরে নানা স্থানে অরবরা বাণিজ্য করিতে আসিত। দেশের একজন রাজা যখন শুনিলেন যে, অরব দেশে এক কমতাপন্ন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে, তখন অরব গিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার কাছে তাঁহার প্রচারিত ধর্মগ্রহণ করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকটি প্রচারক আপনার প্রজাদের শিকার দিতে আনিলেন। ঐ রাজার দেশে কতক অরবরা বাস করিয়াছিল, ঐ অরব ও নূতন মুসলমান প্রজাদের বংশধর এখন মোপ্লা নামে প্রসিদ্ধ। অতএব ভারতে দাক্ষিণাত্যেই সর্বপ্রথমে মুসলমান আসিয়াছে। ইহার ৬২২ ও ৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসিয়াছিল।

মাত্র। পরবর্তী কালের লেখক দেবগিরির প্রবল যাদব-রাজাদের গল্প শুনিয়া ঐরূপ লিখিয়াছে, কিন্তু যাদব-রাজার পৃথ্বীর সমসাময়িক কি না, তাহা খোঁজ করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে নাই।

৪

রাসোর ৩৩ সময়ে ইন্দ্রাবতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। মালব-রাজ ভীমদেব কস্তানান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পৃথ্বীর কাছে পুরোহিত পাঠাইলেন। পৃথ্বী স্বীকার করিলেন, ও কতকগুলি বন্ধু, সুর ও সহচর লইয়া মালবে বিবাহ করিতে গেলেন। বিবাহের পূর্বে তিনি রেবা [নর্দদা] তাঁরে শিকার খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিবাহের ২৩ দিন পূর্বে চর-মুখে সংবাদ পাইলেন, ঘোরী চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। চিতোরের রাণা সমরসিংহ পৃথ্বীর ভগ্নীপতি, অতএব তিনি আর বিবাহের জন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আপনাব প্রতিনিধিধরূপে খড়্গ রাধিয়া তিনি চিতোর চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভীমদেব আপনাকে অপমানিত * বিবেচনা করিলেন, ও খড়্গের সহিত কস্তার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। পরে কবি চন্দ্রের উপদেশ ও অহুরোধে স্বীকৃত হইলেন। চন্দ্র যখন খড়্গের সহিত বিবাহিতা ইন্দ্রাবতীকে লইয়া দিল্লী পহঁ-ছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বীও ঘোরীকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরবে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজধানীতে উৎসবের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইল।

এ বিবাহের তারিখ বা সন নাই। ইহার কিছু পূর্বে ২৮ সময়ে মালব-রাজের নাম যাদব রায়, সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন দেখা যায়। পাঠক অহুমান করিতে পারেন যে, ৩৩ সময়ের ভীমদেব ২৮ সময়ের যাদবরায়ের পুত্র বা উত্তরাধিকারী হইবেন।

মালবের প্রমারেরা এককালে অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বহুকাল এই বংশ হইতেই সম্রাট

নির্বাচিত হইয়াছে; মহারাজ ভোজ ও বিক্রমাদিত্য এই বংশই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যও সে-সময়ে অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কালক্রমে—খৃষ্টীয় ষাটশ শতাব্দীর প্রথম অংশে—তাঁহারা এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, সেকালের রাজা যশোবর্মা গুজরাট-পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কাছে পরাজিত হইয়া গুজরাটের সামন্ত-পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে জয়ী জয়সিংহ ও পরাজিত যশোবর্মা উভয়ের মৃত্যু হইল। তখন গুজরাটের সোলঙ্কীরা নামে দেশ জয় করিয়াছে কিন্তু দেশবাসী সোলঙ্কীদের আধিপত্য স্বীকার করিতেছে না। যশোবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়বর্মা নামমাত্র রাজা হইলেন। তাঁহার এক ভাই অজয়বর্মা কতক অংশে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অল্প ভাই লক্ষ্মীবর্মা জয়বর্মার অহুমতি লইয়া কতক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, অঞ্চ সমস্ত মালবে সোলঙ্কীরা আপনাদের অধিকার প্রকাশ করিত। মালব-রাজবংশের দুই শাখা হইয়া গেল। এইসকল কারণে ১১৪৩ হইতে ১১৭৯ খৃঃ পর্যন্ত বিশ্বসনীয় ইতিহাস পাওয়া যায় না; যদিও উভয় শাখার রাজাদের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

পৃথ্বীরাজের নিধনের পর চোহানদের দেশের মণ্ডনকর [আধুনিক মেবার-রাজ্যে অবস্থিত মাডলগড়]-বাসী আশাধর নামক কবি মুসলমানদের অত্যাচার ও অনাচারের ভয়ে মালব দেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, ও সৌভাগ্যক্রমে সেকালের সাক্ষি-বিগ্রহিক [Foreign Minister] কবি বিলুহনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মালব-রাজবংশের উভয় শাখার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। প্রথম শাখার জয়বর্মার ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্মার ১১৪৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার পিতা যশোবর্মার ১১৩৪ খৃষ্টাব্দের দান স্বীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীবর্মার পুত্র হরিশ্চন্দ্রের ১১৭৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র, ও হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়বর্মার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। অল্প শাখার, অজয়বর্মার পুত্র বিদ্যাবর্মার সময়ে আশাধর আসিয়া তাঁহার রাজ্যনীমতে বাস করিয়াছিলেন। পৃথ্বীর পতন-কালে তিনিই রাজা

* বড় রাজারা ছোট রাজার গৃহে গিয়া বিবাহ করেন না, প্রায় বড় পাঠাইয়া দেন, সেই খড়্গের সহিত বিবাহিতা কস্তা পতিগৃহে আসিলে আবার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়। কখন-কখন রাজারা অবিধাস করিয়া সমান মর্যাদার অল্প রাজার বাটী বাটতে চাহেন না। কস্তানান করিয়া হল করিয়া শত্রুকে হারিয়া ফেলিবার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ছিলেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাবর্মার পুত্র স্তম্ভট-বর্মা রাজা ছিলেন।

এই রাজাদের যখন দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের ঐ সময়ে অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। উহাদের অস্তিত্ব সত্য হইলে রাসোর ভীমদেব ষাটবরায় ও ইন্দ্রাবতী যে কল্পিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

চ

রাসোর ৩৬ সময়ে আছে যে, রণধ্বের যাদব-বংশীয় রাজা ভাহুর কন্যা হংসাবতীকে চন্দ্রের শিশুপাল-বংশীয় রাজা পঞ্চাইন বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভাহু ঐ বিবাহ অমুমোদন করিলেন না, অথচ বলবান্ পঞ্চাইনকে নিরস্ত্র করিতে পারিলেন না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া বলবান্ পৃথ্বীরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আপনাকে কন্যাদান করিলাম, আপনি পঞ্চাইনকে পরাস্ত করিয়া হংসাবতীকে গ্রহণ করুন। পৃথ্বীরাজ পঞ্চাইনকে পরাজিত করিয়া হংসাবতীকে বিবাহ করিলেন।

এ বিবাহেরও তারিখ ও সন নাই, তবে ইন্দ্রাবতীর বিবাহের পরের বর্ণনা, অতএব তাহার পরে হওয়াই সম্ভব।

পৃথ্বীরাজের জীবন-কালে রণধ্ব স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল না, শাক্তরী-পতিদের অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের একটি দুর্গ-মাত্র ছিল, সেখানে পৃথ্বীরাজের বেতনভূক্ত একজন দুর্গ-রক্ষক থাকিত। হাম্মীর মহাকাব্য পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুপরে একজন জৈন সাধুর রচনা [১৪৪৩ খৃঃ]। হাম্মীর এই চোহান্ বংশোদ্ভব পৃথ্বীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, ও রণধ্বের রাজা ছিলেন। ঐ কাব্যে পৃথ্বীর সবিস্তার বর্ণনা আছে, এই কাব্যে আছে যে পৃথ্বীর পতনের পর, অজমীর মুসলমানদের হস্তগত হইলে, পৃথ্বীরাজের পুত্র গোবিন্দরাজ রণধ্বকে আপনার বাসোপযোগী করিয়া আপনার রাজধানী করিলেন। এই গোবিন্দরাজই রণধ্বের প্রথম রাজা। পৃথ্বীর জীবনকালে রণধ্বের রাজা ছিল না।

১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বুদ্ধেলখণ্ডের রাজা পরমাল চন্দ্রের তিনটি রাজধানী ছিল, পূর্বে কালিঙ্গর, মধ্যে মহোবা ও পশ্চিমে চন্দ্রেরী। মদনপুরের শিলালেখ-অনুসারে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বী পরমালের পশ্চিমাঙ্গ রাজ্য ও তাহার সহিত চন্দ্রেরী ও মহোবা জয় করিয়া লইলেন। অতএব ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চন্দ্রেরীতে পরমালের বেতনভূক্ত ও পরে পৃথ্বীর বেতনভূক্ত দুর্গরক্ষক থাকিত।

অতএব পৃথ্বীর জীবিতাবস্থায় রণধ্ব ও চন্দ্রেরী উভয় স্থানে রাজা-রাণী ছিল না, অগত্যা রাজকন্যা হংসাবতীও ছিল না। যে-কালে রাসো রচিত হইয়াছে, সেকালে সম্ভবতঃ চন্দ্রেরীতে ও রণধ্বের উভয় স্থানে রাজাদের বাস হইয়াছে, সেইজন্য একপ গল্প রচনা করা হইয়াছে।

ছ

রাসো-অনুসারে সোমেশ্বরের, দিল্লীর অনঙ্গপাল তোমরের কন্যা কমলার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, বড় পৃথ্বীরাজ ও ছোট পৃথ্বী-কুমারী। রাসোতে পৃথ্বীর আর এক ছোট ভাইর উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি কাহার গর্ভজাত লেখা নাই। এই পৃথ্বী-কুমারীর বিবাহ চিতোরের রাণা সমরসিংহের সহিত হইয়াছিল। পৃথ্বী দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিতে যাইবার ২।৪ দিবস পূর্বে পৃথ্বীর বিবাহ হইয়াছিল, তখন পৃথ্বীর বয়স ১২, অতএব পৃথ্বীর ১০ সম্ভব। সমরসিংহ ১১২৩ খৃঃ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে পৃথ্বীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র রত্নসিংহ চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সমরসিংহ, ও তাঁহার পুত্র রত্নসিংহের কয়েক-খানি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমরসিংহ পৃথ্বীর পতনের প্রায় একশতাব্দী পরে—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও রত্নসিংহ তাহার পর আলাওউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক ছিলেন। চিতোরের রাণাদের মধ্যে একাধিক সমরসিংহ বা রত্নসিংহের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, অতএব সমরসিংহ পৃথ্বীর সমসাময়িক বা ভ্রাতৃপতি ও রত্নসিংহ তাঁহার ভাগিনা হইতে পারেন না।

হাম্বীর মহাকাব্য-অনুসারে সোমেশ্বরের রাণী কপূরা-দেবীর গর্ভে দুই পুত্র পৃথ্বীরাজ ও হরিরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

জ

রাসোর নানা স্থানে, কোথাও বা প্রকাশে, কোথাও ইচ্ছিতে কবি বলিয়াছেন যে, কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীর ঈর্ষা করিতেন; পৃথ্বীও জয়চন্দ্রের ভয়ে রাজধানীতে না থাকিয়া সুর ও সৈন্তপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ বা যুগয়ার চল করিয়া খোলা মাঠে বজ্রাবাসে থাকিতেন। জয়চন্দ্র স্বয়ং পৃথ্বীকে দমন করিতে না পারিয়া মুসলমানদের পৃথ্বীর রাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ও ডাকিয়া-ছিলেন, ও শেষ যুদ্ধে পৃথ্বীকে সাহায্য করেন নাই, সেইজন্য পৃথ্বীর, ও সেই সাহিত হিন্দু-রাজ্যের পতন হইল।

পৃথ্বীর পতনের সার্ব্ব দুইশত বৎসর পরে [১৪৪৩ খৃঃ] গোয়ালিয়রের তোমর-বংশীয় রাজা বীরমের কৃপাপাত্র একজন জৈন-সাধু নয়চন্দ্রসুরি হাম্বীর মহাকাব্য-নামক বৃহৎ কাব্য-রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান নায়ক হাম্বীর পৃথ্বীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, রণধ্বের রাজা ১২৮২ খৃঃ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে চোহান-বংশ ও পৃথ্বীরাজের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

পৃথ্বীরাজ
|
গোবিন্দরাজ
|
[রণধ্বের প্রথম রাজা]
|
বাল্হন দেব
|
বাগভট
|
জৈত্রসিংহ
|
হাম্বীর

[বাল্হনদেব গোবিন্দরাজের পর রাজ্যলাভ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি গোবিন্দরাজের পুত্র কি জাতি ঠিক জানা নাই।]

প্রসিদ্ধ মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৩২২ খৃষ্টাব্দে

পুরুষ-পরীক্ষা-নামক গ্রন্থে জয়চন্দ্রের চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক, ঠিক পতনের সময়ে পৃথ্বীরাজ-বিজয়-নামক মহাকাব্য লেখা হইয়াছে। এইসকল পুস্তকে, অল্প কোন রাজবংশের গাথাতে, ও সেকালের বা অল্প পরের কোনও শিলালেখে এমন কোনও উক্তি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে সন্দেহ করিতে পারা যায় যে, জয়চন্দ্র পৃথ্বীর বিপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য করিয়াছিলেন, বা তাহাদের ডাকিয়াছিলেন। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী একজন দূরদর্শী বিচক্ষণ সেনানায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সে-সময়ে গুজরাটের সোলঙ্কী ভীমদেব, অজমীরের পৃথ্বীরাজ, কনোজের জয়চন্দ্র, চিতোরের রাণা ও মহোবার পরমর্দিদেব এই পাঁচজন হিন্দু রাজা তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে একাই মুসলমানদের বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহারা একত্রিত হইলে মুসলমানদের ভারতে দাঁড়াইবার স্থান হইত না। তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী সেনাপতির রাণা ছাড়া অল্প চারজনকে একে-একে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। শাকস্তরীর চোহান-বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুজরাট-রাজ-বংশ; উভয়ে উভয়ের হিংসা করিতেন। কনোজের জয়চন্দ্র, ও তাহার পূর্বে তাঁহার পিতা বিজয়পাল চক্রবর্তী-সম্রাট বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, কেবল পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তথাপি পৃথ্বী যে জয়চন্দ্রকে ভয় করিতেন ও জয়চন্দ্রের ভয়ে রাজধানীতে না থাকিয়া যুদ্ধ ও শিকারের চল করিয়া খোলামাঠে বজ্রাবাসে সৈন্ত ও সুর বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, ও একস্থানে ২।৪ দিনের বেশী থাকিতেন না, ইহার প্রমাণ রাসোতেই আছে, রাজকার্য্য পৃথ্বীর বিখ্যাসী সুর ও প্রধান অমাত্য করিতেন।

মহোবাতে সেকালে প্রাবণী-উৎসব [যাহার শেষ চিহ্ন এখন যুজাপুর ও কাশীতে কজরীর রূপ ধারণ করিয়া মুম্বু অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়] অতি সমারোহের সহিত হইত। নগরের কাছে বৃহৎ জলাশয়গুলি ও তাহার কাছে হুম্বর পত্রাচ্ছাদিত বন উৎসবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

এই উৎসব বা পোনি [পার্বণী] দেখিতে দেশ-দেশান্তরের লোক একত্রিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, পৃথ্বীও সেইরূপ উৎসব করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহোবার গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। তিনি এক ছল করিয়া মহোবা আক্রমণ করিলেন। [নানাস্থানে মহোবা আক্রমণের ভিন্ন-ভিন্ন কারণ পাওয়া যায়, কোনটি ঠিক জানিবার উপায় নাই। বোধ হয় পৃথ্বীর দর্বাই প্রধান কারণ।] ১১৮২ খৃষ্টাব্দে বেত্রবতী-নদী (Betwa) তীরে ভীষণ যুদ্ধে বহু সেনা ক্ষয় করিয়া চন্দ্রের বিজিত রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ জয় করিয়া লইলেন। মহোবা ও চন্দ্রের পৃথ্বীর অধিকারে আসিল। চন্দ্রের রাজ্যের ইহার পর তাঁহাদের পূর্বদেশের রাজধানী কালিঙ্গেরে গিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পূর্বাংশে অতি হীনবল হইয়া পড়িলেন। চন্দ্র যত দুর্বল হইলেন, পৃথ্বী তত প্রবল হইতে পারিলেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে দুই রাজা মিলিয়া যত বলীয়ান ছিলেন, এখন তাহাপেক্ষা দুর্বল হইয়া পড়িলেন।

পৃথ্বী কনোজপতির কন্যা হরণ করিয়া আপনার প্রসিদ্ধ ১০৮ সুরের অধিকভাগ হারাইলেন। তাঁহার বাহুবল চূর্ণ হইয়া গেল, ও সেই সহিত কনোজ ও মহোবা তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িল। ঘোরীর মত দূরদর্শী যোদ্ধা এ অবসর ত্যাগ করিলেন না। রাসোতেই আছে যে, শেষ যুদ্ধের অন্তর ঘন পৃথ্বী সৈন্ত একত্রিত করিয়া পরিদর্শন করিলেন, তখন চারিদিকে বালক ও নবীন যোদ্ধাদের দেখিয়া ভীত হইলেন। তাঁহার যে রণ-দক্ষ বহুদর্শী সুরেরা যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করিত না, তাহারা এখন আর নাই; তাহাদের পুত্রেরা বা পৌত্রেরা আছে বটে, তাহারা যে বলবান ছিল তাহার পরীক্ষা লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জীবনে রণক্ষেত্র দেখে নাই। পৃথ্বী আপনার সুরদের কাছে যাহা আশা করিতেন, এই বালক বীরদের কাছে তাহা কখনই আশা করিতে পারেন নাই। তিনি জয়চন্দ্রের যেরূপ অপমান করিয়াছিলেন, তাহাতে কখনই আশা করেন নাই যে, চক্রবর্তী-সম্রাট ঐ অপমানের পর, তাঁহার পতাকার তলে আসিয়া যুদ্ধ করিবে। সেকালের

রাজপুত্রদের যদি বিন্দুযাত্র রাজনীতি-জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে গুজরাট, মহোবা, চিতোর, অজমীর ও কনোজের মিলিত সৈন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত ও ভারতে একটিও মুসলমান প্রবেশ করিতে পারিত না।

পৃথ্বী জয়চন্দ্রকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া জয়চন্দ্রের রাগ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রাগের প্রধান কারণ সংযুক্তা-হরণ। সংযুক্তাকে যদি পৃথ্বী স্বয়ম্বরের দিন হরণ করিতেন, তাহা হইলে জয়চন্দ্রের রাগের কারণ হইত না, কারণ ঐরূপ হরণই সেকালে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠতম বিবাহপদ্ধতি ছিল। আল্‌হার গানেও কতকগুলি বিবাহ-যুদ্ধের কথা আছে, তাহাতে বর পক্ষীয়রা কন্যার পিতা ও ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া বাধিয়া রাখিত, পরে তাঁহাদের দিয়া কন্যাদান করাইয়া লইত। কন্যাদানের পর আর শত্রুতা থাকিত না, কোলাকুলি করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিত, ও এইরূপ বিবাহই গৌরবের ও বাহুনীয় ছিল, ইহাতে কন্যার পিতার মান বাড়িত।

জয়চন্দ্র যখন চক্রবর্তী ও বড় রাজা, তখন বিপদের সময়ে পৃথ্বীরাজের তাঁহার কাছে গিয়া সাহায্য ভিক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু রাসোর বর্ণনা-মতে, ঘোরীর আক্রমণ সংবাদ পাইয়া পৃথ্বী অন্তান্ত ছোট-বড় অনেক রাজার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু জয়চন্দ্রকে মোটে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। জয়চন্দ্রের উচ্চপদ ও গরুর তাঁহাকে গায়ে পড়িয়া পৃথ্বীর সাহায্য করিতে, ও তাহার পতাকা-তলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেয় নাই। মেজন্তু জয়চন্দ্রকে দোষী করা যায় না, জয়চন্দ্রের স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিও ঐরূপ করিত।

যাণ্ডা হউক, ভারতের কোনও হিন্দু-রাজা মুসলমানদের ডাকে নাই। ঘোরী পৃথ্বীর দুর্বলতা, ও সে-সময়ে যে-কয়টি সামন্ত ও সুর বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের আপনাদের মধ্যে মনান্তরের সবিস্তার সংবাদ পাইয়াছিলেন। বিচক্ষণ সেনাপতির মতন তিনি শত্রুকে বলসঙ্কল্প করিতে না দিয়াই সম্মুখ-সমরে নামিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

নষ্টচন্দ্র

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পরে একদিন বিকাল বেলা ধনিষ্ঠা তার পূজার ঘরের জান্নায় গিয়ে বসে' পথের উপর চোখ পেতে অনলের আপিসের ছুটির পর বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তাকে একবার দেখবার প্রতীক্ষা করছে, এমন সময় মাধবী ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে ধনিষ্ঠাকে বললে—মা গো মা, মেম-দিদিমণির বাবা,.....

মাধবীর কথার স্বরে আকুট হয়ে ধনিষ্ঠা তার দিকে চোখ ফিরিয়েই তার ব্যস্ত ভাব দেখে' আর তার প্রথম কথাটুকু শুনেই অভ্যস্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল; গৌরীর বাবা তো অনল—তার সম্বন্ধে কি কথা মাধবী অমন ব্যস্ত হয়ে বলতে এসেছে? তিনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?—এই ভেবে তার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল এবং পরক্ষণেই আবার তার মনে হ'ল তাঁর কি কোনো অস্বাভাবিক-বিস্বাভাবিক করেছে, তাই মাধবী এমন শশব্যস্ত হ'য়ে সংবাদ দিতে এসেছে? অমনি তার মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। এক নিমেষের মধ্যে ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও আশঙ্কা বিদ্যুৎ-চমকের মতন বয়ে গেল। পর মুহূর্তেই মাধবীর কথার শেষাংশ শুনে সে স্থির করতে পারলে না যে, সেই সংবাদে সে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে।

মাধবী তার কথা শেষ করে' বললে—বিলাত থেকে ফিরে এসেছেএকেবারে সায়েব মা, বেহেউ মাতাল!

ধনিষ্ঠা এই কথা শুনে কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে বলে' উঠল—বলিস্ কি? কোথায় আছে সে? উনি.....ম্যানেজার বাবু কোথায়?

মাধবী বললে—আমি কাছারী থেকে শুনে এলাম—

অনিল কাকা-বাবু কাছারীতে এসেছিল; ম্যানেজার-বাবু তাকে নিয়ে সকাল-সকাল বাড়ী চলে' গেছেন।

এতবড় একটি নূতন অপ্রত্যাশিত বিশেষ খবর শোনার ফলে ধনিষ্ঠার মনে যে-সব চিন্তা আলোড়িত হয়ে উঠল, সে-সবের উপরে সাগর-তরঙ্গের মাধায় ফেনের মতন ভেসে উঠল—উনি কাছারী থেকে বাড়ী চলে' গেছেন, আজ আর তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না।

এই চিন্তার পরেই তার মনে হ'লো—এত বড় একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য ব্যাপার যখন ঘটল, তখন উনি নিশ্চয় আমাকে সমস্ত ঘটনা বলতে আসবেন।

ধনিষ্ঠা সমস্ত বিকাল-বেলাটা উৎসুক হয়ে অনলের আগমনের প্রতীক্ষা করে' মুহূর্তে গুণে-গুণে ক্লান্ত হয়ে উঠল; সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি হ'ল; তবু অনলের দেখা নেই। অনলের উপর তার ভয়ানক রাগ হতে লাগল—তিনি এই খবরটাও আমাকে দেওয়া আবশ্যিক মনে করলেন না? আমি অন্য কারো মুখে এই খবর শুনে যে উৎসুক হয়ে থাকব এটাও কি তাঁর খেয়াল হচ্ছে না? তাঁর পারিবারিক খবর আমার জানবার দরকার কি, মনে করে' যদি না এসে থাকেন তো ভারি অন্যায় করেছেন? গৌরী কি শুধু তাঁর? গৌরীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই? তবে যে তিনি একদিন বলেছিলেন—গৌরী সম্পূর্ণই আপনার! সে কি তবে.....

ধনিষ্ঠার মনে আসছিল—“সে কি তবে মূনিবকে খুশী করবার জন্তে চাকরের মন-রাখা কথা?” কিন্তু এই চিন্তার ক্ষীণ আভাস মনে হ'তেই সে কুণ্ঠিত হয়ে অপরাধীর ভাবে তাড়াতাড়ি সে চিন্তা চাপা দিয়ে মনে মনে বললে—আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা! গৌরীর স্বখ-দুঃখ যে আমার স্বখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তা কি উনি অতবড় বুদ্ধিমান হয়েও বুঝতে পারেন না?

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুরু হয়ে বসে' রইল, তার আজ পূজাতে বসতেও মন সবুছিল না।

গৌরী বেড়িয়ে ফিরে এল। এসেই সে ধনিষ্ঠাকে দেখেই বলে' উঠল—মা, আমার বাবা ফিরে এসেছে, সবাই আমাকে বললে.....

তাকে মা সন্ধ্যাধনের পর অনিলকে বাবা বলে' গৌরী যখন উল্লেখ করলে, তখন কথাটা গিয়ে ধনিষ্ঠার কানে বাজল, তার মনে বিসদৃশ ঠেকল। তার মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে এই চিন্তাও বয়ে গেল যে আর-একদিন গৌরী তাকে মা বলে' ডেকেই অনিলকে বাবা বলে' ডেকেছিল, এবং তাতে কী সুখকর মধুর লজ্জাই না তার সারা হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলেছিল!

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে থাকতে দেখে' গৌরী জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মা, আমার তো ছুটো বাবা হ'ল, বাবা বলে' ডাকলে কোন্ বাবা উত্তর দেবে?

ধনিষ্ঠা একটুখানি স্নানভাবে হেসে বললে—যিনি আজ এলেন, ইনিই তোমার বাবা; আর উনি তোমার... ধনিষ্ঠার গলার কাছে কথাটা যেন আটকে গেল; সে যেন তার একটা অতি গোপন স্নেহের গলা টিপে শ্বাস রোধ করে' তাকে মাবুতে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে শক্ত হয়ে নিষে বললে—জ্যোঠামশায়।

গৌরী জোরে ঘাড় নেড়ে বললে—না আমি বাবাকে জ্যোঠামশায় বলতে পারবো না, বাবাকে বাবাই বলব; আর এ বাবাকে বলব পাপা—আমি তো ওকে পাপাই বলতাম!

ধনিষ্ঠা যেন জটিল সমস্তার সহজ মীমাংসা শুনে আরাম অনুভব করে' বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বোলো।

ধনিষ্ঠা অনেক রাত পর্যন্ত মনে করতে লাগল যে এইবার হয়তো অনল আসবে। কিন্তু যখন রাত দশটা বেজে গেল, তখন সে হতাশ হয়ে সন্ধ্যাপূজা করতে গেল।

পরদিন সকাল-বেলাটাও অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কেটে গেল। অনলের আগিসে আসবার সময় ধনিষ্ঠা তার নির্দিষ্ট জান্নায় গিয়ে বসল; সে দেখলে, নির্দিষ্ট সময়ে অনল আগিসে এল। ধনিষ্ঠা মনে করেছিল, যতদূর

ডাইকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে অনলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল দেখতে পাবে; কিন্তু অনলকে দেখে তার যেন বোধ হ'ল সহজগন্তীর অনল আরো গন্তীর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে উঠেছে। শুধু কাছারীর উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ই ধনিষ্ঠা অনলকে দেখলে, এবং তার মধ্যেও সব সময় অনলের মুখ সে সম্পূর্ণ দেখতে পায়নি, কখনো মুখের একাংশ দেখেছে, কখনো বা কেবল মাথার পিছন দিকটাই দেখতে পেয়েছে, তাই সে সন্দ্বিহান হয়ে রইল, যে, তার যে মনে হ'ল অনল গন্তীরতর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে আছে, সেটা সত্য, না দূর থেকে দেখার দৃষ্টি-বিলম্ব মাত্র।

ধনিষ্ঠা চিন্তাকুল ও কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কোনো রকমে সমস্ত দিনটা কাটালে; কিন্তু যখন বিকালেও তার কাছে কাগজপত্র সই করাতে হরকাত এল, তখন ধনিষ্ঠার অসহ্য হয়ে উঠল; তার মনে কী আশা ছিল যে আজ হয়তো অনল নিজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিতে আসবে; তা না আসাতে হতাশার পীড়া তাকে অস্থির করে' তুললে, অনলের উপর তার রাগ হতে লাগল, মনে করতে না চাইলেও মনে হতে লাগল অনল যেন তাকে ইচ্ছা করে' অবহেলা করছে। বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে যখন দেখলে কাছারীর ছুটি হব-হব হয়ে এসেছে, তখন সে আর অপেক্ষা করে' থাকতে পারলে না; যদিও সে কিছুদিন আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিল—“আমি মরে' গেলেও আর কোনোদিন ওঁকে ডেকে পাঠাব না; উনি নিজে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো আসবেন, নইলে এই শেষ।” তথাপি সে সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একজন চাকরকে বললে—ম্যানেজার-বাবুকে দৌড়ে গিয়ে 'বলে' আয়, বাড়ী যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন।

কাছারীর ছুটির পর অনল ধনিষ্ঠার অন্দরে এসে তার কাছে নিজের আগমন-বার্তা পাঠালে। ধনিষ্ঠা অনলের আগমনের জন্তই অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু তবু চাকর এসে খবর দিতেই তার মুখের গৌরবর্ণে একটু লালের ছোপ বুলিয়ে গেল, হৃদয়ে রক্তধারা একটু ক্ষততালে আনা-

গোনা করিতে আরম্ভ করিলে। অনল এসে গম্ভীর মুখে
সমস্কার করে' দাঁড়াল; ধনিষ্ঠা মাথা ঝুঁকিয়ে যুক্তকরের
উপর ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে মুহূর্তেরে বললে—বসুন।

অনল গম্ভীরমুখেই. বললে—আপনি দাঁড়িয়ে
রইলেন.....

ধনিষ্ঠা একখানা চেয়ারের পিঠ ধরে' চেয়ারখানাকে
একটু সরিয়ে তাতে বসল। অনলও তার সামনের এক
চেয়ারে বসল। মুহূর্তকাল উভয়েই নীরব। ধনিষ্ঠা
অনলকে ডেকে এনেছে; ধনিষ্ঠারই আগে আস্থানের
প্রয়োজন ব্যক্ত করে' বলা উচিত; অনলও বোধ হয়
তাই আশা করছিল; কিন্তু ধনিষ্ঠাকে নীরব থাকিতে
দেখে অনলই নীরবতা ভঙ্গ করে' জিজ্ঞাসা করলে—
আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

ধনিষ্ঠার মুখ আবার গোলাপী হয়ে উঠল; সে মাথা
নীচু করে' আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা নাড়তে
নাড়তে বললে—হ্যাঁ। অনিল ঠাকুর-পো নাকি কিরে
এসেছে?

ধনিষ্ঠা তার স্বামী বেঁচে থাকতেই স্বামীর প্রিয়পাত্র
অনিলকে ঠাকুর-পো বলে'ই ডাকত, যদিও মাঝে-মাঝে
সে স্বামীর কাছে অনিলের নাম করিতে হলে তাকে সতীন
বলে' উল্লেখ করত। পুরাতন অভ্যাস-বশেই আজও
ধনিষ্ঠা অনিলকে ঠাকুর-পো বললে। কিন্তু বলে'ই তার
মুখ অত্যন্ত আরম্ভ হয়ে উঠল, সে নত চোখের কোণ
দিয়ে অনলকে একবার দেখে নিলে।

অনল ধনিষ্ঠার মুখের ত্রি পরিবর্তন লক্ষ্য না করে'
গম্ভীরমুখে শুধু বললে—হ্যাঁ।

অনল আরও-কিছু বলবে এই আশায় ধনিষ্ঠা অনলের
মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু অনল গম্ভীর হয়ে মুখ একটু
ফিরিয়ে বসে' রইল। ধনিষ্ঠা অনলের গাম্ভীর্য দেখে
অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতে লাগল; সে যে অনলকে
ডেকে এনেছে তা কি ঐ এক হ্যাঁ শোনার জন্য! কিন্তু
ডেকে যখন সে এনেছে, তখন অনল কথা না বললেও তাকে
কথা বলাবার জন্য ধনিষ্ঠাকে তো কথা বলতে হবে। সে
সম্বুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে—অনিল-ঠাকুর-পোর বৌ
যে চিঠি লিখেছিল তা একেবারে আগাগোড়া মিথ্যা?

ধনিষ্ঠা বলতে যাচ্ছিল গৌরীর মা, কিন্তু তা সে বলতে
না পেরে বললে অনিল-ঠাকুর-পোর বৌ। গৌরীর মা
তো সে-ছাড়া আর কেউ নয়; গৌরী যে অপরের মেয়ে
এ চিন্তাও সে মনে স্থান দিতে পারে না।

ধনিষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অনল
বললে—এখন তো দেখছি সে চিঠি মিথ্যা; কিন্তু সে
চিঠি সত্য হলেই ভালো হত। সেই চিঠিকে সত্য ভেবে
যে কষ্ট পেয়েছিলাম, এখন সেই চিঠিকে অসত্য দেখে
ততোধিক কষ্ট পাচ্ছি।

যে ভাই অনলের প্রাণতুল্য প্রিয়, যার জন্য অসাধারণ
ত্যাগ স্বীকার করে' অনল মহেশ্বের ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের
পরিচয় দিয়েছে, অনল সেই ভাইয়ের জীবন অপেক্ষা মৃত্যু
শ্রাঘ্য বিবেচনা করছে যে কতবড় দুঃখে, তা ধনিষ্ঠা বুঝতে
পারলে; নিফলুস-চরিত্র সুসংযতনতাব অনল ভাইয়ের
অনাচার দেখে যে কতবড় দুঃখিত হয়েছে, তা বুঝতে পেরে
ধনিষ্ঠাও ব্যথিত হ'ল। সে স্নান-মুখে মুহূর্তেরে জিজ্ঞাসা
করলে—সুন্দাম সে খুব মাতাল হয়ে এসেছে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—শুধু মাতাল হ'লে
তো 'তাকে পশু বলে' তার অনাচার ক্ষমা করিতে
পারতাম; কিন্তু এ যে একেবারে মানব হয়ে ফিরেছে।
ওর কথা যে আমি কেমন করে' আপনাকে বলব তা ভেবে
পাচ্ছি না—ও আমার লজ্জা, আমার স্বর্গপত্নী মায়ের লজ্জা,
আমার পিতৃপিতামহদের লজ্জা, ও আমার গৌরীর লজ্জা!

ধনিষ্ঠা গম্ভীর স্বল্পবাক্য অনলের মুখে এই ভাবোচ্ছ্বাসের
কথা শুনে কাতর-দৃষ্টিতে অবাক হয়ে অনলের মুখের দিকে
তাকিয়ে রইল।

অনল ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলতে আরম্ভ
করলে—অনিল বিলাতে গিয়ে মদ খেতে ধরে' আত্মবিক
নানা অনাচারে ডুবে গিয়েছিল; মাতৃলামির কোঁকে
নিজের সকল কুকীর্তিই সে ব্যক্ত করে' ফেলেছে।
অনাচারের ফলেই গৌরীর জন্ম হয়। কিন্তু গৌরীর
জননী.....

অনল ধনিষ্ঠার সামনে অনিলের দ্বীকে গৌরীর মা
বলতে পারলে না, তার মুখে বাধল, তাই সে বললে—
গৌরীর জননী ছিল সাধ্বী, সে অনিলকে ভালোবেসে পতি-

ভাবেই তাকে আশ্রয়ান করেছিল ; কিন্তু এই পাষাণটা এমনই নরাধম যে, জীর ভালোবাসার স্বযোগ পেয়ে তার উপর অত্যাচার করত ; সে বেচারী নিজে লোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে' বা দোকানে চাকরী করে' স্বামী ও কন্যাকে পালন করত, আর এ, জীর কষ্টের উপার্জন অনাচারে অপব্যয় করত কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হ'ত না।

ধনিষ্ঠা বললে—আপনি তো ওকে মাসে-মাসে অনেক টাকা পাঠাতেন।

ধনিষ্ঠা বললে না যে সেও অনিলকে অনলের ভুলেই মাসে-মাসে অনাচারের খরচ জুগিয়ে এসেছে।

অনল বলতে লাগল—হ্যাঁ, আমি যা পাঠাতাম আর আপনি তাকে যা দিতেন, তা হাতে পড়'বামাত্রই সে জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, অনাচারে উড়িয়ে দিয়ে রিক্তহাতে বাড়ীতে এসে জীর উপর জুলুম করত। নিজেকে আর নিজের কচি মেয়েকে পাষাণের উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার ভুলে সে-বেচারী প্রাণপণ পরিশ্রম করে' উপার্জন করত স্বামীর অনাচারের খরচ জোগাবার ভুলে। শেষে এক জায়গায় জুয়া খেলে অনেক বেশী টাকা ধার করে' ফেলে ; সেই টাকার মহাজন টাকা আদায় করত এলে অনিল তার সঙ্গে মারামারি করে' তাকে প্রায় খুন করে' ফেলে। সেই সময় সে তার জীকে মারের ভয় দেখিয়ে মিথ্যা করে' নিজের স্বভাসংবাদ জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখায় ; মংলব ছিল টেলিগ্রামকে তাড়াতাড়ি টাকাটা গিয়ে পড়লে সে সেই টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে' ফেলবে। কিন্তু আমার পাঠানো টাকা গিয়ে পৌঁছানোর আগেই ওকে পুলিশে গেরেপ্তার করে' নিয়ে গিয়ে হাজতে আটকে রাখে। ইতিমধ্যে টাকাটা গিয়ে গৌরীর জননী হাতে পড়ে। সে-বেচারী পশু-স্বভাব স্বামীর বন্দী-অবস্থার স্বযোগ পেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে আসছিল ; পথে সে মারা পড়ে, এ পর্যন্ত আর এসে পৌঁছতে পারে-নি—এমনি মরণাপন্ন দশা হয়েছিল তার স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে। ওদিকে ওর জেল হয়েছিল। জেল থেকে খালাস হয়ে ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে। সে বৃদ্ধের সৈনিক ছিল বলে' গভর্নমেন্ট থেকে ওকে পাথের দিয়ে দেশে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা

কোনো খবর পাবার পূর্বেই ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে।

অনল অনিলের ইতিহাস বলে' চূপ করল। ধনিষ্ঠার মনে হতে লাগল যে তার কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি যে বলবে তা ভাবতে গিয়ে তারও আর-কিছু বলা জোগালো না। কণকাল চূপ করে' বসে' থাকার পর অনল উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে—এখনও ওর বয়স অল্প, আপনার কাছে থাকলে ওর স্বভাব শুধরে যাবে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কতদিনে শোধরাবে ভগবান জানেন ; কিন্তু এখন তার পশু-প্রকৃতি দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে—লোকে যে বলছে ও আমার ভাই তাতে আমার লজ্জা আর কষ্ট হচ্ছে খুবই, কিন্তু ওকে যে গৌরীর বাবা বলে' লোকে পরিচয় দিচ্ছে এ আমার মর্মান্তিক হচ্ছে—দেব-নির্দাল্যের মতন পবিত্র স্বন্দর গৌরীর বাবা এই নর-পশু !

ধনিষ্ঠা এর উত্তরে আর কিছু বলতে পারলে না, সে সম্মল দৃষ্টি তুলে একবার অনলের মুখের দিকে তাকালে। অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে' গেলো।

অনল ধনিষ্ঠার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধনিষ্ঠা গৌরীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো—বাবা, আমার পাপা এসেছে ! আমি তাকে দেখ'ব। সে আমাকে দেখতে এল না ?

গৌরীর কথা শুনে ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল এবং দেখলে অনল গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বলছে—হ্যাঁ, সে দেখতে আসবে বৈ কি। সে অনেক দূর থেকে এসেছে কি না, তাই তার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

গৌরী বললে—তবে আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চলো না।

অনল বললে—আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অল্প একদিন নিয়ে যাব।

অনল গৌরীকে কোলে করে'ই চলতে গিয়ে দেখলে ধনিষ্ঠা তাদের পিছনে ঘরের দরজার সামনে রানমুখে দাঁড়িয়ে আছে। অনল গৌরীকে কোলে

থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে—তুমি তোমার মার কাছে যাও।

গৌরী ছুটে ধনিষ্ঠার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—মা, এখন তোমাকে ছেঁব ?

ধনিষ্ঠা নত হয়ে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে।

তাই দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনল সেখান থেকে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে তার পিতার প্রসঙ্গ তুলিয়ে দেবার জন্তে বললে—মা-মণি, চলো তোমার জন্তে একটা নুতন জিনিষ রেখেছি।

গৌরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি মা ?

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—আগে বলব না, দেখবে চলো।

গৌরী কৌতূহলে নিৰ্বাক্ হয়ে রইল। ধনিষ্ঠা তাকে কোলে করে' নিজের আপিস-ঘরে ফিরে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে একটা দেবাজ খুললে এবং দেবাজের টানা টেনে বার করে' তার ভিতর থেকে সুন্দর এক-ছড়া মুক্তার মালা তুলে' গৌরীর গলায় পরিয়ে দিলে।

গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল মুখে বলে' উঠল—বাঃ ! বেশ সুন্দর !

ধনিষ্ঠা গৌরীকে বুকে চেপে বললে—আমার গৌরী আরো সুন্দর !

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধ্যে চাপা থেকে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না ; সে মাথা একটু পিছন দিকে হেলিয়ে ধনিষ্ঠার মুখ দেখবার চেষ্টা করে' বললে—মা তুমি গয়না পরো না কেন ?

ধনিষ্ঠা গৌরীর ছুই হাত নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে দিয়ে বললে—এই যে আমার গহনা ! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার অলঙ্কার !

গৌরী মার স্নেহস্বখে মার বুকে লগ্ন হয়ে চূপ করে' রইল।

* * *

অনল বাড়ীতে ফিরে যেতেই অনিল মদ্যপানে অবশ-চরণে তার কাছে এসেই অলিভবচনে বললে—দাদু-প্রবর !

অনল ব্যথিত ও বিরক্তভাবে বললে—অনিল, আমাকে অপমান করতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না ?

অনিল ছবার 'টলে' নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে—এতে আবার অপমান কিসে হ'ল ? ভ্রাতৃ শব্দের প্রথম অর্থ একবচনে হয় ভ্রাতা, কিন্তু অস্ত্র শব্দের সঙ্গে সমাস হ'লে ভ্রাতৃই থেকে যায় ; তেমনি দাদু শব্দ থেকে হয়েছে দাদা, সমাসে দাদুই থাকবে। ভ্রাতৃ শব্দের সস্বোধনে হয় ভ্রাতঃ ; দাদু শব্দের সস্বোধনে হবে দাদঃ। সেটা শুন্তে ধারাপ লাগল—সর্ব-দক্ষগজসিংহ মলমের কথা মনে পড়ে' যায় ; তাই সম্মান দেখিয়ে সমাস করলাম দাদুপ্রবর, কিনা দাদার মধ্যে সেরা দাদা ! আর সেটা হ'ল কিনা তোমার কাছে অপমান !

অনল ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—মহুয্যব্দের গেশমাত্র অবশেষ থাকলে তুমিও ঐ রকম কথাকে অপমানজনক মনে করতে।

অনিল বললে—মাহুয্য হয়ে জন্মেছি এখন তখন মহুয্য কান্ডে কোন্ শালা ! ভগবানেরও ক্ষমতা নেই।

অনল একবারে মর্ম্মাহত হয়ে নীরবে সেখান থেকে চলে' যাবার উপক্রম করলে। অনিল টলুতে টলুতে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে—কতকগুলো বাজে বকিয়ে পালালে ত চলবে না। কাজের কথাটা বলাই হয়-নি—আমার কিছু টাকা চাই।

অনল অনিলের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললে—তোমাকে আমি এক পরস্যা দেবো না ; তোমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দরকার হবে আমি কিনে দেবো।

অনিল বললে—বেশ, তবে আমাকে ভজন-খানেক হইকির বোতল আনিয়ে দাও।

অনল বললে—ঐটি পাবে না।

অনিল বিক্রপের স্বরে বললে—ঐ তো ! নিজের কথা ঠিক রাখতে পারো না। আবার মহুয্যব্দের বড়াই করো ! এখনি যে বললে আমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দরকার সব কিনে দেবে !

অনল বললে—বিষ খেতে চাইলে তো বিব কিনে দিতে পারি না।

অনিল ঘাড় ঘুরিয়ে বললে—মদ বুঝি বিব ! অমৃত !

অমৃত ! সুখা ! স্বর্গে দেবতারা বা খায় ; আগে আমাদের দেশের ঋষিরা যে সোমরস পান করতেন ; পরম পবিত্র বিত্ত জ্ঞানস্বরস !

অনল আবার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললে—
মাতালের সঙ্গে বন্ধুর অবকাশ আমার নেই। যাও ঘরে গিয়ে শোও পে।

অনিল বললে—বা রে ! টাকা দেবে না তো আমার নেশা ছুটে যাবে যে। টাকা না দাও আমি তোমার সব জিনিষ বেচে-বেচে মদ খাব।

অনিল এই বলে' ধপ করে' হাত বাড়িয়ে অনলের জামার বুকের উপর লম্বিত সোনার চেনটা চেপে ধরলে। অনলও তৎক্ষণাৎ অনিলের হাত এমন জোরে টিপে ধরলে যে বলিষ্ঠ অনলের টিপনে ক্রমশঃ অনিল ব্যথা পেয়ে টেঁচিয়ে উঠল—আঃ দাদা, হাত ভেঙ্গে দেবে নাকি, ছাড়ো ছাড়ো, বড় লাগছে।

অনলের হাতের চাপে অনিলের হাতের মুষ্টি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অনল অনিলের হাত ছাড়িয়ে ফেলে সেখান থেকে দ্রুত চলে' গেল।

অনিল কিছুক্ষণ শুক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনেই বললে—জানি টাকা দেবে না, তাই আগে থাকতেই বুঝি করে' রূপোর ডিবেটা হাতিয়ে রেখেছি। যাই সেটাকেই বিক্রমপুর পাঠিয়ে আসি। কিন্তু কোনো শালা কি আমার কাছ থেকে জিনিষ কিনতে চায় ? মাটির 'দরে ছেড়ে দিতে চাইলেও শালারা বলে ম্যানেজার-বাবু টের পেলে ক্যাসাদে পড়তে হবে। ড্যান্ডে, টাইর্যান্ট্-আর অ্যারান্ট্-কাউন্সিল।

অনিল টলতে টলতে চলে' গেল। রাত্রে আহারের পর অনলকে পান দেবার সময় তার পরিচারিকা হরির মা রূপার পানের ডিবাটা কোথাও খুঁজে পেলেন না। অনল শুনে কেবল বললে—সে আর খুঁজতে হবে না। আজ থেকে আমি আর পান খাব না।

সে বুঝতে পারলে যে সেই ডিবে কোথায় গেছে।

পরদিন সকাল-বেলা গৌরীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে এসে মাধবী হাঁপাতে হাঁপাতে ধনিষ্ঠাকে বললে—ওমা, মাগো, কাল রাত্তিরে ম্যানেজার-বাবুর রূপোর ডিবে চুরি

গেছে ; ম্যানেজার-বাবু তাই শুনে চাকর-দাসী কাউকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে' হরির মা'কে বলেছে—
আজ থেকে আমি আর পান খাব না। এ যে চোরের উপর রাগ করে' ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া হ'ল !

ধনিষ্ঠা নির্বাক হয়ে একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করলে ; তার মনে যে সন্দেহ হ'ল তা সে দাসীর কাছে ব্যক্ত করতে পারলে না।

মাধবী ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর দেখে আবার বললে—আজ সকালে বাজারে টেঁচুরা পিটে দিয়েছে ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে সব জিনিস-পত্তর নিলাম হবে আর কাঙালী-বিদায় হবে। ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে লোকে-লোকাকীর্নি হয়েছে এলাম।

—ওঁর ধনিষ্ঠা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—অনিল ঠাকুরপো কোথায় ?

মাধবী বললে—তিনি কাল রাতের পাড়ীতেই কলকাতা চলে' গেছে। হরির মা তাকে বলেছিল—'এত রাত্রে কলকাতা যাবার কি দরকার হ'ল ?' তাতে তিনি উত্তর করেছিল—এখানে খেনো মদ ছাড়া পাওয়া যায় না, খেনো তিনি খেতে পাবে না। তাই কলকাতা গেছে হুঁই না কি বলে মা বিলিত্তী মদ কিনে আনতে।

ধনিষ্ঠা মুখে আর কিছু বললে না, কিন্তু তার মনে হ'ল—অমন লোকের ভাই এমন হ'তে পারলে কেমন করে' ?

অনল কেবলমাত্র পরিধেয় ধানকয়েক মোটামুটি কাপড় চাদর জামা মাত্র রেখে বাড়ীর আর সব জিনিস বিক্রী করে' ফেললে ; জুতো ছাতা তৈজসপত্র থেকে আরম্ভ করে' খাট পালং দেওয়াল আলমারি যা যেখানে ছিল কিছুই সে রাখলে না। সমস্ত বিক্রী করে' যে টাকা পেলে তা থেকে চাকর-দাসীদের মাইনে আগাম চুকিয়ে দিয়ে বাকী টাকা কাঙালীদের মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করে' দিলে। এ একেবারে সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ।

যখন কাঙালী-বিদায় হচ্ছে, তখন অনিল কলকাতা থেকে মদ কিনে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। ব্যাপার দেখে সে মনে মনে বললে—আমাকে একটা টাকা দিতে পারেন না, এ দিকে নবাবী করে' কাঙালী-বিদায় করা হচ্ছে ! কাল, আমি সিদ্ধুক না ভাঙি তো আমার নাম অনিল নয় !

অনিল বাড়ীতে এসে অবাক হয়ে দেখলে সব শূন্য ! যে সিন্দুক অনিলের টাকা, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি দামী জিনিস থাকত, তার পূর্ব-অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র মাটির বুকে দাগ পড়ে' আছে, সিন্দুক প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্ধান করেছে। অনিল অনলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, জিনিসপত্রের সব কোথায় গেল ?

অনল তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বললে—বিক্রী করে' ফেলেছি।

অনিল আবার জিজ্ঞাসা করলে—কেন ?

অনল গম্ভীরভাবে বললে—কাঙালীদের দান করুব বলে'।

অনিল ব্যস্তভাবে বলে—ভাইকে কিছু দেবার বেলা যত রূপণতা, আর যত রাজ্যের কাঙালীদের ডেকে এনে টাকা বিলিয়ে ফোতো নবাবী করা হ'ল !

অনল এ কথাই কোনা উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিলকে হরির মা এসে ডাকলে—ছোট-বাবু, জল খাবে এস।

কল্কাতা থেকে এসে অনিলের ক্ষুধা পেয়েছিল। সে হরির মার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দেখলে একখানা ফাটা পিঁড়ি পেতে কলার পাতা পেড়ে জলখাবার আর একটা মাটির গেলাসে জল দিয়েছে। এ দেখেই তো অনিলের গা জলে' উঠল, সে কর্কশ হয়ে বললে—এ আবার কি চঃ ! আমি কি হাড়ি না বাগ্‌দৌ যে আমাকে এ রকম করে' জল খেতে দেওয়া হয়েছে।

অনিল লাধি মেরে জলের গেলাস উর্টে খাবার ছড়িয়ে ফেললে।

অনল সেখানে এসে অনিলের কাণ্ড দেখেও তাকে কিছু না বলে' হরির মাকে বললে—হরির মা, ছোট-বাবু নিজেকে কিছু খেতে না চাইলে আর খেতে দিয়ে না। আমাকে খেতে দাও।

অনিল ক্রোধে ও নেশায় কিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করে' বললে—আমি ও মালার ভাঁড়ে খেতে পারুব না।

অনল শান্তভাবে বললে—ভাঁড় মালা ছাড়া আমার

বাড়ীতে আর কোনো পাত্র নেই যখন, তখন হয় ঐ পাত্রে খেতে হবে, নয় উপোষ করুতে হবে।

অনিল নিরুপায় হয়ে রাগে গরগর করুতে করুতে চলে' গেল; সে স্থির করলে যে খুব খানিকটা মদ ঢেলে মনের সব কোভ ভাসিয়ে দেবে।

নিজের ঘরে ঢুকেই সে স্তম্ভিত হয়ে ধমুকে দাঁড়াল—তার বড় সাধের হইকির বোতলগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মেঝের ছড়িয়ে পড়ে' আছে, আর ঘরে মদের চেউ খেলে যাচ্ছে। সে কণকাল শুরু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বেগে অনলের কাছে ফিরে এসে চীৎকার করে' ডাকলে—দাদা !

এই ডাকটা ক্রোধের গর্জন অপেক্ষা শোকের আর্ত-নাদের মতনই বেশী শোনালো।

অনল তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে—আমার মদের বোতলগুলো কে ভাঙলে ?

অনল শান্ত হয়ে বললে—আমি।

অনিল গর্জন করে' উঠল—এ ভারি অশ্রায়। অনল আবার শান্ত হয়ে বললে—মদ খাওয়া আরো অশ্রায়; যে মদকে ঘৃণা করে তার বাড়ীতে মদ এনে রাখা ততোধিক অশ্রায়। অনিল চীৎকার করে' উঠল—তোমার মাথা ভেঙে ফেলে ঐ রকম রক্ত গড়িয়ে দিতে পারলেও আমার রাগ যায় না।

অনল হেসে বললে—রাগ যখন যাবেই না, তখন মাথা ভেঙেও তো কোনো লাভ নেই।

অনিল অভিমান-স্কন্ধ হয়ে বলে উঠল—যাও, তোমার হাসি ভালো লাগে না।

অনল এবার কাতর হয়ে বললে—এ হাসি নয় ভাই, হাসি নয়। লোহা যখন বেশী তেতে ওঠে, তখন লাল হয়, আরো তাতলে শাদা হয়; তেমনি ছঃখ বেশী হ'লে কান্না আসে, আরো বেশী হ'লে কান্না হাসির রূপ ধরে।

অনিল বিরক্ত হয়ে চলে' যেতে যেতে বললে—রেখে দাও তোমার ও-সব স্ত্রাকামি কবিত্ব।

* * *

পরদিন সকাল-বেলা অনিল অনলকে বললে—দাদা, আমাকে একশো টাকা দিতে হবে।

অনল গম্ভীর অথচ শান্ত ভাবে বললে—তোমায় তো বলেছি তোমার হাতে আমি এক পয়সা দেবো না।

অনিল ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—আচ্ছা, মাসকাবারে যখন নিয়ে আসবে তখন আমি একশো টাকা কেড়ে মাইনে নেবোই নেবো।

অনল শান্ত স্বরে বললে—আজ থেকে নিত্যকার ধরনের মতন টাকা প্রত্যহ খুচরা খুচরা নিয়ে আসব, বাকী টাকা খাজাঞ্চীখানাতেই জমা থাকবে।

অনিল তবুও দমে না গিয়ে বললে—আচ্ছা, তুমি না দাও; তোমাকে যে দিচ্ছে তার কাছ থেকেই আদায় করে' আনব।

অনল এবার ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ব্যগ্র স্বরে বললে—ধরবার অনিল, জ্বীলোকের কাছে গিয়ে মাত্লামি কোরো না। আমার উপর তুমি খা খুশী উপজব কোরো, আমি সহ্য করব; কিন্তু অপরের উপর উপজব আমি কমা করতে পারব না।

অনিল বললে—তবে আমাকে একশো টাকা দেবে বলো।

অনল চূপ করে' কিছুক্ষণ ভেবে বললে—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে বিকাল-বেলা বলব।

অনিল খুশী হয়ে চলে' গেল। অনল পূজা-আহ্নিক করতে বসল। সেদিন সে কাতর হয়ে সাক্ষরনয়নে ভগবানের কাছে অনিলের শুভমতির জন্য দীর্ঘকাল প্রার্থনা করলে।

অনল কাছারী চলে' গেলে অনিল ভাবলে—দাদা টাকা দেয় ভালোই; উপরন্তু বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টা করলে মন্দ কি?

অনিল ছেলেবেলা থেকেই ধনিষ্ঠার স্বামীর সঙ্গে তার বাড়ীতে যেত, ধনিষ্ঠাকে সে বৌদিদি বলে' থাকত; ছেলেবেলার পরিচয়ের অধিকারে এবং বর্তমান ম্যানেজারের ভাই ও গৌরীর পিতা হওয়ার সম্পর্কের জোরে সে অবাধে ধনিষ্ঠার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলে। ধনিষ্ঠা তখন সবেমাত্র পূজার ঘর থেকে অনলকে কাছারীতে আসতে দেখে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর গৌরীও পণ্ডিত মশায়ের কাছে লেখাপড়া শেষ করে' ঘর কাছ থেকে এসেছে, এমন সময় সেখানে অনিল এসে

উপস্থিত হয়ে নেশা-জড়িত স্বরে বললে—কি বৌ-দিদি, ভালো আছ তো?.....

অনিল মাঝে এসে পড়াতে ধনিষ্ঠা স্বামীকে কখনো প্রাণ ভরে' কাছে পায়নি, তার স্বামী অনিল আর খিয়েটার নিয়ে দিবা-রাত্রি উন্মত্ত হয়ে থাকত, ধনিষ্ঠার ভাগ্যে স্বামী-সঙ্গ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল; একত্র ধনিষ্ঠা কখনো অনিলকে স্নানজলের দেখতে পায়নি, অনিলকে দেখলে—এমন কি তার নাম শুনে ধনিষ্ঠার গা জলে' যেত। এই অনিল মধ্যে কিছুদিন অনলের ভাই হয়ে ধনিষ্ঠার কাছে নূতন ভাবে পরিচিত হওয়াতে তার প্রতি ধনিষ্ঠার বিরাগ অনেকখানি হ্রাস হয়ে গিয়েছিল; তার পর গৌরীর পিতা বলে'ও অনিলের স্মৃতিটার তিক্ততা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার অনিল অনলের সাক্ষাৎ মনস্তাপের রূপ ধরে' এসে ধুমকেতুর মতন আবির্ভূত হয়েছে, এই অনিলের জন্য অনল সর্বস্বাস্ত হ'ল বারবার এবং অনলের অভাব মোচনের জন্য ধনিষ্ঠাকে কী ভীষণ কৃচ্ছসাধনই না করতে হয়েছে এবং এবার আর অভাব মোচন করা সম্ভবপরও হবে না—ধনিষ্ঠা অনলকে কিছু এমনি দান করলে সে নেবে না, ত্রস্তের চলে দান করলেও সে সেই সামগ্রী নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিতরণ করে' ফেলবে, এবং অনল যেহেতু এবার সর্বস্বাস্ত হয়েছে তাতে তাকে কিছু দেওয়াও ধনিষ্ঠার উচিত হবে না, ভাইয়ের চুরি আর মদ খাওয়া নিবারণ করবার জন্যই না অনল সর্বস্বাস্ত হওয়ার বিষয় ছুঃখ বরণ করেছে,—এইসব ভেবে ধনিষ্ঠার মন অনিলের উপর আবার বিরূপ হয়ে উঠেছিল; এখন তাকে মত্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে অসম্মান-ব্যঙ্গক ব্যঙ্গতরা স্বরে কথা বলতে শুনে ধনিষ্ঠার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হ'ল। সে অনিলের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বিরক্তি বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গৌরী তার জনকের চোখ-মুণের রক্তিমাজা ও কুশী বিকৃতি এবং অবশ অকড়কী দেখেই ভয় পেয়ে গেল; ধনিষ্ঠার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত ধনিষ্ঠাকে যে তার ছুঁতে নেই সেই নিষেধ ভুলে গিয়ে গৌরী ভীতিপাংশুস মুখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধনিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরলে। ধনিষ্ঠা

অনিলের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই গৌরীকে কোলে তুলে নিলে ; গৌরী কথঞ্চিৎ আশ্রয় হয়ে বাঁচল।

অনিল ধনিষ্ঠার বিরক্তি ও গৌরীর ভয়ের দিকে লক্ষ্য না করেই নিজের কথার পিঠেই কথা বলে' চলল—আগে তুমি ছিলে আমার পাতানো বৌদিদি, এখন আমার সত্যিকারের বৌদিদি হয়ে গেছ ! দিব্যি আছ বৌদিদি !

ধনিষ্ঠার চোখ থেকে আশ্রয় ঠিকরে গেল ; সে কৰ্কশ গভীর স্বরে বললে—দেখো অনিল-ঠাকুরপো, মুখ সামলে কথা বোলো, মাতলামি করবার জায়গা এখানে নয় । তুমি যাও.....এখনি চলে' যাও.....না, তোমার কোনো কথা আমি শুনব না.....তুমি ম্যানেজার-বাবুর ভাই, গৌরীর বাবা বলে' এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ, নইলে.....

অনিল ধনিষ্ঠার কড়া মেজাজ ও দৃঢ় স্বভাবের পরিচয় বিলক্ষণই জানত ; তাই সে মস্ত অবস্থায় মনের প্রধান কথাটা ব্যক্ত করে' ফেলেই ধনিষ্ঠাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে বিশেষ দমে' গিয়েছিল ; সে মনে করেছিল ধনিষ্ঠা তার কথাটাকে ঠাকুরপোর রসিকতা বলে'ই মনে করে' নেবে । ধনিষ্ঠা কথার মাঝখানে হঠাৎ খেমে যেতেই অনিল ধনিষ্ঠার মুখের শেষ কথা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—নইলে কি ? আমাকে দারোগ্যান দিয়ে বের করে' দিতে ?

ধনিষ্ঠা কড়া স্বরে বললে—আমি তোমার একটা কথাও শুনব না, তুমি একশি চলে' যাও, আর কখনো আমার বাড়ীর ভিতরে আসবে না বলে' দিচ্ছি ।

এই বলে'ই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়েই ঠিক পিছনেই তার পূজার ঘরে চুকে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে ।

অনিল ভয় ও লজ্জা পেয়ে নম্র স্বরে বললে—বৌদিদি, আমার একটা কথা শোনো... ..

ধনিষ্ঠা বহু ঘরের ভিতর থেকে অনিলের কথা গ্রাহ্য না করে' মাধবীকে ডেকে বললে—মাধী, পাঁড়ে আর তেওয়ারীকে বল ছোটবাবুকে সঙ্গে করে' বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে ।

অনিল এবার বিরক্ত হয়ে বলে' উঠল—হস্ ! সতীপনা দেখে আর বাঁচিনে ! তবু যদি দেশময়

টিচিক্কার না পড়ে' যেত ! পেয়াদার ভয় দেখিয়ে তো আর সত্যিকে লুকিয়ে রাখা যায় না !.....

অনিল বাড়ীতে ঢুকতেই অন্ধরের দেউড়ির দরওয়ান পাঁড়ে আর তেওয়ারী একটু ব্যস্ত হয়েই ছিল ; এখন রাণীজীর তীক্ষ্ণ কর্ণের হুকুম তাঁদের কানে যেতেই তারা বাড়ীর মধ্যে আসুঁছিল ; আবার অল্প দিকে অনেক দাসী চাকর ধনিষ্ঠার দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থেকে মাতালের কাণ্ড দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তারাও রাণীমার হুকুম শোনুবার পাঁড়ে ও তেওয়ারীকে ডাকতে দৌড়ে ছিল, মাঝপথে তাদের উভয় পক্ষের দেখা হয়ে গেল । মাধবী অনিলের সামনে দিয়ে কেমন করে' দারোগ্যানদের ডাকতে যাবে ভেবে ইতস্ততঃ করছিল ; মাধবী এক পা নড়বার আগেই দেখলে পাঁড়ে আর তেওয়ারী সিঁড়িতে উঠছে । সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে অনিল মুখ ফিরিয়েই যখন দেখলে দুই বিশালবণু ভোজপুরী কোয়ান উপরে উঠে আসুঁছে, তখন তার নেশা অনেকখানি ছুটে গেল, মনটাও প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল ; সে মনে মনে ধনিষ্ঠার সঙ্গে শালী-সম্পর্ক পাতিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে' গেল ; পাঁড়ে আর তেওয়ারীও মাঝ সিঁড়িতে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবাবুকে অগ্রসর করে' নিয়ে নেমে চলে' গেল ।

ক্ষণকাল সব চূপচাপ । ধনিষ্ঠা ঘরের ভিতর বহু থেকে বুঝতে পারছিল না অনিল গেছে,না এখনো আছে । সে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' পাষাণমূর্ত্তির মতন শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

বিস্ময়বিমুক্ততা থেকে সচেতন হয়ে মাধবী ধনিষ্ঠাকে ডেকে বললে—মা, দরজা খুলে বেরিয়ে এসো, কাঁকা বাবু চলে' গেছে ।

মাধবীর কথা শুনে সাহস পেয়ে গৌরীরও কথা ফুটল, সে ধনিষ্ঠাকে বললে—পাপা তোমাকে মারতে এসেছিল মা ? আমার সেই আগের মাকেও এমনি করে' মারত, আমাকেও মারত মা, শুধু শুধু আমরা কোনো দোষ করতাম না, তবু মারত !

ধনিষ্ঠা গৌরীর কথার উত্তরেও কোনো কথা বলতে পারলে না, কেবল তাকে আরো নিবিড় করে' বুকে চেপে

ধ্বলে; সে দরজা খুলেও বাহির হতে পারছিল না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে তার লজ্জা করছিল—অনিলের কথা তো তার চাকর দাসীরা শুনেছে, তারা কী মনে করছে! ছি ছি! কী দুর্ভাগ্যের লজ্জা! এই যে মিথ্যা কুৎসার জাল ক্রমশঃ তাকে জড়িয়ে ধরছে এর থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি?

মাধবী আবার ব্যথিত মিনতির স্বরে বললে—মা, তুমি বেরিয়ে এসো, আবার তো নাইতে-টাইতে হবে; ভাত-ট্টা যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

গৌরী ধনিষ্ঠার বকের মতো থেকে তার মুখ দেখবার চেষ্টায় মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে বললে—মা, আমি তোমাকে ছুঁয়ে দিয়েছি বলে' তোমাকে আবার নাইতে হবে? আমাকে নিয়ে তো তুমি পূজোর ঘরেও এসেছ! আমি তো নিজে আসিনি মা। এ সব জিনিস ফেলে দিতে হবে?

শিশুর মুখের এই প্রশ্ন শুনে ধনিষ্ঠার বুক ফেটে যেতে চাচ্ছিল; এ কথার সে কী উত্তর দেবে, এই শিশুকে কী বলে' সে সাহস দিতে পারে?

সে নীরবে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ধনিষ্ঠার মন এই চুঁচুতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, অনিল আজ যে মিথ্যা অপবাদ তাকে দিয়ে গেল, মদের ঘোঁকে যদি সেই অপবাদ তার দাদার সামনে ব্যক্ত করে, তা হ'লে সেটা কী বিষম লজ্জার কারণ হবে! এর আগে সাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী ও জানো বামনী তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করেছে; কিন্তু তারা দুজনেই স্ত্রীলোক, তাদের কুৎসা অনলের কানে পৌঁছাবার সম্ভাবনা কম ছিল এবং কোনো পুরুষ সহসা সাহস করে' জমিদারশী ও ম্যানেজারের নামে যে কুৎসা রটাতে এ সম্ভাবনাও বেশী ছিল না; তাই ধনিষ্ঠা আগে এতটা চিন্তাকুল হয়নি। কিন্তু অনিল একে অনলের ভাই, চিরকাল স্নেহের প্রার্থ পেয়ে এসেছে, তাতে আবার মাতাল; সে অন্যায়সেই অকথা কুৎসা ব্যক্ত করে' ফেলতে পারবে। এই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠার মস্তর উদ্ভিন্ন ও লজ্জাকুণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। সে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে না; তার চাকর-দাসীর কাছে পর্যন্ত মুখ দেখাতে সে সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল।

ক্রমশঃ

বাগ্মা-আহ্বান

শ্রী শ্রীধর শ্যামল

এস এস ভয়ঙ্কর—হে প্রলয়ঙ্কর,—
ভালে জালি' অনল শকার,
বিশ্বধ্বংসী মহাহবে স্তর চরাচর—
হান' হান' স্বকার স্বকার!

শত-চক্র-বর্ধরিত ধ্বংসয়ী রথে পরজি উঠিছ মহারোবে,
দীর্ঘ ভব জটাতলে স্ক্রু যত ভুজ্জিনী মুহমূহ ফৌসে,
থেকে থেকে অষ্টহাসে হাহারবে ঝটিকায় ঝাপটিছ পাখা,
উপাড়িছ তরুশ্রেণী নৃত্যভঙ্গে নত ক'রে সবাকার শাখা;

দিকে দিকে প্রসারিত স্নগভীর মহিমা বিরাট—

এস হে সম্রাট;—

আস নাই আজ চুপে চুপে
আসিয়াছ ওগো রক্ত মহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে।

মহাত্মক গিরিশ্রেণী কেনকল্প তরঙ্গ উত্তাল,
গহন, কাঙ্ক্ষার, বন— অস্তভেদী অরণ্য বিশাল,
প্রলয়ের তুর্ধারবে—'অর্জর কয়েছ সবে
কে তুমি ভয়াল?

কতু তুমি ধ্যেয়ে যাও বালুপূর্ণ মরুত্ব'র 'পরে,
মস্ত হ'য়ে নৃত্য কর জনহীন বিরাট প্রান্তরে—
মহাব্যোম হ'তে বেগে ফেটে পড় বজ্ররূপ ধরি',
আসি' নাশি' ফেল যেন স্তম্ভিময়ী শ্রাবণ-শর্করী ;
কতু কতু হাসে—

নিঃশেষে নাশিতে চাও মহাবিশ্বে স্তম্ভীত্র নিখাসে ।

আজি আস নাই তুমি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী রাতে,
বিকশিত বিভানের বিহসিত বাসর-সভাতে—
সম্বর্পণে ধীরপদে স্মিতহাসে স্তম্ভমদালসে—
যাওনি মন্থরপতি কুম্ভকান্তি করবীর পাশে ;
আস নাই আজি চূপে চূপে ;
আসিয়াছ ওগো কত মহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে ।

হান' হান' বজ্রবীণা—ভাঙো মুহূমান মায়া-বেড়ী,
সূচীভেদ্য আধারের নগ্নদেহ জ্বলে ফেল ছিঁড়ি,
উড়াইয়া জীর্ণ পত্র, টুটি' পাত্র শীর্ণ মন্দিরের
মুক্ত কর এ বিশ্বের মুমূর্ষু ও দীন বন্দীদের ।
দিকে দিকে প্রসারিত স্তম্ভীত্র মহিমা বিরাট,—
এস হে সম্রাট ।

ঘরে ঘরে কতুঘর বহুচোখে কে ক্রন্দন করে ?
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও পেবি' তব বিশাল ধর্পরে,
জনশূন্য দীর্ঘ পথ দেখ তার নাভিখাস ওঠে,
ভগ্ননৌড় বিহ্বলম ফুকায়িছে জীর্ণ বাপীতটে ।

শক্তিচা চকিতা নারী—শূন্য-আধি কেন কতু-মন ?—
মঞ্জল বঞ্জল-কুলে ভয়ে মরে নৃপূর-নিষ্কণ ।

ওগো ঘরে ঘরে
বহু-হিয়া নত-আধি কে ক্রন্দন করে ?

মুক্ত করি' দিহু ঘর—এস এস হে প্রলয়ধর,—
নগ্নবুকে বাঁধ নীড়—বহুহারা ওগো ভয়ধর,—
অগ্নিগিরি-গর্ভ হ'তে টেনে আন' ঘন ঘূর্ণীবায়ু—
মহামন্ত্রে ছিঁড়ে ফেল চন্দ্র তারা গ্রহ কেতু রাহু—
ধরি' দিগন্তের বেণী—হিমশৃঙ্গ অটল অস্ত্রির
ঘুরাইয়া ফেলে দাও—মহাতার হর ধরিজীর ।

হে প্রলয়ধর,—
ভয়ধর বেশে তুমি হে চিরসুন্দর ।

হে দেবতা,—
ওগো বহু, ওগো সখা, ওগো প্রিয় ভ্রাতা—
ওই তব ক্রুদ্ধ রূপ ওই বজ্রা বড় ভালবাসি,—
মোরে কর তব বহু-বাণী ।

করে ধরি' লয়ে চল দিকে দিকে দেশে দেশান্তরে,
কতু বারিধির বুকে, দিশাহীন বিশাল প্রান্তরে,
ঘন স্বার্থবিভাড়িত ঈর্ষ্যানীল বিপদের বুকে,
কুটিল আবর্জিতলে—নাচায়ে নিবিড় মহাস্বখে—
কোথা কুম্ভটিকাবৃত স্তম্ভীত্র অতল পাতালে
স্থণ্য কারা পড়ে' আছে জাগাব তাদের মস্ততালে,
বহু ও মন্দির হতে মৃত জড় দেবতারে ধরি
শূন্তে-শূন্তে ঘুরাইয়া মহাশূন্তে কেলিব আছড়ি',

ক্রুদ্ধরূপ বড় ভালবাসি,
বাজিব দুর্জয় তালে দিকে দিকে তব বহুবাণী ।
আস নাই আজি চূপে চূপে,—
আসিয়াছ ওগো কত মহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে ।

মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ভাববস্তু

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় নাট্যকাবগণের মধ্যে মেটারলিঙ্কের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং নব নাট্য রীতির প্রবর্তক হিসাবেও যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা ইউরোপীয় নাটকের যাহারা পাঠক তাঁহাদের অবদিত নাই। বর্তমান প্রবন্ধে মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির কোনোরূপ বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সমগ্র মেটারলিঙ্কীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া যে ভাববস্তুটির বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

ভাবজীবন ও নাট্যসৃষ্টি

মেটারলিঙ্কীয় নাটকের সহিত তাঁহার ভাবজীবনের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, মেটারলিঙ্কের গভীরতর জীবনের চিন্তা ও অনুভূতি যে তাঁহার নাটকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাবধারার অনুসরণ করিলে স্পষ্টই চোখে পড়ে। যদিও এখানে অপর কাহারও কথা বলার একান্ত প্রয়োজন নাই, তবু সত্যাকার সাহিত্যমাত্রই যে শিল্পীর গভীর জীবনের মধ্যস্থল হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে তাহা শেলী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাতেও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মেটারলিঙ্কীয় নাটকের আলোচনা করিতে হইলে তাই প্রথমতঃ আমাদের কাছে তাঁহার এই ভাবজীবনের বিকাশের সহিত তাঁহার নাট্য-সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে অনুভূতি, জীবনের প্রতি যে দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার যোগটি দেখাইতে হইবে।

নাটকের ভাব ও রূপ

কিন্তু নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনার মধ্যে তাহার রূপের কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ভাব ও রূপ, এ দুটিকে চিন্তার দ্বারা যতই পৃথক করিয়া দেখিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন, জীবনের প্রকাশ-ক্ষেত্রে রূপ এবং ভাব একেবারে অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভাবের বিশেষত্বই রূপকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া

তোলে। এইজন্য আমাদের কাছে মেটারলিঙ্কীয় নাটকের বিশেষ রূপটিকেও দেখার এবং তাহার সহিত তাঁহার জীবনের নিগূঢ় যোগ কোথায় তাহা বোঝার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কবির সৃষ্টি ও তাঁহার মতামত

নাটক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিমা স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয় যে, নাটক-সম্বন্ধে নাট্যকার স্বয়ং কি মতামত পোষণ করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? কিন্তু এই প্রশ্নটি স্বাভাবিক হইলেও কোনো কবির মতামতের দ্বারা যে তাঁহার সৃষ্টিকে বিশেষ বোঝা নাও খাইতে পারে, এ-কথাটি ভুলিয়া গেলে অনেকস্থলেই আমাদের ঠিকিতে হইবে। কবি তাঁহার কাব্যসৃষ্টির অর্থটি যে, নিজে নাও জানিতে পারেন, এ-কথাটি শুনিতে যতই অসম্ভব লাগুক না কেন, কথাটি সত্য। ইহার কারণ এই যে আমাদের জীবন-দেবতাই বলি আর আমাদের গোপন-মগ্নজীবনই বলি, সেটি নিত্যকালই আমাদের নিকট অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া আমাদের জীবনকে অর্থাৎ যাহাকে আমাদের জীবন বলিয়া আমরা জানি তাহাকে—সৃষ্টি করিতেছে; সে-সৃষ্টির অর্থ আমাদের গোচর নহে। শুধু কখনও-কখনও হয়ত বা দু-একটা অনুমানমাত্র আমরা করিতে পারি, কিন্তু তাহা যে সত্য হইবেই তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। বর্তমান মনুষ্যত্বের দিক দিয়া এই সত্যটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা খাইতে পারে।

আমাদের জীবনের অসাম আশা আকাঙ্ক্ষার উৎসটি আমাদের চেতনার মধ্যে উৎসারিত নহে। আমাদের মগ্ন চেতনার গোপনস্তহাভলে আমাদের অনন্ত জীবনখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার যতটুকু আমাদের চেতনার উন্মুক্ত প্রান্তরে বহিয়া আসিতেছে, তাহা অতি সামান্য। সত্যাকার শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর এই গোপন-চেতনার মধ্যে

হইয়া থাকে বলিয়াই তাহার মধ্যে গোপন চেতনার সব-
খানি রহস্য মূর্ত হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু মতামতবস্তুর
ধ্বংস সীমাবদ্ধ, যতটুকু দেখা যাইতেছে বা গিয়াছে ততটুকু
হইতেই আমরা একটা মতামত গড়িয়া লই এবং ধরিয়া
লই যে এই মতামত জীবনের অসীম অপ্রকাশের ক্ষেত্রেও
তেমনই সত্য থাকিবে। অথচ আমাদের গভীরতর
জীবনকে তএমন করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিবার কোনো
উপায় নাই। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিগুলি সহস্র মনের সহস্র মতামতের মধ্য
দিয়া সমালোচিত হওয়ার পরও, আজও তেমনি নূতন,
তেমনি অসীম হইয়া আছে। তাহার কারণ মন-বস্তুটা
বাতায়নের মতন। তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বকে দেখিয়া
আমরা যতই পর্যাপ্ত মনে করি না কেন, বিশ্বজীবন
বাতায়নের দেখার মধ্যে কিছুতেই সবখানি সম্পূর্ণ হইয়া
ধরা দিতে পারে না। এইজন্যই এমনটি প্রায়ই দেখা
যায় যে, কবির মতামত 'সেকলে' হইয়া গেলেও তাঁহার
কাব্য চিরকালই নবীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
থাকে।

তবে মেটারলিঙ্ক, শেলি, রবীন্দ্রনাথ,—ইহাদের
মতামত-সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। একাধারে শিল্পী
এবং চিন্তাশীল দার্শনিক বড়-একটা দেখা যায় না। তাহার
কারণ একের ক্ষেত্র অপরের ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু
রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক এবং শেলির শিল্প সখস্বীয় উজ্জ্বল
একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইহাদের শিল্প জীবনের অমু-
ত্বুতি হইতে বিচারের দ্বারা ইহারা মতবাদ গড়িবার চেষ্টা
করিয়াছেন; শুধুমাত্র দার্শনিকের এ স্বযোগটি নাই।
তাহাকে চিরকালই একটু বাহিরে থাকিয়া শিল্পসৃষ্টিকে
বিচারবিবেচনা করিয়া মতবাদ গড়িতে হয়। এইজন্যই
প্রথমতঃ আমরা নাটক-সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের মতটি কি
তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মেটারলিঙ্কের মত

(ক) "দীনের সম্পদে"

নাটক-সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের সর্বপ্রথম চিন্তা তাঁহার
'দীনের সম্পদেই' পাই। 'দৈনন্দিন জীবনের ট্রাজেডি'

প্রবন্ধে তিনি নাটক-সম্বন্ধে যে-কয়টি মন্তব্য প্রকাশ করেন
তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নাটক-সম্বন্ধে সেই সময়কার
ধারণাটি জানিতে পারি। 'দীনের-সম্পদ' যে মেটারলিঙ্কের
জীবনের কোন্ মুহূর্তে রচিত হইয়াছিল, সেই কথাটি
আমাদিগকে এখানে বিস্তৃত হইলে চলিবে না। 'দীনের
সম্পদ' বইখানি (১৮৯৬) মেটারলিঙ্কের "নৈরাশ্য, ভীতি
ও বিষাদ-যুক্ত জীবনের একটি অপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসিত
প্রভাসসঙ্গীত" ইহা বর্ণে-বর্ণে সত্য মনে রাখিতে হইবে।
মনে রাখিতে হইবে, ইহার পূর্বে মেটারলিঙ্ক তাঁহার
সম্ব্যাসঙ্গীত গাহিয়াছেন; সেই বিষাদ সঙ্গীতের 'রেশ
দীনের সম্পদে' কোথাও-কোথাও থাকিলেও তাহা তেমন
ধরা পড়ে না। উক্ত প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক বলিতে চাহিয়া-
ছেন যে, নাটক জীবনের কোন ঘটনার আশ্রয়ে জীবনের
নিগূঢ়তম রহস্যকথাটিকে ব্যক্ত করিবে, জীবনের দৈনন্দিন
ব্যাপারের মধ্যে জীবনের মহিমা এবং সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ
করিয়া দেখাইবে, জীবন যে কি বিশাল, কি রহস্যপূর্ণ
এবং মহিমাময় তাহা দেখাইবে। তিনি আরো বলিতে
চাহিয়াছেন যে, জীবনের সত্যকার 'ট্রাজেডি' (কারুণ্য)
বাস্তবিক আমাদের আকস্মিক হৃৎ-বিগ্নবের প্রচণ্ডতার
মধ্যে নয়; সত্যকার ট্রাজেডির সন্ধান পাইতে হইলে,
অন্তরাত্মার চিরস্তন (স্বতরাং দৈনন্দিন) ট্রাজেডি কোথায়
তাহা বুঝিতে হইলে এইসব আকস্মিক ঝড়াকে বাদ দিয়া
জীবনের দিকে তাকাইতে হইবে। অর্থাৎ কোলাহল
ছাড়িয়া মানবাত্মাকে তাহার নীরবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ
করিতে হইবে। অন্তরাত্মার গভীরতর সত্তাটিকে
দেখাইতে হইলে তাহাকে বহির্জীবনের কর্মচাকল্যের
মধ্যে দেখানো যাইবে না। স্বতরাং মেটারলিঙ্কের মতে
প্রকৃত নাটকে বহির্জীবনের ঘটনাবহুল চাকল্যকে বর্জন
করিতে হইবে এবং নীরবতার মধ্য দিয়াই অন্তরাত্মার সত্য
ঘটনাকে প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাই মেটারলিঙ্কীয়
গতি-বর্জিত থিয়েটারের (Static Theatre) মূল কথা।
নাটকের মধ্যে—যেখানে বার্তালাপ ভিন্ন কোনো-কিছুর
প্রকাশই অসম্ভব—মেটারলিঙ্ক নীরবতাকে কেন যে এত
বড় স্থান দিয়াছেন তাহা পূরাপুরি বুঝিতে হইলে
আমাদিগকে এইখানে তাঁহার 'নীরবতা' প্রবন্ধের কথাগুলি

মনে রাখিতে হইবে। “দীনের সম্পদে”র আলোচনার আমরা বিশেষভাবে তাহার কথা বলিয়াছি।

স্থিতি নাট্য

মেটারলিঙ্কীয় এই স্থিতি-নাট্যের(Static Drama)পরি-
কল্পনার কথা একটু বিস্তার করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যিক।
মেটারলিঙ্ক গ্রীক নাটকের মধ্যেই তাহার এই আদর্শটিকে
কাণ্ডে পরিণত দেখিয়াছেন। গ্রীক নাটকের মধ্যে
বাহিরের ঘটনা যেমন একেবারেই নাই, তেমনি অন্তরের
মাঝেও ঘটনাবাহুল্য নাই। এই স্থিতিনাট্যের লক্ষ্য
জীবনের একটা গতি বা পরিণতি দেখানো নহে, সেইজন্যই
ইহার মধ্যে চরিত্রবিকাশ বস্তুটা নাই। গ্রীক নাট্যের
লক্ষ্য ছিল জীবনের মাঝখানে অলঙ্ঘ্য নিয়মটিকে উদ্ঘাটিত
করিয়া দেখানো। গ্রীক নাটকের মধ্যে জীবনপ্রবাহ দেখি-
না, সেখানে নিয়মটির সম্মুখে স্তব্ধ জীবনের একখানি মন্দির
মূর্তিমাত্র দেখি। এই স্থিতি নাট্যই মেটারলিঙ্কীয় নব-
নাট্য : গ্রীকনাট্য হইতে ইহার পার্থক্য শুধু উদ্দেশ্যের
মাঝে। গ্রীকনাটক দেখাইয়াছে জীবনের উপর নিয়মটির
অলঙ্ঘনীয় প্রভাবটিকে, কিন্তু মেটারলিঙ্কীয় মতে নব-
নাটকের উদ্দেশ্য হইবে জীবনের পশ্চাতে যে অদৃষ্টরহস্য
রহিয়াছে তাহাকেই মূর্ত্ত করিয়া দেখানো। এইজন্য এই
নাটক গ্রীক নাটকের মতনই জীবনকে তাহার গতিময়
বিচিত্র বিকাশের মধ্যে দেখিবার চেষ্টা না করিয়া একটি-
মাত্র স্তরকে, একটিমাত্র মনোভাবকে (mood) মূর্ত্ত করিয়া
জীবনকে নিশ্চল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতে থাকে।
যে অজ্ঞেয় এবং অপরিমিত অদৃষ্ট রহস্য মানবজীবনকে
অনুরাল হইতে নিত্যকাল চালনা করিয়া আসিতেছে,
মেটারলিঙ্কীয় স্থিতিনাট্য তাহাকেই একটা রূপ দিবার
চূঃসাপ্য চেষ্টা করিয়াছে।

রহস্য ও নব নাটক

মানবজীবন-ঘেরা এই অজ্ঞাত বিপুল রহস্যই নব-
নাটকের বিষয়বস্তু হওয়ার ফলে নাট্যপদ্ধতির মধ্যেও
পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী হইয়া উঠিয়াছে। রহস্য বস্তুটা
হইতেছে অঙ্ককারের, তাহাকে কখনও আলোকে আনিয়া
দেখানো যাইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিচরিত্র বস্তুটা এই
রহস্য-বিরোধী, কারণ ব্যক্তি হইতেছে তাহাই যাহা

ব্যক্তি হইয়াছে, সম্পষ্ট হইয়াছে : দিবালোকের মধ্যে,
জ্ঞানের মধ্যে তাহার সীমারেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে
বলিয়াই সে ব্যক্তি। এইজন্যই রহস্যকে একটা ব্যক্তির
রূপ দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা এই নব নাটক করিতে
পারে নাই ; তাহাকে বাধ্য হইয়া একটা আবহাওয়ার
(dramatic atmosphere) সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।
কারণ জীবনের বিপুল রহস্য-বস্তুটি মানবাত্মার নিকট
একটা ব্যক্তি হইয়া ধরা দিতে পারে না ; একটা আব-
হাওয়ার মতন আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত একটা অব্যক্ত, আসন্ন-
ভাবের মতন তাহাকে অনুভব করা যায় মাত্র। রহস্যের
এই আবহাওয়া প্রকাশ করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক তাই
নববার্ত্তালাপ-ভঙ্গীর প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। এই
বার্ত্তালাপ-রীতির কথা বারাক্ষরে আলোচনা করিবার
ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু মেটারলিঙ্ক তাহার “দীনের
সম্পদে” নাটক-সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন,
তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

(খ) “গোপন-মন্দিরে”

“দীনের সম্পদে” প্রচারিত এই মতবাদ অর্চিরেই
পরিবর্তিত হইয়া যায়। ‘গোপন-মন্দিরে’ (১৯০২)
‘রহস্য বিবর্তন’ প্রবন্ধে রহস্যালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি
নাটকের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ধার্মিকতা মত প্রকাশ করেন।
ইহার মধ্যে তিনি মানব-জীবনকেই নাটকের বিষয়-
বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নীতি-রহস্য-সম্বন্ধে
আলোচনা করিয়া মেটারলিঙ্ক এই সিদ্ধান্ত করেন যে,
মানবজীবনের যাহা-কিছু সংগ্রাম তাহা হইতেছে
নৈতিক এবং এই নৈতিক জগৎ বাহিরের কোনো
শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানবের অন্তরাত্মাই
এই নীতিবোধের প্রতিষ্ঠাতৃমি। মোট কথা অদৃষ্ট-
শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেটারলিঙ্ক-এখানে স্বীকার করিতে
চাহেন নাই। তাই তিনি বর্ত্তমান যুগের নাটককে
মনস্তত্ত্ববিপ্লয়মূলক হইতে হইবে বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন। কারণ এই নাটককে বর্ত্তমান জীবন দেখাইতে
হইবে এবং বর্ত্তমান জীবনে একদিক্ দিয়া সকোঙ্কীয়
নাটকের নিয়মটির নিষ্ঠুর বিধান যেমন স্বীকার্য্য নয়, তেমনি
বহিঃজগতে কোনো নৈতিক শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার্য্য

নয়। যাহা কিছু সংগ্রাম তাহা মানবের অস্তরাস্তর মধ্যে তাহার অন্তরতম নীতি বোধের মধ্যে। যদিও দুর্বল মানবচরিত্র লইয়াও এই শ্রেণীর নাটক হইতে পারে, তবু মেটারলিকের মতে বর্তমান যুগনাট্য সবল জ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানী মানবের, অজ্ঞাত শক্তিপুঞ্জের সহিত সংগ্রামে যে অনিবার্য আশঙ্কি ও বিপদ তাহাই দেপাইবার চেষ্টা করিবে।

(গ) 'রহস্যোদ্যানে'

রহস্যোদ্যানের (১৯০৪) 'আধুনিক নাটক' প্রবন্ধে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া মেটারলিক্ একটি বিস্তৃত আলোচনা করেন। আধুনিক নাট্যের প্রকৃতির মধ্যে মেটারলিক্ চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন ; দেখিতে পাই নাটকে বাহ্য ঘটনার ভ্রাস, প্রচণ্ড ঘটনা সৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা, জীবনের ও নৈতিক সমস্যার গভীরতর আলোচনা এবং বাস্তব সৌন্দর্যের সন্ধান। বাহ্য ঘটনাবল্ক্কনের দিকে আধুনিক নাটকের গতি দেখা গেলেও মেটারলিক্ তাঁহার প্রথমকার প্রচারিত স্থিতি-নাট্যের সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গভীরতর চেতনায় প্রবেশ করা এবং তাহার সত্যটিকে উন্মোচিত করা, দার্শনিক, নীতিকার ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও গীতি-কবির কর্তব্য হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের নয়। কারণ রক্তমঞ্জের সর্বপ্রধান প্রয়োজনই বাহ্য জগতের ঘটনা, ইহাকে কিছুতেই বর্জন করা চলে না।

মেটারলিক্ বর্তমান যুগনাট্যের আলোচনা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, যে আধুনিক নাটক এখনও জীবনে সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ এখনও সে জীবনের রহস্যকে বর্তমান যুগের জীবনের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। এইজন্যই বর্তমান যুগনাট্য কতকগুলি নৈতিক সমস্যানাট্য ছাড়া আর-কিছুরই আলোচনা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আধুনিক নাট্যের বিষয়বস্তু

চিরকালই মানব জীবনের মাঝে ঈর্ষা-শেষ মারামারি-কাটাকাটির সংগ্রামই একমাত্র-সংগ্রাম হইয়া থাকিবে, মানবজীবনে ইহার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কোনো

সংগ্রাম হইবে না, একথা মেটারলিক্ স্বীকার করেন নাই। মানবচেতনা যে ধীরে-ধীরে জ্ঞানে ও প্রেমে সবল হইয়া উঠিতেছে এবং এইজন্যই মানবজীবনের সংগ্রামও যে উচ্চতর এবং নবতর রূপ ধারণ করিবে মেটারলিক্ এই সম্ভাবনাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আধুনিক যুগের সত্য নাট্যসৃষ্টি মানবজীবনের নৈতিক দুর্বলতার সংগ্রাম দেখাইবে না ; আধুনিক নাটক মানব-অস্তরের কল্পনা, মৈত্রী ও জ্ঞানপরতার সহিত স্বার্থপরতা, অহমিকা ও অজ্ঞানের সজ্জাত হইতেই উদ্ধৃত হইবে।

ট্র্যাঞ্জেলির সীমা

আধুনিক নাটকের প্রকৃতি পর্যালোচনা উপলক্ষ্যে মেটারলিক্ ট্র্যাঞ্জেলির সম্ভাব্যতার সীমা-সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। মানব-চেতনায় যতক্ষণ সজ্জাত আছে, সংগ্রাম আছে ততক্ষণই সেই জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হইবার দাবি করিতে পারে। কিন্তু জীবনের বিকাশের কথাটি ভাবিয়া দেখিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশ যতই বেশী হইতে থাকিবে ততই সজ্জাতের সম্ভাবনাও কম হইতে থাকিবে।

মেটারলিক্‌র নাট্যের বিষয়বস্তু

(ক) ১৮৮৬—৯৪

মেটারলিক্ কার্যতঃ তাঁহার নাটকসৃষ্টির মাঝে নাটকীয় বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে কি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। বলিয়াছি যে, "দীনের সম্পদে" মেটারলিক্ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রথম জীবনের মত নহে। দীনের সম্পদের পূর্বেকার আটখানি নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই আমরা তাঁহার নাটকীয় মতবাদটি আবিষ্কার করিতে পারিব। উক্ত নাটক-কল্পখানির সঙ্গে Serres Chaudes এর কবিতায় (১৮৮৬) প্রকাশিত জীবনানুভূতির কথাও আমরা একে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মেটারলিক্‌র যৌবন

যদিও উক্ত কয়েকখানি নাটক ছাড়া মেটারলিক্‌র



প্রতিহাসা



নিগ্রো

এবাসী থেম, কলিকাতা ।

[রুবেন্স অঙ্কিত

যৌবনকালের কথা আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, তবু তাঁহার উপর সেই সময়কার ঘেন্টের (Ghent) পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জেসুট কলেজের আনন্দহীন কঠোর শিক্ষার প্রভাব যে বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই তাহা নিশ্চিত। যৌবনের সমস্ত শক্তি যেন অবরুদ্ধ হইয়া মেটারলিকের মধ্যে পাক বাইতেছিল এবং খুব সম্ভব তাহারই ফলে তাঁহার মধ্যে বিষাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। যৌবনের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি কোনো কারণে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, যদি সে তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার ফলে যে মানসিক ও দৈহিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়, আজকালকার নবমনস্তত্ত্বের পণ্ডিতগণ (Psycho-analysts) তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন। এই মানসিক ব্যাধির নিরূপণ অসহায় অবস্থার মূল কারণ জীবনীশক্তির অবরুদ্ধতা ("Repression") গ্যাটে, শেলি, রবীন্দ্রনাথ, এমিল ভেরহেরেন, মেটারলিক্ ইহাদের সকলকেই নৈরাশ্র ও বিষাদের এবং জীবনের প্রতি আশাহীন বিশ্বাসের ব্যথাময় অধ্যায় পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। যৌবনসময়গমে প্রায় সকলকেই যে কিছু-না-কিছু পরিমাণে এই হৃদয়-অরণ্যের অন্ধকারে কাল কাটাইতে হয় এবং বিশেষভাবে ভাবপ্রধান (sensitive) প্রকৃতি যাহাদের, তাঁহাদিগকে যে যৌবনকালটা অনেক সময়ই নৈরাশ্রমগ্ন হইয়া কাটাইতে হয় নবমনস্তত্ত্ববিদেরা এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক নূতন কথাই বলিয়াছেন। এখানে তাহার বিস্তৃত কোনো আলোচনাই সম্ভব নহে। তবে মেটারলিকের জীবনের ভাবধারাটিকে যাহারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট নবমনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্তটি যে কতখানি সত্য তাহা সহজেই অনুভূত হইবে *।

যৌবনযুগের ভাববস্তু—নিয়তি-বোধ :

মেটারলিকের এই যৌবনযুগের (১৮০৬-১৯) সর্ব

* এইসম্পর্কে কোভুংসী পাঠককে ক্রেডের শির এবং বহি-বিমুখতা, Art and Introversion সম্বন্ধে বক্তব্য পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

প্রথম কথাই হইতেছে নির্দিষ্ট, ভাষণ, অনতিক্রম্য নিয়তির বোধ। এই যুগের রচনার সর্বত্রই তাই মেটারলিকের লক্ষ্য এই নিয়তিকে দেখানো। যুহা যেন সর্গনিবে তাহার ভীষণ অদৃশ্যনঃস্থ! মেলিয়া অসহায়, শাক্তীন মানবাত্মার ত্রিটি চাপিয়া ধরিবার জগৎ পং পরিচয় আছে, তাহার নিকট আপনাকে না চর্চা দিয়া দিয়া যেন উৎসাহ নাই, এমনই একটা নিরুপায়, দুঃসহ অসহায়তাপ একা-কিছের বোধ উপরোক্ত আটখানি নাটকের সমগ্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই এই নিয়তির রাহো মানবাত্মার একমাত্র ক্রান্ত ও অবসন্ন চলা ভিন্ন আশা-আশা-আনন্দের ভরসা-বিশ্বাসের কণামাত্রণ সম্ভাবনা নাই। গ্রীক নাট্যকার অদৃষ্ট বা নিয়তির কথা বলিতে গিয়া তাহার পশ্চাতে একটি স্মরণশক্তি অমোঘ বিনয়নকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মেটারলিকীয় এই নিয়তি জায়ের কোনো পরোয়াই করে না। মেটারলিকীয় এই নিয়তি একমাত্র ভীষণ ও নিদ্রয় নিঃস্বতা লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল। 'রহস্য-বিবর্তন' প্রবন্ধে তিনি তাঁহার যৌবনেব এই বিশ্বাসের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বহুশোভাদানেও মেটারলিক্ প্রথমযুগের এই বিভৌমিকাময় আবহাওয়ার (atmosphere) তত্ত্বটিকে অতি সূক্ষ্মর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।*

"দানের সম্পদে" নবভাব

প্রথম যুগের নাটকের কথা দিয়া মেটারলিক্ যে নিয়তিবাদ এমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন, 'দানের সম্পদে' প্রচারিত আনন্দবাদ যে তাহা হইতে কত দূরে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "দানের সম্পদে" তিনি যে নাটকীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাব মধ্যে তিনি মানব-জীবনের গোপন সৌন্দর্য এবং অহিমাত্মক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মোট কথা, প্রথম যুগের জীবনাত্মকৃতি হইতে মেটারলিক্ এই মতবাদ সৃষ্টি করেন নাই; তবে এই মতবাদের গোড়াপত্তন "পৌলিয়াস ও মেলিস্যাডার" মধ্যেই হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৮২৬ সালের পরে তাহার যে নাটকগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে "দানের সম্পদে"র মতবাদ কতটা সার্থক হইয়াছে, এহার

* The Buried Temple (Evolution of Mystery), p. 109

আমরা তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু মেটারলিঙ্ক-
যে অকস্মাৎ একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা
মনে করিবার কোনো হেতু নাই। ‘তিস্তাজিলের যুত্য়া’,
‘আলাদীন ও পালোমিডিসের’ মধ্যে আমরা তাঁহার নব
পরিবর্তনের পূর্বাভাস পাইয়াছি, সে কথাটি তুলিলে
চলিবে না।

নবভাবের সূচনা

অ্যাস্টোলেন এবং ইগ্নেন চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই নব
পরিবর্তনের বার্তা সূচিত হইয়াছে। ছুটির মাঝেই
আমরা যে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, উহা মেটারলিঙ্কের
জীবনে একটি অভিনব অমুভূতির দিকে নিশ্চিত ইঙ্গিত
করিতেছে নাকি? যে নিয়তির অদৃশ্য অস্তিত্বের সম্মুখে
মানবাত্মা ভীতিবিহ্বল ও শক্তিহীন হইয়া কাঁপিতেছিল,
তাহার সম্মুখে অকস্মাৎ যেন এমন একটি শক্তির আবির্ভাব
হইল যাহা নিয়তিকে দেখিয়া সঙ্কচিত ভ হইলই না, বরং
বিক্রোহ প্রচার করিয়া বসিল। মেটারলিঙ্কের জীবনে—
নিয়তির অঙ্ককার রাত্রির মুখের উপর কোথা হইতে যেন
প্রেমের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িল। ‘পৌলিয়াস
মেলিসাগুর’ দিকে চাহিয়া দেখা গেল যে, সেই ক্ষীণ
জ্যোতিঃ ধীরে-ধীরে পূর্বাকাশকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে,
অঙ্ককার কাটে নাই, কিন্তু উষার গোলাপী আভা
অঙ্ককারকে হাক্কা করিয়া তুলিয়াছে। মেটারলিঙ্কের
ব্যক্ত জীবনের দিক্ দিয়া যেমন এই পরিবর্তন পরম
কল্যাণকে, জীবনের স্বাস্থ্যকে লইয়া আসিল, মেটারলিঙ্কের
নাট্যজগতেও তেমনি প্রেমের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া
উঠিল।

মেটারলিঙ্কীয় যুগলতন্ত্র

‘পৌলিয়াস মেলিসাগুর’ মধ্যেই সর্বপ্রথম—(যদিও
‘আলাদীন পালোমিডিসের’ মধ্যেও ইহার আভাস অতি
ক্ষীণভাবে পাওয়া যাইতে পারে)—মেটারলিঙ্কীয় যুগল-
তন্ত্রটি প্রচারিত হইয়াছে। মানবাত্মার অন্তর্লোকে,
তাহার চিরপরিচিত প্রেমলোকে যে নিত্যকালের
একটি যুগল সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই যুগল নরনারীর
মিলনেই যে জীবন পরিপূর্ণ এবং সার্থক হইয়া যায়,
এই কয়টি ‘দীনের সম্পদে’ কিভাবে মেটারলিঙ্ক

বলিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।* প্রেমের এই
শাশ্বত পরিচয় যে জীবনের একটি পরম সত্য, স্মরণ্য
নাটকেরও বিষয়-বস্তু তাহা মেটারলিঙ্ক নানাস্থানেই
দেখাইয়াছেন। মেলিসাগুর ও পৌলিয়াস, এন্নাভেন ও
মিলীয়াগুর মোনাতানা ও প্রিজিভাল, জয়জেল ও
ল্যান্সিওর, জয় ও টিলটিল, মডলীন ও খুইট সোনিয়া ও
ম্যাক্সেলের মধ্যে এই যুগলতন্ত্রের বিকাশ লক্ষ্য করিলেই
মেটারলিঙ্কীয় প্রেমের মধ্যে এই ‘যুগল’বস্তুটি যে কত বড়
স্থান পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। †

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যের

বিষয়বস্তু

(খ) ১৮২৬—১৯২৩

১৮২৩ সালের পরবর্তী নাটকে আমরা নিয়তির
নিদাক্ষণ অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেও সেই-সঙ্গে মানবাত্মার
অপরিসীম শক্তি ও পরিচয় পাই। প্রেমের মধ্যে
মানবাত্মার যে অতুল মহিমা ও সৌন্দর্য বিকশিত
হইয়া উঠে, মানবাত্মা যে কত সুন্দর, তাহার প্রেম যে কি
মহীয়ান সেই কথাটিই বিশেষ করিয়া এই দ্বিতীয় যুগের
নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেম ও ট্রাজেডি

(অ) অন্তর্লোকে

দীনের সম্পদে মেটারলিঙ্কের জীবনে যে নতুন

* মেটারলিঙ্ক বলেন আমাদের জ্ঞানের বাহিরে নিশ্চয়ই এমন-
একটি দেশ আছে, যেখানে কেহই আমাদের অপরিচিত নহে। সেই
অংশে আমরা সকলেই বাইতে পারি ও পরস্পরের পরিচয়টি পাইতে
পারি। সেখানেই আমাদের নিত্যকালের প্রিয়াকে আমরা বরণ করিয়া
লইয়াছি; এইজন্যই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তা’রাও যেমন জুল করিতে
পারে না আমাদেরও তেমনি জুল করা অসম্ভব.....আমাদের জীবনের
সকল কর্মকে বেটন করিয়া যে সারাচক্র অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার
বাহিরে বাওয়ার চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের অন্তর-নেতা সহজ-
বোধটিকে (instinct) বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু তাহা
আমাদের ভাগ্য-নির্দিষ্ট প্রণয়নিকে পরিত্যাগ করিবার শত চেষ্টা
করিলেও অবশেষে সেই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

Treasure of the Humble, pp. 77-78.

† মতবাদের দিক্ দিয়া, দার্শনিক দৃষ্টিতে যুগলতন্ত্রের ভিত্তি
কোথায় অর্থাৎ অন্তরাত্মার গভীর পরিচয়-বস্তুটি যে নিত্যকালের তাহার
‘পাতী নির্বাচন’ নাটকে জয় ও টিলটিলের চরিত্রে দেখাইবার চেষ্টা
হইয়াছে। তবে খুইট ও মডলীনের পরিচয়টি ঠিক যুগল-পথ্যানে না
পড়িলেও, উহাও মানবাত্মার শাশ্বত পরিচয়ের কথাটিকেই ফুটাইয়া
তুলিয়াছে।

অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল পূর্বে আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। মানবাত্মার নিভৃত অন্তরলোকে প্রেম যে কত বড় শক্তি-স্থমাকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে তাহাই মেটারলিঙ্কীয় ভাবজগতে তখন অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, মেটারলিঙ্ক এই অল্পভবের জগতেই আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার জাগ্রত বুদ্ধি তাঁহাকে বিচারের পথে চালিত করিতেছিল এবং যাহা কিছু জীবনের দুর্কোষ রহস্য তাহাকে অতি স্পষ্ট করিয়া দেখিবার ও জানিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছিল। ফলে তাঁহার রহস্যবোধ বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়া আসিল এবং মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাব্যতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস স্থাপিত হইল। অজ্ঞেয় রহস্য চিরকালই মানবাত্মাকে তাহার অপরিমেয় প্রেমসঙ্গেও চির অসহায় করিয়া রাখিবে, এই কথাটি যেন তিনি সর্কাস্তঃকরণে মানিয়া লইতে পারিলেন না। বরং এই অন্তঃসংগ্রামের ফলেই তিনি এই কথাটি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, মানবাত্মার অন্তর্দৃষ্টিও প্রেমের সম্মুখে অদৃষ্টের কোনোই প্রভাব নাই ও থাকিতে পারে না। মেটারলিঙ্কীয় ভাবজগতে এই পরিবর্তনের ফলে তাঁহার নাটকীয় ধারণাও পরিবর্তিত হইয়া গেল। প্রথমযুগের ট্রাজেডি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল নিয়তির সম্মুখে মানবাত্মার ভীতি ও অসহায়তার মধ্যে, এবার মানবাত্মার শক্তি-বোধের ও প্রেমের অপরাঙ্ক মহিমার ক্ষেত্রে আসিয়া ট্রাজেডি দেখা দিল। মানবাত্মার শক্তি-বোধ, তাহার প্রেমবোধ ও নৈতিক বোধ তাহাকে যে-দিকে আকর্ষণ করিতে চায়, বিশ্বনীতি ও বিশ্ববিধান সেই পথে নিয়তির রূপ ধরিয়া সজ্বাত ও বেদনার সৃষ্টি করিয়া বসিল। জয়জেল নাটকখানি এই সজ্বাত ও বেদনাকেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে।

(অ) বাস্তবলোকে

রহস্যবোধের অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গেই, অন্ততঃপক্ষে রহস্যভীতির অপসারণ ও মানবীয় শক্তির উপর প্রবল বিশ্বাসের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই মেটারলিঙ্ককে বাস্তব জগতের দিকে বাহির হইয়া আসিতে দেখি। এককাল

ট্রাজেডিকে একটা নিদারুণ নিয়তির সহিত জীবন ও প্রেমের অনিবার্য সজ্বাত বলিয়াই মেটারলিঙ্ক দেখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে নিয়তিকে মানবজ্ঞানেরই অভাব ও অপরিণতি-মাত্র বলিয়া দেখিলেন সেই মুহূর্তেই মেটারলিঙ্ক জীবনকে একটা উচ্চতর নৈতিক-সমস্যা বঙ্গিয়া মনে করিতে বাধ্য হইলেন। তাই দেখিতে পাই যে, পরবর্তী মেটারলিঙ্কীয় নাটক অজ্ঞাত রহস্য-ভীতিকে বর্জন করিয়া জীবনে প্রেমের সহিত অজ্ঞান ও স্বার্থপর বৃত্তির সংগ্রামটিকে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং জীবনে সাহস ও বিশ্বাসের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মেটারলিঙ্কীয় নাটক অন্তরলোকের স্বপ্নময় ভাব ছাড়িয়া, অন্ধকার এবং জ্যোৎস্নালোকের রহস্যকে বিদায় দিয়া বাস্তবজীবনের স্পষ্ট সূর্যালোকে ও উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে, এই সমাজ ও সংসারের বিচিত্র আবর্তের মধ্যে, মানবাত্মার উচ্চতর নৈতিক সংগ্রামটিকে আঁকিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই এখানে ট্রাজেডি আবার আর-একটি রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে, এখানে ট্রাজেডি একটি ব্যক্তির প্রেম ও কল্যাণ-বোধের সহিত অপর আর-একটি ব্যক্তির প্রেম ও কল্যাণবোধের প্রতি-যোগিতার মধ্যেই কল্যাণ করিয়াছে। দুটি অন্তরই পরস্পরের ভালোবাসায় ব্যাকুল হইয়া আপনার অন্তরের সর্বস্ব যে অপরকে দিয়া নিঃশব্দে নিজের সকল ব্যথাকে বলি দিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, ইহাকে প্রতিযোগিতা বলিলে প্রেমের মর্যাদা নষ্ট করা হয়। অন্তরতম প্রেমেরই প্রেরণায় এই যে আত্মবলি, ইহার মধ্যে আনন্দ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আত্মার এই মহিমাময় বিজয়ের মধ্যে যে ত্যাগের একটি ভীতিনিবিড় ব্যথা আছে তাহাই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ট্রাজেডির উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। মেটারলিঙ্ক এই ট্রাজেডিকেই 'মেঘাপসরণে' যে অতি চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যবস্তুর সীমা

প্রথম যুগের রহস্যনাট্যের কথা বাদ দিয়া আমরা 'এগ্লাভেন সেলোসেট' হইতে 'মেঘাপসরণ' পর্যন্ত যে নাটকগুলি দেখিতে পাই তাহার বিষয়বস্তুর দিকে চাহিলে

আমাদের নিকট একটি বস্তু খুবই স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মেটারলিঙ্ক্ মানবজীবনে প্রেমের অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্যের দিকটাই বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বত্রই তিনি ভালোবাসার সংগ্রাম ও সমস্যাটিকেই লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া রক্ষণীয়তা না ফুটাইয়া মানবাত্মার নিগূঢ় অন্তরের বেদনা বোধটিকেই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্য-সৃষ্টির দিক দিয়া তাই মেটারলিঙ্ক্ মানবচরিত্রের আর কোনো বৈচিত্র্যকেই দেখিতে পান নাই। প্রায় সর্বত্রই যুগলভালোবাসার মাঝখানে ভৃত্যদের সমস্যাটিকে লইয়া তিনি জীবনের ট্রাজেডিটিকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেম ও নিয়তি (মৃত্যু) এই দুইটিই মেটারলিঙ্ক্ নাটকের বিষয়বস্তু বলিলে বোধ করি বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মেটারলিঙ্ক্ ছাড়াও প্রায় নাট্যকারই এই দুটি বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নাট্যসৃষ্টি করিয়া থাকেন; তবে মেটারলিঙ্কের বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহাকে বস্তুতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে মেটারলিঙ্ক্ প্রেম-মানব-জীবনের অতি উন্নত নৈতিকত্বের বিকাশলাভ করিয়াছে এবং মেটারলিঙ্ক্ নিয়তিও তেমনি তাহার বিশেষত্ব লইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

‘নীলপাখী’ ও ‘পাজীনির্কাচন’

মেটারলিঙ্ক্ ভাবধারার সহিত নাট্যসৃষ্টির যোগ কোথায় তাহার সন্ধান করিতে গিয়া আমরা ‘নীলপাখী’ ও ‘পাজীনির্কাচন’ এই দুখানি রূপকনাটোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি

দিই নাই। তাহার কারণ এই-দুখানি বই নাটক বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় তাহা নহে। নাটকের বিষয়বস্তু একটি রসবস্তু; উহা আমাদের মর্মে অল্পভূতির মধ্য দিয়া ভাবের মধ্য দিয়া, বাখা ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহা অল্পভবের বস্তু, বুদ্ধির বিষয় নহে। ‘নীলপাখী’ ও ‘পাজীনির্কাচন’—এই দুখানি পাঠকের বুদ্ধিদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে মাত্র, অল্পভবকে আলোড়িত করিতে চায় না। তাহার কারণ এই নাটক-দুখানি জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া দেখায় নাই, জীবনের একটা মতবাদকে, দর্শনকে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। ফলে তাহার প্রকাশ-কৌশল আমাদের প্রশংসাকে জাগ্রত করে সত্য, কিন্তু হৃদয়ের মাঝে কোনো রসক্ষরণের চেষ্টা করে না। যে মতবাদের দিকে তিনি আমাদের চিন্তাশীল মনকে উন্মুখ করিয়া দেন, সেই মতবাদের দিকে চাহিয়া আমাদের বিচার জাগ্রত হয়, অল্পভবের মগ্নতা আসে না। নাটকের উদ্দেশ্য জীবন সৃষ্টি না হইয়া যদি মূণ্যভাবে উহা কোনো মতবাক্যেই প্রচার করা হয়, তাহা হইলেই মতবাক্যের সত্যাসত্যের উপায়ই তাহার বাস্তবিক মূল্য নির্ভর করে; আর মতবাদ কোনো কালেই চিরস্থান হয় না দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’কেও প্রায় এইজাতীয় বলিতে পারা যায়।

মেটারলিঙ্কের শেষ জীবনের দার্শনিক চিন্তার ধারা কেমন করিয়া তাহার উক্ত দুখানি নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কবিত্তে হয়। সুতরাং বর্তমান আলোচনাটি এখানেই সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

কুষ্ঠরোগ-সমস্যা ও সমাধান

শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[গত ১৯২১ সনের আদম-সুমারিতে জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১,০২,৫১৩। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা স্বার্থ সংখ্যা অপেক্ষা অনেক

কম, এমন-কি অর্ধেকও নহে। নানা কারণে ঠিকভাবে গণনা করা সম্ভব হয় না। রাস্তায় যে-সকল ভিক্ষুক কুষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া গণনা

করা হয়; গৃহস্থ কুষ্ঠিগণ লোকলজ্জাভয়ে আপনাদের রোগ প্রকাশ করে না, আর বাহ্যলক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়া উৎকর্ণ রোগিগণ গণনা হইতে একেবারে বাদ পড়িয়া যায়। অতএব এ-কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ ২০০,০০০ কুষ্ঠীর বাস। India's Lepers প্রণেতা বলেন, এই সংখ্যা “অন্ততঃ ২৫০,০০০ হওয়া উচিত”।

সমস্ত ভারতে মোট কুষ্ঠাশ্রমের (Lepet Asylum) সংখ্যা ৯২; বর্তমানে তাহাতে কিঞ্চিদধিক ৮০০০ কুষ্ঠরোগী বাস করে। শতকরা ৪ জন কুষ্ঠী সমাজ হইতে পৃথকভাবে রহিয়াছে, আর সকলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া, সুস্থদের আশ্রয়স্থানের মধ্যে বাস করিতেছে, অল্প সকলের মতই ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে, কিন্তু ইহার জিয়া আস্তে-আস্তে হয়। এই রোগ বহুদিন পর্যন্ত দেহের মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় থাকে, রোগী নিজের ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু তখনো রোগীর নাসিকা ও মুখনির্গত স্রাবের সঙ্গে কুষ্ঠরোগের বীজ বহির্গত হয়। রোগ যখন বিশেষ বৃদ্ধি পায় তখনই দেহের বহির্দেশে ক্ষতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা রাস্তায় যে-সকল গলিত কুষ্ঠীকে দেখিয়া শিহরিয়া দূর দিয়া চলিয়া যাই, তাহাদের অপেক্ষা এই-সকল প্রথম অবস্থার রোগিগণ অধিকতর বিপজ্জনক। এই লক্ষ-লক্ষ কুষ্ঠী সমাজের বুকে বাস করিয়া অবাধে রোগের বিস্তার করিতেছে। কুষ্ঠীদিগের পক্ষে কয়েকটি বিশেষ ব্যবসায় করা আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু



কলিকাতার মধ্যস্থিত কুষ্ঠ-উপনিবেশ

কার্যতঃ ইহার বৈলক্ষণ্য প্রত্যাহই দেখিতে পাওয়া যায়।

অথচ আমরা এপর্যন্ত ইহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমরা রাস্তায় যথাসম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া চলি, এবং ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার যথেষ্ট উপায় করা হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের সকল কর্তব্যের অবসান হইল? এইসকল অগণ্য, রোগক্রিষ্ট, গলিতহস্তপদ আত্মরের প্রতি আমাদের কি কোন কর্তব্য নাই? দয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু আত্ম-রক্ষাকল্পে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্যও আমাদেরকে এই সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞ সার্ লিওনার্ড্ রবার্ট্ বলিয়াছেন :—

“We may safely say that although the contagion is very slow and slight, yet those of us who live here in India, in the midst of hundreds of thousands of lepers, no one of us can claim to be certain of immunity from this disease. Any one of us may at any time be attacked, so we ought to take a deep interest in it and even put our hands in our pockets to help the work of prevention.”

অর্থাৎ—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সংক্রমণ ধীর ও সামান্ত হইলেও, আমাদের মধ্যে বাহারা ভারতবর্ষে শত শত সহস্র

সহস্র কুষ্ঠরোগীর মধ্যে বাস করে, তাহাদের কেহই এই রোগ হইতে মুক্ত আছেন—এমন কথা নিশ্চয় কবিতা বলিতে পারেন না। আমাদের যে কেহ যে-কোন সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে; সুতরাং কুষ্ঠ-রোগ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্য, এমন-কি কুষ্ঠ-নিবারণ-কার্যে সহায়তা করিতে অর্থপ্রদান করাও আমাদের কর্তব্য।

অনেকের ধারণা, এই রোগ নীচ জাতির মধ্যেই হইয়া থাকে। আমাদের ভ্রূলোকদের এইজন্য বিশেষ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কথাটি মোটেই সত্য নয়। যদিও অধিকাংশ স্থলেই তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যেই রোগের আক্রমণ বেশী, তথাপি ভ্রূলোক কুষ্ঠীও নিতান্ত বিরল নহে। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওল্ড্রিড্ (Secretary, British Empire Leprosy Relief Association;



পুন্ড্রিয়া কুষ্ঠাশ্রমের রোগীর গির্জার বাইতেছে

formerly Secretary for India, the Mission to Lepers) তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত India's Lepers গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। বাকুড়া-জেলার কোন এক থানার ১১৬ জন কুষ্ঠীর মধ্যে ২৩ জন ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশ

বাঙ্গালাদেশের মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা (১৯২১, Census Report অনুসারে) প্রায় ১৬,০০০। ভারত-বর্ষে সবচেয়ে বেশী কুষ্ঠী বাঙ্গলায়। আবার ইহাদের অধিকাংশেরই নিবাস বাকুড়া-জেলায়। তৎকালীন বাকুড়ার কালেক্টর মিষ্টার ভাস্ বলিয়াছেন, “এই রোগ বিশেষ করিয়া বাকুড়া জেলার একটি স্থানে বাসা বাঁধিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।” সুতরাং বঙ্গদেশকে

কুষ্ঠরোগমুক্ত করিতে হইলে প্রথমে বাকুড়ার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এই জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৫,০০০-এর কম নহে। এখানে একটিমাত্র আশ্রম আছে ও তাহাতে বর্তমানে ১৫০টি কুষ্ঠী বাস করে। এই জেলার কত গ্রামে যে কুষ্ঠরোগীর বাস, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশে আর-একটি আশ্রম আছে—রাণীগঞ্জে। সেখানে ১৭৮ জন কুষ্ঠী স্থান পাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা রোডে একটি কুষ্ঠ-নিবাস নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার নির্মাণ-কার্য শেষ হইলে এখানে একহাজার কুষ্ঠ-রোগীর স্থান হইবে।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সহরের উপরেই গোবরাঙ্গ গভর্নমেন্টের একটি আশ্রম আছে। এই আশ্রমে ৩১৫ জন রোগী আশ্রয় পাইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গলাদেশে শতকরা চারি জন কুষ্ঠী আশ্রমে বাস করে। এই সংখ্যা সমুদ্রের তুলনায় গোপ্পদের ত্রায়। একমাত্র কলিকাতা সহরেই নূনান্বিক ১০০০ কুষ্ঠী ভিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে। কোনরূপ চিহ্ন না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গলা দেশে কুষ্ঠীদের জন্য কিছুই করা হয় নাই। সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য এতদপেক্ষ ব্যাপক ও স্তম্ভর ব্যবস্থার প্রয়োজন।

রোগ ও তাহার বৃদ্ধি

যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ত্রায় কুষ্ঠরোগেব বীজ (lopra bacilli) এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। অধিকাংশ স্থলেই রোগী নাসিকা ও মুখ-নির্গত স্রাব ও ঘা হইতে এই রোগে বীজ বাহির হইয়া কাটা, ঘা প্রভৃতি পথে স্বস্থ দেহে প্রবেশ করে ও রোগ জন্মায়। তবে যক্ষ্মা-রোগের ত্রায় (Bacillus tuberculosis) ইহার বীজ মূষা-শরীরে বাহিরে জীবিত থাকে বলিয়া মনে হয় না।

কুষ্ঠরোগ বংশগত (hereditary) নহে। পিতা কিংবা মাতার কুষ্ঠ থাকিলেই তৎকাত সন্তানেরও কুষ্ঠ

হইবে এমন নহে। ইহা ভগবানের অপার করুণার অন্ততম নিদর্শন। তবে শিশুগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। এইজন্য কুষ্ঠরোগযুক্ত পিতামাতার সংসর্গে বাস করিলে সন্তানেরও কুষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং সন্তান জন্মবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে পিতামাতা হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহাকে এই ভয়ঙ্কর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এইজন্যই কুষ্ঠীদের বিবাহ কিংবা কোনরূপ শারীরিক সম্বন্ধ থাকিতে দেওয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রেত নহে।

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে। কিন্তু অন্যান্য রোগের তায় ইহার আক্রমণ শীঘ্র বৃদ্ধিতে পারা যায় না। শরীরে রোগ জন্মবার পরও বহুদিন বাহিবে তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। ইহাকে রোগ পার্জিবার কাল (incubation period) বলে। সুতরাং কবে, কিরূপে রোগের সূত্রপাত হইল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এই রোগ অতি অল্পে-অল্পে বৃদ্ধি পায়। প্রথমে শরীরের কোন অংশ ফুলিয়া উঠে, বেদনা হয়। ক্রমে



পুলিন্দা কুষ্ঠাশয়ের বাসিন্দারা ক্ষেত্রে চাষবাসের কাজ করিতেছে

দেহের বিভিন্ন অংশে ডিম ডিম চাক-চাক কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হয়। তারপর ঘা হয়। শেষে দিনে-দিনে একটু-একটু করিয়া কতস্থান পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে। ক্রমে যন্ত্রণা, পলে-পলে মৃত্যু। কেহ খসে হয়, কেহ অন্ধ হয়, সকলেই অকর্মণ্য বিকৃত হইয়া যায়। ব্যাধি জলন্ত

অগ্নির মত একটু-একটু করিয়া জলিয়া শরীর থাকে করিয়া দিয়া এক সময়ে নিভিয়া যায়। তখন শরীরে রোগের আর-কোন সঙ্গীত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীরে করিলে রোগেব বীজও হয় ত তখন পাওয়া যায় না।



একটি বালক কুষ্ঠরোগী

(১) চিকিৎসার পূর্বে (২) এক বৎসর চিকিৎসার পর

শিক্ষার অভাব এই রোগ-বিস্তারের মূলে কাষ্য করিতেছে। কুষ্ঠিগণ আপনাদের রোগ গোপন করিয়া রাখে, অবাধে জন-সমাজে চলা-ফেরা করে, এইরূপে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। অশিক্ষিত নীচ জাতীয় কুষ্ঠী তাহার এই কার্যের ভীষণতা ধারণা করিতে পারে না, সে যে সমাজের কি মহা সর্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা সে বুঝে না। তাই আমাদের শুধু আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, কিংবা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেই হইবে না, বাহ্যতে লোকের মনে এইরূপ ব্যবহারের ফল পরিষ্কার হইবে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

চিকিৎসা

অনেকে বিশ্বাস করেন, পূর্বজন্ম-কৃত কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই “মহারোগ” জন্মে; ইহা শিবের অসাধ্য ব্যাধি, দিনে-দিনে পলে-পলে দধ হইয়া মরিতে হইবে, ইহা হইতে পরিজ্ঞানের উপায় নাই। কুষ্ঠিদিগকে লোকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলিয়া কেহ ভয়ে আপনার রোগের কথা অন্তরে জানিতে দেয় না। যতদিন সম্ভব রোগ গোপন করিয়া আপন প্রিয়জনের মধ্যে বাস করে। তারপর এক সময়ে রোগ বৃদ্ধি পায়, শরীর অকর্মণ্য হয়,

জীবন-ধারণের আর কোন উপায় থাকে না; সংসারে একান্ত লাহিত, পরিত্যক্ত হইয়া হতভাগ্য কোন কুষ্ঠাশ্রমে আশ্রয় লয়।

এতদিন লোকের ধারণা ছিল, এই রোগের কোন প্রতিকার নাই। রোগী সাময়িক যত্না নিবারণের জন্য নানা-প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিত, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল তাহাতে দর্শিত না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের গবেষণার ফলে আজ আমরা বলিতে পারি, এই রোগের প্রতিকার আছে, ইহা হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব নহ। উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে পারিলে রোগীর দেহ



কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েকটি বালক-বালিকা

হইতে রোগের লক্ষণ এককালে দূরীভূত হয়, দেহের অভ্যন্তরে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়, আবার মে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, শ্রীমান হইতে পারে। সার্জ গিওনার্ড রজাস্ এই নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ও ডাঃ ই মর (Calcutta School of Tropical Medicine) ইহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। ডাক্তার মিউরের নব-প্রকাশিত Leprosy Diagnosis, Prevention & Treatment নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই প্রণালী-অনুসারে চিকিৎসা করিলে যথেষ্ট সফল পাওয়া যায়, ও কিছু দীর্ঘকাল যাবৎ ঔষধাদি সেবন করিলে আর রোগ পুনরা-ক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে না। Mission to Lepers-

এর বহু আশ্রমে এই উন্নত প্রণালী চিকিৎসা প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং তাহাতে বিস্তর রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে।

রোগ যত দিন দেহে সম্যক্রূপে পরিব্যাপ্ত না হয় ও দেহের ধ্বংসকার্য আরম্ভ না হয়, ততদিন এই চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় তেমন ফল পাওয়া যায় না। যা শুকাইয়া যাইতে পারে, দেহ হইতে রোগের বীজ দূর হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে-অঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, ভগ্ন স্বাস্থ্য আর ত জোড়া লাগিবে না।

আশ্রমে প্রথম অবস্থার রোগী বেশী পাওয়া যায় না। এতদিন রোগমুক্ত হইবার কোন আশা ত ছিল না। আশ্রম শুধু শেষ অবস্থার আশ্রয়। তাই প্রায় অন্তঃসং-শূন্য দেহ লইয়া কুষ্ঠিগণ জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটা-বার জন্য আশ্রমে আসিত। তবে ইদানীং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে জানিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক তরুণ রোগী আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে।

যন্ত্রারোগের জায় এই রোগেও, বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাকে নীরোগ বলিয়া মনে হয়, একরূপ বহু লোকের শরীর পরীক্ষা করিয়া এই রোগের বীজ থাকিতে দেখা গিয়াছে। ফলে, নূতন আবিষ্কার আমাদেরকে যতটা আশ্বাস দিয়াছে, আশঙ্কাও তাহা হইতে কম জন্মায় নাই।

কুষ্ঠ-আইন

দেশকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রথমেই যথা দরকার, আমাদের দেশে তাহা নাই। যতদিন পর্যন্ত কুষ্ঠরোগিগণ নির্কিয়েরে রাখায় চলা-ফেরা করিতে পারিবে, রেল-ষ্টিমারে যাতায়াত করিতে পারিবে, ততদিন রোগের বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে। কুষ্ঠীদের ছোঁয়া পয়সা বাজারে চলে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রীত হয়, কোন-কোন স্থানে তাহারা মিঠাইওয়ালার, কোথাও গাড়োয়ান, কোথাও দোকানদার; তাহারা ছুপ জোগান দেয়, হোটেল করে, তরকারী বিক্রি করে। এমন শত উপায়ে শত কুষ্ঠী নিত্য আমাদের সঙ্গে মিশিতেছে, অবাধে সর্বত্র

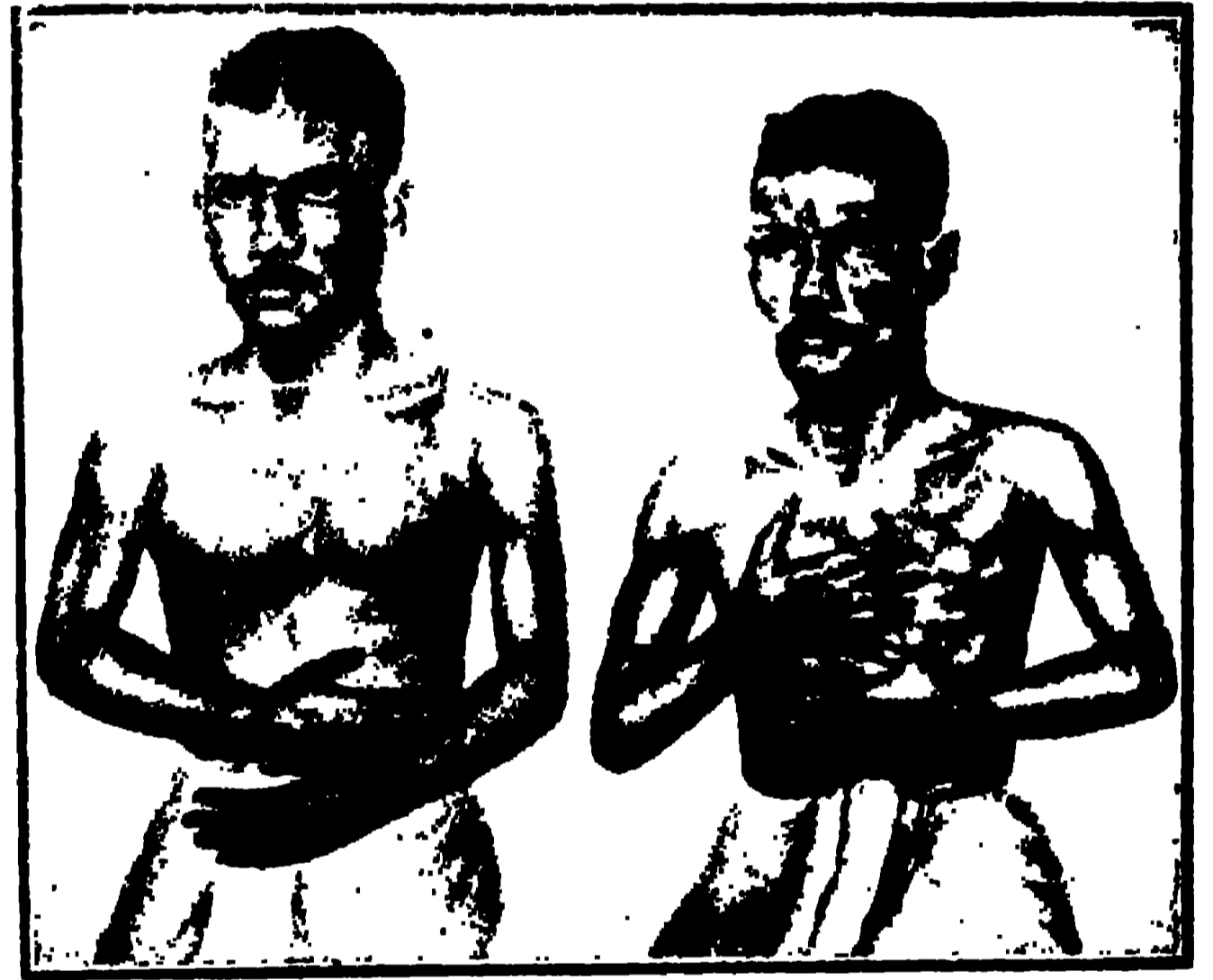
যাওয়া-আসা করিতেছে। দেশ রোগশূন্য হইবে কেমন করিয়া?

এইজন্য সর্বপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে অন্ত্রাল লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা (segregation)। আমেরিকানগণ যখন ফিলিপাইন দ্বীপ অধিকার করেন, তখন সেখানে কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দেশ হইতে এই ভীষণ ব্যাধি তাড়াইবার জন্য আমেরিকান গভর্নমেন্ট ডাঃ হীসারের পরামর্শ-মত দেশের এক-প্রান্তে Cullion দ্বীপে বহু অর্থ-ব্যয়ে একটি কুষ্ঠ-উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। উহাকে সর্বতোভাবে চিন্তাকর্ষক ও আরাম-প্রদ করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি হইল না। বাস্কেল, স্নবন্দোবস্ত, স্কুল-কলেজ, থিয়েটার সবই আছে সেখানে। তারপর আইন হইল সকল কুষ্ঠীকে সেখানে আবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু এইজন্য গভর্নমেন্টকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। উপনিবেশে কোনরূপ অসুবিধা নাই দেখিয়া কুষ্ঠীগণ স্বচ্ছন্দে সেখানে গেল। প্রায় ৮০০০ কুষ্ঠী সেখানে আবদ্ধ হইল, তাহাদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। দশ বৎসর পর দেখা গেল, দেশে নূতন রোগী ত একজনও হয় নাই, পুরাতনের সংখ্যা ৩৫০০ এ নামিয়া গিয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয় (Act III of 1898)। সেই আইনের বলে কোন পুলিশ কর্মচারী ইচ্ছা করিলে ঘা-যুক্ত (with open sore) কোন ভিক্ষোপজীবী কুষ্ঠীকে (pauper lepers) বিচারকের কাছে লইয়া যাইতে পারে, ও বিচারক ইচ্ছা করিলে ষতদিন না ঘা শুকায় ততদিন কুষ্ঠীকে কোন কুষ্ঠরোগের হাসপাতালে জোর করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু বাহিরে ঘা না থাকিলেই কুষ্ঠ হইবে, একথা বলা চলে না। বরং এরূপ রোগীই বেশী অনিষ্টকর। আর ঘা শুকাইলেও ভিতরে রোগের বীজ থাকিয়া যায় এবং কুষ্ঠী বন্ধনমুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই আবার তাহার গায়ে কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হয়। যাহা হউক, উক্ত আইন প্রায় কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই। কোন পুলিশ কর্মচারী ভয়ে কোন কুষ্ঠীর কাছে ঘেসিতে চাহে না, তাহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য তার বিন্দুমাত্রও

আগ্রহ নাই, আর কুষ্ঠীও তাহার বাহিরের উন্মুক্ত জীবন হারাইবার ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক।

১৯২০ সনে যে সংশোধিত আইন গঠিত (Amendment of Leper Act—Act XXII of 1920) হইয়াছে তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এখন ভিন্ন-ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই আইন স্বীকার করিয়া লইলে, উক্ত গভর্নমেন্ট যে-কোন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষা-ব্যবসায়ীকে তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত



একজন কুষ্ঠরোগী

(১) এক বৎসর চিকিৎসার পর (২) চিকিৎসার পূর্বে

কুষ্ঠ-রোগের হাসপাতালে রাখিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য যাহা চাই তাহা নাই—গভর্নমেন্টের এত বেশী ও এত বড় হাসপাতাল নাই যাহাতে সকল কুষ্ঠীর স্থান হইতে পারে। এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে হইলে বিস্তর খরচ। তৎক্ষণ মর্ককার এতিকে তত কান দেন না। সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (segregation) এদেশে সম্ভব নয় জানি; কিন্তু ষতদিন না উপনিবেশ গঠন করিয়া অধিকাংশ কুষ্ঠীকে বাহিরের সমাজ হইতে একান্তে পৃথক্ করিয়া রাখা হইবে, ততদিন দেশ হইতে কুষ্ঠরোগ লোপ করা সম্ভব-পর্যন্ত।

উপনিবেশ

কিন্তু গভর্নমেন্টকে এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে কি? ইহা বহুবায়নাধ্য সত্য, কিন্তু প্রজ্ঞার

স্থান্য রক্ষা করিতে গিয়া কার্পণ্য অবলম্বন করিলে চিন্তিত্ব কেন ?

যাহাতে দেশে আর রোগের বিস্তার না খটিতে পারে সে বর্তমান রোগীর সংখ্যা কমিয়া যায়, সেইজন্য ফিলিপাইন-দ্বীপেব অসুস্থকরণে আর্মাডিগকে দেশের বিভিন্ন স্থানে, লোকায়ত হটতে দূরে, কুটী-বহিঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাকে সুদৃঢ় এবং যথাসম্ভব আরাম দায়ক করিতে হইবে, কুটীগণ যাহাতে স্বেচ্ছায় সেখানে যাইতে চাহে, এইরূপ স্বথ-স্ববিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সেখানে নূতন এবং পুণ্ডিত রোগীদিগকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, স্ত্রী-পুরুষ সন্মিলন নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তারপর নূতন প্রণালী-অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে, যতদিন না রোগীর দেহ সর্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ-বর্জিত এবং রোগবীজশূন্য (symptom free and suninfective) হইয়া যায়। দেশের সকল কুটীকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়ত বায়বাহ্যাবশতঃ, কোনোদিনই সম্ভব হইবে না, কিন্তু যে-সকল কুটীরোগী রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে, রেল-ষ্টীমারে খাতায়ত করে, অন্ততঃ তাহাদিগকেও রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া দাইবার পর আরো ছয় মাস পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা উচিত।

কুটীশ্রম ও “Mission to Lepers”

এতদিন পর্যন্ত এদেশে কুটীদের সেবা, চিকিৎসা কিংবা ভরণপোষণের জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারী। ভারতীয়গণ অদ্যাপি এই বিষয়ে বড়-একটা উদ্যম দেখান নাই।

আর কুটীদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছেন Mission to Lepers। মাসের সেপ্টেম্বর মাসে মিশনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইল। প্রথমে অতি ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ করিয়া আজ তাহারা যে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদিও দ্বাদশটি বিভিন্ন দেশে ইহার সেবাসদন আছে, তবু ভারতবর্ষই প্রধানতঃ ইহার কার্যক্ষেত্র। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া—যখন কুটীদের জন্য ব্যবস্থাই ছিল না,—

আজ পর্যন্ত সমভাবে ইহার একান্ত নিঃসহায়, সর্বজন-পরিভ্রান্ত শত শত কুটীর জন্ম যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইহাদেরই সংদৃষ্টান্ত এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ দেশে কুটীদিগের জন্য একটা সত্যকার বেদনা-বোধ জন্মিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্‌রসি রিলিফ এসোসিয়েশন্ নামে একটি নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ইহার পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষেও ইহার একটি শাখা সমিতি শীঘ্রই স্থাপিত হইবে, এবং বড়লাট এই সমিতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

বর্তমানে ভারতে কুটীশ্রমের সংখ্যা ২২, তন্মধ্যে ১১টি Mission to Lepersএর। এইসকল আশ্রমে যত কুটী বাস করে, তাহাদের ব্যয়ভার মিশন বহন করিয়া থাকেন। সমাজের নির্ধাতন, রোগের যত্না, হতাশাস মিলিয়া কুটীর জীবন দুর্ভর করিয়া তোলে। খেই দেখে সেই দূর দূর করে; কেহ আশ্রয় দেয় না, কেহ একটা আশার কথা বলে না। তত্পরি অক্ষমতার জন্ত জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন এইসকল খঞ্জ, গলিত হস্ত-পদ কুটী-রোগী আসিয়া আশ্রমে আশ্রয় লয়। সেখানে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বেশ শান্তিতেই কাটায়।

এই-সকল আশ্রমে জাতিধর্ম-নির্কিশেষে সকল প্রকার কুটীকেই আশ্রয় প্রদান করা হইয়া থাকে, ইহাদের দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন মিশনের লক্ষ্য। ইহাদের দুঃখ-ময় জীবন যথাসম্ভব স্বথ-ও শান্তিপূর্ণ করিবার চেষ্টা আশ্রম-কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন।

আশ্রমে কাহাকেও জোর করিয়া রাখা হয় না। কে-কেহ ইচ্ছা করিয়া আশ্রমে যায় তাহাকেই থাকিতে দেওয়া হয়, এবং রোগমুক্ত হইলেই, কিংবা ইচ্ছা হইলে তৎপূর্বেই আশ্রম ত্যাগ করিতে পারে। বস্তুতঃ কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর কখনো হস্তক্ষেপ করা হয় না।

ধর্ম-সম্বন্ধে এখানে কোনরূপ জোর-জবরদাস্তি নাই। মিশনের নিয়মাবলীর অন্তঃ নিয়মের দ্বিতীয় অংশে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আশ্রমস্থ কোন কুটীকে খৃষ্টীয় ধর্ম-শাস্ত্র-শ্রবণে বাধ্য করা হইবে না। তবে এ কথা বলা

ভাল যে, সকল আশ্রমেই গির্জা আছে, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্র পাঠনার (christian teaching) রীতি আছে। খৃষ্টধর্ম-গ্রহণে উপদেশ দেওয়া এবং উৎসাহিত করা হয়। আশ্রমের আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টীয়ান আশ্রমেব পুরাতন বাসিন্দা সকলে খৃষ্টীয়ান, এমতাবস্থায় নবাগত নীচজাতীয় প্রায়-নাশ্তিক কুষ্ঠরোগী সহজেই নবধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত হয়। তবে জোর করিয়া কাহাকেও ধর্মাস্তর গ্রহণ করানো হয় না, সকলে স্ব-স্ব অভিকৃতি অনুসারে ধর্মাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেইজন্য তাহাদের প্রতি বাবহারের কোন তারতম্য করা হয় না।

যাহাতে অহরহ আপন ছুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া রোগী হতাশ হইয়া না পড়ে, এইজন্য ইহাদিগকে স্বল্প-শ্রম-সাধ্য কার্যে নিযুক্ত রাখা হয়। শাকসব্জির বাগান প্রায় প্রত্যেক আশ্রমেই আছে। বড়-বড় আশ্রমে শস্তোৎপাদনী কেন্দ্রও আছে। সেখানে কুষ্ঠীগণ খাতাদি শস্তোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া নানারূপ সহজ শিল্প ও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমানে কুষ্ঠাশ্রম কুষ্ঠরোগীদের শেষ আশ্রয়। যে সেখানে যায় প্রায় কেহ আর আপন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আসে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে, কুষ্ঠাশ্রমকে কুষ্ঠরোগের হাঁসপাতাল করিতে হইবে। রোগ আরোগ্য হইলে রোগী আপন গৃহে, আপন প্রিয় জনের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কুষ্ঠীগণ ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহা বিশেষ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্ত্রীপুরুষভেদে কুষ্ঠী রক্ষা ও বালক

বিশেষজ্ঞগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, এইরোগ যদিও বংশানুক্রমিক (hereditary) নহে, তথাপি রোগাক্রান্ত পিতামাতার সংসর্গে বাস করিলে সন্তানেরও কুষ্ঠ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেইজন্য এইসকল আশ্রমে স্ত্রীপুরুষ পৃথক করিয়া রাখা হয়; যাহাতে কুষ্ঠী দম্পতির আর সম্ভান না হয়ে তৎক্ষণ এই প্রচেষ্টা। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় আশ্রমে প্রবেশ করে, অথবা কেহ স্ত্রীসংসর্গে বাস করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া

দেওয়া হয় যে, নবজাত সন্তানের অতি শৈশবেই তাহাকে পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

এইজন্য আশ্রম হইতে দূরে এক বাড়ী থাকে (Home for Untainted Children) সেখানে কুষ্ঠীদের সন্তান রাখা হয়। এইসকল শিশুর অতি অল্পেরই কুষ্ঠ হইতে দেখা যায়। অধিকাংশই স্বস্থ সবল সাধারণ মানুষ হইয়া থাকে। যাহাদের কুষ্ঠ বাতির হয়, তাহাদিগকে



একজন কুষ্ঠরোগী

(১) চিকিৎসার পূর্বে (২) এক বৎসর চিকিৎসার পর

আশ্রমসংলগ্ন পর্যবেক্ষণ-গৃহে (Observation Home) রাখা হয়। আর যাহারা রোগাক্রান্ত হয় না, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার ক্ষমতা চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়।

মিশনের আশ্রয়ে থাকিতে-থাকিতে এইসকল বালক-বালিকা নানারূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়। ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য স্কুল আছে। অনেকে আশ্রমের ডাক্তার-বাবুর নিকট ডাক্তারি শিখে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সূচীকর্মে ও রন্ধন-কার্যে নিপুণতা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত হানকালোপযোগী অন্যান্য বহুবিধ শিক্ষা ইহাদিগকে দেওয়া হয়।

আয়-ব্যয়

মিশনের প্রতিশাল্য প্রায় ৫০০০ নরনারীর ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিবৎসর নানাবিধ সাত লক্ষ টাকার

প্রয়োজন। ইহার কিয়দংশ গভর্ণমেন্ট্ বহন করেন, বাকী সবই সঙ্ঘদয় দাতৃগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই টাকার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিয়া থাকে। ইদানীং বিনিময়ের (Exchange) হার কমিয়া যাওয়ায় মিশন বড়ই কতিগ্রস্ত হইতেছে।

বহুদিন পর্যন্ত গভর্ণমেন্ট্ কিংবা এতদেশীয় জনগণ এই ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এই অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে গভর্ণমেন্ট্ নানাপ্রকারে এই জনহিতকর কার্যে সহায়তা করিতেছেন, রাজপুরুষগণও এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আপনাদের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন।

ভারতীয়দিগের মধ্যেও অনেক মহাশয় ব্যক্তি এইসকল বিপন্ন আতুরের সেবাকার্যে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা কলুটোলার স্বনামধন্য রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মুন্সেরের জমিদার রাজা রঘুনন্দন সিংহ ও মাড়োয়ারী-কুলপ্রদীপ ওকারমল জাঠিয়ার নাম করা যাইতে পারে। মল্লিক মহাশয়ের দয়ার মাস্তাজের অন্তর্গত ভাদাখোরামাতুলতে দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক “লেপার হোম” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্বিধ বোম্বাই ও কলিকাতার দেশী-বিদেশী বহু ধনাঢ্য মহাজন প্রতিবৎসর প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

কার্যের প্রসার

মিশন যে শুধু আশ্রমের পুরাতন অধিবাসীদিগের আহাৰ, পরিধেয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন-নূতন আশ্রম খোলা হইতেছে। স্থানাভাব দূর করিবার জন্য প্রতি আশ্রমে নূতন গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও স্থান সঙ্কলান হইতেছে না। কত আশা ও মিনতি লইয়া রোগী তাহার রোগক্রিষ্ট দেহভার বহিয়া আশ্রম-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, স্থানাভাববশতঃ তাহাকে বলিতে হইতেছে, তুমি কিরিয়্যা যাও, এখানে তোমার আশ্রম মিলিবে না।

যে-সকল কুটী আশ্রমে স্থান পায় না, অথবা আশ্রমে

যাইতে চাহে না তাহাদিগের জন্য চিকিৎসা-বিভাগ (Out Patients' Department) খোলা হইয়াছে। সেখানে রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ, ইন্জেকশন্ প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে।

উপসংহার

কিন্তু এখনো অনেক কর্তব্য বাকী। দেশ হইতে এই ‘মহারোগ’কে দূর করিতে হইবে, যাহাতে রোগের আর বিস্তার না হইতে পারে, তৎক্ষণ্য চেষ্টা করিতে হইবে; আর এই লক্ষাধিক রোগযন্ত্রণাকাতর আতুরের রোগে ঔষধ, ক্ষুধায় অন্ন, পবিধানে বস্ত্র জোগাইতে হইবে।

দানে শুধু গ্রহীতার নহে, দাতারও কল্যাণ—এই সত্যটি এই-বিষয়ে যেমন প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতে নহে। ইহাদের রোগমুক্ত করা, আর আমাদের * আশ্রমকার ব্যবস্থা করা একই। পথে-ঘাটে ইহাদিগকে দেখিয়া আপনাদের মনে যে দুঃখ ও অমুকম্পার উদয় হয়, ইহাদের ভরণপোষণের জন্য, ক্লেশমোচনের জন্য, রোগমুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া মনের সেই অমুকম্পাকে কার্যতঃ প্রকাশ করুন।

সত্ৰাই সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ একবার কোন রোগ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “If preventable, why not prevented?” (যদি দূর করা যায় তবে কেন দূর করা হয় না?) আজ যখন আমরা জানিতে পারিয়াছি কুষ্ঠরোগের ঔষধ আছে, ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষকে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা যাইতে পারে, চেষ্টা করিলে, এ-কথা বলা যাইতে পারে “In India leprosy is a thing of the past,” (ভারতে কুষ্ঠরোগ অতীতের ঘটনা) তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হয় তবে কেন তাহা করা হইবে না, যদি সাধ্যায়ত্ত, তবে কেন দেশকে রোগমুক্ত করিব না, If preventable, why not prevented ?

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় Mission to Lepers এর Acting Secretary for India শ্রীযুক্ত A. Donald Miller মহাশয় আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন; তৎক্ষণ্য আমি তাহার কাছে কৃতজ্ঞ।—লেখক।

জীবন-কাব্য

শ্রী অমিয়া চৌধুরী

এক

আকাশে উজ্জল চন্দ্র উঠিয়াছিল। কিন্তু গ্যাস-লাইটের বহর এত বেশী যে জ্যোৎস্না বুঝিবার উপায় নাই। রাত একটু বেশী হইয়াছে; ট্রাম আর চলিতেছে না। পথে লোকজনও খুব কম; ছুই-একখানা মোটর কেবল নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়া বাইতেছে।

এমনি-সময়ে একটি দ্বিতল অট্টালিকার নিকটকক্ষে স্তিমিত-দীপালোকে একটি তরুণ যুবক শয্যাশায়িত। একটি অবশুষ্ঠনবতী বালিকার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বৃহৎস্বরে ডাকিতেছিল, “জ্যোতি !”

জ্যোতিশ্বরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ছুইতিনটা ডাকের পর “উ” বলিয়া চোখ মেলিল।

যুবকের নাম স্বরেশ; সে বালিকার শিথিল খোপার গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করিতে-করিতে কহিল, “এত শীগগির ঘুমিয়ে গেছলে ?”

জ্যোতি উঠিয়া বসিল; চক্ষু মুছিয়া কহিল, “রাত ত কম হয়নি, এগারোটা বাজতে শুনে তবে আমি শুয়েছি। তা’র আগে ত ব’সেই ছিলাম। তুমি নীচে এতক্ষণ কি করছিলে ?”

স্বরেশ মুগ্ধনয়নে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জ্যোতি কহিল “বলো না—”

“কি ?”

“কোথায় ছিলে এত রাত্তির অবধি ?”

“নীচের ঘরে।”

“পড়ছিলে বুঝি ?”

“না।”

বালিকার কৃষ্ণ আঁখিতারায় বিনয় প্রকাশ পাইল। কহিল, “তবে কেন বসেছিলে ?”

“পরীক্ষা যে এস, জানো না ?”

জ্যোতি কহিল, “জানি ত।”

“শীগগির যদি শুতে আসি, বাবা দাদা সবাই কি ভাববেন ! তাই খানিক বই নিয়ে ব’সে থাকি—টার্না শুতে গেলে তা’র পর আসি”—জ্যোতি কৌতুক বোধ করিল। বয়সে বালিকা হইলেও সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; হাসিমুখে কহিল, “সেই যদি ব’সেই থাকো, তবে পড়লেই পারো ?”

স্বরেশ ছুই হাতে জ্যোতির হাত-ছুইখানা চাপিয়া ধরিয়া, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, “তোমার মুখখানি কেবল আমার মনে পড়ে। কতক্ষণে তোমার কাছে আসিব শুধু তাই ভাবি, পড়ায় ত মন বসে না আমার।”

এই প্রেম-নিবেদনে বালিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। ছয়-মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই ছয়মাসের মধ্যে নিজের স্ত্রীতে সে স্বামীর মুখে কত দিন শুনিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু তাহার বিরক্তি বোধ হয় না। কারণ এসব কথা নূতন। নিত্যসুই সাধারণ গৃহস্থ ঘরে, কাব্যের বাস্তব আওতায় ও নিরন্তর গদ্য-ধাতের বাপ-মায়ের কোলে সে মাহুত হইয়াছিল। নিজের সখ্যে তা’র কোনো সাড়াই ছিল না। বিবাহের পরেই শুনিল, সে তাহার অপকল্প রূপে স্বরেশের নয়ন মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহের পূর্বে সে তাহার শ্রাবণের জন্ত বাপ-মাকে কত না উৎকর্ষা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছে। নিজে খুব স্নেহের নয় বলিয়া একটা সঙ্কোচ তা’র মনে ছিল। স্বরেশের প্রশংসায় সে-সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। এখন সে নিত্য-নূতন প্রশংসানে রূপকে উজ্জলতর করিবার চেষ্টায় আছে।

স্বরেশ তাহাকে “জীবনের আলো” “স্বপ্নের ধন” “প্রেমের প্রদীপ” প্রভৃতি কত নামে আদর করে। তাহার অতি বিশেষত্বহীন ক্ষুদ্র মুখখানিকে চাঁদের সঙ্গে, গোলাপের সঙ্গে, সন্ধ্যার সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করে। সে বলে জ্যোতিকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া বাইত। জ্যোতিকের পাইয়া সে তাহার জীবন-বৌবন সার্থক হইল

বলিয়া অশ্রুভব করিতেছে। জ্যোতির কঠোর বীণাধ্বনির মতন, জ্যোতির হাসি সূর্যালোকের স্তায় গাঢ় আধারকেও উজ্জল করিয়া তোলে; জ্যোতির ছুই চোখে সতীশ্বের অপরূপ দীপ্তি। এককথায় জ্যোতি মানবী-বেশে দেবী, এই সমুচ্চ দেবীশ্বের শিংহাসনে বলিয়া জ্যোতি পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখিতেছে। ভাবিতেছে, এখানে কোনো ছুঃখ নাই, শোক নাই, বিচ্ছেদ নাই, দারিদ্র্য নাই। আছে কেবল পরিপূর্ণ আরাগের মধ্যে পরম্পরের প্রেমগুণন ও চির-মিলন। এই অভিনব অপরূপ দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন সম্ভব, তা জ্যোতির্ধরী কল্পনাতেও আসে না। স্বামীর ভালোবাসা ও প্রশংসা লাভ করিয়া সেও জীবন ধন্য বোধ করিতেছিল। স্বরেশের একটা হাত জ্যোতির খোঁপার উপর ছিল; জ্যোতি মাথাটি সরাইয়া লইয়া কহিল, “খুলে দিয়ো না।”

স্বরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

“বড়দি বেঁধে দিয়েছেন, কাল সকালে যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বলব?”

“সে যা হয় বোলো, এখন খোলো ত দেখি। এমন সুন্দর চুল, কতগুলো কাঁটা ও’জেনে না বাঁধলে তৃপ্তি হয় না বুঝি?”

বড়দির পরিহাসভয়ে জ্যোতি চুল খুলিতে রাজি হইল না। স্বামীর মন ওদিক হইতে সরাইবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা,—ওখানা কি খাতা?”

টেবিলের উপর একখানা মোটা খাতা পড়িয়াছিল। জ্যোতি হাত বাড়াইয়া সেখানা তুলিয়া লইল। “আলোটা একটু বাড়িয়ে দেবে?”

স্বরেশ উঠিয়া প্রদীপ উজ্জল করিয়া দিল। এই শুভ অবসরের আশায় সে খাতাখানি ওখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল; চুলের কথা সে তুলিয়া গেল। জ্যোতি খাতা খুলিয়া বলিয়া উঠিল “ওমা, এ তোমার লেখা নাকি?”

“হ্যা—ভালো হয়নি, ও কি দেখবে!”

“আচ্ছা, তুমি চুপ করো ত—আমি পড়ছি—” বলিয়া জ্যোতি মনে-মনে পড়িতে লাগিল।

“ওগো আমার মৃতিমতি কল্পনালক্ষি, এ আমার ছন্দে-গীথা জীবন-কাব্যখানি আমি তোমার শুচিক্ত হাত-ছুখানিতে এনে দিলাম। এই অসমাপ্ত কাব্য তুমি তোমার প্রেমে সম্পূর্ণ করো। আমার যৌবনের বনে বসন্তের হাওয়া লেগেছে, আমার মনোমুগ্ধ তা’র—”

জ্যোতি ধামিয়া গিয়া কহিল, “আচ্ছা, এ তুমি কা’কে লিখেছ বলো না।”

“কা’কে আবার? তোমাকে!” বলিয়া স্বরেশ বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইল।

জ্যোতি কহিল, “সব কিছু আমি বুঝতে পারিনি।”

স্বরেশের প্রেমালোকিত হৃদয় একটু মলিন বোধ হইল; কহিল, “কেন?”

জ্যোতি যে তা’র সামান্য বিদ্যা লইয়া এত কবিত্ব বুদ্ধিতে পারে না, সে কথা স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। তাই সে কেবল কহিল, “এখন থাক, আমি একসময় একলা ব’সে পড়ব, তাড়াতাড়ি করলে কি বোঝা যায়?”

“সেই ভালো,” বলিয়া স্বরেশ খাতাখানা রাখিয়া দিল। আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

ছুই

আকাশে ঘন মেঘ। কার্তিক মাসের বাদলা; বড় শীত বোধ হইতেছিল, এই ছায়াছন্ন অপরাহ্নে মহানগরও ঘেন কতকটা নিব্বুম হইয়া পড়িয়া আছে।

জ্যোতির্ধরী তাহার এক বৎসরের পুত্র নন্দুলালকে কোলে লইয়া শয়ন কক্ষের বাতায়নে বসিয়াছিল। বিকালে চারিটার পর এখানে বসে তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

ছুই-ছুইবার চেষ্টা অথবা অ-চেষ্টা করিয়া স্বরেশ যখন বি-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন পিতা হতাশ হইয়া তাহাকে কলেজ ছাড়াইয়া লইলেন। স্বরেশও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বৎসরখানেক যাবৎ সে মার্কেট্টাইল ব্যাকে কেরানী নিযুক্ত হইয়াছে। জ্যোতির শয়নকক্ষের বাতায়ন হইতে গলির মোড় খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সেইখানে বসিয়া প্রতিদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করা

জ্যোতির অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। স্বরেশও সে-কথা জানিত।

ক্রমে গলির মোড়ে পরিচিত মূর্তি দেখা গেল। জ্যোতির মুখে-চোখে উজ্জলতা ফুটিয়া উঠিল; সে নন্দর কচি মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে চূষন করিল। হৃদয়বেগ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন মানুষ অন্তত একটুখানি ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না।

স্বরেশ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। এখন আর সে নবপরিণীত কলেজের ছাত্র নয়। তাহার চেহারায় সংসারের ছাপ যারা হইয়া গিয়াছে। গায়ের চাদর ও জামা খুলিয়া সে পাতা-বিছানার উপর ফেলিয়া দিল। হাতের বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া জীর দিকে ফিরিল। নন্দ দুই হাত বাড়াইয়া পিতার কোলে আসিবার জন্য কলভাবার অর্ধহীন অহ্ননর জানাইতে লাগিল।

জ্যোতি কহিল, “নাও না একবার, কি কবুছে দেখ, ভারি ছুট হচ্চে।”

স্বরেশ কহিল, “তাই ত দেখছি। কিন্তু এখন ত নিতে পারুব না। আমার আবার এখুনি বায়স্কোপে যেতে হবে।”

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, “ইংরিজী?”

স্বরেশ কহিল, “না, বাংলা। ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নাকি খুব ভালো শুনেছি। বর্তমান, হারু ওরাও যাবে—শীগগির খাবার দাও দেখি।”

জ্যোতির মনখানি একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কয়দিন হইতে পাড়ার সন্ধিনীদের কাছে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বায়স্কোপের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে লইয়া বাইবার জন্য স্বামীকে সে অনেক অহ্নরোধ করিয়াছিল। স্বরেশ কাজের ছুতা দিয়া অহ্নরোধ রাখে নাই। মনের ভাব সঞ্চার করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

স্বরেশের বৌদি খাবার লইয়া আসিলেন। স্বরেশ খাইতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন। “শ্রীকৃষ্ণ দেখতে ষাট নাকি ঠাকুর-পো?”

“হ্যা, বৌদি—”

“জ্যোতিকে নিয়ে যাবে? ও ক’দিন খেে বসছিল—”

স্বরেশ মাথা নাড়িয়া কহিল, “সে কি হয়? তো কেউ যাবে না—একলা ওকে নিয়ে যাই কি ক’রে বৌদি বলিলেন, “কি করি ভাই! মানুষ আজ আ অর এসেছে, নইলে আমিই যেতে পারতাম, কে কথাও হ’ত না—কিন্তু আমি স্ত্রিবিধে ক’রে মা বা মত করিয়ে দিতে পারি, যাও নিয়ে, তোমার যা কথা বলতে গিয়েই ওর চোখে জল এসেছে।”

“না বৌদি, আমি ত এখুনি যাচ্ছি—অত হাজারী করতে পারুব না। আমি যাচ্ছি আমার বন্ধুদের সঙ্গে—স্ত্রিবিধেও হবে না ত।”

বৌদি মুখখানি বিবল করিয়া কহিলেন, “ভারি দুঃখিত হবে।”

স্বরেশ খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “নন্দাকে নিয়েই ত মুন্সিল হ’বে। ছেলেমেয়ে নিয়ে আর অত সখের দরকার নেই।”

বৌদি চলিয়া যাইতেছিলেন, স্বরেশ কহিল, “বৌদি একবার পাঠিয়ে দিও, আমার কাপড়জামা দিতে হবে, বিশ্রী ময়লা হ’য়ে গেছে—”

“দেবো পাঠিয়ে—” বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন।

স্বরেশ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিপাটি করিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

জ্যোতিখরী আসিয়া বস্ত্রাদি বাহির করিয়া দিল। পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া সে দেওর-ভাজের সমস্ত আলাপাই শুনিতেছিল।

কাপড় পরিয়া স্বরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “ছোটো পানু টান্ পাবো?”

“এনে দিচ্ছি” বলিয়া জ্যোতি ক্রত চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ডিবার করিয়া দুইটি পানু লইয়া আসিল। আর কোনো কথা না পাইয়া স্বরেশ প্রা করিল, “নন্দ কই?” “মার কাছে।”

“ও, আচ্ছা তবে এখন আসি,” বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া ঘরের নিকটে গেল। জ্যোতি পাচখরে প্রবেশ করিয়া “অনেক রাত্তির হবে নাকি?”

স্বরেশ উত্তর দিল, “এখন কি জানি!” বলিয়া ক্রত নামিয়া গেল।

সেই রাতে আহারাদির পরে জ্যোতি যখন শয়নকক্ষে আসিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যোতির বুকের মধ্যে একটা ভারি বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল। সে শয়ন করিল না। একবার মশারি তুলিয়া স্তম্ভ পুস্তকের মুখ দেখিল, তা’র পর নিঃশব্দে সরিয়া আসিয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে একখানা মাহুর মেঝেতে বিছাইয়া আলোটা নামাইয়া লইল। বাক্স খুলিয়া একটা রঙীন রুমাল-বাঁধা কাগজের বাণ্ডিল বাহির করিল। সেই বাণ্ডিলে তিনবৎসর আগেকার চিঠি জমানো ছিল। জ্যোতি বাপের বাড়ী থাকিতে স্বরেশ এই পত্রগুলি লিখিয়াছিল। একটি বালিশ মাথায় দিয়া মাহুরের উপর শুইয়া পড়িয়া জ্যোতি পত্র পড়িতে লাগিল।

পত্রে লেখকের কি গভীর আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতির মনের মধ্যে গতদিনের মধুর উজ্জল স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সেই প্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ দিনরাত্রিগুলি আজও তাহার মনে নবীন হইয়া বিরাজ করিতেছে। জীবনে সে কখনও তাহা তুলিয়া যাইবে না। জ্যোতি ভাবিল আমি কি বোকা! স্বামীর প্রেমে সন্দ্বিষ্ট হইয়া ছুঃখ পাইতেছি। একবার ভাবিয়া দেখি না, এমন প্রেম কি পুরানো হইতে পারে? স্বামী আজকাল বেশী কথা কহে না, আদর করে না, ঘরে একটু বসিতে চাহে না, এসব জ্যোতি খুব লক্ষ্য করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, স্বামী বুঝি আগের মতন ভালোবাসে না। এখন তাহার মনে হইল, কাজকর্ম আছে বলিয়াই স্বামী সময় পায় না, কিন্তু মনের সেই ভালোবাসা তাহার কখনও ফুরাইয়া যায় নাই।

মনের লুপ্তপ্রায় আনন্দ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল। এক নূতন আলোকে তাহার আবার হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিল। জ্যোতির মনে হইল, সে যেন তিন বৎসর পূর্বকার বালিকাবধু, স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ সংসারের চিন্তাশূন্য—স্বরেশের মূর্ত কল্পনালক্ষ্মী—! স্বপ্নের আবেশে তাহার চোখ মুদ্রিয়া আসিল।

“দোর খোলো—”

জ্যোতি চমকিয়া উঠিয়া বসিল; প্রায় ছুটিয়া গিয়া ঘর খুলিয়া দিল।

স্বরেশ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সুমিরে পড়েছিলে বুঝি?”

“না।”

“তবু দু’তিনবার ডাকতে হয়েছে”—জ্যোতি নীরব রহিল। স্বরেশ বিছানার দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে কহিল, “ওখানে চিঠিপত্র কিসের?”

জ্যোতি সেগুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, মুহূর্তে বলিল, “ও আমি এমনি পড়ছিলাম”—

স্বরেশের কৌতূহল জাগিল, প্রশ্ন করিল—“কে লিখেছে।”

“তুমিই ত।”

“সেই—পুরোনো চিঠি! ও আবার জমিরে রেখেছে কেন? মেয়েদের এত কবিত্ব? এসব দেখলেই আমার গা জালা করতে থাকে—। আগে যে মেয়েদের লেখাপড়ার বালাই ছিল না—সে বেশ ছিল, আর এখন হয়েছে”—মুহূর্তে কি বলিয়া সে বিছানার ভিতরে প্রবেশ করিল; লেপটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

জ্যোতি অত্যন্ত আহত হইয়া বসিয়া রহিল। কণপূর্বে মনের মধ্যে যে একটা স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল স্বামীর কথার পর তাহা যে কোন্ শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল, জ্যোতি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

আস্তে-আস্তে উঠিয়া সে আলোটা টেবিলের ওধারে আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। তা’র পর নিঃশব্দে শয্যা উঠিয়া নন্দকে পুকে টানিয়া লইল।

অতিশয় মুহূর্তে ভাবিল, “ওগো—” স্বরেশ বিরক্ত ভাবে কহিল, “কি হ’ল আবার?”

“হয়নি কিছু, ঘুমোওনি দেখাচ্ছি, তাই বলছিলাম—”

“কি?”

“কি দেখে এলে পন্ন করো না একটু। বেশ ভালো নয়?”

স্বরেশ উত্യാক্তকণ্ঠে কহিল, “হাঁ, খুব ভালো। এখ আর আমি বক্তে পারিনে! রাত একটা বেজে গেছে আবার কাল সাড়ে ন’টায় বেরতে হবে ত।”

জ্যোতি কোমল অহনয়ের স্বরে বলিতে গেল, “আগে
ত সারারাত—”

“হ্যা, হ্যা, জানি জানি, সে আর আমাকে মনে
করিয়ে দিতে হবে না, কিন্তু গেছনের দিকে চেয়ে কারা
আমার স্বভাব নয়। তোমার ইচ্ছে হয় কোনো—কিন্তু
আমায় জালিও না। কাল থেকে আমি নীচের ঘরেই
শোবো, রোজ জালাতন।”

আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও জ্যোতি কাঁদিতে পারিল
না। স্তম্ভিত অশ্রুহীননেত্রে নীরব হইয়া রহিল।
তাহার জীবন-গ্রন্থের এক নূতন পৃষ্ঠা তাহার নয়ন-
সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তাহাতে কবিতার বাস্পও
ছিল না।

তিন

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হারিসন রোডের
উপর একখানি নাতিবৃহৎ দ্বিতল অষ্টালিকার সম্মুখে
একখানি বগী গাড়ী আসিয়া থামিল।

শ্রোতৃ গৃহস্থানী গাড়ী হইতে নামিয়াই গম্ভীরস্বরে
ভাকিলেন, “নিমাই—”

তৃত্য নিমাই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাগজপত্র
তৃত্যের হাতে দিয়া বাবুটি উপরে উঠিয়া গেলেন।

অনেক দিন আগের কথা। কি গোলমাল হওয়ার
স্বরেশচন্দ্র “ব্যাকের” কেরানীগিরি ছাড়িয়া দিয়া পাটের
কাব্বার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই কাব্বারে প্রচুর
লাভ করিয়া তিনি যথেষ্ট ধন ও খ্যাতি অর্জন করেন।
আজ ‘ব্যবসায়ী’ বলিয়া সহরে সকলেই তাঁহার নাম
জানে।

আমহাট্ট্ ট্রাটে স্বরেশচন্দ্র এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ
করাইতেছেন, সম্প্রতি ভাড়াটে বাড়ীতে আছেন।

দ্বিতলের দালানে দুইটি বালকবালিকা খেলা
করিতেছিল। পিতাকে দেখিয়া তাহারা খেলা বন্ধ
করিয়া দিল। স্বরেশ কিন্তু উহাদের বড় লক্ষ্য করিলেন
না; একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া পোষাক পরিবর্তন
করিলেন। ছাদের উপর বসিয়া খোলা গারে হাত পাখার
হাওয়া খাইতে লাগিলেন। ভাত্রমাসের অপরাহ্ন; ভারি
গরম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ভাকিলেন, “রাধু—”

দালানের ক্রীড়ারতা বালিকাটি ছুটিয়া আসিল।
স্বরেশ কহিলেন, “তোমার মা কোথা রাধু! আমার
খাবার দিতে বল।”

রাধু সভয়ে কহিল, “মা যে কলঘরে গেছেন।
ভাকব কি?”

“না না, তবে থাকগে। পিসিমা কই!”

রাধু উত্তর দিবার পূর্বেই একটি বয়স্ক স্ত্রীশাক্তী বিধবা
খাদ্যজবাহন্তে ঘর-পথে দেখা দিলেন। বালিকার দিকে
চাহিয়া কহিলেন।

“রাধু, ওই আসনখানা পেতে দে, আর ভাঁড়ার ঘর
পাথরের গেলাসে সরবত রেখে এসেছি নিয়ে আর। স্বপ্ন
তুই খেতে বোস, মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। সারারাত
দিন খাটুনি! আমি কি আর এখন পারি, বাবা? বৌমাকে
কতবার বলেছি তোমার খাবারটা শুছিয়ে
রেখে তবে,—দেখ্ দেখি সরবতটা ঠিক হয়েছে কি
না।”

স্বরেশ গ্লাসে চুমুক দিয়া কহিলেন, “চমৎকার হয়েছে
পিসিমা।”

“হ’লেই ভাল; ও বৌমা। গা ধোয়া হ’ল বাছা!
তবে একবার এদিকে এসো। আমি আবার চাল-ডাল
বার করে আসিনি—ঠাকুর ব’সে আছে।”

পিসিমা চলিয়া গেলেন। বজ্রালকার ও শূল শরীরের
গুরুচাপে মন্থরগামিনী যে মহিলা কক্ষে প্রবেশ করিলেন
তাহাকে অতীত দিবসের কিশোরী জ্যোতির্ধরী বলিয়া
চিনিতে পারা অতিশয় শক্ত।

স্বরেশের আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল। জ্যোতির্ধরী
বোধ করি শূল দেহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই গম্ভীর-
স্বরে কহিলেন, “বাড়ী দে’খে এলে? চূণ দেওয়া
হয়েছে?”

স্বরেশ তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে কহিলেন,
“তেতালার একটুখানি বাকী রয়েছে, হ’য়ে যাবে
শীগুগিরই—”

“হচ্ছে কই? একেবারে বিরক্তি ধ’রে গেছে। এই
একটুখানি বাড়ীতে কি এতজনের কুলোর, একটা বড়

বাড়ী কি ভাড়া নেওয়া চলত না। বেছে-বেছে এই—”

স্বরেশ বাধা দিয়া কহিলেন “তখন ত বড় বাড়ী পাওয়াই গেল না।”

“চেঁটাও বড় হয়েছিল।”

বড় বাড়ীর জন্য অনেক চেঁটা হইয়াছিল, এবং এখনও সেকথা স্বরেশের বেশ মনে ছিল। কিন্তু জীর বখার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কাবণ বহুদিন ধরিয়াই তিনি জীব সহিত সমস্ত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আসিতেছেন, আজও যে জয়লাভ করিবেন এমন ছুঁশা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, তাই নিস্তরক বহিলেন।

• জ্যোতির্ধরী কহিলেন, “এ মাসে আমার সঁসাব ধরচের উপর একশ-খানেক টাকা বেশী লাগবে।”

স্বরেশ জিজ্ঞাসা কবিত্তে যাইতেছিলেন, “কেন?” কিন্তু কি ভাবিয়া জিহ্বা সঘরণ কবিলেন। কোনো উত্তর না পাইয়া গৃহিণী কহিলেন, “পাকলের সাধ দেবো ভাব্চি— একশ টাকায় কুলোলে হয়। কি বলো, দিতে হবে না?”

স্বরেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, “তা দিতে হবে বই কি।”

পাকল গৃহিণীর আত্মপুত্রী। গৃহিণী কহিলেন, ‘নন্দব দুটো আমা কবাত্তে হবে। সামনে শীত—মোটো কাপড়ের দুটো কোট ব’রে দাও, তুমি নিজে দে’খে দিও—সবারই কাপড়-চোপড় কিছু লাগবে, এ-মাসে তুমি ছেলেমেয়েদের আমাকাপড় তৈরি ব’বাব সঙ্গে কিছু টাকা আমার হাতে দিও। পূজোর এখনো একমাস—ততদিন কি এতে চলবে! আমার শাড়ী দু’জোড়া—মাধুর লাগবে—সেমিজ দুটো চাই—আমি সব নিজেই করাবো, তুমি টাকা দিও।”

“নিও।”

কিছুক্ষণ সব নিস্তরক, কেবল স্বরেশের গড়গড়ার শব্দ শানা যাইতেছে। গৃহিণী আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, রজাব কাছে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন। “হ্যাঁ দেখ, কাপড়ের টাকা না হয় দু’দিন পরেই দিলে, তা’তে আটকাচ্ছে না—কিন্তু কাল আমাকে টাকা-কুড়ি দিতেই হবে যে—”

জ্যোতির্ধরীর শ্রীহীন মাংসলমুখে এই অহুনের ব্যর্থ প্রয়াস এমন বিস্তী দেখাইল যে, স্বরেশের মতন নীরস কঠিন কারুবারী ব্যক্তির চোখেও অদ্ভুত ঠেবিল। তিনি মুখটা ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন—“কেন?”

“আজ দুপুর বেলা—লাহিড়ীঘের বাড়ীর সব এসেছিল, কাল ওরা বাংলা-বাগ্গোপে যাবে, আমিও যাবো কথা দিয়েছি, ওরা ত বন্ধ ছাড়া বসবে না, তা আমি কি ওদের সঙ্গে গিয়ে দু’এক টাকায় বসব?”

স্বরেশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “তা কি কুড়ি টাকায় লাগবে?”

“লাগবে না কেমন ব’রে শুনি। আমি, রাধু, আব পাকলকেও তু’লে নেবো ভেবেছি, পোয়াতী মেয়ে—তিন-জনের হ’ল বাবো টাকা, ঝিএব চার আনা, তা’র পর গাড়ীভাড়া, পান, জলখাবাব—কুড়িটাকা এমন বেশী কি?”

“না, তা আর বেশী কি।”

“তা হ’লে দেবে ত?”

“দেওয়া আর কি! নিয়ো। নন্দাকে যে দেখেছিনে! ইচ্ছল থেকে আসেনি।”

“হ্যাঁ, সে বেরিয়ে গেছে।”

“খেলতে বুঝি?”

“না, খেলতে নয়। পূজোর সময় সব ছেলেরা খিয়েটাব ব’বে কিনা, নন্দও ওবি মধ্যে আছে—”

স্বরেশ মুহূর্ত্তে কহিলেন, “আছে বুঝতে পাবলাম, কিন্তু সামনে পরীক্ষা যে।”

“তা’তে হয়েছে কি। ছেলেমাছর দুটিছাটাতে একটু আমোর ব’বে না; তুমি এই নিয়ে ওকে বোকো না কিছু।”

“না। কিন্তু ফেল হ’লে—”

গৃহিণী সগর্বে ভদ্রী করিয়া কহিলেন, “কেল্ আমার ছেলে হবে না।”

স্বরেশ কহিলেন, “ভালো।”

জ্যোতির্ধরী আবার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় স্বরেশ সহসা কহিলেন “ভালো কথা,

লোহার সিঁড়কের চাবিটে দিও ত, একটা দলিল খুঁজে পাচ্চিনে, পুরোনো কাগজের বাক্সটা—”

“অবাক্ করলে! সে বাক্সে কতগুলো ছেঁড়া পাতা ও ছাইমাথা চিঠি জমানো আছে—একদিন পুড়িয়ে কেলতে হবে। ওর মধ্যে দলিল! এ কি আজকের বাক্স?”

“চাবিটে তুমি দিও তো।”

“বেয়াড়া ইচ্ছে যত!” বলিয়া আঁচল হইতে চাবির গোছা বনাৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া জ্যোতি বাহির হইয়া গেলেন।

সেই রাতে স্বরেশচন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরে একাকী বসিয়া আছেন। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো; ফলেজের নোট, কবিতার খাতা, ধোপার হিসাব, বন্ধুর হবি, প্রিয়ার পত্র, বিশ্বত যৌবনের রঙীন স্মৃতি! একখানা খাতার পাতা খোলা, প্রথমটা এইরকম আরম্ভ, ‘ওগো আমার মূর্ত্তিমতি কল্পনালব্ধি—’

স্বরেশচন্দ্র অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন। বহু যত্নে চনা করিয়া যাহা একদিন প্রেমসীর হাতে দিয়াছিলেম, আজ তাহা পাগলের অর্ধহীন প্রলাপের মতন বোধ হইতেছে; কি আশ্চর্য্য, যে-মুখ এতদিন সৌন্দর্য্যে তুলনীয় বোধ হইয়াছিল, আজ তাহা কি মাংসপিণ্ডে রিণত হইয়াছে! কেমন করিয়া দিনে-দিনে তিলে-তলে স্ত্রীর দেহে-মনে এই বিষম পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা তিনি কখনো ভাবিয়া দেখেন নাই। সেই লজ্জা-কুণ্ঠিত, হাসিনী, আদেশ-পালনে অভ্যস্ত নতশির তরুণীমূর্ত্তি রাখায় গেল! তাহার একটু হান্তে ক্রোধে বা বাক্যে হার দিবসের ভাগ্য নিরূপিত হইত, সে জ্যোতি কই!। যেন গুপ্তজীবনের স্মৃতি! একটা স্বপ্ন! কবেকার ধা—একে-একে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, ব্যবসায় পিয়া উঠিল, টাকাকড়ির কোনো অভাব রহিল না, এবং ই সম্পদের দিনে তিনি না জানিয়া আপনার শাসনদণ্ড-নি স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করিলেন। তা’র পর হইতে তিনি ঠাটা অর্ধ-অর্জনের বহুমায়ে পরিণত হইয়াছেন! প্রতিদিনী টাকার কাঙাল; বড় বাড়ী, জুড়ীগাড়ী, কার, শাড়ীজামা, থিয়েটার ব্যয়স্কোপ, নিয়ন্ত্রণ-আয়ন্ত্রণ,

এইসব তাহার কামনার জিনিষ! কোনো মতে স্বামীর নিকট টাকা আদায় করা তাহার জীবনের ব্রত।

বেচারী স্বরেশ! স্ত্রীর নিকটে তিনি টাকার ব্যাপার ছাড়া আর সব বিষয়েই নিতান্ত মূল্যহীন; সন্তানরাও ত তাহাকে বড় একটা গ্রাছ করে না। বলিতে গেলে তাদের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্কই নাই। এই তাহার পরিবার! এই তাহার জীবন! অথচ প্রতিদিন কত-জনে তাহাকে পরমস্বামী বলিয়া অভিনন্দন করে! তিনি স্বামী! স্বরেশচন্দ্রের মনে হইল, এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। সকলে তাঁহাকে উপহাস করে নাকি! তাহার কাবুখানার বিরাট লৌহযন্ত্রের মতন তাঁর হৃদয়টা—অবিশ্রাম চাকা ঘুরিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। রাশি-রাশি রক্তচক্র বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই সম্পদে যন্ত্রের কোনো অধিকার নাই; ভোগ করিবে কাহারো? রক্ত-সম্বন্ধে যাহারা তাঁহার অতি আপনার, অথচ যাহাদের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক নাই, তাহারাই দুই হাতে এই টাকা লুট করিবে!

সমস্ত জীবনটা অদ্ভুত প্রহেলিকার মতন বোধ হইল।

স্বরেশ ধীরে-ধীরে উঠিলেন। একখানা ধারালো কাঁচি লইয়া “জীবন-কাব্যের” খাতাখানি কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখচোখ ঘৃণা ও বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তা’র পর তিনি আলো নিবাইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি শিশুসন্তানকে পার্শ্বে লইয়া শুলকায় জ্যোতির্ময়ী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাহার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া স্বরেশচন্দ্র হতবুদ্ধির মতন ভাবিতে লাগিলেন। এ কে অপরিচিতা নারী! ইহাকে যেন তিনি জীবনেও জানেন না। অনায়াসে তাঁহার উপর সর্বময় প্রভুত্ব করিয়া তাঁহার গৃহ, তাঁহার সন্তান, তাঁহার সর্বস্ব অধিকার করিয়া এ কে নিশ্চিন্তচিত্তে নিশীথের গাঢ় নিদ্রা-স্বপ্ন উপভোগ করিতেছে।

স্বরেশের মাথা বিম্ব বিম্ব করিয়া উঠিল। তিনি কুঁজা হইতে একপায়ে জল ঢালিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। মুখচোখে শীতল হস্ত বুলাইলেন; তা’র পর ধীরে-ধীরে বিনা-শব্দে শয়্যার একপার্শ্বে শয়ন

করিলেন। খোলা জানালার পাশ দিয়া একটা নিশাচর পাখী পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। স্বরেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন।

খুব সকালেই বাহির হওয়া গৃহস্থায়ীর অভ্যাস। ছয়ারের সামনে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; ঘোড়াটা থাকিয়া-থাকিয়া খুরের শব্দ করিতেছে, যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বরেশচন্দ্র মহাব্যস্তভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে; মহানগরী বিচিত্র ধ্বনিতে মুখরিত; রাজপথে প্রতিদিনের জনতা। রাজির আঁধার কাটিয়া প্রভাতের নবীন আলোকে চারিদিক্ অল্পরঞ্জিত হইয়াছে। মাহুকের মনে নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রবলতম ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে।

স্বরেশচন্দ্রের মনেও কঠিন বাস্তব সংসারের চেহারা জাগিতেছিল। কারখানার প্রকাণ্ড লৌহঘট্টা তাঁহার

চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে কাব্য ও কল্পনার কোনো স্বদূর আভাসও বর্তমান ছিল না; কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তিরই থাকে না।

প্রায় শেষ সিঁড়ির ধাপে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে উপরের ঘরে বিরাহুকায়ী গৃহিনীর মোটা গলায় স্বর বাজিয়া উঠিল। “হরি, এ-ঘরখানা কাগজ কেটে নোংরা করলে কে রে।”

হরি সালুনাসিককণ্ঠে কহিল, “আমি না মা—”

“তুমি না! বটে! আচ্ছা, মজা বা’র করুচি, দাঁড়াও—ঘরটা আগে পরিষ্কার করাই। নিমাই, নিমাই—”

স্বরেশচন্দ্রের ঘন গৌপের তলায় মূহূহাস্য খেলিয়া গেল। কাল রাত্তির ছেলেমাহুঘিটা ছেলেমাহুঘেরই উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। তিনি একরকম পলায়িত বন্দীর মতন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আত্মদান

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

নিষ্ঠুর নরের হাতে যারা দিল প্রাণ,
স্বাস্থ শাসনের লাগি’ যার’ দিল শির,
কুঠারের তীক্ষ্ণ মুখে ঘাতক, অধীর,
যাহাদের গুণ্য রক্ত করি’ গেল পান,
তাহাদের ভেজোময় তীব্র জয়গান
দেশ হ’তে মহাদেশে বহিছে সমীর।
মন্দির গড়িছে নর তাদের স্মৃতির।
অমর করিছে নর সেই আত্মদান।
সেইসব জ্যোতির্ধর, নির্ভীক চরিত
শান্তির কুটিল আঁধি উপেক্ষিয়া ধীরে,
পেয়ে গেছে চিরদিন প্রাণের সঙ্গীত;
স্বমধুর স্বর তা’র সঞ্চারিয়া করে।
সেই গুহর জয়গাথা কালের সরিৎ
নিরে যার স্বমহান্ ভবিষ্যৎ-নীরে।

প্রেমের মধুর আলো তাদের লগাটে
পড়িয়া লিখিয়া দেছে দীপ্ত জয়টীকা।
তাহাদের শাস্ত নেত্র তীব্র, ক্রব শিখা—
সত্যের দেবতা ছিল জন্মের পাটে।
কাটিয়া পড়ুক শির, সত্যেরে কে কাটে?
চিরদিন দীপ্ত র’বে জয়পত্রলিখা,
জাতির মরণে সে যে প্রাণ-সঞ্চারিকা।
নব-নব দধীচির জন্ম-কবাটে
লাগিবে আঘাত তা’র তীব্র কলরোলে;
নবীন মুক্তির দূত সেই ত্যাগ স্মরি’
হাসিবে মধুর হাস্ত; সে কি কতু ভোলে
আত্মার চরম দান? কতু কি আবরি’
রাখে তা’রে বিশ্বতির অন্ধকার-কোলে?
বীরস্ব অমর হয় বধুকুমে মরি’!

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওহুদ, এম্-এ

(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অন্তর্গত)

সোনার তরী

‘মানসীর’ যুগের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বড় পরিবর্তন এসেছিল। এতদিন শুধু একগা-মনে কবির জীবন তিনি বাপন করছিলেন। ‘সোনার তরী’ বে-যুগের লেখা, তখন তিনি জন্মদারী কাছের ব্যপদেশে বৃহৎ বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর পতীর সরল প্রকৃতি এই বিপুল বাহিরকে হজম করে যে কি অদৌকিক পরিপুষ্টি লাভ করেছে, ‘সোনার তরী’ ‘গল্পগুচ্ছ’ ‘চিহ্না’ প্রভৃতি তাঁর দৃষ্টান্ত। এই যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ‘সাধনার যুগ’ নামে খ্যাত, এবং অনেকের বিশ্বাস এই যুগই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা পরে করব।

মানসীর যুগের সঙ্গে সোনার তরী, চিহ্না ইত্যাদির যুগের বেশী পার্থক্য রয়েছে। সোনার তরী প্রভৃতির কবিজন্ম নিশ্চয়ই পূর্ণতর, পরিপুষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের যে ভীক্স অশুভুতি আর সন্ধান তা যেন এখানে এক পরম সৌন্দর্য্যময় প্রকাশে নিজের সার্থকতা উপলব্ধি করেছে। তাই সোনার তরী, চিহ্না, গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির ভাল শক্তিমান আনন্দময় স্রষ্টার ভাব; ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্তের অন্তরের সৌন্দর্য্য আর সত্য কবি নিবিড়ভাবে অনুভব করছেন, আর এক অপূর্ব্ব ছন্দে সে-সব শরীরী হয়ে উঠছে।

কিন্তু মানসীর যুগ সাধারণতঃ সজ্ঞাতের যুগ। যে অশুভুতি কবির মনে জাগতে তা ভীক্স; সৌন্দর্য্যও তাঁর চোখে কুটে উঠেছে নানা রেখা ও বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে; কিন্তু এসব সূক্তির নতো গ’ড়ে তোলার দিকে কবির তত চেষ্টা নয়, বত এর সৌন্দর্য্য-আবেগে নিজে মেতে ওঠা—নৃত্য করা। এই আনন্দময়, আবেগময় বেদনাময় কবিজন্মের স্পর্শ বাদের কাছে অপূর্ব্ব ‘মানসী’ তাঁদের প্রিয় কাব্য।

রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ-ভঙ্গির এই দুইরূপ—রহস্যময় বংশীবাদকের রূপ, আর সমাহিত স্রষ্টার রূপ—শুধু তাঁর যৌবনের রচনার নয়, পরে পরের রচনারও প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে মানসী, কল্পনা, কপিকা, বেদনা, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি, অন্যদিকে সোনার তরী, চিহ্না, চিত্রাঙ্গনা, চৈতালি, কথা, কাহিনী, নৈবেদ্য, বলাকা, প্রভৃতি দাঁড় করিয়ে আমরা এই কথা বলছি।

শুধু নিজের মনে বন্ধ না থেকে বৃহৎ জগতে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে কবির মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগছিল, সোনার তরীতে তা কতকটা সার্থক হয়েছে। কতকটা বলছি এই জন্যে যে, বে-জগতে এখন যু’রে-কি’রে তিনি ভুঞ্জি পাচ্ছেন গ্যটের মেকিস্টোকিনিস্‌এর ভাবার তা ক্ষুদ্র জগৎ (Little World) (রবীন্দ্র-প্রতিভার জগৎ যে তা Little World তা পরে দেখব।) সংসারের নানা যু’র তাঁর চিন্তে এখন কিছু অবশ্যিকার পেয়েছে। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের যে একটি আনন্দময় রূপ আছে সেটি কবির চোখে পড়েছে।

আমাদের বৈরাগ্য-প্রপীড়িত তামসিক জীবন-মাত্রার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ভীক্স প্রতিবাদ, ‘সোনার তরী’ কাব্যেই তাঁর প্রথম সূচনা নয়; কিন্তু যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে কবি এই প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর

প্রথম পর্যাপ্ত উপলব্ধি দেখতে পাই এই সোনার তরীতে, আর এই সোনার তরীর যুগের পরও। ‘আকাশের চাঁদ’ কবিতাটিতে দেখছি, এক অকৃত সাধক আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার খেয়ালে আর-সব দিকে উদাসীন হ’রে শুধু নিজের খেয়াল মতোই চলেছিল; শেষে তাঁর চোখ পড়ল প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-ভুলতার উপর, সে দেখলে, এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা-ভুলতার বুকে কি অমৃত লুকানো রয়েছে! অর্থাৎ দেশেরই জড়তাগ্রস্ত খেয়ালী-চিন্তকে প্রাত্যহিক জীবনের তিতরকার অমৃতের সন্ধান কবি দিচ্ছেন।

এমন সময়ে সহসা কি ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী স্তমল মধুর
স্বনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো-ছোটো তরী পাল তুলে বার
মারি ব’সে গার গান।

* * *
দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
স্বন্দর লোকালয়,
প্রতিদিবসের ফরসে-বিবাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহ-সুখা ল’রে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর
প্রতিদিবসের কাজে।

* * *
ছোটো-ছোটো ফুল, ছোটো-ছোটো হাসি,
ছোটো কথা, ছোটো স্বপ্ন,
প্রতিনিয়মের ভালোবাসাগুলি,
ছোটো-ছোটো হাসিমুখ।
আপনা-আপনি উঠিছে কুটির
মানবজীবন ঘিরি’
বিজ্ঞান শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে কিরি’-কিরি’।

* * *
প্রত্যন্ত সঙ্গীতের ‘প্রত্যন্ত উৎসব’ কবিতাটি এই ‘আকাশের চাঁদ’ কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে, কেন আমরা বলতে চাই ‘প্রত্যন্ত সঙ্গীতে’ আবেগময় কবিজন্মের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু স্রষ্টাকে পাইনে।

স্রাগতিক জীবন, ঐতিহাসিক জীবন-যাত্রা যে অমৃতময়, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাধনার এ এক বড় সত্যের উদ্ঘাটন। এ-সত্যের দর্শন কবি পেরেছেন বহু পরে, “নৈবেদ্য” কাব্যে—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি
সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মারের মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।.....

কিন্তু কতরূপে কতভাবে যে কবি বারবার এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন, কাব্যরসিক ও সত্যজিজ্ঞাসু—ছুরেরই তা অনুধাবনের বিষয়। এই-ই “সোনার তরী” কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতরকার কথা; আর পরশুচ্ছে এ-সত্য যে-ভাবে অপরিণীত রেখা ও বর্ণবৈচিত্র্যে মুর্ত হ’য়ে আছে বাংলা-সাহিত্য কেন, জগতের সাহিত্যে তা গৌরবের বস্তু।

সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যের জ্ঞান এইসব গল্পেও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সুপরিষ্কৃত। কিন্তু সেই গভীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টির সামনেই মাঝে-মাঝে এমন-এক সত্য মুক্তি ধ’রে উঠেছে, কথা-সাহিত্যে বা সাধারণত অতি ছল্লভ। আমরা শুধু নিখুঁত চরিত্র-সৃষ্টির কথাই বলছি; অবশ্য চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা চিরদিনই শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক’রে আসছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই, কবি তাঁর নিপুল সৌন্দর্য্যবোধের পটে যেভাবে চরিত্রসৃষ্টি করেছেন তাতে চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নতুন সত্য প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বৈচিত্র্য খুবই লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু একঘর ঘর মূলে নেই; সে-বৈচিত্র্য অসুন্দর—অর্থহীন। অর্থাৎ বৈচিত্র্যকে একঘের বৃত্তের উপর ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সৃষ্টি হয় না। ইউরোপীয় সাহিত্যে “জীবন”রূপ এক সহজ প্রবল অথচ রহস্যময় ব্যাপার সেই একঘের সূত্র হোগাচ্ছে। সেক্সপীয়ার প্রভৃতির মতন বিরাট শক্তিধরদের কথা বাদ দিলে তাঁদের চাইতে অনেক হালকা যে সৃষ্টি বা ছুমা, তাঁদের লেখাতেও দেখছি, এই “জীবন” সব বৈচিত্র্যের মূলে রস হোগাচ্ছে, সব বৈচিত্র্যকে সাজিয়ে তুলছে। আমাদের সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য জাতীয় জীবনের দৈন্তের ভঙ্গ যে অনেক জায়গায় হৃত্রী, অনেক সময়ে অর্থহীন সামিক সাহিত্যের পাঠকেরা তা লক্ষ্য ক’রে থাকবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পে দেখছি, কবি পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিত্তি যে “জীবন” তা’কে আত্মনাৎ আর অভিক্রম ক’রে তাঁর গভীর সৌন্দর্য্য-অনুভূতির সাহায্যে পাঠককে আত্মার দ্বারদেশে পৌঁছে দিতে পারছেন। অবশ্য সবখানেই যে সেটি সম্ভবপর হয়েছে তা নয়; কিন্তু যেখানে কবি পাঠককে সেই অভলে পৌঁছে দিতে পারছেন না, সেখানেও এমন-এক সৌন্দর্য্যের পরিমণ্ডলে নারক-নারিকাদের দাঁড় করানো যে, তাদের অতি সাধারণ কথা, কাজ, অতি সাধারণ ঘটনাও, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হ’য়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নলিনীকান্ত ভণ্ডের কথার বলা যেতে পারে, কবি এখানে Realistও নন, Idealistও নন, তিনি এক অসাধারণ ক্ষমতার সত্যজ্ঞী। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলো এবং ছোটগল্পের অস্তিত্ব বই থেকে এর বৃষ্টি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা অল্প কয়েকটিকে পাঠকদের সামনে দাঁড় করাই—থোকা বাবু গল্পের রাইচরণ, পোটমাস্টার গল্পের রতন আর তাঁর শেষ বয়সের হৈমন্তী। এইসব নারক-নারিকার প্রতি একটুখানি সহানুভূতি আকর্ষণ করাই কবির সব সাধ নয়। তিনি এদের সব স্থূলতা, মূর্ততা, অক্ষমতা আত্মার জ্যোতিতে জ্বলান ক’রে তুলেছেন।

সোনার তরীতে রবীন্দ্রপ্রতিভা যেন বান ডাকতে চাচ্ছে। এখানে এক মহা-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কবিজ্ঞদের আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত—ভাব, হৃদয়, সমস্তের ধারণা সমস্তই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। আর তাঁর নিপুল সৌন্দর্য্যানুভূতি সূত্র-কেনার মতনই এক নিঃসৃত্ত বস্তুধারী রচনা করেছে। কিন্তু

সৃষ্টি-হিসাবে সোনার তরীর খুব বেশী কবিতা অনবস্ত নয়। কবি চোখে লেগে রয়েছে সৌন্দর্য্যের কেমন-এক স্বপ্নাবেশ; তাই এখনকা বিশালতর গভীরতর কবিপ্রতিভার যে সৃষ্টি-মাহাত্ম্য লাভ করা উচিত ছিল, তা কিছু বিলম্বিত হয়েছে। সোনার তরীর মানস-সুন্দরী কবিতাটিকে কি অক্লুত সৌন্দর্য্যপূর্ণ। কিন্তু এই পুলায়ও লেগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথে সেই প্রকৃতিগত রহস্যের সন্ধান।

এর “বৈকব কবিতা”র কবি তাঁর কথাটি কত স্পষ্ট ক’রেই বলেছেন আগে “আকাশের টাদ” কবিতাটি যে আমরা আংশিক উদ্ধৃত করেছি তাঁর চাইতে এর প্রকাশ-ভঙ্গিমা অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। দেশে প্রচলিত মতবিশ্বাসের মোহ কবি কতটা এড়িয়ে উঠেছেন তাঁরও স্পষ্ট পরিচয় এতে রয়েছে।

শুধু বৈকবের তরে বৈকবের গান ?
পূর্বরাগ, অমুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা.....

.....একি শুধু দেবতার ?

.....আমাদেরই কুটীর-কাননে
ফোটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাগে প্রিয়জন-তরে—তাতে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতকার
গাথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে বাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে বাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

সোনার তরীর “যেতে নাহি দিব” কবিতাটি বাস্তবিকই এক অপূর্ণ সৃষ্টি। সমস্ত “সোনার তরী” কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি।

“মানসী”তে দেখেছি কবি নিষ্ঠুর সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু জগতের কাঁচা কোমল প্রাণের সঙ্গে তাঁর যে চিরসংগ্রাম তাঁর কলাকল কি, সে-কথাটি তাঁর দৃষ্টিতে তেমন ফুটে ওঠেনি। এই “যেতে নাহি দিব” কবিতার সেটি অপূর্ণ সৃষ্টিতে বিকশিত হ’য়ে উঠেছে।

* * *

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন “যেতে নাহি দিব।” হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ’লে যায়।

* * *

.....তবু প্রেম বলে’
“সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেরেছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।” তাই কীতবুকে
সর্বগতি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া স্বকুমার কীণ তমুলতা
বলে, “স্বত্ব্য তুমি মাই।”—হেন গর্ভকথা।

মৃত্যু হাঙ্গামে বসি' । মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিবরণ নয়ন'পরে
অক্ষবাস্পসম, প্যাকুল আশঙ্কাতরে
চিরকম্পমান । * *

মেঠো হুরে কীমে ঘেন অনন্তের বাঁশি
বিষের প্রান্তর-মাঝে ; স্তনিয়া উদাসী
বহুক্ষর! বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌজপীঠ হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাধরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী ।
দেখিলাম তাঁর সেই স্নান মুখখানি
সেই ঘরপ্রান্তে লীন, শুক সন্ন্যাসিত
মোর চারি বৎসরের কস্তুরির মতো !

ভাসার শাণিত দীপ্তিতে, সবল ছন্দোগতিতে দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ও
অব্যর্থতার রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যে এটি অন্ততম, সে-সম্বন্ধে কেউ
প্রিয়মত পোষণ করবেন কি না জানিনে । সোনার তরীর “পুরুষার”
কাব্যতাটির অনেক জায়গায় কবি নিজের কথা এমন চমৎকার ভঙ্গিতে
প্রকাশ করেছেন, ছোটোখাটো সত্য এমন পূর্ণভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে যে,
তা'রই জন্য এ-কবিতাটি চিরকাল পাঠকের হৃদয়রঞ্জন করবে । এর
বাণী-বন্দনাটি কত সুন্দর । কবি-প্রতিভার গিতরে কি-একটি নির্লিপ্ততা
বা আত্মসম্পূর্ণতা আছে, যার গুণে কবি শ্রষ্টা ; তা'র কি চমৎকার বর্ণনা
কবি দিয়েছেন—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেবে প্রকাশে নিমেবে সিলায়,
বালুকায় পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের পেলা !

জগতের বত রাজা-মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখরূপ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা ।

তা'র মাঝে শুধু ধ্বনিতেছে হুর,
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন মগনভঙ্গ ।

যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসারে দিগেছে স্বপ্ন-ভঙ্গী,
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসার-কোলাহল ।

* * *

বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে জুলাও জননী,
কে বড় কে ছোটো কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে ।

* * *

তুমি মানসের মাঝখানে আসি'
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি',
কুলবরণ সুন্দর হাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি ।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশি তারা,
সারি-সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পাশ্ব বাহারা
ভব সঙ্গীত শ্রোতে ।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে চন্দ্রে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধু খুলি' কেশজাল
নাচে দশদিক্‌ হ'তে ।

জগতের কি কাজে লাগতে কবির সাধ যায় সে-সম্বন্ধে কবি বাণীর
কাছে আর্থনা জানাচ্ছেন—

লক্ষ্মণের সঙ্গীতে মাণা
সুন্দর ধরাতল ।
এ-ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ-প্রতিবাদ,

* * *

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাঁড় তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণ-মন খুলি
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে

অস্পর্শ হতে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত-রসধারা করি সিকন
সংসার-খুলিআলে

* * *

ধরণীর তলে, পূর্ণনের গায়,
সাপরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আশ্রয়
রঞ্জন করিয়া দিব ।

সংসার-মাঝে ছুরেকটি হুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর
ছুরেকটি কাটা করি দিব দূর
তা'র পর ছুটি নিব ।

সুখহাসি আরো হবে উজ্জল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ-সুখমাধা বাসগৃহভল
আরো আপনার হবে ।

প্রেরণী নারীর নয়নে-অধরে,
আরেকটু মধু দিয়ে যাবো তা'রে
আরেকটু স্নেহ শিশু-মুখপরে
শিশিরের মতো র'বে ।

রবীন্দ্রনাথের নিছক সৌন্দর্য-পূজার নিশ্চয় এ এক অসাধারণ
সার্থকতা । তাঁর নিছক সৌন্দর্য্য দৃষ্টির সামনেই মূর্তি ধ'য়ে উঠেছে ; কেমন

সরল অথচ গভীর সত্য। কবি এখানে মানুষের ছোটোখাটো কাজে লাগতে চেয়েছেন। বাস্তবিক, একতিনসাবে কাব্য মানুষের জীবনের এমন ছোটোখাটো কাজেই লাগে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বা মনে হব সামান্য কাজ, মানুষের জীবনের জন্ত তা যে সত্যই কি অসামান্য তা কি বসুবার দরকার হবে ?

সোনার তরীর 'বহুধরা' কবিতাটি সুবিখ্যাত। চিবশ্যাম ধবণীর নিগূঢ় প্রাণরস কবির চিত্তকে বিভ্রাব ক'বে তুলেছে। কবি আবেগতবে বলছেন—

ওগো মা সুখরিনি,
তোমার সৃষ্টিকা-মাঝে বাস্তু হ'বে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিমা
বসন্তের আনন্দেব মতো.....
.....ছিন্নোন্মিলা, মর্দবিধা,
কম্পিমা, ঝলিমা, বিকিরিমা, বিচ্ছুরিমা
শিহরিমা, সর্চকিমা, আলোকে পুলাকে
এবাহিমা চ'লে বাই সমস্ত ভুলোকে
শান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ;

এ কবিতাটিতে বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য 'নিখপ্রকৃতিব' সঙ্গে কবির প'ম নিবিড় যোগ। মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা সঙ্গে তাঁর বেটুকু সহানুভূতি আছে, তা "আঘাত সংঘাত"-পূর্ণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তেমন নয়, নিখপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বতখানি অবিচ্ছেদ্যে যুগ ও'ব' সঙ্গে। সেট আঘাত সংঘাতপূর্ণ বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই এর পবে 'চিত্রা' কাব্যে।

সোনার তরীর শেষের কবিতার দিগন্তনিষ্ঠিত সৌন্দর্যসাগরের বুক কবির যে নিরুদ্দেশ যাত্রা অঙ্কিত তা'ব সৌন্দর্য।

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমার,
অপরিচিতা,—
ওই বেধা অলে সন্ধ্যার কুলে
দিনেব চিত্তা,
বলিতেছে মল তরল অনল,
গলিমা পড়িছে অধরতল,
দিক্‌বধু বেন ছলছল আঁধি
অক্ষতলে,
হোখায় কি আছে আলব তোমাব,
উন্মিষুধর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অন্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাসো শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা বলনা ক'বে কাব্য রসিক আনন্দ পেতে পারেন ; আবার কারো-কারো মনে হতে পারে, এই অপরিচিতার মরনে রয়েছে বনীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার ছাতি।

মোটন উপর সোনার তরীর ভাব আনন্দময় স্রষ্টার ভাব, কিছু বেশী সৌন্দর্য্যাকরতাও তা'তে আছে। কিন্তু শুধু এই-ই নয়। এই সৃষ্টির আনন্দ আর পরম সৌন্দর্য্যাকরতার মধ্যেও আরপার আরপার দেখছি, কি-এক গভীরতার জন্ত কবির আকাঙ্ক্ষা ভেগেছে। "সমুদ্রের প্রতি" কবিতার কবি অনুভব করছেন—

.....মানব-হৃদয়সিঁদুতলে

বেন সব মহাবেশ স্রজন হতেছে গলে-গলে
আপনি সে নাহি জানে, শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল ববেছে তা'রে,.....
তননী যেমন জানে, জঠরের পোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে মেহ জাগে। শুনে যবে ছুঁক ওঠে গুরে।
প্রাণভবা ভাবাহারা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে ; তুমি সিঁদু একান্ত হাসিয়ে
টানিরা নিতেছ যেন মহাবেশে কি নাড়ার টানে
আমার এ-মর্দখানি তোমাব তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুব মতো।.....

'পুলন' কবিতাটিতে কবির চিত্ত বে বিবন মৌল খাচ্ছে, সে শুধু খেয়ালো মৌল নয়।

দে মৌল মৌল।
দে মৌল মৌল।
এ মহা সাগরে তুকান তৌল।
বধুরে আমার পেয়েছি শ্রাবাব
ওয়েছে কোল।
শ্রিয়াবে আমার তুলেছে ভাগারে
প্রভর-গৌল।
বধু শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিলোল।
ভিতরে বাহিরে ভেগেছে আশাব
কি কলোল।

ববি নিতেব হৃদয় যমুনার এমন-এক অতলম্পশ শর্ভীবতা তু'ব কবুচেন যাব হস্তনাম তিনি দিরেচেন মরণ।

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে কাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
সুভ্যাসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

আব কবি নিজে তাঁর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন "বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ত্রুপে আমার কবিতার মধ্যে যখন কুটুতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি কু'ড়ে বাহিরের আকাশে দেখা দিলে, তা'রই উপক্রম দেখি, সোনার তরীর বিষমুভ্যে।"

বিপুল গভীর মধুব মস্ত্রে
কে বাজাবে সেই বাসনা।
উঠিবে চিত্ত করিমা নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বক, মহা আনন্দ
নব সজীতে নৃতন চন্দ
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্রে
জাগাবে নবীন বাসনা।

চিত্রা

এব পর চিত্রাতে দেখি সৃষ্টির আনন্দ আর বাঁশির ব্যথা যুগপৎ কবির হৃদিতে চলেছে। "স্বপ্ন" কবিতার তিনি বলেছেন—



शिव
शिव्या त्रि शक्ति देवी

আজি বহিঃক্ষে
 এনে মোর শান্তিবাণী, মনে হইতেছে
 হৃৎ অতি সহজ সরল, কাননের
 প্রফুল্ল ফুলের মতো, শিশু আননের
 হাসির মতন

কিন্তু সন্ধ্যা' কবি ব'সে-ব'সে ভাব চেন—

ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নাম অক্ষয়
 গাঢ়তর নীরবতা,—বিষ-পরিবার
 হৃৎ নিশ্চেষ্টন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
 বিশাল অন্তর হ'তে উঠে হৃৎগতী
 একটি ব্যথিত প্রশ্ন—কিষ্ট কান্ত হৃৎ
 শূন্য পানে আরো কোথা ?" আরা বতসুব ?

একদিকে কবির মোহন তুলিকাংশ উর্ধ্বশী স্তোত্র উঠে—

বুগ-বুগান্তব হ তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেরসী
 তে অগূর্ধ শোভনা উর্ধ্বশী।

মুনিগণ ধ্যান শক্তি দেয় পদে তপস্যা'ব ফল
 তোমা'বি কটাক্ষা'ত ত্রিভুবন বোধনচকল
 তোমা'র যদি'র পক্ষ অর বাণু বহে চারি'শত
 মধুমত্ত তৃষ্ণম মুক্ ববি বিদে মুক্ চিত্তে
 উদ্দাম সজীতে।

নূপুর গুঞ্জরি' বাণু আকুল অকলা
 বিদ্যা' চকলা।

আর একদিকে এবার কিরাও মো'র কবিতা'র বীর চেহারা কবির
 মাস্থন আসছে তাঁ'র সৌন্দর্য উর্ধ্বশী'র সৌন্দর্য নব—

বুড়ারে কবি না শক। ছা'র্ষনের অশ্রুতল ধা'ব
 মত্তকে পড়িবে কবি—তা'বি মাঝে বা'নো অভ্যাসে
 তা'র কাছে— জীবনসর্ক'বধন অগিবা'চি বা'বে
 জন্ম-জন্ম ধরি। কে সে ? জানি না কে। চিনি নাহ তা'বে—
 শুধু এইটুকু জানি—তা'রি লাগি' বা'জি অক্ষকারে
 চলছে মানববাজী হৃৎ হ'তে নুগান্তব পা'ন
 শুধু জানি—যে শুনেছে ক'র
 তা'হার আত্ম'নগীত—ছুটেছে সে নির্ভী'র প'শাণ
 দহি'য়াছে অ'ি'র
 বিদ্ব করিয়াছে পূজ হি'র তা'র করেছে কুঠারে
 সর্ক' প্রিয় বস্ত তা'র অকা'ঠরে কবিরা ঠ'কন
 চির জন্ম তা'রি লাগি জে'লছে সে হো'ম হতাশন,—

অজিত-বাবু'র বলেছেন সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির মাধুর্য-
 সম্পন্ন জীবনের সঙ্গে কথা কল্পনা অধিকা প্রকৃতি পরবর্তী কাব্যের জীবনের
 যে বিচ্ছেদ সেটি এমন গুরুতর যে এ ছুটি ছন্দন বস্ত্র লেখকের জীবন
 বললেও অক্ষুণ্ণ হয় না, একথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না।
 আমরা বরং দেখতে পাই, কল্পনাব সম্পূর্ণ একই-সঙ্গে আনন্দ আর
 ব্যাধির উচ্চাসে 'চিত্রা' বিচিত্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সোনার তরীর নিবিড়
 সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যেও যে এর আত্মস বিদ্যমান তাও আমরা
 দেখেছি।

আর রবীন্দ্র প্রতিভার পক্ষে এটি খুবই স্বাভাবিক। অক্ষুণ্ণ
 বীর এক স্ত্রী, আর স্বভাবতই সন্ধান বীর ভিতরে এমন অপ্রতিহত,

নানা পরস্পরবিরোধী ভাবও তাঁর ভিতরে গুঠপ্রোত হ'য়ে থাকতে
 বাধ্য।

সোনার তরীতে দেখেছি রবীন্দ্র প্রতিভার বান ডাকবাব উপস্থ
 হয়েছে। চিত্রাতে দেখছি সশ্যই সে-বান ডেকেছে। তাঁর প্রতিভার
 পৃথক বেন সহস্র ছটার বিচ্ছিন্ন হয়ে। হৃৎসত্যভলে উর্ধ্বশী'র নৃত্যের
 মতনও কি যে তা'র সৌন্দর্য তা'র পুরোপুরি বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

চিত্রার একজাতীয় কবিতা স্থান পায়নি। আরো দেখা বাসে
 পাত্যক স্নেহী'র শ্রেষ্ঠ কবিতা এতে আছে। নিছক সৌন্দর্য পূজা
 হিসাবে চিত্রা' হৃৎ' অতি চমৎকার কবিতা। হৃৎ' কবিতার
 সহস্র সফল হৃৎ কবির হৃৎ কি সহজ সরল অক্ষ সফলভাবে কুটে
 উঠেছে। শ্যো'র রা'য়ে কবিতার কবি কেমন এক তৃকার কা'তর
 নিরাশীন। সৌন্দর্য'র এক দিব্যমুষ্টি চাক্ষু'ভাবে দেখবার জন্তে কবির
 মনে যে আকুলতা জেগেছে তা'র মন বিা'জ হ'য়ে কুটে উঠেছে। কবির
 এই হস্য অভিসা'গী মনোভা'বো সাজ খুব বেশী পাঠকের সহানুভূতি
 না হতে পারে কিন্তু তাঁ'র হৃৎ এর শিল্পগৌরব ম্লান হয় না। কবি
 আধকা'রী হ'য়ে কাব্য লেখেন পাঠকের বলায়ও সেই আধকা'বের কথা
 একেবারে ভুলে গেলে চলে যে কেন।

এ সন্ধ্যা' কবিতাটিও চমৎকার সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যা'র সৃষ্টি তত নয়
 যত কা'র প্রতিভা'র এক সন্ধিস্থেব সৃষ্টি।—এখান বিশ্বপ্রকৃতির
 ক্ষেত্রের মাধুর্য থেকে চোপ একটু উঠিয়ে কবি হুরে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রের
 কত বুদ্ধ বত মৃত্যু'র ছবি'র দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করেছেন।

এর পরই 'এবার কিরাও মো'র' কবিতাটি। রবীন্দ্র প্রতিভা-
 নিক'র এ আর এক স্বপ্ন স্তম্ভ। এককরক লা'ন উপরে উচ্চ
 হয়েছে। এ কবিতাটি সম্বন্ধে বেশা কিছু বলা নিশ্চয়। আমাদের
 জাতীয় জীবনের বর্তমান অবস্থা'র এটি । আমাদের প্রাণো বস্ত হ'বে,
 এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য-চিন্তা'র এ অমূল্য। মহাজীবনের
 স্তম্ভ মানুষের আত্ম'র মাঝে মাঝে বে কন্দন জাগে তা'র বি মসামরণ
 প্রকাশ এতে বর্তমান।

এর কাছাকাছি দাঁড় করানো যেতে পারে পরলোকগত সত্যেন্দ্র-
 নাথের খুঁ আর মহাত্মা গান্ধী কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য পূজার চরম সার্থকতা উর্ধ্বশী। কারো-কারো
 মতে এটি ঠে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের ধারণা কি তা'র আগেই
 বলেছি। কিছু ভিন্নবর্ণের হ'লেও বাধবর্ণে (B)ION) সমুদ্র বন্দনের
 সঙ্গে এ'র উর্ধ্বশী কবিতাটির কিছু সাদৃশ্য আছে। হুরের ভিতরেই সমুদ্রের
 কল্লোল আ'ব তরঙ্গবিক্ষেপ কানে বাজে।

চিত্রাব 'বিজয়িনী' পূর্বিমা', বর্ষ হইতে বিদায়' প্রকৃতিও হৃৎ'র
 কবিতা। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' পুরাতন সৃষ্টি' প্রকৃতি কবিতার দেখছি,
 কবি বাস্তবিকই তাঁ'র সৌন্দর্যপূজার অধিল মানসসর্গ' হেঁড়ে মাটির
 ধবণী'র মহিমার পানে নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিষ্কেপ করেছেন।

'ব্রাহ্মণ' কবিতার বর্ণনাত্মক আর ছন্দোপ্তি খুব লক্ষ্যযোগ্য।
 কবির দৃষ্টি পূর্বে'র আলো'র মতন পরিষ্কার অক্ষ অনাড়ম্বর। ছন্দোপ্তিতে
 সত্যকার ব্রাহ্মণেরই সংসের সূচিত।

পুরাতন কৃত্যের মতন চমৎকার সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র পরও আছে আরো
 করেছেন। এ-কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য এর অতি অনাড়ম্বর
 অক্ষ অতি অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ।

* উর্ধ্বশী'র শেষের দুইটি স্তবক বাদ দিলেই এর শিল্পগৌরব বৃদ্ধি
 পাবে ব'লে মনে হয়।

শুনে মহা রেগে ছুটে বাই বেগে
আনি তাঁর টিকি ধরে—
বলি তাঁরে, “পাজি, বেরো তুই আজি,
দূর ক’রে দিশু তোরে।”
ধীরে চ’লে যায়, ভাবি, গেল দ’র ;—
পরদিন উঠে দেখি
হু কাটি বাড়ায় রচেছে দাঁড়ায়
ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
এসন্ন মুখ, নাহি কোনো হুখ,
অতি অকাতরচিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা’রে,
মোর পুরাতন ভৃত্য।

“ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি” কথাটার গায়ে কি অস্বস্তি মাথিরে দেওয়া হয়েছে।

অজিত-বাবু যে বলেছেন চিত্রাতে আর চৈতালিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে খুব বড়-একটা সম্পূর্ণতা লাভ হয়েছে, সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। চৈতালির সনেটগুলো বেশী প্রশংসারোগ্য এইজন্যে যে, এর অনেকগুলোতে গভীর জ্ঞান অতি অল্পকথায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কবির মানস-প্রকৃতি যে এখন কত সবল, তাঁর পর্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে এই চৈতালির সনেটগুলোর ভিতরে।

এইবার চিত্রার ‘অন্তর্ধ্যানী’, ‘জীবন-দেবতা’ প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবিতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতা’কে নিয়ে তাঁর সমালোচকেরা বর্ণে গোলমালে পড়ে গেছেন। আমাদের কাছে কিন্তু বাপারটি অত গোলমালে ব’লে মনে হয় না। আমরা সোজা কথায় বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার অর্থ—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। অবশ্য প্রতিভা বললেই যে কথাটি খুবই পরিষ্কার ক’রে বলা হ’ল, তা নয়। তবে, এ-কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত; আর আমাদের সবারই অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে যে ‘অপূর্ণ’, ‘অপূর্ণ’, ‘নবনবোজ্জ্বলিতা’, এইসমস্ত হচ্ছে এর বিশেষণ।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিভাবানেরা প্রায়ই নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্বন্ধে সন্ধান। সর্বসাধারণের ভিড়ে তাঁরা যে বেমানান খাপ গেরে যেতে পারেন না, এ-কথাটি নিজের মনে তাঁরা ভালো-রকমই জানেন, আর নিজেদের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে তাঁরা পরম যত্নেই লালন করেন। ‘মাননী’তে তাঁর কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। (নিম্নকের প্রতি, পরিভ্রম, ইত্যাদি)। তাই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে-শারিত এই অসাধারণত্বকে পরম যত্নে আর পরম বেদনার সহম ক’রে আনন্দে-আনন্দে শেবে পূর্ণ যৌবনে অনেকটা পুরোপুরি বহুতে পেয়েছেন, কি তাঁর স্বরূপ।

একি কোড়ুক নিত্য-নুতন
ওগো কোড়ুকময়ী!
আমি বাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?

*

নুতন হৃদয় অঙ্কুর প্রায়
তারা আনন্দে ছুটে চ’লে যায়,

নুতন বেদনা বেজে উঠে তার
নুতন রাগিণীতরে।
বে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-বাখা বুঝি না জানে সেই বাখা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনার ভারে।

মানুষের ধর্ম, সত্যতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সবকিছুই এক অকৃত অমুসন্ধান, —অঙ্কুর মতন মানুষ হাংড়িরে-হাংড়িরে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে চলেছে এক পথ থেকে অন্য পথে, লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে। বিশ্বমানবের সেই পরম রহস্যপূর্ণ বিরাট অমুসন্ধান এমনি অল্পপরিমানে এই এশিয়ার এক-কোণের কবির অন্তরে কেমন ক’রে সম্ভবতা লাভ করতে পারিলে, সেই গুণকে উদ্ঘাটিত করতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথকে যে বিশ্ব-কবি * অর্থাৎ বিশ্বতাবের কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁর একান্তিলগু অতিরঞ্জন নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

কল্পনা

চিত্রা ও চৈতালিতে কবিপ্রতিভার এক পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পর কল্পনাতে দেখি—কবির নুতন চেহারা। এমনি-এক অবস্থায় স্বয়ং-দেশে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন যার পুরো পরিচয় তিনি অবগত নন; কিন্তু পিছনে-কে’লে-আসা ঐশ্বর্যের পানে চেয়ে আর তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

তাঁর এই অবস্থার ছবিটি কত হৃদয়ভাবে ফুটে রয়েছে কল্পনার প্রথম কবিতাটিতে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মনমস্বরে,
সব সন্ধ্যাত পেছে হৃদিতে ধামিরা,
যদিও সন্ধ্যা নাহি অনন্ত অধরে,
যদিও ক্রান্তি আসিছে অঙ্গে নামিরা,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্ দিক্ দিক্ অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ গুরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

এই কল্পনা-কাব্যখানিও যে কল্পনার সৌন্দর্যের দিক্ দিকে পাঠ না করা যায় তা নয়; তবে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এর ভিতরকার সাধক-কল্পনার ধর একটু বেশী না নিয়ে পারেন না। তা-ছাড়া কবির ঝাঁপা সমসাময়িক তাঁদের কাছে সাধক-রবীন্দ্রনাথের গৌরব কবি-রবীন্দ্রনাথের গৌরবের চাইতে একটুও কম নয়; কেননা, ছুইই সমানভাবে তাঁদের কাছে জীবিত। তাই এই দ্বিতীয়পর্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রম একটু বৃদ্ধিতে আমরা চেষ্টা করব।

প্রথম কবিতাটি আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে। এর ‘অষ্টলগ্ন’ কবিতাটি অতি বিখ্যাত। যে বিকল প্রতীকার ছবি কবি এঁকেছেন, কি-এক শান্ত অথচ নিবিড় বেদনা তাঁর অন্তরে অন্তরে।

কাণ্ডন বামিনী, প্রদীপ আলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

* বিশ্বকবির অল্প অর্ধও আছে। কিন্তু তাতে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় না। সত্যকার কবিমাত্রেই বিশ্বকবি।

সোনার খাঁচার ঘুমার মুখরা শারী,
ছন্নর-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে ষারী ।
ধূপের ধোঁয়ার ধূসর বাসর-গেহ
অন্তর-পক্ষে আকুল সকল দেহ ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দুর্বাশ্রামল আঁচল বক্ষে টানি' ।
রয়েছি বিজ্ঞান রাজপথপানে চাহি,
বাতারন-তলে রয়েছি ধূলায় নামি'—
ত্রিধামা বাসিনী একা ব'সে গান গাহি,
“হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি ।”

এর “ভিবারী”, “বিদায়” প্রভৃতি কবিতায়ও এমনি বেদনার সুর বাজছে। কবির জীবন-যন্ত্রে যে নতুন সুর বাঁধা হচ্ছে, এ তাঁরই বেদনা। কিন্তু বেদনা-বোধই এ-কাব্যের শেষ কথা নয়। “অশেষ” কবিতার সব বেদনা সরিয়ে রেখে কবি এক সরল আস্থান কানে শুনেছেন।

মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন স্নান হেসে
হ'ল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণাতে
আবার আস্থান ?

তাঁর সমস্ত অবসাদ চূর্ণ করে তাঁর জীবন-দেবতা বড় নির্মমভাবে তাঁকে নাম্নে টান্চেন ;—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত-লোভাতুরা
কঠোর বাসিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চা'স হ'রে
আমার বাসিনী ?

এ-সব কথার সাম্নে শুধু কাব্যের সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা আপনা থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। যে কবি-কীর্তি নিয়ে কোনো কবিই নিজেকে অপৌরুষাচিত মনে করবেন না, তাঁরই শীর্ষে দাঁড়িয়ে ইনি বলছেন—“শেষে নিতে চা'স হ'রে আমার বাসিনী ?” বাস্তবিক বার-বার এমন নির্মম আঘাত লাভ করবার সৌভাগ্য কত অল্প লোকের ঘটে।

কিন্তু সবচাইতে লক্ষ্যযোগ্য এর “বর্ষশেষ” কবিতাটি। বড়ের বর্ণনা হিসাবেও এ-কবিতাটি সুন্দর ; কিন্তু কবির আশ্রয় যে আশ্রয় এর ভিতরে দাঁট-দাঁট করে অ'লে উঠেছে, কি ছার বড়ের সৌন্দর্য তাঁর কাছে। “এবার কিরাও মোরে,” “অশেষ” প্রভৃতি কবিতায় দেখেছি কবির অন্তরে শায়িত মহাজীবন সচেতন হ'রে উঠেছে। এই “বর্ষশেষ” কবিতায় দেখছি তাঁর যে দিবা-সংকট ও অবসাদটুকু এখনো বাকি আছে, তা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হ'রে বাজে। তাঁর মর্দনে তাঁর এত দিনের প্রতীক্ষা অসাধারণভাবে সার্থক হয়েছে আশ্চর্য্য তাঁর রূপ ! কবি তাঁকে প্রশাসন নিবেদন করছেন এইভাবে :—

হে হৃদয়, হে নিশ্চিত হে নুতন নিষ্ঠুর নুতন,

সহস্র প্রবল ।

দীর্ঘ পুষ্পদল বধা ধ্বংস-ক্রম করি' চতুর্দিকে
বাহিরায় কল—

পুরাতন পর্ণপুট দীর্ঘ করি' বিকীর্ণ করিয়া

অপূর্ণ আকারে

তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রতাপ—

এগমি তোমায়ে ।

প্রত্যেকটি বিশেষণ, প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ এখানে যে নতুন-নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে, অতিথানে তাঁর কতটুকু পাওয়া যায়। “অনুভব” যে না করতে চায়, সেই বা তাঁর কতটুকু গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এর শক্তি ! একবারে বন্ধ-হৃদয় ভিন্ন হরত এ-কথাগুলো আর-কারো কাছ থেকেই ব্যর্থ হ'রে কি'রে যাবে না।

শেলির Ode to West Wind-এর সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। দুই কবিতারই বড় প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেলি বড়কে বলেছেন—

“Be through my lips to unawaken'd earth
The trumpet of a prophecy !”

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম তপ-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেতে ধণ্ড-পণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় ।

শ্রেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে উর্ধ্বে ল'য়ে যাও
পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে,

মহান্ন সূত্বার সাপে যথামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে ।

“বর্ষশেষ,” “বৈশাখ” প্রভৃতি কবিতায় মহাজীবনের “তপঃক্রিষ্ট” স্রবসা চোখে ভ'রে দেখে নেবার পর কবির ভবিষ্যৎ তাঁর চোখে কি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে “রাত্রি” কবিতাটিতে তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে।

তোমার তিমির তলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
অমিতেছে জগতে-জগতে

আমারে তুলিয়া লও সেই তাঁর ধ্বজচক্রহীন
নীরব-বর্ষর মহারথে ।

বড় চমৎকার ধ্যান-গভীর সৃষ্টি কবির মনে জেগে উঠছে -

ভ্রান্তিত ভ্রমিঅপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধগাত্র উঠেছে উচ্ছাসি'

সদ্যক্ষুট ব্রহ্মসত্ত্ব আনন্দিত ধ্বিকর্ষ হ'তে
আন্দোলিয়া ঘন তন্ত্রাবাশি ।

পীড়িত ভুবন ঙগি' মহাযোগী করুণাকান্তর
চকিতে বিদ্বাৎ-রেখানৎ

তোমার নিখিল-লুপ্ত অক্ষকারে দাঁড়িয়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তি-পথ ।

তাঁর কল্পনাও কত মহিমাযুক্ত হ'রে উঠেছে ! এই রাত্রিকেই তিনি বলেছেন—

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত হৃদি-সিংহাসনে

তোমার মহান্ন জাগরণ ।

বাস্তবিক রবীন্দ্র-প্রতিভার এই-এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি নিজের চেতনা দিয়ে সর্বমানবের পরম সূক্ষ্ম চেতনার সঙ্গেও আত্মীয়তা করবার, আর তাঁর উদার কণ্ঠে সে-সব প্রকাশ করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য কবিপ্রতিভার অর্ধই কতকটা তাই। বিশেষ ক'রে গীতি-কবি-প্রতিভার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই গীতি-কবি-প্রতিভারও এক পরম অসাধারণ বিকাশই দেখতে

গাই। নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার আশা-স্বপ্ন-ব্যথা নিবিড় হ'য়েই তাঁর বাঁশীতে এককালে বেজেছিল, তিনিই এখন বাজাচ্ছেন মহাযোগীর পরম নিগূঢ় বেদনার সুর! তবে এইই তাঁর বাঁশীর শেষ সুর নয়!

স্ববীন্দ্রনাথ যে কবি-শেখরের মুখে নিজের রচনা-সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার এসব স্তম্ভিত বাঁশির মতো—বুঝবার জ্ঞান নয়, বাজবার জ্ঞান," তাঁর কাব্য-সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর বর্ণনা আর দেওয়া যায় না।

বুঝবার কথা নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যে ঢের আছে; কিন্তু সব বোঝা, সব জ্ঞান, আনন্দ, বিবাদ, প্রেম, নৈরাশ্র, সাধনা,—এ-সমস্তের অতি ক্ষুদ্রতম কথাও তাঁর কাব্যে কেমন বাঁশির সুরের নিবিড়তা আর অব্যর্থতা নিয়েই বাজে। "কণিকার" সময় থেকে তাঁর এ-কমতার যে অপূর্ণতা জেগেছে, এক হাকেক হাড়া আর কোনো গীতি-কবির ভিতরে সেটি প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

রাজা

শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

(১)

একটা জনম নাইবা পেলাম তোমার দেহের কোমল পরশ,
নাইবা পেলাম গেহের মাঝে তোমার হাসির বিপুল হরষ!
মিলন-সাঁঝের বাসর-মাঝে,
ছুঃখ-সুখের লক্ষ কাজে
নাইবা পেলাম বক্ষে তোমার স্নানীল আঁচল সোহাগ-সরস!
পল্লী-পথের সন্ধ্যা-উষায় নাইবা পেলাম তোমার দরশ!

(২)

একটা জনম থাক না রাণি! থাকো তুমি স্বপ্ন-পুরেই,
চক্রবালের ছবির মতো থাকো এবার ওই স্বপ্নেই!
অচিন দেশের কুঞ্জ-ছায়ে
প্রহেলিকার বুক ছাপায়ে
থাকো এবার প্রাণের তলায় আমার ভাবের রাজ্য জুড়েই!
অরূপ-রূপে ছড়িয়ে থাকো বিশ্ব-ছাওয়া হাওয়ার সুরেই!

(৩)

থাক না রাণি, একটা জনম বরণ-ভালার ফুলের মালা!
থাকুক এবার মোহন আঁধির দৃষ্টি-মায়ায় পৌষ ঢালা,
গন্ধে মাতাল ফাগুন-রাতি,
আলিঙ্গনের মাতামাতি
থাক না এবার শারদ রাকা, মদির-মাথা নাট্য-শালা!
এবার থাকুক নিশীথ আগা পাগল-করা চুম্বন পালা!

(৪)

একটা জনম থাকো রাণি নিদেশ-হারা মানস-লোকেই!
পথের দিকে চেয়েই-চেয়েই থাকো এবার সজল-চোখেই!
নীলকমলের দলে-দলে
ঘুমিয়ে থাকো অধুই জলে,
একটা জনম পরে আবার আগুবে ভাসুর লাল আলোকেই!
গোপিন কোষের মধুর মতো থাকো এবার প্রাণ-কোরকেই!

(৫)

একটা জনম তোমায় পাবার আঙ্গকে আমার নেই অবকাশ!
মর্ম্বতলে ডাক দিয়ে যায় ঐ যে কাদের দীর্ঘ-নিশাস!
ধরার বিকল দেহের পরে
আসন পাতা সবার ঘরে,
আঙ্গকে সেখায় করুতে হবে সত্য আমার রাজার প্রকাশ!
একটা জনম তোমায় তুলে করুব কাজের হিসাব-নিকাশ!

(৬)

আঁধির জলেই হবে এবার অভিবেকের শান্তি-গিনান,
লক্ষ বৃকের জীর্ণ বগন নিশান হ'য়ে ভবুবে বিমান!
হাহাকারের গভীর বাণী
অয়ধ্বনি তুলুবে রাণি!
তোমায় ছেড়ে তা'তেই এবার বুঝতে হবে মান-অপমান!
মাছুষ-বনের ব্যথার জ্বাণেই উঠবে যেতে এবার এ প্রাণ!

(৭)

হাতছানিতে ডাক দিয়ে যায় ঐ যে কা'রা পথের ধূলায়,—
হহ-বরে গুম্বরে ওঠে শ্মশান-ছোড়া বহি-চুলায় ;

শুক নদীর কূলে-কূলে

ওই যে কা'রা কাঁদন তুলে

ঝঞ্জা হত তালের বনে ব্যস্ত-ব্যাকুল হস্ত দুলায় !

তপ্তবাসুর মরীচিকায় সকল গানের ছন্দ তুলায় !

(৮)

ওই যে কা'রা চলছে ছুটে লক্ষ্য-হারা গহন বনে,
ফণীর মালা জড়িয়ে নিয়ে জর্জরিত পায়ে সনে !

বিহঙ্গেরা শুক নীড়ে

উঠছে কেঁপে চমকে ফি'রে ;

'হায়রে এক মরণ খেলা' ! ভাবছে ব'সে আকুলমনে !

বনের লতা নিবিড় ভয়ে নেতিয়ে পড়ে একটি কোণে !

(৯)

এবার আমায় আনতে হবে মৃত্যুপারের জীবন-আসার,
শাঙন হ'য়ে ঝরতে হবে আর্জবুকে ঘোর পিপাসার !

আমার বুকের রক্ত ঝরি'

অযুত নিব্বর পূর্ণ করি'

লাল ক'রে আজ দেবে রাণি বিবাস্ত্র ঐ নীল পারাবার !

এবার আমায় গাইতে হবে প্রাণের গীতি নতুন ভাষার !

(১০)

ঐ যে কা'রা রক্তনিশাস ডুকরে কাঁদে অঙ্ককারে,
আছাড় খেয়ে পড়ছে অচল অশ্রু-পিছল পথের ধারে,

বাতাস হ'য়ে আলোক হ'য়ে

সঞ্জীবনী প্রলেপ ল'য়ে

আজকে আমায় যেতেই হবে মুষ্ড়ে পড়া ঐ কাতারে !

রক্ত নাচন তুলতে হবে অরার অবশ শীর্ণ হাড়ে !

(১১)

ঐ যে কাদের বুকের পরে হিমালয়ের পাবাণ-চাপে,
চওরাজের দণ্ডনীতি হুকি ছাড়ে দারুণ দাপে ;

গোল্ডভিদের বহুহাতে

আজকে আমার দিবস-রাতে

কাটতে হবে অত্যাচারের পাহাড়-প্রমাণ বিশাল পাপে !

আশীষরূপে ঝরতে হবে অমঙ্গলের অভিশাপে !

(১২)

একটা জনম কাটবে আমার বন্যাবাদল নিদাঘ-রোদেই,

হয়ত যাবে অনেক বরষ রণ-অভিযান-অবরোধেই ;

তোরণ-ঘারে রক্ষীরূপে

হয়ত শবের স্তূপে-স্তূপে

কাটবে নিশা দানবদলন কধির-ভেজা জয়ের বোধেই !

এবার জনম কাটবে আমার স্কন্ধ প্রাণের প্রতিশোধেই !

(১৩)

একটা জনম পরে রাণি তোমার কোলে মুখ লুকিয়ে

কেঁদে-কেঁদে বলব আমি মাহুষ হওয়ার ব্যথা কি এ !

হাত এড়িয়ে মৃত্যুজ্বার

তোমায় নিয়ে খেলা করার

সময় হেথা নয় যে স্থলভ যুগদেবতায় ফাঁকি দিয়ে !

অভিসারের নেই অবসর জাতিকুলের ঋণ চুকিয়ে !

(১৪)

থাকুক তবে, থাকুক এবার, রাণি, তোমার বাহর বাঁধন !

বিজন বনেই সাজ করো তরুণ তরুর ফুলপ্রসাধন !

আছল বুকে বসন কাঁপি'

শিথিল বেণী রাখো চাপি'

আপনমনেই গান গেয়ে যাও বিধুর মনের সব আবেদন !

শূন্য গেহের বুক ভ'রে দাও একাকিনীর গভীর মাতন !

(১৫)

দুঃখ কিসের রাণি আমার ! একটা জনম নাইবা এলে,

কল্পলোকের দূর অলকায় সজোপনে র'য়েই গেলে !

মনে করো ক্ষীরোদ-মধন

হয়নি আজো, পাইনি রতন,

লক্ষী তুমি র'য়েই গেছ অতল-তলে আঁচল মেলে !

একটা জনম নাইবা হেথায় স্থধার কলস দিলেই চলে !

প্লেটোর আদর্শবাদ*

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

প্লেটোর 'এইডস'-বাদ একটি বিখ্যাত মত। গ্রন্থকার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'ফেটিবাদ'। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই নাম ব্যবহার করা আপত্তিজনক। রূপবাদ, পরম রূপ-বাদ, পরাকৃতি-বাদ, আদর্শ-বাদ, আদর্শ রূপ-বাদ প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবশ্যক-মত আমরা 'এইডস'-বাদ বা 'এইডে'-বাদও ব্যবহার করিব।

আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে জানা আবশ্যক প্লেটোর পূর্বে গ্রীক সাহিত্যাদিতে এই শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত। Jowett এর Republic নামক গ্রন্থে এ-বিষয়ের আলোচনা আছে (Vol ii, পৃ: ২২৪—৩০৫)। Taylor তাঁহার Varia Socratica নামক গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্রাদি হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্লেটো চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বিশেষভাবে গণিত শাস্ত্র হইতে এই শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে এই শব্দের অর্থ ছিল দেহ, বাহ্য আকৃতি। তাহার পরে বস্তুর প্রকৃত রূপকে অর্থাৎ বস্তুর বস্তুত্বকে ("real essence") 'এইডস' নাম দেওয়া হইয়াছিল।

বহু বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ ভাব দেখা যায়। এই সাধারণ ভাব দেখিয়া বস্তুসমূহকে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া বলা হয় এই পশুগুলি 'অশ্ব'; আর কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া বলা হয় এই পশুগুলি 'গো'। অর্থাৎ বিষয়েও এই প্রকার। বিশেষ-বিশেষ সাধারণ ভাব দেখিয়া বলা হয় ইহার নাম 'সাহস', ইহার নাম 'সংযম' ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন প্লেটো প্রথমে এই জাতি বা সাধারণত্ব অর্থেই 'এইডস' শব্দ ব্যবহার করিতেন। তাহার পর এই সাধারণত্বকে বস্তু-সমূহ হইতে পৃথক করিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন।

Taylor (টেলার) বলেন একথা ঠিক নহে; প্লেটোর মতে ইহার মৌলিক অর্থ "real essence" অর্থাৎ plusis (প্লুসিস্, কুসিস্)। বাজালার ইহার অর্থ হয় বস্তুর 'বস্তুত্ব', বস্তুর স্বরূপ। তৎ শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে; তৎ-তৎ-তৎ, অর্থাৎ 'তাহার ভাব' তাহার বিশেষত্ব, "that-ness"।

এখন দেখা যাউক প্লেটো নিজে কি বলেন। অনেকে প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া এক একটি মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ উপায় প্রকৃষ্ট উপায় নহে। যৌবনকালের মত আর বৃদ্ধ বয়সের মত যে একই হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। সেইজন্য আমরা প্লেটোর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে পৃথক পৃথক-ভাবে আলোচনা করিব।

প্লেটো কোন্ বয়সে কোন্ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমরা Jantoslawskiর মত গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার নির্ধারিত ক্রম অনুসারেই প্লেটোর গ্রন্থের আলোচনা করিব। যে-সমুদায় গ্রন্থে 'এইডস'-বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সমুদায় গ্রন্থের প্রধান-প্রধান অংশ আলোচিত হইবে। ইহার পরে আমরা গ্রন্থকারের মতামতের সমালোচনা করিব।

(১) এউথুক্সোন

'এউথুক্সোন' নামক গ্রন্থের একটি আলোচ্য বিষয় পুণ্য (হসিমন)। সোক্রেটের প্রশ্ন পুণ্য কি? এউথুক্সোন কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সোক্রেটের জ্ঞানিতে চাহিয়াছিলেন—পুণ্যের বিশেষত্ব কি? বহু ঘটনার পুণ্য প্রকাশ পায়। এই সমুদায় ঘটনার মধ্যে এমন কি সাধারণ ভাব (eidos) আছে তাহার জন্ত এই সমুদায়কে পুণ্য বলা হয় (৬ ডি)। এইস্থলে 'এইডস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার অর্থ সাধারণ ভাব, লক্ষণ, বিশেষত্ব, স্বরূপ ইত্যাদি (Burnet, Watt and Mills, Graves, Wells প্রভৃতির টীকা জরুয়া)। ঠিক ইহার পরেই আছে 'ইডেয়া' (idea) শব্দ। উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য (Graves, পৃ: ১২৭, Burnet পৃ: ৬৫ ইত্যাদি)। এস্থলে সে পার্থক্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

ঠিক ইহার পরেই সোক্রেটের এউথুক্সোনকে বলিতেছেন—“তাহা হইলে সেই স্বরূপটি কি আমাকে তাহা বুঝাইয়া বল যাহাতে আমি সেইটিকে নয়ন পথে রাখিয়া [=apo--blepōn] এবং মানদণ্ডরূপে [=paradeigmati] ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি যে, তুমি বা অপরে যেমতল কার্য করিতেছ তন্মধ্যে যাহা ইহার অনুরূপ তাহা পুণ্য, যাহা ইহার অনুরূপ নহে, তাহা পুণ্য নহে (গ্রন্থকারের অনুবাদ, গ্রীক কথা দুইটি আমাদের সংযোজনা, GE)।

এস্থলে দুইটি শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যিক। একটি 'পারাডেইগমা' শব্দের ব্যবহার। ইহার অর্থ আদর্শ বা মানদণ্ড; এই আদর্শ দ্বারা অপর বিষয়ের বিচার করা যায়। দ্বিতীয় কথাটা apo-blepo (আপো-ব্লেপো) ক্রিয়া। ইহার অর্থ অপর সমুদায় বিষয় হইতে (apo) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টি স্থাপন করা (blepo)। এস্থলে অর্থ এই—গৌণ লক্ষণ হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া মৌলিক লক্ষণের প্রতি অর্থাৎ সাধারণ ভাবের প্রতি ('এইডস' এর প্রতি) দৃষ্টি স্থাপন করা। Graves এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চিত্রকর যেমন চিত্রপট হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেইভাবে এস্থলে দৃষ্টি স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। পৃ: ৬৮।

মেনোন (৭২, সি), পার্মিনাস (৫০৩, ই) সাধারণ-তত্ত্ব (৭৭১, বি) প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ ব্যবহার আছে।

এউথুক্সোন গ্রন্থে বলা হইল যে, বহু বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে যে 'সাধারণত্ব' আছে তাহাই ইহাদিগের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব বা 'এইডস'-কে আদর্শরূপে মতত্ব নয়নপথে রাখিয়া এবং মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ভালমন্দ বিচার করা যায়।

* সোক্রেটীস্ ২য় খণ্ড; শ্রীবৃদ্ধ রজনীকান্ত গুহ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ: ২১+৮৩; মূল্য দশ টাকা।

এই পুস্তকে 'এইডস'-শব্দের তিনটি বিশেষ শব্দ আছে। (১) এইডস, (২) ইডিয়া (idea), (৩) প্যারাদেইগমা (paradigma)। Adam বলেন, উক্তকালে প্লেটো যে অর্থে এই কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এ স্থলে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার মতে এ গ্রন্থ রচনার সময়ে 'এইডস'-বাদের জন্মই হয় নাই (as yet unborn, উক্তগ্রন্থের টীকা, পৃ: ৩৫)। কিন্তু Stewart (Plato's Ideas, পৃ: ১৭) এবং Burnet (এই গ্রন্থের টীকা, পৃ: ৩১) বলেন উক্তকালে যে অর্থে এ সমুদায় ব্যবহৃত হইয়াছে এস্থলেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মতভেদে বস্তুই থাকুক না কেন, এ স্থলে ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিচার দ্বারা বস্তুর 'এইডস' নির্ণয় করা যায় এবং এই 'এইডস'ই বস্তুর স্ব-রূপ বা প্রকৃত রূপ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বস্তুর প্রকৃতরূপ 'বস্তু গত'; অপার্থিব লোকে ইহার অবস্থিতি নহে।

২, ৩, ৪, ৫।

ক্রি.টান্, থার্মিডেস (= ক্রামিডেস) লাক্লেস্

এবং প্রোটাগরাস—

এই চারি পান্না গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস' বাদ আলোচিত হয় নাই। (১) জ্ঞানপরাধতা, (২) সংসম, (৩) মনুষ্যত্ব এবং (৪) ধর্ম বা সাধুতা এই চারিটি গুণের বিশেষত্ব কি, তাহা এই চারিপান্না পুস্তকে যথাক্রমে বিচার করা হইয়াছে। বস্তুর বিশেষত্বই বস্তুর প্রকৃত রূপ এবং বিশেষত্বের জ্ঞানই পরম রূপের জ্ঞান। এই চারিপান্না পুস্তকে বস্তু বা জ্ঞানমুহূর্ত হইতে ইহাদিগের বিশেষত্বকে পৃথক করা হয় নাই। জ্ঞানমুহূর্তের মধ্যেই বস্তুর মৌলিক গুণ বিদ্যমান। যেমন, সংসমের নানা-প্রকার লক্ষণ দেখরা যাইতে পারে; কিন্তু এই সমুদায়ের মধ্যে প্রকৃত লক্ষণ কে'নটি? যাহা প্রকৃত লক্ষণ, তাহাই ইহার বিশেষত্ব, তাহাই ইহার পরম রূপ। বস্তুর পরম রূপ বস্তুগত।

৬। মেনোন্

(ক)

এই গ্রন্থে বস্তু এবং গুণের স্বরূপ (ousia-উসিয়া) বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে (৭২, ৩ পরে)। প্রথমতঃ মনুষ্যিকতার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। মৌমাছি বস্তু, এবং বস্তু-প্রকারের; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে এমন কিছু সাধারণ গুণ রহিয়াছে, যেগুলি ইহাদিগের প্রত্যেককেই মৌমাছি বলা হয় (৭২ বি)। ইহার পরে গুণ বা ধর্মের (aretē-আরেটে) কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইল যে, নানা-প্রকার গুণের মধ্যে এমন কিছু সাধারণত্ব (eidos—এইডস্) আছে যেগুলি প্রত্যেককেই 'গুণ' আখ্যা প্রদান করা হয়। (৭২ সি)।

এস্থলে 'সাধারণ জ্ঞান' কে এইডস্ বলা হইয়াছে।

ইহার পথে বলা হইয়াছে যে, এই 'সাধারণ জ্ঞান'টিকেই আদর্শরূপে দৃষ্টিপথে (apo-blepsanta-আপ ব্লেপসান্টা) রাখিতে হইবে (৭২ সি)।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে 'apo-blepo' ক্রিয়া এই অর্থে আরও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Stewart বলেন (পৃ: ২৭) এই শব্দের ব্যবহার 'আদর্শবাদ' সূচক paradigmatic view of the Idea) এবং এস্থলে প্রয়োজনে যুক্তিমূলক বিচার দ্বারা 'এইডস' নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে।

(খ)

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ মত 'প্রাক্তন স্মৃতি' বাদ। এই মত হইতে কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে 'এইডস' বা আদর্শরূপ একটি

বস্তু (thing)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন স্মৃতি কোন বস্তু, বা গুণ, বা ঘটনার স্মৃতি নহে। সোক্রেটস্ মত ও জ্ঞান এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। নিবিধ ঘটনা দেখিয়া অনিচারিতভাবে যে একটা বিশ্বাস হয় তাহাই মত (৬ ক সা); আর যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচার করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান (এপিস্টেম, episteme)। এতোক মনুষ্যই অস্তরে এইপ্রকার জ্ঞানলাভের উপায় লইয়া ভ্রম গ্রহণ করে; ভ্রমতে কিছু দেখিলেই অস্তরস্থ আদর্শ দ্বারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া থাকে। 'প্রাক্তন স্মৃতি' এই উপায় এবং আদর্শমূলক। যে উপায়ে এবং যে আদর্শে সত্যনির্ণয় করা যায়, এমুখি তাহারই স্মৃতি। এই গ্রন্থেই এই স্মৃতিকে যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলমূলক (aitias logismos, 98, A) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মেনোন্ গ্রন্থের মতে 'এইডস' কোন বস্তু (thing) নহে।

৭। এউথুডেমস্।

এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস' বাদ ব্যাখ্যাত হয় নাই। তবে উহাতে (৩০১, এ) লিপিত আছে যে, একসময়ে সোক্রেটস্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে স্মরণ বস্তু কি বিস্তৃত সৌন্দর্য হইতে পৃথক নী অপৃথক? সোক্রেটস্ উত্তর করিয়াছিলেন, স্মরণ বস্তু বিস্তৃত সৌন্দর্য নহে, কিন্তু ইহাতে সৌন্দর্য বর্ধমান।

বস্তু আছে বস্তু, তাহাদিগের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব আছে। কেহ কেহ বলেন পূর্বেইক্ত অংশে বলা হইয়াছে জ্ঞান শাস্ত্রের এই সাধারণত্ব (logical doctrine of universals)। (Gifford's Edition টীকা পৃ: ৫২)।

এস্থলে 'এইডস' বাদের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু জেলার (Zeller) বলেন ইহা গ্রিক 'এইডস' বাদেরই ব্যাখ্যান (actual enunciation of this doctrine; Plato, পৃ: ১২৬)।

৮। গর্গিয়াস্।

এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 'এইডস' বাদ বিবৃত হয় নাই; তবে ইহাতে এ মত পাওয়া যায়। 'এইডস' বাদের প্রধান তত্ত্ব "মঙ্গল-রূপ"। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "মঙ্গলই সর্বকার্যের লক্ষ্য (টেলস্); মঙ্গলের জন্মই সমুদায় কার্য; সমুদায় কার্যের জন্ম মঙ্গল নহে" (৪৯৯, ই)।

অপর একস্থলে (৫০৩, ই) বলা হইয়াছে যে, কর্মকার (শিল্পী প্রভৃতি) যেমন যথেষ্টভাবে কার্য করে না, কিন্তু কোন আদর্শকে লক্ষ্য পথে রাখিয়া কার্য করে, এবং সে যেমন দেখে তাহার রচিত বস্তু আদর্শরূপ ('এইডস') প্রাপ্ত হইল কি না, সাধুলোকও তেমনি বিশেষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ মঙ্গল প্রকাশ করেন।

জাউরেট এ স্থলে 'এইডস' শব্দের অর্থ করিয়াছেন "নির্দিষ্ট রূপ" (definite form)। Lodge এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন, 'এইডস' শব্দের অর্থ বাস্তব আকৃতি; শিল্পীর অস্তরে যে আদর্শ, ইহা তাহারই বাস্তব প্রকাশ। পৃ ২০১।

৯। ক্রাটিলস্।

এই গ্রন্থের একস্থলে (৩৮৯, বি) 'ভুরী'র (অর্থাৎ 'মাকু'র) আদর্শ-রূপের কথা বলা হইয়াছে। যে ভুরী দ্বারা স্মরণভাবে বস্তুবয়ন করা যায়, তাহাই আদর্শ ভুরী; তাহার রূপই আদর্শরূপ।

ইহার পরে বলা হইয়াছে আদর্শ নামের কথা। যে নাম দ্বারা বস্তু প্রকৃতি প্রকাশ করা যায়, তাহাই আদর্শ নাম। সকলে বস্তুর নামকরণ

করিতে পারে না। ইহার বস্তুত্ব, তাঁহারই নামকরণ করিতে সমর্থ এবং তাঁহারই বর্ণ ও অক্ষর যোগে নামের পরম রূপ (eidos, এইডস্) প্রকাশ করিয়া থাকেন (৩৯০, ই)।

এখানে 'এইডস্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার অর্থ পরমরূপ।

এই দুইটি দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতেছে যে, উপায় উদ্দেশ্যসাপেক্ষ। বাহ্য পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাহার রূপই আদর্শরূপ। স্বর্গে বা 'অধিবর্গে' 'মাকু' এবং 'নাম' পরমরূপ ধারণ করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, আর মানব সেই-রূপের অনুকরণে পৃথিবীতে মাকু ও নাম সৃষ্টি করিতেছে, এ-প্রকার কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। 'এইডস্' একটি আদর্শ মাত্র। আরিস্টটল্ বাহ্যকে 'টেলস্' (telos, final cause, অন্ত্যাকারণ বা উদ্দেশ্যরূপ কারণ) বলিয়াছেন, 'এইডস্' তাহাই।

১০। সেম্পসিঅন্।

ডি অটিমা নামক একজন গ্রীক সোক্রেটসকে প্রেম-তত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 'সেম্পসিঅন্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে (২০২-২১১)। 'এইডস্' বাদের সঙ্গে এই মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হুত্তরাং ঐ উপদেশের সারাংশ এখানে দেওয়া আবশ্যিক। উপদেশ এই—

প্রথম পরম হইতেই সূক্ষ্মর বস্তু দর্শন করিতে হইবে, উপবৃত্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ইহা হইতেই শোভন চিন্তার উদ্ভব হইবে। তখন মানুষ নিজে নিজেই বুঝিবে যে বিভিন্ন রূপের সৌন্দর্য একই এবং তখন সে সমুদায় রূপেই অনুরক্ত হইবে। ইহার পরে সে বুঝিবে যে বাহ্যরূপের সৌন্দর্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকৃষ্ট। তাহার পরে সে কর্তব্যক্ষেত্রে ও নিয়মের মধ্যে সৌন্দর্য দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে এ-সমুদায়ের সৌন্দর্যই একজাতীয়। তাহার পরে সে অপার জ্ঞান-সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সৌন্দর্য ধ্যান করিবে এবং জ্ঞানের প্রতি বিপুল প্রেম-বশতঃ বহু শোভন সহ্য ভাব এবং চিন্তার সৃষ্টি করিবে। অবশেষে তাহার নিকটে সেই এক জ্ঞান-সমুদ্র প্রতিভাত হইবে। ইহাই সৌন্দর্য-তত্ত্ব। সৌন্দর্যের আন্দর্য পরম রূপ দর্শনই সমুদায় সাধনার শেষ কল। ইহা "নিত্যসং, উৎপত্তিরহিত ও বিনাশরহিত, বুদ্ধিরহিত ও হ্রাসরহিত,স্ব-হু এবং আপনার সহিত অবস্থিত (auto kath 'auto meth' auton) একরূপ (বা অধিতীয়), নিত্য।.....উৎপত্তিশীল ও বিনাশর বস্তুসমূহ ইহার অংশভাগী" (২১০—২১১)

['স্ব-হু এবং আপনার সহিত অবস্থিত' এই অংশের স্থলে গ্রন্থকার অনুবাদ করিয়াছেন—'সুধুসূক্ষ্মর পরম সূক্ষ্মর', ১ম ভাগ পৃ: ৪৮৬]

এখানে সৌন্দর্যের পরম রূপের কথা বলা হইল। এই গ্রন্থের মতে এই পরম সৌন্দর্য সমুদায় বস্তুতেই নিহিত; সমুদায় বস্তুই ইহার অংশভাগী হইয়া রহিয়াছে। মানুষ সাধনবলে পার্থিব বস্তুর অসৌন্দর্যের দিকে অন্ধ হইয়া কেবল বিস্ময় সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে।

পরমরূপের সহিত এই জগতের কি সম্বন্ধ, এবিষয়ে দুইটি মত আছে—(১) আদর্শবাদ বা অনুকৃতিবাদ (পারাডেইগমা), অর্থাৎ পরমরূপ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং পার্থিব বস্তু তাহার অনুকরণে সৃষ্ট। (২) অংশ-বাদ, অবস্থিতি-বাদ (methoxis, parousia, koinonia) অর্থাৎ আদর্শরূপ প্রত্যেক বস্তুতে অসীম-পরিমাণে বর্তমান। এই গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মতই গৃহীত হইয়াছে।

হুত্তরাং দেখা যাইতেছে, এই পরম সৌন্দর্য লোকে বা আলোকে অবস্থিত কিবা লোকালোকাভীভাব্যে অবস্থিত কোন বস্তু বা পদার্থ (thing) নহে। তবে ইহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, এই অর্থে বলা যাইতে পারে ইহা বস্তু বা বিষয়। প্রচলিত অর্থে ইহা বস্তু বা পদার্থ নহে (এখানে দার্শনিক অর্থে 'পদার্থ' শব্দ ব্যবহৃত হইল না)।

১১। ফাইডোন

এই গ্রন্থে নামাভাবে 'এইডস্' বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (ক) মেনোন্ গ্রন্থের স্তায় এ গ্রন্থেও 'প্রাক্তন স্মৃতিবাদ' পাওয়া যায়। (১২৭৮)। এই স্মৃতিবাদের স্থলে 'এইডস্'বাদ। মনে কর, দুইখণ্ড বস্তু দেখিয়া বলিলাম ইহার সমান। মেটো বলেন অন্তরে সমানত্বের আদর্শ ছিল, সেইজন্যই বলিতে পারিলাম ইহার সমান। অন্তরে আদর্শ না থাকিলে এপ্রকার বিচার করা সম্ভব হইত না। কিন্তু পৃথিবীতে এই আদর্শ লাভ করা সম্ভব নহে। পূর্বজন্মে এই জ্ঞান লাভ হইয়াছিল এবং মানুষ এই জ্ঞান লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই জ্ঞান লুপ্তাকারে থাকে। দুইটি সমান বস্তু দেখিবামাত্রই সেই সমানত্বের স্মৃতি জাগ্রৎ হয়। কেবল গণিত শাস্ত্রের তত্ত্ববিষয়েই যে ইহা সত্য তাহা নহে—জ্ঞানধর্ম প্রকৃতি প্রত্যেক বিভাগেই মানুষ পূর্বজন্মের আদর্শ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া থাকে। ইহাই প্রাক্তন স্মৃতি তত্ত্ব।

এখানে প্রথম বস্তুব্য এই যে, অন্তরে যে স্মৃতি জাগ্রৎ হয়, তাহা বস্তুবিশেষের স্মৃতি নহে, ইহা জ্ঞানলাভের উপায়ের স্মৃতি। জ্ঞানশাস্ত্রে ও জ্ঞানজগতে যে সমুদায় স্বতঃসিদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি, স্মৃতিতে জাগ্রৎ হয় সেই উপায়। দ্বিতীয় বস্তুব্য এই—সমানত্বাদির এই যে আদর্শ ইহা লোকালোকে অবস্থিত বা লোকালোকাভীভাব্যে অবস্থিত কোন স্বতন্ত্র বস্তু (thing) নহে, ইহা অন্তরস্থ আদর্শ।

(খ) ৩৫—৬৮ অংশের আলোচ্য বিষয় বস্তুর তত্ত্ব (তৎ + ত্ব) অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ। Archer-Hind বলেন এখানে ideas এবং ideal world এর কথা বলা হইয়াছে (৩৫, ডি; টীকা, পৃ: ২১)। Burnetও বলেন এখানের আলোচ্য বিষয় 'theory of Ideas' অর্থাৎ 'এইডস্' বাদ।

মেটো এই অংশে বস্তুর স্বরূপকে onsia (উসিয়া, ৩৫, ডি; ৭৮, ডি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুর 'প্রকৃতরূপ' ব্যক্ত করিবার জন্য মেটো বিশেষ ভাষা ব্যবহার করিতেন, যেমন auto kath' anto (আউট কাথ-আউট—; তাহা নিজে বাহা), auto o esti (আউট হ এসটি—টিক তাহা হয় বাহা) ইত্যাদি (৭৫, ডি)। এইসমুদায় ভাবই বস্তুর 'এইডস্'।

এই যে আদর্শরূপের কথা বলা হইল ইহা কি-প্রকারে জানা যায়? মেটো বলেন (৩৫)—"ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে—কেবল চিন্তা দ্বারা" (with thought alone, Burnet, টীকা)। মেটোর মতে মন এবং ইন্দ্রিয় পরস্পরবিরোধী। ইন্দ্রিয়জগতে থাকিয়া বস্তুর বস্তু জ্ঞান বায় না; মন বস্তুই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে অভিক্রম করে, ততই সে বস্তুর প্রকৃত রূপ দেখিতে সমর্থ হয় (৩৫)।

মেটো এক স্থলে (৩৪, সি) বলিয়াছেন যে প্রকৃতরূপ স্মৃতি বা বিচার দ্বারা জানা যায়। তাঁহার ভাষা 'to logizesthai'. ইহার অর্থ reasoning অর্থাৎ বুদ্ধিতর্ক (Lutoslawski, পৃ: ২৪০)। Burnet, Williamson, Parsons and Kerin, Wagner প্রকৃতি টীকাকারগণ এবং Church, Cary, Blagrave প্রকৃতি অনুবাদকগণ এই অর্থই করিয়াছেন। আনাদিগের গ্রন্থকারের অনুবাদ "মনন—সাহায্যে," পৃ: ৫০।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সস্তার পরমরূপ বুদ্ধিতর্ক দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই, বস্তু বা গুণসমূহের মধ্যে যে সাধারণ ভাব রহিয়াছে তাহাই ইহাদিগের প্রকৃত রূপ। Natorp এবং Stewart এ-সমুদায়কে

abstractions বা notions বলিয়াছেন। Stewart : Plato's Doctrine of Ideas, পৃ: ৭১।

(গ) একস্থলে (৭৫, সি) প্লেটো পরম রূপের কথা বলিতে গিয়া সমানত্ব, সৌন্দর্য, মঙ্গল, জ্ঞান ও পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে এই সমুদায়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে বাইরা বলিয়াছেন— “প্রয়োত্তরমূলক আলোচনার আদরা যে সমুদায়কে ‘প্রকৃত সত্তা’ নাম দিয়া থাকি।” (Burnet এর টীকা ত্রুটব্য)।

এইপ্রকার আলোচনাতে বস্তুর ‘লক্ষণ’ নির্ণয় করা হয় এবং এই লক্ষণ বা বিশেষত্বই বস্তুর প্রকৃত রূপ।

(ঘ) আর একস্থলেও (৭৮, ডি) প্লেটো বলিয়াছেন যে, প্রকৃত রূপ সেই সত্তা (ousia—উসিয়া), প্রয়োত্তরমূলক আলোচনাতে বাহা নির্ণয় করা হয়”

এহলেও লক্ষণ বা ‘সাধারণত্ব’ বা বস্তুর প্রকৃত রূপ নির্ণয় করার কথা বলা হইল (Burnet এর টীকা ত্রুটব্য)।

(ঙ) এক স্থলে (১০০) সোসাটেস্ (অর্থাৎ প্লেটো) বলিয়াছেন যে-হ সৌন্দর্য, মঙ্গল, মহত্ব ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। ১০০, বি)। বাহা কিছু মন্দর, মঙ্গল বা মহত্ব হইয়াছে তাহা এইরূপ, যে, ইহার মধ্যে-হ সৌন্দর্য, মঙ্গল এবং মহত্ব বর্তমান (১০০, ডি, ই)।

আমরা ব্যবহার করিয়াছি ‘স-হ সৌন্দর্য’। মূলে আছে kalon auto kath’ auto (কালন্ আউট-কাথ্-হাউট)। ইহার অর্থ ‘সৌন্দর্য নিজে বাহা’। ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে universal beauty (Jowett), absolute beauty (Church), abstract beauty (Cary, Blagrove and Farenside) ইত্যাদি। Burnet ব্যবহার করিয়াছেন “alone by itself”; তিনি বলেন ‘in itself’ দ্বারা এই অংশের অনুবাদ করা ভ্রমোৎপাদক (misleading), কারণ ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বর্তমান যুগের thing in itself এর ন্যায় ইহাও অজ্ঞের (৩৫, ডি, টীকা)।

এই অংশে প্লেটো অনুকৃতিবাদ (paradeigma) গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতিবাদ (methexis, parousia) গ্রহণ করিয়াছেন। পরম-সৌন্দর্য প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি

(১) বহুবস্তুর মধ্যে যে সাধারণত্ব আছে, যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা নির্ণয় করা হয়। এই সাধারণত্বই বস্তুর লক্ষণ, বিশেষত্ব, পরম রূপ।

(২) পরমরূপ পৃথিবীর বা স্বর্গের অতীত স্থানে খত্তর বস্তুরূপে অবস্থিত নহে। বস্তুর মধ্যেই বস্তুর জ্ঞানচক্ষে এই পরমরূপ দর্শন করিতে হয়।

১২ ; পলিটেইয়া (Republic)।

গ্রন্থের এই নামের বাংলা অর্থ ‘সাধারণ-তত্ত্ব’। ইহাতে ‘এইডস্-বাহ-বিষয়ে অনেক কথা আছে।

(ক) একস্থলে লিখিত আছে (৪০২, সি) যে, সংস্রম, মনুষ্যত্ব, বদাভ্যতা, মহত্বাদির আদর্শ (এইডস্) থাকা আবশ্যিক।

এ আদর্শ অবশ্যই মনোগত আদর্শ।

(খ) একস্থলে (৪৭৬-৪৮০) দুইটা বিষয়ে পার্থক্য করা হইয়াছে :—(১) সংসারের বস্তু বা বিষয়; (২) ইহাদিগের আদর্শ-রূপ, যেমন সৌন্দর্যের আদর্শরূপ স্ব-সৌন্দর্য।

এতদ্বয়ের সম্পর্ক-বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, পার্থিব বস্তু আদর্শরূপের অংশভাগী। এই অংশভাগিত্ব বুঝাইবার জন্য ‘মেটেইফিটা’ (metec-honta) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৪৭৬, ডি)।

(গ) একস্থলে (৪৮৪, সি) প্রশ্ন করা হইয়াছে—বাহাদের ‘তত্ত্ব’-জ্ঞান নাই, আত্মাতে (psyche—পসুক্হে) পরম সত্যের আদর্শ নাই, তাহারা দেশনামনের উপযুক্ত কি না। সোসাটেস্ এহলে চিত্রকরের উপমা দিয়াছেন। চিত্রকরের একটি আদর্শ আছে; সে সেই আদর্শকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া চিত্রকাব্য করে। বাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, এবং আত্মাতে আদর্শ নাই, তাহারা চিত্রকরের জ্ঞান আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া কাব্য করিতে পারে না।

এহলে বলা হইয়াছে যে এই আদর্শ (paradeigma) আত্মাতে।

(ঘ) একস্থলে (৫০০, ই) এইরূপ আছে—“বাহা (touto, টুট) জ্ঞাতবস্তুকে সত্য করিয়াছে (=জ্ঞাত হইতে দিরাছে, Bosanquet) এবং জ্ঞাতাকে জ্ঞানিবার ক্ষমতা দিরাছে, তাহা মঙ্গলের আদর্শ (idea—ইডেগা)—তুমি ইহাই বলিবে, তাহাকে তুমি জ্ঞান ও সত্যের কারণ বলিয়া বুঝিবে।.....যদিও জ্ঞান ও সত্য উভয়ই মন্দর, কিন্তু মঙ্গলকে ইহাদিগের অপেক্ষাও মন্দর বলিয়া জানিবে।”

গ্রন্থকারের অনুবাদে কিছু ভুল আছে। তিনি touto শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘যে সত্তা’। কিন্তু প্লেটো উক্ত অংশের কিছু পরেই বহি রাছেন—এই মঙ্গলরূপ একটি সত্তা (উসিয়া, ousia) নহে, কিন্তু ইহা, সৌরবে এবং ক্ষমতার সমুদায় সত্তাকে অতিক্রম করিয়াছে (৫০২, বি)।

এই অংশের প্রতি প্রাধান্য করা আবশ্যিক। Adam এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মঙ্গল নিজে সত্তা নহে, কিন্তু সত্তার কারণ, ইহাকে hyper-ousios (‘অতিসত্তা’ বা ‘অধিসত্তা’) বলা বাইতে পারে। Adam-এর আর একটি মন্তব্য এই, যে অর্থে আদর্শরূপ সমূহ সত্তা, সে অর্থে মঙ্গল সত্তা নহে। কিন্তু উচ্চতর অর্থে মঙ্গলই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, কারণ সমুদায় সত্তাই মঙ্গলের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ (determinations). Republic : Vol. ii, পৃ: ৬২।

Adam শেষ অংশে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্লেটো এহলে বলেন নাই। প্লেটো বাহা বলিয়াছেন তাহা এই—মঙ্গল সত্তা নহে, কিন্তু সত্তার নিয়ামক।

আরিস্টটল্ বাহাকে tolos (অর্থাৎ final cause, অন্ত্য কারণ, উদ্দেশ্য রূপ কারণ) বলিয়াছেন, এই মঙ্গলও সেই উদ্দেশ্য কারণ (Bosanquet : Companion to Republic, পৃ: ২৪২ ত্রুটব্য)।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ঈশ্বর ‘নির্মিত কারণ’ এবং মঙ্গল ‘উদ্দেশ্য রূপ কারণ’ এবং এই মঙ্গল ঈশ্বরেরই অন্তরঙ্গ আদর্শ।

“এই রূপং লক্ষ্যহীন নহে, ইহার এক মহান উদ্দেশ্য আছে। প্লেটোর মতে মঙ্গলই এই উদ্দেশ্য। এই ‘উদ্দেশ্য-কারণ’ বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—

এই বিজ্ঞের রূপতে মঙ্গলের আদর্শরূপ সর্বশেষে (telentiaia) এবং অস্তি কষ্টে (mogis) দৃষ্ট (onusthai) হয়। কিন্তু যখন দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, যে, বাহা কিছু সত্তা ও মন্দর, ইহাই (অর্থাৎ মঙ্গলের আদর্শরূপই) সে সমুদায়ের কারণই এদৃষ্টরূপতে ইহা জ্যোতির (জনক) এবং জ্যোতির ঈশ্বরেরও জনক; জ্ঞানরূপতে ইহা স্বয়ং প্রভু হইয়া সত্য ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছে। যিনি বিচক্ষণতার সহিত নিজের বা দেশের কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই মঙ্গলের আদর্শরূপকে লক্ষ্যপথে রাখিবেন (৫১৭, বি, সি)।

গ্রন্থকার প্রথম বাক্যটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—“জ্ঞানের রাজ্যে পরম শিব আদর্শদিগের জিজ্ঞাসার সীমা নির্দেশ করিতেছে; ইহা প্রায় অনবিগম্য”। প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৭৯।

তিনি সত্বতঃ Davies and Vaughan এর অনুবাদ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাদিগের অনুবাদ এই :—

"The essential Form of Good is the limit of our inquiries and can barely be perceived."

Bosanquet এই অনুবাদ বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The emphasis of the translation seems hardly right: rather—'in the world of knowledge, the form of good is perceived last and with difficulty, but when perceived' etc." (Companion, পৃ: ২৬৮)।

Jowett এর অনুবাদ, "The idea of good appears last of all and is seen with difficulty".

Davis এর অনুবাদ, "The idea of the good is the last object of vision" (Bohn's series).

Adam সাহেব টীকার লিখিয়াছেন—*Teleutaiia* as well as *noyis* should be taken predicatively with *o'ras-thai* (Vol. ii, পৃ: ৯৬) অর্থাৎ 'টেলোটাইইয়া' এবং 'নয়িস্' এই দুইটিকেই 'হরাস্থাই' ক্রিয়ার সহিত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা শেষ চারিজন লেখকের অনুসরণ করিয়াছি।

(৬) একস্থলে প্লেটো তিন-প্রকার শব্দার উল্লেখ করিয়াছেন (৪২৭)। প্রথমতঃ ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃত শব্দা, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিররচিত শব্দা; তৃতীয়তঃ চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত শব্দা।

প্লেটো প্রকৃত শব্দার মৌলিক প্রকৃতিকে *phusis* (প্ফুসিস) বলিয়াছেন। Adam এর টীকা এই—It seems to me certain that *phusis* in this passage refers to the essential nature (i. e., the Idea) of the thing in question" (Republic, Vol. ii, পৃ: ৩২২)

Burnet কাইডোন নামক গ্রন্থের টীকার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহা 'এইডে' (আদর্শরূপসমূহ) বিষয়ক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমুদায় গ্রীক চিন্তাশীল পণ্ডিত অতীব সং (most real) বস্তু বিষয়েই এই শব্দ ব্যবহৃত করেন এবং সোক্রেটসের অর্থ—the world of *eidē* (—পরম রূপের জগৎ)। টীকা ১০৩, বি (তাঁহার Early Greek Philosophy, পৃ: ১২ উদ্ধৃত)। 'কাইডোন' গ্রন্থের ২৪৬ অংশে টীকার Thompson লিখিয়াছেন যে Idea এবং *phusis* বহুস্থলে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

Zeller এর Plato নামক গ্রন্থে (পৃ: ২৪২) এবং Stewart এর Plato's Doctrine of Ideas নামক গ্রন্থে পৃ: (৬) বলা হইয়াছে যে, উদ্ধৃত অংশে ঈশ্বরকেই 'এইডস্' এর (অর্থাৎ পরম রূপের) সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে।

Jowett বলেন, প্রকৃত শব্দা ঈশ্বরের মনোগত আদর্শ (Republic, Vol. iii, পৃ: ৪৪৩-৪৪৪)।

ঈশ্বর 'এইডস্' অর্থাৎ পরম রূপকে সৃষ্টি করেন, এই মতটি অপ্রচলিত। এই মত *Phusis* বিষয়ে এত কথা বলা হইল।

১৩। ফাইড্রস

এই গ্রন্থে রূপকময় একটি উপাখ্যান দ্বারা আত্মার প্রকৃতি এবং বস্তুর প্রকৃত রূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রূপকটি এই—আত্মা একাধারে ত্রিমূর্তি; তিনটির মধ্যে একজন রথী এবং অপর দুইটি পক্ষবৃত্ত দুইটি অশ্ব। দেবগণের উত্তর অশ্বই সং এবং সৎশক্ত। অপরটির আত্মার একটি অশ্ব সং এবং অপরটি অসং ও অসৎশক্ত।

ব্যাখ্যাভূষণ অনেকে বলেন, জ্ঞানকে রথী, বিবেককে সৎশক্ত অশ্ব এবং ইচ্ছা বা বাসনাকে অসৎশক্ত অশ্ব বলা হইয়াছে।

জেউস্ দেবগণসহ ঐশ্বক্য পক্ষবৃত্ত রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন এবং তাঁহারা স্বর্ণপৃষ্ঠে অধিরোহণ করিয়া উর্দ্ধতরস্থ লোক দর্শন করেন। ঐ লোকেই বস্তুর প্রকৃত সত্তা বর্তমান রহিয়াছে। ইহা বর্ণহীন (*achrōmotos*), রূপহীন (*aschēmatisistos*) এবং অপ্রীক্ষ (*anophēs*, বাহ্যিক স্পর্শ করা যায় না)। আত্মার নিয়ন্তা যে জ্ঞান, কেবল সেই জ্ঞান দ্বারাই ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মা এইস্থলে 'স হ' (অর্থাৎ আত্মরূপে অবস্থিত) স্তায়, স হ সংঘন, এবং প্রকৃত জ্ঞান অবলোকন করেন। এ জ্ঞান উদ্ভবশীল বস্তুর জ্ঞান নহে, বস্তুর প্রকৃত সত্তা বাহা (*onta ontos*), এ জ্ঞান সেই সত্তার। এই সমুদায় দর্শন করিয়া, এই সমুদায় ভোজন করিয়া আত্মা পুনরায় স্বর্ণলোকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দেবগণের জীবন এইপ্রকার।

যে সমুদায় আত্মা দেবতুল্য, তাঁহারাও জ্ঞানসারথী সহ সেইস্থলে গমন করিয়া এইসমুদায় দর্শন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অবগণ কর্তৃক বিব্রত হইয়া অতি কষ্টে এই সমুদায় 'ভস্ব' দর্শন করেন। দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠীর আত্মাও সেই দিকে গমন করে; কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব অতি দুর্ভাগ্য, ইহাদিগের গতি উচ্চাচ, কখনও উর্দ্ধদিকে, কখনও বা নিম্নাভিমুখে। এইজন্য এই সমুদায় আত্মা, সমুদায় বস্তু দর্শন করিতে পারে না; কোন কোন 'ভস্ব' দর্শন করে, আবার কোন ভস্ব বা দর্শন করিতে পারে না।

অপরটির আত্মাও এইসমুদায় দর্শন করিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু সফলকাম হয় না। ইহারা নিম্নাভিমুখে নিপতিত হয়। গমন করিবার সময় এক অপরকে পদতলে দলিত করে, এক অপরকে উপর নিপতিত হয়, বিপুল শব্দ উথিত হয়, সকলে ধর্ম্মান্ত হয়, সারথির অকুশলভাবশতঃ কেহ ধস্ক হয়, কাহারও বা পক্ষ ভগ্ন হইয়া যায়। অবশেষে প্রকৃতরূপ দর্শন না করিয়াই ইহারা প্রত্যাবর্তন করে এবং 'মত' রূপ খাদ্য ভক্ষণ করে (২৪৬—২৪৮)।

এই স্থলে বাহা বলা হইয়াছে তাহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'আদর্শরূপ' (এইডস্) একটি পদার্থ (thing)। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যিক, ইহা একটি কবিত্বপূর্ণ রূপকময় পৌরাণিক উপাখ্যান। এখানে একটি বিশেষ সত্যকে রূপকাকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'কাইডোন' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রূপ-রশ্মির জগতে আদর্শের জ্ঞান লাভ করা দুর্লভ। দেহকে বৃত্তই অতিক্রম করা যায়, ততই আদর্শ জ্ঞানের সমীপবর্তী হওয়া যায় (৬৭)। এখানেও রূপকাকারে তাহাই বলা হইয়াছে। আদর্শরূপ কোথায়? না, আকাশেরও অতীত প্রদেশে (*uper-ouranian—'over space' 'supercelstial region'*)। Burnet বলেন, এ রাজ্য স্পষ্টই মনোরাজ্য, বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্য (*pure thought—Greek Phil., পৃ: ১৬৭*)। Lutoslawski বলেন, এখানে বলা হইল যে "এইডে" অর্থাৎ আদর্শসমূহকে জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করা হয় (পৃ: ৩৩৮; Plato's Logic)। প্লেটো নিজেই বলিয়াছেন যে, 'আদর্শরূপ' কেবল *nous* (অর্থাৎ মন, জ্ঞান বা চিন্তা) দ্বারা জটব্য (*monō theatē nō—2.17c*)। এই আখ্যানে সারথি হইল জ্ঞান; বিবেক ও বাসনা হইল অশ্বদ্বয়। ইহাদিগের সাহায্যেই আত্মা 'পরমরূপ' দর্শন করেন। এই 'পরমরূপ' মনেই প্রকাশিত হয়; সূত্রাৎ বলিতেই হয় যে, এ-সমুদায় মানস ব্যাপার। জ্ঞানীগণ 'পরমরূপ' ভোজন করেন (২৪৭ ই); অজ্ঞান ব্যক্তি 'মত' ভক্ষণ করে (২৪৮, বি)। এ-সমুদায়ই রূপক।

ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে, "এ নাম স্বর্ণেতে গোপনে ছিল"। সত্যই কি 'নাম' নামক একটি পদার্থ স্বর্ণলোকে গোপনে বাস করিয়া থাকে! রসময়ী কবিতাকে অরসিক যে ভাবে ব্যাখ্যা করে, প্লেটোর বর্ণনাকেও আরিস্টটল-প্রমুখ অরসিক পণ্ডিতগণ সেইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৪। ঠে আইটেটস্।

(ট্ হে আইটেটস্)।

এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' বাদ আলোচিত হয় নাই। কিন্তু জান কি, জান লাভ কি-প্রকারে সম্ভব, ইত্যাদি বিষয়ের অনেক আলোচনা আছে। প্রথমতঃ, প্লেটো স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ইন্ড্রিয়সমূহ দ্বারা-স্বরূপ, এই দ্বারা দ্বারা বিষয়সমূহ আত্মার নিকট উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আত্মার কতকগুলি মৌলিক ভাব আছে-- যেমন সৎ ও অসৎ, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য একত্ব ও পার্থক্য, এক ও অপরূপ সংখ্যা, যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যা ইত্যাদির ভাব (১৮৫-১৮৬)। তৃতীয়তঃ, এইসমূহ মৌলিক ভাব লইয়া আত্মা নিজে (autē di autēs ē phūchē—185D) বিষয়গুলির উপর কাণ্ডা করে। বিষয়সমূহকে তুলনা করা হয়, যুক্তিযুক্ত বিচার দ্বারা বিষয় সমূহের তত্ত্ব নির্ধারণ করা হয়।

যুক্তিযুক্ত বিচারকে Sullogismos (সুলগিসমস্) বলা হইয়াছে (১৮৬, ডি)। এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ syllogism—স্মার শাস্ত্রের 'অবয়বী'। কিন্তু এ স্থলে এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। Jowett ইহার অনুবাদ করিয়াছেন reasoning; (Campbell এর অনুবাদ generalization (গ্রন্থের টীকা পৃ: ১৬৪)।

বিচার দ্বারা আত্মা যে জান লাভ করে, তাহা সাধারণতঃের জান। এ গ্রন্থে এইটুকু 'এইডস্' বাদ পাওয়া যায়। কি-প্রকারে জানলাভ করা যায়, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, বস্তুসমূহের সাধারণত্ব ও একটি বস্তু hypostatized entity)—এ মত এ গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই (Campbell উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকা, পৃ: ৫৩)।

১৫। পামেনিডেস্

সাধারণতঃ লোকে বাহ্যিক প্লেটোর 'এইডস্' বাদ বলে এই গ্রন্থে পামেনিডেস্ সেই মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন (tears the theory of ideas into pieces: Windelband: History of Ancient Philosophy, পৃ: ১৮৭)। আমরা কেবল দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) একটি মত এই—'এইডস্'-সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু প্রত্যেক পরমরূপই আংশিকভাবে বিভিন্ন বস্তুতে অবস্থিত। এই মতের নাম 'অবস্থিতি বাদ'। এই গ্রন্থে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এ মত অস্বীকার্যক (১৩১-১৩২)।

(২) আর একটি মত এই—'এইডস্' সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা আছে; এসমূহের আদর্শরূপে অবস্থিত। বিভিন্ন বস্তু এইসমূহের আদর্শের অনুকরণে সৃষ্ট। এই মতকে 'আদর্শবাদ' বা 'অনুকৃতি বাদ' বলা হইতে পারে। এ গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে, এ মতও অস্বীকার্যক (১৩২-১৩৩)।

এই আলোচনার অনেক অল্পত প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছিল। যেমন, কেশ, কর্ণস, মল প্রভৃতির এইডস্ আছে কিনা। এ সমস্যার 'এইডস্' স্বীকৃত হয় নাই। 'তৃতীয় পুরুষ' স্মার (tritos anthropos) দ্বারাও পামেনিডেস্ 'এইডস্' বাদকে খণ্ডন করিয়াছিলেন। অপরূপ কি যুক্তি দ্বারা এই মত খণ্ডিত হইয়াছিল, এস্থলে সে-সমস্যার আলোচনা করা সম্ভব নহে। লোকে যে মতকে প্লেটোর মত বলিয়া মনে করে, সেটো নিজে সেই মতকে কেন খণ্ডন করিলেন--সে বিচারেও আমরা সন্দেহ হইব না। তবে এইসময় উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, এইমত কেহ কেহ (যেমন Ueberweg) বলেন যে এ গ্রন্থ প্লেটোর নহে। তবে পণ্ডিতসমাজে এখন গৃহীত হয় নাই।

১৬। সপ্‌হিস্টেস্

এই গ্রন্থে এক জ্ঞেয় দার্শনিক পণ্ডিতের উল্লেখ আছে বাছাদিপের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ক্লগ্রেমিক' (এইডোন প্‌হিলই eidon philoi)। ইহার বলা 'সৎ' এবং 'উত্তম' পদ্যের বিভিন্ন। 'সৎ' অপরিবর্তনীয় এবং 'উত্তম' পরিবর্তনশীল। এই মতে 'সৎ' কোন ক্রিয়াকর্তাও হইতে পারে না এবং কর্তৃও হইতে পারে না।

'সপ্‌হিস্টেস্' গ্রন্থে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। এক স্থলে (২৪৭, ই) বলা হইয়াছে যে, বাহ্য শক্তি দ্বারা অপের উপর কাণ্ডা করে এবং বাহ্য উপর শক্তি দ্বারা কাণ্ডা করা যায় তাহাই 'সৎ'। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ সৎ বস্তুতে গতি (kinēsis), প্রাণ (zōē), আত্মা (psuchē) এবং জ্ঞান (phronēsis) বর্তমান (২৪৮-২৪৯)।

'এইডস্' সমূহ অবশ্যই 'সৎ', সুতরাং আত্মা, জ্ঞান, প্রাণ, গতি প্রভৃতি 'এইডস্' এ বর্তমান।

সুতরাং দেখা বাইতেছে যে গ্রন্থে 'এইডস্'-সমূহকে জগদন্তীত স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে না।

১৭। প্‌হিলে বস্।

বাহ্য কিছু আছে, সে-সমস্যাকে এই গ্রন্থে ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) বাহ্য অপরিমিত বা অসীম (Apeiron), (২) বাহ্য পরিমিত (Peras), (৩) বাহ্য এতদুভয়ের মিশ্রণ (mikron), (৪) কারণ (aitia) (গ্রন্থের ২৩-৩১ অংশ)

এই গ্রন্থের মতে জ্ঞানই (nous) কারণ। একস্থলে (২৮, সি) বলা হইয়াছে 'জ্ঞানই (nous) পৃথিবী ও স্বর্গের রাজা।' ইহার কিছু পরেই বলা হইয়াছে যে 'জ্ঞান (nous) এবং প্রজ্ঞা (phronēsis) এতদুভয়ে নিরমিত ও শাসন করিতেছে' (২৮, ডি)। অপর একস্থলে (৩০, সি) এই কারণকে sophia এবং nous বলা হইয়াছে।

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল ইহা সাধারণ জ্ঞান বা কর্তৃত্ব-বিহীন জ্ঞান নহে। ইহা জ্ঞানবান পুরুষ। প্লেটো এই গ্রন্থে গুণ ও গুণিত্তে কোন পার্থক্য করেন নাই। একস্থলে (৩৬, ই) বলিয়াছেন, কারণ (To aition) এবং কর্তা (To poioun) এতদুভয়ে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল নামে। আর সাক্ষাৎভাবেই একস্থলে (২৭, বি) এই কারণকে বিশ্বকর্মা (Demiourgos) অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থে কেবল চারিটি তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এখানে প্রশ্ন--তবে 'এইডস্' এর স্থান কোথায়? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ ইহাকে দ্বিতীয় তত্ত্বের, কেহ তৃতীয় তত্ত্বের এবং কেহ বা চতুর্থ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন।

Zeller (প্লেটো, পৃ: ২৬৬), Bury (Philebus এর উপক্রমণিকাতে, পৃ:—xiv—xviii; ixiv—lxxiv), Stewart (Plato's Doctrine of Ideas, pp. 98-99) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন—'এইডস্' এর স্থান চতুর্থ তত্ত্ব অর্থাৎ কারণে।

Bury, Stewart প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই 'এইডস্' ঈশ্বরেরই মনোগত আদর্শ। আরিস্টটেল চারিটি কারণের নাম করিয়াছেন। চতুর্থ কারণের নাম telos, final cause, অন্ত্য কারণ বা 'উদ্দেশ্য কারণ'। ঈশ্বরের মনোগত এই যে আদর্শ, ইহাই এই উদ্দেশ্য-কারণ। (Bury's Philebus, p. xviii; Stewart's Plato's Ideas, পৃ: ৯৬-১০০)।

১৮। টিমাএউস্।

এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টিবিষয়ে চারিটি তত্ত্ব পাওয়া যায় :—

(১) বিশ্বকর্মা। (২) আদর্শ রূপসমূহ ('এইডে')। এই আদর্শরূপ অনুসারে বিশ্বকর্মা বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। 'এইডে' হইল আদর্শ (পাশাডেইগ্-মা (এবং বিশ্ব হইল তাহার অনুকৃতি। (৩) দেশ বা আকাশ (chora, ক্হোরা, খোরা)। (৪) সৃষ্টি জগৎ।

এখানে প্রথম প্রশ্ন, বিশ্বকর্মার সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ ?

কাইডেন্ গ্রন্থের টিকার Archer-Hind বলেন : "We must identify *theos* with absolute mind, the *nous basileus* of Philobus, the mythical *demiourgos* of the *Timaeus*" (পৃ: ১২০) অর্থাৎ 'কাইডেন' গ্রন্থের প্রথম, কিলেবস্ গ্রন্থের জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বরাজ, এবং টিমাএউস্ গ্রন্থের বিশ্বকর্মা একই; এক পরমাত্মাই।

বার্ণেট্ (Greek Phil. part i, p. 169), Ueberweg (Ancient Phil., p. 122) প্রভৃতিও বলেন এই গ্রন্থের বিশ্বকর্মা পরমেশ্বরই।

উত্তরকালে পরমেশ্বর এবং বিশ্বকর্মা এতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থে সে পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ঈশ্বরের সহিত মঙ্গল রূপের (অর্থাৎ মঙ্গলের 'এইডস্' এর) কি সম্বন্ধ ?

Zeller এর মতে উত্তরই এক (Plato, pp. 279-292)

Adamও ইহাই বলেন। তিনি Republic এর টিকার লিখিয়াছেন—The majority of interpreters are now agreed in identifying Plato's Idea of the Good with the philosophical conception of the Deity", p. 51. অর্থাৎ এখন অধিকাংশ ব্যাখ্যাত্মপন্থেই এই মত যে প্লেটোর 'শিব-রূপ' এবং দার্শনিকগণের ঈশ্বর একই।

Stewart বলেন—"বিজ্ঞানের দিক্ হইতে বাহা 'শিব-রূপ', ধর্ম-ভাবের দিক্ হইতে তাহাই পরমেশ্বর" (Plato's Doctrine of Ideas, p. 102)

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে Ueberweg (পৃ: ১২২), Schwegler (পৃ: ৮১), Weber (পৃ: ৮১) ও এই মত পোষণ করেন।

তবে বিরোধী মতও আছে। Burnet উত্তরের একত্ব স্বীকার করেন না (Gr. Phil., p. 169 footnote)। Erdmann এর মতে মঙ্গলের 'এইডস্' অন্ত্যকারণ, final cause, ঈশ্বরেরই মঙ্গল উদ্দেশ্য (Hist. Phil., Vol. i, p. 109-116)। কেহ কেহ বলেন "মঙ্গলরূপ" পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত; আবার কাহারও বা মত—মঙ্গল রূপ হইতেই পরমেশ্বরের উৎপত্তি (Stewart এর গ্রন্থে পৃ: ১০১ এবং Zeller এর প্লেটোতে, পৃ: ২৮৩—২৮৪, ইহার আলোচনা কর্তব্য)।

তৃতীয় প্রশ্ন—ঈশ্বরের সঙ্গে অপরাপর 'এইডস্' এর কি সম্বন্ধ ? এবিষয়ে মতভেদ অনেক।

প্রচলিত মত এই যে, আদর্শরূপসমূহ নিরপেক্ষ সত্তা; ইহার ঈশ্বর হইতেও পৃথক্ এবং 'স্বতন্ত্র'। প্রথমে আরিস্টটল এইমতকে প্লেটোর মত বলিয়া প্রচার করেন। লোকেও এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে এবিষয়ে পৃথক্ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য; কিন্তু বিরোধী শিষ্য। বিরোধী শিষ্যের পক্ষে প্রথম সব মত স্থাপন করা সহজ নহে। অনেকে মনে করেন,

আরিস্টটল প্লেটোর এইডস্ বাহা বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। এ-প্রকার অভিযোগ যে অনুসৃত নহে, তাহা পূর্বের আলোচনাতেই বুঝা যাইবে। অপরাপর মতামত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

Lutoslawski বলেন "The ideas were nothing else for Plato when he wrote *Timaeus* than (God's thoughts)"। অর্থাৎ প্লেটো যখন টিমাএউস্ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি মনে করিতেন 'এইডস্'-সমূহ ঈশ্বরের চিন্তা! ভিন্ন আর কিছুই নহে (Plato's Logic, p. 477)।

Erdmann বলেন—"God contemplates the Ideas, the eternal archetypes of things, but contemplates them as a poet does his ideals, i. e., generating them himself (Rep.) and then implants them in matter" অর্থাৎ কবি যেমন নিজ আদর্শকে উৎপন্ন করেন, চিন্তা করেন, ঈশ্বরও আদর্শরূপ বিবরে তেমনি করেন (Hist. Phil., Vol. i, p. 115)।

কেহ কেহ মনে করেন আদর্শরূপসমূহ ঈশ্বরেরই নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত। তিনি যেমন নিজেকে বা স্ব-রূপকে সৃষ্টি করেন না, তেমনি 'আদর্শ' সমূহকেও সৃষ্টি করেন না—এ সমুদায় তাঁহার মজই। এই মতই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বাহা কিছু চিন্তা করা যাইতে পারে, সেই সমুদায় তিন শ্রেণীর অন্তর্গত; ১। বাহা সৎ; ২। বাহা ঘটনা, বাহা পরিবর্তনশীল; ৩। বাহা স্বতঃসিদ্ধ—যেমন $c = c$; $e + ৩ = ৮$ ইত্যাদি; এইসমুদায় সত্য নিত্য স্বতঃসিদ্ধ, এ-সমুদায়কে সৃষ্টি করিতে হয় না; ঈশ্বরের প্রযুক্তিই এই যে, তিনি এই স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করেন।

Lotze এর 'Validity' এই শ্রেণীর মত (Logic Vol. ii, 209-222)। ইহার সমর হইতে এই মতকে অনেকে যুক্তিসূক্ত মনে করিয়া আসিতেছেন।

অধিক আলোচনা আবশ্যিক। অপরাপর গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। আলোচনা করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এই :—

১। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'এইডস্' মানবের চিন্তা ও বিচারের ফল। বহু বিষয় বিচার করিয়া তাহাধিগের মধ্যে যে সাধারণ ভাব পাওয়া যায়, তাহাই 'এইডস্'।

২। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, কতকগুলি 'এইডস্' আত্মার মৌলিক ভাব। যেমন, সাদৃশ্য অসাদৃশ্য, ভালমন্দ, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদির ভাব। এইসমুদায় মৌলিক ভাব আছে বলিয়াই সত্যাসত্য, স্তায় অন্তরাধি বিচার করা সম্ভব।

৩। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'এইডস্' নিত্য; আবার ইহাও বলা হইয়াছে, এইডস্ সৃষ্টি।

৪। কোন স্থলে বলা হইয়াছে, এইডস্ আত্মার অন্তরে; কোন কোন স্থলে পড়িয়া মনে হইতে পারে, 'এইডস্' আত্মার বাহিরে এবং স্বর্গাদি লোকেরও বাহিরে।

৫। ব্যাখ্যাকর্তৃগণের মধ্যে কেহ বলেন, 'এইডস্' একটি বস্তু (thing), কেহ বলেন, নহে। কেহ বলেন, ইহা মানবের চিন্তা, কেহ বলেন ঈশ্বরের চিন্তা, কেহ বা বলেন উত্তরই (Weber, Hist. Phil., p. 84)।

৬। প্লেটো কোন স্থলে বলিয়াছেন, ঈশ্বর জগতের কারণ; আবার কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'মঙ্গল-রূপ' (মঙ্গলের এইডস্) জগতের কারণ।

৭। কেহ ব্যাখ্যা করেন, ঈশ্বর ও 'মঙ্গল রূপ' একই; কেহ বলেন না।

৮। কেহ বলেন, ঈশ্বর মঙ্গল-রূপ হইতে উৎপন্ন, কেহ বলেন 'মঙ্গলরূপ' ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। কেহ বলেন, ঈশ্বর 'মঙ্গল রূপ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; কেহ বলেন মঙ্গলরূপ ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এবং কেহ বা বলেন—মঙ্গল-রূপ ঈশ্বরেরই অঙ্গীভূত, ঈশ্বরেরই আদর্শ।

৯। প্লেটো কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন 'এইডস্' আদর্শ রূপ; পার্শ্বিক বস্তু ইহার নকল। আবার কোন স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এইডস্ পার্শ্বিক বস্তুতে অস্বাভিক-পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট। আবার কোন কোন স্থলে আংশিকভাবে ছুই মতেরই সমাবেশ দেখা যায়।

এত বিভিন্ন মত। কেহ বলেন, প্লেটো তিন তিন সময়ে তিন তিন মত পোষণ করিতেন; কেহ বলেন—মত একই, তবে ইহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। কেহ বা বলেন, মধ্য সময়েই প্লেটো অপরিবর্তিতভাবে একই মতে বিশ্বাস করিতেন। এ অবস্থায় প্লেটোর মতের ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ব্যাখ্যা করিবার সময় বিচারিতভাবে কিছুই বলা উচিত নহে এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে প্ৰাতিপত্তি পণ্ডিতগণ কি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আবশ্যিক।

এখন দেখা যাক ঐহিক গ্রন্থকার প্লেটো বিষয়ে কি বলিয়াছেন। 'এইডস্'-বাদ বিষয়ে তাঁহার প্রধান প্রধান মন্তব্য এই :—

১। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ফোটি-সমূহ ঈশ্বর [ঈশ্বরের?] বা মানবের মনন নহে" পৃ: ১২৫।

এ বিষয়ে কত মতভেদ তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

২। 'এইডস্' "আদিরূপ (archetypes)", পৃ: ১২১। 'ফোটি-সমূহের একটি স্বতন্ত্র পরম সত্তা আছে; উহার নাম 'সমূহ', পৃ: ১২৪।

হাঁ, ইহাও একটি মত। কিন্তু প্লেটো ইহাও বলিয়াছেন, "এইডস্" সৃষ্ট (সাধারণতঃ ৫২৭)। ইহা আনাদিপের গ্রন্থকারের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।

৩। গ্রন্থকার বহুস্থলে বলিয়াছেন যে 'এইডস্' সমূহ 'পদার্থ', 'বস্তু', 'সত্তা' (পৃ: ১৮৬, ১২৪, ১২৫, ১২৭ ইত্যাদি)। এই তিনটি শব্দের নানা অর্থ; আমরা বুঝিরাছি গ্রন্থকার প্রচলিত অর্থেই এই সমুদায় ব্যবহার করিয়াছেন। সমুদায় গুলিরই অর্থ, অন্ততঃ ইহার একটি শব্দেরও অর্থ things কিংবা hypostatised entities, আলোচনা করিয়া দেখান গিয়াছে যে এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। Stewart তাঁহার Plato's Doctrine of Ideas নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যে 'এইডস্' কে thing (অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু) বলা যায় না।

৪। গ্রন্থকার বলেন, সমুদায় পদার্থ এইডস্ সমূহের "অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে।" পৃ: ১২৫।

এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সমুদায় বস্তু এইডস্ সমূহের 'অংশভাৎ' (পৃ: ১২৫)।

প্লেটোর গ্রন্থে এই দুইটি মতই পাওয়া যায়; কিন্তু এ দুইটি পৃথক মত, একমত নহে। অনেকে এমন ভাবে প্লেটোর মতকে বর্ণনা করিয়াছেন যেন এই দুই মতে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে এ পার্থক্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃত কথা এই—যে স্থলে একটি জগৎ আদর্শ, আর একটি জগৎ তাহার অনুকৃতি, সে স্থলে দুইটি জগতের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু যখন বলা হয় এক অপরের অংশভাৎ,

তখন স্বীকার করা হয় যে উভয় জগতের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। (Burnet: Greek Philosophy, p.166)।

Adam (Republic, Vol. ii, p. 173), Archer-Hind (Phaedo, 100D) প্রকৃতি পণ্ডিতগণ এই পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থকার এ বিষয়ে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।

(৫) গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—"প্লেটোর স্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; স্ফোটবাদই শাস্ত্র বেবকুল এবং স্ফোট-শিরোমণি পরম শিবই ঈশ্বর"। পৃ: ২১৬।

এই অংশ পঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইরাছি: আনাদিপের বক্তব্য এই :—

(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্তমান এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্র দেবকুলও বর্তমান। যে-মতে ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 'শাস্ত্র' সত্তার স্থান আছে, সে মত কি ব্রহ্মবাদ? ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিস্তুত অধৈতবাদ। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অর্থ ব্রহ্ম চাড়া দ্বিতীয় বস্তুই নাই। ব্রহ্মবাদ সর্বপ্রকার দ্বৈতগন্ধবিবর্জিত।

(খ) তিনি অপরস্থলে বলিয়াছেন অড় অসৃষ্ট। "অড় বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্বেও ছিল"। পৃ: ১২২।

এ স্থলেও বলা হইয়াছে যে, প্লেটো দ্বৈতবাদী।

(গ) গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবাত্মাও "অজ, নিত্য, শাস্ত্র" পৃ: ২০৩; (২০৫ জ)।

ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাস্ত্র মানবাত্মা বর্তমান। ইহা যোর দ্বৈতবাদ—অথচ গ্রন্থকার বলিতেছেন—প্লেটো ব্রহ্মতত্ত্বই শিক্ষা দিয়াছেন!

(ঘ) গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন, "ঈশ্বর অলজ্জা নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং তদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হইয়া, (পূর্বেও অর্থে) জগৎ সৃজন করিলেন"। পৃ: ১২২।

প্লেটোর মতে ঈশ্বর এক, নিয়তি অজ্ঞ। এই নিয়তি অলজ্জা। ইহার সহিত ঈশ্বরকে সংগ্রাম করিতে হয়। এবং যে অর্থেই হউক ঈশ্বরকে নিয়তি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহতও হইতে হয়।

এ যে যোর দ্বৈতবাদ! কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্লেটোর মত ব্রহ্মবাদই।

(ঙ) আর তিনি স্পষ্টভাবে নিজেই বলিয়াছেন যে, প্লেটো দ্বৈতবাদী। একস্থলে লিখিয়াছেন—"সৃষ্টির মূলে দুইটা কারণ স্বীকৃত হইতেছে।.....প্লেটোর দর্শনে স্ফোটগণও অড় জগৎ দুই-ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কাজেই তিনি দ্বৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই"। পৃ: ২০০।

অথচ তিনি বলিতেছেন প্লেটোর মত ব্রহ্মতত্ত্বই।

(চ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও বলা হইয়াছে, "পরম শিব.....ঈশ্বর (উপনিষদের ব্রহ্ম)"। পৃ: ৪৮৩

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থকার বলেন যে, পরম শিবের সঙ্গে সঙ্গেই 'শাস্ত্র' 'স্ফোটবাদ' বর্তমান। এই 'পরম শিব' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নহে—তবে ইহা কি প্রকারে ব্রহ্মগণবাচ্য হইবে?

(ছ) গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "স্ফোটবাদই শাস্ত্র দেবকুল"। পৃ: ২১৬ এই ভাষা অত্যন্ত আপত্তিকর। এই কবিত্ব কেবল অর্থহীন মতে—ইহা অসংগোপক। আদর্শ সংঘ, আদর্শ সাহস প্রকৃতি কি দেবতা? আর কাইডস্ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জেহুস এবং দেবগণই এই সমুদায় রূপ (গ্রন্থকারের ভাষায়, এই সমুদায় স্ফোট) দর্শন করেন (২৪৬—২৪৭)।

(৩) গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “স্কেটিবাদের নামান্তর অধ্যাত্তবাদ”
পৃ: ১১৭

তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘স্কেট’ সমূহ ‘বস্ত্র’ ‘নিজা,’ ‘শাখত,’ ‘অপ্রতিষ্ঠ’ ‘অন্ত-নিরপেক্ষ’। ইহাদিগের অস্তিত্ব পরমান্বার উপরও নির্ভর করে না। এসমুদায় পরমান্বার কিংবা জীবাত্তার কাহারও সৃষ্টি নহে, কাহার মননও নহে। আত্মার সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্কই নাই। তবে এমত অধ্যাত্ত-বাদ হইবে কি প্রকারে? Subjective Idealism, Objective Idealism, Absolute Idealism ইত্যাদি বহু প্রকার Idealism আছে, কোন Idealism-এই গ্রন্থকার-বর্ণিত বস্ত্র অ-প্রতিষ্ঠ, অন্ত-নিরপেক্ষ ‘স্কেটিবাদের’ স্থান নাই।

কিন্তু ঐহারা ‘এইডস্’ সমূহকে মানবাত্তার বা পরমান্বার চিন্তা বলিয়া মনে করেন, ঐহারা অবশ্যই মেটোর মতকে একশ্রেণীর অধ্যাত্তবাদ বলিতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থকার ‘এইডস্’-বাদের

বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব। ইহা একই সত্ত্ব-বাদ।

Taylor বলেন, “Plato’s theory of Ideas as the t objects of knowledge is not at all a doctrine Idealism” (Plato, p. 43). তিনি ইহার নাম দিয়াছেন ‘Conceptual Realism’, p. 43. অনেকে এই মত পোষণ করেন।

গ্রন্থকার যেভাবে মেটোর ‘এইডস্’ বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সামঞ্জস্য না করিয়া কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন; অনেক মেটোর মত এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাহাতে মনে হয় এ ব্য বেন সর্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন : অর্থাৎ এই স্থলেই প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। তৃতীয় প্রবন্ধে অর্থাৎ বিষয় আলোচিত হইবে।

কবির খেয়াল

শ্রী রামেন্দু দত্ত

এত যে ব্যাকুল মধু-সঞ্চয়ে অলিকুল—
মধু কি অলিরে চাহে ?
চাতক আকুল মেঘের সলিল পিহিতে যে—
মেঘ পুলকিত তাহে ?
জ্যোৎস্না কি কতু চকোরের তরে
বিরহীর মত গোপনে গুমরে ?
স্রাবের তরে আগমনী কেহ
মানসের সরে গাহে ?

ব্যগ্র কি কতু উদার উদাস অমুখি
চটুলা তটিনী লাগি ?
মধুর-মাতন নেহারি’, শ্রাবণ-অমুদে
রহে কি পুলক জাগি ?
উঠিবার আগে প্রভাত-তপন
নলিনী-দলের দেখে কি স্বপন ?
বরষা কি কতু অপেক্ষিয়া রহে
দাহুরীর ডাক মাগি ?

প্রভুর সমদৃষ্টি

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ধৈর্য্য ধরিতে পার না কি মন,—
দেখ না কি সেই জন
পতঙ্গ, কীট, বিহঙ্গ, পশু,—
তত্ত্ব সবার ল’ন ?
জঠর-নিবাসে থাকিলেও জীব,
সংবাদ ল’ন তার,
বিশ্বত তিনি হবেন কেমনে
যাহারা আছয়ে বা’র !
প্রভুর হাসির আলোক হইতে
দূরে কেন যাও ভাই ?
প্রিয়তমে ছাড়ি’ অন্তে ধোয়াও,
সকলি ব্যর্থ তাই।



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদেরকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যিক। সমালোচিত পুস্তক সখ্জে মতামতের প্রতিবাদ বা সমালোচনা সাধারণতঃ ছাপা হয় না। সম্পাদক।]

“মহাভারত ও আচার্য্য বহুর আবিষ্কার”

(১)

পৌষের প্রবাসীতে “মহাভারত ও আচার্য্য বহুর আবিষ্কার” পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। কোন অজ্ঞাতনামা পত্র-লেখকের কথায় মহাভারতে বৃক্ষজীবনের কোন কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়া সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় অবাধে কলাম চালাইয়া গিয়াছেন। “যিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি” থাকিতে পারে, কিন্তু (মহাভারত গড়া দুরে থাক্) তিনি বোধ হয় বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক এই প্রবাসী পত্রিকাটিও নিয়মিত পাঠ করেন না। মহাভারত হইতে কোন তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াও সম্পাদক মহাশয় যদি প্রবাসীর পুরাণ কাহিনীর কথা একবার স্মরণ করিতেন, তাহা হইলেই আর তাঁহাকে এ অনর্থক পরিভ্রম করিতে হইত না। মহাভারত-আদি হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে যে বৃক্ষজীবনের কথা আছে, সে-সখ্জে এই প্রবাসীতেই একাধিক বোঝা বাহির হইয়াছিল; আর তাহাও কিছু দশ-বিশ বৎসর পূর্বে নহে— এই সেদিন।

গত ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে “উদ্ভিজ্জ চৈতন্ত” (৭৮৬ পৃষ্ঠা) নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাভারতে বৃক্ষজীবন-সখ্জে আলোচনার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “মহাভারত-কারের মতে বৃক্ষাদির সমুদয় ইন্দ্রিয়ই আছে এবং ইহারা সচেতন”। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, “বৃক্ষাদি যে চৈতন্ত-বিশিষ্ট ভারতীয় পাঠকগণের নিকট তাহা নূতন কথা নহে।এ-সমুদয় কথা লইয়া অনেকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সাধকগণের বিশ্বাস যে, তাঁহারা বৃক্ষের চৈতন্ত দর্শন করেন।.....বিজ্ঞান-জগতের পরম সৌভাগ্য যে ডাক্তার বহু ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঙ্গলভাষি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলে এ-সমুদয় বিষয়ে তাঁহার কোন কল্পনাই আসিত কি না তাহা কে জানে? অগ্রহারণের প্রবাসীতে (১৩২৮—১৯৯ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস পূর্বোক্ত প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, “মহাভারতের শাস্তিপর্বে ভীম এ-সখ্জে তাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ...। আপনার প্রবন্ধকারেরা শাস্তিপর্কে হইতে উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু বৃক্ষলতার যে হিতাহিত বিবেচনা আছে, কোন কার্য্য হিতকর কোন কার্য্য গহিত তাহা বুঝিবার যে সামর্থ্য আছে—তাহা ভীম অতি বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।”

মহেশবাবুর বক্তব্যে ও বহুবাসীর মন্তব্যে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই। এক অমূলক কথার উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ পাঠকের প্রবন্ধের গ্রন্থসমূহের প্রতি বিক্রপাত্মক আঘাত করা প্রবাসীর উপযুক্ত সম্পাদকের পক্ষে নীরবের কথা নহে।

শ্রী অচিন্ত্যানন্দ রায়

“মহাভারত ও আচার্য্য বহুর আবিষ্কার।”

(২)

পৌষ মাসের “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদকের নোটে যে “একটি... টিঙ্গনী” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার খবরটি আমাদের ভাল লাগিল না। ‘প্রবাসীর’ সৌজন্যে ‘বহুবাসীর’ প্রবন্ধটি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে আচার্য্য বহু-মহাশয়ের অসম্মান বা অগৌরবের কথা কিছুই নাই। পরন্তু প্রবন্ধকার আচার্য্যের আবিষ্কৃত তথ্যের বখাবথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার “আবিষ্কারের বিশেষত্ব”ও দেখাইয়াছেন। বোধ হয়, প্রবন্ধকারের অপরাধ, তিনি লিখিয়াছেন “... হিন্দুর উপনিষৎ শাস্ত্র এবং পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি জানাইয়া দিয়াছেন, বৃক্ষেরও জীবজন্তুর মত ইন্দ্রিয় আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল।” আমাদের মনে রাখার জুল যদি না হয়, আচার্য্য বহু-মহাশয়, তাঁহার “মাত্রে” (To mother) উৎসর্গীকৃত পুস্তকের (Response in the Living and Non-living) সূচনাতে স্বয়ংই সূক্তকণ্ঠে ব্যাপন করিয়াছিলেন, যে, তিনি যে তথ্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যুগযুগান্ত পূর্বে আর্ধ্য্যবিদগণ ভাগীরথীতীরে পাহিয়া গিয়াছেন।

“বাংলা সাহিত্যে...খুব প্রসিদ্ধি” সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার সহায় হইতে পারে না। আর আর্ধ্য্যশাস্ত্রে “ঐচ্ছিক বিজ্ঞানের কোন তথ্য” বর্ণিত আছে কি না, তাহার আলোচনার স্থলও ইহা নহে। এসম্বন্ধে এইমাত্র বলা বাইতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে জানা যায়, মহাবী নারদ যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ‘ভূতবিজ্ঞান’ (Physical Science) তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। Sir William Jonesও তাঁহার দশম প্রবন্ধে (Discourse x) লিখিয়াছেন : “এদেশে জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনুশীলন অরণ্যভীতকাল ধরিয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—এসকল বিষয়ে উপাদেয় সংস্কৃত আলোচনা দেখিতে পাইবার আশা করা যায়—কারণ প্রাচীন হিন্দুগণ ঐ মনোমুগ্ধকর শিক্ষার নিঃসন্দেহই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন” (“Physics appears in these regions to have been cultivated from time immemorial, as well as Chemistry, on which we may hope to find useful disquisitions in Sanskrit, since the old Hindus unquestionably applied themselves to that enchanting study”)। উদ্বারচেষ্টাঃ যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক Tunzelmannও লিখিয়াছেন : “ব্যাপি বৈদিক বিশ্বপ্রকরণ আধুনিক জড় বিজ্ঞানের বিশ্বপ্রকরণের সহিত সর্বিশেষ বা সর্বোংশে তুলনাসহ নহে,—আর সেরূপ প্রত্যাশা করাও চলে না,—তথাপি উভয়ের মূল রেখা-পাতের সাদৃশ্য, এমন-কি প্রথম দৃষ্টিতেই, নিরতিশয় কৌতুকবহু। উক্ত সাদৃশ্য আরও অধিকতর কৌতুকবহু হইয়া উঠে যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, শক্তি (force) সংজ্ঞার অতিহিত ভূমি অব্যাপনোক্ত—অনির্দিষ্ট বৈদিক পরিকল্পনার (concept) সামগ্রণ্ড, আধুনিক সক্রিয় শক্তির

(force) অপেক্ষা অক্রিয় শক্তির (energy) পরিবর্তনের সহিতই অধিকতর। এবং (বৈদিক বিশ্বপ্রকরণে) যখন সক্রিয় শক্তির (force) হলে অক্রিয় শক্তি (energy) এইপদ অধিষ্ঠিত হয়, তখন সড়কবিজ্ঞান-মুশীলনের আধুনিকতম বিকাশব্যাপ্তক বাদের সহিত বৈদিক সৃষ্টি বিবর্ত-বাদ একান্তক বা অভিন্ন হইয়া পড়ে।” (Although the Vedic scheme of the universe does not and could not be expected to bear detailed comparison with that of modern physical science, the similarity of their broad out-lines is extremely remarkable, even at first sight. It becomes still more so when we take note of the fact that the very indefinite Vedic concept designated by the term force corresponds far more with the modern concept of energy than with that of force, and when the term energy is substituted for force, the Vedic scheme of development becomes identical with one which expresses the most recent development of physical research”)

‘প্রবাসীর’ পত্র-লেখক মহাশয় জানিতে উৎসুক, “বৃক্ষ জীবনের সকল রহস্য” মহাত্মারতের কোথায় আছে। দুঃখের বিবর তাঁহার কোতুলক চরিতার্থ করিতে আমরা উপস্থিত অক্ষম। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মূল মহাত্মারতথানি পড়িয়াছিলাম; “বাণ্যকাল হইতে” “পড়িয়া আসিবার” সৌভাগ্য হয় নাই। আর মহাত্মারতথানিও এখন হাতের কাছে নাই। বাহা হউক, তিনি যদি মহাত্মারতের অন্ততঃ শান্তিপর্কটি আর-একবার পড়েন ও বৃক্ষ-জীবনের অনেক রহস্যের বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। দৃষ্টান্তরূপ পুস্তকান্তরে উক্ত এই করটি শ্লোক আমরা তাঁহাকে “উপহার” দিলাম :

উন্নতেঃ স্নায়তে পর্ণং স্বক্ কলং পুষ্পমেব চ ।
স্নায়তে শীর্ষ্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্ত বিদ্বতে ।
বাব স্নায়নির্নির্ঘোষৈঃ কলং পুষ্পং বিশীর্ষ্যতে ।
স্রোত্রেণ গৃহতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্তি পাদপাঃ ।
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সব'ভশ্চৈব গচ্ছতি ।
নহস্তষ্টক্ মার্গেহিতি তস্মাৎ পশ্চান্তি পাদপাঃ ।
পুণ্যাপুণ্যোক্তথা নৈকধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাচ্ছিত্তি পাদপাঃ ।
পাদৈঃ সলিলপানাত্ত ব্যাধীনাং কাপি মর্শনাৎ ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাত্ত বিদ্বতে রসনাং ক্রমে ।
বক্তে নোৎপলনালেন বধোর্ধ্ব জলমাদয়েৎ ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপাঃ ।
সুখদুঃখরোশ্চ গ্রহণাৎ ছিন্নস্ত চ বিরোধণাৎ ।
জীবং পশ্চামি বৃক্ষাণামচৈতন্তং ন বিদ্বতে । শান্তিপর্ক মহাত্মারত ।

অনুবাদ

“উত্তাপসংস্পর্শে পত্র, স্বক্, কল এবং ফুলও স্নান হইয়া যায়; স্নান হয়, শীর্ণও হয়; অতএব বৃক্ষে স্পর্শশক্তি আছে। বায়ু, অগ্নি, ও বজ্রপাতের শব্দে কল ও ফুল বিশীর্ণ হয়; শব্দ স্রোত্রে দ্বারা গৃহীত হয়; অতএব বৃক্ষে শব্দ শক্তি আছে। লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে; এবং সর্ক্রে গমন করে; দৃষ্টিহীনের পঞ্চজান হয় না; অতএব বৃক্ষে দর্শনশক্তি আছে। ভালমন্দ গন্ধ ও বিবিধ ধূলের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও

পুষ্পবৃন্ত হয়; অতএব বৃক্ষে স্পর্শশক্তি আছে। মূল দ্বারা সলিল পান হেতু বৃক্ষে ব্যাধি ও ব্যাধির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; অতএব বৃক্ষে রসগ্রহণ শক্তি আছে। বেরুগ কেহ মুখ দিয়া পদ্মের মৃণালের মধ্যে উক্ত দিকে জল টানিয়া লইতে পারে সেইরূপ বায়ুসহযোগে বৃক্ষ মূল দিয়া জল পান করে। বৃক্ষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে; ছিন্ন অংশ পূর্ণ করে, অতএব বৃক্ষসকলকে আমি সজীব মর্শন করি; ইহারা অচেতন নহে।”

উক্ত শ্লোক করটিতে বলা হইল, বৃক্ষের “চেষ্টা” (vital activity) আছে; “ইন্দ্রিয়” অর্থাৎ স্পর্শাদি শক্তি (sensitivity) আছে এবং “অর্থ” অর্থাৎ সুখদুঃখের বোধ (feeling of pleasure and pain) আছে। এক কথায় জীবশরীরের মৌলিক সকল লক্ষণই অক্ষুণ্ণভাবে বৃক্ষে বর্তমান আছে। মহামুনি গৌতম শরীরের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, “চেষ্টেজ্জিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ (ভায়মুত্তে ১১:১১১), শরীর চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয়। শব্দর মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বৃক্ষের জীবন ও মরণ ব্যতীত, নিদ্রা, জাগরণ, ভেজ প্রয়োগ, বংশবিস্তার অনুকূল বস্তুর অভিসুখে গমন, প্রতিকূল বস্তু হইতে দূরে গমন, ভয় ও ক্রম সংরোধন ইত্যাকার বিবিধ ক্রিয়া ও ব্যাপার আছে (বৈশেষিকমুদ্রোপকার ৪:২৫৫) স্তত্রাং প্রাণের দিক্ দিয়া বৃক্ষশরীরের ও উচ্চতর প্রাণী শরীরের জাতিগত ভেদ নাই; প্রত্যেক কেবলমাত্র ক্রমবিবর্তনের। অতএব শাণীর বয় বধা পরিপাক; বয়, যাস বয়, রসসঞ্চালন বয়, কি বৃক্ষ কি উচ্চতর শরীরে কোন-না-কোন আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাও সর্বব্য বৈ সৃষ্টি বিধানের ক্রিয়াই বস্তুর নির্মাতা—“Function creates structure.” শরীরের ধারণ-পোষণই এইসকল বস্তুর কার্য। প্রাণ-শক্তিই এইসকল শরীরে অহরহ ক্রিয়া করিতেছে। প্রাণের বিবরে অনেক তথ্য মহাত্মারতের অধ্যয়ন পর্কেও দেখা যায়। আবার এই যে মূল শরীর ইহা সর্ক্রেই সমান অর্থে “অন্নময়”—আহার দ্বারা বিবৃত অন্নের স্তম্ভতম অংশই মনঃ (brain) ‘অন্নময় হি সৌম্য মনঃ।’ স্তত্রাং আর্ধ্যাশ্রয়ের ইহাও শিক্ষা যে বৃক্ষের মনঃ (brain) ও আছে। মহামতি Darwinও এক-কথা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন, “উদ্ভিদের মূল প্রাণীর মস্তিষ্কের মত বিচারকম (The root of a plant is as intelligent as the brain of an animal)। প্রাণের ক্রমিক বিকাশ বতই অগ্রসর হইয়াছে ততই এইসকল বয় পিত্তীকৃত (formed, massed) ও দেশাবস্থিত (localised) হইয়া উঠিয়াছে; নিরন্তরে উদ্ভিদের শরীরে, উহার ব্যাপকভাবে (diffused) পড়িয়া আছে। উদ্ভিদের চৈতন্ত ভনসাম্পন্ন; “প্রাণী”-শরীরে চৈতন্ত ক্ষুণ্ণতর হইতে ক্ষুণ্ণতম অবস্থার উন্নীত হইয়াছে।

মহাত্মারত, মর্শন, জ্যোতিষ বৈদ্যকশাস্ত্রাদিতে অবাস্তরভাবে প্রসঙ্গ-ক্রমে উদ্ভিদবিদ্যার কোন-কোন অংশের উদ্ধার, উল্লেখ, সংক্ষেপ বা সারসংকলনমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সকল শাস্ত্র উদ্ভিদবিদ্যার শাস্ত্র নহে। বস্তুরূপ নিদর্শন অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা অবৌদ্ধিক নহে যে প্রাচীন আর্ধ্যগণ উদ্ভিদবিদ্যারও চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

গয়া। ১২ই পৌষ, ১৩৩২।

শ্রীমদলাল সিংহ।

সম্পাদকের মন্তব্য

আলোচ্য বিবরণটি সম্বন্ধে আমি যে চিঠিটি ছাপিয়াছিলাম, তাহা ছাপিবার ক্ষমতা আমিই দারী; যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি বিদ্ব-মাত্রও দারী নহেন। অতএব তাঁহার যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহার ক্ষমতা আমি হুঃখিত।

মহাত্মার এবং অশ্রদ্ধা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আমার লিখনভঙ্গীতে কেহ অশ্রদ্ধার চিহ্ন দেখিয়া থাকিলে আমি তৎক্ষণ হুঃখিত। আমার ধারণা আমি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই। বাহা বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তক নহে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্য না থাকিলে তাহাতে তাহার অপৌরব হয় না।

পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বাহা লিখিয়াছেন, মোটামুটি সেইরূপ ভ্রমিণি আমি কোন-না-কোন সময়ে পড়িয়াছিলাম, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইয়াও বাই নাই। আমার 'স্বয়ং' ও লিখনভঙ্গীতে কেহ বেদনা বোধ করিয়া থাকিলে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে বিধা বোধ করিব না। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য প্রত্যাহার করিতে আমি অক্ষম। বিজ্ঞান বলিতে, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান বলিতে, বর্তমান সময়ে বাহা বৃষ্টির, মহাত্মার মত মহাকাব্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বা তদ্বিধ অশ্রদ্ধা গ্রন্থ তাহা নাই, ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। কল্পনা, অসুমান, অস্বপ্নপ্রতি প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সাহায্য অবশ্যই করে; কিন্তু কেবল কল্পনা, অসুমান, প্রকৃতি দ্বারা বাহা পাওয়া যায়, তাহাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান বা জড়বিজ্ঞান বলা যায় না। এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের জ্ঞান মহাত্মারতাদি শাস্ত্র পঠিত হয় না; ধর্মোপদেশ লাভের জ্ঞান ও কাব্যসাধন নিমিত্ত পঠিত হয়। হিন্দু-বিদ্যালয়গণে, বা অশ্রদ্ধা কোন জাতীয় শিক্ষায়তনে, জড়বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার জ্ঞান মহাত্মার মত গ্রন্থ বা উহার কোন অংশ অধীত হয় না। তাহাতে ঐ অনুলা গ্রন্থের কোন অপৌরব হয় না।

হিন্দুরা কোন বিজ্ঞানই জানিতেন না, বা তাহাদের কোন গ্রন্থই কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত নাই, ইহা আমি মনে করি না, বলিও নাই। আমি জানি, যে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত আছে। কিন্তু কাব্য এবং ধর্মশাস্ত্রগণিকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মনে করা ভুল, ইহা আমার অন্ততম বক্তব্য।

আমি পরিহাস করিতে গিয়া আমার বক্তব্য স্থগিত করিতে পারি নাই, তাহার জ্ঞান আমি হুঃখিত। কিন্তু ইহা বলাও আমি দরকার মনে করি যে, অশ্রদ্ধা কোন কোন প্রাচীন জাতির কাব্যাদিতে এমন অনেক কল্পনা ও অসুমান আছে, বাহা বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার প্রত্যক্ষ সত্যের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেইসব প্রাচীন জাতির বর্তমান বংশধরেরা মনে করেন না, যে, এই সত্যগুলি বৈজ্ঞানিক আকারে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। গ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থে ডাডেলস্ ও তাহার পুত্র আইকেরসের আকারে উড়িবার কথা আছে। কিন্তু তৎক্ষণ বর্তমান গ্রীকেরা মনে করেন না, যে, প্রাচীন গ্রীকেরা এরোনটিক্‌স্ ও এরোডাইডামিক্‌স্ নামক বিজ্ঞানজ্ঞের কিছু বা সব-কিছু জানিতেন।

একদিকে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিজ্ঞানের কিছুই জানিতেন না, মনে করা যেমন অশিষ্টর্য দুর্ভা; তেমনিই, অশ্রদ্ধা দিকে, আজ কাল বাহা-কিছু অবিজ্ঞত বা উদ্ভাবিত হইতেছে, সবই আমাদের প্রাচীন কাব্য ও শাস্ত্রাদিতে আছে, মনে করাও ভুল।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যানন্দ রায় লিখিয়াছেন, "মহাত্মারতে বৃক্ষজীবনের কোন কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়া" আমরা অবাধে কলম চালাইয়াছি। এরূপ কোন সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস করি না। মহাত্মারতে বৃক্ষজীবনের কথা ও "রহস্য" আছে, আমরা জানিতাম। কিন্তু হুঃখের বিবরণ তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। তাহা পরে বলিব। "মহাত্মারতে বৃক্ষজীবনের সকল রহস্যই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড়-বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জ্ঞান পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।" "বঙ্গবাসী"র এই-রূটি উক্তিকে আমরা স্রাস্ত মনে করিয়াছিলাম,

এবং এখনও করি; সেইজন্য তাহা লইয়া পরিহাস করিয়াছিলাম। জড়-বিজ্ঞানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কোন আবিষ্কার হইবার পর, তাহা সংস্কৃত বহিতে আছে বলা সহজ; কিন্তু কেবল সংস্কৃত বহি পড়িয়া জড়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বা করেন, জানিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান সমার্থক নহে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

জড়বিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, পুস্তিকা, পুস্তক এখনও প্রতিদিন অনেক বাহির হইতেছে। তাহার "সকল রহস্যই" মহাত্মারত পাঠ করিলে জানা যায়, বা "তাহা পাঠ করিলে" "হিন্দুকে জড়বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জ্ঞান পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না," এরূপ স্রাস্ত ধারণা গোবণ করিয়া বাহারি আরাম পান, তাহাদের সুখে ব্যাঘাত দিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু আশা করি, এরূপ হিন্দুও বিস্তর আছেন, বাহারি এত সহজে আশ্র-প্রত্যাহিত হন না।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, বাহা ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে। হিন্দুরা বিজ্ঞানের বা জড়বিজ্ঞানের কিছুই জানিতেন না, ইহা আমরা বলি নাই। সুতরাং, তাহা আমরা বলিয়াছি, ধরিয়া লইয়া, কিছু লিখিবার আবশ্যক ছিল না। তাহার প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের সমালোচনা করা হুঃসাধ্য নহে; কিন্তু বাহ্যল্যভয়ে ও প্রয়োজন না থাকার করিলাম না। বাহা লইয়া এই বাহ-প্রতিবাদের উৎপত্তি, কেবল সেই বিঘ্নেই কিছু লিখিতেছি। স্তার উইলিয়াম জোনস্, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ, বা অশ্রদ্ধা কেহ বাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিবরণ নহে; মহাত্মারতে বৃক্ষজীবনের "সকল" রহস্য অর্থাৎ সত্য ও বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং জড়বিজ্ঞানের সব কথা আছে কি না, তাহাই মূল বিবেচ্য বিবরণ। এবিধে শাস্ত্র পূর্ক হইতে বাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতেছি।

"উত্তাপ-সংস্পর্শে পত্র, বৃক্ষ, ফল এবং ফুলও রান হইয়া যায়; রান হয়, শীর্ণও হয়; অতএব বৃক্ষে স্পর্শ-শক্তি আছে।" কাগজও উত্তাপ সংস্পর্শে রান হয়, কৌকড়াইয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু তৎক্ষণ, কাগজের স্পর্শ শক্তি আছে, ইহা কেহ বলে না। বস্তুতঃ বৃক্ষের স্পর্শশক্তির প্রমাণ বলিয়া বাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা উহার স্পর্শশক্তি প্রমাণিত হয় না। বাহাকে স্পর্শশক্তি-জাত বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অশ্রদ্ধা। বৃক্ষের শ্রবণশক্তি নাই; বায়ুতে এবং বজ্রপাতের শব্দে ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়, ইহাও সত্য নহে। লতা যে বৃক্ষকে বেটন করে, বৃক্ষের দর্শন-শক্তি তাহার কারণ নহে, অশ্রদ্ধা কারণ আছে। সুতরাং উহার দ্বারা বৃক্ষের দর্শনশক্তি প্রমাণিত হয় না। দৃষ্টিহীনতার পথজ্ঞান হয় না, ইহাও ঠিক নহে; কেননা, হস্তাঙ্কুরাও বষ্টির সাহায্যে পথ চিনিয়া চলে। ভালমন্দ পত্র ও বিবিধ ধূপের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও পুষ্পযুক্ত হয় না। বৃক্ষের শ্রবণশক্তিও নাই। বেরূপ কেহ মুখ দিয়া পায়ের সুপালের মধ্যে উর্দ্ধদিকে জল টানিয়া লইতে পারে, সেইরূপ বায়ু সহযোগে বৃক্ষ মূল দিয়া জল পান করে না। বৃক্ষের মূল হইতে উচ্চতম পত্রাংশ পর্যন্ত রসসঞ্চয়ের বৈজ্ঞানিক কারণ অশ্রদ্ধা। তাহা চুমুক দিয়া জলপানের সদৃশ নহে। মানবদি প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা বেরূপে রক্তসঞ্চালন হয়, বৃক্ষদেহে রসসঞ্চালন সেইপ্রকারে হয়। তাহা আচার্য বসু প্রণীত The Physiology of the Ascent of Sap নামক গ্রন্থ তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে লিখিত আছে। উহাতে নানাবিধ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বর্ণনা এবং তৎস্বন্ধীয় ১৫টি চিত্র আছে। বৃক্ষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে না। বৃক্ষজাতার হিতাহিত জ্ঞানও নাই।

বাহারা মনে করেন, সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আশঙ্কা নাই, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কোন ঘটনার বা ইতিহাসের কোন ব্যাপারের কারণীভূত নিয়ম বস্তুকণ পর্যবেক্ষণ পরীক্ষাদি দ্বারা নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণ কেবলমাত্র তথ্যগুলি বিজ্ঞান-নামধের হয় না। যেমন, এলোপ্যাথী চিকিৎসক বড় বড় ডাক্তারেরা বলেন, যে, তাঁহাদের অনেক ঔষধে ব্যারাম সারে; কিন্তু কেন সারে তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ, নিয়ম ও প্রণালী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া এলোপ্যাথীর অনেক অংশকে তাঁহারা এম্পিরিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ বলেন, বৈজ্ঞানিক বলেন না।

প্রাচীন সংস্কৃত কোন কোন গ্রন্থে তথ্যহিসাবে নির্ভুল যে-সব কথা আছে, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং বুলীভূত বৈজ্ঞানিক নিয়ম, প্রণালী ইত্যাদি বর্ণিত না থাকিলে তৎসমুদয়কে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা যায় না। উপরে দেখাইয়াছি, শাস্ত্রিকের হইতে উদ্ধৃত শ্লোক-গুলিতে তথ্যের ভুল এবং নিছকতার ভুল উভয়ই আছে।

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান, কি, সে-বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানাভাবে আপাততঃ কান্ত হইতে হইল।

আচার্য্য বহু তাঁহার "প্ল্যাট্ রেন্সল্" বা উদ্ভিদের সাজা নামক গ্রন্থ জননীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে নন্দলাল বাবুর উল্লিখিত কথার অনুরূপ কিছু নাই। তৎপ্রসঙ্গ "রেন্সল্ ইন্ দি লিভিং এণ্ড্ দি নন-লিভিং," বা "জীবে ও অজীবে সাজা," নামক গ্রন্থে রবেসের "একং সং বিদ্যা বহুবা বদন্তি" বচনের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত আছে। তাহা নন্দলাল বাবুর উল্লিখিত কথা নহে। বহু মহাশয় ১৯০১ সালে লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটির সম্মুখে যে বক্তৃতা করেন, তাহা এই বলিয়া শেষ করেন :—

It was when I came upon the mute witness of these self-made records, and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things —.....it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

'They who see but one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth—unto none else, unto none else!'

সম্ভবতঃ এই কথাগুলিই অন্তর্দৃষ্টি আকারে নন্দলাল বাবুর মনে আছে। ইহাতে কিংবা অন্ত কোথাও কিন্তু বহু মহাশয় বলেন নাই, যে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যুগযুগান্ত পূর্বে আর্ষা ঋষিগণ ভাগীরথী তীরে গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন, যে, আর্ষাঋষিগণ যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, জড়বিজ্ঞানের পথ দিয়াও তিনি তাহার কিছু আভাস পাইয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের নানাগ্রন্থপূর্ণ বড় বড় লাইব্রেরী আছে। তাহার "সকল" কথাই মহাত্মার বা অন্ত কোন ধর্মগ্রন্থে আছে, ইহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। কেবল উদ্ভিদবিদ্যার একটী-অংশ সম্বন্ধেই এঁকা আচার্য্য বহুই সাতআট-খানি বড় বই লিখিয়াছেন। তাহার শতাংশের একাংশ জড়বৈজ্ঞানিক কথাও মহাত্মার নাই। বাহা আছে, তাহার সমস্তটি নির্ভুল নহে, দেখা

গিয়াছে। ইহাতে মহাত্মার ভের বিন্দুমাত্রও অগৌরব হয় নাই; কারণ, উহা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নহে।

"প্রাচীন আর্ষাগণ উদ্ভিদবিদ্যারও চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন," এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ করিতে চাহিলে তাঁহার আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের সব কথা জানিয়া এবং সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার সত্যতা যত্নাদি দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া, তবে মেরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত। নন্দলালবাবু তাহা করিয়াছেন কি না, তাহা তিনি বলিতে পারিবেন। যে মনোভাব আমাদেরকে বিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনও অনুমান বা কল্পনা বা তথ্যকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে নিবেদন করে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষেও বিদ্যমান ছিল। এ-বিষয়ে সেদিন বহু মহাশয় বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার এক বক্তৃতা বলিয়াছিলেন :—

It may now be asked whether theological bias in India obstructed the pursuit of inquiry. The fact is well known that two different schools of thought flourished here side by side, one of which relied on faith and was supported by established authorities. The other based itself on pure reason, and refused to accept anything which could not be substantiated by demonstrable truth. It is remarkable that the unorthodox were in no way persecuted for their heresy.

খণ্ড খণ্ড কোন্ কোন্ তথ্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন, তাহা তত প্রয়োজনীয় নহে; তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের এবং বুদ্ধির মূল্য ও গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় বুঝিতেন, ইহাই তাঁহাদের পরম গৌরবের বিষয়। কোন ধারণা, কল্পনা বা অনুমান বস্তুকণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া অনুভূত না হয়, ততক্ষণ তাহার সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহান থাকি বিজ্ঞানের অন্ততম ভিত্তি। এইপ্রকার সংশয়প্রবণতা যে প্রাচীন আর্ষাঋষিগণ মধ্যে ছিল, ইহা পরম গৌরবের বিষয়। কোন একটা গাছ বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে, ইহা নিরক্ষর লোকেরাও ভারতবর্ষে ও অন্ত নানাদেশে বলে। স্বভাব উদ্ভিদের জীবন আছে, প্রাচীন আর্ষা জ্ঞানীরা যে ইহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস কর নহে। কিন্তু উদ্ভিদের ও প্রাণীর নানা সাদৃশ্য বাস্তবিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা, এবং সেইসব বস্তুরও উদ্ভাবন করা কঠিন। ইহা আমাদেরই পূর্বপুরুষের সন্তান আচার্য্য বহু করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অগৌরব না হইয়া গৌরববৃদ্ধিই হইয়াছে। পূর্বতন বৈজ্ঞানিক ধারণা এই ছিল, যে, কেবল জীবদেহের চিত্তসমূহেই অর্থাৎ উহার উপাদানীভূত তত্ত্ববৎ পদার্থেই দ্বারবিক-উদ্ভেজনা-পরিচালকতা, সঙ্কোচনশীলতা, এবং স্বতঃস্পন্দনশীলতা আছে, উদ্ভিদদেহের চিত্তে নাই। আচার্য্য বহুই এখানে conductivity, contractility এবং rhythmicity এই তিন গুণে উদ্ভিদের ও প্রাণীর সাদৃশ্য বস্তুরা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

রূপ ও আলাপ

প্রবাসীর জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভৈরব রাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রানুসৃত নহে। ভৈরব রাগের 'ম' বাঁদী ও 'প' সংবাদী কোন শাস্ত্রমতে হইতে পারে না। আধুনিক মাসের সংখ্যায় বাঁদী, সংবাদী সম্বন্ধে সঙ্গীতরচয়িত্রী হইতে যে

লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে বাদী সর্বাঙ্গীরা বুল অর্ধ বুঝি যায়।
নিরে শাস্ত্রানুযায়িত ভৈরব রাগের একটি আলাপ দেওয়া হইল।

গাঝারামপ্রহরাসো গাঝারাদিকমুছনা।
গীরতে ভৈরবঃ প্রাতর্হনুমম্বতকো বিদৈঃ।

সা গা। গা। মগা রা। সা ন্‌সা সা ধা। ন্‌সা গা গা। মগা
নধা। প মগা ধা না না ধা পা মগা গমা গা রা সা সন্‌সা সগা।

গা বা পা ধা না সা গা রা সা না ধাপা মা সা ননা
ধাপা মগা মগা রা। সা সী না ধাপা মগা মগা রা স
সান্‌সা সগা।

স্বাঃ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য।
প্রধান অধ্যক্ষ, সঙ্গীতপরিষদ বিদ্যালয়।

অক্বরের শিক্ষা

অক্বর বাবশাহ নিরক্ষর বা শিক্ষিত ছিলেন, সে-সময়ে আমার
আবাচ মাসের (প্রবাসী ৩৯৩ পৃঃ) প্রবন্ধের আধিন মাসে (৮২৬ পৃঃ)
একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এরূপ
প্রতিবাদ না হইলে ঐতিহাসিক সত্য নিরূপিত হয় না, কিন্তু এ প্রতি-
বাদে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না, কারণ :—

১। অবুল ক্বল এক স্থানে লিখিয়াছেন, অক্বরের কাছে যখন
যে পুস্তক বতখু পাঠ করা হইত, সেই স্থানে পুস্তকের গারে সত্রাট
সহস্রে সংখ্যা লিখিয়া দিতেন। এই সংখ্যা সম্ভবতঃ তারিখ, কেননা
পরে বলা হইয়াছে পাঠকদের পঠিত পাতার সংখ্যা গণিয়া বেতন
দেওয়া হইত। নিরক্ষর ব্যক্তি এরূপে বত খু পাঠ হইল সেখানে
সংখ্যা লিখিয়া রাখে না।

এখানে বলা উচিত যে ব্রহ্মম্যান এই “হিন্দিসা” শব্দের বিকৃত
অনুবাদ Geometrical figure করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দিসা শব্দের
অনুবাদ সংখ্যা cardinal number হওয়া উচিত।

২। মহম্মদ কাসিম কিরিশতা একজন অক্বরের সমসাময়িক
ঐতিহাসিক। তিনি ১৫৭০ খ্রীঃাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে
ইরানের অস্ত্রাবাদ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে দাক্ষিণাত্যের
প্রথমে অহমদনগরে, পরে (১৫৮৯) বিজাপুর রাজ সরকারে সামন্তের
পদ পাইয়াছিলেন। যখন বিজাপুরের রাজকর্তার অক্বর-পুত্র মিজা
লানিয়ালের সহিত বিবাহ (১৬০৪) হয় তখন তিনি রাজকর্তার বেহ-
রখী দলে ছিলেন। অক্বরের মৃত্যুর পর (১৬০৬) তিনি মহাজীরের
রাজসভাতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে পবেষণা করিয়া ইতিহাস
লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তিনি স্বয়ং যেসকল প্রাচীন পুস্তক পাঠ
করিয়া সত্য নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহার কৰ্ম্ম দিয়াছেন। তিনি
৩৫ খানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া ১৪ খানি
অন্য ঐতিহাসিক ও জয়-বিবরণ পুস্তক হইতে সংবাদ সংগ্রহ
করিয়াছিলেন। কিরিশতা অক্বর-সম্বন্ধে যে পার্শ্ব শব্দগুলি ব্যবহার
করিয়াছেন তাহার অর্থ—“অক্বর যদিও একজন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত
বিদ্বান ছিলেন না...।” এই অংশের ইংরেজি অনুবাদ ব্রিগ্‌স্
Lt. Colonel John Briggs) এই রূপ করিয়াছেন :—

Although Akbar was by no means an accomplished
scholar, he sometimes wrote poetry and was
well read in history, এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়

যে, অক্বর নিরক্ষর হইতে পারেন না, কেননা accomplished
scholar না হওয়া ও নিরক্ষর হওয়াতে আকাশপাতাল প্রভেদ।

অক্বর শেখ মোবারকের কাছে অরবী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ
করিয়াই শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল অরবী ভাষা না জানিলে
লোকে নিরক্ষর হয় না। তবে, সে-কালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাহারা
সংস্কৃত জানিত না, এমন লোকদের, দুর্গ ভাবিতেন; সেইরূপ অরবী
ভাষার বিদ্বানেরা যাহারা অরবী জানিত না তাহাদের মুর্খ বলিতেন।
এভাবে আত্মকাল নাই বটে, কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত
ও অরবী ভাষার বিদ্বান মৌলবীদের মধ্যে অনেকেই ঐরূপ ধারণা পোষণ
করিতেন। সম্ভব যে মহাজীর আপনার পিতাকে ইসলাম ধর্মের ভাষা
অরবী না জানিবার জন্য উম্মী অথবা মুর্খ বলিয়াছেন।

প্রতিবাদকারী শেষের অংশে যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে কৈজীর
উক্তি “নবীরে মা উম্মী বৃহৎ.....” লিখিয়াছেন, সেটি আবারো গল্প মাত্র,
কোনও বিধসনীর পুস্তকে নাই।

শ্রী অমৃতলাল শীল

ফকিরের গান

চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় ‘পন্নীসঙ্গীতে
শুক্কর ককির লালন শা’ শীর্ষক একটি কল্প প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।
যতীন-বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া ককিরের যে গান ও বিবরণ সংগ্রহ
করিয়াছেন, সেগুলি বাস্তবিকই তিনি যত্নবান্দাই। অনেক দিন হইতেই
প্রবাসীতে ‘হারামিন’ নাম দিয়া মধ্য-মধ্যে সন্দর-সন্দর ককিরের-গান
প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই গানগুলির সংগ্রাহকগণ কেবল
গান পাইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বহু কবিদের জীবনী-সংগ্রহের নিকেও একটু
লক্ষ্য রাখেন, তবে এইগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার পক্ষে বিশেষ
সুবিধা হয়। নিরে আমার সংগৃহীত জালাল চাঁদ নামে এক ককিরের
একটু বিবরণ দেওয়া গেল—

জালাল চাঁদ ককিরের সহিত আমার আলাপ হয় পাবনার পদ্মার-ধারে
এক নির্জন স্থানে। এই বৃদ্ধ ককিরের চোখে মুখে এমন-একটা কিছু ছিল
যে দেখিয়াই হাঁসের সহিত আমার আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। আমি
যখন ককিরসাহেবের কাছে গিয়া বসি, তখন তিনি সারেকীর সাহায্যে
গাইতেছিলেন—

ও দরদী সাঁই

আমি কিসের লাগি আইলাম তেখা

কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই।

পরথম ডিলাম তোমার ঘরে

একপে আইলাম পরের ঘারে

পর মোর হইল ভাই

একপ পরের বেগার খাইচ্যা মরি

পরের অন্নই খাই।

ছয় পর আফে ছয় দিকেতে

বাঁধে মোরে দিনি-রাইতে

কতই ছুঃখ পাই;

তবু তামের লাগি ভিক্ষা মাগি

ছুটিয়া বেড়াই।

যদিও ঘটনাটি পাঁচ বছর আগেকার, তবু গানের সুরটি যেন এখনও
আমার কানে লাগিয়াই আছে। এই সৌম্যবর্ণন ককিরের জীবনের

ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই হয়। তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জিলার কি-একটা গ্রামে। তিনি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু এখন আর কোন জাতির গভীর মধ্যে নাই—কেননা

‘কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান,
মিলজুগকে কর সাঁইজীকা কাম’

বছর বারোয় সময় মা বাপ মরিয়া বাওয়ার তিনি এক হিন্দুগৃহস্থের বাড়ী চাকর হন। মাঠে একটা গরু চরানোই ছিল তাঁর কাজ।

এইসময় একদিন কৌপীনধারী এক সাধু আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে সে যদি তাঁহার সঙ্গে যায় তবে তাঁর সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। জালাল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এমনকি তাহার মনিবের সঙ্গেও দেখা না করিয়া, একবস্ত্রে এই সাধুর সহিত চলিয়া আসে। এই সাধুর নামই ঈশান ককির। ‘বশোর ও ধুলনার ইতিহাসে’ এই ককিরের উল্লেখ আছে। জালালের শুক ঈশান নাকি একজন সিদ্ধপুরুষ। জালাল এই মহাপুরুষের সঙ্গে না ঘুরিয়াছে এমন জ্ঞানগা খুব কমই আছে। জালাল লেখাপড়া কিছুই জানে না কিন্তু কোরানের অনেক জায়গা বেশ মুখস্থ বলিতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক গুহ্য খবরও তাহার জানা আছে। নিজে ঈশান ককিরের একটা গান উদ্ধৃত করা গেল।

একি আজব কারখানা

দেহ-ঘরে

কত রঙ-বেরঙের মানুষ দেখিগো

রাতি দিন বেড়ায় ঘুরে।

নাই সূর্য্য চন্দ্র তারা

আলো হেথা আপনহার

আনন্দেরি ছড়াছড়ি গো।

হেথায় আনন্দে বাঁচে মরে

কতই গান কতই বাস্ত

সরোবরে কোটে পদ্ম

কুলবাগিচা জমজমা গো ;

এ কুলের তরঙ্গ না কেউ করে

পাঁচ দরজা পার হ’লে

বাজপুস্তরের সাক্ষাৎ মিলে

সোনার খাট বইস্তা আছে গো

মুখেতে বাঁধ না সরে।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী

শ্রীর আবদুর রহিমের সম্প্রদায়

আমাদের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান’-সম্বন্ধে আলোচনাকালে একস্থানে লেখা হইয়াছে “শ্রীমান শ্রীর আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আকিসে মধ্যে-মধ্যে চিঠি লিখিয়া একরূপ-সব ভণ্ডা সংগ্রহ করিতেছেন, যাহাতে কলিকাতাকে টাকা কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে, কিবা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে।” আমরা এই কথা-করটির ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই-রকম ‘ভণ্ডা’ থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়িলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবার কারণ দর্শানো সহজ হইয়া পড়ে, শুধু কলিকাতা কেমন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি

সেই-রকম অকিশোর ‘ভণ্ডা’ থাকে তাহা জানিয়া লওয়া এবং তাহা বিহিত ব্যবস্থা করাতে যেন কি আছে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আকিস হইতে যে ‘ভণ্ডা’ সংগ্রহ করিবেন তাহা অন্ততপক্ষে মিথ্যা বা খেরালী হইবে না বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের ‘মনে হওয়ারটা’ যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা যে-কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয় আকিসে এই-রকম ‘ভণ্ডা’ পাওয়া যায়, সেখানে নিশ্চয়ই টাকার অপব্যবহার হয়। এই-রকম সত্য ভণ্ডার সাহায্যে যদি কলিকাতা বা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আবদুর রহিম বা তাঁহার স্থানের যে-কেহ টাকা কম দিবার কারণ দর্শান, তাহা হইলে তাহা অস্তায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য প্রবাসী-সম্পাদক মহোদয়ও শ্রীর-অস্তায়-সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুধু কটাক্ষপাত করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীর সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় কথা, “কিবা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়ার সুবিধা হইতে পারে।” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিলে বা একেবারেই না দিলে সেই টাকা কেমন করিয়া স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের পকেটে আনিয়া ফেলান হইবে তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরাও স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক, কাজেই টাকা পাওয়ার নামে আমাদের লোভ হয় বই কি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিয়া বা একেবারেই না দিয়া সেই টাকা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয় তাহাতেও প্রবাসী-সম্পাদক-মহোদয়ের সম্প্রদায়ের বড় লাভ স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের ভৃত্য লাভ নাই।

কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যায়, শিক্ষক সংখ্যায় এবং কর্মচারী সংখ্যায় স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক এক তৃতীয়াংশেরও কম কাজেই শিক্ষাবিভাগের সমস্ত টাকাও যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়ে ঢালিয়া দেওয়া হয় তথাপি শ্রীর আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রবাসী-সম্পাদকের সম্প্রদায়ের লাভ হয় তিনগুণেরও বেশী। সুতরাং স্যার আবদুর রহিম টাকা বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দেওয়ার বা না দেওয়ার, অস্তায় সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ লাভ বা ক্ষতি নাই। অবশ্য শ্রীর আবদুর-রহিম কি মতলবে ঐসমস্ত ‘ভণ্ডা’ সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাও আমরা জানি না ; কারণ শ্রীর আবদুর রহিমের মতন বড় চাকরের সহিত আমাদের আলাপ থাকি নুরে থাক, আমরা আজ পর্যন্ত তাঁহার মুখচন্দ্রমা দেখিবার সুযোগও পাই নাই। সুতরাং শ্রীর আবদুর রহিম কি-কি কারণ দর্শাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবেন এবং কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কি-কি যানবাহনাদির মারফৎ সেই টাকাকুলি তাঁহার সম্প্রদায়ের দ্বারা আনিয়া ফেলিবেন তাহা প্রবাসী-সম্পাদক-মহোদয় একটু খোলসা করিয়া বলিলে সুবিধা হয়। নবীন আমরা, দুর্বল প্রবীণের গভীর মতামত হরত এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বলিয়া বলিলে বুঝিতেও পারি।

এইখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য না দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। আমাদের অভিযোগ টাকার অথবা অপব্যবহারে এবং সম্প্রদায়-বিশেষের এক-চেঁচিয়া প্রকৃত্ত বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি ঐরকম কুক্রিয়া হইয়া থাকে আমরা তাহারও সমান জোরে প্রতিবাদ করিতেছি। অনেকেই মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী-রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক অ-মুসলমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করিয়া 'মকা বিশ্ববিদ্যালয়'ও বলিয়া থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের খবর জানা থাকিলে ইহারা এই ধারণা এখনও পোষণ করিতে পারিতেন না। ছুঃখের বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচকেরা শুধু অতিরঞ্জিত অনুষ্ঠান লিপি (prospectus) পাঠাতালিকা (curriculum) এবং চেঙ্গেলার ও ভাইসচেঙ্গেলারের প্রতিশ্রুতি মধুর কনজোকেশন বক্তৃতা পড়িয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া বলেন। কিন্তু ইহারা তলাইরা দেখেন না যে, এইসমস্ত ইতিহাসে 'বাহ্যিক বিজ্ঞাপন' মাত্র। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড ও ১০০০ টাকা পুঙ্খানুপুঙ্খ নীচে তোলানাথের অয়ের যম, শিশি ১০ আট আনা মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখা রাখা হইয়াছে বই কি, কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শাখাটি খুব বেশী উপেক্ষিত বলিলে মতুঃক্তি করা হইবে না। উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক নাই বলিলেও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখাকে যেমন ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থ, কলকর্ষ, সংস্কৃত প্রভৃতিকে যতটুকু সুযোগ, সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এই শাখাটিকেও অসুতপক্ষে ততটুকু সুযোগ, সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। এই শাখার শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাস হয় না, তাই নির্দিষ্ট পঠিতব্য বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশও বৎসরের শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করা যায় না। সময়-সময় দুইতিনটি ক্লাসও স্থগিতভাবে করিতে হয়। এই বৎসর ইসলামী শাখার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক এবং আরবী অনাসের দ্বিতীয় বার্ষিক আরবী সাহিত্য একসঙ্গে পড়ানো হইতেছে। দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাসের প্রথম বার্ষিকের সময় শিক্ষকের অভাবে একদিনের অন্তর মিলিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই এখন মুড়ি-মুড়কী এক সঙ্গে। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, এই জীবনী-সঙ্গমে এই লেখকেরও যোগ দিবার সুযোগ হইয়াছে। ইহারা মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'উচ্চ আরবী শিক্ষার কেন্দ্র' হইয়া উঠিয়াছে তাহারা ভুল বুঝিয়াছেন। এখানে সংস্কৃত বা অন্যান্য বিষয় যে-যে-কম সুচক্ররূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইসলামী শিক্ষা বা আরবী সেইরূপ হয় না। এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী শিক্ষার কয়েকজন এম্-এ, পাশ করিয়া বাহির হইল। ইহারা ইসলামী শিক্ষার নব্বই প্রথম এম্ এ, শুনিলাম অধিকাংশই নাকি কাস্ টু ক্লাস পাইয়াছেন। সেখা যাতক, ইহারা দেশের ও জাতির কতটুকু কি করেন। অনেকেই মনে করেন ইহারা চতুর্ভুজ হইয়াছেন—কারণ ইহারা আরবী, ইংরেজী, উর্দু, বাংলা এই চতুর্ভুজ্য পারদর্শী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে যেমন ইসলামী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় নাই, অন্যান্যদিকেও তাহারা উপেক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাসের মধ্যে দুইটি অ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত। একটি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের সংস্থাপন হইতেছে না। ছাত্রেরা এখানে-ওখানে বাসা করিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর নাই, অবশ্য নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রস্তাব পাস হইতে ক্রটি হইতেছে না। অথচ ঢাক পিটাইয়া ধোষণা করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে 'হাতে সূর্য্য তালে টান' দেওয়া হইয়াছে।

আবুল ফজল

সম্পাদকের মন্তব্য

খবরের কাগজে এমন অনেক চেষ্টার কথা লিখিত হয়, বাহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ার সেসব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরে তাহার কোন সহজলভ্য প্রমাণ থাকে না, এবং সে বিষয়ে আলোচনা

করিবারও আত্মাঙ্কিত প্রয়োজন থাকে না। তবে ইহা ঠিক, যে, কোন সম্পাদক এরূপ চেষ্টার কল্পিত কথা প্রকাশিত করিলে সেসকল কথা নিশ্চয়ই। আমাদের বিশ্বাস আমরা কল্পিত খবর প্রকাশ করি নাই; খবর পাইয়া লিখিয়াছিলাম। অবশ্য, আমাদের কথা মিথ্যা মনে করিয়াও অধিকার সকলেরই আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার অপব্যবহার নিবারণের জন্য মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে অন্ত কোন কাগজ অপেক্ষা কম চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং স্ত্রী স্বাক্ষর রহিম সেসকল কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলে আমরা তাহার বিরোধিতা করি নাই, বুঝিতে হইবে।

তথ্যসংগ্রহে দোষ নাই। কিন্তু তথ্যের অপব্যবহার দ্বারা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে স্ত্রীয়া প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা অসম্ভব নহে। আমরা জানি, এইপ্রকারে একটি অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু সে-বিষয়ে সমুদয় খবর ছাপিবার অধিকার আমরা পাই নাই। এই অকীর্তি রহিম-সাহেবের নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা একেবারেই না দিলে, তাহাতে ভাগ বসান সম্ভব নহে, ইহা আমরাও বুঝি। কিন্তু কাহাকেও টাকা কম দিলে, তাহার ভাগবণ্ডা নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আমরা পক্ষপাতশূন্য, কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে আমাদের কোন বক্তৃতা ধারণা বা সংস্কার নাই, এরূপ উচ্চ দাবী আমরা করিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলিলে অহঙ্কার করা হইবে না, যে, আমরা নিরপেক্ষভাবে লিখিতে চেষ্টা করি। সুতরাং প্রবাসীর সম্পাদকের যদি কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলেও আমরা সেই সম্প্রদায়ের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিছু লিখি, ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। মুসলমান সম্প্রদায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্ত অনেক প্রতিষ্ঠানে যে যথাযোগ্য কাজ করিবার ও টাকা রোজগার করিবার সুযোগ পান না, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমুসলমানদের দোবে ঘটে নাই। মুসলমানদিগের পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভ করিতে অসুবিধা ও বিলম্ব করাও ইহার অন্ততম এবং প্রধান কারণ।

টাকার অপব্যবহারে এবং সম্প্রদায়বিবেচনের একচেটিয়া প্রভুত্ব আমাদেরও আপত্তি আছে, এবং তাহা বহু বার প্রকাশ করিয়াছি।

লেখক বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে—প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত।" আমরা কোথাও কখনও ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তবে এরূপ ধারণা আমাদের ছিল বটে, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষারও কিছু সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু লেখক মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা ভ্রান্ত মনে হইতেছে। ইহা ছুঃখের বিষয়।

বাঙলা বানান

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় বাঙলা বানান সংস্কারের একটি খসড়া দাখিল করিয়াছেন।

এ খসড়াটি পড়িয়া আমার বাহা মনে হইয়াছে নিম্নে লিগিবদ্ধ করিলাম।

অধ্যাপক মহাশয়ের সর্বপ্রধান প্রস্তাব—“তত্ত্ব ও বিশেষী শব্দের

বানান বতদূর সম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী লেখবার চেষ্টা করিতে হবে।” এই বতদূর সম্ভব কথাটির অর্থ কি? যদি উচ্চারণই আদর্শ হয়, তবে সর্বত্র বানান সেই আদর্শকে অনুসরণ করিবে। এ বিষয়ে রক্ষা মীমাংসা চলে না, তাহা অতিশয় আশঙ্কাজনক। যদি উচ্চারণ অনুসারেই বানান লিখিতে হয় তবে সে বানান সর্বত্র বতদূর সম্ভব নয়, একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই, নতুবা পরে বিঘ্ন পোলা বাধিতে পারে। ‘বতদূর সম্ভবে’ ত কাহাবও আপত্তি নাই; কিন্তু যে প্রথা তাঁহার প্রবর্তন করিতে চাহিতেন তাহা ত ‘বতদূর-সম্ভব’কে ছাড়াইরা চলিয়াছে। অতএব মধো-মধো আবার ‘বতদূর সম্ভব’র সংজ্ঞা রক্ষা করিলে ধর্মহানি হইবে। এই ‘বতদূর সম্ভব’ যে কাহাত বেনীদূর সম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ এই খসড়াগণির মধোই আছে—সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ‘বলি’কে চলিত ভাষাতেও ‘বলি’ বানান করা হইয়াছে; বোধ হয় ব’এর সাধারণ ইলেকট্রা কেমন কবিয়া ছুটিয়া গিয়া থাকিবে। আবার উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে সুবিধা, পুৰাণো, বদলিয়ে—এসবও কি ‘বতদূর-সম্ভবে’র ভিতরে না বাহিরে?

ভাষাতত্ত্ব এবং ‘চোখে লাগা’ এই দুই বিপরীত বিভ্রান্তি পড়িয়া অধ্যাপক মহাশয় বেশ একটু বিভ্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সহর শহর হইবে কিন্তু সরসের শরম না হওয়াই ভাল। আবার চোখে লাগার ভয়ে তিনি এমন ব্যঙ্গও করিতে চান, যাহাতে চোখে-লাগার দায়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাণ, প্রক্ষীড়ার বা মূত্রাকর ভিন্ন অপর কেহই এপর্বাস্ত মাত্রাহীন কোর ও মাত্রাহীন কোরের পার্থক্য লক্ষ্য করে নাই, এগন ঙা-কারের খাতির সেকসকে মার্গনিকাইং গ্লাস ব্যবহার করিতে হইবে। ‘বড়’কে ‘বড়া’ করিয়া লিখিতে শুধুই চোখে লাগে না, বোধ হয় যেন মনেও লাগে। এতদিন যে বানান দেখিয়া হাসি পাইত, লেখক বা লেখিকার প্রতি একটু কুপামিত্রিত অবজ্ঞার স্থাব জাগিত (যেমন, “নোবিন কোলিকাতার গিয়া কতোকটা সারিয়া উঠিয়াছিলো, কিন্তু চঠাং মোদিয়া হইয়া মোরিয়া গেলো,” ইত্যাদি)। এখন দেখিতেছি তাহাই বা উজ্জ্বল বানানরাতি পণ্ডিত-জনোচিত হইতে চলিল।

“গেমে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙলাভাষার সাধারণ নিয়ম।” এই নিয়মের ভয়ে বাঙালীর তেলেকেও ‘আচ’ ‘ছিন’ প্রভৃতি অস্ত্যবর্ণে ইলেক অথবা ো কার ব্যবহার করিতে হইবে। আবার জ্ঞানভঃ, বিশেষতঃ, আপাততঃ প্রভৃতির শেষে বিসর্গের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মাতঃ, পিতঃ, নমোনমঃ প্রভৃতির পক্ষে বিসর্গের প্রয়োজন আছে কেন বুঝা গেল না। ‘আপাতত’ একেবারে বাঙলা হইয়া গিয়াছে, এমন-কি বিশেষ সাবধান না হইলে অনেকের মুখে ‘আপাতত’ বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু মাতঃ পিতঃ নমোনম, চলিত ভাষায় চলে না এবং সাধু ভাষাতে উচ্চারণকালে অ-কারের উপর যেটুকু গোর পড়ে তাহা না পড়িলে ক্ষতি নাই। বাঙলা ভাষা বা বোপান হসন্ত হইবার প্রয়োজন কি? যেখানে জাত সংস্কৃত শব্দ সেখানে উচ্চারণের কথাই আসে না, পাঠকের অর্থবোধের উপর নির্ভর করা চলে; যে সে-অর্থ জানে না তাহার ত পড়িতে যাওয়াই কর্তব্য। যদি বিদেশীয় ভাষা একরূপ নিয়ম করিতে হয়, তবে এক কাজ করিলেই এই হসন্ত উচ্চারণের বিপদ দূর হইয়া যায়। ইলেকের মতই হসন্ত একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেই সব পোলা মেটে। এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন—বাঙলা বর্ণমালায় খণ্ড-ত (৭) গেল কে’খার?

‘পুৰাণো বাঙলা পুঁখিতে কী-বানান অনেক জারগার আছে’। কী লেখার আবার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐসঙ্গে দুই-একটি পুঁখির উদাহরণ পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। এত সহজে কিছুই মীমাংসা হয় না। বাঙলা পুঁখির লিপিকর অনেকেই হৃদয়ীর্ষ ও বদ্বন্দ্য বর্জিত। সেটা

তাহাদের উচ্চারণ সংস্কার-চেষ্টার প্রমাণ না আর কিছু, তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত।

কেবলমাত্র হসন্ত ও ইলেকের সাহায্যে উচ্চারণের রূপ কতটা ধরা যাইবে তাহা ভাবিলে শঙ্কিত হইতে হয়। এমনই ত এই দুই চিহ্নের এত প্রয়োগ বাহলা দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরেও যদি নানা কারণে উচ্চারণকে আরও অধিক ব্যবহার করিতে হয়, তবে এই অসংখ্য পিপীলিকার দংশনে চক্ষে সরিষাকুল দেখা আশ্চর্য নয়। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ মহাশয়ের খসড়ার অবশ্যই যাবতীয় স্বর বা ব্যঞ্জনের উচ্চারণভেদ ও তাহাদের অনুযায়ী চিহ্নের একত্র নির্দেশ করা হয় নাই—একটা খসড়াই খাড়া করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনের কথা ছাড়াইয়া দিলাম, সকল স্বর উচ্চারণের পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইলে আরও অনেক কর্তব্য আছে।

এতরূপ উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের কথাই বলিলাম। এইবার আমার প্রধান কর্তব্য উচ্চারণভঙ্গির আদর্শের কথা বলিব। উচ্চারণ-বিশুদ্ধির জন্য যে আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট নহে, সে-সম্বন্ধে মন্তব্যেদের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, কলিকাতার idiom ও উচ্চারণভঙ্গিতে আর আস্থা থাকিতেছে না—নানা জেলার উচ্চারণ ও বাক্যভঙ্গি যথেষ্ট মিশ্রণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিছুকাল হইতে সাহিত্যরচনার চলিত ভাষার প্রচার পূর্ব বেনী হওয়ার এবং বহু লেখকই কলিকাতানিবাসী নহেন বলিয়া আসলের নামে মেকী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। একেই কলিকাতার কতকগুলি ককনৌ রীতি আছে, তাহার উপর এই প্রাদেশিকতার প্রবল আক্রমণে এখানকার ভাষার বা উচ্চারণে বিশুদ্ধ রীতির বড়ই ব্যতিক্রম হইতেছে।

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার।

“কবি কৃত্তিবাস”

শ্রী ভাগবতচন্দ্র দাস

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় কৃত্তিবাসের উপর যে-সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন তৎসমুদয় কবির স্বকৃত নহে। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কেবল বাঙ্গালীর রামায়ণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে দেশে মহানটিক নামে একখানি রামায়ণ প্রচলিত ছিল। তাহা হনুমৎকর্তৃক রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। বস্তুত তাহা সুগ্রীবসহচর উদারমতি হনুমানের রচিত নহে। অস্ত-কোনো আধুনিক হনুমানের রচিত হইয়া থাকিবে। বাই হউক, পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র, সেইজন্য পূর্বে আর সমস্ত পণ্ডিতই তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। এখনও তাহা অনেক পণ্ডিতের মুখস্থ আছে। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে রামের যে-চরিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে এই মহানটিক হইতে গৃহীত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের বটতলা-সংস্করণে প্রথমে যে

রামঃ অক্ষয়পূর্বজঃ রঘুবরঃ সীতাপতিঃ স্তম্বরঃ।

কাকুৎস্থঃ ককণাময়ঃ গুণনিধিঃ বিশ্রিয়ঃ ধার্মিকঃ।

রাজেন্দ্রঃ সত্যসঙ্ঘঃ দশরথ-ভনয়ঃ শ্রামলঃ শান্তবুধিঃ।

বন্দে লোকান্তিরামং রঘুকুলভিলকং রামবং রাবণারিঃ।

শ্লোকটি লিখিত আছে তাহা ঐ মহানটিক হইতে উদ্ধৃত। কৃত্তিবাসের বহু পয়ার মহানটিকের শ্লোকের অনুবাদ বলিলেও অত্যাঙ্কিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘোষমহাশয়ের উদ্ধৃত একটি পয়ার এখানে পুনরুক্ত হইল।

একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া রঘুনাথ ।
করিলেন আমারে বিবাহ সেই সাথ ।
আর বার ধনুক আনিল গুণমণি ।
না জানি হইবে আমার কতক সতিনী ।

মহানাটকের সীর্ভাও বহুবিবাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন:—

ওচ্চাপমাকর্ষতি ভাড়াকারা বাকারগুণাপি বিশালনেত্রা ।
সাহস্রমৈক্টি বিদেহকস্তা কস্তাং কিমস্তাং পরিশেষ্যভীতি ।

পন্ন্যটি এই গ্লোকের অনুবাদমাত্র । বহু বিবাহ কেবল যে কৃত্তি-
বাসের সময়ে প্রচলিত ছিল তাগ নহে । সকল দেব ও মানবের আদি-
পুরুষ মহর্ষি কল্পের বহুপত্নী ছিল । ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পিতা
দশরথও বহুবিবাহ করিয়াছিলেন । এমনকি তাঁহার অনেক অসবর্ণা
ভাৰ্যাও ছিল তাহা বাঙ্গালিকের রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় । তবে
সেকালে একপত্নীকে অশংসা সকলে করিতেন, সেকালে প্রাতঃ-
স্মরণীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া নির্ঘাতিত
হইয়াছিলেন এইমাত্র প্রভেদ ।

কেবল কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে ভগবান্ সাজান নাই । রামচন্দ্র বিষ্ণুর
অবতার বলিয়া মহানাটকের বহুলোক লিখিত আছেন । দৃষ্টান্তরূপ
একটি গ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

বাম্প্রীকেবদনামহেন্দুগলিতং স্তম্ভং পরং পাবনং
শ্রোত্রং বাগবৃত্তং পিবস্ত্যাহুদিনং বৈশ্রোত্রপাত্রেণ নঃ ।
বিষ্ণোঃ সচ্চরিতং চংচরন্তুরো বাসায়ং সাদরাৎ
ভেবাং শ্রীবিমলা ভবত্যাহুদিনং নশ্যন্তি গাৰ্ভেভয়াঃ ।

মহানাটকের রচয়িতাই রামনামের মাহাত্ম্য গাহিয়া গিয়াছেন,
“বীৰ্ণংধর্ষক্রমাণাঃ প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রাম-নাম ।” মহানাটকের
রামচন্দ্রকেও ফুলধনু লইয়া কাননে-কাননে সুরিরা বেড়াইতে দেখা যায় ।
ঐহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সমালোচনা করিতে যগেন, তাঁহারা
মহানাটক পুস্তকগানি পাঠ করিলে তাঁহাদের সমালোচনা নর্কীক্স-
হুল্লর হয় । ঘোষজ-মহাশয়ও মহানাটক পড়িয়া অবক্ষ লিখিলে
আমরা অনেক নুতন কথা শুনিতে পাইতাম ।

জাভাঙ্গীপের নৃত্যকলা

সম্প্রতি যবদ্বীপ বা জাভা হইতে একদল নর্তক
মাল্লাজে আসিয়া থিয়েটারফিকেল সোসাইটির প্রকাশ



অর্জুনবেণে জাতানর্তক



স্ত্রীলোকের অভিনয়ে পুরুষ

বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে তাহাদের নৃত্য-নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। এই নৃত্যের নাম ওয়াং ওয়াং। তাহারা নৃত্যের দ্বারা মহাভারতের একটি কাহিনী অভিনয় করে। ইহাকে



।ভিমমু।বেশে ভাভাধাপের নর্তক

তাহারা “ভারত যুদ্ধ” বলে। নাটকের যে অংশ মার্জিত-রকমের নৃত্য দ্বারা অভিনীত হয়, তাহা পাণ্ডবদিগের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। পাণ্ডবদের প্রত্যেকের নৃত্য পৃথক-পৃথক। অর্জুনের নৃত্য ভীমের নৃত্য হইতে পৃথক। ভীম সর্কদাই ক্ষত্রধর্মের অমুঘায়ী নৃত্য করেন। কৌরব-দের নৃত্য আবার সম্পূর্ণ অন্য-রকমের; উহা উদ্দাম এবং আততায়িতা-ব্যঞ্জক। দানবদের নৃত্য বর্করোচিত এবং আক্রমণসূচক। অর্জুনের সঙ্গে সবাই তিনজন বিদুষকের মত লোক থাকে। তাহারা তাঁহাকে শক্রদের উপর জয়লাভ করিতে সাহায্য করে।

“ভারত যুদ্ধ” অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের নৃত্যভিনয় কেবল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত যুবকেরাই করে। ইহাকে “বেকসো” বলে। এই নৃত্য-কলার সমুদয় নিয়ম ভাল করিয়া শিখিতে তিন বৎসর সময় লাগে। জাভার অধিকাংশ রাজ-কুমারেরা নৃত্যে সুদক্ষ।

পুরুষ-নর্তকেরা কখন-কখন স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহু শতাব্দী পূর্বে জাভায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। তাহার চিহ্নরূপ এখনও তথায় বোরো-বুদু প্রভৃতি বিস্ময়কর স্থাপত্য-কীর্তি বিদ্যমান আছে, এবং জাভার ভাষায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। তন্ত্রের তথাকার অধিবাসীরা বহুকাল হইতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের পূর্ক পুরুষেরা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা যে-যে ললিতকলার বিকাশসাধন করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করে নাই। নৃত্যকলা তন্মধ্যে একটি। যাহারা নৃত্যের মর্মজ্ঞ, তাঁহাদের মতে প্রাচীন বুলগেরিয়ানরা ভিন্ন আর কোনও জাতি জাভানিবাসীদের মতন নৃত্য দ্বারা নিজেদের অন্তরের কথা এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

বাসী এমস, কলিকাতা]

[লণ্ডনে গৃহীত ফোটো হইতে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

শ্রী সজনীকান্ত দাস

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় মহাসভার পত্তন হয়, তখন খুব অধিকসংখ্যক লোক ইহাতে যোগদান করে নাই। ভারতবর্ষের কল্যাণকামী ছ'একটি বিদেশী ভারত-বন্ধু ও স্বাধীনতা-স্বপ্নবিভোর কয়েকটি স্বদেশী যুবক মিলিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তাহার পর আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অলিগলির মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সদর রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সেই কয়েকটি প্রাণীর আন্দোলন আজ নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। এই সভার নেতৃত্ব-পদ আমরা পরম গৌরবের আসন বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক মনস্বীর ভাগ্যে এই মহাসম্মান লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু এবার এই প্রথম একজন ভারতীয় মহিলা এই গৌরবের আসন পাইয়াছেন। কংগ্রেস আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যখন প্রথম মহিলা-সভ্যরূপে সেখানে উপস্থিত হন, তখনকার দিনে তাঁহাকে বিপুল সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী আজ সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছেন। ভারতের নারী-জাতি যে শুধু অস্তঃপুরিকা গৃহিণী হইয়াই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না, কি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে বাহিরেও যে তাহাদের প্রয়োজন আছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভাপতির পদ দিয়া এই সত্যটুকুকে মানিয়া লইয়া দেশবাসীগণ নিজেরাও ধস্ত হইয়াছেন। সরোজিনী দেবীও এই মহা-গৌরবের আসন অর্জন করিয়া জাতীয় আন্দোলন-ক্ষেত্রে প্রথম পথ-প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের নারী-সমাজের চির-কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। ভারতের অতি অল্পসংখ্যক নারীরই তাঁহার মতন যশোবিমণ্ডিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। যে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এতকাল পুরুষেরই একাধিপত্য ছিল, সেখানে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন

করিয়া সরোজিনী দেবী ভারতের নারীগণের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—



ডাক্তার অখোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

‘—আমি জানি যে দেশে ও বিদেশে স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি যে সামান্ত চেষ্টা করিয়াছি, শুধু তাহার জন্তই আপনারা এই মহাগৌরবের আসন আমাকে দেন নাই—ভারতীয় নারী-সমাজকে আপনারা সম্মান দেখাইতে চাহিয়াছেন ও ইহাতে স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, কি সামাজিক, কি পারিবারিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক সকল বিভাগেই পুরুষের পাশে নারীর সমান অধিকার আছে।...আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনারা ভারতের পুরাতন প্রথারই

দেখিতে গিয়া ১৯০১ সালে মাত্র একশ বৎসর বয়সে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত। দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ এতকাল নিজাম-সরকারে সহকারী রাজস্ব-সচিব থাকিয়া সম্প্রতি ভারত-জীবন-বীমা কোম্পানীর সেক্রেটারী হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র রণেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়া কস্তা সুনলিনী দেবী—এ, এন্স রাজন্ মহাশয়ের পত্নী। তৃতীয়া কস্তা মৃগালিনী দেবী কেব্বিঞ্জের শিক্ষা সম্মানে সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি মাদ্রাজের বিখ্যাত 'শামা' পত্রিকার সম্পাদক। চতুর্থ পুত্র হারীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত গায়ক ও কবি। সর্বকনিষ্ঠা



কুমারী লীলামণি নাইডু (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর দ্বিতীয়া কস্তা।
ইনি বর্তমানে অগ্নকোডে শিক্ষালভ করিতেছেন)

কস্তা শ্রীমতী সুনাসিনী দেবী বালিনে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড ট্রেড প্রিভিউ অব্ এসিয়া' পত্রিকার সম্পাদক, এ, সি নারায়ণ নাথিয়্যার মহাশয়ের পত্নী। মোটের উপর প্রত্যেকেই অস্বাভিক-পরিমাণে যশস্বী হইয়া পিতা ও মাতার মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

সরোজিনীর শৈশবজীবনে তাঁহার পিতার প্রভাব ও শিক্ষা তাঁহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রস্তুত করিতেছিল এবং তাঁহার শৈশবের এই শিক্ষাই জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার পিতার কল্পনাপ্রবণ মনও এই সময়ে সরোজিনীর কবিত্বশক্তি-বিকাশের অঙ্কুলে কাজ করিতেছিল। স্বাধীন যুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে মাতৃ

হওয়াতে সরোজিনী চিরচলিত সামাজিক গভীর্ণলি সহজেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। তিনি সুখের কোলেই লালিত-পালিত। তাঁহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্ত একজন ইংরেজ ও একজন ফার্সী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। অঘোরনাথ সরোজিনীর কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি নিজে মুখে-মুখে সম্ভানদের বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি শিখাইতেন; এইরূপে অতি শৈশবেই সরোজিনীর মনে প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্নজাতীয় ছাত্র থাকিত বলিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই উদ্ভূতেই কথাবার্তা কহিত। বালিকা সরোজিনীর জন্ত একজন ফার্সী শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাকে 'দ্বিতীয় ভাষা'-হিসাবে ফার্সী লইতে হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরোজিনী একদিনেই যশস্বী হইয়া পড়েন। অতি শৈশবে হইতেই বালিকা সরোজিনীর মনে সাহিত্য ও কাব্যাত্ম-রাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। চোদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রায় সকল ইংরেজ কবির কাব্য শেষ করেন। শেলী, ব্রাউনিং ও টেনিসন তাঁহার বিশেষ প্রিয় কবি। ওই সময় হইতেই তাঁহার মানসিক শক্তির নব-নব উন্মেষ সাধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইত এবং দেশের দুঃখ-দুর্দশায়ও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত।

অঘোরনাথের ইচ্ছা ছিল সরোজিনীকে বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবেন। কিন্তু মনে যাহার একবার কবি-প্রেরণা জাগিয়াছে সে কি গণিত ও বিজ্ঞানের বিধিবদ্ধনের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে? তাঁহার কবিমন আত্ম-প্রকাশের জন্ত উন্মুখ হইয়া ছিল। তিনি পরে আর্থার সাইমনস্কে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে এই অস্বনিহিত কবিপ্রতিভার নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর প্রকাশব্যগ্রতার কথা বলিয়াছেন।—

'শৈশবে কবিতা লিখিবার জন্ত মনে বিশেষ প্রেরণা অল্পভব করিতাম বলিয়া মনে পড়ে না বটে, তবে আমি স্বভাবতই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক ছিলাম। বাবা আমাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিতে চাহিতেছিলেন,

কিন্তু যে কবিত্বশক্তি আমি তাঁহার ও আমার মায়ের (মা যৌবনে কয়েকটি চমৎকার গীতি-কবিতা রচনা করেন) নিকট হইতে উত্তরাধিকার-স্বত্রে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা অদম্য হইয়া উঠিল। আমার এগার বৎসর বয়সে একদিন বীজগণিতের একটি অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতে-ঘামাইতে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কাব্য-জীবনের সূত্রাহইল।

এই কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ যেন তাঁহার 'নির্ব্বারের স্বপ্ন-ভঙ্গ'। যে দৈবী-শক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাহা এইবার বাহিরে আশিবার পথ খুঁজিয়া পাইল এবং তাঁহার কিশোর চিত্তের প্রবল অন্তর্ভূতি লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করিতে শুরু করিলেন। ইহার পর আর সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সরোজিনীর কবিপ্রতিভা তাঁহার জন্ম-ও মজাগত। তাঁহার হৃদয়-মালধে তখনই যেন কবিত্বের কোরক ধরিল, কিন্তু তাহা প্রস্ফুটিত হইল অনেক পরে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি ইংরেজী ভাষায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা—'মেহের মুনির' রচনা করেন। এই নাটকটি সম্ভবতঃ তাঁহার ফার্সী শিক্ষার ফল। অঘোর-নাথ তাঁহার প্রিয় কন্ঠার এই প্রথম চেষ্টাটি সযত্নে প্রকাশিত করেন। এই নাটকের একখানি স্বর্গীয় নিজামের হাতে ১৮২৫ সালে দেওয়া হয়। তিনি সরোজিনীর কবিপ্রতিভা ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-কোনো প্রার্থিত পুরস্কার দিতে সম্মত হন। সরোজিনী বিদেশ যাইবার জন্য একটি বৃত্তি প্রার্থনা করেন। সদাশয় নিজাম বাহাদুরও তাঁহাকে বাৎসরিক ৩০০ শত পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করেন। সরোজিনী দেবী ১৮২৫ সালে শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ড-যাত্রা করেন।

মাত্র বোল বৎসরের বালিকা সরোজিনী একাকী বিদেশ যাত্রা করিলেন—ইহা কম সাহসের পরিচয় নহে। বস্তুতঃ তিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না। তিনি বোম্বাইয়ে একটি পরিচিত পরিবারের সন্মুখীন করেন ও তাঁহাদের সঙ্গেই সমুদ্র যাত্রা করেন। সরোজিনী ইংলণ্ডে গিয়া ভারতহিতৈষিনী বিখ্যাত মিস ম্যানিংয়ের কর্তৃত্বা-

ধীনে তাঁহারই বাটীতে থাকিবার সুযোগ পাইলেন। এখানে বহু বিখ্যাত সাহিত্যরথীর সমাগম হইত। এই-খানেই বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এড্‌মাণ্ড গসের সহিত সরোজিনীর পরিচয় ঘটে; ইনি পরবর্ত্তী কালে সরোজিনীর কাব্যপ্রতিভা-উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেন। এখানেই তাঁহার, নাট্য-সমালোচক উইলিয়াম আর্টার, পুস্তক-প্রকাশক হাইন্‌মেন্ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত হয়।



শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা সরোজিনী কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। কারণ, অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কাহাকেও এ সম্মান দেওয়ার প্রথা নাই। সুতরাং বাধা হইয়াই তাঁহাকে লণ্ডনের কিংস্ কলেজে ভর্তি হইতে হইল। বয়স পূর্ণ হইলে তিনি কেম্‌ব্রিজের গার্টন্ কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু ছাত্রজীবনের আইন-কানূনের মধ্যে তিনি যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং পাঠ্য পুস্তক ছাড়িয়া কবিতা চর্চা ও রচনার কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই তাঁহার দুর্বল শরীর ভাঙিয়া পড়িল ও তাঁহার কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা অকালে সমাপ্ত হইল।

তিনি তৎপর ইতালী ও সুইটস্‌জারল্যান্ডে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অতীত-গৌরবময়ী ইতালীকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তিনি দাঙ্কে, র্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, গারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতির স্মৃতিরঞ্জিত ইতালীর চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন।

এডমণ্ড গসের সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় বন্ধুত্ব-বন্ধনে পরিণত হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিতেন। একদিন তাঁহার এই গোপন বাণী-সাধনার কথা গসের নিকট তিনি ভাবাবেগে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। গস তাঁহার এই কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষায় কবি-মশপ্রার্থী এই বালিকা-কবি তাঁহার হাতে এক পাদা কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। তিনি সেগুলি পড়িয়া হতাশ হইয়া পড়েন এবং ব্যথিতচিত্তে সরোজিনীকে ইংরেজ কবিদের ভাব, ভাষা ও ছন্দের ব্যর্থ অহুকরণ করিতে নিষেধ করেন ও সম্পূর্ণ দেশী বিষয়ে দেশী ভাবে কবিতা লিখিতে অহুরোধ করেন। ভারতের অহুত্ব, শিক্ষা, সৌন্দর্য্যবোধ ও সংস্কার লইয়াই যে ভারতীয় কবির কাব্য রচনা করা উচিত, একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ইংলণ্ডীয় কবিদের ব্যর্থ অহুকৃতি, কিম্বা ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির ভাববৈচিত্র্য বর্ণনা না করিয়া ভারত-বর্ষের শ্রামল-জালা-সমারোহ, অস্ত্রভেদী তুঘারমৌলী পর্কত-শ্রেণী, গভীর অরণ্যান্দুরী ও বিচিত্র কারুকার্যখচিত প্রাচীন মন্দিরগুলিকেই তাঁহার কাব্যের পটভূমি করার প্রয়োজনীয়তা সঘঙ্কে উ পদেশ দেন। দেশের সহজাত সংস্কার ও অহুত্বই যে কবিতার বাশক্তির প্রাণ সরোজিনী ইহা বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় মন লইয়া কাব্য রচনা শুরু করিলেন এবং তাঁহার কবিতার উৎকর্ষ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইলেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে তিনি পর পর তাঁহার তিনখানি কাব্যগ্রন্থ ‘গোল্ডেন্ থেশোল্ড্’ ‘বার্ড্ অব্ টাইম্’ ও ‘ব্রোকেন্ উইজ্’ প্রকাশ করেন। এই কাব্যগুলি কি দেশে, কি বিদেশে সর্বত্রই উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে ও জগতের কবিসমাজে সরোজিনীর স্থান চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। বিশেষ করিয়া তাঁহার ‘বার্ড্ অব্ টাইম্’ কে এডমণ্ড গসের স্তায় সমালোচকও নিখুঁত বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রায় তিন বৎসর বিদেশে বাস করার পর ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ডিসেম্বর মাসেই তাঁহার স্বয়ম্বত ডাক্তার মোতিআলা গোবিন্দরাজুলু নাইডু মহাশয়কে বিবাহ করেন। ১৮৯৫ সালে বিলাত যাইবার পূর্বেই তাঁহার মনে প্রেমের সূচনা হয় এবং নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি তাঁহার এই ভালবাসা হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার এই বিবাহ লইয়া অনেক বিরোধ ও মনাস্তর ঘটয়াছে। ব্রাহ্মণ-কন্যা সরোজিনী অত্রাঙ্কণকে বিবাহ করায় তাঁহাকে অনেক গল্পনা সহিতে হইয়াছে। তাঁহার বিবাহিত জীবন আনন্দ-পূর্ণ। কিন্তু আশৈশব স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত দুর্বল শরীরে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সুখভোগ করিতে পারেন নাই। তবু স্বামীর অনাবিল প্রেম ও পুত্রকন্টার নিবিড় স্নেহে তিনি হাসিমুখে সব সহিয়া গিয়াছেন। দুই কন্যা ও দুই পুত্র লইয়া তিনি তাঁহার “সুদ্রগৃহে” সুখেই কালাতিপাত করেন। তাঁহার মহাত্ম্য স্বামীর গভীর প্রেম তাঁহাকে বর্ষের মত ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার দুর্বল শরীর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পীড়া দিয়া মৃত্যুকে স্বরণ করাইয়া দিত। কিন্তু সরোজিনী মৃত্যুভয়ে ভাত নহেন। তবে মাঝে মাঝে এই সময় তাঁহার মনে নিরাশা আসিত। তিনি ভাবিতেন—‘আমার কবিমন পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিবার পূর্বেই কি আমি ঝরিয়া পড়িব? আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কি সফল হইবে না?’ কিন্তু এই মানসিক অবস্থা বেশা দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯০৫ সালে মিঃ হাইন্‌মেন্ যখন তাঁহার প্রথম কবিতার পুস্তক ‘গোল্ডেন্ থেশোল্ড্’ প্রকাশ করিলেন তখনই আশার ঔজ্জ্বল্যে সরোজিনীর চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তাঁহার বন্ধু আর্থার সাইমনস্ এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রাচ্য জগতের সরোহিনী মাধুর্য্যে এই গ্রন্থখানি ভরপুর। এই কাব্য-গ্রন্থখানি ইংলণ্ডীয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিল। বায়রণের মত সরোজিনীও একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলেন যে, তিনি যশের উচ্চ শিখরে আরুঢ় হইয়াছেন। ১৯১১ সালে তাঁহার ‘বার্ড্ অব্ টাইম্’ ও ১৯১৭ সালে ‘দি ব্রোকেন্ উইজ্’ এডমণ্ড গসের ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতা বিশে-

যত 'বার্ড অব টাইম'এর গীতিকবিতাগুলি ভাবরাজ্যে সরোজিনীর স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কবিতাগুলি প্রাচ্য দেশীয় ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার দুর্কল স্বাভা ও রাষ্ট্রনৈতিক কাব্যে অনবকাশবশতঃ সম্প্রতি তাঁহার কবিত্ব-রসধারা শুকু হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় এখনই এই



শ্রীমতী নাইডুর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবী

কবির কাব্য-জীবনের সমাপ্তি হয় নাই। তবে তিনি আর কিছু না লিখিলেও তাঁহার উচ্চ আসনে এই তিনটি গ্রন্থের জন্মই চির আধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার কবিতা যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে তাঁহাকে 'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব লিটারেচার'-এর সভ্য করিয়া প্রতীচ্য দেশ তাঁহার কবিতাকে সম্মান করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে খুব অধিক-সংখ্যক নারীর ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে নাই। জীবনে

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কিম্বা পারিবারিক জীবনে অনেক দুঃখ তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সেই বেদনা তাঁহার কবিতাকে মধুরতর করিয়াছে মাত্র; নষ্ট করিতে পারে নাই। তবে যৌবনের সে উচ্ছ্বাস আর নাই।

সরোজিনী দেবী স্বন্দরের উপাসক। আর্থার সাই-মন্স লিখিয়াছেন—'সৌন্দর্য-তৃষ্ণাই সরোজিনী দেবীকে কবি করিয়া তুলিয়াছে; স্বন্দর কিছু দেখিলেই তাঁহার সমস্ত দেহমন পুলকে স্পন্দিত হইতে থাকে।' তাঁহার কাব্যে দেশমাতার প্রতি গভীর ভক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের সকল লোক যখন দেশাত্মবোধে উদ্ভূত, তখন দেশের কবি কেনই বা সে অহুভূতিকে ছন্দোবদ্ধ না করিবেন? ভারতমাতার উদ্দেশে লিখিত তাঁহার দুইটি ইংরেজী কবিতার বাংলা অনুবাদ দিলাম :—

উদ্ভিষ্ঠত, জাগ্রত

আমিছে প্রভাত, জাগো মা, জাগো মা, সন্তান তব
করণা ঘাচে,
নতজানু হ'য়ে পূজিব তোমায়; মাগিব প্রসাদ
তোমার কাছে।
নূতন দিনের স্বপন দেখিয়া আঁধার রজনী কাঁপিছে জাসে,
তুমি কি রহিবে নিদ্রামগনা, বন্ধ রহিবে বেদনাপাশে?
জাগো, জাগো, মা গো, ঘুচাও মোদের ব্যর্থ ব্যথার
দৈন্ত-ভার;
আশীষ কর মা পরাব তোমায় বিজয়-গর্ভ-রতন-হার।
আমরা নহি কি সন্তান তব জয়মালা তব মোদের নহে?
আশা তব, তব গর্ভ শক্তি শোণিতে মোদের আঞ্জো
যে বহে!

তোমার ভৃষ্টি করিব সাধন, তাজ্জিব না কভু ঘিথার ভুলে,
মোদের চিত্তে আসন তোমার, পূজিব তোমায় ভক্তি-ফুলে,
জননী তোমার মহিমা গাহিয়া কাঁপন লাগাব তারার গারে;
আসন তোমার উচ্চে সবার, সে মহা আসনে বসাব মায়ে।
জননী, মোদের পূজার অর্ঘ্য মুকুট রচিবে তোমার শিরে;
জননী, মোদের আশার শিখাটি নিত্য তোমারে
রহিবে ঘিরে;

জননী, মোদের প্রেমের রূপাণে বিজিত হইবে তোমার
অরি,
জননী, মোদের ভক্তির গীতি নিত্য উঠিবে তোমারে স্মরি',
তোমারে সঁপিব নিত্যভক্তি, শক্তি সাধন তোমারি লাগি,
বরিব তোমায় ওঠ রাজরাণী, হে দেবী জননী, ওঠ
না জাগি।

ভারতমাতার প্রতি

অমর তোমার অতীত স্মৃতির স্মরণে,
ওঠ চির-যৌবনা,
দেখাও টুটায়ে অন্ধ তমসাবরণে,
উষার আলোক-কণা।
মহাস্মৃতির নব-পরিণীতা বধু গো—
অনাদি তোমার কোলে,
নব গৌরব নিত্য জনম লভিয়া
চিরদিন যেন দোলে।
আধার-শিকলে বাধা প'ড়ে আছে দেশ—
কাঁদিছে মুক্তি-আশে,
নিশ্চয় চল তুমি প্রভাতের তীরে যেথা
আলোকের জ্যোতি ভাসে।
জননী, এখনো ভাঙেনি কি ঘুন ঘোর—
পশেনি রোদন কানে?
জাগো, আশা দাও, মা ছাড়া কোলের ছেলে
আর বা কারেই জানে!
ভবিষ্যতের শব্দ উঠেছে বাজিয়া
সঘনে ডাকিছে ওই,—
'বিজয়-রতন, যশের মুকুট হায়,
যে নেবে সে কই কই?'
সুপ্তা জননী, ভাঙ' নিজার ঘোর,
সে-মুকুট পর' শিরে,
অতীত দিনের, হে বিজয়ী মহারাণী—
বৈভব আনো ফিরে।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর দৃঢ় ধারণা এই যে, এই
জগতে কবিদের হাতে এক মহাকর্ভব্যের ভার অর্পিত
রহিয়াছে। তাঁহার 'অরণ্যে' নামক কবিতায় তিনি
গাহিতেছেন—

অচিরে তুলিব আনত শির,
বাহিরে আবার হব বাহির—
অমেছে যেখায় পথের ভিড়
জনতার কোলাহল—
বন্দ যেখায় বেধেছে ঘোর
সেখায়, চিন্ত, আসন তোর,
কাটায়ে অন্ধ মোহের ঘোর

চল রে সেখায় চল।

স্বপনের স্মৃতি যা রবে শেষ,
মনে যা রহিবে স্মরের রেশ—
তাই ত পাথের, সেই ত বেশ
তাই নে সঙ্গে ক'রে।
হারানো গানের ব্যথিত স্বর
জগতের ব্যথা করিবে দূর,
সদৌতে ব্যথা হইয়া চূর—
স্মরেই পড়িবে র'বে।

সরোজিনী দেবীর ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কথাবার্তা
অতীব মনোমুগ্ধকর। তিনি যেন ভদ্রতার অবতার।
সরলতা-গুণে তিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইতে
পারেন। মানসিক সম্পদেও তিনি ধনী; তাঁহার
মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই 'কালচারে'র ধারা মিলিত
হইয়াছে। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সৌন্দর্য-
প্রিয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি
আলাপে পটু এবং হাস্যরস ও প্রাণশক্তি তাঁহার
কথায় কথায় ফুটিয়া উঠে। তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার
প্রতি অসীম-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। ষাঁহারা সরোজিনী দেবীকে
রাষ্ট্রমঞ্চে কেবল বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে দেখিয়াছেন,
তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনযাত্রা দেখিলে আশ্চর্য
হইবেন। তিনি আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী ও আদর্শ
গৃহিণী। তাঁহার পতি-প্রেম গভীর, সন্তান-বাৎসল্য
অপরিমেয়।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর ইহাই ব্যক্তিগত জীবন ও
কাব্য-জীবনের আংশিক ইতিহাস। কিন্তু তাঁহার
জীবনের আর-একটি বৃহৎ দিক আছে; সেটি তাঁহার
সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। দেশ-প্রেমিক অঘোর-

নাথের প্রিয় কন্যা সরোজিনী দেশের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া আপনার পরিবার ও কাব্য-গণ্ডীর ভিতর স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি যেন একদিন অস্তরের মধ্যে ডাক শুনিলেন—

“কবি, তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লহ আজি সাথে, তাই কর আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার—
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ, অন্ধকার,
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বন্ধ-পট। এ দৈন্ত-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি—
এবার ফিরাও মোরে—লয়ে যাও সংসারের ভীরে
হে কল্পনে রত্নময়ি, ছুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর।”—

তিনি এআহ্বান অবহেলা করেন নাই। জননীর মত আর্ন্তের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে তাঁহাকে অনেকখানি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কবির পক্ষে কাব্য-জীবন ত্যাগ সহজ ব্যাপার নহে। “কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সকলের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না। প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়া-তাড়া, বিরোধ-বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যে-সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, তাহার মানসী-মূর্ত্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্ম জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের শুপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে। তাহার উৎসাহের জন্ম বাহিরের দিকে তাকাই, একাজ তাহাদের নহে; কাজও করিতে হইবে, নিজের শক্তিতে তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে, নিজের মনের ভিতর হইতে নিজের মধ্যে একরূপ সহজ সম্পদের ভার সকলের নাই।”

বিধাতার বরে সরোজিনী অকৃত্রিম কল্পনা-সম্পদ লাভ করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ এই, যে, তিনি ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরকালকে দেখিতে পান।

সরোজিনী দেবী যখন সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনৈতিকরূপে দেশের কাজে লাগিলেন—তখন হইতে তাঁহার কার্যাবলী সর্বজন-বিদিত; কিন্তু, তাঁহার কাব্যজীবন চাপা পড়িয়াছে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁহার বিবিধ কর্মসমূহের আমরা নামগুলি মাত্র দিতেছি।



মিঃ এ. এস. নারায়ণ নান্দেয়ার ও শ্রীমতী মহাসিনী দেবী

অসহযোগ আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিবার বহুপূর্ব হইতেই তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধের প্রভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। জনসাধারণের হিতার্থে কাজ করিতে গিয়া তিনি তদানীন্তন অনেক মহৎ ব্যক্তির সংস্রবে আসেন এবং তাঁহারাই সম্ভবতঃ দেশের কাজে

তাঁহাকে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা গোখলে ইহাদের মধ্যে একজন।

১২০৬ সালে কলিকাতা সমাজ-সংস্কার কনফারেন্সে সরোজিনীর মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করেন ও তাঁহাদের এই বক্তৃত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশমাতার সেবাতে যে কি অসীম আনন্দ, গোখলে তাহাই সরোজিনীর নিকট বর্ণনা করিতেন এবং একদিন ঠিক সন্ধ্যার প্রাকালে গভীর আবেগে তিনি সরোজিনীকে বলেন—

‘আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের নক্ষত্র-রাজি ও দূর পর্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রাখিয়া তোমার শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গীত, বচন, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন দেশ-মাতার চরণে নিবেদন কর। হে কবি, পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া স্বপ্ন দেখ এবং তোমার আশার বারতা গ্রামের কৃষিজীবীদের নিকট নিবেদন কর।’

সরোজিনী এই গভীর আবেগ-আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশ তখন ঘোর তমসচ্ছন্ন। হিন্দু মুসলমানে তখন নিত্য বিরোধ, কংগ্রেসে মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট দুই দলে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। গোখলে এই মত-বিভাগ দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। কোনো রাষ্ট্রীয় নেতার একলার পক্ষে মিলন-সংঘটনের কাজ অসম্ভব ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। ১২১৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে লন্ডো মুসলিম লীগের বিখ্যাত অধিবেশনে দেশের উন্নতিকল্পে হিন্দুমুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টা করা হয়। এই সভায় সরোজিনী দেবী বক্তৃতা দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, এবং এই তিনি প্রথম সাধারণ স্থানে বক্তৃতা করিলেন। তৎপর ১২১৬ সালে লন্ডোয়ে সার এন্স পি সিংহের (এখন লর্ড) সভানেতৃত্বে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি সর্বপ্রথম স্বরাজ-প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সেদিন আরম্ভ হইল বলা যায়। ১২১৭ সালে শ্রীমতী বেসান্টের সভানেতৃত্বে কলিকাতা কংগ্রেসেও তিনি একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের নারীজাতির অভ্যুত্থান-চেষ্টায় নানা স্থানে

অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও নানা দেশে বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বিলাতেও ভারতবাসীদের ঘেন নিষঙ্গা-শক্তিরূপে কাজ করেন ও ১২১৪ সালে ‘লণ্ডন সিভিল এসোসিয়েসন্’ স্থাপনে সাহায্য করেন।

১২১৮ সালের মে মাসে কাঞ্চিভরমে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সশ্রমিকদের সভাপতিরূপে তিনি যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অতি কৌশলে সে দুর্ভিক্ষের সভার কার্য পরিচালনা করেন। তিনি যুবকদিগকে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। তিনি সেই সভায় কবিতার মানসলোক পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কোলাহলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন।

১২১৫ সালের পর হইতে কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং দেশের ছোট বড় প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশের আপামর সাধারণ মুগ্ধ, তাঁহার সমাজ-সংস্কার-কার্যের জন্ত সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি ভারতের নারীজাতির মুক্তির জন্ত চিরদিন লড়িয়া আসিতেছেন; ফিজি প্রভৃতি ধীপে কুলী-চালান-দেওয়া-সম্বন্ধে তিনি বিস্তর অল্পসন্ধান করিয়া এই নিরীহ কুলীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১২১২ সালের প্রারম্ভে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত সত্যগ্রহ-আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি নিজে শুধু যোগ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া দেশের লোককে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে অহুরোধ করেন।

ভারতীয় নারীদিগের ভোটাধিকার লইয়া তিনি প্রচুর লড়িয়াছেন। তিনি নিখিল ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ মন্টেগু মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি ১২১২ সালে “অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ”এর তরফ হইতে ব্রিটিশ পালিমেন্টে কমিটিতে দেশের জন্ত আবেদন পেশ করিতে গিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক গুরু বলিয়া মানিয়া লইলেন ও ভক্ত শিষ্যের মত আজ পর্যন্ত সুখে-দুখে তাঁহার গুরুর পদাঙ্ক অহুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

১৯২০ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়াতে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি পাঞ্জাবের অমাসুধিক অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেওয়াতে মণ্টেগু সাহেব তাঁহাকে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে বলেন। সরোজিনী কংগ্রেস-রিপোর্ট হইতে তাঁহার উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। মালাবার মোপ্লা বিদ্রোহ লইয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়। এবারেও তিনি তাঁহার কথার যথার্থ্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টকে অপদস্থ করেন। ১৯২২ সালের ১১ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী ধৃত হন। সরোজিনী দেবী কিন্তু তাহাতেও না দমিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া অসহযোগ আন্দোলন করিতে থাকেন।

কেনিয়াতে খেতাবদের অমাসুধিক অত্যাচারে ভারতবাসীর দুর্দশার প্রতিকারার্থ তিনি ১৯২৪ সালে আফ্রিকা যাত্রা করেন। তথায় তিনি তাঁহার মর্ম্পনশী বক্তৃতা ও অদম্য উৎসাহের জোরে প্রবাসী স্বদেশবাসীদের হৃৎখের অনেক লাঘব করিয়াছেন।

তাঁহার সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান চেষ্টা। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই মহাজাতির মহান্ আদর্শের সহিত তিনি আশৈশব পরিচিত, এবং এই দুই বিভিন্ন ধারার মিলন-সাধনে তিনি নিরন্তর সচেষ্ট। যখন এদিকে ভারতীয় অন্ত কোনো মনোবীর দৃষ্টি পড়ে নাই, তখন হইতেই তিনি এই মিলন-সাধনে তৎপর এবং একমাত্র তিনিই হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই সমান শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন।



দত্তারমান (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী রণেশ্বরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুনলিনী দেবী। উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীমতী উষাবালা দেবী। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী), শাশা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী সুনালিনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুনামিনী দেবী

কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরোজিনী দেবীকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি এ উপাধিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেশ-সেবার জন্য অর্জিত কাইসারীহিন্দ মেডেলও তিনি ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরাইয়া দেন।

সরোজিনী নাইডুর জীবন কর্মবৈচিত্র্যে এত বিচিত্র যে, তাঁহার সমস্ত কার্যের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। তবে আজ পর্যন্ত যেখানে তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার দেখিয়াছেন, হৃৎখীর হৃৎখদুর্দশা লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানেই তিনি তাঁহার উদার মন লইয়া প্রতিকার-সাধনে যত্নবতী হইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে এমন অনেক পুরস্কার ও

সম্মান লাভ ঘটানো যাহা জাতীয় অল্প কোনো মহিলার ভাগ্যেই ঘটে নাই। ১৯২১ সাল হইতে তিনি বোধে কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারী, যিনি বোধে কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। আর আজ তাঁহারই ভাগ্যে নির্ঝল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিত্বরূপ সম্মান ঘটিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ যে-শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা জীবনের যে-কোনো বিভাগেই

তাঁহাকে যশস্বী করিত। তাঁহার বাহিরের কর্মজীবনের বহুধা বন্ধনের মধ্যেও তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন এবং পারিবারিক জীবনেই যে নারীর চরম সার্থকতা নয়, ইহা প্রমাণ করিয়া তিনি ভারতের অবমানিত পদদলিত নারী-জাতির আদর্শ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এই নব জাগরণের দিনে তিনি উদ্বোধনীর রাগিণী বাজাইতেছেন। ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরউজ্জ্বল থাকিবে।

পুস্তক-পরিচয়

বাবলা (উপন্যাস)—শ্রী সৌন্দর্যমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স—কলিকাতা। দেড় টাকা।

বাবলা একজন কম্পাউন্টারের ছেলে। অতি শৈশবে সে তাহার পিতাকে হারায়। তখন তাহার পিতৃশোক বুঝিবার জ্ঞান হয় নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরে সে তাহার মাতাকে হারাইল। বাবলার জীবনের করুণ কাহিনী, পাঠকের মনকে ভিজাইয়া দেয়। লেখক বারোশ্রমের ছবি হইতে বাবলার চরিত্রের অনেক অংশ গ্রহণ করিলেও, বাবলার বিদেশী রূপ চোখে পড়ে না। লেখক বাবলার জীবন এত করুণ করিয়াছেন যে বইখানি পড়িতে পড়িতে সকল পাঠকের চোখ সজল হইয়া উঠিবে। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমাদের চোখের সামনে সমস্ত চরিত্রগুলি চলাকরা করিতেছে। বইখানি চমৎকার হইয়াছে।

অরুণা (উপন্যাস)—শ্রী প্রেমাকুর আতর্ষী প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। এক টাকা।

অরুণা পুরীভের মেয়ে। বাহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল, তাহার সহিত না হইয়া তাহার বিবাহ হইল এক বৃদ্ধের সহিত। কিছুদিন পরে সে বিধবা হইল। বিধবা হইবার পর বাহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল, অরুণাকে তাহারই আজ্ঞা লইতে হইল। সেও তখন বিবাহিত। ছুইটি জীবন ছড়নাকে একান্ত আপন ভাবে কাছাকাছি চায়—কিন্তু উপায় নাই। লেখকের ভাষা এমন সরস এবং সহজ পন্ডিতে বহিরা চলিয়াছে যে, অরুণা এবং অশোক—এই দুইজনকেই একান্তই আমাদের পরিচিত জন বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাসখানির কোন স্থানে ভাবে বা ভাবার কুৎসিত ইঙ্গিত নাই। লেখকের লেপাতে এই যে সার্থীত রুচির প্রকাশ তাহা বর্তমান সময়ে অনেক গুণাক্ষিত বৃহৎ উপন্যাসিকদের লেপাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লেখক যেমন ভাবে ছুইটি বাল শ্রেণিক এবং শ্রেণিকার শেষ মিলন ঘটাইলেন—তাহাতে অরুণার প্রিয় জন অশোকের সংসার তাজিয়া গেল না, অশোক এবং তাহার স্ত্রী মাধবী অরুণাকে নুতন ভাবে একটি নুতন পবিত্র প্রেমের বন্ধনে তাহাদের সংসারে চিরকালের অঙ্গ বাধিয়া রাখিল। এই উপন্যাসে আত্মহত্যা নাই, কোথাও টানের আলোর চড়াছড়ি নাই—কোথাও বিন্দুমাত্র স্তাকামি নাই—অথচ উপন্যাসখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না।

চাষার মেয়ে (উপন্যাস)—শ্রী প্রেমাকুর আতর্ষী। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

এই উপন্যাসখানিতে আমরা একটি চাষার মেয়ের জীবনের ইতিহাস পাই। লেখক এমন ভাবে তাহার জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় যেন সেই চাষার মেয়ে আমাদের সামনে বসিয়া তাহার জীবন-কথা বলিতেছে। সামান্য সামান্য ঘটনা, কিন্তু লেখকের বর্ণনারাজিতে তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে। চাষার মেয়ের অপূর্ণ স্বামী-প্রেমের কথা পাঠকের চোখে সজল করিয়া দেয়। চাষার মেয়ে যখন যক্ষারোগগ্রস্ত স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত সম্বল হারাইয়া অবশেষে নিজের দেহকেও বিক্রয় করিল—তখন পাঠকের মন এই চাষার মেয়ের জন্য সমবেদনার পূর্ণ হইয়া উঠে—তাহার প্রতি যুগা আসে না। সে সমস্ত পাঠক আজ-কাল “এন্ট্রিক্যাটিক্” নভেল পড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাদের কাছে এই সামান্য চাষার মেয়ের কাহিনী অতি উপাদের লাগিবে। এই বইখানি আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে।

পদ্মকাঁটা (উপন্যাস)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম পাঁচ-টাকা।

লেখক যুগপাতে বলিতেছেন যে, বইখানি স্বাধীন ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই শেষ করিয়াছেন। তবে শেষের দিকে ‘একটি করাসী উপন্যাসের চারা তাঁকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করেছে—’ এর ভাষে লেখক নাকি দাগী নন, কারণ কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যকও নাকি নাই। আমাদের মনে হয় উপকার পাইয়া—তাহা যেমন ভাবেই হোক—তাহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। বইখানি পড়িতে ভালো লাগিল না। ভাষা বড় কাপে লাগে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, খোঁরা-ছড়ান কলিকাতার রাস্তা-বিশেষের উপর দিয়া খার্ড-ক্লাশ গাড়ী চলিয়াছে। লেখক করাসী উপন্যাসের চারা শেষের দিকে দেখিতে পাইয়াছেন—প্রথম দিকে বোধ হয় তাহা তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

চিত্ত-নামা (কবিতার বই)—কাজী নজরুল ইসলাম। ডি এম লাইব্রেরী, ৩১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

৪০ পাতা বইএর দাম এক টাকা। খুব সস্তা নয়। কবিতাগুলি

পরলোকগত দেশবন্ধু মাহেশ্বর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে লেখা। তবে পুস্তকের গোড়াতেই কাজী সাহেবের পৌকো-চাঁড়-দেওরা এবং বিষ্ণুপুরের দল-মাদল কামানের গায়ে হেলান-দেওরা অবস্থার তোলা কোটোগ্রাফের নকল দেখিবার ক্ষমতা প্রস্তুত ছিল না। দেশবন্ধু দাঁশের ছবি কোথাও নাই—ইহা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে, এবং বই বিক্রির দিক্ হইতেও ইহা বৃদ্ধির পরিচয়ক হয় নাই। বইএর কবিতাগুলি পড়িয়া ভাল লাগিল। লেখকের দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তি প্রতিভাত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির বাঁধান, ছাপা, কাগজ—সবই খুব ভাল।

পূবের হাওয়া (কবিতার বই)—কাজী নজরুল ইসলাম। ডি এম লাইব্রেরী। দাম পাঁচ সিকা।

বইখানির বাঁধান এবং ছাপা বেশ ভাল। কবিতাগুলি একেই অর্থহীন, তাহার উপর ছাপার ভুলে কতকগুলি একেবারে অপাঠ্য হইয়াছে। কবি নজরুলের পূর্বে প্রকাশিত অনেক কবিতা অর্থহীন হইলেও চন্দ্রশেখর সূর্যপাঠ্য ছিল, আলোচ্য কবিতাপুস্তকে ইন্দ্রকে 'কোতল' করা হইয়াছে—একে অর্থহীন তাহার উপর চন্দ্রহীন অর্থাৎ গভস্তোপরি-বিশ্বেটিকং। যেখানে কোনো অনুপ্রেরণা নাই, সেখানে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনর উদ্দেশ্যে কবিতার বই ছাপানোর মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

মুক্ত পাখী (উপন্যাস)—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখো-পাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বইখানি বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাস 'The Woman Who Did' এর ছায়া হইয়া লেখা। লেখক বলিতেছেন যে, বহু দূর ভবিষ্যতে যে-সমস্ত আনাদের সমাজে জাগিতে পারে, তাহার বিষয় বহু পূর্বে লিখিবার অধিকার আছে। এই পুস্তকে লেখক তাহাই করিয়াছেন। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা বইখানি সরস এবং সুন্দর হইয়াছে, বিলাতির ছায়া মাত্রও যে আছে তাহা বুঝা যায় না। বইখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

পাগল দ্বিজদাসের গান—শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী বিরচিত। পাঁচ সিকা। প্রাপ্তস্থান (১) গ্রন্থকার, পোঃ পাকুলিয়া শক্তিমঠ, জিলা ঢাকা। (২) মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা।

দ্বিজদাসের গান বাঙ্গালার পূর্বে প্রান্তের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত। গানগুলি ভক্তিরসে ভরপুর, ছন্দের বা কবিত্বের মাপ-কাঠিতে ইহার বিচার করিলে অস্তায় করা হইবে। গভীর তত্ত্ববোধ সরল এবং সহজ সহজ গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। গানগুলি ভাবের দিক দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করে।

সাজি—শ্রী কণীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই। আর্ধ্য পাবলিশিং কোং, পি এন রসারোড, মাউথ, কলিকাতা। দাম আট আনা মাত্র।

বইখানি ছেলেদের হরত ভাল লাগিবে। তবে গল্প তেমন কিছু নাই। দাম অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

বিক্রমশিলা—শ্রী কণীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। আর্ধ্য পাবলিশিং কোং। দাম লেখা নাই।

লেখক গল্প বলিবার ছলে ইতিহাস লিখিয়াছেন। এচেষ্টা সফল হইয়াছে। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে গল্পও পাইবে এবং ইতিহাসও জানিবে। লেখকের উত্তম প্রশংসনীয়।

মুদঙ্গ (কবিতার বই)—শ্রী যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী। আশুতোষ লাইব্রেরি, কলিকাতা। দাম বারো আনা। ১৩৩২।

বইখানি কাব্যমোদীদের আদর লাভ করিবে।

গ্রন্থকীট

মধ্যযুগে বাঙ্গালা—শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩০। মূল্য ৩ টাকা।

লেখক অধিতনামা ঐতিহাসিক। "নবানী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস" লেখকরূপে তিনি বাংলা দেশে এককালে বৃষ্টিমের ঐতিহাসিক-গণের একজন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আধুনিক কালে আর-কয়েকজন ঐতিহাসিক বাংলার ইতিহাসচর্চার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। লেখক-মহাশয় এই শ্রেণীর ইতিহাস মন্বন্ধে বক্তিয়াছেন,—"একালে 'বিজ্ঞান-সম্রত' ইতিহাসে আবার 'পাখুরে প্রমাণ' চাই। তত শক্ত জিনিস হজম করিবার সাধ্য না থাকিলেও বহুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব প্রকৃতির অনুসরণ করা গিয়াছে।" সুখের বিষয়, গ্রন্থকার পাখুরে প্রমাণও ব্যবহার করিতে পরাশ্রয় ছেন নাই। গ্রন্থখানিতে (১) রাজা গণেশ, (২) হোসেন শা, (৩) সেকালের নবদ্বীপ, (৪) শ্রীচৈতন্য, (৫) মোগল পাঠান (৬) জমিদার ও মগ-কিরাতী, (৭) বৈদেশিকের বর্ণনা, (৮) সুবাদারী আমল, (৯) জমিদারী বন্দোবস্ত, (১০) সেকালের গ্রাম্য সমাজ, (১১) গ্রাম্য সমাজ, (১২) সেকালের আইন, (১৩) সেকালের বসন-ভূষণ, (১৪) শিল্পকলা, (১৫) বাঙ্গালার বাণিজ্য, (১৬) সাধারণ অবস্থা, (১৭) বঙ্গ-ব্রাহ্মণ-প্রভাব, (১৮) কৰ্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী, (১৯) উপসংহার,—ধর্ম্মকৰ্ম্ম।—এই উনিশটি ঐতিহাসিক বিষয় ও একটি অবতরণিকা আছে। বেশীর ভাগ অবতরণই উপলব্ধ সাহিত্যিক উপাদান ও মুসলমান ঐতিহাসিকের রচনা। কিন্তু "বিজ্ঞান-সম্রত ইতিহাস" কথাটার একটু ঠেস দিয়া গিছিলেও গ্রন্থকার প্রমাণালোচনায় যথেষ্ট সাবধানতা ও বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থে আলোচিত অনেক বিষয়েই নানা বাধ প্রতিবাদ আছে। সে-সব বিষয়ের এখানে উল্লেখ না করিয়া মোটের উপর বলা বাইতে পারে, লেখক খুব সাবধানে মধ্যযুগের বাংলার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবীণ ঐতিহাসিকের এ-প্রয়াস বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। লেখক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি বহুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে কেন নূতন তথ্যের অনুসরণ করেন নাই তাহা বলেন নাই। বঙ্গাবভেতার নাম বক্তিরার ছিল না, ইক্তিয়ার উদ্দিন ছিল, তাহা আজকাল শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও স্বীকৃত; কিন্তু গ্রন্থকার বক্তিরারকে বাহাল রাখিয়াছেন। ড-একস্থলে "খালুজি" লিখিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলে "খিলুজি" রাখিয়াছেন। আলুতামাণ নামের বানানেও তিনি কিছু পরিবর্তন করেন নাই। প্রফ দেখার বহু ত্রুটি লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসঙ্গেও বইখানি বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের ক্ষৌণ কলেবর পুষ্ট করিবে।

বিজ্ঞানভিক্ষু

শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী—শ্রী কিরণচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় প্রণীত। সংবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ গুহরায়, বি-এ, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা। ১৩৩২।

লেখক এখন খিনাবিচারে কাগাগারে বন্দী। তবু তাহার বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য লাভ করা গেল। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ারতেই বুঝা বাইতেছে যে, বঙ্গ-ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল। এসংস্করণেও ভুল-ত্রুটি অনেক রহিয়া গেছে। আশা করি, অল্পের ভবিষ্যতে লেখক মুক্তিলাভ করিবেন ও তখন ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য বইখানির ঐতিহাসিক ও অস্তান্ত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিবেন।

টেরেন্স্ ম্যাক্‌সুইনী—ঐ অরণচন্দ্র গুহ প্রণীত।

প্রকাশক—স.খতী লাহরোরী, ২ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থের লেখকও এখন বিনাবিচারে কারাবাস
করিতেছেন। সুবিখ্যাত আইরিশ্ বীর ম্যাক্‌সুইনীর মতন অরণ-বাবুও
প্রতিবাদধরণ একবার জেলে ৬৪ দিন অনশন করিয়া জেল-
কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অস্ত্রার ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।
এই পুস্তক ম্যাক্‌সুইনীর জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া আমার্ল্যাণ্ডের
স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ইতিহাস অংশত বিবৃত হইয়াছে।

স্বাধীনতার কথা—ঐ নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত। প্রাপ্তি-

স্থান—২ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ইহাতে স্বাধীনতার কথা, দান-মনোভাব, প্রভু মনোভাব, স্বাধীন
মনোভাব, হিন্দুসমসামান্য মিলন স্বাক্ষরের তারিখ, আমাদের পলি-
টিক্‌স্, স্ত্রাশক্তালিঙ্গম্ ও স্বাদেশিকতা, নারীর কথা, বন্দে মাতরম্,
এই দশটি প্রবন্ধ আছে। লেখক অসহযোগ-আন্দোলনের সময় আলি-
পুর জেলে কারাবদ্ধ ছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধই সেইসময়ে লেখা।
সাহিত্যের আবির্ভাবের লেখকের মন গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ
হয়। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টি অনেক স্থলেই বেশ উদার। “নারীর
কথা” ও “স্ত্রাশক্তালিঙ্গম্” প্রবন্ধ তাঁহার দৃষ্টান্ত। লেখক পূর্ববঙ্গের
লোক হইয়া কলিকাতার চণ্ডি ভাষার বেশ অনায়াসে লিখিয়াছেন।
মাকে-মাকে কেবল একটু-আধটু স্বাদেশিকতা আসিয়া পড়িয়াছে।

অ

মহাপ্রস্থান—ঐতিহাসিক উপন্যাস) ঐ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

এম্-এ। প্রকাশক—সুজনাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

গ্রন্থকারের ভাষা ও বর্ণনার জোর আছে; আত্মকাল এরূপ মার্জিত
ভাষা কম দেখিতে পাওয়া যায়; সংস্কৃতবহুল হইলেও স্বচ্ছ ও সরল।
মাকে-মাকে দার্শনিক তত্ত্ব-কথাগুলি সত্যসত্যই চিন্তার ধোরাক জোগাইয়া
দেয়; তবে বইখানি উপন্যাস-রূপে যে বিশেষ মনোরম হইয়াছে, তাহা
মনে হয় না—মাকে মাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে এমন সব ঐতিহাসিক
অবাস্তব কল্পনা প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, কিছুক্ষণ ভাবিতে হয়
বটনাগুলি কোন্ যুগে সংঘটিত হইতেছে। মোটের উপর বইখানি
আমাদের ভালই লাগিল। তবে গ্রন্থকারকে আমরা গল্পের অবতারণা অধিক
করিতে বলি। অতিরিক্ত তত্ত্ব-কথা ও বর্ণনা-বাহুল্য মাকে মাকে পাঠককে
পীড়া দেয়।

দীপালি—(কথা-সাহিত্য) ঐ রবীন্দ্রনাথ সেন। এম্ সি

সরকার এণ্ড সন্স হারিসন্ রোড, কলিকাতা। মূল্য ১০।

সুনিষ্ঠ মার্জিত ভাষার পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি মহীয়সী নারীর
কাহিনী গ্রন্থকার অতীব যত্ন-সহকারে আমাদের হাতে দিয়াছেন।
মূল ও অনুবাদের কবিতার টুকরাগুলি বড়ই সুন্দর। প্রত্যেক
বাহালী-পরিবারে এই পুস্তকখানির আদর হইবে। পুস্তকের
ছাপা, কাগজ, ছবি নিখুঁত সুন্দর। গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমাদের
ধন্যবাদার্থ।

ব্যবধান—(উপন্যাস) ঐ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এম্ সি

সরকার এণ্ড সন্স, হারিসন্ রোড, কলিকাতা। দাম দুই টাকা আট
আনা।

লেখক তাঁহার অস্ত্রান্ত পুস্তকে বেরূপ অতি মনস্তত্ত্ববাদ,
ত্রিভিনলজি, হেরিডিটি প্রভৃতির চড়াছড়ি করিয়াছেন এই পুস্তক-

খানিতে তাহা বহু পরিমাণে কম বলিয়া বইখানি পড়িতে ভালই
লাগিল। এই উপন্যাসের পাপ-বর্ণনার ছাপে মনে ছোপ ধরে না।
কমলার স্বামী শক্তিকান্ত নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আকৃতি-
সাদৃশ্যের সুবিধা লইয়া কাশীনাথ গ্রামের লোকের চক্ষে এমন কি তাহার
চক্ষেও ধূলা দিয়া তাহার স্বামী সাজিয়া বসিল এবং কমলা কিছুদিন পরে
যখন তাহা বুঝিতে পারিল মানসিক ব্যঙ্গ সে ক্ষতাবস্থ হইয়া গেল।
ইতিমধ্যে শক্তিকান্তের আবির্ভাব হইল। গ্রন্থকার কমলার মানসিক
অবস্থা বেশ চমৎকার ফুটাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক বেটনী মানুষকে দেখ
মনে কেমন রূপান্তরিত করে শক্তিকান্তের চরিত্রে তাহাও বেশ ফুটিয়াছে।

পরীর দৃষ্টি—(রূপকথা) ঐ অখিল নিয়োগী, কুলজা লাইব্রেরী,

পোঃ নর্ডন, ষ্ট্রীট, দাম ছয় আনা।

আর্টিষ্ট লেখকের রূপের তুলিতে এই রূপকথাটি অপূর্ণ হইয়া
ফুটিয়াছে। নবীন গ্রন্থকারের প্রথম খণ্ডেই হইলেও সুখপাঠ্য,
ছাবগুলিও অতি সুন্দর।

মায়ের ছেলে—(উপন্যাস) ঐ বিতা দেবী। মূল্য দুই টাকা।

অকারণে স্বামী-পরিভ্রান্ত একটি নারীর করণ কাহিনী এই উপন্যাসে
বিবৃত হইয়াছে। লেখকার ভাষা সজীব ও সরস, কোথাও আড়ষ্ট ভাব
নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে অনিলের ভাগ্যোন্নতি অস্বাভাবিক রকম দ্রুত
ঘটিয়াছে। মোটের উপর বইখানি পড়িতে ভালোই লাগে।

মায়ামৃগ—(গল্পবই) ঐ হেমেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত।

প্রকাশক ক্যালকাটা পাব্লিশাস্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
মূল্য এক টাকা বারো আনা।

বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও কাগজ অতিসুন্দর—বহিরাবরণ এত
সুন্দর কম বাজালা পুস্তকেই দেখা যায়। ভিতরের গল্প পাঁচটিও বাহিরের
সজ্জ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। নিখুঁত মনোরম ভাষার হেমেন্দ্র বাবুর
অসাধারণ দখল আছে। অথচ তাঁহার লেখার মধ্যে বর্তমান-প্রচলিত
কাহিনির চড়াছড়ি নাই। ‘বিক্রোহী’ ‘পরীর ডায়েরী’ ও ‘একটা দিনের
ইতিহাস’ চমৎকার উপভোগ্য, অথচ বেদনার আন্দোলনে মনকে বাধিত
করিয়া তোলে। ‘একটা দিনের ইতিহাসে’ সমাজ-পরিভ্রান্ত একটি
অভাগিনী নারীর সখা-ক্লিষ্ট মনটিকে কবি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত
করিয়াছেন—তাঁহার এই মন্ত্র-ভাষা চক্ষুকে অশ্রুভাগ্যক্রান্ত করিয়া তোলে।
বর্তমান রস-দৈন্যতার দিনে হেমেন্দ্র-বাবুর এই বইখানি সমাদৃত হইবে।

ঐ সজনীকান্ত দাস

বেদান্ত-পরিচয়—ঐ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। পৃঃ ২৫৪;

মূল্য ১০।

গ্রন্থে ১৩টি অধ্যায়—(১) উপক্রম; (২) ব্রহ্মের স্বরূপ; (৩) ব্রহ্ম
ও জগৎ; (৪) জীব ও ব্রহ্ম; (৫) ব্রহ্মপুর; (৬) ও (৭) মায়ী ও
প্রকৃতি; (৮) ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম নিরূপণ; (৯) ভূমাবাদ (অদ্বৈতবাদ);
(১০) ভূমাবাদ (অনুপ্রবেশ); (১১) ভূমাবাদ (শক্তি-প্রবেশ);
(১২) ভূমাবাদ (বিষয়); (১৩) সূত্র ও অনুসূত্র।

পারিশিষ্টের বক্তব্য বিবরণ—১। বেদ ও বেদান্ত; ২। বেদান্ত ও
ব্যালকোর; ৩। বৈদান্তিক সময়সর।

গ্রন্থকার উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া
অতি সুন্দর ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া
আমরা প্রীত হইয়াছি।

দুই-একটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার যুগ্মরূপক
উপনিষদের ২।৩।৭—২ এই তিনটি মন্ত্রের এইপ্রকার অনুবাদ দিয়াছেন—

“যেমন ছন্দুতি বাদিত হইলে তাহার শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু ছন্দুতি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শব্দ বাদিত হইলে তাহার বাহু শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শব্দ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহু শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়,—ত্রুৎ ও জগৎ-সদৃশেও ত্রুৎ”। পৃ: ৪১ এবং ১০৪।

দুইটা স্থলে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থলেই লিখিত তিনটি অংশের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই :—

- ১। সপ্তম মন্ত্রের “ছন্দুভাষাতস্ত বা”
- ২। অষ্টম মন্ত্রের “শব্দগাত্ত বা”
- ৩। নবম মন্ত্রের “বীণাবাদস্ত বা”।

প্রথমটির দুইটি অর্থ হইতে পারে—ছন্দুতি-বাদকের ও ছন্দুতির আঘাতের। তৃতীয়টির দুইটি অর্থ করা সম্ভব বীণা-বাদকের ও বীণা-ধ্বনির। শব্দর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয়টির অর্থ “শব্দ বাদকের”। এই তিনটি স্থল তুলনা করিয়া দেখিলে প্রথমটির ও তৃতীয়টির প্রথম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমটির ৭ম মন্ত্রে এই অংশের সমগ্র বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—“কিন্তু ছন্দুতি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়” ইহার অর্থ হইবে—“কিন্তু ছন্দুতি গ্রহণ করিলে কিম্বা ছন্দুতি-বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়”।

অষ্টম মন্ত্রের অনুবাদ অংশের অর্থ হইবে—“কিন্তু শব্দ গ্রহণ করিলে কিম্বা শব্দবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়”।

নবম মন্ত্রেও এই প্রকার।

প্রথমটির বৃহদাখ্যাক উপনিষদের অন্তর্ধ্যায়ী-ব্রাহ্মণ হইতে ছয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ: ১৫৯—১৬০)।

ইহার প্রথম মন্ত্রটির অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

“যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, পৃথিবী বাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অসুত অন্তর্ধ্যায়ী”।

মূলে আছে “পৃথিব্যাঃ অন্তর”—প্রথমকারের অনুবাদ “পৃথিবীর অন্তর” অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তর। ইহার পরবর্তী মন্ত্রসমূহে আছে—“অন্তাঃ অন্তরঃ”, “অগ্নেঃ অন্তরঃ” ইত্যাদি। এ সমুদায়েরও অর্থ করিয়াছেন—‘সলিলের অন্তর’, ‘আগ্নির অন্তর’ ইত্যাদি। শব্দরের অর্থও এইপ্রকার।

এবিষয়ে দুইটি আপত্তি :—

(১) এইপ্রকার অর্থ করিলে ‘পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্’ এবং “পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ” এই উভয় অংশের অর্থ একই হইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় বক্তব্য এই :—এই ব্রাহ্মণে এইপ্রকার ২১টি মন্ত্র আছে। ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে পৃথিব্যাঃ, অন্তাঃ, অগ্নেঃ, অন্তরীক্ষাঃ ইত্যাদি। ১১টি স্থলে পক্ষমী কি যজ্ঞী বিভক্তি, সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ১০টি স্থলে পক্ষমী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন অন্তাঃ, অন্তরীক্ষাঃ, আদিত্যাঃ, দিগন্তাঃ, তারকাঃ, আকাশাঃ ইত্যাদি। ২১টি মন্ত্র একই প্রকার; সুতরাং সর্বত্র একই বিভক্তি হইবে। সুতরাং সর্বত্র পক্ষমী বিভক্তি করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে অর্থ করিতে হইবে ‘পৃথিবী হইতে পৃথক্’, ‘সলিল হইতে পৃথক্’, ‘আগ্নি হইতে পৃথক্’ ইত্যাদি। আমাদের এই মত গ্রহণ করিলে পূর্বে উদ্ধৃত মন্ত্রের অর্থ এইপ্রকার হইবে :—

“যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, পৃথিবী বাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে বসন করেন—ইত্যাদি।”

সত্যের সন্ধান ও অগ্ন্যায় প্রার্থনা— শ্রী বোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। পৃ: ১৪।-১০৮+২; মূল্য ১।

পুস্তকে ১১টি প্রবন্ধ আছে; সমুদায় প্রবন্ধই কোন না-কোন মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধসমূহের নাম এই—নাগ্নিকের প্রেম, আন্তিক ও নাগ্নিক; নির্ঝাণ ও ঠগ্নাল্লববাম; নিয়তিবাদ; বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য; তর্কসঙ্গ; সতীত্ব; আলোচনা ভৌতিক-তত্ত্ব, উচ্ছ্রাব কল্পিত, জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি; নিমন্ত্রণ-সঙ্গ; ছন্দুবাদ; সত্যের সন্ধান।

অনেক প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থে অনেক স্থলে ইংবেদী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সব স্থলে অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইবে।

ধর্ম্মসূত্র—শ্রী গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এ, প্রণীত। পৃ: ১১৪+৪; মূল্য ১।

গ্রন্থের বিষয়—ধর্ম্ম এবং সর্বপ্রকার কর্তব্য। স্থলিগিত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

অচিন-দেশের রাজপুরী—শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ৮২।১ হারিসন রোড হইতে শ্রীমূল্যলিত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ: ৫৪। মূল্য ১/০। (১৩৩২)

রবীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্য রচনার সিদ্ধান্ত। শিশুদের মস্তিষ্ক লেখা এই গল্পের বইপানি তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্রের আঁকা প্রচ্ছদপট ও অঙ্কিত ছবিগুলি সুন্দর হইয়াছে।

প্র

ইঞ্জিত—শ্রীকৃষ্ণনাস আচার্য্য চৌধুরী। প্রকাশক শ্রী প্রমোদ-রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। আট আনা; ১৩৩২।

গল্পের বই; কিন্তু গল্প বলিতে বাহা বুঝার এগুলি সেরূপ গল্প নয়; ছোট ছোট কবিতার মত ইহাতে ছোট ছোট গল্প বা গল্পের টুকরা আছে। এগুলি বড় গল্পের আভাস বা ইঞ্জিত মাত্র, — কবিতার মত মনোহর, বড় ভাবের উদ্বেগক, অসঙ্গত রসের গভীর গভীরতা। গল্পগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে, আনন্দিত করে, স্তম্ভিত করে, মুগ্ধ করে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—“অল্প কথায় একটি বিশেষ রস, আংশিক রূপে একটি চিত্র, অথবা একটু মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।” তাঁহার চেষ্টা সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে। বইটি কাব্যরসিকের পাঠ্য।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৮১-৮৪ রাখাবাজার স্ট্রীট, ট্যাগার্ড-প্রেস হইতে এস সি ব্যানার্জী এন্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আজকাল দেশে সংস্কৃত শিক্ষার আদর কমিয়াছে। সুতরাং সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের নামও বাঙালী তুলিতেছে। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বিগত উনিব্বিশ শতাব্দীর বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের অকৃতম প্রধান পাণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট নে, বঙ্গগৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং পণ্ডিত রাভেনসলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণামুরক্ত ছাত্ররূপে ছিলেন। নৈনবর্ষের সুব্যাপ্যতা ছিলেন বলিয়াও তর্কবাগীশ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। এমন ব্যক্তির জীবনচরিত থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য জীবন-

চরিত্রটি পঞ্চম সংস্করণ। স্মরণ্য বাঙালী পাঠক জীবনচরিত্রটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়; ইহা আনন্দের বিষয়। জীবনচরিত্রটির ভাষা সংস্কৃতবহু, তথাপি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে সেকালের পণ্ডিত-সমাজের স্মরণ চিত্র পাইবেন।

শ্রী শ্রীচণ্ডী—শ্রী ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ কর্তৃক অনূদিত। ৩৩নং বন্দোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, উত্তর-পাড়া হইতে অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

মহাশয়ের পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী পুরাণ চন্দ্র অনুবাদ। বইখানি ছেলেদের রচিত এবং ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে। কাশীদাসী চন্দ্র অনুবাদ যথাসম্ভব সরল হইয়াছে। শঙ্করালিনী নারীরূপে চণ্ডী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইলেন, দেবশত্রু মহিষাসুর ও তাঁহার সেনানী এবং অচল স্তম্ভ নিশ্চয়কে তিনি কিরূপ আশ্রিতবলে নিধন করিলেন—তাহা বালকদের কল্পনাতৃপ্তিকর তরুণ কাহিনী। ইংরেজী গ্রন্থের দুঃসাহসপূর্ণ পল্ল অংশের ইহা কম কোতুল-জনক নয়; এবং ইহা আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনী। স্মরণ্য বালক-বালিকাদিগকে ইহার দক্ষিণ পরিচিত করা কর্তব্য। এই হিসাবে গ্রন্থকার আমাদের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে চন্দ্রের দোষ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তথাপি বইটির প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ ও আয়ুর্চিকিৎসা—

ডাঃ শ্রী কাঙ্কিচন্দ্র বসু, এম-বি প্রণীত। ৪৫ নং আমহাষ্ট-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্যসংস্করণ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি, প্রকার-ভেদ, আয়ুর্জিক কারণ, চিকিৎসা, প্রতিষেধ, আয়ুর্চিকিৎসা প্রভৃতি অত্যন্ত অয়োজনীয় জাতব্য বিষয়সমূহ ইহাতে প্রচুর অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বইটির একটি কণা বিশেষ গণিধানের যোগ্য। অনেক বলেন ও অনেক ঔষধ-আবিষ্কারী ঘোষণা করেন যে, কুইনাইন প্রয়োগে ম্যালেরিয়া জ্বর দূর হয় না, ঢাকা পক্ষে মাত্র, সুবিধামত আবার প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রবীণ বিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন—“ঐহানিগের (ইনব লোক) মধ্যে অনেকেরই ঔষধ বিবেচনা করিয়া কুইনাইন বা সিন্‌কোনা-খটিত ঔষধ ধরা পড়ে এবং ঐহানিগের মধ্যে উল্লিখিত কোনরূপ পদার্থ নাই, ঐহানিগের ঔষধে কদাচিৎ সুফল ফলিতে দেখা যায়।” বইখানি দূর দূর পঠিত হওয়া দরকার।

স্বস্তি-ঋদ্ধি—শ্রী রসিকচন্দ্র বসু, বিদ্যালয়িনোদ প্রণীত। মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে শ্রী হেনচন্দ্র আচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চৌদ্দ আনা।

প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি চিন্তাগৌরবে ও বিবেচন-বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত সুপাঠ্য হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সেকালের সমাজ শাসন, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, জাতীয় প্রবন্ধগুলি বিশেষ অনুসন্ধিৎসাতৃপ্তিকর। আমাদের বিশ্বাস—বইখানি পড়িয়া সকলেই চিন্তার খোরাক পাইবেন ও আনন্দ লাভ করিবেন।

লড়াইয়ের নতুন কায়দা—শ্রী হারাধন বক্সী। প্রকাশক শ্রী রামেশ্বর দে, চন্দ্রনগর। মূল্য দশ আনা, ১৩৩২।

সংক্ষেপে বইটির পরিচয় দিতে গেলে এই বলিতে হইবে যে, এখানি আধুনিক যুদ্ধব্যাপারের একটি স্মরণ ইতিহাস। বিপত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে লেখক স্বয়ং যোদ্ধার কাজ করিয়াছিলেন। স্মরণ্য তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পুঁথিগত বিদ্যা নয়, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফল। জিনিষটি তিনি এত সরলভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা গল্পের মত মনোগ্রাসী হইয়াছে। সেকালে ও একেলে লড়াই, যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তৃতি, দুর্গ ও খাচ, কামান ও গোলা, বায়ুগান, সংখ্যা ও শক্তি প্রভৃতি আধুনিক লড়াইয়ের বহু দিক লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আবার আধুনিক যুদ্ধের চোখা চোখা উপায়গুলির প্রতি দৃষ্টি ও বিদ্রূপ প্রকাশ করিতেও লেখক ছাড়েন নাই। ইহাতে তাঁহার ভারতবর্ষীয় মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাহারা ইউরোপীয় যুদ্ধের কাহিন্যকরণ, সাজসজ্জায় প্রভৃতি জানিতে চান, তাঁহারা অবশ্যই বইটি পাঠ করিবেন। এইসমস্ত বই লেখিয়া আনন্দ হয় যে, বাংলা সাহিত্য বৃদ্ধি সর্বাঙ্গপুষ্টির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

ছেলেদের বিদ্যাসাগর—শ্রী যামিনীকান্ত গোস্বামী

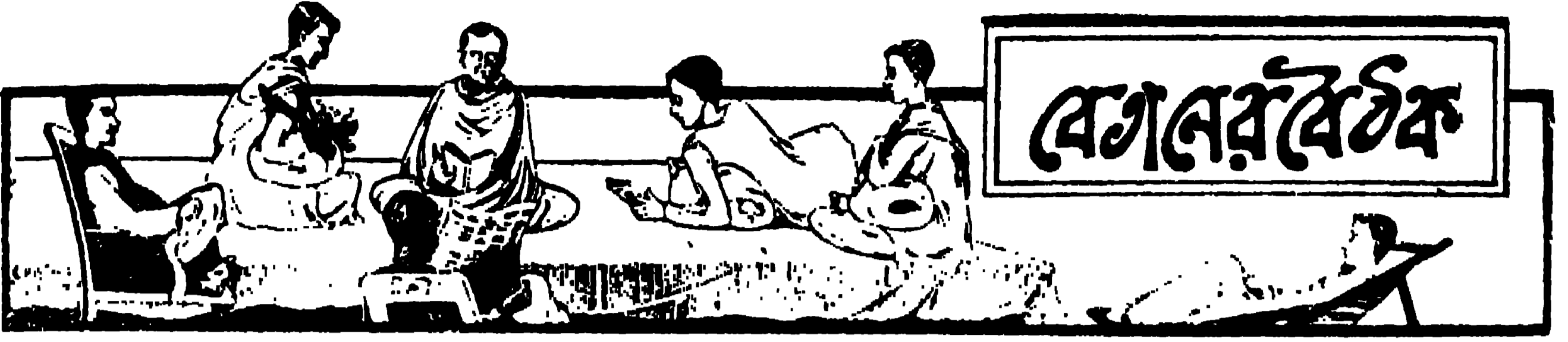
প্রকাশক ইন্ডিয়ান পেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। মূল্য দশ আনা।

পুণ্যপ্রসাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত্র ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বইখানের সরল ভাষায় জনসংগী গল্পের মত অতি স্মরণ্যভাবে লেখক বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের জীবনকথা বলিয়াছেন। বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বইখানি ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগবে, সন্দেহ নাই।

দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা পূজা—

লেখকের নাম নাই। শ্রী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত; ৪৩,৩ নং আমহাষ্ট-ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার আনা। ১৩৩২।

ভারতবর্ষের স্বরূপ কি, কিরূপে ভারতবর্ষকে ভালবাসা যাউতে পারে, মাতৃরূপিনী ভারতবর্ষের মূর্তি কি ও সে-মূর্তিকে কিরূপে মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা যাউতে পারে—ইত্যাদি বিষয় বইটির প্রথমার্শে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা গভীর চিন্তা ও শ্রীতির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও তিনি যে সত্যজ্ঞতা ও তাঁহার উদ্ভি যে সাধনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। বইটির শেষভাগে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশের রূপ কি তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে আঁকিত করিয়া গ্রন্থকার সেগুলিকে স্তোত্ররূপে প্রচারিত করিয়াছেন। এগুলি বাস্তবিকই স্তোত্র রূপে, ভারতমাতার বন্দনা রূপে, বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণের দ্বারা পাঠ ও আবৃত্তির উপযোগী। ইহা প্রত্যেক ভারত-প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করিবে। রাজনীতি, সমাজসেবা প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রের কর্ম্মই দৈনন্দিন জীবনে এই ভারতবন্দনাপদ্ধতি পালন করিলে দেশাত্মবোধে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবেন। দেশোন্নতিকামী সকলেরই বইটি পাঠ করা উচিত।



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আটন-সংকোচ প্রয়োজনের ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সংকোচম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। তাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিলে, তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অন্যান্য প্রয়োজনের ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অধ্যয়ন পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের মনোহর-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসা বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল বাস্তবিক কৌতুক কৌতুহল বা স্থবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আলাদা না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যথার্থ-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া কমাগত বাদ-প্রতিবাদ গোপিনার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ বন্ধন আমাদের দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেগলবৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংযোগনা আরম্ভ হয়। সতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাহারা কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

ভারতবর্ষে কৃষি-বিদ্যালয়

আজকাল অনেকেই কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার জন্ত উৎসুক, কিন্তু তাহাদের উপযোগী স্কুল বা কলেজের অভাবে শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম। যেমন Pusa Research Institute-এ ভুক্তি হওয়া ছুরুহ ব্যাপার। Non-matric, Matric, I. A. এবং I. Sc. ছেলেদের শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত স্কুল বা কলেজ ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ স্থানে কয়টি আছে?

শ্রী রুবজ্যোতিঃ ভৌমিক

'বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধান'

বাঙলা ভাষায় কে সর্ব-প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন ও তাঁর অভিধানখানির নাম কি?

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র

মীমাংসা

(২)

বিষ্ণুপুরে মারাঠাদের পরাজয়

বর্তমান বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অধিকাংশ প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মল্লাজবংশ এই বিশাল জনপদের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন বলিয়া—বিষ্ণুপুর মল্লভূমি নামে পরিচয় লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনের নিকট সন্নয়নপুর নামক স্থানে মল্লরাজ বংশীয়দের আদি নিবাস ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম রঘুনাথ সিংহ। তিনি মল্লরাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া আদি মল্ল নামেও খ্যাত হন। বিষ্ণুপুরের এক পঞ্চাশতম রাজা ২য় রঘুনাথ সিং ১২২ মল্লাকে আপনাদের বংশগত মল্ল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-গণের সুপরিচিত "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন। সেই হইতে বিষ্ণুপুরের

রাজাগণ সিংহ উপাধিই ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ২য় রঘুনাথ সিংহের পুত্র রাজা বীরসিংহ নানাবিধ সংকাজ এবং অপরিমিত দানের জন্ত নিপুল গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বীরসিংহের পুত্র দুর্জয় সিংহ। তিনি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ দেবতা মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন। দুর্জয় সিংহের পুত্র গোপাল সিংহ নগর রাজ্য বা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ বার্থ করিয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্ত বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে গোপাল সিংহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অপূর্ব সাহস ও বীরত্বের সহিত স্বীয় সৈন্য পরিচালন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাদের দিশ্বর উৎপাদন করেন। কিন্তু অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়দের গতি প্রতিহত করিবার মত সৈন্যবল তাঁহার না থাকায় বাধ্য হইয়া দুর্গে আশ্রয় লন। দুর্গের প্রাকারস্থিত কামানশ্রেণী হইতে প্রচুর পরিমাণে গোলাবুটি হইতে লাগায় মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ পলাইতে আরম্ভ করে। গোপাল সিংহের সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জবাদি লুণ্ঠন করে। বর্তমানাবধি কীর্তিচক্র গোপাল সিংহের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়-দিশকে ক্রমে ক্রমে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই যুদ্ধে যে-সমস্ত কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে, দলমাদল বা দলমর্দন আর্মিও বিষ্ণুপুরের ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। রাজা গোপাল সিংহ ১৭৫ মল্লাকে ভ্রমগ্রহণ করেন ১০৫৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে পাঁচটি দেবমন্দির নির্মিত হয়। তিনি ভুলভূমের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপাল সিংহের মৃত্যুর পর হইতেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। "মল্ল রাজবংশ" নামক এক প্রাচীন পুঁথিতে বিষ্ণুপুর-রাজগণের বংশগত লিখিত আছে। এই পুঁথিখানিকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বলা যায় না, তবুও ইহা বিষ্ণুপুর রাজবংশ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৫)

বজ্রবোগিনী লোকেশ্বর এবং প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে

আকর্ষণ করিতেছি। বুদ্ধগয়তে মহাবোধিবৃক্ষের নীচে, “বজ্রাসন” অবলম্বনপূর্বক বুদ্ধদেব নির্ঝাঁপ লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর পাল বংশীয়দের রাজত্ব পর্যন্ত বিক্রমপুরের সকল স্থানেই বৌদ্ধধর্মের খুব প্রসার এবং প্রতিপত্তি চাইয়াছিল, ইতিহাসে এ-বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। বজ্রযোগিনী নামটি বৌদ্ধদের দেবী। সাংহ-তিক দীনেণ সেন মহাশয় বলেন—“নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্যগণ এক সময়ে বৌদ্ধদের ‘বজ্রাসন’ তাত্ত্বিক সাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ‘বজ্রযোগিনী’ গ্রামে এই বজ্রাচার্যগণের একটি প্রধান আড়া ছিল।” (প্রবাসী মাঘ ১৩২২—২৬২ পৃঃ)

বৌদ্ধধর্মোক্ত বজ্রযোগিনী নামের সঠিত এগ্রামের অস্ত্র কোনও সম্বন্ধ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমহাতাত্ত্বিক ও পরম জ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতাত্ত্বিকগণের শাধস্থানীয়, ইঁহার নাম বৌদ্ধ-সঙ্গতে সুপরিচিত। ইঁহার পূর্বনাম ছিল আদিনাথ চল্লসর্ভ। মহারাষ্ট্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব-কালে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর “বিক্রমপুরে” জন্মগ্রহণ করেন।

১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়। তিব্বতের শত শত নর-নারী দীপঙ্করের স্মৃতি স্তুতি ও অঙ্কাসহকারে পূজা করে। তিনি ১০৮ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইসব গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।

বহুভাষা-ও ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীমম্বলাচরণ ঘোষ বিদ্যাসুধন মহাশয়, “বিক্রমপুরের ইতিহাস” গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া-ছেন—“সম্প্রতি আমাদের বোগেন্দ্র-নাবু (সুপ্ত) বজ্রযোগিনীকেই দীপ-ঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেন্ কেন্ প্রমাণদ্বারা পূর্ববক্তের ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক শ্রীশ্রুত বোগেন্দ্রনাথ সুপ্ত মহাশয় বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

তাহা “বিক্রমপুরের ইতিহাস” পাঠ করিয়া জানিবার উপায় নাই। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১৩১৬ সন, ১৬-১৭ পৃঃ)

বাংলাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ “বিক্রমপুরকেই” দীপঙ্করের জন্মস্থান বলেন। শুধু বোগেন্দ্রনাবু কজনীর সাহায্যে একটু অগ্রসর হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বজ্রযোগিনীই অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি। বাহুল্য-ভয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত এ স্থানে আলোচিত হইল না।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

জন্মদিন

হিন্দুদের কোন কাজই শাস্ত্রানুমোদন-ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইত না এবং এখনও হয় না। সেই হিসাবে নানা কাজ নানা বিভাগে বিভক্ত। গমনাগমন, ক্ষৌর-কর্ষণ ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের অধীন। জন্মদিনে এই-সব কাজের শুভাশুভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লেখা আছে।

১। বো জন্মমাসে ক্ষুরকর্ষণ যাত্রা কর্ণদ্য বেধে কুবতে চ মোহাৎ।
নুনং স রোগং ধন-পুত্র-নাশং প্রাপ্নোতি বৃঢ়ো বধবন্ধনাপি।

ধে-বাস্তি জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ষণ, যাত্রা, কিংবা কর্ণবেধ করে নিশ্চয়ই সে মূঢ়, রোগ ধনপুত্রনাশ এবং বধ-বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

২। জন্মতে জন্মমাসে বা বো গচ্ছেদষ্টমে বিধৌ।

আয়ুঃক্ষয়মবাপ্রোতি ব্যাধিঞ্চ বধবন্ধনম্।

জন্মমাস জন্মনক্ষত্র ও অষ্টমচন্দ্রে যাত্রা করিলে আয়ুঃক্ষয়, ব্যাধি, বধ ও বন্ধন হয়।

৩। ব্যতিক্রম। জাতং দিনং দ্বয়তে বশিষ্ঠশ্যাত্তৌ চ গর্গৌ যবনো-
দশাহম্। জন্মাদ্যমাসং কিল ভাগ্যশিচ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরি কর্ণবেধে।

বশিষ্ঠমতে জন্মদিন গর্গমতে আট দিন যবন মতে দশদিন ভাগ্যশিচ্চ মতে সম্পূর্ণ জন্মমাসই চূড়া বিবাহ ক্ষৌর ও কর্ণবেধে বর্জনীয়।

শ্রী ভবানীচরণ দত্ত

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যকার অস্থানে সভাপতির আসন অধিকার করিবার জায়-সঙ্গত দাবী আমার নাই। সুতরাং আপনাদের এই সম্মানটি সম্যক উপভোগ করিবার পথে অন্তরায় হইতেছে আমার সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। আমার এই ক্ষণস্থায়ী পদোন্নতিতে আশঙ্কার কারণ ত আছেই, উপরন্তু ইঁহার দক্ষণ অনেকের বিরাগ বিক্রম অর্জন করারও সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ প্রতিগ্রহ করা সমীচীন কিনা তাহা ভাবিতেছিলাম। একবার মনে হইল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করিয়া এ সঙ্কট

উৎরাইয়াই যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই দার্শনিক সমাগমে আমার পদবীর সব চেয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ত আমার দর্শন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত। এমন হইতে পারে যে, সভাপতি হিসাবে আপনারা তেমন লোকটিই চান যিনি নির্বিকারভাবে উদাসীনপন্থী, যিনি অস্থিত কোন বিশেষ মতবাদের বশ্যতা জ্ঞানতঃ স্বীকার করেন না, কারণ যাবৎ মতবাদ সম্বন্ধেই তিনি নিরপেক্ষ-ভাবে অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে আমার গুণাগুণ তুলনামূলক সমালোচনার বহির্ভূত; কারণ তাহা অস্তিত্ব নাহি হই-

বাদেরই বাহিরে এবং হয়ত আমাকে এইস্থানে আনিবার পক্ষে সেটা মন্ত সুবিধার কথা। এ অবস্থায় আমার মনে হয় আমি যেন একটা বাতিলদান; বাতির মত তার আলোক বিকীর্ণের শক্তি নাই বলিয়াই যেন দীপ্তিহীন নিজের গাভীর্ষ্যে অবিচলিত থাকার পক্ষে সে বেশী উপযোগী।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আপনারা আমায় নীরব থাকিতে দিলেন না, যদি ও আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তির উপদেশ অল্পমারে আমার এ অবস্থায় নীরব থাকাই উচিত ছিল। এই দ্বিধা কাটাইয়া আমার পাণ্ডিত্যরিক্ত মনটিকে কথা বলাইতে সাহায্য করিয়াছে একটি জিনিষ। সেটি এই যে, আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন কাব্য যাহা হউক—একটি একমুখী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অস্থায় বালাই তাহাদের নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য মুগ্ধ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না।

দার্শনিকপ্রবর প্রেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্রে হইতে কবিদের নির্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমণ্ডলীর রুদ্ধতার খাস কামরা আশ্রয় করা নহে। এই জন্তই বোধ হয় শঙ্করাচার্যের মত দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্যকে কোনও আতিথ্যেই “ইমিগ্রেশন” আইনের সাহায্যেই প্রেটো তাঁহার আদর্শরাষ্ট্রে হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত সেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের কাব্য নহে, কিন্তু কবিতাসরবরাহ করাটা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন কাব্যমোদী দোষারোপ করেন না।

আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভাস প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট বড় কত রকমের মানব চরিত্র, কি অদ্ভুত

বৈচিত্র্য, কত বিভিন্ন স্তরের মনশৃঙ্খলে ছেঁতে ছেঁতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচারবিন্যাস এই মহাভারতের উনার আঘতনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে! এই অমিত্যচারী ঐন্দ্রার্থের ফলে কাব্য তার নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষে; কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট সাধারণতন্ত্রে (Communism) বিদ্যুত। বস্তুত মহাভারত যেন একটি ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ; ইহার মধ্যে কত বিচিত্র মানস সৃষ্টি, অসংখ্য গ্রন্থনকত্রের মত জটিল-বিষম ছন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র তর্কবিতর্কজটিল পন্থা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহপরিবেষ্টিত একটি মহাআধ্যাত্মিক সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়।

মুগ্ধমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আশ্রয়ে দীপ্তিমান, তাঁহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্ত নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি :

“পানীমে মৌন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে ইসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে ;
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।”

কবীরের এই উচ্চ হাস্য সেই হিন্দুগায়কের ধর্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম; কারণ, তৎসম্মান যে তাঁহার মনকে মুক্তি দিয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছেন তাঁর হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। সুতরাং উক্ত স্থানদ্বয়ে তাঁরধাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকিত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া ধর্ম-বোধ আগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। তবে যে সমস্ত ধর্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া কত সাধকের ভজন পূজন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধন শক্তিটি তাঁহার মত সাধকের ভেতনই প্রয়োজন বলিয়া তাঁর আকার করেন যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহমানকাল প্রচলিত মন্ত্রের, যে মন্ত্র বহুযুগের ভক্তসাধকের কণ্ঠধরে প্রাণবান হইয়া আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে।

পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সখস্ব স্বত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন;

“মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন ;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম ;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম ।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয় ।”

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাস্ত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

“রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।

আমার মানসে বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।”

এই সব তত্ত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কণ্ঠক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির

সম্বন্ধে কিঞ্চিদন্তী আছে যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন :—

“ফুলের বনে কে চুকেছেরে সোণার জহরি
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।”

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাউলার সেই শ্রেণীর হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি তাহাদের গান কতকগুলি আমার লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় দেখি তাহারা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল; শেষে যখন ভরসা করিয়া লিখিল, আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও অক্ষরবিন্যাস এমনই অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী। কিন্তু এই সব কবি-বাউলদের সাধন পদ্ধতি মানবদেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দূরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে; আমার পথের ধারের জানালা হইতে একটি গান বহুকাল পূর্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে।

“খাচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।”

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা শেলীর সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুর্ভাগিনী হইলেও যেসকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং এই অজাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্য সঙ্গীত সেই অজানা পাখীর ডানার ছন্দে মুগ্ধিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকণ্ঠে শিক্ষিত লোকের জন্ম-আর এই বাউল গান গ্রামের চাষী ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি-বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না।

একটি কারণে এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে ; লোকশিক্ষার যে আশ্চর্য্য প্রণালী বহুকাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে ; কিন্তু তাহা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তনগুলিতে দলে দলে ছাত্রগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও আধ্যাপকের চারিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষা-সত্রগুলি গভীর ও স্থিরসলিল হ্রদের মত ; সেখানে আসিতে হইলে দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু সেই সব জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হইয়া যে সব মেঘ জন্মিত, তাহা বায়ুতরে কত প্রান্তর পর্কিত উপত্যকার উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কত গীতিনাট্য, কথক-শিল্পীর মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের মুখে লোকসাহিত্যের কত অমূল্য গীতসম্পদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত ; এবং এই মেঘপুঞ্জই ত জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে সুসিক্ত ও উষ্ণ করিয়া তুলিত এবং যে সমস্ত তত্ত্ব মূলতঃ অতি কঠিন তাহা সাধারণগণ্য করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদ গুলি লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণের ফসল কলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের অভাবে কোন দিনই সেই তত্ত্ববিদ্যার মূল উৎসে যাইতে পারিত না, তাহাদেরও গৃহধারে সেই তত্ত্বগুলিকে উপস্থিত করিত।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা জটিল কর্মভার বহিবার জন্ত এক দল লোককে বাস্তব অভাবাদি দূর করিবার ভার লইতে হয়। সে দায়িত্ব যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা এড়ান চলে না। সুতরাং এই সব মানুষদের পক্ষে মানসিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ হয় না। এই ভাবে বিরাট জনসম্মুখ পথ উৎপাদনের চাপে লুপ্তচেতন যন্ত্রমাত্রে পর্যাবসিত হয় বলিয়াই কয়েক জন মানুষ বড় ভাব ও অমর শিল্পরূপের স্ফূরণ করে এবং বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্তম শিখরে লইয়া যায়।

সমাজের জন্ত এই যে সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভারত কোন দিন উপেক্ষা করে নাই ; তাঁহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের

উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে এবং সহজ কর্তব্য-বোধেই তাহা করিয়াছে। কোন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় নাই ; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। এই জন্তই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি চলিতেছে।

এক সময় আমি বাঙলার একটি সামান্ত গ্রামে যাই। সেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীরা আমার জন্ত একটি যাত্রা গানের পালা অভিনয় করে। সে নাট্যের আখ্যানবস্তু একটি লুপ্তপ্রায় ধর্মপন্থীদের শাস্ত্র হইতে আহরিত, একদা সেই ধর্মের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। সে ধর্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী জনসাধারণের নিকট ইহার নিজস্ব তত্ত্বটি প্রচার করিতেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কারে সেই লোকেরা ভিন্ন হইলেও সে বাণী শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাট্যটি মানবস্বরূপের বিভিন্ন উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্মা লইয়া বিচার করিয়া চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশে একটি মানুষের ইতিহাস বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুঞ্জ বৃন্দাবনে যাইতে চায় কিন্তু এক প্রহরী পথরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তম্ভিত হইয়া মানুষটি প্রহরী করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া দিল, যেহেতু ঘাত্মীটি তাহার গাজাবরণের মধ্যে অতি সজোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধপণ্য হিসাবে বৃন্দাবনে আমদানি করিতে উদ্যত ; অহং বস্তুটি যে মালিকের, তাহার নিজের নয়, সেটা সে স্বীকার করে নাই ! সেই বমালগুহু ধরা পড়ায় অপরাধীর নিকট তার কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাঁশের উপর ছিন্ন সামিয়ানা খাটাইয়া, ধোঁয়াটে কেরোসিনের আলোয় গ্রামের লোক ভিড় করিয়া শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্র হইতে শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রাজি প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ঔৎসুক্যের অন্ত

নাই। তাহারা নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং আপাত-বিসদৃশ নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসের আবেষ্টনে মানব-জীবনের অনেক চরম সমস্যা ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যান চলিতেছে।

এই উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যাইবে, ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে। সে পূর্ণতার অর্থ কি? ইহার অর্থ সত্যের মধ্যে মুক্ত, তাহার জগৎ এই প্রার্থনা জাগিয়াছে—
অসত্যো না সদৃশময়—কারণ যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ।

আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। চিত্তের মুক্তিপথ দিয়া সত্যের আনন্দ আমাদের দান করাই সমস্ত শিল্পের মূল প্রকৃতি। সেই সম্বন্ধটি মনে রাখিয়া যখন আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (aesthetics) কথা বলি, তখন সৌন্দর্য্যের সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়িয়া তাহাতে কবিগণ যে গভীরতর তাৎপর্য্য দিয়াছেন সেই কথাই ভাবি: “সত্যই সূন্দর এবং সূন্দরই সত্য।” চিত্র-শিল্পী একটি জরাজীর্ণ মানুষের ছবি আঁকিলেন; ইহা দেখিতে শোভন নয়, তথাপি তার সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে এখন আমরা তাহার সত্য মূর্ত্তি গভীর ভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙ্-এর কবিতায় ঈধাউনস্ত যে নারীটি বিষ প্রস্তুত হইতে দেখিতেছে এবং সেই বস তাহার প্রেমজ্জ্বল পাত্রটিকে কি ভাবে জর্জর করিবে তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে—এ-হেন নারীর মনকে সূন্দর বলা যায় না। কিন্তু যখন এই নারীর ছবিটি পরিকল্পন ও রূপসুন্দরের সুসঙ্গতিতে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠে, তখন আমরা এই ছবিও উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে মধ্যে মধ্যে যে নাচতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দরুন শিল্পসঙ্গতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতটা পাই, কেবল মাত্র অবিমিশ্র ঔদার্য্যের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণতাটি নানা বিসংবাদী রসের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিত্রটি

আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়া নহে, সৃষ্টির ছন্দে স্নানিদ্ধিষ্ট বলিয়া।

জীবনে যাহা আমাদের মিলে না তাহা শিল্পের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা উপভোগ করি বলিয়াই যে শিল্পের এত মূল্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শিল্পের আসল মূল্য এই-খানে যে তাহার বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইহা আমাদের সঙ্গে সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই শিল্প সৃষ্টিগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে ছবল মিলিয়া যাইবার দরকার নাই, তাহারা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের জগতে আমাদের চেতনা ও অনুভূতি স্বার্থবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়াই আমরা ঐক্য ও সঙ্গতির একটি অপ্রতিহত স্বপ্নরূপ উপভোগ কবি; পূর্বসত্যের মানসীপ্রতিমা বলিয়াই তাহা চিরস্থান আনন্দের উৎস।

শিল্পীর জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই; সৃষ্টির উৎস ও চরম লক্ষ্য যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ করিতে হইলে অহমের কবল হইতে মুক্ত হওয়া চাই। সেই মুক্তির প্রতীকায় আমাদের আত্মা উন্মূগ হইয়া আছে। এবং তাহার যে ভূমিত আমরা আপাত সত্যের মৃগতৃষ্ণকার পিচ্চনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের ঐক্যলোকে মুক্তিদিবার জগৎ কন্দন করিতেছে। এই মুক্তির আদর্শটি আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহা ভারতের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত করিয়া দিব্য লোকের পানে ছুটাইয়াছে; কাব্য পক্ষপুটে ভর করিয়া আমাদের আত্মা উর্দ্ধে উড়িয়া যায়। সহজবিশ্বাসী তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তি-দায়িনী তারাকে নিবেদন করিয়া গাহিতেছে—

“তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।”

আমাদের দেশের এই সব সাধারণ মানুষ সত্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সঙ্গ সঙ্কস্ত; বস্তু-জগতের ফেন-পুঞ্জের মধ্যে একটানা ডাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার তরঙ্গভঞ্জে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়া, জীবনের কোন চরম

লক্ষ্য ঋজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় তাহাদের আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান হাটে গাড়ী হাঁকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা যে সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেখানে কোন সন্দেহ নাই। সেটি এই যে, সমস্ত দুঃখের কারণ জীবনের আসবাব-পত্রের অভাব নয়, জীবনের সত্য তাৎপর্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব। এষ্ট জন্তাই দেখি যে “আমি ও আমার” এই ভাবটার উপর অঘটা ছোর দিলেই আমাদের দেশের লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ ‘আমি ও আমার’ উগ্রবোধটা সত্যের পরিপ্রেক্ষণকে অলৌকিক করিয়া তোলে। তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত সম্বল পিছনে ফেলিয়া দিয়া সত্যের অভিসারে বাহির হইয়াছে কত মানুষ, তাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ সাধারণের উপরে বায় না।

এই সকল দুর্গমপথ-যাত্রীদের যে পার্থিব শক্তি সম্পদ বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে। তাহারা হয়ত এমন মানুষকে দেখিয়াছে, যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং গ্রামে তাহাদের সঙ্গে এক ব্যবসায়লিপ্ত। সে তাহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, তবু তাহার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে সে একজন মুক্তজীব—শাস্ত্র পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রয় পাইয়াছে। এমন একটি মানুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল; সে একটি জেলে, সারাদিন গাছ মাছ ধরিয়া ফেরে আর তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যায়; একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিভরে দেখাইয়া বলিল, উনি মুক্তপুরুষ। সমাজ মানুষের উপর যে মামুলী মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে; বাজার দর অনুসারে দোকানে সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যে ভাবে সাজায়, তার কোন কোটায় এ লোকটি পড়ে না।

এই জেলেটির মুখ যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা

জীবন দিয়া রচনা করিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা হয়ত নিতান্ত কম নয়—যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও দেখিব না। এই সব অবিকৃত আত্মা সামান্য চাষাভূষা জানে যে, সম্রাট তাহার সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র; লক্ষপাত তাহার কর্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু ঐ সামান্য জেলেটি জ্যোতিলোককে মুক্ত পাইয়াছে।

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন কোন একটি জিনিষে ঠোকর খাইয়া সেষ্টটিকে আঁকড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদের একমাত্র আশা ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্তু যখন আলোকের প্রকাশ হয়, তখন ঐ সমস্ত টুকরা টুকরা বস্তুকে ছাড়িয়া দিই। কারণ দেখি যে জুয়ার সঙ্গে আমরা সকলে সম্বন্ধযুক্ত, বস্তুগুলি ও তার অংশমাত্র। গ্রামের সামান্য লোকেরা জানে মুক্তি কি জিনিষ—অহমের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যাগ্র অধিকার বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদলিপ্সা হইতে মুক্তি। তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নহ—মুক্তি আছে আন্তিক্যবোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিস্তৃত আনন্দের প্রাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান উঠে :

“যে জন ডুবল সখী তার কি আছে বাকি গো।”

তাই ত ইহারা গাহিয়া থাকে :

“মনরে আমার মনের সাথে মিলিবি যদি আয়
দুই মনেতে এক মন হয়ে আন্ধব সহর চলে যাই।”

এক মন আমারে বাহিরে এই বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু ঋজিয়া ফেরে আর এক মন ভিতরে ঐক্যের স্বপ্নমূর্তির সন্ধানে ছোট্টে—এই দুই মনের মধ্যে দ্বন্দ্বটি যখন মিটিয়া যায়, তখনই আমরা ‘আজব’কে, অনির্বাচনীয়কে উপলব্ধি করি। কবীরও এই সত্যটির প্রচার করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম কেবল মাত্র অস্তরের অধ্যাত্ম লোকে বাস করেন ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তুলোকের অপমান করা হয় এবং যখন তাঁহাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দেশ করি তখনও সত্য বলি না।

এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত, স্মৃতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। আমাদের দৈনিক আরাধনা ও ধ্যানের মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে যাশাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় যিনি অর্থেতম্ বলিয়াই অনন্তম্। গভীর তত্ত্বজ্ঞান বাস্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিন্তে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অহুষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দিতেছে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাইতে; কারণ এখানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে বিদেশী সঙ্গীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্তু স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমরা তাহাদের ঐক্যটিকে সঙ্গীতরূপে পাই; তেমনি অস্বহীন বহু যেখানে এককে প্রকাশ করে, সেই সর্বভূতের অন্তরতম সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে।

এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যভাসে নাই; সেইজন্ত ফলপ্রাপ্তর লোভ তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার পথ কাটিয়া বসে। তাহা ঠিক পথ নহে, একজন নগণ্য গ্রাম্য কবি, যাহাকে বিশ্বের মান্তগণ্য লোকেরা বেহ জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ তাহার ছাঁচেঢালা শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি গানের ভিতর দিয়া ঐ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

“নিষ্ঠুর গরজী,

তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আশ্রনে ?

তুই ফুট ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।

দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাই,

সে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়া ছড়া নাই।

তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড ;

এর আছে কোন্ উপায় ?

কয় সে মদন, দিসনে বেদন, শোন নিবেদন,

সেই শ্রীশঙ্কর মনে,

সহজ ধারা আপন হারা তাঁর বাণী শোনে,

রে গরজী।”

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তি লাভের কোন বাহ্য উপায় নাই। অন্তরের সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ

করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়। বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই কেলা গড়িয়া বসিয়াছে। তাহা বর্হিজগতে নাই। বন্ধন রহিয়াছে আমাদের চৈতন্যের নিশ্চিন্ততা, আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সঙ্কীর্ণতা এবং সর্বত্র আমাদের স্থায়ী মূল্য নির্ধারণের ভ্রমে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্তমান সভ্যতার মধ্যে; এই সভ্যতা এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় চালিত; এই যে দুর্দমনীয় গতিবেগের অক্ষশক্তি (inertia), যাহা কোথায় কেমন করিয়া পার্মিতে হয় তাহা জানে না—এই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া মানুষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্কের জাতি মাছুষের মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্ঘে তাহাদের গাণিতিক উন্নততা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া আর শ্রাস্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন তাহাদিগকে একটা অস্বহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া ছুটিতে থাকে। এই বৌভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ স্বাধীনতা তাহা ঘৃণ্যতম বন্ধনেরই নামান্তর। ইহাদের এই নিষ্ঠুর দাবীর তাড়না কেবল বাড়িয়াই চলে, কারণ যে বস্তু তাহাদের লক্ষ্য ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কেবল মাত্র গতিবেগকে বাড়াইয়া, তামসিক ভোগের আড়ম্বর ও আস্বাব পর্ত্তপ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার যাবতীয় উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা বিপুল করিয়া তুলিয়া, যাহা মহান, যাহা বিরাট্ তাহার একটা কাণ্ডজ্ঞান-হীন কদর্য পরিহাসোৎসব মাত্র করিতেছি। বন্ধনের শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দাবীর তাড়না সমস্ত পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে দেখি, যে, জন্মগত একটি শাস্তি হইতে নিস্তার লাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিচার অজ্ঞানের অন্ধকারা হইতে, যে অবিদ্যা অহমকেই চরম বলিয়া মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজা আমাদিগকে

এই অবিদ্যা হইতে মুক্তি দিবে তাহা শূন্যগর্ভ নহে। শূন্যতায় মুক্তি নাই। যে অবাধ সুসঙ্গত গতিবিধির ভিতর দিয়া আমরা আমাদের এই আবেষ্টন—এই পার্শ্ববর্তী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইতে হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্য নিঃফল নিঃসঙ্গতা নহে, সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি—ইহাই ত উপনিষদের কথা—সর্বভূতে যিনি নিজের আত্মাকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার কাছে সত্য আর অপ্ৰকাশ থাকেন না।

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য। শুধু তাহা তাহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক দুর্কোধ্য মুক্তিহীন খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন এক অজ্ঞেয় রিজাতীয় লোকে বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে যে আমাদের স্বরাজের স্থান আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই জগতের চালচলনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্তে সেই মিলনের সেই সঙ্গতির মধ্যেই যে ঐক্য ও মুক্তি দেখা দিল। অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের অটনৈক্য ঘটায়। এবং বিদ্যা যাহা বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই ত বাস্তবজগতের মর্মস্থলের ঐক্যটিকে ধরাইয়া দেয়—অদ্বৈতমূকে চিনাইয়া দেয়।

জগতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যাহারা বাড়াইয়াছে, যাহারা জানে না যে, জ্ঞানের দাবীতে এই জগত তাহাদেরই, সেই সব মানুষ কাপুরুষতায় কায়েমী শিকারী লাভ করিয়াছে। যে নিয়তি অসন্ধিভাবে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই—সেই নিয়তির উপরই আশাহতদের আস্থা। এমন-কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও যখন তাহারা বঞ্চিত হয় তখনও তাহারা বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যেন তাহারা জন্ম হইতেই আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্বদাই তাহাদের উপর দুর্কোধ্য দুর্ঘটনার উপজব চাপাইবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পর-ভাব এবং অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। মিলনের গ্রন্থ-

গুলির উপর অবরুদ্ধ চলিতেছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বন্ধের অর্থই হইতেছে অপরের প্রতি দাখিল-বোধ। কিন্তু হেয়ালীর মত শুনাইলেও ইহা সত্য, যে, জীবজগতে অস্ত্রোত্তর সম্বন্ধ বোধটি পূর্ণ করিয়া সুসঙ্গত করিয়া পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশে কোন দায়িত্বই স্বীকার না করা কেবল মাত্র বর্করদের পক্ষেই সম্ভব এবং সেই জন্তই বর্করদের পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। যে আগুন ভাল করিয়া জ্বলে নাই সুতরাং ধূমজালেই আচ্ছন্ন, সেই আগুনের মতই বর্করগণ চাপা পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই নিকোপিতপ্রায় তমসচ্ছন্ন জীবনের কারাবাস হইতে তাহারা মুক্তি পায়, যাহারা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে ও এক ছোটে কাজ করিতে সমর্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসম্বন্ধের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

এই সর্বোচ্চ মুক্তির পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির বা দলের স্বার্থপরতা। বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যত দূর সম্ভব সাহায্য করাই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোন রকম স্বার্থপরতা অবাধে সমাজের মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, তখন সভ্যতার মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। কারণ, গ্রাস করিবার লোভ এবং সৃষ্টি করিবার জীবন্ত শক্তি পরস্পরবিবোধী। জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কারণ প্রাণ কেবল বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা অন্তর-জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তুর সীমা ছাড়াইয়া যায়—উপাদানের ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথচ নিজের সত্য সীমাটি মানিয়া চলে। প্রাণের প্রাচুর্যে তাহার বৃদ্ধি ও সঙ্গতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং উপায়, বর্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে ঐক্য লাভ করে।

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। ইহার বস্তু এবং শক্তি, কর্ম এবং সত্তা নিগূঢ় ভাবে একীভূত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের জড় উপাদান যখন ওজন ছাড়াইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র

এবং সঞ্চয়ের স্তূপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। প্রাণনদীর স্রোতটি কীণ হইয়া হটিয়া বাওয়ায় যে খাদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা আবেশ্রাম ধন বর্ষণে পূর্ণ করিতে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন ভরাট করিতে পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্ত বস্তুস্তূপের চোরাবালির চাকচিক্য বিপদজনক ফাটলগুলিকে শুধু লুকাইয়া রাখে। কিন্তু একদিন যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে হঠাৎ সব তলহইয়া যায়।

কিন্তু আসল দুর্দৈব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক অল্পবেগের বিনাশে, নহে। মানুষ তাহার আবেষ্টনকে তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব করিয়া সৃষ্টিধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সুযোগধর্মী ছুরাকাজ্ঞার বশে সেই মানুষেই আবার নিম্মম লোভের দাস হইয়া সমস্ত জগৎকে বিকৃত ও কদর্য করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রজগতের বেসুরো আর্ন্তনাদ ও কলের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রকৃতির উপর বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্বদা এমন একটি বিশ্ব-সংস্থানের দ্যোতনা করিতেছে যাহা সম্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। এহেন জগতে মুক্তির অবকাশ নাই; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের চাপে তাহা নিরেট হইয়া গিয়াছে। শুধু খাঁচাটাই সর্বস্ব, তাহার বাহিরে আকাশ নাই। তাই জগৎটা সর্বতোভাবে একটা বদ্ধ জগৎ; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত বন্দী। কিন্তু বীজের মঞ্চস্থলে তখনও প্রাণ কাঁদিতেছে মুক্তির জন্ত তাহার সম্ভাবনা পর্যাপ্ত ও যখন মৌন অঙ্ককারে আচ্ছন্ন। মুক্তির জন্ত এই জীবন্ত পিপাসাকে যখন কোন একটা বিরাট লোভ পদদাঁলিত করিয়া শুরু করিয়া দেয়, তখন ক্ষুণ্ণশক্তিহীন বীজের মত মানব সভ্যতা মরিয়া যায়।

ভারতের মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের কর্তব্য শতায়ু হইয়া কর্ম করা। কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিষ্ক্রিয় আদর্শ এবং তাহার বিকাশের সক্রিয় পদ্ধতির মিলন করা চাই,

অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই; ইহাতেই পূর্ণ সত্য। সুতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অল্পসরণ করে, তাহারা গভীরতর অঙ্ককারে পতিত হয়; তাহাদের তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর। পরিবর্তনশীল কতকগুলি স্বরের দমষ্টিতেই অপরিবর্তনীয় সঙ্গীতের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় নিকোঁধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সঙ্গীতে স্বরের কোন বালাই নাই, তাহার নিকরুঁদ্বিতা ততোধিক। কিন্তু সমন্বয় কোথায়? তুরাধর্ষ্মা (Transcendental) সঙ্গীত কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের বাহন করিয়া লয়? ইহার সৃষ্টির পর্কে পর্কে যে ছন্দ, যে সীমা দেখা দেয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। সসীমের পন্থা অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ করি। এই কথাই ঈশোপনিষৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

“বিদ্যাংগাংবিদ্যাং যশ্বেদোভয়ং সহ

আবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্থা বিদ্যায়াহমৃতমশ্ৰুতে।”

সীমার ছন্দেই আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। অমৃতত্ব মাত্র এই বাহ্য জীবনের প্রসারমাত্র নহে—ইহা পূর্ণতার সিদ্ধি, ইহা জীবনের স্বস্বভূত সুন্দর সীমানির্দেশ; প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমাকে প্রকাশ করে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ আছে, মা গৃধঃ; লোভ করিও না। কিন্তু কেন করিব না? কারণ লোভ সীমার মর্যাদা রক্ষা করে না বলিয়া জীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে; সেই ছন্দের ভিতর দিয়াই যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন।

আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও ‘অহম্’কে অতিশ্রীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম হইতে লুপ্ত হইয়াছি বলিয়াই আমরা জীবনের সৌন্দর্য্যসংস্কৃতও হারাইতেছি। অলৌকিক কবির মত আমরা বাক্যাতুর্ধ্যাকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে

ছন্দোবদ্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতির রহস্যসংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শ জীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের বর্ষপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি সৃষ্টির প্রেরণা—একটি গভীর আন্তরিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিও না, আপন সীমাটি চিনিয়া লও। সুসঙ্গত সৌখ্যের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাঁজা গাঁড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়াছে, এবং চূর্ণইটের গুঁড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। সেই জগত্ই এক ছন্দগীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দাপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।

ছন্দেই সৃষ্টি; ছন্দেই বিদ্যা ও অবিদ্যার সীমা ও অসীমের মিলনভূমি। অরূপের বন্ধ হইতে শতদলটি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল জানি না। অস্পষ্টতার গভে যতদিন ইহা লুকাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার কোন তাৎপর্যই ছিল না, তবু কোথাও সেই পদ্যটি ছিল ত। কোন ছরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া অপূর্ণ ছন্দসীমায় ইহা ধরা দিল, আমাদের চেতনায় একটি নূতন আবর্ত জাগাইল! অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম, তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্তার সর্বোপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দেশ করা; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান। জড়-বস্তুর উপাসনায় অসীম অর্জিত। তাহা ক্রমবর্দ্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চিরঅন্ধকারে আবৃত, অন্ধন তমসাবৃত; এখানে আছে শুধু মুক বস্তুর পিণ্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকে চায় না; সত্যকে চায়, আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাণ্ড নয় জ্যোতির্কণ্ঠ; মানুষ অমৃতকে চায়, কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাস্ত গৌরবে।

মুক্তির অঙ্গুর্য্যকের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া

উঠিয়াছে। সে লোকে বন্ধ আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে। একটি পাণ্ডায় ভর করিয়া পাখী আকাশে উড়িতে গিয়া বাতাসের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করে—কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল। খণ্ড সত্যমাত্রই পাপ। খণ্ড সত্য মানুষকে পীড়া দেয়; কারণ তাহা যাহা দিতে পারে না আভাসে তাহারই কথা মনে জাগায়। মৃত্যু আমাদের পীড়া দেয় না, কিন্তু রোগ যন্ত্রণা দেয়, কারণ রোগ কেবলই স্বাস্থ্যকে স্বরণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়িয়া রাখে। অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ; কারণ যেখানে জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ, সেখানেও তাহা পূর্ণতার ভাণ করে, শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্তু প্রাণ-রস হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখে। সত্য, খণ্ডিত থাকিয়া যায় বলিয়া, তাহার বিকাশযন্ত্রটির পূর্নাবর্তন হয় না বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে এত দুর্দৈব।

শত বৎসরের পুরাতন একটি বাউলের গান শুনাইয়া আমি আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। এই গানে কবি অনন্তের সহিত সান্ত জীবাত্মার চিরন্তন মিলন বন্ধনের কথা গাহিয়াছেন; এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর সম্বন্ধেই সত্য সম্পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বদ্ধতা ও শূন্যতামাত্র। অবিমিশ্র বিদ্যাতেও সত্য নাই, অবিদ্যাতেও নাই, দুইয়ের মিলনেই সত্যের প্রকাশ—উপনিষদের এই কথায় যাহা পাই, এই গানটিতেও আমরা সেই ভাবটি উপলব্ধি করি।

“হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।

তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।

ফুটে ফুটে কমল ফুটায় না হয় শেষ,

এই কমলেঃ যে-এক মধুরস যে তা'র বিশেষ।

ছেড়ে যেতে লোভী লম্বা পারে না যে তাই।

তাই তুমি ও বাঁধা, আমিও বাঁধা,

মুক্তি কোথাও নাই।”*

* এই অভিভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।



দামাস্কাস হত্যাকাণ্ড—

কিছুকাল পূর্বে দামাস্কাস মহরে করাসীগণ এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল, তাহার কথা সংবাদপত্র বাহারা পাঠ করেন, তাহার সকলে জানেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সত্য এবং অসত্য, উত্তম ভগ্নতের লোকে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। একটি অতি সত্য এবং এবল পরাক্রান্ত খৃষ্টানজাতি এই হত্যাকাণ্ড-অভিনয়ের অভিনেতা হইলেও খৃষ্টান জাতিরাও ইহাতে বাহবা দিতে পারে নাই।

বলিতেছেন যে, “জার্মানদের রিম্‌সের উপর গোলাবর্ষণের ভক্ত আমরা এখনও চুঃখ করিতেছি, কিন্তু অপরদিকে দামাস্কাস মহর ভয়ঙ্কর পৰিণত হইয়াছে—তাহার উপর আগুনের খেলা চলিয়াছে।” যে লোকায়নো-সন্ধির এত জয়গান চলিতেছে, সেই লোকায়নো-সন্ধি-বৈঠক বসিবার দুইদিন পরেই এই কসাইএর কাণ্ড অনুষ্ঠান হয়। *St. Paul Pioneer Press* নামক পত্রিকা বলেন যে “ইহা এক অকৃত রহস্যের কথা যে করাসীগণ সভ্যতা” দোহাই দিয়া এই বিবম নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছেন।”



দামাস্কাস মহরের দৃশ্য

দামাস্কাস মহর পৃথিবীর একটি পুরাতন সভ্য মহর। ইহার বয়স কত তাহা অসুমান করা শক্ত ব্যাপার। করাসী কামানের গোলা এবং করাসী এরোমেনের বোমা এই অতি প্রাচীন মহরকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীর একটি আদি সভ্যতার নিদর্শন কত শত মন্দির এবং অট্টালিকা যে ভাঙিয়া-চুরিয়া মাটিতে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গত ১৮ই অক্টোবর—রবিবার রাত্রিকালে এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং মঙ্গলবার বৈকাল পর্যন্ত এই অতিনিষ্ঠুর খেলা চলিতে থাকে। রবিবার খৃষ্টানদের বিশেষ উপাসনা-দিবস, এইজন্যই বোধ হয় করাসীরা বিশেষ করিয়া রবিবার রাত্রেই এই পবিত্রকার্য আরম্ভ করে। একজন দর্শক বলেন ‘দামাস্কাসের সমস্ত পথ-ঘাট স্তম্ভদেহে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমার মনে হয় অন্ততঃ ২০০০ আবালবৃদ্ধবনিতা ভয়ঙ্কর তলার চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। আমেরিকান ধবরের কাগজ-ওয়ারা এই হত্যাকাণ্ডকে কেহ বা “murder in Damascus” (দামাস্কাসের হত্যাকাণ্ড), কেহ বা “Butchery in Damascus” (দামাস্কাসে কসাইয়ের কাণ্ড), কেহ বা “দামাস্কাসে করাসী কসাইয়ের কাণ্ড”— বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। *Richmond Times Dispatch* কাগজ বলেন যে “করাসীগণ তাহাদের এই সামান্য গোলাবর্ষণে যে প্রচণ্ড ক্ষতি করিল, তাহা হাজার শাস্তি-সন্ধি এবং ধর্ম-প্রচারক একশত বৎসরের অক্রান্ত চেঁচাতেও পূরণ করিতে পারিলে না।” আর-একখানি কাগজ

League of Nations এই অতিসভ্য করাসীদের সিরিয়া প্রদেশে স্থপাসন প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছে। করাসীদের এই হত্যাকাণ্ড এতদূর ভয়ানক হইয়াছে যে, আলিয়ানওয়ারালাবাপ-হত্যাকাণ্ডেও অবিচলিত *London Times* এই হত্যাকাণ্ড-সম্বন্ধে বলিতেছেন, “grotesque imitation of the barbarities of primitive peoples.”

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া বাইবার পর করাসীগণ বাইশ জন নিহত ব্যক্তির স্তম্ভদেহগুলিকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমস্ত মহরময় ঘোরায়। পুরাকালে অসভ্যগণ এইপ্রকার করিত বলিয়া শুনা যায়, তাহাও উপকথার। যুদ্ধের সময় জার্মানদের যে-সমস্ত কাণ্ডকে করাসীগণ প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করে, করাসীগণ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে নিষ্ঠুর কাণ্ড শাস্তির সময়ে তাহাদেরই প্রজাদের উপর করিয়াছে।

এতবড় কাণ্ডের মূল অতি সামান্য। হাসান্‌ এল্‌ কারেথ্ (Hassan El Karreth) নামক একজন সর্দার হঠাৎ দামাস্কাসে তাহার দলবল লইয়া প্রবেশ করে (১৮ই অক্টোবর) এবং চাগুর (Chagour) নামক পাড়ায় প্রবেশ করিয়া সেখানকার লোকদের তাহা দলভুক্ত করিয়া লইয়া একটা করাসী থানা আক্রমণ করিয়া একজন করাসী অফিসারকে হত্যা করে। এই ধবর করাসী কর্তাদের কাছে পৌছাইবামাত্র করাসী সৈন্য এবং বিমান বাহিনী শত্রুদের আক্রমণ করে। মাটি এবং আকাশ উত্তর স্থান হইতেই প্রায় একই সময়ে সর্দারের দলকে আক্রমণ করা হয়। রবিবার

রাত্রি হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং মঙ্গলবার বৈকালবেলা তাহা স্থগিত হয়। এই গোলাবর্ষণের কালে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফুলের একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছে। একজন দর্শক বলেন যে “এই হত্যাকাণ্ড যে কতদূর অমানুষিক, তাহা মানুষের কল্পনাতীত। একদল বিক্রোহীকে (ফরাসী মতে) দমন করিবার জন্য মানুষ যে কেমন করিয়া জানিয়া-গুনিয়া হাজার-হাজার নিরীহ শিশু এবং নরনারী হত্যা করিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না।” এই দর্শকের মতে এত বড় হত্যাকাণ্ডে খৃষ্টানগণ একেবারেই নিহত হয় নাই—তাহারা গোলাগুলির বর্ষণ চাইতে রক্ষা পাইয়াছিল।



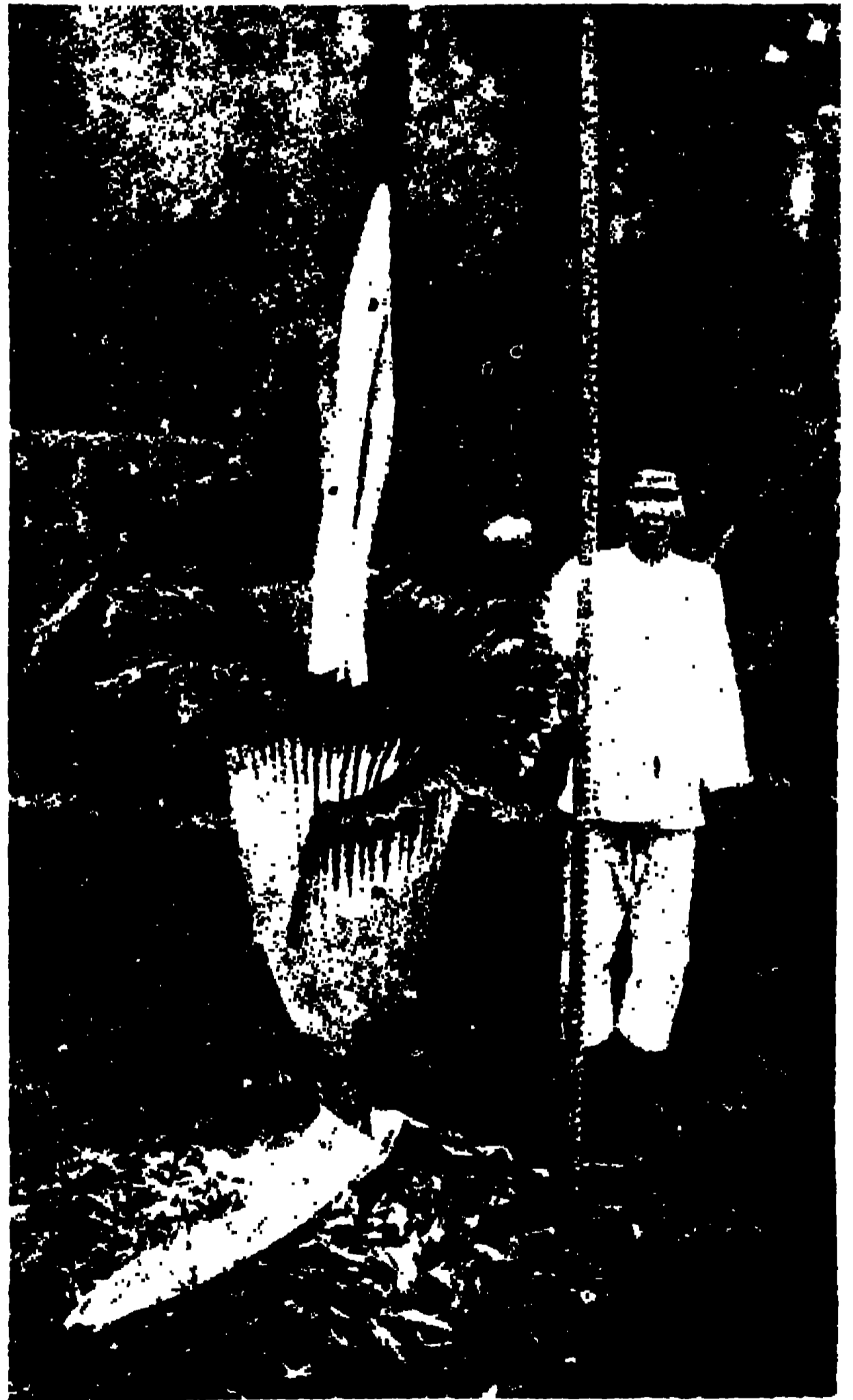
জেনারেল সারাইল

ফরাসীগণ অনেকে বলিতেছে, সহরের ঘর-বাড়ী, মন্দিরাদির ক্ষতির অধিকাংশের তত্ত্ব নাকি বিক্রোহীরাই দায়ী। নিরপেক্ষ জাতির লোকেরা কিন্তু কেহই এ-কথা বলিতেছে না। ফরাসীদের ইঙ্গাও ধারণা যে, দামাস্কাসে যদি সমরমত এই প্রকার গোলাবর্ষণ করা না হইত, তাহা হইলে সিরিয়ার আরো ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইত—অর্থাৎ কি না, দামাস্কাসের সামান্য গোলাবর্ষণ সমস্ত সিরিয়া-দেশকে অমঙ্গলের হাত চাইতে বাঁচাইয়াছে। আলিয়ানগণলাবায় হত্যাকাণ্ডের পর ঠিক এই প্রকার কথা জেনারেল ডায়ারও বলিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এত করিয়াও ফরাসীরা বিক্রোহ দমন করিতে পারে নাই। সিরিয়াতে বিক্রোহীদের সংখ্যা এবং প্রকোপ ক্রমশঃ বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পারীর একটি খবর হইতে জানা যায় যে, গোলাবর্ষণের সময় সিরিয়াতে দশ সহস্র ফরাসী সৈন্য ছিল। গোলাবর্ষণের পর আরো দশসহস্র প্রেরিত হইয়াছে। পারীর খবরে প্রকাশ যে ফ্রান্স মরক্কো এবং সিরিয়ার শাসন ভার লইবার পর তাহার ‘১৭,০০০ হাজার লোক হতাহত এবং ৩,০০০,০০০,০০০ ফ্রা খরচ হইয়াছে। মরক্কোতে তাহার ২,১৭৬ লোক হত এবং ৮,২২৭ জন আহত হইয়াছে। সিরিয়ার হতাহত সংখ্যা ৬,৩২৬। মরক্কোতে খরচ হইয়াছে ৯৫০,০০০,০০ ফ্রা—সিরিয়াতে হইয়াছে—২,০০০,০০০,০০০ ফ্রা।

হত্যাকাণ্ডের সময় জেনারেল সারাইল (Major General Maurice Paul Emmanuel Sarrail) সিরিয়ার সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সরাইবা লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফ্রান্সেও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে ‘কোম্পিরা’ গিয়াছে। লীগ অফ নেশন্স হইতে ফ্রান্সকে এই হত্যাকাণ্ডের জবাবদীর্ষি করিতে উলব করা হইয়াছে।

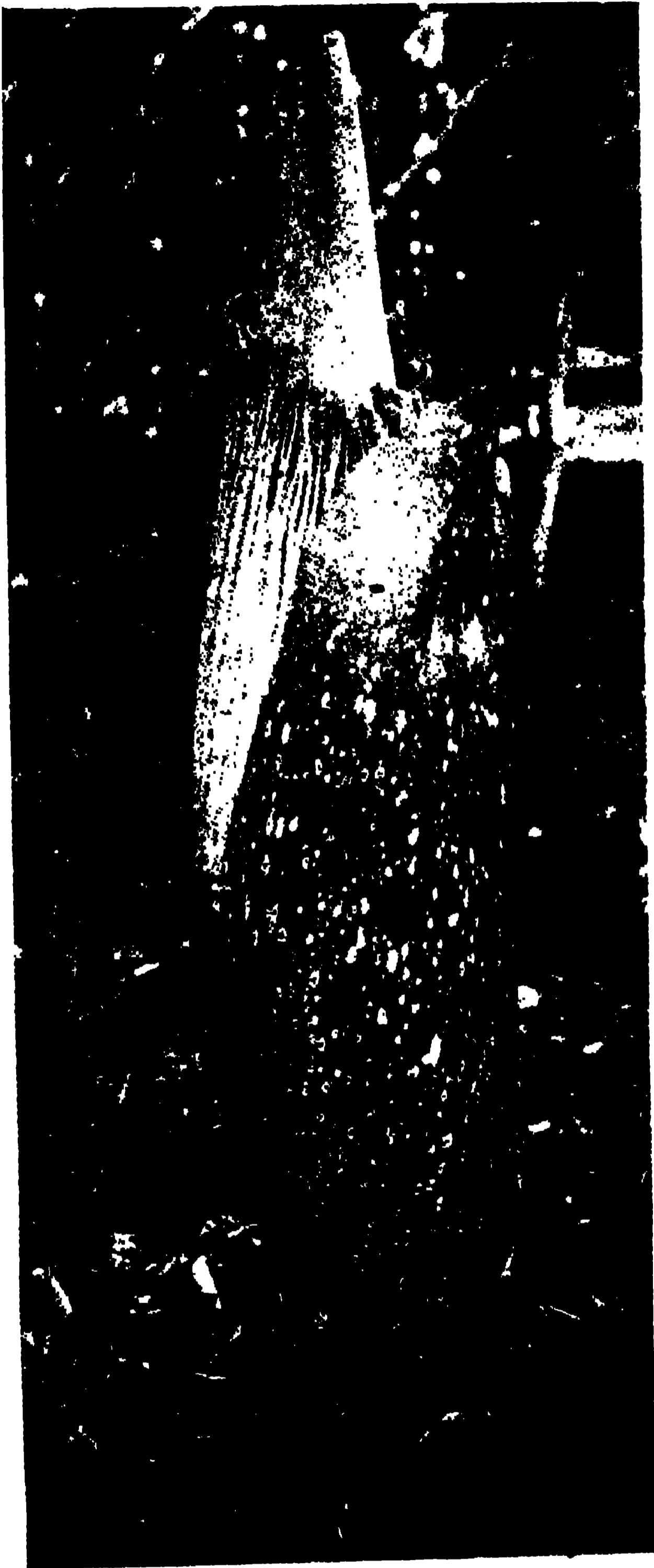
সকলের চেয়ে বড় ফুল—

পৃথিবীতে বড় বড় ফুল আছে, তাঁর মধ্যে সূমাত্রাঘীপের আমফ্রোক্যালাস্ টাইটেনাস্ সকলের চেয়ে বড়। ইহা ফুলটির লাতিন



পূর্ণবয়স্ক ফুল ৪৮ ফুট লম্বা (৩)

নাম। সূমাত্রাঘীপের ভাবার ইহার কি নাম জানি না। এই ফুলের যে ক’ড়িটির যে ছবি পণ্ডিত্য দেওয়া হইল, তাহা বাইশ দিন পরে মোটে উনিশ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল। আশে বার দিন পরে উহা চারি ফুট চারি ইঞ্চি উচু হয় এবং তখন ক’ড়িটি ফুটিয়াছিল। তৃতীয় ছবিটিতে চম্পাশিনের



৩৪ দিনের পরের অবস্থা—এখন ফুলটি ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা (২)

পূর্ণ প্রস্তুতিত ফুলটি দেখানো হইয়াছে। তখন ইহা আট ফুট ডুঁচু হইয়াছিল। পাতের মানুষটির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার বৃহৎ ও উচ্চতা-সম্বন্ধে ঠিক ধারণা হইবে। এই ফুলের পত্র ধারণা।



আমেরিক্যানাস টাইটেনাস ফুলের শৈশব —
২২ দিনের কঁড়ি—১৯ ইঞ্চি লম্বা (১)

তীর ধনুক ছোঁড়ার কথা—

রামায়ণ-মহাভারতে আমরা বহু গুণের বিবরণ পাই, সবই তীর-ধনুক



—এই চিত্রটি ১) কাম্বোজদেশে ২) ভারতবর্ষে ৩) আফগানিস্তানে প্রাপ্ত হইয়াছে।



আমেরিকার কলেজের নারীরা তাঁর হেঁড়া অভ্যাস করিতেছেন

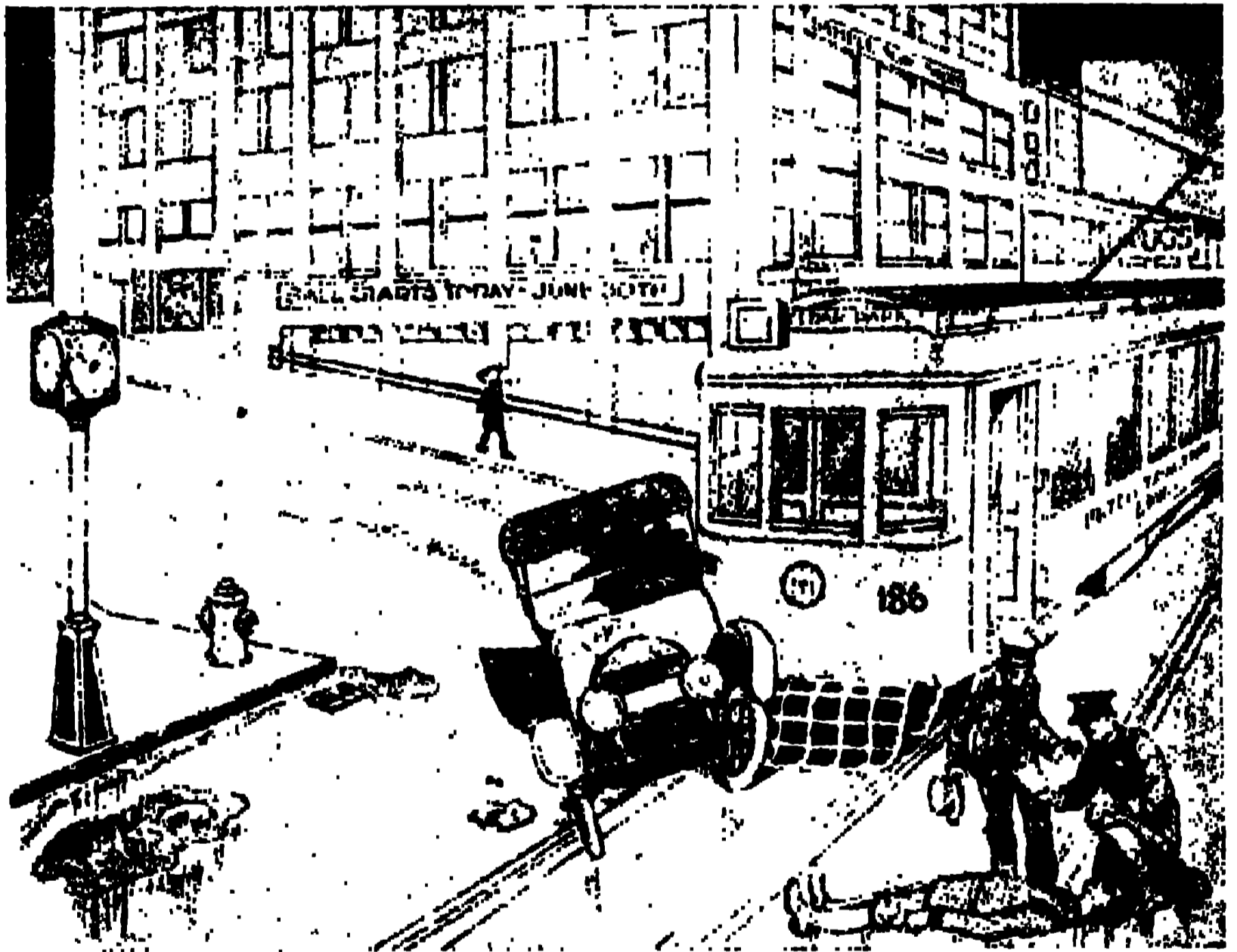
বা পদা লইয়া হইয়াছে। তখনকার দিনে বন্ধুকারি নামও কেহ জানিত না। ইয়ো-রোপেও কয়েক শত বৎসর পূর্বে তাঁর-ধনুক লইয়া অনেক লড়াই হইত—বন্ধুকের আবিষ্কার তখনও হয় নাই। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল, আদি জাতিরাই তাঁর-ধনুক লইয়া বনে-বনে নানা-প্রকার জীবজন্তু পক্ষী আদি শিকার করিয়া বেড়ায়। বর্তমানের যুদ্ধে তাঁর-ধনুক অকেজো হইয়া উঠিয়া গিয়াছে বন্ধুকও এখন আর বাইবার অবস্থায়। শুনা যাইতেছে, ভবিষ্যতে যে-সমস্ত লড়াই হইবে, তাহা নাকি রাসায়নিকের লড়াই হইবে। যুদ্ধ হইতে তাঁর-ধনুকের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও বর্তমান সময়ে ইয়োরোপে এবং আমেরিকার অনেকে সখ করিয়া ইহার অভ্যাস করিতেছেন। আমেরিকার নারীমহলে আজকাল তাঁর-ধনুক হেঁড়ার অভ্যাস অনেকে করিতেছেন। অবশ্য সকলেই সখ করিয়া তাঁর-ধনুক হেঁড়ার অভ্যাস করিতেছেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এখন ২০০০ তাঁর-ধনুক মহিলা আছেন। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যায়ামশিক্ষকের মতে নারীদের পক্ষে তাঁর-ধনুক হেঁড়া খুব ভালো ব্যায়ামের কাজ হইবে—বিশেষতঃ যেসকল মহিলাদের শরীর ফুটবল এবং হকি খেলিবার পক্ষে যোগ্য নয়, তাঁহাদের পক্ষে তাঁর-ধনুক হেঁড়াই প্রশস্ত ব্যায়াম। যুক্তরাষ্ট্রের নারী-কলেজসমূহে তাঁর-ধনুকের আদর খুব বেশী-পরিমাণে হইয়াছে।

পুলিসের স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা—

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন সহরে কোনো লোককে পুলিস

কর্ণচারীর পদ দিবার পূর্বে তাহাকে নানারকম করিয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগুলি খুব সহজ নহে। এইসঙ্গে একখানি ছবি দেওয়া হইল। ছবিটিতে দেখা যায় যে একটা মোটরকারেব সহিত একটা টাম গাড়ীর ঝাড়া লাগিয়াছে। একজন লোক চিংপাত হইয়া পড়িয়া আছে—ছুইজন লোক তাহাকে দেখিতেছে। রাস্তাটি ওয়াশিংটনের একটা বড় রাস্তা। ভাবী পুলিশম্যানকে ছবিটি তিন মিনিট দেখিতে দেওয়া হয়। এইসময় সে ছবির সম্বন্ধে বাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া লইতেও পারে। তাহার পর তাহাকে ছবি-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয় :—

- (১) কোন্ রাস্তা দিয়া মোটর-গাড়ীটা আসিতেছিল ?
- (২) টাম গাড়ীটার নম্বর কত



পুলিসম্যান পরীক্ষা করিবার ছবি

- (৩) কি দেখিয়া বুঝা যায় যে মোটর ড্রাইভার অসাবধান হইয়া গাড়ী চালাইতেছিল ?
- (৪) কোন্ লোকান বা বাড়ীর সামনে ছুর্খটনাটি হয় ?
- (৫) কয়জন লোক আহত হয় ? ইত্যাদি।

এইপ্রকারের ১০টি প্রশ্ন তাহাকে করা হয়। সমস্ত প্রশ্নগুলি ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে উত্তর করিতে চাইবে—এইসময় অবশ্য ছবি বা নোটবুক তাহার সামনে থাকিবে না। এই পরীক্ষাঘারা পুলিসম্যানের স্মৃতি এবং দৃষ্টি-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আর-একটি পরীক্ষা করা হয়। কোনো একটা মোটর গাড়ীর নম্বর তাহাকে মাত্র তিন সেকেন্ড দেখিতে দিয়া পরে সেই মোটর গাড়ীর নম্বর কত ছিল তাহা

লিখিতে বলা হয়। রাস্তার মত ভাঙের সময় অনেক সময় এই সময়ের মধ্যে অনেক মোটর গাড়ীর নথ্য পুলিশমান্যকে লিখিয়া রাখিতে হয়।

মোটর চালাইবার চাড়পত্র লইবার সময়ও মোটর ড্রাইভারদের নানা-প্রকার পরীক্ষা করা হয়। তাহার একটিঃ—মোটর চালককে ১০ খানি রাস্তার গাড়ী-ঘোড়াপূর্ণ-বিপজ্জনক-অবস্থায় ছবি দেখানো হয়। ছবি দেখা হইবার পর চালককে কোন রাস্তার কি বিপদ, কোন্‌খানে বিপদ এবং তাহা বাঁচাইবার উপায়ই বা কি—এইসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। কেবল গাড়ী ভালো করিয়া চালাইতে পারিলেই কাছাকেও অনুমতিপত্র দেওয়া হয় না।

পারস্যের রক্তহীন বিদ্রোহ—

পারস্যদেশে এক জন মুসোলিনির দাব হইয়াছে। ইহার নাম রেজা খাঁ পাহ্‌লেভি (Reza Khan Pahlavi)। ইনি পূর্বে পারস্য-দেশের রাজার প্রধান এবং সামরিক মন্ত্রী ছিলেন। সামান্ত সৈনিক হইতে



বাঁদিকে—পারস্যের ভূতপূর্ব শাহ ডানদিকে—পারস্যের বর্তমান শাসনকর্তা রেজা খাঁ

ইনি অসামান্ত মনমগ্নিত্তি এবং ক্ষমতার বলেই এত উন্নতি করিয়াছেন। পারস্যের জাশনাল এ্যাসেম্বলিতে, ৮-শোটির বিরুদ্ধে ৫ শোটে, কাজার বংশ এবং বর্তমান শাহকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করা হয়। পারস্য এবং পারস্যের বাহিরে ভূতপূর্ব শাহের জন্ত কেহই বিশেষ কোনো চুঃখ প্রকাশ করিতেছে না। তাঁহার এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্ত তাঁহারই দোষ সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। শাহ প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ক্রাসে গমন করেন এবং রাজ্য হইতে অল্প টাকা বিলাস-ভোগে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। শাহের ব্যবহারে পারস্যের লোকেরা ক্রমশঃ বিধ্ব ক্ষেপিয়া উঠিল এবং ভাটার চরম পরিণতি হইল শাহের সিংহাসন চ্যুতিতে। পারস্য-দেশের ভূতপূর্ব শাহ আহ্মদ সিরজা ইরোরোপের জুরার আড্ডায় তাঁহার রাজত্ব বিকাইয়াছেন। শাহের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯,০০০,০০০ টাকা। ইহা ছাড়া ভোগ এবং নৌকা-পাটিতে আরো ৩,০০০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। পারস্য দেশ হইতে এখন তিনি কিছু পেনসন এবং তাঁহার ১,২০০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি পাইবেন, এইপ্রকার স্থির হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্বে পারস্যদেশে, বলিতে গেলে ইংলণ্ড এবং রুশিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি অবস্থায় ছিল। তাঁহার পর রুশিয়ার গোলমালের সময় রেজা খাঁ স্বযোগ বুঝিয়া পারস্যে “মুসোলিনি” হইয়া উঠেন। পারস্য দেশে ভেলের খনি প্রচুর এবং ইহার মূল্য কোটি-কোটি টাকা।

পারস্য শক্তির প্রায় সকলেই পারস্যে ভেলের কিছু স্থবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা গত দুই বৎসর হইতে করিতেছে। ইহাদের মধ্যে রুশিয়া এবং ইংলণ্ডের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পারস্যের পরিমাণ ৬০০,০০০ বর্গ মাইল। সমগ্র পারস্য দেশে মাত্র ১০০ মাইল রেলপথ আছে। তের বছর পূর্বে পারস্য-দেশে ১ খানি মাত্র মোটরকার ছিল।

রেজা খাঁ অতি গণীত্বের সম্ভান। তাঁহার শিক্ষা খুব বেশী কিছু নাই। তাঁহার পিতা ছিলেন সাধারণ কৃষক। ১৯২১ সাল হইতেই রেজা খাঁই পারস্য-দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। রেজা খাঁ সৈন্তদলকে নতুন করিয়া গঠন করিয়াছেন। পারস্যের বর্তমান সৈন্ত সংখ্যা ৪০,০০০। সৈন্তদলের অনেক-প্রকার সংস্কার হইয়াছে। নানা-প্রকার বাজে উপাধি বর্জিত হইয়াছে। গুজনাতির এবং শাসন-ব্যয়ের নানা-প্রকার কুপ্রথা বর্জন করিয়া স্থিতিশাসনিক স্থপ্রথার চলন হইয়াছে। সিংহাসনে বসিয়াই রেজা খাঁ রাজনৈতিক বন্দাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। ভূতপূর্ব শাহকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজ-পরিবারের অন্তান্ত সকলের জন্তও পেন্সনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

টাইপরাইটারে আঁকা ছবি—

একজন দিনেমার চিত্রকর একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে ফল্যান্ডের একটি দৃশ্য আঁকিয়াছেন। টাইপরাইটারের সব-রকম অক্ষরই এই



টাইপরাইটারে আঁকা ছবি

আঁকিতে ব্যবহার করা হয়। নানা-প্রকার কারবার অক্ষরগুলি ঘোরে আস্তে, কম এবং বেশী করিয়া কেলিয়া এই ছবি আঁকা হয়। ছবিখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে, চিত্রকরের বাহাছুরি কতখানি ইহার মধ্যে আছে।



বাংলা

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া শ্রীহট্টবাসীগণ বাংলার সহিত মিলিত হইবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এতদিনে তাঁহাদের সেই বাকুল-বাসনা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে চলিল। গত ১১শতাব্দীতে আমাদের ব্যবহাপক-সভার শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভার গবর্ণমেন্টে সদস্যেরা নিরপেক্ষ ছিলেন। আমাদের মুসলমান মন্ত্রাও করেকজন মুসলমান সদস্য প্রধানত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্বরাষ্ট্রাঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান সদস্য এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া ছিলেন। সুখের কথা সভার প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এখন ভারত সরকার কি মীমাংসা করেন তাহা দেখা যাক। শ্রীহট্টের স্মার কাছাড়ের লোকেরাও বাঙ্গালী। কাছাড়কেও বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মরণ-পথে বাঙ্গালী—

নিম্নে বাংলার জন্ম-মৃত্যুর একটি হিসাব দেওয়া হইল।

জেলা	প্রতি হাজারে জন্মের হার।	প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার।	জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য।
বর্ধমান	২১'২	৫০'৫	২৯'৩
বীরভূম	২৩'৭	৬৩'৩	৩৯'৬
বাঁকুড়া	২৫	৩৬'৫	১১'৫
মেদিনীপুর	২৪'২	৪০'১	১৫'৯
কপলী	২১'৫	৩৬'১	১৪'৬
হাওড়া	২৭	৩৫'১	৮'১
২৪ পরগণা	২২'৫	৩৩'৪	১০'৯
নদীয়া	২৫'৬	৪০	১৭'৪
মুর্শিদাবাদ	২৮'৯	৪৭'৩	১৮'৪
বশোহর	২১	৩০'২	৯'২
খুলনা	২৭'৮	৪১'২	১৩'৪
রাঙ্গসাহী	৩২'৮	৪১'৫	৮'৫
দিনাজপুর	৩১'৬	৪৩'৭	১২'১
জলপাইগুড়ি	৩২'৪	৪৮'৪	১৬'০
দার্জিলিং	৩০	৪৮'৪	১৮'৪
রংপুর	৩২'৪	৩৩'৪	১
পাবনা	২৫'৭	৩৭'১	১১'৪
মালদহ	৩০'৫	৩৯	৮'৫
ময়মনসিং	২৭'৩	২৭'৭	৪
বরিশাল	২৯'৮	৩৪'৭	৪'৯
চট্টগ্রাম	৩০'৩	৪১'৪	১১'১
নোয়াখালী	৩২'৮	৩৩'৪	৬
ত্রিপুরা	২৭'৮	২৯'৪	১৬

— পরীবাণী।

ভারতীয় দার্শনিক মহাসভা—

গত ৪ঠা পৌষ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে মেসেট হলে ভারতীয় দার্শনিক মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লর্ড. লিটন সভার উদ্বোধন-কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার সভা—

গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট ইন্সটিটিউট হলে নিখিল-ভারত সমাজ সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীরা আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মূলধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভানেত্রী ও প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাদেবী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—

“আমি আমার দেশবাসী স্ত্রীপুরুষগণকে সমাজ-সংস্কার বঙ্গপরিষ্কার হইতে আহ্বান করিতেছি। আমি নতুন সম্রাট কাম্পো চাই—এস দেশসেবক, বিশ্বপ্রেমিক যুবক কর্মীগণ, বাহারা নৈরাশ্রয়কারে ভবিষ্যৎ এককায় দেখিতেছে, সেই রুগ্ন, ভাঙ্গাভাঙা অসহায়দের কোমাদের বাকুট বাহ বন্ধনে আবেষ্টন কর; কেননা, আমাদের গৃহে শৃঙ্খলা না আনিয়া আমরা বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিতে পারি না, আমরা রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারিব না এবং তাহা বহন করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতেও পারিব না। স্বার্থক, নীচমনা, অজ্ঞান পৌরোহিত্যই দেশের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়ার বাধা স্মারিত্তেছে; অবস্থার পরিবর্তন না করিলে ভারতের স্বাধীন পথে যাত্রা পদে-পদে বাহিত হইবেই। হর স্ত্রীজাতি ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা আমাদের সহকারী বন্ধু ও সহযাত্রীতে পরিণত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে জাতির সবল কর্মক্ষম অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে, তাঁহারাও বাহিত হইবে হৃৎ ও হিত বর্জন করিবে।

“আমাদের এই ভারতে যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধারণতঃ পুরুষ, স্ত্রীজাতির মানসিক স্বাধা জ্ঞাপান নাই। যখন পাশ্চাত্যের রণতরী ভারতের দ্বারে আসিয়া নৌকর ফেলে, যখন বিদেশী আক্রমণকারী ভারতের বুকের রক্ত শোষণ করিতে আশঙ্ক করে, তখনই প্রথম তাহারা তাঁহাদের উন্নতি পথের বাধা ও কষ্টক স্বরূপ স্ত্রীজাতির বিষয়ে সজাগ হন। স্ত্রীশিক্ষা, পর্দা-প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ, বালাবিবাহ দূর, অস্পৃশ্যতা বর্জন, প্রমুখতম ধর্ম-জ্যোতিষগণকে পুনর্গ্রহণ প্রকৃতি সমাজ সংস্কারের মোটামুটি কতকগুলি দিক। নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা সমাজ সংস্কার সম্মেলনকে শক্তিশালী মিত্র বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং শেখোক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যধারা অনেক বিষয়ে নিজেদের কর্ম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।”

নিখিল ভারত জাতীয় উদারনীতিক সভা—

গত মাসে কলিকাতার মধ্যপ্রদেশের স্মার মোরগছ বোণীর সভাপতিত্বে উদারনীতিক সভার ৮ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত

কুকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সেখানে গৃহীত প্রস্তাব-সমূহের কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—(১) প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দাবী থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত সমস্তের দ্বারা গঠিত হইবে। (২) ভারত সচিবের কাউন্সিল তুলিয়া দিতে হইবে। (৩) সমস্ত ব্যবস্থাপক-সভাকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। (৪) ভোট দেওয়ার, কাউন্সিলে ডিক্লিটবোর্ডে কিংবা লোক্যালবোর্ডে মেম্বর হওয়ার নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হইবে। (৫) ১৯২৫ সনের কৌজদারী আইনের সংশোধিত বিধি অনুসারে বঙ্গের অনেক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, উদারনৈতিক সঙ্ঘ দাবী করিতেছে, হয় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, না হয় প্রচলিত আইন অনুসারে তাঁহাদের বিচার হউক। উদারনৈতিক সঙ্ঘের মত এই যে, সে-আইন তুলিয়া দেওয়া হউক। উদারনৈতিক সঙ্ঘ আরও দাবী করিতেছে যে, ১৮১৮ সালের, ১৮১৯ সালের ও ১৮২৭ সালের রেগুলেশন, বাহা দ্বারা গভর্নমেন্ট ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তিকে নির্বাসিত করিতে পারেন, সেই আইন তুলিয়া দেওয়া হউক। (৬) বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ পৃথক করিবার জন্তও আইন ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে বিচার বিভাগে কর্মচারী গ্রহণ করিবার জন্তও সিভিল সার্ভিস কমিটির নির্ধারণ অনুসারে অবিলম্বে কার্য করিবার জন্ত উদারনৈতিক সঙ্ঘ গভর্নমেন্টের নিকট দাবী জানাইতেছেন। (৭) ভারত-সচিব যে কেবলমাত্র আটটি সৈনিক দলে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘ ইহাকে অপ্রচুর মনে করিয়া তাহাদের নিরাশা প্রকাশ করিতেছে। (৮) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্তের ও ভারতীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্ট, সিভিল সার্ভিস আইন পাশ করাতে উদারনৈতিক সঙ্ঘ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। (৯) ব্রহ্মদেশে যে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে এক আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে গভর্নমেন্ট-বেন সম্মতি না দেন, সেইজন্য উদারনৈতিক সঙ্ঘ গভর্নমেন্টকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

বঙ্গীয় কেরাণী-সম্মেলন—

গত মাসে কলিকাতার বঙ্গীয় কেরাণী-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ সেন। সভাপতি মহাশয় কেরাণীদের ছুঃখ-ছুঃখনার কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। সম্ভবতঃ হওয়ারই কেরাণীদের একমাত্র পথ। সভার কেরাণীগণের মঙ্গলক্ষেপে কতকগুলি প্রস্তাবও লিপিবদ্ধ হয়।

দেশীয় ত্রীষ্টিয়ান সম্মেলন—

গত মাসে কলিকাতা বিশপ্ কলেজে নিখিল-ভারত দেশীয় খৃষ্টান সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হুঁরা বর্জন করিতে হইবে।

নমঃশূত্র কনফারেন্স—

গত ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার নিখিলবঙ্গ নমঃশূত্র কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী চাকুরীতে মুসলমানের সংখ্যা—

বাংলার সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা-সম্বন্ধে কয়েক বৎসর বাবৎ জনসাধারণের মধ্যে যে আলোচনা-আলোচনা হইতেছে তাহার কলে বাংলা গভর্নমেন্ট ইচ্ছাচার জারী করিয়াছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে সরকারী

চাকুরীতে বহাল করিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা ও উৎসাহ প্রদান করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য। বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দের অধিকসংখ্যক অধিবাসী মুসলমান। বাংলাসরকার মনে করেন, অধিকসংখ্যক মুসলমানকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ না করিলে সমষ্টিগতভাবে কখনও এ-দেশের অধিবাসীদের মঙ্গল হইবে না। এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া সরকার এই দেশের অধিবাসীর সংখ্যানুসারে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন। গভর্নমেন্টের নিজের ক্ষমতাবীনে যে-সমস্ত বিভাগের চাকুরী দিবার ক্ষমতা আছে, সেইসমস্ত বিভাগে কতজন মুসলমান চাকুরিয়া নিযুক্ত হইবে, তাহারিই গভর্নর সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন এবং সে বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিস, সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস এবং আবগারী বিভাগে কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে যে, প্রতিযোগী পরীক্ষার পাশ করিলে এক তৃতীয়াংশ মুসলমানকে লইতে হইবে। গভর্নমেন্ট এখন ঐ-সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন করিতে সংকল্প করিয়াছেন এবং উপরোক্ত বিভাগে কোনো পদ শূন্য হইলে শতকরা ৫৫ জন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে।

মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি-বিভাগ, বন-বিভাগ, পশু চিকিৎসা বিভাগে মুসলমানেরা ভেদন যোগ্যতা অর্জন না করার তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখন এই-সমস্ত বিভাগে মুসলমান-দিগকে চাকুরি দিবার বিষয় বিবেচনাধীন।

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ হইতে পদোন্নতি দিয়া অনেক উচ্চতর পদ পরিপূর্ণ করা হয়। গভর্নমেন্ট এই নিয়মের কোনোরূপ পরিবর্তন করিবেন না সংকল্প করিয়াছেন এবং পদোন্নতি-বিষয়ে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিচার করা হইবে না স্থির করিয়াছেন। পূর্বকার-মত কার্যকালের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও গুণের উপরই পদোন্নতি নির্ভর করিবে।

পরলোকগত মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়—

নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় গত ২১শে পৌষ পরলোক-গমন করিয়াছেন। মহারাজা কিছুদিন হইল একটি আকস্মিক ছুঃখিনার কলে যোগশয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ অশেষ সদৃশ্যের আধার ছিলেন। তিনি প্রান্তঃস্বরণীয়া রাণাসবানীর বংশধর। তিনি বাঙ্গালী সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম বহু ও সেবক বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ তিনি বহু বর্ষ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বহু বৎসর ধরন প্রথম সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গতবারে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি সদৃশ্য লিখিয়াছেন। ‘মাননী ও মর্নবাণী’ পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও অন্ততম সম্পাদক ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার খুব পারদর্শিতা ছিল।

প্রথম জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আলোচনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন একবার তিনিই আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য ও কলা-বিজ্ঞা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মাস্ত্রাজে বাঙ্গালীরা বন্দী—

সম্প্রতি মাস্ত্রাজের মিঃ রজবাণী আরেকবার একথানা পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে মাস্ত্রাজ জেলে বাঙালী রাজবন্দীদের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার

করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। চিঠিখানার নীচে "বিনি বিশেষ অবগত আছেন" এই স্বাক্ষর রহিয়াছে। চিঠিতে নিম্নলিখিত কথা লিখিত আছে :—

"বাক্সালী রান্নাবন্দী দাশ, গাজুলী এবং গুপ্ত অকস্মাৎ ত্রিচীনগরী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গেন, সরকার এবং মজুমদার দুই বৎসর তিন মাস পরে ক্যাননোর-জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মিঃ দাশ অত্র প্রদাহ রোগে এবং মিঃ গাজুলী সর্দি, কুত্রনালী প্রদাহ রোগে ভুগিতেছেন। সিভিল সার্জনের অসুরোধ সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞের দ্বারা তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করান নাই। বাক্সালার জেলে তাঁহাদিগকে 'সেলে' রাখা হইত না, তাঁহাদিগকে খোলা ঘরে রাখা হইত; মাত্রাজ জেলে তাঁহাদিগকে অন্ধকার কক্ষে রাখা হইয়াছে। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রতি অতি পাশবিক অত্যাচার করিতেছেন। বাক্সালার জেলে—এমনকি ব্রহ্মের জেলে তাঁহারা যেসমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন, মাত্রাজ জেলে তাঁহাদিগকে সেই সমস্ত সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাক্সালার বন-বিভাগ—

বাক্সালা গবর্ণমেন্টের ১৯২৪ সালের বন-বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বন-বিভাগের রিজার্ভ স্থানের আয়তন বর্তমানে ৫২৮ বর্গ মাইল অর্থাৎ এবৎসর একবর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে। গত পাঁচবৎসরে চিথারের ভূমি ৪৪০২ হইতে ১৫৩২৩ একর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু উত্তম ব্যবস্থার অভাবে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। ১৯২৩-২৪ সালে ৪ মাইল পো-শকট বাতারাভের রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ১৯২৪-২৫ সালে ১২ মাইল তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহার ব্যয় পড়িয়াছে বৎসর ৫০৬২, ৩ ১১৯৮১ টাকা। কাসিয়াং, জলপাইগুড়ি ও বঙ্গার বিভাগে চিথারের সংখ্যাও মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। এবৎসর বন-বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এবার পৌনে পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা কর আদায় হইয়াছে, উহা পূর্ববৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ টাকা অধিক।

শ্রী প্রভাত সান্তাল

কষ্টিপাথর

যেতে যদি হয়

(তৈরবী)

যাবো, যাবো, যাবো তবে,
যেতে যদি হয় হবে।

লেপেছিল কত ভালো
এই বে আখার আলো,
খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।

পেল দিন ধরামাবে
কতভাবে কত কাজে,
হুখে, দুখে, কছু লাগে,
কছু গরবে।

যেতে যদি হয় হবে।

প্রাণপণে কত দিন
সুখেছি কঠিন ধন,
কখনো বা উদাসীন,
ভুলেছি সবে।

কছু ক'রে পেলু খেলা,
স্রোতে ভাসাইলু তেলা,
আনন্দনে কত বেলা
কাটানু তবে।

যেতে যদি হয় হবে।

জীবন হরনি ক'াকি,
কলে-কুলে ছিল চাকি',
কিছু যদি রহে বাকি—

কে তাহা লবে ?

দেওয়া-নেওয়া বাবে চুকে,
বোঝা-খ'সে-বাওয়া বুকে
যাবো চ'লে হাসিমুখে,
যাবো নীরবে।

যেতে যদি হয় হবে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ভারতী, বৈশাখ-তৈজ্যষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩২)

স্বরাজের 'স্ব'

স্বরাজের 'স্ব'টা কি, একটু ভেবে দেখলে মন্দ হয় না। আর্ধ্য জাতির বে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে, তা'তে 'স্বরাজ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

বৃহস্পতি তে বৃহস্পতি স্বরাজ
উগ্রস্তু বুনঃ হৃবিরস্তু যুবেঃ।
অজ্জাযা তো বজ্জিগা বীর্ঘ্যাদি
ইন্দ্র। ক্রতস্ত মহতো মহানি।—৩৪৬।১

"হে ইন্দ্র। উগ্র, বীরবর্ত, স্বরাজ, নবীন-প্রবীণ, জরাহীন, বজ্রধারী, বর্ষণকারী, বিক্রম ভোমার বীর্ঘ্যসমূহ অতিশয় মহীমান্।" 'স্বরাজ' ইন্দ্রের এই বিশেষণগুলি প্রশিধানযোগ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে মানুষকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে—এই সমস্তসকল: অস্মাৎ শরীরাত্ সনুখার পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য যেন রূপেণ অভিনিপ্পদ্যতে। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে মানুষ নিজের স্ব-রূপ ভুলে গেছে। এমন একদিন আসবে, যখন সে পরম জ্যোতিতে জ্যোতিমান হ'য়ে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ স্ব-রাজ হ'বে।

প্রত্যেক মানুষের একটা 'স্ব' আছে—একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা স্বালক্ষণ্য আছে। আমার যা স্ব-ধর্ম, তোমার তা স্ব-ধর্ম নহে। আমি যদি আমার স্ব-ধর্মের অনুসরণ না করে তোমার স্ব-ধর্মের অনুষ্ঠান করি (যেটা আমার পক্ষে পরধর্ম), তা হ'লে আমি শ্রেয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হ'লে শ্রেয়ের বিপক্ষে গিয়ে পড়ব—তা'তে আমার কল্যাণ হবে না, অকল্যাণ হবে।

স্ব-ধর্মের অনুসরণ করলে মানুষ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'লে 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায় স্বরাজ্য হয়।

ব্যক্তির যেমন স্ব-ধর্ম আছে, জাতিরও তেমনি স্ব-ধর্ম আছে। আমরা যেন না ভাবি যে, এক একটা জাতি (Nation) কতকগুলো ব্যক্তির রাশিমাত্র—যেমন একরাশ বালি বা একপাঁজা ইট। বালু-কণার বালু-কণার মিলিত হয় না, মিশ্রিত হয় মাত্র—মিশ্রিত হ'লে একটা রাশি সৃষ্টি করে। জাতি সে-রকম রাশি নয়। যখন অনেকগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তি অজ্ঞানভাবে মিলিত হ'লে একটা সংগতি (Organic Unity) রচনা করে, সেই সংগতির নাম হয় জাতি। অতএব জাতি একটা সংঘাত বা (Organism)—যেমন আমার শরীর।

বৈদ্যস্বিকেরা বলেন, যেমন ব'ড়ি বৃক্ষের সমষ্টি বন, যেমন বাঈ জলবিন্দুর সমষ্টি জলাশয়, সেইরূপ বাঈ পুরুষের সমষ্টি বৈদ্যনর বা বিরাজ পুরুষ। যেমন প্রত্যেক বৃক্ষ ও জলকণা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাদের সংযোগে বন ও জলাশয় রচিত হয়েছে, সেইরূপ এ জগতে যত ব্যক্তি আছে যত বাঈ জীব আছে, তাদের সমষ্টিতে ঐ বৈদ্যনর বা বিরাজ পুরুষ রচিত হয়েছেন; অর্থাৎ তিনি ব্যক্তি জীবপুঞ্জের অজ্ঞান-যোগ-সিদ্ধ, সমবার-গঠিত স্বতন্ত্র সংঘাত।

জগতে যত জাতি আছে, যদি সকল জাতির জন্ম-বোধের একই সুর বাজতে থাকত, তা হ'লে তা'তে সঙ্গীত হ'ত না—একতারার একধেরে আওয়াজ মাত্র হ'ত। কিন্তু বিশ্ব-সঙ্গীতের বিচিত্র বিধান এই যে, বিশ্ব-যন্ত্রে বিশ্ব-সঙ্গীত ধ্বনিত হ'তে হবে—সমস্ত জাতির বিচিত্র জন্ম-তন্ত্রাতে যে বিবিধ সুর মিলিত হচ্ছে, একদিন তাদেরই সমন্বয়ে ঐ বিশ্ব-সঙ্গীতের ঐক্যতান বাড়িত হবে। সেইসকলই প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র; কি প্রবীণ কি নবীন, সমস্ত জাতিরই একটা স্বালক্ষণ্য আছে। হিন্দু, পাশ্চাত্য, চৈনিক, গ্রীক, রোমক, মিসরীয়, আসিরীয়, বাবিলোনিয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতি এবং ইংরেজ, করাসী, জাপান, ইতালীয়, মার্কিন প্রভৃতি আধুনিক জাতি প্রত্যেকেরই এক-এক বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন স্ব-ধর্ম আছে—প্রত্যেক জাতিরও তেমনি স্ব-ধর্ম আছে।

হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য কি? তা'র স্ব-ধর্ম কি? এই হিন্দু জাতি যুগ-যুগান্তর ধরে নানা অবস্থা-বিপদায়ের মধ্যেও অস্তিত্ব ছয় সাত হাজার বৎসর জীবিত রয়েছে। সব প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ'লে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও খাড়া রয়েছে। কেন? কিসে? অস্তিত্ব: ৩৭ হাজার বললাম—আমার কিন্তু ধারণা দশ-বারো হাজার বৎসর। যখন আমাদের পূর্বের পিতৃগণ তাঁদের 'অত্মওক:' থেকে উদাস্ত হয়ে সামগান করতে-করতে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সে আজ খুব সম্ভব দশ-বারো হাজার বৎসরের কথা।

যখন ভারতীয় আধাজাতির সভ্যতা উন্নতির মধ্যগগনে আলোক বিকীর্ণ করছিল, তখন গ্রীক-রোমের পত্তন হয়েছিল মাত্র—তখনও গ্রীক ও রোমক সভ্যতা নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম পর্ভাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। এখন প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর, মেক্সিকো, আসিরিয়া, বাবিলন—কেহই জীবিত নাই; অথচ যখন ভারতবর্ষে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ, তখনও এদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্ভাগ হইয়া নাই। হিন্দুস্থানের বন্ধের উপর দিয়ে যে এদের প্রাণের প্রাণ ব'লে গেছে—যখন,

ইরানী, হন, চীন, পাঠান, সোল, তুর্কী, পর্ত সিন্, ওলোন্দা, করাসী, ইংরেজ—কত জাতির, কত জেতার বিজয়-তুফান বহুবারে ভারতের আকাশকে যে-ভাবে আলোড়িত করেছে, ভারতবাসীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে দিকার, অত্যাচার, অবিচার ও দুর্ভাগ্যের অভিঘাত সহ করতে হয়েছে—তা'র একটা ছোট চেষ্টা করলে অস্ত যে-কোন জাতি চূর্ণবিচূর্ণ হ'লে মটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত। কিন্তু হিন্দুকে লুপ্ত করতে পারলে না। হিন্দুজাতি বৈশিষ্ট্যের বলে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(ভারতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩২)

ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদ্র-পূজা

মানভূম জেলার সর্বত্র, বর্তমান জেলার আসানসোল মহকুমার এবং বাঁকড়া ও বিষ্ণুপুরে ভাদ্রমাস ব্যাপিয়া এট ভাদ্র-পূজা হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে এই পূজা হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদ্র-পূজা হইয়াছে। মানভূমের পঞ্চকোট ও রঘুনাথপুরে ভাদ্র পূজার এত ধুমধাম হয় যে, অস্ত্র কোনো পূজাতেই এমন ধুম দেয়া যায় না। ভাদ্র-পূজার বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্ত্রী লোকেরাই করিয়া থাকেন। এপূজার কোনো মন্ত্র নাই, কোন পদ্ধতি নাই; ফুল, চন্দন, বিধিপত্রাদি কিছুই লাগে না; পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। মেয়েরাই ভাদ্র ছড়া বলেন এবং উগাই এই পূজার মন্ত্র।

ভাদ্রমাসের প্রথমেই ভাদ্র-ঠাকুর আনা হয়। প্রতিমাখানি দেখিতে লক্ষ্মী-প্রতিমার মত, কিন্তু বর্ণ লাল নয় এবং হাতে পদ্ম বা কোনো চিনিষ নাই। বাম পদের উপর দক্ষিণপদ স্থাপন করিয়া দাঁড়ানো, আজকাল আবার কোনো-কোনো স্থলে বাইসাইকেলে বা মোটরে-চড়া ভাদ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকের প্রতিগ্রামের প্রত্যেক পাড়ার লোকে এইরূপ প্রতিমা আনয়ন করে। প্রত্যাহ সন্ধ্যার সময় ছোটো ছোটো মেয়েরা ভাদ্র-প্রতিমার সম্মুখে দুধ, চিড়া, মিষ্টান্নাদি রাখিয়া ছড়া গাহিতে থাকে। ছড়া শেষ হইলেই পূজা শেষ হয়। তৎপরে ঐ মিষ্টান্নাদি তাহারাই অসাদ-স্বরূপ গ্রহণ করে। সারা ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া এইরকমভাবেই ছড়া বলা হয়। সংক্রান্তির পূর্বদিনকে ভাদ্র জাগরণ বলে, ঐ দিনেই পূজার শেষ হয়। এই দিনে সন্ধ্যার পর পাড়ার প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা খালা গরিয়া লু'চ, মোহনভোগ ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভাদ্র সম্মুখে রাখিয়া আসেন। সাধারণতঃ পাড়ার কোনো নির্জন বাড়ীতে এদিনে ভাদ্রকে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর হইতে প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা—বালিকা, যুবতী, শ্রোতা, সধবা, বিধবা, কুমারীনির্কীর্ণশেষে—বেশভূষায় সাজুত হইয়া যেখানে ভাদ্র থাকে, সেখানে সমবেত হন এবং সমস্ত রাত্রি সকলে ভাদ্র ছড়া গান করেন। শেষে করেকটি ভাদ্র ছড়া দেওয়া গেল। ভোর বেলায় ভাদ্র বিদায় গান হয়; তা'র পর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভাদ্র বিসর্জন হইয়া থাকে। কিশোরী কুমারীগণ বিদায়গান গাহিতে-গাহিতে পুষ্করিণা পর্যন্ত ভাদ্র অনুগমন করে। তা'র পর ভাদ্র বিসর্জনের পর ঘরে কিরিয়া আসে। ভাদ্র-পূজা হিন্দু স্ত্রীলোক মাত্রই উদ্ভিষিত অকলে করিয়া থাকেন। উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই এই পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের পূজার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায় একসঙ্গে বসিয়া 'কোরাসে' ভাদ্র ছড়া গান করে, তা'র সঙ্গে কোন বাস্তব আছে না; বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে একজন নাচে আর

ভাছ বলে, অন্য সকলে তাহার 'দোহারকি' করে। ইহাদের ভাছর গান কিছু ভুলীল ও সাদাসিধা।

এই ভাছপূজা-সম্বন্ধে এদেশে নানাধকার প্রবাদ শুনা যায়। কেহ-কেহ বলে যে, প্রায় দেড়শত কি ছইশত বৎসর পূর্বে মানভূম জেলার পঞ্চকোটাধিপতি স্বর্গীর নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুর এই পূজার প্রচলন করেন। তাঁহার পরমরূপবতী এক কস্তা ছিল; তাঁর নাম ভাছেশ্বরী। কস্তা বয়স হইলে রাজা অস্ত-এক দেশের রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করেন; কিন্তু চূর্তাগ্রামে বিবাহের দিন পাত্র বিবাহ করিতে আসিবার কালে পশ্চিমঘো কলেরার আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। রাজা ইহা অবগত হইয়া অস্ত পাত্র স্থির করিয়া সেই দিনই কন্যা সম্ভ্রদান করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু কস্তা কিছুতেই অস্ত পতি বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না এবং যেখানে তাহার বাগ্‌দস্ত পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তথায় বাইরা জলন্ত চিতায় বেচ্ছার পুড়িয়া মরে। কস্তার স্মৃতি-রক্ষার্থে রাজা এই পূজা তাঁহার রাজধানীতে প্রচলিত করেন। আবার কেহ-কেহ বলে যে-রাজা জীলোকের গান শুনিতে বড় ভালোবাসেন, কিন্তু অস্তঃপুরনারীদের গান শুনিবার কোনো সুযোগ না থাকায় নিজ রাজধানীতে এই ভাছ-পূজার প্রচলন করেন এবং নিয়ম করিয়া দেন যে, প্রত্যেক বাড়ীর জীলোকেই তাহা মাস ধরিয়া সন্ধ্যার সময় ভাছ গান করিবে।

ভাছর ছড়া

ভাছ নিমন্ত্রণে

দয়! ক'রে এসেছে গো এখানে।

কেহ বারি আনুতে চল গো, কেহ বাও ফুল-বাগানে।
(আবার) কেহ বা নিবৃত্ত থাকে নৈবেদ্যের আরোজনে।
কলাপাকা আত্র টাণা গো, বাজারে আন কিনে;
আরো কেহ বা মিষ্টান্ন আনো, ভুবন মররার দোপানে।
জিলাপা, খাজা, জেভিকেনি গো, কিন্বে যে দেখে-শুনৈ;
ভালো ক'রে পরাধিবি, বাসি হেন আনিস নে।

ভাছ বিষ্ণুমূর্তি।

বদন তুলে হেসে কথা কও দেখি।
বিয়স বদন কেঃ লো, আজকে তোমার নিরখি।
ধনি, কিবা আভমান হয়েছে, আমারে বলো দেখি।
স্বখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাঁকি।
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ।

ওগো ভাছমণি,

কেমন ক'রে ছিলে বলো তাই শুনি।
সম্বৎসর যে গত হ'ল খবর কিছু না জানি।
(তুমি) ভালোর-ভালোর এলে যবে সুখেতে থাকো তুমি।
(আমি) কি করে যে ছিলাম যবে গো জানেন

চিত্তামণি।

ওগো আমার দিব্য থাকে ভাছ শুনিস না কারো বাণী।
পিতার আমার কঠিন হৃদয় গো কথা না শুনেন তিনি।
ওগো সত্য ক'রে বলছি ভাছ কিবৎসর আন্ব আমি।

এস ভাছেশ্বরী,

হতাশ প্রাণে চালিতে আশা বারি।
ভাঙা প্রণয় জোড়া দিতে লো করিয়ে কারিকুরী।
(এসে) ভাসাইতে মাতাইতে কি পুরুষ কিবা নারী।
অস্তরে আনন্দ দিতে লো নিরানন্দ নাঃ করি।
(এস) হর্ষভরা কর্তে ধরা স্থন্দরী রাজকুমারী।

বিদায় দিতে মন সরে না ভাছ তোমারে।
নিশ্চয় যদি বাবি গো জুলিস না গো আমারে।
যাচ্ছ যদি ভাছমণি কেঁদো না গো মনোমোহিনী।
আর-বৎসর থাকি যদি আন্ব গো তোরে।
আর কেঁদ না বৈধা ধরো মাসী তোমার প্রণাম করে।
কি করিবি যেতেই হবে বিধাতার নিয়ম রে ॥

ভাছ গোমা ধনে

ওগো বিদায় দিবো কেমনে।
যেও না যেও না ভাছ গো ধরি তব চরণে।
চ'লে গেলে আমরা বলো গৃহে রবো কেমনে।
দ্বিবানিশি তোমার হেরে গো থাকি আনন্দ-মনে।
তুমি চ'লে গেলে প্রাণ ত্যজিব কাজ কি এ ছার জীবনে।

(বাঁশরী, কার্তিক, ১৩৩২) শ্রী বিপদ্ভঞ্জন চক্রবর্তী

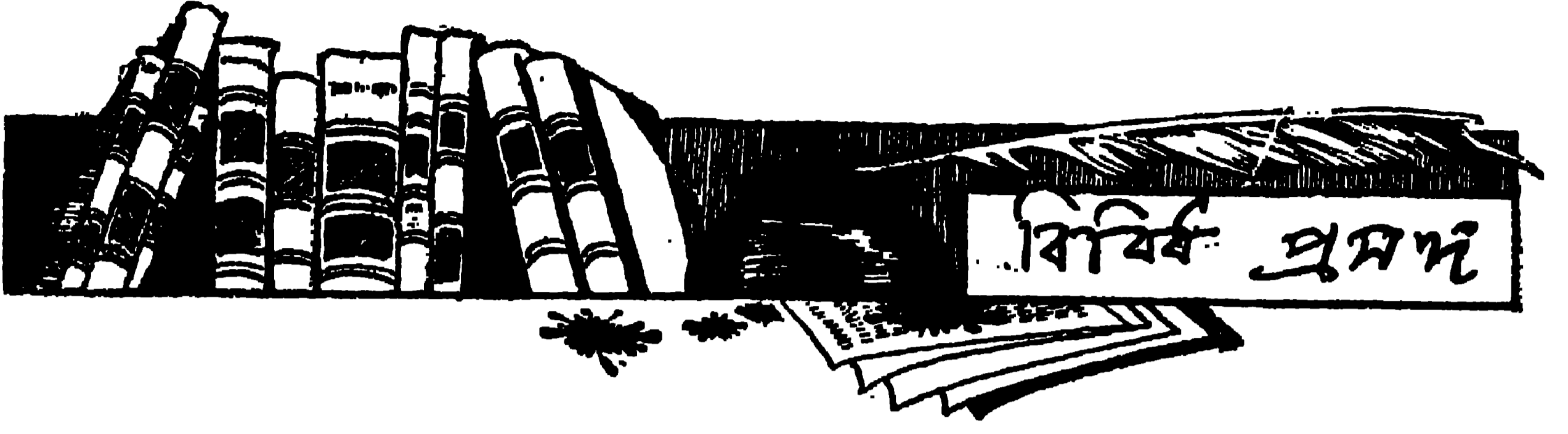
সেনহাটীতে বিষ্ণুমূর্তি

গত ফাল্গুন মাসে আমার বাসগারী খুলনা জেলার সেনহাটীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত গোগালপাড়ার একটি পুরাতন পুষ্করিণী খনন-কালে একখানি নিখুঁত পাবাণময়ী বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি একখানি ২'-৭"×১'-৩" শূর্ণাকৃতি কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ। শুধু মূর্তিটি ১'-২" দীর্ঘ। মূর্তির মস্তকে ক্রীট, গঙ্গদেশে কঠমালা, কৌন্ত-মণি, পরে উত্তরীয়, নিরে আনাতি বজ্রোপবীত, জাহ্নুদেশাবলম্বী বনমালা। বামাবধো হস্তে শঙ্খ, বামোর্ধ্বে চক্র, দক্ষিণোর্ধ্বে গদা দক্ষিণাধে পদ্ম-শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের পদনিরে ছোড় হস্ত, স্তব-পরায়ণ ছুইটি উপবিষ্ট সাধক মূর্তি। মূল মূর্তির বামে শিলাধারিণী সরস্বতী, দক্ষিণে পদ্ম-হস্তা লক্ষ্মী, সরস্বতীর বামে ও লক্ষ্মীর দক্ষিণে ছুইটি ক্রীটধারী মূর্তি—'পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি।' এই মূর্তির উপরে হস্তী, তাহার উপরে লম্বালম্বিতাবে একটি সিংহ, সিংহের উপরে আবার একাঙ হস্তী, তাহার উপরে ছুইটি ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্তি। মূর্তির মস্তকের উপর দিকে চালের উত্তর পার্শ্বে পঞ্চধারী বিষ্ণাধর মূর্তি। এই মূর্তিগুলি ব্যতীত বিগ্রহের আশে-পাশে উপরে-নীচে নানাকারে কারুকাৰ্য্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুমূর্তি একটি অক্ষুণ্ণিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন। মূল পাথরখানির নিরে কীলক আছে। কিন্তু উহা যে পাদপীঠে সংবদ্ধ ছিল সেখানি পাওয়া যায় নাই।

এ বিগ্রহ ঠিক কত দিনের, তাহার দ্বারা কি-ভাবে প্রস্তুত হইয়া কোথা হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিল, বহু অনুসন্ধানও তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন

(প্রতিভা, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২)



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ

কানপুরে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে বক্তৃতা করেন, তাহার দুটি গুণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন; সকলেই বলিয়াছেন উহা দীর্ঘ নয় এবং উহার রচনা উৎকৃষ্ট। কঠোর সমালোচকেরা অবশ্য বলিয়াছেন, যে, উহাতে ভাষা সুন্দর ও কবিজনোচিত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু উহা পড়িবার সময় আমাদের ওরূপ কোন দোষ ঠাণ্ডা হয় নাই।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা তিনটি;—১। কি প্রকারে শীঘ্র স্বরাজ লাভ করা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন; ২। সেই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যসাধন এবং একযোগে কার্যসম্পাদন; ৩। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব ও একতা স্থাপন।

সরোজিনী দেবীর অভিভাষণে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এই তিনটিরই উল্লেখ আছে। প্রথমটির উল্লেখ পরোক্ষ ভাবে আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন সংস্কার আইন অনুসারে শাসন-প্রণালীর যে-সব সংস্কার করা হইয়াছে, তাহা কাহারও আশঙ্করূপ হয় নাই। সরোজিনী দেবী সংস্কারগুলিকে মরীচিকা বলিয়াছেন। সকল দলের লোকেরা তাহা মনে না করিলেও একথা ঠিক, যে, কেহই সন্দেহ হন নাই। প্রত্যেক দলের লোকেরা কি চান, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক; তিনি বলিয়াছেন,

“আমার নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাহাই হউক, * ভারতীয় রাজনৈতিক সকল দলের লোকেই, অন্ততঃ স্বায়ত্ত শাসনের গোড়া পত্তনস্বরূপ ভারতবর্ষের জন্ম

স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সমান অধিকার চান। এই উপনিবেশগুলির অধিকার বলিতে কি বুঝায়, তাহা মিসেস বেসান্ট্ প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞদিগের দ্বারা প্রস্তুত “কমনওয়েলথ্ অব্ ইণ্ডিয়া বিল্” নামক আইনের খসড়ায় দেখান হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে জাতীয় দাবী সকল রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে উহা সংক্ষেপে ও দৃঢ়তার সহিত অন্বীভূত করা হইয়াছে। সকল রাজনৈতিক দলের লোকেরা ন্যূনতম অধিকার কি কি চান, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত; এবং অধিকতম রাষ্ট্রনৈতিক অন্তায় ও ছুঃখ এবং অধিকারহীনতা তাঁহারা কতটা এখনও সহ্য করিতে প্রস্তুত, তদ্বিষয়েও একমত।”

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুচর নো-চেঞ্জার অর্থাৎ পরিবর্তন-বিরোধীরা, স্বরাজীরা, ইণ্ডিপেন্ডেন্ট্ বা স্বতন্ত্রদলের লোকেরা, উদারনৈতিকরা, মোস্লেম্ লীগের লোকেরা, খিলাফতীরা, এবং মাস্ত্রাজের অন্ত্রাঙ্কণেরা কি চান, তাহা আমরা যখন খবরের কাগজে পড়ি, তখন দেখিতে পাই, অবান্তর কতকগুলি বিষয় ছাড়িয়া দিলে, সকলের মূল রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শে মিল আছে। কিন্তু সকল দলের নেতারা একত্র বৈঠক করিয়া, সকলে কি কি বিষয়ে একমত, তাহা স্পষ্টভাবে বলিলে ভাল হয়। নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত পরস্পরকে দেখিতে পাবেন না, কাহারও কাহারও মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধও থাকিতে পারে, কাহারও কাহারও মধ্যে হয়ত পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রতিদ্বন্দিতার ভাবও আছে; কিন্তু এসব ভাবকে বাদ দিয়া, চাপা দিয়া, বিন্ধি করিয়া, সন্নিহিত একটি দাবী স্থির করিয়া অগতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে।

* এই কথাগুলি হইতে অনুমান হয়, সরোজিনী দেবী স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

সকল দলের মিলনের জন্ম কি করা উচিত, সরোজিনী

দেবী তাহা খুলিয়া বলেন নাই। তাঁহার অভিভাষণের এক জায়গায় আছে বটে, যে, স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের দ্বারা মুক্ত করিয়া অন্ত সব দলকে উহাতে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি না, যে, কংগ্রেসের সভা হইবার সব সঠিক সব দলের লোক অবাধে মানিয়া লইতে পারেন। কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলের এক ছত্র প্রভুত্ব মানিয়া লইয়া উহাতে অন্ত সকলের যোগদান সম্ভবপর নহে। আগে কংগ্রেসের সভা হইবার যে সরল সহজ নিয়ম ছিল, তাহা পুনঃ প্রবর্তিত করিলে সকলের যোগ দিবার সুবিধা হয়। তাহার পর যে বৎসর যে দলেরই প্রাধান্য হউক, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

স্বরাজ্য কি প্রকারে শীঘ্র লাভ করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। মহাত্মা গান্ধী প্রথম প্রথম কয়েকটি সঠিক নির্দেশ করিয়া বলিতেন, যে, সেগুলি পালিত হইলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে। অবশ্য এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ্য পাওয়া যায় নাই। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হইতে উত্তরে ইহা বলা যায়, যে, তাঁহার নির্দিষ্ট সঠিকগুলিও পালিত হয় নাই। প্রত্যুত্তরে বলিতে পারা যায়, যে, তাঁহার সঠিকগুলিই এরূপ ছিল, যে, তাহা এক বৎসরের মধ্যে কখনও অধিকাংশ ভারতীয়ের দ্বারা পালিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সে দিনও কানপুরে তিনি বলিয়াছেন, যে, চরখার ও ধদের আশাক্রম প্রচলন ও ব্যবহার হইলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কয়েক বৎসরের চেষ্টাতে চরখার প্রচলন এবং ধদের উৎপাদন ও ব্যবহার যতটা হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎকার আসন গ্রহণ না করিয়াও বলা যায়, যে, চরখা ও ধদের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আশা এক বৎসরে পূর্ণ হইবে না;—কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আমাদের মনে হয়, স্বরাজ্য লাভের তারিখ নির্দেশ করা ভুল। উহার সূচিস্থিত পন্থা ও উপায় নির্দেশ করিয়া তাহাই দেশের লোককে অবলম্বন করাইতে অবিরত চেষ্টা করা কর্তব্য। নতুবা এমন অনেক সর্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা যুগপৎ পালিত হইলে, এক বৎসরে কেন, এক সপ্তাহেই স্বরাজ্য

লাভ হইতে পারে। এরূপ একটি সর্বের উল্লেখ করতেছি যাহা বহু বৎসর পূর্বেই কোন কোন ইংরেজ গ্রন্থকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছিল। যদি ইংরেজ গবর্নেন্টের উচ্চতম হইতে নিম্নতম মৈনিক ও অমৈনিক, বেতনভোগী ও অবৈতনিক, সমুদয় ভারতীয় ভূত্যা চাকরা চাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে অবিলম্বে গবর্নেন্টকে আমাদের দাবী গ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সকলের দ্বারা এরূপ যুগপৎ পদত্যাগ সম্ভবপর নহে। ইংরেজীতে সম্ভাব্যতা বুঝাইবার জন্য ইম্পসিবল্ এবং ইম্প্রবেবল্ এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাহা ব্যবহার করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, সকল ভারতীয় সরকারী চাকরের যুগপৎ পদত্যাগ ইম্পসিবল্ না হইলেও ইম্প্রবেবল্। মহাত্মা গান্ধীর সঠিকগুলি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য।

যাহা হউক স্বরাজ্য লাভের জন্য সরোজিনী দেবী তাঁহার অভিভাষণে কি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, এখন সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। তিনি বলেন, আগামী বসন্ত কালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময় বা তৎপূর্বে যদি গবর্নেন্ট আমাদের দাবীতে কর্ণপাত না করেন, কিম্বা যদি গবর্নেন্ট যাহা দিতে চান, তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে যাহারা কংগ্রেসের প্রভাবাধীন তাঁহাদিগকে স্পষ্ট এই আদেশ জানাইতে হইবে, যে, তাঁহারা ভারতীয় ও প্রাদেশিক সমুদয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের পদত্যাগ করুন। তদ্বিন্ন কৈলাস হইতে কন্যাকুমারী ও সিদ্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র-নদ পর্যন্ত ভারতীয় লোকদিগকে শেষ স্বরাজ্যলাভ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, যে, ভারতজননীকে তাঁহার দাসত্ব-অপমান হইতে মুক্ত করিবার এবং আমাদের সম্মানদিগকে অবিধ্বংসীয় শান্তি দিয়া যাইবার নিমিত্ত কোন ত্যাগই বেশী নয়, কোন ক্লেশ অতি বড় নয়, কোন দুঃখলাহন্য ভোগ অতি ভয়াবহ নহে।

সশস্ত্র যুদ্ধ না করিয়া, ইংরেজদের বা ইংরেজ পক্ষের কাহারও প্রাণ বধ না করিয়া, বরং আবশ্যিক হইলে নিজের প্রাণনাশ পর্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিয়া, শান্তির পথে স্বরাজ্য লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুতরাং শ্রীমত

সরোজিনী নাইডু যে শেষ স্বরাজ্যভাঙ চেষ্টার কথা বলিয়াছেন, তাহা যুক্ত নহে। তাহা ট্যান্ না দেওয়া, তাহা নিরুপদ্রবভাবে কোন আইন লঙ্ঘন বা অমান্য করা, কিংবা ঐরূপ কিছু। প্রয়োজন হইলে উহা করা বিন্দু-মাত্রও গর্হিত নহে। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক লোকের ঐ উপায় অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। দেশ নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত কি না, অসহ-যোগীদের পক্ষ হইতে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত প্রতিকূল হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীও এখন উহার সাধ্যাত্ততা-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহান। এই কারণে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর, যথা আগামী বসন্তকালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের পর, উহার জন্ত দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে বলা আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তাহা কতকটা গবর্নেন্টের উদ্দেশ্যে ফাঁকা আওয়াজের মত শুনায়। আমরা নেতা নহি, আমরা কেবল মত প্রকাশ করিতে অধিকারী। আমরা কাহাকেও উপদেশ দিতেছি না। কেবল এই মত প্রকাশ করিতেছি, যে, দেশের লোককে স্বাধীনতা-লাভের জন্ত সকলপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা এখন হইতেই অবিরত করা হউক।

হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধনের জন্ত স্রীমতী সরোজিনী নাইডু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই ঠিক কথা। মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিন ব্যাপী উপবাসের পর এই উদ্দেশ্যে যে কনকারণের বৈঠক হইয়াছিল, তাহার নির্ধারণগুলিও বেশ ভাল। কিন্তু এবিষয়ে সমুদয় কর্তব্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলা হয় নাই, তাহার জন্ত সরোজিনী দেবীকে দোষ দেওয়া যায় না।

কংগ্রেসের বারটি কর্তব্য

কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বারটি কর্তব্যের উল্লেখ দেখা যায়। সবগুলিই প্রয়োজনীয়।

পল্লীসংগঠনের কথা তিনি প্রথমে বলিয়াছেন। 'দেশবন্ধু দাসের স্বপ্ন' (ইহা নাইডু মহাশয়ের ভাষা) অল্পসারে তিনি এতদ্বিষয়ক অহুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করিতে বলিয়াছেন। দাশ মহাশয়ের প্রাপ্য কোন সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, যে, তিনি যে অহুষ্ঠান-পদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন মৌলিকত্ব ছিল না, এবং তাঁহার 'স্বপ্ন' অল্পসারী কাজ অনেক আগে হইতেই কোথাও কোথাও চলিয়া আসিতেছে। এই সকল অহুষ্ঠানের কর্মীরা প্রশংসা পান বা না পান, তাহা আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে সহুপার অবলম্বন এবং বিপথ ও ভ্রম পরিহারের সুযোগ হইতে পারে। সেই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

গ্রামের উন্নতিসাধক কর্মীদের ভরণপোষণের নিমিত্ত যে উপায়ের ইচ্ছিত সভাপতির অভিভাষণে আছে, তাহার সপক্ষে বলিবার অবশ্যই কিছু আছে। সেকালে গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এবং টোলের অধ্যাপকেরা গ্রামবাসীদের ধর্মভাব ও স্বার্থবোধ প্রণোদিত দানের উপর নির্ভর করিতেন বটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাছুবের মতিগতি ঠিক আগেকার মত নাই। আগেও কখন কখন গুরুমহাশয় ও ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের আত্ম-সম্মানের ও স্বাধীনতার হানি হইত না, এমন নহে। বর্তমান সময়ে গ্রামোন্নতিবিধায়ক কর্মীদিগের গ্রাম্য দলাদলির বাহিরে থাকিয়া, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া, অধচ সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারা আবশ্যিক। এইজন্য, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে গ্রামবাসীদের আত্মকুল্যের উপর নির্ভর করিতে না হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, মহাত্মা গান্ধী কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়ান দেখাইয়াছেন, যে, কোন কোন কংগ্রেস-কর্মী কেমন করিয়া লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়া জাঁতিয়া বসেন এবং অতিথিরূপে সেবাটা পাওনা বলিয়া আদায় করিতে চান। এবিধ কারণে, পল্লীহিতসাধন উপলক্ষে তথাকথিত অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর মত নূতন আর একদল অলস লোকের সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন আগে হইতেই

করা দরকার। সেইজন্য পল্লীকর্মীদেরকে ভরণ-পোষণের জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর না করাইয়া আধুনিক কালের উপযোগী অন্য কোন উপায় অবলম্বিত হইলে ভাল হয়।

ঘনবসতি সহরে কলকারখানার শ্রমিকদের কল্যাণ-সাধনের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অস্বাভাবিক মজুরী, অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ-গৃহে বাস, জন্মগ্রামের ও সমাজের প্রভাব হইতে দূরে জীবনযাপন, পানদোষ ও অন্ত্যস্ত পাপাচার, প্রভৃতি নানা অনিষ্টকর অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা ও উদ্ধার করা আবশ্যিক। বন্ধে এই সমস্যা আরও গুরুতর এই কারণে হইয়াছে, যে, কলকারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বাঙালী নহে বলিয়া বঙ্গীয়সমাজের প্রভাব তাহাদের উপর সহজে বর্ধে না—তাহারা উহা অনুভব করে না বলিলেও চলে। অধিকন্তু, তাহাদের অস্বাভাবিক জীবনের কুফল বঙ্গীয় সমাজকে দূষিত কবিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য সমাজসেবক সমাজহিতসাধক বাঙালীদের নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না। তাহাদের ভাষা জাতি, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভিন্ন, এরূপ বিদেশী অনেক লোক যখন ভারতবর্ষের দুঃখী নানা শ্রেণীর লোকের কল্যাণসাধনে দিনপাত করেন, তখন ভারতীয় আমরা ভিন্নপ্রাদেশিক অন্য ভারতীয়দিগের কল্যাণসাধন কেন করিতে পারিব না?

তৃতীয় সমস্যা ভারতীয় শিক্ষা বিবয়ক। শ্রীমতী সরোজিনী চান প্রাচ্য কালচারের সহিত পাশ্চাত্য শিল্প কলা বিজ্ঞান দর্শন ও পৌর শৃঙ্খলাদির সমঞ্জসীভূত মিলন। এই আদর্শ উৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত ত দুইটি বাক্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু অতিরিক্ত নিন্দা করিয়াছেন।

“The surpassing evil of foreign domination has been to enslave our imagination and intellect and alienate us from the glorious tradition of our national learning. We are today no more than the futile puppets of an artificial and imitative system of education, which, entirely unsuited to the special trend of our racial genius, has robbed us of our proper mental values and perspectives, and deprived us of all true initiative and originality in seeking authentic modes of self-expression.”

কাহারও উপর অন্যের প্রভুত্ব অনিষ্টকর; এরূপ প্রভুত্ব বিদেশীর হইলে আরও অনিষ্টকর। ইহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের কল্যাণ ও বুদ্ধিকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করিয়াছে, আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্তি বিনাশ করিয়াছে, ইত্যাদি কথা বলিলে সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র হয়। কারণ, আমরা দেখিতেছি, যে, ভারতীয়দের মধ্যে ষাঠার আধুনিক যুগে সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, ললিত-কলায়, দর্শনে, প্রান্তভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকেরা কেহই পাশ্চাত্যজ্ঞানবর্জিত কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্রবশূন্য নহেন। বৈদেশিক কোন কিছুই প্রভুত্ব বা একান্ত প্রভাব আমরা একটুও বাহ্যনীয় মনে করি না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের সভ্যতা, সামাজিক ব্যবস্থা, চিন্তাশ্রোত, মনোভাব, প্রভৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ, তাহা ব্যতীত মানুষের মন জাগে না, এবং সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি পাইয়া উদারতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হয় না।

চতুর্থ সমস্যা, সামরিক শিক্ষা। আত্মরক্ষার জন্যও হিংসা কোন জাতির পক্ষে বৈধ কি না, তাহার আলোচনা এখানে করা যাইতে পারে না। তাহা বৈধ ধরিয়া লইলেও, ভারতের বর্তমান অবস্থায় গবর্নেন্ট আমাদেরকে যতটুকু সামরিক শিক্ষা দিতে চাহিবেন, তাহা অপেক্ষা বেশী আমাদের পাইবার উপায় নাই। গবর্নেন্ট যাহা দিতে চাহিবেন, তাহা পাওয়া কতটা বাহ্যনীয় তাহা বিবেচ্য। বর্তমান সময়ে সামান্ত কয়েকজন নিয়মদহ্ন রাজকীয় কমিশনধারী ভারতীয় অফিসার ছাড়া, অন্য সব রাজকীয় কমিশনধারী অফিসার ইংরেজ; নেতৃত্ব তাহারাই করে। অধিকাংশ ভারতীয় যোদ্ধা সিপাহীশ্রেণীভুক্ত। তাহারা ইংরেজের হুকুম মানিতে বাধ্য। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে-সব সৈনিক ভারতীয়দিগের উপর গুলি চালাইয়াছিল, তাহারা গেরা নহে, গুর্খা সিপাহী। গুর্খারাও ভারতীয়। অশিক্ষিত সিপাহীরা ইংরেজের হাতের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদিগকেও ইংরেজের হাতের অস্ত্র বানান দেশের পক্ষে কতটা বাহ্যনীয় ও কতটা অবাহ্যনীয়, তাবিয়া দেখা দরকার। এক দিকে

ইহা যেমন আংশিক সত্য, যে, ভারতীয় শিক্ষিত যুবকেরা ফৌজী অফিসার না হইলে স্বরাজ্য পূর্ণলব্ধ হইতে পারে না; অন্যদিকে ইহাও তেমনি কি আংশিক সত্য নহে, যে, স্বরাজ্যলব্ধ না হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবক ফৌজী অফিসারেরা স্বরাজ্য-সেবক না হইয়া ইংরেজ সেবক হইবে—যেমন সেনার্যাল ডাগারের অধীন সিপাহীরা হইয়াছিল ?

অতঃপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিতেছেন, যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় সামরিক বিদ্যা শিখাইবার বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিটি বসিয়াছে, তাহার নির্ধারণ যাহাই হউক, আমাদের নিজে হইতে স্বেচ্ছাবৃত জাতীয় বাহিনী গঠন করা উচিত; এখন আমাদের যে-সব বেসরকারী স্বেচ্ছা-সেবক (ভলান্টিয়ার) আছে, তাহাদিগকেই কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া এই বাহিনী গঠিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, একদল লোকের নাম রেজিষ্টারী করা হয় ত চলিতে পারে, কিন্তু গবর্নেন্ট তাহাদিগকে কোন প্রকার বন্দুক বা তর্জি অস্ত্র কিনিতে ও তাহা লইয়া কুচকাওয়াজ করিতে দিবেন না; বাহিনী খুব বড় হইলে শুধু লাঠি লইয়া ডিল করিতেও দিবেন কি না সন্দেহ। বীরভূম জেলায় সুরুল ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহের গ্রামে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা, উন্নত প্রণালীর কৃষির জ্ঞান বিস্তার চেষ্টা ইত্যাদির জন্য ছোট ছোট ছেলোদিগকে লইয়া ব্রতীবালকের দল গঠন করা হইয়াছে। মশা মারিবার এই উদ্যোগ ব্যাপদেশে কামান পাতা হইতেছে কি না, সম্ভবতঃ তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য বীরভূম জেলার পুলিশ ও শাসন বিভাগ হইতে ব্রতীবালকদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ হইয়া গিয়াছে। অতএব স্বেচ্ছাবৃত বেসরকারী বাহিনী গঠন করিতে গেলে সরকার-পক্ষ তৎসম্বন্ধে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা অস্বপ্নময়।

নাইডু মহাশয়া আরও বলেন, ভারতীয় জাতিকে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সমুদ্রযুদ্ধ এবং আকাশযুদ্ধ শিখাইবার কথাও আলোচনা করা উচিত। তাহা অবশ্যই উচিত। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বেসরকারী উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে না; কেননা, সরকার

বাহাদুর কংগ্রেসকে যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন কিনিতে দিবেন না।

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে আকাশে, ডাঙায়, জলে ও জলের নীচে যুদ্ধ শিক্ষা বিদেশী গবর্নেন্টের মজি ভিন্ন হইতে পারে না। ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইলেও, সত্য কথা। অবশ্য গবর্নেন্ট যাহাতে আমাদের স্বরাজ্য-লাভ ও যুদ্ধশিক্ষা-লাভ উভয়েই রাজী হন, তাহার জন্য উহার উপর নানা রকমের চাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন পরদেশী জাতি স্বযোগ পাইলে ভারত আক্রমণ করিতে পারে, ইহা না তুলিয়া, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকাও আবশ্যিক। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না, যে, স্বদেশ-রক্ষার জন্য আমাদের সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করাও দরকার। বর্তমানে ইউরোপের যে-সব ক্ষুদ্র জাতিকে প্রবল জাতিরা সহজেই পরাস্ত করিতে পারে, যেমন পোর্চুগীজ, স্পেইন্, ডেন, নরইজিয়ান, তাহাদিগকে প্রবল জাতিরা যে সচরাচর আক্রমণ করিবার চিন্তা করে না, তাহার অন্ততম কারণ অবশ্য এই, যে, তাহারাও প্রবল জাতিদের মত খৃষ্টিয়ান ও খেতকার। কিন্তু ইহাও একটা কারণ, যে, তাহাদের প্রতি প্রবল জাতিদের কতকটা শ্রদ্ধা আছে, কিছু প্রীতি আছে। আমরা কেবল আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কৃতিত্বের জোরে জগতের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইতে পারি না, তাহাদিগকেও বর্তমান সময়ে এমন কিছু করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা অন্য সকল জাতির সম্মান পাইতে পারি এবং যাহার জন্য তাহারা মনে করিতে বাধ্য হয়, যে, বর্তমান কালের ভারতবর্ষের হৃদয়মনের দান না পাইলে জগৎ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র থাকিয়া যাইবে।

দক্ষিণআফ্রিকায় ও অন্যান্য বিদেশে যে-সব ভারতীয় লোক বাস করে এবং যাহারা সেই সেই দেশের খেত-কারীদের দ্বারা নানা প্রকারে লাঞ্চিত ও নানা অহুবিধা-গ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রতি কর্তব্য সাধন কংগ্রেসের ষষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া সভাপতির অভিভাষণে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা স্ব-শাসক জাতি হইলে এইসব ভারতীয়ের জন্য যাহা করিতে পারিতাম, বর্তমান অবস্থায় তাহা পারি না

বটে, কিন্তু যাহা পারি তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা যদি স্বশাসক হইতাম, তাহা হইলে বিদেশে ভারতীয়দের এই দুর্দশা হইত না। আমাদের স্বশাসন অধিকার যে লুপ্ত হইয়াছে, পুরুষানুক্রমে স্বদেশবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাহার অন্ততম কারণ।

কতকগুলি ভারতীয় যুবক মাতৃভূমিকে দাসত্বমুক্ত করিবার নিমিত্ত অধীর হইয়া এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন, এবং এমন অনেক কাজ করিয়াছিলেন, যাহা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অন্ত অনেক দেশের লোকেও করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। কিন্তু এই ভারতীয় যুবকেরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দেশের মালিকরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন না, যদিও তাঁহাদের অনেকে এখন প্রোঢ় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনেকের এখন আর বিজ্রোহী ভাবও নাই। এই নিকরাসিত ব্যক্তিদিগকে স্বরণ করিয়া সরোজিনী দেবী কিছু মর্মস্পর্শী কথা বলেন।

কংগ্রেসের নবম কর্তব্য রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, প্রভৃতি নানা বিষয়ে সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করা। যাহারা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টায় যোগ দিতে পারেন না, তাঁহারাও দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার নিমিত্ত যত বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন, নিজ নিজ পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে সেই জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন।

অতঃপর সরোজিনী দেবী হিন্দুমুসলমানের বিরোধ দূরীকরণ ও তাহাদের মধ্যে সম্ভাব স্থাপনের কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশী রাজ্যসমূহের রাজা ও প্রজা এবং ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মধ্যে বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সম্ভাব যাহাতে জন্মে ও বাড়ে, তাহার চেষ্টা করাও কংগ্রেসের কর্তব্য।

পরিশেষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন, সীমান্ত প্রদেশগুলি এক প্রকার চিরস্থায়ী সামরিক আইন অনুসারে শাসিত হইয়া থাকে। তাহার পরিবর্তে ব্রিটিশ-ভারতের অন্ত প্রদেশগুলির মত সাধারণ শাসন-

প্রণালী লাভের চেষ্টায় সীমান্তপ্রদেশবাসীদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

স্বরাজ্য দলের সাফল্যের পরিমাণ :

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মতে স্বরাজ্য দল আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই দল ব্যবস্থাপক সভায় ভোটে অনেক বার গবর্নেন্টকে পরাস্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে দেশ এখনও কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে নাই। বরং বাংলা দেশে ছোটখাটাবিশেষে মন্ত্রীদের দ্বারা ভাল কাজ যাহা হইতে পারিত, তাহা হইতেছে না। বেসরকারী ভাবে স্বরাজ্য দল নিজেও এখনও এমন কোন কাজ করিতে পারেন নাই, যাহা তাঁহাদের হাতে সঞ্চিত সর্বসাধারণের টাকার পরিমাণ অনুযায়ী। যাহাদের হাঁক ডাক খুবই কম বা মোটেই নাই, এরূপ অনেক সমিতি ও ব্যক্তির দ্বারা স্বরাজ্য দলের চেয়ে অনেক বেশী দেশহিতকর কাজ হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বরাজ্য দলের আর একটা কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি একটা না একটা ছদ্মক মাতাইখা দেশবাসীর চিত্তকে অধিকৃত ও বিনোদিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মঙ্গল কী হইয়াছে? তারকেশ্বরের সত্যগ্রহে কী সফল ফলিয়াছে? আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে কী সফল হইয়াছিল? এই উভয় ছদ্মক এবং অন্ত অনেক ছদ্মকেও কুফল অনেক ফলিয়াছে। পল্লীসংগঠনাদি কাজের জন্য সংগৃহীত টাকার অপব্যয় হইয়াছে। অপব্যয় অপেক্ষা শক্ত কথা ব্যবহার করিলেও অন্তায় হই না। তা ছাড়া, স্বরাজ্যীরা ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কেবল ক্রমাগত গবর্নেন্টের কাছে বাধা দিবার জন্য, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু কেহ কেহ সরকারী চাকরী হইয়াছেন, এবং অনেকেই গবর্নেন্টের সহযোগিতা করিয়াছেন। সরকারী চাকরী লওয়া ও সরকারের সহিত সহযোগিতা করা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে হইতেছে না; ইহাই বলা হইতেছে, যে, স্বরাজ্যীরা অধীকারভঙ্গ করিয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইয়াছেন।

সুতরাং কোন দিকেই স্বরাজ্য দলের “শাকল্য” আশ্চর্য্য রকম হইয়াছে বলা যায় না।

—

উদারনৈতিক দলের অধিবেশন

কলিকাতায় উদারনৈতিক দলের গত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্ত্রী মোরোপস্তু জোশীর অভিভাষণ রাজনীতিকুশল লোকের উপযুক্ত হইয়াছিল। দেশে সার্বজনিক জীবনে ও আচরণে যে অবনতি হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রথমেই আমাদের নজর দেওয়া কর্তব্য। তিনি এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

“সকল দলের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত মিলিত চেষ্টা হইতেছে না; বরং দলগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপ লক্ষিত হইতেছে। আপনাদের কর্তনীতি ও কার্যপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিযোগী দলের নীতি ও পদ্ধতির উপরই যে আক্রমণ করা হয়, তাহা নহে; ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়, এবং পরস্পরের মতামত বুঝিবার কোন চেষ্টা করা হয় না। দলের নেতারা এবং খবরের কাগজের সম্পাদকেরা এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হন না। ভিন্ন দলের নেতাদের বধস, অভিজ্ঞতা, স্বার্থত্যাগ বা নৈতিক শ্রেষ্ঠতা সম্মানের চক্ষে দেখা হয় না। দলের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়া হয়। ইহাতে এদেশের রাজনৈতিক জীবন লোকঠকান ও ভণ্ডামির ব্যাপন হইয়া পড়িয়াছে।”

ছুঃখের বিষয়, জোশী মহাশয় যে-সব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি উদারনৈতিক সংঘের অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির বক্তৃতাতেও লক্ষিত হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার অমুচরগণ, এবং তাঁহাদের কর্তনীতি ও কর্ণের বিষয় বলিতে গিয়া একরূপ বিদ্রূপ ও উপহাসের ভাষা কোথাও কোথাও প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা না করিলে ভাল হইত। অবশ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বক্তৃতার অল্প উৎকর্ষ কিছু আছে। আজকাল অনেকেই মনে করেন, যে, উদারনৈতিক অর্থাৎ সাবেক

মজারেট নামধারী দল দেশের কোন কাজই করেন নাই। ইহা যে শাস্ত, তাহা কৃষ্ণকুমারবাবু তাঁহাদের কাছে তালিকা দ্বারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই তালিকা সঘন্থেও কিছু বক্তব্য আছে।

তাঁহার তালিকায় এমন সময়ের নানা কাজের উল্লেখ আছে, যখন ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মীরা নানা দলে বিভক্ত হন নাই। ইংলণ্ডের ইংরেজেরা যদি হাম্পডেন, পিম, ক্রমওয়েল, মিল্টন, প্রভৃতির কার্যাবলীর গৌরব তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বলে, তাহা হইলে ঠিক হইবে না। আমেরিকায় ইংরেজবংশজাত যত লোক আছে, এই গৌরবে তাহাদেরও অংশ আছে—যদিও এখন তাহারা ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্ষাদের গৌরবে কেবল আধুনিক গোঁড়া হিন্দুরাই গৌরবান্বিত হন না, হিন্দুবংশজাত লোকমাজেই তাহাতে গৌরবান্বিত। সেই জন্ত, যখন কৃষ্ণকুমারবাবু রামমোহন রায়কে উদারনৈতিক দলে টানিয়াছেন, তখন রামমোহনের উপর উদারনৈতিকদিগের দাবী মানিয়া লইয়াও ইহা বলা দরকার, যে, তাঁহার উপর অন্য সব রাজনৈতিক দলেরও দাবী আছে। তিনি যে যুগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদ অভিযোগ আবেদন প্রভৃতি ছাড়াইয়া অন্য কিছু করিবার সময় হয় নাই। কিন্তু রামমোহন, যে, বঙ্গের এখনকার অধিকাংশ উদারনৈতিকদের মত প্রতিবাদ-আবেদন-সর্ব্ব্ব ছিলেন না, তাহা ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, তিনি বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের রিকর্ড্‌বিল পাস্ না হইলে তিনি ঐদেশের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন। এটা ত এক প্রকার চূড়ান্ত অসহযোগের অভিপ্রায়। তা ছাড়া, তিনি বরাবর প্রকাশ্যভাবে, কোন জাতি বিদ্রোহ বিপ্লবাদি দ্বারা স্বাধীন হইলে তাহার সহিত সহায়ত্ব প্রকাশ করিতেন, স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাতে প্রকাশ্যভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। রামমোহন এখন বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা দেশের উদারনৈতিক দলে নিশ্চয়ই ভূক্ত থাকিতেন, বলা যায় কি ?

লোকমান্য টিলককেও এখন উদারনৈতিক দলে টানা হইতেছে। কিন্তু আগেকার উদারনৈতিক অর্থাৎ মজারেটরা এক্ষমিষ্ট বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেন।



শ্রী মনোমোহন গোস্বামী

তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এখন কি হইতেন ও করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

উদারনৈতিকদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও একটা কথা স্বরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। উদারনৈতিকরা ইহা মানেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ইহা জানেন এবং মর্নার জীবনস্মৃতিতেও ইহা আছে, যে, একষ্ট্রিমিষ্ট্ অর্থাৎ চরমপন্থী দল থাকার অন্তই মডারেটদিগকে নিজের দলে টানিবার নিমিত্ত (to “rally the Moderates”) ব্রিটিশ গবর্নেন্ট্ ভারতবর্ষকে অল্পখল রাজনৈতিক অধিকার দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বোমানিক্বেপক হইতে আরম্ভ করিয়া নরমতমপন্থী পর্য্যন্ত সকলেই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে কেবল নিজদের কৃতার্থতার কথাই বলিলেও, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক আদালতে কেহই একা ষোল আনা ডিক্রী পাইবেন না, কেহ সম্পূর্ণ বঞ্চিতও হইবেন না। অতএব, উদারনৈতিকদের নীতির

কখনও ফলোৎপাদন-শক্তির অভাব লক্ষিত হয় নাই (“has never been found wanting”), কৃষ্ণকুমার-বাবুর একথা ঠিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বঙ্গবিভাগ রহিত হইয়াছিল উদারনৈতিকদের কনস্টিটিউশন্যাল আন্দোলনের ফলে, ইহা কৃষ্ণকুমার-বাবুর অন্ততম দাবী। প্রথমতঃ, বঙ্গবিভাগ ঠিক রহিত হয় নাই; কারণ, প্রধানতঃ বঙ্গালীর অধ্যুষিত এমন অনেক স্থানকে বঙ্গের বাহিরে ফেলা হইয়াছে, যাহা আগে বঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গবিভাগের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধি অতুলব্যবস্থা এখনও বজায় রাখা হইয়াছে। দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, বঙ্গ হিন্দু-মুসলমানের অমিল বাড়াইয়া ও জাগাইয়া রাখা, এবং সরকারী বাংলা প্রদেশের সীমা একরূপ করিয়া নির্দ্ধারণ করা যাহাতে উহার হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা মুসলমান অধিবাসীদের চেয়ে কম থাকে। এই উভয় উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তাহার বিচার এখানে করিতেছি না। তৃতীয়তঃ, ঠিক আইনসম্মত আন্দোলন বলিতে এখন উদারনৈতিকরা যাহা বুঝেন, বঙ্গবিভাগ কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই পরিবর্তিত হয় নাই। বিলাতী পণ্যবর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নিমিত্ত যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহারও কার্যকারিতা কিছু ছিল। অস্টিমাকুলার সোসাইটির কাজ সরকারী নিয়ম মানিয়া চালান হয় নাই। তদ্বিন্ন যে-সব বে-আইনী কাজ হইয়াছিল, তাহার নিমিত্ত বঙ্গবিভাগ পরিবর্তন করিতে গবর্নেন্ট্ কিছু লোকদেখান দেয় করিতে বাধ্য হইলেও সেগুলোও যে পরিবর্তনের অন্ততম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোখলে-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতির বর্তমান সভাপতি মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আইনসম্মত আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেও বলিয়াছেন, যে, ইংরেজ নিজের দেশে যে-সব পরিবর্তন করিয়াছে তাহারও কতটা ঐ সকলের অতুল যুক্তিতর্কের প্রবলতাবশতঃ ও স্ত্রায়ের অসুরোধে এবং কতটা যে উপদ্রব ও অসুবিধা এড়াইবার জন্য তাহা বলা কঠিন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, আফিকার কেতলা দেশে খেতকারদের অন্তায় জেদ বজায় থাকিবার এবং ভারতীয়দের স্ত্রায় আবেদন অগ্রাহ্য

হইবার কারণ এই, যে, খেত ঔপনিবেশিকেরা যেরূপ সমূলক ভয় দেখাইতে পারিয়াছিল, ভারতীয়েরা তাহা পারে নাই। আমরাও বে-আইনী উপদ্রবের সমর্থন করি না। ছুঁচ ফুটাইয়া মাতৃষকে কেবল ভ্যাকুই করা হয়। অবশ্য, বিজ্রোহের মত বিজ্রোহ কেহ করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি আমাদের মত সম্পাদকদের অহুমোদনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত না।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্যসিদ্ধির জন্য কোন পথটা ভাল, তাহা নির্দেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা কেহই দেখাইতে পারিবেন না, যে, কেবল কোন একটি প্রণালীর দ্বারাই কার্যসিদ্ধ হইয়াছে।

কৃষ্ণকুমার-বাবু উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, যে, অসহযোগ লোকদিগকে শিখাইয়াছিল, যে, কোন স্বার্থত্যাগ না করিয়া, প্রাণ না দিয়া এবং গায়ে আঁচড়টি মাত্রও না লাগাইয়া, কেবল চরখা ঘুরাইয়া তিন মাসে স্বরাজ পাওয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, ইহাতে মহাত্মা গান্ধী ও অন্ত কোন কোন নেতার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। স্বরাজ লাভের তারিখ নির্দেশ করায় গান্ধীজির ভ্রম হইয়াছিল, ইহা আমরাও আগে বলিয়াছি। কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, দরকার হইলে প্রাণ দিতে হইবে কিন্তু প্রাণ লইতে হইবে না, ইহা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি এবং আরও কেহ কেহ খুব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। বন্দী-দশা-প্রযুক্ত কাহারও কাহারও চিরতরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, কেহ বা মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন।

তাঁহার দলের লোকেরা সবুকারের ধামাধরা, চাকরীর উন্মোচন, সাধারণ লোকদের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, ইত্যাদি অপবাদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকুমার-বাবু যে-সব লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সত্য; যদিও অন্ত কতকগুলি নামজাদা ও অনামজাদা উদারনৈতিক যে ঐরূপ অপবাদের যোগ্য, ইহাও ঠিক। কিন্তু রাজনীতির কথা বলিতে গিয়া তিনি বিজ্ঞানে, বিচারকার্যে, আইনব্যবসায়, চিকিৎসায়, অজ্ঞোপচারে, বাণিজ্যে, যে-সব বাঙালীর কৃতিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত

এক সময়ে আমাদের কিছু রাজনৈতিক কথাবার্তা আদি হইত। তাহাতে তাঁহাকে উদারনৈতিকের উল্টা বলিয়াই আমাদের ধারণা আছে। তা ছাড়া, রসায়নী বিদ্যার অহুশীলন কেহ উদারনৈতিক বা কোন রাজনৈতিক মত অহুসারে ত করে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই করিয়া থাকে; এবং তাঁহার অস্ত্র বল যে উদারনৈতিক না হইয়া কখন কখন দারুণ চরমপন্থী হয়, তাহাও ত সর্বজনবিদিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এখন রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক, কোন সম্পর্কই রাখেন না। আগেও রাখিতেন না, কিন্তু তাঁহার মতের সহিত ভগিনী নিবেদিতার ‘অহুদারনৈতিক’ কোন কোন মতের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাসের বা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের আইন ব্যবসায়ের কৃতিত্ব যদি উদারনৈতিকগণ তাঁহাদের গৌরবের খাতায় জমার ঘরে লেখেন, তাহা হইলে অন্ত দলের লোকেরা মহাত্মা গান্ধীর, দেশবন্ধু দাশের ও পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর আইন ব্যবসায়ের কৃতিত্বও তাঁহাদের খাতায় জমা করিতে পারেন। ৬শুরেশ সর্কাদিকারী লিবার্যাল মত অহুসারে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন বলিয়া ভুলি নাই; এলোপ্যাথী মতেই করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার কৃতিত্ব উদারনৈতিকদের খাতায় জমা হইলে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কৃতিত্বটা কোন দলের খাতায় জমা হইবে? ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা এলোপ্যাথী মতেই হয়, লিবার্যাল মতে হয় না; এবং তাঁহার রাজনৈতিক মত ষতটুকু জানি, তাহাতে তাঁহাকে অফিশ্যাল লিবার্যাল কিম্বা কৃষ্ণকুমার-বাবুর মত দলের প্রতি নিষ্ঠাবান্ উদারনৈতিক বলিয়া মনে হয় না।

প্রভুত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির নিকট হইতে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব আদায় করিবার পক্ষে উদারনৈতিক পন্থাই যথেষ্ট; তাহাদের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইবার বা তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করিবার জন্য অন্ত কিছু করা অনাবশ্যক; কেহ ওরূপ কিছু করিলে তাহা ফলপ্রসূ হয় না; ইত্যাদি কথা বুঝাইবার জন্য মিত্র-মহাশয় কশিয়া, আয়ল্যাণ্ড, ইটালী, অস্ট্রিয়া ও পোর্টুগ্যালের ইতিহাসের উল্লেখ করেন। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সব দেশের

ইতিহাস কতকটা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা ভুল বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন।

কোন প্রকার ডিরেক্ট্‌র্যাঙ্কশন অর্থাৎ স্বাবলম্বনমূলক কোন কাজ করিয়া গবর্নেন্টের উপর চাপ দিবার মত অবস্থা আজকাল ভারতবর্ষের নাই, ইহা সব দলের লোকেই কার্যতঃ এবং অনেকে মুখেও স্বীকার করেন। কিন্তু কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টিশন বা রাষ্ট্রবিধি অমুদায়ী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন দেশের লোক জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে নাই, বা স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কোন উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাস-বিরোধী কথা।

শ্রী মোরোপন্ত জোশী তাঁহার অভিভাষণে কৃষ্ণকুমার-বাবু অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

“আর একটি প্রশ্ন যাহার উত্তর সকলে আশা করেন, তাহা এই, যে, গবর্নেন্টের উপর চাপ দিবার এবং আমাদের জাতির স্বাধীন হইবার ইচ্ছাকে আত্মশক্তির দ্বারাই ফলবতী করিবার নিমিত্ত উদারনৈতিকেরা কি প্রণালী অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। উদারনৈতিকদের আমাদের জাতির উপর প্রচুর বিশ্বাস সত্তত বিদ্যমান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যদি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচকেরা এবং জাতির অপর সমুদয় লোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অনেক বেশী মনোযোগ দেন ও আগ্রহ দেখান, তাহা হইলে, ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বশাসন অধিকার দিবার জন্য গবর্নেন্টের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারা যায়। সর্বসাধারণের মনে স্বাধীন হইবার দৃঢ় ইচ্ছা জন্মাইতে হইবে, এবং ভারতীয় জ্ঞানপদ ও পৌরবর্গের জন্মগত অধিকারের কথা সর্বদা পুনঃ পুনঃ বলিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতাকামী মনোভাবের প্রগাঢ়তা সাধন করিতে হইবে। উদারনৈতিকদের এখনও কনস্টিটিউশনাল প্রণালীর উপর আস্থা আছে; তাঁহারা মনে করেন, উহার কার্যকারিতা এখনও সম্যক্রূপে পরীক্ষিত হয় নাই। রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তির চরম উপায় স্বরূপ কিছুই অরমম্বনের অযোগ্য বলা হইতেছে না; নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন ও গবর্নেন্টের কাজে

বাধাপ্রদান ত নহেই, বিপ্লব পর্যন্তও বাদ দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু উদারনৈতিকেরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন, জাতির সমুচিত প্রস্তুত হওয়া ব্যতিরেকে গবর্নেন্টের উপর খুব সামান্য চাপই দেওয়া যায়। কেবল দৃঢ় কিড়িমিড়ি এবং মাটির উপর সদস্ত পদাঘাত আত্মসম্মত সঙ্গত নহে, কার্যোদ্ধারের উপযোগীও নহে। প্রতিনিধি নির্বাচকদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুত করিবার দিকে আমরা সমুদয় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিলেই এমন এক সময় আসিবে, যখন শাসনকর্তারা নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন ও বিপ্লব ঘটতে দেওয়া অপেক্ষা দেশের লোকদের দাবীতে সায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিবেন। লোকদিগকে যথেষ্ট প্রস্তুত না করিলে গবর্নেন্টকে আমাদের অভীষ্টসাধন করিতে বাধ্য আমরা করিতে পারিব না; এবং লোকেরা একবার প্রস্তুত হইলে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন দরকার হইবে না।”

মোটী অক্ষরে ছাপা কথাগুলির উপর আমরা পাঠকদিগকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে মোরোপন্ত জোশী সদ্য সদ্য মধ্য-প্রদেশের শাসনপরিষদের সভ্যের পদ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মতে, প্রয়োজন হইলে, বিপ্লব পর্যন্ত বৈধ। বিপ্লব দ্বারা অনেক জাতি আপনাদিগকে বন্ধনমুক্ত ও উন্নত করিয়াছে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ না থাকিলে জোশী মহাশয় একথা বলিতেন না। তিনি বলিতেছেন, লোকদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানবান্, সচেতন, ও আগ্রহান্বিত করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য কতি স্বীকার করিতে, ত্যাগ করিতে, মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখ সহিতে প্রস্তুত ও সমর্থ হইবে। ভাষা ভিন্ন হইলেও জোশী মহাশয়ের কথার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কথার তাৎপর্য একই। পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রধান যে প্রস্তাবটি পেশ করেন, তাহারও অভিপ্রায় যে ভিন্ন নহে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

কৃষ্ণকুমার-বাবু জমীদার ও রাজ্য, ধনিক ও শ্রমিক, “উচ্চ” জাতি ও অবনমিত জাতিদের স্বার্থের বিরোধ এবং অসন্তোষ দূর করিয়া সামঞ্জস্য ও সন্তোষ উৎপাদনের যে-সব

পক্ষা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। ইহাও ঠিক যে, “সত্য ও ধর্মের পথ দিয়া ভিন্ন আমরা মহৎ ও শ্রেয়ঃ কোন ফল লাভ করিতে পারি না।” তিনি আরও বলিয়াছেন :—

“আপনি সংযোগী বা অসংযোগী, সামাত্রিক সাম্যবাদী বা স্বরাজী, উদারনৈতিক বা স্বতন্ত্র,—যাহাই হউন, আমরা সকলেই এক মাতৃভূমির সন্তান, এবং একই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী।...আমুন আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া সকলের চেষ্টা সম্মিলিত করিয়া আমাদের সকলের একই যে লক্ষ্যস্থল তাহার দিকে অগ্রসর হই।”

স্মার মোরোপন্থ জোশীর অভিভাষণ স্মৃতিস্তম্ভ, এবং গবর্নেন্টের যে-সব সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহার কোন জবাব দেওয়া সরকার পক্ষের লোকদের পক্ষে সহজ হইবে না। তিনি শাসনপরিষদের সভ্য ছিলেন এবং পুলিশ ও শাসনবিভাগের ভার তাঁহার হাতে ছিল। সরকার বলিতে পারিবেন না, যে, তাঁহার সমালোচনা অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ লোকের অজ্ঞতাপ্রসূত অনধিকার-চর্চা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, ডায়ার্কির অর্থাৎ ঘৈরাঙ্গোর প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ইহার নিফলতা সন্দেহে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরেজদের ভারতবর্ষে শাসক ও প্রভু হইয়া থাকিবার একটা ওজুগত এই, যে, তাঁহারা না থাকিলে সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। উত্তরে তিনি বলেন :—

“আমি আশা করি, কোনও ইংরেজ এরূপ ভরসা রাখেন না, যে, তাঁহার জাতি অনন্তকাল এদেশে রাজত্ব করিবে। সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় সকলের প্রতি অস্ত্রায় আচরণ হইবার ভয়টা ব্রিটিশ জাতির মুখে বড়ই অশোভন। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডে যে রোমান কাথলিকদের অসহ্য দুঃবস্থা ছিল, সে বিষয়ে ইংরেজরা কি বলেন? [সেই দুঃবস্থার প্রতিকারের জন্ত কি ইংলণ্ডে কোন বিদেশী জাতির প্রভুত্ব প্রয়োজন হইয়াছিল?] যে ইংলণ্ড প্যালেটাইনে প্রতিকূল সংখ্যাভূমিষ্ট বেছুইন্ আরবদের মাঝখানে সংখ্যায় ন্যূন কতকগুলি ইহুদীর বসবাস করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন, সেই ইংলণ্ড এদেশে

সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় সকলের যুক্তিসঙ্গত অধিকার স্বরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিতে পারেন।”

জোশী মহাশয় ভারতীয় সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিয়া বলাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তৃতাটির কোথাও উদারনৈতিকদিগের শ্রেষ্ঠত্বসূচক কোন কথা নাই, অস্ত্রাদলের প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ব্যঙ্গ নাই। তিনি বলিয়াছেন—

“ইংরেজরা যাহাই মনে করুন, অস্ত্র যে সব ভারতীয় দলের আমাদের সকলেরই সামান্য লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার প্রণালী উদারনৈতিকদের অবলম্বিত প্রণালী হইতে ভিন্ন, উদারনৈতিকদিগকে তাহাদিগের শত্রু মনে করিবার কোনই কারণ নাই।”

আশা করি জোশী-মহাশয়ের স্বদেশভক্তি ও সদাশয়তা প্রসূত এই কথাগুলির মধ্যে যে মিত্রভাব ও ভ্রাতৃত্বভাব রহিয়াছে, অস্ত্র দলের লোকেরা তাহার আত্মরিক প্রতিদান করিতে পারিবেন।

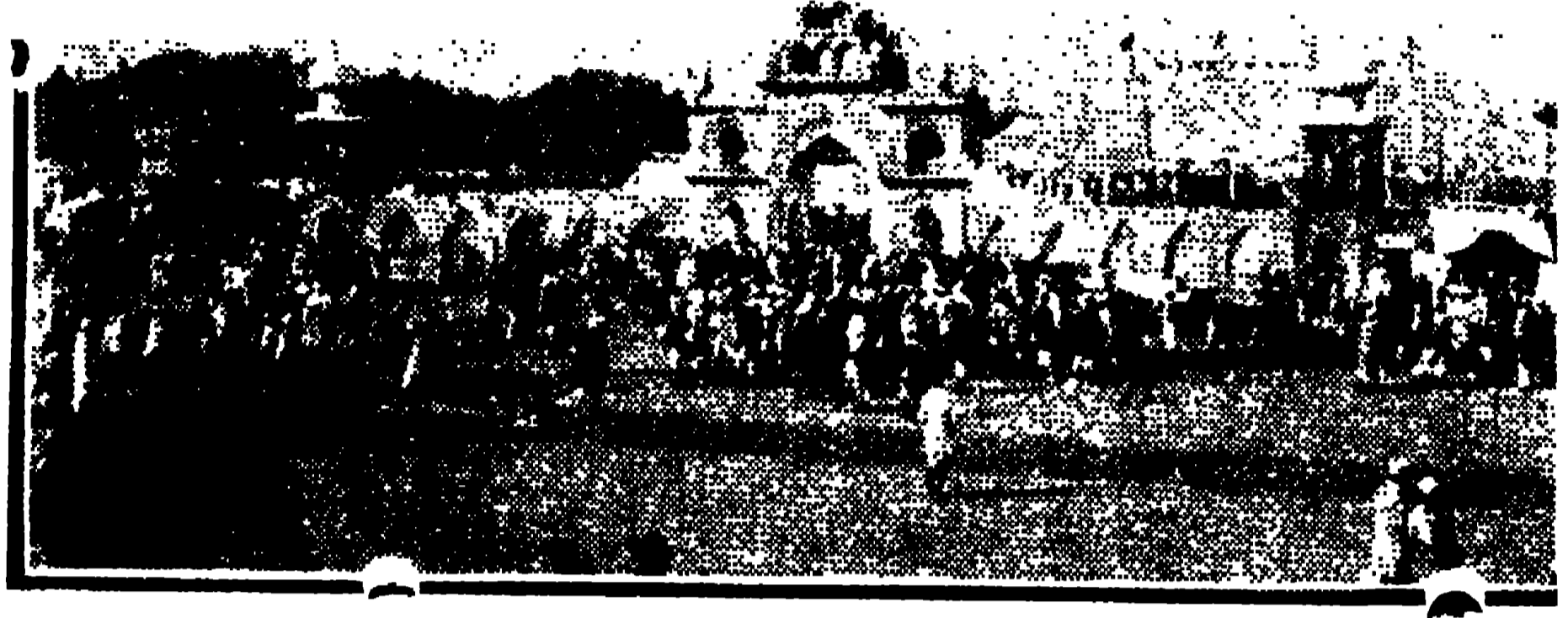
অতঃপর তিনি বলিতেছেন :—

“তাঁহাদের কার্যপ্রণালী যতই দুর্ভাগ্যজনক ও পরি-
তাপের বিষয় হউক, উদারনৈতিকেরা অসহ্য করুন, যে,
সকল দলের লোকেই একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছেন।
যে-সব অবস্থা ও ঘটনাবশতঃ মহাত্মা গান্ধী এবং দাশ
ও নেহরু মহাশয়দের মত লোকের এরূপ মনের ভাব
জন্মাইয়াছে, যে, তাঁহারা সহযোগিতায় পদাঘাত করিয়া
বাধাপ্রদাননীতি পরামর্শসিদ্ধ মনে করিয়াছেন—
তাঁহা অবশ্যই শোচনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক এবং
যে গবর্নেন্ট, সেই সকলের জন্য দায়ী তাহাকে
নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের দাবী সন্দেহে নিজের ভাবগতিক বিষয়ে
পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের জাতির দিক
হইতে ভাবিয়া দেখিলে, এই সঙ্কটসময়ে সকল রাজ-
নৈতিক দলের ঐক্য অতীব বাঞ্ছনীয়, উদারনৈতিকেরা,
স্বতন্ত্রতা, স্বরাজীরা, ব্যতীহার-সহযোগবাদীরা, সকলেই
এক কর্মপদ্ধতির অমুমোদন করা কঠিন মনে করিবেন না,
ইহা খুবই সম্ভব।”

গত কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞা

প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতা লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা যে সকল প্রকার আত্মসম্মান-সম্বন্ধ, সত্যানুসারী, বৈধ উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী, তাহা অনেক বৎসর ধরিয়া বার বার বলিয়াছি। অতএব কংগ্রেস যে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের উপর আমাদের জাতীয় দাবী গ্রাহ্য

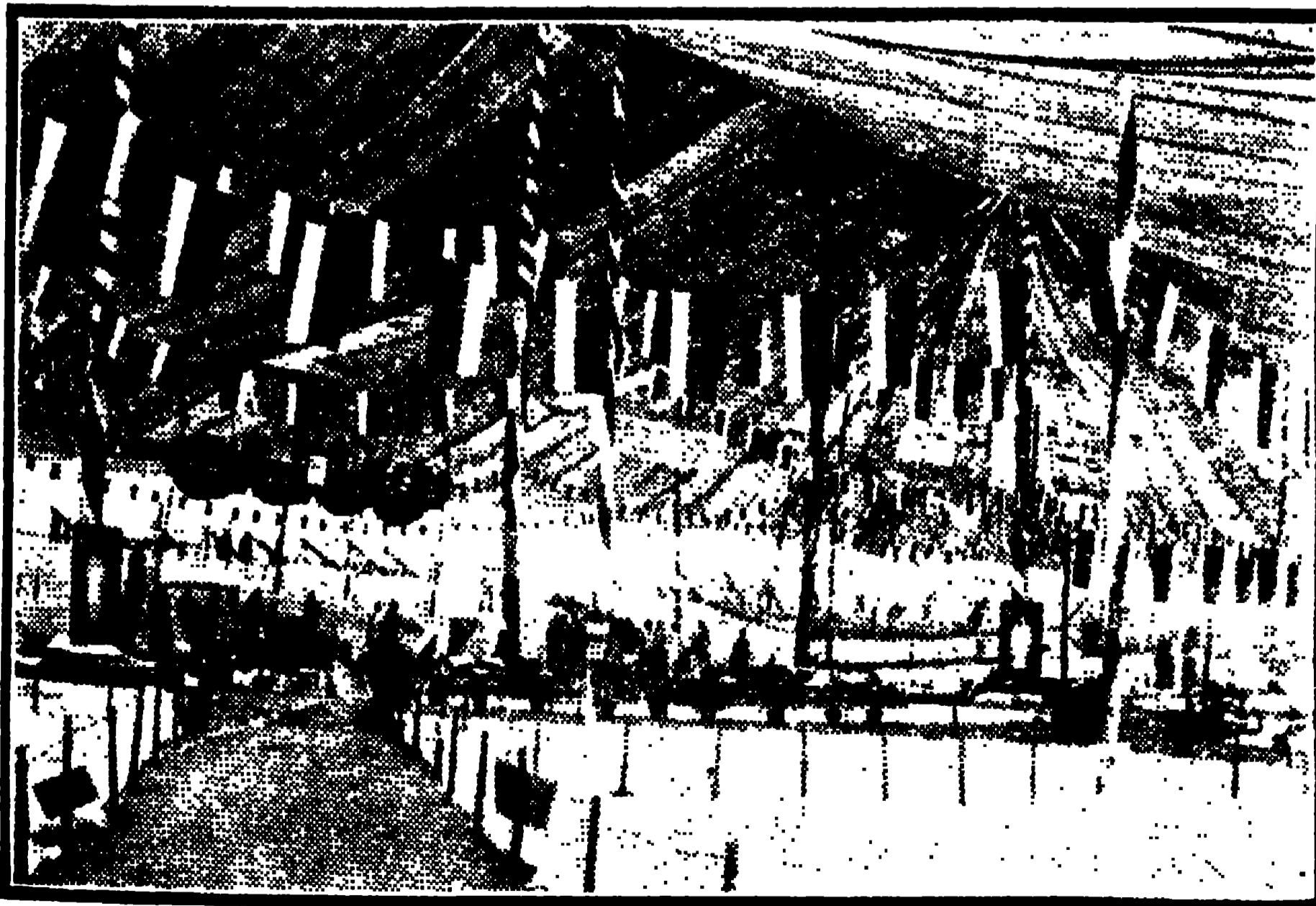
করিতে গবর্নমেন্টকে বাধ্য করিবার ও জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার একমাত্র নিশ্চিত ফলদায়ক শেষ উপায় বলিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আস্থা ও বিশ্বাসকে আমরা অহুচিত মনে করি না। কিন্তু এবারকার কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞায় নিরুপদ্রব আইন অগ্রাহ্য করিবার কথা যে-ভাবে আনা হইয়াছে, তাহা আমরা সুবিবেচনা ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে করি না। সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা



কংগ্রেস-মণ্ডপের ভোরণ-দ্বার

রক্ষা করিয়া কাজ হাসিল করা রাজনৈতিক কার্য-প্রণালীর উদ্দেশ্য। কংগ্রেস্ চান, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে জাতীয় দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং যাহা ঐ সভায় অনুমোদিত হইয়াছিল, গবর্নমেন্ট তাহাতে সম্পূর্ণ বা মোটামুটি সম্পূর্ণ সাহায্য দেন। এই অভিপ্রায়ে কংগ্রেস্ সংক্ষেপতঃ বলিতেছেন, যে, গবর্নমেন্ট যদি ফেব্রুয়ারীর

শেষের মধ্যে আমাদের দাবাতে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস দেশের লোককে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত করিতে বা অধিকতর বলশালী করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা একপ্রকার ভয়-প্রদর্শন, কিম্বা রাজনৈতিক পেঁচাল ভাষায় ইহাকে সব্বকারের উপর চাপ দিবার চেষ্টা বলা যাইতে পারে।



কংগ্রেস-মণ্ডপের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ধমকে কাজ কখন হয়, দেখা যাক। একটা দেশের সহিত যদি কোন বিষয় লইয়া অল্প একটা দেশের ঝগড়া-বিবাদ হয়, তাহা হইলে করিয়াদী দেশ যদি তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বলে, “তোমরা আমাদের কথা না শুনিলে যুদ্ধ করিব।” তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি না হইলে করিয়াদী দেশ সত্য সত্যই যুদ্ধে প্রস্তুত হয়। অভিযুক্ত প্রতিবাদী দেশ জানে, যে, বাদী দেশের যুদ্ধ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা ও সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে বাদীর দাবী ভাল করিয়া বিবেচনা করে, নতুবা করে না। কিন্তু যদি বাদী দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকে, প্রতিবাদী দেশকে কেবল বলে, “তোমরা আমাদের কথা না শুনিলে আমরা সৈন্যসংগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে, তাহাদের বেতনের টাকার জোপাড় করিতে, কামান গোলা বারুদ তৈয়ার করিবার নিমিত্ত খনি হইতে লৌহ সোরা প্রভৃতি উত্তোলন করিতে ও অস্ত্রের কারখানা নির্মাণ করিতে, এবং যুদ্ধ জাহাজ বানাইবার নিমিত্ত অরণ্যের গাছ কাটিতে আরম্ভ করিব,” তাহা হইলে প্রতিবাদী দেশ বাদীর কথা বিবেচনা করিতে খুব সত্বর ও অভিনিবিষ্ট না হইতেও পারে।

যদি রামের কোন প্রবল প্রতিবেশী শ্রাম, রামের কোন জমীদার বা আর কিছু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে রাম তাহার সহিত তর্কযুক্তি করিতে পারে, শ্রায় ও ধর্মের কথা বলিতে পারে, তাহাতে ফল না হইলে বলপূর্বক নিজের অধিকার পুনঃস্থাপন করিবার চেষ্টা করিবার ভয় দেখাইতে পারে। যদি রামের সত্য সত্যই শক্তি থাকে, লাঠি-সোঁটা থাকে, তবেই সে ভয় দেখাইতে ও তাহার দ্বারা কাজ হাসিল করিবার আশা করিতে পারে। কিন্তু যদি রাম শ্রামকে বলে, “তুমি যদি আমার জিনিষ আমাকে না দাও, তাহা হইলে আমি ছোলার চাষ করিব, এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত ছোলা ভিজাইয়া খাইয়া ডন্ বৈঠক আরম্ভ করিব; যখন গায়ে জোর হইবে, তখন তোমাকে দেখাইব,” তাহা হইলে শ্রামের তৎক্ষণাৎ ভয়ে তটস্থ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী হইবে না।

কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞায় গবর্নেন্টকে একটা

মিয়াদ দিয়া যে শাসন হইয়াছে, তাহা কতকটা কল্পিত রামের শেখোক্ত কল্পিত ব্যবহারের সদৃশ।

নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্য করা প্রয়োজনহলে খুব বৈধ। তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ খুব বৈধ। তাহার জন্য দেশকে প্রস্তুত করাও খুব বৈধ। কিন্তু যখন কংগ্রেসের শেষ প্রতিজ্ঞাতেই দেখা যাইতেছে, যে, দেশ উহার জন্য প্রস্তুত নহে, প্রস্তুত করিতে হইবে, তখন, ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গবর্নেন্ট ভাল ছেলে না হইলে দেশকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইবে বলায়, গবর্নেন্টের উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। তার চেয়ে, যে-সব উপায় অবলম্বন করিলে দেশ প্রস্তুত হইবে, বিনা বাক্য অপব্যায়ে তাহা বরাবর করিতে থাকিলে এবং যথা সময়ে গবর্নেন্টকে চূড়ান্ত সর্ভ দিয়া তাহাতে গবর্নেন্ট রাজী না হইলে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন অভিযান আরম্ভ করিলে ভাল হইত।

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গের বাহিরে যে-সকল মানবপ্রেমিক সাধু ব্যক্তি চরিত্রবলে ও লোকহিতসাধন দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছেন, লাহোরের স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। আশ্রী-অযোধ্যা প্রদেশে কানপুরে তাঁহার জন্ম হয়; কিন্তু তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশ তিনি পঞ্জাবেই যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি চাকরীতে নিযুক্ত থাকিবার সময়েও দেশহিত ব্রত পালনে সর্বদা সচেতন থাকিতেন। তাঁহার একখানি পিউরিটি-সার্ভেন্ট অর্থাৎ পবিত্রতার সেবক নামক ইংরেজী কাগজ ছিল। তাহা তিনি বহু বৎসর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চালাইয়াছিলেন। স্বরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য তিনি ইহাতে লিখিতেন। তাঁহার সভাসমিতিতে বক্তৃতা আদি দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেন। পিউরিটি-সার্ভেন্টের অন্য একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক অপবিত্রতা ও পাপাচার দূর করা। পঞ্জাবে ও পশ্চিমের সর্বত্র আগে হোলীর সময় অশ্লীল গান ও গালাগালির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল; এখন কিছু কমিয়া থাকিলেও



অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

তাহা সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। এই অশ্লীলতার জন্ত পথে ঘাটে, এমন-কি কখন কখন অস্ত্রপুরেও, জ্বালোকদিগকে অতিষ্ঠ হইতে হয়। অবিনাশবাবু ইহা দমন করিবার জন্ত “পবিত্র হোলী” প্রবর্তিত করেন। এই অহুষ্ঠানে লোকে দল বাঁধিয়া নিরাবিল গাঁত ও বাঘ এবং বকৃত্তা উপভোগ করিত। লাহোরে ইহা বহু বৎসর চলিয়াছিল এবং তাহাতে লোকে আনন্দিত ও উপকৃত হইত। এক বৎসর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া প্রমুখ প্রধান লোকদিগকে লইয়া এলাহাবাদেও মজুমদার মহাশয় পবিত্র হোলী করিয়াছিলেন। পিউরিটি-সার্ভেঞ্চে তিনি নির্ভীক ভাবে পঞ্জাবের অনেক নামজাদা লোকদের চারিত্রিক সমালোচনা করিতেন। গরীব লোকদিগকে ঔষধ দেওয়াও তাঁহার অন্ততম কাজ ছিল। এই কাজ করিবার সময় তাঁহাকে অনেক সময় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির রোগীও দেখিতে হইত। তাহার অনেক সময় নিজেদের দেহ তাঁহাকে ছুঁইতে দিতে চাহিত না। তিনি তাহাদিগকে,

কখন কখন দয়াকার না থাকিলেও ছুঁইয়া দেখাইতেন, যে, তাহাতে কোন কুফল হয় না।

কাংড়া উপত্যকায় ভূমিকম্পে যখন বিস্তর লোক বিপন্ন হয়, তখন তিনি উদ্যোগী হইয়া টাকা তুলিয়া লোকের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিলেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও অন্তর্গত কোন কোন ছুর্ভিকের সময়েও তিনি প্রধান কর্মী হইয়া দরিদ্রদিগের সেবা করিয়াছিলেন।

সিমলা নগর ঘাইবার পথে ধরমপুর নামক স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্ত যে স্বাস্থ্যনিবাস আছে, তাহা স্থাপনের জন্ত তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী ছিলেন।

তিনি সাধু ও ভক্ত লোক ছিলেন। বাংলায়, হিন্দীতে ও ইংরেজীতে তাঁহার ভগবদারাধনা প্রাণম্পর্শী হইত। তিনি বকৃত্তাও এই তিন ভাষায় বেশ করিতে পারিতেন।

শিখ ধর্মগ্রন্থ তিনি উত্তমরূপে অচরণের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকৃত “অপজীর” অহুবাদ এলাহাবাদের পাণিনি আফিস প্রকাশিত করিয়াছেন। “সুখমণি”র অহুবাদ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালীদের সুমুদ্রিত ও সুপরিচালিত মুখপত্র “উত্তরা” মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

তিনি চাকরী হইতে অবসর লইবার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইদানীং কয়েক বৎসর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বৎসরের অনেক সময় সিমলা ঘাইবার পথে সোলন নামক স্থানে বাস করিতেন।

মোস্লেম লীগের প্রধান প্রতিজ্ঞা

মোস্লেম লীগও যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, মুসলমানেরাও যে অধিকতর রাষ্ট্রীয় ক্রমতা ও অধিকার চান, তাহা লীগের গত অধিবেশনের প্রধান প্রতিজ্ঞা হইতে অহুমিত হয়। ইহা সন্তোষের বিষয়।

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচনের আমরা চিরবিরোধী। আমাদের বিরোধিতার কারণ অনেক। কেবল দুটির উল্লেখ এখানে করিব।

আলাদা আলাদা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথা অল্পস্বারে কখনও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি স্মার্য বিচার হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি ধর্মসম্প্রদায় নাই। তা ছাড়া, জৈন, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ইহুদী, শিখ, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। দাক্ষিণ্যভারতে আবার ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণ ভেদকে উগ্র করিয়া তোলা হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে রোমান কাথলিকরা প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টিয় প্রতিনিধির কার্যে ও কথায় বারবার অসম্মতি জানাইয়াছেন। শিখদের ও জৈনদের মধ্যেও নানা দল আছে। মুসলমানদের শিয়া সূফী ভেদ আছে। কোন নিয়ম চালাইতে হইলে তাহা প্রথমতঃ স্মার্য নিয়ম হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, তাহা স্মার্যভাবে প্রযুক্ত হওয়া চাই। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন আমরা স্মার্য মনে করি না। উহাকে স্মার্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উহার স্মার্যস্বার্থ প্রয়োগ অসম্ভব। যে-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যত, তাহাকে সেই অনুপাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এইরূপ নিয়ম অল্পস্বারে যদি কাহারও ভাগে আড়াই, কাহারও ভাগে পাঁচ ও একতৃতীয়াংশ জন প্রতিনিধি পড়ে, তাহা হইলে কয়জন প্রতিনিধি কাহাকে দেওয়া হইবে? আড়াইএর জায়গায় তিন, পাঁচ ও একতৃতীয়াংশের জায়গায় চয় দিলে বেশী দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে অল্প কাহারও ভাগে কম পড়িবে; আবার যথাক্রমে দুই ও পাঁচ দিলেও কম দেওয়া হইবে ও অন্তের ভাগে বেশী পড়িবে। যে-উপায়ই অবলম্বন করা যাউক, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি স্মার্য ব্যবহার করা যাইবে না ও সকলকে খুশি করা যাইবে না।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন দ্বারা সকল সম্প্রদায়কে খুশি করা যাইবে না বলিয়া ঐ পথে সমগ্র ভারতীয়ের জাতীয়সংহতি (national solidarity) ও জাতীয় একতাপাদন (national unification) কখনও উৎপাদিত ও সম্পন্ন হইবে না।

প্রতিনিধির ভাগও যে কোথায় থাকিবে, বলা যায় না। যদি ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণের আলাদা প্রতিনিধি হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অত্রাহ্মণেরা, বিশেষতঃ

“অস্পৃশ্য”রা কেন আলাদা আলাদা প্রতিনিধি চাহিবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

মুসলমানেরা যে-সব কারণে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চান, তাহার একটি এই, যে, তাহা না পাইলে তাঁহাদের স্বার্থ অবহেলিত হইবে। তাঁহারা যে-সব প্রদেশে সংখ্যায় অল্প সকলের চেয়ে বেশী নহেন, তথাপি তাঁহারা সংখ্যায় অল্পপাত অল্পস্বারে প্রতিনিধি পাইয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলেন, যে, তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা একরূপ হওয়া চাই যে, তদ্বারা তাঁহাদের মত কার্যকরভাবে (effectively) এবং যথেষ্টরূপে (adequately) ব্যক্ত হইতে পারে। ঠিক এই দাবী অল্পস্বার্থ ব্যবস্থা করিতে হইলে, যে-যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা কম, সেখানেও শতকরা ৫০ জন প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে দিলে তবে মুসলমান প্রতিনিধিদলের প্রতিনিধিত্ব কার্যকর ও যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে বাকী শতকরা ৫০ অল্প সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন করিয়া স্মার্যভাবে ভাগ করা যাইবে, এবং তাহাদের সম্মতি কেমন করিয়া উৎপাদিত হইবে?

ইহা বলিলে চলিবে না, যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশী, অতএব তাহাদিগকেই সংখ্যায় অল্পপাতের অধিক প্রতিনিধি দেওয়া হউক;—অন্তের ভাগে যাহাই ঘটুক। কারণ, যদি সংখ্যায় ন্যূনদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন দ্বারা হয়, তাহা হইলে যাহারা যত অধিকংকর, সংখ্যায় যত কম ও দলের সংহতি হিসাবে যত দুর্বল, তাহাদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনই তত বেশী স্মার্যতঃ যে-সব ধর্মসম্প্রদায় খুব ছোট, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তত বেশী হওয়া দরকার।

যাহারা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি চান, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার, যে, তাঁহাদের ঐরূপ প্রতিনিধি থাকায় ব্যবস্থাপক সভার অল্প সভারা তাঁহাদের হিতাহিত সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও তাঁহাদের অভিযোগ করিবার স্মার্য কারণ থাকে না।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মত কি বলিলাম। এখন, উহার প্রয়োজন মানিয়া

লইয়া কিছু বলিতে চাই। কেবল মুসলমানদের সম্বন্ধেই কিছু বলিব। কারণ, কেবল তাঁহারা এই সমগ্র ভারতবর্ষের আলাদা প্রতিনিধি চাহিয়াছেন; দক্ষিণভারতে ভিন্ন অন্তর্ভুক্ত অত্রাঙ্গণেরা আলাদা প্রতিনিধি চান নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মতভেদ আছে।

মুসলমানদের আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে গ্রাহ্য ব্যবস্থা এই, যে, সব প্রদেশেই তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে; যেখানে তাঁহারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হইবে, যেখানে সংখ্যায় যেরূপ কম, প্রতিনিধির সংখ্যাও সেইরূপ কম হইবে। মোস্লেম লীগের গত অধিবেশনে মোলানা মহম্মদ আলী প্রধান প্রস্তাবের এইরূপ একটি-গ্রায়সঙ্গত সংশোধন সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। যাহা পাস হইয়াছে, তাহাতে এই দাঁড়ায়, যে, লীগ চান, যে, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী হইবে, এবং যেখানে তাঁহারা অন্ত কোন ধর্মসম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় কম, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধি সমষ্টির মত বা ভোটকে কার্যকর (effective) এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী (adequate) করিবার নিমিত্ত সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশীসংখ্যক প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার হইবে। এইজন্য, মুসলমানদের মধ্যে যাহারা গ্রায়পরায়ণ তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ মোলানা মহম্মদ আলী এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে, সব প্রদেশেই মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের নির্বাচন কি প্রকারে হওয়া উচিত, তাহাও বিচার্য। মুসলমানদের কাগজে পত্র এবং সভা-সমিতির প্রস্তাবে ও বক্তৃতায় যাহা দেখা যায়, তাহাতে এই ধারণা হয়, যে, অধিকাংশ লিখনপঠনকর্ম মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমান নির্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারা মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচন চান। আমাদের বিবেচনায় সর্বসম্প্রদায়ের সম্মিলিত নির্বাচক-

মণ্ডলীর দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান অমুসলমান সমন্বয় সভার নির্বাচন হওয়া ভাল। এই প্রণালীর বিরুদ্ধে মুসলমানেরা বলেন, যে, তাহা হইলে সেইসব মুসলমানেরাই অধিকাংশ স্থলে নির্বাচিত হইবেন, যাহারা হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত প্রিয়পাত্র। তাহা তাঁহারা চান না। এইরূপ লোকদেরই নির্বাচন হইবে কি না বলিতে পারি না এবং তাহা হইলে মুসলমানদের কি ক্ষতি হইবে, জানি না। কিন্তু শুধু হিন্দুরাই উ নির্বাচক নহেন, মুসলমানেরাও নির্বাচক, এবং যে সব প্রদেশে মুসলমানদের লোকসংখ্যা বেশী, কালক্রমে ও শিক্ষায় ও সম্পদে ঐ সম্প্রদায়ের উন্নতিসহকারে উহার নির্বাচকসংখ্যাও বাড়িবে। তখন প্রধানতঃ মুসলমানদের ভোটের জোরেই মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। তা ছাড়া, বর্তমান অবস্থাতেও সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা হইলে যেমন এক দিকে মুসলমান সভাদিগকে কতকটা অমুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তেমনি অমুসলমান সভাদিগকেও মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের এই অগোষ্ঠ-নির্ভরতা উ জ্ঞানগঠনের পক্ষে ভালই।

মোস্লেম লীগের প্রস্তাবের আর-একটি অংশে বলা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির এরূপ কোন পুনর্গঠন হইবে না, যাহাতে কোন প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যার আধিক্য ন্যূনতায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কোনও প্রদেশকে ছোট বা বড় করিবার যত গুরুতর কারণই থাকে না, তাহা করা বন্ধ রাখিতে হইবে, যদি তাহাতে ঐ প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্য নষ্ট হয়। ইহা হইতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, যে, উক্ত প্রস্তাবের সমর্থকগণের মনে অমুসলমানদের প্রতি আশঙ্কা এবং নিজেদের স্বার্থবোধ এত প্রবল, যে, তাঁহারা চিরকালের জন্য কোন কোন প্রদেশে সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিয়া স্বার্থ রক্ষা করিতে চান, অমুসলমানদের সহায়ত্ব প্রীতি প্রদান ও মানবহিতৈষণার উপর একটুও নির্ভর করিতে চান না, অথচ অমুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলনকালে ও দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প জলপ্রাবন ঝড় প্রভৃতি হইতে জাত বিপদের সময় মুসলমানদের প্রতি প্রীতি ও সহায়ত্ব কার্য দ্বারা

প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও খাদিপ্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, অন্তর্গত জাতির উন্নতি বিধায়িনী সভা প্রভৃতি কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ অমুসলমান কর্মী ও দাতাদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, মুসলমানগণ বহুলপরিমাণে তদ্বারা উপকৃত হইতেছেন।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়

মোটর গাড়ীর ধাক্কায় আহত হইয়া মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের অকালে আকস্মিক মৃত্যু হুঃপের কারণ হইয়াছে।

১৯০১ সালে যে বার কলিকাতায় বৌদনস্ফোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে তেজস্বিতাব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণীস্থ রাজারাজ্জড়ারা ওরূপ বক্তৃতা প্রায় করেন না। নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনের কাণ্ডে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কনফারেন্সেও তাঁহার বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ্যে আন্দোলনের সময় কলিকাতায় টাউনহলে প্রতিবাদ সভায় তিনি মন খুলিয়া বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি বাংলা গদ্যে ও পদ্যে সুলেখক ছিলেন, এবং কয়েকখানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনেক বৎসর “মানসী ও মর্ম্মবাণী” মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গীতবাদ্য ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বয়ং সুদক্ষ বাদক ছিলেন।

ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় তাঁহার সখ্ ছিল, এবং নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন ও খেলার দলের জন্য অর্থব্যয় করিতেন।

তিনি দয়ালু, দানশীল ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন।

সমগ্র ভারতীয় সমাজসংস্কার কনফারেন্স কংগ্রেসের অধিবেশন যেখানে হয়, সেখানে সমাজ-

সংস্কার কনফারেন্সের অধিবেশন হইবার একটি প্রথা বহুবৎসর পূর্বে হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। কানপুরে এবার সমাজসংস্কারের জন্ম কোন সভার অধিবেশন হয় নাই। কিন্তু উদারনৈতিক সংঘের কলিকাতায় অধিবেশনের সঙ্গে সমাজসংস্কার সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজসংস্কার কেন হওয়া উচিত, তাহার কারণ অনেক। পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি গ্ৰাঘ্য সমান ব্যবহারের জন্ম উহা আবশ্যিক, নারীর কল্যাণার্থ উহা আবশ্যিক, শিশুমঙ্গলের জন্ম উহা আবশ্যিক অবনমিত লাক্ষিত ও উৎপীড়িত জাতিসমূহের উন্নতি ও তাহাদের সহিত সপ্রেম ও গ্ৰাঘ্য ব্যবহারের জন্ম উহা আবশ্যিক, সমাজ-রক্ষার জন্ম উহা আবশ্যিক—এইরূপ নানা কারণ বিদ্যমান। তত্ত্বিন্ন, সমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা ও রক্ষা করা অসম্ভব। ইহা অসম্ভব করিয়া মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরাকরণের উপর এত জোর দিয়াছেন। তত্ত্বিন্ন তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের আবার বিবাহ দিবার সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্মভূমি গুজরাটেও নারীর অবরোধ-প্রথা নাই, এবং তিনি উহার সমর্থনও করেন না। কিন্তু আজকাল কংগ্রেস গাহাদের হাতে পড়িয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ সমাজসংস্কারের বিরোধী না হইলেও উহার এতদূর আবশ্যিকতায় হয়ত তেমন বিশ্বাস করেন না। সম্ভবতঃ সেইজন্য কানপুরে অন্য নানা সভার স্থান ও কালের অভাব না হইলেও সমাজসংস্কার সভার জন্ম সময় ও স্থান হয় নাই।

কলিকাতার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বে প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ। পণ্ডিত মহাশয় অনেক খাটি-কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি স্বাধীনতার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। আধুনিক জগতে অন্য মহৎ জাতিসমূহের সহিত একত্র অগ্রসর হইতে হইলে যে ভারতীয় সমাজের সুসংহত হওয়া দরকার তাহাও তিনি প্রদর্শন করেন।

আল্‌বাট্‌ হলে সভার অধিবেশন হয়। শেষাংশেই হলে তিলমাত্রও স্থান ছিল না। অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন, এবং কেহ কেহ সভার কাজে বক্তৃতা দিবার যোগ দিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার আরও দ্রুত বিস্তার-চেষ্টা, বালিকাদের বিবাহের বয়স আরও বৃদ্ধি, অবরোধ-প্রথার বিনাশ, বরপণ-গ্রহণ-প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাদের বিবাহ ও তাহাদের দুর্দশা মোচন, জাতিভেদের বন্ধনেব শিথিলতা-সাধন, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা বালিকা ও স্ত্রীলোকদের সমাজে পুনর্গ্ৰহণ, নারীদিগকে পুরুষদের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান, চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্বরা ও অন্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিবারণ, বায়োফ্লোপ ও পিয়েটাবগুলির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা, ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলায় বিবেচনা, বালিকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য উদ্ধারার্থে স্থাপন, যে-সব প্রদেশে বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য আইন নাই, তথায় তাহা প্রণয়ন, দেবোত্তরাধিকার সম্পত্তির আয়ের অপব্যয় নিবারণ ও সদ্যয়ের ব্যবস্থা করণ, এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্ভাব রক্ষা—এই সমুদয় সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতাগুলি শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিশেষ-ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

মন্ত্রীদের বেতন

যারা কাজ করে, তাদের মজুরী পাওয়া উচিত, এটা খুব সোজা কথা। কিন্তু সেই মজুরীটা কে দিবে, তাহাও স্থির হওয়া উচিত। বাংলার মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন গবর্নর সাহেব। সেই নিয়োগ ব্যবস্থাপক সভা অস্বীকার করেন নাই; কারণ মন্ত্রীদের বেতন উহাতে একাধিকবার নামঞ্জুর হইয়াছিল। অতএব মন্ত্রীদের বেতন লাটসাহেবের নিজের পকেট হইতেই দেওয়া উচিত ছিল। অন্তর্দিকে যে-ব্যবস্থাপক সভা বেতন নামঞ্জুর করিয়াছিল, তাহাই আবার উহা মঞ্জুর করিল। ইহাকেই বলে মতিমৈথি। অবশ্য, যদি সভা মহাশয়দিগকে টাকাটা নিজের ট্যাক হইতে দিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় অটল থাকিত। যাহা হউক, ভূতপূর্ব

মন্ত্রীদিগকে যে শেষপর্য্যন্ত ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে হইল না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে খুসীর বিষয়।

শিক্ষাবিভাগের ভার বহন

দৈরাজ্য ব্যবস্থায় শিক্ষাটা 'হস্তান্তরিত' বিষয়, এবং ইহার ভার কোন একজন মন্ত্রীর উপর পড়িবার কথা। বক্ষে এখন দৈরাজ্য নাই। তথাপি যখন শাসন-পরিষদে দুজন বাঙালী সদস্য আছেন, তখন তাঁহাদের একজনের উপর শিক্ষার ভার দিলে দৈরাজ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে অসুবিধা কাজ হইত। কিন্তু গবর্নরের হইয়াছে বিপদ। তিনি শাসন-পরিষদের বাঙালী সদস্য করিয়াছেন একজন হিন্দু মহারাজাকে ও একজন মুসলমান নবাবকে। কাহারও শিক্ষা একরূপ নহে, যে, তাঁহাকে প্রাথমিক পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার পর্য্যায়পর রূপে ভার দিতে পারেন। সুতরাং তিনি শেষে অধমভারণ সিবিলিয়ানের শরণ লইয়াছেন—শিক্ষাবিভাগের ভার পড়িয়াছে ডোনাল্ড্‌ সাহেবের উপর। শিক্ষা বিষয়ে ইহার কি অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে জানি না। হয়ত খুব আছে; কিন্তু না থাকিলেও ক্ষতি নাই। অরবিন্দ ঘোষ যখন হাজতে ছিলেন, তখন যে কারাকাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে, তাঁহাকে সরকার বাহাদুর সুবিবেচনা ও ভবিষ্যৎদর্শিতা সহকারে যে যোগিত্বনোচিত সামান্য তৈজসপত্র দিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্ভুক্ত একটি বাটীকে তিনি সিবিলিয়ান্‌ আপত্তি দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, যে, সিবিলিয়ান্‌রা যেমন সরকারে, পারদর্শী, তেমনি তাঁহার ঐ বাটীটা তাঁহার পিপাসানিবারণ, ভোজন, স্নান, শৌচ-নির্কাহ, প্রভৃতি সরকারে সহায় ছিল।

যাহা হউক, গবর্নমেন্ট যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করেন, তাহাতে বুদ্ধিমতাই প্রকাশ পায়। কারণ, স্ত্রীর আক্‌র রহিম সাহেব সম্প্রতি বলিয়াছেন, তিনি যতদিন সদস্য ছিলেন কখনও তাঁহার হিন্দু সহকর্মী নদিয়ার মহারাজার সহিত কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। ইহাতে ইংরেজের দেশ-শাসনের সুবিধা খুবই হয়। হিন্দু সদস্য ও মুসলমান

সদস্য একমত হইলে ততটা সুবিধা হইত না। অতএব মুসলমান রহিম সাহেবের জায়গায় অন্ত একজন মুসলমান নিয়োগ ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু রহিম সাহেব শিক্ষিত লোক ছিলেন, শিক্ষাবিভাগের ভার বহন করিতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোক ত আরও অনেকে আছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কেন নিযুক্ত করা হইল না? যোগ্যতম লোকদের নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ নিয়োগ হইলে, নিযুক্ত ব্যক্তির কোন ধর্মাবলম্বী তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

মুসলমানদিগের চাকরীর সুবিধারূপ

বাংলা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং ভবিষ্যতে মুসলমানেরা শিক্ষায় ও যোগ্যতায় সমান অগ্রসর হইবার পর কোন সরকারী নিয়মের সাহায্য ব্যতিরেকেও অধিকাংশ চাকরী তাঁহাদের হইবে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে কিন্তু সরকারী নিয়ম করিয়া তাঁহাদিগকে চাকরী দিতে হইতেছে। তাহাতে মুসলমান শিক্ষিত লোকদের সংখ্যার অল্পপাতে তাঁহাদের যত চাকরী পাওনা হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী চাকরী তাঁহারা পাইবেন। বন্ধের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে, এমন কি লিখনপঠনক্ষম লোকদের মধ্যেও, শতকরা ৪৫ জন মুসলমান নহেন। কিন্তু কোন কোন বিভাগের চাকরী তাঁহারা শতকরা ৪৫টি পাইবেন। আমরা প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের নিয়োগের পক্ষপাতী, এবং বিশ্বাস করি, যে, এরূপ নিয়ম পরিণামে মুসলমানদিগের পক্ষেও কল্যাণকর। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা মুসলমানেরা ভালভাবে গ্রহণ করেন না বলিয়া বেশী কিছু লিখিব না। কেবল একটা কথা বলিলে আশা করি তাঁহারা তাহা হইতে আমাদের কুবুদ্ধির কোন প্রমাণ আবিষ্কার চেষ্টা করিবেন না। সেটা এই, যে, যতগুলি চাকরী মুসলমানদের পাওনা, সেইগুলিতে নিয়োগ কেবল মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ফল দ্বারা করা হউক। তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা, যোগ্যতা, ও স্বাধীনচিত্ততাকে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

যে-যে কারণ দেখাইয়া বাংলা গবর্নমেন্ট কোন কোন

বিভাগে শতকরা ৪৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিতে চাহিয়াছেন, তাহার দুই-একটির আলোচনা করিব।

সরকার বলেন, অফিসারেরা মুসলমান হইলে মুসলমান প্রজারা তাঁহাদের নিকট যত সহায়ত্ব পায়, অমুসলমান অফিসারদের নিকট হইতে ততটা পায় না। তা ছাড়া, মুসলমান অফিসারেরা মুসলমানদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও পরামর্শ, উৎসাহ প্রভৃতি বেশী দিয়া থাকেন। এই তথ্য-দুটি সত্য কি না, স্থির করিবার যত উপকরণ আমাদের নিকট নাই। মুসলমানপ্রধান জেলা ৬ মহকুমাসমূহে মুসলমান অফিসারদের লোকহিতকর কার্য ও অমুসলমান অফিসারদের লোকহিতকর কার্যের তালিকা পাইলে বিচার করা যাইত।

যাহা হউক, তথ্যগুলি ঠিক বলিয়া মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, বাঙালী হিন্দুর ভাল করিবার জন্ত বাঙালী হিন্দু অফিসার চাই, বাঙালী মুসলমানের ভাল করিবার জন্ত বাঙালী মুসলমান অফিসার চাই, বাঙালী খৃষ্টিয়ানদের ভাল করিবার জন্ত বাঙালী খৃষ্টিয়ান অফিসার চাই, ইত্যাদি;— তাহা হইলে ইংরেজ অফিসারদের স্থান ও আবশ্যক কোথায়? না, তাঁহারা স্বর্গের জীব, স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মী সকলেরই হিতসাধনের জন্ত তাঁহাদের সৃষ্টি হইয়াছে? বাংলা দেশে সরকার যে কারণ দেখাইতেছেন, সেইরূপ কারণে অন্য কোন সভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অফিসার নির্দিষ্ট অল্পপাত-অল্পসারে নিযুক্ত হয় বলিয়া আমরা অবগত নহি। কাহারও জানা থাকিলে সে-সব তথ্য কোন্ বহির কোন্ পাতায় লেখা আছে জানাইলে উপকৃত হইব। বিলাতের কথাই জিজ্ঞাসা করি। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে, বিশেষতঃ আয়ারল্যাণ্ডে রোমান ক্যাথলিক আছেন ও প্রটেস্ট্যান্ট আছেন; প্রটেস্ট্যান্টদের নানা উপশাখার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এইসব প্রদেশে খৃষ্টিয় ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত কি আলাদা আলাদা অফিসার নিযুক্ত হয়?

রহিম সাহেব মাফ করিবেন; প্রকৃষ্টা করাই বোধ হয় ভুল হইল। কারণ, তিনি তাঁহার অতুলনীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতের (বোধ করি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর

ছেলার) হিন্দু মুসলমানরা বিলাতের প্রটেক্ট ও
ও রোমান কাথলিকদের মত কেবল দুটা ধর্মসম্প্রদায় নহে;
তাহারা সভ্যতায়, আচারব্যবহারে ঐতিহ্যে ইতিহাসে
জাতিতে (ভাষাটা বাদ পড়িল কেন?) একেবারে পৃথক
দুটি মানবসমষ্টি। যাহা হউক, তাহার বক্তৃতার আলোচনা
পরে করিবার ইচ্ছা আছে।

বাংলা গবর্নমেন্ট বলিতেছেন, যে, ডাক্তারী, এঞ্জি-
নীয়ারিং প্রভৃতি যে-সব বিভাগে বিশেষ রকম জ্ঞানের
দরকার সেখানে তদ্রূপ যোগ্যতা দেখিয়াই কর্মে নিয়োগ
করা হইবে, শতকরা ৪৫টির নিয়ম পাটিবে না। ইহার
মধ্যে তাহা হইলে উহা থাকে এই কথাটি, যে, হাকিমি
করিবার জন্য বিশেষ কোন রকম জ্ঞান বা যোগ্যতা
ততটা দেখিবার দরকার নাই। তাহা হইলে সবকার
চেয়ে বড় হাকিমি যে সিবিলিয়ানগিরি তাহার নিমিত্ত
প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা কেন করা হয়? এবং ঐ
সিবিলিয়ানগিরি কাঙ্গে শতকরা খুব বেশীসংখ্যক
ইংরেজ না থাকিলে ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর ইম্পাতের
'কাঠামো' খাড়া থাকিবে না—ইহাই বা কেন বলা হয়?

জাপান-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাট্

উদারনৈতিঃ সংঘের অধিবেশনে বাবু স্বরেন্দ্রনাথ
মাল্লিক বলেন—

“জাপান সম্রাট্ বলিয়াছিলেন. অতঃপর আমার দেশে
একটি গ্রামেও একটি নিরক্ষর পরিবার থাকিবে না, এবং
একটি পরিবারেরও একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবে
না। [তদনুসারে কাজও হইয়াছে।] আমাদেরও
সম্রাট্ এবং সম্রাট্-প্রতিনিধি আছেন। তাহাদের কাহারও
মুখে কখনও ওরূপ কথা শুনা গিয়াছে কি? তাহার
কারণটা সুস্পষ্ট। ভারত বিদেশীদের দ্বারা শাসিত;
আমাদের দেশের লোকদিগকে শিক্ষিত করা বিদেশী
শাসকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যিক নহে।”

জাপানে ও ভারতে কার্পাস-শিল্প

জাপানের মিলগুলিতে মোট ৪৮ লক্ষ টাকু আছে,
ভারতের মিলগুলিতে আছে ৮০ লক্ষ। কিন্তু তথাপি

জাপান সূতা ও কাপড়ের জন্য ভারতবর্ষের সমান কার্পাস
ব্যবহার করে, এবং ভারতবর্ষকে প্রতিযোগিতায় পরাস্তও
করিতেছে। জাপানের কারিকরদের শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ও
নৈপুণ্যে কিছুশ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্তিতে পারে; জাপানের আবহাওয়াও
হৃদয় বেশী পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু প্রধান
কারণ এই, যে, জাপানী মিলগুলিতে প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে
এক এক দল শ্রমিক এগার এগার ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট
২২ ঘণ্টা কাজ করে; ভারতবর্ষে কিন্তু মিলগুলিতে
সপ্তাহে ৬০ঘণ্টার বেশী কাজ হইবার জো নাই।

বঙ্গে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষা

বাংলাদেশের ইংরেজী যে-সব স্কুল হইতে ছেলেরা
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তাহাতে শিক্ষার উন্নতি করিবার
নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই করেন না; করিবার সময়
ও আয়োজনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। অথচ এগুলির
উন্নতি না হইলে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি পাকা হইতে পারে
না, ভাল করিয়া উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না,
প্রবেশিকা পরীক্ষা অধিকাংশ ছাত্র যে শিক্ষা পায়, তাহাও
নিকট-রকমের থাকিয়া যায়। এইজন্য, প্রবেশিকা
বিদ্যালয়গুলির প্রতি মন দিবার নিমিত্ত একটি বোর্ডের
প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গের সরকারী
বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের কনফারেন্সে সভাপতিরূপে
হাইকোর্টের জজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-
চ্যান্সেলর গ্রীভ্‌স্‌ সাহেব বলেন, যে, বোর্ডটি নিম্নলিখিত
সর্ত্তগুলি-অনুযায়ী স্থাপিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার
সমর্থন করিবেন :—

- (১) উহা গবর্নমেন্টের অধীন হইবে না।
- (২) উহাতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকিবেন।
- (৩) প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন
থাকিবে।
- (৪) বোর্ড স্থাপন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক
অবস্থা খারাপ হইবে না।

এই সর্ত্তগুলির আমরা সমর্থন করিতে রাজী আছি।
প্রথম দুটি তৎক্ষণাত আবশ্যিক। কিন্তু তৃতীয় সর্ত্তটি
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশ

ছেলেকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করিবার প্রথার ও তাহার মূলভূত কারণের উচ্ছেদের জন্ত কি ব্যবস্থা করিতে চান ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিব পরামর্শের পর গবর্ণমেন্ট বোর্ড স্থাপনের জন্ত আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদ্বিময়ক প্রস্তাবগুলি দেখিবার কৌতূহল আমাদের আছে। স্টেটসম্যান কাগজ এগুলি এন্টার-প্রাইজ দ্বারা ছাপিলে ভাল হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু ; দেশী কোন কাগজের এন্টার-প্রাইজ করিবার অধিকার নাই।

বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার কার্য

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ২৯টি বিধবার বিবাহের সংবাদ লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও সহকর্মীদের নিকট হইতে পাইয়াছেন। ১৯২৫এর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬৬৩টি বিধবা-বিবাহের সংবাদ সভা পাইয়াছেন। যথা, জাতি-অনুসারে—

ব্রাহ্মণ ৪৪৭, ক্ষত্রী ৫০৮, অরোরা ৫৭০, অগ্রবাল ১৮০, কায়স্থ ৭৬, রাজপুত্র ২০২, শিখ ২৫১, বিবিধ ৪২৯ ; মোট ২৬৬৩।

প্রদেশ-অনুসারে—

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ ২০৫৭, দিল্লী ৪১, সিন্ধু ৩৮, আগ্রা-অযোধ্যা ৩৫৬, দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ ৫, আসাম ৩০, বঙ্গদেশ ৭৩, মাদ্রাজ ২৩, বোম্বাই ১২, মধ্যভারত ১১, রাজপুতানা ১৭ ; মোট ২৬৬৩।

ডিসেম্বর মাসে সভা স্বেচ্ছাকৃত দান পাইয়াছেন ৮৪৮৭ এবং সম্বৎসরে ১৬৮৫৫০।

এই সভা স্মারু গঙ্গারাম ট্রাষ্ট সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত। স্মারু গঙ্গারাম তজ্জন্ত অনেক টাকা দিয়াছেন। লাহোরে একজন প্রবীণা মহিলার তত্ত্বাবধানে ইহার একটি বিধবা-আশ্রম আছে। তত্ত্বাবধায়িকা সর্বদা সেখানে থাকিয়া বিধবাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণাদির বন্দোবস্ত করেন। বিবাহার্থিনী যেকোন শ্রেণীর হিন্দু বিধবাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ঠিকানা স্মারু বিল্ডিংস, ম্যাকল্যাগ্যান রোড, লাহোর।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব

শ্রীহট্ট বহু পূর্বে বঙ্গের অংশ ছিল। ঐ জেলার লোকদের মাতৃভাষা বাংলা। উহাকে পুনর্ব্বার বাংলা দেশের অঙ্গীভূত করিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছিল ; এক্ষণে তাহা আসামের ব্যবস্থাপক সভাতেও গৃহীত হইয়াছে। আসাম গবর্ণমেন্ট আপত্তি করেন নাই। এখন সম্ভবতঃ ভারত গবর্ণমেন্টেরও মত হইবে। শ্রীহট্ট জেলার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইবে, এই আতঙ্কও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ্রের চেষ্টায় দূর হইয়াছে। আসামের আরও দুটি জেলার কোন কোন অংশের বাংলাই প্রধান ভাষা। সেই অঞ্চলগুলিও বাংলার অঙ্গীভুক্ত করা উচিত।

মানভূম জেলা বাংলারই অংশ। উহা পূর্বে বাংলা প্রদেশের অঙ্গীভূত ছিল। উহার অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। উহাকে বাংলা প্রদেশের সামিল করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এইরূপ সিংভূম জেলা, পাকুড় মহকুমা, সাঁকতাল পরগণার জামতাড়া মহকুমা এবং পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমা বঙ্গভাষাভাষী। এই সকল অঞ্চলও বাংলা দেশের সামিল হওয়া উচিত।

কলিকাতায় বড় দিন

“ভারতবন্ধু” স্টেটসম্যান বলিতেছেন, ১৯২৩ সালে রাজনৈতিক সিংসাহেবরোর প্রবলতাবশতঃ বড়দিন অর্গাৎ কষ্ট মাস তেমন জমে নাই ; কেননা, হুসং ইচ্ছার বাতাস নষ্ট হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে অবস্থাটা কিছু ভাল হইয়াছিল ; ১৯২৫এ ত মনে হইয়াছে যেন রাজনীতি বলিয়া ভিনিষটাই নাই। সম্রাটের নানা প্রমাণ ‘ভারতবন্ধু’ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটা এই—ভারতীয় লোকেরা ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে আবার উপহার দিতে আরম্ভ করিয়াছে ; বড় দিনে কলিকাতার রাস্তাগুলি ইউরোপীয়দের জন্ত উপহারের জিনিষে বোম্বাই দালাল ও অন্ত লোকদের গাড়ীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ! খ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বাস করেন, যে, ষীশু খ্রীষ্ট মানবজাতির মধ্যে সম্ভাব ও শান্তি বিস্তার করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানদের

মুখপত্র বলিতেছেন, এই সম্ভাবটা অষ্ট্রিয়ানরাই শ্বেত অষ্ট্রিয়ানদিগকে উপহার (অর্থাৎ কোন কোন স্থলে উৎকোচ) দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্বেত অষ্ট্রিয়ানরা অশ্বেত হীদেনদিগের প্রতি সম্ভাব বোধ হয় কেবল উপহার গ্রহণ করিয়াই প্রদর্শন করেন! কারণ, তাঁহারা তাহা-দিগকে কিছু দিয়াছেন বলিয়া ত সেটটুম্যানে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। যাহা শুউক, উপহার প্রদান দ্বারা সম্ভাব প্রদর্শন-বিষয়ে হীদেনরা শ্বেত অষ্ট্রিয়ানদের চেয়ে ভাল অষ্ট্রিয়ান।

বঙ্গীয় শিক্ষকদের কনফারেন্স

গত মাসে নোয়াখালিতে বঙ্গীয় শিক্ষকদের কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। খাচার্যা আর্কহার্ট সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যতটা শক্তি আছে, তাহা শিক্ষকদের প্রতি অগ্রায় ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এক্ষণে একটি ব্যবহার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন যদনুসারে কাজ হইলে শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতনের উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কল কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে সালিসী করিবার নিমিত্ত একটি সালিস্ বোর্ড স্থাপনের কথাও আলোচনা করিতেছেন। ইহা স্থাপিত হওয়া খুবই আবশ্যিক। শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধিও খুব দরকার।

গবর্ণমেন্ট গত বজেটে শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্য তিন লক্ষ টাকা রাখিয়াছিলেন বলিয়া এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড স্থাপন করিবার জন্য কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আর্কহার্ট সাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটিগুলির ও শিক্ষকদের পরস্পর সম্বন্ধের উন্নতি বিশেষ দরকার। কমিটির সভ্যে শিক্ষকদের অংশ আরও বেশী থাকা উচিত, এবং বর্তমানে যতটা আছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার-ভাবে ইহা স্বীকৃত হওয়া উচিত, যে, ম্যানেজিং কমিটিগুলি আছে ইন্সলসমূহের জন্য, ইন্সলগুলি ম্যানেজিং কমিটির জন্য নহে।

সভাপতি মহাশয়ের সব কথাই ঠিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

মিষ্টারু ল্যাংলী নামক একজন অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বোধ হয় বেশী দিন শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেছেন না— তাহার বিশেষ কোন কৃতিত্বের কথা শুনি নাই। পাছে তাঁর নিয়োগে তাহা অপেক্ষা বেশী দিনের অধ্যাপকরা গোলমাল করেন, এইজন্য নাকি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে তাঁহার পদ তাঁহাকে প্রথমে ত্যাগ করান হইয়াছে। এলাহাবাদের লীডার্স বলিতেছেন, মিষ্টারু ল্যাংলীর নিয়োগের কারণ নাকি এই, যে, তিনি দর্শনের অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র কোন বরাদ্দ নাই। তাহাই যদি কারণ হয়, তাহা হইলে এ দেশে ত দর্শনে তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত, দর্শনের অধ্যাপনায় তাঁহা অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এবং শিক্ষাদানকাষে তাঁহা অপেক্ষা বিচক্ষণ এমন একাধিক লোক আছেন, তাহারা কেবল ভাইস-চ্যান্সেলরের বেতন গইয়া অধিকতর দর্শনাধ্যাপকের কাজও করিতে পারিতেন ও করিতে সম্মত হইতেন।

লীডার্স জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“What is the meaning of such an appointment in a presidency so rich in educational and literary talent and experience?”

যে প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষা-দান-ক্ষমতা ও সাহিত্যিক শক্তিসম্পন্ন অভিজ্ঞ লোকের এত প্রাচুর্য, তথায় এরূপ নিয়োগের মানে কি?

আমরা নিকৃত্তর।

বালিতে রেলের পুল

বালিতে যে রেলের পুল তৈরী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতির জন্য এবং মাসুঘের হাঁটিয়া খাইবার জন্য পথ নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। এই সেতু হইলে মাল ও যাত্রী বহন দ্বারা রেলের আয় বাড়বে। সুতরাং ইহার ব্যয় সরকারী রেলওয়ে বজেট হইতেই দেওয়া উচিত। আর যদি গবর্ণমেন্ট কে সাধারণ বজেট হইতেই টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে শুধু বাংলা গবর্ণমেন্টই কেন টাকা দিবেন? ইহাতে অন্যান্য সকল প্রদেশের ও সমগ্র ভারতবর্ষের সুবিধা হইবে; সকলেরই টাকা দেওয়া উচিত।

সমগ্র বঙ্গের লাইব্রেরী কনফারেন্স

সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ সমুদয় গ্রামে ও নগরে লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়া উচিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপালটিগুলির নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত স্থানের লাইব্রেরীতে অর্থ সাহায্য করা উচিত। লাইব্রেরীর কাজ কিরূপে চালাইতে হয়, পুস্তক-তালিকা কেমন করিয়া শ্রেণী-বিভাগপূর্বক প্রস্তুত করিতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জিনিষ। এইসব ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত পুস্তকাদ্যক্ষ ও লাইব্রেরীর কার্যে অনুরাগী লোকদের সাধারণ সভা গঠিত হওয়া উচিত এবং তাহার বার্ষিক অধিবেশন হওয়া উচিত।

এবস্থিৎ নানা উদ্দেশ্যে গতমাসে কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাদ্যক্ষ চাপ্‌মান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি ছাড়া অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক মনোরঞ্জন রায়, অধ্যাপক ব্রিজ, শ্রীযুক্ত হুশীল কুমার ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের প্রশংসা

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় কেপ্‌টাউনের মেয়র মিস্টার ডব্লিউ এফ্‌ ফিশ্‌ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় উপনিবেশকদিগের প্রশংসা করিয়া বলেন—

“The Indians have been in South Africa since the year 1860, and no one will deny they have been good and law-abiding people. They are an intelligent and thrifty people...I know the Indian community to be honest, sober and law-abiding.”

“১৮৬০ সাল হইতে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে। তাহারা যে ভাল লোক ও সঠিক মানিয়া চলে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাহারা বুদ্ধিমান ও সঞ্চয়ী।...আমি জানি ভারতীয় লোকেরা সৎ, তাহারা নেশাখোর নয়, তাহারা আইনের বাধ্য।”

এইসব গুণে তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়-দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে বলিয়াই তাহাদিগকে সেদেশ হইতে তাড়াইবার ক্রম আইন হইতেছে।

মুসলমান নারীর জিৎ

গত মাসে আলিগড়ে মুসলমান শিক্ষা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। এইরূপ ইস্তাহার জারি করা হয়, যে, নারীদিগকে উহাতে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। তাহা সবেও বোম্বাইয়ের আটখা বেগম ও অন্ত কয়েক জন মহিলা উপস্থিত হন। আটখা বেগম নারীদের স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পরিশেষে তাঁহাকে বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। তাহার পর কলিকাতার মিসেস্‌ সখাওৎ হুসেন বক্তৃতা করেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি

চিত্রবিদ্যা, সংস্কৃতচর্চা এবং অন্যান্য বিষয়ে আধুনিক ভারতের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, সঙ্গীতে এখন অবধি ততটা হয় নাই। অবশ্য সকল দিক্ দিয়া দেখিলে সঙ্গীত যতটা এখনও ভারতীয়দিগের জীবনের সহিত জড়িত রহিয়াছে, অন্যান্য বিষয়গুলি ততটা নাই। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের সম্যক সাধনা ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন; দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে সঙ্গীতচর্চার স্থান এমনও নাই, তাহাও হওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এবিষয়ে আরও অনুরাগের সঞ্চার হওয়া আবশ্যিক।

আজকাল হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা আগরণের আভাস কিছু কিছু পাওয়া বাইতেছে। তাহার মধ্যে উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ অন্ততম। সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশকদের মধ্যে কলিকাতার ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্‌ এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “তান-মালা” নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দশমাত্রিক পদ্ধতিতে বাটটি গানের কথা, স্বরলিপি ও তান (স্বরলিপি) মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অষ্টাদশ কানাড়ার সবগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা ইহার অন্ততম বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত ইহাতে লিপিবদ্ধ দুই ও চৌদুই ছন্দের চারটিগুলিও মূল্যবান।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবাসী গ্রেস, কলিকাতা]



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩২

৫ম সংখ্যা

দ্বিজের ত্রিজত্ব

কী দেখি এ ! কী করুণা ! কী প্রেম ! কী স্নেহ !
 এত করুণা স্নেহ প্রেম দেখে নাই কতু কেহ ।
 যে যজ্ঞা সহিত্ত আমি বাধা পড়ি' গিয়া করমে ।
 ছাড়িব না চরণ প্রভু ছাড়িব না কোন জনমে ।
 জলিত্তেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার ।
 নাহি ঠাই আজিকে সেখা আনন্দ রাখিবার ॥
 দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাধা পড়ি গেল দিটি ।
 যত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি' ॥
 পাষাণে অঙ্কুরে বীজ করুণা-ধারায় তব ।
 ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব ॥

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিপথগা আনন্দলহরী

(১) ব্রহ্মার কমণ্ডলুনিঃসৃত মন্দাকিনী-লহরী
 আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ।
 ন বিভেতি কদাচন ।

ইহার অনুবাদ

ব্রহ্মের আনন্দ যে বুঝিয়াছে,
 ভরে না কতু সে কাহারো কাছে ।

(২) শঙ্করশিরোধৃত গঙ্গালহরী

যোগরতো বা ভোগরতো বা
 সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ ।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তে
 নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ।

ইহার অনুবাদ

যোগরত হোক ভোগরত হোক সঙ্গহীন বা সঙ্গরত ।
 ব্রহ্মে যে জন যোজিতচিত্ত আনন্দ তার অনবরত ।

(৩) বিষ্ণুপদবাহিনী নবীনা ভাগীরথী-লহরী

উথলে বিশ্ব তোমার অরূপম আনন্দ হইতে ।
 আনন্দে রহিবে নরনারীসবে তোমার সহিতে ।
 ইহা চেয়ে মঙ্গল কি আছে আর এতব সংসারে ।
 সাবাস মদ ভীমতপা, যে আনন্দে বধি' মারে ।
 ভীম কৈলা শরণন না জানি কী ফলের লোভে ।
 ভাবিয়া দেখিলে শকুনির মত পাপীকেই তাহা শোভে ।
 মুখ শিট্‌কান বিকট মূর্তি দেখিলে উপদ্রব ভয় ।
 তপস্যা ততটুকুই ভাল, যতটুকু দেহে সয় ।
 কাজ নাই তপস্যা আমার আনন্দ আমি চাই ।
 হেরিলে তোমার আনন্দরূপ কত না সুখ পাই ।
 তোমার আনন্দে করি ক্রবতারা ভাসাই তরণী
 ছাঁড়িলে পাইলে ভয়, তুমি মোর হও দিনমণি ।
 মাধন করি লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ ।
 মরণে সে ভরে না কতু, রহে যে ধরি' চরণ ।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

নমস্কারপূর্বক সবিনয় নিবেদন—

আমাদের পূজ্যপাদ ৮ষিপেঙ্গনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য শ্রীমতী হেমলতা দেবীর নিকট অরুণোদ-পত্র আসায় তিনি আমাকে ভাড়াভাড়া কিছু লিখিতে বলেন, যাহাতে তাহা প্রবাসী ও মর্ডার রিভিউর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইতে পারে। তাই ষৎকিঞ্চিৎ যাহা পারি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার বহু কথা আছে। ক্রমশ তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আজ এই সঙ্গে দুইটি কবিতা পাঠাইতেছি। ইহা তাঁহার শেষ রচনা। প্রথম কবিতাটি (দ্বিজের ত্রিভঙ্গ) মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্বে লিখিত। ৬ঠা মাঘ সোমবার রাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, আর তাহার পূর্ববর্তী বুধবারে শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য তিনি তাহার প্রক দেখিয়া দেন। দ্বিতীয় কবিতাটি (ত্রিপথগা আনন্দলহরী) তাঁহার শেষ রচনা। মৃত্যুর দিন প্রাতে এক-আধটু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান আকারে ইহা তিনি সমাপ্ত করেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন, কি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেসম্বন্ধে অল্প কিছু না বলিলেও ঐ কবিতা দুইটিতেই প্রকাশ পাইবে। তাহা ছাড়া ষাহারা তাঁহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, ষাহাদের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, মনের কথা ষাহাদিগকে বলিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট নিজের এক বিমল আনন্দের ও পরমা শান্তির কথা সঙ্কোচের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্প কিছু দিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধীকে ইনি একখানি পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে এইরূপ একটি কথা ছিল যে, তিনি এক এমন শান্তি

পাইয়াছেন, ষাহার পর আর কিছু অভিলাষ করিবার নাই। তিনি বলিতেন বহুদিন পূর্বে একবার তিনি এইরূপ আনন্দ, এইরূপ শান্তি অল্পভব করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও তাহার আশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই ঘটনা নারদের প্রথম ভগবদ্দর্শনের কথা মনে করাইয়া দেয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৮ষিপেঙ্গনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইত। ভগবানের যে তাঁহার প্রতি কত করুণা, তিনি যে তাঁহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, ইহা তিনি প্রায়ই বলিতেন। উপনিষদে আছে, পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পরে বালকের মত থাকিবে। তাঁহার মধ্যে ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এবিষয়ে অনেক কথা আছে। পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। তিনি যে জীবনের শেষ ভাগে অনেক সময় অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার বালকোচিত সরলতা ও বিচিত্র পরিহাসপ্রিয়তা শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল। আলস্য তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু লিখিতেন, মৃত্যুর দিনেও ইহার অন্তথা হয় নাই। তাঁহার শেষ কবিতার শেষ দুই চরণে লিখিয়াছিলেন—

“মাথায় করিয়া লব যবে তুমি পাঠাবে মরণ।

মরণে সে ভরে না কত, রহে যে ধরি' চরণ।”

মরণের ভয়ের কোন চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা যায় নাই। তিনি অতি স্থির ও শান্ত ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছুকণ তাঁহার মুখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই। ইতি

আপনাদের

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*
* *

অনিল যে অন্ধবে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে অপমান করে' এসেছে এই খবরটা অনলের কাছে গিয়ে আপিসেই পৌঁছল। অনিল যে ধনিষ্ঠাকে অপমান করেছে সে কথা কাছারীময় ছড়িয়ে পড়েছিল; সকল কর্মচারীরা এই ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার নিয়ে চুপি চুপি আলোচনা করছিল; অনল তখন কার্য-উপলক্ষে তার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়েছিল; সেই ঘরের পাশের ঘরের লোকেরা জানতে পারেনি যে, পাশের ঘরেই অনল আছে; কাজেই তারা এই কথা অস্বীকারেই আলোচনা করছিল। তাদের আলোচনা অনলের কানে গেল। অনল এই পর্যন্ত বুঝলে যে, অনিল ধনিষ্ঠার কাছে গিয়ে তাকে অপমান করে' এসেছে। কোন্ বাক্য বা আচরণে অনিল ধনিষ্ঠার অপমান করেছে তা সে স্মৃতে পেল না, শোন্বার উৎসুক্যও প্রকাশ করা উচিত মনে করলে না। সে স্বভাবতঃই গম্ভীর; অনিলের আগমনের পর থেকে সে আরো গম্ভীর হয়ে গেছে; এই সংবাদে সে আরো গম্ভীর হলো; কিন্তু কেউ তার গম্ভীর্যের হাস্যবুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারলে না।

সে আপিসের কাজ করে' নিয়মিত সময়েই বাসায় ফিরে গেল।

আজ ধনিষ্ঠা নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় অভিভূত হয়ে অনলের আপিস থেকে বাসায় প্রত্যাবর্তন দেখতে আসতে পারেনি।

অনিল দাদার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে পথ তাকিয়ে বাড়ীর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল; দাদার কাছে টাকা নিয়েই ছটার গাড়ীতে সে কলকাতা চলে' যাবে, খেনো খেনে তার অকিঞ্চিৎকর' গেছে, কুর্ভীর অভাবে তার প্রাণে ছাতা ধরে' বাছে।

অনল কাছে আসতেই অনিল বললে—দাদা, আমার টাকা দাও।

অনল তার পাশ দিয়ে চলে' যেতে যেতে বলে' গেল—টাকা আমার নেই; থাকলেও দিতাম না; তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করে' কর্তীঠাকরণকে অপমান করে' এসেছ।

অনিল কি বলতে' যাচ্ছিল, কিন্তু অনল তার কথা শোন্বার অন্তে অপেক্ষা করলেন না। অনিল দাদার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে একবার দস্তরমতো ঝগড়া জুলুম করে' টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে স্থির করছিল, কিন্তু তার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা হলো না, সে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। সে দেখলে ঠেলা-গাড়ীতে চড়ে' হাওয়া খেতে বেরিয়েছে তারই কস্তা প্রিসিলা। তার কস্তার বেশভূষা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে অনিলের ক্ষুদ্র চিও হিংসায় জলে' উঠল—এ বেটা তো আমার মেয়ে হয়ে দিবা স্থখে ঐশ্বর্যে আছে। আর আমি ওরই বাবা হয়ে একটু মদ খাবার টাকার অন্তে এর ঘারে ওর ঘারে হাত পেতে পেতে ক্যা ক্যা করে' বেড়াচ্ছি, তবু ভিক্ষা মেলে না!

এই কথা মনে হতেই অনিল গৌরীর দিকে এগিয়ে চলল।

ধনিষ্ঠা তার দুঃখ লজ্জা ভোলবার অন্তে আজ সমস্ত দিন গৌরীকে নিয়েই ছিল; সে তার স্বাভাবিক নিপুণতাকে স্নেহে নিপুণতর করে' তুলে গৌরীকে আজ নিজের হাতে সাজিয়েছে—সবচেয়ে ভালো দামী পোশাক পরিয়েছে, তার সব গহনা দিয়ে তাকে ভূষিত করেছে; এমন-কি তার ঠেলাগাড়ীখানাকে পর্যন্ত নানান রঙের রেশমী কাপড় কুঁচিয়ে ঝালর করে' সাজিয়ে দিয়েছে। আজ গৌরীও মায়ের স্বপ্নের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পেয়ে খুশী মনে বেড়াতে বেরিয়েছে।

অনিল এগিয়ে গিয়েই কস্তাকে সম্বোধন করে'

বললে—কি রে প্রিসি, তুই তো মস্ত বড় হয়েছিস, বেড়ে হুখে আছিস।

পিতৃসম্বন্ধনে গৌরীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠল, সে ভয়কাতর দৃষ্টিতে অবাক হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার তো এখনো অল্প অল্প মনে পড়ে এই মাতাল পিতার তার মায়ের উপর ও তার উপর অত্যাচারের কথা, আজই তো সে তার নূতন মাকে ভয় পেয়ে ঘরে পালিয়ে দরজায় খিল দিতে দেখেছে, যে ঘরে তার প্রবেশ নিবেদন সেই ঘরে যে তাকে নিয়ে তার মা চুকে পড়েছিলেন, সে তো কম বিপদের আশঙ্কায় নয়! গৌরীর শিশুচিত্ত মাতাল পিতাকে দেখে ভয়ে বিমথিত হচ্ছিল।

অনিল একেবারে গৌরীর কাছে গিয়ে বললে—বাঃ বাঃ! বেড়ে তোকা মুক্তার মালা পরেছিস তো! দেখি দেখি।

এই কথা বলেই অনিল বুকে মুক্তার মালাটা হাতে তুলে নিলে; ছ-একটা মুক্তার নিটোল দানা নখে খুঁটে আছুলে টিপে পরখ করে দেখলে মুক্তাগুলো বুটা কি না; যখন সেগুলোকে সাচ্চা বলে প্রত্যয় হলো তখন সে চর্ট করে গৌরীর গলার পিছনে হাত দিয়ে হারের খামী খুলে হারছড়া গৌরীর গলা থেকে খুলে নিলে।

অনিল গৌরীর হার খুলে নিতেই গৌরীর সজ্জের পরিচারিকার ও পাহারাওয়ালার মুখ শুকিয়ে গেল; পাহারাওয়ালার আনুদালী অনিলকে বললে—হজুর, মেম-দিদিমণির হার আপনি নিলে রাণী-মা হামাদের উপর গোসসা করবেন, হামরা কি বলে অবাবদিহি করব?

অনিল হারছড়া আমার পকেটে রাখতে-রাখতে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে—রেখে দে তোদের রাণীমার গোসসা। তোরা বলিস, মেম-দিদিমণির বাবা মেয়ের হার নিয়েছে। মেয়ের মিনিসে তো বাপেরই অধিকার।

অনিল আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে' নেশায় অবশ পদে যথাসম্ভব সত্বর টেশনের দিকে রওনা হলো।

গৌরীর রক্ষী অনিলকে চুরি করে' পালাতে দেখেও ম্যানেজার-বাবুর ভাই ও মেম-দিদিমণির পিতা বলে' তাকে বাধা দিতে পারলে না; গৌরীর অঙ্গ থেকে

কোনো অলঙ্কার অপহরণ নিবারণ করা তার কর্তব্য, কিন্তু ম্যানেজারের আতা ও রক্ষিতব্যার পিতাকে নিবারণ করা কর্তব্য কি না, এই ছুইয়ের মধ্যে রক্ষী বেচারী মহা ফাঁপরে পড়ে' গেল; যদি অনিলকে বাধা দিলে ম্যানেজার-বাবু বা রাণী-মা জুড় হন তা হলেও বেচারার চাকরী যাবে, আর চুরি নিবারণ করেনি বলে'ও যদি তারা কষ্ট হন তা হলেও বেচারার চাকরী যাবে! সে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হয়ে সজ্জের পরিচারিকাকে বললে—এ বিধু, তুমি দিদিমণিকে দেখো, আমি দৌড়ে ম্যানেজার-বাবুর কাছে এসেলা করে' আসি.....

সে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনলের বাড়ীর দিকে ছুটল। ব্যস্ত জন্ত ঘরে ডাকাডাকি করে' অনলের চাকরকে ডেকে সমস্ত বলার ও অনলের চাকরের বিষয় প্রকাশের পর সন্ধান করে' সে জানলে যে ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন কেউ জানে না। অনল বাড়ীতে গিয়েই অনিলের উপজবের ভয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল।

গৌরীর রক্ষী অনলের নাগাল না পেয়ে আবার ছুটে গৌরীর কাছে ফিরে গেল এবং পরিচারিকাকে বললে—এ বিধু, চলো বাড়ী ফিরে গিয়ে রাণী-মাকে এসেলা করি। ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই আছে।

তার জরতপদে বাড়ী ফিরে চলল।

এত শীঘ্রই গৌরীকে বেড়িয়ে ফিরিয়ে আনতে দেখে চাকর দাসী অনেকেই কারণ জিজ্ঞাসা করলে এবং বিধু ও রক্ষীর কাছ থেকে তারা ব্যাপার শুনেই একসঙ্গে অনেকেই ছুটল রাণী-মাকে এই চমৎকার খবর দিতে; কে আগে খবর দিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় রীতিমতো রেস্ লেগে গেল। একজন চাকর ছুই ছুই সিঁড়ি এক-সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—মা, মেম-দিদিমণির বাবা... ..

এই পর্যন্ত বলেই সে দম নেবার অস্তে একটু থামল।

ধনিষ্ঠা ঐটুকু কথা শুনেই মনে করলে, অনিল আবার হয়তো মস্ত অবস্থায় বাড়ীর ভিতর আসছে। ধনিষ্ঠা

সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—
কোথায় রে ?

ভৃত্য বললে—রাস্তায়.....দিদিমণির গলার মুক্তার
হার.....;

ধনিষ্ঠা এইটুকু শুনেই বুঝতে পারলে, কি ঘটেছে ;
সে স্থির শাস্ত হয়ে দাঁড়াল ।

ভৃত্য তার কথা শেষ করলে—খুলে নিয়েছেন ।

ধনিষ্ঠা ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তিনি কোথায় ?

এমন সময় বিধু গৌরীকে সঙ্গে করে' সেখানে এসে
উপস্থিত হলো ; সে ধনিষ্ঠার প্রশ্ন শুনে দূর থেকেই বললে
—তিনি ইষ্টিশনের দিকে চলে' গেল ।

ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হলো, তার সমস্ত চাকর দারোয়ানকে
সে হুকুম দে' যেখানে পাবে অনিলকে ধরে' নিয়ে
আসে ; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল অনিল অনলের
ভাই, গৌরীর জনক,—অনিলের অপমানে তাদের
অপমান । সে অচ্যুত স্বরে বললে—ম্যানেজার-বাবুকে
ধবর দেওয়া হয়েছে ?

বিধু নিকটে এসে বললে—ম্যানেজার-বাবু এইমাত্র
বাড়ীতে এসেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন ।

ধনিষ্ঠা সংবাদ-দাতা ভৃত্যকে বললে—দারোয়ানদের
বলো, পাঁচ সাত জন নানান দিকে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে
ধবর দিয়ে আনুক ।

ভৃত্য চলে' গেল ।

এতক্ষণে ধনিষ্ঠা গৌরীর দিকে মনোযোগ দিতে
পারলে ; তার মন মুখ দেখে সে ব্যথিত হয়ে তাকে
কোলে ভুলে নিলে এবং হাসবার চেষ্টা করে' বললে—
তোমার পাপা নিয়েছে নিকটে, আমি আবার তোমাকে
ওর চেয়ে ভালো হার কিনে দেবো ।

এই কথা বলে'ই ধনিষ্ঠার মনে পড়ল—অনিল তো
স্বযোগ পেলেই গৌরীর অলঙ্কার অপহরণ করবে ; ছেলে-
মাতুলকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে' রাখাও তো ঠিক হবে
না ; গহনার লোভে কত লোক তো শিশু-হত্যা করে
শোনা যায় ; পিতা হলেও মাতাল অনিল এ'কে তো
হত্যা করতেও পারে ; গৌরীর সঙ্গে রক্ষকেরা গৌরীর

পিতাকে ও ম্যানেজারের ভাইকে আজকের মতনই বাধা
দিতে দ্বিধা বোধ করবে, আর সেই দ্বিধার ফাঁকে এই কচি
প্রাণটুকু নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ধনিষ্ঠা এই ভেবে
গৌরীকে বললে—মা গৌরী, তোমার গহনা সব এখন
খুলে রাখো, বড় হয়ে যখন আর বাড়ী থেকে বেরবে না
তখন পোরো ।

গৌরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বললে—তাই রাখো মা ।
পাপা বিলাত চলে' গেলে পরুব । আজ যখন আমার
হার খুলে নিতে এল তখন এমন ভয় হয়েছিল !—আমি
মনে করেছিলাম আমাকে মারতে আসছে ।

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে গৌরীর গহনা খুলে নিতে বলল ;
সে বিধবা হয়ে যেদিন নিজের গায়ের গহনা মোচন
করেছিল সেদিন সে এত দুঃখ অনুভব করেনি ; এক-
একখানি গহনা সে খুলে নিচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন
তার বুক-চাকা পত্রের এক-একখানা হাড় খসে' যাচ্ছে ।
তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল ।

গৌরী ধনিষ্ঠার কান্না দেখে কোমল স্বরে সাহসনা দিয়ে
বললে—মা, তুমি কেঁদো না, আমি তো বিলাতে থাকতে
কোনো গহনাই পরতাম না ।

বাগিকার মুখে সাহসনার কথা শুনে ধনিষ্ঠার চোখ দিয়ে
আরো বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো । বিলাতে গৌরী
নিরাভরণা ছিল যে মাতাল পিতার অত্যাচারে, এখানেও
নিরাভরণা হচ্ছে তারই জন্য ।

অনেক বিলম্বে অনলের কাছে যখন ভাইএর কুকীর্তির
সংবাদ পৌঁছল, তখন অনল রূপকালস্কন্ধ হয়ে দারোয়ানদের
হুকুম দিলে—যেখানে পাও ছোট-বাবুকে ধরে' আমার
কাছে নিয়ে এস ।

অনিলকে কিছু গ্রামে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ;
সে তখন রেলগাড়ীতে চড়ে' কলকাতার কুর্টি করতে
হুটেছে ।

অনল যখন অনিলের গ্রাম থেকে পলায়নের খবর
পেলো, তখন সে রোবে কোভে বিহ্বল হয়ে ধনিষ্ঠার সঙ্গে
দেখা করতে গেল ।

ম্যানেজার বাবু এসেছেন ।—খবর পেয়েই ধনিষ্ঠা

চম্কে উঠল। এমন সময়ে তাঁর আগমন! ধনিষ্ঠা বুঝতে পারলে, তিনি অনিলের চুরি সব্ব্বই কিছু বলতে এসেছেন। সে কুণ্ঠিত হয়ে সংবাদদাতা ভৃত্যকে বললে— তাঁকে এইখানে ডেকে আনো।

অনল এসেই কোনো ভূমিকা না করেই বলে' উঠল—আপনি যখন খবর পেয়েছিলেন তখনই যদি সেই পাবণটাকে ধরে' আনতে হুকুম দিতেন তা হলে সে পালাতে পারত না।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' ধীর স্বরে বললে—সে গৌরীর পিতা, আপনার ভাই, আমার স্বর্গীয় স্বামীরও ভ্রাতৃত্বল্য; তাঁকে আমি দারোয়ান দিয়ে ধরিয়ে তো অপমান করতে পারিনে।

অনল রুট ক্রুর স্বরে বলে' উঠল—কিন্তু যে বিকৃত-স্বভাব তাকে তার পাপাচরণে বাধা না দেওয়া যে ভয়ানক অন্তায়।

ধনিষ্ঠা শাস্ত স্বরে বললে—সেইজন্তেই তো আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

অনল বললে—আমি যখন খবর পেলাম তখন সে ভেগেছে। আমি কলকাতায় পুলিশে টেলিগ্রাম করে' পাঠাচ্ছি।

ধনিষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে বললে—না, ও-সব করবেন না। সে গৌরীর পিতা।

অনল নিরুচ্ছ রোবে কোণ্ডে গম্ভীর হয়ে আর কোনো কথা না বলে' সেখান থেকে চলে' এল।

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজার ঘরে গিয়ে চুকল।

*
* * *

অনিল পাঁচ দিন পরের রাজিকালে প্রমত্ত অবস্থায় কলকাতা থেকে বাসুদেবী গ্রামে ফিরে এল; সঙ্গে করে' নিয়ে এল এক জীলোক।

অনল আর সহ করে' নীরব থাকতে পারলে না; সে গম্ভীর কণ্ঠের স্বরে অনিলকে বললে—তুমি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে গোল্লায় গেছ। এমন বেহারা অনাচার আমার বাড়ীতে চলবে না। তুমি ছুর হয়ে যাও আমার

বাড়ী থেকে, যদি না যাও, আমি তোমাকে জোর করে' বার করে' দেবো।

অনিল স্থলিত বচনে বললে—কেন? আমি এমন কি অন্তায় করেছি? নিজে যা করো সেটা অন্তায় অনাচার নয়?

অনল ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমি কি অনাচার করি তুমি?

অনিল বললে—নেকা সাজুছ? শোনোনি নাকি? গায়ের সবাই জানে, কেবল তুমিই জানো না?

অনল কৌতূহলে ও সন্দেহে ব্যগ্র হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে—সবাই কি জানে তুমি?

অনিল বললে—অমিদারশীর সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়! নামেই গুপ্ত, কিন্তু জানতে কারো বাকী নেই।.....

অনল অনিলের কুৎসিত কলঙ্কারোপে মর্দাহত হয়ে ডেকে উঠল—অনিল!

আর অনিল! নেশার ঝোঁকে যে কথা সে বলতে ধরেছে তাকে রোধ করা তার ছুঃসাধ্য, সে বলে' চলল—গৌরী তোমাকে বলে বাবা আর রাণী-বৌদিদিকে বলে মা; এর কি কোনো মানে নেই? রাজ-সরকারে চাকরী তো অনেকেই করে, কিন্তু রাজবাড়ী থেকে তোমার বাড়ীতেই বা এত উপহার আসে কেন? এত টাকা রোজগার করো, তবু তুমি বিয়ে করোনি কেন? এর তুমি একটা জবাবদিহি করতে পারো?

অনল অনিলের কথা শুনে শুভ্চিত হয়ে গিয়েছিল; সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্তে লাগল অনিলের প্রমত্ত প্রলাপ—রাণী-বৌদিদির হঠাৎ লেখাপড়া শেখবার সখ কেন হয়? দেশে তুমি ছাড়া আর যাঁটার কেন পাওয়া যায়নি? রোজ ছ-বেলা নিজের সামনে বসিয়ে তোমাকে খাওয়ানোর ঘটনা রাণী-বৌদিদি কেন করত? ব্রতের ব্রাহ্মণ-ভোজনে তুমি একদিনও বাদ পড়োনি কেন?

কথা বলতে বলতে অনিলের স্বর ক্রমশঃ এড়িয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে গেল, অনল আন্তে আন্তে ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনিলের প্রস্নের পর প্রস্নের আঘাতে অনিলের হৃদয় বেদনায় একেবারে টলটল করছিল; কিন্তু তার নিজের দিকে মনোযোগ করবার তখন অবসর ছিল না; অনিল অচেতন হয়ে পড়তেই তার দৃষ্টি পড়ল অনিলের সঙ্গিনীর উপর। অনল গম্ভীর স্বরে তাকে বললে—রাত বারোটোর সময় কলকাতা যাবার একটা গাড়ী আছে; তুমি সেই গাড়ীতে চলে' যাও; আমি পাকী আনিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে দারোয়ান দিচ্ছি, তারা তোমায় ঠেশনে রেখে আসবে। তুমি কিছু খেয়ে নেবে এস।

সেই স্ত্রীলোকটি অনিলের সঙ্গে আসবার সময় দেখে এসেছিল চারিদিকে সিপাই সাত্তা বরুকন্দাজ লাঠিয়াল; যার সঙ্গে সে এসেছে সে মাতাল বেহঁস হয়ে পড়ে' আছে; সে এখন একাকিনী; এখন তাকে মেরে পুঁতে ফেললেও তার মা বলতে নেই, বাপ বলতে নেই; সুতরাং সে আর ঝিকুজিমাত্র না করে' অনিলের আস্থানে উঠে দাঁড়াল।

আহার করে' উঠতেই অনল তাকে সংবাদ দিলে, পাকী এসেছে।

স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে মুখ কাচুমাচু করে' অনলকে বললে— বাবু আমাকে টাকা দেবার চুক্তি করে' এতদূরে নিয়ে এসেছিলেন।

অনল গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কত টাকা?

সে বললে— দেড় শো টাকার চুক্তি ছিল।

অনল চিন্তিত হলো—তার কাছে তো দেড় শো পয়সা নেই। এত রাত্রে খাজাখানাও খোলা নেই। উপায়? শেষ কালে কি এই পাপ বিদায় করবার জন্তে ধনিষ্ঠার কাছে টাকা ধার করতে যেতে হবে? অনিলের মুখে যে কথা সে শুনেছে তার পর সে ধনিষ্ঠার সম্মুখে কেমন করে' উপস্থিত হবে? ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, অনিল গৌরীর গলার মুক্তার মালা নিয়ে গিয়ে এইসব অনাচার করেছে; মুক্তার মালা সে সামান্ত দামেই বেচেছে নিশ্চয়, তবু তার কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকার সম্ভব, নইলে সে কোন্ সাহসে একে দেড় শো টাকা দেবে বলে' এখানে নিয়ে এসেছে। এই কথা মনে হতেই অনল

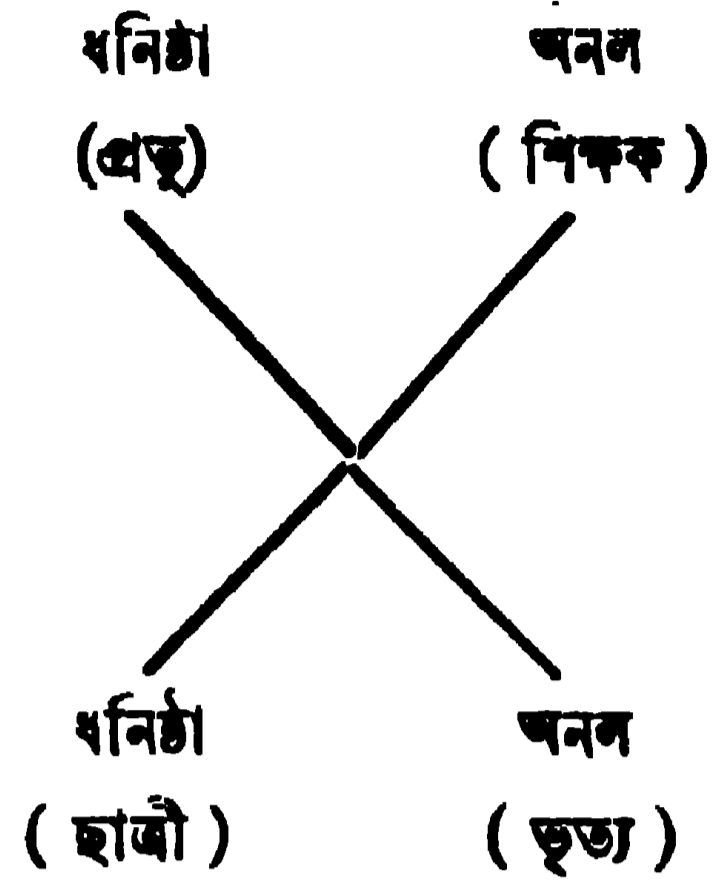
অনিলের জামার পকেটে হাত ভরে' দিলে। হাতে মনিব্যাগ ঠেকল। মনি-ব্যাগ বার করে' ব্যাগ খুলে অনল দেখলে ব্যাগের মধ্যে নোট ও খুচরা টাকা রেজকী পয়সা আছে। নোট গুণে দেখলে, সতেরো-খানা দশ টাকার ও দুখানা পাঁচ টাকার নোট আছে। তাই থেকে সে পনেরো-খানা দশ টাকার নোট আলাদা করে' নিলে। সেই নোট-কথানা সেই মেয়েটির হাতে দিতে গিয়েই অনিলের মনে হলো, এই টাকা গৌরীর গলার মুক্তামালা বেচে সংগৃহীত। এই টাকা অপব্যয় করলে অনিলের হাত উঠছিল না। কিন্তু সে এত রাত্রে কার কাছে কি বলে' টাকা ধার করতে যাবে স্থির করতে না পেরে সেই টাকাই ওকে দিয়ে দিলে।

বাড়ী থেকে পাপ বিদায় হয়ে গেলে অনল চাকরদের বললে, অনিলকে ধরাধরি করে' নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিতে। সে চাকর-দাসী সকলকে খেতে অহুমতি দিয়ে জানালে যে সে আজ আর কিছু খাবে না। এই কথা শুনে হরির মা হেসে-ঘরে গজগজ করে' বকতে লাগল— এইসব অনাচারি কাণ্ডের পর বেরাভনের কি খেতে য়োচে? আহা মুখের অন্ন গা! এমন লোকের অমন ভাই? পোড়াকপাল অমন ভাইএর!.....

অনল বাড়ীর ছাদে গিয়ে পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগল অনিলের প্রস্নমালার উত্তর। গৌরী যে তাকে বাবা ও রাণীকে মা বলে, এ তো একেবারে অচিন্তিত ঘটনা; তখন সে মনে করেছিল গৌরী পিতৃমাতৃহীন, তার পিতামাতার স্থান যে ছুজনে পূর্ণ করবে তাদের গৌরী বাবা ও মা বলে' ডাকলে সে পিতৃমাতৃহীনতার দুঃখ কখনো অহুভব করবে না বলে'ই তাকে ঐরকমভাবে ডাকতে শেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে তো কোনো দুঃখ অভিসন্ধি লুকায়িত ছিল না। রাজবাড়ী থেকে তার বাড়ীতে উপহার যথেষ্ট এসেছে বটে; কেন এসেছে? সে তো কোনো দিন কিছু প্রার্থনা করেনি; যিনি দিয়েছেন তিনি জানেন কেন। সে তো অনিলের জন্তই বারে বারে সর্কসান্ত হয়েছে; তার দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েই রাণীর ভাগ্যর বোধ হয় মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ তো দেশে অনেকেরই আছে,

তার প্রতি এই বিশেষ অহুগ্রহ বর্ষণের অর্থ কিছু আছে কি ?

এই সম্বন্ধে মনে হতে অনলের অন্তর সমস্ত লক্ষিত কৃত্তিত হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র চিন্তায় মনোনিবেশ করলে। সে বিয়ে করেনি কেন? যে এ প্রশ্ন করছে তারই জন্তে সে বিয়ে করার কল্পনাও মনে আনতে পারেনি; সে সর্বস্বান্ত হয়ে যার নেশার আর পাপাচরণের খরচ জুগিয়ে এসেছে সে বুঝতে পারছে না, সে কেন বিয়ে করেনি! সে যখন ভাইএর মৃত্যুসংবাদ পেলে তখনও তার বিয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে এল তার ভাইঝি গৌরী; পাছে নিঃসম্পর্কীয়া রমণী পরের বাড়ী থেকে হঠাৎ এসে গৌরীকে স্নেহের চক্ষে না দেখে, এই ভয়েই তো সে বিয়ের চিন্তা মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু শুধুই এই কি তার বিয়ে না করার কারণ? অনিল তার মনে যে সম্বন্ধ উল্লেখ করে' দিয়েছে, এখন ক্রমাগত তাই তার মনের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে মেরে তাকে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কি তার ও ধনিষ্ঠার মনে অস্বীকৃত অহুরাগ লুকিয়ে ছিল? রাণী তার কাছেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিল; সে কি তাকে নিত্য নিকটে পাবার লোভে? তিনি তাকে যত্ন করেছেন, সাহায্য করেছেন, তা কি কেবলই তাঁর ম্যানেজার ও শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকেই? সেও তো রাণীর কাছে প্রভুর সম্মুখে ভৃত্যের মতন ব্যবহার করেনি; অনেক সময় সমান পদবীর লোকের মতন ব্যবহার করেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের ভাবে কথা বলেছে; এরই বা কারণ কি? এর কারণ নিত্যকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর ধনিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রভু-ভৃত্য ও শিক্ষক-ছাত্রী এই যুগল সম্পর্ক। প্রভু বলে' ধনিষ্ঠা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অহুভব করেছেন, তাকে আদেশ করেছেন, সে পালন করেছে; আবার অপর পক্ষে সে শিক্ষক বলে' ছাত্রীর কাছে সম্মানে তটস্থ হয়ে থাকেনি; একবার ধনিষ্ঠা বড়, সে ছোট, অন্যবার সে বড় ধনিষ্ঠা ছোট; একটা ঢেরা কেটে এক রেখার উপরে প্রভু ধনিষ্ঠার নাম ও নিয়ে ভৃত্য তার নাম এবং অপর রেখার উপরে শিক্ষক তার নাম ও নিয়ে ছাত্রী ধনিষ্ঠার নাম লিখলে তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হবে—



তারা উভয়েই একবার নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অহুভব করেছে, আবার অন্যবার অপরের চেয়ে লঘু প্রতিপন্ন হয়েছে; কাজেই তারা পরস্পরের সমকক্ষ-রূপেই সন্নিহিত হয়েছে—ধনিষ্ঠা প্রভু ও অনিল শিক্ষক সমকক্ষতা উপলব্ধি করেছে এবং ভৃত্য অনিল ও ছাত্রী ধনিষ্ঠা সমকক্ষতা অহুভব করেছে। কিন্তু তারা কি কেবল এই-জন্তেই সমকক্ষতা বোধ করেছিল? এর অভ্যন্তরে আর কিছু ছিল না? যে সম্বন্ধ একবার মাথা তুলে উঠেছে তাকে নিরস্ত করতে সে পারছিল না; সে নিজের অন্ততল অহুসন্ধান করে'ও বলতে পারছিল না—না, এই কারণ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তার মনে পড়তে লাগল, কোন্ দিন কখন কি উপলক্ষে ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ধনিষ্ঠা তার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়েছে, ধনিষ্ঠার মুখ মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে স্তম্ভরতর হয়ে উঠেছে! তার মনে পড়তে লাগল, সেও তো ধনিষ্ঠাকে পড়াতে যাবার সময়টির জন্তে সতৃষ্ণ হয়ে ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাত; ধনিষ্ঠার সঙ্গ, দৃষ্টি, হাসি, বাক্য তাকে অনির্কচনীয় আনন্দ দিয়েছে—এখনো মনে। তার এখন মনে পড়ল—সকলে ধনিষ্ঠাকে রাণী-মা বলে, কিন্তু সে তাকে কেবল রাণী বলে'ই উল্লেখ করেছে—বড় জোর রাণীজী বলেছে! এর কারণ তো এতদিন সে ভেবে দেখেনি; কিন্তু আজ অনিলের কথার আঘাতে যে সম্বন্ধের আগুনে তার মন পুড়ে তারই আলোকে সে আজ নিজের অন্তরলোক তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখতে লাগল। সে যে এতদিন অন্তায় কলুষতা চিন্তাপুরে গোপন করে' রেখেছিল তার জন্তে সে আপনাকে শত ধিকার

দিলে ; আপনার প্রতি তার আর বিশ্বাস রইল না। যদিই বা তার মনের এই ক্ষীণ অনুরাগ তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই স্থগ্ন গুপ্ত থাকত, কিন্তু একবার যখন তাকে খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে তখন তাকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। যদি কোনো অসাবধান মুহূর্তে সে আত্মসম্বরণ করতে না পারে তবে ধনিষ্ঠা তাকে কী হীন অপদার্থ ভাববেন ? তাঁর কাছে সম্মান হারানো অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, অল্প সকল-প্রকার দুঃখ বরণীয়। আজ অনিল যেরকমভাবে তাকে বচনীয় করলে, এমনি যদি কেউ তাঁকে উজ্জ্বলিতও খোঁটা দেয়, তবে তিনি তাকেই বা কি ভাববেন ? তার পর সে তাঁর সম্মুখে গেলে তিনি কি আর তাকে আগের মতন সম্মান সমাদর করতে পারবেন ? দু্শ্চরিত্রকে কেউ কখনো সম্মান করতে পারে ? যার জন্ম মানুষ দু্শ্চরিত্র হয় সেও তাকে ঘৃণা করে। অতএব আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্থগ্নভোগে ধিক্ থাক। ধনিষ্ঠা কি এইজন্মেই তার কাছে পড়া বন্ধ করে' দিয়েছিলেন ? তার বদলে হরকান্তকে জমিদারীর কাগজপত্র সই করাতে আদেশ করেছিলেন ? ধিক্ মুঢ় ধিক্, আগে সে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি ! কী দারুণ অপমান মাথায় বহন করে' সে বেড়িয়েছে ! লোকে তার মুখের কালী দেখে হেসেছে, কিন্তু মুঢ় সে বুঝতে পারেনি, কখনো নিজের হৃদয়দর্পণের দিকে চেয়ে দেখেনি সেখানে তার কী কুৎসিত কলঙ্কলিপ্ত বিভীষণ মুক্তি প্রতিফলিত হয়েছে !

চিন্তায় গ্লানিতে লজ্জায় অনলের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। ভোরবেলা যখন কাক-কোকিল ডেকে উঠল তখন সে ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

*

* *

ধনিষ্ঠা তখন সবে পূজার ঘর থেকে বেরিয়েছে, একজন ভৃত্য এসে খবর দিলে—হরকান্ত-বাবু পেশকার মশায় এসেছেন।

এমন অসময়ে পেশকার এসেছে ! এমন কি জরুরী কাজ ! ধনিষ্ঠা আশ্চর্য হয়ে বললে—তাঁকে আপিস-ঘরে নিয়ে আয়।

ধনিষ্ঠা আপিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কণকাল পরেই পেশকার প্রবেশ করলে। পেশকারকে দেখেই ধনিষ্ঠা ক্রিয়াক্স দৃষ্টিতে তার মুখেব দিকে চাইলে। পেশকার বললে—ম্যানেজার-বাবু এই চিঠিটা আপনাকে এখনই দিতে বললেন, কি জরুরী কথা আছে।

পেশকার একখানা চিঠি ধনিষ্ঠার সামনে রেখে দিলে। ধনিষ্ঠা হাতীর দাঁতের ফারফোর জাফুরীকাটা একখানা কাগজ-কাটা ছুরী দিয়ে সেই চিঠি কেটে চিঠি বার করে' পড়তে লাগল—

মহামহিমাময়ী রাণী শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দেবী

মহোদয়ার সমীপে

বহুল সম্মান ও বিনয়পূর্বক নিবেদন,

বিশেষ প্রয়োজনায় কোনো কারণবশতঃ আমি আর মহাশয়ার আশ্রয়ে থাকিয়া কৰ্ম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অতএব অধীনের বিনীত নিবেদন এই অধীনকে অদ্য হইতেই কৰ্ম অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। আমি কাহাকে আমার কৰ্মের ভার বুঝাইয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিব তাহাও জানিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি আজই বাহুন্দিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এবং গৌরীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে অনুগ্রহীত হইব। গৌরীকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে-সব অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সামগ্রী উপহার দিয়াছেন, তাহা এখন আপনার নিকট রাখিলেই অনুগ্রহীত হইব। গৌরীর বিবাহ হইয়া গেলে আপনি সংবাদ পাইবেন ; তখন ইচ্ছা হয় তাহাকে আপনার যাহা দেয় দিবেন।

আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আজ্ঞাদীন ভৃত্য

শ্রী অনল ঘোষাণ।

চিঠি পড়তে পড়তে ধনিষ্ঠার মুখে হৃদয়ের সমস্ত রক্ত গিয়ে জড়ো হলো, তার হৃৎপিণ্ড বেদনায় টনটন করতে লাগল ; তার মনে হলো এই আকস্মিক আঘাতে তার

চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে। সে চিঠি থেকে চোখ তুলতেই দেখলে তার সামনে বৃদ্ধ হরকান্ত স্থূল দেহ বিস্তার করে তার আদেশ প্রতীক্ষা করছে। তার সামনে পাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ে মনে বল সঞ্চয় করে' সে উঠে দাঁড়াল এবং কেবলমাত্র অতি মৃদু অক্ষুট স্বরে “আসছি” বলে' সে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা স্নানের ঘরে চলে' গেল। হরকান্তের সঙ্গে বেশী কথা বলতেও তার সাহস হলো না পাছে তার উদ্দেশ্য ক্রন্দন চোখ ছাপিয়ে পড়ে অথবা কথা বলতেই তার গলা কেঁপে যায়। স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে' ঘণ্টা ঘণ্টা জল মাথায় ঢালতে লাগল এবং বিগলিত জলধারার সঙ্গে অশ্রুধারা মিলিয়ে দিয়ে সে নিজের কাছ থেকেও নিজের কারা গোপন করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ভাবছিল অনলের এই আকস্মিক পত্রের কি কারণ হতে পারে? অনিল কি তাকেও মিথ্যা অপবাদে ব্যাধিত করেছে? সেই লজ্জার কি তিনি আমার সংস্রব ত্যাগ করে' চলে' যেতে উদ্যত হয়েছেন? কিন্তু গৌরী আমার কাছে থাকলে কী ক্ষতি হতো? গৌরীকে ছেড়ে আমি কেমন করে' থাকব? গৌরী আমার কাছে থাকলে তার সম্পর্ক অনিল এখানে এসে উপদ্রব করতে পারে ভেবেই কি তিনি গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছেন? অনিল যদি গৌরীকে কোনো রকমে ছুঃখ দেয়? উনি তো পুরুষ মানুষ, কখনো ব্যঙ্গ থাকবেন, আমার গৌরীকে কে দেখবে? উনি যে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ওঁর চলবে কিসে? উনি তো সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু গৌরী তো কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। হা ভগবান্! জন্মগত সম্পর্ক না থাকলে কি আর কোনো সম্পর্ক গ্রাহ্য হয় না? গৌরী, গৌরী, মা আমার! আমি তো পাষণ্ড, তাকে ছেড়ে থাকতে পারবো, কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে কেমন করে' থাকবি?

ধনিষ্ঠা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ও ক্রমাগত মাথায় জল ঢালার ফলে শীতে যখন কাপতে লাগল তখন সে স্নান সমাপ্ত করে' কাপড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুলো। সে যখন আবার আপিস-ঘরে ফিরে এল, তার স্ত্রী দেখে হরকান্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল—সদ্যস্নানে তাকে খুব তাজা

স্বন্দর দেখাছিল, আবার তার চোখ মুখ লাল ধম্বমে হয়ে থাকতে তাকে পীড়িতা বলে'ও আশঙ্কা হচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা চেয়ারে বসেই কাউন্টেন্ পেন ঝুলে অনলের আবেদন-পত্রের কোণে অকস্মিত হস্তে স্পষ্ট স্পষ্ট কবে' লিখলে—ছুটি মঞ্জুর। কখনো সহকারী-ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন। গৌরীকে ঠিক পাঁচটার সময় আপনার বাসায় পাঠাইয়া দিব। শ্রী ধনিষ্ঠা মিত্র মুস্তফী; ১৮ই মাঘ।

অনের চিঠিখানা একটা খামের মধ্যে ভরে' খাম বন্ধ করে' উপরে শিরোনামা লিখলে—শ্রীযুক্ত অনল ঘোষাল, ম্যানেজার-মহাশয়। সেই খামখানা হরকান্তের হাতে দিয়ে ধনিষ্ঠা অকস্মিতকণ্ঠে বললে—বৈকুণ্ঠ-বাবুকে বলবেন তিনি যেন চারটের সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যান।

“যে আজ্ঞে” বলে' হরকান্ত প্রশ্নান করলে।

* * *

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল মাধবা। মাধবা ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে' উঠল—মা, তোমার অস্থখ করেছেন নাকি?

ধনিষ্ঠা সেকথা গ্রাহ্য না করে'ই মাধবাকে জিজ্ঞাসা করলে, গৌরী কোথায়? তার খাওয়া হয়েছে?

মাধবা বললে—মেম-নিদিমণি পুতুলের ঘরে খেলা করছে দেখে এলাম। এখনো পাওয়া হয়নি।

ধনিষ্ঠা আর কিছু না বলে' গৌরীর সন্ধানে প্রশ্নান করলে।

সে গৌরীর কাছে গিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বললে—মা মণি, কি হচ্ছে?

কথা বলতে তার স্বর যে কেঁপে ওঠে, চোখের মধ্যে অশ্রু যে ধারণ করে' রাখা যায় না; অবাধ্য অশ্রুকে গোপন রাখা যে ছুঃমাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু গৌরীর সামনে কান্না কিছুতেই নয়, ছেলেমানুষ ভয় পাবে, কষ্ট পাবে; লোকের সামনেই কাঁদা চলবে না—এ আমার একমাত্র নিতান্ত গোপনীয় ছুঃখ।

গৌরী হাসিমুখে একটা বড় পুতুল দেখিয়ে বললে—
মা, এই মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে, খত্তরবাড়ী যেতে
কান্দছে।

ধনিষ্ঠা কষ্টে অশ্রু সঞ্চার করে' জিজ্ঞাসা করলে—কেউ
কেউ তো আবার বাপের বাড়ী যেতেও কান্দে ?

গৌরী বললে—দূর ! বাপের বাড়ী যেতে কি কেউ
আবার কান্দে ?

ধনিষ্ঠা বললে—ধরো, তোমাকে যদি তোমার বাবা
তার দেশে নিয়ে যান ?

গৌরী এবার ভয় পেয়ে বললে—তা হলে আমি কান্দুব।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—কেন ? এই তো তুমি
বললে, কেউ বাপের বাড়ী যেতে কান্দে না।

গৌরী বললে—বা রে ! তাদের বাপের বাড়ীতে যে
বাপও থাকে মাও থাকে ; আমার বাবার বাড়ীতে তুমি
যদি যাও তা হলে আমি কান্দুব কেন ? নইলে কান্দুব।

ধনিষ্ঠা টপ করে' গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে আজ
বারখার তার মুখচুষন করতে লাগল।

মাধবীও ধনিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে এসে ধনিষ্ঠার পিছনে
দাঁড়িয়ে ছিল। আজ মায়ের এই স্নেহের মুখে চুমু খাওয়া
অনাচার দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল ; স্নেহের প্রাবল্যে
অসহক মনে তিনি তুল করে' ফেলেছেন মনে করে'
সাবধান করবার জন্ত সে বলে' উঠল—মা, ও করুছ কি ?
দিদিমণির মুখে মুখ দিচ্ছ !

ধনিষ্ঠা হাসবার চেষ্টা করে' পুনঃপুনঃ গৌরীর মুখচুষন
করতে করতে বললে—দেবো দেবো এর মুখে মুখ দেবো,
নইলে বুক আমার ভেঙে যাবে.....

ধনিষ্ঠা আর ক্রন্দন সঞ্চার করে' থাকতে পারলে না,
তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে' অশ্রু ধরে' পড়তে লাগল।
সে মনে মনে ভাবতে লাগল—যতদিন গৌরী আমারই
ছিল ততদিন তো তার মাধবী সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।
আজ তাকে হারাতে চলেছি, আজ বুঝছি, এতদিন
কি মধুর আশ্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে' রেখেছি।
স্নেহের রাজ্যে প্রীতির রাজ্যে অস্তর-রাজ্যে স্নেহ সম্পূর্ণ
বলে' কেউ নেই !

ধানিকরণ কেঁদে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধনিষ্ঠা মাধবীকে
বললে—গৌরীর ভাত দিয়ে যেতে বল।

ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ অকারণ কান্না দেখে মাধবী স্তম্ভিত
হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নড়ল না। গৌরীর পরিচারিকা
ধনিষ্ঠার আদেশ পালন করতে চলে গেল।

গৌরীর কি গৌরীর ঠাই করে' রেখেছিল। বামুন-
ঠাকুর ভাত দিয়ে যায় আর সে গৌরীকে কাছে বসে'
খাওয়ায়। আজ বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল ; ধনিষ্ঠা
নিজে গৌরীকে খাওয়াতে বসল। গৌরী নিজে হাতে
খেতে শেখার পর আর গৌরীর কি নিযুক্ত হওয়ার পর
ধনিষ্ঠা আর কোনো দিন গৌরীর উচ্ছিন্ন স্পর্শ কবেনি।
আজ সে গৌরীকে খাইয়ে দিতে বসল দেখে গৌরী
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আর মাধবী বিশ্বয়ে অবাক
হয়ে গেল।

ধানিক পরে মাধবী বিশ্বয়বিমুক্ততা থেকে আপনাকে
সচেতন করে' তুলে ধনিষ্ঠাকে বললে—মা, তোমার এ কি
কাণ্ড বলো দেখি ? নিজে কখন খাবে-দাবে ? ভাত-
কটা তো জুড়িয়ে জন হয়ে যাবে !

ধনিষ্ঠা বাদল দিনের অন্তগামী সূর্যের ক্ষণিক
প্রকাশের যতন ম্লান হাসি হেসে বললে—আর আমার
খাওয়া ! আমি আজ আর খাবো না। তোরা সবাই
খেয়ে দেবে নিগে যা.....

মাধবী বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে
বলে' গেল—ধন্থি মেয়ে মা তুমি, খিদে-তেষ্টাও লাগে না !
খামখানত্বে উপোষ, নিত্বে উপোষ।

তার পর নিজের মনে গজর গজর করে' বকতে
বকতে মাধবী প্রস্থান করলে।

গৌরীকে নিজে হাতে খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়ে ধনিষ্ঠা
তাকে কোলে করে' নিয়ে বসল। গৌরী আজ মাকে
এমন ধনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়ে আনন্দে অনর্গল বকে'
চলেছিল। ধনিষ্ঠার মনে হচ্ছিল গৌরীকে আবহুতো
কখনো সে দেখতে পাবে না, গৌরীকে আজ এই শেষ
দেখা ; এবং সেই দেখাও শেষ হয়ে আসার মূর্ত্ত প্রবল
বেগে অগ্রসর হয়ে আসছে ! সুতরাং আজ গৌরীকে
কাছছাড়া করে' তুচ্ছ আহার বা বিপ্রায় করবার তার

অবশর নেই। সে গৌরীকে কাছে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তার সমস্ত জিনিস বাকসে গুছিয়ে দিতে লাগল; গৌরীর বাসন বিছানা পর্যন্ত নিজের হাতে সে বাকসে তুলতে লাগল।

মাধবী মার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এ-সব কী হচ্ছে মা ?

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে হেসে বললে—আমরা দুজনে তাঁর্থে যাবো।

মাধবীর মুখ তীর্থদর্শনের পুণ্যলোভে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে হর্ষভরা স্বরে বললে—ওমা তাই বলো। আমি শতেকখানা ভাবতে নেগেছি!..... তা হ্যাঁ মা, সঙ্গে কে কে যাবে ?

ধনিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বললে—তুই যদি যেতে চাস তো তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মাধবী গলায় কাপড় দিয়ে ধনিষ্ঠার সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে' বললে—তোমার চরণে গড় করি মা, গড় করি, তোমার পুণ্যের জোরে আমাকেও একটু তীর্থদর্শন করিয়ে দিও মা !

গৌরী সব শুনে শুনে বললে—মা, আমার খেলনা-পুতুলগুলো নেবে না? সেখানে গিয়ে খেলব কি নিয়ে ?

ধনিষ্ঠা মনে করেছিল গৌরীকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পরে খেলনাগুলি সংগ্রহ করে' অনলের বাসায় পাঠিয়ে দেবে, যাতে গৌরী না বুঝতে পারে যে এ বাড়ী থেকে তার চিরনির্কাসন হচ্ছে। এখন গৌরীর কথায় সঙ্কোচের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধনিষ্ঠা বললে—হ্যাঁ, খেলনা পুতুল সবই নিতে হবে বৈ কি।

কিন্তু এই কথা-কটা বলতে তার কলিজা যেন ছিঁড়ে গেল, তার চোখ ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। ধনিষ্ঠা গৌরীর খেলনাগুলিও বাকসে তুলতে প্রবৃত্ত হলো।

ধনিষ্ঠা গৌরীর কাজ করছে, তার সঙ্গে অনর্গল বকছে, আর ফিরে ফিরে ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছে। সে তো রোজ এই পাঁচটা বাজার প্রতীক্ষায় ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বসে' থেকেছে; কিন্তু অল্প দিন ঘড়ীর কাঁটা সবুতে চায়নি,

আর আজ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন ছুটে চলেছে! কাঁটার সূচমুখ যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ-মুহূর্তের দিকে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে, এবং প্রতিমুহূর্তে ধনিষ্ঠার অন্তরে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার বেদনা অল্পভূত হচ্ছে।

চারটে বাজতে সাত মিনিটের সময় একজন ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে—ছোট ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা উঠে দাঁড়াল। গৌরীকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা করছিল না; সে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়েই নিজের আপিস-ঘরে গেল।

বৈকুণ্ঠ এসে নমস্কার করে' দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি চার্জ বুঝে নিয়েছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি কি আজকেই যাবেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁর যাবার পাকী গাড়ী লোকজন আর পাথের ঠিক করে' দেবেন।

—যে আজ্ঞে।

—তিনি ষ্টেশনে চলে' গেলে আপনি আর-একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—যে আজ্ঞে।

• •

•

অনলকে হরকান্ত যখন তার দরখাস্তের উপর ধনিষ্ঠার হুকুম এনে দিলে তখন অনল আঁটা খামের উপর ধনিষ্ঠার হস্তাকরে শিরোনামা লেগে আনন্দ অল্পভব করলে, সে ভাবলে ধনিষ্ঠা বোধ হয় তাকে দীর্ঘ চিঠি লিখে অকস্মাৎ কৰ্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাকে থাকতে অনুরোধ করেছে; কিন্তু সে তো কৰ্মত্যাগের কারণও বলতে পারবে না, থাকতেও পারবে না; তবু উনি যে থাকতে অনুরোধ করেছেন এই আশায় এতকালের পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুঙ্খকার।

চিঠি খুলেই অনলের চক্ষুস্থির! এমন সংকীর্ণ সম্মতি সে তো আশা করেনি। এতদিনের পরিশ্রম ও সেবার কি এই পারিতোষিক! এত উপকার পাওয়ার পর কি এই

কৃতজ্ঞতা! ধনিষ্ঠা যে গোটা গোটা হৃদয় অক্ষরে হুকুম লিখেছেন “ছুটি মঞ্জুর”—এই লেখা লিখতে তো তিনি শিখেছেন অনলেরই কাছে! তাঁর লেখার ছাঁদও যে অনলের লেখারই অনুরূপ! অনল কি নিজের হাতে নিজের যত্নাধার শাণিত করে’ ধনিষ্ঠার হাতে তুলে দিয়েছিল? “ছুটি মঞ্জুর!” এই আদেশের অর্থ কি? চিরবিদায় মঞ্জুর, না অনির্দিষ্ট কালের জ্ঞাত বিশ্রাম মঞ্জুর? এই হুকুমের মধ্যে নিশ্চয় ছুই অর্থই জড়াজড় হয়ে গোপন হয়ে আছে। অনল যদি কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসতে চায়, তা হলে তার পথ ধনিষ্ঠার এই চাতুরীভরা হুকুম খুলে রেখে দিলে। এই সম্ভবপর অর্থ মনে করে’ নিয়ে অনলের স্কন্ধ আহত মন আবার কৰ্ণাঙ্কং প্রসন্ন হয়ে শাস্তি লাভ করলে।

কিন্তু গৌরী? গৌরীকে চাইবামাত্র পাওয়া, এও তো এক অচিন্ত্য দুর্লভ ব্যাপার! যে গৌরীকে এগানেই অনলের বাসায় পাঠিয়ে দিতে ধনিষ্ঠার আপত্তি হতো, সেই গৌরীকে একেবারে দূর করে’ দিতে সম্মত হওয়ার অর্থ অনল কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না। সে মনে করেছিল তার বিদায় প্রার্থনা অনেক বলা-কওয়ার পর মঞ্জুর হলেও হতে পারে, কিন্তু গৌরীকে কাছছাড়া করতে ধনিষ্ঠা কিছুতেই সম্মত হবে না। কিন্তু এ যে একেবারে অভাবনীয় কাণ্ড! তিনি অনলের উপর ক্রুদ্ধ হয়েই বোধ হয় এই আবিষ্কার অসম্ভব হুকুম লিখে ফেলেছেন। এগনেই হয়তো তাঁর মনস্তাপ হবে এবং এই হুকুম প্রত্যাহারের পত্র আসবে।

অনল নিজের দরখাস্ত হাতে করে’ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল; হরকান্ত বেচারার যে স্থূল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। হরকান্ত অনলের মনোযোগ নিজের দুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করবার জন্তে চেষ্টা করে’ একটু কাশলে।

সেই কাশির শব্দে চম্কে উঠে অনল হরকান্তর দিকে তাকালে এবং সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি বললে—আপনি যান। অমনি দয়া করে’ বৈকুণ্ঠ-বাবুকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

হরকান্ত চলে’ গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ এসে ঘরে ঢুকে অনলকে নমস্কার করলে।

অনল প্রতিনমস্কার করে’ বললে—বসুন।

বৈকুণ্ঠ বসল।

অনল বৈকুণ্ঠর হাতে নিজের দরখাস্তখানা দিলে।

দরখাস্ত ও হুকুম পড়ে’ বৈকুণ্ঠ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল; কিন্তু সেই এবার প্রদান ম্যানেজার হবে, কৰ্ত্তী-ঠাকুরাণীর এই হুকুম দেখে তার যে বিপুল আনন্দ হয়েছে তাতে তার বিশ্বাস চাপা পড়ে’ গেল। তার একবার মনে হলো, মৌখিক ভদ্রতা করে’ কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বলবে? কেন তিনি চাকুরী ছেড়ে দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করা অনর্থক, কারণ কৰ্ত্তীর কাছেই যখন কারণ অব্যক্ত থেকে গেছে তখন তার কাছে সেটা প্রকাশ হবার কথা নয়। তিনি চাকুরী ছেড়ে যাচ্ছেন, এর জ্ঞাত চঃখ প্রকাশ তো করা যেতে পারে? এই কথা মনে হতেই বৈকুণ্ঠ বললে—আপনি হঠাৎ আমাদের ত্যাগ করে’ ..

অনল বৈকুণ্ঠকে কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে গম্ভীর-ভাবে বললে—আপনি রাগীর হুকুম দেখলেন তো। আমার চাকুরী বুঝে নিন।

বৈকুণ্ঠ তটস্থ হয়ে বললে—যে আক্ষেপ।

অনল বললে—আমি বাস্তবদিক ছেড়ে চলে’ না যাওয়া পর্যন্ত আমার কর্মত্যাগের সংবাদ আপনি গোপন রাখবেন!

বৈকুণ্ঠ বললে—যে আক্ষেপ।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

কালের কোপ

শ্রী গোপাল হালদার

এ নদীটাকে দেখলে আজ আর বেউ নদী বলে স্বীকার করবে না। বালুর ভারে আজ সে প্রায় শুকিয়ে উঠেছে,—ভাঁটার সময় ওর মাঝখানটিতে থাকে হাঁটু-জল, জোর কোমর পর্য্যন্ত; আর জোয়ারে সে জল বেড়ে উঠে' দাঁড়ায় গলা পর্য্যন্ত। তবুও কাছাকাছি গাঁয়ের লোকেরা একে নদীই বলত; এর এককালের দৌলতের কথা তাঁরা পিতা পিতামহদের কাছ থেকে শুনে আসছিল বলেই বোধ হয়।

সত্যই ত, আজ যদি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সেই দুই পারের প্রবল প্রতাপশালী জমিদার-বংশ-দু'টি হঠাৎ তাঁদের নদী-পারের নির্ঝাপিত চিতাভ্রম থেকে ভেঙ্গে গঠেন। তবে কি তাঁরা এই ক্ষাণধার জল-প্রবাহ-টুকুকে সে আমলের 'করালী' বলে চিন্তে পারবেন? একদিন এপারের রায় এবং ও-পারের সিংহদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল এই করালী নদীর করাল স্রোত এপার যখন ও-পারকে দে'খে গর্জেছে, ও-পার যখন এপারের দর্পকে চূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে, আর এপারের তাঁবের ফৌজ যখন ও-পারের ফৌজের মাথাগুলো ফাটাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠে ত, তখন বহুবার মাঝখানকার করালী নদীর ভীষণ জ্বকুটি তাদের সংযত, সমত করেচে। কিন্তু করালীর জল তাদের চিরদিন ঠেকাতে পারলে না। দুই বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের সূদূর প্রাসাদ ও স্ব-উচ্চ দেব-মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে, তাঁদের বিশাল জনশক্তি ও ঐশ্বর্যের শোভা যাত্রার মতোই সম্বল না থেকে একদিন রীতিমত শক্তি-পরীক্ষার জন্যে মাতাল হ'য়ে উঠল! দু-পারের প্রজার হাতে সেদিন লাঠি এবং সড়কি নেচে উঠল, নদে-সদে দু-পারের নেতাদের হাতে রূপ-রূপ নেচে উঠল বড়-বড় ছিপের দাঁড়। সেদিন থেকে করালীর বুকে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলল এই দু-পারের রেঘা-রেঘি।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে ক্রমাগত করালী তাদের রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠল। দুই বংশেরই অধের ভাঁটি প'ড়ে এল, তবু তাদের বিবাদের মীমাংসা হ'ল না।

শেষে একদিন করালী নিজে গর্জে উঠল—এপারের যে-প্রাসাদ এতদিন ও-পারের দূর প্রাসাদের দিকে জ্বকুটি-ভরে তাকিয়েছিল, তা'র উচ্চ শির যেদিন করালীর উচ্ছলিত জলধারার পায়ে হুয়ে পড়ল, সেদিন ও-পারের শিরও খাড়া নেই দে'খে সে এক তৃপ্তি ও ব্যস্তের অটু-হাসিতে চারদিক চমকিত করে গেল। ওপারের সম্পদের শেষ রেখা যেদিন মু'ছে গেল, হতসর্কস্ব বাবুরা যেদিন একমাত্র গৃহ-বিগ্রহটিকে নিয়ে এতকালের সুরক্ষিত বিশাল পুরীর পিছনের ছয়ার দিয়ে বেরিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন, সেদিন একবার ও-পারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন,—যখন শুনলেন, ও-পারের রায়-বংশের শেষ সম্বলও রইল একমাত্র বারাহী দেবী, তখন একবার নিরুদ্বেগে মুক্তির নিশ্বাস টানলেন। করালীর সর্ক-গ্রাসী ক্ষধার হাত এড়িয়ে বেঁচে রইল কিছু দূরের নদী-পারের দুই বংশের শ্মশান-মন্দিরগুলি। লেলিহান ঈর্ষা ও প্রমত্ত রক্তলিপ্সার প্রজ্বলিত টীপের মতন চিতানলের শেষেও ভেঙ্গে রইল তাদের বৈরিতা কালের কপালে।

তা'র পরেও প্রায় দেড়শ বৎসর ভেসে গেল—করালীর ক্ষুধা শেষ হয়েছিল,—তা'র শক্তির মদে অবসান ঘোষিত হ'ল। যে-শ্মশানের মন্দিরগুলি অতীতের দস্ত ও তাণ্ডব-লীলার কাহিনী দু-পারের শাস্ত গ্রামবাসীদের মনে জাগিয়ে রেখেছিল, সেখানকার পরিভ্যক্ত বিশ্রুতায় কি-এক নীরব অটুহাসি ভেসে বেড়া'ত, সেখানকার বাতাসে শৃগালের যে চীৎকার ব'য়ে আনত, তা শোনা'ত এক মৃত্যুপারের কারার মতন, সেখানকার জল-ধারায় যে কানাকানি চলত তা খেয়া-নৌকোর নেয়ের কানে আসত এক অব্যক্ত আক্ষেপের মতন। সেখানে দিন-

ছপুয়ে মরণ-পারের অশরীরীদের যে নৃত্য চলত, সে-কাহনৌ বহু দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছিল; তা'র অনতিদূরের বিস্তীর্ণ পথ থেকে যে কত সরলহৃদয় নিরপরাধ পথিককে সঙ্কায় ও নিশীথে ডেকে নিয়ে চিরদিনকার মতন পথচলার পালা শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, দশ কোণের মধ্যে একথা কারো জানতে বাকী ছিল না। এপারের লোকেরা ধীরে-ধীরে শ্মশানের পাশ থেকে বাড়ি তুলে নিলে; ও-পারের গ্রামও ধীরে-ধীরে তা'র শ্মশানের কাছ থেকে স'মে গেল।

এমনি ক'রে কত-কত বংশর চ'লে গেল—এপার আর ও-পারের মধ্যে আজ আর সে কলহ নেই, আর সে রাঙা আঁধি নেই। এপারের লোক আজ ও-পারে চ'লে গেছে; ও-পারের লোক, কোথা থেকে তা'রা এল তা বলতে পারে না। কালের স্রোতে রায়-বাবু ও সিংহ-বাবু যে কোথায় ভেসে গেলেন, আজ তা'র ঠিক-ঠিকানা নেই—বহুবুরের কোনো-এক দূর গাঁয়ের কোনো-এক পাটের দালাল আজও হস্ত নিজেদের সিংহ ব'লে ভীতি-বিহ্বল পাটের চাষীদের উপর গর্জন করতেন, সহরের কোনো-এক অফিসের অন্নগ্রহণ কেরাণী-বাবু হস্ত বা মাঝে মাঝে তাঁর পিছাদার কাছে রায়-বংশের ছেলে ব'লে আশনার আভিহাত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু দেড়শ বছরের কুয়াশাচ্ছন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ও কোতুহলের বার্তা নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে কেউ তাঁদের ঠাই দাবিকে খাচাই করেনি, করবার ইচ্ছেও ছিল না, সাধ্যও ছিল না।

তেমনি লক্ষণ-সর্দারের বংশে যে-কথাটা পুরুষাত্মক্রমে নেমে এসেছে,—যাকে পুরুষাত্মক্রমে তা'রা অর্ধেক আশ্বাস ও অর্ধেক বিশ্বাসের সঙ্গে চিরদিন মেনে নিয়েছে, কেউ যদি তা'র প্রমাণ চাইত, লক্ষণ দিতে পারত না। লক্ষণ জানত, যতদিন করালীর ভুলে স্রোত ছিল, ততদিন তা'র পুষ্করধারা তা'তেই অকস্মাৎ সমাধি লাভ করেছেন, তা'র পরে যেদিন করালীর জল ক'য়ে এল, সেদিনও তা'র দাদা ওই বড় গাড়ে মাছ ধরতে গিয়ে আর করেনি, একথা সে তা'র বাবার মুখেই শুনেছে; আর কাল-বৈশাখীর হঠাৎ এক ঝড়ে

নৌকা-স্বল্প তা'র বাবা পরাণ-সর্দার যে ভালয়ে গেল—তা'র খোঁজ পেলে সে নিজে তিন দিন পরে বড় গাড়ের ঐ মাঝ-চড়াটার লক্ষণ জানত, তাদের সবাইকে ডুবে মরতে হবে, তাদের বংশে এম্নিতর একটা অভিযান বহু-শত বংশর থেকে নেমে আসছে,—কেননা, তা'রা ভৈরব-সর্দারের বংশধর।

সে ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী ঠিক নেই—কিন্তু তখন ছ'-পারের বাবুদের দৌলতের মব্যাহু, তখন পরিপূর্ণ উৎসাহে এ-পারে আর ওপারে শক্তি-পরীক্ষা হচ্ছে। সেই ছরফ ক্ষণে ভৈরব ছিল রায়বাবুদের তাঁবের লাঠিঘালদের সর্দার। সে তখন জীবনের স্বর-যৌবনে,—কপাটের মতন তা'র বুক, শালের মত দৃঢ় তা'র দেহ, দাঁপিত তা'র শির। তা'র লাঠির কাছে তখন বন্দুক নিয়ে দাঁড়ানো যায় না, তা'র সড়কির লক্ষ্য তখন অশ্রু, তার মুষ্টির আঘাতে তখন লোহার দরজা বন্-বন্ ক'রে আর্ন্তনাদ ক'রে ভেঙে পড়তে চায়।

সে ছিল এক দূর-গাঁয়ের লোক। রায়বাবু তা'কে এনেছিলেন বহু লাগেরাজ দিয়ে, সর্দারের প্রলোভন দেখিয়ে। যেদিন থেকে সে সর্দার, সেদিন থেকে রায়-বাবুরা অর্ধৈর্ষ্য হ'য়ে বসেছিলেন একবার সিংহদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু বাধা দিত ভৈরব। সিংহবাবুদের পক্ষে তখন সর্দার ছিল বুক রমাই ঘোষ—ভৈরবের শৈশবের ও যৌবনের ওস্তাদ। রমাইয়ের দিন একটে গিয়েছিল, সে শুধু দেরি করছিল তা'র একমাত্র ছেলে মাদাই উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। মাদাই তখনো বছর-খুড়ির ছেলে।

হঠাৎ একদিন সিংহদের শুক্কতা আর াদদের সহ হ'ল না,—ছ'-পারের ছিপ-সেজে দাঁড়াল, ছ'-পারের লাঠিঘালদের হুকুর উঠল, ছ'-পারের বাবুরা মহা-সমারোহে বল পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। ভৈরবের ভরা-যৌবনের রক্তের তালে শিবা চাড়া দিয়ে উঠল,—ঝপ-ঝপ দাঁড় ফেলে মাঝ-নদীতে তা'রা মূগোমূগ হ'য়ে দাঁড়াল। তা'র পর লাঠি ও সড়কি, ঢাল, তলোয়ার ও ক'চৎ পুরোনো বন্দুকের সঙ্গে যে মরণলীলা উৎসব চালালে, তা'র প্রথম ঝাপটা শেষ হ'তে-না-হ'তে সিংহ-বাবুরা দেখলেন শত্রু মাঝ-নদী থেকে তাঁড়িয়ে তাঁদের তাঁরে এনে পুরেছে, আর সে শত্রুর সর্বাঙ্গে ভৈরব সর্দার। সে-মুহুর্তে রমাই একবার মুখ তুলে চার-

দিকে তাকালে, তা'র পরে সড়কি নামিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে সে কাটা কাটি দেখতে লাগল।

সিংহ-বাবু হাঁকলেন, 'রমাই, সামালো ভৈরবকো—ছশ' রূপেয়া এক শির।'

রমাই নমস্কার ক'রে বললে, 'হুজুর, সামলাবো ঠিক। কিন্তু শির নিতে পারুব না,—সে আমার চেলা।' ভৈরবের সামনের ছিপে লাফিয়ে পড়তে-পড়তে নতুন যুবক মাথাই ব'লে গেল, 'হুজুর, এক রূপেয়াও চাই নে, শুধু শির দেবো।'

রমাইএর নিষেধ করবার সময় ছিল না—সে ছেলের পিছন-পিছন ছুটল।

ভৈরব নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। পিছন থেকে রায়বাবু হাঁকলেন, "হুঁসিয়ার ভৈরব।" সে চম্কে দেখলে, মাথার উপর মাথাই-এর তলোয়ার। বিছাতের মতন সে স'রে গেল। তা'র পর সড়কির এক আঘাতে মাথাইকে নদীর মধ্যে ফে'লে দিলে। আহত মাথাই তখন প্রাণপণে সাঁতাব কেটে তাঁরে উঠতে চাইছিল। ভৈরব দুরন্ত আক্রোশে তা'কে সড়কির আরেক আঘাতে নদীর তলে ডুবিয়ে দিলে।

"এম্নি ক'রে তোরা বংশের পর বংশ ডু'বে মরবি," ব'লে উন্নাত্তর মতন শোকাভূত বুদ্ধসর্দার রমাই-ঘোম তা'কে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলে।

ভৈরব দাঁড়িয়ে রইল—শুধু আঘাত ঠেকাতে লাগল—একবার ছ'বার তবু হাত তুললে না। তা'র চোখ দিয়ে তখন আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

—তা'র পর ?

একটিমাত্র কঠিন আঘাত—বুদ্ধ পিতা পুত্রের কাছে লুটিয়ে ধু'মিয়ে পড়ল চিরদিনের মতন।

ভৈরব জয়-কোলাহলের মধ্যে ফিবুল—নতশির, গুঁক-মুখ কোটর-গত-চক্ষু।

তা'র পরে এম্নি আর-এক ধ্বংস-লীলার মধ্যে করালীর জলে ভৈরব তলিয়ে গেল; ছ'পারের এম্নি নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে পুরুষের পর পুরুষ তা'রা নদীর জলে বিপ্রায় লাভ করলে।

তা'র পর একদিন করালীর কোপে ছ'পারের এতকালের

দাপাদাপি খেমে গেল, একদিন ঐ ছ'পারের ঐখর্ষের ও কোলাহলের উপর এক বিস্মৃতির সন্ধ্যা নেমে এল। দার্ঘ দেড়শ' বৎসরের সে-রাজির প্রভাতে রইল শুধু অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন স্মৃতি। লক্ষণ জানত, যে-ভৈরব যুদ্ধান্তে ম্লান-মুখে প্রেত-পুরীর কঙ্কালের মতন ফি'রে এসেছিল, সে তারি বংশের পূর্ব-পুরুষ। তা'র না ছিল প্রমাণ, না ছিল বংশ-তালিকা।

ও-গাঁয়ের পাঁচু-দাসের বিধবা পত্নীও ঠিক এম্নি জানত যে, তা'র শিশুপুত্র বিত্ত রমাই সর্দারের দৌহিত্র-বংশের সন্ধান। কিন্তু কালের অঙ্ককারে রমাই-এর দৌহিত্র-বংশ কি ক'রে এখানে ভেসে এসে ঠেকল, জিজ্ঞাসা করলে তা'রাও জবাব দিতে পারত না।

এপারে-ওপারে আজ আর বিবাদ নেই। লক্ষণ সর্দারের সঙ্গে রমাই-এর দৌহিত্র-বংশের আজ কোনো ঘন্ড নেই। লক্ষণের শশুরের দিক দিয়ে পাঁচু বিধবা তা'র আত্মীয়্যই হ'ত।

লক্ষণের বাবা যখন মারা গেলেন, তা'র বিধবা মা তখন থেকে তা'কে আর নেয়ে হ'তে দিলে না। অগত্যা লক্ষণ হ'ল তাই, যেটা তা'র বাবা ঘণা করতেন, অর্থাৎ চাষী।

সে-বার পূজোয় লক্ষণই তা'র শাশুড়ী, শালী প্রভৃতি সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। পাঁচুর বিধবা স্ত্রীস নিমন্ত্রিত হযেছিল। সে পূজো করত না, কিন্তু পূজোর কটা দিন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আমোদ করতে তা'র ভালো লাগত পূজোর পরে বিজ্ঞার সাদর-সম্ভাষণের শেষে তা'রা বিদায় নিলে। লক্ষণ তাদের গ্রাম পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

হঠাৎ সেদিন অংশিনের আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠল। নদীর ও-পার পর্য্যন্ত যেতে-না-যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল—সঙ্গে একটু একটু ঝোড়ো বাতাস। অপচ গ্রাম তখন পিছনে অনেক দূরে—ফি'রে খাল্লারও উপায় নেই। নদীর ও-পারে কয়েকটি বাড়ি ছিল;—লক্ষণ ঠিক করলে সেইখানেই নদী পেরিয়ে বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে।

নদীতে হাঁটুর বেশী জল ছিল না, লক্ষণের পরামর্শ-মত সবাই ধীরে-ধীরে জল ভেঙে-ভেঙে চলল। লক্ষণ

চলছিল সকলের আগে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে—তা'র কোলে পাচুর শিশু-ছেলে বিত্ত।

সেখানে জল ছিল যাত্র আঙুল-চারেক—নদী প্রায় পেরিয়ে তা'রা এসেছিল। 'বাপ'! বলে' হঠাৎ লক্ষণ খেমে পিছনের দিকে চেয়ে বললে, "এসো না এখানে, চোরা বালি" তা'র পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল, এক-পা তুলতে গিয়ে আর-এক পা বেধে গেল। লক্ষণ বার-বার চেষ্টা করে নিদারুণ নৈরাশ্যে চীৎকার করে উঠল, "শীগগির এই ডান দিক দিয়ে গিয়ে ও-পারের লোকদের ডাক দাও, দড়ি নিয়ে এসো।"

বৃষ্টিতে তখন চারিদিক নিস্তর, অকালের সন্ধ্যার কালিতে ছাওয়া। নদী-পারের প্রবল বাতাসে সেই বারিপাত-ধ্বনিকে ছাপিয়ে ভীতিপূর্ণ আর্ন্ত নর-নারীর চীৎকার ও-পারের কোনো গৃহবাসীর কানে পৌঁছল না। যে-নদীর ওপরে একদিন শত আহত ও আর্ন্তের কর্তৃ-ধ্বনি নিষ্ফল কেঁদেছে, আজ তার শীর্ণ ধারার বুকে তা'র দুই ভীরের বালুরাশির মধ্যে এই ভীতি-বিহ্বল নারীদের সম্মিলিত আর্ন্তনাদও অভীতের শত হাহাকারের সঙ্গেই গিয়ে মিশল।

অসহায় মেয়েরা ছুটে পাড়ে উঠে সেখানকার লোকদের খবর দিলে। তা'রা ছুটে আসেছিল। পাচুর বিধবা স্ত্রী মাঝ-পথে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল—তা'র বিত্ত? সে ত লক্ষণেরই কোলে! হায় হায় করে সে ছুটে এল,

বললে, "ওগো, আমার বিত্ত যে তোমার কোলে ধুমুছে, তা'কে কি করে দেবে?"

লক্ষণের তখন কোমরের বেশী ডুবে গেছে। ঠোঁট চেপে ধরে সে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল;—কাঁধ থেকে বিত্তকে নামিয়ে সে বললে, "দূরে দাঁড়াও, কাছে এসো না, আমি ছুড়ে দিচ্ছি।"

বালির ওপর ছিটকে পড়ে ছোটো শিশু চীৎকার করে উঠল, লক্ষণের কানে একটা কণী হাসির মতন কি যেন পৌঁছল। সে চম্কে একবার ও-পারের দিকে তাকালে, সিংহদের সমাধি-মন্দিরের চূড়াগুলি রুঢ়ভাবে তা'র চোখে এসে আঘাত করলে। ও-পারের লোকেরা যখন দড়ি-দড়া নিয়ে ছুটে এসে লক্ষণকে তুলে, তখন সে বুক পর্যন্ত বালুর নীচে ডুবে গিয়েছে। বালির ওপর তা'রা তা'র যৌবন-পুষ্ট স্তূপ দেহ শুইয়ে দিলে। তা'র আগেই দুই দিককার ক্ষুধিত বালির চাপে লক্ষণ সর্দারের প্রশস্ত বৃকের নিঃশ্বাস-গ্রহণের শক্তিটুকু পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে একজন বললে, "পরান-সর্দারের ছেলে। পরান-সর্দার মরেছিল নৌকা ডুবে।"

"ওদের বংশে সবাই ডুবে মরে।"

এপার-ওপার চেয়ে অশীতিপর এক বৃদ্ধ তা'র পাকা চুল-কয়লাছির মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে বললে, "এই করালীর এমনি ছায়গাটাতাই ভৈরব সর্দার রায়বাবুদের পক্ষ হয়ে সিংহদের হটিয়ে দিয়েছিল।"

ভাগ্যচক্র

শ্রী সুধীরা দেবী

গরীব হইয়াও সুন্দর হওয়াটা একটা মারাত্মক ভুল। প্রেমে পড়া একমাত্র ধনীরাই ধর্ম। চালচলনের সন্ধান না রাখিয়া আবার নবীন মেঘোদয়ে প্রেমসীর সুরভি কেশপাশের স্বপ্ন দেখা, জ্যোৎস্না রাতে ছাতে বসিয়া কবিতা লেখা গরীবের পোষাইয়া ওঠে না; আত্মীয় স্বজন

তো দূরের কথা রাস্তার লোকগুলিও বোধ হয় সমস্বরে ছি-ছি করিয়া ওঠে। জগতের এই কঠোর সত্য কথার একটুকু কিন্তু হুগী বেচারী বিশ্বাস করিত না। দেখিতে সে বেশ সুন্দর ছিল, একথা তা'র অতিবড় শত্রুও স্বীকার করিবে—মুখখানি যেন অতি যত্নে কুঁদিয়া গড়া, পিছল

চোখ-ছুটি ঘেন চির রহস্যময়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় অতি অল্প বয়সেই সে মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ফলে জীবনে একটা বড় কথা কখনো তা'র মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তবু বেচারীকে সবাই ভালো বাসিত।

হুগী মাঝে-মাঝে অস্থির হইয়া পড়িত শুধু অর্থের চিন্তায়। তা'র বাবা মরিবার সময় একখানা বাঁকা তলোয়ার ও একখানা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই উইল করিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই; তলোয়ারটি ঘরের একখানা আয়নার পাশে কুলানো থাকিত, আর বইখানি বহুদিন পূর্বেই একখানা ভাঙা শেল্ফে কতগুলি ক্যাটালগের নীচে আঙ্গাগোপন করিয়াছিল। এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করিতেন, তাহাতেই কোনোপ্রকারে সে দিনগুলি কাটাইয়া দিত। অর্থোপার্জনের চেষ্টা হুগী যে মোটেই করে নাই এমন নয়, বহু আয়গায় সে চুঁ মারিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু সুবিধা এ পর্যন্ত কোথাও হয় নাই। মাস-চয় সে লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট-এর কর্ম করিয়াছিল কিন্তু সে যখন দেখিল বীমা-প্রার্থীর চাইতে এজেন্ট-এর সংখ্যা অধিক হইয়া গিয়াছে তখন মনের দুঃখেই কাজটি ছাড়িয়া দিতে হইল। কয়েকদিন চায়ের ব্যবসা ফাঁদিয়া ছুদিন যাইতে না যাইতেই বিরক্ত হইয়া সে ঘরে আসিয়া বসিল। মদ বিক্রীও আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকদিন, কিন্তু সেটা নেহাৎ নীরস বলিয়া তা'তেও মন টিকিল না। অবশেষে সে কিছুই হইল না।—কর্মহীন বেকার অবস্থায় বাড়িতেই বসিয়া রহিল তবু তাহার মুখ হইতে হাসিটি ঘুচিল না।

কিন্তু ব্যাপারটি সন্ধান হইয়া দাঁড়াইল হুগী বেচারী যখন প্রেমে পড়িল। এক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের মেয়ে লরা মার্টিনকে সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়া ফেলিল। লরাও তাহাকে প্রুছা করিত। এই কর্ণেলটি বহুকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া এমনই বদহজমী ও বদমেজাজ লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন যে, তাহার একটিরও আর সারিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি যে হুগীকে পছন্দ করিতেন না এমন নয়,—কিন্তু বিবাহের কোনো কথা

উঠিলেই বলিতেন, না বাপু, এখন নয়। যদি কখনো হাজার-দশেক পাউণ্ড উপার্জন করিতে পারো তবে-ই এসো বিবেচনা করে দেখুব। হুগী বেচারী ছুঃখে বিষমাপ হইয়া পড়িত। এ-বিপদে তা'র একমাত্র সাহায্য-স্থল ছিল লরা।

সেদিন সকালবেলা হুগী-পার্কে মার্টিনদের বাড়ী যাইবার পথে তা'র প্রিয় বন্ধু ট্রেভরের বাড়ীতে হুগী হাজির হইল। ট্রেভর একজন চিত্রকর। আত্মকালকার দিনে চিত্রকর হওয়ার একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু ট্রেভর ছিল প্রকৃতই একজন দরদী শিল্পী। মুখভরা হলদে দাগ, আর ইয়া লম্বা লাল দাড়িতে তাহাকে নেহাৎ বেরসিক বলিয়া মনে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যখন তুলি লইয়া বসিত তখন তাহাকে প্রুছা না করিয়া পারা যাইত না; বাজারে তা'র ছবির কাটুতিও ছিল খুব। হুগীর সৌন্দর্য্যই প্রথম তাহাকে আকৃষ্ট করে এবং এ-বিষয়ে তাহার কতকগুলি বিশেষ মতও ছিল; সে বলিত—চিত্রকরদের পরিচয় থাকবে একমাত্র সুন্দর পুরুষদের সঙ্গে অর্থাৎ যাদের দেখলে মনে সত্যি বেশ একটু আনন্দ হয়। পুরুষ-ই বলো আর স্ত্রী-ই বলো একমাত্র যারা বিলাসী আর সুন্দর শুধু তা'রাই পৃথিবী শাসন করে থাকে, অন্ততঃপক্ষে তাইত হওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হুগীকে ভালো করিয়া জানিবার পরেও তাহার এই দিল্লিরিয়া চপল স্বভাবটি ট্রেভরের এত ভালো লাগিল যে, সে খুসী হইয়া তাহাকে স্টুডিওতে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিয়া দিল।

ট্রেভর তখন একটি দরিদ্র ভিখারীর জীবন্ত ছবির উপর তুলি বুলাইতেছিল। স্টুডিওর এক কোণে উঁচু তক্তপোষের উপর ভিখারীটিও দাঁড়াইয়াছিল। বেচারী একেবারে খুখুয়ে বুড়ো—মুখের চামড়াগুলি শুকনো চিলে হইয়া গিয়াছে, দেখিলেই ডাঁরি কষ্ট হয়। তাহার কাঁধের উপর দিয়া একখানা ছেঁড়া চাদর বুলিয়া পড়িয়াছে, পায়ের জুতাজোড়াও অসংখ্য তালি দেখে—একহাতে একখানি লাঠি ধরিয়া কঁকো হইয়া দাঁড়াইয়া অপর হাতে টুপিটি ভিক্ষার জন্ত পাতিয়াছে।

—বাঃ, ডাঁরি সুন্দর মডেল ত—বলিয়া হুগী তাহার বন্ধুর কর মর্দন করিল।

ট্রেডর কহিল—হাঁ ভাই, সত্যি তাই এমন ভিখারী সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। দেখবে, আমি কেমন একখানা ছবি তৈরী ক'রে ফেলছি।

হগীর হৃদয় সমবেদনায় ডরিয়া উঠিল, কহিল—আহা! গরীব বুড়ো বেচারী! মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেছে! কিন্তু তোমাদের কাছে বোধ হয় ঐ মুখখানাই তা'র অমূল্য সম্পদ!

ট্রেডর হাসিয়া অবাব দিল, হাঁ ভাই—সত্যি তাই! হগী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল—আচ্চা এর জন্ত সে কত পাবে!

—ঘণ্টায় এক শিলিং ক'রে।

—আর তুমিই বা ছবির জন্তে কত পাচ্ছ?

—এই, হাজার দুই—।

—কি? পাউণ্ড?

—নাহে, না, গিনি। চিত্রকর, কবি, ভাস্কর এই তিন প্রাণী চিরকাল গিনিই পেয়ে আসছে।

হগী হাসিতে-হাসিতে কহিল,—তবে ঐ বেচারীকেও তোমার ঠিকিছু অংশ দেওয়া উচিত—সেও ত তোমার মতোই পরিশ্রম করছে।

—পাগল! ছবি আঁকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার তুলনা হ'তে পারে! তবে নেহাৎ মিথ্যেও বলোনি—মাঝে-মাঝে আর্টের ও শারীরিক পরিশ্রমের সমান দামই হয় বটে! কিন্তু ভাই অত কথা বোলো না, আমি ভারি ব্যস্ত, তুমি বরঞ্চ একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকো।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া খবর দিল, ফ্রেমমেকার ট্রেডরের জন্তে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার নাকি কি বলিবার আছে।

ট্রেডর উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—যেখো পালিয়ে যেও না কিন্তু হগী—এই আমি এলাম ব'লে।

বৃদ্ধ ভিখারীটি ট্রেডরের এই অল্পপন্থিতর সুযোগ পাইয়া মুহূর্তকাল বিশ্বামের জন্ত পিছনের একটি কাঠের বেঞ্চির উপরে বসিয়া পড়িল। বেচারীকে এতই দুঃখী ও নিরীহ দেখাইতেছিল যে, হগীর বড়ই দয়া হইল। পকেটে কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্ত হাত দিল—কিন্তু একটা

হাক-ক্রাউন ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। স্টুডিওতে পাশচারি করিতে-করিতে সে ভাবিতে লাগিল, আহা, বুড়ো বেচারী! আমার চেয়ে সত্যি তা'র পয়সার বেশী দরকার। কিন্তু.....হাক। অবশেষে হাক-ক্রাউনটিই সে ভিখারীর হাতে দিয়া দিল।

ভিখারীটি অবাক হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার গুঁড় মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল। কহিল, ধন্যবাদ মহাশয় অসংখ্য ধন্যবাদ!

ইতিমধ্যে ট্রেডর আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে হগী উঠিয়া বিদায় লইল। তখন তাহার মুখখানি লজ্জায় বেশ একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাতটা দিন সে লরার সঙ্গে কাটাইল, এই অমিতব্যয়িতার জন্ত তাহার কাছ হইতে একটু মিষ্ট তিরসকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। এবং অবশেষে ট্যাঁকে পয়স না থাকাতে হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিল।

সেই রাজিতে প্রায় এগারোটার সময় দ্বারভে-ঘুরিতে পেনেলটক্লাবে উপস্থিত হইয়া হগী দেখিল ট্রেডর এক কোণে একাকী বসিয়া মদ খাইতেছে। হাতের সিগারেটটা ধরাইতে-ধরাইতে সে কহিল—কি হে, ছবিখানা শেব করছ?

—হ্যাঁ, শেষ করা বলা কি? একেবারে বাধানো পর্যন্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভাই, কিম্বা মাং ক'রে দিয়েছ যা হোক।—সে বুড়ো বেচারী তোমার প্রতি ভারি অমুগ্ধ হ'য়ে পড়েছে। তুমি কে, কোথায় থাকো, কি করো, কত আয় সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে গেল।—

হগী তাহাকে বাধা দিয়া ঔৎসুক্যসহকারে কহিল, হয়ত বা বাড়ী গিয়ে দেখবে, সে বেচারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আহা, দুঃখী গরীব! তা'কে কিছু সাহায্য করিতে পারলে আমি ভারি খুসী হতাম। উঃ! এত বড়ো মাহুকের সহিতে হয়! সত্যি ভাই, আমার কিছু পুরোনো কাপড় ছিল—তাও ত তা'কে দিতে পারলে হ'ত! তা'র চাদরটার যা অবস্থা!

ট্রেডর অবাব দিল—কিন্তু ভাই, ওতেই ওকে স্মরণ মানায়। লাখ টাকা দিলেও কিন্তু জরির জামা পরিবে

ভিখারীর ছবি আঁকতে আমি রাজি নই। তোমরা যাকে হেঁড়া বলছ, দরিদ্রতা বলছ, ঐখানেই তো কবি—ঐখানেই যে সত্যিকার আর্ট। যা হোক, তোমার কথা আমার মনে রইল, তা'কে জানাবো।

হুগী গম্ভীর হইয়া গেল। বিরক্তির স্বরে কহিল, তোমরা এই চিত্রকরের দলটাই তবে হৃদয়হীনের দল।

ট্রেভর হাসিতে-হাসিতে জবাব দিল,—দেখ, আর্টিস্টদের হৃদয় ব'লে মাথা থেকে ভিন্ন একটা কিছু নেই, বিশেষতঃ একটুও না বদলে জগৎটা যেমনি আছে ঠিক তেমনি উপলব্ধি করাই যখন আমাদের ধর্ম। যাক, কাজের কথা বলো, লরা কেমন আছে? বুড়ো বেচারী তা'র কথা শুনে ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছে কিন্তু!

—তুমি নিশ্চয়ই তা'র সম্বন্ধে বুড়োর সঙ্গে আলাপ করো নি।

—করেছি বই কি!—সে কর্ণেল, লরা—এমন কি দশ হাজার পাউণ্ডের কথাও জানে।

হুগী রাগে লাল হইয়া উঠিল, কহিল—তুমি ঐ বুড়ো ভিখারীটাকে আমার গোপনীয় কথাও সব বলেছ! ছি ছি ছি!—

ট্রেভর হাসিতে লাগিল, কহিল—ওগো, তুমি যাকে বার-বার ভিখারী বলছ, তিনি লণ্ডনের সব চেয়ে বড়, তা জানো? ইচ্ছে করলে তিনি কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে এই সারা সहरটা কি'নে ফেলতে পারেন—কশিয়াকে যুদ্ধ থেকে—

হুগী লীৎকার করিয়া উঠিল, কহিল—কি সব পাগলামি করছ? -

—পাগলামি আমি করছি! তবে শোনো, তুমি আজ যাকে আমার স্টুডিওতে দেখেছ, তিনি আর কেউ নন—ব্যাডন হুস্বের্গ। তিনি আমার মস্তবড় বন্ধু! আমার প্রায় ছবিই তিনি কি'নে থাকেন। মাসখানেক আগে তাঁকে ভিখারীর বেশে আঁকবার জন্তে তিনি আমাকে কিছু টাকা দেন। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ হেঁড়া জামা জুতো পরে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল; আর ঐগুলো যে আমার স্পন থেকে আনা, সেও ত তুমি জান।

বিশ্বয়ে অভিজ্ঞ হইয়া পড়িল—অনুটস্বরে

কহিল—ব্যাডন হুস্বের্গ! ছি ছি ছি—আমি কিনা তাঁকে একটা হাফক্রাউন ভিক্ষা দিতে গেলাম, বলিয়াই সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল!

—হাফক্রাউন দিয়েছিলে? বলিয়াই ব্যাপারটা এক-নিমেবে আন্দাজ করিয়া লইয়া ট্রেভর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

হুগী অভিমানের স্বরে কহিল, আমাকে এ-কথা তোমার আগে জানানো উচিত ছিল এলান—তা হ'লে হয়ত আমাকে এমন বোকা বনুতে হ'ত না।

—কিন্তু তুমি যে আমার এখানে এসে পাগলের মতো ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করবে, সে-কথা ত আমি কখনো ভাবিনি, হুগী। তুমি একটি সুন্দর মডেলকে চুমো খেতে পারো, বিশ্বাস করি কিন্তু একটি কিছুতর্কিমাকার জীবকে বখশিস্ দিতে যাবে, সে আমি কি ক'রে ভাবব বলো! তা ছাড়া, আমি আজ সারাদিন কারো সাথে ভালো ক'রে মেলামেশা করিনি, তা'র পর তুমি যখন এলে, তাঁর পরিচয় দেওয়াটা অশোভনীয় হবে ভেবে চূপ ক'রে গেলাম। তুমি ত জানোই তাঁর ভালো জামা-জুতো পরা ছিল না।

হুগী অনেকক্ষণ চূপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ছি ছি ছি, তিনি না জানি আমাকে কি বোকাই ঠাণ্ডেছেন!

—না, না, মোটেই নয়। তোমার চ'লে আসার পরই তিনি হঠাৎ ভারি খুসী হ'য়ে উঠেছিলেন—মাঝে-মাঝে আপন মনে হাসুছিলেন। তখন আমি তা'র কারণ বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন সব বুঝতে পারছি। তুমি অনর্থক কিছু ভেবো না—তিনি হয়ত তোমার হাফক্রাউনটা হুদে খাটাতেও পারেন—আর বিশেষ কি খাওয়া দাওয়ার পর আসর জমাবার মতো একটা মজাদার গল্পও পাওয়া গেল!

হুগী আপন মনে বলিয়া উঠিল, ছি ছি! আমি একটা অপদার্থ! পালানো ছাড়া এখন আমার আর উপায় নেই! যাক তুমি ভাই দয়া ক'রে কাউকে কিছু বোলো না; এখন যে রাস্তায় কি ক'রে মুখ দেখাবো তাই ভাবছি।

—দূর বোকা। এ যে তোমার একটা পরোপকারের চিহ্ন রইল। দোহাই তোমার, পালিও না, আর-একটা সিগারেট ধরো—ততক্ষণ লরা-সম্বন্ধে বরঞ্চ কিছু গল্প করো।

হুগী বেচারী কিন্তু বসিল না—দুঃখিতমনে বাড়ীর দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল, পিছনে ট্রেভর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে হুগী খখন খাইতে বসিয়াছে—তখন তাহার চাকর একটি কার্ড লইয়া উপস্থিত। তাহাতে লেখা—গুস্তাভ্ নোদিন্, ব্যারন্ হস্বের্গের প্রধান কর্মসচিব। হুগী ভদ্রলোকটিকে উপরে লইয়া আসিতে আদেশ করিল। সে সঙ্কল্প করিল, আজই তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবে। না, আর দেৱী নয়।

যে ভদ্রলোকটি আসিয়া প্রবেশ করিলেন তাঁহার চোখে সোনার চশমা—চুলগুলি পাকিয়া বিল্কুল সাদা হইয়া গিয়াছে। ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে তিনি কহিলেন—আপনিই কি মসিয়ে হুগী ?

হুগী মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—ব্যারন্ হস্বের্গ আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি—

হুগী অকস্মাৎ থামিয়া উঠিল, কোনোপ্রকারে ঠেকিয়া-

ঠেকিয়া গে বলিল, তাঁকে বলবেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা—

ভদ্রলোকটি মুহূ-মুহূ হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন—ব্যারন্ এই চিঠিগানা দিখে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন বলিয়াই একথানা শিলমোহরমারা খাম বাহির করিয়া ধরিলেন।

খামটির উপরে লেখা ছিল—‘হুগী এফিন্ ও লরা মাটনের বিবাহে বুড়ো-ভিখারীর প্রীতি-উপহার’—ভিতর হইতে বাহির হইল দশহাজার পাউণ্ডের একথানা ক্ষুদ্র চেক।

* * *
তাহাদের বিবাহে সবচেয়ে খুসী হইয়াছিল এলান্ ট্রেভর—বিবাহ-ভোজ্যে-ব্যারণও একটি নাতিদার্ষ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

সর্বশেষে এলান্ মস্তব্য প্রকাশ করিল—লক্ষপতির আদর্শ পাওয়া দুস্বর বটে, কিন্তু আদর্শ লক্ষপতি পাওয়া আবে দুস্বর।*

* অস্কার ওয়াইল্ড হইতে।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর ঐতিহাসিকতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী অমৃতলাল শীল

ক

অনৈতিহাসিক ও অসম্ভব ঘটনা।

১। রাসো-অনুসারে সর্বস্বত্ব যোগবার পৃথীরাজ ঘোরীকে বন্দী করিয়াছিলেন, ও কখন সামান্ত কিছু দক্ষিণা লইয়া, কখন কেবলমাত্র সলাম করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ কথা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একজন প্রবল—সম্ভবতঃ আপন অপেক্ষা বলবান্—শত্রুকে ধরিতে পারিলে বড়-বড় বলবান্ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজারা একবারও ছাড়েন না; ইংরেজরা নেপোলিনকে

ছাড়িতে সাহস করেন নাই, আর পৃথী বার-বার ধরিয়াও ছাড়িয়া দিলেন !! এ-সংখ্যাও সকল পুস্তকে এক-প্রকার নহে। হুগীর মহাকাব্যে আছে সাতবার। অন্যান্য পুস্তকে ৫।৭।১০ বার, যাহার যেকোন রূপে, সে সেই-রূপ লিখিয়াছে। এককালে রাজারা বার মাস সৈন্য লইয়া করিয়া বেড়াইতেন। প্রতিবাসী বা অন্য কোনও রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্বে কারণ দেখাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি কিছুই করিতে হইত না। প্রত্যেক রাজাকে সকল সময়ে যুদ্ধের অন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইত, দুর্গে ও

নগরে অবরোধের সময়ের জন্ত খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত। এই বারমেসে যুদ্ধে প্রতিবাসী রাজাদের মধ্যে প্রতিবৎসরই ২।৪ বার সংঘর্ষ হইয়া যাইত। রাসোতে আছে, এইরূপ সংঘর্ষ পৃথ্বী ও ঘোরীর মধ্যে অনেকবার হইয়াছিল, অধিকাংশ বারই ঘোরীর পরাজয় হইয়াছিল। এইরূপ সংঘর্ষে ঘোরী ১৬ বার বন্দী হইয়াছিলেন, ও অনেক যুদ্ধে কোন পক্ষের হার বা জিত হয় নাই, সম্ভব সেগুলিতে পৃথ্বীর হার হইয়াছিল। কিন্তু বোলবার খরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব; যে রাজনীতির কোনও ধার ধারে না, সেও পারে না; অতএব বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যখন বন্দী করিবার কথা দস্তকথায়, আল্‌হার গানে ও নানাকাব্যে ও নাটকে আছে, তখন বন্দী করার ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে। আমার বিশ্বাস একবার সত্য-সত্যই বন্দী করিয়াছিলেন, ও বলদর্পী উদার রাজপুত্র রাজা এই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকিবেন, “দেখ, আমি তোমা অপেক্ষা কত বলবান, তোমাকে বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। তোমার যদি সাহস থাকে, তবে আবার আসিও, আবার মারিব, আবার বন্দী করিব।” সেকালের রাজপুত্ররা অতি সরল, বলদর্পী, অদৃষ্টবাদী, আশ্রিতপ্রতিপালক, ও সত্যবাদী ছিল; তাহারা মুসলমানদের কূট রাজনীতি বুঝিতে পারিত না।

২। রাসোর নানাস্থানে প্রথমে সোমেশ্বরের, ও পরে পৃথ্বীর বেতনভুক্ বা সামন্ত একজন প্রতিনিধি লাহোরে থাকিবার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ লাহোর [ও পঞ্জাব] পৃথ্বীর বিস্তৃত রাজ্যের এক প্রদেশ ছিল। পৃথ্বীর শেষ বড় যুদ্ধের অথবা পতনের পূর্বে লাহোরের শাসনকর্তা পৃথ্বীর একজন স্ত্র ছিলেন, তিনি ঘোরীর আক্রমণের সময়ে আপনার প্রভু পৃথ্বীকে সাহায্য না করিয়া ঘোরীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্র কবি তাঁহাকে বুঝাইয়া অনেক উপদেশ দিলেন ও পূর্বে প্রভু হিন্দু রাজাকে ছাড়িয়া বিদেশী ও বিধর্মী মুসলমানকে সাহায্য করিতে বারণের নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, এখন মুসলমানদের ভাগ্যোদয় হইতেছে, তাহাদের সেবা করাই যুক্তিযুক্ত। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তকে লইয়া আজ ছয়মাস প্রাসাদের বাহিরে আসেন

নাই; রাজ্যের কি অবস্থা হইতেছে, কিছুই সংবাদ রাখেন না; যে প্রভু রাজ্যরক্ষা করিতে নিশ্চেষ্ট, তাহার সেবা করিয়া লাভ কি? ইহা ছাড়া এতকাল কেহ পৃথ্বীকে দেখে নাই; লোকে বলে, তিনি সংযুক্তার অন্তঃপুরে আছেন, কিন্তু তিনি যে বাচিয়া আছেন তাহার প্রমাণ কি? চন্দ্র তাঁহাকে কোন মতে স্বীকৃত করিতে না পারিয়া ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এ-বর্ণনা রাসোর; কিন্তু অন্য সকল ঐতিহাসিকরা বলে, ১০২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ গজনবী লাহোর জয় করিয়া তথায় আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। সেই পর্যন্ত লাহোর ও তাহার পশ্চিমাংশ মহম্মদের বংশধরদের অধীনেই ছিল। কালে তাহারা গজনবী হইতে বিভাজিত হইলে লাহোরেই রাজ্য করিত। ঐ বংশের শেষ বংশধর খুসরো মলিককে ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ঘোরী ফাঁকি দিয়া বন্দী করিয়া লাহোরে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

অতএব সোমেশ্বর ও পৃথ্বীর সময়ে লাহোরে প্রথমে গজনবী বংশীয় ও পরে ঘোরীরা রাজ্য করিয়াছে। সেখানে কোনও হিন্দুরাজা বা রাজার প্রতিনিধি কোনকালে ছিল না।

৩। রাসো অল্পসারে রাণা সমরসিংহ যখন পৃথ্বীকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি আর জীবিত ফিরিয়া আসিবেন না; তিনি আপনার দ্বিতীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রত্নসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। এই রত্নসিংহ পৃথ্বীর ছোট ভনী পৃথ্বীর একমাত্র পুত্র। রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিলেন না কেন, সে-প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিতেছেন, জ্যেষ্ঠা কুম্ভা পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছে, ও দাক্ষিণাত্যে বিদরের মুসলমান রাজার সহচর হইয়া রহিয়াছে

এই ঘটনা ১১২২-২৩ খৃষ্টাব্দের, কিন্তু ইতিহাস-পাঠক-মাজই জানেন যে দাক্ষিণাত্যে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সৈন্য সর্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণের মুসলমান সেনাপতিরা ভোগলক বংশীয় বাদশাকে ত্যাগ করিয়া ফুলবর্গাতে বহমনী-বংশীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। অহমদশাহ বহমনী ১৪২২

খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বিদর্ভ নগরের কাছে নূতন রাজধানী অহমদাবাদ বৌদর স্থাপন করিয়া সেইখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বহমনা বংশ দুর্বল হইলে লোকে অহমদাবাদ শব্দ ছাড়িয়া কেবল বৌদর বলিতে লাগিল। এখন বৌদর নগর নিজাম রাজ্য-মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান; হায়দ্রাবাদ হইতে মোটরে যাওয়া যায়। কবি দক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইবার ১১৫ বৎসর পূর্বে, ও বৌদর রাজধানী হইবার ২৩০ বৎসর পূর্বেই কুস্তাকে বৌদরের মুসলমান রাজার সহচর করিয়াছেন।

এই উক্তি দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে লেখকের সময়ে বৌদর মুসলমান রাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব রাসো অস্বতঃ ষোড়শ শতাব্দীর লেখা হইবে।

৪। রাসোর বর্ণনামুসারে মুসলমানেরা পৃথ্বীকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া গিয়াছিল, সেখানে তাঁহার দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কবি চন্দ্র, ঘোরীর অহুমতি লইয়া, আপনার অন্ধ প্রভুর কাছে থাকিতেন। কবি ঘোরীকে পৃথ্বীর শব্দভেদী বাণ মারিবার ক্ষমতার কথা বলিলেন। ঘোরী দেখিতে চাহিলেন। লক্ষ্যভেদ করিবার আয়োজন হইলে চন্দ্রের ইচ্ছিত-মত পৃথ্বী ঘোরীর শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিলেন, এই সময়ে ঘোরী কত দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কবি পূর্বেই সেই দূরত্ব মাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন পৃথ্বীকে বলিয়া দিলেন। ঘোরীর মৃত্যু হইল, এই অবসরে পৃথ্বী ও চন্দ্র উভয়ে উভয়কে কাটিয়া ফেলিলেন। অতএব শেষ যুদ্ধের কয়েক মাস পরে—সম্ভবতঃ ১১২৪ খৃষ্টাব্দে—একই সময়ে ঘোরী, পৃথ্বী ও চন্দ্রের মৃত্যু হইল।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, পৃথ্বী সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে সরস্বতী-নদীতীরে তাঁহার দেহ পাওয়া গিয়াছিল। ঘোরী ১২০০ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধু-নদীতীরে গন্ধরদের ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাসো-বর্ণিত মৃত্যু সময়ের পর আরও বার বৎসর নানা যুদ্ধ ও দেশ জয় করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি ঘোর ও গজনী রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু কবিরা পৃথ্বীর মত বীরের কাপুরুষোচিত আত্ম-হত্যা ও শেষ জীবনে অন্ধ ও বন্দী হওয়ার গিথিগাছেন, কিন্তু মুসলমানেরা বীরের মত সম্মুখ সমরে মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ঘোর নগরবাসী ছিলেন। ঐ নগর এখনও আছে। কিন্তু রাসোর কবি বলিতেছেন, শিহাবউদ্দীনের মাতা যখন দুইটি শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তখন নানা কারণে পুত্রদ্বয়কে লইয়া রাধবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ও একটি ভগ্ন গোর-মধ্যে কয়েক দিবস লুকাইয়াছিলেন। পরে ঐ দুই শিশু গজনা জয় করিল, বড় রাজা ও ছোট প্রধান সেনাপতি হইল। শৈশবে তাহারা গোবে লুকাইয়াছিল বলিয়া গোরী নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু শব্দটি গোরী নহে ঘোরী, ও গোরের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই।

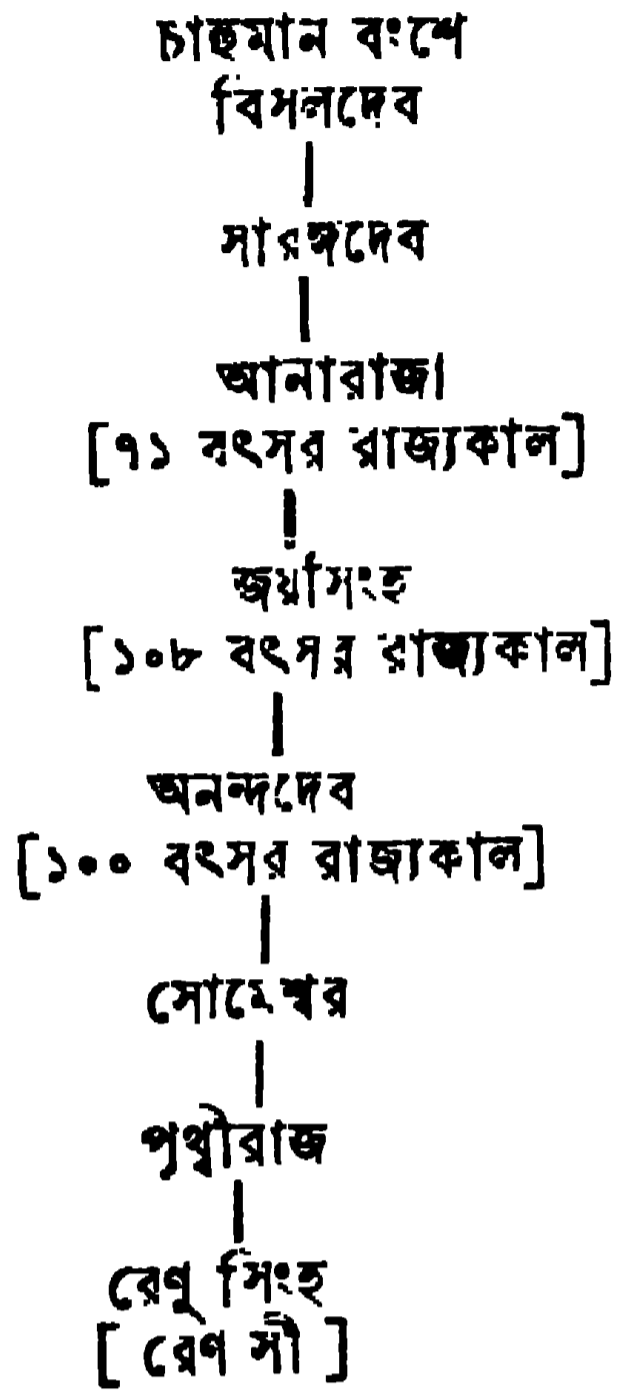
কেহ-কেহ বলে, চোহানদের এক শাখার নাম গোড়িয়া চোহান ছিল। যখন চোহানেরা অহিন্দের হইতে শিবালিক পর্বতের তলে বাস করিতে গেল, তখন এই গোড়িয়া চোহানেরা সিদ্ধু নদের পশ্চিম তীরে কোনও স্থানে বাস করিয়াছিল। তাহার পর আর তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হয়ত গোড়ি হইতে ঘোরী হইয়াছে। কিন্তু এ উক্তি অস্বাভাবিক, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক অফগানিস্থানবাসী কবিদের সহিত রাজপুতদের আদান-প্রদান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আল্‌গার গানে আছে, আল্‌হার পুত্র ইন্দল [ইন্দ্রজিৎ] কাছারের শৈব রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন কাছারবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে নাই।

এ

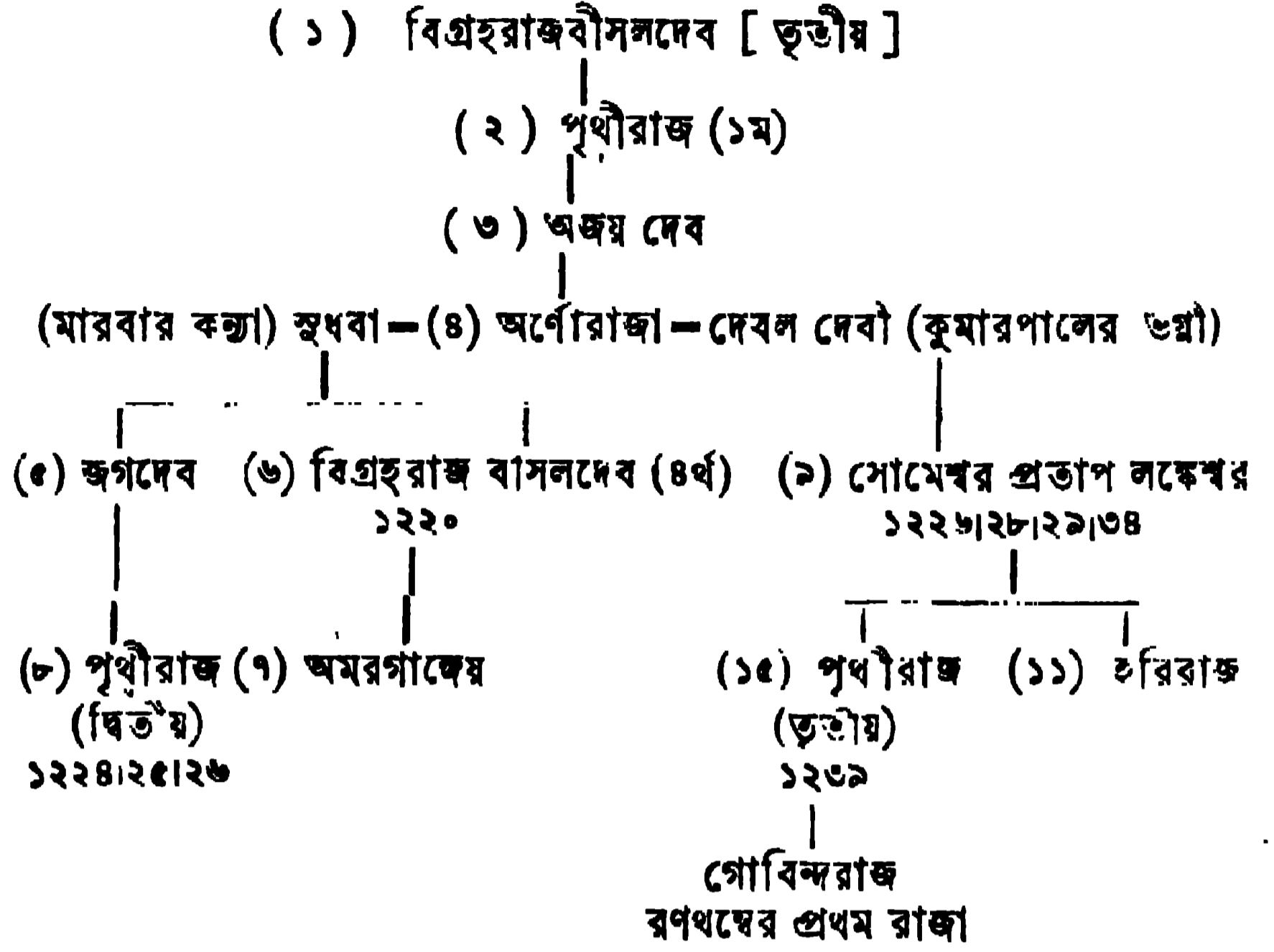
এইবার রাসো-লিখিত বংশলতা ও হম্মীর মহাকাব্য ও বিজয়লার শিলালেখ অনুসারে বংশলতা উপমিত করিব।

প্রত্যেক নামের পর যে বিক্রম সঙ্খ আছে, সেই-সেই সঙ্খতের শিলালেখ অথবা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। নামের পূর্বে এক হইতে এগার পর্যন্ত সংখ্যা রাজ-সিংহাসনের অধিকারীর ক্রম।

রাসোলিখিত বংশলতা



শিলালেখ ইত্যাদি মতে বংশলতা



হুম্মীর মহাকাব্যে (৫) জগদেবের সিংহাসন-প্রাপ্তির উল্লেখ নাই। অর্ণোরাজের পর বিগ্রহরাজ বীসলদেব (৪র্থ)র নাম। তাহার কারণ অর্ণোকে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ২।৪ দিবস বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে বিগ্রহরাজ পিতৃ-হত্যাকারী অগ্রজকে মারিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। ‘পৃথ্বীরাজ বিজয়’ কাব্যে আছে “সুধবার জ্যেষ্ঠপুত্র আপন পিতার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন, যেমন পরশুরাম আপনার মাতার সহিত করিয়াছিলেন। বাতি নিবাইয়া দিলে যেমন দুর্গছমাত্র থাকে, তাঁহার কার্ণেরও সেই-রূপ দুর্গছমাত্র থাকিয়া গেল।” (৭) অমরগাজেশ্বর অতি অল্প দিন রাজ্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ আপনার পিতার প্রাপ্য রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়া-ছিলেন। পৃথ্বীরাজ বিজয় ও বিজয়লাল লেখে এ-নামের উল্লেখ নাই।

ট

রাসোল সকল বড় ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল, কেবল সংযুক্তা হরণ-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্য ভারতে বর্ষাকালে এখনও আল্‌হার গান গাওয়া হয়। পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক রাজা পরম-

দেব চন্দেল [পরমাল] বৃন্দেলখণ্ডের রাজা ছিলেন। মহোবা তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি আল্‌হা বনাফর [আলহন রাজা] ও তাঁহার অজ্ঞ উদন বাকড়া [উদয়সিংহ] সেকালের প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। আল্‌হার গান আরম্ভ করিবার পূর্বে সংক্ষেপে সংজ্ঞাগিন- [সংযুক্তা] হরণের গান করা নিয়ম। যখন পৃথ্বীরাজ মহোবা আক্রমণ করিলেন, তখন কনোজপতি জয়চন্দ পরমাল চন্দেলকে সাহায্য করিতে আপনার ভ্রাতৃপুত্র লাখন [লক্ষণ] রাণার অধীনে সেনা পাঠাইয়াছিলেন। এই সাহায্যের কারণ সংযুক্তা-হরণের অপমানের প্রতিশোধ বলা হয়। আল্‌হার গানে কয়েক স্থানে লাখন রাণার উক্তি আছে, “যে পৃথ্বী আমাদের বাটীর একটি চেরী [দাসী কন্যা] ভুলাইয়া আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতি-শোধ লইতে আসিয়াছি। পৃথ্বী যদি জয়চন্দকে দিয়া কন্যাদান করাইয়া লইতে পারিত, তবে তাহাকে বীর বলিয়া মানিতাম, সে ও চোরের কাজ করিয়াছে।” পৃথ্বী একবার লাখনকে বলিতেছেন, “তুমি এখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, কিন্তু আমি যখন সংযুক্তাকে আনিয়া-ছিলাম তখন কোথায় ছিলে?” লাখন উত্তর দিলেন, “তখন আমি বালক, তরবারি ধরিতে শিক্ষা করি নাই,

তাহাই এখন প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি।” লাখন একবার দিল্লীতে পৃথীর পাটরাণীকে বন্দিনী করিয়াছিলেন ; পরে, বন্ধু উদনের অহুরোধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই সময়ে বলিয়াছিলেন ; “পৃথী আমাদের বাটীর চেরী আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইলাম।” মদনপুরের শিলালেখ-অনুসারে ১২৩৯ সন [১১৮২] মহোবা জয় হইয়াছিল, অতএব যদি লাখনের উক্তি বিশ্বসনীয় হয়, তবে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই কোনও সময়ে সংযুক্তা-হরণ হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের দস্তকথায় সংযুক্তা-হরণ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে, ও ইহার উল্লেখ নানা কাব্যে ও নাটকে দেখা যায়। আল্‌হার গানে অত্যাঙ্ক আছে সত্য, কিন্তু অত্যাঙ্ক ও মিথ্যা সহজে ধরা পড়ে। আল্‌হার গানে দেখা যায়, পৃথী সামান্ত একটি গ্রামের বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিতে হইলেও সাতলক্ষ সেনা লইয়া আক্রমণ করিতেন। “সাতলাখ সে চটো পিখোরা” প্রায় সকল অভিযানেই গাঁও হয়, কিন্তু “সাতলাখ” শব্দ আছে বলিয়া অভিযানগুলি মিথ্যা বা কল্পিত বোধ হয় না।

রাসোতে সংযুক্তা-হরণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

একদিন পৃথীরাজ চন্দ্র কবিকে ধরিয়া বসিলেন, আমাকে ছদ্মবেশে আপনার সহিত কনোজ লইয়া চল, তুমি কবিরূপে জয়চন্দ্রের সভাতে প্রবেশ করিবে, ও আমি তোমার পানদানবাহক সেবকরূপে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া জয়চন্দ্রের সভা ও সংযুক্তাকে দেখিব।

ইহার কিছুকাল পূর্বে, জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে ভারতের সমস্ত ছোটো বড় রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; রাজসূয় যজ্ঞের নিয়ম-মত রাজাদের এক-একটি কার্য করিবার ভার দিয়াছিলেন। পৃথীকে ছড়ি হাতে করিয়া যজ্ঞসভার দ্বার রক্ষা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পৃথী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না, দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, ও যজ্ঞ নষ্ট করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্রের এক নিকট জাতি-ভ্রাতা এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন,

যজ্ঞরম্ভের দুইএকদিন পূর্বে, পৃথী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন ; মৃতশোঁচে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া গেল।

এ-যজ্ঞে পৃথীকে দ্বারপালরূপে আহ্বান করা হইয়াছিল, তিনি যখন নিমন্ত্রণ লইলেন না তখন জয়চন্দ্র, বিদ্রূপ করিয়া, অথবা আপনার আজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত কাগজ ও স্বর্ণের পৃথীর পূর্ণ শরীরপ্রমাণ মূর্তি গড়িয়া হাতে ছড়ি দিয়া, যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারের কাছে দ্বাররক্ষকের মতন বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইল না, কিন্তু মূর্তিটি থাকিয়া গেল, মূর্তি তুলিয়া ফেলিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই।

যজ্ঞ নষ্ট হইবার পর জয়চন্দ্র ভাবিলেন, ভারতের সকল রাজারাইত এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, একমাত্র আদরের কথা সংযুক্তাও বয়স্বী হইয়াছে, অতএব এই সুযোগে তাহার স্বয়ম্বর করিলে ভালো হয়! তিনি সেই যজ্ঞের পরিত্যক্ত মণ্ডপে স্বয়ম্বর সভা করিলেন।

সংযুক্তার প্রধানা দাসী কর্ণাট-দেশীয়া ছিল, সে পূর্বে পিখোরার দাসী ছিল, তাহার চরিত্রের জন্ত পৃথী শাস্তি দিয়াছিলেন বলিয়া সে পলাইয়া জয়চন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার মুখে ও ভাট ও কবিদের মুখে পিখোরার নানা বীরত্বের গল্প ও গাথা শুনিয়া সংযুক্তা মনে-মনে পিখোরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাঁহাকে কখন দেখে নাই, তথাপি তাঁহাকে স্বয়ম্বর সভায় পতিত্ব বরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এখন সভায় প্রবেশ করিল। সভাতে যখন ভাট একে-একে সকল রাজাদের পরিচয় দিল, তখন পিখোরার নাম না শুনিয়া সংযুক্তা চিন্তিত ও ভয় মনে বরমালা হাতে করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল ; এমন সময়ে মণ্ডপের দ্বারের কাছে মূর্তি দেখিয়া, কৌতূহলের বশে ঐ মূর্তিটি কি, কাহার, ও দ্বারের কাছে কেন রাখা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। পিখোরার মূর্তি শুনিয়া সংযুক্তা সেই মূর্তির গলায় মালাদান করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। এই ঘটনা দ্বারা উপস্থিত রাজারা আপনাদের অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন ; কিন্তু সম্রাটের আদরের কণ্ঠার কার্যের আলোচনা বা প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। জয়চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং কিছু না বলিয়া কণ্ঠাকে তিরস্কার ও শাসন করিতে তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে সংযুক্তার

মতপরিবর্তন ও সন্মতি হইলে দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর সভা করিবেন, সেইজন্য অতিথি রাজাদের আরও কয়েকদিবস থাকিতে আজ্ঞামিশ্রিত অমুরোধ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সংযুক্তার মাতা, মহারানী জ্যোৎস্না, কন্যাকে নানা কথায় তিরস্কার করিলেন; পরে বলিলেন, “তোমার ব্যবহারে তোমার পিতার মানসম্মত নষ্ট হইয়া গেল, রাজাদের সমাজে মুখ দেখানো ভার হইল। তুই কি নিকোঁধ! সভাতে এত বড়-বড় রাজা থাকিতে তুই কিনা তোমার পিতার পরম শত্রু ও অপমানকারী, আমাদের বংশের শত্রু, অকারণে ও অধম যুদ্ধে তোমার খুল্লতাত মাতকের মূর্ত্তিকে বরণ করিলি?” গার্কিতা সংযুক্তা এতক্ষণ চূপ করিয়াছিল, মাতার তিরস্কার-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কানে তোলে নাই, এখন এই কথাগুলি শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, “মা তুমি ভুলিতেছ, আমি যে-সে সাধারণ বালিকা নহি, আমি চক্রবর্তী রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা, যে-রাজা অজুলী হেলাইলে সে আদেশ সমুদ্রতীর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত নভিশিরে মাণ্ড করে, আমি সেই সম্রাট জয়চন্দ্রের কন্যা, যাহার দ্বারে সর্কদা অগণিত ছত্র ও মুকুটধারী ক্ষত্রিয়রা নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রহরীর কার্য্য করে, আমি সেই দ্বিধিজয়ী বীর জয়চন্দ্রের কন্যা। তুমি বলিতেছ, এত বড় রাজা আসিয়াছেন, কিন্তু আমি ত সভাতে একটিও রাজা দেখিতে পাইলাম না। আমার চক্রবর্তী পিতার হকার শুনিয়া যে কুকুরগুলি ভয়ে লাজ গুটাইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া বসিয়াছে, আমি জয়চন্দ্রের কন্যা হইয়া, কোন্ লজ্জায় তাহাদের মধ্যে কাহারও দাসী হইতে যাইব? তাহা ত জীবন থাকিতে পারিব না। যে সিংহ আমার পিতার মত রাজচক্রবর্তীর নিমন্ত্রণ-পত্রবাহক দূতকে আবজ্ঞা করিয়া তাড়াইয়া দিতে সাহস করিয়াছে, কেবল সেই বীর আমার স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যদি কখন তাঁহাকে পাই, তবে তাঁহার দাসী হইব, নতুবা কুকুরী হওয়া অপেক্ষা কুমারী জীবনই কাটাইব।” এ উক্তি উপর আর কোনও-প্রকার তর্ক চলে না, অতএব জয়চন্দ্র রাগ করিয়া কন্যাকে গজাতীরের এক প্রাসাদে অন্ন কয়েকটি দাসীর সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছু-

কাল পরে, কনোজ হইতে কোনও পথিক দিল্লীতে গিয়া পৃথীকে এই গল্প শুনাইল। পৃথী, ছদ্মবেশে কনোজে আসিয়া অন্ততঃ একবার এই অদ্ভুতচারিত্রা তেজস্বিনী ও গার্কিতা সংযুক্তাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

চন্দ্র প্রথমে রাজাকে ছদ্মবেশে সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই, কিন্তু পৃথীকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সুর ও মন্ত্রীদের পরামর্শ করিতে বলিলেন, ভাবিলেন, তাহারা কখনই এমন ছঃসাহসের কার্য্যের অনুমোদন করিবে না। চন্দ্রের পরামর্শ-মত পৃথী আপনার সুর ও মন্ত্রীদের ডাকিয়া সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমেশ্বর পৃথীর বাল্যকাল হইতে একশত আট জন সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই সম্বংশজাত বীর ও সাহসী যোদ্ধা, ইহারা পৃথীর প্রসিদ্ধ “অষ্টোত্তর সুর” নামে পরিচিত। পৃথীর এক জাতি খুল্লতাত—কহুকা—এই সুরদের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বলবান্ ও সাহসী ছিলেন। তিনি সুরদের প্রধান বানামক বিবেচিত হইতেন। ইহাদের বাহুবলে পৃথী এত বলীয়ান্ ছিলেন, যে খতই বলবান্ শত্রু হউক না কেন, তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চিন্তা না করিয়াই মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রস্তুত হইতেন। সকলেই ছদ্মবেশে যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন “একজন রাজার এ-প্রকার ছদ্মবেশে সেবক সাজিয়া যাওয়া উচিত নহে। ইহা ছাড়া তোমার মতন প্রসিদ্ধ রাজাকে জয়চন্দ্র স্বয়ং কখন দেখেন নাই বটে, কিন্তু সভার কেহই চিনিতে পারিবে না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?” পৃথী বলিলেন, “একজন ব্রাহ্মণ কবির পানদানবাহক সেবককে প্রসিদ্ধ বীর ও বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী পিথোরা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে, এমন মুখ কোথায় পাইবে?” যখন সকলে পৃথীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিলেন, তখন বলিলেন, “একান্ত যদি যাওয়া স্থির করিয়া থাকো, তবে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া চল।” পৃথী আপনার সঙ্গী অষ্টোত্তর সুর ছাড়া ঐ সুরদের সমকক্ষ, যত্নাভয়হীন যোদ্ধা, ১১০০ এগার শত বাছা-বাছা বীর অশ্বারোহী সঙ্গে লইলেন। তাঁহার সুর ও অশ্বারোহী প্রত্যেকে ৫৭১০ জন আপনাদের সমকক্ষ বীর, আপনার-আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গে লইল। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য, এক-একটি ধরিলেও,

অতিরিক্ত ১০।১২ হাজার বলবান্, কষ্টসহিষ্ণু, ক্রতগামী শিক্ষিত অশ্ব, ১২,০০০ যোদ্ধার উপযুক্ত অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র, অটোলা [ভোজনালয়], বস্ত্রাবাস ও সেবকদের দল সঙ্গে লইতে হইল। এইরূপে, অতি অল্প করিয়া ধরিলেও ২৫।৩০ হাজার লোকের দল হইল। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিতেন ও রৌদ্রের সময়ে বিশ্রাম করিতেন। দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিবস সূর্যোদয়ের সময়ে তাঁহারা কনোজ নগরে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ রাজ্যে আসিয়া প্রচার করিলেন, তিনি দিল্লীর রাজকবি, কনোজপতিকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। সকালে কবিদের, বিশেষতঃ রাজকবিদের অনেক ছোটো-খাটো রাজ্যপেক্ষা বেশী সম্মান ছিল। তাহারা রাজাদের মতন হাতী, ঘোড়া, ডকা, নিশান, চোবদার ইত্যাদি ও ২।৪ হাজার বা ততোধিকসংখ্যক লোক সঙ্গে করিয়া পর্যটন করিয়া বেড়াইত, ও ছোটো-বড় সকল রাজপুত্র সভাতেই সম্মান লাভ করিত। তাহারা নিজদের রাজাদের কীর্তির গাথা, অথবা শ্রোতা যাহা শুনিতে চাহে তাহাই শুনাইত, ও অল্পদের সংবাদসংগ্রহ করিত, সকলে আগ্রহ করিয়া আপনাদের দেশের সত্য সংবাদ দিত। এই ভ্রাম্যমাণ কবিরা রাজপুত্রদের ইতিহাসের সচল পুস্তকাগার ছিল, সকল রাজপুত্রদের কীর্তিকাহিনী ইহাদের কণ্ঠাগ্রে থাকিত। সকালে সংবাদপত্রাদি ছিল না, এই কবিদের দ্বারাই সকল রাজপুত্র-বীরদের কীর্তিকাহিনী, ধন ও পুত্র কন্যাদের কথা রাজপুত্রসমাজে অতি অল্প কালে প্রচারিত হইত। রাজপুত্রসমাজে পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে এইরূপ সংবাদ কার্যকরী হইত। কখন-কখন রাজপুত্রবালারা যুবকদের বিবাহ করিতে আহ্বান করিত।

যখন চন্দ রাজসভাতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে পিথোরা স্ববর্ণময় পানদান হাতে লইয়া সেবকরূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সভার যাহারা পূর্বে পিথোরাকে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, কবির পানদানবাহক দেখিতে ঠিক পিথোরার মতন, স্বয়ং পিথোরা নহে ত ? এ-সন্দেহের কথা ক্রমে জয়চন্দের কানে উঠিল, কিন্তু অপমানের ভয়ে, কেবল সন্দেহে একজন সেবককে পিথোরা বলিয়া ধরিতে ও বন্দী করিতে তিনি

সাহস করিলেন না। পানদানবাহকের পরিচয় জানিবার জন্য গুপ্ত চরদের আজ্ঞা করিলেন। জয়চন্দ কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার রাজা কিরূপ দেখিতে, ও তাঁহার বয়স কত ?' কবিরা চারি দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা প্রকারে হাত নাড়িয়া, অজ্ঞত্বী করিয়া, কবিতা আবৃত্তি করিত; চন্দও তৎক্ষণাৎ পিথোরার রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়া, মুখে মুখে কয়েকটি রচনা করিয়া আপনার পানদান-বাহকের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজা এইরূপ ও তাঁহার বয়স ৩৬ * বৎসর ছয়মাস; অর্থাৎ প্রকারান্তরে পিথোরাকে দেখাইয়া দিলেন। জয়চন্দ কবি ও তাহার অল্পচরদের এক বিস্তৃত বাগান বাটীতে থাকিবার স্থান দিলেন, কবির সহিত ৫।৭ হাজার লোক রহিল, বিদেশী ধনবান্ ভ্রমণকারীদের মতন নগরের নানা স্থানে, কিন্তু যত দূর সম্ভব, বাগানের নিকটে স্থান ভাড়া লইয়া আশ্রয় লইলেন।

পরদিন প্রাতে জয়চন্দ বহুমূলা উপহার লইয়া, হাতী ঘোড়া মণিমুক্তাদি লইয়া, বাগান-বাটীতে আসিয়া কবির সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। জয়চন্দের বিদায়ের সময়ে কবি নিয়ম-মত আপনার পানদানবাহককে মহারাজাকে পান দিতে আজ্ঞা করিলেন। পিথোরা পান আনিলেন বটে, কিন্তু হাতে করিয়া পান তুলিয়া জয়চন্দকে দিতে গেলেন। পান দিবার নিয়ম, যে যখন সম্মাননীয় ব্যক্তিকে পান দিতে হয়, তখন নিজের হাত পাতিয়া তাহার উপর রাখিয়া ভেট দিবার মতন করিয়া দিতে হয়, গ্রহীতা তুলিয়া লয়; কিন্তু যখন রাজারা প্রজাদের পান দেন, তখন দান করিবার মতন নিজের হাত উপুড় করিয়া সেই হাতে হাত দিয়া থাকেন, গ্রহীতা হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জয়চন্দকে হাত পাতিয়া, তাহার উপর পান রাখিয়া, ভেট দিবার মতন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু পৃথী আপনার পূর্ব অভ্যাসমত, অথবা ইচ্ছা করিয়া জয়চন্দকে অপমান করিবার জন্য, আপনার হাতে পান তুলিয়া দান করিবার মতন দিতে

* রাসোতে পৃথীর জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল [বৈশাখ] মাসে, অতএব এগটনা ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর [কার্তিক] মাসের হওয়া উচিত, কিন্তু সংস্কৃত বিবাহের সময়ে কান্তন বাস বলা হইয়াছে। ১১৮৪খৃঃতে ও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গেলেন। জয়চন্দ্র ওরূপে মান লইতে অভ্যস্ত নহেন, অতএব লইতে অস্বীকার করিলেন। কবি জয়চন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সেবক নূতন লোক, এরূপ কার্যে অনভ্যস্ত, পূর্বে কখনও রাজাদের পান দেয় নাই; অতএব জয়চন্দ্রের নিয়মের বশীভূত না হইয়া কবির আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। তিনি দুই চারিটি কবিতা ও শ্লোকও বলিলেন, যে এমন অবস্থায় সজ্জনেরা কেবল প্রীতি ও ভক্তিটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন; পান ত সামান্ত মূল্যহীন উপলক্ষ মাত্র। কবির বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া জয়চন্দ্র পান লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি এই পানদান-বাহক সত্য-সত্যই পিথোরা? কিন্তু একজন ছত্র ও মুকুট-ধারী বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী সম্মানিত রাজা এরূপ হীন কার্যভার লইবে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নূতন সেবক হইলে কি কবি তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজাদের সভায় পর্যটন করিতে বাহির হইয়াছেন, অথচ রাজাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে শিক্ষা দেন নাই? সেবকের ভুলের জন্য আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু কই সেবকের প্রতি ত রুষ্ট হইলেন না। এরূপ সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য বাগানবাটীতে আরও কয়েকটি চতুর চর পাঠাইলেন। ষিপ্রহরে, কবি জয়চন্দ্রের আস্থানে রাজবাটীতে গিয়া নানা কথাবার্তায় সময় অতিবাহিত করিলেন। চোহান-বংশের ইতিহাস, ও পৃথ্বীর পূর্বপুরুষের কীর্তিকাহিনী শুনাইলেন। ঘোরী কয়েকবার জয়চন্দ্রের রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন পৃথ্বী তাঁহাকে পথেই পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া প্রকারান্তরে জয়চন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন সে-কথাও শুনাইলেন। পৃথ্বী এইরূপে জয়চন্দ্রের কত উপকার করিয়াছেন, জয়চন্দ্র তাহা জানিতেন না, কবি এখন সেইসকল কথা বলিয়া তাঁহাকে পৃথ্বীর প্রতি তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন।

তৃতীয় প্রহরে, ধনবান্ যুবকের বেশে, পিথোরা এক জন সুর সঙ্গে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে যখন

তিনি নদীতীরে বেড়াইতেছিলেন, তখন সংযুক্তার প্রধান দাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল, ও তাঁহার চেষ্টায় পৃথ্বীর সহিত সংযুক্তার সাক্ষাৎ হইল। দাসী উভয়কে পরিচিত করাইয়া দিলে সংযুক্তা পৃথ্বীর গলায় ফুলের মালা দিয়া বলিলেন, “পূর্বে আপনার মূর্তি বরণ করিয়া মনে মনে নামমাত্র দাসী হইয়াছিলাম, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সত্য-সত্যই আপনার দাসী হইলাম।” পিথোরার সঙ্গী সুরটি চোহান বংশের কুস-পুরোহিত বংশীয় ছিলেন, তিনি কস্তাদানের মন্ত্রপাঠ করিলেন, সংযুক্তার প্রধানা কণাটী দাসী কস্তাদান করিল, বিবাহ হইয়া গেল। রাজি ষিপ্রহরের পর পিথোরা একা বাগানে ফিরিয়া আসিলেন। কহুকাকা, বিবাহের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “তোমার মত মূর্থ জিজ্ঞাগতে নাই; বিবাহ যদি করিলে, তবে চোহান রাজ-বধুকে অসহায় ও অরক্ষিতা অবস্থায় কমধ্বজ কারাগারে রাখিয়া আসিতে একটুও লজ্জা বোধ করিলে না?” পৃথ্বী আবার গিয়া সংযুক্তাকে সেই রাতেই সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

এ ঘটনার পর পৃথ্বী আর কোনোজ্ঞে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না, অতএব কোনোজ্ঞবাসের তৃতীয় দিবস প্রাতে পৃথ্বী ও সংযুক্তা উভয়ে এক বলবান্ অশ্বপৃষ্ঠে বসিলেন, চারিদিকে সুরেরা বাহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন পৃথ্বী চন্দ্র-কবিকে বলিলেন, “যাও, রাজসভাতে জয়চন্দ্রকে সংবাদ দিয়া আইস।” চন্দ্র বলিলেন, “বৃথা বিবাদ করিয়া লাভ কি? তোমার ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, এইবার গৃহে চল।” কিন্তু পৃথ্বী স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন “আমি চোর নছি, চুরি করিতে আসি নাই, সংবাদ দিয়া বীরের মতন যাইব, যাহার ক্ষমতা বা সাহস থাকে সে আমাকে আটক করুক।” এইরূপে, সংবাদ দিয়া, পৃথ্বী আপনার সুর ও অহুচরদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিলেন।

ইতিপূর্বে, জয়চন্দ্র গুপ্তচরের মুখে কবির দলে পিথোরার অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছিলেন; তিনি পৃথ্বীকে বন্দী করিবার উপায়-সম্বন্ধে মন্ত্রীদেবর সহিত পরামর্শ

করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্র-কবি রাজসভাতে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—“মহারাজ! দিল্লীধরী মহারানী সংযুক্তা পতিগৃহে বাইতেছেন, তিনি পিতার আশীর্বাদে জগৎ অপেক্ষা করিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া কোণে জয়চন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিফুলিক বাহির হইতে লাগিল। তিনি কবিকে বলিলেন, “তুমি ব্রাহ্মণ ও কবি, সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার সহিত পিধোরা আমার সভাতে—আসিয়াছিলেন কি না?” চন্দ্র উত্তর করিলেন, “হাঁ মহারাজ, আসিয়াছিলেন। আমি ত আপনাকে এইপ্রকারে হাত দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিয়া ছিলাম, “আমার রাজ্য এইরূপ আপনি না বুঝিতে পারিলে আমি কি করিব?” জয়চন্দ্র বলিলেন, “তবে পিধোরাই কি তোমার পানদানবাহক সেবক?” কবি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “না মহারাজ! তিনি আমার সেবক নহেন, তবে ঐরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, সে কথা সত্য।”

জয়চন্দ্র আপনার প্রধান সেনাপতি রাবণকে পৃথ্বী ও সংযুক্তাকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তিনি উভয়কে স্বহস্তে শাস্তি দিবেন, সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। সেনাপতি বলিলেন, “আজ্ঞা করুন পিধোরার মস্তক ও সংযুক্তাকে আনিতেছি, কিন্তু তীর ব্যবহার না করিয়া কেবল তরবারির যুদ্ধে সুরদলবেষ্টিত পৃথ্বীকে জীবিত বন্দী করা কার্যতঃ অসম্ভব।” রাজা শুনিলেন না, প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিতেই বারবার আজ্ঞা করিলেন। জয়চন্দ্রের এই হঠে পৃথ্বীর প্রাণ বাঁচিয়া গেল, নতুবা তীরের যুদ্ধ হইলে জয়চন্দ্রের লক্ষ্যধিক সেনাবেষ্টিত ঐ কয়টি দিল্লীবাসীর প্রাণ অল্পকয়েক মুহূর্তেই বাইত। কনোজ যোদ্ধারা পৃথ্বীকে ঘিরিয়া ফেলিল, ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দল পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময়ে [আধুনিক মিরাত জেলায়] * সোরোঁ নগরে দিল্লীর দল গঙ্গা পার হইয়া নিরাপদ হইলেন। সংযুক্তা অধ্বপৃষ্ঠে ও পৃথ্বী তাঁহার পাশে সঁতার

দিয়া পার হইলেন। গঙ্গার অপর পারে পৃথ্বীর রাজ্য। জয়চন্দ্র আপনার রাজ্যসামা মধ্যেই তাঁহাদের ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পৃথ্বীর রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। পৃথ্বীর সুরদল, অশ্বারোহী ও তাহাদের আত্মীয়দের মধ্যে সর্বমুদ্র ৭০।৮০ জন যোদ্ধা অনাহত জীবিতাবস্থায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে উঠিয়াছিলেন। সেবকদের অবশ্য কেহ মারে নাই।

পৃথ্বীর পক্ষে সংযুক্তা অতি মূল্যবান, কেননা তিনি প্রায় এগার হাজার যোদ্ধা ও আপনার বাহুবলের বিনিময়ে তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এতগুলি যোদ্ধার মৃতদেহ অতিক্রম করিয়া সংযুক্তা পতিগৃহে প্রবেশ করিলেন, এগোরব সম্ভবতঃ অল্প কোনও রাজকুমারীর কপালে হয় নাই। সংযুক্তাকে অনেকে বীর্যশুদ্ধা বলিয়াছেন, কিন্তু ঘটনাগুলি দেখিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে বীর্যশুদ্ধা বলা যায় না। বীর্যে দ্বারা পৃথ্বী তাহাকে লাভ করেন নাই; গোপনে তাহার পিতামাতার অমতে বিবাহ করিয়া, আপনার বিবাহিতা স্ত্রীকে রক্ষা করিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরত্বের বিনিময়ে বন্ডলাভ করিলে তাহাকে বীর্যশুদ্ধা বলিতে পারা যায়।

পথের যুদ্ধ বর্ণনাতে আছে যে, একসময়ে সংযুক্তা দেখিলেন তাঁহার পিতা জয়চন্দ্র আপনার “লাল কমান” [বৃহৎ ধনুর্কাণ] দিয়া পৃথ্বীকে লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি যুক্তকরে পিতার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, জয়চন্দ্র ধনুর্কাণ রাখিয়া দিলেন। ইহার পর অল্প-একসময়ে দেখিলেন, পৃথ্বী জয়চন্দ্রের প্রতি “লাল কমান” দিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি পৃথ্বীকে স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতিপূর্বে জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে লক্ষ্য করিয়াও ধনুর্কাণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন তরবারির যুদ্ধ হইতেছিল, কাহাকেও তীরধনু দিয়া লক্ষ্য করা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য হয় না। পৃথ্বী কমান রাখিয়া দিলেন। অর্থাৎ পথিমধ্যে একবার স্বামীর ও একবার পিতার জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন।

পথে তিনদিন ও দুইরাত্রি কাটিয়াছিল। সমস্ত দিন ধর্মযুদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ একজন দিল্লীর যোদ্ধা একজন কনোজের যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন নিহত

* বরাহকেত্র, শুকরখেৎ, শুররখেৎ, সোরোঁ Soron on the Ganges, কনোজ হইতে আকাশপথে প্রায় ৮৫ মাইল। তখনকার রাজপথে ৩০।৩২ কোশ হইবে।

বা আহত হইয়া অকর্মণ্য হইলে অল্প যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে বাহ-বেষ্টিত পৃথ্বী পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কখনও একজন যোদ্ধাকে এককালে দুইজন আক্রমণ করে নাই। সূর্য্যাস্তের সময়ে উভয় দল বজ্রাবাস পাঠাইয়া বিশ্রাম করিত, সেবকরা পাদ্য প্রস্তুত করিত। তখন ফাল্গুন মাস, অনেকে খোলা মাঠেই নিদ্রা যাইত। রাত্রে, দিল্লীর দল ইচ্ছা করিলে গলাহিতে পারিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা করেন নাই। সূর্য্যোদয়ের পর, গত বৈকালে যতদূর যুদ্ধ করিতে-করিতে আসিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া আবার যুদ্ধ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেন। দিল্লীর দল মোরোঁতে গঙ্গাতটে সন্ধ্যার পূর্বে পহুঁছিলেন, গঙ্গাতে ঝাঁপ দিবার পরই যুদ্ধ বন্ধ হইল।

জয়চন্দ্র কনোজ প্রত্যাগমনের সময়ে পথে যে হতাহত যোদ্ধাদের পারিলেন, তন্মধ্যে উভয় পক্ষের হতদের সংকার করিয়া কনোজের আহতদের আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন ও দিল্লীর আহতদের ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া, অতি যত্নে দোলায় করিয়া, দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে জয়চন্দ্রের এক ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন, তিনি রাগ করিয়া কনোজ ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর কনোজের দলে ছিলেন, যুদ্ধের সময়ে, ঘটনাক্রমে, দুই সহোদরে যুদ্ধ হইয়াছিল, ও উভয়ে আহত হইয়া পথে পড়িয়াছিলেন। এক ভ্রাতা কনোজে অল্প ভ্রাতা দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। আহত সখকে রাজপুত্র শক্রমিত্রে প্রভেদ করিত না, সকলেরই অতি যত্নে সেবা করিত।

জয়চন্দ্র কনোজ প্রত্যাগমন করিয়া কচা ও জামাতার প্রাপ্য দানের জব্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ অভিমানে কেবল পৃথ্বীর বাহুবল চূর্ণ হইল না, জয়চন্দ্রও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীর পতনের এক বৎসর পরে মুসলমানেরা—যাহারা বহবার তাঁহার কাছে পরাজিত হইয়াছিল—তাঁহাকে ও পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে হিন্দুরাজ্যের চিহ্ন লোপ করিল।

সংযুক্তা হরণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ ও মতভেদ আছে।

মদনপুরের শিলালেখ-মতে সন্থ ১২৩২ [১১৮২ খৃঃ] মহোবা জয় হইয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীর বিপক্ষে পরমাল চন্দ্রলকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ও সাহায্যের কারণ [দস্তকথা ও আল্লায় গান অনুসারে] সংযুক্তা-হরণের অপমানের প্রতিশোধ বলা হইয়া থাকে; সেইজন্য আগে সংযুক্তা-হরণ সংক্ষেপে গাহিয়া তবে মহোবার যুদ্ধ গান করা হয়। একথা সত্য হইলে, ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই হরণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই সংযুক্তা-হরণে পৃথ্বীরাজের বাহুবল একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি কোনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত রহিলেন না। তিনি সে লুপ্ত দল আবার সঞ্চয় করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

পৃথ্বী তখন কিছু কাল, সংযুক্তার মনোরঞ্জনের স্ত্রী নানা প্রকার শিবারে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে, জঙ্গলে, ঘুরিয়া বেড়াইলেন; পরে রাজকার্য্য মন্ত্রীদেব স্বয়ং চাপাইয়া সংযুক্তার অস্ত্রপুত্র প্রবেশ করিলেন। তাঁহান যে কয়টা স্ত্রী বাঁচিয়াছিল, তাহারা রাজার অস্ত্রপুত্র বাসকালে মন্ত্রীদেব আধিপত্য সহ্য করিতে পারিল না, বিস্কৃত হইয়া কেহ বা আপনার দেশে চলিয়া গেল, কেহ তীর্থ ভ্রমণ করিবার ছল করিয়া পৃথ্বীকে ত্যাগ করিল; রাজ্য অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ঘোরীর মতন দূরদর্শী চতুর শত্রু এ অবসর ত্যাগ করিলেন না, দ্বিতীয় বার বল-সঞ্চয় করিবার পূর্বেই পৃথ্বীকে আক্রমণ করিলেন। পৃথ্বী সংযুক্তার অস্ত্রপুত্র হইতে ছয় মাস বাহিরে আসেন নাই। সংযুক্তা আপনার প্রাসাদের পুরুষ-প্রহরী ও সেবকদের তাড়াইয়া স্ত্রী প্রহরিনী ও সেবিকা নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত প্রাসাদ ও বাগানে একটিও পুরুষ ছিল না।

রাসোতে আছে যে পৃথ্বীরাজের রাজধানীতে [দিল্লী হউক বা অজমীর] ঘোরীর অনেকগুলি গুপ্তচর ছিল, তাহারা কাবুলী অশ্ব-বিক্রেতা ইত্যাদি নানা বণিকের ও মুসলমান ফকিরের বেশে সংবাদ সংগ্রহ করিত। পৃথ্বীর লেখক-সম্প্রদায়ের একটি বিশ্বাসঘাতক উচ্চ রাজকর্মচারী গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিত। প্রয়োজন হইলে, শীঘ্রগামী উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বিশেষ বাহক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হইত।

ঘোরীর চরেরা স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ কবিয়া পাঠাইত, একজন চর কি সংবাদ পাঠাইল অত্রা জানিতে পারিত না। ঘোরী একজন চরের কথায় বিশ্বাস করিতেন না, একই সংবাদ একাধিক চর আনিলে বিশ্বাস করিতেন। পৃথীর সংযুক্তার অন্তঃপুরে বাসের কথা এত অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে, তিনি একাধিক চর বলিলেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সেইজন্য একজন উচ্চ রাজকন্ঠচারীকে ফকির-বেশে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ সংবাদ লইয়া যাইলে, আক্রমণ করিবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন। রাজপুত্রেরা কবিদের অকাতরে সত্য সংবাদ দিয়া থাকে বলিষ্ঠা, ইতিপূর্বে একবার একট গজনাবাসী ব্রাহ্মণ-কবিকে পৃথীর সভায় সংবাদ-সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। পৃথীর কিন্তু এরূপ চর ছিল না; তিনি শত্রুর গতিবিধি বা সৈন্য-সংগ্রহের কোন সংবাদই রাখিতেন না। শেষ বড় যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ রাজধানীর বাণকেরা পাইয়া অনেকে মানবদেশে বা জয়চন্দের রাজ্যে পলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাজকন্ঠচারীরা কোনও সংবাদ পান নাই। রাজা ত যুদ্ধের পূর্বে ছয়মাস পুরুষের মুখ দেখেন নাই, রাজ্য আছে কি নাই তাহাও জানিতেন না; রাজার অমাত্যরা, রাজা জীবিত কি মৃত, তাহাও নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারিতেন না। যখন দেশের প্রজারা পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন কবি চন্দ প্রহরিণীদের প্রহার অগ্রাহ করিয়া, বলপূর্বক সংযুক্তার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, ও আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “মহারাজ, রাজ্য যে গেল, আর থাকে না; একবার দেখিবেন না?” পরে এক কবিতাতে বলিলেন, “তুমি ভোমার গোরী [সুন্দরী] লইয়া উন্নত, আর গোরী ভোমার রাজ্য লইতে উন্নত।” এই কথা শুনিয়া পৃথী বাহিরে আসিলেন, ও যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন।

অতএব, শেষ যুদ্ধের সন্ন্য দু-এক বৎসর পূর্বে সংযুক্তা-হরণ হইয়াছিল, ও ইহা অনেকটা সম্ভব বোধ হয়। সংযুক্তা-লাভের পর, সংযুক্তার মোহ কাটাইবার পূর্বেই সব শেষ হইয়া গেল। ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যদি হরণ হইত, তবে অন্ততঃ বার বৎসর অন্তঃপুর বাস স্বীকার করিতে হয়। একজন রাজার পক্ষে এত কাল রাজকার্য ছাড়িয়া বসিয়া

থাকা সম্ভবও নহে, শত্রুরা অবসরও দিত না। সুন্দরীর মোহও এত কালে থাকে না।

সেকালে রাজারা বারো মাস যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন, বর্ষার পর বিজয়ার দিন যুদ্ধযাত্রা করিয়া আষাঢ় মাস পড়িলে রাজধানীতে ফিরিতেন। ঘোরীর সহিত বড় সম্মুখ সমর সন্ন্য দু-একটি হইলেও প্রায় প্রতিবৎসর ২৫ বার সংঘর্ষ হইত, রাসোতে এইরূপ অনেকগুলি সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। যদিও কোন ইতিহাসে ইহার সবিস্তার বর্ণনা নাই, তথাপি বোধ হয় সংযুক্তা-হরণের পর, যখন পৃথীর বাহুবল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ঘোরী কোনও স্থানে, সংঘর্ষে পৃথীকে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবেন। পৃথী, অত্র উপায় না দেখিয়া কর দিতে, ও ঘোরীর সামন্তপদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া থাকিবেন। যে ভানুমুদ্রার এক দিকে “পৃথারাজ” ও অত্রদিকে “সুন্দরী মংঘর সাম” লেখা, সেগুলি ঐ সামন্তপদ স্বীকার করিবার পর মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বোধ হয় পৃথী সামন্তপদের অঙ্গমান সহ্য করিতে পারেন নাই, কোনওরূপ বলসঞ্চয় করিয়া ঘোরীর অধীনতা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, এই চেষ্টাকেই তাজ-উল-মামার মুসলমানদের ঘৃণা করা ও বড়োজ্ঞ বলিয়াছে। [ক ২।১০ দেখ]। ঘোরীর মতন দূরদর্শা যোদ্ধা সে-চেষ্টার অবসর দিলেন না, বলসঞ্চয় করিবার পূর্বেই সম্মুখ সমরে আসিতে বাধ্য করিলেন।

শেষ যুদ্ধের সন্ন্য পৃথী অনেকগুলি ছোটো-ছোটো রাজাদের সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাট, বৃন্দেলখণ্ড, ও বনোজের মতন প্রবল রাজাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য অথবা যে কারণেই হউক, তাহাদের কাছে সাহায্য চাহিতে সাহস করেন নাই, বা চাহেন নাই। তাহারাও গায়ে পড়িয়া কেহ সাহায্য করে নাই। রাসোর সমরসিংহ বল্লিত নায়ক, কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস হইতে জানা যায়, যে পৃথীর পতনের শেষ যুদ্ধে, সে-সময়কার রাণা পৃথীকে সাহায্য করেন নাই।

সরস্বতী-নদীতীরে পৃথীর দেহ পাওয়া গিয়াছিল;

সংযুক্ত পৃথীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াই চিত্তারোহণ করিয়া ছিল।

এ-দেশে প্রবাদ ও কোন-কোন কাব্যে আছে যে

সংযুক্তা ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহিতা ও ২৭ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। এ-কথা সত্য হইলে ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সংযুক্তা হরণ হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ধনবিজ্ঞান, মানব ও সামাজিক বিজ্ঞান

শ্রী হৃষীকেশ ত্রিপাঠী

অল্পকয়েক বছর আগেই ধনবিজ্ঞানের আসন অনেক নীচে ছিল। কার্ল মার্কস, রাশ্বিন প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যরথীরা ধনবিজ্ঞানকে খুব ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। তাঁদের মতে ধনবিজ্ঞানটা ছিল মেমনের নীতি, কতকগুলি স্বার্থপর লোকের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই বিজ্ঞানটার সৃষ্টি। মানুষের সুখস্বাস্থ্যের উপর, তা'র চরিত্রের উপর ধনের যে কি-রকম প্রভাব তা ভখনকার ধনবিজ্ঞানবিদরা তত তলিয়ে দেখতেন না যেমন আজকালকার এ'রা দেখেন। তাঁরা কেবল ধন-উৎপাদন নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত। সেই কারণেই ধনবিজ্ঞানের আসন ছিল অনেক নীচে। ধন কেবল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার উপায়মাত্র। ইহা মহৎ উদ্দেশ্যে অর্জিত হ'তে পারে, নীচ ও জঘন্য উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করবার জন্যও অর্জিত হ'তে পারে। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে আমি আমার কলেজের বেতনের টাকা রোজগার ক'রতে ব্যস্ত, আমার এই ব্যস্ততা ও অর্থাভাবের ভিতর অপ্রশংসার কিছুই নেই। ধন টাকা এগুলিতে আমাদের কাজ করবার প্রবর্তনার ঘে-রকম পরিমাণ করা যায়, এ-রকম অল্প কোনো জিনিষদ্বারা হয় না। এ-কথাটি যদি আগেকার ধনবিজ্ঞানবিদরা বুঝতে পারতেন তা হ'লে ধনবিজ্ঞানকে এত তীব্র নিন্দা-বাদ সহ্য ক'রতে হ'ত না। অর্থপিপাসাতে অল্প পিপাসার অভাব বুঝায় না, একথাটা তাঁদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কাজ করবার আনন্দ প্রভূত লাভের চেষ্ঠা প্রভৃতির শক্তি ও অর্থপিপাসার মধ্যে আছে। ঘোড়দৌড়ের বোড়া যেমন প্রতিযোগিতায় জিতবার

জন্য প্রাণপণ চেষ্ঠা ক'রে আনন্দ পায় সে-রকম অনেক ব্যবসাদারও তা'র প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে খুব আনন্দ পান, টাকা রোজগার ক'রে তেমন নয়।

অর্থপিপাসা যে সব সময় নিন্দনীয় হয়, শুধু এটি প্রমাণ ক'রে আজকালকার পণ্ডিতরা নিরস্ত হননি।—তাঁদের মতে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের একদিকে যেমন ধন, অন্য দিকে তেমন মানুষ। মানুষের সুখস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তা'র চরিত্রের দিক দিয়ে ধনের আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ। তাই অধ্যাপক [Marshall তাঁর পুস্তকের প্রথমেই লিখলেন।

"Political Economy or Economics is the study of mankind in ordinary business of life."

ধনবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করে।

*** "Thus it is, on the one side, a study of wealth, and on the other and more important side, a part of the study of man."

ধনবিজ্ঞান যেমন একদিকে ধন-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তেমন অন্য দিকে ইহা মানববিজ্ঞানের একটি অংশ, এবং শেষোক্ত দিকটিই ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক।

ধনবিজ্ঞান আজকাল মানববিজ্ঞানের অংশ, তাই তা'র আসন এত উচ্চে। মানুষের দিক দিয়ে ধনকে আলোচনা করা হ'ল ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক। কারণ, মানুষ সারাদিন মাথার ঘাম পায় ফে'লে যা রোজগার ক'রে আনলে সবই ঢুকল তা'র উদরে—। সেটির চিন্তা তা'র যেমন বলবতী হবে, এবং সেগুলি চরিত্রগঠনে তা'র যেমন

সহায়তা করবে, ধর্মমতদ্বীয় চিন্তা ছাড়া এরকম বলবতী অল্প কোন চিন্তা হবে না, কিংবা তা'র চরিত্রগঠনে সহায়তা করবে না। ধর্মচিন্তা আর অর্থচিন্তা এ দুটি হ'ল মানুষের মূল চিন্তা। ধর্মচিন্তা অতি তীব্র হ'তে পারে কিন্তু মানবজীবনে বেশীর ভাগ সময় দখল করেছে অর্থচিন্তা বা অর্থচিন্তা। অর্থচিন্তা চমৎকার। যে কাজের দ্বারা জীবিকা নিরূপিত হয়, বেশীর ভাগ সময় মানুষ তা'র কথাই ভাবে, তা'র সহকর্মীদের সঙ্গে প্রভুর প্রভাব সবই তা'র চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। আমি অধ্যাপক, আমার চিন্তা সং, যাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ হয় তাঁরাও সং, আমার চরিত্র ভাগো হওয়াই স্বাভাবিক। চুরি ক'রে জীবিকানির্ভর করলে, তা'লে চুরির কথা, সঙ্গী হ'ল সব চোর-বদমাইস, আর আদর্শ হ'ল একটা চোরের সঙ্গী তা'তে তা'র চরিত্র ক্রমশঃ খারাপ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

তা'র পর আর-এক কথা। দারিদ্র্যাদোষো গুণরাশিনাশী। নিজের পরিবারকে খাওয়াতে-পড়াতে পারে না, বন্ধুত্ব কবুবার সামর্থ্য নাই, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক—তিনদিকেই দরিদ্রতা হ'ল ক্লিষ্ট। অর্ধতুচ্ছ অবস্থায় কঠিন পরিশ্রম ক'রে এসে না আছে একটু শান্তি না আছে একটু বিশ্রাম। এতে মানসিক বৃদ্ধিগুলির বিকাশ বা কি ক'রেই হয়? টাকা-পয়সা যথেষ্ট আছে, শক্তি আছে, সুখ আছে—তাদের যেমন নিজের কিংবা ছেলপিলেদের মানসিক উন্নতি কবুবার সুযোগ, এমন কি আর হস্তভাগা গরীবদের হয়?

তাই মানবচরিত্রের উপর ধনের এত আধিপত্য যে মানুষের দিক বাদ দিলেই ধনবিজ্ঞান হ'ল অসম্পূর্ণ। সেই সম্পূর্ণতা দিয়েই ধনবিজ্ঞানের আসন এত উচ্চে পেতেছেন আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদ্র।

যদি মানুষ নিয়ে আলোচনা করাই হ'ল ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক, তা হ'লে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এর তফাৎ কি? Marshall বলেছেন, "it is a part of the study of man." ফরাসী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক Gide তা'র উত্তর দিয়েছেন বেশ ভালোভাবেই

**** of all relations which exist between beings living in society, Political Economy deals with those alone which tend to the satisfaction

of their material wants with all that concerns his well-being.

সমাজে বাস ক'রে মানুষের যত-রকম সম্বন্ধ আছে ধনবিজ্ঞান কেবল সেগুলি নিয়ে আলোচনা ক'রে যাতে ক'রে তা'র জড় পদার্থের অভাব দূর হয় ও যাতে ক'রে সে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। সোজা কথায় ধনবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যায়। এবং এটি যত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, অল্প সামাজিক বিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হতে পারেনি। তা'র কারণ মানুষ যে-কোন মত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করুক না কেন, শারীরিক পারিতোষিক পাওয়ার প্রবর্তনাই তাকে অবিচলিতভাবে সে কাজে লাগিয়ে রাখতে পারে। প্রত্যেক প্রবর্তনারই সামনে আছে নির্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থ। মানুষের আশা, উচ্চাভিলাষ এবং অহুরাগ, সবই তাদের বাস্তবিক প্রকাশে নির্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থের দ্বারা মোটামুটি পরিমিত হ'তে পারে। দু'জন মানুষ মদ খেয়ে কি সুখ পেলো, তা প্রত্যক্ষ ভাবে তুলনা করতে না পারলেও, কিংবা একজন মানুষের দু'সময়ের মদ খাওয়ার আনন্দের তুলনা প্রত্যক্ষভাবে না করতে পারা গেলেও, যদি একটি মানুষ চা খাবে, না তামাক খাবে, কি পায়ে হেঁটে বাড়ী যাবে, না ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী যাবে, এ তিনটার কোনোটা করতে ঠিক ক'রে উঠতে পারছে না, তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি যে তিনটে কাজেই সে সমান আনন্দ পাবে। আর যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করতে পারা যাচ্ছে না, সেগুলিও তা'র আয়ব্যয় দেখে, তা'র কাজ কবুবার মানসিক তাড়না দেখে অনেকটা মোটামুটিভাবে তুলনা করতে পারা যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হ'ল একটি দেশ, একটি জাতি ব্যক্তিগত চরিত্রের ভারতম্য নিয়ে ধনবিজ্ঞান আলোচনা করে না। তাই ধনীরা সঙ্গে দরিদ্রের সুখের ভারতম্য, এবং অল্প সব ভারতম্য গড়ে সব ঠিক হ'য়ে যায়। তাই ধনবিজ্ঞান যত পূর্ণতার দিকে নিতুলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, অল্প কোনো সামাজিক বিজ্ঞান এতদূর হয়নি। অধ্যাপক Marshall বলেছেন—

Just as the chemist's fine balance made chemistry

more exact than most other physical sciences, so this economists' balance, rough and imperfect as it is, has made Economics more exact than any other branch of social science.

রাসায়নিকের স্বল্প নিক্তি যেমন রসায়নশাস্ত্রকে

অস্তান্ত্র অনেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চাইতে নিতুলতর করেছে, সে-রকম ধনবিজ্ঞানবিদদের নিক্তি মোটা হ'লেও ধনবিজ্ঞানকে অস্তান্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের চাইতে নিতুলতর করেছে।

চীনে ভারতীয় সাহিত্য

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সহিত ভারতীয় সাহিত্যও প্রচার লাভ করে। চীনদেশের প্রবাদানুসারে ৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৌদ্ধধর্ম সে-দেশে আবির্ভূত হয়। শোনা যায়, হান- (Han) বংশীয় সম্রাট মিংতি একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে-একটি সোনার মানুষ তাঁহার প্রাসাদে উড়িয়া আসিয়াছে। সম্রাট রাজসভার পণ্ডিতগণকে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, যে, এই স্বর্ণময় মানুষটি বুদ্ধ (ফুত্ বা ফো) ছাড়া আর কেহই নয়। মিংতি এই স্বপ্নের ব্যাপারে এমনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ গ্রন্থ ও পুরোহিত আনিবার জন্য অবশেষে তিনি ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে দূত পাঠাইলেন। কেহ-কেহ বলেন, মিংতি ভারতে আঠারো জন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই পথিমধ্যে দুইজন বৌদ্ধভিক্ষুর সাক্ষাৎ পান। তাঁহারা একটি শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে তাঁহাদের ব্যবসজ্জার চাপাইয়া চলিতেছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বৌদ্ধ পুঁথি ও মূর্তি ছিল। দূতগণ প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, তাঁহারা নূতন দেশে বুদ্ধের দাণী প্রচার করিতে যাইতেছেন। এই দুইজন ভিক্ষুর নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ। চীনভাষায় ভারতীয় নামসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চীনা উচ্চারণানুযায়ী লিখিত হইয়াছে; কোন-কোন ক্ষেত্রে তিব্বতী প্রথানুসারে অনুবাদিত হইয়াছে। এখানে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনা ভাষায় কিআ-য়ে মো-খঙ্ ও ধর্মরক্ষ চীনা অনুবাদে চু-ফা-লন্ লিখিত হইয়াছে। তিব্বতী ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, চু-

ফা-লনের নাম ভরণ বা গোভরণ। মাতঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও মধ্য-দেশের অধিবাসী ছিলেন; ধর্মরক্ষও তদ্রূপ ছিলেন। এই দুই ভারতবাসী চীনে গিয়া হান-রাজধানী লোয়াঙ নগরের নিকটস্থ শ্বেতাশ্ব-বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

উপরে-উক্ত গল্পটি সত্য কি মিথ্যা বলা কঠিন; তবে ইহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোনো হেতু নাই। কিন্তু ৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চীনারা ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধে কিছু জানিত না, এই লৌকিক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। চীনের পশ্চিমে কাংসু প্রদেশে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খুব সম্ভব হিন্দু উপনিবেশ ছিল; ঐ অঞ্চলে স্যার আউরেল্ স্টাইন্ সাহেবের আবিষ্কার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। হান ঐতিহাসিক দপ্তরে আছে যে, সি-উঙ হু নামক একটি স্থান হইতে চীনারা একটি 'স্বর্ণময় মনুষ্য' বন্দী করিয়াছিল; অনেকে মনে করেন, ইহা বুদ্ধদেবের একটি স্বর্ণময় মূর্তি। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাই-লিও নামে একজন তাও-ধর্মী বুদ্ধের জন্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, যে খ্রীষ্টপূর্ব ২ সালে সম্রাট আ-ই যুই-চি রাজের সভায় যে রাজদূত প্রেরণ করেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া আসেন। শেষ যুগের হান ইতিহাসে আছে যে চু-রাজ-কুমার বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ শ্রমণ ও উপাসক ছিল।*

* T'oung Pao, 1905, p. 519—Chavannes.

এই সময় হইতে চীনাগের বহির্জগৎ-সম্বন্ধে পরিচয়ের প্রসারতা হয়। তাহাদের কাগজপত্রে এই সময়ে ভারতের নাম প্রথম দেখা যায়। ভারতবর্ষ চীনা ভাষায় ইন্-তো লিখিত হয়। হিউএন সাঙ্ ইন্-তো শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, ইন্-তো শব্দ সিদ্ধ শব্দ হইতে হইয়াছে। স্মরণ্য দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীকে গ্রীক ও চীনারা সিদ্ধুর নাম হইতেই হিন্দু বলিয়া জানিতেন। খৃষ্টপূর্ব ১২২ অব্দে জনৈক চীনদূত মধ্য-এসিয়া হইতে স্বদেশে ফিরিয়া সম্রাট্ বু-তির নিকট নিবেদন করিয়া বলেন যে, তিনি মধ্য এশিয়াতে সিন্-তো দেশের সামগ্রী দেখিয়া আসিয়াছেন। এই সিন্-তো দেশ ও সিদ্ধুদেশ অভিন্ন।*

মিং-তির পূর্বে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে চীনের কিছু-কিছু জ্ঞান ছিল, তবে তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও স্বল্প। মিং-তির উদ্যোগে প্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষু তথায় নীত হয়। কাশ্মীর মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ চীনা ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ সেই ভাষায় অনুবাদ করিতে মন দিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, সঙ্ঘ দেশের লোকের ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। ভিক্ষুঘর শাস্তার সেই আদেশ স্বরণ করিয়া চীনের ন্যায় দুঃস্থ ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন। ভিক্ষুঘরের সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম বুদ্ধভাষিত দ্বিচত্রিংশ সূত্র। এগ্রন্থখানি কোনো সংস্কৃত বা পালি ভাষার গ্রন্থবিশেষের তর্জমা নহে; ইহা বুদ্ধের কতকগুলি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশের সমষ্টিমাত্র। কেহ-কেহ বলেন যে, উহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই সূত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে দুইটি বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। প্রথমটি হইতেছে—বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পূর্ব হইতে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ মত কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছিল; আর দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম প্রচারকেরা তাহাদের ধর্মের কোন্ জিনিষগুলি সর্বপ্রথমে নূতন লোকদের কাছে প্রচার করিবার পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। চীনদেশ ইতিপূর্বে কুয়াং-টুং (Confucius) ও লাও-টুংর উপদেশে দীক্ষিত হইয়াছিল; স্মরণ্য সে-দেশে নবধর্ম প্রচার করা কত কঠিন

তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিচত্রিংশ সূত্র-সম্বন্ধে কেহ-কেহ মনে করেন যে, ঐরূপ গ্রন্থ সত্য-সত্যই সংস্কৃত বা অল্প কোনো ভারতীয় প্রাচীন ভাষায় ছিল। কিন্তু এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। খুব সম্ভব, অনুবাদকগণ যে-সকল বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার-কল্পে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে এইসকল স্থান বাছিয়া-বাছিয়া কুয়াং-টুংর গ্রন্থের অনুকরণে প্রস্তুত করেন। কুয়াং-টুংর ‘আনালেকট্’ গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে আছে ‘গুরু কহিয়াছেন’; তাহারই অনুকরণে বোধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ‘বুদ্ধ বলিয়াছেন’, এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি চীনদেশে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে ও যুরোপীয় ভাষায় বহুবার অনূদিত হইয়াছে।*

প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম যখন চীনে প্রচারিত হয়, তখন লোকে এই নূতন ধর্মমতের উপর তেমন শ্রদ্ধাবান্ হয় নাই; সেইজন্য মাতঙ্গ তথাকার অধিবাসীদের উপযোগী করিয়া ‘দ্বিচত্রিংশ সূত্র’-খানি সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ধর্মরক্ষের হাত ছিল। ধর্মরক্ষ আরও চারিখানি, কেহ-কেহ বলেন পাঁচখানি, সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় তর্জমা করেন; দুঃখের বিষয় ধর্মরক্ষের একখানি বইও আজ পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন চীনা গ্রন্থতালিকা হইতে আমরা বইগুলির নাম পাই। এই গ্রন্থের মধ্যে একখানি ছিল বুদ্ধের জীবনী; তবে গ্রন্থখানি যে কি তাহা স্পষ্ট চীনা নাম হইতে বুঝা যায় না। কেহ অনুমান করেন যে, সেখানি ললিতবিস্তারের অনুবাদ, কেহ বলেন যে, সেখানি ছিল বুদ্ধ-চরিতের তর্জমা। বর্তমানে অনুমান ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নাই। তাহার অন্ত্য গ্রন্থের নাম পাঠকদের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্ম দিলাম; যথা, দশভূমি-ক্লেশছেদিকা, ধর্মসমুদ্র কোষ-সূত্র, জাতক ও একখানি শীলসংগ্রহের গ্রন্থ।

এই দুই জন ভারতীয় প্রচারক-সম্বন্ধে আমরা তিব্বতী গ্রন্থ হইতে কিছু তথ্য জানিতে পারি। তাহাদের

* Edkin's Chinese Buddhism pp. 88-89

* Suzuki—Sermons by a Buddhist Abbot—Chicago, Open Court, 1908.

মতে মিং-তি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন ও ভিক্ষুীদের জন্ম তিনটি মঠ স্থাপন করেন। সম্রাট স্বয়ং উপাসকশ্রেণীভুক্ত হন ও এক সহস্র লোক ভিক্ষুসভ্যে প্রবেশ করেন। তিব্বতী বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জন আছে; আমরা তাহার মধ্য হইতে সংক্ষেপে সম্ভবপর ঘটনা কয়েকটি-মাত্র উল্লেখ করিলাম; কিন্তু মিং-তির এই চেষ্টায় চীনদেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ ধারণা যেন কেহ না করেন।

কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষের মৃত্যুর পর কিছুকাল চীনদেশে কোনো ভারতীয় ভিক্ষু ছিলেন না; ১৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দ্বিতীয় দল উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে বৌদ্ধদের উপর নানাবিধ অত্যাচার হয়, কিন্তু প্রবাদ যে, অলৌকিক শক্তি-বলে তাহারা রক্ষা পায়। দ্বিতীয় দলে যে সব ভিক্ষু ভারতবর্ষ হইতে চীনে উপস্থিত হন—তাঁহারাও লোয়াঙের 'শ্বেতাশ্ব বিহারে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম ভিক্ষুক লোকরক্ষ বা চিলুকক্ষ যুই-চি দেশবাসী ভ্রমণ ছিলেন। তিনি বোধ হয় ১৪৭ বা ১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লোয়াঙে আগমন করেন ও আর্ধ্যকাল প্রভৃতি অপর ভিক্ষুদের সহিত বহুকাল সংস্কৃত গ্রন্থ অম্ববাদ ও বৌদ্ধমত প্রচার করেন। লোকরক্ষ বা চিলুকক্ষ একুশখানি গ্রন্থ অম্ববাদ করেন, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে অর্ধেকগুলি নষ্ট হইয়া যায়; বর্তমানে মাত্র বারো খানি (১২) গ্রন্থ চীনা ভাষায় এখনো পাওয়া যায়।

লোকরক্ষ (১৬৪-১৮৬খৃঃ অঃ) সর্বপ্রথম চীনদেশে মহা-যান মতের অন্ততম গ্রন্থ দশসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা ত্রিশ পরিচ্ছেদে চীনা ভাষায় অম্ববাদ করেন বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রজ্ঞাপারমিতার স্থান অতি উচ্চ। সুতরাং ইহার অম্ববাদ ও প্রচার ভারতীয় চিন্তাধারাকে বহুদূর বিস্তৃত করিতে সাহায্য করিল। লোকরক্ষের আর একখানি গ্রন্থ সুখাবতীব্যাহ। ইহার অপব নাম অমিতাম্বুবাহ বা অমিতাভস্মত্র। সুখাবতীব্যাহ-প্রচারের ফলে চীন ও জাপানে পরযুগে নূতন চিন্তার ধারা, নূতন ভক্তি-রসের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। সুখাবতীব্যাহের বৃহৎ ও সামান্ত সংস্করণের সর্বসমেত বারোখানি তর্জমা চীনা ভাষায় ছিল। লোকরক্ষের অম্ববাদিত অন্ত বইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করিতেছি; যেমন 'অক্ষোভ্য-তথাগতস্য ব্যাহ'। মহা-যান বৌদ্ধমতে অক্ষোভ্য পঞ্চদশাধী বুদ্ধের অন্ততম। বুদ্ধদেব অক্ষোভ্যের বুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাতে উপদেশ দিয়াছেন। 'প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধ-সম্মুখাবস্থিত-সমাধি' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ লোকরক্ষের অন্ততম অনূদিত গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে; তিব্বতী ভাষায় ইহার অম্ববাদ আছে; কেঙ্কের ১১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী তর্জমা দেখিয়া মনে হয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। 'কাশ্যপ-পরিবর্ত', 'ভদ্রপালস্মত্র', 'তথাগত-বিশেষণ-স্মত্র', 'মহাঅক্ষম-কিন্নররাজ-পরিপৃচ্ছা', 'অজাতশত্রু-কৌকৃত্য-বিনোদন' প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ লোকরক্ষের দ্বারা অনূদিত হইয়া আজও রক্ষিত আছে। এইসব গ্রন্থের একখানিরও মূল সংস্কৃত নাই বা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে-সব সংস্কৃত পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা চীন দেশে অম্ববাদিত হইয়া যাইবার পর যত্নভাবে বা প্রতিলিপিকা-কারের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অম্ববাদক ছিলেন আর্ধ্যকাল বা আনসিকাও। মধ্য এশিয়া আনসি দেশে তাঁহার বাস ছিল; তিনিও বুদ্ধদেবের স্তায় রাজকূলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মের জন্ম তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ হইয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দ ১৪৮ সালে লোকরক্ষের সময়ে তিনি চীনে প্রবেশ করেন এবং ১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোয়াঙের মঠে বাস করিয়া ধর্মপ্রচার ও সাহিত্যাম্ববাদ করেন। বাইশ বৎসরের মধ্যে আর্ধ্যকাল ১৭৬খানি বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অম্ববাদ করেন। কিন্তু ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুস্তকসমূহের যে বিস্তৃত গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে আছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে আর্ধ্যকালের ৫৪খানি গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্তমান চীন ত্রিপিটকে তাঁহার ৫৫খানি অম্ববাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আর্ধ্যকাল বহু বিষয়ের গ্রন্থ অম্ববাদ করেন; তাহার মধ্যে চীন-সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে কতক-গুলি আগমের অংশ-বিশেষের অম্ববাদ। পালিতে যেমন



অন্ধ এবং পক্ষাঘাত-রোগীর পলায়ন
চিত্রকর—র্যাফেল .

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মহিম্নিকায়, অমৃতরনিকায়, সংযুক্তনিকায় আছে, তেমন সংস্কৃত ভাষায় অমুরূপ গ্রন্থ ছিল; তাহাদিগকে মধ্যমাগম, একোত্তরাগম, সংযুক্তাগম ইত্যাদি বলিত। বৌদ্ধ চীনা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, কিন্তু সংস্কৃতে বহু কাল এই আগম-শাস্ত্রের কোনো সঙ্কলন না পাওয়ায় সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বুঝি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ আগম ছিল না। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কারের ফলে আজ জানা গিয়াছে যে, সংস্কৃত মধ্যম-আগম, সংযুক্ত-আগম প্রভৃতি গ্রন্থ এককালে ছিল। চীনা ভাষায় সম্পূর্ণ আগম গ্রন্থ-সমূহ পরযুগে সম্পূর্ণভাবে অনূদিত হইয়াছিল; কিন্তু আর্ধ্যকাল মধ্যম ও একোত্তরাগমের অনেকগুলি পৃথক-ভাবে অনুবাদ করিয়া চীনাণের হস্তে উপহার দেন। ইংরেজি সাহায্যে তাহারা প্রথম বিপুল আগম সাহিত্যের আভান পাইল।

দীর্ঘাগমের ২য় বর্গ হইতে দশোত্তর-ধর্ম-নামক একটি পুস্তক আর্ধ্যকাল অনুবাদ করেন; ইংতে ৫৫০টি ধর্মকথা আছে। পালি দীর্ঘঘনিকায় ইহাই দমুত্তর স্তোত্র-নামে পরিচিত। ৩য় বর্গ হইতে মহানিদান উপায় ও বিখ্যাত শৃগালবাদ-সূত্র তিনি ভাষান্তরিত করেন। প্রথম গ্রন্থ-খানিতে বুদ্ধ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, জাতি প্রভৃতি ছাদশ নিদান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পালি শৃগালবাদসূত্র ও দীর্ঘাগমের শৃগালবাদ অভিন্ন; বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠক মাঝেই জানেন, পালি শৃগালবাদ সর্বত্র কিরূপ সমাদৃত হয়। মধ্যমাগম হইতেও কয়েকটি বিশেষ সূত্র বাছিয়া আর্ধ্যকাল চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিলেন, যেমন আশ্রবক্ষয়, ব্রহ্মচর্য্যসূত্র, চতুঃসত্য সূত্র প্রভৃতি। একোত্তর আগম হইতেও কতকগুলি সূত্র চয়ন করিয়া তিনি অনুবাদ করিলেন; সংযুক্ত-আগমও তিনি বাদ দেন নাই।

আগম সাহিত্যের বাহিরের বহু গ্রন্থ আর্ধ্যকালের সাহায্যে চীনাভাষায় রূপান্তরিত হইয়া তথাকার সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে পড়ে আশ্রপালী-জীবসূত্র। আশ্রপালী এক রমণীর নাম; বিখ্যাত ভিক্ষু জীববুদ্ধের সমসাময়িক আশ্রপালীর পুত্র। মগধাদি-পতি বিধিসারের ঔরসে আশ্রপালীর গর্ভে জীবকের জন্ম হয়। এই অভূতকর্মা অনুবাদকের সকল গ্রন্থের বর্ণনা

দেওয়া অসম্ভব নহে; তবে তাহারই চেষ্টিয় চীন-ভারত-বর্ষীয় বৌদ্ধ আগমের ও বহু কথা-উপকথা সূত্রের অনুবাদ পাইল।

হান বংশের অধীনে লোয়াঙের খেতাখ মঠ বৌদ্ধ-ধর্ম ও ভারতীয় কৃষ্টির কেন্দ্র থাকিল। এই সময়ে (২৫-২২০ খৃঃ অঃ) বারো জন লেখক ৩৫৯খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনুবাদকদের সকলেই যে ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ তখন হিন্দুরা ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে-সব ভিক্ষু এই পর্বে চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বহির্ভারতের হিন্দু উপনিবেশিক।

হান যুগের অন্যান্য ভারতীয় ভিক্ষু ও অনুবাদকদের কীর্তি আমরা এপর্য্যন্ত সামান্যই জানিতে পারিয়াছি; যাহা জানা গেছে, সংক্ষেপে এখানে তাহাই বলিব। চু-ফো-সো নামে একজন ভারতীয় শ্রমণ বোধ হয় লোকরক্ষ, আর্ধ্য-কাল প্রভৃতির সহিত চীনে প্রবেশ করেন। ১৭২ ও ১৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন; কিন্তু সে বই দুইটি বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আনুসি দেশ হইতে আর-এক জন হিন্দু, চীনা নাম আনুসিয়েন, লোয়াঙ মঠে ১৮১ খৃষ্টাব্দে য়েন-ফো-পিয়াঙ নামক জর্নৈক চীনা শ্রমণের সহিত দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম উগ্রপরিপূচ্ছা চীনা ভাষায় পরে একাধিক বার অনূদিত হইয়াছিল। চীনা শ্রমণ য়েন-ফো-থিয়াঙ ভালোরূপ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং আনুসিয়েনের সহকারিতা করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লোয়াঙ মঠে বাসকালে ৫৭খানি সংস্কৃত গ্রন্থ মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু বর্তমানের বোধিসত্ত্বের ষট্‌পারমিতা সঙ্ঘাদ নামক একখানি গ্রন্থ ব্যতীত চৈনিক শ্রমণের আর কোনো গ্রন্থ নাই।

যুই-চি দেশের চ ইয়াও নামে একজন শ্রমণ লোয়াঙ-মঠে এই সময়েই অনুবাদ-কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। দশ-এগারখানি গ্রন্থ তিনি নাকি ভাষান্তরিত করেন; কিন্তু পাঁচখানিমাাত্র চীনা উর্জমায

ত্রিপিটকে আছে; 'পূর্ণ প্রভাসসমাধিসূত্র', যুগভূমিসূত্র ব্যতীত মধ্যম ও সংস্কৃত আগমের কয়েকটি সূত্র তিনি পৃথক্-ভাবে অল্পবাদ করেন। বোধ হয়, খোটার্নের দুইজন শ্রমণও এই দলের সহিত চীনে গমন করেন, আমরা মধ্য-এশিয়ার আলোচনা-কালে দেখিব যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে তথায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই শ্রমণ-ঘরের অন্ততম সংস্কৃত ও পালি হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ চীনা ভাষায় দান করেন; তাঁহার বইগুলির প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবে তাহাদের নামগুলি আমরা জানিতে পারিয়াছি, যেমন ব্রহ্মজালসূত্র, চতুঃসত্যসূত্র, কুমারনিদান-শ্রীফল সূত্র; শেষোক্ত গ্রন্থখানি বুদ্ধদেবের জীবনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইনিও আগম হইতে কিছু তর্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনূদিত নিদান-চর্য্যা সূত্র ছোটো-ছোটো ১০টি সূত্রের সমষ্টি; বুদ্ধের জীবনের কতকগুলি ঘটনা ইহাতে আছে। এই গ্রন্থ-খানির অন্ত নাম চর্য্যানিদান-সূত্র; মহাবন নামক জর্নৈক ভারতীয় বৌদ্ধের সাহায্যে গ্রন্থখানি অনূদিত হয়। ধর্মফল বা শাক্য খানকুও কপিলাবস্ত হইতে একখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন; সেখানিও বুদ্ধদেবের জীবনী; পূর্বোক্ত খোটার্নবাসীর সহায়তায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানি সংস্কৃত দীর্ঘাগমের একটি অংশ।

পূর্ববর্ণিত বারো জন অল্পবাদককৃত ৩৫২খানি গ্রন্থ ব্যতীত ১২৫খানি গ্রন্থের অল্পবাদকের নাম পাওয়া যায় না। হান যুগে সর্বসমেত ৪৮২খানি গ্রন্থ ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মিং-ত্রিপিটকে ১১১খানি মাত্র বর্তমান আছে।

হান যুগে যে-সব গ্রন্থ চীন দেশে যায়, তাহার অধিকাংশই হীনযান। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা যে, হীনযান গ্রন্থমাত্রই পালি ভাষায় লিখিত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হীনযানের অন্ততম শাখা থেরোবাদমাত্র পালি ভাষায় লিখিত; অন্ত সব শাখাই প্রায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই সংস্কৃত কাব্যের সংস্কৃত নয়; সর্বদেশে যাহাতে বোধগম্য হয় ইহা সেইরূপ ভাবে লিখিত। আজকাল আমরা যেমন মুসলমানী বাংলা, খৃষ্টানী বাংলা বলিয়া বাংলা সাহিত্যকে খণ্ডিত করি

তেমনি বৌদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া একটি পৃথক্ সাহিত্য ও লিখন-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে বর্ধিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ সংস্কৃততেই বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য রচিত হইত। মধ্য-এশিয়ায় এই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ-ভাবে প্রচার লাভ করে। তবে চীনে যে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচারিত হয়, তাহা তখনো নামাঙ্কিত হয় নাই; কারণ হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ভেদ তখনো স্থম্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; কেবল বিভিন্ন দার্শনিক মত বিচারিত হইতেছিল। তথাপি হান যুগের প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের মধ্যে ২৬খানিতে মহাযানের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

হান বংশের প্রভাব ২২০ খৃষ্টাব্দে অন্তিমিত হইল। ইহার পর ২৬৫ সাল পর্যন্ত তিনটি রাষ্ট্র মিলিয়া চীনে রাজনৈতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লোয়াঙ তখন ওয়াই বংশের রাজধানী, কিন্তু তখনও শ্বেতাশ্রম বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র।

এ পর্যন্ত আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পাইলাম, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূত্র-সাহিত্য—সংস্কৃত আগমের অনেকগুলি সূত্র অনূদিত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এপর্যন্ত বিনয় বা অভিধর্মের কোনো গ্রন্থ চীনদেশে প্রচারিত হয় নাই। হান যুগে শীল ও পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। আর্ধ্যকাল শীলভঙ্গনিত পাপ-পুণ্যের লঘু ও গুরুত্ব-সম্বন্ধে গ্রন্থ এবং আর-একজন লেখক মহাযানীয় শীল-ধর্ম প্রচার করেন। মোট কথা, হান-অল্পবাদকগণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বীজমাত্র বপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টিপ্রচারের অগ্রদূত।

ওয়াই বংশের রাজত্বকালে (২২০—২৬৫) ভারতবর্ষ হইতে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্মকাল নামক একজন ভিক্ষু মধ্যভারত হইতে আসেন। তিনি চীনে আসিয়া দেখিলেন যে, চীনা বৌদ্ধ-দের মধ্যে বিনয় বা সঙ্ঘের নিয়ম-নিষেধ কিছুই নাই। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মহাসম্মিকদের প্রাতিমোক্ চীন ভাষায় অল্পবাদ করিলেন। বিনয় বা নিয়ম-নিষেধ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্-পৃথক্। ধর্মকালের অনূদিত মহাসম্মিক

প্রাতিমোক্শ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূলও পাওয়া যায় নাই। কেবল সর্বাশ্ত্রিবাদের সংস্কৃত প্রাতিমোক্শ মধ্য-এশিয়ায় ও থেরোবাদের প্রাতিমোক্শ সিংহলে পাওয়া গিয়াছে। মহাসম্বিক ব্যতীত ধর্মগুপ্তশাখার গ্রন্থাদি এই-সময়ে চীনে আনীত হইতে আরম্ভ হয়—যেমন ধর্মগুপ্ত-নিকায়ের অন্তর্গত ‘সংস্কৃতকর্ম’।

ওয়ারাই বংশের রাজত্বকালেই প্রথম অভিধর্ম গ্রন্থ প্রবেশ করে। অর্হৎ ঘোষ সংস্কৃত ভাষায় অভিধর্মামৃত রস-শাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না। চীনভাষায় এই সময়ে গ্রন্থখানির অনুবাদ হয়; অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। পূর্ববর্ণিত সুখাবতীব্যাহ এই সময়ে চীনে খুব জনপ্রিয় হয়। সুখাবতীব্যাহের দুইটি সংস্করণ আছে—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। উভয় গ্রন্থের পুঁথি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। জাপানের একটি প্রাচীন মন্দিরে সংস্কৃত পুঁথি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। সুখাবতীব্যাহের অপর নাম অমিতায়ুসুত্র বা অমিতাভব্যাহ। চীনদেশে ও জাপানে এই গ্রন্থখানি এক সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী। ঐশ্বর্যস্বত্ব উভয় সংস্করণের বারোখানি তর্জমা চীনা ভাষায় হইয়াছে; আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগেই তিনখানি অনুবাদ হইয়াছিল। নিম্নে আমরা এই গ্রন্থখানির বিবিধ নাম ও অনুবাদকদের নাম ও কাল প্রদান করিতেছি।

- ১। অমিতায়ুসু সূত্র, অনুবাদক আর্ধ্যকাল (গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া পিরাছে)।
- ২। অমিত-সুত্র-সম্বুদ্ধ-সূত্র—লোকরক্ষ।
- ৩। অমিত-সূত্র - চ-চিয়েন।
- ৪। অমিতায়ুসুসূত্র—সংঘবর্ধন।
- ৫। অমিত-সুত্র সম্যক-সম্বুদ্ধ-সূত্র—পো-য়েন।
- ৬। অমিতায়ুসু সূত্র—ধর্মরক্ষ।
- ৭। নব-অমিতায়ুসু সূত্র -- বুদ্ধভক্ত।
- ৮। অমিতায়ুর্হৎ-সম্যক-সম্বুদ্ধ-সূত্র—মহাবল (নষ্ট হইয়াছে)।
- ৯। নব অমিতায়ুসু সূত্র—পো-য়ুন (নষ্ট)।
- ১০। নব-অমিতায়ুসু সূত্র—ধর্মমিত্র (নষ্ট)।
- ১১। অমিতায়ুসু তথাগত-পার্বন—বোধিরুচি।
- ১২। মহাবান-অমিতায়ুর্বাহ-সূত্র—ফা-হিয়ান।

সুখাবতীব্যাহে সুখলোকের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ও অমিতাভের নামে যাম্বু-উদ্ধার পায় সেই মত প্রচারিত হইয়াছে। সুখাবতীব্যাহ জাপানের শিনরন (Shinran) সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মপুস্তক। ইংরেজী ও ফরাসীতে সংস্কৃত সুখাবতীব্যাহের তর্জমা আছে। চীনা তর্জমার ইংরেজী অনুবাদ জাপানী অধ্যাপক তাকাহুসু করিয়াছেন। ৪০২ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব সুখাবতীব্যাহের ক্ষুদ্র সংস্করণে চীনা তর্জমা করেন; এই অনুবাদই চীন-জাপানে সর্বাধিক লোকপ্রিয় হইয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীতে গুণভক্ত ইহার দ্বিতীয় তর্জমা করেন, সেখানি হারাইয়া গিয়াছে। বৃহৎ-সংস্করণের অনুবাদ বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েনৎসঙ করিয়াছিলেন। চীন ও জাপানে কুমারজীব ও হুয়েনৎসঙের অনুবাদ-দুখানি বিশেষভাবে পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা

কাজী আবছল ওহুদ

কথা

নাম যে সহজ প্রবল সত্যের রূপ কবির চোখ ঘেঁষে দিয়ে গেল, কথা কাব্যে দেখেছি তা'রই সঙ্গে কবির বার-বার মুখোমুখি হচ্ছে। তাঁদের পুরাণে ইতিহাসে ধারা জীবনের রহস্যোদ্ঘাটনের উপভোগ হইছে, ক্ষুদ্র স্বার্থের কংরাগারে বদ্ধ হ'য়ে গলে-গলে যে নিদারুণ আত্ম-ভা'র হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ক্ষতির ত্যাগের সময়-সময় বৃত্ত্যর, গীকা পরিণে জীবনকে ধারা হৃদয় করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত এক নুতন

মহিমা নিয়ে কবির সামনে দাঁড়িয়েছে। অতীত তাঁর কাছে আর অতীত নয়। অতীত ইতিহাসে দীপ্যমান দেখছেন যে মহাজীবন তা'রই স্পন্দন কবি নিজের ভিতরে অনুভব করতে পারছেন ব'লেই এর অর্থ কিছু কাল পরের একটি কবিতার অতীতকে বলতে পেরেছেন :—

কথা কও কথা কও।

সুখ অতীত হে গোপনচারী,

অচেতন ভূমি নও—

'কথা' কাব্যখানির প্রায় সব কবিতাই মূল্যবান। প্রতিপদেরই মহিমা আছে; তাঁর উপর লেখক অনাধারণ কুশলী, কাজেই "প্রবন্ধ" "মহত্তর" ত হবেই। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যখানি বোধ হয় সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়।

গাথা (Ballad) হিসাবে শেষের দিকের কবিতাগুলিই (অপমান-বর, স্বামী লাভ, বন্দী বীর, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ ইত্যাদি) উৎকৃষ্ট। আর এসমস্তের মধ্যে 'হোরি খেলা' কবিতাটি অতি উঁচু দরের। Ballad-এর বিশেষত্ব তাঁর সবল সরলতায়। এই কবিতাটিই এই কবিতার পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায়। আর এর ছন্দ বড় চমৎকার, - বোকার হোরি খেলার ছন্দই বটে।

পত্র দিল পাঠান কেমন খাঁরে
কেতুন হ'তে জুনাগ রাজার রাণী,—
দড়াই করি আল মিটেছে মিশ্রণ?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এস ভোমার পাঠান সৈন্ত নিরা—
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।
বুকে হারি কোটা-সহর দাড়ি'
কেতুন হ'তে পত্র দিল রাণী।

কিন্তু 'কথা' পরিশোধ কবিতাটিই হয়ত এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা— রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতা সম্পর্কে নীতির কথা কেউ ভুললে আশ্চর্য হবো না; এর বিশেষত্বও সেইখানেই। কবি-দৃষ্টি যে কি অসাধারণ, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ, অচলিত নীতি কচি মত-বিধান ইত্যাদি মূলত সে-দৃষ্টির সামনে যে কেমন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়, সত্য আপনার উল্লেখ মহিমার স্মরণকট হয়, এ কবিতাটিতে তাঁর আশ্চর্য পরিচয় রয়েছে। এর যে-আয়গায় স্থানা বসুছে—

.....বালক কিশোর
উত্তীর ত্রাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে নোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনে
তব চুরি-অপবাদ নিজ স্বক্ষে ল'য়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি ভোমার লাগি' এ মোর গৌরব।—

সেখানে বসন্তসন যদি—

কি কহিলি পাপীরসী.....
.....চাহি না আর তোরে

ব'লে নাটকীয় ভঙ্গিতে পদাঘাত করে চ'লে যেত, আর সেখানেই যথনিক পতন হ'ত, তা হ'লে চারিদিক থেকে হরত হাততালির আর অন্ত থাকত না। কিন্তু কবির প্রাণ পুরুষ লক্ষ্যের ছুরক হারে পিষ্ট হ'য়ে যেত। যুঁচু যে সেই কেবল জানে পাপ আর পুণ্য ছই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। দৃষ্টিমান্ প্রত্যক্ষ করে, ভালো মন্দ পাপপুণ্য সমস্তের ভিতর দিয়ে মানুষেরই জয়-বাজা। সে বাজা-পথে, মোহ-চূর্কলগতার সংস্র কুশাকুরে বিদ্ধ মানুষের চরণতল; মানুষের সে-বেদনা পরম দরদী কবি যদি না বুঝবেন তবে আর বুঝবে কে ?

কণিকা

কল্পনার কবি জগতের যে-বেদনা উপলব্ধি করেছি, 'কথা' মহাকল্পনের অন্তর্ভুক্ত লাভ করেও কবির অন্তরের সে-বেদনা প্রশমিত হ'য়ে যায়-

নি। কিন্তু এই কণিকা কাব্যে সে-বেদনা রয়েছে নীচে। সেই ব্যথার যুগলের উপর তাঁর প্রতিভাপন্ন যে-ভাবে পাগড়ি খুলে ঠাড়িয়েছে অপূর্ণ তাঁর সৌন্দর্য আর মৌরভ। ব্যথা, বিবেচনা, সমস্তা, সন্ধান—সব সরিয়ে দিয়ে কণ-প্রকাশের বৃকে মুহুর্তে মুহুর্তে যে-অমৃত ফুটে উঠছে কবি তাই চোখ ভ'রে দেখছেন আর প্রাণ ভ'রে উপভোগ করছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি!
দুই হা' দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেবে
নিজ হাতে বাধা বাধনি!
যে সহজে তোমার রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেবে বৃকে,
আজিকার মতো থাক থাক চুকে
যত অসাধ্য সাধনি!
কণিক হুপের উৎসব আজি,
ওরে থাক থাক কাঁদনি!

প্রকাশ-ভঙ্গিমা কি শাপিত। এপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যত কাব্য লিপেছেন তাঁর মধ্যে ছয়খানিকে আনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়— চিত্রা, কণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পলাতকা। নিচক গীতি-কবিতা-হিসাবে এই কণিকার কবিতাগুলি যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে-সম্বন্ধে অনেকেই বোধ হয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। সরল চটুল ভঙ্গীতে কবি কথা বলছেন অথচ তাঁরই ফাঁকে-ফাঁকে কবি জগতের অন্তর্ভুক্ত দেখবার সুযোগ আমাদের যখন ঘটছে তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কি গভীরতা থেকে তাঁর কথা উৎসারিত, আর অনেক সময়ই কেমন বেদনা ভরা সেই গভীরতা।

ওমর পৈয়গামের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। তবে ওমরের মতো জীবনের অতি গুরুতর সমস্যাগুলোর কোনো মীমাংসা করতে না পেরে "ভাগা-দেবীর কুর পরিহাস পেয়ালা ভ'রে জুলবার" চেটাই এখানে কবির সব কথা নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গিমার বেশী দিক বরং হাকফের সঙ্গে।

কণিকার বহু গরে শিশু, গীতিমালা, শিশু ভোলানাথ প্রভৃতি কাব্যে কবির সহজের সাধনা পুরোপুরিই আমরা দেখতে পাই। এই কণিকায় তাঁরই পূর্ণসুচনা। সত্যকে সব বাহুল্যের আবর্জনা থেকে মুক্ত করে এমন সহজরূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এর আগে রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়নি; কণিকার এর সামান্য আভাস আছে; কিন্তু কণিকার সহজ মূল্যের জীলা যে-ভাবে দলের পর দল খুলে যেতে চাচ্ছে বাস্তবিকই তা অপূর্ণ; প্রকৃতির সৌন্দর্য-বর্ণনারও কবির এই সহজ ভঙ্গী—

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চখাচখির ঘর।

কণিকার 'মাতাল' কবিতাটি বিখ্যাত। জীবনের সব জটিলতা, জর্জবনা সরিয়ে দিয়ে হৃদয়বেগের সহজ পথে চলার যে সত্য কবির চোখে ফুটে উঠতে চাচ্ছে, তাই-ই বাক্য দিয়ে উঠেছে এই কবিতায়

* মা দর পিরালে হাকের আর বেথবর আকসে রোধে ইয়ার
দিয়ারে ম জেলজতে গুরবে মুদাম মা।—হে শরাব-রসের অরসিক,
শোনো, আমি আমার পেয়ালার ভিতরে প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্বিত
দেখেছি।

পাড়ার বত জানী গুণীর সাথে
নষ্ট হ'ল দিনের পর দিন
অনেক শিখে গক হ'ল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
ব'সে ব'সে কেবল জমা করি,
ফেলা ছড়া ভাঙা ফেঁড়ার বোকা
বুকের মাঝে উঠে 'ভরি'-ভরি'
উড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে কে'লে দিক
দিক-বিদিকে তোদের কোড়ো হাওয়া !
বুকেছি তাই শূণ্যের মতো শূণ্য
মাতাল হ'য়ে পাতাল-পানে ধাওয়া !

বৃগল কবিতাটিতে সত্যের গন্ধান কি স্বার্থ ! জায়গায়-জায়গায়
Browning-এর 'The Last Ride Together' মনে করিয়ে দেয় ।

স্বয়ং যদি আসেন আজি ঘারে
মানব নাকি রোগের দারোগাং, --
কেলা হ'তে কোজ সাধে-সাধে
দাঁড়ায় যদি, উঁচায় ছোঁরাচুরি,
বলব, রে ভাই, বেজাব কোরো নাকো,
গোল তেচে একটু খেমে থাকো,
কুপাণ খোলা শিল্পন পেশা-রপে
কাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুড়ি !
একটুখানি সরে' গিয়ে করো
সঙের মতো সঙীন্ কামকামর,
আজকে শুধু একবেলারই তরে
আমরা দৌছে অমর দৌছে অমর !

সময়ের আবেগ যে অসত্য নয়, সৌন্দর্যের উপলব্ধি যে কোনো
সত্যের কাছেই মাথা হেঁট করবার প্রয়োজন করে না, 'অভিবাদ'
কবিতাটিতে কত স্বচ্ছন্দচিত্তে কবি সে-কথা বলতে পারছেন !

আজ বসন্তে বিশ্বখাতার
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতার,
জগৎ বেন ঝে'কের মাথার
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,
প্রিয়র পূণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজাধিরাজ,
ভাঙারে আজ করুচে বিরাজ
সকল-প্রকার অজস্রহ ।
কেন রাখব কথার গুজন ?
কুপণতার কোন্ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাগী বোজন-বোজন
উড়িয়ে দিয়ে বহু-গহ ।

হাকিমের দিউরান বাঁদের প্রিয় তাঁরা 'কণিকার' এইরকম বহু
বিভিন্ন তাঁর বক্তার অনুভব করবেন । কিন্তু ছয়ের পার্থক্যও লক্ষ্য
[বার বোধ্য । মিলনের যে সৌন্দর্য, আবেগ, আনন্দ তাই দিউরানের
মী ভাব ; কণিকারও মাঝে মাঝে এসব চিকমিক ক'রে ওঠে, কিন্তু
স্বর্ষ করেছে এর সব সৌন্দর্য-বোধ, আবেগ, আর মুর্তির তলদেশে

লুকায়িত যে-বেদনা । কতকগুলো কবিতার দেখা যাচ্ছে, কবি সে-বেদনা
আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না ।

কবি বলছেন -

গভীর শূরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই ।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন ক'রে ?
'আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাটা ক'রে শুড়াই আমি
নিহের কথাটাউ ।
হালুকা ভূমি করো পাচে
হালুকা কপি তাই
আপন বাধাটাই ।

আর 'পরামর্শ' কবিতায় কবির অশ্রু বেন আর বোধ মানতে
চাচ্ছে না !—

অনেক বার ও হাল ভেঙেচে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে,
ওরে ছুঃসাহসী !
সিদ্ধু পানে পেঁচিস ভেসে
অকূল কাণো নীরে—
ছিন্ন এসারসি ।
এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোব
ভ'রে উঠেছে ভলে ।
অশ্রু মৌ'চে চলুখি কত
আপন ভাবে কোর
তলিয়ে যাবি তলে ।

কবি নিজেকে সম্বোধন, এখন না হয় তরী ঘাটেই বাঁধা থাকুক,
আর কাজ কি ছুঃসাহসে ভর ক'রে নতুন যাত্রা করা ?

এবার শুবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী !
রাখ'রে আনাগোনা ।
বধ-শেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা গগন ভরি'
ঐ বেতেচে শোনা ।

কিন্তু মিছে প্রবোধ দেওয়া,—

হার রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার বাবে ভেসে ।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তাঁর
বনদূতের মম
স্বভাব সর্ব্বদেশে ।

ঝড়ের নেশা চেউয়ের নেশা
ছাড়বে নাকো আর,
হার রে মরণ-লুতী।
ঘাটে সে কি রইবে বীণা,
অদৃষ্টে বাহার
আছে নৌকা-ডুবি।

এর সঙ্গে “এবার ফিরাও মোরে” কবিতা মিলিয়ে পড়লে এর বিশিষ্টতা সহজেই অনুভব করা যায়। ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার রয়েছে দুঃ থেকে কবি যে সৃষ্টাত্মিক মহাজীবনের কল্লোল স্তম্ভে পেয়েছেন তারই মূল; তাই বলাই এ তাঁর প্রতিভা-নির্ভর আর-এক স্বপ্নপত্র। কিন্তু সে জীবন-পথে বহু দূর এগিয়ে কবি যে বিষম আকর্ষণ অনুভব করছেন সেই সর্বশেষে আকর্ষণের টানে সামনে চলতে যে অসুস্থ আশঙ্কায় বেদনা কবির চিত্তে জাগছে তারই অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। হাফিজও বলেছেন,

...ইশক আদান নমুদ আউরজ
ভালে উক্‌তাদা মোশকল্‌হা। *

অথবা

শবে তারীখ ও বীয়ে মওজ
ও গিরদ আবে চনিদ হায়েল।
কুজা দানন্দ হালে মা
সুবুক্‌ সারানে সাহিল হা। †

কবির আধ্যাত্মিক সাধনার এখন কি অবস্থা তাঁর নির্দেশ রয়েছে এর শেষের দিকের ‘অস্তরতম’ কবিতায়—

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেয়ে তোমার আশাস
কত জনে কত করে পরিচাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ভলে তারি ডাকি যে তোমার,
কেহ কিছু নায়ে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়ের
সে কথা বলিবে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তবে ছুরারে।

স্বক তোমার উদার আলম,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।

* প্রথমে প্রেম বড় আরাগের মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখছি
মুশকিল এসে পৌঁছেছে।

† অন্ধকার রাত, উর্শ্বিন্দাঘাত, ঘূর্ণাবর্ত ও তুমুল গর্জে,
বেলায় বাস বাস বুঝবে ছাই তাঁর পথের ক্লেশ মোর সমুদ্রের যে।
—কবি নজরুল ইসলামের অনুবাদ।

চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
কি'রে আসি তবে পরবে।

প্রভাত না হ'তে কখন আবার
পৃথ-কোণ মাঝে আসিয়া,
যাতারনে বসে বিহ্বল বীণা
বিদনে বাজাই হামিয়া।

পথ দিয়া যেণা আসে যেণা যার
সহসা ধর্মিক' চমকিতা চার,
মনে করে তা'রে ডেকেছি।
জানে না ত কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে পূর্বরাগের পালা শেষ, কবির চিত্ত এখন
অনুরাগের রাতা রাখিতে বীণা প'ড়ে গেছে।

এ ভিন্ন অঙ্গ-ধরণের কবিতাও ক্ষণিকার আছে, আর কবির অন্তিম
বর্ণন-স্তম্ভীতে তারও অধিকাংশই সুন্দর কবিতা। এর মধ্যে কবিতা-
গুলি খুবই চমৎকার। বর্ষার অনেক সুন্দর কবিতা রণাল্লনাথ লিখেছেন।
তাঁর মধ্যে ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’ আর ‘ক্ষণিকার’ বর্ষার কবিতা
লক্ষ্যযোগ্য। বাস্তবিকই যেন কাজল মেঘের ছায়া পড়েছে এইসব কবিতার
উপর, আর তাই তাদের চেহারায় কেমন তৃণপল্লবেরই নবীনতা।

গুগো আজ তোরা যাসনে পো তোন
যাসনে ঘরের বাহিরে
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর নাহিরে।
ঝঞ্ঝর ধারে ভিড়বে নিচোল
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিচল,
ওই বেণুবন ছলে ঘনঘন
পথ পানে দেখ চাহিরে।
গুগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

ক্ষণিকার নববর্ষ কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। এর প্যাঁতি কোনো দিন
যে ম্লান হবে তা মনে হয় না।—

হৃদয় আমার নাচেরে আঁধারিক
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কম্বোপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে করে যাচে রে।

হৃদয় আমার নাচে রে আঁধারিক
ময়ূরের মতো নাচে রে।

শুধু শুধু মেঘ শুনি' শুনি'
গর্জে গগনে গগনে
গর্জে গগনে।

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন খাত ছ'লে-ছ'লে সারা,

কুলায়ে কাঁপিতে কাতর কপোত,
দাঁছরি ডাকিতে সঘনে ।
শুধু শুধু মেঘ শুধরি' শুধরি'
গরজে গগনে গগনে ।

কবির নিবিড় রসানুভূতি পাঠকের হৃদয়কে পুরোপুরিই স্পর্শ করে। এর ক্ষতিপূরণ, প্রতিজ্ঞা, পথে, কবি, সোজাত্ব, একপায়ে অভূতি খুবই লক্ষ্যযোগ্য কবিতা। কবির সহজের সাধনার কথা আগেই বলা হয়েছে। কত গভীর আর জটিল কথাও সহজ আর চটুল ভঙ্গিতে কবি প্রকাশ করতে পারেন এভাবে তাইই শূন্য পরিচয় রয়েছে। বেশ হালকা-জবাবও এতলা পড়া যেতে পারে; কিন্তু কবির দিকে একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে চাইলেই বুঝতে পারা যায় স্মৃতিবাহী তাঁকে বহুই মনে হোক, আসলে সোজা পাত্র তিনি নন।

আমি নাবব মহাকাব্য

সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিকিণীতে
কল্পনাটি গেস কাটি' হাজার পীতে ।
মহাকাব্য সেই অভাবা ছুঁটিনার
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণার-কণার ।

বাস্তবিক কবির দৃষ্টি এখন কত তীক্ষ্ণ, আর কত প্রসারিত তাঁর মন, তাঁর গুণের পরিচয় আমরা পাই এর "কবির বরস" কবিতাটিতে—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাঁহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ার বত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী ছেনো ।
ওঠে কারো সরল সাদা হাসি,
কারো হাসি আঁধার কোণে-কোণে,
কারো অক্ষ উল্লে পড়ে যায়,
কারো অক্ষ শুকাই মনে-মনে ;—
কেউবা থাকে ঘরের কোণে দৌছে,
জগৎ-মাঝে কেউবা হাঁকার রথ,
কেউবা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউবা হারায় পথ ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার বত ধরুক পাক ।

নৈবেদ্য

কল্পনার ও ক্ষণিক কবির ভিতরে যে নবজন্ম-সঞ্চয়ের বেদনা উপলব্ধি করেছি, নৈবেদ্যে দেখা যাচ্ছে, সে-বেদনা কেমন একটু সার্থক হ'য়ে দেখা দিয়েছে স্পষ্টতর দৃষ্টিতে। কবি উপলব্ধি করছেন, সারা জীবন তিনি যেভাবে কাটিয়ে এসেছেন, যে-সব অনুভূতির ভিতর দিয়ে এসেছেন তাঁর কিছুই বুঝা নয়, মিথ্যা নয়। সেই সমস্তেরই সঙ্গে-সঙ্গে অপরাধও তাঁর ঘরে বহুবার প্রবেশ করেছেন।

নির্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা । হেন ক্ষণে
সুঁনিলাম, ডুমি কহিতেছ মোর মনে ;—
ওরে মন্ত, ওরে মুষ্ণু-ওরে আশ্র-তোলা
হেগেছিলি আপনার সব ঘর খোলা,
চকল এ সংসারের বত চারালোক,
বত জুল, বত ধূলি, বত ছুঃশ শোক,
বত ভালো মন্দ, বত গীঃগন্ধ ল'য়ে
বিষ পশেছিল ত্রোব আনাথ আলয়ে ।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিলাম না'মি' ।
ঘার ক'ধি' জপিতিসু যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম ।

নৈবেদ্যের প্রথমে কতকগুলি প্রার্থনা-সঙ্গীত রয়েছে। সত্যকার প্রার্থনার ক্ষমতা প্রয়োজন যে স্থির চিত্তের আবস্থায় লক্ষ্যের রবীন্দ্র-প্রতিভার এখন সেটি সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে কবি অনুভব করেছেন, জাগ্রত আত্মার ভার বহন করা কত আরামসাধ্য। অথচ এ ভার বহনের প্রতি তাঁর পরম লোভ —

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শক্তি ।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও শক্তি ।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
ছুঃখের সাথে ছুঃখের জাগ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়িয়ে চাই না মুক্তি ।
হুঃ হুঃ হুঃ মোর মাঝার মাণিক
সাথে যদি দাও শক্তি ।

কিন্তু এ ভারবোধ শেষে আর থাকে না। আত্মার অপরূপ জ্যোতিই তাঁকে চমৎকৃত করছে :—

দেহে আর মনে-প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অক্ষ আমার ।
এ কি জ্যোতি ! এ কি বোম্ব দীপ্ত দীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা ।
এ কি শ্রাম বহুধরা, সমুদ্রে চকল,
পর্বতে কঠিন, উরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার । এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতোছে সৃষ্টির জাল
আমার ইন্দ্রিয়-বস্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
কুত্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত । ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ ?

এই নৈবেদ্য কাব্যখানিতে বেশী করে চোখে পড়ে কবির যোগীর ভাব—পরম মঙ্গলময়ের প্রতি তাঁর চিন্তা সব সময়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তাঁর এ যোগ যেন কিছুতেই ভাঙে না।—

কালি হাসো পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বক্রলন-মনে ;
আনন্দের নিছাহারা শ্রান্তি ব'হে ল'য়ে
কিরি' আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইলু স্বীকার অজনে। শীতবার
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্রান্ত গার
মুহুর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।

মুহুর্তেই মৌন হ'ল স্বক হ'ল হিয়া
নির্ঝাপপ্রদীপ রক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিলু উর্ধ্বপানে ; চিত্ত মম
মুহুর্তেই পার হ'য়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিলু তখনি—
খেলিতেছিলার মৌরী অকুণ্ঠিত মনে
তব স্বক প্রাণদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

এই পরম সমাহিতচিত্ততার অবস্থায় এমন অনেক কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কাব্যদৃষ্ট মস্তুর মতনত বা পূর্ণ আর অগ্নিগর্ভ। নৈবেদ্যের

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

—এমনই এক বাণী—বিশ্বমানবের কানে এক বড় মন্ত্র।

এই মন্ত্রটি তাঁর সাধনার মাঝখানে ঠাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকে ছ'ভাগ করে দেখাচ্ছে। একনিকে অসংখ্য বন্ধন-মাঝে যে-মুক্তির আনন্দ প্রচ্ছন্ন রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে বারে-বারে ঘুরে-কিরে নানা পাকে বন্ধ হ'তে দেখে আর সে-সব বন্ধন এড়িয়ে যেতে দেখে সে-কথার যোগ্য প্রমাণ আমরা পাই। অস্তিত্বিক গীতালিতে এই মতটি আরো গভীর করে উপস্থিত করুবার পর বলাকা, পলাতকা প্রভৃতি কাব্যে দেখতে পাই, দৃষ্টির অব্যর্থতা নিয়ে আনন্দময় কবি যেন স্বর্গমর্ত্য পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। ভারত সম্বন্ধে সে-সমস্ত কবিতা এতে আছে, সে-সমস্তও এমনি পূর্ণ আর বীর্ষবানু দৃষ্টির আলোকে ভাষার। ভারতের অতীত মহিমা, বর্তমান হীনতা দীনতা, আর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সমস্তই তাঁর যোগ-দৃষ্টিতে তিনি যেন মধ্যদিনের আলোক-দেখা চিত্রের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।—

তাঁহার দেখিরাছেন—বিশ্বচরাচর
বঞ্জিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ নিব্ব'র ;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভগ্নে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারই প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি' মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্শ্বরিয়া করে বাতারাতি ;

* * *

এ ছুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব ভুচ্ছ'র,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাবান-ভার,
এই চির পেষণ-ব্রতপা, ধূলিভলে

এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে-পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, তন্তু নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য মর্যাদাগর্ভে চিরপরিচার—
এ বৃহৎ লজ্জারানি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো !

* * *

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের গাণি'
হে ভারত সর্ব্বভূমি রহ তুমি গাণি'
সরলনির্ম্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাপি' পুষ্প ও চন্দন
আপনার স্তম্ভেরে মাহাত্ম্য-মন্দির
সম্বিত্ত স্মৃগন্ধি করি', ভ্রুংগনস্তম্ভির
তাঁর পদতলে নিত্য রাগিয়া নীরবে !
তাঁহাতে বঞ্চিত করে তোমার এ-ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ভভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাকো তুমি নির্ভর অন্তরে
তাঁর হস্ত হ'তে ল'য়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক না তব যত নির স্থান
তাঁর গানপীঠ করো সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল শব।

আরে! লেপ্যের বিষয় এই যে, কবি এখানে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে অকণ্ঠে-অন্তরে অনুভব করেই ক্রান্ত হ'য়েছেন না। তাঁকেই তাঁর চিত্তমন্দিরে পূর্ণ পৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই সৈনিকরূপে সংসার-বন্ধে দৃঢ়পাদক্ষেপে বিচরণ করতে চাচ্ছেন—

অ-মা যথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রক্ত, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে ! যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য কলি' উঠে পর খড়্গ সম
তোমার ইজিতে ! যেন রাধি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান !
অস্তায় নে করে আর অস্তায় যে সহ
তব ঘৃণা যেন তারে ভূশম দহে।

বাস্তবিক ঐক্যবিবর্জিত এক অসাধারণ বলীমান আত্মার সাক্ষাৎই আমরা এই নৈবেদ্য কাব্যের প্রায় সব জায়গায় পাই। আর এইমতই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে আমরা তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্ততম বলতে বিধা বোধ করিনি। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ওজস্বল জাগ্রত আত্মা সেই সৃষ্টি-মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে।

নৈবেদ্য কাব্যখানি মুসলমান পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, কেননা মঙ্গলের অভিপ্রেতে এমন ঐক্যবিবর্জিত অগ্রগতিই ইসলামের প্রিয়। শাবিলাসী বাঙালীর নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত এই কাব্য।

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহুর্তে বিফল হয় নৃত্যগীতগানে

ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারী
উদ্ভাস্ত উচ্ছল-কেন ভক্তি মদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ !

দাও ভক্তি-শান্তিরস,
ত্রিধা মুখা পূর্ণ করি' মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-ধারে । যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব্ব কর্ণে দিবে বল,
বার্ষ শূভ চেষ্টারেও করিবে সফল

আনন্দে কল্যাণে । সর্ব্বশ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেদ, সর্ব্ব মুখে দীপ্তি
দাহহীন ।

সম্বরিত্তা ভাব-মঙ্গলীর
চিত্ত হবে পরিপূর্ণ অমৃত গন্তীর ।

কিন্তু এর শেষের দিকের দুটি প্রার্থনায় (৮৬, ৮৭) দেখতে পাচ্ছি, আর-এক সুর বাজছে কবির চিত্ত বীণায় । ধ্যান তাঁর হৃদয়ে চমৎকার উচ্ছলতা এনে দিয়েছে, তবু অস্তরের শুষ্কতা তাঁর যুচ্ছে না । সে উদ্বেলতা সময়ে যেন তাঁর পক্ষে "নিঃশব্দ দাহ" । তাই কবি প্রার্থনা করছেন—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ উর্ধ্বপানে চাহি' ! ওহে নাথ,
এ রক্ত মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হ'তে এসে
বাগ্নী শাখা পশাখায় চক্কের নিমেষে
কাণে-কানে রটাইবে আনন্দমর্ষর,
প্রতীক্ষার পুলকিতা বন বনাস্তর !

এত ধ্যানজ্ঞানের অস্তরে-অস্তরে এই প্রতীক্ষার ব্যথা ! তপস্যার রক্ত দহন প্রেমের বর্ষণই চায় । বিধাতার অসাধারণ কৃপা এই কবির উপর । আমাদের মনে হয়, নানা সংস্কার-জর্জরিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রাজ্য রামমোহনের যে-প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে তাঁর এক বড় সার্থকতা লাভ করেছে এই নৈবেদ্য কাব্যে ।

নৈবেদ্য প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে । এই ঘটনা হয়ত নিরর্থক নয় ।

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত পেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উদ্ভাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী । দয়াহীনা সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল কণা চক্কের নিমিষে,
শুভ্র বিব দস্ত তাঁর ভরি' তীর বিবে ।

আর বিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভকে সামনে ক'রে ভারতের এক প্রান্তে এক জাগ্রত-আত্মা কবি প্রার্থনা করছেন—

.....বীর্ঘ্য দেহ, ক্ষুদ্র মনে
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে ; বীর্ঘ্য দেহ, চিন্তেয়ে একাকী
প্রত্যাহের তুচ্ছতার উর্ধ্বে দিতে রাখি' ।

বীর্ঘ্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহনিশি আপনারে রাখিবারে স্থির ।

শিশু

নৈবেদ্যের কিছুদিন পর শিশুকাব্য প্রকাশিত হয় । এই শিশুকাব্যে :
জগদ্বস্ত্রান্ত সখকে অশ্রিত-বাবু বলেন, পাড়িতা কন্ডা, মাতৃগীণ শিশু
পুল সমী কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়েরই স্নেহ লাভ করে
ছিল । সেই একটি গভীর স্নেহ থেকে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্য-
রসে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে ।

শিশুকাব্য রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন সন্দেহ নেই ।
অগ্রিত্যগণ যে বলেছেন, এ গেই বৈকল্য মাধুয়াতন্ত্র, ভগবানকে যারা
বাৎসল্যরসের ভিতর দি'র দেখে তাদের সেই মাধুয্যের শ্রোতাটি এর মতো
আগাগোড়া প্রবাহিত ; সে-কথাটি অনেকপরিমাণে সত্য । অনেক-
পরিমাণে বলছি এই শিশুকাব্যের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে । বৈকল্য
ভগবানকে লাভ করে শিশুতে তাঁর প্রকাশের আনন্দ উপলব্ধি করেন,
অথবা গুরুর কাছ থেকে এ তত্ত্বলাভ করে জীবনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা
করেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বেলায় দেখা যাচ্ছে ভগবৎ-মাধুয্য ও
নিঃস্বপ্ন অস্তরের অশ্রুভূতি আর সন্ধানের প্রাণীপ তাঁকে পথ দেখাচ্ছে ।
তাই একাত্মে মাধুয্য-রসের সঙ্গ-সঙ্গ মিশে রয়েছে এক রক্ত সুর ।
কিন্তু তাতে কাব্য-হিমায়ে এর গৌরব বেড়েচে বহু কমেনি ; কেননা
আধুনিকের সামনে প্রমাণিত যে জগৎ-ক্ষেত্র তা বহু-পরিমাণে বিরচিত্র,
যার গেই অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরাট জগৎ ক্ষেত্রের উপর ক্ষুদ্র শিশু
পরম রহস্যপূর্ণই বটে ।---

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা ।
অস্তহীন গগনস্তল
মাধার পয়ে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই স্থলীল জল
নাচিছে সারা বেলা ।
উঠিছে তটে কি কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা ।

এই কাব্যে কবি যেন তাঁর ভগবৎ-উপলব্ধির হৃদয়ে দাঁড়িয়ে
শিশুতে তাঁর সহজ প্রকাশের চটা প্রত্যক্ষ করছেন । এ আলোর দিকে
স্থির নেত্রে চেয়ে থাকার নয়, এহেন প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ গাছের পাতা-
কেকড়ির ফাঁকে-ফাঁকে তীক্ষ্ণ হ'য়ে এসে চোখে পড়ছে ।

আগেকার অগ্নিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ তাঁর সঙ্গ-ও এর ত্বকৎ
রয়েছে । অগ্নিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ সে জীবনানন্দেরই এক
বিচিত্র ভঙ্গিমা । ভগবৎ-অন্বেষণ এর তলে তলে লুকিয়ে রয়েছে বলে এই
বিচিত্রতা ; কিন্তু 'শিশুর' ভিতরে ভগবৎ-দীপ্তি যেন কতকটা সোজা-স্বাভা-
বিকর চোখে-মুখে এসে পড়তে চাচ্ছে । তাই কবির কথাগুলো খুব
সোজা আর মধুর ; কিন্তু তাঁরই সঙ্গ-সঙ্গ বাজছে কেমন এক অপ-
রূপ সন্ধানের সুর ।

রঙীন খেলনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে মেঘে,
কেন এত রং মেগে ফুলের পাতে—
'রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে ।

* * * *

যখন নবনী চিঠি লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেশেচুক বেড়াও করে,
ভগ্ন বৃষ্টিতে পারি স্বাচ্ছ কেন নদীবারি,
ফল মধুসে ভারী কিনের হবে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে !

'সমন্বাধী' কবিতায় বালকের সহজ খেলার অন্তরে কবির মনের
কি এক ভীক হিজ্জাসা !—

যদি গোকা না হ'রে
আমি হতেম কুকুরচানি—
তবে, পাছে তোমার পাতে
আমি মুপ দিতে চাই ডাতে
তুমি করতে আমার মানা ?
মতি ক'রে বল
আমায় করিস নে মা চল,
বলতে আমার "দূব দূব দূব দূব !"
কোথা থেকে এল এই কুকুব ?
যা' মা তব যা' মা.
আমায় কোলের থেকে নামা !
আমি খাবো না তোম হাতে,
আমি খাবো না তোম পাতে !
যদি গোকা না হ'রে
আমি হতেম তোমার টিরে,
তবে পাছে যাই মা টড়ে
আমায় রাগতে শিকল দিয়ে ?
মতি ক'রে বল
আমায় করিস নে মা চল—
বলতে আমার হতভাগা পাখী
শিকল কেটে দিতে চায়ের ফাকি !

এর কতকগুলো কবিতায় বাৎসল্যরস জমাট হ'রে দেখা দিয়েছে।—

তোমার কটিতটেব ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?
কোমল গারে দিল পরায়
রঙীন আঙিয়া ।
বিহান বেলা আঙিনা-তলে
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে
চরণ-ছুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে আঙিয়া ।
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?

* * * *

বাছারে তোম সবাই ধরে দোষ !
আমি দেখি সকল তা'তে
এদের অসন্তোষ ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে ?
ছি ছি কেমন ধারা ।

চোঁড়া মেখে অশ্রুত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া ?

তার এং কতকগুলি কবিতা অতি চমৎকার ছড়া—ছোটো-বড়,
বীরপুরুষ, বলবান ইত্যাদি। সমস্ত শিশুকথাখানির ভিতরে একটি
ভাঙ্গা চিরনবীন প্রাণ নগ্নমগ্ন করছে ।

রবীন্দ্রকব্যের বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয়
—চিরদিনই হয়ত সা'হিত্যগুরুগীরা এই কথাটি ভেবে চমৎকৃত হবে ।
জগতের কোন্ হর যে তাঁর চিত্ত-বাণিতে বাজেনি, তা খুঁজে পাওয়া
শক্ত ।

খেয়া

এর কিছুদিন পরে স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথকে একজন
অগ্রণীক্ৰমে দেখতে পাওয়া যায়। নৈবেদ্যে তিনি কর্কশক্রে ঘোণা-
ভাবে অবতীর্ণ হবার ক্ষেত্রে প্রার্থনা করেছেন,—

কর মোরে সম্মানিত নব বীর-বেশে,
চুকহ কর্তব্য ভাবে, চুঃসহ কঠোর
বেদনার। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধস্ত করো দাসে
সকল চেষ্টার আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের লালিত কোড়ে না রাখ' নিলীন
কর্শক্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি যে কর্কশক্রে নিয়েছিলেন, তার
উদ্ঘাপনে তাঁর ভিতরে এতটুকু ঘিবা দেখা যায়নি। সজ্ঞাত, বস্তুত,
আদর্শপ্রচার ইত্যাদি দ্বারা সে-আন্দোলনকে তিনি আরো বহুগুণে
আন্দোলিত ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু শেবে দেখা গেল, এ-আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে
নিলেন। এর জন্ত তাঁর অনেক ভক্তও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের সেই কাজ উচিত হয়েছিল কি অসুচিত হয়েছিল, সে-
আলোচনা অনেকটা অর্থহীন। ইতিহাস যে-ভাবে প'ড়ে উঠেছে, সেই-
ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করা তাঁর উপায় কি আছে ! কিন্তু এই
বৃগের ববীন্দ্রসাহিত্য একটু ভালো ক'রে প'ড়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়,
যে স্বদেশের সন্ধান কবি আশ্রয়ন ক'রে আসছেন, নিজেকে শেষে স্বদেশী
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই স্বদেশপালনই তিনি করেছিলেন।
প্রথমতঃ তিনি যে আদর্শ থেকে স্বদেশ-সঙ্গলের কথা বলছিলেন, স্বদেশিক-
তার শেষ পর্যায়ের তা ভিন্ন চেহারা নির দাঁড়িয়েছিল ; দ্বিতীয়তঃ এক
গভীর আধ্যাত্মিক রোধের জন্ত সমস্ত কর্ক-কোলাহলের মধ্যে তিনি বড়
পীড়ন অনুভব করছিলেন। সাধকের যে শান্ত সমাধি, ভক্তের যে
সঙ্গোপনের পূজা, এইনস্বতরই তাঁর বড় প্রয়োজন হ'রে উঠেছিল।
এ'কেই লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন—

বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই ।
কাজের পথে আমি ত আর নাই ।
এগিরে সবে যাও না দলে-দলে,
জয়মাল্য লগে না তুলি' গলে,
আমি এখন বনচ্ছাত্রাতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই ।

অনেক দূর এলেন সাথে-সাথে,
চলেছিলেন সবাই হাতে-হাতে

এইখানেতে ছুটি পথের মোড়ে
হিরা আমার উঠল কেমন ক'রে
জানিনে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
হুঁটিছাড়া বাকুল বেদনাতে ।
আর ত চলা হয় না সাধে-সাধে ।

ঋণিকায় দেখেছি, কবির চিত্তে পরম স্মরণের প্রতি অনুরাগ
জেপে উঠেছে ; নৈবেদ্যে দেখেছি, এ প্রত্যয় কবির ভিতরে দৃঢ় হ'য়ে
দেখা দিয়েছে । কিন্তু প্রকৃত ভরসায় রবীন্দ্রনাথকে গভীর দেখি
ধেরাতে । অনুাগ আর বিশ্বাসেই তিনি সঙ্কল্প থাকতে পারছেন না—
প্রতীক্ষা তাঁর ভিতরে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে ! সেই প্রতীক্ষার ব্যাধার কবি
এক নূতন ভাষাতে কথা বলছেন ।—

আমার যে হুঁ নূতন পড়া
নূতন বাঁধা তার
নূতন হুঁরে বরতে সে যায়
হুঁটি আপনায় ।
মোশ না তাই চারিদিকের
সত্য সমীপে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
শুক আলোর সনে ।
জীবন আমার কাছে যে তাই
দলে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে ।
যটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝ না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অন্যায়নে
হয় না হুঁরের মিল ।

বেশীর ভাগ কথা কবি রূপক দিয়ে বলছেন । এর এক কবিতায়
বালিকা-বধূ এক স্মরণ ছবি আঁকা হয়েছে । কিন্তু সেটি হয়ত শুধু
বালিকা-বধূ ছবিই নয় । কবি অনুভব করছেন, সেই বিরাটের পাশে
তাঁর নিজের চিত্তও তেমনি বালিকা বধুর মতনই দাঁড়িয়ে । তিনি যে
কত বড় কি যে তাঁর মহিমা, অবাধ বালিকারই মতন কবি হৃদয় দেশ
ভরের রস-খিলাসের মতান পুরোপুরি পাইনি ; তবু তাঁর সঙ্গে কবির
যে একটি সহজ অর্থ নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছে একথাটি বাঁশর
হুঁরের অনর্কণীয়তা নিয়েই বেঙ্গে উঠেছে ।

ওগো বর, ওগো বধু,
এই যে নবানা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধু ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটার যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভানে তুমি তাঁর
খেলিবার ধন শুধু ;
ওগো বর ওগো বধু ।

* * * *

শুধু হুঁদিনে বড়ে
—দশ দিক্ জাগে আঁধারিরা হাদে
ধরাভলে অধরে—
তখন নরনে ধুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা প'ড়ে থাকে তাঁর
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিরা কাঁপে ধরধরে—
হুঁ-দিনের বড়ে ।

যে-প্রতীক্ষা নিয়ে কবি আগে আছেন, তাঁর চমৎকার রূপটি ফুটে
রয়েছে এর কাগরণ কবিতায় ;—

কৃষ্ণ পলে আধপানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঁকড়িনাতে ।
ওরে আমার নরন আমার
নরন নিছকাতা,
আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে
কত সন্নিব তারা ?
সাড়া কাণে নাহিরে সবাই
ঘুমায় অকাতরে ।
প্রদীপগুলি নিবে গেল
ছুবার-দেওয়ার ঘরে ।
তুই কেন আজ বেডাস্ ফিবি'
আলোর গন্ধতাবে ?
তুই কেন আজ মৌনস্ চেয়ে
বনপথের পারে ?

বৈকল্য কবির রূপার প্রতীক্ষার চাইতে এক হিসাবে, নিবিড়তর
এই খেয়ার প্রতীক্ষা । বৈকল্য কবিঃ অনুভূতি নিশ্চয়ই অতি গভীর,
কিন্তু জীবনের স্ফুটনতা তাঁর সান্নিহে কম । সহজ প্রতীক্ষার ভিতর
দিয়েই তিনি সহজ অর্থ গভীর মিলনে পৌঁছতে পারছেন । কিন্তু
রবীন্দ্রনাথের (আধুনিকেরও বটে) প্রতীক্ষা বড় আশ্চর্য । দেবতার
যৌবন নিয়ে একমনে যিনি উপনিষদের নৃত্য উপভোগ করেছেন,
বিদ্বন্ধিনীর বিক্রম চেয়ে দেখেছেন ; গভীর জ্ঞানকে আশ্রয় করে
গভীর উদাস কঠে যিনি ঘোষণা করেছেন—“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে
আমার নয়,” অর্থাৎ—

যেথা তুচ্ছ আচাৰ্যের মন্ত্র-বালিরামি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই প্রাসি',
পৌরুষেরে করিনি পতনা ; নিতা যেথা
তুমি সর্বা কথা চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হৃদয়ে নির্জর আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো আগরিত ।

সেই অসাধারণ বলীরাম হৃদয় কবি আজ বিরাটের ঘেমের
আকর্ষণে নব-অনুরাগিণী কিশোরীর মতন কাঁপছেন । ভাবার যত
দীপ্তি, উচ্চাস, কল্পনার যত উদ্দামতা, সে-সব আজ কোথায় ? একেবারে
শাধা কথার হারহাটি অনাহৃত করবার জন্ত কবি ব্যাকুল ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পাট-চাষীদের সমস্যা

শ্রী চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত

একটি প্রণালী-বদ্ধ ব্যবস্থা

বাংলা দেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের মধ্যে পাট বা কোটা অন্যতম। সত্য বটে, এই পাট বিক্রয় করিবার বহু টাকা এই দেশে আমদানি হয় ও বহু আড়ত-দার ও দালালের হাত দিয়া অগণিত অর্থের আদান-প্রদান হয়; কিন্তু যে কৃষক গায়ে রক্ত জল কাঁরয়া এই পাট উৎপাদন করে, সে যে-নিরন্ন সেই নিরন্নই থাকিয়া যায়। যাহাতে দরিদ্র কৃষকের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে, ও যাহাতে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-মূল্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগকে দরের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থার একটি আভাস সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এদেশে সাধারণতঃ ধনী মহাজনেরা হয় একা, না হয় কয়েকজন একত্রিত হইয়া এক একটি কোম্পানি গঠন করিয়া পাট ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার খোলে। তাহারা গ্রামে-গ্রামে হাটে বাজারে লোক পাঠাইয়া চাষীদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করে, এবং কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বড়-বড় মহাজন বা কারু-বারীর নিকট উহা বিক্রয় করে। কখনওবা তাহারা কোনো বড় আফিসের দালালরূপে গ্রাম কি হাট হইতে পাট ক্রয় করিয়া সেই আফিসে পাঠায়। এইপ্রকার কয়েক শ্রেণীর লোকই কৃষক ও বড়-বড় কোম্পানীর মধ্য-বর্তী লোক বা middlemen. সাধারণতঃ ইহারাই পাটের দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা উচ্চতন মহাজনগণের নিকট যে দরে পাট বিক্রয় করিতে পারিবে অথবা ঐ মহাজনগণ তাহাদিগকে যে দরে পাট খরিদ করিতে আদেশ দেয়, সেই-সেই দর-অনুসারেই তাহারা বাজারে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাট খরিদ করিয়া থাকে। অতএব দরিদ্র সংস্থানশূন্য

নিঃসম্মল কৃষকগণকে বাধ্য হইয়াই সেই মূল্যে পাট ছাড়িয়া দিতে হয়। বর্তমান অবস্থায় ইহার গত্যন্তর নাই। কাজেই পাটের ব্যবসায় যে প্রভূত অর্থের আগমন হয়, তাহার অধিক অংশই বিদেশে রপ্তানিকারী বড়-বড় কোম্পানী ও কুঠিঘাল মহাজনগণের ও বঙ্গ-দেশের বহু চট ও খালের কলের মালিকগণের হস্তে পতিত হয়। বাকি যাহা থাকে তাহারও সার ভাগ ইহাদেরই কমিশন এজেন্টগণ এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা ও ছোটো-ছোটো ফড়িয়া বা ব্যাপারীরা ভোগ করে। বস্তুতঃ, যে দরিদ্র কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া জমি চাষ করে ও বীজ বপন করিয়া পাট উৎপাদন করে, আবার দারুণ গ্রীষ্মে পাটবনে বসিয়া জল পরিষ্কার করিয়া দেয়, এবং বর্ষায় স্থানে-স্থানে অগাধ জলে ডুবিয়া-ডুবিয়া এই পাট কাটিয়া, ভিজাইয়া ও ধুইয়া বহাদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর সামান্য-পরিমাণ পাট হাটে উপস্থিত করে, সে এত কষ্টের পরিবর্তে সামান্য-কিছু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গহে ফিরিয়া যায় ও নিজের ভাগ্য-দেবতাকে দোষারোপ করিতে থাকে।

সত্য বটে, পাটের কারুকার্যে এই মধ্যবর্তী জনকতক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থার উন্নতি হয়। যেখানে এক-দিন পর্ণকুটীর ছিল সেখানে বড়-বড় টিনের ঘর অথবা বৃহৎ অটালিকাসমূহ দেখা যায়; কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে জনকতক লোকের আর্থিক উন্নতিকে সমাজের উন্নতি বলা যায় না। কৃষকরাই বর্তমান সমাজের প্রধান অঙ্গ; তাহারা উৎপাদনকারী; তাহাদের উন্নতিতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি। কাজেই কৃষকেরা যে-পর্যন্ত এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমূহ তাহাদের বর্তমান দুর্দশার হেতু সম্যক্ স্বদয়কম করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা করিতে পারেন না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক

অবস্থার উন্নতি হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ পাঁচ জন মিলিয়া একত্রিত হইয়া কাজ করিবার প্রয়াস, বিশেষ শিক্ষা ও সময়সাপেক্ষ।

এই দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, এইজন্যই তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া উঠে না। ভবিষ্যতে তাহাদের কিসে সমৃদ্ধ সুবিধা হইবে সেদিকে দৃষ্টি তাহাদের আদৌ নাই। কাজেই যাহাদের অর্থের সম্ভাব আছে এবং যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাবশতঃ সম্ভবত কাম-কৌশল আছে, তাহাদের কাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃষকদের স্বার্থ বাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, সমযোচিত উদ্যোগ উদ্ভাবন দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির বিধান করা কৰ্ত্তব্য। অবশ্য তাহারা বর্তমানে মনোবর্তী ব্যক্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া পাট ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বেশ ছুপয়সা উপাঞ্জন করিতেছেন তাহাদের উচ্ছেদসাধন করা বা তাহাদের কারবারের অন্তঃস্থ সাধন করা উল্লিখিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বরং যাহাতে তাহারা এই আপাতমধুর পরিণাম-প্রতিকূল ব্যবসার পথ ত্যাগ করিয়া কৃষি ও সম্ভবতঃ এবং ক্রমশঃ ধন-বৃদ্ধিকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অন্বেষণ করিতে পারেন সেই পথের নির্দেশ আভাস দেওয়াই এই ব্যবসার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সর্বসাধারণের দরিদ্রতা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইহার ফলে জনসমাজের বিলোপ হইবারই কথা। এই কৃষকদিগকে বর্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে সঙ্কে-সঙ্কে যাহারা ধনী ও শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, তাহাদেরও বিলোপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তির কৃষকদের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল। তাই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাদের উদ্ভাবিত ও সম্ভব ব্যবস্থা দ্বারা এবং ধনীগণ তাহাদের ধনদ্বারা এই ব্যবস্থা কার্য-কারী করিয়া এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত জন-মণ্ডলীকে ধ্বংস-মুখ হইতে এখনও রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা।

নিম্নে একটি প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা দেওয়া গেল। ইহা ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে, তবে এই প্রণালীতে কার্য আরম্ভ

করিলে, ও উপযুক্ত সময়ে উপস্থিতমত ভ্রমাদির সংশোধন হইলে, কৃষকগণও সমবেত চেষ্টায় কি কণ হয়, তাহার একটা আভাস পাইবে ও তাহাদের স্ব-স্ব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাতের ক্ষমতা হইবে। আশ্রয়-মধ্যাদা ও আশ্রয়-ভাণ্ডার-তার ভাব স্বতঃই তাহাদের মন্থনে উপস্থিত হইবে এবং এত কষ্টে উৎপন্ন যান্ত্রীয় শস্যের মূল্য নিষ্কারণ করিবার দাবি বহাল রাখিতে তাহাদের কোনো প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে না। সঙ্কে-সঙ্কে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বড়-বড় মণ্ডলন ও কুঠিখালগণও তাহাদের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে লইতে বাধ্য হইবে।

পাটচাষীদের সমবায় যৌথ কারুবার

কৃষক চাষী বা অংশীদার—অন্যন ১০ শত কৃষক অংশীদার (মেধর) লইয়া এই কারুবার আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইহারা মোট অংশের শতকরা ৯৫টির মালিক হইবে। (কৃষকের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভালো, কিন্তু বহু অংশীদার লইয়া কাজ করিবার পূর্বে অল্পসংখ্যক মেধর লইয়া আরম্ভ করাই সম্ভব।)

সাহায্যকারী (বা বিশিষ্ট) অংশীদার—যাহারা খুব নিম্ন হারের মূদে এই সমবায়কে স্বর্ণ প্রদান করিবেন ও যাহারা উপদেষ্টারূপে সমবায়ের কার্যাদি-সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহারা বাকী শতকরা ৫টি অংশ পাইবেন।

প্রবেশিকা ১০।—প্রতি অংশের জন্য ১০ (আট আনা) প্রবেশিকা আদায় হইবে; অথবা প্রত্যেক মেধর ৩টি হইবার সময় ১ এক টাকা প্রবেশিকা দিবে। (অবশ্য সমবায় যাহা ভালো বোধ করিবে, তাহাই নির্দ্ধারিত হইবে।)

অংশের মূল্য ১০ দশ টাকা—প্রতি-অংশের মূল্য অন্যন ১০ দশ টাকা হওয়া উচিত। প্রত্যেক সভ্যকে অন্যন একটি অংশ সমবায়ের রাখিতে হইবে। অংশ প্রাপ্তির দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে প্রত্যেক অংশের জন্য কৃষকগণ মাত্র ১০ আনা জমা দিবে। যে-পর্যন্ত তাহাদের অংশগুলির মোট মূল্য আদায় না হয়, পাটের মূল্য বাবদ তাহাদের প্রাপ্য টাকা হইতে প্রতি দশ টাকায় ১ এক টাকা হিসাবে কাটিয়া রাখা হইবে। সম্পূর্ণ টাকা

আদায় হইলে পর আবশ্যক হইলে অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কারবারের প্রসারণ করা যাইতে পারিবে। এই বৃদ্ধি হারও উচ্চরূপে ক্রমশঃ আদায় হইবে। এইপ্রকারে কয়েক বৎসরে অনায়াসে সমবায়ের আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে, অথচ অংশীদারগণকে এক কালে নিজ দুই অংশের সমস্ত মূল্য দিতে হইবে না। কারবার ভালোরূপে চলিলে অংশগুলির আংশিক লব্ধ মূল্যই মোট মূলধন-রূপে পরিণত হইতে পারিবে।

সহযোগী বা সাহায্যকারী সভা—এই সমবায়-প্রচলন-সময়ে অর্থসাহায্য প্রয়োজন হইবে, এবং ধনী মহাজনগণ হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে। এই ঋণদাতৃগণ এক কালে সমস্ত অংশের মূল্য প্রদান করিবে। এই অংশগুলির হিসাবে তাহারা লাভের অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং যে টাকাটা তাহারা ঋণ দিবে, তাহার সুদ প্রাপ্ত হইবে। উপদেশকগণও অংশ ক্রয় দ্বারা মেঘর হইবে, তবে তাহারা তাহাদের অংশের সম্পূর্ণ মূল্য ৪ বৎসরে আদায় করিবে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সাহায্যকারীই সহযোগী সভা।

সভ্যের সংখ্যা—সমবায়ের কার্যনির্বাহক সমিতি, প্রতি সভ্য কয়টা করিয়া অংশ লইতে পারিবে তাহা নির্ধারণ করিবে, কিন্তু সাধারণ সমিতি সমবায়ের মোট মেঘরের সভ্যের ও অংশের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

সাধারণ সমিতি—প্রত্যেক অংশীদার এই সমবায়ের সাধারণ সমিতির সভ্য হইবে। প্রতিসভ্যের এই সমিতিতে একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। দরকার হইলে অল্পপস্থিত সভ্যের ভোট দিবার ক্ষমতা অন্য কোনো সভ্যের হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

কার্যনির্বাহক সমিতি—সাধারণ সমিতির সভ্যগণ দ্বারা কার্যনির্বাহক সমিতি মনোনীত হইবে। ২ জন সভ্যদ্বারা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। ইহা ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর সমস্ত কার্য পরিচালনা করিবে। এই সমিতি ইহাদের প্রত্যেক কার্যের জন্য সাধারণ সমিতির নিকট দায়ী থাকিবে। সাধারণ সমিতি ইচ্ছা করিলে যে-কোনো সময়ে এই কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। এই সমিতির সম্পাদক সাধারণ সমিতিতে নির্বাচিত হইবে। ছয় জন মেঘর কৃষক

সভ্য দ্বারা, এক জন বিশিষ্ট সভ্য দ্বারা ও এক জন গ্রাম্য বোর্ড কি কো অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা মনোনীত হইবে। আবশ্যক হইলে বোর্ড ও সোসাইটির লোকের পরিবর্তে বিশিষ্ট সভ্যগণ আরও একজন সভ্য মনোনীত করিবেন। সমবায়ের প্রথম অবস্থায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিকট হইতে কতক টাকা ঋণ লওয়া যাইতে পারে এবং সেইজন্যই উক্ত সোসাইটির মনোনীত একজন কার্যনির্বাহক সমিতিতে সভ্য হইবে। যতদিন সমবায় সোসাইটির নিকট ঋণী থাকিবে অন্ততঃ তত দিন এই সোসাইটির তলব-মত ইহার হিসাব-পত্রী-ক্ষকগণকে যে-কোনো সময়ে সমস্ত হিসাব-পত্র দেখাইতে হইবে।

কার্যনির্বাহক সমিতির সাধারণ কার্য

১। প্রত্যেক বৎসরেই এই সমিতি পাট বিক্রয়ের সময় অর্থাৎ মসূর্য নির্ধারণ করিবে। এবং কার্য পরিচালন করিবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিবে। (অবশ্য কর্মচারীগণের মাহিয়ানা সাধারণ সমিতি নির্ধারণ করিয়া দিবে।)

২। প্রতিবৎসর যে তারিখে পাট বিক্রয় আরম্ভ ও বন্ধ হইবে উহা অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্বে সর্বসাধারণকে ও সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবে।

৩। এই সমিতি সমবায়ের অংশীদার যাত্রেরই উৎপন্ন যাবতীয় পাট ক্রয় করিবে এবং ঐ পাট যাচনদারগণ দ্বারা যাচন করাইয়া গুণানুসারে শ্রেণীভুক্ত করিবে। যাচনকারীর কার্য-সম্বন্ধে তৎকালে কাহারও কোনো আপত্তি হইতে পারিবে না। যদি দরকার হয় ইহার কার্যের বিরুদ্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যনির্বাহক সভার নিকট আপিল চলিবে।

৪। অংশীদারগণের পাট অত্যন্ত নিকট হইলে এই সমিতি উহা গ্রহণ নাও করিতে পারিবে।

৫। এই সভা পাটের দর নির্ধারণ করিয়া দিবে। (অবশ্য চতুর্দিকস্থ বাজার দর দেখিয়া দর সাব্যস্ত হইবে)।

৬। এই সমিতি বৎসরান্তে ব্যবসায়ের লাভালাভ নির্ধারণ করিয়া প্রতি অংশের লভ্যাংশ দাখ্য করিবে। এই

কার্য পরিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

- (ক) সমবায়ের ব্যবসায় চালাইবার সমস্ত খরচ।
- (খ) ভূদাম ভাড়া।
- (গ) ঋণের সুদ।
- (ঘ) ঋণশোধের জন্য টাকা জমা।
- (ঙ) সম্পত্তির ব্যবহার-জনিত ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ।
- (চ) ভবিষ্যতে কোনো অন্তাবনীয় ক্ষতিপূরণ পরিবার জন্য টাকা জমা।
- (ছ) কার্যপরিচালনা-সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ।

সমবায়ের দায়—কোনো অংশীদার উপযুক্ত সময়ে পাট বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিলে, সমবায় কোনো কারণে পাট গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে, (অথবা পাট ক্রয়ের উপযুক্ত হওয়া চাই) প্রতিসভাকে প্রত্যেকবার পাট গ্রহণ না পরিবার জন্য ৫ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। (এই পাটের পরিমাণ সমিতি নির্ধারণ করিবে)।

অংশীদারগণের দায়—সমবায়ের মসৃম আরম্ভ হইবার পর কোনো অংশীদার তাহার উৎপন্ন সমুদায় পাট এই সমবায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবে; অন্য কোনো স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবে না। অন্য কোনো স্থানে বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রয়ের পূর্বেই কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদকের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে। পাট সমবায়ের পছন্দানুযায়ী না হইলে সম্পাদক তৎক্ষণাত তাহা অন্যত্র বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিবেন। কোনো-প্রকার অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র পাট বিক্রয় করিলে অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দণ্ড দিতে হইবে; এই ক্ষতিপূরণ ১ পাচ টাকার কম হইবে না এবং ২০ বিশ টাকার অধিক হইবে না। কার্যনির্বাহক সমিতি ভবিষ্যতে এই অংশীদারের নিকট কোনো পাট ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং দরকার হইলে সমবায়ের তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তন করিয়া দিতে পারিবে। এমনকি তাহার প্রদত্ত অংশের মূল্য ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত হইতে পারিবে।

পাটের মসৃম শেষ হইলে কার্য-নির্বাহক সমিতি যাবতীয় ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিবে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে ক্রয়-সম্বন্ধে সকলকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। মসৃম শেষ বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে শেষ তারিখের

পর কার্যকরী সমিতির সভ্যদের বৈধ কি অবৈধ কোনো কার্যের জন্য সমবায় দায়ী নহে।

পাটক্রয়—কার্য-নির্বাহক সমিতির নির্দেশ-অনুসারে পাটক্রয় আরম্ভ হইলে কৃষকগণ বিক্রয়ার্থ পাট উপস্থিত করিবে। উহা যাচনদার দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইলে গুণানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সমবয়ে মারকা দিবার স্থানে নীত হইবে। যাচনদার পাটের শ্রেণী ও পরিমাণ উল্লেখ করিয়া পাট বিক্রেতাকে একখানা রোকা-পত্র প্রদান করিবে। এই রোকা সম্পাদক কিম্বা অন্য-কোনো ভারপ্রাপ্ত কামচারীর নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহাতে পাটের দর উল্লেখ মোট পাতনা লিখিয়া দিবেন। এই রোকা দৃষ্টিমাত্র আদ্যাবিত মোট মূল্যে একচতুর্থ অংশ বিক্রেতাকে দিবেন ও আদ্য টাকার পরিমাণ উহাতে লিখিয়া দিবেন। বাকী অংশ অংশ সম্ভব হইলে ১ মাসের মধ্যে তিন কিস্তিতে তিনবারে ১/৪ হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ঐ প্রদানের তারিখগুলিও রোকায় লিখিয়া দেওয়া হইবে। আফিসের খাতায় এই রোকায় নকল থাকিবে যেন টাকা আদায়ের তারিখের পূর্বে সুবিধা-মতো সমস্ত হিসাব-পত্র ঠিক করিয়া রাখা যাইতে পারে। যতদিন সমবায়ের অবস্থা বেশ সচ্ছল না হয়, ততদিন উপরিলিখিত ব্যবস্থা-অনুসারে কার্য চলিবে। কিন্তু অবস্থা সচ্ছল হইলেই সর্বপ্রথমে পাটক্রয়ের মোট দেয় মূল্যের অর্ধেক প্রথম দিবসে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক অংশীদার তাহার প্রাপ্য পাটের মূল্য আদায়ের শেষ তারিখে, (অথবা ইচ্ছা করিলে পূর্বেই) তাহার মোট অংশের দেয় টাকার পরিমাণে প্রতি ১০ টাকায় ১ টাকা হিসাবে কাটিয়া তাহার মোট অংশ মূল্য-বাবদ জমা দিবে, ইচ্ছা করিলে জমা টাকার দার বাড়াইয়া অল্প দিনের মধ্যেই দেয় টাকা আদায় করিতে পারিবে।

পাটবিক্রয়—যেপর্যন্ত সমবায় ক্রয়-করা পাট বিদেশে অনির্ধারিত মূল্যে রপ্তানি করিতে না পারিবে বা কোনো-প্রকার লাভজনক ব্যবসায় যোগ্য পণ্যে পরিবর্তিত করিতে না পারিবে, তত দিন কলিকাতায় অথবা অন্য কোনো স্থানের বড়-বড় কুঠিঘাণ মহাজন ও বিদেশীয়

কুঠিয়ালগণের এজেন্টগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

পাট ক্রয় করিবার পর উহাতে যাচন হিসাবে সমবায়ের নাম পুণ্যসারে নম্বর ও ছাপা দেওয়া হইবে। কোনো-প্রকার কৃত্রিমতা থাকিতে পারিবে না। জায়া যাচন দ্বারা পাটের শ্রেণী বিভাগ হইয়া গাঁইট বাজা হইলে দেশীয় কি বিদেশীয় কুঠিয়ালগণ উহা আগ্রহের সহিত সমুচিত মূল্যে ক্রয় করিবে, এ-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইসব ধনী মহাজন পাট চালানী রসিদ দেখিলেই পাটের মূল্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং এই মূল্যের টাকা দ্বারা কৃষকদের প্রাপ্য ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির পাটের মূল্য আদায় হইবে।

সমবায়ের লাভালাভ—প্রবেশিকা ও প্রথম আদায়ী অংশের মূল্যপ্রাপ্তির পর এই সমবায়ের দ্বারা গড়ে কত টাকার পাট ক্রয় করিবার কথা তাহার মোটামুটি একটা হিসাব করিতে হইবে। এই মোট টাকার ১৩ অংশের পরিমাণ টাকা হাতে লইয়া এই কারুবীর আরম্ভ করা যাইতে পারে। অবশ্য ব্যবসা আরম্ভ করিলে পাট খরিদের মূল্য কিছু আচল ও বর্জ্য অস্ত্রাণ্ড খরচ উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্নই উল্লেখ করা হইয়াছে। আদায়ী টাকা বাদে অবশিষ্ট টাকা প্রথম দুই এক বৎসরের জন্ত সাহায্যকারী সভাগণের অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের বা কোঅপারেটিভ সোসাইটির নিকট হইতে ঋণ লইতে হইবে। পাটের মসুমের ৫ কি ৬ মাসের জন্ত ঐ ঋণ লওয়া হইবে যেন মসুম শেষ হইলেই উহা আদায় হইয়া যায়। মসুম-শেষে হিসাব-সময়ে প্রথমবাবের আদায়ী টাকা অংশীদারগণের অংশের আদায়ী মূল্য এবং লাভের অংশ যোগ হইবে। অতএব দ্বিতীয়বারের মসুমে প্রথমে অপেক্ষাকৃত অল্প ঋণ গ্রহণ করিলেই চলিবে। এইপ্রকার তিনচারি বৎসর মধ্যেই মোট কার্যকারী অর্থ জমা হইবে এবং সমবায় বিনা-সাহায্যে কার্য্য চালাইতে পারগ হইবে। কৃষকগণ ও অন্যান্য অংশীদারগণকে যথেষ্ট লভ্যাংশ দিবার সুবিধা হইবে।

হিসাবনিকাশ—পাটের মসুম শেষ হইবার তারিখের ৫ কি দুই মাসের মধ্যে কার্য্যনির্কাহক সমিতি

সমস্ত হিসাবপত্র সাধারণ সমিতির নির্ধারিত হিসাব-পরীক্ষকগণের পরিদর্শনের জন্ত উপস্থিত করিবে। এই উপস্থিত করিবার তারিখের দুই মাসের মধ্যেই পরীক্ষকগণের (অনুভবঃ ২ জনের) মতামত সঠ উহা সাধারণ সমিতির সমক্ষে বিবেচনার জন্ত উপস্থাপিত হইবে। সাধারণ সমিতি লাভালাভ নির্ধারণ করিয়া অংশীদারগণকে বিজ্ঞাপিত করিবে। সমস্ত হিসাব-পত্রের নকল অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিবেন। অবস্থা সচ্ছল হইলে সকল সভাই নিকাশী ফর্দের ছাপা নকল পাইবে। এই সমবায়ের ব্যবস্থায় নিয়মাবলী এই সাধারণ সমিতি দ্বারা অনুমোদিত হইবে এবং কার্য্যনির্কাহক সমিতি সাধারণ সমিতির অনুমোদিত নিয়ম দ্বারা চালিত হইবে।

উপলোক প্রণালীতে কার্য্য চালাইলে এই সমবায় ৪.৫ বৎসরের মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অংশীদারগণের বিশেষ লাভের বিষয় হইবে। সাধুতার সহিত পাটের যাচন হইলে সমবায়ের পাট বাজার দর হইতে বেশী দরে বিক্রয় হইবে। অল্পকাল মধ্যেই এই সমবায় বড় বড় কুঠিয়াল মহাজনদের বিশেষ বিখ্যাতভাজন হইবে ও দরুদার হইলে সমস্ত-সমস্ত তাহারা উহাকে টাকা অগ্রিম দিতেও আপত্তি করিবে না।

কোনো-কোনো গাম্য বোর্ড এই সমবায় পরিচালনা করিতে বিশেষভাবে উপযুক্ত। উহারা এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া কৃষকগণের ও সমাজস্থ সকলের অবস্থার বেশ উন্নতিসাধন করতে পারেন। যাহারা ধনী তাহাদের ধন দ্বারা পরোকভাবে সকল শ্রেণীর লোকের লাভ হইবে, পরন্তু তাহাদের নিজের লাভের কোনোই বাধা হইবে না।

এই প্রণালীর ব্যবসায় অন্যান্য রবি-শস্ত্রের সম্বন্ধেও খাটে; তবে পাটের মসুম বৎসরে মাত্র ৬ কি ৭ মাস, কিন্তু অন্যান্য শস্ত্রের কারুবীর সমস্ত বৎসর ধরিয়া চলে, এই-জন্ত এইসমস্ত কারুবীরে বহু প্রয়াস ও অর্থের দরকার।

এই সমবায় যে ভবিষ্যতে নানাবিধ ব্যবসায়ের মূল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাট দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য যাহা বিদেশ



ওমর খৈয়াম

শিল্পী--শ্রী জ্ঞানদাকান্ত দাসগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হইতে আমদানি হইয়া অথবা এই দেশে বিদেশীয়গণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিদেশীয়দিগকে বহু অর্থশালী করিয়া দেয় তাহার প্রত্যেক পণ্যই দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় অর্থ-সাহায্যে এই দেশে প্রস্তুত হইয়া দেশের আর্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে।

এই সমবায়ের কাৰ্য্যাদি পরিচালনার জন্য যে সমস্ত কৰ্মচারী ইত্যাদির আবশ্যক হইবে, তাহাদের সমবায়ের সভাগণ হইতে নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

অতি অল্প মূল্যের কল ও অল্প মূলধন হইলেই সমবায় নিম্নলিখিত পণ্যগুলি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবে।

- ১। সরু হুতলী, মোটা হুতলী, দড়ি এবং কাচি।
- ২। চট, থলে ইত্যাদি।
- ৩। মিহি চট, ভেগিফান ইত্যাদি।
- ৪। গালিচা ইত্যাদি।

কৃষক

শ্রী: অরীন্দ্রজিৎ সুখোপাধ্যায়

১

কবি লিখে পুঁথি ল'য়ে ছন্দে বন্ধে গাঁথি'
চিত্রকর রঙে তুলিকায় ;
শিল্পী আসে মাখে ল'য়ে রত্ন-আভরণ,
মনোভাব দতনে সাজায়।
তা'রা স্তম্ভী লভে কীর্তি, বিজয়ের মালা
দেশে-দেশে রাজার সভায় ;
ইতিহাস তাহাদের লিখে রাখে নাম
পুঁথি খুলি 'পাতায়-পাতায়।
কিন্তু হে আদিম কবি, ধরাতলে জ্যোতা
তব কাব্য মহা শিল্পকলা
কারও চোখে এতদিন পড়েনিকো ধরা—
রূপে কেহ হইনি উতলা।
কক্ষ হাতে ধরাবন্ধে যুগ যুগ ধরি'
হলমুখে যা লিখিলে কবি,
প্রভাত-সূর্যের রঙে চন্দ্র-কৌমুদীতে
আঁকিলে যে বিচিত্রিত ছবি ;
দিগন্তে প্রাস্তর জুড়ি' শূন্য বালুচরে,
তাপদীর্ঘ দগ্ধ মরুবকে

যে হাসি আঁকিয়া দিলে, যে দীপ্তি ফুটালে
আম পীত পত্রলেখা-মুখে,
পথে লোক চেয়ে যায়, কেউ বলে "সেশ",
কোনো কথা বলে নাকো কেউ ;
কারো চোখে ঠেকে নাকো, কারো মনে লাগে
সৌন্দর্যের আঘাতের চেউ।
নীরবে উথলে সৃষ্টি রূপের সাগরে
অষ্টা শুধু আপনি গোপন ;
সেই ত চরম কথা, হে কলাকুশলী !
তাই বুঝি নাহিক দর্শন ?
মানবের ইতিহাসে তাই নাহি নাম,
সেথা তুমি অখ্যাত মায়াবী ;
তোমার গীতির ছন্দে রোমাঞ্চিত ধরা,
মানবের নাহি শুধু দাবি।
ঙগো ও মাটির বন্ধু, নিভৃতবিলাসী,
রহস্যের নব মন্ড্রে তব
মুঞ্জরিছে পত্রশ্যাম বসন্ত বৈভব
তরুণিত চির-অভিনব।
বরষসঞ্চিত তা'র বন্ধের বেদনা
ফুল হ'য়ে ফুটিবারে চায় ;

মুক মেদিনীর ব্যথা খুঁজে ফি'রে পথ,
 এস বন্ধু ভাষা দাও তায় ।
 বৌজের গোপন বন্ধে শিহরে উল্লাস
 তরু হ'য়ে উঠিতে আকাশে ;
 কোরকের বন্ধ হিয়া পেতে চায় ছাড়া
 দিশাহারা অশান্ত বাতাসে ;
 নবীন আগাচ এল উড়িয়ে নিশান
 তৃণদল আনন্দে বিহ্বল ;
 এস করি পূর্ণ করো তাদের কামনা
 —স্বপ্ন হোক সার্থক সফল !

মহাদানবের শিল্প মিশেছে হাওয়ায়
 —কথাসার মহাভারতের ;
 অযোধ্যা, দ্বারকা, কাঞ্চী, পাটলী, বৈশালী
 —ইতিহাস শুধু অতীতের ।
 তুমি হে অমর শিল্পী, চির যাতুকর,
 স্পর্শ তব বিলোল যৌবন ;
 হয়ত বুঝো না নিজে আপনার কথা,
 সৃষ্টির সঙ্গীতে নিমগন ।
 অরণ্য কাটিয়া নিভি করিছ রচনা
 কমলার লীলা-পদ্মাসন ;
 বিজ্ঞান স্থাপনভূমে তুলিছ গড়িয়া
 মুখরিত মানব-ভবন ।
 নগ্না ধরণীর বুকে দিয়াছ বিছায়ে
 চীনাংকুর হরিৎ হিরণ ;
 করবো সাজালে তা'র ফুটায়ে গোলাপ,
 মল্লিকা, মালতী অগণন ।
 মাতৃভেদে তৃপ্তি আনি' রিক্ততা ঘুচায়ে
 গাছে-গাছে ভরি' দিলে ফল ;
 ভরিয়া মেঘের কুন্ত সহস্র ধারায়,
 বিসর্জিলে অভিষেক-জল ।
 তোমারে চিনেছে তাই, হে চির-নবীন !
 বসন্তের প্রথম বাতাস ;

প্রথম কর্ণগন্ধি বরষের প্রাতে
 মৃত্তিকার সুরভি নিশ্বাস ;
 প্রথম উষার আলো আকাশের চোখে,
 প্রথম পাখীর কলধ্বনি ;
 নিশান্তের সৃষ্টিহারা তটিনীর বুকে
 নুপুরের প্রথম নিকণি ।
 জাহাঙ্গীর গজদীপ, সাজি ভরি' ফুলে
 তাই তব আরাটিক গান
 রচিছে নিখিল ধরা—নিত্য অহর্নিশ
 নান্দীপাঠে তোমার আশ্রান ।

আকাশে আশ্রয় তুলি' নিশান উড়িয়ে,
 ডকারবে আসোনি সস্তায়ি',
 নহ তুমি জয়শীল রাজা বাদশাহ
 মারী-সম নিষ্ঠুর-বিলাসী ।
 যুগে-যুগে ঝঞ্জাবাত প্রাবনদহন
 শির পাতি' করেছ গ্রহণ ;
 অক্রোধে চিনেছ ক্রোধ, শাস্তিতে বিগ্রহ,
 —কমা দিয়া হিংসার বারণ ।
 তৃণসম নতমাথা করুণ কোমল
 তরুসম সহিষ্ণু নির্বেদ ;
 মুখ ফুটে বলোনিকো, হে মৌনী সাধক,
 জীবনের কিবা হর্ষ-খেদ ।
 কোথা সেই হত্যাপ্রিয় আততায়ী দল
 দিখিছনো যাহাদের নাম ;
 কোথা সেই রণোল্লাস, কোন্ ধূলিতলে
 ধূলি হ'য়ে লভিছে বিশ্রাম !
 ম'রে গেছে রাজা ও নকীব—রক্ত-লেখা
 সে-কাহিনী বিশ্বত স্মদুর,
 তৈমুরের অস্থি ল'য়ে নগর-তোরণে
 খেলা করে পথের কুকুর ।
 আপনার আশীর্ষে দহন-জর্জর
 আপনি মরেছে তা'রা সব,

আজও তুমি বেঁচে আছ হে চির-নবীন,
 হে কিশোর, তরুণ পেলব !
 এখনও তোমারে ঘেরি', তুলিছে উল্লাসে
 ষড়্ঋতু রূপতরঙ্গিমা ;
 আশ্বিনের শস্যক্ষেত্রে শিহরিয়া চলে
 শ্রামায়িত মহাজ্ঞ ভঙ্গিমা !
 এখনও তোমার বাঁশী বেজে উঠে দূরে
 প্রভাতের ভাঙাইয়া ঘুম ;
 এখনও তোমার গানে পূরবীর সুর
 সঙ্কার ললাটে আঁকে চুম ।

৪

আকাশ ধূসর করি' ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়
 আঙ্গিকেও এসেছে আবার,
 অতীতের অতিকায় বারণের সম
 স্তবিরাহি বাতাস-আকার ।
 মুখ তার রক্তমাখা, লোহাগড়া দাঁত,
 মুহূর্ষ অনল উদ্‌গার ;
 ধরণীর ফুলশোভা শ্যাম দেহবাস
 নিশ্বাসেতে জ্বলে হয় ক্ষার ।

দস্ত তার প্রাণহীন দেহের আহার
 বৃষ্টি শুধু দুর্ক্লমপীড়ন ;
 একেশ্বর ধনিকের ফুলাইয়া পেট
 লক্ষ জনে দেয় অনশন ।
 জন্মে যা'র বিশ্বগ্রাসী মারুতির ক্ষুধা
 ভাগ্যে তা'র অশনি-সম্পাত ;
 ককচ্যুত জ্বালাময় কিপ্প গ্রহসম
 অন্ধপথে হবে বাজী মাং...।
 তখনও মাঠের পথে দোহুল হাওয়ায়
 এম্নি ফুটিবে মেঠো ফুল ;
 তখনও দোয়েল বাসি' বেড়াটির গায়—
 পিক্ পিক্ গাহিবে ব্যাঙুল ।
 রাত্রির উৎসব-শেষে তখনও শেফালি
 ছেয়ে রবে দিনের অন্ধনে ;
 তখনও ছুটিবে নদী নটিনী-লীলায়
 কলভঙ্গে নৃপুত্র-নিষ্কণে ।
 তখনও রহিবে তুমি, ধরণীর প্রিয়,
 হে তরুণ, হে অমর কবি !
 তখনও ধরার বক্ষে মোহন তুলিতে
 ফুটাইবে স্নিগ্ধশ্রাম ছবি ।

পরলোকগত রায়-সাহেব ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার, ডি-এসসি ; আই-ই-এস্

শ্রী রমাদাস হালদার

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য রসায়নাদ্যাপক
 রায়-সাহেব ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার, ডি এসসি ;
 আই-ই এস্ পুরীধামে ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেছেন ।

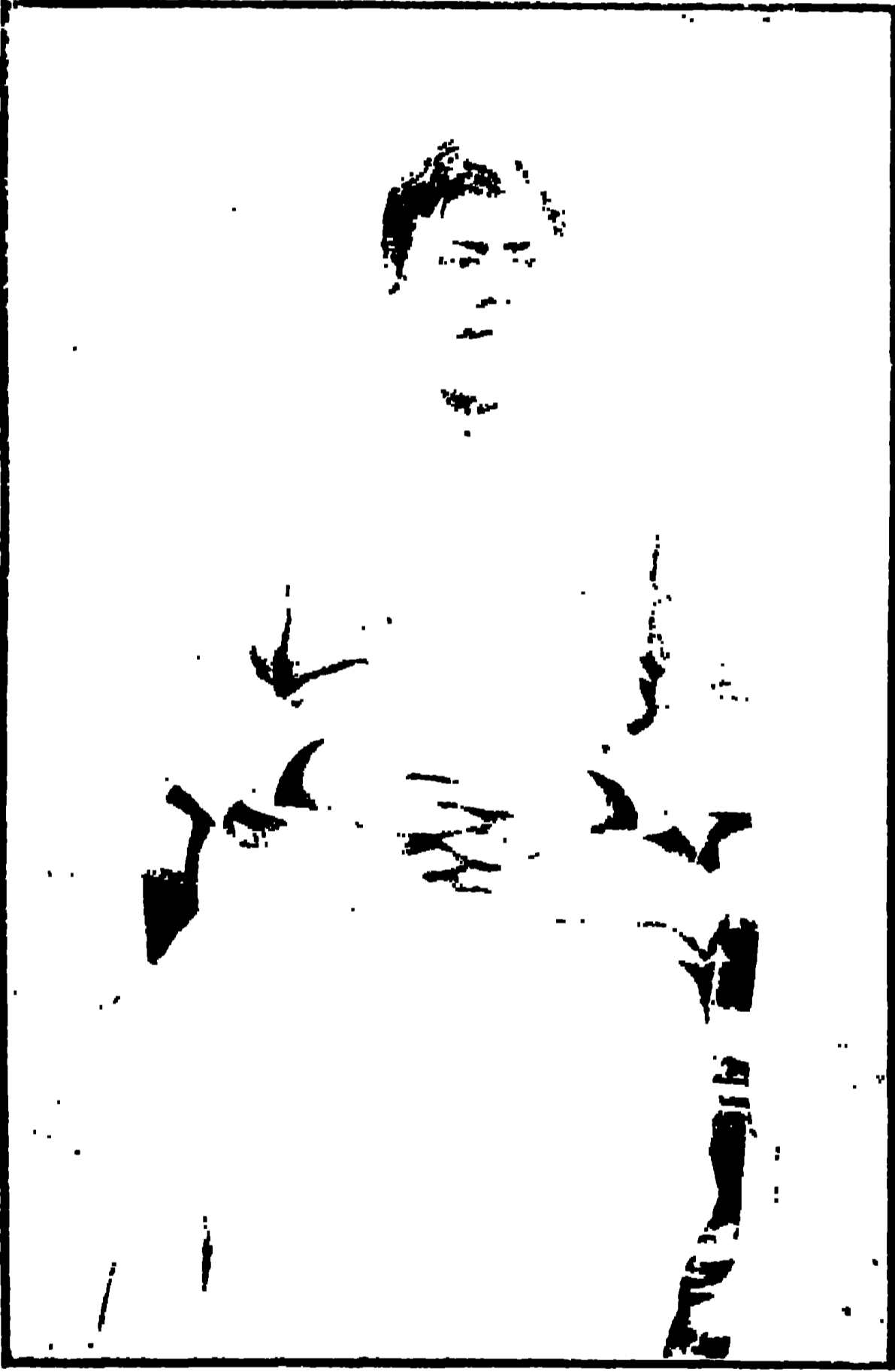
বয়স তাঁর এমন কিছু বেশী হয়নি—এই সবে তিনি
 বিয়াল্লিশ পার হ'য়ে তেতাল্লিশে পা দিয়েছিলেন । সারা
 বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর, গরমের অবকাশে পুরী

গিয়েছিলেন একটু বিশ্রাম নেবার জন্তে ; কে জানত
 ভগবান্ তাঁর জন্তে সেই সাগরতীরে চির-বিশ্রাম-স্থান
 তৈরী ক'রে রেখেছিলেন ।

সব সময়েই দেখা যায়, মানুষের যখন বেশী দরকার
 তখনই ঠিক তা'র অভাব পড়ে । ডাক্তার সরকারেরও
 আমাদের মধ্যে যখন বেশী দরকার তখনই তাঁকে অকালে

বিনাম নিতে হ'ল। তবে সেদিনের কথা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, একটা মস্তবড় পরিবর্তনের ভিতর থেকে পুরোনো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে—সে এখনও তরুণ, ভালো ক'রে দাঁড়াতে শেখেনি। যারা শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, ডাক্তার সরকার ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন।

ডাক্তার সরকার আমাদের কর্ণধার ছিলেন রসায়ন-বিভাগে। তাঁর অভাবে আজ বাঙালী-অবাঙালী সব ছাত্রই হাতাকার করছে। বাঙালী ছাত্রদের তিনি



ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার

সর্বদাই চোখে-চোখে রাখতেন। তাদের কোনো কাজই তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পেত না এবং প্রায়ই তাঁর ঘরে একজনকে না একজনকে ঢুকতে হ'ত তাঁর তলব পেয়ে স্নেহের মুহূর্তসনা শুনতে।

তাদের সাহায্য করতে তিনি ছিলেন উদার; তাদের জন্তু লড়তে তাঁকে কখনও পিছপাও হ'তে দেখিনি।

ক্লাসে তাদের যথেষ্ট ভয় দেখালেও বিপদের সময় তিনি তাদের কখনও ত্যাগ করেননি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অ্যাম্বুলেন্স কোর (ambulance corps) ছিল; প্রথম থেকে তাঁকে তা'র সভাপতি ক'রে এবং ক্রমশঃ তাঁকে সেক্রেটারী কায়ম ক'রে তাঁর যা-কিছু ভার তাঁরই খাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর্থিক ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রে সহ্য ক'রেও বিখণ্ডভাবে তিনি এ-ভার শেষ অবপি ব'য়ে গেছেন এবং তাঁর চালনায় আমাদের ক্ষুদ্র 'কোর' অনেক উন্নতির ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠেছে; শুধু তাঁর জন্তুই এমন-কি 'আমরা ছু' বছর বাইরে গিয়ে অল-ইণ্ডিয়া অ্যাম্বুলেন্স কমিশিটিশনে প্রতিযোগিতা ক'বে এসেছি।

কয়েক বছরের কথা। কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা একটা বাংলা অভিনয় করবার সংকল্প করে। তাদের এ সংকল্পে সবাই সহায়তা ও সাহায্য করা দূরে থাক, অনেক ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে। ডাক্তার সরকার শুধু আমাদের কর্ণধার হ'য়ে নিজের বাড়ীতে আমাদের মনোরাজ্য পথ্যক দিয়ে মৃশৃঙ্খলে আমাদের এসংকল্পকে কার্যো পরিণত করবার অবসর দেন। শুধু তাঁর জন্তুই আমরা পরের বছরেও অল্প অভিনয়ে কৃতকায্য হই।

ছাত্রদের সঙ্গে মিলতে, তাদের মতে মত দিতে তিনি ছিলেন একমাত্র এবং অধিতীয়। "এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী সম্মিলনী" নাম দিয়ে 'আমরা বাঙালী শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলবার একটা ক্ষেত্র গ'ড়ে তুলে-ছিলাম। ডাক্তার সরকার মশাই আমাদের বেশ একজন নিয়মিত সভ্য ছিলেন। সম্মিলনীর কোনো কাজে তাঁকে বড়-একটা অমুপস্থিত দেখিনি।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ভারি মধুর। তিনি একাধারে তাদের শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর বাড়ীর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত ছিল আমাদের জন্তু—আমাদের আদার-অত্যাচার তাঁকে সময়ে-অসময়ে সব সময়েই সহ্য করতে হয়েছে। অনেক সময়ে বেশ মনে আছে, ধমক দিতে গিয়ে তাঁকে হেসে ফেলতে দেখেছি।

বুদ্ধ ও সোক্রেটেস্

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষতা মানুষকে কহদুর্ন বিপথপামী করিতে পারে, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বুদ্ধ ও সোক্রেটেসের 'খৃষ্টান-সমালোচনা'। খৃষ্টানগণ খীণের সহিত বুদ্ধের ও সোক্রেটেসের তুলনা করিতে বাইরা এই দুই মহাপুরুষকে সীন হইতে হীনতর করিয়াছেন। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে Isstin Carpenter প্রণীত Buddhism and Christianity নামক গ্রন্থে। অল্প কোন খৃষ্টানের গ্রন্থে এই দুই মনের প্রতি প্রতিচার করা হয় নাই।

হিন্দুগণ উনার কিত্ত উদাসীন। শাস্ত্রে বাহা আছে, হিন্দু সাধকগণ, যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন, তাহাই যথেষ্ট; আদর্শ জীবন এবং সত্যের জগৎ অস্তর যাইবার আদর্শক নাই, এই বিশ্বাসের জগৎ উদার আদর্শ খালা সত্ত্বেও হিন্দুগণ কায্যতঃ অনুসার হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িকতা স্ততিক্রম করিয়া অতি উদারভাবে বুদ্ধ ও সোক্রেটেসের জীবন-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে ইহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈমাদৃশ্য দেখাইয়াছেন—এ উদাম সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহাব ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং পাঠকগণও হইবেন।

আমরা এখনে তুলনার সমালোচনা করিয়া এই দুই মহাত্মার বিশেষত্ব বুঝবার চেষ্টা করিব।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার

সোক্রেটেস্ বলিতেন, শত্রুর প্রতিও শ্রীতি-ব্যবহার করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সেটোর গ্রন্থ হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিব।

(ক)

প্রথম অংশ 'সাধারণ তত্ত্ব' (Republic) নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

এই উদ্বিগ্নাছিল 'স্তার' কি? 'সিমোনিতেস' নামক কবির ভাবার একজন উত্তর দিল বাহার বাহা প্রাণ্য, তাহাকে তাহা দেওয়াই স্তার। ইহার পরে সিদ্ধান্ত হইল মিত্রের প্রাণ্য উপকার এবং অমিত্রের প্রাণ্য অপকার। সোক্রেটেস্ আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, বাহার অপকার করা হয় তাহার সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। মানুষের বাহা বিশেষত্ব সে তাহাই হারায়। তাহাতে সেই ব্যক্তি স্তার পথে চলিত হয়। স্তারং স্তারের পরিণাম হইল স্তার। ইহা কি প্রকারে সম্ভব? স্তারং অপকার করা কখন স্তার হইতে পারে না। শত্রুই হউক, বা মিত্রই হউক, কাহারও অপকার করা স্তারসঙ্গত নহে (৩৩১-৩৩২)।

(খ)

গসিয়াস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, সোক্রেটেস্ নানা ভাবার ব্যাংবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপকার পাওয়া অপেক্ষা

অপকার করা অধিকতর অকল্যাণ। অহায ব্যবহার পাওয়া অবশ্যই অমঙ্গল এবং স্তার ব্যবহার কবাও অমঙ্গল। এই দুইয়ের মধ্যে অধিকতর অমঙ্গল স্তার ব্যবহার করা (৫০৮, বি; ৫০৯, বি, সি; ৫১৭ বি)।

গ্রন্থের শেষভাগে সোক্রেটেস্ কাইল'রসূকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই :- "আমাব এই উপদেশ গ্রহণ কর। আমাব অনুসরণ করিয়া সেই স্থলে আপমন কব, যে-স্থলে গমন করিলে ইচ্ছানুসারে এবং পরলোকে স্থনী হইতে পারিব.....। লোকে তোমাকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করুক, যদি তাহারা ইচ্ছা করে, তোমাকে মন্দমানিত করুক, অপমানসূচক আঘাতদ্বারা তোমাকে প্রহার করুক, কিন্তু নেট'সের নামে আনন্দিত হও। যদি তুমি সাধু ও সং লোক হও, ধর্মপথে চলিলে তোমার কোন বিপর উপস্থিত হইবে না" (৫১৭ সি, ডি)।

কি উচ্চ আদর্শ।

করাণ্ডের উপমা

শত্রুকে যে শ্রীতি করিতে হইবে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রকার উপদেশ তুমি করি। কেবল একটি উপদেশ উদ্ধৃত হইতেছে। একস্থলে বুদ্ধ বলিতেছেন—

"হে হিন্দুগণ। মহাপণ যদি বি মুখ ক্রকট (দুঃখপো করাত) দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তখনও যদি তোমাদিগের কাহারও মন প্রদূষিত হয়, তাহা হইলে সে আনার উপদেশ অনুসারে জীবন গঠন করিতে পারে নাই। হে হিন্দুগণ। সে অস্বাস্থ্যেও তোমাদিগের মনের এই প্রকার শিক্ষা হওয়া আবশ্যিক, 'তোমাদিগের চিত্ত নিকৃত হইবে না। কোন পাপ বা ক্রমা তোমাদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে না, আমরা হিতাশুকী হইয়া যেখনি হীন চইয়া মৈত্রীপারা চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করিব। আমরা সেই পুরুষকে (অর্থাৎ সেই হস্তাকারী দ্বারা) মৈত্রী-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা প্রাবিত করিব। এবং সেই স্থল হইতে আবস্ত করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে বিপুল মহত্ত্ব-প্রাপ্ত অপরিমিত, বৈরবিহীন, হিংসাবিহীন এবং মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্তদ্বারা প্রাবিত করিব।' হে হিন্দুগণ। এই প্রকার তোমাদের শিক্ষা হওয়া আবশ্যিক। অনুক্ষণ তোমরা এই করাণ্ডের উপমা হৃদয়ে ধারণ করিও। ইহাতে তোমাদিগের হিত ও কল্যাণ হইবে।" (মেজার্বিন নিকায়, ককচূপন-স্থল) *

করাণ্ডের উপমা কি মধুর। এ উপদেশ একমাত্র বুদ্ধই দিতে পারেন।

আর সোক্রেটেস্ যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা দার্শনিকেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

অক্রোধ ও ক্ষমা

বুদ্ধ এবং সোক্রেটেস্ উভয়েই ক্রোধ তর করিয়াছিলেন এবং উভয়েই ক্ষমাশীল ছিলেন। দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

* সোক্রেটস্ ; ঐরজনীকান্ত গুহ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড; পৃষ্ঠা ১০৮

* 'করাণ্ডের উপমা', নব্যভারত ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

আমাদিগের গ্রহকার লিপিয়াছেন—“একদিন এক বর্ষের পথে চলিতে চলিতে কি কথার সোক্রাটীসের কর্ণমূলে মৃষ্টিধারা আঘাত করিল। তিনি শুধু শাস্তভাবে বলিলেন ‘কখন শিরস্রাণ পরিতে হয়, তাহা না জানাটা আমারই জুল হইয়াছে।’” (পৃঃ ২৩৮)।

“আর একদিন এক উচ্চ ও অষ্টচরিত্র যুবক তাঁহাকে অজ্ঞতায়ে পদাঘাত করিল; ইহাতে তাঁহার সহচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া নাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সোক্রাটীস তাঁহাদিগকে বলিলেন—“সে কি? যদি একটা পাখা আমাকে লাধি মারিত তবে তোমরা কি পুনরায় তাহাকে লাধি মারিতে এবং সেই কাজটা শোভন মনে করিতে,” (পৃঃ ২৩৮)।

“একদা পত্নী স্যামিথ্রী (= স্যাক্টিসিপেপ) উত্তেজিত হইয়া স্বামীকে অসঙ্গ কটুকোটনা বলিতে লাগিলেন এবং চোচাচোচি করিয়া পাড়াগুচ্ছ অস্থির করিয়া তুলিলেন। অনেককণ কোলাহল করিয়াও যখন একটি কথাবও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে দিশাহারা হইয়া একপাশলা ময়লাজল আনিয়া স্বামীর মাথায় ঢালিয়া দিলেন। সোক্রাটীস মুহু মুহু হাসিয়া বলিলেন—‘এত পক্ষনের পন নধন হইবেই।’” (পৃঃ ২৩৯)।

এইপ্রকার দৃষ্টান্ত স্রগতে বিরল। বুদ্ধের বিষয়েও ছই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাউতেছে।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনির্নাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল। এগনে করেকখন যাতক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বধ করিতে পারে নাই। একজন অমৃতপ্ত হইয়া বুদ্ধের নিকট সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। ইহার পরে হস্তী ঘারাও তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহাতেও বুদ্ধ আশ্চর্যকার জন্ত সাবধান হইলেন না। ইহার পরে দেবদত্ত নিজেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কুত্ৰসকল হইল। একদিন বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন হইয়া গৃহকূটের পাদমূলে পাদসারণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবদত্ত পর্বতের উপগ্রি ভাগে গমন করিয়া এক প্রকাণ্ড শিলা (মহাস্তং শিলা) নিম্নদিকে গড়াইয়া দিল। শিলা কিছুদূর আসিয়াই একস্থলে আবদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইহার একপাশ ভগ্ন হইয়া উৎক্লিষ্ট হইল এবং বুদ্ধের পদে আঘাত করিল। ইহাতে সেই আহত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সেখানে দেবদত্ত। বুদ্ধ কেবল এই কথা বলিলেন, মোহাসুপুরুষ। ছুইচিঙ হইয়া বধচেষ্টার তথাগতের রক্তপাত করিলে—ইহাতে তোমার বহু অপুণ্য প্রসূত হইল। (চুল্লবগ্গ, ৭৩৯)

গৌতম ক্রোধাক হইলেন না, অধিক আর কিছু বলিলেনও না।

আর একটা ঘটনা এই :—

একজন ভারবাহী ব্রাহ্মণ গৃহস্থায়ণ ত্যাগ করিয়া গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে ভারবাহীপণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তাহাদিগের মধ্যে একজন বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া অসত্য এবং পক্ষবাক্যে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ। তোমার গৃহে কি মিত্র, অসত্য, জাতি, কুটুম্ব ও অতিধি আগমন করে?

ব্রাহ্মণ বলিল—হী, আগমন করে।

বুদ্ধ। তুমি কি তাহাদিগের জন্য হুখাহু ভক্ষ্য ও ভোজ্য বস্ত্র প্রস্তুত কর না?

ত্র। হী, করিয়া থাকি।

বু। যদি তাহারা সেই সমুদায় গ্রহণ না করে তাহা হইলে সেই সমুদায় বস্ত্র কাহার হয়?

ত্র। আমারই থাকে।

বু। তাহা হইলে এই সমুদায় অসত্য এবং পক্ষবাক্য তোমারই রহিল, আমি গ্রহণ করিলাম না।

(সংস্কৃত-নিকায়, ৭১১২)

এই বাস্তবিক বুদ্ধের; কিন্তু মনে হয় ইহা যেন সোক্রাটীসেরই।

ঐ উপলক্ষেই আর-একজন ভারবাহী ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে অসত্য ও পক্ষবাক্যে ভাষার ভৎসনা করে। বুদ্ধ কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিল, হে অসম। তুমি পরাজিত হইলে, হে অসম। তুমি পরাজিত হইলে।

তখন বুদ্ধ বলিলেন :—‘বালকই মনে করে পক্ষবাক্য প্রয়োগ করিলেই জয় লাভ হয়। যে তিতিক্ষা অবলম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারই জয়। যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, সে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হয়। আর ক্রুদ্ধের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করে না, সে বিপুল জয় লাভ করে। যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ অবগত হইয়া উপশান্ত হয় সে নিজেই এবং অপরের উত্তরেরই কল্যাণ সাধন করে, সে নিজের ও পরের—উত্তরেরই চিকিৎসক। ধর্ম্মান্ধিত্য ব্যক্তিই তাহাকে মূর্খ বলিয়া মনে করে।’

(সংস্কৃত-নিকায়, ৭১১৩)

লিপিত আছে বুদ্ধের বাহ্যহারে মুক হইয়া উভয় ভারবাহী ব্রাহ্মণ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

মিষ্ট ভাষণ

মিষ্ট ভাষণে সোক্রাটীস স্রগতে অধিত্য। ‘তিনি ভাষাতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন’ (পৃঃ ২৪৬)। এমন-কি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেও সাধারণতঃ কুণ্ঠিত হইতেন।

গৌতমও মিষ্টভাষী ছিলেন। প্রতিপক্ষগণের সহিত আলোচনাতে সর্বদাই ভ্রমব্যবহার করিতেন, কখনই তাঁহার হৈর্ঘ্যচুতি হইত না। সংকারণের জন্য শিষ্যগণকে মুস্তকর্থে প্রণয়সা করিতেন; কিন্তু অস্তায় কার্য দেখিলে তিরস্কারও করিতেন। ইহাতে শিষ্যগণ অনেক সময়ে প্রাণে ক্রেশণ পাইত। কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবার সময়ও তিনি স্থির ও গভীর থাকিতেন।

সোক্রাটীসের প্রাণ ছিল মিষ্ট-রসে জরা; এই রসের স্রোত নিতাই উৎসারিত হইত। বুদ্ধ ছিলেন সমুদায় রস-ভরঙ্গের অতীত; নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তিনি সকলের সহিত বাক্যালাপাদি করিতেন।

এবিষয়ে সোক্রাটীসই অধিকাংশ লোকের আদর্শ।

ধ্যানশীলতা

বুদ্ধদেব ও সোক্রাটীস উভয়েই ধ্যানশীল ছিলেন। ধ্যানমগ্ন হইলে কাহারও বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। বিষয় বড়বৃষ্টি, বজ্রপাত, বজ্রাঘাতে মানব ও পশুর মৃত্যু, ভয়ঙ্কর বহু জমতা ও কোলাহল—এসমুদায় ঘটনাতেও একসময়ে বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই (মহাপরিঃ ৪৩০-৩২)। তিনি কখন কখন ৭ দিন পর্যন্ত সমাধি-মগ্ন হইয়া থাকিতেন (উদান, ১, ২ অধ্যায়); (প্রবাসী, ভাঃ ১৩৩১)। ‘হুগসিঅন্’ গ্রন্থে (১৭৪-১৭৫, ২২০) সোক্রাটীসের ধ্যানশীলতা বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তিনি এক সময়ে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া একস্থলে নিম্পন্দ ভাবে একদিন ও একরাতি দণ্ডায়মান ছিলেন (সোক্রাঃ, পৃঃ ২৫২-২৫৩)। সোক্রাটীসকে সাধনা করিয়া এই অবস্থা আনিতে হইত না; কিন্তু

বুদ্ধের ধ্যান কতটুকু স্বাভাবিক আর কতটুকু সাধনের ফল, তাহা বলা মুশকিল।

এখন বৈসাদৃশ্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সুন্দর ও গভীর

সুন্দর পুষ্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের প্রাণে একপ্রকার ভাবের সঞ্চার হয়, আর নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অস্ত্রপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহাদিগের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদের হৃদয়ে ঐপ্রকার বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। সোক্রাটেশের জীবন সুন্দর; আর বুদ্ধের জীবন 'উদার' (মৌলিক অর্থে) গভীর ও বিশাল।

পিতা ও সপা

ভিক্ষুগণ মনে করিতেন তাঁহার। বুদ্ধের পুত্র (বুদ্ধসসপুত্র, সুগমসসপুত্র ইত্যাদি? সংস্কৃতনিকায়, ১ম পত্র, পৃ: ১১২, P. T. S.; খেরগাথা, শ্লোক ১৭৪, ২১৫, ৩৪৮, ৫৩৬ ইত্যাদি); এবং ভিক্ষুগণ মনে করিতেন তাঁহার। বুদ্ধের হুহিতা ('হীতা', খেরী, ৪৬, ৩৩৬ ইত্যাদি)। কি মধুর সন্ধ্যা। সোক্রাটেশের সহিতও তাঁহার সহচর-গণের সন্ধ্যা ছিল অতি মধুর—তাঁহার। তাঁহাকে সপা বলিয়া মনে করিতেন (সোঃ, পৃ: ৩১৮)।

সজ্ঞনতা ও নির্জ্ঞনতা

গোতম যখন সংসারাত্মমে ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখনও তাঁহার প্রাণ নির্জ্ঞনতার জন্ত ব্যস্ত হইত। সুযোগ পাইলেই তিনি নির্জ্ঞনে ধ্যাননিমগ্ন হইতেন (মজ্জিম, মহাসচ্চক)।

সংসারাত্মম ত্যাগ করিবার পর নির্জ্ঞনবাসই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছিল। সর্কী সম্প্রদায়ের ভিক্ষুই যে নির্জ্ঞনবাস করিতেন তাহা নহে। এবিষয়ে এই ঘটনাটি পাওয়া যায়। এক সময়ে ৩০০ শিবাসক পোটিঠপাদ নামক পরিভ্রাজক মল্লিকা রাণীর আরাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সকলে 'উচ্চনায়ে, উচ্চশব্দে, মহাশব্দে' নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। সেই সময়ে গোতমের ইচ্ছা হইল যে, তিনি ভিক্ষুগণ তাহাদের সঙ্গ লাভ করেন। ছুর হইতেই পোটিঠপাদ দেখিলেন ওগবান্ সেইদিকে আগমন করিতেছেন। তখন তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—“হে ভদ্রশ্রমণ! আপনারা নিশ্চয় হউন, শব্দ করিবেন না, শ্রমণ গোতম এইদিকে আগমন করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়তা—ভালবাসেন, নিশ্চয়তার প্রশংসা করেন। সকলে নিশ্চয় রহিয়াছে দেখিলে, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন”। তখন ভিক্ষুগণ তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন (দীঘ, পোটিঠপাদ সুত্ত, ১-৪)।

উল্লেখ্যরিকা সীহনাদ হস্তেও অমুরূপ একটি ঘটনা আছে (দীঘ, ৫.৩)।

অপর একস্থলে এইপ্রকার বর্ণিত আছে:—এক সময়ে গোতম শীবক নামক রাজচিকিৎসকের আশ্রবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শীবকের পরামর্শানুসারে রাজা অজাতশত্রু গোতমকে দেখিবার জন্ত সেই আশ্রবনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্রবনের রকটবর্জী হইবামাত্রই তিনি ভয়ে অতিভূত হইলেন, তাঁহার প্রাণ স্তম্ভিত হইল, তাঁহার লোম-হর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি শীবককে জিলেন—শীবক, তুমি ত আমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছ না? তুমি ত আমাকে শত্রুর হস্তে অর্পণ করিতেছ না? এ কি করিয়া সত্য বটে,

এস্থলে ভিক্ষুগণের এক মহাসম্ম। ১২৫০ জন ভিক্ষু এস্থলে বর্তমান, আর একজনেরও হাঁচির শব্দ নাই কাশির শব্দ নাই, কোন প্রকার শব্দই নাই? (দীঘনিকায় ২.৮-১০)।

গোতম যে কেবল একাকি স্বাবস্থায় নির্জ্ঞনতা লাভ করিতেন তাহা নহে, যখন ভিক্ষুসম্ম সহ বাস করিতেন, তখনও নির্জ্ঞনতা রক্ষা করিতেন।

কখন কখন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশেও গমন করিতেন (মজ্জিম, ২৫)।

তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত এই:—

অশুরক, নন্দীর এবং কিম্বিল এই তিনজন ভিক্ষু এক সময়ে গৌমিন্দ্র শালবনে বাস করিতেন। ইঁহারা মৈত্রী-পরিপূর্ণ হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভাবে এবং পরোকভাবে পরস্পরের সেবা করিতেন। সমুদায় কাষা সম্পাদিত হইত নিঃশব্দে। প্রতি পঞ্চম দিনে ইঁহারা সমবেত হইয়া ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। অল্প সময়ে একত্র বাস করিয়াও বাক্যালাপ করিতেন না। তিন জন একত্র থাকিয়াও প্রত্যেকে একাকী থাকিতেন। (মজ্জিম, ৩১)।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ এতট নির্জ্ঞনতা প্রিয় ছিলেন। সোক্রাটেশের প্রকৃতি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। পথে, ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারে যেখানে লোকের সমাগম হইত, সেইখানেই তিনি গুরিমা বেড়াইতেন এবং সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত আলোচনা করিতেন। তিনি নগরের বাহিরে বাইতেন না বলিলেই চলে। প্হাইড্রুস নামক গ্রন্থে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি পাওয়া যায়।

একদিন প্হাইড্রুসের সঙ্গে সোক্রাটেশের দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্হাইড্রুস লুসিআসের বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছে। তখন সোক্রাটেশ সেই বক্তৃতার সমুদায় বিষয় শুনিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি পরিয়া ফেলিলেন যে, লেখা বক্তৃতা তাঁহার কাপড়ের নীচে লুকান রহিয়াছে। প্হাইড্রুস নগর-প্রাচীরের বাহিরে সাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ বক্তৃতা শুনিতেনই হইবে। সুতরাং সোক্রাটেশ তাঁহার সঙ্গ ধরিলেন। স্থির হইল নগরের বাহিরে ঐ বক্তৃতা শ্রবণ হইবে। ঐকাল, বেলা দুই প্রহর, নিকটে ছিল এক ক্ষুদ্র শ্রোতশ্রী। উভয়েই ইহার ভীয়ে উপবেশন করিলেন। শ্রুত পাদপের বিস্তীর্ণ শাখা, কুম্বের মনোমোহন সৌরভ, সুন্দর-নির্দািত গগনমণ্ডল, সুমধুর সমীরণ, শ্রোতশ্রীর সুশীতল সলিল, তুণাচ্ছাদিত স্তামল ক্ষেত্র—সমুদায়ই সোক্রাটেশের মন প্রাণ মুগ্ধ করিয়া দিল। আনন্দভরে সোক্রাটেশ বলিল—প্রিয় প্হাইড্রুস, কি আশ্চর্য পদ্যপ্রদর্শক তুমি! কি সুন্দর স্থানে আমাকে লইয়া আসিলে! প্হাইড্রুস বলিল—‘হে রহস্যময় বন্ধু! তুমি এক তত্ত্বত লোক। তুমি যেন এদেশবাসী নহ, যেন বিদেশ হইতে আসিয়াছ এখানে কিছু দেখিবার জন্ত। তুমি যে কখনও নগর-প্রাচীরের দ্বার পার হইয়া বাহিরে আসিয়াছ ইহা ত মনে হইতেছে না।’ সোক্রাটেশ বলিলেন, “ঠিক বলিয়াছ, পরম সখা! আমি নগরে থাকি কেন জান? আমি জ্ঞান ভালবাসি। এট মাঠ, এই গাছ, আমাকে কিছু শিখাইতে পারে না। নগরের যে লোক তাহারাই আমাকে শিক্ষা দেয়। তুমি কিন্তু আমাকে সহরের বাহিরে আনিবার মত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ” (প্হাইড্রুস, ২৩১)।

প্হাইড্রুসের নিকটে একখানা হস্তলিপি ছিল, ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল—প্রমত্তত্ব। এই বিষয়ে জানিবার জন্তই সোক্রাটেশ প্হাইড্রুসের সঙ্গে সহরের বাহিরে আসিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখা বাইতেছে যে, সোক্রাটেশ ও বুদ্ধ এতদূরের প্রকৃতি ছিল বিপরীত। সোক্রাটেশ ভালবাসিতেন জনসমাজ, গোতম ভাল-

বাসিতেন নির্জনতা। একজন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়া সত্য লাভ করিতেন এবং তাহা জনসমাজেই প্রচার করিতেন। আব- একজন থাকিতেন নির্জনে, সত্য লাভ করিতেন নির্জনে; এবং তিনিও সেই সত্য প্রচার করিতেন জনসমাজে।

স্বাস্থ্য বিহারাদি

স্বাস্থ্য বিহারাদি বিষয়ে উভয়েই অত্যন্ত সংযত ছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

গোতম মদ্য পান করিতেন না। কিন্তু সোক্রেটস্ মদ্য গ্রহণও করিতেন আবার বর্জনও করিতে পারিতেন (হুম্ প সি অন্. ১৭৩, সি)। আকিনিয়াডেস্ এ বিষয়ে এই প্রকার বলিয়াছেন :-

“ভোক্তার সময় একমাত্র তিনি (—সোক্রেটস্) ইহা সন্ধান করিতে পারিতেন। যদিও তিনি মদ্যপান করিতে ইচ্ছুক হইতেন না, কিন্তু বাধ্য হইয়া পান করিতে হইলে, তিনি সকলকেই ইহাতে পরাস্ত করিতেন। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, কেহই সোক্রেটস্কে কখন মাতাল হইতে দেখে নাই” (হুম্ প সি অন্. ২২০. এ; গ্রন্থকার প্রথম বাতীতি অনুবাদ করেন নাই, পৃ: ২৩১)।

ঐ গ্রন্থই লিপিত আছে যে, এক রাত্রিতে আগাখোনের গৃহে এক ভোক্তা অনেক বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। কেহ কেহ মদ্যপানে বিস্তার হইয়া সেইস্থলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকিনিয়াডেস্ প্রত্যুদ্যে আগ্রহ হইয়া দেখিলেন যে, সোক্রেটস্ এবং আবও দুইজন সেই স্থলেই থইয়াছেন। তাঁহারা ‘প্রকাশ পান-পাত্র’ হইতে মদ্যপান করিতে ছিলেন এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আলোচনাও চলিতেছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন সোক্রেটস্। অবশেষে অপর দুইজনও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, কেবল সোক্রেটস্ই জাগ্রত রহিলেন। সমস্ত রাত্রি এইরূপে মদ্যপানে ও আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল (২২৩)।

সোক্রেটস্ কখনই মাতাল হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকেই মাতাল ছিলেন।

বুদ্ধের প্রকৃতি অস্বাভাবিক ছিল। তিনি নিজে মদ্যপান করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণও মদ্যপান করিতেন না এবং কেহই আমোদ-প্রমোদ-পূর্ণ ভোক্তা যোগ দিতেন না। বুদ্ধ ছিলেন নিত্য গম্ভীর; তিনি কখনও হাসিতেন কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে। সোক্রেটস্ গম্ভীরও ছিলেন; আবার আমোদ-আহ্লাদের তরঙ্গে ভাসিতেও পারিতেন।

দেব-বাদ

উভয়েই দেবগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু গোতম দেবো-পাসনা করিতেন না, আর সোক্রেটস্ করিতেন। গোতমের মতে মহাত্মকও প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনিও অশাস্তকে শাস্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সোক্রেটসের মতে দেব-গণ প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করেন (প্লাইড্রস্, ২৪৭)। তবুও বাক্ত দেবতুল্য (সপ্তিস্টিস্, ২১৬); এবং মৃত্যুর পর দে-তুল্য হইয়া দেবগণের মধ্যে বাস করেন—(প্লাইড্রস্, ৮২, সি; ট্রেইয়াটেটস্, ১৭৬)। বুদ্ধ বলেন—দেবতা হইব বা দেবতা হইয়া দেবগণের সহিত বাস করিব এইরূপ ব্রহ্মচর্যা উদ্দেশ্য করা চিন্তের একটি ‘বিনিবন্ধ’ (বন্ধন)। (মজ্জিম ১। ১০২-১০৩; অঙ্গুত ৩২৪২; ৪৪৩১; ৫১১৮ ইত্যাদি)। বুদ্ধের মতে বুদ্ধের বে-দ্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ দেবগণেরও দৃষ্টির অতীত (উদান, ২।১০, মজ্জিম, ২২ ইত্যাদি)।

গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন,—“মানুষ ঈশ্বরের দাস এ ভাবটিও

খ্রীস্টে গৃহীত হয় নাই” (১ম ভাগ, পৃ: ৩৩৭)। কিন্তু সোক্রেটস্ ঈশ্বর বলিয়াছেন, মানব দেবগণের সম্পত্তি (প্লাইড্রস্, ৬২, বি)। সম্পত্তির গ্রীক কথা Kte mata; গো-মেব, দাস প্রকৃতি সম্পত্তিকে Kte mata বলা হয়। গ্রন্থকার নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের উপক্রমণিকাতে তিনি এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—“আত্মহত্যা না করিবার একটা কারণ এই—আমরা দেবগণের দাস। তোমার দান আত্মহত্যা করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেবগণও তেমনি আমরা আত্মহত্যা করিলে ভয়তঃ বিরক্ত হইবেন”। (পৃ: ৫৫২)

মানুষ দুর্বল, দাস-শাব তাহার অস্থিমজ্জাগত। ঈশ্বর বা দেবগণ মানবের প্রভু। মানব ইহাদিগের দাস, জগতের প্রায় সমস্তর ধর্মেরই এই আদর্শ। এভাবে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিমাছে কেবল দুইটি ধর্ম—ভারতের অদ্বৈতবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম। অন্ত আদর্শও এই দা-দ্ব বাদ অতিক্রম করা যায়। যে-স্থলে মানুষ মনে করিতে পারে, ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং সখা, সে-স্থলে ঐতি থাকে, সেবা থাকে, কিন্তু দাসতাব থাকে না। দাস-ভাবে প্রেমের স্থান নাই, দাসের বে-প্রেম, সে-প্রেম প্রেম নহে, সে-প্রেম প্রেমের বাক্স।

এস্থলে বলা আবশ্যিক কোন কোন স্থলে সোক্রেটস্ সাধু মানবকে theophilous অর্থাৎ দেব প্রিয় (দেবগণের প্রিয়) বলিয়াছেন। (Phil. 39E, 40B; Rep. 612E, 613A; Symp. 212A, Gorgias 507E অংশও উল্লেখ্য)। ইংরেজীতে এই শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে Friend of God (Jowett), God-beloved (Burgos, Davis) ইত্যাদি।

এই সমুদয় স্থলে বলা হইয়াছে যে, সাধু-মানব দেবগণের বন্ধু, বা দেবগণের প্রিয়। ‘লুসিস্’ নামক গ্রন্থে ‘প্রিয়’ এবং ‘বন্ধু’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২১২-২১৪)। এস্থলের সিদ্ধান্ত এই—যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই প্রিয় বা সেই বন্ধু। সুতরাং যদি বলা হয় ‘সাধু মানব দেবগণের বন্ধু’, ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দেবগণ সাধু মানুষকে ভালবাসেন; সাধু-মানুষ দেবগণকে প্রীতি করেন, সাক্ষাৎ-ভাবে ইহা বুঝা যায় না।

জীবন ও মৃত্যু

লোকের বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষেই দেহকে অগ্রাহ করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের বহু স্থলে বলা হইয়াছে, দেহ একটি বন্ধন। কিন্তু খ্রীস্ট দেশের সোক্রেটস্ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। বহুস্থলে বলা হইয়াছে যে, দেহ (soma, সোমা) আত্মার সমাধি (sema, ‘কবর’)। (গার্গিয়াস্ ৪২৩, ই)। প্লাইড্রস্ গ্রন্থেও (২৫০, সি) এই “সোমা-সেমা” বাদ গৃহীত হইয়াছে। এই দেহ জীবন্ত সমাধি (‘কবর’)। শব্দক যেমন দেহ-কোষে আবদ্ধ থাকে, আমরাও তেমনি এই দেহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি এবং শব্দকের স্থায় দেহ বহন করিয়া বিচরণ করিতেছি। যখন দেহ হইতে মুক্ত হইব (a-sema-nloi), তখন প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিব। এস্থলে ‘আসেমানটাই’ শব্দ ঐ অর্থের (১) একটি অর্থ অর্চিহিত, হি হইতে মুক্ত; (২) দ্বিতীয় অর্থ ‘কবর’ হইতে মুক্ত। উক্ত শব্দের ‘সেমা’ অংশ স্বেচ্ছাপূর্ণ।

‘ক্রাইলস্’ গ্রন্থে সোক্রেটস্ ‘সোমা’ শব্দের দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন; একটি ব্যাখ্যা এই—

‘আত্মা ইহা জীবনে দেহরূপ ‘সেমা’তে (অর্থাৎ কবরে) প্রোথিত, এইরূপ দেহের নাম ‘সোমা’ (৪০০, বি, সি)।

‘প্লাইড্রস্’ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, দেহ সমুদয় অনর্থের মূল, ইহা-জীবনে দেহকে বতই অতিক্রম করা যায়, ততই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব লাভ করা

সহজ হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ যুত্মতে ভীত হওয়া চূরে থাকুক, আশঙ্কিতই হইয়া থাকেন; কারণ দেহমুক্ত না হইলে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা সহজ হয় না, যুত্মের পরে দিব্যালোকে দিবা তপ্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে (৬৪-৬৮ ; সোঃ ৫৫৬-৫৬৫)।

যুত্মরূপে দেখা যাইতেছে, দেহ-বিষয়ে বুদ্ধ ও সোক্রাটেশের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা আবশ্যিক। সোক্রাটেশ বলেন, দার্শনিক পণ্ডিতগণ যুত্মা বাসনা করেন (প্লাইডোন্ ৬৪-৬৮)। কিন্তু বুদ্ধের মতে বিত্তব তপ্তা অর্থাৎ যুত্মাকামনাও বর্জনীয়।

নরক

উভয়েই নরককে বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধের ধর্মে অনন্ত নরকের স্থান নাই; কিন্তু সোক্রাটেশ অনন্ত নরক মানিতেন।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, সমস্ত ভাঙ্গিবার চেষ্টা সচেষ্টে হইয়াছিল। এমন যে দেবদত্ত তাহার চেষ্টাও অনন্ত নরক নহে। লিখিত আছে যে, অষ্ট অপবাধের জন্য তাহাকে এক কল্পপরিমিত সময় নরকভোগ করিতে হইবে (বিনয়-পিটক, চুল্লবঙ্গ, ৭।৪।৭)।

প্লেটোর সোক্রাটেশ বিশ্বাস করিতেন যে, সংশোধন করিবার জন্য শাস্তি ও নরক-যন্ত্রণা। "কিন্তু যাচাঙ্গিগের পাপ এত গুরুতর যে, তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহারা বহুবার দেবদেবপূজা-রূপে ভ্রমপূর্ণ পাপাচরণ করিয়াছে বা অজ্ঞান ও অবৈধ উপায়ে বহু নরকভোগ করিয়াছে কিংবা এইপ্রকার অজ্ঞান চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সোপার্কিট ভাঙ্গাবশে টাটারসে নিক্ষিপ্ত হয়, তথা হইতে তাহারা কখনও উঠিতে পারে না।" (গ্রন্থকারের অনুবাদ, পৃঃ ৬৭৩ ; প্লাইডোন্, ১১৩, ই)।

এই অংশকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—“সত্য বটে তিনি কাইডোনে মহাপাপীর জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু উহা উপাখ্যানের অন্তর্গত রূপক বর্ণনা; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না” (পৃঃ ৫৩৭)। গ্রন্থের প্রথম ভাগেও তিনি ঐ অংশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “প্লেটো কিন্তু বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না।” (পৃঃ ৩১৩) কিন্তু গ্রন্থকারের এই স্তম্ভ কথা কল্পনা-মাত্র; প্লেটো অর্থাৎ প্লেটোর সোক্রাটেশ এক জেলীর লোকের জন্য অনন্ত নরকেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ‘পার্গিঅাস্’ নামক গ্রন্থে (৫২৫, ই) টিক অনন্ত নরকের কথাই আছে। ‘সাধারণ তন্ত্র’ নামক গ্রন্থও (৬১৫, সি, ডি) লিখিত আছে যে, ‘আর্ডিআইঅস্’ নামক একজন চরিত্র রাজা কখনও নরকের বাহরে আসিবে না।

তিন পুস্তকে একই কথা; যুত্মরূপে অনন্ত নরক নিত্য রূপক নহে।

বার্ণেট্, এবিষয়ে বলেন—“The Neoplatonists are very anxious to get rid of the doctrine of eternal punishment, but it is stated quite explicitly.” (Notes, Phaedo, 113 E.)

অর্থাৎ “নব-প্লেটো-মতাবলম্বীগণ অনন্ত নরকবাদ চূর করিবার জন্য অত্যন্ত বাস্তব; কিন্তু এই মত অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে”।

গ্রন্থকারের সহিত আরও দুই-একটি বিষয়ে আশাঙ্গিগের মতভেদ আছে।

জ্ঞান ও মুক্তি

সোক্রাটেশের সহিত বুদ্ধদেবের সাদৃশ্য দেখাইতে বাইরা গ্রন্থকার বলিয়াছেন :-

“বৌদ্ধমতে জ্ঞানলাভই মুক্তি,” পৃঃ ৩০৪।

গ্রন্থকারের এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধ অবশ্যই প্রচার করিতেন, উাহার ধর্ম জ্ঞানসম্বন্ধ। তিনি নিজে মুক্তিচর্ক প্রয়োগ করিয়া লোককে সত্যামতা বুঝাইতেন। তিনি এই উপদেশ দিতেন—বিচার করিয়া নিজে সত্যামতা নির্ণয় কর। কেহ আবিচারিতভাবে উাহার ধর্ম নরক, ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। উাহার ধর্ম জ্ঞানদ্বারা নিরামিত। তিনি বলিতেন, যেমন ধর্ম-জ্ঞান আনন্দক, তেমনি সেই অনুসারে কার্য করাও আবশ্যিক—‘তৎকর’ অর্থাৎ ‘তৎ কর’ হইতে হইবে (ধর্মপত্র, ১২ ; দীর্ঘ ১।২৩৫)। তৎ=তাহা; ‘তৎ কর’—যে ব্যক্তি সেইপ্রকার কর করে। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানলাভ যথেষ্ট নহে; মুক্তিলাভ সাধনসাধন। উাহার সাধন-প্রণালীর মূলে ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম এবং সখ্যম। গ্রন্থকার যে বৌদ্ধধর্মের ‘সমস্ত সাধন’ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পৃঃ ২৭৬-২৮২), তাহাতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। আবার, বুদ্ধের ব্রহ্মবিচার সম্পূর্ণ প্রেমের ব্যাপার। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান প্রেম-ধর্ম সমন্বয়ীভূত হইয়াছে।

এখানে সংযুক্তনিকার হইতে এক অংশ উদ্ধৃত হইতেছে (দ্বিতীয় পত্র, পৃঃ ১১৭-১১৮, P. T. S. সং)।

এক সময়ে হিন্দু সনিক্ট নামক একজন হিন্দুকে নির্কীর্ণ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদের উত্তর শুনিয়া সনিক্ট বলিলেন—“তাহা হইলে আয়ুঅন্ নামক সীমাত্মক অর্হৎ হইয়াছেন”। নারদ বলিলেন—“হে আয়ুঅন্! আমি সমাক্ প্রজ্ঞা দ্বারা (সন্ন-পঞ্জ-ক্রায়) যথাভূত (যথাভূতম্) সমাক্ দর্শন (শুদিট্টম্) করিয়াছি যে ‘তৎ-নিরোধই নির্কীর্ণ’, কিন্তু আমি সীমাত্মক অর্হৎ হই নাই”।

তাহার পরে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উাহার অর্থ স্পষ্টতর করিলেন। তিনি বলিলেন—“হে আয়ুঅন্! যেন কাম্বার মার্গে একটি কুপ রহিয়াছে; কিন্তু সে-স্থলে রক্ষণ নাই, উদকপাতও নাই। একজন পূর্ব যন্ত্রাভিহীন, যন্ত্রাঙ্ক, ক্রিষ্ট, স্তম্ভকণ্ঠ, ও পিপাসিত হইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। সে কুপ ধাঁড়ো—তাহার জ্ঞান (জ্ঞানম্) হইবে যে ঐ উদক; কিন্তু যে ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। তেমনি হে আয়ুঅন্, আমিও সমাক্ প্রজ্ঞা দ্বারা (সন্ন-পঞ্জ-ক্রায়) যথাভূত নির্কীর্ণকে সমাক্ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু সীমাত্মক অর্হৎ হই নাই”।

দেখা যাইতেছে সমাক্ প্রজ্ঞা ও (সন্নপঞ্জ-ক্রা) যথেষ্ট নহে।

প্রকৃত কথা এই, বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞান, প্রেম ও উচ্ছাশক্তি এই তিনেরই সমন্বয়ন হইয়াছে। কিন্তু সোক্রাটেশের আদর্শ ‘জ্ঞানই ধর্ম’। এইভাবে সোক্রাটেশ ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক মতভেদ।

ত্রিবিধ তৃকা

বুদ্ধদেব ত্রিবিধ তৃকা (তপ্তা) পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ত্রিবিধ তৃকা এই :-

- (১) কাম—তপ্তা অর্থাৎ অশুভ্রোণের প্রতি তৃকা।
- (২) ভবতপ্তা—জীবনের প্রতি তৃকা; বাচিয়া থাকিব, অস্তিত্ব-বান্ হইয়া রহিব এইপ্রকার বাসনার নাম ‘ভব-তৃকা’।
- (৩) বিত্তব-তপ্তা—বিনয়ের প্রতি তৃকা; বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অস্তিত্ব-বান্ রহিব না, এইপ্রকার বাসনার নাম বিত্তব-তৃকা।

গ্রন্থকার বিত্তব-তৃকার অর্থ করিয়াছেন—“বৈত্তব অর্থাৎ সাংসারিক জীবুদ্ধির বাসনা,” পৃঃ ২৬৯। তিনি যেভাবে বিত্তব-তৃকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে বিত্তব-তৃকা কাম-তৃকাই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ইহাতে তৃকা তিনটি না হইয়া কেবল দুইটি হয়।

'ভব' এবং 'বিস্তব' একত্র ব্যবহৃত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এ দুইটি বিপরীত অর্থবোধক। ভব—জীবন, অস্তিত্ব; বিস্তব—মৃত্যু, বিনাশ, অনস্তিত্ব। বহু স্থলে 'বিস্তব' শব্দ 'বিনাশ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দীর্ঘনিকায়, ব্রহ্মসালসূত্র, ১।৩।২-১৬; মজ্জিমনিয়াকায়, অলঙ্গ দ্বন্দ্বপদ-সূত্র, পৃ: ১১৪০, P. T. S.)

'নির্দেশ' নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 'ভব-তপ্হা' শব্দত দৃষ্টিমূলক এবং 'বিস্তব-তপ্হা' উচ্ছিন্ন দৃষ্টিমূলক (মহানির্দেশ, পৃ: ২৪৫, ২৮২ ইত্যাদি)

'বিস্তব' নামক গ্রন্থে লিপিত আছে, "উচ্ছিন্নদৃষ্টি সহগতো রাগো সারা গো, অমুনরো, অমুনরো, নন্দী, নন্দীরাগো, চিত্তসম সারাগ, অন্নম্ বুদ্ধতি বিস্তব-তপ্হা (পৃ: ৩৬৫) অর্থাৎ উচ্ছিন্নদৃষ্টির বে-রাগ, সংরাগ, অমুনর, অমুবোধ, নন্দী, নন্দীরাগ, চিত্তের সংরাগ ইহারই নাম 'বিস্তব-তপ্হা'। রাগ-সংরাগাদি ৬টি শব্দ সমপর্যায়, ইহাদিগের অর্থ আসক্তি।

বুদ্ধঘোষণা বলেন, শাখত-বাসমূলক বে-আসক্তি, তাহাই ভব-তপ্হা (সমসত্ত-দিট্ঠি সহগতো হি রাগো ভব-তপ্হাতি বুদ্ধতি) এবং উচ্ছিন্ন-বাদ-মূলক বে-আসক্তি তাহাই বিস্তব-তপ্হা (উচ্ছিন্ন দিট্ঠি সহগতোহি রাগো বিস্তব তপ্হা তি বুদ্ধতি)। বিম্বুদ্ধি মগ্ধ ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৮ (P. T. S.)।

Rhys Davids

বিনয়পিটকের অনুবাদে বিস্তব-তপ্হার অনুবাদ করিয়াছিলেন, "Thirst for prosperity" (Vinaya-Pitaka, vol. i., p. 95, S. B. E.)

গ্রন্থকার এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিনয়পিটক অনুদিত হইয়াছিল ১৮৮১ সালে; ১৯২১ সালে Rhys Davids দীর্ঘনিকায়ের শেষ খণ্ড অনুবাদ করেন। ইহাতে 'বিস্তব-তপ্হার' অর্থ করা হইয়াছে, "Craving to end life" অর্থাৎ জীবননাশের বাসনা। ঐ স্থলেই পাঠটীকাতে ভব-তপ্হা ও বিস্তব-তপ্হা বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন, "Lit. becoming-craving and contra-becoming craving" (Dialogues of the Buddha, part 3, p. 253)

গ্রন্থকার ইহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

P. T. Society এর নতুন পালি-অভিধানে বিস্তব-তপ্হার অর্থ "Craving for life to end," desire for non-existence অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন হইবার বাসনা। Childers এর অভিধানেরও এই অর্থ।

আর-একটি স্থল

আর-এক স্থলে গ্রন্থকার এইপ্রকার অনুবাদ করিয়াছেন :-

"হে বাসেট্ঠ, যেমন বলবান্ শম্বধর অজ্ঞান-সেই চতুর্দিকে শম্বধরনি প্রতিগোচর করে, তেমনি বাসেট্ঠ (ক), বাহা কিছুই প্রাণ ও আকার আছে, তাহার কিছুই তিনি প্রাণ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না (খ). কিন্তু তিনি সমস্তই প্রাণচক্রপে অনুভূত মৈত্রী ও বিমুক্ত চিত্ত দ্বারা অ-প্রদান করেন। ভেবিজ্জসূত্র, ৭৭। (পৃ: ১৮৪)।

অনুবাদের (খ) অংশ মূল্যের অনুপক নহে। গ্রন্থকার এখানেও Rhys Davids এর অনুসরণ করিয়াছেন; তাহার অনুবাদ এই :-

Even so of all things that have shape or life, there is not one that he passes by or leaves aside, মূল এই :-

'বা পমাণ কত্তং কন্নং, ন তং তত্র অবসিসসত্তি, ন তং তত্র অব-তিট্ঠতি"।

ইহার কথার কথার সংস্কৃত এই—

"বাং প্রমাণ-কৃতং কর্ম, ন তং তত্র অবশিষ্যতে, ন তং তত্র অবতিট্ঠতে"।

(১) পমাণ-কত্তং = প্রমাণ-কৃতম্ = পরি-মাণ-কৃত = পরিমিত

(২) "কর্ম" তিনপ্রকার হইতে পারে, কারককর্ম, বচী-কর্ম, মনো-কর্ম; অর্থাৎ দৈহিক কর্ম, বাচ্য রূপ কর্ম এবং মানসিক চিন্তা ভাবাদি রূপ কর্ম (ধর্ম-সঙ্গনী পৃ: ১৮০, ১৮৩, পুণ্যগল পৃ: ৪১, অমুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২, ১০৪, ১১০, ১৫৪ ইত্যাদি বহু স্থলে)।

বুদ্ধ ঘোষের টীকা* এই :-

"পমাণ কত্তং কন্নং নাম কামাবচরং বুদ্ধতি" অর্থাৎ "পমাণ কত্তং কন্নং" অংশের অর্থ কামা-বিষয় অথবা কামলোকে উৎপন্ন চিত্তরূপ কর্ম।

(৩) তত্র = সেই স্থলে মৈত্রী-বিমুক্ত চিত্তে।

(৪) অবসিসসত্তি = অবশিষ্যতে = অবশিষ্ট থাকে।

(৫) অবতিট্ঠতি = অবতিট্ঠতে = অবস্থান করে।

সুতরাং এ অংশের অর্থ এই— "বাহা কিছু পরিমিত ভাব, তাহা কিছুই এস্থলে (অর্থাৎ মৈত্রী-বিমুক্ত চিত্তে) অবশিষ্ট থাকে না, কিছুই অবস্থান করে না।"

উহারই অংশ বিশেষ অরক-জাতকে (১৬৯) পাঠ্য দ্বারা :-

"অন্নমাণং হিত্তং চিত্তং

পরি পুন্নং সুভাবিত্তং,

বাং পমাণ কত্তং কন্নং

ন তং তত্রাবসিসসত্তি"।

Rouse এর অনুবাদ এই :-

Filled full of pity infinite,

infinite charity,

In such a heart nought

narrow or confined can ever be.

অনুবাদে ভালো কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

আত্মা

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ "আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই" (: : ২৮২, ২৮৩, ৩০৮)।

বুদ্ধের সময়ে আত্মা বলিলে লোকে কি বুঝিত, তাহার জ্যোত্ব-বর্ণই বা ইহা কি অর্থে গ্রহণ করিত, এবং বর্তমান যুগে আমরাও 'আত্মা' শব্দকে সেই অর্থে গ্রহণ করিতেছি কি না, তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া ঐপ্রকার সিদ্ধান্ত করার বুদ্ধের প্রতি অবিচার এবং পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।

* অজ্ঞানপদ বদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশুক্ত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে বহুবার সাহায্য করিয়া এবং (১৩২৯ সালে) এই অংশের বুদ্ধঘোষের টীকা উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ছই-একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। হিন্দুগণ যদি বলেন, 'লোকটি দেবতুল্য', বুঝিতে হইবে লোকটি অতি সাধু পুরুষ। কিন্তু অহুরোপাসক (বর্তমান পার্শ্বদেশ) যদি বলেন, "লোকটি ০ বতুল্য", বুঝিতে হইবে লোকটি বড়ই অসৎ।

আবার যদি একজন নব্য হিন্দু বলেন, "অহুরের অস্তিত্ব নাই" তাহা শুনিয়া কোন অহুরোপাসক বলিতে পারে, লোকটি নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না। কিন্তু আমরা জানি, অহুরোপাসকের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তুলণ হইতে পারে। একজন একেশ্বরবাদী হিন্দু অনায়াসেই বলিতে পারে, 'অহুর নাই'।

একজন সাংখ্যবাদী যদি বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, আমরা বলিয়া, লোকটি নাস্তিক। কিন্তু কোন অশেষতত্ত্ববাদী যদি বলে, "ঈশ্বর অস্তিত্ববিহীন", তাহা হইলে আমরা তাহাকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিতে পারি না; কারণ আমরা জানি লোকটি ঈশ্বর মানে না বটে, কিন্তু পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেহলে একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ, সে-হলে অর্থ নির্ণয় না করিয়া সেই শব্দটি ব্যবহার করিলে অনেক সময়েই অসামঞ্জস সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

বুদ্ধ-যুগের আত্মা-বিষয়েও ঠিক তাহাই। দৌষনিকায় গ্রন্থের ব্রহ্মজাল-স্থলে (২৮—৭০) জগৎ ও আত্মা বিষয়ে ৩২ প্রকার মতের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া অপর স্থানেও আত্মা-বিষয়ে বিভিন্ন ভি. মতের কথা বলা হইয়াছে।

বর্তমান যুগেও আত্মা-বিষয়ে বিভিন্ন মত। প্রচলিত মত এই— আত্মা একটি বস্তু বা পদার্থ (thing, substance, entity)— ইহার কতকগুলি গুণ আছে যেমন ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা, ইত্যাদি। আত্মা-বস্তু গুণ হইতে পৃথক্; এই সমুদায় গুণ না থাকিলেও আত্মা বর্তমান থাকে; আত্মার এইপ্রকার সত্তাকে নির্গুণ সত্তা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও এক সময়ে এই মত প্রবল ছিল। এখন অনেকই এই মত গোষণ করেন না। Baldwin, Hoffding, James, Jodl, Ladd, Sully, Wundt প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিৎগণ মনে মানসিক প্রক্রিয়া এবং চেতন বা আত্মা (consciousness) একই। মানসিক প্রক্রিয়া বাব দিলে আত্মার অস্তিত্বই থাকে না। জেম্‌স্ self অর্থাৎ আত্মাকে stream of consciousness বলিয়াছেন, অর্থাৎ উহার মতে আত্মা একটি প্রবাহ। এই প্রবাহের পশ্চাতে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা নাই। লোকে সাধারণতঃ এই কল্পিত অপরিবর্তনীয় সত্তাকে আত্মা বলে। কিন্তু তিনি প্রবাহকেই আত্মা বলিয়াছেন। উহার তাবা self, ইহার ঠিক অনুবাদ আত্মা।

'আত্মা'-বিষয়ে এত বিভিন্ন মত। 'প্রবাহবাদী' ও আত্মা-বাদী; আবার 'হাবি-সত্তা বাদী' ও আত্মা-বাদী।

এখন দেখা যাউক বুদ্ধ আত্মা-বিষয়ে কি মত গোষণ করেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন— "বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট প্রমাণ করিতেছেন, যে, আত্মা নাই"।

গ্রন্থকার প্রমাণরূপ নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তৎপর ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে হে ভিক্ষুগণ, রূপ (দেহ) আত্মা নহে, রূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না (ক); তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম, 'আমার রূপ এইপ্রকার হউক'। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ আত্মা নহে, এইজন্যই তাহা রোগের অধীন এবং এইজন্যই আমরা বলিতে পারি না, 'আমার রূপ এইপ্রকার হউক'।

বেদনা আত্মা নহে...সংজ্ঞা আত্মা নহে...সংস্কার আত্মা নহে। বিজ্ঞান আত্মা নহে। বেদনা যদি আত্মা হইত...ইত্যাদি (অবিকল পূর্ববৎ)।

এখন ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কব, রূপ নিত্য না অনিত্য? অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না দুঃখ উৎপাদন করে?

দুঃখ উৎপাদন করে, ভগবন্। পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে কি আমরা ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা?' (খ)

না, ভগবন্, এরূপ ভাবিতে পারি না।

বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান...নিত্য না অনিত্য? অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না দুঃখ উৎপাদন করে?

দুঃখ উৎপাদন করে।

পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে আমরা কি ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা?' (খ)

না, ভগবন্, তাহা ভাবিতে পারি না।

অতএব হে ভিক্ষুগণ, যে কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্তমান, যাহা কোনও জীবের কিংবা কোন জীবের নহে, যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে, সে-সমুদায় রূপ আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্ সর্বার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার এইরূপেই দর্শন করা কর্তব্য।

যাহা-কিছু বেদনা...যাহা-কিছু সংজ্ঞা...যাহা-কিছু সংস্কার...যাহা-কিছু বিজ্ঞান...অতীত, অনাগত বা বর্তমান, যাহা কোন জীবের; কিংবা জীবের নহে; যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে; সে-সমুদায় বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্ সর্বার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার এইরূপেই দর্শন করা কর্তব্য"। মহাবিগ্ণ, ১৩৩৮-৪৫। (পৃ: ৩০৮-৩০৯)

উক্ত ৩ অংশে আমরা (ক), (খ) ধারা তিনটি বাক্যকে চিহ্নিত করিয়াছি।

আমাদিগের প্রধান বস্তু্য এই—এই অংশে 'আত্মা নাই' এমন কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন কথা নাই যাহা হইতে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে 'আত্মা নাই'। এই অংশ পড়িলে অতি সহজে বুঝা যায় যে বুদ্ধের প্রধান বস্তু্য এই :—

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই এটি আত্মা নহে। আর বুদ্ধ যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক—ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিত্য, এবং রোগ, দুঃখ ও বিকারাদির অতীত। কেহ-কেহ বলিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই কষ্টকর। এইজন্য কিছু বিচার করা আবশ্যিক।

(ক) চিহ্নিত অংশটি এই :—রূপ (দেহ) আত্মা নহে, রূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না (পৃ: ৩০৮)।

এই অংশটিকে স্মারশাস্ত্রের উপযোগী করিয়া লিখিলে এইপ্রকার হইবে।

"রূপ রোগের অধীন (গ) সুতরাং রূপ আত্মা নহে (ঘ)।

স্মারের তিনটি অবয়ব

- (১) সাধ্য (major premiss)
- (২) পক্ষ (minor premiss)
- (৩) সিদ্ধান্ত (conclusion)

এখানে কেবল দুইটি অবয়ব পাওয়া যাইতেছে; (গ) বাক্যটি পক্ষ; (ঘ) বাক্যটি নিগমন। সাধা অবয়বটি অব্যক্ত। অব্যক্ত সাধ্যটি এই:—

“যাহা রোগের অধীন, তাহা আত্মা নহে” (ঙ)।

(ঙ) বাক্যটিকে নিম্নলিখিত আকারে লেখা যাইতে পারে:—

“রোগের অধীন বস্তু আত্মা নহে” (চ)।

ক্রমাগতের conversion নিয়ম (আবর্তন-অনুমান) দ্বারা (চ) বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়—

“আত্মা রোগের অধীন নহে”।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্বেও অংশ দ্বারা আত্মার অনতিদৃষ্ট ও প্রমাণিত হইলই না, বরং প্রমাণিত যে আত্মা রোগের অধীন নহে।

এখন (খ) বাক্যটিকে গ্রহণ করা যাক। এখানে বলা হইয়াছে— “যাহা অনিত্য, চুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার বিষয় বলিতে পারি না যে, ‘ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহা আমার আত্মা’ (পৃ: ৩০৮)।

এই (গ) অংশকে বিশ্লেষণ করিলে ২টি বাক্য পাওয়া যায়। এই ২টির মধ্যে ২টি বাক্য এই:—

১। ‘যাহা অনিত্য, তাহা আমার আত্মা নহে’ (ঙ)।

২। ‘যাহা বিকারের অধীন, তাহা আমার আত্মা নহে’ (চ)।

(ঙ) বাক্যটিকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত করা যায়:— “অনিত্য বস্তু আত্মা নহে” (ঝ)। ‘আবর্তন অনুমান (conversion) প্রয়োগ করিলে (ঝ) বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়:—

“আত্মা অনিত্য বস্তু নহে” (ঞ)। এই (ঞ) বাক্যের উপর obversion (আবর্তন-অনুমান) প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত হইবে:—

“আত্মা নিত্য বস্তু”।

এইরূপে (ঙ) বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত হইবে:—

“আত্মা নির্বিকার”।

প্রকৃতকর যে-স্থলে দেখিতেছেন (কিংবা দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিতেছেন) “আত্মা নাই”— প্রকৃত পক্ষে সে-স্থলে রহিয়াছে

“আত্মা নিত্য ও নির্বিকার”।

তবে কি বুদ্ধ ‘নিত্য নির্বিকার আত্মা’র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন? বুদ্ধ নিজে সাক্ষাৎভাবে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

একবার বচ্ছগোস্ত নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“আত্মা কি আছে?”

বুদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

তাহার পরে বচ্ছগোস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন...

“আত্মা কি নাই?”

এবারও বুদ্ধ তুচ্ছভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন।

তখন বচ্ছগোস্ত সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

আনন্দ ওখন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কেন ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

ভগবান উত্তর করিলেন, ‘আত্মা আছে’ বলিলে শাস্তবাসের কথা বলা হইত। ‘আত্মা নাই’ বলিলে উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা করা হইত (সংস্কৃত-নিবন্ধ, অব্যক্ত সংস্কৃত; P. T. S., Vol. 4, p. 400)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ‘আত্মা নাই’—বুদ্ধ ইহা বলিতেছেন না; কিন্তু প্রকৃতকর বলিতেছেন, ‘আত্মা নাই’ ইহাই বুদ্ধের মত। এই স্থলে বলা আবশ্যিক যে, প্রকৃতকরও আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বুদ্ধ দশটি প্রশ্ন

অমীমাংসিত রাখিয়া গিয়াছেন (পৃ: ২১১)। এই ১০টির মধ্যে ছয়টিই আত্ম-বিষয়ক।

তবে কি বুদ্ধের কোন মত নাই? তিনি নিজে বলিয়াছেন ‘উৎপত্তির সমুদায় মত (দ্বিট্ট-গতং) অগনীত হইয়াছে’ (মজ্জিম, ১১৮০)।

কিন্তু এ উত্তরে লোকে সন্দেহ হয় নাই। ক্রমাগতই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে, আত্ম-বিষয়ে বুদ্ধের মনোগত ভাব কি? সম্যক আলোচনা না করিয়া প্রশ্নের যে উত্তরই দেওয়া যাক না কেন, পঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। আবার যদি কোন উত্তরই না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পঠকগণ অধিকতর বিভ্রান্ত হইবেন। সেইজন্য এ-বিষয়ে দুই-একটি মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যিক বলিয়া মনে হইতেছে। বুদ্ধ দুইটি বিষয় স্বীকার করিতেন—

(১) অনিত্য পরিবর্তনশীল ভগৎ

(২) নিত্যাবস্থা।

যাহা রূপ রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দাদিক তাহাই ভগৎপ্রবাহ; এই প্রবাহের অন্তর্গত যাহা, বুদ্ধ তাহাকে ‘অনাত্ম’ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের জীবন-প্রবাহও অনিত্য। কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইহ-জীবনেই জীবন-প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করা সম্ভব। যখন এই প্রবাহ স্থিরত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং প্রজাপতিও “সেই মুক্ত পুরুষের সমান পান না” (‘অলপদ’-উপমা নামক গ্রন্থ, মজ্জিম, ১১৪০)।

মুক্ত পুরুষের এইপ্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঐ ‘অলপদ’ উপমাতেই বুদ্ধ তিস্কুগণকে এইপ্রকার বলিতেছেন:—

“হে তিস্কুগণ! আমি এইপ্রকার বলি, এইপ্রকার বাধ্য করি। কিন্তু তবুও কোন-কোন ভ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মুখা, এবং অজুত (অদত্য) বাক্যে অস্তায়রূপে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, ‘ভ্রমণ গৌতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক); তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ, বি-ভব (বিনাশ, অনতিদৃষ্ট) প্রচার করেন।’ হে তিস্কুগণ! আমি বাণী নহি, আমি বাহা বলি না, সেই বিষয়ে ঐ-সমুদয় ভ্রমণ ভ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মুখা এবং অজুত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, ভ্রমণ গৌতম বিনায়ক, তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন” (মজ্জিম, P. T. S., প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৪০)।

বুদ্ধ নিজে বলিতেছেন তিনি বিনাশক নহেন।

আমাদিগের মন্তব্য এই:—চৈতন্য-প্রবাহকে (stream of consciousness) যদি আত্মা বলা যায়, তবে Baldwin, James, Ladd, Wundt প্রভৃতির দ্বারা বুদ্ধও আত্মবাদী। জীবন প্রবাহ, হিতশীল এবং নিত্য অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই নিত্যাবস্থা যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ আত্মবাদী।

ধর্মসাধনের অস্ত্র এবং উন্নত জীবন গঠনের অস্ত্র বাহা বাহা স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধ সে-সমুদয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, ‘আত্মাদীপ হও, আত্ম-শরণ হও’ (২৫পরি: ২২৬), ‘আত্মাই আত্মার নাথ’ (ধর্ম: স্তোক ১৬০, ১৬০); ‘আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার কর’ (ধর্ম, ৩২৭), আত্মাকে রক্ষা কর (ধর্ম: ১৫৬, ৩১৭) ইত্যাদি। এসমুদয় যদি আত্মবাদের কথা হয়, তবে বুদ্ধ আত্মবাদী।

জীবন-প্রবাহকে যদি আত্মা সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

স্বীকারা মনে করেন চৈতন্য-প্রবাহের পশ্চাতে একটি পৃথক নিত্য অপরিবর্তনীয় অস্ত্রের নিত্য সত্তা রহিয়াছে—এবং সেই সত্তাই আত্মা, তাহাদের মতে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

বাহারা বলেন স্বপ্নের অভ্যন্তরে একটি অসুস্থমাত্র পুরুষ রহিয়াছে— এই পুরুষই আত্মা, তাহাদের মতে বুদ্ধ অনাস্ত্রবাদী।

বাহারা দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার কিংবা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মতে বুদ্ধ অনাস্ত্রবাদী।

এ-প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা সম্ভব নহে।

সঙ্কার-দৃষ্টি

৬ম সংস্করণের একটি সংস্করণ সঙ্কার দৃষ্টি। আমাদের প্রহকার ইহার অর্থ করিয়াছেন “আমি আছি”—এই আশ্চি। এই অর্থ অসম্মত।

বৌদ্ধ সংস্কৃতে এই শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কার-দৃষ্টি। ‘দেহ-সং’ এই মতকে ‘সংস্কার-দৃষ্টি’ বলা হয়। Childers তাহার অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ‘স-কার-দৃষ্টি’। নুতন পালি অভিধানে এই মত গৃহীত হয় নাই। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাহাই ৯টুক না কেন, ইহার অর্থ-বিষয়ে কোন-প্রকার সন্দেহ নাই।

ত্রিপিটকের বহুস্থলে সঙ্কার দৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ আছে, যেমন, P. T. S. সংস্করণের মঙ্গলম নিঃ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০ ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭, সংযুক্ত-নিকায়ে, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪, ১০২, ১৮২ ; চতুর্থ খণ্ডের ২৮৭ পৃঃ ; বিভঙ্গ, পৃঃ ৩৬৪ ইত্যাদি। ‘পটি-সম্বিদা-মঙ্গল’ গ্রন্থে ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১।১৪৩-১৫১)। এই সমুদায় স্থলে দেখা যায় যে সংস্কার দৃষ্টি ২০ প্রকার। রূপ-বিষয়ে সংস্কার-দৃষ্টি চারি প্রকার (১) রূপই আত্মা, (২) আত্মা রূপবান্, (৩) আত্মাতে রূপ, (৪) রূপে আত্মা। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই চারি-টির প্রত্যেকটির বিষয়েও পূর্বে ৪ প্রকার মত, যেমন—(১) বিজ্ঞানই আত্মা, (২) আত্মা বিজ্ঞানবান্, (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান, এবং (৪) বিজ্ঞানে আত্মা। সুতরাং মোট ২০টি মত পাওয়া বাইতেছে। কার-বিষয়ক অর্থাৎ ধাতু-বিষয়ক এই ২০ প্রকার দৃষ্টির নাম সংস্কার-দৃষ্টি।

এস্থলে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যিক। এস্থলে ‘কার’ কে ‘আত্মা’ বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে অনেকেই দেখকে আত্মা বলিয়া মনে করিত। এইজন্য দেখা যায় অনেকে প্রশ্ন করিত, “দেহ ও আত্মা কি এক?” (দৌষ, ৯.২৩, মঙ্গলম ৬০, ৭২ ; সংযুক্ত-নিকায়ের অব্যাক্ত সংযুক্ত, ইত্যাদি)।

সুতরাং দেখা বাইতেছে, ‘আমি আছি এই আশ্চি’ বুঝাইবার জন্য ‘সঙ্কার দৃষ্টি’ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

“অতীন্দ্রিয় সত্তা”

প্রহকার একস্থলে বলিয়াছেন—“বৌদ্ধধর্ম পূর্ণমাত্রার জ্ঞানের তিস্তিতে প্রতিষ্ঠিত ; ইহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই।” পৃঃ ৩০১।

বাহা পূর্ণ মাত্রার জ্ঞানের তিস্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তার বিশ্বাস হইতে পারে না,—এপ্রকার বুদ্ধির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু বুদ্ধের ধর্মে অতীন্দ্রিয়-বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটি এই :—

(১) সংসার অনাদি কাল হইতে চলিয়া আদিতেছে ; কল্প-কল্পান্তরে কত জগৎ হইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

(২) কল্পকল্পান্তরে জন্ম জন্মান্তর।

(৩) ঈশ্বর, নরক। ঈশ্বর তির গ্রহে ঈশ্বর-নরকের নামও দেওয়া হইয়াছে।

প্রহকার অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন—“বুদ্ধ.....আপনার সাধন-প্রণালীতে অতীন্দ্রিয় সত্তার স্থান রাখেন নাই”। (পৃঃ ২৬৩)।

প্রহকারের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি নিজেই একস্থলে বুদ্ধের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—“আমি যে ধর্ম অধিগত হইয়াছি, তাহা সুপত্তী, দুঃসংস্কার, দুঃকর্মাণা, শাস্তিপ্রদ, মহোচ্চ, তর্কের অপোচর, দুঃসংস্কার, (কেবল) পত্তিতগণের বেদনীর” (বিনয়পিটক, মহাপন্থ, ১।৫:২) (পৃঃ ২৯৮)। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের পক্ষেই এই প্রকার উক্তি সম্ভব।

ইহা সত্য যে বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্মের অধিকাংশই সাধাবণের বোধনম্য। কিন্তু অষ্ট বিমোক্ষের শেষ ৪টি সোপান এবং অরূপ ধ্যান অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। বিমোক্ষের চতুর্থে পর্যন্ত রূপ, সংজ্ঞা এবং ইন্দ্রিয়মূলক জ্ঞান তিরোহিত হয়। বিজ্ঞানের অনন্ত আশ্রয়নে বিহার, ‘কিছুই নাই’ এই অসংস্কার বিচরণ, ‘সংজ্ঞাও নাই অসংজ্ঞাও নাই’ এই অবস্থার অবস্থান, সংজ্ঞা ও বেদনার অতীত অবস্থা—এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা (মহানিবানসূত্র, ৩৫ ; মঙ্গলপরিণিকায়-সূত্র, ৩।৩৩)।

অরূপ ধ্যান ও অরূপ এবং অতীন্দ্রিয়।

অতীন্দ্রিয় উপায়ে গৌতম কি কি বিষয় অসুভব করিতে পারেন, তাহা মঙ্গলম নিকায়ের মহা-সৌচনাদ-সূত্রে বর্ণিত আছে।

‘অঙ্গমদ’ উপমাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষ হইলোকেই এমন অবস্থা লাভ করেন যে, ইন্দ্র ব্রহ্ম এবং প্রজাপতিও তাহার সন্ধান পায় না। (মঙ্গলম, ২২)।

এসমুদায়ই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়।

‘সংযুক্ত-নিকায়ে’ গ্রন্থের ‘সার-সংযুক্ত’ এর অন্তর্গত কসমকম্ (কুমক) নামক অংশে রূপকচ্ছলে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মার গৌতমকে বলিল—হে ব্রহ্মণ ! চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কার ও স্পর্শ, মন ও তাহার বিষয় এবং এই সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয়-মূলক রাজ্য আমারই। ‘হে ব্রহ্মণ ! তুমি কোথায় গমন করিয়া থামা হইতে রক্ষা পাইবে ?’

গৌতম বলিলেন—হে পাগায়া ! চক্ষু ও রূপ, এবং অপরায়ণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়বিমূলক রাজ্য তোমারই। কিন্তু হে পাগায়া—যেখানে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়-মূলক রাজ্য নাই, হে পাগায়া সেখানে তোমার গতি নাই।

সর্বশেষে গৌতম বলিলেন—‘হে পাগায়া ! জানিও আমার মার্গ তুমি দেখিতে পাইবে না’ (৪।২।৩)।

এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা বাইতেছে যে, গৌতমের মতে চক্ষুর্কর্পাদির অতীত রাজ্যও আছে।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

প্রহকার পূর্বে অংশের পরেই লিখিয়াছেন :—

“বিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিতৃত্বতম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না” (পৃঃ ৩০২)।

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন দেখা বাউক বুদ্ধ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন কি না।

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই :—বুদ্ধ যে কেবল দেবগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন তাহা নহে ; তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। ইহার বর্ণনা এই :—

তিনি ব্রহ্মা, মহা ব্রহ্মা, প্রকৃ (অতি-কৃ), অমের (অনতি কৃত), সর্বমর্শী (অককৃৎ-অংগ-দশ), নিরতা (বস-বর্তি), ঈশ্বর (ইস্বর),

কর্তা (কৰ্তা), নির্ধাতা (নিৰ্ধাতা), স্বেচ্ছ (স্বেচ্ছ) বিধাতা (সঙ্ঘিতা) বশী (বশী), ভূত-ভবিষ্যতের পিতা (পিতা ভূত-ভবানং) । (দ্বীপ, ব্রহ্মসংহিতা-২১৫ ; মন্ত্র-বিশ্ব, ব্রহ্ম-নিমন্তিক-সংহিতা, ইত্যাদি) ।

প্রায় সমস্ত ধর্ম সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্মা একই ; এতদুত্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । তবে পৌরাণিক ব্রহ্মার জ্ঞান এ ব্রহ্মাও মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন করে আবার সমুচিত হইয়া থাকেন ।

শব্দের পরমব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞান বা জ্ঞান-কর্তৃক নাই । তাঁহাতে কোন প্রকার শক্তি আরোপ করা যায় না । যে স্থলে আত্ম জ্ঞান এবং শক্তি, সেই স্থলেই পরিবর্তন । সুতরাং শব্দর বস্তু, ব্রহ্ম আত্ম-জ্ঞানবিহীন এবং সর্বপ্রকার শক্তিবিহীন । শব্দর ঈশ্বর স্বীকার করিতেন, কিন্তু সে ঈশ্বর পরিবর্তনশীল ও অনিত্য ।

এ বিষয়ে শব্দ এবং বুদ্ধে কোন পার্থক্য নাই । বুদ্ধের মতে জ্ঞান ও শক্তি অনিত্য । ইহাদ্বয়ের উদ্ভবও আছে, বিলয়ও আছে । বুদ্ধ অনিত্য বস্তু প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই । ঈশ্বরও অনিত্য, সুতরাং ঈশ্বরের কোন প্রাধান্ত নাই । শব্দর একটিমাত্র নিত্য বস্তু স্বীকার করিতেন এবং এই নিত্য বস্তু নাম পরব্রহ্ম । বুদ্ধও একটি নিত্য সত্ত্বা স্বীকার করিতেন । ইহার নাম পরব্রহ্ম না হইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্ম বাহা, ইহাও তাহাই ।

নিত্য সত্ত্বা

বুদ্ধ এ-বিষয়ে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন :—

“হে হিন্দুগণ । এমন এক আরতন আছে, বাহাতে পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, বাহাতে আকাশের অনন্ত আরতন নাই, বিজ্ঞানের অনন্ত আরতন নাই, অশব্দ আরতন নাই, সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞার আরতন নাই, ইচ্ছা নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র ও সূর্য্য এতদুত্তরও নাই । আমি ইহাকে আগমনও বলি না, গমনও বলি না ; স্থিতিও বলি না, চ্যুতিও বলি না এবং উপপত্তিও বলি না । ইহা প্রতিষ্ঠা-বিহীন, প্রসঙ্গ-বিহীন ও নিরালম্ব ; এবং ইহাই জ্ঞানের অন্ত । (উদান, পাটসগামির বঙ্গ, ১ ; ২ ; ৩—এই তিন স্থলে উক্ত অংশ তিনবার উক্ত হইয়াছে) ।

বুদ্ধের নিম্নলিখিত উক্তি ‘উদান’ এবং ‘ইতিবৃত্তক’ এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

“হে হিন্দুগণ । এমন কিছু আছে বাহা অজাত (অজাতং), অজুত (অজুতং) অকৃত (অকৃতং) এবং অবৌগিক (অসংখতং) । হে হিন্দুগণ । যদি অজাত, অজুত, অকৃত, এবং অবৌগিক (কোন বস্তু) না থাকিত, তাহা হইলে জাত, জুত, কৃত ও বৌগিক বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব হইত না । হে হিন্দুগণ । যেহেতু অজাত, অজুত, অকৃত ও অবৌগিক (কোন এক বস্তু) আছে সেইজন্য জাত, জুত, কৃত ও বৌগিক বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব ।” (উদান, পাটসগামির বঙ্গ, ৩ ; ইতিবৃত্তক, ৪৩) ।

এই যে অজাত, অজুত ও অকৃত মৌলিক সত্ত্বার কথা বলা হইল, বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার কি নাম ? অনেকেই বলিবেন—ইহার নাম ‘নির্কীর্ণ’ । নাম বাহাই হটক না কেন, ইহা উপনিষদের পরম ব্রহ্ম ।

তিব্ব ভিন্ন গ্রন্থে নির্কীর্ণের যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও ঠিক ইহাই প্রমাণিত হইবে । এই নির্কীর্ণ অচূতস্থান (ধর্মপত্র ২২৫), অচূতপদ (ধেরী ২৭), শান্তপদ (ধর্মপত্র ৩৬৮), বিরহ (ধেরগাথা, ২২৭), পরম সুখ (ধঃ পঃ ১০৪, ২০৩) ইত্যাদি । পটি সঙ্ঘাঙ্গ মঙ্গ নামক গ্রন্থের এক স্থানে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪) ইহার ১৪টি এবং অপর এক স্থানে (২।২০৮-২৪১ পৃঃ) ৪০টি বিশেষণ দেওয়া

হইয়াছে । তাহার কয়েকটি এই—নিত্য, প্রব, জ্ঞান, শরণ, লয়ন (আশ্রয়), সুখ, পরমার্থ, সার, অবিপরিণামধর্মী, অবিভব, অতর, অচল, অজাত, অজর, অমৃত, অশোক, অনির্মিত ইত্যাদি । এসমূহের একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিশেষণ হইতে পারে ।

মাতৃক্য উপনিষদের তুরীয় ব্রহ্ম-বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

“যিনি অজঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উত্তরপ্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞান-ধন নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অপ্রাক, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্কর্তনীয় । যিনি এতদ্ব্যতিরিক্ত বিবরণ পঞ্চবিষয়ের অতীত, শান্তি-সম্বলময় ও অতৈত, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে চতুর্ধ বলিয়া জানেন ।” নির্কীর্ণ ও পঞ্চ স্বর্গের অতীত, সংজ্ঞার অতীত, অসংজ্ঞার অতীত এবং অনাধাত ।

নির্কীর্ণে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অবজ্ঞ, ইচ্ছা, পরলোক, চন্দ্র, সূর্য্য প্রকৃতি কিছুই নাই । উপনিষদেও ব্রহ্ম-বিষয়ে বলা হইয়াছে ।

“ন তত্র সৃধ্যো ভাতি, ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিহুতো ভাস্তি কুতোহরমগ্নিঃ ।

বৃহক, ২।২২ ।

নির্কীর্ণ ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, তাহা শব্দগাঢ়াদি পণ্ডিতগণেরও মত । বেদান্ত তাহা শব্দ এ-বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন :—

(১) ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্ত—ব্রহ্ম মোক্ষ-স্বরূপ (১।১।৪, ভাষ্য) ।

(২) ব্রহ্মভাবত মোক্ষ :—ব্রহ্মভাবেই মোক্ষ (১।১.৪) ।

(৩) ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা—মুক্তির অর্থই ব্রহ্মই (৩।৪।৫২) ।

(৪) “এই মোক্ষ পরমার্থতঃ কুটম্ব নিত্য ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, সর্ববিক্রিয়ারহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, অরাজ্যোতিঃ স্বভাব—ইহাই অপরোক্ষী মোক্ষ, ইহাতে ধর্মার্থ ও কালক্রয় কিছুই নাই । এই-জন্য প্রতিতে বলা হইয়াছে—ইহা ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, ভূতভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ ইত্যাদি । (কঠ ১।২।৪) । ইহাই অর্থাৎ এই মোক্ষই ব্রহ্ম” (১।১।৪, ভাষ্য) ।

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে (৪।৪.২), শব্দগাঢ়া স্বতীশাস্ত্র হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অপুণ্যপুণ্যো পরমে বৎ পুনর্ভব-নির্ভরঃ ;

শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনো বাস্তি তস্মৈ মোক্ষান্বনে নমঃ ।

অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের উপরম হইলে পুনর্জন্মবিমুক্ত হইয়া শান্ত সন্ন্যাসিগণ বাহাকে প্রাপ্ত হন, সেই “মোক্ষরূপী”কে নমস্কার ।

নির্কীর্ণ, মোক্ষ এবং পরব্রহ্ম একই বস্তু ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্মে বাহাকে স্রষ্টা ও ঈশ্বর বলা হয়—বুদ্ধ তাহা মানিতেন । কিন্তু বেদান্ত ও বুদ্ধ উত্তরেরই মতেই এই ঈশ্বর অশাস্ত ।

বুদ্ধ ও বেদান্ত উত্তরই এক নিত্যসত্ত্বার সত্ত্ব স্বীকার করিতেন । ইহার নাম নির্কীর্ণ বা পরব্রহ্ম ; উত্তরেরই মতে ইহা পরমা গতি, পরম শরণ ।

সুতরাং বুদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন, পরব্রহ্মও মানিতেন । এই স্থলেই আলোচনা শেষ করিতে হইল । মতভেদ আছে বলিয়া পঠিকগণ যেন মনে না করেন এ গ্রন্থের মূল্য নাই । মতভেদ থাকিবেই এবং সে-বিষয়ে আলোচনা হইবেই । বড় বড় তিনটি শব্দে যে-গ্রন্থের সমালোচনা হয়, সে গ্রন্থ নিশ্চয়ই মূল্যবান । একতৃপ্তকে গ্রন্থখানি উপায় হইয়াছে । ব্রহ্মভাবের এই প্রকার গ্রন্থ প্রথম রচিত হইল । আশা করি ইহার সমুচিত আদর হইবে ।



কুড়ল রান রচিত :: টেকী রান বিচিত্রিত

ভূমিকা

পাঠক, বৌবাজারের বড় রাস্তার উপরে ঐ যে তিনতলা বাড়ীখানা দেখেছেন ওটি বাংলার বিখ্যাত বিজ্ঞান-ব্যাकरण ও ব্যবসাবিদ দেশভক্ত শ্রীহসন্তবাবু তরফদার এম্. এন্সি, বি.এল, পিএইচ.ডি, মহাশয়ের পৈতৃক বাড়ী। ওর ছাদের উপর যে আবর্জনার মতো অনেক-কিছু দেখা যাচ্ছে, ও-সব আবর্জনা নয়, কলকল্লা। Radio, lightning conductor ইত্যাদির খুঁটি উঁচয়ে বাড়ীখানা যেন আকাশকে চ্যালেঞ্জ করছে। Rain gauge, weather cock, sundial ইত্যাদি আর যা-কিছু ছাদে জমা হয়ে আছে, তা সবই হসন্ত-বাবুর দৈনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও তাঁর পিতৃঅর্থে সংগৃহীত। ভিতরেও automatic fly-catchers, electric cockroach-exterminator, hydraulic হামান দিস্তা, ইত্যাদি যন্ত্র-পাতিতে ভর্তি। তা ছাড়া হসন্ত-বাবু নানা যন্ত্রের আয়নার হাওয়া compressed air cylinder-এ ক'রে এনে বাড়ীতে রেখেছেন ও এই উপায়ে ইচ্ছামতো

দার্জিলিং, পুরী, রাঁচি ও হাজারীবাগের হাওয়া খেয়ে থাকেন। প্রাকৃতিক কোনো বাধা তিনি যেমন স্বীকার করেন না, পোষাক-টোষাকও তাঁর তেমনি স্বাধীন ভাবাপন্ন। তাঁর আবিষ্কৃত combined safety pyjama ও কৌচান ধুতি প'রে অতি অসাধনান লোকেও অবাধে লজ্জা নিবারণ করতে পারে। তাঁর প্রস্তুত two-in one hold-all overcoat আজকাল ট্রেনের যাত্রীদের প্রধান আস্বাবরূপে গণ্য হচ্ছে। তিনি ব্যাঘ্রামে বিশ্বাস করেন না; injection ও mechanical muscle squeezing এর সাহায্যে শরীর ভাল রাখেন। হসন্ত-বাবু যে বাংলার এডিসন একথা তাঁর ভাই বোন নির্কিংশেবে সকলেই স্বীকার করেন। এক কথায় হসন্ত-বাবু অত্যন্ত উচ্চরের একজন হালি মানুষ, অর্থাৎ কি না modern man।

ব্যাकरणে এবং ভাষাতত্ত্বেও হসন্ত বাবু কম যান না। প্রথমত এটা তাঁর একটি বংশগত ক্ষমতা। হসন্ত-বাবুর বাবা শ্রীহরকুমার ব্যাकरणবাগীশও ব্যাकरणে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং নিজের লকার আড়ত খাকা



Combined Safety পায়জামা ও কৌচান বৃত্তি

সম্ভেও বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন হসন্ত, যেহে ছেলের নাম কারক ও একমাত্র কল্পার নাম বিভক্তি। কারক ও বিভক্তি বাবার গুণ কিছুই পায়নি বলেই বোধ হয় ভগবান অধিক মাত্রায় হসন্তকে পিতৃগুণে গুণী করেছিলেন। হসন্তের লিখিত খীসিস্তুলি সব ছাপা হ'লে ডবল ক্রাউন আট-পেজী ৫০,০০০।৬০,০০০ পৃষ্ঠা হ'ত সম্ভেই নেই। সচরাচর বৈয়াকরণের যে-ভাবে ভাষাকে কেটে কুটে নীরস ক'রে তোলেন, হসন্ত-বাবু সে রকম করেন না। তাঁর মতে ভাষাটা একটা জীবন্ত জিনিস, তার সঙ্গে

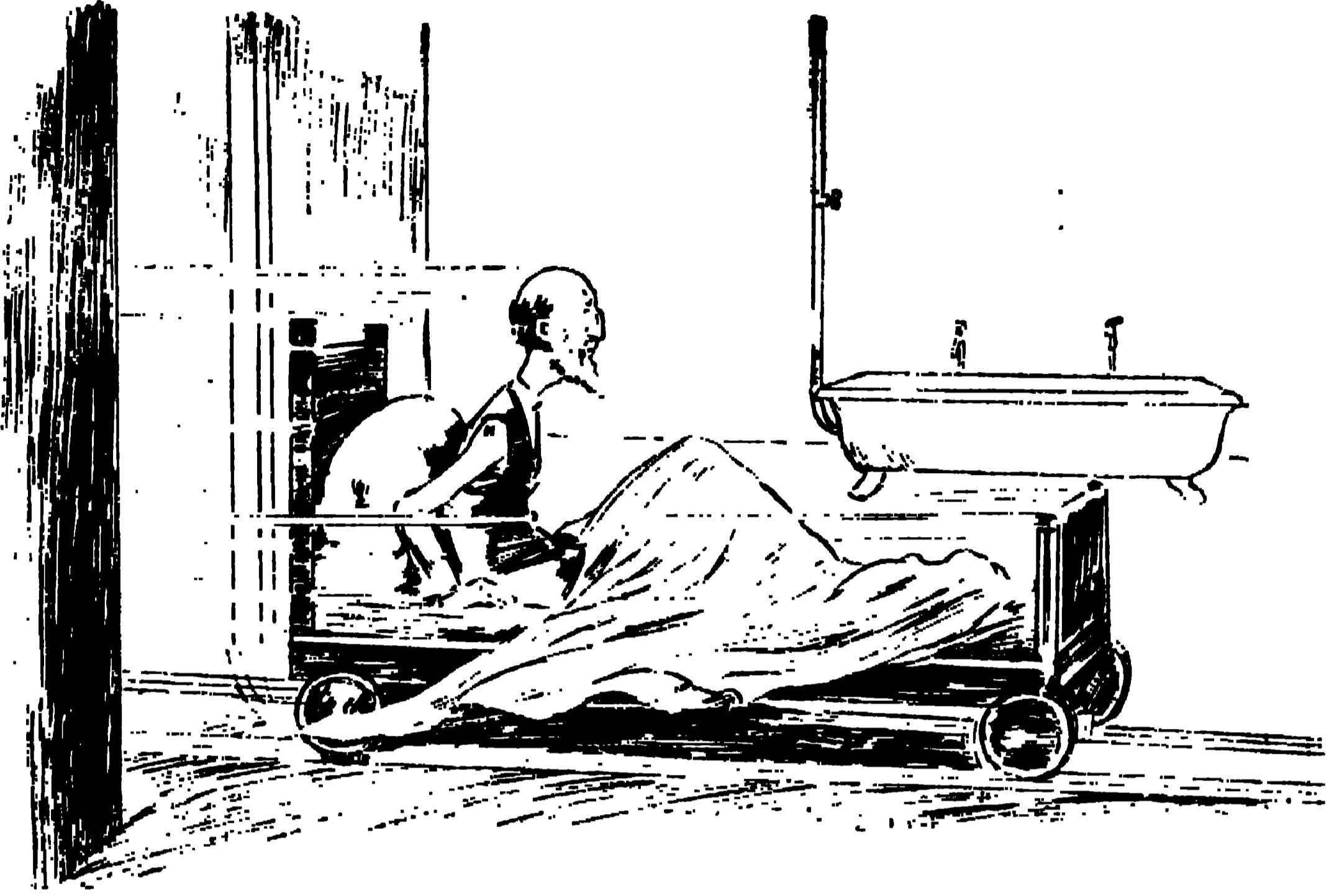
মাহুষের নাড়ীর সঘন, হৃৎস্রাং দেহ ও মনোবিজ্ঞান-বিবর্জিত ব্যাকরণ খোলবর্জিত হাঁকার ভ্রায়ই অকেজো। হসন্ত-বাবু একবার একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন “এই যে একটা চেঁটা আদিমকাল থেকে চ'লে আসছে, মাহুষের মনের রাস্তা ধ'রে সোজা—নিজের তার মনো-ভাবগুলিকে পরিষ্কার সুমধুর, স্বার্থবর্জিত ভাবে ব্যক্ত করতে। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অল্প, সমন্বয় ও সক্ষুট আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা,” তখনই সকলে বলেছিল, “আর শব্দরূপ আড়ালে চলবে না।” এই আদর্শ হসন্ত-বাবুর সকল লেখার মধ্যে দেখা যায়। তাঁর লিখিত “Phonetics in Bengali Poetics and the Influence of the palatal “চ” the dental “ল” and the labial “ম” on the Composition of Nineteenth Century Lyrics” যে পড়েছে সেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যে তার মধ্যে তিনি কবিতা লেখা ব্যাপারটার ভাষাতত্ত্বের দিকটা অক্ষাত্তের মতোই জগৎ বুদ্ধিয়ে দিয়েছেন। “On the amazing Absence of the Vowel া (লি) in Bengali Blank Verse” নামক তল্লিখিত একখানি প্রকরণেও হসন্ত-বাবু বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। হসন্ত-বাবুর মতে বিজ্ঞান-ব্যাকরণ ও দর্শন পরস্পর অমুসঙ্গী, এবং অন্তঃপুশস্ত ভূখণ্ড যেমন অর্ধহীন, বিজ্ঞানবর্জিত ব্যাকরণ, ব্যাকরণ বর্জিত বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ বর্জিত দর্শন, ও দর্শন ও বিজ্ঞান বর্জিত ব্যাকরণ এবং দর্শন ও ব্যাকরণ বর্জিত বিজ্ঞানও সেইরূপ অর্ধহীন। “ইহাদের অর্থাৎ জ্ঞানের সকল শাখার পরস্পর অবিচ্ছিন্নতার আদর্শ আমাদের চিরায়িত রাখতে হ'বে, এই আদর্শই জ্ঞানজগতের সেই আদিম নীহারিকাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে আজ Benedetto Croce (বেনেদেত্তো ক্রোচে) অবধি জ্ঞানজীবীদের একমাত্র অর্থেষিত।” এই কথাগুলি হসন্ত-বাবুর লেখা “The Incidence of the Nativity of the Great on Terrestrial Tremulation as found in Seismographic Records” পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত। এই পুস্তিকাতে হসন্ত-বাবু প্রমাণ করেছেন যে মহাপুরুষ-

দের অল্পকালে শুধু তাঁদের গর্ভধারিণীরাই যে যন্ত্রণা পান তা নয়, মাতা ধরিণী দেবীও তৎকালে সেইরূপ যন্ত্রণাজনিত কল্পনে মুহমূর্ছিত কল্পিত হন। হসন্ত-বাবু ঐরূপ পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক আরো দুই-পাঁচটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। C. S. P. C. A.এর ভারবাহী জীবের স্নায়বিক দৌর্ভাগ্যের কারণ অল্পসন্ধান সভার সভ্যরূপে হসন্তবাবু "Pyrotechnical Publicity and its Effects on Vertebrate Associates of the Vehicular Traffic on the Howrah Bridge and Elsewhere" নামে একটি প্রকরণ সভায় উপস্থিত করেন। ইহাতে হসন্ত-বাবু দেখিয়েছেন, যে, অত্যাঙ্গুল আলোক-মালাশোভিত সিগারেট, বিস্কুট প্রভৃতি দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল্য ও খামখেয়ালী রকম জলা ও নিভার জন্ত ভারবাহী ঘোড়া, গরু ও মহিষদের বিশেষ স্নায়বিক আনষ্ট হয়। তাঁহার মতে, হয় ঐ সব বিজ্ঞাপন তুলে দেওয়া দরকার, নয় ঐ সকল জীবজন্তদের জন্ত নীল কাঁচের চশমার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

আর একটি পুস্তিকায় হসন্ত-বাবু দেখিয়েছেন যে বঙ্গ দেশের জমির মাটির প্রকৃতির সহিত তাহার মহাপুরুষদের আবির্ভাব বিশেষরূপে অভিত। তিনি দেখিয়েছেন যে, হালি-সহর (রামপ্রসাদ), নান্দুর (চণ্ডীদাস), কৈতুলী (জয়দেব) ফুলিয়া (কৃষ্ণিবাস), রাধানগর (রামমোহন), বীরসিংহ (বিনয়সাগর), জোড়াসাঁকো (রবীন্দ্রনাথ), কলুটোলা (কেশবচন্দ্র), ভ্রামবাজার (বিবেকানন্দ), রামবাগান (রমেশচন্দ্র), কাঁঠালপাড়া (বঙ্কিমচন্দ্র), প্রভৃতি সকল স্থানের মাটিই এক প্রকার অর্থাৎ alluvial (পলিপড়া)। আর বেশী লিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। হসন্ত-বাবু যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বলাকার "ছবি" কবিতাটিকে "Theory of Relativity"র কাব্যানুবাদ প্রমাণ করে কবি-মহলে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং জীবজন্ম ও আরাবল্লি অঞ্চলে ভ্রমণ করে ও রামায়ণটি ভ্রম ভ্রম করে "ট্রাভি" করে "Recruitment and Mobilisation of Infantry in Ancient India" নামক প্রবন্ধ লিখে স্বয়ং অজি-লার্টের ধন্যবাদ

লাভে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীহসন্তচন্দ্র তরফদারের নাম জ্ঞানরাঞ্জোর সর্ব্বঘণ্টে বিদ্যমান, তাঁর জ্ঞানচ্ছায়া "নর্শরির" (চারাবাড়ীর) মতো বিভিন্ন জ্ঞানবৃক্ষের চারাকে পুষ্ট করে বাড়িয়ে তুলেছে। বাৎসর্য থেকে Havelock Ellis (হ্যাভেলক এলিস) ; বেদব্যাস থেকে H. G. Wells (এইচ, জি, ওয়েলস্) ; Plato (প্লেটো) থেকে Bertrand Russel (বাট্রাণ্ড রাসেল) Bergson (ব্যর্গস) ও Giovanni Gentile (জিওভান্নি জেন্টিলে) ; Laotze (লাওটসে) ও Confucius (কনফুসিয়াস) থেকে Paul Richard (পল রিসার) ; Adam Smith (এডাম স্মিথ) থেকে ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; তানসেন থেকে কাজি নজরুল ইসলাম ; Herodotus (হেরডোটাস) থেকে অধর মুখোপাধ্যায় ; জীন মহাবীর থেকে Jinarajadasa (জীনরাজোদাস) ; চাণক্য থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ ; বাণভট্ট থেকে যাদবেশ্বর তর্করত্ন ; Michael Angelo (মাইকেল এঞ্জেলো) থেকে হেমন মজুমদার ; পাণিনি থেকে লোহারাম শর্মা ; Homer (হোমার) ও Aristophanes (এ্যারিস্টোফেনিস) থেকে Hillaire Belloc (হিলোয়ার বেলক) ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্ব দেশকাল-প্রসূত জ্ঞান-সম্ভার হসন্ত বাবুর মস্তিষ্ক মিউজিয়ামে সখত্রে সংরক্ষিত আছে।

হরকুমার ব্যাকরণবাগীশ মহাশয় যখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হসন্ত রেখেছিলেন তখন তাঁর একবারও ব্যাকরণ-পুঁজা ব্যতীত অন্য কোনো কথা মনে হয়-নি। কিন্তু তাঁর প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র নিজের নামটি একের অধিক উপায়ে সার্থক করেছিলেন। হসন্ত-বাবুর শক্তি ছিল অনেক, যদিও সর্বদাই কোনো না কোনো আদর্শ বা ব্যক্তির পিছনে, ব্যক্তিবর্গের পিছনে হসন্তের () মতো, লেগে থাকতেন। ব্যক্তিবর্গবর্জিত হসন্তের যেমন কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেহ জানে না, কোনো মহাপুরুষের বা মহান আদর্শের সংসর্গ বর্জিত হসন্তচন্দ্র তরফদারের অস্তিত্বও সেই রকম কেহ কল্পনা করে না। আত্মবিলোপ আর কাহাকে বলে? দুর্ভেদ্য বনানীর ঘনশাণ-প্রশাখাজর বৃকরাজির মধ্যে সতত ভ্রমণ করে, শার্দূল-



হসন্ত-বাবুর ঘানবাতা

শাবক যেমন ক্রমশঃ সূস্থ বর্দ্ধিতদেহ এবং মহাবলে বলীয়ান হ'য়ে ওঠে; জ্ঞানবনানীর অনন্ত "ism" ও "logy"মালার উন্মুক্তির মধ্যে জ্ঞানশার্দূল হসন্তও তেমনি ক্রমশঃ চির উন্নতির মধ্যে এগিয়ে চলছিল। আপনা অপেক্ষা কোনো বৃহত্তর শার্দূলের সম্ভাভ করলে হসন্ত তাহার পশ্চাতে কিছুকাল যুক্ত থাকত কিন্তু সে কখনো নিজের অন্তরের প্রেরণাকে প্রত্যাখান ক'রে এক জাগরণ বৈশীকণ থাকত না। কোথাও কোনো সময় যদি কোনো নিরীহ নিরীকোষ পুটদেহ জ্ঞানগাভী বা জ্ঞান-গর্দভের দর্শনলাভ করত তা হ'লে অচিরে তাহার রক্তপানোদ্রেক্তে হসন্ত সেই দিকে ধাবমান হ'ত। অর্থাৎ কখনো বিনীত এবং কখনো বা হিংস্র ভাবে সর্বদাই হসন্ত-বাবু কোনো না কোনো ব্যক্তি বা জ্ঞানমতের পিছনে লেগে থাকতেন। কেউ কেউ বলত তাঁর ভরফদার নামের অন্তেই তাঁর স্বভাব হয়েছিল কোনো না কোনো তরফে সর্বদা যুক্ত থাকা। যাই হোক এখন যে ঘটনাটার কথা বলতে চাই সেটা বলি।

আসল ঘটনা

(১)

আনুমান্য মাসের মাঝামাঝি একদিন হসন্ত-বাবু সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠলেন। একটি স্নাইচ্ টিপ তেই রেলের উপর বসান খাটখানা ধীরমহরগতিতে তাঁকে নিয়েই স্থানের ঘরের দিকে চলল। অমনি পাশের ঘরের গ্রামোফোনটাতে আপনাআপনি সানাইয়ের সুরে একটা রামকেলীর আলাপ বাজতে শুরু করল; স্ট্রট ক'রে তোতা পাখীটার খাঁচার চাকনীটা প'ড়ে গেল, আর সেটা "অসতোমাসদগময় তমসোমাজ্যোতির্গময়....." ইত্যাদি অবিশ্রান্ত আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল, বাবুর্চিখানায় নিদ্রিত মাস্তাজী বাবুর্চিটার কানের পাশে ছুঁ ক'রে একটা পট্কা ফুটে গেল আর সে লাক্ দিয়ে উঠে প্রাতরাহারের আয়োজনে মেতে উঠল। এক কথায় হসন্ত বাবুর ঘুম তাড়াতাই automatically সমস্ত বাড়ীটা নবজাগরণের অধীর চাকল্যে চকল হ'য়ে উঠল। হসন্ত-বাবু দেহের নানা স্থানের চামড়ার স্বাস্থ্য

ও অবস্থা অস্থায়ী নানাপ্রকার তেল মেখে স্নান করে উঠে, একটা টিনের বাসের মধ্যে মাথাটা ভরে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর একবার “উঃ” বলে টেঁচিয়ে মাথাটা বাসের তিতর থেকে বের করে নিলেন। বাসটার গুটিকতক মৌমাছি ছিল। হসন্ত-বাবুর বিশ্বাস যে, প্রয়োজন ও ব্যবহার না থাকলে প্রকৃতি মানুষকে কোনো কিছুই দেয় না, সুতরাং যদি তাঁর ঈশ্বর টাক ভাণ্ডার মাথায় তিনি নিয়মিত মৌমাছির কামড় খান তাহলে নাকি প্রকৃতি তাঁর মস্তকে এতদূরত প্রয়োজন অস্থায়ী কেশোদগম করিয়ে তবে ছাড়বে।

তাঁর একটি গুঁচ উদ্দেশ্য ছিল এই ঘটনা-হল সেবনের পিছনে। এই প্রচণ্ড বিজ্ঞান-ভয় সঙ্কে সঙ্কে তাঁর মনে অস্তঃসলিলা ক্ষুধার মতো ধর্মভীরুতার ধারা প্রবাহিত ছিল। টিকি জিনিষটা আসলে ছোটো হলেও তার রক্কে রক্কে যে অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক শক্তি সঞ্চারিত হতে থাকে একথা তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতেন ও টাকাকাস্ত মস্তকে টিকি গজিয়ে এ বিষয়ের চরম মীমাংসা করার জন্যেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক এই মধুকর-কামড়-প্রথায় কেশোদগমের চেষ্টা করতেন। তাঁর এই দারুণ ধর্ম-গোড়ামীর সঙ্গে অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার একত্রসমাবেশ দেখে অনেকে আশ্চর্য হ’ত বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর বহিরাবরণ, combined (মিশ্র) কৌচান ধৃতি ও safety (বিপদ-বারণ) পায়জামা, বিরাট Gogglesএর সঙ্গে এই স্বদেশী বৈজ্ঞানিক টিকির সামঞ্জস্য দেখলেই তবে লোকে বুঝবে যে, জগৎ-সিঁহ ও ওসমানের স্থান একস্থানেই সম্ভব।

তারপর হসন্ত বাবু প্রাতঃরাহার সেরে আফিস ঘরে এসে বসলেন এবং খবরের কাগজগুলি লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। এ সমস্ত পরে তাঁর কেরাণী সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে ফাইল করে রাখবে। হঠাৎ একটা কাগজের একটা খবর পড়ে হসন্ত-বাবু বেড়ালের ইঁচুর ধরার মতো তড়িৎ গতিতে সেটার উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং খুব ক্ষতবেগে লেখাটার চারি পাশে মোটা করে কয়েকটা লাল নীল দাগ দিয়ে দিলেন। তার উপরে লিখলেন, “see”। তার পর টেবিলের গায়ে লাগান একটা

বৈজ্ঞানিক ঘণ্টার বোতাম টিপতেই কেরাণী হরহরি এসে দাঁড়াল। হসন্ত-বাবু বলেন, “রহরিবাবু আমাকে ‘শ্রীশ্রী ডিফারেন্সিয়া ফাইলটা’ এনে দিন্ত।” হরহরি ফাইলটা আনতে চলে গেল।

‘শ্রীশ্রী ডিফারেন্সিয়া’ ফাইলটাতে হসন্ত-বাবু আমাদের সকলপ্রকার জাতীয় অনন্তসাধারণতার হিসাব রাখতেন। আমাদের জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় কোথায় কোথায় বিভিন্ন, কি কি দোষগুণ আমাদের আছে বা অপর জাতির নেই এই সবেল খবর হসন্ত-বাবুর এই ফাইলটির মধ্যে পানওয়া যেত। চার পাঁচ বছর আগে শ্রী স্বামী অভ্যুত্থানের পিছনে হসন্ত-বাবু কিয়ৎকাল যুক্ত ছিলেন। স্বামীজিই প্রথম হসন্ত-বাবুর দৃষ্টি আমাদের জাতীয়তা ও জাতীয় অবনতির দিকে আকর্ষণ করান। হসন্ত বাবু তখনই বলেছিলেন যে, জাতীয় অবনতির কারণ প্রকৃষ্টরূপে নির্ধারণ না করে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার সাহিত তুলনীয়। Diagnosis(রোগ-নির্ণয়)ই যদি না হ’ল, তা হলে চিকিৎসা করা অন্ধকারে টিল ছোঁড়ার চেয়ে কি আর কম হ’ল? স্বামীজি যতই বলেন, জাতিভেদ, “মূর্তিপূজা, পবুদা, নিরক্ষরতা, পরাধীনতা ম্যালোরিয়া, হকওয়াম, ভাড়িখানা, আফিম ও গাঁজা” হসন্ত-বাবু ততই বলেন, “প্রমাণ কি, যে, এই সব কারণেই আমাদের এই দুর্দশা হয়েছে? হর্ষবর্ধনের সময় কি জাতিভেদ ছিল না? বর্তমান রোমান ক্যাথলিক ও প্রাচীন প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবান্ জাতিরা কি মূর্তিপূজা করত না? আকবরের সময় কি পবুদা ছিল না? রাণী এলিজাবেথের আমলে কি ইংরেজরা সকলে লেখা পড়া জানত? স্বচরা ও পোলরা পরাধীন হলেও তারা কি কখনো আমাদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল? ইতালিতে কি ম্যালেরিয়া নেই? অন্তর্দেশে কি হকওয়াম ও নেশা করার মালমশলা নেই, না আমাদের দেশেই হকওয়াম ও নেশাহীন লোকেরা খুব উঁচুদরের মানুষ?” ইত্যাদি। তর্কে হেরে গিয়ে স্বামীজি বললেন, “তবে এই দুর্দশা, একি স্বভূব মহাদেবের প্রলয়লীলা?

হসন্ত-বাবু ঈশ্বর হেসে তখন বলেছিলেন, “না।” Mythology, theosophy—groping in the dark



হসন্তবাবু। প্রমাণ কি.

(অঙ্ককারে হাতুড়ান)। ওসবে হবে না। চাই ঠিক মত ও যথেষ্ট পরিমাণে Statistics। Facts and Figures, বুঝলেন? আমরা Facts and figures দিন, আমি আপনাকে জাতীয় উন্নতি অবনতি সব কিছুর পরিষ্কার সীমাংসা করে দেব। Blue Print (ব্লু প্রিন্ট) দেখে যেমন যন্ত্রের নাড়ী নক্স সব জানা যায়; আশিও তেমনি ক'রে সব কিছু আপনাকে দেখিয়ে দেব। কেবল চাই Statistics।”

সেই দিন থেকে হসন্ত-বাবু আমাদের জাতীয় দোষ গুণের যেখানে যা কিছু নির্দর্শন পেতেন সব সম্বন্ধে ফাইল বন্ধ করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই উপায়ে বের ক'রে ফেলবেন কি কি বিষয়ে ও কি কি পরিমাণে আমরা

অল্প জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতার মধ্যে আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ খুঁজে বের করবেন আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করে হসন্ত বাবু হাজার হাজার জাতীয় বিভিন্নতার উদাহরণ সংগ্রহ করে ফেলেছেন। তাতে দেখা গেছে আমরা অতিভোজন প্রিয়, ঘরোয়াবিবাদ অভিলাষী, চলন্ত ট্রেনে ও ট্রামে ওঠ নাবার পক্ষপাতী, খালি পায়ে হাঁটা চলায় অভ্যস্ত, জীনির্বাণ তক, মশক-দংশন-উদাসী ইত্যাদি। কিন্তু সর্কাপেক্ষা অধিক বিভিন্নতা পাওয়া গেছে আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে তাঁরা ভয়-রোগে বিশেষরূপে ক্লিষ্ট। হসন্ত-বাবু আজকার “কেস” টি সমেত ৪৫৫৩টি নারীর “কাপুরুষতার” উদাহরণ পেয়েছেন। কোথাও নারী ভয়-ব্যাকুলতার অল্প পুত্রবে

কর্তব্যবিমূঢ় করেছে, কোথাও স্বামীকে বিপদে ফেলেছে, কোথাও কুপথগামী হয়েছে, কোথাও পিতার ব্যবসা ফেল পড়িয়েছে, কোথাও বাকদস্ত প্রণয়ীকে বিবাহের অন্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতগ্রস্ত করেছে ইত্যাদি। সব দেখে হসন্ত-বাবু একটি সাময়িক কাগজে লিখেছিলেন—

হায় ভীত ভারত-ললনা,

তব দোষে ছুটে মোরা ; সত্য কথা, নহে এ ছলনা !

অন্ত জাতি বানিয়েছে কল কল কত ;

মোরা কি সত্যত

পাকিব এ দুর্দশায় নিমজ্জিত, হায় ?

দেশ যায় যায় ।

ওঠো, জাগো, ভারতের মেয়ে,

সাহসের নিদর্শনে ফেল দেশ ছেয়ে,

বাঁধো কেশ ও কোমর যতনে,

ভোল আজ মুর্ছা ও পতনে ।

জাগরণ চাই,

কাঁদবে কাঁপবে ভয়ে, সে সময় নাই ।

হ'তে হবে বীরের জননী,

শুন সবে শুন হিন্দু ইন্দু-নিভাননী ;

তোমাদের ভয় ন্যাকুলতার বন্ধনে,

তোমাদের হৃদয়ের ক্রন্দন-স্পন্দনে,

কাতর ভারত আজ ।

তাই তোরা “সাজ সাজ”

ভারতের মেয়ে,

ছুটে আয় ভয় ভুলে ধেয়ে ।

কবিতাটি প'ড়ে সকলেই বলেছিল, যে, হসন্ত-বাবু যদি “সৌরিয়াসলি” কবিতার চর্চা করতেন তাহলে হয়ত জানের রাজ্যের অনেক নীরসতাকেই সরস কবিতায় ব্যক্ত করতে পারতেন। তিনি যে অতি ছুঁহ ব্যাপারও কবিতায় পরিষ্কৃত করতে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ হসন্ত-বাবু Kant's Critique of Pure Reason এর এক অংশ অমিত্রাকর ছন্দে তর্জমা করেন। এ ছাড়া বড় বড় জাব ও অধিক জটিল কাগজের কনিষ্ঠ

ব্যক্ত করার উদাহরণ স্বরূপ তিনি Plotinus-এর Absolute Nous, Leibnitz এর Monad, Momentum, Anaphylaxis ইত্যাদি বিষয়ে বয়েসটি সনেট রচনা করেছেন।

যাই হোক, ভারতনারীর কাপুরুষতার এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়ার ফলে হসন্ত-বাবু ভাবতে আরম্ভ করলেন, যে, এইটিই আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ। বীরপ্রসাবিনী ভারতমাতা যদি নিজের বীর না হন, তা হলে তাঁর বীরপ্রসব কার্য কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। মাতৃজাতিই শিশুকাল থেকে সন্তানের দেহ ও মনের পুষ্টি ও গুণাগুণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরাই যদি সাহসহীনতা দোষে ছুটে হন, তা হলে শিশু কি ক'রে আর বীর পুরুষ হয়ে উঠতে পারে? হসন্ত-বাবু ভাবতে আরম্ভ করলেন, কি ক'রে ভারতে আবার লক্ষ লক্ষ বীর জননীর সৃষ্টি করা যায়।

স্বামী অভ্যুত্থানন্দ ইতিমধ্যে একদিন এসে হাজির হলেন। হসন্ত-বাবু তাঁকে তাঁর ফাইল বের ক'রে দেখালেন কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রূপে নারীর কাপুরুষতার কুকল ফলছে। স্বামীজি বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েই বলেন, যে এতদিন পরে হসন্ত-বাবু ভারতের রোগ ঠিক ধরেছেন। হসন্ত-বাবু একটু দিনয়ের হাসি হেসে বলেন এখনও data যথেষ্ট পাওয়া যায়নি; তা ছাড়া এইটাই যে ভারতীয় অবনতির কারণ এই conclusion (সিদ্ধান্ত)টি এখনও সব রকম logical test (স্তায় বিচার) ক'রে establish (প্রতিপন্ন) করা হয়নি। এ ঘটনাটি যে সময়ে ঘটে তখন হসন্ত-বাবুর হাতে মাত্র ৩৫০০টি উদাহরণ জমা ছিল। কিন্তু আরও হাজারখানেক “কেস” না পেলে তিনি কিছুই সঠিক বলতে পারতেন না। কিন্তু আজ তাঁর ফাইলে ৪৫৫৩টি “কেস” হওয়াতে তিনি তাঁর কাজে লেগে গেলেন। প্রথমত, তিনি স্ত্রী-কাপুরুষতার উদাহরণগুলিকে ভাল ক'রে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে নিলেন। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীজাত কুফলাবলি লিপিবদ্ধ ক'রে ফেললেন। তার পর সেই সমস্ত কুফলের সঙ্গে আমাদের জাতীয় অবনতি যে যে রূপে প্রকাশ পায়, সেই সেই অবস্থা ও ঘটনা-নিচয়ন সকল যোগে কি না পোষে

নিলেন। তাঁর পর দেখলেন স্ত্রী-কাপুরুষতা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বিভিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় অবনতির সম্বন্ধ কি। এইরূপ নানা উপায়ে ভেবেচিন্তে, কষে, খাঁড়িপেতে হসন্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যথা :—

- ১। নারীর কাপুরুষতা একটি সত্তা।
- ২। এই সত্তার নানা প্রকার রূপ আছে, অর্থাৎ ইহা নানা কার্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।
- ৩। এই সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ কোথাও ইহা ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে প্রকাশ পায়।
- ৪। এই সত্তা ফল-প্রসূ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, ইহা দ্বারা ফলাফলের উৎপত্তি হয়।
- ৫। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও দোষ রূপে পরিগণিত হয়।
- ৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার বিস্তারিত জাতীয় দোষ প্রকৃষ্ট হয়।
- ৭। এই সত্তার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার প্রাবল্যের অনুপাতে কম বা বেশী দেখা যায়।
- ৮। এই সত্তা অবিদ্যমান নহে।
- ৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রধানতম কারণ।

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যে নারী-কাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদাহরণ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এছাড়া **Positively related**। হসন্ত-বাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে হঠাৎ উপনীত হলেন না, অনেক তর্ক মীমাংসা করে তবে এগুলি তিনি স্থির নিশ্চয় বলে প্রচার করলেন। প্রথমত তিনি “**The Nine Points of National Narcolepsy**” বলে একটি পুস্তিকা বের করে ফেললেন। এতে তিনি দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনো কিছুতেই সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটানা জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেতে পারে না, এই যে সর্বদা আমাদের জাতি মাত্র অর্ধ-জাগ্রত, এই যে আমাদের জাতি ছুখে দারিদ্র্যে নিরুন্ন হ’য়ে পড়ে

রয়েছে, এ সবার কারণ আমাদের নারীদের সাহসের অভাব এবং তৎপ্রসূত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির প্রভাব।

“**Hasanta's Nine Points**” শীঘ্রই ভারতব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। নানা জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ-নির্ধারণক এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচার নিয়ে মীটিং ইত্যাদি হ’তে আরম্ভ হ’ল। হসন্ত-বাবু চারিদিক থেকে কনগ্রাচুলেশন পেতে লাগলেন কংগ্রেসেও এই নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া প’ড়ে গেল। কয়েকজন নারীসভ্য তাঁদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উদ্ভস্তের মতো হ’য়ে পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। হসন্ত-বাবু যে হুচারখানা মারের ভয়-দেখান বেনামী চিঠিও না পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি সকলেই হসন্ত-বাবুর অকাটা **Statistics**এর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তাঁর লুপ্ত গৌরব ফিরে দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হ’তে লাগল। হসন্ত-বাবু প্রেস ও পাবলিককে জানালেন, যে, নারীদের আবার সাহসী ক’রে তোলবার একটা স্বীম্ তাঁর খসড়া করা আছে; আর্থিক সুবিধার আশা দেখলে তিনি সেটা **finally set up** করতে রাজি আছেন। এই আশা পাবামাত্র “**বীরপ্রসূ প্রসাবনী ভারত**” নামে একটি সংঘ যাত্রাজ্ঞ অঞ্চলে গঠিত হ’য়েটাকা তোলার কাজে উঠে প’ড়ে লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও তাঁর স্বীম্টাকে ঘসে মেজে ঠিক করতে লাগলেন।

(২)

হসন্ত-বাবুর স্বীম্টা ছিল খুবই ‘সিম্পল’ এবং সহজবোধ্য। হসন্ত-বাবুর যখন বয়স খুব অল্প তখন তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে কেপা কুকুরে কামড়েছিল। তাতে তাঁকে কাসোলি যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করে তিনি জলাতকের আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। পাস্তরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মাসুকের কোনো বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিশালিত্বের ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকস্মাৎ প্রয়োগ করলে মাসু

অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই বিষই যদি ক্রমশঃ তাকে সহিয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে তার অপকার ত কিছু হয়ই না, বরং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায়, যে, বেশীমাত্রায় ঐ বিষে আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা কুকুরের বিষ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে ঐ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎপন্ন করা হয়। বাল্যকালের এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবুর কাজে লেগে গেল। তিনি ভাবলেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎসা, তাহ'লে সর্কাতঙ্ক নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দূর করা যাবে না?

তার এক ভাগ্নের (বিভক্তির বড়ছেলে তর্কিত-কুমারের) বড় আঁধারের ভয় ছিল। হসন্ত-বাবু তাকে প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' আলোয় একটা ঘরে বন্ধ করে রাখলেন, তার পর আলোর 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একেবারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখলেন তর্কিতের অন্ধকারের ভয় আর নেই। এই একসপেরিমেন্টটা সফল হওয়ায় হসন্ত-বাবু আর বিলম্ব না ক'রে তার নারীজাতির ভয় দূরীকরণের স্ফাট্টা প্রকাশ ক'রে ফেললেন। তাতে তিনি লিখলেন, যে, অনেক গবেষণা ক'রে তিনি ভয় জিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, ১। শারীরিক ভয়, ২। মানসিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক ভয়; এবং দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প অল্প ক'রে ভয় সহ্য করিয়ে মানুষকে ক্রমশঃ 'ভয়শূন্য' ক'রে তোলা। যথা, শারীরিক ভয় দূর ক'রতে হ'লে ছারপোকাকার ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সহিয়ে সহিয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর ক'রতে হ'লে, একলা থাকা কিছা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও ঐ উপায়ে, 'মাষ্টার মশার রাগ করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে শুরু ক'রে, 'ভগবান বিমুখ হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে।

হসন্ত-বাবু ঠিক করলেন মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা Central Institute খুলবেন; সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম ভয় বিমুক্ত হবার জন্যে তাঁর তত্ত্বাবধানেই চলবে। তিনি একবার তাড়াতাড়ি মাস্ত্রাজ চল গেলেন। সেখানে "বীর প্রসুপ্রসবিনী ভারত সংঘ"র সভ্যরা তাঁকে একটা তুমুল-রকম "রিসেপশন" দিল; সকলে একবাক্যে হসন্ত-বাবুকে উক্ত সংঘের কৌটিকার প্রধান (Working President) মনোনীত করল; এছাড়া একজন সার্বপ্রধান (Vice-President) একজন সর্কার্থাধার (Treasurer), তেরজন স্রাম্যমান প্রতিভ (Travelling Agents), ও বিশ্লিষ্টজন নৈতিক কার্যনাযক (Members of the General Committee) নিযুক্ত হ'ল। হসন্ত-বাবু পরম উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শীঘ্রই অনেক হাজার টাকা তুলে ফেললেন। তার পর চার পাঁচ মাস ধ'রে খুব হৈ চৈ চলল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু এককথা—"বীরপ্রসুপ্রসবিনী ভারত"। সকলে শুধু "The Nine Points of National Narcolepsy" আওড়ায় ও বলে, "এইবার হসন্ত-বাবু জাতীয় অবনতির একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বেন না।"

(৩)

মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ী আর বাগান নেওয়া হ'য়ে গেছে। যারা নিচ্ছেদের মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্রে হসন্ত-বাবুর ৮প্তর গিজ্ গিজ্ করছে। Imperial Bank এ "বীরপ্রসুপ্রসবিনী সংঘ"র account বেশ ভারী হ'য়ে উঠেছে। এখন শুধু কাজ আরম্ভ হ'লেই হয়; হসন্ত-বাবু সংঘের কৌটিকার প্রধান হিসেবে কাগজে দুইজন সং, কর্মক্ষম ও বয়স্ক "মেট্রনের" জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেকে দঃপাল্ট করল এবং বহুস্থলে হসন্ত-বাবুর আবিষ্কৃত Honesty ও Efficiencyর Infallible Nose Test পাস ক'রে (নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হসন্ত-বাবু মানুষের চরিত্রবিচার ক'রতে পারতেন) দুইজন খুঁটখাবলধিনী মহিলা "মেট্রন" নিযুক্ত হলেন। অতি শীঘ্রই মধুপুরের বাড়ী ছাড়তে ত্বরপূর্ণ হ'য়ে উঠল। হসন্ত-বাবু তারাপদ

নিলেন। তাঁর পর দেখলেন স্ত্রী-কাপুরুষতা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বিভিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় অবনতির সম্বন্ধ কি। এইরূপ নানা উপায়ে ভেবেচিন্তে, কবে, খড়িপেতে হসন্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যথা :—

- ১। নারীর কাপুরুষতা একটি সত্তা।
- ২। এই সত্তার নানা প্রকার রূপ আছে, অর্থাৎ ইহা নানা কার্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।
- ৩। এই সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ কোথাও ইহা ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে প্রকাশ পায়।
- ৪। এই সত্তা ফল-প্রসূ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, ইহা দ্বারা ফলাফলের উৎপত্তি হয়।
- ৫। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও দোষ রূপে পরিগণিত হয়।
- ৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ প্রকৃষ্ট হয়।
- ৭। এই সত্তার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার প্রাবল্যের অসুপাতে কম বা বেশী দেখা যায়।
- ৮। এই সত্তা অবিনাশ নহে।
- ৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রধানতম কারণ।

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যে নারী-কাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদাহরণ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এছাড়া *Positively related*। হসন্ত-বাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে হঠাৎ উপনীত হলেন না, অনেক তর্ক মীমাংসা করে তবে এগুলি তিনি স্থির নিশ্চয় বলে প্রচার করলেন। প্রথমত তিনি “The Nine Points of National Narcolepsy” বলে একটি পুস্তিকা বের করে ফেললেন। এতে তিনি দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনো কিছুতেই সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটানা জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেতে পারে না, এই যে সর্বদ্যে আমাদের জাতি মাত্র অর্ধ-জাগ্রত, এই যে আমাদের জাতি ছুখে দারিদ্র্যে নিরুন্ন হ’য়ে পড়ে

রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীদের সাহসের অভাব এবং তৎপ্রসূত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির প্রভাব।

“Hasanta's Nine Points” শীঘ্রই ভারতবর্ষ ছড়িয়ে পড়ল। নানা জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ-নির্ধারণক এই বৈজ্ঞানিক অসুস্থত্বের বিচার নিয়ে মীটিং ইত্যাদি হ’তে আরম্ভ হ’ল। হসন্ত-বাবু চারিদিক থেকে কনগ্রাচুলেশন পেতে লাগলেন কংগ্রেসেও এই নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া প’ড়ে গেল। কয়েকজন নারীপড়া তাঁদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উদ্ভস্তের মতো হ’য়ে পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। হসন্ত-বাবু যে ছুচারখানা মারের ভয়-দেখান বেনামী চিঠিও না পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি সকলেই হসন্ত-বাবুর অকাট্য Statistics এর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তাঁর লুপ্ত গৌরব ফিরে দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হ’তে লাগল। হসন্ত-বাবু প্রেস ও পাবলিককে জানালেন, যে, নারীদের আবার সাহসী করে তোলবার একটা স্বীম্ তাঁর খসড়া করা আছে; আর্থিক সুবিধার আশা দেখলে তিনি সেটা *finally set up* করতে রাজি আছেন। এই আশা পাবামাত্র “বীরপ্রসূ প্রসাবিনী ভারত” নামে একটি সংঘ মাস্ত্রাজ অঞ্চলে গঠিত হ’য়েটাকা তোলার কাজে উঠে প’ড়ে লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও তাঁর স্বীম্টাকে ঘসে মেজে ঠিক করতে লাগলেন।

(২)

হসন্ত-বাবুর স্বীম্টা ছিল খুবই ‘সিম্পল’ এবং সহজবোধ্য। হসন্ত-বাবুর যখন বয়স খুব অল্প তখন তাঁর ঘুর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে কেপা কুহুরে কামড়েছিল। তাতে তাঁকে কাসৌলি যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তরের আবিষ্কৃত প্রণালী অসুস্থায়ী চিকিৎসা করে তিনি জলাতকের আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। পাস্তরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মাহুষের কোনো বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিশালতার ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকস্মাৎ প্রয়োগ করলে মাহুষ

অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই বিষয়ই যদি ক্রমশঃ তাকে সহিয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে তার অপকার ত কিছু হয়ই না, বরং উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায়, যে, বেশীমাত্রায় ঐ বিষয় আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা কুবুরের বিষয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে ঐ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎপন্ন করা হয়। বাল্যকালের এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবুর কাছে লেগে গেল। তিনি ভাবলেন, জলাভঙ্গ যদি চিকিৎসায়, তাহ'লে সর্কাতঙ্ক নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দূর করা যাবে না?

তাঁর এক ভাগ্নের (বিভক্তির বড়ছেলে তদ্বিত-কুমারের) বড় আধারের ভয় ছিল। হসন্ত-বাবু তাকে প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাণ্ডল পাওয়ার' আলোয় একটা ঘরে বন্ধ করে রাখলেন, তার পর আলোর 'ক্যাণ্ডল পাওয়ার' ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একেবারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখলেন তদ্বিতের অন্ধকারের ভয় আর নেই। এই একসপেরিমেন্টটা সফল হওয়ায় হসন্ত-বাবু আর বিলম্ব না ক'রে তাঁর নারীজাতির ভয়-দূরীকরণের স্কামটা প্রকাশ ক'রে ফেললেন। তাতে তিনি লিখলেন, যে, অনেক গবেষণা ক'রে তিনি ভয় তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, ১। শারীরিক ভয়, ২। মানসিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক ভয়; এবং দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প অল্প ক'রে ভয় সহ্য করিয়ে মানুষকে ক্রমশঃ ভয়শূন্য ক'রে তোলা। যথা, শারীরিক ভয় দূর করতে হ'লে ছারপোকাকার ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সহিয়ে সহিয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর করতে হ'লে, একলা থাকা কিম্বা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও ঐ উপায়ে, 'মাষ্টার মশার রাগ করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে শুরু ক'রে, 'ভগবান বিমুখ হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে।

হসন্ত-বাবু ঠিক করলেন মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য কোন স্থানস্থায়ক স্থানে একটা Central Institute খুলবেন; সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম ভয় বিমুক্ত হবার জন্যে তাঁর তত্ত্বাবধানেই চলবে। তিনি একবার তাড়াতাড়ি মাদ্রাজ চলে গেলেন। সেখানে "বীর প্রত্নপ্রসবিনী ভারত সঙ্ঘ"র সভ্যরা তাঁকে একটা তুমুল-রকম "রিসেপশন" দিল; সকলে একবাক্যে হসন্ত-বাবুকে উক্ত সংঘের কীর্তিকা প্রধান (Working President) মনোনীত করল; এছাড়া একজন সার্জপ্রধান (Vice-President) একজন সর্কার্থাধার (Treasurer), তেরজন আশ্রয় প্রত্ন (Travelling Agents), ও বিদ্যালয়জন নৈতিক কার্যনাযক (Members of the General Committee) নিযুক্ত হ'ল। হসন্ত-বাবু পরম উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শীঘ্রই অনেক হাজার টাকা তুলে ফেললেন। তার পর চার পাঁচ মাস ধ'রে খুব টে চলে চলল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু এক কথা—"বীরপ্রত্নপ্রসবিনী ভারত"। সকলে শুধু "The Nine Points of National Narcolepsy" আওড়ায় ও বলে, "এইবার হসন্ত-বাবু জাতীয় অবনতির একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বেন না।"

(৩)

মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ী আর বাগান নেওয়া হ'য়ে গেছে। যারা নিজেদের মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্যে ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্রে হসন্ত-বাবুর দপ্তর গিজ্ গিজ্ করছে। Imperial Bank "বীরপ্রত্নপ্রসবিনী সংঘ"র account বেশ ভারী হ'য়ে উঠেছে। এখন শুধু কাজ আরম্ভ হ'লেই হয়; হসন্ত-বাবু সংঘের কীর্তিকা প্রধান হিসেবে কাগজে ছুইজন সং, লক্ষ্যম ও বয়স্ক "মেট্রনের" জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেকে দরখাস্ত করল এবং বহুকষ্টে হসন্ত-বাবুর আবিষ্কৃত Honesty ও Efficiencyর Infallible Nose Test পাস ক'রে (নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হসন্ত-বাবু মানুষের চরিত্রবিচার করতে পারতেন) ছুইজন খুঁটখুঁটাবলি মনো মহিলা "মেট্রন" নিযুক্ত হলেন। অতি শীঘ্রই মধুপুরের বাড়ী ছাড়তে ভরপুর হ'য়ে উঠল। হসন্ত-বাবু তারাপদ

নামক একসুপেরিয়েন্ট্যাল সাইকলজি পাস একজন ছোকরাকে নিয়ে সেখানে সব বন্দোবস্ত করতে চলে গেলেন। ছাত্রীদের দৈনিক এবং বংশ ও জাতিগত কোনো অবস্থার জন্য তাদের মধ্যে ভয়ের প্রাচুর্য হইছে কিনা নির্ণয় করবার জন্য হসস্ত-বাবু তাদের বিষয়ে নানা প্রকার Statistics নিলেন। যথা তাদের মাথার মাপ, চুলের ও গায়ের রং, নাকের দৈর্ঘ্য, ত্বকের আকৃতি, ওজন, শরীরের দৈর্ঘ্য, ফোর আর্ম বাইসেপ্‌স্‌, চেষ্ট্‌, ওয়েষ্ট্‌ ইত্যাদির মাপ, তাদের দেহে কোথায় কোথায় তিল আছে, তাদের জাতি, গোত্র, পারিবারিক খবরাখবর, বাল্যকালে হাম হইয়েছিল কিনা, তাহারা অত্যধিক চা পান করে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাপদ বললে, অত data সে একলা “ক্লাসিফাই” ও “রেকর্ড” করতে পারবে না। হসস্ত-বাবু তাতে তারাপদের সাহায্যার্থে তিনজন বি-এ, ফেল কেরাগী নিযুক্ত ক’রে দিলেন।

তার পর আরম্ভ হ’ল প্রত্যেকটি মেয়ের Fear Survey অর্থাৎ তার কি কি প্রকার ভয় আছে এবং সেইসব ভয়ের প্রাবল্য কতটা ইত্যাদি। কাকর নামের পাশে হয়ত লেখা হ’ল physical, minimum—cockroach; mental minimum—darkness five candle; spiritual minimum—maternal uncle go away for ever, অর্থাৎ উক্ত বালিকার আরম্ভলা মাত্র দেখলেই ভয় হয়, অন্ধকারে এবং পাঁচ ক্যান্ডেল পাওয়ার আলো থাকলেও ভয় হয়, এবং মামা তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাবেন এইটুকু মাত্র আশঙ্কা হ’লেই ভয় হয়। অন্তান্ত সব মেয়েদের নামে এইরকম সকল জ’তব্য বিষয় লেখা এক একখানা কার্ড তৈরী হ’ল। সেগুলি triplicateএ “রেকর্ডেড” হ’ল।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হ’য়ে যাবার পরে হসস্ত-বাবু দেখলেন, যে, শারীরিক ভয় জিনিষটাই মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী এবং অধিকসংখ্যক মেয়েদেরই বাল্যকালে হাম হইয়েছিল এবং প্রায় সকলেই চা পান করে। হসস্ত-বাবু এর ফলে “বীরপ্রসূপ্রসবিনীসংঘে”র সভ্যদের মধ্যে বিস্তারিত হবার জন্য একটা “নোট” লিখলেন :—Physical Fear

and its probable Relation to infantile Measles and excessive Tea drinking.

এর পর তিনি সকলের জন্য “কটিন” তৈরী ক’রে দিলেন। Emil Cone আবিষ্কৃত Auto-suggestionএর নিয়ম অনুসারে এবং প্রত্যাহ দুই ঘণ্টা ক’রে “আমি বীরনাগী হব; ভবই হব” ইত্যাদি জপ করবার জন্য একটা গাথা তৈরী ক’রে দিলেন। মধুপুরের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড লেকচার ‘হল’ ছিল। সেখানে প্রত্যাহ মেয়েদের হসস্ত-বাবুর জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুনে হ’ত। প্রথম দিনকতক তিনি “ভয়” যে শুধু একটা negative অথবা অভাবাত্মক বা নেতিগর্ভ জিনিস সে সম্বন্ধে মেয়েদের ভাল ক’রে বোঝালেন। অর্থাৎ সাহসের অভাবই ভয়, অর্থাৎ সাহস নেই বলেই ভয় আছে, অর্থাৎ সাহস থাকলে ভয় থাকতে পারে না ইত্যাদি। এ কথাও বললেন, যে, ভয়টা নেতিগর্ভ বলেই তার থাকা-না-থাকার কোনো মানে হয় না, অর্থাৎ ভয় না থাকলেই সাহস আছে প্রমাণ হয় না, স্বতরাং না-ভয়-না-সাহসাত্মক এই যে একটা neutral বা নির্লিপ্ত বা অনির্দিষ্ট অবস্থা, প্রথমতঃ তাদের মনের মধ্যে সেই অবস্থাটা আনতে হবে, তার পর Positive Courage বা অস্ত্যাত্মক সাহস গ’ড়ে তুলতে হবে, ইত্যাদি।

এই প্রকার কথাবার্তা শুনিয়া মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসার জমি তৈরী ক’রে হসস্ত-বাবু একদিন কলিকাতায় চলে এলেন। উদ্দেশ্য প্রথম মাত্রা ঔষধের বন্দোবস্ত ক’রে মধুপুরে ফিরে যাওয়া ও যথারীতি চিকিৎসা সূত্র করা। দুই তিন রাত্রি জেগে অনেক ভেবে ও স্বামী অভ্যুত্থানের সঙ্গে অনেক পরামর্শ ক’রে হসস্তবাবু চিকিৎসার প্রথম মাত্রা হিসেবে মেয়েদের কি ভয় দেখাবেন তা ঠিক করলেন। খুব ছোটোখাট রকম ভয় দেখান হবে এটা ঠিকই ছিল, তবু ঠিক কি ভয় দেখান হবে সেটা হঠাৎ না ভেবে নির্ধারণ করা উচিত নয় বলেই এতটা দেয়ী হ’ল।

এই জিনিষটা ঠিক হয়ে যাবার দিন-চারেক পরেই হসস্ত-বাবু দুটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক নিয়ে মধুপুরে ফিরে গেলেন। কেউ জানতে পারল না যে, সেগুলিতে কি আছে। যেটনরাও না। পরদিন সকাল বেলা হসস্ত বাবু

মেয়েদের লেকচার 'হলে' হাজির হ'তে বসলেন। সিন্দুক দুটি আগেই সেখানে ঠিক মতো ক'রে বসান হয়েছিল। মেয়েরা সকলে এস। কিছু একটা মজার ঘটনা হবে ভেবে মেট্রন কাদখিনী ও স্মৃতিবালাও এসে বসলেন। 'হলে'র চারদিক বন্ধ। শুধু হসন্ত-বাবুর আসনের পিছনে একটা বড় ও আধ ভেজান দরজা। প্রথমত, মেয়েরা সকলে দণ্ডায়মান হ'য়ে বীরনারী হওয়ার গাথাটা সম্বন্ধে আকৃতি করুল। খণা—

বীরনারী গাথা

তারাপদ রচিত*

(দরদী আবেদন রায়ের সুরে)

তামিল তেলেগু অথবা বাঙ্গালী হইব রমণীবীর
পতিভাষ্যক ব্রাহ্মণ কেবট তুলিব উচ্চ শির—।

হায়, নহিক বীরের নারী

তাহে মোরা কি করিতে পারি—

নিজেরা সবলা হইয়া আমরা দু'রিব লাজ পতির—

(মোরা) মাথা খাড়া করি তুলিব দেশে লাজ অবনত শির।

স্বামী কাপুরুষ, কাপুরুষ পিতা, ভ্রাতা কাপুরুষ হোক—

বীর সন্তান গর্ভে ধরিয়া সৃষ্টিব নূতন লোক !

মোরা আনিব নূতনালোক

সখি তুল ভবে মিছে শোক—

এলায়িত চুলে কোমর বাঁধিয়া হও সবে সৃষ্টির—

নূতন শিক্ষা কর পস্তন উচাইয়া তোল' শির—।

ভাব জ্যোপদী Joan†তারাবাই আর বগিবিন্দীর‡কথা

Sanger দিদি উঠে লেগেছেন ঘুচাতে মোদের ব্যথা।

ভেঙে ফেল কৌণ দেহলতা

ধর পাদপের সবলতা ;

মহু পরাশর সোপেনহাউরে যে ভাবে ভাবুক পীর—

ভাদের রচিত শাস্ত্রে লাখিয়া তুলিব উচ্চ শির—।

মোরা'বীরনারী হব বীরনারী হব'অপে যাব অবিরাম ;

গম্ভীর নামে কাঁপাইব বীর-প্রসূ-প্রসবিনী-ধাম

মোরা পাড়াব আপন পায়ে—

নহে পুরুষের পদছায়ে ;

এ মহামন্ত্রে পরদা জেনানা ফেটে হবে চৌচির—

কয় হসন্ত কৃপায় বাহার উঁচা করিয়াছি শির—।

তার পর হসন্ত-বাবু তাঁর বেগুনে রেশমের চাদরটা একটু ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলেন, "আজ আমরা এখানে যে স্তম্ভ সমবেত হয়েছি সে একটা খুব উচ্চ আদর্শ নিয়েই। এই ঘটনা হয়ত প্রথম দর্শনে চমকপ্রদ নয়, কিন্তু এরই প্রভাব ভারত-ইতিহাসের অতি দূর ভবিষ্যৎ অবধি পৌছাবে। আপনারা সকলে একান্তমনে আন্দানের বীর-প্রসূ-প্রসবিনী সংঘের মহান আদর্শের কথা চিন্তা করুন ও 'আশুহাসিনী ভারতমাতা' গানটি সকলে মিলিয়া করুন। হসন্ত-বাবু এই উপায়ে মেয়েদের মধ্যে একটা অত্যন্ত ভাব জাগাচ্ছিলেন কেন না ভয় দেখান জিনিসটা আকস্মিকতার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। গান আরম্ভ হ'ল।

আশুহাসিনী ভারত মাতা

(স্বামী অত্যাচানন্দ রচিত)

(কবিবর গান্ধী আকাশ বিটুকেলের
"বিশ্রোহিণী ভৈরবী রাগিণী"তে গায়)

আশুহাসিনী ভারত মাতা—

অভাগা এ তো'র সন্তান দলে

মুখ তুলে চেয়ে হরবে মাতা'।—

একবার হাস মা

তুমি অনেক কেঁদেছে অনেক কেটেছ

স্বধ-নীরে একবার ভাল মা ;

হুখ নিশি ভোর হ'ল হ'ল ওই

চোখ চেয়ে একবার হাস মা।

ওমা

ভেঙেছে মোদের মোহ মায়া ঘোর

বুকে বেঁধে লব হাসি দেখে তো'র ;

স্নেহে দেখে নহ জড়িত-নয়না

নাহি শুধু তব ছিন্ন কাঁথা।

আশুহাসিনী ভারত মাতা।

* হসন্তের সেক্রেটারী

† Joan of Arc

‡ দীনবন্ধুবিজয়ের 'আমাইবারিক' বইখা

একবার হাস মা—
সেই পুরাণ-যুগের স্ববেশ-সাজে
দৈন্ত মোদের নাশ মা—
সেই হেম-বসন্ত রক্ত-ধবল
প্রাণ খোলা হাসি হাস মা ।

আপান হাসিছে হাসিতেছে চীন
রিফ্ হাসে হাসে তুর্কী নবীন
তুমি হাস মাগো বৃকতে তোমার
আর ইংরেজ পেষে না জাতা।
আশুহাসিনী ভারত মাতা ॥

মেয়েরা যখন অন্তরাতে এসেছে ও “প্রাণ খোলা
হাসি হাস মা” বলিয়া ভৈরবীতে ভারতমাতাকে

কিচ কিচ্ শব্দে ‘হল’ মুখরিত ক’রে প্রায় হাজার ধানেক
ছোটো বড় ইঁহর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। গানটাও
হঠাৎ থেমে গেল ।

তারপর যা দৃশ্য, তার বর্ণনা অসম্ভব। ভয়ব্যাকুল
মেয়ে সকলে সমন্বরে ইঁ..... ক’রে একটা বিকট চীৎকার
ক’রে উঠল। ছুচার জন দৌড়ে হসন্তবাবুর পিছনের দরজা-
টির দিকে চলল। তাদের দেখাদেখি বাকি সকলেই একটা
প্রবল বস্তার মতোই দরজার দিকে ছুটল। ঘরময় তখন
ইঁহরের ছড়াছড়ি। মেয়েরা এ ওর ঘাড়ে প’ড়ে, ও
পরস্পরকে স’রিয়ে, আগে পালাবার চেষ্টায় জামা কাপড়
ছিঁড়ে, নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হ’য়ে দরজার উপর গিয়ে
পড়ল। হসন্ত-বাবু একবার উঠে তাদের খাম্বাতে গেলেন,
কিন্তু সেই সর্বসংহারিণী বস্তার মুখে তিনি রেশমের জামা



Overdose ! Overdose !!

হাস্য করিতে আহ্বান করছে, এমন সময় হসন্ত-বাবু
একটা দড়ীতে সজোরে টান দিলেন। অমনি সিঁদুকের
ডালা ছুটি খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে

কাপড় সমেত কোথায় যে তুলিয়ে গেলেন, তা বোঝাই
গেল না।

কয়েক মিনিট ঘরে ঘেন ঝড় ব’য়ে গেল ; তার পর

বেশার ভাগ মেঘেরা পালিয়ে যাবার পর দেখা গেল, ঘরে অসংখ্য জীবিত, মৃত ও পদদলিত ইঁহর, ছুই একটি মুচ্ছিত মেয়ে, কয়েকপাটি জুতা ও কিছু চুড়ি বালা ও ব্রোচ। আর দেখা গেল, এক পার্শ্বে হসন্ত-বাবুর ধূলিমলিন ছিন্নবস্ত্র ভঙ্গ-চশমা-রূপ। তিনি সর্বাঙ্গে উঁচু 'হালে'র আঘাতে অর্জুরিত হ'য়ে বহুকষ্টে উঠবার চেষ্টা করছেন, শুধু মেট্রন কাদধিনী পলায়ন কালে তাঁর হাঁটুর উপর ব'সে পড়ায় ভক্তাত বেদনায় উঠতে পারছিলেন না। শেষে বহুকষ্টে তিনি হামাগুড়ি দেবার ভাবে আগুয়ে গিয়ে মনিব্যাগটা কুড়িয়ে নিলেন, তারপর খানিকক্ষণ কাতুকুতু আক্রান্তভাবে

ছটফটক'রে একটা ইঁহরকে ল্যাজ ধ'রে পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে টেনে বের ক'রে দূরে ফেলে দিলেন। তিনি হামা- দিয়ে ক্রমশঃ দরজার দিকে এগিয়ে চলে গেলেন ও বলতে লাগলেন, "Overdose, Overdose! ইঁহরটা না দিয়ে আরসুলাটা দিলেই ঠিক হত। খালি স্বামীজির কথায় এটা কবুলাম। এর evil effect দূর করতে এখন অস্ততঃ ছু সপ্তাহ লীগবে! তার পর আবার আরসুলা দিয়ে কাজ আরম্ভ করব। *Vulneratus, non victus!*"*

* বিকৃতমেহ কিন্তু বিকৃত নহে (ল্যাটিন)।



কাব্য-কথা

কবি ও কবিগণ

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

কাব্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় নাই—এইরূপ কথা পূর্বে প্রবন্ধে বলিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, কবি যাহা লেগেন তাহা যখন তাঁহার অন্তরতম অনুভূতির প্রকাশ, তখন কাব্যে কবি-মাত্মবটীর গূঢ় প্রকৃতির লক্ষণ কিছু থাকিবে বৈ কি। উত্তরে বলিব, কাব্যে কবি-মাত্মবটীর পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতির পরিচয় নিশ্চয়ই থাকিবে। প্রত্যেক কবির ভাব ও ভাবনার রূপটি কিছু স্বতন্ত্র—সত্য-সুন্দরের একটাব্যক্তিগত আদর্শও থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক কবির ভাষা ও ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু থাকে যাহা সেই কবির নিজস্ব। এই মৌলিকতাই শক্তিমানের লক্ষণ, এবং ইহারই মধ্যে কবির কাব্যগত বিশিষ্ট ব্যক্তি-পরিচয় ধুঁজিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা যে বাংলাভাষা পাইয়াছি, তাহার পূর্বে আর কোথায়ও ঐরূপ ভাষা ছিল না—সে একটি অভিনব রীতি, তাহাকে একটি নূতন ভাষা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। শেকস্পীয়ারের ভাষা আর কোনও রূপ হইতে পারিত না, প্রাচীন ভঙ্গিটুকু ছাড়িয়া দিলেও সে ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা যেন সাধারণ ইংরেজী ভাষা নয়—শেকস্পীয় ভাষা। ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিতে প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে। একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক কবির রচনা পাঠ করিলে ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে। ইংরেজীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলী উভয়েবই ‘স্কাইলার্ক’-পাখীর উদ্দেশে লিখিত কবিতা আছে—এই একই উপলক্ষ্যে দুই কবির কল্পনা দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ‘ভাজমহল’ লইয়া অনেক কবিই কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সকলেরই পরিচিত, এই সন্ধে আর দুই একজন কবির রচনা পাঠ করিলেই কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবশ্য এক্ষণে বিচারে ইহাও দেখিতে হইবে যে, তুলনাধীন কবিতায় কবির নিজস্ব কাব্য-

প্রেরণা পূর্ণক্ষুর্ভি লাভ করিয়াছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের ‘উর্ধ্বশী’ কবিতাটিতে সে যুগের রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবির সত্যোজ্ঞানাথ ঐ একই ছন্দে নিজ কবিজীবনের আরাধ্যা আদর্শ-দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। উভয় কবিতা হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ভাষার ভঙ্গি ও ভাবনার প্রকৃতি উভয়ের কত স্বতন্ত্র, উভয়ের কল্পনায় কত প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথের কল্পনা উর্ধ্বতম লোকে দেশকালের অতীত পরমরহস্যময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর বন্দনা করিতেছে—

যর্গের উদয়াচলে বৃষ্টিমতী তুমি হে উবসী
হে জুবনসোহিনী উর্ধ্বশি।
অগভের অপ্রথারে ধৌত তব তনু তনুমা
ত্রিলোকের হৃদয়কে আঁকা তব চরণ শোণিমা,
সুজবেশী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুতার।
অখিল মানসযর্গে অনন্ত রঞ্জিনী,
হে স্বপ্নসজ্জিনী।

—কবির অন্তর-বিশ্বে সৃষ্টিশতদলে যিনি বিরাজ করিতেছেন, এখানে আমরা তাঁহারই একটি রূপ দেখিতে পাই। সত্যোজ্ঞানাথ তাঁহার কাব্যালক্ষ্মীকে ‘মহাসরস্বতী’ রূপে কল্পনা করিয়া আরাতি করিয়াছেন,—

তুমোকে অমর-গর্ভে গুহ-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসাক্রা—ময়ূর-আসনা।
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী। মহাকবিকুলের জননী।
কখনো বাজাও বীণা, কতু দেবী। কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ধ্বাণ ;
হলবাহী কৃষকের ধরি’ হল কতু গাহ গান,—
পুলকি’ পরাণ।—
সর্ব-বিদ্যা-বার্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি’ উঠে গীতে।

* * *

লক্ষ কোটি চিত্তে এখানে অলক্ষিতে বিহর’ আগনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শধনি।

সমুদ্র সূক্ষ্মনা আর হিমালি 'অচলঠাট' বার
হে মহাতারতা দেবী। গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;
এন গো সত্যের উবা। অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ !
বীণাধনি-ঘটাংগোলে বুক হোক বুক রক্ত-রোষ
শব্দের নিধোষ ;
পুণ্যে কর বৃত্তাম্বরী গাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী !

এই দুই কবিতায় দুইটি বিভিন্ন কবি-প্রকৃতি স্পষ্ট
হইয়া উঠিয়াছে, উভয়ের কবি-স্বপ্নের আভাস গাঢ়
অনুভূতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতএব প্রত্যেক কবির কবিহিসাবে যে ব্যক্তিগত
বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার একমাত্র প্রমাণ তাঁহার কাব্য-
প্রকৃতির এই লক্ষণ। সৃষ্টির আর সকল বৈচিত্র্যের মতন
কবি-মানসও বিধাতার এক একটি বিচিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির
কিছুই নির্কিশেষ হইতে পারে না, তাই কবির যে অনুভূতি
দেশকাল পাত্রের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া স্ফুর্তি পায় তাহারও
একটি বিশেষ রং, বিশেষ রূপ ও বিশেষ ভঙ্গি আছে। যে
কবি-প্রতিভা নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত, তাহাই কতক
পরিমাণে দেশকালপাত্রের অধীন হইয়া কার্যকরী হয়।
মহাকবিগণের কাব্য-প্রেরণা যুগকে অতিক্রম করিয়াও,
সেই যুগের আশা-বিশ্বাস ধ্যান-বাণীকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন
করিতে পারে না। প্রত্যেক কবির স্বপ্রকৃতি, ও বহিঃ-
প্রভাব—এই দুই কারণে কাব্যের বৈশিষ্ট্য ঘটে। মনে
রাখিতে হইবে, এই বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতির, তথা আর্টের,
প্রধান গুণ। আবার, এ বিষয়ে প্রকৃতি ও আর্টের মধ্যেও
প্রভেদ আছে—সে কথা পরে। কবি-সৃষ্টির আলোচনায়
এই বৈশিষ্ট্যের কথাটাই ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।
সত্য বা আনন্দ নির্কিশেষ, অথচ বিশেষের মধ্য দিয়াই
যাহা কিছু রস-বিলাস। বিশেষ ও নির্কিশেষের মধ্যবর্তী
সেতুটি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা'র রহস্যটি
কাব্যসৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই 'দুই-এ-এক, একে-দুই' বা
বৈতর্ক্য-তত্ত্বটিই যে পরমতত্ত্ব, কবিকল্পনা তাহাই প্রমাণ
করে। সকল রূপের মধ্যেই যে রূপক রহিয়াছে—সর্ববস্তুর
যে apparent pictures of unapparent realities—
সকল উৎকৃষ্ট কবিতার ভাবব্যঞ্জনার তাহার ইঙ্গিত
পাওয়া যায়। কবিগণ, একটি বিশেষ ঘটনা, চিত্র বা চরিত্র

অবলম্বন করিয়াই, যাহা সার্বভৌম, সর্বজনীন ও নিরিশেষ
—যে আনন্দ কোনো তথ্যবিশেষের অধীন নয়, তাহাকে
প্রকটিত করেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বিশেষই,
নিরিশেষের অনুভূতিকে গভীরতর করে। শেকস্পীয়ারের
'হ্যামলেট' চরিত্র একটি বিশেষ সৃষ্টি, কিন্তু তাহার সেই
ব্যক্তিস্বই সর্বকালের সর্বজনীন মানবপ্রাণের একটি গূঢ়
রহস্যের প্রতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা-বধু' একটি
স্পষ্ট রূপক ; পড়িতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারি, এ বধু
কোন বধু ; নিখিল মানব-প্রাণের ধর্মচেতনার একটি
অপূর্ব অনুভূতি-রস এই বধুর মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
সে মূর্তি এতই পরিচিত, তাহার আকৃতি এতই সুস্পষ্ট, যে
ওই বিশেষের দ্বারাই নির্কিশেষ রস-রূপ আরও গাঢ় হইয়া
ওঠে।

এই যে বিশেষের কথা উল্লেখ করিলাম, কাব্যের এই
ধর্ম অনেকখানি কবির উপরেও নির্ভর করে। এক্ষণে
দেখিতে হইবে, কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কবিশক্তিকে কি
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

কবির গান করার সঙ্গে গাছের ফুল-ফোটারো যে
উপমা প্রায় দেখা যায়, তাহা নিরর্থক নয়। গাছের সম্বন্ধে
যেমন এইরূপ মনে করা চলে যে, ফুল-ফোটানো তাহার
স্বভাব, তাহার মধ্যে কোনো বিশেষ একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য
নাই—সেটি যেন স্বাভাবিক আনন্দের সৃষ্টি-ক্রিয়া, তেমনি
কবি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তথাপি গাছের যেমন
একটা স্বভাবগত নিয়ম আছে—যে গাছ যে ফুল ফোটার
তাহার বর্ণে, গন্ধে ও রূপে একটি বৈচিত্র্য আছে, কবির
কল্পনাতেও সেই রকমের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক
কবির নিজ নিজ কল্পনার গতি-প্রকৃতি এই কারণেই স্বতন্ত্র
—অর্থাৎ, স্বপ্রকৃতির বন্ধনই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের কারণ।
ফুলের উপমাটি এখানে খুব যথাযথ এইজন্য যে, ফুল যেমন
গাছের স্বপ্রকৃতিবশে একটি বিশেষ ফুল হইয়া ফুটিলেও
তাহার সম্বন্ধে কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্য কল্পনা করা যায় না—
তেমনি কবি স্বপ্রকৃতির নিয়মাবধীন হইলেও তাঁহার কাব্য-
সৃষ্টির মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টার ক্রিয়া প্রতিপন্ন করা
যায় না।

অতএব কবির বৈশিষ্ট্য বলিতে কাব্য-প্রেরণার

অন্তর্গত ব্যক্তি-বিশেষের মতামতের কথা আসে না। কবিগণের কল্পনায় একটা কবি-স্বপ্ন বা মনোগত আদর্শের লক্ষণ আছে, তাহাকে কবির মত-বিশ্বাস বা সজ্ঞান অভিপ্রায় বলা চলে না। প্রায় দেখা যায়, কবিধর্ম-সম্বন্ধে কবিগণের একটা স্বগত ধারণা কাব্যের মধ্যে নানা স্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্য-প্রেরণার পরিচয় মেলে। এগুলিকে ঠিক মত বলা চলে না—আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করার মতন একটা চেষ্টাই বলা চলে। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবার পূর্বে আমি কয়েকটি এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমেই শেকস্পীয়ারের সেই সুবিখ্যাত বচন—

The poets' eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth
to heaven,

And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

[দিব্যোন্মাদবৃত্তিতে কবি একবার স্বর্গ হইতে মর্ত্যে, আবার মর্ত্য হইতে স্বর্গে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করেন; তৎকালে কবির কল্পনায় যে অজ্ঞাতপূর্ব ভাবসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, কবির লেখনীমুখে তাহারা বেহ ধারণ করে—যাহারা বাস্তব শূন্য, তাহারা এই এক একটি নাম ও ধাম লইয়া স্থলগ্ৰহণ হইয়া ওঠে।]

—ইহার মধ্যে কবিধর্ম সম্বন্ধে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার গূঢ় অর্থ তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যেই আছে। ওয়াডসওয়ার্থের নিম্নোক্ত উক্তিটি তাঁহার কবিধর্মের পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করা যায়—

The moving accident is not my trade.
To freeze the blood I have no ready arts,
'Tis my delight, alone in summer saade
To pipe a simple song for thinking hearts.

[কোনওরূপ অঘটনঘটনপটীয়া কল্পনাচাতুরী আমার নাই; মানুষকে অভিভূত করিবার বিদ্যাও আমার আরস্ত নহে। রৌদ্রোজ্বল বসন্তদিনে প্রচ্ছন্নবনতলে বসিয়া, ভাবুক-জনের সমীপে ছইচারিটি সহজ সরল ছুর আলাপ করাই আমার বাসনা।]

যাহারা শৈলীর কবি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত তাঁহারা কবি সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি স্মরণ করিবেন—

He will watch from dawn to gloom
The lake-reflected sun illumine
The yellow bees in the ivy-bloom,

Nor heed nor see what things they be
But from these create he can
Forms more real than living Man,
Nurslings of Immortality !

[সরোবর-জলে সূর্য্যকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া আইভি-কুল্লের উপর পড়িয়াছে, সে আলোকে আইভি-কুল্লের উপর যে হলুদবর্ণ মোমাছিয়া বসিয়াছে তাহাদিগকে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে; যিনি কবি তিনি সারাদিন ধরিয়া মুকুন্দে তাহার পানে চাহিয়া থাকিবেন— কিন্তু তাহার দৃষ্টি ঠিক সেদিকে নাই, তথাপি তাহারই মাধুরী দিয়া তিনি যাহা বৃত্তি করিবেন—তাহা রক্তমাংসের চেয়ে বাস্তব, তাহাই শাস্ত ও মৃত্যুহীন।]

এই সঙ্গে কীটসের সেই Beauty-Truth (সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর)-বিষয়ক বাণী এবং উপরি-উদ্ধৃত শেকস্পীয়ারের বচনটি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই একই সত্য বিভিন্ন কবির কল্পনাদর্শে প্রতিফলিত হইয়া কেমন বিভিন্ন বোধ হইতেছে।

আমাদের কবিগণের মধ্যে বিহারীলালের উক্তি এইরূপ—

রহস্ত স্বপন-বালা খেলা করে মাখার তিতরে,
চন্দ্রবিধ স্বচ্ছ সরোবরে,
কবির দেখেছে তাঁরে নেণার নয়নে,
বোগীরা দেখেছে তাঁরে বোগের সাধনে।
* * *
ব্রহ্মার মানসসরে
কুটে চল চল করে
নীলজলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তার
হাসি' হাসি' ভাসি' যায়
বোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-বামিনী।

এই কবি-ভাষণ যে কবি-স্বপ্নের আভাস দেয় তাহা উক্ত কবির সম্বন্ধে কতখানি সত্য, তাহা বিহারীলালের কাব্যপাঠ করিলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিধর্ম সম্বন্ধে বহুবার বহু উক্তি করিয়াছেন, একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি'
পুষ্পের মত সন্ন্যাসগুলি
কুটাই আকাশতালে।
অস্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিকন
সংসার-ধুলিমালা।

করে, এমন বিবেচনা নিতাস্তই নিরর্থক। কবির যদি কোনও বাণী থাকে, তবে তাহা যুক্তি-বিচারের দাবী মিটাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত নহে; তাহা একটি অহেতুক—এমন কি অধৌক্তিক আনন্দের নিদান। এজন্য কবির যদি কোনও মত থাকে, কাব্যপাঠকালে সেই মতটিকে সম্মুখে না ধরিয়া, যদি আবশ্যক হয় কাব্যেরই আলোকে সেই মতের মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব হইবে না। দর্শন, বিজ্ঞান, বা নীতিশাস্ত্রের কোনও তত্ত্ব যদি কবির কবিতার মধ্যে উকি দেয়, তবে তাহারও তত্ত্ব হিসাবে কোনও মূল্য নাই—এবং সেই সকল মত যদি সৃষ্টিস্থিত না হয়—এমন কি সঙ্গতিহীন হয়, তাহা হইলেও কাব্যের কোনও ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের “হে বিরাট নদী” কবিতাটির মধ্যে একটি সুপরিচিত দার্শনিক চিন্তার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু এখানে তাহা কেবলমাত্র কাব্যপ্রেরণার আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এজন্য কবিতাটির রস-উপভোগের জন্ত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা অনাবশ্যক, এবং কবিকে কোনও একটি দর্শনপন্থার পথিক বলিয়া স্থির করা নিতাস্তই হাঙ্গুলকর। ইংরেজ কবি শেলীর কাব্যগুলিতে জ্ঞাননীতি, সত্য ও স্বাধীনতার উগ্র অহুত্বের মধ্যে যে মতবাদ রহিয়াছে, তাঁহার Prometheus Unbound কাব্যের মূলা সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহার Millennium-স্বপ্ন একটা স্বপ্নই, এই স্বপ্নের মূল্য এই যে, ইহা তাঁহার কবি-কল্পনার আহ্লাদিনী শক্তি—এই স্বপ্ন তাঁহার কল্পনাসমূহের একটি তরঙ্গ, এই তরঙ্গের আঘাতে কবিচিন্তা কতই না ছলিয়াছে! তাঁহার Epipsychidion-এর মূলে প্লেটোর যে তত্ত্বকথাই থাক, আমরা তাহা মুহূর্তের জন্ত বিশ্বাস না করিয়াও ঐ কবিতার অপূর্ণ কবি-প্রেরণায় মুগ্ধ হই। Adonais-এর শেষ কয়টি শ্লোকে যে নক্ষত্র-লোকের রাগিণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রবণ-কালে কোনও তত্ত্বকথা মনে আসে না। বরং, আবার তখনই যদি পড়ি—

On a poet's lips I slept
Dreaming like a love adept

ইত্যাদি,—তবে কবির কথায় আশ্রয় হই, কবির স্বরূপ দেখিয়া সকল আশঙ্কা নিরস্ত হয়।

অতএব কবিধর্ম বলিতে কবিস্বই বুঝিতে হইবে। কবির কোনও খেয়াল, স্বপ্ন বা মতবাদ যদি কাব্যের মধ্যে উকি দেয়, তবে তাহাকেও কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাকে কোনও বহির্গত নীতি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা কবির ব্যক্তি-ধর্ম হইয়া দাঁড়াইবে, কবিধর্ম হইতে পারিবে না। কবি-মাহুত্বটির সম্ভাৱন চিন্তায় যদিও তাহা একটি বিশেষ মতবাদের মত গুণিতে হয়, কবির দিব্যাহুত্বের ভাবাবস্থায় তাহা কবির একটি চিত্তবৃত্তি মাত্র।

তবে কি কবির কোনও নীতি-বিশ্বাস নাই? কবি কি ধর্মহীন? তাঁহার ভাবনার কি কোনও নিয়ম বন্ধন নাই? ইহার উত্তরে কবিকল্পনার স্বধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিবার—পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কোনও বিধি-সংস্কারের নিয়মাহুত্ববর্তিতা যদি ধর্মবিশ্বাসের লক্ষণ হয়, তবে কবির কোনও ধর্ম নাই। কবিচিন্তা এতই উদার, মুক্ত ও লীলা-প্রবণ যে, সাক্ষাৎ অহুত্বভিযোগে যাহা কিছু তাঁহার দিব্যাহুত্বের গোচর হয়—আনন্দের অব্যর্থ প্রমাণে তাহাই তাঁহার নিকট সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সত্য হওয়ার পক্ষে কোনওরূপ মতসামঞ্জস্যের আবশ্যক হয় না, একারণ তাঁহার কল্পনাপথে কোনও বাধা নাই। কবিধর্ম সম্বন্ধে কবির এই উক্তিই যথার্থ—

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা ;
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিন্তের স্থাপনা ;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি ভূণ, হই কুল কল,
জীব সাথে যদি কিরি ধরাভল
কিছুতেই নাই ভাবনা ;
বেথা বাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

কবির সঙ্গে কাব্যের যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্ত কবি-সৃষ্টির বৈচিত্রের নানা কারণ এবং সেই প্রসঙ্গে কাব্যকথায় বিশেষ ও নির্বিশেষের সংকীর্ণ আলোচনা করিয়াছি। কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্থে কবির মত-বিশ্বাস বলিয়া যদি কোনও প্রশ্ন উঠে, তবে তাহারও মূল্য

।কল্প, সে আলোচনা যথাসাধ্য করিয়াছি। তথাপি এই প্রসঙ্গে একটা দিক এখনো লক্ষ্য করা হয় নাই। কবি-প্রকৃতি বা কবিচিত্তের একটা অন্তরতর প্রবেশ আছে। কবিপ্রকৃতিতে একটা মূল প্রবৃত্তির প্রেরণা আছে বাহার গতি ভিন্নমুখী। এইবার সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া প্রবেশের উপসংহার করিব।

কবিত্ব বলিতে একটা সাধারণ ধারণাই সম্ভব, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কবিত্বের উৎস প্রধানতঃ দুইটি ধারায় প্রবাহিত। একই জগৎ সকল কালে সকল কবির সমক্ষে দৃশ্যমান, ভাবাবস্থার তন্ময়তাও সাধারণ কবিধর্ম। তথাপি কাব্যপ্রেরণার প্রবৃত্তি এক নহে। কবিচিত্তকে প্রকৃতির দর্পণ বলিলেও সেই দর্পণের গঠনভেদ আছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটি অহং যুক্ত হইলে সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে। এই অহং যেন অনেকটা মজিয়া যায় বলিয়াই রসাত্মকতা হয়। তথাপি কবিকল্পনায় সর্বত্র অহং-যুক্ত হইতে পারে না। বরং এক জাতীয় কাব্যে অহং-এর অতিরিক্ত প্রকারই কাব্য-প্রেরণার মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ কাব্যে কবির অহমিকা এতই তীব্র, কবির আত্মমোহ এতই প্রবল, যে সেখানে 'তন্ময়তা'র স্থলে 'মন্ময়তা'ই কবিধর্ম বলিতে হইবে। কল্পনা এখানে অন্তরমুখী, কবি এখানে আপনাকেই সম্বোধন করেন—এই জাতীয় কাব্যে কবির আপন অন্তরতম অনুভূতিই বিশ্বজনীন হইয়া উঠে; মাহুষের সঙ্গে মাহুষের যে হৃদয়গত আত্মীয়তা তাহারই রসে একটি গভীর সহমর্মিতার উদ্বেক হয়। এরূপ কাব্যপাঠে মাহুষের যে গূঢ়তম হৃদয়বৃত্তি ঘুমাইয়া আছে, তাহাই জাগ্রৎ হইয়া ওঠে। যাহা আমরাই অবস্থা, অথচ স্পষ্ট গোচর নয়—যে বেদনা ব্যাকুল করে, অথচ ব্যক্ত হইয়া উঠে না—যে সৌন্দর্যের আভাস পাই, অথচ দেখিয়াও দেখি না—মাহুষের সেই আত্মগত গূঢ় বাসনা এইরূপ অন্তর-সন্ধানী কবির কল্পনায় আত্মগত হইয়া ওঠে। তাই কবি বলেন—

নর অরণ্যে মর্মর-ভান তুলি,
যৌবন-বনে উড়াই কুহুম-গুলি,
চিত্তগাহার হৃৎ রাগিণীগুলি
নিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।

ববীন উবার ভরণ অরণ্যে থাকি'
গগনের কোণে বেলি পুলকিত আঁধি,
নীরব প্রহোষে করণ কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ার লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁধিজনল করে যবে
আমি তাহাদের গৈথে দিই স্নিগ্ধ-রবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি ক'বে
হৃদের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

আপনাকেই বিশ্বের কেন্দ্ররূপে উপলব্ধি করিয়া সেইখানে সৃষ্টির সকল রহস্যকে সাক্ষাৎকার করিয়া অপার বিশ্বয়ে অভিতূত কবির আত্মসুষ্ঠি সকল যুগের কাব্য-সাহিত্যেই অল্পবিস্তর আছে। কাব্যে কবিমাত্রেয়ই এই আত্মসুষ্ঠা অবশ্যস্বাভাবী; এবং এই কারণেই প্রায় কোনও কাব্যই সম্পূর্ণ 'আত্মহারা' হইতে পারে না। তথাপি,

পাগল হইয়া বনে বনে কিরি
আপন গন্ধে মন
কস্তুরী মৃগ মন—

এমন কথা সকল কবির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে না—আর একরূপ কবি-প্রবৃত্তিও আছে। অন্তর ও বাহির, কবি-মানস ও জগৎ, 'অহং' ও প্রকৃতি—এই দুইএর যুগপৎ লীলা কাব্যসৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। এছন্দ কাব্যবিচারে এই স্বন্দের একটি বা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব নয় বটে, তথাপি সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে এই যমজ প্রবৃত্তির মিলিত-ধারা গভীর-যমুনা-সঙ্গমের মতই পৃথক চিহ্নিত করা যায়। কোনও কবির কল্পনা বিশেষ করিয়া ভাবপ্রধান ও আত্মপন্থী, কাহারও কল্পনায় আত্মবিস্মরণী নাটকীয় প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই যেখানে কাব্যের মূল প্রেরণা, সেখানে বাহিরের ঘটনা বা বস্তুবিশেষের বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; কাব্যবস্তু যাহাই হউক, অন্তরের আবেগেই তাহা মহীয়ান, সেখানে ভাষা—বস্তুগত অর্থের গৌরবে নয়—গানের হৃদে রূপান্তরিত হইয়া কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আর এক জাতীয় কবি-কল্পনা আছে। তাহাতে কবি আত্মমুগ্ধ নহেন; আপনার অন্তর-কাহিনীর পরিবর্তে বহিঃসংসার, বাহিরের মানব-জীবনের রহস্য-বিশ্বয় কবি-প্রেরণার মূল কারণ। এই দুই রকমের কবিপ্রবৃত্তি কতকটা যুগপ্রভাবের অধীন

বটে, তথাপি ইহা কবিবিশেষের প্রকৃতিগত। বৈষ্ণব পদাবলী ও পরবর্তীকালের কথাকাব্যে (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র) আমরা কবি-প্রেরণার এই দুই মূল প্রবৃত্তি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই। আবার সন্ধান করিলে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইবে—যেখানে যুগধর্মবশে, তদানীন্তন প্রচলিত আদর্শের শাসনে কবির ধর্ম পীড়িত হইয়াছে; যাহার প্রেরণা গীত তাহা কাহিনীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহার প্রেরণা কাহিনী তাহাকে গানের ভঙ্গী স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই দুই ভিন্নমুখী কল্পনার বশে কাব্য-সাহিত্যে দুইটি পৃথক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি এই দুই পক্ষের নাম-করণে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। পূর্বেই বলিয়াছি, কাব্যসৃষ্টিতে এই স্বল্পের একটি লুকাচুরী খেলা চলিয়াছে দেখা যায়—কোনও কাব্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আত্ম সর্কষ বা সম্পূর্ণ বহিঃসর্কষ হইতে পারে না। যাহা কিছু বাহিরের তাহা কবির অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; আবার যাহা কবির নিজস্ব আবেগ তাহাও একেবারে বহিঃসম্পর্ক-শূন্য নহে। এতদ্বারা কবিকল্পনাকে মূলে একটি সাধারণ মানস-ক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়াও এইরূপ ভেদ নির্দেশ করা যায় যে, কাহারো প্রেরণা বহিমুখী, কাহারো বা অন্তর্মুখী; কোনও কবির কল্পনার প্রেরণা জোগাইয়াছে তাহার অন্তরের ভাবরাশি, কাহারও প্রেরণা আসিয়াছে বাহিরের রূপরাশি হইতে। কেহ বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবে আত্মসাৎ করেন, কেহ বা অন্তরের ভাবে বাহিরের রূপে প্রসারিত করেন। কেহ বলেন,

‘তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে’
কেহ বলেন,

“আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়
তোমায়ে করেছি রচনা।”

এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ কবি ও সমালোচকের মত * উদ্ধৃত করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিব।

* Encyclopaedia Britannicaয় Theodore Watts-Dunton লিখিত Poetry শীর্ষক প্রবন্ধে উইয়া।

উক্ত সমালোচক কবিকল্পনার এই দুই প্রবৃত্তির একটিকে Lyric বা Egoistic Imagination (গীতাত্মক, আত্মপরায়ণ) ও অপরটিকে Dramatic Imagination বা নাটকীয় কল্পনা নাম দিয়াছেন। নাম দুইটি ইংরেজী কাব্যসমালোচনায় বহু প্রচলিত। এই দুই জাতীয় কবি-কল্পনায় দুই ধরণের কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে তিনি যথাক্রমে Relative Vision বা আপেক্ষিক দৃষ্টি, ও Absolute Vision বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি বলিয়াছেন। ‘আপেক্ষিক দৃষ্টি’র অর্থ এই যে, ইহা একটা চশমার অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ যাহা দেখে, তাহাতে নিজের মনের রং অন্তর্নিহিত মাত্রায় থাকিবেই। ‘নিরপেক্ষ দৃষ্টি’ অর্থে স্বাধীন অবাধ দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। যাহারা নিছক গীতি-কবি তাহাদের এই আপেক্ষিক দৃষ্টিও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। যাহারা মহাকাব্য, কাহিনী বা নাটক-সদৃশ কাব্য রচনা করেন তাহাদের দৃষ্টিও আপেক্ষিক। এই দুই দলের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা একটি উপমার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাহারা গীতিকবি তাহাদের একটিমাত্র বর্ণ, এবং সেই বর্ণে একটিমাত্র সুর। অপর কবিগণের বর্ণ একটি বটে, কিন্তু সেই বর্ণে বিবিধ সুর খেলিতে পারে। জগতের প্রায় সকল বড় কবি—কল্পনা ও কাব্যভঙ্গি যাহার যেমনই হউক—সকলেই এই আপেক্ষিক দৃষ্টির অধিকারী। দ্বিতীয় প্রধান দল—যাহারা নিরপেক্ষ বা পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী— তাহাদের বর্ণ একাধিক, এবং সেই বহুবর্ণে বহুতর সুর বাজিয়া ওঠে। ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প; যুরোপীয় কবিগণের মধ্যে শেকস্পীয়ার, এক্সাইলাস্, সোফোক্লিস্, হোমার ও কতকটা চসারকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

গীতি-প্রাণ কবিদের মনকে ইনি বলেন যে, ইহাদের দৃষ্টি অপর সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, ইহারা অতিমাত্রায় আত্মসর্কষ—বাহিরের কিছুই ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; ইহারা যেন অন্ধ বলিয়াই গান করেন। এই সকল কবির বহিদৃষ্টি যত সঙ্কীর্ণ, অন্তর-রাজ্য ততই বিস্তৃত। ইহাদের গান বড় মিষ্ট, বড় করুণ ও স্বপ্নময়।

কিন্তু যাহাদের দৃষ্টি আপেক্ষিক হইলেও যথেষ্ট বৃহৎ ও উদার, জগতের সেই অধিকাংশ বড় কবির

শক্তি একটু স্বতন্ত্র। দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেন—
জগৎ সৃষ্টিতে প্রতিবস্তুই অপর হইতে বিশিষ্ট, কোনও
ছুইবস্তুই একরূপ নহে; কিন্তু আর্টের সৃষ্টিতে সকল
বস্তুই সাধারণীকৃত—সকলের মধ্যেই বিশেষ অপেক্ষা
সামান্ত লক্ষণই প্রবল। এই কবিগণের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে
ইহাই সত্য। ইহাদের কাব্যে ব্যাষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণের
পরিবর্তে তাঁহাদের মনোগত সমষ্টি-লক্ষণ প্রকাশ পায়;
অর্থাৎ নিজ নিজ ধারণা অল্পায়া একটা সাধারণ লক্ষণ
ফুটিয়া ওঠে। আমাদের প্রত্যেকের জগৎ যে এক-একটি
'অহং' কে কেন্দ্র করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেই 'অহং'
এর গভী ইহারা ভাবিতে পারেন না; স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু
যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মগত বস্তুনার সৃষ্টি, তাহারা যেমন স্বপ্ন-
দ্রষ্টাকেই ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিতে থাকে—সেইরূপ
তাঁহাদের সৃষ্টির আপাতগোচর বিভিন্ন "অহং" গুলি
সেই একই 'অহং' এর প্রতিচ্ছবি।

যাহাকে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ দৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা
একেবারেই আত্ম-সম্বন্ধ-শূন্য—সে দৃষ্টির যাহা সৃষ্টি
তাহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র; তাহাদের সামান্ত লক্ষণ
যেমনই হউক, এমন বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে,
তাঁহাদিগকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির মত স্বতন্ত্র ও নূতন
বলা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক দৃষ্টিও
এমন সৃষ্টি করে, যে হঠাৎ ভ্রম হয়—সে বুঝি
আপেক্ষিক দৃষ্টি নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টি। দৃষ্টান্তরূপ
সাগা-(Saga)-কাব্য হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ
করা যাইতে পারে। নাগিকার স্নাতৃষ্য তাহার স্বামীকে
হত্যা করিতেছে; তাহার স্বামীর পূর্নপ্রাণিনি, উপেক্ষিতা
অপর এক রমণী এই হত্যাকাণ্ডে তাহাদিগকে প্ররোচিত
করিয়াছে। হত্যাকাণ্ড হইয়া গেলে স্বামীর মৃতদেহের
উপর অবলুপ্তিতা রক্তাক্তকলেবরা নাগিকার মর্ষভেদী
আর্ন্তনাদ শুনিয়া, স্বারদেশে প্রতীক্ষমানা অপরা রমণী
হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি দেখিয়া হত্যাকারীদের মধ্যে
একজন তাহাকে বলিল,

“তোমার হাসি দেখিয়া ত মনে হয় না, যে তোমার কলিঙ্গার শিকড়-
ভাগে হাসিতেছে—তাহা হইলে তোমার মুখ এত পাণ্ডাশ দেখাইবে
কেন?”

চিত্রটি খুব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নাটকীয়
অবস্থায় যে কোনও ছুই ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথোপকথনই
সম্ভব হইত। এজন্য এখানে কবির দৃষ্টি সাধারণে আবদ্ধ,
বিশেষে নয়—ইহাও আপেক্ষিক দৃষ্টি, পূর্ণদৃষ্টি নয়।
এই আপেক্ষিক দৃষ্টির দূরীকৃত পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী মহাকবি
শেকস্পীয়ারের কাব্যে অনেক আছে—সে এতই চমকপ্রদ
যে সংসা তাহাকে পূর্ণদৃষ্টি বসিয়াই ভ্রম হয়, এবং তাহাকে
আর কোনও দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিলে সমালোচকের
বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের
দ্বিতীয় অঙ্কে লর্ড ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত উক্তি—

“রাজার নিহিত মুখ আমার পিতার মুখের মত না দেখাইলে,
আমি নিশ্চয় এ কাণ্ড (হত্যা) করিতাম।”

—মহাকবির অতি গভীর চরিত্রসৃষ্টির পরিচায়ক,
তথাপি এ লক্ষণ সাধারণ মানবচরিত্রের অন্তর্গত, এখানে
কোনও বিশেষ চরিত্রের পরিচয় নাই। সত্যসত্যই
একবার এক পান্দসীওয়াল। এক আরোহীর নিদ্রাবস্থায়
তাহার সঙ্গী চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আদা-
লতে যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক এইরূপ—“যদি উহার
ঘুমন্ত মুখ আমার বাপের মুখের মত না দেখাইত, তবে
উহাকে হত্যা করিতাম।” এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

পূর্ণ দৃষ্টির প্রেরণা অন্তরূপ। সে অবস্থায় কবির অহং
যেন নিষ্ক্রিয়; তাহার মনশ্চক্রে যে ভাবমূর্ত্তি ভাসিয়া
ওঠে তাহাই যেন দৈবশক্তিবলে তাহার বস্তুনা
চালিত করে—তাহার অতিরিক্ত বা বহির্গত কোনও
চেতনা তখন আর থাকে না। তাই কাব্যে যে
মূর্ত্তিটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার ব্যক্তিত্ব এত নিখুঁত,
এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, যে তাহার তুলনা সে-ই,—
তাহা যেন আর্ট নয়, স্বয়ং প্রকৃতি। পুত্র-হত্যা
আকিলিসের (Achilles) হস্ত চূষন করিবার সময়ে
হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের (Priam) মুখে যে আর্ন্ত
চাঁৎকার শুনি, সে যে-কোনও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতার
বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই এক মাত্র ট্রয়-রাজ প্রায়ামেরই
শোকোচ্ছ্বাস। ওই বিলাপভঙ্গী ঐরূপ অবস্থায়, কোপন-
স্বভাব, অবুঝ বৃদ্ধ লিয়ারের (Lear) মুখে মানায় না।
শেকস্পীয়ারের নাটকগুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য লওয়া যাক। হ্যামলেট এই প্রথম হোরোসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা দুর্গ-মধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকটা ক্ষণ্ড ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা এই অলৌকিক ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া হ্যামলেট বলিয়া উঠিলেন, “আমি যদি সে সময় সেখানে থাকিতাম।” ইহার উত্তরে হোরোসিও নিতান্ত প্রাকৃত জনের মতই বলিল, “তাহা হইলে আপনি খুব বিস্মিত হইতেন।” এইবার হ্যামলেট যাহা বলিলেন তাহাতে কি অপূর্ণ নাটকীয় কল্পনার পরিচয়!—বলিলেন, “খুব সম্ভব, খুব সম্ভব,—বেশীক্ষণ ছিল কি?” শ্রেষ্ঠশক্তির অধিকারী ব্যতীত আর কোনও কবির রচনায় এখানে কি দেখিতাম? যে ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দশটা নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হওয়া অপেক্ষাও বৃহৎশকারী, তাহারই সম্পর্কে হোরোসিওর এই অতি ক্ষুদ্র কথা শুনিয়া হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতেন, “কি বলিলে? বিস্মিত হইতাম।” তার পর ইহা যে তাঁহার পক্ষে কতখানি বিস্ময়কর সেই সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন—কবি-প্রেরণার দিব্য-শক্তি তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, হ্যামলেটের মত চরিত্রের অন্তর-নিকর ভাবাবেগ ব্যক্ত করিবার ভাষা জুটিল না—তাই একরূপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আশ্চর্য-গত পরিহাসের ছলে কতকটা মনে মনেই বলিয়া উঠিলেন, “খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।” এক হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই একরূপ অবস্থায় এইরূপ উত্তর। এমনভাবে দিতে পারিত না।

অতএব কবি-প্রেরণার এই গুণ একটি বিশিষ্ট গুণ বটে। কেবলমাত্র রসবিচারে কাব্য-প্রেরণার এই প্রভেদ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু কবিকে যদি কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন হয়, যদি কবি-প্রেরণার বৈচিত্র্য বা কবি-শক্তির তারতম্য তুলনায় বিচার করিতে হয়, তবে এই Absolute Vision বা নিরঞ্জন কবি-দৃষ্টির কথা বিশেষ করিয়া আলোচনার যোগ্য। কারণ, সত্যকার সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, যে সৃষ্টি-প্রেরণার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মের “এক আমি বহু হইব”—এই কামনা,—সেই সৃষ্টিশীলতার আনন্দ এই পূর্ণ দৃষ্টিতেই

সম্ভব। কবি যখন আপনার সম্পূর্ণ বহির্গত, অথচ সৃষ্টি-রহস্যের অল্পগত কিছু সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা একটা বিশেষ কিছু, অর্থাৎ সত্যকার সৃষ্টি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাঁহার কল্পনার লীলা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চরম কবিশক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। পূর্ক প্রবন্ধে সাহিত্যকেই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই সত্যকার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে কবির যে দিব্যাত্মত্বের প্রমাণ পাই তাহাই পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের লীলা। এইরূপ সৃষ্টি করার শক্তিতে সৃষ্টি রহস্যভেদের যে পরিচয় আছে—উৎকৃষ্ট নাটকীয় শক্তিতেই তাহা সম্ভব, সে যেন সেই অন্তর্ধ্যামী আদি পুরুষের মত। কবিদৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করে, ঠিক সেইটির অস্তিত্ব যেন তৎপূর্বে ছিল না—তাহা যেন ‘airy nothing’; কিন্তু তাহাই যখন কবি-কল্পনার নাম ধাম লইয়া শরীরী হইয়া উঠিল, তখন সে আর অসম্ভব বা অসত্য নহে, বিশ্বশিল্পীর স্বহস্ত-রচিত কীর্তি-বিশেষের মতই তাহা বিশিষ্ট, ভাবস্ব ও বাস্তব। এই আশ্চর্যরূপে দৃষ্টিই যে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের নিদান, আপনা হইতে আপনার বাহিরে দাঁড়াইবার শক্তিই যে সকল রহস্যভেদের শক্তি—এ অবস্থায় যে ঘূর্ণিতে হয় না, খুঁজিতে হয় না—সব ‘দেখিতে’ পাওয়া যায়—সে কথা কবি নিজেও বলিতেছেন—

গুরে মন আর তুই সাজ কলে আর,
মিছে কি করিস নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিসু যদি বাহিরেতে আর
খেলা ছেড়ে আর খেলা দেখিতে।
ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই চাসু যদি ভেদিতে
মিছে না কিরিসু নাট-বেদীতে।
নেনে এসে ঘুরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
বিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি বুঝিবি,—

দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমি কবির দিব্যাত্মত্বকে পূর্ণমানবতার লীলা, এবং কবিধর্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি।



শ্রী সজনীকান্ত দাস

চামড়ার সাহায্যে দেখা—

প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক জিন লাভাডি প্রথম জীবনে কতগুলি অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তাহাদের অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করিতেন। তন্মধ্যে চোখের উপর পুরু পর্দা বাধিয়া দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও সমস্ত দেখিতে পাওয়া একটি। কিন্তু পরে তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে এই সমস্ত বাস্তবিক



চামড়ার দৃষ্টিশক্তি ; লাভাড়ির পরীক্ষা

প্রত্যেকেই জুয়াচোর। তিনি এতাবৎকাল ওই ধরণের সমস্ত বাপারকেই জুয়াচুরী মনে করিয়া আসিতেছিলেন তাই সম্প্রতি যখন শুনিলেন যে প্যারিসে মাদাম নি—এক দল ডাক্তারের কাছে চোখে কাপড় বাধা অবস্থাতেই যে কোনো জিনিষ বা লেখা দেখিয়া বা পড়িয়া বলিয়া দিয়াছেন তখন তিনি সেই মহিলাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঠক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং অবশেষে নিজেই তাহাকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন।

তিনি খুব সাবধানে মেয়েটির চোখ বাধিয়া খুব অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া একটি কালো বাস্তব জিন্স বৈদিক ক্যালেন্ডারের একটি পাতা হিঁড়িয়া লইয়া নিজে না দেখিয়াই মুঠা করিয়া ধরিয়া মেয়েটিকে বলিলেন 'কি দেখেছ ?'

মেয়েটি বলিল—'দিন ক্যালেন্ডারের একটি পাতা, ২২ শে জুলাই। লাভাডি নিজে কাগরখানা দেখিয়া চমকিত হইলেন। তাই বটে।

তৎপর আরো নানা প্রকারের অল্প পরীক্ষা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন যে মূর্খের চামড়ারও দৃষ্টিশক্তি আছে। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের অল্পদূরত্বে নিবাসী ১১, ১৩ ও ১৯ বৎসরের ছিনটি মেয়েকে লইয়াও ওই ধরণের নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহারা এইরূপ অস্বাভাবিক পড়া পড়া করিয়া বই পড়িতে পারে, যুক্ত যুক্ত পড়াতে পারে, তিনিযেব রঙ ও বলিয়া দেয়। শংখের ছবিতে ওই মেয়েদের একটিকে লাভাডি পরীক্ষা করিতেছেন তাহাই দেখান হইয়াছে। মেয়েটির সামনে উঁচু হ একটি ছবি বা লেখা ধরিয়া রাখা হইয়াছে ও আলোকরশ্মি মেন ছবি হইতে বাহাতে কিছু তই বাস্তবিকর চক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাবও ব্যবস্থা আছে। অথচ মেয়েটি ওই অস্বাভাবিক ঠিক ঠিক সব বলিয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া উহা সম্ভব হইল ?

লাভাডি মনে করেন সম্ভবতঃ চক্ষু বাতীত মানুষের মূর্খের চামড়ারও দৃষ্টি শক্তি আছে। তবে কপালের চামড়ার শক্তিই বেশী।

কোনো জিনিষ দেখিবার সময় মেয়েগুলি অধিরক্ত মনোযোগ দিতেছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল ও উহার পরই তাহারা লবণ হইয়া পড়িয়াছিল। আরো একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চক্ষু দৃষ্টিতে আলোক রশ্মি যেমন সোজাসুজি কাজ কবে চামড়ার দৃষ্টিতে ঠিক যেন তার উল্টা ভাবে কাজ হয়। লাভাডি মনে করেন চামড়ার মধ্যে বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো দেখিবার অঙ্গ নাই তবে হইয়া জিনিষ হইতে আলোক রশ্মি চামড়ার উপর কাধা করিয়া মস্তিষ্ক তাহার অস্বভাবিক চন্দ্রায়। এ সম্বন্ধে তিনি আরো অনুসন্ধান করিতেছেন।

অদ্ভুত কাজ—

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে কেরাণীপিরি ভাড়া কোনো কাজ আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহার কারণ আসলে কাজের অভাব নহে আমাদের জীবনীশক্তির অভাব। যাচারা সত্য সত্যই বৈচিত্র্য আছে সেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞান-বলে পৃথিবীকে কয়লায় পরিণত ফেলিয়াছে। তাহাদের কাজের অভাব কখনো হয় না। কত পুস্তক অল্প কাজ করিয়া যে তাহারা জীবিকার জোগাড় করিতেছে দেখিলে বিশ্বাস হইতে হয়। কেহ বরফের পাতী তৈয়ারী করিতেছে, কেহ সারাটা জীবন কেবল মাছ ও পাখী ধরবার চারাই তৈয়ারী করিতেছে, কেহ বা কলকারখানার চিম্বীর ধোয়ার রঙ ইত্যাদি দেখিাই অর্ধোপার্জন করিতেছে। পাণের ছবিটি জার্মান নাবিক কাপ্তান এইচ ওয়ালের। তিনি নাবিক পৃথিবীর



কুমীর-পোষা

মধ্যে একমাত্র লোক যিনি কুমীর বশ করিতে পারেন। তাঁহার পোষা এই কুমীরগুলি শুধুই তাঁহার কারবার।



দাঁতের জোরে শিকল ছেঁড়া

অমানুষিক শক্তি—

চুই একজন ওস্তাদ শক্তি সম্পন্ন লোকের কার্য-কলাপ দেখিয়া মনে হয় 'হগবান মানুষের শক্তির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। মানুষ



হাতের জোরে পেরেক পোঁতা

সাধনা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। পাশের চনি দুইটি মানুষের এই অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। প্রথমটি একটু কসাকের ছবি; তাঁহার নাম এ, এস্ জ্যাস। তিনি কাছে থাকিলে হাতুরি দরকার হয় না। তাঁহার শক্তি এত বেশী যে এক হাতে ৫৬ মণ ওজনের কাঠের বরণা ধরিয়া অস্ত্র হাত দিয়া পাথরের জোরে তাহাতে বড় বড় পেরেক আনুল বসাইয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয় ছবিটি বেন ডারই নামক এক ভ্রমলোকের। তিনি দাঁত দিয়া লোহার শিকল কাটিয়া দিতে পারেন।

কুকুরের শিক্ষা—

আমাদের দেশে জীব জানোয়ারকে বিশেষ বহু করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে গাছপালা মহিষ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পশুদেরই যথোপযুক্ত বহু নেওয়া হয় না; কুকুর বিড়াল ঘোড়া প্রভৃতি সখের জন্ত ত দূরের কথা। অথচ আমরা নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় এই সব পশুদের বাধ দিয়া এক মুহূর্ত চলিতে পারি না। যে গরু মহিষ প্রভৃতি পশুদের আমরা প্রতিদিন নাড়া চাবে দোহন করিয়া থাকি তাহাদেরই প্রতি আমরা কতদূর কৃপাপূর্ণ যে-কোনো বাড়ীর গোরালঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায় গোরালঘর আবর্জনার বেন আঁতাকুঁড়, অথচ একটুকু বহু করিলেই সে সব নিরীহ প্রাণী আগাদের দ্বিগুণ উপকার সাধন করিয়া থাকে। সে কথা আমরা নিজেগাই নিজেদের বহু করিতে শিখি নাই। আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন বেবন্দোবস্ত যে মনে হয়

কোনো রকমে টিকিয়া থাকিলেই আয়ত্ত্য সম্ভবে। এই টিকিয়া থাকা বাপারটাই যে কত স্থল্লর ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় বিদেশী যে-কোনো জাতির দিকে চাচিলেই তাহা স্থল্পষ্ট বুঝা যায়।

ঘোড়ার মত কুকুরও আমাদের দেশে জনসাধারণের সাধারণতঃ প্রিয় নহে। সুতরাং এই দুইটি প্রাণীকে যুক্তকালে শিক্ষা দিয়া কাজে খাটানার ব্যবস্থাও এখানে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যে দুই চারিজন লোক কুকুর পুষ্টিয়া থাকেন কুকুরকে নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া নানাভাবে কার্যোপযোগী করিবার চেষ্টা উহার করেন না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কুকুরকে নানাবিধ কৌশল শিক্ষা দিয়া বহু শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। সে দেশে ব্যক্তি বিশেষের পোষা কুকুরগুলিই যে শুধু শিক্ষালভ করে তাহা নহে সর্বসাধারণের হিতকর কাজেও এই জন্তুকিকে লাগান হয় এবং রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খল রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইতে হইলে ইহাদিগকে প্রভূত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহারাই চোর ডাকাতি ধুনে প্রভৃতির ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে পুলিশের একমাত্র সহায়ক। অবশ্য সকল জাতীয় কুকুরই যে এই কার্যের উপযুক্ত তাহা নহে। তবে 'ব্লাড হাউণ্ড' জাতীয় কুকুরই এই কার্যে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী। এতদনাতীত 'ইংরেজী এয়ারেডেল' কুকুর (airedales) : নানা জাতের উদ্ভোগ্যীয় মেস কুকুর, 'টেরিয়ার' কুকুর প্রভৃতিও যথেষ্ট কার্যোপযোগী। যেটি কথা এই কাজের জন্য প্রচুর বুদ্ধি ও বিচার শক্তি ও স্রাণ-গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োজন। জার্মানিতে পুলিশের কার্যে 'এয়ারেডেল' ও 'ডবার-মান পিনসার' নামক একজাতীয় কুকুর নিযুক্ত করা হয়। লসএঞ্জেলস (আমেরিকা) এ পুলিশের কার্যের জন্য ১০টি আলসেট্রিয়ান কুকুর ২০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে। নিউইয়র্কে পূর্বে একপাল শিক্ষিত 'ব্লাডহাউণ্ড' কুকুর ছিল। পরে বেলজীয়-মেসকুকুর তাহাদের স্থান অধিকার করে। তবে বিশুদ্ধ ব্লাডহাউণ্ড প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কাণগুলি লম্বা এবং রক্তিমাত চকু সর্বত্রই জঙ্গ জঙ্গ করে। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহার আশামীর পলায়ন-পথ সমস্ত সন্ধান আবিষ্কার করিতে পারেই— দুই চারিদিন পরেও স্রাণ শক্তির জোরে ঠিক পথ বাহির করিয়া লয়। ইহাদের অধ্যবসারও অসাধারণ। ব্লাডহাউণ্ডের বংশগত ইতিহাসও পাওয়া গিয়াছে। 'বিজরী উইলিয়ামের' সঙ্গে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে ইহাদের আনয়ন হইয়াছে। সাদা ও কালো ভেদে ইহার দুই জাতের হইয়া থাকে। আমেরিকার ব্লাডহাউণ্ড এই কালোজাতের। তবে আমেরিকার ব্লাডহাউণ্ড এখন আর খাঁটি ব্লাডহাউণ্ড নহে। আমেরিকার এই জাতীয় কুকুরকে পুরাপুরি অংহিস করিয়া তোলা হয় না। প্রয়োজন হইলে তাহারাই দাঁত ও নখের বাহাতে উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

ব্লাডহাউণ্ডের থাকিবার জায়গা বাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়। এই বাবদে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয়। একটি শিক্ষিত পূর্ণ বয়স্ক কুকুর কিনিতে অন্ততঃ ২০০০ টাকা লাগে, কুকুর রাখিবার খরচও সামান্য নয়।

যে রূপ অকৃত্ত প্রভূতপন্নমতিত্ব ও অধ্যবসারের সহিত ইহার আশামীকে খুঁজিয়া বাহির করে দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহার ব্যবহৃতঃ অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত কিন্তু শিকারের সন্ধানে যখন বাহির হয় তখন ভীষণ মূর্ছিত ধারণ করে। মানুষের পথ চিনিতে ইহার ওস্তাদ। একবার খালি শিকারের গায়ের গন্ধের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেই হইল— বাস, আশামী বেচারীর আর নিশ্চয় নাই, তাহার নিজের গৃহ ও আর তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। ঘটনার দুইচারি দিন অতীত হইবার পরও যদি অনুসন্ধান হয় হয় তবু এই অকৃত্ত জানোয়ার অত্যন্ত স্রাণশক্তি-প্রভাবে ঠিক পথ চিনিয়া বাইবে। হরত আশামীর পলায়নের পর বয়স্ক পড়িয়া পথঘাট আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কত গাড়ী ঘোড়া লোকজন সেই পথে

যাতায়াত করিয়াছে তবু এই ভীষণ পবাস্ত হয় নাই, নাকটি প্রায় ভূমি-সংলগ্ন করিয়া পাহাড় পর্বত তেজ করিয়া প্রকৃত্তিনন্ত ক্ষমতা-প্রভাবে ইহার প্রভুর কার্যোদ্ধার করিয়া দেয়। মাঠ শস্তক্ষেত্র, বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া যেপথে খুনি বা চুহা চলিয়া গিয়াছে ঠিক সেই পথ ধরিয়া ইহার অগ্রসর হয়—আশামী যেখানে গাড়া কিছু ব্যবহৃত জিনিস পরিত্যাপ করে চিনিয়া লয় এবং এ দিক ওদিকের মাটি খুঁজিয়া আবার গন্ধানুসরণ করিয়া চলে। আশামী যদি কোনো স্থানে রেলগাড়ীতে চড়িয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে ইহার যেখানে সে গাড়ীতে আরোহন করিয়াছে সেখান পর্যন্ত ঠিক লইয়া যায়। মোটেই উপর এই কুকুরবাহিনী রাখাই হয় শুধু পথের সন্ধান দিয়া বহু ; আশামী কোন পথে গিয়াছে সেটুকু পথের ইহার সঠিক জানিয়া দেয় তার পরের কাজ মানুষ-পুলিশের।



কুকুরকে বনুকের মাওরাজে অভ্যস্ত করান হইতেছে

মতীর স্রাতি কিম্বা অতি প্রভূবেই ইহার ভাল পথ চিনিতে পারে কারণ সেই সময়ে নানা কারণে গন্ধটি হারাষ্টয়া যায় না। ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর লইয়া বাহির হইয়া পড়িলে আশামীর পথ-নির্দর্শক গন্ধটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। গন্ধ টাটকা থাকিতে থাকিতেই অতি সহজেই কার্যোদ্ধার হইয়া যায়।

এই শান্তিরক্ষা-কার্যের উপযোগী করিবার জন্য এই কুকুরদিগকে প্রচুর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিকার ব্যবস্থা পূর্ব সহজেই আয়ত্ত হইয়া উঠে না ; অনেকদিনের অনেক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। অবশ্যই তাহা নানা প্রকারের শিকার ব্যবস্থা আছে। বন জঙ্গল পাহাড়, শস্তক্ষেত্র, বয়স্ক, রাজপথ প্রভৃতিতে গন্ধানুসরণ করিবার জন্য নানারকমের শিক্ষা লইতে হয়। কুটপাতে গন্ধ ধরিতে পারাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ; সেইজন্যও বহুদিন শিক্ষা করিতে হয়। বাহাতে আভ্যন্তরীণ বনুকের মাওরাজে শুদ্ধকাইয়া



জার্মান পুলিশ-কুকুরের কুচকাওয়াজ

না বার সেচক্ৰ বন্ধকর আওতাধীন স্তম্ভিত্ত করান হয়। পার্শ্বের চবিদানিতে দার্দানীতে কিক্রপে বন্ধকের আওতাধীন অস্তম্ভিত্ত করা হয় তাহাই দেখান হইল। ইহা ছাড়া কুকুরদের যথারীতি সৈক্ৰ ও পুলিশ প্রক্ৰীমর স্তম্ভিত্ত কুচকাওয়াজদিও করিতে হয়। দ্বিতীয় চিত্রে জার্মান পুলিশ কুকুরদের মানুষদের মত কেমন ড্রিল করিতে হয় তাহা দেখান হইল।

বিচ্ছিন্ন এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর কুকুরদের পরীক্ষা লওয়া হয়। যাহারা পানমাঝা পায় তাহাৎসিক্রকে দায়িত্বজনক কাছের তার দেওয়ার হয়। জনসাধারণের শাস্তি-রক্ষার অধিকার ইহারা তখন প্রাপ্ত হয়। কোনো জার্মানি পোড়িত লোক পথে পড়িয়া থাকিলে কিংবা বরকের মধ্যে মরিয়া থাকিলে ইহারা যথারীতি সাহায্য ও বাবস্থা করে; আসামী ধরাইয়া দেয় ও নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। ইউরোপের কাটিং-স্টে কুকুর-পুলিশ দুইভাবে কাৰ্য্য করে; এক ছুঁইয়া শাসক ও শাসিতরক্ষক ইহাও এবং পলাতক আসামীর পথ নির্দেশকরূপে। শাসন কাৰ্য্যে সে তাহার পুলিশ-প্রভুকে সঙ্গে পশীং দ্বায়ে জনশূক্ৰ পার্ক, উচ্চান, ও পথে যুঁইয়া বেড়ায় এবং সন্দেহজনক কিছু আশ্রম পাইলেই নিঃশব্দে তাহার প্রভুর পোচর করে। চোর বদমায়েস স্তম্ভিত্ত প্রভুতিকে শাসিত্তা করিতে ও জনশূক্ৰ স্থানকে সাধারণের পক্ষে নিরুপজ্জব করাই ইহার কাজ; পলাতক আসামীর পশ্চাচ্ছাবকরূপে আসামীকে ধরিয়া দেয় কিংবা ধরিয়া দিতে সাহায্য করে। জার্মানীতে ও বেলজিয়াম এই সব শিক্ষিত কুকুরের মুক-সাম্য আদারতে গৃহীত হয়।

এই সব কুকুরকে পালকেরা যথেষ্ট আদর দিয়া থাকে। কচিং ইহাদের চক্ৰ চাবুক ধরিতে হয়। ইহাদিগকে অতি গোপন কুকুরশালার রাখা হয় যাতে অধিক মানুষের সহিত পরিচয় হইয়া মানুষ-সন্ধানের ক্ষমতা বিলুপ্ত না হইতে পারে সেদিকে নজর রাখা হয়।

এই কুকুর গোয়েন্দারা বর্তমানে মানুষের বহু উপকার করিতেছে। মৈনন্ডিন সংবাদপত্রে কুকুরের সাহায্যে চোর ডাকাতি প্রভৃতি ধরার কথা

প্রায়ই পাওয়া যায়। বিগত মহানুদ্ধের সময় সময়ক্ষেত্রেও শিক্ষিত কুকুরেরা নানা ভাবে সৈক্ৰদের সাহায্য করিয়াছিল।

বোতলের শক্তি পরীক্ষায় হাতী—

সম্প্রতি এক ভারী কৌতুকবহু উপায়ে কাঁচনির্মিত বোতলের শক্তি পরীক্ষা করা হইয়াছে। একটি কাঁচের বোতলের উপর সমান্তরালভাবে চারটি আধ পাইন্ট বোতল সমচতুর্ভুজ আকারে রাখিয়া তাহার উপর



কাঁচের বোতলের শক্তিপরীক্ষায় হাতী

আর একটি তক্তা চাপা দেওয়া হয়, তৎপর আর ২০০ মণ ওজনের একটি বিশালকার হাতীকে সেই তক্তার উপর বসিতে দেওয়া হয়। একটি বেতলও ভাজে নাই বটে কিন্তু একটু অধিক চাপ পড়াতে একদিনের একটি মোড়ক আধ ইঞ্চি পরিমাণ তক্তার হিড়র বসিয়া গিয়াছে।

ল্যাম্পপোষ্টের অভিনব সজ্জা—

পেনিসিলভানিয়ার একটি সহরে রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টগুলির উপরে ফুলের বুড় বনাইয়া শোভিত করা হইয়াছে। ফুলের গাণ্ডুলি বাহাতে যথেষ্ট মাটি ও জল পার তাহার ব্যবস্থা আছে। ভ্রমস্বপ্ন বাহাতে গাছগুলি চুরি কবিত্তে না পারে তজ্জন বখান্দ্রব উঁচু করিয়া বুড়গুলি



ল্যাম্পপোষ্টের অভিনব সজ্জা

বসান হইয়াছে। তা ছাড়া উঁচুতে সেই ষোপগুলি সন্নিবেশিত হওয়ারতে দৃষ্টি পথে সেগুলি বাধা জন্মায় না। এক একটি রাস্তার একশ দুইশ এইরূপ ল্যাম্পপোষ্ট থাকার দরুন রাস্তাগুলিকে ঠিক উদ্যান বলিয়া মনে হয়

শুধুহাতে চিতা শিকার—

আমেরিকার কাল, ই, অ্যাক্লি চৌবজানোরার সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লোক। তিনি নানা দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে শিকারস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও সম্ভ্রান্ত তাঁহার অদ্ভুত কার্যকলাপের বিবরণ দিতেছেন। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি কয়েকটি হিংস্র জানোয়ার তাঁর পোবা কুকুরের মত থাকে। তিনি কতবার বে সাক্ষাৎ সূত্ৰার হাত হইতে উদ্ধার হইয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ তিনি দেখিতে মোহারা গোড়ের; বয়স বাটের বেশী হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার তিনি অসাধারণ পণ্ডিত এবং যে কোনো জানোয়ারের বহিরাবরণ অঙ্গুর রাখিয়া তাহা 'ট্যান' করিতে তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তিনি 'সিবেস্ট বন্ধুকে'র আবিষ্কারক, চলচ্চিত্র এগুতে "অ্যাক্লি ক্যামেরা"ও তাঁহার আবিষ্কৃত; ভাষার্থ্যেও তাঁহার হাত ভাল এবং কারশিল্প

সমালোচনার তিনি ওস্তাদ। মোটকথা তিনি একজন সর্কবিজ্ঞাবিশারদ অদ্ভুত লোক। বয়স বাট পার হইয়া গেলেও তিনি এখনও বেশ শক্ত আছেন ও অবলীলাক্রমে ভাবী বন্ধুক বচন করিয়া বেড়ান।

তিনি সম্ভ্রান্ত সস্ত্রীক আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। তিনি আফ্রিকাকেই পৃথিবীর দৌলভাগ্যনিবেশন জাগা দিয়াছেন এবং সেখানে থাকিতে পারিলেই তাঁহার অপার আনন্দ। সহর বাজারের যানবাহনাদির হট্টপোল তিনি মগ্ন করিতে পারেন না।

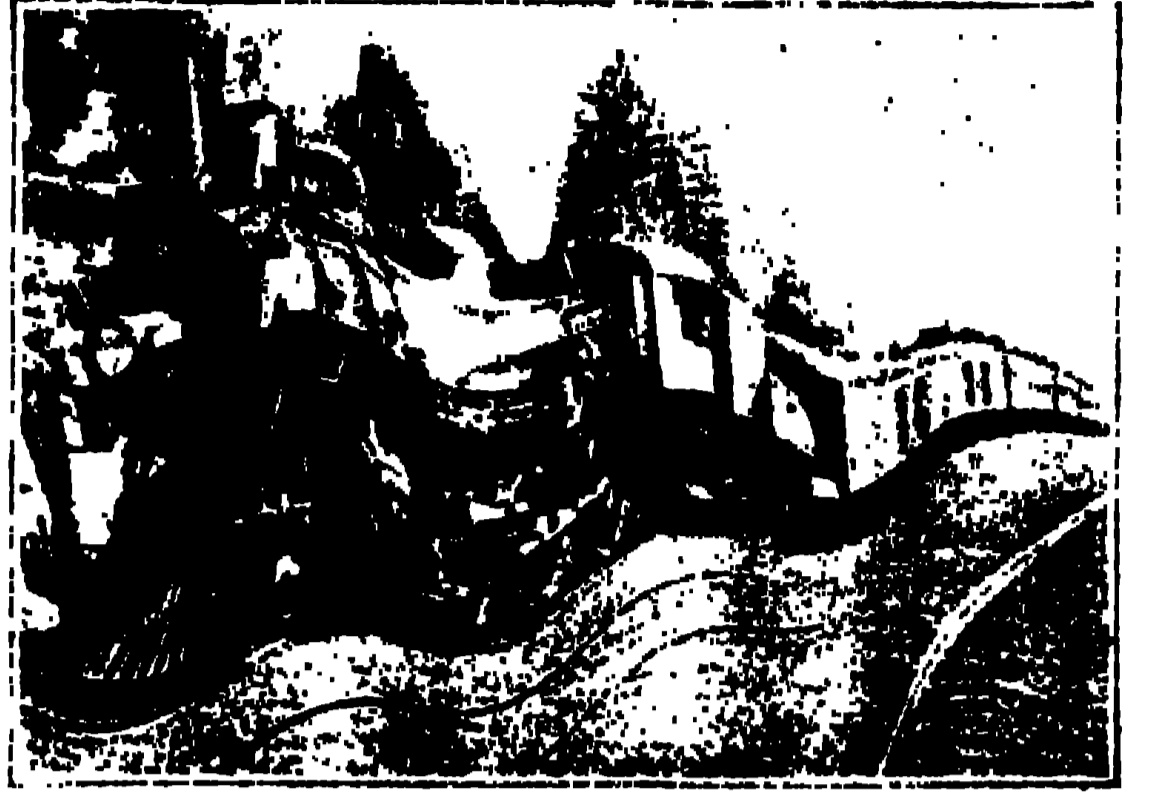
তিনি বহুবার বহু বিপদে পড়িয়াছেন। একবার একটি বুনো হাতী তাঁরাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি হড়াব মত অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন। তবে তিনি অশান্তিমা কমতা দেখাইয়াছেন খালি হাতে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ শিকার করিয়া। তিনি এখনবার বথম আফ্রিকা যান সেইবারই এই বিষম বিপদে পড়িয়া



খালি হাতে চিতা শিকার

ছিলেন। পাশে সেই ভয়াবহতরুজ্জ্বল একটি ছবি দেওয়া চইল। সেদিন বেকালে তিনি একটিমাত্র সস্ত্রী লঙ্কায় বাহির হইয়াছিলেন। প্রথমেই একটি হারেনা শীকার করিয়া গুলী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তারপর আর কোনো শীকারই মিছিল না দেখিয়া গুর হইয়া ফিরিতেছেন এমন সময় একটি ষোপের ভিতর খস খস আওয়াজ শুনায়। সেই ষোপ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। তিনি জানিতেন না ষোপের ভিতর কোন্ জন্তু আছে তবে একটি গর্জন শুনিয়া বুঝিলেন ভীষণ হিংস্র চিতাবাঘের গারেই গুলী লাগিয়াছে। অজ্ঞকার খনীভূত হওয়ারতে তিনি আর সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় তাগিয়া সস্ত্রীসহ নিজের তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সেই চিতাবাঘের সচিত্র সাক্ষাৎ। চিতাটি ২০ গজদূর দূরে থাকিতে তিনি আবার গুলী ছুড়িলেন কিন্তু তাহা ফস্কাইয়া গেল। তিনি তৃতীয়বার গুলী ছুড়িতেই চিতাবাঘটি ভীষণ ছফার দিয়া অ্যাক্লি সাহেবকে আক্রমণ করিল। কি তাহার বিদ্রোহ-গতি! এত দ্রুত বোধ হয় কোনো জন্তুই ছুটিতে পারে না। বাঘটি বখন মাত্র ৬৬ হাত দূরে অ্যাক্লি সাহেব আবার বন্ধুক ছুড়িলেন কিন্তু হার—বন্ধুকে আর টোটা পোরা ছিল না। তিনি দেখিলেন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে বন্ধুকে টোটা

ভরিতে লাগিলেন কিন্তু বাঘটি তখন আসিয়া পড়িয়াছে ও মহাশক্তিতে তাঁহার উপর লাকাইয়া পড়িয়াছে। বন্যকটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল; চিত্তবাঘটি তাঁহার ডানহাত কামড়াইয়া ধরিল। এমন অবস্থায় মনের ভাব কি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রত্যাশনমতিত্ব গুণে অ্যাকলি সাহেব সে অবস্থাতেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। তিনি বাঁ হাত দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বাঘের গলা চাপিয়া ধরিয়া ক্ষতবিক্ষত ডানহাত গানি সজোবে বাঘের মুণের তিতর পূরিয়া দিলেন। বাঘটি তাঁহার টুটি কামড়াইয়া ধরিবার জন্ত প্রাণ-পণ করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এ ভাবে ক্রমশঃ ছুড়নেই ছুড়ল হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং অবশেষে ছুড়নেই গড়াইয়া পড়িলেন। মৌভাগ্যক্রমে চিত্তবাঘটি তাঁহার নীচে পড়িয়া যায় ও তাঁহার ডান হাঁটুর চাপে তাহার বৃকের পাকুর ভাঙিয়া যায়। একরূপ কিচ্ছুক্ষণ ধস্তা-ধস্তির পর বাঘটি ক্রমশঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। অ্যাকলি সাহেব কিচ্ছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া তাঁহার নিগ্রোসঙ্গীর সাহায্যে তাঁহাতে কিরিয়া আসিয়া ক্ষতস্থানে বিষ প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া আশনার প্রাণ রক্ষা করেন। এই ক্ষমতাপন্ন শিকারীর বিস্তৃত জীবনচরিত পড়িয়া দেখিলে প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ করা যায়।



চেউ খেলানো ট্রেন; কোটোগ্রাফীর কৌশল

যান বাহনাদিতে বৈচিত্র্য—

পাশ্চাত্য দেশে জীবিকা উপার্জনের উপায় যেমন অল্প, পোষাক পরিচ্ছদ যানবাহনাদিতেও সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। বেশ বোঝা যায় যে কাঙ্ক্ষিত অবকাশে বিচিত্র স্মিনন আবিষ্কার করার অবসরও



সাইকেলের বেলুনচাক।

ইহাদের আছে। পাশের ছবিতে দেখুন সাধারণ একটি বাইসাইকেলকেও কিরূপ আরাগমনক করিয়া তোলা হইয়াছে। এই ধরণের বেলুনচাকাবৃত্ত বাইসাইকেল সিকাগোর রাস্তায় একবার দেখা গিয়াছিল!

আলোকচিত্রের কৌশল—

পাশের ছবিটি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ট্রেনখানি চেউ খেলিয়া চলিয়াছে কিম্বা সানফ্রান্সিস্কোর ওই স্থানের মাটি চেউয়ের তালে নাচিতেছে। আসলে কিন্তু কিছুই হয় নাই। সাধারণ ট্রেন যেমন সোজাতাবে যায় তেমন চলিয়াছে কেবল কোটোগ্রাফির কৌশলেই ট্রেনখানিকে এইরূপ মনে হইতেছে।

ঘুম কি আমাদের অত্যাৱশ্যকীয়?—

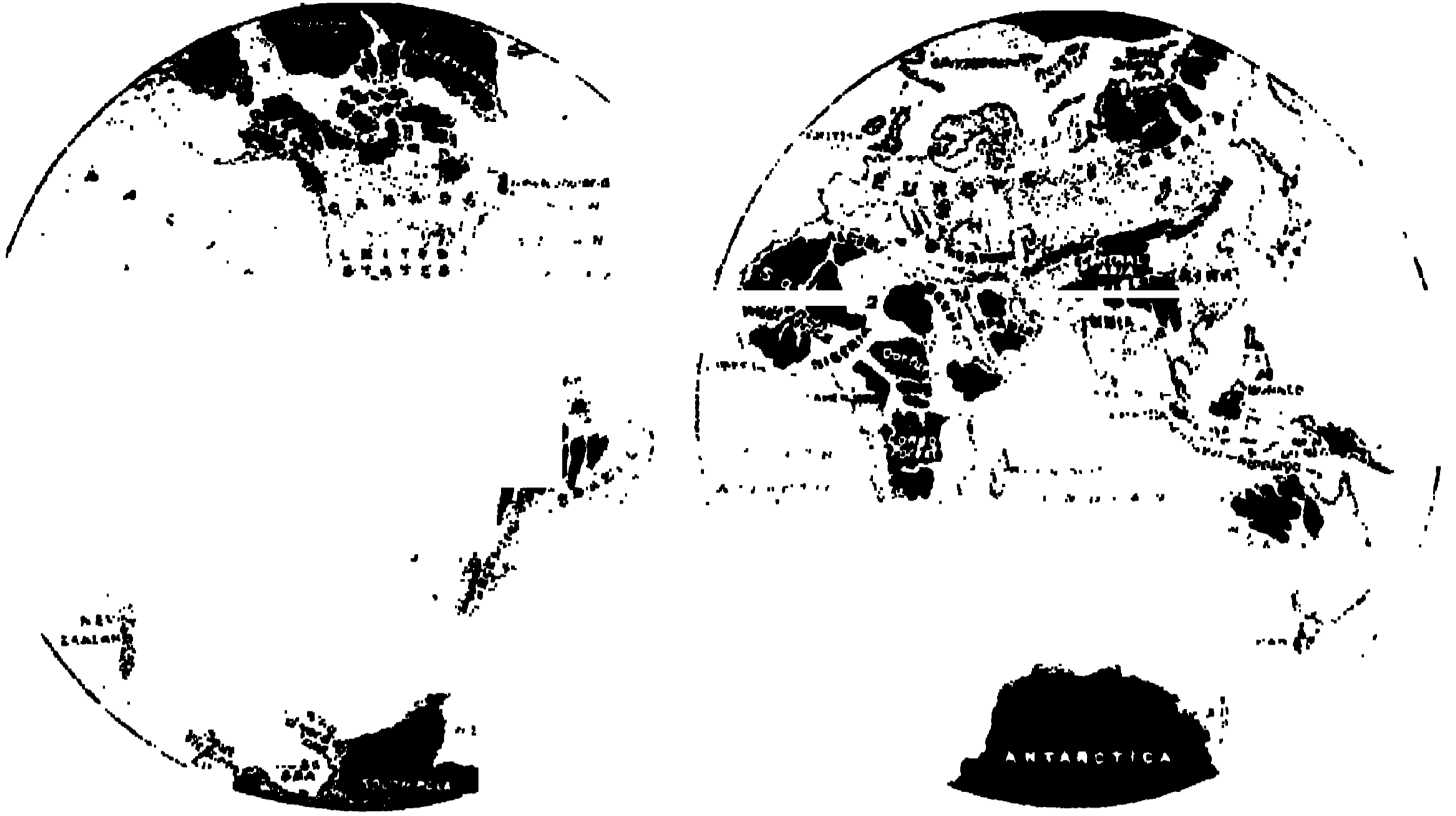
আমরা প্রত্যহ ঘুমাইয়া বে-সময় কাটাই তাহা সামান্য নহে। অতটা সময় কি আমরা সত্য সত্যই নষ্ট করি না তাহা আমাদের ক্রান্ত মনকে ও দেহকে বিশ্রাম দিয়া আমাদেরকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিয়া তোলে? সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের জীবনের এক তৃতীয়াংশ যে আমরা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিই তাহা একান্তই জীবনের বাঞ্ছনীয়। সে সময়টুকু অল্প কাজে লাগাইলে আমাদের শারীরিক মানসিক কোনো ক্ষতিই হয় না। সম্প্রতি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রেড এ. মস চারটি ছাত্র ও চারটি ছাত্রী জইয়া এক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পুরা ষাট ঘণ্টা না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষাব ফল খুব প্রামাণিক না হইলেও অনেক বৈজ্ঞানিকদের মতের সহিত মিলিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—ঘুম জিনিষটি মানুষকে ভগবানের বর হিসাবে দেওয়ার নয়; ইহা অতিশয়ই বাটে। এই কুম্ভাসটি আমাদের প্রাচীনকাল হইতে বংশ পরম্পরায় মজ্জাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক মস বলেন যে এবিধের তাঁহার পরীক্ষা সবে শুরু হইয়াছে মাত্র তবে ইতিমধ্যে তিনি বাহা জানিয়াছেন তাহা এই—

ঘুম আসলে একটা নেশা মাত্র, মাদক দ্রব্যের মত ইহাকে অল্প অল্প পরিত্যাগ করা যায়। অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবন যেমন অনিষ্টকর অত্যধিক ঘুমও তেমনই অনিষ্টকর। ইহা মনের গতিবেগ ও চিন্তার ধারাকে প্রতিহত করে। অধ্যাস করিলে ঘুমের গতি বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ঘুমের কাজ এক ঘণ্টার সারা যায়।

অধ্যাপক মস এই তিন বৎসরের অধ্যাসে ২ ঘণ্টা ঘুম কমাইয়া আনিয়াছেন। অনেকরূপ এক সঙ্গে জাগিয়া থাকিলে শারীরিক কোনই ক্ষতি হয় না। ইহাই ইহার মত তবে মানসিক একটু চাকলা ঘটিতে পারে।

পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ—

কলম্বাস, ভাঙ্কোভিগামা, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, স্কট, আমুনসেন প্রভৃতির জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে মনে এই সন্দেহ হয় যে পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ সবই ইহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন—আমাদের জন্ত আর কিছুই থাকিলনা। পৃথিবীর এই মানচিত্রখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এই মানচিত্রের



পৃথিবীর অনাবিকৃত দেশ (কালো চিহ্নিত)

কালো রঙের দেশগুলি এখনও একেবারে অনাবিকৃত। এইসব দেশে খেতঘোঁপবাসীদের পদধূলি এখনও পড়ে নাই। হরত ইহার মধ্যেই কোনো স্থানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত কিংবা স্তম্ভর উপত্যকা কিংবা রেডিয়াম খনি বিদ্যমান। উত্তর মেরু আবিষ্কারক আর্ডামিরান পিরারী যখন শেখবার সেখানে হইতে কিরিয়ান আদিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর উত্তর মেরু-সীমান্তে হাজার হাজার মাইলব্যাপী সবুজ ভূমি বস্তু বিস্তারিত আছে; সেখানে কস্তুরী যুগ চরিয়ান বেড়ায়; মেরু-ভল্লুক, শৃগাল, সিন্ধুসংসা প্রভৃতির তাহা নিত্য বাসস্থান। অথচ তাহা কোনো মানুষেরই অধিকারে নাই। দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশেও এখনও বহু স্থান অনাবিকৃত রহিয়াছে। তবে আজকাল বিমানপোতের যুগ। বহুকাল ধরে সেই সকল স্থান অনাবিকৃত থাকিবে তাহা মনে হয় না।

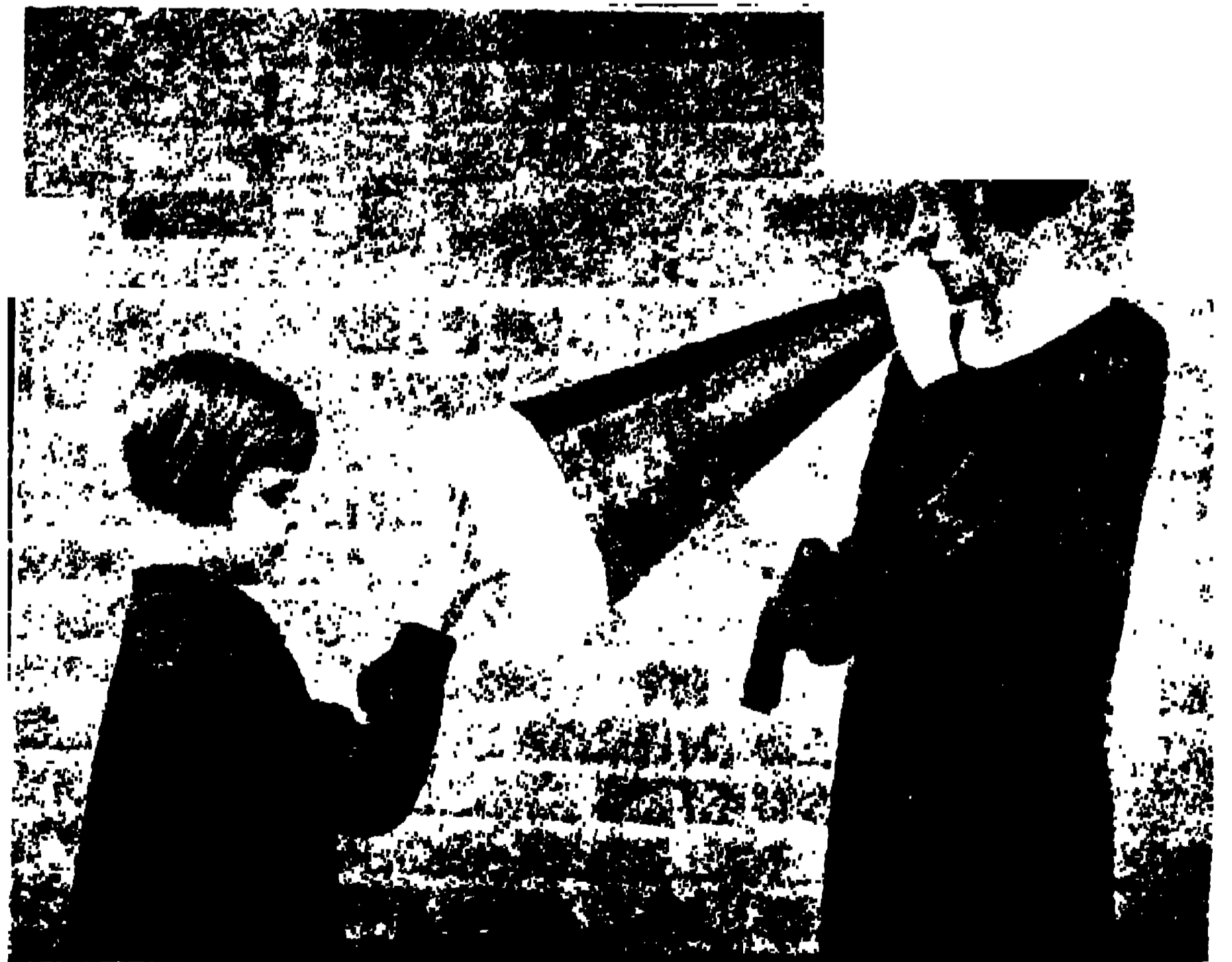
আঙুলের সাহায্যে শোনা—

বধিরদিগকে এক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে শ্রবণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। পার্শ্ববর্তী ভবিতে সেন্ট লুইএর সেন্টাল ইনস্টিটিউটে মেরি টিলসন নামে একটি বধির বালিকাকে মেগাকোনের সাহায্যে কথা শোনান হইতেছে—দেখান হইয়াছে। মেরি টিলসন মেগাকোনের পরদার উপর

আঙুলের উপর দিয়া স্পর্শ করিয়া আছে। কথা বলার দরুন পরদার যে কম্পন হইতেছে তাহা আঙুল ও হাতের ভিত্তর দিয়া নাস্ত্রকে অবগামুভূতির সৃষ্টি করিতেছে।

সংখ্যার খেলা—

এক ছুই প্রকৃতি সংখ্যার সাহায্যে নানা রকমের অঙ্কিত খেলা করা



আঙুলের সাহায্যে শোনা

যার এবং বন্ধুবান্ধবদের চমকিত করিতে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হয় না। সাধারণতঃ লোকে অঙ্কের নাম শুনিলেই যাবড়াইয়া যায়। সুতরাং অতি সহজগোণা সামান্য গুণদ্বয়ের খেলা দেখাইয়া অনেক সময় অতি বিচক্ষণ লোকেরও তাক লাগাইয়া দেওয়া যায়। নিম্নে সংখ্যাসম্বন্ধে কতকগুলি সহজ কৌশল দেওয়া হইল।

৯ সংখ্যাটি বড় সহজ। ইহার যে কোনো গুণিতকের সংখ্যাগুলি পাশাপাশি যোগ করিলে আবার ৯ই হইবে। যেমন $৪ \times ৯ = ৩৬$ আবার $৩ + ৬ = ৯$

দুই একটি প্রথমে করিয়া ও দুই চারিবার যোগবিয়োগ গুণ ভাগ প্রভৃতি করাইয়া এককনের বয়স বলিয়া দিয়া তাৎকালে চমৎকৃত করা কত সহজ। ধরা যাক হরির বয়স ১৫ ও সে ইংরেজী আগষ্টমাসে জন্মিয়াছে। প্রথমে তাহাকে বলা হইল যে সে তাহার জন্মমাস (জানুয়ারী ১; ফেব্রুয়ারী ২; মার্চ ৩ এই হিসাবে) কে ২ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে ৫ যোগ করুক। তৎপর সংখ্যাটিকে ৫০ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে তাহার বয়সটি যোগ করিয়া তাহা হইতে ৩৬৫ বাদ দিয়া তাহাতে ১১৫ যোগ করিয়া যাহা থাকে তাহাট বলাক। জিজ্ঞাসামত গুণ যোগ করিয়া ৮১৫ হইল। ইহার ১ম সংখ্যাটি যে মাসে জন্ম তাহার নিদর্শক ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুইটি বয়স নির্দেশক। যে কোনো লোকের বয়স ও জন্মমাস এই নিয়মে বলা যায়।

একটি সংখ্যা হইতে যে কোনো একটি অঙ্ক মুছা হইলে তাহা বলিয়া দিয়া লোককে খুশি আশ্চর্য করা যায়। চার পাঁচ কি অধিক অঙ্কযুক্ত একটি সংখ্যা কেহ মনে করিল। ধরা যাক সংখ্যাটি ৪৫২৩৮। পাশাপাশি অঙ্কগুলি যোগ করিলে হয়, ২২। আসল সংখ্যা হইতে ২২ বাদ দিয়া ৪৫২১৬ থাকে। ইহা হইতে যে কোনো একটি অঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে বলা হইল। ৪ অঙ্কটি মুছিয়া ফেলা হইল। আবার পাশাপাশি সংখ্যা গুলি যোগ করিতে বলা হইল। যোগফল হইল ২৩। এই সংখ্যার কাছাকাছি ৯এর গুণিতক সংখ্যা হইতে ইহা বাদ দিয়া যাহা থাকিবে সেই অঙ্কই মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। যদি কিছু বাকী না থাকে তাহা হইলে ৯ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এদ্বারা কাছাকাছি ৯এর গুণিতক সংখ্যা ২৭। ২৭ হইতে ২৩ বাদ দিলে থাকে ৪। সুতরাং ৪ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে।

আর একটি খেলা এই। ১ হইতে ৬ এর মধ্যে দুইটি সংখ্যা কাছাকাছে মন করিতে বলা হইল। সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা সহজেই বলিয়া দেওয়া যায়। ধরা যাক সে ৪ ও ৬ মনে করিয়াছে। প্রথম সংখ্যাটি বিস্তার করিলে ৮ হয়। তাহাতে ২ যোগ করিয়া তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া ও তাহাতে দ্বিতীয় সংখ্যাটি যোগ করিলে ৭১ হয়। সংখ্যাটি জানিয়া লইয়া তাহা হইতে ২৫ বাদ দিলে থাকিল ৪৬। তাহার বা দিকের অঙ্কটি প্রথম সংখ্যা ও ডানদিকেরটি দ্বিতীয় সংখ্যা।

আর একটি কৌশল এই, তিনি অঙ্কের একটি সংখ্যা কাছাকাছে

লিখিতে বলা হইল, তার মধ্যে প্রথম অঙ্কের চেয়ে তৃতীয় অঙ্কটি ২ কম হওয়া চাই। সে লিখিল ৮৩৬। সংখ্যাটি উল্টাইয়া লিখিয়া প্রথমটি হইতে বাদ দিলে থাকে ১৯৮। উহা উল্টাইয়া লইলে হয় ৮৯১। যোগ করিলে ১০৮৯ হয়। তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা মনে করুন না উপরোক্ত উপায়ে শেষ যোগফল বরাবরই ১০৮৯ থাকিবে।

নীচে যে সংখ্যাগুলি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে কৌশলে যে কোন লোকের বয়স বলিয়া দেওয়া যায়। যিনি বয়স জানিতে চান তাহাকে বলিতে হইবে কোন্ কোন্ লাইনে (লম্বালম্বি) তাহার বয়সের সংখ্যাটি আছে। সেই সেই লাইনের প্রথম সংখ্যা করটি যোগ দিলেই তাহার আসল বয়স পাইবেন। যদি তাহার বয়স ৩৬ হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় ও ষষ্ঠ লাইনে তাহার বয়সের সংখ্যাটি আছে। সুতরাং তৃতীয় লাইনের প্রথম সংখ্যা ৪ + ষষ্ঠ লাইনের প্রথম সংখ্যা ৩২ = ৩৬।

১	২	৪	৮	১৬	৩২
২	৩	৫	৯	১৭	৩৫
৫	৬	৬	১০	১৮	৩৪
৭	৭	৭	১১	১৯	৩৫
৯	১০	১০	১২	২০	৩৬
১১	১১	১৩	১৩	২১	৩৭
১৩	১৪	১৪	১৪	২২	৩৮
১৫	১৫	১৫	১৫	২৩	৩৯
১৭	১৬	২০	২৪	২৪	৪০
১৯	১৯	২১	২৫	২৫	৪১
২১	২২	২২	২৬	২৬	৪২
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭	৪৩
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮	৪৪
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯	৪৫
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৪৬
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৪৭
৩৩	৩৪	৩৬	৩০	৪৮	৪৮
৩৫	৩৫	৩৭	৩১	৪৯	৪৯
৩৭	৩৮	৩৮	৩২	৫০	৫০
৩৯	৩৯	৩৯	৩৩	৫১	৫১
৪১	৪২	৪৪	৩৪	৫২	৫২
৪৩	৪৩	৪৫	৩৫	৫৩	৫৩
৪৫	৪৬	৪৬	৩৬	৫৪	৫৪
৪৭	৪৭	৪৭	৩৭	৫৫	৫৫
৪৯	৫০	৫২	৩৮	৫৬	৫৬

৫০ পর্যন্ত বয়স ইহাতে পাওয়া যাইবে।

কণ্ঠ পাথর



জলের রাগী

ওগো জলের রাগি

চেটে দি:রা না চেটে দিয়ো না গো,

আমি যে ভয় মানি ।

কখন তুমি শান্ত গভীর, কখন টলমল,

কখন খাঁধি হাশ্রমদির, কখন ছলছল,

কিছুই নাহি জানি ।

যাও কোথা চকাল,

লও গো ব্যাকুল বকুল বনের

সুকুগ-অঞ্জলি ।

ধধিন হাওয়ার বনে বনে জাগল মরমর

তোমার বকের পরে পুলক-ভরে কাঁপুক ধরধর

হুনীল আঁচলখানি ।

হাওয়ার ছুগালি,

নাচের তালে জামল কুলের মন যে ডুলালি ।

অরণ আলোর মণিকমালা দেলাবো ঐ শ্রোতে,

দেবো তোমার হাতে গোপন রাতে খাঁধার গগন হ'তে

তারার ছায়া 'খানি' ।

(ভারতী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩২)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

বায়ু

১। বাসগৃহে বাহাতে যথেষ্ট-পরিমাণে বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চারিপাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি বজ্র বজ্র জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয়।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে। অবস্থার কুলাইলে ঘরের মেঝে পাকা করিয়া লইবে।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা বাঁশের ঝাড় অথবা বোঁপ-জঙ্গল থাকিতে দিবে না।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া তদ্ব্যতীত কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শরৎগৃহের অন্ততঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না, কারণ বহুলোকের বাসাক্রমাদিগা গৃহের বায়ু অতি দীর্ঘ বিধাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল বাহাতে নিকাল হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া বতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে।

৭। বাড়ীর নিকটে ছোটো খানা, ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা

ভাট করিয়া দিবে। খানা ডোবার পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পড়িয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐসকল স্থানে মশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

৮। গ্রামের পথে ঘাটে, পুকুরপীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলমল করিবে না। এত কথায় অত্যাশের কলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি দীর্ঘ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৯। বাড়ীর আশে-পাশে ময়লা থাকিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। এইরূপ বায়ুগৃহ হইতে কিংবা দূরে গোশালা ও মলমলাদি পরিষ্কার করিবার স্থান নির্মাণ করিবে। পরিষ্কার মল ও আবর্জনা দি বাহাতে দীর্ঘ স্থানান্তরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সে-ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাতঃ শুক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ-নিজ গৃহ ও তাহার আশ-পাশ এইরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্বদা নির্মল থাকিবে।

জল

১। প্রতিগ্রামে একটি বা দুইটি ভালো পুকুরপীর কেবল পানীর জল সংগ্রহের জন্য পৃথক করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে কেহই স্থান করিতে কাপড় কাচিতে—এমন-কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটি পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুকুরপীর জল কোনো মতেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুকুরপীর পাড়ে বড় গাছ বা বেনী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পড়িয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রৌদ্র পায় না।

৩। স্বল্পমতীর কূপের জল পান করা কখনও নিরাপদ নহে। যে-কূপের জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই কূপটির ভিতর দিক পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল বাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও চালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। সাধারণ কূপের জল প্রায় নির্মল হয় না, এজন্য আশ্চর্য্যজনক অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্বদা নির্মল থাকে এবং কোনো সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোনোপ্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল বিনি পান করিবে, তাহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীর জল সহজে বিপুল করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্যকর্তব্য। আমাদের মতন গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা। এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে-কোনো সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাগ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং এক্ষণে সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আহার ও পানীয়

১। সহরে নির্দোষ খাদ্য পাওয়া মুশকিল, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও এ-বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তৈল, দুধ ও নারিকেলের মিশ্রিত পল্লীগ্রামে বিস্তৃত ব্যবহার পাইতে অল্প বধা হয় না। এইসকল খাদ্য সহজপরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। ঝাঁহারা মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না। তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্যক্রমের মধ্যেও সেই সারবান্ পদার্থ বঃধঃ-পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙালী জাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। ঝাঁহারা কোনরূপ আমিষ জব্য ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেখ লাভ করিতে পাবেন।

৪। ভাত অপেক্ষা রুটি সারবান্ খাদ্য। আমাদের দেশে এক বেলা রুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেশে আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের কোন কোনরূপ খাওয়া কখনই উচিত নহে; উহাতে চালের সারণ্য কতক-পরিমাণে পারিত্যক্ত হয়। বিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে অত্যন্ত পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভালো হয়।

৫। ঝাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্তে ব্যবহার করলে আর একটু ফল পাইবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে-কোনো পদার্থই ভোজন করা বাটক না কেন, গুরু ভোজন প্রকৃত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ তৃপ্তি করিয়া না খাওয়াই সর্বদা কর্তব্য। মিঠাহার—খাদ্য ও দার্দ্র্যবান্ জাতের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ একসময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যকর পক্ষে অনুকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত শ্রমহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যক্রম উত্তমরূপে চর্ষণ না করিয়া ভাড়াভাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা যে কেবল হস্তম না হইয়া অর্থাৎ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকংশ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত-মুখ উত্তমরূপে ধোত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে-স্থানে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়, তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা জব্য ও রোগের বীজ পানের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য-ক্রমের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। স্তন্য-রসের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে বাহাতে মাছি আনিত না পারে এবং খাদ্যক্রম বাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপজব বেশী হইয়া থাকে, স্তন্য-এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপজব কমিয়া যাইবে। খাদ্যক্রম সর্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাত্বারের খাবার যে দুর্বিত—তাহার কারণ এই যে, উহা যে-ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। তৎপরি বাত্বারের খাবার আরই ভেতাল তেল, ঘি, ময়লা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জল-খাবারের জন্ত বাত্বারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের

পূর্ব-প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিঁড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাদা, বুনা নারিকেল কিংবা নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দোষ অথচ বিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক হস্তে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকো বা কফি পান করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত-পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনোটিই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অর্শ ও অস্ত্রাঙ্গ রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সুরা বা অস্ত্রাঙ্গ মাদক জব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জনীয়।

শরীর চালনা

প্রত্যহ কোনো-না-কোনোরূপ ব্যায়াম করা অবশ্যকর্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। সুস্থস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোনো-প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অধ্যয়ন করিলে স্বাস্থ্যকর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অস্ত্র কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থশরীরে দুই মিনিট অন্ততঃ দুই ক্রোশ ভ্রমণ করা উচিত।

বিশ্রাম

শরীরের পক্ষে পঃবিশ্রাম ও ব্যায়াম বেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তৎপন্ন মাঃশুক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিশ্চাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রিকালে নিশ্চায় প্রশস্ত সময়। দিবানিশ্চায় সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাত্রিকালে শ্রমহার সুনিশ্চায় পক্ষে প্রশস্ত।

পরিচ্ছন্ন

আমাদের গোবাক-পরিচ্ছন্ন ধূম সাবাসিদে অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন আড়ম্বরজন হইবে, কিন্তু রুচিবিকৃত বা ময়লা হইবে না। অর্শাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছন্ন ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(স্বাস্থ্য, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) ডাঃ শ্রী চুলীলাল বসু

ভারতে নারীর সংখ্যা

ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। ইউরোপে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষে ৯৫৫ জন স্ত্রীলোক আছে; আর ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌স-এ হাজার পুরুষে ১০৬৮ জন স্ত্রীলোক আছে; ফ্রান্স, ইটালী ও অস্ট্রিয়াতে হাজারে ১০০০ স্ত্রীলোক। বিশেষ ভূঃপের কথা এই—ভারতে নারীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ১৯০১ সালে ছিল ৯৬৩, ১৯১১ সালে ৯৫৫, এবং ১৯২১ সালে ৯৫৫। ভারতে ও ইউরোপে এই পার্থক্যের কারণ এই নয় যে, ভারতে ইউরোপ অপেক্ষা কম স্ত্রী শিশু জন্মায়। বরং ইহার বিপরীতই

ঘটে; ইউরোপ অপেক্ষা ভারতে অধিক স্ত্রীলোকই হুম্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক হাজার পুরুষের পক্ষে ইংলণ্ড এবং গুয়েলুস-এ ০ হইতে ১০ বৎসর বয়সের ২২৬ জন স্ত্রীলোক আছে; ফ্রান্সে ১৮৯ জন; কিন্তু ভারতে ১১৮ জন, অর্থাৎ অস্তান্ত দেশের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ভারতে স্ত্রী শিশুর তনুস্থাপন পুরুষসংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা হ্রাসের কারণ নয়। পুরুষ-অনুপাতে ভারতে স্ত্রীলোকের অল্পতাব কারণ—এখানে ১০, ২০, ৩০ এবং ৪০ বৎসরের স্ত্রীলোকের মৃত্যু অত্যধিক ঘটে।

শুশ্রূষ নিহাল সিংহ

(বেনারস্ হিন্দু ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন)

জাপানে হিন্দু দেবদেবী

বর্তমানে জাপানে অধ্যাপক জে তাকাবাহু একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। জাপানী সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার নিকট কতটা স্বর্ণী তাত্ত্ব তিনি কয়েক মাস ধরিয়া জাপানের দ্বি ইন্স ইন্সটি পত্রিকার প্রবন্ধ-পর্মাণে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি একটি প্রবন্ধে বহু গবেষণার সহিত দেখাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত দেবদেবী ভারত হইতে জাপানে উপস্থিত হইয়াছেন :—

মহাকাল, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কুবের, গণেশ, কুম্ভীর (বক্ষ) বরুণ ইন্দ্র-শক্র ব্রহ্মা, রুদ্র, নারায়ণ, হরপ্রীত, অচল, ভৈরব, দুর্গা, উমা, ডাকিনী, হারিত্তি, অগ্নি, স্বন্দ, বহু, গৌমুখ ইত্যাদি। এইসব দেবদেবীর নাম, গুণাগুণ ও প্রভাব অবশ্য জাপানে অনেক পরিবর্তন লাভ করিয়াছে।

ভারতে ইসলাম

এমন লোক আছেন যাহারা মনে করেন, ইসলাম সকল সময়েই বৃষ্টি একরূপ। আইনের আকরিক ব্যাখ্যা হিসাবে ইহা খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাতার মনোভাবের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। আরবীরের কাছে এই ধর্ম ছিল আশার বাণী, পারস্তবাসীর নিকট ইহা দার্শনিক চুঃখবাদের সাহুনা, ভারতীয়ের কাছে ইহা তত্ত্ববিজ্ঞানসূক আলোচনার একটা নূতন কঠামো হইল, ইহাতে তাহার প্রাচীন রীতি-নীতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটাইল।

অনেকে বলেন, মুসলমানগণ হিন্দুধর্মের নিকট হইতে অনেক প্রথা ও রীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ঠিক কথা নয়। অবশ্য হিন্দু প্রথা সর্বত্রই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছে এবং জন হইতে মৃত্যু অবধি সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাহা আমাদের সাধী নয়; আমরা তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের সাধী।

সামাজিক জীবনের দুইটি ভিত্তিগত অনুষ্ঠান পরিবারবদ্ধতা ও জাতি—এই দুই বিষয়ে আমাদের ধারণা প্রাচীন হিন্দুজাতির ধারণার সমান। ইসলাম জাতিভেদের কিছুই জানে না; গণসামাই ইহার ভিত্তিকার কথা। কিন্তু বিভাড়ণ-চেষ্টা সম্বন্ধে ইসলামের প্রভাব বাঁচিয়া রহিল। যে-সব হিন্দু মুসলমান হইল তাহার নিজেদের জাতি হইতে দীক্ষিত মুসলমান পক্ষীই বিবাহ করিতে চাহিল। তাহার বল এই হইল যে, জাতিভেদ রূপান্তর গ্রহণ করিল, লোপ পাইল না। এখানে-ওখানে

একটু-আধটু ইসলামের অনুকূল পরিবর্তনশীল হিন্দুধর্মে ঘটিল; ভীষণ জাতিভেদের ভিত্তি অটল রহিল। ইসলাম যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দান করে হিন্দু সমাজপ্রভাব তাহা ঘমাইয়া দিল, এবং সে-মাজে অসবর্ণ-বিবাহের যেমন স্থান নাই নবীন মুসলমান ধর্মেও তাহার স্থান করিতে দিল না। সুতরাং যে আন্তরিক পবন্দর মিলনের বাস্তব লইয়া ইসলাম আসিয়াছিল তাহা এখনও সুদূর্বল রহিত। আমরা মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু পূর্বপুরুষগণের জাতিভেদের কঠোর বাবু প্রহণ করিয়াছি, কেবল তাহার নাম পরিবর্তন করিয়াছি মাত্র। পারিষাৎ-অনুসারে মুসলমান জাতি ৬ ভাগী একসঙ্গে পিতৃসম্পত্তি পবিচালন করিতে পারে; পরিবার-গঠন ইসলামে সমবায়-হিসাবে গণ্য নয়; ব্যক্তিকে উচ্চ স্বীকার করে ও তাহার পর রাষ্ট্রকে। কিন্তু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সম্প্রতি পরিবারের ভাব নিদূর্বল হইল না। হিন্দু সামাজিক প্রভাব মুসলমান কষ্টাকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য করিল। এই বাধ্য করা ক্রমে নিয়মে দাঁড়াইল এবং পরে প্রথার দাঁড়াইল। কোরণের উপদেশের বিরুদ্ধে উচ্চা গঠিল। ইসলাম সর্বশোভাবে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ; সুতরাং ভারতের হিন্দু যেমন মুসলমানও তেমনি, এই সামাজিক বাবুধার অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছে। ইহাই আমাদের জাতীয় মিলনের ভিত্তি।

মুসলমানের ধর্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর আচারপ্রথা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর ঐ-ঐ বিষয়ের আচার-প্রথার অনুরূপ।

(নিউ গার্ডিয়েট্)

মহম্মদ হাবিব

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ-জাতীয় সাবপদার্থ থাকা আবশ্যিক। ছুঃ প্রকৃতিগত আদর্শ খাদ্য—চুঃখের মধ্যে পাঁচ-জাতীয় সাবপদার্থ আছে। (১) চানা-জাতীয়, (২) মাংস-জাতীয়, (৩) শর্করা-জাতীয়, (৪) লবণ-জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং চুঃখের মধ্যে যে সব সাব-পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্য তাহাদেরই পয়োজন।

দেশের অননু্য ভাগে নহে,—চুঃখ, মাংস প্রকৃতি চুঃখ, চানা-জাতীয় পদার্থ খাউতে হইলে ভাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে। মাংস, মাংস অপেক্ষা ভাল চানা-জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান এবং উপরন্তু সস্তা।

ভাত—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রকৃতি অপেক্ষা কম। উচ্চ চকরের পক্ষে উৎকৃষ্ট। আমরা সৌন্দর্যের বশে মাংস ধব্ধবে পরিষ্কার চালের পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের ভূষের নীচের আচ্ছাদনের ভিত্তি যে একটি সার পদার্থ থাকে (vitamin) হাঁটা চালে তাহা বাত বায়, উচ্চা স্বাস্থ্য রক্ষার অন্তঃকার। বেরিবেরি প্রকৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতব প্রাণীকে এট চুঃখ প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, চাটা চাল খাওয়ার তাহাধিককে বোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধব্ধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা—ধৈ, চিঁড়ে, মুড়ি। এই তিনটিই বেশ সুপথ্য। মুড়ি শ্রমজীবীদের চুঃখেলাকার খাদ্য, উচ্চা সুপাচা ও ভাতের চেয়ে সারবান, অথচ অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব-রকমের সারপদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে চোলা বা মটর এবং নারিকেল মিশাইয়া খাইবে। এই তিনের সম্বন্ধে অতি উত্তম খাদ্য হয়। চোলা বা মটর—ডালের কাজ করে অর্থাৎ চানা জাতীয় তিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় স্নেহযুক্ত তিনিস, ইহা মাংস জাতীয় তিনিবের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার রুটি ভাতের বিত্তন সারবান্, কারণ নাটটোজেন ময়দার শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ, কলে পেয়া সূক্ষ্ম ময়দার ভূষি বাঘ বাওয়ারে ইহার সারভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার রুটি খাইবে। জাঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে—অনেক সময়ে ভূষি-মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার রুটি বাছ ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে পড়া রুটি ভালোভাবে তৈয়ারী না হইলে যেতসার পদার্থ ভালোভাবে অগ্নিপক হয় না, ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভালো সেক দেওয়া পাউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়া বাইবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটিও ভালো খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু লুচি বেশী খুতখুত হইলে বেহজমী হয়, ইহা খুলদেহ লোকদের অনুপযুক্ত।

ডাল—ময়দার ডাল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে চানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মূগ ও ছোলার ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মূগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিম খুব চলিত আছে। ইহাতে চানা-জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অস্বাস্থ্যে আশ্রয়সাং করিতে পারে।

দুধ—ভালো দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট-পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। তেজাল ধরাও অনেক সময় মুশ্বিল হয়। সকল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ফ্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অল্প সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাপুর ক্ষিয়ার দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহার জঠরের অনিষ্টকর জীবাণু মারিয়া ফেলে। অম্লহ এইসকল বীজাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকালবার্দ্ধক্যের হেতু হয়। বাহ্যদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাহাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভালো। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবত্তের জ্বর পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

চানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান্ খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে চানা-জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দূষিত হয়। কিন্তু চানার এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য-পণ্ডি নীরোগ হওয়া দরকার, বড়-বড় সহরে ইহা পত্রীকা করিবার ব্যবস্থা আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক অ্যাসিড্ জন্মাইয়া বাত প্রকৃতি রোগ ঘটে। তাই যুরোপীয়দের এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া "টোমেন" নামক একপ্রকার ভীষণ বিষ অনেক

সময়ে পচা মাংসেও জন্মে। এইপ্রকার মাংস আহাৰ করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান্ খাদ্য। ইহাতে চানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে। ইহা পূর্ণ সিদ্ধ করিয়া খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অসিদ্ধ ডিম বেড় ফটার হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিপজ্জনক ও উত্তেজনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে মাছ পরিভ্যাজ্য।

ঘৃত, তৈল—এই দুটি দেহের অত্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-সামগ্রী। কিন্তু ঘৃতে অনেক বীভৎস ও অপব্য পদার্থের তেজাল থাকে এবং তাহা মহার্ঘ। ঘৃতের অত্যন্ত খাঁটি তৈলে পূরণ করা যায়। মাল্লায়ে তিল তৈল এবং নারিকেল-তৈল ঘিের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চিনা বাদ্যের তৈলও ব্যবহার করা খাইতে পারে। এই-সব তৈল অনিষ্টকর নহে এবং ঘিের চেয়ে অল্প-একটু নিকট হইলেও ইহা ব্যবহার্য।

তিরিতরকারি—ইহার মধ্যে আলু সর্বোৎকৃষ্ট ও মুখরোগক তরকারী। ইহাতে জল ৮০ ভাগ আর যেতসার ২০ ভাগ। খোসা ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সারভাগ অনেকটা কমিয়া যায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট হয় না। অধিকাংশ তিরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাভনিক পদার্থ আছে তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও সেই উপকার হয়। তিরিতরকারী কোষ্ঠবদ্ধতার নিবারক। রাঙা আলুতে চিনি জাতীয় পদার্থ ও যেতসার থাকতে বেশ উপকারী খাদ্য। কড়াইনুটি, বরবটি, সিন প্রভৃতি দুটি জাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী। কাঁটালের বীজে চানা-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও সারবান্।

চিনাবাদাম—ইহার চাষ আরও বেশীপরিমাণে করিলে ছেলেরদের জলখাবারের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে। চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈলজাতীয় জিনিসটা অপকার করে। ইহাতে চানা পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য ধীরে-ধীরে উত্তমরূপে চর্ষণ করিয়া খাইবে। পরিপাকবস্তুর কাজ মূগ হইতে আরম্ভ হয়। দীর্ঘকৈ তাহার কর্তব্য সাধন করিতে দেওয়া চাই—খাবার অতি সূক্ষ্ম হইয়া উদরে বাওয়া প্রয়োজন এবং মুখের লালা টহার সহিত মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালা খাদ্যের যেতসারকে চিনিতে পরিণত করে।

(স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩২)

ডাঃ শ্রী চূণীলাল বসু

অনুগঢ়িয়া

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

(কবীর)

ওগো অনুগঢ়া দেবতা আমার,
সেবা করে তব কেবা ?
ওরা নিজ-পড়া দেবতারে পূজে,—
নিত্য যে তারি সেবা !
পূর্ণব্রহ্ম অধঃ স্বামী—

জানে না তাঁরেই, লাজে মরি আমি ;
কবীর কহিছে,—শোন ভাই সাধু,
তাঁহার রাগিণী খানি
যে শোনে, সেই সে ত'রে যার সীমা
এ আমি ভালোই জানি।



শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

“বীরভোগ্যা বহুধরা” অর্থাৎ কিনা দুর্বল ও কাপুরুষের স্থান এ-পৃথিবীতে নাই। তাহার প্রমাণ আজ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব উত্তমরূপেই পাইতেছি এবং অন্তান্ত স্থানেও ভবিষ্যতে পাটব এইপ্রকার আশা আছে।

আমাদের ক্ষমতার তুলনায় দেশের জনসংখ্যা অসম্ভব-বকম অধিক। ইষ্ঠাৎ স্তনিলে বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের এই পরপদানত দেশে ৩২,০০০০০০ লোকের বাস। বত্রিশকোটি যে-কোনো-প্রকার জানোয়ারকে ঠিকমত সায়েস্তা রাখিতে হইলে যতজন রক্ষীর প্রয়োজন হয়, আমাদের সায়েস্তা রাখিতে ইংরেজের তদপেক্ষা সম্ভবত কম লোকেরই বেতন জোগাইতে হয়। ইহা গেল আমাদের নিজেদের ঘরের কথা। ঘরের বাইরেও যেখানেই পরের সুবিধা বাতীত অন্য কোনো কারণে আমরা অবস্থান করিতে চাই, সেখানেই আমাদের অতি শীঘ্র অপরে বুঝাইয়া দেয় যে এ-পৃথিবীতে আমাদের মতন অপদার্থ জাতের লোকের স্থান এক দাসরূপে ছাড়া অন্য কোনরূপে হইতে পারে না। আফ্রিকা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আফ্রিকায় আমরা গিয়াছিলাম তত্রস্থ শ্বেতচর্ম নিগ্রো-বিধেতাদিগের চাষ-বাসের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য।

বাণ্টুগণ উত্তমরূপ চাষবাস করিতে অক্ষম প্রমাণ হওয়ার ফলেই শ্বেতকায়গণ আমাদের আফ্রিকায় লইয়া যায় ও আশা দেয় যে উত্তমরূপে তাহাদের কার্য সমাধা করিয়া দিলে আমাদেরও সে-দেশে কিছু জমিজমা দিবে। কাজ করা হইল, জমিজমাও হইল, কিন্তু লোভী আমরা আফ্রিকায় ব্যবসায়বাণিজ্য আরম্ভ করিলাম। শ্বেতকায়গণ দেখিল ইহাতে তাহাদের ক্ষতি হইতেছে, এবং আমাদের শক্তিসামর্থ্যের বিশেষ অভাব; সুতরাং তাহারা আমাদের বলিল, “তোমরা বিদায় হও। আমাদের রাজত্বে আসিয়া আমাদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন করা তোমাদের মতন কৃষ্ণকায় লোকের পক্ষে বেয়াদবি।” আমরা এই কথা শুনিয়া অবধি অনেক ক্রন্দন ও অশ্রমোচন করিতেছি; কিন্তু “বীরভোগ্যা বহুধরা”; ক্রন্দন করিয়া লাভ কি?

আমাদের দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। খুব সুদূর ভবিষ্যতে নহে, শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যখন আমাদের দেশের “বাড়তি” নরনারীদিগকে অন্তর পাঠাইবার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে, আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রার অশেষ দুর্গতি হইবে। ইয়োরোপের লোকেরা তাহাদের বাড়তি জনবল দিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা ও

ও অষ্ট্রেলিয়ার জনহীন প্রান্তরগুলি
মহা-অধিবাসিত করিয়া তুলিতেছে।
এখনও তাহাদের সম্ভ্রান্তসম্ভ্রান্তের
মধ্যে ৫০৬০ কোটি অবাধে ঐসকল
দেশে স্থান পাইবে; যদিও তাহাদের
জন সংখ্যা এমন-কিছু দ্রুতবেগে
বাড়িতেছে না, যাহাতে তাহারা
আগামী দুইশত বৎসরের মধ্যে
৫০৬০ কোটি লোক ঐসকল দেশে
পাঠাইতে পারে। কিন্তু ঐসকল
দেশে তাহারাই রাজা এবং ঐ-
সকল দেশ জনহীন থাকিলেও তাহারা
শ্বেতকায় ব্যতীত অন্ত-প্রকার
মানবকে সেখানে আসিতে দিবে না
এইরূপ মনস্থ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া এইসকল শ্বেতচর্মবাদী দেশগুলির মধ্যে
প্রধান। অষ্ট্রেলিয়াতে বিশ-ত্রিশ কোটি লোকের স্থান
হইলেও, শ্বেতকায় উপনিবেশকারীর অভাবে আজ
অষ্ট্রেলিয়াতে মাত্র ষাটলক্ষ লোকের বাস। অষ্ট্রেলিয়েরা
ঠিক করিয়াছে যে "For all time this continent
is to know only one race, one language and
one nationality." অর্থাৎ "এই মহাদেশে চিরকাল শুধু
একজাতি, এক ভাষা ও এক দেশমাতৃকতা থাকিবে"।
সে জাতি হইবে অ্যাংগো-স্যাকসন, সে ভাষা ইংরেজী এবং
সে দেশমাতা বৃগানীয়া। অ-শ্বেত জগতের পক্ষে ইহা



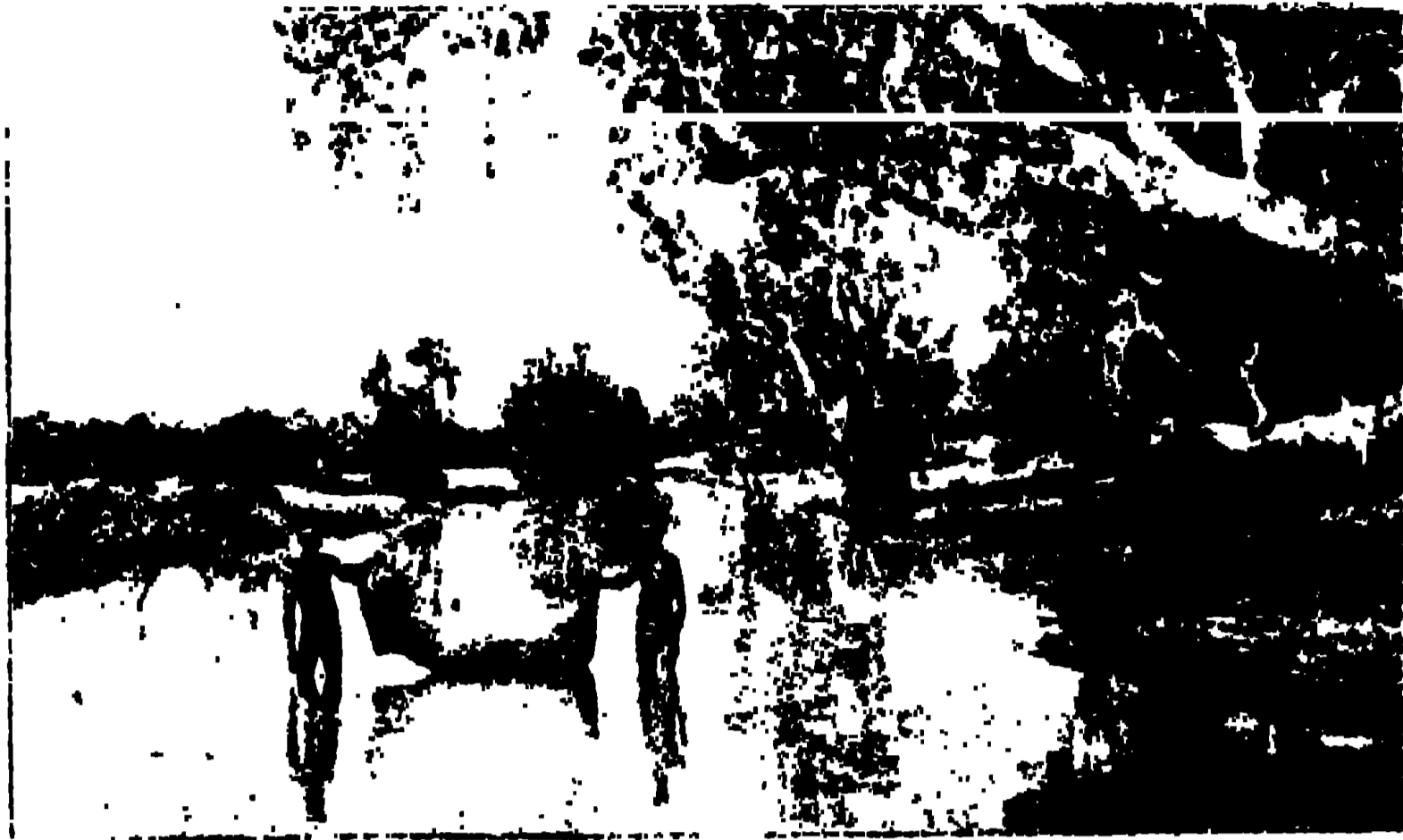
পশম কাটিবার পূর্বে ভেড়ার পাল

আশার বাণী মন্দেহ নাই। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ
নিজ-নিজ দেশে কয়েদ হইল। তাহাদের আর বাহিরে
কোথাও যাইবার উপায় রহিল না, এক যদি তাহারা সে
উপায় সঙ্গীনের সাহায্যে না করিয়া লয়। তাহাদের
ধরের সম্মুখে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে ভগবান্ এই যে-
সকল-ভোগ্য-বস্তু-সমস্বিত এক মহাদেশ সৃষ্টি করিয়াছেন
তাহাতে তাহাদের কোনো অধিকার নাই, আছে শুধু
ইংরেজের। কিন্তু চীন কিম্বা ভারতবর্ষের লোকেরা যদি
বলে যে তাহাদের শুধু নিজেদের দেশের হাটবাজার
প্রভৃতিতে ইংরেজের স্থান নাই তাহা হইলেই তুমুল কাণ্ড।
রাজনীতি-নামক যে একপ্রকার নীতি আছে তাহাতে এই-
প্রকার সমতামূলক সৃষ্টিগুলিকে "স্ববিচার" "সত্যতাপ্রচার"
নামে অভিহিত করা হয়।



মেরিনো

অষ্ট্রেলিয়া আয়তনে ২,২৭৪,৫৮১
বর্গ মাইল। এই মহাদেশের প্রায়
অর্ধেক জনমানবশূন্য অবস্থায়
পড়িয়া আছে। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে
অষ্ট্রেলিয়ার ২,০০০,০০০,০০০ একর
জমির মধ্যে মাত্র ১৩,২৯৯,০০০
একরে চাষ হইতেছিল। তাহা
হইতে অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ৭ কোটি
পাউণ্ডেরও অধিক উপার্জন করে।
১৯১৯-২০ সালে চাষের হিসাব-
নিয়ন্ত্রিত-প্রকার ছিল।



অভ্যন্তরীণ ধানসাবশেষ

গম	৬,৪১২,০০০	একর
ওট	১,০১২,০০০	একর
ঘাস	৩,১২৭,০০০	একর
আলু	১১৪,০০০	একর
আখ	১৫২,০০০	একর
আঙুর	৭০,০০০	একর
কলের বাগান	২৭২,০০০	একর

ইহা ব্যতীত অন্যান্য-প্রকার চাষে বাকি জমি ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক জগতে পশুসম্পদ চিরকাল শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গরু ও ভেড়া ইত্যে মাত্ৰ এককালীন দুগ্ধ, মাংস, চৰ্ম, পশম, ইত্যাদি নানা-প্রকার ভোগ্যবস্তু আহরণ করিতে পারে বলিয়াই, পশু-পালনের সুবিধা পাইলেই মাত্ৰ উক্ত কার্যে রত হয়। অষ্ট্রেলিয়াতে পশুপালন একটি খুব বড় ব্যবসায়। এই কার্যে অনেকে কোটিপতি হইয়াছে।

১৯১৯ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে ২,৪২১,০০০টি ঘোড়া, ১২,৭১১,০০০টি গরু, ৭৫, ৫৫৪,০০০টি ভেড়া এবং ৬৯৬,০০০টি শূকর ছিল। ত্রি-বৎসর অষ্ট্রেলিয়াতে ৬৬৩,২৪২,০০০ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়ার চামড়া, মাংস, মাখন, চৰ্ম ইত্যাদি পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি হয়। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শ্রামল প্রান্তরে উদ্ভূত অপৰ্যাপ্ত খাদ্য পাইয়া এবং বিভিন্ন

দেশ হইতে উন্নত জাতীয় ঘোড়া, গরু ও ভেড়া আমদানি করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা আজ পৃথিবীর মধ্যে পশু সম্পদে প্রধান দেশগুলির অন্ততম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মেরিনো ভেড়া পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের ঘোড়াও প্রসিদ্ধ।

অষ্ট্রেলিয়ার মেরিনো ভেড়ার রাজ্য। তাহার এক-একটি পুরুষ ভেড়া ৫০-৬০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। তাহার দেহজাত পশম বহুমূল্য এবং ওজনেও অনেক। পশমের ব্যবসায় অষ্ট্রেলিয়া অন্যায়সে অপর সকল দেশকে ছাড়িয়া যায়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তিন, কয়লা ও লৌহ সম্পদও অষ্ট্রেলিয়ার অজস্র আছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ার খনিজ ঐশ্বর্যলাভ হইয়াছিল প্রায় ৩২৩,৮৪০,০০০ টাকার।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বেশ বঝা যায় যে কেন ইংরেজ আজ অষ্ট্রেলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া অপর সকল জাতিকে “প্রবেশ-নিবেধ” বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া-আগমনে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসি-গণ প্রায় নিশ্চল হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজরা একটি অষ্ট্রেলিয়া-সম্পর্কিত পুস্তিকায় আত আনন্দের সহিত



কলিম.সি.ই.; বেলবোরন



উষ্ট্র-বান

শ্বেত জনসাধারণকে জানাইতেছে যে অধুনা অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধ স্থানগুলিতে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইলেও, একটিও যথার্থ কৃষ্ণকায় দেখা যায় না। এই আদিম অধিবাসিগণকে তাহারা "Relics of the Past" বা "অতীতের ধ্বংসাবশেষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

এই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আদিম অধিবাসিগণের আর কোনো আশা নাই। আমেরিকার লাল "ইণ্ডিয়ান"-দিগের জায় ইহারাও শুধু জগতকে দেখাইবার জন্ত মাত্র কয়েকজন অবশিষ্ট আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বেত-রাজত্বের ইহারা কোনো প্রকার শক্ততা করিতে সক্ষম নহে।

অষ্ট্রেলিয়াতে বড়-বড় শহরের অভাব নাই! সিড্‌নি, মেলবোর্ন, ব্রিস্‌বেন, অ্যাডেলড, পার্থ্‌; ও হোবার্ট-প্রত্যেকটিই শহরনামের যোগ্য। এইসকল স্থানের আবহাওয়া উৎকৃষ্ট, তবে গরমের দিকেই অষ্ট্রেলিয়ার আব-

হাওয়ার টান বেশী। অষ্ট্রেলিয়ার এক এক স্থানে শুধু মরুভূমি এবং সেইসকল স্থানে উষ্ট্রের সাহায্যে মাহুবে যাতায়াত করে। ইয়োরোপীয় মাহুয শুধু এক অষ্ট্রেলিয়াতেই সম্ভবত উষ্ট্র চালনা করে। তবে এশিয়ার বাসিন্দাও জন-কতক উষ্ট্রচালক অষ্ট্রেলিয়াতে আছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে কোথাও-কোথাও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আবহাওয়া ইয়োরোপের সমতুল্য। বরফ-ঢাকা

পাহাড়ও যে সেখানে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া দেখিলে অষ্ট্রেলিয়া এশিয়াবাসীর আবাসের পক্ষেই অধিক উপযুক্ত। অবশ্য এশিয়াবাসীর



অষ্ট্রেলিয়ার 'নালার' পর্বত

তাহা জানিয়া কোনো লাভ নাই। অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা ৯৮ জন অধিবাসী আজ বৃটিশ-জাতীয় এবং শতকরা ১০০ জন যাহাতে বৃটিশ হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

শুভইচ্ছা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের কী পরিচয়? বাইরের নানা বিক্ষেপে তা ভুলে
পাই। এইজন্তে, আমরা কোন্ ব্রতের ব্রতী সেটা বৎসরে
বৎসরে উৎসবের মহাদিনে অন্তরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে
ছন্দাস করিতে হয়। আমাদের সাধনার উপর যে
গুলিস্তর পড়ে সেটাকে মার্জন ক'রে তবে জানি কোন্
লক্ষ্যের দ্বারা আপন স্বধর্মকে আমরা চিন্তে
পাবি।

এই স্বধর্মের পরিচয় গ্রহণ করাকেই বলে দীক্ষা। এই
দীক্ষা কেবল একবারের নয়, বারে বারে এর পুনরাবৃত্তি।
সেই পুনরাবৃত্তিরই দ্বারা বারে বারে এর নবানতার
প্রমাণ। প্রভাতের আলোতে প্রতিদিনই পৃথিবীর নব-
জীবনের দীক্ষা, প্রতিদিনই তা'র নব জাগরণ। যে
সত্যকে স্বীকার করেছি অথচ সার্থক করতে পারিনি,
পুনঃপুনঃ তা'কে নূতন ক'রে স্বীকার করতে হবে। নইলে
সে ক্রমেই ম্লান হ'য়ে যায়। সাধ্বৎসরিকে আমাদের সেই
স্বীকৃতির পুনরাবর্তন।

আমরা যারা বিষয়ী, যারা বিজ্ঞ, তা'বা কী করি? না,
যেটা আছে সেইটেকেই মেনে নিই। “সংসারে
সাধারণত এইরকমই ঘ'টে থাকে,” এই উক্তিই আমাদের
কাছে বাস্তব সত্যের প্রবলতম বাক্য। অধিকাংশের
পক্ষে প্রতিদিনের যেটা চলতি পদার্থ সেইটেকেই আমরা
গ্রহণ ব'লে গণ্য করি—মনে করি, সেইটেকে আঁকড়ে
থাকলেই আমরা ঠকব না। স্বার্থের দিকে অহঙ্কারের দিকে
সাধারণ সংসারের যে-গতি আমাদের লক্ষ্য যদি তা'র উল্টো
দিকে হয় তা হ'লে জীবনে বিড়ম্বিত হবো, এটা বিষয়বুদ্ধির
কথা। যারা উপস্থিতকেই বিশ্বাস করে, যারা বাস্তববাদী,
তা'রাই চরনাল এমন মানুষকে বিজ্ঞা করেছে পৌড়া
দিয়েছে যে-মানুষ সচরাচরের প্রচলিত সীমানার বাইরে
সত্যকে দেখেছে ও মেনেছে, যে-মানুষ সাধারণ লোকের
প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের অভিমুখতা অঙ্গসরণ ক'রে আপন

ক্ষীণ সাধনের সাধনাকে প্রচলিত লোকমতের আড়িনা
পার হ'তে দেয় না। পায়ে পায়ে চিহ্নিত হ'য়ে যে
সক পথ হাটমাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বঁেকে গেছে সে ত
পণ্যভার-পীড়িত প্রতিদিনের পথ; ঝড় এসে তা'কে লুপ্ত
করে, বন্যা এসে তা'কে মুছে দেয়; মহা ভবিষ্যতের
অভ্যর্থনার জন্ত শ্রদ্ধাসবল শক্তি যে-পথ কাটে সেই ত
সত্যকার পথ। আমরা সেই পথের অঙ্গসরণ ক'রব, আমরা
সেই দীক্ষা নেবো যেটা অসাধা-সাধনের দীক্ষা।

মানুষ যুগে যুগে এই কথাই ব'লে এসেছে যে, সে তা'র
সহজ প্রকৃতিকে চরম ব'লে স্বীকার করে না। যদি কবুত,
তাহ'লে সে পশু হ'য়েই থাকত। উপস্থিত কালে ও
উপস্থিত অবস্থায় একমাত্র যেটা সম্ভবপর ব'লে বোধ
হয়েছে মানুষ তা'কে উপেক্ষা করতে সাহস করেছে, প্রচলিত
প্রমাণ-অনুপারে যেটা একমাত্র সম্ভবপর ব'লে প্রতিভাত,
মানুষ তা'কে অতিক্রম করার চূঃসাধ্য চেষ্টায় আনন্দ
পেয়েছে ব'লেই বাহিরের উপরে ও নিজের উপরে তা'র
অধিকার কেবল বেড়ে চলেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে,
যিনি প্রজ্ঞাপতি তিনি সমস্ত প্রজ্ঞার মধ্যে আপনাকে
প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অনন্ত পুরুষের
বিকাশ নিত্য সচেষ্ট। হৃদয় কাল থেকে এই অস্ত্রীনের
পরিচয় ক্রমশ ফুটতর হ'য়ে উঠছে। যা হয়েছে সে ত
অনেক, তা'র চেয়েও আরো অনেক হবে না, এমন ছোটো
কথা বলবে কে? অথচ প্রতিদিনের চলিত কথায়, বিষয়ী
বিজ্ঞানের সন্ধি আলোচনায়, মানুষের এই সবচেয়ে বড়ো
সত্যটিই প্রচ্ছন্ন হ'য়ে উপহসিত হ'য়ে থাকে যে-সত্যটি
একদিন আমাদের ঋষিবাক্যে উচ্চারিত হয়েছিল, “ভূমিব
স্বং নাল্লো স্বধর্মস্তি।” আমাদের সেই সত্যের দীক্ষা।
হৃদয়কে বিশ্বাস্তন ব'লে ধ্যান করবার দীক্ষা, চিত্তকে
নিখিল প্রজ্ঞার প্রজ্ঞাপতির আসন ব'লে উপলব্ধি করবার
দীক্ষা। মানুষের মধ্যে অনন্তরূপের যে-অভিব্যক্তি

তা'কে আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা গ্রহণ করবার অমুশাসন আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? পরম সত্যের মধ্যে আত্মোপলব্ধির অমুসরণে যে-বাক্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন ঘোষণা করেছিলেন তাই থেকে। তাঁরা বলেছিলেন, একই বছর মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করেন—ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে তবে এই সত্য বুঝে নিতে হবে। তাঁরা বলেছেন, সেই এককে জানাই অমৃতকে জানা। এই একের মন্ত্রকে মানুষ প্রতিদিন পরিহাস করেছে। তা'র কারণ, আমাদের রিপু আমাদের প্রবৃত্তি তা'র রঙীন মশালে অহমিকাকেই বড়ো করে দেখিয়েছে। কিন্তু এইটেই কি মানুষের ধর্ম? কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, স্বার্থের সংগ্রামই চারিদিকে অত্যন্তকট,—এও ঠিক যে, সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অনেক মানুষ ধনী হ'ল। কালের খণ্ডতার মধ্যে যদি দেখি তবে সেই ছোটো ক্রেমের মাঝখানে এই ছবিটাকেই বড়ো করে দেখতে পাই। এই মুহূর্তের খাঁচাটার মধ্যে যদি তাকিয়ে দেখি তবে চোখে পড়ে—ঠেঁষাঠেঁষির ভিতর মানুষ পরস্পরকে কেবলি খোঁচাখুঁচি করে মরছে। কিন্তু এই মুহূর্তের কাঠগড়ার ভিতরে যে-সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে তা'র সাক্ষ্যই কি চরমভাবে প্রামাণিক? কখনো তা মান্ব না। হোক সে প্রবল, তবু প্রচণ্ড প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলতে হবে, মানবসমাজে কল্যাণের পূর্ণরূপ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, যেহেতু, সে সত্য, সেইজন্যই বাহু পরাভবের ভিতর দিয়েও সে জয়ী হবে।

আমাদের দেশে যে মূল অর্থটির উপরে ধর্ম শব্দটি বিবাক্ষ করছে সেটি খুব বড়ো। প্রত্যেক জিনিসের যেটা প্রকৃতিগত, সেইটেই তা'র ধর্ম। দাহ্যগুণ শুকনো কাঠের স্বভাবগত, এইজন্যে যখন সে নাও জ্বলে তখনো আমরা বল্ব দহনীয়তা তা'র ধর্ম। তেমনি, সত্যরূপে মানুষের যেটি স্বভাব সেইটেই তা'র ধর্ম। কত-বড়ো জোরে এমন কথা বলা হয়েছে! প্রতিদিনই ত চারদিকেই দেখছি স্বার্থপরতা নিষ্ঠ রতা মিথ্যা আপনাকে প্রবল করছে। তবে মানুষ কেমন করে বললে যে, দয়া ত্যাগ সত্যই মানুষের ধর্ম, প্রতিদিন যা আমাদের পীড়া দিচ্ছে, আমাদের অভি-
কৃত করছে তা'কে স্বীকার করেও ত মানুষ বলেছে, সত্যে

ত্যাগে দয়াতেই মানুষের পরিচয়। কোনো জন্তু ত মনেও করতে পারে না যে, যে-সব প্রবৃত্তির পথে তা'র জীবনাত্মা নিরন্তর চলছে, তা'র পশুধর্ম তা'র বিপরীত। প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যে-সব প্রবৃত্তি মানুষকে চালাচ্ছে, তা'কেই মানুষ বলেছে মোহ, অর্থাৎ মিথ্যা। আর শুভ-বুদ্ধির যে-প্রবর্তনা আমাদের পক্ষে ছুরক, যার থেকে পদে পদেই আমরা স্বলিত হচ্ছি, তা'কেই মানুষ বলেছে ধর্ম, অর্থাৎ তার সত্যতম স্বভাব। মানুষ সেইসব লোককেই নরোত্তম বলেছে যারা স্বার্থধর্মের আবরণ ছিন্ন করে নিজের মধ্যে মাহাত্ম্যের জ্যোতিকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন। তার মানেই, মানুষ উপস্থিতকে, প্রতিদিনের-প্রচলিত প্রামাণ্য-তথ্যকে বিশ্বাস্য সত্য বলে মানতে পারেনি। এত যুগযুগান্তর ধরে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ সমস্ত দস্যবৃত্তি সমস্ত প্রতারণার নিরন্তর অভিঘাতের মধ্যেও ত ঐ সত্য মানবসংসারে অটল বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সর্ব-মানুষের সর্বকালের মানুষের অস্তরের এই বাণীকে কি তবে আজ অশ্রদ্ধা করতে পারি? তবু এমন কথা কি বলা চলবে যে, চিরদিনই মানুষ মানুষকে মারবে, ঠকাবে? পশুধর্মই মানুষের নিত্য ধর্ম? আজ মানুষের মধ্যে যতটুকু আত্মদমন, আত্মত্যাগ ও আত্মীয়তা দেখা যাচ্ছে, তা যত অল্পই হোক না কেন, তা সম্ভব হ'ল কি করে? কারণ সেইদিকেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছে, রিপুর উদ্দামতার দিকে নয়। ভোরের দিকে যখন আলো-অন্ধকারের পরিমাণ প্রায় সমান, তখনো আমরা আলোটাকেই ভোর বেলাকার প্রধান লক্ষণ বলে থাকি। মানুষের চরিত্রেও অন্ধকার যতই নিবিড় হোক না কেন, সেই অন্ধকারকেই আমরা তার স্বভাব বলতে পারিনে। মানুষ যে বিজ্ঞানচর্চা করে এসেছে, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তা'তে ভ্রমের ধারা প্রবাহিত, কিন্তু যতটুকু অংশে সেই ভ্রম কেটে যাচ্ছে, ততটুকু অংশেই আমরা বিজ্ঞানে সত্যধর্ম উপলব্ধি করি। তাই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে জোর করে বলতে পারি, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্যকে উদ্ঘাটন করা, মিথ্যাকে প্রচার করা নয়। যদি প্রথম ওঠে, বিজ্ঞান কি মিথ্যা প্রচার করেনি? উত্তরে বলতে হবে, হ্যাঁ বারবার করেছে; এমন কি সংখ্যার পরিমাণ করতে গেলে দেখা

যাবে যে, এপর্যন্ত সত্যের চেয়ে তা'র ভ্রমের হিসাব অনেক বড়ো। তবুও জোর ক'রে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য। মানুষের ধর্ম-সম্বন্ধেও সেই কথা। উপস্থিত প্রমাণের ওজন কর্তে গেলে দেখা যায়, প্রত্যহই মানুষ অন্বেষণ করছে, তা'র অসত্যের পার পাওয়া যায় না—তবুও সমস্ত আশু প্রমাণের ভিড় ঠেলে মানুষ বলে এসেছে, তা'র ধর্ম অর্থাৎ তা'র নিগূঢ় স্বভাব অন্বেষণ নয়, অসত্য নয়। এইজন্মে যারা মানুষের শুভবুদ্ধির কোনো আধ্যাত্মিক নিত্য আশ্রয় মানে না, তা'রাও ব্যক্তিগত বা সমাজগত দায়ে ঠেকলে মানুষের ধর্মবুদ্ধিরই দোহাই দিতে থাকে।

বাইরের কাজের দিক থেকে মানুষের প্রকৃতি বিচার ক'রে দেখা যাক। মানুষ পাখী নয়, অথচ কতকাল থেকে স্বপ্নে-জাগরণে মানুষ ইচ্ছা করেছে, সে আকাশে উড়বে। যখন সমস্ত আশু প্রমাণ ওড়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে, তখনো কল্পনায়, তা'র পৌরাণিক গল্পে, তা'র রূপ-কথায় নিজের অন্তর্গত ওড়বার ইচ্ছাকে প্রকাশ করাটাকে মানুষ অদ্ভুত হাস্যকর মনে করেনি। মানুষের সেই অদ্ভুত ইচ্ছাও আজ জয়ী হয়েছে। দূরত্বের ব্যবধানকে মানুষ না মেনে থাকতে পারেনি, কিন্তু মানুষ জাগ্রৎস্বপ্নে চিরদিন সেই ব্যবধান লোপ কর্তে চেয়েছে; তা'র সেই অত্যন্ত অসম্ভব ইচ্ছা প্রতিদিনই সম্ভবতর হ'য়ে উঠছে। বস্তুজগতে মানুষ যুগে যুগে সর্বত্রই অসাধ্যকে সাধ্য ক'রে চলেছে দেখতে পাচ্ছি; সে ভূতলে ভূগর্ভে জলতলে জলগর্ভে আকাশে, সব জায়গাতেই দুশ্চিন্তনীয় বাধাকেও মানলে না, জয়ী হ'ল। মানুষের ইচ্ছা যা কিছু কর্তে সাহস করেছে প্রায় তা সবই ক'রে উঠতে পারলে, এবং আশা কর্তে ছাড়ছে না যে ক'রে উঠতে পারবে। কেবল কি ধর্ম-জগতে অধ্যাত্মজগতেই তা'র ইচ্ছার ভীকতা সহ্য কর্তে পারি? মানুষের কল্পনায় ত সত্যযুগ আছে, স্বর্গ আছে। কোনো বাহ্যদৈন্তকে মানুষ চিরন্তন বলে স্বীকার করেনি, কেবল কি নৈতিক দারিদ্র্যকেই সে চিরকালের বলে হাল ছেড়ে ব'সে থাকবে? বলবে মানুষ তা'র ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্তই কাটাকাটি করবে, দস্যুবৃত্তি করবে, স্বার্থের অহুসরণে

সমস্ত পৃথিবীকে কর্ণা কলুষিত ও রিক্ত ক'রে দেবে?

এসম্বন্ধে একান্ত ইচ্ছা করার মতোই কি মানুষের সৃষ্টিশক্তি কাজ করে না? সংশয়-কুটিল বিজ্ঞপ কি সেই শক্তির সর্বপ্রধান বাধা নয়? এইজন্যই আমাদের দীক্ষা শুভইচ্ছার দীক্ষা। আমরা শুভ ইচ্ছা করুব, মানুষের শুভ ইচ্ছাকেই বিশ্বাস করুব, তা'কেই সত্য বলে, মানুষের ধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্র প্রকৃতি বলে মানুব। দেশবিদেশের সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রী হোক, এ ইচ্ছাটাকে অস্তিত ভারতবর্ষ হ্রাসবার কথা বলে মনে করেনি। এই ইচ্ছাকেই ভারতবর্ষ সমুদ্রপর্কিত পার হ'য়ে দূরে দূরান্তরে প্রচার করেছে। কত হিংস্রবর্কীরজাতি এই ইচ্ছাকে ধর্ম বলে মাথা নত ক'রে মেনে নিয়েছে, বলেছে এ'তেই মানুষের চরম শাস্তি চরম পরিভ্রাণ। অথচ উপস্থিত প্রমাণের হিসাবে তখনো ত এর বিরুদ্ধতার অস্ত ছিল না। সেই শুভইচ্ছার সীমাকে আমরা আজ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছি। জানি যে সেই ইচ্ছাই মানুষের ধর্ম, এইজন্যে সেই ইচ্ছাকে উত্তরোত্তর জাগ্রত কর্তে পারলে সিদ্ধি লাভ হবেই। সকল বড়ো বড়ো ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ইচ্ছা নিত্য নিয়তই কাজ করছে, আমরা সেই শক্তির পক্ষে আপন শক্তিকে নিযুক্ত করবার সাধনা নিয়েছি। শাস্তিনিকেতনের সাৎসরিকদিনে আমাদের সাধনার সেই আত্মপরিচয় স্বরণ কর্তে চাই, তা'র সমস্ত মলিনতা দূর ক'রে তা'কে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে চাই। সাধনায় সত্য হবার আশা করুব, আশু ফললাভের আশা করুব না। এর প্রতিকূলে দুঃখবাধা, আত্মীয়-পরিজনের ঐদাসীন্দ্র ও অবজ্ঞা সমস্তই স্বীকার করুব, কিন্তু বিশ্বাস হারাবো না। এ-কথা মনে রাখব যে, যা আছে তা'র ভিতরেই যা থাকা উচিত তা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; নইলে সে থাকটুকু থাকতেই পারত না। সংসারের সহস্র পাপের ভারে আক্রান্ত হ'য়েও সে বেঁচে আছে। কিসে তা'কে বাঁচিয়ে রেখেছে? প্রচ্ছন্ন সত্য, যে-সত্যকে আমরা ধর্ম বলি, এবং বলি "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"—ধর্মের তত্ত্ব গভীরের মধ্যে নিহিত থেকেই কাজ করে। শিশুর একান্ত দুর্বলতার মধ্যে শক্তির বাহু প্রমাণ নেই। কিন্তু

সেই দুর্দশতার মধ্যেই বলিষ্ঠ যৌবনের প্রত্যাশা নিহিত হ'য়ে আছে ব'লেই শিশু বেড়ে উঠছে। নইলে অশক্তির দ্বারা সে অভিভূত হ'য়ে বিনাশ পেত। ভূরি ভূরি অপরাধের ভিতরেও আজও মানুষ বেঁচে আছে। সেই বেঁচে থাকা যে কল্যাণশক্তির লক্ষণ সেই শক্তিতেই মানুষের পরিচয়। এবং সেই পরিচয়েই মানুষের এই অপরাহত

আশা, যে মানবসংসারে মানুষের ধর্মই জয়ী হবে। বিশ্ব-ভারতীর সাধনা সেই আশাকেই পরম সম্পদের মতো গ্রহণ করুক, রক্ষা করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

[* গত এই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ প্রদান করেন। ইহা তিনি তৎপরে বহুস্তো আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিয়াছেন। লিখনার সময় শ্রীযুক্ত-ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর সঙ্গুলিখন স্মারক-লিপির কাজ করিয়াছিল।]

বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অন্ন ও বস্ত্র এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজন সমস্ত দেশের পক্ষেই প্রায় সমান। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া দিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, আর-একটিকে ছাড়িয়া দিলে সমাজ অচল হইয়া উঠে। খাদ্যের প্রয়োজন অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বসনের প্রয়োজন মানুষের নিজ-হাতে গড়া। নিজের হাতে গড়া এই জিনিষটির উপর মানুষ তাহার প্রয়োজনের পক্ষে এমনভাবেই টানিয়া দিয়াছে যে, খাদ্যকে যদি বা দুই একদিন বাদ দিলে চলে, বসনকে একমুহূর্তও বাদ দেওয়া চলে না। সৃষ্টির আদিম যুগে যাহা ছিল না, সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত বা কতকটা বিলাসের দিক দিয়াই যাহার সৃষ্টি শুরু হয়, আজ সেই বিলাসের উপকরণ অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য জিনিষের তালিকার ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভ্যতার রথ যন্ত্র-মুখরিত রাজপথে খুলি উড়াইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, বস্ত্রের উপাদানে নূতন নূতন বিলাস-পণ্যের রসদ জোগাইবার কাজ হয়ত ততই বাড়িয়া উঠিবে। জীব-জগতের ল্যাজ ছনিয়ার ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে খসিয়া পড়ে—বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে প্রকৃতির সভ্য করিয়া তোলায় এমনি-একটি ইতিহাস নাকি ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু মানুষ যে-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে যে প্রয়োজনের লেজুড় একবার জুড়িয়া দেওয়া

হয়, তাহার চাঁটা বা কাটা পড়িবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। সে ল্যাজ হুমুমানের ল্যাজের মতো

“বাড়িয়া উঠিছে উর্ধ্ব পকাশ বোজন।”

আর তাহার উপর একটা আবরণ রচনা করিবার জন্ত

“ভারে-ভারে বস্ত্র সবে আনিছে নিকটে।

এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি খাঁটে।”

এ-যুগের মানুষ আজ আর কল্পনাও করিতে পারে না: যে, আবার কখনো এমন দিন ফিরিয়া আসিবে, যখন ঠিক আদিম যুগের মতোই বস্ত্রের প্রয়োজন খসিয়া পড়িবে। বস্ত্রের প্রয়োজন যখন এমনি অপরিহার্য তখন তাহার জন্ত কোনো দেশের চাহিদা বাহাতে সেই দেশের ভিতর হইতেই পূর্ণ হয়, তাহারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। World-Republic (বিশ্ব-জন-তন্ত্র) Universal Brotherhood (বিশ্ব মৈত্রী) ইত্যাদি বড়-বড় কথা উপর নির্ভর করিয়া নিজের দেশের কাঁচা মালের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে পরের দেশের বাণিজ্য-পণ্য বিকাইবার বাজারে পরিণত করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। Imperial Preference এর (সাম্রাজ্যগত পক্ষপাত) যে ধূম আজ উঠিয়াছে, সাম্রাজ্যের আর সকল অংশের স্খিণ্ড হইলেও তাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থার যে কোনো পরিবর্তন হইবে না তাহাও জানা কথা। সুতরাং পক্ষপাত (Preference) যদি কাহাকেও দেখাইতেই হয়, তবে সকলের আগে নিজের

দেশকেই দেখানো উচিত, এ-কথা বলিলে হয়ত আজিকার এই আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়ার দিনেও তাহা অন্তায় বলিয়া মনে হইবে না।

ভারতবর্ষের বঙ্গ-শিল্পের পুনরুদ্ধারের দুইটিমাত্র পথই কেবল গোলা আছে—একটি কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা, দ্বিতীয়টি চরুকার প্রবর্তনের দ্বারা; বঙ্গ-সমস্ত সমাধানের জগৎ জাতির মনের ভিতর একটা গুরুতর-রকমের তাগিদ এখন একবার জাগিয়াছে, তখন দুই পথের কোন পথ যে গ্রহণ-যোগ্য সে-দৃষ্টিতে একটা চূড়ান্ত-রকমের মীমাংসা এই সময়েই হওয়া সম্ভব। উভয় পথের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষভাবে বিচার করিয়া না দেখিয়া কাজে নামিলে, সব কাজেই যেমন পশ্চাইতে হয়, এ-ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি পশ্চাইতে হইবে। উপরন্তু যে আন্দোলনটা দেশের নিঃসাড় মনের উপর একটা ধাক্কা দিবার জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সফল করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

ব্যাবহারিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, মিলের একটা সুবিধার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে—মিলের কাপড়ের একছাঁদের বুনানীর কথা। যে বে-রকমের কাপড় পরিয়া অভ্যস্ত, তাহার সেইরকমের কাপড়ের চাহিদাই মিল অতিসহজে মিটাইতে পারে। মানুষ দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে জিনিষে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহার জগৎ তাহার একটা ঝাঁক ধাক্কা স্বাভাবিক। এ-ঝাঁকের হাত হইতে যদি কেহ হঠাৎ আপনাকে মুক্ত করিতে না পারে, তবে সেজন্য তাহাকে দোষও দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া মুক্ত করিবার কারণ যদি খুব গুরুতর না হয়, তবে সেজন্য কোনো লোকের উপর জোর জবরদস্তি চালাইলেও তাহা অন্তায় হয়। সুতরাং মিলকে বাদ দিয়া অন্য পথটিকেই যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এইপথে মিলের ব্যাবহারিক সুখ-সুবিধার চাহিদা মিটিবার সম্ভাবনা আছে কি না। আর যদি না থাকে, তবে অন্য-সব সুখ-সুবিধা এত বেশী কি না, যাহার জগৎ ইহার ব্যাবহারিক অসুবিধাটাকেও অগ্রাহ্য করা চলে।

এই প্রশ্নে বছর-কুড়ি আগের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এখন বাংলার একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বহুর মতো বহিয়া গিয়াছিল এবং বিদেশী-বজ্রনের উত্তেজনার মনে বাংলার তরুণ মন মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই বঙ্গ-সুয়শ্রুতি ছিল সে মাতামাতির দিনেরও বিশেষ হাতিয়ার। চরুকা এবং মিল, এই দুইটি জিনিষই সেই প্রথম স্বদেশী ভাবের দিক হইতে আমাদের মনে ঘা দিতে সক্ষম করে। একান্ত ঘরোয়া চেহারার চরুকা সেদিন ছ'দণ্ডের অতিথির মতো আমাদের মনকে চকল করিয়া তুলিলেও আমাদের মনের ভিতর স্থায়ী আসন সে গাড়াতে পারে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ালোকে ঘেরা আমাদের মনের দুঘারে মিল সেদিন যে শঙ্খনাদ করিয়াছিল, সেই শঙ্খনাদে মিলের পিছনেই আমরা ধর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ আবার যদি মিলকে বাদ দিয়া চরুকার হাতছানিতেই ছুটিতে হয়, তবে তাহার আকর্ষণ মিলের অপেক্ষাও জোরালো না হইলে মানুষের মন যে তাহাতে মাদ্রা দিবে না তাহা সূনিশ্চিত।

মহাত্মা গান্ধী চরুকাই ভারতবর্ষের সমস্ত-বকম নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হাতিয়াররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সঙ্গে হয়ত সকলের মত মিলিবে না। রাজনৈতিক উপযোগিতা দূরের কথা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা লইয়াও হয়ত মতদ্বৈদের সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর আদ্যাত্তিক যুক্তির আঘাতও নহে, তিনি আঘাত করিয়াছেন বিশেষভাবে ভাবের দিক হইতে। ভাবের আঘাত একেবারে পৌরাণিক যুগের পরশপাথরের আঘাতের মতো। যাহার ভিতর সে পরিবর্তন আনিতে পারে, তাহাকে একেবারে পাঁচি সোনার পরিণত করিয়া রাখিয়া যায়। কিন্তু যাহার উপর পরশ-পাথরের প্রভাব নাই, ছনিয়ায় তেমন জিনিষও আছে। যাহা পাড়ুদ্রব্য নহে, যাহা ইঁট, কাঠ, পাথরের মতো জিনিষ, তাহাতে পরশ-পাথর ঠেকাইলেও তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। সেগুলির ভিতর কোনো পরিবর্তন আনিতে হইলে অন্যরকমের ব্যবস্থা দরকার। ভাব বোঝে না অথচ গুস্তি

বোঝে, ছুনিয়ার একরূপ লোকের সংখ্যা একেবারে অল্প নয়।

ভাবেব এই মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াও মিলের উপযোগিতা-সম্বন্ধে যাহাদের মতের পরিবর্তন হয় নাই, তাঁহারা সাধারণত একেবারে বস্ত্র-জগতের লোক। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ লইয়া তাঁহাদের হিসাবের খাতা তৈরী হয়। পাতার হিসাবের বাহিরে পা বাড়াইতে ও তাঁহারা নারাজ। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে লাভ-লোকসানের কষ্টিপাপরে কষিয়া তাঁহাদের খাতার অঙ্ক যে ভুল, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য-আর কোনো উপায় নাই। এবারকার আন্দোলনের সম্পর্কেও খাতা খুলিয়া ইঁহারা লাভ-লোকসানের হিসাব লইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—কাপড়ের আন্দোলনে জোর দেওয়ার অর্থ বস্ত্রের জন্ত প্রতিবৎসর যে ৬০।৭০ কোটি টাকা বিদেশের মালখানায় যাইয়া মজুত হইতেছে, তাহার পথ বন্ধ করা। দেশী মিলের উপরে যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলেও এই অর্থ দেশে থাকে। দেশী লোকের মূলধনে যে মিল প্রতিষ্ঠিত, দেশী মজুরের দ্বারা যে মিল চলে, দেশী বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারীদের দ্বারা যে মিলের তত্ত্বাবধান হয়, এবং দেশের লোক যাহার লাভের অংশ ভোগ করে, তাহাকে বর্জন করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। যুক্ত লইয়াই যদি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে হয়, তবে এ-যুক্তিটা বিশেষভাবেই যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যিক। কাবণ এযুক্তি যাহারা দেয় তাহারা কেবল দলেই ভারী নহে, যুক্তির ভিতরও তাহাদের জোর আছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের এই লাভ-ক্ষতির প্রসঙ্গটাকে নানাদিক্ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। তৃত্বা, মিলের কল-কজা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা—এ সমস্তেরই হিসাব না গণিয়া তাহার পরীক্ষা শেষ করা চলে না। সূতার কথাটাই আগে ধরা যাক্। বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারত-বর্ষকে সূতাতেও স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ সূতাতে যে স্বাবলম্বী নয়, আমদানি-রপ্তানির হিসাব-নিকাশটাই তাহার প্রমাণ।

বিশেষী সূতার আমদানি

১৯১৪ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত

বৎসর	সূতার ওজন (পাউণ্ড)	সূতার দাম (টাকা)
১৯১৪	৪৪১৭১০০০	৪১৬০০০০০
১৯১৭	২২৫৩০০০০	৪০৪৮২০০০
১৯১৮	১২৪০০০০০	৪২২৫২০০০
১৯১৯	৬৮০২৫০০০	৮০৬৬০০০০
১৯২০	১৫০২৭০০০	৪০৫২৫০০০
১৯২১	৪৭৩৩৩০০০	১৩৫৭৮৩০০০
১৯২২	৫৭১২৫০০০	১১৫১২২০০০
১৯২৩	৫২২৭৪০০০	২২৫৮৫০০০

কলে বস্ত্রবন্দনই যদি চলিতে থাকে, তবে বিদেশ হইতে সূতার এই আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হইবে কি না, সে-সম্বন্ধে সকলের আগে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের বস্ত্র আন্দোলনের এই মরশুমের দিনেও বিদেশী সূতার আমদানি কমে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যাহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২২ সালে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯২৩ সালে সেই সংখ্যা পৌঁছিয়াছে প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ডে।

বিশেষী সূতার আমদানি ভারতবর্ষে বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? এই 'কেন'র জবাব নানারকমে দেওয়া চলে। একটি জবাব হইতেছে এই—ভারতবর্ষে তুলা যথেষ্ট জন্মিলেও লম্বা আঁশের তুলা জন্মায় না। ল্যাক্সাশায়ার, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি স্থানের মিলগুলির জন্ত দেখা যায় লম্বা আঁশের তুলা অপরিহার্য। ল্যাক্সাশায়ার, ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে যাহা অপরিহার্য, ছুনিয়ার সমস্ত মিলেই তাহা অপরিহার্য হওয়া অসম্ভব নয়; মিলের বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে, অন্ততঃ মিলের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পকে পরিপূর্ণতা দান করিতে হইলে অন্তর্দেশের লম্বা আঁশের তুলার উপরেও খানিকটা নির্ভর করিতে হইবে। সূতরাং সূতার সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়ার এখানেও একটা বড় রকমের বাধা আছে বলিয়া মনে হয়।

তুলার-সম্বন্ধে অন্তর্দেশের উপর এই যে নির্ভরতা—ইহার দুঃখ এবং অনিশ্চয়তা যে কত বড়, ইংলণ্ডের বস্ত্র-

শিল্পের আগাগোড়ার ইতিহাসটা আলোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পই ইংলণ্ডের জীবনকাঠি মারণকাঠির মতো। অথচ তুলা সে নিজের দেশে জন্মাইতে পারে না—তুলায় অল্প তাহাকে ধারণ হইতে হয় আমেরিকার দ্বারা। আমেরিকা বস্ত্রশিল্প বন্ধ করিলে ইংলণ্ডের কলগুলির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, আমেরিকান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ ইংরেজ একবার পাঠিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আবার হয়ত আরো ভালো করিয়া পাঠবে। কারণ আমেরিকা আর খুব বেশী দিন যে ল্যান্কাশায়ারের কলগুলিতে তাহাদের চাহিদা-অনুসারে তুলায় জোগান দিবে না, আজ তাহা অতিমাত্রায় স্থম্পষ্ট। ১৯০৭ সালে আমেরিকার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of the Bureau of Agriculture) ইউরোপের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতি-নিষিদের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন :—

“আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন যুক্তরাজ্য তাহার তুলায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ বস্ত্রশিল্প না করিয়া নিজের দেশেই তাহার অধিকাংশ বস্ত্র-নির্মাণে ব্যয় করিবে এবং এই বস্ত্রশিল্প যে কত বড় লাভের ব্যবসা তাহাও অনুভব করিতে সক্ষম হইবে।”

তাহার এই নীতির ইঙ্গিত আমেরিকা কতটা যে কাজে পরিণত করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন মিঃ জি, বিগউড। তিনি তাহার ‘Cotton’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

“১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে যুক্তরাজ্যে তুলায় কলনের মোট পরিমাণ ছিল ৮০,০০,০০০ বেল। পরের পাঁচ বৎসবে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯০,০০,০০০ বেল হইয়াছিল। কলনের দিক্ দিয়া ১০,০০০,০০ বেল বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমেরিকার বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রটাও বাড়িয়া উঠে। পূর্বে যেখানে ২০,০০,০০০ বেল তাহার নিজের দেশে বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজন হইত, সেইখানে সেই বৎসর ২৫,০০,০০০ বেল সে নিজের দেশেই বস্ত্র-নির্মাণে ব্যয় করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার বাড়তি উৎপন্নের অর্ধেক সে লাগাইয়াছে নিজের দেশের বস্ত্রশিল্পে। ইহার ফলে ছনিয়ার কাঁচা মালের জোগানে তুলায় পরিমাণের কম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ছিল মোট ২৫,০০,০০০ বেল। সে বৎসর ল্যান্কাশায়ারের অনেক মিলকেই তুলা কম পড়ার কাজের সময় কমাইয়া দিতে হইয়াছিল। সুতরাং মূলধন এবং মজুর উভয় দিক্ দিয়াই ল্যান্কাশায়ারকে কঠোর বন্ধি সঙ্ক করিতে হইয়াছে। তাহার পর সর্বমানের দিকে বর্তাই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, আমেরিকার কলকারখানাগুলিতে তুলায় খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ৫৫,০০,০০০ বেল, ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ৬০,০০,০০০ বেল এবং ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে ৭২৫০,০০০ বেল তুলায় প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার উপনিবেশ ও অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে তুলা উৎপন্ন করা অর্থনীতি ও

বাণিজ্যনীতি এই উভয় দিক্ দিয়াই যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছনিয়ার বস্ত্রশিল্পের উপযোগী তুলায় অল্প একটি দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকার সমীচীন নহে। যখন তুলায় কাঁচা মালের জোগান পাওয়া না যায়, তখন এ-দেশের কল কারখানাগুলির অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহায় ও শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহাও প্রমাণ আমেরিকার অস্ত্রবিপ্লবের সময়েই পাওয়া গিয়াছে।”

ইংলণ্ডে তুলা জন্মায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে তুলায় ফলন বড় অল্প নহে। সুতরাং অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন লক্ষ্য আশের তুলায় অল্প ইংলণ্ডের যে বিপদ, ভারতবর্ষের পক্ষে সে-বিপদ নিছক কল্পনা-মাত্র। কিন্তু ইহা যে কেবল কল্পনা নহে তাহারও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার হাতে মার পাঠিয়া ইংরেজেরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য আশের তুলায় জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অল্প অর্পব্যয় করিয়াও তাহাদের সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। ভারতবর্ষের মাটি লক্ষ্য আশের তুলায় বীজ দারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ১৮১২ সালে কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টর্স্ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কপাটা স্পষ্ট করিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে :—

“আমরা ব্রিটিশ শ্রাবকে বিদেশী ধরণের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা বন্ধ বৎসর ধরিয়া করিয়াছি এবং তাহাতে অকৃতকার্য হওয়ার অনুশোচনাও ভোগ করিতেছি।”

মিঃ মার্কারের মতও এই মতেরই পরিপোষণ করে :—

“এইসব পরীক্ষা-কেন্দ্রে পূর্ণমাসের ব্যয় সম্পূর্ণ অনর্থক হইয়াছে আমেরিকার পদ্ধতি ভারতবর্ষে অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবর্ষের কৃষকদের দেশের আবহাওয়া ও জমির শক্তি-সম্বন্ধে বেশ একটা স্থম্পষ্ট ধারণা আছে। আর তাহারই ফলে তাহারা ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা চের কম খরচে ক্ষেত্রে কমল উৎপন্ন করিতে পারে।”

মিঃ মার্কারের একথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার যে কাহারও অপেক্ষা কম নয় তাহা বলাই বাহুল্য কারণ ভারতবর্ষের তুলায় উন্নতির জন্য পূর্ণমাস্ট্ যেসব বিশেষজ্ঞের আমদানি করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাহাদেরই একজন।

‘পাদি ম্যানুয়ালের’ দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

“পূর্ণমাস্ট্ তুলায় চাষের উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের মাটির উপাদান নিরীক্ষণ করিয়া আমেরিকার মাটির সহিত তুলনা-মূলক আলোচনাও এইসম্পর্কেই শুরু হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তনই সাধিত হয় নাই। * * * ভারতবর্ষের ধারমন্ডর গতিতে হতাশ হইয়া

সাত্রাভোগর জনাঙ্ক তথা আঁশের তুল্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টাতেই এখন তাঁহারা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন।”

এই অঘোষণার ফলে ইংরেজের মতো শক্তিশালী জাতির তুলার চাহিদা হ্রাস হইতে পারে এবং তাহার সম্ভাবনাও হ্রাস দেখা দিয়াছে। সুদান লইয়া এই যে এত হানাহানি, তাহা ইংরেজের নেহাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম নহে। “Daily Express”-এর একটি প্রবন্ধের কয়েকটি পংক্তির উপর দৃষ্টি দিলেই এই হানাহানির অর্থ বোঝা যায় :—

“সুদানে নানাভাবে পরীক্ষার দ্বারা বেশ স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে-সুদান পৃথিবীর উর্ধ্বতম স্থানগুলির অন্যতম। ইতিমধ্যেই তাহার ২০,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ চলিয়াছে। সুদানে প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমি চাষ-আনারের লোপা, প্রথমে এই স্থানের দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে অর্থাৎ ৩ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে বৎসরে প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড তুলার কসল ফলিতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এক পুরুনের ভিতরেই কসলের পরিমাণ ১০ লক্ষ বেলে গিয়া দাঁড়াইবে। ১০ লক্ষ বেলে তুলার দাম দুই কোটি পাউণ্ড। সুদানের বন্দর হইতে এই তুল্য ইংরেজের তাহাজে লঙ্কন এবং লিভারপুলে প্রেরিত হইবে।”

সুদানের এই জমিগুলি চাষের উপযোগী হইয়া উঠিলে ল্যাঙ্কাশায়রের তুলার জন্ম ইংরেজের বিপদ হইতে কাটিবে, কিন্তু ভারতবর্ষের মিলের চাহিদা মিটিবার উপযোগী তুল্য তাহাতেও মিলিবে না। মিলের কথা বিশেষভাবে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষে যে তুল্য জন্মায়, তাহাতে চরুকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিলে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্রও তৈরী হইতে পারে মিল যাহা বুনিবার কল্পনাও করিতে পারে না। মসলীন প্রভৃতি ভারতবর্ষের তুলার সূতাতেই তৈরী হইত। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, লক্ষ্য আঁশের তুল্য লইয়া যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র মিলের সম্পর্কেই, চরুকায় সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। ভগবানের দেওয়া হাতে এবং মানুষের তৈরী মিলে এইখানেই তফাৎ। অবশ্য মিলে যদি কেবল মোটা সূতার বস্ত্রই তৈরী করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষের ঘাড়ে এ-বিপদের বোঝা হ্রাস না-ও চাপিতে পারে। কিন্তু শিল্প-সম্বন্ধেই হোক, অথবা আর যে-কোনো সম্বন্ধেই হোক, কোনো বিশেষ পথ অবলম্বনের পূর্বে সে-পথের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষ নিজের উপর নির্ভর করিয়া মিলের

দ্বারা তাহার বস্ত্র-শিল্পকে যদি সম্পূর্ণতা দান করিতে না পারে, তবে সে-পথ আর যাহাই হোক, তাহার গন্তব্য পথ যে নহে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুলার এবং সূতার এই পরাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও মিলের বস্ত্রের সম্পর্কে ভারতবর্ষের পরাধীনতার দ্বের মিটে না। বস্ত্রের জন্ম মিলের উপরেই যদি ভারতবর্ষকে নির্ভর করিতে হয়, তবে আর-এক দিক্ দিয়া এমন আর-একটা পরাধীনতার জোয়াল তাহার ঘাড়ে চাপে যাহার ভারও বড় সহজ নহে। সে-চাপ কল-কারখানা, লোহা লকড়েব। কল-কাজ তৈরীর উল্লেখযোগ্য কারখানা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটিই আছে—টাটার লোহা-ইম্পাতের কারখানা। সেটিকে শিবরাত্রির সলিটার মতো নানা জোড়-জোড় দিয়া সাহেব-মিস্ত্রীদের সাহায্যেই নাকি কোনো-রকমে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে হইলে যতগুলি কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা দরকার তাহার উপাদান জোগাইবার সামর্থ্য টাটার কারখানার নাই। একটি মিল প্রতিষ্ঠায় কত টাকার মেশিনারি লাগে, তাহার সম্বন্ধ আমাদের ধারণা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। সুতরাং ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে প্রতিবৎসর যত টাকার মেশিনারি আসে, তাহার একটা আভাস দিলে, হ্রাস তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মেশিনারির আয়দান

কাপড়ের কলে

	১৯২২		১৯২৩	
সূতাকাটার বস্ত্র	৬৪২৩১৩৮১	টাকা	৫২২.১৭৩৮	টাকা
বস্ত্রবস্ত্র	১৭৮৪৪৮৪২	"	১২৬৬৩৪৫.০	"
রং করার বস্ত্র	১৭০৫৪৫৪	"	৭৪৬.০০	"
চাপের বস্ত্র	২৫০২.০	"	৭৮৩৩	"
অস্ত্র-রকমের বস্ত্র	৫৩৩১২২২	"	৪৬৮৪৫৭৮	"
মোট	৮২১৩৮৬২৬	"	৭.৬৪৩২২২	"

সুতরাং মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো-রকমের সম্ভাবনা ত নাই-ই, উপরন্তু এইসব মেশিনারির জন্ম একটা বিপুল অঙ্ক অধুনা হ্রাস ভারতবর্ষকে বাধ্য করিতে হইবে। যাহারা বলেন, কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের অর্থ

বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, এইসব যুক্তির মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখিলে তাঁহাদের কথায় বিশেষ-কোনো দাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাহা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটাও একেবারে অবেহলার জিনিষ নহে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অপরিণাম। এক-একটি মিলের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যয়ের কড়ি গণিয়া এ-দেশের পক্ষে বহু মিলের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কি না তাহাও ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। কয়েকটি কাপড়ের কলের ব্যয়ের অঙ্কটা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এত অর্থ ব্যয় করিয়া এ-দেশের কয়টি কল প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা আছে, এই অঙ্কগুলির দিকে নজর দিলে দেশের লোকের সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ত গড়িয়া উঠিতে পারে।

মিলের নাম	মূলধনের পরিমাণ
সেন্টাল ইন্ডিয়া স্পিনিং উইলিং এণ্ড	
মানুফ্যাকচারিং কোং	২৬৮৭৫০০
ডাব্বার মিলস্ কোং	৫০,০০০০
মাইথ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়ালস্	৩০,০০০০
বঙ্গলক্ষী কটন মিলস্	১৮,০০০০

অর্থনীতির দিক্ দিয়া মিলের হাতে ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার ভার ছাড়িয়া দেওয়ার এতগুলি প্রতিবন্ধক আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিবন্ধকও নিত্যসংঘ। মিলের সহিত প্রতিযোগিতার নিত্যসংঘ। মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে এদেশের মিলগুলিকেও প্রতিযোগিতায় বিনোনের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডের মিলগুলিকে পরাজিত করিয়াই টিকিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ জয়লাভের অর্থ কি তাহা সহজেই অসম্ভব। বস্ত্রশিল্পের উপর বিলাতের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে, গত কয়েক বৎসরের খবরের কাগজগুলি দ্বারা পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। যুদ্ধের অন্ত এবং ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে যখনই ম্যাক্লেটোরের কাপড়ের কল-গুলিতে বস্ত্রের চাহিদায় কমতি পড়িয়াছে, সমস্ত গ্রেট-ব্রিটেন জুড়িয়া তখনই হাহাকার আশ্রিত উঠিয়াছে। সেই

হাহাকারের চাকলোর ধাকার এই কয় বৎসর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এতটুকুও সোয়াস্তি ছিল না। তাহার কর্তৃত্বের ভার এইজন্যই উত্তিমধ্যে যে কতবার হাত বদলাইয়া লইয়াছে, তাহার ইতিহাসও খবরের কাগজ দ্বারা নিত্য-নিয়মিতভাবে পড়েন তাঁহাদের আজানা নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সাফল্যের উপর যে দেশের ভবিষ্যৎ এতখানি নির্ভর করে, ভারতবর্ষ সেই দেশের কাছেই পরাধীন। সুতরাং মিলের ব্যাপার লইয়া এই দুইটি দেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ইংরেজের উদারতার মুখোমুখি যে একান্ত নিঃসঙ্কভাবেই খসিয়া পড়িবে না, একথা আজ কেহই হালপ করিয়া বলিতে পারে না। ইংরেজের উদারতাও এদিক্ দিয়া বড় বলিয়ঃ মনে করিবার কারণ নাই। কারণ যে সামান্য একটু প্রতিযোগিতা আজ চলিয়াছে, তাহারই ফলে ইতিমধ্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্পাসশিল্পের উপর Excise Duty, Supertax প্রভৃতি নানা ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই ট্যাক্স-গুলির স্বরূপ যে কি 'খাদ্য ম্যাগাজিনের' ভিতর হইতেই তাহারও আভাস পাওয়া যায়।"

ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সহিত ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা তখনই চরমে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন ম্যাক্লেটোরের ঋণের দ্বািতরে ভারতবর্ষের ব্যবহারের জন্য ভারতের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপরেও ট্যাক্স বসিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের Cotton Duties Act এর দ্বারা ভারতীয় মিলের তৈরী বস্ত্রের উপর শতকরা ৩০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। * * * কাপড়ের মিল হইতে পর্দামেন্টে প্রতিবৎসর শুধু বাবদ ১৬ কোটির টাকা এবং ইনকম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স বাবদ শুধু প্রায় ৩০ কোটি টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন।"

এই Excise Duty বাবদ ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে বৎসরের পর বৎসর যে ক্ষতির ঝুঁকি সহ্য করিতে হইতেছে নিয়ে তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত Excise Dutyর হিসাব

স্থান	১৯১৯	১৯২০
বোম্বাই	১১৬১৮০০০	১২৮৬৬০০০
মাদ্রাস	৭৪৮০০০	৭৬৭০০০
বঙ্গদেশ	২১০০০০	৩০২০০০

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত

Excise Dutyর হিসাব

স্থান	১৯১৯	১৯২০
বৃহৎপ্রদেশ	৪৪০০০০	৫৩৩০০০
আন্ধ্রপ্রদেশ-মাদ্রাসার	৬৭০০০	৭৮০০০
পঞ্জাব	২৩০০০	২৩০
দিল্লী	৩৩০০০	
মধ্যপ্রদেশ এবং বেহার	৬৭৫০০০	
করদ মিল ও অন্যান্য		
ভারতীয় স্থানীয় রাজ্য	৫০৭০০০	
মোট	১৫৩২১০০০	১৬৩৯৯০০০

মিলের দ্বারা বস্ত্রসমস্তার সমাধান করিতে হইলে এই Excise Dutyর হ্রাস ভারতবর্ষকে হয়তো চিরদিনই টানিয়া চলিতে হইবে—হয়তো ইহার নাম এবং চেহারা তখন বদলাইয়া যাইবে। অর্ধের অঙ্ক বদলাইয়া আরো ভারী হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

আর ইংরেজদের উদারতা সত্যসত্যই নিজের বিপন্ন করিয়াও যদি ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করে তথাপি এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী নহে। কারণ ভারতবর্ষ কেবলমাত্র অর্ধেরই কাঙাল নহে। ইউরোপের ধনিক সভ্যতা যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আজ এত বড় হইয়াছে—সে-সাধনাও ভারতবর্ষের নাই। ভারতবর্ষ কোনোদিনই গোটা দেশকে কারখানার শ্রমিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই স্বতরাং পশ্চাত্য-জগতের শ্রমিকদের যোগ্যতা, পারদর্শিতা, ক্ষিপ্ততা—এগুলির অভাবও ভারতবর্ষকে প্রতিপদে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করিবে। মিঃ রাশ্‌ক্রক্ উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন :—

“মিঃ টমাস্ এইনস্‌কাক্ ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রিপোর্টে লিখিয়াছেন, ভারতীয় মজুরেরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান মজুরদের তুলনায় কম মজুরী পায় বটে, কিন্তু কাজের দিক দিয়াও তাহারা অশিক্ষিত, অনিপুণ ও চিলা প্রকৃতির। মিঃ এইনস্‌কাকের এই মন্তব্য মিথ্যা নহে। * * * যে পর্যন্ত ভারতীয় মজুরদের জীবনধারণের ও কর্ম-নৈপুণ্যের আদর্শ উন্নত না হইতেছে, সে পর্যন্ত তাহারা তাহাদের সমুদ্রপারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো কাজে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে না। এক্ষণে ভারতীয় মজুরদের মজুরী, বাসস্থান, সাধারণ অবস্থা চের উন্নতকর আদর্শের করিয়া তোলা চরুকার। এ-দেশের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এই উপায়েই কেবল পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।”

উহার প্রদর্শিত পথে শ্রমিকদের যোগ্যতা বাড়ানো যেমন অর্থসাধ্য তেমনি সময়সাধ্য ব্যাপার। স্বতরাং সে-পথ ভারতবর্ষের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ পথ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া শ্রমিক সমস্তা আজ ইউরোপে যে-ভাবে দেখা দিয়াছে—তাহা দেখিয়াও ওপথে পা-বাড়ানো হয়ত বিশেষ সম্ভব হইবে না। ধনিক সভ্যতার-জীর্ণ দেয়ালের উপর ভার আর কতখানি সহিবে সেটাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। ইউরোপে নিজের ভারে আজ যাহা নিজেই ভাঙিয়া পড়িবার মতো হইয়াছে তাহারই ভার ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইলে, সে তাহা সহ্য করিতে পারিবে কি না, পশ্চাত্য-সভ্যতার নীল চশমা চোখে না পরিয়া সাদা চোখেই তাহা যাচাই করিয়া লওয়া দরুকার।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা জানেন, এই বস্ত্রশিল্পে তাহার প্রাক্তী বড় সহজ ছিল না। গোটা ছুনিয়ার বস্ত্রের অভাব একদিন তাহারই হাতে বোনা কাপড়ে পূর্ণ হইয়াছে। Mr. Shah ষোড়শ শতাব্দীর কোনো বিদেশী লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

“স্কেপ অব শুড্ হোপ হইতে চীন পর্যন্ত সমস্ত স্থানের প্রত্যেক অধিবাসী ভারতীয় হাতে তৈরী কাপড়েই তাহাদের মেহের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিত।”

ছুনিয়ার কাপড়ের জোগান দিতে গিয়া তাহাকে যখন কলের পায়ে তেল মাখিতে হয় নাই, তখন কেবলমাত্র তাহার নিজের দেশের বস্ত্র বোনার কাজ কল ছাড়া আজ তাহার চলিবে না কেন, তাহার কোনো স্বল্পষ্ট যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের জমি, তাহার শ্রমিক, তাহার ব্যবসার ধারা, তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমস্তই কলের পরিপন্থী। কলের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলা তাহার জমিতে জন্মায় না, কিন্তু তাহার জমিতে সে তুলা প্রচুর জন্মায় যাহার দ্বারা চরুকার সূতা কাটিলে দেশের অভাব উ মেটেই, তাহা ছাড়া এমন বস্ত্রেরও রসদ পাওয়া যায় মিল বাহা কাটিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বিদেশীর কষ্টপাথরেও এ-দেশের চরুকার সূতার যে স্বরূপ ধরা

পড়িয়াছে তাহারই একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া
গেল :—

“বিশেষ জোরালো নমুনার উদ্ধৃত করিয়াই আমি দেখাইয়া দিতে পারি
বে, এইসব সূতার গড়পড়তার ৫০০ কাউন্টের ছিল এবং ছোটো আঁশের
তুলা হইতেই তাহা কাটা হইত। বর্তমান যুগের বিশেষ উন্নতধরণের
যন্ত্রেও অসাধারণ জোর ও পরিষ্কার ছাড়া এত বেশী নমুনের সূতা কাটা
যায় না।” (Mr. Woogewerf in Quarterly Journal.)

যে হাতিয়ারে এই সূতা কাটা হইয়াছে তাহার কল-
বস্ত্রের জন্ত বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন
নাই। তাহার উপাদান সামান্য কয়েকখানা কাঠমাত্র।
আর সে কাঠ ভারতের বনে-জঙ্গলে এত পর্যাপ্ত-পরিমাণে
জন্মায় যে, তাহার জন্য একটা টাকা ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট।
এই হাতিয়ারে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র তাহার
নিষ্কাশন নহে, সমগ্র ছিন্মার বস্ত্রশিল্পের অভাব পূর্ণ করিতে
পারে। যে প্রচুর মূলধন মিলের পক্ষে অপরিহার্য এবং
যাহার জোগান দিবার সাধ্য ভারতবর্ষের নাই, চরুকায় সে
মূলধনেরও আবশ্যক হয় না। মিলে যে প্রতিযোগিতার
আশঙ্কা আছে, গৃহ-শিল্পের সাধারণ নিয়ম অনুসারে চরুকা
সে প্রতিযোগিতার হাত হইতেও মুক্ত। সুতরাং যুক্তির
দিক দিয়াও যাচাই করিতে গেলে, ভারতবর্ষে অস্বতঃ
মিলের উপর জোর দেওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া
যায় না।

তবে এ আশঙ্কা একেবারে অস্বাভাবিক নহে যে, বস্ত্র-
শিল্পের রথচক্র ঘর্ষরে যেখানে ছিন্মার অর্থভাগ্যের মাথা
লুটাইয়া দিতেছে সেখানে গৃহ-শিল্পের প্রচেষ্টাকে জীয়াইয়া
রাখা সম্ভবপর হইবে কি না। কিন্তু বাহারা দেখিতে
জানেন তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, বস্ত্র-শিল্প
আপনার মৃত্যুবাণ আপনারই বুকে হানিয়া বসিয়া আছে।
যে অবিচার ও অন্যায়ের উপর বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদ গড়িয়া
উঠিয়াছে, ছিন্মার শ্রমিকদের কুঠার তাহার মূলে ঘা
দিতে শুরু করিয়াছে। বর্তমানের চাকচিক্যে তাহার
ধ্বংসের নিশানাটা দেখা না গেলেও ভবিষ্যতের অন্তরালে
তাহার ধ্বংসেরও খুব দেরী নাই। লক্ষ লোকের বুকের
রক্ত পান করিয়া কাহারো গৌরব-ধ্বজা যখন রাজা হইয়া
উঠে, অকস্মাৎ একদিন তাহার মাথার মুকুট, বাহাদের

রক্ত সে পান করিয়াছে তাহাদেরই পায়েব তলায় লুটাইয়া
পড়ে। আভিজাত্যের জয়ধ্বজা একদিন ছিন্মাব দরবারে
এম্নি করিয়া মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু
তাহার চূড়া যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন সাবধান হইবার
অবসরটুকুও তাহার মিলে নাই।

ইউরোপ পাশ্চাত্য সভ্যতার মদে মশগুল হইয়া আছে।
সুতরাং তাহার শিল্প-দেবতা যে মিলের ময়দানবের পায়ে
মাথা লুটাইয়া মরিয়া গেল, আজও সে তাহা খেয়াল
করিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষে মিলের জয়ের
অভিযান এখনও শুরু হয় নাই। সুতরাং তাহার সাব-
ধান হইবার সময় এখনও হয়ত মিলিতে পারে, এবং
মনে হয় চরুকার এই আকস্মিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া
সেই ইচ্ছিতটাই আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ সকল যুক্তির অপেক্ষাও সোজাসৃজি যুক্তির
কথা এই যে, খাদ্যের মতো যে জিনিষটা প্রয়োজনীয়,
সম্ভব হইলে খাদ্যের মতোই তাহা ঘরে তৈরী করিয়া
লইতে পারিলে ভালো হয়, অস্বতঃ তাহার জন্ত ভিন্-
দেশের মুখাপেক্ষী যাহাতে না হইতে হয়, তাহার পথটা
সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া রাখা দরুকার। চরুকায়
সূতা কাটিলে নিষ্কাশন ঘরেই হয়ত বস্ত্রের চাহিদা মিটানো
চলে। কিন্তু মিলের শরণাপন্ন হইলে সে সম্ভাবনা ত
নাই-ই, কত জিনিষের জন্ত যে সেক্ষেত্রে পরের
শরণাপন্ন হইতে হয় তাহারও ইয়ত্তা নাই। শেফিল্ড-বা
বার্মিংহাম যদি বলে আমি কল-বস্ত্র সরবরাহ করিব না,
আমেরিকা যদি বলে আমার কাছে লম্বা আঁশের তুলা
পাওয়ার আশা মিথ্যা—আমি নিজে কাপড় বুনিয়া
তোমাদের দেশে খরুচার বিশেষ বেশী দামে বিক্রী
করিয়া লাভ করিব, ইংলণ্ড যদি বলে আমার শিল্প
রক্ষার জন্ত যখন প্রয়োজন তখন তোমার কলের পণ্যের
উপর এমন গুরু বসাইব যে পড়তা পোষাইতে পারিবে না,
ওবে তাসের প্রাসাদের মতো মিলের দ্বারা দেশের বস্ত্র-
শিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কোথায় যে মিলাইয়া
যাইবে কেহ খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান দিতে পারিবে না।
এইজন্যই সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে একটি কথা বার-বার
করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, “সর্বং আশ্রয়শং স্তম্ভু,

সর্বং পরবশং হুঃখম্।” অবশ্য ছনিয়ায় বাস করিতে গেলে একেবারে আশ্র-ভৃগু হইয়া থাকি যায় না, পরের উপর কতকটা নির্ভর করিতেই হয়। আর এই নির্ভরতা অপরিহার্য বলিয়াই মাহুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমাজের ভিতরও পরম্পরের মেনা-পাওনার স্বর্ণ

যে কতদূর পর্যন্ত গড়ানো দরকার তাহা লইয়াও মত-বৈধের অন্ত নাই। অন্ততঃ এ-কথাটার কেহই সন্দেহ করে না যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিষগুলির জন্য পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকার মতো নির্কৃদ্ধিতা আর নাই।

এই চিঠিখানি

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

এই চিঠিখানি,

লিখেছি যবে বাণী

আছিল প্রচুর !

গত সে দিনের কত কথা এ মনের উজল মধুর

হাসি দিয়ে মাজা দেয়া আলো দিয়ে লেখা,

ঝলমলে রূপ আর নাহি যায় দেখা,

হাতে হাতে মুছে গিয়ে কঁরামরা কালী,

সাদা কাগজের বুক ছেয়ে আছে খালি

ছায়ার মতন,

কাঁকা বুক ভরে রাখা স্মৃতি পুরাতন।

এই চিঠিখানি,

লিখেছি যারে, জানি, সে নাহিক আর ;

ছিল কোন্ কালে ?

সেই কথা অন্তরালে ভাবি বার-বার,

যেজন লিখিয়াছিল সে আজিকে কোথা ?

তার সেই হাসি গান ছেলে খেলা কথা,

নিবু নিবু দীপশিখা ছায়া-ভার নত,

জুয়ে-পড়া দেহখানি, আজি তারি মত,

সুয়ে পড়া মন,

চেয়েছুঁয়ে চেনা দায় এমনি নূতন !

এই চিঠিখানি,

আজি মনে দেয় আনি' গত ইতিহাস,

সকালের আলো

কত লেগেছিল ভালো, ভোরের বাতাস,

ফুলের হাসির সুরে পাখীদের গানে,

সে যে কোন্ নওরোজ মনের বাগানে,

কে সেথা ঝড়াল হেসে এসে মোর পাশে

পরশ-পুলক-ভরা ফুলের স্বাসে

ভরি' দিল মন,

খুলিল আঁখির আগে নূতন ভুবন।



[কোন মাসের “প্রবাসী”র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আনামিককে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আনামিকের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী”র সাধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যিক। পুস্তক-পরিচয়ের বা পুস্তক সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আনামিকের নিয়ম। সম্পাদক।]

“গ্রীক উচ্চারণ”

গৌর মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের ‘সোক্রাটীস (দ্বিতীয় খণ্ড)’-এর সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শ্যাম গ্রীক উচ্চারণের উপর এক নাতিবৃহৎ প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন। তাঁর মধ্যে তিনি এ রকম অনেক কথা বলেছেন, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে যার প্রতিবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যিক বলে মনে করি। আমার এ-বিষয়ে যা বক্তব্য তা যথাসাধ্য সংক্ষেপে লিখছি।

(১) ‘ইটা’-বাদীদের মত তুলে দেখানোর বা ‘এটা’-বাদীদের সঙ্গে তাঁদের অনৈক্য ও-রকম বিস্তৃতভাবে দেখাবার কোনই প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না। * প্রস্তকারের এবং সমালোচকের আলোচনা বিষয় প্রাচীন গ্রীক, আর বিশেষ করে Attic গ্রীক (খৃষ্ট-পূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী)। ‘ইটা’-বাদীরা কেবল Hellenistic, মধ্যযুগের ও নব্য গ্রীকের উচ্চারণ অবলম্বন করে থাকেন।

(২) Alphaর উচ্চারণ দু-রকম ছিল;—(ক) বিবৃত অ(=হুখ আ), আর (খ) আ (দীর্ঘ)। ১

(৩) Deltaর উচ্চারণ বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের নৃদন্ত ‘ড’ নয়; হয় দন্ত্য ‘দ’, না হয় ইংরেজীর d-র মত বা বৈদিকের মত দন্তমূলীয় ধ্বনি। মহেশবাবু রোমান্স অক্ষর dকে ইংরেজী d মনে করেছেন, আর সাধারণ বাঙ্গালীর মত আন্দাজ করেছেন যে, ইংরেজীর d আর আমাদের ‘ড’ এক, তাই গ্রীক deltaর প্রতিধ্বনি ‘ড’ বলে ধরে নিয়েছেন। পরবর্তী গ্রীকে ইটা উষ (spirant) ‘থ’ [যথা ইংরেজী then = *then* এর ধ্বনি] -তে পরিণত হয়,—‘ইটা’-বাদীরা ইহাই শিষ্ট উচ্চারণ বলে ধরেছেন; মহেশবাবু এই উষ ‘থ’ কে বাঙ্গলা ‘দ’ মনে করেছেন। সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীকের মৌলিক সম্বন্ধ ধরে deltaকে বাঙ্গলার ‘দ’ লেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ২

(৪) Epsilon এর ধ্বনি ‘এ’ (হ্রস্ব)। ৩

(৫) Zetaর উচ্চারণ প্রাচীনতম গ্রীকে ছিল ‘dz’ [যেমন পূর্ব-

বঙ্গীয় ‘জ’]; পরে বর্ণব্যত্যয় হ’লে ‘zd’ তে পরিণত হয়। Atticএ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ‘dz’ ‘z’ হ’লে দাঁড়ায়। ৪

(৬) Eta :—প্রাচীনতম গ্রীকে দীর্ঘ ‘খা’ ও দীর্ঘ ‘এ’ এই দুই ধ্বনি ছিল। Ionic Atticএ এক দীর্ঘ a [‘খা’]। ধ্বনি ঐ ছুটিই হানেই ব্যবহৃত হ’ত। ‘H’ অক্ষরটি ঐ ধ্বনির প্রতীক ছিল যেমন, মাতার নাম-মাতার ΜΗΤΗΡ। ৫ Hellenistic গ্রীকে ‘ই’ উচ্চারণ এসে পড়েছিল। কিন্তু প্রাচীনতম উচ্চারণ Attic ছাড়া অন্য অনেক উপভাষাতে ছিল দীর্ঘ ‘এ’ উচ্চারণ, সেই ক্ষেত্রে দুইয়ের একটা সঙ্গতি করে ‘এ’ লেখাই ভাল।

(৭) Thetaর উচ্চারণ ছিল ‘থ’; তবে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাদেশিক উষ [spirant যেমন ইংরেজী thin, thank] উচ্চারণও ছিল,—এই থেকেই theta অক্ষর গ্রীকের Lakonic উপভাষাতে ‘স’ হলে দাঁড়ায়। ৬

মহেশ-বাবু অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভেদ লক্ষ্য করেননি বোধ হচ্ছে। ক, প অল্পপ্রাণ ধ্বনি; এতে প্রাণ [breath] বা ‘হ’ যোগ করে ‘খ’ (ক্ হ) ও ‘ঘ’ (প্ হ) হয়। ‘থ, ঠ, ড, ধ’ এই মহাপ্রাণ ধ্বনিদ্ব্যাতক বর্ণগুলি থাকতে আলাদা করে ‘ক্ হ’ ইত্যাদি লেখার কোনই আবশ্যিকতা নেই; যিচামিতি সরল গ্রীক ধ্বনিকে পাণ্ডিত্যের আবরণে ঢেকে সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্তিকা জন্মানো মাত্র। আলাদা করে ছাপা বা লেখা ‘প্ হ’ এই বর্ণদ্বয়কে বাঙ্গালী পাঠক দুই অক্ষরে প-হ পড়ছেন সন্দেহ। এই হিসেবে theta = থ, phi = ফ, chei (বা khei) = খ।

(৮) Iota কেবল ‘ই’ নয়, ‘ঐ’ও বটে। ৭ এবং হ্রস্ব-বিশেষে ‘ই’ও বটে।

(৯) Omikronএর উচ্চারণ বাঙ্গলা ‘অ’ নয়, হ্রস্ব ‘ও’। ৮ পরবর্তী যুগে ‘অ’ উচ্চারণ এসে গেছে।

(১০) Epsilonএর উচ্চারণ প্রাচীনকালে ছিল ‘উ’ ‘ঊ’। Attic গ্রীকে এর হ’লে পড়ে ভারমানের ii বা ক্রাসীর ii [অর্থাৎ ‘উ, ঊ উচ্চারণের মত ঠোট গোল করে ‘ই, ঐ’ উচ্চারণ। বাঙ্গলার এই ধ্বনিকে প্রকাশ করতে হলে ‘উ’ বা ‘ই’, এর মতন একটা উৎকট কিছু সৃষ্টি করতে হয়। ক্রাসী বা ভারমান শব্দে এই ধ্বনি থাকলে ‘i’ বাঙ্গলা প্রত্যক্ষরীকরণে দিয়ে লেখাও হয়, যেমন বুলা Böhler]। পুরাতন গ্রীক ধ্বলে ‘উ, ঊ’ বা ‘i, ii’ (Attic গ্রীক অনুসারে ইচ্ছামত) দুয়ের এক লেখা চলবে। ৯

* আমাদের বিবেচনার ছিল; কারণ রজনীবাবু ইংরেজী উচ্চারণের পরিবর্তে গ্রীক উচ্চারণ দিরাছেন। তাহাও বিস্তৃত পরীক্ষা করা আবশ্যিক ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

১ K. Brugmann, Griechische Grammatik (চতুর্থ সংস্করণ), München, 1913 [দ্বিতীয় খণ্ড], পৃ ৩৭; H. Hirt, Handbuch der Griechischen Laut und Formenlehre (দ্বিতীয় সংস্করণ), Heidelberg, 1912 [দ্বিতীয় খণ্ড] পৃ ৮২, ৮৫।

২ Hirt পৃ: ৮৭। ৩ Hirt পৃ: ৮৩, ৮৫; Brugmann পৃ: ৩৫।

৪ Hirt পৃ: ৮৮-৮৯; I. Wright, Comparative Grammar of the Greek Language, Oxford, 1912 [দ্বিতীয় আনুমানিক ৮ শিলি] পৃ ৮-৯। ৫ Brugmann পৃ: ৩৫; Hirt পৃ: ৮৩। ৬ Hirt পৃ: ৮৭। ৭ Hirt পৃ ৮২। ৮ Hirt পৃ: ৮৩-৮৫। ৯ Hirt পৃ: ৮৩-৮৫।

(১১) Phei ও Chei এর উচ্চারণের জন্ত আগের (৭) মন্তব্য দেখুন।

(১২) Omega এর উচ্চারণ দীর্ঘ 'ও'। হির্টের মতে আথেল্-নগরে চতুর্থ শতাব্দীতে এই দীর্ঘ 'ও'র শেষে একটু হ্রস্ব 'আ' ধ্বনির আমেজ আসত (Oa)১০। কিন্তু এই খুঁটিনাটি-টুকুন না ধ'রলেও চলে—বাক্যলার 'ও' লিপ্যঙ্কেই হবে।

(১৩) AI এর উচ্চারণ 'আই': আ এখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুইই হ'তে পারে। ১১ পরবর্তী যুগে সন্ধি হ'য়ে 'এ' হ'য়ে গিয়েছিল; 'ইটা'-বাকীরা সেই ধ্বনিই ধ'রে থাকেন। বাক্যলার 'আই' লেখা হ'লে চ'লবে।

(১৪) EI এর প্রাচীনতম উচ্চারণ 'এই'; পরে সন্ধি হ'য়ে Ionic Attic:এ দীর্ঘ 'এ' হ'য়ে পড়ে। 'এই' লেখাই স্থাবধার। ১২

(১৫) OI এর উচ্চারণ 'ওই'। ১৩ পরে সন্ধি হ'য়ে 'ই' হ'য়ে দাঁড়ায় ['ইটা'-বাকী]।

(১৬) UI এর উচ্চারণ 'উই' ১৪; যখন U ক্রমে ই, ঐ হ'ল তখন UI > - II > I (ঐ) ['ইটা'-বাকী]।

(১৭) AU এর উচ্চারণ 'আউ'। ১৫ এই 'আউ' থেকে 'আব' (aw), পরে ঘোষ ধ্বনির পূর্বে w ধ্বনি উন্ন 'ভ'য়ে (v-তে) পরিণত হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায় (av); আর অঘোষ ধ্বনির পূর্বে উন্ন 'ক' (f: af) হয়; সেই রকম 'eu' = এউ - ew - ev, ef।

(১৮) OU এর প্রাচীন উচ্চারণ দক্ষিণ ইংল্যান্ডের stone, bone এর ধ্বনির মত; = বাক্যলার 'ওউ'। পরবর্তী যুগে Attic:এ দীর্ঘ 'ও' হ'য়ে পড়ে, আর যখন U বর্ণের উচ্চারণ ii হ'য়ে গেল তখন OU 'ও' (দীর্ঘ) থেকে 'উ, উ'তে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। ১৬

এইবার মহেশ-বাবুর উদ্ধৃত গ্রীক নামগুলির বাক্যলা প্রতিরূপ দিতেছি।

Sokrates = 'সো-ক্রা-তাস্' (Sokrates এর নিজের উচ্চারণে); কিন্তু সাধারণ গ্রীকের পদ্ধতি ধ'রে 'সো-ক্রা-তেস্' লেখা চলবে।

Xanthippe = 'ক্সান্থিপিপ্-প্যা', বা 'ক্সান্থিপিপ্-পে'।

Euripides = 'এউরিপিদ্যাস্' বা 'এউরিপিদেস্'।

Parmenides = 'পার্মেনিদ্যাস্,' বা 'পার্মেনিদেস্'।

Thoukudides = 'থৌ-কু-দি-দ্যাস্' (নিজের উচ্চারণ); কিন্তু সাধারণ মান ধ'রলে 'থৌ-কু-দি-দেস্'।

Zēnōn = 'জ্যা-নোন্,' বা 'জে-নোন্'।

Fukleidos = 'এউ-ক্লে-দ্যাস্,' বা 'এউ-ক্লেই-দেস্'।

Glaukon = 'গ্লাউকোন্'।

Aiskhulos = 'আইস্খুলোস্,' বা 'আইস্খুলোস্'।

Phaidon = 'ফাইডোন্'।

Puthagoras = 'পুথাগোরাস্,' বা 'পুথাগোরাস্'।

Lukourgos = 'লুকোরগোস্' বা 'লুকোরগোস্'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী স্বকুমার সেন

৬ই মাঘ ১৩০২।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুত্তর

বক্তৃত্যের কিতাবে গ্রীক ভাষা উচ্চারিত হইবে, সেবিষয়ে এই প্রথম আলোচনা হইতেছে। রজনীবাবু একপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন; ১১ জন গ্রহকার এবিষয়ে কি বলেন, মহেশবাবু তাহার আলোচনা করিয়াছেন। স্বকুমার বাবু এই ১১ জন লেখকের মতামত আলোচনা না করিয়া কল্পকটি হলে নুতন উচ্চারণ দিয়াছেন। তিনি নুতন তিন জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের অনুসরণও করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য-নির্ণয়ের উপায় নহে। ৩ জন খ্যাতিনামা লোকের নাম উল্লেখ করিলেই যে ১১ জন খ্যাতিনামা লোকের মত অসিদ্ধ হইয়া গেল, ইহা বলা যায় না। সত্যনির্ণয়ের প্রধানতঃ দুইটি উপায়:—

(১) মৌলিক গবেষণা

(২) খ্যাতিগণ লেখকদিগের মতামতের আলোচনা।

স্বকুমারবাবু একটা পথও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার নিজের মতই সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে বুদ্ধি-সহকারে দেখান উচিত ছিল যে

(১) পূর্বেজ্ঞ ১১ জনের মত ভুল।

(২) কিংবা মহেশ বাবু ইহাদিগের মত ভুল বুঝিয়াছেন এবং অমুক অমুক হলে ভুল বুঝিয়াছেন।

(৩) কিংবা মহেশ-বাবু ভুল বুঝিয়াছেন এবং অমুক অমুক হলে ভুল বুঝিয়াছেন।

লেখক এসব কিছুই করেন নাই; তবে এক হলে বলিয়াছেন মহেশ বাবু এক 't' কে অপর 'd' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং আর এক হলে বলিয়াছেন মহেশ বাবু সম্ভবতঃ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির পার্থক্য করেন নাই। এতদুত্তরই লেখকের কল্পনা, তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই (কিংবা আমরা বুঝিয়াছি তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই)।

এইপ্রকার প্রতিবাদে সত্য-নির্ণয় হয় না। একজন বলিল ১১ জনের এই মত; আর এক জন বলিল অপর তিন জনের অসমত। ইহাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পাঠকগণ বিজ্ঞ হইয়া বলেন "নানা মূনির নানা মত।"

প্রকৃত পক্ষে বিষয়টিও অতি জটিল। প্রাচীন কালে গ্রীক উচ্চারণ কি ছিল, বর্তমান যুগে তাহা নির্ণয় করা দুঃস্ব। এবিষয়ে অতি শাস্ত্র-ভাবে বহুল আলোচনা হওয়া আবশ্যিক—কাগজে, পুস্তকে, বিশেষজ্ঞ-গণের সম্মিলনে আলোচনা করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যিক—বাংলার কি উচ্চারণ গ্রহণ করা উচিত। তাহার একবার ভুল উচ্চারণ এখিষ্ট হইলে, তাহা সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এখন লেখকের মন্তব্য বিষয়ে দুই একটা কথা বলা বাইতেছে।

(১) তাঁহার প্রথম অভিযোগ, মহেশ-বাবু বিকৃতভাবে 'ইটা' বাক্যের সহিত 'এটা' বাক্যের তুলনা করিয়াছেন। একপ্রকার বলা নিতান্তই প্রতিবাদের জন্ত প্রতিবাদ? তিনি ভাবাতঙ্কের জন্ত প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। কিন্তু এ তুলনা কি ভাবাতঙ্কের বিরোধী?

উচ্চারণ-বিষয়ে অসংখ্য মত, তবে প্রধান মত দুইটি। মহেশ-বাবু এইজন্মই এই দুইটি মতকে প্রধান স্থান দিয়াছেন—; এই মত অপরগণের মতেরও আলোচনা করিয়াছেন।

লেখক একটা ভুল করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস 'ইটা'-বাকীর সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত পক্ষে 'ইটা'-বাকী প্রাচীন গ্রীককেও ইটাবাক্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন— এইজন্যই 'এটা'-

১০ Hirt পৃ: ৮৫। ১১ Brugmann পৃ: ৫৭-৫৮;

Hirt ৮৫। ১২ Brugmann পৃ: ৫৪-৫৬; Hirt পৃ: ৮২, ৮৫।

১৩ Brugmann পৃ: ৫৬-৫৭; Hirt ৮৫ ৮৫। ১৪ Brug-

mann পৃ: ৫৮-৫৯। ১৫ Brugmann পৃ: ৬১, Hirt পৃ: ৮৪-৮৫।

১৬ Brugmann পৃ: ৬১; Hirt পৃ: ৮৫।

বানের জন্ম। এখনও গ্রীস দেশে অধিকাংশ লোকই প্রাচীন গ্রীক বিদ্যেতে 'ইটা'-বাদী।

(২) লেখক বলেন alpha এর উত্তর 'বিবৃত্ত অ'। বাংলা ভাষার 'বিবৃত্ত অ' নাই, আছে 'অ' এবং 'আ'। সংস্কৃতের সহিত তুলনার বাংলা 'অ' কারের উচ্চারণ অতি অল্প। ই, ঐ কিংবা উ, ঊ এক শ্রেণীর উচ্চারণ, পার্থক্য এই ই, ঐ হ্রস্ব এবং ঐ, ঊ দীর্ঘ। কিন্তু 'অ' এবং 'আ' এতদূত্বের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কেবল হ্রস্বদীর্ঘ-মূলক নহে। আমরা যেভাবে 'অ' উচ্চারণ করি তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে 'অ' এবং 'আ'—দুইজাতীয় স্বনি। হিন্দীতে এপ্রকার নহে। তাহাদের 'অ' এবং 'আ' একজাতীয়। হিন্দীতে লেখা হয় 'হাজারী' কিন্তু উচ্চারণ করা হয় এমনভাবে যে বাঙ্গালী শুনে 'হাজারী'; বাংলাতে লেখাও হয় 'হাজারী'। যে স্থলে আমরা শুনি 'চা', হিন্দুস্থানী সে স্থলে শুনে 'হ'। দোষ বাঙ্গালীই; আমাদের হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই। হিন্দুস্থানীর 'হ' এর 'অ' কার এবং 'জা'র 'আ'কার একটু শ্রেণীর; একটি হ্রস্ব, অপরটি দীর্ঘ। বাঙ্গালীর 'হা' এবং 'জা' একইপ্রকার উচ্চারণ—'হা'কে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয় না। বাংলা 'আ'-কারে হ্রস্বদীর্ঘ নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা আপনাকে alpha এর উচ্চারণ 'আ'ই লিখিতে হইবে। হিন্দুস্থানীর জন্ম পুস্তক লিখিতে হইলে, লিখিতে হইবে alpha উচ্চারণ 'অ' এবং 'আ' উভয়ই।

(৪) মহেশ বাবুর ভুল অনেক হয়; কিন্তু delta এর উচ্চারণ বিদ্যেতে তাঁহার কোন ভুল হয় নাই এবং তিনি এক 'd' কে অল্প 'd' বলিয়াও ভুল করেন নাই।

ইংরেজী ভাষার যত গ্রীক ব্যাকরণ লেখা হইয়াছে, তাহা ইংরেজের জন্ম। "এসমুদায় গ্রন্থে যদি বলা হয় delta এর উচ্চারণ 'd' তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই 'd' ইংরেজী 'd'; ইহা রোমান ভাষাসমূহের d নহে।

Goodwin বলেন, "Probably beta, delta.....were sounded as h, d.....in English (পৃ: ১১, শেষ সংস্করণ)।

Simonson বলেন—"The consonants beta, delta.....were practically the same as h, d.....in English" Or. Accidence. পৃ: ১৭।

Thompson (পৃ: ৩) Jannaris (পৃ: ৩৩), Hadley and Allen (পৃ: ৭) প্রকৃতির ব্যাকরণেও ঐ মত।

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন মহেশ-বাবু 'সাধারণ বাঙ্গালীর যত আশঙ্ক্য করেছেন যে ইংরেজী d আর তাহাদের 'ড' একই"। ইহাতে মনে হইতেছে যেন ইংরেজী 'd' এবং বাংলা 'ড' এক নহে। এবিধে যখন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তখন কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক। এখন বক্তব্য এই যে ইংরেজের পক্ষে 'ড' বর্ণ উচ্চারণ করা সম্ভব নহে, অধিকাংশ স্থলেই ইহারা ভারতীয় দন্ত্যবর্ণকে সূক্ষ্ম বর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহারা

'ডুমি'	কে বলে	টুমি
দাস	...	ডাস
দন্ত	...	ডট

ইহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে যে ইংরেজী বর্ণ মালার প্রকৃত ড; ধ, দ, ধ, নাই। (আমরা বলিতেছি 'প্রকৃত')।

ইংরেজগণ সংস্কৃত বা বাংলা 'ড'ও পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে পারে চৌদ্ধ আনা।+ এবিধে Sayce বলেন—

The English 't' and 'd' are also said to be cerebral, though the tip of the tongue is not bent very

sharply backwards in forming them.—The Science of Language Vol. 1 276

সুতরাং বলিতেই হয় ইংরেজী 't' এবং 'd' সূক্ষ্ম বর্ণ এবং ইহা-দিগের উচ্চারণ প্রায় 'ট' এবং 'ড'।

সুতরাং delta এর উচ্চারণ যে 'ড'—ইহা মহেশ-বাবুর স্বকপোল-কল্পিত মত নহে।

এখন প্রশ্ন ইটাবাদী delta কে 'দ' বলেন না 'ধ' বলেন। বহু গ্রন্থে বলা হইয়াছে ইটার উচ্চারণ 'then এর 'th'। এখানে জিজ্ঞাস্য, then এর উচ্চারণ 'ধেন' না 'ধেন'? বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে যে উচ্চারণ 'ধেন' নহে। পাটি ইংবেজগণ 'ধ' উচ্চারণ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্ণের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ করিতেই ইহারা অসমর্থ। ইহারা ধর্মকে বলে ডর্ম (অতিধানও জটীয়া), ঘোষকে বলে গৌষ।

ইংরেজীতে 'dhi' এর উচ্চারণ 'd' যেমন ghost = gost, ghast = gast. উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়াই ইহাঙ্গিণের বর্ণমালার আমাদের বর্ণের চতুর্থ বর্ণ নাই। এইসমুদায় বর্ণের স্থলে dh, jh, dh, dh, ph, এম কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ধ' এবং dh, 'ক' এবং jh 'চ' এবং dh, 'ধ' এবং dh, 'ক' এবং ph এক নহে। বর্ণের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় ইহারা তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যুগ হইতে বাতাস নির্গত করে; যেমন পূর্ববঙ্গে হইয়া থাকে—

dh = গ্, অঅ

ph = প্, অঅ, ইত্যাদি।

কোন কোন ইংরেজ

'ধ' উচ্চারণ করেন গ্, গ্, অঅ

ক " " ক্, ক্, অঅ।

যাহারা চতুর্থ বর্ণকেই তৃতীয় বর্ণে পরিণত করে, তাহারা যে তৃতীয় বর্ণকে চতুর্থ বর্ণরূপে উচ্চারণ করিবে, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং বলিতে হয়, then = ধেন, ধেন। আর যদি স্বীকারও করা যায় যে, then এর th = ধ, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহা পূর্ববঙ্গের ধ, অর্থাৎ দ্, অঅ। Grimm এর একটি নিয়ম এই :—

"If the same roots or the same words exist in Sanskrit, Greek, Latin, Celtic, Slavonic, Gothic and High-German, then wherever the Hindus and Greeks pronounce an aspirate, the Goths, and the Low Germans generally, the Saxons, Anglo-Saxons, Frisians, etc., pronounce the corresponding Sonant Chock" (Max-Müller, Science of Language, Vol. ii, pp. 229-230).

অনাবশ্যক অংশ বাহ দিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিলে এই বীড়ায়—

"যে স্থলে হিন্দুগণ মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করে ইংবেজগণ সেইস্থলে সেই বর্ণের অল্পপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে।" দৃষ্টান্ত :—যে স্থলে হিন্দুগণ 'ধ' ব্যবহার করে, ইংবেজগণ সে স্থলে 'দ' ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সমুদায় কারণে সিদ্ধান্ত যে ইটাবাদীর delta এর উচ্চারণ 'দ', 'ধ' নহে। আর 'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ড'।

৪র্থ ও ৫ম প্রতিবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদ নহে, মহেশ-বাবুরই মত সমর্থন।

৬। ৬ষ্ঠ প্রতিবাদে লেখক মহেশ-বাবুকে সমর্থন করিয়াছেন 'eta' এর উচ্চারণ 'এ'।

(৭) ও (১১)

সপ্তম ও ১১শ প্রতিবাদ বিবরে বক্তব্য এই :—

(ক) theta, phei, chei এর উচ্চারণ নিত্য সমল বিবর নহে। এ বিবরে বহু মতভেদ; বহু বাক্যবিত্ততা, বিবাদ বিসংবাদ হইয়া গিয়াছে।

(খ) মহেশবাবু নিজের কোন মত প্রকাশ করেন নাই, এটা-বাদিগণ বাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন—তিনি বার্তাবাহক মাত্র। এটা-বাদিগণ ঐ তিনটির প্রত্যেকটিকেই সংযুক্ত অক্ষররূপে গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকটির প্রত্যেক বর্ণকেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

Theta=t+h

Phei=p+h

Chei=c+h

এখানে শিষ্টাঙ্গনের সম্ভাষিত উক্ত করা আবশ্যিক বলিয়া মনে হইতেছে।

(১) Jannaris বলেন, “The aspirates chei, theta, phei are sounded according to the Erasmians like two separate elements k-h, t-h, p-h, while traditionists pronounce them as simple ch, th, f, (p. 57).

অর্থাৎ এটা-বাদী প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করেন, আর প্রচলিত মতে এ সমুদায়ের উচ্চারণ থ, থ, ক।

(২) Hadley and Allen বলেন—

“The letters phei, theta, chei, seem to have had at first the sounds of ph, th, ch in English up-hill, hothouse, blockhead. But afterwards they came to sound as in English graphic, pathos and German machen (p. 7). অর্থাৎ প্রাচীনকালের phei এর উচ্চারণ uphill এর p-h; theta এর উচ্চারণ hothouse এর ‘t-h’ এবং chei এর উচ্চারণ blockhead এর k-h.

(৩) Goodwin বলেন—The rough consonants theta chei and phei in the best period were t, k and p followed by ‘h’. (পৃ: ১১) তাহার দৃষ্টান্ত এই—

han(th)a=han-t(h)a; ha(ph) iēml=ha-p(h)ēmi; he(ch)ō=he-k(h)ō

আমরা theta, phei এবং chei অক্ষরকে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী অক্ষরে th, ph, এবং ch লিখিয়াছি।

গ্রীক ভাষার ‘হ’ অক্ষর নাই; স্বরবর্ণের মতকে উচ্চা করা (o; spiritus asper দিয়া ‘হ’ উচ্চারণ করা হয়। আমরা এইরূপ ‘হা’ (‘হ’ চিহ্নিত আ) হলে ha, হে’ (‘হ’ চিহ্নিত এ) হলে he, হো’ (‘হ’ চিহ্নিত ও) হলে ho বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়াছি। প্রেসে গ্রীক অক্ষর নাই বলিয়া এই রূপ করিতে হইল।

Goodwin বাহা বলিয়াছেন তাহার বাংলা ব্যাখ্যা এই :—

গ্রীক ভাষার ‘হ’ নাই; কিন্তু চিহ্ন দ্বারা স্বরবর্ণকে ‘হ’ বুঝ করা হয়। এই প্রকার চিহ্নিত ‘অ’ অর্থ ‘হ’, চিহ্নিত ই অর্থ ‘হি’, চিহ্নিত ‘এ’ অর্থ ‘হে’, চিহ্নিত ‘ও’ অর্থ ‘হো’ ইত্যাদি। নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া বলা বাইতে পারে যে গ্রীক ভাষার ‘অ’ কারের স্থান ‘হ’ কারও আছে; এইরূপ ‘ই’ কার এবং ‘হি’ কার উভয়ই আছে; এইরূপ ‘হ’ কার, ‘হে’ কার, ‘হো’ কারাদিও আছে। Goodwin বলিতেছেন :—

theta তে ‘অ’ কার = ‘ট’ তে ‘হ’ কার, theta তে ‘আ’ = ‘ট’ তে ‘হা’ কার, এইরূপ phei তে ‘এ’ = ‘প’ তে ‘হে’ কার ইত্যাদি।

উক্ত অংশের পরে Goodwin বলিতেছেন :—We cannot represent the rough mutes in English; but our nearest approach is in words like hothouse, blockhead, and uphill, but here the ‘h’ is not in the same syllable with the mute. In later Greek theta and phei came to the modern pronunciation of th (in thin), and f, and chei to that resembling German ch in machen” (পৃ: ১১ শেষ সংস্করণ)।

ইহার মতে প্রাচীন উচ্চারণ ট্‌হ, প্‌হ, ক্‌হ এবং নূতন উচ্চারণ থ, ক, খ।

(৪) Thompson বলেন—

“The aspirates theta, phei are usually pronounced as spirants, theta as th in thick, phei as ph in Philip or f in fear; chei is pronounced like ch in character. But in Greek they were real aspirates and were pronounced: theta as ‘t-h’ in mast-head, phei as p-h in up-hill and chei as k-h in work-house.” (p. 6.)

Simouson বলেন—

The rough mutes theta, chei, phei were pronounced as t, k and p followed by rough breathing. Gr. Accidence. (p. 17.)

Goodwin এর ভাষে তিনিও ‘হ’-কার ‘হা’-কারাদি দ্বারা এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

han(th)os=han-t(h)os, he(ch)ō=he-k(h)ō, ha(ph)elko=ha-p(h)elko তাহার পরে লিখিতেছেন

We may represent these sounds approximately in words like pothook, blockhouse, up hill, পৃ: ১৮।

(৫) Arnold and Conway এইমত পোষণ করেন। ইহা-দিগের দৃষ্টান্ত—

ant-hill এর t-h, up-hill এর p-h এবং back-handed এর k-h.

(৬) Moulton বলেন—“The aspirates were during the classical period mutes followed by h; our shepherd, hothouse packhorse give the sounds fairly, except that the mute has to be pronounced in the same syllable as the ‘h’ (shepherd etc). Gram. N. T., voll. ii, part i, পৃ: ৯৫।

সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, ‘এটা-বাদী’ এবং অনেক ব্যাতনামা বৈয়াকরণের মতে প্রাচীন গ্রীক ভাষার—th, ph, ch—এই তিনটির প্রত্যেকটিতেই দুইটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হইত। এই মতানুসারে বাংলার ঐ কয়েকটি উচ্চারণ লিখিতে হইলে ট্‌হ, প্‌হ, ক্‌হ লিখিতে হইবে।

(৭) কেহ কেহ বলিতে পারেন ঠ, ক, খ—এই তিনটি মহাপ্রাণ বর্ণ থাকিতে এ বিকট বিধি কেন? ইহার উত্তর এই :—

এটা-বাদীর মতে ঐ তিনটি সংযুক্ত বর্ণ (diphthong); কিন্তু ঠ, ক খ অসংযুক্ত বর্ণ ‘monophthong’, সংযুক্ত অক্ষরের পারবর্ত্তে অসংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা বুদ্ধিসঙ্গত নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এক অর্ধে মহাপ্রাণ বর্ণসমূহও সংযুক্ত বর্ণ ; খ-ক্হ ; ঘ-গ্হ ; ঠ-ট্হ ইত্যাদি ।

এ আপত্তি যুক্তিবদ্ধ নহে । এ সমুদায় যদি সংযুক্ত বর্ণ হইত, তাহা হইলে হ্রস্ব এ সমুদায়ের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরও দীর্ঘস্বর বলিয়া পরিগণিত হইত । কিন্তু এপ্রকার হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হয় না । সুতরাং সিদ্ধান্ত এই মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ সংযুক্ত বর্ণ নহে ।

(৪) বিজ্ঞ শিক্ষকগণ অনেকেই জানেন যে, শিশুগণকে মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ শিখাইতে হইলে অনেক সময়ে পরোক্ষ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় । মনে করা যাউক—'ঠ' শিখাইতে হইবে । যে শিশু 'ঠ' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্ত 'ঠ'বৃত্ত একটা উপযুক্ত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন 'কুঠার' বা 'কঠিন' । প্রথমে শিখাইতে হইবে কুট্, হার ; কুট্‌হার । তাহার পরে শিখাইতে হইবে কুট্‌হার ; কুট্‌-হার ।

তাহার পরে শিখাইতে হইবে

কুট্‌-হার ('ট্' এত পরে না থাকিবে)

তাহার পরে সে শিখিবে 'কুঠার' ।

ইহাতেও দেখা যাউতেছে যে, অল্পপ্রাণবর্ণের সহিত 'হ' উচ্চারণ করিলেই মহাপ্রাণ বর্ণ হয় না ।

(৫) এইরূপে 'অল্পপ্রাণ' ও 'মহাপ্রাণ' বর্ণ-বিষয়ে আরও কিছু বলা আবশ্যিক । 'প্রাণ' অর্থ 'বায়ু' । অল্পপ্রাণ বর্ণে মূল হইতে অল্প বায়ু নির্গত হয়, আর মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে অধিক বায়ু নির্গত হয় । কিন্তু ইহাও একমাত্র পার্থক্য নহে । 'অল্পপ্রাণ বর্ণ 'অল্প শ্রমত্ব' এবং মহাপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রমত্ব । অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রভূত বায়ু নির্গত করিলেই যে মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইয়া যায়, তাহা নহে । রোগণযায় পারিত বাস্তি নির্ভাব হইয়া 'বাবা' উচ্চারণ করিবার সময় বলে "বাবাবাবাবা"; কিন্তু ইহাতে 'ভাবা' উচ্চারিত হয় না । সংযুক্ত মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করিতে মহাপ্রমত্ব আবশ্যিক ; আবার বর্ণের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ অপেক্ষাও মহত্তর প্রমত্বসাপেক্ষ ।

দেখা যাউতেছে 'ক্হ' কিংবা 'ক্‌অ' উচ্চারণ করিলে 'খ' হয় না, 'গ্হ' কিংবা 'গ্‌অ' উচ্চারণ করিলে 'ঘ' হয় না । প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সংস্কৃতের খ, ব, চ, ধ, ভ এর উচ্চারণ অপরাপর অস্বাভাব্য তাহার নাই বলিলেই চলে । সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—

'খ'	বর্ণ	'ক্হ'	নহে ।
'ঘ'	বর্ণ	'গ্হ'	নহে ।
'চ'	বর্ণ	'ট্হ'	নহে ।
'ধ'	বর্ণ	'প্হ'	নহে ।

ইত্যাদি ।

আমরা ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে 'এটা'-বাদ সত্য হইলে theta, phi এবং chi হলে ঠ, ক খ লেখা যায় না । তবে 'এটা'-বাদ সত্য কি না মহেশবাবু পূর্বেও তাহার বিচার করেন নাই, এখনও তিনি করিতেছেন না । ঘটনা বাহা, তিনি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন ।

৮। অষ্টম প্রতিবাদের বিশেষত্ব নাই ।

৯। নবম প্রতিবাদে লেখক বলিয়াছেন, "Omikronএর উচ্চারণ দ্বারা 'অ' নয়, হ্রস্ব 'ও'; পরবর্তী যুগে 'অ' উচ্চারণ এসে গেছে।"

বক্তব্যবাবুর সহিত মতভেদ ছিল না বলিয়াই এ বিষয়ে আলোচনা নাই । এখন কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক হইয়াছে ।

Thompson বলেন, ইহার উচ্চারণ 'not' এর 'o' (পৃ: ৪) ।

Arnold and Conwayএর মতে ইহার উচ্চারণ cannot কিংবা consistএর 'o' এর জায় (পৃ: ৬)

Jannaris কোন দৃষ্টান্ত না দিয়া কেবল বলিয়াছেন ইহার উচ্চারণ short 'o'.

Hadley and Allenএর দৃষ্টান্ত oicyএর 'o' (পৃ: ৪) ।

Goodwin বলেন, ইংরাজীতে, অনুরূপ উচ্চারণ নাই । তবে ইহার উচ্চারণ monastic কিংবা renovate শব্দের 'o' এর নিকটবর্তী (পৃ: ১১, শেষ সংস্করণ) ।

সুতরাং দেখা যাউতেছে কিছু মতভেদ আছে । কেহ বলেন, ইহা অকার, কেহ বলেন ইহা প্রধানত: 'অ', তবে 'ও'কারের কিছু টান আছে । 'ও'কারের টান অতি কম এবং 'অ'কারের ধ্বনি বেশী বলিয়াই পরবর্তীকালে ইহাও উচ্চারণ বাংলা 'অ'কারের জায় হইয়া গিয়াছে । বাংলা ভাষাতেও এমন বহু শব্দ আছে যাহার 'অ'কারে 'ও'কারের টান পাওয়া যায় । কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :—

মতি, পতি, রতি, নতি, কবি, পতি, সখি ইত্যাদি ।

মহু, ধহু, তহু, দহু, কহু, মধু, পহু, বহু ইত্যাদি ।

অদ্য, পদ্ম, সদা, মদা, কদ্য, পদ্য, গদ্য, নব্য ইত্যাদি ।

এইপ্রকার বহু শব্দ আছে যাহার অন্তর্গত 'অ'কারের পতি 'ও'কারের দিকে । বাংলার যেমন আমরা এ সমুদায় স্থলে 'ও'কার না লিখিয়া 'অ'-কারই রাখিয়া দিই, মোতি, পোতি, রোতি, নোতি না লিখিয়া মতি, গতি, রতি নতিই লিখিয়া থাকি, তেমনি গ্রীক ভাষার সামান্ত 'ও'কার মিশ্রিত 'অ'কার ধ্বনিকে, বাংলার 'অ'কাররূপেই লিখিতে হইবে ।

সংস্কৃত উচ্চারণ দ্বারা বিচার করিলে আমরা এনবৃন্দ স্থলে 'ও'কার লিখিতেই পারি না । 'ও' নিত্য দীর্ঘ—সংস্কৃত হ্রস্ব 'ও'কার নাই ।

'অ'-কে অনেক স্থলে বাধা হইয়া 'ও' করিতে হয় ; কিন্তু কোন স্থলেই 'ও'কার 'অ'কাররূপে পাবণত হয় না ।

এই সমুদায় বিচার করিলে মনে হয় () mikron-কে বাংলা 'অ'-রূপেই গ্রহণ করা উচিত । ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ মন্তব্য প্রতিবাদ নহে ।

১১শ প্রতিবাদের উত্তর ৭ম প্রতিবাদের মন্তব্য হইবে ।

১২শ প্রতিবাদে লেখক বলেন oi—ওই ।

মহেশ বাবুর বক্তব্য এই—Thompson বলেন, ইহার উচ্চারণ 'oil' এর 'oi' (পৃ: ৫) । Goodwin (পৃ: ১১), Arnold and Conway (পৃ: ৮) এর দৃষ্টান্তও oil. Hadley and Allen (পৃ: ৫) এবং Simonson (পৃ: ১৬) এর দৃষ্টান্ত foil এর 'oi'

Curtins এর দৃষ্টান্ত boy এর 'oy' (পৃ: ৪) ।

অনন্তই এসমুদয় স্থলে oi—অই । এ-প্রকার বোধ হয় কেহই বলিবেন না যে, oil ওইলু

foil—ফোইলু

boy—বোই ।

১৩শ ১৭শ মন্তব্যে নূতন কিছু বলা হয় নাই । বাংলাতে অনন্তই এই কয়েকটি কথার উচ্চারণ

১৮। ১৮শ প্রতিবাদে লেখক বলেন om—ওউ ।

Jannaris বলেন, ইটা বাদী ও এটা-বাদী উত্তরেরই উচ্চারণ 'u' (—উ)—'distinct sound of u' (পৃ: ২৬, ৪০, ৪৭ ট্রোগ) ।

Hadley and Allen (পৃ: ৫) এবং Simonson-এর (পৃ: ১৬) দৃষ্টান্ত 'youth' এর 'ou' (—উ) ।

Goodwin-এর দৃষ্টান্ত moon এর 'oon' (দ্বিতীয় সংস্করণে); তৃতীয় সংস্করণে বলেন প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'o' ।

Geddes বলেন, ou=oo=u (পৃ: ২)।

মহেশবাবু ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অল্প মতও আছে। যেমন Thompson বলেন, ইহা 'note' এর 'o,' Platoও বলেন, ou=o.

লেখকের মত ধরিলে আরও একটি নূতন উচ্চারণ পাওয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ কি নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এটা-বাটা, ষ্টাটা-বাটা এবং আরও অধিকাত্ম পণ্ডিতের মতে ইহার উচ্চারণ 'উ' (কিংবা উ)।

লেখক এই স্থলেই উচ্চারণ-তত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনা না করিয়া গ্রীক নামের উচ্চারণে 'i' স্থলে লিখিয়াছেন 't'।

annaris এর মতে ইহার উচ্চারণ ইংরাজী 'i' (পৃ: ২০)।

Goodwin এর উচ্চারণ 'ট', যেমন 'tin' কিংবা 'to' এর। (পৃ: ১১)।

Hadley and Allen (পৃ: ৭) এবং Simonson এর (পৃ: ১৭) দৃষ্টান্ত 'to' এর 't'.

Thompson এর মতে ইহার উচ্চারণ ইংরাজী 't' (পৃ: ৪)।

ইংবানী 't' যে মর্দঙ্গ বর্ণ ইহা Sayce এর মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

সুতরাং বলা বাইতে পারে অনেকের মতে গ্রীক 'tau' এর উচ্চারণ 'ট'।

এইস্থলেই উচ্চারণ-তত্ত্ব শেষ হইল।

উপসংহারে দুই-একটি মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যিক।

লেখক লিখিয়াছেন, 'মহেশ বাবু এরকম অনেক কথা বলেছেন, ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে বার প্রতিবাদ একান্ত আবশ্যিক বলে মনে করি।'

এখানে জিজ্ঞাসা :—

মহেশ-বাবু কি স্বকপোলকল্পিত কোন কথা বলিয়াছেন? তিনি কি নিজের কোন মত প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? তিনি কি কোন স্থলে সত্য গোপন করিয়াছেন? 'এটা-বাবের ও ষ্টাটা-বাটা'র বিরোধী মতেরও কি তিনি উল্লেখ করেন নাই? তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটিও কি ভুল? তিনি কি প্রাকৃতজনের মত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন? তাহার প্রত্যেক কথাই কি নিষ্টে-জনের উক্তি নহে? তিনি কি কোন স্থলে নিজে বলিয়াছেন—'ইহাই প্রাচীন উচ্চারণ?'

তবে প্রতিবাদ কিসের? প্রতিবাদ করিলে পূর্বেই নিঃসন্দেহে মতামতের সমালোচনা করিতে হইবে, এমতাবস্থায় মতামত অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

লেখক তিনখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মহেশ-বাবু তাহা পড়েন নাই—এরূপ যদি তাহার অপরাধ হইয়া থাকে, তিনি অপরাধ স্বীকার করিতেছেন।

প্রপৃতি।

অসময়ে Wright-এর Comparative Grammar of the Greek Language হস্তগত হওয়ার নিম্নলিখিত অংশ পরে সংযোজিত হইল।

এ গ্রন্থ স্বকুমার-বাবুর একটি আশ্রয়। কিন্তু এ গ্রন্থ হইতে তাহার সমুদায় মত সমর্থিত হয় না। দুই-একটি দৃষ্টান্ত এই :—

Wright বলেন, O-mega was an open vowel like the

'au' in English "aught"। পৃ: ৩। অর্থাৎ O-mega-এর উচ্চারণ 'aught' এর 'au'। এ উচ্চারণ অবশ্যই 'ও' নহে। কিন্তু স্বকুমার-বাবু বলেন () mega এর উচ্চারণ 'ও'। O-mikron-বিষয়ে Wright এর মত এই :—

'(o) was a close vowel which is common in some English dialects in such words as coal (kol, 'o' এর উপরে বিন্দু), foal (fol, বিন্দুহীন o) and in the final syllable of such words as fellow (felo, বিন্দুশীর্ষ 'o') and window (windo, বিন্দুশীর্ষ 'o')। পৃ: ৩।

এ স্থলে 'o' কে close vowel অর্থাৎ সংবৃত স্বর বলা হইল। মৌক-মুলার 'o' এর চারিপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন (১) দীর্ঘ বিবৃত, (২) হ্রস্ব বিবৃত (৩) দীর্ঘ সংবৃত (bone এর 'o') এবং (৪) হ্রস্ব সংবৃত (soft এর 'o')।—The Science of Language, ii, 126.

Wright এর মত Max-muller এর বিরোধী হইবার কথা নয়। ()-mikron বখন হ্রস্ব ও সংবৃত তখন সম্ভবতঃ Wright এর মতেও ইহার উচ্চারণ soft-এর 'o' এর জায়।

প্রাথমিক উচ্চারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে প্রত্যেকের বলিয়াছেন,

- coal = kol (বিন্দুশীর্ষ 'o')
- foal = fol (বিন্দুশীর্ষ 'o')
- ellow = fello (বিন্দুশীর্ষ 'o')
- window = windo (বিন্দুশীর্ষ 'o')

উপরে মনে হইতেছে এই কয়েকটিতে উচ্চারণ 'কল' কল, ফেল উইন্ড।

উপস্থানে দেখা যায় প্রাথমিক অশিক্ষিতলোক 'fellow' স্থলে 'fellar' এবং অনেক মৌলীন পুরুষ এইস্থলে 'fellah' ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতেও মনে হয় পূর্বেই কয়েকটি কথার 'o' স্বরের গতি 'আ'কারের দিকে।

তবে ইহা নিশ্চিত যে বিন্দুশীর্ষ 'o' কিংবা সংবৃত হ্রস্ব 'o' কখন 'ও' নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংবৃত হ্রস্ব 'o' এর দৃষ্টান্ত soft-এর 'o'।

স্বকুমার বাবু Thoukudi দুইটি উচ্চারণ দিয়াছেন : একটিতে ou স্থলে উ। কিন্তু Wright বলেন পূ: পূ: পক্ষম শতাব্দীতে ইহার উচ্চারণ ছিল 'উ'। তাহার ভাষা এই :—

ou = o + u until the fifth century, it then became long close ii"। পৃ: ৭

অপর এক স্থলে বলিয়াছেন, "In the Attic and Ionic it became u [long 'u' = উ].....in the fifth century B. C.। পৃ: ৩০

সুতরাং মৌক্কাটেন্স এবং মেটোর সময়ে 'ou'-এর উচ্চারণ ছিল 'উ'। এ সময়ে ইহা 'উ'-রূপে উচ্চারিত হইত না।

Wright বলেন, প্রাচীনকালে গ্রীক 'tau' এবং 'delta' এর উচ্চারণ ছিল আর ইংরাজী 't' এবং 'd' (had approximate: the same sound values as in English—পৃ: ৮)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরাজী t=ট এবং d=ড। সুতরাং Wright এর মতে tau=ট, delta=ড। এস্থলেও স্বকুমার বাবুর মত সমর্থিত হইল না।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

[গ্রীক উচ্চারণ এবং তৎসম্পর্কিত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক অল্প কে বাস্তবপ্রতিবাদ অতঃপর ছাপা হইবে না। [প্রবাসীর সম্পাদক]

স্বরাজ্য পল্লীসংগঠন তহবিল

কাজিক মাসের প্রবাসীতে পল্লীসংগঠনের প্রথম সংগৃহীত স্বরাজ্য তহবিল সংক্ষেপে যে-মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহাতে দুইটি ভুল দেখা যায়।

(১) মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে, স্বরাজ্য সপ্তাহের পর প্রত্যাপচন্দ্র গুহ রায় যে আরও আর ৭হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, তাহারই বা কি হইল? এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গত ১৯শে ভাদ্র তারিখে 'নারকে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রতাপ-বাবুর মারফতে যে ৭২৫১১-কানা আদায় হয়, তাহা মাতকড়ি রায় প্রমুখ ভ্রাতৃলোকদের হাতে দেওয়া হয়, ইহার মধ্য হইতে স্বরাজ্য সপ্তাহের বন্দোবস্ত ও অর্থসংগ্রহের খরচ বাদে ৫৫৭২:৬৩পাই দেওয়া হইয়াছে।

(২) উক্ত মন্তব্যে আরো লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে ৩২০০ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ২১শে ভাদ্র তারিখের দৈনিক বহুমতীতে যে-হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত কমিটিকে ৩১০০০ একত্রিশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে।

গত ২৫শে ভাদ্র তারিখের সঞ্জীবনীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলামে স্বরাজ্য সপ্তাহ সংগৃহীত টাকার যে হিসাব মুদ্রিত হইয়াছে, তদনুসারে উল্লিখিত ভ্রম দুইটি প্রদর্শিত হইল।

শ্রী মত্যাশ্রয় গুপ্ত

“ফকিরের গান”

১১ মাসের “প্রবাসী”তে ৫১৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন

চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত “ফকিরের গান” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত দুইটি ফকিরের গান প্রাপ্তির বিবরণ-পাঠে বড়ই দুঃখিত ও মনোহত হইলাম। কারণ উক্ত দুইটি গান বহুদিন পূর্বে আমি নিজে কোনো ফকিরের মুখে পাঠিতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে ১৯২৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসীতে” “বেতালের বৈঠকে” ২৬নং প্রবন্ধে শেখাংশের লিপিতামুসারে মনোরঞ্জন-বাবুর নিকট উক্ত দুইটি গান ১৯২২ সালের শেষ ভাগে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম; এবং তিনি প্রবাসী পি. এন্ড বোডিং হইতে ১৫ ১২১২২ তারিখে আমাকে পত্র লিখিয়া আমার প্রেরিত গান-দুটির কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তস্বীকার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মনোরঞ্জন-বাবু কি কারণে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত গান-দুটি অজ্ঞভাবে জ্ঞাত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বুঝিতে অক্ষম অন্তঃসৌন্দর্যের গাতিরে বহুমান প্রকাশিত গান দুটি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ার সময় উল্লেখ করা উচিত ছিল। তর্কহলে আমার নিকট হইতে গান-দুটি পাঠবার পূর্বে উহা সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহাও বহুমান প্রবন্ধে বা আমার নিকট পত্র লিখবার সময় প্রকাশ করিলে পারিতেন। আর যদি তিনি ঠিক এই-দুটি গান আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই বলিতে চাচ্ছেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত যে দুটি গানের প্রাপ্ত স্বীকার করিয়াছিলেন সে দুটি গানের পাঠ লিপি কি সাধারণকে দেখাইতে পারেন?

৬/১/১৩২

শ্রী শিঃ গাধ মুন্সী

কাশির পাড়া, পোঃ রাখানপুর,
জেলা ষশোর

নিভূতে

শ্রী জাহাঙ্গীর বকীল

বসেছি একেলা। অভীতের মাল্য হ'তে
ধসি' পড়ে কোন্ বিচ্যুত-মাঘের দিন
আজিকার কোলে। বসন্তের তপ্ত ক্ষীণ
বাসনা-নিশ্বাস আগাইল মুছু স্রোতে
বিশ্বের সঞ্চিত চঞ্চলতা, আমাদের
কঙ্ক ভালোবাসা অপূর্ব দুর্দম। তব
নয়ন-পল্লব হ'তে কোন্ অভিনব
অজানা বিহ্বল মোর চিত্ত-আকাশের

স্থির নীলিমার মাঝে ঝলসিল তার
ফিবোজা পাণ্ডুর ডানা? হিসের সন্ধান
ঘুরে ফিরেছিল মোর গুঁঠ বারেবার
গ্রীবায়ে তোমার—বন্ধে ললাটে নয়ানে?
জানি না এখনো—কথাভীত সে পূর্ণতা
সেই কি আনে এ শূন্যে—কম্প ব্যাকুলতা?
শান্তিনিকেতন।



পরশ

শিল্পী শ্রী সিব্বানন্দ, মডেল

অবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

ভারতবর্ষে কৃষি-বিদ্যালয়

(মাঘ ১৩৩২ সালের প্রশ্নের উত্তর)

ভারতবর্ষে যে-সকল কৃষি-কলেজ আছে তাহার নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

- (১) Allahabad Agricultural Institute, Allahabad.
 - (২) College of Agriculture, Cawnpur.
 - (৩) Agricultural College, Nagpur.
 - (৪) Agricultural College, Lyallpur (The Panjab).
 - (৫) College of Agriculture, Poona Camp.
 - (৬) Agricultural College, Coimbatore (Madras).
- Sabour Agricultural College সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে।

উপার-উক্ত কলেজসমূহের বিষয় সবিশেষ জানিতে হইলে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারা যায়।

Capt. Pactaval পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে।

Pusa Research Institute কেবলমাত্র Post-Graduate Course পড়ানো হয়।

ব্রহ্মদেশে Mandalayতে একটি Agricultural College সম্প্রতি নূতন হইয়াছে। ছুংখের বিষয় বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে কোনো কৃষিকলেজ নাই। তবে কোনো কোনো High Schoolএর কর্তৃপক্ষ কৃষিবিদ্যা পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাঙালী ছাত্রদের অল্প প্রদেশের কৃষিকলেজে ভর্তি হওয়া খুবই কঠিন। ইহার একমাত্র কারণ domicile-প্রশ্ন।

এন, মুখার্জী

বিদায়ের ক্ষণে

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

কুহেলিমন্ডর আজি শিশিরের বিদায়-বাতাস
করণ লিপটি তা'র বেধে গেছে ব্যাধিত মর্শ্বরে
বনানীর জীর্ণ পরে,—

ওগো ধরা উন্নয়ন-উদাস,
প্রবাসী চলছে ফিরে' সঙ্গীহীন মেকর অঙ্গরে।
আজিকে বিনায় দাগ। দীর্ঘতর বিরহবেলায়
আমি একা ছিলাম তব পাশে; আজি মিলনের প্রাতে
মোর স্থান সেথা নাহি আর।

সেই একদিন হায়,
হেমন্তের নিশাশেষে উৎসবের বেগুরব-সাথে
সবাই গেছিল চ'লে। শেফালিকা, কাশের মঞ্জরী,
কুশুদ, কহ্লাব, শ্রাম বিটপী। ঘনপর্ণরাজি—
ঝরিয়া পড়িল তা'রা গীতিশেষে অক্ষুট গুঞ্জবি'।
আমি এমু উদাসীর বেশে রক্ত গোলাপের সাজি
হাতে ল'য়ে।

হায় বন্ধু, সেই মোর প্রথম পরশে
মনে পড়ে শিহরিয়া স্নান হাসি হেসেছিলে তুমি,
মোর পানে চেয়ে! আমি সেই ক্ষণে একটি দরশে

তোমারে বেসেছি ভালো। তব রক্ত কেশপাশ চুমি'
আমার নিশাস গেছে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, তুমি হায়
পারোনি বুঝিতে।

যবে ফাগুনের সমীকণ-সাথে
তোমার প্রেমের কত কথা—না না বিদায় বিদায়।
আমারে মার্জনা কোরো। কতদিন কত স্তব্ধ রাতে
যে-কথা বলিতে গিয়া আধপথে থেমেছি নীরবে
আজি বিদায়ের ক্ষণে মৌনে তা'রে পারিনে ঢাকিতে।
মুগ্ধা তুমি আনুমনে মলয়ের প্রণয়-গৌববে
কয়েছ কাহিনী তা'র; আমি যত্নে মলিন হাসিতে
ঢেকেছি প্রাণের ব্যথা।

আজি তা'র নাহি প্রয়োজন।
আসিছে দধিন বায়ু নব পত্র পুষ্পডালা ল'য়ে
কুহব সঙ্গীতে; আমি যাই রিক্তহাতে বিসর্জন
দিয়া সব দীর্ঘশ্বাসে কুমেকর তুবোর-আলয়ে।
বন্ধু মোর, বিদায়েব ব্যথাভরা আজি সঙ্কক্ষেণে
কাহিতে প্রাণের কথা ফাটে বুক, রোদন-উচ্ছল
ছন্দন। ছুংখের সাধীবে তব বেগো বন্ধু মনে,
বিলীর্ণ গোলাপ-দলে দিও একবিন্দু আঁপিজল।



ভারতবর্ষ

বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা-সদস্য -

সম্প্রতি বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। তিন জন মহিলা প্রার্থী মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী গোখল ও শ্রীমতী লতাবাই গত বারে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারে বোম্বাই কর্পোরেশনে নির্বাচিত মহিলা-সদস্য-সংখ্যা কমিয়া গেল।

ভারতীয় কৃষি-কমিশন -

ব্রিটিশ ভারতে কৃষির ও গ্রাম্য আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং গ্রাম-বাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্ত কি পদা অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে যে রাজকীয় কমিশন বসানোর কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি-সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন—

(১) কৃষি ও পশুপালন-সম্বন্ধে প্ৰবেশনা, কৃষি-বিষয়ে সংখ্যাসংগ্ৰহ ও কসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্ত নূতন বীজের আবাদনি, চাষের প্রণালী-পরিবর্তন, গো-পালন ও প্রজনন।

(২) কৃষিজাত জ্বোর বিক্রয় ও আবাদনি রপ্তানি।

(৩) কৃষকদিগকে ঋণপ্রদানের উপায়।

(৪) গ্রামের শ্রমসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও কৃষকের উন্নতি।

বর্তমান প্রজাবল্ল, বসন্তীভূমি, রাজস্ব, সেচন প্রভৃতি-সম্বন্ধে এই কমিশন কোনো তদন্ত করিবে না। তবে প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট গুলি এই সম্পর্কে যে-সমস্ত কাজ করিতেছেন তৎবিষয়ে কেন্দ্রের গবর্নমেন্ট-কি-ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে কমিশন আলোচনা করিবেন।

এই কমিশনে কে-কে সভ্য হইবেন তাহা পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

বড়োদার জুবিলী উৎসব—

সম্প্রতি বড়োদা-রাজ্য জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বড়োদার নানা-প্রকার উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বড়োদার প্রজা-সাধারণ মনে করিয়াছিলেন যে, এই উপলক্ষে গাইকোয়াড় শাসনসংস্কার প্রবর্তিত করিবেন এবং প্রজাদের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু প্রজাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু মহারাজা এই উপলক্ষে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “আমি হুসন্তা রাজ্যসমূহের উন্নত আদর্শ অনুসরণের স্বাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্ত দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন করিতে বৃত্ত করিয়াছি। কোনো-কোনো বিষয়ে আমি বিকলমনোরথ হইয়াছি বটে, তবুও আমার আশা আছে যে, দেশের মধ্যে যদি প্রকৃতরূপে শিক্ষার বিস্তার হয়, তবে একদিন না একদিন আমার আদর্শ সার্থক হইবেই হইবে।”

ভারতীয় রেলপথে-সমুদ্রের বিবরণ—

১৯২৪-২৫ সনে ভারতীয় রেলপথসমূহের অবস্থা-সম্বন্ধে সরকারি বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ-সনে গবর্নমেন্ট-রেলপথগুলি হইতে মোট ১২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের রেলপথগুলির এ-বৎসরে মোট ১১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহার মধ্যে ৬৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা মাল আবাদনি রপ্তানিতে এবং বাকী টাকা বাতীদেয় কাচ হইতে ভাড়া বাবদে আর হইয়াছে। এ-বৎসর মোট ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল রেলপথসমূহে আবাদনি-রপ্তানি হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৩৮২৭০ মাইল লম্বা রেল-লাইন আছে। উহার মধ্যে ১৫৪১৪ মাইল গবর্নমেন্টের খাস তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। গবর্নমেন্ট-আরও ২২৮৫ মাইল রেলপথ সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার করিতে সক্ষম করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে ১২০১ মাইলের নির্মাণকায়া চলিতেছিল।

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য মহাসভা—

আগামী ১৯শে এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী দিন দুইতে শিল্প বাণিজ্য মহা-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে; দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, বরন-শুল্কের বিলোপ সাধন, বিলাসজ্বোর উপর আবাদনি শুল্ক স্থাপন, ঋণসংক্রান্ত প্রচলন, ঋণসংক্রান্ত জন্ত টীকশাল স্থাপন, বিনিময়ের স্থায়ী হার নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন, সর্বত্র এক ওজন প্রচলন এবং বড়লাটের এল্লিকিউটিভ কাউন্সিলে শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ ভারতীয় সদস্যের হস্তে প্রদান।

নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—

নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯২৫ সনের রিপোর্ট-বাহির হইয়াছে। তাহাতে কয়েকটি আশার কথা আছে। এই বৎসরের প্রারম্ভে মাত্র ৮টি সমিতি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন ৪১টি ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মোট সভ্যসংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজার। এই সমিতিগুলি রেলপথ, বরনশিল্প, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম, নৌ-চালন, খনি ও গণিত্য প্রভৃতির কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারে। গত বৎসরে তিনটি বড় ঋণঘট হইয়া-ছিল। যথা :—নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ঋণঘট, বোম্বাই মিল ঋণঘট ও ইরাবতী ফ্ল্যাট্টা কোম্পানীর ঋণঘট। এই তিন ক্ষেত্রেই শ্রমিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বোম্বাই মিল ঋণঘটের সময় বুটেনের আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিকট হইতে অর্থসাহায্য আদায় করা গিয়াছিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তৎকাল উক্ত সমিতিগুলিকে সক্রিয় ধর্মবাদের দ্বারা দ্বিষ্ট করিয়াছেন।

ভারতের জন্ম-মৃত্যুর হার—

দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি নিম্নলিখিত বিবরণে ভারতের জন্ম-মৃত্যুর হার (হাজার করা) দেখাইয়াছেন।



মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ ঠাকুর ও শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসগুপ্তা

দার্শনিক-দেশভক্তের বিরোধান। আমি, কবি এবং শান্তিনিকেতনের অধিবাসীর প্রতি, তাঁহাদের গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।”

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ—

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এখানে তিনি ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ঢাকার অধিবাসীগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কঙ্কণপূর্ণ ও বিশ্বভারতীর ঢাকা-শাখার-কর্মপণ্ডীতাহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও জন-সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসনৌ উপলক্ষে তিনি আর-একবার ঢাকায় গিয়াছিলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয়-বার ঢাকা-গমন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

“ইতিপূর্বে আমি আর একবার ঢাকায় আসিয়াছিলাম। সে-সময় আমি বলিয়া গিয়াছিলাম যে, তিনকা হারা মুক্তি আসিবে না। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে যে মানপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সে-কথার উল্লেখ আছে। একদল রাজনীতিক কর্মত্যাগীদের জন্য উপস্থাপিত

আবেদন-নিবেদন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সেই কথা বলিয়াছিলাম। আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সেবা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না।”

রবীন্দ্রনাথ কুমিল্লার অভয়-আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবেন।

সামরিক শিক্ষায় বাঙালী—

সম্প্রতি লেজিস্লেটিভ এসেম্বলিতে একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের মেন্ডেটরী বলিয়াছেন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এ-পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত-মত ছাত্র সামরিক শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছে :—

বোম্বাই—৩, পাঞ্জাব—১৬, বৃহত্তরদেশ—৩, বিহার—১, আসাম—১, ত্রুক্ষদেশ—১, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—২, রাজপুতানা—২, এবং হায়দরাবাদ—২। মোট—৩১। এই ৩ বৎসরে একজনও বাঙালী শিক্ষার্থ মনোনীত হয় নাই।

বাংলায় নারীনির্ধ্যাতন—

বাংলায় নানাহান হইতে নারী-নির্ধ্যাতনের সংবাদ আসিতেছে। সহযোগী আন্দোলনকার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি হইতে প্রতীয়মান হয়, এই গুণ্ডাদের অত্যাচার দিন-দিন স্মরণ বাড়িয়া চলিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

“ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে আবার নারী নির্ধ্যাতনের সংবাদ আসিতেছে। কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা মিলিয়া আনন্দপুর গ্রাম হইতে একটি নমঃগুজের মেয়েকে বলপূর্বক তাহার বাড়ী হইতে লইয়া যায়। চইয়া বাইবার পথে মেয়েটি চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে থাকিলেও কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহস করে নাই। দ্বিতীয় ঘটনাটি নারায়ণ-গঞ্জের, নির্ধ্যাতিতা মেয়েটি মুসলমান; জনকরেক মুসলমান গুণ্ডা মিলিয়াই তাহাকে বলপূর্বক লইয়া যায় এবং নানাহানে রাখিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। মেয়েটির স্বামী একবার পুলিশের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিলেও, আদালত হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে আবার ঐ মুসলমান গুণ্ডারা তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যায়।

এইসব নারী-নির্ধ্যাতনের ব্যাপারে দুইটি জিনিষ চোখে পড়ে। প্রথম—অত্যাচারকারী পাণ্ডেরা আর সকল স্থলেই মুসলমান; দ্বিতীয়—গ্রামের লোক বা প্রতিবাসীরা এমনই কাপুরুষ ও ভীক যে তাহারা এইসব লম্পট গুণ্ডাদের হাত হইতে নির্ধ্যাতিতা মেয়েদের উদ্ধার করিতে সাহস পায় না।”

শিশু-মঙ্গল ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী—

গত ২৫শে মাঘ কেডী লিটন কলিকাতার শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে চিত্র ও মডেলের সাহায্যে বাংলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় দেখানো হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার বাসরিক অধিবেশন হইবে। সভায় অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি দিলাম।

১। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের স্কুলের ছাত্রদের বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রবর্তন। এবং কলেজে সামরিক শিক্ষা-প্রবর্তন।

২। বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতায়, শিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিবার নিষিদ্ধ আইন-প্রণয়ন।

৩। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ পুনরায় মন্ত্রীদের হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব।

৪। সমস্ত রাজস্বদায়িককে মুক্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব।

খাদি-প্রতিষ্ঠান—

খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় একটি স্বল্পখাদি-পদার্থের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলার খাদিই যে কি অশুভ উন্নতি হইয়াছে এই প্রদর্শনী দেখিলে তাহা বোঝা যায়। পদার্থ-গুণে বড় বড় পাকাটে যে সব তপা লিপিত আছে, তাহাতে দেখা গেল বঙ্গদেশে প্রায় ১০ হাজার বাঙালীকে তাঁহারা অন্ন দিতেছেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঠাহারা ৩ হাজার টাকার কাপড় বিক্রয় করিয়াছেন, ঠাহারা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৮ হাজার টাকার খাদি বিক্রয় করিয়াছেন।

তুরমা-উপত্যকা রাষ্ট্র সংগঠন—

আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হবিগঞ্জে তুরমা উপত্যকা রাষ্ট্র সংগঠনের আবির্ভাব হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতির আনয়ন গ্রহণ করিবেন।

বাংলায় অতৈত্তনিক প্রাথমিক শিক্ষা—

বাংলার বাহ্যিকমুগ্ধক অতৈত্তনিক প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহার আলোচনার নিমিত্ত বাংলায় প্রত্যেক বিভাগে সভা হইয়া গিয়াছে। বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টান্তেই এতদসমস্ত সভাগুলি বসে। কোনো কোনো বিভাগের সদস্যসভায় শিক্ষাকল্প-সম্পন্ন বিকল্পে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, রাজসাহী ও ময়ূ কোনো কোনো বিভাগের সদস্যগণ কংক্রিপনের ধনুকুলে মত দিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও তাহার হাতে থাকিলে, এ-বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। বিষয়টি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন।

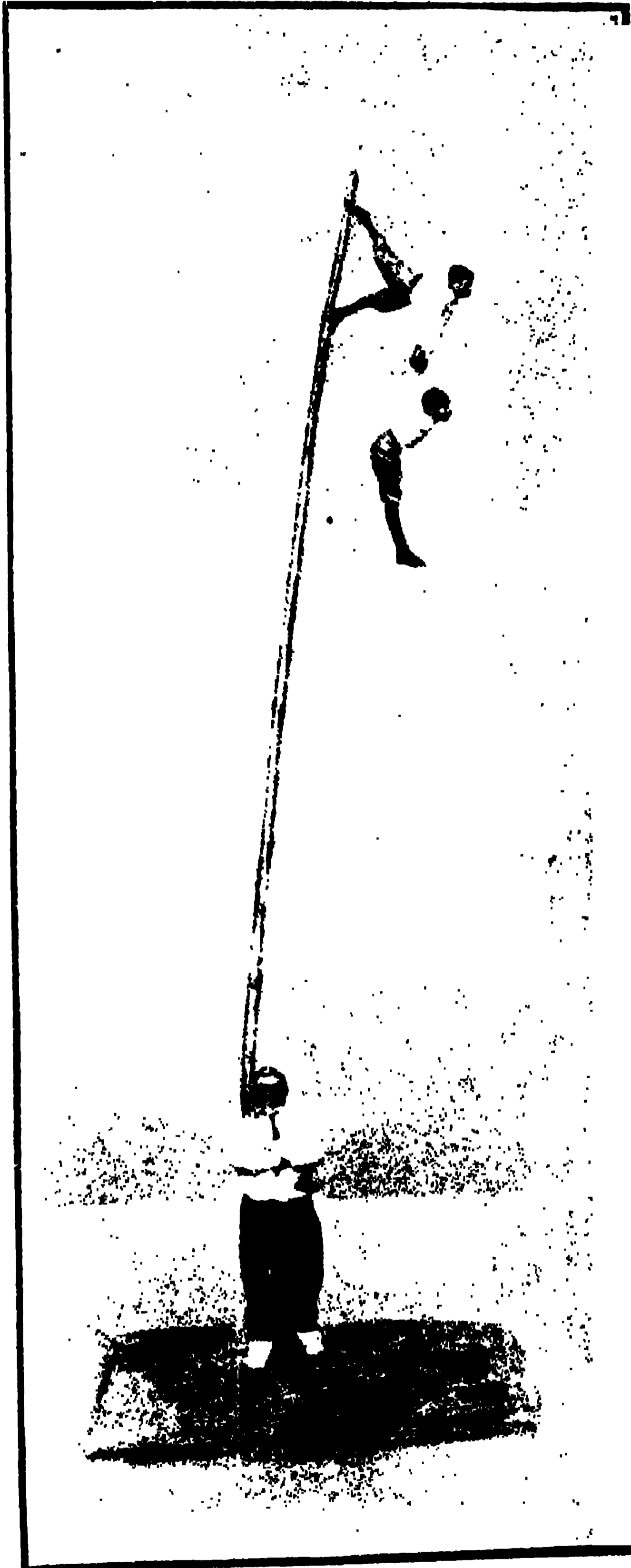
বঙ্গ ভূক্তি ও কাটাড়—

আমায় বাবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আলোচিত হইবে, "এই কাউন্সিল আমায় গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কাটাড়-জিলার পার্শ্বভাগ অংশ বাদ দিয়া কাটাড় জিলাকে শ্রীহট্টের সঙ্গে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিতে আমায় সরকার বর্তমানে অনুরোধ জ্ঞাপন করুন।" আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

বঙ্গবীর মাটার বসন্ত—

মাটার বসন্ত, ব্যারামচার্চা শ্রীগৌরহরি বৃণোপাধায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেনিরাটোলা আনর্শ ব্যারাম-সমিতির একজন উদীয়মান ছাত্র। এই সমিতি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেনিরাটোলার প্রতিষ্ঠিত হয়। মাটার বসন্তের বয়স বিংশতিবর্ষধাত্র। তিনি কলিকাতা মেডিকেল ইন্সটিটিউটের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

এই অল্প বয়সে মাটার বসন্ত যেনকস অল্পত ও দুঃসাহসিক ব্যারাম-গীড়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। তিনি হ দুবকবৃন্দ ও বালকবৃন্দকে ব্যারাম শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। গনি কলিকাতা ও বাহিরের কয়েকটি ব্যারাম-সমিতিতে শিক্ষাদান রিয়া থাকেন। মাটার বসন্ত ৩৫ ঘোটকের মটর-গাড়ীর গতিরোধ রিতে পারেন এবং সম্প্রতি তিনি একই দিকে ধাবমান দুইখানি গাড়ীও উরোধ করিতে সমর্থ হইয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।



ব্যারামবীর মাটার বসন্তের অক্ষোপরি একটি উচ্চ বংশদণ্ডের উপর অল্পত শরীরাবর্তন। তারবেস্তের অল্পত সামান্ত্যব; কেবলমাত্র বসন্ত কর্তৃক প্রদর্শিত।

সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতি—

সম্প্রতি কলিকাতার মহারাণী স্মৃতি সন্ধানী সন্ধানী সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতির প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসরে ২৪ পরগণার ১৩, ঢাকার ৩, হাওড়ার ৩, ময়মনসিংহে ৩, বাঁকুড়ার ২, ফরিদপুরে ৫, যশোহরে ২, বরিশালে ১, বগুড়ার ১, দার্জিলিংএ ১, এবং শ্রীহট্ট জেলার ক্রিমগঞ্জ ও কুবাজপুরে ২টি, সর্ব-সাকল্যে ৫৩টি শাখা-সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে কাৰ্য্য করিতেছে এবং দিনদিনই শাখা-সমিতির সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ-সমিতি—

সমিতির কার্য্যকরী সম্পাদক লিখিতেছেন যে, শিক্ষিত ভ্রমবংশসমৃদ্ধা রূপেণে বিশেষরূপে প্রশংসনীয় ১৮ জন হিন্দু বালবিধবার অভিভাবক-বৃন্দ পুনরায় তাহাদিগকে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তন্মধ্যে ৬টি ব্রাহ্মণ, ৮টি কারক ও ৮টি শূদ্র। ইহারা সকলেই স্ব স্ব বর্ণানুসারে হিন্দু-মতে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

বাংলার রাজবন্দাদের কথা—

(১) শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০শে জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের বাড়ীতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হইয়াছেন।

(২) মেদিনীপুর জেলার খেঙ্গুরী নামক স্থান হইতে চিকিৎসার জন্যে শ্রীযুত বিনয়েন্দ্র চৌধুরীকে আবার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনিয়ন করা হইয়াছে।

(৩) ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-বি-কে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে হইতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হইয়াছে। তিনি তাঁতের পাঁড়িতে ভুগিতেছেন।

(৪) শ্রীযুত বতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার আটক-খাকার জারগায় গিয়াছেন।

(৫) শ্রীযুত অমৃতপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতার অসুস্থতা-হেতু এক মাসের জন্যে ৬১, মালদা লেনে বাস করার অনুমতি পাইয়াছেন।

(৬) নদীয়া জেলার শ্রীযুত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় করদিন পূর্বে মর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার হইয়া আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনীত হইয়াছেন।

(৭) শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে তাঁহার পিতার অসুস্থের জন্যে তাঁহাদের ময়মনসিংহের বাড়ীতে ১৫ দিন বাসের অনুমতি পাইয়াছেন।

(৮) শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এক সপ্তাহ বাড়ী বাইরা থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

(৯) শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মুক্তি পাইয়াছেন।

(১০) শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চৌধুরীকে তাঁহার বাড়ীতে আটক রাখা হইয়াছে।

শ্রী প্রভাত সান্নাল

পথ চেয়ে

শ্রী প্রিয়ংবদা দেবী

পথ চেয়ে বসে আছি,

তুধু আশা লয়ে বাঁচি,

কবে যে গিয়েছ তুমি চ'লে ;

এ অদূর পথ চেয়ে আরবার যাবে গেয়ে,

চোখে চেয়ে যাবে কথা বলে,

পড়িবে তোমার আলো বুকের আঁচলে।

হেমস্তের শেষ রাতে জেলে দেবে নিজ হাতে

বরণের দীপ শত শত

আঁখিতে পরাণ আঁকি, কত আর ব'সে থাকি

নয় দিন সে দিনের মত।

উয়ার] আরতি হিয়া চায় অবিরত।

আমি একে-একে তুলি' দিমু সব দিনগুলি,

অঞ্জলি করিয়া ছুটি পায়।

চঞ্চল পবনে তুমি আনমনে গেলে চুমি'

বনানীর সীমন্ত-সীমায়।

ছুটে এসে সমীরণ, ক'রে নিল আহরণ,

অতুলন পরিমল যত প্রাণ চায় ;

আমার পূজার ফুল তবে কি মনের তুল

চায়নি কখনো জেগে উঠে ?

চেয়ে দেখি দলে-দলে হোথা শ্রাম বনতলে

পূজারি পাতার করপুটে

মুদিত মুকুল দল পুষ্প হ'ল ফুটে।



[পুস্তক-পরিচয়ের কিংবা পুস্তক-সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম—প্রঃ সম্পাদক]

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—শ্রীমৎ শ্রীমতী লক্ষ্মীনাথ সরস্বতী প্রণীত, শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রী নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল। চতুর্থ খণ্ড পৃ: ২৮৯ ৩৯২।

পূর্বে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিখণ্ডে নিম্নলিখিত আচার্যগণের মত সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—বাদরি, কাশ্মিরি, অত্রের, উড়ুলোমি, আশ্ররখা, কাশকুৎস, জৈমিনি, শঙ্কর, পদ্মপাদ, হরেশ্বরচাৰ্য্য, সৰ্বজ্ঞান মুনি শ্রীকৃষ্ণচাৰ্য্য, ভাস্করচাৰ্য্য, বাচস্পতি মিশ্র, যামুনচাৰ্য্য, অভিনব গুপ্তচাৰ্য্য, নিখার্ক, শ্রীনিবাস ও বাণবপ্রকাশ।

বাদরি প্রমুখ আচার্যগণের বিষয়ে বিশেষ-কিছু জানা যায় না; ব্রহ্মসূত্রে ইঁহাদিগের বিষয়ে বাহা পাওয়া যায় গ্রন্থকার এত পুস্তকে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শঙ্করপ্রমুখ আচার্যগণের বিবরণ কিছু বিস্তৃত। প্রথমে সংক্ষেপে তাহাদের জীবন তাহার পরে এই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তাহার পরে ইঁহাদিগের দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বাহার বেদান্তদর্শনের ইতিহাস জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। এ-প্রকার গ্রন্থ আব প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের একটি বক্তব্য এই :—গ্রন্থকার আচার্যগণের আবির্ভাবের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন সে-বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।

The Evidences of Theism. The Four-fold Proof of God's Existence : শ্রী সীতানাথ ভট্টভূষণ কর্তৃক লিখিত; পৃ: ৬০; মূল্য ১০।

মচরচর চারিপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ ভট্টভূষণ মহাশয় হুন্দর ভাবার সংক্ষেপে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহারা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং বাহারা ঈশ্বর-ভক্তি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

মহেশ চন্দ্র ঘোষ

সরোজ-নলিনী—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এন্স মহোদয় লিখিত। মূল্য ১০ আনা। দি বুক কোম্পানী, কলেজ কোয়ার্টার কলিকাতা।

সরোজ-নলিনী দেবীর মৃত্যুতে শুধু যে দত্ত মহাশয়েরই নিদারুণ কষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, সমগ্র দেশ একটি কল্যাণপরাণী আদর্শ নারী হইয়াছে। গভীর গভী-প্রেমের নিদর্শন এই পুস্তকের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ

পাইতেছে অশ্রু অকারণ উচ্ছ্বাসে জীবনটিকে আড়ম্বরপূর্ণ করিবার বার্থ চেষ্টা ইহাতে নাই। জীবনীটি পড়িলে বুঝা যায় যে সরোজ-নলিনী দেবী সুখে-দুখে বিপদে-আপদে, পারিবারিক জীবনে কিংবা কর্ম-জীবনে, বার্থ সহধর্মিণী ছিলেন। অশ্রু তাঁহার উদার হৃদয় শুধু খামো ও সম্মানের সেবাতেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয় নাই; তিনি এই চূর্ণশক্তি দেশের কল্যাণে প্রভুত পরিচয় ও চিন্তা করিয়াছেন। কবির রবীন্দ্রনাথ সরোজ-নলিনীর জীবনী ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন,—“আজকালকার দিনে যে-নারী কেবল একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন। ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই গিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ; বাহ্যিক জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা, তিনি আদর্শ নহেন; কিন্তু বাহ্যিক মতো বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও হৃদয়ভাবে সজ্জিত লাভ করিতে বাধ্য না পার তিনিই আদর্শ।” সরোজ-নলিনী দেবীর জীবনে এই আদর্শ আমরা দেখিতে পাই।

প্রচ্ছদপটে বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বস্থ মহাশয়ের চিত্রটি সরোজ-নলিনীর জীবনকে তুলির রেখার রূপ দিয়াছেন, পুস্তকটির ছাপা, কাগজ; বাধাই হুন্দর ও ইঁহা বহু চিত্রসম্বলিত। নামমাত্র ১০ মূল্য করিয়া দত্ত মহাশয় হরিত্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অতি অল্পব্যয়ে এই হুন্দর আদর্শ জীবনীটি ঘরে-ঘরে বিরাজ করিবে।

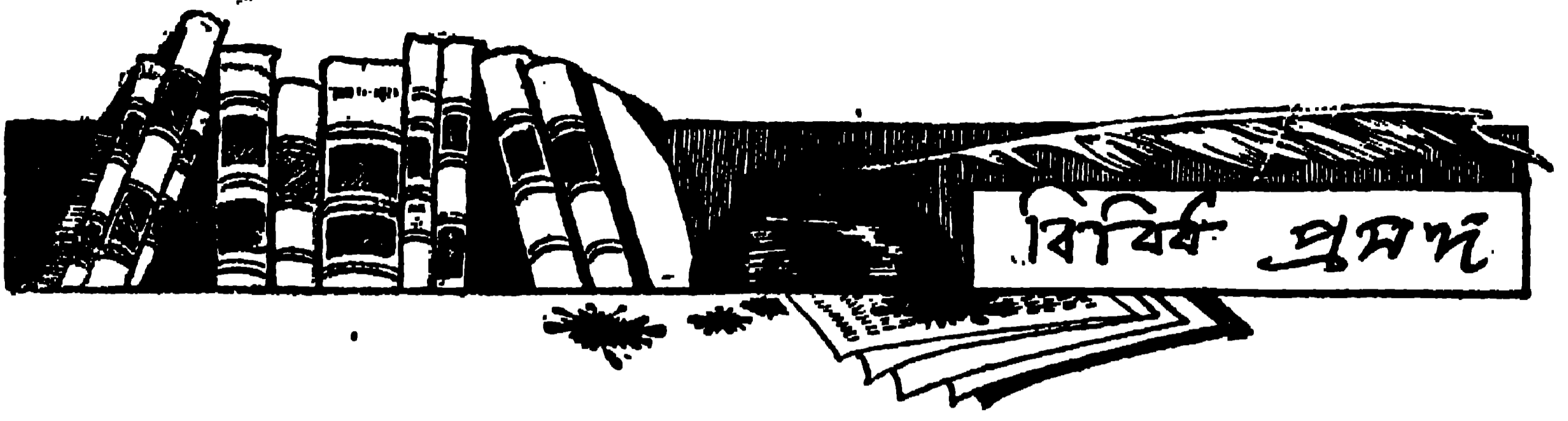
শ্রী সজনীকান্ত দাস।

কর্ণ (সচিত্র)—৷ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নরেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত, বগুড়া। ২য় সংস্করণ। মূল্য ১১/০ আনা। পৃ: ১৩৩। (১৩৩২)

৷ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্তের চিত্তাশীল শুলেখক বলিয়া সাহিত্যিক মহলে খ্যাতি ছিল। এই সচিত্র শিশুপাঠ্য বইখানিতে কর্ণের চরিত্র-মাধুর্য্য সরল সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বালক-বালিকাদের নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে। বইখানির ছাপা ও বাধাই ভালো।

আরো মজা—শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ: ৩২। (১৩৩২)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনার সিদ্ধহস্ত। এই ছোটো ও মজার গল্পগুলি শিশুদের নিশ্চরই খুব ভালো লাগিবে। শিল্পী চাক-চন্দ্রের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি হুন্দর হইয়াছে। বইখানির ছাপা ও বাধাই চমৎকার।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪৬ সালের ২২শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। বর্তমান ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইবার পর হইতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁহার বিদ্যাচর্চা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। ৪ঠা মাঘ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়; সেদিন প্রাতেও তিনি একটি স্বরচিত নূতন কবিতা অল্পক্ষণ পরিবর্তন করিয়া তাহাকে নূতন আকার প্রদান করেন। তাহা এ মাসের প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিৰ্মিত বোজ্জ্-প্রতিমূর্তির ছাপ)

বাল্যকালে কৃষ্ণবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তা ছাড়া তাঁহাদের

বাড়ীর এক বৃদ্ধ কাম্ভচারীর নিকট হইতে তিনি প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প আগ্রহের সহিত শুনিতেন। সাত আট বৎসর বয়সেই তাঁহার বাংলা লেখার ঝোঁক চাপে। তখন যাহা কিছু মনে আসিত, তাহাই গদ্যে বা পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন।

তিনি প্রথমে বাংলা বিদ্যালয়ে ভৰ্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর পড়িয়া ইংরেজী সেন্টপল্‌স স্কুলে ভৰ্তি হন। কিন্তু বাংলা শিখিবার ও লিখিবার তাঁহার যেরূপ আগ্রহাতিশয় বরাবর ছিল, ইংরেজী শিখিবার ও লিখিবার সেরূপ আগ্রহ তাঁহার কখনও হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ইংরেজী বেশ জানিতেন, এবং শেক্সপিয়ার, বায়রন্ ও কীট্‌সের গ্রন্থাবলী তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে তিনি দর্শনের বহিঃ অনেক পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ ডার্গ্যান্ দার্শনিক কাণ্টের বহিঃ অনুবাদ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন; গণিতজ্ঞ ছিলেন;—ভারতবর্ষের লোক ইহাতে কিছু অসম্মতি বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। ভারতীয় দার্শনিক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

“আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন, কাব্য, যাহা হউক—একটি একাঙ্গবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অনুষঙ্গর বালাই তাহাদের নাই; সুতরাং পাশ্চাত্য-স্বলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকারপ্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না। দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নিৰ্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ, এদেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর কল্পনার খাস-কামরা আশ্রয় করা নহে।... আমাদের জনসাধারণ সহজেই তদ্বদর্শীকে কবিব্দের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধী-শক্তি প্রকার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।”

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী এইসকল কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তহল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “জীবন-স্মৃতি” পুস্তকে তাঁহার বড়দাদার কাব্যরচনার কিছু-কিছু আভাস দিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

“বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিছুত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতি-দিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহাস্যাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু-কিছু পদ শুনিতো পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যের কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না আর বোলো না,
বল চ বধু কিসের বোঁকে—
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাসবে লোকে—

হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে !

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা পাইত।”

দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্য অসাধারণ-রকমের ছিল। ১৩২১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে গুণনামা কোন লেখক তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন,

“হাস্যরসের সময় যে অট্টহাস্য শুনিয়াছি, সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অঙ্গকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য। তাহার মধ্যে কার্পণ্যের লেশমাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতলনিয়ন্ত্র টেবিলের কাষ্ঠখণ্ডের আয়ুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি—সরস উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি।”

তাঁহার অঙ্কা ও প্রীতিভাজন পরমবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হাসিও এইরকমের ছিল।

রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতি”তে তাঁহার বড় দাদার “স্বপ্নপ্রয়াণ” কাব্যের উল্লেখ হুজায়গায় আছে। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

“বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন।

গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত বাতাসের মত কাজ করিত। বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন-ঘন উচ্চ হাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্ত আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেখ জীবিত ফোটোগ্রাফ
(৭ ই পৌষ ১৩৩২ উৎসবের দিন গৃহীত)

‘তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাবার কল্পনার একে-বারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব-নব অশ্রান্ত তরঙ্গের সলোচ্ছাসে কুল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম ? কিন্তু পূর্কেই বলিয়াছি, লাভ করিবার অস্ত পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না।’ সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি

না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না ; কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া চেউে খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনশ্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত !”

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

“সাহিত্যে বৌঠাকুরাণার প্রবল অমুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কটাইবার জন্ত, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

“স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। বিশেষতঃ আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অমুরাগের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এইরকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

“স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারু-নৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।”

রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং অন্ত অনেকে সমস্তদার ব্যক্তি স্বপ্নপ্রয়াণের প্রশংসা করিলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়া-ছিলেন, “আমার যথার্থ কবিতার মুড়ু যখন ছিল—অর্থাৎ সেই কালে—তখন আমি একা ব্যক্তি লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; ইহার রচনার সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মগ্ন ছিলুম, তাই অন্য উহাতে মেটাফিজিক্স চুকিয়াছে।” তাঁহার পক্ষে একথা বলা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কারণ তিনি নিজের লেখার কঠোর সমালোচক ছিলেন; নিজে কিছু লিখিয়া সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না। বার বার সংশোধন, এমন কি পুনর্লিখন চলিত।

স্বপ্নপ্রয়াণের আগে এবং পরেও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পঞ্চানুবাদ তাহার মধ্যে অন্ততম। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ বাল্যকালের রচনা বলিলেও চলে। অথচ অনুবাদটি উৎকৃষ্ট। উহার কতকগুলি পংক্তি বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পরিচিত; যথা—

“কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—”

“তাহারে নাচাত প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রণ রণ বাজে তায় বাল্য।”

হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি অন্তর্ভুক্ত লিখিয়াছিলেন, জীবিতকালের শেষ দুই তিন বৎসরেও লিখিয়াছিলেন। আগেকার হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে “গুফ-আক্রমণ কাব্য” তাঁহার পাঠকদের নিকট সুপরিচিত।

উহার শেষে এইরূপ ফলশ্রুতি আছে :—

“শুনিলে সুখাব্য, এই কাব্য কবিকুল-অভাব্য
মধুর ছটা।

লভে ইষ্টসিদ্ধি, গোপবৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা।

পঢ়ে বেই লোক এই শ্লোক, পাষ সে গুফলোক
ইহার পরে।

যথা গুফধারী, ভারি ভারি, গোফের সেবা করি,
সুখে বিচরে।”

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হইল, কেন? ঐ সুদূর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ? অতঃপর তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ “তত্ত্ববিদ্যা” পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

“আমাদের দেশের সর্বসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভাষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।” রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যে যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার স্রোতাগ্রন্থ সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরলোকগত কবি



দ্বিজেন্দ্রনাথ

মৃত্যুর স্বাব্যবহিত পরে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত কানুদেশাই অঙ্কিত চিত্র)

শান্তিনিকেতনের অন্ততম শিক্ষক সত্যশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজের এক বন্ধুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন,

“মাটব্লিংকের ‘প্রজ্ঞা ও নিয়তি’ নামক বইটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা মাটব্লিংক করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের স্তায় শাস্ত নিরহকার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বঙ্গপতের রহস্যের মুখামুখি শয়ান, অভিজুতব্য (৭) চিন্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা উইজডম্। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্র বাবুর আছে।”

প্রায় বার বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন।

“সংসারে লোকের অনেক দিক থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য করিতে

হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক থাকে, যদি তিনি সমগ্র জীবনে কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা এক মাত্র জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আর একজনকেও দ্বিজেন্দ্রনাথের স্তায় জ্ঞানের অনন্তনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও কি দিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্রান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্রান্তি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধিবাসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে স্নপ্ত, শালসমীরণ তাহাদের ললাট স্পর্শ করিয়া দিবসের ক্রান্তিবেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষী শান্ত-স্নিগ্ধ গভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার আমলক কুঞ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন; ভূত্য মুনীশ্বর

ছই ধারে ছইটি মোমবাতী জালিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার লেখনা অবিশ্রাম চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব গগন লোহিত রাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! স্বিজেরনাথের এ নিশাকাহিনী পিতামহীর কাহিনী নহে।”

প্রবাসীর যে সংখ্যায় এই বাক্যগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই ভূপনামা পূর্বেক লেখনকও বলিয়াছিলেন,

“পূর্বে দেখিয়াছি লিপিতে লিপিতে ভোর হইয়া গেল,



স্বিজেরনাথ
(মৃত্যুর পরে)

চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, প্রভাতের বিহঙ্গম বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্বান করিয়া দৈনিক ছই মাইল পর্যটন সমাপ্ত করিয়া চা পান করিয়া আবার খাতা লইয়া লিপিতে বসিলেন।”

তিনি দর্শনশাস্ত্রের একান্ত অমুরাগী ছিলেন। উহার চর্চা ও চিন্তাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে তিনি উচ্চাঙ্গের গণিতের অমূল্য করিতেন। তাঁহার রেখাকর বর্ণমালা বিশ্রামকালে লিখিত। এফাস্ত বিশ্রাম করিতে চাহিলে তিনি সূতা বা আঠার সাহায্য না লইয়া বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের নানা-রকম খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। তিনি প্রবাসীতে যে অগণিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সমুদয় এইরূপ খাতায় লেখা। তাঁহার চিঠিও খামের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতেন না, স্বকৌশলে তাহা ভাঁজা হইয়া আসিত। তিনি যাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, তাহারা কলম পেঙ্গিল লেফাকা প্রভৃতি রাখিবার এক একটি কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও একটির অধিকারী।

স্বিজেরনাথ যে খুব বেশী বহি পড়িতেন, তাহা নহে; কিন্তু পাঠ অপেক্ষা চিন্তা করিতেন বেশী। তিনি গীতার ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রের যে-সকল ব্যাখ্যা স্বদেশবাসাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিভার বলে অস্ত্রে যে-সকল সত্তোর অস্তিত্ব অমুমান করে না, তিনি শাস্ত্রবচন হইতে তাহা পরিষ্কট করিতে সমর্থ হইতেন

ইউরোপ হইতে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার বড় দাদাকে একখানি চিঠি লেখেন, তাহাতে এইরূপ মর্মের কথা ছিল, যে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ভারতীয় দর্শনে ও জানে সামান্ত অধিকার থাকা সত্ত্বেও যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়েরা বিস্মিত হইতেছে। এই জন্ত তিনি স্বিজেরনাথকে এই অমুরোধ করেন যে, তিনি যেন ইংরেজীতে ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থিত করেন; তাহা হইলে তাহারা উপকৃত ও মুগ্ধ হইবে। এই চিঠি যখন আসে, তখন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। স্বিজেরনাথ চিঠিখানি আমাদিগকে পড়িতে দেন; তাহার পর নিজের ইংরেজী লেখার অনভ্যাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, পরোক্ষভাবে, কেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অমুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা জানান। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে তিনি



দ্বিজেন্দ্রনাথের শবদেহ

আমাদিগকে বলেন, “রবির wonderful literary powers (আশ্চর্য্য সাহিত্যিক শক্তি) আছে,” অর্থাৎ কিনা “রবি” যাহা পারে সকলের পক্ষে কি তাহা সুসাধ্য? রবীন্দ্রনাথও প্রৌঢ় বয়সে ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি ইংরেজী লেখার অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে তদ্বারা জগৎ উপকৃত হইত।

দর্শনের প্রসঙ্গে আমাদের একটি আখ্যান মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাতিশষট্টি বৎসরপ্রেমিক ছিলেন, এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত অমুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌সে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্বে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করেন, তখন আমরা তাঁহার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যে, আমাদের লক্ষ্য ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত

হয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহার রিক্‌শাটি আরোহণ করিয়া আমাদের তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার দেশাভিমান ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের যে কোনও অশ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আর একবার, প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে, বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভার্থে ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিতে অসমর্থ, এইরূপ কিছু লিখিবার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে, ওরূপ কোন কথা লিখিলে ভারতবর্ষের অপমান করা হইবে, এই মত তিনি প্রকাশ করেন।

এঞ্জেল্‌ সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া ও চা খাইয়া কিয়ৎকণ তাঁহার

সহিত যাপন করিতেন। তিনিও এণ্ড্রু সাহেবকে স্নেহ করিতেন। তথাপি, একদিন দেশে কি একটা অভ্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাদিগকে (অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে অভ্যাচারদিগকে) তাড়াইয়া না দিলে আর শাস্তি নাই” (ইংরেজী কথাগুলো ইহা অপেক্ষা জোরাল ছিল; তাহা লিখিলাম না)। তাহাতে এণ্ড্রু সাহেব বিজ্ঞাননাথের এক পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, “I say,—, your grand-father is a terrible—.” তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিবার স্তম্ভই এই কথাগুলি লিখিলাম; নতুবা ধীর শাস্ত (যদিও বীর্যবান) বিজ্ঞাননাথ যে হিংসামূলক কোন হঠকারিতার সমর্থন করিতেন না, তাহা তাঁহার ভক্তমাত্রেই জানেন।

ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাভাৱ্য ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি স্রিয়মাণ থাকিতেন ও তজ্জন ক্ষোভ লইয়া মরিবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত প্রচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ইহার পর তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্রের ভাব চলিয়া যায়। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সান্ত্বনয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, এবং আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ধর্মবীর ও কর্মবীর বলিতে শুনিয়াছি।

“ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তার ॥”

তিনি এই আনন্দের অধেষণে অস্বস্তিমৎসরগুলি ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার অধিকারী হইয়া অনেক দিন জীবিত থাকিয়া তিনি শাস্তিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। “বিজ্ঞের ত্রিভঙ্গ” কবিতা-টিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাননাথের পুত্রপৌত্র ধনজনবিভব সবই ছিল, কিন্তু তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। অথচ তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার অনেক কথায় তাহাদের প্রতি স্নেহের পরিচয় অনেক বার পাইয়াছি।

তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন আমলক-কুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাঁহার স্নেহকরণা দেখিলে প্রাচীনকালের শাস্ত্র-রসাম্পন্ন তপোবনের কথা মনে পড়িত। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি :—

“তিনি নিরুপদ্রবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসমুদ্রের রত্নগুলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক তরু হইতে পাখী নিজের মনে তাঁহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার গাভার খাইতেছে; কাঠবিড়ালগুলিও লাফাইয়া লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে। বিজ্ঞাননাথ ভৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই সকলেই যেন বলিতেছে, সর্বা আশা মম মিত্রঃ ভবন্ত—সমস্ত দিক আমার মিত্র হউক! মিত্রশু চক্ষুযা সমীক্ষামধে—মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন একটি পাখী তাঁহার কাঁধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে সহসা ঠোঁট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে। চোখটি ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি অয়ং আমাদের নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিলেন—‘না, ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া যাইবে। ও তো আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই!’ বিজ্ঞাননাথ জ্ঞানচর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, তাঁহার ‘ভূতদয়া’ এইরূপই পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।”

এই বিষয়ে প্রবাসীর পূর্বোক্ত গুপ্তনাথ লেখকও লিখিয়াছিলেন :—

“শালিক চড়াই কাঠবিড়ালী আসিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত হইলে মাঝে মাঝে ‘আঃ বড় জালাতন করুচে’ বলিয়া রুদ্ধ চোঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া যাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়াল ভয়তর অমুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভর করিয়া বাসিল।”

চোখের ভিতরে পূর্বোক্ত পাখীটি ঠোকরাইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে পনের দিন চোখ বাধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। “রাগিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত নাই, ত’ ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ‘আহা, তাড়াতে



ছাতিম ভলার ছিক্কেন্দ্রনাথের শবদেহ

বল্লেই কি তাড়াতে হয়! যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়। ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।”

“ছিক্কেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাণ্ডায় শুইয়া শীতে থবু থবু করিয়া কাঁপিতেছে এবং কুঁই কুঁই করিয়া কাঁপিতেছে। তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভৎসনা করিলেন, বলিলেন ‘তোদের কি কোনও মায়া দয়া নেই! আহা, কুকুরটা এইরকম ক’রে কাঁদে, আর তোরা দরজা বন্ধ ক’রে ভোস্ ভোস্ ক’রে ঘুমুচ্ছিস্?’ এই বলিয়া আপনার একখানি নূতন লালরঙের কঞ্চল আনিয়া কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপা দিয়া যখন দেখিলেন যে সে কতকটা স্থস্থ হইয়াছে, তখন আবার ফিরিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন।”

কোন মানুষ তাঁহার কথায় বা আচরণে ক্লেষ পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে তিনি বাধা পাইতেন এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিকার করিতেন। তাঁহার কোন কথায় কেহ হয়ত রাগ করিয়াছে এরূপ ভ্রমও

তাঁহার কখন কখন হইত। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার তাঁহার সহিত কিয়ৎকণ কথাবার্তার পর একটি কি বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পরেই আমি তাঁহার অহুমতি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসি। আমি বোধ হয় একটু হঠাৎ আসিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, যে, আমি বুঝি বা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই ভুল কিয়ৎকণ পরেই এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, ‘বাবু মহাশয় আপনাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন’। আমি গেলে তিনি নিজের সন্দেহের কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম, যে, তাঁহার কথা শেষ হওয়ার ও আমার অনেক কাজ থাকায় আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি আমাদের সকলের এরূপ পূজনীয় ও ভক্তিতাজন ছিলেন, এবং সকলকে এরূপ স্নেহ করিতেন, যে, তিনি ভিন্নকার্য করিলেও (আমাদিগকে

তাহা কখনও করেন নাই) আমাদের অসন্তোষ জন্মবার সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, সেদিন তিনি, অন্য কোন কোন দিনের মত, বম্‌ওয়েচ্ নামক জার্মান মিশনারীর বাংলা কথাবার্তা ও বাংলা কবিতা পাঠের হাস্তকর অক্ষরকরণ করিতেছিলেন; এবং অন্তবিধ লঘু কথাবার্তা চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে চিনিত না, একপ লোকেরও সেদিনকার কথাবার্তায় কোন বিরক্তি জন্মবার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের সহিত ব্যবহারে তাঁহার শিষ্টতার ও কোমলহৃদয়ের পরিচয় এইরূপ সামান্ত সামান্ত ঘটনাতেও পাওয়া যাইত। আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অনেকও এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত দিতে পারিবেন।

কোনপ্রকার অহমিকা প্রকাশ তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। পরোক্ষভাবেও যাহাতে নিজের বা নিজ পরিবারের কোন বড়াই করা না হয়, সে-বিষয়ে তিনি একরূপ সতর্ক ছিলেন, যে, উহা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আমি একবার তাঁহাকে বলি, যে, তাঁহার বাল্য ও যৌবন কালে বঙ্গের সামাজিক ও অন্ত নানাবিধ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু লেখেন, তাহা উপদেশ হইবে ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাহাতে সেরূপ কিছু না লিখিবার দুটি কারণের তিনি উল্লেখ করেন। একটি এই, যে, তাঁহার স্বর্গত দুর্বল হইয়া গিয়াছে, অনেক কথা ভাল করিয়া মনে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই বলেন যে, উহা লিপিতে গেলে তাঁহাদের নিজেদের পরিবারের কথা এত বলিতে হইবে, যে, তাহা আত্মসম্মতির মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ, তিনি এই দ্বিতীয় কারণটি যত গুরুতর মনে করিতেন, উহা তাহা নহে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার স্বভাবনয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার স্বস্থরে যেমন একটি সহজ সরল দর্পহীন তেজস্বিতা ছিল, বাহিরের পরিচ্ছদেও তিনি তেমনি, অন্তের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, নিজের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে চলিতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,

“তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন অনুসারে, প্রচলিত প্রথা বলিয়া তাঁহার নিকটে

কিছু নাই। চশমার যে-যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই সেই স্থানে তুলা ঝড়াইয়া লইবেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অস্ববিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্বন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতার বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, তিনি তজ্জন্ত জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইবেন। [তিনি শীতকালে গরম মোজার ভিতর হাত ঢুকাইয়া সূতা দিয়া মোজা ও জামার আন্তর হাত বেঁটন করিয়া বাঁধিতেন, যেমন বাইসিক্লু আধো-হীরা মোজা ও পাতলুন পায়ে ঝড়াইয়া বাঁধে; ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতে পারিতেন।] যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে-কোন বিষয়েই হউক; আহার-বিহার বসন-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না।”

একবার এণ্ড্রু সাহেব তাঁহাকে একটি গরম ওভার-কোট উপহার দেন। তিনি উহা লইয়াছিলেন, কিন্তু গায়ে না দিয়া উহার ছায়া তাঁহার বেদারাটি মুড়িয়া তাহাতে বসিতেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না করার যে নিয়ম, শব্দপ্রয়োগসম্বন্ধেও তিনি তাহা রক্ষা করিতেন। সকল-রকম লেখাতেই তিনি বিশেষ বিবেচনা ও ওজন করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই জন্ত তাঁহার লেখায় তাঁহার চিন্তা ও ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইত।

তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মানুষ বুদ্ধি চতুরতাপূর্ণক মত বা মনের ভাব গোপন করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই জন্ত কখন কখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হাস্তকর অবস্থা ঘটত। একদিন মিঃ এণ্ড্রু ও আমি তাঁহার সহিত সন্ধ্যায় দেখা করিতে গিয়াছি। সেদিন তিনি, আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেক সময় কেমন উচ্চ ধর্মভাব ও দার্শনিক চিন্তা লক্ষিত হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, খৃষ্টিয়ান্ মিশনারীরা যে আমাদের দেশের লোককে পুতুলপুতুলক বলিয়া ভুল বুঝে ও অবজ্ঞা করে, এই মর্মে নানা কথা খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন। শ্রোতা ছুটনের মধ্যে এক-

জন যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-প্রচারে উৎসাহী, তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। আমরা যখন বিদায় লইয়া নিজ নিজ আবাসে চলিলাম, তখন এণ্ড্রু আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন, “আজ বড় দাদার কথোপকথন খুব ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল।” আমি চুপ্ করিয়া এই মন্তব্যের রসটুকু উপভোগ করিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের ছাপকে মোটেই মূল্যবান মনে করিতেন না; এই জন্ত বহুবার আমাদের সাক্ষাতে বি-এ এম্-এ-দের সম্বন্ধে একরূপ অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যাহা শুনিলে তাঁহারা খুশ হইবেন না। তাঁহার শ্রোতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগী লোক, তাহা তাঁহার মনে থাকিত না; অথবা হয়ত তাঁহার স্নেহগুণে তিনি তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ, শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধেও তাঁহার কতকগুলি প্রতিকূল ধারণা ছিল। কিন্তু তাহার জন্ত, ঐরূপ যেসব মহিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহারা তাঁহার প্রাক্তন কম ভক্তিমতী ছিলেন না। অজ্ঞকালকার মেয়েরা যে সেকেন্দ্রে ভাল ভাল রান্না ভুলিয়া যাইতেছেন, এটা তাঁহার একটা অভিযোগ ছিল।

বিজ্ঞানসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যেমন বিস্তর সত্য আখ্যানমালা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা হওয়া উচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তি বিশ্বয়কর ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, “শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা-প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়াছেন, যে, ইহা এইরূপ হইতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তুতঃ ও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে।” “তাঁহার শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচর্চায় সফলতা লাভের একটি প্রধান কারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তাঁহার হৃদয় কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে।...হটক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, তিনি কাহারও প্রতি কোন অহুচিত আরোপ সহ করেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন, যে, হিন্দুগণের শ্রীকৃষ্ণের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অতি কুৎসিত; এবং ইহা

অসভ্য বর্কের জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কপাটা ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌছে। দিবা সার্কি প্রহর, প্রথর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী ধীরপদ-ক্ষেপে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তীক ভাষায় তাঁহার সম্মুখে দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন—“শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিত রূপের কথা কোথায় আছে? সর্বত্রই ত তাঁহাকে ‘শ্যামসুন্দর’ ‘মদনমোহন’ বলা হইয়াছে!”

যুবা সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, “প্রকৃত আইডিয়ালিষ্টের প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইহাদের একটি লক্ষণ এই, যে, ইহারা যে কথাই বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সামান্য দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্তা গব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি ভ্রান্তি, কি তেজ প্রেরিত হইতে বাধ্য।...দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে সরল ভাব হো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারা এ-টি বড় জোরের অথবা বৌর্ষ্যের ভাব আছে। এইসময় জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।”

সূর্যগ্রহণ

গত ২০ শে পৌষ সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক তথ্যানির্ঘণ ও সত্য আবিষ্কারের নিমিত্ত ঐ উপলক্ষে স্মারাজ্যসীপে যে পাশ্চাত্য নানা জাতির লোকে পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ নির্মাণ ও দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অগ্রহাঙ্গণের প্রবাসীতে বলিয়াছি। পর্যবেক্ষণের ফলও পরে পাঠকদিগকে জানাইবার ইচ্ছা আছে। ভারতবর্ষে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয় নাই। হইলেও এখানে আমাদের দেশের লোকেরা পর্যবেক্ষণের কোন সমুচিত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ, ভারতে যথেষ্ট জ্ঞানবান্ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা কম; দ্বিতীয়তঃ, একরূপ লোক যাহারা আছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট আর্থিক আত্মকূল্য পাইবার সম্ভাবনা কম, এবং হয়ত সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে উদ্যোগিতাও কম।

ভারতবর্ষে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে নানা তীর্থে স্নানার্থীদের খুব ভীড় হইয়াছিল। গ্রহণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ

আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। তাহা জানিয়া তাঁহারা, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কখন হইবে, তাহা গণনা করিবার নিয়মও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে গণনা করিয়া আমাদের পত্রিকাকারেরা গ্রহণের দিন-কণ পত্রিকায় নির্দেশ করিয়া থাকেন। গ্রহণ-সম্বন্ধে এইরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে থাকা সত্ত্বেও অস্তুবিধ এবং ভ্রান্ত ধারণাও চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসবশতঃ অসংখ্য নর-নারী সূর্যকে রাহুর গ্রাস হইতে বাঁচাইবার জন্ত শব্দ ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন, এবং নিজদের অশুচিতা কালনার্থ তীর্থস্থানে স্নান করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় গঙ্গার নানা ঘাটে লক্ষ লক্ষ নরনারী ৩ শে পৌষ স্নান করিয়াছিলেন। নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্ত, আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত, সঙ্গীহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে তাহাদের অভিভাবকদের হাতে অর্পণ করিবার জন্ত, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যুৎপন্ন হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাদের আত্মোৎসর্গ ও নিয়মাত্মগত অতীব প্রশংসনীয়।

মাঘমেলা ও সূর্যগ্রহণ-স্নান

প্রয়াগে প্রতিবৎসর মাঘমাসে গঙ্গাঘমূনার সন্ধ্যায় মাঘমেলা হইয়া থাকে। মেলা একমাস থাকে; কিন্তু প্রথম দিন ও শেষ দিনেই বেশী ভীড় হয়। এই এই দিনে প্রায় দুই তিন লক্ষ লোক স্নান করে। সাধারণ মাঘমেলায় সচরাচর খাদ্য মিষ্টান্ন ব্যতীত অস্ত্র কিছু বড় বেশী বিক্রী হয় না। কিন্তু বার বৎসর অন্তর যে কুম্ভমেলা এই মাঘমাসেই হয় তাহাতে কাপড়, বহি, বাসন, খেলনা, মিষ্টান্ন, পট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন কুম্ভমেলায় ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত লোক প্রয়াগে সন্ধ্যায় স্নান করে।

বর্তমান বৎসরে মাঘমেলায় প্রথমে সূর্যগ্রহণও পড়ায় স্নানার্থীরা ভীড় খুব বেশী হইয়াছিল। এইরূপ অস্তুমিত

হইয়াছে, যে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক এবার স্নান করিয়াছিল। আমরা গ্রহণের পূর্বদিন ও গ্রহণের দিন যাত্রীর জনতা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিন দিকের তিনটি রেলওয়ে দ্বারা প্রয়াগে পৌছা যায়। তিন ট্রেনেই কয়েক দিন ধরিয়া লোকারণ্য হইয়াছিল। যাত্রীদের সান্ত্বনয় কষ্ট হইয়াছিল—বিশেষতঃ ফিরিবার সময়। তাহারা বস্তার মত মাল গাড়ীতে পর্যন্ত ঠাসা বোঝাই হইয়া যাত্রায় বাধা হইয়াছিল। অথচ আইন মাহুসকে এইরূপ যত্ন দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু রেলওয়ের কর্মচারীরা লক্ষলক্ষ টিকিট বিক্রী করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন; যাত্রীদের অস্তুবিধা নিবারণের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। শুনিয়াছি, পাণ্ডারা স্নান উপলক্ষে তাহাদের লক্ষ বহু অর্থের কিছু অংশ ট্রেনে হস্তান্তর করিয়া গাড়ীতে কোন প্রকারে ঠাসিয়া ঠাসিয়া যাত্রী বোঝাই করিয়াছিল; ঐপ্রকারে অর্থব্যয় করায় রেলওয়ের কর্মচারীরা তাহাদিগকে বাধা দেয় নাই। এক দল যাত্রীর নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া অস্ত্র আরো যত দলের নিকট তাহারা আদায় করিতে পারে, ততই তাহাদের লাভ।

গঙ্গাতটে কিন্তু যাত্রীদের জন্ত নির্মল জল সরবরাহের ও তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রয়াগের সেবাসমিতি হারান ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের আত্মীয়দের হাতে অর্পণ করিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য-প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় কেহ ডুবিয়া গেলে তাহাদের উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার জন্তও বন্দোবস্ত ছিল।

এবার সন্ধ্যায় গঙ্গার বাঁধের প্রায় দুই মাইল নীচে হওয়ায় সুবিস্তৃত বালুকাময় নদীতটে যাত্রীদের থাকিবার ও চলা ফিরা করিবার অস্তুবিধা হয় নাই। প্রায় পাঁচবর্গ মাইল স্থান যাত্রীরা পাইয়াছিল।

গ্রহণের পূর্বদিন সন্ধ্যায় সময় দেখিলাম, অনেক পুরুষ ও নারী বালুকার উপর নিজদের সামান্য খাদ্য পাক করিতেছে। তাহারা সেইখানেই রাত্রি যাপন করিবে।

অধিকাংশের কোন বিছানা লেপ কাঁথা নাই; গায়ে যে সামান্ত কাপড় আছে তাহাতেই তাহারা খোলা জায়গায় আকাশের নীচে বালির উপরে এলাহাবাদের রাত্রে দারুণ শীত কাটাইবে। কেহ কেহ বিছা খড় সংগ্রহ করিয়াছে; তাহারই উপর রাত্রি যাপন করিবে। বাকী অধিকাংশের বালুকাশয়া। হিংস্রতায় ভারতীয়েরা পৃথিবীর নানা জাতির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু সাদাসিধা জীবনযাপন প্রণালী ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অল্প কোনও সভ্য জাতি তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আমাদের জ্ঞান বাড়ুক, ঐশ্বর্য্য বাড়ুক, ইহা আমরা চাই; কিন্তু সাদাসিধা-ভাবে জীবন যাপনের ক্ষমতা ও কষ্টও অসুবিধা সহিবার ক্ষমতা আমাদের না কমে, এই ইচ্ছা আরও অধিকপরিমাণে করি।



প্রয়াগ-খাট স্টেশন (ও, আর্ রেলওয়ে) দারাগঞ্জ

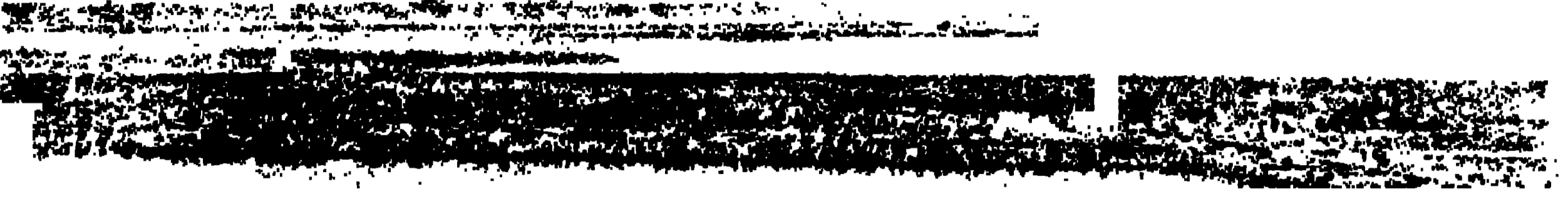
[ডাঃ ললিতমোহন বসু এন্ড বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]

যাধারা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন ও স্নান করিতে ছিলেন, তাহাদের কাহারও কাহারও মুখে ভক্তি শ্রদ্ধার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু অনেকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের, মুখের ভাব দেখিয়া শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কার কাহারও থাকে, তাহা আমরা চাই না; সকলেই যে বাহ্যিক স্নানের পাপক্ষালন ক্ষমতায় বিশ্বাসবশতঃ স্নান করিয়াছিলেন,



ইলাং ব্রিজ স্টেশন (বি. এন্ড, ডব্লু বেলওয়ে) বেণীঘাট বাঁধ হইতে।

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এন্ড বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]



দারাগঞ্জঘাট খুঁসী হইতে দৃশ্য

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এন্ড বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]

তাহাও মনে করি না, উচ্চতর ভাব হইতেও কেহ কেহ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া ঔদাসীন্য ও বিজ্ঞপের ভাব তাহার স্থান অধিকার করিলে তাহা আরও অবাঞ্ছনীয়। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার হউক, সকলে শিক্ষিত হউন, কিন্তু আমাদের জাতির বিশেষত্ব যে ভক্তিশ্রদ্ধা তাহা নির্মূল ও বন্ধমূল হউক, ইহাই চাই। আমাদের

দেশের নারীরা যে আত্মোৎসর্গ ও সেবা অনেক সময় বাধ্য হইয়া করেন, শিক্ষিতা, অবরোধমুক্তা, বন্ধনমুক্তা হইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাহা করিলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পুণ্যতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্নানের ভীড় তিনদিনব্যাপী চলন্ত ভীড় বলিয়া এবং জনতা স্তম্ভিত স্থানের উপর হওয়ায়, ফোটোগ্রাফগুলি দেখিয়া উহার কোন ধারণা হইবে না। আমরা রাস্তায়,



পট্টন সেতু, গ্র্যাণ্ড টার্ক রোড.

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এন্ড বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]



বেণীঘাটে মেলায় ভিতরকার দৃশ্য—মেঠাইর দোকানের কাছ

[ডাঃ ললিতমোহন বহু এম্-বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ



মেলায় ভিতরকার অপর একটি দৃশ্য

[ডাঃ ললিতমোহন বহু এম্-বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

বালুঘর পক্ষাতটে, এবং সম্মুখে ও তাহার নিকটবর্তী জলের স্রোতে যাত্রীদের মধ্যে গিয়া তাহাদের সংখ্যাধিক্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তা ছাড়া, বেশী ভীড়ের কয়েকটি ফোটোগ্রাফ না উঠায়, তাহা হইতে কোন ছবি পাওয়া যায় নাই।

জাতিসংঘ ও ভারতবর্ষ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন সভ্যের প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা গিয়াছে, যে, লীগ অব নেশন্স বা জাতিসংঘের ব্যয়নির্বাহার্ক বিলাতের গবর্নমেন্ট যত অর্থ দেন, ভারতবর্ষকেও তত অর্থ দিতে

হয়, এবং ভারতবর্ষকে যত দিতে হয় এদেশের দেশী রাজ্যসমূহের নিকট হইতে তাহার কোন অংশ পাওয়া যায় না। অথচ প্রতিবৎসরই কোন-না-কোন দেশী রাজ্যের রাজাকে প্রতিনিধি করিয়া জাতিসংঘে পাঠান হয়। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করাতেও গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি স্বীকার করেন নাই, যে, এই রাজারা দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি; গবর্নমেন্টের মত এই, যে, উহারা ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ বলিতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও দেশী রাজ্যগুলির সমষ্টি বুঝায়। দেশী রাজ্যের রাজারা যদি নিয়মিতরূপে জাতিসংঘে প্রতিনিধিরূপে যাইতে চান, তাহা হইলে উহার, ব্যয়ও তাহাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু শুধু ব্যয়ের অংশ দিতেই তাহাদিগকে বলিতেছি না।

তাহাদের অধিকার কি কি তাহাও নির্ণীত হওয়া উচিত, এবং তাহাদের প্রতিনিধি ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দ্বারা মনোনীত না হইয়া দেশী রাজাদের সভা যে “নরেন্দ্রমণ্ডল” আছে, তাহার দ্বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত, এবং ব্রিটিশ ও দেশী ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের নেতা ইংরেজ না হইয়া ভারতীয় হওয়া কর্তব্য। ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি আছেন স্যাব্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। যেমন অনেক বেসরকারী দেশনাগকের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহার সহিতও তেমনি মতভেদ থাকিলেও তাহার অদেহ-হিতৈষিতা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা সন্দেহে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সহজেই বুঝা যায়, যে, তিনি যদি ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত ভারতবর্ষের বেসরকারী প্রতিনিধি হইতেন, তাহা হইলে তিনি যাহা বলিতে ও করিতে পারিতেন, এখন তাহা পারেন না।

ভারতবর্ষ আত্মশাসন-অধিকার লাভ করিবার পূর্বে সম্ভবতঃ জাতিসংঘে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বর্তমান অবস্থাতেও তাহার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। জাতি-সংঘ হইতে ব্রিটেন্ বেরূপ লাভবান হন, ভারতবর্ষ তাহা ত হনই না, অধিকন্তু ভারতীয়দের বিদেশে লাঞ্চার কথা জাতিসংঘে উত্থাপিত পর্য্যন্ত হইতে পায় না। যেমন আফ্রিকার টাঙ্গানুয়ীকা দেশবাসী ভারতীয়দের লাঞ্চার ও অস্ববিধার কথা জাতিসংঘে উত্থাপিত হইতে পায় নাই। তথাপি যখন আমরা এত টাকা দিতে বাধ্য হই, তখন তাহার অস্বরূপ কিছু লাভ ও স্ববিধা পাইবার চেষ্টা সতত করা আমাদের কর্তব্য। ইংরাজ বা ভারতীয়, যাহারা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের নিকট আমাদের সার্কুলার সভা-সমিতি সকল হইতে এবং ব্যবস্থাপক সভা সকল হইতে আমাদের দাবী ও বক্তব্য যাওয়া উচিত। যাহাতে

আমাদের বৃথা পণ্ড্রম না হয়, সেইজন্য জাতিসংঘের মূল ও অবাস্তর নিয়মাবলী এবং গঠনব্যবস্থা আমাদের সকলের জানা উচিত। এই আপত্তি উঠিবে, যে, কাজ ত কিছু হইবেই না, বৃথা এসব করিয়া লাভ কি? উত্তরে জিজ্ঞাস্য, ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা করিবার জন্য সভ্যেরা যত পরিশ্রম করেন, তাহার সদৃশ ফল পান কি?

জাতিসংঘের জন্য ভারতবর্ষকে যত টাকা দিতে হয়, তাহার পরিমাণও কমানিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, তথায় আমাদের অধিকার বড় কম।

আপাততঃ জাতিসংঘ হইতে আমরা যে পরোক ফল লাভ করিতে পারি, তাহাও তুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এ কথাই আভাস পূর্বেই দিয়াছি যে, আমরা আত্মশাসনক্ষমতা পাইবার পূর্বে আমাদের মনের মত প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিব না এবং আমাদের ইচ্ছামত কোন বিষয়ের অবতারণাও জাতিসংঘে করিতে পারিব না। কিন্তু এ সকল অস্ববিধা সত্ত্বেও আমরা সংঘের আন্তর্জাতিক কাজ-সকলে অনেকটা প্রভাব অর্জন করিতে এবং এই উপায়ে পৃথিবীর অন্তঃসব দেশের সংঘসভ্যদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি অস্বরূপ করিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যদি সংঘের আলোচনায় জায়ের এবং অন্তঃসব দেশের লোকদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদেরও ভারতের প্রতি কতকটা মিত্রভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য আত্মশাসনক্ষমতা পাইতে হইলে সাক্ষাৎভাবে, তাহার প্রধান চেষ্টা আমাদের দিগকে, এবং এই দেশেই করিতে হইবে। কিন্তু ইহা তুলিলেও চলিবে না, যে, ইংলও তাহার উপনিবেশগুলির এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের সভ্য জগতের লোকমতের প্রভাব অনেকটা অস্বভব করে। এই প্রভাবটি যাহাতে ভারতবর্ষের অস্বকূল হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের করা কর্তব্য। আমাদের অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, যে, সাক্ষাৎভাবে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যাহা করেন, কেবল তাহাই বুঝি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সাহায্য করিবে। কিন্তু, ঐরূপ নেতাদের ঐরূপ কাজের মূল্য বিস্ম-

মাত্রও কমাইবার ইচ্ছা না করিয়া বলিতে চাই যে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, ইতিহাসে কিম্বা মানব চেষ্টার অন্যান্য বিভাগে যাহারা জগতে ভারতবর্ষের নামকে গৌরবান্বিত করেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছেন। অজ্ঞতা, আত্মহঙ্কার, প্রভুত্বপ্রিয়তা বা স্বার্থাঙ্কতা বশতঃ ভারতের আত্মকর্তৃত্বের বিরোধী ইংরেজরা যাহাই মনে করুক, স্ত্রায়বান্ ইংরেজরা এবং জগতের অন্ত সত্যদেশের লোকদের মধ্যে স্ত্রায়বান্ ব্যক্তির

কমতা এখন সীমাবদ্ধ, কিন্তু উহা ক্রমশঃ বলসঙ্কয় করিতেছে ও অদূর ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বেও, যে পরোক্ষ প্রভাবের কথা উপরে বলিলাম, তাহা আমরা অর্জন করিতে পারি।

তাহা করিবার জন্ত আমাদের কংগ্রেসের একজন কর্মী যদি জেনিভায় জাতিসংঘের অধিবেশনের সময় থাকেন, এবং সবদেশের সভ্যদের মধ্যে ভারতীয় ব্যাপারসমূহের জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

পৃথিবীর সব সভ্যজাতিদের মধ্যে জ্ঞানজগতে সহযোগিতা-স্থাপনের জন্ত জাতিসংঘের একটি সমিতি আছে। তাহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তিনি আগামী মার্চ মাসে ঐ সমিতির কার্য-উপলক্ষে জেনিভা যাইবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উপস্থিতি এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধতা ও যত্নাদি প্রদর্শন দ্বারা জেনিভায় সমবেত নানা সভ্যজাতির প্রতিনিধিদের মনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। জাতিসংঘ হইতে ইহা ভারতবর্ষের অশ্রুতম লাভ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি যে বর্ণ-বাধা আইন পাস হইয়াছে, তাহাতে আফ্রিকার আদিমনিবাসী ও ভারতীয় দিগের সে দেশে খনি ও রেলপথে সমূহে চাকরী পাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটি এরূপ আইন হইতেছে, যাহার দ্বারা তথাকার ভারত, ঘেরা জীবিকার উপায় অভাবে মরিতে বা সেদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এইসকল বিষয় জাতিসংঘের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

লঙ্কোতে সস্তুরণের প্রতিযোগিতা

গত ১২শে ডিসেম্বর লঙ্কো শহরে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবর্নরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাদেশিক ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণের অন্ততম অঙ্গস্বরূপ সস্তুরণের যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে তথাকার ইন্টারমুভিয়েট শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ পৃথ্বীশচন্দ্র ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশা করি, এই বালকের প্রশংসনীয় শক্তি তাহাকে সমাজসেবায় প্রবৃত্ত ও সমর্থ করিবে।



স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যখন দেখিবেন, যে, পরাধীন অবস্থাতেও ভারত নানা বিদ্যার ও কার্যের ক্ষেত্রে ছুনিয়ার মরবারের উপযুক্ত লোকের জন্ম দিতেছে, তখন তাহাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মিবেই যে, এ-হেন ভারতকে শৃঙ্খলিত রাখা অসম্ভব। এরূপ বিশ্বাসের ও তাহার প্রভাবের কোন ফলই হইবে না, মনে করিতে পারি না। জাতিসংঘের



শ্রীমান্ পৃথীশচন্দ্র ঘোষ

দামাস্কাস

প্রথম কে যে দামাস্কাস শহর নির্মাণ করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাইবেলে দামাস্কাসের নাম অনেকবার উল্লিখিত আছে। রাজা দায়ুদ দামাস্কাসের বিরুদ্ধ অভিযান করেন। সলোমনের রাজত্বকালেও দামাস্কাসের রাজা বহবার তাঁহাকে উত্থুক্ত করেন। খৃঃ-পূর্ব ৩৩৩ অব্দে আলেকজান্ডারের সেনাপতি পারমেনিও দামাস্কাস অধিকার করেন এবং পারস্তসম্রাট দরায়ুসের অস্ত্রপুরিকাসমূহ ও কোষাগার আত্মসাৎ করেন।

সেপ্টপল দামাস্কাসে ছিলেন। এখনকার দামাস্কাসের রাস্তার হয়ত একদিন সেপ্টপল চলাফেরা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৫০ অব্দে রোমসম্রাট ট্রাজান দামাস্কাসকে প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহার পরে দামাস্কাস বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-



দামাস্কাসের দৃশ্য

এইখানে হয়ত একসময় সেপ্টপল চলাফেরা করিয়াছেন

উপনিবেশ ছিল। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে খলিফ-ইব্ন-ওয়ালিদ দামাস্কাস অধিকার করিয়া খিলাফত মক্কা হইতে উক্ত নগরীতে স্থানান্তরিত করেন এবং এই ঘটনার পর হইতে নব্বই বৎসর পর্যন্ত ওম্মাইয়দ বংশের আশ্রয়ে দামাস্কাস বিখ্যাত হইয়া উঠে। ওম্মাইয়দদিগকে আব্বাসিদগণ পরাস্ত করে এবং দামাস্কাস হইতে খিলাফত ও রাজধানী বাগদাদে লইয়া যায়। ইহার পর দামাস্কাস উপযুক্ত পরিমিশরী কারমাথিয়ান ও সেলজুক সৈন্যদলের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। খৃষ্টীয়ান ক্রুসেডারগণ ১১২৬ খৃঃ অব্দে দামাস্কাস আক্রমণ করে। কিন্তু উহারা কখনও অধিক কাল ঐ শহরের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। ক্রাঙ্কদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত থাকিবার কালে সম্রাট সলাদীন্ দামাস্কাসে নিজের গতিবিধির কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার সমাধি এখন দামাস্কাসের একটি দেখিবার জিনিস। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে জার্মান সম্রাট কাইজার ভিল্‌হেল্ম দামাস্কাস ভ্রমণকালে সলাদীনের সমাধির উপর একটা



দামাস্কাস্‌ শহর

ব্রন্থ ধাতুর মালা স্থাপন করেন। তাহাতে লিখিত ছিল, “একজন মহা-সম্রাটের নিকট হইতে আর একজন মহা-সম্রাটকে”। ইংরেজদের সেনাপতি ম্যালেনবী ১২১৮ খৃঃ অব্দে তুর্ক দিগের নিকট হইতে দামাস্কাস্‌ কাড়িয়া লইবার পর উক্ত ধাতু-মালাটি সলাদীনের কবর হইতে অপসারিত করেন।

পারিত না; তাই দামাস্কাস্‌ দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু “সভ্য” ইয়োরাপের যুদ্ধক্ষেত্র যদি ইহার বকের উত্তর হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ।



দামাস্কাসের দৃশ্য

পিছনে পুরাতন একটি রোমান প্রাচীরের এক অংশ দেখা যাইতেছে

ইতিহাসে দামাস্কাস্‌ অসংখ্য বার বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজ আবার “সুসভ্য” ফরাসীরা দামাস্কাসের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়া শহরের অনেক বিখ্যাত ও অমূল্য স্থাপত্য-সম্পদ চিরকালের মতন নষ্ট করিয়া দিয়াছে। পূর্বকালের ‘অসভ্যরা’ এত উত্তমরূপে ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করিতে



ফরাসী সেনাপতি সারেল্

যে শহর দূর হইতে দেখিয়া, দামাস্কাস্‌বাসিনগ কর্তৃক আমন্ত্রিত হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, “যত্ন পর ত অর্গে যাইবই, তবে এখন হইতে দামাস্কাসে যাইবার কি প্রয়োজন ?” সেই শহর আজ ফরাসীরা গোলাঘাতে চূর্ণ করিয়াছে।

ইংরেজ অভিজাতের আদর্শানুসারিতা

স্যার ব্রোড্রিক হার্টওয়েল্ জাতিতে ইংরেজ ও সামাজিক মর্যাদায় ব্যারনেট্। আমেরিকা যখন প্রাণপণে স্বরাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিতেছিল (সে-সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই), সেই সময় স্যার ব্রোড্রিক আমেরিকায় গোপনে হুইস্কি নামক মদ চালান করিবার



ইংলণ্ড-গৌরব স্যার ব্রোড্রিক হার্টওয়েল্ বার্ট

জন্ত একটি কোম্পানি গঠন করেন। তিনি তাঁর অংশীদার-দিগকে প্রতি দুই মাস অন্তর শতকরা কুড়িটাকা করিয়া লাভ দিতে অধীকার করেন। অতঃপর কিছুকাল লাভ করিবার পর তাঁহার বিদ্যা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার ব্যবসা ফাঁসিয়া যায়। আমেরিকানরা এই বৃটিশ অভিজাতের কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত ও ছুঃখিত হইয়াছে। একটি আমেরিকান কাগজে লিখিত হইয়াছে :—

“এইপ্রকার ইংরেজদের পূর্বপুরুষরাই, পৃথিবীতে যখন সর্বত্র দাসব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, তখনও জাহাজে করিয়া নিগ্রো দাস চালান দিত। আশা করি ইংরেজরা,

এই মহাপুরুষের ব্যাপার দেখিয়া, অতঃপর, যাহাতে তাহাদের স্বজাতীর লোকেরা অপর দেশের আইন ভাঙ্গিয়া ছেঁড়ামি আর না করে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে।”

এই ব্যক্তির ব্যাপারে মনে হইতেছে, যে, সকল ইংরেজ, এমন-কি সকল সম্ভ্রান্ত ইংরেজও, মহানুভব নহে।

অ।

বর্গা জমির ভাগ ব্যবস্থা

[শ্রী জানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী]

প্রজাস্বত্ব আইনের কোন কোন ধারার কিছু কিছু অদলবদল হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। দেশে যাহাদের বাড়ীঘর, জমি-জমা কিছু আছে—এই আইনের অদল-বদলে তাহাদের অনেক খাইবে আসিবে।

নিজের পৈতৃক বা স্বকৃত ভূসম্পত্তিতে অধিকার বৃদ্ধি বা অধিকার-চ্যুতি সামান্ত কথা নহে। শত সম্পদের অধিকারীরাও দেশের বাস্তবিত্তেখানি ও জমি-জমাকেই শেষের পরম সম্বল বলিয়া মনে করে। আর যাহাদের ইহাই সম্বল, তাহাদের জীবনই ইহার উপর নির্ভর করে।

প্রজাস্বত্ব আইনের যে কোন ধারার পরিবর্তন সম্বন্ধে দেশবাসীর সতর্ক মতামত, দেশের সত্য অবস্থা, বিশেষ-রূপে জানিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

পল্লীগ্রামে পরিবার পরিজন আছে, জীবিকা-সংস্থানের কিছু ও একটু মানসম্মত বজায় রাখিয়া চলিবার ব্যবস্থা আছে, এমন লোকদের বর্গা আইনের পরিবর্তনের কথায় সম্মত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ইহার যথেষ্ট কারণও আছে।

বাংলায় জমির মালিক মাজেই চাষী নহে। যে জমির মালিক নিজে হাল চাষ করে না, সে অপর হাল-ওয়াল চাষীকে দিয়া নিজ জমি চাষ আবাদ করাইয়া লয়। চাষ আবাদের বিনিময়ে চাষী অর্ধেক শস্ত পায়। ইহাকেই বর্গার ভাগীদার কহে।

আইনপরিবর্তনকারীগণ যে জমির চাষী বা বর্গাদার

তাহাকেই জমির একরকম সর্ব-অধিকারী অর্থাৎ একমাত্র কসলভোগী করিতে চাহেন। কারণ যে চাষ করে শস্ত তারই প্রাপ্য হইবে, জমির মালিক জমির খাজনা পাইবে। ক্ষেত্রস্বামকে কোন দোষে এত বড় অধিকারচ্যুত হইতে হইবে এবং দেশের ইহাতে কি মহা উপকার হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

চাষ বাস, কৃষির উপকারিতা অনেকেই বোঝে ও জানে, কিন্তু সকলেই চাষী হইতে পারে না। চাষ বাহারা হাতে করিতেছে, তাহাদের শতকরা নব্বইটিরও বেশী দিন মজুব। চাষকে বাবসায় হিসাবে বাহারা লইয়াছে তাহারা নিজের জমিও মাহিনা বা রোজের লোক দিয়া চবাইতেছে—বর্গা জমিও চবাইতেছে। সকলেই হাল ধরিয়া চাষ করিবে ইহা সম্ভব নহে।—ছ'বিঘা চার বিঘায় হাল চলে না, পোষায় না—বর্গা দিলে ভাগীর ভাগ আধা পাইয়া তবু তাহাদের কিছু খোরাকের জোগাড় হয়।

ভদ্র-গৃহস্থের পক্ষে চাষীর কাজ করা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কায়িক সহনক্ষমতা, ভদ্র গৃহস্থের একরকম—চাষী গৃহস্থের একরকম। তাহার উপর চাষ করিলে পোষাইবে এ উপযুক্ত জমিও অনেকের নাই। যে জমি আছে তাহা বর্গা দিয়া ছ'মাস, ছ'মাসের খরচ চলিতে পারে। কিন্তু তাহার উপরই নির্ভর করিবার চাষী সাজা চলে না।

পৈতৃক বা স্বকৃত জমিকে ভদ্র গৃহস্থেরা নিজের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি মনে করে। খুব দায়ে না পড়িলে কহ মুখের আধার জমিজমা বা বসতবাড়ী ছাড়ে না। ভদ্র গৃহস্থগণ এ বিষয়ে যেমন মায়ী করে, চাষী গৃহস্থ মনেকস্থলে ঠিক তত করে না। তাহারা জমি হস্তান্তর করিতে বিশেষ ইতস্ততঃ করে না।

বর্গা বাহারা দেয় সেসব ভদ্র গৃহস্থ বা সাধারণ গৃহস্থ গহাতে যে খুব লাভবান হয় তাহা নহে, অনেক সময়ই গহাদের বর্গাদারের কুপার উপর নির্ভর করিয়া, সে হাতে গুলিয়া যাহা দেয় তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। বাহাদের পরিবার গুলিবার লোক নাই এমন জমির মালিকদের অনেক সময়ই বিশেষ ঠকিতে হয়। জমির মালিক ও

বর্গাদারের মধ্যে এই ঠকা-ঠাকির ভাব বর্তমান সময়েই বেশী আসিয়াছে। বর্তমান সভ্যযুগে ও অভাবের যুগে সব বিষয়ে যেমন নীচতা ও প্রবঞ্চনা আসিয়াছে, এ ব্যাপারেও তাহার অন্তথা হয় নাই। এ বিষয়ে যে সব ধর্মনীতি পূর্বকালীন বর্গাদারেরা মানিত এখন তাহা শিথিল হইয়াছে। তবু যাহা আছে তাহাতে দিনে ডাকাতি হয় না—এই লাভ।

ভদ্র গৃহস্থ বর্তমানে নূতন জমি কেহ করিতে পারিতেছে না—তাহার নানা কারণ আছে। জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার উপর চরে চাচরে নূতন জমি যাহা উঠিতেছে, চাষী গৃহস্থেরাই তাহার পোণে বোলমানা অধিকার করিতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, মামলা মোকদ্দমা করিয়া তাহাতে ভদ্রলোকের পা বাড়াইবার উপায় নাই।

চাষীর জ্ঞান, শ্রমীর জ্ঞান খেদ আজকাল বহু হইতেছে। কিন্তু ইহাদের অভাবের চেয়ে বাংলা দেশের মধ্যবিত্তের অবস্থা শোচনীয়। না পাইয়া চাষী বা শ্রমী যত না মরে, মধ্যবিত্ত ভদ্ররা তাহার চেয়ে বেশী মরে।

এভাবে যদি নিজের জমি বর্গাদারকে চাড়াইয়া দিতে আইন বাধ্য করে, তবে বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ তাহাদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

কত নিঃসম্বল বিধবা, কত নারী, কত ভদ্র পরিবার যে মহাবিপদগ্রস্ত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। বহু চাষী বা মজুর গৃহস্থও অসহায় হইবে। কারণ চাষী বা মজুরও অনেকেই হেলে-গৃহস্থ নহে।

বর্গা আইনের এইভাবে কিছুমাত্র রূপান্তর হইলে জনকত চাষী গৃহস্থ আনন্দে লাফাইয়া পরের জমি হস্তগত করিবার জন্ত ফন্দী আঁটিবে। দেশে মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাড়িবে; অসহায় ভদ্র গৃহস্থের অসাম নির্ঘাতন ও ছুঃসহ কষ্ট হইবে।

বর্গা আইনের এইরূপ কোন পরিবর্তনে দেশের জমির বা চাষের বিন্দুমাত্র উন্নতি হইবার আশা নাই। এ আশা যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তাহা একান্ত মিথ্যা।

ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন—বর্তমানেই বা জমির অধিকার ছাড়িতে বলা হইবে কোন্ নীতির অহুশাসনে ?

দেশে কৃষির উন্নতির পন্থা কি ইহাই? ভারতের কৃষিসম্পদের উন্নতির কথা যখন সাগরপারের উচ্চতম দপ্তরে ৬ ভারত-সরকারে আলোচিত হইতেছে, বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কি তখন এইরূপ আশ্বাসী কৃষি সমর্থিত হইতে পারে?

দেশে দেশী কারবার অর্থাভাবে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে অনেক দেশী লোকের অগাধ অর্থ জমা আছে। সুতরাং সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে কি? কলিকাতা সহরে বাড়ীর বড় কষ্ট—অথচ বাড়ীওয়ালাদের অনেক বাড়ী আছে, সুতরাং ভাড়াটেরা বাড়ীগুলি অধিকার করিয়া বাড়ীওয়ালাকে শুধুমাত্র ট্যাক্স বহনের দায় হইতে মুক্তি দিলেই তো পারে। কলিকাতায় ইহা কি প্রয়োজনীয় নহে?

কিন্তু আইন দ্বারা একরূপ করিতে গেলে কিরূপ দাঁড়াইবে? বর্তমান বর্গাজমি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত আইন ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর প্রস্তাব।

আইনে জন-সাধারণকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাইবে। তাহা না হইয়া ইহা আতঙ্কেরই সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞ আইনজ্ঞ আইনের কূটজালে বা ধোঁয়াটে সমীকরণ-বাদীরা কোন অছিলায় ইহা সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু পরের ধনে পোন্ধরী এইভাবে আইন দ্বারা করিতে গেলে দেশময় যে হাহাকার উঠিবে, তাহা কিভাবে নিবারণিত হইবে? ইহার গুরুত্ব কোন্ দিকে কত দেখিতে হইবে।

প্রজাসাধারণ বা চাষীমাজেই ইহাতে লাভবান হইবে না। কিন্তু কৃষিগ্রস্ত হইবে অসংখ্য দেশবাসী। তাহার পর, নিজ অধিকার, বিশেষ করিয়া মুখের গ্রাস খেতের ফসলের অধিকার, কে কাহার ছাড়িয়া দিতে পারে? কিন্তু এমন সর্বনেশে আইনও যদি এ-দেশে এ-যুগে সম্ভব হয়, তবে ভ্রম গৃহস্থের ছয়বছর পরিসীমা থাকিবে না। বাংলার পল্লীতে এখনো ভ্রমসমাজ যেটুকু ভ্রমহতা লইয়া আছে, তাহাও আর থাকিতে পারিবে না।

শতকরা ৬০ বা ৮০ জন সরকারী চাকরী পাওয়ার স্বপ্নের চেয়ে এই জীবন-ধারণ সমস্তা ও অন্ততম শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার স্বপ্ন কত যে তীব্র হইবে, তাহা আজ দেশজীবনে অনভিজ্ঞ খেয়ালী তীব্র সংস্কার-

কারীরা মনে না করিতে পারেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুমাত্র জানিয়াও কে এই ভীষণ প্রস্তাব সমর্থন করিবে? বাংলার মধ্যবিত্ত ভ্রম গৃহস্থের পক্ষ হইতে এমন আইনের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। ধাহারা এ বিষয়ে উৎসাহী, আশা করি, তাহারাও দ্বিনিষটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবেন।

বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

আমরা যখনই সমাজসংস্কারের কথা বলি, তখনই আমরা কতকগুলি সামাজিক দোষ ও নির্মূর্ত্তিতার কথা ভাবি। সত্য ন্যায় ও জ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া সামাজিক জীবনগঠনের চেষ্টাকেই সমাজসংস্কার বলা হয়। মানুষ যেসকল সামাজিক নির্মূর্ত্তিতায় আসক্ত থাকে, তাহার সকলগুলিকেই যে সে জানিয়া গুনিয়া নিজের জীবনে স্থান দেয় তাহা নহে। অনেক স্থলেই মানুষ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অথবা ভুল বুঝিয়া কুর্কর্ম করিয়া থাকে। এই কারণে সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আবশ্যিক হয় সমাজের সকল ব্যক্তিকে আদর্শ জীবনের মূল্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং আদর্শবিচ্যুত জীবন-যাপন-প্রণালীর দোষগুলিকে দোষ বলিয়া দেখিতে শিক্ষা দেওয়া। ইহা নানান উপায়ে করিতে হয়।

প্রথমত, জ্ঞানবিস্তার করিলেই সমাজের লোক আপনা হইতেই দেখিতে পায়, যে, তাহার জীবনের কোন্ খানে কি দোষ কিভাবে রহিয়াছে। স্বার্থ খাদ্যাখাদ্য-বিচার, স্বার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কি তাহা নির্ধারণ, সামাজিক উন্নতি ও অবনতি কিভাবে হয় তাহা বুঝিতে পারা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে মানুষের মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। বাল্য-বিবাহ, পবুদা, জীলোকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা ইত্যাদির সামাজিক অপকারিতা বুঝিতে হইলে, বিজ্ঞানচর্চা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাবিস্তার সমাজ-সংস্কারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও অনেক উপায়ে, সমাজের চোখ ফুটান প্রয়োজন হয়। অনেকে আছেন, ধাহাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী

বিভিন্ন-প্রকার। তাঁহারা শিক্ষাবিকল্পভাবে জীবন যাপন করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করেন না। কারণ অশিক্ষিত জাতিবর্গের মনস্তত্ত্ব, অথবা মানসিক নিষ্কোঁবতা, অথবা অপরে যাহা করিতেছে তাহা ব্যতীত অন্য কিছু করিবার উদ্যোগের ও সামর্থ্যের অভাব। এরূপ অনেক লোক আছেন যাহারা শিক্ষায় ও বিশ্বাসে জাতিভেদ, পরদা, বাল্যবিবাহ, পৌত্তলিকতা, জীবনলীলা ইত্যাদির বিকল্পমতাবলম্বী, কিন্তু কার্যতঃ ঐ সকলগুলিই মানিয়া চলেন। এইপ্রকার লোকদের জন্ত কেহ কেহ বিশেষ কাঁকাল রকম ঔষধের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাহার পরিবর্তে অতি পুরাকাল হইতেই মনুষ্যসমাজে বিজ্ঞপত্রের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যাহার কিছুতেই জ্ঞান হয় না, তাহাকে লোকসমাজে হাঙ্গাম্পদ করিতে পারিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহার স্মৃষ্টি হয়।

মূর্খের উপকারার্থে যত-প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিজ্ঞপত্র প্রাচীনতম না হইলেও অতিশয় প্রাচীন বটে। বাইবেলে, হোমারের লেখায় ও প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের রচনায়, আমরা বিজ্ঞপত্রসম্বন্ধে অনেক কিছু পাই। সেইসকল রচনার উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে সমাজ-সংস্কার, তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত-বিষেব-বশতঃ তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যত আমরা আধুনিক সময়ের দিকে আসি, বিজ্ঞপত্রসম্বন্ধে ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজের নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংঘ ও বিকারের বিকল্পে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। এরিষ্টোফেনিস, হেরাস্টিয়াস, পাসকাল, থেরভাট্টেস, মোল্লিয়ার, পোপ, ড্রাইডেন, ভোল্ভেয়ার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রান্স, বৌজনাথ, রম্যা রলী প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ সকলেই বিজ্ঞপত্র রসের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং ইহার সাহায্যে নানা-প্রকার দোষ ও নিরুদ্ভিতার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই গেল লেখার কথা।

চিত্রকলায় সাহায্যেও এই বিজ্ঞপত্র কার্য সুসম্পন্ন হয়। আধুনিক জগতে ব্যঙ্গচিত্র সর্বত্রই দেখা যায়। ইংলণ্ডের পাক্ কিং ক্রাফের ল্যাম্বি পারিকিয়েন্স শুধু বিজ্ঞপত্রসম্বন্ধে পত্রিকা এবং ব্যঙ্গ করিয়াই অনেক জাতীয় উপকার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও আজকাল ব্যঙ্গচিত্র অল্প আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সকলগুলিই মার্জিত কচির পরিচয় না দিলেও এইপ্রকার চিত্র যে বাংলায় ক্রমশঃ নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অনেক সহৃদয়দের বিকল্পেও লোকের নিজাতক করিয়া সম্মত আলোচনা করিত বা লোকের

জায় চুল ফিরাইয়া রাজপথে বিচরণ করিত, সে আজ নিজের অপরূপ ব্যঙ্গচিত্রে দেখিয়া ভাবিতেছে— “আমার দিন ফুরাল”। শ্রীযুক্ত গগনেজনাথ ঠাকুরের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের ভিতর দিয়াও এই বিজ্ঞপত্রের বস্তা সমাজের পক্ষিপক্ষী ধৌত করিতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়াই পাশ্চাত্যে বিজ্ঞপত্র অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। অধুনা আমাদের দেশেও অনেকে এইপ্রকার অভিনয় করিয়া থাকেন। তাহাদের অভিনয় দেখিয়া অনেক নিরুদ্ভিতের জ্ঞান হইয়াছে। বাংলা দেশে এইপ্রকার অভিনয়তাদের মধ্যে মার্জিত কচির অত্যন্ত অভাব। যে কয়েকজন কচিসম্মতভাবে নানান দোষের ব্যঙ্গ অভিনয় করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ব্যঙ্গ-অভিনয়-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সূক্ষ্ম বাংলা দেশে আমদানি করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন। আমাদের থিয়েটারগুলির ব্যঙ্গ অভিনয়ের এখনও অনেক উন্নতি সম্ভব।

বিজ্ঞপত্র-রসের যথার্থ ব্যবহার করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মন দেওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, ইহা হাস্যরসাত্মক হওয়া প্রয়োজন। হাস্য-রসবিযুক্ত বিজ্ঞপত্র ও গলাগালির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার ভাষা বা অভিব্যক্তির উপায় মার্জিত ও সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে এক দিকে ভাল আদর্শ জাগ্রত করিতে গিয়া অপর একদিকে অবনতির পথ খুলিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞপত্রের মধ্যেও অর্ধপ্রচ্ছন্নভাবে সত্য যাহা তাহা প্রসূত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হওয়া চাই। তাহা না হইলে শুধু ভাঙ্গাই হইবে, গঠনের কোন সাহায্য হইবে না। ইহা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও অনেক স্থলেই সম্ভব।

বাংলায় সংস্কার করিবার আছে অনেক। ঐসকল সমাজ-অবনতিকারক দোষগুলির বিজ্ঞপত্র বিপ্লবণ বিশেষ প্রয়োজন। তাহা করিতে হইবে নানা উপায়ে নানারূপে—উপস্থাসে, নাটকে, গল্পে, কবিতায়, গানে, চিত্রে, থিয়েটারে, সিনেমায়, যাত্রায়—যাহাতে দেশের কোথাও এমন একজনও নিরুদ্ভিত না থাকে যাহাকে চোখে আঙুল দিয়া তাহার দোষগুলি না দেখান হইয়াছে।

অঃ

চাই—“বাংলার দশটি প্রধান লেখিকার নাম”

শ্রীযুক্ত সরলা দেবী দয়া করিয়া আমাদের

প্রবাসীতে 'অনতিবিলম্বে' ছাপিবার জন্য "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সভাপী নারীসভা"র একটি বিজ্ঞাপনের প্রফ পাঠাইয়াছেন। উহা বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায় সমস্তটি ছাপিবার সময় নাই। এই জন্য আমরা কেবল উহার শেষ অংশটি নীচে মুদ্রিত করিতেছি। আশা করি, তাহাতেই প্রেরয়িত্রীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কর্মবিভাগেই কর্মের সৃষ্টিলা, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমাদের কুহ্ম সমিতিতে আমরা কুহ্মতর করেকটি শাখা-সমিতিতে বিভক্ত করেছি। তা'র মধ্যে সাহিত্য-শাখা যে কাঙ্ক্ষিত প্রথম হাতে নিরেছে, তা'র সহায়তা প্রার্থনা করাই এই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিছুকাল পূর্বে ঠঠনৈক করাসী মহিলা-বন্ধু আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠি:রচিলেন, আমাদের দেশের করেকটি বিশিষ্ট লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁহাদের গল্প-গল্প রচনার নমুনা যেন ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে পাঠাই; তিনি আবার তা করাসীতে তর্জমা ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ কর'বেন। কারণ আজকাল করাসী মেয়েদের মধ্যে ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। আমরা তাই কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর না ক'রে বাঙ্গলাদেশের পাঠকপাঠিকাসাধারণের দ্বারস্থ হলুম; তাঁরা যদি আমার এই নির্বাচন-ব্রতে সাহায্য করেন, এবং তাঁদের মতে ব্রিটিশযুগের দশটি শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-লেখিকা ও তাঁদের দুই-একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বা গল্প-রচনার নাম লিখে ফাল্গুন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন, তা হ'লে বিশেষ বাধিত হব।

২০ মেরফরার, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। ঐইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী,
President, F. I. U. W.

ডাকমাণ্ডল কমাইবার প্রস্তাব

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পোষ্ট্কার্ড ও চিঠির মাণ্ডল কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। লিখিবার সময় উহার শেষ মীমাংসার ধবর পাই নাই। প্রস্তাবের সব সমর্থকই পোষ্ট্কার্ডের মাণ্ডল এক পয়সা করিতে চান, কিন্তু চিঠির মাণ্ডল কেহ দুই পয়সা, কেহ তিন পয়সা করিতে চান। আমরা যথাক্রমে এক ও দুই পয়সার সমর্থন করি। তাছাড়া, বহির ডাকমাণ্ডল আপেকার মত প্রতি দশ তোলায় দু-পয়সা করা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্য একান্ত আবশ্যক মনে করি। ধবরের কাগজও এক পয়সায় দশ তোলা এবং দু-পয়সায় চল্লিশ তোলা পর্যন্ত যাওয়া উচিত। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ডাকমাণ্ডল এবং রেলভাড়া বাড়িয়াছিল। যুদ্ধের পর তথায় দুইই কমিয়া গিয়াছে। ভারতে তাহার অনেক পরে রেলভাড়া কিছু কমিয়াছে। এখন ডাকমাণ্ডল কমিলেই ঠিক জ্ঞান্য ব্যবস্থা হয়। ডাকমাণ্ডল কমিলে হয়ত আপাততঃ ডাক-বিভাগে কিছু টাকা ঘাটতি পড়িবে। কিন্তু পোষ্ট্কার্ড, চিঠি, ধবরের কাগজ ও পুস্তকাদি আরও বেশী-পরিমাণে ডাকে বাইতে থাকার ঘাটতি ক্রমশঃ পুরিয়া আসিবে। তাছাড়া, ডাক-বিভাগ কতকটা শিক্ষা-বিভাগের জায়, উহার দ্বারা জ্ঞান-বিস্তার

হয়; সুতরাং উহার ব্যয় আর অপেক্ষা কিছু বেশী হইলে তাহাতে কুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। ডাক-বিভাগ দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোকভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি হয় বলিয়াও কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ে কুষ্ঠিত হওয়া অর্হাচিত।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়া, বাঙালী যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। এ-বিষয়ে তাঁহার সন্ধে আমরা বরাবর ধেমন দুঃখ অনুভব করিতাম, তেমনি তাঁহার ব্রমে হাসিও পাইত স্বীকার করিতেছি।

তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে-সব অভিনন্দন-পত্র পাঠিত হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুরাতন কথা হইলেও নূতন করিয়া প্রিধানযোগ্য। তাহার কোন-কোন অংশের তাৎপর্য এই :—

ইতিপূর্বে আমি আর একবার ঢাকায় আসিয়াছিলাম। সে-সময় আমি বলিয়া গিয়াছিলাম যে, তিন্কা দ্বারা মুক্তি আসিবে না। অন্য মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে যে মানপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সে কথার উল্লেখ আছে।

আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সেবা ও আন্তোৎসর্গ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না। অবিরত চেটা এবং আন্তোৎসর্গের বলে নিজের দেশের উপর যে অধিকার ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই অধিকার ও শক্তি বতদিন পর্যন্ত আমরা লাভ করিতে না পারিব, ততদিন পর্যন্ত শাসকবর্গের সহিত আদান-প্রদানে মর্ধ্যাণা রক্ষা করিয়া আমরা চলিতে পারিব না, আর সেই আদান-প্রদানে কোনো খাটি লাভও আমাদের হইবে না। স্মৃতি আমি আর একটি কথা বলিয়াছি, তাহাও মিউনিসিপ্যালিটি-প্রদত্ত মানপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি বলিয়াছি যে, লুণ্ঠন হইয়া বাগরাই একটা দেশ বা জাতির পক্ষে বখেট নহে। স্বীয় অকুরন্ত ধন-ভাণ্ডার হইতে অপরকে কিছু-কিছু দিবার ভার তাহাকে লইতে হইবে। অভীত ভারত এই কর্তব্যকে স্বীকার করিয়া, গিরি-কন্দর, সাগর-প্রান্তর ভেদ করিয়া স্বীয় দানের পসরা দুর্ঘণে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ভারতের আজ এ-কথা মিন্দরই বলা উচিত নহে যে, তাহার ভাণ্ডার আজ শূন্য—সে নিঃশক্তিধারী। অন্ততঃ আমি সে-কথা বলিবার মত হীন কখনও হইব না। 'জগতের যে বেধার আছে, আমার কাছে এস,' ভারতের এই সনাতন আছানের বাণী বহন করিয়া আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। নিঃশক্তি কখনও এ-আছান দিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রাচুর্য এবং চিরন্তন আভিধেরতার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি ভারতের নামে ভারতের পক্ষ হইতে একটি অভিধালা খুলিয়াছি, যে কোনো পর্যটক আসিয়া এখানে বিজ্ঞান করিতে পারে এবং ভারতের চিরপ্রবাহিত উৎসের সুখাধারা পান করিতে পারে।

আপনারা আমাকে স্রবণ রাখিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইলাম। আমার প্রতি আপনাদের যে ঐতি আছে, সেই ঐতির এম আমি চলিয়া গেলে আমার স্মৃতির সহিত যদি আপনারা আমার একান্ত প্রিয় কার্যকে স্রবণ রাখেন, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।

আর কতকগুলি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি অশ্রান্ত কথার মধ্যে, মাতৃভাষার ব্যবহার না করিলে, চিন্তা ও কৰ্মের পরিপন্থী বিদেশী ভাষার দাসত্ব-পাশ ছিন্ন না করিলে, যে জনসাধারণের স্বাভাবিক চৈতন্য জন্মিতে পারে না, তাহাব উল্লেখ করিয়া এ-বিষয়ে অতীত কালে তাঁহার মাতৃভূমির সেবার কথা বলেন।

আমার সেইদিনের চেষ্টা হস্ত কতকটা ফলবতী হইয়াছে। মাতৃভাষা আজ দেশে স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জনসাধারণও স্ব-স্ব অধিকার এবং কর্তব্য-তার গ্রহণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

তাঁহার পব তিনি শেষ বিদায়-গ্রহণ-সূচক যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ব্যথা পাইয়াছি। আমাদের হৃদয় বলিতেছে, তাঁহার অস্তিম বিদায়ের সময় এখনও আসে নাই। তিনি আগ্রণে অনেক বার গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। আটশ বৎসর পূর্বে, ১৩০৪ সালে, তিনি গাহিয়াছিলেন,

এবার চলিছ তবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন

বাঁধন ছিড়িতে হবে।

ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন, অস্ত-সাগরের কূল হইতে তাঁহার মিত্র, “রবি,” তাঁহাকে ডাকিতেছে। অস্তমিত-প্রায় সূর্য্যের সহিত নিজের এই সখ্য-বন্ধনের কথাও তাঁহার মুখে ব্রতন নহে। তের বৎসর পূর্বে লোহিত-সাগরে ভাসমান সিটি অব্ লাহোর জাহাজে তিনি গাহিয়াছিলেন,

জানি গো দিন যাবে,

এদিন যাবে।

একদা কোন্ বেলা-শেষে

মলিন রবি করুণ হেসে

শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার

মুখের পানে চাবে।

সেই “বেলা-শেষ” এখনও আসে নাই, আমরা তাঁহাকে বদায় দিতে প্রস্তুত হই নাই, প্রস্তুত নহি। এখনও তিনি তন বাণী শুনাইতেছেন; আমরা আরও শুনিতে ও বাস্তব মধ্যে গ্রহণ করিতে চাই।

তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার পতা দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁহার অগ্রজজয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভোক্ত্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। এবাধিখ না-কারণে আমরা পূর্ণ আশার সহিত সর্কাস্তঃকরণে ঠাধনা করিতেছি, তিনি দীর্ঘায় হউন, আরও বহু বহু ৎসর মানব-কুলের আনন্দ ও কল্যাণের কারণ হউন। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা হইতে এখনই ত মানব-মাজ এমন অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছে, বাহা তাঁহার শাখত সম্পর্কিত; তাহারা আরও অনেক-কিছু হইবার জন্ত উৎসাহ হইয়া আছে।

রাজকীয় কৃষি-কমিশন

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্ত যে রাজকীয় কমিশন বসিবে, তাহার অনাবশ্যকতা দেখাইবার জন্ত আমরা বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মৃত্যু-রিভিউ কাগজে লিখিয়া-ছিলাম, যে, ভারতে কৃষির অল্পত অবস্থার প্রধান-প্রধান কারণ সুপরিজ্ঞাত এবং সেই কারণগুলির উল্লেখও করিয়াছিলাম (পৃ: ২৩৫)। মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব শাসন-কর্তা স্যার রেভিন্ড্র ক্র্যাডক্ ছুটা প্রদেশে কৃষি বিভাগের কার্যক্ষেত্র বাড়াইয়াছিলেন। তিনিও লণ্ডনের এশিয়াটিক্ রিভিউ কাগজের জাহুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছেন,

“There is, indeed, little that a Royal Commission can find out that the Government does not know already, or cannot collate from the abundant material available in the settlement and revenue reports, and the recommendations of numerous committees and conferences held annually or from time to time.”

আমরা আরও লিখিয়াছিলাম, যে, ভারতবর্ষের জমীর খাজনা, জমীর উপর প্রজার স্বত্ব, জমী বিলির নানা-রকম বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সেইসকলের দোষ সংশোধন না করিলে কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের দারিদ্র্য-নিবারণ হইতে পারে না; কিন্তু প্রস্তাবিত কমিশন এইসব একান্ত-আবশ্যক বিষয়ে কোন অল্পসন্ধান করিবেন না (“what is excluded is of vital importance”); ক্র্যাডক্ সাহেবও দেখিতেছি তাঁহার প্রবন্ধে ঠিক এইরূপ কথাই বলিতেছেন :—

“If you exclude land tenures from examination, you will be excluding matters which have a vital influence upon agriculture.....”

“It would be singularly unfortunate if its terms of reference laid down any forbidden ground upon which it must not trespass, even though the interests of agriculture were vitally affected by the prohibition.”

বাংলা ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার

গত ১৭ই মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এক অধিবেশনে মৌলবী আবদুল মজিদ এম্-এ মহাশয় “বাঙালী মোস্লেম ভাষা ও সাহিত্য”-সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধের মধ্যে লেখক বাঙালীভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাঙালীভাষায় মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক, সুতরাং বাঙালীর মাতৃভাষাকে ইসলামী রূপ দিবার জন্ত বহুলভাবে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হওয়া আবশ্যিক।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। মৌলবী সৈয়দ এম্-এ আলি, মৌলবী মোলান মোস্তফা বি-এ বি-টি, “দি মুসলমান” পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মোস্তফা মোস্তফা মৌলবী

চমায় বোপদান করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট ভাব ও চিন্তা, ধ্যান ও ধারণা প্রকাশের জন্য আমাদেরকে বাঙ্গালার বহু আরবী, ফারসী শব্দের আয়ত্ত্বানি করিতে হইবে বটে; কিন্তু বিনা বিচারে আরবী ফারসী শব্দ হইলেই যে মুসলমান সমাজের খাতিরে তাহা বাঙ্গালার প্রচলন করিতে হইবে, একরূপ মনোভাব সমীচীন নহে। ইসলামের নিম্নতম ভাব-সম্পদ দান করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলাই আমাদের কর্তব্য—ভাষার রূপের দিকে অধিক মনোবোপ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা শেবোক্ত মতের সমর্থন করি। তাহার দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ধর্মোচ্চারণ, আচারব্যবহাব, রীতিনীতি, ধর্মমত, ধর্মভাব, সাধনা, শিল্প, প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে যদি বাংলায় প্রচলিত কোন কথা দ্বারা, যাহা বহুতর তাহা প্রকাশ করা না যায়, তাহা হইলে অবশ্য ফারসী বা আরবী কথা আমদানী করিতে হইবে। এইরূপ কারণে বহুশতাব্দী ধরিয়৷ অনেক ফারসী ও আরবী কথা বাংলার মধ্যে ঢুকিয়াছে। ছোর করিয়া একরূপ কথা চালাইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। মিলিত চেষ্টার দ্বারা ভাষার শক্তি ও সম্পদ বাড়ে, অকারণ ভাগাভাগির দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

বড়লাটের বুলি

বড়লাট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং তাহার পর ব্যবস্থা-পরিষদে আবার ভারতীয়দিগকে গবর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে বলিয়াছেন, তাহা করিলেই শাসন প্রণালীর আংগ উন্নতি ও সংস্কার হইবে বলিয়াছেন, নতুবা হইবে না। এ-বিষয়ে আমরা অনেক লিখিয়াছি। যখন অসহযোগ প্রচেষ্টার গুণ হয় নাই, যখন স্বরাজ্যদলের জন্ম হয় নাই, বহুপূর্বে যখন চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় নাই, তখন ত সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল; তখন ব্রিটিশ জাতি আকাশের ক'টা টাদ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া-
চিনেন? উদারনৈতিক অর্থাৎ মতাবেহু দলের প্রধান নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কাগজে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি বিশ্বাস করেন না, যে, ভারতীয় সব রাজনৈতিক দল গবর্নমেন্টের সব কথায় ও কাজে সাহা দিলেই গবর্নমেন্ট আমাদের অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দিতেন। বস্তুতঃ কোন আন্দোলন না থাকিলে, গবর্নমেন্টের কোন কথা ও কাজে দেশের লোক অসন্তোষ প্রকাশ ও বাধা প্রদান না করিলে, ব্রিটিশ জাতি বলে, তাহাদের স্বশাসনে ভারতীয়েরা ভারি সুখী ও ধুঁশ; অন্তএব কোন পরিবর্তনের দরকার নাই। পক্ষান্তরে

আমরা আন্দোলন করিলে, প্রতিবাদ করিলে, অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, বাধা প্রদান করিলে, তাহারা বলে, “তোমরা আমাদেরকে ভয় দেখাইতেছ? আমরা কি ভয় পাইয়া তোমাদের কথা শুনিব মনে করিতেছ? কখনই না।”

উদারনৈতিকরা ত শাসন-সংস্কার-আইন প্রকৃতির প্রথম হইতেই সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন। তাহার পর অসহযোগীদের স্বরাজ্য-সম্প্রদায় কৌশলে চুকিয়া, তর্জন-গর্জন সঙ্ঘেও, ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে সহযোগিতা করিতেছেন। অবশ্য সব রাজনৈতিক দল ও নেতা তাহা করিতেছেন না। কিন্তু সগাই সব সময়ে সব বিষয়ে ব্রিটিশের রাঙা পায়ে দেহ-মন সঁপিয়া দিবে, ইহা অসম্ভব ঘটনা। সেই অসম্ভব ব্যাপারের ফরমাইস্ করাতেই বুঝা যাইতেছে, যে, লর্ড রেডিং ও লর্ড বার্কেনহেড ইংরেজের পক্ষ হইতে যে সহযোগিতা চাহিতেছেন, তাহা না-পাওঘাটা কিছু না করিবার একটা ছকমা। তাহা বাধা না হইলে কিছুতেই কিছু করিবেন না।

ভয়? না সত্য ও স্মার?

ইংরেজরা বলিতেছে, আমরা ভীত হইব না, ভীত হইয়া তোমাদের ভাল কিছু করিব না, কখনও ভীত হইয়া কোন সংস্কার করি নাই বা কাহারও কথা শুনি নাই। ইতিহাস কিছু বলিতেছে, যে, তাহারা কখনও, কি স্বদেশে কি বিদেশে, শুধু সত্য ও স্মারের দোহাইয়ে, শুধু তর্কযুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, কোন সংস্কার করে নাই। অতীতে মাহুদ ঘেজলু যাহা করিয়াছে, বরাবরই সেইজন্য তাহা করিবে, আমরা একরূপ মনে করি না। সেইজন্য আমরা চাই, যে, কেবল সত্য ও স্মারের খাতিরে, কেবল আমাদের তর্কযুক্তির অকাটাভাবশতঃ, আমাদের উন্নয়ন রাষ্ট্রিক অধিকার আমাদেরকে ভোগ করিতে দেওয়া হউক। আমরা খুনখারাবী উপজীবের পক্ষপাতী মোটেই নহি।

সত্য ও স্মারের মর্যাদা রক্ষিত হইলে, তাহারা বল-প্রয়োগের পক্ষপাতী তাহাদিগকেও বুঝাইবার সুবিধা হইবে, যে, বলপ্রয়োগ না করিয়াও, এমন-কি ভয় না দেখাইয়াও, রাজনীতি-ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফল লাভ করা যায়।

ভারতীয়দের মধ্যে ঐকমত্যের দাবী

বড়লাট ও ভারতসচিবপ্রমুখ ইংরেজরা যেমন চাহিয়াছেন, যে, সব ভারতীয় রাজনৈতিক দল ও নেতা একযোগে সরকারের সহিত সহযোগিতা করুক, তবেই কিছু করা যাইবে, তেমনই নানা উপলক্ষে ও সময়ে ব্রিটিশ

রাজনীতিজ্ঞেরা আমাদেরকে বলিছিলেন, “আপনারা সবাই একমত হইয়া একটা স্বরাষ্ট্রের খসড়া আমাদেরকে দিন, তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করিব”—“মঞ্জুর করিব” বলেন নাই। এই যে একমতের ব্রিটিশ দাবী, এটাও একটা পুরাতন ফাঁকী। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ছোট জন্ ডিকিন্সন কর্তৃক রচিত “Government of India under a Bureaucracy” নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বই জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতপূর্ণ বহিঃসম্প্রতি এলাহাবাদের পাণিনি অফিস পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে এক জায়গায় ছোট জন্ ডিকিন্সন বলিতেছেন :—

“I shall be met, I know, by the old argument that the Legislature [i.e., the British Parliament] cannot make any change because Indian reformers do not agree among themselves upon what ought to be done. But is this argument really serious? Why, men must have remained savages ever since the creation of the world, if nothing had ever been done till all men were agreed upon what ought to be done. The argument is as much as to say that there shall be no progress until a condition is complied with which is notoriously impossible. Besides, I apprehend that it is not merely the function of legislators to redress grievances but their duty to find out the means of doing so. There is not the same obligation on a private person who proves the grievance; he is only one of the patients; a legislator is the state physician; and if it is not the business of members of Parliament to know and apply the proper cure for political grievances, then what is their business?”

রাজবন্দীদের মুক্তি ও নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তন

শ্রীযুক্ত ভুলসীচরণ গোস্বামী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির জন্ত এবং রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত লোকদিগকে প্রত্যাবর্তন করিবার সুবিধা দিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। সম্মেলনভাঙ্গন লোকদিগের হয় সাধারণ আইন অনুসারে বিচার কর, নতুবা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, ইহা অতি সঙ্গত প্রস্তাব। সাধারণ বা অসাধারণ আইন অনুসারে বিচারিত লোকদিগকেও মিয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত অটক করিয়া রাখিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ লোকেরা বুদ্ধিহীন নহেন। অবস্থার পরিবর্তনে তাহাদের মতের পরিবর্তনও সম্ভবতঃ হইয়াছে। বিদেশবাসী ভূতপূর্ব বিপ্লববাদী ও বিপ্লবপ্রিয়সী কাহারও কাহারও যে মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা আমরা স্বয়ং জানি। অনুসন্ধান করিয়া একরূপ লোকদের ভারতপ্রত্যাবর্তনের বাধা দূর করিলে দেশের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ইহাদের বিচার সাধারণ আইন অনুসারে হয় নাই, বেঙ্গল অভিভ্রাম্ অনুসারে হইয়াছিল। তাহাতে, আসামীরা কি কি প্রকারে ও কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুবিধা পায় নাই, তাহা তাহাদের কৌশলী শ্রীযুক্ত নিশাধ সেন বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন। ইহাও বর্ণিত হয়, যে, তাহাদের একজন সহচরের নানা আত্মীয় কুটুম্ব সব পুলিস্ কর্মচারী; সুতরাং গুপ্ত চরের বানান অনেক ব্যাপার ইহাদের বিরুদ্ধ অভিযোগগুলির মধ্যে আছে বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা।

সম্মেলনভাঙ্গন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত যতদূর সম্ভব আইনসম্মত সুবিধা লাভ করুক, এরূপ কোন প্রবল ইচ্ছাবশতঃ বেঙ্গল অভিভ্রাম্ প্রণীত হয় নাই।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিবার নিমিত্ত নূতন আইন জারী করিবার ও নূতন ট্যাক্স বসাইবার কথা উঠিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে অনেক কোটি টাকা ইন্ডিয়ান ট্যাক্স বাবদে ও পাটের রপ্তানী-স্বত্ব বাবদে আদায় হয়। আমাদের বিবেচনায় তাহার কতক অংশ বাংলা গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্ত পাইলেই চলিতে পারে। যদি নূতন ট্যাক্স বসাইতেই হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহা গণীব্রজাদের ঘাড়ে না বসে, তাহা করা কর্তব্য। এরূপ একটি প্রস্তাব খবরের কাগজে দেখিলাম। তাহা এই। পাটের জিনিষের মূল্যের উপর শতকরা দুই টাকা এবং কাঁচা পাটের রপ্তানীর উপর শতকরা দশ টাকা ট্যাক্স বসাইলে মোটামুটি বাৎসরিক তিন কোটি টাকা আয় হইবে। তাহার আবশ্যিকমত অংশ অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয়িত হওয়া উচিত।

ট্যাক্স যেরূপই হউক বা না হউক, প্রাথমিক শিক্ষার উপর গবর্ণমেন্টের পূর্ণকর্তাবিস্তার বাঞ্ছনীয় নহে।

আদালত-অবমাননা আইন

আদালত অবমাননা সঙ্ঘর্ষ আইন সংশোধিত হইয়া নূতন আকারে পাস হইয়াছে। বিচারকদের অযথা নিন্দা অবশ্য গর্হিত কাজ। কিন্তু বৈধ ও অবৈধ সমালোচনার মাঝখানে দাঁড়ি টানা বড় কঠিন। এই জন্ত খবরের কাগজগুলিকে বরং একটু বেশী স্বাধীনতা দিলে

আদালতসকলের কার্যকারিতা বাড়ে এবং সুবিচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গবর্নমেন্ট নিজের কর্মচারী-দিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে অধিকতর ব্যস্ত। ফলে সম্পাদকদিগের পক্ষে নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদন অধিকতর বিষয়সমূহ ও কঠিন হইল।

আফ্রিকার এশিয়া-বিরোধী আইন

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্ততম মন্ত্রী ডাঃ ম্যানান পষ্টাপটি বলিয়াই দিয়াছেন, তিনি যে আইন তথাকার পার্লামেন্ট পেশ করিয়াছেন, তদ্বশে ভারতীয়দের সংখ্যা কমান তাহা উদ্দেশ্য। নামতঃ ইহা সব এশিয়াজাত লোকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে, কিন্তু অল্পটার লক্ষ্য হইতেছে ভারতীয়েরা; কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়া-সমুহ লোকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই বেশী। সম্প্রতি এই আইনের খসড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বার পঠিত হইয়াছে। ইহার পক্ষে ৮ জন, বিরুদ্ধে ১০ জন ভোট দিয়াছিল। ভূতপূর্ব জেনার্যাল স্মার্টসের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে চুক্তি হইয়াছিল, এই আইন তাহা ভঙ্গ করিতেছে। স্মার্টস ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা কিছু-কিছু করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভোটের বেলায় তিনি ও অন্ত কয়েকজন নামজাদা সভ্য কোন দিকেই ভোট দেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা তথাকার শ্বেতদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, এবং নেশা-বিমুখ। এইজন্য শ্বেতরা তাহাদের সঙ্গে টকর দিতে পারে না। সুতরাং আইন দ্বারা তাহাদের সংখ্যা কমাইতে হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য না-চলায় তাহারা উপবাসে অর্দ্ধাশনে মরে কিম্বা ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়।

ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাট বলিয়াছেন, এখনও এবিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্নমেন্টের সহিত তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছে; বলিয়াছেন,

"I gratefully acknowledge that the attitude of the Indian Legislature and the standing committee has been a strong support to me throughout these negotiations."

ব্যবস্থাপক সভার একরূপ প্রবল সমর্থন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াও কিন্তু তিনি ঐ বক্তৃতাতেই সহযোগিতার অভাবের কাঁড়নী গাহিয়াছেন। সাথে কি বলি, ওটা কেবল ছলমাত্র ?

আমাদের "রুপী"র ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশের চলতি মুদ্রার ইংরেজী নাম "রুপী"।

ইহাকে "টাকা", "টকা", বা অপরাপর নামেও আখ্যাত করা হয়। রুপী-নামটি হিন্দুস্থানী "রুপেয়া" হইতে আসিয়াছে এবং উক্ত নামের সহিত সংস্কৃত "রৌপ্য" বে জড়িত আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে দিল্লীতে মুসলমান সম্রাটগণ এই মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেন। ইহার নাম তখন ছিল টকা এবং ইহার ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ গ্রেন। রুপী বা রুপেয়া শের সা ১৫৪২ খৃঃ অব্দে মুদ্রণ করান। তাঁহার মুদ্রিত রুপীর ওজন ছিল ১৭২ গ্রেন। ইংরেজরা তাহাদের আমলের গোড়ার দিকে বিভিন্নপ্রকার ওজনের ও বিস্কৃততার রুপী চালাইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তাহারা আইন করিয়া ভারতে সর্বত্র একমাত্র ১৮০ গ্রেন ওজনের (১৬৫ গ্রেণ বিস্কৃত রৌপ্য ও বাকি খাদ) রুপীর প্রচলন করে। এই ওজন স্থির করিবার কারণ এই, যে, ইহাতে রুপী নানান-প্রকার তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার মধ্যে অধিকসংখ্যকের সহিত প্রায় এক ওজনের হয় এবং ১৮০ গ্রেন এক তোলা সমান। তোলা ভারতীয় ওজন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। প্রচলিত মুদ্রা যদি এক তোলা হয়, তাহা হইলে ওজনের কাজ দেশময় সর্বত্র সহজ হইয়া যাইবে, ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দ অবধি এই ১৮০ গ্রেন ওজনের রৌপ্য মুদ্রা ও তাহার অংশরূপে অভিহিত অন্যান্য মুদ্রাগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে দেশের সকলপ্রকার বিনিময় কার্য চালাইয়া আসিতেছিল। এ-সময় অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পরের তুলনায় মূল্য বরাবর প্রায় এক-প্রকারই ছিল। সেইজন্য ভারতের সহিত যে-সকল অপরাধাত্মীয় লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক কারণে লেন্দেন ছিল, তাহাদের নিজদের দেশের প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণের হইলেও তাহারা ভারতের সহিত কাবুবার করিতে কোন অসুবিধা বোধ করিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে বিনিময়ের হার যদি স্থিরনির্দিষ্ট-প্রকারের না হইয়া পরিবর্তনশীল হইত, তাহা হইলে কখনও নির্কির্বাণে এই সকল দেনা-পাওনার কার্য সম্পন্ন হইত না।) যে ভারত হইতে ধারে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিলাতে তাহা ১০০ গিনিতে বিক্রয় করে, সে হয়ত ক্রয়কালে প্রতি ১০ টাকার দ্রব্য এক গিনিতে বিক্রয় করিলে তাহার লাভ হইবে এইরূপ স্থির করিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ একশত গিনিতে বিক্রীত দ্রব্যের জন্য সে ১০০০ টাকা খরচ ধরিয়াছিল, কিন্তু ধার শোধের সময় যদি রৌপ্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়া প্রতি দশটাকার জন্য তাহাকে এক গিনি অপেক্ষা কিছু অধিক দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ধার শোধ করিতে গিয়া লোকসান হইয়া যাওয়ার কথা। এইরূপে ভারতের ক্রেতার পক্ষেও স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া গিয়া ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।)

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের পরে রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ এত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে যে, যে-স্থলে লোকে একটাকার দুই শিলিং পাইত, সে-স্থলে এক সময় মাত্র টাকায় এক শিলিং পাওয়া যাইত। ইহার ফলে যাহাদের বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইত, তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এইপ্রকার লোকের মধ্যে বহু বৃটিশ কর্মচারী ছিল। ইহা ব্যতীত ভারত-গবর্ণমেন্টকে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইত। যাহাতে টাকার মূল্য ও রৌপ্যের মূল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া টাকার মূল্য রৌপ্যের মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত স্থির রাখা যায়, সেই জন্ম ১৮২৩ খৃঃ অব্দে টাকশালে সাধারণের পক্ষে অবাধে টাকা মুদ্রণ বন্ধ করা হয়। তা’র ফলে লোকে সস্তা দামে রৌপ্য পাইলেও আর পূর্বের মত ইচ্ছামত তাহা দিয়া টাকশালে টাকা গড়াইয়া লইতে পারিত না। অর্থাৎ রৌপ্য অপেক্ষা টাকা অধিক দুস্পাধ্য হইয়া গিয়া টাকার দাম রৌপ্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারিত এবং হইতও। ১৮২২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট টাকার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৫টি স্থির করিয়া দেন। অর্থাৎ যে-কোন সময় ১৫ টাকায় একটি পাউণ্ড-অথবা একটি পাউণ্ডে ১৫টি টাকা দিতে গবর্ণমেন্ট প্রস্তুত আছেন এইরূপ প্রচার করেন ও দিতেও আরম্ভ করেন।

বাজার-দর অপেক্ষা কম দামে টাকা বা পাউণ্ড দিবার এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের আগে অবাধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভারতম্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় বরাবর ১৫ টাকায় এক পাউণ্ড এই আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের ফলে তাহারা আর এই অস্বাভাবিক নিদ্বিষ্টভাব রক্ষা করিতে পারিলেন না।

গবর্ণমেন্ট-যদিও সর্বসাধারণের নিকট টাকশালের দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তবুও নিজেদের নিকট টাকশাল সর্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ সস্তায় রৌপ্য ক্রয় করিয়া টাকা মুদ্রণ যদিও সাধারণের পক্ষে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে বন্ধ হয়, গবর্ণমেন্ট কিন্তু যথেষ্ট উচ্চ উপায়ে “রুপী” মুদ্রণ করিতে থাকিলেন। এই উপায়লব্ধ যে আর তাহাদের হইতে লাগিল, তাহা তাহারা একটি ফণ্ড করিয়া রাখিলেন। এই ফণ্ড হইতে তাহারা পাউণ্ড ও টাকার বিনিময়ের নিদ্বিষ্ট হার বজায় রাখিবার খরচ জোগাইতেন। কিন্তু এই ফণ্ড অক্ষয় ছিল না। যুদ্ধের পরে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া এবং তৎসঙ্গে ইংরেজ বণিকের সুবিধা করিয়া দিতে গিয়া এই ফণ্ড গবর্ণমেন্ট নিঃশেষ করিয়া ফেলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হন, যে, এই উপায়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার নিদ্বিষ্ট রাখা অবস্থা-বিশেষে সম্ভব হইলেও অবস্থা বিশেষ ধারণ হইলে আর সম্ভব হয় না।

আজ বহুকাল ধরিয়া আমাদের টাকার স্বদেশে ও বিদেশে ক্রমশক্তি অনির্দিষ্টভাবে রহিয়াছে। কেহই বলিতে পারে না, যে, একটাকায় সাধারণভাবে এদেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করা যাইবে এবং অপর দেশের মুদ্রাই বা কি-পরিমাণ এক টাকায় পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ দেশে গবর্ণমেন্টের কাছে টাকশালের দ্বার চিরউন্মুক্ত এবং বাহিরে অন্য দেশের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত। সর্বদেশের মুদ্রা যদি স্বর্ণের হইত, তাহা হইলে এই আন্তর্জাতিক বিনিময় সমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া আসিত, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগণ বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এত স্বর্ণপ্রিয় হইয়াছে, যে, তাহারা যে-কোন উপায়ে পারে স্বর্ণকে ভারতে বা চীনে যাইতে দিতে নারাজ। বর্তমানে পাশ্চাত্যে স্বর্ণ এত বেশী জমিয়াছে, যে, এখন কোন-কোন দেশের অর্থনীতিবিদগণ প্রাচ্যে স্বর্ণ-প্রেরণের সমর্থন করিতে-ছেন। ইহা ব্যতীত স্বাভাবিক উপায়ে যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে শঠতার স্থান কোথাও থাকে না। অস্বাভাবিক উপায়ে দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা হইলে ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসে সে ব্যবস্থার কুব্যবহার করিয়া এক দেশের খরচে অপর দেশকে ধনবান্ করিয়া দিতে পারেন। এই সকল বিদেশীর পক্ষে সুবিধাজনক কারণেই আজকাল শুনা যায়, যে, ভারতের পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার অসম্ভব কেন না :

১। ভারতবর্ষের লোকেরা স্বর্ণ পাইলেই পুঁতিয়া রাখিবে,

২। স্বর্ণমুদ্রা এত অধিক মূল্যের যে তাহা এ গরীব দেশে চলিবে না,

৩। স্বর্ণমুদ্রা চালাইলে গবর্ণমেন্টের অত স্বর্ণ জোগাইতে অনেক খরচ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বর্তমান জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমানে রৌপ্যের উপর নির্ভর-শীল থাকিলে চলিবে না বলিয়াই ধারণা হয়। যেমন দেশের অভ্যন্তরে নানা-প্রকার বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন থাকিলে ও সেই সকল মুদ্রার পরস্পরের সহিত বিনিময়-সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়, তেমনি বর্তমান জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা সকল জাতির আর্থিক উন্নতির দিক দিয়া এত অধিক যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মুদ্রাপ্রণালীসমূহের মধ্যে ভারতম্য যত কম হইবে, ততই জাতিসকলের মঙ্গল। ভারতবর্ষ শুধু ইংরেজের অধীনে আছে বলিয়াই তাহার টাকাকড়িসংক্রান্ত সকল বিধিব্যবস্থা একরূপভাবে

করা হয়, যাহাতে ইংরেজের ভারতের সহিত ব্যবসার কোন ক্ষতি না হয়। এককাল ধরিয়া ভারতের মুদ্রাপ্রণালী শুধু এই বাহিরের সম্বন্ধ বজায় রাখিতে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেশের ভিতরে টাকার ক্রয়ক্ষমতার অনূর্ধ্বে যাই থাক, যেন এক পাউণ্ডে নির্দিষ্টসংখ্যক টাকা সব সময় পাওয়া যায়, ইহাই ছিল আমাদের মুদ্রানীতির মূল-মন্ত্র। কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত অস্বাভাবিক উপায়ে সে কার্যও আর করা চলিতেছে না।

ভারতের লোক বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান আমলেও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাশাপাশি ভারতে চলিয়াছে। অবশ্য কোন সময়েই তাহাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিনিময়ের হার বজায় রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। শুধু ইংরেজ আমলেই আমাদের দেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এতদূর উঠিয়া যায়, যে, লোকে গিনি পাইলেই জমাইয়া রাখে। কিন্তু পুনর্বার যথেষ্টসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা চলিলেই সে শেষ আপনা হইতেই দূর হইবে।

যে-দেশে ১০০, ২০০, ১০০০ ও তদূর্ধ্ব মূল্যের নোট চলে, সে-দেশে স্বর্ণমুদ্রা বহুশূন্য বলিয়া চলিবে না, একথা অবিশ্বাসযোগ্য। স্বর্ণমুদ্রা আদরের সহিতই লোকে ব্যবহার করিবে এবং স্বর্ণমুদ্রার সমান মূল্যের নোটও ঠিক টাকার পরিবর্তে নোটের স্থায়ী চলিবে। স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে কিছু খরচ প্রথমত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণ মেন্ট প্রতিবৎসর যে-পরিমাণে রৌপ্য ক্রয় করেন, তাহাতে মনে হয় না, যে, চেষ্টা করিলে কিছু কালের মধ্যেই স্বর্ণমুদ্রা ও ব্যাঙ্কনোট স্বর্ণের পরিবর্তে নোট দেশে চলিবে না। ইহাতে পকেটে পকেটে ঘুরিয়া স্বর্ণ নষ্টও হইবে না এবং লোকে নোটগুলি পুঁতিয়াও রাখিবে না।

এইরূপে দেশের মুদ্রা-প্রণালী স্বর্ণের উপর গঠন করিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের মুদ্রার সম্বন্ধ আবণ্ড অটুট হইবে। ইহা ব্যতীত এই উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের টাকশালের ও টাকার বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপকনিগের হস্ত হইতে আমরা অনেকটা মুক্তি পাইব। টাকশালের দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া তৎ-সাহায্যে যথা-ইচ্ছা “রুপী”-মুদ্রণ এবং তাহার লাভের টাকায় বিদেশী বণিকের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিও ইহাতে কমবে। এবং টাকশালের অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত ছুর্গম হইলে দেশের ভিতরে টাকার গাধিক্যজনিত গোলমালও কিছু কমবে।

সকল দিক্ দিয়াই ভারতের পক্ষে বর্তমানে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কারেন্সী কমিশন বিদেশে গিয়া যদি এখন দেখেন, যে, ভারতে স্বর্ণ প্রেরণ করিলে বিদেশীরা খুশি হইবে না তাহা হইলেই যা বিদ্।

অঃ

স্বাভাভিকতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা

মুসলমানদের আঙ্গিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিয়নে মাস-মেডেক পূর্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, সাম্প্রদায়িক সুবিধার উদ্দেশ্যে রচিত কার্য প্রণালীর পরিবর্তে সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে রচিত কার্য-প্রণালী অবলম্বিত হউক। মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না, আব্দুল আলী ইমাম, আব্দুল মোহাম্মদ শকা, প্রভৃতি নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে, এই প্রস্তাব হইতে হয়ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভ্রমসংশোধন

অগ্রছায়ণ সংখ্যা

২৮০ পৃ: ১ম স্তম্ভ ১৪ পংক্তি—“ইংরেজদের” হইবে “রংরেজদের”

মাঘ সংখ্যা

৫৫৩ পৃ: ২য় স্তম্ভ ১০ পংক্তি—“৪৮ ফুট লম্বা” হইবে “৮ ফুট লম্বা”।

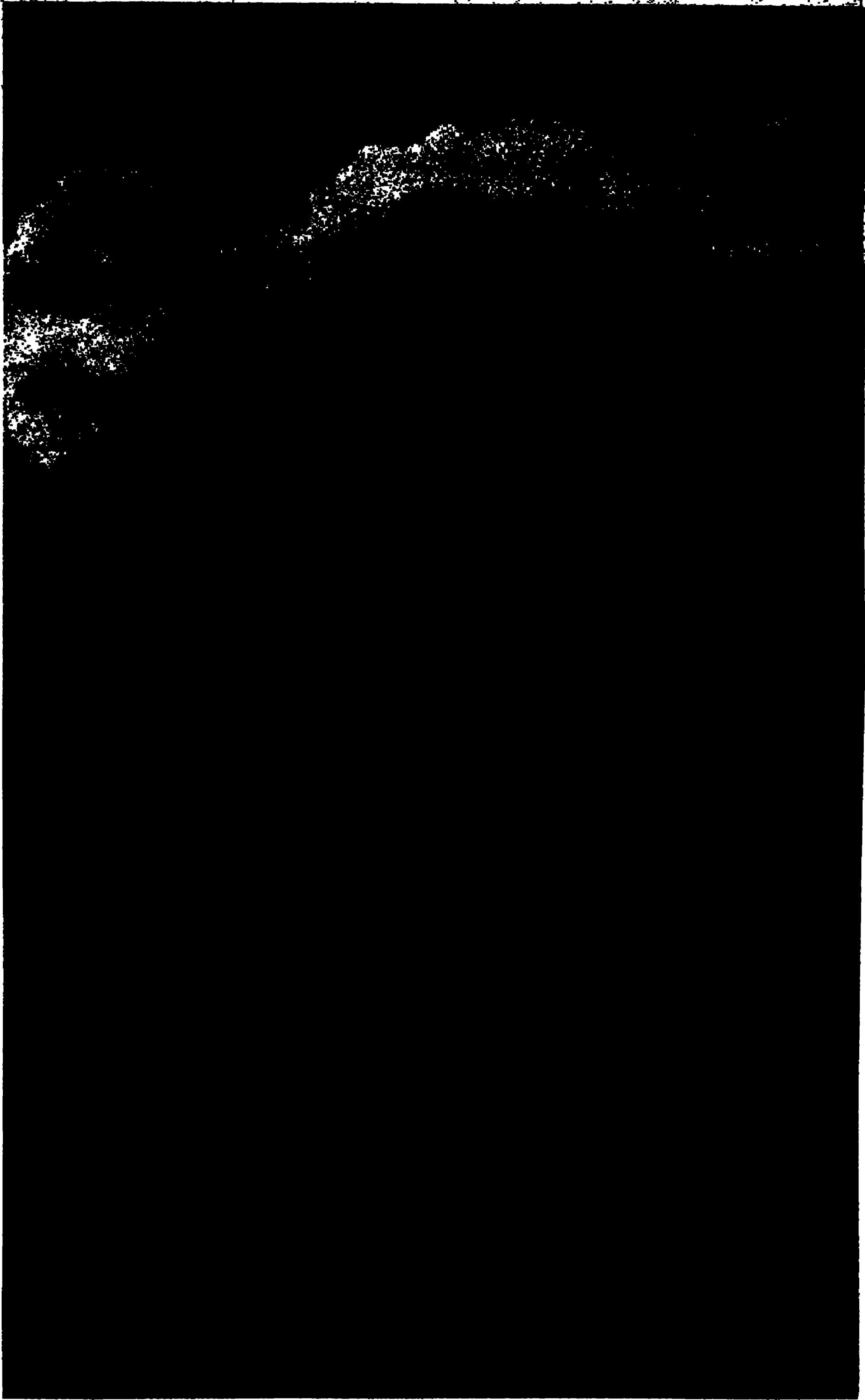
৫৬৭ পৃ: ২য় স্তম্ভ ১২ পংক্তি—“অধিকৃত” ও বিনোদিত করিতে পারিয়াছিলেন” হইবে “অধিকৃত ও বিনোদিত রাখিতে পারিয়াছিলেন”।

পৃ: ৬৫৩ প্রথম কলামের অষ্টম ছত্রে Assoiates স্থলে Associates হইবে।

পৃ: ৬৫৩ দ্বিতীয় কলাম অষ্টাদশ ছত্রে হিলোয়ার স্থলে হিলেয়ার হইবে। সপ্তবিংশ ছত্রে যদিও স্থলে তিনি হইবে।

পৃ: ৬৫৭ দ্বিতীয় কলাম দ্বিতীয় ছত্রে Nous স্থলে Nons হইবে।

পৃ: ৬৬০ দ্বিতীয় কলাম চতুর্থ ছত্রে Cone স্থলে Coue হইবে।



গিরি-পরিব্রাজক

শিল্পী শ্রী. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ

২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

কন্ফিউশিয়াস্

শ্রী হরিপদ ঘোষাল এম্-এ, বিজ্ঞাবিনোদ

চৌ বংশের (১১২০—২৪২ খৃঃ পূঃ) রাজত্বকালে ৫৫০ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে চীনদেশের লু প্রদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কন্ফিউশিয়াস্। তাঁহার বংশের উপাধি কুং ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে “আমাদের প্রভু কুং” বলিয়া অভিহিত করেন। এখনও চীনদেশে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাহারা কন্ফিউশিয়াসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্বি অহুভব করেন। কন্ফিউশিয়াসের পিতার নাম স্থ-নিয়াং-হি ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার দেহে অমিত তেজ ও সাহস ছিল। কন্ফিউশিয়াসের তৃতীয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে মাতা ও পুত্রের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাঁহার বয়স যখন ২৩২৪ বৎসর তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার একটি পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্রের লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু

তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বাইশ বৎসর বয়সের সময় কন্ফিউশিয়াস নিজ গ্রামে লোকশিক্ষার কার্য আরম্ভ করেন। অহুসঙ্কিত বহু তরুণ যুবক তাঁহার গৃহে আগমন করিত। জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের দিকে তিনি তাহাদের মন আকৃষ্ট করিতেন এবং তাহাদের সহিত মাহুষের কর্তব্য ও শাসনতন্ত্রের সুন্দর তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা তিন সহস্রের বেশি হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স ৭০ হইতে ৮০র মধ্যে ছিল। এইসমস্ত ব্যক্তিকে তিনি খুব সম্মান করিতেন। শিষ্যগণের যৎসামান্ত অর্থ দ্বারা তিনি জীবিকানির্ভাহ করিতেন। দেড়শত বৎসর পরে মেন্সিয়াস্ যখন কন্ফিউশিয়াসের উপদেশ প্রচার করিয়া দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তিনি রাজগণের দান গ্রহণ করিতে বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহা কন্ফিউশিয়াসের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। যে রাজার কার্যাবলী তিনি অহুমোদন করিতেন না এবং যে তাঁহার শিক্ষা-

অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিত না, সেইরূপ রাজার দান গ্রহণ করিয়া তিনি আশ্বসমান বিসর্জন দিতে পারেন নাই।

কনফিউশিয়াস্ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চপদ পাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তাহা হয় নাই। তখন চীনদেশে অশান্তি ও অনাচার পুরামাত্রায় চলিতেছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে দেশ বিধ্বস্ত হইতেছিল—কৃষিকার্য্য অবজ্ঞাত হইতেছিল—মেরামতের অভাবে নদীর বাধ ভাঙিয়া দেশ জলপ্রাণিত হইতেছিল। গোলমাল, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় সমস্ত দেশকে তোলপাড় করিতেছিল। দেশের এই দুর্দিনে, এই “মাৎস্ত্রায়ে” কালে কনফিউশিয়াস্ দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ চীনদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত চীনরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তির অমৃতবার্ত্তা প্রচার করিতেছিলেন, দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দেশবাসিগণকে তাহাদের প্রাচীন রীতি, নীতি ও প্রথা অমূল্য করিয়া একছত্র চীনসম্রাটকে ভক্তি, প্রীতি ও বশতা দেখাইতে আহ্বান করিতেছিলেন। বিংশ বৎসর বয়সে তিনি গোলারক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সাধারণের ক্ষেত্র ও পশুদল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার পাইয়াছিলেন। দারিদ্র্য ও অভাববশতঃ তিনি শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার বশঃসৌরভ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি লু প্রদেশের কোনো-এক নগরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যের Minister of Crime নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কর্ত্ত্বাধীনে রাজ্যে এক নূতন যুগ আসিয়াছিল। দুর্বৃত্ত ও চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ যেন লজ্জায় কোথা লুকাইয়া পেল। রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পাইল এবং শত্রুগণ হীনবল হইয়া পড়িল। পুরুষগণ রাজভক্তি ও সাধুতার জন্য এবং স্ত্রী-লোকগণ পতিভক্তি ও বশতার জন্য অপর রাজ্য অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কনফিউশিয়াস্ প্রজাসাধারণের অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন। গানে ও ছড়ায় তাঁহার নাম মুখে-মুখে গীত হইয়া অপর রাজ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অন্যান্য রাজ্যের বহুপ্রজা লু প্রদেশে বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু এই সুখ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অকালে মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। লু প্রদেশের শৃঙ্খলা ও ঐশ্বর্য্যে নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল এবং কনফিউশিয়াসের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া মন্ত্রী একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। চীনরাজ্যের শাসনকর্ত্তা কনফিউশিয়াসের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়া লু রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মন ধরাপ করিতে ব্যর্থ হইলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া আর বেশীদিন রাজ-কার্য্যে থাকা অপমানজনক ভাবিয়া ৪২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে কয়েকজন শিষ্যের সহিত কনফিউশিয়াস্ স্থানত্যাগ করিলেন। ম্রোটার জায় আদর্শ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য জয়োদশ বৎসর ধরিয়া তিনি বহুরাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং নিজ আদর্শ অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিবার জন্য রাজগণকে অমুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো শাসনকর্ত্তা তাঁহার কথা কৰ্পপাত করিলেন না। তিনি ও তাঁহার কতিপয় বিদ্বস্ত শিষ্য উদ্ভেজিত লোকের হস্তে অনেকবার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। বিপদের সময়ও তিনি ধৈর্য্য হারান নাই। তিনি বলিতেন, ভগবান্ তাঁহার মধ্যে শক্তি দিয়াছেন, কেহই তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। তিনি নিজেকে অতিমামুষ বলিয়া কখনও ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিতেন মামুষ কোন্ পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং শাসন কর্ত্তাগণ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহাদের প্রজাগণ ধর্ম্মভাবে জীবনধারণ করিয়া সুখভোগ করিতে পারে তাহা তিনি জানেন। মামুষকে ইহা শিক্ষা দেওয়া তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং অনন্তভাবে তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে লাগিয়া থাকিবেন বলিয়া প্রচার করিতেন। সুখার্ভ ও ভীত শিষ্যগণের মধ্যে

তিনি সর্কদা দীর ও স্থির থাকিতেন এবং বীণাবাদ্যের সহিত গান গাহিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি জ্ঞান লইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই, আমি পুরাতত্ত্ব জানিতে ভালোবাসি এবং আমার এই জ্ঞানপিপাসা প্রবল। শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ করিবার সময় অনেক সংসারত্যাগী যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের বিফল চেষ্টার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিতেন। তিনি বলিতেন, পশুপক্ষীর সহিত বাস করা অসম্ভব। মানুষের সহিত না মিশিলে আর কাহার সহিত মিশিব? পৃথিবীর লোক সিক্ পথ অবলম্বন করিলে ইহার অবস্থা পরিবর্তন করিতে আমাদের চেষ্টিত হইতে হইবে না।

অবশেষে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে কনফিউশিয়াসকে পুনরায় লু রাজ্যে আহ্বান করা হয়। তখন তাঁহার জীবনের মাত্র পাঁচ বৎসর বাকী ছিল। এক বৎসর পরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি এই শোকাবহ ঘটনা ধৈর্যের সহিত সহ্য করেন। পর বৎসর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ইয়েন হই ইহ-সংসার ত্যাগ করিলে তিনি শোকে বিচলিত হইয়াছিলেন—তাঁহার বিশাল হৃদয় দুঃখে আলোড়িত হইয়াছিল। ৪৭৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজে-নিজে বলিতেছিলেন—বিশাল পর্কত ক্ষয় হইয়া যাইবে, লোহার শক্তি কড়ি ভাঙিয়া যাইবে; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি লতার স্তায় শুক হইয়া যাইবে।

কনফিউশিয়াস দীর্ঘকায় ছিলেন। তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। যথানিয়মে, যথাকালে এবং যথাস্থানে তিনি সকল কার্য করিতেন। তাঁহার ভোজন-প্রণালী সূক্ষ্ম ছিল। তিনি বেশী আহার করিতেন না। তিনি খুব কমমাত্রায় মদ্যপান করিতেন। না দেখিয়া না জানিয়া তিনি কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করিতেন না। একগুঁয়েমি ও অহঙ্কার তাঁহার মধ্যে স্থান পাইত না। শিষ্যগণের সহিত তিনি প্রায়ই কাব্য, ইতিহাস ও ভক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও অভিমান, উপবাস ও রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে বলিতেন। সাহিত্য ও নীতি আলোচনা করিতে এবং সরলতা ও সত্যকথন অভ্যাস করিতে তিনি উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,

পাঁচটি সম্বন্ধের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ; পিতাপুত্র সম্বন্ধ; জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সম্বন্ধ; রাজ-প্রজা সম্বন্ধ এবং বন্ধু সম্বন্ধ। এই-কয়েকটি সম্বন্ধের লোক যথাযথভাবে কর্তব্য প্রতিপালন করিলে সমাজ ও দেশ সুশাসিত হইবে। তাঁহার পূর্বেও এইসমস্ত নীতিশিক্ষা চীনদেশে বর্তমান ছিল, কিন্তু তিনি পুরাতনের মধ্যে এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। নৈতিক শিক্ষায় তিনি সর্কবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এমন একটি নীতি আছে কি না যাহা অভ্যাস করিলে জীবনে আর কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি নিজে যেভাবে আচরিত হইতে চাও না, অপরেও প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও না। অনেক জ্ঞানগর্ভ সূত্র-সূত্র বাক্য তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

১। চিন্তাশীলতা-বিযুক্ত পাণ্ডিত্য-অর্জনের পরিশ্রম বৃথা; পাণ্ডিত্যরহিত চিন্তাশীলতা বিপজ্জনক।

২। অসম্ভটি প্রকাশ না করিয়া দারিদ্র্য ভোগ করা অতি কঠিন।

৩। গর্ক না করিয়া ঐশ্বর্যশালী হওয়া সহজ।

৪। জাতি কর্তব্য সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিলে দেশ ও রাজ্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

৫। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ যতই শিক্ষিত হইবে তাহারা উপরিস্থগণ কর্তৃক যুদ্ধে পরিচালিত হইতে ততই অনিচ্ছক হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কনফিউশিয়াস মধ্যপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল না যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা থাকিতে পারে। সং কর্ত্বের দ্বারা শক্তকে জয় করিতে পারা যায়—আমার প্রতি কেহ মন্দ ব্যবহার করিলেও আমি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া বরং তাহার প্রতি সদ্যবহার করিব, তাহাকে বন্ধুর স্তায় দেখিব, ভালোবাসিব ও তাহার দোষ ক্ষমা করিব। এই কথা উত্তরে কনফিউশিয়াস বলিয়াছিলেন, যদি মন্দ ব্যবহারের জন্য তুমি তোমার শত্রুর প্রতি ভালো ব্যবহার করো, তাহা

হইলে ভালো ব্যবহারের জন্য বিরূপ ব্যবহার করিবে ? অতএব সম্ভাব্যতার জন্য সম্ভাব্যতার এবং স্ত্রীর দ্বারা স্ত্রীর প্রতিকার করিবে।

কনফিউশিয়াস কোন নূতন ধর্ম স্থাপন করেন নাই। তিনি বুদ্ধ বা যীশুখ্রিষ্টের স্ত্রীর ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন নীতি অবলম্বন করিলে মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে এবং পারিবারিক জীবন বিরূপে দুঃখময় না হইয়া শান্তি-সুখের আকর হইয়া উঠিবে, এই সমস্যা সমাধান করিতে কনফিউশিয়াস চেষ্টা হইয়াছিলেন। তিনি চীনের প্রাচীন চিন্তা ও শিক্ষার ধারা রক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি নূতন কিছুই করেন নাই। তাঁহার শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তাহাতে কোনো ধর্ম-বিশেষের উল্লেখ নাই। তিনি ভাবিতেন যে মানুষের বর্তমান জীবন এক বিষম সমস্যা ও শিক্ষার বিষয়। তিনি বলিতেন যে মানুষ সামাজিক জীব। আন্তরিকতা থাকিলে মানবপ্রকৃতি পূর্ণবিকাশ লাভ করিবে, স্বর্গে ও মর্ত্যে অতুলনীয় ক্ষমতাপন্ন হইবে। তাৎ-ধর্মের প্রবর্তক লাওৎসে কনফিউশিয়াসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মত মানসিক শক্তি ও চিন্তা-সুফুরণের সহায়ক। তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষকে প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইতে—বাহ্য প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে—মানবপ্রকৃতির জন্মগত

পবিত্রতা রক্ষা করিতে—নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিজননীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে, প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নৈর্ঘর্ষ্য অবলম্বন করিতে। কিন্তু কনফিউশিয়াস চাহিয়াছিলেন নির্দিষ্ট বিধি ও প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন সংস্থার করিতে, ইউ ও সুন আমলে যে রাজনীতি ও প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা প্রাচীন চীনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে। লাওৎসে বলিয়াছিলেন আদি অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে—রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে, কিন্তু কনফিউশিয়াস উপদেশ দিয়াছিলেন ইউ ও সুন বংশের শান্তিসুখময় রাজত্বকালের আদর্শ নীতি অবলম্বন করিতে। তাঁহার মতে ইউ ও সুন বংশের রাজত্বকাল চীনের ত্রেতাযুগ—চীনের রামরাজত্ব। সেই কালের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ও পারিবারিক ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুবর্তন করিলে চীনে নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে।

বর্তমান চীন অনেক বিষয়ে কনফিউশিয়াসের নিকট ঋণী। চীনের সভ্যতা, চীনের উৎকর্ষ, চীনের আচার-ব্যবহার, এককথায় সর্ববিষয়ে তিনি এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। যতদিন চীনদেশ ও চীনজাতি ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্যন্ত কনফিউশিয়াসের নাম তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাকরে মুদ্রিত থাকিবে।

ভারতীয় আর্ষ্যগণের আর্ষ্য-ব্যবহার

শ্রী অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই বলিয়া থাকেন “প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ কেবলমাত্র ফল-মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।” কেহ-কেহ বলেন “তাঁহারা কেবলমাত্র হরীতকী ভক্ষণ করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রচর্চা করিতেন ও তত্ত্ব-জ্ঞান অন্বেষণ করিতেন।” কিন্তু যাহারা ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহ

উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অন্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। মহাভারতখানি আগাগোড়া পড়িলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে মাংসই আর্ষ্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় মাংস ব্যবহৃত হইত, অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আসিলে মাংস দ্বারা তাঁহাদের

অভ্যর্থনা করা হইত, প্রাণে পিতৃপুরুষগণকে মাংস প্রদান করা হইত, দেবগণের তৃপ্তির জন্য মাংস উৎসর্গ করা হইত, আর মাংসই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। ক্রমে এই মাংস-ভোজন-প্রথা ভারতবর্ষে কমিয়া আসে; বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাভারতে আশ্বিনভোজনের কতকগুলি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই যে মাংস ভোজন-সম্বন্ধে ঋষিগণের কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। যে-কোন পশুর মাংস পাইলেই তাঁহারা ভোজন করিতেন। যাহা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত তাহাও ভোজন করিতেন, যাহা উৎসর্গ করা না হইত তাহাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। মাংস তাঁহাদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল।

সূর্যাদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বর দিতেছেন

“হে নরাধিপ। আমার প্রদত্ত তন্ত্রনির্ধিত এই স্থানী গ্রহণ কর। পাকালী অনাহারী হইয়া বাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাবৎ পাকশালার পক ফল, মূল, শাক, আশ্বিন প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।” বন ৩।

পাণ্ডবেরা যখন বনগমন করেন তখন

“তাঁহারা মুনিতোজা সুরস ফল-মূল এবং বিশুদ্ধ শর-নিষ্ঠত স্নান-মাংস ভোজন ও হিমাচলসমুদ্র বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।” বন ১৬০।

এক ব্যাধি কোনো ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন

“লোকে পশুগণকে আক্রমণপূর্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও গুণ্ডি সমুদয় ছিন্ন করে।” বন ২০৭।

রাজা দুর্ষোধান

“পরে গোরস পান ও অস্ত্রাস্ত্র মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকর-সেবিত, ময়ূরগণের কেকারব-মুগুরিত পরম রমণীয় বন ও উপবন-সকল অবলোকনপূর্বক সপ্তচ্ছদ, পুরাণ ও বকুল সমাকর্ষণ অতি পবিত্র বৈভবন-নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন।” বন ২০৯।

যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে বলিতেছেন

“আমাদের বনবাসের আর একবৎসর আটমাস অবশিষ্ট আছে, ঐ সময় আমানিগকে স্নানমাংসও উপযোগ করিতে হইবে, অতএব আইস, আমরা মন্ত্রভূমির প্রান্তরস্থিত তৃণবিন্দু সরোবর সমীপবর্তী সেই পরম-রমণীয় কাম্যাক-বনে গমনপূর্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতি-বাহিত করি।” বন ২৫৭।

ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঋগ্বেদে বনগমন করিতেন তাঁহারা কেবল ফল-মূল আহাৰ করিতেন না। মাংসই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।

কোনো সমরাভিযানের সময় অগ্ন্যাগ্ন খাদ্যভব্যের সহিত মাংস সরবরাহ করিতে হইত।

লক্ষা সময়ের প্রাকালে রামচন্দ্রের বানব-সৈন্যগণ—

“প্রভূত মধু মাংস ও জনসম্পন্ন, বিবিধ ফলমূলসংকীর্ণ অরণ্য ও গিরি-শিলাভূলে বাস করিয়া নিষ্কিন্ধে ক্ষীরোদ-সাগর-সমীপে সমুপস্থিত হইল।” বন ২৮২।

পাণ্ডবগণের অস্ত্রাতবাস-সময়ে—

“ভীমসেন মৎস্যরাজ প্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যভব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন।” বিরাট ১৩।

রাজাদিগের স্ত্রায় অগ্ন্যাগ্ন ধনী-ব্যক্তিগণেরও মাংসই প্রধান খাদ্য ছিল।

বিহুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন—

“আচ্যগণের ভোজন মাংসপ্রধান, অধিবাস্তগণের ভোজন গব্য-রসপ্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈলপ্রধান।” উদ্যোগ ৩৩।

সমুদ্র-পারে কোনো ধনবানু বৈশ্বের পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পাম্বস, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাঁককে ভরণ-পোষণ করিত। বর্ষ ৪২।

“ব্যাধনগ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরমভক্তিসহকারে মাংস আহরণ করিত।” শল্য ৩২।

ধৃতরাষ্ট্রের ভোজনের নিমিত্ত মৈরেয়, মৎস্য, পানীয় ও মধু প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্য-সমুদয় প্রস্তুত হইত। আত্রসবাসিক ১।

ভীষ্ম কহিতেছেন—

“মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরে বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে।” অমুশাসন ১১৬।

শান্তি পর্বে তিনি বলিতেছেন

“ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও কত্রিরকে সাধারণের হিত-সাধনার্থ নির্মাণ করিয়াছেন।” শান্তি ১৪২।

অস্ত্রত্ব তিনি বলিতেছেন—

“স্বায়ম্ভু গৃহ যেমন সৃষ্টিকার্য্যে লেপিত হয় তদ্রূপ এই স্বায়ম্ভু দেহও সৃষ্টিকার্য্যে পুষ্টি হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধাতু ও ফল মূলাদি সমুদয় ভব্য সলিল ও সৃষ্টিকার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়।” শান্তি ২১২।

শৃগালরূপী ঈশ্বর এক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

“দেহ মধ্য ও লডক পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য স্বজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই।” শান্তি ১৮০।

এইরূপ মাংস ভক্ষণে তাঁহারা কোনোরূপ অধর্ম্ম দেখিতে পাইতেন না।

সৌপ্তিক পর্বে লিখিত আছে—

“ব্রহ্মা অমর সৃষ্টিকর্তার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ-সমূহ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়ম-মুসারে চূর্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে।” সৌপ্তিক ১৭।

বাসুদেব কহিতেছেন—

“বলবান্ জীবগণ চূর্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে, নকুল শ্বিককে, মার্জার নকুলকে, কুকুর মার্জারকে, চিত্র-বায়ু কুকুরকে, এবং মনুষ্য সেই চিত্র বায়ুকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।” শান্তি ১৫।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—

“আর অনেক সামান্ত মনুষ্যও ভূমিতেদ এবং ওষধি পশু পক্ষী ও বৃকাদি ছেদন করিয়া ব্রহ্মাসুতানপূর্বক স্বর্গলাভ করিতেছে।” শান্তি ১৫।

ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণও প্রচুর-পরিমাণে মাংস উপযোগ করিতেন।

পাণ্ডবেবা বনগমন করিলে—

“পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিত্তম্ভ শরনিপাতিত যুগমাংস ও বস্ত্রভক্ষ আহরণ করত অত্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন।” বন ৫০।

অন্তত্—

রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণ দ্বারা কুক ও কুকসার যুগ এবং অন্তান্ত পরিভুক্ত বস্ত্রভক্ষ নিহত করিয়া সহস্র-সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশজন মোক্ষবেত্তাকে ভরণ-পোষণ এবং অন্তান্ত ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। বন ৫০।

স্নাতক ব্রাহ্মণগণ, মোক্ষবেত্তা ও অন্তান্ত সকল ব্রাহ্মণই মাংসপ্রিয় ছিলেন।

আবার দেখুন, অর্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষার্থে স্বর্গে গমন করেন তখন, অর্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশস্ত মনে সেই কাম্যকবনে বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিত্তম্ভ বাণ দ্বারা বহুবিধ পবিত্র যুগসমূহ সংহার করিয়া ও অন্তান্ত-প্রকার বস্ত্র আহরণ আহরণপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। বন ৮০।

পাণ্ডবগণ যখন তীর্থ যাত্রা করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন—

“যে-সকল ভিক্ষোপভোজী ব্রাহ্মণ ও যতি কুংপিপাসা, পথভ্রম, আরাস ও শীতবাতাদি সহ্য করিতে অসমর্থ, যে-সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী, ষাঁহার পধ্যাপ্ত, লেহ্য পের ও মাংসের অভিলষী, ষাঁহার ভোজনের

নিমিত্ত সর্বদা স্থপকারের অনুবর্তী, তাঁহার সকলেই তীর্থভ্রমণে বিনিবৃত্ত হইয়া ব-ব স্থানে প্রস্থান করুন।” বন ৯২।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কেবলমাত্র মাংস ও অন্ত্যান্য দ্রব্য ভোজনের নিমিত্ত অনেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডব-গণের সহচর হইয়াছিলেন।

অন্তত্—

পূর্বে কাম্যব্যা নামে এক নিষাদ বাস করিত। “অরণ্য-বাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্য ধর্ম ছিল। সে প্রতিদিন যুগ বধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত।” শান্তি ১৩৫।

আমিষভোজনে ঋষিগণের পরমার্থ সাধনার কোনো বিঘ্ন হইত না। বরং অনেকে আমিষের উপর নির্ভর করিয়াই পরমার্থ সাধনা করিতেন।

শল্য-পর্বে লিখিত আছে—

“সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারথী তথায় অবস্থানপূর্বক মৎস্য-হারে প্রাণদারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ, ও বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। শল্য ৫২।

জীলোকেরাও তৎকালে মাংস-ভোজনে অভ্যস্তা ছিলেন। দময়ন্তী বাহকবেশী নলকে চিনিবার নিমিত্ত কেশিনীকে তাঁহার সংস্কৃত মাংস আনয়ন করিতে কহিলেন। কেশিনী তৎক্ষণাৎ স্বরিতপদে বাহক-সমীপে গমন করিয়া অভূক্ষ্য মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিলেন। দময়ন্তী সেই মাংস ভোজন করিয়া বাহককে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বন ৭৫।

অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আসিলে মাংস প্রভৃতির দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করা হইত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে শল্য যখন চূর্ব্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন চূর্ব্যোধন তাঁহার শ্রীতি সম্পাদনার্থ

“শিখী দ্বারা স্থানে-স্থানে এক-এক সভা নির্মাণ ও নানা-প্রকার ক্রীড়াভব্য প্রস্তুত করাইলেন। তথায় নানাবিধ অন্ন, বৎস্য, মাংস, হ্রসংকৃত ভক্ষ্য ও স্থাসোদর পানীয় আহরণ, বিবিধ রমণীয় কুপ ও বাণী ধনন এবং অনেকানেক রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিলেন।” উদ্যোগ ৭।

পাণ্ডবেবা বনগমন করিলে জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের কুটীরে অতিথি-বেশে

গমন করেন তখন জৌপদী তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কহিলেন—

“আমি তোমার আভরণ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চত যুগ প্রদান করিতেছি। কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আদিরা যখন তোমাকে এণ, পৃথ, কুতু, হরিণ, শরভ, শশ, কক, কক, শশ্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।” বন ২৬৮।

কত-প্রকারের বস্ত্র জন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভক্ষ্য-শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন এক্ষেত্রে তাহাও ব্রষ্টব্য। উষ্ট্র, ভল্লুক, শূকর, বস্ত্র গো ও মহিষ, এ সমস্ত পশুর মাংস হরিণ, শশক প্রভৃতির সহিত এক-পর্ষ্যায় ভুক্ত ছিল।

কোনো ব্রাহ্মণ এক বকের অতিথি হইয়াছিল।

“সদাশয় বক এই বলিয়া বথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাহাকে শালপুষ্পময় দিব্য আসন, গজা-সলিলাভর্গচ্চ বৃহৎ-বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হত্যাশন প্রদান করিল।” শান্তি ১৭০।

মহিষ চাবন কোনো সময়ে মহারাজ কুশিকের অতিথি হইয়াছিলেন—

“মহিষ এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভাষ্যা-সমভিব্যাহারে সত্বরে সিদ্ধান্ত, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানা-প্রকার রস এবং মুনিভোজ্য, রাজভোজ্য ও গৃহস্থভোজ্য রাশি-রাশি কল আহরণ-পূর্বক তাঁহার নিকটে সংস্থাপিত করিলেন।” অশ্বশাসন ৫৩।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

“রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনুণ লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহা-দিগকে যুগমাংস, অন্ন, ঘৃত, ছন্দ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে।” অশ্বশাসন ৬৪।

পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন—

“উত্তরতাজপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেঘমাংস প্রদান করেন তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি-সম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত কললাতে সমর্থ হবেন।” অশ্বশাসন ৬৪।

একদা রাজা কল্যাণপাদ

“বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময় এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। আদি ১৭৬।

বৃহৎ-বৃহৎ যজ্ঞে ও অন্তান্ত উৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের নিমিত্ত যে-সমস্ত খাদ্য সংগৃহীত হইত তাহার মধ্যে মাংস একটি প্রধান খাদ্য ছিল।

দক্ষযজ্ঞে—

“কৃত্যগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খত, শর্করা ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পের-সমূহর নানাপ্রকার সুখধারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল।” শান্তি ২৮৪।

এইসমস্ত খাদ্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত ভ্রাতৃলোক-দিগের নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠির যখন প্রথম সভা প্রবেশ করেন তখন তিনি

“ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স, কল, মূল, হরিণাদি যুগমাংস, বিবিধ ভোজ্য, নানাবিধ পের ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানা দিগ্-দেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন।” সভা ৪।

উত্তরার বিবাহের সময় বিরাট-রাজ্যে

“উচ্চাচ যুগ, মৎস্য ও মৈরের প্রভৃতি দ্বারা সকল সমাধৃত হইল।” বিরাট ৭২।

যজ্ঞবংশধ্বংসের প্রাকালে—

ছনিমিত্ত-সমুদয় উপস্থিত হইলে বৃকি ও অন্ধক বংশীয় বীরগণ সকলেই সগরিবারে তীর্থ-যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্য মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মৌসল ৩।

গোমাংস ভক্ষণও তৎকালে অবাধে চলিত।

‘মহান্না সঙ্কতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে মণিকুণ্ডলধারী স্ত্রীগণ একবিংশতি সহস্র বর্ষাবধি মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক-পরিমাণে স্ত্রণ ভক্ষণ কর, আজি অল্প দিনের জ্ঞান অপর্ধ্যাণ্ড মাংস নাই।’ জ্যোৎ ৬৭।

ইন্দ্র ও অগ্নি যখন শ্বেন ও কপোত বেশে শিবিরাজ্যকে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন শিবিরাজ্য কহিলেন

“এই কপোতের পরিবর্তে ওদনের সহিত বৃষত পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি, হে শ্বেন। তুমি যে প্রদেশে অবস্থিত করিয়া ঐত হও তথায় গমন কর, শিবিরাজ্য তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।” বন ১২৬।

গোমাংস ভক্ষণ প্রথার বহুল প্রচলন না থাকিলে শিবিরাজ্য একটি কপোতের পরিবর্তে একটি বৃষত হত্যা করিতে সম্মত হইতেন না।

কর্ণ কহিতেছেন

“মন্ত্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, স্বজন, স্বগুর, মাতুল, ভ্রাতৃতা, ছহিতা, ভ্রাতা, নন্দা, অন্তান্ত বন্ধুবান্ধব, অত্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং.....মদ্যপানপূর্বক শক্ত, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন, কখন হাস্ত, কখন গান ও কখন-কখন অসংবদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে।” কর্ণ ৪১।

কোনো রাজসী গাহিতেছে

“আহা আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া পৌরীগণের সহিত সৌভী দ্বরাগান এবং গোমাংস ও পলাতুবুজ মেঘমাংস ভোজন করিয়া বাহ্যিক সজ্জিত করিব? বাহারা বরাহ, কুকুট, গো, গর্ভত, উষ্ট্র ও মেঘের মাংস ভোজন না করে তাহাদের জন্ম নিরর্থক।” কর্ণ ৪৫।

যুধিষ্ঠিরের মাতুল শল্যের রাজ্যে এই প্রথা ছিল।

অন্তর্দেখুন

“অষ্ট দেশের স্তায় প্রহল, মজ, গাছার, খস, বসতি, সিদ্ধ ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।” কর্ণ ৪৫।

বলা বাহুল্য, এইসকল দেশের অধিকাংশই আর্ধ্যদিগের অধ্যুষিত ছিল ও আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত ছিল।

নর-মাংস-ভোজনেরও আভাস মহাত্ম্যে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে একবার ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে শৈব্য রাজার কুমার প্রাণত্যাগ করে। তখন কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই সাত জন ঋষি সেই কুমারকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। এমন সময় শৈব্য রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদিগকে এই জঘন্য কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। তখন সকলে শবদেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অমুশাসন ২৩। এক ব্রাহ্মণ শিবিরাজাকে কহিলেন,

“রাজন্! বৃহদর্ভ নামে তোমার বে পুত্র আছে, তাহাকে বিনষ্ট করত তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।” বন ১২৭।

যদিও ব্রাহ্মণ এস্থলে শিবিরাজাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন তথাপি নর-মাংস ভোজন প্রচলিত না থাকিলে তিনি রাজাকে এরূপ অশ্রদ্ধা ও অসম্ভব আদেশ করিবেন কেন? শক্রর প্রতি প্রতিহিংসা-গ্রহণ-কালে তাহার বন্ধ-শোণিত পান করা হইত।

ভীমসেন

“সোৎসুকনয়নে কণকাল চুশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপন্য প্রীতি সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুচ্ছত করিয়া কল্পিত-কলেবরে তাহার উপর পদার্পণপূর্বক বন্ধুহল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদ্রুশোণিত পান করিলেন।” কর্ণ ৮৪।

অর্গেও এইরূপ প্রথার কল্পনা করা হয়।

মহিষাসুর বধের পর

“এইরূপে মহাসেন অনবরত শর বর্ষণ করিয়া শক্রগণকে নিঃশেষ করিলে পর নিভাস্ত দুর্ভব ওদীর পারিবর্ষর্ষ প্রকটমনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল।” বন ২৩০।

যজ্ঞেও দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ পশু উৎসর্গ করা হইত।

মহর্ষি স্যামরাম্মি কপিলকে কহিতেছেন

“ছাগ, অশ্ব, মেঘ, খেঁচু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্ত সমুদয়

এবং, ওষধি-সকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়।.....খেঁচু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, মার্জার, অশ্বতর ও গর্ভত এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর, এই সাত আরণ্য, এই চতুর্দশ-বিধ জন্ত দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে।” শান্তি ২৩৮।

ভীষ্ম কহিতেছেন

“গো-সমুদয় পরম পবিত্র জগতের অবস্থান দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাজ্ঞকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কাশে সৎপাত্রে প্রদান করিবে।” অমুশাসন ৮০।

ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে গাভীসকল বহুল-পরিমাণে যজ্ঞে উৎসর্গ করা হইত।

মহর্ষি বক একবার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি গাভী প্রার্থনা করেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কতকগুলি মৃত গাভী প্রদান করেন। ইহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া

“সেইসমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।” শল্য ৪২।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন

“যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটি রাজ্যপুষ্টির প্রধান সাধন।” শান্তি ১৩০।

বেদব্যাস শুকদেবকে কহিতেছেন

উদার (গৃহস্থের) যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত চতুর্বেদোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন।” শান্তি ২৪৩।

সরস্বতী-তীর্থে

উদারবৃদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মন্ত্রল-সাধনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। শল্য ৪২

দেবরাজ রাজা মরুতকে কহিতেছেন

“অতএব ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে অগ্নির ঐতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের ঐতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অশ্বাত্ত দেবগণের ঐতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন।” আশ্বমেধিক ১০।

ব্রাহ্মণেরা অহণ্ডে এইসমস্ত ছেদন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়

“পাণ্ডুনয়ন ধৃতরাষ্ট্রনয়ন যুৎসুক রাজ্যরক্ষার্থ নিবৃত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স, ও মাংস-নির্মিত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সন্ধান, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও অদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, গাছারী, ও পৃথার অমৃতপ্রহণ-পূর্বক অর্ঘ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন।” আশ্বমেধিক ৩০।

আবার অস্তস্থানে দেখুন

“তখন বেদ-পারদর্শী পুরোহিত ধোয়া বধাবিধি ক্রমশে আহুতি প্রদান পূর্বক চক্ৰপ্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চক্ৰ এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমতঃ মহেশ্বরের অর্চনা করিলেন।” আৰ্য্যমেধিক ৬৫।

মহাদেব প্রথমে মাংসপ্রিয় ছিলেন। আজকাল তিনি নিরামিষাশী।

যুধিষ্টির অশ্বমেধ-যজ্ঞ

“মনীষী ঋষিগণ শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, মৃগ ও জলজর সমুদয়কে সংস্থাপন করিয়া যুগ সমুদয়ে তিনশত পশু সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।” আৰ্য্যমেধিক ৮৮।

“অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ কমে-কমে সমুদয় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন।” আৰ্য্যমেধিক ৮৯।

“ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে পাণ্ডব মিত্রান নির্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।” আৰ্য্যমেধিক ৯০।

উপবি-উক্ক চ অংশমূহ হইতে ইত্যু উপলক্ষি হয় যে যজ্ঞকালে গো, বৃষ ইহারা অন্ত্য পশুর সহিত এক-পায়ায়-ভুক্ত ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাদিগকে অস্ত্র পশু হইতে কোনোরূপে পৃথক করিতেন না।

এবার আমরা দেখাইব পিতৃকার্য্যে এইসমস্ত পশুর মাংস ব্যবহৃত হইত।

“প্রস্থিবেদের ক্রিয়ানুষ্ঠান-কালে গ্রামা ও আরণ্যক পশুসকল স্বয়ং তাঁহাব নিকট সমুপস্থিত হইয়া ‘আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন’ বলিয়া উপাসনা করিত।” শান্তি ২০।

ঐয় যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন

“উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই আন্ধ করা উচিত।” অশ্বশাসন ২৩।

অন্ততঃ তিনি কহিতেছেন, “শ্রাদ্ধে মংস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুইমাস, মেঘ মাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শশ মাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজ মাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাংস, বরাহ মাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষত-নামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুক্ক মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে একবৎসরকাল তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঘৃত ও পায়স গোমাংসের দ্বারা পিতৃগণের শ্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃত ও পায়স প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য।

শ্রাদ্ধে বাপুীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর সুপ্তি-সুখ অশ্রুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস, কালশাক, ও যজ্ঞবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। অশ্ব-শাসন ৮৮।

কসাইয়ের দোকানে সর্কবিধ পশুর মাংস বিক্রয় হইত। এবং ঐ মাংস শ্রাদ্ধে ও দেবগণের পূজায় ব্যবহৃত হইত।

এক ব্রাহ্মণ মিথিলায় গমন কবিয়া দেখিলেন

“তপস্বী ব্যাধ সূনা মধো আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে।” বন ২০৬।

উক্ক ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন

“হে ব্রাহ্মসন্তম! বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন, যাতক কেবল নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ! আমরা যে সমুদয় পশুমাংস বিক্রয় করি তাহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়, কারণ উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর গোধি, লতা, পশু, মৃগ, ও পক্ষীসকল যে লোকের ভক্ষা ইহা কতিসিদ্ধ।” বন ২০৭।

ঋষিগণ যখন যে মাংস খাইতেন অগ্রে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তাহা সমর্পণ করিয়া তবে খাইতেন।

একবার তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কোনো খাদ্য না পাইয়া এক চণ্ডালের গৃহ হইতে কুক্কর মাংস অপহরণ করিয়াছিলেন।

“অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধিপূর্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধানপূর্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন কবিয়া স্বয়ং সেই কুক্করমাংস ভক্ষণ করিলেন।” শান্তি ১৪১।

এইরূপ বহুকাল চলিলে পর আৰ্য্যদিগের মধো মাংস-ভোজন-সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে কতকগুলি প্রাণীর মাংস নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কালের যেসকল উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায় তাহাকে আমরা দ্বিতীয় স্তরের রচনা বলিয়াছি ও নিম্নোক্ত ত অংশগুলি পাঠ করিলে এই দ্বিতীয় স্তর কিরূপ ছিল তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্বামিত্র যখন চণ্ডালগৃহ হইতে কুক্করমাংস চুরি করেন, তখন সেই চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পকনধ-সম্পন্ন শরীরী প্রভৃতি পাঁচ বৎসর ভক্ষণ করাই শাস্ত্র-সঙ্গত।” শান্তি ১৪১।

অল্প অল্প মাংসভক্ষণ এইসময় দ্বিজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

ভীষ্মদেব কহিতেছেন

“যে-ব্যক্তি কুকুর, বরাহ, মগুয়া, কুক্কট, বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্তব্য।” শান্তি ১৩৫।

মুরগী শূকর ও নরমাংস প্রভৃতি এই সময় হইতে সমাজে নিষিদ্ধ পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। এইসময় গোহত্যার বিরুদ্ধেও আন্দোলন উপস্থিত হয়।

“পূর্বে মহারাজ নহষ মধুপর্কদানসময়ে গোবধ করাতে মহারা তদ্বদনী ঋষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ‘মহারাজ তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও শ্রমপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া বার-পর-নাই গৃহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।’” শান্তি ২৩২।

“পূর্বে নরপতি বিচখ্যা গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞতুমিহ নির্দয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গো-সমূহেব আর্তনাদ অবগপূর্বক দয়ায় হইয়া কহিয়াছিলেন, ‘আহা গো-সমূহ কি কষ্ট ভোগ করিতেছে।’” শান্তি ২৩৫।

এই সময় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক গোহত্যা দর্শন করিয়া কাহারও-কাহারও দয়ার উদ্রেক হইতে লাগিল।

নরপতি বিচখ্যা আরও বলিতেছেন

“অহঃপর সমুদয় লোকে গো-সমূহের মঙ্গললাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংসারীরা সৃষ্টিপ্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসা-যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।” শান্তি ২৩৫।

একদা মহর্ষি ঋষি নরপতি নহষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে তিনি শাস্ত্রবেদ-বিধানানুসারে তাহাকে মধুপর্কপ্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে ‘হা বেদ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শান্তি ২৩৮। ইহার পর কপিল ও স্যামরশ্মিনামক ঋষি এই দুইজনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। স্যামরশ্মি গোহত্যার ও বেদবিধির সমর্থন করিতেছিলেন। যাহা হউক অনেক বিতণ্ডার পর কপিল স্যামরশ্মিকে স্বমতে আনয়ন করিলেন।

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন

“বৃষ, মৃত্তিকা, কুড় পিপীলিকা, স্নেহাঙ্কুর, বিঘ্ন, শব্দবর্জিত মৎস্য কচ্ছপ তিল চতুশ্দ মস্ত, মণ্ডুক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, হুর্ণ, চক্রবাক, মধ, বক, কাক, মধু, গৃহ, শ্রোন, উলুক ও চতুশ্দ পক্ষী, মাংসাশী মস্ত ও দ্বিদন্ত ও চতুর্দন্ত আর্ষির মাংস ভোজন এবং মেঘ, বড়বা, গর্ভাঙ্গী, উল্লী, স্তম্ভিকাবহা গাভী, মাদুরী, ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। শান্তি ৩৬।

এখন দেখুন বৃষ প্রভৃতি জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—

‘ছাগ, গো ও মধুরের মাংস, শুক মাংস এবং পর্বুযিতার ভোজন করা নিতান্ত গৃহিত।’ অনুশাসন ১০৪।

ইহার পরই অনুশাসন-পর্বের ৭৪ অধ্যায়ে একেবারে কঠিন অনুশাসন।

“যে-ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে-ব্যক্তি সকলকে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত খেদুর লোম-পরিমিত-বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। অনুশাসন ৭৪।

এই সময় হইতেই গোহত্যা ভারতবর্ষে রহিত হইয়া যায়। অনুশাসন পর্বের অল্প স্থানে এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে।

“পূর্বকালে মহাত্মা রুদ্ভিদেব স্বীয় যজ্ঞে গো-সমূহকে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মগতী নদী প্রবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুঘে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিঘ্ন হইয়াছে।” অনুশাসন ৬৬।

ইহার পর অনুশাসন-পর্বের ৬৩ হইতে ৮১ অধ্যায় পর্যন্ত এইসমস্ত অধ্যায়ে গো-সেবা ও গো-দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই সময় হইতে গোসমূহ পবিত্র ও দেবতাস্থানীয় হইয়া ভারতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

উক্ত অধ্যায়-সমূহের মধ্য হইতে দুই-একটি স্থান কেবল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ভীষ্ম কহিতেছেন

“এই ত্রিলোক-মধ্যে গো-সমূহ অগেফা পবিত্র বস্ত্র আর কিছুই নাই। গো-সমূহ দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে।” অনুশাসন ৮১।

মহর্ষি বিশিষ্ট সৌদামকে কহিতেছেন

“গোমাম কীর্তন করিয়া শরন ও গাত্রোথান, প্রাতঃকাল ও সারংকালে গো-সমূহকে নমস্কার, গোবৃন্দ ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য।” অনুশাসন ৭৮।

মহর্ষি চ্যবন নহষকে বলিতেছেন

“উহারা সমুদায় লোকের নমস্ত ও অমৃতের আধার-স্বরূপ।” গাভী স্বর্ণের সোণানস্বরূপ। স্বর্ণে দেবগণও উহার পূজা করিয়া থাকে। অনুশাসন ৫১।

ব্রহ্মা দক্ষ-হুহিতা স্মরণিকেকে বর দিতেছেন

“তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বা

করিতে পারিবে; তোমার লোক গো-লোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে।" অনুশাসন ৮৩।

যাক্, এখন আমাদের বক্তব্যে আসা যাক্। দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিলাম যে কতকগুলি পশু নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল। তৃতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই বৃথামাংসভোজন নিষ্পনীয় ও পাপজনক বলিয়া গণ্য হইল। যেসকল পশু দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় নাই তাহার মাংস অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইল।

ধর্মব্যাদ্য কৌশিককে কহিতেছেন

যে ব্যক্তি সর্বদা বিধানানুসারে শ্রদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত শ্রুতানুসারে তাহাকে অমাংসালী বলা যায়। বন ২০৭।

ভীষ্ম কহিতেছেন

"ধর্মরাজ, যাহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া স্থূথের নিমিত্ত অতোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাহারা খেচ্ছাচারী.....আর যাহারা বেদোক্ত-নিষিদ্ধ-অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন তাহারা ব্রতানুরাগী।" শান্তি ১২১।

অনুত্র তিনি বলিতেছেন

যে-মাংস মন্ত্রপুত্র ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃবজ্রাদিতে প্রদান করা হয় তাহাই পবিত্র ও শুভ্য এবং উচ্ছাতিত সমুদয় মাংসই বৃথা মাংস ও অশুদ্ধা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" অনুশাসন ১১৫।

শান্তিপর্কে তিনি বলিতেছেন

"বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্তব্য নহে।" শান্তি ১২৩।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে দানবগণকে পরিত্যাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মী বলিতেছেন

"তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন, ও শঙ্কুনি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদয় পাক করাইয়া থাকে।" শান্তি ২২৮।

পূর্বে কৌশিকী তীর্থে অগস্ত্য ঋষির মৃগাল অপহৃত হইলে তত্রত্য ঋষিগণ আপনাদের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য শপথ করিতে লাগিলেন। শুক্র কহিলেন "যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে সে বৃথামাংস ভোজন করুক।"

ইহার পর চতুর্থ স্তর। এই স্তরে সর্ববিধ মাংস ভোজনই নিষ্পনীয় বলিয়া গণ্য হইল। যজ্ঞের সময়ও পশুবধ নিষিদ্ধ হইল ও যজ্ঞে পশুহত্যাকারিগণকে ক্ষুদ্র-

স্বভাব ধূর্ত ও পিশাচ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সমগ্র শান্তি ও অনুশাসন পর্ক এবং বনপর্কের অনেকাংশ এই অহিংসা ধর্মের মাধ্যমে পরিপূর্ণ। আমরা এই স্তরের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞে পশুবধের সময় উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়াজ্ঞে ইন্দ্রকে সহোদনপূর্বক কহিলেন

"দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে।..... যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্র-সম্মত নহে।" আশ্বমেধিক ১১।

তুলাধার নামে এক বণিক্ কোনো ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন

"সকল মূঢ় ব্যক্তির গুণিপরিত্যাগপূর্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।" শান্তি ২৬৩।

নরপতি বিচক্ষু বলিতেছেন

পূর্বেই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্ত, ভালরস ও ববাগুতে আসক্ত হইয়া থাকে।" শান্তি ২৬০।

দেবস্থান কহিতেছেন

"বিদ্বান্ ব্যক্তির এইসমস্ত বিষয় সমাক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" শান্তি ২১।

ভীষ্ম কহিতেছেন

অহিংসা, সত্য, অনুশাসনতা ও দয়াই যথার্থ তপস্তা।" শান্তি ৭৯।

ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিতেছেন

"যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অজ্ঞাত সমুদয় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্মে অজ্ঞাত সমুদয় ধর্মই বিলীন রহিয়াছে।" শান্তি ২৪০।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন

"মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শুভ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।" অনুশাসন ১১৬।

অনুত্র তিনি বলিতেছেন

"মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদয় স্থূথ উৎপন্ন হয়।" অনুশাসন ১১৫।

মহেশ্বর পার্কীতীকে কহিতেছেন

"যাহারা বীতরাগ হইয়া কারমনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেনতাহারাই কর্মপাণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাহারা সর্বভূতে দয়াবান্; সকলের বিশ্বাস-পাত্র, হিংসা-বিহীন,.....তাহাদিগের বর্গলাভ হয়।" অনুশাসন ১৪৪।

ব্রহ্মা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন

"সর্বভূতে অহিংসাই পরমধর্ম ও প্রধান কার্য।" "যাহারা হিংসা-

পরায়ণ নাস্তিক ও লোভমোহে একান্ত আসক্ত, তাহার নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে।” আখ্যমৈত্রিক ৫০।

এইরূপ বহু স্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহ্যিক ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। সমস্ত উক্তির সারমর্ম একরূপ। অহিংসা-ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ। এই যুগকে বৌদ্ধযুগ বলিয়া বোধ হয়। এই যুগে মন্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র নিম্নস্তরে অনাধ্য জাতির মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এ-যুগের অবসান হইল; এবং পূর্বে ঋষিগণ যাহাদিগকে ধূর্ত ও

পিশাচ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাদিগের বংশ-ধরেরা নানা দেবদেবীর আবিষ্কার করিয়া তাহাদের পূজায় পুনরায় মন্য মাংস চালাইতে লাগিল ও সেই সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া নানারূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লাগিল ও তাহাদের নাম দিল তন্ত্র। আমরা আজকাল ঐসমস্ত গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া মন্য মাংসকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। বলা বাহুল্য এইরূপ লোককেই আমাদের বহুদর্শী ঋষিগণ ধূর্ত ক্ষুদ্রস্বভাব লোভী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

বাক্‌দেবী

শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

কলা ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতীর পূজা বিভিন্নভাবে ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে যুগে-যুগে দেশে-দেশে হ'য়ে আসছে। কেউ নদীর ধারে ব'সে বিদ্যার আরাধনা করে-ছিলেন,—সেই নদীই সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হ'ল, কেউ গ্রন্থকে বাক্‌দেবীর প্রতীকরূপে পূজা করলেন, কেউ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বীণাকে বাণীর কমল-করে তুলে দিলেন, হংসের কলতান ও বাণীপূজকদের দৃষ্টি এড়ালো না; সর্বোত্তর, কমল, বসন্তকাল সবট বিদ্যার সঙ্গে একত্র হ'ল। কোন স্মরণাতীত যুগে এইসব মিলিত হ'য়ে সাত্ত্বিক শ্বেত-বর্ণের সরস্বতী, বীণা-পুস্তক-কমল-হস্তা বাণী বসন্তের শুভ আগমনে মানবের মানসলোকে জেগে উঠেছিলেন; সে-দিন হ'তে এই শাস্ত্র মাঘোৎসবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ভারতের সর্বত্র প্রতিমা গড়ে অন্তর ও বাহিরের অর্ঘ্য-সম্ভারে বাণীর পূজা ক'রে আসছেন।

“বা কুন্দেন্দুভুবার-হার-ধবলা বা শুভবস্ত্রাবৃত।

বা বীণাবর-নগ্নমণ্ডিতকরা বা শ্বেতপদ্মাসনা।”

হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে দেবী সরস্বতীর ভিন্ন-ভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীতে বাণীর দশটি নামের উল্লেখ আছে;—

মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্‌ সরস্বতী।

আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী। ১৬, চণ্ডী প্রা. রঃ.

এই চতুর্দশে সরস্বতীর অনেকগুলি নাম রয়েছে, ইনি বেদগর্ভা আর ধীশক্তির ঈশ্বরী। অন্তর ইনি “মহালক্ষ্মী” নামে অভিহিতা হয়েছেন।

“ভামিতুজ্ঞা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপয়ং নৃপ।

সম্বোধনাবতিগুণেন গুণেনেনুপ্রভং দধৌ। ১৪, চণ্ডী; প্রাধানিকং রঃ

মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, আর্য্যা, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি বিদ্যাদেবীগণের স্বরূপ হচ্ছে এইরকম;—

“অক্ষয়ানুশুধরা বীণাপুস্তকধারিণী। ইত্যাদি

১৫, চণ্ডী, প্রাধানিকং রহস্যম্.

হিন্দুধর্ম গ্রন্থাদিতে অষ্টভূজা সরস্বতীরও উল্লেখ আছে, ইনি শুভ আর নিশুভ অক্ষরদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এঁর আঁটহাতে ষষ্ঠাক্রমে বাণ, মুঘল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাজল আর কার্মুক আছে, এই দেবীর আরাধনায় সর্ব-শাস্ত্রবিশারদ হওয়া যায়। এর স্বরূপ হ'ল এই;—

‘গৌরী দেহাৎসমুচ্ছতা বা সর্বৈকগুণাভরা।

সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাঙ্গনিবহিণী। ১৪

দধৌ চারুভূজা বাণান্ মুঘল শূলচক্রকৃৎ।

শঙ্খং ঘণ্টাং লাজলক কার্মুকং বহুধাধিপ। ১৫

এয়া সম্পূর্ণিতা ভক্ত্যা সৰ্ব্বভবঃ প্রবহতি ।
নিমন্তনধিনী দেবী শুভাহরনিহিণী ।

১১, চণ্ডী, বৈকুণ্ঠিকং রহস্যম্

এই বর্ণনাংশ থেকে জানতে পারা যায় যে, এই সরস্বতীর আর-একটি নাম নিমন্তনধিনী ; স্থানান্তরে সরস্বতীকে মহাকালী বলা হয়েছে, এইদেবী 'খড়্গমালাকুশপুস্তকধরা', শববাহিনী, এঁর রূপায় ধর্মশাস্ত্রাদিতে জ্ঞানলাভ করা যায় ।

হিন্দু তন্ত্রাদিতে নীল সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তা থেকে জানতে পাওয়া যায়, এই দেবীর নাম কৃষ্ণা আর নীল সরস্বতী :—

“তরণ শাস্ত্রী.....তন্ত্রত্রিণী ।

উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীলসরস্বতী । ৩, সুগমালচয়

স্থানান্তরে নীল সরস্বতীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তদনুসারে ইনি শবাকৃতা চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা ; চার হাতে অসি, নর-কপাল, নীলকমল আর খড়্গ আছে, এর অর্চনায় সৌভাগ্য ও সম্প্রলাভ হয় ।

মাতনীলসরস্বতি.....মৌভাগ্যসম্প্রদে ।

প্রত্যালীচপদস্থিতে শিবজ্জি শ্মেরাননাস্তোকহে ।

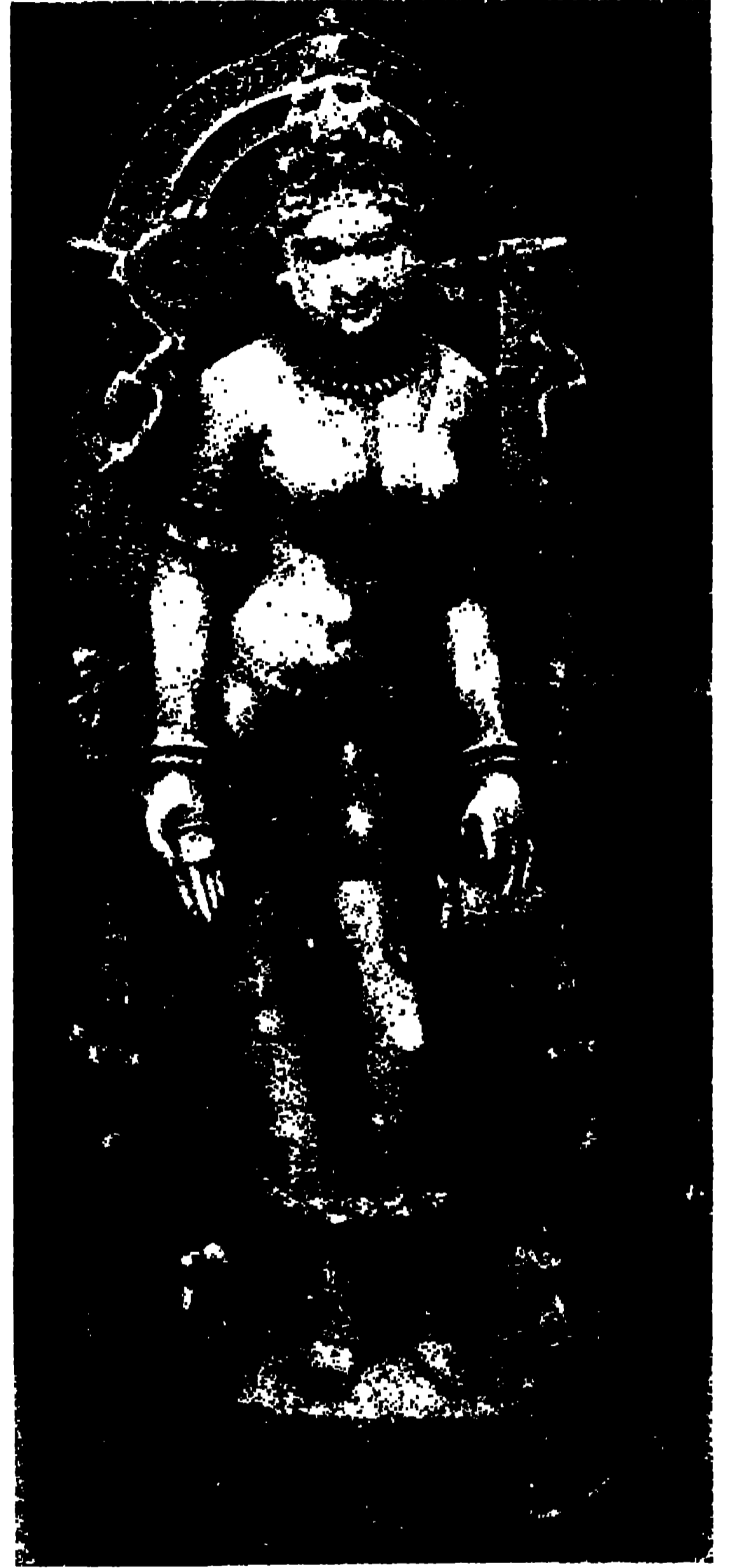
কুলেন্দীবরলোচনত্রয়বৃতে কল্পীঃ কপালোৎপলে ।

খড়্গকাদধতী ভ্রমেব শরণঃস্থানীধরীমাজরে । ১, নীলতন্ত্র

এই দেবীর রূপ অত্যন্ত ভয়াল, অন্যত্র ইনি 'দশমহাবিদ্যা'র এক বিদ্যারূপে বর্ণিতা । বেদ এবং অন্তান্ত্র বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বাণীদেবীর যে বর্ণনা আছে তাতে ইনি শ্বেতকমলাসনা, শ্বেতবর্ণী বীণাপুস্তক-কমলধারিণী । এই ত হ'ল আমাদের হিন্দু বিদ্যা-দেবীর বর্ণনা আর তাঁদের স্বরূপ ।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও বিদ্যাদেবীর অর্চনা করেন, তাঁদের সরস্বতীর বর্ণ নীল, ইনি নীলাঙ্গী, নীলকমলাসনা, ডমরু আর শূলধারিণী । এঁর রূপায় সর্ববিদ্যালাত্ত হয়, এই বৌদ্ধদের ধারণা । এই সরস্বতী ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে অন্য-কোনো বিদ্যাদেবীর নাম বা রূপের উল্লেখ পাওয়া যায় না ।

হিন্দুদের মতো জৈনরাও বাণীর অর্চনা করেন । মাঘ-মাসের পঞ্চমীর দিন উপবাসী থেকে তাঁরাও ষথানিয়মে লেখনী পুস্তকাদির পূজা করেন, বিদ্যার উপকরণগুলিকে



দেবী সরস্বতী মহামানসী বা নির্ঝাণী

তাঁরা বিশেষ যত্ন করে স্থাপন করেন, মাঘ মাসের এই পঞ্চমী জৈনদের মধ্যে “জ্ঞান-পঞ্চমী” নামে প্রসিদ্ধ ।

জৈন ধর্মশাস্ত্রে একজন নম্র, বোলো জন সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায় । এ-সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত, এইসব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত জৈন গ্রন্থে ষোড়শ বাণীর বিস্তৃত পরিচয় আছে । শ্বেতাশ্বর জৈনদের কর্মকাণ্ডের বই “আচারদিনকর” আর দিগম্বর সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠা-সারোদ্ধার নামক গ্রন্থেই বিশেষ ক'রে এঁদের বর্ণনা করা হয়েছে।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতেও ষোড়শ বাক্‌দেবীর নাম পাওয়া যায়।



সরস্বতী দেবী পুরুষদত্তা

জৈন-ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে উপরের ঐ ষোলজন সরস্বতীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সেগুলিও খুব চিত্তাকর্ষক।

রোহিণী—ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ, অক্ষমালা, ধনু ও বাণধারিণী, বর্ণ এঁর “কুম্ভ-ভূষার-গোরা” গীতচরপ্রভবা বলে বর্ণিত। দিগম্বরের বইয়ে এরই অন্তরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, সে-বর্ণনায় রোহিণীর চিহ্ন—কুম্ভ, শঙ্খ, ফল ও কমল, এর অর্চনায় পরা দৃষ্টি লাভ হয়, ইনি গোবাহিনী।

প্রজ্ঞপ্তি দেবী—ইনি প্রজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত। দুটি হাত, এক হাতে শক্তি অস্ত্র অন্ত হাতে কমল, আভা এঁর কমলের মতন, ময়ূরবাহিনী। দিগম্বরের মতে ইনি

ধৃগা ও চক্রহস্তা; দৃপ্‌জান, চরিত্র ও তপের দেবী ইনি।

—প্রতিষ্ঠাসারোদ্ধার MSS in Arrah Gaina Bhavan
বজ্রশৃঙ্খলাদেবী—ইনি পদ্মাসনা শৃঙ্খল ও গম্ভাহস্তা। এঁর কৃপায় বৃত ও শীল লাভ হয়; বৃত ও শীল বজ্রশৃঙ্খলের মতনই দৃঢ় হওয়া দরকার, তাই বোধ হয় বজ্রশৃঙ্খল এঁর রূপক।

দেবী বজ্রাক্ষা,—হাতে অক্ষুণ্ণ ও বীণা, বাহন পুষ্পধান, বীণা বাণীর একটি বিশেষ স্মারকচিহ্ন; ইনি জ্ঞানদান করেন;—

বাণী চক্রেশ্বরী—ইনি গরুড়বাহিনী, আয়ন- ও চক্র-হস্তা। দিগম্বরের গ্রন্থে এঁকে জাম্বুনদ বলে।

হিন্দুশাস্ত্রেও ময়ূরবাহিনী সরস্বতী আছেন, বৌদ্ধ-ধর্মেও এইরূপ বাণীর উল্লেখ আছে। চক্র বা ধর্মচক্র বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের একটি প্রধান চিহ্ন।

পুরুষদত্তাভারতী—এঁর বাহন কোকিল হাতে বজ্র ও কমল, এই দেবীর অর্চনায় শক্তি সংঘর্ষ ও ত্যাগলাভ হয়, ইনি পুরুষদান করেন। উপরোক্ত গুণত্রয় পৌরুষের লক্ষণ।

দেবীকালী—এঁর বাহন মৃগ, একহাতে মৃগল অন্ত-হাতে তলোয়ার—মতান্তরে মৃগল ও গদা। এই দেবীর দ্বায় তপ: ও বীর্ষ লাভ হয়।

মহাকালী—ইনি শ্রামাদী—শবারুঢ়া চতুর্ভুজা; চার হাতে যথাক্রমে ধনু, ধৃগা, ফল ও অস্ত্র।

সমাধিকামীরা এই দেবীর পূজা করেন। শবসাধনা সমাধিলাভের এক উপায়; সম্ভবত সেইজন্যই ইনি শবারুঢ়া-শ্বেতাশ্বর মতে ইনি ফল, ঘণ্টা, অক্ষুজাদি-ধারিণী। হিন্দু-শাস্ত্রেও বাণীর মহাকালী-রূপের বর্ণনা আছে।

সরস্বতী গৌরী—ইনি কুম্ভ-কর্পূর-নিম্মল-বর্ণা পদ্ম-হস্তা গোধাবাহিনী। ইনি তপস্বীগণের আরাধ্যাদেবী।

দেবী গাঙ্কারী—ইনি মৃগল- ও বজ্রধৃতা, মূর্তি এঁ

কমনীষ ; দিগম্বরমতে ঐর এক হাতে চক্র অস্ত্র হাতে অসি, আর বাহন হচ্ছে কূর্ম। এই দেবীপূজায় ভক্তি-লাভ হয়।

মহাঙ্কালাদেবী—এই দেবীর বর্ণ শশাঙ্কধবল, বাহন বিড়াল। দিগম্বর-মতে—চার হাতে ধনু, খেটক, খড়্গা ও চক্র থাকে। আর বাহন—মহিষ। ঐর দ্বায় সাধুসন্ন্যাসীর ভক্তি লাভ হয়; এই দেবীর অস্ত্র নাম জালামালিনী।

দেবী মানবী—এই দেবী নীলাঙ্গী আর নীলকমলা-সনা, প্রধান চিহ্ন ঐর ত্রিশূল।

বাণী বৈরাটী—ইনি খড়্গাংস্তা সিংহবাহিনী, বর্ণ ঐর তুম্বারগোর।

সরস্বতী অচ্যুতা—এই দেবীর হাতে খড়্গা আর কাম্বুক আছে, বাহন ঐর অশ্ব; শ্বেতাধর-মতে নাম—অক্ষুণ্ণা।

মানসীদেবী—সর্পবাহনা ইনি; হিন্দু দেবী মনসার সঙ্গে ঐর খুবই সাদৃশ্য আছে।

দেবী মহামানসী—এই দেবীর চার হাতে অক্ষুত্র, বর, অক্ষণ আর মালা আছে, ইনি হংসবাহনা। এই দেবীর স্বরূপ ঠিক হিন্দু বিদ্যা দেবীর মতন, শ্বেতাধর-মতে ঐর হাতে বই, কমণ্ডলু, কমল আর পদ্মলাল আছে; তারা এই সরস্বতীর নাম রেখেছেন—নির্ঝাণী।

শ্বেতবর্ণই জ্ঞানের প্রকৃত বর্ণ, তাই এইসব বর্ণনায় কেউ বা কুম্ভধবলা কেউ বা তুম্বারগোঁরা। নীলবর্ণা বাণী হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন তিন ধর্মশাস্ত্রেই আছেন। বই, হংস, কমল, অক্ষুত্র, বীণা, কোকিল, ময়ূর, শঙ্খ ইত্যাদি বিদ্যা ও কলা-শিল্পের যেন প্রধান অঙ্গ। এখন ভাব্‌বার কথা এই যে, জৈন ধর্মাবলম্বীরা বোলোজন সরস্বতীর কল্পনা করলেন কেন? আমাদের মনে হয়, চৌষটি কলার প্রধান চতুর্থাংশ কলা ও বিদ্যার দেবীরূপে যোড়শ বাণীর কল্পনা হয়েছে। রুচি-অহুসারে দেবতা ভিন্ন-ভিন্ন হন। এই যোড়শবিদ্যাদেবীর মধ্যে কেউ জ্ঞান, কেউ প্রতিভা, কেউ ভক্তি, কেউ শক্তি দিচ্ছেন, কেউ চরিত্র, শীল, ব্রত দিচ্ছেন, কেউ বা ধর্ম দিচ্ছেন, এই সবগুলির মিলনই বাণীর সনাতনী মূর্তি, এই মূর্তিই একদিন আর্ধ্যগণের মানসলোকে জেগে



মানসী দেবী সরস্বতী

উঠেছিল, ভারতবাসী সেই প্রতিমাকেই হৃদয়পীঠে বসিয়ে আজও ভক্তি-অর্ঘ্য দিচ্ছেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সকল ধর্মাবলম্বীই পুণ্য মাঘোৎসবে বাণীর অর্চনা করেন। পূণ্যপঞ্চমী তিথিকে কোনো ধর্মাবলম্বী “বসন্ত-পঞ্চমী,” কেউ বা “বিদ্যাপঞ্চমী,” কেউ আবার “জ্ঞান-পঞ্চমী” নামে অভিহিত করেছেন। এই চিরন্তনী তিথিটিতে সমগ্র ভারতে সকল ধর্মাবলম্বীই সাগ্রহে বাণী-অর্চনা করেন, তবে বাংলার বাণীপূজা অন্যান্য প্রদেশের বাণী-পূজার চেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ আর মনোরম।

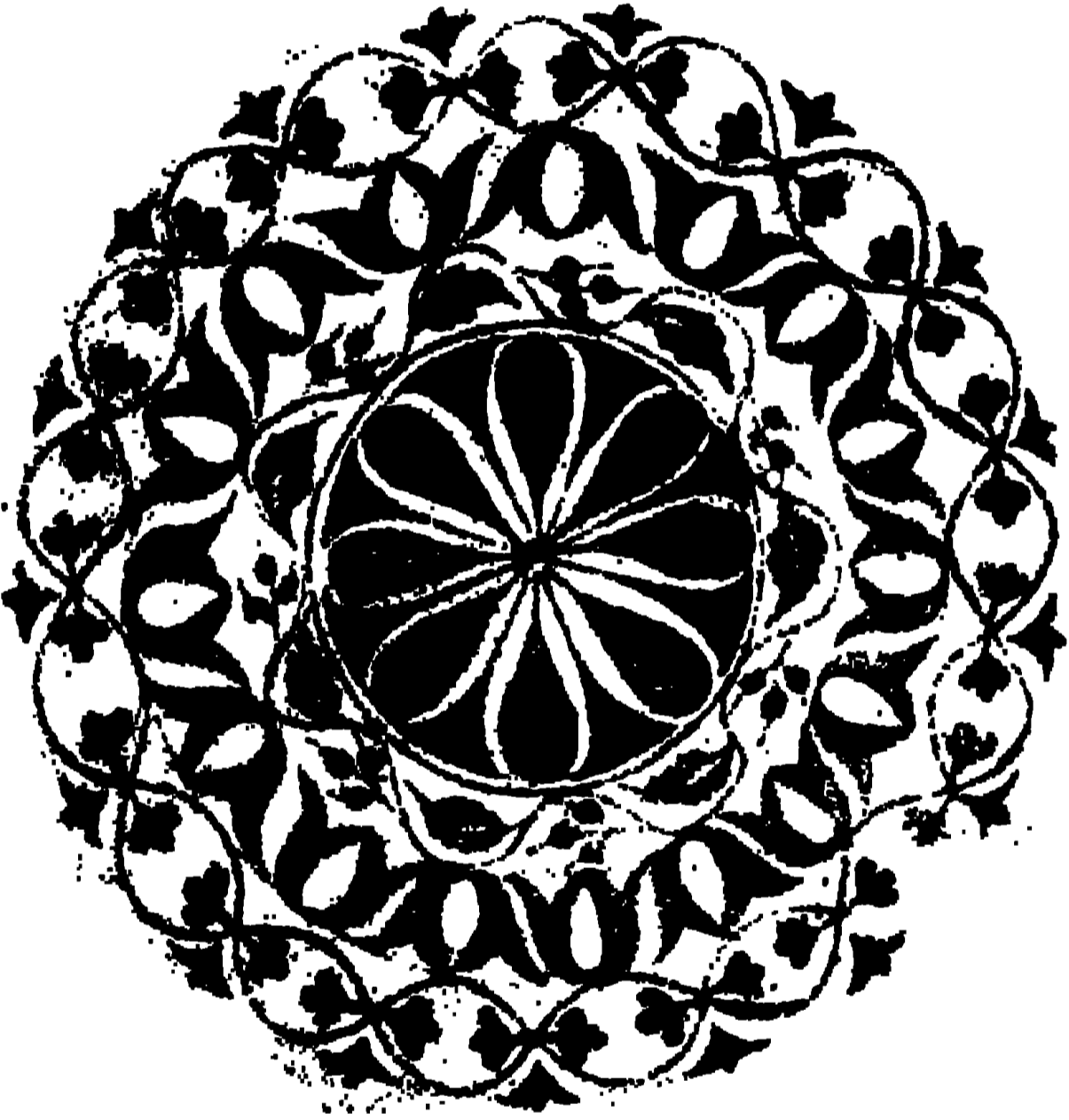
চিত্র-শিল্পে পল্লীরমণা ও আল্পনা

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস

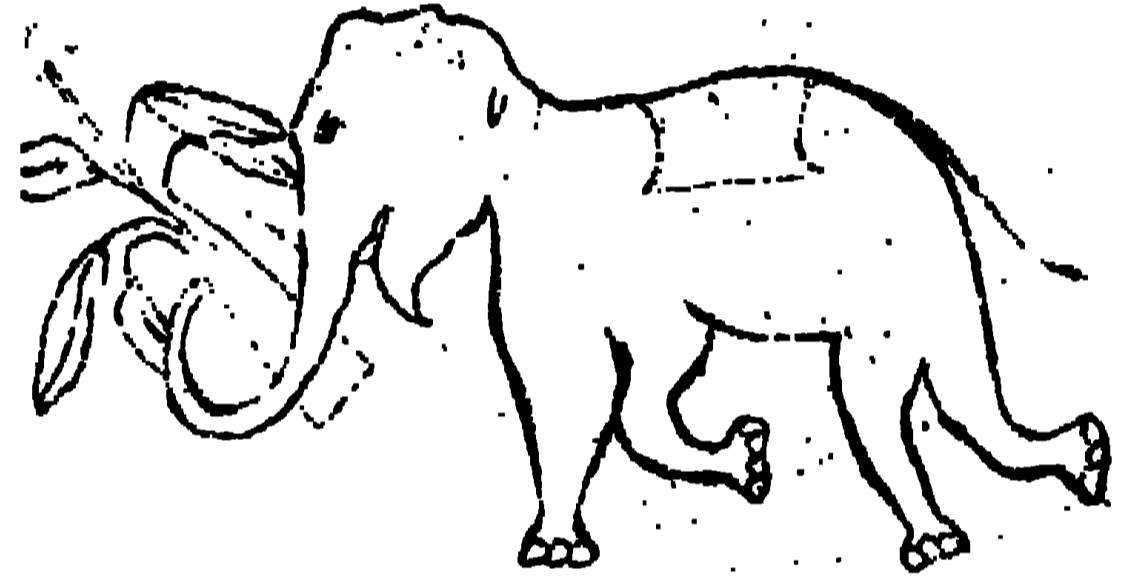
অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে বঙ্গ জননা গণের চিত্র-শিল্পে রুচি ও অধিকার আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই প্রবন্ধে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আল্পনা দেওয়ার প্রথা বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই

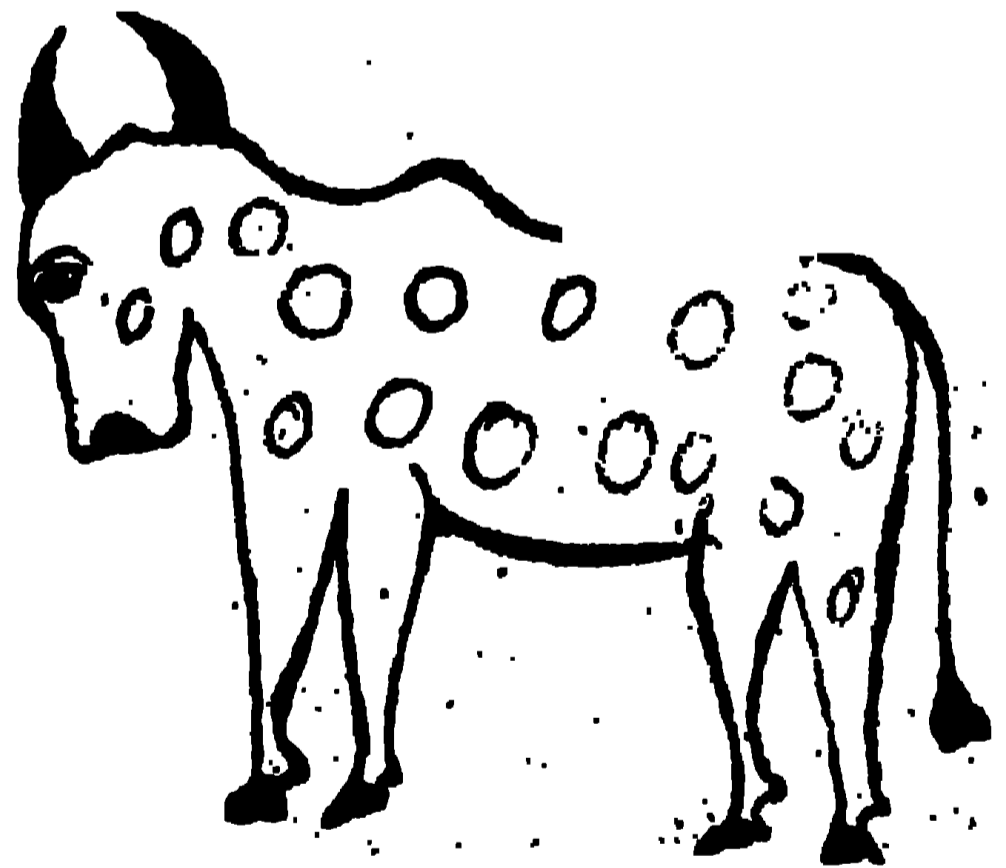
বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। ক্ষুদ্রবৃহৎ সর্বপ্রকার পূজা-পার্বণে এবং অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক শুভাহুষ্ঠানেই পুরাঙ্গণাগণ সর্বোচ্চে আল্পনা দিয়া থাকেন; ইহা স্ত্রী-আচারের প্রধান অঙ্গ। আল্পনা দেওয়ার সহিত বাহ্যতঃ ধর্মের সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতির যথেষ্ট।



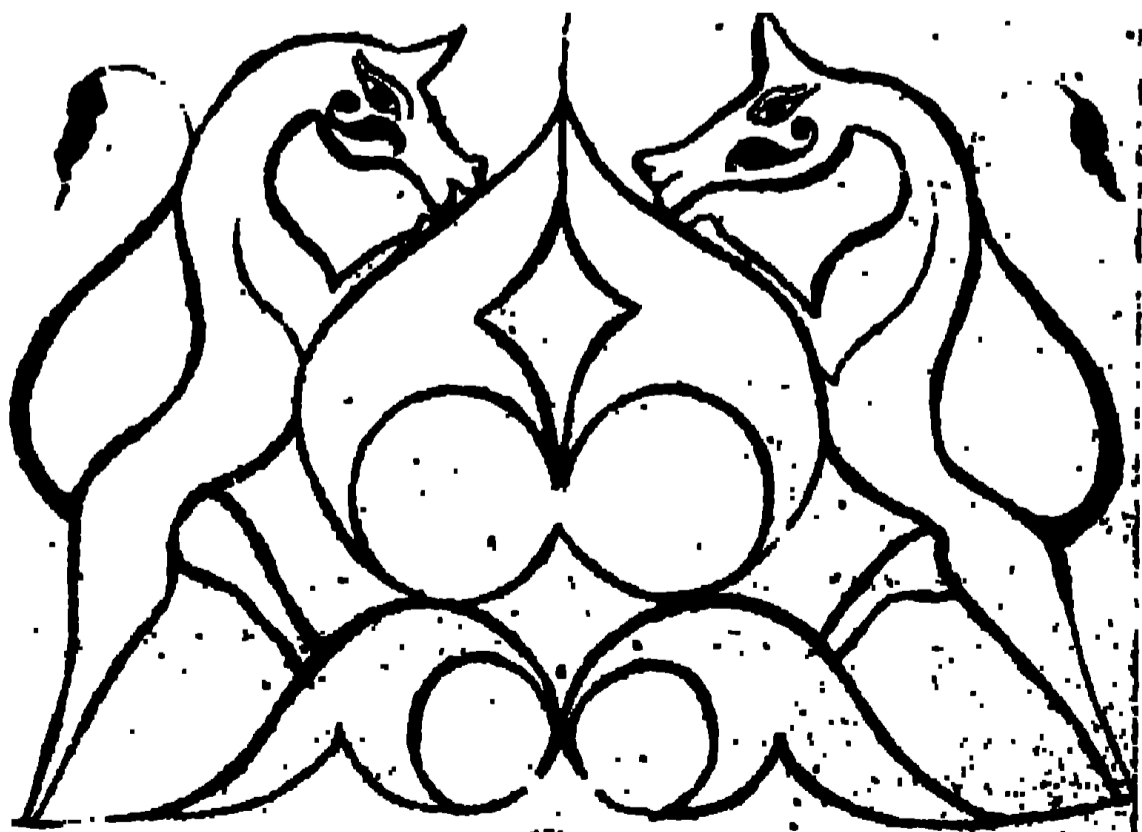
১নং চিত্র—গোবর-আল্পনার দিন অঙ্কনে এই আল্পনা দেওয়া হয়



৩নং চিত্র

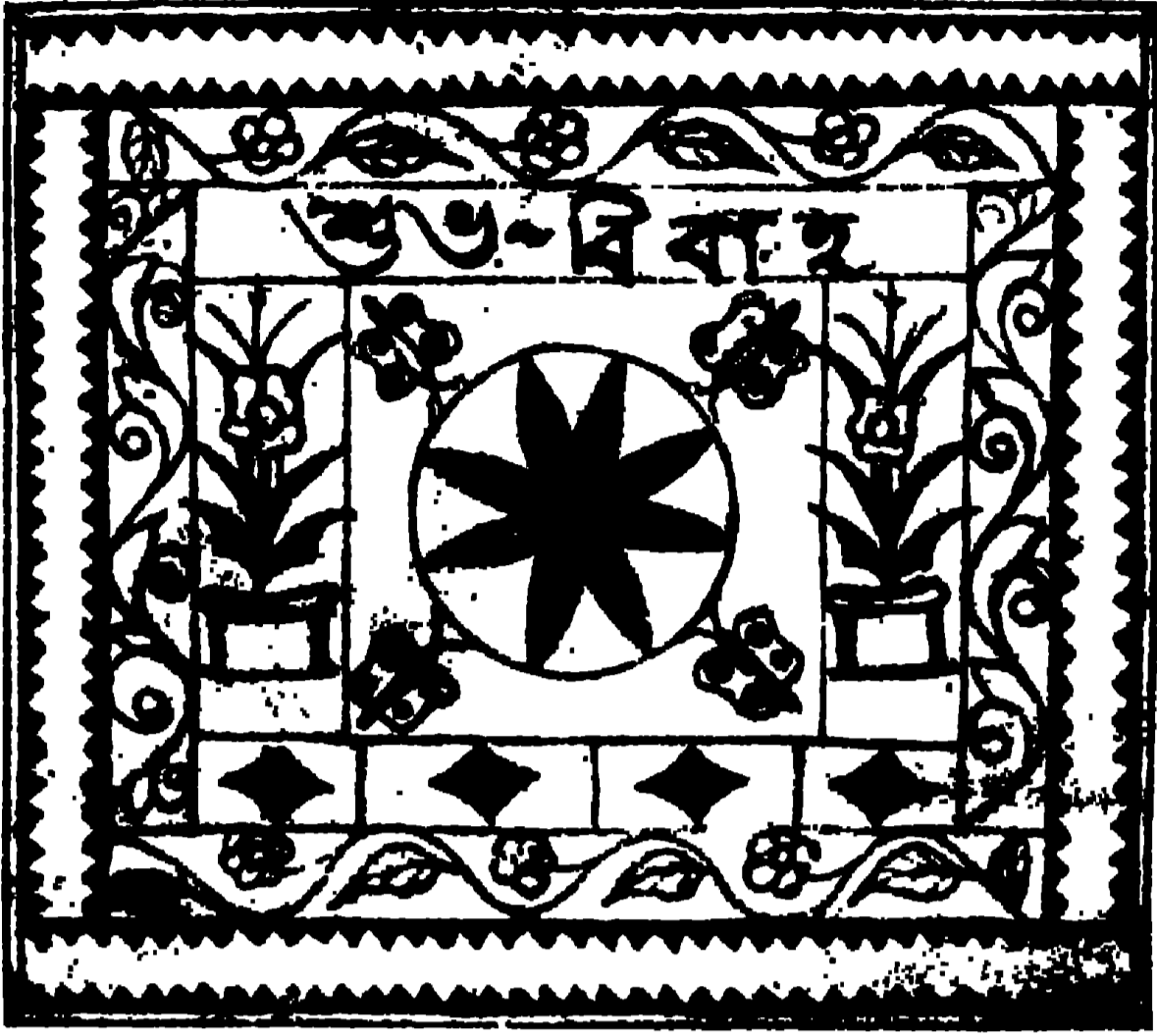


৪নং চিত্র—গোবর-আল্পনার দিন গরুর গায়ের আল্পনা



২নং—চিত্র

আল্পনা দিবার নিয়ম—অন্যান্য অনাহারে থাকিয়া আল্পনা দেওয়ার নিয়ম। আতপতগুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা ঘন ছদ্মের স্রায় হইলে উহাতে তুলিকা কিম্বা বাঁশের কলম ডুবাইয়া আল্পনা দিতে হয়। প্রাচীনকাল হইতে এই যে আল-



১নং চিত্র—বিবাহের সময় বর যে পিড়িতে বসে তাহার উপরের আল্পনা



২নং চিত্র—পুকুর-পূজার ছবির আল্পনা

পনা দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে ইহাতেই আমরা বিশেষ করিয়া পল্লীবালাগণের চিত্র-শিল্পের প্রতি অসুরাগ ও দক্ষতা বুঝিতে পারি। গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যশুরভঞ্জন আল্পনা শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিয়া আমাদের পাবনা জিলার পল্লীসমূহের আল্পনার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হই এবং সেই জন্য আমি মেয়েদের নিকট হইতে আল্পনার



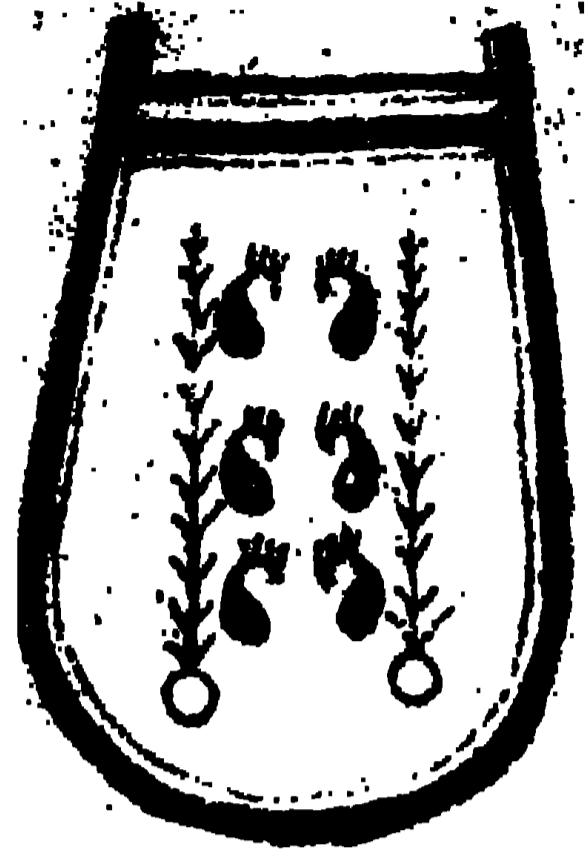
৩নং চিত্র—কোম্বাগরী লক্ষ্মীপূজার লক্ষ্মীর আসন হইতে বরের দরজা পর্যন্ত মেয়ের উপরের আল্পনা

আদর্শ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে-কয়টি পাইয়াছি তাহাই দেখাইতেছি।

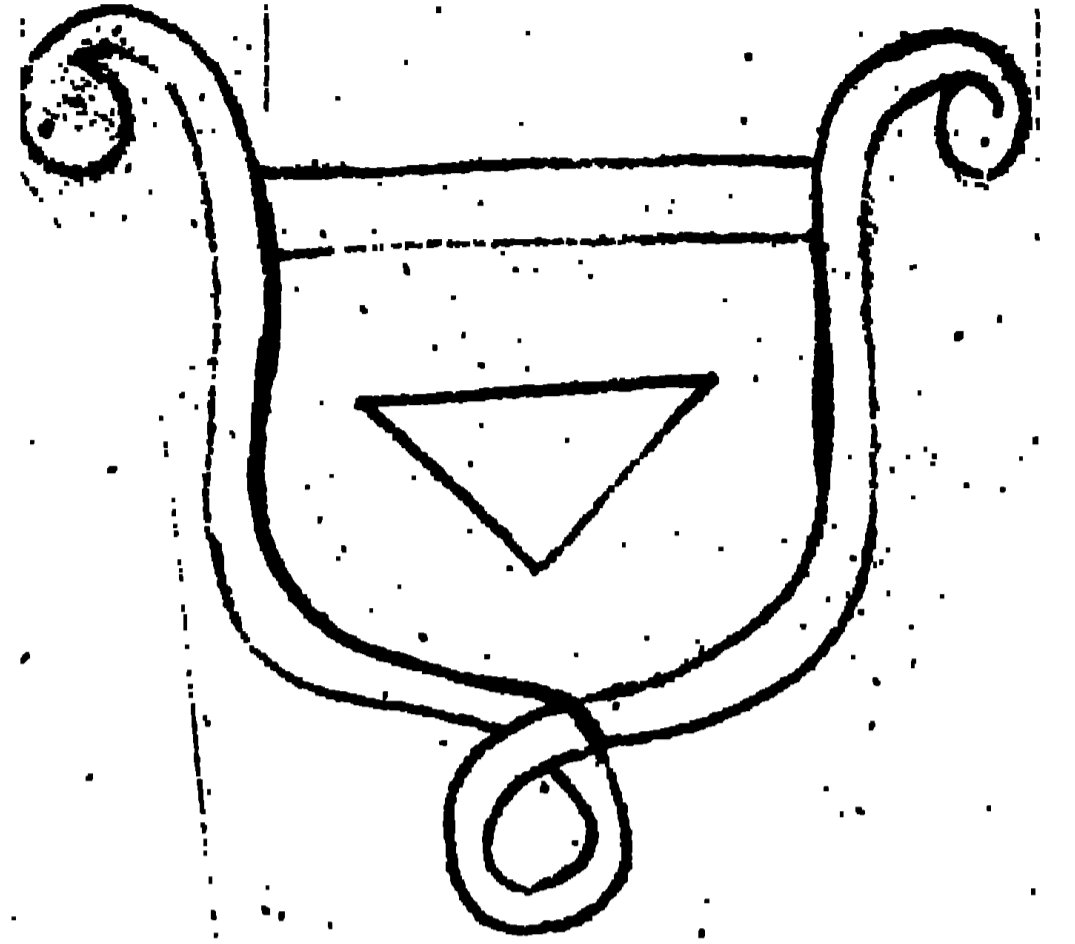
"গোবর আল্পনা।"—পাবনা জিলার শিরাঙ্গগঞ্জ মহকুমার পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব দিবস "গোবর আল্পনা" বলিয়া মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান বা উৎসব হয়। ঐ দিবস প্রাক্কণাদি উত্তমরূপে নিকানো হয় এবং প্রাক্কণ শুক হইলে পূর্বাঙ্ক ৭।৮ ঘটিকার সময় বাটির গৃহিণী, বধু ও মেয়েরা স্নান করিয়া আসিয়া অনাহারে থাকিয়া আল্পনা দিয়া থাকেন। প্রথমে গৃহিণী সূচনা করেন, পরে অন্যান্য-সকলে নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে পান।

ঐদিন রাখালগণ প্রত্যয়ে স্নান করিয়া গাভীদের পুচ্ছাগ্রভাগ কাটিয়া দেয় ও আল্পনার জলে কস্কের মাথা ডুবাইয়া গরুর গায়ে ছাপ দিয়া থাকে। এই প্রথাকে "গরুকে পিঠা খাওয়ানো" বলে। গোবর আল্পনার দিবস অবধি যে আল্পনা দেওয়া হয় তাহার কয়েকটি নমুনা ১—৩ নং চিত্রে দেখানো হইল।

এতদঞ্চলে কুমারীগণ বাড়ীতে ক্ষুদ্র একটি পুকুর কাটিয়া উহা নানাবিধ পুষ্পে সজ্জিত করিয়া কার্তিক মাসের প্রথম দিবস হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত একমাস কাল পূজা দিয়া থাকে। ইহাকে পুকুর-পূজা বলে। এই পূজার ফলে নাকি আশাহুরূপ বর পাওয়া যায়। এক বাড়ীতে ২।৩টি বালিকা থাকিলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পুকুরের



৮নং চিত্র—সম্বী পূজার কুলাব পৃষ্ঠের আল্পনা



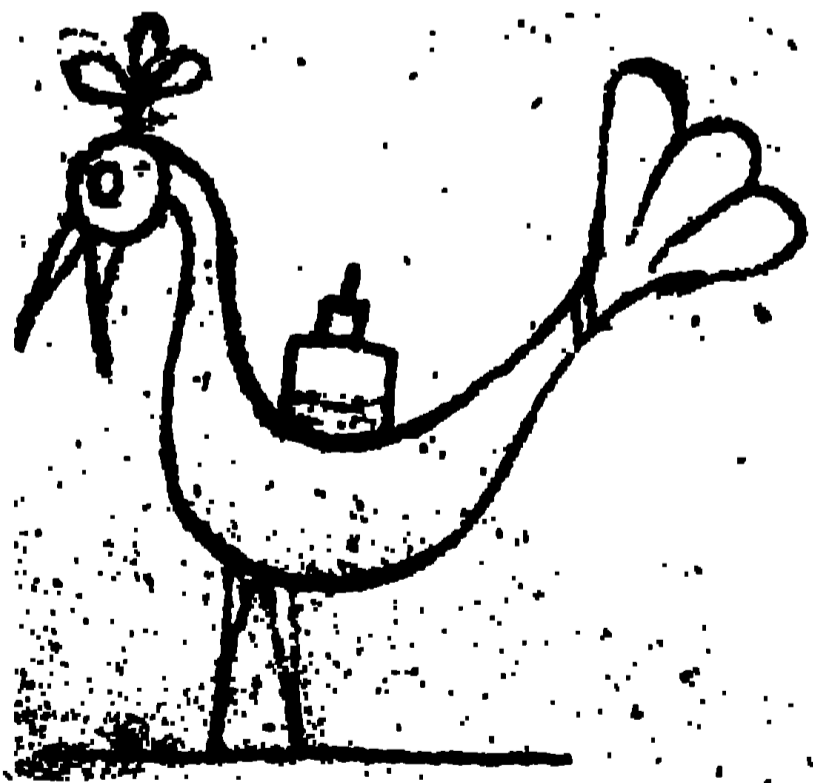
১১নং চিত্র—মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়া আঁকা



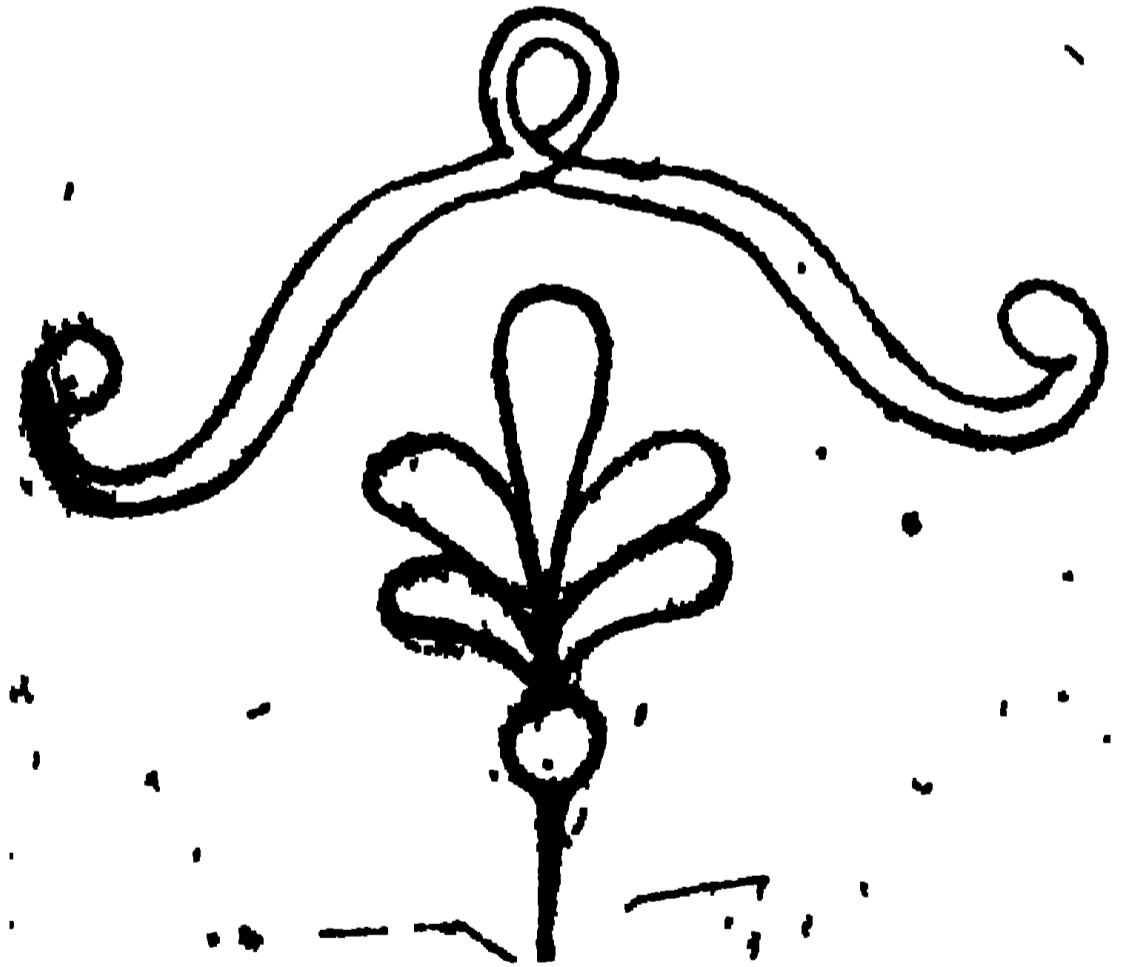
৯নং চিত্র—সম্বী পূজার দিন গভোক ঘরের সম্মুখে এইপ্রকার আল্পনা দেওয়া হয়

প্রয়োজন! প্রতিদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেয়েরা পুষ্প চয়ন করে, পরে অরুণোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্নান করিয়া আসিঙ্গা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে—

পূণ্যপুকুর পুষ্পমালা ।
কে ভঙ্গিবে ছপুং-বেলা ॥
আমি মতী পীনাগী ॥
সাত ভাইয়ের বোন্ ভাগ্যবতী ॥
পতির কোলে পুত্র থুরে (১) ।
ভক্তি গেন বাবুনের কুলে ॥
মরি যেন পত্রা কুলে ।
পড়ি গেন শিবচূর্ণার পদতলে ॥”

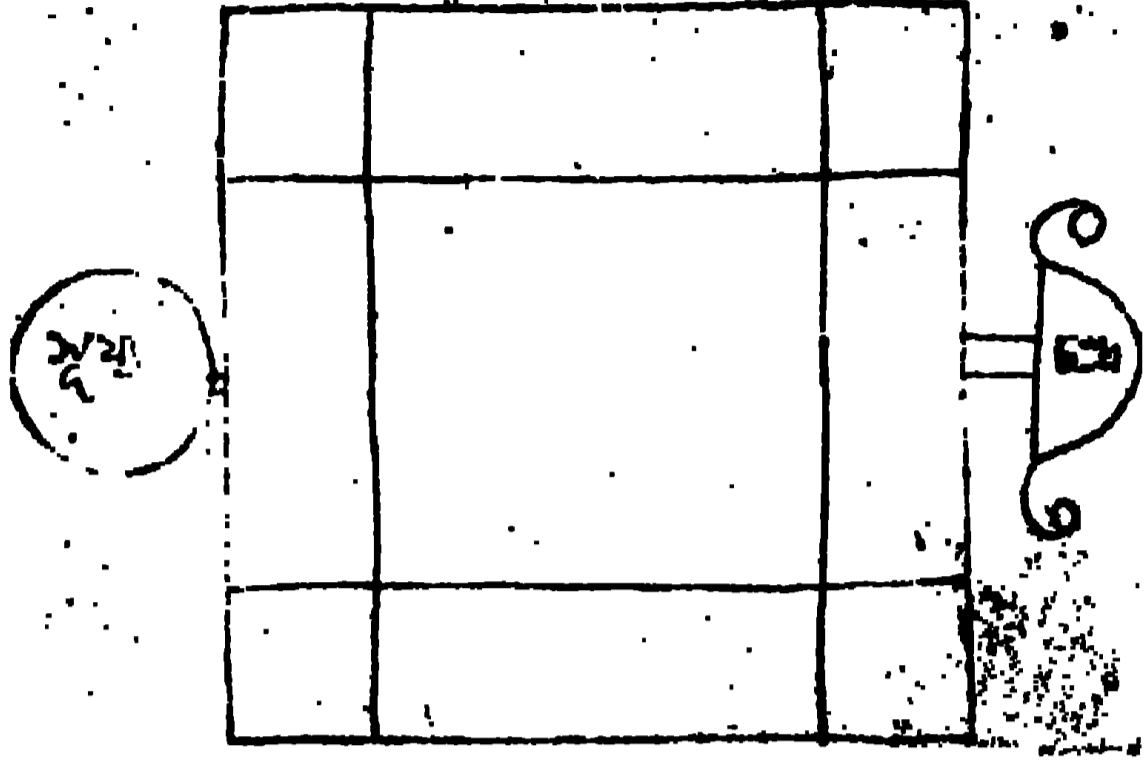


১০নং চিত্র—এই চিত্রের পৃষ্ঠের উপর কেরোসিনের আলো, জেলের বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়া আঁকা হয়

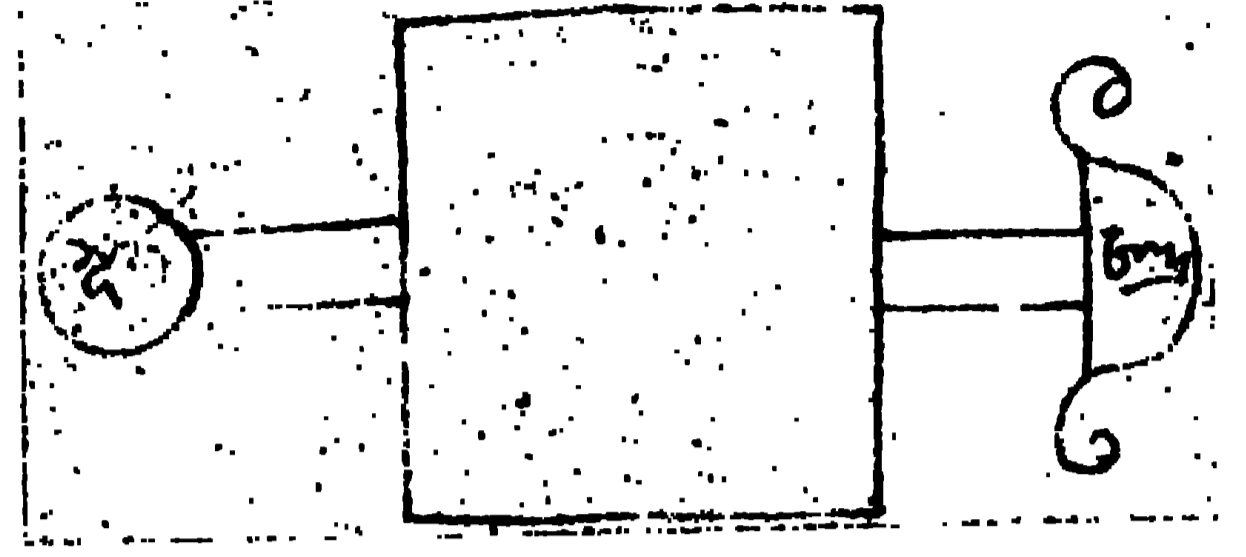


১২ নং চিত্র—মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়া আঁকা

* মেয়েদের নিকট যেমন গুনিয়াহি অবিকল ভেঙ্গনি রাখা হইয়াছে। (১) থুরে—রেখে ॥ উক্ত মন্ত্রে উৎকৃষ্ট পতিলাভের লক্ষ্য কোনো প্রার্থনা না থাকিলেও সেই উদ্দেশ্যেই ঐ ভর্জন প্রচলিত।



১৩নং চিত্র—“চন্দ্র পূজি চন্দ্রে ।
সূর্য পূজি বন্দনে ।
চন্দ্র সূর্যে দিগে ফুল ।
সুখে থাকে তিন কুল ॥



১৪নং চন্দ্র-সূর্য পূজা আর-একটি আল্পনা

এতদেদে শৌখ কুমারীগণ উৎকৃষ্ট পতি-লাভার্থে তারাত্রত গ্রহণ করিয়া নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য পূজা করিয়া থাকেন । উহার আল্পনা ও মন্ত্র ১৩নং চিত্রে দেখানো হইল । বিবাহের পর সখবাগণ এই পূজা করিতে পারেন ।

এতদ্ব্যতীত কাঁথা, বালিশের আচ্ছাদন, কাপড়ের পাখা প্রভৃতিতে অনেকেই লতা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি সূতা দ্বারা সেলাই করিতে পারেন ।

কলখাবারের সামগ্রীর মধ্যে কীরের 'সস্তি' ও কীরের পুতুল ইত্যাদিও পল্লীরমণীগণের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । পাখরের টুকরার উপর নানাবিধ মনোহর ফুল লতা পাতা খোদিত করিয়া উহা কীরের 'সস্তি' তৈয়ার করিবার ছাঁচরূপে ব্যবহৃত হয় ।

উল্লিখিত বিষয়-সমূহ হইতে আমরা পল্লীরমণীগণের চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা পল্লীগৃহেও চায়ের কেতলী ও ষ্টোভের উনান প্রবেশ লাভ করিয়াছে । পল্লীবধুগণ এক্ষণে চা প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের সাঙু সিদ্ধ করিয়াই সময় করিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং প্রাচীনাদিগের এসকল পুরাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার কৃচি ও অবসর তাঁহাদের অতি অল্প ।

পুতুলের তিন পার্শ্বের যে-প্রকার পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় তাহা ফুলের আল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

এইসকল পল্লাগ্রামে ধনী দরিদ্র-নির্কিঁশেযে সকলের গৃহেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে । লক্ষ্মীর আসন হইতে ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত মেঝেতে যে আল্পনা দেওয়া হয় তাহা ৭নং চিত্রে দেখানো হইল । ঐ দিন প্রত্যেক গৃহের সম্মুখভাগে মেঝেতে লক্ষ্মীর পদ ও ধানশীষের আল্পনা দেওয়া হয়, এমন-কি ধান ভানিবার ঢেঁকি ও ধান ঝাড়িবার ফুলার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না । (৮—২ নং চিত্র)

এই জিলার দরিদ্র হিন্দুদিগের ঘরের কাদার দেয়ালে মেয়েদের প্রস্তুত কাদার ছবি দেখিতে পাওয়া যায় ; উহার ২।১টি নমুনা দেওয়া গেল । ১০ নং চিত্রে প্রদর্শিত কাদার ছবির-পৃষ্ঠ-দেশে কেরোসিনের আলো, তেলের বাটি ইত্যাদি রাখা হয় ।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচটার সময় অনল আপিস থেকে বাসায় চলেছে । আজও তার সঙ্গে আব্দালী আছে, কিন্তু তার ঘাড়ে আজ

ডেসপ্যাচ-বক্স নেই, কাগজপত্রের নথি ফাইলও নেই । আজ সে সব ছোট ম্যানেজার বৈকুণ্ঠের পশ্চাদনুসরণ করেছে ।

অনল 'অল্প দিন অশ্রমনস্ব হয়ে চলে' যায় ; কিন্তু

আজ তার দৃষ্টি ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে রাজাস্ত্রপুত্রের প্রত্যেক জানালায় জানালায় কাকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার ছুরাশায় ঘন ঘন অভিসার করছে। সে যেতে যেতে দেখলে, এক জানলায় গৌরীকে বৃকে করে' দাঁড়িয়ে আছে ধনিষ্ঠা! অনলের মুখ সাকল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল; সে কণকাল আশ্চর্যবিশ্বত হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলে, এবং মাথা নত করে' চলে' গেল। কিছু দূর গিয়ে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলে তখন পথের বাঁকে সেই জানালাটা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেছে। অনলের মনে পড়ল, রবার্ট ব্রাউনিঙের "বাষ্ট্ এণ্ড ষ্ট্যাচু" এবং "ইন্ এ ব্যাল্কনি" কবিতার কথা।

অন্য দিন ধনিষ্ঠা গোপনে চুরি করে' অনলকে দেখে; কিন্তু আজ সে জানলা একেবারে খুলে ফেলে নিজেকে প্রকাশ করে' দাঁড়িয়েছিল। আজ সে শেষ দেখা দেখে নেবে, শেষ দেখা দিয়ে নেবে; তার পর তার বিসর্জন—

“এক দিন তার পূজা হয়ে গেলে

চিরদিন তার বিসর্জন!”

অনল দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে ধনিষ্ঠা ঘরে থেকে বাহিরে এসে মাধবীকে ডেকে বললে—মাধী, তুই গৌরীকে নিয়ে ওর বাবার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়; আর চাকরদের বল এই বাক্স বিছানাগুলো সব দিয়ে আসবে।

গৌরী আপত্তি জানিয়ে বললে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা।

ধনিষ্ঠা গৌরীর মুখচূষন করে' বললে—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আগে যাও, তার পর আমিও যাবো।

গৌরী সন্দেহ করে' বললে—না, তুমি যাবে না।

ধনিষ্ঠা কষ্টে চোখের জল সঞ্চার করে' বললে—সত্যি বলছি মা, আমিও যাবো, আজই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবো। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারি। তোমাকে ছেড়ে এ বাড়ীতে কি আমি থাকতে পারবো?

গৌরী আর আপত্তি করলে না। কিন্তু মাধবীর

মনে একটা বিষম খটকা লেগে রইল। আজকের ব্যাপারটা সে কিছুতেই গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারছিল না।

* * *

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটা প্রকৃতিস্থ হয়ে অনিল যখন দেখলে যে তার সন্নিহী তার কাছে নেই তখন সে প্রথমে মনে করলে সে বাড়ীতেই কোথাও আছে। কিন্তু এই বাড়ীতে তার দাদাও আছে মনে করে' তার একটা লজ্জাও বোধ হলো। সে বাইরে বেরিয়ে একটা লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে সকল ঘরে উকি মেয়ে মেয়ে বেড়াতে লাগল; সে যে কি খুঁজছে তা যে চাকর-দাসীরা বুঝতে পারছে এই ভেবেও তার লজ্জা বোধ হতে লাগল। কিন্তু যখন সে বাড়ীর কোথাও তার সন্ধান পেলে না তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত ও সন্দেহান্বিত হয়ে হরির মাকে জিজ্ঞাসা করলে—হরির মা, আমার সঙ্গে কাল যে লোকটি এসেছিল সে কোথায় গেল?

হরির মা বললে—কাল রাত্তিরে বাবু তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনিলের পিত্ত জলে' উঠল, সে চেষ্টা করে' বললে—আমার লোককে বাবু বিদায় করে' দেন কোন্ আক্কেলে!

এ কথা জবাব হরির মা আর কি দেবে? সে নীরবে মনে মনে অনিলের বেহায়াপনাকে শত দিকার দিতে দিতে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিল স্থির করলে, এখনই সে কাছারীতে গিয়ে তার দাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে' কলকাতা চলে' যাবে। সে জামা গায়ে দিতে গিয়ে দেখলে, তার মনি-ব্যাগটা জামার পকেটে নেই। সে আবার চেষ্টা করে' উঠল—হরির মা, নফর, সাধু, আমার টাকা কি হলো।

চাকর-দাসীরা বললে—বাবু আপনাকে বলতে বলে' গেছেন টাকা তিনি নিয়েছেন।

অনিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অনলের সঙ্গে ঝগড়া করতে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু গিয়ে দেখলে, সদর দরজায়

তারা বন্ধ। সে চাকরদের ডেকে বললে—এই, দরজায় দিনের বেলা চাবি কেন? চাবি খুলে দে।

চাকরেরা বললে—বাবু চাবি দিতে বলে' গেছেন; তিনি না আসা পর্যন্ত খুলতে বারণ করেছেন।

অনিল ক্রোধে উন্নতবৎ হয়ে দরজায় লাথি মেরে বললে—আমি কি বাড়ীতে বন্দী নাকি? আমি তারা ভেঙে ফেলব।

চাকরেরা বললে—আপনি তাগা ভাঙতে গেলে আপনাকে ধরে' রাখতেও তিনি বলে' গেছেন।

অনিলের মাথায় খুন চেপে উঠছিল; তার মনে হতে লাগল সব কটা চাকরকে সে তখনই মেরে খুন করে' ফেলে। কিন্তু সে একা, আর ওরা তিন জন। কাজেই সে আত্মসম্বরণ করতে বাধ্য হলো। তখন তার নিজীব ছড় পদার্থের উপর রাগ বাড়বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল; ইচ্ছা হতে লাগল বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে' গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। কিন্তু বাড়ীতে আছে কি যে সে নষ্ট করবে? খান কতক খুরি সরা মালুসা মাটির গেলাস আর খান কতক লেপ কয়ল তো বাড়ীর পুঞ্জি! সেগুলো নষ্ট করলে হাতের আঁজলায় করে' জল খেতে হবে, আর এই শীতের রাতে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে' কাটাতে হবে। কাজেই অনিল নিফল ক্রোধে প্রথমমে হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে শান্ত হয়ে বসল।

অনল আপিস থেকে বাড়ীতে এসেই অনিল ঘাতে শুন্তে পায় এমন উচ্চ স্বরে চাকর-দাসীদের ডেকে বললে—আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে' যাচ্ছি, তোমরা সবাই তোমাদের মাইনে নিয়ে যাও।

হরির মা এই আকস্মিক হুঃসংবাদে কেঁদে ফেললে; চাকরদের মুখ শুকিয়ে গেল। হরির মা কান্দতে কান্দতে বললে—তুমি চলে' যাবে বাবা? তবে আমাকেও নিয়ে চলো। যে কটা দিন আছি তোমার চরণ সেবা করে'ই মরতে দাও।

অনল ছলছল চোখে বললে—তা কেমন করে' হবে মা, আমি যে গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছি; আমি তো আর হৌগুনা-নাড়ার বিচার করে' চলতে পারব না।

কথাগুলো অনিলের কানে গেল। তার মাথায় যেন

বজ্রাঘাত হলো। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে' রইল।

অনল বলতে লাগল—তোমরা আমার অনেক যত্ন করেছ; তোমাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। আমার এই মাসের মাইনেটা আমার নিজের যারা কাজ করেছে তাদের মধ্যে ভাগ করে' দিতে খাজাঞ্চি-বাবুকে বলে' এসেছি। আমার আর কিছু নেই.....

অনিল আর চূপ করে' বসে' থাকতে পারলে না। সে ছুটে বোরিয়ে এসে বললে—চাকরী ছেড়ে দিয়ে একেবারে খালি হাতে গৌরীকে নিয়ে বাড়ী গিয়ে খাবে কি? শেষ-কালে গৌরীর গায়ের গহনা বেচে বেচে খেতে হবে তো?

অনল একটু হেসে ব্যক্তরা স্বরে বললে—আমি তো আর মদ খাই না যে মেয়ের গায়ের গহনা বেচে বিলাসিতা করব? গৌরীকে যিনি গহনা দিয়েছিলেন তিনিই গৌরীকে নিরাভরণা করে' পাঠিয়ে দেবেন; স্ত্রীরাং ভয় নেই, আমি ইচ্ছা করলেও গৌরীর গহনা বেচে খেতে পারব না।

অনিল একেবারে বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তবে? বাড়ীতে গিয়ে আমরা খাবো কি?

অনল বললে—তুমি কি খাবে তা তুমি জানো। তে'মাকে বাড়ীতে রেখে আমি গৌরীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো; আমাদের দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার মতন উপার্জন আমি করতে পারব।

অনিলের মনে হলো তার আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনিষ্ঠাই বোধ হয় অনলের চাকরী ছাড়িয়ে দিয়েছে, গৌরীকেও বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সে অনলকে বললে—আমি রাণী-বৌদিদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে...

অনল মাথা নেড়ে বললে—এখন too late. যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

অনিলের মনে পড়ল, ধনিষ্ঠা কৌতূহল একরোখা জেদী মেয়ে; সে যা একবার স্থির করে তার নড়চড় করানো হুঃসাধ্যই বটে। সে স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় মাধবী প্রভৃতি চাকর-দাসীরা গৌরীকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

গৌরীর নিরাভরণা শ্রী দেখে অনলের বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো; অনিলেরও অত্যন্ত দুঃখ অনুভূত হলে।

অনল তাড়াতাড়ি গৌরীকে বুক তুলে নিয়ে তার মুখচুষন করলে।

মাধবী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। আজ সকলেরই কি এক মতিভ্রম উপস্থিত হয়েছে! ধনিষ্ঠা গৌরীর মুখচুষন করেছে, এখন অনলও তার মুখচুষন করছে! এদের হয়েছে কি?

মাধবী কণকাল নীরব থেকে অনলকে বললে—রাণী-মাতীর্থে যাবার কথা বলছিলেন। আপনারা কি আজই এগুনে যেতেছ?

অনল এর কি উত্তর দেবে ভেবে স্থির করবার আগেই গৌরী জিজ্ঞাসা করলে— বাবা, আমরা কখন যাবো?

—এখনই যাবো মা।

গৌরী ভয়ে ভয়ে অনিলের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে অশ্রুচক্ষুরে জিজ্ঞাসা করলে—পাপাও যাবে? পাপা আমাকে যদি মারে?

অনিলের কানে এ কথা গেল। সে অস্তরে বেদনার সঙ্গে লজ্জা অনুভব করলে। তার সামনে অভাব ও রিক্ততার যে দারুণ বিভীষিকা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল তাতে তার স্বভাব অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল।

অনল গৌরীকে বললে—তোমাকে কেউ মারতে পারবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।

গৌরী উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে বললে—মাও তাই বলছিলেন—মাও তো ঐ জন্তে তীর্থে পালিয়ে যাচ্ছে।

অনিল অস্বস্তিতে বললে—দাদা, আমাকে ক্ষমা করো.....

অনল বললে—এখনই না। আমি যেখানেই থাকি তোমার খবর নেবো। যখন শুনব গৌরীর তোমাকে বাবা বলে' পরিচয় দিতে লজ্জার কোনো কারণ নেই, তখন তোমাকে ক্ষমা করতে পারব।

অনিল মাথা নীচু করে' সেইখানে বসে' পড়ল।

*
*

সন্ধ্যার সময় একজন চাকর এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—নতুন ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠার কানে গিয়ে সেই কথাটা বাজল। বৈকুণ্ঠ এতদিন ছিল ছোট ম্যানেজার, আজ সে হয়েছে নতুন ম্যানেজার।

ধনিষ্ঠা তার আপিস ঘরে গেল। বৈকুণ্ঠ ঘরে ঢুকতেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—গৌরীরা চলে গেল।

—আজ্ঞে হাঁ।

ধনিষ্ঠা একটু চুপ করে' থেকে উদ্গত অশ্রু দমন করে' নিয়ে কম্পিত কণ্ঠকে সংযত করে' বললে—আমি আজই কাশী যাবো। পাকী একখানা পাঠিয়ে দিন; আমার সঙ্গে মাধী আর ছুজন চাকর ছুজন দরোয়ান আর প্রাণরক্ষা যাবে; তাদের টেনে যাবার জন্তু দুখানা গাড়ীও চাই।

বৈকুণ্ঠ বিশ্বয়ভরা দৃষ্টিতে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা বলতে লাগল—কাশীতে রাজকুমার-বাবু আছেন; তাঁকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম করে' আমার জন্তু একটা বাড়ী ঠিক করতে বলুন, আর ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকেও একটা টেলিগ্রাম করুন। যে তিনি যেন এন্ট্রি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীঘ্র করেন। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকে একখানা চিঠিও লিখে নিয়ে আসুন, আমি যাবার আগে সেই করে' দিয়ে যাবো।

এবার বৈকুণ্ঠ বিমূঢ়ের মতন মূনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, মূনিবের আদেশের উত্তরে বলতে পারলে না—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা বলতে লাগল—আমাদের এন্ট্রি কোর্টের উকিলকে দিয়ে আমার একটা দানপত্র তৈরি করাবেন, আমার সমস্ত জীধন সম্পত্তি গৌরীকে আমি দান করব; তার বিয়ের পর সে সেই সম্পত্তি পাবে।

বৈকুণ্ঠ বললে—যে আজ্ঞে।

*
*
*

একই দিনে অকস্মাৎ অনল ও ধনিষ্ঠা দুজনেই একেবারে বাস্তুশুদ্ধি ত্যাগ করে' চলে' গেল। বিস্মিত গ্রামবাসীরা এতদিনে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে' নিজেদের নিজেদের কল্পনা ছুটিয়ে তাদের নামে অপবাদ-জল্পনায় প্রমত্ত হয়ে

উঠল। কেবল জানো-দিদি কারো মুখে অনল বা ধনিষ্ঠার নিন্দা শুনে হৃৎগত হয়ে প্রতিবাদ করে। এই জানো-দিদির ভয়ে লোকের মনে শাস্তি নেই। সবাই তারও তীর্থযাত্রা বা গঙ্গাযাত্রার শুভ অবসরের জন্য উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

(সমাপ্ত)

কাশীর কতিপয় বাঙ্গালী পণ্ডিত

অধ্যাপক শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দীনবন্ধু মিত্র কাশীর সংস্কৃতকলেজ-সম্বন্ধে লিপিয়া-
লেন—

“চন্দ্রনারায়ণ-শুণে এই বিদ্যালয়।

করেছে পণ্ডিত-মানে স্থপাতি সঙ্ঘ।”

—স্বরধুনী কাব্য (পৃ: ৪২, চতুর্থসর্গ)

ভারতীয় জ্ঞানগরিমার কেন্দ্রস্থান কাশীর সংস্কৃত কলেজটি বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান বিদ্যালয়। যে মহামনীষীর সময়ে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপনসময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে কথঞ্চিৎ প্রচলিত থাকিলেও বোধ হয় বাঙ্গালার জনসাধারণ এখন তুলিতে বসিয়াছে। “বজ্রের বাহিরে বাঙ্গালী” প্রভৃতি গ্রন্থে কাশীতে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তিকাহিনী অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে; তাহাতে বহুতর পণ্ডিতের বিবরণও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু হুঃখের বিষয় চন্দ্রনারায়ণ-সম্বন্ধে বিশেষ-বিছুই কেহ উল্লেখ করেন নাই। অথচ তিনি সর্বতোভাবে বিষ্ণুসমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া কাশীতেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। আমরা দীনবন্ধুর কবিতার টীকাচ্ছলে কাশীসংস্কৃত কলেজের ইতিবৃত্তপ্রসঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য বিশ্বতপ্রায় বাঙ্গালী কৃতী পুরুষের পরিচয় প্রদান করিলাম।

১৮৪২ খৃ: কাশীর উক্ত বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার জি
নেকলস্ Historical Sketch of the Benares

College (কাশীকলেজের ঐতিহাসিক চিত্র) নামক গ্রন্থে লিপিয়া বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, কাশীর তৎকালীন রেসিডেন্ট, মি: ডে ডনকান প্রথমতঃ নিজব্যয়ে ১৭২১ খৃ: ১৭ নবেম্বর তারিখে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং পরবৎসর (১৭২২ খৃ:) হইতেই উহা সরকারী বায়ে পরিচালিত হয়। স্নেহের সংসর্গে পাছে কাহারও আপত্তি থাকে, তজ্জন্য একজন প্রধান পণ্ডিতকে অধ্যক্ষ (Rector) নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা ও পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হয়। কাশী সংস্কৃত কলেজের এই প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙ্গালী—“কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য।” এই “সর্বশাস্ত্রজ্ঞ” পণ্ডিতপ্রবর তৎকালে সাহেব-মহলে পরিচিত ছিলেন এবং ইহার উপাধিও কিছু বিচিত্র-রকমের ছিল—“কাশীনাথ তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেজ, বিদ্যাবাহাদুর।” ইনি শ্রাব্ উইলিয়ম্ জোন্সের জন্য “শব্দসন্দর্ভসিদ্ধি” নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন (Cat. of Jones MSS. in the India Office Library: Tawney and Thomas, 1903, p. 7)। ইহা নিতান্ত কলঙ্কের বিষয় যে, উক্ত ডনকান (Duncan) সাহেব চলিয়া গেলে, পণ্ডিতপ্রবর কাশীনাথের নানাবিধ অসদাচরণে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে অগ্রসর

২য়। অবশেষে ১৮০১ খৃঃ এপ্রিল মাসে কাশীনাথ বিতাড়িত (expelled) হন। (Brooke's Minute of 1804), বিদ্যালয়ের এই বিশৃঙ্খলতা ও দুর্ব্যবহার আর-একটি কারণ—তৎকালে সর্বসারী চাকরী-গ্রহণে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই চাকরী গ্রহণে পরাজ্ঞ ছিলেন (“the most learned pandits have consequently invariably refused the situation”...Lord Minto's Minute of 1811 A. D.)। নানাবিধ পরিবর্তনের পর ১৮২০ খৃঃ একজন সাহেব সেক্রেটারী নিযুক্ত হয় এবং তৎপর বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে। প্রথম সেক্রেটারী লেফটেনেন্ট এডওয়ার্ড ফেল (Lieutenant Edward Fell) ভালো সংস্কৃত জানিতেন (“a profound Sanskrit scholar”) এবং ১৮২১ খৃঃ পুরস্কার-বিতরণী সভায় স্বয়ং সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের স্থাপন-কালে অধ্যক্ষ তির আরও আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তন্মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ জ্ঞানের অধ্যাপক পণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খৃঃ ইহাকে মাসিক ৫০ টাকা পেন্সন ও একটি প্রশংসাপত্র দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়—তৎকালে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন এবং বয়স হইয়াছিল ১০৩ বৎসর! এ বয়সেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল (“bore a high character for learning and attention to his duties”)। ইহারই স্থানে নিযুক্ত হন ফরিদপুর, (পং বিক্রমপুর) ধাহুকা গ্রামের বিখ্যাত “কৃষ্ণাজেয়”-বংশীয় পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ স্মায়পকানন। ১৮২০ খৃঃ সেক্রেটারী লেফটেনেন্ট ফেল (Secretary Lt. Fell) বিখ্যাত পণ্ডিত এইচ এইচ উইলসন (H. H. Wilson)-এর সহযোগে স্মায়শ্রেণীর পরীক্ষাকালে জানিতে পারেন যে, চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে নানাদেশ হইতে বহুতর ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার বাটীতে (“out of the college”) পাঠ গ্রহণ করিত। ১৮২৫ খৃঃ তাঁহার বেতন মাসিক ৬০ টাকা হইতে ৮০ টাকায় বৃদ্ধি হয়, তৎকালে নূতন সেক্রেটারী কাপ্তেন থরসবি

(Secretary Captain Thoresby) মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন (“was the most celebrated Logician in India”). ১৮২৭ খৃঃ স্মায়শ্রেণীর প্রশংসা করিয়া সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন—“I am sure I do not err in saying that it is esteemed the first class in this very difficult branch of Sanskrit Literature at Benares. But this is no more than might be expected, considering that it is instructed by a pandit of such eminent acquirements as Narain Bhatta charji.” অর্থাৎ বারাণসীতে সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতিকঠিন শাখায় এই স্মায়শ্রেণী প্রথম পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণিত হয়, বলিলে যে ভুল বলা হয় না, এবিষয়ে আমার কোনে সন্দেহ নাই। নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতন প্রভূতগুণশালী পণ্ডিত যে-শ্রেণীর শিক্ষক সে-শ্রেণীর পক্ষে এ প্রশংসা ও আশাতিরিক্ত বলা যায় না। ১৮৩৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়—তৎপক্ষেও তাঁহার উচ্চপ্রশংসা ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি—তৎপক্ষে নিযুক্ত হন। কিন্তু ৪৭ বৎসরেই ছাত্র-সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় (১৮৩৩ খৃঃ শিরোমণি তাঁহার জবানবন্দিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন)। ১৮৩৬ খৃঃ জাহ্নবারী মাসে শিরোমণির মৃত্যুর পর চন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকান্ত শিরোমণি (“considered to be one of the most learned in the Nyaya Shastra now living”) [স্মায়শ্রেণীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ জীবিত পণ্ডিত] (General Report of Pub. Ins. N. W. P. 1846-47, p. 40) নিযুক্ত হন কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয় এবং তৎপক্ষে তাঁহারই জামাতা কালীপ্রসাদ শিরোমণি ১৮৪৭ খৃঃ জাহ্নবারী মাসে অস্থায়ীভাবে স্মায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (“until enquiries should be made for a suitable successor to the late Pandit who was a scholar of established reputation”—Ibid 1847-48, p. 24)। বস্তুতঃ কিন্তু কালীপ্রসাদই স্থায়ীভাবে থাকি

যান এবং ১৮০০ খঃ তাঁহার মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ১২০৭ খঃ পর্যন্ত জ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (প্রবাসী ১৩১৬, ৪৪ পৃঃ)।

এইভাবে যে-সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত ধারাহিকরূপে কাশীতে জ্ঞানের আসন অলঙ্কৃত করিয়া নব্যজ্ঞানের বিলাসভূমি বঙ্গদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তন্মধ্যে চন্দ্রনারায়ণ, কেবল সর্বকারী প্রশংসাবাক্যে নহে; সাম্প্রদায়িক জনশ্রুতিতেও সর্বতোভাবে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আমাদের একজন পূজনীয় অধ্যাপক ৮কৈলাস শিরোমণির নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তৎকালে কাশীর বাঙ্গালী সমাজে দুইজন মহাত্মা চরিত্রগুণে সাক্ষাৎ “বিশেষ্বর” ও “কেদার” বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ছিলেন “বিশেষ্বর”। গৌতমাবতার এই মহানৈয়ায়কের অভ্যুদয়-কালে নিজ বঙ্গদেশ হইতে নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া ছাত্রগণ তাঁহার নিকট পাঠ সমাপন করিত। তন্মধ্যে নব্যজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ “পত্রিকা”র বিক্রমপুর-নিবাসী কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধান ছিলেন—তাঁহার পৌত্র ৮রজনী তর্করত্ন (“সারমঞ্জরা”র টীকায়) চন্দ্রনারায়ণ-রচিত ন্যায়ের (অহুগমে) টীকা ও টিপ্পন, কুসুমালির টীকা এবং জ্ঞানস্বরবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—“প্রাণৈষীদতিগৌরবামহুগমে টীকাং তথা টিপ্পনোং, ব্যাখ্যানং কুসুমালেশ্চ বিমলং জ্ঞানস্ব বৃত্তিং বরাম্ ॥” তন্মধ্যে ন্যায়ের টীকা “চান্দ্রী পাতড়া” নামে বঙ্গদেশের নৈয়ায়িক সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ একটি বিচার-কাহিনী উল্লেখযোগ্য। খঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে পূর্ববঙ্গের একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক স্বীয় প্রতিভাধারা তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীনদের মুখে সেই দিগ্বিজয়ী, ফরিদপুর জপ্সা নিবাসী অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কারের গল্প এখনও শুনা যায়। বিজয়ী রাজার মত এই বিচারমল্ল পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন এবং নবদ্বীপ পর্যন্ত জয় করিয়া তথায়ই অধ্যাপনা করিতেন। ১৮১৭-৮ খঃ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তিনি অবশেষে চন্দ্রনারায়ণের সহিত

বিচারপ্রার্থী হইয়া কাশী গমন করেন। কথিত আছে, নৌকাযোগে যে-ঘাটে তিনি অবতীর্ণ হন তাগ্যক্রমে সে-ঘাটেই চন্দ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ পান এবং নৌকা বাঁধিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সর্বাগ্রে বিশেষ্বর দর্শন করার অহুরোধ উপেক্ষা করিয়া পদ্মাতীরে জ্ঞানের “পক্ষতা” গ্রন্থের একটি ছুঁহ পূর্বপক্ষ করেন। অভয়ানন্দ চন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত ক্রমাঙ্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তের দোষ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার “গোদ”-যুক্ত পদদ্বয়ে প্রশংসা হইয়া বলিয়াছিলেন, “আপনিই সাক্ষাৎ ‘বিশেষ্বর’, আমি আর অন্য বিশেষ্বর দর্শন করিতে চাই না।” কথিত আছে, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ৩৫ বৎসর বয়সে এই দার্শনিক নৈয়ায়িকের মৃত্যু ঘটে।

চন্দ্রনারায়ণের সময়ে যে মহাত্মা কেদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহার নাম রামকিশোর জায়লকার। তিনি মেহারের প্রসিদ্ধ “সর্ববিদ্যা”-বংশীয় এবং নিজেও একজন উন্নত সাধক ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ বৈয়াকরণ ছিলেন বটে, কিন্তু কাশীতে তাঁহার টোলে প্রায় সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার রচিত কলাপঞ্জীর টীকা পূর্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে তিনটি ছাপা হইয়াছে—মুদ্রাপ্রকাশ (রচনাকাল ১৭৫২ শকাব্দ) দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ উভয়ই তন্ত্র-সম্বন্ধীয় এবং বহু পূর্বে কাশীতে ছাপা হয়। সম্প্রতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ “শাস্ত্রবোধ-প্রকাশিকা” বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য এইসকল গ্রন্থেই পরিস্ফুট রহিয়াছে। তিনি নিঃসন্তান, পরলোকগত হইলে (আত্মমানিক ১৮৫০ খৃঃ) তাঁহার পত্নী তাঁহার সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রকাশসহকারে স্বদেশীয় সুধীদের তাকিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্রনারায়ণের অন্যতম ছাত্র প্রবন্ধ-লেখকের ধুল-প্রপিতামহ রামশঙ্কর তর্কপকানন (খৃঃ ১৭২৮-১৮৬৭) অধ্যাপকের মৃত্যুর পর কাশীতেই টোল করেন এবং একজন প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত হন। নেপালের

মহারাজকুমার “মুহিলা সাহেব” প্রকৃত নাম “উপেন্দ্র-বিক্রম সাহ” জন্ম বাহাছরের বিক্রমে বড়বয়সে করায় প্রয়াগে অবস্থান হন। ১৮৫৪ খৃঃ জাহ্নসারী মাসে তাঁহার মৃত্তির পর তিনি লক্ষ্যধিক টাকা আয়ের সম্পত্তি বৈরাগ্যবশতঃ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উক্ত রামশঙ্করই তাত্ত্বিক অভিষেকধারা তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই রাজ-সন্ন্যাসী তাহার পর বহুকাল নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

ডাঃ রাইট্ (Dr. Wright) স্বরচিত History of Nepal (নেপালের ইতিহাস) গ্রন্থে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অদ্ভুত বলিয়া উক্ত হইল।

“The king's brother, who seems to be tainted with hereditary insanity, became a *fakir* and may

still (1875) be seen wandering about and bathing at the various holy places in all the odour (and filth) of sanctity (p.61)

অর্থাৎ রাজভ্রাতা সম্ভবতঃ বংশগত উন্মাদ-দোষে ছুটে, ইনি ফকির হন, এখনও ১৮৭৫ ইহাকে নানাতীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং পবিত্রতার পূতিগন্ধ ও গন্ধে স্নান করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

পরিশেষে আমরা উক্ত রামশঙ্করের ভ্রাতৃপুত্র এবং ছাত্র কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮২২—৮৭ খৃঃ) নামোল্লেখ করিয়া উপসংহার করিলাম। তিনি কাশীর পণ্ডিত-সমাজের একজন বিশিষ্ট “দলপতি” ছিলেন এবং কাশীর বর্তমান এবং পরলোকগত অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার নিকট জ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বরদাই মহাকবি চন্দ্রের মহাকাব্য রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ড

রাসোতে ক্ষত্রিয়-চরিত্র

রাসো পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক গ্রন্থ নহে, কিন্তু যখনই রচিত হউক না কেন, গ্রন্থরচনার সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিত্র ও পৃথ্বীর সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিত্রে বিশেষ প্রভেদ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, পুস্তকে বর্ণিত চরিত্র পৃথ্বীর সময়ের বর্ণনা বিবেচনা করিলে বিশেষ ভ্রম হইবে না। রাসোর কয়েকটি গল্পই সেকালের ক্ষত্রিয়চরিত্র বৃত্তিতে পারা যায়।

১। পৃথ্বীর অষ্টোত্তর সুরের মধ্যে কহকাকা প্রধান ছিলেন, তিনি সোমেশ্বরের জাতি-ভাই। গুজরাটের ভীমশেব আপনার ভাইদের যে বৃত্তি দিতেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রায়ই রাজার গ্রাম ইত্যাদি লুট করিতেন, সেইজন্য ভীম তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভীমের আটটি

ভ্রাতৃপুত্র বৃত্তি বাড়াইতে অস্বরোধ করিলেন; ভীম যখন বাড়াইলেন না, তখন তাঁহারা রীতিমত ডাকাতি আরম্ভ করিলেন। ভীম তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন; তাঁহারা ভীমের শত্রু সোমেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। সোমেশ্বর শত্রুর ভাইপোদের হাতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মনোমত বৃত্তি ধার্য্য করিয়া; অল্পবয়স্ক বলিয়া পৃথ্বীর সহচররূপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পৃথ্বীর বাটীতে একদিন মহাতারতের কথকতা হইতেছিল, পৃথ্বীর সহচর সুরেরা, গুজরাটের রাজপুত্রেরা, ও সেবকের দল কথা শুনিতেছিল। কহকাকা যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক সম্মুখে গুজরাটের এক রাজপুত্র বসিয়াছিলেন। কথক কোনও যুদ্ধের কথা তেজস্বিনী ভাষায় বলিতেছিলেন, হঠাৎ কহকাকা তরবারি দিয়া সম্মুখের রাজপুত্রের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অন্য রাজপুত্র ও তাঁহাদের সেবকরা কহকে আক্রমণ করিলেন।

স্বরেরা কেহ কহের পক্ষ, কেহ রাজপুত্রের পক্ষ লইল ; কথকতার সভা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। অল্প সময়ের মধ্যে গুজরাটের আটটি রাজপুত্র ও তাহাদের কয়েকটি সেবক কাটা পড়িল, কিন্তু বিবাদের কারণ কেহই জানিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর পৃথ্বীকহের গৃহে গিয়া বিবাদ আরম্ভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কহ বলিলেন, কথক যখন যুদ্ধের বর্ণনা করিতেছিল, তখন দেখিলাম আমার সম্মুখে যে রাজপুত্র বসিয়াছিল সে গোঁপে তা দিতেছে। আমার সম্মুখে বসিয়া কেহ গোঁপে তা দিলে আমার অপমান হয়, আমি তা সহ্য করিতে পারি না, অতএব আমি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর অন্য রাজপুত্রেরা আক্রমণ করিলে আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। পৃথ্বী কহকে দোষী করিলেন ; কেননা তিনি রাজপুত্রকে মারিবার পূর্বে তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন নাই ; রাজপুত্রের কাছে তরবারি ছিন্ন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি নিরস্ত্র। কজিয়দের ধর্মযুদ্ধের নিয়ম-অনুসারে বিপক্ষ অন্ত্র লইয়া প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলে, তবে আক্রমণ করা উচিত। অতক্ৰমে তাহাকেও আক্রমণ করা কজিয়োচিত ধর্মযুদ্ধের অঙ্গ নহে।

পৃথ্বী ইহার পর সকল সময়ে কহকাকার চক্ষে ঠুলি দিয়া রাখিতেন, কেবল স্ত্রীদের মধ্যে শয়নাগারে, ও যুদ্ধক্ষেত্রে ঠুলি খুলিয়া দেওয়া হইত।

২। পৃথ্বীর আদরের হাতী মারিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া আপনার এক শালক ও স্বরের কাছে এক জোড়া লোহার বেড়ী পাঠাইয়া পৃথ্বী আজ্ঞা করিয়াছিলেন, নিজ হস্তে এই বেড়ী পায়ে পরিয়া আপনার গৃহে বন্দী থাক। স্বর এই আজ্ঞাপালন করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল বন্দী ছিলেন, কনোজ অভিযানের পূর্বে বন্দী হইয়াছিলেন, ও শেষ যুদ্ধের পূর্বে সমরসিংহের অহুরোধে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হাতী মারিলেন কেন, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, আমি এক সঙ্গীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম সম্মুখে হাতী মস্ত হইয়া আসিতেছে। হাতীকে না মারিলে আমাকে পিছনে ফিরিয়া আসিতে হয়, অর্থাৎ পলাইতে হয়। আমি

কজিয় হইয়া একটা পাগ্লা হাতীর সম্মুখ হইতে ফিরিতে বা পলাইতে পারিলাম না। আমি হাতীকে না মারিলে, হাতী আমাকে মারিত, অতএব রাজার আদরের হাতী জানিয়াও মারিতে বাধ্য হইলাম।

৩। জয়চন্দ্রের এক ভাইপো রাগ করিয়া পৃথ্বীর কাছে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কনোজ-অভিযানে তিনি জয়চন্দ্রের বিপক্ষে আপনার সহোদরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুই সহোদর দুই পক্ষে ছিলেন। তাহার রাগের কারণ এইরূপ :—একদিন তিনি কয়েকটি বন্ধু লইয়া শিকারের ফেরতা নগরের বাহিরে একটি সুন্দর বাগান দেখিয়া সেই বাগানে, বাগানরক্ষকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন, ও বাগান-বাটীতে ভোজ ও আমোদ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সুন্দর ফুলের কেয়ারিতে তাহাদের ঘোড়া বাঁধা হইল। বাগান-রক্ষক তাহার প্রভু জয়চন্দ্রের প্রধান মন্ত্রীর পুত্রকে সংবাদ দিল। তিনি কয়েকটি সেবক সঙ্গে লইয়া আসিলেন, ও রাজপুত্র ও তাহার সঙ্গীদের বাগান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রাজপুত্র জয়চন্দ্রের কাছে অভিযোগ করিলেন, ও মন্ত্রীপুত্রকে শাস্তি দিতে অহুরোধ করিলেন ; কিন্তু জয়চন্দ্র তাহার মুখেই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, তাহাকেই পরের বাগানে অহুমতি না লইয়া প্রবেশ করিবার অন্ত ভৎসনা করিলেন। রাজপুত্র জ্যাঠার এই অবিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন ও তাহার শত্রু পৃথ্বীর আশ্রয় লইলেন। তিনি পৃথ্বীর কাছে বলিয়াছিলেন জয়চন্দ্র যদি মন্ত্রীপুত্রকে প্রাণে না মারিয়া কেবল দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলেও আমার খান রক্ষা হইত, কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। এত অবিচার করিলে তাহার দেশে কিরূপে বাস করিতে পারি ?

৪। ঘোরীর সহিত শেষ যুদ্ধের পূর্বে পৃথ্বীর অমাত্যদের এক মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল, তাহাতে হুর্গরক্ষা, নগররক্ষা ইত্যাদি ভার লইতে কেহই স্বীকৃত হইতে-ছিল না ; সকলেই সম্মুখসমরে মরিয়া অর্গে যাইতে ব্যস্ত। রাসোতে পৃথ্বীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নাম রেণসী বা রেণু সিংহ, হাম্মীর মহাকাব্যে নাম গোবিন্দরাজ, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কেবল “গোলা” লিখিয়াছেন ; রাজপুত

ভাবায় গোলা অর্থে দাসীপুত্র। পৃথী তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজধানীতে রাখিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সে বলিল আমার রাজ্য চাই না, আমাকে যুদ্ধে যাইতে অস্বস্তি দিন। সকলে সম্মুখ-সমরে মরিয়া স্বর্গে যাইবে, আর আমি যাইতে পারিব না? সকলে স্বর্গে গেলে দেশের দশা কি হইবে, সে চিন্তা কেহই করিতে চাহিত না। তাহার বলিত পুরুষেরা স্বর্গে গেলে সতীরা চিতারোহণ করিবে; অসতীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুক। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের মত “হইয়ে ওহী ঘো রাম রচ রাধা অর্থাৎ যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা হইবেই, তবে সে-বিষয়ে এত চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি?

৫। রাসোতে পৃথীর উক্তি আছে যে কীর্তিহীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভালো।

৬। ক্ষত্রিয়রা আশ্রিতকে কখনও ত্যাগ করিত না। পৃথী মুসলমানদের ঘৃণা করিতেন, তথাপি একবার ঘোরীর এক ভ্রাতৃপুত্র পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় চাহিলে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহার জন্ত ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও ত্যাগ করেন নাই।

৭। ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত বলদর্পিত ছিল, যখনই ঘোরীকে বন্দী করিয়াছে তখনই বলিয়াছে তোমাকে আমরা গ্রাহ্য করি না, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, পলাও; সাহস হয় আবার আসিও, আবার মারিব আবার বন্দী করিব।

৮। ক্ষত্রিয়রা জীপুরুষে উভয়ে পাশা খেলিতে বড় ভাল বাসিত।

৯। ক্ষত্রিয়রা অতি সরল ও অদৃষ্ট-বিশ্বাসী ছিল। গন্ধাজলকে তাহার অমৃত বলিয়া বিশ্বাস করিত। মাহুয যতই পাপী হউক না মৃত্যুর পর তাহার একখানি হাড় যে-কোনো উপায়ে গন্ধাতে পড়িলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে বিশ্বাস করিত। ব্রাহ্মণদের ভক্তি করিত, ব্রাহ্মণের হাতে মরিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইবে বিশ্বাস করিত কিন্তু মক্তা বা ভিখারী বলিয়া তাহাদের ঘৃণাও করিত। তাহার বিশ্বাস করিত অজ্ঞাঘাতে মৃত্যু হইলে দেহ পবিত্র হয়, আত্মার স্বর্গলাভ হয়। আহ্লার গানে আছে যে পৃথীর ব্রাহ্মণ-সেনাপতি চূড়ামণি উদনকে মারিয়াছিল,

সেই রাগে আহ্লা চূড়ামণিকে মারিয়াছিলেন কিন্তু অজ্ঞা ঘারা মারিলে স্বর্গ লাভ করিবে বলিয়া গঙ্গা টিপিয়া মারিয়াছিলেন।

১০। পৃথী যখন যুগ্মযুদ্ধে যাইতেন তখন সকল সহচর-দের সহিত সমানভাবে কষ্ট সম্ব করিতেন। সকলের সহিত এক বৃহৎ বস্ত্রাবাসে ঢালা বিছানাতে শুইতেন, স্বয়ং সুখে থাকিয়া অজ্ঞদের কষ্টে রাখিতেন না।

১১। ক্ষত্রিয়রা ভূত, প্রেত, দেব, দানব ইত্যাদি ও স্বপ্নে, শকুনে, বাহুমন্ত্রে, তন্ত্রে, ইঁচি-টিক্‌টিকির ডাকে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। সকল কার্য্যারম্ভেই শুভ মুহূর্ত্ত খুঁজিত। শুভ মুহূর্ত্ত না হইলে যুদ্ধে যাত্রার জন্ত অস্বীকার করিত না, কিন্তু শত্রুর আগমন সংবাদ পাইলে আর শুভ সময়ের অপেক্ষা করিত না বা ইঁচি গ্রাহ্য করিত না।

১২। ক্ষত্রিয়রা বহু বিবাহ করিত, কিন্তু অবিবাহিতা অথবা পর জ্ঞীর সহিত একাসনে বসি অতি ঘৃণিত কার্য্য বিবেচনা করিত; বলিত, ঙ্‌রূপ করিলে রজপুতী নাশ হইয়া যায়। রক্ষিতাদের অর্দ্ধপত্নী বলিত ও তাহারও এক পুরুষগামিনী ছিল ও আপনাদের পতিব্রতা বলিয়া দণ্ড করিত। পিতার রক্ষিতাকে বিমাতার মতন মান্ত ও ভরণ-পোষণ করিত। কোনও জ্ঞীলোককে মুখে একবার মাতা বা ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলে চিরকাল তাহার সহিত মাতা বা ভগ্নীর মতন ব্যবহার করিত। ক্ষত্রিয়বালাদের বিপদে রক্ষা করিবার ভার তাহাদের ভ্রাতারা অথবা ধর্ম-ভ্রাতারা লইত। ক্ষত্রিয়বালারা মোগল-সম্রাটদেরও রাধী উপহার দিয়া ধর্মভ্রাতা সম্বন্ধ পাতাইয়াছে।

১৩। সমুদ্রশিখরগড়ের যুদ্ধের আহতরা ভুলিয়া, বর্ধার সময়ে অস্বস্তি না লইয়া মহোবার পরমাল চন্দলের বাগান-বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরমাল উদনকে আক্রমণ করিলেন, বাগানে যাহারা ঢুকিয়াছে তাহাদের মাথা কাটিয়া আনো। উদন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন তাহারাত আহত, আমি ক্ষত্রিয় হইয়া আহতদের প্রাণে মারাত পরের কথা, গায়ে হাত ভুলিতে পারিব না। ক্ষত্রিয়রা কণ, আহত, যুদ্ধে অক্ষম, অজ্ঞত্যাগী, পরাজয় স্বীকারকারীকে কখনও আক্রমণ করিত না।

১৪। পৃথী যখন মহোবা আক্রমণ করিলেন তখন



মজুরনী

শ্রী অন্নদাকুমার মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

আল্‌হা ও উদন মহোব্য ত্যাগ করিয়া কোনোজি বাস করিতেছিলেন। মহোব্য রাজদূত পাঠাইয়া বলিলেন, এখন আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহি, একমাস আমার আতিথ্য স্বীকার কর, আল্‌হা আসিলে যুদ্ধ করিব। পৃথ্বী বেত্রবতী নদীতীরে একমাস অপেক্ষা করিয়াছিলেন; আল্‌হা ও জয়চন্দের প্রেরিত সৈন্য আসিলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৫। পৃথ্বীর সুর ও সেনা মধ্যে সকলজাতীয় কৃত্রিম ছিল। চাঁওড়া বা চূড়ামণি নাগর একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ তাঁহার এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

১৬। পৃথ্বীর রাণীরা ও রাজবাটীর দাসীরা সকলেই পত্র লিখিবার পড়িবার মতন বিদ্যাবতী ছিল। সেকালের কৃত্রিমবালারা প্রায় সকলেই পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিত কিন্তু পুরুষদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিত না। পৃথ্বীর লেখক-সম্প্রদায় কায়স্থ ছিল।

১৭। রাসোতে অবরোধ প্রথার যথেষ্ট কঠোরতা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা পৃথ্বীর একমাত্র পুত্রকে গোলা অর্থাৎ দাসীপুত্র বলিয়াছে, কিন্তু রাসো-অহুসারে রেনসী বিবাহিতা রাণীর পুত্র, তবে তাঁহার মাতা রাজকন্যা ছিলেন না। যখন পৃথ্বী সংযুক্তার অন্তপুত্র বাস করিতেছিলেন, ও প্রজারা মুসলমান-আক্রমণের ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রেনসী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিমাতার অন্তঃপুত্র প্রবেশাধিকার পান নাই। এক স্থানে, মহারাণী সংযুক্তা ও চিতোররাণী পথার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে; সেখানে তাঁহাদের দোলা বা পাঙ্কী স্ববর্ণগ্রথিত কাপড়ে ঢাকা, তাঁহার চারিদিকে সেবিকার দল, তাহার চারি দিকে অস্ত্র হস্তে স্ত্রী প্রহরিনী, তাহার চারিদিকে খোজার পাহারার বর্ণনা আছে। ইহা অনেকটা মোগলদের হারেমের অঙ্কুরণ বলিয়া সন্দেহ হয়।

১৮। পৃথ্বী একবার রাণা সমর সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুই রাজা, সুর ও ামস্তরা খাইতে বসিলে পরিবেষণের পর কয়েকটি পশু ও পক্ষী সেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কোনও পাতে কোনও খাদ্যে বিবাক্ত দ্রব্য থাকিলে ঐ পশুরা একপ্রকার শব্দ বা অস্বভাবী করিত।

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া শ্রীরামচন্দের স্তব পাঠ শুনিয়া গৃহকর্তা অহুমতি দিলে সকলে ভোজন আরম্ভ করিল। ঐ ভোজের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, আগেনানা প্রকার মিষ্টান্ন তাহার পর নিমকী মুখরোচক চাটনী, ও অন্ন তাহার পর নানা-প্রকার নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হইল, সকলের শেষে নানা প্রকার পশু ও পক্ষীর মাংস পরিবেষণ করা হইল। এই ভোজে বহুপ্রকার পশু ও পক্ষীর মাংসের উল্লেখ আছে কিন্তু মাংসের উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ রাজপুতদের দেশে মাংস দুপ্রাপ্য বলিয়া উল্লেখ নাই।

চ

রাসোর ভাষা

রাসোর ভাষা পঞ্জাবি-মিশ্রিত হিন্দী, ও তাহাতে যথেষ্ট পার্সী ও অরবী শব্দ আছে। চন্দ বলিয়াছেন তিনি বেদের দেবভাষা, প্রাকৃত দেশীয় ভাষা, ব্রহ্মভাষা ও কোরাণের ভাষাতে রচনা করিয়াছেন, তথাপি রাসোতে বিদেশী শব্দবাহুল্য দেখিয়া তাহাকে ষাণ্ঠ শতাব্দীর দিল্লী ও অজমীরের ভাষা বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

রাজপুতানার একজন দেশাচারবিৎ ও ভাষাবিৎ বিশেষজ্ঞ রাসো-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজপুতদের মধ্যে চোহানদের কুলমর্যাদা বড় বেশী নাই, ও চিতোরের রাণা-বংশ কুলীনশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য; রাণার বংশে যে-বংশের কন্যার বিবাহ হয়, তাহার সম্মানবৃদ্ধি হয়, ও রাণা-বংশের কন্যা যে বংশে যায়, সে কুলীনের মতন সম্মানিত হয়। এই সম্মানের লোভে রাণা-বংশের কন্যা অনেকে আকাজ্ঞা করে। রাণা-বংশে সচরাচর চোহান-কন্যার বিবাহ দেখা যায় না, সেইজন্য চোহান-বংশের কোনও পুরোহিত-কবি চোহানদের মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য চোহান রাজকুমারীর বিবাহ রাণার সহিত হইবার কাল্পনিক গল্প রচনা করিয়া সমাজে চালাইয়াছেন। তিনি রাসোর ভাষা দেখিয়া ও নানা আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা অহুমান করেন যে এই পুস্তকখানি শাহজহানের সময়ে [অন্ন পূর্বে বা পরে] রচিত হইয়াছিল। [কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জব্বানাল, ১৮৮৬] কিন্তু কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা বলেন, যে অকুবর-বাদশা একবার

বিশেষ সভা করিয়া রাসো ও আহ্লার গান গুনিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের কাছে আছে, অতএব অকুবরের সময়ে, ষোড়শ শতাব্দীতে, রাসো ও আহ্লার গান ছিল। কিন্তু তখন যে আধুনিক পুস্তকখানিই ছিল, ও ইহাই গীত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। খুব সম্ভব, তখন অল্প একখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল, এখন সেখানি হুপ্রাপ্য হইয়াছে বা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক রাসোর অনেকগুলি পাঠান্তর আছে, অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া নাগরী-প্রচারিণী সভা যে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন এখন তাহাকেই প্রামাণিক বলিতে হইবে।

উত্তর ভারতে এক শ্রেণীর লোক ছিল, রাসো গান করা তাহাদের বংশগত ব্যবসা ছিল। তাহারা ভিন্ন-বংশীয় শিষ্যও গ্রহণ করিত। তাহাদের মধ্যে পুস্তক অতি অল্পই ছিল, অধিকাংশ গায়কের কণ্ঠেই এই বৃত্ত গ্রন্থ ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ন মিস্টার [পরে সর চার্লস] ইলিয়ট [যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন] একখানিও লিখিত আহ্লার গান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তিনি গায়কের কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাসোও ঐরূপ ছিল, এখন মুদ্রিত হইয়াছে। রাসোর মতন যে গীত কেবল গায়কদের কণ্ঠে থাকে, তাহা কালে-কালে গায়কদের বিদ্যা ও শ্রোতার রুচি অল্পস্বল্পে পরিবর্তিত হইতে থাকে। অকুবরের সময়ে রাসো ও আহ্লা লিখিত ছিল কিম্বা কেবল কণ্ঠে ছিল ঠিক জানা নাই। প্রাচীন ভাষার যে রাসো এখন পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞরা তাহার ভাষাকে পৃথ্বীর সময়ের ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। নাগরী-প্রচারিণী সভার প্রকাশিত রাসোর এক অধ্যায় বা সম্বন্ধের নাম “আহ্লাখণ্ড”। তাহাতে আহ্লার কেবল পৃথ্বীর সহিত যুদ্ধের কথা আছে, অল্প যুদ্ধের কথা নাই, তাহার ভাষাও অল্প অংশের ভাষার মত প্রাচীন নহে, যদিও অনেকটা সেই ছন্দে লেখা ও চন্দ্র বরদাইর ভণিতা আছে। সম্পাদকেরাও এ ক্রটি স্বীকার করিয়াছেন।

হিন্দী ভাষাতে অনেক কবি ১৭, ১৮ এমন কি ১৯ শতাব্দীতেও কবিতা রচনা করিয়া, তাহাতে আপনার নাম না দিয়া, বরদাই কবি চন্দ্রের ভণিতা দিয়াছেন, সেই

অল্প এখন একই বিষয়ে কবি চন্দ্রের ভণিতাযুক্ত একাধিক এমন রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভাষা বা শব্দ মিলে না। কবি চন্দ্রের ভণিতাযুক্ত অতি নিকট কবিতাও দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃতের অল্পকরণ, কেননা, বেদব্যাসের নামে চলিত নানা-প্রকার কবিতা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রবাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে একখানি আয়ুর্কৌদ-মতে অর চিকিৎসার পুস্তিকা দেখিয়াছি, তাহাও বেদব্যাসের রচনা বলা হইয়াছে, হরপার্কর্তীর প্রণোত্তর-রূপে লেখা, অথচ তাহাতে কুইনাইন প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে।

রাসোর পক্ষপাতীরা বলেন কবি চন্দ্র পঞ্জাবের লাহোর-বাসী ছিলেন। লাহোর পৃথ্বীর পতনের ১৭০ বৎসর পূর্ক হইতে [১০২২ খৃঃ হইতে] মুসলমান রাজাদের অধীন রহিয়াছে, অতএব লাহোরের ভাষাতে, পৃথ্বীরাজের সময়ে, পার্শী অবুবী শব্দ প্রবেশ লাভ করাই সম্ভব; সেইজন্য রাসোর ভাষাতে এত বিদেশী শব্দ। কিন্তু রাসোতেই আছে যে কবি চন্দ্রের পিতা বহু পূর্ক হইতে—চন্দ্রের বা পৃথ্বীর জন্মের পূর্ক হইতে—শাকস্তরি-পতিদের কবি ছিলেন, অজমীরে থাকিতেন, অতএব চন্দ্র-পরিবারের আদি নিবাস লাহোরে হইলেও চন্দ্রের জন্ম অজমীরে হইয়াছিল, তিনি বাল্যাবধি অজমীরে ছিলেন। চন্দ্র পৃথ্বীর সমবয়স্ক ছিলেন, পৃথ্বীর সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন, অতএব চিরকাল অজমীর ও দিল্লীবাসী ছিলেন। চোহানেরা মুসলমানদের ঘৃণা করিত, চোহানদেশে মুসলমান ছিল না, বা অতি অল্প কাবুলী অধ্বিক্রোতা, অল্প ২৪টি বণিক ও ককির ছিল; এরূপ বিদেশীদের ভাষা দেশে প্রচলিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব অজমীরের ভাষাতে পার্শী ও অবুবী শব্দ ছিল না। দিল্লী-সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। এ-কারণে কবি চন্দ্রের কবিতাতে,—যদি তিনি পৃথ্বীরাজ্যের সম-সাময়িক হইলেন—বিদেশী শব্দ থাকা উচিত নহে। উহাতে বিদেশী শব্দের বাহুল্যই উহাকে পরবর্তী কালের লেখা বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে।

চন্দ্র যখন অজমীরে অজমীর ও দিল্লীবাসী, তখন তাহার ভাষাতে পঞ্জাবী বিশেষত্ব থাকাও সম্ভব বা উচিত

নহে, অথচ সমস্ত গ্রন্থে একটিও কবিতা এমন আছে কি নাই। এইসকল কারণে রাসোকে বিশেষজ্ঞরা সপ্তদশ
না সন্দেহ, বাহাতে একটিও পঞ্জাবী শব্দ বা উচ্চারণ শতাব্দীর রচনা বিবেচনা করেন।

সমাপ্ত

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি *

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
২৯ নভেম্বর ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

এবার দ্বিখণ্ডিত করা কঠিন!
সবটা দিলেই ভাল হয়।
যন্ত্রে সঁপি দেও, থাকিতে দিন,
দ্বিধা প্রতি হইয়া সময়।
বলিতেছ “করিব চেষ্টা”—
হইবে দেখিতেছি শেষটা
—পুরুফ্ সাতাশে বা আটাশে
উড়িয়া আসিবে বাতাসে।
পোস্টকার্ড তব—কী ভোগায় ক’ব—
মাখায় গো হানিল ডাঙা।
ইহার সত্তর, ভেটিয়া উত্তর,
দ্বিজের মন কর ঠাঙা।

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
২৬ মে ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিয়াছিলে তাহাই
করিলাম—ভাড়াভাড়ি সংক্ষেপে সারিয়া ১৫ই তারিখের
মধ্যে রসদ যোগাইলাম। আমার দুইটা কথা এখন তুমি
মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর :—

* এই চিঠিগুলি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লেখেন। প্র: স:

প্রেসাম্বুদ হ’তে যবে প্রফ-ধারা ঝরে।
চাতক দ্বিজের মনে আনন্দ না ধরে।
প্রেসাম্বুদ না হইলে সময়ে সদয়।
যে করে চাতক-প্রাণ বলিবার নয়।

সারদা দেবীর বরপুর

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
২৮ মে ১৯

ভেট বাহা পাঠাইছ যতনে-সোহাগে
পেয়েছেন প্রবাসী ? না নিয়ে গেছে কাগে ?
ন-ডাকে সাড়া যে নাই ! এ কি ভাব চাক !
তোমার ব্যাভার দেখি বনে’ গেছি দাক !!

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯

পরান পাইছ ধড়ে পাইয়া উত্তর।
খুসী হৈছ শুনি প্রফ পাঠাবে সত্তর।
যে দেখে কলঙ্ক শুধু চাকদ্বিজরাজে।
বিফল নয়ন তার এ ধরণী মাঝে।

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

সঁপিছ তোমার হাতে মস্তকের ছেলে।
পুরিয়া রেখো না তা’রে যন্ত্রধর-জলে।
প্রফ-যানে করি ভর, সপ্তাহ ভিতরে—
ঘরের ছেলোটি ঘেন শীত্র আসে ঘরে।

গোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১০ আগস্ট, ১৯

ও

চাকচন্দ্র

কাটাবনে ভরা প্রফের ক্ষেত্র ।
নিরখিলে মোর ব্যথমে নেত্র ।
অ্যাভো কাটিলাম—হ'ল না ফবুসা ।
এ ঘোর বিপদে তুমিই ভরসা ।
সঁপিছ তোমায় মাথার ধন ।
তরাও ইহায়ে গহন বন ।

গোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
নভেম্বর ১৯

প্রিয়দর্শন চাকচন্দ্র

তুমি লিখিয়াছ—“আমার তিতুমিঞার* শিষ্য বলিয়া
যে অহুযোগ আছে তাহার গুঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতেছে
না।” অর্থাৎ তোমার নামে আমি যেন ভয়ানক একটা
charge আনিয়াছি ; অথচ তুমি মাহুষ খুনও কর নাই
—জালও কর নাই—চুরি ডাকাতিও কর নাই !
তিতুমিঞার ইতিহাস কি তুমি শোনো নাই কখনো ?
সে যখন বাঁশের কেজা বাঁধিয়া অ্যাকা হাতে কোম্পানির

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৩১ পৃষ্ঠা, “দীপপ্রভ চকুর কাছনী
নীত” নামক কবিতা দ্রষ্টব্য ।

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন কোম্পানির ফৌজেরা
হুই একবার ফাঁকা আওয়াজ করাতে সে বলিল, “গোলা
খা ডলা”। তোমার প্রতি আমি যতবার কবিতার
ছিটাগুলি বর্ষণ করিয়াছি—একবারও তুমি তাহার সম্বন্ধে
ভালমন্দ কোনো একটি কথা উচ্চবাচ্য না করাতে
আমার মনে হইল তুমি “গোলা খা-ডলা” বলিয়া তাহা
waste paper basketএ নিক্ষেপ করিলে, এই যা কেবল ।
শ্রীঃ

গোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৮ মে ২১

ও

চাকচন্দ্র

শ্রীঃ শীঘ্র পাঠাইলেই ভাল হয়—

কেননা এটা ব্রহ্মবাণী
“বিলম্বে হয় কর্মহানি !”
Rhyme কে সাম্ভানো তার—
দেখা দিয়াছে আবার !
আদর যদি দিই তাকে
পড়িব ঘোর বিপাকে ।
পায়ে পড়ি থাকে ধমক খে'লে ।
শিরে চড়ি বসে আদর পে'লে ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অগভের তুমি ছিলে না ত' কেহ
কল্পনা-লোকে রহিতে তাই
চিন্ময় ছিলে স্ববি দ্বিজেন্দ্র
অড়তা তোমারে পরশে নাই ।
যে হেরেছে তব শাস্ত শুভ
দিব্য দীপ্ত মুরতিখানি

যে শুনেছে তব কোমল মধুর
মর্মভরা সে অমিয় বাণী—
সে হাস্ত তব হা-হা-হা আ-হা-হা
ঝরিয়া হৃৎ শুভ ধারে
কর্ণ ভরিয়া আলিয়া চিত্ত
কছু পবিত্র ক'রেছে ধারে

তারি হিয়া-মাঝে তব রূপ রাজে
 আঁজিকে অরূপ মরণভয়ী
 শাস্ত বদন দীপ্ত নয়ন
 গুহ্র মূর্তি প্রতিভাময়ী ।
 নন্দন-মধু- স্বপনে উধাও
 ছিলে না ত তুমি ধরণী-তলে,
 নব রসে ভরা কাব্য-জগতে
 বিচরিতে সদা কোতুহলে ।
 পারিজাত-ফোটা মনোরাজ্যের
 কামধেনু-চরা সোনার ধূলি
 বিচরিত্বা সেখা কোতুকী তুমি
 ধরিয়া উজ্জল-বরণ তুলি
 আঁকিলে কি ছবি কল্প ভীষণ
 কোমল মধুর উদাস কহু,
 কহু বা বিকট বীভৎস রসে
 লোমহর্ষণ করিয়া প্রভু,
 কহু আনন্দ কহু বা বিষাদ
 রৌদ্র-মেঘের রচিলে নেলা
 নিখিল কাব্য- রস নিঙাড়িয়া
 বসাইলে ঘরে প্রমোদ-মেলা ।
 ভুবনের সার সত্য-অমৃত
 আহরি' বিলালে অগৎজনে,
 গীতার ভূমিকা রচি' আচার্য্য
 কত না প্রসাদ লভিলে মনে ।
 খুঁজিয়া মিলালে তুমি যে শাস্তি
 পরিবেশি' দিলে সবার কাছে

আনন্দ-রসে তারি' মঙ্গল
 বিভরিলে স্বধী-জন-সমাজে ।
 ভাবিতে সবারে আপনার মত
 তবদণ্ডী গভীর জানী
 তাই ত কহিতে ' সবার আগে
 নিগূঢ় মর্ম-শাস্ত্র-বাণী ;
 তাই তব পাশে রহিত যে জন
 আনন্দ-লোক-বার্তা লভি'
 কণেক ভুলিত মরম-বেদনা
 নেহারিয়া তব মুখচ্ছবি ।
 তেমন হৃদয় লোকজুলুভ
 কখনো কাহারো হেরিনি আর,
 পরের বেদনা শুনিলে যা গলি'
 ক্ষরিত নয়নে শতেক ধার ।
 মানবাত্মারে দিগ্বেচ্ছ শ্রদ্ধা
 করেও করনি অবিশ্বাস,
 আপন সরল চিন্তেরি সম
 তোমাতে সবার হ'ত প্রকাশ ।
 গুহ্রশীর্ষ শিশু-ভোলা-নাথ
 তোমার তুলনা তুমিই প্রভু,
 সরল সত্য ছিল তব সাধী
 ছলেও ছলনা করনি কহু ।
 ধরণী তোমার না হইতে শেষ
 স্বর্গেরে তুমি লভিয়াছিলে,
 সাধক-উচিত তব তিরে।ধানে
 আঁজকে সে কথা বুঝিয়ে দিলে ।
 শাস্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওহুদ

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলিতে দেখা যাচ্ছে, খেয়ার এই প্রতীক্য কারণ কেটে গড়তে
 চাচ্ছে :—

কোথার আলো কোথার ওরে আলো ।
 বিরহানলে আলোরে তারে আলো ।

রয়েছে দীপ না আছে শিখা

এই কি ভালো ছিল রে শিখা,

ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো ।

বিরহানলে প্রদীপখানি আলো । (১৮)

গীতাঞ্জলির প্রায় সব আয়নারই দেখতে পাওয়া যায়, কবি বিরহের
 ব্যথা বড় গভীর করে অনুভব করছেন । সেই বিরহের ভিতরেই কখনো-

কখনো প্রিয়তমের কোনো একচুখানি সান্নিধ্য লাভ করতে পারছেন।

বাহিত-সম্বন্ধে মানা কথাই কবির মনে জাগছে, বড় মাধুর্যমাখা সেইসব কথা। কখনো বলছেন—

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।

এবার হৃদয়-মাবে লুকিয়ে বোসো
কেউ জানবে না কেউ বলবে না। (২৪)

তিনি জানেন, তাঁর হৃদয় এখনো তাঁর চরণস্পর্শে ধস্ত হবার মতো হয় নি,—

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
কিন্তু এ কথা বলবার অধিকার কবি পেয়েছেন—
সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ার
তবু কি প্রাণ গলবে না ?

আর এ বে-সে অধিকার নয়।

মাঝে-মাঝে কবি অদ্ভুত আবঙ্গারের কথা বলেছেন—
বুধ কিরিয়ে রবো তোমার গানে
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে। (২৯)

কখনো অজানিতভাবে তাঁর কণিক স্পর্শ লাভ করে সচেতন হয়ে
কবি নিজেকে দিকার দিচ্ছেন—

সে বে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি। (৩২)

বলা বেতে পারে বিরহের বেদনাই গীতাঞ্জলির পূর্ণ হৃদয়, আর রীতিমত
তীব্র সে বেদনা।

কবি প্রায় সব অবস্থায়ই এই বিরহের বেদনা অনুভব করছেন।
প্রত্যন্তে মেগে উঠে বলছেন,—

হৃদয়, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরণ্য বরণ পারিজাত ল'রে হাতে। (৩৮)

মেঘলা দিনে বলছেন,—

বেশের পরে মেঘ মনেছে,
আঁধার করে আসে,
আমার কেন বসিয়ে রাখো
একা ঘরের পাশে। (১৭)

বৃষ্টির সাতাষাতি দেখে তিনি বলছেন—

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ বড়,
বুক ছাপিয়ে ভরঙ্গ মোর
কাহার পারে পড়ে। (২৮)

রান বৈকালে তাঁর মনে পড়ছে—

এখন বিজনপথে করে না কেউ
আসা বাওয়া
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে চেউ
উত্তল হাওয়া।

জানি না আর কিরুবে কিনা
কায় সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজার বীণা ভরষিতে। (২৭)

ঝড়ের রাতে তিনি আকুল হয়ে ভাবছেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানখা বহু হে আমার। (২১)

আর সব অবস্থাতেই তাঁর মনে জাগছে—

অভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে। (২২)

গীতাঞ্জলিতে কবির ছুই ভাবের সাধনা আমরা লক্ষ্য করি। একবার
তিনি বলছেন—

নিভৃত প্রাণের দেবতা
বেথানে জাগেন একা,
ভক্ত সেবার খোলো ঘর,
আজি লবো তাঁর দেখা। (৫১)

আর-বার বলছেন—

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।

রুদ্ধঘরে দেবালয়ের কোণে
কেন আঁহিসু ওরে ? (১২০)

অথবা বিশ্ব সাথে যোগে যেবার বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেবার আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেবার আপন আমারো। (৯৫)

এর ভিন্ন-ভিন্ন পরিণতি আমরা গীতিমালা আর গীতালি বলাকা
পলাতকা ইত্যাদিতে দেখতে পাই।

গীতাঞ্জলির এই বিরহকে বৈকব বা হৃকীর বিরহের সঙ্গে মিলিয়ে
পড়া যেতে পারে। প্রকৃত বৈকব চরৎকার প্রেমিক, তাই প্রেমের ব্যথা
রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভব করেছেন তখন বৈকবের ভাবটি মাঝে-মাঝে
তাঁর ভিতরে যে ফুটে উঠবে এটি স্বাভাবিক। রাধিকার ভাবটি
গীতাঞ্জলির অনেক জায়গায়ই বেশ ফুটে উঠেছে। এমন-কি কেউ
বুঝি বলেন, বৈকবের প্রেমের ভাবটিই গীতাঞ্জলিতে বেশী প্রস্তুত, তা হলে
তাঁর সঙ্গে তর্ক না করলেও অজায় হবে না। তবু একথা বলতেই
হবে, মোটের উপর বৈকবের প্রেমের ধাত রবীন্দ্রনাথের নয়। বৈকব
মুর্তিবাদী, রাখাক্ষ এক হৃদয় রসধনবিগ্রহ বলেই বৈকব তা
অবলম্বন করে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারী।
সে রহস্যময় তাঁর কাছে "জলে হলে" "নানা আকারে" ধরা যেন। কবি
নিজের গাঢ় অনুভূতিতে কখনো তাঁর চরণ হুঁতে পারছেন। কখনো
বৃত্তার বেশে তিনি কবির মনোনেত্রে আবির্ভূত হচ্ছেন।

এই মতই হৃকীর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও তাঁর কিছু অমিল
রয়েছে; হৃকীও পীর মনেন; শাস্ত্রের সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে
চেষ্টা করেন। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সাধনার নুতনত্বই বেশী করে
চোখে পড়ে।

ইরোরোপ তাঁকে বলেছে 'মিস্টিক' (Mystic), কিন্তু মিস্টিক
বললে তাঁর বিশেষত্ব-নির্দেশ পুরোপুরি হয় না, কেননা এ-কথাটি খুবই
ব্যাপক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth)ও Mystic, 'এমার্সন'
(Emerson)ও Mystic, আবার ব্লেক (Blake)ও Mystic। শ্রীকৃষ্ণ
নলিনীকান্তও Mystic-এর এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—"তাঁর কাছে
মধ্যাহ্নের তপন বড় রুঢ়, রুঢ়, সে ভালোবাসে হারা-আঙ্গোর বিজন।"
একজেরী Mystic-সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে

একখাটি একেবারেই খাটে না। তাঁর স্ফূর্তির তীব্রতা অনুভূতির
গাঢ়তা আর প্রকাশের পর্যাপ্ত প্রায় সব জায়গার চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ Mystic এই হিসাবে যে সত্যের চিররহস্যময় ধারে
তিনি উঁকি মেরেছেন। সেই হিসাবে জগতের কোন্ শক্তিময় Mystic
নন ?

বৈকবের ভক্তির হ্রস্ব রবীন্দ্রনাথে পান না ব'লে অনেককে
ছুঃখ করতে দেখেছি। তাঁরা তুলে যান, মানুষের জীবন বিচিত্র,
জীবনের সার্থকতাও বিচিত্র। তা ছাড়া অপরের পরিচয় যখন আমরা
পেতে বাই তখন আমাদের উচিত, নিজের খেয়াল কচি ইত্যাদিকে
একটুখানি চেপে রাখা। এই জ্ঞানী মানী হুমত্যা কবি যখন
বলছেন—

জড়িয়ে গেছে সর-মোটা
ছুটো ভারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে নারে (১২৯)

তখন কি ছুঃখে তাঁর হৃদয়ে এই দারুণ অশক্তি বাজছে, কি সত্য
রয়েছে এর ভিতরে, কোন্ অবস্থায় পড়ে মানুষের হৃদয়-ভারে এমন
বন্ধার গুঠে—সেই সমস্তের অনুসরণই কি সত্য অনুসরণ নয় ? যারা
সহজ অধিকারে ডুব দিয়ে অভলে তলিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁরা
নিশ্চরই ভাগ্যবান। কিন্তু যিনি ভেঙ্গনি করে নিঃক্ষে তলিয়ে দিতে
পারছেন না, অগচ অভলের জন্ত প্রাণ তাঁর আকুল হ'রে উঠেছে। তাঁর
সেই আকুলতারও ত বিধিবিধাতার এক চমৎকার লীলা। মানুষের
ইতিহাসে তা একতিলও অসত্য নয়। তার উপর খেরা গীতাঞ্জলি
গীতিমাল্য শুধু বিরহীর কারাই নয়, এ-সমস্তে ফুটে উঠেছে এক নব
বিরহবুর্ধি। এইসমস্ত কাব্যের অনেক কবিতা যে ইরোরোপের
আধুনিক ভাবুক মনীষীদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সেও এই জন্তেই।

গীতাঞ্জলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্ততম
বলেছি। গীতিমাল্য আর গীতাঞ্জলির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক
সাধনার যে গ্রাম তা হরত গীতাঞ্জলির গ্রামের চাইতে উচ্চতর। কিন্তু
স্বষ্টি পূর্ণতার অর্থাৎ মূলতর ব'লে মনে কর গীতাঞ্জলির ভিতরে।

গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলির যে কারা গীতিমাল্যে তা খেমে যায়। কিন্তু সে অশ্রু
এখন এক নতুন বেশ। এ ভীত বেদনার অশ্রু নয়, এ অশ্রু ভিতর
দিয়ে কবি-জগতের কেমন-এক স্নিগ্ধ শান্তি চোখে পড়ে—যেন বৃষ্টিতে
ভেজা টপক। গীতাঞ্জলিতে বড়র রাত্রে কবি বলেছেন

আজি বড়ের রাতে তোমার অভিসার ইত্যাদি
আর গীতিমাল্যে বলেছেন

যে রাতে মোর ছুরারগুলি
ভাঙল বড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কাঁপে
নিবে গেল দীপের আলো
আকাশ পানে হাত বাড়াগেল
কাহার ভরে।
অন্ধকারে রইল প'ড়ে
ঘপন মানি।
বড় যে তোমার জরখণ্ড
জাই কি জানি ?

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি,
ঘরতর মোর শূন্যতারি
বুকের পরে। (৬৭)

কবির অশ্রুরে ব্যথা বুচে যায়, কিন্তু অশ্রুরের তলে কেমন একটু
তৃপ্তি গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতাকে সরস ক'রে রেখেছে।

আমার এই পথ চাওরাতেই আনন্দ (৭)
কোলাহল ত বারণ হ'ল
এবার কথা কানে-কানে। (৮)

কে গো অন্তরতর সে ?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি হৃদয়ীর পরশে। (২২)
তোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে। (৩৫)
ইত্যাদি

ভক্তের যে সঙ্কোচনের পূজা সেইটাই গীতিমাল্যের মূল হ্রস্ব। কবির
যত কথা যত ছুঃখ যত সার্থকতা যত আনন্দ একান্ত ক'রে তাঁকেই তিনি
বলছেন—

লুকিয়ে আসো আঁধার বাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ। (৪৭)

গীতিমাল্যে কবি বড় খাদের পর্দায় হ্রস্ব বেঁধেছেন ; তাই তা পুরো-
পুরি উপভোগ করবার জন্ত খুবই দরদার কান চাই। সেই কান থাকলে
গীতিমাল্যে খুবই একটা গভীর তৃপ্ত অনুভব করা যায়। এই খাদের
পর্দাতেই সমর-সমর কবির মনের কথা কি মর্মস্পর্শী হ'রে বেজে উঠেছে।

“এই যে তুমি” এই কথাটি
বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ কোরলেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
“আছ আছ”র শ্রোত ব'হে যায়
'কই তুমি কই' এই কাদনের
নয়ন-জলে গলে। (১৪)

* * * *

যদি জান্তেহ আমার কিসের ব্যথা
তোমার জানাতাম।
কে যে আমার কাঁদার, আমি
কি জানি তার নাম।

* * * *

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাইনে জীবন ভ'রে।

হৃৎখ বায়ে কর সকল জনে
বাজাই তা'রে কণে-কণে,
গভীর হুরে “চাইনে, চাইনে,”
বাজে অবিজ্ঞাম। (৫৭)

তখন মনে হয় এমন থাকে পক্ষীর হৃৎ না ধরলে এমন অপূর্ণ গান
সুনার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত না। *

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার চেহারা গীতিমাগ্যে অনেকখানি
পরিষ্কৃত হ'য়ে উঠেছে। কোনো গুর বা শাস্ত্র তাঁর পথ-প্রদর্শক নন।
উপনিষৎ তাঁর প্রিয়, বৈক্য কবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দেশ-
বিশেষের সাহিত্য-সহায়ীদের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা; কিন্তু প্রকৃত
গুরর পদে বরণ তিনি কাউকেই করেন নাই। তাঁর অন্তরের অমুত্থিই
বিষ-জগতের বৃকের উপর দিয়ে তাঁর পথ দেখিয়ে চলেছে।

মিথ্যা আমি কি সন্ধান

বাবো কাহার ঘর ?

পথ আমারে পথ দেখাবে

এই জেনেছি সার।

সুগাতে বাই যারি কাছে

কথার কি তার অন্ত আছে ?

বতই শুনি চক্রে ততই

লাগার অঙ্ককার। (৬২)

নিজের অন্তরের সত্যকার বেদনা যে কেমন ক'রে মানুষকে পথ
দেখায়—চিরকাল মানুষকে পথ দেখিয়ে এসেছে—সে-কথাটি অন্ত-এক
কবিতার বড় মন্ত্র ক'রে বলা হয়েছে। সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্যে এ একটি
শ্রেষ্ঠ কবিতা।

আমার ব্যথা বধন জানে আমার

তোমার ঘরে

তখন আপনি এসে ঘর খুলে দাও

ডাকো তারে।

* * *

আমার ব্যথা বধন বাজার আমার

বাজি হুরে,

সেই গানের টানে পারো না আর

রইতে হুরে।

লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম

বড়ের রাতের পাখী-সম,

বাহির হ'য়ে এস তুমি

অঙ্ককারে ;

আপনি এসে ঘর খুলে দাও

ডাক তারে। (৬৪)

এর "বড় ঘর গো উড়ে" শীর্ষক কবিতাটি বড় অদ্ভুত।

বড়ে ঘর উড়ে ঘর গো

আমার মুখের আঁচলখানি।

ঢাকা থাকে না যে হার গো

তারে রাখতে নারি টানি। (১৯)

কোন চুখকের আকর্ষণে কবি-চিত্ত এমন আহির হ'য়ে উঠেছে
আমাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ নয়। হাকেরঙ এক জারগার
বলেছেন

দিল্, মি রঙম রে দস্তান্

সাহিবদির্না খোদার।

* গীতামালিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্ততম
বলেছি। কেউ যদি সে জারগার গীতামাল্যের নাম করেন তবে আমরা
তর্ক করব না।

সহজের সাধনার কবি যে অনেকখানি এগিয়েছেন গীতিমাল্যের
অনেকগুলি কবিতার তার পরিচয় রয়েছে।

বাজাও আমারে বাজাও।

বাজালে যে হুরে প্রভাত-আলোরে

সেই হুরে মোরে বাজাও।

যে হুর ভরিলে ভাব'-ভোলা গীতে

শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে

জননীর মুখ তাকানো হাসিতে

সেই হুরে মোরে বাজাও। (৩৯)

আকাশে

ছুই হাতে প্রেম বিলাস ও কে ?

সে-সুখা

গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে।

গাছেরা

ভ'রে নিল সবুজ পাতার,

ধরণী

ধ'রে নিল আপন মাথার।

ফুলেরা

সকল গারে নিল মেখে।

পাখীরা

পাখায় তা'রে নিল একে। (১০৮)

*

*

*

গীতিমাল্যের শেষের দিকে কতকগুলি কবিতার দেখা বাজে কবির
বেদনা আর অর্ধহিত হয়েছে, আর আনন্দ বেশ সজীব হ'য়ে উঠেছে।

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ক'রে পড়ুক ক'রে,

তোমারি হুরটি আমার মুখের পরে বৃকের পরে।

পূর্বের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে ছুই নয়নে

নিশীথের অঙ্ককারে গভীর ঘরে পড়ুক প্রাণে

নিশিদিন এই জীবনের হুরের পরে দুখের পরে

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ক'রে পড়ুক ক'রে। (৬৮)

*

*

*

*

ভূমি যে হুরের আশ্রয় লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে

সে আশ্রয় ছড়িয়ে গেল

সবখানে।

বতসব মরা গাছের ডালে-ডালে

নাচে আশ্রয় ভালে-ভালে

আকাশে হাত তোলে সে

কার পানে। (৮৯)

বৈক্যের সেই

এ মোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইল বাটে

আঙিনার পরে তিত্তিছে বঁধুরা

দে'খে যে পরণ কাটে—

কবিতার সঙ্গে গীতিমাল্যের "কেন চোখের জলে তিত্তিছে দিলেম না"
শীর্ষক কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। বৈক্যের সরল হৃদয়,
বাইরের বন্ধনই তাঁকে আবদ্ধ করেছে। তিনি কেঁদে বুক ভাসিয়ে
দিয়েছেন। কত বর্ণস্পর্শ এই কারা তা কে না বুঝতে পারে ? কিন্তু
গীতিমাল্যের কবির হুঃখ দেখেছি একটু ভিন্ন-রকমের ;

ভূমি পার হ'য়ে এসেছ মর

নাই যে সেবার হারাতর,

পথের হুঃখ দিলেম তোমার,

এমনি ভাগ্যহত ! (৯১)

বাইরের ভেমন-কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁকে হুঃখ দিচ্ছে না। তাঁর
প্রিয়তমের আশ্রয় পথ বন্ধ হয়েছে তাঁর নিজের অন্তরের গুহতার

সকলে—শিখিল প্রবৃত্তি চার সকলে । আধুনিক কবির এই ছুঃখ বিশেষ ক'রে আধুনিক জগতের লোকেরই ছুঃখ, কেননা মানুষের এই ভিতরকার বন্ধনই আজ বেশী প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে ।

এক যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার সঙ্গে অল্প যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার নিশ্চয়ই খুঁ বেণী মিল । তবু একযুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশভঙ্গিমা অল্পযুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশ ভঙ্গিমা হ'তে ভিন্ন হ'তে বাধ্য, নইলে ভিন্ন-ভিন্ন যুগ ব'লে কোনো কথাই থাকত না । অতীতের ধারা অল্প তত্ব এ কথাটি তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার ।

গীতিমাল্যের শেষের কবিতার কবি যে প্রশাসন নিবেদন করছেন কেমন-এক সার্থকতার আনন্দ রয়েছে তাতে—

মোর সন্ধ্যায় তুমি স্থম্বরবেশে এসেছ,
তোমার করি পো নমস্কার ।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমার করি পো নমস্কার । (১১১)

গীতালি

কবির এত দিনের সব কার-বাখা কেমন-এক সার্থকতার স্মৃতিতে মজিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে গীতালিতে ।

ছুঃখের বরষায়
চক্কের জল বেই
নাম্ন
বন্ধের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
খাম্ন ।

* * * *

এত দিনে জান্লেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাঁহার জন্ত ।
ধস্ত এ কন্দন,
ধস্ত এ জাগান,
ধস্ত রে ধস্ত । (১)

গীতালির প্রায় সব কবিতারই এই সূত্র—এই সার্থকতার স্বপ্ন হ'য়ে । তত্ব কবি তাঁর চিরবাঞ্ছিতের সামনে বসে যেসব আবদারের কথা বলছেন কত নিবিড় তাঁর রসটি ।

বন্ধ আমার এখন ক'রে
বিদীর্ণ যে করে
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ? (৩২)

অথবা

গর্ভ আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়বে না কেউ কভু । (৬৪)

তাঁর স্বপ্ন-পূহ-শরান প্রিয়তমকে জাগাবার জন্ত কবি যে ডাকছেন কোনো ব'খ কোনো আশঙ্কা নেই নেই স্বপ্নে । পূর্ণ বিশ্ব'সে প্রাণ ত'রে তিনি বলছেন

মোর হৃদয়ের পোঁপন বিজ্ঞান ঘরে
একেলা রয়েছে নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো ।
রক্ত ঘরের বাহিরে ঠাড়ায়ে আমি
আর কত কাল এমনি কাঁটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো ।

* * * *

মিলাবো নতন তব নয়নের সাথে
মিলাবো এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে —
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো ।

হৃদয়পাত্র স্থধার পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপবে গভীর আলোর রবে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো ।

এখন সার্থকতার অন্তরে কবির দৃষ্টি আরো পরিষ্কার আর প্রেম-মুগ্ধ পানে তাঁর কণ্ঠ আরো সবল । তাই তাঁর এতদিনের আধ্যাত্মিক সাধনার যে বেদনা আর এখনকার যে আশা সে-সবকে কবি বেশ-দরঙ্গু বন্ধারে ব'খা বলছেন—

যখন তুমি বাঁধাছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ।
আর বাজাও বীণা, ভুগাও ভুগাও
সকল ছুঃখের কথা (১৭)

গীতালিতে কতকগুলো উচ্চরের কবিতা স্থান পেয়েছে—রূপ আর রনের দিক দিয়েই উচ্চরের ।

আপ্তনের

পরশমণি
ছোঁরাও প্রাণে
এজীবন
পূণ্য করো
—বহন দানে । (১৮)

যে থাকে থাক না ঘরে
যে বাবি বা না পারে ।

* * * *

কুঁড়ি চার আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে ।
কোটাফুল চার না নিশা
প্রাণে তার আলোর তৃষা
—কাঁদে সে অন্ধকারে । (২০)

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন ক'রে ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
পানের ঘোরে । (৫৫)

* * * *

পুষ্প ঘিরে মারো ঘারে
চিন্তন না সে মরণকে ।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
ধর তোমার চরণকে । ৭৩
ইত্যাদি ।

এর ছুটি কবিতা গীতিমাল্যের সেই 'বড় বার উড়ে গো বার' শীর্ষক কবিতার মতনই আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে ছুজোঁয় । উচ্চ (Egotistic) সাধনা ধারা করেন তাঁরা হরত এ সমস্তের রস ভালো ক'রে উপভোগ করতে পারেন—

কোন সাহসে একবারে
শিকল খুলে দিলি ঘারে,
জোড় হাতে তুই ডাকিস কারে ?
এলর যে তোমার ঘরে চোকে । (১০)

* * * *

আমি যে আর সহিতে পারিনে

সুর বাজে মনের নাখে গো

কথা দিবে কইতে পারিনে । (১১)

* * *

যাঁর প্রেমের আকর্ষণে অকৃষ্টি হ'য়ে কবি এতকাল কেঁদেছেন তাঁর সেই প্রেমকে কবি বলেছেন সর্বনাশ। হাকেঞ্জু বলেছেন :—

কসু বদৌরে নাগিসত তরু কিনবপ্ত আঙ্গ আকিরাত

বাস্তবিক সত্যের যে সন্ধানী তাঁর আরাম-আয়েসে আঙনের স্পর্শই লাগে। আচার্য্য ভগবানচন্দ্রের বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তাঁর কাছেও এই কথাটিরই আভাস বেশী ক'রে পেয়েছেন।

গীতালির "আবার যদি ইচ্ছা করো" শীর্ষক কবিতাটিও খুবই লক্ষ্য-বোধ্য। কত অল্প কথার কত বিস্তৃত আর রসময় ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! কবির এই কল্পনার আরো বেশী পরিচয় পাওয়া যায়, এর পরে রচিত পলাতকার আর বিশেষত লিপিকার।

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চত্বমিতে দাঁড়িয়ে চিরপরিচিত অতি বড় ধরণীর পানে চেয়ে কবি বলেছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো

আবার আমি কি'রে

দুঃখ হুখের ঢেউ-খেলানো

এই সাগরের ভীরে।

আবার জলে ভাসাই তেলা,

ধুলার পরে করি খেলা

হাসির মারা-সুপার পিচে

ভাসি নবন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে

আবার যাত্রা করি ;

আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা

আঘাত খেয়ে মরি।

আবার তুমি ছদ্মবেশে

আমার সাথে গেলাও চেসে।

নূতন প্রেমে ভালোবাসি

আবার ধরণীরে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ গীতালিতে বেশ পরিষ্কৃত হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেন—

সেই ত আমি চাই।

সাধনা যে শেষ হবে মোর

সে ভাবনা ত নাই।

* * *

এমনি ক'রে মোর জীবনে

অসীম ব্যাকুলতা,

নিত্যনূতন সাধনাতে

নিত্য নূতন বাধা।

"নিত্যনূতন সাধনাতে নিত্যনূতন বাধা" স্মৃ করার ভিত্তরে মুক্তির খাদ আছে। কবির জীবন এতেই ভোর হবে না, এমন দিন আসবে যে-দিন তাঁর প্রতিভা-নিবন্ধিণীর সব কলকল ভাব সাগরসঙ্গমে নীরব হ'য়ে যাবে, কে তা বলতে পারে? কিন্তু এই কবিতার অল্প জ্ঞানগায় তিনি যে বলছেন—

কলের তরে নরত খোঁজা,

কে বইবে সে বিঘম বোঝা,

বেই কলে কল ধুলার কে'লে

আবার ফুল ফুটাই।

এটি তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার কথা হ'লেও এর ভিত্তরে একটি বড় সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিক সাধনার বাঁদের উপলক্ষি তত্ত্ব-আকারে, অনুশাসন-আকারে কলের মতন দেখা দিচ্ছে, তাঁদের মাহাত্ম্য ইতিহাসে কীর্তিত হয়েছে। অবতার-পরমেশ্বররূপে, শাস্ত্রকাররূপে, পথপ্রদর্শক গুরুরূপে তাঁরা মানুষের পূজা পেয়েছেন। তাঁদের মাহাত্ম্য যে অসাধারণ একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু একদিকে যেমন রয়েছে তাঁদের প্রতিভার উজ্জ্বলতা, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় দুর্ভল লোকের জীবনে তাঁদের প্রভাবের বিকারের অঙ্ককার। তাঁদের আবিষ্কৃত যে-সব তত্ত্ব, যে-সব উপদেশ তাঁরা মানুষকে দিয়েছেন, যে-সব কালে-কালে মানুষের উপর অকথা অত্যাচারই করেছে। জগতে সব ধর্মের ইতিহাসই বহু-পরিমাণে এই কলের বিঘম বোঝার দৌরাঙ্কোর ইতিহাস নয় কি? অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত মৌল্যবোঝার নিয়ম যে ভগবান তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর বিশেষ আনন্দ, বিশেষ শক্তি প্রকাশিত যে অবতারাে পরমেশ্বরে, মানুষ তাঁদেরই জীবনের সব অবস্থার অবলম্বনরূপে বেশী ক'রে চেপে ধ'রে নেই কি? মানুষের সব ব্যাপারেই এই গুরুর অত্যাচার, আদর্শের অত্যাচার—সাধনার কলের "বিঘম বোঝার" অত্যাচার।

এখন অবশ্য এই গুরুর অত্যাচার আন্তে-আন্তে হালকা হবার পথে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরুর এখন বন্ধ হ'য়ে উঠেছেন—অন্ততঃ সে-সত্য স্বাক্ষত হয়েছে। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন যে ধর্ম—ভগবৎ-উপলক্ষি—সেখানেও যে গুরুর শুধু বন্ধ, অবতার পরমেশ্বর প্রাচীন আদর্শ সবাই বন্ধ একটুখানি সহায়, তাঁর বেশী নয়; তাঁর বেশী হ'লেই তাঁরা যে মানুষের উপর দৌরাঙ্ক্য করেন, তাঁদের জীবনে সত্যকার ফুল কোটাবার সুযোগ নষ্ট করে দেন *—দেখা যাচ্ছে এই আশ্চর্য্য সন্ধানী মানুষের বড় কামনার ধন সেই সত্যকে কবি নিজের জীবনে উপলক্ষি ক'রে মানুষকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাকে তত্ত্ব-আকারে অনুশাসন-আকারে জমিয়ে তুলতে তাঁর কত সঙ্কোচ।

কলের তরে নরত খোঁজা,

কে বইবে সে বিঘম বোঝা!

একহিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনই বিশ্ব-মানবের কাছে এই সংস্কার-মুক্তির উপহার,—ইতিহাসের ধারার সহস্র সংস্কারবদ্ধ মানুষের ভিত্তরেও অমৃত্যব করা যার যে অবস্থানের চমৎকারিত্ব তাঁরই মূর্ত্তি মহিমা।

তৃতীয় পর্য্যায়

বলাকা

গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার বেশ একটা সার্থকতা লাভ হয়েছে, আমরা দেখেছি। এই সার্থকতার রসে কবি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিতেও পারতেন—অর্থাৎ অনেক ভক্ত তা পেয়েছেন। তা হ'লে তাঁর গানে হরত অনুভব করতে পারা যেত হাকেঞ্জু বা কবীরের জমাট মিলনানন্দ। কিন্তু তা না পেয়ে আমরা দুঃখিত নই, কেননা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্বয়ং কবি এর ভক্ত দুঃখিত নন। তিনি আর কিছুই সন্ধান পেয়েছেন, আর-এক অপূর্ণ সময়ের সঙ্গে সে-পথ অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

গীতালির এই সার্থকতার সবলতার কবি অনুভব করছেন গতির

*চতুর্দশ শতাব্দীর বক্তৃতা, "আমার অন্তর্ভাবী কেবল আমার পথ দিয়েই আনাপোনা করেন।"

জানন্দ। তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরেই গতি বধেই তুর্ন—হিন্নোচিত
ত বটেই। এখনকার এই দৃষ্টির আর চিত্তের সবলতার কবি প্রত্যক্ষ
করছেন তাঁর সেই মাতৃদেব পথিক রূপ।

আমি পথিক, পথ আমারই সাথী।

* * * *

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।

বাত্ম আমার চলার পাকে

এই পথেরই বাঁক বাঁক

নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

কবি তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—

পাছ তুমি, পাছজনের সখা হে,

পথে চলাই সেই ত তোমার পাওয়া।

বাত্মপথের আনন্দ-গান যে গাহে

তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

তাঁর এই পরিব্রাজকরূপ বলাকার পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবেই দেখতে
পাওয়া যাচ্ছে। জীবনেও তিনি এখন থেকে পুরোপুরি পরিব্রাজক,
কিন্তু এই বলাকা কাব্যের ভিতরে তাঁর যে পরিব্রাজকরূপ তা দেশ-কালের
গণ্ডা অতিক্রম করে এক অসাধারণ সৃষ্টি-মাহাত্ম্যই লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আর সর্বত্রই আমরা যে একটা গতিবেগ
দেখতে পাই, তৎ-হিসাবেও তা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে খুব প্রিয়;
কেননা আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়,
অভিক্রমরূপে গতিবেগের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক।
রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু এই গতির তত্ত্বই তার দেশবাসীকে দিতেন তা হ'লেও
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে তাঁর একটি বড় স্থানই লাভ হ'ত। কিন্তু
তিনি সত্যকার কবি, তাই গতির যে চিরকালের সত্য তাই-ই রূপ ধরে
উঠেছে তাঁর সামনে।

বলাকার অনেক কবিতাই সুন্দর। তৎ-এসময়ের ভিতরে
কম নেই, কিন্তু তাঁকে রাঙিয়ে দিয়েছে আর জীবন্ত করেছে তাঁর
কল্পনা। কি বিরাট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কল্পনা তা ভাবলে
স্তম্ভিত হ'তে হয়। বলাকার কতকগুলো কবিতার দৃশ্যও অসাধারণ।
এহনক্ষত্রের যুর্নের মহাচ্ছন্দে যেন ছন্দিত হ'য়ে উঠেছে কবির
ভাবোচ্ছ্বাস।

হে বিরাট নদী,

অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

অবিচ্ছিন্ন অবিরল

চলে নিরবধি।

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রক্ত কারাহীন বেগে;

বস্তহীন প্রবাহের এচও আঘাত লেগে

পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত-কেনা উঠে বেগে;

আলোকের ভীতুচ্ছটা বিচ্ছুরিতা উঠে বর্ণ-শ্রোতে

ধাবমান অন্ধকার হ'তে;

যুর্নাচক্রে যুরে যুরে মরে

স্তরে স্তরে

স্বা চক্রে তারা বত

বুড়দের মত।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, ইতিহাসে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে
চলার যে গীতা, তাঁর অপরূপতা প্রত্যক্ষ করে কবি যেন আনন্দে নৃত্য
করছেন।

আমরা চলি সমুখ পানে

কে আমাদের বাঁধবে?

রৈল যারা পিছুব টানে

কাঁদবে তারা কাঁদবে।

ছবি শুধু ছবি, চিত্রকলের মাঝে পাশে, একধার তাঁব আর মন ওঠে
না, তিনি বলেন—

কি প্রলাপ ক'রে কবি?

তুমি ছবি?

নহে, নহে নও শুধু ছবি!

কে বলে রয়েচ স্থির রেখার বন্ধনে

নিশ্চর ফন্দনে?

* * *

বিশ্বস্তির মর্মে বসি রক্তে মোর দিগন্তে যে দোলা।

নয়ন সঙ্গুণে তুমি নাই।

নয়নের মাঝখানে নিরেছ যে ঠাঁই;

আজি তাই

শ্রামলে শ্রামল তুমি নীলিমার নীল।

চিত্রা কাব্যের ভিতরে দেখা গেছে রবীন্দ্র-প্রতিভার এক পূর্ণ-উচ্ছ্বাসিত
রূপ, ভেদনি আর-এক বস্তাবেগ পরিলক্ষিত হয় এই বলাকা কাব্যে।

বলাকার “ভাজমহল” কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। তাঁর বর্ণনা
জারগার-জারগার দ্বিতীয় ভাগমহলের মতনই মাথা উচু করে
দাঁড়িয়েছে।

হে সজাট কবি,

এই তব হৃদয়ের ছবি,

এই তব নব মেঘদূত,

অপূর্ব অদ্ভুত

ছন্দে গানে

উঠিয়াছে অলঙ্কার পানে

বেধা তব বিরহিণী প্রিয়

রয়েছে শিথিল

প্রভাতের অরণ-আভাসে,

ক্রান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করণ নিশ্বাসে,

পূর্ণিমার দেহহীন চামেলির লাষণ্য-বিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেনা ধার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

বলাকাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্ততম বলেছি।
অনেকেই হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। বড় ভাব কি বড় রূপ
এতে লাভ করেছে। এর আর সব কবিতাই পাঠককে সেই কথা মনে
করিয়ে দেয়। সামান্য ভাবও এতে কী পূর্ণ জার পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ
করেছে। এর “মোর গান এরা সব শৈবালের দল” শীর্ষক কবিতাটি
তার প্রমাণ।

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,

যেখার জন্মেছে সেখা আপনারে করেনি অচল।

মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে

আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।

বাধা নাই নাইক সঙ্গ,

অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়।

বেদীন শ্রাবণ নামে ছুঁর্ষিবার মেঘে,

ছই কুল ভোবে প্রোতোবেগে,

আমার শৈবালদল
উদাস চকল,
বস্তার ধারায়
পথ বে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে বার ভেসে ভেসে।

কিন্তু এর "ভাঙ্গমহল" কবিতাটি সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বলবার আছে। কবির গতি-ভব, জীবনভব এসব শিরোধার্য করে নিরেও, যখন কবিকে বলতে শুনি "মিথ্যা কথা,—কে বলে রে ভোলো নাই?"—তখন আমাদের অন্তরপুরব কমন একটু পৌড়ন অনুভব করে। কবি বা বলছেন তা মিথ্যা নয়, তবু মন বলে, "আর যে বলে বলুক, কিন্তু কবির মুখ থেকে একথাটা এই ভঙ্গিতে শুনে রাঙ্গি হওয়া বার কি?"

এই অসম্পূর্ণতা হয়ত কবির মনেও লেগেছিল, তাই ভাঙ্গমহল-সম্বন্ধে মস্ত-একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

ভাঙ্গ সর্ব মানবের অনন্ত বেদনা
এ পাখান হৃদয়ীরে
আলিঙ্গনে ধিরে
রাজিদিন করিছে সাধনা।

অতীত অন্তর্নিহিত বটে, কিন্তু তা'র সবটুকু চিরস্থায়িত্ব নয়। কবি-নিজে একথাটা খুব ভালো করেই বোঝেন, তাই বলাকার একটি কবিতায় কবিকে বলতে শুনি—

এমন একান্ত ক'রে চাওয়া
এও সত্য বহু
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।

এ ছুরের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এত কাল কিছতে বহিতে পারিত না।
সব তার আগে
কীটে-কাটা পুস্পনয় এতদিনে হ'রে যেত কালো।

আমাদের মনে হয় এই ভাঙ্গমহল কবিতাটির শেষের দিকে কবি যখন ভয়ের আকর্ষণে বড় বেশী আকৃষ্ট হ'রে পড়েছেন।

বলাকা যে-যুগের লেখা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে একটি বড় যুগ। সবুজ পত্রের যুগ। আগেকার সাধনার যুগের মতন এ যুগও কাব্য, গল্প, উপন্যাসে নাটকে এবং অবশেষে সমুদ্র। সাধনার যুগ আর সবুজ পত্রের যুগ এ দুয়ের কোনটি সমৃদ্ধতর—শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধতর, সে-সম্বন্ধেও আলোচনা হ'তে পারে। দুই যুগ সম্বন্ধেই টের কথা বলবার আছে। সবুজপত্রের যুগের বলাকা, পলাতকা, লিপিকা, করেকটি ছোটো গল্প, আর সাধনার যুগের সোনার তরী, চিত্রা, পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ পাশাপাশি ঝাঁড় করালে সাধারণতঃ সবুজপত্রের যুগের দিকেই পক্ষপাত করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন মনে করা যায় পঞ্চভূতের নবীন মনোবা—নবীন প্রতিভাচ্ছটা, প্রথম ছোটো গল্পের নিবিড় রসাত্মকতা আর সোনার তরী ও চিত্রার তত্ব-নিরপেক্ষ আর নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনা—বর্ণনৈবচিত্র্যে পরম আভ্য কবি-কল্পনা, তখন পক্ষপাতিক ব্যাপারটি যথেষ্ট কঠিন হ'রে ওঠে। সবুজ পত্রের যুগের কবির অন্ত্যাকর্ষ্য সৃষ্টি ক্ষমতার আমরা মুগ্ধ, বলাকা, পলাতকা, কালো মেয়ে, হৈমন্তী, শেষের রাত্রি, বাণি প্রভৃতি কবিতা আর ছোটো গল্প গড়লে কে না মুগ্ধ হয়? বাস্তবিক দার্শনিকতা আর

কল্পনার অদ্ভুত মিলনে সবুজপত্রের যুগ খুবই লক্ষ্যযোগ্য; তবু সোজা কথা বলাই ভালো—সাধনার যুগ থেকে এ যুগ মোটের উপর শিল্প-নৌরবে শ্রেষ্ঠতর কি না সে-সম্বন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনি।

আগেই বলা হয়েছে, বলাকার অনেক কবিতাই হৃদয় কবিতা। এর 'বর্ণ কোথায় জানিস কি তা, তাই' শীর্ষক কবিতায় 'নৃত্য দোহুল' ছন্দটি বড় মর্মস্পর্শী। "অক্ষয়লো চিত্রায় ধর্মীর বর্ণখণ্ডলির" প্রতি চিরকালই কবির অপরিণীত মমতা। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চির আরাগের কর্তৃত্ব বর্ণের পানে কবি আর চাইতেই চান না। সে-বর্ণ বর্ণই নয়। অনন্ত মুখে আর অনন্ত দুঃখে বিচিত্র যে মাটির ধরার জীবন, তা'র চমৎকারিত্ব আর সত্যতা কবির চোখে এত বেশী যে সে-কথা শুনে আনন্দে তিনি যেন নৃত্য করছেন।—

বর্ণ কোথায় জানিস কি তা, তাই ?
তা'র ঠিক ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাইরে তাহার দেশ,
ওরে নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।
কিরেছি সেই বর্ণ শূন্যে শূন্যে
ফাকির ফাকা মানুষ।
কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি ভাঙ্গ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।
বর্ণ আজি সুভার্ঘ্য তাই আমার মেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা আমার সজ্জা আমার দুঃখেহুখে।
আমার মন সুভূরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটার খেলার সে বে রঙ্গে।

রসের এমন অল্পম উপলব্ধির জগতই রবীন্দ্রনাথ এত তারিকতা সম্বন্ধে চমৎকার কবি—যেমন চমৎকার কবি কালিদাস, যেমন চমৎকার কবি হাকের।

'বলাকা' কবিতাটির কথা আগেই বলা হয়েছে। বলাকা ব্রহ্মহাের এ মধ্যমণি। গতির যে অগ্নিব্যাগী কালব্যাপী তত্ব, রবীন্দ্রনাথের আলৌকিক প্রতিভার তা যেভাবে বিগ্রহাধিত্ব হয়েছে, তার সামনে আনন্দে, বিস্ময়ে, অন্ধার শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়; সমালোচকের দৃষ্টিকোণে আপনা থেকে মাথা নত করে।

হে হংস-বলাক',
আজ রাজে মোর কাছে পূলে দিলে খড়তার ঢাকা।
তুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমুনি পাখার শব্দ উদাস চকল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অক্ষুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাঙ্গি,

এই বন, চলিরাছে উগ্ৰুজ ডানায়
ঘীপ হ'তে ঘীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায় ।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অক্ষকারে আলোর স্পন্দনে ।
সুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অপটু অতীত হ'তে অক্ষুট হৃদয় যুগান্তরে ।
সুনিলাম আপন অস্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে

এই বাসা-ছাড়া পাখী ধার আলো-অক্ষকারে
কোনু পার হ'তে কোনু পারে ?
ধানরা উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার গানে--
'হেথা নয়, অস্ত কোথা, অস্ত কে'নু খানে!'

গাটের কাউস্ট-এর প্রারম্ভে দেবদূতদের যে স্তুতি আছে, তা'রই বিরাট-
ভাবধারণা এর সঙ্গে কিছু তুলিত হ'তে পারে ।

পলাতক

বলাকার রবীন্দ্র-প্রতিভার যে জোরার এসেছে, পলাতকার ভাঙে
ভাঁটা পড়েনি, শুধু তার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী কেনোচ্ছল তরঙ্গতলের
পালা চু'কে গেছে, মানুষের অত্যন্ত আপনার জনের মতন সে জোরার
এখন তা'র ধারের সামনে দিগে বইছে—বিভূত, প্রশান্ত, আনন্দরশ্মি-
দীপ্ত তার রূপ ।

পলাতক কাব্যখানি রীতিমত পছন্দ করেন না, রবীন্দ্র-কাব্যের
এমন পাঠক আজো আমাদের চোখে পড়েননি ।

বাস্তবিক, এর এমন সরল ওজস্বী আর অব্যর্থ কবিত্ব সূর্যালোকের
মতন যার উপর পড়েছে, তা'রই সমগ্ররূপ উগ্ৰুজ হ'য়ে দেখা দিয়েছে । কত
গভীর কথা কত সহজভাবে কবি বলেছেন । আর কি অব্যর্থ তাঁর
ইঙ্গিত । এর প্রথম কবিতা পলাতকার আংশিক উদ্ধৃত করছি ।

কুকুরচানা বারে বারে এসে
কাছে দে'সে গোসে

কেঁদে কেঁদে চোখের চাঁওগার শুধায় ছনেননে,
"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তা'রে না দেখি অজনে ?"
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এস না তা'র সাথী ।
আঁধার হ'ল, অলল ঘরে বাতি ;
উঠল ভাড়া ; মাঠে মাঠে নামল নীরব রাতি ।
আতুর চোখের ঐশ্ব নিরে কেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
"নাই সে কেন, যার কেন সে কাহার তরে ?"

কেন যে তা সেই কি জানে ? গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তা'কে ।
আকাশ হ'তে, আলোক হ'তে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হ'তে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার শ্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো ।

বুকে যে তা'র বাজল বাঁশি বহুবুগের কাণ্ডন দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তা'র আপন চেয়ে আরো আপন জন ।
তা'রই অবেশ

জন্ম হ'তে আছে যেন মর্শে তারি লেগে,
অ'ছে যেন চু'টে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে ত্রেপে ।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই ত তাহার চেনা শুনার খেলাধুলা ঘোটার একেবারে ।
আঁধার তা'রে ডাক দিগেচে কেঁদে
আলোক তা'রে রাখল'না আর বেঁধে ।

পলাতকার আর-একটি কবিতা আংশিক উদ্ধৃত ক'রে আমরা এ
আলোচনা শেষ করব । ঐষ্টা রবীন্দ্রনাথ আর বংশীধর রবীন্দ্রনাথ কি
পাটু আলিঙ্গনে এক হ'য়ে গেছেন, পলাতকার এইসব কবিতার ভিতরে
তাই উপলব্ধির বস্তু ।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দু'রে আর উপবাসে ।
আপটা হাঁপায়, মাথা যোরে,
ওস্তপোবে সুরে পড়ি ধপাস ক'রে ।
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে যায় উপরেতে,—
মরুচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
ব'সে আছে পাশের বাড়ীর কালো মেয়ে নন্দরাণী ।

* * * *

ঐ যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর গুর ভাঙা ঐ জান্‌লাখানি,
যেখানে গুর কালো চোখের তারা
কালো আকাশ-তলে দিশাহারা ;
দে'নানে গুর এলোচুলের সুরে সুরে
বাতাস এসে করুত খেলা আলসতরে ;
যেখানে গুর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী ;
ভে'মনি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা
চারদিকে মোর চাপা মেয়াল,ঐ বাঁশিটি আমার জালালা পোলা ।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার দৃষ্টিরে দিত অসীম বাবধান ।
এসংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে ছই অজানার রইল জানাশোনা ।
যে-কথাটা কারা হ'য়ে বোবার মতো ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে ।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়ারি যার না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া ।

এই কি আশাধারণ প্রতিভার সঙ্গলাভ আমরা এতক্ষণ করলাম ।
বাঙালীর ভবিষ্যৎ হরত মন্দ নয় ; এক শত বৎসরের ভিতরে বাঙালীর
ঘরে জন্মেছেন রামমোহন, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ । এঁদের
একজনকেও এক শত বৎসরে গেলে যে-কোনো সমাজ ধস্ত হ'য়ে যার ।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে প্রভাবান্বিত সে-কথা
বলবার দরকার বোধ করি নে । কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার
চাকচিক্যেই যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, তা'র প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাইবার
আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে তেমন প্রবল হয় নি—এ-কথা তাব'বার
সময় এসেছে ।

রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ; তাঁর খ্যাতিতে বাঙালী গৌরবান্বিত। কিন্তু তাঁর এখ্যাতিতে সত্যকার খ্যাতিতে রূপান্তরিত করবার অর্থাৎ তাঁর প্রতিভাকে একটা জাতির জীবনের বস্তু করে তাকে সার্থকতা দান করবার, শ্রেষ্ঠ অধিকার যে বাঙালীরই আছে—এ কথা ভুললে চলবে কেন?

রবীন্দ্রনাথের বহু সুন্দর সৃষ্টির সামান্য সামান্য পরিচয় আমরা এতক্ষণ পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যশতাব্দী আশ্রয় করে কুটে রয়েছে যে এক মহিমান্বিত প্রতিভা, বিধাতার হাতের সেই অপূর্ব সৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধির অধিকারী শ্রদ্ধাবান, মার্জিতবুদ্ধি, জন্ম-অকাতর পাঠক।

সমাপ্ত

হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহ্ এবং ওয়ারসী সম্প্রদায়

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

পনের-বোল বৎসর অতীত হইল, আলীগড় প্রবাসকালে একজন মুসলমান ফকিরের সহিত আমার আলাপের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার নাম আলিফ্ শাহ্। তিনি প্রায় নিত্যই আমার বাসায় আসিতেন এবং ধর্ম-জগতের অনেক মূল্যবান সংবাদ দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে জর্নৈক প্রৌঢ় বৈদান্তিক সন্ন্যাসীও আসিতেন। তিনি বেদান্ত-বিষয়ক একখানি স্বরচিত হিন্দী পুস্তক উপহার দিয়া ছিলেন। পুস্তকখানি বহুদিন আমার গৃহে ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাহা পাইতেছি না। সন্ন্যাসীর নামও এখন মনে নাই। আলিফ্ শাহের বয়স তাঁহার অপেক্ষা কিছু কম ছিল। ফকির দীর্ঘ-কৃষ্ণতকেশ, শ্রামল বর্ণ, সন্ন্যাসী শ্মশ্রু-শুষ্কহীন, মুণ্ডিতমস্তক ও গৌর-কান্তি। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যিনি ফকিরের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, একদা আমার সেই মুসলমান বন্ধুর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে একটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতনেত্রে দাঁড়াইয়া গেলাম। দেখিলাম বাটীর বাহিরের খোলা রোয়াকে একখানি বড় “পাতলে”র ছই দিকে বসিয়া ফকির ও সন্ন্যাসী তাহা হইতে অন্নানবদনে অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিতেছেন। আমার দিকে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চাহিয়াই আহারে মন দিলেন। ফকির প্রথমে উপরে, পরে সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—“উপরূমে একহী খোদা, নীচে হাম্ দোনো ভাই, আগে ধরম্কা রাস্তা খুলা

হৈ।” আমি তাঁহাদের ভোজনে বাধা না দিয়া “হুকুমত-” (ঠিক) এই কথা বলিয়া গম্ভব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলাম। যাইবার কালে মনে পড়িল, মীরার্টের সূর্য্যকুণ্ডস্থ মুসলমান ফকির ও পরমহংস সন্ন্যাসীর কথা।* তাঁহারাও উভয়ে হরিহর-আত্মা ছিলেন।

পরদিন আলিফ্ শাহ্ আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া-ছিলেন, “কাল আমাদের ছইজনকে এক পাতে আহার করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন না?” আমি বলিলাম, সত্যই তাই, কারণ ইতিপূর্বে কখন এরূপ দেখিয়া আমার চোখ দোরস্ত হয় নাই। তখন তিনি “প্রেম পত্রিকা” নামক একখানি হিন্দী পুস্তকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা হইতে—

“আলিফ্ এক হৈ এক নিরামা
কো ই কুমত্ কোই মাতোরামা;
কঁহি ধূপ কঁহি মেঘা বরসে
হর দরূপন্ মে আগহি দর্পে।”

“ইন্ ভুলন্ যে ভুলমৎ গদা ১ কহে সো মান
পানিওরামা এক হৈ ইহে না ছুলা জান।”

বিনু মেখে কাম না সব্ হৈ
হাজির-২ নামির কবলপ্ করু হৈ
বব ভু খোজে আপন মাহি
পরুটো হোরে খট্ মে সাই।”

* ইহাদের বিবরণ আমরা ১৩২৪ আবার সংখ্যায় “উষোধন” পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম—জ।

১—ফকির। আহায়েক। ৩—একট। ২—সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বদর্শী সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাধি-বিশেষ।

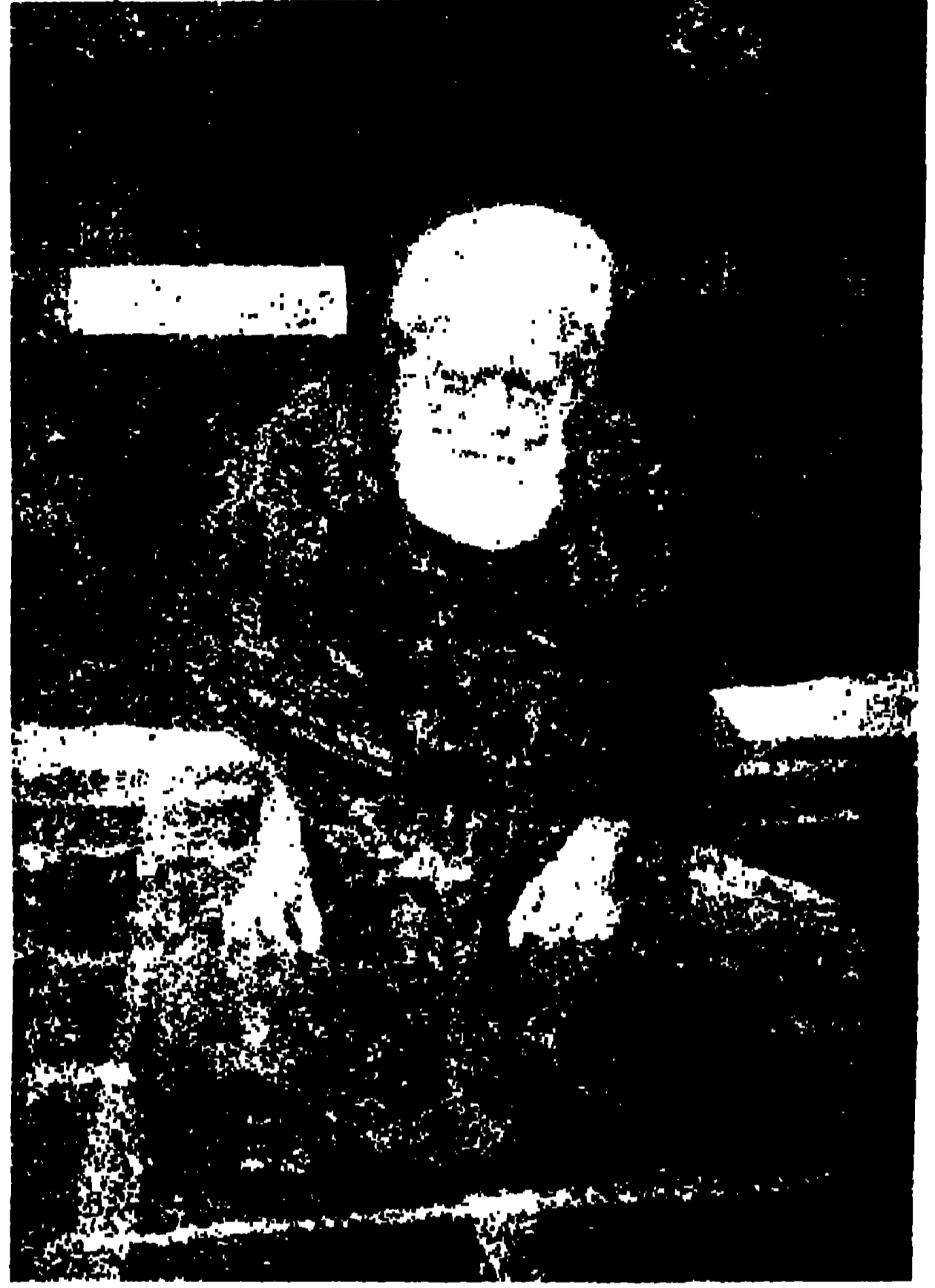
“পহলে তনম্ন শুর-পর বায়ে
শ্রেম কি পেণ্ডি তব-পক্ ডালে
তাজ দে শীল সকোচ সব ভরম
না হিরুমে আন
শুর জানী অজান জো কহে
সো নিশ্চয় জান ।
সে সবুত কর মেরী মাতে
ইই সব রাম মিলন কি খাতে ।”

ইত্যাদি ইত্যাদি বহুস্থল পাঠ করিয়া বলিলেন—

“জাত ভাত না পুঁছো কোয়
হরকো ভজে সে হরকা হোর ।”
“মাত পিতা বব এক ইই
শুন্ বুরখ নাগান ৫ ।
কিব লড়কা কৈসে ভয়ে
বামন মোগল পাঠান ?”

অতঃপর ফকির-সাহেব কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিলেন । তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যোল-সতের বৎসর বয়সে অযোধ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে-করিতে অযোধ্যার অন্তর্গত বারাবাকীতে আসিয়া উপস্থিত হন । এবং এই চিরকুমার ব্রাহ্মণ-যুবক এখানকার ধর্মগুরু হাজী ওয়ারিস আলী শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার মুরীদ অর্থাৎ শিষ্য হন । আলি শাহ তাঁহার গুরুদত্ত নাম । হাজী সাহেবের বাস ছিল বারাবাকী সহর হইতে ৮ কোশ দূরে “দেবা” নামক গণ্ডগ্রামে । হাজী সাহেব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই মুরীদ করিতেন । তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ভারতের শিখ ও ব্রাহ্মণ হইতে ধোবী ও ভদ্রী পর্যন্ত সকল জাতি ও বর্ণের এবং অর্দ্ধল, নিসারা প্রভৃতির লোকও দেখা যায় । ভাগলপুরের অর্ধশতক বাঙ্গালী প্রথমে ঘাড়ির কাজ করিতেন । তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম জানিতে পারা যায় নাই । তিনি হাজী সাহেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া মহাদেব বস্তু নামে পরিচিত হন । আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কাছাইয়া লাল, আলীগড়ের আমীন হাফিজ হাসেন খাঁ, ষারবন্দের পণ্ডিত চতুর্ভূজ মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লাল মিশ্র, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এবং পাটনার পরলোকগত জজ সফুদ্দীন সাহেব, ধরমপুরের নবাব

আবদুল সফুর খাঁ, পাটনার বাবা মুরলীধর, গয়ার সৈয়দ আবদুল্লা শাহ, ভূপালের হাফিজ পেয়ারে এবং গয়ার



হাজী ওয়ারিস আলি শাহ

ভূতপূর্ব তহশীলদার ফজিহ শাহ ও পূর্বোক্ত আলি শাহ-প্রমুখ প্রায় চার হাজার হিন্দু এবং অত্যধিক-সংখ্যক মুসলমান হাজী সাহেবের শিষ্য । তন্মধ্যে গৃহস্থ এবং ফকির উভয়ই আছেন ।

হাজী সাহেব বিবাহ করেন নাই । তিনি জীবনে কখন পাছকা ধারণ করেন নাই । পশু-বাহনে কখন গমনাগমন করেন নাই । তিনি রেলেই যাতায়াত করিতেন এবং অতি বৃদ্ধাবস্থায় পাকীতে যাওয়া-আসা করিতেন । তিনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন । প্রায় ২০।২১ বৎসর হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন । আলি-গড়ের নিকটবর্তী ধরমপুরের নবাব আবদুল সফুর খাঁর সফুরগঞ্জ কুঠীর উদ্যানে তাঁহার সমাধি আছে । মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি নবাব সাহেবকে স্বীয় সমাধি স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । হাজী সাহেবের শিষ্য

পূর্বোক্ত সৈয়দ আবদুল্লাহ শাহ্ ওয়ারসী, মহাজনবাণী সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত “প্রেমপত্রিকা” পুস্তক প্রচার করিয়া যান। গয়ায় তাঁহার জন্মস্থান ছিল, কিন্তু বুলন্দ সহরে তাঁহার সমাধি হয়। হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহের ধর্মমতাবলম্বীরা ওয়ারসী সম্প্রদায় নামে অভিহিত। এই সম্প্রদায় “প্রেমপন্থী” নামেও পরিচিত।

উক্ত হয়, বিহার গবর্ণমেন্টের জনৈক উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী, যিনি অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, হাজী সাহেবের বিশিষ্ট শিষ্যগণের অন্ততম ছিলেন। যৌবনে তিনি বিলক্ষণ উচ্ছ্বল ছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজীর মুরীদ ছিলেন। তিনি পুত্রের চরিত্রের জন্য চিন্তিত হইয়া স্বীয় গুরু শরণাপন্ন হন এবং পুত্রকেও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অহুরোধ করেন। পুত্রকে তাহাতে সম্মত না দেখিয়া পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেবাসরীফে লইয়া যান। হাজী-সাহেব শিষ্য-পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে মৃদু মৃদুঘাত করিয়া বলেন, “হুট্ট, তোমাকে অচিরেই মদ্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে, কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে।” বিদ্যা ও ধনপদগন্বিত যুবক সে-বথায় ক্রক্ষেপ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। তাহার অল্পদিন পরেই দীর্ঘ অবসরে রেলপথে দেশে যাইবার সময় কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মদের বোতল খুলিয়া গ্লাসে যেমন ঢালিতে যাইবেন, অমনি প্লাটফর্মের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, হাজী ওয়ারিস্ আলী তাঁহারই দিকে ফিরিয়া দণ্ডায়মান। তিনি চক্ষুলাল্য বোতল বন্ধ করিয়া প্লাটফর্মে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হাজী সাহেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সুরাপানের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় চলন্ত গাড়িতে পুনরায় গ্লাসে সুরা ঢালিবার কালে বিশ্বয়ের সহিত দেখিলেন, গাড়ির পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া হাজী সাহেব গাড়ির ভিতর খুঁকিয়া দেখিতেছেন। বোতল ও গ্লাস যথাস্থানে রাখিয়াই দ্বারদেশে আসিলেন, কিন্তু পিতৃ-গুরুর আর দর্শন পাইলেন না। হাজী সাহেব সেই ট্রেনেই উঠিয়াছেন এবং তাঁহাকে অহুসরণ করিতেছেন ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন,

বাড়ী পৌছিয়া আপনার কক্ষে যখন সুরাপানের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন হাজী সাহেব তাঁহার কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান। বহু অহুসন্ধানেও হাজী সাহেবকে খুঁজিয়া পাইলেন না বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহার সুরাপানের অভ্যাস তিরোহিত হইল। একদা তিনি গণিকালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান তাঁহার বাহিতা যে পালকে শয়ন করিয়া আছে, সেই শয্যাতে ও তাহারই পার্শ্বে তাঁহার পিতৃগুরু হাজী ওয়ারিস্ আলী সাহেব শয়ান রহিয়াছেন, সেই কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিতেই হাজী সাহেবের বিস্ফারিত নেত্র-যুগলের বিক্রম-দৃষ্টি যেন তাঁহার মর্ম ভেদ করিয়া লক্ষ্য, সংকোচ এবং ভয়ে অভিভূত করিয়া দিল।

বিষধর সর্পের দংশন-ভয়ে ভীত ব্যক্তির স্তায় তিনি বারানসী গৃহ হইতে উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া বারাবাকীর টিকিট ক্রয় করিলেন এবং যথাসময়ে দেবাসরীফে গিয়া অহুতপ্ত হৃদয়ে হাজী সাহেবের চরণে পতিত হইলেন। এবং তাঁহার অতি বিনীত শিষ্য হইলেন। এইরূপ দ্বারবন্ধের চতুর্ভুজ মিশ্রের সহোদর লালমিশ্র হাজী সাহেবের মুরীদ হইলে চতুর্ভুজ তাঁহাকে ‘মুসলমান হয়েছে’ বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন। লালমিশ্র বলেন, তোমাকেও তাঁহার চরণে পতিত হইতে হইবে। চতুর্ভুজ সহোদরের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। লালমিশ্র তখন বলেন, ‘তাঁহার সৌরভ তোমাকে তাঁহার সমাজে টানিয়া লইয়া যাইবে।’ ইহার কয়েকদিন পরে চতুর্ভুজ হীনার স্নগন্ধ অহুভব করিতে থাকেন। এবং যেখানেই গমন করেন, সেই স্থানেই হীনার গন্ধ পান। ক্রমে সেই ভীত গন্ধ অহরহ পাইতে-পাইতে তাহা তাঁহার অসহ হইয়া উঠে এবং সে গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে অহুসন্ধান করিতে-করিতে ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তির জন্য হীনার গন্ধের সূত্র ধরিয়া দেবাসরীফে আসিয়া উপস্থিত হন। হাজী-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি কষ্ট হইয়া বলেন, ফকিরকে পবীক্য করিতে আসিয়াছ? মিশিরজীর তখন তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা আদৌ ছিল না; তিনি বলিলেন, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি মাত্র, আমি খালি

গদের আলো

স্বদেশী গের কলিকাতা ।

দেখিতে চাই। চতুর্ভুজ মিশ্র গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তদবধি তাঁহার প্রত্যেক জীবন-ব্যাপারে উঠিতে-বসিতে শয়নে ভোজনে, মলমূত্র-ত্যাগকালে ফলতঃ সর্বকর্মে ও সর্বত্রই মনে হইত হাজী-সাহেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই বিভীষিকা অধিক দিন স্থায়ী হইতে না দিয়া চতুর্ভুজ মিশ্র হাজী ওয়ারিস্ আগী শাহের অতি বিনীত ভক্ত মুরাদ হন।

সম্প্রতি বাঙ্গালা প্রদেশের রেজিস্ট্রেশন্ অফিস-সমূহের অবসর-প্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর্ খাঁ সাহেব আবদুল ওলি মহোদয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহারা অনেকেই জানেন ব্যারিস্টার সফুদ্দীন সাহেব একবার তাঁহার গুরু চরণে নিবেদন করেন যে, তাঁহার যেন জজিয়তি লাভ হয়। তাহা শুনিয়া হাজী-সাহেব তাঁহাকে একপাটি ছুতা ছুঁড়িয়া মারিয়া বলেন, “যা জজই হোগে যা”। ইহার অল্পদিন পরেই যে কয়জনের উক্ত পদ পাইবার কথা, তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া সফুদ্দীন সাহেবই হাইকোর্টের জজ হইয়া পাটনা গমন করেন।

আমি যখন আলীগড়ে প্রবাসে ছিলাম, তখন ফকির আলিফ্ শাহ্ এবং আলীগড় সিভিল্ কোর্টের উকিল বাবু কহাইয়া লালের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের গুরু

মুসলমানকে হিন্দুর দীক্ষা-মন্ত্র দিতেন এবং হিন্দু শিষ্যকে মুসলমানের কল্মা দিতেন এবং বলিয়া দিতেন, চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে নেমাজ পড়িয়া কোন ফল নাই। বাবু কহাইয়া লালকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন, যে, হাজী সাহেব তাঁহাকে মুসলমানের কল্মাই দিয়াছেন। তিনি কল্মা পড়েন বলিয়া মুসলমান বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না। তিনি প্রেমপন্থী এবং গৃহী।

সে-সময়ে নিচুবাগানে ওয়াসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন ফকির বাস করিতেন। এখন তাঁহাদের কেহ আছেন কি না জানি না। হাজী সাহেব-সঙ্গে অষ্টিস্ সফুদ্দীন সাহেবকে পত্র লিখিলে, তিনি উত্তরে তাঁহার শিষ্য স্বীকার করিয়া আমাদের জানাইয়াছিলেন, যে তিনি সেই মহাত্মার অলৌকিক জীবনের অনেক কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে আমাদের অমূল্য সুযোগ হারাইতে হয়।

আমরা এখানে হাজী সাহেবের যে ফোটা দিলাম, তাহা আলীগড় সফুরগঞ্জে নবাব সাহেবের উদ্যানস্থ প্রাসাদে রক্ষিত তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি।

টেলিগ্রাম

শ্রী সুবোধকুমার রায়চৌধুরী

ডেপুটি-আপিসের চিঠির মতো সর্বদা চন্দনের ছাপ-মারা এক হিন্দুস্থানী গণৎকারের সহিত আপিসের পথে মল্লিনাথের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তখন বেলা সাড়ে দশটা; বাদলার রোদ উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই গণৎকার প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে বলিয়া উঠিল—“বারে—বারে ! বড়ি জ্বর !”

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মল্লিনাথ ধমুকাইয়া দাঁড়াইল এবং

মহা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেয়া ? সাধুবাবা ?”

হাতের চেটোতে ঘুবি মারিয়া গণৎকার বলিল, “পয়লা বাজী তুমার !”

বলে কি ! মল্লিনাথ যে একখানা ডাব্বীর টিকিট কিনিয়াছে। চারিদিকে সেবার ডাব্বীর মহা পশার—কল্পিত বিজয়ের আনন্দে অনেকেই উৎফুল্ল। রাস্তা-ঘাটে

কেবল ঐ একই কথা ডাব্বি—ডাব্বি—ডাব্বি। শ্রীমতী
ঘর্ষণযোগ একবারই আসে, স্তম্ভরাং সেটা ছাড়তে চায়
কে! মলিনাথ একটু কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া লিঙ্গাসা
করিল—“ক্যা জী ? পয়লা বাজী ?”

—“ল্যাড়কা!”

—“বলো কি গণৎকার মহারাজ! সে যে বহুং!
সাত লাখ যে ডাব্বিতে; লেজারে তিন লাখ!”

গণৎকার পুনরায় জোর গলায় বলিল, “ভগবান্ এক—
বাৎ এক! মগর এ বাৎ ঝুটা হোয় হাম বিছ্যাচল চলা
যায়েছে—আউর ইএ কেতাব দারিয়ামে ফেক্ দেছে”—
বলিয়া রোদ্দ বাগির কাগজে ছাপা একখানা পুঁথি কাপড়ের
মধ্য হইতে বাহির করিল। প্রত্যেক পাতায় সূদর্শন
চক্রের মতন কত কি আঁকা—আর তাহার মধ্যে হাজর,
কুমার, কর্কট—আরো কত কি নম্বর। গণৎকার মলিনাথকে
উহা দেখাইয়া বলিল, “দেখিয়ে ইসমে।” মলিনাথ
ঝুঁকিয়া কি দেখিল কে জানে! সে সন্তুষ্টচিত্তে বিনাৎ
করিয়া একটা টাকা তাহার সামনে ফেলিয়া দিল।
পার্শ্বস্থিত পানের দোকান হইতে গুটিকয়েক পান মুখে
পূরিয়া সে ভাবিতে লাগিল—“লেগে বাবে দেখছি—
তা হ’লে! ওঃ! শিখেছে বটে! কসরৎ করেছে!
ইয়ারকি নয়!”

আপিস গম-গম করিতেছে। কেরাণীরা কেহ
হেঁটমুণ্ডে, কেহ উর্ধ্বমুখে লিখিতেছে, ঠিক দিতেছে,
চাপরাশি ছুটিতেছে সাহেবের বেল গুনিয়া। মলিনাথ
অপরাধীর মতন ধীরে-ধীরে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল।
এগারোটার কাঁটা এগারোবার দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল
মলিনাথের বুকে ভল্ল মারিবার পূর্বে। পিছন হইতে
বাজখাই গলায় বড়বাবু হাঁকিয়া উঠিলেন, “কি নাম হে
তোমার?”

—“আজ্ঞে, মলিনাথ।”

মুখ ড্যাঙচাইয়া বড়বাবু আবৃত্তি করিলেন, “মলিনাথ!
গাল-ভরা নাম, বহর খুব, আর সই করিতে হবে না,
স’রে পড়।”

মলিনাথের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে

কাকুতি-মিনতি-বরে বলিল—“আজ্ঞে, দেয়ী হ’য়ে গেছে
আজ।”

বড়বাবু কোনো কথা কহিলেন না, রাগে গজ-গজ
করিতে-করিতে একটা কাগজে কি খানিকটা লিখিয়া
ফেলিলেন। কাতরমুখে হাত জোড় করিয়া মলিনাথ
বলিল, “বড়বাবু, আপনি গরীবের মা বাপ, এবারটা ক্ষমা
করুন—কাছাবাছা নিয়ে বড্ড জড়িয়ে পড়েছি, মশায়।”

কিন্তু যাহার কাছে মিনতির আবেদন হইল কথাটা
তাহার কানে গেল কি না সন্দেহ।

মলিনাথ বার-কয়েক “বড়বাবু—বড়বাবু—দয়া করুন”
বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাহার
শ্রীমুখের করুণা-মিশ্রিত একটি ইচ্ছিতের অপেক্ষায়
অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল—বড়বাবু হঠাৎ ধম্কাইয়া
উঠিলেন “আঃ! বড় আলাতন করো তোমরা!”

ত্রিশ টাকায় অমন চাকরি! এখন যে বি-এ পাশ
ছুটিয়া আসিবে, হয়ত ইহারই মধ্যে বাহিরের দরজায়
বিশ-ত্রিশ জন অপেক্ষা করিতেছে সুপারিশের চিঠি
লইয়া। মলিনাথ ধামে না—ঘ্যান ঘ্যান করিতেছে।

বড়বাবু রুদ্ধবরে বলিলেন—“যাও।”

—“যাচ্ছি” বলিয়া মলিনাথ ছুই-এক পা পিছাইয়া
আসিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সম্মুখে আসিয়া বলিল, “তবে
জেনে রাখবেন, এইসব বড়বাবুদের খেয়াল ও অহুগ্রহের
উপর যে-সব ভদ্র সন্তানদের জীবিকার ভার তা’রা অতি
বেচারী—তাদের উচিত কি জানেন?—রেলের লাইনে
গলা পেতে দেওয়া, কিবা তেতালার ছাদ থেকে লাফিয়ে
পড়া, কেন? কি হয়েছে যে চাকরী যাবে? ভেটকী মাছ,
লালপানি সব্বব্রাহ করতে পারিনি ব’লে?”

বড়বাবু হকার দিয়া বলিলেন “ডেঁপো জিচার!”

স্বর চড়াইয়া মলিনাথ উত্তর করিল, “জিচার মানে
কি জানেন?—তেলী—এ তেলী তেল বেচে না, ভদ্র-
সন্তানদের রক্ত বেচে চাকরির ঘানিতে পেশে।”

উন্নতের মতন বড়বাবু হাঁকিলেন—“প্রাসি!”

—“আর চাপরাশি কেন? তুমিই এস না সোনার
চাদ—হোঁৎকামি সায়ের্তা ক’রে দিই”—বলিয়া সে ক্ষত-
বেগে বাহির হইয়া গেল।

গড়ের মাঠে বড়-বড় গাছে সবুজ রং ধরিয়াছে। মল্লিনাথ একটা গাছের তলায় দিয়া বসিল। ঘাসের উপর একটা মরা কাক পড়িয়াছিল অনন্ত আকাশের বৃকে ঠ্যাং তুলিয়া, আর গাছের উপর কাকের দল চীৎকার করিয়া কান ঝালা ঝালা করিয়া তুলিল। মাঠের মধ্যে খানায় জল জমিয়া আছে। ছেলেরা ইহারই মধ্যে বল পিটিতেছে। মল্লিনাথ বেকীর উপর শুইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল, চাহিয়া দেখে দলে-দলে লোক কেল্লার দিকে চলিয়াছে। বিকালে ড্যালহাউসি ও মোহনবাগানের ম্যাচ—মহামারি কাণ্ড! কাঠের গ্যালারিতে বিপুল জনতা। খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দর্শকের দলের স্ত্রী-পক্ষীর দৃষ্টি পড়িয়াছে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উপর। গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিতেছে—“বাক্ আপ্ মোহন-বাগান,” “man at the back”, “হ’সিয়ার সেনগুপ্ত”; কিন্তু যাহাদের জন্ম এই বিকট চীৎকার, এই অসাধারণ সাবধানতা তাহারা চাহিয়াও দেখিতেছে না, বা ইহাদের একটি কথাও তাহাদের কর্ণগোচর হইতেছে না, সমবেত চীৎকারের বীভৎস গণ্ডগোলে।

‘ভড়াক্ ভড়াক্’ শূটের আওয়াজের সঙ্গে বলটা আকাশে ঠিকরাইয়া উঠিতেছিল, তাহাই দেখা গেল। গ্যালারির পাশে এমন ফাঁক নাই যে, মল্লিনাথ মাথা গলায়। “চিনাবাদাম,” “পাকোড়ি” ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এখনি ভাঁড় ভাঙিবে; মল্লিনাথ ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া ট্রামে চড়িল।

(২)

ঘরে বিছানা পাতা ছিল—ময়লা বিছানা। তাহার উপর গুটি চারেক হেঁড়া বালিশ, কেমন একটা সঁাতানে গছ। মল্লিনাথ বিছানার উপর আসিয়া বসিল। সদ্য চাকরি যাওয়ার ছুঁখে তাহার মুখ কিঞ্চিৎ বিষন্ন, কিন্তু আসন্ন ডাব্বি-বিজয়ের আশায় উৎফুল্ল।

মেনকা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—
“আজ এত দেরি যে? কাজ বড় বেশী ছিল বুঝি? টিপিন খেয়েছিলে পাউরুটিখানা চিনি দিয়ে?”

“পাউরুটিখানা খেয়েছি, কিন্তু এবার খাবো কি? চাকরি গেছে।”

—“বলো কি!”

নেড়ী বাপের কাদামাথা জুতাটা বাহিরে রাখিয়া আসিল। বাপের পায়ে এক-হাঁটু কাদা—নেড়ী উহা জল দিয়া ধুইয়া দিল।

মল্লিনাথ উত্তর করিল—“হাঁ—ঐ শালা; শালীর ছেলেকে ঢোকাবে ব’লে ভাড়ালে—আমি আর বুঝিনে কিছু!”

“হা ভগবান্! গরীবের খুদ-কুঁড়ো যা কিছু চলছিল তাও নিলে”—বলিয়া মেনকা হলুদমাথা হাতখানা চোখে একবার ঘষিয়া মেজের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।

সিঁড়ির নীচে একটা ঘর—ঐত ঘরের স্ত্রী। সঁাতসেঁতে, সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, দিনেও কেরোসিন জলে, পার্শ্বে অপ্রশস্ত গলি, নোংরা ড্রেনের বেজায় গছ। আর এদিকে বাঁধানো একটা চাতাল, তাহার এক কোণে কল-চৌবাচ্চা, পাঁচ সাত ঘর উপর নীচের ভাড়াটের বাসন-মাস্তা-কার্য্য দিনরাত ওখানে চলিতেছে। উহারই ভাড়া আট টাকা। এই সদ্য নরক-কুণ্ডেব মধ্যে বিষাক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে মল্লিনাথ কি করিয়া যে ছেলেপুলে লইয়া বাঁচিয়া আছে কে জানে! কিন্তু তাও যায়—ভাড়া না দিতে পারিলে উঠিয়া যাইতে হইবে।

দেয়ালে জগন্নাথার মূর্তি। মেনকা সেই দিকে সম্মল-নয়নে চাহিয়া ছিল, আর কত কি মনে-মনে মানত করিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “কি হবে তা হ’লে? কি ক’রে ছেলেরা বাঁচবে? কি ক’রে তুমি বাঁচবে? উপায় কি নেই কিছু?”

মল্লিনাথ এ-দিকে রাজা মাং করিয়া বসিয়া আছে! সে হঠাৎ প্রফুল্লমুখে উত্তর দিল, “উপায়? উপায় ঐ ‘১২০৭৫’—হাঁহা বাহার, তাঁহা তিগ্নার! লাগে! গণৎকার আজ বল্লে আমার ‘পয়লা বালী তুমার’—হ্যাগো! ঢের নাগা সন্ন্যাসী দেখেছি—এরকম সঁাচ্চা লোক দেখিনি—বড়াক্ ক’রে ব’লে দিলে আচ্ছা বোঝো, কি ক’রে বুঝ্লে সে আমার ডাব্বির টিকিট কেনা আছে! তোমাকেও কি বলেছি এতদিন ডাব্বির কথা—১২০৭৫!” মেনকা ভ্যাবড়াবে চোখ মল্লিনাথের উপর কেলিয়া

কিয়ৎকণ চাহিয়া রহিল—পরে বলিল “আমায় বলবে কেন ? আমি যে কেড়ে নেবো।”

—“না—না—না, তা নয়। বুঝলে—মানে—বেশী বললে ফসকে যায়—কথাটা উঠল তাই বললাম,” বলিয়া স্বচ্ছন্দভাবে কোলের উপর বালিশটা টানিয়া লইয়া মল্লিনাথ হাঁকিয়া উঠিল, “ওরে ভূতো, দেশলাইটা নিজে আয় ত একবার।” ভূতো দেশলাই আনিয়া দিল—বাক্সে দুটি কাঠি—ভিত্তা—অলে না!

মেনকা বিড়িটা উনান হইতে ধরাইয়া আনিয়া স্বামীর কাছে ঘেসিয়া বলিল ও বলিল—“হাঁ গা ? বারো হাজার পচাত্তর কি ?”

মল্লিনাথ মুক্খিয়ানাস্থরে বলিল—“ঐ যে—ডাব্বির নম্বর, যা ধরেছি আমি।”

“গণৎকার বললে পাবে ? মা মজলচণ্ডী যেন তাই করেন, বড় ছুঃখী আমরা” বলিয়া মেনকা বার-বার মজলচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

—“করবেন না ত কি ? আমি কারো কখন :অনিষ্ট করিনি”, বলিয়া মল্লিনাথ নাক দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িল।

—“হাঁ গা ? কত পাবে ?”

—“লাক [সাতেক হয় গণৎকারের হিসাবে, আরে পয়লা বাজি হয় ভালোই, না হয় খার্ড্ই হোক—সেও ত তিন লাখ গো ! মারি ত হাতী, বুঝেছ গিন্নী ? এ পাতাচাপা কপাল, হাওয়া এসেছে অম্নি স’রে গেছে—কি ‘নম্ভিগুম’ দিয়েছি জানো ?”

—“সেটা কি ?”

—“ঐ যে গো—“জয় তারা” “জয় হরি” গোছের একটা কিছুকে বলে ‘নম্ভিগুম’।”

—“তুমি কি দিলে ?” বলিয়া মেনকা গৌরবান্বিত-মুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ভূতো বলিল, “হা-হা, বাবার গৌফ পুড়ে যাচ্ছে।”

বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া মল্লিনাথ বলিল, “দিলাম ‘রজা’—ঐটেই বাঁ ক’বে মাথায় এল”।

—“এঃ ! রজা যে অযাজা ! ওটা দিলে কেন ?”

মল্লিনাথ মহা বিরক্তির সহিত বলিল—এ তোমার সে

রজা—অষ্টরজা নয়—কাঁটালি, মর্ডমান, গাবল্ গাবল্ গিল্বে—এ সে নয়—এ হচ্ছে রজা—ঐ যে ইন্ডের সভায় যে নাচের স্পেসালিস্ট (specialist)—তোমারই সখী ; তুমি মেনকা, এ রজা, বড় মজলিস মেয়েগাহুবা”।

নেড়ী আট হাত ডূরে পরিয়া বসিয়াছিল—দু-চটা, জ্যান্জলে একটা ডূরে ; ভূতো একেবারে দিগম্বর, ওয়াহার কাপড় ছিড়িয়া গিয়াছে। সে বলিল, “আমায় একটা ডাব্বি বাবা”। নেড়ী অম্নি নাকিস্থরে বলিল, “আমায়ও একটা বাবা, আমি ডাব্বি খেতে বড় ভালোবাসি”।

মল্লিনাথ হাসিতে-হাসিতে বলিল, “ডাব্বি খায় না রে, খেলে”।

—“আমিও খেলব” বলিয়া নেড়ী বাপের কামিজ ধরিল। “যা—যা” বলিয়া নেড়ীকে হঠাইয়া দিয়া মল্লিনাথ মেনকার দিকে চাহিয়া বলিল “যাক্ গে চাকরি—ভারী ত ! মাসখানেক পরে তার আসবে সাহেবের কাছে যার কাছ থেকে আমি টিকিট কিনেছি—আমি আজ থেকেই কাগজ দেখতে থাকব”।

মেনকা বলিল, “দেখ, আর-একটু ভালোমন্দ খেও—গেছে চাকরীটা—আপদ গেছে—দিনকতক জিরোও এখন ; আজ একটু কাটা ইলিশ এনে দিলে না কেন—ঝাল দে ক’রে দিতাম”। মল্লিনাথ স্মৃতির সহিত বলিল, “খিচুড়ী চড়াও—আর বেশী ক’রে পেঁয়াজ, আলু ছেড়ে দাও তা’তে।”

নেড়ী ও ভূতো দমভোর খিচুড়ী খাইবার আনন্দে নাচিতে লাগিল।

(৩)

মাসখানেক পরে মল্লিনাথ একদিন কাগজ পড়িতে-পড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিল—“মাৎ”—১২০৭এর পরের অক্ষরটি ছাপায় ভাল ওঠেনি—তবে ওটা যে ৫ মল্লিনাথের সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মল্লিনাথ সার্ট গায়ে দিয়া বাহির হইবে, মেনকা জিজ্ঞাসা করিল—“কি ? কোথায় যাচ্ছ ?”

—“যাচ্ছি স্টেটসমানে (Statesman)—ঠিক ক’রে জেনে আসতে—উঠেছে দেখা যাচ্ছে, তবু যাচ্ছি—অম্নি কিছু টাকা ধার ক’রে কিছু কিনে-কেটে আনুব’ধন।

তার পর বাজীর টাকা থেকে শোধ দিলেই হবে—ভাবুবি :মরেছি জানলে অনেক বেটা টাকা ধার দেবে।”

—“হাঁ গা—মেরেছ বাজি ? ও নেড়ী ও ভুতো— :তাদের কি-কি আসবে বলে দে” বলিতে-বলিতে মনকা ছমদাম শব্দে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ভুতো ও নেড়ী একসঙ্গে চীৎকার করিল, “ইন্জিন্ একটা ; রেরে একটা—বাবা।”

ট্রেটস্ম্যান আপিসে প্রবেশ করিয়াই মল্লিনাথ পকান-পরা একটি মোটা বাবুকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। মল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “ওটা ১২০৭৫ ত শাই ?”

মোটা বাবুটি উত্তর দিল, “কোনটা ? Box-নম্বর ? ওটা কন্সিডেন্শ্যাল।”

—“আহা— না মশাই। ১২০৭—এর পর ৫ টা বেটা পায় ভালো ওঠেনি।”

—“ওঠেনি—পরের ইস্তে একটা না হয় ইন্সার্ভম্ন্ ওয়া যাবে—দেখি কি ভুল হয়েছে আপনার অ্যাড-ভটাইসমেন্টে (advertisement)।”

—“কি মুঞ্চিল ! advertisement নয়—বাক্সও নয়।”

“তবে কি ? চাকরী ? এখানে খালি নেই” বলিয়া বুটি অশ্রুকাছে মন দিল। মল্লিনাথ আর কোনো কথা বলিয়া ট্রেটস্ম্যানের ছাপাখানায় প্রবেশ করিল যং প্রিন্টারের হাতে আট আনা গুজিয়া দিয়া বাহিরে রের অপরকার দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে াটার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল “ওটা ০৭২—”

চোখের সম্মুখে পৃথিবীট। ঘুরিতে লাগিল—চারিদিক্ ারায় ধোঁয়াকার। মল্লিনাথ যে যায়।—ধরো।

একজন কেরাশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মিরুগী কি ?” মল্লিনাথ স্তব্ধ।

সেই লোকটি বলিল—“কি বলে কোন্ কব্ব লুলে ?”—কোনো উত্তর নাই।

অমাদার আসিয়া বলিল, “মাতরালা কা হিরা কুছকাম হি—বাহার যাও।”

মল্লিনাথ টলিতে-টলিতে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

অপরাত্তের কুরকুরে হাওয়া বহিতেছে। হোয়াইটওয়ারে দোরে বিস্তর বাড়ালী কাচের ভিতর দিয়া দেখিতেছে ওয়াটারপ্রফ, সোয়েটার, গাউন, টাই, কলার—দেখিয়াই তৃপ্তি। মেমেরা বাহার দিয়া অরণে বাহির হইয়াছে—কাহারও বা গলা কণা-উঠা ; কাহারও বা ঘাড় কামানো।

রাস্তায় বর্ষার কাদা ; এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর গাড়ীর চলাচল ; কাহা লাগিয়া কাপড়-চোপড়ে চিতাবাঘের রং ধরিয়াছে। জুতার একপাটি ফড়াং করিয়া ছিঁড়িয়া গেল এবং গাদাখানেক কাদা গিলিয়া ফেলিল। আর চলা অসম্ভব। মল্লিনাথ জুতা-ছোড়াটি ডেনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ছুঁচালো-খোয়া-ওঠা রাস্তা খালি-পায়ে ফুটিতে লাগিল। কে একজন একটি ফোটো সামনে ধরিয়া বলিল, “চার আনার তুলে দেবো।” মল্লিনাথ তাহার দিকে কটমট করিয়া দেখিল। লোকটা চলিয়া গেল। মল্লিনাথ কলুটোলার মোড়ে আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে রম্-রম্ শব্দে কাহার একটা ক্রহাম ছুটিয়া আসিল—বাড়ে পড়ে আর কি। গালপাট্টাওয়াল গাড়োয়ানটা হৈ-হৈ শব্দে চাবুক হাঁকড়াইল, মল্লিনাথ ডেনের ধারে পড়িয়া গেল। ফুটপাথের উপরে মুসলমানের কাফিখানা ; যে-লোকটা চা খাইতেছিল সে দৌড়াইয়া আসিল এবং মল্লিনাথের কোষর ধরিয়া চায়ের দোকানে লইয়া গেল।

* * * *

ভরা সন্ধ্যা। কাহারও দেখা নাই। মাহুব সেই বাহির হইয়াছে। মেনকা রাস্তার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া এবং যত দূর চক্ষু যায় দেখিয়া লইল—কেহ কোথাও নাই।

ভুতো চাদর পরিয়া আসিয়া বলিল, “মা চু আচড়ে এলাম।”

মেনকা অশ্রুমনস্কভাবে বলিল—“বেশ।”

নেড়ী সাজিয়া আসিয়াছে—মাথায় কতকটা নারিকেল তৈল ঢালিয়া ; তাহা কান ও কপালের পাশ দিয়া ক্রমাগত গড়াইতেছে। সে মায়ের কমলালেবু রংএ ‘বে’র চেলিটা গুছাইয়া পরিয়াছে, কেবল পেটের কাছটা

সামুলাইতে পারে নাই। আর পরিমাণে মেনকার রং-ওঠা ফেরোজা বডিটা, সেটা প্রকাণ্ড—হাতা ছেঁড়া। নেড়ী বলিল, “টেক মা ? বাবা এখনো এল না বে !”

ভূতো বলিল, “বাবাকে একটা চটি আনতে ব’লে দিলে না কেন মা ? আর একটা সবুজ গেঞ্জি ?”

ভূতোর কথার উত্তরে মেনকা বলিল, “আনুব’ধন বাবা”—তার পর নেড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল, “এই আসে আর কি—আবার চুলে হাত দেয়—নাঃ তোকে আবার ভালো ক’রে চুল বেঁধে দিতে আছে—ইঃ পোড়া বৃষ্টির আর বিরাম নেই—মাতুষটা আহুকই কি’রে, ছাই !”

একটা ট্যাক্সি দেখা গেল, সেই দিকে আসিতেছে। নেড়ী আহুলাদে চেঁচাইয়া উঠিল, “মা, বাবা আসছে।”

“কি রে নেড়ী, আলোটা ধর, মা,” বলিয়া মেনকা শব্দব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কই ! ট্যাক্সিতে কেহ নাই। সেটা চলিয়া গেল। নবদ্বীপ একটা ইলিশমাছ হাতে ঝুলাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, নেড়ী জিজ্ঞাসা করিল “নবদ্বীপ-বাবু, বাবাকে দেখলেন ?”

“কই ? না”—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

উপরতালার ছুইচারিটি স্ত্রীলোকের নিকট ডাব্বি মারার খবর বলা হইয়াছিল ; তাহারা নামিয়া আসিল। খেতাবিনী বলিল, “কই গা মেনকা ?—এঃ ! এখানে চারটি খোয়া ফে’লে দিস, বড় প্যাচপেঁচে হয়েছে—মল্লিনাথ এখনো ফেরেনি ? বাজার ক’রে এনে ফেলছে বোধ হয়—তাই দেরি হচ্ছে।”

মেনকা উত্তর দিল, “হাঁ দিদি—ব’লে গেছে তাই”।

অনঙ্গস্বন্দরী বলিল, “হাঁ দেখ—কি-কি গহনার প্যাটার্ণ্ কবুয়াস হয়—দেখাস্—আমিও ভালো-ভালো প্যাটার্ণ্ ব’লে দেবো—বুঝিছিস্ মেনকা ?”

মেনকা মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমাদের আশীর্বাদ ছাড়া, রাঙাদিদি, আর আমি কিছু চাইনি”।

রাঙাদিদির হুখে-আলতার রং, জাঁকালো গড়ন, গহনাগুলোও তেমনি ভারী। চূড়ির গোছা কনকন শব্দে নাড়িয়া রাঙাদিদি বলিল, “কেন চাষিনে লো, আমার বন্ দেখি,—বরাং যখন ফিরেছে—আমোদ-আহ্লাদ কর ; ছুখানা পর—এই ত সময় তোদের”।

ওপাড়ার হলধর রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—হাঁকিয়া উঠিল “টেক হে ? মল্লিনাথ ? কিবুলে নাকি ? নেড়ী চেঁচাইয়া বলিল, “না জ্যাটামশাই, বাবা এখনো ফেরেনি”।

“সে কি রে ! এখনো ফেরেনি !”

রাজি আটটা। বৃষ্টি ধরিবার কোনো চিহ্ন নাই—বরং আকাশ ঘোলাটে। সাইক্লোন-বড় মাতাল হইয়া বাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই ধাক্কা দিতেছে। এদিকটার লোক-চলাচল ইহারই মধ্যে বন্ধ হইয়াছে। একটা লোম-ওঠা কুকুর ঘাড় বাঁকাইয়া ভিজিতে-ভিজিতে ছুটিতেছিল। মুখুন্দের ঘোষাকের উপর কে একজন কাত্‌রাইতেছিল। নেড়ীর হাতে একটা আনি দিয়া মেনকা বলিল, “বা ওকে দিয়ে আয়—আর ব’লে দিস, বাবু এখনি আসবে, এলেই একটা টাকা দিয়ে যাবো’ধন”। নেড়ী ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে আনিটা দিল। মেনকা চেঁচাইয়া বলিল, “বন্ না ওকে—ওখানে ভিজছে কেন ? মুখুন্দের গোললে গিয়ে বহুক না—বলে কিছু ওরা—আমি ব’লে পাঠাব’ধন”। সে কাঁপিতে-কাঁপিতে গোলঘরে গিয়া বসিল। একখণ্ড ছেঁড়া লেপের টুকরো ভূতোর হাতে দিয়া মেনকা পাঠাইয়া দিল। ভিধারী সেটা গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িল, আর গ্যাঙাইয়া গ্যাঙাইয়া কত-কি বলিতে লাগিল—বড়-বড় ঠাকুরদের কথা।

কলিকাতার রাস্তা—কতকটা গ্যাসের আলো, কতকটা আঁধার মা ধরা প্রকাণ্ড অন্ধরের — হুম্‌ডি খাইয়া পড়িয়া আছে আর আকাশ হইতে দেবতাদের অজস্র বৃষ্টির বাণ তাহার পিঠে আসিয়া বিধিতেছে ! গ্যাসের অল্পট আলোকে দেখা গেল একটা মহামুষ্টি দল হইতে ছটকে-পড়া অন্ধরের মতন যেন দেবাত্মের যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছে সেই দিকে—ধীরে-ধীরে আসিতেছে। তাহার লম্বা ভিঁজা চুল মুখেচোখে কাঁপাইয়া পড়িয়াছে, খালি পা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, ভিঁজিয়া ঢোল—বুঝরাস্তা কুস্তিগিরের মতন সর্বদা কর্দ্দমাস্ত-দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসে বে !

নেড়ী বলিল, “কে গা ভুমি ? বাবা বাড়ী নেই।”

ভূতো বলিল, “তবুও ঢোকে—মা দেখসে—কথা কয় না।”

মেনকা আসিয়া দেখিল—তাহারই স্বামী। বিস্মিত্তি আসিয়াছে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“এত ঘেরি করলে কেন? জিনিষপত্র পরেই না হয় কিন্তে—পেছিয়ে পড়েছে বুঝি—তুমি কি ট্রামে এলে? মোটরে এলেই ত পারতে যদি গাড়ীতে আরগা নেই—না হয় কিছু ভাড়াই যেত।”

মল্লিনাথ কথা বলিল না। সে যেমন আসিয়াছিল সেই অবস্থায়ই সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

“কে কি ক’রে দিয়েছে, মা গো” বলিয়া মেনকা উপর-ভালায় খবর দিতে গেল।

বসীচরণ ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিল মুখে মদের গন্ধ আছে কি না—পবে জোরে-জোরে ডাকিল, “মল্লিনাথ, মল্লিনাথ”। কোন সাড়া নেই।

নিশিকান্ত বলিল,—“ও, দেখছ কি? যা ভেবে-ছিলাম তাই হয়েছে—অত টাকা! বেজায় আমোদ টাকার হে! সেই মেথরটার মত হ’ল আর কি! সেও ডাব্বিতে সাত লাক মেরে হাস্তে-হাস্তে দম ফেটে ম’রে গেল—এও সেই জিনিষ!—ভিতরে হাস্তে, উপরে দম ফেটে যাচ্ছে।”

বসীচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “তাই ত! কি করা যায় হে? একটা কিছু বাৎলাও যাতে—”

নিশিকান্ত বলিল, “শক্ত! ভায়া শক্ত! ঐজন্তেই ডাব্বি ধরি নে আমি—কি জানো, দশটা টাকার জন্তে নয়, কড়াক ক’রে উ’ঠে গেলেই, বাস! এই দশা—নইলে—যাক—এখন একটা চাবুক নিয়ে সপাসপ মায়া, কি ছেলে-মেয়ে একটা কিছু মরেছে-টরেছে—এইরকম একটা কিছু অভিনয় করা—খিয়াটারের ফাস্ আর কি!—বুঝেছ তা’তে কি হবে? শোকের পালাটা আমোদের পালাটাকে ধানিকটা ঠেলে তুলবে।”

উমাপতি একটা চামড়ার হস্তার আনিয়া কেলিল। সে জিম্বাস্টিক করে—বেন স্যাণ্ডো! সে চাবুক মারিবে।

বসীচরণ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল,

“তোমরা সব এস—শীগ’র এস—ভূতো মোটর চাপা পড়েছে—ওঃ! কি রক্ত! মাংসের টুকরো ছড়াছড়ি—মুণ্ডা ‘মা, মা’ ডাকছে।”

ভূতো ঘরের মধ্য হইতে সাড়া দিল, “মা, আমি মোটর চাপা পড়িনি এই ষে আমি এখানে বসে—তক্তোপোষে—ইন্জিন চালাছি।”

“বালাই—ঘাট! তুমি মোটর চাপা পড়বে কেন বাবা,” বলিয়া মেনকা ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল এনং তাহার মুখে বার-বার চুষন করিতে লাগিল।

ভূতো ও মেনকার কাছে নিশিকান্ত বড়ই ধান্না হইয়া গেল, সে গভীর-গলায় বলিল, “এখন অত আদর কাড়ালে, এদিকে যে ধায়! যত সব হ’!” বলিয়া সে রাগে গব্-গব্ করিতে-করিতে বাহির হইয়া যাইবে, ডাক-পিয়ন হাঁকিল “তার আছে।” হলে ধামে মল্লিনাথের নাম লেখা। নেড়ী চেঁচাইয়া বলিল, “মা বললে পড়ো অ্যাঠামশাই খুলে ওটা”। নাকে চশমা লাগাইয়া নিশিকান্ত স্পষ্ট-স্পষ্ট পড়িল—“মল্লিনাথের শালা লিখে দানাপুর থেকে—আজকে রাতে যদি স্টার্ট করিয়া কাল অয়েন্ করিতে পারো, ৭৫ টাকার চাকরি নির্ঘাত—দেহিতে আসা বুধা—সপরিবারে এস।”

দানাপুর মল্লিনাথকে বরণ করিয়া লইবার জন্ত বরণভালা সাজাইয়া সম্মুখে ধরিল—তাহার পরিষ্কার রাস্তা, ক্যান্টনমেন্ট, সবুজ গাছপালা, বহু পুষ্করিণী, মল্লিনাথের মনশ্চক্রে ভাসিয়া উঠিল। সে স্বপ্নোখিতের মত খড়্-মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লইয়া আকপাক করিতে করিতে বলিল “এখনি বেকতে হবে—এখনি—দশটার ট্রেনে—সময় বেশী নেই—ভাড়াভাড়ি গোছগাছ ক’রে নাও—ঘেরি নয়—মোটে নয়—বুলে? গাড়ী আনতে চক্ষু আমি।” সে গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

কিছুকণ পরে একখানা ছ্যাক্কা গাড়ী ডাকিয়া আনিলা এবং ধুপ্-ধাপ্ শব্দে টিনের প্যাট্রা, সত্তরকী-জড়ানো বিছানা, হারিকেন, জলের কঁজো, গাড়ীর মধ্যে কেলিতে লাগিল। নেড়ী বাবার কোলে আর্জ্বরে বলিল,

গ্রহণ করিয়া অথচ সেই জীবন যারা সমৃদ্ধ হইয়া বৌবন ও সৌন্দর্যের জীবনে কিরিতা আসিতে চাহিলেন এবং 'বলাকার' আশ্রয় তাহার প্রথম আশ্রয় লাভ করিলেন। পূর্ববর্তী বাহা শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে দেখা দিবে, 'বলাকার' তাহার কথকিত্ব পরিচয় লাভ ঘটিল।

১৩২০ সালের বৈশাখের প্রথম খরদাহে নববর্ষের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া কবি 'বলাকার' হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁর পর হইতেই কবি-জীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। কি জানি কেন মনে হইতে লাগিল—জীবন হইতে একটা জিনিষ হারাইয়া গিয়াছে অথচ তাহাকে কিরিতা না পাইলে কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না। চারিদিকে বরা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া আছে, এই পৃথিবীর সকল বস্তু যারা এই জীবনকে কিরিতা আছে, তাহাদের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি একসময়ে কবির পক্ষে বস্তু সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা বেন দুর্লভ ও দুর্লভিত্য হইয়া উঠিয়াছে—অথচ এদিকে জীবনের দিনগুলি কুরাইয়া আসিল। শেষে কি এই দুঃখ থাকিরা বাইবে—যারা 'আপন হিয়ার পরশ দিরে' কবির স্বরূপে

* * * * * সাঁক-সকালের গানের দীপে আলিয়ে দিলে আলো

* * * * * এই জীবনের সকল সাঁক-কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা * * * * * সেই যে কবির 'আপন মাদুগলি'; তাদের সজলাভ, তাদের প্রাণের সাঁক হইতে 'এই জীবনের অপরাহ্ন-বেলায়' বকিত থাকিতে হইবে? না, চাই না গুচু তখন পাকে-পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই না জীবনের রহস্য বুঝিতে, অধ্যাক্স-জীবনের নিগূঢ় ও দুর্লভ আনন্দের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে। এর চাইতে জীবনের শেষ করটা দিন 'দিনের আলো থাকিতে থাকিতে' এই স্বপ্নের স্বপ্নস্তম যারা তাদের হাতে হাত দিয়া গাহিয়া লই, বলিয়া লই,

"এই বা দেখা, এই বা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো,
এই ভালো আজ এ সময়ে কারা-হাসির গঙ্গা বনুনার
চেঁটে খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, বস্তু ভরেছি, নিরেছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসন্ন সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো-মাটি কল হাওয়া জল তৃণভঙ্গর মনে।

ইহাই "পূর্ববর্তী"র প্রথম কবিতা। বাস্তবিকই ত বে ধরার ধুলো মাটি কল হাওয়া জল তৃণ ভঙ্গর মধ্যে এই জীবন গানে গড়ে রসে রূপে প্রেম আনন্দে সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন কতদিন বাঁচে? নীড়-ছাড়া বিহীন ত আপন মনের আনন্দে মুক্ত বাতাসে উড়ার আকাশে শুধু উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে অসীম আলোক বিচ্ছিন্নিত জ্যোতির মধ্যে কোথায় যে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু সঙ্গীর রত্নী আলোর-আলোর বন্ধন সকল অগৎ রত্নী হইয়া উঠে তখন সেই স্বপ্ন আকাশের প্রান্ত হইতে নীড়ের পাখী নীড়ের পানে উর্ধ্ব হইয়াই কিরিতা আসে; অনন্ত অসীমের বেশা তাহাকে আর বাঁধিরা রাখিতে পারে না। এই ভাবিয়াই কি কবি 'কারা-হাসির, গঙ্গা-বনুনার সময়ে আবার কিরিতা আসিলেন? বেনন করিয়াই বৌবনের সেই 'সুগু দিনগুলিকে কিরিতা পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তাহার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম সুরণ ত 'বলাকার'তেই দেখা গিয়াছে—এক 'বলাকার' স্বর "পূর্ববর্তী"তে তাঁর শেষ চিহ্ন রাখিরা গিয়াছে "বিজয়ী" কবিতাটিতে। এই কবিতাটির ভাব ও ছন্দ বেন 'বলাকার' স্বরেই গীত। তাঁর কারণও আছে; পূর্ববর্তী প্রথম কবিতা ছুটি ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও কবি 'বলাকার' জীবন' সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অত

কোন গ্রহে এ বাবৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহা 'পূর্ববর্তী'তে স্থান লাভ করিয়াছে, নহিলে 'পূর্ববর্তী'র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজয়ী' কবিতাটির কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। *

'শিশু ভোলানাথের' পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ২৭, এই পরিপূর্ণ ছুটি বৎসর এবং ২৮ সালের ও দীর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গবাসীর মুখের কবিতা একেবারে শুষ্ক নীরব হইয়া রহিলেন। †

তিনিরাহি একবার ছুই বৎসরে একটা মাত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন— 'নদী'। আর এইবার দ্বিতীয় বার। মানুষের জীবনের চিন্তাধারা যখন এক রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য রাজ্যে পুনোদ্যোগ করে, তখন একদিকে বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে সম্মুখে ভবিষ্যতের অস্পষ্ট প্রেরণা এই দুইয়ে মিলিয়া যে সংশয় ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিচিন্তার প্রকাশ নীরব হইয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যের' নিবিড় অধ্যাক্সগৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিতেছিল এবং অতীতের সর্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্যের এক নূতন রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের মুখে 'বলাকার' বাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু বৌবনের শক্তি এবং জীবন ও সৌন্দর্যের নিগূঢ় তত্ত্ব—সহজ উপলব্ধি নয়। কিন্তু জীবনের গতি বাহাকে লক্ষ্য করিয়া নোড় কুরাইয়াছিল 'বলাকার' তাহার সম্মান মিলিল না; অতৃপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল মহাবুদ্ধের অবসানে রণকান্ত পশ্চিমের দুর্ভাষা স্বচক্ষু দেখিরা এবং কবিত্বময় উপলব্ধি করিয়া। এই ক্ষমতামস্ত ঐশ্বর্য-গর্ভিত পশ্চিম, বস্তুসত্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম, জ্ঞান বিজ্ঞান ললিতকলার লীলাভূমি পশ্চিম—এরা ত মানুষের প্রাণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিরা পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত জড়াইয়া বৌবনের তাত্ত্ব লীলার মাতৃরাহিল, শক্তির অক্লান্ত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এরা মজলকে, কল্যাণকে লাভ করিতে পারিল কি? জীবনের নিগূঢ় রহস্যও ত এদের কম জানা ছিল না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাত্মাদের শক্তি ও শ্রীতির বাণীও ত এরা কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষা করিতে পারিল না। কবি অবশ্য দেশে কিরিতা আসিরা সর্বপ্রায়ে একথা স্বীকার করিলেন যে প্রাণের লীলার অক্লান্ত বিকাশে, কর্তব্য ও চিন্তার অগতে শক্তির সুরণে 'পশ্চিম-জয়ী হইয়াছে' কিন্তু ব্যক্তি জীবনে কবিচিন্তার মধ্যে তাহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি চাকল্যে কিংবা শুধু শক্তির সুরণে কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই—জীবনের নিগূঢ় অন্বেষণের মধ্যেও নাই, প্রেম ও শান্তির রহস্য-প্রচারের মধ্যেও নাই। আক্ষে, এই যে জীবনের আশে-পাশে চারিদিকে ধূলা মাটি কল কুল তৃণ নিজেদেরে বিলাইল দিয়াছে, হাসি-কারার ভরা এই যে মানব-সংসার চিরকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ইহাদেরই মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের শক্তি ও কল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে, তাঁর স্বভূ উৎসবের মধ্যে, তাঁর স্বপ্ন ও দুঃখের মধ্যে, যে-কারণে 'স্বপ্ন হইতে বিদায়' লইয়া কবিচিন্তা এই ধরার মেহে পুট সকল প্রাণীর মধ্যে

* 'পূর্ববর্তী'র সক্তি অংশে বাহা ছাপা হইয়াছে তাহা এই আলোচনার নিবিষ্ট হয় নাই।

† E. J. Thompson তাঁর রবীন্দ্রনাথের এক জারপার লিখিয়াছেন—"I remember asking him (the poet) in April 1920 if he had ever known a period of deadness in poetry. He answered, 'I am passing through it now.'" (p. 55)

কিরিমা আনিরাছিল তাহাদেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে এই কথাটি যেখানে আনিল সেইখানেই 'পুরবী'র সৃষ্টি।

'সোনার তরী'র 'ধরিয়া' 'কিংবা' 'বর্ষ হইতে 'বিদায়', 'চিহ্ন', 'চৈতালী', 'ক্ষণিকার' অনেক কবিতাতে দেখা যায় এই ধর্মাত্মীর প্রতি কবির প্রাণের কি একটা অস্বাভাবিক ভালবাসার টান—তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড়; এই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই যেন কবির প্রাণে অপরিণীত বিনয়নের উদ্ভেক করিতেছে : বাহা কিছু দেখিতেছেন,

'কিছু তুচ্ছ নয়—

সকলি ছল'ত বলে' আনি মনে হয়।'

ঐশ্বের ধরতাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের রৌদ্র, সবুজ মাঠ, হরিৎক্ষেত্র সকলের সঙ্গে তাঁর কি বন্ধুত্ব—প্রকৃতির সঙ্গে কি নিবিড় যোগ ॥ কিন্তু বলিয়াছি, এ জীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। তার পরে কত সুদীর্ঘ দিবস কাটিয়া গিয়াছে; ঐ বিচিত্রতার জীবন হইতে নির্বাসনের পর জীবনের উপর দিয়া কত ভাবের বহা-প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে আবার সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়িল কেন?—কেন মনে পড়িল

"শালবনের ঐ আঁচল ব্যোপে
বেদিন হাওয়া উঠত কেপে
কাণ্ডন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতার,
যে-দিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কি মস্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথার,
সে-দিন মনে হতো কেন
ঐ ভাবারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে স্বরকুণ্ডল-ছারে।" (মাটির ডাক)

কেন মনে হয় 'আনি'র কসল ক্ষেতে' কিংবা 'নীল আকাশের কূলে কূলে সাগরের চেউয়ের তালে' সবুজের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবী আছে। দাবী যে এক সময় ছিল একথাও সত্য, কিন্তু কবি নিজেই নিজেই দাবী করিতেছেন,

'কোন ভুলে হার হারিয়েছিলে চাবী?'

যে মাটি-জননীর কোলে তাহার জন্ম সেই কোল হইতে কে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই আজ কে যেন কবিকে বলিতেছে,

'বীধন-ছাড়া ভোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি—
কিরে কিরে চাইবে আপন মাকে।'

কবির এতদিন 'নানা মতে নানান্ হাটে' নানান্ পথে হারানো কোল খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কেবলি ঘুরিয়া ঘুরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার তাহার সন্ধান মিলিল।

"আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
কল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে,
আজকে মার্চের ঘাসে ঘাসে
নিঃশাসে ঘোর ধবর আসে
কোথার আছে বিশ্বজনের প্রাণ।"

উপরে 'পুরবী'র যে-কবিতাটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই অনুরূপ তাবটি প্রকাশ পাইয়াছে "লীলাসজিনী"তেও। জীবনের যে প্রিয়তমা

লীলাসজিনী কবিকে একা কেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহার বন্ধুকে মনে পড়িয়াছে। সেই কবেকার পুরাতন চেনা সুরে আবার আনিরা সে কিছিনী বাজাইল—সে-শব্দে কবি ছুরার-মাহিরে আনিরা বেই চাহিলেন অমনি তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। এই লীলাসজিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার 'ছলে আনিরা কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে—তার কঙ্কণ-বন্ধার কবির বন্ধ ছুরার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে-বাতাসে তার ইসারা আনিরা আনিরাছে, কখনও 'আমের নব মুকুলের বেশে' কখনও নব মেঘতারে, কত বিচিত্র রূপে চকল চাহনিতে কবিকে বারবারে জুলাইয়াছে—এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া গেল। শুধু কি তাই—কত প্রশ্ন যে বৃকের মধ্যে উতলা হইয়া উঠিল—

"এলো চুলে বহে এনেছো কি মোহে
সেদিনের পরিখল?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সঞ্চল?"

এর পরেই হৃদয়ের একটি সনেট—শেষ অর্ধ্য; সেখানেও ঐ একই কথা। যে-কবিকে 'শ্রদ্ধা' 'মাহেন্দ্রক্ষেপে' প্রথম নিশান্তের বাণী' শুনাইয়াছিল, যে তাহাকে এই 'নিখিলের আনন্দ-বেলার' ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে

"দিল আনি'

ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলার
প্রাণের প্রাক্রমে; যে হৃদয়ী যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দচরণে আসি' কল্পিত পরশে
চম্পক-অঞ্জুলিগাথে তন্ত্রা-ববনিকা
সহাস্যে সরিয়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ায় পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অস্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরবে
প্রথম জুলায়ে দিল রূপের মণিকা—"

সে কবির জীবন হইতে কোথার খসিয়া পড়িল, কোথার আত্মপোষণ করিল। অথচ আজ তাহাকে না হইলে ত আর কিছুতেই চলিতেছে না, জীবন-সন্ধ্যায় একবার তাহার দর্শন, একবার তাহার নিবিড় আলিঙ্গন চাই। তাই সব-কিছু তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের সন্ধান

"এ সন্ধ্যায় বন্ধকারে চলিছ খুঁজিতে
সকিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পুঞ্জিতে।"

বাহাদের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন জড়াইয়া ছিল, তাহাদের কতজন আজ সন্ধ্যা-বেলার 'কাণ্ডের কক্ষকোণে' আনিরা উঁকিঝুঁকি খাতিতেছে—হাতছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। চোখের সমুখ দিয়া 'বকুলবনের পাণী' উড়িয়া বাইতেছে; কবি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন—তুমি ত এক সময়ে আমার মনোজগতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে; আজ যে আনি তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছে, তার যেমনা কি তোমার বৃকে বাজে নাই?—আনি যে তোমার ভালবাসিতাম। আবারের জলভরা বেবের ধবর কি তুমি বলিতে পার—সে কি আমার আশার উল্লুখ হইয়া থাকে না? নদীর কলতানে আমার অতীতের বেবনা কি বেহুরে বাজে না; আনি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া কাহারও আঁখি-জলে বুক আনিরা যায় নাই?

“শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখী,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি?
পার ঘাটে যদি বেতে হয় এইবার
খেয়াল-খেয়াল পাড়ি দিয়ে হবো পার,
শেখের পেয়ালার ভরে’ দাঁও হে আমার
স্বরের স্বরার সাকী

একদিকে এই বেদনাময় আকুলতা আর একদিকে বিশ্বাসের দীপ্তি
—‘আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ্বাসিত আনন্দের পরিপূর্ণ অমুভূতির
জীবনকেই আবার কিরিতা পাইলাম,’ নহিলে এই জীবন-সন্ধ্যার ‘পঁচিশে
বৈশাখ’

“সীত উত্তরীরতলে লয়ে মোর প্রাণ দেবতার
বহুতে সাজিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের খালা
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত স্থধার পেয়ালার”

সাজাইয়া আনিবে কেন ?

এর পরে আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার
নামকরণ করিয়াছেন ‘তপোভঙ্গ’। এই অপূর্ণ কবিতাটিকে হৃদয় এবং
ধ্বনিতে, শব্দগন্ধার এবং বর্ণনাতন্ত্রিতে তাবের সূক্ষ্ম প্রকাশ এবং
অমুভূতিতে উর্ধ্বশীর সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও বিধা
নাই। উর্ধ্বশীতে কি শক্তিতে অথচ কি সংযত কৌশলে শব্দ দ্বারা
ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ণ কল্পনার ভাবকে রূপদান করিয়া কবি
সৌন্দর্যের ভীত অথচ শান্ত ও নির্দল অমুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন।
‘তপোভঙ্গ’ও প্রকাশ-ভঙ্গী একই কিন্তু অমুভূতি হইতেছে তারুণ্যের
সদানন্দ প্রাণশক্তির। কি করিয়া এই অপূর্ণ বর্ণনাচাতুৰ্য্য ও প্রকাশ-
ভঙ্গী এতদিন পরে পুনরায় করিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।
‘তপোভঙ্গ’ কবিতার বাহা বলিতে চাহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা
এই :—

কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতায় ত মানুষের জীবনের
প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনি কি কবির ‘বৌবন-
বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলির’ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ? সেদিনগুলি
কি অবশ্যে ভাসিয়া গিয়াছে, না ‘বেচ্ছাচারী হওয়ার খেলার নির্দল
হেলার’ বিস্মৃতির ঘাটে ডুবিয়া গেল ? একদিন সেই বৌবনের দিনগুলি
প্রাণশক্তিতে কি পরিপূর্ণ ছিল—তাহারা ভোলানাথের রক্তরূপকে
সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া দিয়াছিল, উৎসব-শিলা কাড়িয়া লইয়া হাতে মঞ্জিরা
বাঁশরী তুলিয়া দিয়াছিল ; তাঁর তপস্যাকে ‘গীতরিত্ত হিব মরুদেশে’
নির্কাসিত করিয়া সন্ন্যাসের অবসান করিয়া দিয়া বিশ্বের সুধার
জ্যোতির্পর স্থাপাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরের
এই নব সৌন্দর্য্যরূপই কবি-রক্তরূপকে প্রেম ও গানে, রসে ও সৌন্দর্য্যে
ভরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কবির বৌবনের দিনগুলির সঙ্গে-সঙ্গে
ভোলানাথের এই নব রূপকে কে সংহরণ করিয়া লইয়াছিল ?
নটরাজের ভাঙব নৃত্যে ‘অগীত সঙ্গীতে’ ‘অঙ্গুর সঙ্করে’ পরিপূর্ণ
জ্যোতির্পর স্থাপাত্রটি কি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল ? কবির বৌবনের
লুপ্ত দিনগুলি কি নিঃশব্দ কাল-বৈশাখীর নিঃশব্দে আকুলিয়া উঠিল ? না,
সে দিনগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই ; মহেশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের
চিরন্তন রূপও বিশেষিত হয় নাই—আছে তারা ;

“নহে নহে, আছে তারা ; নিরেছো তাদের সংহরিতা
নিগূঢ় ধ্যানের রাতে, নিঃশব্দের মাঝে সংহরিতা
রাখো সন্ধ্যাপনে।”

বৌবনের সেই অকারণ-আনন্দ-উত্তাসে সৌন্দর্য্যের সেই উচ্ছলিত
আনন্দ-বেগ ‘তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশব্দে’ শান্ত হইয়া আছে। কিন্তু এ
তপস্যা কি চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে ? বৌবন কি চিরকাল বন্দী
হইয়া থাকিবে ;—এর কি অবসান হইবে না ? হইবেই—এ তপস্যার

“চকলের নৃত্যশ্রোতে আবার উন্নত অবসান
হুরন্ত উন্নাসে।

বন্দী বৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।”

কবি এতপস্যাকে স্থায়ী হইতে দিবেন না ; তিনি যে তপোভঙ্গ
হৃত, স্বর্ণের চক্রান্ত। ভোলানাথের ছলনা তিনি জানেন ; সেই শুক
বকুলধারী বৈরাগী তপস্যার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সূক্ষ্মের
সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কামনা করিতেছে। সেইজন্যই

“বারে বারে তারি তুণ সন্মোহনে ভরি’ দিব বলে’
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিরে আসি চলে’
স্বস্তিকার কোলে।”

মহেশ্বরের তপস্যা তখন ভাঙ্গিয়া যায় ; তার চিত্তান্তর, বিভূতি
সমস্তই ধসিয়া ধরিয়া পড়িয়া যায়, পরিবর্তে দেখা দেয় পুষ্পমালা।
বহুদিন বিচ্ছেদের পরে কবির প্রসাদে আবার উমার সঙ্গে তাঁর মিলন—
সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার স্বর জাগায় ; আর

“কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবিগানে
সে হাস্যে মল্লিল বাঁশী সূক্ষ্মের অরুণনি-গানে
কবির পরাণে।”

শুধু অপূর্ণ কাব্যশৃঙ্গার দিকে হইতে না দেখিয়া এই কবিতা-
টিকে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির উপর প্রতিফলিত করিয়া এই কথা
বলি যে “তপোভঙ্গ” কবিতার নিজের তপস্যাও ভঙ্গ করিয়াছেন তবে
খুব ভুল করিব কি ? আমার মনে হয় কবিতার মহেশ্বরের তপোভঙ্গের
আড়ালে নিজের এই “নিত্য নৃত্যের লীলা চিত্ত ভরিয়া” দেখিবার
আকুলতার অস্পষ্ট আবেগটি ছিন্ন করিয়া একেবারে আপন মর্দবাপীটি
ব্যক্ত করিলেন।

কবিতাগুলির এই পরিবর্তনকে শুধু তাঁহার কাব্যকথার মধ্যেই খুঁজিলে
চলিবে না। তাব ও কথা বে-রূপ ধরিয়া, যে হৃদয় ও ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ
করে, তাহার মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। “তপোভঙ্গ” আমি
তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু সেই কবিতাটিতেই নয় ; “পুরবী”র
অনেক কবিতাতেই সে আভাস অতি সুপরিষ্কৃত। “সাবিত্রী,” “আহ্বান,”
“সমুদ্র,” “বাজী” প্রভৃতি কবিতা কিছুতেই “বর্ষশেষ” “সমুদ্রের প্রতি,”
“রাতি,” “এবার কিরাও নোরে” প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া না
দিয়া পারে না। বাস্তবিক ‘পুরবী’ পড়িলে মনে হয় হৃদয়ের অগভীর কবি
আবার কিরিতা আসিলেন। ‘বলাকা’তে অবশ্য একটা নূতন চন্দ্র
প্রথম সৃষ্টিলাভ করিল ; তার মধ্যে একটা বিপুল শক্তি, উদ্দাম
গতিবেগ, বাহা আছে বাহা পাইয়াছি সেই জানা সীমার মধ্যে বকনের
একটা চকল অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তির হাত হইতে মুক্তির বন্ধনবিহীন
আবেগ ও উচ্ছ্বাস সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু হৃদয় নয়—ভাবেও।
কিন্তু তৎসঙ্গেও কিসের যেন একটা অতাবও তাহার মধ্যে রহিয়া
গিয়াছে। ‘বলাকার’ হৃদয়-গতিতে ও শক্তিতে মনটাকে বর্ধার পার্বত্য
নদীর মত উদ্দাম বেগে ঠেলিয়া লইয়া যায় কিন্তু পরতের ভরা নদীর
বেদন শান্ত, সংযত গভীর অথচ ক্রমশঃ উত্তরারিত লীলা আছে

এবং তাঁর চলার মধ্যে যে-মাধুর্য আছে সেই লীলা ও মাধুর্য তাহাতে নাই। হৃদয়ের এই লীলা ও মাধুর্যের জন্য “বলাকার” দানে প্ৰস্তুত হইয়া ‘পুরবীর’ কবিতাগুলিতে পুনরাবিষ্কার লাভ করিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি এতক্ষণ বাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই কথাটি নানাহানে কবিজগৎ হইতে বিচিত্ররূপে আপনি বাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্য্য এক সময় যে জীবন পরিপূর্ণ হইয়াছিল, জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পরস্কারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও রূপের রাতের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় ক্ষুদ্র ক্ষণিকার মতো সেদিনের সেই ত্রস্ত আঁধি-বুগল স্থানিবিদ্ধ ভিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল—হৃদয়ের জীবনের চরম অভিশ্রয় সেদিন পূর্ণ হয় নাই—; আজ তাই

“খোলো খোলো হে আকাশ, শুকু তব নীল বনিকা
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের তারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমাব ফুরয়ে যুগান্তরে
গোধূলি-বেলার পাছ জনশুভ্র এ মোর প্রান্তরে
ল’য়ে তাঁর ভীক দীপশিখা

দিগন্তের কোন্ পারে চ’লে গেলো আমার কণিকা।”

* * * * *

“আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তাঁর
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
দেখি তাঁর অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্ন-অশ্রু-সরোবরে কণে-কণে দেয় ঢেউ তুলি।” (ক্ষণিক)

তাঁর পরে “খেলা” “কৃতজ্ঞ” প্রভৃতি কবিতারও এই একই কথা। “কৃতজ্ঞ” কবিতাটি তাঁর চমৎকার একটি সরল মাধুর্য এবং করুণ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীত জীবনের ছোটো-খাটো স্মৃতিগুলি কবিকে কি-রকম বেদনা দিতেছে এই একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কোন অতীত দিনে কবেকার সেই শ্রিয়া কবিকে তাঁর শেষ চুখন দিয়া গিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিশ্বস্তির জন্ত ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুখনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী ধরে-ধরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত ‘কপোতকুঞ্জ-মুখারিত মধ্যাহ্ন’ কত ‘সন্ধ্যা সোনার বিশ্বস্তি আঁকরা দিয়া’, কত ‘রাত্রি অম্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া’ প্রতি মুহূর্ত্ত ‘বিশ্বস্তির জাল বুনিয়া’ দিয়া কাটরা গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁর শ্রিয়াকে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন—আজ তাঁর জন্ত ক্ষমা চাহিতেছেন। তবু একদিন এই শ্রিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়াই গানের কসলে কবি-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল—‘আজো তার শেষ নাই’; তার পরশ আজ আর নাই কিন্তু কি যে ‘পরশমণি’ কবির অন্তরে সে রাখিয়া গিয়াছে বার কল্যাণে

* * * বিশ্বের অমৃত ছবি দেখা দেয় মোরে
কণে কণে—অকারণ আনন্দের স্থখাপাত্র ভ’রে
আমারে করার পান। * * * ”

আজ সে শ্রিয়া আর নাই তবু তাঁর স্মৃতি কবির বক্ষলগ্ন হইয়াই আছে—

“আজ তুমি আর নাই, হুর হ’তে গেছো। তুমি হুরে
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-বাঙরা তোমার সিঁছুরে।

সঙ্গীহীন এ জীবন, শূন্যের হয়েছি লীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।”

এই কবিতাটির করুণ মাধুর্যের তুলনা ‘পুরবীর’ আর একটিতেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

‘পুরবীর’ ‘পশ্চিম অংশে’ যে-কবিতাগুলি গ্রন্থিত হইয়াছে তাহা ১৩৩১ সালে যুরোপ ও পশ্চিম আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা; কিন্তু এই কথাটি জানা না থাকিলে কিংবা কবিতার নাচে ‘আগেই জাহাজ’ অথবা ‘বুয়েনোস এয়ারেস্’ লেখাটি না দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই, এই মহাজ হৃদয়ের মাধুর্যময় কবিতাগুলি জাহাজের নির্জন কক্ষে কিংবা পশ্চিমের জনসংঘাতের উন্নত কোলাহলেব মধ্যে বসিয়া লেখা না বাংলাদেশের পাণ, বিল, নদী, বট, শাল, পলাশ, খুঁই, বেলা, করবীর চিরপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে প্রসূত। ‘কিশোর প্রেম’, ‘অস্থিহিতা’ ‘শেখবসন্ত’ প্রভৃতি যে-কোনো কবিতা পড়িলেই একবার মতান্তর প্রমাণিত হইবে। স্থান ও কালের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কি করিয়া সর্বদাই চিরপরিচিত গৃহের স্থনধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করিয়া ও একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বাস্তুতির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া চলে তাহা বাস্তবিকর বিশ্বের উৎপাদন না করিয়া পারে না।

‘চাপাভ মালাল’ কিংবা ‘বুয়েনোস এয়ারেস্’ও অতি তুচ্ছ ‘আকাশ’ এবং ‘খুঁই’ যে কবিচিত্তের স্মরণ ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বিশ্বাসকর নয় কি?

অতীতের সৌন্দর্য্য ও রসভরা দিনগুলিকে যখনই কিরিয়া পাঠবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষের স্মৃতিও অতি করুণ স্বভাৱে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই বেদনা সবচাইতে ভীক ও ভীক হইয়া দেখা দিয়াছে “লীলাসঙ্গিনী”তে।

‘পিরতমা লীলাসঙ্গিনী’ এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার আসিয়া চিত্ত-ছুরারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে বেলা-শেষে সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি—পারিলেও আর কতদিন!

“দেখো না কি হার, বেলা চলে যায়
সারা হ’য়ে এলো দিন।
বাজে ‘পুরবীর’ ছন্দে রবির
শেষ-রাগিণী বীণ।
এতদিন চেখা ছিছু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বঁশী
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাস
গানছাড়া উদাসীন।”
“এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?”

আবার “বৈতরণী”তে—কতবার মরণ-সমুদ্রের খেয়ার তরণী
—এসেছিলো এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।

“নিরে গেলো কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাধী,
দিবসেরে রিক্ত করি’ তিক্ত করি’ আমার রাত্রিরে।
সেই হ’তে চিত্ত মোর আজর নিরেছে তব ভীরে।”

কবির জগতের একদিকে এই সুতীত্বে বেদনাবোধ এবং অন্য দিকে ব্যথাকীর্ণ হৃদয় লইয়া শেষ দিনটির জন্ত নীরব প্রতীক্ষা—ইহা পাঠককেও পীড়িত না করিয়া পারে কি? বাংলার যে কবি অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বের রসপিপাসু চিত্তকে রসে গানে গঞ্জে সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছেন, তিনি অনাগত যুগের জন্তও রসের পেরালা অক্ষুরন্ত সুধার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি আজ পরপারের স্বাক্ষর জন্ত সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া রাখিতেছেন—ইহার চিন্তামাত্রই আজ অক্ষুরন্ত পাঠকের চিত্তকে বেদনামৃত করিয়া তুলিতেছে। তবু মনে হইতেছে এই জীবন-সন্ধ্যার ও রোগ ও জরার পীড়িত উত্তরীয়েব অস্ত্রশালে যে সবুজ জয়ন্তির পরিচয় আমরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইতেছি, সেই চিরনবীন হৃদয় শীতের কুরাসাপাতে এত সহজে পীতবর্ণ ধারণ করিবে না; বসন্তের দক্ষিণা বাতাস আবার তাঁহার প্রাণে দোলা দিয়া হর জাগাইবে; সে হরে কত অকালজরাগ্রস্ত প্রাণ আবার পুলক-সন্ধারে মাতিয়া উঠিবে।

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

সন ১৩৩৩ সালের স্বাস্থ্য-ধর্ম গৃহপঞ্জিকা—

সম্পাদক শ্রী কার্তিকচন্দ্র বসু, ৪৫নং আমহার্ট স্ট্রিট কলিকাতা বাহ্যধর্ম সঙ্ঘ হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা, ৪০১ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

স্বন্দর পয়ার ছন্দে স্বাস্থ্য-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদকোষে সাধারণের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এত অল্পমূল্যে এমন প্রয়োজনীয় পঞ্জিকা বাহির করিয়া কার্তিক-বাবু দেশের উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালী-গৃহে একখণ্ড রাখা কর্তব্য।

ছেলেদের চিত্তরঞ্জন-জীবনী।—শ্রী শোভনা ঘোষ।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে অপূর্ণ কৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা।

ছেলেদের জন্ত মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের সচিত্র জীবনী। বইখানি ভালো হইয়াছে।

হজরতের বাণী—শাহাদত আলী খাঁ কর্তৃক সঙ্কলিত।

প্রকাশক মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াছিন আলী খাঁ, বি-এ, সমসপুর, পাংশা ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা।

হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার বাণী। প্রত্নকার বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মুসলমান ধর্মের সারসংগ্রহ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার ধরিয়া দিয়াছেন।

শিবপূজা-পদ্ধতি—পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী

উপদেষ্টা; আদিমা মন্দির হইতে শ্রী বোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিহান বহুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৬ নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৪ পৃষ্ঠা, দাম দুই আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে শিবপূজা-পদ্ধতি, আচমনমন্ত্র, প্রণব-আবাহন, পারজীমন্ত্র ও শতাষ্টক মন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মিলন—নাটিকা শ্রীমন্নাকুয়ার চক্রবর্তী।

বর্ধমানের প্রত্যেক পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ পৃষ্ঠা দাম দুই আনা।

স্মৃতিপূজা—(কবিতাপুস্তক) শ্রী অন্নদাকুয়ার চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক হিতৈষিনী সভা, পুরাতন চক, বর্ধমান ২৮ পৃষ্ঠা, দাম দুই আনা। দুই একটি কবিতা বেশ ভালো।

সঃ

ঐশ্বরজালিক—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্তক গাব্‌লিনিং হাউস, বোড়াইচৌতলা, চন্দ্রনগর। ১২৭ পৃষ্ঠা। উত্তম কাগজ ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক নিজেই ঐশ্বরজালিক। পোনার কলমের স্পর্শে তুচ্ছ বিষয়কেও কল্পনার কুহকে জড়াইয়া অপরূপ মোহন করিয়া তুলিয়াছেন। এই পুস্তকে ১৫টি ছোটো গল্প আছে। সেগুলি ঠিক গল্প নয়, কতকগুলি কবিতার রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত কথিকা শ্রেণীর, কতকগুলি গদ্য কবিতা; পড়িতে-পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া গিয়াছি। ভাষা ভাব উজ্জী মনোহর। যিনি পড়িবেন তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিতে বাধ্য হইবেন—বাঃ! বাঁহার উচ্চ সাহিত্যের মধুররসাখাদ করিতে চান তাঁহাদিগকে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী রামেশ্বর দে, চন্দ্রনগর। দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক অমর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমর কমলাকান্ত। প্রকাশক মহাশয় এই অপূর্ণ প্রবন্ধখানি স্বন্দর শোভন সঙ্ঘায় প্রকাশ করিয়া সাহিত্যমোদীর ধন্যবাদ স্বর্জন করিয়াছেন। ছাপা কাগজ বাঁধাই সবই স্বন্দর সুরচিসঙ্গত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের পুনঃপরিচয় দিয়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের অপমান করিতে চাহি না; বাঁহারি না পড়িয়াছেন তাঁহারি সত্ত্বর ইহা পাঠ করিয়া নিজেদের লজ্জা ও দৈন্ত মোচন করিবেন।

চাক্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের নবজন্ম—শ্রী অরবিন্দ ঘোষ।

প্রাপ্তিহান—ক্যালকাটা পাবলিশাস, ২০৭এ হারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১০। ১৩৩২।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের “দি রেনেসাঁস ইন ইন্ডিয়া” নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। যেসব বাঙালী পাঠক ইংরেজী জানেন না তাঁহারি এই অনুবাদ-গ্রন্থখারি অরবিন্দ বাবুর ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। অরবিন্দ-বাবুর আধুনিক কালের ইংরেজী রচনা এরূপ রীতিতে লেখা যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভাবগ্রহণ করা দুঃসহ। যে-সে অনুবাদক হয়ত তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভুল অনুবাদ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহারই একজন শিষ্য বখন এ-কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা করিয়া গেল। তবে নলিনী-বাবুর “রূপায়ন” “রূপবৈদ্য” প্রভৃতির কথাগুলির অর্থ সাধারণ পাঠক কি বুঝিবে বলিতে পারি না। মোটের উপর, অনুবাদের ভাষা বুঝিতে কোনো কষ্ট হয় না, তবে পদবিভাসরীতি ইংরেজী ও ফ্রেন্সীভিই অনেক স্থলে অনুসরণ করিয়াছে। বইখানির ছাপা খুবই ভালো, তবে প্রক্‌দেখার ভুল এত বিস্তর রহিয়াছে যে পড়িতে বড়োই অসুবিধা হয়। মূল গ্রন্থকারের মতামত-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম না, কারণ তাহার হৃদ এই “পুস্তক-পরিচয়” নহে।

জ্ঞানভিন্দু

কথ্য পাথর



কলিকাতায় প্রথম ইংরাজের ফাঁসী

লর্ড এলগিনের শাসনকাল একটি ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে। সে-ঘটনা তাঁহার সমদর্শিতা ও স্মরণপরতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয়, আমরা সংক্ষেপে সেই ঘটনা-বিবৃত্ত করিব।

স্বাভাৱে ৯২ সংখ্যক রেজিমেন্টে জন্ম রাত্-নামক এক ২৫১০-বৎসর বয়স্ক ইংরাজ-সৈনিক ছিল। অপর-এক রেজিমেন্টের জেলিকে ও পট্‌স্-নামক ছুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিয়া নিউজিল্যান্ডে গমন করিবার উদ্যোগ করেন এবং অর্থহারা মুক্ত করিয়া জন্ম রাত্‌কে তাঁহাদের স্ত্রীস্বরূপে নিযুক্ত করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর, রাঙালপিত্তিতে অবস্থানকালে প্রভুগণের আদেশে রাত্, কাজিন-নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি মেসী ক্রয় করিতে যায়। মেসীটি সম্ভ্রান্তসম্ভাবিতা বলিয়া কাজিন উহা বিক্রয় করিতে অসম্মত হয় এবং অস্ত্র-কোনও মেস বা মেসী লইতে অস্বীকার করে। জন্ম রাত্ কোনও কথা শ্রবণ না করিয়া সেই গর্ভবতী মেসীটিকে এক মুঠের মাথায় চাপাইয়া লইয়া যায়। কাজিন তাহার প্রভুগণের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আগমন করে। রাত্, কাজিনের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে পড়াঘাত করিয়া ও তাহার মাথার উপর দিয়া ছুইবার গুলি ছুঁড়িয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে অসম্মত হয় এবং অবশেষে তাহার প্রভুগণের বাসস্থানের অভিসম্বলিকটে একটি বন্দুক আনিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। কাজিন হাঁসপাতালে নীত হয় এবং পরদিন সৈন্ধ্যাক উইলিয়ম্ মরগানের নিকট তাহার এলেক্সার দিয়া প্রাণত্যাগ করে। তৎকালীন ব্যবস্থানুসারে সহস্র মাইল দূরে কলিকাতায় স্প্রিং কোর্টে আসামী ও সাক্ষীদের আনিয়া বিচার হয়। জুরীগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারপতি স্ত্রু চান্‌স্ ক্র্যাঙ্কসন্ জন্ম রাত্‌কে ফাঁসীর আদেশ প্রদান করেন।

ইহাতে ইংরাজ-সমাজে মহা হলহুল পড়িয়া যায়। ব্যারিস্টার লংভেল্ ক্লার্ক্ (Longvella Clarke) এবং কয়েকজন ইংরাজ জন্ম রাত্‌কে অপরায় মার্জনা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া লর্ড এলগিনের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড এলগিন এক স্থানে লিখিয়াছেন, আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যেন দেখি প্রাচ্য-জগতে ইংলণ্ড কেবল আত্মরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, ব্রিটিশ স্মরণপরতা প্রাচ্যজগতের স্রষ্টা আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার নিকট কৃষ্ণাঙ্কের ও বেতাঙ্কের প্রস্তাব ছিল না। তিনি দৃঢ়তার সহিত এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া লিখিলেন যে, তিনি এমন কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছেন না বাহার জন্য বিচারপতির আদেশ পরিবর্তন করা হইতে পারে। তিনি তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ট্রেট্ স্যন্ চান্‌স্ উজ্জ্বে (পরে লর্ড্ হ্যালিক্যান্) লিখিয়াছিলেন যে, হত ব্যক্তিটি তাহার মেসীটিকে কেবল চাওয়া ভিন্ন আর কোনও অপরায় করে নাই এবং এমন কোন কার্য করে নাই, বাহাতে তাহার প্রতি কোন ব্যক্তি উত্তেজিত হইতে পারে।

লর্ড এলগিনের আদেশ-অনুসারে কলিকাতায় হতভাগ্য জন্ম রাত্‌কে ফাঁসী হয়। ইহার পূর্বে কলিকাতায় কোনও ইংরাজের ফাঁসী হয় নাই— বিশেষতঃ কৃষ্ণাঙ্ক হত্যার জন্য। ইতঃপূর্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে

একজন যুরোপীয়ের কাণী হইয়াছিল বটে—সে আরল্যাণ্ডবাসী ছিল এবং একজন যুরোপীয়কে হত্যা করিবার অপরাধে তাহার কাঁসীর আদেশ হয়।

(অর্চনা, ফাল্গুন, ১৩৩২)

শ্রী মনুনাথ ঘোষ

দেড়শত বৎসরের পুরাণে কথা

লালদিঘী

“লালদিঘী” দেড়শত বৎসরের উপরও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর প্রথম আমলে কলিকাতা উপনিবেশের লোকদের জন্য এই “লালদিঘী”ই পানীয় জল সরবরাহ করিত। লালদিঘীর “মিঠে জলই” তখনকার কলিকাতাবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করিত। গঙ্গা-জলও প্রচুর ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু পানার্থে এই লালদিঘীর জলই প্রশস্ত ছিল। তখন বরকের নাম-গন্ধও ছিল না, টানা-পাখার প্রচলনও ছিল না। গ্রীষ্মকালে দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে পানীয় জলকে “সোরা” সহযোগে ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া হইত।

এই লালদিঘীর মধ্যে অব্ চারুনকের সময় সাবর্ণ-চৌধুরীদের স্মারারের মন্দির ছিল। তখন সাবর্ণ-চৌধুরীরাই কলিকাতা, হুতামুটি ও পোবিন্দুপুর গ্রামের অধিকার ছিলেন। পরে তাঁহারা এই ভিনখানি গ্রামই নামমাত্র মূল্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। ইহাতেই বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যে-দামে সেকালে সাবর্ণেরা, এই ভিনখানি গ্রাম বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বিঘা জমির দাম অপেক্ষা অনেক কম। সমগ্র কলিকাতার এখন জমি ও বাড়ীঘর সমেত মূল্য কত?

এই স্মারারের মন্দিরে রাস, দোল প্রভৃতির জন্য একটা মহোৎসব হইত। তাহা দেখিবার জন্য হাটের লোক জড় হইত। এত আত্মীয় খেলা হইত যে, তাহার জন্য মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরটি লালে-লাল হইয়া যাইত। এইজন্য অনেকে অনুমান করেন, ইহার নাম “লালদিঘী” হইয়াছিল। রাধাবাজার প্রভৃতির নামকরণ এই স্মারারের নামের সহিত পূর্ব নিকট সম্বন্ধ। তখন Writers' Building-এর অস্তিত্বমাত্র ছিল না। কলিকাতার পুরাতন কেয়ার (বাহা সেরাজ-উদ্দৌলা আক্রমণ করেন) কাছে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাকারী অব্ চার্নকের কুঠী বা মাল-গুদাম ছিল।

তখন কলিকাতার নাম ইউরোপীয় জাতি ব্যবসারে লিপ্ত। তাহাদের সহিত কথাবার্তা করিবার ও কাজ-কর্ম করিবার জন্য সাবর্ণ-চৌধুরীরা এন্টনি-নামক এক পট্‌স্‌নীক কিরিন্দীকে নিজেদের কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। এই এন্টনি বাজালা, কাঁসী বেশ ভালো জানিতেন। আর ইংরাজ, দিনেমার ও করাসীদের ভাষাতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই এন্টনি সাহেবই বঙ্গবিখ্যাত সেকালের কবি-ওয়ালী এন্টনি সাহেবের পিতামহ ছিলেন।

একদিন স্মারারের দোল-উৎসব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন-কয়েক পোরা-সৈনিক সহ খাইয়া আসিয়া স্মারারের ঠাকুরবাড়ীর

কাছে একটি মহা হস্তা উপস্থিত করে। উন্নত পোরামের যখন আর কেহ শাসন করিতে পারিল না, তখন এটনি সাহেব চাবুক-হস্তে আসিয়া তাহাদের ঠাকুরবাড়ীর সীমানা হইতে বাহির করিয়া দেন। তখন জব্ চার্ণক্ কলিকাতা কুঠীর ম্যানেজার। এইজন্য এটনির সহিত জব্ চার্ণকের খুব বিবাদ বাধে। শেষে একটি আপোষ রফা হইয়া যায়।

জব্ চার্ণক্ এক এ-দেশীয়া স্ত্রীলোককে সহস্ররূপ-শ্বেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। জব্ চার্ণকের সমাধির পাশে তাহার এই বাঙ্গালী-পত্নীর কবর আজও বর্তমান। স্ত্রীরাছি আগে-মাগে এই কবরের উপর চার্ণকের জন্মদিনেই হটক, কিংবা মৃত্যুদিনে ছুটী করিয়া মোরগ বল দেওয়া হইত।

পুরাণো পোরহান

আজকাল কোজিল হাউস স্ট্রীটে, যে-ঘড়ীওয়ারা গির্জাটা আছে— তাহার পাশের বিঘা কয়েক স্থানের মধ্যে অনেকগুলি, সেকালের নামজাদা ইংরাজের সমাধি আছে। এখন যেখানে এই-সব শতাধিক বর্ষের উপরের পুরানো সমাধি দেখা যায়, পূর্বে ইহা অস্ট্ ইণ্ডিয়া কোংএর কলিকাতাবাসী ইংরাজ কর্মচারীদের সমাধিক্ষেত্র ছিল। এই সমাধিক্ষেত্রের নীচে অর্থাৎ বর্তমান Stamp ও Stationery Dept.এর রাস্তা পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতি ছিল। অস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে-সমস্ত জাহাজ বাণিজ্যার্থে সেকালে কলিকাতায় আসিত, তাহাদের মৃত কাপ্তেন স্টুয়ার্ড্ ওস্ততির গোর এই স্থানে হইত।

আজকাল যেখানে ঘড়ীওয়ারা গির্জাটা দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মহারাজা নবকৃষ্ণের দান। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের সহিত মহারাজা নবকৃষ্ণের খুব-একটা মাথামাধি ছিল। তখন সাহেবদের কোনো নির্দিষ্ট ভাঙ্গনাগার ছিল না। মিশন্ রো'র গির্জাটা বোধ হয় তখনকার কলিকাতার একমাত্র গির্জা, সুতরাং ওয়ারেন্ হেস্টিংসকে বাধ্য করিবার জন্য মহারাজা নবকৃষ্ণ জমিটুকু তাহাকে বিনা-মূল্যে দান করেন। সেই স্থানের উপরই এই গির্জা নির্মিত হইয়া আজও নবকৃষ্ণ ও ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বিজড়িত স্মৃতি-চিহ্ন বহন করিতেছে। গির্জার মধ্যে এক প্রস্তরকলকে নবকৃষ্ণের এই দানের কথা আজও খোদিত আছে।

(অর্চনা, ফাল্গুন ১৩৩২)

শ্রী হারিসাধন মৃগোপাধ্যায়

অর্জীর্ণ রোগের কারণ

কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সুবিখ্যাত ডাক্তার Jesse Peiring Williams অর্জীর্ণ রোগের একাদশটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।—

- ১। কুপথ্য আহার।
- ২। রক্তের দোষ।
- ৩। বিশেষ দ্রব্যের প্রতি অতিরিক্ত লালসা।
- ৪। শারীরিক ক্লান্তি। অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে সাহায্যের পূর্বে বিশ্রাম করা কর্তব্য কিংবা স্বল্প-পরিমাণে সাহায্য করা উচিত; ক্লান্ত অবস্থায় আহার না করাই সর্বাপেক্ষা ভালো।
- ৫। শোক, বিরক্তি ও মানসিক অশান্তি।
- ৬। ক্রম আহার।
- ৭। গরম খাদ্য গ্রহণের পূর্বে শীতল জল পান।
- ৮। অপরিমিত আহার।

৯। কোষ্ঠ-কাঠিন্দ।

১০। দাঁতের দোষ।

১১। অল্প নানাপ্রকার রোগ।

অর্জীর্ণ রোগ, Appendicitis বা উপাজ প্রদাহের লক্ষণসূচক হইতে পারে। আন্ত্রিক অস্তের (Gastric ulcer) অস্ততম কারণ দীর্ঘকালহারী অর্জীর্ণ রোগ। অর্জীর্ণ রোগ প্রৌঢ়দিগের মধ্যে পাকস্থলীর Cancer নির্দেশ করিতে পারে।

(শরীর, অগ্রহায়ণ ১৩৩২)

বাঙ্গালী মহিলা কর্ম্মী

সর্বপ্রথম মিস্ চন্দ্রমুখী বহু ও মিস্ কাদম্বিনী বহু বি-এ, পাশ করেন। মিস্ চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বহু মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাশ করেন।

ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা-ডাক্তার। ইহার কাঙ্ক্ষিত কেবল চিকিৎসাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলন ভারতীয়দের স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনে ইনি ভারত মহিলাদিগের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যোগে নারীদিগের প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন, সেইবারেই ইনি প্রতিনিধি হইয়া বোম্বাই-কংগ্রেসে যোগদান করেন; কলিকাতা কংগ্রেসে ইনি বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহিলা-সমিতি গঠন করেন এবং ইহার সহকারী সভানেত্রীরূপে বাঙ্গালী পণ্টনের অল্প নানারূপ ব্যাজ, মোজা, খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমিনী দাস নানাবিধ জনহিতকর কার্য করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ইনি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী; একটি বিধবাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী বাণীগঙ্গা গড়িয়া-হাটার মহিলা-শিক্ষাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের বঞ্চেই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী খান্দগীর মহীশূর বালিকা-বিদ্যালয়ের এবং পরে বেধুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালরূপে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে বেধুন কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। কুমারী হৃদয়বালা বহু এম-এ, শিক্ষা-বিভাগে স্কুল-ইনস্পেক্ট্রসের কার্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বেধুন কলেজ ও কটক স্নাতক কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করিয়া সিংহলের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে ১৯১৮ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ইনি Southern Indian Association বা দক্ষিণ ভারতীয় সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তাঁর পর সিংহল জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত শিশু-শ্রমিক কমিটির সদস্যরূপে ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া শিশুশ্রমিকের ন্যূনতম বয়স ৬ হইতে ১২ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেন এবং প্রত্যেক শ্রমিক উপনিবেশে বিদ্যালয় ও শ্রমিক রক্ষণাঙ্গণের প্রসারার্থে স্থাপন করেন। ১৯২০ সালের কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসে ইনি মহিলা বেচ্ছাসেবিকাদের পরিচালনা করিয়া বিশেষ যশ লাভ করেন; পরে জলন্ধর বালিকা বিদ্যালয় ও কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালরূপে বঞ্চেই কার্যকুশলতা দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা অবলা বহু বর্তমান বাঙ্গালী নারীকর্মীদের মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। ইনি নারীশিক্ষা সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়—এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ইনিই প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পরলোকগতা সরোজনলিনী দত্ত কয়েকটি জেলার মহিলাসমিতি স্থাপন করেন এবং হাঁসপাতালে বোগিনীদের চিকিৎসার স্ববন্দোবস্তের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মহিলা কর্মীদের মধ্যে গোষ্ঠে যেনোরিয়াল, বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা মিসেস পি, কে, রায়, সঙ্গীতসম্মিলনীর সম্পাদিকা মিসেস বি, এল, চৌধুরী, পালংএর শ্রীযুক্তা অধিকা দেবী, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, পাবনার শ্রীযুক্তা জ্ঞানমোহিনী দেবী প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। শ্রুতি শ্রীযুক্তা প্রিয়দর্শনা দেবী ভারত-স্বী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকারূপে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসের প্রারম্ভ কার্য চালনা করিতেছেন। শ্রীমতী কামিনী রায় ও শ্রীমতী গিরীজামোহিনী দাসীর কবিতা বঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র (বহু) বি-এ, বহুদিন যাবৎ সুপ্রসিদ্ধ-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বোগাতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আটন-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় মহিলা টকিল হইয়াছেন পাটনার শ্রীযুক্তা সুধাংশু হাজরা। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের প্রথম মহিলা ফেলো(fellow)। কিন্তু প্রথম বঙ্গরমণী শ্রীযুক্তা রেণীনী

ওহ আইন-পরীক্ষার পাশ করিয়া উকিল হইবার সপ্ন আবেদন করেন, কলিকাতা হাইকোর্ট, উহার সে-আবেদন নামঞ্জর করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দাস সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এম্-এ, এবং ডর্শনী হইতে পি এইচ-ডি উপাধি-ভূষিতা হইয়া আসিয়াছেন।

অসহযোগ-আন্দোলনের দিনে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী স্বামী চিন্তা-রঞ্জনের সঙ্গে দেশের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্তা ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সভার উহার সভানেত্রীর কার্য পরিচালনা কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারের প্রভাব সমগ্র বাঙ্গালার প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বীরগৌরী ব্রতের প্রবর্তন করিয়া বাংলার যুবকদিগের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুদিন পবে বাংলার কিরিয়া আসিয়া ইনি এবংসর হইতে এই ব্রত পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ইনি “ভারতীর” সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এ-বারকার কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাট্টু বাঙ্গালী মহিলা, শ্রুতি বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ভারতীয়দিগের-স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং শ্রুতি আফ্রিকা পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

(মাতৃমন্দির, পৌষ ১৩৩২)

আলোর খেলা

শ্রী কুমারলাল দাসগুপ্ত

মাসিক-পত্রে একখানা ছবি দেখলাম, ছবিখানির নাম ‘আলোর খেলা’। অজস্র রবিকিরণসমূহের কূপের পাশে জমায়েৎ কয়েকটি মূর্তির সর্বাঙ্গে ছাড়িয়ে পড়েছে—এই হচ্ছে ছবির বিষয়। এই যে আলোর খেলা, উন্মুক্ত আকাশের নীচে রবিকিরণের আলিঙ্গন—এ’কে রং ফলিয়ে পটে ফুটিয়ে তুলতে এদেশে ক’জন চেষ্টা করেছেন জানিনে। ইউরোপে এই শ্রেণীর পটুয়ারা একটা বিশেষ সম্প্রদায়, আর তাদের আঁকা অনেক পট বিশ্বের গুণিসভায় বহু সম্মান লাভ করেছে। আমাদের দেশে কোনো-কোনো শিল্পী আজ যখন এই শ্রেণীর পট আঁকতে প্রয়াস পেয়েছেন, তখন সে-সঙ্গে কিছু আলোচনা করা একেবারে নিরর্থক হবে না।

ইউরোপের যে বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ

আমি করেছি, তা’কে বলা হয় “ইম্প্রেশনিস্ট স্কুল” (Impressionist School)। ইম্প্রেশনিস্ট-এর জন্মস্থান হচ্ছে ফরাসী দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে ফ্রান্সের একদল তরুণ শিল্পী চিরস্থান পদ্ধতিকে ত্যাগ করে এক অভিনব উপায়ে অভিনব বিষয়ে এমন-সব অত্যন্ত ছবি আঁকতে শুরু করলে যে তাদের ছবি সালয় (চিত্র-প্রদর্শনীতে) স্থান পেলে না। নব্বইয়ের সাধক কোনোকালে কোনো দেশে বাধা পেয়ে নিরাশ হয়নি, তাই যে কতিপয় নবীন-প্রবীণের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়ে কি’রে এল, তা’রা নিজেরা একটা প্রদর্শনী খুলতে ভয় পেলে না। ৩০ জন তরুণ শিল্পী এক সন্ধ্যা গঠন ক’রে নিজেদের সেই উপেক্ষিত চিত্রাবলী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের সামনে ধরলে ম্যাসিয়ে নাদারের চিত্রশালায়। এই

প্রদর্শনীতে অ্যাপ্রেসিও—সো-লেই লেভাঁ Impression—
Soleil Levant সূর্য উঠছে—তারই ইম্প্রেশন-চিত্র
নামে মোনের আঁকা একখানা ছবি ছিল। অনেকের মতে
এই ছবির নাম থেকে সঙ্ঘের নাম হয়েছে ইম্প্রেশনিস্ট্‌স্‌।

এই তরুণবৃন্দ শিল্প-জগতে কোন অপরাধ রূপকে স্বজন
করুলে সেইটি জানা এখন প্রয়োজন। তা'রা চিত্রে
আলোর খেলা ফুটিয়ে তুলতে চায়, তাই তাদের আর-এক
নাম 'উন্মুক্ত আকাশের শিল্পী' plein air painters (প্লাঁ
এয়ার পেন্টার্স)। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে সূর্যের প্রভা
আলো যখন মাঠের বুকে তরুর শিরে প্রকৃতির সর্বত্র
ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে,
ইম্প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পী পটে আঁকতে চায় তাই। চিত্রশালার
জানালার ফাঁকের মত আলো নয়—মুক্ত বাতাসের মাঝে
মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র আলো। এই আলো তা'রা চায়
বর্ণ-বিন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে। চঞ্চল জলের বুকে আলোর
খেলা তা'রা আঁকে, ঘরের চালে, গাছের মাথায় আলোর
চমকানি তা'রা আঁকে।

ইম্প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পীর আঁকবার বিষয় হচ্ছে ভূদৃশ্য।
ভূদৃশ্যকেই প্রধান বিষয় করে এই নবীনরাই প্রথম
ছবি আঁকতে শুরু করলে। গ্রীকরোমান শিল্পে
ভূদৃশ্য-চিত্র চিরদিন নীচ আসনই পেয়ে এসেছে।
ভূদৃশ্য কোনো দিন ভূদৃশ্যেরই খাতিরে আঁকা
হয়নি। তা'র পরে রেনেসাঁস- (Renaissance) এর
যুগেও ভূদৃশ্যের আদর হ'ল না। রেনেসাঁস-এর শিল্পী
ভূদৃশ্যকে [ছবির একটা অলঙ্কারমাত্র বিবেচনা
করেছেন—মূলবস্তু মনে করেননি। ভূদৃশ্যকে মূলবস্তু
বিবেচনা করেছে উনবিংশ শতাব্দীর নবীন শিল্পীরা।
ভূদৃশ্য যত বর্ণবৈচিত্র্য আছে, এমন আর কোনো
কিছুতেই নেই, তাই এই বর্ণপ্রিয় শিল্পীর দল ভূদৃশ্যকেই
বরণ করলে।

ইম্প্রেশনিস্ট্‌এর চিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে আলো,
আর এই আলোকে নিয়েই অন্তের সঙ্গে তা'র বিরোধ।
এতকাল বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী আলোর প্রয়োজন
বোধ করেছেন, তাই আলো ছিল গৌণ, বস্তু ছিল মুখ্য।
ইম্প্রেশনিস্ট্‌ চাইলে আলোর মুখ্যত্ব, তাই সঙ্গে-সঙ্গে

বস্তু গৌণত্ব প্রাপ্ত হ'ল। বস্তুকে সে চায় না, চায় বস্তুর
সর্বত্র আলো যে রহস্যকে স্বজন করে তা'কে। সর্ব-
লোচকের সঙ্গে এইখানে তা'র মতের অমিল। জন-
সাধারণ এইখানে তা'কে বুঝতে পারে না।

আর যে একটা দোষে ইম্প্রেশনিস্ট্‌দের দোষী
ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে, সে হচ্ছে চিত্রের অস্পষ্টতা।
পুরাতন পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছেন যে চিত্রকর, তিনি
যখন ছবি আঁকেন, তখন তা'তে থাকে স্পষ্টতা—রেখার
স্পষ্টতা, আলো ও ছায়ার স্পষ্টতা, বর্ণের স্পষ্টতা।
কিন্তু ইম্প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পী তা করতে রাজি নয়। সে
স্বেনেছে কোনো দিন কোনো সময়ে কোনো বস্তুকেই চোখে
স্পষ্ট দেখা যায়নি। সে বস্তুকে দেখেছে কতকগুলি স্তরের
সমষ্টিরূপে। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে প্রত্যেকটি স্তর
আবার বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত। তাই ইম্প্রেশনিস্ট্‌ যখন
কোনো বস্তুকে আঁকে, তখন সে হয় কতকগুলি রঙীন্
স্তরের সমষ্টি। তখন স্পষ্টতার পরিবর্তে হয় একটা
অপরাধ অস্পষ্টতার সৃষ্টি। এই অস্পষ্টতাকে চিত্রে
চালাবার আরো একটা হেতু আছে। দৃষ্টি কোনো বস্তুর
বা স্থানের সমগ্ররূপ স্পষ্ট দেখতে পায় না; সে যখন বস্তুর
কোনো বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করে, তখন বস্তুর অবশিষ্ট অংশ
অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মাছের মুখের দিকে যখনই চাই তখন
তা'র গায়ের জামা পায়ের মোজা স্পষ্ট আমরা দেখতে
পাইনে। আবার কারো কান্না আঁধি যখন দৃষ্টিকে
আকর্ষণ করে, তখন তা'র কালো চুল রাজা ঠোট ঝাপসা
হ'য়ে ওঠে।

এই বিস্তোহী পটুয়ার দল পটের বুকে রংএর ছোপ
(dabs of paint) দিয়ে দিয়ে ছবি আঁকে চলে, তাই
খুব কাছে গেলে তা'তে এলোমেলো রংএর ছোপ ছাড়া
আর কিছু বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু একটু দূর থেকে
সেই ছবিকেই পরখ করলে দেখা যায় যে সে এলোমেলো
রংএর ছোপ বিশেষ একটা রূপগ্রহণ করেছে। কাছ
থেকে দেখলে যেটা হয় হাসির জিনিস, দূর থেকে দেখলে
সেইটিই হয় আর-এক পরম বিশ্বয়।

পৃথিবীতে কোনো জিনিস স্থির হ'য়ে নেই—হয় সে কাঁপছে
নয় ছুটছে, আবার যদিই বা কোনো জিনিসের পক্ষে স্থির

থাকা সম্ভব হয়, তবে যে ডটটা, সে নিজে কাঁপছে বা ছুটছে বলে দৃষ্ট বস্তুকে কাঁপতে বা ছুটতে দেখবে। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী তাঁর আঁকা ছবিতে ঐ কম্পন বা গতি দিতে পেরেছে। তাঁর বর্ণ-বিস্তারের এই অপকল্প রীতি, এলোমেলো রংএর ছোপ চিত্রে কম্পন বা গতি ফুটিয়ে তুলেছে।

আলোর বলক আলোর নৃত্য আলোর দীপ্তিকে আঁকতে গিয়ে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এক অভিনব অঙ্কন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তাঁকে বলা হয় পোয়ান্টিলিজম (Pointillisme)। একাধিক রং মিশিয়ে একটা রং তৈরি করে পটে লাগাবার যে পদ্ধতি এতকাল ছিল, তাঁরা তাঁর বদলে পটে লাগাতে লাগল অমিশ্রিত রং পাশাপাশি ছোপ দিয়ে। এতে কাছ থেকে ছবির সৌন্দর্য কিছুমাত্র উপভোগ করা সম্ভব হ'ল না, দূরে থেকে সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া গেল আলোর কম্পন, আলোর দীপ্তি। বিজ্ঞান-জগতের অ্যানাটমি (শরীরসংস্থাপনবিজ্ঞান) ও পার্ভাস্পেক্টিভ (পরিপ্রেক্ষণ) সম্বন্ধে গবেষণার যুগের মতন শিল্পজগতে যেমন একটা অ্যানাটমি ও পার্ভাস্পেক্টিভের যুগ গেছে, তেমনি বিজ্ঞান-জগতের আলো ও বর্ণের যুগের মতো শিল্পজগতে এও একটা আলো ও বর্ণ সম্বন্ধে বিপুল গবেষণার যুগ। আরো একটা নতুন জিনিষ যা ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর ছবিতে দেখা গেল সে হচ্ছে এক রংএর পরিবর্তে অল্প আর-এক রংএর সমাবেশ। রোদ্দুরের মাঝে বস্তুর যে ছায়া তাঁকে চিরদিন আঁকা হয়েছে কালো রংএ কিন্তু ইম্প্রেশনিস্ট আঁকলে তাঁকে বেগুনী রংএ। এতে লাভ ছাড়া লোকসান হ'ল না, কারণ পটে রোদ্দুরের দীপ্তি অনেকখানি বেড়ে গেল।

এইবার এই বিপ্লবের সূত্র হ'ল কবে এবং কেমন করে তা দেখতে হবে। যারা এর অগ্রদূত তাঁদের কথা একটু বলা তাই প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইম্প্রেশনিজম্ উনবিংশ শতাব্দীর নতুন জিনিষ নয়; তাঁরা বলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে এর উদ্ভব হয়েছিল। তখন তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল স্প্রেজ্জাটুরা (Sprezzatura), কিন্তু শতাব্দীর সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেদিনের সে আন্দোলনেরও সমাপ্তি

হয়েছিল। তাঁর পরে ১৫০ বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে সুদূর জাপানের শিল্পপ্রভাব যখন ইউরোপের শিল্পজগতে বিস্তার লাভ করছিল তখন আবার তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল ইতালিতে নয় ফ্রান্সে।

সনাতন পথ থেকে যাত্রা বিপথে চলতে প্রথম প্রয়াস পেয়েছিলেন গুস্তাভ কুবুবে ছিলেন তাঁদের একজন। কুবুবে জন্মেছিলেন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ছবির বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি চোখে যা দেখেছেন পটেও ঠিক তাই আঁকেছেন। কোনো কিছু বৃহৎ করে মহৎ করে দেখবার চেষ্টা তিনি কোনো দিন করেননি। তিনি ছিলেন সোশ্যালিস্ট তাই তাঁর আঁকার বিষয় ছিল টেশন, কারখানা, খনি, অল্পহীন দীন গ্রামবাসী, পাথরভাঙা মজুরের দল। যারা এতদিন সব-কিছুর ভাবমূর্তি দেখে এসেছে তাঁরা কুবুবের আঁকা বর্তমানের সত্যিকার মানুষকে দেখে চমকে উঠল।

এরই কিছু দিন পরে একদল ফরাসী দৃশ্যচিত্রকর প্রকৃতিকে বিশেষ করে জানুয়ার জন্তে প্রকৃতির মাঝে আত্মসমর্পণ করলেন। ফেভেনরোর বনের ধারে বার্বিস গাঁয়ে করো, দিয়াস, ক্রশো গাঁয়ের লোকের মতনই বাস করতে লাগলেন আর বছরের পর বছর বনে-বনে ছবি আঁকে যেতে লাগলেন। বার্বিস-সম্প্রদায় ইম্প্রেশনিজম্-এর অগ্রদূত আর করো হচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী বা গুরু।

কামিল করো ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পারিতে জন্মেছিলেন। পঞ্চাশ বছরে পা দেবার পর করোর বিশেষত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। করো শুধু পটুয়া ছিলেন না, গায়কও ছিলেন। তাই তাঁর পটে সুরের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রং নির্বাচনে একটা বিশেষত্ব ছিল। এমন সব রং-এ তিনি ছবি আঁকতেন যাতে ছবিতে একটা শাস্তিন্ময় মাধুর্য ফুটে উঠত। তাঁর দৃশ্যপটে স্পষ্ট কিছু থাকত না—অস্পষ্টতার সূক্ষ্ম আবরণে সব-কিছু ঢাকা থাকত। ইম্প্রেশনিজম্ কথাটির উদ্ভব যখন হয়নি তখন করোর পটে ইম্প্রেশনিজম্ এর সূত্রপাত হয়েছে। করোর বন্ধু, বার্বিস সম্প্রদায়ের আর একজন শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন জঁ

ক্রাসোয়া মিলে। মিলে ছিলেন চাষার ছেলে, তাই চিরদিন গাঁয়ের প্রতি তাঁর টান দেখা গেছে। তিনি তাঁরই মতন গরীব চাষাদের জীবন-কথা তুলি দিয়ে লিখতেন। রুসো ছিলেন গোঁড়া বাস্তবদর্শী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ (classical) ছবিতে প্রকৃতির যে রূপ আমরা দেখতে পাই সে তা'র সত্যিকার রূপ নয়—অনেকখানি পালিশ করা, মাজা রূপ। সে-ছবির মূর্তি প্রায়ই মানুষের নয়, দেবতার বা পরীর, ঘরবাড়ী পৃথিবীর নয় কল্পলোকের। রুসো এঁকেছেন প্রকৃতির সত্যিকার রূপ—অগোছালো, অসংস্কৃত, কঠিন; আর তা'র মাঝে যে মানুষকে এঁকেছেন সেও প্রকৃতিরই সন্তান—সে চাষা, যে ঘরবাড়ী এঁকেছেন সে চাষার কুঁড়ে। দিয়াখ্ আঁকতেন গাছের মাথায় আলোর খেলা।

এঁদের পরে যে ছ-একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে তাঁরা প্রতিভাবান্ না হ'লেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যোহান্ বার্টোল্ড্ য়োঙ্কিঙ্ (Johann Barthold Jongkind) ছিলেন ওলন্দাজ শিল্পী। ইল্যাও তাঁর জন্ম স্থান হ'লেও ফ্রান্সেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। লুই বদ্যা এর শিল্পশিক্ষা হয়েছিল মিলের হাতে।

ইম্প্রেশনিস্ট নাম যিনি প্রথম পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন এডুয়ার্দ মানে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে জন্মলাভ করেন। উনবিংশতি শতাব্দীর যে কয়জন নবীন শিল্প-সাধক নৃতনের আরাধনা করেছিলেন, দেলাক্রোয়া, জেরিকো, রুসো, করো, কুবুবে, মিলে,—সকলকেই লাঞ্ছনা, অনাদর, অবহেলার তীব্র বিষ অনেক পান করতে হয়েছিল, কিন্তু মানে পান করেছিলেন আকর্ষণ। চিত্রকরের প্রথম জীবনে চিরদিন যা ঘটে মানের জীবনেও তা ঘটেছিল। আত্মীয় অনাত্মীয়ের বহু বাধাকে উপেক্ষা করে তাঁকে শিল্পাচার্য্য কৃতিত্বের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিভা কোনোদিন বয়সের বিচার করে প্রকাশ পায় না, তাই যেদিন শুরুতে অতিক্রম করে শিষ্য বিশেষত্ব লাভ করলেন সেদিন শুরুশিষ্যে বিরোধ বাধল। মানে, কৃতিত্বের চিত্রশালা ত্যাগ করে বিশ্বের চিত্রশালার সন্মানে বের হলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসার জাতীয় জীবন যখন

একটা ভীষণ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিল—শিল্পী মানে তখন "দেশ-দেশ স্তরে সৌন্দর্যের সন্মানে ফিরাছিলেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ও ইতালীর চিত্রশালা দেখে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখনও তাঁর রূপত্বা যেটেনি। তিনি যে সত্যের আলোকের দর্শনপিয়াসী হয়েছিলেন তা'র দর্শন লাভ হ'ল না।

সহসা একদিন অভীপ্সিতের দর্শন মানে পেলেন স্পেনদেশীয় শিল্পী ভেলাস্কেথ্ এর চিত্রে। ভেলাস্কেথ্ তাঁকে মুগ্ধ করলে, ভেলাস্কেথ্কে তিনি শুরু ব'লে মেনে নিলেন। সেইদিন থেকে তাঁর নিজের পথে নিজের বলে চলা শুরু হ'ল। দিনের পর দিন মানের তুলি অবিরাম ছবি এঁকে চলল। এত তীব্র যার সাধনা সাধারণ তা'কে চিন্তে পারুলে না। কতিপয় সমসাময়িক প্রতিভাবান্ পুরুষ হইস্কার, লেগো, ফাঁত্যা লাতুর, জোলা ও বোদলেয়ার মানেকে অভিনন্দিত করলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সাল'র (চিত্রপ্রদর্শনীর) সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। দি স্প্যানিশ পইটার-প্রেয়ার নামে যে ছবি তাঁর সাল' (চিত্রপ্রদর্শনী)এ গৃহীত হয়েছিল, প্রশংসাও তা'র যথেষ্ট হয়েছিল। এমনি একটা জয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিচিত্র জীবন শুরু হয়। পরের বছর তাঁর ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেলে না। ঐ বছর সাল'র দরজা থেকে এত শিল্পী নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল যে তা'রা নিজেরা একটা প্রদর্শনী খুলতে বিধা করলো না। এই প্রদর্শনীতে, বিদ্রোহীদের এই আড্ডায় মানে ছিলেন নেতা। তাঁকে ঘিরে হইস্কার, স্যাং মাসে', সাটার, লাভিয়েল্ একটা সম্প্রদায় গঠন করলে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে (universal exposition) মানে ও কুবুবের স্থান হ'ল না। নূতন পথে যারা চ'লে বাধা তারা অনেক পায় কিন্তু নিরাশ হয় না। মানে-সম্প্রদায় আবার আর একটি প্রদর্শনী খুলে নবীন শিল্পীদের মিলন ঘটালে। মানের বন্ধু সাহিত্যিক জোলা তাঁর ছবির সমালোচনা করে যে প্রবন্ধ লিখলেন আজ পর্যন্ত তা'র যথেষ্ট নাম আছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিল্পজগতের একটা স্মরণীয় বছর।

যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি এমন সময় মানে একদিন পারির কাছেই তাঁর বন্ধু নিস্তির গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বন্ধুর বাগানে ব'সে ছবি আঁকতে-আঁকতে হঠাৎ মানে এক অভিনব অঙ্কনপদ্ধতি আবিষ্কার করলেন—মুক্ত আকাশের নীচে ছবি আঁকবার পদ্ধতি—প্ল্যা এয়ার পেইন্টিং (plein air painting)। এক নূতন জগৎ তাঁর সামনে খুলে গেল। সেই দিন থেকে তিনি এই নূতন পথে চলতে শুরু করলেন। তাঁর পায়ের রেখা ধরে তাঁর সহচর নবীন শিল্পীরাও এগিয়ে চলল। মানেকে ঘিরে এই যে নবীন সঙ্ঘ, এর নাম হ'ল—লেকোল স্ত বাতি-ঞোল (L'Ecole de Batignolle), কারণ বাতিঞোল এ ছিল এদের ক্লাব। দীর্ঘ জীবনের অবসান যখন ঘনিয়ে এল তখন মানে পেলেন সম্মান; সাল (প্রদর্শনী) তাঁর ছবিকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হ'ল না, লিজিয়ন অব্ অনার-এর সম্মান তিনি পেলেন।

যারা দেখতে-দেখতে ইম্প্রেশনিস্ট ব'লে দেশবিদেশে বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন কার্মিল পিসারো হচ্ছেন তাঁদের একজন। ব্যবসায়ীর ছেলে পিসারোকে সবাই যখন বললে দোকান খুলতে, তখন পিসারো খুলে বসলেন চিত্রশালা। ক্রালে পিসারো করোর আঁকা ছবি দে'খে করোর শিষ্য গ্রহণ করলেন। তাঁর পরে তাঁর পরিচয় হ'ল মানের সঙ্গে, বাতিএল স্কুল তাঁকে গ্রহণ করলে। পিসারোর প্রতিভা প্রকাশ পেলে।

প্রত্যেক আন্দোলনের আবের্ষে—সে কি ধর্মের, কি বিজ্ঞানের, কি সাহিত্যের, কি শিল্পের—একজন করে প্রতিভাবানের জন্ম হয়। ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলনের আবের্ষে জন্ম নিলেন মানে। ক্লব ওয়ার মানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পারিতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসা করবে, এ খুব সহজ কথা, কিন্তু অতি সহজ যা জগতে তাও অনেক সময় ঘটে না। মানে হলেন শিল্পী। পারির এক প্রদর্শনীতে মনের ছবি দে'খে মানে মানের অঙ্কনপদ্ধতি গ্রহণ করলেন।

প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে করো, কুববে, মানে যখন প্রকৃতিকে আঁকতে লাগলেন তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন নিবিড়তা নয়, উজ্জলতাকে পটে ফুটিয়ে

তুলতে হবে। প্রকৃতি আলোর লীলানিকেতন—প্রকৃতি উজ্জল, আর এই আলো, এই উজ্জলতা, এই দীপ্ত মনোহর আবরণ, ভগবানের এই অভিনব বিকাশকে পটে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হয় হাল্কা উজ্জল রং। ক্রালের প্রথম বর্ণবিপ্লবী দেলাক্রোয়া পথ নির্দেশ করলেন। তাঁর পরে এলেন করো, কুববে, মানে; আলো ও বর্ণের জয় হ'ল। মানে যখন এলেন তখন মানুষ দৃশ্যপটকে আর অসম্মান করে না, আলো ও বর্ণকে ভালোবাসে; তাই মনের প্রতিভা সহজেই সম্মান পেলে।

মানে তাঁর সব ছবিই এঁকেছেন মুক্তাকাশের নীচে ব'সে—আঁকবার বিষয়কে সামনে রেখে। কোনো দৃশ্যের নিখুঁত প্রতিকৃতি তিনি কোনোকালে আঁকেননি—তিনি এঁকেছেন ভূদৃশ্যের সেই বিশেষ রূপ আলো ও বর্ণের মিলনে যা ফুটে উঠেছে। কানন-কান্তারে, মাঠের বুকে যে মুহূর্তের আলোর লীলা-বর্ণের মাধুর্য তিনি আঁকতেন, দিনের সেই মুহূর্ত যখন চ'লে যেত ছবি আঁকাও তাঁর বন্ধ হ'ত। আর-এক দিনের সে-মুহূর্তের আশায় তিনি থাকতেন। বস্তুর সূচক বিগ্রাসে বা বস্তুর নিখুঁত অবয়বে তিনি সৌন্দর্য দেখতে পেতেন না—সৌন্দর্যের সম্মান তিনি পেতেন বস্তুর উপরে আলো ও বর্ণ যে দৃশ্য রচনা করে তা'তে। কণিকের এই সৌন্দর্যই ছিল তাঁর উপাস্য।

মানের সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা কতখানি, তাঁর আর্টের বিশেষত্ব কোথায় এ জানা সহজ হয় তাঁর আঁকবার বিষয় নির্বাচন দেখলে। একই দৃশ্যের ছবি তিনি এঁকেছেন একাধিক—একাধিক কণের। একই তরুণী-কার শিরে আলোর লীলা মানে সাতটি পটে চিত্রিত করেছেন—দিনের সাতটি কণে। প্রভাতের রঙীন আলোর খেলা তিনি এঁকেছেন, মধ্যাহ্নের প্রথম আলোর দীপ্তি তিনি এঁকেছেন, সন্ধ্যাহ্নের স্তিমিত আলোর রহস্য তিনি এঁকেছেন। মাঠের মাঝে যে তৃণের স্তূপ, তা'রই ছবি তিনি এঁকেছেন ২০ খানি—ঋতুর পরিবর্তনে স্তূপের ২০টি রূপ। মনে কর্যা কাথিড্রালকে একাধিক পটে চিত্রিত করেছেন।

মানের পর যাদের নাম করা যেতে পারে

তাঁরা হচ্ছেন আলফ্র্যাঙ্ক সিস্লে, পল সেইসানে, দেগা, রেনোয়া, মহিলাশিল্পী বেয়াতঁা মেরিসো। এঁদের মধ্যে দেগা ও সেইসানে বিখ্যাত। দৃশ্যপট আঁকবার ইম্প্রেশনিষ্ট পদ্ধতিতে দেগা এঁকেছেন মূর্তি। বর্তমান সভ্যতার বিবটুকু আঁকণ পান করেছে লালসা-

কাতর যে নারীবন্দ, দেগা তাদের এঁকেছেন। সেইসানে হচ্ছেন পোস্ট ইম্প্রেশনিজ্‌ম্ বা উত্তর ইম্প্রেশনিজ্‌ম্-এর অগ্রদূত। ইম্প্রেশনিজ্‌ম্-এর পরে এল পোস্ট ইম্প্রেশ-নিজ্‌ম্, তা'র পরে এল কিউবিজ্‌ম্ (cubism)। নৃতনশ্বের ঢেউ অনন্তকাল ধ'রে সভ্যতার কূলে যা দেবে।

বিস্মরণী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

আমারে তোমরা কূলে' যেও, ভাই,
এসেছি পথ কূলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্ত্তিনাশার কূলে।
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে মনে ছিল আশা,
ভাঙা-মন্দিরে বেঁধেছি বাসা
পুরাণে বটের মূলে;—
প্রাণের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্ত্তিনাশার কূলে!

তারার আধরে কে লিখেছে লিপি
ধরার ললাট-পটে!—
ভেবেছি আমি পড়িব তাহারে
ষিধাহীন অকপটে।
যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন,
যার অভিনয়ে দিবস মগন—
ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন
বসুধার বালুভটে—
তারার আধরে যে-লিপি বিহরে
নভোনৌলিয়ার পটে!

নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী-চাঁদ—
তখন কৃষ্ণাতিথি,
কুহেলি-আকাশে কাদে দিক্বালা
হারারে তারার সিঁধী;
সেই কালে আমি বাহিরিছ পথে,
নদী-গিরি পার হ'ছ কোনো মতে,
উত্তরিছ শেষে স্বপনের রথে
বন-যুধিকার বীধি,
পূর্ণিমা-চাঁদ ছিল না আকাশে—
তখন কৃষ্ণাতিথি।

মরণ আমারে ছ'হাতে বাঁধিল
মুখ-চুষন লাগি
হিম হ'য়ে গেল বৃকের পাঁজর
শিশির শয়নে জাগি'—
হেরিছ জীবন আধেক স্বপন
তারকার চোখে তাকায় তপন!
যে আধা আধারে রয়েছে গোপন
হ'ছ তার অহুরাগী,—
বৃকের আগুন জুড়াইয়া গেল
হিমেল হাওয়ার জাগি'।

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
 ধরার অরুণোদয়,
 আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক—
 তারকার গাহি জয়!
 যে আলো কাঁদিছে উর্দ্ধ ভুবনে,
 তরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে,
 তারি এক কণা মনের ভবনে
 করিয়াছি সঞ্চয়,
 তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
 করিছ অরুণোদয় !

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
 মণি সে বিশ্বরঙ্গী !
 কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
 বেদনার বন্ধনী ।
 যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে
 ফে'লে দিয়ে যাই জনহীন বাটে,
 জীবনের এই যৌবন-ঘাটে
 তরিছ বৈতরণী—
 গাঁথি কামনার শতনরী-হারে
 মণি সে বিশ্বরঙ্গী !

স্বপ্নি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
 স্ফুরিছে জ্যোতির্ধর !
 মনোমুদ্রকে ধ্বনি অনাহত
 নিবারিছে সংশয় !
 কানে আগ্নেয় রূপ, সুর বাজে চোখে !
 বেড়াই অতীত অনাগত লোকে,
 সমুখে পিছনে—স্বপ্নের শোকে
 তুলি নিকটের ভয়,
 যে স্বপ্ন স্বপন তাহারি রক্তসে
 জগৎ জ্যোতির্ধর !

হাসি হাহাকার না জানি সে কার—
 প্রাণ করে উত্তরোল,
 সেই কলরবে তুলি জন-রব
 পথের কলহ-রোল ।
 অজানা জনের আঁধির পাহারা
 স্বপ্ন-সভায় করে দিশাহারা—
 তাই ফিরে যায় স্নেহরসধারা,
 কেঁদে যায় ফুল-দোল !
 যত হাহাকার হাসির মতন
 চিত্ত করে উত্তরোল !

তুলিবার ছলে ভরিলাম ডালা
 বাছা-বাছা বনফুলে,
 সৌরভে তা'র মৃদু ধূপবাস,
 আত্মাণে আঁধি ঢুলে ।
 মুকুতা-মুকুলে কার আঁধি কাঁদে,
 রাঙা অশোকের হাসি কারা সাথে,
 কেবা নীল নীবি নীপহারে বাঁধে
 চম্পক-অঙ্গুলে !—
 রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল,
 আত্মাণে আঁধি ঢুলে !

রূপের আরাতি করিছ আঁধারে
 আবেশে নয়ন মুদি'—
 হেরি দেহে-মনে বাধা নাই আর,
 —উষল অমুদি !
 যে-রেখা আঁকিছ তিমির-কলকে,
 যে-ছায়া ধরিছ নিমীল-পলকে,
 যে মুখ চুমিছ অলখ-আলোকে,
 দিবসের ষার কুদি'—
 তাহারি আবেশে উখলিল স্বধা-
 ময়ন-অমুদি !

তুলে গেছ শোক, তুলিছ ভাবনা,

—যমতার পরাজয়,

রাখীটির মত রাজা হ'য়ে ওঠে

জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় !

বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ

তারি মধুমদে পরাণ অন্ড !

হয়ত মনের এ মকরন্দ

সত্যের স্থধা নয়—

তবু তুলে আছি তাহারি গুলকে

জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় ।

হোথা অক্ষুট উষার কিরীটে

শোভিছে হীরক ফুল,—

জানি সে আলোক-শিখার সকাশে

ফুলিবে না মোর ফুল ।

টানের সোনা যে রূপা হয়ে আসে !

তারারা পলায় আগুনের জ্বাসে !

রথ-ঘর্ষর ওই যে আকাশে

অরণের—নাহি তুল ।

হেথা সে আলোক-শিখার সকাশে

ফুটিবে না মোর ফুল ।

আমি ধরেছিছ নিশীথের গান

তোমাদের শেষ-রাতে,—

জ্যোৎস্না যখন মিলাইয়া যায়

গোধূলি-ধূসর প্রাতে ।

গান শেষ করে' চলে' গেল সব,

আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে,

দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে,—

বাঁশিখানি লয়ে হাতে

আমি বাহিরিছ বন-পথে একা

গোধূলি-ধূসর প্রাতে ।

* * *

আমারে তোমরা তুলে যেও ভাই,

এসেছিছ পথ তুলে,—

নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি

আতপ-উৎস কূলে !

যে-গান হেথায় হ'ল নাকো সারা,

স্বরখানি তা'র হবে না যে হারা,

আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা

লইবে তাহারে তুলে'—

নব-আগরণী গাইবে সেথায়

বিস্মরণীয় কূলে ।

দিবসের শেষে

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

(১)

রতি নাপিতের বাড়ীর অবস্থান-ক্ষেত্র বড় চমৎকার ।
বাড়ীর পূবে নদী কামলা, পশ্চিমে বাগান, উত্তরে বেণুবন,
দক্ষিণে বভ্রুর দৃষ্টি চলে, ততদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ।
সূর্য্যদেব দিগন্ত স্পর্শ করিতে-না-করিতেই তাঁর হিঙ্গুল-
টকটকে আভাটি রতির গৃহচূড়া চূষন করে ; রতি ঠিক
পাখীর ডাকেই আগে, গোধূলিতে তা'রা বৃক্ষবাসে কি-রমা
আসিলেই তাদের কল-কাকলীর সঙ্গে-সঙ্গে শান্তিহরে

স্বর মিলাইয়া রতির তুলসী-তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জলিয়া ওঠে,
দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ সিঁদু সিঁদু করে, পশ্চিমে
তা'র প্রতিধ্বনি আগে ; দক্ষিণে সূচিকণ শ্যামল দোলের
অন্ত থাকে না । কিন্তু রতির সে দিকে দৃকপাতও নাই,
তা'র চোখ-কান এসব দেখিতে-শুনিতে শিখে নাই । রতি
বস্তৃতান্ত্রিক । সে যে চাকরান্ জমি ভোগ কর, তাহাই
তা'র একমাত্র ধ্যান ।

একপুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতি লোক ভালোই

হইত। এবং, রত্নির বাড়ীর পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস বাগানের আম-কাঁটাল-সম্বন্ধে তাহাকে যে সম্বন্ধের চক্রে দেখে, তাহা যদি অমূলক জানে বিশ্বাস না করা যায়; তবে রত্নি নিঃসন্দেহ-চরিত্র। কিন্তু লোকে যাদবের কথা বিশ্বাস করে। ছুই ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্র-পুরের হাটে তাহাকে গ্রামের অনেকেই আম-কাঁটালের কালে আম-কাঁটাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে এবং সর্কা-পেকা আশ্চর্যের কথা এই যে, ফলগুলি আহরণের উপায়-সম্বন্ধে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও কেহ সন্দেহ হইতে পারে নাই।

রত্নির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রত্নির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব-গৃহ হইতে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বীরাটমী-ব্রত গ্রহণ এবং পাঁচুগোপালের মাদুলী ধারণ করে; তা'র পর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলী কবচ তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর সঙ্গে উচ্চত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে অহরহ প্রহরা দিতেছে। অগণ্য নির্খাল্য, জাগ্রত যন্ত্র ও প্রসাদ ধারণ করাইয়াও নারাণীর অক্ষুণ্ণ সশক উৎকর্ষার সীমা নাই—পাঁচু ক্ষণেকের ভরে নীরব হইলেই নারাণীর মনে হয় বুঝি সে হারাইয়া গেছে।

এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিল, তাহা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি ভয়ঙ্কর। নারাণী তাহাকে হাত ধরিয়া ক্ষেতের দিকে লইয়া যাইতে ছিল, নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মাঘের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা, আজ আমাকে কুম্বীরে নেবে।

নারাণী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—সে কি রে ?

—হ্যাঁ মা, আজ আমাকে কুম্বীরে নেবে।

—কি ক'রে জান্নি ?

—তা জানিনে।

ছেলের সর্ব্বনেশে কথা শুনিয়া নারাণী প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই হুঁতবনা কাটিয়া তা'র বুক হাল্কা হইয়া গেল। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই বলিয়া থাকে,—একদিন সে সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অটুহাস্ত করিতে দেখিয়াছিল, আর-একদিন একটি কচ্ছপকে বাজাসহ

তাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই-সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে। পাগল ছেলে!

রত্নি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিল। এই সংপ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বস্ত্রীর কথাটা। অধর বস্ত্রী সে-বার নৌকাযাত্রা করিবার ঠিক পূর্বেদিন সন্ধ্যাবেলায় আব্‌ছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল; প্রাচ্যে লাকাইয়া-লাকাইয়া নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া সে কেবলি চীৎকার করিয়াছিল,—ও কে ? ও কে ? তা'র রক্তবর্ণ নিম্পলক চকুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সেদিন সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতন সে শাস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তা'র নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেদিন রত্নিকে বলিয়াছিল,—রত্নি, রকম ভালো না, ওটা মৃত্যু-লক্ষণ। ও-রকম মনের ভুল হয়—পাগলের আর ধার মরণ ঘনি়েছে।.....

তাই রত্নি ছেলেকে কঠোরকণ্ঠে শাসন করিয়া দিল,—খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আন্বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোব পিঠে ভাঙ্ব।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ। নদী বাড়িয়া চড়া ডুবিয়া জল ছল্‌ছল শব্দে খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা লেহন করিতেছে। স্বচ্ছ শাস্ত জল ধরগতি ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী কামলা, তা'র ছুই তীর, আর তা'র জল তাদের চির-পরিচিত; এ নদী ত নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তম্ভদায়িনী জননীর মতন মমতাময়ী; চিরদিন সে গিরিগৃহের স্তপের শীতল নীর পল্লী-কুটীরের ছায়ার পর্য্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তা'কে ভয় নাই।

স্বানের বেলায় রত্নি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল,—আয়, নেয়ে আসি।

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মাঘের কাছে ছুটিয়া গেল। মাঘের পিঠের

উপর উপড় হইয়া পড়িয়া তা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপি-চুপি বলিল,—আমি আজ নাইব না, মা।

নারাণী বলিল,—কেন ?

পাঁচু বলিল,—ভয় করছে।

নারাণী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল,—পাঁচু নাইবে না আজ।

রতি ভ্রতঙ্গী করিয়া বলিল,—কেন, কি হয়েছে ?

—হয়নি কিছু।

—তবে ?

—নাইতে চাইছে না, থাক না আজ।

—না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বলুন, ত'নে তিনি হাসতে লাগলেন।

গ্রামের বাবু চৌধুরী-মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে-ঘষিতে রতি পাঁচুর উদ্ভট কথাটি বিবৃত করিয়াছিল। বাবু ত হাসিয়াই ছিলেন, উপস্থিত ইতর-ভ্রতঙ্গ সকলেও কথাটি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমীর ? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি কি হইতে পারে ? বাবু বলিয়া দিয়াছিলেন,—কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস্, কুমীরে যদি নেয় ত তোকেই নেবে।

রসিক পোদ্দার প্রতিধ্বনির মতন বলিয়াছিল,—বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তা'র খোরাক হবে।

হলধর হালদার বাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল, সে টাট্টা করিয়া বলিয়াছিল,—রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ ? তা'র উপর ভেতে নাপিত !...

এমনি-সব কথায় মনে-মনে কথিয়া উঠিয়া এবং এই শ্রেণীর ভুলের দরুন অধর বস্তীর প্রত্যক্ষ নিধন-প্রাপ্তির কথাটি স্মরণ করিয়া পাঁচুকে আজ নদীতে নাওহইতেই হইবে, এই সংকল্প করিয়া রতি বাড়ী আসিয়াছিল।

নারাণী পাঁচুকে বলিল,—যাও বাবা নেয়ে এস। সঙ্গে বড়-একটি মাল্লব যাচ্ছে। ভয় কিসের ? বলিয়া সম্মুখে মুখচূষন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিল ; মনে-মনে তাহাকে সহস্র আশীর্বাদ করিল।

অন্য দিন তেল মাখাইবার সময় পাঁচু ছট্‌ফট করিত,

আজ সে, নির্ঝিবাদে তেল মাখিল এবং বাপের গাম্‌ছা-খানা হাতে করিয়া তাঁর পিছন-পিছন ঘাটে আসিল। স্নানার্থিগণের উঠানামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি ধমুকিয়া দাঁড়াইল, তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়কর নিঃশব্দ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে। ছলছল তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতবড় একটা প্রতিবেশ, অথচ তা'র শব্দ নাই, আকার নাই, ভালো! করিয়া যেন সে চোখে পড়ে না ; যেন গলাধরের সমস্ত ছুঃশাসিত নির্ধম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।.....এমন নিদারুণ অকরণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তা'র চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার ছুনির্ভীক্য অভল গর্ভে কত হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে। রতি শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কিতদৃষ্টিতে রতি সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধও কোথাও নাই।.....ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর ছুটি গ্রামের বন-প্রান্তের মধ্য দিয়া বহিরা বহুদূরে গিয়া দিক-প্রান্তে মিশিয়াছে, সন্ধিস্থলটা ধূসর ধূস্র একটা দীর্ঘ রেখার মতন। প্রসারিত বালুরাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্র-তাকে সবুজ বৃষ্টিতে সাজাইয়া স্থানে-স্থানে তৃণগুচ্ছ জন্মিয়াছে।.....নদীর ছুই তীর নির্জন জনশূন্য। রতি ভাবিতে লাগিল।

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া রতিকে ছুইহাতে জড়াইয়া ধরিল,—ওটা কি ?

পাঁচুর ভয়ের কারণটাও রতি দেখিয়াছিল, একটি জল-চর জানোয়ার ছপ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ভিগ্ন বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিল,—শুণক মাছ তাড়া করেছে।

পাঁচু বলিল, কেন বাবা ?

—ধাবে বলে। ওরা বড়-বড় কই-কাংলা মেরে মেরে খায়।

শুভকগণ বড়-বড় কই-কাংলা মারিয়া খায় উনিয়া পাঁচু-গোপালের বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। জলের ভিতর ত অঙ্ককার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায়।

এদিকে হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল, কামদায় কুমীর ভাসিতে এ গ্রামের কদাচ কেহ দেখে নাই, এমন-কি কোনো দিন জনশ্রুতিও আসিয়া এগ্রামের কানে পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের ?

ঝপ করিয়া গভীর জলে পড়িতে না হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজল পর্যন্ত নামিল, ছেলেকেও টানিয়া লইল; তাহাকে হাঁটুর সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া তাহার গা মাঝিয়া দিল; ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইল; তা'র পর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

রতি আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—পাঁচু কই রে ?

• রান্নাঘরের ভিতর থেকে ভারি-গলায় পাঁচু বলিল,—খাচ্ছি, বাবা।

—কেমন কুমীরে নেয়নি ত ?

পাঁচুও মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—না।

নারাণী বলিল,—ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

(২)

বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া নারাণী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুর সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিছাষেগে অদৃশ হইয়া গেল। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে ব্যাপারের ভয়াবশেষ নারাণীর চোখে পড়িল, তাহাতে সে গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেল। অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ব্যাপার এই—নারাণী যখন ঘুমাইতেছিল, তখন পাঁচু ও তাঁর সঙ্গীরা ঘরে-রাখা ছোটো একটি পাকা কাঁটাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া

খাইয়াছে, কিন্তু খাইবার পদ্ধতি না জানা থাকায় ছেলে কাঁটালের গাঢ় রসে সর্বদেহ আপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার উপর আনন্দের আবেগে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছে, সুতরাং ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মরস্ক, অলিয়া উঠিবারই কথা।

পাঁচু মার খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তা'র আর্ন্ত চীৎকারে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—যেমন ছেলের গলা, তেমনি তা'র—হয়েছে কি ?

—হয়েছে আমার শ্রদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁটাল খাওয়া হয়েছে; ছেলের বিদ্যে কত। বলিয়া নারাণী এমনি-ভাবে রতির দিকে চাহিল যেন চুরি করিয়া কাঁটাল খাওয়াটা পুরুষ-স্রাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—খামো, আর চেষ্টা না। আমি ধুয়ে আনছি। বলিয়া সে উঠানে নামিল।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিল; সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিল।

রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগুড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিল। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু বলিল,—বাবা, আমার ঘট ?

উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু ব্যস্ত হইয়া বলিল,—নিয়ে আসি বাবা ?

রতি বলিল,—থ'।

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া পাড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুইটি স্ববহুং চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই সেন্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার বিছাৎ-বেগে ঘুরিয়া গেল, এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলের তলে অদৃশ হইয়া গেল। মুদ্রিতচক্ষু ভয়ানক রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটি কাটিতে বেশী সময় লাগিল না; পরক্ষণেই তাহার মুহুমূহ তীব্র আর্ন্তনাদে দেখিতে-দেখিতে নদী-তীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ওপারের কাছাকাছি পুনর্বার পাচুকে দেখা সূর্যের শেষ রক্তরাশি অলিতে লাগিল। সূর্যকে ডাক
গেল, তখন সে কুস্তীরের মুখে, নিশ্চল। জনতা হাঙ্গ- দেখাইয়া লইয়া কুস্তীর অদৃশ হইয়া গেল—কেবল নারায়ণী
হাঙ্গ করিয়া উঠিল। তাহার মৃত্যুপাতুর মুখের উপর সে দৃশ দেখিল না ; সে তখন মূর্ছিত।

টাটা লৌহ-কারখানার কাঁচা উপাদান

শ্রী কালীপদ ঘোষ

লৌহা প্রস্তুত করবার প্রধান উপাদান হচ্ছে লৌহার পাথর (iron ore) এবং সেই পাথর থেকে লৌহার অংশ বা'র করবার জন্য আরও কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন। লৌহার পাথরকে উত্তাপে গলিয়ে তা'র সঙ্গে আরও হুএকটা জিনিষ মিশিয়ে তা'র ভেজালটুকু বার ক'রে নেওয়া হয়।

লৌহার পাথরের সঙ্গে নানা-রকম জিনিষ মিশ্রিত থাকে যথা—এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফস্ফরাস, টিটানিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি। আবার লৌহার অংশটুকুও খাঁটি লৌহা থাকে না, উদজান (oxygen) বাষ্পের সঙ্গে মিশে অন্য আকারে বহুরূপী-ভাবে থাকে (যথা— FeO_2 , FeO_3 , $Fe_3 O_4$) এই রূপান্তরিত আকারকে খাঁটিরূপে আনতে এবং ভেজালগুলি দূর করতে ডলোমাইট (Dolomite), চূণের পাথর (Lime Stone), ম্যাঙ্গানিজের পাথর ও পাথুরিয়া কয়লার প্রয়োজন হয়।

এইসকল জিনিষ কি'নে একটা বিরাট কারখানা চালানো বড় ছরুহ ব্যাপার, তাই কোম্পানী এই সকল জিনিষের খনি আবিষ্কার ক'রে কাজ চালাচ্ছে।

লৌহার পাথর :-লৌহার পাথর ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে, কিন্তু সকলগুলির কাছে কয়লার খনি না থাকায় সেগুলিকে আধুনিক-ভাবে লৌহা প্রস্তুতের কাজে লাগাতে পারা যাচ্ছে না। পুরাতন দেশী-ভাবে লৌহা প্রস্তুত ভারতের প্রায় সর্বত্রই হ'ত, কিন্তু আধুনিকভাবে 'পিপ্'লৌহা ১৮৭৫ সালে

প্রথমে কলুটিতে হয়। এবং ১৯১১ সাল থেকে টাটা কোম্পানী আরম্ভ করে।

লৌহার পাথরের খনি টাটা কোম্পানীর অনেক স্থানে আছে। কিন্তু এখন ময়ূরভঞ্জের মধ্যে গরু-মহিষাণীই প্রধান। এই ময়ূরভঞ্জের মধ্যে আরও দুইটি খনি আছে—বাদাম পাহাড় এবং সুলেপাই। সিংভূম জেলায় একটি প্রকাণ্ড লৌহার খনি টাটা নিয়েছে, তা'র নাম হচ্ছে জামদা। ময়ূরভঞ্জের তিনটি খনিতেই কাজ চলছে, আর জামদায় কাজ আরম্ভ হবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়া কেঁওঝোরে কাটায়াটি, জোডা (Joda), খোন্দোবন্দ নামে আরও তিনটি খনির কাজ শীঘ্র আরম্ভ হবে।

মধ্যপ্রদেশে বুলিরাজারা, চান্দা প্রভৃতি স্থানেও খুব ভালো লৌহার পাথর টাটার অধিকারে আছে, কিন্তু সে-সকল জায়গা থেকে পাথর আনতে অনেক খরচ পড়ে ব'লে সেখানকার কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই খনির পাথরেই প্রথম লৌহার চুল্লীতে আগুন দেওয়া হয়। গরু-মহিষাণীর খনি কাছে থাকার জন্য মধ্য-প্রদেশের খনি বন্ধ ক'রে গরু-মহিষাণীরই কাজ চলছে।

এইসব খনির পাথরে সব জায়গায় সমান লৌহার ভাগ থাকে না। এখন চলুতি খনির মধ্যে সুলেপাই খুব ভালো, তা'র নীচের গরু-মহিষাণী, বাদাম পাহাড়ের পাথর হলুদ রংএর হাফা এবং তা'তে লৌহার ভাগ কম গরু-মহিষাণী ও সুলেপাইয়ের পাথরের রং উজ্জল কা

(specular) দেখলে খাঁটি লোহার মতন বোধ হয় এবং অত্যন্ত ভারি।

জামনা, জোড়া প্রভৃতি স্থানেরও পাথর খুব ভালো এবং এগুলিও কারখানার কাছে।

লোহার পাথরের রং তিন-প্রকার—উজ্জল কালো, ঘোর লাল এবং হলুদ। উজ্জল কাল রং-এর যে সেই-গুলিই সব চাইতে ভালো এবং তা'তে এমন-কি ৭০ থেকে শতকরা ৭২ ভাগ পর্য্যন্ত লোহা পাওয়া যেতে পারে। এর নীচেই হচ্ছে লাল রং-এর পাথর এবং সালের নীচের হচ্ছে হলুদ রং-এর। এই হলুদ রং-এর পাথর চেনা অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার, কারণ তা'তে শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত লোহা থাকতে পারে। লাল রং-এর পাথর হ'লেই বুঝতে হবে যে তা'তে কিছু লোহার ভাগ আছে।

কয়লা—লোহার কারখানায় পাথুরে কয়লার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই কারণে সকল সময়ে বাতে কয়লা পাওয়া যায় তা'র বন্দোবস্ত রাখা উচিত। টাটা কোম্পানীর নিজের প্রায় তেরটি কয়লার খনি আছে এবং সেগুলি ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনির (coal fields) এলাকায়। গ্যাস কয়লা এবং বাষ্পের জন্ত কয়লা (steam coal) খুব ভাল-প্রকারের হওয়া আবশ্যিক।

গ্যাসের কয়লার (gas coal) জন্ত কয়লাতে বাষ্পীয় অংশ (volatile matter) খুব বেশী থাকা প্রয়োজন, এবং steam কয়লার জন্য তাপ উৎপাদক শক্তি (calorific value) বেশী থাকা আবশ্যিক। আবার কয়লার মধ্যে গন্ধক এবং ফস্ফরাসের ভাগ বেশী থাকিলে তাহা গ্যাস বা স্টীমের জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নয়; কারণ তা'তে বয়লার (boiler) ধারণ হ'য়ে যায়। বয়লারে (boiler) কাঁচা কয়লা দেওয়া হয়, কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নেস (blast furnace) এর জন্য কোক (coke) কয়লার প্রয়োজন, সেইজন্যে কোম্পানীর আলাদা চুল্লী (oven) আছে।

আবার ব্লাস্ট ফার্নেস ইম্পাত তৈরীর চুল্লী প্রভৃতির জন্ত গ্যাসের আগুন প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ-ভাবে এইসব চুল্লীর উত্তাপ দু'হাজার তিনহাজার ডিগ্রীতে তোলা সম্ভব নয়। আবার এই কয়লাকে কোক কয়লা কব্বার সময় যে গ্যাস বেরোয় তা থেকে, আলকাতারা, অ্যামনসালফেট, বেনজল প্রভৃতি চোয়ানো হয়। কয়লার রং ঘোর কালো, আবার যেগুলো কাল ও চক্চকে সেইগুলোই খুব ভালো কয়লা। কিন্তু কয়লার খাদানে কয়লারই মতন এক-রকম পাথর বেরোয় তা'কে বলে শেল (shale)। সেগুলো খুব নিকট জিনিষ। কয়লার মতন দেখতে, কিন্তু কোনো কাজের নয়, রংটা তা'র মেটে-মেটে কালো।

ডলোমাইট এবং চূণের পাথর (lime-stone)

যদি কয়লা দ্বারা লোহার পাথর থেকে তা'র ময়লা দূর করা যায় না, সেই কারণে লোহার পাথরের সঙ্গে ডলোমাইট এবং চূণের পাথর ব্যবহার করা হয়।

চূণের পাথর এবং ডলোমাইট প্রায় এক-জাতীয় পদার্থ। হ'এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে চূণের ভাগ বেশী এবং অপরটিতে চূণের ভাগ কম। এ পাথরগুলি দেখতে ধূসর-বর্ণের কতকটা। এ পাথর প্রায়ই সমতল-ভূমি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আবার পাহাড়েও আছে।

এই কোম্পানির ডলোমাইট পাওয়া যায় আমঘাট, কলুঙ্গা, পানপোস্ গোমার্ড এবং খোটকুরিবাহালে, এবং চূণের পাথর পাওয়া যায় বারছয়ার হ'তে। উপরোক্ত জায়গার খনিগুলি সবই গাংপুর করদরাজ্যে এবং চূণের পাথরের খনিটি শাক্টি করদরাজ্যে। এবং সবগুলিই বি, এন, রেলের লাইনের ধারে। অবশ্য এখানকার চূণের পাথর খুব ভালো নয়। অদ্রব অংশের (insoluble residue) পরিমাণ বেশী এবং চূণের অংশ কম। আবার কখনও-কখনও কোম্পানি কাটনী থেকে চূণের পাথর কি'নে আনে। সেখানকার পাথর অবশ্য বারছয়ারের পাথরের চেয়ে ভালো। এই পাথরে সাধারণতঃ অদ্রব অংশ, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম, চূণ এবং ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য পদার্থ সামান্য-পরিমাণে থাকে। জুকেহিতে কোম্পানির নিজের খনি আছে, সেখানকার চূণের পাথর ভালো।

ম্যাংগানিজ :—ম্যাংগানিজ অবশ্য খুব কম-পরিমাণেই আবশ্যিক হয়। এ পাথর কতকটা লোহার পাথরের মত, লালচে কাল রং-এর, কিন্তু লোহার মতন উজ্জল নয় (dark brown)। এই পাথরে বালির (silica) লোহা এবং ম্যাংগানিজ থাকে, কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ধাতুও সামান্য-পরিমাণে থাকতে পারে। অবশ্য তাদের পরিমাণ এত কম যে সেগুলিকে পরিত্যাগ করাই চলে। ইহা দানার আকার, এক সঙ্গে জড়িত

ইহা পিণ্ড লোহা (pig iron) প্রস্তুতের সময় সামান্য-পরিমাণে দেওয়া হয়। ইহা লোহার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে ফেরো ম্যাংগানিজ (ferromanganese) প্রস্তুত হয়।

কোম্পানির এই ম্যাংগানিজ এর খনি হ'চ্ছে মধ্য প্রদেশের, রামরালা, কাটানগিরি, বলাগিরি, প্রভৃতি স্থানে, ও নেত্রায় সরকারী অরণ্যে।

ম্যাগনেসাইট :—ইহাও একপ্রকার পাথর, কিন্তু ইহার ভিতরে অনেক শিরা আছে। ইহার রং কটা (brown) কিম্বা সাদা। কতকটা ডলোমাইটের মতন। ইহা লোহা প্রস্তুতের জন্ত লাগে না, কিন্তু ইম্পাত প্রস্তুতের চুল্লীর (Hearth) জন্ত লাগে। ভিতরে ইহার ইট দিয়া একটি স্তর গেঁথে দেওয়া হয়। কারণ এই ইট অনেক

উদ্ভাপ সম্ভব করিতে পারে। এই কোম্পানির ম্যাগনে-
সাইটএর খনি হচ্ছে মহীশূর রাজ্যে। কারখানা থেকে
১৩০০ মাইলেরও উপর দূরে।

এছাড়া অন্যান্য যে-সব জিনিষের প্রয়োজন অতি
অল্প সেসব প্রায় কি'নে আনা হয়। যেমন সিলিকা ব্রিক,

ফায়ার ব্রিক, ক্রোমাইট (Chromite) গন্ধক, সোবা,
সিমেন্ট, ইত্যাদি।

কয়লার খনি-সংক্রান্ত বিশেষ ক'রে টাটা লোহ
কারখানায় ব্যবহৃত লোহার উপাদানগুলির বিশ্লেষণ
ইত্যাদি নিম্নলিখিত তালিকাগুলিতে দেখানো হ'ল।

লোহ-প্রস্তুত

স্থান	ভূমির পরিমাণ	পাথরের পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ লৌহাংশ, ফস্ফরাস, অক্সিজেন	দাম † টাটানগর পৰ্য্যন্ত	টাটানগর হইতে দূরত্ব মাইল
ময়ূরভঞ্জ					
গুরুমহিষাণী	৫.১ বর্গমা	২৫ লক্ষ		টাকা ৩-৩-৬	৪০
বাদাম পাহাড়	৩.৬ ”	২০ ”	৬১.২০ .১৩৩ — ২.৬১	” ৩-২-৬	৫৬
হুলাইপাট	২.২ ”	২৫ ”	৬৬.৪০ .০৩৬ — ২.৮১	” ৩-১০-০	৪৭
পূর্ণাপাণি	.৫ ”	৫১০০০ টন			
সিংভূম					
জামদারক ১	৩.২ ”	৮০০ ”	৬২.৬৬ .০৮২ .০৩০ ৩.৫২	} এগুলির কার্য এখনও আরম্ভ হয়নি।	৮১
” ” ২-৬	.৫১ ”	১০০ ”			২৮
শাশাংদা ” ৭	৪.১৫ ”	১.৫০০ ”	৬৩.৩৭ .০৫৮ .০১৫ ১.১২		
কৈওবোর					
কাটামাটি ব্লক ২	১.৫৮ ”	৪০ ”	৬৩.০৪ .০৫ .০২৮ ৩.১৫	১০০ হইতে ১২০	
পশ্চিম জোড়া ” ১০	৪.১৮ ”	৪০ ”			
পূর্ব জোড়া ” ১১	২.৪৪ ”	৪৬০ ”			
খোন্দোবন্দ ” ১৩	৩.৫০ ”	২৭০ ”			
বাস্তার	৬.৮৬৭ ”	২৬১০ ”	৬৬.০০ .০৭৮ .০২২ ১.৫৫	৭-৮-০	৫০৪
মধ্যপ্রদেশ					
ধুলিরাঝারা	৮.৭ ”	৭৫ ”	৬৭.৪৫ .০৬১ .০৮০ ১.০৮		৪০০
চান্দা	৩০৪.১৭ একর		৬২.৫০ .০১২ .৩০ .৩২	১৩-৫-০	৫৬৬
* একুনে	৪৪.৭৭৭ বর্গমাইল	৫৫৫০.৫ লক্ষ টন			

এখানে বাস্তার ও মধ্যপ্রদেশের খনি বন্ধ দেওয়া হ'ল কারণ সেগুলির কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দাম টাটানগর পর্য্যন্ত অর্ধ, খনি থেকে তুলবার খরচ রেলগি, ও গাড়ি-ভাড়া টাটানগর পর্য্যন্ত নিয়ে।

লৌহ-প্রস্তুত বিশ্লেষণ

সাল	অক্সিজেন অংশ	লৌহাংশ	ম্যাংগানিজ	করফরাস
১৯১৮	৩.৯৯	৬০.৫১	.৬৯	.১১৫
১৯১৯	৪.৯৬	৬০.২৯	.৭৪	.০৭২
১৯২০	৫.৫১	৫৯.৫১	.৬৮	.০৮১
১৯২১	—	—	—	—
১৯২২	৪.৭৮ (Si O ₂)	৫৯.০৬	.৪৯	.৬৬
১৯২৩	৪.১৫ ,,	৫৯.৮০	.৫১	.০৬৭
১৯২৪	৪.০৩ ,,	৬০.১১	.৫৬	.০৬৬

ডলোমাইট এবং চূণের প্রস্তুত

স্থান	পরিমাণ একর	পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ অক্সিজেন, চূণাকার, ম্যাগ্নেসিয়াম CaCO ₃ (MgCO ₃)	দাম টাকানগরে	টাটানগর থেকে দূরত্ব
জুকেহি					
বিস্তারা	৭০.৯৯	} ২০ লক্ষ	৩.১৪, ২১.৫৫, ৩.৭৪	টাকা ২-৮-০	৫০০
কাঁচ গাঁও	১৮.৭৫				
গাংপুর করদরাজ্য					
পশ্চিম কে	২২৫	ডলোমাইট	২.৫০, ৩০.০০, ২০.০০	৫ ৩-৩	১২১ হইতে ১৩৪ মাইল
,, এল	৪০	৮৬০ লক্ষ			
,, এম	৬৫				
,, এন	৫০	চূণের পাথর	৭.৫০ ৪৭.৮৯ ৪.০৮	৩-১০-০	
,, ও	২৬০	১৬০ লক্ষ			
,, পি	৫০				
,, ভেড	২৫				
গোমার ডি	} ৪৭৫	৪৫০ লক্ষ	৪.৭৪, ৩০.৫২, ১৮.৮৮	৬	১২৯ ,,
খোঁটকুড়ি বাহাল		২০০ লক্ষ	৩.৩০, ৩০.৫৩, ২০.০০		১৩৪ ,,
শাক্তি করদরাজ্য					
ডেরাগড়	} ১৬৮.৭৭	১৩ লক্ষ	৫.২৮, ৪০.৩৩, ৩.২৬	৬-১১-৬	২৪৯ ,,
বেলাডি					
বিলাসপুর					
ডুমার পাড়া	} ২৮.২০	৪.৬ লক্ষ	৫.৬০, ৪৫.৩১, ৬.৪২	৬-১১-৬	২৪৯ ,,
রাইপুর					
অরণ্যাংশ					
জোড়াপুকুর	১৫০	২.২ লক্ষ	২.২৯, ৫০.৫৮ ০.৩৩		৪৯

ডলোমাইটের বিশ্লেষণ

সাল	অক্সিজেন অংশ	লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম Al ₂ O ₃ & Fe ₂ O ₃	চূণ CaO	ম্যাগনেশিয়া MgO.
১৯১৮	৩.৩৭	.৯২	২২.৪৮	২০.৮৪
১৯১৯	২.৮৪	.৮৪	২২.৬৯	২০.৬৭
১৯২০	৩.৫০	.৯০	২২.৭১	২০.২৯
১৯২১	—	—	—	—
১৯২২	৩.৬১	১.৪৪	২২.৬৮	২০.০২
১৯২৩	৩.৬৬	১.১৭	২২.৫৭	২০.৪৫
১৯২৪	৩.৭৫	১.১২	২২.৮১	২০.৪০

চূণের প্রস্তর

১৯১৮	৪.২৫	১.১১	৫০.৭৬	১.৮৯
১৯১৯	৩.০৫	.৯৬	৫১.৮৮	১.৬১
১৯২০	৩.৫৮	১.১৭	৫১.৫৫	১.৭২
১৯২১	৪.২০	১.২০	৫১.০২	১.৫৬
১৯২২	—	—	—	—
১৯২৩	৩.৯৪	১.১২	৫১.২৩	১.০৮
১৯২৪	৫.৮৪	১.৩৭	৪৭.৬৬	৪.১৭

পাথুরিয়া কয়লা

স্থান	ভূমির পরিমাণ		টন পরিমাণ		দাম টাটা-নগরে প্রত্যেক টনে	টাটা-নগর থেকে দূরত্ব
	বিঘা	প্রমাণিত	আন্দাজী			
জামাডোবা	} ১১৬২-০-০ ১০-৪-১৪ ৭৬-৫-৬ ৪৭৫০-০-০	১২৯০ লক্ষ	জামাডোবা	৪৮৬০ লক্ষ	টাটা—৫-১০-০	১১৭
সিরগুজা						
ভাতগোড়িয়া						
জোড়া পুকুর						
ডোংরি	} ২৪৩৭-১৫-০ ২০৯৮-১৮-৪ ২৬৩-০-০	১৫ লক্ষ	৪৮৫ লক্ষ	৫-৫-০	১১৭	
পাতিয়া						
ভেলাটাণ্ড						
মালকেরা	১৭৩২-২-৮	৪০ লক্ষ	১১১৭ লক্ষ		১১৭	
চৈটোডি	৫০৫-২-৮				১১৭	
সিজুয়া	২৬০০-০-০	২৪৫ লক্ষ	১৫১১ লক্ষ		১১৭	
গুণসাদি	৫৩২-০-০					
পুরুষোত্তমপুর	৩০৩৩ ০-০	৭০০ লক্ষ	৪০৭ লক্ষ		১৪৬	
অভিরামপুর	২৩৭১-০-০	২০০ লক্ষ	২০০ লক্ষ		৩৩২	
কারিয়া	১৩ বর্গ মাইল	—	৫০০ লক্ষ	ইহার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি।		

কোকসন-বিশ্লেষণ

সাল	জল	ছাই	ফিক্সড্ কার্বন্		গন্ধক	ফস্ফরাস্
			ভোলাটাইল অংশ (Fixed Carbon)	অজার		
১৯১৮	৪.০৫	২১.০৬	১.৯৯	৭৬.৯১	.৬৫	.১৯১
১৯১৯	৫.১৭	২০.৪৬	২.১৩	৭৭.৪০	.৬৩	.১৬২
১৯২০	৪.৫১	১২.১১	১.৮৪	৭৬.০৪	.৫৭	.১৬৪
১৯২১	—	—	—	—	—	—
১৯২২	৩.২১	২৩.৭৯	২.৬৫	৭৩.৫১	.৫৬	.২০০
১৯২৩	৫.৩২	২৪.৩১	২.৩০	৭২.৪৪	.৫৬	.১৭৫

ম্যাংগানিজ

স্থান	ভূমির পরিমাণ একর	পাথরের পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ		টাটানগরে দাম প্রতি টনে	টাটানগর থেকে দূরত্ব মাইল
			বালি (SiO ₂) ম্যাংগানিজ (Mn)	লৌহাংশ (Fe) ফস্ফরাস্ (P)		
মধ্যপ্রদেশ						
রামরামা ১ } কাটান্ গিরি ১ }	২১২.৪৫	২১৫, ০০০	৪.২১, ৫.৫, ৫১.৯৬, .০৩৫		টাকা, ১৪-৪-০	৪৯৩
রামরামা ২	৪৭.৬২					
কাটান্ গিরি II } ওবালা গিরি I }	৬৭৭.৯৫					
কাচওয়া	১৪৮.৮৩					
নেজা সরকারী জমল	৬০০.০০					

ক্রোমাইট ও ম্যাগনেসাইট ।

মহাপুররাজ্য	বালি SiO ₂	ম্যাংগানিজ Al ₂ O ₃	CaO	MgO	ম্যাগনেশিয়া	
					বালি অ্যালুমিনা চূর্ণ	টাকা
ছধকানাইয়া	১৪৭.৫০	১০০০, ০০০	১.৮২, .৯৬, ২.৩৭, ৪৪.৭৪	}	টাকা ৩০.০	১৫.২৯
ছধকাটুর	৪৯.২৫	১০০, ০০০				
সোলাপুর	১৫৩.১৫	১৫০, ০০০				

কাঁচা উপাদান
খনি থেকে চালান দেবার পরিমাণ

	লৌহপ্রস্তুত টন	ভলোমাইট টন	চূনের পাথর টন	ম্যাগনেসাইট
১২১৮ টাটানগরে দাম	৩৩৮২৩৬ ১-৭-৪	৩৪২৪৪ ১২৩৬৩৬ ৬-১০-৪৩৪-২-১০	২২১৬৭ ৭-৫-১	১৪৪১
১২১৯ টাটানগরে দাম	৪২২৮৭৩ ২-০-৪	১২৩৮৬৩ ৪-৮-২	১২৮২৫ ৬-৭-০	২২৬৩ ২২-৬-৬
১২২০ টাটানগরে দাম	৪০৩৪৫০ ২-১০-৬	১৫৩৫৫১ ৫-৫-১০	২৩২২৪ ৭-৪-০	১৮৮০ ৪৬-০-৬
১২২১ টাটানগরে দাম	৪৩৮৮০৮ ২-১২-০	১৮২৭২০ ৫-৫-২	৩৬১৬৭ ৬-১৩-১	২৬০১ ৪৫-১১-৮

কাঁচা উপাদান

ধাতু	পরিমিত টন (Estimated Reserve)	প্রতিমাসে আবশ্যিক	বৎসরের ব্যয় টন
লৌহ প্রস্তুত	৩৩৮০ লক্ষ	৮৩৩০	১০০০০০০
কোক কব্বার কয়লা	৪১০০ "	১০১৭০০	১২২০০০০
কোক	—	৭২১৮০	৮৭৫৪০০
প্যাসের কয়লা	২০৮ "	১৩৫২৫	১৬২৩০০
স্টীম কয়লা	৩৮৭০ "	২১১৭৬	২৫৪১০০
ভলোমাইট্	১১৪০ "	৩৭১০০	৪৪৫০০০
চূনের পাথর	৩৮ "	৪৩৭৫	৫২৫০০
ম্যাগনেসাইট্	১৫ "	৪০০	৪৮০০
ম্যাংগানিজ্ পাথর	২ "	২২৩০	৩৫১৪০
চীনা মাটি (koelin)	—	২০	২৪০
ফ্লুওস্পার	—	১৪৫	১৭৪০
ক্রোমাইট্	—	১৭০	২০০০
কায়াব ক্রে	—	৩৬০	৪৩২০

বর্তমানে টাটার কারখানায় ৫টা লোহার তৈরীর চুল্লী (Blast Furnace) চলছে, তা থেকে pig iron আন্দাজী বছরে ৬,১০,২০০ টন বা'র হ'তে পারে এবং সাতটি পুরাণো ইম্পাত-তৈরীর চুল্লী ও নতুন নতুন Duplex চুল্লীতে বছরে আন্দাজী ৫০০০০০ টন ইম্পাত তৈরী হ'তে পারে। তবে অবশ্য কার্যাত (practically) সাধারণত কিছু কম হওয়া সম্ভব।

এখন লোহা তৈরীর চুল্লীতে কি-কি জিনিস কোন্-পরিমাণে দেওয়া হয় এবং কি-পরিমাণে লোহা (pig iron) তৈরী হয়, তা'র একটি তালিকা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে, চুল্লীতে নিক্ষেপ্ত উপাদান।

উপাদান	'A' চুল্লী	'B' চুল্লী	'F' চুল্লী	'D' চুল্লী
	টন	টন	টন	টন
খণ্ডলোহা (Scrap)	৬৭২.৭	১২৩	৮৪৭.২	১২০.২
Scale	—	—	৪২৫.২	—
লোহার পাথর	১২৭৫৪.২	১৩৬৪২	১২১৪৪.৪	২০৭৩৩.৩
মাংগানিজ্	১৩৭.১	৩২	১১৮.৮	৪৫২.৪
কোক্	১০৬০৬.৭	৩০৩৫	১০৬১৪.২	১৬২৫২.৮
চূণের পাথর	৩৬৭৩.৫	১০.৫১	৩৬২৩.২	—
ডলোমাইট	—	—	—	১০২৮৫.
উৎপন্ন পিঙ-লৌহ (Pig Iron)	৭৮২৮	৮৫২৫	৭৭৫৩	১৩০৩৫.
দৈনিক পরিমাণ	২৫২ টন	২৭৫ টন	২৫০ টন	৪২০.৫ টি

কাঁচা উপাদান মিশাবার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। লোহার পাথরের ভেজালের অংশের পরিমাণ-মত, এবং ঘে-রকম লোহা তৈরী করতে হবে, সেই অনুযায়ী অন্যান্য উপাদান মেশানো হয়।

চিত্তবাসন্তী

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

হে স্মরণী মর্মবাধা! কতদিন পরে,
উষা-রজনীর স্নিগ্ধ তারকার মত
জ্যোতিঃস্নাত্ত বসন্তের পথে এলে দেবী,
ছন্দোহীন স্মরণী অড়কণ্ঠে মোর ;
স্বপ্নের তপ্ত-তালে না লভিয়া সাড়া
শিরা-মাকে নাচিয়া উঠিলে ; কত রাগ-

রাগিনীর মৌন ব্যথা, গুমরিয়া কাঁদি,
বুকে মোর আগাইল বেদনাহিমোল,
সে কি দেবী তোমার চঞ্চল পদক্ষেপ ?
জীবনবীণীর কোন্ স্মরণ ছিন্ন-পথে
ছন্দোবদ্ধ গীতিকার তানে লয়ে মিশি'
কত উজ্জ্বলিয়া উঠে আকুল ক্রন্দন

কত্ হর্ষে ছেপে ওঠে সমগ্র পরাণ ।
 দূর অতীতের স্মৃতি কত আসে মনে
 ধর শ্রোতে ভাসমান শৈবালের মত ;
 বালির চরের প্রায় কত দুঃখ সুখ,
 কত বেদনার ক্ষত, কত হাসিমুখ,
 জন্মজন্মান্তর হ'তে যত ভালোবাসা
 তুলে গেছি, মনে আছে আরো যতখানি
 সব যেন ভেসে উঠে, চকিতে মিলায়
 আবার ভাসিয়া উঠে হৃদিসিন্ধু-মাঝে ।
 স্বপ্নধ্বনি-সম এই দূরাগত তান
 কানের অন্তরে এই সঙ্গীত বন্ধার,
 নিবিড় এ সুরের নিকণ, একি তব
 নূপুর-শুভ্রন-দেবী ? সুখদুঃখ সে কি
 আঁবন-বীণায় তব সুরের আলাপ ?
 উড়ায়ে আঁচলখানি দিলে গো পরশ
 যদি আজি দক্ষিণের ঝরি-ঝরি বায়ে
 আকুলিত-মুকুলিত পল্লব-মর্দরে
 কহ দেবী, কোথা ছিলে লুকাইয়া তুমি,
 এতকাল স্বপ্নহীন গাঢ় স্থপ্তিসম
 হৃদিশতদল-বৃক্ষে গোপনে গড়িয়া
 চিরন্তন আনন্দের মধুচক্রখানি,
 রস তা'র বিন্দু-বিন্দু সিক্কি' প্রাণে মোর
 অকস্মাৎ একদিন করিলে মাতাল ।
 উন্নত যৌবন মম মস্ত হস্তী-সম
 প্রবেশিল রক্ষীহীন তপোবন-মাঝে
 বিধ্বংসিল তরুলতা । নিষ্কম্প-নিবাত
 দীপশিখা-সম অন্তরের যোগাসনে
 ধ্যানমগ্ন ভোলা-মহেশ্বর, যেন আজ
 কিসের পরশ পেয়ে কাঁপিয়া উঠিল ।
 নহ তুমি বাহিরের ঋতুসম্মী শুধু
 রসালের চাকগন্ধ নূতন মুকুলে
 পেয়েছি তোমার গন্ধ, অশোককলিকা

রাগ-দীপ-শিখা জালি তোমারে দেখাশ ;
 ভ্রমর-শুভ্রনে শুনি তোমার সঙ্গীত
 তোমারে ধরিতে চাই, মায়া-যুগ-সম
 রূপ তব রূপান্তরে খেলিয়া ভূলায় ।
 চক্ষুর্কর্ণনাসা মোর বাহিরে-বাহিরে ।
 যত ধায় খুঁজিতে তোমায় রূপমাঝে,
 ক্লান্ত শ্রান্ত ব্যর্থ হ'য়ে কি'রে-কি'রে আসে ।
 কিন্তু ঐ রূপ তব শব্দ গন্ধ গান
 নহে মায়া নহে মরীচিকা ; স্পর্শে তব
 আনন্দে অমৃতে বিশ্ব পূর্ণ হয় মোর ।
 নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়-পথে যদি পেতে হবে
 তোমায় অতনু দেবী, তবে ওঠপুটে
 কেন মোর প্রিয়া করে সুধার সিক্কন,
 যুগী কেন যুগ মুখে চক্ষুটি ব্লায়,
 জ্যোৎস্না কেন সুধা-স্নাত করে বহুছরা,
 নদী কেন আপনারে নিঃশেষ করিয়া
 চলে দেয় অবিরত সাগরের বুকে ?
 এ লীলার মাঝে নিত্য আমি লভি যে গো
 তোমার পরশ দেবী, সে ত মিথ্যা নয় ।
 সে নহে ছলনা । যোগাসনে যোগীন্দ্রের
 ধ্যান তুমি ভাঙো ; চিরশুণী বিরহিণী
 কে তুমি গো হৃদে বসি' তপ্তধাসে মোর
 ভোগ-ক্ষুধা জাগাও নিয়ত ? তবু ভোগে
 ভোগ নাহি যিটে ! কে তুমি গো নীলাঘরে
 ঢেকেছ শরীর ? শুধু অন্ধ-আভাটুকু
 হয় যে বাহির, মস্ত মুগ্ধ করে প্রাণ
 অন্তরে-বাহিরে ; যেন উদাসীর মত
 আছাড়ি' পরাণ মোর কাঁদে অবিরত
 সন্ধ্যালোকে নদীতীরে চক্রবাক সম ;
 দিবারাজি স্থপ্তিহীন জাগরণ মম !
 ওগো মৌন, কথা কও, কথা কও রাণী,
 অন্তরে আলিয়া দিব্যপ্রেম মজ্যোতিখানি ।



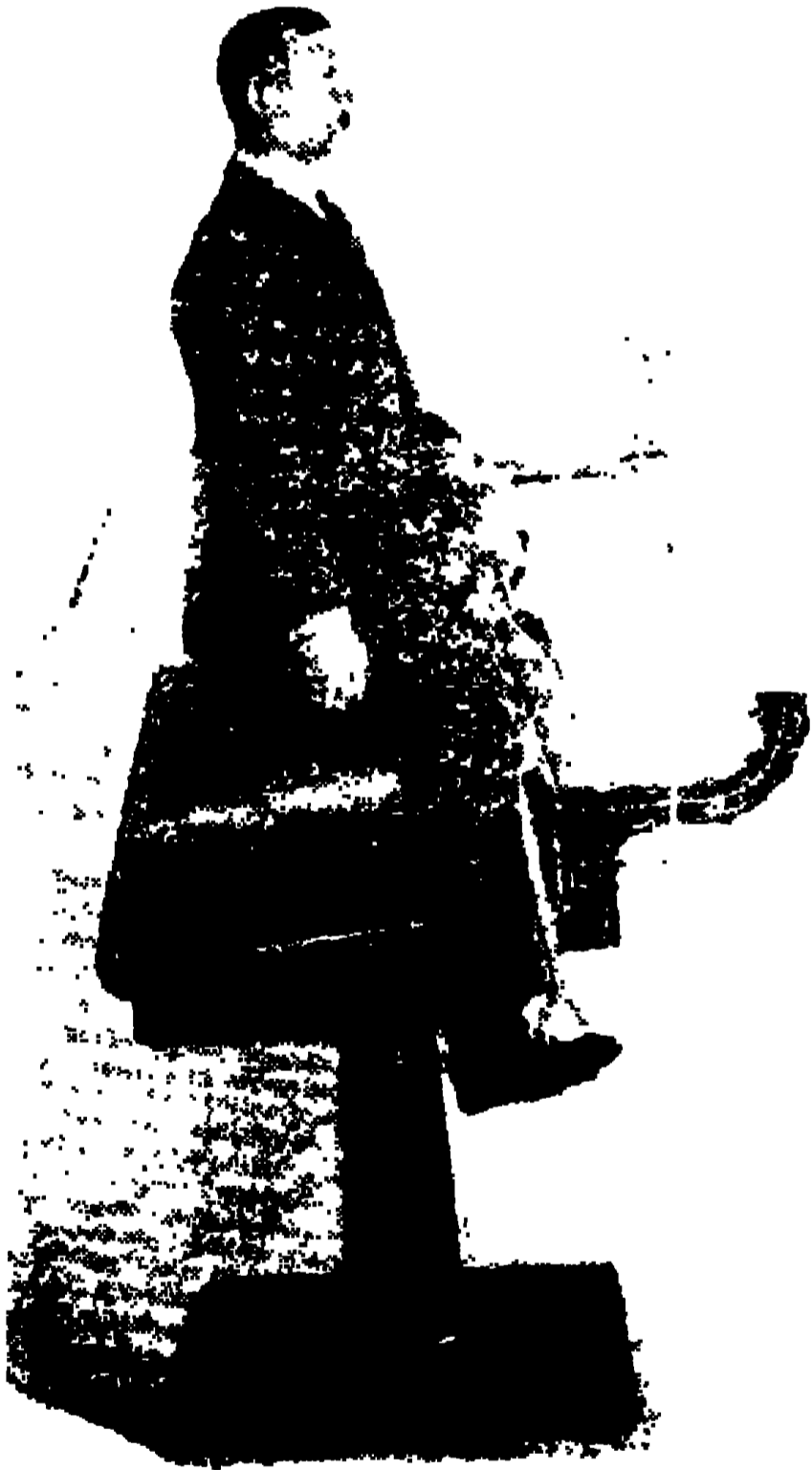
শ্রী সজনীকান্ত দাস

ঘরে বসিয়া ঘোড়ায় চড়া :—

ঘোড়ায় চড়িলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিয়মিতরূপে চালাইয়া শরীরের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। বস্তুতঃ অস্বাস্থ্যের ও সমস্তরূপ ব্যায়ামের সেরা। আমেরিকার যুক্তপ্রজ্জার প্রেসিডেন্ট ক্লিভার প্রত্যঙ্গ নিয়মিত ভাবে অস্বাস্থ্যের করিয়া শরীর পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এত জীবিত অর্থ নষ্ট ও অস্বাস্থ্যের কাগাটি ঘরে বসিয়াই সম্পাদিত হয়। ফরমায়েন দিয়া তিনি লোহা ও কাঠের একটি পোড়া নিশ্চয় করাইয়া লইয়াছেন। এত বৈজ্ঞানিক শক্তিতে চালিত হয়। পাশের জীবিত প্রেসিডেন্ট

দোষারূপশাস্তি :—

মানুষের একবার কি দুইবার পদঙ্গলন হইলেই সে মেন একেবারে সমাদ্রবহিত হইয়া পড়ে। সে মানুষ একবার কয়েক খাটিয়াছে তাহাকে লোকে ভয়ে ভয়ে দূরে রাখে। এই নিশ্চয় বাবুদের অনেক সময় তাহার মনের সমস্ত সমস্তগুলি হারাউয়া সহ্য হইতে পক্ষ প্রাপ্ত হয়। নিউইয়র্কে কয়েকজন মহাশয় বাকি কয়েক জন আশ্রমীদের শাস্তি না দিয়া নানা প্রকারে সমাজতন্ত্রের কাজ দিয়া সংপদে আশ্রমীদের



প্রেসিডেন্ট ক্লিভার ও তাঁহার ঘোড়া



এডউইন জে কলো

করিয়াছেন ও সকলকানও হইয়াছেন ; এডউইন, জে কলো ইত্যাদের মতো একজন। ইহার নিশ্চয় শত্রুরা পঁচাত্তর জন লোককে সহজে সংপদে আনা যায়।

ক্লিভার ও তাঁহার ঘোড়াটিকে দেখান হইয়াছে। এক হর্স পাওয়ারের মোটরের শক্তিতে ইহা চলে। মাথায় হুইচ টিপিলেই ঘোড়া চলিতে শুরু করে। ঘোড়ায় চড়িলে যেমন সামনে পিছনে উপরে নিচে ঝাঁকানি লাগে ইহাতেও ঠিক সেইরূপ লাগে। ইচ্ছামত বিছাড়ের শক্তি বাড়াইয়া অতি ক্ষুদ্র ঘোড়া ছোটান যায়।

আগুলফলস্বিত চুল :—

আগুলফলস্বিত চুলের কথা আমরা কাব্য-সাহিত্যেই পড়িয়া থাকি। আমাদের দেশে খুব লম্বা চুল আঙ্গকাল বড় একটা দেখা যায় না ; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ও কচিং দেখা যায়। ক্রীমতঃ নিকফুসেক 'সম্প্রতি' একটি লম্বা চুলের প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন।



আঙুলকলম্বিতচুল

তিনি ওয়াশ প্রদেশের বাকলী শহরের অধিবাসী। তাঁহার চুলের দৈর্ঘ্য ৭৮ ইঞ্চি, চুল গোলা থাকিলে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।



শ্রীমতী সেন্ৎ-টাকা-মুরা

দৌড়ে জাপানী বালিকা :—

জাপানে শ্রীমতী সেন্ৎ-টাকা-মুরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর তিনি ১৩ সেকেন্ডে ১৩৪ গজ দৌড়াইয়াছেন।

বিদেশে ভারতীয় বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য :—

পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় শিল্পকলা দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছে। এমন কি, সে দেশের অনেকের ভারতীয় প্রস্তরমূর্ত্তি-সংগ্রহের বাণ্ডিক হইয়াছে। এক এক দল বিদেশী ভ্রমণকারী আসিয়া অসম্ভব মূল্য দিয়া ভারতীয় কলাশিল্পের নিদর্শনসমূহ ক্রয় করিয়া লইয়া বাইতেছেন। বিদেশী যাত্রাবলিতে ভারতীয় এমন সব মূর্ত্তি রক্ষিত আছে যাহার নমুন আমাদের দেশেও আর নাই। বোস্টনের চার শিল্পের যাত্রাবলি (Museum of Fine Arts, Boston) ভারতের অতীত পৌরবের নিদর্শন স্বরূপ চমৎকার ভাস্কর্য্য সমূহ রক্ষিত আছে। সম্মতি সেখানে ডাক্তার ডেন-ম্যান, ডব্লিউ রস সাহেব কতকগুলি চমৎকার ভারতীয় জাভা ও শ্রামদেশীয়

এবং কাঞ্চোভীর মূর্তি উপহার দিরাছেন। তদ্ব্যতীত দুইটি বুদ্ধমূখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই মূখ দুইটির প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইল। প্রথমটি বাণু-প্রস্তর নিশ্চিত ও সম্ভবতঃ খানী বুদ্ধমূর্তির অঙ্গ। ব্যাটাভিয়ার বরবুদর স্তূপ হইতে উহা সংগৃহীত। খুব সম্ভব এই মূর্তি অষ্টম শতাব্দীতে জাভাধীপে নিশ্চিত হয়। এই বরবুদর স্তূপ প্রাচীন বৌদ্ধদিগের এক অপূর্ব কীর্তি। সম্প্রতি পাশ্চাত্যদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই স্তূপকে তন্ন তন্ন করিয়া পরামর্শ করিতেছেন ও উল্লেখযোগ্য কিছু পাইলেই সম্বন্ধে তাহা স্বদেশে চালান করিয়া নান্ন কিনিতেছেন। বরবুদর স্তূপের মধ্যের স্তূপটি ফাটল এবং সম্ভবতঃ তাহাই আসল স্তূপ। কিন্তু স্তূপনিৰ্মাণকালে এক দিক দক্ষিণে বসিয়া যাওয়ার সৈদিকে পাশাপাশি অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ



বরবুদর] বুদ্ধমূখ [জাভা, ৮ম শতাব্দী
মিঃ রস কর্তৃক সংগৃহীত



বুদ্ধমূখ | জাম, ১১ম শতাব্দী
মিঃ রস কর্তৃক সংগৃহীত

1925) নামক পুস্তকে খানীবুদ্ধ, দীপঙ্করবুদ্ধ ইত্যাদি মতক্ষে চমৎকার বর্ণনা আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর উর :-

বাইবেলের জেনেসিসের বহির একাদশ অধ্যায়ে আছে যে এব্রাহাম ও তাঁহার সন্তানগণ পিতৃভূমি 'কাল্ডীয়দের উর' পরিত্যাগ করিয়া প্রভূত পলাতনের পর কানিনজুমিতে উপস্থিত হন। উর সম্বন্ধে আর কোথায়ও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিশ্চিত বিখ্যাত উর নগরীর কথা এককাল বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস কিম্বা প্রাচীন বাবিলোনিয়ার ধর্মবাহক বেরোসাসের লিপিত উত্তরভূমিতে উরের কোনো উল্লেখ নাই। বাহুবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া কাল্ডীয়গণের নাম করা হইত কিন্তু তাহাদের নগরীর কথা এক বাইবেলের এব্রাহামের গল্পের মধ্যে ছাড়া কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই প্রাচীন নগরী নবাবিস্কৃত হয়। পারস্য উপদ্বীপের হইতে শতাধিক মাইল দূরে ইউফ্রেটাস নদীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত মরুভূমিতে আকার-প্রকারহীন বৃষ্টি-ধোত একটি আবর্জনার স্তূপ আছে বলিয়া জানা ছিল। এই স্তূপের আশেপাশে তাঁদের কলার মত অসুত লিখনাক্রিত ইষ্টক দৃষ্ট হইত। যখন এই লিখনগুলি উদ্ধার করা হইল তখন জানা গেল যে এই বৃহৎ স্তূপ ও আশে পাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্জনার চিপগুলি এব্রাহামের সন্তানগণ উর নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক লিপিগুলি প্রাচীন বাবিলোনের ভাষা।

শ্রাণ করিয়া আসল স্তূপটি রক্ষা করা হইয়াছে। মধ্যের স্তূপটিতে কটি বৃহৎ অসম্পূর্ণ বুদ্ধমূর্তি আছে। অল্প প্রত্যেকটি স্তূপে একটি করিয়া খানী বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় স্তূপমূর্তিটি জামদেশীয় ও সম্ভবতঃ ১৫ কি একাদশ শতাব্দীতে নিশ্চিত। থাই (Thai) কলাশিল্পের একটি নিদর্শন। এই শিল্প কিরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ঐটি স্তূপের পার্শ্বকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহা চাকচিক্য ও মনোহরতা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়। এই মূর্তিটি প্রায় নিশ্চিত বলিলেই হয়। . নাসিকা ও ওষ্ঠাধরের রেখা সুস্পষ্ট কিন্তু কপাল ও ক্র বেন সম্পূর্ণতা হ করে নাই।

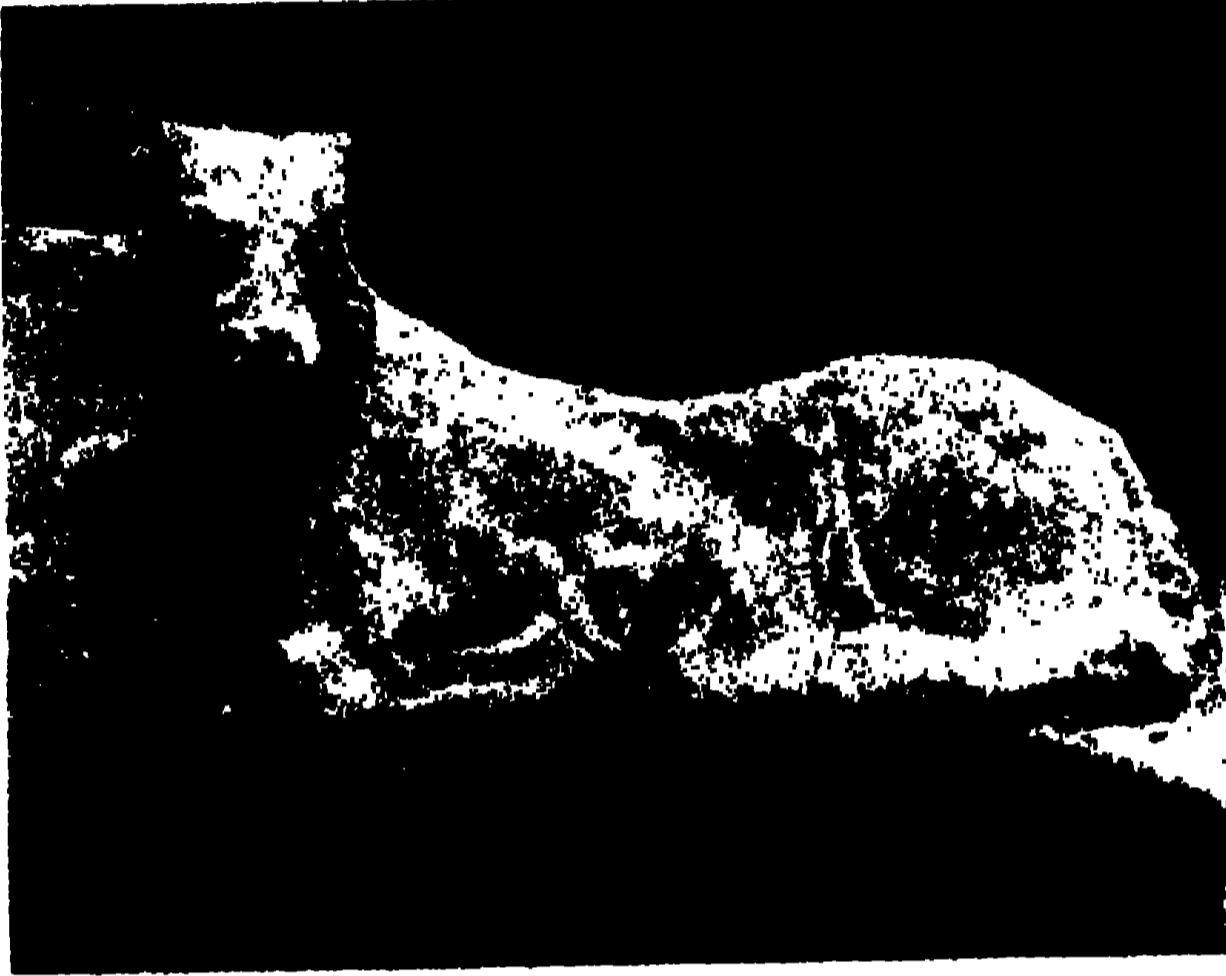
জামদেশীয় কলা-শিল্পের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনযোগ্য। এ. স্যালমণি লিখিত 'জামে ভাস্কর্য' (Sculpture in Siam, London

বিগত মহাগুদ্ধের পূর্বে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কাজ বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। ইংরেজ সৈন্য বাবিলোনিয়া অধিকার করিবার পর প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি ওঠে দিকে পতিত হয়। গত তিন বৎসর ধরিয়া মেসর সি. এল. উলীর নামকাজে ব্রিটিশ যাত্রণ ও পেনিসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রণের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই স্থানের আশেপাশে খনন করিয়া অস্তুত অস্তুত ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন।

মেসর উলী যে কেবলমাত্র চারি সহস্র বৎসর পূর্বের, এরাহানের সমসাময়িক মন্দির ও প্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াই থামিয়া হইয়াছেন তাহা নহে তিনি তাহা হইতেও বহু শতাব্দী পূর্বের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন।

চারি সহস্র বৎসর পূর্বে এরাহাম শৈশবকালে যখন উরে তাঁহার আত্মীয়দের কাছে মান্না হইতেছিলেন তখনই নগরীটি দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ছিল; এবং তখনই দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া সহরটি মস্তাও ও বাবসায়ের কেন্দ্র ছিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রস্তর লিপি (যাহা পাওয়া গিয়াছে) উরের খনিতে টেল-এল-ওবিদ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ টেল-এল-ওবিদ উর নগরের সহরতলী ছিল। এই শিলালিপি অপসে কোনও মন্দিরের ভিত্তিতে প্রথিত ছিল। উরে তৎকালীন প্রচলিত অস্তুত চিত্রলিখন সেই ক্ষুদ্র শিলা-পাথরের উপর লিপিবদ্ধ ছিল। পেনিসিল-



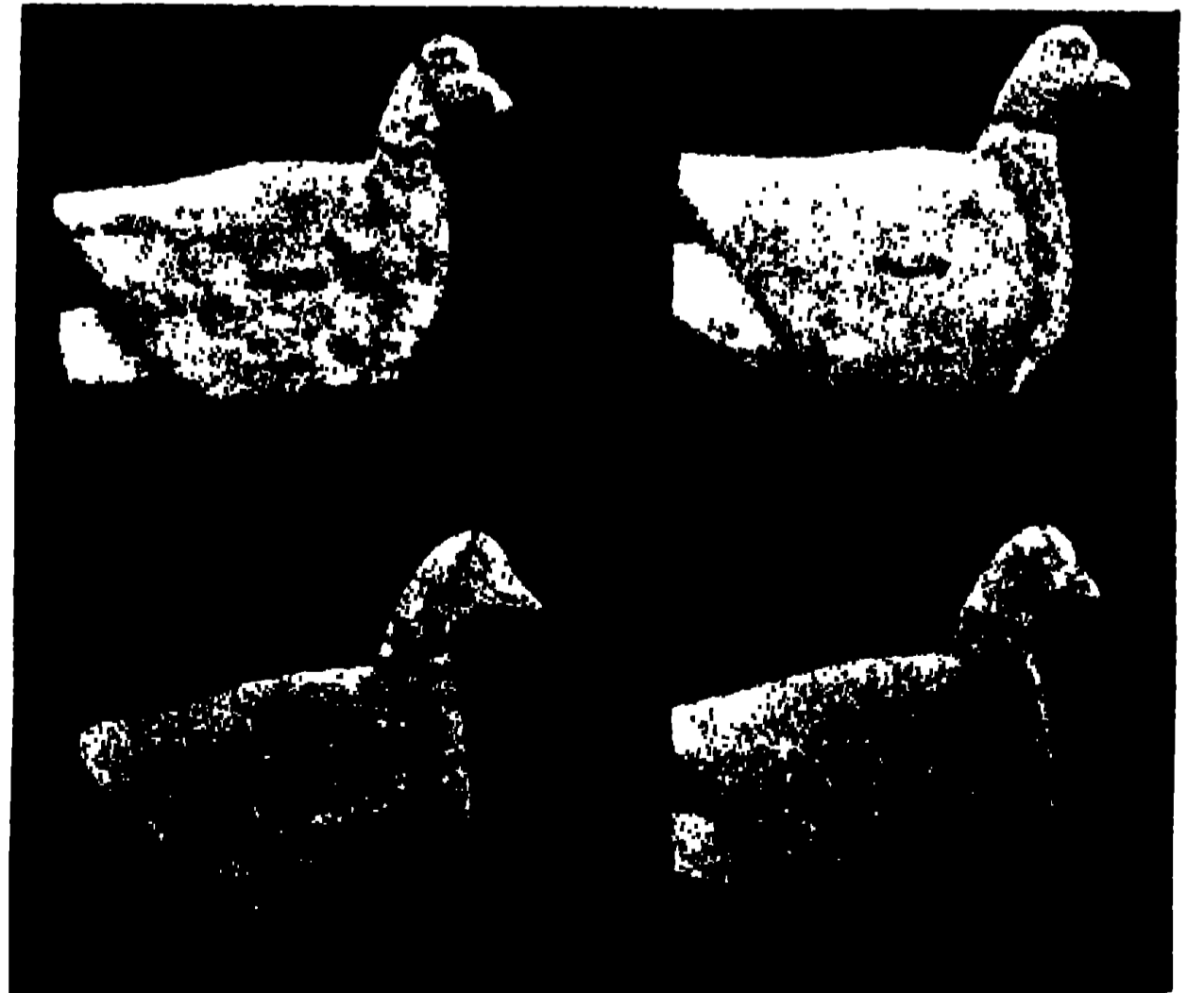
টেল-এল-ওবিদে প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত মূষ :
(মূষাটি ঢালাই করা ও শরীরজিপেটা)



শঙ্খ-নির্মিত মূষ
(টেল-এল-ওবিদে নিন-হার-সাগের মন্দিরে প্রাপ্ত)



সম্ভবতঃ খৃঃ পূ ২৮০০ সালের নির্মিত মূর্তি
(উরে প্রাপ্ত)



মন্দিরগায়ে চূণ-পাথরে নির্মিত পাখী
(টেল-এল-ওবিদে নিন-হার-সাগের মন্দিরে প্রাপ্ত)

ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা সেই লিপি উদ্ধার করিয়াছেন।
উহাতে লিপিত আছে যে উরের তৎকালীন সম্রাট আ-আন-নি পক্ষ দেবী
নিন-হার-সাগের নামে ওই মন্দির উৎসর্গ করিলেন। প্রায় চৌদ্দটি
শতাব্দী পূর্বে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ তে উহা লিপিত হইয়াছিল।

পননকালে কতকগুলি আশ্চর্য শিল্প কলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।
কয়েকটির চবি দেওয়া হইল।

নিন-হার-সাগের প্রথম মন্দিরগাত্র ও বিস্তৃত অঙ্গন এবং অগ্ণ্য
পাসাদগুলিও চিত্রিত বা পোদিত দৃশ্য দ্বারা মণ্ডিত। উরে প্রাপ্ত মূর্তি ও
চবিগুলির মধ্যে ঢালাই ও পেটা তাম নিশ্চিত একটি চমৎকার পোদিত
মূর্তি আছে। একদল গৃহের শোভাসামা তাতাতে দেখান হইয়াছে।
সম্রাট আলকাতরার উপর শত্রুর পোলের চুকরা দিয়া নিশ্চিত অগ্ণ্য
অনেক দব্যও আছে। সম্ভবতঃ এই সম্রাট আলকাতরা কেরোদান
এলের প্রসবনের কাড়াকাচি পাওয়া যাইত। আরও ব্যাবিলোনিয়াতে
এইরূপ আলকাতরাপও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বস্তুই শিল্পীদের
কায়ে লাগিত।

বিপাত স্মেরিয়ান জাতি উর নগর স্থাপন করে। এই স্মেরীয়গণ
নিশ্চয়ত পাতান উত্তরানে মক্কাপেছা পেঠে ও প্রতিপত্তিশালী ছিল।
তারা একেবারে বিশ্বত হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতগণ ব্যাবিলোনিয়ায়
প্ৰসবশেষের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া সম্রাট উহাদের উত্তরান
আঁকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্মেরীয়দের আদিম বাসস্থান
মটিক কান্না যায় না। পূর্ব সম্ভবতঃ তাহারা ভারতবাসী এবং যৌবনয়
উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাযোগে ভারতমহাসাগর ও পারস্যোপসাগরের কূলে
ধরে এখানে উপস্থিত হয়।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক গৃহে যৌবনয় ৫০০০-৪০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে
স্মেরীয়গণ ব্যাবিলোনিয়াতে আগমন করে। উপকার অসম্পূর্ণ আদিম অধি-
বাসগণ এখন উপসাগরের ভারতমহাসাগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে কোনও
পাঠকে ছৌবন ধারণ করিত। স্মেরীয়গণ প্রথম সেখানে সভ্যতা বিস্তার
করে। তাহারা লিপিতে ও প্রস্তরে পোদাই করিতে জানিত। তাম্রনিশ্চিত
যন্ত্রের ব্যবহার করিত, বস্ত্রাদির ব্যবহার অবগত ছিল এবং নৃষি পদ্ধতি
অনুগতকে বলা করিতে পারিত। তাহাদের রাস্তা ছিল, ওদানী পুরোচিও
ছিল ও তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃশিত।

সম্ভবতঃ ৪৫০০ পূঃ পৃষ্টাব্দে কি আর ডুই এক শতাব্দী পূর্বে উই-
ফেটাস নদীর উপত্যকা ভূমিতে অশ্রুতঃ পাঁচটি নগর স্থাপিত হয়। উর
তাহার মধ্যে একটি। সাগরের উপকূল তখন আরও উত্তরে ছিল এবং উর
সমুদ্রতীরবর্তী নগর ছিল। ধীরে ধীরে নদীর পলি পড়িয়া সমুদ্র তীরট
হইতে থাকে এবং এই নগরটিকে সমুদ্র হইতে শতাব্দিকমাইল তফাৎ করিয়া
দেয়। আরো কিছু দক্ষিণে হরিত নামে একটি মহর ছিল। পূর্বে নাগাশ
ও ৩০ মাইলের মধ্যে হরেক ও লাসী মর্দশুজ এই পাঁচটি মহর তুর্কিয়া
স্মেরীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং হুইই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ।

তখন হইতে আত্রাহামের জন্ম প্ৰায় ২৫ শতাব্দী ধরিয়া স্মেরীয়
দেশে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। রাজার পর রাজা ও রাজবংশের পর
রাজবংশ রাক্ষু করিতে থাকে। পরিশেষে পশ্চিমের এক পার্সিয়া প্রদেশ
হইতে সেমাইট নামে এক জাতি আসিয়া এই দেশ অধিকার করে
ও পরাজিত জাতির ভাষা শিক্ষকলা ও সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।
সমৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইতে থাকে। নগরীর পর নগরী স্থাপিত হয়।
প্রসিদ্ধ ব্যাবিলোন হইবার অন্যতম। উহা আরো ১০০শত মাইল উত্তরে
ইউফ্রেটাস নদীর তীরে অবস্থিত। পরিশেষে আত্রাহামের সময়ে এই
ব্যাবিলোনিয় উপত্যকা বিশাখিক নগরী-সম্বলিত হইয়া ব্যবসায় ও শিল্প
কলার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

শ্যামের নৃতন সম্রাটের অভিষেক :—

শ্যামের বৌদ্ধ সম্রাট বঠ রানের দেহভাগের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা
কমার প্রজাদিপকের বাৎকক রাজ্যাসাদে অভিষেক হইয়াছে। কপিও
আছে ইহার গোত্রমবুদ্ধের বংশধর। নৃতন সম্রাট অক্ষফোর্ডে ও
আমেরিকায় শিক্ষিত। পরলোকগত সম্রাটও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন ও
শতাব্দীব্যাপী মজ্জাগত বহু বৃক্ষারের উচ্ছেদ করিয়াছেন; তাহাও বহু-



অভিষেক উৎসবে শ্যামদেশের পঞ্চ-সম্রাট

বিবাহ একটি। তিনি পালি ও সংস্কৃতে গুপ্তিত ছিলেন ও চমৎকার
নাটক রচনা করিতে পারিতেন। নৃতন সম্রাটের অভিষেককালে রাস্তাগুলি
কেমন চমৎকার সজ্জিত করা হয় তাহা নশুন দেওয়া হইল। যেতঃস্তা
মূর্তি শ্যামে অদ্যের চিত্র।

টার্কি-রমণীর রূপান্তর :—

দেহুশত বৎসরের মধ্যে টার্কি রমণীদের কি আশ্চর্য্য ও দ্রুত পরিবর্তন
ঘটিয়াছে তাহাই এই চবিটিতে দেখান হইয়াছে।



১৫০ বৎসরে নোরকা হইতে গাউন
টার্কি রমণীদের পরিবর্তন

জাপানের শিশুসাহিত্য :—

জাপানের শিশুসাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার নৃসিদ্ধান্তে শৈশবের শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জাতিপটনের একমাত্র উপায় শিশুকে গড়িয়া তোলা। জাপানে শতাধিক শিশুদের মানিক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। মূল্য খুব অল্প। কাট্টি খুব বেশী। বিলাতের মত শিশুদের অল্প সেই সব কাগজে অল্পত আঙ্গুর্বা ছবি দেওয়া হয় না। সাধারণ ছেলেমেয়েদেরই ছবি দেওয়া হয়। এই সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সমস্ত সচিত্র গল্প দেওয়া হয়। সারা মোফাট



জাপানী শিশু-পত্রিকার প্রচ্ছদপট

মেক নামক একটি আমেরিকার মহিলা জাপানের শিশুসাহিত্য আন্দোলন করিয়া বলিয়াছেন “পশ্চাত্য দেশের শিশুরা যেমন অল্পত অবাস্তব কথা বীভৎস ছবি পছন্দ করে জাপানের শিশুরা তেমন করে না ; তাহারা মনোহর বাস্তব ছবি পছন্দ করে। শিশুসাহিত্যী (কো দোমো নো টোমো) নামক একটি পত্রিকার প্রচ্ছদপট দেখানো হইল।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ শৈশবে :—

এটি সম্রাট আলেকজান্ডার পৃষ্ঠে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছবি। সম্রাট সমস্ত এডওয়ার্ড যখন ওয়েল্‌সের যুবরাজ ছিলেন এই ছবি তখনকার।



মায়ের পিঠে সম্রাট পঞ্চমজর্জ

সোক্রেটসের প্রতিমূর্ত্তি :—

কোনও এক বিপ্যাত্ত জাঙ্গান লেখক কিছুকাল পূর্বে মত পচার করেন যে আমরা আজকাল প্রতিমূর্ত্তি বলিতে যাহা বুঝি প্রাচীনকালে



সোক্রেটস্

তাহার প্রচলন ছিল না। কোনও বিখ্যাত লোকের মূর্তি গড়িবার সময় তাহার আনল আকৃতি না গড়িয়া তাহার গুণগুণি প্রকটিত করিবার দৃষ্টি আদর্শ মূর্তি গড়িয়া তোলা হইত। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ যাদুঘর (British Museum) সোক্রাটেশের এক প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাতে এই মতটি পণ্ডিত হইয়াছে। সোক্রাটেশের মূর্তির অঙ্কন এক শতাব্দীর মধ্যে এই মূর্তি নিশ্চিত হয়। যদি জাশ্মাণ মতটি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে সোক্রাটেশ তাহার সমসাময়িক লোকদের চক্ষে কানুক, সোলঙ্গাহীন ও গুণহীন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু লণ্ডন টেলিগ্রাফ তাহার সম্বন্ধে লিপিয়াছেন—

প্রাচীন কালে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যাহাদের ভাব ও চিন্তার ধারা মানুসকে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে কেহই সোক্রাটেশের জ্ঞান জনসাধারণের পরিচিত ছিলেন না। তাহারা আপনাদের ভাবের সোরে মগ্ন থাকিতেন। সেই কারণে লোকে তাহাদের চিন্তাগুলির সম্বন্ধেই পরিচিত হয় আসল ব্যক্তির কোনই পোড় লয় না। এরিস্টটল কেমন ছিলেন, জেনোকেনন কখনো বলিতেন, এপিফিউরাসের পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদ্ভূত হয় না অথচ গীকভাষা জানে না কিংবা সোক্রাটেশের দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহার হাজার লোক সোক্রাটেশের জীবনের বড় কথা জানে। অবশ্য বিখ্যাত প্লেটো

তাহার শিষ্য হওয়ার দরুন তাহার পরিচিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু প্লেটো তাহার আদর্শ চরিত্র যথার্থ চিত্রিত করিয়াছেন কিনা সন্দেহ হইতে পারে ; কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জীবনের বৈচিত্র্যের মোহ লোকে পাইয়া বসে। একজন সিনিক (Cynic) বলিয়াছিলেন যে 'সোক্রাটেশের দৈহিক কদম্যতাই তাহার যশের কারণ। সুন্দর চেতনার লোকে যশস্বী হইতে পারে না।' সত্যই হয়ত তাই। সব দিক দিয়া নিপুণ চেতনাসম্পন্ন লোকে সাধারণের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যেমন অন্ধু ও চেতাবা বিশিষ্ট লোকে করে। এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই সোক্রাটেশ সাধারণের প্রিয়। প্লেটো লিপিয়াছেন সোক্রাটেশের কদম্য কাম্বকের চেতাবা ছিল ; তিনি হৃৎ, ফাতোদর, স্বলকণ, ৩টা-চক্ষু, বক্ষনামা পুরুষ ছিলেন। রোমীয় যুগের প্রতিমূর্তিসমূহেও আমরা এই আকৃতির পরিচয় পাই। কিন্তু আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে উঠিত কি শীত কি গায়ে পালিপায়ে পালিপায়ে এপেলের পথে পথে যাতাকে তাকে প্রাণ করিয়া ফিরিতেন ; এবং ক্রীতদাস অপেক্ষা কষ্টকর জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু নবাবিষ্কৃত এই প্রতিমূর্তিটি দেখিলে মনে হয় যে তিনি সুপুরুষ না হইলেও বাঁহৎস ছিলেন না। তাহার মূণ ও দৃষ্টি দীর্ঘাতির পরিচায়ক এবং সম্ভবতঃ তাহার যথার্থ প্রতিমূর্তি।

পরিচ্ছদ-বিপ্লব

শ্রী উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রাচীনকালে ভারত-ভূমি যখন অসভ্য জাতির আবাস-স্থল ছিল, যখন তাহাদের বংশধরগণ গৃহহীন অবস্থায় জঙ্গলে ও পর্বত-কন্দরে অবস্থান করিত, তখন তাহাদের কোনো-প্রকার পরিচ্ছদাদি ছিল না। তাহারা উলঙ্গ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। পুরাতত্ত্ববিদগণ তৎকালীন কোনো ইতিহাস অদ্যাবধিও নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া তৎসময়কে প্রাগৈতিহাসিক কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ভীল, কোল, মুণ্ডা, টিবেটো-বার্মান ও কোলেরিয়ান প্রভৃতি অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ আপন-আপন উলঙ্গ অবস্থাকে ঢাকিবার নিমিত্ত বৃক্ষ-পত্রাদি ব্যবহার করিত। অতঃপর এইসমস্ত জাতিকে বিতাড়িত করিয়া দ্রাবিড়গণ যখন তাহাদের স্থানে উপনীত হইল, তাহারাও তাহাদেরই স্থায় উলঙ্গ অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিল। এই দ্রাবিড়গণও কখনও বা অত্যধিক শৈত্য-

প্রযুক্ত বৃক্ষ-বকল ও বৃক্ষ-পত্রদ্বারা আপন-আপন গাত্র-রক্ষা করিত, কখনও বা গাত্রাদি রঙীন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। এই শরীর-রক্ষার প্রচেষ্টার পরিণামই পরিচ্ছদ-ধারণ।

অতঃপর যখন আৰ্য্যগণ ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতে পরিচ্ছদ-প্রচলন। এই পরিচ্ছদ কে, কোথায়, বা কখন সৃষ্টি করিল, কেহ বলিতে পারে না। আৰ্য্যগণের সঙ্গে-সঙ্গে অসভ্য আদিম অধিবাসিগণও পিতৃপিতামহের উলঙ্গ অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া বৃক্ষপত্র দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কখন-কখন বা বৃক্ষ-বকলেও গাত্রাচ্ছাদন আরম্ভ করিল। বৈদিক ভারতীয় কালেও সেই বকলের ব্যবহার দেখা গিয়াছে।

ভট্ট মোক্ষমূলার ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়া গিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ৫৪৪ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ভারতের

মহাকবি কালিদাস তৎকালীন কাব্য-জগতের উদায়মান কবি ছিলেন। তাঁহার শকুন্তলা-নামক নাটকে দেখা যায়—
দুঃস্বপ্ন বশাশ্রমে শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া যখন তাহার
রূপমাধুরী পান করিতেছিলেন, সেই সময় শকুন্তলার
পরিধেয় বকল কটিদেশে দৃঢ়সম্বন্ধহেতু কষ্টানুভব করিতে-
ছিল। এই সময় আমরা বকলের উল্লেখ দেখিতে পাই
এবং মনে হয় সেই বকলেরই ব্যবহার তৎকালীন মুনিদের
আশ্রমে প্রচলিত ছিল।

দ্রাবিড়গণের সেই নূতন পরিচ্ছদাদির আদর দেখিয়া
মনে হইতেছিল যেন তাহারা অশিক্ষার শাস্তিময়ী ক্রোড়ে
লালিত-পালিত হইয়াও বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে উল্লস
অবস্থাতে সন্মোষ-প্রাপ্ত না হইয়া শরীরাক্ষাদনের উপায়
খুঁজিতেছিল। তাহারা পরিচ্ছদ কখনও দেখে নাই, কিম্বা
পাইবার প্রত্যাশাও করে নাই। কিন্তু নবানুসন্ধানের
সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের রুচি পরিবর্তিত হইয়া চলিল।

ভারতের বৈদিক যুগের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কেপ করিলে
তৎকালীন পরিচ্ছদাদির ব্যবহার দেখিতে পাই—ঋগ্বেদে
বয়ন-বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে
পারা যায়, তৎকালেও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদে আমরা দেখি—

“নুনো না শিখা ব্যদন্তি মাধাঃ

স্তোভরম্ তে শতক্রতো বিস্তম্ মে অন্ত রোদসী।”

হে শতক্রতু! যেমন মুষিক সূত্রখণ্ড ছেদন করে,
তেমুনি দুঃখ আমার অন্তর ছেদন করিতেছে।

“সাম্বন” তাঁহার টিকায় বলিয়া গিয়াছেন, বয়নার্থ
সূত্র যে মাড় প্রদত্ত হইত, উহা মুষিকের একটা উৎকৃষ্ট
খাদ্য ছিল। ইহাতেও বয়নবিদ্যার প্রমাণ পাওয়া
যায়।

তখন যজ্ঞকালে তদুপযোগী স্রব্যাদি আবরণার্থে
নানাবিধ ছোটো-ছোটো বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদের ৫ম, ২৯ ও ১৫ শ্লোকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের
বর্ণনা আছে—“ভদ্রেব বস্ত্রা স্কৃত্তা।”

ঋগ্বেদের ১০ম, ১১, ৪ শ্লোকে দেখি—“জায়েব
পত্যে উশসী স্বেসাসাঃ।”

ঋগ্বেদের ৮ম, ৪৬ ও ৩৩ খণ্ডে উত্তমবস্ত্রপরিহিত
দাসীধ বর্ণনা দেখিতে পাই।

তৎকালে পরিচ্ছদাদি সাধারণতঃ ভেড়ার লোমদ্বারা
নির্মিত হইত।

ঋগ্বেদের ১০ম, ২৬ ও ৬ শ্লোক পাঠ করিলে আমরা
দেখিতে পাই তখনও বয়ন ও রেশমের নির্দেশ আছে।

ঋগ্বেদের ১ম, ৩১, ১৫ শ্লোকে দেখিতে পাই, পাট বা
শণের বস্ত্রনির্মিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। আবার
৫ম, ১০১ ও ৮ শ্লোক পড়িয়া দেখি, তন্নির্মিত রেশমের
একপ্রকার কাপড়ও ব্যবহৃত হইত, উহাকে তর্পা বলা
হইত।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে,
ভারতবাসিগণ আলেক্সান্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বে
ধুতিচাদর ব্যবহার ব্যতীত অপর কোনো পরিচ্ছদের
ব্যবহার জানিত না।

পরন্তু ইহা একটি আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়
যে, তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তিগণও শুধুমাত্র ধুতি-
চাদরে সন্তুষ্ট থাকিত। বস্তুতঃ সীবন-বিদ্যা যে তখনও
প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Wilson's
Rig-Veda, Vol. II, p. 280 and IV, p. 60)

আমরা তৎকালীন গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখি,
বৈদিক যুগের আর্বাগণ নানাবিধ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার
করিত। তাহারা যে ভিতরের পোষাক ব্যবহার করিত,
উহাকে নীবি বলা হইত। (অথর্কবেদ-৮ম, ২, ও ২৬।)
ইহার উপরে যে-কাপড় ব্যবহৃত হইত, উহাকে বাসম্
বলিত; এবং সর্কোপরি যে কাপড় বা পোষাক ব্যবহৃত
হইত, উহাকে অধিবাস বলা হইত” (ঋক্, ১ম, ১৪০ ও ৯)।
এই অধিবাসের অপর নাম ছিল “অৎক ও জাপি”।
এতদ্ব্যতীত যখন তাহারা যজ্ঞস্থানে প্রবৃত্ত হইত তখন
তাহারা যে একটি রেশমের গাত্রাবরণ ব্যবহার করিত,
উহাকে তর্পা বলিত। মন্তকাক্ষাদনার্থে যে বস্ত্র
ব্যবহৃত হইত, উহাকে “ওপশ” বলিত। (ঋগ্বেদ ১০ম,
৮৫-৮) কেহ-কেহ, যথা অধ্যাপক ব্রুম্ফিল্ড, এই ওপশকে
ওড়না বলিয়া গিয়াছেন। (Hymns of the Atharva-
Veda, p. 538, 39)

এইসকল বিভিন্ন পোষাক পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় তৎকালে এতদ্দেশে সৌকন-বিদ্যা (tailoring) প্রচলিত ছিল।

অমরকোষ-গ্রন্থে দেখিতে পাই, বৈদিক যুগের সীবন-বস্ত্র (tailored cloth) ব্যবহৃত হইত, উহাকে সৌবিক বলা হইত। সাহারা ইহা প্রস্তুত করিত, তাহারা পরিশেষে একটি নীচজাতি হইয়াছিল। শুনা যায় তাহারা বৈশ্য পিতার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। অন্যাবধিও এই জাতি কাশীতে বর্তমান আছে।

ঋগ-বেদে ২য়, ৩, ৬, ৩৮, ৪ ও ৬ষ্ঠ ২২ শ্লোকে দেখা যায়, স্ত্রীলোকগণও বয়ন-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ভগবান্ মহুয় স্মৃতি-গ্রন্থের ৩:৫২, ২:২১২ ও ১:১১৮-১ শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। তাহারা জল প্রক্ষালনদ্বারা কার্পাস বস্ত্র, এবং কারজ সূতিকাচারে রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া লইতেন।

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায় ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিবাদ চণ্ডালাদি হীন জাতীরের যুতের চেলী পরিধানের বিধি আছে দেখা যায়।

মহাভারতেও নানাপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদেহরাজ নল বনে যখন দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একখানা বস্ত্রের অর্ধ আপন অঙ্গে রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।

তখন যদি বস্ত্রের প্রচলন না থাকিত, তবে বোধ হয় স্ত্রীপতীর বস্ত্রহরণ সম্ভব বলিয়া মনে হইত না।

মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যবান্ ও সাবিত্রী বনে গমন করিলে পর যখন সত্যবানের শিরোবেদনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন তিনি বস্ত্রদ্বারা মস্তক বন্ধন করিতে আপন ভার্যাকে বলিয়াছিলেন।

রাজা দুর্যোধন যখন পাণ্ডব-সভায় গমন করিয়া জয়বশত কুপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার

পরিধেয় বস্ত্রাদি আর্জ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষেত্রেও আমরা বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মহাভারতের সভাপর্কের ৫ম খণ্ডের ৭৬ ও ৭২ শ্লোক পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালে বয়ন-বিদ্যায় চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

রামায়ণ-যুগেও আমরা দেখিতে পাই, তৎকালে নানা-প্রকার বস্ত্রাদি প্রচলিত ছিল।

বালকাণ্ডে দেখা যায়, রামের পরিণয়-কালে জনকরাজ প্রস্তুত রেশম বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৩য় সর্গের ১২ শ্লোকে দেখি, দশরথ যোদ্ধাদিগকে পরিষ্কার বসন পরিধানপূর্বক অঙ্গন-মধ্যে থাকিতে আদেশ করিলেন।

ঐ সর্গে আবার ২ম শ্লোকে দেখিতে পাই রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত দশরথ কহিলেন—“আপনারা কল্যা প্রভাতে মহীপতির অগ্নিহোত্র গৃহে দ্বত, মধু, লাজ, অনেক সদ্যোজাত বস্ত্র, রথ প্রভৃতি বখাবোধ্য স্থানে রক্ষা করিবেন।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে দেখা যায়, রাম মাতা-কৌশল্যার গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার রাজলক্ষ্মী কামনা করিয়া কৌম্বাস পরিধানপূর্বক, দেবালয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া দেবতার আরাধনা করিতেছেন।

ঐ কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গের ৭ম শ্লোকেও কৌম্বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

ঐ কাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে ১৪ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাম বনে গমন-কালে যখন সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করিতেছিলেন, তখন তিনি রামকে বলিয়াছিলেন, “স্বামিন্ ! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কথনাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে ?”

এখানেও আমরা পুরাকালের বয়ন-বিদ্যায় পরিচয় পাই, আবার এই সর্গেই দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সীতা-দেবী বনে গমনের অন্ত রামের আত্মা প্রাপ্ত হইলেন, তখন রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন, “আমার সকল

মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি ভৃত্যবর্গকে প্রদান করে।”

ঐ কাণ্ডের ২৪ সর্গের ১৪ শ্লোকে দেখা যায়, রাম সীতা ও লক্ষণের সহিত বনে গমন-কালে রাজা দশরথ গণনা-পূর্বক চতুর্দশ বৎসরের উপযুক্ত বস্ত্র ও আভরণ দিয়াছিলেন।

ঐ কাণ্ডের অষ্টমপ্ৰতিভম সর্গের ৬ শ্লোকে দেখা যায়, কুন্ডা অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্বক রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই-সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিল।

রামায়ণে অরণ্য-কাণ্ডের ৪৬ সর্গে তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায়, রাম মাঘামৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল এবং লক্ষণ রামের জাণার্থে গমন করিলে লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হইলেন। সে উত্তম গৈরিক-বসন পরিহিত ছিল।

অরণ্য-কাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গের ১৪, ১৫ শ্লোকে দেখি, তখন বিত্ত্ব স্বর্ণবর্ণ পীতবর্ণ কোশেয়-বসন-পরিধারিণী রাজনন্দিনী সীতা অস্ত্রী শোভাষিতা বিদ্যুতের স্তায় প্রভা ধারণ করিলেন। রাবণ তাহার বায়ুমঞ্চালিত পীতবর্ণ বসনদ্বারা অগ্নি-প্রদীপ্ত পর্বতের স্তায় সমাধিক বিরাজমান হইল।

এই কাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গের ২৩ শ্লোকে দেখা যায়, রাবণকর্তৃক অপহৃত সীতা পথি-মধ্যে রামকে না দেখিয়া পর্বত-শৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান-প্রধান পাঁচটি বানরকে দেখিতে পাইলেন এবং রামের নিকট তাহার সংবাদ বলিবে ইহা মনে করিয়া তাহাদিগের নিকটে নিজেঃ স্বর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কোশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্বেপ করিলেন।

কিঞ্চিদ্বা কাণ্ডে ষাটশ সর্গের ১৫ শ্লোকে দেখা যায়, তখন স্ত্রীীব বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়ভাবে কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া স্বরিতবেগে নগরের নিকট গেল।

“স্ত্রীীবোহ প্যনমদ্ ঘোরং বালিনোহ্মানকারণাৎ।

গাঢ়ং পরিহিতোর্কেগাম্মাঈর্দৈর্ভিন্দ্রিবাস্বরম্।

এই কাণ্ডে সপ্তদশ সর্গের ১৬ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া

যায় স্ত্রীীবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া পরম ক্রোধনশতাব বীর্থাবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল।

স্বন্দরকাণ্ডে নবম সর্গের ৩৩ শ্লোকে দেখা যায় যে, হনুমান লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া দেখিল, তথাকার স্ত্রীগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা—তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্রবর্ণ।

ঐ কাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গের ৬ শ্লোকে দেখি, রাবণ-কর্তৃক আদিষ্ট হইলে কোপনশতাব রাক্ষসগণ জীর্ণ কার্পাস-বস্ত্র দ্বারা হনুমানের লাজুল বেটন করিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়াও প্রমাণিত হয় তখনও কার্পাসবস্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সর্গেরই ২৬ শ্লোক বলিয়া দিতেছে যে, তখনও বসন ব্যবহৃত হইত। এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, হনুমান সীতা-সাক্ষাদনন্তর রাম-সম্মর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্ট-নামক পর্বতের উপরে উঠিলেন। তখন ঐ পর্বত বিশাল ভূচ্ছ-তরু-শোভিত নীলবর্ণ বনরাজি রূপ বসন পরিধান করিয়া, শৃঙ্গসংলগ্ন মেঘস্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্বক, স্ত্রীতিনিবন্ধন দিবাকররূপ শুভকর-স্পর্শে যেন তদ্রূপ বস্ত্র-সকলকে আগরিত করিতেছে।

এই কাণ্ডের নানা শ্লোকে আলোচনা করিয়া দেখা গেল, তৎকালে নানাপ্রকার বস্ত্রাদির বহুল প্রচলন ছিল।

লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, দশানন রাম-কর্তৃক নিখন প্রাপ্ত হইলে তাহার আশ্চর্যগণ রাক্ষসরাজকে ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন।

আবার অপর শ্লোকে দেখা যায়, বিভীষণ স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রেই বিধিপূর্বক তিল- ও দর্ভ-মিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

আবার ঐ কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় রাবণ-বধাস্তর সীতাদেবী স্নানান্তে উত্তম বসন ও অলঙ্কার পরিধান-পূর্বক রাম-সন্নিকটে প্রয়াণ করিলেন।

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাদেবী আগমন করিলে রাম বিভীষণকে কহিয়াছিলেন, গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা এরূপ লোকাপসারণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে।

দেশ-বিশেষের জলবায়ু-অনুযায়ী পরিচ্ছদাদির বৈশিষ্ট্য

লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাই এদেশ-বাসিগণ ধুতিচাদর ও টিলা জামা ব্যবহারে অভ্যস্ত। আবার এতদ্দেশেই যে-স্থান একটু শীতপ্রধান বলিয়া মনে হয় তথাকার অধিবাসিগণ অগ্নেকাকৃত গরম জামা ও মস্তকাচ্ছাদনার্থ উকীষ বিছা পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ড শীত-প্রধান দেশ। সে-দেশবাসিগণ তপনুযায়ী গরম পরিচ্ছদাদির ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে জগতের নিয়ম চিরস্থায়ী নহে। মানবের কচিও একই-প্রকারের নহে বরং পরিবর্তনশীলই দেখা যায়। কাজেই কাল-স্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে কচিও পরিবর্তিত হইয়া পড়িল।

এই জগতে প্রত্যেক জাতির এক-একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক জাতি আপন-আপন নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে। যখন কেহ আপন দেশ হইতে পরদেশে গমন করে, তখন সেই পরদেশবাসী তদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিকে তাহার পরিচ্ছদ দ্বারা চিনিয়া লন। সুতরাং পরিচ্ছদ জাতীয়তার প্রধান সাক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য। তাই ধুতিচাদর ভারতবাসীর প্রকৃষ্ট চিহ্ন। উচ্চনীচ সকলেই ধুতিচাদর ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তন্মধ্যে তাহার ধনী ছিলেন, তাহার মূল্যবান্‌ জব্যাদি ব্যবহার করিতেন। তখন রাজা-মহারাজগণ অতি মূল্যবান্‌ স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আপন-আপন মর্যাদা রক্ষা করিতেন।

ধুতিচাদর ভারতবাসীর সারল্য ও আড়ম্বর-বিহীনতার পরিচায়ক। যাহারা যেমন লোক তাহাদের পরিচ্ছদাদিও তজ্জপ। শ্রেণীভেদে যে পোষাকেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, উহা কেবল এতদ্দেশেই নহে, জগতের সর্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে।

যেমন ইংলণ্ডে দেখা যায়, রাজার পোষাক (royal dress), মন্ত্রীর পোষাক (minister's gown); সৈন্তের পোষাক (soldier's dress), চাকরের পোষাক ইত্যাদি, তজ্জপ ভারতেও পোষাকের বিভিন্নতা বর্তমান আছে। রাজা-মহারাজগণ বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। তাহার সভাসদগণ মর্যাদানুসারে পরিচ্ছদ

ধারণ করিয়া রাজসভা সমুজ্জল করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলী মন্ত্রপুত্র উপবীত-শোভিত সমুদ্রত মেহে শুভ্র ধুতিমাত্র পরিধান করিয়া একখানি উত্তরীয়মাত্র স্বল্পদেশে রক্ষা করিতেন। কৃষকগণ ও নানা নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসিগণ ধুতি পরিধান করিত বটে, কিন্তু তাহারা যে ধুতি ব্যবহার করিত তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ নগ্নতা দূরীকৃত হইত না। তাহারা কখন বা উত্তরীয়ের গ্রাম স্বল্পদেশে একখানা নাতিসূত্র বস্ত্র রক্ষা করিত; তাহারা উত্তরীয় ও গামছার কার্য সাধিত হইত। অন্যাবধি সেই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ বলিলে যে জিনিষটি বুঝায়, তাহা যে এতদ্দেশে ছিল না তাহা নহে। সৌন্দর্য-বিদ্যার প্রচলন যে পুরাকালেও ছিল, পূর্বেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণেব বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, রামের পরিণয়ান্তে সীতাদেবী যখন অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন রেশমের পরিচ্ছদাদি তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এদেশবাসিগণ বাহ্যিক পারিপাট্য আদৌ পছন্দ করিত না। পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে এদেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করিলেও বয়ন-বিদ্যায় যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই; তাহার একটি প্রমাণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

পাশ্চাত্য-মতে মিশরের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতার আদিভূত। কিন্তু সেই প্রাচীন মিশরেও ভারতের শিল্প-কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। প্রাচীন মিশরের মৃতদেহ-রক্ষার যে-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে দৃষ্ট হয়, তজ্জাত্য ধনবান্‌গণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্পদে ও বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত করিতেন। ১৪৬২ বৎসর পূর্বে মিশরীয় রাজগণের অষ্টাদশ রাজবংশের পরিসমাপ্তি। কবরে যে-সকল মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই মসলিন বস্ত্রে আবৃত ছিল দেখা গিয়াছে। আর সেই মসলিন ভারতজাত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইজেকিএল গ্রন্থাংশে লিখিত আছে—বণিকগণ ভারত-বর্ষ হইতে বিবিধ পণ্যজব্য লইয়া গিয়াছিল; সেইসকল

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাপড়-করা মূল্যবান পরিধেয়, গজদন্ত ও আব্দুল কাঠ ছিল।

সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, যাহারা যে জিনিষটাকে পছন্দ করে, তাহারা কেবল সেই আদৃত বস্ত্রের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যস্ত হয়।

পরিচ্ছদাদির পারিপাট্যে ও তাহার উৎকর্ষ-সাধন করা যে একটি উত্তম কলা-বিদ্যা—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবগণ যেমন আপন-আপন স্ববিধা-অস্ববিধার বিচার করিতে সক্ষম হইল, তেমন তাহারা আপন-আপন আবশ্যিকতামুযায়ী পরিচ্ছদেরও পরিবর্তন আরম্ভ করিল।

রোম-নগরী যখন যুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, রোমের রমণীগণের নিকট তৎকালীন ভারতীয় রেশমী জিনিষ অতি আদরের জব্য ছিল।

যদিও তখন পরিচ্ছদ-কলা-বিদ্যার আদর তত ছিল না বটে, কিন্তু মানবগণের শিক্ষা ও সভ্যতার শীর্ষস্থানের অধিকারী হইতে হইলে যে-সকল উত্তম কলা-বিদ্যার অধিকারী হওয়া আবশ্যিক, ভারতবাসী সেই-সকল কলা-বিদ্যার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে।

ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট-রেশম-নির্মিত বস্ত্রাদির নিমিত্ত সুদূর সপ্তসমুদ্রের উপকূলস্থিত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত মানব-মণ্ডলীও হস্তপ্রসারণ করিয়া উৎকৃষ্ট-চিত্তে অবস্থিতি করিতেন। ঢাকার মসলিন, কাশীর রেশম জগৎবিখ্যাত লোভনীয় সামগ্রী।

তামিল ভাষার প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির নানা স্থানে এতদ্বন্ধে দৃষ্ট হয়। পাণ্ড্য-বংশীয় রাজা চেলিঙ্গানের রাজত্বকালে ভারত হইতে বহুদূর দেশে উৎকৃষ্ট মসলিন প্রেরিত হইত।

ছোটনাগপুরের ভূতপূর্ব কমিশনার হিউরেট (Mr. Hieuret) আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য প্রখ্যাত। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে “মসলিন” রপ্তানি হইত। এই মসলিন বাবিলনে সিদ্ধু-নামে পাওয়া যায়। এইসকল বস্ত্র বাবিলনে (Babylon) ব্যবহৃত হইত। মিস্টার হিউরেট

উহা সমুদ্র-পথে সংবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, উহার নাম “সিদ্ধু” সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৎকালীয় বস্ত্রাদির তালিকায় এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এমন-কি, সভ্যতার উচ্চ শিখরে সমাপন ও সভ্যাগ্রগণ্য গ্রীক জাতিও খৃঃ পূঃ ৪৮০ সংবতেও ভারতীয় মসলিন ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

মসলিন বস্ত্রের তিরোধান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সমকক্ষ বস্ত্রাদি অদ্যাবধিও জগতের কোনো জাতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া কোনো ইতিহাস সাক্ষ্য-প্রদানে অসমর্থ। ভারতের বস্ত্রাদি যেরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল, তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক সামগ্রী আর কোথায় মিলিবে?

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-অনুযায়ী পরিচ্ছদ পারিপাট্য যেমন সুকৃষ্টি ও শিক্ষাসম্মত, অপর দিকে তেমনি ইহা সভ্যতার পরিচায়ক। ভারতবাসী পাশ্চাত্য আবহাওয়া প্রাপ্ত হইয়া সেখানকার পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেছে। ভারতবাসী মুসলমান-রাজত্বে ইসলামের অনুকরণে আপন দেশ-মর্যাদা ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া নব শ্রোতে গা ভাসাইয়াছিল।

ভূত সদাই তাহার প্রভুর অনুগত ও তাহার চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করিতে প্রয়াসী।

এদেশে ধূতি-চাদরের স্থানে পাজামা ও চোগা-চাপ্কানের সৃষ্টি হইল; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতামুযায়ী যেমন ভারতবাসী রাজ-দরবারে উপনীত হইলে কিম্বা রাজকার্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদাদি ধারণ না করিলে চলে না, তদ্রূপ বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ৩ মুসলমান রীতি-নীতি-অনুসারে তৎদেশীয় পোষাক ধারণ করিতে হইত। এখনও দেখা যায় মুসলমানগণ তাহাদের নিজ-নিজ জাতীয় পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে; ভারতবাসীও পূর্ব প্রথামুযায়ী সেই বৈদেশিক চোগা-চাপ্কান, শিরওয়ানী প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন।

তৎকালীন পরিচ্ছদ-মধ্যে চোগা, চাপ্কান, শিরওয়ানী, আচ্কান, তুর্কী কোট, তিলা পাজামা ও চুড়ীদার বা আটা পাজামার প্রচলন ছিল। এই চুড়ীদার পাজামা হইতে আমাদের চুড়ীদার পাজামার সৃষ্টি হয়। মুহুরাট

ঢিলা থাকিলে বুলিয়া পড়ে ও কাজ করিতে নিতান্ত অসুবিধা, তাই ইহাকে চূড়ীদার করা হয়।

পুরাকালে তুর্কিস্থানের অধিবাসিগণ যে কোট ব্যবহার করিত, উহাকে টার্কিশ্ কোট অথবা ইংলিশ মতে ক্রক কোট বলা হয়। তবে পুরাকালে যে সকল কোট ব্যবহৃত হইয়াছিল, ঠিক সেই কোটই অধুনা প্রচলিত নহে; কিন্তু সেই জিনিষটিই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

পাঞ্জাবের ও তৎসন্নিকটস্থিত প্রদেশসমূহের মুসলমানগণ অদ্যাবধিও চূড়ীদার ও ঢিলা পাজামা ব্যবহার করে, এবং তাহাদের গায়ে শিরওয়ানী ও টার্কিশ্ কোট দেখা যায়। আধুনিক মাড়োয়ারীগণের গায়েও শিরওয়ানী দৃষ্ট হয়।

বিশিষ্ট হিন্দু-মহোদয়গণ ও পদস্থ ব্যক্তির গায়ে চোগা-চাপ্‌কান সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীগণ ও ইংরেজগণ যখন এদেশে রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করিল, ভারতবাসী তাহাদের পূর্ব-বিজ্ঞতা মুসলমানগণের পরিচ্ছদাদি ও আচার-ব্যবহার পরিহার করিয়া, ফরাসী ও ইংরেজগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতীয়গণ চোগা-চাপ্‌কানের পরিবর্তে হ্যাট্-কোটের উচ্ছন্ন কিরণে শোভিত হইলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতার অবসান হইল। তাহারা দেখিল, বিদেশীয় পোষাক পরিলেই রাজ-সম্মান ও রাজত্বগ্রহ লাভ করা যায়।

রাষ্ট্রজগতে বর্তমান ভাবের ধারা

কি-কি ভাবের ধারা বর্তমানে রাষ্ট্রজগতে আন্দোলন তুলিতেছে তাহা নির্দেশ করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিশেষ নূতন-কিছু বলিবার নাই; এসম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতির পুস্তকেরও অভাব নাই, তবুও ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কেননা, বাঙ্গলা ভাষায় এইপ্রকার পুস্তক এখনও প্রচুর হইয়া উঠে নাই। বৈজ্ঞানিক (Academic) আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি সরল কথায় কয়েকটি জিনিষ বলিতে চাই যাহা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

যে-তিনটি ভাবের তরঙ্গ বর্তমানে রাষ্ট্রজগৎকে সচকিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা এই :—(১) স্বাধীনতা (Liberty), (২) জাতীয়তা (Nationalism) ও (৩) অন্তর্জাতীয়তা (Internationalism)। সর্বপ্রথম স্বাধীনতার আলোচনা করা বাউক।

স্বাধীনতা বলিতে এক কথায় আমরা বুঝি অনধীনতা (absence of restraint), আপন প্রকৃতি

অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ তাহা করিবার পথে কোনো বাধা না থাকার যে-অবস্থা, তাহাকেই আমরা স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকি। ইহা স্বাধীনতা সন্দেহ নাই, এবং ইহাই মানবজীবনের কাম্য স্বাধীনতা হইতে পারিত, যদি পৃথিবীতে একের সহিত অন্যের সম্পর্ক না থাকিত, যদি সবাই নিজের মত একলাই একস্থানে পরিপূর্ণ-ভাবে বসবাস করিতে পারিত এবং অন্য জনমানবের বা সমাজের কাছে তাহাদের কোনো প্রয়োজন না থাকিত। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক, অর্থাৎ কিনা, দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার রীতি; সুতরাং এইপ্রকার স্বাধীনতা কিছু থাকা সম্ভবপর নয়। আমি হয়ত এক-জনকে চপেটাঘাত করিতে চাই, কিন্তু সে-ব্যক্তি আমার চপেটাঘাত বরণ করিতে অনিচ্ছুক, এরূপ অবস্থায় এক-জনের সেই অনধীনতা স্ক্র হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। হয় আমি প্রবৃত্তি-অনুযায়ী তাহাকে চপেটাঘাত করিতে পারিব না, অথবা তাহার অনিচ্ছাসম্মেও তাহাকে আমার চপেটাঘাত

সহ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং বাধাহীন স্বাধীনতা (absolute liberty) বা অনধীনতা সামাজিক বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা যায় না, বস্তুত ইহাই যথেষ্টাচার(licence)।

তবে, প্রকৃত স্বাধীনতা কি? ত্রিনিঘটি বৃত্তিতে হইলে আমাদের আরও একটু ভিতরে ঢুকিতে হইবে। বর্তমানে সর্বত্রই মানুষ সমাজবদ্ধ ও সকল স্থানেই তাহাদের পরম্পরের সহস্ব স্থির করিয়া দিবার জন্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, প্রজাদের সমষ্টিগত ক্ষমতার উপর তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত; সুতরাং তাহার প্রভাব যে-কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় হইতে অনেক বেশী। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিতর সর্বপ্রথম আমাদের নজরে পড়ে রাজশক্তি, সেই রাজশক্তির আচ্ছাদিত বিধি বা আইন (law)। আইনের প্রধান লক্ষ্য পরম্পরের সহস্ব নিরূপণ করা। চোরকে চুরি হইতে নিবৃত্ত করে এই আইন, ডাকাতকে পরজ্বা লুণ্ঠন হইতে প্রতিহত করে এই আইনের রাজশক্তি। ইহাতে চোর বা ডাকাতের অনধীনতা ধর্ম করা হয় বটে, কিন্তু যাহাদের স্বোপার্জিত ধনরত্নাদি রক্ষা হইল, তাহাদের স্বাধীনতা বর্ধনই হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, আইনের উদ্দেশ্য সর্বজনীন স্বাধীনতা ধর্ম করা নয়; পরন্তু সকলকে নির্কির্বাদে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সুবিধা করিয়া দেওয়াই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজশক্তি তাহার ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া লোককে জোর করিয়া স্বাধীনতা দান করিয়া থাকে, যাহাকে Rousseauর কথায় বলিতে হয় “forced to be free.”। এই-প্রকার স্বাধীনতার সুবিধা করিয়া দিবার সময় অনেকেই রাষ্ট্রের কার্যের তুল অর্থ করিয়া থাকেন, অনেকে ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে অন্তায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দ্বিতীয় চিন্তায় বৃত্তিতে পারেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্তই রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা। একটা সোজা দৃষ্টান্তে ত্রিনিঘটি বৃত্তিয়া লওয়া যাউক। কলিকাতায় বড়-বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়াইয়া পথিকগণের গতিবিধি পরিচালনা করিয়া থাকে, তাহা আমরা সবাই দেখিতে পাই। আমি হয়ত একটা

বিশেষ প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া যাইতেছি, রাস্তায় পুলিশ আমাকে ধামাইল, অন্ত পথের কতক গাড়ী যতক্ষণ না চলিয়া গেল ততক্ষণ আমার মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমি হয়ত মনে-মনে তখন খুবই বিরক্ত হইব, কিন্তু উপায় নাই, আইনভঙ্গে শাস্তি। হঠাৎ আইনের অত্যাচারের কথাটাই চট করিয়া আমার মনে আসিবে, ও আইন অথবা আমার স্বাধীন কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে মনে করিয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিব। কিন্তু একটু ভাবিলে আর আমার তাহা মনে হইবে না। আমি যদি ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার স্বাধীনতাটুকু নির্কির্বাদে সেখানে ব্যবহার করিতে পারিতাম, তবে হয়ত অন্ত রাস্তার একটা লরী আসিয়া আমার গাড়ীর উপর পড়িয়া তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিত; সুতরাং ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া লরীর ধাক্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার স্বাধীনতা আমি লাভ করিলাম, ও তাহা এই আইনেরই জন্ত।

তা'র পর স্বাধীনতা উপভোগ করিতে হইলে কতকটা শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। তাহার অভাবে লোকে কোন্টা স্বাধীনতা কোন্টা অধীনতা তাহা বিচার করিয়া লইতে পারে না। ক্রীতদাস-গণকে যখন মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব হইল, তখন তাহারা সম্মিলিত এই আবেদন জানাইয়াছিল যে, তাহারা নিজদের অবস্থায়ই তুষ্ট রহিয়াছে, তাহারা অন্ত কোনো অবস্থার ভিতর গিয়া পড়িতে চাহে না। তখন যদি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অর্থাৎ কিনা তাহাদের সেই দাসত্বের ভিতর থাকিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এমন কথা কখনও বলা চলিত না। মানুষের স্বভাব রক্ষণশীল, তাহাদের মন চিরদিনই পরিবর্তনের বিরোধী। নূতন কিছু ভিতর গিয়া পড়িলেই (বিশেষতঃ যখন সে নূতন অবস্থার কথা একেবারেই অজানা) অনেক অসুবিধা, সুতরাং আমাদের দেশে যে কথা আছে “স্বপ্নের চেয়ে স্বোয়ান্তি ভালো” এই মনোভাবই সর্বত্র মানুষকে পাইয়া বসে। দ্বিতীয়তঃ

মানুষ সাধারণতঃ দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে চাহে না, সবাই জানে যে, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব আসিয়া ঘাড়ে জুটিবে। এই দায়িত্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক সময় লোকে স্বাধীনতার ইচ্ছা মন হইতে দূর করিয়া দেয়। ক্রীতদাসগণ খুবই বুদ্ধিত যে, তাহাদের অবস্থা কষ্টনায়ক, কিন্তু যে-অবস্থায় তাহারা আছে তাহা তবু জানা, তাহা ছাড়িয়া একেবারে অজ্ঞাত অবস্থায় (যে-অবস্থা তাহাদের সন্দিক্ত-মনে আরও কষ্টনায়ক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল) গিয়া পড়িতে তাহাদের ইচ্ছা হইতেছিল না। অশিক্ষিত মনে স্বাধীনতার মততা তাহাদের পাইয়া বসিতে পারে নাই। আমাদের দেশে বর্তমানে নারীর অবস্থাও তদ্রূপ; তাই দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার সর্বাঙ্গিক বেশী প্রতিবাদ করিতেছেন নারীরা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টিতে রাষ্ট্রের শক্তি। সুতরাং তাহা প্রবল বলে বলীয়ান ও সমাজের বিধি সংরক্ষার্থ অপরাধীদিগকে শাস্তি বিধান করিতে সমর্থ। ব্যক্তি মাজেরই রাষ্ট্রের সহিত এই সম্পর্ক যে রাষ্ট্র রক্ষার্থ যাহা-কিছু প্রয়োজন সমস্তই ব্যক্তি-নির্বির্শেষে সকলকেই দিতে হইবে এবং তৎপরিবর্তে তাহারা পাইবে জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা (security of life and property) ও স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কথাটা লইয়াই যত কিছু গোল। কি কি বিষয়ে রাষ্ট্রের ব্যক্তির উপর হস্তক্ষেপ করা বিধে ও কতটা করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে ও কতখানি অগ্রসর হইলে তাহার স্বাধীন কার্যকলাপে অন্তায় হস্তক্ষেপ করা হয়—এই প্রশ্ন লইয়া নানা দলে প্রভূত বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ও এখনও সে-বিষয়ে কেহ একমত হইতে পারেন নাই।

একদল আছেন যাহারা অরাষ্ট্রবাদী (anarchist),* তাঁহারা রাষ্ট্রের আবশ্যিকতা স্বীকার করেন না, বরঞ্চ

* অনেকে বিপ্লববাদী বলিতে অ্যানার্কিস্ট বুঝেন, কিন্তু অ্যানার্কিস্ট প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদী নহেন, তাঁহারা বিপ্লব চাহেন না, তাঁহারা চাহেন সমাজের শৃঙ্খলা ও সাম্য। রাষ্ট্রের অভাবেই ইহা রক্ষিত হইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

রাষ্ট্রের ভিতর সমাজের যত-কিছু অমঙ্গল দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা রাষ্ট্র তুলিয়া দিতে চাহেন ও প্রত্যেক লোককে স্ব-স্ব বিবেকের কাছে ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেন। মানুষেরা খারাপ, এধারাটাই মূলতঃ ভুল, বরঞ্চ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবতঃ ভালো; আইন, বিধি, দণ্ড, সামাজিক অসাম্য ও অবিচার তাহাকে ধারাপ করিয়া তোলে। মানুষ স্বভাবত অল্পকে খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় না, পরের জিনিস অপহরণ করাও মানুষের স্বভাবের ভিতর নহে। ডাকাতদের ভিতরও কতকগুলি বাধা নিয়ম আছে যাহা তাহারা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া থাকে। চুরি জিনিসটা অন্তায় বটে, কিন্তু ইহা অল্প একটা অন্তায়েরই প্রতিবাদ, বর্তমান কালের অর্থ-বণ্টনে সাম্যের লেশগন্ধ নাই, ইহা মুষ্টিমেয় লোককে বা সম্প্রদায়কে সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। যাহাতে মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের অন্তায়লক ধনবৈভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহারা স্বীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) আইনত স্বীকার্য করিয়া লইয়াছেন ও তাহা ভেদে ভ্রমকারীকে শাস্তি বিধান করিবার জন্য রাষ্ট্রকে চালিত করিয়া থাকেন। যদিও সকলের শক্তি-সমষ্টিতে রাষ্ট্রের শক্তি, তথাপি রাষ্ট্র এই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই চলে ও তাঁহারা নিজেদের সুবিধার জন্য ইচ্ছামত আইন-কাহন করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া যদি সম্পত্তি সর্বত্র সমাজের হইত, (যাহা এক-কথায় কাহারও নয় অথচ সকলেরই,) তবে চুরি কথাটার কোনো অর্থ থাকিত না। এই দলের একজন লেখক একটি চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন, চিত্রটি এইরূপ। “কোনো মাঠে একদল পাখী বসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে; কিন্তু কেহই সেই সংগৃহীত খাদ্য উপভোগ না করিয়া এক-কোণে জমাইয়া রাখিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি অকর্মণ্য পাখীর জন্য, সেই পাখী ক্ষমতায় হয়ত তাহাদের প্রত্যেকের হইতে দুর্বল, তবু সে পাইয়া যাহা উচ্ছিষ্ট রাখিতেছে তাহা খাদ্যসংগ্রহকারীরা পাইয়া নিজেদের ধন জ্ঞান করিতেছে। হয়ত তাহাদের মধ্যে একজন মনে করিল যে, “আমি যখন খাবার সংগ্রহ করিতেছি, তখন

নিজে খাইব না কেন ?” ও এই মনে করিয়া নিজ-সংগৃহীত খাদ্য খাইতে অগ্রসর হইল, অমনি দলের সমস্ত পাখী তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিল।” এই চিত্র বর্তমান-সমাজের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্থানে-স্থানে একটু অতি-রঞ্জিত থাকিলেও এই অরাষ্ট্রবাদীদের অনেক কথাই সত্য, ও একথাটাও সত্য যে, বর্তমান অপরাধের অনেকগুলির অন্য দায়ী সমাজের বর্তমানকালীন অসাম্য। তবে ইহাদের বিপক্ষে এই বলা যায় যে, ক্রিমিনলজি বা অপরাধতত্ত্ব যতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এমন ছ’-একজন লোক আছে যাহারা জন্ম-অপরাধী, অপরাধ করাই যাহাদের জন্মগত স্বভাব ও সংস্কার। তাহাদের লইয়া যে এই অরাষ্ট্রবাদীরা কি করিবেন তাহাই সমস্যার বিষয়।

অন্য মত যাহারা স্বাতন্ত্র্যবাদী (individualist), তাহারা রাষ্ট্রের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাহার হস্ত বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিতে চাহেন না। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের কাজ স্বল্প-পরিধির ভিত্তর নিবন্ধ থাকি কর্তব্য, তাহাদের ভাবায় যাহাকে বলে, ‘Individualistic minimum’। প্রতি ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তির কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতের একজন প্রধান সমর্থক, তাহার মতে রাষ্ট্র একটি অয়েন্ট-স্টক প্রোটেকশন সোসাইটি (Joint-Stock Protection Society,) অথবা যৌথসং-রক্ষণ সমিতি তাহার কাজ প্রজা-রক্ষা; তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কোনো প্রয়োজন রাষ্ট্রের নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতের খুবই প্রাতিপত্তি ছিল। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)-এর “Wealth of Nations” পড়িয়া সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লোকদের নিজ-নিজ হাতে ছাড়িয়া দিলে জাতির ধনসম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবর্তনবাদের সূত্র (Evolution Theory) তখন খুব প্রাতিপত্তি লাভ করে। সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া যায় যে, সত্য-সত্যই পৃথিবী জুড়িয়া প্রধানত

একমাত্র তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে প্রত্যেকেই লিপ্ত ও প্রত্যেকেই একে অন্নের সহিত লড়িতেছে। তাহারা তাহাও বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে সেই কেবল টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত যে, এ-সংগ্রামে জয়লাভ করে। যাহারা মরে মরুক, কারণ মৃত্যুই তাহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি; তাহারা মরিলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল, কারণ অক্ষয় লোক সমাজকে শুধু নীচুই করিয়া দেয়, আর কোনো কাজে আসে না। এই যুক্তির ফল যে কি বিষময় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই কিছু-কিছু জানেন। ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিযোগিতায় শ্রমিকেরা দিন-দিন নিঃশ্ব হইতে নিঃশ্বতর হইয়া চলিল ও তাহাদের অবস্থা পূর্বের জীতদাস অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়িল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের নিকট মরিবার স্বাধীনতা বই আর কিছুই রহিল না। সকলেই বুঝিল যে, প্রতি-যোগিতা চলে সমানে-সমানে, অসমানের সহিত প্রতি-যোগিতায় দুর্বলের নিধন অবশ্যজ্ঞাবী। শ্রমিকেরা দুর্বল বলিয়াই তাহারা নিকট নহে, কারণ অর্থের অধিকারী হইলে প্রতিযোগিতায় তাহারা ধনীদিগের সংহার করিতে সমর্থ। তা ছাড়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভই উৎকর্ষের মাপ-কাঠি নহে। এই জয়লাভ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুবিধার (opportunities) উপর নির্ভর করে। আর-একটা জিনিষও সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইল যে, সমাজ কখনও পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না, ইহার প্রধান ভিত্তি সহায়ত্ব ও সামাজিকতা বা সামাজিক একতা (social unity)। উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রতন্ত্র এক বা অন্য লোকের হাতে ন্যস্ত ছিল বলিয়াই তখন এই স্বাতন্ত্র্য-বাদ লোকের মনকে অতখানি মাতাইয়াছিল। গণতন্ত্র থাকিলে হইত তাহারা বুঝিত যে, রাষ্ট্রকে বেশী ক্ষমতা দিলেই তাহার জনসাধারণের পক্ষে অধিক উপকারে আসিবার সম্ভাবনা। সেইপ্রকার স্বাতন্ত্র্য আজকাল বড়-কেহ একটা চাহে না, ইহার কি-কি দোষ, তাহা সকলের চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে; আর গণতন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আজকাল সবাই চায় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করুক। আজ সকলেরই বিশ্বাস যে,

রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির পক্ষে (বিশেষত দুর্বলের) স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বর্তমান সামাজিক অসাম্যের প্রতিবাদে গণবাদের (Socialism) সৃষ্টি। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এই মতের প্রধান হোতা। গণবাদীরা বলেন যে, ভূমি (land) কাহারও নিজের সৃষ্টি নহে, ইহা প্রাকৃতিক দান, সুতরাং ইহা কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না। দেশের সম্পদ-সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ভূমি ও পরিশ্রমের (labour), ধনের (capital) কাজ খুবই সামান্য। কিন্তু সম্পদের ভাগ হইবার সময় সম্পদ-সৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ শ্রমের ভাগ্যে পড়ে নামমাত্র, যাহা দিয়া শ্রমিকেরা অনেক সময় নিজেদের দু'বেলার দু'মুঠা অন্ন-সংস্থান করিতেও পারে না, কিন্তু ধনিকেরা বিশেষ-কিছু না করিয়া পাথের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া সম্পদের ১৫ আনা ভাগের উপভোগী হইতেছে। অলস সম্প্রদায় যাহারা স্ত্রায়তঃ এক কপর্দকও পাঠাইবার অধিকারী নয়, তাহারাই সমস্ত ধনের মালিক ও তাহাদের হাতে শ্রমিকেরা কেনা গোলামের মত খাটিতেছে। এই অত্যাচার দূর করাই এখন সমাজ-হিতৈষীদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। কোন-কোন গণবাদীর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। সকল সম্পত্তি স্ত্রায়ত ও ধর্মত রাষ্ট্রের, দেশের এবং জাতির; যে যেরূপ পরিশ্রম করে, সে সেইরূপ ফললাভ করিলে স্ত্রায় রক্ষা হয়। গণবাদের তত্ত্ব আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বাহিরে, তবে গণবাদীরা রাষ্ট্রের কাব্য-সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানা দরকার।

গণবাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রতিকাজেই হস্তক্ষেপ করা উচিত। ধনিকেরা যাহাতে শ্রমিকদের দুর্বলতার প্রভাব লইয়া তাহাদের নির্যাতন করিতে না পারে এবিষয়ে কড়া নজর রাখা কর্তব্য। রাষ্ট্রকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে। অসাম্য ও অত্যাচার একমাত্র তাহাতেই দূর হইবে। গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে লোকের মনে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সবাই বুঝিয়াছে, রাষ্ট্র একটা ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা তাহাদেরই

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় টিকিয়া আছে, সুতরাং ইহার কার্য-কলাপ তাহাদেরই সমষ্টির কার্যকলাপ, ও তাহারা ইচ্ছামত ইহা দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া লইতে পারে। গণবাদের সহিত যে এখন প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরই সহানুভূতি তাহার প্রমাণ বেশ দেখা যায় যে, ইতালি প্রভৃতি স্থানে ফ্যাসিষ্ট (Fascist)-দের প্রতিপত্তি-সঙ্গেও ইংলণ্ড, জার্মানি এবং ক্রিয়ার রাজ্যভার বর্তমানে এই গণবাদীদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

এই গণবাদীদের ভিতর একদল চরমপন্থী আছেন, যাহারা মস্ত একাকার করিয়া দিতে চাহেন; ইহারা কমিউনিস্ট; বর্তমান ক্রিয়ার বল-সিভিজম্ এই কমিউনিস্ট-প্রসূত। আর একদল আছেন, যাহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীকার করিতে চাহেন না, পরন্তু কেবল ধর্মঘট করিয়া শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী ও পাওনা আদায় করিয়া লইবার উপদেশ দেন, ইহারা সিওক্যালিস্ট।

বর্তমান রাষ্ট্রজগতে গণবাদ সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত না হইলেও প্রতিরাষ্ট্রই এটুকু ধরিয়া লয় যে, রাষ্ট্র যখন সকলের সম্পত্তি ও সকলেই তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি-উপভোগে এই রাষ্ট্রের নিকট দায়ী, তখন এমন কোনো জিনিষ নাই, যাহা একমাত্র ব্যক্তিগত কাজ (individual concern) যাহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বস্তুত প্রতি ব্যাপারেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ ও প্রয়োজনানুসারে তাহার তাহা করাও কর্তব্য। তবে কতকগুলি জিনিষ আছে, যেমন স্বাস্থ্য-শিক্ষা, গৃহধর্ম ইত্যাদি, যাহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রতিব্যক্তির নিজ-নিজ হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহা আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সে-সব বিষয়ে সুবিধা ও সৌষ্ঠবের নিমিত্ত রাষ্ট্র তাহা ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেয়। উপরন্তু রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালনা করা সম্ভবপরও নহে। মানুষের কচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন, এক নিয়মে (যাহা ছাড়া রাষ্ট্রের গত্যন্তর নাই) সমস্ত পরিচালনা করা অসুচিত ও অসম্ভব। কিন্তু স্থানে-স্থানে মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইলেও মোটামুটি দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য রকম এক, অনুসন্ধান করিলে সব মানুষের ভিতরই একটা সামাজিক মিলন (social harmony) পরিদৃষ্ট হয়, যাহার

উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্র সার্বজনীন উন্নতি সাধন করিতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে গণতন্ত্র (democracy) এই স্বাধীনতা-দানে প্রভূত চেষ্টা করিতেছে। গণতন্ত্র আজকালের সৃষ্টি নহে, ইহা গ্রীক আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এথেন্সের গণতন্ত্র (Athenian Democracy) সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে বর্তমান গণতন্ত্রের মৌলিক তফাৎটা আমাদের দেখিতে হইবে। এথেন্সের গণতন্ত্র ছিল একমাত্র সিটিজেনদের জন্য, সাধারণের তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরিস্টটলের মতে সে-ই সিটিজেন হইবার উপযুক্ত যাহারা হুকুম করিতে (to rule) ও হুকুম পালন করিতে (to obey) শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ক্রীতদাসদের ত কথাই নাই, কারণ তাহারা জীবিত যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন-কি mechanics, helots ইত্যাদিরা সিটিজেন হইবার উপযুক্ত নয়, কারণ তাহারা এমন কাজ করে, যাহাতে তাহাদের নিজেদের জীবনের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পেরে হুকুমের উপর নির্ভর করিতে হয় ও কাজে-কাজেই তাহাদের হুকুম করিবার ক্ষমতা জন্মে না। সম্রাটদের হাত হইতে বর্তমানে রাজ্যভার সাধারণের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ জনসাধারণ (the people), সুতরাং গণতন্ত্র বৃদ্ধিতে আমরা আজকাল সাধারণের রাজত্ব বৃদ্ধি।

কিন্তু গণতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে নাই। যে-দলের সংখ্যা কম (minority), তাহাদের সাধারণত গণতন্ত্রের অধিক সংখ্যকের (majority) দ্বারা নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের স্বার্থ (interests) ও দাবী (claims), গণতন্ত্রে অবহেলা পাইবার আশঙ্কা, বিশেষতঃ সেইখানে যেখানে একমাত্র লোকের ভোটের সংখ্যা দ্বারা রাজকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। তা' ছাড়া গণতন্ত্রের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইলে দলদলি সৃষ্টি অবশ্যস্বাভাবিক। দলদলিমূলক রাজকার্য (party system of government) চিরদিনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দলের নিয়মের (party discipline) জন্ত স্তম্ভ করিতে হয়

ও দলের নেতাদের প্রায়ই রাজ্যের অধিক ক্ষমতা জন্মে। একান্ত স্বাধীনচেতা যিনি, সাধারণতঃ তাহার কোনো দলে স্থান হইবার সম্ভাবনা কম। তাহার কোনো-না-কোন দলের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে, নহিলে জনসাধারণের কাজের দ্বার (the opportunities of public life) তাহার নিকট চিরদিনের তরে বন্ধ থাকিবে।

বর্তমান গণতন্ত্র মাহুষের দাবী অসুধায়ী নহে, ইহা ক্রমশই স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু উপায় কি? শত সহস্র লোকের এই সময়ে একই নিয়মাধীনে থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা কি উপায়ে সম্ভবপর হইতে পারে? সম্ভ্রতি একটি দল সৃষ্ট হইয়াছেন, যাহারা বহুরাষ্ট্রে (pluralistic state)। ইহার উপায় দেখেন। ইংলণ্ডে Lashi, ফ্রান্সে Despagne এই মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। তাহাদের মতে বর্তমান রাষ্ট্রকে বিশেষ করিয়া দেওয়া উচিত ও তৎপরিবর্তে অসংখ্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করা কর্তব্য। প্রত্যেক মাহুষই নিজের জীবনের ভিতর এমন অনেক সম্ভ্র (associations) সহিত সংমিশ্রিত যাহার সহিত তাহার বোঝাপড়া তাহার রাজ্যের রাষ্ট্রশক্তি হইতে অনেক গুণ বেশী। আমেরিকার বণিকদের সহিত ইংলণ্ডের বণিকের যে-সম্ভাব ও পরস্পরের মধ্যে যে-বোঝাপড়া আছে, ইংলণ্ডের অধুমপানকারীদের সঙ্গে তাহার দেশের বণিকদের হয়ত তুলনা নাই। সমগ্র বিশ্বজোড়া শ্রমিকদের ভিতর যে-সম্ভাব বর্তমান কোনো দেশের ধনিক ও শ্রমিকদের ভিতর তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। প্রতি লোকের কর্মক্ষেত্রের ভিতর এক-একটি রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে; তাহারা নিজেদের কাজ নিজে বোঝে সুতরাং নিজেদের সুবিধাসুধায়ী রাষ্ট্রকে পুনঃ গঠন করিয়া লইতে পারিবে। একমাত্র এই উপায়ে রাষ্ট্রকে তাহার বর্তমান কাঠকাম (wooden character) হইতে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব ও এই উপায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। চার্চের হাতে বিশপদের ছাড়িয়া দাও, ব্যবসা বাণিজ্যের সমবায়ের (Trade guilds) হাতে ব্যবসায়ীদের ভার ন্যস্ত কর; একরাজ্যেও ব্যবসায়ী, কবি, সন্ন্যাসী ইত্যাদী সকলকে এক নিয়মে একই আইনের

পেষণে একাকার করিয়া দিতে চাহিও না, তাহা হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা আকাশ-কুসুম বই আর কিছুই থাকিবে না। বহুরাষ্ট্র (Pluralistic State) প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে কি না স্থানাভাববশত এখানে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না। যাহারা এ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাহারা লাস্কির (Laski) বই বা মিস্ ফাউলেট্ (Miss Fowlett) প্রণীত "The New State" পড়িয়া দেখিতে পারেন।

'স্বাধীনতা'-প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করিয়া এখন জাতীয়তা (Nationalism) সম্বন্ধে ছুএকটি কথা বলা যাউক। জাতীয়তা উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি, রাষ্ট্রজগতে ইহার প্রবল শক্তির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় জার্মান শক্তির গঠনে। মানব-সমষ্টির ভিতর তাহারাই জাতি বন্দিয়া অভিহিত হইতে পারে, যাহাদের ভিতর একটা প্রচণ্ড একতা বর্তমান, বাহিবের ধাক্কা যাহাদের কখনও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারেনা। লোক-সমষ্টি হইলেই শুধু শক্তির সৃষ্টি হয় না, তাহাদের সমষ্টির ভিতর ঐক্য থাকিবে প্রয়োজন। প্রথম ঝাপটায় যদি তাহারা যে যাহার সরিয়া পড়ে তবে সংখ্যাগুণ যতই বেশী তাহারা হউক না কেন, শক্তি তাহাদের তেমন কখনও ক্রমিতে পারে না। এক ভাষা, এক ধর্ম, ভাল-মন্দে এক সূত্র, এক শিক্ষা সাধারণতঃ মানব-সমষ্টির ভিতর একতা জন্মাইয়া দেয়। অল্প ক্ষেত্রে একই স্থানে বসবাস, একই অবস্থার ভিতর দিয়া দৈনন্দিন জীবন অতিবাহন করাও জাতীয়তা গঠনে বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে। একই বিপদ যখন সমগ্র দেশকে অভিভূত করিয়া তোলে, কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যখন দেশের সকলের একই অভিযোগ মন ভোলপাড় করে তখন সেই দেশের লোকসমষ্টির ভিতর জাতীয়তা অতি সহজেই গঠিত হইয়া উঠে, অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ভীত ইটালির জাতীয়তা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ-বলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; বর্তমানে যে ভারত-বর্ষে জাতীয়তার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহার প্রধান কারণ যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মাগাঠা সকলেই আজ বৈদেশীর বিরুদ্ধে মনে-মনে অভিযোগ পরিপোষণ

করিতেছে, সকলেই আজ একই ছুখে মিলনের ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছে।

জাতীয়তার প্রধান দাবী স্বতন্ত্র শাসন। পোলরা (the Polish) আর জার্মান কিংবা রুশিয়ার শাসনাধীনে থাকিতে চাহে না, তাহারা নিজেদের যত নিজেদের রাজত্ব চায়, কারণ তাহারা নিজেরা একটি জাতি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্য জাতির শাসনাধীনে থাকিতে তাহারা নারাজ। যুদ্ধের পর রাজ্য-বিতাগে এই জাতীয়তার দাবী সর্বাগ্রে গ্রাহ্য করা হইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা স্থাপন, বর্তমান রুশিয়ার বিপ্লব—সকলেই এই জাতীয়তার শক্তির প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত।

অন্তর্জাতীয়তা (Internationalism) ও জাতীয়তা বিরুদ্ধবাদী শব্দ নহে। জাতীয়তা যাহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর করিয়া দেয় অন্তর্জাতীয়তা তাহা জগৎ জুড়িয়া সম্ভব করিতে প্রয়াস পায়। এক দেশে ভিন্ন সম্প্রদায়রা যেমন স্ব-স্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের সমোদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর মিলনের দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তোলে তেমন পৃথিবীর নানা জাতি সার্বজনীন মিলনের ক্ষেত্র খুঁজিতে পারিয়া স্ব স্ব সুবিধার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরস্পরের ভিতর একটা সান্মিলনের অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রাপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান-আলোচনা (ইহাদের পরিধি কখনও একই দেশের গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহাদের ক্ষেত্র জগৎ-জোড়া) ধর্ম-প্রচার—এইসমস্ত মিলিয়া বর্তমানে সকল জাতির চক্ষে আজুল দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সভ্যতার এই যুগে, এককোণে পড়িয়া থাকা আর চলে না, জগতের ধারা আর তাহাদের না টানিয়া যাইবে না, সুতরাং বর্তমানে সমাজ, দেশ ও পৃথিবী সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য অন্তর্জাতীক সংস্পর্শ ও সৌহার্দ্য। আন্তর্জাতিক বিধি (International Law) এই বিষয়ে জগৎকে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে। বর্তমানে জাতি-সঙ্ঘ (League of Nations) ইহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবে বলিয়া দাবী করিতেছে।



মহাকবি বাইরন্ লিখিয়াছেন—পুরুষের জীবন-গ্রন্থে প্রেম একটি অধ্যায় মাত্র, কিন্তু নারীর জীবনে ইহা সর্ব্বম্ব। এই উক্তির সত্যতা ও প্রেমের একটি অধ্যায়ই যে চুই এক-জনের পক্ষে কী সাংঘাতিক হইয়া উঠে কবি মদনমোহন ঋতুগীরের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী ইতিহাস লিখিবার জগুই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

মদনমোহন ঋতুগীর কবি। কাব্য তাঁহার পেশা না হইলেও তিনি চায়ের দোকানে কবি, মেসে কবি, রাস্তায় বটের ছায়ায় কবি, পানের দোকানের সম্মুখে কবি, চলনে কবি, বস্তুতায় কবি, আত্মাভিমানের কবি এবং গৃহিণী ও সম্পাদকগণের সহিত মানঅভিমানের কবি। বস্তুতঃ কাব্য তাঁহার জীবনের সবখানি না হইলেও তাঁহার জীবনের সমস্ত কাজে কাব্য-আর্ট-প্রেমের ছাপ আছে। তিনি কবিতা লেখেন ভাল, কিন্তু লেখা কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করেন অনেক বেশী। কোনো-না-কোনো দিক্ দিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা কাব্যসাহিত্যের বিশেষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, কোনো কবিতা তাঁহার বাঙলা স্পেন্স-রীয়ান্ ছন্দে লিখিত, কোনো কবিতার অঙ্কে মিল না থাকিলেও পাঠক মিল আছে ভাবিয়া মহোন্মাদে পড়িয়া যায়—ইত্যাদি। তিনি ছইটম্যানী ছন্দে কবিতা লেখেন

না। মোটের উপর এক কথায় মদনমোহন-বাবু বস্তুতঃ কবি এবং কাব্যতঃ ইন্সুল-মাটার।

মদনবাবু তাঁহার কাব্যসুভূতির প্রথম হিড়িকে তাঁহার কবিতা-স্বপ্ন বাছাই করিয়া “ধোয়ার হাট” নামে এক কাব্যগ্রন্থ ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন যে, অচিরে এই বস্তুতাত্ত্বিক জগতের কঠোরতার উপর তাঁহার ভাবের ধোয়ার আবরণ দিয়া তাহাকে বোঝাবৃত্তা আরব-মহিলার মতই মহিয়সী ও লোভনীয় করিয়া তুলিবেন। আসলে কিন্তু বইখানিতে বেশ উচ্চ ধরণেরই কবিতা স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু কয়েকটি কবিতা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয়-জাতীয় একটা ভাব জাগাইয়াছিল মাত্র; প্রীতির উদ্বেক করিতে পারে নাই।

মদনবাবু বেশ উচ্চরের কবিই ছিলেন। তাঁহার কবিতা যথার্থ কাব্যমোদীদের আনন্দ বিধান করিত। কিন্তু হায়, এই কবির দেশে যথার্থ কাব্যমোদী কোথায়? তাঁহার কবিতা ইত্যাদির ভক্ত যে কেহ ছিল না তাহা নহে তবে তাঁহার অকবিঅনোচিত চেহারার নীচে অনেক ভক্ত চাপা পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বাজে কবিতা লিখিতেন না এবং উচ্ছ্বাসবশে ধারণা জিনিষ কলমের মুখে বাহির হইয়া পড়িলেও ধারণা মনে

হইলে কোনো লেখাই ছাপিতেন না; বারবার কাটিয়া-
কুটিয়া ভঙ্গগোছের করিয়া নিজের মনোমত হইলে তবে
ছাপাইতেন। তবু লোকে তাঁহার লেখা পড়িত না;
বাক্সে 'রদ্দি' কবিদের লইয়া ছড়াছড়ি করিত।

এই নিদাক্ষণ হত্যাগরে মদন-বাবু বিশেষ আঘাত
পাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই তাঁহার লিপিত কবিতাকে
ছাপাইয়া তাঁহার মৌখিক কবিতা মাথা তুলিয়া উঠে ও
তাহা রীতিমত একটা ব্যারামে দাঁড়াইয়া যায়। মনস্তত্ত্ব-
বিদেরা সম্ভবতঃ ইহাকে Repression (কামনাদমন) এর
পর্যায়ভুক্ত করিবেন। কিন্তু আমরা জানি বলিয়াই
মদন-বাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না।

মদন বাবু তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই বলিয়াই
তাঁহার সামান্ত কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে
সেই সম্মান একটু অধিক পরিমাণে দাবী করেন। হয় ত
একই কবিতা পাঁচটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাঁচ বার
শুনিত হইবে, শুনিয়াছি বলিলে নিশ্চয় নাই; কবি অমনি
ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অরসিকেষু.....উত্যাদি বলিয়া গুণ
হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেকী সাধ্য-সাধনা!
কবির জীবিতকালে হয়ত প্রত্যেকটি কবিতা ২৫ বার
টাকাটীপ্‌পনী সমেত শুনিত হইয়াছে। আমরা মদন-
বাবুর দুঃখের কারণ জানিতাম বলিয়াই তাঁহাকে
অল্প বাহবা দিয়া ফুলাইয়া রাখিতাম। তিনি
আমাদিগকে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় বলিয়া পরিচয়
স্বখে থাকিতেন।

কিন্তু এত করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না।
অলক্ষ্য দেবতা যে আমাদের অলক্ষ্য বেচারী কবিকে
এতখানি নাকাল করিবে তাহা কি বুঝিয়াছিলাম?—অথবা
একচক্ষু হরিণের মত যদিকে বিপদের আশঙ্কা নাই
তাবিষয় নিশ্চয় ছিলাম অতর্কিতে সে দিক হইতেই
আক্রমণ হইল।

আমরা ভাবিতাম, মাসিক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত মদন-
বাবুর কবিতা কেহ পড়ে না; আমরাই স্থানে অস্থানে
চায়ের দোকানে বা ফুটপাতে দাঁড়াইয়া অনন্তমনা হইয়া
শুনিয়া শুনে আসলে মদন-বাবুকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান
দিয়া থাকি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। অন্ততঃ একজন

মহিলা যে তাঁহার নিয়মিত পাঠিকা ছিল তাহা জানিতে
পারিয়াছি।

বিপদ আরম্ভ হয় 'পসারিণী' পত্রিকায় প্রকাশিত মদন-
বাবুর 'আমি' কবিতাটি হইতে। মদন-বাবু সুপুরুষ
নহেন। স্ফাতোদর, কৃষ্ণকায়মুষ্টি; বিকশিত দস্তপংক্তি
বিদ্যুৎচমকের সৃষ্টি করিত। তিনি হেলিয়া ছলিয়া
চলিতেন, সশব্দে বলিতেন, যেখানে-সেখানে নিঃশব্দ
ত্যাগ করিতেন এবং কথার তোড়ে থুথু ছিটাইয়া প্রেমের
পরিবর্তে বিকল্প ভাবই মনে জাগাইতেন। কিন্তু ছাপার
অক্ষরে ত আর মাতৃষটিকে দেখা যায় না। কালিদাস
যদি সুপুরুষ না হইয়া আজকালকার মত মাসিক পত্রিকায়
মাসের পর মাস তাঁহার মেঘদূত বা কুমারসম্ভব ধারা-
বাহিক ভাবে ছাপাইতে আরম্ভ করিতেন তবে তাঁহার
পাঠিকা প্রেমিকাদের মধ্যে যে একটা রীতিমত কুরুক্ষেত্রের
অবতারণা হইত, ইহা আমরা হৃদয় কল্পনা বলিতে পারি।
এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। 'আমি' কবিতাটি পড়িয়া শ্রীমতী
পঙ্কজিনী হালদার আপনাবিস্মৃত হইয়া মনে মনে কবিকে
প্রীতির চক্ষে দেখিতে শুরু করিলেন। সেই কবিতার
'আমি' ব্রহ্মণ্যগৌরবে দীপ্যমান পুরুষ। তাঁহার ললাট
প্রশস্ত, বক্ষ সুবিশাল, নাসিকা খড়্গধার, জিহ্বাঃ মধু—
অন্তরে উদ্বেল অজ্ঞানিত প্রেমসীর 'লাগিয়া' প্রণয়োল্লাস।
পঙ্কজিনী কবিতে কাব্যবর্ণিত গুণগুলি বলিয়া
মজিলেন।

কবিতাটি পড়িলে পঙ্কজিনীকে বিশেষ দোষ দেওয়া
যায় না। সেই 'আমি'কে আমাদেরই হিংসা হয়। 'আমি'র
ধানিকটা এই—

* * * *

আমি ব্রাহ্মণ, ললাটে আমার দাউ দাউ হোমানল—
নয়নে আমার যজ্ঞ-অগ্নি হবি-শিখা ছাতিমান;
নাসিকায় মোর খড়্গধার—মুখ-জ্যোতি অলঙ্কার,
তপের বহি আমি, তেজে অলি' দীপ্তিতে অবসান।

আমি গায়ত্রী, মধু-জিহ্বায় সবিতার গাহি জয়—
আমিই সবিতা 'তুতু'ব' আমি.'খ' মোর শিখাটি ঘিরে;
ওঁকার আমি, টঙ্কারে মোর ব্যোম ব্যোম ধনি হয়
নয়নাগ্নিতে মদনভঙ্গ,—রতি সে কাঁদিয়া ফিরে।

বন্ধ আমার কবীট-বিশাল, যুগরাজ জিনি' কটি ;
 বাহতে আমার ভীম বিক্রম, আমি সে সব্যসাচী ;
 অন্তরে মোর জনম নিতেছে নব ভাব কোটি কোটি ;
 পার্কীতী হ'ল প্রেমের যোগিনী আমার প্রসাদ যাচি' ।

আমি শুধু 'আমি' ধ্যানী যোগীর তুষারমৌলি গিরি ;
 বন্ধ আমার অতলান্তিক উদ্বেল ভাব-ঝড়ে ।
 আমি 'কাবা' আমি মক্কাশরীফ হজ ক'রে ক'রে ফিরি—
 আমার জ্যোতিই হিমমেকদেশে অরোরার আলো ধরে ।

উমারে আমার স্বন্ধে লইয়া আমি নাচি তাণ্ডব—
 ভাব-উমা মোর লেখনী-চক্রে হয় যে পীঠস্থান ;
 আমি ব্রাহ্মণ আমারই বন্ধে আছো দহে খাণ্ডব,
 প্রেমের অমৃতে কণে কণে আমি হই অমৃতায়মান ।

পঙ্কজিনী নিবিড় বাধনে বাধা পড়িলেন । মদনবাবুর
 কবিতা পাইলেই অতি যত্নে তাঁহার নোটবইয়ে সংগ্রহ
 করিয়া অবসর-বিনোদন করিতেন । তাঁহার ধ্যান-ধারণা
 মদনবাবুর 'আমি'কে লইয়া একাকার হইয়া গেল ।
 পঙ্কজিনী মরিলেন—মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন ।

পঙ্কজিনী হালদার কে তাহা আমরা বলিব না ।
 প্রেমের যাহা বাধা এবং আত্মকালকার উপশ্রাস ও গল্প-
 লেখকগণ যে বাধার কথা একেবারে বিস্মৃত হন অর্থাৎ
 পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, মানসম্বন্ধ, অর্থাভাব এসব কিছুই
 বাধা গল্প-উপশ্রাসের নায়িকাদের মতন তাঁহার ছিল না ।
 তিনি প্রায় ভূইফোড় ছিলেন । স্বাধীনা ছিলেন । সুতরাং
 মাসিকে মদনবাবুর নিত্যনবপ্রকাশিত কবিতারূপ কুসার
 বাতাসে সে প্রেম ! স্তরোস্তর বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তরুণ-
 পত্রে প্রকাশিত 'ঐরাবত' কবিতাতে আসিয়া বিরাট-রূপ
 ধারণ করিল । কবি মদনমোহন ইন্দ্রের ঐরাবতে চড়িয়া
 প্রেমের বিজয়যাত্রা করিয়াছেন । শচী হইতে পাচী
 পর্যন্ত কেহ আর বাদ রহিল না, একে-একে সকলেই
 সেই প্রেম-ঐরাবতের চরণতলে পিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকার
 হইয়া গেল । ঐরাবতের উপরে কবি ; প্রেমিকারা
 হতাশ হইয়া সরিয়া যাইতেছে—

* * * * *
 "ঘণ্টা-নির্নাদ ওই শোনা যায়—
 গজরাজ আসে ধীরে—
 প্রেমিকারা সবে সব ভুলে যায়
 দাঁড়ায় পথটি ঘিরে ।
 নিম্নলিচক্ষু কবি বসে' পিঠে
 বুকের অবতার—
 এত যে তরুণী, এত দিঠি মিঠে—
 সব হয় ফুৎকার !
 ঐরাবত সে ছলে-ছলে চলে
 কিছু না খেয়াল করি'—
 প্রেমিকারা পায়ে পড়ে দলে-দলে
 কবি যার আশুসরি'—"

তার পর কবির স্বপন-বাহিতা আসিলেন ; এবং
 মোজেসের সম্মুখে নীল নদীর মতন নারীর ভিড় ছুই পাশে
 সরিয়া গেল । মোহিনীর দৃষ্টি অঙ্গে লাগাতে ধ্যানীর
 ধ্যান ভাঙিল, কবি আয়ত আঁখি মেলিয়া চাহিলেন,
 চারি চক্ষের মিলন হইল, ঐরাবত হাঁটু গাড়িয়া বসিল,
 প্রেমসী গজপৃষ্ঠে উঠিলেন, অয়ডকা বাজিয়া উঠিল, কবি
 বলিলেন—

"ওগো বাহিতা, কোথা ছিলে তুমি
 কোন্ সে স্বপন-লোকে !
 জীবন আমার ছিল মরুভূমি
 তোমার বিরহ-শোকে ।"

প্রেমসী বলিলেন—“জীবন আমার সফল আজিকে
 আমি পেছু হৃদিরাজা” ।

কবি বলিলেন—“এসো মুখোমুখি থাকি অনিমিখে—”
 তারপর বাদ্যকরদের ডাকিয়া বলিলেন—

“মিলন-বাদ্য বাজা ।”

পঙ্কজিনী নায়িকার স্থলে আপনাকে বসাইয়া অধীর
 হইয়া উঠিলেন । কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া
 চাই-ই । তিনি 'পসারিনী' পত্রিকার সম্পাদকের কেয়ারে
 মদনবাবুকে বহু স্তুতিবাদ করিয়া একটি 'লিপি' লিখি-
 লেন । সে-লিপিটি আমরা মদনবাবুর কাছে অনেকবার



চারি চক্কর মিলন হইল, ঐরাবত হাঁটু পাড়িয়া বসিল

দেখিয়াছি। বিশেষ কিছু ছিল না কেবল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। শুধু একটি লাইন ছিল—‘হে সুন্দর কবি—বন্ধের নারী সমাজের তরফ হইতে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি’। সেই লাইনটিই মারাত্মক হইল। মদন-বাবু বিগলিত হইয়া মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করা যায়। একদিন আমাদের সঙ্গে চায়ের দোকানে তর্কই বাধিয়া গেল। হাতের লেখা, চিঠির কাগজ, খাম ইত্যাদি দেখিয়া মদন-বাবু পঙ্কজিনীর এক রূপ কল্পনা করিয়া গেলেন, আমাদের বর্ণনার সঙ্গে তাহা মিলিল না বলিয়া মদন-বাবু মহা ধাক্কা। “তুমি স্ত্রী স্ত্রী শিখরদশনা’ নিশ্চয়ই”। আমরা শেষে হটিয়া গিয়া বলিলাম “নিশ্চয়ই”।

তার পর যাহা ঘটিল, অন্তর্ভাষ্যমীই বলিতে পারেন; মদন-বাবু আমাদের গোপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে অবশ্যই সমস্ত জানিয়াছি। যখন মদন-বাবু পঙ্কজের ‘অ’টি উড়াইয়া দিয়া পঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার

সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তখন এই গোপন অভিসারের বার্তা গোপন করিতে পারেন নাই।

পঙ্কজিনীর চিঠি পাইয়া মদনবাবু তাঁহার এক কপি “ধোয়ার হার্ট”এর উপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ঠিকানা-জানা অজানা প্রেমসীর উদ্দেশে গোপন অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া ডাকঘোষে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে লিখিলেন—

“হে গোপন, তব মু’খানি হেরেছি স্বপনে,
কাটায়েছি কাল না-জানা নামটি অপনে;
তব প্রেম মম হৃদয়-কুঞ্জে বপনে—

হে প্রেমসী, আমি তুখারী—”

যাহা হইবার হইল, ঘন ঘন পত্রাঘাত হইতে লাগিল। পঙ্কজিনী মজিলেন, মদন-বাবু ডুবিলেন।

তারপর একদা প্রেমসী ঠিকা গাড়ী করিয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেদিন রবিবার, মধ্যাহ্নকাল। বসন্তের হাওয়া তখন সবে মাত্র কচি অশ্বখপাতাগুলি দোলাইয়া, বহিতে শুরু করিয়াছে। মন উড়ু উড়ু

কারতেছে। কাব স্বানের গামছাখান পরিধান করিয়া দেড়হাত মাছুরের উপর নগ্নগাত্রে উবু হইয়া বসিয়াছেন। বা হাতে খেলো ছঁকাটি ধরিয়া নিম্নলিখিত ঘন ঘন টান দিতেছেন। ডান হাতে সম্মুখেখোলা সুইনবার্ণের Songs before Sunrise (উষার গান) নামক কবিতা-পুস্তকের পাতা উন্টাইতেছেন। সাধের কল্যা পিতার রোমশ কৃষ্ণ বুক তৈল মর্দন করিতেছে। কবিগেহিনী রান্নাঘরে ইলিশমাছ ভাজিতেছেন।

স্থান ও কাল উপযুক্ত সম্বোধন নাই, কিন্তু পাত্রটি তখন ঠিক নাগকের অবস্থায় ছিলেন না। এমন সময় ঠিকা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

মদনমোহনবাবু যখন পঙ্কজিনীর উদ্দেশে সপ্রেম লিপিশুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার মনে উদ্ভিত হয় নাই যে, অঘটন-ঘটন-পটিনসা পঙ্কজিনী এমন অধীর হইয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িবেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাই কাব্য, ইহাই শব্দ। কিন্তু কাব্যের পিছনে 'বস্তু' দাঁত বাহর করিতে পারে বা মধুর লোভে হলের তাড়না সহ করিতে হয় ইহা তাঁহার কবি-মানসের সুদূর কল্পলোকেও ছিল না। আর এও ত অজ্ঞায়। কবির সাহিত্য সাক্ষাতের স্থান কখনই কবির গৃহ নয়; সেখানে গৃহিণীরূপ প্রকাণ্ড একটা 'বস্তু' শতমুখী হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। স্থান ঠিক কবু, তারপর ত সাক্ষাৎ। ইর্ভেন গার্ডেন রহিয়াছে, ম্যাডান কোম্পানীর অমন অমন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা রহিয়াছে, টার থিয়েটার আছে, গড়ের মাঠ আছে, নিদেনপক্ষে কালীঘাটের কালীবাড়ীও ত রহিয়াছে। তাহার পর, ফরসা ধুতি আছে, কোঁচান চামর আছে, পাউডার, ক্রীম, পমেটম আছে, আরো কত কি ভাবিতে হয়; বিয়ত্রিশে কি করিয়া-ছিলেন ভাব্—মহাশেতার কথা মনে কবু। তা না, এমন সময়ে বাড়ীতে অকস্মাৎ—

পঙ্কজিনীরও দোষ নাই। তিনি কবি ও কাব্যকে তফাৎ করিতে পারেন নাই। কাব্যে যেমন কবি অবাধে ঔরভঙ্গীবের অস্তঃপুর হইতে শচীর বিলাসকক পর্য্যন্ত সর্বত্রই আড়ি পাতিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল জীবনেও তাঁহার সেইরূপ অবাধ গতিবিধি। তাঁহার

স্ত্রী পুত্র পরিবার নাই তিনি যেন একখানি ডাঁটাইন পদ্ম—কাব্য-সরসীর বুক হাওয়ায় দোল খাইতেছেন। কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য এত বড় আঘাতটাই মানুষকে পাইতে হয়!

নাগরা-জুতা-পরিহিতা পঙ্কজিনী অতি সন্তর্পণে আসিয়া অনামিকা-ও তর্জনী-সহযোগে ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। কটাকট শব্দ হইল; পঙ্কজিনীর বুক টিব্ টিব্ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুক বুঝি শতধা ফাটিয়া পড়িবে। এত করিয়া শাড়ী আর ব্লাউজের রং মিলাইয়া পরিয়া আসিলেন—মনে হইতে লাগিল বোধ হয় ঠিক খাপ খায় নাই। ঘামে বুকের পাউডারটা সব উঠিয়া আসিল। ঘন ঘন ক্রমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ফিরিয়া যাই—কিন্তু কড়া নাড়িয়া চলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? আর এতক্ষণ হয়ত কবির অস্ত্রলোকে আগমনীর সানাই বাজিতে শুরু হইয়াছে।

রান্নাঘরের পাশেই দরজা। 'কে গা' বলিয়া কবি-গিন্নী দরজা খুলিলেন। পঙ্কজিনী ধীর-মন্দগতিতে ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে চকিতে চাহিয়া লইলেন। গিন্নীকে দেখিয়া ভাবিলেন—কি বোধ হয়। তারপর উঠানে কবির সেই বিচিত্র বেশ দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, ভাবিলেন কবি বাস্তব জগতের কিছুই দেখেন না বলিয়া কি চাকরে বাড়ীর উঠানেই এত-সব বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করে। কবিকে এ-সম্বন্ধে কি বলা কর্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

তারপর সাহস সঞ্চয় করিয়া গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ই্যাগা বাছা, মদনমোহন-বাবু কোথায়?" কবি-গিন্নী একটু মুচ্ক হাসিয়া কথা না বলিয়া অজুলিনির্দেশে কবিকে দেখাইয়া দিলেন।

পঙ্কজিনীর চারিদিকে বাড়ী ঘর-ছয়ারগুলি ছলিতে শুরু করিল। উঠানে উপবিষ্ট কবিকে কয়লার গালা বলিয়া ভ্রম হইল। তিনি শুরু হইয়া গেলেন। কবিগিন্নী চেয়ার আগাইয়া দিয়া যখন বলিলেন, 'বসুন না', তখন তাঁহার ক্রোধের বেগ একটা বহির্দ্বার পাইয়া সবেগে বাহিরে আসিতে চাহিল। তিনি ছুটিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া কান্না-গদগদভাবে বলিয়া উঠিলেন— 'তুমি, আপনি—মদন-বাবু' বলিয়াই নাগরা-জুতা-সমেত



কবীর গাথা বলিয়া অম হইল

হই পাক ঘূর খাইয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুখ হইতে বাহির হইল 'জুমাচোর !'

কবি ত এদিকে ভ্যাবাচ্যাকা। বহুকষ্টে হ'কাটি নামাইয়া কৌপণ্যে গিন্নীকে কহিলেন, "ওগো এ'কে দেখো"। কবি-কন্ডা কাদিয়া উঠিল। গিন্নী জল লইয়া পঙ্কজিনীর মুখে জলের ঝাপটা দিতে শুরু করিলেন।

পঙ্কজিনী ও কবির মধ্যে সে-ঘাত্তা কে রক্ষা পাইলেন বলা কঠিন। তবে কবি গিন্নীর নিকট কেঁচো বনিয়া গেলেন; আজকাল তাঁহার কবিতার ধারা শুক হইয়াছে, বড়-একটা কোথায়ও বাহির হয় না। তবে বঙ্গসাহিত্য-গগনে আর-একটি নূতন কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি পঙ্কজিনী হালদার।

পঙ্কজিনীর গায়ের জালা অনেক দিন ধরিয়াছিল। তাহার পর 'পসারিনী' পত্রিকায় পঙ্কজিনী হালদারের 'তুমি'-নামক কবিতাটি বাহির হইবার পর এই হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন হইয়াছে। কবিতাটির কতক অংশ তুলিয়া দিয়া আমরাও এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

* * * * *
তুমি শূন্যক, 'ভগু পূজারী, আবর্জনার স্তূপ—
তুমি 'খাপা', তুমি 'বিদ্যাধরী'র খাল—
তুমি কালিঝুলি নিদারুণ, তুমি অন্ধকারের কূপ,
তুমি 'ভাটবিন' উঠানের * অঞ্জাল।

* পাঠক উঠান কথাটি লক্ষ্য করিবেন।

তুমি হে ভীষণ, মোহ-কারাগার, তুমি যে ভয়ঙ্কর,
তুমি উন্মাদ, প্রলাপ বকিছ সদা—
শূত্র তুমি হে কব্জের সাথে নিজে সাজ স্তম্বর—
ক্রাচেরে † তোমার ভাবিছ ভীমের গদা।

† ক্রাচ—খোড়ার লাঠি।

আস্তাকুড়ের গোবরের পবে কে ফোটাল 'তুমি' ফুল—
ভীমকারা মাঝে দিল কবিতার জ্যোতি—
যত লেখ কবি—পঙ্কজ আর কতু না করিবে ভুল—
তুমি 'তুমি' থাক, দূর হ'তে নিও নতি।

কো-অপারেটিভ্ ব্যাকের বিশুদ্ধীকরণ

অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

“ভাষ্” লইয়া দেশে হ্রস্বুল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেটা সামাজিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভাষ্টির আয়োজন হইয়াছে। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাক্গুলিকে “শুদ্ধ” (pure type) করার চেষ্টা হইতেছে। একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে। কো-অপারেটিভ্ ব্যাক্ একটি যৌথ কারবার। উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। যাহারা টাকা ধার লইবে, তাহা-দিগকে একটি মণ্ডলীতে পরিণত হইতে হইবে। ইহারই নাম কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটি। সেন্ট্রাল ব্যাকে টাকা আসে দুই রকমে—যাহারা প্রথমে অংশ ক্রম করেন তাহাদের নাম প্রেকারেন্স্ শেয়ার হোল্ডার। ইহারাই ব্যাকের সূচনা করেন। ইহারা আপনাদের টাকার স্তম্ভ ডিভিডেণ্ড্ বা লভ্যাংশরূপে প্রাপ্ত হন। নিয়ম হইয়াছে শতকরা ১২র বেশী পাইবেন না। তা’র পর বহুলোক ব্যাকে টাকা জমা রাখেন, যেসব তাহারা নিয়মিত স্তম্ভ প্রাপ্ত হন। কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটিগুলি এই সেন্ট্রাল ব্যাক্ হইতে টাকা ধার লইয়া সেই টাকার কিয়দংশ জমা দিয়া ব্যাকের অংশীদাররূপে গণ্য হন। ইহাদের নাম অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার হোল্ডার। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রেকারেন্স্ শেয়ার হোল্ডাররা আপনাদের ঘর হইতে টাকা দিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ অংশীদাররা এই টাকা ধার লইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ দিয়া ভাগীদার হইয়াছেন। এই ভাগীদারেরা সেন্ট্রাল ব্যাকের খাতক। তাহারা টাকা লইয়া তাহার

সদ্যবহার করিতে পারিতেছে কি না তাহা দেখিবার ভার সেন্ট্রাল ব্যাকের উপর। ব্যাক্ পরিচালনের অস্ত্র যেসকল ডিরেক্টর আছেন, তাহার অর্ধেক নিযুক্ত হয় প্রেকারেন্স্ অংশীদারদের দ্বারা, আর অর্ধেক ক্রেডিট সোসাইটিগুলি দ্বারা। অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ক্রেডিট সোসাইটিগুলিকে অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পাওনাদারের উপরে দেনদারের একরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তাদের কোনই দায়িত্ব নাই। যে টাকার জোরে তাহারা ভাগীদার, সে টাকাও ঐ ব্যাক্ হইতে তাহাদের ধার করা। সুতরাং ব্যাকের মরণ-বাঁচনের অস্ত্র তাহাদের তেমন একটা দরদের সম্ভাবনা নাই যাহা প্রেকারেন্স্ শেয়ার হোল্ডারদের স্বভাবতই থাকিবে। অস্ত্রদিকে এই বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা এই সেন্ট্রাল ব্যাক্ সমূহে খাটিতেছে। তাহার সাড়ে চারি কোটিই এই প্রেকারেন্স্ শেয়ার হোল্ডার এবং ডিপজিটর বা আমানতকারীদের। বাদবাকী এই সামান্ত অংশ মাত্র ক্রেডিট সোসাইটি-সমূহের, তাহাও ব্যাক্ হইতে ধার করা টাকা। প্রথম যেভাবে ব্যাক্ পরিচালিত হয়—উভয়-প্রকার অংশীদারদের মনোনীত ডিরেক্টর দ্বারা—ইহারই নাম মিক্সট্ টাইপ বা মিশ্র হাঁচের। প্রস্তাব হইতেছে বিশুদ্ধ হাঁচ বা আদর্শের করা। অর্থাৎ সমস্ত কার্যপরিচালনের ভার পড়িবে ক্রেডিট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত লোকের উপর—ঠিক যার শিল তা’রই নোড়া, তা’রই জাল দাঁতের গোড়া।

গাওনাদার সম্পূর্ণরূপে দেনদারের অধীন হইবে। দেনদার কর্ক টাকার কি ব্যবহার করিতেছে তাহা দেখিবার ভার যাহার উপর তাহাকে গ্রহণ করিবার অধিকার ঐ দেনদারদের। হবুচন্ডের দেশেও ইহা অপেক্ষা অধিকতর বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা দেশের বিশেষতঃ কৃষিকর্মীদের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি উঠাইয়া দিবার ইহা অপেক্ষা সূচত্বর চাল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন মূর্খ কে আছে যে, এই বন্দোবস্তে ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখিবে বা প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার থাকিবে। যেখানে অজ্ঞের লেখা, ব্যাধা ত তথায়। টাকাগুলি সম্পূর্ণ ব্রষ্ট হইয়া গেলে যাহাদের গায়ে আঁচড় লাগিবে না, এতগুলি টাকা তাহাদের হাতে কোন্ অর্থনৈতিক শাস্ত্র-অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই প্রস্তাবক মহাশয়েরা বলিয়া দিতে পারেন কি? অপর পক্ষে, ক্রেডিট সোসাইটিগুলির সহজ কার্য যাহাদের হাতে ছাড়িয়া

দেওয়া চলে না বলিয়া যাহারা নিয়মের উপর নিয়মের ইট বসাইয়া বিরাট আইনের সৌধ নির্মাণ করিতেছেন, তাহারা যদি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জটিল কার্যের ভার উহাদেরই উপর স্থাপন করিবার প্রস্তাব লইয়া আসেন, তবে সে কার্যটির উদ্দেশ্য-বিষয়ে মনে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। সুতরাং ব্যাঙ্ক যাহাদের টাকা আছে তাহাদেরকে এখন হইতেই সাবধান হইতে হইবে। দেশে অর্থের এমন প্রাচুর্য্য হয় নাই, যে, এতগুলি টাকা চকের উপরে বিনষ্ট হইতে দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশের আমানতকারী (depositors) জনসাধারণ অজ্ঞ। এ-বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞানও নাই, আর এ-বিষয়ে কোন যৌক্তিকতার রাখাও দরকার মনে করেন না, টাকা জমা দিয়াই নিশ্চিন্ত। তাই তাহাদের টাকা লইয়া কর্তাদের এরূপ খেলাখেলি চলিতে পারে। সেইজন্যই সংবাদ পত্রের মধ্য দিয়া আন্দোলন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক দেশের অন্য নিত্যস্বই প্রয়োজন। কিন্তু যে আয়োজন হইতেছে, তাহাতে ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

প্রিয়া

শ্রী চন্দ্রশেখর আচ্য

বসন্তে গাওনি গান, শুভক্ষণে না কহিলে কথা
মঞ্জু যবে কুঞ্জবন, বৃকে দিলে মরণের ব্যথা।
বিশ্বজয়ী কিরি যবে শিরে বহি গৌরবের ভার,
নরনারী মাল্য রচি' কণ্ঠে দেয় শ্রীতি-উপহার,—
তুমি শুধু ওগো প্রিয় না চাহিলে তুলি' মৃদু আঁধি,
সবাই কুড়ালো ফুল তুমি শুধু প'ড়ে র'লে বাকি।
উপেক্ষায় অনাদরে দিলে মোরে তীব্র অভিশাপ,
গর্কোজ্বল স্নিগ্ধদিনে মাখে দিলে নিখাস-উত্তাপ।

(তা'র পর) বসন্ত ফুরালে যবে শূন্য হ'ল পুণ্য শুভক্ষণ,
ভগ্ন হ'ল কুঞ্জবন হাহাকারে আগিল ক্রন্দন,
জীবনের দীপ্তদিন অস্ত গেল রাজির আঁধারে
ছুভাগ্য মেলিল পাখা, নেমে এল ধূলির মাঝারে,
সেইযুগে-মহাযুগে শুভব্রতা ওগো মহারাণী
আমার মলিন কণ্ঠে পরাইলে শুক মাল্যখানি।
ব্যথার গভীর রাজি কেটে গেল, তব মুখ চাহি
স্বর্ঘ্যোদয়ে মুক্তি পেছ, মুক্তকণ্ঠে উঠিলাম গাহি।

আলোচনা



[কোন মাসের “প্রবাসী”র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদের কাছে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী”র আর্থ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যিক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

“সোক্রেটিস্”—গ্রন্থকারের নিবেদন

বিবিধশাস্ত্রবিৎ প্রফেসর ঐযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ পৌষ, মাঘ ও কাশ্বনের প্রবাসীতে “সোক্রেটিস্” বিত্তীয় খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আমাদের সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তিনি এই সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক গুরুতর বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমুদায় সিদ্ধান্ত খাতসহ কি না, তাহা পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও আমি পারতপক্ষে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছুক হইতাম না। কিন্তু তিনি কোন কোন স্থলে আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন; স্থলবিশেষে আমার প্রতি অবিচারও করিয়াছেন। কাজেই সম্ভাব্যরূপে আমাকে দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া পোড়াতেই এক সপ্তকে পড়িয়াছি। কারণ, প্রবাসীর সম্পাদক-বাহিনীর উত্তর দিবার জন্ত আমাকে নোটে একপক্ষ কাল সময় দিয়াছেন, এবং জানাইয়াছেন যে, তিনি “এ-” বৎসরের বাৎসরিক আগামী বৎসরে লইয়া বাইতে চাহেন না। মহেশবাবু তাঁর পরিপক্ব ও তীক্ষ্ণ সমালোচক তিন মাস ধরিয়া যে-সকল সুন্দর ও চরম বিষয়ের অবতারণা করিলেন, পনের দিনের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবসাধ্য। যদি কেহ বিজ্ঞাসা করেন, আমি সমালোচনার প্রথম দফা বাহির হইবামাত্রই উত্তর দিতে আরম্ভ করি নাই কেন, তবে তাঁহাকে বলি, সমালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই আমার নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তা’র পর সমালোচনা তিন বারে প্রবাসীর প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। এই বিপুল সমালোচনার আলোচনার জন্ত অন্ততঃ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যে এক মাসে তাঁহার পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধাংশ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন, তাঁহার সদাশ্রয় চিত্তোদ্বার্য স্মরণ রাখিয়াও তদ্বিষয়ে আমি কিছুমাত্র আশাও মনে পোষণ করিতে পারিতেছি না।

এই দুই কারণে আমি কোন কোনও গুরুতর প্রশ্ন আপাততঃ আলোচনার বাহিরে রাখিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে সঙ্কল্প প্রকাশ করিব।

পৌষের প্রবাসী

১। গ্রীক উচ্চারণ

মহেশবাবু গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিষয়টি কত বিরোধসম্মুল, তিনি নিজেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই কাশ্বনের প্রবাসীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমি শব্দকোন্দল হইতে দূরে থাকিব, এবং নিজে কি প্রমাণী অবলম্বন করিয়াছি, শুধু তাহাই বিবৃত করিব। এই উদ্দেশ্যে প্রথম খণ্ডের সুখবক হইতে একটু উদ্ধৃত হইতেছে।

“আমি এ বিষয়ে যে-নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি, তাহা এই যে—গ্রীক নাম বাঙ্গালার হ্রস্বচলিত নহে, তাহার গ্রীক উচ্চারণ দিয়াছি, যথা ‘আইথ্যালস্,’ যে গ্রীক নামের উচ্চারণ স্পষ্টই অবিদ্যমান, তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন ‘সোক্রেটিস্,’ আর যে গ্রীক নাম ইংরাজীসাহিত্য হইতে বিকৃত উচ্চারণ লইয়া এদেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইংরেজী উচ্চারণই গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে ‘প্লাটোন’ না লিখিয়া ‘প্লেটো’ লিখিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই নিয়ম পালন করিতে বাইয়া আমি সকল স্থলে সঙ্গতিরক্ষা করিতে পারি নাই, কিন্তু বৈদেশিক নাম লিখনে সঙ্গতিরক্ষা অতি দুষ্কর।”

সর্বশেষ বাক্যটির প্রমাণ সমালোচক স্বয়ং। তিনিও ‘প্লাটোন’ না লিখিয়া ‘প্লেটো’ এবং ‘ক্লেসনপ্লেহান’ না লিখিয়া ‘ক্লেসনফোন’ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে Theaitetos নামের বিকৃত উচ্চারণ ‘ঠেআইটেটস্’ বা ‘ট্লেআইটেটস্’; কিন্তু তিনি “এউথ্লেফোন” লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি গ্রন্থকারের অনেকগুলি গ্রীক নামের উচ্চারণ অবিদ্যমান বলিয়া অভিযত প্রকাশ করিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার বাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। আমি শুধু একটি শব্দ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। তৎপূর্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, তিনি যে-সকল নিয়ম চালাইতে চাহেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চলিবে কি না, সন্দেহ। আমার তো মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকেরা তাঁহার “ডসেনোন”কে “ডসেনোন” (প্রবাসীতেই “ডসেনোন” ছাপা হইয়াছে—৩২৪ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড), “ক্লেসমিডেস”কে “ক্লেসমিডেস”, “ট্লেআইটেটস”কে “ট্লেআইটেটস” “প্লেসিভেস”কে “প্লেসিভেস” উচ্চারণ করিবে। চরমলব্ধ বঙ্গবাদী এইপ্রকার দাঁতভাঙ্গা নাম বর্জন করিতে পারিবে কি?

আমি কেন “সোক্রেটিস্” না লিখিয়া “সোক্রেটিস” লিখিয়াছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। এটা-বাদীর মতে eta দীর্ঘ ‘এ’। বাঙ্গালার হ্রস্ব ‘এ’ ও দীর্ঘ ‘এ’ এই দুইটির পার্থক্য বুঝাইবার কোনও চিহ্ন নাই। হুতরাং বঙ্গীয় পাঠক যে “সোক্রেটিস্” শব্দটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। পক্ষান্তরে সমালোচক রবার্টসনের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে “খৃষ্টের পূর্বে প্রথম সভ্যতায় এই ‘ই’ উচ্চারণ প্রচলিত ছিল।” তা’ ছাড়া ‘সক্রেটিস্’ রূপে eta’র ‘ই’ উচ্চারণ বাঙ্গালী সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ‘ই’কে ‘ই’ করা অতি সহজ, কিন্তু “সক্রে” রাখিবার উপায় নাই, কেননা, ওটা স্পষ্টই ভুল। হুতরাং ‘সোক্রেটিস’ লিখিলে উচ্চারণ শুদ্ধ, অর্থ পরিবর্তনও বধাসম্ভব অল্প হয়। আমি অবিশিষ্ট এটা-বাদীও নই, উটা-বাদীও নই, আমি সুবিধাবাদী। বৈদেশিক নামের রূপান্তরকরণে সুবিধাটা উপেক্ষার তিনিস নয়। মুসলমান লেখকেরা Sokratesকে “সোক্রেৎ” Platon ‘এপ্লাতুন’ Aristotetesকে ‘আরিস্ত’ করিয়া কেলিয়াছেন; সেমন্ত তাঁহাদিগকে কেহ বোধ দিতেছে না।

২। উপদেবতা

আমি কোন-কোন স্থলে (সর্বত্র নহে) to daimonion এর বাঙ্গালা করিয়াছি ‘উপদেবতা’। সমালোচক বলেন, ইহা উচিত হয় নাই। কারণ, তিনি বলেন,

(১) “বাংলা ভাষার উপদেবতা শব্দ ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না।” কথাটা বিচার্য।

বাংলা ভাষার ‘অপদেবতা’ শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ‘উপদেবতা’ শব্দের হীনার্ধক প্রয়োগ বিরল, এবং উহার মৌলিক ভাব নিন্দাসূচক নহে। তাহার প্রমাণ

শব্দকল্পকম বলেন,

উপদেবতা (উপপত্তা সাদৃশ্চেন দেবতান্) বন্ধ ভূতাদিঃ ।

উপদেবতাস্ত মণ। বধাহ অমরঃ ।

বিদ্যাধরো হুঙ্গরো বন্ধো রক্ষো গন্ধর্ষকিমরো ।

পিপাচো শুহকঃ সিদ্ধো ভূতোহনী দেবতানমরঃ ।

বাচস্পতি অভিধানেও উপদেব শব্দের ব্যাখ্যাত্তে ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে; অধিকন্তু তাহাতে লিখিত আছে, ‘এবাকোলৌকিকশক্তি-কথাস্তথাৎস্’—ইহারা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া উপদেবত্ব (উপদেব আখ্যা) লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মন্দ ভাব অনুস্থ্যত নাই। অপিচ, অমর উপদেবত্বের যে মণ শ্রেণী উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রক্ষঃ, পিপাচ ও ভূত, এই তিনটি ছাড়া অপর সাতটি বাংলা ভাষাতেও মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

Boehtlingk এর St. Petersburg Dictionaryতে উপদেব শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে eine untergeordnete Gottheit অর্থাৎ an inferior deity.

আপ্তের মতে উপদেবতার ইংরেজী অর্থ a minor or inferior God, সুবল নিজের বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধানেও a minor deity, a demigod, a ghost প্রভৃতি প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষার উপদেবতা শব্দটি কোন স্থলেই ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। আর যদিই বা উহা নিত্য মন্দার্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলেও উহার মৌলিক অর্থ পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইত না। ইংরেজীতে demon (বা daemon) শব্দটি প্রায়শঃ মন্দার্থে ব্যবহৃত হয়; অথচ the demon (বা daemon) of Socrates এই শব্দটির বহুল প্রচলন আছে।

(২) সমালোচকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, daimonion “শব্দের অর্থ দেবতা না দেবকর্তৃক, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।” কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সাক্ষ্যগুলি আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি, কেন না Plato's Apologyর যে-সংস্করণ আমি পড়িয়াছি, তাহার ভূমিকার সম্পাদক স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, “It is perfectly clear from all these passages that Socrates meant by to daimonion some ‘divine agency, not a divine agent or deity,’ in other words that daimonion is an adjective and not a substantive,” তা সত্ত্বেও কোন-কোন স্থলে বাধ্য হইয়া আমাকে ‘উপদেবতা’ শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। নতুবা অর্থ প্রকাশের অহুবিধা ঘটত। সমালোচক তাহার সপক্ষে জাউএটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জাউএট নিজে Theaetetus 151a ‘to gignomenon moi daimonion’ এই শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন ‘my familiar’ তার পর Liddel and Scott সঙ্কলিত বৃহৎ Greek-English Lexiconএ

Daimonion শব্দের অর্থগুলির মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায় ‘an inferior divine being, a demon’ এবং ‘the name by which Socrates called his genius, or the spirit that dwelt within him,’ এইরূপ লিখিত আছে। ‘জেনফোন-প্রণীত “সোক্রেটসের জীবন স্মৃতির” ভাষ্যকার Cluerএ ঐ শব্দোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ট্যার্ট (The Myths of Plato, p. 3) daimonion শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন “his familiar spirit,” আর একটা কথা

এযুথুফ্রোন সোক্রেটসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি এমন কি করিতেছ, বাহাতে সে বলে যে তুমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ?”

সোক্রেটস—ও বিচিত্রবুদ্ধি, তাহা শুনিতে বড়ই কষ্টকৃত। সে বলে যে, আমি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমি নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি (kainous poionta theous) ও পুরাতন দেবতার বিশ্বাস করি না, এইজন্য সে বলিতেছে, পুরাতন দেবত্বের পক্ষে সে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানয়ন করিয়াছে।

এযুথুফ্রোন—বুদ্ধিতে পারিতেছি, সোক্রেটস; তুমি কিনা বল যে তুমি সময়ে-সময়ে দৈববাণী (to daimonion) শুনিতে পাও। এই জন্ত—Plato, Euthyphron.

জেনফোন “জীবনস্মৃতির” প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলিতেছেন, “লোকে সদানন্দকর্দাই বলিত, যে সোক্রেটস বলিয়া থাকেন, তিনি দৈব ইচ্ছিত প্রাপ্ত হন, অথবা দেবতা তাঁহাকে ইচ্ছিত প্রেরণ করেন (to daimonion heautoi semainein)। আমার মনে হয় প্রধানতঃ এই-জন্যই তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, যে তিনি নূতন দেবতা kaina daimonia—daimonion শব্দের বহুবচন প্রবর্তিত করিয়াছেন।”

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে স্নেটো যে-স্থলে theous শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, জেনফোনের গ্রন্থে ঠিক তার অনুরূপ স্থলে daimonia শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দ-ছটি যে সমার্থক তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অতএব আমার মতে স্থলবিশেষে to daimonionএর অনুবাদ ‘উপদেবতা’ করিলে কাহাটা খুব অনুচিত হয় না। সমালোচক লিখিয়াছেন, “প্রকৃতপক্ষে ইহা দৈববাণী-দৈবদেশ বা দৈব ইচ্ছিত।” আমি ২৪ পৃষ্ঠার এই তিনটি পদই ব্যবহার করিয়াছি; একাধিক স্থলে (যথা ৩৬০ ও ৩৭৪ পৃষ্ঠার) অস্ত-দেবতা শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৪ পৃষ্ঠার “দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা” নামক যে-প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, “কিন্তু তাঁহার নিত্যসঙ্গী দৈববাণী যে কি, তৎসম্বন্ধে বিস্তার মততত্ত্ব রহিয়াছে। সোক্রেটস নিজে ইহাকে কারা প্রদান করেন নাই।” ইহার কয়েক ছত্র পরে ‘উপদেবতা’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া সমালোচক এমনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বাহাতে পাঠকেরা মনে করিতে পারেন গ্রন্থকার to daimonionএর প্রকৃত অর্থ না জানিয়া আপাগোড়াই ভুল অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি যে তিনটি পদ দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, গ্রন্থকারের এক পৃষ্ঠাতেই যে সে তিনটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা তিনি মোটেই উল্লেখ করেন নাই। সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী “দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা” তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, আর তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, যে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ স্ট্রটার্কের অনুসরণ করিয়া daimon শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।”—ইহাতে কি গ্রন্থকারের প্রতি স্মৃতিচারণ করা হইয়াছে?

পারিভাষিক শব্দ

সমালোচক লিখিয়াছেন, “এইতে’ বাক্যকে ফোটিবাদরূপে বর্ণনা কর বাইতে পারে না।”

Ideaর প্রতিশব্দ ‘ফোট’, অধ্যাপক ব্রজেননাথ শীল মহাশয় আমাকে এই প্রকার বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি পরে সর্বদর্শনসংগ্রহে ফোটের ব্যাখ্যা (বোধ হয় দ্বিতীয় বার) পাঠ করি।

যদি আমার অনুবাদে ভুল হইয়া থাকে, তবে সে-ভুলের দায় শীল মহাশয় দায়ী। তিনি আশ্চর্যক সমর্থনের দায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন কি না, সে-বিষয়ে গভীর সংশয় আছে। বিচার পণ্ডিতে পণ্ডিতেই শোভন হয় আমি কেবল আমার বক্তব্য বলিয়া অব্যাহতি পাইতে চাই।

আমার ধারণা, শুধু একটা শব্দ দ্বারা কোন দর্শনেরই মর্মকথা পরিব্যক্ত হয় না। বৈদেশিক পরিভাষার অনুবাদে ইহা আরও ভীতরূপে অনুভূত হয়। ফোটিবাদ বলিলে শুধু এই নাম হইতে প্লেটোর Doctrine of Ideas বিষয়ে কোনই জ্ঞান হয় না; সেজন্য উহার বিবৃতি আবশ্যিক। বিবৃতি স্পষ্ট হইলে একটা অপূর্ণ নামেও কাজ চলিয়া বাইতে পারে; এবং কালে ঐ নামটি একটা দার্শনিক মতের সহিত যুক্ত থাকিয়া সাহিত্যে স্থান লাভও করিতে পারে।

এখন কথা এই যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ফোট শব্দটির বহু প্রচলন আছে বলিয়াই Ideaর প্রতিশব্দরূপে ইহার ব্যবহার অসমীচীন হইয়াছে কি না।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, ভারতীয় দর্শনে ‘বিবেক’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, তাহা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা ‘ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ’ বা Conscience অর্থে সর্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং ফোট শব্দটিকে শব্দফোট হইতে বিযুক্ত রাখিয়া ‘রূপফোট’ রচনা করিয়া Ideaর প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করিলে গুরুতর প্রত্যাবার হয় না। বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই উপলক্ষ্য করিতেছি, যে, বাঙ্গলা ভাষার দৈর্ঘ্যবশতঃ কোন শব্দ দ্বারা প্লেটোর Doctrine of Ideas সূত্ররূপে অনুদিত হইতেছে না। ‘প্লেটোর আকৃতিবাদ,’ ‘প্লেটোর পরাকৃতিবাদ,’ ‘প্লেটোর রূপবাদ বা পরমরূপবাদ’ ‘প্লেটোর ভব বা প্রযুক্তভব,’ ‘প্লেটোর আদর্শবাদ’—ইহার কোনটিই গ্রন্থকারের মনঃপূত নয়, যেহেতু কোনটির দাবিই ‘ফোটিবাদ’ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে আমি ভো মনে করি, Plato’s X বলিলে আমাদের যতখানি জ্ঞানোদয় হয়, ‘প্লেটোর রূপ’ বা ‘প্লেটোর ভব’ বলিলে তদপেক্ষা অধিক হয় না।

সমালোচক মোক্ষমূলর হইতে যে-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩১৫ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ), তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আচার্য্য লিখিয়াছেন, “It has been translated by expression, notion, concept or idea, but none of these renderings can be considered as successful.” দেখা বাইতেছে, ফোট ও idea সমার্থক বলিয়া ধরিয়া লইবার ত্রুটি আমার একার হয় নাই, পূর্ববর্তী আরও অনেকের এইরূপ প্রমাণ ঘটিয়াছে।

মাঘের প্রবাসী

প্লেটোর ফোটিবাদ

মহেশবাবু Doctrine of Ideas কথাটির বাঙ্গলা করিয়াছেন ‘আদর্শবাদ’। প্লেটো Ideaকে এক অর্থে আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ১১৫ পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি, “ফোটসমূহ সম্ভার শব্দত আদর্শ বা প্রথম রূপ।” কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থাবলিতে ফোটের অন্তরূপ ও বিরোধী বর্ণনাও বর্ণিত আছে; আমি তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং বর্তমান আলোচনার আমি ‘আদর্শবাদের’ পরিবর্তে ‘ফোটিবাদ’ শব্দই ব্যবহার করিব।

মহেশবাবুর একটি বিশেষ গুণগ্রন্থেই, যে তিনি যে-বিষয়ের বিচারেই প্রযুক্ত হউন না কেন, সেই বিষয়টিকে বিশেষে পরীক্ষা না করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হন না। মাঘের প্রবাসীতে প্লেটোর Doctrine of Ideas সম্বন্ধে তিনি তাহাই করিয়াছেন। এই পল্লবিত আলোচনার দায় আমি তাঁহাকে বক্তব্য জানাইতেছি।

কিন্তু তিনি আলোচনাটির অন্তিম ভাগে গ্রন্থকার-সম্বন্ধে যে-সকল টিপ্সনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলে পাঠকগণ “বিশ্রান্ত” হইবেন; কাজেই আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাই।

সমালোচক লিখিয়াছেন (১১৪ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ)—

“গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর ‘এইডস’ বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সামঞ্জস্য না করিয়া কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, অনেকস্থলে প্লেটোর মত এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এ ব্যাখ্যা যেন সর্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত ভব জানিতে পারিবেন না।”

অভিযোগটি গুরুতর; এখন দেখা যাক, গ্রন্থকারের পক্ষে কি বলিবার আছে।

(১) গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর ‘এইডস’ বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে সেই কথাই বলি। গ্রন্থকারের নাম ‘সোক্রেটিস’, প্লেটোর ‘জীবন-চরিত’ বা ‘গ্রীক-দর্শনের ইতিহাস’ নয়। ফোটিবাদ ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তথ্যটি কত জটিল; ছন্দ, ছন্দোধ্য ও বিরোধ-সঙ্কুল, সমালোচক তাহা দিবালোকের জায় উজ্জলরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এমন একটি ভবের বৃত্তান্ত আমাকে মোটে দশ পৃষ্ঠায় (১১৩—২০৩) সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। সুতরাং একটা মত উল্লেখ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সঙ্কে-সঙ্কে আর দশটা বিরোধী মত উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই, সম্ভবতঃ বোধ করি নাই। গুরুতর করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খ নুপাঠ্য না অপাঠ্য হইত, সে-বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আমি প্লেটোর ফোটিবাদ নিজে যেমন বুঝিয়াছি বশাসম্বন্ধে সংক্ষেপে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সমালোচক আমার ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, ইহা আমার পক্ষে চুপেচুপে বিষয়; কিন্তু তিনি যে-প্রণালী নির্দেশ করিতেছেন, “সোক্রেটিসের জীবনচরিতে” সে-প্রণালীতে ফোটিবাদ ব্যাখ্যা করা এখনও আমার নিকটে সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

(২) আমি সামঞ্জস্য না করিয়া কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছি, এই ত্রুটি (যদি বস্ততই এটা ত্রুটি হয়) আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই ত্রুটি পরিহার করিবার উপায় ছিল না। প্লেটোর ফোটিবাদের সামঞ্জস্য-সাধন আমার সাধ্যাতীত। সমালোচক নিজেই বলিতেছেন, “এত বিভিন্ন মত ...এ অবস্থায় প্লেটোর মতের ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ব্যাখ্যা করিবার সময় অবিচারিতভাবে কিছুই বলা উচিত নহে এবং প্রধান-প্রধান বিষয়ে খ্যাতিনামা পণ্ডিতগণ কি-কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আবশ্যিক।” গ্রীক দর্শনের ইতিহাস যিনি সঙ্কলন করিবেন, তাহার পক্ষে এই উপদেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু সোক্রেটিসের জীবনচরিতকারের পক্ষে নহে। পুঙ্খ-খানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬০। ফোটিবাদের ব্যাখ্যা করিতে বাইরা খ্যাতিনামা পণ্ডিতগণের মতাবলি উদ্ধৃত করিয়া তিনি যদি উহার কলেবর আরও বিপুল করিয়া তুলিতেন, তবে বোধ করি পাঠকেরা কেহই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তা ছাড়া, প্লেটো বাস্তবিকই ফোট-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত

করিয়াছেন, সেগুলি পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করা লেখকের একটা কর্তব্য; কিন্তু প্রত্যেক বাক্যের পরে এক-একটা আলোচনা জুড়িয়া দেওয়া যে তাঁহার কর্তব্য, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

(৩) সমালোচক লিখিয়াছেন, “(গ্রন্থকার) অনেক স্থলে প্লেটোর মত এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাহাতে মনে হয় এব্যাপ্য যেন সর্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না।”

পাঠকগণ আমার পুস্তকে দশ পৃষ্ঠার মধ্যে ফোটেবাদের ব্যাখ্যা পড়িয়া “প্রকৃত তত্ত্ব” জানিতে পারিবেন, এছুরাশা আমি অন্তরে স্থান দিই নাই; আগাপোড়া ভুল বুঝিবেন, তাহাও মনে করি না। কিন্তু সমালোচকের উক্তিটি কি যুক্তিসঙ্গত? পাঠকগণ বিচার করুন।

(ক) গ্রন্থের সোরা পৃষ্ঠার (১২৫—৬) ফোটেবের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এই নিবন্ধে ফোটে-সম্বন্ধে প্লেটোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছি, “প্লেটো এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিতে বাইরা আগাপোড়া অসঙ্গতি-দোষ এড়াইতে পারেন নাই।” এতদ্বারা কি বলা হইল, আমি যেভাবে প্লেটোর মত ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সর্ববাদিসম্মত? অসঙ্গতিদোষ-ছুট মত কি কখনও সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে?

(খ) ‘জড়’ বিষয়ক আলোচনার পরিশেষে লিখিত আছে, “কেহ-কেহ বলেন, প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, সৃষ্টির পূর্বে হইতেই শাশ্বত শরীরী জড় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা সকলে নিঃসংশয় নহেন।” (১২৮ পৃঃ)

এখানে কি একটা “সর্ববাদি-সম্মত মত” প্রচারিত হইয়াছে?

(গ) গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠার যে নিবন্ধটি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম “ফোটেবের সহিতে ইল্লিরগ্রাহ্য বিষয়ের সন্ধক।” উহার প্রথম কয়েকছত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

“অনেকে বলেন, প্লেটোর দর্শনে ইল্লিরগ্রাহ্য জগৎ ও ফোটেব জগৎ পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়ের সমতা মূলতঃ বিভিন্ন। কিন্তু প্লেটো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে ফোটেবই একমাত্র সত্য বস্তু; ইল্লিরগোচর পদার্থসমূহের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমরা উক্ত মত বিচারহিত হইয়া সমর্থন করিতে পারি না। তবে উভয়ের প্রকৃত সন্ধক কি, অথবা ইল্লিরগোচর পদার্থনিচর ফোটেবগৎ হইতে প্রসূত হইয়াছে কি না; মানবাত্মার ফোটেব কি রাম স্তান বহু, মধুর মধ্যে খণ্ড-খণ্ড রূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, না প্রত্যেকের মধ্যেই অখণ্ড ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে; পরম সূক্ষ্ম কি করিয়া যুগপৎ সমুদায় সূক্ষ্মর বস্তুতে বর্তমান থাকিতে পারে?—এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে; তাহার কারণ এই, যে প্লেটো স্বয়ং এঃ সমস্তার একটা সুসঙ্গত সমাধান করিয়া বান নাই।” ইহার একটু পরেই আমি লিখিয়াছি, “কলতঃ বিষয়টি এমন জটিল, যে, উহার সীমাংসা করিতে বাইরা কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো দ্বৈতবাদী, কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন প্লেটো অদ্বৈতবাদী।” (১২৯ পৃষ্ঠা)

আমি তো বুঝিতেই পারিতেছি না, এই কথাগুলি পড়িলে পাঠক-গণের বিজ্ঞান হইবার কি কারণ থাকিতে পারে।

(ঘ) সমালোচক আরও বলিতেছেন, ‘পদার্থসমূহ ফোটেবের অনুকরণে সৃষ্ট’; এবং ‘পদার্থসমূহ ফোটেবের অংশভাক্’, এই দুই মত পৃথক্, কিন্তু আমি এমনভাবে প্লেটোর মতকে বর্ণনা করিয়াছি যেন এই দুই মতে কোনো পার্থক্য নাই।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, “গ্রন্থকার এবিষয়ে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে পাঠকগণ বিজ্ঞান হইবেন।”

উপরে যে-অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরেই আমি লিখিয়াছি—

“ইল্লিরগ্রাহ্য জগতের উদ্ভবের জ্ঞান তাহার অবস্থিতিও সংশয়-ভিম্বিরে আচ্ছন্ন। ফোটেব হইলে পরিপূর্ণমান পদার্থ কিরূপে উদ্ভূত হইল, প্লেটো তাহা যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, তেমনি এই উত্তরে কি করিয়া যুগপৎ বর্তমান থাকিতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলিতেছেন, ফোটেব জড়ীয় বস্তুর আদর্শ বা আদিক্রম, আবার তাহার সমতা ও বাস্তবতা। পদার্থ যে পরিমাণে ফোটেবের অংশভাক্, সেই পরিমাণে তাহার অনুকৃতি। সুতরাং পদার্থ কিরূপে ফোটেবের অংশভাক্ হইল, তাহা ব্যাখ্যাত না হইলে, পদার্থ ফোটেবের অনুকৃতি, শুধু একবার ঘাটা ব্যাখ্যার অস্তাবের পরিপূরণ হইবে না।” (১২৯ পৃষ্ঠা)

সমালোচক বোধ করি এই কথাগুলি গ্রন্থকারের মন্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

দশ পৃষ্ঠার মধ্যে চার বার প্লেটোর অসামঞ্জস্য এবং তাঁহার এক একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে মতানৈক্য উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পরেও যদি সমালোচক বলেন, যে, আমি “অনেক স্থলে,” প্লেটোর মত এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, “বাহাতে মনে হয়, এব্যাপ্য যেন সর্ববাদিসম্মত”, তবে আমি নিরুপায়।

সমালোচকের ৪ সংখ্যক মন্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বাহা বক্তব্য আছে, এই মাত্র বলা হইল। ১ ও ৩ সংখ্যক মন্তব্যে তিনি মতভেদের কথা বলিয়াছেন, তদন্তরে বাহা বলিবার পূর্বেই বলিয়াছি। ২য় মন্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন, “কিন্তু প্লেটো ইহাও বলিয়াছেন, এইডস্ সৃষ্ট (সাধারণতঃ ১১৭)। ইহা আমাদিগের গ্রন্থকারের প্রশ্নে উল্লেখ করা হয় নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।” ‘এইডস্’ (ফোটেব) সৃষ্ট, ইহার সপক্ষে সমালোচক একটি মাত্র স্থল নির্দেশ করিয়াছেন, সেস্থলেও প্লেটো শব্দের দৃষ্টান্তে ‘এইডস্’ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন; স্পষ্ট করিয়া ‘এইডস্’ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তথাপি, আমি স্বীকার করি এই স্থলটি উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

এখন তাঁহার পঞ্চম মন্তব্য বিষয়ে একটু বলিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন,

“গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—‘প্লেটোর ফোটেববাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; ফোটেবই শাশ্বত দেবকুল এবং ফোটেবিরোমনি পরম শিবই ঈশ্বর।’

“এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আমাদিগের বক্তব্য এই :—

“(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্তমান এবং সেই সঙ্গে শাশ্বত দেবকুলও বর্তমান। যেমতে ঈশ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় শাশ্বত সত্তার স্থান আছে, সে মত কি ব্রহ্মবাদ? ভারতীয় ব্রহ্মবাদ নিতান্ত অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম ‘একমেবাধিতীয়স্’—ইহার অর্থ ব্রহ্মহাড়া দ্বিতীয় বস্তুই নাই। ব্রহ্মবাদ সর্বপ্রকার দ্বৈতমত-বিবর্জিত।”

এখানে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের কথা কোথা হইতে আসিল? প্রথমোক্ত বাক্যটির সরল অর্থ, ‘প্লেটোর ফোটেববাদ ও প্লেটোর ব্রহ্মতত্ত্ব।’ পাঠকগণ সমগ্রস্থলটি পাঠ করিয়া দেখুন, উহার আর কি অর্থ হইতে পারে।

“দ্বিতীয় প্রকরণে ফোটেবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে প্লেটোর ফোটেববাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; ফোটেবই শাশ্বত দেবকুল, এবং ফোটেবিরোমনি পরম শিবই ঈশ্বর। এহলে বলা কর্তব্য যে অধ্যাপক বার্ণেটের মতে পরম শিব ও ঈশ্বর বিভিন্ন। ফোটেবাদের সাহায্যে প্লেটো ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে লৌকিক সংস্কার মার্জিত করিয়াছেন। ঈশ্বর নির্ধারণ, তিনি সাকাররূপ

পরিগ্রহ করেন, তাঁহাতে অজ্ঞতা ও অস্বাভাবিকতা বা মিথ্যার লেশ থাকিতে পারে; তিনি বলি ও আর্চনাধারা প্রসন্ন বা বশীভূত হন—মোটো অপ্রজ্ঞাতের এই স্বাভাবিক প্রচলিত মত নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্বস্বত্ব, সর্বশক্তিমান, প্রেমময়, মঙ্গলময়, স্তারবানু, পূর্ণ পরম স্তম্ভ, পুণ্যের পুংস্কর্ভা ও পাপের দণ্ডবিধাতা। আমরা প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে (৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা) মোটোর ব্রহ্মতত্ত্বের কিকিং পরিচয় দিয়াছি, অতএব এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।” (২১৬ পৃষ্ঠা)

তবে সমালোচক যদি বলেন, ‘ব্রহ্মতত্ত্ব’ শব্দ একমাত্র ভারতীয় অধৈতবাদের সংশ্রবেই ব্যবহার করিতে হইবে, কোন বৈদেশিক দার্শনিক বা মহাপুরুষের ধর্মমতের ব্যাখ্যাতে উহার প্রয়োগ অবৈধ তবে আমার নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি ‘ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিপুল অধৈতবাদ’, এবং ‘সর্ব-প্রকার ঐশ্বর্য-বিবক্ষিত’ ?

সম্প্রতি ছান্দোগ্যোপনিষদের এক ‘অপূর্ব’ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা “শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি কর্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ” প্রভৃতি সহ ব্যাখ্যা, এবং পণ্ডিত “সীতানাথ ভট্ট-ভূষণ কর্তৃক ঋগ্বৈদ্য ইত্যাদি সহ সম্পাদিত। এই সংস্করণের ভূমিকার “ব্রহ্মবাদের দুই ধারা” নামক প্রবন্ধে ভট্টভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে বাস্তবিক অস্তিত্বকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন, এবং “বাস্তবিক্যের মত হইতেই যে গৌড়পাদ এবং শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকগণের নির্বিশেষ অধৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।” পক্ষান্তরে প্রতাপতির মতে ব্রহ্মলোকে উপাস্ত উপাসকের ভেদ থাকে; এবং ইহা “শ্রীমদ্ভগবৎ গৌড়পাদ, নির্বিশেষ অধৈতবাদের বিরোধী।” ‘এই দ্বিতীয় চিন্তাধারা হইতেই যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের বিশিষ্টাধৈতবাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।’ (২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা।)

ভট্টভূষণ মহাশয় বলিতেছেন, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের অধৈত এবং ঐশ্বর্য বা বিশিষ্টাধৈত, এই দুই ধারা।

সমালোচকের নিজের নামে যে-প্রহ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকাতেই তাঁহার মতের প্রতিবাদ রহিয়াছে। ৬ই ভাগ ছান্দোগ্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়; মহেশবাবু এ যাবৎ ভট্টভূষণ মহাশয়ের মত হইতে আপনাকে বিযুক্ত (dissociate) করেন নাই।

সমালোচক প্লেব করিয়া লিখিয়াছেন, “ব্রহ্মের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাস্ত মানবান্ধা বর্তমান।”

হাঁ, প্রহকার ও সমালোচক যে-স্বাক্ষের সত্য, তাহা এই মতই প্রচার করিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মের “অধৈত” বা “একমেবাবিশীতম্” ব্রহ্মের উপাসক; আবার তাঁহার ব্রহ্মবাদমতে ভগবদ্দীতার “অন্যোনিত্যঃ শাস্তোহং পুরাণঃ” ইত্যাদি বাণীও ব্রহ্মের সহিত আবৃত্তি করেন। সমালোচকের সহযোগী পণ্ডিত সীতানাথ ভট্টভূষণ প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল নানা পুস্তকে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ভেদভেদ প্রতিপন্ন করণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

“ফোটিক্সই শাস্ত দেবকুল,” এই বাক্যটি উল্লেখ করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, “এই ভাষা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এই কবিত্ব কেবল অর্থহীন নহে—ইহা ভ্রমোৎপাদক।”

আপত্তি করিলে চলিবে কেন? এই “অর্থহীন, ভ্রমোৎপাদক কবিত্ব”, মোটোর নিজের, আমার নয়। তিনি “টিমাইয়সের” সৃষ্টি প্রকরণে লিখিয়াছেন, যে এই বিধ পিতা ষায়া ‘রচিত, শাস্ত দেবগণের প্রতিমা’ (Ton aidion theon gegonos agalma) (Tim (37c)। ইহার মর্ম এই যে, জগৎপিতা শাস্ত দেবগণের আদর্শ (বা তাঁহাদিগের

অনুকৃতিতে) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জেলারের মতে এখানে ‘শাস্ত দেবগণ’ পদের অর্থ ফোটিক্সের মত আর কিছুই নহে। (Plato, pp. 283, 495) পল্লার্টসও জেলারের সহিত একমত। Greek Thinkers, Vol. III. pp. 209, 212, 213. সমালোচক হয় তো এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অপর দণ্ডটা ব্যাখ্যা আনিয়া উপস্থিত করিবেন; কিন্তু আমি একেত্র বিসংবাদী মতাবলির নিবিড় অরণ্যে এই দুইজনকেই পথ-প্রদর্শক করিয়া চলিয়াছি।

ফাল্গুনের প্রবাসী

ফাল্গুনের সংখ্যার আলোচ্য বিষয় ‘বুদ্ধ ও সোক্রাটস’। ইহাতে সমালোচক কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সেগুলির বিচার আবশ্যিক। তৎপূর্বে দুই-একটি প্রশ্নোত্তরীয় কথা বলিয়া রাখি।

প্রথম কর্তব্য অস্বীকার। সমালোচক তিন স্থলে আমার প্রশ্ন প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) ত্রিবিধ ভূষণ

বিভবভূষণের আমি যে অর্থ করিয়াছিলাম ও তাৎপেক্ষ সমালোচকের অর্থই অধিকতর সুস্তিগুত; তিনি তাহার সপক্ষে প্রমাণও দিয়াছেন। আমার মনের সকল সংশয় এখনও যায় নাই, কিন্তু প্লেব-কথা এখানে ভুলিবে না।

(২) আর একটি স্থল

প্রহের ২৮৪ পৃষ্ঠে ভেদিক্তবৃত্তের অনুবাদে ‘বাহ্য কিছুই প্রশ্ন ও আকার আছে’ ইত্যাদি বাক্যটি সঘর্ষে আমার নিজের মনেই একটা অভূষ্টি ছিল। সমালোচক প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ইহার সন্দর্ভ করিয়াছেন।

(৩) সকারবিটটি

আমি ইহার বাক্যলা করিয়াছিলাম, “আমি আছি, এই সত্যি।” সমালোচক এই অর্থ অস্বীকার করিয়া নির্ধারণ করিয়া শব্দটির কুড়ি প্রকার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মঙ্গলবিম্বিকায় (১৩০০ পৃঃ) এই কুড়িটির উল্লেখ দেখিলাম, স্তরায় অল্প প্রমাণ নিশ্চয়প্রাপ্ত। কিন্তু তথাপি একটা কথা বলিতেছি। আমি দশ সংস্করণের তালিকার ঐ চারটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। সমালোচক যদি উহার স্থলে সংক্ষিপ্ত একটা কিছু বলিয়া দিতেন, তবে ভাল হইত। আর মোটের উপরে অর্থের পার্থক্যও যে খুব বেশী ঠাড়াইতেছে, তাহাও মনে হয় না। আশা শব্দটি অনেক সময়ে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাতেই বস গোলাবোণ ঘটে। P. T. S. অভিধানে সকারবিটটির একটি অর্থ, the heresy of individuality.

এই তিনটি সংশোধনের জন্য আমি সমালোচককে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এখন দুইটি অবান্তর বিষয়ে কিকিং বলিয়া গণ্য করিয়া গুরুতর সমস্তার আলোচনার প্রবেশ করিব।

(১) আহার বিহারাদি

আহারবিহারাদি শব্দক আলোচনাতে ‘পানপর্ক’ হইতে একটু স্থল উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, “প্রহকার প্রথম বাক্যটির অনুবাদ করেন নাই।” এখানে সমালোচক ভুল করিয়াছেন। ২৩১ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র উহার অনুবাদ, এবং আমার মতে এই অনুবাদই ঠিক।

(২) নরক

সমালোচক বলেন, “মোটো বাস্তবিক অনন্ত নরক নামিতেন না!”

‘গ্রন্থকারের এই শুভ কথা কল্পনামাত্র।’ তাঁহার মতে “প্লেটো অর্থাৎ প্লেটোর সোক্রেটস্ এক শ্রেণীর লোকের অল্প অনন্ত নরকেরই ব্যবহা করিয়াছেন।’ অসামান্য তিন তিনটি স্থল উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তবুই উপাখ্যানের অন্তর্গত। এই সম্পর্ক জেলায়ের দুইটি উক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

“The Platonic myths, in short, almost always point to a gap in scientific knowledge : they are introduced where something has to be set forth, which the philosopher indeed acknowledges as true but out which he has no means of establishing scientifically.” (Plato, p. 161)

“However admirable in themselves, therefore, they are in a scientific point of view, rather a sign of weakness than of strength: they indicate the point at which it becomes evident that as yet he cannot be wholly a philosopher, because he is still too much of a poet.” (Ibid. 162)

ইহার সার্থক এই যে, প্লেটো বাহ্য বিশ্বাস করিতেন, অথচ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না, তাহারই বর্ণনামূলে উপাখ্যান রচনা করিতেন। উপাখ্যানগুলি যতই চমৎকার হউক না কেন, জ্ঞানের হিসাবে এগুলি দুর্বলতার পরিচায়ক। প্লেটো (বা সোক্রেটস্) যে উপাখ্যানের সকল কথাই বিশ্বাস করিতেন, তাহাও বলা যায় না। কেন না, পূর্বাঙ্গলিখিত তিনটি উপাখ্যানের মধ্যে দুইটির শেষেই সোক্রেটস্ এমন কথা বলিয়াছেন, বাহ্যে মনে হয়, উপাখ্যানগুলিকে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বুদ্ধিবৃত্ত নহে। কাইডোনের উপাখ্যানটি সমাপ্ত করিয়া তিনি বলিতেছেন, “এখন কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই জোর করিয়া এ প্রকার বলা সম্ভব হইবে না, যে এই বিষয়গুলি আমি যেমন বর্ণনা করিলাম, ঠিক সেইরূপ।” পর্গাসের উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াও সোক্রেটস্ কালিক্রাসকে বলিতেছেন, “যুব সম্ভব তোমার নিকটে এগুলি বড়ী দিদিয়ার গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এবং তুমি এগুলি অবজ্ঞা করিবে।”

অতএব, ‘প্লেটো অনন্ত নরক বানিতেন’, এই মত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বলবত্তর প্রমাণ আবশ্যিক। সমালোচক বার্বেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে আর্চার-হাইডের মত উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

“The hopeless reprobation of the incurable criminals described in the myth of the *Phaedo* belongs simply to the pictorial presentation : we find it only when Plato is pressing popular legend into his service ; not when he is presenting his own views undisguised by this veil of tradition.” (Phaedo, Introduction, p. XXVII)

টিমাইয়স (42 C) হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়, যে প্লেটোর মতে অধঃপতিত আত্মা অল্প-অল্প সংসারচক্রে পারম্প্রয়ণ করিতে করিতে যে কোনও কালে সংশোধিত হইয়া পুনশ্চ আদি শুদ্ধতা লাভ করিতে পারে।

অতীন্দ্রিয় সত্তা

আমি লিখিয়াছি, “বৌদ্ধধর্ম পূর্ণমাত্রার জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। যিনি আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিদ্রিততম কোণেও

ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।”

দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটির প্রসূতি। সমালোচক বাক্য দুইটির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রথমটির বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, এবং বাহ্য প্রমাণিত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা বহুমান হইয়াছেন। আমি ভাবি নাই যে, পাঠককে ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে ‘অতীন্দ্রিয় সত্তা’ বলিতে, যিনি উপনিষদের ‘ন সন্দেহে তিষ্ঠতি রূপমস্ত ন চক্ষুশা পশ্যতি কন্দনৈনং’ ইত্যাদি শ্রুতির বিপরীত, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি বহু লিখিতাম যে, বৌদ্ধধর্মে ধর্ম, মৈত্রীকরণানুদিতাউপেক্ষা, আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিকমার্গ, নির্ব্বাণ প্রকৃতি সকলই সাকার, তবে অবশ্যই আমার অক্ষতা বিশোচনের উদ্দেশ্যে সার্বভৌম বুদ্ধিমহকারে প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যিকতা ছিল যে, “প্লেটোর মতে চক্ষুর্কর্ণাদির অতীত রাজ্যও আছে।”

জ্ঞান ও যুক্তি

সমালোচক ‘বৌদ্ধমতে জ্ঞানলাভই যুক্তি,’ এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বাহ্য-বাহ্য বলিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

প্রথমতঃ তিনি বাক্যটি অবিকল উদ্ধৃত করেন নাই। গ্রন্থ আছে, ‘বৌদ্ধমতে সত্যজ্ঞান লাভই যুক্তি।’ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার সারসংক্ষেপে বাক্যটি লিখিত হইয়াছে। বাহ্যের আলোচনাটি পড়েন নাই, তাহার শুধু এই বাক্যটি (apart from the context) পড়িয়া বিজ্ঞান হইবেন।

তার পর, “গ্রন্থকারের এই মত সত্য বহু প্রমাণ করা যায় না,” এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বলিতেছেন, (১) “বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানপ্রেরকর্ম-সমগ্রসীত হইয়াছে।” এবং (২) “দেখা যাইতেছে সম্যক্ প্রজ্ঞাও যথেষ্ট নহে।”

(১) বাক্যটি কি অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পূর্বাঙ্গলিখিত তিন পৃষ্ঠার তাহার ব্যাখ্যা আছে। এখানে প্রমাণ ও কর্মের সাধন উপেক্ষিত হয় নাই। গ্রন্থ সাধন-প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কাজেই ‘জ্ঞান ও ধর্ম’ নামক নিবন্ধে (৩০১ পৃষ্ঠা) জ্ঞানের কথাই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আমার আশঙ্কা হয়, সমালোচকের মস্তব্যের কলে বাক্যটিতে একটি বক্রার্থ অস্ত্র প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২) গ্রন্থকারের মত সত্য কি না, পাঠকগণ তাহা বিনয়গিতিকের নিরোক্ত বর্ণনার আলোকে বিচার করুন।

গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠার আশ্রয় বিবরে যে-আলোচনা আছে, তাহার উপসংহারে বুদ্ধ বলিতেছেন—(রূপ প্রকৃতি আত্মা নহে। যে সম্যক্ বস্তু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার ইহা এইরূপেই ধর্ম করা কর্তব্য।) যে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ধর্মকারী জানো আর্ধ্য আবেশের রূপের প্রতি, বেদনার প্রতি, সংসারের প্রতি, সংসারের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয়, নির্বেদ হইতে তাহার বিরাগ উৎপন্ন হয়, বিরাগ হইতে তিনি বিমুক্ত লাভ করেন, (বিমুক্ত হইলে) বিমুক্ত ব্যক্তির এই জ্ঞান হয়, ‘আমি বিমুক্ত হইয়াছি।’ তিনি সম্যক্ জ্ঞানেন, ‘পুনর্জন্ম কম হইয়াছে, ত্রাঙ্কর্ষা (উচ্চতরধর্মজীবন) উদ্ভাপিত হইয়াছে, বাহ্য করণীয় ছিল কৃত হইয়াছে; ইহাজীবনের পরে আমার আর পুনরাগমন নাই।’ (মহাবগ্গ ১৬।৪৬)

উপাগত এখানে সরল ভাষায় বলিয়াছেন, সত্যজ্ঞানলাভের কল যুক্তি। গ্রন্থের ২০২-২০৩ পৃষ্ঠার সামঞ্জস্যকল্প হস্ত হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অবিকল এই ভাষায় আশ্রয়বৃত্ত ভিক্ষু অর্থাৎ অহর্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সমালোচক সংযুক্তনিকার হইতে যে-অংশ বিস্তৃত

করিয়াছেন, তাহা যদি পূর্বেই বাখ্যানের বিরোধী হয়, তবে তাহাতেই গ্রন্থকারের মত অসত্য প্রমাণিত হয় না। নিম্নোক্ত বচন দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইতেছে।

ভাষ্যপত্রের উপস্থাপিত উপদেশের পরেই লিখিত আছে—

“ভগবান্ (বুদ্ধ) এই প্রকার বলিলেন। পঞ্চমর্গীয় তিসু পরিভুক্ত হইলেন এবং ভগবানের অভিত্যগণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যখন এই বাখ্যান বিবৃত হইল, তখন পঞ্চমর্গীয় তিসুগণের চিত্ত সংসারামুক্তি চিন্তা করিয়া আশ্রয়সমূহ হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময়ে ভগতে চর জন সর্হৎ ছিলেন।” মহাবঙ্গ, ১।৩।৪৭।

সমালোচক যদি বুদ্ধবাপী অপেক্ষা নারদের বাক্যকে অধিকতর মূল্য সমর্পণ করেন, তবে আবার কিছু বলিবার নাই।

পরিশেষে সমালোচক লিখিয়াছেন—

“প্রকৃত কথা এই, বুদ্ধের ধর্মে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি এই তিনেরই সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু সোক্রাটেশের আদর্শ ‘জ্ঞানই ধর্ম’। এই স্থলে সোক্রাটেশ ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক প্রভেদ।”

এই আশ্রয়কা সঙ্গ গ্রন্থখানির একটি অতি সংক্ষিপ্ত ‘সূত্র্যাখ্যান’।

সমালোচক সোক্রাটেশের একটি মতকে তাহার আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই মতটিই আলোচনা আট পৃষ্ঠার অধিক অধিকার করিয়াছে। (৩০-৩৮ পৃষ্ঠা)। নবম অধ্যায়ে ২২২ হইতে ২৩১, এই চল্লিশ পৃষ্ঠার সোক্রাটেশের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এগুলি অকিকিংকর বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু মেটো “পানপর্কে” সোক্রাটেশের যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, —২৩৪ পৃষ্ঠা) তাহা তো অবজ্ঞার বস্তু নয়। এবং তাহার যে চারিপানি গ্রন্থ আমার পুস্তকে ভাষ্যভরিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি, তাহাতেও সোক্রাটেশের একটি বৃষ্টি পাঠকগণের নয়নসমক্ষে সৌন্দর্যমান হইয়া উঠে। এইসমুদায় পতীর মনোবোধের সহিত অধ্যয়ন করিয়া সমালোচক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সোক্রাটেশে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন হয় নাই, এবং “এই স্থলেই সোক্রাটেশ ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক প্রভেদ।”

আমি বাহা মৌলিক ঐক্য বলিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, সমালোচক তাহাকেই মৌলিক প্রভেদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে যেখানে এইপ্রকার স্তম্ভকুৎসবের ব্যবধান, সেখানে বিচারের পথ অবরুদ্ধ।

অপর দুইটি বিষয়ে গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে গুরুতর মত-বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে।

(১) আত্মা

আমি লিখিয়াছি, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। সমালোচকের মতে এই সিদ্ধান্ত দ্বারা “বুদ্ধের প্রতি অবিচার এবং পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।”

পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সমালোচকের গুরুবাহের মধ্যে পড়িয়া আমি যে বিভ্রান্ত হইয়াছি, তাহা সূত্রকর্ত্তেই স্বীকার করিতেছি।

সমালোচক ইচ্ছিত করিয়াছেন যে, বুদ্ধের সময়ে আত্মা বিষয়ে যে বাবর্ডি প্রচার কিংবা ততোধিক মত প্রচলিত ছিল, সেগুলি এবং বর্তমান যুগের বিখ্যাত বিখ্যাত দার্শনিকগণের ভূরি ভূরি মতাবলি আলোচনা না করিয়া বুদ্ধের আত্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা সমীচীন হয় নাই।

সমালোচকের প্রের্ষিত প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষার কেহ জীবনচরিত লিখিয়াছেন কি না, জানি না। লিখিত হইতে পারে কি না, তাহাও আমি বলিতে অক্ষম।

আমি যেটামুটি এই বৃষ্টি যে, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি না, এই আলোচনার প্রথম বিবেচ্য আত্মা শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সচরাচর কি অর্থে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ তৎকাল-প্রচলিত কোন একটি মতেও আত্মা মানিতেন কি না।

(১) পূর্বে বলিয়াছি, আমরা আত্মা বলিতে এক নিত্য ও শাশ্বত সত্তা বুঝিয়া থাকি। সমালোচক যদি ভিজ্ঞাসা করেন, ‘আমরা কে?’ তবে প্রথমে বলিব, ‘বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ;’ তৎপরে আবঙ্গক হইলে বলিব, ‘অন্ততঃ লেখক যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজ’।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, বুদ্ধ এই অর্থে আত্মার অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছেন কি না? আমি বলি, “না।”

গ্রন্থের ২৮-৩০ পৃষ্ঠে মজ্জিমবঙ্গের হইতে ইহার একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহার প্রথম পঙ্কের ১০৮ পৃষ্ঠার আত্মাসম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যান আছে। ব্যাখ্যানটি প্রয়োজনমূলক। বুদ্ধ শিষ্যগণকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “তিসুগণ, যদি আত্মা থাকে, তবে আমার আত্মার (আত্মা বলিবার কিছুও থাকিবে?)” “হাঁ, ভগবান্।” (কিথা হাঁ, প্রভো)। “যদি আত্মার থাকে, তবে আমার আত্মাও থাকিবে।” “হাঁ, ভগবান্।” “তিসুগণ, আত্মা ও আত্মার সত্যতঃ (বর্ষার্থতঃ) স্থির বর্তমান, ইহা যদি উপলব্ধ না হয়, তবে এই যে মত—এই মতং এই আত্মা, ‘আমি হুত্বার পরে নিত্য, জ্ঞান, শাশ্বত, বিকারবিহীন আত্মাই হইবে, (এবং) শাশ্বতী সয়া সেইরূপই অবস্থান করিবে,—তিসুগণ, ইহা কি কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম (ব আত্ম বিশ্বাস) নয়?’ “ভগবান্, ইহা কেন কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম হইবে?”

এই প্রশ্নের পরে গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠার বিনয়পিটক হইতে আমরা যে-অংশ অনুবাদ করিয়াছি (মহাবঙ্গ, ১।৩।৮-৪৫), তাহারই শেয়ার্ড (১।৩।৪১-৪৫) পুনঃপ্রাবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। মজ্জিমবঙ্গ, ১ম পঙ্ক, ৮ পৃষ্ঠারও আত্মা সম্বন্ধে এতদনুরূপ উক্তি আছে।

এই ব্যাখ্যানে বুদ্ধ, “আত্মা নিত্য ও নির্বিকার” এবং “আত্মা রূপ বেদনা, ইত্যাদি,” এই দুই মতের নিরসন করিয়াছেন।

(২) বুদ্ধ যে আত্মা-বিষয়ে তৎকালপ্রচলিত কোন-একটি মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিনয়পিটক ও সূত্রপিটকে তাহার প্রমাণ এবাবৎ আমা-দিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তিনি আত্মা কি নয়, শিষ্যগণকে পুনঃ পুনঃ তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন; আত্মা কি, তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মা-সম্বন্ধে পালি সাহিত্যে ‘নেতি’-বাচক উপদেশ ভূরি ভূরি আছে, কিন্তু ‘অস্তীতি’-বোধক উপদেশ একটিও নাই। তিনি এই প্রশ্নটি অব্যক্ত তৎস্বের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। হুত্বরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তিনি আত্মা—অস্তিত্ব: আত্মা বলিতে আমরা বাহা বুঝি, তাহা—মানিতেন না।

এই প্রসঙ্গে সমালোচক ‘নিত্য-বহা’-নামক মন্তব্যো ভগবৎ-প্রবাহ ও জীবন-প্রবাহ উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, “কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইহাজীবনেই জীবন-প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করা সম্ভব। যখন এই প্রবাহ স্থিরত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং প্রজাপতিও ‘সেই মুক্ত পুরুষের সন্ধান পান না।’” (‘অগমব্দ’-উপমা নামক সূত্র, মজ্জিমবঙ্গ, ১।১৪০)।

বুদ্ধ কোথায় ইহা বলিয়াছেন? সমালোচকের লিখন-ভঙ্গী হইতে মনে করিয়াছিলাম, মজ্জিমবঙ্গ, ১।১৪০ পৃষ্ঠার বুদ্ধ ঐপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়া-ছেন। কিন্তু সেখানে “ইন্দ্রাদি মুক্ত পুরুষের সন্ধান পান না,” এই কথা বলিয়া তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তৎপূর্বে, ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে মুক্ত পুরুষের বর্ণনাই চলিয়াছে। সমালোচক ইহার সহিত বুদ্ধবাপী-রূপে জীবন-প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করিবার কথা জুড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ইহার মূলের সন্ধান পাইলাম না।

ইহার একটু পরে তিনি মহাপরিনির্বাণস্থ হইতে একটি ও ধর্ম-পদ হইতে করেকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, “এসমুদয় যদি আত্মবাদের কথা হয়, তবে বুদ্ধ আত্মবাদী।”

ইহার একটিও আত্মবাদের কথা নয়। মহাপরি, ২১২০এ উল্লিখিত উক্তির প্রথমার্ধে তিনিই বাক্য আছে। সমালোচক তৃতীয় বাক্যটি বাদ দিয়া প্রথম দুইটির মনঃকরিত অর্থ করিয়াছেন। আমরা সমগ্র উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি—

“তস্মাৎ ইহ’ আনন্দ অন্ত-দীপা বিহরথ অন্ত-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা, ধর্ম দীপা ধর্ম-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা।” মহাপরি, ২১২৬।

“অতএব, হে আনন্দ, তোমরা আপনার প্রদীপ হও, আপনার শরণ লও, অন্তের শরণ লইও না, তোমরা ধর্মকে আপনার প্রদীপ কর, ধর্মের শরণ লও, অন্তের শরণ লইও না।”

ইহা পুরুষকারের কথা, আত্মবাদ নহে। সমালোচক ধর্মপদের যে-করটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লেখ্য ১৫৬ ও ৩১৭ শ্লোকে আত্মার কোন কথাই নাই। ১৬০ ও ৩৮০ শ্লোকের মর্ম (মাসুখ) “আপনই আপনার নাথ;” ৩২৭ শ্লোকের মূল বক্তব্য “বচিস্তকে রক্ষা কর, আপনাকে উদ্ধার কর।”

ধর্মপদের অস্তা (আত্মা) শব্দ আত্মবাদের সমর্থক কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে দ্বিতীয় এই প্রশ্নে উপরে, যে বুদ্ধ আত্মা মানিতেন কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তররূপ ধর্মপদ হইতে “অস্তাহি অন্তনো নাথো” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিলে ঘোটকের সম্মুখে শকটস্থাপনের অনঙ্গতি ঘটে।

সমালোচক লিখিয়াছেন, “বুদ্ধ নিজে বলিতেছেন, তিনি বিনাশক নহেন।”

ই, তিনি বলিয়াছেন, তিনি “সত্তো সত্তসু” “বেনরিকো” এই অভিযোগ মিথ্যা। কেন? না, প্রথম ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে মোটেই জানে না; যেহেতু তৎপাত গজের (অননুবেজ্জা ; না জানিয়াই, তিনি বাহা কখনও বলেন না, তাহাই তাঁহার প্রতি আরোপ করে। এখানে দুইটি বিবরণ বিবেচ্য।

(১) বুদ্ধ এখানে স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। (He does not commit himself to any particular view)।

(২) সত্তো সত্তসু বেনরিকো এই তিনটি কথার অর্থ কি?

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্কোচ্চ-উপাধিকারী, বৌদ্ধবংশোদ্ভূত পালির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেপীনাথ বড়ুয়ার মতে এখানে বুদ্ধ নৈতিক সত্তার বা সনাতন রীতির কথা বলিয়াছেন। তাঁহার অর্থাৎ বিনয়পিটক, স্তুত-বিত্তর ১১১৩ বুদ্ধ কোন্ অর্থে বিনাশক, কোন্ অর্থে বিনাশক নহেন, এই স্থলে তিনি তাহা নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “হে ব্রাহ্মণ, আমি বিনয়ের (বা বিনাশের) স্তম্ভ ধর্ম শিক্ষা দিই; আমি আর্জাত, যেব এবং মোহের বহুবিধ পাপ ও অহিতকর কর্মের (বা কলের) বিনাশের স্তম্ভ ধর্ম শিক্ষা দিই। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই সেই তাৎপর্য, যে তাৎপর্য অল্পসারে কেহ সত্যই বলিতে পারে; যে পৌত্তম্য বিনাশক (বেনরিকো); তুমি বাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বিনাশক বলিতেছ, সে অর্থে নহে।”

বড়ুয়া মহাপরি বলেন, মব্ধির, ১১১০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত বাক্য ধারা, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সিদ্ধ হয় না।

সমালোচক গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠা হইতে “আত্মা নাই” শীর্ষক ব্যাখ্যানটি উদ্ধৃত করিয়া তদুপরি তর্কবিচার ইঙ্গল বিচারপূর্বক এই সিদ্ধান্ত আহরণ করিয়াছেন, যে, “আত্মা নিত্য ও নির্বিকার।”

আমি প্রথমেই স্বীকার করিতেছি, যে, ব্যাখ্যানটির শিরোনামে ও উল্লিখিত প্রথম পংক্তিতে ‘আত্মা নাই’ না লিখিয়া ‘আত্মা আছে কি না’ লিখিলেই ঠিক হইত। কিন্তু এই অসাবধানতার স্তম্ভ সমালোচকের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয় নাই। প্রথমতঃ বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার কোন উপদেশের প্রতিই আবর্তন-অনুমান, ব্যাবর্তন-অনুমান প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে, বুদ্ধ বাহা বলেন নাই, এমন কোনও সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন নাই। গ্রন্থের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, “তিনি এত বিশুদ্ধরূপে হ্রস্ব তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতেন, যে বিনয় পিটকে ও স্তুত-পিটকে ও তাঁহার ধর্মব্যাখ্যার প্রথমসাত্তক একটি বাক্য পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।” পঞ্চবগীর ঠিক পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান শুনিয়া বুঝিলেন, রূপ প্রকৃত আত্মা নহে, তাহারই যে সাধ্য পক্ষ নিগমন ইত্যাদির সাহায্যে ‘আত্মা নিত্য ও নির্বিকার’, এই মীমাংসার উপনীত হইয়া বিমুক্তি লাভ করিলেন, বিনয়পিটক এমন কথা বলে না। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ স্বয়ং এই-প্রকার সিদ্ধান্তের অবলম্বন তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, কেন না, তিনি ঐ মতটিকে “বালধর্ম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমালোচক যে লিখিয়াছেন, “বুদ্ধ নিজে সাক্ষাৎভাবে এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই”, ইহা স্বীকার করিতে পারিতোহ না। তাঁহার কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা Baldwin, James, Ladd, Wundt এর শিষ্যের দ্বারা চৈতন্যপ্রবাহকে আত্মা বলি না; আমরা বাহাকে আত্মা বলি, বুদ্ধ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তাঁহার সমসাময়িকেরা আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল মত পোষণ করিত, সেগুলিও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তিনি নিজ আত্মা বলিতে ঠিক বুঝতেন, তাহা কোথাও কাহাকেও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেন নাই—স্রাবকপণ্ডকে তদ্বিষয়ক আলোচনার সুযোগ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি বাহা মানিতেন না, তাহা সুপরিচ্ছাদিত; বাহা মানিতেন, তাহা অজ্ঞাত; অতএব আমরা বুদ্ধের আত্মবাদ-বিষয়ে বাহা বলিয়াছি, তাহা অসৌভাগ্যিক নহে।

(২) ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

সমালোচক বলেন, “বুদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন পরব্রহ্মও মানিতেন।” “কিন্তু এই ঈশ্বর অশাস্বত।”

আমরা অশাস্বত ঈশ্বকে ঈশ্বর বলি না। আমরা যখন ‘ঈশ্বর’ শব্দ ব্যবহার করি, তখন বেদান্তের ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, সত্ত্ব ব্রহ্ম, নিগুণ ব্রহ্ম, তুঙ্গীয় ব্রহ্ম ইত্যাদির ভেদ মনে রাখিয়া বিজ্ঞ বৈদান্তিকের দ্বারা কথা বলি না। আমি যখন লিখিয়াছিলাম “তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, তখন “দাব্যমতর-মশোকমদেহং পূর্ণমনাধি চরাচরগেহং। চিত্তায় শান্তমতে পরমেশং”—রামমোহন রায় এই ভাষায় বাহার বন্দনা পাঠিয়াছেন, তাঁহাকেই শ্রদ্ধাপথে রাখিয়াছিলাম। “বুদ্ধ অশাস্বত ঈশ্বর মানিতেন” একথা ধারা আমার মতের নিরসন হয় না।

সমালোচক বলেন,

“প্রায় সমুদয় ধর্ম-সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্ম একই; এতদু-ত্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে পৌরাণিক ব্রহ্মের দ্বারা এ ব্রহ্মও মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন করে আবার সমুৎপত্ত হইয়া থাকেন।”

তবে পৃষ্ঠীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন করে আবার সমুৎপত্ত হইয়া থাকেন। এতদিন ইহা অসম্ভাব্য না।

সমালোচক “নিত্য সত্য” বিষয়ে উদান হইতে বুদ্ধের দুইটি উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে-সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই, যে (১) উক্তি দুটির ব্যাখ্যা এখনও নিশ্চিত নির্ধারিত হয় নাই। বুদ্ধের অল্প বয়সে শত উপদেশের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে ইহা যে ব্রহ্ম বিষয়ক উক্তি, এমন প্রতীতি জন্মে না। (২) উদান (এবং ইতিবৃত্তক) বিনয়পিটক ও নিকায়সমূহের পংখ্য রচনা। উক্তি দুটি যে বুদ্ধের, তাহা প্রমাণিত করা আবশ্যিক। (৩) বিশেষণের সাম্য হইতে বিশেষ্যের সাম্য অবধারণিত হইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্বাণের বর্ণনার উপনিষদের ভাবের প্রতিফলন আছে। (গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠার তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।) ইহাতেই নির্বাণ ও ব্রহ্মের একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। (৪) নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই বস্তু” ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সমালোচক “বুদ্ধ হইতে বাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে যোকের কথা আছে, কিন্তু নির্বাণের কথা নাই। নির্বাণ ও যোক যে এক, তাহার প্রমাণ পাইলাম না।

পরিশেষে সমালোচককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—

১। বুদ্ধ যদি পরব্রহ্ম মানিতেন, তবে শিষ্যদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিখা দেন নাই কেন? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, “হে আনন্দ, আমি আমার ধর্মে অন্তর-বাহির ভেদ না রাখিয়া উহা প্রচার করিয়াছি, কোন কোনও আচার্য্য যেমন এক-একটা তত্ত্ব মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তথাপতের সত্য-সমূহে সেসকল মুষ্টিবদ্ধ কিছুই নাই।” (মহাপরি. ২।২৫৪)

যিনি ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান পরমতত্ত্ব শ্রাবকবর্ণের নিকটে সন্মোচন রাখিলেন, তাহার মুখে কি একথা শোনা পার?

২। বুদ্ধ তাঁহার সাধন-প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনার স্থান রাখিলেন না কেন? তাঁহার সবকালে ভারতে ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে আলোচনা অপ্রস্তুত ছিল না; তিনি আত্মবন এসম্বন্ধে নীরব রহিলেন কেন? তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য আনন্দ, উপাসি ও মহাকাশ্যপই বা তাঁহাকে জ্ঞান বুঝিলেন কেন?

৩। মহাপরিনির্বাণের কয়েক শতাব্দী পরেই বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে ব্রহ্মের পিছনে প্রতিষ্ঠিত করিল কেন? তাহার কোন সুদীর্ঘকালেও বুদ্ধিত পাবিল না, যে বুদ্ধ ব্রহ্ম মানিতেন, সুতরাং উপাসনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য বুদ্ধে ব্রহ্মের স্বরূপাবলি আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই, তৎপক্ষে একা ব্রহ্মই যথেষ্ট?

৪। বুদ্ধ যদি ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তবে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী হইল কেন? শুধু পশুপাতমূলক ব্রহ্মবিধির নিন্দার জন্য? শক্রমিত্র কেহই তাঁহার ধর্মের পতীরতম উৎসের সম্মান পাইল না, ইহার কারণ কি?

৫। “নির্বাণ, যোক ও পরব্রহ্ম একই বস্তু।” তবে শব্দর বৌদ্ধ-গণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য উদ্ভিন্ন পড়িয়া লাগিলেন কেন? যে-ধর্মের স্বর্গস্থলে তাঁহার সহিত এমন নিপুট ঐক্য ছিল, তাহাকে সুসংযুক্ত ও সুসংযুক্ত করিবার প্রয়াস না পাইয়া তিনি তাহা একেবারে ঘেঁষ হইতে বিহীন করিবার জন্য বুদ্ধগণিকর হইলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

৬। এপর্যন্ত পানি সাহিত্য প্রায় বার হাজার পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের ব্রহ্মবিষয়ক উক্তি কয়টি পাওয়া গিয়াছে? তাঁহার এক-একটি উপদেশ কতবার কত স্থানে বলিতে গেলে প্রায় একই ভাবের বিগৃহ্য রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ববোধক ব্যাখ্যানের সখ্যা নাই। অথচ ব্রহ্মবাদের স্বকীয় উক্তি মুদ্রিত পায়েরা কঠিন; এবং যে দুই-একটি সমালোচক প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহারও ‘ব্রহ্ম’ শব্দ উল্লিখিত হয় নাই। এই সমস্তার সমাধান কোথায়? সমালোচক হয় তো বুদ্ধের ব্রহ্মবাদপ্রতিবাদক, আরও প্রমাণ সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি অব্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া যে-বিষয়ে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে, তাহার নিঃশেষ ‘সীমংসার’ জন্ত প্রমাণগুলি সাধারণের গোচর করা বাঞ্ছনীয়। তৎপক্ষে একটি করণ্য একান্ত আবশ্যিক। তাহা এই যে, সমালোচক খৃষ্টি-বিষয়ক আলোচনার বাইবেলের প্রতি যে-সমালোচনা-প্রণালী প্রয়োগ করিয়াছেন, বিনয়পিটক ও সূত্রপিটকও সেই প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে। (১) পিটকাদ্বয়গত গ্রন্থগুলির স্তব-নির্ধারণ, (২) প্রত্যেক গ্রন্থের রচনাকাল নির্ধারণ, (৩) কোন্ কোন্ ব্যাপান বুদ্ধের, কোন্-গুলি শ্রদ্ধিগত, এই প্রশ্নের যথাযথ নিষ্পত্তি—এই তিনটি বিষয়ে একমতের উপনীত হইতে না পারিলে বিদোষী পক্ষের শুধু বাগ্‌বিহ্বা করিয়া লাভবান হইবেন না। বুদ্ধকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া বরণ করিবার জন্য হু-এ-২ নেকের চিত্র হাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মের শ্রীকৃত মতের মত যৌব মহাশয় যদি তাঁহাগুলির পরিভূক্তিমাধনের অস্তিত্বের উচ্চতর সমালোচনার নিরমাত্মদারে বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ অক্ষয় ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস্তবতা পাবেন, তবে তিনি ভারতবাসীর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও সঙ্গে-সঙ্গে অমর কীর্তির অধিকারী হইবেন।

সমালোচকের প্রত্যুত্তর

গ্রন্থকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন, যে, তিনি যথেষ্ট সময় পান নাই। কিন্তু তিনি তিন সমালোচনার পৃথক পৃথক জবাব দিয়াছেন। প্রথম সমালোচনার জবাব দিতে সময় পাইয়াছেন আড়াই মাস, দ্বিতীয়টির জবাব দিতে সময় পাইয়াছেন দেড় মাস, তৃতীয়টির জবাব সময় পাইয়াছেন ১৫ দিন।

আর মহেশবাবু সময় পাইলেন আড়াই দিন। তিনি ১লা মার্চ সোমবার ১০টার জবাব পান, প্রত্যুত্তর দিলেন ৩রা মার্চ বুধবার সাড়ে তিনটার। *

প্রথম বক্তব্য গ্রীক উচ্চারণ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা আবশ্যিক। ইহা সত্য, প্রবন্ধের কোন-কোন স্থলে আমি ইংরেজী নাম লিখিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রাচীন উচ্চারণ কি তাহা যথাস্থলে আলোচিত হইয়াছে। বাংলায় কি উচ্চারণ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে নানাদিক হইতে বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে (১) d = ড, (২) t = ট.

* অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মহাশয় সময়ের কথা না ভুলিলে ভাল হইত। তিনি যে-গ্রন্থ লিখিতে ২(নয়)বৎসর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার সমালোচনার মহেশবাবু সত্যসত্যই তিন মাস সময় লইলেও কিছু অজ্ঞায় হইত না। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তিন মাস ধরিয়া সমালোচনা করেন নাই, কয়েকদিনের মধ্যে করিয়াছেন; আমারই তাহা ছাপিতে তিন মাস লাগিয়াছে। রজনীবাবুর বহিষ্ঠানির দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩১ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহার পৃষ্ঠা ও অক্ষর যেরূপ, সেইরূপ পৃষ্ঠা ও অক্ষরে ছাপা হইলে মহেশবাবুর সমালোচনা আনুমানিক ৫০ পৃষ্ঠা হইত। ৮৩১ পৃষ্ঠা পড়িয়া তাহার সমালোচনা করিতে মহেশবাবু যদি বাস্তবিকই তিন মাস লইতেন, তাহা হইলে ৫০ পৃষ্ঠা সমালোচনা পড়িয়া তাহার জবাব দিতে রজনীবাবুর সাড়ে পাঁচ দিনেরও কম সময় পাওনা হয়। কিন্তু তাঁহার নিজের কথা অনুসারেই তিনি ১৪ দিন সময় পাইয়াছেন। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন। গ্রন্থ-সমালোচনার সমালোচনা আমি সাধারণতঃ ছাপি না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া রজনীবাবুকে দীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিবার সুযোগ দিয়াও আমার নিষ্কৃতি নাই। সেজন্য প্রবাসীর অনেক অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ছাপিতে আগেকার ও বর্তমান মাসে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ও কম হয় নাই।

প্রবাসীর সম্পাদক।

(৩) eta—এ, (৪) o-mikron—অ, (৫) o-mega—ও । Theta, Phei, Chei হলে ট হ (হট্‌স), প্ হ (হস্‌প) ক্ হ (হস্‌ক) লিপিতে উচ্চারণ বিভ্রাট হইবে । এইজন্য এই তিনটির হলে ঠ (থ' নহে) ফ এবং 'খ' লেখা যাইতে পারে । তবে এই সঙ্গে-সঙ্গে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যিক । zeta হলে 'জ' লেখা যাইতে পারে । সংযুক্তস্বর সমূহকে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিতে হইবে । তবে o u—উ বা উ । গ্রন্থকার 'সোফ্রাটাস্' উচ্চারণের যে-যুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইলাম না ।

দ্বিতীয় বক্তব্য—আমাদিগের (= আমার) বিশ্বাস 'উপদেবতা' ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না । অনুরূপ দৃষ্টান্ত উপপতি, উপপত্নী, উপধর্ম ইত্যাদি । 'অপদেবতা' সর্বত্রই কদম্বা অর্থে ব্যবহৃত হয় ; উপদেবতা কোন-কোন স্থলে অপদেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু বক্তব্যস্বারা সর্বত্রই ইহা হীন অর্থে ব্যবহৃত হয় । দেবতা হিন্দুগণের উপাস্য ; কিন্তু তাঁহারা কেহই উপদেবতার উপাসনা করেন না । সংস্কৃত অভিধানের মতে বিদ্যাধর, অপ্সরা, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ষ, কিন্নর, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধ ও ভূত এই দশটি দেবগোনি বা উপদেবতা । গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“রক্ষ, পিশাচ ও ভূত—এই তিনটি ছাড়া অপর সাতটি ভাবার ত মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না ।”—আমাদিগের মনে হয়—এক মাত্র 'সিদ্ধ' বাতীত অপর নয়টিই হীনভাষ্যক । অপ্সরা, কিন্নর, বিদ্যাধরাদির স্থান উচ্চ নহে । আর-একটি কথা এই সোফ্রাটাস্ ঐহারা বাণী শ্রবণ করিতেন তাঁহার প্রকৃতি কি বিদ্যাধরাদির স্থার ? অবশ্যই নহে ।

গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, daimon on অর্থ divine agency ; তবুও তিনি এই বলিয়া আপত্তি করিতেছেন :-

“জীউএট্‌ নিজে Thoe lotus 151 A to gignomenon moi daimonion.” এই পদের অনুবাদ করিয়াছেন “my familiar” ই, ঠিক । কিন্তু Campbell ঐ স্থানের টীকার লিখিয়াছেন—“Here, as always, not commanding but forbidding ; and as generally neuter and impersonal.” (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ: ৩৪) । ইহার মতে ঐ শব্দটি ক্রীবলিঙ্গ এবং ইহাতে ব্যক্তিত্ব অর্পণ করা হয় নাই ।

যদি বিশেষ কোন স্থলে এই ক্রীবলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ অর্থ করিতেই হয় তবে 'উপদেবতা' ব্যবহার না করিয়া 'অল্পদেবতা' ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

Daimonion অর্থ দেবকর্তৃৎ এই মত সমর্থন করিবার জন্য গ্রন্থকার Apology এর কোন বিশেষ সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন । ঐ অংশের তিন পংক্তি পরে এইরূপ আছে—
“It is clear then that all references in later writers, whether ancient or modern, to Socrates' belief in a special 'Genius' or 'Guardian Angel' that watched over him are based on a misinterpretation and are quite beside the mark”.—Williamson's Edition p. XXII). অর্থাৎ পরবর্তীকালে ঐহারা ঐ শব্দের অর্থ (Genius বা Guardian Angel) করিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন ।

এবিধে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক ।

তৃতীয়তঃ—স্ফোটবাদ ও 'এইডস্'-বাদ এক নহে । বিনা যুক্তিতে বৃহস্পতির বচনও গ্রহণীয় নহে । স্ফোটবাদ একটি বিশেষ পারিতোষিক শব্দ । বহু গ্রন্থে, ভাষ্যে ও টীকাতে ইহা একটি বিশেষ অর্থে গৃহীত হইয়াছে । এমতাবস্থায় এই শব্দে নূতন অর্থ আরোপ করিলে অর্থ-বিভ্রাট হইবে ।

ভুলক্রমে দুই-একটি সংস্কৃত শব্দ নূতন অর্থে অল্পে অল্পে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে । তাই বলিয়া কি বিশেষ বিশেষ পারিতোষিক শব্দকেও

নূতন অর্থে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ? এপ্রকার করিবার কোন প্রকার আবশ্যিকতাও দেখিতেছি না ।

চতুর্থতঃ—গ্রন্থকার যে-যে স্থলে বিচার না করিয়া পরস্পর-বিরোধী মতসমূহের মধ্যে একটা মতকে মেটোর মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা কেবল সেই-সেই স্থলেই বলিয়াছি যে, এপ্রকার ব্যাখ্যায় পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন । যে অধিকরণে গ্রন্থকার বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন সে-স্থলে অবশ্যই কিছু বলা হয় নাই । এক অধিকরণের সিদ্ধান্ত অপর অধিকরণে প্রযোজ্য নহে ।

পঞ্চমতঃ—অনুকৃতবাদ ও অংশভাগিত্ব—তাইটি পৃথক মত । আমরা বলিয়াছিলাম, গ্রন্থকার এতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই । অর্থাৎ গ্রন্থের ১১১ পৃ: হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাতেও এপার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই । বরং তিনি বলিয়াছেন—অংশভাগিত্ব তটুগেট্‌ অনুকৃতি হয় ।

ষষ্ঠতঃ—গ্রন্থকার স্ফোটবাদকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন । আমরা বলিয়াছিলাম—ইহা ভারতীয় ব্রহ্মবাদ নহে । গ্রন্থকার অর্থাৎ বলিতেছেন, “ভারতীয় ব্রহ্মবাদের কথা কোথা হইতে আসিল ?” উত্তর এই—গ্রন্থকারের মতে ঐশ্বর এবং উপনিষদের ব্রহ্ম একই । তিনি প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন “পরম শিব.....ঐশ্বর (উপনিষদের ব্রহ্ম)” পৃ ৪৮৩ । ঐশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর উপনিষদের ব্রহ্ম তখন ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থ নিশ্চয়ই “উপনিষদের ব্রহ্মবাদ” । আমাদিগের যদি বুঝিবার ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে সেজন্য আমরা অপরাধী নহি ।

৭ । আমরা বলিয়াছিলাম, “সঙ্কের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাস্ত মানবান্না বর্তমান,—ইহা বোর ষ্ঠতবাদ । (মুদ্রাক্ষেণে ভুলক্রমে বর্তমান শব্দের পরে কমা না চাপাইয়া পূর্ণচ্ছন্দ ছাপান হইয়াছিল) । গ্রন্থকার মনে, করেন ব্রাহ্ম সমাজের লোকে বিশ্বাস করেন যে, সঙ্কের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাস্ত মানবান্না বর্তমান । আমাদিগের অস্বীকৃতি অল্প প্রকার । আমরা জানি যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মই মনে করেন যে, মানবান্নার আরম্ভ ও জন্ম আছে । যাহার জন্ম আছে তাহা অজ নহে এবং নিত্য ও শাস্ত নহে । এই স্থলে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে । ব্রাহ্ম সমাজ আশ্রয় অনন্ত উন্নতি স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং এমতান্না পরিবর্তনশীল । পরিবর্তনশীল বস্তু কখন নিত্য শাস্ত হয় না ।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার গীতার 'অজ্ঞানিত্যঃ শাস্তোত্তরঃ' ইত্যাদি অংশের উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদিগের মনে হয়, এস্থলে গ্রন্থকার কিছু ভুল করিয়াছেন । গীতার ঐ অংশ ব্রাহ্মবাসরে পাঠ করা হয় না—শাস্ত্রের বিধি কঠোপনিষদের অনুরূপ অংশ ব্রাহ্মবাসরে পাঠ করা । যদি কোন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মবাসরে ঐ অংশ পাঠ করেন, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না । কিন্তু কোন ব্রাহ্ম যদি গীতা বা কঠোপনিষদের ঐ অংশ ব্রাহ্ম সমাজের মতানুসারে ব্যাখ্যা করেন, আমরা বলিব ব্যাখ্যা ভুল হইয়াছে । তবে কোন ব্রাহ্ম যদি অদ্বৈতবাদী হন, কথা স্বতন্ত্র ।

৮ । উপনিষদের কোন স্থলেই আশ্রয় বহু স্বীকার করা হয় নাই । সর্বত্রই 'আশ্রয় এক' এবং এই আশ্রয় ব্রহ্ম । কিন্তু মেটোর মতে আশ্রয় বহু এবং ঐ সমুদয় আশ্রয় ব্রহ্ম নহে । মেটো দ্বৈতবাদী বা নানাবাদী ।

৯ । ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্মকে বা উপনিষদের ব্রহ্মকে কখন নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় না । স-সীম ঐশ্বরই নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন । সুতরাং মেটোর স্ফোটতত্ত্ব ব্রহ্মবাদ নহে ।

১০ । ছান্দোগ্য উপনিষদের কথাটা না ভুলিলেই ভাল হইত । “অপূর্ব” কথাটা আমার নহে । আমি বিজ্ঞাপন দেই নাই—কাহাকে দিতেও বলি নাই এবং এসমুদয় বিষয়ে আমার কোন সম্পর্কও নাই ।

সুতরাং বিজ্ঞাপনে “অপূর্ব” কথাটা ব্যবহার করার যদি দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমার নহে।

গ্রন্থের টীকা, অনুবাদ ও মন্তব্য বিষয়েই আমি দায়ী। সম্পাদক বাহা লিখিয়াছেন সেজন্য সম্পাদক দায়ী—একজনের মতের জন্ত অপরে দায়ী নহেন। সর্বদেশেই এইপ্রকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতামত সমালোচনা করিতে হইলে উক্ত গ্রন্থের মন্তব্য ও প্রবাসীতে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সমালোচনা করা আবশ্যিক।

১১। ‘কোটি বৃন্দই শাশ্বত দেবকুল’ এ কথার আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার ‘টিনাইডস্’ গ্রন্থের ৩৭০ অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এখানে শাশ্বত দেবগণের কথা বলা হইয়াছে এবং এই শাশ্বত দেবগণ কোটিনমূহ হইতে অভিন্ন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তিনি এখানে ‘জেলার’ ও ‘গম্পটিনস’ এই দুই জনের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার Archer-Hind এর মতকে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মত বলিয়া মনে করেন। তিনি গ্রন্থকারের উদ্ধৃত অংশ বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

“This is a very singular phrase. The *Kosmos* we know is the image of the *auto zoon* and the creatures in it are the images of the *noita zoa*. Therefore *aidioi theoi* can be nothing else than the ideas. But nowhere else does Plato call the ideas ‘gods’ and the significance of so calling is very hard to see. If however Plato wrote *theon* (which I cannot help regarding as doubtful), I am convinced that he used this strange phrase with some deliberate purpose in view; but what that purpose was, I confess myself unable to divine.” (পৃ: ১১৮)

অর্থাৎ উক্ত অংশ অতি অস্বভাব; মেটো বিত্তীয় কোন স্থানে এইপ্রকার কোন কথা বলেন নাই; তিনি এই স্থলে ‘দেবতা’ শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে যদি তিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়াই থাকেন তবে বলিতে হইবে তিনি বিশেষ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে সে অর্থটা যে কি, তাহা টীকাকার বুঝিতে অক্ষম।

এই অতি অস্পষ্ট অংশ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার ‘কোটি’ বৃন্দকে শাশ্বত দেবকুল বলিয়াছেন।

আর-একটা কথা বলা আবশ্যিক। এখানে ‘এইডস্’ এর (গ্রন্থকারের ‘কোটে’র) উল্লেখ নাই। আছে ‘দেবতা’; ব্যাখ্যাতে মনে হয় ইঁহা বেন ‘এইডস্’ই।

১২। প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে (প্রবাসী, পৃ: ৬৪৪) বলিয়াছিলাম গ্রন্থকার একটি বাক্যের অনুবাদ করেন নাই। জবাবে গ্রন্থকার বলিতেছেন, “২৩১ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র ইঁহার অনুবাদ এবং আমার মত এই অনুবাদই ঠিক।” গ্রন্থকারের প্রথম ছত্র এই :—“যখন প্রচুর খাদ্য ও চিত্ত, তখন তিনি একা সৈনিকের খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন।”

মূল এই :—*en t’au tais euōchiais monos apolaucin oios t’ēn* ইত্যাদি (হু ম প সি অন, ২২০এ)। এখানে

euōchiais = তোজে

monos = একমাত্র, একাকী

apolaucin = সন্তোষ করিতে

oios te = সমর্থ

ēn = ছিলেন

Jowett এর অনুবাদ :—

“*at a festival he was the only person who had any real powers of enjoyment.*”

Burgess এর (Bohn’s editor.) অনুবাদ :—

“*On the other hand at our jollifications, he was the only person who could enjoy them.*”

১৩। মেটো তিন স্থলে অনন্ত নরকের কথা বলিয়াছেন এবং যে অনন্ত নরক ভোগ করিবে তাহার নাম পণ্ডিত আছে। এ অবস্থায় এসমুদায়কে কি করিয়া রূপক বলি? আজকাল অনেকে নরক নামক স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রাচীনকালে সর্বদেশেই নরক স্বীকার করা হইত। প্রত্যেক রূপকের মূলেই একটি সত্য আছে। নরক যদি রূপক হয় তাহা হইলে বলিব—‘নরকভোগ’ অর্থ ‘পাপভোগ’ বা শাস্তিভোগ ইত্যাদি। ‘অনন্ত নরকভোগ’ অর্থ ‘অনন্ত কাল পাপভোগ বা শাস্তি ভোগ’ ইত্যাদি।

রূপকেও অনন্ত শাস্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বাইতেছে না।

আমরা Burnet এর মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। Stewart বলেন—

“The incurably wicked who suffer eternal punishment are mostly tyrants—men like Archelaus and Tantalus who had the opportunity of committing the greatest crimes and use it. All praise be to the few who had the opportunity and did not use it. But Thersites, a mere private offender, no poet has ever condemned to eternal punishment. He had not the opportunity of committing the greatest crimes and in this is happier than those offenders who had. Here is a mystery set forth. The man who has the opportunity of committing the greatest crimes and yields to the special temptation to which he is exposed, is held worthy of eternal damnation……This mystery is set forth in the *Gorgias* Myth (The Myths of Plato, p. 129).

এখানে বলা হইতেছে যে, যে-ব্যক্তির চূর্ণ করিবার সুযোগ আছে এবং সুযোগ পাইয়া সেই চূর্ণ করে, সেই ব্যক্তি অনন্ত নরক ভোগ করিবে।

এই মতকে রূপক বলিবার কোন কারণ নাই। এ মত যদি গ্রীকদিগের নিকট একটি নূতন বিষয় হইত তাহা হইলে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ উদ্ভাষিত হইতে পারিত। হোমারের *Odyssey* নামক গ্রন্থে Tantalus, Sisyphus, Tityos প্রভৃতির অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হইয়াছে। Pindar এর গ্রন্থেও এইসমুদায় বিষয়ণ পাওয়া যায়। এইসমুদায় প্রসিদ্ধ কবির মতামত গ্রীকদিগের সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং বলা বাইতে পারে যে, সোক্রাটস্ ও মেটোর সময়ে লোকে অনন্ত নরকে, বিশ্বাস করিত। আর এই প্রাচীন মতের বর্ণনা যখন মেটোর গ্রন্থেও কয়েকটি স্থলে পাওয়া বাইতেছে তখন এই মতকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই।

১৪। জ্ঞান ও মুক্তি বিষয়ে আর্মানদিগের বক্তব্য এই :—“বুদ্ধিবর্ধে সত্য জ্ঞান লাভই মুক্তি”। এখানে ‘জ্ঞানলাভ-ই’ ‘ই’ অক্ষরের প্রতি প্রতিধান করা আবশ্যিক। এই ‘ই’ অক্ষর বলিতেছে যে, মুক্তি লাভের জন্ত একমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট। আর্মানদিগের বিশ্বাস এই যে, গোতর কখনই এইপ্রকার মত পোষণ করিতেন না। ‘জ্ঞানলাভই মুক্তি’ ‘জ্ঞান হইতে

মুক্তি হয়'—এ দুইটি এক কথা নহে। গ্রন্থকার মহাবগ্নের ১৩৮৬ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। উদ্ধৃত অংশ একটি প্রকাশ উপদেশের শেষ ভাগে। উপদেশের প্রথম অংশে গৌতম কি বলিয়াছেন গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। ঘটনাটি এই :—সর্বপ্রথমে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে মধ্যপক্ষের কথা বলিলেন ; এই সঙ্গে-সঙ্গেই বলিলেন, আষ্টাঙ্গিকমার্গই এই মধ্যপথ (মহা, ১৩৮১, ১৮ ইত্যাদি)।

সেই ৮টি পথ এই :—

- (১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সংকল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্মাশু, (৫) সম্যক্ আত্মোব, (৬) সম্যক্ ব্যারাম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি এবং (৮) সম্যক্ সমাধি।

এই ৮টিই নির্লিপ্যসত্তের উপায়। অসংখ্য স্থলে এই আষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হইয়াছে। এই ৮টি উপায়ের প্রথমটি মাত্র জ্ঞান। গ্রন্থকার প্রথমটির অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টির এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

“দুঃখের জ্ঞান, দুঃখসমূহের জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধের জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধপারী পথের জ্ঞান—ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি লাভে অত্রিহিঃ” (পৃ: ২৭১)।

যদি একমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট হইত তাহা হইলে অবশিষ্ট সাতটি উপায়ের কথা বলা হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বপ্রথমে জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের স্লেষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। আষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দিয়া গৌতম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আবার জ্ঞানের কথা বলিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, জ্ঞানই একমাত্র পথ। আর মুক্ত পুরুষ যদি অনুভব করেন (অর্থাৎ এই জ্ঞান লাভ করেন) আমি মুক্ত হইয়াছি, ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যজ্ঞান লাভই মুক্তি।

আমরা নারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, জ্ঞানলাভ যথেষ্ট নহে। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নারদের মত বুদ্ধের মতেরই অসঙ্গত। আর ইহা যদি বুদ্ধের বিরোধী মত হইত তাহা হইলে বুদ্ধের নিত্য-সঙ্গী আনন্দ নিশ্চয়ই এই মত মত্যা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ‘স্বল্পপিটিক’ আনন্দের সাহায্যেই সংপৃহীত হইয়াছিল।

আর সোক্রাটেশের বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মতে “জ্ঞানই ধর্ম”—ইহা দার্শনিক জগতের একটা সাধারণ সত্য। Zeller বলেন—“The leading thought of the ethics of Socrates may be expressed in the sentence—“All virtue is knowledge” (Socrates, p. 141). Firmounএর ভাষা—“Virtue is epistēmē (=জ্ঞান) (Hist. of Phil. Vol. ., পৃ: ৮২)। Wildelbandএর ভাষা—“It is the formula of the identity of virtue and knowledge (Ancient Phil, পৃ: ১৩১)। নিম্নলিখিত গ্রন্থও উল্লেখ—Schwegler's Hist. of Phil., পৃ: ৫১ ; Paulsen's Ethics, পৃ: ৪০ ; Mackenzie's Ethics, পৃ: ৭৯ ; Sidgwick's Method of Ethics, পৃ: ২২৭ ; Wundt's Ethics, Vol. ii., পৃ: ৬ ; Grotes' Plato, Vol. ii., পৃ: ২৩৯ ; ইত্যাদি।

সোক্রাটেশের মতে ধর্ম ও জ্ঞান যে এক, সে-বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যিক। সোক্রাটেশের দর্শনে যদিও ধর্মকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, সোক্রাটেশ জীবনে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন।

১৫। আমরা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বুদ্ধ আত্মবাদী কি না, ইহার মীমাংসা নির্ভর করে আত্মা শব্দের অর্থের উপরে। গ্রন্থকার তাঁহাকে আত্মবাদী না বলিতে পারেন, কিন্তু অনেক দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাকে আত্মবাদী বলিবেন।

বুদ্ধ আত্মা মানিতেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার মনুস্মৃ-নিকায়ের ‘অলপদ উপমা’ হইতে (১১৩৮ পৃ:) অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঘাটা উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা দ্বারা বুদ্ধ বাহা প্রমাণ করিয়াছেন তাহা এই :—বুদ্ধের সময়ে একাংশের লোকে মনে করিত যে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই সমূহায়ের কোন-না-কোনটি কিংবা এই পাঁচটিই নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, এবং বিকারবিহীন আত্মা। বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, এইপ্রকার নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত ও বিকারবিহীন আত্মা অস্তিত্ববিহীন। তিনি যে রূপ, বেদনা, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে, ঠিক ইহার পরেই তিনি আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, রূপ, বেদনাদি অনিত্য। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাহা অনিত্য, দুঃখময়, বিকারময় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলা যায় যে ‘ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা?’—ইহার উত্তর—‘না’ (মগ্গবিম্ব ১১৩৮)।

ইহার পরে আরও আলোচনা করিয়া বুদ্ধ বুঝাইয়া দিলেন—আর্গাম্মাবক উপনুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া রূপ বেদনাদি বিষয়ে নির্বেদ লাভ করেন এবং বিমুক্ত হইলেন (পৃ: ১৩৯)।

ইহার পরে গৌতম এইপ্রকার বিমুক্ত সাধকদিগকে চারিটি বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করিলেন (পৃ: ১৩৯)।

ইহার পরে বিমুক্ত-পুরুষদিগের বিষয়ে গৌতম বাহা বলিয়াছেন, গ্রন্থকার ১৪০ পৃষ্ঠায় তাহা বুঝিয়া পান নাই। সুতরাং বাধা হইয়া সেই অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতে হইল।

‘এবং বিমুক্ত-চিত্তঃ পো ভিক্ষুগবে ভিক্ষুং স-ইন্দ্রা দেবা স-ব্রহ্মকা স-পত্রাপতিকা অঘেদং নাধিগচ্ছন্তি ; ইদং নিস্মিতং তথাগতস্ব বিক-ঞানন্তি, তং কসম হেতু ? দিট্ঠে বাহং ভিক্ষুগবে ধম্মে তথাগতং অনন্সু-বেজ্জো তি বদামি।’

ইহার অর্থ এই—হে ভিক্ষুগণ। ইন্দ্র, ব্রহ্ম, প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সন্ধান পান না। (এবিষয়ে বলা হয়) যে তথাগতের বিজ্ঞান আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে (নিস্মিতং—নিশ্চিত—নিশ্চিতরূপে আশ্রিত)। কিসের জন্য (ভিক্ষুর সন্ধান পাওয়া যায় না) ? (ইহার উত্তরে) আমি বলি এই দৃষ্টধর্মেরই (অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতেই, এই জীবনেই) তথাগত অননুবেদা (অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই তথাগতকে অনুভব করা যায় না)।

এই কথা বলিয়া বুদ্ধ বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ আমি এইপ্রকার বলি, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করি ; কিন্তু তবুও কোন-কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, ভুল, মূঢ়, অসত্য বাক্যে সন্তোষরূপে আমার প্রতি এই দোষারূপ করে যে, ‘শ্রমণ গৌতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক) তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ বি-ভব (অনস্তিত্ব) প্রচার করেন’। হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা নছি, আমি বাহা বলি না সেই বিষয়ে এইসমূহের ভ্রম শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, ভুল, মূঢ় এবং অতুত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারূপ করে যে, শ্রমণ গৌতম বিনায়ক তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন” পৃ: ১৪০।

আমরা যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দিলাম তাহাতে পূর্বাপর সঙ্গতি রহিয়াছে। গ্রন্থকার অপরের মত উল্লেখ করিয়া যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত ও কষ্ট-কল্পিত।

আমাদিগের ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে (১) লোকে রূপ বেদনাদিকে নিত্য আত্মা বলিয়া মনে করিত, (২) বুদ্ধ ইহা স্বীকার করিতেন, (৩) তিনি এমন কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন—যাহা আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া স্থির লাভ করে ; (৪) তিনি উচ্ছেদবাদী নহেন।

১৬। পূর্বোক্ত সূত্রের অংশে একস্থলে বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাহা অনিত্য তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।

ইহা হইতে যাহা প্রমাণিত হয়, তাহা বলিতে হয় হইতেছে। গ্রন্থকার বলিয়া ফেলিবেন, আমি জ্ঞানশাস্ত্রের ইঞ্জিমালা বিস্তৃত করিয়া লোককে বিমুক্ত করিতেছি। যাহারা নিতান্তই ইঞ্জিমালা দেখিতে চাহেন, তাহারা দয়া করিয়া পূর্বের প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন।

১৭। ধর্মপদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল—“আত্মাকে রক্ষা কর।” শ্লোকসংখ্যা ১৫৭ এবং ৩১৫ (১৫৬ এবং ৩১৭ নহে)।

১৮। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধের মতে “জগতের সকলই... অনাস্ব-লক্ষণ” (পৃ: ২৮৩)।

এই অংশ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ ‘আত্মা’ মানিতেন। আনন্দ-বস্তু জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তুকে অনাস্ব-বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তবে কষ্ট কল্পনা করিয়া অস্ত্র ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। জগতের সকলই অনাস্বলক্ষণ—ইহার অর্থ লোকে যাহাকে আত্মা বলে, জগৎ সেপ্রকার আনন্দবস্তু নহে। লৌকিক অর্থে ইহা অনাস্ব বস্তু।

১৯। বুদ্ধের আনন্দ-তত্ত্ব বিষয়ে আমি এই পর্যন্ত নিজের কোন মত প্রকাশ করি নাই। আলোচনা যখন চলিতেছে, তখন নিজের মত প্রকাশ করা আবশ্যিক বলিয়া মনে হইতেছে।

সাধারণ লোকে মনে করে, প্রত্যেক জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এক-একটি অজ্ঞের নিত্য সত্তা আছে,—এই সত্তাই আত্মা। বুদ্ধ এ-প্রকার আত্মার (self-in-itself) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

তিনি জীবন-প্রবাহ স্বীকার করিতেন এবং এই জীবন-প্রবাহের ধর্ম-ধর্ম ও মুক্তি স্বীকার করিতেন। একটি উপমা দ্বারা বুদ্ধের মতামত ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জীবন-প্রবাহ যেন একটি সচেতন নদী। এই নদী সর্বপ্রকার অস্তিত্ব লাভ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেছে। দেখা গেল অকস্মাৎ ধর্মধর্ম এবং সমুদয় অস্তিত্বসহ জীবন-প্রবাহ অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অদর্শনই মৃত্যু। এই অবস্থার জীবন-নদী বৃক্ষবীজের স্তায় সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে। আবার জন্ম-লাভ করিয়া পূর্বজন্মের সর্বপ্রকার অস্তিত্বসহ জীবন-নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন এই প্রবাহের নতুন চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহের স্মৃতি থাকে না বটে কিন্তু ঐ ঘটনাসমূহের প্রভাব বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব জন্মের ঘটনা বর্তমান জীবন-প্রবাহকে অনুরঞ্জিত এবং বখানিয়মে নিয়মিত করিয়া থাকে।

জীবন-প্রবাহ এই ভাবে জন্মধর্মাস্তরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন প্রবাহ আর প্রবাহিত হয় না। এই মুহূর্তে জীবন স্থির লাভ করে। বেদান্তের ভাবায় বলা যাইতে পারে যে, তখন নদী-প্রবাহ ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিপতিত হয়। বুদ্ধের ভাবায় ইহা নির্বাণ, বেদান্তের ভাবায় ইহা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ।

বুদ্ধের মতে চৈতন্য স্ফূর্তি; কিন্তু জীবনের ধর্মধর্ম, পাপপুণ্যাদি কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, যখন নির্বাণ লাভ হয় তখনই কেবল এই সমুদায়কে অতিক্রম করা যায়।

সাধারণ লোকের মতে আমি-নামক বস্তুই মৌলিক, তাহারই জীবন-প্রবাহ। বুদ্ধের মত অস্ত্র প্রকার। তিনি বলেন, বুদ্ধের অঙ্কুরোৎপত্তির স্তায় জীবন-প্রবাহে আমিদের উদ্ভব হয়। সুতরাং এক জীবন-প্রবাহে ভিন্ন-ভিন্ন জন্মে ভিন্ন-ভিন্ন আমিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব জন্ম আমার কি না, বুদ্ধের ধর্মে এ-প্রশ্নের স্থান নাই, পর জন্মে আমি থাকিব কি না, অর্থাৎ কিংবা তথাগত থাকিবেন কি না এ-সমুদায় প্রশ্নও অসঙ্গত।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, অনেক আন্তিক দার্শনিকের মতে আমি-বোধ অপূর্ণতাপ্রচক। এই কারণে অনেকে ব্রহ্ম চৈতন্য আরোপ করেন না, তাহাদের মতে ব্রহ্ম অধিচৈতন্য বা অতিচৈতন্য; ব্রহ্মের স্থান চৈতন্যের নিম্নে নহে, উচ্চে। শব্দ এই শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত।

উপনিষদ পাঠক জানেন যে, যাজ্ঞবল্কীর আত্মা মৃত্যুর পরে সংজ্ঞাবিহীন হয়।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ দর্শনেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিকে অনাস্ববস্তু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অহঙ্কার শব্দটির প্রতি মনোবোগ দেওয়া আবশ্যিক। ‘অহঙ্কার’ শব্দের অর্থ অহং এইপ্রকার জ্ঞান; অর্থাৎ আমিই এই অহঙ্কার আত্মার নহে। বুদ্ধ যে অহঙ্কার কিংবা বেদনা, সংজ্ঞা প্রভৃতিকে অনাস্ববস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে অহিন্দু দর্শনের কথা বলা হয় নাই।

২০। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই:— শব্দপ্রমুখ পণ্ডিতগণের ঈশ্বর ও বুদ্ধের ঈশ্বর এক; শব্দাদির পর-ব্রহ্ম ও বুদ্ধের নির্বাণ এক। শব্দের ব্রহ্মবাদ এবং বুদ্ধের মত প্রায় এক শ্রেণীর।

২১। আমরা লিখিয়াছিলাম:—প্রায় সমুদায় ধর্ম-সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্ম একই; এতদ্ব্যতিরেকে মধ্য কোন পার্থক্য নাই। তবে পৌরাণিক ব্রহ্মের স্তায় এতদ্ব্যতিরেকে মহা প্রলয়ে ধীন হন এবং নতুন করে সমুচিত হইয়া থাকেন।

ইহার জবাবে গ্রন্থকার এক অল্পত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“তবে খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ ও ব্রহ্ম সমাজের ঈশ্বর মহাপ্রলয়ে ধীন হন এবং নতুন করে আবার সমুচিত হইয়া থাকেন, এতদিন ইহা জানিতাম না।”

সমালোচক কুহু দুইটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দুইটির প্রতি প্রাধান্য করিলে গ্রন্থকারকে ধীনতা স্বীকার করিয়া অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইত না। ঐ দুটির একটি শব্দ “তবে”। প্রথমে বলা হইয়াছে কোন পার্থক্য নাই। তাহার পরে ‘তবে’ শব্দ ব্যবহার করিয়া পার্থক্য দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি “প্রায়।”

২২। এপ্যাক্স ত্রিপিটকের স্তর সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিশক্তিতে নির্ভর করা সম্ভব হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ত্রিপিটকে যে-যে উক্তিকে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সেই-সমুদায় উক্তিকে বর্তমান যুগে বুদ্ধের উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় উদান, ইতিবৃত্তক, স্তম্ভনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রাচীন।

২৩। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, “উদান (এবং ইতিবৃত্তক) বিনয়-পিটক ও নিকায়সমূহের পরবর্তী রচনা”—

প্রথম বক্তব্য—কেন বলিব, পরবর্তী কালের রচনা? দ্বিতীয় বক্তব্য—উদান এবং ইতিবৃত্তক নিকায়েরই অন্তর্গত। খৃষ্টকালিকারে ইহাদিগের স্থান।

২৪। পূর্বোক্ত দুইখানা গ্রন্থ হইতে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, ঐ সমুদায় স্থলে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্মবাদেরই কথা। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “উৎ-দুটির ব্যাখ্যা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই।” কে বলিল? আমরা দেখিতেছি, ইহার ভাবা ও ভাব অতি সচ্ছ এবং প্রাচীন। ইহাতে এমন-একটি কথা বা ভাব নাই যাহা দুর্বোধ্য।

গ্রন্থকারের শেষ বৃক্তি ‘উক্তি দুইটি যে বুদ্ধের তাহা প্রমাণিত করা আবশ্যিক’। আমাদের বক্তব্য:—

১। গ্রন্থ দুইখানি বুকের নামে চলিয়া আসিতেছে, বুকের মতের পরে তাহার শিষ্যগণ এই গ্রন্থদ্বয়কে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। ইহাতে এমন কোন মত নাই, যাহাকে অস্বীকার বলা যাইতে পারে।

৩। ঐ দুইটি উক্তি যে বুকের, তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রমাণ করার আবশ্যক নাই যে, ইহা বুকের। যিনি বিরোধী মত প্রকাশ করিবেন, তাহারই প্রমাণ করা আবশ্যক যে ইহা বুকের উক্তি নহে।

৪। গ্রন্থকার নিজে যে-সমুদায় উক্তিকে বুকের উক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সে-সমুদায়কে বুকের উক্তি বলিয়া প্রমাণ করার আবশ্যক হয় নাই। আমরা নিকায় হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাকেই বুকের উক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। এ স্মৃতি আশ্চর্য্য কথা।

২৫। বুকের নিকটে নির্বাণ যাহা শব্দের নিকটে মোক্ষ তাহাই। 'মোক্ষ' যে-ধাতু হইতে উৎপন্ন বুদ্ধ নির্বাণ বিষয়ে সেই ধাতু এবং সেই ধাতুমূলক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

২৬। বুদ্ধ অনেক স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন (প্রবাসী, ১৩১৮ শ্রাবণ, ত্রৈভ্য)। প্রবাসীতে উদ্ধৃত উক্তিসমূহে কিংবা অনুরূপ স্থলে বুদ্ধ 'অব্রহ্ম' অর্থে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার করিয়াছেন এপ্রকার বলিবার কোন কারণ নাই।

২৭। গ্রন্থকার কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন; তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—

(১) বুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার ব্রহ্ম অবশ্যই ব্রহ্ম সমাজের ব্রহ্ম নহে। তাহার নির্বাণ-তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং এই নির্বাণ ও তুরীয় ব্রহ্ম বা শব্দের পরব্রহ্ম একই বস্তু।

(২) তুরীয় ব্রহ্মবাদে বা নিগূর্ণ ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মোপাসনার স্থান নাই। এইরূপ নির্বাণবাদেও নির্বাণের উপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনার স্থান নাই।

সমুদায় ব্রহ্মেরই উপাসনা হয় নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। যজ্ঞ-ব্রহ্মের অবশ্য মননাদিকে প্রকৃত অর্থে (ব্রাহ্মণের অর্থে নহে) ব্রহ্মোপাসনা বলা যায় না।

(৩) অশ্বত্থব্রহ্মবাদের দেশে রাম, কৃষ্ণাদি ব্রহ্মের সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধও যে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ মানুষ যাহা চায়, ব্রহ্মবাদে বা নির্বাণবাদে তাহা পাওয়া যায় না এইজন্যই অবতারবাদের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

(৪) হিন্দুগণ সর্ববিষয়ে বুদ্ধ-বিরোধী হন নাই। প্রধানতঃ বিরোধী হইয়াছিলেন আশ্রম-বিধি, সামাজিক-বিধি ও যজ্ঞ-বিষয়ক মতামতে। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ সামাজিকবিধিমূলক; এইজন্য অনেকে বুদ্ধবিরোধী হইয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মনীতি, বিশ্বপ্রীতি প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। তাহার নির্বাণবাদও শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

হিন্দুগণ বুদ্ধকে ও পরিত্যাগ করেনই নাই, প্রত্যুত তাহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবত ১।৩।২৪, সংসারপুরাণ ৪৭।২৪৭; বায়ুপুরাণ, একলিঙ্গ-মাহাত্ম্য ১২।৪৩, ১৪।৩৯; গরুড়পুরাণ ৮৩।১০, বরাহপুরাণ ৪।৩, ১১।৩২৭, কঙ্কিপুত্র ২।৩।২৬, নৃসিংহপুরাণ ৩৬।২৯ প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

এহলে একটি কথা বলা আবশ্যিক। ব্যক্তি বিশেষের সাধ্য নাই যে সে কোন ব্যক্তিকে সমাজে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন সর্বজনপূজনীয়, প্রথমে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন; কালক্রমে তাহার স্থান হইয়াছিল অবতারগণের মধ্যে। শাস্ত্রকারগণ এই প্রচলিত মতকেই শাস্ত্রে প্রথিত করিয়াছিলেন।

কোন-কোন গ্রন্থে যে তাহাকে নিন্দা করা হয় নাই তাহা নহে।

সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে এপ্রকার হইয়াই থাকে। কেহ নিন্দা করিয়াছেন শিবকে, কেহ করিয়াছেন বিষ্ণুকে, আর বৈষ্ণবগণ পরমব্রহ্মকেও হীনতর স্থান অর্পণ করিয়াছেন।

(৫) মৌলিক বিষয়ে শব্দের সহিত বুকের মতভেদ নাই। শব্দ বুকের মত জানিতেন কি না সম্ভব। তিনি এক শ্রেণীর বৌদ্ধ-মত জানিতেন এবং সেই মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

তিনি বুকের সম্পত্তি অপরূপ করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিভাঙিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘটি-বাটি সহ তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করা হয় নাই। কেহ কেহ এই কথাটিকে নতুন বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে এবং কেহ কেহ প্রমাণ করিয়াছেনও। ইহার একটি প্রমাণ 'গৌড়পাদকারিকা'। গৌড়পাদ শব্দের গুরু গুরু। তাহার নামে যে কারিকা প্রচারিত আছে, তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ শাস্ত্র। মূল কারিকাতে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে; এখন সমগ্র পুস্তকই হিন্দুশাস্ত্র নামে পরিচিত। শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধাদি এবং তারতার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তকে (পৃঃ ৪২৩) ইহা আংশিক আলোচিত হইয়াছে। উক্ত কারিকাতে বুকের নাম পর্য্যন্তও রহিয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রন্থের অন্ত আমরা উদ্গীর্ষ হইয়া আছি।

(৬) শব্দ লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করা বৃথা। অনেক স্থলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই বিষয় স্বীকার করে, কিন্তু বিভিন্ন নাম বলিয়া তাহার বৃত্তিতে পারে না যে, তাহাদিগের মত একই; না বুদ্ধিগা তাহার ঝগড়া করে। বুকের বিষয়েও তাহাই হইয়াছে।

বুদ্ধ যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তাহা নহে; ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অল্প। ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহারে তাঁহার আপত্তি ছিল। উপনিষদের যুগে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইত। আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে গুরুতর মত-ভেদ ছিল। প্রাচীন উপনিষৎসমূহেই ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। ব্রহ্মের সংজ্ঞা আছে, ব্রহ্মের সংজ্ঞা নাই; ব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্ত্যাতি আছে, ব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্ত্যাতি নাই; ব্রহ্মের অহম্ ইদম্ জ্ঞান আছে; ব্রহ্মের অহম্ ইদম্ জ্ঞান নাই; ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান আছে, ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান নাই; ইত্যাদি বহু বিরোধী মত প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে। এই সমুদায় বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বুদ্ধ নতুন ভাষায় নিজের মত প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্যই ব্রহ্মাদি শব্দ সহজে ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি নিজের ধর্ম্মকে ব্রহ্মবাদ বলিয়া প্রচারিত করেন নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে, তাহার মত তুরীয় ব্রহ্মবাদই। শব্দের নিগূর্ণ ব্রহ্মবাদ এবং বুকের নির্বাণবাদ একই। বুদ্ধ যখন নির্বাণতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে যে তিনি নতুন ভাষায় ব্রহ্মবাদই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এহলে বলা আবশ্যিক এপ্রকার ব্রহ্মসমাজের ব্রহ্মবাদ নহে, ইহা শব্দের ব্রহ্মবাদ।

বুকের ঈশ্বর ব্রহ্মসমাজের ঈশ্বর নহে, ইহা পৌরাণিক ঈশ্বর এবং শব্দের ঈশ্বর।

যদি সমালোচনার এবং এই প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকারের প্রাণে কোন-প্রকার আঘাত লাগে আশা করি তিনি দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৩২

মহেশচন্দ্র ঘোষ

প্রজাস্বত্ব আইন

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব ৮ আইন সংশোধনপূর্বক ১৯২৫ সালে যে-সকল ধারা সংযোজিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে সিলেক্ট কমিটিতে দাখিল হইয়াছে, ঐ আইন পাশ হইলে বাঙ্গালা দেশের প্রজা-বর্গের ভূসম্পত্তির স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কার ভীত হইয়া আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, (৩ ধারা, ৩ উপধারা) “বর্ণাদারদিগকে জ্ঞাতস্বত্ব দেওয়া হইবে,” বলিয়া যে-বিধান হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব আইন হইতে আনুল উঠাইয়া দেওয়া হউক; প্রজা-স্বত্ব আইনের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর যে-ধারাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাও সম্যকপ্রকারে সংশোধিত হউক।

ভাগ কসলের দ্বারা বঙ্গের পল্লীগ্রামের সকল শ্রেণী প্রজার হাজার হাজার পরিবার আবহমান কাল হইতে প্রতিপালিত হইতেছে, ভাগচাষের আয়ে অরণ্যভীত কাল হইতে যে-সকল দেবালয়, সেবালয়, বিদ্যালয়, জাতীয়-বিদ্যালয় ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, ঐ আইন পাশ হইলে এইসকল সার্বজনীন কার্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

এই ভাগপ্রথা শত শত বৎসর হইতে প্রবর্তিত হইয়া অদ্ব্যাবধি সর্গোরবে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে বঙ্গের প্রজামণ্ডলীর সমান রূপে হিতসাধন করিতেছে। ভাগপ্রথার জমী চাষ চলিতেছে, ভাগ-প্রথার পক্ষ প্রভৃতি-পত্ত প্রতিপালিত হইতেছে, ভাগ-প্রথার ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কারুবার করিয়া ধনী ও অধনী উভয় পক্ষই সমানভাবে লাভবান হইতেছে। এখন

আইন করিয়া একের গৈতুক বা বোপার্জিত সম্পত্তি অন্যকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া এই চিরচরিত ভাগপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিলে দেশের যে কি সর্বনাশ হইবে তাহা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ও মহানাত্ত গবর্ণমেন্টকে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রস্তাবিত আইনের নজীরের বগে বড় বড় কল-কারখানা ও ক্যান্ট্রীর স্বত্ব অধিক সম্প্রদায় পাইবে না কেন? প্রজা-স্বত্ব আইনের সংস্কারক ও সমর্থক মহাশয়রা বর্ণাদার বা ভাগচাষীকে বা কৃষিমজুরকে প্রজার জ্ঞাত বা রাইয়তী স্বত্ব দিতে যে-প্রকার বন্ধপত্রিকর হইয়াছেন, রেঙ্গ, জাহাজ ও চা-বাগানের স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব ছাড়াইয়া লইয়া এইসকল প্রতিষ্ঠানের অধিকদিগকে সেই স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করার স্পর্ধা রাখেন কি?

আমি রীতিমত সেলামী টাকা দিয়া, জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট জমী বন্দোবস্ত লইয়া ঐ বন্দোবস্তী জমীর জঙ্গল কাটিয়া, বাঁদবন্দী করিয়া, মাটি কাটিয়া, সমতল করিয়া, সারাদি দিয়া চাষ করিতেছিলাম। হঠাৎ বাতরোগাক্রান্ত হইয়া চলৎশক্তিহীন হওয়ার একবার অস্ত্র চাষীকে ভাগে দেওয়ার আমার জমীতে তাহার স্বত্ব হইয়া গেল। এমন আইন না করিতে পারিলে বাহাদুরী কি? পল্লীর কি কৃষক, কি মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণী প্রজার মোকররী স্বত্ব, স্থিতিবান্ স্বত্ব ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর জমিতে বাহাতে ভাগ-চাষী বা বর্ণাদার বা কৃষিমজুরকে কোন স্বত্ব দেওয়া না হয়—উপসংহারে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

২৩,২।২৬

প্রজা—শ্রীজগন্নাথ দাস,
মহিষাঙ্গল।

“থের গাথা” হইতে

(Saundersএর অনুবাদ অবলম্বনে)

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

(১) জ্ঞানের মুক্তি

কি স্বাধীন শিক্ষা মোরে দিবেছেন প্রভু,
গ্রামে থাকি, সদা মন চলে ঘর তবু
উন্মুক্ত প্রান্তরে বনে, বাধা বন্ধ নাই,
জ্ঞানের আলোকে মুক্তি সর্বত্র সদাই।

(২) জাগ্রত সাধনা

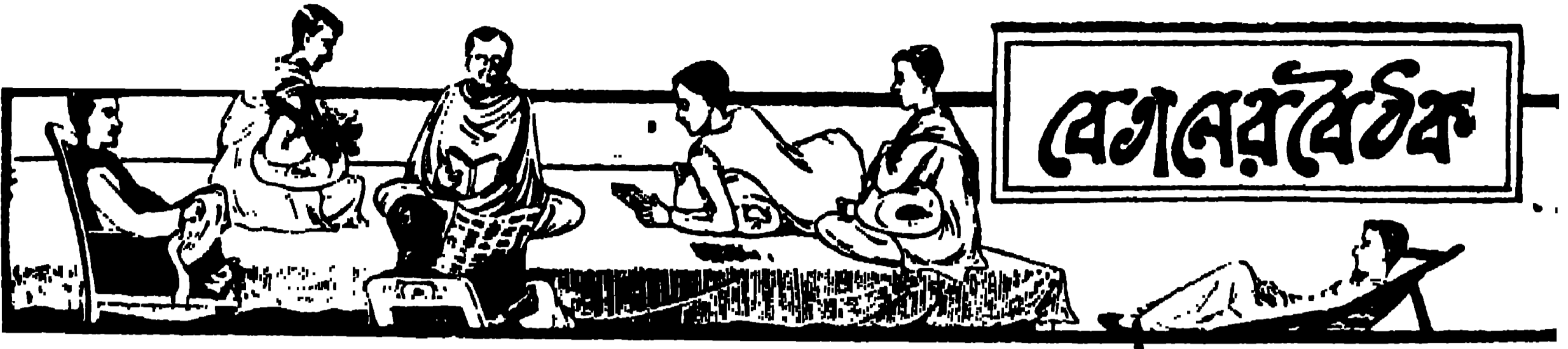
স্বপ্ননিদ্রা ভরে নহে তারাময়ী রাত্তি;
জাগ্রত সাধনা লাগি, জেনো হে তাপস!
যুঝিতে তামস সনে নাহি অপঘণ
যটিলেও পরাজয়; নিম্নে শির পাতি’

নির্ভয়ে বীরের মৃত্যু স্বাধীন স-রে,

—ধিক্ বার্থ বেঁচে থাকা দাসদের ভোরে!

(৩) নিষ্ঠা

“এত শীতে থাক্ কাজ; অসহ্ গরম আজ,
আজ বেলা নাহি আর মোটে!”
—এই ভাবি দিন দিন, থাকে সবে কর্মহীন,
সুসময় কিছুতে না জোটে।
তবু আছে হেন লোক, ছুর্থোগ যেমনি হোক
নিমগ্ন মৌন আরাধনে,—
এস, মোরা ভিক্ যত, বরিব তেমনি ব্রত
একনিষ্ঠ কঠিন সাধনে।



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে বাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। বাহারের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাহার লিখিতা জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিতা পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিতা পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিবৃতি বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। বাহাতে সাধারণের সম্বন্ধ-নিরসনের দৃষ্টিদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, বাহার মীমাংসা বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্থবিধার দৃষ্টি কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় বাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া বখার্ব ও যুক্তিবৃত্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুইয়ের সাধারণ-সম্বন্ধে আমরা কোন্দোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং বাহার মীমাংসা পাঠাইবেন তাহার কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

নৌ-বিদ্যা

নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্ত আমাদের দেশে কোথায় কিরূপ বন্দোবস্ত আছে? দেশের বর্তমান জাহাজ-কোম্পানীগুলির ভাবৎ কর্মচারীবৃন্দই মুসলমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুদের এই দিকে ঝোক নাই কেন? আমি প্রধানতঃ Marine ও Stearing Dept. এর কথাই বলিতেছি। কোম্পানীগুলির কেরানীকূলে অবশ্য হিন্দুরই সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইবে, কিন্তু ড্রিমার-চালনার (সারেঞ্জের), মালবন্দার (স্থগানীর) ও মালদারীদের কাজের সমস্তই মুসলমানরা অধিকার করিয়া আছে। ইহার প্রধান কারণ কি? জাত্যাভিমান কি? না বোগ্যতার অভাব? অথবা হিন্দুদের আইনের কোনও বাধকতা আছে কি না? দেশের ড্রিমার কোম্পানীগুলি বহুদিনের। আশ্চর্য্য এই—এই অর্ধশতাব্দির দিনেও কোন হিন্দুকে সারেঞ্জ অথবা অন্য কোনও হাতের কাজ করিতে এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কোনও পাঠক এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০ নং চেলার রোড পোঃ কেমশেদপুর

টিহিরির রোগ্যমুত্র

আমি টিহিরির একটি রোগ্যমুত্র পাইয়াছি। তাহার মূল্য ৩ মাস। তাহার এক পিঠে "বিক্রম" ও অন্য পিঠে "শা" এই শুধু গড়া যায়; আর সব অন্ত্যস্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। টিহিরিতে "বিক্রমশা" বলিয়া কোন রাসা ছিলেন কি? তিনি কোন্ শকাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন?

শ্রী সরযু রায়

পেঁদো আগাছা

রোয়া জমিতে এক প্রকার আগাছা জন্মায় তাহার নাম পেঁদো (দেশ-চলিত কথায় উহাকে রহুনিয়া বলে)। উহার গন্ধ ঠিক রহুনের মত, আবেণের শেষে এবং তাজের প্রথমে জন্মায়। উহা বর্জিত হইলে

যান গাছ লাগ রং ধারণ করে। জমি আরই পতিত হয়। কোন-কোন জমিতে উহা হাঁটু নাগাং উঁচু হয়।

শ্রী পেঁদো বা রহুনিয়া নিবারণের সহজ এবং একটু উপায় কি?

সম্পাদক, খোদামবাড়ী পল্লী পাঠাগার

ঘরের মেঝে শুক করা

ঘরের স্রষ্টিক-নির্মিত তিস্তির সেন্টসেঁতে (damp) দূর করিবার উপায় কিছু আছে কি না। চুন ছড়াইয়া দিলে পরে মেঝে শুক বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে সেন্টসেঁতে দূর হয় কি?

শ্রী ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাগজী লেবু রক্ষার উপায়

বরিশাল অঞ্চলে বহু কাগজী লেবু গাছ আছে ও অসংখ্য লেবু কলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই বড় হইতে না হইতে বরিয়া পড়িয়া যায়। আর বাহা গাছে অবশিষ্ট থাকে তাহাও হলদে রং হইয়া অকালে পরিপকতা লাভ করে। লোকে বলে লেবু মউরায় ধরিলেই বরিয়া যায়। কিন্তু কেহ কোনো প্রতিকারের উপায় বলিতে পারে না। প্রবাসীর কোনো পাঠক-পাঠিকা এর প্রতিকারোপায় বলিতে পারেন কি?

শ্রী বোগেশচন্দ্র বাগল

মীমাংসা

(১৯৩)

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

৫০ মাইল উর্ধ্ব পরিমাণ বায়ুমণ্ডল স্বভাবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করিয়া থাকে এবং দূরত্ব অনুসারে সাধ্যাকর্ষণ শক্তিও এতদুলে কম বেশী কার্যকরী হয়; এজন্য বিমান পোড়খানি ঠিক কলিকাতাতেই অবতরণ

করিবে। তবে বায়ুর অস্বাভাবিক গতি হেতু সামান্ত একটু হানাতরিত হইতে পারে। ঠিক এই একই কারণে চিল, ঈগল কিবা শকুনি প্রভৃতি পক্ষিবাহারী পক্ষিপণ সারাদিন অতি উর্ধ্বে অবস্থান করার পরও আপনাপন বাগার সন্ধান পাইয়া থাকে।

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি

(১৯৯)

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

শোহরাত অর্ধ যোষণা। কেশোরারী নামক অভিধানে ইহা আরবি শব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। শহরত এই শোহরাত শব্দেরই অপভ্রংশ। মোহলমহান বাহাদুরশাহের সময়ে শোহরাত শব্দের স্থান ছিল, নকিব ইত্যাদি আরও অনেক আরবি পার্শ্ব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি

(২৫)

১৩৩১ সাল আশ্বিন

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লী নামে এক নৃপতি স্থিতিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে একটি নূতন নগরী নির্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। বাঙ্গালা অভিধান, হুবলচন্দ্র মিত্র।

শ্রী হুকুমার গৈড

“সর্বপ্রথম বাঙলা অভিধান”

প্রথমে শ্রীযুক্ত আব্দুলচরম বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ১৩২৯ সালের পৌষ মাসের ভারতীতে ‘প্রথম বাঙলা অভিধান’ নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে বহু জানিতে পারিলাম নিয়ে তাহা লিখিত হইল। “পর্ভু সীমিতের বাণিজ্য যখন কোন-কোন প্রাচ্য দেশে চলিতেছিল তখন Nunoda Cunha (১৫২৯-১৫০৮) উহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ Dacunha'র চেটার পর্ভু সীমিত বঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন..... ১৭৯৮ সালে Henry Pithsforster-এর বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হয়।...ইনিই ১৭৯৯ সালে বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষা সম্বলিত একখানি বাঙলা অভিধান সংকলন করেন...রাজনৈতিক বুদ্ধি ও কটারের সাহিত্যানুরাগ এই কারণবশত সন্দ্বিগনে উহার অভিধান সৃষ্ট হয়। ইহাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার শব্দ সংখ্যা ১৩৫০০। অভিধানখানির নাম “A Vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa. By H. P. Forster অভিধানখানি Thomas Grahamকে উৎসর্গকৃত...”

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়

কারহ শব্দের ব্যুৎপত্তি

আদৌ প্রজাপত্তের জাতা মুখ্য বিধাঃ স-দারকাঃ ।
বাহোশ কজিরা জাতা উর্ধ্বো বৈজ্ঞা বিজজিরে ।
পাদন্ত শূত্রাঃ সমুত্তাস্ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ ।
হীম-নামা স্তম্ভস্য প্রদীপস্য তস্য পূত্রকঃ ।
কারহস্য তস্য পুত্রোহুত্ব বত্ব লিপিকারকঃ ।
কারহস্য জয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জননীতলে ।
চিহ্নস্তম্ভস্য চিহ্নসেনো বিচিহ্নস্য চ তৈব চ ।

ইত্যাদি।—অগ্নিপুরণ

অগ্নিপুরণের মতে কারহ একজন লোকের নাম। সেই লোকের বংশজাত সকলে আদি পুরুষের নামে সংজ্ঞিত হইল।

মহরীরায় সমুত্তাস্ তস্যায় কারহ-সংজ্ঞকঃ ।

—ভবিষ্যপুরণ ।

অক্ষরাকারোত্তবো বস্মায় কারহো জাতির্ উচ্যতে ।

—পদ্মপুরাণ ।

কজ-শব্দেন কারঃ স্যাৎ ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ ।

ততঃ কজির-শব্দেন কারহ ইতি বোধ্যতে ।

—বৃহৎসংহিতা ।

অক্ষর কারা হইতে উৎপন্ন জাতি, অথবা কজির-বর্ণের (কার-বর্ণের) স্থিত জাতি কারহ ।

হাতের অঙ্গুলি বাতীত অপর চার অঙ্গুলির (তর্জনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠার) নাম কার ; কার দ্বারা (কলম মুঠা করে' ধরে') যে স্থিতি (জীবিকা) লাভ করে—কারেন তিষ্ঠতি যঃ সঃ—সে কারহ ।

কারহ শব্দের অপভ্রংশ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট কবিকল্প-চণ্ডীর টীকার দ্রষ্টব্য ।

চার বন্দোপাখ্যার

কারহ শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যুৎপত্তি

কা [(কার)-হ (হা) ঠাকা + অ-কর্ক-ক]

যে শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে কারহ বলে—কারহ শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিসংগত অর্থ। ব্যুৎপত্তিসংগত অর্থে কারহ আত্ম বা বেহী শব্দবাচক ।

বর্তমানে কারহ জাতিবাচক শব্দমাত্র ; কিন্তু পূর্বে কারহ ও লেখক একার্থবাচক ছিল বলিয়াই বোধ হয় ।

বিকুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে আছে :—“রাজাধিকরণে তন্নবুত কারহকৃতং রাজসাক্ষিকন্” ।

চৈতন্যভাগবতে মধ্য খণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে

“এ ছুইর পাপ নিরন্তর হুতে কহে ।

লিখিতে কারহ সব উজাপিত হয়ে ।”

কবিকল্পে আছে :—বিচারিরা কেহ বেধে, তাহারে কারহ লেখে, সার করি বেধে দেয় টকা ।”

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগীশ্বরী—খ্যান ।

- বীণা-বিনোদী কমলময়নাকী
- সৌন্দর্য্যলাবণ্যহৃদয়গোবিন্দা ।
- কান্তসমীপে কমনীয়কণ্ঠা
- বাগীশ্বরী সা মালকৌশলভাৰ্যা ।

ভাবার্থ—

বীণাবিনোদী কমলময়নাকী সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যবৃত্তা গৌরবর্ণা কৃকণ্ঠা যিনি কান্তের নিকট উপবিষ্টা তিনিই মালকৌশলের ভাৰ্যা বাগীশ্বরী ।

*বাগীশ্বরী—আলাপ

- সম্পূর্ণ ।
- গও নি কোমল ।
- ম—বাদী ।
- ধ—সংবাদী ।

আস্থায়ী ।

সা মা -১ -১ ধা -১ -১ পা -১ সধা পা ধা মা -১ জাঃ জাঃ রজা রজা
জা • • • না • • • • • তে • • • না • ০ • • • • •

সা -১ সা গা ধা -১ মা -১ মধা পধা গা -১ -১ ধপা ধা -১
তো ম্ তে রে না • • • ০ রি ০ • • • • • ০ • • • • • রে ০

গা -১ সা সা -১ -১ -১ সা মা ১ ধা পা ধা -১ -১ পা ধপা ধা মা ১
• • • ০ না • • • • • তো • • • • • ম্ না • • • • • তে • • • • •

জা ১ রা -১ জা সা -১ সা সা সা সপা সপা সা রা • সা ১ • ১ । । ।
• • • না • • • নে তে রে না তে না • তো • • • • • ম্

অন্তরা ।

মা ধা গা -১ ১ ধপা ধা -১ -১ পা সী -১ সী সী -১ ১ -১
তো • • • • • ম্ নে • • • • • রি • • • • • • • • • • • রে না • • • • •

সর্গী সর্গী জর্গী -১ র্গী সর্গী -১ ১ সধা সর্গী পা -১ ১ ধা মা
জা • ০ • • • • • নে না • • • • • তে • • • • • • • • • • • না •

* বাগীশ্বরীর দুই প্রকার চরিত্র প্রচলন হইয়াছে। বহু পুরাতন বাগীশ্বরী বাহা আছে, তাহাতে পক্ষম বেশী ব্যবহার হয় এবং ইহাবরণ সর্গী-এর ধরণে যে বাগীশ্বরী, তাহাতে পক্ষম কম ব্যবহার হয়, অর্থাৎ টকারাগিণীর ধরণ। মহানন্দ শা বাগীশ্বরীর সময়ে ইহাবরণ সর্গী গায়ক ছিলেন, ইহার রচনাও অতি সুন্দর এবং বড় গায়ক ছিলেন। উপরে যে বাগীশ্বরী দেওয়া হইল ইহা ইহাবরণ সর্গী-এর ধরণ। বিষয়টি না জানিয়া বাগীশ্বরীর চরিত্র বিধরে অনেকের মনে মনে ভ্রান্ত ইহার প্রকৃত কারণ লেখা হইল। সংকৃত ভাষাশাস্ত্র-নামক গ্রন্থে ১৮ কনোড়ার বিধরে সমস্ত বর্ণিত।

মা ধপা ধা -১ ঃ গঃ সর্ধা গা ধা মা
নে তে০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০

মাধা পধা ১ -১ মা জা -১ রজা রজা সা -১ ১
তো০ ০০ ম্ 'না ০ ০ ০০ ০০ না ০ ০

সা সা সা সগ্ সগ্ সা রা -১ সা -১ ৥
তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

সকারী ।

সা গা ধাপা ধা গা ১ ১ সর্ধা গা ধপা মা -১ মা ধপা গধা
তে রে নে০ রি ০ ০ ০ ০ ০ রে০ না ০ তা ০০ ০০

সর্ধা গা ধামা মা জা -১ রজা রা সা সা গ্ ধা
০ না ০০ তো ০ ০ ০০ ০ ০ তে রি ০

গ্ সা -১ মা -১ ধপা গা ধামা -১ মজা -১ ১ রাঃ জঃ সা -১ ৥
রে ০ ০ না ০ ০০ ০ ০ ০ ০ তো ০ ম্ ০ ম্ না ০

আভোগ ।

মা গধা সর্ধা -১ সর্ধা ০১ রর্ধা গা সর্ধা -১ সর্ধা ১ ১ ১
তা ০০ ০ ০ না ০ তে ০ ০ ০ না ০ ০ ০

সর্ধা রর্ধা সর্ধা মর্ধা -১ মর্ধা -১ জর্ধা -১ রর্ধা -১ সর্ধা -১
তে ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০

সর্ধা গা ধপা ধা ১ ১ গা সর্ধা ধনা ধা মা
তে রে না০ রি ০ ০ ০ ০০ ০ ০ রে না

মধা পধা মা জা -১ রজা রজা সা -১ সা সা সা
তা০ ০০ না ০ ০ ০০ ০০ নে ০ তে তে না

সগ্ সগ্ সা রা -১ সা -১ ৥
তে না ০ তো ০ ০ ম্



বাংলার কথা

১৯ চিকিৎসকের সহায়তা—

বিষভারতীর পল্লীসংস্কার-বিভাগের আস্থানে অবসর-প্রাপ্ত সিন্ধু সার্জন ও বড়লাটের অনারারী অস্ত্রচিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় মহাশয় শ্রীনিকেতনে আসিয়া চতুর্পার্শ্ব গ্রামের দরিদ্র-গণের চক্ষের ছানি কাটিয়াছেন। তিনি একত্রে তাহারিগণের নিকট কোনো পরদা লন নাই।

এখানে আসিবার পূর্বে ডাঃ রায়-মহাশয় বরিশালে এইভাবে ১০০ শত লোককে চক্ষুদান করিয়াছেন, এখানেও তিনি তিন শতেরও উপর লোকের চক্ষু ছানি কাটিয়া বহুলোককে দৃষ্টি কিরাইয়া দিয়া দরিদ্র-সাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন।

রায়-মহাশয়ের ইচ্ছা তিনি বাংলাদেশের স্থানে-স্থানে গিয়া এইভাবে লোকসেবা করেন। আমরা আশা করি, দেশবাসিন্দা ও দেশের কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া রায়-মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া বহু দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। বাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা এ-বিষয়ে শ্রীনিকেতনে জানাইলে সমস্ত খবর জানিতে পারিবেন।

ডাইরেটরী পঞ্জিকা—

১৩৩০ সালের শুভপ্রবেশ ডাইরেটরী পঞ্জিকা। এই ৫৭ বৎসর ধরিয়া সুপরিচিত পঞ্জিকা এবার বর্ধিতকলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জিকার বাহা-বাহা থাকি আবশ্যিক তাহা ইচ্ছাতে আছে, এবং তাহা ছাড়া অল্প অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের জন্য অভিপ্রেত হইলেও অল্প সহায় বাঙালীরও কাজে লাগিবে।

কুড়া শিল্প-বিদ্যালয় * —

কুড়া শিল্পবিদ্যালয় ইংরেজী ১৯১৮-১৯ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। সে বছর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সরকার এবং নানাপ্রকার সেবা-সমিতির সাহায্যে এ-অঞ্চলের অধিকাংশ লোক আধমরা হইয়াও বাঁচিয়াছিল। য-দেশে কুর্বিই একমাত্র সম্পদ ও সম্বল সে-দেশে অনিবার্য কারণে কসল-হানি হইলে পরিণাম এই ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই দুর্দিনে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রিলিফ কমিটির সম্পাদকরূপে ইহার প্রতিকারার্থ এই বিদ্যালয় ও কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া কতগুলি গৃহশিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। “কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির” শিল্প-বিভাগের কর্তৃকর্তৃপক্ষ সম্পাদক-মহাশয়কে মৌখিক উৎসাহ প্রদান ও একখানা শ্রীরামপুরের ঠক-ঠকে ঊত উপহার দেন। তন্নিম্ন

* কুড়া-শিল্পবিদ্যালয়ের শ্রী সত্যভূষণ দত্ত পরিচালক মহাশয়ের প্রেরিত বিবরণ হইতে।

সম্পাদক স্বয়ং বহু প্রতিকূলতার ভিত্তর দিয়া সংগ্রাম করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে প্রয়াস পান। প্রতিষ্ঠাতা নিজেও বর্ষেট আর্থিক কতিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসারে আজ কতগুলি লোক এই শিল্প-বিদ্যালয়দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। বর্তমানে বাংলা-সরকারের শিল্প-বিভাগ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ও ওয়ার্ড্ ট্রেষ্টের সাহায্যে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে এবং কার্যকরী বিভাগগুলি ক্রমশঃ নিপুণ শিল্প (fine articles) উৎপন্ন করিতেছে। বাণবত্তের কাজে মেয়েরাও বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বয়ন-বিভাগে নানাপ্রকার ডিম্বাইনের কাজ হয়। তজ্জ্বরের মেয়েরাও অনেকেই মণিপুর তাঁতের (hand-loom) কাজ শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া বার বড়ই কম।

গৃহশিল্প-সমিতিগুলিতে বাহারা কাজ করে, তাহাদের উপাদান অর্থাৎ বাঁশ, বেত ইত্যাদি জোগাইয়া দিতে হয় শিল্পবিদ্যালয়ের তহবিল হইতে। জিনিষ প্রস্তুত হইলে পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উপাদানের মূল্য কাটিয়া রাখিয়া বাকী সব প্রস্তুতকারককেই দেওয়া হয়। বিক্রয়ের তার কর্তৃকর্তৃপক্ষই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে মাসিক ৮।১০ টাকা পাইয়া থাকেন।

কুড়া শিল্পবিদ্যালয়ে বর্তমানে কাপালী, নমঃশূত্র দাস, তজ্জলোক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই কাজ করিতেছে।

সমগ্র জিপুরা-জেলায় গ্রামের মধ্যে মাত্র এই শিল্প-বিদ্যালয়টি আট বছর বাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য ব্যবসায়ের হিসাবে আরো কোনো-কোনো গ্রামে শিল্পকার্য আছে, কিন্তু নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আর নাই।

বিগত ১৩২৬ বাংলার আধুনিক সংখ্যা প্রবাসীর “দেশের কথা”তে বিস্তৃতভাবে কুড়া শিল্পবিদ্যালয়ের কি-কি জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহা শ্রীমতী হেমন্তলা দত্তের পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে বাহারা আশীর্বাদ একেবারে বিফল হয় নাই, সেই পূজ্যপাদ ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্বাদ-পত্রখানা নিয়ে দিয়া শিল্পবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করা হইল।

৩

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

গ্রামে শিল্প-শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তোমরা যে চেষ্টা করিতেছ, আমি একান্তমনে তাহার সফলতা কামনা করি। এ-পর্যন্ত দেশের জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা সহরেই বন্ধ ছিল। এখন এই চেষ্টার স্রোত পল্লীতে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। ইহাতেই আমরা স্বার্থ শুভকল লাভ করিবার আশা করিতে পারি। দেশের যে-সকল যুবক নিঃস্বার্থ উদ্যমেব সহিত এই কল্যাণ-সাধনের ত্রুত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন—তাঁহারা সমস্ত দেশের আশীর্বাদে পাত্র। সমস্ত বাধা-বিপত্তিতে

ভাষ্যের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকে, ঈশ্বর ভাষ্যদ্বারা এমন শক্তি দিন।
ইতি ১০ই পৌষ ১৩২৩ বা

তত্বাকালী—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গ মহিলার বীরত্ব—

গত ২২শে মার্চ ১৯২৫, তারিখে ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত রায়নগর গ্রামের কৈলাসচন্দ্র সাহা বঙ্গের বাড়ীতে এক ভীষণ ভাঙাতি হয়। ঐ ভাঙাতির বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ভাঙাতিতে বীর রমণী হেমলা গোপিনী ও তাহার ৩ ভাই ভাঙাতিদ্বারা আক্রমণ করিয়া অসীম সাহসের সহিত ভাঙাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং কলে ২জন ভাঙাতিকে প্রেতার করে। অন্যান্য আসামীগণও ধৃত হইয়া ইতঃপূর্বেই দণ্ডিত হইয়াছে। হেমলা গোপিনী ও তাহার ৩ ভাই সশস্ত্র ভাঙাতিদের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেন্ট হেমলাকে ১০০ টাকা ও তাহার ৩ ভাইকে ১০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন এবার ইস্টারের ছুটিতে বীরভূমের গিউড়ী মহরে হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন—

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীদিগের উদ্যমে চারি বৎসর হইল যে, সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বাহা বর্তমানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে পরিচিত তাহার ৪র্থ অধিবেশন আসামী ইস্টারের অবকাশে কানপুরে হইবে স্থির হইয়াছে।

এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য চারিটি—

১। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা।

২। পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঐতির বোপ-স্বত্র রচনা করা।

৩। বাঙ্গালার ভাব-ধারার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবের অনুরোধ-রক্ষণ।

৪। পরস্পরের অতাব অভিযোগের আলোচনা দ্বারা বাঙ্গালীর প্রবাস-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান।

বলা বাহুল্য, যেসকল প্রবাসী বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা ও আন্তরিক সহায়তের উপরই এই সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সমিতির সহকারী কার্যাধ্যক্ষ লিখিতেছেন :—

বাহারা নিজে আসিতে অক্ষম ভাষ্যের পরিচিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক গণের নাম ধার পাঠাইয়া অত্যাধিক সমিতির সাহায্য করিতে পারেন। এই উপলক্ষে আমরা প্রবাসী সাহিত্যিকগণের নিকট বিশেষভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি ভাষ্যের সম্মেলনে পার্শ্বের অল্প সাহিত্য, মৌলিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; দর্শন প্রভৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীর নানা প্রদেশের ভাষ্য এ প্রদেশের লোকজনের সমাজ-তত্ত্ব পাঠা, কবিতা প্রভৃতি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া অত্যাধিক সমিতির সহায়তা করিবেন।

বাংলায় নারী-নির্ধ্যাতন—

মুসলমান কর্তৃক হিন্দুরমণী হরণ

আজাই নবীর ধারে কোনো এক গ্রামে কয়েক বর ব্রাহ্মণ জমিদার বসতি, ব্রহ্মণী ও আত্মীয়-সুহৃৎ লইয়া বাস করিতেছেন। গ্রামটি

ছোট-খাট নহে, নানা শ্রেণীর হিন্দুও তথায় আছে। এই অবস্থার চোখে সামনে গ্রামের বৃকের উপর হইতে একজন মুসলমান যুবক একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে অবাধে হরণ করিয়া লইয়া এক মাইল ব্যবধানে তাহার বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে; জমিদারগণ বা অন্য হিন্দু অধিবাসীরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না। ব্রাহ্মণদেরও আর কোনো শক্তি নাই। তাহারা বিবহীন চোড়াগাং। এইরূপ ছব্বুস্তেরা যে কলমা পড়াইয়া তাহাকে মুসলমান করিয়া বিবাহ বা নিকা করিবে তাহাতে আর আশঙ্ক্য কি? ব্রাহ্মণ জমিদার ও হিন্দু প্রতিবেশী থাকিতে ব্রাহ্মণ-কলমা আত্ম মুসলমানী হইতে চলিল। আর যদি ইহার কোনো প্রতিকার না হয় তবে আবার কাল আর একটিকে লইয়া বাইয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিবে। এইরূপ করিয়া ব্রাহ্মণ-কলমা মুসলমান হইবে আর ব্রাহ্মণগণও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তপস্তার ভাণে আত্মত্যাগ দেখাইবেন।

(হিন্দুরক্ষিকা)

সহযোগী বরিশাল হিতৈষীতেও এইরূপ অত্যাচারের কয়েকটি বরণ কাহিনী বাহির হইয়াছে। সহযোগী লিখিতেছেন,

“আমরা আশা করি এই কাহিনী না সাহিত্য একজন হিন্দু যুবক এখনই ঐসমস্ত গ্রামে পাহারা দিতে আরম্ভ করুক—এবং ছব্বুস্ত বেই হটক বা বত বড়ই হটক তাহাকে বুঝাইয়া দিক্ যে এই সমস্ত ভাণা শাসনের অস্ত্র হিন্দুগণ আত্ম-বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছে।”

লাঞ্ছিত রাজনীতিক সম্মেলন—

হবিগঞ্জ রাজ্যীয় সম্মিলন মধ্যে ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুরমা উপত্যকার লাঞ্ছিত রাজনীতিকদের একটি সম্মেলন হয়। করাচীর স্মরণীয় কর্মী মৌলানা হোসেন আহম্মদ সভাপতি হইয়াছিলেন। আর শতাধিক ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দী (ex-prisoners) উপস্থিত ছিলেন।

বাংলায় শিক্ষা—

১৯২৩-২৪ সনের বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা-সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৪ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে বাংলা দেশে গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত এবং অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৫০০১টি ছিল। উহার মধ্যে ৪২৭৭টি বালকদিগের এবং ১৩২৪টি বালিকাদের বিদ্যালয় ছিল। এইসমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যাও আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মোট ২০৫৭০৬ ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিল; এই সংখ্যা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ১০৬১৩০ বেশী। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১৩৯২৬৮ জন বালক ও ৩৬৪৩৭৪ জন বালিকা ছিল। ছাত্র ও ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের ৫০টি আর্ট ও শিল্প কলেজ, ৯৫টি উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়, ১৬৬৪টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, ৪৯৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৫৬৪টি বিশেষ-ধরণের বিদ্যালয় ছিল। এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭৩টি গবর্ণমেন্ট, ৩৪৬টি জিলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড পরিচালন করে। ৪২৮০টিতে সরকারী সাহায্য আছে।

আলোচ্যবর্ষে শিক্ষা-বিভাগে মোট ৩৪৪৮০.৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩১২২৩৬। উহার মধ্যে বাংলা সরকার ১৩০০৯৪৬ টাকা দিয়াছেন। জিলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলি যথাক্রমে ১৪০২২৩৪ টাকা ও ৩০.৩৫৪ টাকা দিয়াছেন

এবং বাকী ১৪.১৩৩৬৪ টাকা ও ৫৬.২৮৬৯ টাকা ছাত্র-বেতন ও অন্যান্য উপায়ে পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে বিজ্ঞানসমূহে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা দেওয়া হইল—হিন্দু ছাত্র ১১৫৬৬৪, মুসলমান ছাত্র ৭১১৪৫০; হিন্দু ছাত্রী ১৩১৩৩৮, মুসলমান ছাত্রী ১৬৯৬৫০। উহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা হিন্দুদের অপেক্ষা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই বিবরণে প্রকাশ যে ১৯২৩ সনের শেষ ভাগে বাঙ্গালা দেশে মোট ১০০টি জাতীয় বিজ্ঞালয় ছিল। উহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯০৮১; পূর্বে বৎসরের বিজ্ঞালয় ও ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৭৫ ও ২২৭৯১।

বিধবা বিবাহ—

মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ-সমিতির উদ্যোগে গত ২৩শে মাঘ চন্দ্র-কোণা থানার শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্তোষ ঘোষ, গড়বেতা থানার গোকুলগঙ্গা নিবাসী ৮২বর্ষীয় পাত্রের ষাটশব্বারী বিধবা কস্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বালিকাটি ৩১ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল।

উক্ত সমিতির চেয়ার এমরা থানার কুলটিকরী মৌজার শ্রী অক্ষয় নারায়ণ বেরার সহিত শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ও উক্ত থানার বারিদা গ্রাম-নিবাসী শ্রীমতীলোচন বেরার সহিত শ্রীমতী গয়ামণি নামী বাল-বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

নারায়ণগড় থানার বাগছুর পরগণার বেলাদা গ্রাম নিবাসী শ্রীবাইন চরণ বারিক স্বজাতীয় শ্রীমতী বিদ্যাশঙ্করী নামী বালবিধবার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন।

সমিতির চেয়ার সর্ব্বত্র ৫০টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল। বাংলার সকল জেলায় বিধবা-বিবাহ-সহায়ক-সমিতির শাখা স্থাপন হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

৮হুয়েঞ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান—

দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে স্যার হুয়েঞ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০,০০০ টাকা রিপন কলেজকে দিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে কলেজের আগামী বর্ষ হইতে বর্তমানের বৈ বৃত্তির বরাদ্দ আছে, তাহা অনেক বাড়ান হইবে।

বাংলা সরকারের আয়-ব্যয়—

আগামী ১৯২৬-২৭ সনের জঙ্গ পর্ব্বমেন্টের আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, মোট ১০৭৬৭৮০০০ টাকা। গত বৎসর বাংলা পর্ব্বমেন্টের যে আয় হইয়াছিল তদপেক্ষা এ বৎসর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। এই বৎসর পর্ব্বমেন্টের ব্যয় ধরা হইয়াছে মোট ১০৯২৯০০০ টাকা। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ৫২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইয়াছিল।

সাধারণ শাসন বিভাগে বর্তমান বৎসরের ব্যয়ের অপেক্ষা আগামী বৎসরে ছুই লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে; পুলিশ বিভাগে ৪ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

চিকিৎসা বিভাগে বর্তমান বৎসরে যে টাকা ব্যয় হইতেছে আগামী বৎসরে তদপেক্ষা আড়াই লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে বর্তমান বৎসরে যে খরচ হইতেছে তদপেক্ষা ১২৫০০০০ টাকা অধিক আগামী বৎসরে ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ

করা হইয়াছে। এই বিভাগে মফঃখলে জল সরবরাহের জঙ্গ ২৮৪০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

আগামী বৎসরে শিক্ষার জঙ্গ বঙ্গীয় পর্ব্বমেন্ট মোট ১৩৯৬০০০০ টাকা ব্যয় করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের সাধারণ কাজকর্ম নির্বাহের জঙ্গ যদি অতঃপর আর অতিরিক্ত টাকার দাবী উপস্থিত না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর ১৪৩০০০০ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসর কাল অর্ধ-সাহায্য দেওয়া হইবে।

পল্লী-সেবা—

দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার-সমিতি কুল-কলেজের ছাত্রদের সমীপে নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছেন :—

পরীক্ষার পর এই লম্বা ছুটিতে কি করিবেন? নিম্নের গ্রামে যান, গিয়ে মাতঙ্গরদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামের জঙ্গ পল্লী-সংস্কার কাজ আরম্ভ করে দিন। চার মাস ত ছুটি? এ চার মাসে অন্ততঃ (১) ৫টি পুকুর পরিষ্কার করে পানীয়জলের অভাব দূর করুন। (২) ১টি নৈশ ও দিবা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। (৩) ১টি দাতব্য চিকিৎসা-সালয় স্থাপন করুন। (৪) চরকা ও খন্দর প্রচলন করুন। (৫) একটি ব্রহ্মীদল সংগঠন করুন। (৬) ঘন ঘন সভা সমিতি এবং মেশা-মেশি করে সম্ভবদ্রুতভাবে কাজ করার প্রবৃত্তি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করুন। (৭) ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন। (৮) দেশী জিনিষের দোকান খুলে গ্রামে স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা করুন। গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড—গ্রামকে বাঁচানই জাতিকে বাঁচান। নিম্নেদের গ্রাম নিম্নেদেরই গড়ে তুলতে হবে বিদেশীর ভরসায় থাকলে চলবে না। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্যকালীন বৈঠকে প্রধ্বনিতঃ “জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতের দান” বিষয়ে আলোচনা হইবে। এই উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহার নুতন আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তিনি আগামী ২০ মার্চ তারিখে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হইবেন। এয়ার তিনি রাষ্ট্র-সভা এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া আনিবেন। আগামী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে নাহোবে ভারতীয় বিজ্ঞান মহা-সভার অধিবেশন হইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহু ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

মৈমনসিংহের চাঁদ মিক্রার দান—

করটারার বড় ভরকের জমিদার জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলী খানপাণি ওরফে চাঁদ মিক্রা তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ওয়াকুফ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে গত ২১ এ কেরগারী করটারার একটি সভার অধিবেশন হয়; ঐ সভায় ওয়াকুফের শর্তসমূহ পঠিত হইয়াছিল।

ওয়াকুফ দলিলের শর্ত :—

- জমিদারের আয় সমস্ত অংশই ওয়াকুফ হইল।
- চাঁদ মিক্রা সাহেব স্বয়ং প্রথম মোতওয়ারী থাকিবেন, তৎপর মোতওয়ারী হইবেন তাঁহার একমাত্র পুত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ পৌত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ প্রপ্রপৌত্র এইরূপ—।
- সমস্ত ওয়াকুফ সম্পত্তির নেট আয়ের চারি আনা পারি-বারিক ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইবে; অপর চারি আনা ব্যয়িত হইবে নানা লোক-হিতকর কাজে— যথা করটারাহিত হাই স্কুলে

বার্ষিক ২৫০০, মাস্মাসার ২৫০০, কলেজে ৬০০০, দাতব্য চিকিৎসাগারে ৩৫০০, মসজিদে ১০০০, এতিম ও দরিদ্র আশ্রয়গণের জন্য ২০০০, ঈদ, কাতেহা-দোয়াহ-দহম প্রকৃতিয় মজ ৫০০, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দরিদ্র মুছলিম ছাত্রগণের বৃত্তিতে ১০০০, ইছলাম প্রচারে ৫০০ এবং অজ্ঞাত সংকালে অবশিষ্ট টাকা। নেট আয়ের অবশিষ্ট আট আনাঘারা প্রতি বৎসর নূতন সম্পত্তি খরিদ করা হইবে। এইরূপে খরিদা সম্পত্তিও ওয়াকফ মধ্যে গণ্য হইবে এবং ঐরূপে সম্পত্তির নেট আয়ের চারি আনা পারিবারিক ভরণপোষণে এবং বার আনা শিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইসলাম প্রচার ও ধর্ম পুস্তক মুদ্রণে ব্যয়িত হইবে।

কুমিল্লা অভয়-আশ্রম—

বিগত এই কাঙ্ক্ষন কুমিল্লা অভয় আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। শ্রী জগদীশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের নিম্নলিখিত সারাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি।



আগরতলা কুমিল্লা আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

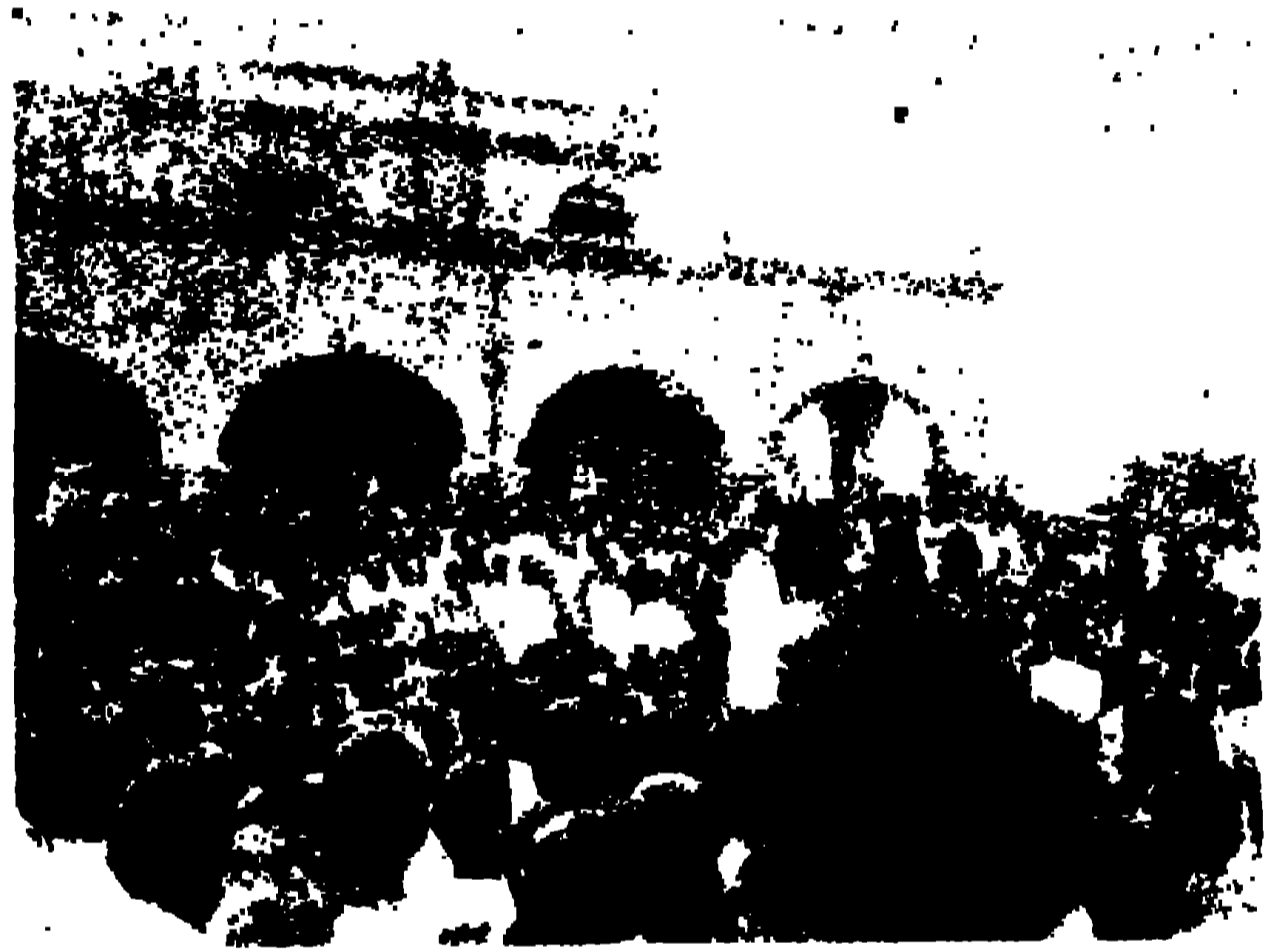
আমার বঙ্গগণ, আমার জংপিণ্ডের মধ্যে সূত্না-দুত্তের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে। তাই চিকিৎসকগণ আমাকে কণ্ঠের থেকে ছুটি দিয়েছেন। কিন্তু কর্ণকে এড়িয়ে নয়, কর্ণকে সমাধা ক'রেই তবে কর্ণ থেকে ছুটি নিতে হবে—বিধাতার সেই হুকুম আমার কাছে এসেছে। এইজন্তে পূর্ববঙ্গে আজ উপস্থিত হয়েছি। বাবার সময় আমার শেষ কথাটি ব'লে যাব।

দেশের মধ্যে অনেক দিন থেকে কর্ণ করবার যে-সংকল্প জেগে উঠছে, তার সখ্যে ব'লে বাবার এই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কেমনা পূর্ববঙ্গের লোক নিষ্ঠাবান, দৃঢ়সংকল্প, সরলচিত্ত—তারা বুদ্ধির অহঙ্কারে

বিজ্ঞপের দ্বারা বড় বড় কথাকে দূর ক'রে দেয় না। সেইজন্তে পূর্ব-বাংলা দেশের মধ্যে বড় কাজের ক্ষেত্র। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে আমি কণ্ঠের একটি রূপ বেগুতে পেয়েছি—আমার আশা অক্ষুরিত হয়েছে।

বাণী স্থল্যর ক'রে তৈরী হ'লে বাদক খুঁস হয়—সে বলে, এতে আমার গান ধ্বনিত হবে। দেখলুম, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের বাণী স্থর বাজাবার মত হয়েছে,—'যদি তোমার সময় থাকে, স্থর বাজাও'—এই প্রেরণা আমার মনে এসেছে।

দেশের মধ্যে প্রাণশক্তি কতগুলি ঐক্যকেন্দ্র স্থাপিত ক'রেছে—সেই-গুলি মঙ্গলান, যেমন জন্ম-যেবান থেকে দেশের সর্বত্র প্রাণরস সঞ্চারিত হয়। এতে দেশের উৎকর্ষ। এই প্রতিষ্ঠান সেই-রকম একটি মঙ্গলান। এইখান থেকে পল্লীতে-পল্লীতে প্রাণরস সঞ্চারিত হবে। জংপিণ্ড, মাথা পা পর্যন্ত সর্বত্র প্রাণরস প্রবাহিত ক'রে দেয়—তাই প্রাণের স্বরাজ্য দেখে। এমনি ক'রে দেশে মঙ্গলান সব সৃষ্টি হ'লে তবেই এখানে প্রাণের স্বরাজ্য হবে। এই কাজের এথেকে সূত্রপাত হয়েছে। এর সঙ্গে দেশ অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। যদি মাক করেন, একদিন আমি ঘোষণা করেছিলাম, পল্লীর মধ্যে প্রাণের ঐক্যই ঐক্য দান



মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষার সমবেত জননগুণী

করবে। বাহিরের যে-অপুষ্ঠান, সে-দড়ি; নাড়ী নয়। কিন্তু কবির কথা লোকে কাব্য-কথা ব'লে উপহাস করেছিল সেদিন, আপনারা অনেকে তা জানেন না। আমি জানি,—কেমনা আমার সংকল্প তখন বড় ছুঁথের আঘাত পেয়েছিল। সেইজন্তেই যদি দেখতে পাই আমার সেই সংকল্প কোথাও কোনো জায়গায় আকার পেয়েছে, আনন্দ পাই।

জংপিণ্ড মৈত্রিক, জন্ম মানসিক পদার্থ। দেশের জন্মকে যদি দেশের অধিবাসীরা না জানতে পার; তবে দেশের আত্মনাথ ভাগবে না। একদিন ছিল—পল্লীতে পল্লীতে দেশের প্রাণশক্তি জাগতে জাগতে আপনাদের সাধারণকে এক ক'রে তুলেছিল। সে জন্মের সখ্য একদিন বিচ্ছিন্ন হ'ল। সে পুরাতন ঐতিহ্য, স্নেহ, সেবার সখ্য পুনরায় আজ বিধাতার প্রাণ-সমীরণের মতো সমীরিত।

এইজন্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার ক্ষেত্রে আমি এসেছি। আমার ধেরা নৌকো তৈরি আছে, আমার বাবার সময় হ'ল। সমস্ত দেশের অন্তরের মধ্যে যে সংকল্প ছিল, তা' আজ এখানে আকার লাভ করেছে,—এর



শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি

[কুমিল্লার গৃহীত ছবি

বিনাশ নেই ; এই দেশে আমার যা' আনন্দ, তা' প্রকাশ ক'রে গেলুম।

অমৃত লাভ করেছে তারা, যারা হৃদয়মনোময়নসম সত্যের বিরাট মূর্তিকে দেখে আনন্দে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্ম-সমর্পণের আনন্দ দেশকে বাঁচাবে, কোনো আচার নয়। আমি এখনকার আত্ম-সমর্পণ দেখে আনন্দিত ; ক্ষীণকণ্ঠে এইটুকু বলবার জন্যে আমি এসেছি।

সমগ্রতার রূপকে বাল্যকাল থেকে পূজো ক'রে এসেছি, খণ্ডতাকে বড় মনে করিনি। সত্যের পরিপূর্ণতার আদর্শ আমার। বিবস্ত্রী লোকের বুদ্ধি আংশিককে আঁকড়ায়। আংশিকের মধ্যে যা' দি, তা' মৃত্যুকে দেওয়া হয়, সময়ের মধ্যে যা' দি, তা' অমৃত। ক্রীড়ুওরাল ধর্ম মানুষকে বড় রকম মুক্তি দেয় না। চৈতন্যকে সর্বত্র প্রসারিত ক'রে দেওয়াই মুক্তি, কর্ত্ত্বও তাই।...

মানুষের সর্ব্বোত্তম শক্তিকে আজ আহ্বান করতে হবে। তপস্বী জ্ঞানের, কর্ম্মী কর্ম্মের, ভাবুক ভাবের তপস্যা করছে। আমাদের দেশেও তপস্যা বিস্তৃত হোক, বহুধা হোক, নানা তপস্যা জাগ্রত হোক। সর্দীপ সীমার চৈতন্যকে বদ্ধ করলে সিদ্ধি হবে না। মানব-ধর্ম্মের মধ্যে বৈচিত্র্য, বহুধা শক্তির স্থান আছে। অস্বীকার করলে সমুদ্রের মূলে কুঠারামত করা হবে। সমগ্রতার, পরিপূর্ণতার উপাসক আমি। আপনাদের কর্ম্ম যেন সমগ্রতাকে বাধ না দেয়।

আশ্রমের ৩য় বার্ষিক বিবরণী হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ দিলাম।

বর্ত্তমান আশ্রমের সেবক-সংখ্যা ৫০ জন। ইহা ব্যতীত আশ্রমের বিভিন্নপ্রকার কর্ম্মের নিমিত্ত প্রায় ২০ জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছেন। উক্ত সেবক ও কর্ম্মচারীরা আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকিয়া আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

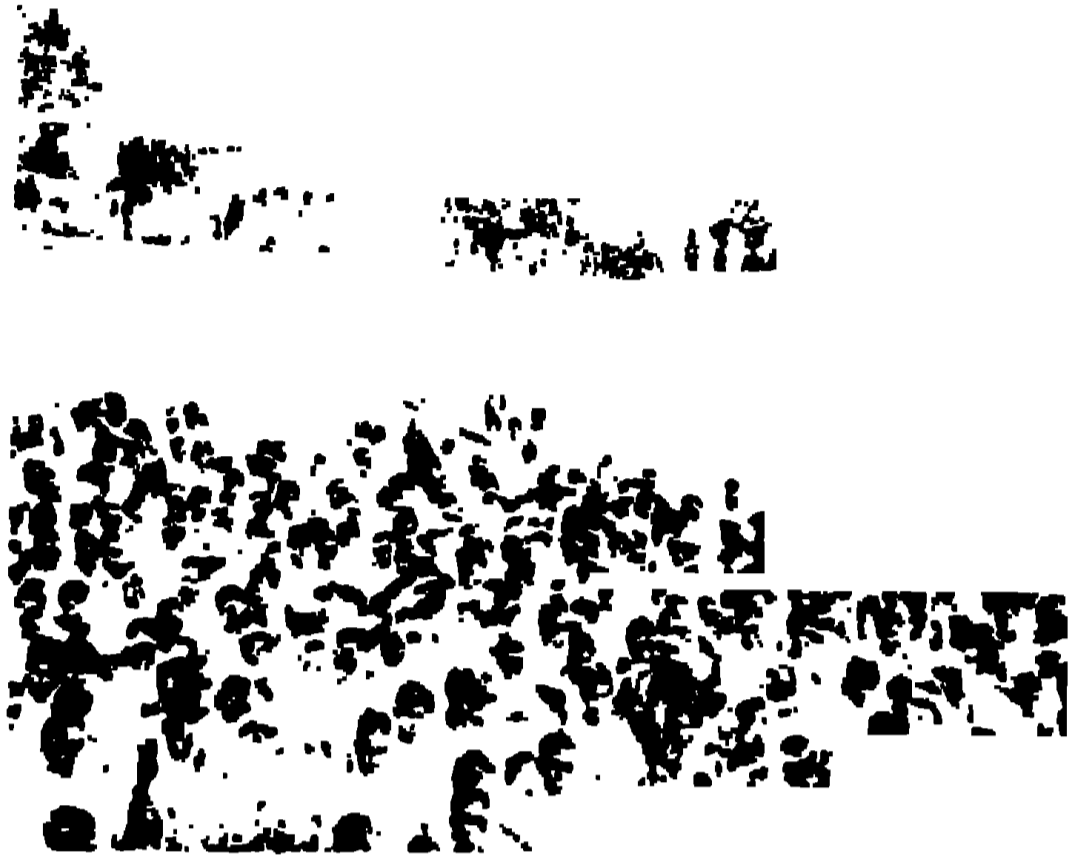
নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে এই বৎসর আশ্রমের শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরা—কুমিল্লা আশ্রম, কুমিল্লার খন্দর ভাণ্ডার, বরকামতা, পাঁচপুকুরিয়া ও চৌদ্দগ্রাম। নোয়াখালী—কেশী ও মুন্সিরহাট। চট্টগ্রাম—মিঠাচরা। করিমপুর—করিমপুর। ঢাকা—ঢাকা। —জলপাইগুড়ী—চেঙড়াবাঁধা। নদীয়া—কুকনগর। মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর। বাঁকুড়া—বাঁকুড়া। কলিকাতা—কলেজলীট মার্কেট ও রসারোড, ভবানীপুর।

আশ্রমের চিকিৎসা বিভাগ (outdoor)

গত বৎসর ৬৪২৯ জন রোগী এই বিভাগে ২৬২৭০ বার উপস্থিত হইয়াছিল। উন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ২১৭৫, হিন্দু রমণী ৭২৫, মুসলমান পুরুষ ২৭৪০, মুসলমান রমণী ৭৮৬।

উপস্থিত রোগীদের শতকরা প্রায় ৭৫ জনকে বিনামূল্যে ঔষধ

বিস্তরণ করা হয়। বাকী ২৫ জনের অর্ধের দ্বারা ডিস্‌পেনসারীর ঔষধ বাবদ ব্যবহারি খরচ নির্বাহিত হয়। গত বৎসর এইভাবে ৪৪৪৬/০ সংগৃহীত হইয়াছিল। আশ্রমের চিকিৎসা-বিচক্ষণতা দেখিয়া ক্রমশঃ ইহা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।



রবীন্দ্রনাথের চাকার আগমনে নদীপাড়ের দৃশ্য

হাসপাতাল

আশ্রমের হাসপাতালের নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছে। এই হাসপাতালের জন্ম প্রতিমাসে প্রায় ৩৫০ টাকা খরচ হইবে। তন্মধ্যে স্থানীয় 'অভয়-আশ্রমসেবা-সমিতি' সহরে মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা প্রতিমাসে ১০০ টাকা সংগ্রহ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত ধনী রোগীদের নিকট হইতেও মাসিক কিছু কিছু টাকা আদায় হইবে। বাকী প্রায় ২০০ টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহা ভগবান জানেন। এই জিলায় বহু ধনী লোক আছেন যাহারা পূজাপার্বণে হাজার হাজার টাকা পয়সা খরচ করিয়া থাকেন। প্রায় ২৫০০ টাকা দান করিলে উক্ত টাকার স্ৰব হইতে একটি রোগীশালা চিরন্তনে বিনা খরচে রাখা যায়। আমরা আশা করি, সঙ্কল্প ব্যক্তিগণ এই মহৎ কার্যে টাকা দান করিতে পশ্চাত্পদ হইবেন না। ২৫০০ টাকা যে ব্যক্তি দান করিবেন তাঁহার মনোনীত নামানুযায়ী একটি রোগ-শালা নামকরণ হইবে।

স্থানীয় স্কুল কলেজের যুবক এবং আশ্রমের কতিপয় সেবক লইয়া গত ২৩ মাস হইল এই সেবা-সমিতি আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন এই সমিতির সেবক সংখ্যা ৭০ জন। এই সমিতির উদ্দেশ্য :—১। আশ্রম হাসপাতালের অসমর্থ দরিদ্র রোগীদের সাহায্যের জন্ম সহরের সর্ব শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে রীতিমত মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করা। প্রতি রবিবার মুষ্টি-ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৪/ মণের অধিক চাউল সংগৃহীত হইতেছে। তাহাতে মাসিক ১০০ টাকার অধিক আয় হয়।

২। সহরের দরিদ্রের জন্ম অবৈতনিক শিক্ষালয় ও পাঠাগার স্থাপন।

খন্দর বিভাগ

১৯২৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১০১৩৮/৫ টাকার খন্দর উৎপাদন ও ২১৮২২৮/৫ টাকার খন্দর বিক্রয় করিয়াছিলাম। গত বৎসর আমরা প্রায় ২০,০০০ টাকার খন্দর উৎপাদন ও ৭৪৬২০ টাকার খন্দর বিক্রয় করিয়াছি।

বর্তমান বৎসরে আমরা প্রায় দুই লক্ষ টাকার খন্দর উৎপন্ন করিতে চাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিভাগে আমাদের নিজেদের মূলধন ১১০০২৮ পাই ছিল। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্ক শতকরা ২ টাকা হার সূদে ১১০৩১৮, নিখিল ভারত চরকা সমিতির ১০,০০০ বেঙ্গল খাদি বোর্ডের ১,০০০ দেয়া আছে।



নারায়ণগঞ্জ জেলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকার সমবেত জনতা

আমরা আশ্রমের জমী বন্ধক দিয়া হাজারকরা বাৎসরিক ১ টাকা সূদে নিখিল ভারত চরকা সমিতির নিকট হইতে ৩৫০০০ টাকা কর্কস লাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই টাকা আমাদের দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। সেজন্য করিয়াই হউক দুই বৎসরের মধ্যে এই টাকা আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আমাদের সঙ্কল্প বন্ধুবর্গ ও শুভামুখ্যায়ী প্রত্নপোষকগণের অবগতির জন্ম ইহা নিবেদন করিলাম।

আমাদের আশ্রমের তত্ত্বাবধানে গত বৎসর প্রায় ১৮৬২৪ মূল্যের কার্পাস ও তুলা খরিদ এবং ৬৪৫৫৮ মূল্যের সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পরিমাণ সূতা কাটিবার জন্ম প্রায় ১০,০০০ কাটুনীর দরকার বাহারা অবসর সময়ে সূতা কাটে।

সূতা হইতে খন্দর উৎপাদন করিবার জন্ম আশ্রমের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৫০ তাঁতী পরিবার, ছেলে, মেয়ে বুড়ো সকলেই, নিযুক্ত থাকে। প্রায় ৪৫ জন কর্মীও এই কার্যে ব্যাপৃত। ইহা ব্যতীত তুলার চাষী



বন্দীভায়ে কবিকে দেখিবার জন্ম জনতা

কামার, ছুতার, গাড়োরান প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক এই কার্যে অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে ষড়্দের কাজের অবিকাশে টাকাই দেশের পরীব জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।

রপ্তান

আশ্রমের উৎপন্ন ষড়্দের জিনিষ প্রায় সমস্ত আশ্রমেই রং করা ও ছাপ দেওয়া হয়। রঙের কাজ বেশ লাভজনক। নানা প্রকারের ছাপ ও ১৮২০ রকমের রং আশ্রমেই হইতেছে। সরঞ্জাম ও উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এই বিভাগের কাজ ইচ্ছামত অগ্রসর হইতেছে না।

বয়ন

আশ্রমের অধীনে একজন বয়ন-শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তিনি আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়া সাধারণ উত্তীর্ণদের নানা প্রকার রঙীন লম্বাকরা ও বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ তৈয়ার করা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন।



ভূরগ বজরা— কবির ঢাকার নদীবন্দের আবাসস্থল

ষড়্দের বিভাগে ৪৫ জন কর্মী আছেন। ইঁতাদেব ভরণ-পোষণ, বিভাগীয় গরুচ এবং ব্যাঙ্কের সুদ প্রায় ৭০০ টাকা বাধে গত বৎসর ৮০০১২ পাই পরমা লাভ হইয়াছে।

বর্তমানে শিক্ষা-বিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলি আছে। (১) আশ্রম বিদ্যালয়। (২) মেধর বিদ্যালয়। (৩) আশ্রম-বালিকা-বিদ্যালয়। (৪) আশ্রম নৈশবিদ্যালয়।

আশ্রম-বিদ্যালয় বর্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ১০৮ জন। তন্মধ্যে মুসলমান ৩৩, খোপা, নাপিত, বৈরাগী, নমঃশূদ্র, সূত্রধর প্রভৃতি বৈশী। ব্রাহ্মণ কার্হের সংখ্যা ৮২ জন।

মেধর-বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন। তন্মধ্যে মেধর ১৭ জন, বেস্তার চেলে মেয়ে ৫ জন, মুসলমান ৬ জন এবং ষবি ১৭ জন।

নৈশ-বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্হপরিধি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে ইহার ছাত্রী সংখ্যা ৩০ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন নমঃশূদ্র বাকী ১৪ জন মুসলমান।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১০ জন। দেশের শ্রমজীবীগণ এখনও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে নাই। তাই দিবসব্যাপী পরিশ্রমের পর তাহারা লেখাপড়া পছন্দ করে না। আমাদের প্রথম কর্হব্য তাহাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের প্রতি এই উদাসীন্ত দুর করা।

গ্রন্থাগার ও পাঠভবন

শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রন্থাগার ও পাঠভবন আছে। ইহার সত্য সংখ্যা ২০০এর অধিক।

বাংলা দেশে সঙ্গীত চর্চা—

বাংলা দেশে সঙ্গীত বিদ্যা যে প্রসার লাভ করিতেছে তাহা বোঝা যায় এই বিষয়ক নানা পত্রিকার প্রকাশে। পত্রিকাগুলির মধ্যে “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” নামক সচিত্র মাসিকখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ভারতীয় গীতবাহু বিষয়ক বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ ও উৎকৃষ্ট গানের স্বরলিপি এই পত্রিকাতে প্রতি মাসে ছাপা হয়।

নারী শিল্প-প্রদর্শনী—

হিরণ্ময়ী বিধবা শিক্ষাশ্রম

পরলোকগতা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর উদ্ভোগে বালীগঞ্জে ৫৫নং পরিমাছাটা রোডে বিধবা শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অসহারা ও নিরাশ্রম বিধবা হিন্দু-রমণীগণ শিক্ষা লাভ করেন। গত এই ডিসেম্বর এই স্থানে নারী শিল্প প্রদর্শনীর দারোদারটন হয়। শ্রীযুক্ত বাহুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা ইহার একটি বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা হইতে আমরা কিছু কিছু সংবাদ দিলাম।

প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা নানা কলমুলে প্রস্তুত যে কার্হশিল্পটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মনোরম হইয়াছিল। এতদ্বিধা বিম্বকের কাজ, মাছের আঁশের ফুল, সূচিকাৰ্হা, মূর্তি-গঠন প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর দেখিবার জিনিষ ছিল। আশ্রমের সম্পাদিকা



পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী

শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর নিকট প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের যে পুরস্কার তালিকাটি পাইয়াছি, সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল।—



হিরণ্ময়ী বিধবা শিক্ষাশ্রম

১। কার্জনিক—ব্রজকুমারী শ্রীটনুপ্রভা (ত্রিপুরা)। (বিশেষ স্বর্ণপদক) এই পুরস্কারটি ময়ূধস্তম্ভের রাজমাতা শ্রীমতী সূচাকদেবী প্রদত্ত।

২। সূচিকাৰ্ঘ্য (সৌধীন)—শ্রীম্নেহলতা দাস। (রৌপ্য-পদক)।

৩। সূচিকাৰ্ঘ্য (সাদা)—শ্রীপ্রফুল্ল কুমারী দাসী। (সনন্দ)।

৪। সূক্তি-গঠন—শ্রীপ্রভাবতী সেন। (রৌপ্য-পদক)।

৫। চিত্রকলা—শ্রীসুনন্দী দেবী। (রৌপ্য-পদক)।

৬। চিত্রকলা (অঙ্কন)—মিস সুনইনহা। (সনন্দ)।

৭। সূতার শিল্প—শ্রীপঙ্কজ মোহিনী দাসী। (রৌপ্য-পদক)।

৮। বয়ন-কার্ঘ্য—শ্রীপ্রিয়বালা গোল্ডপিন্ড। (সনন্দ)।

৯। পাথরে খোদাই—শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। (সনন্দ)।

১০। সেলাইয়ের ছবি—শ্রীনিরুপমা দেবী। (সনন্দ)।

১১। কাপড়ের ফুল—শ্রীগিরিজাবালা দেবী। (সনন্দ)।

শিক্ষাশ্রমের প্রথমে নিজস্ব কোন বাস-গৃহ ছিল না। কলিকাতার তিন্ন তিন্ন বসতবাড়ী ও ভাড়াটির বাটতে শিক্ষার্থীগণকে আশ্রম দেওয়া হইত। এই সময়ে শিক্ষকিত্রীর বেতন প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রায় এক ছাত্রের টাকা মাসে ধরচ পড়িত। এই ধরচের এক তৃতীয়াংশ বাংলা সরকার বহন করিতেন। বাকী টাকা আশ্রম নিজে সংগ্রহ করিয়া লইত। ১২২৩ সালে "সদী সমিতি" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল; পরে ১৯১১ খৃঃ এই সমিতির তহবিল শিল্প আশ্রমে অর্পিত হয়, ও তখন হইতে ইহা সদী-শিল্প-সমিতি নাম ধারণ করে। এই সমিতি ভারতীয় মহিলা শিক্ষাশ্রম পরিচালিত।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সমিতি বালীগঞ্জে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণ করেন। ইহার কিছুদিন পর হইতে সমিতি সরকারী সাহায্য ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার কারণ এই যে, সরকারী স্কুল সমূহের তত্ত্বাবধায়িকা মহাশয়া এমন ছুইটি প্রস্তাব করেন, বাহা পালন করিতে হইলে আশ্রমের প্রতি সাধারণের সহায়ত্ব নষ্ট হয়। প্রস্তাব দুইটি এই যে, এখানে ভর্তি হইবার সময় প্রতি ছাত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষা খাচা চাই, এবং শিক্ষাশ্রমে সকলকেই সরকারী ট্রেনিং স্কুলে বাইতে হইবে। সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ার সমিতি ব্যয় সংক্ষেপ

করিতে বাধ্য হন। প্রথম বৎসর সমিতি ৩০টি নারীর তত্ত্ব-পোষণের ভার লইলেন, কিন্তু বাধ্য হইয়া বর্তমানে তাহার সংখ্যা ১৫ পর্যন্ত কমাইয়া আনিতে হইয়াছে।

আশ্রমটির শিক্ষা-বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত :—

১। অন্তঃপুর কলাভবন।—এখানে বিশেষ করিয়া শিল্প-শিক্ষা ও চতুর্ধমান পর্যন্ত সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

২। পাঠাগার।—এখানে বর্তমান পর্যন্ত বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহার উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত, বা পাইতে ইচ্ছা কৰ্ত্তাদের কোন বালিকা বিদ্যালয়ে দৈনিক ছাত্রীরূপে পাঠান হয়।

পূর্বে এখানে লেশ প্রকৃত, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি তৈয়ারী ও নানা প্রকার কার্ঘ্য শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্তমানে সূচিকাৰ্ঘ্য, সূতা-কাটা এবং তাঁত-বোনা বাদে আর সব স্থগিত রাখা হইয়াছে। কারণ বেপা গিয়াছে সূচাকরূপে শিক্ষার্থী শিখিয়াও কেহ মাসিক ১৫-১৬ টাকার বেশী আর করিতে পারেন না। অথচ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই তাঁহারা টেনিং পাশ করিয়া মাসিক ৩০ হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক। আশ্রমটি বিধবাশ্রম নামে সাধারণে পরিচিত। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দু-বিধবাগণকে আশ্রয়দানপূর্বক তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইবার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। স্ত্রীর হিন্দু বিধবাগণের থাকিবার মতন সমস্ত বন্দোবস্তই এখানে আছে এবং নিতের ধর্ম সংস্কার অসুস্থ রাগিয়া চলিবার কোনই বাধা নাই। একজন প্রীণা মহিলা সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া এই আশ্রম বাটতেই বাস করেন। কয়েক বৎসর যাবত আশ্রমটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে ও সেই জন্য আশ্রম অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কেবল টাকা বা দানের উপর কোন প্রতিষ্ঠান চিরকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। একটা স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। সমিতি সেই হেতু আশ্রম প্রাক্তনস্থ জমির উপর একটি বাটী নির্মাণের মানস করিয়াছেন। এই বাটীটির আর হইতে আশ্রমের স্থায়ী আয়ের একটি স্টি হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য অন্ততঃ ২৫,০০০ টাকার আবশ্যিক। সাধারণের সহায়ত্ব ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। হিরণ্ময়ী দেবীর অশেষ ও অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি বাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে বাংলার সাধারণ সে ব্যবস্থা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী-শিক্ষা-সমিতি

গত মাসে নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে একটি নারী-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনী তিন দিন ধরিয়া পোলা ছিল এবং বহু সংখ্যক মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়া ছিলেন। শ্রীবুদ্ধা অবলা পত্নী ও সমিতির অধ্যক্ষ কন্যার অক্লান্ত চেষ্টায় প্রদর্শনী সাক্ষ্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনী-কর্মটি নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। এই পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শেখদিনে একটি সভা হয়। তাহাতে সমস্তের রাণীসাহেবা সভানেত্রীর কাজ করেন।

১। শ্রীমতী নির্মলপ্রভা চলিহা রেশমের বস্ত্র বয়নের জন্য, ২। শ্রীমতী শ্রেহলতা ভট্টাচার্য্য, সূতার বস্ত্র বয়নের জন্য, ৩। শ্রীমতী সুপ্রভা বার, সূতা সূতা-শিল্পের জন্য, ৪। শ্রীমতী চারুবালা সোম, সূতা সূতা-শিল্পের জন্য, ৫। শ্রীমতী হিরণবালা দাস (বোলপুর), সূতা



শ্রীযুক্তা অবলা বসু

সুচী শিল্পের জন্য, ৬। হিন্দু মহিলা টেনিং স্কুল—সাদা সেলাইয়ের জন্য, ৭। হিন্দু মহিলা টেনিং স্কুল, চাট্টনীর জন্য, ৮। শ্রীমতী চারুশীলা দেবী (বিদ্যাসাগর বাণীভবন) জেলির জন্য, ৯। শ্রীমতী হেমলতা সেন ঐরিকেলের খাবারের জন্য, ১০। শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দাসগুপ্তা কানজ দিয়া নানা ছবির জন্য ১১। শ্রীমতী প্রকুলকুমারী সেন চট্টের আসনের জন্য, ১২। শ্রীমতী সুরবালা দেবী কার্পেট বয়নের জন্য, ১৩। শ্রীমতী রাখারানী রায় মটির তৈয়ারী গ্রাম্য গৃহস্থালীর দৃশ্যের জন্য, ১৪। শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু, চরকার ১৮০ নম্বরের সুতা কাটার জন্য, ১৫। শ্রীমতী রেবা মিত্র বালিকাদিগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কার্যের জন্য।

প্রদর্শনীতে ছোট ছোট বালিকাদের সুন্দর সুন্দর সুচী-শিল্পের জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভদ্র্যতিরেকে আসল, চট্টের আসন ও নানা প্রকার সুন্দর কাঁথা সেলাই ছিল। ৬০ বৎসর পূর্বেরকার ছুইটি কাঁথা বশোইর ও পাবনার মেয়েদের হাতের নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে। প্রদর্শনীর সাক্ষ্য দেখিয়া আশা করা যায় যে, বাংলা দেশের মেয়েদের হাতের নিপুণতা পূর্বের মতনই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহাদের হাতের নিপুণতা শিক্ষা দ্বারা নিপুণতর হইয়া সর্বপ্রকারে ভারতের পৌরব বাড়াইবে।

শ্রী প্রভাত সাত্তাল

ঢাকা ম্যুনিসিপালিটির অভিনন্দনের উত্তরে*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১।

নর্থব্রুক হল,
অপরায় ৪১০ বটিকা।

আপনারা আমাকে যে সাদর অভিবাদন করলেন আমি তা'র যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারি এমন শক্তির আমার অভাব ঘটেছে। আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি দুর্বল ক্রান্ত। সে কথা সহসা আপনারা সকলে হয়ত গ্রাহ্য না করতে পারেন। সেজন্য আমিই দায়ী, কারণ, আজ আমার এখানে উপস্থিতিই শারীরিক অশক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যখন আপনারা নিমন্ত্রণ আমার কাছে পৌঁছল, দুর্বল শরীর বললে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু মনেরও যে দুর্বলতা আছে। তাই আপনারা ডাক এড়াবার সাধ্য রইল না। দেহ যখন বলে, না, মন তখন বলে, হ্যাঁ। শেষে মনেরই জিৎ হ'ল। ডাক্তারের উপদেশ মূৰ্ছন করেই এসেছি, এখন আর অস্থূল শরীরের দোহাই দিয়ে কি হবে? অতএব, আমাকে কিছু বলতেই হবে, কেবল আমার আবেদন এইটুকু যে আমার কাছে বেশি বলা দাবী করবেন না।

ঢাকা সহরে বহুপূর্বে একবার এসেছিলাম, কিন্তু সে না-আসারই মধ্যে। এই আজ প্রথম এসেছি বললেই হয়, এই সুযোগে আপনারা আমাকে আমার পরিচয় স্পষ্ট করতে হবে। কেমন করে করি? সমস্ত কোথায়? অথচ না করতে পারলে আনন্দ কিসের? কতকগুলি প্রথাগত অনুষ্ঠানের ভিড়ের মধ্যে মুখের কথা কিছু বলে গেলে মনের ভিতরকার অতৃপ্তি থেকে যায়। তাই ভয় ছিল যে, হয়ত যত্ন সময়ে ও শ্রান্ত শরীরে তা ঘটে উঠবে না; হয়ত বা আপনারা আমাকে আসন বাইরের আসন হ'য়ে থাকবে। কিন্তু আজ আপনারা অভিনন্দন শুনে বুঝলাম

যে আমাকে আপনারা স্বাগত করেছেন। শুনে আপনারা হাসতে পারেন, মনে করতে পারেন বিনয় করি। কিন্তু তা নয়। আমার বিশেষ একটা পরিচয় স্বাগত না রেখে আপনারা উপায় নেই। বই বিস্তার লিখেছি, ছাপার কালীতে তা'র প্রমাণ র'য়ে গেল। আমি সাহিত্য লিখে থাকি একথা গোপন নেই কিন্তু সে ছাড়াও আরো কিছু পরিচয় বাকি ছিল। কাগজের ক্ষেত্রেও নিজের পুঁজিবিচার ও শক্তি অল্পস্বল্পে দেশের সেবা কিছু করেছি। ভেবেছিলাম এই কথাটাই বুঝি আপনারা ভুলেছেন। ভোলাবার কারণ আছে। যে উদ্দীপনার মশাল-আলোকে কখনো আন্দোলনের সকল ভঙ্গীই সাধারণের মনের মধ্যে চিহ্নিত করে দেয় একদিন বাড়লো সেই উদ্দীপনার বহির্দীপ্ত কাল এসেছিল। যারা অল্পবয়স্ক, এখনকার কালের ধারার সঙ্গে যাদের জীবন দোলায়মান হ'য়ে চলেছে, তাঁরা আমার সেদিনকার বৃত্তান্ত হয়ত কিছু জানতেও পারেন। কিন্তু সে তাঁদের স্পষ্ট করে মনে রাখবার কথা নয়। তা'র পর অনেক দিনের অনেক কার্যকোলাহল অনেক কথাই চাপা দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও আজ এই অভিনন্দন থেকে দেখলাম একটি কথা আপনারা মনে আছে। সেটি এই। সে আজ হয়ত ত্রিশ বৎসর হ'ল, সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলেছিলাম, যে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব দূর করার ভার যদি আমরা না নিলাম তা হ'লে দেশকে পাওয়াই হ'ল না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্ত, অন্নের জন্ত, জ্ঞান বিস্তারের জন্ত, অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্ত, আমাদের লোকেরা রাজস্বারে সম্মিলিতকণ্ঠে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে সভায়-সভায় সংবাদপত্রে-পত্রে কখনো বা মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো বা ক্ষোভের তাড়নায় রাজস্বারে আলোড়িত করে তুলেছিলাম, আমার তখনকার কালের রচনা যদি প'ড়ে দেখেন তবে দেখবেন আমি সেই আবেদনের পুনঃপুনঃ পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

* বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে কবিবর যে বক্তৃতা দেন, তিনি স্বয়ং তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। দৈনিক কাগজে তাহার বক্তৃতার যেসব প্রতিলিপি বাহির হইয়াছিল তাহার অনেক স্থলের সহিত ইহার অমূল দৃষ্ট হইবে।

প্রকাশ করেছি। তা'র কারণ কেবল এই অত্যন্ত বাহ্যিক কথা নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় দেশের অভাব ও দুঃখ দূর হ'তে পারে, তা'র আর-একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের রাজ-শক্তির সঙ্গে যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা ভিক্ষকের মতো কবুলে চলে না। আত্মশক্তিদ্বারা দেশকে যে-পরিমাণে আত্মস্ত কবুলে পাবুন সেই-পরিমাণেই রাজশক্তির সঙ্গে সমকক্ষভাবে আমাদের ব্যবহার চলতে পাবে। একপক্ষে কেবল প্রার্থনা অন্যপক্ষে কেবল দাবিদার, এর মাঝখানে যে ফাঁক সেটা অসীম। সে আমাদের আত্ম-বমাননার প্রকাশ গহ্বর। তখনকার কালের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি দুই অসমানের মিলনের সেতু নিষ্কাণ কবুলে লেগেছিল। আমি তখন বলেছিলাম, অসাম্যের মিলন অসম্মানের মিলন। তখনকার দেশহিতৈষীরা এই ব্যাপারে আমাকে কর্মনাশা ব'লে মনে-মনে বিরক্ত হয়ে-ছিলেন। সংশয় ছিল, একথা হয়ত আপনারা ভুলে গিয়ে থাকবেন। ভোলেননি জেনে আমি ধন্য হয়েছি।

আমার পরিচয় বর্ণনা ক'রে আপনারা আরো-একটি কথার আভাস দিয়েছেন, সেও আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। আমি বলেছিলাম ভিক্ষা নেবো না, নিজের শক্তিকে উদ্বোধিত করার দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার কবুল, এরই সঙ্গে আরো-একটি কথা আপনিই এসে পড়ে, সে হচ্ছে এই যে শুধু যে নেবো না তা নয়, দেবো। যে দিকে নিজের দারিদ্র্য আছে, অজ্ঞান আছে, অস্বাস্থ্য আছে, সেদিকে অভাবপূরণের জন্য নিজের শক্তি সচেষ্ট হ'য়ে থাকবে, কিন্তু যেদিকে আমাদের পূর্ণতা সেদিকে দেবার দায়িত্বই আমাদের। আমরা যে বর্কর নই তা'র প্রমাণ দিতে হ'লেই ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হবে। সে পরিচয় ত দানের দ্বারা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মানুষকে এমন-কিছু দিচ্ছে গেছেন যা চিরকালের দান; অহংকার কবুলার বেলায় সে-কথা আমরা বলি, ব্যবহার কবুলার বেলায় সে-কথা আমরা ভুলি, তা'তেই ত আমাদের পিতামহদের গৌরবকে স্নান ক'রে দিয়ে থাকি। তাঁরা বলেছিলেন আয়ত্ত সর্বতঃ স্বাহা—সব জায়গা থেকে সবাই আমাদের

কাছে আয়ত্ত। এতবড় নিমন্ত্রণ কোনো দরিদ্র কবুলে পারে না। তাঁদের সেই নিমন্ত্রণ ত কেবল তাঁদের কালের নয়, সে চিরকালের,—তা'কেই কি আজ আমরা ব্যর্থ কবুলে বসব? আজ কি দ্বার বন্ধ ক'রে এটা কথাই বলতে হবে যে, আমাদের যা আছে তা'তে আমাদের নিজেই চলে না, বলতে হবে পিতামহদের আমন্ত্রণ কালের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আজ আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি! যদি আমার দেশের অধিকাংশ লোকেই এমন কথা বলে, তবুও আমার দেশের হ'য়েই সেই অধিকাংশ লোকেরই প্রতিবাদ কবুল, ভারতবর্ষের পূর্ণ ভাগ্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে বলব, আয়ত্ত সর্বতঃ স্বাহা।

আজ পৃথিবীব্যাপী দুঃখের দিনে মানুষ বলতে, শাস্তি চাই। একদিন ভারতবর্ষ আত্মার মধ্যে শাস্তির মন্ত্র শুনেছিল। একদা দেশে-বিদেশে সমুদ্রপর্বত ভ্রমণ ক'রে ভারতবর্ষ শাস্তিমন্ত্র প্রচার করেছিল। ভারতবর্ষ সেদিন দূরদেশে পণ্য বিক্রয় কবুলে যায়নি, দেশজয় কবুলে যায়নি, অন্তরে যে সম্পদ সে আবিষ্কার করেছিল সেই সম্পদ দান কবুলার পরম অধিকার প্রকাশ কবুলে সে গিয়েছিল। তা'র সেই সম্পদ কখনো কি নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারে? বিশ্বজয়ের আয়োজন ভারতবর্ষে আজ কিছুই কি বাকি নেই? অথচ মানুষের সংসারে দূরত্বের ব্যবধান প্রত্যাহ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে,—আমরা ইচ্ছা করি আর না করি বিশ্বপৃথিবী আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত; আজকের দিনে তা'রাই ধন্য সকল মানুষকে আতিথেয় ডাকবার মতো সাহস ও সম্মল যাদের আছে! তাদের নেই যারা বিষয়ী, যারা স্বার্থকেই একান্ত ক'রে জানে, জাতীয় অহমিকায় যারা উন্নত। কিন্তু এমন কথা যারা বলেছেন, আপনাকে সকলের মধ্যে না জানলে সত্যকে জানা হয় না তাঁদের আতিথ্যের অন্ত নেই, তাঁদের অতিথিশালায় দ্বার কখনই বন্ধ হ'তে পারে না। তাই আমি অতিথিবৎসল ভারতবর্ষের নামে তাঁর হ'য়ে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার ভার নিয়েছি। এই জন্তে আমি আপনাদের সকলের কাছেই দাবী কবুলে এসেছি। সকলের অঙ্গে সকলের সম্মিলিত আয়োজনে তবেই ত এই অতিথিশালা ভারতের হ'তে পারে? এ গৌরব যদি আমার একলার হয়, তবে তা'তে

দেশের গৌরবের হানি। আমি কি এই কথা বলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো যে একদিন বাংলাদেশের লোকের মনে এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল যে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তা'র মাতৃভূমি একঘরে হ'য়ে থাকবে না ?

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বারম্বার বলেছিলাম, বধিরের কাছে, অসাড়ের কাছে, উর্দাগীনের কাছে যে, নিজের ঘরে ফিবুতে হবে সেবার দ্বারা কর্মের দ্বারা। ক্ষমতার অভাবে কৃতকার্য না হ'তে পেরে থাকি, কিন্তু আমার সাধনার ক্ষতি হয়নি,—আমার কণ্ঠ কণ্ঠ ব'লে আমার বাণী যদি সকলের হৃদয়ে শৌছে না থাকে তবে আমার সঙ্কল্পকে দোষ দেবেন না, দোষ দেবেন আমার অপটুতাকে। কিন্তু একদিন আমি যে বলেছিলাম সে-কথা আপনারা স্বরণ করেছেন তা'তেই আমি ধস্ত। আজ আমি অন্য কথা বলতে বসেছি,—প্রান্তরের প্রান্তে, নিভৃত আশ্রমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মুখের কথায় নয়, কর্মের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে আমার নিজের কথা নয়, তা'র মধ্যে আমাদের ঋষিদের কথা প্রতিধ্বনি। সেই জন্তে কেউ-কেউ কখনো-কখনো যখন আমাকে ঋষি উপাধি দেন তখন আমার সঙ্কোচের সীমা থাকে না। আমি ঋষিদের বাণী চয়ন করেছি কিন্তু আমি তা মন্ত্রজ্ঞা নই। যে উচ্চপদে যার অধিকার নেই তা'কে সেই পদগৌরব দেওয়ার মতো অন্ত্র আর হ'তে পারে না। আমি ঋষিদের সঙ্গ সন্মান করি তাঁদের সন্মানের অংশ নিজে হরণ করাকে অধর্ম ব'লেই জানি। কবি ব'লে আমাকে যে সন্মান করেন তা গ্রহণ করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে। ভাষার সেবা করেছি, কর্তব্যবোধে দেশের লোকের ক্রটিবিরুদ্ধ কথাও বলেছি, ভারতের শ্রেষ্ঠদান দেশে বিদেশে বহন করেছি। এই পথিকবৃত্তিতে দেহ ক্লান্ত ও দুর্বল, তবু আমার পক্ষে যে ভার অসাধ্য তাও নিতে বিমুখ হইনি। আমার সেই প্রয়াসের পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার দাবী করি, আর কিছুই না। আপনাদের অভিবাদন নীরবে গ্রহণ করা অসৌভাগ্য ব'লেই এত কথা বললাম। এখন নমস্কার জানাই, যদি দয়া ক'রে আমাকে মনে রাখেন তবে আমার যেটুকু সত্য পরিচয় তাই মনে রাখবেন। অত্যাতিরিক্ত কোনো প্রয়োজন নেই। আমি

যতটুকু কাজ যথার্থভাবে করেছি সেটুকুর জন্তে যদি আপনাদের হৃদয় পাই তবে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করুব।

২।

ঢাকা করোনেশন পার্ক,
অপরাজ ৫১০ বটিকা।

বহুকাল পূর্বে আর একবার এই ঢাকা নগরীতে এসেছিলাম সেদিনকার রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন-উপলক্ষ্যে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপারে নিপুণভাবে যোগ দিতে পারি এমন অভ্যাস ও শক্তি আমার ছিল না,—এই অশুষ্ঠানে আমার দ্বারাও যে কাজটুকু হ'তে পারে আমি কেবলমাত্র তা'র ভার নিয়ে এসেছিলাম। তখনকার রাষ্ট্রীয় সভাগুলিতে ইংরেজি ভাষাতেই বক্তৃতা হ'ত। যারা বাংলাভাষার চর্চায় বিরত ছিলেন, যারা এ-ভাষা সভাস্থলে ব্যবহার করতে জানতেন না, তাঁদেরই অনেকে রাষ্ট্রিক আন্দোলন-কার্যে প্র'ধান লাভ করেছিলেন। তা'র ফল হয়েছিল এই যে, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রিক শিক্ষা-বিস্তারের যে একটিমাত্র উদ্যোগ তখন ছিল, ইংরেজি ভাষার চাপে তা'র উদ্দেশ্যটি মারা গিয়েছিল। দেশের হিত কিসে হয়, তা'র বাধা কি, সে বাধা দূর হ'তে পারে কোন্ উপায়ে, দেশের লোককে সেই কথাটি ভালো ক'বে ভাবিয়ে তোলাই দেশহিতের প্রথম ও প্রধান কাজ, কিন্তু এই ভাবনার চর্চা বন্ধ ছিল ইংরেজি-জানা অল্পসংখ্যকজনের মধ্যেই। এই সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে দেশসেবার যে সাধনা বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হ'য়ে ছিল তা'কে তা'র আপন ভাষার মধ্যে মুক্তি দেবার জন্যেই এখানে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার সেদিনকার সে চেষ্টা সফল হয়েছিল; তা'র পর থেকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে ইংরেজি ভাষার প্রভুত্ব দূর হ'য়ে গেছে। মাতৃভাষার প্রতি দেশসেবকদের উপেক্ষা ঘুচিয়ে দেবার জন্ত ঢাকায় তিনদিনকাল যে চেষ্টা করেছিলাম সে-স্বতি আমার মনে আছে। তখনো আমি রোগে পীড়িত ছিলাম, তাই সেদিন এগানকার পৌরসাধারণের সঙ্গে আমার মিলন হবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমার যেটা কাজের ক্ষেত্র সে তা চাক্ষুব মিলনের ক্ষেত্র নয়। আমার সাধন-

উপলক্ষে আমি দূরে নিভূতে থেকেও ভাষার ধারা বেধে সকলের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি। সেই ভাষার যোগে মিলনই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে খাঁটি। সেদিন সেই ভাষার নাম নিয়ে তা'রই জয়পতাকা বহন ক'রে এখানে অল্পকাল প্রচ্ছন্নপ্রায় থেকেই চ'লে গিয়েছিলাম। আজ আমার সৌভাগ্য এই যে কেবলমাত্র বাক্যরচনার যোগে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে আমার অদৃশ্য আসন পাতা হয়নি, আজ প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারুব। বিশেষ-কিছু কাজ ক'রে যেতে পারুব এমন শক্তি নেই, আশা নেই। কেবল, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে বঙ্গদেশের দিকে দিকে চৈতন্যকে পরিব্যাপ্ত করুব, আপনাদের সঙ্গে প্রীতিসম্মিলন-উপলক্ষে বঙ্গদেশের বিচিত্রপীঠস্থানে অধিষ্ঠিতা বঙ্গলক্ষ্মীর কাছে প্রীতি-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিয়ে যাবো, এইবার এইটুকুমাত্র আমার আশা। আজ জীবনপথঘাত্তার শেষ প্রান্তে পৌঁচেছি। মাতৃভূমির সকল তীর্থ হ'তেই বঙ্গজননীর শেষ চরণধূলি

নিয়ে যাবো সেই প্রত্যাশায় এখানে আমার আসা। আপনারা আমার প্রতি অহুকুল হোন। স্মরণ জীবনে দেশের কাছে আমার যা উৎসর্গ করেছি, সেই নৈবেদ্য থেকে নির্মাল্য নিয়ে প্রণয়নে যদি বলতে পারেন, “এ রইল, এ রাগ্লুম, আমাদের ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের কর্মসঙ্কল্পের মধ্যে”—তা হ'লেই আমার চরিতার্থতা। মনে রাখবেন, আপনাদের কবি একদিন এই স্মরণ সূর্যাস্তকালে এই স্মরণ নদীতীরে আপনাদের সকলের মধ্যে হৃদয় প্রসারিত করেছিল। এই মনোহর সন্ধ্যার আলোকে আলিঙ্গিত কবির চিত্রকেই স্মৃতিপটে বেধে দেবেন। কেননা, এই মর্ত্য কবিরও অন্তের দিন কাছে এসেছে, পশ্চিম সূর্য ঐ যে তা'র জ্যোতীরশ্মির অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে অস্তাচলের পথ নির্দেশ করুচে। তাই আজ ঐ সন্ধ্যাসূর্য্যেব শেষ বাণীর দ্বারাই আমার বিদায় অভিবাदनকে পূর্ণ ক'রে আপনাদের কাছে রেখে দিয়ে গেলাম।

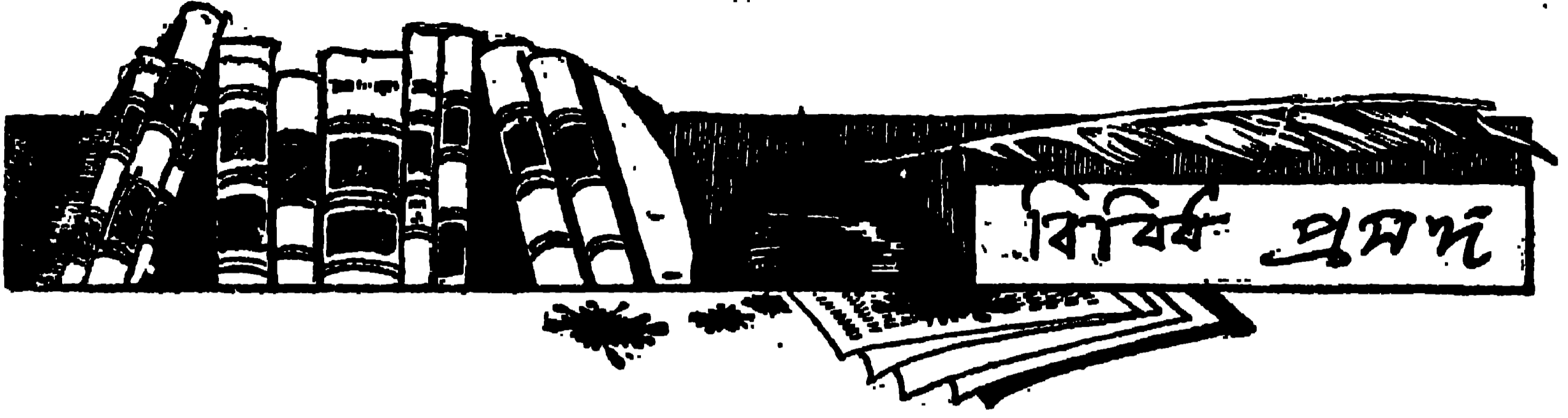
ভ্রম-সংশোধন—১৪৯ পৃষ্ঠা ২য় কলামের ২২শের লাইনে 'আত্মসবাসিক' হলে 'আশ্রমবাসিক' পড়িতে হইবে।

১৫২ পৃষ্ঠা ১ম কলামে নীচে হইতে ২য় লাইনে 'স্বামরন্নি' হলে 'স্বামরন্নি' পড়িতে হইবে।

১২৯ পৃষ্ঠা ১ম কলামে ২৪শের লাইনে '৫০০০-৪০০০ খ্রীষ্টাব্দের' হলে '৫০০০-৪০০০ গুঃ খ্রীষ্টাব্দের' পড়িতে হইবে।

৮৩৭ পৃষ্ঠা 'রাষ্ট্রভগতে বর্তমান ভাবের ধারা' প্রবন্ধের লেখক—শ্রীযামাপ্রসন্ন সেন গুপ্তের নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই।

৮৪৯ পৃষ্ঠার ২য় কলামের ১ম লাইনে 'ধরিয়াছিল' হলে 'ধরিয়া ছিল' পড়িতে হইবে।



প্রবাসীর ব্যয়

ঈশ্বরের কৃপায় প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর ব্যয় পূর্ণ হইল।

যাহারা এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কিংবা উহার কোন-না-কোন সময়ে কোন-না-কোন প্রকারে আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমার একর চেঁচায় ইহা কখনই টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

যাহাদেব আদর্শ অতি উচ্চ তাঁহাদের কথা দূরে থাক, প্রবাসী আমার নিজের আদর্শের অনুকরণে এখনও হয় নাই। কিন্তু ইহার উন্নতি সাধন করিবার ইচ্ছা ও আশা আমি এখনও পোষণ করিতেছি।

আমি জানি, কর্তব্য পালন করিতে গিয়া কখন কখন আমার ভয় ও ক্রটি হইয়াছে। তাহার জন্য আমি দুঃখিত।

ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আয় ব্যয়

১৯২৫-২৬ সালে ভারত গবর্নমেন্টের যত আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, ১৯২৬-২৭ সালের আয় তাহা অপেক্ষা দুই কোটি টাকারও উপর বেশী হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভারত-গবর্নমেন্টের আয় বিরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা ১৯১৫-১৬ এবং ১৯২৪-২৫ সালের আয় হইতে বুঝা যাইবে। ১৯১৫-১৬ সালের আয় ছিল ৮০,০০,০০০ টাকা, ১৯২৪-২৫ সালে আয় হইয়াছিল ১৬৮,০০,০০০ টাকা। এই যে নয় বৎসরে গবর্নমেন্টের আয় ৫৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, ইহার মানে এ নয়, যে, দেশের সমৃদ্ধিও এই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিতেছে; ইহার মানে প্রধানতঃ এই, যে, গবর্নমেন্ট ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর টাকা ট্যাক্স রূপে দেশের লোকদের নিকট হইতে লইতেছেন।

সুতরাং ১৯২৫-২৬ অপেক্ষা ১৯২৬-২৭ সালের আনুমানিক আয় বেশী হইবে বলায় ইহা বুঝাইতেছে না, যে, দেশের ধন বাড়িয়া চলিতেছে।

রাজস্বসচিব অনুমান করিতেছেন, যে, আগামী বৎসর আয় হইবে ১৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ১৩০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা; উদ্বৃত্ত থাকিবে তিন কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। ইহাও সমৃদ্ধির লক্ষণ নহে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শনে বাহাদুরী নাই। দেশের লোককে সুস্থ সবল জানবানু এবং ধনশালী করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তবে তাহাকে বলি রাজনৈতিক কৃতার্থতা।

১৯২৬-২৭এর সামরিক ব্যয়

১৯২৬-২৭ সালে সামরিক ব্যয় হইবে ৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। রাজস্বসচিব বলিয়াছেন, যে, ইহা ১৯২৫-২৬ সালের বরাদ্দ সামরিক ব্যয় অপেক্ষা এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা কম। তাহা হইলেও ইহা অত্যন্ত বেশী। ব্রসেল্‌স্‌ নগরে নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কোন গবর্নমেন্টের সামরিক ব্যয় উহার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অধিক হওয়া উচিত নহে। কিন্তু ভারত-গবর্নমেন্টের সামরিক ব্যয় উহার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অনেক বেশী। যদি এদেশের প্রাদেশিক গবর্নমেন্টগুলির আয় ভারত-সরকারের আয়ের সহিত যোগ করা যায়, তাহা হইলেও ৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয় মোট সরকারী আয়ের পঞ্চমাংশ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য যে ইক্‌কেপ্‌ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার মতে ভারতের সামরিক ব্যয় পঞ্চাশ কোটি টাকা মাত্র হওয়া উচিত। সেই মাপনায় অনুসারেও ১৯২৬-২৭ সালের সামরিক ব্যয় অনেক বেশী।

বিলাতের ১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে সামরিক ব্যয় ধরা হইবে, তাহা ১৯২৫-২৬ সালের বরাদ্দ অপেক্ষা তিন কোটি টাকা কম হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের নিকটেই ইউরোপের অনেক শক্তিশালী যুদ্ধকম জাতি আছে, এবং তাহাদের কেহই ইংলণ্ডের চিরবন্ধু নহে। তাহা সত্ত্বেও যদি সে-দেশে সামরিক ব্যয় তিন কোটি টাকা কমান যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যুদ্ধবিভাগের বরাদ্দ নিশ্চয়ই এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী কমান যাইতে পারে; কারণ ইংলণ্ডের যত নিকটে যুদ্ধকম শক্তিশালী যত জাতি আছে, ভারতবর্ষের তত নিকটে যুদ্ধকম শক্তিশালী জাতি ততগুলি নাই।

ভারতের যুদ্ধব্যয় এত বেশী থাকিতে দেশের উন্নতির জন্য নানা দিকে যথেষ্ট ব্যয় কখনই হইতে পারিবে না।

উদ্ভূত টাকার সদ্যবহার

১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে উদ্ভূত দেখান হইয়াছে তাহা হইতে দুটি কাজ করা হইবে। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় মিলের সূতা ও কাপড়ের উপরে যে শুল্ক ছিল, তাহা স্থায়ী ভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক গবর্নেন্টসমূহ ভারত-গবর্নেন্টকে বৎসর বৎসর যত টাকা দিতে বাধ্য, তাহা হইতে মাস্ত্রাজকে ৫৭ লক্ষ, আগ্রা অধোধ্যাকে ৩৩ লক্ষ, পঞ্জাবকে ২৮ লাখ এবং ব্রহ্মদেশকে ৭লাখ মোকুব করা হইল।

কার্পাসজাত পণ্যের উপর কোন কালেই শুল্ক বসান উচিত হয় নাই। যাহাতে ভারতের মিলসকলের প্রতিযোগিতায় বিলাতের মিলসমূহের ক্ষতি না হয়, সেইজন্মই উহা বসান হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানী মিলের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ও বিলাতী (বিশেষতঃ বিলাতী) মিলের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সম্ভবতঃ জাপানী মিলসকলের বিরুদ্ধে ভারত ও বিলাতের একজোট হইয়া কিছু করিবার সুবিধার নিমিত্ত ভারতীয় মিলসকলকে শুল্ক হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। যে-উদ্দেশ্যেই উহা দেওয়া হউক, কাজটা মন্দ হয় নাই।

কিন্তু ইহার অন্ত একটা দিকও আছে। ভারতীয়

কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্য দুই প্রকার; (১) মিলের সূতা ও কাপড়, (২) চব্বাকার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়। এই উভয়কে রক্ষা করা যায়, এমন উপায় অবলম্বন করাই কর্তব্য ছিল। যদি বিলাতী, জাপানী এবং অন্ত সব বিদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে কর বসান যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভারতীয় উভয় প্রকার কার্পাস-শিল্পের সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু এখন যাহা করা হইল, তাহার দ্বারা ভারতীয় মিলগুলির কিছু সুবিধা হইলেও, চব্বাকার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়ের সুবিধা ত হইলই না, বরং অসুবিধাই হইল। কারণ, এখন ভারতীয় মিলের সূতা ও কাপড় আগেকার চেয়েও সস্তা দামে বিক্রী হওয়ায় চব্বাকার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়কে অধিকতর প্রবল প্রতিযোগিতা সহ করিতে হইবে। তাহাতে টিকিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইবে। অন্ত দিকে শুধু লক্ষ উঠাইয়া দিয়াই ভারতীয় মিলগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইলে বিদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে কর বসাইতে হইবে, দেশী মিলগুলির পরিচালনায় মিত্যব্যয়িতা প্রবর্তিত করিতে হইবে, এবং তৎসমুদয়ে আধুনিকতম কল ও উৎপাদন-ও বিক্রয়-প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড-

ভারত-সরকারের আয় হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র করিয়া মূল ধন রূপে রাখা হইবে, এবং তাহার হ্রদ আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কাজের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইবে। ইহা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অপব্যবহার নহে। কিন্তু যে-গবর্নেন্টের বার্ষিক আয় একশত ত্রিশ কোটিরও উপর, তাহার পক্ষে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া কোন বৎসরই কঠিন নহে। সূতরাং তাহার জন্য আলাদা একটা খোক টাকা মূলধন-রূপে গচ্ছিত রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রাজস্ব-সচিব অবশ্য বলিয়াছেন বটে, যে, এই ফণ্ডটা

স্থাপিত করিয়া তাহার ট্রস্টী নিযুক্ত করিলে ভারতীয় রাজামহারাঙ্গা ও অন্তর্ধনী ব্যক্তিদ্বিগের নিকট হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য মূলধন পাওয়া যাইবে। তখন বৃহত্তর ফণ্ডের স্বদে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ আরও অনেক বেশী করা চলিবে। কিন্তু বড় লাট প্রত্নতাত্ত্বিক যাহার মুক্তি, সেরূপ কোন কাজের জন্য টাকা অভাব হয় না। সুতরাং রাজস্ব হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া না রাখিলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড একটা খুলিলে এবং রাজা মহারাজাদিগকে টাকা দিতে বড়লাট বলিলে টাকা পাওয়া যাইত।

রাজস্ব-সচিব এবিষয়ে তাঁহার বক্তৃত্ত্ব যোগ্য বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা আশঙ্কার কথাও আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড একবার খোলা হইয়া গেলে ভারতীয় রাজা মহারাজা, প্রত্নতত্ত্বমোদী অন্যান্য লোক এবং শীতকালে বিদেশী ভারত-পর্যটক-দিগের নিকট হইতে ইহাতে টাকা আকৃষ্ট হইবে। * ইতি-মধ্যেই একটা প্রস্তাব হইয়াছে, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে প্রত্ন-তাত্ত্বিক খনন-কার্যের জন্য যথেষ্ট টাকা ও বিশেষজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না, অতএব বিদেশী উপযুক্ত লোকদিগকে এই সর্ব্বত্র এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হউক, যে, তাঁহারা খনন করিয়া যে-সকল ঐতিহাসিক জিনিষ পাইবেন, তাহার একটা অংশ তাঁহারা নিজেদের দেশে লইয়া যাইতে পারিবেন। ঐতিহাসিক কোন সামান্য প্রমাণও যাহা হইতে পাওয়া যায়, এরূপ কোন জিনিষ বিদেশে চালান হওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজস্ব-সচিবের প্রস্তাব-অনুসারে যদি বিদেশী লোকেরা প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ডে টাকা দেয়, তাহা হইলে প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষের উপর ভাগ বসাইবার তাহাদের একটা দাবী জন্মিতে পারে। রাজস্ব-সচিব সেইরূপ দাবীর একটা ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন কি না, বলিতে পারি না।

এবিষয়ে আরও কিছু বলিবার আছে। তাহা পরে বলিতেছি।

* "Once the fund came into existence, it might, it is hoped, attract donations from Indian Princes and from others interested in archaeology and from winter visitors to India....."

বজেটে গরীব লোকের প্রতি অমনোযোগ

ভারতীয় বজেটে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু গরীব লোকদের সাহায্যে বিশেষ ভাবে সুবিধা হয়, এরূপ কোন ট্যাক্স রহিত করা বা কমান হয় নাই। লবণের উপর ট্যাক্স রহিত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ডাকমাণ্ডুল না-কমান

মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও ডাকমাণ্ডুল বাড়িয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর তাহা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ডাকমাণ্ডুল কমিতেছে না।

রাজস্ব-সচিব উহা না-কমাইবার নানা কারণ দেখাইয়াছেন। একটা কারণ এই দেখাইয়াছেন, যে, ১৯১৩ সালে জুব্বাদির মূল্য যদি ১০০ ছিল ধরা হয়, তাহা হইলে ১৯২৫ এর ডিসেম্বরের শেষে তাহা বাড়িয়া ভারতবর্ষে ১৬৩, আমেরিকায় ১৫৮ ও বিলাতে ১৫৩ হইয়াছিল। ১৫৩ ও ১৬৩তে বেশী প্রভেদ নাই। বিলাতে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও যদি ডাকমাণ্ডুল কমিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কেন কমিতে পারিবে না? তা ছাড়া, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ত রেলভাড়া কমান চলিতেছে, টেলিফোনের ভাড়া কমান চলিতেছে, ট্রামগাড়ির ভাড়া কমান চলিতেছে, এবং মোটরগাড়ির উপর ও পেট্রলের উপর পণ্যশুল্ক কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে।

রাজস্বসচিবের আর-একটা যুক্তি এই যে, ডাকমাণ্ডুল কমাইলে ভারতীয় করদাতাদিগকে প্রতি বৎসরই তাহাদের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে ডাকবিভাগের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বেশী বেশী টাকা দিতে হইবে। যদি দিতে হয়, তাহা হইলেও, যাহারা টাকা দিবে, সুবিধা ত তাহারাই ভোগ করিবে। কেন না, ভারতবর্ষের লিখন-পঠনকর্ম লোকেরা ত পোস্টকার্ড ও চিঠি লিখেই, নিরক্ষর লোকেরাও অল্পের দ্বারা পোস্টকার্ড ও চিঠি লেখায়। অধিকন্তু লিখনপঠনকর্ম লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে।

ডাকবিভাগকে ঠিক একটা ব্যবসায় জিনিষ বলিয়া মনে করা ভুল। যে-ব্যবসাতে লাভ হয় না, তাহা তুলিয়া দেওয়াই উচিত। কিন্তু ডাকবিভাগ ব্যবসা নহে; ইহার অন্য দিক আছে।

এখনও অনেক রেলওয়ে লাইন আছে, যাহাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। প্রথম প্রথম সব লাইনেরই অবস্থা এইরূপ ছিল। কোন-কোন এরূপ লাইন আছে যাহা সামরিক কারণে, অর্থাৎ অস্ত্রবিপ্লব নিবারণের জন্য, বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য, ভারতসরকার রাখা দরকার মনে করেন। দেশটির সম্বন্ধে ক্ষতিলাভ গণনা করেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যাহা প্রধানতঃ ব্যবসা হিসাবে চালাইতে হয়, তাহাও কোন-কোন স্থলে লোকসান দিয়া রক্ষা করা উচিত বিবেচিত হয়। ডাকবিভাগ দ্বারা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার গরোকভাবে সাধিত হয়। বস্তুতঃ ডাকবিভাগ ভিন্ন দেশব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্য আধুনিক সময়ের উপযোগী সূচাকভাবে চলিতে পারে না। ডাকবিভাগ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারেরও উপায়। অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এবং কোন-কোন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক। আমাদের দেশে তাহা নহে। অধিকন্তু ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত এরূপ যে, ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে একখানি চারি পয়সার বহি বেহ আনাইতে চাহিলে তাহার খরচ হইবে ১/০ (ছয়) আনা। সাড়ে ছয় আনা বলাই ঠিক; কেননা ছয়পয়সার পোষ্টকার্ডে ক্রেতা পুস্তকবিধিক্রমকে বহি পাঠাইতে লিখিলে তবে বহি আসিবে। জ্ঞান ও শিক্ষাকে দুর্মূল্য করা কোন সভ্য গবর্নমেন্টের উচিত নহে। প্রতিবেশীর সহিত সংবাদের আদানপ্রদান এবং ভাব ও চিন্তার বিনিময় মানব-সমাজের একটি বিশেষত্ব ও আনন্দের উপায়। অসভ্য নিরক্ষর দেশে প্রতিবেশী কেবল নিজের পাড়ার বা গ্রামের লোক। কিন্তু যে-দেশ যত সভ্য এবং যেখানকার ডাকবিভাগ যত সুশৃঙ্খল ও ডাকমাণ্ডল যত কম, সেখানে প্রতিবেশী বলিতে তত দূরের লোকও বুঝায়। অতএব স্তম্ভ ও সুশৃঙ্খল ডাকবিভাগকে দেশবিশেষের সভ্যতার মাপকাঠি, লক্ষণ এবং সভ্যতাবৃদ্ধির কারণও বলা যাইতে পারে।

ডাকমাণ্ডল কমাইলে ডাকবিভাগ বরাবর লোকসান দিয়া চালাইতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য ঠিকমত হিসাব যাহা বলিয়াছেন ও যেরূপ হিসাব দিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে।

ডাকমাণ্ডল বৃদ্ধি হওয়ায় পোষ্টকার্ড ও চিঠির সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এক পয়সার পোষ্টকার্ড ও দুই পয়সার চিঠি আবার চলিত হইলে কার্ড ও চিঠির সংখ্যা খুব বাড়িবে। তাহাতে ডাকমাণ্ডলের হ্রাসজনিত কতকটা ক্ষতির পূরণ হইবে।

তা ছাড়া, এখন বাস্তবিক শুধু ডাকবিভাগে লোকসান না হইয়া লাভই হয়। বর্তমান বৎসরে সম্মিলিত ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ১৮ লক্ষ টাকা নিট লাভ থাকিবে, আশা করা যাইতেছে। আগামী ১৯২৬-২৭ সালে শুধু ডাক-বিভাগে ২০ লাখ টাকা লাভ অর্জিত হইয়াছে; কিন্তু টেলিগ্রাফ-বিভাগে ২০ লাখ ও টেলিফোনে ১০ লাখ লোকসান হইবে। পূর্বে পূর্বে যখন ডাক-মাণ্ডল বৃদ্ধি হয় নাই অথচ ডাকবিভাগের লাভ হইত, তখন সেই লাভটা সরকার সাধারণ রাজস্বের অর্ধীভূত করিয়া পরের ধনে পোন্ধরী করিতেন। এখনও ডাক-বিভাগের হিসাবকে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের সঙ্গে জড়াইয়া ডাকবিভাগকেই লোকসানের কাণ্ড বলিয়া প্রকাশ করিয়া ডাকমাণ্ডল কমাইতে চাহিতেছেন না।

ইহা যে অন্তায়, তাহা অন্য প্রকারেও দেখান যায়। সাধারণতঃ যাহারা টেলিগ্রাফ বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোক। প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহৃত বিভাগের লোকসান অতি দরিদ্র হইতে অতি ধনী পর্যন্ত সকলের ব্যবহৃত ডাক বিভাগের ঘাড়ে চাপান অন্তায়। অধিকন্তু ইহাও বক্তব্য যে, টেলিগ্রাফের মাণ্ডল অত্যন্ত বেশী রাখা হইয়াছে। বার আনা নূনতম মাণ্ডল না রাখিয়া উহা কমাইলে টেলিগ্রাফের সংখ্যা বাড়িয়া লাভ হইবার সম্ভাবনা। সরকারী টেলিফোন-বিভাগ এবং রেডিও বা বেতার বার্তা বিভাগ প্রধানতঃ যুদ্ধসম্পর্কীয় লোকেরাই ব্যবহার করে। তাহার লোকসানটা ডাকবিভাগের ঘাড়ে চাপান অসুচিত।

মোটের উপর আমাদের মত এই, যে, আগেকার মত পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সা, চিঠির ন্যূনতম মাপুল দু পয়সা, ব্রি প্যাকেটের মাপুল প্রতি দশ তোলায় দু পয়সা হওয়া উচিত, এবং ধবরের কাগজের মাপুল দশ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সা ও চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত দু পয়সা হওয়া উচিত। টেলিগ্রামের ন্যূনতম মাপুল আট আনা হওয়া উচিত।

বাংলা গবর্নমেন্টের আয় ব্যয়

১৯২৬-২৭ সালে বাংলা গবর্নমেন্টের আয় ১০, ৭৬, ৭৮০০০ (দশ কোটি ছিয়ান্নতর লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কোন্ বিভাগে কত খরচ হইবে, তাহার আলোচনা অবশ্যই করা উচিত। আগে আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া প্রতি বারের বজেটের এইরূপ আলোচনা করিতাম। গত বৎসর অল্প-বয়সের কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এবারেও তাহা করিতেছি।

কোন্ বিভাগ কত টাকা পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার পূর্বে বাংলা গবর্নমেন্টের মোট রাজস্ব ও অশুল্য কোন-কোন প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের মোট রাজস্বের দিকে দৃষ্টিগত করা ভাল। নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালের অনুমিত রাজস্ব

প্রদেশ	অধিবাসীর সংখ্যা	রাজস্ব
বাংলা	৪৬৬৯৫৫৩৬	১০, ৭৬, ৭৮০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৩৭৫৭৮৭	১২৮৯৬৮০০০
মাদ্রাজ	৪২৩১৮৯৮৫	১৬৩৪২০০০০
পঞ্জাব	২০৬৮৫০২৪	১৪৪৯০০০০০
বোম্বাই	১৯৩৪৮২১৯	১৪৫১০০০০০
ব্রহ্মদেশ	১৩২১২১৯২	১০৩৫৩১০০০

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, ধান ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের লোকসংখ্যা বাংলা দেশের চেয়ে কম হইলেও তাহাদের রাজস্ব বেশী। পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা বাংলার অর্ধেকেরও কম হইলেও উহাদের

রাজস্ব বাংলার চেয়ে অনেক বেশী। ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম হইলেও উহারও রাজস্ব বাংলার প্রায় কাছাকাছি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, বাংলা দেশের উন্নতির জন্য যথেষ্ট টাকা ভারতসরকার বাংলার রাজকোষে থাকিতে দেন না; বাংলা অল্প অনেক প্রদেশ অপেক্ষা কম টাকা পায়।

বাংলার জমীর খাজনা জমীদারেরা মোট বাহা দেন, কর্তিত ও কর্ণযোগ্য জমীর পরিমাণ-অনুসারে তাহা কোন-কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম নহে, তাহা আমরা পূর্বে প্রবাসীর এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি। যদি জমীদারেরা চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে কিছু কম খাজনা দিয়া আসিয়া থাকেন, সে বন্দোবস্ত গবর্নমেন্টেরই নিজের সুবিধার জন্য শতাধিক বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। রায়ৱরা সে-সুবিধার অংশভাগী কার্যতঃ হয় নাই, এবং দেশের অধিবাসীর অধিকাংশ তাহারাই। অতএব, জমীদাররা যদি সত্য-সত্যই কম খাজনা দেন, তাহা হইলেও তাহার জন্য বাংলা দেশে সংগৃহীত অল্প রকম প্রচুর রাজস্ব হইতে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কিন্তু কার্যতঃ তাহাই করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

আমাদের নিকট ১৯২০-২১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সব রকম রাজস্বের মোটামুটি তালিকার যে-বহি (Statistical Abstract for British India from 1911-12 to 1920-21) আছে, তাহাতে দেখিতেছি, বাংলা দেশ হইতেই ইনকম্ ট্যাক্স সর্বাপেক্ষা বেশী (১৯২০-২১ সালে ৮৩২, ৭৫২০১ টাকা) আদায় হয়। অথচ ইনকম্ ট্যাক্স হইতে বাংলা গবর্নমেন্টের কার্যতঃ কোন লাভ হয় না, উহার সবটাই বা প্রায় সবটাই ভারত-গবর্নমেন্ট লইয়া থাকেন। পাট বাংলা দেশের একচেটিয়া পণ্য। তাহা হইতে যে কয়েক কোটি টাকা আয় হয়, তাহাও বাংলাদেশ পায় না, ভারত-সরকার লইয়া থাকেন। অথচ পাট উৎপন্ন করিতে গিয়া বাংলা দেশের জল ও বায়ু দূষিত হয়, দেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, এবং তাহাতে বাঙালী মরে। এমন শ্রায়সম্বন্ধ চমৎকার বন্দোবস্ত আর কি হইতে পারে?

বাংলা গবর্নমেন্টের আয় যে অশুল্য কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট হইতে কম, তাহার কারণ হয়ত অনেকে এই

বলিলেন, যে, বাংলা দেশ ট্যাক্স কম দেয়, রাজস্ব আদায়ই এখানে কম হয়, এইজন্য বাংলা সরকারের আয় কম। বাস্তবিক কিন্তু সেটা কারণ নয়। বাংলা দেশ হইতে ট্যাক্স আদায় হয় খুব বেশী, কিন্তু ভারত-গবর্নেন্ট খুব বেশী টাকা বাংলা দেশ হইতে শে্ষণ করিয়া লন বলিয়া বাংলা সরকারের টাকা কম।

যে রূপ বন্দোবস্তের ফলে বাংলা সরকারের আয় কম, তাহার কর্তা রুড মেটন। এবার বাংলার বজেট আলোচনার সময় স্তার আব্দুর রহিম পর্য্যন্ত এই মেটন বন্দোবস্তেব নিন্দা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে আশা পাওয়া গিয়াছে, যে, ইহার পুনর্বিবেচনা হইবে। কিন্তু পুনর্বিবেচনার ফল বাংলার পক্ষে ভাল হইবে কি না, বলা যায় না।

রাজবন্দীদের অনশনব্রত

সম্পাদকদিগকে নানা বিষয়ে কলম চালাইতে হয়। অথচ খুব বিদ্বান সম্পাদকদিগেরও সব বিষয়ের জ্ঞান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তাঁহাদিগকে সব-জান্ধা বলিয়া বিক্রম করা হইয়া থাকে। এই বিক্রম সহ্য করা কঠিন নহে।

কিন্তু সম্পাদকদিগকে অন্ত কোন-কোন বিষয়েও যত্নব্য প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তাঁহাদের অধিকতর সঙ্কোচ বোধ করা স্বাভাবিক। যাহারা স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং দেশহিত সাধন করিতে গিয়া লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন, তাঁহাদের কোন কাঙ্ক্ষের সমালোচনা করিলে লোকের পক্ষে ইহা মনে করাই স্বাভাবিক, যে, একরূপ সমালোচনা সম্পাদকদের অনধিকার-চর্চা ও পুঙ্খভা মাত্র; কারণ, তাঁহারা ত দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন নাই এবং তাঁহাদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই; আরামে সম্পাদকীয় কক্ষে বসিয়া অন্তের ছিত্রাঙ্কণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ।

তথাপি, যে-সব ঘটনায় সর্বসাধারণের চিত্ত আন্দোলিত হয়, তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও নয় বলিয়া, ব্রহ্মদেশে বাঙালী রাজবন্দীদের অনশনব্রত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইতেছে।

খুব গুরুতর কারণেও মানুষের অনশন দ্বারা আশুহত্যা করা উচিত কি না, সে-বিষয়ে সকল মনীষী একমত নহেন। আম্মার্ল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রেমিক ম্যাক্সইনীর যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সস্তর দিনেরও অধিক উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন

করিবার জন্য তিনি যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশী রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও তাহার সমর্থন করেন নাই। কলিকাতার ক্যাথলিক হেরাল্ড খব্ব ইণ্ডিয়া তাঁহার কাণ্ডের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাম্বালয় ও ইন্সেইনু জেলের রাজবন্দীরা কি কি কারণে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ের আলোচনার সময় তাহা সমস্ত জানা যায় নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছিল, যে, সরকার পক্ষ হইতে প্রথমতঃ বাঙালী রাজবন্দীদিগকে দুর্গাপূজা করিবার জন্য ৫০০ টাকা আগাম দেওয়া হয়, পরে তাহা আবার তাঁহাদের সাধারণ মাসিচ ভাতা হইতে কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সংস্কৃতি-পূজা প্রভৃতি করিবার জন্য তাঁহারা টাকা চাহিলে তাহা দেওয়া হয় নাই। ইহাও খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, আলিপুর জেলে খৃষ্টিয়ান কয়েদীদিগকে ষ্ট্রিমাস উৎসব করিবার জন্য ১২০০ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে।

খৃষ্টিয়ান কয়েদীদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যদি টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী কয়েদীদিগকেও তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া উচিত, না-দেওয়া অগ্ৰায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিবেচ্য কেবল ইহাই, যে, সরকার এইজন্য টাকা না দিলে বন্দীদের অনশন অবলম্বন দ্বারা প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটান উচিত বা আবশ্যিক কি না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে, খুব গুরুতর কারণেও অনশন দ্বারা প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটান উচিত কি না, সে-বিষয়ে মনীষীরা একমত নহেন। কিন্তু পরিয়া লওয়া যাউক, যে, গুরুতর কারণ থাকিলে অনশনে প্রাণ-ত্যাগ বৈধ। তাহা হইলে এখন বিবেচ্য, দুর্গাপূজা করিতে সরকার টাকা না দিলে হিন্দুর পক্ষে অনশন করা উচিত কি না।

নামে মাত্র হিন্দু, নামে মাত্র বৌদ্ধ, নামে মাত্র জৈন, নামে মাত্র খৃষ্টিয়ান, নামে মাত্র ব্রাহ্ম, ইত্যাদি অনেকে আছেন। তাঁহারা কি ভাবেন করেন, আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টির বিচার করিব না। যাহারা স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মমত মানেন, দেশাচার ও লোকাচার মানেন, এবং তদনুসরণে নিষ্ঠাবান, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিচার করিব।

বাংলা দেশে নিষ্ঠাবান হিন্দু লক্ষ লক্ষ আছেন, শাক্ত হিন্দু বিস্তর আছেন, যাহাদের পরিবারে দুর্গাপূজা হয় না, হয় ত কখনও হয় নাই। তাঁহাদের অনেকের দুর্গাপূজার সময় পুষ্পাঞ্জলি দিবার স্বেযোগও হয় না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের হিন্দু লোপ পায় না, ধর্ম্মনাশ হয় না। কেহ

একবার বা বহুবার দুর্গাপূজা করিয়া পরে তাহা করিতে না পারিলে তাহাতে তাঁহার হিন্দু বা ধর্ম লুপ্ত হয় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, রাজবন্দী হিন্দু বাঙালী কেহ দুর্গাপূজা করিবার টাকা বা স্বেযোগ না পাইলে তাঁহার হিন্দু লুপ্ত হইত বা ধর্ম নষ্ট হইত। এই কারণে আমরা মনে করি, দুর্গাপূজার টাকা লইয়া সরকারের সহিত মতান্তর ও বাদপ্রতিবাদ অনশনব্রত গ্রহণের যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না। রাজবন্দীদের অল্প কোন গুরুতর অভিযোগ থাকিলে, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

সাধারণভাবে রাজবন্দীদের অনশন অবলম্বন সম্বন্ধে আরও একটি কথা সঙ্কোচ-সন্দেহে বলিতে হইবে। যদি জেলে রাজবন্দীরা, যত্নে যত প্রকার আরাম ও সুবিধা পাইয়া থাকেন, তাহার সমস্তই পাইতেন, তাহা হইলে বন্দী হওয়ার যে-গৌরব, তাহা অনেকটা লুপ্ত হইত। প্রধানতঃ, স্বদেশের জন্য দুঃখভোগ করিতে হয় বলিয়াই, এই বন্দীরা দেশবাসীর বন্দনা পাইয়া থাকেন। যদি জেলে সব বিষয়ে দিব্য আরামে থাকিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সর্বসাধারণের মনের ভাব কিছু পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য, স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ারটাই একটা মহা দুঃখ, তাহা স্বীকার্য। কিন্তু সে-কারণে ত রাজবন্দীদের কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করেন না। তাঁহারা উপবাস করেন, খাদ্য, পরিধেয়, পুস্তক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞান, জেলের কর্মচারীদের শিষ্টতা-অশিষ্টতা, উৎসবাদি করিবার স্বেযোগ, ইত্যাদি বিষয় লইয়া। এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে, উপবাস আরম্ভ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক, যে, কারণটা যথেষ্ট গুরুতর কি না।

শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র বসু খুব বুদ্ধিমান, কস্মিষ্ঠ এবং দেশ-ভক্ত ত্যাগী পুরুষ। তাঁহার প্রাণ তুচ্ছ নয়—কাহারও প্রাণ তুচ্ছ নয়। তিনি যে অনশন ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। তিনি চিরকাল বন্দী থাকিবেন না। তিনি আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসুন, এবং দীর্ঘজীবী হইয়া দেশহিত-ব্রত পালন করিতে থাকুন, ইহাই আমরা চাই।

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার

এগার বৎসর পূর্বে জেল-কমিশনের সম্মুখে নতুন আলিপুর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেফটেন্যান্ট-কর্নেল মালভ্যানী যে-সাক্ষ্য দেন, তাহা, এবং তিনি রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে জেলসমূহের ইন্স্পেক্টর জেনের্যালকে যে-চিঠি লেখেন, তাহা ফরওয়ার্ড কাগজ প্রকাশ করিয়া ও শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী রাজবন্দীদের অনশনসম্বন্ধে

ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় তর্ক-বিতর্কের সময় তাহা পাঠ করিয়া দেশের লোকদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে, যে, রাজবন্দীদের নির্জন কারাবাসে তাঁহাদের উন্নাদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও পুলিশের হুকুম অনুসারে তাহাদের কঠোর নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইত এবং সম্ভবতঃ এখনও হয়, এবং তাহাদের স্বাস্থ্য আদি সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট লিখিতে জেলসুপারিন্টেন্ডেন্ট-দিগকে বাধ্য করা হইত, এবং সম্ভবতঃ এখনও হয়।

জেল-কমিশনের সম্মুখে মালভ্যানী সাহেব এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত কমিশনের রিপোর্টে রাজবন্দীদের উপর কোন অত্যাচারের কথা নাই; তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার যে বেশ ভাল, তাহাই লেখা আছে।

তুলসী গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার পর সরকার পক্ষ হইতে মাডিম্যান সাহেব বলেন, যে, উহা ১৫ বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু পনের বৎসর আগেই বা এমন অত্যাচার ও মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ গবর্নেন্ট কেন দিয়াছিলেন, এবং জেল-কমিশনই বা মিথ্যা রিপোর্ট কেন লিখিলেন? পনের বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, এখনও যে তাহাই হইতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? স্যাবু আলেকজান্ডার মাডিম্যানের বক্তৃতার পরই লাল লাজপৎ রায় বলেন, যে, জেলবাস সম্বন্ধে তাঁহার ১৯১৫ সালের পরবর্তী অভিজ্ঞতা আছে। তদনুসারে তিনি বলিতে পারেন, যে, এখনও বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার হয়।

সরকারী কলঙ্কের কথা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইলেও তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই, ইহা ঘোরতর দুঃখ, অপমান ও লজ্জার কথা। “ভাল ছেলের মত” চিরকাল কৌশলে গিয়া “সহযোগিতা” করিলে, এমন কি কড়া কড়া বক্তৃতা করিলেও ইহার প্রতিকার হইবে না। তাহা অপেক্ষা দুঃসাধ্য সাধনার প্রয়োজন।

কৌশল হইতে স্বরাজ্যদলের নিষ্ক্রমণ

কানপুর কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল, যে, গবর্নেন্ট যদি জাতীয় দাবীতে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে স্বরাজ্যদলের সভ্যরা প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিবেন ও তাহার পর স্বরাজ্য লাভের চূড়ান্ত উপায় অবলম্বনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিবেন।

ইহা লিখিতে আমাদের কোনই সন্দেহ হইতেছে না, যে, আমরা কংগ্রেসের পরেই ভাবিয়াছিলাম ও লিখিয়া-

ছিলাম, যে, গবর্নেন্ট কংগ্রেসের কথায় বিচলিত হইবেন না এবং ক্রমশঃ করিবেন না। ঘটনাছেও তাহাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, ইংরেজ শাসনকর্তারা আমাদের কোন প্রকার মনুষ্যোচিত ভাণ্ড ও ব্যবহার দর্শন ও ধৃষ্টতা মনে করেন। আমরা তাঁহাদের “সহযোগিতা” করিব অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রেত কাজে আজ্ঞানুবর্তী ও সহায় হইব, একটু-আধটু অবাস্তর পরিবর্তন করিব, দুঃখের কাঁচুনী গাহিব, আবেদন-নিবেদন করিব, কখন কখন খুব বড়া বক্তৃতা করিব—এসব তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা “দাবী” করিব, মাথা হেঁট না করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইব—ইহা অসহ্য। সর্বাপেক্ষা অসহ্য, যে, আমরা নিজেদের সাহস, দুঃখভোগশক্তি, সাধনা ও কৃতিত্ব দ্বারা স্বরাজ্য লাভ করিবার স্বপ্ন দেখি, এবং সে-কথা প্রচারও করি। ইংরেজদের মতে, আমরা যাহা কিছু পাইতে চাই, তাহা তাঁহাদের অসুগ্রহের দান বলিয়া লইতে হইবে।

স্বরাজ্যের নিজেদের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঠিক কাজ করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাতে যেন লোক-হাসি না হয়, ইহা ত দেখিতেই হইবে, অধিকন্তু তার চেয়ে বড় যাহা তাগ করিতে হইবে—আত্মসমর্পণ ও সেবা দ্বারা জাতীয় দাবীর পশ্চাতে সমগ্রজাতির শক্তিকে দাঁড় করাইতে হইবে।

বাঙালীর মস্তিষ্কের অবস্থা

বাঙালীদের একটা ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারা সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি। এই ধারণা সত্য কি না বলিতে পারি না, এবং এবিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তাহা হইলেও কিছু দিন আগে স্টেটসম্যান কাগজে কয়েকজন বাঙালী মহারথী এই বিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কথাটা উঠিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, পরীক্ষা প্রভৃতি লইয়া। আমাদের মত এই, যে, আর্থিক ও অন্যান্য কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ করিয়া দেওয়ায়, অনেক বৎসর হইতে ছাত্রেরা আর জ্ঞানার্জনের জন্য আগেকার মত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় না। ক্লাসগুলিতে, বিশেষতঃ কলেজে, ছাত্রের আধিক্যবশতঃ শিক্ষাও যথেষ্ট ভাল হয় না। এইজন্য গড়ে তাহাদের জ্ঞান আগেকার পাস্করা ছেলেদের চেয়ে কম হইবার কথা। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালীর মস্তিষ্কের অবনতিও হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। কারণ মস্তিষ্কের অবনতি-উন্নতির বিচার করিতে হইলে

পরীক্ষা পাস্ করা ছাড়া আরও অনেক তথ্য জানা দরকার।

কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া, তর্কবিতর্ক করা প্রভৃতি কাজে বাঙালীর প্রাধান্য ত নাই-ই, অন্য প্রাদেশিকদের সহিত সমকক্ষতাও নাই। ইহা মোটের উপর সত্য কথা; যদিও, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, বিপিনচন্দ্র পালের মত বাগ্মী ও তর্কানুগ ব্যক্তি এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মত দীর্ঘ ও তথ্যজ্ঞ সত্য তথায় আছেন। ইহার কারণ নানা রকম হইতে পারে। ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব বিষয় আলোচিত হয়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞানবান্ বাঙালীরা উহার সভ্য হন না, এটা একটা কারণ হইতে পারে; এপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট বাঙালীর সংখ্যা কমিয়াছে, ইহাও হইতে পারে; শুধু বিষয়ের আলোচনা ও তদ্বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে বাঙালীর শ্রমশীলতার ও ধৈর্যের অভাবও একটা কারণ হইতে পারে।

ইহা কিন্তু ঠিক, যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মুদ্রাবিষয়ক আলোচনায় বাঙালী বক্তা ও সাংবাদিকরা সাধারণতঃ বেশী উৎসাহ বা পারদর্শিতা আগেও দেখাইতেন না। শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাংকিংএ বহু বৎসর হইতে বাঙালীর স্থান সামান্য হইয়া যাওয়া ইহার একটা কারণ; এসব বিষয়ে তাঁহারা আদার ব্যাপারী বলিয়া জাহাজের খবর বেশী রাখেন না। তা ছাড়া, যে শ্রমবিমুখতা-বশতঃ বাঙালীকে অল্প অনেক কার্যক্ষেত্র হইতে বেদগল হইতে হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই অলস ও আরামপ্রিয় প্রকৃতি বশতঃ পূর্কোপস্থিত বিষয়গুলিতেও বাঙালী অমুরাগী, উৎসাহী ও পারদর্শী হইতে পারে নাই। কিন্তু এবিষয়ে বাঙালীদের যে কোন কৃতিত্বই নাই, তাহা বলিলেও ভুল হইবে ও তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। এসব বিষয়ে কোন-কোন বাঙালী ইংরেজী ও বাংলা ভাষা বহি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তুরস্কের কথা

জনপ্রবাহ আছে যে, অটোমান তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষ ছিলেন কারাখানের পুত্র ওঘুজ্। ইতিহাসে তুর্কীদিগের কথা শুনা যায় সর্বপ্রথম ১২২৭ খৃঃ অব্দে। তার পর কখন কি অবস্থার ভিতর দিয়া তুর্কীগণ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করে, তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদ ও সম্রাট প্রথম মুলেমানের প্রত্যাপে তুর্কীগণ এক সময় ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জুড়িয়া এক

বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কনষ্টান্টাইনকে জয় করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করেন। তাঁহার আমলে যে-কার্যের আরম্ভ হয়, সুলেমান তাহাই আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন। সুলেমানের সময়েই তুরস্ক সর্বাধিক প্রতাপশালী হইয়া উঠে এবং তৎকাল ইতিহাসে সুলেমানের নাম "সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেন্ট" অর্থাৎ বৈভবশালী সুলেমান বলিয়া উল্লিখিত হয়। সুলেমান ১৫২১ হইতে ১৫২৯ মধ্যে বেলেগ্রেড ও বুডাপেস্টে অধিকার এবং ভিয়েনা অবরোধ করেন। তাঁহার প্রতাপে শক্তিশালী ভিনিসীয়গণ হার মানিতে এবং তাঁহাকে দণ্ডরূপে বহু অর্থ দিতে বাধ্য হয়। সুলেমানের সময়ে তুরস্কের সাম্রাজ্য জাৰ্মানীর সীমান্ত হইতে পারস্য উপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। সেই অতীত গৌরবের কথা তুর্কীরা আজিও ভুলে নাই।

সুলেমানের সময় হইতে গত মহামুহুর শের অবধি ভাল মন্দ নানান অবস্থার ভিত্তি দিয়া তুরস্কের অবনতি সম্পূর্ণ হয়। ইহার কারণ জাতীয় গৌরবে অন্ধ হইয়া তুর্কীদিগের অধোগতি এবং ইয়োরোপের শক্তিসমূহের তুরস্ক-বিদ্বেষ। সেই ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন দেখিব মহামুহুর পূর্বে তুরস্কের কি অবস্থা ছিল।

১২১০ খৃঃ অব্দে সাক্ষাৎভাবে তুরস্কের অধীনস্থ প্রদেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৫২,২৬,০০০। এইসব লোক বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৫ জন মাত্র হিসাবে ছড়াইয়া বাস করিত। তুরস্ক প্রাকৃতিক সম্পদের জন্ত প্রসিদ্ধ। এই দেশের উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে গম, তুট্টা, জই, জব, তুলা, তামাক, আফিং, কমলা লেবু, খেজুর, আঙ্গুর, রেশম, তুলা, তিসি, শন, ভেরেণ্ডা, মৌরি, জলপাইয়ের তেল, এছোরা ছাগের পশম, ঘণ্টিমধু, কুঙ্গুম, স্পঞ্জ, সোহাগা, শিরীষ, সোনা, রূপা, তামা, শিষা, লোহা, কয়লা, পারা, দস্তা, মসলিন, কারপেট, মখমল ইত্যাদি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক হিংসা ও অর্থনৈতিক লোভ, এই দুই কারণেই ইয়োরোপের শক্তি-পুঞ্জের তুরস্কের উপর দৃষ্টি পড়ে। তুরস্কের হৃদয় দ্বারা দিনে ঐসকল ইয়োরোপীয়গণ "তুরস্কে দি সিক্ ম্যান" বা "রুগ্ন ব্যক্তি" বলিয়া বিজ্ঞপ করিলেও সেই রোগীর খরচে কিছু লাভবান হইবার আশা তাঁহাদের মধ্যে কেহই ত্যাগ করেন নাই।

১২০৫-১২০৬ খৃঃ অব্দে তুরস্কের অস্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আমদানী ২,৭৫,১৪০,৫২ পাউণ্ড (৪১,২৭,১০,৭০০ টাকা) ও রপ্তানী ১,৭২,৫৫,৪৬৭ পাউণ্ড

(২৫,৮০,৩২,০০৫ টাকা)। এই ব্যবসায় ইংলণ্ডের ভাগ ছিল সর্বাধিক অধিক ও তৎপরে অষ্ট্রিয়া, জাৰ্মানী, ফ্রান্স ও আমেরিকার। যে-সকল আশা করে সাহায্যে এই ব্যবসা চলিত, সেগুলির অতি অল্পসংখ্যাই তুর্কীদের হাতে ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই ইংরেজের।

তুরস্কের রেললাইনগুলির মধ্যে অতি অল্পই তুর্কীদিগের হাতে ছিল। কি ভাবে রেললাইনগুলি নানা দেশের মধ্যে ভাগ করা ছিল ও তাহা হইতে কোন্ দেশ কি পরিমাণে লাভ করিত তাহা নিম্নের সংখ্যাগুলির সাহায্যে বেশ বুঝা যায়।

১৯০৮ খৃঃ তুরস্কের সমুদয় রেললাইনের মধ্যে ছিল।

দেশ	মাইল
তুর্কীর	২৩২
জাৰ্মানের	২৩৮
ইংরেজের	৩২০
অষ্ট্রো-জাৰ্মানের	৮১৫
ফরাসীর	১০৫৪
অপরের	২৬

ঐসকল রেললাইন হইতে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে লাভ করিয়াছিল

দেশ	টাকা
তুর্কী	২২,৫৬,৫২৫
জাৰ্মান	১,২৬,২৬,২১৫
ইংরেজ	৪৩,২৬,৫৬০
অষ্ট্রো-জাৰ্মান	৭৩,৭২,২০০
ফরাসী	১,৬৩,২৪,৩৫৫
অপরে	২,২৫,৫৮৫

অর্থাৎ তুরস্ককে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়া ক্রমশঃ সুলতানকে কোন ভারতীয় "নেটিভ" রাজার মহিমায় মগ্নিত করিয়া ইয়োরোপীয় সুখে উক্ত দেশে বসবাস করিবেন, এইরূপই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। যুদ্ধের পূর্বে তুরস্কে যে সকল ব্যাঙ্ক ছিল, সেগুলির জাতীয়তা আলোচনা করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। তুরস্কের 'রাষ্ট্রীয়' ব্যাঙ্কের নাম ছিল ইম্পেরিয়াল অটোম্যান ব্যাঙ্ক। উহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের সম্পত্তি ছিল এবং সুলতানকে কোন-কোন সুবিধা করিয়া দিবার বিনিময়ে উক্ত ব্যাঙ্ক হইতেই তুরস্কের নোট-মুদ্রণ কার্যও সম্পাদিত হইত। ইহা ব্যতীত যে-কয়টি ব্যাঙ্ক ছিল, তাহার মধ্যে ইংরেজের সম্পত্তি দি গ্রাশভাল ব্যাঙ্ক অব টার্কির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। জাৰ্মান, ফরাসী, অষ্ট্রীয়, রুশীয় ও গ্রীক যে-কয়টি ব্যাঙ্ক তুরস্কে ছিল তাহাদের নাম ছিল, ডয়েটশে ব্যাঙ্ক, ডয়েটশে ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্ক, ক্রেদি লিগিয়নে, ভিয়েনের ব্যাঙ্কেরান, রাখিয়ান

ব্যাঙ্ক, ফর্ কমান্স্ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী, ব্যাঙ্ক অব্ মিটিলানি, ব্যাঙ্ক অব্ শালোনিকা, ও ব্যাঙ্ক অব্ এথেন্স-।

এইরূপে ইয়োরোপীয়গণ ব্যবসাবাণিজ্য ও তুরস্কের জাতীয় ঋণের স্বত্রে তাহার উপর প্রভুত্ব করিত। তুর্কীগণের অবস্থা ঠিক চান কিংবা ভারতবর্ষের মত না হইলেও, সেইরূপ হইবার আশঙ্কা যে ছিল না, তাহা নহে। শুধু সৌভাগ্যের বিষয় ছিল এই, যে, ইয়োরোপীয়দিগের নিজেদের মধ্যে “চোরে চোরে মাস্ ভূত ভাই” ধরণের কোন-প্রকার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল না। তুরস্কের রাজনীতিবিদগণও এই স্বেচ্ছায়ের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অটুট রাখিবার ও বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

যে-সকল স্বাধীনচেতা ও আদর্শবাদী ব্যক্তিদিগের চক্ষে তুরস্ককে নতুন করিয়া উন্নতির পথে দাঁড় করাইবার স্বপ্ন প্রথম জাগিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্যা ছিল দ্বিবিধ;— ১। তুরস্ককে বিদেশীর কবল হইতে রক্ষা করা; ২। তাহাকে সামাজিক সকল প্রকার দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিয়া সভ্যতার বর্তমান আদর্শে গড়িয়া তোলা। তাঁহারা তাঁহাদের এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত যে-আন্দোলন করেন, তাহা ই তহাসে “তরুণ তুর্কী প্রচেষ্টা” নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার মূল সূত্রগুলি পাশ্চাত্য ও বিশেষ করিয়া ফরাসী আদর্শে গঠিত। তুরস্কের আধুনিক অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব বিশেষ প্রবল, এবং নবীন তুর্কী সাহিত্য যেরূপ আহবমান কালের ফার্সী, আরবী আদর্শ ত্যাগ করিয়া ফরাসী আদর্শ ধরিয়াছিল, সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তুরস্ক তেমনি ফরাসীকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। যেখানে ফরাসী আদর্শ তাহার পছন্দ হয় নাই সেখানে সে জার্মান অথবা ইংরেজের অনুসরণ করিয়াছে। অর্থাৎ যে-সময়ে ইয়োরোপের পরস্পরোত্তী শক্তিপুঞ্জ তুর্কীকে জগতের সম্মুখে প্রাচ্যের অবনত চরিত্রের নিদর্শনরূপ বলিয়া সত্য মিথ্যা উভয় প্রকার বর্ণনার সাহায্যে প্রচার করিতেছিলেন, যে-সময় বিশ্বের সকলে ইয়োরোপীয় ছাপাখানার রূপায় তুর্কী বলিতে চরিত্রহীন ও বর্বর-জাতীয় একপ্রকার মনুষ্য ব্যতীত আর কিছু বৃথিত না, সেই সময়ে এক দল লোক এই পতিত জাতিকে পুনরায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ ইয়োরোপীয় আদর্শ হইতে কোন প্রকারে বিভিন্ন ছিল না। তাহারা তুরস্ককে একটি আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতির মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্তই প্রাণপাত করিতেছিল। কোন

অতীত আদর্শ, কোন দার্শনিক অভিনবতা, কিছু দিয়াই তাহারা অনুপ্রাণিত হয় নাই! তাহাদের চক্ষের সম্মুখে শুধু ছিল একটি শক্তিমান, সুসভা ও সমৃদ্ধ তুরস্কের চিত্র।



মুস্তাফা কামাল পাশা

এই নবীন তুর্কী প্রচেষ্টার নেতারা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, অধিক দৈ চৈ, বোমা ছোড়া, অযথা বিদ্রোহ ইত্যাদি করিয়া সময় নষ্ট করিলে তাঁহাদের কাজের ক্ষতি বই লাভ হইবে না। তাই ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যখন তাহারা নিয়াজি বে-র নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সুলতানকে নিয়মতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন, তাহাব পূর্বে লোকে নবীন তুর্কীদিগকে সামর্থ্যহীন আদর্শবাদী ব্যতীত আর কিছু বলিয়া জানিত না। নবীন তুর্কীগণ প্যারিস ও সালোনিকায় বসিয়া তাহাদের প্রচেষ্টার বিরাট প্রচার-কার্য সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে এইরূপে নিজেদের স্ব-রূপ প্রকাশ করেন।

নবীন তুর্কীদিগের আকাঙ্ক্ষা এই ঘটনার পর কতকটা পূর্ণ হইলেও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই। তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা কমাইয়া নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাহাদের সংস্কার-কার্যের আরম্ভ মাত্র। সমাজসংস্কার ও শক্তি-

পুঞ্জের কবল হইতে মুক্ত হওয়া তখনও বাকি ছিল। মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এই বিষয়ে নবীন তুর্কীগণ সফল-কাম হন নাই।

মহাযুদ্ধের পর সকলেই ভাবিয়াছিল, যে, এই বার তুরস্ক বৃষ্টি চিরতরে ডুবিবে। কেননা, যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ তুরস্কের বিশেষ চূর্ণনার বন্দোবস্ত করে। অটোমান সাম্রাজ্যের নিকট হইতে তুরস্কের অধীনস্থ আরব, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া কাড়িয়া লওয়া তুরস্কের রাজস্বের উপর হস্তক্ষেপ, তুরস্কের জলপথের উপর প্রভুত্ব ইত্যাদি নানা প্রকার অবমানকর আয়োজনই শক্তিপুঞ্জ বিজিত শত্রুর গুণ্য করিয়াছিলেন; শুধু একটি ভুল করিয়া তাহারা তুর্কীদিগকে খোচাইয়া জাগাইয়া তুলিলেন। তাহা গ্রীসের হস্তে স্মার্মা ও থেসস সমর্পণ। ইহা আর তুর্কীগণ সহ্য করিতে পারিল না। কি করিয়া সর্বস্ব পণ করিয়া তুর্কীগণ কামাল পাশাকে নেতা করিয়া আবার নিজেদের লুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিল ও পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহা আমাদের সকলেরই বিদিত আছে। আজ অর্ধেকের অধিক সাম্রাজ্য ও জনবল হারাইয়াও তুরস্ক জগৎজাতি-সভা মণ্ডপে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। জাপানের উত্থানের পর এইরূপ ঘটনা আর হয় নাই। নবীন তুর্কী আজ তাহার বহুকষ্টে রক্ষিত স্বাধীনতার উপরে এমন একটি পিছু গড়িয়া তুলিতে বন্ধপরিকর হইয়াছে, যাহা সহজে মরিবে না। কামাল পাশা তুর্কীকে বলিতেছেন, “আমরা যেন অন্ধ হইয়া না থাকি। জগতের অন্তান্ত জাতি আমাদের ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমাদের তাহাদের অনুসরণ করিয়া সকল ব্রহ্ম বিশ্বাস ও অতীতের দাসত্ব-ভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া আগাইয়া চলিতে হইবে”। তাহার মতে যদি উন্নতির দিকে কেহ স্বেচ্ছায় না চলে, তাহা হইলে তাহাকে চাবুক মারিয়া চালান প্রয়োজন। ইহা আধুনিক কিগোরগার্টেন্ শিক্কা প্রণালীর বিরুদ্ধ হইলেও ইহাতে তুরস্কের উন্নতি হইতেছে দেখা যাইতেছে। তুর্কী চিরকালের সুলতান-পূজা ও খলিফা-পূজা ত্যাগ করিয়া আজ সাধারণতঃ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তুরস্কের নারী আজ স্বদূর অতীতের দাসত্বচিহ্ন অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবতী। কামাল পাশা বলিতেছেন, “তুর্কী নারীর কর্তব্য ভবিষ্যৎ জাতি যাহাতে চরিত্রে, বুদ্ধিতে ও শক্তিতে বিশেষরূপে উন্নত হয়, তাহার জন্ত প্রস্তুত হওয়া”। তুর্কীর আজ জগৎজোড়া ইসলামিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন নাই, সুলতান নাই, খলিফা নাই, অবরোধ নাই, বহুবিবাহ নাই, ফেজ নাই। “আমরা জগৎকে আমাদের অপরূপ আচার-ব্যবহার, পোষাক ইত্যাদি দেখাইয়া আমোদ দিবার জন্ত সৃষ্ট হই নাই”।—এই কথা

কামাল পাশা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছেন। তুরস্কের ১,৪০,০০,০০০ লোক তাহার সহিত একপ্রাণ ও একমত। সত্যের উপর তাহাদের সকল আশা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কার্য সত্য চিন্তা ও সত্য অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত—তাহার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা অথবা জনতুষ্টিকর (জনহিতকর নহে) “আদর্শ”বাদের স্থান নাই। এইজন্যই তুরস্কের ফবিষ্যৎ উজ্জল।

তুরস্ক হইতে কি শিখিতে পারি।

এক ধর্মসম্প্রদায়ের লোক অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ বা পরামর্শ দিলে তাহাতে সফল না হইয়া অনেক সময় ফুলই হইয়া থাকে বটে—বিশেষতঃ ভারত-বর্ষে; কিন্তু তথাপি আমরা সবাই এক দেশে থাকি ও সকলের ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত বলিয়া সকলের কথাই ভাবিতে ও বলিতে হয়।

তুরস্কের আধুনিক পুনরুত্থান হইতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। তুরস্কের ধর্ম ইসলাম বলিয়া ভারতীয় মুসলমান-দেরই উহার নিকট হইতে বেশী শিখিবার আছে।

তুরস্ক মুসলমান ধর্মের ও ইসলামিক সভ্যতার উৎপত্তিস্থল নহে। ইসলাম ও ইসলামিক সভ্যতার আকর প্রথমতঃ আরব দেশ ও তৎপরে পারস্য। তুরস্ক অবশ্য পরে আর্থিক শক্তি ও সম্পদে অপর সব মুসলমান দেশকে অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এখন তুরস্ক আরব ও পারস্যের এবং নিজের অতীত কালের গৌরবের স্বপ্নে বিভোর না থাকিয়া, বর্তমান কালে নিজের উন্নতিতে মন দিয়াছে। তাহারা মুসলমান নহে এরূপ মনে করে না, এবং তাহা বলিতেছেও না। কিন্তু তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য যে স্বদেশের প্রতি—বিদেশের মুসলমানদের প্রতি নহে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছে ও তদনুসারে কাজ করিতেছে। তুরস্কে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মেরও লোক আছে। ভারতীয় মুসলমানদেরও ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, তাহাদেরও তুর্কদের মত চিন্তা ও কাজ করা কর্তব্য কি না।

তুর্করা যাহা কিছু করিতেছে অবিচারিত ভাবে তাহারই নকল করিতে হইবে, কোন চিন্তাশীল লোক এরূপ বলিবে না। কিন্তু তাহাদের কাজের মূলে যে-নীতি আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। একটা সোজা কথা ধরুন, তাহাদের পোষাক পরিবর্তন। তাহারা ইউরোপের অন্তান্ত জাতির মত হাঁট পরিতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার ভিতর তাহাদের

উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহারা অল্প ইউরোপীয়দের হইতে স্বতন্ত্র, আমোদজনক কোন পেশিক না রাখিয়া ইহাই দেখাইতে চায়, যে, অপর মানুষের সহিত পার্থক্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বড় জিনিষ।

তুর্করা অলস ফকীর ও দরবেশদিগের আড়াল তুলিয়া দিয়াছে, খলিফার ক্ষমতার উচ্ছেদ করিয়াছে, অবরোধ-প্রথা ও বহুবিবাহের মূল উচ্ছেদ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে একজনের বা কয়েকজনের প্রভুত্বের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। খেদাম-বশতঃ ইহা করে নাই; জীবনসংগ্রামে লক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছে, যে, পূর্বতন প্রথা ও ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ও সনাতনের পক্ষে অনিষ্টকর। তাহারা নারীদিগকে শিক্ষা লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়াছে।

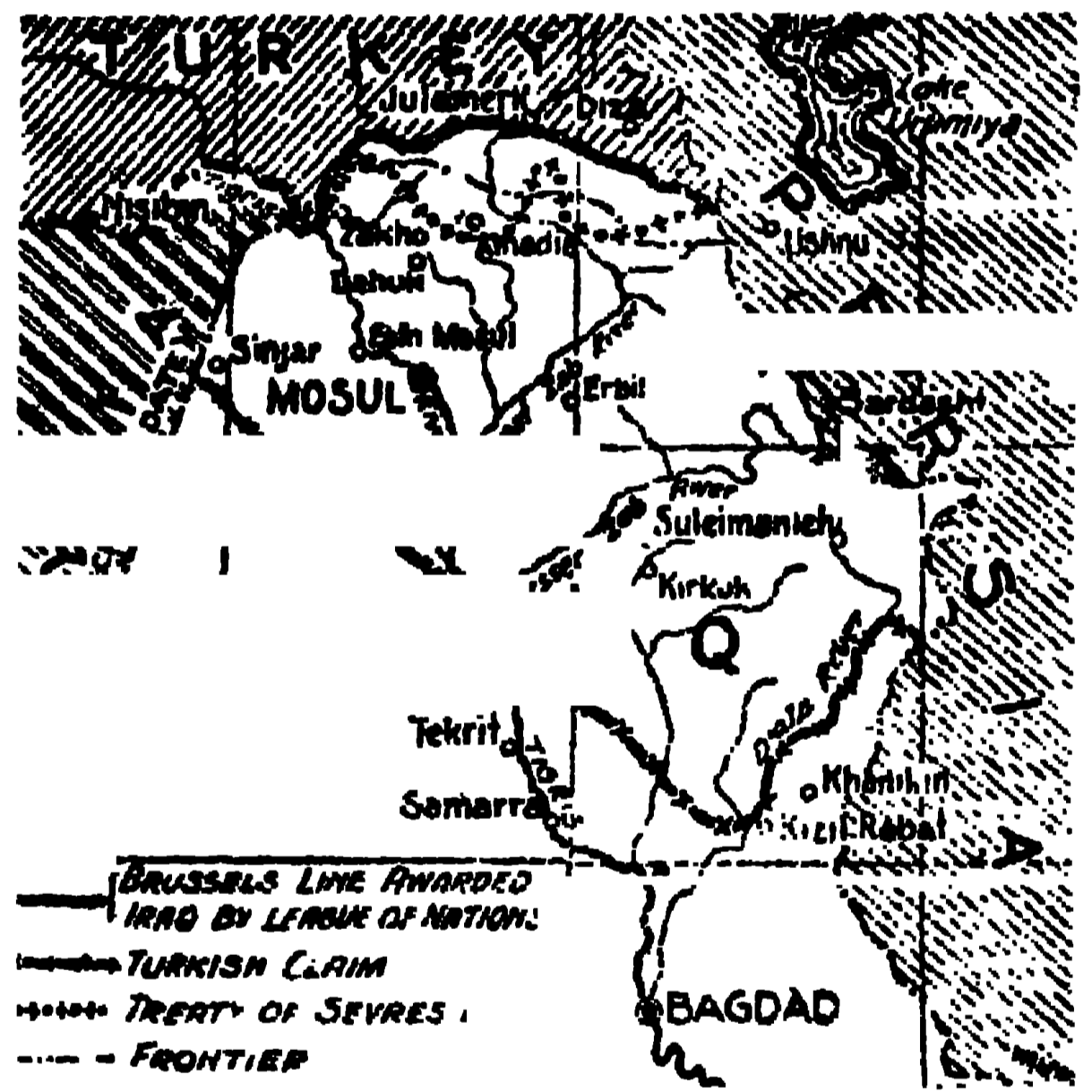
তুর্করা অন্য দেশের ও নিজের দেশের অতীত গৌরবের নেশা নষ্ট করিয়া বর্তমানে সচেতন ভাবে কাজে লাগিয়াছে। তাহারা আরবের ও পারস্যের মোহে মুগ্ধ না থাকিয়া নিজেদের এমন একটি নবীন তুর্কী সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে চায় যাহার সহিত অতীতের সম্বন্ধ থাকিলেও যাহা বর্তমান কালের ও তাহাদের নিজের দেশের বিশেষ উপযোগী। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তাহা করিবেন কি না, ভাবিয়া দেখুন।

তুরস্ক হইতে কেবল ভারতীয় মুসলমানদেরই কিছু শিখিবার আছে এমন নয়; ভারতবর্ষের হিন্দু প্রভৃতিরও শিখিবার আছে। আমরা যে যে-সম্প্রদায়েরই হই না কেন, সকলেই অস্বাভাবিক অতীতের গৌরবে স্ফীত ও অলস ও পথভ্রান্ত। অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, অতীতের শিক্ষা ও আলোক অগ্রাহ্য করিতে হইবে বলিতেছি না; বরং অতীতের খোঁসটি ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে তাহার প্রাণশক্তির আবিষ্কার করিতে হইবে, ইহাই বলিতেছি। কিন্তু শুধু তাহার দ্বারাই বর্তমানে বাঁচিয়া থাকিবার ও অগ্রসর হইবার উপায় হইবে না। বর্তমান জগতে বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধার্মিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবরোধ-প্রথা, বহুবিবাহ, নারীদের অস্বাভাবিকতা, অলস তথাকথিত সাধুগণ, মহাস্ত্রদের ভয়ঙ্কর মঠ ও মন্দিরের সম্পত্তি, প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু-ভারতের অবস্থাও তুরস্কের সহিত তুলনীয়। কিন্তু এসকল বিষয়ে, অতিন্দুর কথা দূরে থাক, কোন হিন্দুও কোন সংস্কার করিতে চাহিলে এক শ্রেণীর হিন্দু ভীষণ কোলাহল উত্থাপন করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও আমাদিগকে সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের মতকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। আমাদের এবং অন্য সব জাতির পূর্বপুরুষদিগকে ভগবান যেমন বুদ্ধিশালী জীব করিয়াছিলেন, বর্তমান

কালের মানুষদিগকেও তিনি তেমনি বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, আমরা কেবল অতীতের অহুসরণ না করিয়া বর্তমানের উপযোগী ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করি, ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। গডলিকা-প্রবাহ রক্ষাই যদি তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে মানুষ না করিয়া মেঘই করিতেন।

মোসল বিপাক

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণের মতে মোসল প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। ইহাকে মত না বলিয়া শুধু আশা বলিলেই ঠিক হইত; কেননা লীগ অফ নেশান্‌সের বিচার ব্রিটিশের সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়াই ব্রিটিশ পণ্ডিত-বৃন্দ এই বিচারকে মোসল সমস্যা সমাধান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তুর্কীগণ এবিষয়ে ব্রিটিশের সহিত একমত নহে এবং এই মতবৈধ যে শুধু বাকো ও লেখাম শেষ হইবে



ইরাক ও তুরস্কের সীমান্ত সমস্যা

সর্বোচ্চ লাইনটি ব্রসেলসে নির্দিষ্ট লাইন। বর্তমানে লীগ অফ নেশান্‌স এই লাইন বরাবর সীমান্ত নির্দেশ করিয়াছেন।

তাহার নীচে বর্তমান সীমান্ত; তাহার নীচের লাইনটি মেসুরের সন্ধিসভার নির্দিষ্ট হয়।

সর্বোপেক্ষা নীচের লাইনটিতে তুর্কীর দাবী দেখান হইয়াছে।

এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। লীগ অফ নেশান্‌সের বিচার-অনুসারে মোসল ইরাকের অন্তর্গত হইবে এবং ইহার অর্থ এই যে, মোসলে ব্রিটিশের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকিবে। ইরাকের সীমান্ত ব্রসেলসে নির্দিষ্ট লাইন বরা-



তুরস্কে যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটিশের বিপদ

তুরস্কে যুদ্ধ করিতে হইলে ব্রিটিশদিগকে সৈন্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ পৃষ্ঠে করিয়া ৭৫০০ মাইল বাইতে হইবে। তুরস্ক প্রায় ঘরে বসিয়া যুদ্ধ করিবে। ব্রিটিশ সেনানায়কগণের মতে মোসলে গোলমাল বাধান এইসকল কারণ প্রচণ্ড নির্ভীকতার পরিচায়ক।

বর হইবে। সঙ্কের মানচিত্রে এই লাইন মোটা করিয়া সর্বোচ্চে দেখান হইয়াছে। তুরস্কদিগের মতে তাহাদের স্বেচ্ছা অধিকার সর্বাপেক্ষা নীচের লাইন অবধি। ইহাতে তাহারা মোসল ও তৎপ্রদেশস্থ কেরোসিন তৈলের খনির অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যত সহজে প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া ব্রিটিশ ছাপাখানা হইতে প্রচার হইতেছে, ঠিক ততটা সহজে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে।

লীগ অফ নেশ্যন্সের বে-সভায় এই তুরস্কদিগের পক্ষে কতিকর মীমাংসা করা হয়, সে সভায় তুরস্ক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে নারাজ হন। ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, তুরস্কগণ এই বিচার মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহে। তাহারা নিজেদের দাবী বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিবে কি না সে-কথা বিভিন্ন, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

ব্রিটিশের এখন বড় দুর্দিন চলিতেছে। রুশিয়া, চীন, তুরস্ক, মিশর, ভারতবর্ষ, সর্বত্র তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা যে তাহারা জানে না, তাহা নহে। শ্রীযুক্ত এইচ, এম্, ব্রেন্সফোর্ড একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক। তিনি দি নিউ লীডার পত্রিকায় লিখিতেছেন :—

“আমরা এই প্রাচ্য সমস্যা যতই দেখিতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি, যে, ইহার মধ্যে কি নিদারুণ পরিণতির আশঙ্কা রহিয়াছে। রুশিয়া, তুরস্ক, চীন, আমাদের কি ইহাদের সকলকেই শত্রু করিয়া তুলিতে সাহস করা উচিত? একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, কাল যদি রুশিয়ার বন্ধু জেনারেল ফেঙ্ক যুদ্ধে জয়ী হইয়া চীনের প্রভু হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে কি হইবে। তাহার সহিত যদি কোন নূতন ভাবের বন্ধন পড়িয়া ভারতে

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। একদিকে তুরস্ক ও অপর দিকে রুশিয়াকে শত্রুরূপে লইয়া তখন আমাদের সামরিক সমস্যা বা দাঁড়াইবে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? একটা অবস্থায় মোসলের তেলের কুপের দিকে নজর দেওয়া ও ঘরে আগুন দেওয়া এক কথা।”

ইহার উপর শ্রীযুক্ত ব্রেন্সফোর্ডের মতে ইরাক ও মোসলের আরবগণ ব্রিটিশদিগকে কিছুমাত্র প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাহারা ব্রিটিশদিগকে অতি শীঘ্র তাহাদের দেশ হইতে বাহির হইতে দেখিলে বিশেষ খুসী হয়— যদিও ব্রিটিশগণ তাহাদের আবহমান কালের অভ্যাস অনুসারে পৃথিবীতে প্রচার করিতেছে, যে, এইসকল দেশের লোকদের হিতের জন্যই তাহারা ইরাকে বসিয়া আছে। ব্রিটিশ জাতির পরার্থপরতার কথা আমাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কেহ জানে না। সুতরাং ব্রিটিশের মোসলে আধিপত্য করিবার ইচ্ছার মূলে জন-হিত-চেষ্টাই আছে অথবা অন্য কিছু আছে, তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের অধিক সময় লাগা উচিত নহে।

অ

রাজবন্দীদের মুক্তির আশা

ইংরেজরাই একটি প্রবাদের প্রচলন করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে, প্রাণী-বিশেষকে ফাঁসি দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমে তাহার বদনাম রটাইতে হয়। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে ইংরেজ পবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে বুঝা যায় যে, এই প্রবাদটি ব্রিটিশ রাজনীতির অন্তর্গত। আজ অবধি যতবার পবর্ণমেণ্ট সাধারণের উপর কোন-প্রকার যথেষ্টাচারিতা করিয়াছেন, ততবারই আমরা শুনিয়াছি, যে, ঐরূপ না করিলে দেশের সমূহ বিপদের, শাস্তিভঙ্গের

কিষ্ণা বিস্তোহের সম্ভাবনা। শাস্তিভঙ্গ, বিস্তোহ অথবা অন্য কোন-প্রকার অসামাজিক অপরাধের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে অবশ্যই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বিপদজনক অবস্থার প্রতিবিধান করা; কিন্তু “বিচার” বলিয়া যে-একটা সামাজিক ব্যবস্থা আজ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মনুষ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য এইরূপ অপরাধজনক অবস্থা (অথবা সত্য-সত্যই কোন অপরাধ) যথার্থই ঘটিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা। বিচারের অপর কোন শোভাবর্জনকারী উদ্দেশ্য নাই।

কিছুকাল পূর্বে যখন গবর্ণমেন্ট অনেকগুলি নির্দোষ প্রজাকে বিনাবচাবে জেলে বন্ধ করেন, তখনও তাঁহাদের পুরাতন বুলিই তাঁহারা পুনর্বার আওড়াইলেন। আমরা শুনিলাম, যে, উক্ত প্রজাদিগকে স্বাধীনতা-বিচ্যুত না করিলে অবিলম্বে দেশে অরাজকতা আরম্ভ হইবে এবং কোন অলৌকিক কারণে সেইসকল নির্দোষ প্রজাদিগের বিচার সম্ভব নহে। সুতরাং বাংলার অনেকগুলি যুবক, যাহাদের মধ্যে অনেক বাংলার প্যাডনামা সুসন্তানও ছিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা হারাইলেন। আমরা তাঁহাদের নির্দোষ বলিতেছি ও বলিবও, কেননা তাঁহারা কোন বিচারের ফলে দোষী স্থির হন নাই। এমন কোন কারণ থাকিতে পারে, যাহার জন্য গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের বিচার করিতে পারেন নাই। হয়ত সে-কারণ প্রমাণের অভাব। অবশ্য তাহা হইলে তাঁহাদের জেলে বন্ধ করা গবর্ণমেন্টের বিশেষরূপে অন্তায় হইয়াছে। হয়ত বা সে-কারণ, গবর্ণমেন্ট কোন-কোন লোককে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হইয়া থাকিবার ভয়। অবশ্য তাহা হইলেও গবর্ণমেন্টের এইসকল যুবককে শাস্তি দেওয়া অন্তায় হইয়াছে। কেননা, গুপ্তচরগণ সচরাচর অতিশয় নীচ-প্রকৃতির লোক হয় এবং তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া ও অরাজকতার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। বিচার না-করা অথবা গুপ্তচর-তন্ত্র অতুসারে রাজ্য-শাসন, ইহার কোনটিই যে আদর্শ রাজনীতি নহে, এ-কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু “জ্ঞান ও সুবিচারের” একাধারে মাতাপিতা ব্রিটিশরাজের আমলে ভারতবর্ষে আজ বিনা-বিচারে লোকে বৎসরের পর বৎসর জেলে বন্ধ থাকিতেছে। তাহাও আবার নিজের মাতৃভূমির এলাকার মধ্যে নহে, কোন-কোন বাঙ্গালীকে সুদূর মান্দালয়ে তন্ত্রস্থ জেলারের কোমলতার আশ্রয়েও রাখা করিতে হইতেছে।

রাজবন্দীদের সম্বন্ধে গত ৮ই মার্চ তারিখে পার্লামেন্টে কথা ওঠে। শ্রমজীবী-সংঘের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পার্টল, শ্রীযুক্ত আল্‌ উইন্টারটনকে কিছুকাল পূর্বে অতুসারে বন্ধ করেন যে, সকল রাজবন্দী বেঙ্গল-

অর্ডিনাল্‌ অতুসারে ছয় মাসের অধিককাল বন্দী তাঁহাদের অবিলম্বে যেন প্রকাশ্য বিচার করা হয়। আল্‌ উইন্টারটন উত্তরে বলেন, যে, ১১০ জন উপর এই “আইন” খাটান হইয়াছে, তাহা অর্ধেকের কম জেলে বন্দী আছেন। গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, যখনই জনসাধারণের মঙ্গলের দিক দেখিয়া এইসকল বন্দীদিগকে মুক্তি তাঁহারা সম্ভব মনে করিবেন, তখনই ইহারা মুক্তি করিবেন এবং বর্তমানে যে কয়জনকে জেলে না রাখিয়া শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, শুধু তাঁহাদেরই জেলে রাখা হইবে। গবর্ণমেন্ট যে-নীতির অতুসরণ করিয়াছেন, তাহা এই যে, যখনই প্রকাশ্য বিচার সম্ভব, তখনই বিচার করা হইবে।

গবর্ণমেন্টের এই উক্তির মধ্যে আমরা সেই স্বর আবার শুনিতেছি। কেহ শাস্তিভঙ্গের কথা করিতেছে কি না, তাহাই বিচার করিয়া স্থির করা হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সুবিচারবিবর্জিত কোন অতুসার উপায়ে লোক-বিশেষের অপরাধ নির্ণয় করিয়া শাস্তি দিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেবতার কাঙ্গারি বিচার, আটলিন ও প্রমাণের সাহায্যে বিচার নানা-প্রকার বিচারের কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু “জাস্টিস্” ইহার মধ্যে কোন্টি? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এক দেবতা বলিয়া মানিয়া লইলেই লোকে তাঁর বিচারে তুষ্ট থাকিবে।

রাজকর্মচারীদের নৈতিক সুবৃত্তি

পঞ্জাবের গভর্ণর্ সাব্‌ ম্যালকম্ হেলি ৮ই মার্চ তারিখে লায়ালপুরে একটি দরবার করেন। তিনি যে-বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে রাজকর্মচারীদের নৈতিক অবনতির (অর্থাৎ অত্যাচার, উৎকোচ ইত্যাদি কথার) উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কর্তব্য, যখনই কোন প্রকার অকর্মের কথা তাঁহারা জানিতে পারেন সেই-বিষয়ে উত্তমরূপে অতুসন্ধান করা।

তিনি বলেন, গবর্ণমেন্টের ‘প্রেষ্টীজ্’ বা সুনাম নি রাজকর্মচারীদের চরিত্রের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। এই কারণে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উচিত, কোন কারণে দুর্নীতির প্রশংসা না-দেওয়া ও সর্ব-সর্ব-উপায়ে ইহা দমন করা। তবে, জনসাধারণ একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, তাঁহারা যদি সর্ব-রাজকর্মচারীদের গোচরে নিম্নপদস্থদিগের দুর্ভুক্তির কথা আনয়ন করেন এবং নিজেদের অভিযোগ সমর্থন

সম্ভব হইবে না। দনী ও সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদিগের
এবিষয়ে গরীব ও দীনের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য
এমন-কি ইহাতে নিম্নদের অস্ববিধা হইলেও
হইয়া লড়া।

ম কথা। এখমতঃ, সার্ব ম্যাল্কমের মত
। মুখ দিয়া রাজকর্মচারীদের ভ্রষ্টতা স্বীকৃত হওয়াতে
আনন্দিত হইলাম। অপরে একথা বলিলে
শ্রম সিডিসনের সাক্ষিত হইত। সে যাহা হউক,
একথা স্থির হইল, যে, অস্বতঃ নিম্নস্তরের রাজ-
গণ “শ্রম ও স্ববিচার” মনে রাখিয়া সর্বত্র
করেন না। ইহাও স্থির যে, উচ্চ রাজকর্মচারিগণ
তা নিবারণের জন্য যতটা করা কর্তব্য ততটা
না। তাঁহাদের মধ্যেও ভ্রষ্টচরিত্রের লোক আছে
সার্ব ম্যাল্কম বলেন নাই এবং থাকিলে সেই-
উচ্চ রাজকর্মচারীদের কে দমন করিবে, তাহাও
নাই। খেতাব সিবিলাসানের ঘুষ লইয়া দণ্ডিত
দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বর্তমানে উচ্চ রাজকর্মচারী-
বা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক নিম্নপদস্থদিগের
শোধন সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলে উন্নতির
কতদূর আছে।

ম্যাল্কমের কথা হইতে ইহাই মনে হয় যে,
রাজকর্মচারিগণ যতটা চেষ্টা করিয়া ও খাটিয়া
দমন করা প্রয়োজন ততটা চেষ্টা করেন না।
করার মধ্যে তাঁহাদের কোন স্বার্থ আছে কি না
কোন অসুস্থান হইয়াছে কি? কোন-কোন
ট, মেসেজ, মার্গেট, বড় লাটের এ-বিষয়ে বদনাম
মতঃ, নিম্নস্তরের কর্মচারীদের উপর গবর্ণমেন্টের
ভর করিলেও তাহাদের চরিত্রবল অটুট রাখিবার
গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য করেন কি? চরিত্রভ্রষ্ট হইবার
ধান কারণ অর্থলোভ। অর্থলোভ দূর করিবার
পায় উপযুক্ত বেতন-দান। গবর্ণমেন্ট কি সর্ব-
নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের চরিত্র ভাল রাখিবার
করিবার জন্য বেতন-বর্দ্ধনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন
কছেন? উচ্চপদস্থদিগের বেতনের কথাই দেখা
গবর্ণমেন্টের মনে অধিক জাগে। নিম্নপদস্থ-
দের বেতন-ভাগটুকু দিয়া উপর-ওয়ালাদিগকে মোটা
পুট করা স্বমবিভাগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে।
কর্মচারিগণ দেশীর ভাগ ভারতবর্ষীয়।
নামে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিলে গবর্ণমেন্টের
র স্বনাম বাড়িতে পারে, কিন্তু দেশের উন্নতি
হইবে না।

ভ্রষ্টাচার, জনসাধারণের কষ্টব্য কি তাহা বলা সহজ,
কিন্তু জনসাধারণ যদি গবর্ণমেন্টের ব্যবহারে দেখে যে, ছুট
কর্মচারীকে যেমন করিয়া হউক রাজকোষের প্রচুর অর্থ
ব্যয় করিয়াও নির্দোষ প্রমাণ করিতেই গবর্ণমেন্টের
অথবা গবর্ণমেন্টের উচ্চ কর্মচারীদিগের উৎসাহ অধিক,
তাহা হইলে কোন্ আশায় ও কাহার ভরসায় লোকে ছুটের
দমন করিবার চেষ্টা করিবে? বরদাস্থম্বরীর মোকদ্দমায়
যে-ছজন পুলিশ-কর্মচারীর কাজ গিয়াছে, বে-সরকারী
লোক হইলে তাহাদের পাঁচ-সাত বৎসর জেল হইত।
সকল দিক দেখিয়া দেশের ছোট-বড় সকলেই ব্রিটিশ
রাজের কর্মচারীদিগের অকস্মাৎ ধার্মিক হইয়া উঠা সম্বন্ধ
নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি লোকের প্রাণে
পুনরায় উন্নতির আশা জাগাইয়া তুলিতে চান, তাহা হইলে
তাঁহাদের কর্তব্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া ভিতর হইতে
দুর্নীতির দমন করা। ইহাতে হয়ত অনেক ভিতরের কথা
জানা জানি হইয়া পড়িবে, হয়ত খেতাবদিগের নিষ্কলঙ্কতা
জগতে উচ্চকণ্ঠে ও বড় হরফে জাহির করা ইহাতে একটু
কমাইতে হইবে; কিন্তু মাগঃ পদ্ম বিদ্যাতে অমনাধ।

শিক্ষার বাহন

বাংলা দেশে শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়া উচিত,
এটা এত সোজা কথা যে, এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার
একমাত্র কারণ আমাদের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক
অবস্থা। ভারতের মত জাপানেরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক
ও অন্তর্বিধ জ্ঞান লাভের জন্য ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য
ভাষা জানা দরকার। তথাপি জাপানে শিক্ষার বাহন
জাপানী, এবং তৎসঙ্গেও সেখানকার লোকেরা ভারতবর্ষের
চেয়ে অধিক শিক্ষিত এবং নূতন আবিষ্কারে ও যন্ত্র-
উদ্ভাবনে সক্ষম।

আমাদের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার জন্য
আমাদিগকে ইংরেজী লেখা ও বলায় অত্যন্ত বেশী সময়
ও মন দিতে হয়। মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিলে
তাহা যেমন মজাগত এবং হৃদয়মনের একান্ত অঙ্গীভূত
হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা তেমন হয় না। তন্নিম্ন
মাতৃভাষার সাহায্যে যে-বয়সে যতটা জ্ঞান লাভ করা যায়,
বিদেশী ভাষার সাহায্যে সে-বয়সে ততটা জ্ঞান লাভ করা
যায় না। আমাদের মনে পড়ে, আমরা ও আমাদের
সহপাঠীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য ১০।১১ বৎসর
বয়সে বাংলা স্কুলে ইতিহাস ভূগোল পাটীগণিত প্রভৃতি
যতটা শিখিয়াছিলাম, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা ১৬।১৭ বৎসর
বয়সে ইংরেজীতে তাহা অপেক্ষা বেশী শিখে না।
অধিকন্তু আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, বায়ু-

রক্ষা, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা শিখিয়াছিলাম, প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীরা তাহা শিখে না। অথচ বাংলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ে বেশী বিদ্বান বা যোগা নহেন। সুতরাং বাংলা ইন্সকুলে কোন-কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেদের ইংরেজী স্কুলের তার চেয়ে বড় ছেলেদের সমান শিখিবার এবং অধিকতর ইংরেজী স্কুলে অনধীত কোন-কোন বিষয় শিখিবার একমাত্র কারণ বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা।

বাংলাভাষায় ভাল পাঠ্যপুস্তকের অভাব একটা বাধা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান গণিতাদির বহি যদি বাংলা বিদ্যালয়ের জন্ত লিখিত হইত পানিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনকার অধিকতর অগ্রসর বাংলা ভাষায় কেন তাহা হইতে পারিবে না? এমন সময় ছিল যখন ইংলেণ্ডেও লাটিন গ্রীকের প্রভু ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজীতে সব বস্তু ভাল বহি লিপিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে খুব প্রতিযোগিতা থাকায় এবং বিলাতের খুব যোগা লোকও ছেলেদের কোন-কোন পাঠ্য পুস্তক লেখায় অনেক ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক বেশ ভাল। কিন্তু সবগুলি আমাদের দেশের বালকবালিকাদের উপযোগী নহে। প্রবেশিকার জন্ত অধীতব্য সকল বিষয়ে বাংলা পুস্তক যথাসম্ভব ভাল করিতে হইলে অবাধ প্রতিযোগিতার দরকার। এইজন্ত যদিও বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করাইলে তাহা হইতে উহার খুব আয় হইবে, তথাপি আমরা সেরূপ বন্দোবস্তের সমর্থন করি না। উপযুক্ত অনেক লোক পাঠ্য পুস্তক লিখুন। তাহার পর পক্ষপাতশূন্য নির্বাচক কমিটির দ্বারা শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচিত হউক। প্রবেশিকার পর ছাত্রদিগকে কলেজে ভর্তি হইয়া ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইবে। এইজন্ত ভূগোল গণিত প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব বাংলা পাঠ্য পুস্তক লিপিত হইবে, তাহার পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া দরকার হইবে।

উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ত, ভারতবর্ষের বাহিরের জগতের সহিত এবং বহির বাহিরে ভারতবর্ষের সহিত যোগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বদা জ্ঞান-রাজ্যে জগতের অগ্রগতির সহিত অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, সরকারী চাকরী পাইবার জন্ত, ব্যবস্থাপক সভার কাজ চালাইবার জন্ত, ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিবার জন্ত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বাঙালী ছাত্রদিগকে ইংরেজী ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। বর্তমান

সময়ে ইংরেজী ইন্সকুলে তাহার ইংরেজী : ছাড়া অন্যত্র বিধি শিখিবার নিমিত্তও পড়ে বলিয়া, পরোক্ষভাবে তাহার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। ইংরেজী এখন আর-সব বিষয় বাংলায় শিখিলে ইংরেজী এই পরোক্ষ সাহায্যটি ছাত্রেরা আশ্রয় পাইবে তাহাদিগকে ইংরেজী শিখাইবার নিমিত্ত সর্বোৎসাহে অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা বাংলায় ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে শিখিবে। অর্থাৎ ইউরোপের অনেক অ-ইংরেজ অধিবাসী ইংরেজী মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় এবং ইংরেজী অবাধের ভাষা স্বরূপ শিখে, অথচ তাহা লিখিবার ও বলিবার ক্ষমতা চলনসই। নরুণের একটি ছেলে আসিয়াছিল। ১৮।১২। সে ঐ বয়সের বাঙালীর ছেলেদের মন্দ জ্ঞানিত না। অথচ নরুণেতে শিক্ষার বন্দোবস্ত নহে, উহা অন্ততম শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র; তথাকার শিক্ষাপ্রণালী ভাল। এইজন্ত এই ভরসা আছে, যে, শিক্ষাপ্রণালী ও হইলে আমাদের ছেলেরাও, মাতৃভাষা শিক্ষার সহিত, ইংরেজী ভাল শিখিতে পারিবে।

বাংলার যাহা স্ববিধা, ইংরেজীর চর্চা। অন্ত প্রাদেশিকদিগের তুলনায় অস্ববিধায় পরিঃ বাংলার খাস অধিবাসীদের ভাষা কেবল বাং বাঙালীদের প্রায় সব কথাবার্তা ও কা ভাষার সাহায্যেই চলে। কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটিতে চারি প প্রধান ভাষা প্রচলিত। মাদ্রাজে তামিল, তে মলয়ালম, প্রভৃতি প্রচলিত। বোম্বাইয়ে মরাঠী কন্নড় ও সিন্ধী প্রচলিত। এইসব ভাষা যাহা ভাষা তাহাদের মধ্যে কথাবার্তা ও পত্রব্যবহা হইলে অনেকে সাধ্যপক্ষে ইংরেজীর আশ্রয় লয়। আশ্রয়-অধোধ্য প্রদেশে এবং পঞ্জাবেও শিক্ষা বাঙালীর চেয়ে অধিক পরিমাণে ইংরেজীতে বেশী অভ্যস্ত। আমি যখন ত্রিশ বৎসর পূর্বে একটি কলেজে কাজ করিতে গিয়াছিলাম, তখন যে, আমি যদিও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তথাপি অনেক ছাত্র এবং হিন্দুস্থানী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ইংরেজী বলেন।

এইসকল অবস্থা ও কারণ বিবেচনা করিয়া দিগকে ইংরেজীর চর্চা বেশী করিয়া করিতে হইবে। অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, যে, কলেজ হইতে, জ্ঞানলাভের জন্ত ভাল ইংরেজী বহি এ

দেশের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের বেশী আছে।
দেশীদের বিদেশী ভাষায় লিখিত-লিখিত ভাল বহি ও ভাল
তৈরমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পড়িবার
সমস্যা বাড়িলে তাহারা ইংরেজীর জ্ঞানে এখনকার
আরও পিছাটুয়া পড়িবে। তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয়
নহে।

দৈনিক সার আবেছর রহিম বন্দীর ব্যবস্থাপক সভায়
আছেন, যে, তাঁহার সমাজ অর্থাৎ বঙ্গের মুসলমান
বাংলাকে বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষার বাহন করিবার
ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না। তিনি বাঙালী মুসলমানদের
হইতে যে-কথা বলিবার দাবী করিয়া বলিয়াছেন, তাহা
হইলে সাহিত্যিক ছুঃখের বিষয় হইত। কিন্তু বাস্তবিক
যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই অবিবেচনা-
ফল; তাহা বাঙালী মুসলমান সমাজের কথা নহে। এ-
কালের বাঙালী মুসলমানদের প্রধান মুখপত্র ইংরেজী “মুসল-
মান” নামক কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিক কথা।

বঙ্গের মুসলমানদের মাতৃভাষা; কলিকাতায়
সেই ২১টি শহরের অল্পসংখ্যক মুসলমানগণ ছাড়া
যাই বাংলায় কথা বলে, ভাবে, স্বপ্ন দেখে। বন্দীর
সাহিত্যিক সমিতি প্রভৃতি মুসলমান
সমিতি বাংলাকেই নিজের মাতৃভাষা
মানেন, মানেন। তাঁহারা বাংলাকে শিক্ষার
মাধ্যমে দেখিতে চান। ইত্যাকার যে-সব কথা
“মান” কাগজে লেখা হইয়াছে তাহা খাটি সত্য।

আগামে যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাহাদের জন্ম
স্বদেশ স্বদেশ স্বদেশ হউক; বঙ্গে যাহারা উর্দু বলেন,
তাদের জন্ম স্বদেশ স্বদেশ স্বদেশ হউক; কিন্তু
দেশের জন্ম বঙ্গের শাস্তি কিম্বা উর্দু ভাষীর জন্ম বঙ্গে
স্বদেশীয় শাস্তি হওয়া সঙ্গত নহে। গ্রেট ব্রিটেনে,
ফ্রান্সে ও গেলিকে এবং আইরিশ ভাষায় অনেকে কথা
বলে। তা ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা রঙের
জাতির নানা ভাষাভাষী লোক শিক্ষার জন্ম বিলাত
হইতে। কিন্তু তাহাদের খাতিরে গ্রেট ব্রিটেনে ইংরেজীকে
শিক্ষার বাহনের পদ হইতে চ্যুত করা হয় নাই। আমে-
রিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ইউরোপের সকল জাতির লোক
বসবাস করিয়াছে ও করিতেছে; কিন্তু তাহাদের
খাতিরে তথায় শিক্ষার বাহন হইতে ইংরেজী পদচ্যুত
হইত।

প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষের রপ্তানী

জমীতে যে-কসল জন্মে তাহা পুনঃ পুনঃ জন্মে। অরণ্যে
জন্মানে যে-সব গাছ, ফলফুল জন্মে, তাহাও পুনঃ পুনঃ

বস্তু। বনে যে-রপ্তানী করিলে ক্ষতি চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু
খনিতে যে-সব ধাতু রত্ন তৈল আদি পাওয়া যায়, তাহা
উত্তোলন করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ
বিদেশীদের হস্তগত হইলে তাহা হইতে লভ্য ধনের যে-
প্রধান অংশ তাহারা পায়, তাহা দেশের পক্ষে চিরস্থায়ী
লোকসান। কারণ খনি একবার নিঃশেষ হইলে তাহাতে
আবার খাতুরত্বাদি নূতন করিয়া গজায় না।

যাহা হউক, এক্ষেত্রেও এই সাধুনা ক্ষতিগ্রস্ত দেশ
ও জাতিকে দেওয়া চলে, যে, তাহাদের দেশের খাতু
বিদেশী কর্তৃক লুপ্ত হইয়া গেলেও তাহারা ভবিষ্যতে
ধনের বিনিময়ে তাহা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে।
কিন্তু আর-একরকম মূল্যবান জিনিষের রপ্তানী আছে,
যাহা একবার গেলে আবার অন্তর হইতে সংগৃহীত হইবার
নহে। সেগুলি হইতেছে প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান পদার্থ।

ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়িয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন
সভ্যতার ও ইতিহাসের নিদর্শন মুদ্রা, লিপি, প্রভৃতি
অনেক জিনিষ এদেশ হইতে বিদেশীরা লইয়া গিয়াছে।
আরও অন্ত্য এই, যে, ভারতবর্ষেরই করদাতা জনসাধা-
রণের অর্থে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে
তাহা হইতে লক্ষ অনেক জিনিষ বিলাতে ব্রিটিশ মিউ-
জিয়মে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অর্থে ভারতের
বাহির হইতে সংগৃহীত এইরূপ জিনিষ বিলাতে পাঠান
হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে বালী খুঁড়িয়া ষ্টেইন্-
সাহেব ভারতীয় ঔপনিবেশিক সভ্যতার যে-সকল নিদর্শন
আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে খুব মূল্যবান জিনিষগুলি
ব্রিটিশ মিউজিয়মে চালান করা হইয়াছে। অথচ তাঁহার
কাছের ব্যয় ভারতবর্ষ দিয়াছিল।

এখন খবরের কাগজে ছুঁরকম প্রস্তাবের কথা দেখা
যাইতেছে। একটা এই, যে, সিন্ধু দেশে মোহেন-জো-
দড়ো নামক স্থানে বহু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ
স্বরূপ যে-সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, (সচিৎ্র যাহার
বৃত্তান্ত আমরা প্রবাসীতে ছাপিয়াছি,) তাহার মধ্যে যে-
সব জিনিষ একাধিক পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি
করিয়া ভারতবর্ষে থাকিবে, বাকী লগুনে ব্রিটিশ মিউ-
জিয়মে প্রেরিত হইবে। এই ব্যবস্থা অন্ত্য। পুনর
ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পবেষণা-প্রতিষ্ঠান) ইহার
প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতীয় অন্ত্য সমুদয় বিদ্বান-
গণেরই ইহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের
ভূগর্ভনিহিত এই জিনিষগুলি ভারতবর্ষেরই; স্বতরাং
সংখ্যায় তাহারা যত বেশীই হউক, প্রথমতঃ সেগুলি
ভারতেরই নানা প্রদেশের মিউজিয়াম-সকলে রাখিয়া দেওয়া
উচিত। তাহার পরও যদি কিছু উদ্ভূত থাকে, তবে

হইতে বিবেচনা করা
নিষ্পত্তি ভারতবর্ষের
করাং সে দিক দিয়াও
।
বন্ধ নিজেদের টাকায়
ধামেনের কবর পনন
আমাদের বাহির করেন; কিন্তু
ত
কিন্তু মিশ্র হইতে

আর-একটি প্রস্তাবের কথা যাহা আমরা কাগজে
পড়িয়াছি, তাহা এই যে, যেহেতু ভারতবর্ষের মাটির
নীচে এখনও অতীতকালীক এক জিনিষ আছে, যে, পঞ্চাশ
বৎসর ধরিয়া খুঁড়িয়া তাহা সমস্ত বাহির করা যাইবে
না, সেইজন্য বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকগিকে এই কামো সাহায্য
করিবার জন্য ডাকা হউক এই মর্মে যে তাঁহারা তাঁহাদের
আবিষ্কৃত জিনিষের একটি কাগ পাইবেন। এই প্রস্তাবকেও
আমরা আশঙ্কাজনক মনে করি। হইতে পারে যে,
আমরা এখন এই সব জিনিষের সন্ধান বুঝি না; হইতে
পারে, যে, এখন আমাদের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক পনন-
কার্যে দক্ষ লোক যথেষ্ট নাই; হইতে পারে যে,
পননকারী আবিষ্কৃত লিপি প্রত্নতাত্ত্বিক বুঝিবার
লোক একজনও বা যথেষ্ট আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু
আমরা অপেক্ষা করিতে চাই; আমরা দেশবাসী সর্ব-
সাধারণকে এই-সব জিনিষের অমূল্যতা বুঝাইতে চাই;
আমরা ক্রমশঃ অধিকাংশকে স্বদেশবাসীকে এইগুলি
বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য দেশে ও বিদেশে শিক্ষা দিতে
চাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও ইতিহাসের
প্রমাণ ভারতবর্ষেই থাকা উচিত। একল সভ্যদেশই
নিজের দেশের প্রাচীন জিনিষ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা
করিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা কঠিনতর করিতেছে।

ইহা অতি অসম্ভব ব্যাপার, যে, আমাদের দেশের
ইতিহাসের মূল উপকরণ ও আকর্ষণগুলি পরীক্ষা ও অধ্যয়ন
করিতে হইলে আমাদের বিদেশে যাইতে হইতেছে।
আগে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা
করিয়া লাভ নাই, প্রতিকারের উপায় থাকিলে তাহা
অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এখন যে-সব জিনিষ
আবিষ্কৃত হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে
এখন হইতেই এরূপ কড়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যাহাতে
সেগুলি হাত-ছাড়া না হয়।

ধনের প্রতি কুপণের লোভ, কিম্বা কথামাল্য বর্ণিত
অশ্বের খাদ্যাধারে শয়ান পরশ্রীকাতর কুকুরের মনো-
বৃত্তির মত কোন ভাব হইতে আমরা এসব কথা
লিখিতেছি না। অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ, আমাদের

অতীত ইতিহাস আমাদেরও লেখা উচিত। তাহার
জন্য কেবল মাত্র বিদেশীদের-লেখা ইতিহাস অবলম্বন
না করিয়া মূল উপকরণ ও আকর্ষণগুলিই প্রধানতঃ
অবলম্বন করা উচিত। সেইজন্য এই উপকরণগুলি
এদেশে রক্ষিত হওয়া আবশ্যিক। আমরা যথেষ্ট যত্ন-
সহকারে রক্ষা করিতে না জানিলে বিদেশ হইতে শিখিয়া
আসা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি, প্রাচীন
ভারতের কথা বিদেশীরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার
মধ্যে অনেক তুল ও অসম্পূর্ণতা আছে। এইরূপ
খুঁৎ নানা কারণে জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যথেষ্ট
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব একটি কারণ। আর
একটি কারণ, ভারতবর্ষকে হীন প্রতিপন্ন করিবার
প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি ভারত-শাসক ইংরেজ-জাতির
মধ্যে প্রবল ও সুস্পষ্ট; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যেও
আছে। সকলে জ্ঞাতসারে এই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া
চলিতে না পারেন, কিন্তু বৈদেশিক অনেক ত্রীতহাসিকের
মনের উপর ইহার প্রভাবের অস্তুত্ব অস্বীকার করা যায়
না। বর্তমানে ত ভারতবর্ষ হীন আছেই; অতীতেও
হীন ছিল দেখাইতে পারিলে কোন-কোন বিদেশীর
আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়। এইজন্য তাহারা অতীতের
ভারতকে যথাসম্ভব আসিরিয়া, কালডিয়া, বাবিলন, গ্রীস
ও পারস্যের নিকট পুণ্য করেন, এবং বর্তমানে ভারত ও
ইউরোপের নিকট হইতে শিথিতেছেই। তাহা হইলে
কথাটা দাঁড়াইবে এই, যে, ভারতবর্ষ আগেও ইউরোপের
সম্বন্ধে একটি দেশের শিষ্য ছিল, এখন ত সকলেরই
শিষ্য। অসভ্য ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার অঙ্গার
ইহাতে বেশ তৃপ্ত হয়।

তা' ছাড়া, ঐতিহাসিক বিষয়ে ইংরেজের সন্দেহী
সাধারণত এই যে, ভারতবর্ষ আগে কোন কালে প্রজ্ঞার
অধিকার বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না, এবং স্বায়ত্ত-
শাসন ইংরেজরাই প্রথম এদেশে প্রবর্তিত করিতেছেন।
ভারতবর্ষকে স্বরগাভীত যুগ হইতে আত্মশাসনে অনভ্যস্ত
বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাকে স্ব-শাসন ক্ষমতা
হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া বঞ্চিত রাখিবার বেশ-একটা
ওজুহাত পাওয়া যায়। কেন না, যে জাতি কোন কালে
স্বশাসক ছিল না, তাহার ঐ বিদ্যা শিখিতে দু'পাচ
শতাব্দী লাগা চাই!

যে-সব তথাকথিত প্রমাণের বলে যে-সব প্রমাণ
চাপা দিয়া ভারতবর্ষের অতীতকে বিকৃত করিয়া দেখান
যায়, সবগুলিই ভারতীয়দের চোখের সামনে থাকিলে
বিদেশীদের তুল সংশোধনের সুবিধা হয়। অবশ্য, স্বদেশ-ও
স্বজাতি-প্ৰীতিবশতঃ আমাদেরও তুল হয়। কিন্তু
একদিকে আমাদের অতিরিক্ত ভারত-প্ৰীতি ও অন্তর্দিক

কোন-কোন বিদেশীর অতিবিক্ত ভারত-বিষেব বা ভারতের প্রতি অবজ্ঞা—এই উভয়ের ফলে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার সাহায্য হইতে পারে।

এই সকল কারণে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক সব-রকম জিনিষের ভারতবর্ষে রক্ষণেরই পক্ষপাতী।

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী সরাইবার প্রস্তাব

কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী-নামক যে বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে, তাহার বহিঃগুলি দিল্লীতে সরাইবার প্রস্তাব অনেক বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। এখন বোধ হয় ব্যাপারটা ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাই কলিকাতায় কিছু সাড়া পড়িয়াছে।

এই প্রস্তাবটি অদ্বৈত। প্রস্তাবকদের যুক্তি এই, যে, আগে কলিকাতা ভারত-খর রাজধানী ছিল এবং লাইব্রেরীটি ভারত গবর্নমেন্টের টাকায় সমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন রাজধানী দিল্লীতে হইয়াছে, অতএব লাইব্রেরীটিকেও সেখানে লইয়া যাইতে হইবে। এই যুক্তির সিন্ধুটিকে ঠিক কাংশাজ্ঞানমোচিত করিতে হইলে বলা উচিত, বৎসরের যে কয়মাস রাজধানী দিল্লীতে থাকে সেই কয় মাস দিল্লীতে এবং সে কয়মাস উহা সিমলায় থাকে সেই কয়মাস সিমলায় লাইব্রেরীটিকে রাখা উচিত। কারণ দিল্লী একমাত্র রাজধানী নহে।

বস্তুতঃ রাজধানী হইলেই সাম্রাজ্যের সব কিছু সেইখানে রাখিতে হইবে, ইহা বড় অদ্ভুত কথা। অষ্ট্রেলিয়ার নূতন রাজধানী ক্যানবেরা নামক স্থানে নির্মিত হইতেছে, এখন আছে মেলবোর্নে। ক্যানবেরায় যখন রাজধানী যাইবে, তখন কি মেলবোর্নের সব বিদ্যাসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানও উক্ত স্থানে স্থানান্তরিত হইবে? কখনই না। ভারতবর্ষেরও সব সাম্রাজ্যিক প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে অবস্থিত নহে, পরেও হইবে না, হইবার কোন প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় নাই। সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত দেৱাদুনে প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজ আছে; তাহা ভারত গবর্নমেন্টের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। তাহা দেৱাদুনেই থাকিবে। যাহা রাজধানীতে ছিল, অন্তত তাহা রাখিলে কাজ ভাল হইবে বলিয়া তাহা স্থানান্তরিত করিবার দৃষ্টান্তও আছে। এপর্যন্ত মীটিংরলজিক্যাল বিভাগের (যাহার দ্বারা বড়ের গতি, মেঘবৃষ্টির সময় ও সম্ভাবনা প্রভৃতি লক্ষিত ও সূচিত হয়) প্রধান আফিস ছিল সিমলায়, কিন্তু এই কাজ মহারাষ্ট্র দেশের প্রধান নগর পুনা হইতে অধিকতর সুন্দর রূপে নির্বাহিত হইবে বলিয়া, গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন, যে আবহ বিদ্যার প্রধান পর্যবেক্ষণ মন্দির ও আফিস অতঃ-

গ্রন্থাগারের প্রধা: উৎকর্ষ সাধনে, সাহিত্য রা শহরে যত বেশী লোক'বিম করিতে চায়, সাহিত্যরস চা লাইব্রেরীর উপর দাবী তত অপেক্ষা বিচাৰ্ণী, গবেষক, স আছে। এখানে যত ফুল কলেজ আছে, তাহার সংখ্যাও সহিত দিল্লীর তুলনাই হয় না। তাছাড়া এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃহৎ আর্টস্ ও বিজ্ঞান শিকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট দুটি বিভাগ আছে, যাহার সমতুল্য কিছু দিল্লীতে নাই। এখানে এশিয়াটিক সোসাইটি আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আছে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি আছে, আরও কোন কোন সমিতি আছে, যাহাদের সমতুল্য দিল্লীতে কিছু নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক ও লেখকগণেরও ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর সাহায্য দরকার হয়। কলিকাতায় এইরূপ যত ও যে-দরের কাগজ আছে, দিল্লীতে তাহা নাই। হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবীদেরও ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী কখন কখন কাজে লাগে। দিল্লীতে হাইকোর্ট নাই। দিল্লীর পক্ষে কেবল এই কথা বলা যায়, যে, সেখানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের বৈঠক বসে। কিন্তু উাদিগের সভাগণের ব্যবহার্য অতঃ লাইব্রেরী আছে। তাছাড়া, তাঁহারা ত সিমলাতেও বৈঠক করেন; তাঁহাদের সুবিধার জন্ত ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীবে স্থানান্তরিত করিতে হইলে উহাকে চাকার উপর বসাইয় এঞ্জিন্ সহযোগে চলিষ্ণু করিয়া কখন দিল্লীতে কখন সিমলায় লইয়া যাইতে হয়।

শেষ যুক্তি এই, যে, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক গবর্নমেন্টে টাকায় যখন এই লাইব্রেরীটি সমৃদ্ধ হইয়াছে ও রক্ষি হইতেছে, তখন উহা কেন কলিকাতায় থাকিবে? আম বলি কেন থাকিবে না? কলিকাতাও ত ভারতসাম্রাজ্যে অন্তর্গত; কলিকাতার লোকেরাও ভারতসাম্রাজ্যের প্রজা ভারত গবর্নমেন্টে যে টাকা ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীে দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন, তাহা একমাত্র দি হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কলিকাতা হইতেও তাহ অনেক অংশ সংগৃহীত হইয়াছে। দিল্লীর ওকালতী যাহা করেন, তাঁহারা দেখান্ যে দিল্লী কলিকাতার চেয়ে বে টাকা ভারত গবর্নমেন্টকে দেয়। একা কলিকা ভারত গবর্নমেন্টকে ভারতগবর্নমেন্টের লভ্য ইনকম্-ট্য ও পার্টের শুদ্ধ যত কোটি টাকা দেয়, দিল্লীর সব রকম রাজস্ব তাহা হইতে অনেক অনেক কম।

ইহা অবশ্য ঠিক কথা, যে, সাম্রাজ্যিক জিনিষ হই লাভবান্ হইবার অধিকার সাম্রাজ্যের সব লোকে আছে। কিন্তু ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীটি সাম্রাজ্যের বে

একটা স্থানে রাখিতে হইবে, আলো ও বাতাসের মত উহা সর্বত্র থাকিতে পারে না। দিল্লীর পক্ষপাতীদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, উহা সেখানে রাখিলে কলিকাতায় রাখা অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিকতর লোক তদ্বারা উপকৃত হইবে। ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী টাকা অমান্য রাখিয়া তাহার সর্বস্বত্ব ডাকে বন্দি পাঠাইয়া থাকেন, ফাত্তাভের ডাকমাশুল পাঠককে দিতে হয়। ডাকমাশুল দিল্লী হইতে যত কলিকাতা হইতেও তত; অধিকতর শিক্ষিত জনবহুল নগরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির অধিকাংশ দিল্লী অপেক্ষা কলিকাতার অধিকতর নিকটবর্তী।

পূর্ববর্ণিত সমুদয় কারণে আমরা মনে করি, কলিকাতা ও বাঙালীর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় এবং দিল্লীর অশ্রায় লোভ এই প্রস্তাবের মূলভূত; সমুদয় ভারত-সাম্রাজ্যকে অধিকতর উপকৃত করিবার ইচ্ছা ইহার মূলভূত নহে।

কলিকাতার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্বান-মণ্ডলী, প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র প্রতিবাদ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত-গবর্ণমেন্টের নিকট অবিলম্বে প্রেরিত হওয়া উচিত।

ক্ষিত্রীয় নিয়োগীর পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক বিল্

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে কারখানা ও মিলে-প্রস্তুত যত-রকম জিনিষ আমদানি হয়, তাহা কোন দেশে উৎপাদিত, তাহার ছাপ বা অন্তবিধ বর্ণনা দিতে রপ্তানী বা আমদানী-কারককে বাধ্য করিবার কোন আইন নাই। পণ্য-বিষয়ক আইনে এইরূপ বাধ্যতামূলক ধারা বসাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিত্রীশচন্দ্র নিয়োগী একটি বিল্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনিবার নোটিস্ দিয়াছেন। এইরূপ আইন হইলে জাপানী ও অন্ত বিদেশী যে-সব জিনিষ বিদেশী বলিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকান হয়, তাহা বিদেশী বলিয়া জানা পড়িব। অনেক বিদেশী মোটা মিলের কাপড় অনেক দোকানে গন্ধর বলিয়া বিক্রী হয়। এইরূপ প্রতারণা ক্ষিত্রীশ-নাবুর প্রস্তাবিত আইনদ্বারা বন্ধ হইলে দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উপকার হইবে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হইতেছে,

তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু একটা সাধারণ নীতির কথা এখানে বলা দরকার। জমিদার কিম্বা কোন শ্রেণীর প্রজার এতাবৎকাল-প্রচলিত কোন অধিকার ধর্ম বা রহিত করা অসম্ভব ও আবশ্যিক বিবেচিত হইলে, তাহার অধিকার ধর্ম বা রহিত হইবে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ উপযুক্ত মূল্য দেওয়া কর্তব্য; কেবল আইনের ছোরে কাছাকাছ ক্ষতি করা উচিত নয়। আয়ারল্যান্ডের নূতন ফ্রীটেট্ রাষ্ট্র জমির উপর জমিদারদের স্বত্ব লুপ্ত করিয়া কৃষককে মালিক করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জমিদারদিগকে কিস্তিবন্দী করিয়া সরকার হইতে পুরা মূল্য দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই মূল্য কতকৃৎক্ষম-প্রজার নিকট হইতে আদায় হইবে, কতক ফ্রীটেট্ রাষ্ট্র সরকারী টাকা হইতে দিবে।

এই বিষয়-সম্বন্ধে গাঙ্গারা আরও কিছু জানিতে চান, তাঁহারা বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ সেন্ট নিহাল সিং-লিপিত ও ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ওয়েল্‌ফেয়ার (Welfare) মাসিকে প্রকাশিত “বায়ািং আউট্ ল্যান্ডলর্ডস্” (“Buying Out Landlords”) -শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িতে পারেন।

অধ্যাপক ফর্মিকির বিদায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক আচার্য্য কার্লো ফর্মিকির বিশ্বভারতীতে কয়েক মাস কাজ করিবার জন্য আগমনের সংবাদ আমরা যথাসময়ে দিয়াছিলাম। তাঁহার কার্যকাল শেষ হওয়ার তিনি গত ২৬ শে ফাল্গুন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে প্রথমতঃ শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে বিদায়-সূচক সংবর্দ্ধনা করেন। তাহাতে উভয় পক্ষের পরস্পরের সহিত হৃদয়ের যোগ সূক্ষ্ম প্রভিভাত হইয়াছিল। তাহার পর ২৫ শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ ‘বিচিত্রা’ গৃহে তাঁহাকে বিদায় দান উপলক্ষ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিখিত ও সম্ভাবপূর্ণ অভিব্যক্তি পাঠ করেন। উত্তরে আচার্য্য ফর্মিকি সাশ্রুনেত্রে ও বাস্পভারাক্রান্ত কর্ণে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্বভারতীর প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যে প্রীতি ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বর্গগতা জননী শুভ্রন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা

